বরিশালের যোগেন মণ্ডল

দেবেশ রায়

এই নভেলটি ১৯৩৭
থেকে ৪৭-এ বাংলায়, একমাত্র
বাংলাতেই, যা সব ঘটনা ঘটেছে ও
যে-সব ঘটনার ফলে বাংলা সারা ভারতের
শাসননীতি ও রাজনীতি থেকে
বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে থাকে,
তার নানা গল্প।

বাংলা ছিল মুসলিম প্রধান ও তপশিলিজন অধ্যুষিত। কংগ্রেসের হিন্দুওয়ালা নেতারা সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে তাড়ালেন। মুসলিম লিগের অবাঙালি নেতারা ফজলুল হককে লিগ থেকে তাড়ালেন। ব্রিটিশ যুদ্ধনীতি পূর্ব পরিকল্পনামত সিঙ্গাপুর, মালয়, ব্রহ্মদেশ ও থাইল্যান্ড থেকে পশ্চাদপসরণ করে বাংলাকে যুদ্ধের পূর্ব রণাঙ্গন করে তোলে। ফলে, নিম্নবঙ্গকে ধ্বংস করে দেয়া হল ও যুদ্ধের রেশন চালাতে বাংলায় ঘটল ৪৩-এর দুর্ভিক্ষ। ৪৫-এ ম্যালেরিয়া মহামারী। ১৯৪০ পর্যন্ত ও ১৯৪৫-এর পর হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ছিল বাংলার নিজস্ব রাজনীতি।

ভারতের অন্য কোনো প্রদেশ থেকে বাংলা কোনো প্রকার সাহায্য পায়নি। এমনকী সর্বাধিক সংখ্যক রাজবন্দীদের জন্যও তারা জেলখানায় জায়গা দেয়নি।

এই নতুন সময়ে বাংলার তপশিলি নেতা বরিশালের যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ছিলেন অবিসংবাদী শূদ্রনেতা। তিনিই প্রথম বলেন, উচ্চবর্ণ হিন্দুদের রক্ষা করা শূদ্রদের কাজ নয় ও মুসলমানদের সঙ্গে শূদ্রদের শ্রেণীগত মিল অনেক বেশি। এই শূদ্র যোগেন মণ্ডলই একমাত্র ভারতীয় যিনি পাকিস্তানকে তাঁর স্বদেশ বলেছিলেন ও সেই কালবেলায় ভারতবর্ষ-ধ্যানটিকে রক্ষা করেছিলেন।

ISBN : 978-81-295-1073-0

অঙ্কন : হিরণ মিত্র

দেবেশ রায়, জন্ম ১৯৩৬।

তিনি কখনো নিজের পুনরাবৃত্তি করেন না। —সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে দোসরহীন, তাকে সেই মর্যাদা দিয়েই দেখতে হবে।
—সত্যেন্দ্রনাথ রায়

চরম আধুনিক লেখক বলে মনে হয়।
—সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

ভিন্নতর এক গদ্যস্থাপত্যে উপন্যাসের বৃহৎ নির্মাণ। —অমলেন্দু চক্রবর্তী

এই আধুনিক সময়ের সম্ভবত সবচেয়ে আধুনিক গল্পকার। —অশ্রু কুমার সিকদার

আধুনিক বাংলা-উপন্যাস ঠিক যে যে জায়গায় দুর্বল, ... ঠিক সেইখানেই দেবেশের রাজকীয় আধিপত্য।—পূর্ণেন্দু পত্রী

দেবেশ নিবিষ্টচিত্ত নিপুণতায় প্রায় একটি মহাকাব্য লিখেছেন যা একই সঙ্গে উপন্যাস এবং সমকালীন ইতিহাস, কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। —শিবনারায়ণ রায়

বরিশালের যোগেন মণ্ডল

উপন্যাস

বরিশালের যোগেন মণ্ডল

উপন্যাস

দেবেশ রায়

দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা ৭৩

উৎসর্গ

বেণুমাসিকে

বেণুমাসি ছিলেন আমাদের মাতৃসমা। তিনি সারাজীবন আমাদের লালনপালন করেছেন।

দেশ থেকে জলপাইগুড়িতে যখন চলে আসি আমরা, ৪৩-এ, বেণুমাসি তো তখন আসবেনই। ১৯৫৩ পর্যন্ত সমরেশ ছিল আমাদের সবচেয়ে ছোটভাই। সমরেশের জন্মের পর মা এমন অসুখে পড়েন যে তাঁকে স্থানান্তরে নিয়ে যেতে হয়। আমরা ভাইবোনরা কখনো-সখনো ভাবতাম মা আর বেঁচে নেই। কিন্তু বেণুমাসি আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন।

সমরেশকে লালন করেছেন। সমরেশ তার ছোট মা-র কাছেই খেত-শুত। আমার মা-কে বেণুমাসি ডাকতেন 'বৌমা' বলে। এমন ভাবতে চাই এখন, এমন ভাবতে ভাল লাগে, আমরা ভাইবোনরা শূদ্রাণী-পালিত বংশ।

এই উপন্যাসটির গল্পটুকুতে আমার সেই বাল্য-কৈশোর-প্রথম যৌবনের পারিবারিক শূদ্রপ্রচ্ছায়া চিনতে পেরেছি, রচনার সময় জুড়ে বেণুমাসির গলার স্বর শুনতে পেয়েছি ও ভারী কাজের ওতপ্রোত বিষণ্ণ ক্লান্তিতে বেণুমাসির অদৃশ্য হাতের ছোঁয়ায় সেরেও উঠেছি।

এ-লেখাটি বেণুমাসি ছাড়া কাউকে দেয়া যায় না।

নববর্ষ ১৪১৭

লেখকের কিছু বই

উপন্যাস

মফস্বলি বৃত্তান্ত

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত

সময় অসময়ের বৃত্তান্ত

আত্মীয় বৃত্তান্ত

শিল্পায়নের প্রতিবেদন

একটি ইচ্ছামৃত্যুর প্রতিবেদন

দাঙ্গার প্রতিবেদন

খরার প্রতিবেদন

তিস্তাপুরাণ

মারবেতালের পুরাণ

যযাতি

আপাতত শান্তিকল্যাণ হয়ে আছে

মানুষ খুন করে কেন

জীবনচরিতে প্রবেশ

বেঁচে বত্তে থাকা

স্বামী স্ত্রী

ইতিহাসের লোকজন

লগনগান্ধার

সহমরণ

চেতাকে নিয়ে চীবর

জন্ম

আঙিনা

ব্যক্তিগত ফ্যাসিবিরোধী একটি উপন্যাস

ছোটগল্প

দেবেশ রায়ের গল্পসমগ্র—৬ খণ্ড

প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর আদি গদ্য

সময় সময়কাল

উপন্যাস নিয়ে

উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে

শিল্পের প্রত্যহে

উপনিবেশের সমাজ ও বাংলা সাংবাদিক গদ্য

তারাশঙ্কর নিরন্তর দেশ

কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন

যে-কোনো আক্কেলে মানুষই বুঝবেন—পুরনো একটি সময়, অনেকেরই জানা ঘটনা ও মানুষজন নিয়ে এত জনবহুল ও পৃষ্ঠাবহুল একটি লেখা কত মানুষের কত রকম সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। শিল্পকর্মের তেমন কোনো কৃতজ্ঞতার দায় স্বীকার করা অনর্থক। কিন্তু যদি কারো শারীরিক শ্রম নিয়ে থাকি, তা স্বীকার না-করা ঋণখেলাপি।

সমরেশ রায়, আমার ভাই, যা খেটেছে সেটাই এই বইটি লেখা হয়ে-ওঠার প্রধান একটি কারণ। বাংলাদেশের শামীম রেজা ও অন্যান্য বন্ধুরা হাত-উজাড় সাহায্য করেছেন। অধ্যাপক বন্ধু স্বপন পাণ্ডা, শাশ্বতী মজুমদার, মণিময় মুখোপাধ্যায় এঁরা নিজেদের শরীরের অসুবিধে, ও শেষ দু-জন কলকাতা আসা-যাওয়ার নিত্য বাধা, যে-অনায়াসে উৎরে এই এত বড় লেখার প্রুফ একাধিক বার দেখে দিয়েছেন সেটা যেন রহস্যময় ঠেকে। শাশ্বতীই একমাত্র নানা আকারে পুরো পাণ্ডুলিপি অনেকবার পড়েছেন ও তাঁর স্বাধীন মত-অমত জানিয়ে আমাকে সংস্কারে সাহায্য করেছেন। অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বদলি, টানা ও পাকা প্রুফের ও অনবরত বদলের ঝামেলা মিটিয়েছেন। সিতশ্রী ভড় ম্যাপগুলো এঁকে দিয়েছেন আমার আবছা ইচ্ছে অনুমান করে। বর্তমানে দিল্লিবাসিনী নিবেদিতা সেন-এর আঁকা অনেক ছবি দেখছিলাম—তাঁর কল্পনা ও সামর্থ্যে মুগ্ধ হয়ে। এই ছবিটি তিনি প্রচ্ছদে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন।

সবচেয়ে বেশি রাত জাগতে হয়েছে মুদ্রক দিলীপ দে-কে। দিলীপ কিছুতেই কেন যে হাল ছাড়েননি!

আমার প্রধান প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে আমাকে শুধু আরো নির্ভরশীল করে তুললেন দু-বছরের বেশি সময় ধরে বইটি ছাপানোর প্রক্রিয়া সয়ে।

আমার বন্ধু অরুণ সেন লেখালিখি সংক্রান্ত সব ব্যাপারেই আমার ভরসা ও চিরসখা। ফোন, ইন্টারনেট, বইপত্র, ম্যাপ জোগাড়, লোকজনের হদিশ এত সব জটিলতা অরুণই সামলেছেন।

দেবেশ রায়

বল্মীক আবাসন
কলকাতা ৭০০ ০৫৯

নববর্ষ, ১৪১৭

অধ্যায়সূচি

যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রায় সম্পূর্ণ বিস্মৃত এখন। ১৯৩৭ থেকে ৪৭ এই দশটি বছরে তিনি ছিলেন বাংলার নমশূদ্রদের অবিসংবাদী নেতা। বাংলার ও ভারতের রাজনীতিতে পরে তিনি প্রধানতম বিসংবাদী নেতা হয়ে ওঠেন। ১৯৪৩-এ খাজা নাজিমুদ্দিনের প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় তিনি ছিলেন। ৪৬-এ পুনর্নির্বাচিত হয়ে সারওয়ারদির মন্ত্রিসভাতেও। ১৯৪৬-এ তিনি মহম্মদ আলি জিন্না কর্তৃক অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভায় মুসলিম লিগের প্রতিনিধি মনোনীত হওয়ায় হিন্দু ও মুসলিম দুই জাতেরই শত্রু হয়ে পড়েন। তিনি পাকিস্তানের প্রথম মন্ত্রিসভায় আইনমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫০-এ কলকাতায় চলে আসেন। আম্বেদকর ও যোগেন মণ্ডল তাঁদের শূদ্রতার কারণে কোনো জাতীয়তাবাদেই গৃহীত হন নি। কিন্তু বহু নিন্দা ও বিরোধিতার পর কংগ্রেস দলিত-ভোটের জন্য আম্বেদকরকে জাতীয়-আখ্যানের দেবমণ্ডলিতে জায়গা করে দেয়। বাংলা বিভক্ত হওয়ায় যোগেন মণ্ডল সম্পর্কে তেমন কোনো দায় বা ভয় জাতীয়তাবাদীদের ছিল না। তাঁকে তাই ইতিহাস থেকে স—ম্—পূ—র্ণ মুছে দেয়া হয়েছে। তাঁর নাম এখন কোনো
স্থানীয় ইতিহাসের ফুটনোটেও থাকে না।

অধ্যায়সূচি বিভাজক মধ্যবর্তী সংখ্যাটি খণ্ড নির্দেশক। বাঁ মার্জিনের সংখ্যা অধ্যায়সূচক। ডান মার্জিনের সংখ্যা পৃষ্ঠাঙ্ক।

১

১ যোগেন মণ্ডল 'বরিশালের মেগাস্থিনিস' / ১৯
২ যোগেনের ভোটপ্রচার / ২৬
৩ যোগেনের ভোটপ্রচার : ইসারদির হাট / ৩১
৪ ভোটের সাতসকালে দুঃসংবাদ / ৩৫
৫ ১৯৩৭-এ বরিশালে সাইকেল / ৩৯
৬ : সাইকেলে ব্যক্তিত্ব : অশ্বিনী দত্ত ও যোগেন মণ্ডল / ৪৪
৭ : সাইকেলে ইতিহাস : বীরনগর, কাশীপুর, লাখুটিয়া, শিকারপুর, মাধবপাশা, চাঁদপাশা, দেহের গতি... / ৪৯
৮ : সাইকেল জলপথে ওপারে, বাটাজো৷ড়ে / ৫৩

৯ : কংগ্রেসের পৈতে-তিলকের নখদাঁতের বদলা / ৫৬
১০ : বাটাজোড় থেকে দলবলে ফিরে, একলা / ৬১
১১ : প্রভু জগবন্ধু জয়, যোগেনো মণ্ডলো জয় / ৬৫
১২ : কাটা জিভের ভাষা / ৭৩
১৩ : দুর্গা সেনের কাছে / ৭৯
১৪ নৌকাপথে মৈস্তারকান্দি / ৮২
১৫ : যা জিগ্যাইবেন তা সত্যি তো? / ৮৮
১৬ : মিলনশয্যায় যোগেনের জাগরণ ও কিছু পুরনো কথা / ৯৩
১৭ : বরিশালে ঝালাই নাই? / ১০১
১৮ : যোগেনের সংবর্ধনা / ১০৬
১৯ যোগেনের রিস্টওয়াচ ও ফাউন্টেন পেন লাভ ও নানা বাবুসাক্ষাৎ / ১১০
২০ যোগেনের প্রিপজিশন / ১১৭
২১ : হরির লুট / ১২৫
২২ : ফজলুল হকের বার্তা / ১২৯

২

২৩ : হকশাহেবের বাড়ি / ১৩৯
২৪ : সরষের তেল ও বেগুনের কাঁটা / ১৪২
২৫ : হকশাহেবের গান-তোলানো / ১৪৪
২৬ : ফজলুল হকের মাথা ও যোগেনের সন্দেহ / ১৫০
২৭ যোগেনেরা এল কোত্থেকে? যায় না-হয়—কলকাতায় / ১৫৪
২৮ : একটা কোরাস তৈরি হওয়ার আগেই ভেঙে গেল / ১৫৮
২৯ : একটু হয়ত দেরিতে, কিন্তু পৌঁছে গেল যোগেন / ১৬৫

৩

৩০ যোগেন এমএলএ কলকাতায় / ১৭১
৩১ : তপশিলিদের মিটিং / ১৭৮
৩২ : শুধু হিন্দুও নয়, শুধু মুসলমানও নয় / ১৮৪
৩৩ : শুদ্দুর থাইকলেও নাই / ১৮৯
৩৪ যোগেনের বোঝাবুঝি / ১৯৫
৩৫ সেক্রেটারি : শিডিউল্ডকাস্ট অ্যাসেমব্লি পার্টি / ১৯৯

৪

৩৬ : কংগ্রেস-হক আলোচনা / ২০৭
৩৭ এক কংগ্রেসের কটা ঘর / ২১০
৩৮ : হকশাহেবের জনসাধারণ ও তুলসী গোঁসাইয়ের বক্তৃতা / ২১৪

৩৯ : নলিনী সরকার মাঠে নামেন / ২২০
৪০ : হকশাহেব-সামসুদ্দিন-নাজিমুদ্দিন-সারওয়ারদিদের নৈশভোজ / ২২৪
৪১ : নলিনী সরকারের অসাম্প্রাদায়িক ডিনার / ২২৯
৪২ খবর ফাঁসাতে সামসুদ্দিন অমৃতবাজারে / ২৩১
৪৩ : কংগ্রেস-এর হকত্যাগ ও হকশাহেবের লিগপ্রবেশের ফলাফল / ২৩৪
৪৪ : বড়লাট লিনলিথগোকে লেখা ছোটলাট অ্যান্ডারসনের গোপন চিঠি / ২৩৭

৫

৪৫ : নবাব ফারুকির প্রস্তাব : স্যার রহিমকে মন্ত্রিসভা গড়তে ডাকুন / ২৪৩
৪৬ : হকশাহেবকে ডাকেন ছোটলাট, পরদিন মন্ত্রী হওয়ার লাইন / ২৪৭
৪৭ : আইনসভার প্রথম অধিবেশন ৭ এপ্রিল, ১৯৩৭ : নামাজহেতু বিলম্ব / ২৫৫
৪৮ : 'কংগ্রেস যেন স্পিকারপদে প্রার্থী না দেয়' / ২৬০
৪৯ : স্পিকার ভোট ঠেকে থাকে : অনাস্থার কাগজে কংগ্রেস সই জোগাড়ে লাগে / ২৬২
৫০ যোগেন আইনসভায় রপ্ত হচ্ছে / ২৬৮

৬

৫১ যোগেন এল বরিশালে / ২৭৯
৫২ যোগেনের ডাকা মিটিঙের দূত মুহুরি শিবু / ২৮২
৫৩ যোগেনের সঙ্গে বরিশালের কর্তাব্যক্তিদের কথোপকথন / ২৮৪
৫৪ : আগৈলঝরায় যোগেনের মিটিং / ২৮৮
৫৫ : শ্বশুরবাড়িতে যোগেন / ২৯৭
৫৬ যোগেনের স্ত্রী-সম্ভাষণ / ৩০২
৫৭ যোগেনের গোপালগঞ্জ যাত্রা ও প্রহ্লাদ ও শিবুর কাছে নিজের রাজনৈতিক দর্শন উত্থাপন / ৩০৭
৫৮ যোগেনের কীর্তিতে প্রহ্লাদ ও শিবুর গৌরব / ৩১২
৫৯ : বিলের পথে রাজনীতি / ৩১৮
৬০ : উপকথাময় সেই দেশ / ৩২৩
৬১ : শিডিউল আর মুসলমানদের মিলমিশই বেশি / ৩৩১
৬২ পদ্মবিল্যা কাইজ্যা : আদিকথা / ৩৩৬
৬৩ পদ্মবিল্যা কাইজ্যা : মধ্য কথা / ৩৪০
৬৪ পদ্মবিল্যা কাইজ্যা শেখদের প্রতিশোধ / ৩৪৪
৬৫ পদ্মবিল্যা কাইজ্যা : কবিগান / ৩৪৬
৬৬ : ভাদ্রের স্নানযাত্রা আর নমশূদ্রবিজয় যাত্রা / ৩৫০
৬৭ যোগেনের কবিগান শেখশুদ্দুর মিলন / ৩৫৪

৭

৬৮ : বন্দীমুক্তি আন্দোলনে যোগেন পথ পায় না / ৩৬৩
৬৯ আইনসভায় গভর্নরের ভাষণ / ৩৬৮
৭০ গভর্নর ভয় পেলেন / ৩৭১
৭১ : ক্যাবিনেট : লাটশাহেবই চেয়ারে, অনুরোধক্রমে / ৩৭৩
৭২ যোগেনের এমএলএ-গিরি : মন্ত্রীর সঙ্গে / ৩৭৮
৭৩ যোগেনের এমএলএগিরি সেক্রেটারির সঙ্গে / ৩৮১
৭৪ যোগেনের এমএলএগিরি : বড়বাবুর সঙ্গে / ৩৮৬
৭৫ যোগেনের এমএলএগিরি : ঢাকা মেলে / ৩৯০
৭৬ যোগেনের এমএলএগিরি : রাজবাড়ির এসডিওর সঙ্গে / ৩৯৬
৭৭ পদ্মায় ভাসমান যোগেনের এমএলএগিরি ডেপুটির সঙ্গে / ৪০১
৭৮ : সিলেটমুখী যোগেন, শায়েস্তাগঞ্জে / ৪১৬
৭৯ : হবিগঞ্জে তুলসীমালা / ৪২৩
৮০ শিমুলগড়ে যোগেন তর্কালঙ্কারের তর্কযুদ্ধ / ৪৩৫

৮

৮১ : লাট-বেলাটের দরবার ও বিপ্লবীদের বোমা-গুলি / ৪৪৫
৮২ : রাজবন্দীদের মুক্তি নিয়ে গান্ধীজির মধ্যস্থতা। ফলে স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চে ইনফর্মার প্রথা চালু। / ৪৫০
৮৩ : মহাজনি বন্ধ ও টেন্যান্সি নিয়ে যোগেনের উলটো ভাবনা / ৪৫৪
৮৪ : সুভাষ ও শরৎ বোসের সঙ্গে যোগেনের দেখাশোনা / ৪৫৮
৮৫ : সুভাষ বোসের চাঁদসী চিকিৎসা করে যোগেন / ৪৬৬
৮৬ ফেরার পথে যোগেনের কিছু ভাবনা / ৪৭০
৮৭ : অ্যালবার্ট হলের মিটিং / ৪৭৬
৮৮ : শূদ্র জাত নিয়ে সুভাষ বোসের সঙ্গে যোগেনের একটু-আধটু তর্কবিতর্ক / ৪৮৭
৮৯ : শরৎ বোসের টিপার্টির রাজনীতি / ৪৯৮
৯০ গান্ধী সকাশে / ৫০২
৯১ : গান্ধীজির লুকনো দোস্ত / ৫০৬
৯২ : বরিশালের তরল অন্ধকার / ৫০৮

৯

৯৩ গান্ধী মুগ্ধতা থেকে পরিত্রাণ / ৫১৭
৯৪ : আন্দামান ফেরতদের সঙ্গে যোগেন / ৫২৫
৯৫ মাহিলাড়ার কৃষক সম্মিলন / ৫৩০

১০

৯৬ হকের খপ্পরে মণ্ডল / ৫৯৫
৯৭ : হক-মণ্ডল চোর-পুলিশ / ৫৯৮
৯৮ হক-মণ্ডল ইকুয়েশনের খেলা / ৬০২
৯৯ হক-মণ্ডল যাত্রা / ৬০৫
১০০ শিশির ভাদুড়ীর মেবার পতন / ৬০৮
১০১ : ইন্টারভ্যালে গিরিশের সন্দেশ / ৬১২
১০২ ইন্টারভ্যালের পর / ৬১৩
১০৩ শিশির সকাশে হক / ৬১৬
১০৪ থিয়েটার থেকে ফেরা থিয়েটারে / ৬২০
১০৫ : দ্যাট ইট অয়্যার ডান কুইকলি / ৬২২

১১

১০৬ সুভাষ বোসের কাজে যোগেন / ৬২৭
১০৭ এম এন রায় / ৬৩১
১০৮ যাদুগোপাল / ৬৩৫
১০৯ সাতদিনের বিবৃতি যুদ্ধ / ৬৩৭
১১০ সুভাষের জয়-পরাজয়-নতুন রণাঙ্গন / ৬৪৪
১১১ 'সব কিছুর পরও সুভাষবাবু তো আর দেশের শত্রু নন' / ৬৫০
১১২ : কলকাতা এআইসিসি ৩৯ / ৬৫৫
১১৩ : ক্ষমতা দেখে যোগেনের আতঙ্ক / ৬৬২

১২

১১৪ শিবের নন্দীর মত / ৬৬৭
১১৫ যোগেনের বডিসার্চ / ৬৬৯
১১৬ ছেলেকে নিয়ে খেলা / ৬৭১
১১৭ ছোটকবর্য়াজ / ৬৭৬
১১৮ : দুর্যোগ শুরু / ৬৮১
১১৯ দুর্যোগের রাত / ৬৮৭
১২০ : দুর্যোগসহ সকাল / ৬৯০
১২১ যোগেন দুর্যোগে যায় / ৬৯৫
১২২ মুলাদি / ৬৯৯
১২৩ দুর্যোগের মাঝবন্দর ভাসানচর / ৭০৬
১২৪ ভোলার সাইক্লোন / ৭১১

১২৫ : চরভাসান থেকে বরিশাল : নদীর নৈরাজ্য / ৭১৫
১২৬ : বরিশালে : মণ্ডল-মিয়া তর্ক / ৭১৭
১২৭ : দুর্যোগ নিয়ে মিটিং ও মিটিঙে দুর্যোগ / ৭২০

১৩

১২৮ মুসলমান আপকানট্রি ও ডাউনকানট্রি / ৭৩১
১২৯ : রহমানের ঠাকুরদাদার মুসলমানি / ৭৩৫
১৩০ : কর্পোরেশন ভোটে যোগেনের স্ট্র্যাটেজি / ৭৩৮
১৩১ ভোটে গোঁজ / ৭৪৪
১৩২ : ইস্তাহারে যোগেনপক্ষ / ৭৫১
১৩৩ যোগেনকে নিয়ে মিছিল / ৭৫৩

১৪

১৩৪ : সুভাষসহ বরিশালে / ৭৫৯
১৩৫ : সুভাষের সভায় সভাপতি যোগেন / ৭৭১
১৩৬ ধাঙড় ধর্মঘট / ৭৮০
১৩৭ শাকিনা-যোগেন সাক্ষাৎ / ৭৮৪
১৩৮ শাকিনা ও ধাঙড় স্ট্রাইক...নতুন ধরনের কষ্ট / ৭৯২
১৩৯ একদিনের জন্য প্রোগ্রাম স্থগিত / ৭৯৮
১৪০ ধাঙড় স্ট্রাইকের সমর্থন-বিতর্ক / ৮০৪
১৪১ পনের নম্বরের সভা / ৮০৬
১৪২ যোগেনের কানে ভারত আহ্বান / ৮২০
১৪৩ নাগপুর থেকে ভারত আহ্বান / ৮২২
১৪৪ সুভাষ-যোগেন শেষ দেখাশোনা / ৮২৬
১৪৫ : সুভাষ প্রহেলিকা / ৮৩১

১৫

১৪৬ : আবার মন্ত্রিসভা, আবার হকশাহেব, এবার প্রোগ্রেসিভ / ৮৩৭
১৪৭ শরৎ বোসের অ্যারেস্টের পর / ৮৪২
১৪৮ উডবার্নের বাড়িতে / ৮৪৪
১৪৯ মুসলমান ঐক্য নানা রকম / ৮৪৭
১৫০ : লাহোর প্রস্তাব ৫ মার্চ ১৯৪০ / ৮৪৯
১৫১ : কংগ্রেস ও পাকিস্তান প্রস্তাবের পর...কর্পোরেশন দখল / ৮৫১
১৫২ বেঙ্গল টেনান্সি বিল হারিয়ে গেল / ৮৫৪
১৫৩ পাটও কী করে হারানো যায় তার শলা / ৮৫৬

১৬

১৫৪ ঢাকায় সেনসাসের দাঙ্গা / ৮৭৭
১৫৫ : হিন্দু ও মুসলিম দাঙ্গায় তপশিলিরা কোথায়? / ৮৮৩
১৫৬ নতুন দাঙ্গা / ৮৯৩

১৭

১৫৭ ঘটনা, রটনা ও গুজব / ৯০৫
১৫৮ : শ্যামাপ্রসাদের রণনীতি ও গান্ধীজির আখেরি লড়াই / ৯০৯
১৫৯ : হকশাহেবের স্টাইল : যুদ্ধে ও শান্তিতে / ৯১৯
১৬০ : জাতীয়তাবাদ বলেও কিছু একটা / ৯২৬
১৬১ জাত, জাতি, জাতীয়তা বিভ্রাট / ৯২৯
১৬২ : মহাদেশ বিভ্রাট ও যুদ্ধবিভ্রাট ৪২ / ৯৩৩
১৬৩ : দলবিভ্রাট নীতিবিভ্রাট / ৯৩৬
১৬৪ কালানুক্রমিক ও বিষয়ানুক্রমিক / ৯৩৯

১৮

১৬৫ যোগেনের তিন সাক্ষাৎ / ৯৫৭
১৬৬ : যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ / ৯৬৫
১৬৭ বেকবুল দেশ—ডিনায়্যাল / ৯৭৭
১৬৮ বেকবুল দেশের তল্লাশ / ৯৭৯
১৬৯ : অলৌকিক আরো তল্লাশ / ৯৮৫
১৭০ লৌকিক কিছু প্রতিকার / ৯৮৮
১৭১ খরচের খাতায় বাংলা / ৯৯৪

১৯

১৭২ গৃহযুদ্ধে পক্ষবিভ্রাট / ৯৯৯
১৭৩ গৃহযুদ্ধে পক্ষ সাজানো / ১০০৩
১৭৪ নৌযুদ্ধ / ১০০৯
১৭৫ বায়ুযুদ্ধ / ১০১১
১৭৬ বাংলার তপশিলিদের পার্টিশন / ১০১৬

২০

১৭৭ ১৬ আগস্টের জুয়ো কে কার পার্টনার? / ১০২৭
১৭৮ তারিক-ই-যোগেন / ১০৩৩
১৭৯ যোগেন অন্তর্বর্তী সরকারে / ১০৪৩
১৮০ যোগেনের নভেল ত্যাগ / ১০৪৭
১৮১ ও স্বদেশযাত্রা / ১০৫৫

যোগেন মণ্ডল 'বরিশালের মেগাস্থিনিস'

'আরে, মুই—না চব্বিশডা ঘণ্টার উপুর আরো চব্বিশ চাপ্যাইয়া—না নাগাড়ে কই, বাবু, মুই হিন্দু, মোর বাপ—চোড্ড পুরুষ হিন্দু, মোর নাতি-নাতনিরা চোদ্দডাও হিন্দুই হইব, আমাগ তো হিন্দু না হইয়্যা কুনো উপায় রাখেন নাই। বাবুরা চইঠ্যাই থাহে, ব্যাডা তুই হিন্দুই তবে এক পোয়া কম। মুই কই তাইলে মোর ঐ খালাশ এক পোয়াডায় মুই জল মিশাই—স্যায় খালেরল জল নদীর জল যাই হোক, তার লগে তো আপনাগ কোনো নিষেধ নাই আমাগও কোনো প্রাচিত্তির নাই। কিন্তু বাবুরা তো বাবু তাইলেও বরশালিয়া বাবু। একবার যদি রগ চইড্যা। চইড্যা যায়, আর নামা নামি নাই। কয়—বেটা নম, তোগো আবার পুরাপুরি চারপোয়া ক্যা রে। যা, ঐ এক পোয়া কমই থাকবি।'

নিজের কথায় যোগেন মণ্ডল নিজেই হেসে ওঠে তার সুস্থ, স্বাস্থ্যল, পেশল শরীরে ছড়ানো তেত্রিশ বছর বয়সের যৌবন নিয়ে। তার সেই খোলা আওয়াজের হাসিতে গোপন প্রতাপের প্রকাশ একটু অমীমাংসিত থাকে। না-হয় বরিশাল সদর আদালতে ঢুকতে-না-ঢুকতেই নামগাম করেছে, না-হয় বারে যোগ দেওয়ার আগেই ভোটে জিতে লোকাল বোর্ডের মেম্বার হয়েছে, না-হয় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে মনোনীত মেম্বার, আর দিন-পনের পরে এমএলএ ভোটের প্রার্থী, কিন্তু এর কোনো একটি কারণে বা সবগুলি কারণ এক করে দিয়ে একটা কারণ তৈরি করে নিলেও, একজন নমশূদ্রের পক্ষে এমন একটা বৈঠকে এতটা জোরে এতক্ষণ ধরে হাসাটা, একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না? যোগেনের হাসিটা শেষ হওয়ার মুখে তার ঠোঁটের বিস্তার কমে এলে তার সম্মুখপাটির দাঁতগুলি যেমন দেখা যায়, তাতে কারো মনে হতেও পারত, যোগেনের একেবারে ভিতরে একটা আক্রমণ যেন লেজ ঝাপটাচ্ছে। লেজই ঝাপটাচ্ছে বটে তবে দৃষ্টি, যোগেনের দৃষ্টি, সম্পূর্ণ লক্ষনিবদ্ধ নয়—যেন লক্ষ নিয়ে দ্বিধা ঘটে যাচ্ছে।

বাংলা তেতাল্লিশ সালের পৌষের মাঝামাঝি বরিশাল শহরের বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'বরিশাল হিতৈষী'র ছাপাখানায় বসে কথা হচ্ছিল মালিক, প্রকাশক, মুদ্রক, সম্পাদক ও একাই একশ দুর্গামোহন সেনের টেবিল ঘিরে। টেবিলটা ঠিক দেখা যাচ্ছে না—এত নানা সাইজের কাগজের স্তূপ। সেই স্তূপের ভিতর থেকে অনেক কাগজের লালচে কোনা বেরিয়ে আছে—সেগুলো যে কতই পুরনো তার নিশানা দিয়ে। একটি কোণে পাঁজা করা পুরনো পাঁজি। ওপর থেকে একটা আলো ঝোলানো, টেবিলের মাঝামাঝি, কেরোসিনের লম্বা চোঙের আলো, চোঙের মাথায় একটা কাগজের ঘের বসানো, আলো যাতে ছড়িয়ে না পড়ে। টেবিলে দুর্গামোহন সেনের সামনে

একটু জায়গা, পৌনে একহাত মত, আর তার মুখোমুখি চেয়ারটার সামনে খানিকটা, বিঘতখানেক, ফাঁকা—কাজের দরকারে। ঘরের ভিতর দুটো বড় র‍্যাকে 'বরিশাল হিতৈষী' স্তূপ করা, আর-একটাতে শাদা কাগজ, দু-তিন সাইজের। দুর্গামোহন সেনের টেবিল ঘিরেই ইতস্তত ছড়ানো ছ-সাতটি কাঠের ও টিনের চেয়ার। এর বাইরেও বারান্দার দিকে দুটো-একটা টুল ছিল। এগুলো কম্পোজিটারদের টুল—এখন ভিড় সামলাতে এখানে দেয়া হয়েছে।

থা হচ্ছিল, দুদিন আগে টাউন হলের সাধারণ সভার ঘটনা নিয়ে—মাস দেড়েকের মধ্যে ৩৫ সালের 'ভারতশাসন আইন' অনুযায়ী প্রাদেশিক আইনসভা তৈরির প্রথম ভোট। সভাপতির ভাষণের জায়গায় যখন সভা পৌঁছেছে যোগেন মণ্ডল দাঁড়িয়ে জানায়, সে কিছু বলতে চায়। সভাপতি ঠিক বুঝতে পারে না, কী করবে। সে বলে উঠল, 'কিন্তু তুমি তো ক্যানডিডেট!' যোগেন হেসে উঠে বলে, 'তার লগেই তো কব্যার চাই। নাকী বরিশাল নিয়্যা আমার ভাবন-কহন প্রহিবিটেড হইয়া গেল নাকী? আমি তো ভাইবছিলাম উলটা। নাইলে আমার ভোটে দাঁড়ানোর কামডা কী ছিল? সবে তো সেরেস্তা খুইলছি, ভোটে জিতলে তো ওকালতির হাঁড়ি শিকায় উঠব। আর, ভোটে হাইরলে তো নাম হইব নে—হারুয়া উকিল, মামলা জিইতব্যার পারব না। ভোটের কথা ছাড়ান দ্যান। আমার কথা আছে—বরিশালের লাইগ্যা, খালবিলের লাইগ্যা, ইশকুল-কলেজের লাইগ্যা। কইব্যার দিবেন, মিস্টার প্রেসিডেন্ট, স্যার?'

ততক্ষণে সভা থেকেই কথা ওঠে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ'।

'আরে যোগেনেরই তো আগে ডাকা দরকার ছিল'।

'ওর মত কেউ চেনে নাকী বরিশাল?'

'কও, কও।'

যোগেন মণ্ডল তখন বরিশালের একজন এমন নেতা হয়ে উঠছে, যার কথার দিকে কান আর কাজের দিকে নজর রাখতে শুরু করেছে টাউনের মানুষজন। বারে যোগ দিতে-না-দিতেই কয়েকটা কেস এমন জিতল যোগেন, যে কারো কোনো সন্দেহ থাকল না—যোগেন বরিশালের প্রধান উকিলদের একজন হবেই। তার ওপর তার ইংরেজি বাগ্মিতা সহজেই মুগ্ধ করত। সেই মুগ্ধতার মধ্যে এমন একটা অতিরিক্ত তারিফও গোপন থাকত—ব্যাটা নমো-র ছেলে, ইংরেজি কয় য্যান্ কার্ভালো। বরিশালে তখন 'কেদার রায়' যাত্রার খুব চল ছিল। যোগেনের সিনিয়ার ছিলেন, বরিশালের একডাকে চেনা উকিল কুলদারঞ্জন দাশগুপ্ত। যোগেন ভোটটোটে দাঁড়ানোয় তিনি বিরক্ত হয়েই বলেছিলেন, ইংরেজিতে, 'ইভেন ইফ ইন্ডিয়া গেট্‌স্ ফ্রিডম, হোয়াট উড শি ডু উইথ দিস ইরিট্রিভিবল লস অব সাচ এ ব্রিলিয়্যান্ট অ্যান্ড রেয়ার লিগ্যাল ব্রেন টু পলিটিকস।' কুলদারঞ্জনের রাগ কমাতে যোগেন তাঁকে আশ্বস্ত করতে বলেছিল, 'কীই যে কন স্যার, ওকালতি না কইরলে বাড়িতে হাঁড়ি চইড়ব ক্যামনে?'

যোগেনের এই প্রকাশ্যতা ও স্পষ্টতা সকলের চেনা হয়ে যাচ্ছিল আর তা থেকে তার ওপর একটা ভরসা তৈরি হচ্ছিল।

বোধহয়, আর একটা বড় কারণ ছিল, গোপনে।

বরিশাল অশ্বিনী দত্তের দেশ। এত দূরে, এত দুর্গম একটি জেলাকে সারা বাংলায় যে প্রাধান্যে তিনি নিয়ে গেলেন, সে বরিশালবাসীর গৌরবকথা। জনসেবা, শিক্ষা, জাতিবৈরিতার অবসান, এক নাগরিক সমাজ তৈরি করে তোলার দরকার ও এক সামাজিক নৈতিকতা, তাঁর কাছ থেকে বরিশালবাসী শিখেছিল ও বরিশালের কাছ থেকে সারা বাংলা শিখতে চাইছিল। দূরত্ব ও দুর্গমতা

হয়ত বরিশালকে এমন সমষ্টিবদ্ধ জীবন তৈরি করার পক্ষে দরকারি বিচ্ছিন্নতা দিয়েছিল। বরিশালের বিচ্ছিন্নতা ছিল বরিশালবাসীর একক বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন। ও কতকটা উদ্ভট এক স্থানপ্রেমের অনড় অবলম্বন।

কিন্তু অশ্বিনী দত্তের সময় থেকে বিশ-তিরিশ বছর পর তাঁর কর্মসূচির প্রাসঙ্গিকতা কমে আসছিল। যেন মনে হতে শুরু করেছিল যে এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপে স্বাদেশিকতার সাধনা হয়ে উঠছে গূঢ় কিছু ধর্মাচরণের মত। তার সঙ্গে বরিশালের খুব একটা বাঁধন কিছু নেই। বরিশাল খালবিলের দেশ, পঞ্চাশ পা যেতে হলেও সেখানে একটা খাল পেরতে হয় আর সেইসব খালে ভরা জোয়ারের জল সমুদ্র থেকে কলকলিয়ে বয়ে আসে প্রায় সব বাড়ির পৈঠায় দিনে বার কয়েক। বরিশাল জুড়ে নমশূদ্র আর মুসলমান জনগোষ্ঠী ছড়ানো বামুন-কায়েত-বৈদ্যরা খুব নামডাক নিয়ে আছেনও তাঁরা তাদের গ্রামগুলিকে শহুরে করে নেন। এখানকার বেশির ভাগ মুসলমানই ফরাইজি। বিরিশালে একদিকে 'ভক্তিযোগ', অন্যদিকে বামুন বৈদ্য-মুসলমান সকলেই আর, নমশূদ্ররা ছড়িয়ে আছে অসংখ্য জমিদারির চাষী হয়ে। বরিশালের জমিদারির ব্যবস্থাও আলাদা—একজন মধ্যস্বত্বভোগীর জমি থেকে ধাপে-ধাপে নেমে গেছে উপস্বত্বভোগীরা। নামডাকের জমিদারিও কিছু কম ছিল না—কীর্তিপাশা, বাটাজোড়, কোদালধোয়া, গৌরনদী, হিজলা। একবার এক হিশেবে বেরিয়েছিল এক জমিদারির জমিদার থেকে রায়ত পর্যন্ত উনিশজন উপস্বত্বভোগীর ধাপ।

১৯১১-এর সুমারিতে সারা বাংলায় নমশূদ্রের সংখ্যা গোনা হয়েছিল প্রায় ২১ লক্ষ। এর পরের সুমারিগুলোতে জাত জানাতে আপত্তি শুরু হয়ে যায়। ১১ সালের সুমারিকেই প্রামাণিক ধরা যায়। এই প্রায় ২১ লক্ষ নমশূদ্রের ছ-আনি, আট লাখই, থাকত—বাখরগঞ্জ, দক্ষিণ ফরিদপুর, নড়াইল, মাগুরা, খুলনা, বাগেরহাট মিলিয়ে যে-ডাঙা, সেখানে। এগুলো সবই ১১ সালের হিশেব। ১৯২০ থেকেই সরকার ভাঙনের নদীর চরে দখল মেনে নিতে শুরু করে। সেই চরের দখল নিতে জমিদাররা এই নমশূদ্র আর মুসলমান জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগাত। তখন থেকেই এই স্থলদেশ একটা মারামারি-কাটাকাটির জায়গা হয়ে যায় কিন্তু তাতে হিন্দু-মুসলমান ভাগাভাগি ছিল না।

বরিশালের এই জলময় পশ্চাদভূমির সঙ্গে বরিশাল শহরের সম্পর্ক ছিল একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে। এমন বোধহয় আর কোনো জেলায় ছিল না। সদরে বাংলাখ্যাত ব্রজমোহন কলেজ, হাইস্কুল, ব্রাহ্মসমাজ, সাপ্তাহিক পত্রপত্রিকা, কংগ্রেস ও অন্যান্য দল, কলকাতার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ, কলকাতার নেতাদের মিটিং। নমশূদ্রদের যারা নেতা ছিল তারা যদি-বা ২০-২৫ সালে জনগোষ্ঠীভিত্তিক নানারকম আন্দোলন করেছে, সেসব আন্দোলন বেশিরভাগটাই ছিল হিন্দু বর্ণসমাজে নমশূদ্রদের জায়গা ওপরের দিকে তোলার চেষ্টা। ৩০ সাল নাগাদ সেই নেতারা কৃষক-নমশূদ্রদের নিয়ে মাথা ঘামায়নি—তখন কাউন্সিল, লোকাল বোর্ড আর ইউনিয়ন বোর্ডে ঢোকার হাওয়া। নমশূদ্রদের নেতাদের অনেকেই কংগ্রেসের ও নেতা হয়ে গেছে—কেশবচন্দ্র দাস, মোহিনীমোহন দাস। ফজলুল হক কৃষকপ্রজা পার্টি তৈরি করেছিলেন। সে পার্টি মুসলিম রাজনীতির এই ফাঁকটা ভরে দিল বটে কিন্তু তপশিলি জাতি নিয়ে তাদের মাথাব্যথা ছিল না। নমশূদ্র নেতারা কেউ বর্ণাশ্রম ও শূদ্র দাসত্বের কথা ভাবেনি। নমশূদ্রেরা না-ঘরটা না-ঘাটকী হয়ে থাকল। তাই তপশিলি জাতির জন্য আসন সংরক্ষিত রেখে প্রায় সর্বজনীন ভোটাধিকার দিয়ে ৩৭ সালের যে ভোট হল—সেটাকে উপলক্ষ করেই বরিশালে নমশূদ্রদের নতুন নেতৃত্ব তৈরি হয়ে গেল নিজে থেকেই। তৈরি হওয়ার পর বোঝা গেল, সেই নেতৃত্বের প্রথম ও প্রধান

ব্যক্তি—যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, বিএ, বিএল, যে মাত্র ৩২ বছর বয়সে বরিশাল বারে ঢুকল আর বছর ঘুরতে-না-ঘুরতেই আইনসভার ভোটে দাঁড়াল সাধারণ আসন থেকে, সংরক্ষিত আসন থেকে নয়। কেন, কী—সেটা আলাদা ঘটনা। আর-একটু পরে, আরো বোঝা গেল—যোগেনের মত নেতা পাওয়ার ফলেই ফাঁকটা চেনা গিয়েছিল। বরিশালের একটা নেতা চাই। এই ভোটেরই দিনপনের আগে বরিশাল টাউন হলের সেই সভা, যোগেন যেখানে উপযাচক হয়ে বক্তৃতা করেছিল। সেই বক্তৃতা শুনে 'বরিশাল হিতৈষী'-র সম্পাদক দুর্গামোহন সেন এতটাই মুগ্ধ হন যে তাঁর কাগজে যোগেনকে নতুন বরিশালের নতুন নেতা, 'বরিশালের মেগাস্থিনিস,' বলে বর্ণনা করেন।

দুর্গামোহন সেন কংগ্রেসি, যেমন যে আর-কিছু না, সে কংগ্রেসি। তাঁর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা ছিল নির্ভীক সত্যভাষণের জন্য। তাকে নিয়ে একটা প্রবাদই চালু ছিল, 'বরিশাল-গান'। মেঘনায় যখন সমুদ্র থেকে ষাঁড়াষাঁড়ির বান ডাকত, তখন, কখনো-কখনো কামানের গোলা ফাটার মত আওয়াজ হত। তার কারণ খুব একটা স্পষ্ট করে জানা যায়নি। তাকে বলত, বরিশাল-গান, ইংরেজি gun। দুর্গামোহন কখনো কাউকে প্রশংসা বা সমর্থন করতেন না। তাঁর মতামতে একটা হুল থাকতই। সে-কারণেই তাঁর মতামতের দামও ছিল খুব উঁচু।

সেই বরিশাল-গান যখন তাঁর কাগজে যোগেনের প্রশংসা করে তাকে 'বরিশালের মেগাস্থিনিস' আখ্যা দিলেন, তখন ভোটাভুটিতে যেন যোগেনের পক্ষে জোয়ারের স্রোত ঢুকল। যোগেন, পৌষের মাঝামাঝি এই সকালে দুর্গামোহনের সঙ্গে, দেখা করে কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছে। এসব কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা তখন তৈরি হয়নি, ঐ যোগেনের আসাতেই যা বোঝা যায় তা-ই। এসে, যোগেন আড্ডায় জমে গেল। সেখানে ছিলেনও শহরের দু-একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি। দিন চক্রবর্তী, বরদা ব্যানার্জি। দু-জনই বরিশাল বারের খুব বড় উকিল।

সাইকেল থেকে নেমে, ঘরে ঢুকে এঁদের দেখে, যোগেন বলে, 'আইজ কি কোর্ট ছুটি, স্যার? দুই-দুইজনই এইখানে। জজশাহেবরাই-বা কইরবে কী, মক্কেলগুলাই-বা কইরবে কী। এইডা কী কথা, স্যার? আর, সাক্ষীগুলারে যে এত মিথ্যা কথা শিখাইল্যাম, সব তো ভুইল্যা যাবে নে।'

বরদা-উকিলই বললেন—'তুমি তোমার ভোটের জায়গাগুলাত্ ঘুরান দিছ?'

'এইডা কি একডা সম্ভব কথা, স্যার? আমার কনস্টিটুয়েন্সি পুরাখান ঘুরান দিবার তো লর্ড লিনলিথগোও পারব না।'

'ক্যা? হইলডা কী?'

'হইব আবার কী স্যার? ভাইসরয়ের না-হয় একশখানেক লঞ্চ-ইস্টিমার থাইকতে পারে কিন্তু স্যার কোন খালে কোন লঞ্চ যাবার পারে এইডা কে ঠিক করব? এইডা কি একডা কনস্টিটুয়েন্সি স্যার? এইডা তো একখান মহাদেশ। তিন-তিনখান সাব-ডিভিশন, সদর, নর্থ, সাউথ, আর ভোলা। ষোলডা থানা। যে যে-জায়গার লোক, সে ছাড়া কেউ সেই জায়গা চিনে না। যাব ক্যামনে?'

'তার লগেই তো সেনমশাই তোমারে মেগাস্থিনিস কইছেন। তুমি বরিশালের আবিষ্কারক। তো কোর্টকাছারি পুরাপুরি বাদ দিয়ো না যোগেন। তোমার স্মৃতিশক্তির যা অবস্থা দেখি—'

'কেন স্যার। আমার মেমরি তো ভাল। দ্যাহেন স্যার, মাঝখান থিক্যা কয়্যা দেই

হেরো লয়ে মেঘ রাশ রাশ
লইয়্যা আলোক অন্ধকার।
কী গাঢ় গভীর সুখে

পড়িয়া ধরার বুকে
নাহি ঘৃণা নাহি অন্ধকার।
'বাঃ বাঃ, তোমারে তো 'দাঁড়া করি' টাইটেল দেয়া উচিত।
খাড়ায়্যা খাড়ায়্যা বানাইয়া দিল্যা?'
''স্যার, এই কাব্যটি আমার জিভে আসে। অক্ষয় বড়াল মশায়ের।'
'না। জিগাইল্যা না—আজ কোর্টে যাই নাই ক্যান?'
'সেডা তো এহনো জিগাই স্যার।'
'তুমি গেছিলা? না যাইবা?'
'যাইব স্যার, এখান থিক্যা বাড়ি, দুইডা মুখে দিয়া কাষ্ঠাহরণে যাইব।'
'যাইও না।'
'ক্যান স্যার? এতগুলা প্রাণীর আহার! কাষ্ঠ আইনব্যার লাগব না?'

'আজ-না সম্রাট বদলের ছুটি? তোমার মেমরি তাহলে তো ভালই। আর দিন কয়েক পরেই তো তুমি হইবা এমএলএ আর ষষ্ঠ জর্জ হইবেন কিং এমপেরার।'

'হ তাই তো! ৩১ ডিসেম্বর তো অষ্টম এডোয়ার্ড-এর সিংহাসন ত্যাগের দিন। হ স্যার। মুহুরি হালদার মশাই তো সেরেস্তা ছাইড়্যা মাথায় গামছা বাইন্ধ্যা ভোট কইরবার গিছেন কোথায়-না-কোথায়। ডায়রিখানাও দিয়্যা যান নাই।'

'মুহুরি একখান পাইছ যোগেন—শিবু হালদার।'

'কী কইব স্যার, শিবুবাবুরে আমি কইল্যাম, তুমি আমার মুহুরি নাকী আমি তোমার মুহুরি। কইরল কী কাণ্ডডা? নমিনেশন ফর্ম জমা দেওয়ার আড়াইশ টাকা পাব কুথায়। আর তহন আমি ভোটে খাড়াইতেও চাই না। শিবু কোথা থিক্যা টাকা আইনল, আরো কার কাছ থিক্যা কী নিল আর আমারে দিয়া সই কর‍্যাইয়া নমিনেশন জমা দিল।'

'অন্তত এই একডা কারণে শিবুর কাছে আমাগ কৃতজ্ঞ থাকা দরকার। সেই তো সগ্‌গলের আগে বুইঝছে—বরিশালের একখান নূতন নেতা দরকার। অশ্বিনী দত্তের নাম ভাঙানোর দিন শ্যাষ। এহন তো নতুন নেতা দরকার,' দুর্গামোহন সেনের কথা বলায় জিভে একটু আচমকা বাধা আসে। সেই কারণেই একটু কম কথা বলেন।

'কী যে কন স্যার,' স্বাভাবিকভাবে দুর্গামোহন সেনকে তো তার জ্যাঠাই বলা উচিত, কিন্তু যোগেন জানে, তার মত এক নমশূদ্রের জ্যাঠা হতে তাঁদের আপত্তিও থাকতে পারে। তাই, সে 'স্যার' এই শব্দটিই বেছে নিয়েছে। 'স্যার' শুনলে টাউনের বাঙালি বামুন-কায়েত-বৈদ্য খুশিই হয়।

'কী যে কন স্যার—আমার নি শিবুর কথায় ভোটে খাড়ানো সম্ভব ছিল? সোজা হিশাব দেইখ্যা একটুখান লোভ হইছিল। কংগ্রেস আর দুই স্বতন্ত্র যদি ভোটগুল্যা ভাগ কইর‍্যা দ্যায়, মাঝখান দিয়া আমি গইল্যা যাইতে পারি। সে লোভখান চাগাইতে-চাগাইতেই তো কীর্তিপাশার শীতাংশু রায়চৌধুরি স্যার উইড্র কইরলেন। আমার ভোটের শখও মিলাইয়্যা গেল। অ্যাহন তো রণক্ষেত্রে সরলকুমার দত্ত স্যার আর এই অভাগা। তাইন তো কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট আর অশ্বিনী দত্তের ভাইয়ের বেটা আর জমিদার। এক্কেরে মাহেন্দ্র যোগ। আমারে তো নস্যির নাগাল টাইন্যা নিবেন। তো কইল্যাম, শিবুবাবু, উইড্র করেন নমিনেশন। কিন্তু শিবু কইরল উলটা কামন—আপনাগো জানাইল, স্যানস্যারডে জানাইল, পাঁজিপুঁথি পাড়ার পণ্ডিতস্যারকে জোট কইরল। মনোরঞ্জন স্যার আইস্যা খুউব একচোট গালি দিলেন—হারামজাদা, ভোট কি তোর

একার যে তোর খাড়া হইবার হাউশ হইলে খাড়াবি আর সইর‍্যা যাবার হাউশ হলি সইর‍্যা যাবু। ভোটের ফল তো ভোটে। কিন্তু ভোটের আগেই একখান্ জিত্ তো আমার হইয়া গিছে, স্যার।'

'সেইড্যা কী। খুইল্যা কও।'

'সে স্যার আপনাগ কারণে। আমি তো শিডিউল সিটে খাড়াই নাই। আপনারাই স্যার এই নমশূদ্রকে হিন্দু বইল্যা সম্মান দিলেন।'

'হিন্দু সিট কও ক্যান? জেনারেল সিট কও।'

'কেডা কয় স্যার? এইডাই তো বরিশালের রেকর্ড হইয়া গেল—জিতি হারি যাই হোক। শিডিউল হইয়া জেনারেল সিট। এইডা স্যার বরিশালের বর্ণহিন্দুদের সাপোর্ট ছাড়া হইত না।'

'সে তো ভোটের পরের হিশাব মিলাইয়্যা দেইখতে হবি যোগেন। কিন্তু সেইডা তো কাস্ট হিন্দুগো ব্যাপার। কিন্তু হিন্দু বুইঝতে তুমি কী বুঝো?'

'না, না, স্যার, আমি তো এইডা কই নাই যে বেবাক বামুন-কায়েত আমারে ভোট দিবে। আমি কইছি যে আমার যে সাধারণ-আসন থিক্যা খাড়া হওয়া গেল, তার পিছনে তো স্যার কিছু বর্ণহিন্দুর, আপনাগ নাগান, সাপোর্ট পাইছি বইল্যা।'

'তুমি তো তোমারে হিন্দু বইল্যাই ভাবো? বাড়ির কাজকর্মে তো তোমাগ বামুন লাগে?'

'সে তো স্যার নমো-বামুন, পতিত। বামুন-কায়েতরা তো সেই পুরুত্ দিয়্যা তুলসীপাতাও ছোঁয়ায় না।'

'আরে, সেডা তো হিন্দুগ সাইডের কথা, সেডা তো তোমাগ সাইডের কথা না?'

'আমাগ সাইডের কি এইডা কম কথা স্যার? একডা নমকে হিন্দু-আসনে ছাইড়্যা দেয়া?'

'তুমি কি বামুন-কায়েত হবার চাও?'

'না স্যার, আমি নমশূদ্রই থাইকব্যার চাই। সে আকাঙ্ক্ষা ছিল আমাগ বাপ-ঠাকুরদার। পৈতা পইর‍্যা বামুন হবার ধরছিল না?'

'হয়। অ্যাহন তো হিন্দুগ সংখ্যা বাড়াইতে লাগব। বামুন-কায়েত আর কয়ডা? তাগো দিয়্যা তো আর ফজলুল হকরে সামাল দিয়া যাবে না। মুসলিম লিগরেও ঠেকান যাবে না।'

'সেইডা ঠিক কথা স্যার। যহন আমরা কইছিলাম, আমরাও বামুন, তহন বামুনরা কইল আরে চাঁড়াল তো চাঁড়ালই থাকব। আর, অ্যাহন মুসলমানরা যহন কবার ধইরছে আমরা আলাদা নেশন, তহন বামুনরা আইস্যা আমাগ ভজাইবার ধইরছে, আরে, চাঁড়ালও হিন্দু, তোগো কী সৌভাগ্য, হিন্দু বইল্যাই তো চাঁড়াল হইব্যার পারলি, মুসলমান তো আর চাঁড়াল হইব্যার পারে না। মোগল-বাদশাহেব পুরস্ত্রী মাত্রই অন্য রাজ্যের পাটরানী অপেক্ষাও বড়।'

'আরগুমেন্ট হিশাবে কিন্তু কথাডার একটা জোর আছে। কও, এর পালটা কী কবা? মুসলমান তো আর চাঁড়াল হইবার পারে না। সুতরাং বাই ইমপ্লিকেশন, চাঁড়াল ইজ অন এ সুপরিয়র লেভেল টু এ মুসলমান। তার মানে এইডাও দাঁড়াইতে পারে যে, এ চাঁড়াল হ্যাজ এ স্ট্যাটাস। বলো, এই আরগুমেন্টটা তুমি অ্যাজ পার জুরিসপ্রুডেন্স সায়েন্স, তুমি কাটান দিব্যা কেমনে? মানে, উই আর ডিসকাসিং অ্যান অ্যাকাডেমিক পয়েন্ট। তোমার শার্প সেন্স অব কাউন্টার-আরগুমেন্ট আমরা তো লইখ্য করি। ইন ক্রিমিন্যাল সাইড দ্যাট ইজ অ্যান আসেট।'

'এইডা কি একডা কথা হইল স্যার? ওকালতি কি বামুন-কায়েতদের বিয়ার দুই পক্ষের পুরুতের ঝগড়া? আমি তো স্যার, আপনাগো দেইখ্যা-শুইন্যা শিখত্যাছি—ওকালতি মানে শুধুই ল পয়েন্ট, গলা কাঁপাইয়া চিল্লালেই কি আর চাঁদরায় হয়?'

'সে বিষয়ে তোমার এড্ডু অসুবিধাই আছে, যোগেন।'

'কী অসুবিধা স্যার?'

'আরে, আমরা তো কেউ তোমার নাগাল পাবলিক স্পিকার না। কই, দেখছনি, কুনোদিন কুনো মিটিঙে মুখ খুলি?'

'সেডা তো স্যার আরো বড় স্পিকিং পাওয়ার। একডাও কথা কইল্যাম না কিন্তু যা বলার সব বলা হইয়্যা গেল।'

'আরে, কইতে পাইরলে তো কইব? কাল কোট, একখান চেয়ারের মাথা আর চোখের সামনে হাকিম না থাইকলে মুখে কথা ফোটে না। তুমি পারবা না যোগেন—তুমি য্যামন অরেটার, তোমার গলায় খুব ইনট্রিকেট ল-পয়েন্টেও, ঐ কইল্যা না, চাঁদরায়ের ঢক আইস্যা যাবে। তাতে ক্ষতিডা কী? এডা তো একডা অ্যাডিশন্যাল কোয়ালিফিকেশন। এই যে তোমার টাউন হলের মেগাস্থিনিস স্পিচে তুমি যে সেদিন কইল্যা যোগেন—ভেগাই হালদারের ইশকুলের কথা, ভর্তার বিলের কথা, মাহিলাড়ার মানে বাঘের গ্রামের খালের কথা—তহন সত্যি-সত্যি মনে আইল —হ তো, এইডাই তো আমাগ স্বদেশী হওয়া উচিত—এই ভেগাই হালদারের ইশকুল, বিলের বাঁধ, জলের খাল। এইডা তো তোমার স্পিকিং পাওয়ারের জন্যই সম্ভব হইল। আবিষ্কারের মত একখান। স্যান মশায় তোমার টাইটেলখান ঠিকই দিছেন—মেগাস্থিনিস!'

'স্যার, সইত্যের তো কুনো শত্রু হয় না। ঐ কথাডা তো আমার অন্তরের কথা স্যার, ওর সঙ্গে ভোটাভুটির কুনো সম্বন্ধই নাই স্যার। আমি স্যার, আপনাগো মন জাগাইব্যার জন্য কই নাই। আমার নিজের মন জাগানোর জইন্যে কইছি।'

'আরে, তা না হইলে কি তোমার কথাগুলা মন ছুঁইব্যার পাইরত, যোগেন? তোমার বিসমিল্লায় কুনো গলদ নাই।'

'আমি এইডা অনুভব করি স্যার, পৈতা পইর‍্যা আর পদবী পালটাইয়া নমশূদ্ররা কুনোদিন কাস্ট-হিন্দু হইবার পারব না। আরে, বামুন-কায়েত-বৈদ্যরা তো শুধু হায়ার কাস্ট না, হায়ার কালচার। সেই কালচার তুমি পাইব্যা ক্যামনে—এডুকেশন ছাড়া? এক এডুকেশনই তো তোমারে নমশূদ্র-পরিচয়ে প্রাইড দিবার পারে। স্যার, কয়ডা মানুষ জানে, খুলনার কুমুদ মল্লিক নমশূদ্রদের মইধ্যে প্রথম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ভীষ্মদেব দাস প্রথম উকিল, আর মল্লিকদের তিন ভাইয়ের কথা আর কী কইব। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির পালি ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর। আমাগ জাইতের তাতে কুনো চৈতন্য নাই। তাই উনাদেরও মনে থাকে না যে উনারা নমশূদ্র। এ নেশন উইদাউট এনি আইডেনটিটি। আমার স্যার, নমশূদ্র ছাড়া মানুষ নাই, বরিশাল ছাড়া দ্যাশ নাই।'

'যোগেন, যা কইছ—কইছ। আর কয়ো না। ধরো আমরা শুনি নাই। এ কথায় মানুষজন তোমারে ভুল বুইঝবে।'

যোগেনের ভোটপ্রচার

ভোটের দিন দশেক আগে পড়ল পুষুড়্যা।

দুনিয়া যদি রসাতলে যায়, তাও কোনো বরিশাইল্যাকে পুষুড়্যা বা পৌষপার্বণের দিন হাতের নাগালে পাওয়া যাবে না—'দে ভাই, একখান কাঁধ দে, দুনিয়াখান যে ভাইস্যা যায়, একখান কাঁধ লাগাইয়্যা এড্ডু ঠেকান দে।' 'আরে, এক দুনিয়া ভাইস্যা গেলে আর একখান দুনিয়া আবার কোটালের বানে ভাইস্যা আইসব—কিন্তু একখান্ পুষুড়্যা গেলে তো এক বছরের আগে ফিরব না। দুনিয়াডারে ভাইসব্যার দে এডডু। চিতৈ পিঠাডা খাইয়্যা নেই।' সরায় ছোট-ছোট গর্ত করা, নতুন চালের গুঁড়োয় ভর্তি করে উনুনের ওপর ভাপে তৈরি হয়। তারই নাম চিতৈ পিঠা—ফরিদপুরে-বরিশালে। অনেক জায়গায় বলে 'সরা পিঠা'। সরা পিঠা আকারে একটু বড় হয়, চিতৈ পিঠা তো বড় বাতাসার সাইজ। ভিরা গুড়ে ডুবায়্যে খাও চিতৈ আর নারকেলের পুর দেয়া চুষি, পুলি, পাটিসাপটা। এত গুড় আর এত দুধ আর এত নতুন চালের গন্ধে খালবিলের ওপর থিকথিকে মাছি ভনভন করে ওড়ে। মণ-মণ চিতৈ আর গুড় খাওয়ার পর পেট ছাড়ে। তবে খালবিল দিয়েই তো যাতায়াত। পেট ছাড়লে ক্ষতি কী? ক্ষতি কী? ক্ষতি কিছুই না—পেট না-বুইঝ্যা যদি পিঠ্যাও খাওয়া না যায়, তা হাইলে আর পুষুড়্যার কামডা থাইকল কী? দে ফেলাইয়া। কিন্তু ভোটটা একেবারে পুষুড়্যার গায়ে-গায়ে পড়ল! আজ পুষুড়্যা, ভোট আটই মাঘ আর গেজেট হবে একুশে মাঘ। পুষুড়্যাটা ঐ আট আর একুশের মাঝামাঝি পড়লে সব দিকটা রক্ষা পেত।

এর মধ্যে বরিশালের তিরিশ জন বর্ণহিন্দু ভদ্রলোক একটা ছাপা কাগজে ভোটারদের অনুরোধ করেছেন, তারা যোগেনকে এই সাধারণ আসনে সমর্থন করছেন, ভোটাররাও যেন যোগেনকে ভোট দেন।

এই কথাগুলি ছাপা কাগজ এই সব লোকদের নামে এই কেন্দ্রের প্রধান-প্রধান জায়গাগুলিতে বিলি করা হল। বর্ণহিন্দু ভোটারদের মধ্যে একটা মত যোগেনের পক্ষে দানা বাঁধতে থাকে। তবে মিছরির দানা নয়, ঢ্যাপের দানা, একটু জোরে বাতাস লাগলেই ঝরে যায়। ভোটের দিন যতই এগিয়ে আসে, মতটা ততই শক্ত হয়ে গড়াতে থাকে। যোগেন সেটা টের পেয়ে টাউনের হিন্দুপাড়ায় বেশি করে ঘুরতে লাগল।

ঐ ছাপা-কাগজ বেরবার দিন সাতেক পরেই সদর দক্ষিণ ও ভোলা থেকে খারাপ খবর আসতে শুরু করে। ঐ সব জায়গায় নাকী রটে যাচ্ছে যে যোগেনবাবু হিন্দু হয়ে গেছে ও কংগ্রেসে ঢুকে গেছে। ঐ ছাপা-কাগজ দেখিয়ে-দেখিয়ে বাবুরা, মানে বাবুহিন্দুরা, মানে কংগ্রেসিরা সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে, এই-যে ছাপানো দলিল, যাঁরা সই করেছেন এই-যে তাঁদের নাম, এঁরা বলছেন, যোগেনকেই আমরা ভোট দেব, আপনারাও যোগেনকেই ভোট দেন। দেখো, এই যে তিরিশজন মানুষের নাম—তার মধ্যে একটাও নমশূদ্র বা মুসলমানের নাম নেই।

বরিশালে যোগেন যে-বাড়িতে থাকে, সেখানে সবাই মিলে কথা হচ্ছিল, এই মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে কী করা দরকার। এক আধবুড়ো মোক্তার খেপে উঠে বলে, 'আরে যোগেন না-হয় বামুনই হইল, কিন্তু তাতে যোগেনের সুবিধাডা কী হইল? সে যদি কাস্টহিন্দুগ ভোট পাইয়া জিতে, তাইলে, কংগ্রেসের প্রার্থী তো হাইর‍্যাই যাবে নে। তাইলে?'

এই কথার নানা জবাব এল, কোনোটাই খুব স্পষ্ট নয়। ফলে, সেই মোক্তার রাগারাগি

শুরু করলেন, 'আরে, রাইত পোহাইলেই ভোট আর অ্যাহন সব সংবাদ আইনবার ধইরছে—কংগ্রেসের লিডাররা নাকী কইয়্যা বেড়াচ্ছে যে যোগেন মণ্ডল হিন্দু হইয়া গিছে।'

কেউ শুধরে দেয়, 'যোগেন মণ্ডল তো হিন্দুই। কন কংগ্রেস হইয়া গিছে—'

মোক্তারবাবু তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, 'আরে, থোন তো। ঐ তো এককথাই হইল। কংগ্রেসি লিডাররা মিটিং ধইর‍্যা কইল আর একডা মানুষও কানে হাত দিয়া দেইখল না—কান কানের জায়গায় আছেনি?'

বরিশাল শহরে যোগেনের কোনো বাড়ি ছিল না। সে প্রহ্লাদ দত্তের তার মোক্তারবন্ধু বাড়িতে থাকত। ওখানেই খেত—স্ত্রী বা বাড়ির কাউকে আনেনি। প্রহ্লাদ দত্তের বাড়িতেই এইসব কথা হচ্ছিল। দত্ত ঠান্ডা মাথার মানুষ, তার বয়সও চল্লিশ পেরিয়েছে। সে তার নিজের গলা একটুও না চড়িয়ে বলে, 'এই, উকিল-মোক্তারগ সঙ্গে কথা কওয়ার বিপদ।' কথাটায় একটু হাসাহাসি হল। যোগেন তো চুপ করেই ছিল, সে বেশ দুলে-দুলে হেসে উঠে, হাসি-হাসি মুখেই থাকল, চোখটা একটু নামিয়ে। অপদস্থ সেই রাগী মোক্তারবাবু, প্রহ্লাদ দত্তকে জিজ্ঞাসা করল, 'হইত্যাছে ভোটের কথা, ইর মধ্যি মোক্তারির কথা আসে কোথ্থিক্যা। কে না কে কইল যোগেন কংগ্রেস হইয়া গিছে, আর সব মানুষ চৈতন্যকীর্তন বাধাইয়া বসব? আরে আহাম্মকের দল, যোগেন কংগ্রেস হইয়্যা গেলে কংগ্রেসের ক্যানডিডেট সরল দত্ত কি বেগুন বেচবার বসব? আমার আরগুমেন্টের ত্রুটিখান কোথায়?'

প্রহ্লাদ দত্ত তার আগের গলাতেই বলে, 'স্যাও আবার খুঁইজবার লাগে? আরে, চেয়ারে তো মুনশেফ নাই, আরগুমেন্ট করো কার লগে? দুধ উথলাইলেও আখার মুখে আরগুমেন্ট কইরবা না কি?'

যোগেনের আচমকা উঁচু হাসিতে প্রহ্লাদ দত্তকে থামতে হল। হাসি শেষ হলে সে বলে, 'আরে, কথা একখান রটাইয়্যা দিয়্যা দশখান ভোট সরাইতে পাইরলেও তো অগ উবগার! সেইডা ঠ্যাকানের বুদ্ধি কর।'

যারা খবর নিয়ে এসেছিল, তাদের একজন বলে ওঠে, 'এই কথাখান তো খুব কঠিন কথা না। যোগেন মণ্ডল কংগ্রেস হইলে সরল দত্তর কী হইব। সেই কথা আমরা কইছি। তার পালটা কথা রটছে : যোগেন মণ্ডল যত ভোট পাবে সেইগুলা সরল দত্তকে বেইচ্যা দিবে। এর উত্তর কী দিব?'

প্রহ্লাদ দত্ত অনুচ্চস্বরে বলে ওঠে, 'অ, বেচাবেচি সব শ্যাষ? শুধু রেজিস্ট্রি বাকি? সেইডা হব ভোটের দিন?'

এ কথাতেও যোগেন একাই হেসে ওঠে। তাকে হাসতে দেখেও কেউ যে হাসে না, তার কারণ প্রহ্লাদ দত্তের কথার ভিতরকার কৌতুকটি সবাই বুঝতে পারে না। কিন্তু বুঝতে পারে এমনও তো ছিল অনেকে, তারাও হাসল না। তাদের মনে হচ্ছে হয়ত, এমন একটা গুরুতর খবরকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না।

যোগেন কারো দিকেই না তাকিয়ে বলে, 'শুইনল্যা কবে কথাডা পরথম?'

'আগের বারের ছোড হিজুরার হাটে।'

'কী? কংগ্রেসের লিডার সেইখানে মিটিং ধইরছিল?'

'না। আমরা মিটিং শুনি নাই। ছোড হিজুরার হাটে কথাটা কানে আইল।'

'কথা তো আর পাখি না যে তোমার মাথায় হাইগ্যা উইড়্যা যাবে। কথা তো গাই-বলদ—গলার দড়ি ধইর‍্যা টাইন্যা খুঁটায় বাঁইধব্যার লাগে। তোমাগো কানে কথাডা আইল ক্যাম্‌নে? এ তো

বেশ বিস্তারিত কথা। ফুস কইর‍্যা কেডা-না-কেডা আন্ধারে লুকাইয়া কইয়্যা গেল, তা তো না।'

'কথাডা আমরা শুইনছি আমাগ মাইনষের মুখে। যে কইছে স্যায় যে সব বুইঝ্যা-শুইন্যা কইছে, তেমন না। আমরা জিগাইব্যার ধরি। তহন আস্তে-আস্তে ঐ যে হিন্দু-উকিল-মোক্তারের একখান কথা ছাপা হইছে তার কথা, ভোট বেচার কথা—এই সব জাইনব্যার পারি। শুইন্যা মনে হইল কথাডার মইধ্যে কায়েতি বুদ্ধির মারপ্যাঁচ আছে, এ কাঁচা বুদ্ধির কাম না। তাই কথাডার পাঁজিপুথি খুঁইজব্যার যাই নাই। আপনাগ জানাবার আইসছি। কুনো বুদ্ধি থাইকলে কয়্যা দ্যান।'

'এহানে পুরুতঠাকুর কেডা আছে যে তোমাগো বিধান দিব? তোমার জায়গার ঘটনা, তোমরা যে ধইরতে পারছ—কথাডা পাকা মাথার কাজ—সেইডাই তো আসল কথা। তোমরাই কাটান দিবার পারবা। যারা এইসব কথা নিয়া কাতলা মাছের বিছন নাড়াবার তারা ভোটার তো?'

'সেইসব তো জানারও টাইম হয় নাই। যেইডা কইল, সেইডা তো আমগো লোক।'

'অ। আইজ ঐ দিকে কোন্ হাট?'

'আইজ তো ছোড হিজুরার হাট না।'

'ছোড হিজুরা দিয়্যা কামডা কী? সে হাটে তো দুইডা নৌকাও যায় না। ঐখানে কথাডা রাইখ্যা দেয়ার সুবিধা। কচ্ছপের ডিমের নাগাল। বড় হাট কিছু আইজ নাই, ঐ দিগে'?

'হয়। আইজ তো বিসারদির বড় হাট—চার বেড়ি লাগে নৌকা বাঁধব্যার লাগে।'

খাল, নদী আর নৌকো হচ্ছে বরিশালের একমাত্র নিরিখ। কত বড় হাট? না, এত নৌকো আসে যে হাট চার চক্করে ঘেরা হয়ে যায়।

'তো চলো। যাই বিসারদির হাট।'

'বিসারদির হাটে তো এ কথাডা উডে নাই। কাঠ না কামঠ জানার জইন্যে কুমিরের ল্যাজ তুইল্যা দেখনের কাম কী?'

'আরে, কথাখান উঠে নাই তো, আমরাই উঠাই। আর যদি উঠাইবই তাহলে ছোড হাজুরির নাগাল গেঁড়ি হাটে ফিশফিশ কইর‍্যা তুইলব ক্যান। যদি উঠাইবই তাইলে বিসারদির হাটেই উঠাইব। যারা শুনে নাই তারা শুইনবেও, জবাবও বানাইবে। চলো। বিসারদির হাট।'

'মিটিং তো ডাকা নাই।'

যোগেন একটু হেসে বলে, 'আরে, এই ভোট আইস্যা কী শিখাইল রে বাপ? মানুষের লগে কথা মিটিং ছাড়া কহা যাবে না?'

যোগেন দাঁড়িয়ে পড়েছিল, তারপর খুব নিচু স্বরে গেয়ে উঠল, 'যদি ডাকার মতন পাইরত্যাম ডাইকতে।' যোগেনের গানের গলার খ্যাতি আছে নিকটজনদের মধ্যে। 'খাড়াও, পিরান গলাইয়া আসি।'

বিসারদি বরিশাল শহর থেকে সোজা পুবে। এখন শীতের সময়—খালেবিলে জল কম, মানে ছোটখাটো খালেবিলে। বরিশালের খালবিল নদীনালার জল বর্ষা নিয়ন্ত্রিত নয়। বর্ষা টানা হলে হয়ত নতুন একটা খাতায় জল জমে উঠল—পায়ে-হাঁটার বদলে লোকজন ডিঙি বেয়ে এপার-ওপার শুরু করল—সে আর নতুন কথা কী—কত বাড়িতে তো বাহ্যি করতেও ডিঙা নিয়ে বাঁশবনে যেতে হয়। বর্ষা কমে এলে বা থেমে গেলে হয়ত সেই খাতের জল নেমে যায়, পায়ে হাঁটা পুরনো মাঠ বেরিয়ে পড়ে। কিংবা, বর্ষা শেষ হয়ে গেলেও খাতের জল সরল না—তখন ঐ ডিঙিতেই আসা-যাওয়া চলতে লাগল। কেউ জিজ্ঞাসাও করে না। সকলেই জানে, বর্ষায় জমা জলে 'জান' ঢুকে গেছে, অন্য কোনো বড় খাতের জল।

বরিশালের নদীনালা, খালবিলের জল, বাড়ে কমে, স্রোত পায়, মুখ বদলায় সমুদ্রের জোয়ার

ভাটায়। প্রতিদিন, প্রতি একটা সূর্যোদয়ে বরিশালের, প্রায় পুরো বরিশালের শিরা-উপশিরা দিয়ে জোয়ার বয়ে যায়—ঘোর দুপুরে, কাকভোরে, কৃষ্ণপক্ষের সন্ধ্যায় ঝকঝকে তারাগুলির টলটলে প্রতিবিম্ব মুছতে মুছতে। বা, শুক্লপক্ষে ক্রমোজ্জ্বল জলরাশির শীকরচ্ছটায় রহস্য ছড়াতে-ছড়াতে।

বিসারদি নদী, কীর্তনখোলার চরই প্রায়, আবার চর নয়ও। মানে, বিসারদি যেতে, বরিশাল থেকে, কীর্তনখোলা পেরতে হয় না। বরং বলা যায় কীর্তনখোলায় ঢুকতে হয়—বিসারদির তিনদিকেই কীর্তনখোলা। ভাঙনের নদীতে এইটুকু একটা জাগা ডাঙা, নদী হয়ে যেতে কতক্ষণ কিন্তু কী এক কারণে বিসারদির পাড় ভাঙে না কখনো, বা এমনকী কীর্তনখোলা কোনোদিনই 'ে'-কারের মত বাঁকটাকে সোজা করে নিয়ে বিসারদিকে চর বানিয়ে দেয়নি। তবে কারণও জানা গেছে, নদী গবেষণায়। যে-জোড়টুকু ভাঙেনি সেটা জলের ভিতরের বেশ উঁচু ডাঙা। অর্থাৎ কীর্তনখোলার বাঁকটাতে জল ততটা গভীর নয়, যতটা একটু বাঁয়ে। তাহলে তো জল বাঁয়েই যাবে। কিন্তু এসব তো নানা যন্ত্রপাতি দিয়ে জমি-নদী আর নদীর জমি মাপামাপির ফলে জানা গেছে। মানে, জানার মতন বিদ্যে যাদের আছে, তারা জানতে পারে, এখন। যাদের সে বিদ্যে নেই, তারা তখনো জানত না, এখনো জানে না। বরিশালের মানুষজনের জল, নদী, বন্যা, পাড়ভাঙা—এসব নিয়ে কোনোদিনই মাথাব্যথা নেই। ব্যথা করতে হলে মাথা কেটে বাদ দিতে হবে। জলের ভিতরই থাকতে-থাকতে জলের সঙ্গে চেনাজানাও তো হয়ে যায়। বিসারদির লোকজন তাই সেই চেনাজানায় জেনে গিয়েছিল, বিসারদি-ভাঙার ভয় তত নেই। সেই কারণেই বিসারদিতে একটা গঞ্জ-বন্দর তৈরি হয়ে গেছে, সাতদিনে একদিন হাট বসে। নদীর আরো অনেক ভিতরচরের চাষীরা সওদা আনে। সওদা মানে দুটো শশা বা দুটো কুমড়ো নয়, বোরো ধানের পাহাড় বানিয়ে দেয়। পুবের আড়িয়াল খাঁ আর পশ্চিমের কীর্তনখোলা, জুড়ে দেয়া একটা মাঝারি নদী। উত্তরে আর দক্ষিণেও সেরকমই জোড় লাগানো আরো ছোট একটা নদী দিয়ে ঘেরা চরকাড়িয়া, চাঁদপুর আর টুঙ্গিবাড়িয়া মিলে বেশ খানিকটা টানা চরে ভাল বোরো ফলন হয়। সেখানকার চাষীরাই বিসারদিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। টুঙ্গিবাড়িয়ার চাষীরা এ হাটে আসে না।

বরিশালের মানুষজন নদীর নামধাম নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামায় না, জিভে যে-নাম আসে, বলে দেয়। আরো ওপর থেকে নামছে বলে যদি-বা আড়িয়াল খাঁ, মেঘনা এ-সব নাম একটু বেশি চলে, তাই বলে আড়িয়াল খাঁ আর কীর্তনখোলার ভিতর যত আড়াআড়ি নদী বা খাল আছে, তার নাম দিতে গেলে আর নামে কুলবে না। বিসারদির হাটের দৌলতে আর বরিশাল সদর কাছে বলে, চরকাড়িয়া-চাঁদপুরের উত্তরের নদীটার একটা নাম জুটেছে, যেটা ধরে কোনো কোনো সময় বোঝানো হয়—নদী বিসারদি। দক্ষিণের নদীটার কথা কখনো-সখনো বলতে হলে ছোট-বিসারদি বলে কাজ চালিয়ে নেয়া হয়। যেমন যোগেন মণ্ডল বলল, তার সঙ্গীদের, 'বড় না ছোট, কোনডা দিয়্যা ভাইসবেন?'

'ঘুর্ হইব তো বিসারদি নদী দিয়্যা হাট যাইতে—'

'অ—'

যোগেনের এতটা যাতায়াত নেই ওদিকে যে কোনো খাল দিয়ে কোথায় তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যাবে, তা তার সবসময় খেয়াল থাকবে। জলপথে পথের কোনো গোলমাল নেই, হয় এক বাঁক পিছনে, নয় এক বাঁক সামনে। এর ওপর আবার ছোট-ছোট খাঁড়ির গলিঘুঁজিও আছে। তবে খুব বেশি যাতায়াত না থাকলে, সেসব খাঁড়িতে ঢুকলে জলহারানোর ভয় থাকে।

বরিশালের লোকের মুখের লব্‌জ—'নাও থাইকতে পাও ক্যান।'

'পাঁঠা থাইকতে, চালকুমড়া ক্যান', বিসারদির হাটে খোলা কাঁচালঙ্কার স্তূপের এক দোকানে চেয়ারে বসে যোগেন বলল, মনজুর আলমকে। মনজুরের স্থায়ী দোকান ও গুদাম আছে—পুরনো লোক, বড় ব্যবসায়ী। যোগেনকে দেখেই সে দোকান থেকে দৌড়ে এসেছে, 'আরে, আপনি আইবেন, কই, ঢোল দেয় নাই তো, কয়ও নাই তো কেউ। দেহ তো কাণ্ডখান'। যোগেনের সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে মনজুর ধমকে ওঠে, 'এই বৈশালল্যাগ কুনোদিন পুবপচ্ছিম জ্ঞান হইব? কাছা খুইল্যা নামাজ দিলেই পচ্চিম হইল? বলদার দল! আরে, এড্ডা জিতুয়া ক্যানডিকরে কান্ধে কইর‍্যা আইস্যা হাজির, য্যান, কাত্তিক পূজার কাত্তিক আইনছে চোরের নাগাল, কারো তুলসীতলায় লুক্যাইয়া থুইয়া যাবে। বল্‌দার দল! আয়েন, আয়েন, গদিত বসেন মণ্ডলমশায়, চারিদিকে তো জয়কার! আর এইগুলান্ আপনারে নিয়্যা আইল এমন চুপে? গেট নাই, মালা নাই, আয়েন। মিটিংডা ধইরছ তো? নাকী তাও নাই? আয়েন।'

মনজুরের গদির সামনেই এই কাঁচালঙ্কার পাহাড়, সেখানে মনজুরের চিৎকার চেঁচামেচিতে লোকজন জুটে গেছে। যোগেন মনজুরকে বলল, 'আরে অগ দোষ কী? আমার লগে আইসছে। আমি নিজেই আইল্যাম', আর তারপরই যোগ করল, 'পাঁঠা থাইকতে চালকুমড়া ক্যান?' যেন তার সঙ্গীরা চালকুমড়া আর সেই পাঁঠা। বৈষ্ণবদের রীতি আছে, বলি দিতেই হয় যে পুজোয়, সে পুজোয় চালকুমড়ো বলি দেয়া। মানে, যারা বলি-দেয়ার পুজোতে অভ্যস্ত, তারা বৈষ্ণব হয়েও বলিটা পুরো ছাড়ার সাহস পায় না। বরিশালের বর্ণহিন্দুদের মধ্যে বৈষ্ণবধর্মের খুব একটা বিশেষ প্রভাব নেই। কিন্তু নমশূদ্রদের মধ্যে আছে। তারা প্রায়ই তুলসীতলায় হরিলুট দেয় ও নিজেদের মত করে গৌরগান গায়। সে গৌরগানের সঙ্গে নদীয়ার বা বর্ধমানের নামকীর্তন বা পালাকীর্তনের সম্পর্ক নেই, তেমন কোনো নাটকীয়তা বা রোম্যান্সও নেই। ওরা 'কীর্তন' বলে না, বলে 'নাম' করতে যাচ্ছি। এর কিছু-কিছু কারণ আন্দাজ করা খুব কঠিন না। হলেও দরকারও নেই।

মনজুর বলে, 'আয়েন, দুকানে বয়েন, জিরান নেন।'

যোগেন বলে, 'আরে, আয়া তো পড়ছিই। আবার কোথায় আইব।'

'আপনি কি এই খুলা জাগায় খাড়াইয়্যা থাইকবেন? এদ্দুর আইলেন, এডডু বইসবেনও না? জিরানও নিবেন না?'

'আচ্ছা মনজুর ভাই, তোমারে এডডা ধাঁধা জিগাই? জবাব দিবার পাইরলে দুকানে বইসব। না পাইরলে বইস্যা থাকব।'

এর মধ্যে ভিড় বেশ বেড়ে উঠেছে। সবাইই যোগেনের কাছাকাছি আসতে চায় কিন্তু কাঁচালঙ্কার পাহাড়টার জন্য ভিড়টা তার উলটোদিকে একটু কেতরে যায়। যোগেন ধাঁধার কথা বলতেই ভিড় থেকে হাসি, হাততালি, 'কন্ কন্', উঠল।

'আমরা জব দিলে কুথায় বইসবেন?'

'তোমাগো কাঁধে। এতগুলা কাঁধে একখান মানুষের নিবার পারবা না?'

'নিব তো নিব। সে তো ভোটে জিতার পর।'

যোগেনের ভোটপ্রচার ইসারদির হাট

‘কেডা রে অক্রূর? ধাঁধা খেলার মইধ্যে ভোটাভুটি তুলে? আপনি ধাঁধা কন উকিলবাবু’—ভিড়ের কেউ বলে।

৩

যোগেন খাঁকারি দিয়ে গলা সাফ করে, ‘রও, খাড়াও, মনজুর আলমের মতন ব্যাপারী, অমাবস্যার রাতে দুই নম্বর সুচে সুতা পরাবার পারে। তারে এড়্ডা একমণি বাটখারার নাগাল শক্ত আর ভারী ধাঁধা ধইরব্যার লাগব।’

‘আরে আমারে নিয়্যা পইড়লেন ক্যান মণ্ডলমশায়? আমার মুখ্‌খামির কি কুনো তল আছে?’

‘তা হাইলে খেলবা না ধাঁধা? তয় ছাড়ান দ্যাও।’

‘আরে, খেলা ছাড়ে কেডা, আপনি কন জোরে, মহাজন ঠিক জব দিবে,’ ভিড়ের ভিতর থেকে কথা ওঠে। আলমের দিকে তাকিয়ে যোগেন একটু হেসে ও একটা ভুরু নাচিয়ে বলে, ‘তয়?’

আলম বলে, ‘ক-অ-ন তয়! দশের ইচ্ছা তো ফ্যালবার পারি না। তয় আমার কথাডা এডডু ভাইববেন, কঠিন কিছু জিগাইয়া দশের কাছে ঘাড় হেঁট করায়েন না।’

যোগেন দেখে, ভিড় আরো বেড়ে গেছে, তার মানে হাটে রটে গেছে যে এখানে ধাঁধা খেলা হচ্ছে। সেই ভিড়ের দিকে তাকিয়ে যোগেন বলে, ‘তাইলে কই?’

‘কন, কন, হেই যারা লগে আছে, বইস্যা পড়। মণ্ডলমশাক দেখা যায় না।’

যারা সামনে ছিল, তাদের কেউ-কেউ বসে পড়ল আর কেউ-কেউ পিছিয়ে গেল। যারা বসছিল, তাদের কারো ছাতার পেছনকাঠিতে পেছনের কারো খোঁচা লাগে আর সে চিল্লিয়ে ওঠে, ‘আরে, কেডা রে, মাঘমাসে ছাতার পাছা মোতনে ঢুকায়?’ এই কথায় হাসির হুল্লোড়টা থামতেই যোগেন উঁচু গলায় বলে ওঠে, ‘তা হাইলে জিগাই?’ আর ভিড়টা একেবারে চুপ হয়ে গেল।

যোগেন বলে, ‘ধাঁধাঁ তো আর গাবের নাগাল টুপটুপ কইর‍্যা পড়ে না, জোরে না ঝাঁকি দিলে ধাঁধাঁ পড়ে না। আমি আইস্যা এইখানে খাড়াইছি আর আলমভাই ফাল দিয়্যা আইস্যা ঝাঁকাইব্যার ধইরছে, দুকানে চলেন, গদিত বসেন, জিরান ন্যান। সেই ঝাঁকির চোটে ধাঁধাখান মাথায় পইড়ল নাইরকেলের নাগাল।

একখান্ মাও, তার দুইখান মাথা
দশখান মানুষ বুকের গাঁতায় (গর্তে)
একবেলা চইললেও নাই এড্ডুও ব্যথা।’

ভিড়টা চুপই থাকল, একেবারে চুপ। আলম বাঁহাত কপালে দিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে। একটু-আধটু করে শোনা যায়, ‘মাও একখান?’ ‘আর মাথা দুইখান?’ ‘বুকে গাঁতা’ আছে কার-কার?’ ‘ব্যথার কথা আসে ক্যান?’ ‘চলা আর বেলা নয় বুঝা গেল—একবেলা চইললে তো পাও ব্যথা করব্যার পারে কিন্তু সেই ব্যথাডা হয় না।’ যে যার মত করে ইশারা ধরে অর্থের ভিতরে ঢুকতে চায়। কিন্তু অনেক রকম ভাংচি ইশ্বারা থাকে। কোন্ কোন্ ইশারা ভাংচি সেটা আগে বাছতে হয়।

এখন সেই হিশেবটা চলছে ভিড়টা একেবারে চুপ করে গেছে, কান পাতলে যেন এত মানুষের শ্বাসটানার আওয়াজ আলাদা-আলাদা শোনা যাবে। একটা-আধটু ফিশফিশ হয়ত

ওঠে—শলাপরামর্শের। সে ফিশফিশ ঐ শ্বাসের আওয়াজে চাপা পড়ে যায়। ঐ ফিশফিশটাকেই কেউ একজন চড়িয়ে দেয় একটুখানি, যেন লুকিয়ে, 'ছাতা'।

শুনে একটি নীরবতায় সবাই মিলিয়ে নিতে চায়। হ্যাঁ, ছাতাটাকে উলটো গর্ত বলা চলে। এক ছাতায় দশজন যেতেও পারে বটে। কিন্তু 'ছাতা'র সঙ্গে একবেলা যাওয়ার একটা সম্বন্ধ যদি ভাবাও যায়, 'ব্যথা' আসবে কী করে। ছাতা ছাড়াও হাঁটায় যে ব্যথা, ছাতাধরা হাঁটাতেও সেই একই ব্যথা। তাহলে? এক উলটানো গর্তের মিল দিয়ে কি এতগুলো অমিল ঢাকা যায়? 'ওঃ, আইলেন আমাগ চাণক্য পণ্ডিতের সম্বন্ধী! ছাতার মাথাখান কি দুইডা?'

ধাঁধাঁ খেলায় জবাবে পৌঁছানোর এই প্রক্রিয়াটাই উদ্বেগ-উত্তেজ ছড়ায় আর এমন সব ভুল উত্তর থেকেই ঠিক উত্তরটা তৈরি হয়ে যায়। 'ছাতা' বলে যে ঢোক গিলেছে, সে উত্তরের আকারটার আভাস দিয়েছে—গোল কিছু। সেই আভাস ধরেই একজন বলে ওঠে, 'ধামা'।

এবার সে সরাসরি ধমক খায়, 'ধামা? আরে, ধামার গর্তডা কি মাথা না হোগা?'

'থাহে, থাহে, মাথা ছাড়া ধামা না।' এই কথাটুকুতে একটু নতুন মোচড় আছে—হ্যাঁ, দুজন মানুষ এমাথা-ওমাথা করে ধামা নিয়ে যাচ্ছে। বা, স্বামী-স্ত্রী। হাট থেকে ফিরছে—একখান ধামার দুইখান মালিক বা মাথা। বুকের গর্তটাও না-হয় হল। সেই গাঁতায় 'দশজন মানুষ'ও না-হয় হল—ধামা তো আর খালি নেই, দশরকম জিনিশে ভরা। 'মাও'-ও না হয় হল—ধামা না-হয় মায়ের মতই খাওয়া জোটায়। কিন্তু 'ব্যথা'টা কোথায় যাবে? মানে, বেচাবিক্রি খুব ভাল হয়েছে, তাই একবেলা ধামা মাথায় গেলেও পায়ে ব্যথা লাগছে না! হতে পারে! হতেও পারে! তবে ঐ একবেলা যাওয়ার কথাটা ঠিক মিল খাচ্ছে না যেন! এটাও ধাঁধাখেলার বড় মজা—ভিড় জানিয়ে দেয় কোন্ উত্তরটা খাপমত লাগছে না, লাগানোর জন্য একটু গোঁজ লাগাতে হচ্ছে। তুমি যদি ঠিক হয়ে থাক্ তো ঠিক, কিন্তু একবারে ঠিক না।

কাঁচালঙ্কার স্তূপের পাশে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকায় আচমকা হাঁচি শুরু হয়ে যায়। হাঁচি চলছে তো চলছেই। গামছায় নাকঝাড়ার আওয়াজ। যোগেন পর পর দুটো হাঁচি দিয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে। আলম তার লুঙ্গি তুলে নাক ডলে নেয়।

ভিড়ের পেছনের আলগা দাঁড়ানো কেউ হেঁকে ওঠে, 'আরে, এত হাঁচাহাঁচির হইলডা কী?' লোকটার নাকে লঙ্কার ঝাঁজ হয় ঢোকেনি, বা এখানে যে একটা লঙ্কার স্তূপ আছে তাও সে দেখেনি।

আলম হঠাৎ হেসে ফেলে বলে ওঠে, 'পাইছি, পাইছি জব। পাইছি।'

'পাইছ তো, কও।'

'নাকী কয়্যা ফেললে জব কর্পূরের নাগাল উইড়্যা যাইবেনে? ছাইড়বেন না মহাজন, চাইপ্যা ধইর‍্যা রাহেন। নিজের বিচি নিজের মুইঠ্যায়। ছাইড়া দিলে আর পাবেন না।'

আলম মাথার ওপর একটা হাত ঘুরিয়ে বলে, 'নাও, নাও। নৌকা। 'যোগেন তাকে জড়িয়ে ধরে 'আলমভাই আমারে হারাইয়্যা দিছে রে—এ'।

'তয় চলেন, দুকানে বসেন।'

'বইসব ক্যা, শুইব। এতগুলা মানুষেরে কিছু কাজের কথা কয়্যা নেই আলমভাই। তুমিও শুনো। কামের কথা।'

বলে যোগেন ভিড়ের দিকে ঘাড় ফেরায় কিছু বলতে আর হাঁচির একটা দমক এসে পড়ে—একটা, দুটো, তিনটে। চতুর্থটা আসবে কী আসবে না, যোগেনের নাক কুঁচকে যায়, চোখ বন্ধ হয়ে যায়, হাঁ খুলে যায়, ঘাড় হেলে যায়—নাঃ কেটে গেল। কাপড়ের খুঁট তুলে

যোগেন নাক মোছে ও নাক টেনে নেয়। সেই লঙ্কার পাহাড়ের দোকানি দু-হাত জড়ো করে ক্ষমা চাইবার মুদ্রায়, তার মুখে হাসি, পরিস্থিতির এমন বদলে। যোগেন তার দিকে তাকিয়ে আবার নাক টেনে গলা পরিষ্কার করে বলে, 'হাত দুইখান তো জড়ো কইরছেন মাপ চাওনের লাইগ্যা ; আর মুখে হাসিখান ধইর‍্যা রাইখছেন তো যোগেন মণ্ডলের হাঁচির বহর দেইখ্যা। আরে মিয়া—আমার নাকে তোমার মরিচের ঝাঁঝে সুড়সুড়ি লাইগলে অপরাধটা কার হইল। তোমারনি? আরে ব্যাটা বাঁদির বাচ্ছা, তোর মরিচের এত ঝাল আইসে কোথ্ থিক্যা রে যে আমার নাক শুলায়—একখান না, দুইখান না, তিনখান, আর চার নম্বরখান মুখ ভেঙায়, নাক বেঁকায়, চোখ ধাক্কায় কিন্তু পড়ে না। আরে বেটা ন্যাড়া যবন, তোর মরিচের ঝাঁঝে যে ব্রাহ্মণের হাঁচি পইড়ল, তাতে ত্রিদোষ প্রাচিত্তির কইরব্যার লাগব। হালার যবন, তর হাতের মরিচ এমন সুমিষ্ট কেমনে হয় রে হালারে। প্রাচিত্তির কর্, প্রাচিত্তির কর্—তিন দিন তিন মুইঠ্যা কাঁচা মরিচ এক্কেরে গাছ থিক্যা মাথা মুইড়্যা আমার সিঁড়ির গোড়ায় থুয়্যা যাবি। আমি মন্ত্র পইড়া গঙ্গাজল ছিটাইয়া শুদ্ধি কইর‍্যা নিব। তোর মরিচে হট্টলমুলার স্বাদ যা হইব-না!' মুলো দিয়ে শোলমাছ রান্নাকেই হট্টলমুলা বলে।

ভিড় আরো বেড়ে গেল। ঐ কাঁচালঙ্কার ঝাঁঝ থেকে হাঁচতে-হাঁচতেই যোগেন যে ভাষণ দেওয়া ধরেছে, সেটা ভিড় ধরতে পারে কী পারে না, তবে, তারা গল্পের মজাটায় মেতে উঠেছে। লঙ্কার ঝাঁঝে হাঁচার কারণে প্রথমে এক মুসলমান জমিদার, আর পরে এক ব্রাহ্মণ—বামুনের খ্যামতা জমিদার নির্ভর না—লঙ্কাদারকে গালাগাল দিচ্ছে। কোথায় যে মুসলমান জমিদারের কথা শেষ আর বামুনের কথা শুরু হয়, তা ধরা যায় না।

'আরে, মরিচের কামই তো ঝাঁঝানো আর হাঁচানো। না হইলে তো মিয়াশাহেব ও বামুনঠাকুর দুইজনেই কইবেন, 'তুই বরং কুসুর‍্যার চাষ দে রে, তোর মরিচেই যদি এত মিষ্ট, কুসুর তাহলি কতখান মিষ্ট হইব, ক-অ।'

ততক্ষণে ভিড় জমে উঠেছে—হাসির ফোয়ারা কোনো রকমে চাপা দেওয়া হচ্ছে, কথাগুলো আরো ভাল করে শোনার জন্য ও মনে রাখার জন্য। যোগেন ছাড়া কেউ এমন বলতে পারে না, যা পরে মনে পড়লে হাসি একেবারে বুড়বুড়িয়ে উঠবে, আ-হা। যদি মরিচের ঝালে জিভ আর নাক জ্বলে তাহলেও মরণ, আর খাওয়ার সময় তার মরিচের ঝাঁঝে যদি হট্টলমুলোর স্বাদ না বাড়ে তাহলেও মরণ। পরদিন তাকে ডেকে বলা, তুই বরং আখের চাষ ধর রে, তোর হাতে কাঁচা মরিচ যদি এত মিষ্টি হয় তাইলে আখ দিয়ে তো রসগোল্লা গড়াবে রে।

'আমাগ বাঁচনের আর কুনো পথ নাই। আমাগ আর বাঁচনের কুনো পথ নাই গ। আমি ভোটে খাড়াইছি, তো আমারে কইব্যার ধইরছিল, যুগেন—তোমাগো আর মুসলমানরেগ আলাদা আসন আছে, সংরক্ষিত আসন, তুমি সেইখান থিক্যা খাড়াও। কংগ্রেসের সিট নিয়্যা কামড়াকামড়ি করো ক্যান। জবাবে আমি কইছি—সংরক্ষিত হইতে ডর লাগে স্যার, সাধারণ হইতে আর ডর লাগে না। এ তো আমাগ সবাইয়ের আসন। জিতলে আপনারাই কইবেন—যোগেনের কুনো আপনপর নাই, ক্যামন নিজের আসনখান ছাইড়্যা আমাগ সবাইয়ের আসনে জিতবার পারল। আমি কত্তা যোগেন মণ্ডল নমশুদ্দুর থাইকতে চাই, কিন্তু হইব্যার চাই আপনার মানুষ। মানে, আপনার পাইক আর লাইঠ্যাল হবার চাই না, আপনাগ নাগাল দ্যাশের দশজন মানুষের একজন। এই দ্যাহেন, বরিশালের দশজন ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-মানুষগ তিরিশখান মাথা এই ছাপার হরফে কইছেন, আমরা চাই যোগেন আমাগ দশজনের একজন হোক। সেই আশীর্বাদখান ছাপাইয়্যা বিলি-বন্টন কইরব্যার ধইরছেন আপনারা। ক্যান যে এত ছাপাছাপি বিলি-বন্টন, সেডা আমার

বুদ্ধিতে ঢুকে নাই। তবু না ঢুইকল্যে আমি কাউরেও ছাপাছাপি বন্ধ কইরতে কই নাই। না, সবাইয়েরই তো মনের হাউশ থাকে একখান-দুইখান। তো একখান গোটা ভোট হইব্যার ধইরছে, একখানা ছাপাকাগজ বিলি-বণ্টন কইরলে মনে এডডু আনন্দ হয়। আনন্দ হয় তো হউগ। কিন্তু আমি তো জানি, আমার এই বরিশালে যত ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ-নমশূদ্র-মুসলমান আছে তাগো সকলেই আমাগ চন্দ্রদ্বীপের পণ্ডিত, এক্কেরে সূর্যচন্দ্রের গ্রহনক্ষত্রের চলাফেরা পাকখাওয়ার হিশাবপত্তর কইয্যা প্রতি বচ্ছরই পাঁচখান পঞ্জিকা লেখেন, এত পণ্ডিত। আরে-এ, চাইর ঝাঁকিতে এক কুড়ি গুইন্যা, মাটিতে দাগ দিয়্যা, আবার চাইর ঝাঁকিতে আর-এক কুড়ি গুইন্যা ফেলাবার পারি আর দুইখান কুড়ির দাগ মিল্যায়্যা যে একমন কলাইয়ের ডাইল হইল, তাও বুইঝব্যার পারি, আর সূর্যচন্দ্র গ্রহনক্ষত্র জোয়ারভাঁটার হিশাব কইরতে পারব না? কী যে কন। আমাগ ষোল-আনির আধ-পাই মানষিও কুনো ছাপা কাগজের সোজা-উলটা দেইখ্যা বুইঝবার পারে না। টাকার নোটেরও না। তাগ হাতে একখান ছাপা-কাগজ—!'

সকলে মিলে এত জোরে-জোরে হাসতে শুরু করে দিল যে যোগেনকেও থেমে, সারা শরীর দুলিয়ে সবার সঙ্গে হাসতে হয়। যোগেন নিজেই এতক্ষণ কোনোরকমে হাসি সামলে কথাগুলি বলছিল, সেই তিরিশজন বর্ণহিন্দু নেতার তাকে সমর্থন জানিয়ে ইস্তাহারের কথা। এখন বলতে যাবে—তার নামে অপপ্রচার নিয়ে যে সে হিন্দু হয়ে গেছে, কংগ্রেস হয়ে গেছে ও পাওয়া-ভোট বেচে দেবে। কথাটা তোলার আগেই সবাই টের পেয়ে গেছে যোগেন কী বলবে।

'আস্ত একডা সম্রাটের ছবি ছাড়া তার মাথা কোনডা আর হোগা কোনটা বুঝে না। আরে, যোগেন মণ্ডল হিন্দু হইয়া গিছে না মুসলমান হইয়া গিছে সেই কথাডার বিচার তো হইবেনেই। যোগেন মণ্ডল তো অ্যাহনও বাঁইচ্যাই আছে, এই-যে, অ্যাহন বিসারদির হাটে কাঁচা মরিচের ঝাঁঝে হাঁইচতেছে। যোগেন মণ্ডল তো অ্যাহনও মরে নাই। তার ভূত ব্রহ্মদৈত্য হইছে না নমশূদ্রই আছে, সেইডা বিচারের টাইম তো অ্যাহনও আইসে নাই। কিন্তু আমার কথাডা তো এই অ্যাহনিই বিচার কইরব্যার লাগব। কথাডা হইল—ইস্তাহারডা পইড়ল কেডায়, কোন্ পণ্ডিত।'

'একডা কথা আমি সিধাসিধি কই। আপনাগ কথা আপনাগই জাইনতে হবে। না অইলে এই এই বিদ্যালঙ্কার পণ্ডিতগ হাত থিক্যা বাঁচন নাই। আমি যে খাড়া হইছি এই ভোটে, নমশূদ্র হইয়্যাও যে নমশূদ্রদের সিটে খাড়া না হইয়্যা বাবুগ সিটে খাড়া হইছি—এইডা মহাত্মা গান্ধীর দান। পাঁচ বচ্ছর আগে জেবারদা জেলে সে মইরতে চাইছিল। যাতে তার মরণ হয় সেই লগে খাওয়া বন্ধ করছিল। মরণের সাধ ক্যান তার আইছিল? শাহেবরা ঠিক কইর‍্যা দিছিল—ভোট হইত তিনপ্রকারে। বাবুরা আর শুদ্দুররা দুইডা আসন। একটা বাবুগ। আর-একটা শুদ্দুরগ। আসন এক-এক কইর‍্যা। ভোট দিব বাবুগ আসনে বাবুরা। আর শুদ্দুরগ আসনে শুদ্দুরবা। মুসলমানরা মুসলমান্গ সিটে খাড়াইব আর মুসলমানরাই ভোট দিবে। মহাত্মা গান্ধী, তাইতে ভাইবলেন, দ্যাশডা যদি এমন টুকরা-টুকরা হয়, আমি তাইলে আর বাঁইচ্যা থাইক্যা করবডা কী? আমি তাইলে মরি—কিছু খাইব না, না খাইয়্যা মরব। তহন মহাত্মা গান্ধী জেলে আটক। দিন কাইট্যা গেল। এই মরে কী সেই মরে। আটদশ দিন পর একডা পুনাচুক্তি সই হইল। সবাই মাইন্যা নিল—হ্যাঁ, বাবুগ, শুদ্দুরগ আর মুসলমানগ সিট আলাদা হইব কিন্তু ভোট দিবে সবাই। আর বাবুগ সিটটা খোলা সিট—সেইডাতে বাবুরা, শুদ্দুররা আর মুসলমানরা যার বাবু হওয়ার ইচ্ছা স্যায় খাড়াইবার পারব। কিন্তু শুদ্দুর আর মুসলমানগ সিটে শুদ্দুর আর মুসলমান না হইলে খাড়াইবার পারব না—বাবুরা তো আর শুদ্দুর বা মুসলমান হবার চায় না। কিন্তু সব সিটেই

সবাই ভোট দিবে। দেহেন-না, এই দক্ষিণের পটুয়াখালিতে মুসলমানদের সিট নিয়্যা বাঘ-সিংহের লড়াই? ফজলুল হক শাহেব আর নাজিমুদ্দিন শাহেব। তেমনি আমারও এডডু সাধ হইছিল—বাবু হইবার। নমশুদ্দুর বাবু। তাই আমি শুদ্দুরদের সিটে খাড়াই নাই। বাবুদের সিটে খাড়াইছি। বাবুদের সিটটারে ক্যাও কয় হিন্দু সিট, ক্যাও কয় কংগ্রেসের সিট, আমি কইছি, বাবুগ সিট। এই তিনডা কথাই ভুল। এটার নাম খুলা সিট। সেই খুলা-সিটে আমি খাড়াইব্যার পারছি মহাত্মা গান্ধীর হেই পাঁচ সাল আগে উপাস দিয়্যা গঙ্গাযাত্রা কইরব্যার চেষ্টার ফলে। কেউ যদি বিদ্যালঙ্কার সাইজ্যা আপনাগ আইস্যা বুঝায়, যোগেন হিন্দু হইছে, যোগেন কংগ্রেস হইছে, তাও কইবেন—যোগেন শুদ্দুরবাবু হইছে, বাবুশুদ্দুর হয় নাই।'

ভোটের সাতসকালে দুঃসংবাদ

৪

ভোটের দিন অবিশ্যি গোলমাল ঠেকানো গেল না। যোগেন ঠিক করেছিল, সকালবেলাটা বরিশাল শহরে একটা ঘুরান দিয়ে গৌরনদীর দিকে যাবে। সকাল সাতটা বাজতে-না-বাজতেই বাটাজোড় থেকে একজন এসে যোগেনকে জানায়, দত্তবাবুর লোকজন নদীতে নৌকা নিয়ে পাহারা দিচ্ছে, যোগেনের ভোটারদের নিয়ে কোনো নৌকো এলে পাড়ে ভিড়তে দিচ্ছে না।

যোগেন ঠান্ডা গলাতেই বলে, 'আমারে কি নদীর পাড় ঠাহর করছ? নৌকা আটকাইল গৌরনদীতে আর তুমি আইলা সদরে। তোমার নৌকা আটকাইবে না তো কারডা আটকাইব?'

'এইডা তো ভোটের নৌকা—'

'কোনডা?'

'আমাগটা—'

'আর অগটা? যারা আটকাইছে? অগ নৌকা নারদ ঠাউরের গানের নৌকা, নাকী?'

'তয়?'

'অগও তো ভোটের নৌকা?'

'না। কইছে তো ঐখান দত্তবাবুর ঘাট, আইজ নাকী কী পূজা হইব। কোনো নৌকা ভিড়াইনো নিষেধ।'

'অ। তো নদীখান তো শুধু দত্তবাবুর ঘাটেই নাই। অন্য ঘাটে নামাও। ঝাম্‌লা পাকাইবা না।'

'তার লগেই তো আপনার নিকট আসা। না-হয়, নৌকা আটকাইলে কী কইর্যা খুইলতে হয় তা কি আমরা জানি না?'

'জানো তো করো গিয়্যা—আমার লগে আইল্যা ক্যান?'

'এ তো ভোটের টাইম। অ্যাহন কি আমাগের আইন চইলবে তাই জিগানোর লগে।'

'জিগাইছ?'

'হ, জিগাইল্যাম তো?'

'জব কিছু পাইল্যা?'

'পসন্দ হয়—পাইছি।'

'কী পাইলা কও দেহি'।

'নৌকার পথ যদি আমাগ আইনে খুইলব্যার চাই, আপনারে জিগাইব্যার কাম নাই। আর, যদি অন্য ঘাটে নৌকা লাগান যায় তাইলেও আপনারে জিগাইব্যার কাম নাই।'

'সার বোঝা বুইঝছ। এতখান মূল্যবান মাথা নিয়্যা এতডা পথ আইল্যা ক্যামনে? চোরডাকাইতের ডর নাই?'

'ভোটও তো আগে দেহি নাই। কী কইরতে কী করি, তাই। আপনি তো দত্তবাবুর কাছারির বুধ মাইন্যা নিলেন। তয়?'

যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল—স্বতন্ত্র প্রার্থী। তার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের প্রার্থী জেলা কংগ্রেসের সভাপতি, বাটাজোড়ের জমিদার, অশ্বিনী দত্তের ভাইপো—সরলকুমার দত্ত। গ্রামে যে-কোনো কাজের জায়গাই তো জমিদারবাড়ি। বুথের তালিকা যখন বের হয়, তখন দেখা গেল, বাটাজোড়ের জমিদারবাড়িতেই একটা বুথ হবে। অথচ সেই জমিদারই তো একজন প্রার্থী। এ নিয়ে একটু আপত্তি শুরু হতেই রিটার্নিং অফিসার যোগেনকে জানান, এটা একেবারেই 'ক্ল্যারিক্যাল মিসটেক', ওঁরা নিশ্চয়ই ঐ বুথ ঐ বাড়ি থেকে সরিয়ে দেবেন।

রিটার্নিং অফিসার যেমন যোগেনকে প্রার্থী হিশেবে জানিয়েছিলেন, তেমনি সরল দত্তকেও জানিয়েছিলেন। এতে বাটাজোড়ের দত্তবাড়ির অহংকারে ঘা লাগে। তাঁরা তো বলেননি, তাঁদের বাড়িতে বুথ করতে। গ্রামের যে-কোনো উৎসব-অনুষ্ঠানই তাঁদের বাড়িতে হয়। ভোটবুথও তেমনি একটি ঘটনা মনে হয়েছে তাঁদের। কিন্তু এখন এই বুথ তাঁদের বাড়ি থেকে সরিয়ে নিলে তাঁদের দশ পুরুষের জমিদারি সম্মানে আঘাত লাগতেই পারে। তার ওপর এ থেকে এমন একটা ভুল ধারণাও তৈরি হতে পারে, যেন তারা সরকারের সঙ্গে গোপনে এই ব্যবস্থা করেছিল, এখন ধরা পড়ে যাওয়ায় বুথটা সরানো হচ্ছে।

এ নিয়ে যোগেন একটি কথাও বলেনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে বলতে হল। কারণ, পাশাপাশি যে তালুকদার-জমিদাররা আছেন, তারা জমিদারির অসম্মানের বিষয়টিকে বড় করে ধরলেন। যাঁরা এমন ধরলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন যোগেনের সমর্থক। যেমন, কীর্তিপাশার জমিদার বাড়ির ছোট হিস্যার শীতাংশু রায়চৌধুরি বা তারপাশার রায়-জমিদাররা, বাসণ্ডার সেনবাবুরা। এঁরা বললেন, ভোটের সঙ্গে জমিদার বাড়ির ঐতিহ্য ও প্রতিপত্তিকে গুলিয়ে ফেলা হচ্ছে। যদি বাটাজোড়ের জমিদারবাড়িতে বুথ ঘোষণা করা না হত, তাহলে কোনো কথাই উঠত না। কিন্তু ঘোষণার পর বুথ সরিয়ে নিলে জমিদারি-ব্যবস্থার সামাজিক প্রতিপত্তির হানি ঘটবে। রিটার্নিং অফিসারের পক্ষ থেকে বলা হল, জমিদার হলেও দত্তবাবু তো প্রার্থী। জমিদারদের পক্ষ থেকে বলা হল, দত্তবাবু প্রার্থী হলেও তো জমিদার। সে এই জমিদারবাড়ির পূর্বপুরুষদেরও প্রতিনিধি।

যোগেন বুঝল, ভোটের দিন আসতে-আসতে জমিদারদের এই কথা সরল দত্তের পক্ষে চলে যাবে, আর বুথ যদি সরানোই হয়, তাহলে তো কথাই নেই। কিছু বর্ণহিন্দু ভোট নিয়ে তার যে আশা, তা আর ফলবে না। জমিদারবাড়ির সম্মান থেকে বর্ণহিন্দুর সম্মানের কথা উঠবেই আর তখন নিমিত্তের ভাগী হবে 'ব্যাটা চাঁড়াল'—যোগেন।

যোগেন বাটাজোড়েই একটা মিটিং করল। যোগেনের মিটিঙে এমনিতেই ভিড় হয়, সে বলে খুব ভাল আর বলে রসিয়ে-রসিয়ে। শুনতে দেখতে ভাল লাগে। বক্তৃতা তো সবাইই দেয় —বরই। যোগেনের বক্তৃতা আলাদা একটা ধরণই তৈরি করে তুলছিল যেন, ধীরে-ধীরে। বাটাজোড়ের এই মিটিঙে ভিড় এত হল যে, যোগেনকে একটা টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে

হল। তখন মাইক আসেনি। গলার জোরটা একটা বড় জোর ছিল।

যোগেন বলল, 'আমি এই একডা কথা কওয়ার জন্য বাটাজোড়ে আসছি। কথাডা খুব শাদাসিধা। কিন্তু জিভের দোষে কথাডা ব্যাঁকাচোরা, ছ্যাঁদাভরা হচ্ছে। আমাকে এই কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার এক চিঠির দ্বারা জ্ঞাত করেন যে অতি তুচ্ছ একটি ক্ল্যারিক্যাল মিস্টেকের জন্য বাটাজোড়ের দত্ত জমিদারবাবুদের দালানে ভোটের বুথ খোলা হইবে বইল্যা নোটিস পাঠান হইছে। কিন্তু এই 'মিসটেক' অর্থাৎ কেরানিবাবুর ভুল, শুধরানো হইবে। আমি এই চিঠির কুনো জব দেই নাই। এই চিঠি পাওয়ার আগে আমি জাইনতামও না যে দত্ত জমিদারবাবুদের দালানে একটা বুথ খোলা হইবে। কোথায় বুথ বইসবে—এই নিয়্যা আমার কোনো মাথাব্যথা নাই। আমার মাথাব্যথা যদি কইরতেই হয় তাহাইলে ভোটের বাক্সের ভিতর থিক্যা কী বারায় তাই নিয়্যাই মাথাব্যথা কইরব। ভোটের বাক্স এমন কল, যেহানে শুধু ঘোড়ায় ডিম পাড়ে। যার বাক্স থিক্যা বার হব, তারে ঘোড়ার ডিমের উপর তা দেয়া লাগব। যদি আমার বাক্স থিক্যা বারায় তাইলে আমাক্ তাও দিবার লাগব। পক্ষীরাজ ঘোড়ার এড্ডা ডিম! চাইড্ডিনি কথা? যদি বারায় আমার বাক্স থিক্যা তাহাইলে তাওডা দিব কখন? সারাদিন ওকালতি, সন্ধ্যাবেলা মক্কেলগ আরতি কইরব্যার টাইম। তাই আপনাগ কাছে অনুরোধ, আমারে এ বিপদে ফেলাবেন না। তার একডা মাত্র উপায় আপনারা যে ব্যালট কাগজখান পাইবেন ঐডা শুধু আমার বাক্সে ফেইলবেন। এই কথাডায় কোনো ফাঁক নাই। ভোটের বুথ দত্তবাবুদের দালানেই হোক আর ইশকুল ঘরের ভিতরেই হোক—ভোটটা দালানে বা চালে দিবেন না। দিবেন আমার বাক্সের ভিতরে।

'আমি এই কথাডা আপনাগো জানাইব্যার চাই, বুথ নিয়্যা আমাগ কুনো আপত্তি ছিলও না, নাইও। একবার যহন নুটিস করা হইছে, তখন নুটিস জারি থাউক। দত্তবাবুদের দালান থিক্যা বুথ উঠাইলে তাগ অসম্মান করা হয়। বরিশালের জমিদার-তালুকদারগ অসম্মান করা চলে না। কেন? না, তারা এই জঙ্গল-বরিশালকে সদর-বরিশাল তৈরি কইরছেন। এই ভোট আইজ আছে, কাইল নাই। কিন্তু বরিশাল তো ফর এভার। ক্যানডিডেট হিশাবে আমার কথাডা আপনাগ দশের সম্মুখে আমি কয়্যা দিচ্ছি। বুথ দত্তবাবুর দালানে। ভোট মণ্ডলের বাক্সে।'

যোগেন তার কর্মীকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাগো কি আজ সক্কালে ঘাট আটকানোর পর খেয়াল হইল, দত্তবাবুদের বাড়ির বুথ আমার মাইন্যা নেয়া ঠিক হয় নাই?'

'হ। এইডা তো সোজা কথা। আপনি যদি কইতেন তাহালি বুধ সরতই। তা হাইলে দত্তবাবুগ ঘাটে নাও ভিড়াইব্যার দরকারই হইত না। তাছাড়া প্রার্থীর বাড়িতে বুধ হওয়াডা ন্যায্যও না।'

'অ। তুমি তাইলে আর বাটাজোড় ফেরত যাইয়ো না। এইহানে দুগা খাইয়্যা একখান দিবানিদ্রা দ্যাও। নিদ্রাভঙ্গের পর জাইনতে পারবা—তোমাগ প্রার্থী হাইর‍্যা গিছে। সেই সংবাদডার জইন্য আর দুপুরের নিদ্রা বাদ দিব্যা ক্যান?'

'আমাগ প্রার্থী? সে তো আপনি! আপনি হাইর‍্যা যাবেন ক্যাম্‌নে?'

'শুনো। ভোট তো কখনো দেখোও নাই, দ্যায়ও নাই। ভগবান করে, এমন আরো অনেক ভোট তোমরা সারাডা জীবন ভইর‍্যা দেইখ্যা যায়ো। ভোট হত্যাছে একখান ক্ষমতা। তবে তোমার প্রথম ভোটের আসল শিক্ষাডা আমার কাছে আইজ ন্যাও। আমারও তো আরো ভোটে খাড়াইব্যার লাগব। তোমাদের আরো ভোটে খাইটব্যার লাগব। শিক্ষাডা ন্যাও।'

'নেয়ার বাদেই তো বইস্যা আছি। গুরুবাক্য তো বাহির হয় না।'

'ভোটের আগেই যে-প্রার্থীর কর্মীরা কইব্যার ধরে, কী কী ভুল হইছে, সেই প্রার্থীডা জিতার প্রার্থী না।'

লোকটি একটু সময় গালে হাত দিয়ে ভাবে। তার ডান হাতের কনুইটা ছিল ডান হাঁটুর ওপরে। ঠোঁটটা ছুঁচলো, যেন হাট থেকে ফেরার সময় হিশেব মেলাতে পারছে না।

তারপর হঠাৎ কিছু একটা মনে পড়ে গেলে হিশেবটা যেমন হঠাৎ মিলে যায় আর মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, এই লোকটির তাই হল। সে তার বাহুসংলগ্ন মুখটাতে একা-একা হাসি ফোটাল।

'বুঝছি। তাইলে যা-ই।'

'বুইঝছ্যা থাকলেই যে যাইতে হইব, তেমন কুনো শর্ত নাই।'

'শর্ত আর কেডা দিবে? আমার শর্ত আমারই দিব্যার লাইগব। আমার কাজডা তো আমারেই কইরব্যার লাগব। কিন্তু যাওয়ার আগে ছোট মুখে একডা বড় কথা কব, আপনারে?'

'আরে, তুমি নিজের মুখকে ছোটমুখ কইছ আর তোমার কথাডাকে বড় কথা কইছ! তোমার বামুন-কায়েতরা আমার মুখডাকেই ছোট মুখ বলে, কয়, বেটা চাঁড়াল,' যোগেন হেসে উঠে বলে, 'আরে, যার প্যাটে যতডা জল, ততডাই তো পেচ্ছাপ হবে। যার মুখে যতডা ধরে, ততডাই তো কথা হবে। তোমার কথাখান কও রে ভাই। মুখের ছোটবড় দিয়্যা কি কথার ছোটবড় মাপা যায়?'

লোকটি বেরবার দরজায় দাঁড়িয়ে একগাল হেসে বলল, 'এতদিনে আপনার মতন একখান লিডার পাইছি। আপনি য্যান লিডারি ছাইড়্যা দিবেন না। যা-ই।'

যোগেনের একটু চুপ করে থাকার ফাঁকে লোকটি বেরিয়ে যায়। তাকে ডাকার জন্যই যোগেন দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়। লোকটি এখন গলি থেকে বেরচ্ছে—ডাকলে শুনতে পাবে। হাঁ-ও করল যোগেন। কিন্তু ডাকল না।

তার কাজের সূচি বদলে ফেলে। আগে, এখনই, গৌরনদী যাবে। ফিরে এসে শহর। গৌরনদী মানে বাটাজোড়। বাটাজোড়ের উত্তরে আর যাবে না। ফিরে এসে শহরে একটা 'ঘুরান' দেবে।

বাটাজোড় থেকে খবর নিয়ে যে এসেছিল, তার সঙ্গে কথাবার্তার ফলে বা তার শেষ কথাতেই যে যোগেন তার কর্মসূচি বদলে ফেলল, তা নয়। তেমন কিছু নাটুকে ঘটনা ঘটেনি। লোকটি বেরিয়ে যাওয়ার পর যোগেন যে দরজায় দাঁড়িয়ে মুখ হাঁ করল অথচ ডেকে উঠল না—সেটাও কিছু নাটুকে নয়, তখনও মন ঠিক করে উঠতে পারেনি। যেন, যেমন ভেবে রেখেছিল তেমন করতে পারলেই তার মনে হত সব ঠিকঠাক আছে।

ছেলেটি গৌরনদীর পথে মোড় নিতে অদৃশ্য হয়ে গেলে যোগেন একা-একা বুঝে ফেলে, দরজা থেকে ঘরের মাঝখানে ফিরে আসতে-আসতেই বুঝে ফেলে—এইডা কি একডা কুনো কথা? গৌরনদীর ভোটে যদি গোলমাল বাধ্যাইয়্যা দেয়, তাহাইলে কি বরিশাল টাউন তারে জিত্যাইয়া দিবে? বরিশাল টাউনে যোগেন কাস্টহিন্দুগ ভোট কিছু পাইব। তবে, সে তো সরল দত্তের ভোট-খাওয়া। আর উলটাদিকে গৌরনদীতে যদি যোগেনের ভোট দত্তবাবু নষ্ট কইর্যা দিব্যার পারে—তাইলে যোগেনরে তো তুলসীগাছের সামনে খাড়াইয়্যা হরির লুট দিব্যার লাগব। সরল দত্তের খ্যামোতা আছে—গৌরনদীতে যোগেনের ভোট নষ্ট করার। যোগেনের কি তেমন খ্যামতা আছে, টাউনে সরল দত্তের ভোট নষ্ট করার?' গৌরনদী তার নিজের জায়গা—তার বাপঠাকুরদার ঘর, তার লেখাপড়া, তার কাজকর্ম। সেইখানেই তার ভোট উপড়ালে...। না, না। আগে বাটাজোড়ে যাওয়া দরকার, তাকে যারা ভোট দেবে তারা যাতে ভোট দিতে পারে তা নিশ্চিত করাই প্রথম কাজ। তাড়াতাড়ি মিটে গেলে ফিরে এসে টাউনে ঘুরতে পারে। টাউনের যে-ভোটার ঠিক করেছে যোগেনকে ভোট দেবে, তারা ভেবেই ঠিক করেছে, যোগেনের মুখ

দেখে তারা ঠিক করবে না। তেমন-তেমন জায়গায়, যেমন, মাঝিপাড়ায়, জেলেপাড়ায়, ব্যাপারীপাড়ায় ভোটারদের জড়ো করে বুথে নিয়ে আসার কাজ তো তাদেরই, যারা এদের মধ্যে যোগেনের হয়ে কাজ করেছে। সেরকম কোনো জায়গায় আজ যদি যোগেনকে দরকার হত, তাহলে তারা সেটা আগেভাগে জানিয়ে রাখত।

কিন্তু বাটাজোড়ে তাকে হাজির দেখলে, তার মুখ দেখলে, তার সঙ্গে কথা বললে অনেক ভোটার সাহস পাবে। দলবাঁধা ভোটাররাই আসল। তারাই ভোটের ফল ঠিক করবে। ওদিকে মুসলমান, নমশূদ্র, বাগরি, ধন্বন্তরী—জাতের ভোটার অনেক। দত্তবাবুদের সাবেক জমিদারি বাটাজোড়। অশ্বিনীকুমারের আদিবাড়ি। সেখানে যোগেনকে যারা ভোট দেবে, তাদের কাছে যাওয়া আগে দরকার। যোগেনের নিজের বাড়ি মৈস্তারকান্দি, সেখান থেকে আগৈলঝরা, বারথি, চাঁদসী, চন্দ্রহার, লক্ষ্মণকাঠি, শোলক, বাঁকাল—এই সবই বাটাজোড়ের উত্তরে, যোগেন যা বুঝেছে ও খবর পেয়েছে, তাতে তার শক্ত ঘাঁটি। তবে সেখানেও সাহস দেয়ার যাওয়াও যাবে না, যাওয়ার দরকারও নেই। বরং ওখানকার দু-একজন মাতব্বরকে বাটাজোড়ে এনে বসালে ভাল হত। মাস্টারমশাই, নিয়ামত চাচা বা জিরান, আলম।

যোগেন তার সাইকেলটা নিয়ে বেরল।

১৯৩৭-এ বরিশালে সাইকেল

৫

১৯৩৭ সালে এত গাড়িঘোড়া রাস্তাঘাট ছিল না যে ডাকলেই গাড়ি পাওয়া যায় আর গাড়ি পাওয়া গেলেই রাস্তা পাওয়া যায়। বরিশাল টাউন থেকে বাটাজোড় মাইল বিশের মত—সোজা পাকা রাস্তা গেছে মাদারিপুরের ভিতরে। পাশে-পাশে ঢাকাখাল দিয়ে মানিকগঞ্জ পর্যন্ত মহাজনী মালের ভারী-ভারী নৌকো যায়। যাতায়াতে চল্লিশ মাইল—চার ঘণ্টার কমই লাগবে।

বাজারের খালের ছোট ব্রিজটা পার হতে-না-হতেই যোগেনের হিশেব গোলমাল হয়ে যায়—তিন-চারটি যে নদী আর খাল আছে? ছোট খালে না-হয় সাইকেল তুলে এক-একটা ডোঙা নিল। কিন্তু কালিজিরা, আমতলি আর আগাপুর এই তিনটি নদী তো ঘাটনৌকো ছাড়া পার হওয়া যাবে না। সেই ঘাটনৌকোর জন্য তো বসে থাকতে হবে। তাহলে তো বাটাজোড় পৌঁছতেই বেলা শেষ। একমাত্র উপায় ছিল—একটা নৌকো নিয়ে জনাচার মাঝি বসানো। অত টাকা যোগেনের নেই। যোগেনকে যেতে হলে তার সাইকেলেই যেতে হবে। যেন আগেই ঠিক করা আছে—এমনই সহজে যোগেন মাদারিপুরের পাকা রাস্তা ছেড়ে দিয়ে আরো পুবের পুরনো রাস্তাটা ধরল—কাশীপুর, বাবুগঞ্জ, রহমতপুর দিয়ে যেটা বাটাজোড় ছাড়িয়ে গেছে।

তাহলে কি একটা নৌকোই নিয়ে নেবে—যে-পুজোয় যে-নৈবেদ্য। নৌকো ভাড়া করার মত টাকা তার সঙ্গে নেই। সে না-হয়, ফিরে এসে জোগাড় করা যাবে। কিন্তু একটা গোটা নৌকো নিয়ে বাটাজোড় যাচ্ছে—যোগেনের নিজের কাছে দোষী ঠেকে।

১৯৩৭-এ গ্রামেবন্দরে বা এমনকী ছোটখাটো শহরেও সাইকেল এত কম ছিল যে মাইল-মাইল ছড়ানো ধানক্ষেতের একপার থেকে আর-একপারে কেউ সাইকেল চড়ে যাচ্ছে

দেখামাত্র যে-কেউ চোখের পাতা ফেলার আগে বলে দিতে পারবে—কে যাচ্ছে। বড় নদীর একপার থেকে আর-একপারের চলন্ত সাইকেল দেখেই চেনা যায়—কে যাচ্ছে। যোগেনের সাইকেলও তেমনি চেনা হয়ে যাচ্ছে—ঐ শায়েস্তাবাদের মাইঝ্যান মীর যায়, কলেজ পাশ দিয়ে কলকাতা থেকে ফিরেছে একেবারে সাইকেল কাঁধে—সবুজ রঙের র‍্যালে, 'আর সবাই বি এ পাশ, মাইঝ্যান মীর সাইকেল পাশ।' ঐ জাঁহাপুরের ঘাটবাবু যায়—সাইকেল—কোম্পানি হারকিউলিস নাকী ঘাটবাবুকে প্রথমে সাইকেলে চড়া শিখিয়েছে, তারপরে সাইকেল থেকে নামা শিখিয়েছে, তারপরে সাইকেলটা গড়ানো শিখিয়েছে, তারপর সাইকেলটা উপহার দিয়েছে এই এক শর্তে যে অন্য কোনো কোম্পানির সাইকেল ঘাটবাবু জাহাপুর ঘাটে স্টিমার থেকে নামতে দেবে না। ঘাটবাবু সবটাই খুব তাড়াতাড়ি শিখেছে ফলে কোনো-কোনো শেখা পুরো শেখা হয়নি। একটা বড় অসুবিধে—ঘাটবাবু কিছুতেই সাইকেল থেকে নামতে পারে না। নামতে হলে সে ব্রেক কষে ডাইনে বা বাঁয়ে হেলে গিয়ে ধরা—ম্ করে পড়ে যায়। আর নয় তো চেঁচাতে থাকে', 'আরে কে আছিস, নামাইয়্যা নে, নামাইয়া নে। সবাই ছুটে এসে সামনে সাইকেলের হ্যান্ডেল আর পেছনে ক্যারিয়ারটি ঠেলে বা টেনে ধরে আর ঘাটবাবু হ্যান্ডেল থেকে হাতদুটো তুলে যেন মায়ের কোলে উঠছে এমন করে মানুষজনের দিকে দু-হাত বাড়িয়ে দেয়। তবে এ নিয়ে খুব কিছু অসুবিধে হয় না। রাস্তার মাঝখানে সাইকেল থেকে নামার কোনো দরকার তার ঘটবে কেন। অন্য কারো তাকে যদি হয়, সে নামিয়ে নেয়। তবে রাস্তা তার খেয়াল থাকে, আলরাস্তা ছাড়া বড় একটা সাইকেল চালায় না। সাইকেলের সামনে কোনো বাধা না ঘটলে বা আচমকা আলটা কেটে দেয়া না-হলে—সাইকেল মিছেমিছি পড়তে পারে না। কিন্তু ঘাটবাবু সাইকেল নিয়ে আল থেকে ডাইনে-বাঁয়ে ক্ষেতের নরম মাটিতে পড়ে যেতে পছন্দ বা নিরাপদ বোধ করে। পড়তে যখন হবেই, আল থেকে ক্ষেতে পড়াটাই ভাল। সাইকেল থেকে তাকে নামিয়ে নিয়ে তাকে আবার ঝাড়তে হত। ঘাটবাবুর হারকিউলিস সাইকেল '৩৭ সালের আগেই অথচ তাকে নিয়ে ছড়া রটল '৪১ সালে যুদ্ধের মধ্যে, তখন তো আরো কত জনের সাইকেল হয়ে গেছে, সাইকেল দেখে লোক চেনাতেও কারো মন নেই। ঘাটবাবুর সাইকেল নিয়ে ছড়াকাটতে যে একটা যুদ্ধই দরকার হল, তার কারণ, যুদ্ধ না হলে, 'ঘুষ' কথাটা কি এতটা চেনা হত? 'ঘুষের সাইকেলের আছাড়ও বেশি, ঝাড়নও বেশি।'

আর-এক সাইকেলের নাম ছিল 'নইলিবিবির সাইকেল'। গুলামকাঠির মোনাগাজি-শাহেব-জমিদার চার নম্বর নাকী পাঁচ নম্বর বিবি আনল যখন, তার সব দাড়ি পেকে বুকের মাঝবরাবর ঝুলে পড়েছে আর মাথায় চুল আছে শুধু দুই কান আর ঘাড়ের ওপর। নতুন বিবির বয়স টেনেটুনে বাড়ালেও পনের কিন্তু এত রোগা যে বার-তের বললেও কেউ অবিশ্বাস করবে না। মোনাগাজিশাহেব একে গাজি, তায় জমিদার। তার যদি বিয়ে করার ইচ্ছে হয় তাহলে দশের কিছু বলার নেই বরং দু-একদিন বিরিয়ানি খাওয়া যাবে। শুধু বিরিয়ানি খাওয়া ছাড়াও জিভের তো অন্য কাজও আছে। হাটবাজারের মানুষ গাজিশাহেবকে জিজ্ঞাসা করত, 'আরে, গাজিশাহেব, আপনার রহইস্যাডা এড্ডু দেন-না, শরীলের এত্ত গরম জাগান্ ক্যামনে? এইডা তো পাটের কাঠির আগুন না, গাজিশাহেব, যে ধপ্ কইর‍্যা জ্বইল্যা উইড্যা ছাই হয়্যা যায়। এইডা তো পাটের ফাঁসের আগুন—এতখান্ বচ্ছর জ্বইল্যাই দাব্যায়। চাইর-চাইরডা বিবিও যে-আগুন ঠান্ডা কইরব্যার পারে নাই, সেই আগুনে তো ঐ বাচ্চাবিবিডা ঝইলস্যা যাবে।'

আড়াল থেকে কেউ ছুঁড়ে দিত, 'আরে, ঝইলস্যালে তো আবার বিরিয়ানি।'

গাজিশাহেব মিটমিটিয়ে হাসত, 'কওড়া কী? তোমাগো বিবিরে তো টানাটানি করি নাই,

নিজে শাদি কইর‍্যা বিবি বানাইছি। তোমাগো বিচির জোর থাইকলে তোমরাও বানাও।'

'তাই বইল্যা চাইরবার?'

'এই, গোনায় ভুল ঢুকাইও না। তিনবার।'

'তিনবার কী কইর‍্যা হয়? হিশাব ধরেন। ধরেন তুফানির মা—'

'আরে, করোডা কী? বিবি আমার আর গনা ধরো তোমরা? আরে ভাই, অ্যাহন এড্ডু নাতিনাতনির লগে খেইলব্যার মন চায়, তাই, আইনল্যাম এক বিবি। ছুডাছুডি কইরব, খেইলব, থাকব, আল্লার জীব, আল্লা যহন আমার ভাতের টান রাখেন নাই, আর-এড্ডা জীবের সঙ্গে ভাগ কইরতে দোষ কী?'

'আপনার তো তিন-চাইর বাড়িভর্তি নাতিনাতনি। তাগ সঙ্গে খেলা হয় না? খেলার লগে নাতনির মতন একখান বিবি আইনলেন, গাজিশাহেব?'

'আরে, সেইডা খেলা কি নাতিনাতনির লগে শ্যাষ হয়? খেলার শ্যাষে যে-খেলাডা না অইলে বিস্বাদ ঠেকে? তো এইডা তো বিধান। নাতনির নাগাল বিবি করো। খেলা তাহাইলে আর শ্যাষ হইবার না। ঘুমের আগে বিবি হইয়্যা ঘুমায় আর ঘুমের শ্যাষে নাতনি হইয়া জাগে।'

সেই মোনাগাজি একবার খুলনা গেলেন আর ফিরলেন এক সাইকেল নিয়ে। মোনাগাজি শাহেব কি এই বয়সে সাইকেল চড়বেন? 'না, না। রংটং আর চাকা দুইখান দেইখ্যা মনে আইল, নতুন বিবিডা খেইলবার পারব। আগনও যায়, পাছনও যায়। আর, শুদু-শুদু ঘুরানোও যায়। তাহাইলে বুঝো, কতখান খেলা এড্ডা খেলনায়?'

মোনাগাছিশাহেব সে-সাইকেল ঠেলে নিতে পারে না, হ্যান্ডেল ঘুরে-ঘুরে যায়। শেষে স্টিমারের এক খালাশি সেটা দুই হাতে মাথার ওপর তুলে পাড়ে নিয়ে যায়। পাড়ে তো নেওয়া গেল, কিন্তু গাজিসাহেবের হাভেলি নলচিড়ায় যাবে কী করে, সাইকেল? সাইকেল না থাকলে গাজিশাহেব তো হেঁটেই যেতেন। খুলনার দোকানদার তাকে বলেছিল, 'হেঁইটে যদি যাবার পারে, সাইকেলটাও ধইরে-ধইরে যাবার পারবেন। শুধু ধইরে থাইকলেই হবে।' ধরে থাকলেও যে হয় না তা তো বোঝাই গেল। স্টিমারঘাটা, স্টিমার আসা-যাওয়ার সময় ভিড় তো হয়ই। তাছাড়া, মোনাগাজিশাহেবকে আদাব জানাতেও দু-চারজন আসে। তার ওপর ওরকম একটি ঝকঝকে নতুন সাইকেল দেখে ভিড় আরো বেড়ে যায়। তারও ওপর যখন জানা যায় সাইকেলটা মোনাগাজিশাহেবই এনেছেন—খুলনা থেকে, তখন ভিড় আরো বেড়ে যায়। তারপরেও যখন জানা যায় সাইকেলটা নলচিড়া পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না—তখন ভিড়টা সবচেয়ে বেড়ে যায়। মোড়ল-মাতব্বররাও জুটে চেঁচামেচি শুরু করে।

সাইকেলটাতে দু-একজন হাত দিয়েছে কিন্তু কেউই গড়ানোর সাহস পায়নি। গাজিশাহেব তখন একজনকে, যে তার সামনে ছিল তাকেই, বলে, 'হে-ই, চল্, সাইকেলডা মাথায় কইর‍্যা হাঁটা দে আমার লগে।' স্টিমার থেকে সেই খালাশিটা যেভাবে নামিয়েছিল, সেভাবেই তো নিয়ে গেলে হয়! নলচিড়া আর কদ্দূর? হাঁটা দিলেই তো পৌঁছে যাবে।

গাজিশাহেব কাকে বলেছিল সেটা তার কাছেও খুব স্পষ্ট ছিল না। কেউ একজন কাঁধে করে তার পেছন-পেছন চলে আসবে। গাজিশাহেব রওনা দিতেই একজন বলে ওঠে, 'ছাহেব, গড়ায় কী না, দ্যাখব?'

'দ্যাখ্।'

মুহূর্তে লোকটি ঐ ভিড়ের সবচেয়ে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। সে দুই হাতে হ্যান্ডেলের দুই মাথা এত শক্ত করে চেপে ধরে যে তার কাঁধ ফুলে ওঠে। কিন্তু সে টানতেই সাইকেলটা চলতে

শুরু করে। তাকে তারিফ দিয়ে কেউ চেঁচিয়ে ওঠে, 'বাপের নাম রাখলি রে, বেটা!'

এত হৈচৈয়ে লোকটিই একটু নার্ভাস হয়ে যায় বোধহয়। সে হ্যান্ডেলটা আরো শক্ত করে চেপে ধরে আর সেই জোরের একটু হেরফেরে সাইকেলটা ডানদিকে ঘুরে যায়। লোকটি আরো চেপে ধরতেই সাইকেলটা ডাইনে কাত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। লোকজন তাকে ও সাইকেলটাকে তুলে খাড়া করে। লোকটি কিছুতেই হ্যান্ডেল থেকে মুঠো খুলছিল না। 'আরে, মুইঠ্যা খুল। তুই কি শুইয়্যা শুইয়্যা চালাবি?'

সাইকেলের সামনের চাকাটা উঁচু হয়েছিল—সেটা একটু ঘুরছিলও, 'জো—র দ্যাখ্, জো—র, চাকার জো—র, ক্যামন নিজের থিক্যাই পাক খায়।'

গাজিশাহেব শুধু বলল, 'কইল্যাম মাথাত্ নিবার, আর তুই গড়ান ধরলি? এক কাম কর্। একখান গাড়ি ধর্।'

গাড়ি মানে গরুর গাড়ি। 'ধর্' মানে নিয়ে আসা। কোত্থেকে সেটা নিশ্চয়ই গাজিসাহেবের জানার কথা নয়। গাজিশাহেব তো আর নিলামে ওঠা তিন পাইয়ের জমিদার না, তাঁদের জমিদারির সনদ বাদশাহ জাহাঙ্গিরের আমলের। এত পুরনো ঘর বলেই যেমন বুড়ো বয়সে নতুন বিবি করতে পারে, তেমনি তা নিয়ে হাটে বসে দশের ঠাট্টাতামাশাও নিতে পারে, আবার সেইসব কিছু নিয়ে জীবন, নরনারী আর দিনযাপনের রহস্যও করতে পারে। এত পুরনো ঘর বলেই তাকে জমিদারির ঠাটঠমক আয়ত্ত করতে হয় না—গ্রামের সঙ্গে মিশেই থাকে। তবু তো মোনাগাজি জমিদার—তাকে তো সরকারে রাজস্ব জমা দিতে হয়। সে যদি নিজের মনেই বলে, 'একটা গাড়ি ধর্' তাহলে দেখতে-না-দেখতে দু-দশটা গাড়ি তো নিজে থেকেই এসে পড়বে। তবে এই স্টিমারঘাটাটা গাঁয়ের বাইরে—তাই হয়ত একটু সময় লাগে বা দশটা গাড়ির বদলে দুটো আসে।

স্টিমারঘাটা থেকে নলচিড়া যাওয়া যদি হাঁটার বদলে গাড়িতে সহজ হত, তাহলে গাজিশাহেব নিজের গাড়িই তো লাগিয়ে রাখতে পারত, তার নিজেরই জন্য। স্টিমারঘাটা থেকে নলচিড়া পায়ে যেতে যদি লাগে এক আঙুল টাইম, তাহলে গাড়িতে যেতে লাগে অন্তত দুই আঙুল, মানে, ডবল টাইম। গরুর গাড়ি তো পায়েহাঁটা আল ধরে যেতে পারে না, তার তো চওড়া জায়গা দরকার, মাঠ দিয়ে বা বাঁধ দিয়ে। তার ওপর মাটির ওঠানামা আছে, ঠেলাঠেলি আছে।

একটা গাড়িতে সাইকেলটাকে শোয়ানো হল। প্যাডল পাটাতনে ঠেকে যাওয়ায় সামনের চাকাটা শূন্যে উঠে গেল। তার মানে সারা রাস্তা ঘটর ঘটর। গাড়োয়ান গাড়ির পেছনে গোঁজা একটা ছালা এনে প্যাডলের নীচে দিয়ে সামনের চাকাটাকে ডাইনে একটু নেতিয়ে দিল—চাকাটা আর উঁচু হয়ে থাকল না। ভিড়টার দিকে তাকিয়ে গাড়োয়ান বলল, 'বাইন্ধ্যা দিব না কী?' গাজিশাহেবকে জিজ্ঞাসার সাহস নেই তার। তারই বয়সের একজন বলে ওঠে, 'বান্ধাবান্ধির কাম নাই। চল্ গিয়্যা। আমি ধইর‍্যা রাখব।'

গাড়ি চলতে শুরু করল আর সেই গাড়ির পেছন-পেছন চলতে লাগল পুরো ভিড়টা। এক মুরুব্বি এসে গাজিশাহেবকে বলে, 'আপনার আর লগে-লগে যাওয়ার কামডা কী? এই নাইমলেন ইস্টিমার থিক্যা। আপনি বাড়িত্ যাইয়্যা বসেন, আমরা তো আছি।'

'সেইডা কি ঠিক কাম হইব? একলগেই যাই।'

সামনে গরুর গাড়ি। তার ওপর দুই গাড়োয়ান পা ঝুলিয়ে। গরুর গাড়ির ওপর সাইকেল, শোয়ানো। যে জানে না, তার পক্ষে দূর থেকে আন্দাজে সাইকেল বোঝা তো সম্ভবই নয়, এমনকী গাড়ির ওপর উঠে উবু হয়ে গন্ধ শোঁকার পরও সেটা যে সাইকেল এটা বোঝা তার

পক্ষে কঠিন, খুব কঠিন। কারণ, এমন যে যেতে পারে, সাইকেল, তা সে কোনো কালে তো শোনেনি। শোনেইনি। এমন হতে পারে, আজ যদি সে দেখে ও বোঝে, বোঝে ও দেখে, তাহলে, সাইকেল আর গরুর গাড়ি তার মাথায় এতই ঘোর ঢুকিয়ে দেবে যে সে আর সারা জীবনে সেটা ছাড়াতে পারবে না।

তার ওপর পেছনে এত ভিড়, চারপাশের সব মোড়ল-মাতব্বর, কাচ্চাবাচ্চা, কে নেই? সবচেয়ে আগে, মোনাগাজি তার শাদা দাড়ির নিশান উড়িয়ে। শুরুতে কেউ-কেউ গাজিশাহেবের পাশে-পাশে যাচ্ছিল, মোড়ল-মাতব্বরদের কেউ-কেউ, তারপর কোনো এক সময় পেছিয়ে গেছে। পেছিয়ে গেছে—মানে, দু-এক পা। গাজিশাহেব কোথাও বসে থাকলে, সে তার দলিজেই হোক আর হাটের বাঁশের মাচাতেই হোক, তার মুখোমুখি বসে কিংবা দাঁড়িয়ে হাসিমশকরাও করা যায়। বা, গাজিশাহেব কোথাও দাঁড়িয়ে থাকলে, এই যেমন ছিল স্টিমারঘাটায়, তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েও কথা বলা যায়। কিন্তু সে তার নইলিবিবির জন্য একটা সাইকেল কিনে এনে স্টিমার থেকে নামাতে পারল না, নিজে গড়িয়ে-গড়িয়ে বাড়ি নিয়ে যেতে পারল না, এখন গরুর গাড়িতে চাপিয়ে পেছন-পেছন যাচ্ছে, যেন কফিনের পেছনে কবরখানায়, তখন কি আর খেলা, খেলা? থাকে, তখন কি তার পাশে-পাশে হাঁটা যায়?

মাঠঘাট থেকে দু-একজন চেঁচিয়ে প্রশ্ন করে, 'যায়ডা কী?'

যে-বাচ্চারা অনেক পেছনে তারা সরু গলায় চিৎকার তুলে জবাব দিচ্ছিল, 'নইলিবিবির সাইকেল।'

নইলিবিবির সাইকেল—মোনাগাজির তিন নাকী চার নাকী পাঁচ নম্বরের বিবির খেলনা আর যোগেন উকিলের সাইকেল বরিশালের পয়লা এম এল এ-র বাহন?

অ্যাহন তিন সাব-ডিভিশন, যোল থানা জুইড়্যা সেই বাহনের দলাইমালাই চইলত্যাছে, বাহন যাতে খাড়াইতে পারে, খাড়াইয়া দৌড় মাইরব্যার পারে। আর সে-বাহন অ্যাহন তার একমাত্র সওয়ারি পিঠে...। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন একজন সাইকেলারোহী পুরুষ চন্দ্রদ্বীপ হইতে গাড়-রহমতপুরের পথে একাকী গমন করিতেছিল। যোগেনের ঠোঁটে একটু হাসি লেগে থাকে। আরে, বাটখারার ওজন নিতে না পারলে কি আর দাঁড়িপাল্লার পাল্লা ওজন নিতে পারে? নামের মত নাম না-হলে কি আর নামের ওজন বওয়া যায়? যদি বলা যায়, বাখরগঞ্জ থেকে রহমতপুরে যাইতেছিল, তাহলে কি আর 'গমন করিতেছিল', বলা যায়? কোন শব্দে পাল্লা চড়ে যাবে—তার একটা বিচার নেই না কী? যোগেনের ঠোঁটের বাঁকা হাসি আর-একটু ছড়িয়ে পড়ে। যোগেন মণ্ডল—এ শব্দের ওজনের কোনো বাটখাড়া হয়? যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল—এরকম বানালেও দাঁড়ায় না। শ্রীযুক্তবাবু রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরি মহাশয়, শ্রীযুক্তবাবু রামজীবন রায় মহাশয়, শ্রীযুক্তবাবু শশিকুমার ঘোষ মহাশয়—এসব নামের ওজন কত? শ্রীযুক্তবাবু যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, এই নামের ভিতরে কোনো মাংস নাই, যে-মাংস থেকে ওজন বাড়ে। পিছনে যার 'মণ্ডল', সামনে কি তার 'শ্রীযুত' চলে? পিছনেই যার 'মণ্ডল', তাকে কি পেছন থেকে 'মহাশয়'-এর গোঁজ দেওয়া যায় হয়ত চলতেও পারে—মণ্ডলমশয়রা? 'মণ্ডল'-এর পর 'মহাশয়'—চলে? চালালেও?

বরিশালে চলে না—সেখানে এত নাম, এত গল্প, এত জমিদারি, এত নৌযুদ্ধ, এত চোরাগোপ্তা।

সাইকেলে ব্যক্তিত্ব অশ্বিনী দত্ত ও যোগেন মণ্ডল

৬

এই রাস্তাটা অনেক পুরনো, হয়ত আদিকালের পায়েহাঁটা পথকে নানা সময় নানারকম করে একটা পাকাপথ বানাবার চেষ্টা হয়েছে। কখনো মাটি পিটিয়ে, কখনো তার সঙ্গে বালি মিশিয়ে পেটাই করে, কখনো ছোট-ছোট ঝামা দিয়ে, কখনো কয়লার গুঁড়ো দিয়ে। ফলে, রাস্তাটা হয়ত মাস-দুই-তিন চলার মত থেকেছে, তারপরই ভাঙতে-ভাঙতে আগের চাইতে খারাপ হয়ে গেছে। তখন লোকের মুখে শোনা যায়, দোহাই দে বাবা, রাস্তাটারে রাস্তার মতন থাইকব্যার দে। লোকজনের মুখের এমন কথার সাধারণত মাথামুন্ডু থাকে না। তবে এই রাস্তাটার ব্যাপারে এই কথাটার মাথাও আছে, মুন্ডুও আছে। মেরামতির চেষ্টার দু-মাস যেতে-না-যেতেই যখন রাস্তাটা ভাঙতে শুরু করে তখন মেরামতির মাটি কিংবা বালি কিংবা শুরকি কিংবা ঝামা কিংবা কয়লাগুঁড়ো উগরে দেয় রাস্তাটা, উগরে দেয়ার মত করেই উগরে দেয়। ফলে যা ভাঙন ছিলই, তার সঙ্গে এই সব দ্রব্য মিশে ভাঙনটাকে অচেনা করে দেয়। শেষে একবার বুঝি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড গোটা-গোটা ইট কোণাকুনি বসিয়ে পাকা রাস্তা বানিয়ে দিল। সেটা ভাল কাজই হয়েছিল। সময়ে তো সব রাস্তাই ভাঙবে—কেয়ারি-মেরামতির পর উগরনোটা বন্ধ হয়েছিল। সেই মেরামতিই এই রাস্তার শেষ মেরামতি। তারপর তো ফরিদপুর-মাদারিপুর থেকে খাড়া টানা শ-খানেক মাইলের রাস্তাই তৈরি হয়ে গেল। বরিশাল থেকে কাশীপুর পর্যন্ত রাস্তাটুকু একবার পিচঢালা হয়েছিল—কবে, সেটা যোগেনের খেয়াল নেই ও কেন, সেটা যোগেন কখনো ভাবেনি, এখন একা-একা সাইকেল চালাতে-চালাতে ভাবতে চায়।

মাঘ মাস, রাস্তাটা তাই শুকনো। হেঁটে যেতে একজনের যতটা জায়গা দরকার, সাইকেলে তার একফালি হলেই চলে। রাস্তার একটা ধার দিয়ে সরু ফালির মত পথ পেলে অসুবিধে নেই। সেই ফালি কোনো গর্তে গিয়ে পড়লেই ঝামেলা। গর্ত এড়াতে সাইকেল ডাইনে-বাঁয়ে ঘোরাতে হয়, রাস্তার ওপর নজর রাখতে হয়, গতি যায় কমে, কোনো-কোনো সময় পড়ো-পড়োও হতে হয়। এই রাস্তা নিয়েই যোগেনের ভাবনাটা একটু পাক খেল। আচ্ছা, একটা জায়গা থেকে আর-একটা জায়গা পর্যন্ত পুরনো, চালু, চেনা, হাঁটাপথ যদি থাকে, তবে ঐ দুরত্বটা যুক্ত করতে যদি রাস্তা নতুন করে ও ভাল করে বানাতে হয়—তাহলে পুরনো রাস্তাটাকেই তো নতুন ও ভাল করা স্বাভাবিক। এখনো তা হল না কেন? একটুমাত্র পশ্চিমে সরে গিয়ে, নতুন রাস্তা বানাতে হল কেন? কথাটা এতদিন ওঠেনি কেন? যোগেনের মনে হওয়া না-হওয়ার কথা বাদ দেওয়া যায়—সে না-হয় বি এম কলেজ থেকে ২৯-এ বি এ পাশ করে সেই-যে বরিশাল ছেড়েছিল, সাত-আট বছর পর ফিরে এল উকিল হয়ে। কিন্তু বরিশালের ভদ্রলোকরা তো কাউকে ছেড়ে কথা বলে না, কংগ্রেস আর হকশাহেব দুয়েরই ভিত শক্ত—কথাটা তাহলে উঠলই না কেন? নিজের মনে প্রশ্নটা এভাবে এল কেন? সে তো একটা আন্দাজ করতে চায়—পুরনো এই রাস্তাটাই নতুন না করে নতুন একটা রাস্তা বানানো হল কেন? ঠিকঠাক কারণ খুঁজে বের করা তার কলেজজীবনের অভ্যাস—অশ্বিনীকুমারের 'লিট্‌ল ব্রাদার অব দি পুওর'-এর কর্মী হিশেবে। এখন সেই অভ্যেসই কোর্টের নথি তৈরির কাজে লাগে। একদিন সিভিল কোর্টের জজশাহেব তার নথি খুলে বলে উঠেছিলেন—'মিস্টার মণ্ডল তো তাঁর হাতের লেখার গুণে ও নথির পরিচ্ছন্নতায় মামলার অর্ধেকটা আগেই জিতে নেন।' সেই কথার পর

তো বার লাইব্রেরিতে সিনিয়ররা তার পেছনে লাগলেন, 'এই যোগেন, তোমার শ্রুতিলিখিন ক্লাশ কখন?'

বার্থী তারা ইনস্টিটিউশন থেকে অঙ্ক আর সংস্কৃতে লেটার নিয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে যোগেন বরিশাল শহরে ব্রজমোহন কলেজে ভর্তি হল। বছরের হিশেবে সেটা ১৯২৪-এর ২০ আগস্ট। আর অশ্বিনীকুমার মারা যান ৭ নভেম্বর, ১৯২৩—যোগেন কলেজে ঢোকার মাস নয়েক আগেই। তবু, যোগেন তো একটু বেশি বয়সেই পড়াশুনো শুরু করে, অশ্বিনীকুমারের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল ক্লাস ফাইভেই, তখন তার বয়স পনের-ষোল। উলটো করে বলা যায়—অশ্বিনীকুমারই পৌঁছে গিয়েছিলেন যোগেনের কাছে। ১৯১৯ বরিশালে মারণঝড় আর সাইক্লোনের বছর। অশ্বিনীকুমার তখন বুড়ো—কিন্তু সেই উদ্ধার-ত্রাণ-পুনর্বাসনের অভিযানের সেনাপতি। স্কুলে-স্কুলে ঘুরে ভলান্টিয়ার বাহিনী তৈরি করে দু-জন করে নেতার অধীনে উপদ্রুত উপকূলের নির্দিষ্ট জায়গায় পাঠিয়ে দিচ্ছেন। সেই কাজেই অশ্বিনীকুমার এসেছিলেন যোগেনদের স্কুলে।

অশ্বিনীকুমার-মুগ্ধ হতে বরিশালবাসী কারো তাকে চোখে দেখার দরকার ছিল না। সত্যি বলতে—বহু দূরের গ্রামের গরিব চাষীরা অনেকে জানতই না, অশ্বিনীকুমার নামে একজন হাত-পা ওয়ালা মানুষ আছেন, তাঁর বাড়িঘর অফিসকাছারি আছে, তিনি হেঁটে চলে বেড়ান ও কথাবার্তা বলেন। তারা, এই চাষীরা, রোয়াগাড়ার সময় 'জয় গৌর'-এর সঙ্গে 'জয় অশ্বিনী'ও বলত। তেমন অশ্বিনীকুমারকে তাদেরই স্কুলের হেডমাস্টারমশাইয়ের পাশে ধুতির খুঁটো জড়িয়ে বসে থাকতে দেখে যোগেনের বাক্‌রোধ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। কথা বলতে যখন তিনি দাঁড়ালেন, তখন যোগেন বুঝতে পারে—না, ধুতির খুঁট নয়, ওটা একটা কাপড়ের উতোরি। শাদা একটা পণ্ডিতি পাঞ্জাবি আর কাপড়ের জুতো তার পরনে।

অশ্বিনীকুমার খুব আস্তে-আস্তে কথা বলেন ও শুধুই কাজের কথা। কোথাও কোনো হুঙ্কার নেই, কোথাও কোনো হাহুতাশ নেই, কোথাও কাউকে দোষারোপ নেই।

তিনি বলেছিলেন—বরিশাল সমুদ্র-উপকূলবর্তী একটি বদ্বীপ। সেই কারণে বরিশাল জিলায় আমরা প্রকৃতির অনেক সাহায্য পাই—আমাদের ফলনের পরিমাণ বঙ্গদেশে অদ্বিতীয়। প্রকৃতির এই সাহায্যের মতই কখনো-কখনো আমাদের খুব বিপদও ঘটে। সামুদ্রিক ঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাসে বরিশাল খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বরিশালের স্থলভাগের ভিতরে অজস্র ছোটবড় খাল পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। ফলে দোনা দিয়ে দুই মুখে বন্যার স্রোত ঢুকে মধ্যপথে একটা জলবিস্ফোরণ ঘটায়। এটাও বরিশালের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য যে সমুদ্রোপকূলের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঐ দোনাপথে সারা জিলায় ছড়িয়ে পড়ে। এ-বছর খুব বড় দুর্যোগ হয়েছে। আমার বয়স যখন ৩১, তখন একবার এমন ভয়ংকর দুর্যোগ হয়েছিল—মনে আছে। এখন, আমার বয়স ৬৩—এখন আবার সেইরকম আর-একটি দুর্যোগ ঘটল। এই বিপদ থেকে এখন নিজেদের বাঁচতে হলে কয়েকটি কাজ পরপর করতে হবে। প্রথম কাজ—দুর্যোগ-আক্রান্ত প্রধান জায়গাগুলির সর্বত্র প্রতিটি শিশু-বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে, টাইফয়েড ও কলেরার ইঞ্জেকশন দিতে হবে। কারো কোনো আপত্তি বা বাধা শোনা হবে না। আমরা এই অঞ্চলে ঘুরে-ঘুরে দেখেছি ও ঠিক করেছি—প্রথম দফায় যুদ্ধসৈন্যদের ন্যায় দ্রুততায় পটুয়াখালির দক্ষিণে, পুবে দশমিনা আর পশ্চিমে গলাচিপা গ্রাম পর্যন্ত এই ইঞ্জেকশন-অভিযান শেষ করতে হবে। প্রথম দফায় গলাচিপা নদী পার হওয়ার দরকার নেই। এই ইঞ্জেকশন বাহিনীকে—একটি ম্যাপের ওপর তাঁদের যাত্রাপথ আঁকতে হবে, ইঞ্জেকশন-দেওয়া প্রতিটি ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা লিখতে হবে। পরিচ্ছন্ন হাতের

লেখায় তারা কোথা থেকে এসেছে বা কোথাও থেকে এসেছিল কী না—সেটা পরিষ্কার করে লিখতে হবে। ইঞ্জেকশন বাহিনীর পেছনে পানীয়জল ও খাদ্যবাহিনী।

অশ্বিনীকুমারের দেখাদেখি পনের বছরের কিশোর যোগেন শিখেছিল—যে-কাজের হিশেব নেই, সে-কাজের দরও নেই। যোগেন শিখেছিল—নিজের সারাদিনের কাজের হিশেব কষতে। যোগেন শিখেছিল—আয়োজনে সময় খরচ না করে কাজটাতে ঢুকে পড়তে। ১৯১৯-এর দুর্যোগত্রাণের কাজ আর ১৯২১-এর প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মিলনের জন্য অভ্যর্থনা সমিতির ভলান্টিয়ারের কাজ—এই দুইয়ের মধ্যে কোনো ফাঁক ছিল না। গরমের আর পুজোর ছুটির শুরু ও শেষে এক সপ্তাহ করে বাড়িতে থাকা আর বাকি সময়টা ভলান্টিয়ারি। ভলান্টিয়ারির মানে—গ্রামের মানুষকে গিয়ে হিশেব দেখিয়ে জানাতে হবে—গত দু-এক বছরে কোন্ বা কোন্-কোন্ প্রতিদিনের দরকারি জিনিশ বরিশালে তৈরি করে, বরিশালের বাইরে পাঠানো হয়েছে। জোলা ও তাঁতিরা কী বুনেছে বেশি—গামছা নাকী জালি শাড়ি? কতটা সময় ধরে কতটা জায়গার কটা পুকুর কী কী কারণে ভেঙে গেছে ও মজে যাচ্ছে? কোন্ গ্রাম থেকে কোন গ্রাম পর্যন্ত মাইল দুয়েক মত বাঁধরাস্তা বানালে বা খাল কাটলে যাতায়াত সহজ হয়? পুরনো চৌকিদারি এলাকার জনবসতির হার কী রেটে কমেছে বা বেড়েছে? সাব-সাব-পোস্টঅফিসের লোকসংখ্যা কী হারে কমেছে বা বেড়েছে? যদি বেড়েই থাকে তাহলেও চিঠিবিলির কাজে সরকারি রেটেই আরো কত লোক দরকার?

শেষ চারটি প্রশ্নে এটাও সঙ্গে-সঙ্গে জানতে চাওয়া হয়েছে—শিক্ষিত ভদ্র যুবকেরা কে কে এই কাজ বিনা বেতনে ও সরকারি অনুদানের অপেক্ষায় না থেকে এখনই করে ফেলতে রাজি আছে?

তার পনের বছর বয়স থেকে, বলা যায় তার পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত, যোগেনের কেটেছে অশ্বিনীকুমারের ছায়ায়-ছায়ায়। তার বয়েসি অন্য সব কিশোর-যুবকদের মতই। না। যোগেনের বয়েসি বর্ণহিন্দু বাড়ির কোনো কোনো কিশোর-যুবকের মত। যোগেন যখন অশ্বিনীকুমারের সংগঠন, 'লিট্‌ল ব্রাদার্স অব দি পুওর'-এর ভলান্টিয়ার হয়েছে, তখন তাতে নমশূদ্রও নেই, মুসলিমও নেই। অশ্বিনীকুমারের মৃত্যু যোগেনের উনিশ বছর বয়সে। তিনি দেশের কাজ বলতে যা বুঝতেন ও হাতেকলমে করেছেন তার প্রভাব ছিল, তাঁর হাতে তৈরি নেতারা ছিলেন, তাঁর স্কুল ও কলেজে তাঁর ভাবনায় ভাবিত কর্মী-শিক্ষকরা ছিলেন। যোগেনের মত ভাল, বুদ্ধিমান ও সক্রিয় ছাত্র সব কাজেই ডাক পেত ও ভার পেত। বিএ পাশ করার পর আরো পড়ার সংস্থান জোটাতে যোগেনকে বরিশাল ছাড়তে হল। অশ্বিনীকুমারের কাছ থেকেও তাকে সরতে হল।

এর উলটোটাও সত্যি।

অশ্বিনীকুমার নিজেই ততদিনে সরে যাচ্ছেন অশ্বিনীকুমারের কাছ থেকে।

অশ্বিনীকুমার তো প্রাচীন নেতা—কংগ্রেসের চাইতে প্রাচীন, গান্ধীজির চাইতে প্রাচীন, আর যদিও কলকাতায় তাঁর সম্মান ও প্রতিপত্তি কলেজজীবন থেকেই অব্যাহত, তবুও তাঁর সমস্ত চিন্তা ও কাজ তো রচিত হয়েছে বাখরগঞ্জ-বরিশালকে ভিত্তি করেই। তাঁর প্রধান কর্মকাল তো যোগেনের জন্মের অনেক আগে থেকে যোগেনের নয়-দশ বছর বয়স পর্যন্ত। সারা বাংলায় গুপ্ত সমিতির বিরুদ্ধে যখন ব্যবস্থা নেয়া হয়, সেই ১৯০৮-এই, অশ্বিনীকুমারকে গ্রেপ্তার করে লক্ষ্ণৌ জেলে নিয়ে যাওয়া হল। অশ্বিনীকুমারের নেতৃত্বে আত্মনির্ভরতার ও শিক্ষাপ্রসারের যে-অভিযান চলছিল বরিশালে, তাকে নিরীহ সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন বলে মেনে নেয়নি ইংরেজ-সরকার। সংস্কার-কাজে ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সমাবেশে অশ্বিনীকুমার বর্ণহিন্দু সংস্কৃতি

দিয়ে নির্ধারিত সীমা ভেঙে, বরিশালের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম ও নমশূদ্রদের কাছে পর্যন্ত যেতে চাইছিলেন ও সেই স্তর পর্যন্ত স্বদেশবোধ ছড়াতে মুকুন্দ দাসের মত এক সাংস্কৃতিক যোক্তা সম্ভব করে তুলেছিলেন। ১৯১০-এ মুক্তি পাওয়ার পর অশ্বিনীকুমার নতুন করে ভাবার ভিত পাচ্ছিলেন না, বরিশালে বা তার নিজের মধ্যে। তাঁর বি এম কলেজকে বাঁচাতে তিনি সরকারের শর্ত মেনে সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নেন ও সরকার-অনুমোদিত ট্রাস্টি বোর্ডের হাতে পরিচালনার দায়িত্ব দিতে বাধ্য হন। আবার ১৯২১-এ অসহযোগ আন্দোলনে বি এম কলেজ জাতীয় বিদ্যালয় হয়ে গেল। শিল্পোন্নয়নে তিনি ইংরেজের সমর্থনেও বিশ্বাস জানাচ্ছেন। ক্রমেই অশ্বিনীকুমার হয়ে যাচ্ছিলেন অশ্বিনীকুমারের গল্প।

সে-গল্পের সঙ্গে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী জাগরণ মিশে আছে। 'বন্দেমাতরম্' বলা নিষেধ করে কার্লাইল সার্কুলার জারি হল। তার প্রতিবাদে বরিশালে প্রাদেশিক সম্মিলন। সম্পাদক অশ্বিনীকুমার। পুলিশের সুপার কেম্পশাহেব, সভা ভেঙে দেওয়ার সরকারি হুকুম জারি করতে সভার মঞ্চে এলে সভায় উপস্থিত মানুষজনের দাবিতে ভয় পেয়ে নিজেই 'বন্দেমাতরম্' বলতে বাধ্য হয়েছিল আর সরকারি এই হুকুমে নেতারা সভা ভেঙে দিতে বাধ্য হয়েছিল। সমিতির পরামর্শসভায় বিপিন পাল বলেন, 'আমি গবর্মেন্ট মানি না কিন্তু লাঠি মানি।' তার জবাবে কাব্যবিশারদ বলেন, 'আমি গবর্মেন্ট মানি, কিন্তু লাঠি মানি না।' পুলিশের লাঠিতে মৃতপ্রায় ছেলে চিত্তরঞ্জনকে সম্মেলনে এনে মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা 'মেঘনাদ বধ কাব্য' থেকে বলছেন, 'জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?' সিলেট থেকে সুন্দরবনের লাটমহল পর্যন্ত পুরো বঙ্গদেশের নেতা ও জমিদাররা এসেছিল, কলকাতার বুদ্ধিজীবীরাও সেই সম্মিলনে, বরিশালে। একসঙ্গে এতগুলো একনম্বরি জমিদার, নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের এমন লাঠিপেটা আর গ্রেপ্তার সম্ভবত আর কখনো পুলিশ করতে পারেনি। সুরেন ব্যানার্জি, ফণিভূষণ ব্যানার্জি, গীষ্পতি রায়চৌধুরি, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শচীন্দ্র প্রসাদ, বেচারাম লাহিড়ী, শশিভূষণ দে, ললিত ঘোষাল, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, ব্রজেন গাঙ্গুলি, কেদার দাশগুপ্ত, জি চৌধুরি, বিপিন পাল—এঁরা কেউ কখনো কল্পনাও করতে পারেনি যে গণতন্ত্র, প্রগতি ও আইনশৃঙ্খলার প্রতীক ব্রিটিশরাজের সেপাই তাঁদের এমন পেটাই পেটাতে পারে। এঁরা সকলেই 'বাবু', ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান নির্ভর। এঁরা প্রধানত বর্ণহিন্দু। কাব্যবিশারদকে যখন পুলিশ মারছিল, তখন এক সুবেদার এসে সেই সেপাইকে নিরস্ত করে, 'মাৎ মারো, ব্রাহ্মণ হ্যায়।' ব্রাহ্মণদের নীতি অনুযায়ী কাব্যবিশারদ কোনো সেলাই-করা জামা পরেননি—ফলে তাঁর পৈতে তাঁকে বাঁচিয়েছে। সম্মিলনে অবিশ্যি রাজেন সাহা বলে এক অজলচল হিন্দুকেও দেখানো হয় বালকবীর হিশেবে। সে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিলেতি কলমে সই করতে, আর জেলখানায় বিলেতি কম্বল গায়ে দিতে, অস্বীকার করে।

হ্যাঁ, অশ্বিনীকুমারই বুঝেছিলেন—মুসলিম ও অবর্ণহিন্দুদের বিপুল জনস্তরকে মিলিয়ে দিতে না পারলে দেশবোধ তৈরি হবে না। এটা তিনি বুঝেছিলেন স্বদেশী যুগের কাজকর্ম ও চিন্তাভাবনা থেকে। সেই বোঝাবুঝি পরে তিনি আর নিজের মধ্যেও ফিরিয়ে আনতে পারেননি। ১৯০৬-০৭-এই-বা কতটা পেরেছিলেন? তাঁর 'স্বদেশবান্ধব সমিতি'র প্রায় অর্ধেক নেতারাই তো ছিল ছোট বা মেজ জমিদার। যেখানে ছোট বা মেজ জমিদার হিন্দু আর তার চাষীরা বেশির ভাগই মুসলিম, সেখানে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন হয়ে উঠছিল হিন্দু-জমিদারের সঙ্গে মুসলিম-চাষীর স্বার্থের সংঘাত। এটাই বদলে যেত ছোট ও মেজ জমিদার যখন মুসলিম আর চাষীরা অবর্ণহিন্দু। বরিশালে তো এটা আকছার—এক আদি জমিদারি যে কত উপ-উপ স্বত্বে ভাগ আর সেই ভাগাভাগির কোন্ স্তরে যে হিন্দু জমিদারিতে মুসলিম ছোট বা মেজ ছিল,

বা উলটোটা, সেটা তখনো বা এখনো জানা যায়নি। ফলে, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে ধরে হিন্দু-মুসলমান জমিদারদের ও হিন্দু-মুসলমান চাষীদের দুটো আলাদা সমাবেশই ঘটে যাচ্ছিল—জমিদারদের আর চাষীদের। বা, বড়জোর বাবুদের বঙ্গভঙ্গ বিরোধিতার সমাবেশ এক-এক জায়গায় এক-এক রকম করে ভাগ হয়ে যাচ্ছিল। ১৯০৭-এর অক্টোবরে উত্তর কলকাতায় স্বদেশী মিছিলের ওপর পুলিশ চালাল লাঠি আর পুলিশের পেছন থেকে নতুন শহুরে 'ছোটলোকরা', 'ধাঙড়, মেথর, ডোম'—ইত্যাদি শূদ্র হিন্দুরা মারল ঢিল-পাটকেল। দাঙ্গা বেধেছে ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে, কুমিল্লায়, জামালপুরে, দেওয়ানগঞ্জে। একদিকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে জমিদারবাবু নিজের জমিদারির স্বার্থে নমশূদ্র ও অন্যান্য শূদ্রদের সঙ্গে একজোট হওয়ার কথা বলছেন, অন্যদিকে ঠিক ঐ সময়ই, ঐ সুযোগেই ময়মনসিংহে এক-এক জমিদারের ডজন-ডজন কুলদেবতার খোরপোশের জন্য চাষীদের ওপর 'ঈশ্বরবৃত্তি'-র নামে খাজনা বসাচ্ছেন। আর-একদিকে, পুব বাংলা ও আসামে পরপর তিন-চার বছর পাটের ফলনের বান ডেকেছিল—১৯০৬ থেকে ১৯০৯ পাটের ব্যবসায়ী মুসলিম মহাজনরা লাভে-মুনাফায় ফেটে পড়ছিল। তারা কোথা। না-কোথা থেকে নতুন-নতুন পির আর মৌলবি আমদানি করে রটাতে লাগল—ইংরেজরা ঢাকার নবাব সলিমুল্লা-র হাতে নতুন প্রদেশ 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম'-এর ভার দিয়ে চলে যাচ্ছে। সেই সব পির-মোল্লারাই হয়ে দাঁড়াল নেতা। হিন্দু জমিদার বা বাবুদের তো পুরুত দরকার নেই—তারা নিজেরাই তো কুলীন বামুন-কায়েত।

স্বদেশী বা স্বাধীনতা বা কংগ্রেস বা আন্দোলন সম্পর্কে যোগেন খুব রাজনীতি করে, চিন্তাভাবনার মধ্য দিয়ে, পড়াশুনোয় মীমাংসা দেখে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছয়নি। যোগেনদের মত হদ্দ গরিব নমশূদ্রদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাও আর—কতটুকুই উচ্চ হতে পারে? আকাঙ্ক্ষার সেই উচ্চতা তো একটা অপরিবর্ত প্রক্রিয়া নয়। বরং অহোরহ পরিবর্তমান ফলে, তার জীবনযাপন থেকে ছিটকে গেছে বহু দরকারি, বহু অনিবার্য, বহু স্বাভাবিক ভারসাম্য। একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী অথচ হদ্দ গরিব নমশূদ্রের যদি ব্যক্তিত্বের ভিতরই ঢুকে পড়ে থাকে নেতৃত্ব, তাহলে তাকে চলাফেরা, মেলামেশা ও মতামতে সব সময় সজারুর মত কাঁটা উঁচিয়ে থাকতে হয়—আত্মরক্ষার দরকারে। সে সব সময়ই আক্রান্ত। সে-আক্রমণ সব সময়ই আসে তার জাতি-পরিচয় থেকে, তার নমশূদ্র পরিচয় থেকে। সে নিজেই এক পলকের জন্যও নিজের সেই পরিচয় ভুলতে পারে না। কোনো বর্ণহিন্দু বাড়িতে গেলে সে এক গ্লাস জল চাইতে পারে না। তাকে বেশ খেয়াল করে বর্ণহিন্দু বাড়ির নিমন্ত্রণ সামলাতে হয়। স্কুলে না-হয় তা নিয়ে মারামারি করেছে। কলেজে না-হয় তা নিয়ে দল পাকিয়েছে। কিন্তু এখন? তার ভিতর অস্বীকারের মনোভাব শিকড় গাড়ছে। সে-শিকড় জালের মত নয়। সে-শিকড় বহুতোয়া নদীর মত নয়। সে-শিকড় স্তবকের মত নয়। সে-শিকড় এক-ফলক বর্শার মত শাণিত, তীব্র, বিদ্ধক্ষম, মৃত্তিকাতলের সমস্ত বাধার ভিতর দিয়ে সূচ্যগ্রগতি।

কিন্তু বর্শা তো খননের হাতিয়ার নয়। বর্শা তো আক্রমণের হাতিয়ার, শূন্যকে এফোঁড়-ওফোঁড় করার হাতিয়ার।

অশ্বিনীকুমারের বরিশালপ্রাণতা যোগেনের ভিতর বাসা বেঁধেছে। আর, যোগেনের জৈবক্রিয়া থেকে তৈরি হয়েছে এক পদ্ধতি—যাতে পরিধিকে ছোঁয়া যায়। যোগেন নিজেও কেন্দ্র-পরিধির এই দখল তার ব্যক্তিত্বে টের পায়।

তাই এক ভয় হয়ে উঠছে ক্রমেই বাস্তব। যদি কোনো একদিন মাটির অন্তর্ভেদী বর্শা ফলক তার স্বভাবে ফিরে যায় আক্রমণে। তাহলে তো গাছটা উপড়ে যাবে।

সাইকেলে ইতিহাস বীরনগর, কাশীপুর, লাখুটিয়া, শিকারপুর, মাধবপাশা, চাঁদপাশা, দেহের গতি...

৭

যোগেন সাইকেলে বেশ গতি পেয়ে গিয়েছিল। ভালই তো রাস্তা। দু-দিকে তাকাতে-তাকাতে চালানো যায়—রাস্তায় কাকপক্ষীও নেই। কিন্তু যোগেন তো যেতে-যেতে বুঝতে চাইছিল—পুরনো এই রাস্তাটা এখন বাতিল করে দিয়ে নতুন বড় সড়কটা কেন বানানো হল।

বরিশালের জমিজমা বোঝা যার-তার কাজ না। বরিশালের পরগনা, পরগনা থেকে জমিদারি, জমিদারি থেকে খারিজা তালুক আর খারিজা তালুক থেকে হাজার-হাজার ছোট-ছোট হকিয়তের লিস্টি মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়, শাহেবদের পক্ষেও নয়। ব্রহ্মোত্তর, মহাত্রাণ, দেবত্র, লাখেরাজ, সিকিমি তালুক, হুজুরি তালুক, নিমওসত তালুক, হাওলা, নিম হাওলা, ওসত নিম হাওলা, ইজারা, মিরাশ ইজারা, মিরাশ মালগুজার, কায়েম করজা, মেয়াদি করজা, রায়তি, জোত—এর কি শেষ আছে? খাজনা ফাঁকি দেওয়ার জন্য জমিদারদের ফন্দি। গত মাসেই যোগেন এক মামলা দায়ের করেছে। গৌরনদী থানার বীরমহল পরগনার সদর-জমা একশ বছর আগে ছিল দুইশ বায়াত্তর টাকা আট আনা নয় পাই। সেকালের হিশাবেও একটা পরগনার সদর-জমা মাত্র দুইশ বায়াত্তর টাকা হতে পারে? খোঁজ করতে-করতে দেখা গেল এটা ছিল একেবারে ঘন জঙ্গল—এমন জঙ্গল যার আশপাশেও কোনো মানুষের বসতি থাকা সম্ভব নয়। ওটাকে খাশ-জঙ্গলমহলই করে দেওয়া উচিত। কিন্তু বরিশালে কি আর ইচ্ছে করলেই খাশ করা যায়? শাহেবরাও পারবে না। আকবরের আইন-ই-আকবরিতে পরগনা বলে লিস্ট করা আছে। এখন শাহেবরা যখন সেটলমেন্ট শুরু করল, তখন সেটলমেন্ট অফিসারের হাত-পা বাঁধা। আরে, শাহেবেরও তো মালিক থাকে। তিন-চারশ বছর আগে যা পরগনা, সেটা এখন কী করে খাশ-জঙ্গলমহল হবে? বরং উল্টোটা হতে পারে। আগে জঙ্গল ছিল, এখন কায়েম হয়েছে।

অবিশ্যি, বরিশালে সবই হতে পারে—এখানকার কোনো এক রাজ্যের রাজাই আচমকা সামুদ্রিক বানে ভেসে গিয়েছিল—এই বাখরগঞ্জেই। তাহলে বীরনগরের আর জঙ্গলমহল হতে অসুবিধে কোথায়? অসুবিধে ছিল শাহেবের আইনে। তাকে তাহলে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক সাক্ষ্যপ্রমাণ জোগাড় করতে হবে। কিন্তু শাহেব মিছিমিছি তা করতে যাবে কেন? তার কী দায় পড়েছে? জমিদাররাও মানবে না—'এক পয়সা আদায় নেই, অথচ জমা আছে।' তখন শাহেব তাদের বলল, 'আচ্ছা তোমাদের জমা আমি বাড়াচ্ছি না, ঐ দুশ বাহাত্তরই থাকল।' সেই বীরনগরের জমিদারির মালিক চৌধুরিরা আর নড়াইলের জমিদাররা। তাদের তো পোয়াবার, তারা মেয়াদি করজা দিয়ে প্রজাবসতি শুরু করল। মেয়াদি করজা মানে জমি ভাড়া দেওয়া। এখন নামমাত্র, খাজনা, পরে দেখা যাবে। আর, জমিদারের সুবিধে হল এই-যে, মেয়াদি করজার প্রজাকে জমি ছাড়তে বললেই ছাড়তে হবে—রাতে বললে সকালে, সকালে বললে সন্ধ্যায়। বার্ষিক জমা দুইশ বাহাত্তর টাকার জমিদারি দেখতে-না-দেখতে বছর দশেকে ডাগর হয়ে উঠতেই জমিদাররা খাজনা-বাড়ানো আর উচ্ছেদ শুরু করল—সেই ব্যবস্থাই চলছে এখন পর্যন্ত—জমিদারির বার্ষিক জমা দুইশ বাহাত্তর টাকাই অথচ প্রজাবৃদ্ধি, প্রজার খাজনা-বৃদ্ধি ও প্রজা-উচ্ছেদ চলছেই, দেড়শ বছর হতে চলল। যোগেনের এই মক্কেল এক বামুন। কাগজপত্র দেখতে-দেখতে দেখতে-দেখতে যোগেন বুঝতে পারল—মক্কেলের কথাটা সত্য হতে পারে যে

তার পরবাবাকে (বাবার ঠাকুরদা) যখন ঐ গ্রামে বসানো হয় তখন তাকে কায়েমি কর্জাতেই বসানো হয়। অথচ এখন চার পুরুষ পরে এই বামুনকে মেয়াদি করজার দখলদার বলে জমি-ছাড়ার নোটিশ ধরিয়ে দিয়েছে।

উচ্ছেদ নোটিশ পেলে সকলেই তাই বলে। বামুন তার কথার কোনো প্রমাণ দিতে পারে না—কোনো প্রমাণই নয়, এমনকী তাঁদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের মধ্যে কোনো বুড়োসুড়ো কারো হদিশও দিতে পারে না, যাঁর মৌখিক সাক্ষ্যকে প্রমাণ বলে ধরা যায়। যোগেনের কিন্তু মনে হচ্ছিল—লোকটি বানিয়ে বলছে না কিন্তু কিছু কথা চেপে যাচ্ছে। বীরনগর বলেই যোগেনের মামলাটি নিয়ে এই ধারণাটি হল। অবশেষে, অনেকদিন ধরে জেরাজিজ্ঞাসার পর বামুন বলল—হ্যাঁ, তাদের আরো খানিকটা জমি ওখানেই আছে, সেটা ব্রহ্মত্র আর এটা কায়েমি করজা। যোগেন তাকে জিজ্ঞাসা করল—এই কথাটা লুকিয়ে রাখছিলেন কেন। বামুন বলে—ভয়ে বলিনি, যদি ব্রহ্মত্রটা চলে যায়। যোগেন বলেছিল ঐ বামুনকে—শোনেন, এক জমিরই কোনো বামুন-শুদ্দুর নাই, আপনার ঠাকুরদার বাপকে বামুন বলেই ঐ গ্রামে বসানো হয়েছিল যাতে গ্রামে বামুন আছে জেনে আরো লোকজন বসতি গাড়ার জোর পায়। তাই তো? এ প্রশ্নের জবাবে বামুন বলে, সেরকমই শুনে এসেছে। আপনাদের কি পুরোহিত বংশ? হ্যাঁ। আপনি কি পুরুতগিরি করেন, এখনো? কেউ ঠেকায় ডাকলে যাই। মানে, মরার সঙ্গে শ্মশানে? হ্যাঁ, তেমন হলে তো যেতেই হয়—তবে সবাই আমার কাছাকাছিই তো মরে না। তাহলে, যারা বেঁচে আছে তাদের পুজো-আচ্চা করে দেবেন। আপনার বড় ছেলের বয়েস কত? তা একুশ-বাইশ তো হল। সে কী করে? কিছু না। বিয়ে দিয়েছেন তো। হ্যাঁ, ছেলের বয়স হলে তো পুত্রবধূ ঘরে আনতেই হয়। ষাটের নাতিপুতিও হয়েছে? হ্যাঁ, দুই নাতি, সে তো সংসারের নিয়মে যা ঘটার ঘটছে। সে ঘটুক, আমি আপনার মামলা নিলাম, কিন্তু আপনি যদি পুরুতগিরি পুরোদমে না করে, গাঁয়ের লোকজন যদি আপনাদের ঠাকুরবাড়ি বা পুরুতবাড়ি বা বামুনবাড়ি বলে আলাদা করে না চেনে আর আপনার বড় ছেলেও যদি আপনার সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে পুজো না করে তাহলে মামলা ফেঁসে যাবে, ব্রাহ্মণের কাজ না করলে ব্রহ্মত্র ভোগ করবেন কী করে? বাড়িতে নারায়ণ আছেন? সে আছেন, কিন্তু, সেবা, মানে আমার স্ত্রী-ই, জলবাতাসা, আর কী! বুঝেছি, নারায়ণকে ভাল করে রাখুন, রোজ পুজো দিন শঙ্খঘণ্টা বাজিয়ে, আরতি দিন, লোকজনকে হালখাতা কী রোয়াগাড়া কী নতুন কেনাকাটায় নারায়ণকে সেবা দিতে বলুন, দশজন যদি বলে, আপনি বামুন, গ্রামে আপনার থাকা দরকার, তাহলেই তো হাকিম আপনাকে বামুন বলে মানবেন।

মামলাটি যোগেন নিত না—ব্রহ্মত্র শুনলেই মাথায় রক্ত চড়ে যায়। গলায় একটা সুতো ঝোলালেই জমির খাজনা নাই। ঘি-আতপ চালটাও কিনতে হয় না, ধুতি-শাড়ি-গামছাও কিনতে হয় না। এমনকী বর্ষার ছাতিও কিনতে হয় না। সবই দানে কিংবা ভুজ্যিতে পাওয়া যায়।

পুরো পরগনার বছর-জমা দুইশ বাহাত্তর টাকা আট আনা নয় পাই, গত দেড়শ বছর ধরে, এই অবিশ্বাস্য কারণে যোগেন মামলাটি নিল। অথচ এটাই এখানকার ব্যবস্থা। যোগেন তার পিটিশনে বলেছে—কোর্টকে এ-বিষয়ে খুব পরিষ্কার মত দিতে হবে যে, যে-সামাজিক অবস্থায় ব্রাহ্মণকে এই মর্যাদা দেওয়া হয় সেটা কি বদলে গেছে? জমিদারির জমা-র যদি কোনো বৃদ্ধি না ঘটে থাকে, তাহলে সেই অপরিবর্তিত অবস্থায় প্রজাস্বত্বের বদল কেন ঘটানো হবে—সে-প্রজা বামুনই হোক আর...।

যোগেন কাশীপুরের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল। কী নামডাক ছিল কাশীপুরের, যেন বরিশালের

যাঁরা গৌরব হবেন বলে ঠিক করেছিলেন, তাঁরা বরিশালে না থেকে এই মাইল কয়েক দূরে থাকবেন বলেই কাশীপুরের পত্তন হয়েছিল—মুখার্জি, চ্যাটার্জি, চক্রবর্তী, বসু, ঘোষদের জন্য। কলকাতা ইউনিভার্সিটি হতে-না-হতেই কাশীপুরে যেন এম এ-বি এ-র বান ডেকেছিল। কাশীপুর নিয়ে একটা মজার ছড়া আছে—'না-খাইয়্যা থাকা নাই কাশীপুরে/চাউল্যা সীতারাম বসু ঘুরে ফিরে।' একজন নাকী ছিলেন ঐ নামে যিনি ঘুরে-ঘুরে নিরন্নদের চাল দিয়ে আসতেন। যারা ছিল, এখন বরিশালে সর্বস্ব, বরিশালই তাঁদের পক্ষে ছিল যথেষ্ট। তাঁদের যাঁরা ছেলেপুলে তারা বেশিরভাগই যেন বরিশাল ছেড়ে গেলই না, ঠিক ছেড়ে-যাওয়া নয়। প্রত্যেকের সঙ্গেই বরিশালের যোগ আছে, তাদের বাড়িঘর আছে, তারা নিজেরাও অনেকে আছে। থাকবেই-বা না কেন। এত সব বড়-বড় জমিদারি দেখবে কারা? এক-একটা জমিদারির আয় কত! এই এক জমিদারির আয় থেকেই তো এক-একটি পরিবারের এমন সব উন্নতি। তার ভিতর আবার জমিদারের জমা-বন্দবস্তের কত হেরফের।

লাখুটিয়ার দিকে যাওয়ার রাস্তা বাঁদিকে বেরিয়ে গেছে। লাখুটিয়ার শিবমন্দিরের মাথাটা দেখা যাচ্ছে। এ-রাস্তা বানিয়েছিল লাখুটিয়ার জমিদার রাজচন্দ্র রায়—একটা খালও কাটিয়েছিল, এদিকে নাকী প্রথম ইটের বাড়ি তুলেছিল। যোগেনের মাথায় যে-কথাটি ঘুরছিল, তার মনে হল সে তার কিছু আন্দাজ পাচ্ছে। কাশীপুরের চ্যাটুজ্যেরা যদি কাশীপুর-বরিশাল রাস্তা তৈরি করায় বা খাল কাটায়, লাখুটিয়ার রায়চৌধুরিরা যদি লাখুটিয়া থেকে বরিশাল রাস্তা ও খাল কাটায়, শিকারপুরের রাস্তাটি বোধহয় সরকারি রাস্তা—সেটাও তো শুধুই শিকারপুরের রাস্তা, তাহলে যাকে হাইওয়ে বলে, যে-রাস্তায় রাস্তাটিই একটি নদীর মত বয়ে গেছে, সেই হাইওয়েটা তৈরি হবে কী করে? যোগেন যেন আর-একটা প্রশ্নের প্যাঁচের ভিতর ঢুকে পড়ছে, সে সেটা এড়িয়ে যেতে চায়। ভিতরে ঘেমে গেছে—মাঘের বাতাসেও। আজকে তার ভোট, আর আজ সকালেই তাকে বিশ মাইল সাইকেল দাবড়াতে হচ্ছে। তার ভাগ্য ঠিক হচ্ছে ৬৪টি পোলিং বুথে আর সে এক পরিত্যক্ত পুরনো রাস্তা বেয়ে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে—দুই খেয়া পেরিয়ে বাটাজোড়ে পৌঁছুতে।

যোগেন যে একটু অভিমানী হয়ে ওঠে, এতেই নিজের ওপর বিরক্ত হয়। এই পরিত্যক্ত পুরনো রাস্তাটি আর এই সাইকেল তো তাকে নিয়ে যাচ্ছে কলকাতায়, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভায়। যদি তাকে সেখানে পৌঁছে দিতে না পারে, তাহলেও তো যাত্রাটা মিথ্যে হয়ে যাবে না। তার এই যাত্রার সঙ্গে বরিশালের কত দেশখ্যাত পরিবারের মানুষজনের ঐতিহাসিক সব যাত্রার কতটাই তফাত। লাখুটিয়ার রায়চৌধুরিরা তো বরিশালের গৌরব—রাখালচন্দ্র, বিহারীলাল, গগনলাল, প্যারেলাল সকলেই যথাসময়ে ব্রাহ্ম হয়ে পৈতে ছেড়েছিল, বড় সরকারি চাকরি করেছে, বিলেত-ফেরত ডাক্তার-ব্যারিস্টার হয়েছে। তাদের ছেলেরাও বিলেতের জাহাজে উঠতে শুরু করেছে। এখন তাদের সকলের মিলিত আয় নিশ্চয়ই জমিদারির আয়ের চাইতে বেশি। কিন্তু সংসারটাও তো আর লাখুটিয়া-য় নেই, কত জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। দিল্লির কোনো সম্রাটের কর্মচারী ছিল নাকী লাখুটিয়া ফ্যামিলির প্রতিষ্ঠাতা রূপচন্দ্র। সেই কোনো সম্রাট নাকী রূপচন্দ্রের নাতিকে এই জমি, এমন বেশি কিছু নয়, লাখেরাজ দান করে। আইন-ই-আকবরির জোরে সেই খাজনাহীন জমিই লাখুটিয়া-বংশটাকে খাড়া করে দিল।

'ওকালতি করলেই ভাল করত্যাম। আরগুমেন্টটা মাথায় খেলে ভাল', ঘাম তেলতেলে মুখে একটু আত্মবিশ্বাসী হাসি হেসে নেয় যোগেন। হ্যাঁ। এতক্ষণে সে কথাটা গুছিয়ে নিতে পেরেছে যেন। তার কোনো বংশ নেই। তার কোনো লাখুটিয়া-বাটাজোড় নেই। তাকে কোনো বংশ

খাড়া করতে হবে না। যদি সে জেতে ও এমএলএ হয় তাহলেও তাকে বরিশালেই ফিরতে হবে—আবার জেতার জন্য। যদি সে হারে—তাহলেও কিন্তু সে বরিশালের নেতা। সরল দত্ত যদি জেতে, তাহলেও সরল দত্ত বরিশালের নেতা না। এঁরা সবাই, অশ্বিনীকুমার থেকে সরল দত্ত, এই লাখুটিয়া-কাশীপুর-বাখরগঞ্জের—এই সব বামুন-কায়েত জমিদাররা তাদের বংশটিকে বরিশালে রেখে নিজেরা বেরিয়ে গিয়ে কেউ ফিরে এসেছে, কেউ মাঝেমধ্যে এসেছে, আর, ধরেই নেয়া যায় কেউই ভোলেনি। ভোলা বা না-ভোলা, ফেরা বা না-ফেরা, এ সব কিছুরই কর্তা সেই লোকটি একা। কিন্তু যদি যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল বিএ, বিএল জেতে তাহলে সেটা হবে বরিশালেরই জয়। বরিশাল তো আর বরিশাল ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না। ব্যাটা নমো, ব্যাটা চণ্ডাল—এইডা তো আগে ভাবি নাই। আমার এই সাইকেলডা তো আমার রথ। সাইকেল তো আর গাড়োয়ান বা ড্রাইভার চালাব্যার পারে না। নিজেরে চালাইতে হয়। কয়ডা সাইকেল আছে এই পুরা তল্লাটে?

যোগেন পথ শেষ করে এনেছে প্রায়। তার ডাইনে-বাঁয়ে এখন মাধবপাশা-চাঁদপাশা-দেহের গতি—গল্পে ডুবসাঁতার দিতে পারে যোগেন, এত গল্প, আর তাদের কারো নামই যোগেন না, তাঁদের কারো বাহন সাইকেল না। চন্দ্রদ্বীপের রাজা কন্দর্পনারায়ণ মগদস্যুদের আক্রমণ হইতে তাঁহার প্রজাগণকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে মাধবপাশায় নতুন রাজধানী স্থাপন করে—কেমন চকিতে একটা গল্প হয়ে যায়। এর মধ্যে, এই গল্পে, যোগেন বলে কেউ তার সাইকেল নিয়ে ঢুকতে পারে? আবার, মণ্ডল পদবীতে?

গল্প রটনার একটা মস্ত সুবিধে আছে। যে-কাজ হারামজাদ্গির কাজ, সে-কাজও কেমন বীরোচিত হয়ে যায়। ঐ মাধবপাশার জনৈক রাজপুত্র এক রামচন্দ্রের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দিল যশোহরের রাজা প্রতাপ-আদিত্য। সে তো হয়ই—রাজপুত্রের সঙ্গে রাজকন্যা-ছাড়া আর-কার বিয়ে হবে? প্রতাপ-আদিত্য তার মেয়েকে শুধু সম্প্রদানই করল না, বিয়ের রাতেই মেয়েকে বিধবা করার যাবতীয় সুবন্দবস্ত সেরে রেখেছিল। উদ্দেশ্য চন্দ্রদ্বীপ দখল ও কায়স্থ সমাজের মাথা হওয়া। মেয়ে সেটা তার সদ্য স্বামীকে ফাঁস করে দিলে, একটা ঝুড়ির মধ্যে সেই রামচন্দ্রকে বসিয়ে, ঝুলিয়ে, নামিয়ে অন্ধকারে নদীর ওপর ভাসিয়ে রাখা এক ৬৪-দাঁড়ের কোষা নৌকোয় ভরে, বাঁচিয়ে দেয়া হয়। এমন-যে সদ্য-পরিণীতা প্রতাপ-আদিত্যের মেয়ে, বিন্দুমতী, সে কাশীযাত্রার ছলে মাধবপাশায় পালিয়ে এল। পালিয়ে এল তার বিয়ের বাকিটুকু সারব ও স্বামীর কাছে থাকব। অথচ তার স্বামীর আর দেখাই পেল না। বছরের পর বছর স্বামীর জন্য তার এই অপেক্ষায় গ্রামের লোকজন দু-দুটো হাট বসিয়ে নাম দিল, 'বৌঠাকুরাণীর হাট'। সে কাছের এক গ্রাম, 'সারসি'-তে গিয়েও ছিল। সেখানে তার স্বামীর জন্য অপেক্ষার সম্মানে গ্রামের লোকজন নিজেদের খন্তা-কোদাল দিয়ে কয়েক বছর ধরে একটা বিরাট দিঘি কেটে দিয়েছিল। সব কাজ সেরে রাতে দিঘি কাটত বলে সময়টা বেশি লাগে। দিঘি কাটার সময় ও কাটার পরে-পরে লোকের মুখে-মুখে প্রতাপ-আদিত্যের জামাই ও বৌঠাকরুনের স্বামীর কথা মনে রেখে 'রামপগার' নামটাই চলত। পরে, নাকী বৌঠাকরুনই বলে, সে কী করে স্বামীর নাম বলবে। তখন থেকে লোকে নাম নিতে হলে বলত 'উঁয়ার পগার।' বৌঠাকরুনের আর স্বামীর সঙ্গে দেখাই হয়নি—তবে সেও আর শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে যায়নি। তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন 'দেহের গতি'-তে গিয়েও বসতি করল। বামুন-কায়েতদের গল্পের শেষ নেই। যে-রামচন্দ্রের সঙ্গে বৌঠাকরুনের দেখাই হল না সারাজীবন আর রামচন্দ্র-বৌঠাকরুনের বিয়েও সারা হল না—রামচন্দ্রকে তো বাসর থেকেই বৌঠাকরুন পালাবার পথ বলে ও ব্যবস্থা করে দিল, ফলে

সম্প্রদান আর পাণিগ্রহণ হলেও বাসিবিয়ের সকালে সিঁদুরদান আর কনকাঞ্জলি হয়নি। বৌঠাকরুন সারাজীবন তাই সিঁথিতে সিঁদুর দেয়নি। ডানকানের পেছনে এক সিঁথি বের করে সিঁদুর ছোঁয়াত-সেই রামচন্দ্রের আর কোনো বৌয়ের ছেলে কীর্তিনারান নাকী ঢাকার নবাবের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার পথে, নবাবের পাকশালার রান্নার গন্ধ টেনে ফেলে, আর সেই দোষে তাকে জাতিচ্যুত করা হয়—সম্পত্তি চলে যায় তার ভাগ্নেদের লাইনে।

মাধবপাশার ঐ রাজবাড়ির ধ্বংসস্তূপের পেছনে সাহাদের মন্দিরের চুড়ো দেখে যোগেনের মাথা একটু ঠান্ডা হয়—তাও এতক্ষণে একটা সাহা দেখা গেল। এরাও তো আবার সাহা বললে রেগে যায়। এরা তো পাঁচ-সাত পুরুষ আগেই রায়চৌধুরি হয়েছে। এখন কি আবার সাহা হওয়ার টাইম এসেছে?

সাইকেল জলপথে ওপারে, বার্যাজোড়ে

রহমতপুরে এসে যোগেনকে সাইকেল থেকে নামতে হয়। নদীর ঘাট দেখা যায় ডানদিকে। লোকজন আছে দু-চারজন। সাইকেল চড়ে নদীর পাড় ভেঙে রাজগুরুর ঘাটে যাওয়া যাবে না।

৮

সাইকেল থেকে নেমে রাস্তার ঢাল ঘেঁষে জঙ্গল মাড়িয়ে সাইকেল নিয়ে মাটিতে গিয়ে দাঁড়াতে যোগেনের সারা জামার কোমরের তলাটুকু বাদ দিয়ে ঘামে একেবারে জবজবে হয়ে যায়। জোরে-জোরে শ্বাসও পড়ে। এতটা রাস্তা একবেগে সাইকেল চালিয়ে এসে, একটু না জিরিয়ে ঢাল বেয়ে নেমেছে। যোগেন হেলেচাষী-ঘরের ছেলে নয়। ওদের হালও নেই, চাষও নেই! তবু ক্লাস নাইন-টেনেও স্কুল থেকে ফিরে তাকে কোনোদিন খালে নেমে মাছ তুলতে হত, রান্নার জন্য গাছের গুঁড়ি কুপিয়ে ফালাফালা করতে হত। যোগেন তার শরীরের ব্যবহার থেকেই জেনে গিয়েছিল—বড় খাটনি যখন চলে, তখন ঘাম বেরবার টাইম পায় না। খাটনি থামানোর পর ঘাম গলগলিয়ে বেরতে থাকে। সেই জন্য বড় খাটনি একবারে হঠাৎ থামাতে নেই। খাটনি ধীরে-ধীরে ধীরে-ধীরে কমিয়ে আনলে ঘাম বন্ধ হয়ে যায়। এখন, সাইকেলে না উঠে, হেঁটে নদীর পাড়ে গেলে শরীরটা জুড়িয়ে যাবে। পারলে, নৌকোয় একটু ঘুমিয়েও নিতে পারে।

পাড়ে এসে পৌঁছুবার পর দেখে—দূর থেকে যা মনে হয়েছিল, তার চাইতে বেশ বড় একটা ভিড়। যোগেনকে দেখে দু-চারজন এগিয়ে এল। 'আরে, আপনে এই রাস্তায় অ্যাহন আইজ?'

পাঞ্জাবির হাতায় মুখটা মুছে যোগেন বলে, 'আরে, আমহোঁর কথা শুইনবেন পরে, কিন্তু খেয়া বন্ধ দিছে?'

'না। আছে তো। দুইখান নৌকা ভোটের বাদে নিয়্যা গিছে।'

'এই খাইছে। এইডা তো মাথায় আসে নাই। আমার তো আবার অ্যাহনি ফিরব্যার লাগব—'

'যাবেন কই?'

'যাব তো বাটাজোড়। শুইনল্যাম না কি ঘাটে নৌকা ভিড়াব্যার দ্যায় না।'

'হয়। মারামারিও তো হইছে। দত্তবাবুর লোকরা পিটাইছে ভোটারগ।'

'অ। তয়?'

'দেহি। আপনার তো যাইব্যার লাগে। বরং একখান ডোংগা কী ট্যাবইর‍্যা লইয়্যা আপনি সাইকেল নিয়্যা পার হন তো।' বলে সেই লোকটি নৌকোর খোঁজ করতে চলে গেলেও আরো দু-চারজন যোগেনের কাছে এলে যোগেন তাদের জিজ্ঞাসা করে, 'কী? ভোট নাই?'

'হ্যাঁ। দিয়্যাথুয়্যা আসছি। আপনার বাক্সে। আর আইস্যা দেখি আপনি এইখানে খাড়াইয়া। দ্যাহেন কাণ্ড।'

'কাণ্ডখান কোনডা? আমার বাক্সে না আমার এইখানে খাড়াইয়্যা থাকা?'

'বাক্সেও আপনি খাড়াইয়্যাই আছেন।'

'খাড়াইয়্যা আর থাকবডা কী? শুইনল্যাম বাটাজোড়ে ভোটারগুলাক পিটাইছে।'

একটি কমবয়েসি মাঝি এসে যোগেনের সাইকেলটায় হাত দিতেই যোগেন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে, একটা টাবইর‍্যা নিয়ে আগের লোকটি দাঁড়িয়ে। মাঝি ছেলেটি যোগেনের সাইকেলটা কাঁধে তুলে নেমে যায়। যোগেনকে একটু সাবধানে কাত হয়ে নামতে হয়।

নৌকোয় ওঠার আগে যোগেন বলে, 'উবগার কইরলেন ভাই। আর কেউ যাবে না পারে?'

'সে যার যাওয়ার যাইবেনে। আপনি কামে আগান।'

'এতখান নৌকায় আমি একা?'

'মানুষখানও তো বড়।'

শীতের নদী পেরতে আর কতক্ষণ। এতটা পথ সাইকেল করার পর নদীর ওপর দিয়ে আসা হাওয়ায় যোগেনের ঝিম ধরে একটা চিন্তার মাঝখানে—বাটাজোড়ে যদি মারামারি হয়ে থাকে তাহলে যোগেনের কী করা ঠিক হবে। যোগেন যে ওখানে এমন হাজির হয়ে যাবে—এটা নিশ্চয়ই কেউ ভাবেনি। দত্তবাবু কি বাটাজোড়ে? বরিশ্যাইল্যা মারামারির কুনো ঠিকানা নাই। হয়ত লাঠি-লাঠি ঠকাঠকি শুধু। আবার হয়ত দুডা-চাইরড্যা লাশ ভাইস্যা গেল। নৌকো ভেড়ার একটা দোলা আছে—সরে আসার মত।

মাঝি কিছুতেই পয়সা নেবে না। 'আরে, পয়সা না নিলে খাবাডা কী? ধরো, ধরো।'

'না। আমারে না কইর‍্যা দিছে। আপনি আমাগ মেম্বার হইবেন।'

'আরে বাপধন, আমি মেম্বার হইলে তোমার প্যাট ভরব?'

'ভরব। আপনি মেম্বার হইলে আমরা কইব্যার পারব শুধু বামুন-কায়েতরাই মেম্বার হয় না, আমাগ নমশূদ্ররাও হয়।'

যোগেন একটু থমকে যায়। এই ভোটে দাঁড়ানোর পর থেকে এমন থমকে তাকে যেতে হচ্ছে মাঝে মাঝে। তার দিক থেকে, এই কথাটা তো, ভোট পাওয়ার একটা কৌলনও হতে পারে। নমশূদ্র আর অন্যান্য শূদ্র আর মুসলমানদের ভোট এক হলে বামুন-কায়েত কংগ্রেসকে হারান্ যায়। কিন্তু এই ছেলেটির কাছে তার জেতাটা এতটা ব্যক্তিগত হয়ে উঠছে কেন?

যোগেন তো একটু বেশি বয়সেই পাস করেছে, ওকালতিও শুরু করেছে সবে। বাড়িঘরের অবস্থা-ব্যবস্থা সঙ্গীন। অত বড় সংসার কী করে চলে! সে তো এখনো বাড়িতে কোনো পয়সাকড়িই দিতে পারে না—অন্তত ছ-সাত বছর আগে থেকেই বাবা তো ভাবতে শুরু করেছিল, এই যোগেন খাড়াইল, এই যোগেন খাড়াইল। কাকা-কাকিমার জেদ না থাকলে তার কি কলেজে পড়া হত? ওকালতিটা না-হয় সে একাই কষ্ট করে কলকাতায় থেকে নিজের খরচা নিজে চালিয়েছে। সেটা তো কোনো হিশেব না—যোগেনের তো সংসার চালানোর কথা, শুধু নিজেরটা চালানোর কথা না। তার স্ত্রীও তো বাড়ির ভাতের ভাগিদার। বরিশাল কোর্টে প্র্যাকটিস

শুরু করার পর এত তাড়াতাড়ি যে তার পশার হয়ে যাবে—যোগেন সে-কথা ভাবতেও পারেনি। ফি-ও সে কম রেখেছে, গরিব মানুষের ফি ছেড়েও দেয়, তাই লোকে হয়ত তার কাছে আসতে ভরসা করে। ভরসা করুক আর যাই করুক—মামলায় তো লোকে জেতা ছাড়া কিছু চায় না। দুটো-একটা কঠিন কেসে জেতার ফলেই তার ওপর হয়ত ভরসা হচ্ছে। একটা মুসলিম-সম্পত্তি ভাগের মামলা জিতেই যোগেনের নাম বেড়ে যায়। যোগেনও বুঝতে পারে—বরিশালে জমির মালিকানা এত পুরনো ও প্যাঁচালে। যে দলিল-কবলার ভিতর উঁইয়ের মত ঘুরে বেড়াতে না পারলে আইনের কথায় পৌঁছনো যাবে না। সে-সব পড়ার দিকেই তার মন ঢুকে পড়েছে। যোগেন যুক্তিকে আইনের খোপে সাজানোর গভীর ওকালতিবিদ্যা, কৌশল নয়, বিদ্যা, সবেমাত্র আয়ত্ত করছে তার সিনিয়র কুলদারঞ্জন দাশগুপ্তের কাছে। কী তার ঢোকার ক্ষমতা আইনের ভিতর থেকে ভিতরে। মনে ভয় হয়, এই গেল বুঝি সুতো ছিঁড়ে, আর বেরতে পারবে না। যোগেন সবে দাশগুপ্তের চিন্তার ধরণটা ধরতে শুরু করেছে আর তার মধ্যে এল এই ভোট। যোগেনের উচিত ছিল, আরো কয়েক বছর দাশগুপ্তের কাছে শিখে নিজেকে দাঁড় করানো, বাড়িঘর সামলানো। দিল দশজন মিলে তাকে ভোটে দাঁড় করিয়ে। তবে তার নিজের ইচ্ছে না-থাকলে দশজন কি আর পারত? তেত্রিশ বছর বয়সের অস্থিরতায় যোগেন দেখতে পাচ্ছিল—প্রাদেশিক আইনসভার প্রথম ভোট, মন্ত্রিসভা, দেশশাসনের বদল ঘটাতে যাচ্ছেই। সরকার, কর্তৃত্ব, ক্ষমতা। যেন, এ-সুযোগ ছেড়ে দিলে আর-একবার নাও আসতে পারে। ভোটে নেমে ও ভোটের জন্যে প্রচার করতে-করতে, বাজারে-বন্দরে মানুষজনের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে, মিটিঙে-মুটিঙে ব্রিটিশ, কংগ্রেস, গান্ধী, জিন্না এ-সব কথা একবারও না-বলে শুধু বরিশালের কোথায় একটা খাল কাটলে কত একর জমি বাঁচে আর কোথায় একটা স্কুল করলে কত ছাত্রের পড়া হয় এই সব ঘরোয়া কথা তুলে-তুলে যোগেন তার সেই নতুন অনুশীলনের চিন্তাবিদ্যায় বুঝে ওঠে—যেন মানুষজন ভাবতে শুরু করেছে এটাই যেন ছিল অশ্বিনীকুমারের ইচ্ছা। আর, বরিশালের সেই মহাপুরুষের প্রতি আনুগত্য থেকেই আরো একটা চিন্তা মানুষজনের মনে ঘুরতে শুরু করেছে—সে-চিন্তা হয়ত প্রথম চিন্তার বিপরীতও, বা অন্তত কৌণিক—নামডাকওয়ালা সব জমিদার-তহশিলদারদের দেখা হয়ে গেছে, এখন যোগেনের মত শুদ্দুরের ছেলে, গরিব ছেলেরই লিডার হওয়া উচিত। যোগেন বোঝে—এই দ্বিতীয় চিন্তাটি থেকে আরো একটা চিন্তা গোপন জোয়ারের মত অবর্ণহিন্দু সমাজের নমশূদ্র ও আরো এমন অজলচল জনগোষ্ঠীর মধ্যে, এক রাতে নদীর খাত বদলে দেওয়ার বেগে, পাড়ে আছড়ে পড়ছে। তার আইনবিদ্যা অনুশীলন থেকে যোগেন এই তৃতীয় চিন্তার ভিতরে-ভিতরে এক গর্ভচিন্তাও অনুভব করছে, চক্রবৃদ্ধি সুদের হিশেব কষার মহাজনি নির্ভুলতায়—যদি শূদ্র ভোটের সঙ্গে মুসলমান ভোট মেলে তাহলে তাদের লিডারই হবে লিডার। বাটাজোড়ের খবর নিয়ে যে-ছেলেটি আজ বরিশাল গিয়েছিল সে কেন তাকে বলল, আপনি লিডারি ছাড়বেন না, এই মাঝিছেলেটি কেন বলল, নমশূদ্ররাও পারি। তাহলে যোগেন কি না-জেনেই একটা উত্থানের উপলক্ষ হয়ে উঠছে? যোগেন তার চিন্তাগুলিকে নম্বর দিয়ে রাখছে, ভোটের পর ভাববে বলে, ভোটের ফলের প্রতিক্রিয়া থেকে পরীক্ষা করার সুযোগ থাকবে—কোন্ চিন্তাগুলি সে ঠিকঠাক চিনতে পেরেছে। গরিব, খেটে-খাওয়া, অপূর্ণ-আহার ও অদ্যজীবী মানুষের ভয় থাকে না। তার বাঁচার প্রতিটি মুহূর্তই ভয়ংকর—এই বুঝি শেষ হয়ে গেল তার বাঁচা। মরণের অধিক তো কোনো ভয় নেই। সেই ভয় নিয়ে যাকে জীবনধারণ করতে হয়, তার পক্ষে আরো ভয়ের অতিরিক্ত কারণ খোঁজার সময় পাওয়া কঠিন। যোগেন ক্ষুধা কাকে বলে তা নিজের ক্ষিদে দিয়ে জানত,

অভাব কাকে বলে তা নিজের অভাব থেকে জানত, শ্রম কাকে বলে তা একেবারে ছাট বয়সেই জানত—স্কুল থেকে ফিরে তাকে খালে নামতে হত, কলকাতায় এক আশ্রয়দাতার দুটি ছেলেকে পড়িয়ে তার থাকা-খাওয়াটুকু হত ও আরো টিউশন, প্রুফ দেখার কাজ, চাঁদসীর ডাক্তারি তাকে করতে হত। যোগেনের কোনো ভয় ছিল না। কিন্তু তার ওকালতিবিদ্যার গুণে এই এখন তার অবস্থানবিন্দু থেকে পরিধিকে একটু আবছা ও ঘোলাটে লাগছে। অশ্বিনীকুমারের ঐতিহ্য, জমিদারি নেতৃত্বের বিরোধিতা, বর্ণহিন্দু বিরোধিতা, শূদ্র হিন্দু ভোট ও মুসলমান ভোটের যোগফলের নতুনতম নির্বাচকসমাজ—যোগেন নিজের স্থানাঙ্ক পাচ্ছিল না।

কংগ্রেসের পৈতে-তিলকের নখদাঁতের বদলা

বাটাজোড়ে পৌঁছুতে-না-পৌঁছুতেই সাইকেলে তাকে দেখে লোকজন ছুটে আসছিল। পুরুষকণ্ঠের কান্নার আওয়াজও পায়। তার মানে দত্তবাবু কি লড়াই ফৌত করে দিয়েছেন?

৯

যোগেন কারো দিকে না তাকিয়ে সোজা এগতে থাকে। এই হাঙ্গামার তো নিশ্চয়ই একটা সীমান্ত তৈরি হয়ে গেছে—যোগেন সেই সীমান্তটায় পৌঁছে যেতে চায়। তার লোকজনের সঙ্গে কথা বলে কী হয়েছে, কখন হয়েছে সে-সব শোনাজানার এখন সময় নেই। ভোট তো আর সারাদিন চলবে না। তার ভোটারদের ভোট দিতে আসার বাধাটা আগে ভাঙতে হবে।

যোগেন যে কারো দিকে না তাকিয়ে, কারো সঙ্গে কোনো কথা না বলে সাঁই সাঁই করে সাইকেল চালিয়ে সোজা নদীর সামনের ঘাটের দিকে গেল তাতেই তার লোকজন বুঝে যায় এবার কিছু হবে। তারা যোগেনের পিছনে-পিছনে দৌড়তে থাকে। যোগেনের ঘামে ভেজা সপসপে পাঞ্জাবিটা দেখে সেই ছুটন্ত ভিড়ের মধ্যে একটা কথা হাওয়ার মত পাক খেয়ে যায়—তাহলে তারা কি যা করা দরকার ছিল তা করেনি? এমন ধাবমান ভিড়ে কোনো প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। যে কথা মনে আসে, সেটাই কাজ হয়ে যায়। ভিড়ের দৌড়নোর গতি বেড়ে যায়, প্রায় যোগেনকে ধরেই ফেলে। একজন কেউ চিৎকার করে ওঠে, 'যোগেন মণ্ডল জয় জয়।'

যোগেন ঠিকই আন্দাজ করেছিল। সরল দত্ত যে লাঠিয়ালদের দিয়ে পাড় দখল করেছিল, তারা তখন তাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে ধরে নিয়ে একটু শুয়ে বসেছিল। পাড়ের নীচে নৌকোর ওপরে ছিল বলে তারা দেখতে পায়নি—পাড়ের ওপরে কী ঘটছে। তাদের দলের কেউ-কেউ চলে গিয়ে থাকবে। তাদের ভিতর কোনো উদ্বেগ বা উত্তেজনাই ছিল না। কিন্তু, মানুষের এত উঁচু গলা শুনে তাদের দু-একজন লাফিয়ে পাড়ে উঠে দেখার চেষ্টা করতেই যোগেন ও তার লোকজন হামলে পড়ে। এক-এক ধাক্কায় তারা সরল দত্তের এক-একজন লেঠেলকে পাড় গড়িয়ে জলে ফেলে দেয়। তাদের পেছন-পেছন যোগেনের লোকজন পাড় বেয়ে নৌকোগুলির দিকে ছুটতেই যোগেন সাইকেলটা মাঠের ভিতর ফেলে বরিশাল-gun-এর আওয়াজে চিৎকার করে ওঠে—'ভোটারের নৌকা আডকায় কে? নৌকা ধইর‍্যা বাইচ দাও গাঁওয়ে। একডা ভোটারও য্যান বাদ না যায়।'

যোগেনের লোকজনের তখন আর ঐ নির্দেশের দরকার ছিল না। সরল দত্তের ঐ তিন লেঠেলকে পাড়ের মাথা থেকে এক-এক ধাক্কায় জলে ফেলে দেওয়া মাত্র এই সমাবেশ পেশিতে-পেশিতে জেনে গেছে, কী করতে হবে। দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় একদল আর-এক দলকে মারতেও পারে, জিততেও পারে। কিন্তু হারা দল যদি ঘুরে দাঁড়ায় তাহলে জেতাহারার লড়াই হয়ে যায় বাঁচামরার লড়াই। হারা দল ফিরে এলে মরা পর্যন্ত যাবে বলেই ফিরে আসে। তা ছাড়া এই ভিড় এই অপমানের জন্য তৈরিই ছিল না। যোগেন মণ্ডল দাঁড়িয়েছে বলেই তারা ভোট করেছে পাগলের মত, মাতালের মত। এই একটা লোক নমশুদ্দুর হয়েও যদি সাত-পুরুষের জমিদারের টক্কর নিতে পারে, তাহলে আমরা তার পেছনে খাড়া হতে পারব না? তাদের পার্টি নেই, নিশান নেই, হিল্লিদিল্লিতে তাদের কোনো নেতা নেই, লোক নেই। তাদের শুধু জমিদার আছে—সে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, তাদের শুধু বাপঠাকুরদার ঋণবন্ধকি আছে, তাদের শুধু গর্ভের ছেলের ঘাড়েও ঋণ-চাপানো আছে, তাদের ফলনের ভাগ প্রতি ফলনেই কমে—নদীর ভাঙনের মত। আরে, নমশূদ্রদের কত মানুষই তো বড় অফিসার বড় উকিল হয়েছে। কিন্তু যোগেন মণ্ডলের আগে তো কেউ বলেনি, হ্যাঁ, আমি শুদ্দুর হয়েও বামুন-কায়েত জমিদারদের টক্কর নেব।

চোখের পাতা ফেলতে-না-ফেলতে ঐ চরাচরে একটুকরো জলের দৃশ্যটা বদলে যায়। প্রায় সকলেই জলে, কোনো নৌকোতেই কেউ নেই। কংগ্রেসের নিযুক্ত লেঠেলরা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুবসাঁতার দিয়ে পালাচ্ছে। যোগেনের লোকরা কেউ-কেউ তাদের ধাওয়া করছে আর কেউ-কেউ নৌকোগুলির দিকে সাঁতরে যাচ্ছে। ঐ জলটুকুর মধ্যে শুধুই আলোড়ন। যোগেনের সেই নির্দেশের গর্জন যেন দরকারও ছিল। নইলে সকাল থেকে মার-খাওয়া এই মানুষজন পালটা মারের উত্তেজনায় হয়ত ভোট ভুলে যেত। বা, যাচ্ছে।

আবার চিৎকার করে ওঠে যোগেন—'এই নৌকা নিয়্যাই সব ফেরত-ভোটারগ নিয়া আইস, আরো নৌকা বাহির করো, বাইচের বেগে যাও, বাইচের বেগে যাও।'

যোগেনের লোকজনেরও নৌকো-ডোঙা এদিক-ওদিক লুকনো ছিল হয়ত। দেখতে-দেখতে নদীর জল ভরে ওঠে নৌকোয় আর নৌকোয়—ডোংগা থেকে কুইশ্যা নৌকো। সব নৌকোতেই অনেকগুলি করে বৈঠা। নদীর তো মোটে দুটো মুখ। নৌকোগুলি যেন নদীর দশমুখের দিকে ছুটছে। 'যোগেন মণ্ডল জয় জয়।'

যোগেনের লোকজনের সকলেই তো আর পাড় ভেঙে নদীতে ঝাঁপাতে পারেনি। কেউ-কেউ পেছনে ছিল, বুঝতে পারেনি সামনে কী হচ্ছে। কেউ-কেউ পেছিয়ে গেছে, তাদের বয়স একটু বেশি—এতটা মারামারি করে উঠতে পারবে না। কয়েকজন আবার ঘাটের দিকে পেছন ফিরে মাঠ বেয়ে ছুটছে—নানা দিকে। যোগেনের ভোটারদের লুকিয়ে রাখা হয়েছে যে-সব জায়গায়, সেখান থেকে এখন বের করতে।

তাকে ঘিরে যারা ছিল তাদের ওপর যোগেন রাগে ফেটে পড়ে, 'ভোটের পাট তুইল্যা দিয়্যা তো হরির লুটের আসর বসাইছেন। অদ্ধেকখানি বেলা আর আপনারা সিকি ভোটও কইরব্যার পারেন নাই? ইডা একডা ভোট?'

যোগেনের ঘাম তেলতেলে মুখ, ঘামে ভেজা সপসপে জামা, তার গলার একটা আওয়াজে নৌকোয়-নৌকোয় নদী ভরে ওঠা আর সরল দত্তের মাঝি-লেঠেলদের দু-চারজনের এখনো সাঁতরে পালানো—দেখে, কেউই তার মুখের ওপর কিছু বলতে পারে না। পেছন থেকে কারো একটা উঁচুগলা শোনা যায়—'আরে, জাইনত্যাম যদি ভোটের দাঙ্গায় আর জমির দাঙ্গায় কুনো

তফাত নাই তাহাইলে তো অগ মুন্ডুগুল্যা কাইট্যা সাজায়্যা রাইখতাম! কেউ তো কইব, কী করার লাগে।'

যোগেন খুঁজতেও যায় না, কে বলেছে, 'আহা রে, মনখান জুড়াইয়্যা গেল! এ কী বাল্যবিবাহ? বাবা কইছে তাই বিয়্যায় বসছি, বিয়্যার পর বৌয়ের লগে কী কইরতে হইবে জানি না, বাবা তো কয়্যা দেয় নাই! কতগুলো বাপ লাগে আপনাগ? এক হাট বাপেও যে কুল্যাইবে—পসন্দ হয় না। শুনছি নাকী খুনাখুনি হইছে—কয়জন হইছে খুন?' জবাব না পেয়ে যোগেন যোগ করে, 'আমাগ। আমাগ'

খুব পাতলা ও সরু একটা গলায় পেছন থেকে কেউ কিছু বলার চেষ্টা করে, 'না, ঠিক যথাযথ খুন বা হত্যা কিছু ঘটে নাই। তবে তেমন ঘইটলে তা এক বা দুইডা খুনে শ্যাষ হইত না...'

কথাটা শেষ হওয়ার আগেই মাঠের নানা দিক থেকে লোকজন যোগেনের দিকে আসতে শুরু করে, কেউ-কেউ দৌড়তে-দৌড়তে, কেউ-কেউ হেঁটে—'যোগেন মণ্ডলের জয় জয়।'

তারা যোগেনের কাছাকাছি হতেই যোগেন তাদের বলে ওঠে, 'আর জয়কার দিব্যার কাম নাই। লাইন লাগান, লাইন লাগান, না হয় তো ভোটের খোঁয়াড়ে ঢুইকব্যার পাইরবেন না। দ্যাহেন গা, উহানে আবার কী কইর্যা থুইছে আপনাগ জমিদার মশাই। লাইন লাগান, লাইন লাগান।'

যোগেন বোঝে, তার কথাটা কেউ ধরতে পারছে না। লাইন কী করে লাগাতে হবে বা ভোটের খোঁয়াড়টা কী? এখন তো আর সব বোঝানোর সময় নেই। এরা কেউই তো এবারের মত করে ভোট কখনো দেয়নি। কিন্তু এখনই যদি ভোটের লাইনে সারি দিয়ে ঢোকা না যায় তাহলে ডুবতে হবে।

হাতের কাছে যে-দুজনকে পায়, তাদের কব্জি ধরে টানতে-টানতে যোগেন একটু দূরে নিয়ে গিয়ে হাত দেড়েক তফাতে পাশাপাশি তাদের দাঁড় করিয়ে দিয়ে দুই হাত ঐ দুজনের মাথার ওপর তুলে চেঁচাতে থাকে—'সারি বান্ধেন, সারি—।'

যোগেন যে খুব ভেবেচিন্তে, 'লাইন' বলেছিল আর পরে ভেবেচিন্তেই 'সারি' বলেছে—একেবারেই তা নয়। ভোটের জন্যই হয়ত 'লাইন' কথাটি জিভে এসে গেছে আর 'সারি' কথাটি এসেছে অভ্যেসে। লোকজন 'লাইন' কথাটি ধরতে না-পারায় 'সারি' কথাটি ধরে ফেলে আর হু-হু করে লাইনটা তৈরি হয়ে যেতে থাকে। যোগেন একটু ঘাবড়েই যায়। এত ভোটার যদি ভোট দিতে এসে ভোট দিতে না-পেরে পালিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে নৌকায়-নৌকায় আরো কত ভোটার ভেগে গেছে? তাদের কি আবার গুছিয়ে আনতে পারবে?

কিন্তু যোগেন আর একমুহূর্তও দেরি করতে চায় না। বুথের মুখে আবার কী কল করে রেখেছে জমিদার মশায় কে জানে। তার প্রাসাদেই ভোট। 'এই চলো সব, চলো। এরপর যারা নৌকাত্ কী হাঁইট্যা আসব তাগ এই লাইনখানই ধইরতে কইব্যা। লাইন য্যান না ছাড়ে!' যোগেন হাঁটতে শুরু করে, ভোটের লাইনও তার সঙ্গে চলে। প্রথম কয়েক পা-র মধ্যেই লাইনে একটু হাসাহাসি ওঠে—এরকম করে তাদের হাঁটাচলার অভ্যেস নেই। পায়ে-পায়ে লেগে যায়, নিজের পায়ের সঙ্গে নিজের পা জড়িয়ে যায়, সামনের মানুষের গোড়ালিতে নিজের বুড়ো আঙুল ঠেকে যায়, পেছনের লোক যেন হাঁটু দিয়ে গুঁতোয়। সকাল থেকে এখানে যে-যুদ্ধ চলছে, এইমাত্র, এইমাত্র নদীর পাড়ে যে-যুদ্ধ ঘটে গেল বা এখনও ঘটছে, সে সব ভুলে গিয়ে এরা লাইন ধরে হাঁটতে-হাঁটতে হেসে ফেলে। কারো গলা শোনা যায়—'ভোটের হাঁটনে হাসন নাই।'

যোগেন ঘাড় ঘুরিয়ে চিৎকার তোলে, 'আরে, জয়কার দ্যাও।'

'যোগেন মণ্ডল জয় জয়'—

জয়কারটার দরকার ছিল—মানুষ দিকও পাবে, দিশাও পাবে, লোকজন কোনদিকে আছে—যোগেনের লোকজন।

যোগেন নানা কিছু পড়তে ভালবাসে—টাইপটাই ভাল ছাত্রের, হাতে পেলে পড়ে ফেলো। অঙ্ক আর সংস্কৃত তো তার বি এ পাশের বিষয়। গড়গড়িয়ে সংস্কৃত পড়তে-পড়তে, মানে বলে যেতে পারে, নাগরী হরফে। আর, যখন আর-কোনো পথ দেখতে পায় না, পাবে বলে আঁচও পায় না—তখন অঙ্ক কষতে বসে—ইনটিজার আর ভেক্টর নিয়ে। যোগেনের পড়াশুনোর দিকে স্বার্থহীন এই মোক্ষম যান, নিজের পড়ার অভ্যেস তৈরি করা, অঙ্ক আর সংস্কৃতে এই দক্ষতা ও সেই দক্ষতা কোনো কাজে আসবে না জেনেও নিজের মনেই একা-একা সেই দক্ষতা বাড়িয়ে চলা—এই সব, গুণ বা স্বভাব বা অভ্যেস, বড়হিন্দু বা বর্ণহিন্দু বা বামুন-বদ্যিদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের কারো-কারো থাকতে বা ঘটতে পারে। সবার না, কারো-কারো। কোনো একটা কারণে নয়, অনেক কারণে, অনেক কাটাকুটি কারণেও। 'তোর ছোট্‌দাদু, মানে ঠাকুরদার কাকাও মুখে-মুখে জমির পাই-পর্যন্ত হিশেব এমন করে দিতেন যে তাকে বিক্রমপুর থেকে তুলে এনে এখানে জমিদারি দিয়ে বসিয়ে দিলেন শেয়ানকাঠির জমিদার। তার সেই শুভয়ংকরীর জোরেই চার পুরুষ ধরে বালাম চাল খাচ্ছ'—এই সব পুরুষানুক্রমিক গালগল্পের কারণেও। 'আমি আমার ছোট্‌ঠাকুরদাদার মত হব', কথাটা একবার তার মাথায় ঢুকে গেলে আর ছোট্‌ঠাকুরদাদা হতে কদিন লাগে। আর, হওয়াও যায়। নিজে নিজের ছোট্‌ঠাকুরদার মত হতে চেয়ে যা হল সেটাকেই ছোট্‌ঠাকুরদার মত হওয়া ধরে নিতে বাবুদের বাড়িতে আর বাধা কোথায়?

যোগেনদের তো ছোট্‌ঠাকুরদা নেই। থাকে না। যোগেনদের মত শুদ্দুর-চাঁড়ালদের ছোট্‌ঠাকুরদা আর যোগেনের বড় ভাইদের মধ্যে কোনো তফাত নেই—মাঝখানের বছর সত্তর সময় ছাড়া। যোগেনদের বংশ পুরুষানুক্রমিক হয় না। বলা যায়, একটাই পুরুষ, সে-পুরুষের আর শেষ নেই। তাই, যোগেনের ভাল ছেলে হওয়া, ক্লাসে বারবার ফার্স্ট হওয়া, প্রত্যেকটা পরীক্ষায় জিলার মধ্যে সবচেয়ে ভাল রেজাল্ট করে মেডেল পাওয়া, আইন পরীক্ষাতেও মেডেল পাওয়া—তার একার ব্যাপার, এক তারই ব্যাপার। সে, যোগেন মণ্ডল, শুধু যে ভদ্রলোক বা বাবুদের বাড়ির ছেলেদের মত মেডেল-পাওয়া গ্র্যাজুয়েট, তাই নয়, ল-পাস করা বি-এলও বটে, তাই নয়—সে বাবুদের বাড়ির গল্পকথার তিন পুরুষ আগের দাদু-ছোট্‌ঠাকুরদাদের মতই, কোনো কাজেই লাগবে না, এমন পড়াশুনোও করে। নম-র ছেলের-এর আগেও বিএ, এমএ পাশ করে বড়-বড় চাকরি নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়েছে। কিন্তু তারা কি তাদের সেই খ্যাতি ক্ষমতার কাজে লাগে না এমন কিছু কখনো জানতে চেয়েছে, যা শুধুই জানার জন্য জানা বা শখের জানা? জানার কাজ বা নেশা কি অতটাই মাতাতে পারে, তাদের, যেমন যোগেনকে মাতাচ্ছে।

তবে, যোগেন, মানুষের সমাবেশ তৈরি, নানারকম যুদ্ধে সেনাপতিদের আক্রমণ পরিকল্পনা আর আত্মরক্ষা-আক্রমণ—এগুলো নিয়ে কিছু তখনো জানে না।

অথচ, সব পরিস্থিতিই তো নিজের-নিজের বিদ্যা তৈরি করে, যে পারে সে প্রত্যুৎপন্ন সেই বিদ্যা আয়ত্ত করে নেয়।

এই ১৯৩৭-এর ভোটের মত ভোট এর আগে কখনো হয়নি। এই ভোটবিদ্যা যোগেন তাহলে আয়ত্ত করবে কোথা থেকে? ভোটবিদ্যাই তো আর-এক অর্থে মানুষের মত তৈরির বিদ্যা।

এই ভোটের সাতষট্টি বছর পর যোগেনের শতবর্ষ জয়ন্তী পালনের প্রাক্‌কালে, ঐ, যাকে যোগেনের আমলে 'ব্রিটিশ ভারত' বলত, সেই ভূখণ্ডে সকলেরই জানা হয়ে গেছে যে ভোট-করাটা শুধুই মতগঠন নয়, নির্মিত মত ভোটবাক্সের ভিতর দিয়ে বের করে আনাটাও ভোট-করার মধ্যেই পড়ে। যোগেনের জন্মশতবর্ষ (২০০৪)-নাগাদ নানাভাবে এই 'ভোটবিদ্যা'র অনেক ওতপ্রোত কাজে, নতুন পরিভাষা, প্রধানত ইংরেজিতে ও হিন্দিতে, ব্যবহার শুরু হয়ে গেছে। যোগেন জানত না—ভোটের দিন সকালে প্রতিপক্ষের প্রধান জায়গায় মিথ্যে কথা রটিয়ে বা মিথ্যে বাধা তৈরি করে প্রতিপক্ষের ভোটারদের ঘাবড়ে দিতে হয়। তাকে বলা হয়, 'লাস্ট গেম', 'শেষ কেরামতি'। সেটাই সরল দত্ত করেছিল। ঐ লোকটি যদি যোগেনের কাছে না-পৌঁছুত, তাহলেই তো হয়ে গিয়েছিল! সরল দত্তকে কেউ ঠেকাতে পারত না। যোগেন জানত না—সে-যে সাইকেল থেকে নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে গর্জন করে উঠল, সেটাই 'প্রত্যাঘাত', 'কাউন্টার অ্যাটাক'। যোগেনের দলের আক্রমণের সামনে সরল দত্তের দল যে কুটোর মত ভেসে গেল সেটাই হচ্ছে, 'লাস্ট বেট' ও শেষ দান। আর, যোগেন যে তার ভোটারদের লাইন করে সাজিয়ে বুথে নিয়ে যাচ্ছে—একেই বলা হবে 'বুথজ্যাম', বুথে প্রতিপক্ষের কাউকে থাকতে-ঢুকতে না-দেওয়াকে যোগেনের শতবর্ষকালে বলা হবে 'বুথ দখল'। আর, ব্যালট পেপারে নিজের প্রার্থীর চিহ্নে সিল লাগিয়ে ব্যালট বাক্সে ফেলে দেওয়াকে ততদিনে বলবে, 'ছাপ্পা ভোট', যদিও, তখন, সেই ২০০৪-সালে মতনির্মাণ-প্রক্রিয়া, ব্যালট পেপার, ব্যালট বক্স, সিল—এই সবই, অবান্তর হয়ে গেছে। তখন কম্পিউটারের বোতাম টিপে ভোট দেওয়া চালু হয়ে গেছে।

যোগেন এর আগে লোক্যাল বোর্ডের ভোট করেছে। সে আর কী ভোট! এই ১৯৩৭-এর প্রথম প্রাদেশিক আইনসভার এমন ব্যাপক ভোটের ভিতর দিয়ে যোগেন জেনে ফেলে—ভোটপদ্ধতির ভিতর ফাঁক তৈরি করে সুযোগ নেওয়ার অপরিহার্য কৌশল—ঐ 'লাস্ট মিনিট গেম', 'কাউন্টার অ্যাটাক', 'বুথজ্যাম', 'বুথদখল', 'ছাপ্পা ভোট'। বছর পাঁচ-ছয়ের মধ্যে সে 'ক্যান্ডিডেট গুম', 'ভোটার গুম', 'রেসকিউ অপারেশন'—এগুলো শুধু জেনেই যাবে না, ব্যবহারও করবে দক্ষভাবে।

যোগেন তার লাইনকে বুথে সামিল করে দিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে দেখতে পায়—যারা নৌকো নিয়ে ফেরত-ভোটারদের আনতে গিয়েছিল, তাদের প্রথম দল আসছে দৌড়ে-দৌড়ে। একবার ফিরিয়ে দেওয়ার পর তার ভোটাররা ফিরে আসছে, যারা লুকিয়ে ছিল তারা লাইন লাগিয়েছে—তাহলে, কানের পাশ দিয়ে হলেও জিতে যেতে পারে?

যোগেন আন্দাজ করতে চাইল—সেটা বুঝতে পেরেই কি সরল দত্ত এই কাণ্ডটা করল লোকজন নামিয়ে?

যোগেন এই আন্দাজটা মনে-মনেও পাকিয়ে তুলতে পারল না।

ভোটই হোক আর যাই হোক—সরল দত্ত তো সরল দত্ত-ই, দত্তবাড়ির কর্তা, অশ্বিনীকুমারের ভাইপো, জিলা কংগ্রেসের সভাপতি। তার পক্ষে এই মারামারি দাঙ্গা-হাঙ্গামার বুদ্ধি কষা কি সম্ভব? এই বুদ্ধি, এই গায়ের জোরে ভোট যদি একটা বুদ্ধি বলে মেনেই নেয় সবাই, তাহলে তো, সে, যোগেন, নমশূদ্র, চাঁড়াল তো গৌরনদী ঠেসে দিতে পারত মানুষের শবে? যোগেন একটা আঁচ পেতে চায়—সরল দত্তই এটা করেছে নাকী সে জানেই না, তার অজান্তে কংগ্রেসের লোকরা করেছে?

যে-ঘটনা যোগেনকে জানাতে সাতসকালে বাটাজোড় থেকে লোক ছোটে বরিশালে—

সে-ঘটনা সরল দত্ত জানে না এটা মেনে নিতে যোগেনের ওকালতি বুদ্ধিতে বাধে। বড়জোর তার পক্ষে বলা যায়—জানত, কিছু বলেনি।

জেনে থাকুন, বা 'না'-বলে না থাকতে পারে, সে নিয়ে যোগেন ভাবছে কেন? যেন, তার ভিতরে-ভিতরে পুরনো কোনো টান কাজ করছে! সরল দত্ত। কংগ্রেস।

কংগ্রেসের মত দুনিয়াজোড়া দল, মহাত্মা গান্ধীর দল, না থাকলে, সরল দত্তই হোক আর যেই হোক, এ ঘটনা ঘটাতে পারে না। যোগেনের কোনো দল নেই। যে-কোনো দলের সঙ্গে বোঝাপড়ার দরজা যোগেন খোলা রেখেছে। কংগ্রেসও তাকে বলতে তো পারত—দাঁড়াচ্ছই যখন, তুমি কংগ্রেসের হয়েই দাঁড়াও। তেমন কোনো কথার আভাস দেওয়া দূরে থাক—চাঁড়ালের ছেলে জেনারেল সিটে দাঁড়ায়—এতে কংগ্রেসের পৈতে-তিলকের আড়ালের নখ-দাঁত বেরিয়ে পড়েছে।

বাটাজোড় থেকে দলবলে ফিরে, একলা

১০

যোগেন ভেবেছিল, দুপুরের আগেই বরিশালে ফিরে আসবে। দুপুর দূরের কথা, ফিরতে-ফিরতে তার রাত হয়ে গেল। সঙ্গে লোকজন ছিল—একটা ট্যাবইরা-তে সকলে মিলে উঠে খালে-খালে চলে এল সন্ধের পর। তখন কালেক্টরিতে ভোট গোনা চলছে। যোগেন সাইকেলটা রেখে আসতে চেয়েছিল। স্থানীয় এক মাতব্বর বলল—'ঐ একখান ভাঙা-জোয়ালের বলদ রাইখ্যা যাওয়ার কাম কী? একদিকে কাত তো একদিকে কাত। এতগুলা মানুষ এড্ডা সাইকেল কুল্যাবার পারব না? ও ঝামলা সঙ্গে নিয়া চলো।'

'কইল্যা তো দুষ্ট বলদ। নাওয়ের মইধ্যে ঝাঁকি তুইল্যা নাও না-ডুবায়?'

'গোবদ্দি তো সঙ্গেই আছে', সুতরাং সাইকেলও ট্যাবইরাতে ঢুকল। ট্যাবইরা-র মাঝি ছিল দুইজন। তারা এই ভিড়ে হারিয়ে গেল। সবার হাতেই একটা করে হাত-বৈঠা, কারো হাতে কলাগাছের খোল, বৈঠার মত কাটা। যার হাতে বৈঠা নেই সে হাতটাকেই বৈঠা করে নেয়। নৌকা ছাড়তে-না-ছাড়তেই সদরঘাট এসে যায়। সাইকেলটাকে আগে নামিয়ে ফেলার জন্য দুজন মিলে সেটাকে তুলতেই যোগেন বলে ওঠে, 'শুনেন। কথাডা ঐখানেও সবাগো কয়্যা দিবেন। আইজ যে গনা হচ্ছে তার কুনো দাম নাই। একবার গুইন্যা জিলা ম্যাজিস্ট্রেট সব সিল কইর‍্যা রাইখ্যা দিব। ছয় তারিখে, বাইশে মাঘ, আসল গনা হইব, গেজেট হইব, কে জিতল কে হারল ঘোষণা হইব। আপনারা কালেক্টরিতে গনার যা খবর শুইনবেন, যাই শুইনবেন, হারা জিতা যাই হোগগিয়া কুনো আওয়াজ কইরবেন না। হাইরলে তো জব এমনিতেই বন্ধ হইয়া যাবে নে। জিতলে বাইচজিতার ধ্বনি তুইলবেন না। এইডা নিষেধ থাইকল।'

কার নিষেধ কে শোনে? যোগেন নিষেধ করল দুটি কারণে। এর মধ্যেই নিশ্চয় বাটাজোড়ের ঘটনা টাউনে-চরে-নদীতে-খালে-বিলে রটে গেছে। বাটাজোড় পৌঁছুবার আগে রহমতপুরের খেয়াতেই স্বয়ং যোগেন শুনেছিল—খুনোখুনি হয়েছে। বরিশালে কোনো হাঙ্গামা থেকে খুনোখুনি হওয়া খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। বাটাজোড় বলেই যা একটু সন্দেহ! খুনোখুনি হয়েছে জানলে বুঝে নিতে হয় গোলমাল বেশ ভালই পাকিয়েছে। যে-গোলমালে খুনোখুনির খবর থাকে না,

সে-গোলমালের খবরে কেউ বড় একটা কান পাতে না। যদি যোগেন জিতেই যায়—তাহলে তার লোকজন বাটাজোড়ের বদলা নিতে শুরু করে দিতে পারে। যোগেন যে সারা দিনই বাটাজোড়ে ছিল—এই খবর সবার জানা হয়ে গেছে বা যাবে। তারপর এইসব বদলাবদলির সঙ্গে তার নাম জড়িয়ে যায় যা ইচ্ছে রটাবে। যোগেন এটা চায় না।

দ্বিতীয় কারণ হল যদি সে হারে, তাহলেও তার লোকজনের সব রাগ গিয়ে পড়বে বাটাজোড়ের ওপর। আবার, বাটাজোড়ে যোগেনের ভোট আটকানোর যে-চেষ্টা হয়েছিল, তা শেষ পর্যন্ত ভেস্তে যাওয়ার পরও জিতে গেলে কংগ্রেসিরা তার লোকজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। জিতে যাওয়ার ফুর্তিতে কংগ্রেসিরা বাটাজোড়ের ঘটনাটা উলটে দিয়ে যোগেনের ঘাড়ে দোষ চাপাতে পারে। যেন, যোগেন নিজে বাটাজোড় হাঙ্গামা পাকানো সত্ত্বেও সরল দত্ত জিতেছে, কারণ সরল দত্ত—সরল দত্ত আর কংগ্রেসি। যোগেন এটাও চায় না।

যোগেন তার বাসায় এসে দেখে—সব ভোঁ-ভোঁ। কেউ কোথাও নেই। একটা ঘরে একটা লণ্ঠন টিমটিম করছে। ওটা কেষ্টামাসির ঘর। যাঁর বাড়িতে যোগেন থাকে, সেই প্রহ্লাদ দত্ত মোক্তারের মা। কেষ্টামাসি ঝিমচ্ছে হয়ত, যোগেন তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে একেবারে হুলস্থুল বাধিয়ে বসবে। মাসি ঝিমচ্ছেই যদি, ঝিমক। তাও পরীক্ষা করার জন্য যোগেন খুব চাপা স্বরে একবার ডাকে, 'কেষ্টা, জাইগ্যা আছ নি?' কোনো জবাব না পেয়ে যোগেন তার ঘরের দিকে যায়। তার ঘর মানে, বাড়ির বাইরের দিকের ঘরটা—সেরেস্তা বললে সেরেস্তা, প্রহ্লাদ দাও বসে, যোগেনও বসে। রাতে প্রহ্লাদদার ছেলে আর যোগেন ঐ ঘরেই শোয়। একটা দড়ি ঝোলানো আছে—তার ওপরই যোগেনের প্যান্ট-শার্ট—কাল কোট আর ধুতিপাঞ্জাবি গামছা ঝোলে।

যোগেন তাকিয়ে দেখে—গোটা বাড়িটাই অন্ধকার। তার তো একটা লণ্ঠন চাই—হয়ত ঘরে রাখা আছে, জ্বালাতে হবে তো! কেষ্টামাসি টের পেলে? যোগেন বাইরে ও আকাশের দিকে চোখটা বুলিয়ে আনে—জল থেকে এসেছে, তাই চোখে আলো লেগে আছে, হ্যাঁ, আলোই তো।

যোগেন খানিকটা পা-টিপে-টিপেই কেষ্টামাসির ঘরে ঢুকে গলা নামিয়ে বলে, 'কেষ্টা, ঘুমাওনি?' না, তাহলে বুড়ি সত্যিই একটু ঘুমিয়ে আছে। যোগেন লণ্ঠনটা তুলে শিখাটা একটু বাড়িয়ে নিয়ে হাতে দোলাতে-দোলাতে তার ঘরের দিকে চলল। তার ঘরে যদি লণ্ঠন থাকে, তাহলে সেটা জ্বালিয়ে কেষ্টার লণ্ঠন কেষ্টার ঘরে রেখে খালে যাবে।

কেষ্টামাসির সূত্রেই এ-বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক।

কেষ্টামাসির বাপের বাড়ি যোগেনদের গ্রাম মৈস্তারকান্দির পাশেই। মাসি ছিল মায়ের মিতেনি—নয়-ছয় মাসেও দেখাসাক্ষাৎ নেই, তবু মিতেনি তো মিতেনিই। মাসির শ্বশুরবাড়ি ছিল ঝাপরকান্দিতে, মাইল দশ পশ্চিমে। খালপথ বলেই মাসি তাও সারাজীবনে বার দুই-তিন মৈস্তারকান্দির পাশে তার বাপের বাড়িতে এসেছে। যোগেনের মা যে সেই বাপের বাড়ি ছেড়ে শ্বশুরবাড়ি ঢুকেছে, সারাজীবনে আর কখনো বাপেরবাড়ি যায়নি। যোগেনের মা বলত, মৈস্তারকান্দি তো অভিমন্যুর ব্যূহ, ঢোকা আছে, বারান নাই। কেষ্টামাসি একবার জন্মাষ্টমীতে মৈস্তারকান্দিতে আসতে পেরেছিল। তখন যোগেন পড়ে ক্লাস সিক্সে না ফাইভে। গাঁয়ে 'বংশীশিক্ষা' গান হবে। লম্বা-লম্বা চুল, দিঘল গড়ন, একটু রোগা আর গানের গলার জন্য রাধার পার্ট ছিল যোগেনের বাঁধা। দানখণ্ড, নৌকাবিলাস, মানভঞ্জন—সব গানই যোগেনের কণ্ঠস্থ ছিল। এখনো আছে। সেই 'বংশীশিক্ষা'-পালা শুনতে গিয়েছিল কেষ্টামাসি। তখন তো 'কেষ্টা' বলত না, বলত, 'মিতেন', মিতেনমাসি। মিতেনমাসি বংশীশিক্ষার গান শুনে কেঁদে

ভাসিয়ে দিয়েছিল। যোগেনের মা তাকে বলেছিল, 'সে কী রে মিতেন। বংশীতেই জোয়ার ডাকাইলি, বিরহে কী করবি রে। বংশীতে দানে নৌকাবিলাসে তো রগড় রে।' মিতেনমাসি বলেছিল, 'মিতেন রে, কাঁদনের কি কারণ লাগে? ধইর‍্যা নে না ক্যান—বিরহের কান্নাডাই বংশীতে কাইন্দ্যা থুইল্যাম। এর পর বিরহ শুইন্যা বংশীর হাসিডা হাসব। নে মিতান, তোর পোলার গান শুইন্যা তুই হাস, আমি কান্দি।'

রাধাবেশী যোগেন তখন গাইছিল, পায়ে বাঁধা মলে আড়ে ঠেকা দিয়ে—

তোর ঐ ডাকাইত্যা বাঁশি
থামা রে মাধাই,
আমার সব ঘর-বাহির
পুইড়্যা হইল ছাই।

কৃষ্ণ আর রাধা মিলে গাইছিল—পরপর, একজনের পর আরেকজন,

এই ফুকাডা বন্ধ করো
চম্পক-আঙ্গুলে
এই ফাঁকডায় শ্বাসখান ফেলো
অধরোষ্ঠ মিলে।

এ বাঁশি শুধু ডাকে, 'রাই'
আমি যতই-না ডাকি 'কানাই'।

বাড়ি ফিরে কেষ্টামাসি তাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'বল্ তুই আমারই রাধা থাকবি যোগেন, আমি তোর কেষ্টা।'

তখন থেকেই কেষ্টামাসি। যোগেনকে সব সময় মনে রাখে। প্রহ্লাদ দত্তের বাড়িতে সেই সুবাদেই ঠাঁই গেড়েছে যোগেন—প্রহ্লাদ কেষ্টামাসির ছেলে। এখনও যোগেন কেষ্টামাসিকে 'কেষ্টা' বলে ডাকে আর মাসি যোগেনকে ডাকে, 'রাই' বলে। তেমন ফাঁক আর সুযোগ পেলেই কেষ্টা যোগেনকে পাকড়ে গান তুলে দিতে চাইবে—'হঠাৎ উইঠ্যা আইল গীতডা, বুকে মোচড় মাইর‍্যা, কহন আবার ভুইল্যা যাব, তুইল্যা নে না রাই।'

'আরে, আমি কি জজশাহেবের কাছে গান গাইয়্যা গাইয়্যা তোমার আর্জি জানাইব?'

'হাকিমের যদি গানের কানই থাকব, তা হাইলে আর সে আবাগা হাকিম অইব ক্যান?'

যোগেন একটা গামছা পরে, একটা গামছা কাঁধে, দুই হাতে দুই লণ্ঠন ঝুলিয়ে ঘাটে চলল—কেষ্টার লণ্ঠনটা কেষ্টার ঘরে রেখে। ঘাটের জল দেখে যোগেনের শরীরটার ভিতর ঝাঁপান এল, সাঁতারের মত কি আর-কিছু হয়, সারা শরীরের ভিতর-বাহির যেন নতুন হয়ে যায়। যোগেন নিজেকে সামলাল। সারাদিন যা গেল—সাঁতার কাটাটা ছিল অনিবার্য। কিন্তু একে মাঘমাস, তার ওপর তো ভোট গোনাগুনি চলছে। সেখানে কী হয় কে জানে। এখন যদি সাঁতার কেটে গরম ভাত গলা পর্যন্ত খেয়ে ঘুমুতে পারত—তাহলে না-হয় হত।

ঘাট সেরে ফেরার সময় হঠাৎ যোগেন যেন বহু মানুষের একসঙ্গে গলার আওয়াজ পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে কান খাড়া করে। আর-কোনো আওয়াজ এল না। যোগেন একটু পা চালিয়ে ঘরে ফেরে—কাছারিবাড়ি যেতে হবে, তাড়াতাড়ি, রাতে আর সাইকেল নিয়ে যাবে না। অঘটন যাতে কিছু না-হয়, যোগেনের হাজির থাকা দরকার। যদিও নিশ্চয়ই মিস্ত্রিপণ্ডিত, ভট্চাযস্যার,

সেনমশায়—এঁরা আছেন। দুর্গা সেন আসবেন না। এঁরা কোনো অঘটন ঘটতে দেবেন না। এঁরা তো বরিশালের মান্যগণ্য নেতা—যোগেন তো দুই দিনের ফকির, পুরো নেতা হয়েছে কী না তা নিজেই জানে না।

ছাড়া ধুতিটাই যোগেন পরে নিচ্ছিল, গিঁঠের জায়গাটা লণ্ঠনের আলোয় খুঁজছিল। আবার সেই জনরব, এবার উঠে থামে না, আবার ওঠে, আবারও ওঠে। কী, এর মধ্যে কি গোনা শেষ, নাকী কোনো হাঙ্গামা বাধল? আওয়াজটা আর জোরে উঠছে না কিন্তু অনেক মানুষ যে কথা বলছে—তেমন একটা আওয়াজ, নদীর মত বা হাটের মত, ভেসে আসছিল। যোগেন গিঁঠখোঁজা ছেড়ে তাড়াতাড়ি ধুতিটা পরে নিয়ে, গেঞ্জিটা টানতেই, আবার সেই আওয়াজ—এবার অনেক কাছে। তাহলে আওয়াজটা কি এই তাদের রাস্তা দিয়েই এগচ্ছে? দত্তবাবু জিতে গেছেন, কংগ্রেসিরা বাটাজোড়ের বদলা নিতে তার বাড়ির সামনে দিয়ে মিছিল করে আসছে? যোগেন ভিতরে-ভিতরে বোঝে—বরিশাল শহরে এমন কাণ্ড কী হতে পারে? সমাজের তো একটা আচার-ব্যবহার আছে? এত বঙ্গভঙ্গ, আইনঅমান্য, পুলিশের লাঠির গল্প শুনে এসেছে, যোগেন সারাজীবন, কখনো কি এমন গল্প শুনেছে, এক নেতার বাড়ির সামনে অন্য নেতা দলবল নিয়ে প্রতিশোধ নিচ্ছে? যোগেন মনে করতে পারে না। তবে, এর আগে কখনো তো কোনো নমশূদ্র কোনো কুলীন কায়েত, তার ওপর জিলা কংগ্রেসের সভাপতি, তার ওপর দশ পুরুষের জমিদারের বিরুদ্ধতা করেনি! মুসলমান কারো সঙ্গে ভোট করতে হলে জিলা কংগ্রেস বা দত্তবাবুর হয়ত ততটা লাগত না। কিন্তু একটা নমো, মেথর, তার এতটা সাহস হয় কী করে?

যোগেন কি একবারও ভাবেনি—সে জিতেছে বলেই এই জনরব তার এই বাড়ির দিকে আসছে? তেমন ভাবাটাই তো সহজ ও স্বাভাবিক ছিল।

হয়ত ছিল সহজ, স্বাভাবিক ও সংগতও। এমন সম্ভাবনা না থাকলে সে ভোটে দাঁড়াবে কেন? আর, বর্ণহিন্দুরা অনেকেই তাকে তো সমর্থনও করেছে—সেটাই-বা সে এই সময় ভুলে যাবে কেন? এটা ঠিক ভোলাভুলি বা ভোটে দাঁড়ানো নিয়ে দোষীবোধের ব্যাপারই নয়। হয়ত যোগেনের একার ব্যাপার নয়।

চিরকাল যাদের 'নমো' বলে ডাকা হয়, 'চাঁড়াল' বলে বর্ণনা করা হয় বা যাদের সঙ্গে হিন্দুরা খেতে বসে না বা যাদের ছোঁয়া কোনো খাবার খায় না বা হাতের দুই পাতা মিলিয়ে ঘটি বা পাউলি থেকে ঢালা জল যাদের খেতে হয় সেই নমোদের ভিতর অপরাধবোধ ও অনধিকারবোধ জন্ম থেকে, হ্যাঁ, জন্ম থেকে, এমনই শারীরিক, যে কখনো হয়ত আত্মরক্ষার সেই ভিতু চেষ্টা মুহূর্তে বদলে যেতে পারে মরিয়া আক্রমণে, তাও কখনো-কখনো, শ-খানেক বছরে দু-একবারের মত কখনো-কখনো, তার বেশি নয়, তারা এমন এগিয়ে-আসা জনরবে, যেমন কোনো পশু, এমনকী গৃহপালিতও, কোনো হঠাৎ-আলোয় বা হঠাৎ-আওয়াজে খাড়া হয়ে যায় নিজেকে আক্রান্ত ভেবে আত্মরক্ষায়, তেমনি, পুরুষানুক্রমিক প্রতিবৃত্তক্রিয়ায় হয়ত প্রথমে নিজেকে আক্রান্তই মনে করে, যোগেন মণ্ডল হয়েও, পরমুহূর্তেই সে হয়ত ভেবে ফেলেছেও তার জয়ের কথা কিন্তু তেমন ভেবে-ফেলাও তো অপরাধ বা অনধিকার, এখন এমন একা-একা, এই স্থায়ী বোধ তাকে প্রত্যাঘাতে ফিরিয়ে দিয়েছে ভাবনার ঐ আত্মতা থেকে—সে একজন নমশূদ্র, সে কী করে নিজের জীবনে এমন আত্মতা খুঁজতে পারে, যে-আত্মতা খোঁজার অধিকার হিন্দুসমাজ তাকে দেয়নি, খোঁজার ক্ষমতা তো দেয়ইনি।

প্রভু জগবন্ধু জয়, যোগেনো মণ্ডলো জয়

যোগেন জামা গায়ে ঢুকিয়ে বোতাম আটকে লণ্ঠনটা হাতে ঝুলিয়ে বাইরে বেরয়। আওয়াজটা সে বুঝতে পেরেছে—তার নামেই জয়কার দিচ্ছে।

১১

রাস্তায় নেমে দেখে—একটা হ্যাজাক কিংবা ডে-লাইটের আলো এগিয়ে আসছে। লোকজন কাউকে দেখা যাচ্ছে না। সে লণ্ঠনটা উঁচু করে ধরতেই আবার আওয়াজ ওঠে, 'যোগেন মণ্ডল জয় জয়' আর আওয়াজটা শেষ না হতেই তার দিকে যে অনেকে ছুটে আসছে সেটা বোঝা গেল অনেকগুলি ছায়া হ্যাজাক বা ডে-লাইটের আলোতে লম্বা হয়ে তাকে ঢেকে ফেলে ছোট হয়ে যাচ্ছে। যোগেনের চশমায় ঐ বড় আলো পড়ায় সে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না—চোখ কুঁচকে তাকিয়ে লণ্ঠনটা উঁচু করে ধরেছিল। হঠাৎ কারা তাকে কোমরে আর হাঁটুতে ধরে ওপরে নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়ে জয়কার দিয়ে ওঠে, 'যোগেন মণ্ডল জয় জয়।' এতগুলো লোকের কাঁধের ওপর যোগেনের মাথার পাশে তার হাতের লণ্ঠনটা দোলে। যোগেন যে কী বলছে, সেদিকে কারো কান নেই। যে-কজন তাকে কাঁধে করেছিল তারা হঠাৎই নাচের একটা ছন্দ বের করে ফেলে।

জয় যোগেনো মণ্ডলো
জিইত্যা হইছে এম-এল-ও
হরির নামের আসরে কোনো বামুন-শূদ্র নাই।
জগবন্ধু প্রভু জয়
যোগেনো মণ্ডলো জয়
ভোটের ব্যালটবাক্সে হিন্দু-শূদ্র নাই॥
জগবন্ধু প্রভু জয়
জয় জয় জয় জয়...

গানটা সবারই জানা—প্রভু জগবন্ধুর নামকীর্তন। প্রভুর তো আর কোনো শত্রু থাকতে পারে না। ঢাকা-ফরিদপুর-বরিশাল আর কলকাতার অস্পৃশ্যজাতের মানুষের সে ছিল 'বন্ধু'। 'বন্ধু' ছিল এমনকী রামবাগানের বেশ্যাদেরও। পরে, বড় হিন্দুরাও প্রভুর ভক্ত হয়ে যায়। এই গানটি পেয়ে যাওয়ায়—সবাইই হাত তুলে নাচতে থাকে—'জগবন্ধু প্রভু জয়', 'জয় জয় জয় জয়।' আর নাচগান দুটোই এমন মিলে যাওয়ায়—যারা যোগেনকে কাঁধে তুলেছিল, তারা একেবারে খেপে উঠে নাচতে থাকে। তাদের কাঁধে যোগেন সেই লণ্ঠন হাতে বাঁয়ে একবার ডাইনে একবার, ক্রমেই ঘন ঘন ও জোরে জোরে, মাঝনদীতে ঝড়ে পড়া নৌকোর মত, টালমাটাল করছিল আর লণ্ঠনটাও সেরকম দুলেই যাচ্ছিল। জগবন্ধু-বন্দনার গান তো একসময় শেষ হয়। যোগেনের জয়কেও তার সঙ্গে জুড়ে দিলে শেষ হতে একটু বেশি সময় হয়ত লাগবে, কিন্তু শেষ তো একসময় হবেই।

সে-আশায় বালি দিয়ে কোত্থেকে এক ঢাক আর কাঁসি এসে ঐ নাচগানের সঙ্গে জুড়ে গেল। কাঁসি আর ঢোলটা একেবারে পেছনে। নাচগান হচ্ছে একেবারে সামনে। ঢোলওয়ালা বা নাচওয়ালা কেউই পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছে না। ফলে, ঢোল ভাবছে—তার সংগতেই নাচ হচ্ছে আর নাম ভাবছে, তাদেরই তালে ঢোল বাজছে। কেউই কাউকে পথ দেয় না। কারোই থামা হয় না।

জয় প্রভু জগবন্ধু জয়
জয় যোগেনো মণ্ডলো জয়
কারো আর নাহি ভয় যে-কহে যোগেন...

যোগেনের তো ভার আছে। যতজন মিলেই কাঁধে তুলুক, ওজনের ভার তো পড়বেই। কেউ হয়ত কাঁধ বা হাত বদলাতে গিয়েছে, যোগেন সেদিকে একটু হেলে গেছে। ঐটুকু হেলে গেছে বুঝে যোগেন এর চুল ওর কাঁধ ধরে সোজা হওয়ার চেষ্টাই করে না, সে আরো হেলে যায়, তার বাঁ-পাটা মাটির দিকে ঝুলিয়ে দেয় আর নাচের দল বাধ্য হয়েই তাকে মাটিতে নামায়।

'আরে, হইলডা কী কইব্যা তো? ঢোল বাজে কাঁসর বাজে তো সব পূজাতেই, সরল অঙ্ক না যোগ অঙ্ক?' যোগেনের কথা কারো শুনতে পাওয়া সম্ভবই নয়। তবু যেন 'যোগ যোগ যোগ অঙ্ক' বলে একটা আওয়াজ উঠলে তার ভিতর দিয়ে কীর্তিপাশার রায়চৌধুরি ভাইয়েরা জোড়হাতে যোগেনের হাত ধরে কী বলল যোগেন তার কিছুই শুনতে পেল না। যোগেনের হাত থেকে লণ্ঠনটাও তখনও কেউ নেয়নি। ওরা কী বলছে, উত্তর দেওয়া যাচ্ছে না, যোগেন হঠাৎ তার সেই বাঘের ডাকের মত গলা তুলে চেঁচিয়ে ওঠে, 'আরে, হইলডা কী?'

যোগেনকে ঘিরে যারা ছিল, তারা থমকে গেল। দেখাদেখি হ্যাজাকের আলোর মধ্যে যারা ছিল, তারাও থেমে গেল। কিন্তু ঢোল-কাঁসি ছিল সবার পেছনে—সে তো কিছু দেখতেও পাচ্ছে না, শুনতেও পাচ্ছে না। সে বাজিয়েই চলে। সবাই চুপ করে গেছে দেখে সে আবার কুড়-কুড়-কুড়-তাল তুলতে থাকে। আর সে সেই সুরটা ঢাকে বাজাতে-বাজাতে ঘুরতে থাকে একটু নাচের ছন্দে। 'এই এই থামা থামা', বলে কেউ কেউ চেঁচিয়ে উঠতেই ঢাকি তার কাঠির আওয়াজটা নরম করে এনে থেমে যায়। থেমে যে গেল, তা বোঝাতে কাঠিদুটো আলগা পেটায় দুবার।

কীর্তিপাশার দুই জমিদার-ভাই অমিয় আর সীতাংশুর হাতে ধরা তার হাতদুটো বের করে এনে যোগেন দুই ভাইয়ের চার হাত তার নিজের দুই হাতে বেঁধে বলে ওঠে, 'আরে, বড়দাদা-মাইঝ্যান দাদা, করে কী?'

যোগেন তখনো জানে না ওরা কী করছে বা বলছে। যোগেন শুধু নিজের অস্বস্তি কাটাতে কথাটা বলল—দুই ভাই এসে যে তার হাত চেপে ধরেছে, সেই অস্বস্তি কাটাতে। তাতে অবিশ্যি খুব গোপনে নিজেকে নিয়ে আর-এক অস্বস্তিতে পড়ল। সে কি 'দাদা' বলে ফেলল রায়চৌধুরিদের? সে বরাবর 'কর্তা' বলে না? বড়কর্তা-মাইঝ্যান কর্তা?

সীতাংশু রায়চৌধুরি বলে, 'যোগেন, আমি তো তোমার ক্ষতি করতে কম চেষ্টা করিনি—'

রায়চৌধুরি ও যোগেনের মধ্যে কথা হচ্ছে—সবাই চুপ করে তাদের ঘিরে ধরে। কিন্তু আলো না থাকলে কিছু শোনা যাচ্ছে না। 'এ—ই হ্যাজাক, এদিকে।'

যোগেন সেই আলোতে স্পষ্ট হতে-হতে বলে, 'মাইঝ্যান-দাদা, এটা কী কন?'

'শোনো, তুমি তো খাড়াইছিল্যা এই ভরসায় যে সরল দত্ত আর আমার মইধ্যে ভোট ভাগ হইলে তোমার ভোট নিয়্যা তুমি জিত্যা যাইবা। তোমার সে-হিশাবে তো কাঁটা দিল্যাম আমি। উইড্র কইরল্যাম। য্যান্ আমি সরল দত্তর ভোট ভাগ কইরব্যার চাই না। চাইছি কী না-চাইছি সেইডা তো মানুষ দেইখল পরে।'

'কন কী মাইঝ্যান-কর্তা? আপনি যে বেবাগ্‌রে কইছেন আমারে ভোট দিতে, এডা কে শুনে নাই?'

'সে কী কইছি, কারে কইছি বাদ দেও। কিন্তু তোমারে যে-কথাডা কইব যোগেন, সেডা

তোমার রাইখতে হব।'

'আরে, কন কী, আপনার কুন কথাডা আমার পক্ষে না-রাখা সম্ভব?'

'কও কী তুমি। এতবড় ভোটে তুমি এমন জিতা জিতলা'—

'এই সংবাদডা তো অ্যাহনও কেউ আমারে দেয় নাই', বলে যোগেন তার স্বাভাবিক উঁচু গলার হাসির শেষে বাকিটুকু বলে, 'হারছি না জিতছি।'

'আরে, তোমারে যে কাঁধে তুইল্যা নাইচল—'

'কাঁধে তুইল্যা তো বিসর্জনের আগেও নাচে—'

'কও কী? এইডা তো বোধনের নাচ। শুনো, কাজের কথা কই। তোমার এই বিজয়ের উৎসব শুরু কইরব্যার লাগব আমাগ বাড়ি থিক্যা। ঐখান থিক্যা তোমরা আইসো এইখানে—প্রহ্লাদের বাড়িতে।'

'মাইঝ্যান কর্তা, আপনাগ বাড়ি আছে। আপনারা ডাক দিবার পারেন। দিছেন। আর প্রহ্লাদদার বাড়ি আছে—আমারে খাওয়া-পরা-থাকন দিয়্যা আমার মতন একখান কালসর্প পুষেন। আমি তো সহজেই পরাধীনা। আমার তো কুনো বাড়ি নাই। প্রহ্লাদদা আর আপনি বুইঝ্যা নেন—'

'প্রহ্লাদ তো কইছেই। চলো, চলো তাহাইলে। এই হ্যাজাকখান তোল রে।'

হ্যাজাকওয়ালা তখন হ্যাজাকটা মাটিতে নামিয়ে পাম্প করছে। তার পাশ দিয়েই ভিড়টা এগোয়—এবার সামনে যোগেন, তার দুই পাশে কীর্তিপাশার দুই ভাই। 'যোগেন মণ্ডল জয় জয়।'

বরিশাল শহরে 'কীর্তিপাশা হাউস'টা প্রহ্লাদ দত্তের বাড়ির পশ্চিমের উলটোদিকের পাড়ায়, নিচুখালের সামনে। বলতে গেলে, এই রাস্তাটাই মাঝখানের বড়রাস্তা পেরিয়ে নিচুখালের পাশ দিয়ে গেছে। আসলে, বড়রাস্তায় পড়তেই রাস্তাটা চওড়া হয়ে যায় আর ডাইনে নিচুখালের দিকে ঘুরতেই আরো চওড়াই শুধু হয় না, ঐ রাস্তায় দু-চারটে বাড়ি বেশ দেখার মত, তার ওপর নিচুখালের জলে হ্যাজাকের আলো পড়েছে। 'যোগেন মণ্ডল জয় জয়।' খালের উলটো পাড় থেকেও আওয়াজ ওঠে 'যোগেন মণ্ডল জয় জয়।' তারাও এই জয়োৎসবে ভিড়ে যেতে দৌড়তে-দৌড়তে আসছে। এত মানুষ একসঙ্গে কথা বলতে-বলতে তো রাস্তায় সাধারণত হাঁটে না, তার ওপর—রাত হয়েছে সোয়া নটা। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ারই কথা, ভোটের জয়যাত্রা যে এদিকেই আসছে, তাও তো আগে কারো জানা ছিল না।

পাশের এক বাড়ির বারান্দা থেকে কেউ চেঁচিয়ে বলে, 'এই, খাড়াও, খাড়াও,' জজ কোর্টের পুরনো উকিল দীনু চক্রবর্তীর বাড়ি। সে-বাড়ির বাইরের মাঠটাই প্রায় দুই বিঘে, তারপর কাছারি ঘর। দীনু চক্রবর্তী যে দাঁড়াতে বলছেন, সেই ডাক কারো কানে আসেনি বটে, তবে দেখা গেল দুটো-তিনটে লণ্ঠন এগিয়ে আসছে। কেউ-কেউ রাস্তার ওপর উবু হয়ে বসে পড়ে, 'জ্যাঠার তো কাছারি যাইব্যার লগে বাড়ি থিক্যা রাস্তায় পইড়তে দুইসারতে মুত হয়, আর রাস্তা দিয়্যা কোর্টে পৌঁছাইতে থুতু শুকায় না। জিরায়্যা নে।'

দীনু চক্রবর্তী খানিকটা দূর থেকেই জানতে চান, 'আরে, জিইতলডা কে?'

অমিয় রায়চৌধুরি গলা তুলে দীনু চক্রবর্তীকে বলে, 'আপনি না-জাইন্যাই আমাগ খাড়াইতে কইলেন জ্যাঠা? যদি আমরা আপনার প্রতিপক্ষ হই?'

দীনু চক্রবর্তী ততক্ষণে পৌঁছে গেছেন, 'খবর একখান্ কি আর আগে জোগাড় করি নাই? তবু যাচ্যায়া নিলাম। যোগেন কই? যোগেন—'

যোগেন ততক্ষণে দীনু চক্রবর্তীর পায়ের ধুলো নেয়ার জন্য নিচু হয়েছে। যোগেনের চওড়া

পিঠের ওপর তার রোগা হাতটা রেখে দীনু চক্রবর্তী বলে ওঠেন, 'নবযুগের সূত্রপাত কইরল্যা যোগেন। বিগিনিং অব এ নিউ এজ। চাড্ডিখানি কথা? সেদিনের ছাওয়াল! চিত কইর‍্যা দিল তো আমাগ সব পুরানা চিন্তা আর পুরানা কায়দাকানুন। কৈ, তোমরা কী কইরব্যা বইলল্যা যে—অ বৌমা, তোমার মা কনে?'

দীনু চক্রবর্তীকে হাত ধরে টেনে সরিয়ে অমিয়বাবু বলে, 'মা-রে আগুইব্যার জায়গা দিলে তো মা আইব।'

এর মধ্যে দীনু চক্রবর্তীর পরের বাড়ি ছেড়ে পরের বাড়ি থেকে ছালাউদ্দিন শেখ এত লোকজন আলো দেখে বেরিয়ে আসে, 'আরে শুইনছ নি সবাই? ঢাকার নবাব তো তেঁতুলিয়াত্ ঝাঁপ দিছে।' এটা পটুয়াখালির খবর। ফজলুল হক আর ঢাকার নবাববাড়ির নাজিমউদ্দিন দাঁড়িয়েছিল। সকলেরই নজর ছিল পটুয়াখালির ওপর—হক শাহেবের কৃষকপ্রজা পার্টি আর মুসলিম লিগের লড়াই। ভোটের মধ্যেই হকশাহেব দাবি তুলেছিল, 'জমিদারি ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে।' হকশাহেব জিতেছেন শুনে ভিড় থেকে ধ্বনি ওঠে, 'ফজলুল হক জয় জয়।'

দীনু চক্রবর্তীর স্ত্রী তার বৌমাদের নিয়ে যোগেনকে ধান-দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করে। সে বৌ-ই নেহাত বালিকা, তবে দীনু চক্রবর্তীর এক বৌমা গ্র্যাজুয়েট। যোগেন জেঠিমাকে প্রণাম করতে মাথা নামিয়েছে আর তিন বৌমা তার মাথায় ধান-দূর্বা ছড়িয়ে দিল। বৌমাদের যোগেন নমস্কার করল। তখন মেয়েরা নমস্কার পেতে অভ্যস্ত ছিল না। বামুন হলে প্রণাম পাবেন—বয়স সেখানে বাধা হয় না। যোগেন যে নমস্কার করল, তাতে এটাই বোঝা গেল—সে প্রণাম করল না।

দীনু চক্রবর্তীর বৌ ও বৌমাদের এই সব করতে দেখে ছালাউদ্দিনশাহেব তার ছোট ছেলেকে চিৎকার করে ডাকে—'এ—ই নেওয়াজ বাপ রে—এ'।

নেওয়াজ তার পেছনেই দাঁড়িয়েছিল, 'কী কও বাপজান!'

'যা যা। নোর পার‍্যা তোর মা-রে ক, মিঠাই-শিমুই নিয়্যা আইতে। ভোটে জিতছে-না যুগেন! যা—আ।'

ততক্ষণে হ্যাজাক আবার চলতে শুরু করেছে। দীনু চক্রবর্তীর পাশের বাড়ি আনোয়ারশাহেবের দোতলা, এখন বাড়ি বন্ধ। আনোয়ারশাহেবের দাদা থাকে কলকাতার পার্কসার্কাসের ট্রাম ডিপোর পেছনে। দাদা-ভাবি মিলেই আনোয়ারের বিয়ে দেয় কলকাতার এক বড় বাড়ির মেয়ের সঙ্গে, মনে হয় আপকানট্রি মুসলিম। আনোয়ারশাহেবদের ভূসম্পত্তি ভাল, তার ওপর তার দাদা একটা কারখানাও খুলেছে বজবজে। টিন করোগেট করে আর সলিড-টিনের প্যাকিং বাক্স বানা। ছোট ভাই বরিশালে তালুকদারি তদারকি করে আর বড় ভাই কলকাতায় কারখানা করে। তালুকদারি-ফ্যাক্টরির পয়সাতেই তো কলকাতা শহরের ঐরকম জায়গায় এমন বাড়ি—এত বড়, উঁচু, দোতলা, রেলিং, লাল বারান্দা, লাল সিঁড়ি। তাহলে আর বড় ভাইশাহেব চাইবে না কেন—জাতে উঠতে? সে ঐ পশ্চিমি মুসলমান বাড়ি থেকে মেয়ে পছন্দ করে। সে-ই বিয়ের পর থেকেই, বছর বিশ-পঁচিশ, আনোয়ার শাহেব বদলে গেছে, কেমন অচেনা হয়ে গেছেন। কারো সঙ্গে কথা বলে না, কোথাও যাতায়াতও করে না। দরজা-জানলা খোলা দেখলে জানা যায় ওরা ফিরেছে, বন্ধ দেখলে জানা যায় ওরা ফিরে গেছে। আনোয়ারশাহেবের স্ত্রী নাকী শুরু থেকেই কলকাতা ছেড়ে থাকতে চান না। বরিশালে টাউনের সবচেয়ে ভাল জায়গায় এই বাড়িতেই মশা, বদবু, গরিবি। মেলামেশার কেউ নেই। বিবিশাহেবের জবানই কেউ বুঝতে পারে না। লোকগুলির গায়ের রং কালো। বিয়ের পর থেকেই ওরা বছরের বেশ কয়েকমাস,

বিশেষ করে বর্ষার সময়, কলকাতায় কাটায় তবে এই শীতের সময়টা এসে কয়েকমাস থেকে আদায়পত্র বুঝে নিতে হয়। চোখের সামনে ঐরকম জ্বলজ্বলে ছেলেটা কেমন হয়ে গেল—ধোয়া পাটের গুছির মত নেতানো। ছেলেপিলে হয়নি। দীনু চক্রবর্তী নাকী একবার বড় ভাই সারোয়ারকে বলেছিল—'আরে, ছাওয়ালডারে তো এক রিয়্যা দিয়্যা মাইর‍্যা ফেইল্যা! নিজেদের ঘর ছাইড়্যা পচ্চিমা হবার গেল্যা ক্যান। তোমাগো তো 'তালাক' বললেই তালাক। তাই কওয়্যইয়া দ্যাও না একদিন আনোয়ারকে। দিয়্যা, আর-একখান বিয়্যা দাও।' সারোয়ার জানিয়েছিল, 'কইছিল্যাম তো। আমি কইছি, ওর ভাবি কইছে, দুইজনে এক লগে কইছি। কিন্তু আনোয়ার রাজি না। স্যায় কয়—ভাইব্ব কী বৌডায়? হাই সোসাইটির মাইয়্যা। উর্দু ছাড়া বুলি নাই। এমনিতেই তো আমাগ ভাবে ছোটলোক—মুসলমান। তালাকের কথা কইলে তো ভাবব—বুন্যা মুসলমান, কোনো নিয়মকানুনও নাই।' দীনু চক্রবর্তীর মুখ থেকে এ-ই সব শুনে আনোয়ারকে নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন নতুন করে মনে জাগেনি।

এখনও সে-বাড়িটা অন্ধকারেই থেকে যায়। ছালাউদ্দিনশাহেবের বাড়ির সম্মুখে দাঁড়িয়ে ভিড়টা সরব হয়—'যোগেন মণ্ডল জয় জয়।'

ছালাউদ্দিনশাহেবের বেগম এ-সব কাজে খুব পাকা না। এক ইদের সময়! সেও তো বাড়ির ভিতরে, ছোটদের দোয়া করা। সে বাটি থেকে চামচে করে এক চামচ শিমুই ঢুকিয়ে দেয় যোগেনের মুখে। তারপর পাশে রাখা আসান-চিরাগে হাতের তেলোটা তাপিয়ে যোগেনের কানের পাশে হাতদুটো ছোঁয়ায়।

নিচু হয়ে তার পায়ের দিকে যোগেন হাত বাড়াতেই বেগমশাহেবা এক লাফে দু-পা পেছিয়ে যান আর তাতে দীনু চক্রবর্তীর পায়ে লাগে ধাক্কা। দীনু চক্রবর্তী 'কী করো কী করো' করে উঠতেই বেগমশাহেবা একপাক ঘুরে জ্যাঠাকে গোর করে।

'যোগেন মণ্ডল জয় জয়—।'

'কীর্তিপাশা হাউশ'টা সাজানো হয়েছিল। ছোট গেট দিয়ে ঢুকে পা-আটদশ গেলেই দালানে ঢোকার প্রধান দরজা—তার ডাইনে-বাঁয়ে দুটো বড় সাইজের হ্যাজাক। ঐ পথটার ডাইনে-বাঁয়ে দু-টুকরো মাঠ বা মাঠের দুই টুকরো। ১৯৩৭-এর জানুয়ারির শেষে বাড়ির সামনের এই মাঠগুলিকে যে 'লন' বলা হয়, তা, বরিশালের মানুষজনের জানা হয়ে গেছে। কিন্তু তখনো এই এমন সংস্কার কাটেনি যে খুব বড় বড় সরকারি অফিসারের, বেশিরভাগই শাহেব, কোয়ার্টারের সামনের মাঠটাকেই শুধু 'লন' বলে, নাকী জমিদারবাড়ি বা টাউনের বড়লোকদের বাড়ির সামনের মাঠটাকেও বলা যায়।

'কীর্তিপাশা হাউশ'-এর ডানহাতি মাঠটাতে একটা বড় চাঁদোয়া টাঙানো আর মাটির ওপর অনেক রঙিন শতরঞ্চি ছড়িয়ে পাতা। কীর্তিপাশার দুই কর্তা, বাড়ির আরো সব বড় ছেলেরা ও ঘোমটা-টানা কয়েকজন বৌ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সকলকে সংবর্ধনা করছিল ও বাঁ হাত এগিয়ে ডানহাতি মাঠটা দেখাচ্ছিলেন, 'বসুন, বসুন।' একজনমাত্র মাঝবয়েসি বৌ মাথায় কাপড় দেয়নি। উনি ছোট ভাই সীতাংশুবাবুর স্ত্রী। উনি বড় ভাই অমিয়বাবুর চোখের মণি—ওর কোনো কথায় কেউ 'না' করতে পারে না আর ও-ও যেমন ইচ্ছে চলেন।

বরিশাল টাউনের হিন্দুবাড়ির মেয়েদের ভিতর এই সাবলীলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে ব্রাহ্মসমাজ থেকে। ব্রাহ্মদের সঙ্গে হিন্দুদের যা মারামারি কাটাকুটি তা কলকাতাতেই শেষ হয়ে গেছে। বরিশালে এসেছে শুধু সেইটুকু—সব মেয়েদের আকাঙ্ক্ষিত সামাজিকতা, ব্রাহ্মকর্তাদের সহনশীলতা, হিন্দু কর্তাদের একটু কম হিন্দুয়ানি ও পরিবারের মহিলা প্রধানদের উদ্যোগ—

যেটুকুকে ছেঁকে নিয়েছে। ভোটের মত সরাসরি রাজনৈতিক ঘটনায় মেয়েরা হয়ত কাজে নামতেন না, কিন্তু বাড়িতে একজনের সংবর্ধনা তো সামাজিক কাজ।

ধীরে-ধীরে ভিড়টা শতরঞ্চি পাতা চাঁদোয়া টানানো আসরের দিকে এগয়। অনেকেরই পা খালি, তারা ঘাসে পায়ের ধুলো ঝাড়তে গিয়ে দেখে একটু তফাত করে রাখা দুটো ড্রামে জল আর ওপরে বদনা রাখা আছে।

ড্রাম থেকে বদনায় জল নিয়ে পা আর মুখ ধুয়ে ধুতির কোঁচায় মুছে শতরঞ্চিতে একটু ছাড়া-ছাড়া দল পাকিয়ে বসে সবাই। কেউ-কেউ পা দুটো লম্বা করে, দু-চারজন উবু হয়েও। এই জল ব্যবহার আর বসাবসির মধ্যে খুব সহজ ও অভ্যেসমত ভাগাভাগি ছিল। একটা ড্রামের জল ব্যবহার করছিল নমশূদ্র, ধোপা, যুগি, কৈবর্ত এরা। আর-একটা ড্রাম থেকে জল নিচ্ছিল বামুন-কায়েত-বৈদ্যরা। শতরঞ্চিতে বসার মধ্যেও তেমন একটা ভাগাভাগি ছিল। শীতকাল, বাবুদের বেশির ভাগই জামার ওপর চাদর জড়িয়ে। দু-একজনের গায়ে গরম কাপড়ের জামা। যারা বাবু নয়, তাদেরও অনেকের গায়ে গেঞ্জি, কারো-কারো গায়ে ছিটের হাফশার্ট, অনেকেরই গলায় বা কাঁধে মোটা মাফলার—গরমই, তবে উলের নয়, পাটের আর সুতির কাপড়ের মিশেল, অথবা গায়ে দেওয়ার চাদর।

যোগেন এতক্ষণে দেখতে পায়—কারা আছে, কারা এসেছে। তার পায়ে ছিল কাবলি স্যান্ডেল, বেল্টটা বাঁধা কিন্তু থাকে পায়ের ওপরে। সেই স্যান্ডেল খুলে রেখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় মনোরঞ্জন বসুর কাছে, সে শতরঞ্চিতে বসেছিল।

'আরে কামডা দেখছ? এই রাত্তিরে স্যার আইসছেন? আপনি কি আমাগ লগে হাঁইটলেন নাকী স্যার, এতডা।'

যোগেন তাকে প্রণাম করতে নিচু হতেই সে তার পায়ের পাতা বের করে দিতে দিতে বলল, 'তুমি ভোট জিতব্যা রাত্তিরে, আমি তাহাইলে সকালে আসি ক্যামনে? জয়োস্তু। না, হাঁটি নাই। শুইনল্যাম এহানেই আসা হবে তাই আগে আইস্যা বইস্যা আছি। উপেনের সঙ্গে দেখা হইছে? দ্যাখো, সেও আইসছে।'

'দেখি স্যার, খুঁইজ্যা—' উপেন চ্যাটার্জি মোক্তারকে খুঁজতে যোগেন চোখ ঘুরিয়ে দেখে পাঁজিপুথি পাড়ার পণ্ডিতমশায় দুর্গাচরণ মিস্ত্রি, মাথা-গলা ঢাকা এক টুপি আর বগলে ছাতা। যোগেন তাড়াতাড়ি তার কাছে যায়, 'আমিই তো যাইত্যাম, আপনি আবার এতখান পথ...', যোগেন প্রণাম করতে নিচু হয় আর পণ্ডিতমশায় বলে ওঠে, 'তুই গেলে তো তোর যাওয়া হইত, আমার আসা তো হইত না। নে, নে, যতখান পারিস পায়ের ধুলা নে। আমি যাইয়্যা তোরে না-চড়াইলে তো উইড্র কর‍্যা বসতি!'

কথাটা পুরোপুরি ঠিক। শীতাংশুবাবু ভোট থেকে সরে দাঁড়ালে যোগেন যখন উইড্র করার জেদ ধরেছে তখন পণ্ডিতমশায় গিয়ে তাকে প্রায় বাধ্য করে দাঁড়াতে।

যোগেন সোজা হয়ে বলে, 'গলাখান্ তো আপনার ভাইঙ্গ্যা দশকর্মা হইছে। আর চিল্লাচিল্লির কাম নাই। বগলে ছাতা ক্যান?'

'মাঘের রাইতে বৃষ্টি, খাড়া মানুষ শোয়া ছিষ্টি।'

একজন এসে প্রথমে যোগেনকে, তারপর পণ্ডিতমশায়কে প্রণাম করে দাঁড়াতেই যোগেন তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে, 'তুই আইছিস বাপ? খুড়্যা কই?'

'আইসে নাই। আমারে পাঠাইয়্যা কইল ভাল-মন্দ যাই হোক, জাইনলেই চইল্যা আসবি।'

'তয়? তুই তো এইহানে। খুইড়্যা করবডা কী?'

'জাইন্যা গিছে এতক্ষণ! আমি এই ছাইড়্যা যাই ক্যামনে?

'এডারে চিনেন, পণ্ডিতমশায়?'

'না। চিনা তো ঠেকে না।'

'আরে নরেনকাঠির ললিত রায়ের ভাইয়ের ব্যাটা বিনোদ। কী কইরছে আর কী করে নাই? ঘরের টাকা খরচা কইরছে জলের লাগান আর শরীর খরচা কইরছে অসুরের লাগান।'

'দেখ যোগেন, ভোটে তো জিত্ব একজনই। বাকি সগ্গলেই তো হারব। তোমার এই ভোটে দাঁড়ানোয় আর জিতায় তার থিক্যা অ্যাড্ডা বড় ঘটনা ঘইট্যা গিছে। তুমি-যে খাড়াইল্যা এইডা তো একখান সাহস। তুমি সেই সাহসডা দেখাইল্যা তো—তাই আমাগ ভিতরে, এই ধরো কেন, আমার ভিতরে, ঐ যে নরেনকাঠির ললিত রায়ের ভিতরে, কী, ধরো, এই ছাওয়ালডার ভিতরে যে-সাহস লুকাইয়্যা-ঘুমাইয়্যা ছিল, সেই সাহসগুলা বাহির হয়্যা পইড়ল। এরে জাগরণ কয়। তোমরা তো আমারে পণ্ডিতমশায় ডাকো। তাই এড্ডু পণ্ডিতি কইরল্যাম। এই কথাডা তোমারে আইজই কওয়ার কথা। তার লগেই আমি আইসছি। কথাডা তুমি মাথায় জমা রাইখ্যা দ্যাও। অ্যাহন ভাইব্যার যায়ো না। তাহাইলে ভাবনাডা ভুল হইয়া যাইবে বাপ। কইলকাত্তায় তোমার তো একলা ঠেকব। যারা জিতছে, তারা সকলেই শিক্ষিত, সকলেই বড় মানুষ। নিজেরে তোমার ছোট মনে হইব্যারও পারে। সেই সময় কথাডা নিয়্যা ভাইব যে তোমার ভোটে একখান্ জাগরণ ঘইটছে। তুমি য্যান বাবা সেই জাগরণ থিক্যা পৃথক হইয়্যা যাইয়ো না। তহন এই কথাডা ভাইবো। জোর পাইবা।'

'পণ্ডিতমশায়, আপনি কি ডর পান যে আমি ভুইল্যা যাব এই জাগরণ? জাগরণ কথাডা খুব ভাল কইছেন। আমি তো বেশির ভাগ জায়গাত্ যাব্যারই পারি নাই। যারে জন্মে চিনি না, নাম শুনি নাই—সেই মানুষডাও পয়সা দিয়্যা, গতর দিয়্যা, কী কইরছে আমারে জিতানোর জইন্যে? হ। বামুন-কায়েতরাও অনেক জায়গায় মত ঠিক করছে। কিন্তু আমি অ্যাহন কই—মুসলমান, আমার জাতভাই, ধোপা, জোলা, যুগি, কৈবর্তগ কথা। আমি একখান্ উপলক্ষ, পণ্ডিতমশায়।'

'দ্যাখো যোগেন, যে-ভুলডা থিক্যা তোমারে বাঁচাইতে চাই, সেই ভুলডাই তুমি কইরল্যা। নিজেরে উপলক্ষ ভাইবো না। ঐ কথাডা বামুনদের বানানো আরো একডা মিছা কথা। যাগ নিজে ছাড়া কোনো লক্ষ নাই, স্যায়ারাই এই মিথ্যাডা কয় যে আমি উপলক্ষ।'

একটু চুপ করে থেকে যোগেন বলল, 'এই কথাডা মনে-মগজে ঢুইকতে এড্ডু টাইম লাগ্‌ব।'

'বাঁচাইল্যা বাবা। তুমি যে চট কইর‍্যা বুঝো নাই, তাইতেই রক্ষা। ভাইবো। ভাইব।'

'আমি আপনার লগে যাইয়্যা নিরিবিলিতে এড্ডু কথা কয়্যা আসবো একদিন।'

'যোগেন, যাইয়ো না। আমি তো নমোগো পণ্ডিত। বামুন পণ্ডিতরা ঠাট্টা কইর‍্যা আমার থাকনের জায়গার নাম থুইছিল পাঁজিপুথি পাড়া। নামডা কিন্তু টিক্যা গেল। ঠাট্টাডা মানুষ ভুইল্যা গেল। নিরিবিলি বুইঝ্যা উপদেশ দেওনের পণ্ডিত না আমি। ভিড়ের মইধ্যেই কথা কয়ো। অ্যাহন তো ভিড় লাইগ্যাই থাকব।'

'যোগেন, অ যোগেন, এইহানে আও', অমিয়বাবু ডাকে।

যোগেন দেখে, গেট থেকে বাঁধানো কয়েক-পা রাস্তার মাঝখানে তিনটি চেয়ার বসানো হয়েছে, হ্যাজাকের আলোতে পালিশ চমকাচ্ছে। অমিয়বাবু মাঝখানের চেয়ারে যোগেনকে বসতে ইঙ্গিত করে। যোগেন বলে ওঠে, 'ঐডা পারব না বড়কর্তা। এইখানে এত গুরুজনরে ফ্যালায়া আমি চেয়্যারে বইসতে পারব না। আমি এইহানেই বইসল্যাম'—যোগেন শতরঞ্চির

যে-জায়গায় দাঁড়িয়েছিল, সেখানেই বসে পড়ল। একটা হইহই উঠল। 'যোগেন মণ্ডল জয় জয়।'

বড় ঠাকর‍্যান এসে অমিয়বাবুকে কিছু বলল। অমিয়বাবু যোগেনকে বলে, 'এজলাশে যে গুরুজনদের কাঠগড়ায় খাড়া কইর‍্যা রাইখ্যা তুমি চেয়ারে বসো!' সকলের হাসির মধ্যে অমিয়বাবু বলে, 'বসো বসো, ঐখানেই বসো।'

বড় ঠাকর‍্যান, মাইজান ঠাকর‍্যান, আরো সব মেয়েরা মিষ্টির থালা, ফুল, প্রদীপ নিয়ে আসেন। বড় ঠাকর‍্যান আর মাইঝ্যান ঠাকর‍্যান পরপর যোগেনের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিল, ছোট মেয়েদের মধ্যে কেউ এসে ফুলের মালা পরিয়ে দিল, তারপর বড় ঠাকর‍্যান রুপোর থালায় চুড়ো করা মিষ্টির থালাটা রেখে বলল, 'খাও'। আর মাইঝ্যান ঠাকর‍্যান রুপোর বড় গ্লাসে জল রেখে বলল, 'জল না খেয়ে মিষ্টি খেও।'

সবাই যোগেনকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। যোগেন বলল, 'অরা সগলে খাইব না?'

'সবাই খাইব। ঐ তো শুরু কইরছে। তুমি খাও।'

'আমি কিন্তু সবগুল্যা একাই খাব, বড় ঠাকর‍্যান। কাউরে ভাগ দিব না।'

'ভাগ দিবা ক্যান। তোমার খাওনের লগেই তো দিচ্ছি। সগলে খাবে। তুমি খাও।'

এতক্ষণে যোগেনকে ঘিরেই ভিড়টা গোল হয়ে গেছে।

যোগেন বসে-বসে ঘাড় উঁচু করে সেই মুখগুলোর ওপর দিয়ে চোখ বোলায় তার ডানদিকে। প্রথম সারির পেছন থেকেও অনেকে উঁকি দিচ্ছে। ডান দিকে চোখ বোলানো শেষ করে যোগেন থামে।

'তাহাইলে খাইয়্যাই ফেলি! কী কও?'

'যোগেন মণ্ডল জয় জয়—'

যোগেন এবার তার বাঁদিকে ঘাড় ঘোরায়। সবার মুখের ওপর দিয়ে একটু হাসিমাখা মুখে, মাঝে-মাঝে একটা ভুরু তুলে, দৃষ্টি বিনিময় শেষ করে থামে। যোগেন হাসিটা একটু বাড়ায়।

'তোমরা দুঃখ কইরো না। আমার খাওয়ার দিকে চোখ দিয়ো না। তোমরাও পাবা। এত না হইলেও, একটু-আধটু পাবা নে। বড় ঠাকর‍্যান কইছেন। আর, রাত কইর‍্যা তো বেশি-খাওন স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল না। তাহাইলে খাইয়্যাই ফেলি! কী কও?'

'যোগেন মণ্ডল জয় জয়—'

মিষ্টিগুলো চুড়ো করা ছিল। সবচেয়ে ওপরে একটা গ্যাঁদাফুলের রঙের গোল মিষ্টি ওলকপির আকারের। সেই মিষ্টিটা তুলে, না ভেঙে গোটাটাই যোগেন মুখে পুরে চোখ বুঁজে চিবুতে লাগল।

'এই, তোমরাও বইস্যা পড়ো, যার যেহানে ইচ্ছা', মাইঝ্যান কর্তা বলে আর বাড়ির বৌ আর মেয়েরা বড়-বড় বারকোশে মিষ্টি নিয়ে পরিবেশন শুরু করে।

কাটা জিভের ভাষা

১২

এমন একটা ধারণা ছিল সবার যে কীর্তিপাশা বাবুদের বাড়ি থেকে প্রহ্লাদ দত্তের বাড়ি এসে আবার জয়োৎসব করা হবে। তখন ভিড়ের ভিতর অনেকেই আছে যারা বাইরে থেকে এসেছে, রাতে আর ফিরবে না। দলবল আসার আগেই প্রহ্লাদ দত্তের বারান্দায় বাঁশের সরু বাতার তিন-চারটি বড়-বড় ঝুড়িতে নিমকি, লুচি, আলুর দম আলাদা-আলাদা রাখা। পাশেই কেরোসিনের টিনের মত একটা বড় টিন ভর্তি রসগোল্লা। কে যে ভাবল, কে যে আনল—সেটা কেউই জানে না। ছোটকাঠি-র কবির বারান্দায় উঠে এক-একটা ঢাকনা খুলে চিৎকার করতে লাগল, 'কারো কি মিষ্টির ক্ষুধা আছে? রসগোল্লা খাবা?'

'আরে ঐ টিনডা ধইর‍্যা রাইখ্যা দে। কাইল সকালে খাব।'

কবির দ্বিতীয় ঝুড়িটার ঢাকনা খুলে আবার জিজ্ঞাসা করে, 'নিমকি আছে রে, নিমকি, গরম এহনো।'

'দে, দে কবির, নিমকি খাইয়্যা মুখ নোন্তা কইর‍্যা রসগোল্লা খাব।'

কবির পুরো ঝুড়িটা দু-হাতে মাথার ওপর নিয়ে নেমে গিয়ে রাস্তার ওপর উবু হয়ে বসে বলে, 'নে, আমার মাথাডারে মিষ্টির দোকানের কড়াই ভাইব্যা নে।'

ধাক্কাধাক্কির কোনো দরকার ছিল না। কীর্তিপাশার বাড়িতে এমন চুপচাপ খেতে হয়েছে আর এত ভাল-ভাল মিষ্টি, যে এখন একটু ধাক্কাধাক্কি করে নিজেদের চেনা নিমকি কাড়াকাড়ি করে না খেলে যেন বিজয়োৎসব সম্পূর্ণ হবে না।

শীতের রাতে ভারী বাতাস ঘিয়ের গন্ধমাখা হয়ে যায়।

নিমকির হৈ-হৈ চোকার পর কেউ হেঁকে ওঠে, 'এই কবিরদা, বাকি ঝুড়ি দুইখান দ্যাখ।'

কবির আবার বারান্দায় উঠে ঝুড়ির ঢাকনা খুলে হাত দিয়ে তাপ বুঝে চিৎকার করে, 'আরে লুচি রে লুচি, গরম।'

'ঐডাতে কী, দ্যাখ্!'

প্রহ্লাদ দত্ত আর যোগেন ভিড়ের মধ্যে ঘোরাঘুরি করছিল। প্রহ্লাদ দত্ত যোগেনের কাছে বলে, 'আমি আছি। তুমি যাইয়্যা এড্ডু হাত-পা ছড়াইয়্যা ন্যাও। রাইত পোহাইলেই তো মানুষের ঢল নামব। স্যানবাড়িতে তো খাইল্যা য্যান কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের খাওন।'

যোগেন বুক ফাটিয়ে হেসে ওঠে, এত আচমকা, ভিড়ের দু-একজন তাকায়। 'খাওয়া পাইলে খাব না? তুমি কি ডর খাইছিল্যা প্রহ্লাদদা?'

'না, ঠিক ডর খাই নাই। একবার মনে উঠল—পারব তো, অ্যাহন তো শরীর খারাপের টাইম নাই। লোকে আবার ভাইব্যা না বসে, এ আবার কেমন মেম্বার? কথা কইতে-কইতে হাইগতে ছোটে?'

'শের আফগান আত্মরক্ষায় অক্ষম নহেন। আরে, ধইরছেনি কেউ কুনোদিন এত মিষ্টি মুখের কাছে? ঐ মিষ্টি দেইখ্যা আর ঠাকর‍্যানগ দেইখ্যা জিভ সংবরণ করে কার সাধ্য?'

বাড়ির ভিতরে ঢুকে দেখা গেল, কোথাও শোয়ার মত একফালি জায়গা নেই। চৌকিতে, মেঝেতে, ভিতরের বারান্দায় যে যেখানে পারে, গা এলিয়ে দিয়েছে। হাঁটাই মুশকিল।

'দেখো কাণ্ড! তোমার-আমার কথা কারো মাথায়ই নাই', প্রহ্লাদ দত্ত যেন একটু বিরক্তই।

'কার মাথায় থাইকব? এইখানে কি তোমার শাশুড়ি আছে?' যোগেন হাসি শুরু করতেই

প্রহ্লাদ বলে ওঠে, 'তোমার ঐ কংসবধের হাসিখান আর তুইলো না যোগেন। ঘুমের মধ্যে মানুষজনের বোবা ধইরব?'

সেই হাসিতেই প্রহ্লাদের মা, যোগেনের কেষ্টার, গলা এল, 'কেডা রে?' আর যোগেন প্রহ্লাদকে চোখ টিপে বলে উঠল, 'আমি কেষ্টার পাশে পা গুটাইয়া শুইয়া পড়ি, তুমি ঐ দিক সামলাও।' যোগেন কেষ্টার ঘরের দিকে পা বাড়াতেই প্রহ্লাদ লণ্ঠনটা উঁচু করে ধরে।

'কেডা রে?'

'তোমার রাই, কেষ্টা। তোমার লগে শুব। আইজ আমাগ কুঞ্জবিলাস।'

'আয়। আমি তো সারারাত বকবক করি। তোর তো ঘুম হইব না।'

'যোগেন তখন পাঞ্জাবিটা খুলছিল, বলল, 'হইব। হইব। তোমার ঘরে কেউ ঢুকে নাই?'

'ঢুকব্যার নিছিল। বড়বৌমা খেদ্যায়্যা দিছে—রাইতে ঘুম না হইলে কাইল সকাল থিক্যা বুড়ির যে ব্যায়াল উঠব, সেইডা সামলাইবো কোন মেম্বার?'

যোগেন বুড়ির পাশে শুতে-শুতে প্রহ্লাদকে বলে, 'প্রহ্লাদদা যাও গিয়্যা। লুচি খাও'। প্রহ্লাদ লণ্ঠন নিয়ে চলে যায়। বুড়ি যোগেনের মাথা বুকে টেনে নিয়ে কান্না ভেজা গলায় বলে ওঠে, 'তোর মায়ে যদি আইজ বাঁইচ্যা থাইকত—'

যোগেন একটু ধমকের স্বরে বলে, 'তুমি তো কইল্যা ঘুমের মইধ্যে বকবক কইরব্যা। কাঁইদব্যা তো কও নাই কেষ্টা?'

'না। তাই কই। তুই এতবড় একখান মানুষ হইলি, তোর মাও তো দেইখ্যা যাইতে পারত, আর এড্ডু বাঁইচলে? আমি যহন বাঁইচ্যা আছি, সে-ও তো বাঁইচব্যার পারত রে রাই। তাই কই। তোর মনে হয় নাই?'

'ছাড়ান দ্যাও তো! চোখের জল না ফেইললে তোমাগো কুনো সুখই সুখ হয় না।'

'সুখের সময়ই তো তাগো মনে পড়ে, যারা নাই।'

যোগেন পা দুটো একটু ভাঁজ করতে গিয়ে বুড়ির শরীরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে, 'এই সাইরছে, কেষ্টা, তোমার কি দুঃখ লাইগল আমার হাঁটুতে?'

'না। আমি সইর‍্যা শুই। তুই জায়গা নিয়্যা শো।'

'আরে, আমার শরীরখান তো হইছে অ্যাখন গন্ধমাদন। নাওয়ে উইঠলে নাও কাইত। তোমার আর সইর‍্যা কাম নাই। শ্যাষে পইড়্যা গিয়্যা কোমরের হাড় ভাইঙব্যা। খায়্যায়ও ফেললাম বেশি, লোভে, ঐ বাড়িতে—' যোগেন তার ধুতির কষি একটু আলগা করে দেয়।

বুড়ি তার বাঁ হাতটা যোগেনের পেটে বোলাতে-বোলাতে বলে, 'নিজের শরীর খোঁটাস না। নজর লাগে। প্যাটে দিল্যাম বাঁও হাত, হজম হইল প্যাটের ভাত। প্যাটে দিল্যাম বাঁও হাত, হজম হইল প্যাটের ভাত। প্যাটে দিল্যাম বাঁও হাত, হজম হইল প্যাটের ভাত। প্যাটে দিলাম... খাওয়াইলোডা কী, স্যানরা? খিচুড়ি না ভাত? কত পুরানা বাড়ি—পুরানা বংশ। এক বাড়িতে এক বংশে তের বছর পুরব্যার আগেই দুই-দুইখ্যান সতী—নবকেষ্টর বৌ আর তাগো বৌমাও।'

যোগেন চোখ বুজে ফেলেছিল, 'বৌমার আর করনের কী ছিল? শাশুড়ি যখন সতী গিছেন, বৌমার তো যাব্যার লাইগবই।'

বুড়ি বলে না, কিন্তু ভাবে, সে তো ঠিকই। বংশে একটা ধারা হয়্যা গেলে তা তো রাইখতেই হয়। শাশুড়ি সতী গেলে বৌ-রেও যাইতে হয়।

যেন বুড়ির ভাবনার জবাবেই যোগেন ঘুমেল গলায় বলে, 'তোমাগ এই হিন্দুধর্মখান বড়

নিষ্ঠুর গ কেষ্টা। মানুষরে বড় দুঃখ দেয়। নিজের ভাইবৌ-ব্যাটারবৌ গ পিটাইয়্যা পুড়াইয়া মারে। ধুত, এরে আবার ধর্ম কয়? কেষ্টা, আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি অন্য কোনো ধর্ম নেই। আমার আর হিন্দুধর্মে থাকার বাসনা নাই।'

'রাই, এই কথা আর কইয়ো না বাপ। অ্যাক্কেরে কইয়ো না। একবারও কইও না। তুমি অ্যাহন কলকাত্তার মেম্বার। মানুষ ভুল বুইঝবে। যোগেন মণ্ডল আমাগ ক্রিশ্চান বানাইছে, মুসলমান বানাইছে। এমন কথায় বান্দরের ল্যাজে আগুন লাগাইব।'

কথার শেষ দিকে যোগেনের নাকের ডাক অল্প একটু শোনা গিয়েছিল। কথা শেষ করার পরও যোগেনের কাছ থেকে সাড়াশব্দ না আসায় বোঝাই গেল সে ঘুমিয়ে পড়েছে। তারও একটু পরে পাশ ফিরতে-ফিরতে যোগেন বলে ওঠে, 'একশ বছরের মধ্যে তিন-তিনডা বৌ পুড়ায় আর নিজেরগ একখান পদবী রাইখব্যার পারে না?'

'ক্যা? পদবীর আবার হইলডা কী? সব্বাইই তো রায়চৌধুরি বাড়ি-ই কয়।'

'তুমি না অ্যাহনই স্যানবাড়ি কইল্যা?'

'সে তো পুরানা অব্যাসে কই। অগ তো অনেক পদবী।'

'ক্যা? পদবী অনেক হইব কিয়ের লাইগ্যা? তয় যে শুনি হিন্দুরা এক-এক দেবতা না ঋষিরুশির টানা বংশ?'

'বংশ টানাই। পদবীগুলান যার যেমন।'

'পাহিদাস নামের এক শুদ্দুর অগ ঘরে বোনের বিয়্যা দিয়্যা, অগ না বিক্রমপুর থিক্যা ঘরজামাই আইনছিল?'

'তুই দেইখব্যার গিছিস? আইনছিল কি বাঁধছিল?'

'না। আমি কই, শুদ্দুরের ঘরজামাই তো শুদ্দুরই হয়। ওরা 'স্যান' হইয়া কি সেইডা ঢাকা দিল?'

'ক্যান? অগ আদিপুরুষ তো স্যান। দুর্গাদাস।'

'আরে কেষ্টা, পোলায় যদি বাপের নাম বদল্যায়া থোয়, বাপ কি তখন পরলোক থিক্যা জামিনে খালাশ ছুটি নিয়া আইস্যা কোর্টে আফিডেবিট কইরবে গো কেষ্টা? ঐ দুর্গাদাসের দাসখানাই অগ টায়টেল। দ্যাহ, মিল দ্যাহ। পাহি দাস। দুর্গা দাস। তারপর থিক্যা অরা নাম নিব্যার ধইরল—রাম দিয়্যা। রামজীবন, কেষ্টরাম, বলরাম। আর রটাইল, নবাব সরকার অগ মজুন্দার কইর‍্যা দিছে। মজুন্দারের দ্বার নাই। কুলীন বামুনও হয়, চাঁড়ালও হয়, মুসলমানও হয়—।'

'অরা তো আর শুধু মজুন্দার আছিল না। রায় ছিল, স্যান ছিল, চৌধুরি ছিল, মিল্যাইয়া মিশ্যাইয়া রায়চৌধুরি হইছিল, স্যানচৌধুরিও হইছে। যার যেমন সাধ—'

'যার যেমন সাধ তেমন পদবী-নেওনের কুনো বাধা নাই হিন্দুগরে। এক নমশূদ্র যদি একখান পদবীও বলে তাহাইলে তার জিভখ্যান টাইন্যা কাইট্যা দিতে হয়। চাঁড়ালের আবার নাম! নামের আবার পদবী!'

যোগেনের গলার স্বর ঘুমের ভিতরে তলিয়ে যাচ্ছিল। এ-সব কথা বলার স্বরলিপি যেন তৈরি হয়েই আছে—এমন রেওয়াজে। ঐ শেষ কথাগুলি গিটকিরি-সহ বেরিয়ে আসে। যোগেনের গলা আরো ঘুমের অতলে তলিয়ে যায়। মাঝরাতে নদীর অতল থেকে ভেসে ওঠা বুদ্বুদ যেমন বিস্ফারিত হয়, তেমনি এক নৈঃশব্দ্য বিস্ফারিত হয় যোগেনের গলায়, সে-কথা প্রায় শোনা যায় না—'দ্যায় নাই? কাইট্যা? জিভ? আমাগ?'

বুড়ি কোনো জবাব দেয় না। যেন তার নীরবতায় জিজ্ঞাসা চাপা পড়ে যাবে। জিজ্ঞাসা না-হয় চাপা পড়ে, কিন্তু ঘটনা? পাছে ঘটনা থেকে আবার জিজ্ঞাসা জেগে ওঠে, বেড়াজালে যেমন জেগে ওঠে নদীর ভিতরে আওরে থাকা খাণ্ডববন আর মৈনাক পর্বত, বিশেষ করে আজই, এই বাংলা ১৩৪৩ সালের ১০ই মাঘের রাতে, উত্তর বরিশালের সাধারণ গ্রামীণ আসনে এক নমশূদ্র জিতে এসে যখন ঘুমিয়ে পড়ছে—তাই কেষ্টা চুপ করে থাকে। চুপ করে থাকতে পারে অভ্যাসে।

যে-ঘটনাটি যোগেনের গলা থেকে বেরিয়ে এল, সেই ঘটনার গায়ে বছর বা তারিখ আর পড়া যায় না। কারো তেমন দরকার হয় না পড়া। হয়ত ঘটনাটি এতই পুরনো হয়ে গেছে যে রামায়ণ-মহাভারতের গল্পগুলির সঙ্গে মিশে আছে। হয়ত ঘটনাটি ঘটা এখনো শেষ হয়নি। বা হয়ত ঘটনাটি এখনই ঘটছে—জানা যাচ্ছে না। হয়ত যাকে বলে প্রমাণ—তা আরো নানা সূত্র থেকে আসছে এখনো। প্রমাণের অভাবে মামলা ঠেকে থাকতে পারে কিন্তু ইতিহাসের তো কোনো প্রমাণ দরকার হয় না। যদি-না ইতিহাস নিয়ে মামলা হয়। এটা এমনই একটি ঘটনা—মায়ের পেট থেকে পড়ার আগে এক নমশূদ্রকে ঘটনাটি জেনে বেরতে হয় ও যে প্রক্রিয়াতেই তার সৎকার হোক না কেন, একজন নমশূদ্রকে তার শরীরের ছাইয়ের সঙ্গে সেই ঘটনাটিকে জলে-স্থলে-আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে যেতে হয়।

এক চাঁড়ালকে এক শাহেব ডাকিয়ে এনেছেন।

কেন, সেটা নির্ভর করে কখন ডাকিয়েছেন তার ওপর। ১৭২৪-২৬ হতে পারে—ব্রোক নামের এক শাহেব তখন বাখরগঞ্জের ম্যাপ আঁকছিল ও লোকজন ডেকে জায়গার নাম, লোকের নাম, নদীর নাম, খালের নাম জেনে লিখে নিচ্ছিল। ১৭৯০ হলে টেইলারশাহেব হতে পারে—সে তখন ঘুরে ঘুরে সাপের ওঝাদের 'বিষ নামানো' দেখছিল ও তাদের নামঠিকানা লিখে নিচ্ছিল। ১৮৪০ হলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রেলি হতে পারে—সে তখন সতীদাহের খবর পেলে লোক ডাকিয়ে আসল খবর জানতে চাইত। ১৮৯৮ হলে বেলশাহেব হতে পারে—সে তখন প্লেগ-আক্রান্ত শূদ্রগ্রামে-গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ১৯০৮ হলে পুলিশসুপার কেম্প হতে পারে—সে তখন কারা 'বন্দেমাতরম' বলে তাদের সম্পর্কে খবর জোগাড় করছে। ১৯২৭ হলে পুলিশসুপার সুডেন হতে পারে—সে তখন সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে ডাকা হরতালের খবর নিতে লোকজনকে ডেকে-ডেকে জিজ্ঞাসা করছিল।

তবে এ সমস্ত গবেষণার কোনো মানে নেই। একজন নমশূদ্রকে, বা যে-কোনো নমশূদ্রকে, ডেকে তার নাম ও হালহকিকত জানতে চাইলে, কে জানতে চাইছে—সেটা কোনো প্রশ্ন?

এক চাঁড়ালকে এক শাহেব ডেকে তার নাম জিজ্ঞেসা করে।

সম্ভবত কোনো দোভাষী ছিল, বামুন কিংবা কায়েত। বা সম্ভবত কোনো অজলচল হিন্দু অচ্ছুৎ। শাহেবের দোভাষী বা মুনশি হয়ে সে টাকা কামাচ্ছিল ও অজলচল থেকে জলচল হচ্ছিল ও হিন্দু-অচ্ছুৎ থেকে ছুঁতহিন্দু হচ্ছিল—মালো থেকে মল্লিক।

লোকটি যা হোক একটা নাম বলেছিল ও দোভাষীও শাহেবকে একটা নাম বলতে পেরেছিল। কিন্তু শাহেব বলল, এটা তো অসম্পূর্ণ নাম। পদবী কোথায়?

তাতে ওরা দুজনেই হেসেছিল, বোঝার পর, যে শাহেব কী চাইছে, সেই দোভাষী ও সেই নমশূদ্র। দোভাষী হাতদুটো ও ঘাড় নাড়িয়ে-নাড়িয়ে শাহেবকে বোঝাতে চাইছিল, এদের সেসব হয় না, এরা তো মানুষ নয়, নো ম্যান, চণ্ডাল ইজ চণ্ডাল। লোকটি শাহেবের দিকে তাকিয়ে হেসে-হেসে ঘাড় নেড়ে দোভাষীর কথাটাই যে ঠিক, তা বোঝাতে চাইছিল। সে হয়ত শাহেবকে

দেখে একটু মজাও পাচ্ছিল—শাহেবও কত কী জানে না। যে-কারণেই হোক, শাহেব গেল রেগে। সে দোভাষীকে যা মুখে এল, তাই বলল। অনুমান করা যেতে পারে যে শাহেব পৌত্তলিকতা সম্পর্কেই রাগ করে থাকবে, 'টায়টল মানে কী? টায়টল মানে এই সমাজ তোমার কোনো কোনো অধিকার মেনে নিয়েছে। টায়টল ছাড়া তোমাদের দেশে এক গ্লাস জলও পাবে না। একজন লোকের পরিচয়ের পূর্ণতা-অপূর্ণতা নেই?'

সেই দোভাষী তখন ডাকা-লোকটিকে বলে, 'বাবা, দে না একটা নাম বলে, এ তো মেরে ফেলবে।'

ডাকা-লোকটি তার কোনো জবাব দেয়নি। দোভাষী কী সব বলে শাহেবকে ঠান্ডা করল আর ডাকা-লোকটিও চলে গেল।

পরদিন সকালে গ্রামের বামুন-জমিদার ঐ ডাকা-লোকটিকে আবার ডাকা করল—মহারাজা ডেকেছেন।

মহারাজ তাকে দেখেই বলল, 'দাঁড়া দেখি ঐ খানে, সোজা হয়ে, জিভ বের করে।' লোকটি একবার জিভটা বের করেই হেসে ফেলল। তারপর হাতের পাতা দিয়ে হাসিটা মুছে নিয়ে আবার জিভ বের করল।

মহারাজ গলা তুলে কাউকে ডাকল। সেই ডাকে একজন নমশূদ্র এল। মহারাজ, জমিদার হলেও ব্রাহ্মণ। সে তার লোকটিকে বলল, 'যা, একটা ছুরি নিয়ে আয়। আর ও যে দাঁত বের করে হাসছে, ওর জিভের আগাটুকু কেটে দে। যা—আ-যা।'

যাদের সামনে ঘটনাটা ঘটছে, তাদের শরীরে তো মানুষেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। সেগুলোর ওপর তো সব সময় নিয়ন্ত্রণ থাকে না—চোখের পাতা পড়া, রোম খাড়া হয়ে ওঠা, হঠাৎ বড় শ্বাস পড়া। মহারাজ বলল, 'বেটা চাঁড়ালের নামও থাকে, নামের আবার পদবীও থাকে!'

ততক্ষণে মহারাজের ভৃত্য শূদ্রটি এসে সেই দোষী শূদ্রের পাশে দাঁড়িয়ে, বাঁ হাতে তার মাথার খুলিটা চেপে ধরে, ডান হাতে সেই ছুরিটা জিভের পাশে চালিয়ে দিল। দু-এক পোঁচ দিতেই জিভের কাটা টুকরোটা মাটিতে পড়ে গেল।

পড়ে গিয়ে লাফাতে লাগল, ঐ জিভের কাটা টুকরোটা, মাটির ওপর, লাফাতে লাগল, পাক খেতে লাগল, সোজা হয়ে গেল, উলটে গেল—যেন একটা জোঁক।

এমন যে হতে পারে, এটা কারো জানা ছিল না। মহারাজেরও না। কী করে থাকবে। কেউ কি কোনোদিন জিভের কাটা টুকরো দেখেছে? জিভ কেটে দিলে কাটা-টুকরোটার কি প্রাণ আসে? সকলেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল—মহারাজা, তার ভৃত্য শূদ্র ও সেই দোষী শূদ্র। সেই দোষীর মুখ থেকে গলগলিয়ে রক্ত উপছে পড়ছিল। নিজেরই কাটা জিভের টুকরোর নড়াচড়া, পাকিয়ে ওঠা দেখতে দেখতে তার শরীরের সব রক্ত এই রকম বেরিয়ে গেলে সে দড়াম করে পড়ে, মরে গেল। বা, সে মরে, দড়াম করে পড়ে গেল, মাটিতে।

তার কাটা জিভের টুকরোটা তখনো বেঁচেছিল কীনা, জোঁকের মতনই হোক—তবু, বেঁচে ছিল কীনা সেটা কারো জানা ছিল না মানে, জানা হয়ে ওঠেনি তার। তেমনি আর জানা হয়নি কারো—ঐ যে লোকটি, দোভাষী, সে কেন মহারাজকে আজ সকালে শাহেব-শূদ্র ঘটনাটি এমন বিশদে জানিয়ে গেল। জানা হয়নি, কারণ, এরকমই তো হয়। হয়ে আসছে। যা হয়ে আসে, তা তো হয়েই আসে, তেমন হয়ে-আসতে কি প্রতিবারই নতুন কারণ দরকার? দোভাষীটি হয়ত কেবল এইটুকুই চায় যে বেশ কিছুদিন পরে, যখন তার চেহারাটা কারো মনে থাকবে না অথচ শাহেব চড়িয়ে-চড়িয়ে তার টাকা হবে বিস্তর, তখন কি সে সরিকেল, কলকিনি,

রামজানপুর, হেমামদ্দি, মুরুদিয়া, কুকুরকাঠি—এই সব চরের দিকে একটা নিলামি জমিদারির আনা-দুয়েক কিনে জমিদার হতে পারবে না আর রেজিস্ট্রেশনের সময় বিশ্বাস বা হালদার বা চৌধুরি পদবী লিখে জলচল হয়ে যেতে পারবে না? ঐটুকু আশাতে সে কারণে-অকারণে মহারাজা-জমিদারদের কোনো-না-কোনো সেবা দিতে চায়—এমনই সব তুচ্ছ সেবা যে শুদ্দুররা আজকাল পদবীও বলে!

বুড়ি ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো সাড়া দেয়নি—এই রাতে, জন্ম-সময়ে বা জন্মান্তর-সময়ে ভেসে যেতে কথাটার যতক্ষণ সময় দরকার। কিন্তু আইজই রাইয়ের এই কথাডা মনে হইল? এই এমন জিতন জিইত্যা? কথাডা তাহাইলে কুনো সময়ই ওর মন থিক্যা সরে না, ইষ্টমন্ত্রের মতন? তয় তো রাইয়ের আমার বড় কষ্টের জীবন শুরু হইল। বড় কষ্টের আর একার।

একটা গুনগুন ওঠে, 'সোঁতো বিথারজলে এ তনু ভাসাইয়াছি, কী করিবে কুলের কুকুরে?'

বুড়িও গুনগুনিয়ে থাকতে পারে, যোগেনও পারে।

দু-জনের ঘুমের অভ্যেস একেবারে উলটো।

কেষ্টা রাতে যতক্ষণ ঘুমোয়, ততক্ষণ কথা বলে। শুনলে মনে হয়, কারো সঙ্গে গল্প করছে। কোনো কোনো সময় কেষ্টা থেমে তার কথাসঙ্গীকে যেন কথা বলার সময় দেয়। কখনো নিজে কথা শোনার সময় নেয়। কখনো কথাবার্তার ভিতর নৈঃশব্দ্য চারিয়ে দেয়। তার এই ঘুমের কথাগুলির ভিতর সুতোছাড়া গাঁথনি থাকে, কোথাও কোনো কথা ঝড়ে ছেঁড়ে না বা উড়ে এসে জুড়ে বসে না।

যোগেন দিনে রাতে, সেখানেই ঘুমোয়, মুহূর্তে একেবারে গভীরে চলে যায়—ঘুমের বা জাগরণের। সে ঘুমের ভিতর কথা বলে না। সে ষোল আনা জেগে না থাকলে তার কথা তৈরি হয় না। কিন্তু সে যখন ঘুমিয়ে, তখন তার সঙ্গে কথা বলার বিপদ হচ্ছে, বোঝা যায় না সে জেগে না ঘুমিয়ে। তার স্বরে শুধু ঘুম লেগে থাকে। তার ফলে অবিশ্যি সে যা বলতে চায়, শুধু তাই বলে। কোথাও কিছু বাদ পড়ে না।

১০ মাঘ বাকি রাতটুকু আরো অনেক কথা বলা হয়েছিল। সব কথাই এত স্পষ্ট যে কেষ্টা বা রাই যে-কারোরই হতে পারে। সব কথাই ঘুমের কুয়াশা মাখা—কেষ্টার বা রাইয়ের। তফাত এইটুকু যে কেষ্টা না-ঘুমিয়ে কথা বলে না আর যোগেন না জেগে বলে না। শুধু সেটুকু দিয়ে কি আর চিনে নেয়া যায়, কোন কথাটা কার?

সেটা চিনে নিতে না পারলেও, কথা বয়ে যায়—শেষরাত জুড়ে, ভোররাত জুড়ে, পরের দিনগুলোর দিকে ও সেই দিনগুলোরও পরের দিনগুলোর দিকেই। বিজয়রজনীতে কেষ্টা আর রাই তাদের উদ্ভট প্রণয়ের ভাষায় যেন একটা পরনকথা বুনে যাচ্ছিল, অন্ধকারে।

দুর্গা সেনের কাছে

১৩

২৬ জানুয়ারি মঙ্গলবার যোগেন শ্বাস নেয়ারও সময় পায় না। তার কেন্দ্রের নানা জায়গা থেকে লোকজন এসে পড়বে, এটা তো তার জানাই ছিল। তবে, আন্দাজ ছিল না সূর্য উঠতে-না-উঠতেই শাহারাণপুর নদীর পাড়ের মেদুয়া থেকে একনৌকো লোক এসে পড়বে। যোগেন ওখানে যায়নি, যাওয়ার কথা ভাবেওনি, ওখানকার কোনো খবরও সে রাখেনি। ভোলা-দৌলতখানে কেউ-কেউ হয়ত ভোট করছে—মেদুয়া তো বোধহয় দৌলতখান থানারই উত্তরে। এই একখান থানা, দৌলতখান, যে-থানায় মানুষের মাটি থেকে নদীর জল বেশি। ওদিকে সব থানারই ঐরকম। মেদুয়ার আর কটা ভোটার—বড়জোর হাজার-বারশ। তার জন্য এত দূর যাওয়া যাবে কী করে? 'আ রে তোমরা আইল্যা ক্যামনে? সারা রাইত কি নাও বাইলা?'

শাদা নুরে শাদা টুপিতে মোড়লমত এক মুসলমান বলে ওঠেন, 'ক্যা? নাও লাইগব ক্যা? আল্লা তো দেহ দিছে, সাঁতার কাইট্যা আসছি।'

যোগেন একে চেনে না। তবে এরা যেরকম করে বসেছে, তাতে সাঁতার কেটে আসাটা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না—বরিশালিয়াদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। আর-একজন জোয়ান ছেলে বলে ওঠে, 'আপনে তো জিতার আগে আর পৌঁছব্যার পাইরলেন না, তাই আমরা ভাইবল্যাম, জিতা যখন হইয়্যাই গেল, চলো, যারে জিত্যাইল্যাম সেডা কী বস্তু, পাথর না গাছ না মানুষ একবার দেইখ্যা আসি।'

'সেই কেডা না কইছিল—মরণঘোষের মেলা দেইখতে আইলাম, মরণরে তো দেইখলাম না।'

'আরে মৈনুদ্দি কাকা, এইডাই তো আমাগো জিতা মানুষডা? সদর বরিশালে তো জিতা-মেম্বারের অভাব নাই। ভুল জায়গায় আইলেন না তো?'

কথাটাতে যেন তেমন করে হাসি উঠল না। এটাও তো ঠিক যোগেনও এঁদের দেখেনি, যোগেনকেও এঁরা দেখেনি। এমন হওয়া তো একেবারে অসম্ভব না যে ওড়াকান্দির পি-আর ঠাকুরের কাছে যাওয়ার জন্যই এঁরা বেরিয়ে ভুল করে যোগেনের কাছে চলে এসেছে।

'থো দেহি। এ কি মাইয়্যা বদলাইয়া শাদি দেয়া? দেখাইল এক মাইয়াক আর বহাইল আর-এক মাইয়াক?'

'যে দেখাইল্যা-মাইয়াটাক দেইখছে আর যে বহাইল্যা-মাইয়াটাক দেইখছে সেই চারিখান চক্ষু কি একডা মাইনষের নাকের দুইপাশে, না কী দুইডা মাইনষের নাকের দুইপাশে?'

যারা এসেছিল, তারা খুব নিশ্চিন্তমনে ছড়িয়েছিটিয়ে ছিল। তাদের সেই ছড়িয়ে থাকার ভঙ্গিতেই যোগেন বুঝে যায়, না, ওদের কোনো ভুল হয়নি, ওরা পি-আর ঠাকুরের ভোটার না, তারই ভোটার।

ইতিমধ্যে আশপাশের জায়গাগুলো থেকেও লোকজন এসে জুটেছে। মাঝেমধ্যে আওয়াজ উঠছে—'যোগেনো মণ্ডলো', 'জয় জয়'। লোক বেশি হওয়ার সুবিধে এইটাই যে লোকজন নিজের-নিজের লোক খুঁজে যায় ও খুঁজে পায়। যোগেনের কিছু করার থাকে না। মাঝেমধ্যে তাকে বারান্দায় দেখলেই লোকজন 'জয় জয়' শুরু করে। ২৫ তারিখের সন্ধ্যা রাতে যোগেন তো সবার সঙ্গেই ছিল। তখন তো তার এমন কোনো সমস্যা হয়নি—এই মানুষ-সমাবেশের

সঙ্গে তার কীরকম ব্যবহার করা উচিত? সবার সব ইচ্ছা তো আর পূরণ করা যায় না। কেউ তো তার কাছে কোনো ইচ্ছা জানায়নি। কিন্তু ভিড়ের দিকে তাকালেই তার চোখে পড়ে যায়, তার সমবয়েসি বা প্রবীণতর কেউ দাঁড়িয়ে। যিনি দাঁড়িয়ে, তিনিও শুধু যোগেনকেই দেখছেন। বেলা একটু বাড়লে যোগেন ভিড়ের দিকে চোখ রাখা ছেড়ে দিল। বিকেলের মধ্যেই একবারও মুখ না ফিরিয়ে সেই ভিড়ের দিকে বাঁ-হাতটা নাচান। এই দুই বেলার মাঝখানে এক সময় যোগেন, তার সাইকেলটা নিয়ে বেরয়—'বরিশাল হিতৈষী'র সেই অফিসে পৌঁছুতে। সব কাজের একটা হিশেব থাকে। সেই হিশেবমত কাজ না হওয়ার দোষ পরে আর কিছুতেই কাটানো যায় না। কাল রাতেও দুর্গা সেন মশায়েরা হয়ত ভাবছিল, যোগেন আজ আর কী আসবে! কিন্তু আজ সকালের মধ্যে না গেলে ওঁরা নিজের মনে-মনে জেনে যাবেন—যোগেন তাহলে সত্যিই এল না। এই কথাটা একবার মনে এসে গেলে আর দূর হয় না—সে মণ্ডল যতবারই যাক। বাড়ির এই ভিড়টা হয়ত দুপুরে কমে বিকেলে বাড়বে। এখনই দুর্গা সেনদের প্রণাম করে আসার ঠিক সময়—দেখা হয়ে যাবে অথচ বেশিক্ষণ থাকতেও হবে না।

যোগেন একটু ঘুরপথ নিল। সোজা পথে গেলে বাজারের ভিড়ে পড়তে হবে আর বারবার থামতে হবে।

সেই ঘুরপথে যেতে-যেতে যোগেনের মনে এসে যায়—আচ্ছা, এঁরা সবাই মিলেই তো তাকে জিতিয়েছে, তাহলে যোগেন এমন চোর-পুলিশ খেলছে কেন। সে কি ভোটে জিততে-না-জিততেই, এখনো তো গেজেট হয়নি, ভোটের নেতা হয়ে গেল নাকী? নিজেকে যোগেনের ভাল লাগল না।

দুর্গা সেন মশায় একা ছিল। সাইকেল বাইরে রেখে যোগেন ভিতরে ঢুকল। পাশ থেকে ঘাড় ঝুলিয়ে দুর্গা সেনের পা খোঁজে যখন যোগেন, তার মাথাটা দুর্গা সেনের পেটের ওপর নেমে আসে। দুর্গা সেন যোগেনের মাথাটা বুকে জড়িয়ে ধরেন। তার মত মানুষের এতটা আবেগতাড়না প্রকাশের জন্য এতটা একাকীত্ব দরকার ছিল। সেনমশায় হাত সরানোর পর যোগেন সোজা হয়ে দাঁড়ায়। এত বড় যে একটা ঘটনা এইমাত্র ঘটল, হয়ত এই ঘরে আর-কেউ নেই বলেই ঘটল, দুজনের কেউই সেটা নিয়ে কিছু বলে না তো বটেই, নিজেদের ভিতরের আলোড়ন সামান্যও দেখায় না।

'গ্রাম থেকে মানুষজন আসত্যাছে। তাগো মাতবরগও চিনি না। তারাও নাকী আমাক দেখে নাই কুনোদিন। এদিকে আপনার সঙ্গেই দেখা করা হয় নাই। তহন আমি প্রহ্লাদদারে কইল্যাম—প্রহ্লাদদা, তুমি এডড়ু যোগেন মণ্ডল হইয়্যা খাড়াও, আমি এই গ্যালাম আর আইল্যাম।'

যোগেনের কথা-বলার ধরনে দুর্গা সেনও হেসে ফেলেন। যোগেন আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, দুর্গা সেনের ঠোঁটের ভঙ্গিতে তার মনে হল তিনি কিছু বলতে চাইছেন। কথা বলার সেই বাধাটুকু পেরিয়ে দুর্গা সেন বললেন, 'কিন্তু গ্রামের ঐ মানুষজন, যারা তোমারে দেখেন নাই, তুমিও যাদের চেনো না, তারাই তো এই জয়ডা ঘটাইল।'

'সে তো ঠিকই স্যার। মাইনষে অবিশ্যি অন্য এড্ডা কথা কওয়াও ধইরছে—'

দুর্গা সেন তাকিয়ে থাকেন।

যোগেন বলে, 'কওয়া ধইরছে স্যার, যোগেন মণ্ডল কেডা, জিতছে তো দুর্গা সেন।'

দুর্গা সেন ডান হাতটা তুলে যোগেনকে থামান। তারপর বলে, 'তুমি কি এমন কথায় সন্তুষ্ট হইব্যার কারণ পাইছ।'

'সন্তুষ্ট অসন্তুষ্টের তো কথা না স্যার। কথাডা হচ্ছে মানুষ সত্যি কথা কইলে আমি কী

করব, স্যার।'

'না, তোমারে কিছু কইরব্যার কই না। জিগাই। কথাডা তোমার ভালই লাগছে শুনতি?'

যোগেন তার সেই খোলা হাসি হাসেন।

'যো—গেন, মানে, কই কী, এই কথাডা যদি দুই-একজন বইল্যা দ্যায়, তাহাইলে তোমারে আর কৃতজ্ঞতার ছালা ঘাড়ে কইরতে হয় না। না-হইলে তোমার নিজেরেই তো আগ বাড়াইয়্যা কইতে হইত!'

'সে তো স্যার এখনো কইব্যার লাইগবই। সত্যি কথা কি একজন কইয়্যা দিলেই আর-একজনের কওয়া নিষিদ্ধ হয় স্যার?'

'শুনো যো—গেন, এক নম্বর—কথাডা ষোল আনা ঠিক না, খুব বেশি দর ধইরলেও কথাডার দাম বড়জোর চাইর পাই। তোমারে জিত্যাইছে এড্ডা জাগরণ। সেই জাগরণে তোমাগ জাইতের মনুষ্যরা, মুসলমানরা আর আমাগো মত ভদ্র হিন্দুদের কেউ-কেউ—মিল্যা গিছে। এই মিলন স্থায়ী কিছু না। খড়ের আগুনের নাগাল জ্বইল্যা উইঠছে।'

'হ্যাঁ স্যার। ভোটের তফাতটাও তো কিছু বেশি না। হাজার দেড়েকেরও কম। দত্তবাবুমশায় আর সাড়ে-সাতশ-আটশ ভোট পাইলেই তো মণ্ডল কাইত।'

'ভোটের শতকরা হিশাবডা পাইছনি?'

'পাই নাই স্যার, কিছু-কিছু শুইনছি।'

'কও দিনি।'

'ভোট দিছে স্যার পাঁচ-আনির কম।'

'সেও তো হওয়ারই পারে। চোদ্দ আনিই তো এই পরথম্ ভোট দিছে। তাও আবার মাইয়ালোগ আছে কত। তবু যদি ছয় আনি ছুঁইত যোগেন—বুঝা যাইত ঐ জাগরণডা স্থায়ী হবারও পারে। খড়ের আগুন না হইয়্যা বনের আগুনও হইব্যার পারত।'

'তাহাইলে স্যার, আমার গণেশও তো কাইত হবার পাইরত, স্যার!'

হ্যাঁ। অঙ্ক-অনুযায়ী পাইরত। কিন্তু এই হিশাবডা মহা ভুল হইব যে ভোট কম পইড়ছে বইল্যা তুমি জিতছ। প্রদত্ত ভোট এক আনি বাইড়লে ধরো হাজার দেড়েক। এই পুরাডা তোমার বিরুদ্ধে যাইব্যার কারণডা কী? তার উপর তুমি তো, যোগেন, ভোট পাইছ নয়-আনির উপর। এইডাই তো মোস্ট সিগনিফিকান্ট। তুমি সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে জিইতছ।'

'জিতা তো হইল, করবডা কী?'

'যোগে—ন, ঐখান পর্যন্ত দুর্গা সেনের দৃষ্টি নাই। করাডা সবডা তোমাগো হাতেও থাকে না। একডা কথা তো ভোলা চলে না। আমি তো আছি বরিশালে। তুমি যাবা কইলকাতায়। কিন্তু তোমারে তো কাজ কইরতে লাইগবে পুরা ভারতবর্ষের হিশাবে।'

'ভারতবর্ষ? তার তো কিসুই দেখি নাই, স্যার।'

'এইবার দেইখব্যা। এক্কেরে তলার থিক্যা?'

'আপনি তো স্যার কইয়্যাই খালাশ। আমার কি দেখার সেই চক্ষু আছে? নাকী, কোন দেখাডা ঠিক আর কোন দেখাডা বেঠিক, তার হদিশ জানা আছে? শ্যাষে আলো দ্যাখ্যাইয়া পথ ভুল্যাইয়া পেত্নী না কাদায় ডুবাইয়্যা মারে?'

'শুনো যোগে—ন। খালি নিজেরে নিয়্যা ভাইবো না। ভাইবো—ঘাটে একখান মাত্র নাও আছে আর সামনে নদীতে আইসছে বন্যা—দুই দিক থিক্যাই। উপুর থিক্যা নদীগুলার জল আর তলা থিক্যা সমুদ্রের কোটাল। তোমার আর কুনো ফিরান নাই। তোমারে পার দিবার লাইগবই।

তুমি কী কইরব্যা। নাও তো ঐ একখান। তুমি কি অ্যাহন নৌকাডার ফাটল আর ফুটা গুইন্যা ঠিক করবা ভাসবা কী ভাসবা না? নাকী পাড়ে খাড়াইয়্যা থাইকলে মরণং ধ্রুব বুইঝ্যা ঐ নৌকাডা ভাসাইব্যা? যদি ফাটা কী ফুটা থাকে তাও তো জল সেঁইচ্যা নৌকাডারে আর নিজেগেরো বাঁচান্ যায়। ভালমন্দ বিচার কইরো না যোগেন।'

'স্যার, আপনার কথায় তো ডরে সুষুম্নাকাণ্ড থিক্যা কুলকুণ্ডলিনী পা আর পাছা দিয়া মাটিত্ গড়াগ... খাইব্যার ধরসে।'

'আরে, কুলকুণ্ডলিনী তো মাটিতই পড়ব। গামছা হোক আর ধুতির কোঁচা হোক, শুইষ্যা নিবা বেবাক।'

'স্যার, আর ভয় খাওয়াইবেন না। আমি যাই। অ্যাহনো তো বাড়ি যাইব্যার পারি নাই। দেখাসাক্ষাৎ না হইলে ক্ষমা দিবেন।'

নৌকাপথে মৈস্তারকান্দি

১৪

তার বাড়ি মৈস্তারকান্দি রওনা দিতে-দিতে আরো একদিন কেটে গেল যোগেনের। শেষে শুক্রবার শেষ বিকেলে প্রায় জোর করেই বেরিয়ে পড়ে ঘাটে এক নৌকোয় উঠে বলে, 'আগে নাও খোলো, তার বাদে কই, কই যাব।' নৌকোয় দুই মাঝি। একজন লাফিয়ে পড়ে নেমে কাছি খুলে দিয়ে ঝুলে গলুইয়ে উঠতেই লগির এক খোঁচায় নৌকো মাঝখালে গিয়ে পড়ে।

'কোনোদিগে হাল ঘুরাই, বাঁয়ে না ডাইনে?' বয়স্ক মাঝি জিজ্ঞাসা করে আর যোগেনের পেছন থেকে কেউ বলে ওঠে, 'নে, নে, লগিঠেলা নাও, তার আবার হাল?'

যোগেন একটু অবাক হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে, তার সঙ্গে-সঙ্গে আরো চার-পাঁচজন নৌকোয় উঠেছে। তারা পথে কোথাও নেমে যাবে নাকী তার সঙ্গে মৈস্তারকান্দি যাবে—সেটা বুঝতে যোগেনকে দ্বিতীয়বার ঘাড় ঘোরাতে হয়। ঘাড় আর সোজা করতে পারে না—পাটাতনে তাকে উলটে বসতে হয়। এরা কেউই যাত্রী নয়, তার সঙ্গে মৈস্তারকান্দি চলল। তা চলুক।

বয়স্ক মাঝি একেবারে নিচু গলায় বলে, 'নাওয়ের না অয় হাল নাই, জলের তো পুব-পচ্চিম আছে। সেইডা তো এডডু কওয়ার লাগে—পুবে যাই না পচ্চিমে যাই।'

যোগেন তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'ভাই, মৈস্তারকান্দি, মৈস্তারকান্দি যাবার লাইগব।'

'মৈস্তারকান্দি? তার থিক্যা ফরিদপুর চলেন না কত্তা, আড়িয়াল খাঁ দিয়া সোজা পাড়ি হইব নে। টাইমও কম লাইগবে, একখান বিদ্যাশেও ঘুরা হবে গিয়া।'

'তুমার মত নাইয়া পালি তো দেখি, কহন না কইয়্যা বসো, আর-অ্যাদ্দিন কষ্ট কইর‍্যা থাইকবেন ক্যান, চলেন, গোরেই চলেন, খাটনিও কম আর জলে গোর হইলে তো কবরও খুঁড়া লাইগব না', যোগেনের সঙ্গে যারা যোগেনের অজ্ঞাতেই নৌকোয় চড়ে বসেছে, কথাটা তাদেরই কেউ বলে।

মাঝি বলে, 'না কত্তা, আগে কইলে যাইত্যাম না।'

যোগেন হেসে উঠেছিল, 'আগে কইলে তো যাইত্যা না। অ্যাহন কইলে তো যাইবা,

সোনাভাই? চলো।'

নৌকো তো চলছিলই। খালপাড় থেকে শহরের আলো জলটাকে আরো একটু ঘন করে তুলেছিল। কিছু আলো, কখনো-সখনো জল বেয়ে উঠে নৌকোয় মানুষজনকে চকিত আলোকিত করে নৌকো থেকে গড়িয়ে যাচ্ছিল। নৌকোর গতিতে বোঝা যায়, বয়স্ক মাঝি অনিচ্ছেয় লগি ঠেলছে যেন সে ঠিক করতে পারছে না, কী করবে। ছোট মাঝির ঠেলাতেই নৌকো যা চলার চলছে। নৌকোর যাত্রীদের ভিতরও সেই অনিশ্চয়তা ছড়িয়ে পড়ে। মাঝির দোষ নেয়, এই সন্ধ্যায় এতটা পথ কোনো নৌকাই যাবে না, যদি আগে ঠিক করা না থাকে।

যোগেনের সঙ্গীরা চুপ করে থেকে মাঝিদের বোঝাতে চায়—যেতে তাদের হবেই। কিন্তু বাঁশের সাঁকো পার হওয়ার পরও নৌকোর গতি বাড়ে না।

একজন বলে ওঠে, 'আরে কারে নিয়্যা যাও মাঝি, জানো নি?'

উত্তরটা দিল ছোট মাঝি, বেশ জোরে, 'সেই দুঃখেই তো যাব্যার চায় না।'

'ক্যান? কী হইছে? যোগেন মণ্ডলরে নাওয়ে নিব্যার চায় না?

'ক্যান?'

হয়ত এই কথাটা থেকে পেছন ফিরতেই বড় মাঝি লগিতে জোরে খোঁচা দিয়ে ফেলে, একটু দুলে উঠে নৌকোটা চলকে এগিয়ে যায়। ছোট মাঝি খ্যাক খ্যাক করে হেসে ওঠে। বড় মাঝি ধমকে দেয়, 'শিয়ালের নাখান হাসস্ ক্যান?'

'কথাডা তো শুইনতে হয় মাঝিভাই। ঐ-বা ক্যান হাসে আর তুমিই-বা ক্যান কান্দো?'

ছোট মাঝি আরো হেসে ওঠে, 'বাজানের পাটি যে হাইর‍্যা গেল!' এই মজাতে সে আরো একবার হাসে।

'অ—। তাই কও। তুমি আমাগো শত্তুর পাটটি? তাই জলে ডুবাইয়্যা মাইরতে চাও। ক্যা? তোমার কী কাম পইড়ছিল কংগ্রেস হওয়ার।'

'কাম দিয়্যা কি কেউ ভোট করে? দত্তমশায় পুরানা মানুষ, জোতজমির কাজকম্ম জানে বোঝে, ভদ্দরলোক, ভরসা হয়, সংসারের কত্তা বইল্যা মাইনতে মন চায়—'

'সে না-হয় বুঝা গেল। তা ভোট হইল ধরো গিয়্যা চাইর দিন। দত্তবাবুরে ভোট দিছ তো দিছ। তার লাইগ্যা এই চাইর দিন ধইর‍্যা তোমার মুখ কালা, যোগেন মণ্ডলরে নাওয়ে নিব্যার চাও না? এইডা কী কথা?'

তখন নৌকো ছোটখাল থেকে বড়খালে ঢুকছে। পাড়ের একটা মহীরুহ খালের ওপর ঝুলে থাকায় জায়গাটা গাঢ় অন্ধকার দেখায়। সেই অন্ধকারটা পেরতে-পেরতে বড় মাঝি বলে ওঠে—'কী যে কন্! উনি না হইয়্যা আর-কেউ হইলে কি নৌকা খুইলতাম? ভোট যারেই দেই কত্তা, মানীর মান দিব্যার পারি।'

এই কথার মাঝখানে বড় মাঝির শ্বাস পড়ে যায়। যোগেন বলে ওঠে, 'ভাই, আমাগো এড্ডা নৌকা ধইর‍্যা দ্যাও-না! তোমারে জিগ্যাইয়া আমার উঠা কাম ছিল। জিগ্যাইলে তো আর উঠা হইত না। তুমি বরং আমাগো এড্ডা নাও ধইর‍্যা দ্যাও।'

ছোট মাঝি পেছন থেকে কচি গলায় বলে ওঠে, 'তাই কি হয়? আপনারে নাও থিক্যা নামার কথা কি কওয়া যায়? বসেন-না কত্তা—বাজানের মুখডা সগল সময়ই দ্যাখতে অমন ব্যাজার লাগে।'

যোগেন বলে, 'জলের উপুর দিয়্যা যাচ্ছি—জলের উপুর দিয়্যা কি ব্যাজার মুখে ভাসা যায়। মা গঙ্গার ক্রোধ লাগে—আরে, আমি কলকল্যাইয়া হাইসবার ধরছি আর এই মানুষগুল্যা য্যান

শ্মশান থিক্যা ফিরে। বড়মাঝি, যদি সত্যি আমাগো নিয়্যা মৈস্তারকান্দি যাবার চান, তাহাইলে হয় গীত ধরেন, নয় প্রস্তাব কন।'

'যাচ্ছি তো—। রাইতে আর এতখান পথ ফির‍্যা কাম নাই। আপনি কাইল যখন ফিরবেন, আপনারে নিয়্যা ফিরুম।'

'এই কথার তো আর মাইর নাই। কিন্তু আমি তো কাইল ফিরব্যার পাইরব না।'

যোগেনের সঙ্গীদের ভিতর থেকে সে-ই প্রবীণ গলা শোনা যায়, 'আরে, যাওনের টাইমে ফিরনের কথা আসে কোথ্ থিক্যা। ফিরনের কাম যদি থাকে তো আমরাই তো ফিরব—আইজ রাত্তিরেই—'

'তাহাইলে নোড় পাইর‍্যা আইস্যা হেই নৌকা-বিলাসের কামডা কী ছিল?' যোগেন বলে।

'আ-আ-রে কন কী মণ্ডলমশায়—সরকারের একখান মেম্বার লাগছ, তোমার কি আর মানায় রাত্তিরবেলা অন্ধকারে একা নদী পাড়ি দেয়া?'

'ক্যা? পছন্দ হয়—তোমাগো য্যান দিনরাইত মেম্বার দেহাই অব্যাস। দেইখল্যা কারে, মেম্বার হইয়া পাখা গজাইছে।'

'পাখা গজায় না। মেম্বার হইলে মুরগির তাওয়ের গরম বাইড়্যা যায়। আর, উঁই-পিঁপড়ার নাগাল বাচ্চা মুরগিগুল্যা লাইন লাগাইয়্যা মার পিছনে-পিছনে ছুটে।'

'দেইখল্যা কারে? এমন মুরগিমেম্বার? কথা তো ধইরছ য্যান মেম্বার তোমার বদনায় জল ভইর‍্যা দ্যায় রোজ!'

'আরে, দেইখছি, দেইখছি। নুরে পাক ধইরছে আর একখান মেম্বার দেইখব্যার পারব না? কও কী?'

'আমি কোথায় কইল্যাম। তুমিই তো কয়্যা যাও। আমি তো মেম্বারের নাম জিগাইছি। জাইনলে যাইব একবার তার লগে—মেম্বারের কায়দাকানুন শিখব্যার জইন্যে।'

'এই নৌকাডারে মৈস্তারকান্দির দিকে না যাইয়া ডাইনে বেঁকব্যার কও। তাহালিই তো মেম্বারের ঘাটে নৌকা ভিড়ব,' প্রবীণের কথায় জোর আসে, যেন জুতমত কথা পেয়ে গেছে আর পেয়ে গেছেই যখন তখন আর সুতো ছাড়তে চায় না। অন্যান্য সকলেই মনে-মনে হিশেবে ব্যস্ত হয়ে পড়ে—ঐ জায়গা থেকে আড়িয়াল খাঁ যদি সোজা আড়াআড়ি পাড়ি দেয়া যায়, তাহলে তো ফরিদপুরের মাদারিপুর। সেখানে মেম্বার কে?

যোগেন বলে উঠল, 'দ্যাহো মিয়াঁ, ধোঁকা লাগাইও না।'

'আরে, তুমি যদি ধোঁকা খাও, তার আমি করব কী? নিজের বন্ধুর পৈঠ্যা ভুইল্যা গেইলা রে মণ্ডল, তোমার বন্ধু—'

'হে—ই, তুমি নি রসিককাকার কথা কও?'

'কই। রসিকলাল বিশ্বাস।'

'কী যে কও? নিজের অন্যায্য কথার সাক্ষী খাড়া কইরতে যশোরের মানুষডারে ফরিদপুরে নিয়্যা ফেল্‌লা?'

'রসিক বিশ্বাস মেম্বার কী মেম্বার না?'

'হ্যাঁ। হ্যাঁ। মেম্বার।'

'দেখি নাই তারে?'

'দেইখব্যা না ক্যান? সেইডা তো যশোরের।'

'আরে থাকব্যার পারে যশোরের মিউনিসিপ্যালিটার চেয়ারম্যান হইয়া?'

'চেয়ারম্যান না। ভাইস, ভাইস, ভাইস চেয়্যারম্যান, বামুনগ হারাইল না রসিককাকা আর নৌশের অলি মিইল্যা? নমশূদ্র আর মুসলমান ভোট যোগ হইলে কেউ পারে? এরে কয় ভোটের হিশাব।'

'সে-ই হিশাবেই তো তুমিও জিতল্যা মণ্ডলমশায়! এই ভোটখান কিন্তু এক জবর কল বানাইছে। আমাগো নাগাল পাটের ছিবড়ার দর উঠাইছে।'

'রসিককাকার মতন মানুষরে তুমি মুরগি কইল্যা?'

'তোমার পছন্দ না আইলে তুমি শিবঠাকুরও কইব্যার পারো। যেহানেই যান সেইহানেই তার ষাঁড় হাজির—'

'আর ফরিদপুর?'

'তোমার তো মাথায়-মাথায় বয়স রসিক বিশ্বাসের। তাহাইলে তো তোমার স্মরণে থাকা উচিত ছিল।'

'রসিককাকা সব দিক দিয়্যাই আমার বড়। স্যায় তো অ্যাহনো কাউন্সিলের মেম্বার। এডা ঠিকই কইছ—ফরিদপুরডা যদি ছাইড়্যা দাও।'

'ছাড়ব্যার চাইলেই কি ছাড়া য্যায়, মণ্ডলমশায়? রসিক বিশ্বাসই তো তোমাগ সমাজে প্রথম বিধবা বিবাহ কইরল। ফরিদপুরের গোপালগঞ্জের সাতপাড়ের গয়ালি বিশ্বাসের বড় মাইয়ারে? তাহাইলে আমার হিশাবে ভুলডা কোথায়? রসিক বিশ্বাসের উপর ফরিদপুরের দখল আছে কি নাই?'

'কত্তা, অ্যাড্‌ডা কথা জিগাইব্যার চাই', বড়মাঝি তার ঘাড় না ঘুরিয়েই বলে নিখুঁত হিশেবে, যেন হাওয়া ঠিকঠাক পৌঁছে দেবে তার কথা।

'একখান ক্যান বড়মাঝিভাই, কী কও?'

'না—আ। কই কী। শুইনল্যাম নাকী মহাজনের ধার মিটাইব্যার আইন চালু হইছে কুন-কুনখানে। আমাগো এইখানে হইব না?'

'ভোটে তো এই কথাই উঠছিল। কিন্তু অ্যামন আইন যদি জারিই থাহে, তাহালি সে-কথা নিয়্যা আর চিক্কুর পাড়ার কী ছিল?' যোগেন বলে।

'আমার ভাইয়ের বেটির বিয়া হইছে চাঁদপুরে। তা, ধরেন কেন সাল পাঁচ-ছয়। এইবার ইদে জামাই আইস্যা জিগ্যাইল আপনাগ এহানে এই আইন চলে না ক্যান। তাই জিগ্যাই।'

'চাঁদপুর? কোন চাঁদপুর? ঢাকার না ত্রিপুরার?'

'না কত্তা, উত্তরের না, পুবের চাঁদপুর।'

'কইলডা কী জামাই, এডডু ছড়াইয়্যা কও।'

'ছড়াইয়্যা তো শুনি নাই। ক্যামনে কব?'

'অ্যাহনও মনে আছে তোমার। তাহাইলে তো কথাডা মনের ভিতর জমা আছে?'

'তা আছে। আমাগ আর কতখান জমি? ফুফা কইল যে বড়ভাইরে জমিত্ লাগাইয়্যা তুই বরং নাওয়ে যা। নাও বানাইতে তো টাকা লাগে। টাকা দিব কেডা? ফুফা কইল ক্যা, জমির মহাজন দিবে! আমরা কইল্যাম, মহাজন তো জমির। স্যায় নদীতে টাকা ঢাইলব ক্যা? তো ফুফা কইল—মহাজনের আবার জমি-নদীর ফারাক কী রে। তার সুদ পাইলেই হইল। আমরা কইল্যাম—মহাজন তো 'শুধ্' তুইলবে জমির থিক্যাই। এক জমির 'শুধ্', তার সঙ্গে নাওয়ের 'শুধ্', সব 'শুধ্' কইর‍্যা ধানকাটার পরে ঘরে উঠবে তো ধুলা। প্যাটটা তো আগে সামলাইবার লাগব। ঐডায় হাত দিয়্যা কী অনাহারে পইড়ব? তাও ফুফা বলে—এগুলা তো তোর নিজের

কথা, মহাজনের কথাডা মহাজনেরই কইব্যার দে না, যা, যা, মহাজনের লগে ক। ফুফার কথাডা মাইন্য করার জইন্যেই যাই মহাজনের নগত। আমরা তো কথা কইব্যারও পারি না পরিষ্কার কইর‍্যা। হালা, হাইলার কথা বলদ বুঝে। মহাজন তো আর বলদ হইব্যার পারে না। আমিই বলদ। হালা, বলদের কথা হাইলা বুঝে। তাই বুইঝ্যা নিল মহাজন। জিগ্যায়—'আরে তুমি তো অ্যাহন একখান নাও বানাইয়্যা সংসারের আয় বাড়াইবার মন করছ? সে তো খুবই ভালা কথা। নতুন আয় না কইরলে নতুন টাহা আইসব কোত্থন, মণি। তুমি নাওয়ের কামে টাকা চাও। তা না কইর‍্যা, ডাঙায় নাও বাও ক্যা? আমি কইল্যাম, না, মহাজন, আমার ভুল, আমি পছন্দ করছি আপনি য্যান ডাঙার মহাজন। তাই কইছি। মাপ দ্যান। মহাজন তহন কয়, একখান সিধ্যা কথা শুইন্যা বাড়ি গিয়্যা বিবিরে ডাইক্যা শোও আর বিচার ভাবো। বিচার শ্যাষ কইরবার পাইরলে আইসো। না-পাইরলে, আইসো না। সেই সিধা কথা বুইঝব্যার লাইগ্যা আমারে এক জুম্মাবার রোজা রাইখতে হইল। কিন্তু কথাখান এতডাই কটকইট্যা সোজা যে কিছুতেই ফেগরা বাইর হয় না। মহাজন আমারে একখান নৌকা বানাইয়্যা দিবে, সব খরচা কইর‍্যাই, নতুন একখান নৌকা। নৌকার যা আয় হইব পাই-পয়সা মহাজনরে দিয়্যা আইসবার লাগব। নৌকার উপার্জন। আর, মহাজন আমারে প্রত্যেক মাস-পয়লায় পঞ্চাশ টাকা কইর‍্যা বেতন দিবে। নৌকা মহাজনরে বেতন দিবে রোজের রোজ। মহাজন আমারে বেতন দিবে, মাসে একবার। শ্যাষম্যাষ মহাজনরে গিয়্যা কই, আমি রাজি। তহন মহাজন আমারে বামুনরে খবর দিব্যার কয়—নৌকাটারির শুভদিন দেইখ্যা দিতে। ছয় মাস তো চইল। মাসে-মাসে টাহায় মাইন্যা পাওয়ার তো অব্যাস নাই। সে-অব্যাস পাকা হইল কী হইল না, মহাজন কইল, 'তোর নৌকা তুই নেগা। আমার যে-টাকা খরচা গেইছে, সেইডা তুই 'শুধ্' দিবি, ঐ আগের নাখাল। আর, নৌকাডাই তো আমার না। তাহালি তোক মাস-পয়লার মাইনা দিব ক্যান? জামাই যহন কইল, অগ দেশে নতুন আইনে পুরানা ঋণের উপুর শুধ্ নাই তহন ক্যামন লজ্জায় সইর‍্যা পইড়ল্যাম। য্যান জামাইগ ঐ চাঁদপুরের থিক্যা আমাগো এই বরিশাল বড় পড়তি জায়গা।'

বড়মাঝি অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছিল। লগি ঠেলার জন্য মাঝে-মাঝে তাকে থামতেও হচ্ছিল। শেষের দিকে একটু হাঁফিয়েও যাচ্ছিল—কথা-বলা আর লগি ঠেলার খাটনিতে। সে যে তার কথা শেষ করেছে—এমন কোনো ইঙ্গিত ছিল না।

যখন সেটা বোঝা গেল তখন তো যোগেনকে ও তার দলবলের কাউকে কিছু একটা কথা বলতে হয়। বলার মত কোনো কথা যোগেন খুঁজে পায় না। বড়মাঝি জানতে চায়—চাষির ঋণমকুবের ব্যবস্থা হয়েছে কী হয়নি। এর শাদা উত্তর, না, হয়নি। তাহলে মাঝির জামাই যে বলল, তাদের জায়গায় হয়েছে, ত্রিপুরার চাঁদপুরে? যোগেন তেমন কোনো ব্যবস্থার কথা শোনেনি। আর জামাই-ই-বা কী বলেছে আর বড়মাঝিই-বা কী বুঝেছে সেটাও তো জানা যাচ্ছে না। বড়মাঝির মহাজন মুসলমান, বড়মাঝিও মুসলমান, যোগেনের সঙ্গে যে-দলবল নৌকোয় যাচ্ছে তারাও সবাই মুসলমান। জাতের কথাডা মনেই আইত না যদি বড়মাঝির মহাজন মুসলমান না হইত। মহাজনি ব্যাবসা মুসলমানগ মইধ্যে কম। অগ ধর্মে সুদ খাওয়া নিষেধ। আর নিষেধ না-থাইকলেও হিন্দু জমিদার আর নতুন পচ্চিমা ব্যবসায়ীগ বাঁধা মহাজনি ব্যবসায় ঢুইকব কুন ফাঁকে। তয়, ছুটোখাটো জায়গায় কি আর মুসলমানি মহাজন দুই-এক টাকা ঢালে না? ঢালে। বড়মাঝির মহাজন তো ধুরন্ধর। পুরা ছয়মাসে নৌকার টাকা দুই গুণে উশুল নিয়্যা, অ্যাহন কিস্তিসুদে আদায় নিচ্ছে। এডার হিশাব তো চক্রবৃদ্ধি হারেও আইসব না। তার উপর সপ্তাহের দুই দিন কিস্তি। এ মহাজন হিন্দুও না, মুসলমানও না, অ্যাহেবারে সংরক্ষিত! নিজের এই

রসিকতায় যোগেন খুশিই হয়। তার সঙ্গীদের মধ্যে মহাজনি ব্যাবসার কেউ থাকতেই পারে। তাঁদের দোষ দিয়ে যোগেন কিছু বলেনি।

নৌকোর নীরবতাটা একটু লম্বা হয়ে যাচ্ছিল।

সেই প্রবীণ গলা থেকে বেরল, 'তোমরা তো দেহি, ভাগ্যমান। সব জায়গা থিক্যা মহাজনি উইঠ্যা গিছে আর তোমার জায়গায় চাষের মহাজন নৌকায় টাকা খাটায়।'

বড়মাঝি বলে ওঠে, 'বাজান, বৈঠা বাঁধ্।'

ছোটমাঝি লগিটা নৌকোর পাশ ঘেঁষে রেখে তলা থেকে একটা বৈঠা বের করে ফাঁস গলিয়ে জলে নামায়। বেঁকল কোনদিক? ডাইনে না বাম? ডাইনে তো আড়িয়াল খাঁ।

ভোটে যোগেন জমিদারি উচ্ছেদ, মহাজনি উচ্ছেদ এসব নিয়ে কোনো কথা তোলেনি। তার প্রধান, বলা যায়, একমাত্র জোর ছিল—স্থানীয় সব সমস্যার ওপর। কোথাও খাল কাটতে হবে, কোথাও খাল ভরাতে হবে, কোথাও গুড-ওয়েদার ব্রিজ বানাতে হবে। যোগেনের আর-এক জোর ছিল—শিক্ষার ওপর। যোগেন একেবারে মেপেজুখে বলেছে—কত মাইলের মধ্যে স্কুল নাই, আর, থাকলেও খাল-বিল-নদীনালার জন্য সে স্কুলে ছাত্র-যাওয়ার পথ নাই। শিক্ষার অভাবেই মুসলমান ও শুদ্দুর হিন্দুরা সরকারি চাকরিতে ঢুকতে পারে না। যোগেন বলত—থানার দারোগা কজন হিন্দু আর কজন অহিন্দু, মানে মুসলমান আর নিম্ন হিন্দু। কাউরে তো এই বইল্যা গালি পাড়ন যায় না যে তুই ক্যান ম্যাট্রিক পাস দিলি। এ-কথাডা তো কইতে পারে এক-বেটার পাঁচ-ছয়খান বৌয়ের একডাই শাশুড়ি—আমার যখন ম্যাট্রিক পাস হয় নাই—বৌয়ের তাহালি ম্যাট্রিক পাসের হাউস উঠে ক্যান? শিক্ষাডারে সব থিক্যা বেশি মূল্য দিয়া শিখতে হবই। যোগেন যে ঋণখালাসি, মহাজনি, জমিদারি এ-সব নিয়ে তার কী কর্তব্য তা জানানি, তেমনি তাঁদের শ্রোতাদেরও খুব খেয়াল হয়নি। 'কংগ্রেসের বিরুদ্ধে' মানেই তো জমিদারির বিপক্ষে। এর আবার কহনের কী? কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লিগ এখানে কোনো প্রার্থী দেয়নি। তার মানেই তো—জমিদারি-মহাজনি রাইখতে চায়—কংগ্রেস আর লিগ, নিজ-নিজ জমিদারগ। এদিকে কৃষক-প্রজা পার্টিও তো কোনো প্রার্থী দেয়নি। তার মানে তো মণ্ডলই বাখরগঞ্জ উত্তর সাধারণ আসনে কৃষক-প্রজার প্রার্থী।

'আইন যদি হইয়া থাকে, তাহালি তোমার জামাইয়ের জায়গাতও হইবে, জামাইয়ের শ্বশুরের জায়গাতও হইব। কিন্তু একখানা সত্যি কথা কইবা বড়মাঝি?' যোগেন তার দলবলের দিকে তাকিয়ে কথাটা বলে, যেন তাদেরও কেউ জবাব দিতে পারে।

'আগে শুনি মেম্বার শাহেব। যা জিগাইবেন তা যদি সত্যি হয়, তাইলে আমার জবও সত্যি হবার পারে।'

প্রশ্নেরও সত্যিমিথ্যে থাকতে পারে—এমন একটা কথা বরিশালের জলরাশি পাড়ি দিতে-দিতে এই মাঘের রাত্রিতেও ঘেমে-নেয়ে-ওঠা এক মাঝবয়েসি মাঝির কাছে যোগেন শুনল। সে মাঝি পুরুষানুক্রমে চাষি। আয় বাড়াতে মহাজনের কাছে টাকা নিয়ে খেয়া চালাচ্ছে। তার মহাজন কত সুদ নিচ্ছে তা বড়মাঝি জানে না। প্রথম ছ-মাসেই মহাজন যে তার কাছ থেকে ঋণের টাকার দ্বিগুণ ও তার সঙ্গে সুদ উশুল করে নিয়েছে—এ-কথা হিশেবের অঙ্কে বোঝার ক্ষমতা বড়মাঝির যে দুই পুরুষেও হবে না, সে তো দেখাই যাচ্ছে—ছেলেও তো লগি ঠেলছে। এ লোকটি তবু রাজনীতি বুঝে নিতে চাইছে তার মত করে—নইলে কংগ্রেসকে ভোট দেয়া নিয়ে তার ছেলে তার পেছনে লাগত না, নইলে সে যোগেনের প্রশ্নের জবাবে এমন করে বলতে পারত না—প্রশ্নের সত্যমিথ্যার ওপর জবাবের সত্যমিথ্যা নির্ভর করে। বড়মাঝি

মণ্ডলকে তার সমগোত্রীয় ভাবে বলেই কথাটা বলতে পারল। এই বড়মাঝি জানে—মণ্ডল মেম্বার হতে পারে, সে তো সরকারের আইনকানুনের ব্যাপার। কিন্তু মণ্ডল কখনো শাসক হতে পারে না। মণ্ডল নমশূদ্র। বড়মাঝি নিজেকে যেমন শাসিত ভাবে, মণ্ডলকেও তাই ভাবে। মণ্ডলকে যদি মালিক ভাবতে পারত, তাহলে, বড়মাঝি নিজেকেও অন্তত আংশিক মালিক ভাবত।

যা জিগ্যাইবেন তা সত্যি তো?

ক্ষমতার ধারণা মণ্ডলের আলাদা কিছু তৈরি হয়নি। মণ্ডল ক্ষমতার যে-চিরন্তন ধারণার মধ্যে জন্মেছে, মণ্ডলের পাড়ায়-গ্রামে ধুলোবালি নিয়ে খেলার সময় যে-চিরন্তন ধারণা মণ্ডল

১৫

গায়ে-মাথায় মেখেছে, স্কুল-কলেজে পড়তে-পড়তে যে-চিরন্তন ধারণা মণ্ডলের জ্ঞান ও বিদ্যাচর্চার রাস্তা বাঁধাই করে রেখেছে—মণ্ডল কখনোই তার বাইরে যায়নি। বাইরে যাওয়ার তেমন কোনো ঝোঁকও তার ছিল না।

ক্ষমতার সেই ধারণা হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী জন্মান্তর, বর্ণভেদ, চতুর্বর্ণ, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ, শূদ্র-অশূদ্র, স্পৃশ্যতা-অস্পৃশ্যতা—এই উপাদানগুলি দিয়ে নিশ্ছিদ্র। ব্রাহ্মণ সহপাঠী তাকে অপমান করলে স্কুলে মণ্ডল তাকে পালটা আক্রমণ করেছে, বা কলেজে নমশূদ্র ছাত্ররা মণ্ডপে উঠে সরস্বতীকে অঞ্জলি দিতে পারবে না—এই ব্যবস্থার পালটা পুজো মণ্ডপ সংগঠিত করেছে, বা বরিশালের কালীবাড়িতে এক কথকঠাকুর নমশূদ্রদের সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করলে যোগেন বিক্ষোভ করেছে—এসব সত্ত্বেও যোগেন জ্ঞানবিশ্বাসের ক্ষেত্রে হিন্দু সংস্কারে আষ্টেপৃষ্ঠে আপাদমস্তক বাঁধা ছিল। অজ্ঞান ও অনভিজ্ঞ মানুষজন যেমন বাঁধা থাকে। সেই ধারণা অনুযায়ী ক্ষমতা বলতে বোঝায়—নমশূদ্র বলে যা-কিছু অপমান তাকে সইতে হয়েছে, তার এক ও একমাত্র প্রতিকার নিজেকে ভদ্রলোক করে তোলা। বামুন-কায়েত-বদ্যির ছেলে জন্মের আগেই ভদ্রলোক। নমো-র ছেলে মরার পরও নমো। সেটা বদলে দেয়ার কথা কখনো যোগেনের মাথায় আসেনি। তার মাথায় ভদ্রলোকদের সমতুল্যতা অর্জনই ছিল ক্ষমতা-অর্জনের একমাত্র অবলম্বন। সমতুল্যতা এতটাই অর্জন, যেন যোগেন প্রকাশ্যে নিজেকে চাঁড়াল বা নমো বলে ঠাট্টাও করতে পারে। মিড্‌লস্কুল পাস, আইএ—বিএ পাস, বিএল পাস, ওকালতি পেশা, ইংরেজি ও বাংলায় অনর্গল বক্তৃতা দেয়া, আইনের পড়াশুনো—বার লাইব্রেরিতে বসেই কারণ তার নিজের বই ছিল না, খুবই কম সময়ে বরিশাল কোর্টের মত খানদানি কোর্টে নাম করে ফেলা, দুটি-একটি কঠিন সিভিল মামলায় জিতে যাওয়া—বত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত তো তাকে নাক-ডোবানো জল ঠেলেই এগতে হয়েছে, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বার হওয়া পর্যন্ত। কাল ১৪ মাঘ তার জন্মদিন। আজ তাই বাড়ি যাচ্ছে।

ক্ষমতা মানে হিন্দু উচ্চবর্ণের, বিশেষত ব্রাহ্মণের, ক্ষমতা। তাই ক্ষমতাবান হওয়ার একটাই অর্থ—হিন্দু হওয়া, উচ্চবর্ণ হওয়া ও ব্রাহ্মণ হওয়া। নিজেদের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিষ্ঠাই তো নমশূদ্রদের মননচর্চার প্রধান বিষয়। সেই বিষয় নিয়েই প্রমাণপঞ্জি তৈরি করা হয়েছে। বল্লাল সেনের ব্রহ্মণ্যবাদ যে-ব্রাহ্মণরা মেনে নেননি, তারা নিজেদের পরিচয় দিয়েছিল—আমরা নমব্রাহ্মণ না, আমরা নমশূদ্র। তারপর তারা জলময় বাংলার জলে আত্মগোপন করলেন। ইতিহাসের এমন

ব্যাখ্যার আরো কত সংস্করণ হয়েছে। সমস্ত সংস্করণের উদ্দেশ্য একটা কথাই প্রমাণ করা—নমশূদ্ররা শূদ্র নয়। নমশূদ্ররা বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ—বল্লাল সেন কনৌজি ব্রাহ্মণদের পরামর্শে তাদের পতিত্ বলে শূদ্র করে দেন। নমশূদ্ররা চণ্ডাল নয়—কারণ চণ্ডালদের মত তারা গ্রামের বাইরে বাস করে না, চণ্ডালদের মত তারা ভাঙা মালসায় ভাত খায় না, খাওয়ার সময় জলপান চণ্ডালদের পক্ষে নিষিদ্ধ, নমশূদ্রদের পক্ষে নয়, নমশূদ্ররা চণ্ডালদের মত কেবল মরা মানুষের কাপড়চোপড়ই পরে না। কালো লোহার বালাও পরে না, নমশূদ্ররা অবৈদিক ব্রাহ্মণ, তাই নমশূদ্রদের উপবীত ধারণ—এই আত্মপরিচয় তো উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে এই ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত চলে এসেছে। হরিচাঁদ, গুরুচাঁদ, তারকচন্দ্র, গোপাল সাধু, হরিবর, মহানন্দ—এঁরা নমশূদ্রদের আধ্যাত্মিক আভিজাত্য রক্ষা করে এসেছেন, 'মতুয়া ধর্ম' প্রবর্তন করেছেন। আর, এঁদের দেখে ও এঁদের ক্ষমতা-সংজ্ঞার সীমার মধ্যে, কুমুদবিহারী মল্লিক, শশিভূষণ ঠাকুর, রাধামোহন মণ্ডল, ভগবতী ঠাকুর, প্রমথরঞ্জন ঠাকুর, মহানন্দ হালদার, মুকুন্দ মল্লিক ও আরো অনেকে উচ্চশিক্ষার শেষে বিদেশে গিয়ে ডিগ্রি এনে নিজেদের হিন্দুউচ্চবর্ণের সমতুল্য করে তোলেন। ক্ষমতার এই সংজ্ঞা ও এই প্রসারের বাইরে কোথাও মণ্ডল ক্ষমতার উৎস খোঁজেনি। জানেও না। ব্যক্তিগত উচ্চাশায় ও পরিশ্রমে ভদ্রলোক বাঙালির মান্যতা পাওয়ার চাইতে পৃথক কোনো ক্ষমতাবোধ মণ্ডলের ছিল না। আইন-অমান্য ও অসহযোগের সময় তার বয়স পনের-যোল ও পঁচিশ-ছাব্বিশ। সেসব কোনো আন্দোলনে সে দর্শক হিশেবেও ছিল না। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তার ভিতরে কখনোই এমন তীব্র হয়নি যে সে ইংরেজদের বিরোধিতা করবে। এই জ্ঞানতত্ত্বই তার ক্ষমতাতত্ত্বও বটে—একমাত্র ইংরেজই পারে তাকে ক্ষমতাবান করতে। বর্ণহিন্দুর সমতুল্যতা অর্জনের জন্যই সে এই ভোটে দাঁড়িয়েছিল, খুবই ছোট একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা মেটাতে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিজের সমর্থন জোগাড় করে ফেলে। মণ্ডলের ভরসাও ছিল এই হিশেবের ওপর যে দুই জমিদার ভোট কাটাকুটি করলে তিন নম্বর প্রার্থী গলে যেতে পারে। কিন্তু এক জমিদার তো বসে পড়লেন। তাতেই তো যোগেনের বাড়া ভাতে ছাই। ঐ ভোটে দাঁড়ানোর কথাটুকু তোলার পর যাঁরা যোগেনকে দাঁড়া করানোর জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল, তারা কিছুতেই যোগেনকে নাম প্রত্যাহার করতে দিলেন না। যোগেন শেষ পর্যন্তও রাজি হয়নি। বড়জোর নাম প্রত্যাহার থেকে বিরত থেকেছে। এত নিকটজন ও বন্ধুদের যেন তাতে অসম্মান করা হত।

যাঁরা যোগেনকে ভোটে দাঁড়াতে বাধ্য করলেন, তাঁদের আবার সেইসব ভাষা বা যুক্তি জানা ছিল না, যেসব যুক্তি ও ভাষায় বোঝানো যায়—এই ভোট যারা দেবে তাদের ভিতর এই নতুন অধিকার ব্যবহার করে একটা বদল-ঘটানোর ইচ্ছে কেমন শক্ত হয়ে উঠেছে। তারা, সেই যাঁরা যোগেনের সবচেয়ে প্রধান নেতা ও কর্মী হয়ে উঠলেন, তারাও জানতেন না, মানুষজন এমনকী পুরনো ধরনের রাজনীতিটাই বদলে দিতে চাইছেন। বেশিরভাগই তারা ইংরেজবিরোধী নন। কিন্তু তাঁদের বেশিরভাগই বিদ্রোহ করতে চাইছিল—পাটের দর ধানের দর পড়ে যাওয়ায়, মহাজনরা এক পয়সা দাদন না-দেয়ায়, প্রতিটি জিনিশের দর বেড়ে ওঠায় আর খাজনার জন্য জমিদারদের-তালুকদারদের নিষ্ঠুরতা। মানুষ তো তার রোজকার বেঁচে থাকা দিয়েই বেঁচে-থাকা বদলাবার শেষ জোরটা পায়।

মণ্ডল নিজের ভিতরে-ভিতরে টের পায়—নিজেকে ভদ্রলোক করার জন্য জীবনের প্রথম বত্রিশটা বছর যেমন দমবন্ধ করে বেঁচেছে, অভদ্রলোক হওয়ার জন্য তাকে সেইরকম রুদ্ধশ্বাস বাঁচা বাঁচতে হবে। আগের বাঁচার একটা মডেল ছিল—মণ্ডলের কাজ ছিল হোঁচট না খেয়ে,

দম শেষ না করে সেই মডেল পর্যন্ত দৌড়নো। এর পরে যে আসল দৌড়টা বাকি আছে, তাও তো মণ্ডল জানত না। সে-দৌড়ের কোনো মডেল নেই। মণ্ডল ক্ষমতা চায়। তার আগে তাকে নিজের কাছে স্পষ্ট হতে হবে—ক্ষমতা বলতে সে কী বোঝে। তার সঙ্গেই তাকে এই জল, এই জঙ্গল, এই নৌকো, এই রাত্রি, এই মাঝিদের যেমন প্রত্যক্ষ করছে, ঠিক তেমন করেই তাকে প্রত্যক্ষ করতে হবে—কাদের সে ক্ষমতাশালী করতে চায়।

বড়মাঝি জিজ্ঞাসা করে, 'কত্তা, বাঁ দিকের এই খাল দিয়্যা ঢুইকব?'

'নাও চালাও তুমি আর ঢোকার রাস্তা জিগাও আমাগ?'

'ছোট খালের রাস্তা তো, গুণ টাইনব্যার লাইগব। তাই জিগ্যাই। টাইম লাইগব। কিন্তু রাস্তাও তো আড়াই পোয়া কম। তাহালি কাটাকুটি কইর‍্যা দুই পোয়া রাস্তা তো বাঁইচবই।'

'এতই যদি পাকা হিশাব, তাহালি আবার এত কথা কেন? পছন্দ হয় এই খালটায় বড় বেশি যাতায়াত নাই?'

'থাইকলে কি আর জিগ্যাই?'

'ক্যান নাই। রাস্তাখান অর্ধেক হইয়া যাইব—তবু যাতায়াত নাই ক্যান?'

'ছোট খাল তো! কে জানে কুথায় কোন্ বড়গাছ আড়ে পাইড়্যা পথ আটকাইয়া থুইছে!'

'সেই বড়গাছের ফাঁকফোকর দ্যাখবার পাও?'

'রাইতের বেলা তো! ডাকাইতিও হইবার পারে।'

'বাঃ বাঃ এই না অইলে কী আর মহাজন তোমারে নৌকা দ্যায়? প্রথমে কইল্যা, বড় গাছ আড় মাইর‍্যা পইড়্যা থাইকবার পারে, তার পরে কইল্যা ডাকাইতিও হওয়ার পারে। এমন একখান বাদশাহি সড়ক বানাইয়্যা নৌকায় প্যাসিঞ্জার তুইলছ?'

'সেই বাদেই তো জিগ্যাইল্যাম। আপনারা কইলে যাব। আপনারা না কইলে যাইব না।'

'তুমার ডাকাইতের ডরও নাই, পথ আটকের ডরও নাই।'

'আমার ক্যান ডর থাইকব? পথ আটকা দেইখলে নাওয়ের মাথা ঘুর‍্যাইয়া আবার এইহানে আইসব।'

'ও। পথ দুই পোয়া কমাইতে গিয়্যা সাড়ে তিন পোয়া বাড়াইয়্যা দিব্যার চাও?'

'সে তো কত্তা, রাস্তা কমাব্যার চাইলে টাইম বাইড়্যা যাবারই পারে।'

'বাঃ বাঃ। তোমার লগে আইস্যা বড় খুশি হইল্যাম মাঝি। নাও তো কতই থাহে। কিন্তু এমন পীরের বাণী আর কুথায় পাব? আর ডাকাইতি? ডাকাইতিরেও ডরাও না।'

'ডাকাইতদের ডরনের কী আছে? ওরা তো আর মাঝিগুল্যাক মাইরবার জইন্য ডাকাইতি করে না। মাঝিরে মাইর‍্যা আর পাবেডা কী? ওরা তো প্যাসিঞ্জাররে লুট কাইরব্যার চায়। মাঝিরে মাইর‍্যা দিলে আর পরের খ্যাপ পাবে ক্যামনে?'

'বাঃ বাঃ। এমন শাদা কথা কদ্দিন শুনি নাই! মাঝি, তুমি নি মাদ্রাসায় গিছ?'

'বরিশালের পানি-ডাকাইতরা খালের পথে গাছ ফেইল্যা ডাকাইতি করে এই শাদা কথাখানে রহস্যডা কী যে মৌলবিশাহেবরে জিগাইতে হইব?'

'বাঃ বাঃ বাঃ। গোরে যাওয়ার এমন একখান দুই পোয়া পথ বান্যাইয়া রাইখছ! না গিয়া পারি?'

কথাবার্তা হচ্ছিল মাঝি আর যোগেনের সঙ্গীদের মধ্যে। এতক্ষণ চুপ করে থেকে যোগেন বলে, 'ছোটখাল দিয়্যাই চলেন। ডাকাইতরা তো সব নাওয়েই আছে।'

আরও খানিকটা বেয়ে বাঁয়ে ছোটখালে নৌকো ঢোকে। মাঝি তার ছেলেকে বলে, 'বা-জান,

তিন নম্বর বাঁকে পাড়ে নামিস। গোল্লা নিছস?'

যতক্ষণ খোলা নদী ছিল, ততক্ষণ আবছা একটা আলো ছিল। খোলা নদীর ওপর কখনো পুরো অন্ধকার হয় না। তারার আলো জলে প্রতিফলিত হয়ে আকাশের দিকে যায়। কুয়াশার মত একটা আলো ছড়িয়ে থাকে। খালে ঢুকতে-না-ঢুকতেই মনে হয় যেন গুহাপথের অন্ধকার কেটে যাওয়া হচ্ছে। বৈঠার আওয়াজ নেই। লগি ঠেলা হচ্ছে। কোথায় জল, কোথায় জঙ্গল, কোথায় বাঁক—কিছুই বোঝা যায় না। সবটাই অন্ধকারে লেপাপোঁছা।

কখন যে সেই তিন নম্বর বাঁক এসেছে আর ছোটমাঝি গুণের গোল্লা নিয়ে পাড়ে নেমে গেছে কেউ টেরই পায় না। বুঝতে পারে যখন বড়মাঝি গলার স্বর খুব একটা না তুলেও বলে, 'এড্ডু জল ধইর‍্যা টান্ বাজান।'

গুণ টেনে নৌকো নিয়ে চলেছে ছোটমাঝি জঙ্গল ভেঙে। এতটা অন্ধকারে নৌকোর ভিতর বসেই এ ওকে দেখতে পাচ্ছে না, শুধু শাদা কাপড়ের আভাস পাচ্ছে আর ছোটমাঝি কী করে তার নিজের পায়ের তলায় কী আছে, তা দেখতে পাবে। তাই হয়ত বেশি বাঁয়ে সরে গেছে আর নৌকোটা পাড়ে ঠেকে যাচ্ছে একটু-আধটু। ছোট খাল বলেই খালের মাঝখান দিয়ে বাইতে হয়। গুণটানার কথা তো বড়মাঝি বলেছিল—তাহলে যোগেনরা রাজি হল কেন? তাড়াতাড়ি মৈস্তারকান্দি পৌঁছুতে পারবে বলে? কী হত দেরি হলে? নাকী বড়মাঝির ডাকাতিটাকাতির গল্পে একটু ভুলেই গিয়েছিল তারা যে ছোটমাঝিকে কতটা অন্ধকারে কতটা অজানা জঙ্গল পেরতে হবে এই নৌকোটাকে গুণ টেনে নিয়ে যেতে।

ভুলে যাওয়ার কৈফিয়ত দেয়া যায় কিন্তু কৈফিয়ত চাইছে কে? বড়মাঝি বা ছোটমাঝির মাথায়ও আসেনি যে এটা কোনো একটা বিশেষ রকমের কাজ। গুণ টানতে হলে সেখানে কী করে বৈঠা বাইবে? একটা অনিশ্চিত গভীরতার খাল রাতে পেরতে হলে গুণ টানতেই হবে, দিনে না-হয় দেখে শুনে বুঝে কোথাও গুণ কোথাও লগি করে এগনো যায়। কোন্টাতে খাটনি বেশি সে-মাপের কোনো বোধই তো বড়মাঝি-ছোটমাঝির তৈরিই হয়নি। যে-কাজে যে-খাটনি সেটা তো লাগবেই। না হলে কাজটাই তো শেষ হবে না। পায়ে হেঁটে জঙ্গল ভেদ করে যাওয়ার ভিতরে বিশেষ কোনো বিপদের ধারণাও কি মাঝিদের আছে? বড়জোর তারা বুঝে নেয়, এই কাজটি করা যাবে না। পরিবারের খাওয়া-দাওয়া আর কামাইয়ের হিশেবে যোগেনের আর এই মাঝিদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তবু তো যোগেন পাঞ্জাবি-ধুতি পরে, ভদ্রলোকদের মত ওকালতি করে। তার সঙ্গীদের তো মাঝিদের থেকে কোনো বিচ্ছেদই ঘটেনি। তাই তাদেরও মনে আসে না—এই অন্ধকারে গুণ টেনে নৌকো নিয়ে যাওয়ার মধ্যে বিশেষ কী আছে? যোগেন পড়াশুনো করে, নানা কষ্টে দিন কাটিয়ে, চাঁদসি থেকে প্রুফ-দেখা যা পায় তাতেই পয়সা কামিয়ে ভদ্রলোক হতে পেরেছে। সেই হতে-পারায় শারীরিক কষ্টও কম না। কিন্তু সেই কষ্ট দিয়েও শ্রমের ও কর্মের এই অনিবার্যতা ঠাহর করাই যেত না। যোগেনের বাল্যে কৈশোরে এমন শ্রম তাকেও করতে হয়েছে, যে-শ্রম থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় ছিল না। তার বাপ-খুড়ো-দাদাদের, তার মা-খুড়িদের এমন শ্রম করতে হয় রোজ—একটুখানি জমিতে চাষ ফলাতে, বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ছুতোরগিরি করতে। সেই শ্রম থেকে যোগেন বিযুক্ত বলেই সে বাইরে থেকে মাঝিদের শ্রমের ভিতর ঢুকতে পারে। এরপর এই শ্রমের মজুরি নিঃশেষে মহাজনকে কিস্তি দিতে হবে। কোনো হিশেবনিকেশ নেই। মহাজন যদি নিজে কোনো হিশেব দেয়, সেটা ঠিক কী বেঠিক তা বুঝবে কী করে মাঝিরা। নিষ্কাম ধর্ম অর্জুনের মাথায় ঢোকাতে কৃষ্ণকে পুরো একটা 'গীতা' বলতে হল। অর্জুনের মত বীর ও রাজপুত্রকে বীরত্বের

ও রাজত্বের যুক্তি ছাড়া যুদ্ধে নামানো যাবে কী করে। কৃষ্ণ ক্ষমতাকেন্দ্র সম্পর্কে অর্জুনের ধারণাটুকুকে মাত্র সরিয়ে দিলেন। অর্জুন ভেবেছিল, ক্ষমতার কেন্দ্র তিনিই, তাই ইচ্ছে করলে যুদ্ধ করতেও পারেন, নাও পারেন। ক্ষমতা যাঁর তিনিই তো প্রয়োগকর্তা। কৃষ্ণ অর্জুনকে তত্ত্ব বোঝালেন—অকাম কর্মের তত্ত্ব। তুমি ক্ষমতার আধার কিন্তু প্রয়োগকর্তা তো আমি, 'আত্মন্যেবাত্মনা'। কৃষ্ণের এই 'আমি'র প্যাঁচ যে কী প্যাঁচ! মণ্ডলের সম্পূর্ণ 'গীতা' মুখস্থ—এক পুরুতের সঙ্গে ঝগড়ার ফল, ল-কলেজে। পুরোহিত বলেছিল, সরস্বতী পূজার গীতাপাঠ সে করবে না, কারণ, ছাত্রদের মধ্যে অনেক শূদ্র ও যবন ছাত্র আছে, 'গীতা'-শোনার অধিকার যাদের নেই। যোগেন দু-দিন পুরো 'গীতা' মুখস্থ করে মণ্ডপের বাইরে বসে তার গুরুগম্ভীর স্বরে 'গীতা' বলতে লাগল। একটা ছোট কাগজে লাল কালিতে মোটা করে, 'গীতা ফর আনটাচেব্‌ল হিন্দুস অ্যান্ড মুসলিমস অনলি।' তার মুখস্থের বাহাদুরি দেখতে তাকে ঘিরে ভিড় জমে গিয়েছিল।

কৃষ্ণ অত তত্ত্ব না বলে অর্জুনকে এই অন্ধকারে এই জঙ্গলে গুণ টানতে পাঠালেই অর্জুন বুঝে যেতেন, তলোয়ার দিয়ে কী কাটা যায় না, আগুনে কী পোড়ানো যায় না, বাতাসে কী শোষা যায় না। শ্রম। ছোটমাঝির শ্রম।

যোগেন শুনতে পায়—জলে হুমড়ি খাওয়ার আওয়াজ। ছোটমাঝি কোনো জলের গর্তে পড়ে গেছে? নৌকো চলছে। যোগেন শুনতে পায়—খানিকটা মাটি ভেঙে জলে পড়ল। ছোটমাঝি কি সামলে নিয়েছে? যোগেন কিছু শুকনো ডাল ভাঙার আওয়াজ পায়। ছোটমাঝি কি শীতের শুকনো জঙ্গলে আটকে গেছে? নৌকো চলছে। যোগেন একটা হাসি শুনতে পায় কিশোর কণ্ঠে। ছোটমাঝি কি নিজের কোনো চমককে উড়িয়ে দিচ্ছে? নৌকো চলছে। যেন নিজের বেগে। কে দেখছে সেই কিশোর মুসলমানকে যে এই অন্ধকারের মজা খালে স্রোতের টান বইয়ে দিচ্ছে?

বড়মাঝি বলে ওঠে, 'কী জিগ্যাইবেন কইছিল য্যান মেম্বারমশায়? সইত্য কইতে লাগব। জিগ্যাইলেন না তো?'

'তোমার জিগ্যানোর জব তো অ্যাহনো খুঁইজ্যা পাই নাই। যা জিগ্যাব সেইডা সত্যি না মিথ্যা?'

'আমি কি আপনারে বেদ্‌না দিলাম, মণ্ডলমশায়?'

'কী যে কও। বেদ্‌না ছাড়া কিছু জানা যায়?' তারপর সেই অদৃশ্য অন্ধকারেই বলে উঠল, 'বেদাম্যহম্‌ তং পুরুষং মহান্তম'। মিয়াশাহেব বলে ওঠে, 'আরে, মণ্ডলমশায় তো দেহি বামুন ঠাউরের নাগাল মন্তর পাইড়ব্যার পারেন?'

যোগেন তার বুকখোলা হাসিতে অন্ধকার ভরে দেয়, 'এমনই বামুন যার মন্ত্র বুইঝতে পারে এক মোছ্‌লারা।'

একেবারে ছেলেবেলা থেকে যাত্রাগান ও পালাগান গাওয়ার ফলে যোগেনের ভিতরে-ভিতরে দৃশ্যভাগ-অঙ্কভাগের একটা ঝোঁক আছে। যোগেন যেন তেমন একটা ভাগাভাগির মধ্যে ঢুকছিল। কাল তার জন্মদিন। ছোটমাঝি এই অন্ধকারে তাকে জন্মদিনে পৌঁছে দিচ্ছে। সেই নতুন জন্মদিন থেকে যোগেন নতুন যাত্রায় বেরবে—ক্ষমতার ধারণা তৈরি করতে, ক্ষমতার প্রয়োগপদ্ধতি বুঝে নিতে। এই হাসিতে সে নিজেকে সেই গোপন নাটকীয়তা থেকে ছাড়িয়ে নিল।

মৈস্তারকান্দির খালের ঘাটে নৌকো ভেড়াতেই মিয়াশাহেব বলে ওঠে, 'আমরা আর নাইমল্যাম না মণ্ডলমশায়। ফিইরতে হবে নে এতডা জল?'

যোগেন একেবারে রে-রে করে ওঠে, 'আরে মিয়াশাহেব। আমারে কি আপনারা

আউল-বাউল ঠ্যাহরাইলেন নাকী—ঘরবাড়ি নাই, বাপ-মা নাই, কুটুমকাটাম নাই! আপনারা আমার বাড়ি না গেলে তো বাপের, দুই খুড়ার, দুই খুড়ির, দুই দাদার, দুই বৌদিদির চ্যালাকাঠের মারন আমারে একা খাইতে হব। বাড়িতে আইস্যা ভাইঙ্গ্যা তুমি মেম্বার হইছ হারামজাদা! চলেন, চলেন।' দুই মাঝি ও সঙ্গীদের নিয়ে মণ্ডল বাড়ির পথ ধরল।

মিলনশয্যায় যোগেনের জাগরণ ও কিছু পুরনো কথা

১৬

পরের দিন সকালে, শুক্রবারে, যোগেনের ঘুম ভাঙে একটা কাঠচেরার আওয়াজে। একটু চমকেই চোখ খোলে। চমকে তাকে মনে করতে হয়—মৈস্তারকান্দির বাড়িতে ঘুম থেকে উঠেছে। কাইল রাত্তিরে না বৌ শুইছিল পাশে, কথাও য্যান দুই—একখান হইছিল, হ্যায় গেল কই। তার বৌ যেখানে শুয়েছিল বলে তার আন্দাজ হচ্ছে—সেখানে তাকিয়ে দেখে, কোনো চিহ্নও নেই। চিহ্ন না দিলে আর চিহ্ন আইব কোথ্থন? রাত্তিরে লম্ফর আলো তো যোগেনই ফুঁ পাইড়া নিবাইল। না? যা ধোঁয়া বারাচ্ছিল! মাচায় উইঠ্যা আন্দাজ হইল মাচায় আরো য্যান কেডা। সে তো কেউ-না-কেউ শুব্যারই পারে। তবু, য্যান ক্যান যোগেন জিগ্যায়া ফেইল, কেডা? ক্যান জিগাইল? জায়গা একখান পাইছে, কাইত হইয়্যা চক্ষু মুইদবে আর বিহানে চক্ষু খুইলবে। আর মইধ্যে 'কেডা' জিগ্যাইবার আছেডা কী? একডা কিছু কি নিশানা ছিল? লম্ফর ধোঁয়ার গন্ধে য্যান এডড্যা বাস মিশ্যাইয়া ছিল না? হয়। পরে তো সেই বাসখান চিনাও গেল—নতুন কাপড়ের বাস। ঐ নিশানাতেই কি কয়্যা উঠছিলাম—কেডা। হা রে যোগেন মণ্ডল, নিজের বৌয়ের নিশানা চিনো না, অ্যাহন ঘুম থিক্যা উইঠ্যা নিশানা খুঁজো?

যোগেন উঠেও মাচার ওপর বসেই ছিল—যেন ঘুম শেষ হয়নি। কাল রাত্রিতে বৌয়ের সঙ্গে শোয়ার স্মৃতিতে যোগেনের ঠোঁটে সামান্য হাসি আসে। যোগেনের মনে-মনে কোনো প্রত্যাশা ছিল না? অব্ভ্যাস নাই তো বৌয়ের সঙ্গে শোয়ার। আইজও শুবে তো? আরে, মুখডাই তো মনে থাকে না। তবু তো এগার বছরের পুরানা বৌ।

বাইরে ছোটখুড়ার গলা ওঠে, 'যে মানুষগুলা ওডারে ভোট দিছে, তা গ আইন্যা দেহাও, তাগ মেম্বার এই চনচনা বেলাতও চৌকিদারের নাগাল ঘুমায়, য্যান সারা রাত্তির পাহারা দিছে। দেইখলে তো তারা ভোট ফির‍্যাইয়া নিয়া যাব।'

ছোটখুড়ো যতক্ষণ কথা বলে, করাতের আওয়াজ পাওয়া যায় না। ছোটখুড়োই তাহলে করাত চালাচ্ছে?

'হ্যার ঘুম হ্যায় ঘুমায়, তোমার তাতে কী। ঘুমাইয়্যা ঘুমাইয়্যাই বামুন-কায়েতগ চিৎ কইর‍্যা এই ভোটখান তো জিত্যা আইল? ছাওয়ালপাওয়ালের আরাম তোমার দুই চক্ষুর বিষ'—যোগামা-কে থামায় কে? না। তাহলে ছাওয়ালপাওয়ালের আর ঘুমানো ঠিক না। ঘরের ঝাঁপটা টানা ছিল—যোগেন বাঁয়ে ঠেললে ঝাঁপ নড়ল না। তাহলে কি সে ভুলে গেছে, কোন্দিকে ঠেলে খোলে। যোগেন ডানদিকে ঠেললে ঝাঁপ নড়ল না। যোগেন নজর করে খোঁজে, ভিতর থেকে কোনো বাঁধন আছে কী না। নেই। কিন্তু ভিতরে বাঁধন দেবে কে? ভিতরে তো সে একা। তাহলে বৌ বেরল কোথা দিয়ে? বৌ তাহলে বেরিয়ে গিয়ে বাইরের বাঁধন লাগিয়ে

দিয়েছে? যোগামা বা খুড়িমা কেউ লাগিয়ে দিতে বলেছে—যাতে যোগেন ভাল করে ঘুমুতে পারে? বৌ নিজেও তো পারে—লাগিয়ে যেতে। পারে না? যোগেন হঠাৎ ভাবতে বসে—তার বৌ কমলার বয়স এখন কত হতে পারে? সে আর কী করে জানা যাবে? বছর বার আগে বিএ পড়ার খরচা জোগাতে যে-মেয়েটিকে বিয়ে করেছিল, তাকে তো তখন ভাল করে দেখতেই পায়নি, সে তো তখন ঘুমে কাদা—সাত-দশ যে-কোনো বয়সই মেয়ের হতে পারে।

যোগামা-র কথায় ছোটখুড়া চাপা গলায় বলে উঠেছে—'এর মইধ্যে বামুন-কায়েতের কথা উঠে কোথ্থিক্যা? কে কী শুইন্যা কী রটাইব, ছাওয়ালডার বিপদ হওয়া পারে। আরে, হাজারবার-না কইল্যাম—অ নমশূদ্র সিটে খাড়ায় নাই, বামুন-কায়েতের সিটে খাড়াইছে—'

'যোগা কি বামুন হইছে?'

'আরে, এড্ডা কথা মাথায় ঢুকে না?'

'ঢুকাইব্যার পার না, তাই কও। মাথা তো খুলাই আছে। সব কথা ঢুকে আর তোমার এই কথাখানই ঢুকে না? আমি যোগাইরে জিগ্যাব।'

'তাই জিগ্যায়ো। তুমি তো হাকিম। উকিল-ব্যারিস্টারের কথা ছাড়া তোমার মাথায় ঢুকে না। যা জিগ্যাইব্যার যোগারে জিগাইও। মাথা খুল্যা রাখো, জিভখান্ খুইলো না।'

যোগেন আন্দাজ করে ফেলে, তাহলে তো কমলার বয়স এখন উনিশ-কুড়ি কিছুও হতে পারে। তাহলে কমলাই তো ঝাঁপটা বন্ধ করে থাকতে পারে। এতে যোগেনের বেশ ভাল লাগে। তাহলে কমলাই তো খুলে আসবে—এটা কি তেমন নিশানা।

যোগেন কি 'টকি' ভাবতে শুরু করেছে? শুধু শরীরের বয়সে কি ঐ নিশানা জানা যায়? যোগেন বেশ জোরে বলে ওঠে, 'যোগামা, আমারে কি ঘরে আটকাইয়্যাই থুবা? ঝাঁপ খুলো।'

'এই, যোগার ঝাঁপ লাগাইছে কেডা? খুইল্যা দ্যাও।'

যোগেন বেরতেই তার যোগামা জিজ্ঞাসা করে, 'যোগা, তোর তো চা লাইগবে, বাবা? এই-যে তোর বড়খুড়্যা আইন্যা থুইছে। বানাবে নে কেডা।'

'খাড়াও, আগে খালপাড় থিক্যা আসি'—যোগেন খালপাড়ের দিকে চলে যায়।

যোগামা, মানে, যোগেনের বড় খুড়িমা। যোগেনের মা শুধু তাকে পেটে ধরেছিল, ঐ জন্মদান আর স্তন্যদানটুকু বাদ দিলে যোগেনের সবকিছুই করেছে যোগামা আর বড়খুড়া। তাঁদের নিজেদের সন্তান হয়নি। তখনকার দিনে সন্তানের জন্য দ্বিতীয় বিয়ে ছিল খুবই স্বাভাবিক। বিশেষ করে বামুন-কায়েতদের মধ্যে। আগের বৌয়ের পেটে যদি ছেলে না হয়ে থাকে, শুধুই ডজনখানেক মেয়ে হয়ে থাকে, তাহলেও আর দুটো-একটা বিয়ে করা বামুন-কায়েতদের মধ্যে চালু ছিল। নমশূদ্রদের মধ্যে এমন রীত্-কানুন ছিল না। সে অল্প বয়সে কারো বৌ মরে গেল, তাকে বাড়ির লোকজন আর-একটা বিয়ে দিল—এটা অন্য কথা। কিন্তু শখ হল আর ছেলে বা ছেলের ছুতোয় বিয়ে করে আনলাম—আর-একটা—এ চলে এক বামুন-কায়েতদের মধ্যে আর আমির-মুসলমানদের মধ্যে। ওদের তো বিয়ে করলেই লাভ—নতুন করে পণের টাকা, বৌয়ের সোনাদানা, জোত-যৌতুক। আরো একদিকে লাভ—পুরনো বৌ কাজকামের লোক হয়ে যায়। জমিদার-তালুকদার বামুন-কায়েতের আর আমির-মুসলমান বাড়ির কাজের শেষ নেই। বৌ যদি পেটভাতায় কাজ করে দেয়—তাহলে কত পয়সা আয় হয়? নমশূদ্রদের তেমন করলে চলে না। নতুন বিয়ে মানেই তো নতুন একটা পেট। নতুন বিয়ে মানেই তো মেয়েবাড়িকে পণ আর মেয়েকে একটু-আধটু কিছু দিতে হবে। কটা নমশূদ্র বাড়িতে সারা বছর সমান খাওয়াদাওয়া পাওয়া যায়? এক কাজ ছেড়ে দশ কাজ করলেও পেট ভরে না। তার ওপর

দু-দুটো বৌ নিয়ে সংসার বড় করে ফেলা?

যোগার বছর দেড়েক আগে জন্মায় সদা। জন্ম থেকেই সদাটা রোগা তো ছিলই, অপুষ্টিতেও ভুগছিল। হয়ত সেসব কারণেই রামকৃষ্ণ আর তার স্ত্রী, সদাকে একটু ভাল করে রাখা, একটু খাওয়ানোদাওয়ানো আর সদাকে কাছে নিয়ে শোয়া—এই সবে জড়িয়ে পড়ে। বড়বৌয়ের তো পিঠেপিঠে তখন তিন ছেলে আর দুই মেয়ে। বড় নন্দ, তারপর ক্ষীরা, ক্ষীরার পরে প্রেমানন্দ, প্রেমার পর শারা—শারদা, তারপর সদানন্দ। বড়বৌ একা কী করে সামলায়। তারপর হল যোগা। শোয়ার জায়গাই হয় না—সদা আর যোগা যদি মেজবৌয়ের কাছে না শোয়। মেজভাই কেষ্টা—রামকৃষ্ণ, আর মেজবৌ সন্তানের জন্য একেবারে বুক থাবড়ানো তো শুরু করেনি। ভগবান দিলে পেট থেকে পড়ে। আবার, ভগবান তো অন্যের পেটের সন্তানকে বুকে জায়গা দেয়ার জন্যও তো অনেক মেয়ের পেট খালি রাখেন। মা বলতেই তো মা-যশোদা। কানু কি তার পেটের ছেলে?

সদাটাকে বাঁচানো গেল না। তখন মেজবৌয়ের বুকে যোগা, আর বুকের ভিতরে ভয়। তার নিজের মায়ের চাইতেও কি সে বেশি আগলাতে চেয়েছিল সদাকে? সেই দোষেই কি সদা চলে গেল? ভগবান যাকে সন্তান দেননি, সে নিজে-নিজে সন্তান জোগাড় করলে ভগবান তাতে রাগ করেছেন? সেই ভয়ে ধুকপুক করে মেজবৌয়ের বুক অথচ যোগাকেও বুক থেকে নামাতে পারে না। নামানো যায় নাকী। বুক থেকে না-নামিয়েও মেজবৌ মন থেকে নামানোর চেষ্টা করেছে। যেন, আছে বলেই আছে। যেন, মেজবৌয়ের কোনো টান নেই। যেন, বাড়ির সব ছেলেমেয়ে যেমন, যোগাও মেজবৌয়ের কাছে তেমনি। বাড়ির কোনো মানুষ যদি এই কথাটার একটু আভাসও দিত তাহলেও মেজবৌ যেন শান্তি পেত। বাড়ির কেউ তো দূরের কথা, নমশূদ্রপাড়ার গায়ে-গা লাগা ঘরবাড়িতে এত মেয়ে এত পুরুষের কোনো একজনও তো ইশারাতেও এমন কোনো কথা জানায়নি। শেষে মেজবৌ আর না-পেরে একদিন যোগার খুড়োর কাছেই কথাটা তোলে বটে কিন্তু আবার পুরোটা বলতেও পারে না। মেজবৌ এইটুকুই বলেছে—'যার ছাওয়াল, তার কাছেই ভাল থাকব—', তাতেই রামকৃষ্ণ বেশ রেগেই বলে, 'ক্যা? তোমার গতর বাইড়্যা গিছে, নাকী, বৌদিদির নতুন প্রাসাদ হইছে?' মেজবৌ এরপরও বলতে পারে, কারণ, এই সম্ভাব্য কথাবার্তা অনেকবারই তার মনে-মনে বলা—'কী য্যান? সদাডারে তো তো রাইখতে পারল্যাম না? কী য্যান? আমার কোলের দোষ আছে কী নাই।' রামকৃষ্ণ গলা একমাত্রা চড়িয়ে বলে, 'বাড়ির কাজকর্ম কি কম পইড়ছে? খাটনিতে যার গতর ভেজে না, তার এই নাগাল দুষ্ট চিন্তায় মাথা ভিজে। অসুখ হইছিল সদার। তার সঙ্গে যোগার কী?'

রামকৃষ্ণের এই উঁচু গলায় মেজবৌয়ের মনটা ঠান্ডা হয়েছিল। তবু সে কোনো একটা রীতিকানুন মেনে যোগেনকে মানুষ-করার মত দৈনিক কাজটাতে লেপটে যেতে চাইছিল। এমন কিছু নয়—বড়জোর একটা হরির লুট বা একটু নামগান। সে তো যে-কোনোদিনই হতে পারে। হরির লুট কেন—এ-কথা তুলতে নেই, এ-কথার জবাবও নেই। কে আর মেজবৌকে নিষেধ করেছে—এক পাতা-মোড়া বাতাসা কিনে এনে সন্ধেবেলায় পাড়ার বাচ্চাকাচ্চাদের ডেকে নাম গেয়ে লুট দিতে। দিলেই হয়—একদিন। কিন্তু তাতেও যে এ-কথাটা লুকনো থাকবে—যোগাকে নিজের করে নিতেই বা যোগার ওপর কারো নজর ঠেকাতেই মেজবৌ লুট দিচ্ছে, নাম গাইছে? সেই গোপনতাটুকু, এমনকী যোগার মা-বাবার কাছ থেকেও গোপনতা রক্ষাতে একটু পাপের ছোঁয়া লাগে না? যার ছেলে সে জানলও না, অথচ তারই নামে তুমি সন্ধেবেলা তুলসীগাছের

তলায় প্রদীপ সাজিয়ে লুট দিলে? লুট তো কারো নামে হয় না, লুট হয় ভগবানের নামে আর তার মানসিকের কথা যদি পিঁপড়ে বা পাখিও জানতে পারে, তাহলে সে মানসিক কখনো পূরণ হবে?

শেষে অবিশ্যি ভগবানই পথ করে দিলেন।

এটা তো পুরোপুরি মৈস্তারকান্দি গ্রাম নয়। বরং সত্যি কথা হল—এটাকে কেউ মৈস্তারকান্দি বলে না। মৈস্তারকান্দিতে জোলার ওপারে-এপারে বাবু-হিন্দুদের আর বাবু শেখদেরবাড়ি—লাইন দিয়ে। ওদিক, মানে সিংহাসনের দিক থেকে এলে প্রথম, বাঁয়ে, জমিদার সন্তোষ রায়ের পাকা দোতলা। ছাড়িয়ে এলে ডানহাতে, বোধহয় ওঁরা ভটচাযই। সেই বাড়ি ছাড়িয়ে এলে ডানদিকে বাগানবাড়ি—সামনে অনেকটা জায়গা জুড়ে ফুলের বাগান। তার শেষে পুবের ভিটেয় বারবাড়ি। তার পরের বাড়িটাই তো ন্যাংটা বামুনের—দিনরাত ন্যাংটা হয়ে ঘুরে বেড়ায়, মুখ দিয়ে সব সময় লালা ঝরে। তারপরে পুরুতবাড়ি—তার পেছনে হেডমাস্টারের নতুন বড় বাড়ি উঠছে—নদীভাঙা মানুষ। ব্যস, মৈস্তারকান্দি শেষ। কিন্তু রাস্তা তো আর শেষ না। নিচু, খোবড়ানো, ছোট দাওয়া, কোথাও আবার দাওয়া নেই—সিধা ঘরের ঝাঁপ, বাইরে আখা, খোলা, দুয়ার, একটা ঘরই বেশি, তবে দুটো চালা যে একেবারেই নেই, তা নয়—এটাও মৈস্তারকান্দি, যখন নাম বলার দরকার হয়। দরকার না-হলে বাড়ির মালিকের নামেই কাজ চলে যায়, যেন সেটাই একটা গ্রাম, সেটাই গোটা একটা গ্রাম—দাড়িজোলা, গাধূলির মা, কলার ঝাড়, ছুতারের কাঠি, জলিল মাস্টার, লালচাঁদের কাঠি, নুদির ভিটা, লাটিক ঠাঁই—এই করতে-করতে হায়াতুন্নেছার তালুক। একই নাম যে সবাই বলে, তা তো নয়। একটা মাত্র বাড়ি চেনাতে এক-একটা গোটা গ্রামের সমান নাম। আবার একটাই নাম নয়—যেমন ইচ্ছে তেমন নাম। আর, এও নয় যে বামুনপাড়া, কায়েতপাড়া, নমশূদ্রপাড়া, ছুতোরপাড়া, ডোমপাড়া, মুসলমানপাড়া বলে আলাদা-আলাদা বসত আছে। যাদের পয়সাকড়ি আছে—তারা ডাঙায় বাড়ি করে। যাদের নেই, তারা তলায় বাড়ি করে। যাদের আরো নেই, তারা আরো তলায় বাড়ি করে। যাদের আরো নেই, তারা হয়ত খালের ঢালে বাড়ি করে। তবে এত খালি জায়গা থাকতে আর ঢালে গড়াবে কে? সব জায়গাতেই সবরকম মানুষ মিশে থাকে। কার্তিক সেন-রা কুলীন বৈদ্য। ছুতারের কাঠি থেকে নুদির ভিটা পর্যন্ত পুরোটাই তো সেনদের বাড়ি, তাদের কবরেজি ওষুধের গাছপালার বাগান, গাছপালা ধোয়া-বাটা-গুঁড়া করার চালা আর সেনদের বসতবাড়ি। সেনরা কুলীনই আছে, তবে বৈদ্য নেই। তাদের বংশের মানুষজন নানাদিকে চলে গেছে। শেষ পর্যন্ত বাড়িতে অবশিষ্ট থাকল—এক বুড়ি, যাকে এখনকার সেনদের বাবারা পিসি ডাকত আর ছিল অভিমন্যু—তার সংসার নিয়ে। অভিমন্যু ছিল ওষুধ তৈরির কারিগর। কালে-কালে এমন দাঁড়াল যে বুড়ির খাওয়াদাওয়া অভিমন্যুকে জোটাতে হয়। সেই-বা পারবে কোত্থেকে। সে ওষুধের বাগান তো জঙ্গল। শেষে, অভিমন্যুই বুদ্ধি বের করে। বুড়িও রাজি হয়। বুড়িকে কিছুটা টাকা বায়না দিয়ে, যারা ঘর তুলতে পারে, তারা ঘর তুলে নিত। সেখানে তো ছুতার কাঠির মিস্তিরিদের বেশ ভাল অবস্থা। যোগাদের বাড়ির কাছে বলে আর যোগার বাপ-কাকারা কাঠমিস্তিরির কাজও করে বলে অনেকে তো যোগাদের বাড়িকেও ছুতার কাঠি বলে। ছুতার কাঠির পরই জলিল মাস্টারের মুদির দোকান, পাঠশালা, ছোট একটা মাটির মশজিদ। সে-ও তো কার্তিক সেনের ভিটা। বরিশালের আর-সব গ্রামেও লোকজনের বসতিতে এমন মেলামেশাই বেশি।

যোগাকে নিয়ে মেজবৌয়ের দুশ্চিন্তা অথচ আকাঙ্ক্ষা নিরসনের উপায় বাতলেছিল কে, তা কেউ কোনোদিন জানে না, জানার কথাও না। মেজবৌয়ের মনে কী করে শান্তি এল—সেটা

তো মেজবৌয়ের মনের ব্যাপার। তার স্বামীর কাছে সে যেটুকু মুখ খুলেছিল, ততটুকু তো সে নিজের কাছেও খোলেনি। এমনও হতে পারে—নানা ধর্মের, নানা সমাজের, নানা বিত্তের, নানা পেশার নারী-পুরুষের কত অজস্র কথা থেকে মেজবৌ নিজেই পরিত্রাণের উপায়টা বের করেছিল। তাকে তো সবাই, এমনকী তার বড়জা, যোগার মা নিজেই, তো 'যোগার মা' বলেই ডাকত। যোগা তো অষ্টপ্রহর মেজবৌয়ের কোলে-কাঁখেই থাকত—এমনকী ধানভানা বা পাটছাড়ানো বা কোনো ব্যাপার বাড়ির বাসনমাজার কাজে যখন তাকে বাইরে যেতে হত, তখনো যোগাকে সে সঙ্গে নিয়ে যেত। যোগা বেশ মোটা ছিল—তাকে কাঁধে-কোলে নিয়ে দূরে-দূরে যেতে জোয়ান মানুষও হাঁফিয়ে পড়ত। যোগার মা, মেজবৌয়ের বড়জা, বলত, 'আরে, তোর ছাওয়ালরে আমরা সবাই মিল্যা কি পিট্যাইবার ধইরব? যাইস কাজে, ছাওয়াল নিয়্যা গেলে কি মহাজনগ ভাল্ লাগে?' মেজবৌ জবাব দিত, 'ছাওয়ালডারে মহাজনের ভাল লাগাইব্যার কামডা কী? তার দরকার কাম, হ্যায় কাম বুইঝ্যা নিক, ছাওয়াল দিয়্যা হ্যার কাম কী?'

যোগা যখন মাত্র দুটো-একটা কথা বলতে শুরু করেছে, সে তখন মেজবৌকেই 'মা' ডাকতে শুরু করে। মেজবৌ তাতে যোগার ওপর রেগে ওঠে, 'এই ছ্যাঁড়া, নিজের মারে মা ডাক'। যে-বাড়িতে রোজকার খাওয়া রোজ কামাই করতে হয়—নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে, সে-বাড়িতে এসব কথা শোনার মত বাড়তি কান কারো থাকে না। কিন্তু মেজবৌ বছর দুয়ের যোগাকে বুঝিয়ে দিতে পারে যে মেজবৌকে 'মা' বললে তাকে ছোটখাটো ব্যথা পেতে হয়—যে তাকে সর্বক্ষণ আঁকড়ে থাকে, তারই হাতে। খুব ঝাঁকড়া চুল যোগার। সেটা ধরে টেনে দিত মেজবৌ বা কান একটু মুচড়ে দিত বা পাছায় চিমটি কাটত। ব্যথা দিয়েই মেজবৌ তার আপত্তিটা যোগাকে বুঝিয়ে দিতে পারে। যোগা, 'মা' আওয়াজটাই ছেড়ে দিল।

যোগা আওয়াজ ছাড়তে পারে, আওয়াজ তো আর যোগাকে ছাড়তে পারে না। আর, এটাই-বা কী করে সম্ভব যে বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে যোগা সব কথাই বলতে পারবে, এক 'মা' ছাড়া? মেজবৌয়ের সঙ্গেই তো সে সারাদিন। সারাদিনই তো সবাই মেজবৌকে 'যোগার মা' বলে ডেকেই যাচ্ছে—'যোগার মা, কবর্যাজবাড়ির বড় মা ঠ্যারান ডাইকছে একবার।' 'যোগার মা, অ্যাড্ডা চ্যার তো বার্নিশ করব্যার লাইগব।' 'যোগার মা শ্যাতলা ষষ্ঠী কাইল না ফরশু জাইন্যা আইসো।' 'যোগার মা, খালে যাইব্যা নি? ইঁচা মাছ উথাল দিছে।' এইসব কাজে সবাই এমনি করেই সবাইকে ডাকে। আগে ডাকত, 'মাইঝ্যান' বা 'কেষ্টার বৌ' বলে। ডাকটা বদলাবার সময় পার হয়ে গিয়েছিল। তাই 'যোগার মা' ডাকটা সবাই জিভে তুলে নিল। আর, সব সময় 'যোগার মা,' 'যোগার মা', শুনতে-শুনতে যোগাও এক সময় 'যোগামা' আওয়াজটা করতে শুরু করল। যোগা তখন নিজেই জানে না তার নিজের নাম যোগা।

যোগার 'যোগামা'-তে আর 'র' এল না। সবাই ডাকে 'যোগার মা', এক যোগা ডাকে, 'যোগামা'। বড় বাড়িতে যেমন হয়—যোগা সকলের সঙ্গেই বড় হতে লাগল, সবার চেয়ে স্বাস্থ্যবানও। তার দাদাদের ও তার চাইতেও বড়দের ও তার চাইতে ছোটদের তো বটেই—যোগা এত পেটাতে শুরু করল যে যোগা আসছে টের পেলেই তারা পালাত। যোগার মা যোগার কোঁকড়ানো বাবরি চুল চুড়ো করে বেঁধে দিত, দু-এক সময় হলদে ফালি-কাপড় জাঙ্গিয়ার মত পরিয়েও দিত। আর, যোগা সেই বেশে দাপিয়ে বেড়াত। তাতে যোগার মা তার মতন করে সেই গোপবালক ও রাখালবালকের প্রাচীনতাকে একটা আধুনিকতা দিত।

যোগার বয়স যখন বছর আট, তখন একদিন সে হনুমান সেজেছিল। যোগা মা রঙ-বেরঙের কাপড়ের টুকরো ও একটু-আধটু জড়ির পাড় দিয়ে খড়ের মোটা লেজটাকে এমন করে মুড়িয়ে,

শেষে আবার মুচড়ে দিয়েছিল আর লেজের সঙ্গে মানানসই মুকুট ও গন্ধমাদনে রাংতা লাগিয়েছিল যে ঘর থেকে বেরিয়ে একহাতে কাঠের মুগুর আর-এক-হাতে গন্ধমাদন নিয়ে টাল সামলাতে না পেরে তার সেই বপু নিয়ে যোগা আছড়ে পড়ল তার বুড়ো বাবার ওপর। রামদয়াল তখন বাড়ির একমাত্র কাঁসার বাটিতে পুরনো তেঁতুল দিয়ে ছাতু মেখে খাচ্ছিলেন। রামদয়াল হয়ত একটু তাড়াতাড়িই খাচ্ছিলেন—নইলে তেঁতুলের টকে আবার কাঁসার কল উঠবে। স্বাদ বাড়াতে রামদয়াল ছাতুটা একটু শুকনো করেই মেখেছিল। তাড়াতাড়ি গিলতে পারছেন না অথচ গিলতে চেষ্টা করছেন।

ছাতু নিয়ে এতটা ব্যস্ত না থাকলে রামদয়াল হয়ত হনুমানরূপী তার কনিষ্ঠপুত্র যে তারই ঘাড়ে পড়ছে, এটা বুঝে সরে যেতে পারতেন।

ফলে, ছাতুর অত বড় জামবাটি দুয়ারে পড়েও গড়াতে লাগল। রামদয়ালের ঠ্যাংদুটো বাতাসে ডানা কাটছে তো কাটছেই। যোগার মোটা শরীরের তলায় তার রোগা শরীর বা মাথা কিছুই দেখা যাচ্ছে না। যোগা নিজেই নিজেকে তুলতে পারছে না। এদিকে তার মুকুট, গদা ও পাহাড় রক্ষার জন্য সে কোনো একটি হাতও খালি পাচ্ছে না। আর যোগার মোটা রঙিন লেজ খাড়া দুলছে। রামদয়ালের গলায় ছাতু আটকে গোঁ-গোঁ আওয়াজ বেরচ্ছে। এ-বাড়িতে ছুতোরগিরির এত আওয়াজ ওঠে—রামদয়ালের গোঁ-গোঁ কারো কানে যাওয়ার কথা নয়। তখন প্রায় দুপুরবেলা। বাড়ির প্রায় সকলেই কাজে বেরিয়ে গেছে। যোগার মা আর ছোটবৌ ছিল বাড়িতে। যোগার মা টেরই পায়নি কী হয়েছে। ছোটবৌও টের পেত না—যদি সে আখা ছেড়ে দাঁড়িয়ে না উঠত। সে-ই 'অ দিদি গ, বটঠাউরের কী হইল—' রবে কান্না তুলল।

তারপর তো রামদয়ালকে উদ্ধার করা হল। তার হাঁ-মুখের ভিতর আঙুল ঢুকিয়ে ছাতুর গোলাটা বের করল যোগার মা। ছোটবৌ ঘটিতে জল আনল—রামদয়াল সেটা উঁচু থেকে গলায় ঢাললেন। সকলের এই ব্যস্ততার মধ্যে যোগা তার লেজ, মুকুট, গদা ও পাহাড় সবগুলোই রক্ষা করে হাওয়া হয়ে গেল। যোগার মা ছাতুর বাটিটা তুলে দেখে বালি-মাটি এক কোণে লেগেছে। সেটুকু ফেলে দিলে খাওয়া যাবে। রামদয়ালকে জিজ্ঞাসা করে, 'দাদা, এডডু পাৎলা কইর‍্যা দেই। না-হয় তো আবার গলায় ঠেইকব!' যেন শুকনো বলেই ছাতু রামদয়ালের গলায় ঠেকেছে, যেন এর সঙ্গে যোগা বা তার হনুমান-সাজার কোনো সম্পর্ক নেই।

হাঁফাতে-হাঁফাতে রামদয়াল বলে, 'তাই দ্যাও আর দুইডা কাঁচা মরিচ ডইল্যা দ্যাও।'

এটা তার দুপুরের খাওয়া ছিল—ভাতের বদলে। দুপুরে আবার রান্না হয় কবে? বেটাছেলে-মেয়েছেলে যাদের কাজের বরাত থাকে—তারা গেরস্ত বাড়িতে কিছু খেতে পায়। বাড়িতে যারা থাকে—তারা বেশিরভাগ দিনই পান্তা খায়। গরম ভাত তো হয় সবাই ফিরলে, সন্ধ্যার মুখে। রামদয়াল পান্তা খেতে চাইছিল না বলেই, ছাতু মেখে নিয়েছিল। যোগার মা কখন ছাতুর বাটি নিয়ে আসে, তার জন্য অপেক্ষা করতে-করতেই, অত রোগা শরীরে যতটা রাগ করা সম্ভব, রামদয়াল ততটাই রাগ করেন, 'এ হালা বাপ-খুইন্যা দিনে-দিনে বইস্যা-বইস্যা তো কালাপাহাড় হইয়্যা উইঠছে। হয় ওগ্ জলিল মাস্টারের নিকড়ে পাঠাও কাইল আর নয়তো পাঁচনবাড়ি দিয়্যা কুনো বামুনবদ্যির গোয়ালে ঢুকাও। কাইল সহালে য্যান ওর মুখ দেইখব্যার না-হয়।'

সারাদিনের পরে এইসব ঘটনার কোনো গুরুত্ব থাকে না। পাছে যোগাকে কোনো বাড়িতে কাজে ঢুকিয়ে দেন বটঠাকুর, তাই, যোগার মা তার স্বামীকে রাজি করায় জলিল মাস্টারের পাঠশালায় যোগাকে দিয়ে আসতে। রামকেষ্টও বলে, 'অয়, অন্তত শুভঙ্করডা না শিইখলে তো শুদ্দুরের ব্যাটা শুদ্দুরই হইব।'

যোগাকে পাঠশালায় পাঠানোর সময়ই যোগার মা তার সেই সংগৃহীত উপায়টাকে কাজে লাগায়। সে তার স্বামীকে বলে, 'যোগারে পাঠশালায় ঐ যোগানন্দ নামডা ছাড়ান যায় না?'

তার স্বামী একটু বিরক্তিই হয়, 'তোমার যত ভেজাইল্যা কথা। আবার নাম নিয়্যা পইড়ল্যা? সব ছাওয়ালপাওয়ালের নাম তো নন্দ দিয়্যাই আছে—মহানন্দ, প্রেমানন্দ, সদানন্দ। তার সঙ্গে মিল রাইখ্যা যোগানন্দই তো আসে?'

'তোমাগো ভাইগো নামে তো মিল নাই।'

'ক্যা? দাদাই এক রামদয়াল—আমি আর রাজু তো কিঙ্কই।'

'হ্যাঁ। যোগারে ঐ মতন আলাদা কইরো। যোগ-খান রাইখ্যা নন্দ বাদ দিয়্যা আর-কিছু দিও। দাদারে জিগাইবা না?'

'হ। দাদার মনে আছে অর নাম যোগা না ভোগা। তার উপর আজ ছাতুর বাটি ফেল্যায়া দিছে।'

পরদিন সকাল হতে-না-হতেই যোগার মা গিয়ে তার বড়জাকে বলে, 'দিদি, তোমারে যদি আমি দুই পোয়া খুদ দেই আর একখান সিকি দেই, তুমি কোনডা রাইখব্যা?' বড়জা বলে, 'দুইডাই।'

'ক্যা? দুইডা ক্যা?'

'এডা কী জিগাইলি? মান্‌ষে দুইডা পাইলে একডা নেয়?'

'না। তা কই না। তোমারে যদি এড্‌ডা নিব্যার কই?'

'তুই কইলেই আমারে কি একডারে না কইরতে হব?'

'না কইরব্যা ক্যান? আমি তো হ্যাঁ কইরবার কই। একডারে।'

'একডারে হ্যাঁ কইরলেই তো আরেকডারে না-কহা হইয়া যাবেনে? সেইডা তো অমঙ্গুল্যা।'

'ক্যা? অমঙ্গুল্যা হইব ক্যা?'

'তোর মাথায় কি সত্যি-সত্যি কুনো জ্ঞানবুদ্ধি নাই?'

'কেডা কয়, নাই?'

'এইডা বুঝস না—সারাখান জীবন তো খুদই ভরসা। খুদ যদি না থাহে এই বেবাক মানুষগুলাক বাঁচাবি ক্যামনে? তোর ভাস্‌ররা তিনভাই, ছাওয়ালপাওয়াল মা ষষ্ঠীর দয়ায়। কেউ খুদ সাইধ্যা দিব্যার চ্যালে কি না করন যায়? এক মুঠা দিলে দুই মুঠা চাবি—'

'ভিক্ষুকের নাগাল।'

'তুই তো চাইস নাই। তোরে দিলে তুই না করবি নাকী?'

'আচ্ছা খুদ থাউক। সিকি সিকি?'

'সিকিই ক আর লাল পয়সাই ক—ওডা তো লক্ষ্মীর দয়া।'

'আচ্ছা, তোমারে যদি দুইডাই দিয়া দেই, 'তুমি কী করো?'

'খুদ না-হয় বাড়িত্‌ থিক্যা দিলি। সিকি পাইছিস কনে?'

'একডা-একডা পয়সা কইর‍্যা জমাইছি দিদি, আইজক্যার দিনডার লাইগ্যা।'

'ক্যান? কী হইছে আইজ?'

'যোগা পাঠশালে যাবে—'

'বাপেরে ছাতুর বিষম খাওয়াইয়্যা শখ মিটে নাই? অ্যাহন মাস্টারের নুর ছিঁড়ব্যার যায়? তো তার সঙ্গে খুদেরই-বা কী, সিকিরই-বা কী। তোরে কেডা কইছে—খুদ দিয়্যা কড়ি দিয়্যা ছাওয়াল কিনতে?'

'ডর লাগে দিদি। যে-জিনিশ আমার না, সে-দ্রব্য লই ক্যামনে? যোগার যদি বিপদ হয়?'

'ছাওয়াল তো নিজেই তোরে মা বইল্যা বাইছ্যা নিছে। তোরে ক্যান দোষ ছুঁব?'

'দিদি, আমি কিন্তু তোমারে লুক্যাইয়া ছাওয়াল কাড়ি নাই।'

'লুক্যাইয়া পরপুরুষ করা যায়। ছাওয়ালপাওয়াল কি লুক্যাইবার মত জিনিশ? তোর অত ভাবনের কাম কী? পাঠশালে ওর বাপের নাম লিখ্‌ব্যার লাগব না?'

'লাগে বুঝি?

'ঐহানে তোর নামখান লিখ্যা দিতে ক।'

'কও কী দিদি? খুড়ি না-হয় মা সাইজব্যার পারে, বাপ সাজব ক্যাম্‌নে? আমাগো তো কাছা নাই। তাহাইলে তোমার দেওরের নাম দিব্যার লাগে তো—।'

'কী কস তুই? আমার প্যাটের ছাওয়ালের বাপের নাম বইল্যা আমার দ্যাওরের নাম দিলে আমাগো ধর্মচরিত্তির থাহে কনে? তোর নামই দে—কুনো হাঙ্গাম হইব না।'

কথাডা যোগামার মনে ধরেছিল। কিন্তু যোগাকে একটা নতুন ধুতি-পিরান পরিয়ে, বগলে একটা বেতের আসন গোল করে দিয়ে, তার স্বামীর কাছে দেয়া পর্যন্ত কথাটা নিজের মনে গুছিয়েই তুলতে পারল না। অ্যামন কথা ক্যামনে কাওয়া যায়। উলটে তার স্বামী বলল,

'ঐ আসনটাসন রাইখ্যা দ্যাও'।

'বইসবনে কীসে?'

'বাড়িতে কি আসনে বসে? জলিল মাস্টারের ঐখানে বামুন-কায়েতরাও পড়ে। শুদ্দুরের ছাওয়াল আসনে বইসলে তাগ বাপজ্যাঠা আবার পতিত্ কইরব।'

যোগার মা যোগার বগল থেকে আসনটা বের করে নিল। কথাটা তার মনে ওঠা উচিত ছিল, 'চাঁড়াল হইব্যার এই একখানই সুবিধা। চাঁড়ালের আর পতিত কী?'

'বামুনগ জানো না? প্রাচিত্তির বিধান দিয়্যা পয়সা চাইব নে।'

জলিলমাস্টারের পাঠশালা বাড়ির গা-লাগা। খালের ওপারে যোগামা-ই যেতে পারে। কিন্তু ইস্কুলটিস্কুলের ব্যাপার বলে গেল না। রামকৃষ্ণ যোগার কাঁধ ধরে মাস্টারকে বলে, 'মাস্টারশাহেব, অর নামখান লেইখ্যা নেন।'

'পইড়ব তো? না দুইদিন বাদে পাঁচন ধইরব্যার যাবে নে? নাম কী?'

'যোগা যোগা কইয়্যাই তো ডাকাডাকি হয়। ও আপনি একখান থুয়্যা দিবেন।'

'তোমাগো ছাওয়ালরা তো আনন্দ সব—ক্ষমানন্দ, প্রেমানন্দ। তাইলে তো অর যোগানন্দ হওয়া লাগে। যোগানন্দ মণ্ডল।'

'ঐ আনন্দখান বাদ দিয়্যা দ্যান। আর-কিছু বসাইয়্যা দ্যান।'

'ক্যা? তোমাগো বাড়ির কুনো ধারা নাই? ওর ভাইগুল্যা যহন আনন্দ, অরে ক্যান নিরানন্দ কইরব্যা?'

মাস্টারের কথার শেষটুকু না বুঝলেও রামকৃষ্ণ টের পায়—মাস্টারের ইচ্ছে 'আনন্দ' লেখার। এ-কথাতে আপত্তির ভাষা রামকৃষ্ণের জানা থাকবে কী করে? সে বলে বসে, 'না মাস্টারশাহেব। ওর খুড়ির পছন্দ নাই—ঐ আনন্দ।'

'যোগার মা-র? তাইলে তো কথাডা ফ্যালান যায় না। এক কাম করো-না। যোগার মা তো কলিকালের মা-যশোদা। তার ছাওয়াল প্যাটের না পালা, এই কথা কাউরে কহনো জিগাইব্যার শুনছ? তাইলে যোগার নামখান লিখি যশোদানন্দন। মানে যশোদার ছাওয়াল। এর থিক্যা ন্যায্য নাম যোগার আর-কিছু হবার পারে?'

রামকৃষ্ণকে একটু ভাবতে হয়। এত বড় নাম? তো নাম তো নামের নাখান থাইগব। যোগা তো যোগাই থাইকব। 'যোগা'-ডা এক্কেরে বাদ দেওয়া কি ঠিক কাম হব? বেকামটা কী সেটা রামকৃষ্ণ বুঝে উঠতে পারে না। বড় হয়ে যোগার যদি নামের দরকার হয় তো যোগা মাস্টারশাহেবের লেখা নামটাই নেবে। রামকৃষ্ণ বলে বসে, 'যোগাডা, রাইখ্যা কিছু করন যায় না মাস্টারশাহেব? ঐ নন্দখান বাদ দিয়্যা?'

'নিশ্চয় যায়। ধরো, যোগেন্দ্রকুমার হব্যার পারে, যোগেন্দ্রনাথ হব্যার পারে। যোগেন্দ্রচন্দ্রও হব্যার পারে। কও, কোনডা মনে ধরে, কও।'

'সবোই তো ভাল, বাবুগরে নাম।'

'বাবুরা এইসব নাম রাখে, তবে এগুল্যা তো দেবদেবীর নাম। যোগেন্দ্রকুমার বইলতে বুঝায় শিবের দুই পুত্তুরকে—কার্তিক আর গণেশ। যোগেন্দ্রনাথ বইলতে বুঝায় এক্কেরে আসল শিবরে। যোগেন্দ্রচন্দ্র—'

রামকৃষ্ণ বাধা দিয়ে বলে, 'মাস্টারশাহেব, আমারে এই বুড়াকালে আর শিখাইব্যার খাটনি ক্যান। জিভে তো মইরচ্যা পইড়্যা গিছে। শিবের ছাওয়ালপাওয়াল দিয়্যা কাম নাই। আপনে ঐ আসোল শিবঠাকুরডাই থোন। যোগীন্দর্নাথ। এই যোগা, বয় গিয়্যা'।

একা বাড়ি ফেরার পথে রামকৃষ্ণ ভাবতে থাকে, মাস্টারশাহেব তাদের ছেলেদের নামের মধ্যে যে ক্ষমানন্দ বললেন, সেইডা কেডা?

বরিশালে ঝালাই নাই?

১৭

খাল থেকে যোগেন একেবারে স্নানটান সেরে ভেজা কাপড়ে ফেরে। কাল রাতে যোগামার কাছ থেকে একটা খাটো ধুতি চেয়ে নিয়েছিল—আটহাতি কোঁড়া ধুতি, তার কোঁড়া রং কোনোদিনই ঘোচে না, লাল পাড়। গ্রামে নমশূদ্রদের এটাই পোশাক। যতই ছিঁড়ে যাক আর হাঁটুর যত ওপরেই উঠুক—ধুতিই পরে নমশূদ্ররা। কেউ-কেউ হয়ত ভূস্বামীর বাড়ি থেকে চেয়েচিন্তে, পুরনো ধুতি-জামা নিয়ে আসে। বাবুরা দশ-বারহাতি ধুতি ছাড়া পরেন না। তাই তাঁদের ধুতির কোনো একটা দিক বেশি ছেঁড়া থাকলেও এদের পরতে অসুবিধে হয় না—ছিঁড়েছুঁড়ে খাটো করে নেয়। তবে সেটা একটা দৃশ্য হয় বটে—ধুলোঘাটা মাথা খাটো ধুতির মধ্যে হঠাৎ একজনের পরনে ইস্তিরি-ভাঙা ফটফটে বাবু ধুতি। তবে, ঐ একদিনই। সে ধুতিও পরদিন ধুলোরঙা হয়ে যায়।

যোগেন দুয়ারে দাঁড়িয়েই যোগামার দেয়া কাপড়টা পরে নেয়—ভেজা ধুতি ছেড়ে।

'জার লাগে যে যোগামা'—

'জারের আর দুষ কী? মাঘের শীত বাঘের গায়। তোর জামাডা পইর‍্যা নে।'

'ঐডা তো পাঞ্জাবি। পিরান-ফিরান নাই কারো?'

'পাঞ্জাবির তো তলায় গেঞ্জি লাগে। গেঞ্জিখান পইর‍্যা নে বাবা।'

'কইব্যার ধইরছ কী? অ্যাহন আমি গেঞ্জি-জামা পইর‍্যা নিজের বাড়িতে মোড়া পাইত্যা বইসব নি কাছারির গোমস্তার নাখান।'

'তুই ক্যান গোমস্তা হইবি বাপ, তুই না উকিল, তোরই না পাঁচখান গোমস্তা লাগে। তার উপর তো ভোটে জিতা মেম্বার হইছে আমাগ ছাওয়াল। ত—য়?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ—বুইঝব্যার পারছি দ্যাশের খুব উন্নতি হইছে। তুমি যহন আমারে পিরান না দিয়া উকিল-গোমস্তা বুঝ্যাবার ধইরছ—'যোগামা তাকে একটা দলা-পাকানো পিরান ছুড়ে দেয়। যোগেন সেটা নিয়ে একটা হাত ঢুকিয়ে আর-একটা হাত খুঁজতে দুয়ারে এক পাক ঘোরে। তারপর বোঝে, পিরানটা এত ছোট যে তার আর-এক কাঁধ পর্যন্ত আসেই না।

'অ যোগা—আ—মা, আমারে ছোড কইর‍্যা দ্যাও। না অইলে তোমার পিরানে ঢুইকব্যার পারি না'—হাসির হুল্লোড়ের ভিতর যোগেন তার এক হাত ঢোকানো পিরান নিয়ে দুয়ারে ঘুরপাক খায়। যোগামা এসে একটানে পিরানটা খুলে নেয়। যোগেনের ছোটখুড়োর বড় ছেলে, রাজেশ্বর, ছিটের একটা হাফশার্ট পরে বাইরে, নিশ্চয়ই কিছু দূরে ও ভদ্র জায়গায়, নইলে হাফশার্ট পরতে যাবে কেন, বেরতে যাচ্ছিল, যোগামা তার ওপর হামলে পড়ে, 'তোর শাটখান্ খুইল্যা দে।' রাজেশ্বর সদার সমান, যোগার চাইতে এক-দেড় বছরের বড়। সে যোগামাকে বাধা দেয়, 'জেডি, আমারে বাইর‍্যাতে হব, অ্যাহনই।'

যোগামা ততক্ষণে তার শার্টটা ওপর দিকে তুলতে শুরু করেছে, 'তা বারানের আছে তো বারা গিয়া, শাট দিয়্যা কী করবি?' রাজেশ্বর নিজেই শার্টটা খুলে দিচ্ছিল। জামাটার গলা থেকে নিজের মাথাটা বের করতে-করতে সে বলে ওঠে, 'অ, যত জার সব যোগা-র গায়। আমাগ জার লাগে না?'

যোগামা শার্টটা নিয়ে যোগার হাতে দিয়ে বলে, 'পইর‍্যা নে বাপ, নাইলে কাইড়্যা নিবে।'

যোগেন শার্টটায় গলিয়ে মাথাটা বের করে রাজেশ্বরের দিকে একটা ভুরু খেলিয়ে, তাকিয়ে বলে, 'শার্ট কি খলিফার নিকড় থে আইনলেই পরা যায়? পরার ভাগ্যি তো আলাদা।'

রাজেশ্বর বলে ওঠে, 'তুই তো বাড়িছাড়্যা থাগিস। তাই ছাইড়্যা দিল্যাম। নে, পর, শার্টখান, এক বেলাই তো?'

যোগামা—'তোগো তো রোজই জার লাগে। ও এড্ডা দিন থাইকব্যার আইসছে। ওর জার তো ঠেকাব্যার লাগব?'

'ওরে রোইজ থাইকব্যার নিষেধ কেউ দিছে? থাকুগ এইখানে। তাহালি উকিল আর মেম্বার হইব কেডা?'

'তয়? মেম্বারগ গরম-জার-বর্ষা সবই বেশি, জানো না?'

রাজেশ্বরের বৌ বলে বসে।

'অ্যাহন, যারা মেম্বার হয় নাই, তাগ জারের লাইগ্যা অ্যাড্ডা দলুই-ধলুই কিছু দ্যাও।'

দুয়ারের উলটোদিকে, ঝাঁকড়া তুলসীমঞ্চের পেছনে, একটা ছোট সাইজের ছিপ নৌকো কাত করা ছিল। উলটোদিকে মানে রাস্তা থেকে ধাপ ভেঙে দুয়ারে দাঁড়ালেই নৌকোটার তলা, কাত-করা, চোখ পড়বে। তৈরি হচ্ছে। যোগাদের বাড়ির সকলেই এর-ওর ক্ষেতে কাজ করে—যোগার বাবা-খুড়ারা-দাদারা-খুড়িমারা-বৌদিদিরা—সবাইকেই কাজ করতে হয়, ক্ষেতে, লাঙল দেয়া থেকে কাটা-ধানের ক্ষেত থেকে ঝরা ধান তুলে আনা পর্যন্ত। তাদের নিজেদের একটু-আধটু জমি আছে—আধা হলের চাইতেও কম। সেই নিজেদের জমি আর বর্গাদারির, এমনকী মজুরির, অন্য জমির মধ্যে কোনো তফাত বাড়ির কেউও করতে পারে না, করে না। নিজের জমিও তো তাদের চাষ করতে হয় অন্যের কাছ থেকে বলদ-লাঙল ধার করে। ঐসব মিলিয়েও বছরের ধান দূরের কথা, মাস চারেকের ধান বড়জোর ওঠে। বাড়ির সবাইকে সবরকম

কাজই করতে হয়। বামুন-কায়েত বাড়ি বাচ্চা ধরা, বাচ্চাকে মাই দেয়া, গরু-ছাগল দেখা, বরকন্দাজের কাজ, ব্যাপারবাড়ি, মাঝিগিরি, ছুতোরগিরি—কোনো কাজেই নারী-পুরুষের ভেদ নেই, এক মাই দেয়া আর দাইগিরি আর বরকন্দাজি ছাড়া। বাড়ি-বাড়ি গিয়ে কাঠের মিস্তিরির কাজ করত যোগার বড় আর ছোট খুড়ো। বড় খুড়োই বোধহয় নৌকোর কাজ প্রথম ধরে। গৌরনদীর উত্তরদিকের গ্রামগুলির নৌকো তৈরির খুব নামডাক। অন্য জায়গা থেকেও এদিকে আসে নৌকো তৈরি করিয়ে নিতে। বরিশালে তো নৌকো ছাড়া এক-পাও এগনো যায় না। আর, নৌকো বানানোর কাজের তিনটি সুবিধে। নৌকো লোকে কেনে স্থায়ী সম্পত্তির মত। ফুটোফাটা পচাঘচা হলে সে-মিস্তিরিকে আর দ্বিতীয় নৌকোর বরাত কেউ দেবে না। তেমনি একটু ভাল নাম ছড়ালে কাজ দিতে লোক ছুটে আসে। দুই নম্বর সুবিধে—বাড়িতে কাজ আনলে বাড়ির সবাইই কাজ করতে পারে। চেরাইয়ের কাজ, জোড়ার কাজ ছেলেরা করে আর গাবমাখানো, তলাচাঁছার কাজ মেয়েরা করে, ছেলেপিলেরাও করতে পারে। আর তিন নম্বর সুবিধে—নৌকো তৈরির মজুরি ভাল, মজুরি একসঙ্গে আসে, তেমন কেউ-কেউ ধানে ও টাকায় মজুরি দেয়। তাতে বাড়ির খাওয়া অনেকটা সামলানো যায়। যোগার বড়খুড়ো নৌকো তৈরির কাজ ধরেছিল বলেই যোগেন ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়তে পেরেছে। তবে, মূলধনের অভাবে গয়না বা পাট বা গোলা নৌকো পর্যন্ত তারা যেতে পারেনি। খোলা, ডিঙা কী এইরকম ছোট ছিপ পর্যন্ত চলে। বড়খুড়ো একবার ভেবেছিল—মহাজনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বড়নৌকোয় ঢুকবে। যোগার মা তখন বেঁচে। বড়বৌই নাকী বড় দেওরকে বলে, 'ভাইব্যা দ্যাখো ঠাকুরব্যাটা। ছোড ডোঙার জল হাত দিয়্যা সাঁইচ্যা ফেলান্ যায়। গয়নার নাও, পাটের নাওয়ের খোলে যে-জল ঢুকে তাতে মানুষ ডুইব্যা যাবার লাগে। শ্যাষে কী হইতে কী হইব! ডর লাগে। আমাগো যে কিছু নাই, তবু মহাজনের কাছে আমাগো কুল্যা ঝাইড়্যা আইতে হয় না। বাড়ির হগ্‌গলে মিল্যা যে গতর খাটায়, তারই ভাত প্যাটা-আধাপ্যাটা খায়। আমাগো ওপর কুনো মহাজনের দৃষ্টি নাই—তার হবাদেই আমাগো সংসারের দুঃখ। সেই দয়াতেই আবার আমাগো সুখ।' বড়বৌদিদি—যোগার মা, সন্ধ্যার, এই কথায়, বড়খুড়ো আর এগয়নি।

শার্টটা গলাতে-গলাতেই যোগেন নৌকোর দিকে দৌড়য়। নৌকোর তলাটা এদিকে কাত, খোলটা ওদিকে। সেই খোলের দিকেই ছোট খুড়ো কাঠ কাটছে। যোগেন এক লাফে সেখানে পৌঁছুতেই খোলের ভিতর থেকে একটা রঙিন শাড়ি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আর যোগেনের বৌ কমলা ছুটে পালায়—তার ছোটার পথ ধরে শাড়ির রংটা তরল হয়ে বয়ে যায়। যোগেন থতমত খেয়ে যায়। সে জানত না কমলা নৌকোর খোলের মধ্যে বসে-বসে পুট্টি দেয়া, গাবের রস ঠেসা, টুকরা কাঠ গোঁজা এইসব কাজ করছে। ছোটখুড়ো করাত-চালানো বন্ধ করে যোগেনের দিকে মুখ তুলে আছে—হাতটা করাতের হ্যান্ডেলে। যোগেন বলে উঠতে পারে, 'ছাড়ো তো, দ্যাও তো করাতখান, হেই-রাত না পুহাতে এমন ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ করাত চালাইব্যার ধরইছ, ঘুমায় কোন সম্বন্ধীর ব্যাটা? ছাড়ো, উঠো। দ্যাহো, কত্‌খন্ লাগে?'

ছোটখুড়ো করাত ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'আইছিলি তো সম্বন্ধীর বুনের গন্ধ পাইয়্যা। বুঝিস নাই—আমি এইখানে খাড়া আছি করাত লইয়্যা।'

নৌকোর আড়ালে দুয়ার থেকে ছোটখুড়ির গলা খনখনিয়ে ওঠে, 'হইছে ছোটমণ্ডল, তোমারে ঐহানে করাত-হাতে ভৃঙ্গীর নাগাল বেটার বৌ পাহারা দিব্যার কাজ দিল কেডা? যত বুড়া হচ্ছে, বুদ্ধি য্যান অ্যাক্কেরে তমালবৃক্ষের নাগাল ঝাঁক্যায়া উইডত্যাছে। দ্যাহো, গাছের ডালে আবার কাগ-শগুন বাসা না বাধে।'

ছোটখুড়ো ততক্ষণে তো দুয়ারে, 'যোগা গিয়্যা মিছা কথা কইল ক্যান, ছোটখুড়া করাত দ্যাও, কাঠ কাড়ি।'

ছোটখুড়ি বলে উঠল, 'আ হা হা, কে আমার দ্রৌপদীর ভাসুর আইলেন লো। সত্যি ছাড়া কথা শুনেন না? ন্যাও, এডডু তুলসীজলে কান ধুইয়্যা লও, ছাওয়াল তোমারে গিয়্যা কয় নাই যে ছোটখুড়্যা তুমি এইহান থিক্যা য্যাও, আমার কিছু বৌয়ের লগে কথা আছে।' যোগেন শুনে হেসে ফেলে, দুয়ারেও হাসি উঠেছে। ছোটখুড়ি নিশ্চয়ই দুই হাতের তালু নাচাচ্ছে। ঝগড়া যদি বাড়তেই থাকে, তাহলে হাঁটু ভেঙে আবার সোজা হয়ে নাচও হবে। এ-ঝগড়ার তো আর কোনো সালিশি নেই। বাড়ির কেউও কিছু বলে না, পাড়ার লোকরাও কিছু বলে না। তারা জোরে-জোরে হেসে উঠে শুধু এক-এক পক্ষকে তারিফ দেয়।

যোগেন এই ঝগড়া শুনতে-শুনতে করাতটা জোরে-জোরে চালাচ্ছিল বলে আন্দাজ পায়নি—কতটা জোর লাগছে। মনে হচ্ছে, ছোটখুড়ো কোনো কথা বলেনি। আর, তার অপরাধের যথেষ্ট গঞ্জনা দেয়ার সন্তুষ্টিতে ছোটখুড়িও গলা বন্ধ করেছে। গলা একবার খুললে তিন-সপ্তক না ঘুরে নমশুদ্দুরের মাইয়্যার গলা বন্ধ হয় না। ছোটখুড়ি যেন আচমকা ছেড়ে দিল। নমশুদ্দুর মেয়েদের কথার কী তোড় আর গলার কী জোর। এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে কত গল্প আছে। মেয়ে দেখতে গিয়ে ছেলের বাপ জিজ্ঞাসা করে, 'আপনাগোর এহানের শিয়ালের ব্যাভার-আচার ক্যামন?' মেয়ের বাপ যদি শেয়ানা হয় তাহলে জবাব দেয়, 'শিয়ালের? হে কই ক্যামন কইর‍্যা? ছোডবেলার স্মরণ কি অ্যাদ্দিন থাগে?' ছেলের বাপ যদি শেয়ানা হয়, তাহলে সে বুঝে নেবে সম্ভাব্য পুত্রবধূর গলার জোরে শিয়ালের ডাক চাপা পড়ে যায়। ব্যস, বিয়ে পাকা। আর, মেয়ের বাপ যদি শেয়ানা না-হয় আর বরের বাপের প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝতে না পারে, তাহলে জবাব দেয়, 'শিয়ালের বজ্জাতির কথা আর কী কন? কাইল রাইতেও তো একখান হাঁস নিয়্যা গেল', 'ক্যা? একডা হাঁস তো নিছে, বাকিগুল্যা চিককুর পাড়ে নাই?' পাইড়ছে। নিচ্চয় পাইড়ছে।' 'আপনাগো কানে যায় নাই? আপনার কইন্যার কানে?' 'হ্যাঁ, গিছে। না-যাইব ক্যা? গিছে। তবে সজাগ হইব্যার টাইম পাই নাই।' 'কেডা পায় নাই।' 'হগগলের কথাই কই, রাত্তিরের নিদ্রা তো, সজাগ হইতেও তো টাইম লাগে।' 'কার লাগে, আপনার মাইয়ারও?' 'তা তো লাগেই। লাগবই। মেয়েরে তো শিয়াল পাহারার বিদ্যা দেই নাই।'

তার মানে, এ-মেয়ের শুধু পেট আছে, আর ঘুম আছে। ব্যস, বিয়ে খারিজ।

কেউ-কেউ বলে, বিয়ে নাকী মেয়ের বাপই ঐকথা বলে খারিজ করল আগে। তার বাড়িতে এসেছে, সে তো আর মেয়েদেখার দলবলকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলতে পারে না। তাই সে জানিয়ে দিল—অত খাটুনির ঘরে মেয়ে দেবে না।

যোগেন ছোটখুড়োর হাত থেকে করাত নিয়েই পুরোদমে চালাতে শুরু করেছে। করাতটাকে কাঠে বসার সময় দেয়নি। তাই এতক্ষণে যত-না কেটেছে, তার চাইতে হাঁফাচ্ছে বেশি।

করাতডাও তো লম্বা। এমন লম্বা, হিলহিলে, ছোট দাঁতের বড় করাত সিধে রাখতে হলে, আর-একজন উলটোদিকে থাকা দরকার। দরকার আর কে না বোঝে? তাহলে খুড়ারা বা ভাইরা সরুর দিকে একটা হ্যানডেল বানিয়ে আর-একজনকে বসিয়ে দিল না কেন। করাতের আওয়াজ কিছুক্ষণের মধ্যেই তার কানের ভিতর দবদবাতে শুরু করে। কপালের পাশে দুই শিরাও। বাইরের আওয়াজ কানে আসে তবে ঢোকে না। মাথা ঘেমে ওঠে। গায়ের তপনটা খুলে ফেলতে মন করে। করাত-চালানোর ছন্দটা আর হাতেই আটকে না থেকে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে চায় কিন্তু ছড়িয়ে পড়তে পারে না। যে-কাঠের টুকরোটা খাড়া টুকরো করছে—সেটা এমনকিছু

বড় না যে দুই হাঁটুর মাঝখানে আঁটবে না। যোগা সেইরকমই আটকে নিয়েছে। কিন্তু আধাআধি নামার পর, বাইচনৌকার মাঝি যেমন চিত হয়ে যায় বৈঠার টানে, অতটা চিত হতে পারে না যোগা। তা করতে হলে—দাঁড়িয়ে করাত চালাতে হয়, কাঠটা আটকে রাখতে দুটো মোটা বাঁশের টুকরোকে মাথার একটু নিচে বেঁধে দিয়ে খাড়া একটা x বানিয়ে। নৌকো বানাতে নানা সাইজের নানা কাঠ লাগে—তাই x-এর জায়গাটা ওঠানো ও নামানোর ব্যবস্থা দরকার। আর, একটু বড়, দু-মুখে ধার করাত দরকার। একই সঙ্গে দুই দিক থেকে না-কাটলে আর কাজ এগুবে কী করে?

এই চিন্তাগুলি যোগেনের মাথায় ঢোকে করাত আরো জোরে চালাতে-চালাতে, আরো ঘামতে-ঘামতে। কানের ভিতরের শিরার দবদব ও কপালের দু-দিকের শিরার ঝিনঝিন ক্রমেই বাড়তে থাকে। কাল অন্ধকার জঙ্গলের ভিতর দিয়ে নৌকোটার গুণ ধরে সেই এক কিশোরের নিজেরই শ্রমের কাছে নিজের বাধ্যতা যেমন অদৃশ্য হতে-হতেই হয়ে উঠেছিল একটা ক্ষমতা, যোগেনের এখন তেমনই ঘটছে—যেন, তার শরীরের ভিতরের ক্ষমতাই চিরে দিচ্ছে এই কাঠের টুকরো, যেমন রামচন্দ্রের হাতে হরধনু ভেঙে গিয়েছিল। শরীরের ভিতরের এই ক্ষমতাটা কাঠ-চিরবার সময় যে কিছু ছিটকে যাচ্ছিল, ছিটকে নষ্ট হচ্ছিল, কাজের বেগে যোগেনের মনে হয়, এটুকুই-বা নষ্ট হচ্ছে কেন, এটুকুকেও চিরবার ক্ষমতায় লাগালে কাঠটা তো আর-একটু বেশি চেরা হত, শুধু বাঁশের একটা x বানিয়ে নিলেই আর করাতের সরু-দিকে একটা হ্যানডেল লোহা-ঝালাইয়ে লাগিয়ে দিলেই...। ঝালাই মৈস্তারকান্দিতে হয় না। গৌরনদীতে? ঝালকাঠিতে? যোগেন করাত-চালানোর গতি বাড়াতে-বাড়াতেই মনে আনার চেষ্টা করতে থাকে—লোহার ঝালাই আর-কোথায় হতে পারে? যোগেনের মনে আসে না। যোগেনের মনে আসে না—এই তার চলাফেরার একটা কোনো জায়গা—যেখানে লোহার ঝালাই-কাজ হয়। তাই? এতক্ষণ তার মনে হচ্ছিল ছোটখুড়োরাই কিছু ভাবতে চায় না। শরীরের ক্ষমতাই করাতে যাচ্ছে—এটা ছোটখুড়োরা ভাবে না। শরীরের অর্ধেক ক্ষমতা করাতে ঢুকিয়ে অর্ধেক টাইমে কাজ সেরে ফেলার উপায়টা ছোটখুড়োদের খেয়ালই হয় না। না-হলে, কাজের ভিতরে ঢুকে যাকে কাজ খুঁড়ে বের করতে চায়, তার মাথায় কি কাজ ছোট করে নেয়ার উপায় না-এসে পারে? যোগেন যদি লাফ দিয়ে এসে করাত না ধরত, তাহলে কি বার লাইব্রেরিতে বসে-বসে সে এই x ও হ্যানডেলের কথা ভাবতে পারত? ছোটখুড়োরাও কাঠ চিরতে-চিরতে নিশ্চয়ই ভেবেছে—সে-ও মনে করতে পারেনি, ঝালাই, লোহার ঝালাই হবে কোথায়। তাহলে দুই পুরুষের বাপবেটা ধরে ঝালাইয়ের জায়গা খুঁজে পায় না বটে, তবু যোগা—যোগেন, যোগেন মণ্ডল, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, জে এন মণ্ডল—বিএ, বিএল, মেম্বার—ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, এমএলএ হতে পারে।

এই চিন্তাটার মানে কী হল, ঝালাইয়ের সঙ্গে মেম্বারির বিবাদ কোথায়—এসব যোগেনের মাথায় আসে না। যেমন তার মাথায় এটাও আসেনি যে অর্ধেক-টাইমে আর অর্ধেক-খাটনিতে কাঠ চেরা হলে বাঁচানো টাইম আর খাটনি নিয়ে করবেটা কী ছোটখুড়ো? টাইম আর খাটনি—দুটোই যদি ফালতু হয়ে যায়, তাহলে হাতপায়ে বাত ধরবে, গিঁঠে-গিঁঠে।

যোগেন করাত চালাচ্ছিল দ্রুত, কাঠটাকে দুই পায়ের মাঝখানে জুতমত বাগাতে পেরেছে, যোগেন করাতের তালে-তালে নুয়ে পড়ছিল, সোজা হচ্ছিল, নুয়ে পড়ছিল, সোজা হচ্ছিল। তার কপালের ঘাম নাকের পাশ দিয়ে তার ওপরের ঠোঁট বেয়ে মুখের ভিতর ঢুকছে। তার শরীরের দোলায় যোগেনের ঘাম ছিটকেও পড়ছিল এদিকওদিক। যোগেনের মনে এখন কোনো আওয়াজের অর্থ তৈরি হচ্ছিল না, যদিও আওয়াজগুলি তার কান পর্যন্ত আসছিল। যোগেনের

কানে বা মনে এসে যায়—'উজিরপুর', 'বানারীপাড়া'। ওখানে লোহার কামাররা আছে না? ঝালাইয়ের কামার? কোদাল, কুড়াল, দাও, কাঁচি দাও, কাঁচি, বঁটি—এর কোনোটাতেই তো ঝালাই নেই, কাঁচি-সাঁড়াশি-জাঁতিতে তো নাটবল্টু। বালতি ফুটা হয় না বানারীপাড়া-উজিরপুরে? মেরামতির ঝালাইয়ে কি করাতের হ্যানডেল জোড়া যায়? যোগেন আরো একবার তার খোঁজা সারা করে—নাঃ, বরিশালে লোহার ঝালাই নেই। কিন্তু ঝালাই থাকলে কী হত, ঝালাই না-থাকায় কী লোকসান, সেসব নিয়ে যোগেনের মনে কোনো প্রশ্নই নেই। যেদিকে ঢল সেদিকে জল—এটা যেমন একটা প্রাকৃতিক নিয়ম, যার লঙ্ঘন নেই—তেমনি খাটার মানুষও কম খাটনি চায় আর খাটনির টাইম কমাতে চায় এমন একটা প্রাকৃতিক সত্যেরও যেন কোনো লঙ্ঘন নেই।

খাটনির পরিমাণ ও সময় নিয়ে একটা এই প্রাকৃতিক সত্যে যোগেন নিশ্চিত পৌঁছে গেল কোন্ দিক দিয়ে? কেউ তাকে বা সে-ও নিজেকে জিজ্ঞাসা করেনি—যে-টাইমডা বাঁইচবেনে, সেই টাইমডায় কাম দিব কেডা।

ল-পড়ার সময় কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে খাওয়া-থাকার বিনিময়ে চাঁদসির ডাক্তারের দুই ছেলেকে যোগেন পড়াত, তার ওপর টিউশনি করত ও প্রুফ দেখত। হ্যারিসন রোডের মোড়ে গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকার প্রেশে প্রুফ দেখে হেঁটে ফেরার সময় দেখত—ট্রামরাস্তা জুড়ে ঝালাইয়ের নীল বিদ্যুৎ—আকাশে-মাটিতে ট্রামের তার-লাইন ঝালাই হচ্ছে।

যোগেনের সংবর্ধনা

'আরে যোগা, তোর কানে ঢুকে না?'

ছোটখুড়ো এসে দাঁড়ায়। যোগা চোখ না তুলে বলে, 'খাড়াও'।

১৮

ছোটখুড়ো দেখে তক্তাটা ফালা হয়ে যেতে আর দুই-চার ঘষা মাত্র দরকার। ছোটখুড়ো দাঁড়িয়ে থাকে যতক্ষণ-না তক্তাটার একটা ফালি নিচে পড়ে যায়।

'যা, যা, তোর মাস্টার আইছে। সেই আশুবাবু।'

'আশুবাবু স্যার? আরে কও কী?'

'তুই যা না। আমি এহ্যানে যা করনের করি।'

'আশুবাবু', বলতে-বলতে যোগেন নৌকোর গলুই পেরিয়ে দুয়ারে ঢুকে দেখে—সত্যি, আশুবাবু স্যার তাদের দাওয়ায় বসে আছেন আর বাড়ির সবাই তার সামনে দাঁড়িয়ে। ধুতির খুঁটে মুখের ঘাম মুছতে-মুছতে প্রায় ছুটে এসে, 'স্যা—র', বলে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে, আশুবাবুর দুই পায়ের ওপর মাথা নামিয়ে আনে আর দুই হাতে তার পা জড়িয়ে থাকে, কিছুক্ষণ। আশুবাবুর চোখে জল। যোগামা শাড়ির খুঁটে সশব্দে নাক ঝাড়ে। যোগেনের কোঁকড়ানো কুচকুচে বাবরি চুলে দুই হাত রেখে, আশুবাবু বলে, 'ওঠ্, অ্যাহন্, ওঠ্'।

'আপনারে স্যাবা দেয়া কি যোগার শ্যাষ হয়? গৌর রে—'

যোগামা বলে ওঠে।

যোগেন মুখ তুলে ওখানেই হাঁটু বেড় দিয়ে বসে, মুখটা বাঁয়ে-ডাইনে ঘাড়ে ঘষে চোখদুটো মুছে নেয়। যোগেনের দু-কনুই পর্যন্ত কাঠের গুঁড়ো, দুই পায়েও। সে তার সারা মুখটায় হাসির

জ্যোৎস্না ছড়িয়ে বলে, 'স্যা-র আপনি আইলেন ক্যান এই কোরস রাস্তা ভাইঙ্গ্যা? আমি তো যাইত্যামই। দাড়ি রাইখছেন ক্যান স্যার? পরামানিকরা নাই নাকী?' যোগেনের হাসির বাহার যে কত! এই যেমন চোখে জল, হাতে মাটি আর মুখটায় স্থলপদ্ম ফুটে ওঠার হাসি। আবার যখন বুক খুলে, গলা খুলে, সারা শরীর দুলিয়ে হাসে তখন মনে হয় বটগাছে ঝড় ঢুকেছে। যখন যোগেন মুখ টিপে হাসে তখনো ধরা পড়ে যায় সে মনে-মনে কোনো বুদ্ধি আঁটছে বা তার ভিতরে-ভিতরে রাগ কাঠপোড়া আগুনের মত ধিকধিক করছে। এটাই বোধহয় যোগেনের সবচেয়ে বড় গুণ—দেখলেই মনে হয়, লোকটার ভিতর কোনো ছলনা নাই, সে নিজেকে একেবারে মেলে দেয়, রোদের মত।

আশুবাবু বলে, 'অ্যাহন তোরে আমার দাড়ির কথা ভাইবব্যার লাগত না। দ্যাশের দাড়ির কথা ভাব্।'

'স্যার, কন কী, দ্যাশের দাড়ি?' যোগেন মাটির ওপর চড় মেরে ডিগবাজি খায়, হো-হো হাসি থামিয়ে বলে, 'স্যার, সবাই কয় দ্যাশসেবা, দ্যাশভক্তি, দ্যাশোপ্রেম। আর আপনি কইলেন—দ্যাশের দাড়ি। দ্যাশের দাড়ি কাটা হবে—পরামানিক যোগেন মণ্ডল।'

যোগামা একটি জামবাটিতে—সেই যে-জামবাটিটি যোগা তার বাবার মাথায় ফেলেছিল—মুড়ি আর গোটাদুয়েক কাঁচালঙ্কা দেন। আশুবাবু বলে ওঠেন, 'মুড়ি খাওয়ার দাঁত নাই, খাব ক্যামনে?' ছোটখুড়ি চাপা স্বরে বলে, 'অ্যাহন তো মানুষ আইসবই, ঘরে কিছু তো থোয়া লাগে।' আশুবাবু তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, 'আমার নাগাল দাঁতনড়া লোক আর কয়ডা আইসব? যারা আইবো তাগ দাঁত আছে, মুড়ি চিব্যাবার পারব। আমার না-হয় দুগা খৈ দ্যাও।'

ছোটখুড়ি এসে মুড়ির বাটিটা তুলে নিতে গেলে যোগেন সেটার দিকে হাত বাড়ায়, 'মুড়ির বাটিটা ফ্যারত্ নেওনের কী হইল। আমাগ তো দাঁত আছে।'

'চুপ যা তো বোকাডা। মুড়ি নিবি তো নে, কোঁচড় ফ্যাল, বাটি ছাড়, মাস্টারবাবুরে কি খৈ দিব কলাপাতা কাইট্যা?' যোগেনের মেলে ধরা ধুতির কোঁচায় ছোটখুড়ি মুড়ির বাটি উপুড় করে যায়। যোগেন, 'আরে, সরষ্যার ত্যালও দিছে দেহি।' যোগেন মুড়ি মাখতে থাকে। আরো দু-চারজন এসে মুড়ি খেতে শুরু করে। যোগেন একটা কাঁচালঙ্কা এককামড়ে অর্ধেক করে। ইতিমধ্যে ছোটখুড়ি সেই জামবাটিতেই খৈ আর বাতাসা এনে আশুবাবুর পাশে রাখে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—বারথি তারা ইনস্টিটিউশনের ইংরেজির মাস্টার ছিল। জলিল মাস্টারের পাঠশালার পড়া শেষ হলে তো যোগার কাজকামে নেমে পড়ার কথা। পাঠশালে তো আর ক্লাশ-টেলাস ছিল না। ঐ বর্ণপরিচয়, হস্তলিপি, ধারাপাত আর আর্যা শিখতে-শিখতেই ছাত্ররা পড়া ছেড়ে কাজে জুড়ে যেত, তারপর, একে-একে যুক্তাক্ষর, ব্যঞ্জনবর্ণ, স্বরবর্ণ ভুলতে-ভুলতে নিজের নাম লেখাটাও ভুলে যেত। একে-একে ছাড়ত আবার একে-একে এসে বসত। এটাই বরাবর চলে আসছে। যোগেন কোনো কাজে লাগার আগেই এই সবগুলো শিখে তো ফেললই, মনেও রাখল। জলিল মাস্টারের পাঠশালের সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক ঘটনা যে যোগেন কড়াকিয়া ও পঁচিশের নামতা পর্যন্ত বলতে পারত, যোগ ও বিয়োগ অঙ্ক করতে পারত ও যদিও সে গুণভাগ শেখেনি তবু শুভঙ্করের আর্যা অনুযায়ী এক কাঠা জমির এক-ক্রান্তির হিশেব পর্যন্ত মুখে-মুখে করে দিত, ছটাক-পাইয়ের তো কথাই নেই। এক পণ-এর হিশেবের গোলমালটা যোগা ধরতে পারত না। তাতে যোগার কোনো দোষ নেই। বরিশালে সুপুরির পণ ষোল গণ্ডায় আর আলুর পণ কুড়ি গণ্ডায়। যোগা যা শিখেছে, তা যে কাজে লাগছে—এটাই সকলের কাছে তার শিক্ষার প্রমাণ। অগত্যা তাকে ক্রোশখানেক উত্তরে বারথি তারা স্কুলে ভর্তি

করা হল। মাস্টারমশায়রা ওকে ক্লাশ ফোরে নিয়ে নেন। কিন্তু বংশের প্রথম ক্লাশ ফোরে পড়া ছেলের পড়া চালিয়ে যাওয়া এতই কঠিন যে যোগাকে স্কুল ছাড়তে হল। কিন্তু যোগা বছর খানেক পরে ফিরে এল। স্কুল ছেড়ে দেয়ার পর স্কুলে ফিরে আসা যোগাদের সমাজে কল্পনারও বাইরে। সম্ভব যে হয়েছিল তার প্রধান কারণ নিশ্চয়ই যোগার নিজের জেদ, দ্বিতীয় কারণ যোগামা আর যোগার মা—এই দুজনের জেদ। সেই জেদেও কাজ হত না, যদি আশুবাবু যোগার বাবাকে এক হাটে পেয়ে বকে না দিতেন। আশুবাবুর বকার কোনো কারণ ছিল না—যদিও ক্লাশ ফোরেই এটা সবাই বুঝেছিল—যোগা পড়াশুনোয় খুবই ভাল। সে-বোঝার জোরে আশুবাবু রামদয়ালকে এমন ধমকে উঠতেন না, 'তোমাগ কোনোদিন কোনো উন্নতি নাই। সেই আদিকাল থিক্যা তো তোমাগ সমাজে অক্ষরজ্ঞান গোমাংসতুল্য। বাড়িভর্তি অতগুল্যান মূর্খ লইয়্যাও তো প্যাটের ভাত জোটে না। একখান ছাওয়াল অ্যাডডু লিখাপড়ায় মন লাগাইছিল—সেডারেও স্কুল থিক্যা ছাড়াইয়া গোয়ালে পুরলা। স্কুলে পাঠাইয়্যা দিও যোগারে।' যোগার বাবা রামদয়াল খুবই ঠান্ডা, কারো চোখের দিকে তাকিয়ে কথাই বলতে পারেন না আর কেউ যদি পরিষ্কার হুকুমের গলায় কোনো কথা বলে—রামদয়াল সঙ্গে-সঙ্গে সেটা মেনে না নিয়ে পারেন না। রামদয়াল আড়ালে-আবডালে থেকে কোনোরকমে টিকে যেতে চান। এই ভয়েই রামদয়াল সব সময় কাঁটা—কারো কাছে কী দোষ করে ফেললেন, বুঝি। আর বামুন-কায়েত বা নায়েব-গোমস্তাকে দূর থেকে দেখলেই রামদয়াল সরে পড়েন। হাটের ঐ ভিড়েও রামদয়াল যে আশুবাবুর চোখে পড়ে গেছেন, এটাই তার নিজের কাছে প্রায় পরশুরামের মায়ের ধরা পড়ে যাওয়ার অপরাধ। তার ওপর আশুবাবু যে যোগাকে স্কুল-ছাড়ানোর জন্য রাগ করলেন—তাতেই রামদয়ালের নিজেকে নরকের জীব মনে হয়েছে। তারও পরে আশুবাবু যখন হুকুমের সুরে যোগাকে স্কুলে পাঠাতেন বললেন, রামদয়াল হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। যাক, হুকুম একটা হয়েছে। সেই সন্ধ্যাতেই রামদয়াল যোগাকে স্কুলে পাঠিয়ে দিতে পারলে স্বস্তি পেতেন। পরের সকাল পর্যন্ত তাকে এমন করে থাকতে হয় বা ঘুমোতে হয় যেন সে সেখানে নেই।

আশুবাবুর যে খেয়াল ছিল যোগা আর স্কুলে আসছে না, তারও একটা কারণ ছিল। বারথি ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম বললেও কম বলা হয়, বলা উচিত বারথি একেবারে ব্রাহ্মণ গ্রাম, ব্রাহ্মণ ছাড়া কিছু নেই। সে-ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেক জমিদার-জোতদার-তহশিলদার আছে, চালকলা-বাঁধা পুরুতও আছে আবার গাঁজা-ভাঙ খেয়ে খারাপ জায়গায় পড়ে থাকা মহাজনপুত্রও আছে। বারথির হাওয়াতে একটা বামুনগুমোরের গন্ধ ছিল। সেখানে ক্লাশে একমাত্র নমশূদ্র ছাত্র হয়ে থাকা যোগার পক্ষে কঠিন ছিল। পরে, অবিশ্যি যোগা পুরো স্কুলেরই একমাত্র 'চাঁড়াল'-ছাত্র হয়েছিল। আশুবাবুর ক্লাশেই তিনি দেখেন দুই নম্বর সারির কোণের দিকে যোগার সঙ্গে তার পাশে-বসা ছাত্রদের যেন একটু ঠেলাঠেলি হচ্ছে আর তাদের পেছনের বেঞ্চের ছেলেরাও বেঞ্চির তলা দিয়ে পা চালিয়ে যেন যোগাকেই খোঁচাচ্ছে। আশুবাবু তাদের কাছে গিয়ে, কী হয়েছে, জানতে চাইলে চক্রবর্তী বাড়ির ছেলেটি বলে উঠল, 'স্যার, ও কিছুতেই কথা শুইনতেছে না।'

'কী কথা?'

'ওকে বারবার কইব্যার লাগছি—অন্য একডা বেঞ্চে গিয়া বোস।'

'কী হয়েছে?'

আশুবাবু যোগাকে জিজ্ঞাসা করতেই যোগা বলে, 'স্যার, ঐরা আমারে কইছে শুদ্দুর হইয়া তুই আমাগ সঙ্গে বসিস ক্যান? আমি কইছি—স্কুলডা শুধু তোমাগ লাইগ্যা বানান্ হয় নাই। আমাগ লাইগ্যাও হইছে।' আশুবাবু ঐ বামুন ছেলেদের ওপর মনে-মনে খুবই ক্ষেপে গেলেন।

কিন্তু খুব একটা কিছু বলতে সাহস পেলেন না—কী যেন, কোন্ কথা কীভাবে রটবে আর বামুনরা একজোট হয়ে তাকে বিপদে ফেলবে। মাত্র এইটুকুই বললেন 'যে ও যেখানে বইসছে সেখানেই বসব, তোমরা যদি চাও অন্য বেঞ্চে যাও।' এই ঘটনার কিছুদিন পর থেকেই যোগাকে আর স্কুলে না দেখে আশুবাবুর মনে হল—এই বামুন-ছেলেগুলোই বোধহয় ঐ শূদ্র ছেলেটিকে তাড়াল, তার যেন উচিত ছিল আর-একটু সাহস দেয়া যোগাকে। ফলে যোগা স্কুলে ফিরে এলে স্বস্তি পেলেন। তারপর অবিশ্যি যোগাকে কারো ওপরই নির্ভর করতে হয়নি। সে যে স্কুলের সবচেয়ে ভাল ছেলে—এ নিয়ে কারোই কোনো প্রশ্ন ছিল না। তার ক্লাশে আশুবাবু যোগাকে পড়া ধরতেন না। অন্য উচ্চবর্ণের ছাত্ররা যখন পারত না, একমাত্র তখনই যোগাকে উত্তরটা দিতে বলতেন। ক্লাশ এইটে একদিন এরকম একটি ঘটনায় আশুবাবু যোগাকে বললেন, 'তাইলে মণ্ডলমশায়, তুমিই বলো।' আশুবাবু ক্লাশের এমন পরিস্থিতিতে যোগাকে 'মণ্ডল' বলেই ডাকতেন, বামুনদের একটু ঠাট্টা করতে। সেদিন প্রশ্নটা যোগার পক্ষে সহজই ছিল কিন্তু যোগা পড়া করে আসেনি বলেই উত্তর দিতে পারল না। আশুবাবুর মনে হল—যোগা তাকে অপমানে ফেলে দিল। যত ভাল ছাত্রই হোক, সে একদিন একটা প্রশ্নের জবাব তো নাই দিতে পারে। কিন্তু আশুবাবু যে যোগাকে 'মণ্ডলমশায়' বলে ডাকলেন, 'তাহলে তুমিই বলো' বললেন, এতে একটু অহংকার ছিল। অপ্রস্তুত হয়ে বলে ফেললেন, 'ও, ভুইল্যা গিছিলাম, এডা তো ক্লাশ এইট, তোমার তো তাইলে উচ্চশিক্ষা হইয়্যা গিছে। এর বেশি আর তোমার কী হইব?'

আশুবাবুর কথার মধ্যে যোগেনের নমশূদ্র-পরিচয় ইঙ্গিত ছিল। তেমন ইঙ্গিত হয়ত সে দিতে চাননি। তবে তিনিও তো ব্রাহ্মণ। হয়ত-বা, নিচু জাতের মধ্যে শিক্ষাসভ্যতার বিস্তার হোক—এটা মন থেকেই চাইতেন। হয়ত, নিজেকে এমন করেই দেখাতে চাইতেন যে ব্রাহ্মণ হলেও একজন উদার হতে পারে। বা, এর বিপরীতটা—ব্রাহ্মণত্ব যার স্বধর্ম, সে ব্রাহ্মণ, যেমন অন্যবর্ণ যার স্বধর্ম সেও ধার্মিক। বা, হয়ত নিজের ব্রাহ্মণত্বে তার গৌরববোধ ছিল ও সেই গৌরববোধকে নিজেরই কাছে প্রামাণিক করে রাখতে প্রচলিত হিন্দু বামুনদের থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র রাখতেন। তার হয়ত হিন্দু না-হলেও চলত কিন্তু ব্রাহ্মণ না-হলে চলত না। এইসব আনুমানিক আত্মপরিচয়ের যে-কোনোটিতে, বা এক-এক সময় এক-একটিতে, থিতু হতে, যোগেন হয়ত হয়ে উঠেছিল তার অবলম্বন ও যুক্তি, দুইই। যোগেন তুচ্ছ একবারও যদি তার মুখ রাখতে না পারে, তাহলে তাকে জাতের ইঙ্গিত করতে আশুবাবুর বাধেও না, মনস্তাপও হয় না।

যোগেনের রিস্টওয়াচ ও ফাউন্টেন পেন লাভ ও নানা বাবু সাক্ষাৎ

খৈ-মুড়ি খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। আশুবাবু বললেন, 'তোর সইরষ্যার ত্যালের ঝাঁঝে তো আমার নাক শুল্যায়। দেহি, আমারে এক ফোঁটা ত্যাল দ্যান।'

১৯

'আর-দুগা খৈ দেই?' ছোটখুড়ি তেল দিতে এসে বলে।

'না, না, লাইগলে তো চাইত্যামই।' খৈ আর মুড়ি শেষ হয়ে গেলে একটু হাসহুস হয়। তারপর আশুবাবু বলে, 'বাবা যোগা, আমার শিক্ষকজীবনে তুমি আমার শ্রেষ্ঠ ছাত্র—এইডা তোমার পক্ষে আর খুব বড় কথা না।'

'কী যে কন স্যার?'

'ফ্যার, মুহে-মুহে কথা?' আমার শিক্ষকজীবন আর কদডুগু? তুমি তারে বড় কইর‍্যা দিছ। আমি তোমারে দুইখান উপ্‌হার দিব—তোমার আরো জয় চাইয়্যা। তোমার অ্যাহন যা কাম—তাতে উপ্‌হার দুইডা তোমার কামেও লাইগব। দেহি তোর বাঁ-হাতখান।' যোগেন তার বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দেয়। আশুবাবু নিজের বাঁ কব্জি থেকে ঘড়িটা খুলে যোগেনকে পরিয়ে দিতে থাকেন।

যোগেন বলে ওঠে, 'স্যা—র'।

আশুবাবু বলে—'আমার বিয়্যার সময় আমার শ্বশুরমশাই নিজে খাশ শাহিবগ দুকান থিক্যা কিন্যা আমারে এটা দিছিলেন ইন দি ইয়ার নাইনদিন হানড্রেড অ্যান্ড থার্টিন। চব্বিশ বছরে মেরামতির দরকার হয় নাই। এক্কেরে রাইট টাইম। তোমারে তো অ্যাহন সময় মাইন্যা চইলবার লাগব। সাইমা সাইমা ঘড়ি।'

'স্যার, আপনারে কি ঘড়ি মাইন্যা চইলবার হব না?'

আশুবাবু তার বুক পকেটের একটা পেন খুলে যোগেনের সেই জামার বুকপকেটে লাগিয়ে দিতে-দিতে বলে, 'আর এই পেনডা রাখো। ফাউন্টেন পেন। রাজা। এইডা আমি শখ কইর‍্যা পুজার এক স্পেশ্যাল ট্রেইন থিক্যা কিনছিলাম। ইন দি ইয়ার নাইনটিন টুয়েন্টি ওয়ান। কুইঙ্ক কালি ভইরব্যা। কী শক্ত নিব। তোমার তো অ্যাহন সর্বক্ষণই কলম লাগে। কী দিয়্যা লিখ, কোর্টে, দুয়াত-কলমেই? এইবার তুমি এডডু ভদ্দরলোক সাইজ্যা আমার লগে চলো। বাবুগ এডডু দেখাইয়্যা আনি। তোমারে অগ কাছে আর নিয়্যা যাবে কেডা?'

'সেইডা কামের হইব স্যার। কিন্তু, আপনি আমার ভার এমন বাড়ায়্যা দিলেন স্যার? আপনার ঘড়ি, ফাউন্টেন পেন, স্যার—' যোগেন আশুবাবুকে আগের মত করেই প্রণাম করে, আশুবাবু তখন দাঁড়িয়ে। বাড়ির সকলে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। আশুবাবু বলে, 'নে, উঠ, চল্'। যোগামা চোখের জল মুছতে-মুছতে বলে, 'অরে উইঠব্যার কবেন না। দিক। প্রাণভইর‍্যা ভক্তি দিক।'

যোগেন উঠে যোগামার হাতে পেন আর ঘড়ি দিয়ে বলে, 'চলেন স্যার'।

'জামাকাপড় বদল্যাইলা না?'

'সে তো স্যার বাবুগ নাগাল ধুতিপাঞ্জাবি।'

'সেইডাই পরো।'

'সে তো ধলা স্যার।'

'ধুতিপাঞ্জাবি কি ধলা না হইয়্যা কালা হব?'

'স্যার, সে আমি পারব না। মইস্ত্যারকান্দির রাস্তা দিয়্যা আপনার লগে বাবু সাইজ্যা জুতা মচমচ্যায়া যাইবার পারব না।'

'জুতাও পরবা না? তো এডা ক্যামন দ্যাখায়?' আশুবাবু যোগেনের মাথা থেকে পা খুঁটিয়ে দেখেন। বাবরি, কোঁকড়ানো চুল, মোচও আছে একডা, গালে বাসি দাড়ি, মাপে ছোড একডা তপন, হাঁটুর উপুড় তুলা লাল পাইড়্যা কোঁড়া ধুতি, পায়ে আর হাতে অ্যাহনো কাঠের গুঁড়া।

আশুবাবু বলে ওঠেন, 'এডা ক্যামন দেখায়? উনারা তো তোমাক মেম্বার অব দি লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লি অব বেঙ্গল, না ভাইব্যা, বরিশালের জলডাকাইত ভাবব।' কথাটা বলতে-বলতেই আশুবাবু রাস্তার দিকে হাঁটা দিয়েছেন। যোগেন তার পিছু-পিছু নামে। আশুবাবু পশ্চিমে চলেন। মৈস্তারকান্দির বাবুরা ঐ ডাঙার দিকেই থাকেন।

তিনি বলে চললেন, 'যোগা, আমি যে তোমারে বাবুগ কাছে নিয়্যা যাচ্ছি এর কারণডা কি তুমি আন্দাজ কইরব্যার পারো?'

'আমার দিক থিক্যা পারি—আমারে একা যাইতে হইল না। আপনার দিক থিক্যা পারি না।'

'এই বাবুগ কারো-কারো জীবনের কাম একডাই। অন্যে যে যাই করুক, সেইডা কী কইরলে আরো ভাল হইত তার বিধান দেয়া। এই-যে তুমি বাবুগর লগে দেখা কইরতে যাত্যাছ, এডা তো তুমি নাও যাইব্যার পারতা। তুমি তো জিতছ বরিশালের লাইগ্যা। মৈস্তারকান্দির থিক্যা না। যদি না-যাইত্যা, বাবুরা কিছু নাও কইব্যার পাইরত। কিন্তু তুমি যে যাইত্যাছ, ব্যাস, শিয়ালরে ভাঙা বেড়া দেখানো হয়্যা যাবে নে। বাবুরা কেউ-কেউ ভাইব্যা বসত—এটা তাগ বিচারের বিষয়। কাউরে বাদ দেয়া যাবে না—তালেই তো হইল তোমার! যত্‌গুল্যা দেব্‌তা সবার পায়েই ফুল-ব্যালপাতা দাও। তাও অরা কইব্যার ধইরবেনে—ফুলপাতা এড্ডু বেশি দিলে ভাল হইত।'

'আপনি স্যার, সাইধ্যা এই গোলমালে ঢুকেন ক্যান? যাওনের কাম নাই। চলেন ফিরি।'

'তার লগেই তো আমি তোমারে নিয়্যা যাত্যাছি। কথাডা য্যান অ্যামন কইর‍্যা রটে যে আশুমাস্টার তার নতুন মেম্বার ছাত্ররে নিয়্যা আসছিল। দোষগুল্যা তাহাইলে আমার ঘাড়ে আইসব। চলো, আগে হেডমাস্টারমশায়ের লগে যাই। কম কথার মানুষ। বাজে কথায় নাই। চিনো তো?'

'হ্যাঁ। নদী ভাইঙ্গ্যা আইসছেন তো। উনার ছাওয়ালরে একবার দেখছিলাম, আইসছিল, য্যামন চেহারা, ত্যামন বাবু, কইলকাতায় থাহে।'

'পুত্র না। পোষ্যপুত্র।'

'আপনাগ যে স্যার কতরকম পুত্র হয়? কাণীন পুত্র, করণপুত্র, ঔরসপুত্র—'

'আরে, খাইছে, তুই আবার এই সব কথা জাইন্যা ফেলছিস?'

'স্যার— ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এব চ।
গুঢ়োৎপন্নোহপবিদ্ধশ্চ দায়াদা বান্ধবাশ্চষট্‌॥
কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ ক্রীতঃ পৌনর্ভবস্তথা।
স্বয়ংদত্তশ্চ শৌদ্রশ্চ ষড়দায়াদবান্ধবাঃ॥

কিছু তো আর বাকি থাইকল না স্যার। তার উপর দোষ দ্যান মুসলমানগ চার বিবি বইল্যা। আরে, অগ তো বিবি। আর আপনাগ তো পুত্রের বিছন। নিজেরডাও পুত্র, বন্ধুরা কইর‍্যা দিলেও পুত্র, বিয়্যার আগে গর্ভবতীরও পুত্র। স্যা—র।'

আশুবাবু থেমে গেলেন। ওঁরা যে-রাস্তা দিয়ে এগচ্ছিলেন সেটাই হেডমাস্টারের বাড়িতে যাওয়ার সরকারি পথ ও ঘুরপথ। কিন্তু ওঁরা যেদিক থেকে আসছিল সেদিক থেকে এটাই সোজা

রাস্তা। হেডমাস্টারের বারবাড়ির পেছনে তারা পৌঁছে গিয়েছিল। আশুবাবু থেমে গিয়ে বললেন, 'যোগা, হিন্দু কাস্ট সিস্টেম ইজ এ ভেরি কমপ্লেক্স ট্র্যাডিশন দ্যাট হ্যাজ কাম ডাউন টু আস ফ্রম ওভার এলং আনডিটারমিন্ড পাস্ট। তুমি যা কইছ হ্যাই কথাডা ফ্যালনা না—সেটা আমি বুঝি। কিন্তু এই বাবুগ কারো কাছে তুমি সংস্কৃত কইয়ো না।'

'হ্যাঁ স্যা—র।' ওঁরা বারবাড়িটা ডান হাতে রেখে এগচ্ছিলেন। বাঁ হাতে বিরাট এক দিঘিতে জল টলটল করছে, এই মাঘেও—দিঘির কোণে-কোণে কিছু-কিছু জলজ ফুল ভেসে আছে। যোগেন বলে, 'বা বা, দিঘি তো কাটাইছেন য্যান মানসসরোবর।'

'আরে, হাইলি লার্নেড ফ্যামিলি। উনি বেঙ্গল এডুকেশন সার্ভিসে ছিল। এ কী তোমার বারথি ইশকুলের আশু স্যার? শোনো, সংস্কৃত কইয়ো না। দুই-একখান ইংরাজি বরং কইব্যার পারো।'

যাঁর কাছে আসা তিনি, হেডমাস্টার, তার বারবাড়ির বারান্দার এই পুবকোণেই বসেছিল একটা চেয়ারে। ধুতির ওপর একটা চিনে কোট। তার সামনে খুব বড় একটা মাঠ—বাড়ির বারদুয়ার, ঐ দিঘির পাড়েই। সেই মাঠে দুটি বাচ্চা ছেলে—বড়টির রং যেন মাঘের রঙে মিশে যাচ্ছে—হাঁটু পর্যন্ত খোলা ধুতি পরা আর একটা তপন পরা আধবুড়ো গোছের লোকের সঙ্গে খেলছে, মনে হয় ডাংগুলি। যোগেন নিশ্চিত জানে ঐ লোকটি হয় নমশূদ্র বা মুসলমান।

আশুবাবু বললেন, 'স্যার, আমি আশু মুখার্জি, বারথি তারা স্কুলের।'

শুনেই হেডমাস্টার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন—'বসুন, বসুন, আরে একটা চেয়ার দাও কেউ।'

যোগেন একলাফে বারবাড়িতে ঢুকে একটা চেয়ার নিয়ে এসে দেয় আর একঝলক দেখে নেয় আরো দুটো চেয়ার আছে। উকিলের সেরেস্তার মত দুই চৌকি মেলানো। শতরঞ্চির ওপর শাদা চাদরে ঢাকা। চাদরটা এত ধবধবে নয়। চালের বেড়ার মাঝামাঝি সম্রাট পঞ্চম জর্জের বাঁধানো ছবি টাঙানো—ছবিটা পুরনো। পঞ্চম জর্জের পর তো দুইবার সম্রাটবদলি হইল—অ্যাহন তো ষষ্ঠ জর্জ।

হেডমাস্টার বললেন, 'আপনার সঙ্গে তো আরো একজন আছেন, মনে হচ্ছে। ওঁর বসার জন্য—'

আশুবাবু বাধা দেন, 'অরেই তো নিয়্যা আইসছি আপনারে দ্যাখ্যাইতে—'

'কিন্তু আমার তো দৃষ্টিশক্তি নেই, আমি তো দেখতে পারি না।'

'স্যা—র, এ দর্শনে তো চক্ষু লাগে না। আমাগ গ্রামের ছাওয়াল। আমাগ বারথি স্কুলের ছাত্র। এই ভোটে এমএলএ হইছে। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল বিএ, বিএল।'

'এমএলএ কি অ্যাক্রোনিম?'

'স্যার? এই যোগা, পায়ের ধুলা নে।'

'এমএলএ কি কোনো, অ্যাব্রিভিয়েশন? কথাটা তাহলে কী? আমি ঠিক জানি না,' যোগা তার পা ছুঁলে সে বলে, 'এঁর বয়স কত?'

'কত আর হইব? এহনো চ্যাংড়াই। তিরিশ পাড়াইছে।'

'উনি কী হয়েছেন? কথাটি কী হল—এমএলএ?'

'ও। মেম্বার অব দি লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লি। এমএলএ। আমি বুঝি নাই স্যার আপনি এইডা জিগাইছেন। কী যেন কইলেন—অ্যাক্রো না অ্যাব্রো? সেডা স্যার বুঝি নাই।'

'হ্যাঁ। অ্যাক্রোনিম কথাটি নতুন, ওঁরাও সবে ব্যবহার করছে। এখনো বোধহয় বছর-দুই হয়নি, ওঁরা শব্দটা বানিয়েছে। কিন্তু অ্যাব্রিভিয়েশন তো পুরনো শব্দ—কোনো বড় শব্দ ছোট করে নেয়া, এই যেমন, মিস্টার, মিসেস, এটসেটেরা, মিসলেনিয়াস, বা বেঙ্গল পুলিশের বদলে বিপি।

এমন শব্দগুলি দিয়ে ওরা নতুন-নতুন শব্দ বানাতে শুরু করেছে, সবে শুরু করেছে—জিবি মানে গ্রেট ব্রিটেন, গক্ মানে জেনারেল অফিসার ইন কম্যান্ড। তাহলে তো ইনি খুবই সাফল্যলাভ করেছেন। মেম্বার অব দি লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লি। কিন্তু কী লেজিসলেট করবেন?'

'ক্যান্ স্যার, আপনারে ভোট দেয়ায় নাই—গত সোমবার দিন?'

'আমাদের এখানে, এই গ্রামে ভোট হয়েছে?'

'হইছে তো স্যার। আমরা সবাই ভোট দিছি? আপনারে কেউ তালাশই দ্যায় নাই? দ্যাখছ কাণ্ড!'

'না। তাতে কিছু হয়নি। কিন্তু উনি, আমাদের গ্রামের মানুষ, আমাদের প্রতিনিধি, এটা তো গৌরবের কথা। একটু বসুন। আমি ভিতরে আমার বৌমাকে খবর দিচ্ছি। এ—ই জুড়ান।'

যে-লোকটি বাচ্চাদুটির সঙ্গে খেলছিল সে ছুটে আসে—'কত্তা'।

'বৌমাকে বলো, এঁরা এসেছেন শুভ সংবাদ নিয়ে—'

'কী নিয়্যা আইসছেন কত্তা?'

'সুসংবাদ। বলো, ভাল খবর।'

লোকটি ভিতরবাড়ির দিকে দৌড়য়—একঝলক বাচ্চা দুটির দিকে তাকিয়ে। যোগেন বারান্দার মেঝেতে একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে হেডমাস্টারের কথাগুলো বেশ মজা নিয়ে শুনছিল। লোকটি যে ভিতরবাড়ির দিকে ছুটতে গিয়ে বাচ্চাদুটির দিকে একঝলক তাকাল, তাতেই যোগেন বুঝে যায়—তার প্রধান কাজ বাচ্চাদুটিকে পাহারা দেয়া—যাতে দিঘির দিকে চলে না যায়। দিঘির পাড় উঁচু, বাচ্চারা উঠতে পারবে না। যোগেন দৌড়ে বাচ্চাদুটির কাছে গিয়ে তারা যেটাকে গুলি ভেবে নিয়ে ডাং দিয়ে মারছিল, সেই গুলিটা মাঠ থেকে তুলে খেলতে শুরু করে। যোগেন নিশ্চয়ই আগের লোকটির চাইতে বাচ্চাদের কোনো নতুন মজা দিতে পেরেছিল। তারা হেসে ওঠে আর সেই লোকটি ফিরে আসে 'ভাল খবর'-এর খবর দিয়ে। কিন্তু যোগেন খেলা ছেড়ে যায় না।

'এই যোগা, এইখানে আয়,' আশুবাবুর ডাকে যোগেন বারান্দায় ফিরে গিয়ে দেখে—আশুবাবুর হাতে ছোট্ট গোল একটা কাঁসার বাটিতে পায়েস। আশুবাবুর হাতের বাটিটার চাইতেও সুন্দর—ধবধবে শাদা আর সেই শাদার ওপর ফুলকারি একটা এনামেল-করা বাটিভর্তি পায়েস—মেঝের ওপর রাখা, যোগার জন্য। যোগা জানে—এইসব বাটি-থালা বাবুদের ঘরে থাকে খানদানি মুসলমানদের জন্য। তারা কেউ-কেউ হয়ত কাজেকম্মে বছরে দু-বছরে দু-একবার আসেন। তাঁদের দাওয়াত দিতে হয় সম্মানের সঙ্গে। গ্রামের যারা রোজই আসে নানা কাজে কিন্তু যাদের ছোঁয়া জল খাওয়া বাবুগ মানা, তাদের জন্য, মুসলমান-নমশূদ্র-জোলা-কৈবর্তদের জন্য, কলাপাতা তো আছেই। ঐসব জাতের যারা বাড়িতে সব সময়ের কাজ করে তাদের বাসনকোশন তাদের কাছে থাকে—জল খাওয়ার ঘটও।

পায়েস শেষ হতে আর কতক্ষণ?

'যাই। তাহাইলে, স্যার।'

'হ্যাঁ, আমি খুবই সন্তুষ্ট হলাম।'

আশুবাবু আর আগের রাস্তায় ফেরেন না। এবার বারবাড়িটাকে ডানহাতে রেখে সোজা যেতে-যেতে বলে, 'ঠাকুরবাড়ির দুয়ার মাইর‍্যা রাস্তায় পড়ব, চল্।'

হেডমাস্টারের বাড়ি আর ঠাকুরবাড়ির মাঝখানে খালের মতই একটা গর্ত, বর্ষায় নিশ্চয়ই জল আসে, তার ওপর একটা বাঁশপাতা। আশুবাবু সেটা টলটলিয়ে পার হতে-হতে বলে, 'একডা

ধরার কিছু দ্যায় নাই?' যোগা তার ওপর একটা পায়ের ভর রেখে টপকে যায়। ওঁরা ঠাকুরবাড়ির রান্নাঘরের পেছন দিয়ে দুয়ারে ঢোকেন। আশুবাবু চেঁচান, 'ঠাকুরমশায় কই'। রান্নাঘর থেকে নওমা বেরিয়ে আসেন। 'দ্যাহেন, ঠাউর‍্যানি, কারে আনছি। আমাগ যোগা, ভোটে জিতছে।'

'আ হা হা রে! মামার খ্যাতে বিয়্যাল গাই, সেই সূত্রে মামাত ভাই। উনি আইছেন বারথি [illegible]কা যোগারে চিন্যাইতে? অর বংশের কারে চিনি না? অর মাডা বড় ভাল ছিল রে। আমি [illegible] যোগারে ভোট দিয়্যা আসছি, আমাগ ঘরের ছাওয়াল—তারে ছাইড়্যা কারে দিমু?' 'আপনারা সব ভোট দিলেন আর হেডমাস্টারমশাই কিছু জানেনেই না।'

'জানান্ তো হয় নাই। উনি তো চোখে দেইখবার পায় না। এখানে তো দৃষ্টিহীনগ ভোট দেওনের ব্যবস্থা ছিল না।' যোগেন প্রণাম করতে কোমর ভেঙেছিল। নওমা একটু সরে গিয়ে বললেন,

'অ্যাহন আর ছুঁইস না গোপাল। ঠাকুর, পূজায় বসছে। নারায়ণের ভোগ রান্ধছি।'

'তাহালি আমরা চলি অ্যাহন', আশুবাবু পা বাড়াতেই নওমা বলে ওঠেন, 'খাড়াও, খাড়াও।' ছুটে যান বড়ঘরের বারান্দা দিয়ে ঠাকুরঘরে—সবাই চেনে ঐ ঠাকুরঘর। বড় পুরোহিত গ্রামে এই একজনই। নিঃসন্তান। দজ্জাল বলে নওমার নামডাক আছে।

বেলপাতা দুটি আর দুটি গ্যাঁদা ফুল এনে নওমা বলে, 'নে বাবা, নারায়ণের আশীর্বাদী নে। আমাগ মুখ উজ্জ্বল কইরছ। যোগা, তোর সেই দানখণ্ডপালা শুইনব্যার গিছিলাম! কী গান যে গাইছিলি বাপ।' নওমা স্পর্শ বাঁচিয়ে যোগার এক হাতের পাতার ওপর রাখা আর-এক হাতের পাতায় নারায়ণের আশীর্বাদী দেন। যোগা হাত মুঠো করে নিয়ে কপালে ঠেকায় আর আশুবাবুর পেছন-পেছন বেরতে-বেরতে এক কানে ফুল, আর-এক কানে বেলপাতাটা গুঁজে নেয়।

রাস্তায় পড়তেই সামনে শুকনো জোলা—বর্ষায় ভরে যায়। ওপারে রায়দের পাকা বাড়ি। বাইরে ঢাকা বড় বারান্দা। আশুবাবু সেদিকেই হাঁটেন—'রায়গ ক্যামন ছত্রখান ব্যবস্থা। বড় ছাওয়াল তো পাগলাছাগলা। নটীবাড়ি পইড়্যা থাহে। আর মাইঝ্যাল ছাওয়াল গান্ধী কইর‍্যা জ্যালে।'

রায়মশায় বেত-ছাওয়া একটা বড় চেয়ারে, একটা হাতলের ওপর দুই পায়ের আঙুলগুলো জড়িয়ে প্রায় শুয়েই ছিল। তার মাথার ওপর চেয়ারের মাথা আর সারা শরীর মোটা গরম চাদরে ঢাকা। পোর্টিকোতে উঠে আশুবাবু বলে, 'রায়মশায়, ঘুমাননি?'

'না। জাগ্রতই আছি।'

'যোগেনরে নিয়্যা আইল্যাম আপনার লগে দেখা করাইতে?'

'ক্যা? আমার কি ল্যাজ গজাইছে? আর মণ্ডলের বেটার ল্যাজ অ্যাহনো তো খসে নাই, গাছেই তো থাহে।'

'অয় তো জিত্যা এমএলএ হইছে।'

'হয়, জানি, ঐ নেড়াগোর সাথে শুদ্দুরগুল্যার মিল করাইয়্যা কংগ্রেসের অমন একখান নেতারে যে হারাইল—সেডাই তো গ্রামের লজ্জা।'

অস্বস্তিকর নীরবতা রায়মশায়ই ভাঙেন—'ভিতরবাড়ি যাও। ঠাউর‍্যানি গিছেন কুমিল্ল্যায়। সুবর্ণ আছে।'

আশুবাবু সিঁড়ি বেয়ে নামেন। অপমানিত বোধ করেন। সে একে টিচার, তার ওপর ব্রাহ্মণ। বামুনকে ভিক্ষা দেয়ারও একটা রীতিপ্রকরণ আছে। সে ছাত্রগর্বে যোগেনকে নিয়ে ঘুরছেন বলে সে তো আর চাঁড়াল হয়ে যাননি যে রায়মশায় তাকে ভিতরবাড়ি দেখায়। সুবর্ণ কার্যত ওঁর

রক্ষিতা। নমশূদ্র মেয়ে—পঁচিশ বছর ধরে আছে, সে-ই এ-বাড়ির কর্ত্রী। রায়মশায় তাকে সুবর্ণের কাছে যেতে বলতে পারেন? কিন্তু ভিতরবাড়ি ঢোকার পথ ডানহাতি। আশুবাবু যদি না যান তাহলে সেটা রায়মশায় দেখতে পাবেন। রায়মশায়ের চোখের ওপর দিয়ে ডাইনে না-ঘোরার সাহস আশুবাবুর নেই। সে ভিতরবাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে বলে, 'তুই ঘুইর‍্যা আয়। আমি যাইয়্যা কী করব?'

যোগেন দৌড়ে ভিতরে যায়। কোঁকড়ানো চুলে, খাটো জামায়, খাটো কোঁড়া ধুতিতে এই দৌড়টা তাকে মানিয়েও যায়। সে ডাকতে শুরু করে, 'মামি কই, বর্ণমামি, অ বর্ণমামি।'

তার ডাক শুনে ঘর থেকে বারান্দা, বারান্দা থেকে সিঁড়ি, সিঁড়ি বেয়ে দুয়ারে নেমে আসে সুবর্ণ, কাঁচাপাকা চুল, যেন আরো দিঘল, গায়ের কাল রঙে যেন রোদ ঠিকরচ্ছে। সুবর্ণমামি তো বারবারই নীলরঙের কালীঠাকুরের মত সুন্দর। চুলডা কোমর ছাপিয়ে নেমেছে। আর, চোখ দুটো যেন চিলের ডানা মেলছে। বরাবরই যোগার মনে হয়—যে যাই কক্, সুবর্ণমামিরে দেইখতে যেমন তাতে রায়মশায়ের ঘরেই মানাইছে, ও আমাগ ঘরে আমরা রাইখতে পারত্যাম না। কথাডা কখনো যোগা কয় নাই। এইসব কথা কহাবলা যায় নাকী। যোগার মায়ের বাড়ি যে-গাঁওয়ে তার এক আধবুড়ার লগে বিয়া হইছিল সুবর্ণর। সেই সূত্রে যোগার মামি। রায়মশায়ের এই বাড়িডার আসল ঠ্যারান তো মামিই। সব ছাওয়াল-পাওয়াল-বৌরা মানে, ডরায়।

সুবর্ণ যোগেনের মাথা বুকে নিয়ে কেঁদে ওঠেন, 'শ্যাষে তুই দুধের ছাওয়াল করলি তারকারে বধ। আমাগ জাইতের এতখান গর্বের কথা শুইনছে নাকী কেউ কুনোদিন? যোগা, তুই তাহালি মামিরে ভোলস নাই?'

যোগেনের খুব ভাল লাগছিল মামির বুকে। এমন নরম, কোমল, সুবাসিত বুকে সে কখনো মাথা রাখেনি। কিন্তু মামি চোখের জল মুছতে ও নাক ঝাড়তে মাথাটা ছেড়ে দিল। 'মামি, আইজ যাই, আশুস্যার বাইরে খাড়ায়্যা আছে—'।

'খাড়া, খাড়া এডডু' সুবর্ণ আবার অতগুলো সিঁড়ি ভেঙে বড় বারান্দায় উঠে যান, কয়েক পা হেঁটে একটা ঘরে ঢুকে যান। সে-ই ঘরে ঢোকার সময়ই যোগেনের মনে হয়, সুবর্ণমামির যেন পায়ে আলতা থাকার কথা। কেন-যে মনে হল, সেটা যোগেন বোঝে, মামি নেমে এসে 'দ্যাহ, ছেলে আইছে ক্যামন, ধুতির কোঁচা পাত্', যোগেনের ধুতির কোঁচা নারকেলের চিড়া, বরফি, নাড়ু, তক্তি, চন্নপুলি, খেজুর‍্যা গুড়ে মাখা মুড়কি একেবারে ভয়ে যায়—'আরে, এগিলা খাবে নে কেডা?'

'ছাওয়াল-পাওয়ালরে দিস। আমার নাম কইর‍্যা দিস।'

যোগেন ঘুরতেই মামি যোগেনের জামার বুকপকেটে কয়েকটি নোট ঢুকিয়ে দেয়। যোগেন ভুরু কুঁচকে জিগগেস করে, 'টাহা দ্যাও ক্যা?'

মামি যোগেনকে দরজার দিকে ঘুরিয়ে বলে, 'তরে দিছি। অ্যাহন তো তোর কত খরচ। করবি কোত্থ্যা সে-কথা কেউ বুঝে?'

'সে তো খরচা আছেই। তুমি তার কী করবা?'

'যা পারি যহন আসবি, দিব।'

যোগেন বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ঘুরতেই মামি পেছন থেকে ডাকে, 'যোগা—আ, হোন।' যোগেন যে-দুপা গিয়েছিল সেখানে দাঁড়িয়ে ফেরে। সুবর্ণও এগয় না। যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখান থেকেই বলে, 'রায়কর্তা কইছিল, তোরা নাকী মুসলমানগ সঙ্গে মিল্যা শাহেবগ পক্ষে? কংগ্রেসের বিপক্ষে? এইডা তো কংগ্রেসের বাড়ি। বটুক তো জেলে। তোরা মাঝেমইধ্যে শাহেবগ

বিপাকেও দুই-চাইরডা কথা কইয়্যা থুস। না-হয় তো আমারে রায়কর্তা ঠ্যাস দিয়্যা-দিয়্যা কথা কন।'

আশুবাবু ও যোগেনকে পোর্টিকোর সামনে দিয়েই ডানদিকে ঘুরতে হয়। ওদিকে যে ঘোরা হবে, সেটা যোগেনের জানা ছিল না। আশুবাবুই ঠিক করেছিল, কবরেজবাড়ি সেরে চুনাবাড়ির পেছন দিয়ে আবার রাস্তায় উঠবেন।

ওদের বাড়ি পেছনে আড়াল হয়ে যেতেই যোগেন বলে, 'স্যার, মামি তো আমার কোঁচর ভইর‍্যা যা দিছে তা খাইয়্যা শ্যাষ কইরতে দিন তিন লাইগব, একা-একা খাইলে। একডা মুখে দিবেন না কী স্যার', বলে যোগেন কোঁচর খুলে দাঁড়িয়ে পড়ে। সেদিকে না তাকিয়ে আশুবাবু প্রায় যেন চিৎকার করে ওঠেন, 'উনি ভাইবছেনডা কী? য্যান উনি একাই বামুন। তাও তো সিলেটি বামুন। আমি তো রাঢ়ী কুলীন। আমারে ভিতরবাড়ি দেখায়? থো তোর নারকোলের তক্তি। ওর এডডাও আমি ছুব ভাবছিস?'

যোগেন খুব জোরে হেসে ওঠে, 'স্যার, বামুনগ নিজেদের মইধ্যে এই বর্ণভেদডা তো জলচল-অচলের থিক্যাও রগড়ের। স্যার, বামুনগ নিজেগ জাতপাঁত টাইট কইর‍্যা নিয়্যা তার বাদে শুদ্দুরগ শুদ্দুর কইরলে ভাল হইত।'

'অ। আইলেন আমার নতুন রঘুনন্দন।'

আশুবাবু রেগে থাকায় ছোট-কবরেজমশাই বাড়িতে নেই শুনে আর ঢুকলেনই না। রাস্তায় নেমে ফিরে গিয়ে চিৎকার করে বললেন, 'ছোড কবর‍্যাজমশায় রে কইয়া দিয়ো যোগেন মণ্ডল এমএলএ-রে লইয়্যা আসছিল্যাম বারথির আশুমাস্টার।'

চুন্যাবাড়ির পেছন দিয়ে একটু জঙ্গল ভেঙে রাস্তায় উঠে পশ্চিমে পা বাড়িয়েই আশুবাবু উলটোদিকের বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থেমে যান, 'আরে, রায়বাহাদুর আইছেন—পছন্দ হয়। আয় তো, দেইখ্যা যাই।'

'এইডা নিয়্যা?' যোগেন তার ফোলা কোঁচড় দেখায়। তলপেটের নীচে জিনিশটা খারাপই দেখাচ্ছে।

'আরে, রায়বাহাদুর তো আবার শাহেব রে! এইডা তো তোর কোঁড়লের লাগান দেহায়। কাঁধে ফেল।'

'ধুতিডা তো খাটো। কোঁচড় কান্ধে ফেইললে তো বাবা মহাদেব ব্যার হয়্যা পড়বে নে!'

'হাজারবার কইল্যাম—জুতা-ধুতি-পাঞ্জাবি পইর‍্যা আয়। তো মাত্বর কইলেন উনি মাটির সন্তান হইবেন। তো হ ঐ কোঁড়ল লইয়্যা।'

'ছাড়ান দ্যান না। আমি পরে আইস্যা রায়বাহাদুররে ভক্তি দিয়্যা যাব।'

'তাহালি আমার বংশপরিচয়ডা উনি জাইনবেন ক্যামনে যে আমি এমন প্রাতঃস্মরণীয়ের মাস্টার।'

'কন কী স্যার? রায়বাহাদুরের এইসব জানা নাই?'

'না, না। আইসছি যহন, দ্যাখা সাইর‍্যাই যাই। তুই ঢোকার সময় কোঁচড়ডা পিছনে নে আর বসার সময় কোলে নিস। রায়বাহাদুর আছেন নি?'

একটি মেয়ে দরজা খুলে দিল। যোগেন বলে ওঠে, 'অরে টুনি, তুই অ্যাহন নি এই বাড়িত্?'

'হ্যাঁ। সে অনেকদিন হইল তো। জয়াদিদির ছাওয়াল হইল না?'

'জয়াদিদি কনে?'

'স্যায় তো ঝালকাঠি। ফিইর‍্যা আইসব। আইসো যোগেনদাদা। তুমি তো ভোটে জিত্ছ?

বসো। কত্তারে ডাকি? যোগেনদাদা, আমি তোমাক ভোট দিছি। মাইয়্যাছাওয়াল তো খুব কম। তাই লজ্জা লাগে। বসো, কত্তারে ডাকি?'

যোগেন একটা সুযোগ পেল, তার কোঁচড় লুকিয়ে মেঝের ওপর বসতে।

'ও কী যোগেনদাদা। মাটিত্‌ বইসল্যা ক্যান? তুমি আমাগ মইধ্যে একখান মানুষ। তুমি মাটিত্‌ বইসলে তো আমাগ বসাশোয়ার জইন্য গর্ত খুঁইজব্যার লাগব। সমানে-সমানে বসো।'

যোগেনের প্রিপজিশন

২০

মেঝে থেকে যোগেন একটু চমকে টুনির দিকে তাকায়। যোগেনের মুখটা চওড়া, তাই সে মনোভাব গোপন করতে পারে। তবু সে যে একটুও না হেসে টুনিকে দেখতে থাকে ও টুনিও নড়ে না, তাতে একটা পরিস্থিতি তৈরি হল। সে-পরিস্থিতি যোগেনের মুখমণ্ডল বা স্বভাবের গড়ন দিয়ে ঢাকা গেল না। যোগেন দেখে—একটি নমশূদ্র মেয়ে, যোগেনের চাইতে অনেক ছোট, কত হবে, বিশ-পঁচিশ, বিয়ে হয়েছে, শ্বশুরবাড়ি কাছেরই একটা গ্রামে, নিশ্চয়ই ছেলেমেয়েও আছে, রায়বাহাদুরের বাড়ি কাজ করে। এসব কাজের কোনো নিয়ম নেই, যাঁদের বাড়িতে থাকে—তারা বলেও না কাজের লোক, বলে—আমাগ বাড়ির। ছোট বা বড় বামুন-কায়েত বাবুদের বাড়ির সঙ্গে এমন দু-এক-ঘর নমশূদ্র জুটে যায়। যে-কোনো বাবুবাড়িতে গেলেই দেখা যায় এদের—জামা পরে না, এক পাল্লা কাপড়, দৌড়ে-দৌড়ে বাড়ির কাজ সারে। টুনি চায়—যোগেন সমানে-সমানে বসুক। যোগেন ধুতি-পাঞ্জাবি-জুতো পরে এই তিনচারটি গ্রামের একজন রায়বাহাদুরের সঙ্গে কথা বললে হয়ত টুনির আরো গর্ব হত। যোগেন মেঝে থেকে উঠে চেয়ারে বসল—কোঁচড়টা কোলের ওপর রেখে।

'বসো', টুনি যেন যোগেনের চেয়ারে বসাটায় খুশি হয়ে বলে, 'বসো, কত্তারে ডাকি।'

টুনি যেতে-না-যেতেই রায়বাহাদুর ঢুকলেন। রায়বাহাদুর যে রায়বাহাদুর ও শাহেব—তার প্রমাণ, গ্রামে এক তার বাড়িতেই দরজা বন্ধ থাকে, কেউ ডাকলে খোলা হয়। অনেক বাড়িতেই কাছারিঘর বা বারবাড়ি আছে—ঐ শতরঞ্চি পাতা, এক রায়বাহাদুরের বাড়িতেই আছে বৈঠকখানা—চেয়ার-টেবিল দিয়ে সাজানো অফিসঘরের মত, দেয়ালে ফটো ও ক্যালেন্ডার ঝোলানো—ফটো মহারানি ভিক্টোরিয়া ও পঞ্চম জর্জের, ক্যালেন্ডার গ্ল্যাক্সো কোম্পানির। রায়বাহাদুর বেশ বড় জমিদার—গৌরনদীতে তো আছেই, তবে ওঁর আসল জমিদারি যশোরে, ফরিদপুরেও কিছু। রায়বাহাদুর উকিল—প্র্যাকটিশ করেন যশোর কোর্টে, কিন্তু ওঁদের বংশের আদিনিবাস মৈস্তারকান্দি সে ছাড়েননি, নিজের পানসি আছে, যখন-তখন আসেন, এখানকার বাড়িতেই অনেকেই থাকেন, রায়বাহাদুরের জমিদারির নামও মৈস্তারকান্দি এস্টেট, রায়বাহাদুর যে রায়বাহাদুর কেন, সেটা কারো জানা নেই কিন্তু রায়বাহাদুর যে রায়বাহাদুর সেটা সকলেই জানে ও মানে। রায়বাহাদুর প্লেয়ার্স সিগারেট খান—টিনের ওপর দেশলাই, বুড়ো আঙুলে চাপা থাকে। মৈস্তারকান্দিতে সিগারেট খাওয়ার মত দ্বিতীয় লোক কেউ নেই—এক পুজোপার্বণে দেশের বাড়িতে কেউ-কেউ না এলে। রোজ দাড়ি কামানো লোকও আর-কেউ নেই।

'কেডা আইছে?' বলে রায়বাহাদুর ঢোকেন। তার পরনে ধবধবে ধুতি আর গায়ে সবুজ

জমিতে খয়েরি পাড় দেয়া বালাপোশ।

'ও। আশু স্যার? ইউ আর লেট বাই ওয়ান ডে। আমি তো কাইল আসছি।'

'এরে তো চিনেন?'

'মানে, তুমি কি আমার পয়েন্ট অব প্রাইডে পকেটমার কইরব্যার চাও আশু? মৈস্তারকান্দির কাউরে আমি চিনি না, তার নাম ও বাপঠাকুরদার নাম জানি না—এডা তো অ্যাহনো ঘটে নাই। অ্যান্ড মোরওভার মিস্টার মণ্ডল ইজ এ রাইজিং ল-ইয়ার ইন বরিশাল বার। দি মোস্ট অব অল হি ইজ দি ফার্স্ট ইলেকটেড এমএলএ ফ্রম আওয়ার কনস্টিটুয়েন্সি। ওয়েল, মিস্টার মণ্ডল, ভেরি গুড অব ইউ টু ভিজিট মি', রায়বাহাদুর যোগেনের মুখের ওপর কথা শেষ করেন। যোগেন আশুবাবুর দিকে তাকায়—সে কী করবে।

আশুবাবু উত্তেজিত ভঙ্গিতে যোগেনকে বলে, 'স্পিক টু হিম ইন ইংলিশ। হি উইল লাইক টু হিয়ার ইউ স্পিকিং ইংলিশ।'

'উই বিলং টু দি সেম প্রফেশন আশুস্যার অ্যান্ড ইন দি অ্যাসেমব্লি হি উইল হ্যাভ নো আদার ল্যাংগুয়েজ দ্যান দি কিংস।'

'মিস্টার রায়বাহাদুর, ইফ ইউ থিঙ্ক সো ইউ শুড হ্যাভ টেকন এ পজিশন এগেইনস্ট দি ইনট্রোডাকশন অব বেঙ্গলি অ্যাজ দি মিডিয়াম অব ইনস্ট্রাকশন ইন দি ম্যাট্রিক স্ট্যান্ডার্ড'—আশুবাবু বলে।

'হাউ কুড আই এগেইনস্ট দি স্ট্রং অ্যালায়েন্স অব লর্ড অ্যান্ডারসন, মিস্টার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। অ্যান্ড হাসান সারওয়ারদি? নিদার ডু আই হ্যাভ এনি লোকাল স্ট্যান্ডিং। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, মিস্টার মণ্ডল?'

যোগেন নিজেও টের পায়নি ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত বাংলায় পড়া ও পরীক্ষা-দেয়া যাবে—এই প্রশ্নটি ওঠামাত্র সে তার হাঁটু পর্যন্ত কোঁড়া ধুতি, ছোট শার্ট, খালি পা ও কোঁচড়ের কথা ভুলে গিয়েছে। এই পোশাক-আশাকের পেছনে নিশ্চয়ই তার আত্মসচেতনতা ছিল। আবার, শিক্ষার মাধ্যমঘটিত এই কথায় তার সেই আত্মসচেতনতার একটা অপসরণও ঘটল বটে কিন্তু সেই অপসরণের ফলে উজ্জ্বল ও স্পন্দিত এক আত্মসচেতনতা—যা তার অর্জন, ফুঁড়ে উঠল। যোগেনের গলা গম্ভীর ও চাপা।

'হোয়াইল অবজারভিং দি ডিবেট, আই অ্যাম এ লিটল কনফিউজড ওভার দি ইউজ অব দি টার্মস, প্যাট্রিয়টিক অ্যান্ড নন-প্যাট্রিয়টিক।'

'হোয়াট ইজ দি কনফিউশন অ্যাবাউট? টু গো ফর বেঙ্গলি ইজ এ ন্যাশনালিস্ট প্রোগ্রাম, মিস্টার মণ্ডল।'

'আই হ্যাভ দি ফার্দার কনফিউশন রিগারডিং হু দি ন্যাশনালিস্ট ইজ?'

'দোজ হু ক্লেইম দেমশেলভস টু বি ন্যাশন্যালিস্ট। দ্যাটস কংগ্রেস।'

'ইজ ইট নট এ ব্যাড জাজমেন্ট টু অ্যাকসেপ্ট ওয়ানস ক্লেইম অ্যাবাউট হিমসেলফ? দ্যাট লিভ্‌স নো গ্যাপ ফর ক্রিমিন্যাল-ল টু অ্যাক্ট টু ডিটারমিন দি ট্রুথ', যোগেন বোঝে যে তার কথাটা সে ঠিক বলতে পারল না, রায়বাহাদুরের মুখচোখেও সেটা বোঝা গেল। আশুবাবু বলে উঠলেন, 'ইউ আর টকিং অ্যাবাউট দি মিডিয়াম অব ইনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ইউ আর রেইজিং কোয়েশ্চেনস অ্যাবাউট ল। আই ফেইল টু ফলো।'

'নো, নো, হি হ্যাজ এ পয়েন্ট দেয়ার। হি সেস দ্যাট ওয়ান শুড নট বি টেকন টু বি এ ন্যাশন্যালিস্ট অনলি অন হিজ ওন ক্লেইম। দেয়ার হি ইজ মিটিং মাই পয়েন্ট দ্যাট কংগ্রেস

ইজ ন্যাশন্যালিস্ট ওনলি বিকজ অব ইটস ওন ক্লেইম। ইয়েস, মিস্টার মণ্ডল, ইউ আর কারেক্ট? বাট হ্যাভ আই ফলোড ইউ কারেক্টলি?'

'ইয়েস স্যার, আপটু দ্যাট ইউ হ্যাভ পুট ডাউন মাই আর্গুমেন্ট ফার বেটার দ্যান মি।'

'বাট দি আর্গুমেন্ট ইজ ইয়োর্স। লেট মি গো ফারদার। উইল ইউ এগ্রি টু ডেসক্রাইব দোজ পার্টিজ লাইক, সে, মুসলিম লিগ অর সে কৃষক-প্রজা পার্টি, অ্যাজ ন্যাশনালিস্ট ইভন দো দে হ্যাভ নো সাচ ক্লেইম?'

'বাট স্যার, দে হ্যাভ আদার ক্লেইমস ফর রেকগনিশন। অ্যান্ড বাই দোজ ক্লেইমস দে মে বি রেকগনাইজড অ্যাজ ন্যাশন্যালিস্ট।' ঠিক এই জায়গায় টুনি একটা চিনে মাটির ডিশে ফোলা-ফোলা লুচি নিয়ে ঢোকে। সারা ঘরে ঘিয়ের সুবাস ছড়িয়ে পড়ে। টুনি যোগেনের দিকে এমন করে তাকায় যেন সে তার নিজের কানকে বিশ্বাস করছে না। যোগাদাদা রায়বাহাদুরের সঙ্গে সমানে-সমানে ইংরেজিতে কথা বলছে? যোগাদাদা কি এতটাই সমান-সমান? যোগা যদি খুব শুদ্ধ বাংলাতেও কথা বলত, তাও টুনি বুঝতে পারত না ও সে একইরকম অবাক হত। সেটাকেও সে ইংরেজিই ভাবত—কারণ, যা কিছু সে জানে না, তাকেই সে ইংরেজি ভাবে। কাকে আগে দেবে—সেটা ভুলে যায় টুনি, সে রায়বাহাদুরকেই এগিয়ে দেয়। রায়বাহাদুর বলে ওঠেন, 'করিস কী মা, অগরে আগে দে'। টুনি আশুস্যারকে দেয়। রায়বাহাদুর ততক্ষণে যোগেনকে বলছেন, 'উইল ইউ প্লিজ এক্সপ্লিকেট দি লাস্ট পয়েন্ট?'

'প্লিজ একসকিউজ মাই ইগনোরেন্স অব ইংলিশ ল্যাংগোয়েজ। দিজ পয়েন্টস আর সো ভাইট্যাল ফর আস দ্যাট আই লাইক টু স্পিক ইন বেঙ্গলি।'

'বাট মিস্টার মণ্ডল, ইউ আর টু এক্সপ্রেস ইয়োর ফিলিংস অব দি হার্ট অনলি ইন ইংলিশ ইন দি অ্যাসেমব্লি। অ্যান্ড ইউ স্পিক ভেরি ওয়েল। ইট ইজ সো ফরচুনেট দ্যাট দি গ্রেট ব্রিটিশ নেশন ইজ টিচিং আস দিজ পার্লামেন্টারি প্রসেসেস। ইফ-সান অব দি সয়েল লাইক ইউ বিকামস ইউজড টু দিজ প্রসেসেস, আনলাইক দি ইল্লিটারেট জমিনদার্স হু অয়্যার সুটস মেড বাই র‍্যানকিং অ্যান্ড ইভন র‍্যানকিং ক্যানট ম্যানেজ দেয়ার অড শেপ্‌স,' রায়বাহাদুর হাসলেন বলে আশুস্যার আর যোগেনও হাসল কিন্তু তারা কথাটা বুঝতে পারলেন না। টুনি দুই হাতে দুটো ডিশ নিয়ে এসে ডান হাতেরটা রায়বাহাদুরকে আর বাঁহাতেরটা যোগেনকে যখন দেয়, রায়বাহাদুর বলে, 'টুনি মা, আমারে মাত্তর দুইখান দে। ভাত খাব তো? নাইলে তো দুপুরের ঘুম আইসব না। মিস্টার মণ্ডল পারহ্যাপস ইউ নো দ্যাট আই অ্যাম এ ডাইহার্ড সাপোর্টার অব দি এমপায়্যার। দি ব্রিটিশ হ্যাজ মেড আস সিভিলাইজড। আই প্রে টু গড দ্যাট দি ব্রিটিশ নেভার লিভস আস টু এনি কাইন্ড অব ন্যাশন্যালিস্টস। বাট আই উড লাইক টু নো ইয়োর পয়েন্টস। দি ডিপ্রেসড ক্লাশেস উইল বি কিলড ইফ দি ব্রিটিশ লিভ্‌স।'

টুনি রায়বাহাদুরের ডিশ নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসে, যোগেনের ইংরেজি গলার স্বরটা শুনতে।

'মাই প্রোপোজিশন ইজ টু সিম্পল। হোয়েন দি মুসলিম লিগ পিপ্‌ল সে, আনলাইক কংগ্রেস, দ্যাট দে আর দি অনলি পার্টি টু রিপ্রেজেন্ট দি মুসলিমস—দে ওয়ান্ট টু অ্যাসার্ট দি মুসলিমস রাইট অ্যাজ এ পার্ট অব দি ইনডিয়ান নেশন, ইফ দেয়ার বি এনিথিং লাইক দ্যাট। সিমিলারলি কৃষক-প্রজা পার্টি অ্যাসার্টস্‌ দি পেজান্টস রাইট অ্যাজ এ পার্ট অব দি সো কলড নেশন। সে, দি ডিপ্রেসড ক্লাশেস অ্যাসার্ট দেয়ার রাইট অ্যাজ এ পার্ট অব দি সেম নেশন। দি কমপ্লিমেন্ট ডিপ্রেসড—'

'ইট ইজ অ্যান অ্যাডজেকটিভ যোগা, নট এ কমপ্লিমেন্ট'—আশুবাবু যোগেনকে বাধা দেন। যোগেন একটু হেসে বলে, 'স্যার, ইয়োর কারেকশন হেল্পস মি মোর। ইফ ডিপ্রেসড ইজ অ্যান অ্যাডজেকটিভ, দেন ইট মাস্ট বি রিলেটিভ টু অ্যানাদার অ্যাড্‌জেকটিভ, ইমপ্রেসড। ইফ দেয়ার বি এনি লো কাস্ট, দেয়ার মাস্ট বি সাম হাইকাস্ট। দে হাইড দিস বাই কলিং দেমসেলভ্‌স্ ন্যাশন্যালিস্ট।'

'বাট হোয়াট অ্যাবাউট দি মিডিয়াম অব ইনস্ট্রাকশন?' আশুবাবু যোগেনকে জিজ্ঞাসা করেন।

'সেই কথাডা কইতেই তো এতডা কথা। স্যার, আমি বুঝি বাংলায় পড়াশুনা হইলে আমাগ জাতের মানুষের বড় সুবিধা হয়, অন্তত বাংলাডা তো শিখতে পারব। কিন্তু আপনাগ তো স্যার ধনুর্ভাঙা পণ। শিখব তো ইংরাজিতেই শিখতে হইব। না হইলে শিক্ষা নাই।'

'তুমি ঠিক কইছ যোগেন। শিক্ষা যদি বেবাকরে দিবার হয়—তাহালি সবারগা ভাষাতেই দিবার লাগব। আমাগ তো শিক্ষায় দুর্ভিক্ষকালীন ব্যবস্থা। লঙ্গরখানা যদি খুইলব্যার লাগে তাইলে ভাল কইর‍্যা পাতলা-খিচুড়িই দিব্যার লাইগব। আমি তোমার পক্ষে যোগেন।'

'আরে, আমি একডা দরকারি কথা তুইলল্যাম শিক্ষার ব্যাপারে, আর যোগা নিয়্যা গেল ন্যাশনালিজমের ব্যাপারে। এইডা কী হইল?'

ওঁরা উঠে পড়েছিল। যোগেন তার কোঁচড়টা সামনেই ধরে থাকল, কোনো সংকোচ হল না, 'স্যার, ঐ কথাডার মীমাংসা নাই। শুইদ্ধ্যা শুইদ্ধ্যা আপনার মটকা গরম হইব।'

'ক্যান? নাই ক্যান?'

'আপনার লগে শিক্ষা কইতেই তো ইংরাজি।'

'তার বাইরে শিক্ষার আর আছে ডা কী?'

রায়বাহাদুর নিজেই দরজা খুলে দিয়েছিল।

বেরতে-বেরতে যোগেন বলে, 'বাংলা পইড়তে পাইরলে, অঙ্ক কইষব্যার পাইরলে আর বাংলাতেই লিখব্যার পাইরলে এড্ডু, সেইডা ক্যান শিক্ষা হয় না, স্যার?'

ওঁরা বাইরে এসে দাঁড়ালেন। রায়বাহাদুর যোগেনের কাঁধে বেশ জোরে তার বাঁ-হাতটা রেখে বলে উঠলেন, 'এডা কী হইল? যোগেনরে তো আমি রামদয়ালের বেটার বেশি ভাবি নাই। অ জিইতছে শুইন্যা ভাইবল্যাম, ঐ নমশূদ্রগুলানও অ্যাহন ন্যাশন্যালিস্ট হব নে। অ্যাহন তো দেইখতেছি, যোগেন আর আমি সব বিষয়েই একমত!'

'বিষয়গুল্যা কি সব ঠিক হইয়া গেল নি?' আশুবাবু বলে।

'অন্তত দুই-চাইরডা তো হইল। অও ন্যাশনালিস্টগুলারে পছন্দ করে না, আমিও করি না। অও কয়—কমপক্ষে যতটুকু শিক্ষা দরকার তা বাংলাতে হইলেই বেশি হইব। অও কয়—কংগ্রেস যদি ন্যাশনালিস্ট হয় তো মুসলিম লিগ হইব না ক্যান? যোগেন, এই কংগ্রেসিগুলাকে ঠ্যাহাও। এইগুলা তো যমের অরুচি। আর কী এক নেতা খুঁইজ্যা আইনছে। গান্ধী! আমাগ কি সাহা-শুড়ি কিছু কম ছিল?'

'তাইলে তো বিষয় একখান বাইড়্যা গেল—গান্ধী।' আশুবাবু একটু হাসি মিশিয়ে বলে।

'না। শুধু গান্ধী না। বাদ থাইকল, ধরো জমিদারি। বাদ থাইকল, ধরো, রিজার্ভেশন, বাদ থাইকল ধরো মহাজনি। যোগেন, তুমি যহনই পারবা আইসো, যশোরে পারো যশোরেই আইসো। না-হয় আমার পানসি কইর‍্যা সারাদিন ভাইস্যা সবগুল্যা কথা শ্যাষ কইর‍্যা নদী থিক্যা ফিরব।'

'যোগাদাদা, আইসো কিন্তু আবার', পেছনে দরজার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আঙুলে ভর রেখে খাড়া হয়ে টুনিও তার মুখ তুলে চিলের মত চেঁচায়।

'আইসবনে। লুচি ভাইজ্যা থুস।'

রাস্তায় উঠে যোগেন বলে, 'স্যার, অ্যাডডা কথা কই। এতখান যহন আইয়্যা পড়লাম, আমি আগৈলঝরাডা সাইর‍্যা বাড়ি ফিরি। আপনি এহান থিক্যা বারথির পথ ধরেন। আমি সদর যাওয়ার আগে আর-একবার আপনার লগে দেখা কইর‍্যা যাবু নে।'

'তুই কি আগৈলঝরাত্ আমারে লগে নিব্যার চাইস না?'

'সে কী কথা? কী যে কন স্যার?'

'আমি তো তাহাইলে তোর লগে আগৈলঝরা গিয়্যা ফিরার বাদে বারথির পথ ধইরব্যার পারি আর তুইও মইস্ত্যারকান্দির পথ ধইরবার পারস। আমারে অ্যাহনই খেদাবার চাইস ক্যা?'

আপনে স্যার আসলে নারদমুনি। খটখটি না বাধাইয়্যা পারেন না। আগৈলঝরা গিয়্যা ফিরতে তো বেলা শ্যাষ। শীতের বেলা আর কতক্ষণ? তাই কইল্যাম। কাম নাই আমার, আপনার খাটনি বাঁচাইয়্যা। চলেন, আগৈলঝরা। আমি আগৈলঝরা থিক্যা বারথি গিয়্যা আপনারে বাড়িতে গস্ত কইর‍্যা মৈস্তারকান্দি ফিরব।'

'সে তো তোর অনেক রাইত হইয়্যা যাবে নে।'

'সে যা হয় বুঝা যাবে। না-হয় তো আন্ধারে কুন খানায় কুন গর্তে পা ভাইঙ্গ্যা পইড়্যা থাকবে আর দুনিয়ার মানুষ কবে নে—ম্যাম্বার হওয়ার পরে যোগেনের পেরথম কাজ—মাস্টারের পা-ভাঙা।'

'তো চল্ বাবা, তাই চ-ল্। আমি আগৈলঝরা থিক্যা বারথি যাইব্যার পারব।'

ওঁরা হাঁটতে-হাঁটতেই কথা বলছিল। আশুবাবু বলে, 'টুনি তো লুচি দিয়্যা ঠাইস্যাই দিছে।'

যোগেন তার কোঁচড় দেখিয়ে বলে, 'আর বন্নমামি?'

'কী দিছে?'

'আপনি কি আর দেইখব্যার দিলেন? যে-রাগ রাইগলেন।'

'তুই এইডা বুইঝবি না। বামুনের অপমান।'

'এইডা একখান জবর কথা কইছেন স্যার। বামুনের অপমান আমরা বুইঝব না। দিনরাত, ধরিস না, ছুঁইস না, সইর‍্যা খাড়া শুনতে-শুনতে এমন হইছে যে ঘুমের মধ্যেও কাইত হব্যার পারি না। ভাবি, ঐখানে আবার কোন বামুন না-ঝ্যান খাড়াইয়্যা আছে। বামুনের অপমান আর আমরা বুইঝব ক্যামনে?'

'আরে, সে-কথা কই নাই। বামুন এহানে কজেটিভ নাউন না, যেমন তোগ বেলায়। এইডা এইহানে অবজেকটিভ নাউন। অপমান কার? না, বামুনের। বাংলার এই একখান বিপদ। এইগুল্যা ঠিক না কইর‍্যা বাংলারে শিক্ষার বাহন কইরলেই হয়? কইব্যার চাই, টু ডিসগ্রেস এ বামুন। আর বাংলায় কথাখান বললে অর্থ হইব, 'দি ডিসগ্রেস বাই এ বামুন। আমি কইছিলাম—রায়মশায় আমারে ব্রাহ্মণ বইল্যাই অপমান দিছেন।'

'সে তো তহনি বুইঝছি। একডা তিলকাঠি খাবেন নাহি স্যার? প্যাট-জিভ্ভা-গলা এক্কেরে পাতলা হইয়্যা যাবে নে, এমন মিষ্ট তিতা।'

'দে দেহি একখান।'

যোগেন কোঁচড় খুলতে গিয়ে প্রায় উলটে ফেলে। তাড়াতাড়ি গিয়ে রাস্তার পাশে ঘাসে বসে কোঁচড় খুলে তিলকাঠি খোঁজে। খুঁজতে-খুঁজতে বলে, 'ওটাও তো কজেটিভ হইব্যার পারে স্যার। বামুন তো বামুন বইল্যাই অপমান হইল আর-এক বামুন কর্তৃক।'

'তোরে আর নেসফিল্ড শেখান্ হইল না আমার। সে তো যা কইলি হবারই পারে—কজেটিভ

আর ইনস্ট্রুমেন্টাল অ্যাডভার্বিয়্যাল ক্লজ। ঐ তো তিলকাঠি। দুইখান দে। আমি তো এহানে ক্লজের কথা কই নাই—নাউনের কথা কইছি। ওহানেও তো একখান ভুল কইরলি প্রিপজিশনে। হইব 'অ্যাবাউট', কইলি 'রিগারডিং'। আর রায়বাহাদুর তো একজায়গায় 'অ্যাবাউট', কইলিলেনই না।'

'অ, উকিলদের ইংরাজি আর মাস্টারগ ইংরাজি আলাদা।'

যোগেন এবার কোঁচড়টা কোমরে বেঁধে নিয়েছিল। সেও একটা নিমকি খেতে-খেতে চলেছে।

'স্যার খুনের মামলায় মক্কেলরে ধইরছে, তারে জামিন নিতে হইব, জজশাহেবরে যদি বুঝাইবার না পারেন যে আপনি এক্কেরে পাগল হইয়া গিছেন আসামি আপনার এতখান আপন, তাহালি জজশাহেব জামিন দিবে না। প্রিপোজিশন ঠিক রাইখ্যা কি পাগল হওয়া যায়?'

ওঁরা যাচ্ছিলেন মৈস্তারকান্দির রাস্তা ধরে পশ্চিমমুখো। একটু পরেই রাস্তাটা শেষ হয়ে যায়। একটু উত্তর কোণের একটা পায়ে চলা রাস্তা ধরে বাকল-গৌরনদী আড়াআড়ি সড়কে ওঁরা উঠবেন। সেই সড়ক সোজা পশ্চিমে গিয়ে মিশেছে বাকলের বাঁধে। বাকলের বাঁধ বড় বাঁধ, চাকার মত ঘিরে রেখেছে আগৈলঝরাকে। আগৈলঝরাতে তো যোগেনকে যেতেই হত। তবে, যোগেন ভেবেছিল—এটা একটা আয়োজন করে করতে হবে। চারদিক থেকে সবাই আগৈলঝরাতে জড়ো হবে। মিটিং হবে, বক্তৃতা হবে। তার জন্য তো তৈরি হতে হবে—ভেবেচিন্তে করতে হবে। আজ না-হয় সে একাই যাচ্ছে।

আগৈলঝরার মহাত্মা ভেগাই হালদার মাত্র বছর চার হল, সেই কারণে ও ভেগাই হালদারের জীবনের বৈচিত্র্যের কারণেও হয়ত, তিনিই হয়ে উঠছেন নমশূদ্র জাগরণের প্রতীকপুরুষ—যোগেন ও তার মত তরুণ নেতাদের কাছে। ভেগাই হালদার প্রায় নিরক্ষরই ছিল। ভারতের সমস্ত তীর্থ ঘুরে এসে, নিজের বাড়িঘর পরিবার থাকা সত্ত্বেও আগৈলঝরার হাটের ওপরে একটা খড়ের ঘর বানিয়ে থাকতেন। ছিল অশ্বিনীকুমার দত্তের একান্ত সহচর। অশ্বিনীকুমারের নেতৃত্বে ভেগাই হালদার বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে বরিশালের নমশূদ্রদের জড়ো করে—একটা উদাহরণ তৈরি করেন। ১৯০৬-এ বরিশালের প্রাদেশিক সম্মিলনে সে ছিল প্রধানতম কর্মী। ১৯২৬-এ আগৈলঝরাতে প্রজা সম্মিলনের সে ছিল প্রধান সংগঠক—মদনমোহন মালব্য, সরলা দেবী এঁরা এই সম্মিলনে এসেছিল। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতা ছিল বাইশ বছরের তরুণ যোগেন, সবেমাত্র আইএ পাস করেছে। এই সম্মিলনে যোগেন একটা বক্তৃতা করে—সেই বক্তৃতায় নমশূদ্র ও অন্যান্য শূদ্রশ্রেণির মানুষজনের উন্নতি সম্পর্কে তার ধারণার পার্থক্য ধরা পড়ে। যোগেন যে খুব ভেবেচিন্তে কিছু বলেছিল, তা নয়। কিন্তু সেটা ছিল সম্মিলনের দ্বিতীয় দিনের বিকেল। বাইরে থেকে যে-নেতারা এসেছিল—তারা সকলেই হিন্দুত্ব নিয়েই কথা বলছিল। তারা কেউই অস্পৃশ্যতার পক্ষে বলেনি—কেউ-কেউ বলে অস্পৃশ্যতাই সবচেয়ে বড় শত্রু হিন্দুদের, আর কেউ-কেউ ও-বিষয়ে কিছু বলে না। কিন্তু কেউ-কেউ বর্ণভেদ প্রথার এমন ব্যাখ্যা দেন যে একটা প্রথার অপব্যবহার দিয়ে প্রথার গুণাগুণ বিচার করা উচিত নয়। বিশেষ করে যে-প্রথা হাজার-হাজার বছর ধরে কোটি-কোটি মানুষ মেনে আসছে, যে-প্রথা শাস্ত্রানুমোদিত। বক্তানেতারা নানারকম মজার-মজার উদাহরণও দেন—পুতনারাক্ষসী তার স্তনে বিষ মাখিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে মারতে গিয়েছিল, তাতে কি প্রমাণ হয় মাতৃস্তন্যে বিষ আছে? শুনতে-শুনতে যোগেনের মনে হয়—এঁরা কেউ জানেনেই না নমশূদ্র বলতে কী বোঝায়, প্রজা বলতে বরিশালে কাদের কথা বলা হয়। আর, কীরকম তার মনে গোল পাকিয়ে যায় হিন্দুধর্ম, জাতিভেদ, কংগ্রেস, স্বরাজ, গান্ধী, ইংরেজ, স্বদেশী। এই গোলপাকানোর ভিতর যে-কোনো একটি যুক্তি তৈরির চেষ্টা ছিল তাও নয়। নেতারা এক-একজন এক-একরকম বলছিল। কিন্তু

কেউ যদি চায়, তাহলে একটা যুক্তির আভাস পেতেও পারে—একদিকে হিন্দু-কংগ্রেস-গান্ধী আর-একদিকে ইংরেজ। মুসলমানদের সম্পর্কে কেউ-কেউ বলেছেন—বিদেশির হাত থেকে দেশকে স্বতন্ত্র করতে কি অন্য কোনো বিদেশি-বিধর্মীর সঙ্গে হাত মেলানো যায়?

সেটা ছিল সম্মিলনের শেষ দিন—লঞ্চ ঠিক করা আছে, সন্ধ্যার আগেই নেতারা রওনা হয়ে খুলনা চলে যাবেন। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান হিশেবে যোগেনকে ডাকা হয়েছে অতিথিদের বিদায় জানাতে। যোগেন বলে ফেলল—কারো কাছে দয়া চেয়ে নমশূদ্র বা মুসলমান চাষিদের কোনো উন্নতি বা পরিবর্তন হবে না। যাদের দুঃখ-কষ্ট একরকম, তাদের নিজেদের দুঃখকষ্ট নিজেদেরই দূর করতে হবে। আমরা তো রোজই বুঝতে পারি—নমশূদ্র আর মুসলমান চাষিদের সব দুঃখকষ্ট একইরকম। সেটা বদলানোর জন্য আমাদের এখানকারই নেতা ভেগাই হালদার, নিজে এই হাটের মধ্যে খড়ের ঘরে থাকেন, নিজের বলতে একটা পয়সা নেই। কিন্তু বিয়েবাড়িতে বা শ্রাদ্ধবাড়িতে সে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘোরেন। সে নিজে লেখাপড়া জানেন না কিন্তু সে চান তার স্বজাতীয়রা ও সহজাতীয়রা লেখাপড়া শিখুক। এইখানে একটা প্রাইমারি আর-একটা হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন। অথচ অশ্বিনীকুমারের সে বন্ধু, দেশবন্ধুর বাড়িতে সে থাকতেন, কংগ্রেসের জাতীয় অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ তাকে বক্তৃতা করতে ডাকেন। আমাদের সকলকে তার আদর্শে চলতে হবে—নিজেদের উন্নতি নিজেদের করতে হবে।

খুব যে পরিষ্কার করতে পেরেছিল নিজের কথাটা, তা নয়। সে নিজেই তো জানত না কথাটা কী। তাছাড়া তখন সম্মিলন শেষ, নেতাদের লঞ্চঘাটে নিয়ে যাওয়ার তাড়া, মানুষজনেরও বাড়ি ফেরার তাগাদা। কিন্তু যোগেন এখন বুঝে ফেলেছে—মানুষকে যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায় না, মানুষ ইশারার কথা চট করে বোঝে। কেউ-কেউ তাকে বলে গেল, 'যোগেন, বাপের ব্যাটার মত একখান কথা কইছ।' কেউ-কেউ বলে গেল, 'আরে যোগা কইব না তো কইব কেডা। ওর পালাগান শুনইছ।' কলেজের বন্ধুরা বলে গেল, 'রাইটলি সার্ভড।' আর ভেগাই হালদার নেতাদের পাঠিয়ে দিয়ে প্রায় ছুটতে-ছুটতে এসে যোগেনের গালে মারলেন এক বিরাশি সিক্কার চড়। সে-চড়ে মাটিতে পড়ে যাওয়ার কথা—যোগেনের শক্ত শরীর, গায়ের জোরও বিখ্যাত। সে শুধু তার গালে হাত রাখল। ততক্ষণে ভেগাই হালদার চেঁচাচ্ছেন, 'হালা, সম্বন্ধীর পুত, তোরে কি আমি ঢাকির বায়না দিছি? এতগুলা মান্যগণ্যের মুখের ওপর ভেগাই ভেগাই। এতখান লেখাপড়া শিখলি ক্যান? ভেগাই ভেগাই কহনের লাইগ্যা তো ইশকুল-কলেজ লাগে না। হ্যায় তো হাটের কুকুরও ভোখায়—ভেগাই। উনি আইছেন, নমোর পুরুত সাইজ্যা পঞ্চামৃত দিবার? যা, দুর হইয়া যা সামনে থিক্যা। তোর ভেগাইয়ের লগে যা।'

ঘণ্টা দুয়েক পরে যোগেনের ডাক পড়ল রাতের খাওয়ার জন্য। ভেগাই হালদারের পাশের জায়গাটা খালি। যোগেনকে ভেগাই ডাকলেন, 'আয় বাবা, বইস্যা খা, খাইয়্যা আমারে হারা দেহি—দেহি তোর জোর ঠোঁটে না প্যাটে।'

যোগেন বসে বলে, 'আপনারে খাওয়ায় হারাইতে তো মহিষাসুররে লাগব।'

ভেগাই হালদারকে এখানকার মানুষজন বাইট্যা-দৈত্য বলে ডাকত। তার খাওয়া সম্পর্কে রটনা ছিল—আধমণ ভাত, একটা বড় সাইজের পাঁঠা, আটাশিটা রসগোল্লা খেতে পারেন। একবার মহাপ্রস্থানে যাবেন বলে বাটাজোড়ের নদীতে চিৎ হয়ে স্রোতে ভাসতে-ভাসতে যান। শুনে অশ্বিনীকুমার এসে নৌকো নিয়ে ধাওয়া করে তাকে তুলে বলে, 'তুই ভেগাই, আমি তোর চেগাই। আরে, আহাম্মক, নদীর জল তো সমুদ্রে যায়, মহাপ্রস্থান তো পাহাড়ে।' অশ্বিনীকুমার তাকে নিজের বাড়িতে আটকে রাখেন। যোগেন তার পাশে বসতে-বসতে বলে, 'পাঁঠা আমার

এমনিতে চার সের হইলেই চইলত। কিন্তু ঐ চড়খান খাওয়ার পর তো আরো সের দুয়েক লাগব, পছন্দ হয়। কয়ডা কাইটছে?'

আশুস্যারকে বারথির মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ডানহাতি রাস্তা ধরে মইস্ত্যারকান্দিতে ফিরে আসতে বেলা পড়ে গেল যোগেনের।

মাঘ মাসের বেলা তো উঠতে-না-উঠতেই ফুরয়। এতটা খোলা জায়গায় সূর্যাস্তের পরও কিছু আলো থেকে যায়—আকাশের এমন উঁচু ও ছড়ানো গোলকে, মাঠের ফসলকাটা প্রসারে, নদীনালার স্রোতে। সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের সময়টা যোগেন পাঁজি দেখে জেনে রাখে—সেটাই তার ঘড়ি। স্যার, যে কী করেন, নিজের রিস্টওয়াচটা দিয়ে দিলেন। অভ্যেস করতে ক-দিন যায়, কে জানে! যোগেনের একটু ঠান্ডাও করছিল। এই খাটো ধুতি-শার্টে খালি পায়ে প্রান্তরের এই ঠান্ডা সামলানো যায় না। শেষ বিকেলেই সবাই বাড়ি ফিরে গা-হাত ধুয়ে আগুনের কাছে বসে যায়। মানুষ মরলেও কেউ এই ঠান্ডায় বেরবে না, মরা আগলে সকালের জন্য অপেক্ষা করবে। বেরনো মানেই সর্বনাশা কোনো দুর্ঘটনা—হয় ডাকাত পড়েছে, না-হয় নৌকো ডুবেছে। নিজের মনে মুচকি হেসে যোগেন ভেবেছিল, নয় তো ডাকাতি করতে। ডাকাতের বৌ-ও টের পায় না, পাশ থেকে উঠে স্বামী কখন ডাকাতিতে বেরিয়ে গেল, ডাকাতি সেরে ফিরে এসে বৌয়ের পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। কথায় বলে, 'ডাকাইতের পা-ও আর বিলাইয়ের পা-ও।' গাছের পাতাতে রাতের পাখি বসলে যেটুকু আওয়াজ ওঠে—ডাকাতের পা-ফেলায় সেটুকু আওয়াজও ওঠে না।

টের কি আর পায় না বৌ? নিশ্চয়ই টের পায়। কিন্তু টের পাওয়া-পাওয়ি নিয়ে কারো মধ্যে কোনো কথা হওয়া নিষেধ। যদি কোনো বৌ ইশারাতেও জানান দেয়, তাহলে তার পরের সকালে বৌয়ের নলীকাটা শব খালের স্রোতে ভেসে বয়ে যাবে। যোগেনের উকিলি বুদ্ধিতে মনে হয়—বাড়িরও কেউ টের পায় না, বৌ-ও না, এই কথা এত পুরনো কাল থেকে রটিয়ে রাখা হয়েছে যাতে ডাকাতির পর দারোগা-পুলিশ বাড়ির লোকজনের ওপর কোনো জবরদস্তি না করে।

কিন্তু এই টের পেতে না-দেয়া আর টের না-পাওয়া বরিশালের নমশূদ্রদের, বা, সব জিলার নমশূদ্রদেরই জীবনের ধর্মীয় আচরণ হয়ে গেছে। ডাকাতি যাওয়ার সন্ধ্যায় স্বামী হয়ত একটু আলগোছে ঘুমোয়—বৌয়ের সঙ্গে শোয় না বা অন্য কারো বাড়িতে গিয়ে শোয়। বা, বৌকেই হয়ত ঘর থেকে বের হয়ে অন্য ঘরে শুতে বলে—'যাও গা, দিদির লগে শোও গিয়া। সারা রাইত তোমার মাইয়্যা মুতব আর কাইন্দব। মেয়েমানুষের এমন আলগা-মুত হয় নাহি?' যে-মেয়েমানুষের কথা বলা হয়—তেমন সাত-আট মাসের শিশু আর কোন্ ঘরে না থাকে?

যোগেন রাস্তা থেকেই দেখে, তার বাড়ির ভিটেয় লোকজনের ভিড়। একটা লণ্ঠনও দেখা যায়। তার বাড়িতে লণ্ঠন নেই। এত লোক এমন অসময়ে শুধু তার কাছে আসতে পারে না। দু-একটি গলা শুনতে পায় বটে যোগেন, কানও খাড়া করে, কিন্তু গলা শুনে লোক চেনা যায় না। যোগেন তো এখন গ্রামে থাকে না—গলা তার চেনা হবে কী করে। তিন ধাপ বেয়ে দুয়ারে উঠে দেখে—আরো লোকজন বসে আছে, তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বলছে আর প্রদীপের নীচে কলাপাতার ওপর বাতাসার স্তূপ। ও, লুট হবে।

যোগেন দুয়ারের আবছায়া থেকে গলা সপ্তমে চড়িয়ে গেয়ে ওঠে, 'অরে, লাইগছে লুটের বাহার, তোরা লুইট্যা নিবি আয়'—। গলা শুনে সবাই খোঁজে কার গলা। আলো এত কম যে

সবাইকেই এক-একটা ভঙ্গি করতে হয়—দেখতে। কেউ চোখের ওপর হাতের আড়াল দেয়—অন্ধকারও যেন চড়া রোদের মত চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। কোনো-কোনো বৌ মাথার কাপড় একটু টেনে এনে ভুরু পাকায়—যেন অসময়ে বৃষ্টি এসে গেল। কমবয়েসি কোনো-কোনো জোয়ান গলা বাড়িয়ে খুঁজতে-খুঁজতে তাদের ধুতির কাছায় হাত দেয়—যেন এখনই তাদের মালকোঁচা সেঁটে নিয়ে ঝাপাতে হবে।

হরির লুট

শারদা হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে, 'আগে, ভাই আইস্যা গিছে, ভাই আইসছে—'

যোগামা কোন আড়াল থেকে গেয়ে ওঠে, 'অসময় ছাড়া/আমার গোপালের নাই ফেরা।

২১

কইহানে কাটাইয়্যা আলি সারাডা দিন। তোর না আইজ জন্মদিনের হরির লুট। দ্যাখ্ বাবা, যারে কইছি স্যায় আইছে, কাগের মুহে শুইন্যাও আইছে। আমার যোগা রে বেবাক মানুষ কত ভাল যে বাসে! গৌর! গৌর!'

শারদা, যোগেনের দিদি, এগিয়ে যোগেনের হাত ধরে টানতে-টানতে তুলসীতলার সামনে নিয়ে আসে, 'ভাই, তোর জইন্যে পুরান তেঁতুলের আচার বানাইয়্যা আনছি—'

'কত্‌দিনের পুরান রে ছোটদিদি?'

একটু অপ্রস্তুত থেমে থেকে শারদা বলে, 'সেডা ক্যামনে কই? শাশুড়ির হাতের বান্ধা তেঁতুল। মাটির হাঁড়ির গায়ে তো ব্যাঙের ছাতা গজাইছে।'

'অ। তাই ক। আমি ভাইবল্যাম—তুই ভাইয়ের লাইগ্যা, তেঁতুলগাছ পুঁইত্যা, বড় কইর‍্যা, তেঁতুল ফল্যাইয়া, সেই তেঁতুল হাঁড়িত ভইর‍্যা, সেই হাঁড়ি পুরানা কইরা, হাঁড়ির গায়ে ব্যাঙের ছাতানাতা তুইল্যা, তার শ্যাষে ভাইয়ের লাইগ্যা আচার বানাইয়্যা আনছিস। জামাইবাবু কি অ্যাহনো তেঁতুল গাছেই আছে, না, নাইম্‌ছে।'

'আরে, নামছে, নামছে', শারদার স্বামী পেছন থেকে যোগেনের পিঠে কিল মেরে বলে, 'নাইমছে'।

দুয়ারে ওঠার জায়গাটুকুতে হঠাৎ একটু আলো পড়ে। তারপর কারো-কারো গলায় শোনা যায়, 'মাস্টারশাহেব', 'মৌলবিশাহেব'। যোগেন এগিয়ে যায়। জলিল মাস্টার হাতে কলাপাতায় ঢাকা একটা বাটি নিয়ে এগিয়ে আসেন। পাটখড়ির একটা গোছায় আগুন লাগিয়ে কেউ তাকে পথ দেখাচ্ছে। দোকান, পাঠশালা আর মাটির একটা ছোট মসজিদের খোদার নোকর জলিল মাস্টার।

যোগেন জলিলমাস্টারের সামনে নিচু হয়ে যেন প্রণাম করতে এগিয়ে যায়। জলিলমাস্টারের দুই হাতে কলাপাতা ঢাকা বাটি—তিনি হাত দিয়ে বাধা দিতে পারেন না। ব্যস্ত হয়ে দু-পা পেছনে সরে যান, 'ন্ না, না, না।' যোগেন খাড়া হয়ে বলে, 'সাপ দেইখলেন নি মৌলবি সাব'।

'তোরে না আমি কতবার কইছি আমারে সেবা দিবি না। আমি খোদার বান্দা, আমি সেবা নিব্যার পারি?'

'মৌলবি সাব, আমারে গাইল পাইড়া কী হব? এডা তো আমাগ শুদ্দুর জাইতের অভ্যাস।

মানুষ দেইখলেই সেবা দিব্যার লাগব। শুদ্দুরের থিক্যা তো কেউ নিচু নাই। শুদ্দুরের তাহাইলে ভুল-সেবা দেয়ারও কুনো উপায় নাই।'

'তোর মায়ে কই?'

'যোগা—আ মা, মৌলবি-সাব ডাহে'।

যোগামা মাথার কাপড় টানতে টানতে সামনে এসে পড়ে, 'জয় গৌরমাস্টার-সাব। আবার হাতে কী লইয়্যা আলেন।'

'আরে মা, আগে আমারে ভারমুক্ত করো। জোলাপাড়ার কুটটির মায়ে নাকী মোনাজাত করছিল, কুটটির পালাজ্বরের সময়, যে কুটটি ভাল হইয়া গেইলে দরগায় সিন্নি চড়াইব। সেই চড়ান আজই চড়াইল রে মা। তাই নিয়্যা আইল্যাম যোগার জইন্যে।'

যোগামা ততক্ষণে সিন্নির বাটি হাতে নিয়েছেন। এ-হাত ও-হাত করার সময় কলাপাতা উড়ে পড়ল দুয়ারে। কে একজন নিচু হয়ে তুলতে গেলে যোগামা বলে ওঠেন, 'ছাড়ান দ্যান, ধুল্যায় পইড়ছে, মাস্টারসাব বহেন, অ বৌ—বৌ—'।

অন্ধকারের সুযোগে যোগেনের বৌ এসে পেছনে দাঁড়িয়ে বলে, 'কও কী?'

'এইখান সিন্নি আমাগ ঐ বাটিটায় উপুড় কইর‍্যা মাস্টার-সাবের বাটিটা ধুইয়্যা আন্ মা।'

যোগেনের বৌ যোগামার পেছন থেকে শুধু তার হাতটুকু বাড়িয়ে বাটিটা ধরতেই জলিলমাস্টার বলে ওঠেন, 'আরে দেইখ্ছ কাণ্ড, এইডা প্রহ্লাদের মাইয়্যা না? ঐডা অ্যাত্ত বড় হইল কবে?'

'ক্যান, প্রহ্লাদের মাইয়্যা হব ক্যান শুধু? ঐ তো আপনার ছাত্তরের বৌ।'

'আরে মা, তোমার তো দেহি বুদ্ধিনাশ হইব্যার জো হইছে। তুমি-না সেইদিনকার ছুঁড়ি, তোমার-না ভাসুর ঠাউর অ্যাহনো বাঁইচ্যা? তুমি আমারে যোগার বৌ চিনাও?'

'বৌরে কন কইন্যা, তা বুইঝব ক্যামনে, চিনছেন কী চিনেন নাই।'

'দ্যাহো, বুদ্ধি দ্যাহো যোগামায়ের। ছাওয়াল হইল উকিল-ব্যারিস্টার আর মায়ের বুদ্ধি জলিল মাস্টারের পাঠশাল।'

'মাস্টার-সাব, এমন দুর্নাম দিবেন না। বাবুরা যদি শুনে যোগামা পাঠশালে পড়া মাইয়্যা, তাহাইলে ঘরছাড়া কইরবে।'

'এইডা এড্ডা ঠিক কথা কইছ মা। বাবুগ বুদ্ধিশুদ্ধি তোমারই নাগাল—পুব কইলে পচ্চিম বুঝে। আমি জিগ্যাই মা—প্রহ্লাদের মাইয়্যাডা কি শ্বশুরঘর কইরব্যার আইল? ডাগর হইছে তো?'

'অর বাপও তো আইছে। দ্যাহেন নাই।'

তুলসীতলাতে হাততালির সঙ্গে লুটের গান উঠল, 'লুট পইড়ছে লুটের বাহার', কারো তীক্ষ্ণ গলা কেঁপে ওঠে, 'গৌর গৌর', 'লুইট্যা নে রে তোরা'। একমুঠো বাতাসা আকাশের দিকে ছোঁড়া হল। যারা মাটিতে দাঁড়িয়েছিল, তারা হুমড়ি খেয়ে পড়ে মাটিতে—লুটের বাতাসা কুড়োতে। এত কম আলোতে বোঝাও যায় না—বাতাসা কোথায়। কোনো বাচ্চার গলা ওঠে, 'পাইছি, পাইছি অ্যাড্ডা'।

একইভাবে লুটের গান, হাততালি আর লুট দু-চার দফা চলে। লুটের বাতাসা যে ছোড়ে সে দু-একবার ছোড়ার ভঙ্গি করে কিন্তু ছোড়ে না। সেই ভঙ্গিটুকু দেখেই ছেলেমেয়েরা, ছুঁড়িবুড়িরা মাটির ওপর হামলে পড়ে। লুট-ছোঁড়ানির হাসির ধাক্কায় তারা বোঝে, তাদের ঠকানো হয়েছে।

লুটের পর জলিলমাস্টারের সিন্নি হাতে-হাতে দেন যোগামা নিজের হাতের আঁজলায় তুলে-তুলে।

কোথা থেকে ঢোল বাজিয়ে কে গান গেয়ে ওঠে,

'আয় রে কানী, তোর
আরেড্ডা চক্ষু কানা করি
এই তির্‌শূলে মোর।
শিবো শিবো শিবো হে।

যোগা যহন আইয়্যাই পড়ছে, ধর্‌ রয়্যানির গান।'

যোগেনের একেবারে জন্মকালের বন্ধু—ছিদাম। যোগেন বলে ওঠে, 'ছি—দাম, তুই অ্যালি কহন? তুই-না নাওয়ের বায়নায় গিছিলি?'

ঢোলে ঠোকা দিতে-দিতেই ছিদাম গানের মতই তালে-তালে বলে ওঠে, 'বায়ানির খ্যাপও শেষ হয় যোগা, রয়্যানির গানের শ্যাষ নাই। তুই আইছস আর একখান বেউলা হইব না? ধর্‌ যোগা ধর্‌—কী কালনাগিনী রে—এ।

হঠাৎ যোগামা বলে ওঠেন, 'রয়্যানি ক্যান। গাইস তো বিয়্যার গান গা।'

যোগামা বলতে-না-বলতেই শারদা কোথাও থেকে নাচের তালে সুর ধরে,

হাতি গোদা গোদা ঠ্যাং
রে মোতুয়ালা হাতি

শারদার গলায় নানা জায়গা থেকে মেয়েরা গলা মেলায়।

হাতির বিবি হইলেন
দুইশ মণি হাতনি।

ছিদাম বলে ওঠে, 'লুট হইল, ছিন্নি হইল আর রয়্যানি হইব না? বিয়্যা নাই তো বিয়্যার গীত গাইয়্যা হব কি?'

যোগেন বলে, 'ছিদাম, ঢোল বাজা রে, বিয়্যাই হোক আর রয়্যাই হোক।'

শোনামাত্র ছিদাম ঢোলে দুটো বড়সড় চড় মেরে লাফিয়ে উঠে মেয়েদের গানের সঙ্গত শুরু করে। গানের আসর বলে তো কিছু নেই। একটা দুয়ার আছে—সেটা আরো অনেক বড় হতে পারত, নৌকোটা কাত করা না-থাকলে। বড় হয়ে গেলেও সেটা ঠাহর হত না আলোর অভাবে। এখন আলো প্রায় নেইই, যে-লণ্ঠনটা ছিল তাও নিবে গেছে। জায়গাটায় যে মানুষজন ছড়িয়েছিটিয়ে বসে-দাঁড়িয়ে আছে নানা ভঙ্গিতে, তা বেশ বোঝা যায়।

শারদা বিয়ের গান ধরতেই যোগামার ধক্‌ করে মনে আসে—এটা সে আচমকা কী করে বসল, রয়্যানির কথা উঠল, ছিদাম শুরুও করল আর যোগামা কী না বাধা দিয়ে বলল, বিয়্যার গান গা। রয়্যানি ছাড়া রক্ষা আছে—এই অন্ধকারে, জলেডাঙায়, বনবাদাড়ে, খালেবিলে, জলে সাপ, মাটিতে সাপ। মা মনসার যদি রাগ হয়? মনসার রাগ চৈত্রমাসে ছনে আগুন লাগার মত—লাগতে-না-লাগতেই সব পুড়ে ছাই। কিন্তু যোগামা তো বাধা দেননি। যোগামার হঠাৎ মনে হয়েছিল—কাঁদতে আর ভাল লাগছে না, সেই চাঁদের সাত ছেলের মৃত্যু, লখিন্দরের বিয়া আর ভাসান, বেউলা—রয়্যানি গানে কি কান্নার শেষ আছে? আর, বুকে জমে-জমে অক্ষয় পাথর হয়ে গেছে এমন কান্না কাঁদতেই তো চায় লোকে রয়্যানিতে। এখন তো বিয়ের গান তুমুল হয়ে উঠেছে, দুই পক্ষ হয়ে মেয়েরা এ ওকে যা-তা বলে গালাগাল দিচ্ছে, ক্রমেই আরো খারাপ কথা আসবে, ছিদামের ঢোল গানগুলোতে নাচ এনে দিচ্ছে।

এসব গান তো কারো কথায় শুরু হয় না, শেষও হয় না। এক যোগা বা যোগার মত কেউ যদি রয়্যানির গান গেয়ে ওঠে, তাহলে এই বিয়্যার গান চাপা পড়ে যাবে। কিন্তু যোগাকে

বলবে কী করে যোগামা। যোগা তো বলবে, 'তুমিই-না কইল্যা বিয়্যার গান গাইতে। গাউক-না। ক্যামন সুন্দর গায়, শুনো-না!' বা, যোগা হয়ত বলবে, 'ছিদাম কী না কী কইলো আর তুমিও নাইচল্যা, দ্যাহো না, ছিদাম ঢোল পিটায় ক্যামনে।' মেয়েদের একদল তখন বলছে,

রাজার বাড়ির হাতি
কারে লাথথি দিল—
নাসিমাক্ লাথথি দিল।
জমিদারের ছাওয়াল আইস্যা
কারে কোল দিল—
ছিনাল নাসিমাক গোল দিল।

বিয়ার গীত তো মুসলমান বাড়ির বিয়েতেই গাওয়া হয়, নমবাড়ির মেয়েরাও সেই গানে গলা দেয়। কেচ্ছা গাওয়া চলতেই থাকে এর নামে ওর নামে।

'এড্ডা রাইতে নাসিমা তোর
বিছ্না ক্যান দোলে লো।'
'নাং নাই লো, মাকুরের বাচ্চা
বিছ্না বাইয়্যা গেল লো।'

ছি, ছি, ছি, ছি—রয়্যানি গানের কান্নার বদলে কীনা যোগামা এইসব গানের হাসি বেছে নিল। যোগামা মনে আনার চেষ্টা করে কী সে বলেছিল। সে কি বলেছিল—বিয়্যার গান গা? যদি তাই বলে থাকে, তাহলে তো রয়্যানিতে বাধা দেয়া হয় না। যোগামা তো নাও শুনতে পারে যে ছিদাম রয়্যানির কথা বলেছে। মা মনসাও তো ঐটুকুই শুনে থাকতে পারেন যে যোগামা বিয়ের গান গাইতে বলেছে। তাহলে তো তার রাগ হওয়ার কথা নয়। কিন্তু যোগামা কি বলেছে—'রয়্যানি ক্যান? বিয়্যার গান দুই-একখান ধর্। রাইত হইছে'? যদি বলে থাকেন, তাহলেও তো রয়্যানিতে বাধা দেয়া হয় না। বরং বলা হয়—ঠিকঠাকমত না-গাইলে রয়্যানি গাওয়া উচিত নয়। মা মনসা তার মনের ভাবটা ঠিকই বুঝে নেবেন—যদি যোগামা সত্যি ঐ কথা বলে থাকেন, বা বলতে চেয়ে থাকেন। এইবার ঐ বিয়ের গানের উচ্ছ্বাস, হাসি আর দ্রুত তালের মধ্যে যোগামার দু-চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে। না, আমি অ্যাহন যাই বানাই-না ক্যান, তা আমি কই নাই। মা মনসা মনের কথাডাই শুইনছেন। মা কি শুইনছেন, মা কী শুইনছেন, আমি কী কইছি—আমি এই সব কথা বান্যাইয়া-বান্যাইয়া নিজের পাপ বাড়াই ক্যা? হ্যাঁ, মা, আমি কাইন্দব্যার চাই নাই বইল্যাই রয়্যানি গাওয়ায় বাধা দিছি, মা! এই যে অ্যাহন একা-একা কাইন্দ্যা সেই পাপের প্রাচিত্তির করি মা। মা, তুমি আমার পাপ জানো মা। তুমি আমার সত্যডাও জানো মা।'

রাতের মিলনপ্রহরে তখন বিয়ের গান মেয়েদের গলায় শানিয়ে উঠে একটু মদালস অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছিল, সমবেত উল্লাসে আবার ফিরে আসছিল।

এত যদি জাইনত্যাম আল্লা
মা হইব পর
দুয়ারেতে উঠ্যায়া থাইকত্যাম
জলটুঙ্গির ঘর।

বিপরীত পক্ষ গেয়ে ওঠে,

দেহিস মাগি, ঠেলা খাইয়্যা
তোর জলটুঙ্গি না ভাঙে
বিয়া থিক্যা কত সুখ—
দেইখবি ভরা গাঙে।

সেই উত্তাল গানের মধ্যে যোগামা হাতজোড় করে অন্য তালে অন্য এক গান গুনগুনিয়ে গাইতে থাকে আর চোখের জলে ভাসে—

এমন বাসর বানাইছে বেউলা সোন্দরী
মান্দাসে গাঙুরে ভাসে সে মরা-ভাতারি—।

ফজলুল হকের বার্তা

২২

রাত আরো একটু হতেই বিয়ের গানের কলরোল শেষ হয়ে যায় আর যোগামা চোখের জল মুছে তার নিভৃত গান শেষ করে দেন। মা নিশ্ছয়ই তার প্রাচিত্তির স্বীকার দিছেন। নিশ্ছয়ই দিছেন। এতক্ষণ যারা এই বাড়ি ভরে রেখেছিল তারা অন্ধকার আর নৈঃশব্দ্য বাড়াতে-বাড়াতে কখন একসময় দুয়ার খালি করে চলে যায়। আর আওয়াজের গতি বেড়ে যায়—কত ছোট-ছোট, আরো ছোট-ছোট, আরো চাপা, আরো-আরো চাপা আওয়াজ শুনতে পায় যোগেন।

সে যে-ঘরে শোবে, সে-ঘরে ঢুকতেই অন্ধকারের পাটভাঙা গন্ধও পায় যোগেন। তার বৌ তাহলে ঘরে, মাচার ওপরে। ঘরের ভিতর কিছু দেখা যায় না। পায়ের আন্দাজে যোগেন মাচায় গিয়ে ঠেকে হেসে ফেলে—বৌ আবার ঘুমের মইধ্যে চাপা খাইব না তো। একটু জানান দিতেই যোগেন বলে, ‘এড্ডু সইর‍্যা শুইয়ো নে—’।

খুব চাপা গলায় যোগেনের বৌ বলে, ‘ছোঁয়া লাগার ডর কইরলেন নি?’

‘ছোঁয়া লাইগব কার? তোমারে চাপা দিয়্যা ফ্যালার ডর খাই।’

‘আপনি নি কণ্ঠী নিছেন? পিঁপড়া চাপা দিতে ডর খান?’

যোগেন শুয়ে-শুয়ে খুশি হয়। এই অন্ধকারটায় পাটভাঙা গন্ধ আরো নিবিড় হচ্ছে। এই অন্ধকারে তার বৌয়ের চাপা স্বরও গলায় ঘষা খাচ্ছে—শুকনো পাতার ওপর দিয়ে হেঁটে গেলে যেমন আওয়াজ ওঠে। এ সবের চাইতে অনেক বেশি খুশি এসে যায় যোগেনের মনে—তার বৌয়ের কথার এমন বাহারে। কথা বলে তাহলে সুখ হবে, কথা শুনেও সুখ হবে। বৌকে তো তার দেখাও হয় নাই, শোনাও হয় নাই। ডাগর হল কখন যোগেন জানেই না। শ্বশুরবাড়িতেই থাকত। মাস চার আগে, আশ্বিনের শেষে, মৈস্তাকান্দি থেকে ফেরার সময় খাগবাড়িতে রাত কাটিয়েছিল যোগেন। সেখানেও তো কমলার সঙ্গে ঘুমনোর সময় দেখা, যদি এই অন্ধকারে দেখা বলে কিছু ঘটতে পারে। তখন তো এই গন্ধও পায়নি, এই কথাও শোনেনি।

‘তুমি নি অ্যাহন শ্বশুরবাড়ি থাইকব্যা?’

যোগেনের এই কথাটার কোনো মানে নেই, তাদের সমাজে। একটা পেট তো বাঁচে, যদি স্বামীর এমন দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে বৌ বাপের ঘরেই থাকে। তা ছাড়া প্রহ্লাদ বারুই অত গরিব

না যে মেয়েকে রাখতে গাঁইগুঁই করবে।

'হ। অ্যাহন তো আমার নতুন শ্বশুরবাড়ি।'

'সেডা ঠিক কথা। বার বছরের বিয়াতী বৌয়ের শ্বশুরবাড়ি নতুন থাহা!'

'আমি কই কইলকাত্তার কথা—সেইডা তো আমার নতুন শ্বশুর ঘর।'

এতটা যোগেন ভাবতেও পারেনি। সে শুধু বলতে পারে, 'অ্যাঁ?'

'আপনি ম্যাম্বার হইলে আমারেও তো ম্যাম্বারনি হব্যার লাগে?'

যোগেনের ঘুমিয়ে পড়ার গতি মশামাছির চাইতেও ক্ষিপ্র। মাথা সম্পূর্ণ নামানোর আগেই তার ঘুমিয়ে পড়া সম্পূর্ণ হয়ে যায়। অন্ধকার, পাটভাঙা গন্ধ, বৌয়ের স্বর ও কথা—এই সব মিলে আজ এই একটু দেরি হল। কিন্তু কমলার শেষ কথায় এমনি চমকে ওঠে যোগেন যে তার মুখে চট করে কথা জোগায় না। তার ওপর তার এই অপ্রস্তুতকে ঠাট্টা করেই তার বৌ চাপা-ঘষা গলায় আবার বলে ওঠে, 'লাগে না?'

কথায় যোগেন হেরে যেতে পারে নাকী! তাছাড়া, এমন কথার জবাব দিতেও তো সুখ, 'কোন্ পালা শুইন্যা পাঠ মুখস্থ কইরছ?'

সকাল হতে-না-হতেই ডাকাডাকিতে যোগেন জেগে উঠে দেখে বৌ আগেই বেরিয়ে গেছে। মাচা থেকে নেমে ঝাঁপ খুলতেই আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যায়—'হইলডা কী?'

'আরে, দ্যাখ, এই মাঝি কী কয়?'

'মাঝি কেডা?'

'আমারে পটুয়াখালি থিক্যা হকশাহেব কাইল সদরে পাঠাইলেন।'

'পটুয়াখালি থিক্যা? মানে লিডার ফজলুল হক?'

'আর কেডা হব? ডাইক্যা হুকুম দিলেন, যা, নোড় পাইড়্যা বরিশালে যাইয়্যা ঐ মণ্ডলরে ধইর‍্যা আন্, অ্যাহনি, সূর্যাস্তের আগে।'

'আমার কথাই কইছেন?'

'হ। আর কেডা বরিশাল থিক্যা মৈস্তারকান্দি আইব? শুইন্যা ভাইবল্যাম আর পটুয়াখালি ফিরুম না। আমাগ তো জল থাইকলেই ফল। বরিশালেই খ্যাপ মাইরব। তারপর য্যান চোক্ষের উপর বাঘের চোক্ষু জ্বইল্যা উইঠল—হকশাহেব। উনিই তো কুনো কথাই ভুইলব্যার পারেন না। পটুয়াখালি না ফিইরলে কি সূর্যাস্ত থিক্যা মুক্তি পাব? তো দিল্যাম পাড়ি মৈস্তারকান্দি বইল্যা। এহানে পৌঁছাই, পছন্দ হয়, সূর্য ওঠার ঘড়ি দুই আগে। একডা ছোড ঘুম সাইর‍্যা নিল্যাম। কারে জিগাইব—মণ্ডললিডারের বাড়ি কোনডা? তবে শ্যাষ রাইতের ঘুম তো ল—ম্বা হইবারই কথা। তো হইল না। মনে উদ্বেগ। কহন সকাল হয়, কহন মণ্ডল-লিডারের বাড়ি খুঁইজব? তার আগেই যদি আবার সূর্যাস্ত ঘইট্যা যায়? হকশাহেব একখান পত্রও দিছেন।'

যোগেন কোনো কথা না বলে তাকিয়ে থাকে—লোকটি তার লুঙির ট্যাক খুলে একটা ভাঁজ করা গোল-পাকানো পুরচি বের করে লুঙির প্রান্ত দিয়ে মুছে দু-হাতে যোগেনের দিকে বাড়িয়ে দেয়। যোগেন কাগজটার ভাঁজ খুলতে থাকে আর তার বাড়ির লোকজন—যোগেনের বাবা, কাকা, যোগামা, শারদা—সকলেই তাকিয়ে এই অপূর্ব ঘটনাটা দেখে। এই ভিটের কোনো দাওয়াতে দাঁড়িয়ে এর আগে এমন কোনো কাগজের ভাঁজ খোলা হয়নি। এটা যোগেন খুব আলাদা করে হয়ত বুঝতে পারেনি। তার সমস্ত কাজই তো কাগজ নিয়ে, কাগজের ওপর কলম দিয়ে লেখা নিয়ে, কাগজের ওপর ছাপা লেখা নিয়ে। ঐটুকু একটা কাগজ পড়তে যোগেনের

একটু বেশিই সময় লাগছে। কাগজটা উলটেও যোগেন দেখে। কাগজটা ভিজে লেখাটুকু ধুয়ে গেছে। শুধু 'ডিয়ার মিস্টার মণ্ডল'টুকু বোঝা যাচ্ছে আর প্যাডের নীচে 'এ. কে. ফজলুল হক এমএ-বিএল' ছাপাটুকু।

যোগেন বলে, 'ধুইয়্যা গিছে তো?'

'অ্যাঁ? হায় আল্লা। কাগজ নিয়্যা জলে ভাইসলে কাগজেরও দুষ নাই, জলেরও দুষ নাই।'

'ছাড়ান দ্যান। যাব ক্যামনে? তোমার লগে?'

'আমার লাগ ধইরলে তো কয় গণ্ডা সূর্যাস্ত ঘইট্যা যাবে নে। পটুয়াখালিতে না বাঘ হাঁ কইর‍্যা খাড়া আছে? আমি নামব আর আমারে গিলব। চিবাইব্যারও সময় দিবে না।'

'অ্যাহন যাউম ক্যামনে?'

'পাখা গজাইয়্যা তো আর যাব্যার পারবি না,' যোগেনের বাবা বললেন। যোগামা মাঝিটিকে ডাকে, 'এদিগে আয়ো, মাঝি।'

'কাহা, এডডা কাম কইরব্যা? ছুড্ড্যা রায়বাহাদুরের কাছে যাইব্যা?'

'স্যায় আছে কি নাই?'

'আছেন। কাইল তো কত কথা হইল। উনারই তো আসা যাওয়া সগলের থিক্যা বেশি। উনি ঠিকঠাক কইয়্যা দিব্যার পারেন।'

যোগেনের বড়খুড়ো একটু ইতস্তত করেন। যোগেন বলে, 'যাও-না কাহা, তুমি ফিরতে-ফিরতে আমি সাইজ্যা নেই। হকশাহেব ডাক পাঠাইছেন।'

'তুই তো কইয়্যাই খালাশ। রায়বাহাদুরের ঘুম ভাইঙছে নি? আর রায়বাহাদুরের লগে খাড়াইয়্যা আমি জিগাইবার পারি—আমার ভাইয়ের ব্যাটার পটুয়াখালি যাবার লাগে, তাই, আপনার লগে আইছি পথ জিগ্যাইতে? আমারে চিনেন না, তার আবার ভাইয়ের ব্যাটা? কী যে কস?'

'কাহা, কাইলই তো আশুস্যারের লগে গিছিল্যাম, কত কথা হইল। তুমি যাইয়্যাই দেখো।'

'তোর পটুয়াখালি যাওয়ারও কাম নাই, আমার রায়বাহাদুরের নিয়ড়ে যাওয়ারও কাম নাই।'

'কাহা, আমি অ্যাড্ডা চিঠি লিখা দেই। তুমি সেই চিঠিডা টুনির হাতে দিও।'

'টুনি কেডা?'

'কাহা, রায়বাহাদুর তোমারে চিনেন না, তুমি টুনিরে চেনো না, তোমরা কি মৈস্তারকান্দিতে অচিনা মানষের মেলা বসাইছ। জয়বসন্ত কাহার মাইয়্যা, টুনি।

শারদা হঠাৎ করে বলে বসে, 'টুনি? দে ভাই, চিঠি লেইখ্যা দে। আমি নোড় পাইর‍্যা গিয়্যা জব আইনছি। টুনি আছে তো?'

যোগেন গলা তুলে বলে, 'চিঠি লিখব কনে? অ্যাডডা কাগজ দে।' যোগামা বাচ্চাদের লেখাপড়ার খাতা থেকে একটা কাগজ ছিঁড়ে দেয়। যোগেন কাগজটা নিয়ে বলে ওঠে, 'দাওখান আনলা না?'

'দাও? হাতদাও?'

'যা দাও পাও—রামদাও, হাতদাও, কাঁচিদাও। ধার থাইকলেই হব।'

'তুই তো চিঠি লিখবি কলি, দাও দিয়্যা কী করবি?'

'আঙ্গুল কাইট্যা কলমো বানাইল্যাম', যোগেন গুনগুনিয়ে ওঠে। বুঝতে একটু সময় নেয় যোগামা—তারপর হাসতে-হাসতে মুখে আঁচলচাপা দেয়। যোগেনের বুড়ো বাপ দুয়ারের কোণা থেকে দন্তহীন হাসি ছড়িয়ে বলে ওঠেন, 'তুই লায়েক হইবি কবে রে, ছ্যামড়া। যেইহানের

মেম্বার হইছিস, সেইহানে গিয়া খাড়াইয়্যা কি সখী-সংবাদ ধরবি নাহি রে বাপ?'

'যোগামা—কলম খুইজ্যা আর কলম্বাস হইয়ো না। আশুবাবুর কলমখান দ্যাও। আর এড্ডা ছোড পিড়্যা দ্যাও'—যোগেন এতক্ষণে বসে পড়ে।

যোগামা আশুবাবুর দেয়া কলম আর আধহাতি এক পিঁড়া এনে দেয়। যোগেন কোলের ওপর পিঁড়াটা রেখে, পেনটা খুলে, ক্যাপটা পেছনে লাগিয়ে রায়বাহাদুরকে চিঠি লিখতে বসে।

বাড়ির সবাই, পাড়ারও অনেকে যোগেনকে গোল করে ঘিরে চিঠিলেখা দেখছে।

তাদেরই এই দুয়ারে বসে তাদেরই যোগেন মণ্ডল ফাউন্টেন পেন দিয়্যা চিঠি লিখত্যাছে এমন এড্ডা মানুষ রে, যারে সবাই দেখেও নাই, যার ঐ একখান নাম সগগার চেনা—'রায়বাহাদুর'। কাণ্ড যোগেনের—তারে নি চিঠি লেখা যায়? রাস্তায় কহনো-সহনো দেইখলে যারে রাস্তা দিতে রাস্তার পাশে খাড়া হইয়্যা থাইকব্যার লাগে। না-হয় পাশ দিছে যোগা। না হয় যোগা বরিশালের উকিল। না হয় যোগা মেম্বারের ভোটে জিতছে—তার লগে কি যোগা রায়বাহাদুরও হইছে? এইডা এড্ডু বেশি হইয়্যা গেল না। যাওয়ার সময় রায়বাহাদুররে নিজেই না-অয় জিগাইয়া যাতি। শ্যাষে তুই চিঠি লিখব্যার বসলি যোগা? রায়বাহাদুররে?

মাটির ওপর লেপ্টে বসে, কোলে পিঁড়া নিয়ে, পিঁড়ার ওপর কাগজ রেখে, আশুবাবুর পেন নিয়ে যোগেন একটু সমস্যায় পড়ে। রায়বাহাদুরকে কি তার চিঠি লেখা মানাচ্ছে? হ্যাঁ, রায়বাহাদুরই ঠিক বলতে পারবেন—আর-কেউ তার মত যাতায়াত করে না এ লাইনে। বলতে তো পারবেন—কিন্তু যোগেনকে কি সে বলবেন? মানে, যোগেন কি তাকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারে? রায়বাহাদুরকে যোগেন মণ্ডল জিজ্ঞাসা করছে—তাড়াতাড়ি পটুয়াখালি কোন্ পথে যাওয়া যাবে? কথাটাতো আসলে—লঞ্চ লাইন বা স্টিমার লাইন নিয়ে। হকশাহেবের নাম করে জিজ্ঞাসা করা হয়ত যায়—রায়বাহাদুর তো রায়বাহাদুর, হকশাহেব তো কাউন্সিলের মেম্বার। তার কথা রায়বাহাদুর ফেলতে পারবেন না। কিন্তু রায়বাহাদুরকে কি হকশাহেবের কথা বলতে পারে যোগেন মণ্ডল? সেটা তো হকশাহেব পছন্দ নাও করতে পারেন।

যোগেন এটারও হদিশ চায়, প্রথমেই তার রায়বাহাদুরের কথা মনে পড়ল কেন।

রায়বাহাদুর, রায়বাহাদুর হলেও বামুন, বামুন হলেও জমিদার, জমিদার হলেও উকিল, উকিল হলেও রায়বাহাদুর। এ-জীবনে বা পরজীবনে রায়বাহাদুরের সঙ্গে তার কখনো কোনো বিনিময় ঘটা সম্ভবই নয়। ওকালতিতে অনেক-অনেক টাকা করে জমিদারি কিনতে পারে যোগেন, রায়বাহাদুরও পেতে পারে। কিন্তু সে তো কখনো বামুন হতে পারবে না। জন্মজন্মান্তরেও না।

তবু চিরকালের ও পরকালের চণ্ডাল বলেই যোগেনের অনুভবশক্তি পশুর মত আত্মরক্ষাচেতন। সে বুঝতে পারে, তাকে বুঝতেই হয়—তাকে মেনে নেয়ার সীমাটা কোথায় কুলীন হিন্দুদের। কেউ বলার আগেই সে শুনতে পেয়ে যায়, 'ব্যাটা, চাঁড়ালও চিঠি লেখে। আরে, যে-অক্ষরের নামই বর্ণ, সে-অক্ষরে বর্ণহিন্দু ছাড়া কারো অধিকার থাকে? লেখাপড়ার অত হাউশ থাকলে আরবি-ফারসি পড়, অগ তো বামুন-শূদ্র নাই। আর ক্ষমতা থাকলে ইংরাজি পড়। অগও তো দেবভাষা নাই, সুরাসুর হগ্গলেরই এক বুলি।'

যোগেন স্বস্তি পায়। রায়বাহাদুরের সঙ্গে সে সমতা বোধ করে ফেলেছিল—ইংরেজিতে কথা বলতে পারায়। রায়বাহাদুরই যোগেনকে সমমর্যাদা দিয়েছেন—মিস্টার বলেছেন, কলিগ বলেছেন, তার রাজনৈতিক সমর্থনও জানিয়েছেন। রায়বাহাদুরকে তার এই চিঠি লেখায় বামুন-কায়েতদের প্রচলিত প্রতিক্রিয়া ঐ পশুর অনুভবশক্তিতে আন্দাজ করতেই যোগেনের নিজের কাছেই ধরা পড়ে গেল—রায়বাহাদুর বামুন হলেও শাহেব-বামুন, আর জমিদার হলেও

শাহেব-জমিদার। তবে হ্যাঁ, ইংরেজিতে লিখলে, যোগেন নিশ্চয়ই তাকে লিখতে পারে।

কাগজে কলমটা প্রায় ছুঁইয়ে ফেলেছিল যোগেন। সম্বোধন করবে কী বলে? ডিয়ার স্যার—হয় না। শুধু স্যারও—হয় না। মোস্ট রেভার্ড স্যার—হয়, তবে একটু বেশি অফিসিয়াল শোনায়। 'শ্রীচরণকমলেষু' ইংরেজি করে লিখতে পারলে এক ঢিলে অনেকগুলো বক মারা যেত। 'শ্রীচরণকমলেষু'র ইংরেজি কী হতে পারে। 'টু' দিয়ে না হয় সপ্তমীর কাজ হল। 'শ্রী' হল 'বিউটি' বা 'গ্রেস'। একটা 'ফুল' লাগাতে হবে। 'চরণকমল' তো 'লোটাসফিট'। তাহলে, 'টু দি গ্রেসফুল, লোটাসফিট অব রায়বাহাদুর। মোস্ট রেভার্ড স্যার।' একটু দ্বিধা আসে, লিখে দেখলে হত কেমন দেখায়। কাগজ তো মোটে এই একটা। উলটো পৃষ্ঠায় লেখা যাবে না—একজন উকিল হয়ে সে তা করতে পারে না। অথচ 'শ্রীচরণকমলেষু' সে ছাড়তে পারে না—মাথায় যখন একবার এসে গেছে। রায়বাহাদুর তো শাহেব হলেও বামুন। যোগেনের কাছ থেকে সে যথাযথ সম্মান আশা করতেই পারেন। কাল একবার বলেওছেন রামদয়ালের ছাওয়াল।'

যোগেন ফাউন্টেন পেনটা কাগজে ঠেকিয়ে বড় করে একটা ইংরেজি 'এস' লিখে, ইংরেজি বানানে 'শ্রীচরণকমলেষু' লিখে ফেলে—'চরণ'-এর পর একটা 'এ' দিয়ে—সে সংস্কৃতও জানে। তারপরের লাইনে ইংরেজিতে লেখে 'দি মোস্ট রেভার্ড স্যার রায়বাহাদুর'। 'স্যার' পর্যন্ত সে লিখতই, তারপর 'রায়বাহাদুর'টা এসে গেল সেই পশুস্বভাব থেকে—'স্যার রায়বাহাদুর' কথাটার মধ্যে কি রায়বাহাদুরের আকাঙ্ক্ষা একটু ছোঁয়া হল না? রায়বাহাদুরদের কে না 'স্যার' হতে চায়? সে যতই কেন অসম্ভব হোক। আনুপাতিক বিচারে রামদয়ালের ছাওয়াল যদি এমএলএ হয়, তাহলে রায়বাহাদুরের কি 'স্যার' না-হলে চলে? বাকিটুকু লিখতে আর দেরি হল না। শেষে 'ইয়োর্স মোস্ট অবিডিয়েন্ট সারভেন্ট' লেখার পর 'যোগেন' লিখে তার নীচে 'এস/ও রামদয়াল মণ্ডল' লিখে ফেলল।

যত্নে ভাঁজ করেও কাগজের দোষ ঢাকল না! 'ছোডোদিদি', শারদা এসে দাঁড়াতেই যোগেন পিঁড়েটা রেখে দাঁড়িয়ে উঠে চিঠিটা তার হাতে দিয়ে বলে—'মুইঠ্যা পাক্যাইয়া নিস লা। আর-ভাঁজ দিস না। টুনিরে দিবি। টুনি আমারে ভোট দিছে।'

শারদা ছুটতেই শুরু করেছিল, ঘাড় ফিরিয়ে ভাইকে একটু বকে নিল, 'থো তো ভাই—'।

যোগেন ফাউন্টেন পেনটা রাখার জন্য ডাকে, 'যোগামা—আ।' তার মাস্টার আশুবাবুর উপহারের পেন দিয়ে যোগেন প্রথম লিখল—এক শাহেব-বামুনকে ইংরেজিতে চিঠি। কেন? না, আর-এক শাহেব-যবন তাকে চিঠি পাঠিয়েছে 'মিস্টার মণ্ডল' বলে। জলের মাঝি ছাড়া সে-চিঠি আনবে কে? আর, জল দিয়ে চিঠি পাঠালে সে-চিঠির কথাগুলি তো ধুয়ে যাবেই। এখন, শারদা-টুনিকে ছাড়া যোগেনের চিঠিই-বা ঠোঁটে উড়িয়ে নিয়ে যাবে কে? ঠোঁট থিক্যা পইড়্যা না যায়।

'এই পেনটা ধরো। ভুইল্যা না যাই।'

কোর্টে যাওয়ার সময় এক তৈরি হওয়া থাকে—স্নান-খাওয়া, প্যান্টশার্ট, কলার-কালকোট, সু, তার আগে দাড়িকামানো, তারও আগে জুতো পালিশ করা আছে কী না দেখা। মৈস্তারকান্দিতে তো সব সময়ই তৈরি। চিঠিটা পাঠিয়ে দিয়ে, খাল সেরে, দুটো ডুব দিয়ে উঠে ধুতিটা পরে নিল, গেঞ্জিটা গলাল। পাঞ্জাবিটা পরে বেরিয়ে যাবে। বাড়িতে গেঞ্জি পরতেই লজ্জা করে, তার ওপর পাঞ্জাবি।

'যোগামা, ছোটদিদি তো আইসে না—'

'আইলো বইল্যা, তুই একদলা ভাত মুখে ফেল্যা।'

'তোমার মাঝি আছে তো?'

'থাহারই তো কথা, খাইয়্যা গেল তো।'

'তারে তো লাইগব্যার পারে। দেহো, কোথায়?'

যে-পিঁড়ের ওপর কাগজ রেখে যোগেন চিঠি লিখেছিল, সেটা তো পড়েই ছিল। তার ওপর বসে যোগেন বলে, 'দ্যাও, এহানে দ্যাও ভাত।'

বাড়ির সেই একটামাত্র বড়বাটি ভর্তি ভাত, ওপরে কাঁচালঙ্কা আর পেঁয়াজ, তলায় ডালটাল কিছু থাকতেও পারে। যোগেন শাদা ভাত মুখে পুরে পেঁয়াজে একটা কামড় দিয়ে, ভর্তি গলায়, 'আরে, কনে' বলে ওঠে, আর শারদা-টুনি দুইজনেই উঠে এসে হাঁফায়। শারদা বলে ওঠে, কথায় মাঝে-মাঝে হাঁফ ফেলে, 'ভাই, রায়বাহাদুর তোমার চিডির জব লিখ্যা দিছে।'

যোগেন ভাতের গন্ধে বিভোর ছিল, সে বাটি থেকে মুখ তোলে না। বলে, 'এই বাডিডার উপর হাঁফ ফ্যাল তোরা দুইজন। ভাতডা ঠান্ডা হইব। টুনিরে ধইর‌্যা আনলি—যে!'

'ক—স কী ভাই। রায়বাহাদুর কী সব নাম কব্যার ধইরলেন—আমায় কি মনে থাগে। তহন কত্তাই তো কইলেন, টুনি যা, ও সব জানে, যোগেনরে কইয়্যা আয়।'

যোগেন একটু হাসিমুখে টুনির দিকে চায়।

টুনিটারে দেইখলে চক্ষু জুড়াইয়্যা যায়। বাবলা গাছের তলার খালের জলের মত গায়ের রংডায় য্যান কত শান্তি! কাল। এরেই কয় নমশুদ্দুরের কাল। গায়ের চিকন দেইখলে কত গোরা কর্তা পায়ে পড়ত প্যাটভইর‌্যা খাওয়া জোটে তো। শাড়ির নীচে পেটিকোট পইরছে গায়ে ব্লাউজ। তার দিদি শারদার মুখখানের ঢকও তো সুন্দর। ঐ-সুন্দর কেডা দেইখব? মাথায় জটা। গায়ে খড়ি। প্যাট খালি। ময়লা একখান কাপড়। একপাল্লা জড়ানো। শরীর ঢাকারও উপায় নাই। দেখলেই বুঝা যায় শুদ্দুরনি।

'দিদি, এড্ডু জল দে।'

মাটির একটা ঘড়া এনে বাটিটা জলে ভরে দেয় শারদা। সেই বাটিভর্তি জল মুখের ওপর তুলে শূন্য থেকে গলায় ঢালে যোগেন আর ঢকঢকিয়ে পান করে। হাতটা ধুয়ে বাড়িয়ে দেয়। 'দে, দিদি, চিঠি দে।'

তারই চিঠির উলটো পিঠে নিজের হাতে লিখে দিয়েছেন রায়বাহাদুর, ইংরাজিতে, ডিয়ার মণ্ডল, আমি তো যশোর থেকে নড়াইল হয়ে আসাযাওয়া করি, ফলে পটুয়াখালির দিকের লঞ্চ সার্ভিসের ব্যাপারটা জানি না। তার ওপর এখন তো শীতকাল—অনেক রুটই আর নাব্য নয়। মনে হয়, বড় নদী দিয়ে রওনা দিলে কিছু পেয়ে যেতে পার। তোমার যাত্রার জন্য শুভেচ্ছা—নীচে সই।

'আরে তাই তো। আমি ক্যামনে ভাইবল্যাম রায়বাহাদুর জাইনবেন। উনির তো আসাযাওয়া পচ্চিম থিক্যা। আর আমি তো যাব দক্ষিণে।'

টুনি বলে, 'কর্তা বল্যা দিছেন তুমি এইখান থিক্যা একখান নৌকা ধইর‌্যা মুলাদি চইল্যা যাও। মুলাদি গেলে অনেকগুলান লঞ্চ সার্ভিস পাবা নে। অ্যাহন তো তেমন ফরসা হয় নাই—আড়িয়াল খাঁ দিয়্যা পটুয়াখালির লঞ্চ ধইরতে পারো। যদি না পাও তাহাইলে লতা নদী দিয়্যা যে-লঞ্চ পাও সেইডা ধইরলেও পটুয়াখালি সিধা যাবার পারো। কর্তা কইছে, মৈস্তারকান্দি থিক্যা মুল্যাদি যাওনই আসল। যাইবানে কীসে?'

'আরে, টুনি তো আমাগো স্টেশন মাস্টার হইয়্যা বইসছে, দেখছ নি? তো কর্তা এই সব লিখ্যা দেয় নাই ক্যান?

'সে তো তোমরা জানো। যা কওয়া যায় তা কি লেখা যায়।'

'আমি অ্যাহন মুলাদি যাই ক্যামনে সেডা ক।'

'তুমি আইসো। আমরা বড় ঘাটে গিয়্যা নৌকা বাছি। চ—ল্ শারি', ওরা দু-জন দুয়ার গড়িয়ে ছুটতে থাকে। যোগেনের মনে কোনো উদ্বেগ নেই। এটুকুই জানার ছিল—কোথা দিয়ে যাবে। মুলাদি পৌঁছাক তো—তার পরের কথা তার পর।

'যোগামা, জামা কনে?'

'ঘরে দ্যাখ, খাড়া, আসি।'

যোগেন ঘরে ঢুকে নিজেই পায় পাঞ্জাবি, বেড়ায় ঝোলানো। সে পরে নিতেই যোগামা পেনটা এগিয়ে দেয়। বুক পকেটে লাগিয়ে একবার দেখে হাসে যোগেন। যোগামা ঘড়িটা এগিয়ে দেয়—সেটা হাতে নিয়ে যোগেন বলে, 'এতডা পাইরব না এক্‌দিনে। পকেডে থাউক।' সে পাশ পকেটে ঘড়িটা রাখে। যোগামা বলে, 'টাহা দে'।

'ন্যাও নাই? খাড়াও।' যোগেন গুনে-গুনে দশটা দশটাকার নোট দেয়।

'কত দিলি?'

'একশ—'

'একশয় কয় কুড়ি?'

'পাঁচ। না, তুমি চাইর কুড়ি রাখো। আমারে কোন নৌকা ধইরতে হয়।'

যোগামা সবগুলি নোটই যোগেনের হাতে দেয়। যোগেন দুটো নোট তুলে বাকিটা যোগামাকে ফেরত দেয়, 'চাইর কুড়ি থাইকল।'

'এই নোটের কডায় এক কুড়ি হইব?'

'দুইডায়।'

যোগেন ঘর থেকে বেরতে গেলে যোগামা বলে, 'যোগা, তোরে এডডা শুভসংবাদ দেই যাত্রার মুহে। বৌয়ের তো ছাওয়াল হইব।'

'কার বৌয়ের?'

'ধুর বোগদা! তোর বৌয়ের প্যাটে তোর ছাড়া আর কার ছাওয়াল হইব?'

'সে আবার কী? আমার লগে তো ভাল কইর‍্যা কথাই হইল কাইলরাইতেই প্রথম। এক রাত্তিরেই প্যাটে ছাওয়াল? কও কী?'

'ক্যান? আশ্বিন মাসে যে শ্বশুরবাড়ি গিয়্যা রাইত কাট্যাইলা! বৌয়ের লগে তহন খারাপ কইর‍্যাও কি কথা হয় নাই সোনা? তহন থিক্যাই—। তুই আবার আসবি কবে?'

যোগেন এবার ঠোঁট খুলে দাঁত বের করে হাসিমুখে তাকিয়ে থাকে—যোগামার মুখের দিকে।

'কইয়্যা যা। নতুন পোয়াতি—'

'তোমার নাতি যহন আইব, তহন। এইডা একখান শুভসংবাদই হইল যোগামা।'

'ছাওয়ালপাওয়াল হওয়া তো সব কালেই শুভ। যাগো হয় নাই তাগো চিরডা কালই অশুভ', যোগামা চোখে আঁচল চাপা দিতে যোগেনের মনে পড়ে যে যোগামার পেটের কোনো সন্তান নেই।

'যোগামা, তোমার এই নাতিডা জব্বর শেয়ান হইব।'

'ক্যা? শেয়ান দেখলি কীসে?'

'বাপেরেও টের পাইতে দ্যায় নাই কহন আইয়্যা পইড়ছে। ডাকাতের পা। দ্যাহ-না, বাপের লগে-লগে হাঁইটব্যার ধইরছে। মৈস্তারকান্দি থিক্যা পটুয়াখালি। এ-কে ফজলুল হকের ডাক।

পটুয়াখালি থিক্যা কইলকাত্তা। অ্যাসেমব্লির ডাক। দেহো। আরো কত ডাক শুনার লাগে।'

'ডাক শুনা তো শুভই। দশদিক থিক্যা দশজন যহন একজনরেই ডাকে।'

'হ। ঠিকৈ কইছ। সেই একজন যদি সামলাইতে পারে—কার ডাকের কী জব দিবে। আর ভুল কইর‍্যা মামাকে যদি বাবা ডাইক্যা ফেলে, তয় তো মরণং ধ্রুব।'

যোগেন মণ্ডল বিএ, বিএল, এমএলএ তার বাড়ির দুয়ার বেয়ে নেমে খালঘাটার দিকে হাঁটে একা-একা। ছোড়দিদি আর টুনি ঘাটে বসে আছে তার বাহন ঠিক করে। যোগেন মণ্ডলের পরনে ধুতি, একটু আধময়লা ; তার পায়ে গোড়ালি পর্যন্ত ধুলো। গায়ে পাঞ্জাবি। তার বুকপকেটে ফাউন্টেন পেন। সাইড-পকেটে রিস্টওয়াচ। আধময়লা হলেও গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা ধুতি আর ধুতির ওপর পাঞ্জাবি তার জাতভাইরা কেউ মৈস্তারকান্দিতে পরে না। তার কোনো-কোনো জাতভাই সুট-টাই পরে বটে কিন্তু তাদের সংখ্যা হাতের আঙুলে গোনা যায়।

যোগেন মণ্ডল এই সাজে খালঘাটের দিকে হাঁটছে।

ইতিহাসের ভিতরে ঢুকে পড়ার ঐ সাজে।

হকশাহেবের বাড়ি

পটুয়াখালির স্টিমারঘাটা থেকে যোগেন লোকজন এড়িয়ে টুক করে বেরিয়ে রাস্তায় উঠে হাঁটতে শুরু করল হকশাহেবের বাড়ির দিকে, যদিও হকশাহেবের বাড়ি সে চেনে তো নাইই, সে-বাড়ির কোনো হদিশও জানে না।

২৩

ঘাটে স্টিমার লাগতে-না-লাগতেই যোগেন নিচে এসে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়ায় যাতে খুলতে-না-খুলতেই নেমে রাস্তায় উঠে যেতে পারে। মৈস্তারকান্দি থেকে নৌকোয় মুলাদি পৌঁছে আড়িয়াল খাঁ দিয়ে পটুয়াখালিরদিকে ডাউন-লঞ্চ যোগেন পেয়েছিল বটে, তবে সেটা ধরতে হলে আরো ঘণ্টা তিনেক মুলাদিতে বসে থাকতে হত, তাহলে আবার তার বরিশাল ফিরতে-ফিরতে রাত হয়ে যেত, ফেরা নাও হতে পারে। যোগেন তাই লতানদী ধরে যে-লঞ্চ ছাড়ব-ছাড়ব করছিল, সেটাতেই গিয়ে উঠল।

লঞ্চ ছাড়ার পর যোগেন বোঝে, লঞ্চসুদ্ধু লোক যেন তাকে চেনে কিন্তু সে একজনকেও চেনে না। তেমনই তো হওয়ার কথা—এই পুরো রুটটার অনেকটাই তো তার কনস্টিটুয়েন্সি গৌরনদী উত্তরপূর্ব গ্রামীণ সাধারণ। ভোটটা যে সে জিতল, সে তো ভোটারদের ভোটেই। তাহলে লঞ্চের মানুষজন তাকে দেখে সেলাম দিয়ে গেলে যোগেন মুখ লুকতে চায় কেন আর ঘাটে সিঁড়ি পড়তে-না-পড়তেই সবাইকে এড়িয়ে রাস্তায় উঠে পড়ে কেন আরো হাঁটতে শুরু করে দেয় কেন?

সেটা একটা খুব পাকখাওয়া ব্যাপার—বরিশালের খোলানদীর মাঘমাসের সকালে গায়ে রোদের তাপ মাখতে-মাখতে তেমন ব্যাপারে ঢোকার কথা না, বরং জ্যৈষ্ঠের সকালে, ঘন হয়ে আসা কালো মেঘগুলির, নানা কোণ থেকে নানা কোণে ছুটে-যাওয়া আঁধার, নদীর জলের ওপর গর্ত খুঁড়ে জলের অতলের অভিমুখে পাকখাওয়া হতেও পারে। যোগেন লঞ্চে সেই বেটাইমি প্যাঁচের ঘেরে পড়ে গিয়েছিল, অপ্রস্তুত।

যোগেনের নিজের কাছে নিজেকে মনে হত—ভোটের আগে সে ছিল সিকিনেতা। না-হলে তার ভোটে দাঁড়ানো হত না। আর, ভোটে জিতে সে বড়জোর আধুলিনেতা হয়ে উঠেছে। বড়জোর আধুলি নেতা। কিন্তু এই লতানদীর ওপর দিয়ে লঞ্চে রোদে পিঠ দিয়ে পটুয়াখালির দিকে ভাসতে-ভাসতে যোগেনের ঐ আধুলি নেতাগিরির ধারণাতেই যেন ফাটল ধরে। ভোটে জেতা নিয়ে বরিশাল শহরে যা হয়েছে আর মৈস্তারকান্দিতে যা সব হল যোগেনের যেন প্রায় জানা হয়ে গিয়েছিল—সে যে ষোল-আনি-নেতা হচ্ছে না, তাতেই তার নেতাগিরির আট-আনি,

নির্ভুল ধার্য হয়ে যাচ্ছে। বরিশাল শহরে আর মৈস্তারকান্দিতে তাকে যোগেন আর যোগা, দাদা আর ভাই, বলে ডাকার লোক এত যে তার আট-আনি নেতা হয়ে থাকাটাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। কিন্তু মুলাদি থেকে লতানদীর ডাউন-স্টিমারে উঠতেই তাকে পায়ে-পায়ে আদাব শুনতে হয়, আর কারো দিকে না-তাকিয়ে নিচু চোখে বলে যেতে হয় 'আদাব আদাব'। স্টিমারের বাটলার তাড়াহুড়োয় ভাঁজিলুঙ্গি আর গেঞ্জির ওপর জরি সাঁটা পাগড়ি পরে এসে বলতে শুরু করে, —'ছার, ছার, চলেন আপনি স্পেশ্যাল ক্যাবিনে ছার, কোনো অসুবিধার বন্দবস্ত নাই ছার, ফাউলকারি মাটনকারি হিলসা-শর্ষ্যাবাটা—যা খাব্যার চান ছ্যার, হগগই দিব ছ্যার, এমনকী কৈমাছ খাওয়ার চান যদি পরের স্টপেই তুলি ছ্যার—।' যোগেনকে না-শোনার ভান করতে হয়। বা, একটু প্রশ্রয়ে বলতে হয়, 'আমি একা অত খাব নাকী মিঞা'? এমন সচেতন আত্মরক্ষা যোগেনকে করে যেতে হয়। এতই তার আশপাশের এই মানুষজনের মত যোগেনকেও ভাবতে হয়—নেতাগিরির কোনো সিকি-আধুলি নেই, হয় ষোল-আনি, না-হয় তো ফুটোপয়সা। জনসাধারণ চায় এমন এক নেতা যে ষোল-আনা পেলে আঠার-আনা ফেরত দেয়। নেতাও চায় এমন জনসাধারণ যারা ষোল-আনার হিশেব রাখতে আঠার-আনা দক্ষিণা দেয়।

সকলে যত জানতে চায়—যোগেন এদিকে কোথায় এসেছিল, কোথায় যাচ্ছে—এই সাতসকালে, যোগেন ততই নিজের মধ্যে গুটিয়ে যায়। সে যদি এখন বলে দেয়, হকশাহেব ডেকে পাঠিয়েছেন, তাই সে যাচ্ছে, তাহলে সঙ্গে-সঙ্গে লতানদীর মাঝগাঙ থেকে কথাটা দুই পাড়ে তো ছুটে যাবেই, ঘাটে-ঘাটে স্টিমার লাগলে—কথাটা কলকাতার দিকে ও রংপুরের দিকে ছুটবেই। হকশাহের হলেন প্রজা পার্টির নেতা আর যোগেন হল সাধারণ আসনে সংরক্ষিত নেতা। এই দুই নেতা যদি জোট বাঁধে, তাহলে কংগ্রেস বা মুসলিম লিগ ছাড়াই বাংলায় সরকার তৈরি হয়ে যাবে। এই সব কথা যারা আকাশের তারা গুনে নিশ্চিত বলে দিতে পারে, তেমন দু-একজন মাঝারি কর্তা আর খোকাবাবুকে স্টিমারে দেখেছে যোগেন।

সে তাই পটুয়াখালির ঘাটে স্টিমার লাগতে-না-লাগতেই সকলের চোখ এড়িয়ে রাস্তায় উঠে একদিকে হাঁটতে থাকে। হকশাহেবের বাড়ি কোন্‌দিকে তা না-জেনেই।

যোগেন মাঝারি-নেতার সুবিধেগুলি ছাড়তে চাইছিল না। সে যে সব কাজ করে দিতে পারে না—সবাইকে একটা টের পাইয়ে রাখতে চায় যোগেন। যদিও সে নিজেই জানে না, কী কাজ সে করে দিতে পারে। আর, মানুষজন তার কাছে কোন্ কাজ চায়, তার কোনো আন্দাজই তার নেই। মানুষজনেরও নেই। চাঁড়াল যোগেন চাঁড়াল বলেই তার অনুভবে বুঝে ফেলেছে যে মানুষজনের তেমন কোনো চাওয়াই নেই। চাইতে গেলে তো নিজের অভাবটা চিনতে হয়। চেনে নাকী, তার বাবা বা বড়কাকা বা যোগামা? পুলিশের সেপাই, থানার দারোগা, জমিদারের নায়েব, ঠাকুরমশায়—এরা কোথায়, কোন্‌দিকে আছে তা না জেনেই তো যোগেনের মানুষজন হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে। কিছু চাইতে না। তারা যে আছে সেই অপরাধের স্বীকারোক্তিতে। যোগেনের সমাজের বেশ কিছু মানুষ তো ঐ ষোল-আনা মান্যিগণ্যির মধ্যে চলে গেছে। তারাও যেতে চেয়েছে, তাদের সমাজও তাদেরদিকেও তাদের করজোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে—তারা যে আছে সেই অপরাধের স্বীকারোক্তিতে।

হকশাহেব পটুয়াখালিতে কোথায় বাসা গেড়েছেন—যোগেন জানে না। ভোটের মুখে শুনেছিল, হকশাহেব মুসলিম লিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতার জবাবে স্যার খাজা নাজিমুদ্দিনের খাশ জমিদারি দক্ষিণ পটুয়াখালিতে ঢুকতেই পারছেন না। খাজা ঐ আসন থেকেই দু-দুবার কাউন্সিলের মেম্বার হয়েছেন। ডাকসাইটে জমিদার তো বটেই, গভর্নর অ্যানডারসনের বন্ধু ও সারা ভারত

মুসলিম লিগের নেতা। পটুয়াখালির সরকারি ব্যবস্থা তাঁর হুকুমে চলে, তাঁর নিজের জমিদারির কর্মচারীর সংখ্যা—লেঠেলসহ—অনেক ও সারা পটুয়াখালিতে ছড়ানো।

বাঙালি মুসলমানদের ওপর লিগের নেতৃত্বের প্রতিপক্ষ হিশেবেই ফজলুল হক ১৯৩৬-এ 'নিখিলবঙ্গ কৃষক-প্রজা পার্টি'র পক্ষে ইস্তাহার বের করে, জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ আর চাষিদের ঋণ মকুবের কথা তোলেন। কৃষক-প্রজা পার্টির নেতা ভারতের বিখ্যাত দন্ত-চিকিৎসক, আর. আমেদ মুসলিম লিগের নেতা শহিদ সোহরাবর্দিকে ভোটযুদ্ধে ডাক দিয়েছিলেন, 'হকশাহেব কোন্ কেন্দ্রে দাঁড়াবেন, তা মুসলিম লিগই ঠিক করে দিক। যে-কোনো কেন্দ্রে হকশাহেব লিগের যে-কোনো নেতাকে হারিয়ে দেবেন।' তার উত্তরেই মুসলিম লিগ জানায়—সাহস যদি থাকে তাহলে হকশাহেব দক্ষিণ পটুয়াখালিতে স্যার নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে লড়ে যান—নাজিমুদ্দিনকে হারানো এতই অসম্ভব। হকশাহেব পটুয়াখালিতে এসে দেখেন কেউ তাঁকে বাসা ভাড়া দেয়ার সাহসটুকুও পাচ্ছে না। শেষে স্থানীয় উকিল ললিত সেনের বাড়িতে ঠাঁই গাড়তে পারলেন। প্রথম জনসভাতেই হকশাহেব এক ধাঁধা ছাড়লেন—'পয়লা লড়াই হয় র-এ আর র-এ রাম-রাবণ, দোসরা লড়াই হয় ক-এ আর ক-এ, তেসরা লড়াই হয় গ-এ আর গ-এ কৃষ্ণ-কংস গান্ধী-গরমেন্ট, আর এই চৌঠা লড়াই হচ্ছে লাঙল লিগে ল-এ আর ল-এ'।

এসব উড়ো কথা নৌকোয়-নৌকোয় ভেসে যোগেনের কানে গেছে, কিন্তু কোনো খবর সে রাখেনি। এখন যোগেন পটুয়াখালির রাস্তা দিয়ে একা হনহনিয়ে হাঁটছে এমন যেন তার দুই বেলা যাতায়াত, হকশাহেবের বাড়িতে।

কিন্তু যোগেন জিগগেস করলেই তো পারে কাউকে। স্টিমারে তো সেই সাহসটাই খুইয়ে নামল যোগেন। তাকে যে কবে এত লোক চিনে ফেলেছে, যোগেন টেরই পায়নি। বাটলার থেকে শুরু করে বোরখা-ঢাকা মেয়েরাও। এমনও হতে পারে—মুলাদিতে লঞ্চ ধরার সময় কেউ-কেউ তাকে দেখে স্টিমারে কানাকানি করে জানান দিয়ে নিজের নিজের ঘাটে নেমে গেছে। লঞ্চে-স্টিমারে তো রটানো সবচেয়ে সহজ, না-শুনে তো আর উপায় নেই।

এখন যদি যোগেন কাউকে জিজ্ঞাসা করে আর সে যোগেনকে চিনে ফেলে তাহলে হকশাহেবের বাড়ির হদিশ যোগেন পাওয়ার আগেই তো ঐ খবর শীতকালের গভীর রাতে লাগা আগুনের মত বেড় লাগিয়ে ছুটবে—শুইনছ নি বাপ, বরিশালের যোগেন মণ্ডল, হকশাহেবের বাড়ির তালাশে পটুয়াখালির বাজারে পা ঝুলাইয়্যা বইস্যা আছে—এ!

সেই চেনা-পাবলিক ও যোগেনের একটা লুকোচুরি তৈরি হতে থাকে যোগেনের একলা হাঁটার তালে। একটা কথা তার মাথায় আসে, একটা টমটম নিলে হয়, ঘোড়ার গাড়ি যদি নাই নেয়। যা হোক, টমটম নিল, উঠল, তারপর কী বলবে? হকশাহেব? টমটমওয়ালা যদি জিগগেস করে বসে কোন্ হকশাহেব—তাহলেও না-হয় একটা পালটা কথা বলা যায়। তাতে একটা খুব বড় অনিশ্চয়তা—পটুয়াখালির লোকজন এখন হয়তো হকশাহেবকে অন্য কোনো নামে ডাকে। এ-পাবলিককে বিশ্বাস আছে? কখন যে নাম বদলে দেয় কারো, এমনকী নিজের বাপেরও। কোনোটাই মিথ্যে নয়, কোনোটাই বানানো নয়, নাম' কোন্‌টা বলবে নির্ভর করে—একটু অন্যরকম আদর জানাতে বা আত্মরক্ষা করতে। আধঘণ্টা আগে যে-বৌকে ডেকেছে, 'চোখঠুকরা', মানে পুরুষ দেখলেই চোখ দিয়ে ঠুকরয়, তাকেই অন্ধকারে শুয়ে ডাকে 'আন্ধার মানিক'। যোগেন হয়তো টমটমওয়ালাকে বলল, 'হকশাহেব বাড়ি', টমটমওয়ালা হয়তো বলল, 'কামডা কার লগে? তারে পাইলেই তো হইল। নাকী! নাকী হকশাহেবেরই দর্শন চান?' মানে, সে কার সঙ্গে দেখা করবে সেটা টমটমওয়ালাই তার চাইতে ভালো জানবে।

সরষের তেল ও বেগুনের কাঁটা

২৪

যোগেন হাঁটতে থাকে। তার দু-হাতে, দেয়ালে দরজায় ও মাথার ওপরে হকশাহেবেরই প্রতীক, 'লাঙ্গল'। এই পোস্টার ধরে শহরে ঘুরতে থাকলে সে একরকম পৌঁছে যাবে। আর-একটা উপায় হল—কোথাও কারো সঙ্গে কথাটা তুলে ফেলা, তারপর জেনে নিয়ে চলে যাওয়া। ব্যাপারটা যদি এত সহজ হত, তাহলে কী আর যোগেনকে স্টিমার থেকে নেমে এমন হাঁটতে হয়। ঠিক যখন একটা টমটমকে থামাবে বলে দাঁড়িয়েছে, তখনই টমটমটা দাঁড়িয়ে পড়ল—

'বাবু, যাবেন নি, এইদিকে?' টমটমওয়ালাই জিজ্ঞাসা করে।

যোগেন তাকিয়ে দেখে, পেছনের একটা সিট খালি। টমটমে বসে চারজনই, বাচ্চা থাকলে এঁটে যায়। যে এঁটে যাচ্ছে সে সত্যি-সত্যি বাচ্চা কীনা অনেক সময়ই এ নিয়ে প্যাসেঞ্জার আর ঘোড়াওয়ালার ঝগড়া বাধে। ওজনের একটা নিয়ম মানতে হয়, সামনে বেশি ওজন হয়ে গেলে ঘোড়ার কাঁধে চাপ পড়ে। মাঝরাস্তায় কেউ উঠলেও, সে ভারী হলে, নেমে-উঠে প্যাসেঞ্জারদের ওজন বেঁটে নিতে হয়, নতুন করে। টমটমের পেছনেই একটা জায়গা খালি। নিজের ওজন নিয়ে যোগেনের তাই দ্বিধা হয় না। সে উঠে বসে পড়ে। যোগেনের মুখ টমটমের পেছন দিকে আর ঘোড়াওয়ালার মুখ টমটমের সম্মুখ দিকে।

যোগেন তার চোখের সামনে রাস্তার লম্বা হয়ে যাওয়ার দিকে তাকিয়েই বলে, 'পটুয়াখালিত কি নাম-ঠিকানার বালাই উইঠ্যা গিছে। ঘোড়া যেহানে নিয়্যা যায় সেইডাই কি যাওনের জায়গা হয়?'

'ঘোড়ায় কি এডডু খবর রাখে না? যাবেন তো হকশাহেবের বাড়ি আর ফেরার ইস্টিমার তো সন্ধ্যায়। আপ না ডাউন—সেইডা ঘোড়া অ্যাহনো জানে নাই'—টমটমওয়ালা তার মুখের সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে থেকেই বলে।

যোগেনের মুখভরা হাসিটায় ধরা পড়ে যাওয়ার মুগ্ধতা ছিল। গাড়োয়ান আর সে তো উলটো মুখে। যোগেন যখন হেসেই ফেলেছে তখন তো কারো দিকে তাকিয়ে তাকে হাসতে হয়। তার পাশে বসা শাদা নুর, গেঞ্জি আর লুঙিপরা মানুষটি যেন জানেই—এবার যোগেন তার দিকে ঘাড় ঘোরাবে। সে-ই আগে ঘাড় ঘুরিয়ে ও হেসে যোগেনের হাসিটা নিয়ে নেয়।

যোগেন আবার গড়ানো রাস্তার লম্বা হয়ে যাওয়ার দিকে মুখ করে বলে, 'হকশাহেবের বাড়ি কি সব ঘোড়ারই সমান দূরে? ভাড়ার কমব্যাশ নাই?'

গাড়োয়ান যেন তার ঘোড়ার সঙ্গে কথা বলছে, এমন নিচু স্বরে বলে, 'জীবনে আর টাহাপয়সা দিয়্যা হয়ডা কী বাবু?'

যোগেন এ দার্শনিকতা চেনে। অন্য কোনো কথায় যেতে চাইছে।

'না। হইবডা কী? হেই সর্ষ্যার ত্যাল কিনব্যার লাগে। না অইলে ভাতে আর বেগুনপোড়ায় মাখামাখি হয় না।'

'এইডা একডা দশকথার এককথা কইছেন, বাবু। পয়সা লাগে তো ঐ বেগুনপোড়াডা মাখার লগে। ধান আছে খ্যাতে, বেগুন আছে মাঠে—ফিরি, ফিরি। শুধু ত্যালের পয়সাডা হইয়্যা গেলে, যারে, বোয়াল, তোরে ছাইড়্যা দিব।'

'ঘোড়ার নাম থুইছেন বোয়াল?'

'না, বাবু, রাঘববোয়াল।'

'অ। নামের মতলবডা শুনা যায়?'

'মতলবডা কওয়ার জন্যই তো নাম থুছি। ভোটের আগে তো ওর নামানামি ছিল না। অরে আর ডাইকব কেডা?'

'অ্যাহন ডাকে কেডা?'

'ডাকেই না যহন, নামখান বড়ই থাকুক। অ্যাহে নবাব, তায় ছার, তায় খাজা, স্যায় নাজিমুদ্দিন যদি পটুখালির মজা জলে এই শীতকালে খাবি খাইল যহন, তহন আমার ঘোড়ার নাম রাঘববোয়াল রাইখব না ক্যান? সব্বাইয়ের ফুর্তি কি একরকমের হয়?'

'অ। ঘোড়ায় জানে তো তোমার ফুর্তি?'

'ফিরি। ফিরি। আপনারা আইসছেন হকশাহেবরে ভক্তি দিতে। আপনাগ কাছে পইসা নিয়্যা সইরষার ত্যাল কিনলে বেগুনের কাঁটা গলায় বিঁধব। ফিরি ফিরি।' এত বড় একখান জয় আর নারান মিয়া টমটমে এক অতিথ মানুষকে ফিরি টিরিপ দিবার পারব না, বাবু?'

'কইলডা কে যে পাইরবা না?'

'না। কবে আর কেডা? আমিই কই? নারান রে, এই-যে ল আর ল-এর লড়াইডা গেল তাতে তুই কী করলি রে নারান? কথাডা যহন মনের ভিতর খাবলা মাইরব্যার ধইরছে, হাঁড়িতে জিয়ান্ মাগুর মাছের নাগাল, তহন বুদ্ধিডাও খ্যাল্‌ল—মাথায়—ঢাকার নবাবশাহেব যদি ফিরিতে আমাগ নবাবি খানা খাওয়াইতে পারে, তাহালি, নারান, তুই ক্যান হকশাহেবের অতিথদের ফিরিটিরিপ দিব্যার পারবি না? যার যাতে নবাবি—আমার নবাবি এই টমটমডা আর আমার ঘোড়াডা। তাহাইলে এইডা কেন ফিরি দিব না? জানেন তো নবাবিখানার পেরস্তাবডা?'

'কইলেন কনে যে খানা শুইন্যাই আশ মিটাব?'

'ক্যা? আপনি যে দ্যাশ থিক্যা আলেন, সেহানে এই পেরস্তাবডা পৌছায় নাই?'

'কই? শুনছি বইল্যা তো পছন্দ হয় না।'

'আরে বাবু, এইডা না শুইন্যাই পটুয়াখালি আইছেন? শুনেন। শুইন্যাও সুখ, কইয়্যাও সুখ। এই-যে আমাগো লবাব খাজা, স্যায় তো ঢাকার লবারের বোনাই না খালা। স্যায় ঢাকার লবাব যহন খবর পাইল তার বোনাই-না-খালা লবাবের গাঁড় দিয়্যা লাঙ্গলের ফাল ঢুকত্যাছে, তহন, বজরা কইর‍্যা আইস্যা রোজ-রোজ মহোচ্ছব খাবার ডাইকল আমাগ। নবাবিখানার মহোচ্ছব। তা ঢাহার লবাব খাওয়ার শ্যাষে কইল, 'ভোটটা খাজারে দিয়ো বাপরা।' আর আমাগ থিক্যা জব হইল—তাই কি হয়। লাঙ্গল হক খাড়াইছে বইল্যাই তো খানা দিলেন হুজুর। এই খানা কি ছাড়া যায়? লাঙ্গল জিতলে বড়খানা দিবেন।'

এক মোড়ে, 'হে-ই খাড়া' বলে ঘোড়াটিকে দাঁড় করিয়ে ঘাড় না ঘুরিয়ে টমটমওয়ালা বলে, ডানহাতের রাস্তাটা দেখিয়ে, 'যান গা—সিধা, দুই পা। ফেরার টাইমে দেইখবেন এইহানে খাড়ায়্যা আছি। চক্ষু দুইখান যদি বোজা দ্যাহেন, এডডু ডাক কইরবেন, বাবু। লাগব না অবিশ্যি ডাইকব্যার, আমি একচক্ষু খুল্যাই ঘুমাই। ভাইববেন না। ফেরার সময়, পাবেন আমারে।'

হকশাহেবের বাড়ির রাস্তাটা ধরতেই যোগেন একই সঙ্গে হঠাৎ নিজের ওপর আর টমটমওয়ালার ওপর বিরক্ত হয়ে ওঠে। যেই বুঝেছে, বাইরের লোক, অমনি তাজ্জব বানানোতে মেতেছে! আর, যোগেনের কাল হয়েছে—এই ধুতিপাঞ্জাবি। হিন্দুবাবু ছাড়া কেউ ধুতিপাঞ্জাবি পরে? যদি শুধুই হিন্দু হয়, বামুনও হয়, কিন্তু বাবু না হয়, তাহলে সে খালি গায়ে থাকতে পারে, একখান নিমা কাঁধে ফেলে রাখতে পারে, একখান শাদা উতরি কাঁধে ফেলে রাখতে

পারে কিন্তু গামছা নয়, গামছাও থাকতে পারে, ভেজা রোদে মাথায় দিতে। কিন্তু পাঞ্জাবি পরে এক বাবু ও হিন্দু। সেই ধুতিপাঞ্জাবি দেখেই টমটমওয়ালা তাকে বাতচিতের খেলা দেখায়, ধরে নেয় হদ্দ বোকা। আর যোগেনের কাণ্ডটা কী? ধুতিপাঞ্জাবি পরে আর হকশাহেবের বাড়ি খুঁজে পায় না? কিন্তু যোগেন পরবেটা কী? কোন্ পোশাকে সে বোঝাতে পারে—সে হিন্দু বটে কিন্তু ভদ্দরলোক না। বার লাইব্রেরিতে তো শাদা প্যান্ট-কালো কোট—এই একটাই পোশাক। গ্রামেও, যা হোক একটা কিছু, পরে নিলেই চলে। শহরেবন্দরে ঘোরার মত তার কোনো ঠিকঠাক পোশাক হয় না। কলকাতায় তো আরো হবে না। যোগেন ধুতির সঙ্গে একটা হাফ বা ফুলশার্ট পরে না কেন—তাহলে তো লোকে তাকে হিন্দু ভাববে, বাবু ভাববে না। কিন্তু সে পাঞ্জাবি না পরলে তার সমাজের লোকদের মনে মান বাড়বে কী করে?

হকশাহেবের গান-তোলানো

২৫

সত্যি, দুই পা। নারান মিয়া ভুল বলেনি। রাস্তায় লোকজনের চলাফেরা দেখেই যোগেন বোঝে, এটাই ললিত সেনের বাড়ি। আর, সেই লোকজনকে ভিতরে ঢুকে বাঁয়ের পোর্টিকোতে দাঁড়াতে বা সেই পোর্টিকো থেকে বেরতে দেখেই, যোগেন ঢুকে পড়ে।

পোর্টিকোতে দু-একজন যোগেনের দিকে তাকায়। যোগেন সামনের ঘরটাতে ঢুকে পড়ে। হকশাহেব একটা চৌকির ওপর পা ছড়িয়ে বসে, গায়ে একটা বুকখোলা ফতুয়া আর পরনে একটা চেককাটা লুঙি। যোগেন চৌকির কাছে গিয়ে বলে, 'এই-যে দারার ছিন্নমুণ্ডুখান আপনার কাঁধে বসাইয়্যা চইল্যা আইসল্যাম। অ্যাহন আদেশ দ্যান—ছিন্নমুণ্ডুখান আপনার কাছে রাইখ্যা শূন্যমুণ্ডু হইয়্যা ফিইর‍্যা যাই।'

হকশাহেব তাড়াতাড়ি দুই পা গুটিয়ে বলে ওঠেন, 'কেডা? কেডা?'

যোগেন যেখানে দাঁড়িয়েছিল তার পেছনে একটা বিরাট জানলা। দরজা আর সেই জানলা গলা রোদের ঝিলিকে হকশাহেবের চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। যোগেনকে চিনতে পারেননি। চেনার অবিশ্যি কথাও নয়। কিন্তু যোগেনের কথা শুনে আর ধুতিপাঞ্জাবি দেখে বুঝে ফেলেছেন, রোজকার ভিড়ের বাইরের কেউ। যোগেন জবাব দেয়, 'বান্দার নাম যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। আপনি এক মাঝির হাতে পত্র লিইখ্যা তলব পাঠাইছেন। সে-মাঝির তো লুঙির ট্যাঁক ছাড়া পত্র রাখার জায়গা নাই। ফলে, জলে সে-পত্রের বেবাক ধুইয়্যা সাফ। শুধু ছাপার হরফে এ. কে. ফজলুল হক নামখান ধোয় নাই। সেই নামখান দেইখ্যাই তলব বুইঝছি। যদি ভুল বুইঝ্যা থাহি, কইয়্যা দ্যান, একজিট নেই।'

হকশাহেব যেন একটু থতমত খেয়েছিলেন। যে-কোনো পরিস্থিতিতে তিনিই সব সময় প্রধান। যোগেন 'ছিন্নমুন্ডু', 'একজিট' এই সব বলে নিজেকে এমন জাহির করে ফেলে যে হো হো হাসিতে ঘর ভরিয়ে দিতে হকশাহেবের পলকখানেক দেরি হয়।

'হা হা হা হা। আরে মণ্ডল, আরে তুমি অ্যাকটিং করো নি? হা হা হা হা। দারার ছিন্নমুন্ডু—ও জব্বর কইছ! আবার একজিটও কও। তুমি তো অ্যাসেমব্লিতে সকলরে জববন্ধ কইর‍্যা দিবা! আরে, দেখছ নি, আবার কয় একজিট? তোমার এনট্রান্সটা হইল কহন। ভোটে জিইত্যা পাশের

বাড়ির ফজলুল হকরে মলাম দ্যাও নাই। তোমারে লোক পাঠাইয়্যা চিঠি দিয়্যা শমন জারি কইর‍্যা আইনবার লাগে! তোমার এনট্রান্স হয় নাই, তাই তোমার একজিটের ক্ল্যাপসও নাই।'

'তাহাইলে সেবাডা ন্যান আর একখান সিট দ্যান', যোগেন হকশাহেবের দুই হাঁটু ছুঁয়ে প্রণাম করে, হকশাহেব তাকে জড়িয়ে ধরে পাশে বসান, 'আয়ো, আয়ো, বাপজান আয়ো।'

বসে যোগেন বলে, 'আপনি তো দিগ্বিজয়ী থিয়েটারের নাদির শাহ। শিশিরবাবু তো আর-কাউরে স্টেজে খাড়্যা থাইকব্যার দ্যান না! সব দিল্লি ম্যাসাকার। কোতল। কোতল।'

হকশাহেব আবার বুক ফাটিয়ে হাসেন, 'দেইখছ নি? আমিও দেইখছি। জুতা খুইল্যা বাবু হইয়া বসো। অনেক কথা আছে তোমার লগে। কও, খাইব্যা কী? বড় গোস্ত খাও? আনাই?'

'কন কী, কন কী। এই কথাডা আপনি আমারে কইছেন শুইনলেই তো আমার জাতধর্ম যাওনের বিধান দিব বামুনরা।'

'য্যান বামুনরা তাগো খাওয়ার মত জাতধর্ম তোমার অবশেষ রাইখছে। জাইত থাইকলেও তুমি শুদ্দুর আর আমি ন্যাড়া। জাইত খাইলেও তুমি শুদ্দুর আমি ন্যাড়া। আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি খাশিই খাও। অ্যাই, রামনা, মণ্ডল খাইব আমার লগে, খাশির মাংস আন। আর তোমরা অ্যাহন যাও, মণ্ডলের লগে আমার পোলিটিক্যাল ডিসকাশন আছে। কেউ থাইকব্যা না। অ্যাই, রামনা, দেহিস, কেউ য্যান শাশুড়ির নাগাল জানলায় কান না পাতে, খাশি আইনছস?'

হকশাহেব যোগেনকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আরে, মণ্ডল, সে-মাঝিরে তো আমি দিন তিন আগে পাঠাইছি আর তুমি আইল্যা দিন তিন পর। তোমার কি ফাঁসির আসামির কেমন আছিল?'

'না শাহেব। যে কয়ডা ছিল ফাঁসির মক্কেল আমার, আমার উপর ভরসা না রাইখ্যা তারা নিজেরা নিজেরাই ঝুইল্যা পইড়ছে। আপনার মাঝি বরিশালে আমারে পায় নাই। আমি গিছিল্যাম দ্যাশের বাড়ি মৈস্তারকান্দিতে। আপনার মাঝি তো যমদূতের সম্বন্ধী। বরিশাল থিইক্যা সারারাত বৈঠা মাইর‍্যা আমারে ঘুম থিক্যা ডাইক্যা তুইল্যা কয় হকশাহেব ডাইকছে।'

'মৈস্তারকান্দি? বাড়িত আছে কেডা?'

'সগগলে, যারা বাড়িত থাকে। মা নাই।'

'কতদিন নাই?'

'বছর সাত-আড।'

'তা হাইলে তো সইয়্যা গিছে।'

'কী?'

'মাতৃশোক। সারাজীবনে সয় না। তবু তো সওয়াবার লাগে, বাপ! বাবা-জ্যাঠা-খুড়া?'

'হ্যাঁ। সগলেই আছে—।'

'চলে কীসে? সংসার? কামাইয়্যা কেডা? জমি আছে নি?'

'অরে জমি কয় না। ছটাকখানেক। সগগলের যা, আমাগোও তাই। সংসার চলার কথা না। তবু তো চলে, দেহি।'

'তুমি তো অ্যাহন দেশের জন্য বলিপ্রদত্ত। এক-পয়সার আয় নাই, বার গণ্ডা ব্যয় আছে। তুমি আর বাড়িতে দিবা কী? বাড়ির থাইকলে সেইডায় ভাগ বসাইবা। দ্যাশের নেতার কি একা সংসার চলে? পোলাপান কয়ডা?'

যোগেন বুড়ো আঙুল তুলে লবডঙ্কা দেখায়।

হকশাহেব চিৎকার করে ওঠেন, 'আরে, আরে কয় কী? শাদি কয়ডা?'

'এডডাই যথেষ্ট।'

'এই তোমাগো হিন্দুগো বদভ্যাস। আরে, শাদির কহনো যথেষ্ট আছে নি? কয় বছর হইল শাদি।'

'হ্যায় তো মনে থাকে না, এতই তামাদি। কলেজে পড়ার লগে—'

'অ। পড়ার হাউশ ছিল, পয়সা ছিল না?'

'তা নাইলে বিয়া বসে কেডা?'

'হ্যায় তো তহন শিশু, তোমার বৌ?'

'শিশু হইবার বয়সে শিশু থাইকব না কি পিট্যাইয়া কাঁঠাল পাকাইব?'

'পিট্যাও নাই আর পাকাও নাই যে তার তো সাক্ষী রাইখছ নিজের শরীলে, আটকুড়্যা থাইক্যা? অ্যাহন কি কুনো গন্ধ পাও ক্যাঠাল নিজের থিক্যা পাইকল কী না।'

'আপনার পাঠানো মাঝি যে-ঘুম থিক্যা আমারে তুইল্যা শমন জারি কইরল, সেই ঘুমডার ভিতর কাইল রাতে য্যান গন্ধ-একখান নাকে লাইগল্—'

'আরে, কও কী, মণ্ডলের পোলা। ফজলুলের ডাক আর সন্তানের ডাক একডা টাইমেই শুইনল্যা?'

'তা, সেরকম কওয়া যায়।'

'তাহইলে পোলা হইলে নাম হইব ফজলুল, আর মায়্যা হইলে নাম হইব ফজলি।'

'স্যায় যহন হইব, তহন রাইখবেন। অ্যাহন আমারে ডাকলেন ক্যান, সেই কথাডা কন।'

'আরে, সে তো কইবই। তোমারে এড্ডা চান্স দিলাম। ভাইবল্যাম, বয়স কম, আইতে লজ্জা পায়, ডাইকলে লজ্জাডা হয়তো কাটানোর সুবিদা হইব। তাই সমন। তুমি তো যাদু, ভূমিকম্প দিছ, ভূমিকম্ফ। যুক্ত আসনে অশ্বিনী দত্তের ভাইয়ের বেটাকে চিৎ ফেইল্যা দিল্যা। জানো তো, সারা দ্যাশে তোমার লাগান জিতা আর-কেউ জিতে নাই। এইডা কি তুমি জানো, না জানো-না।'

'দ্যাশ? মানে—বাখরগঞ্জে?'

'আরে আরো একদুইখান দ্যাশ তো আছে তোমার? নাকী? ইলেকশন-টিলেকশন কি বাখরগঞ্জের লাইগ্যা কইরল্যা মণ্ডল?'

'না, না, স্যায় সব ক্লিয়ার আছে। আপনি কইলেন না—কী, সারা দ্যাশে ফার্স্ট—'

'হইছ তো তুমি। অ্যাহন পর্যন্ত যতখান খবর পাইছি তাতে যে-এগারডা প্রভিন্সে এই ইলেকশন হইছে, তার মইধ্যে ঐ অ্যাহন যাগো শিডিউল্ড কাস্ট কব্যার ধরছে, সেই শিডিউল্ড কাস্টের কোনো ক্যানডিডেট জেনারেল সিট থিক্যা, মানে, জয়েন্ট ইলেকটরেট থিক্যা জিতব্যার পারে নাই। দি অনলি এক্সসেপশন ইজ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল অব বাখরগঞ্জ। বুইঝল্যানি সোনা, তোমার জিতার অর্থখান? কিন্তু ফার্স্টই হও আর যাই হও—তোমার জিতার তো কোনো মূল্য নাই।'

'কন কী হকশাহেব। দরাদরি কইরতে হইলে তো বাজারহাটে একডা ছালা পাইত্যা এক মুঠা কাঁচা মরিচ বেইচব্যার রাইট লাগে। সেই রাইডডাই তো হইল এই নতুন আইনে, কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ডে।'

হকশাহেব যেন যোগেনের কথাটা ধরতে পারলেন না। তিনি 'অ্যাঁ' বলে যোগেনের দিকে তাকিয়েই থাকেন। যেন কানে শুনে যে-প্রশ্নটির প্রশ্ন বুঝতে পারেননি, চোখে দেখে সে-প্রশ্নটা জেনে নিতে চান। যোগেনও ভেবে বসে, তার কথার ভিতর হকশাহেব আবার অন্য কোনো ইঙ্গিত পেলেন নাকী? যোগেনও হকশাহেবের চোখে চোখ মিলিয়ে বলে ফেলে, 'অ্যাঁ...।'

একটু নিচু স্বরে ও ভুরু পাকিয়ে হকশাহেব বলে ওঠেন, 'কাঁচামরিচের কথাটা উঠে

কোত্থন?'

'মরিচে ঝাল লাইগ্‌লে ওটারে কলা কইর‍্যা লন—!'

'কাঁচা কলা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাঁচা না হইয়্যা কলা যদি পাকা হয়, তাও আপত্তি নাই।'

'আপত্তি যে নাই তা তো চোখের সম্মুখেই দেইখলাম। স্বকর্ণে শুইনল্যাম। অন্যের মুখে শুইনলে অবিশ্বাস হইত।'

'কওয়া কথার তো ফেরত হয় না। আমার মায়ে যহন আমারে প্যাটে ধরছিল, আপনি তো তারও আগে পড়াশুনা, চাকরিবাকরি, উকিল-মোক্তারি সাইর‍্যা ফেলছেন!'

'তুমি তো উকিল, ভালো—এই কথাডা তো আমার লগে আইছে। কিন্তু এইডা তো উকিল-মোক্তারির কথা না। এইডা তো পলিটিক্যাল পারপাজের কথা। তুমি কি তোমার পলিটিকসডা কী, তা কইব্যার পার?'

'কইব্যার হয়তো পারি একডা কিছু বানাউটি কইর‍্যা। সেটা তো সত্যি না। আবার পুরাডা মিথ্যাও না। আমার সইত্যডা বুঝি আমার থিক্যা আপনিই বুঝবেন ভালো। আমারে কইয়্যা দ্যান। আমারে তো এডডু ভাইব্‌বার লাইগব, আপনার কথাডা আমার বেলায় ষোল আনা গিনি, না ব্রোঞ্জের, মিশাল।'

'অ। অ্যাহনো তুমি ষোল-আনা গিনি আর ষোল-আনা ব্রোঞ্জের বিশ্বাসী। কাঁচামরিচ আর কাঁচাকলা তো স্বচক্ষে দেইখল্যাম, স্বকর্ণে শুইনলাম। এরপর তুমি আমার কাছ থিক্যা তোমার নিজের পোলিটিক্যাল পারপাজ শিখব্যার চাও? এরপর তোমার মামলা আর টেঁকে ক্যামনে? না, মণ্ডল। তোমার এক্কেরে ঢাকিসহ বিসর্জন।'

'একখান কথার কথা কইছি, মরিচ আর কলা, আর সেই নিয়্যা গলায় এক্কেরে পাঁড়া দিয়া ধইরছেন। আপনি কইলেন, শিডিউলগো জিতার কোনো মূল্য নাই। তার জবাবে কইছি—সবে তো এই ভোটে প্রথম মরিচকলা নিয়্যা ছালা পাতছি। সেই কথাডারে এত কচলান ক্যান?'

'তুমি তো হাটঘাট চিনো? দেইখছ তো?'

'সেডাও সন্দ হয়?'

'কোনো হাটে দেইখছ কাঁচা মরিচ আর কাঁচা কলা ছালা পাইত্যা বিক্কিরি হয়? দেইখছ?"

'ছালায় দেখি নাই, পাহাড় কইর‍্যা দেইখ্‌ছি।'

'সে তো দেইখব্যাই, চালান যায়, বরিশাল থিক্যা। কিন্তু ছালা পাইত্যা একমুঠ কাঁচা মরিচ নিয়া বইসছে হাটে—দেখছ নি?'

'মনে হয় না, দেইখছি।'

'আরে, দেইখলে তো মনে হব? চাষির যদি কাঁচা মরিচ কিন্যা খাওয়ার পয়সা হয়, তাহলি তো কওয়া লাগে—রামরাজত্ব তো হইয়্যাই আছে, শুধু একখান রামচন্দ্রের অপেক্ষা।'

'এইডা বড় ঠিক ধইরছেন। কৃষকের খরচার পয়সা—আমার এইডা মাথায় আসে নাই'—বলে যোগেন হেসে ফেলে, আত্মোপলব্ধির হাসি।

—'আবার, তো, দেহি হাসো! চক্ষু তো আল্লা দুইডাই দিছে তোমারেও। মুণ্ডুও দিছে একখান। বঙ্গপ্রদেশের প্রথম নির্বাচিত আইসভায় গিয়া ছালা পাইত্যা বলবা—এই যে বাবুরা, আমরা গরিব শিডিউল, আমাগো কলামরিচও কিছু নিবেন? এর লগে ভোট? আবার হাস?'

'না, হকশাহেব, হাসি দুঃখে। চাষি গরিবের খরচার কথাডা মাথায় খেলে নাই কেন—সেই কারণডা বুইঝ্যা—।'

'বুইঝল্যাডা কী?'

'আমাগো নিজের বাড়িতেও তো খরচা নাই। ক্যান? না, পয়সা নাই। তয়? খরচা-ছাড়া যেইটুক্ বাঁচা যায়, আমাগো সেইটুক্ বাঁচা। যার মরণশ্বাস উঠছে, সে তো আর ভাইবব্যার পারে না তার শ্বাসটানা আর শ্যাষ হব না। আপনাগো নাগাল যারা তারে ঘিইর‍্যা বাঁইচ্যা খাড়াইয়্যা থাহে তারা বুঝে ঐডা মরণশ্বাস। আমাগো তো এই অভাবের বোধই নাই হকশাহেব। কামনে বুঝি?'

'কও কী মণ্ডল? ল্যাংটার নাই বাটপাড়ের ডর?'

যোগেন তার হাসিটা নিয়ে চুপ করে থাকে। বোঝা যায় সে কথাটা ভাবছে। হকশাহেবও চুপ করে থেকে তাকে ভাবতে দেন। কথাটা কি তিনি জানতে চান, না, কথাটা তিনি জানাতে চান। এটা তো একটা রাজনীতির বিনিময়ের বিষয়, এমন বিষয় যা হকশাহেব বা মণ্ডলের ক্ষমতায় সমলানো যাওয়া নিয়ে সংশয় আছে।

যোগেন জিজ্ঞাসা করে, 'কথাখান উলটা না তো হকশাহেব?'

'উলটাও, উলটাইয়্যা দ্যাহো, কথাডার কোন্ দিকে প্যাট আর কোন্ দিকে পিঠ, দ্যাহো।'

'বাটপাড় কি আর ল্যাংটারে ডরে?'

হকশাহেবের ভুরু কুঁচকে যায়। যোগেনের ঠোঁটের হাসিটা তার ঠোঁট থেকে মোছে না। সে যেন আরো ঠিকঠাক কথাটা ভাবতে চায় আর আরো ঠিকঠাক কথায় সেটা বলতে চায়। হকসাহেব আইনের সূক্ষ্ম একটা বিচার মনে-মনে সারার জন্য নিজের মনে বলেন, 'ক্যা? বাটবাড়ের কী কারণ থাইকব্যার পারে ল্যাংটারে ডরানোর?' তারপর যোগেনকে বলেন, 'কথা সাফ করো। তুমি কি বাটপাড় না ল্যাংটা?'

যোগেন হাসিটা ছড়িয়ে দিয়ে বলে, প্রশ্নের সুরে, 'আমি যে ল্যাংটা সেডা তো সগলেই দেখতিছে। আমি যদি কইও, না, আমি ল্যাংটা না, সে কথা কেউ মানব নি? সগলেই তো দেইখছে—আমার চ্যাটটা খোলা, সেইটুক্ ঢাকার ত্যানাও নাই আমার। তহন যদি আমি কই—আমি বাটপাড় হইয়া তোর পাছার কাপড় টাইন্যা নিয়্যা আমার চ্যাট ঢাগব—তহন যার পরনে কাপড় হ্যায় ডর খাইব না? যোগেনের স্বরে কোনো মীমাংসা ফোটে না, প্রশ্নই ফোটে, 'যার পরনে কাপড়, হ্যায় ডর খাইব না?'

হকশাহেবের কপালের ভাঁজ সোজা হয় না। একবার তিনি 'অ্যাঁ' বলেন কী না, বোঝা যায় না, হয়ত ছোট একটা কাশি।

যোগেন বলতে থাকে, 'প্রথমে খাইব না ডর। যাঃ, যাঃ, কইর‍্যা খ্যাদাইব। যাঃ, যাঃ, চাঁড়ালের চ্যাট দ্যাহে কেডা। চাঁড়াল তো তিনজন্মের ল্যাংটা।'

'তিন জন্ম ক্যা?'

'আগের জন্ম আর পরের জন্ম মিলাইয়্যা।'

'অ।'

'খ্যাদাইলেও ল্যাংটা যদি না সরে আর কয়—ত্যানা একখানা নিবই—'

হকশায়েব অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে কেশে ফেলেন, কাশি থামলে আবার হেসে আবার কাশেন। কোন্টা তিনি থামাতে চান—কাশি না হাসি—বোঝা যায় না।

শেষে লুঙিতে নাক ঝেড়ে চোখ মুছে বলেন, 'জব্বর্ কইছ রে মণ্ডল। পোলিটিক্যাল মোটিভেশন এর চ্যায়্যা ক্লিয়ার করার সাইধ্য নাই কারো। তুমি নি এই কথাডাই কইছ ইলেকশনে—ত্যানার ভাগ দাও, চ্যাট ঢাকব।'

'না। কই নাই। আমার তাতে বিপদ হইত।'

'বিপদডা কী?'

'বাবুরা কইব্যার ধইরত, তোগো তো ত্যানা আলাদা কইর‍্যা দিছে, রিজার্ভ সিট। সেহানে না বইয়্যা হিন্দুগো সিট কংগ্রেসিগো সিটে আসিস ক্যান? আমার সিট তো জেনারেল—।'

'অ। তালি তো ডর খাওয়ানোর বুদ্ধি খাটে না। তো কইল্যাডা কী, এই কথায়?'

'এই কথায় আমি এদিকওদিক করি নাই। সিধা বর্শা চালাইছি বাবুগো কণ্ঠা লক্ষ কইর‍্যা।'

'ব্রহ্ম হত্যা হইত না?'

'দেহি নাই। কইছি—একখান ভোটের লগে এতডা মিথ্যা কথা কওয়া ধর্মে সবে না। বামুন-কায়েত-বদ্যিগো আমরা পণ্ডিত বইল্যা দিনে দশবার সেবা দেই, মুসলমানগো পাঁচ-ওকতো নমাজের ডবল আর তাইনরা এমন একখান মিথ্যা রট্যাব্যার ধইরছেন? হ্যাঁ। কয়েকডা আসন রিজার্ভ রাখা হইছে হিন্দুগো ভিতর যে-সব জাইত সৎশুদ্দুর আর শুদ্দুর তার লাগে। বাকি সব সিট তো খুলা—যার ইচ্ছা সে-ই খাড়্যাবার পারে। বিদ্যাসাগর পণ্ডিত যহন বিধবাগো বিয়্যার আইন পাশ কইরলেন তহন কি তিনি কইছিলেন—শুধু বিধবাগোরই বিয়া করা চইলবে, আর কারো বিহা করা চইলবে না? তিনি তো খুঁইজা-পাইয়্যা এর উলটা কথাডাই বাইর করছিলেন—শাস্ত্রে সগগ্‌লে বিহা কইরতে পারব, বিধবারাও ইচ্ছা কইরলে পারবো। আমি তাই খোলাসিটে খাড়াইছি।'

'জব্বর কইছ তো মণ্ডল। বিদ্যাসাগরের কথাডা। তোমার ভোটার তো সব শুদ্দুর আর মোছলা। অগ তো আর বিধ্‌বা বিয়ার আপত্ত নাই। তালে অরা কোন্ পাকে বুইঝল?'

'চিরডা কাল একসঙ্গে বসবাস। অরা বুঝে না—বামুন কায়েতের বিধ্‌বারা আলাদা?'

'আপন বুঝ পাগলেও বুঝে হে মণ্ডল। আর, বুইঝবে না শুধু মোসলা আর নমশুদ্দুর চাষি, নাকী? কয়, রিজার্ভ সিট নিয়্যা যাবি কনে। বর্ণ এ মোসলা অ্যান্ড শুদ্দুর ইজ অলওয়েজ এ মোসলা অ্যান্ড শুদ্দুর। ভোটের পর তো অ্যাহন আবার ডর খাওয়াইব্যা, বাটপাড়গো? এই ঠাকুরমশায়, তোর নামাবলির আদ্ধেকখান ছিঁইড়্যা দে, চ্যাট ঢাহি। যাউক গা, ডর খাওয়াও। আমার তো নামাবলিও নাই, ধুতিও পরি না, বামুনও না। আমার ডরের কিছু নাই।'

'তয় যে শুনি ললিত স্যান মশায়ের বাড়ির দুয়ারে প্রথম মিটিঙে নাহি ধুতি পরছিলেন? আর কী এক ধাঁধা ছাইড়ছিলেন। লয়ে লয়ে যুদ্ধ। শুইনছি। কিন্তু বুঝি নাই। বোকা ভাইবব বইল্যা কাউরেও জিগ্যাবারেই পারি না। অ্যাহে তো মনে-মনে জানি, আমি হদ্দবোকা। সে কথাডা যদি দশের কানে যায়—তালে তো ভোটও দিব না, মামলাও দিব না। বৈশাখ মাসের ব্যাঙের নাগাল শুখাইয়া মইরব্যার লাইগব। এডডু কয়্যা দ্যান হক শাহেব।'

'ঐডা তো বানান ধাঁধা। রাম-রাবণে, কৃষ্ণ-কংসে, গান্ধী-গভর্নমেন্টে আর এইবার লবাবে-লাঙলে। শুইনছ নি লাঙ্গল নিয়্যা কাজির গান, আব্বাসের গলায়?

চল্ বাজান, চল্ মাঠে, লাঙ্গল বাইতে
বৌ দিয়েছে গলায় দড়ি, তার ব্যথা সইতে।

তুমি নাহি ভালো গান গাইব্যার পারো, মণ্ডল। এই গানডা গলায় তুইল্যা নিয়ো।'

ফজলুল হকের মাথা ও যোগেনের সন্দেহ

‘এই আপনার গোপন পলিটিক্যাল মিটিং? শিডিউলগো জিতার দাম নাই। তাই, তারা গান বান্ধুক।’

২৬

‘কথা ঘুরাইও না মণ্ডল। কইছি—ইন্ডিয়ায় তুমি ফার্স্ট হইল্যা যে শিডিউল হইয়্যাও জেনারেল সিটে জিতত্যা, তেমন জিতাডাও কাজে লাগে না।’

‘কোন্ কাজের কথা কন?’

‘তোমরা তো শিডিউলই জিতছ, আইন সভার ৩০-৩২ জন তো জিতছ তোমরা শিডিউল। ঐ কংগ্রেসের জনা সাত ধইর‍্যা। কিন্তু তোমরা তো কেউ কারো মুখও চেনো না। সগলে শিডিউল—এই-যা মিল। ৩০-৩২-ডা এমএলএ মানেডা বুঝো? রাজা বানাইব্যার পারো। রাজা ফেইলব্যারও পারো। পারো কিন্তু পারো না। তোমরা ৩০-৩২ জনই তো স্বতন্ত্র, ইনডিপেনডেন্ট। তোমাগো কোনো পার্টি নাই, ব্লক নাই, নেতা নাই। যদি থাইকত, তালি আমারে কি আর প্রাইম মিনিস্টার হওয়ার লগে কংগ্রেসের কাছে ভোট চাইব্যার লাগে?’

‘সব ফলাফল বাইরিয়্যা গিছে?’

‘বায়র‍্যায় নাই। খবর যা পাইছি। মন্ত্রী হইব্যার উমেদারগো ভিড় লাইগব্যার ধইরছে।’

‘আপনি-যে প্রাইম মিনিস্টার হইবেন, সেইডা ঠিক হইয়া আছে?’

‘সেইডা তো ঠিকই আছে। কিন্তু কোন্ দলের থিক্যা হইব, তারা অ্যাহনো ঠিক করে নাই।’

‘তালি তো আপনার এই এমন জিতারও কুনো দাম নাই। প্রাইম মিনিস্টার ঠিক হইয়্যা গেল, কিন্তু তার চেয়ারডার চাইর পাও ঠিক নাই। পার্টি নাই, ব্লক নাই, নেতা নাই—’

‘আরে ছ্যামড়াডা কয় কী? এতগুলো এমএলএ জিতল, ২৫০ডা, তাগো মন্ত্রী কইরব কেডা, আমি ছাড়া?’

‘আপনারে প্রাইম মিনিস্টার কইরব কারা?’

‘যারা মন্ত্রী হইব্যার চায়—’

‘তাগ তো নিজেগ পার্টি আছে, ব্লক আছে। আপনি তো আইজ মুসলিম লিগ, কাইল ইউনাইটেড, পরশু কৃষক-প্রজা। ওরাও তো কইব্যার পারে—এর মাথার ঠিক নাই।’

‘কইব্যার পারে কও ক্যা? কয় তো। মাথার ঠিক নাই তো ন্যায্য কথা। কিন্তু মাথাখান তো আবার ফজলুল হকের। তয়? নাকী সেডাও তোমার সন্দেহ?’

‘আমার সন্দতে আপনার কী আসে-যায়? আপনে তো আপনেই।’

‘আরো কও। কও যে আমার তুল্য আর-কেউ নাই, ভুভারতে নাই। কও। নাকী তোমার সন্দেহ আছে।’

‘সন্দেহ নাই। কিন্তু থাইকলেও স্বীকার যাওয়ার সাহস নাই।’

‘আরো কও। অ্যাহন যারা পলিটিক্স্ করে, তাগো সগ্গলের চায়্যা সিনিয়ার আমি। কও।’

‘জিন্নার থিক্যাও?’

‘জিন্না? তিন-না-চাইর বছরের ছোড়্?’

‘নেহেরু?’

‘বাপ না ব্যাটা?’

‘বুইঝছি। গান্ধী?’

'বয়সে দুই-তিন বছরের বড় হইব্যার পারে। কিন্তু স্যায় যহন পলিটিক্স কইরব্যার আইল ইনডিয়ায় তহন তো নাইনটিন সিক্সটিনের লখনৌ প্যাক্ট কইর‍্যা সারছি। আমি তহন কংগ্রেসেরও প্রেসিডেন্ট, মুসলিম লিগেরও প্রেসিডেন্ট। আর-কেউরে দেইখছ অ্যামন? আমারে কয়—মুসলমানের শত্রু। ক্যান? না, লিগের শত্রু মানেই মুসলমানের শত্রু। আরে, তোরা তো মুসলমান হইলি লাল পরশুদিন আর লিগ করলি সামনের পরশুদিন। আমি তো লিগের প্রতিষ্ঠাতা—১৯০৬-এ।'

'গাল পাড়েন কারে? আমারে কি পড়া জিগানোর ধইরছেন?'

'তোমারে কি জিগাইব রে মণ্ডল? তুমি তো দুগ্ধপোষ্য। কই আমার জাতভাইগো—সুরাবর্দি, নিজামুদ্দিনগ। যত্ত সব নবাবের পাছাচাটা। এই নবাব-জমিদারগ উচ্ছেদ না কইরলে বাংলার মুক্তি নাই। আমারে লুক্যাইয়া কইরল—ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি। জিন্নায় ভাইবছিল, আমার মাথায় পা রাইখ্যা মুসলমান কৃষকের ভোট গুনব। আর মাথাখান তো ফজলুল হকের। ঢাকার নবাব সলিমুল্লা, তেগো বাপের বাপ, কইছিল, ফজলুল রে, তোর মাথাডা আমারে দে আর আমার গদিখান তুই নে। নাকী তোমার সন্দেহ আছে?'

'কী সন্দেহ কইরব, এই মামলায়? নবাবের সম্পত্তি কি আমার সন্দেহের সীমায় আসে?'

'ও। আর আমার মাথাডা তোমার সন্দেহের সীমার মইধ্যে পড়ে?'

'সে হয় নাকী? নবাবশাহেবই তো এক্সচেঞ্জ ভ্যালু বইল্যা দিছেন। তাঁর সম্পত্তিতে যদি বিশ্বাস কইরতে হয়, তালে, আপনার মাথারেও বিশ্বাস কইরতে হয়। দুইডার ভ্যালুই সমান।'

'দ্যাহো মণ্ডল, আমারে আইন শিখাইয়ো না। আমি আশু মুখার্জির জুনিয়ার ছিল্যাম।'

'আমি আবার আইন কইল্যাম কহন?'

'কইল্যা না—বাই ডেরিভেশন আমার মাথার দাম মাইনতে পারো? তাতেই তো বুঝা যায় এই মাথার ইনট্রিনশিক দর লইয়্যা তোমার সন্দেহ আছে। এইগুল্যা হইল জিন্নার ব্যারিস্টারি। বড় ব্যারিস্টার, মণ্ডল, খুব বড়। ও এই ডেরিভেশনের খেলায় এক্কেরে যারে কয়, মাস্টার। এক আমি বইল্যাই পার পায় নাই, গান্ধী রে তো সকাল-সন্ধ্যায় চুবায়।'

'আপনারে চুবানো আর গান্ধীরে চুবানো কি এক হইল? দুইজনের সাইজ মাপছেন? আপনারে চুবানোর লগে তো পদ্মা-মেঘনার নাগাল বড় নদী চাই, নেহাৎ যদি একখান সমুদ্দুর হাতের বগলে পাওয়া নাই যায়। আর, গান্ধীরে তো ধাক্কা মাইরলেই গড়াইয়্যা পিছনের খাল কী ডোবায় গিয়া পড়বে নে।'

'গান্ধী রে চিনো না মণ্ডল, চিনব্যার যাইয়ো না। তুমি তো পিছনের ডোবার জলে গান্ধী রে ফ্যালাইয়া আগাইয়্যা গেলা, ভাইব্ল্যা ঝামেলা চুইকছে। তারপর, এক অমাবস্যার রাইতে দেইখলা সামনে য্যান কে আসে—দ্যাখতে তো গান্ধীর নাগালই নাগে। তহন তো তুমি বুদ্ধি-মন্তর সব ভুইল্যা যাবা মণ্ডল, জিনের কলমা পইড়বা, না, ফজরের নামাজ পইড়বা। আমার তো সে-খ্যামতা নাই। আমার তো আছে এক সম্মুখসমর। বুদ্ধি কইরছিল কি, জিন্না, ভোটের আগে, ভাবো। আমারে দিব পিছন থিক্যা কাঁচি চাল্যাইয়া। কাঁচি খাইলে আর সম্মুখসমরে আগান্ যায়? কাঁচি বুঝো নি? ফুটবলের? হিলচার্জ। আমি তো কইলকাতার মাঠে ব্যাকে খেলত্যাম। আমারে হিলচার্জ কইরতে তো নৌকা-সাইজের পাও দরকার। জিন্না, সুরাবর্দি, নাজিমুদ্দিনের পাও তো লেডিজ পা—তাও কত ঢাকা-ঢাকনি, মোজা-জুতা-ফিতা। আরে, তোরা পারস আমার বরিশালি আল-খাল পরানো পায়ের লগে? দিল্যাম একখান লাথ্থি, ঘাড় না-ঘুরাইয়্যা, পিছনে, কতডা জোর আর সিয়োর হওয়া লাগে কও, ফুটবলে তো তোমার ভাবনাচিন্তার টাইম নাই। ভাবার

আগে কাম। দ্যাহো...'

হকশাহেব উঠে মেঝেতে লুঙিটা একটু তুলে যোগেনকে ফুটবল দেখাতে শুরু করেন।

যোগেন বলে, 'কী দেহান, এহানে, হকশাহেব? আপনার তো ফুট আছে, বল নাই।'

হকশাহেব ধমকে ওঠেন, 'আরে, শিখাইলে শিখে না? এইডারে কী কয়?' বলে তিনি ডান পা সামনের দিকে ছোঁড়েন।

'কী আবার কয়। কিক।'

'গুড। তুমি জানো মনে হয়। খেলো নাকী' তালে এডারে কী কইব্যা? বলে হকশাহেব তাঁর ডানপাটাকে বেশ জোরে পেছন দিকে ছোঁড়েন। ছোঁড়া হয় ভালোই কিন্তু টাল খেয়ে যান, 'বয়স হইছে তো! ব্যালান্স রাইখবার পারি না।'

'আর, আপনারে ব্যালান্স রাইখব্যার হব না। বসেন।'

'কইল্যা না, এডারে কী কয়?'

'কী আবার কইব—ব্যাককিক। বসেন তো।'

'অ রে মণ্ডল। তুমি তো দেহি সবই জানো। তালে এডা কী কও?'

হকশাহেব লুঙিটা আরো তুলে নিয়ে বাঁ পায়ের ওপর পুরো ভর দিয়ে লম্বা, শক্ত, ডান পা-টাকে সামনে ছড়িয়ে বাঁয়ে ঘোরালেন। দেখতে ভালো লাগে। যোগেনের চোখে সেই মুগ্ধতা এসে যায়।

'জানো না, এডারে কী কয়?'

'জানি-কী-না-জানি, আপনি বসেন। শ্যাষে বুড়া মাইর্যা খুনের দায়ে পড়ি!'

'ওরা তো সেই বুদ্ধিই করছিল। বুড়াকে মাইর্যা খুনের দায়ও বুড়ার ঘাড়ে চাপাইব,' হকশাহেব নিজের জায়গায় বসে বলেন, 'এই হইল জিন্নার ডেরিভেটিভ কৌশল। ইস্পাহানিরে লাগাইয়া ভোটের মুখে, মাস আটেক আগে, ঢাহার নবাবরে দিয়্যা এক দল খাড়া কইরল। নবাবগো বুদ্ধি তো আর নবাবগোর চায়্যা বেশি হবার পারে না। নবাব হবিবুল্লাহ খুইল্যা বইসলেন—ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি। সুরাবর্দি মজলিশ আর লিগ তো ছিলই। বাকি রইল্যাম এক আমি। জিন্নারি কইলকাত্তায় আইসলেন মুসলমান পার্টিগুলারে একখান ছাতার তলায় আইনতে। হইল সইসাবুদ। তারিখখান দেখো, গত বছরের আগস্টের ১৮ই। পরের দিন জিন্নারে নাকী সংবর্ধনা দেয়ার মিটিং ডাকা ছিল। আমি জাইনত্যামই না। আমারে প্রেসিডেন্টের চেয়ারে বসাইয়্যা চইল্‌ল জিন্নার প্রশস্তি। তারিখটা খেয়াল রাখো—১৮ আগস্ট চুক্তি, ১৯ আগস্ট জিন্নার অভ্যর্থনা। এই দুইডা যদি মিলাও, তালে, তো অ্যাড্‌ডাই ডেরিভেটিভ কনক্লুশন হইব। জিন্নাই এডা করাইছে, জিন্নাই আমাগ নেতা। সেই সুবাদে পরদিনই সকালে এই আমাগ ডেরিভেটিভ নেতা মহম্মদ আলি জিন্না গিয়্যা ছোটলাটকে সেলাম বাজাইয়্যা বইল্যা অ্যালো, 'স্যার, সব ঠিক কইর্যা দিয়্যা গ্যালাম।' মানে, ফজলুল হকফক কেউ না। আ রে, এ তো হিলচার্জ করব্যার লাগছে। আমিও ছুইড়ল্যাম ব্যাককিক। ঐ ২০ তারিখ সন্ধ্যাবেলায়। কার বিচিতে লাইগল আর কার বিচি মাথায় উঠল—জানি না। ঐ ডেরিভেটিভ আরগুমেন্ট আর মাথায় খেলে না—বিচি মাথায় উঠলে। বিচিতে যে পুরা লাইগছে বোঝা গেল, পরের দিনই ২১ তারিখ। জিন্না আর তার লবাবজাদারা মিল্যা কইয়্যা দিল আমরা ফজলুল হকরে মানি না আর ফজলুল হক ইসলামের শত্রু। অ্যাহন তো ভোটের রেজাল্ট বারাচ্ছে—নিজেগ বিচি নামা আর ভোট গোন।'

'হকশাহেব, এডা তো খানিক-খানিক জানা। শিক্ষাডা কী দিলেন? কার বিচি দেখাদেখি নাই, সিধা ব্যাককিক।'

'হ্যাঁ। অ্যাকশনের পার্টে তাই। যদি তাগদ থাকে। যদি ঐ ডেরিভেটিভরে, ঠেক্যাইব্যার চাও, তালে সিধা বিচিতে কিক। সি-ধা। দৈয়ের হাঁড়িডাই যদি ভাইঙ্গ্যা দ্যাও, ন্যাপায় আর খাইবডা কী? যাইব্যা কবে, কইলকাত্তায়? আমার লগে চলো, ফেব্রুয়ারির সাত। আমি যাইয়্যা মন্ত্রী খুঁজি আর তুমি যাইয়্যা শিডিউল এমএলএ-গোর সঙ্গে দেখাশুনা করো, মনের মিল খুঁজো আর এডডা কিছু ছাতা বানাও। শিডিউলড ক্লাশ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, কী অ্যাসোসিয়েশন, কী, ইনডিপেনডেন্ট শিডিউল কাস্ট ব্লক, এইসব এড্ডা বানাও। তো যাইবা তো সাতুই?'

'না। আপনি যান। আমি পরে যাই।'

'ক্যা?'

'না। আপনারে বিশ্বাস নাই। দশজনের সামনে ক্যাবিন থিক্যা ডাক পাইড়বেন। আর আমি ডেকের টিকিট নিয়্যা ক্যাবিনে যাই ক্যামনে?'

'এই কামও কইরো না, মণ্ডল। এই টাকাডা তো তোমারে গবর্নমেন্ট দিব। সে-কথা ছাড়ান দাও। ফজলুল হক যদি ডেকে যায়, তালে লোকে দ্যাখে। দ্যাহো, ক্যামন মানুষ! আর, যোগেন মণ্ডল যদি ডেকে যায় তাহাইলেও মানুষ দ্যাখে। দ্যাহো, ক্যামন মানুষ, কোনো মানমর্যাদা জ্ঞান নাই, চাঁড়াল তো, ক্যাবিনে যাওয়ার সাহস নাই।'

'এই কথাডা ভাবি নাই। ভাইবলেই-বা কী হইত! টাহা পাব ক্যামনে?'

'আমি দিব। তুমি শোধ দিও। এই রাম্—না, সাত তারিখে দুইখান ক্যাবিন টিকিট কাটবি। সিঙ্গল ক্যাবিন। জে এন মণ্ডল, এমএলএ। থাইকব্যা কনে?'

'দেহি, ভাবি নাই, প্যারী ডাক্তারের বাড়ি তো...'

'তোমারে তো আমার লগেই উঠানো কাম ছিল। কিন্তু তুমি নতুন মানুষ। তোমারে হাঙ্গরের মুখে ফেলি ক্যামনে?'

'হাঙ্গর কেডা?'

'আমার সঙ্গে বরিশাল থিক্যা তুমি কইলকাতায় নামলা। আমারে যত মালা দিব শিয়ালদায়, কইয়্যা দিলে তারা তোমারেও না-হয় দুই-একখান দিবে। তারপর, আমারই লগে তুমি আমারই বাড়ি গিয়্যা উইঠল্যা। তালে আর বাকিডা থাকে কী। 'আজাদ'-এ হেডলাইন হইব—'ফজলুল হক কর্তৃক স্বতন্ত্র সিডিউল মেম্বার আটক—প্রধানমন্ত্রিত্বের লোভে।' নাঃ, সে তো তোমার একডা এমব্যারাসমেন্ট। চলো, আমার লগে চলো আর উঠো প্যারী ডাক্তারের বাড়িতেই।'

যোগেনেরা এল কোত্থেকে? যায় না-হয়—কলকাতায়

২৭

১৯৩৭-এর ফেব্রুয়ারির গোড়ায় ফজলুল হক আর যোগেন মণ্ডলের মত আরো সব এমএলএ -রা কলকাতা যাচ্ছিলেন, প্রায়-স্বাধীন ভারতের, একটি প্রদেশের, প্রায়-প্রথম, প্রায়-সরকার, তৈরি করতে। আরো-আরো অনেক নেতা তো কলকাতাতেই ছিলেন—সব দলেরই, যেসব দল কেউ কারো মুখ দেখে না। হিন্দুরা ক-ভাগ, হিশেব রাখা মুশকিল—কংগ্রেস, হিন্দুসভা আর নতুন শিডিউল্ড কাস্ট নেতারা, তার ওপর কলকাতা আর মফস্বল। তারও ওপর কেন্দ্রীয় কংগ্রেস আর প্রদেশ কংগ্রেস। তারও ওপর প্রদেশ কংগ্রেসের হিন্দু নেতাদের নিজেদের ভাগাভাগি। বিধান রায়, শরৎ বোস, নলিনী সরকার, তুলসী গোস্বামী, নির্মল চন্দ্র—এই পাঁচ কংগ্রেসি নেতার প্রদেশ কংগ্রেস, কাউন্সিল আর কর্পোরেশনের দখল নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি-কাটাকাটি। তারই সঙ্গে শিডিউল্ড ক্যাস্টের জন্য সংরক্ষণের বিরুদ্ধে প্রদেশ-কংগ্রেসের সঙ্গে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রায় সিভিল-ওয়ার, গৃহযুদ্ধ—তবে প্রধানত চিঠিপত্রে ও গৌণত এক-এক উপদলের প্রদেশ-অফিস দখলে। জমিদারি ব্যবস্থা যাতে নিখুঁত থাকে তার জন্য কংগ্রেস আর লিগ মতৈক্যে কোনো ফাটল ছিল না। ১৯২৮-এর রায়তি স্বত্বের সংশোধনের পক্ষে তারা কেউ ভোট দেয়নি। জমিদারি আর শিডিউল্ড কাস্ট সংরক্ষণের পক্ষে ও বিপক্ষে বাংলার তাবৎ জমিদার কংগ্রেসের নেতা হয়ে নিজেদের জায়গায় কংগ্রেসকে তৈরি করে তুললেন আর প্রদেশ কংগ্রেসকে তাঁদের স্বার্থে চলতে বাধ্য করলেন। কংগ্রেসের জিলা অফিসগুলি ছিল সদরে—শহরের শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার, মোক্তার, চাকুরে এঁরাই ছিলেন, মেম্বার ও নেতা। কিরণশঙ্কর রায়—ঢাকার তেওটার জমিদার, তুলসী গোস্বামী—রাজা কিশোরীলাল গোস্বামীর ছেলে, তারকনাথ মুখার্জি—উত্তরপাড়ার জমিদার, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ-এর জমিদারি মৈমনসিঙে, তুলসীঘাটার জমিদার বিজয় রায়চৌধুরী, ইন্দুভূষণ গুপ্ত, কালীপ্রসন্ন গুহ, ব্রজেন রায়চৌধুরী।

মুসলমানরাও তখন টুকরো-টুকরো—নবাবদের মুসলিম লিগ, কৃষক ও প্রজার ফজলুল হক, আরো কত ভাগ। একই ধর্মের, কত ভাগ।

এই ভাগগুলি ধর্মীয় ও সামাজিক। অথচ এগুলির মার্কা দেয়া হচ্ছে—ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি প্রথা অনুযায়ী এক-একটি পার্টির নামে। ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে ব্রিটিশ ধারণা—শুধু সরকারি অফিসারদের নয়, ব্রিটিশ সমাজের ধারণা যে ভারতীয় সমাজ বলে কিছু নেই, শ্রেণি-জাতি-সম্প্রদায়ের এক জগাখিচুড়িকেই ভারতীয় সমাজ বলা হয়। তাদের স্বার্থ ও পরমার্থ এতই ভিন্ন যে-কোনো একটি স্থানীয় ঘটনা নিয়েও কোনো মতৈক্য তৈরি সম্ভব নয়। ব্রিটিশরা একটা অদ্ভুত ও উলটোপালটা ধারণা দিয়ে ভারতীয় সমাজকে বুঝে নিয়েছিলেন, কোনো সময়ই যে-ধারণা বদলায়নি। ভারতের যে-কোনো ঘটনাকেই ব্রিটিশরা বুঝে নিতেন জাতপাত, গাঁওগাঁই, বোলি, দেবদেওতা আর ঘর বা পরিবার দিয়ে। ব্রিটিশরা ভেবে নিয়েছিলেন—ভারতে সমাজ-পরিবার ছাড়া কিছু ঘটে না, ভারতে কোনো একটি মানুষও সমাজ-পরিবারের বাইরে একা কিছু করতে পারে না, করলে সেটা খুব খারাপ কাজ।

যে-ভোটে জিতে ফজলুল হক আর যোগেন মণ্ডল ১৯৩৭-এর ফেব্রুয়ারিতে আইনসভা তৈরি করতে যাচ্ছেন, সেই ভোটের ফল আইন-অনুযায়ী এইসব অংশ উল্লেখ করে-করে বেরিয়েছিল—সাধারণ শহর, সাধারণ গ্রাম, মুসলমান শহর, মুসলমান : গ্রাম, সাধারণ

নারী : শহর, মুসলমান : শহর, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, ইয়োরোপিয়ান, ভারতীয় খ্রিস্টান, শিল্পবাণিজ্য, জমিদার, শ্রমিক বিশ্ববিদ্যালয়।

কোনো বানরকেও যদি বলা হত, তাহলে, সে এর চাইতে এলোমেলো অংশ-ভাগ করতে পারত না।

এইরকম অংশভাগের একমাত্র নীতি হল—অংশগুলির জোড় মিলিয়ে দিতে হবে। কিন্তু এই অংশভাগের একমাত্র নীতি—কোনো ভাবেই যেন জোড় না মেলে। ততদিনে তো বাঙালির মিল আর স্পেন্সার পড়া হয়ে গেছে। এগুলি পড়তে আর লন্ডন যেতে হয় না। কলকাতাতেই, এমনকী বরিশালের বিএম কলেজ, রংপুরের কারমাইকেল কলেজ, পাবনার এডোয়ার্ড কলেজ, কোচবিহারের ভিক্টোরিয়া কলেজেও ক্লাশরুমে বসেই মিল পড়া যেত।

জন স্টুয়ার্ট মিলের স্বদেশবাসী ও মিলের কাছে শিক্ষা পেয়েছেন সেই বঙ্গবাসী-রা কিন্তু এমন অসম্ভব সব অংশভাগে কোনো খুঁত সেদিনও পাননি, এদিনেও পান না। কোনো যুক্তিবিজ্ঞানী বা ঐ ধরনের কেউ বলেননি—একটা ভাগের নাম যদি হয় 'সাধারণ' আসন, তাহলে একটা ভাগের নাম হতে পারে বা হতেই হবে—'অসাধারণ'। সেই 'অসাধারণ'-এর আবার, 'শহর' ও 'গ্রাম' ভাগ থাকতেই পারে। তাহলে দাঁড়াত, সাধারণ শহর, সাধারণ গ্রামীণ, মুসলমান সাধারণ-শহুরে, মুসলমান সাধারণ গ্রাম্য। আবার মুসলমান অসাধারণ শহুরে, মুসলমান গ্রাম্য সাধারণ। 'নারী সাধারণ' শহুরে। নারী অসাধারণ শহুরে। আবার নারী 'অসাধারণ' গ্রাম্য। যদি 'মুসলমান' ধর্মপরিচয় হিশেবে থাকে, তাহলে, হিন্দুরাও ধর্ম হিশেবে থাকতে হবে। নেই। আর কোনো ধর্মের উল্লেখ নেই এক 'ইন্ডিয়ান ক্রিশ্চিয়ান' ছাড়া। ইয়োরোপিয়ান বলে একটা টুকরো আছে, তাহলে তো এশিয়ান-আফ্রিকানও থাকতে হয়। যদি কমার্স অ্যান্ড ইনডাশট্রি থাকে, তাহলে তো কমার্স অ্যান্ড এগ্রিকালচারও রাখতে হয়। 'ল্যান্ডহোল্ডার' থাকলে, 'ল্যান্ডলেস'ও হতে হয়। 'আরবান'-এ আলিপুর আছে, ঢাকা নেই—ঢাকা পূর্ববঙ্গ-আসামের রাজধানী।

মাত্র বছর দশেক আগে কিন্তু মিল-বেন্থামের ভারতীয় ছাত্ররা একেবারে লজিকের সূত্র অনুযায়ী ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান ছকে ফেলেছিল। না। ভারতের সংবিধান ভারতীয়রাই তৈরি করবে—এই প্রতিশ্রুতি সত্য করে তুলেছিল সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে পুরো দেশের মিলিত বিক্ষোভে, বিদ্রোহে, বয়কটে। ব্রিটিশ রাজনীতির টৌরি-লেবার সংঘর্ষে টৌরিরা সামনের ভোটে তাদের নিশ্চিত পরাজয় ঠেকাতে শুধুমাত্র শাহেবদের নিয়ে সাইমন কমিশন বানিয়েছিল।

সাইমন তাঁর কমিশন নিয়ে বম্বে পৌছুলেন ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৮। মুসলিম লিগের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ আলি জিন্না পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে বম্বে-বয়কট সম্ভব করে তুললেন। দেশব্যাপী সাইমন-বিরোধিতার সেটাই শুরু, নেতা—জিন্না। গান্ধীজি অভিনন্দন জানালেন এই অকল্পনীয় সাফল্যে।

ব্রিটিশ মন্ত্রী বার্কেনহেড ভারতের ভাইসরয়কে লিখিত আদেশ দিলেন, ভাঙো, ভাঙো, ভারতীয়দের এই ঐক্য। জিন্নাকে আলাদা করো। ডিপ্রেসড ক্লাসকে আলাদা করো। ভাঙো, ভাঙো।

জিন্না ভাঙতে দিলেন না। শারীরিক অসুস্থতায় ৫১-বছর বয়সে তিনি কাহিল—সে-ই হয়তো তাঁর লাঙ ক্যানসারের শুরু। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে—তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুও ঘটল প্যারিসে। এরই মধ্যে জিন্না মুসলিম নেতাদের বোঝালেন—মুসলমানদের শুধু মুসলমানরাই ভোট দেবে এসব বিশ বছরের পুরনো দাবি ফেলে দিয়ে নতুন দাবিপত্র তৈরি করতে। তাতে

থাকবে—আসন-সংরক্ষণ, একটাই ভোটার লিস্ট, কেন্দ্রীয় আইনসভায় তিন ভাগের এক ভাগ আসন, পাঞ্জাব ও বাংলায় জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে আসন, আর সিন্ধুপ্রদেশ, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের লিস্টে ঢোকানো—এই দাবিগুলি নিয়ে কথা হবে। ১৯২৭-এর মে মাসে এ-আই-সি-সির বৈঠক ও ডিসেম্বরে মাদ্রাজ কংগ্রেসে জিন্নার প্রস্তাবে কংগ্রেস রাজি হয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রের প্রদেশ কংগ্রেস রে-রে করে উঠল। ১৯২৮-এর এপ্রিলে হিন্দু মহাসভার জব্বলপুর অধিবেশনে অহিন্দুদের হিন্দু করার কর্মসূচি ঘোষিত হল আর সমস্ত রকম সংরক্ষণ ও প্রদেশের নতুন তালিকা তৈরির বিরোধিতা করা হল। কংগ্রেসের নেহরু-রিপোর্টে কেন্দ্র ও মুসলমান-সংখ্যালঘু প্রদেশগুলিতেই কেবল সংরক্ষণ থাকবে বলা হল—মানে, পাঞ্জাব ও বাংলায় থাকবে না। আর, সিন্ধুপ্রদেশকে আলাদা প্রদেশ করা যায় কী না ভাবা হবে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস পাওয়ার পর। নেহরু রিপোর্টে কোনো স্বীকৃতিই থাকল না যে বছরখানেকও পেরয়নি—কংগ্রেস জিন্নার প্রস্তাব সমর্থন করেছে। মতিলাল নেহরুকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলে উঠেছিলেন, 'জিন্না? সে আবার কে?' এতসব সত্ত্বেও ১৯২৮-এর ডিসেম্বরে কলকাতায় অল পার্টি কনফারেন্সে হিন্দু-মুসলিম ও কংগ্রেস-লিগ ঐক্যের জন্য জিন্না একটা শেষ চেষ্টা করলেন। বললেন—বাংলা-পাঞ্জাবে সংরক্ষণ মাত্র ততদিন থাক যতদিন সর্বজনীন ভোটাধিকার চালু না হয়, প্রদেশগুলিকে ব্রিটিশ সরকারের বিশেষ ক্ষমতার কিছু অংশ দেয়া হোক, সিন্ধুপ্রদেশকে এখনই আলাদা প্রদেশ করা হোক। জিন্না একটা শেষ আবেদন করলেন, কাউকে কোনো দোষ না দিয়ে, যদিও কংগ্রেসকে তিনি চেপে ধরতে পারতেন—কথাখেলাপের অপরাধে। সে-সব না-করে তিনি বলেন,—'আমরা সকলেই তো এই দেশেরই মানুষ। আমাদের একসঙ্গে থাকতেই হবে। ...বিশ্বাস করুন, ভারতের কোনো আশাই নেই যদি হিন্দু ও মুসলমানরা এক না হন।'

জিন্নার আপোশ-প্রস্তাবকে হিন্দু মহাসভার নেতা জয়কার কোনো পাত্তাই দিলেন না। জয়কার-এর নিজের কোনো রাজনৈতিক নেতৃত্বের জায়গা ছিল না। হিন্দু মহাসভাও তখন পার্টি হিশেবে দুর্বল। কংগ্রেসের হিন্দুপন্থীদের প্রায় প্রকাশ্য সমর্থনের জোরেই জিন্নার প্রস্তাব জয়কার তুচ্ছ করতে পেরেছিলেন। মুসলিম রাজনীতিতে যাঁদের বিরোধিতা করে জিন্না একটা জায়গা তৈরি করতে চাইছিলেন, হিন্দুপন্থী নেতারা সেই ফজল্-ই-হাসান ও মুহম্মদ শফি প্রমুখ কট্টর নেতাদের দলেই তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন। বছর না-পেরতেই জিন্না তাঁর চোদ্দ-পয়েন্ট দাবি নিয়ে নতুন রাজনীতি শুরু করলেন। আর কংগ্রেস আইন-অমান্য আন্দোলনে নামল।

কিন্তু ইতিমধ্যে অন্য ধরনের কিছু ঘটনা কংগ্রেস-লিগ-হিন্দু মহাসভা-দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাগাম এইসব পার্টির সভা-সমিতি-সম্মিলন-প্রস্তাব বা দিল্লি-এলাহাবাদ-কানপুর-বোম্বাই-মাদ্রাজ এইসব শহর থেকে অনেক দূরে ও ভিতরে ও অনিশ্চিত সব লক্ষ্যে ঘটে যাচ্ছিল।

সূর্য সেনের নেতৃত্বে ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি ১৮ এপ্রিল সরকারের অস্ত্রাগার লুঠ করে জালালবাদ পাহাড়ে ২২ এপ্রিল সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধের মুখোমুখি হয়। ভারতের সশস্ত্র আন্দোলনে চট্টগ্রাম-বিদ্রোহের সমতুল্য কোনো ঘটনা ঘটেনি। সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা, তাদের বিশ্বস্ততা নিশ্ছিদ্র করে তোলা, অস্ত্রচালনা শেখা, শহরে সামাজিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, যুদ্ধের পরিকল্পনা, লক্ষ্য স্থির করা আর সেনাবাহিনীসহ ইংরেজদের প্রাণভয়ে চট্টগ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা—সমস্ত ঘটনাটিতে পরিকল্পনা, সংগঠন ও যুদ্ধশক্তির যে-প্রমাণ স্পষ্ট হয়ে উঠল তা থেকে বিপ্লবী সম্ভাবনার নতুন আবিষ্কার ঘটে গেল। এপ্রিলে হল চট্টগ্রামযুদ্ধ আর রাইটার্স বিল্ডিংসের অলিন্দযুদ্ধ করলেন বিনয়-বাদল-দীনেশ ডিসেম্বরে। পেশোয়ারে বাদশাহ খাঁনকে

গ্রেফতার করা হল ২৩ এপ্রিল—আইন-অমান্য আন্দোলনের কারণেই। সারা পেশোয়ার বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। কিসসাকাহিনি বাজারে সেনাবাহিনীর সঙ্গে সমবেত মানুষের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ২০০ থেকে ২৫০ সাধারণ মানুষ মারা গেলেন। গাড়োয়াল রাইফেল্‌স-এর হিন্দুসৈন্যরা জনতার ওপর গুলি চালাতে অস্বীকার করে। ১৯৩০-এর শেষার্ধে উপজাতিদের প্রচলিত হঠাৎ-আক্রমণ শুরু হয় কিন্তু তারা আর গ্রামে ডাকাতি বা লুটপাট করল না। এমন লুটপাট ও হঠাৎ-আক্রমণ তো তাদের জীবিকা। এই বছর তারা শ্লোগান তুলেছিল—বাদশাহ খাঁন, মালং বাবা (নাঙ্গা ফকির), ইনকিলাব-কে জেল থেকে ছাড়তে হবে।

গান্ধীজির গ্রেফতারের (৫ এপ্রিল, ১৯৩০) খবর পৌঁছুনোমাত্র শোলাপুরের সুতাকল শ্রমিকরা মিল ছেড়ে রাস্তায় নেমে পড়ল ৭ মে। থানা, মদের দোকান, স্টেশন, কোর্ট-কাছারিতে খেপে-ওঠা মানুষ আগুন লাগিয়ে দিল। তিনজন মুসলিম পুলিশকে পুড়িয়ে মারা হল। দুদিন পর ছিল বক্‌র্‌-ইদ। কোনো দাঙ্গা হাঙ্গামা ঘটল না। ১৩ মে শোলাপুরের জিলা ম্যাজিস্ট্রেট দিল্লিতে জানালেন, 'ট্র্যাফিক কনট্রোল থেকে সমস্ত প্রশাসনিক কাজ স্বেচ্ছাসেবকরাই চালাচ্ছেন। তারা নিজেদের ভিতর বেছে জিলা ম্যাজিস্ট্রেট থেকে দারোগা পর্যন্ত সব পদে কর্মী নিয়োগ করেছে।'

করাচিতে ডকশ্রমিকরা, মাদ্রাজে চুলাই মিল শ্রমিকরা, কলকাতায় অবাঙালি যানবাহন মজুররা, কলকাতার কাছে বজবজে মিল শ্রমিকরা—রাস্তায় নেমে পুলিশের সঙ্গে কখনো সম্মুখ, কখনো গেরিলা, লড়াই শুরু করে দিয়েছিল।

গান্ধীজি আমেদাবাদের সবরমতী আশ্রম থেকে হাঁটতে শুরু করেন ১৯৩০-এর ১২ মার্চ। তিনি ডান্ডিতে পৌঁছন ৫ এপ্রিল ও সমুদ্রের জল তুলে লবণ-আইন অমান্য করলেন ও জানিয়ে দিলেন পরদিন ৬ এপ্রিল থেকে সারা ভারতে আইন-অমান্য শুরু হবে। হাজার-হাজার মাইল দীর্ঘ উপকূলীয় ভারত উত্তাল হয়ে উঠল। ৫ এপ্রিল গান্ধীজিকে গ্রেফতার করা হল।

আইন-অমান্য আন্দোলনের বাইরে, স্থানীয় কোনো বিবাদের ওপরে, চেনাজানা পার্টিগুলির বহুবার শোনা কথাগুলি ছাড়িয়ে, ভাইসরয়ের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি বা দেখাসাক্ষাৎ এড়িয়ে—এই-যে কখনো ব্যক্তিগত সশস্ত্র আক্রমণ, কখনো তাৎক্ষণিক এক সমাবেশ,—কখনো সংগঠিত সশস্ত্র যুদ্ধ, কখনো কোনো শাহেব অফিসারকে মেরে ফেলা, ভাইসরয়ের স্পেশ্যাল ট্রেনেও বোমা ফাটানো—করাচি থেকে বজবজ—সেই সব ঘটনারও একটিই শ্লোগান—শাহেবরাজ খতম, গান্ধীরাজ জারি—এমনকী, জালালাবাদ যুদ্ধেও। 'ভারত' বলে একটা ধারণাকে সত্য করে তোলা তাদের পক্ষে কঠিন। 'গান্ধী'—কথাটিতে একটা চেনা মানুষের আদল আসে—হাঁটু-বেরনো খাটো ধুতি, খালি গা, টাক মাথা, মুখটি কখনো ভার, কখনো আলোমাখা।

১৯৩৭-এ সত্যি-সত্যি প্রায় সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রদেশে-প্রদেশে আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হচ্ছেন, তাঁরা প্রাদেশিক সরকার গড়বেন, তাঁরাই মন্ত্রিসভা গঠন করবেন, তাঁরাই আইনসভায় আইন তৈরি করবেন—তাহলে ক্ষমতা কি এসে গেল?

একেই তো স্বাধীনতা বলে? এমনই তো হয় স্বাধীন সব সভ্য দেশে। তাহলে কি স্বরাজ এসে গেল?

না, এটা যে স্বাধীনতা বা স্বরাজ নয়—সে-কথা বলার অনেক লোক ছিল, অনেক পার্টি ছিল। কেন্দ্রের কী হবে, কেন্দ্রীয় সরকার কি একটা সরকার হবে—না, প্রদেশগুলি মিলিয়ে মিশিয়ে কোনো সরকার হবে? কেন্দ্রীয় সরকার মানে তো ভারতবর্ষ। তাহলে ভারতবর্ষের কী হল? ভারতবর্ষ স্বাধীন না হলে কি প্রদেশ স্বাধীন হতে পারে? প্রদেশগুলি তো চেনাজানা জায়গা,

তার মাটি চেনা, তার পৌরাণিক গল্পগুলি চেনা, তার নদীনালা চেনা, তার রাস্তাঘাট চেনা, তার ডিএম-ও সিবিল সার্জেন চেনা, তার পুলিশ সুপার চেনা। আর, ভারতবর্ষ বলে এক কেন্দ্রের বা পরিধির তো কিছুই জানা নেই। ধারণা করে নিতে হয়েছে কোথায় ভারতবর্ষের সত্তা, কোথায় ভারতবর্ষের অতীত, কোন্ ধারণায় বাঁধা পড়ে আছে হিমালয় থেকে পূর্ব-পশ্চিমঘাট, ভারতবর্ষের মন্ত্রিসভা কী করে তৈরি হবে—যদি একজন কোনো রাজা বা অন্তত সহরাজা মাথার ওপর না থাকেন। দেড়শ বছরের ওপর ভারতবাসী ইংরেজের ভারতবর্ষকে চিনেছে। এখন অনিংরেজ ভারতবর্ষকে ধারণা করতে পারছে না। দেশ স্বাধীন হবে—ভারতবাসী এই বিশ্বাস বা আস্তিক্য বা আস্থাটুকু তৈরি করে তুলতে পেরেছিল। সেই তৈরি-হওয়ার ক্রিয়া খুবই জটিল। নিজের-নিজের জমির আলের সমস্যা, নিজের-নিজের জীবিকার সমস্যা, নিজের-নিজের মিল-কারখানার সমস্যা—মালিকের ও মজুরের, নিজের-নিজের মিউনিসিপ্যালিটি ও ইউনিয়ন বোর্ডের সমস্যা গণ-আন্দোলন গোপন-আন্দোলন এইসব কিছুর মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ, ইংরেজের ভারতবর্ষকে চিনেছে।

ব্রিটিশরা জানতেন, ভারতবাসী অনিংরেজ ভারতবর্ষের ধারণা বিভ্রাটে পড়েছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উপজাতিরা তাদের জীবিকার দরকারে লুঠ করতে এসে শ্লোগান দেয়, নাঙ্গা ফকিরকে জেল থেকে ছাড়ো। উত্তর-পূর্ব সীমান্তের চট্টগ্রামের জালালাবাদ পাহাড়ে ইংরেজকে যুদ্ধে আহ্বান করে বিপ্লবীরা শ্লোগান দেয়, গান্ধীরাজ জিন্দাবাদ। কিন্তু এই ভারতবাসীদের ভিতর যারা হিন্দু, তাদের ধারণাই নেই, অস্পৃশ্য হিন্দু ও যবন মুসলমানদের সঙ্গে তারা একসঙ্গে থাকবে কী করে। এই ভারতবাসীদের ভিতর যারা মুসলিম—তাদের ধারণাই নেই অনিংরেজ ভারত ও হিন্দু ভারতের মধ্যে তফাত কোথায়। যারা অ্যাংলো ইয়োরোপিয়ান তারা ধারণাই করতে পারে না—তাদের যারা পিতা, তারা তাদের জন্য কোনো ব্যবস্থা না করে চলে যাবে। আটাশ বন্দুক আর খেতাবে যারা সূর্যবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় দেশীয় রাজা ও নবাব, তারা তখনো ধারণা করতেই পারে না,—ইংরেজ না থাকলে তাদের রাজত্ব দেখবে কে?

ব্রিটিশরা লন্ডনের এক প্রাসাদকক্ষ সাজিয়ে সব নেতাদের ডেকে বলল, 'ভাবো। এখানে বসে-বসে ভাবো।' দ্বিতীয় গোলটেবিল, ১৯৩১-এর সেপ্টেম্বর।

একটা কোরাস তৈরি হওয়ার আগেই ভেঙে গেল

এটা সেই গোলটেবিল যে-আলোচনায় কংগ্রেস যাবে কী যাবে না ঠিক করতে ১৯৩১-এর ২৩ মার্চ করাচিতে কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হল আর ঐ দিনই রাতে ভগৎ সিং-রাজগুরু-সুখদেবের ফাঁসি হয়ে গেল।

২৮

গান্ধীকে নিয়ে ট্রেন করাচি স্টেশনে ঢুকতেই সমবেত মানুষের হাহাকার উঠল, 'গান্ধী—দূর হঠো', 'গান্ধীবাদ বরবাদ'।

মাত্র আঠার দিন আগে গান্ধী-আরুইন চুক্তি একেবারে হঠাৎ সই হয়েছে। গান্ধীজিই ভাইসরয় আরুইনের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন, এক চিঠি লিখে, ১৭ ফেব্রুয়ারি। সে-চুক্তিতে আইন-অমান্য করে যাঁরা জেলে ছিলেন, তাঁদের কারো-কারো মুক্তি জুটল, কিন্তু ভগৎ সিংদের

ফাঁসি রদের তেমন কোনো চেষ্টাই হল না। সরকার পুলিশি অত্যাচারের কোনো তদন্ত করতে বা গুজরাটের রায়তদের বাজেয়াপ্ত জমি ফেরত দিতে রাজি হল না। করাচি কংগ্রেস তবু গান্ধীজিকে বলল—সেপ্টেম্বরের গোলটেবিলে যেতে ও কংগ্রেসের একক প্রতিনিধি হয়ে যেতে।

গান্ধী-আরুইন চুক্তির এই একটিই সুফল। ব্রিটিশ সম্রাটের প্রতিনিধি গান্ধীকে তাঁর সমমর্যাদার একমাত্র ভারতীয় নেতা বলে স্বীকৃতি দিলেন। বিলেত থেকে ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র গান্ধীকে এই স্বীকৃতি দেয়ায় আরুইনের ওপর চটে গেল।

এদিকে গান্ধীর অহিংসার বিরুদ্ধে বাংলার শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত যুবকদের মধ্যে সশস্ত্র আক্রমণে ব্রিটিশ শাসনকে পঙ্গু করে দেয়ার এক বিপরীত উপায় ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। ৯ জন শাহেব খুন হলেন—তাদের দু-জন জিলা ম্যাজিস্ট্রেট। ত্রিপুরার জিলা ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে খুন করল স্কুলের দুই ছাত্রী।

গান্ধীজি করাচিতে জামায়েৎ-উল-উলেমা-হিন্দ-এর মিটিঙে বললেন,

'আমার একার কথা ধরলে মুসলমানরা যা চাইছেন তার সবই তাঁদের দিতে আমার কোনো বাধা নেই।' করাচি থেকে গান্ধীজি দিল্লি এলে সেখানে তখন 'নিখিল ভারত মুসলিম সম্মিলন' চলছে—তাঁরা চান তাঁদের জন্য আলাদা ভোটারলিস্ট, মানে, মুসলমানরাই কেবল মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনের প্রার্থীদের ভোট দিতে পারবে। দিল্লি থেকে গান্ধীজি এক বিবৃতি দিয়ে জানালেন, 'হিন্দু-মুসলমান সমস্যার একমাত্র সমাধান হতে পারে—মুসলিম ও শিখরা একমত হয়ে যা চাইবে, তাই তাদের দিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা। হিন্দুরা কী চায়, তা আমি জানি না, আমি তাঁদের কাছে তাঁদের সূত্র কী জানতে চেয়েছি। ধর্মের ভিত্তিতে এমন প্রস্তাবিত কোনো সমাধানের সঙ্গে আমি নিজেকে জড়াতে চাই না।' শাহেবদের বাণিজ্যিক সংগঠনের বার্ষিক অধিবেশন উদ্বোধন করে তিনি বললেন, 'আপনারা যে এদেশে আমাদের সমান অধিকার চাইছেন, তাতে আমরা এমন চমকে-চমকে উঠি কেন। কেন আমাদের মনে হয়—ইয়োরোপীয়দের এই দাবিটা স্বাভাবিক তো নয়ই, আইনসঙ্গতও নয়। ইয়োরোপিয়ানদের জন্য নিশ্চয়ই ইয়োরোপীয় সভ্যতার দরকার আছে কিন্তু তা নকল করতে গেলে ভারতের সর্বনাশ। আপনারা ভারতে থাকুন, কিন্তু ভারতীয় হয়ে থাকুন। ৭ এপ্রিল এই কথা বলে গান্ধী পরদিনই শিখ-লিগ মিটিঙের জন্য দিল্লি থেকে অমৃতসর গেলেন। সেখানে মাস্টার তারা সিং জানালেন, কোনো একটি ধর্মের দাবি ঠেকানোর একমাত্র উপায় একই ওজনের পালটা দাবি জানানো। গান্ধীজি তাঁদের বললেন, 'কোনো একটি ধর্মসম্প্রদায়ের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণে ভয়টা কী? যে-মুহূর্তে আমাদের দু-জনের মধ্যে বাইরের কোনো তৃতীয় পক্ষকে নাক ঢোকানোর চেষ্টা আটকাতে চাইব, সেই মুহূর্তে আত্মরক্ষার স্বার্থে দ্বিতীয় জনের সব দাবি মেনে নিতে আমাদের কোনো আপত্তি থাকবে না। এটা নিশ্চয়ই চিরকালের জন্য সর্বোত্তম সমাধান নয়, কিন্তু নিশ্চ ই এখনকার পক্ষে একমাত্র সময়োপযোগী সমাধান।' অমৃতসর থেকে আমেদাবাদ গিয়ে গুজরাট বিদ্যাপীঠের সমাবর্তনে বললেন, 'আশা তো করছি, এখনকার মত অস্থায়ী কোনো সমাধানে পৌছুতে পারলে, তার ওপর ভর দিয়ে স্থায়ী কোনো সমাধানও পাওয়া যাবে। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে তো আর যুদ্ধ করা যায় না, অন্তত আমি পারব না। আর দেখেশুনে মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে প্রকৃতি আমাদের ওপর বিরূপ।' আমেদাবাদ থেকে বোম্বাইয়ে এসেছিলেন তিনি বিদায়ী ভাইসরয় লর্ড আরুইনকে বিদায় জানাতে। সেই সম্ভাষণ থেকেই গুজরাটের বিপন্ন কৃষকদের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায়ের জন্য সরকারি অত্যাচারের কথা এসে গেল। ৩০ এপ্রিল তাঁর কাগজে 'গুজরাটের কৃষক' নিয়ে লেখা এক প্রবন্ধের শেষে বলে দিলেন, 'গান্ধী-আরুইন চুক্তিরক্ষায় আমার যা করণীয় আমি করে

যাচ্ছি বটে, তবে, আমি বেশ বুঝতে পারছি দিগন্তে দুর্যোগ জমছে আর আমি যে তা ঠেকিয়ে রাখতে পারব না তাও গোপন করে যাওয়া ঠিক নয়।' এক ব্রিটিশ কাগজ কেব্‌ল্ পাঠিয়ে গান্ধীজির কাছে জানতে চাইল, 'আপনি কি ইংল্যান্ড আসছেন।' গান্ধীজি সঙ্গে সঙ্গে জবাব পাঠালেন, 'আমার যাওয়া কতকগুলি অবস্থার ওপর নির্ভর করছে। তার ভিতর দুটো হল—গান্ধী-আরুইন চুক্তি সরকার মানছে কী না ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার কোনো মীমাংসা হল কী না।' সিমলাতেই এক ছোট্ট জনসভায় ১৪ মে গান্ধীজি বললেন, 'যুক্তি দিয়ে, বুঝিয়ে, দরকষাকষি করেও স্বরাজ যদি না-ই পাওয়া যায়, তাহলে আবার আমাদের দুঃখযন্ত্রণা আত্মত্যাগের পথে যেতে হবে।' ব্রিটিশ সরকার ও লর্ড উইলিংডনকে খুব চাপা একটা হুমকি দেয়া হল এই কয়েকটি কথায়। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ও করাচি কংগ্রেসে, গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীজির প্রতিনিধিত্বে কংগ্রেসের যোগদান পাকা হওয়ায় ব্রিটিশ সরকার তাঁদের মত করে তৈরি হচ্ছিলেন। কংগ্রেস ও গান্ধী বৈঠকে এলে, সে-বৈঠকের নৈতিকমূল্য বেড়ে যাবে। সেই মূল্যবৃদ্ধির সুদ যাতে কংগ্রেস ও গান্ধী আদায় করতে না পারে—সেই উদ্দেশ্যে ভবিষ্যৎ ভারতের ভাগীদার বলে ভাইসরয় সব গোষ্ঠী ও নেতাকেই দেদার নিমন্ত্রণ ছড়াচ্ছিলেন। লর্ড উইলিংডন-ও তাঁর ব্যবহারে বুঝিয়ে দিলেন, গান্ধীও অন্যান্য নেতার মতই একজন। তাই গান্ধী এইটুকুই শুধু জানালেন—গোলটেবিলে কংগ্রেস যাবে বললেও ও কংগ্রেসের হয়ে গান্ধীই যাবেন ঠিক হলেও—কোনো ঠিকই তো আর অপরিবর্তনীয় নয়। গোলটেবিলে কংগ্রেসের চেয়ার খালি থাকতেও পারে বা সে-চেয়ারে গান্ধীজি নাও থাকতে পারেন। এটা এখন ব্রিটিশ সরকার সাব্যস্ত করুক—তারা কি গান্ধীর প্রতিনিধিত্বে কংগ্রেসকে চায়? ৯ জুন বোম্বাইয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আবারও গান্ধীকে গোলটেবিলে পাঠাবার প্রস্তাব নিলে তিনি ১৮ জুন 'ইয়ং ইন্ডিয়া'য় এক প্রবন্ধ লিখে বিস্ফোরণ ঘটালেন। তাতে তিনি বলে দিলেন, গোলটেবিলে কংগ্রেসের যাওয়া তিনি সমর্থন করেন না, কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠদের তিনি নিজের মতে আনতে পারেননি তাই একজন গণতন্ত্রী হিশেবে তিনি সে-সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন। কিন্তু গোলটেবিলে যাওয়া মানে স্বাধীনতা আন্দোলন থামিয়ে দেয়া নয়। কংগ্রেস চায় স্বাধীনতার নির্যাস, স্বাধীনতার ছলনা নয়। সেই ছলনার জন্য যদিবা অপেক্ষা করা যায়, স্বাধীনতার নির্যাসের জন্য তো আর অপেক্ষা করা যায় না। সেই নির্যাস মূঢ়-ম্লান কোটি-কোটি মানুষের জীবনের মৃতসঞ্জীবনী। গান্ধীজি জানিয়ে দিলেন, 'প্রকৃত ক্ষমতা পেলে কি আমি তা ফিরিয়ে দেব? একেবারেই না। তেমন কিছুর জন্য তো আমি একেবারে প্রাণপণ চেষ্টা করব। কিন্তু যদি দরকার হয়, তার জন্য অপেক্ষাও আমি করতে পারি। সেটুকু আক্কেল ও ধৈর্য অন্তত আমার আছে।'

গান্ধীজি ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে এইরকম সব দরকষাকষি চলার মাঝখানে জুলাইয়ের শেষে সশস্ত্র বিপ্লবীরা বোম্বাইয়ের অস্থায়ী গভর্নর স্যার অর্নেস্ট হটসনকে খুনের চেষ্টা করে কিন্তু তিনি বেঁচে যান। পাঁচদিন পর আলিপুরের জেলাজজ বিপ্লবীদের গুলিতে খুন হন। যাবেন কি যাবেন না বলে যে জায়গা গান্ধীজি তৈরি করে তুলতে পেরেছিলেন তাতে গান্ধীজিকে পিছুতে হল। মাত্র সপ্তাহ দেড়েকের মধ্যেই তিনি তাঁর পুরনো জায়গায় ফিরে গিয়ে ১১ আগস্ট ভাইসরয়কে টেলিগ্রামে জানালেন, 'উত্তরপ্রদেশ, সীমান্তপ্রদেশ ও অন্যান্য প্রদেশে সরকার সাধারণ মানুষের ওপর যে-অত্যাচার করছেন, তাতে এটা স্পষ্ট যে [গান্ধী-আরুইন] চুক্তি সরকারের দিক থেকে আর কার্যকর নেই। এ থেকে এই কথাটিই বেরিয়ে আসছে—যে আমার কিছুতেই লন্ডনে যাওয়া উচিত নয়।' ১৩ আগস্ট ভাইসরয় জানালেন, 'এসব কারণ আমার কাছেও গ্রাহ্য নয়। সরকারের নীতি ও পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার বিভ্রান্তি থেকেই আপনি

এরকম ভাবছেন।' গান্ধীজি সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিলেন, '[গান্ধী-আরুইন] চুক্তি সম্পর্কে আপনার ও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য এতটাই মৌলিক যে আমাদের গৃহীত সিদ্ধান্তই কিন্তু আমাদের পক্ষে চূড়ান্ত নির্দেশ, এ-কথা আপনাকে একবার জানানো দরকার।' আইন অমান্য যে-কোনো সময়ই শুরু হতে পারে।

গোলটেবিল বৈঠকে পৌঁছুতে ১৪ আগস্ট একদল জাহাজে উঠল, আর-এক দল কংগ্রেসি, টিকিট ফেরত দিলেন। গান্ধী ভাইসরয়কে চিঠি লিখে জানতে চাইলেন, 'আপনাদের পক্ষে কি [গান্ধী-আরুইন] চুক্তি মেনে চলা আর সম্ভব নয়? অথবা কংগ্রেস গোলটেবিলে না গেলেও এ-চুক্তি কার্যকর থাকবে?' ভাইসরয়ের জবাব না পেয়ে ২০ আগস্ট গান্ধীজি 'ইয়ং ইন্ডিয়ায়' লিখলেন, 'একটি ভাঙা চুক্তির গল্প', আর একটা সম্পাদকীয়, 'আসল কথা'। ভাইসরয় ছিলেন কলকাতায়। এই লেখাদুটি পড়ে তিনি সিমলার দিকে ছুটলেন। ১৪ আগস্টে পাঠানো গান্ধীজির যে-চিঠির উত্তরই দেননি ভাইসরয়, তারই উত্তরে গান্ধীজিকে জানালেন, 'কংগ্রেস ও গান্ধীজি গোলটেবিলে না গেলে [গান্ধী-আরুইন] চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। সরকার বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে যে-স্পেশ্যাল মেজার গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন সে-বিষয়ে ভবিষ্যতে আরো সতর্ক হবেন।' উইলিংডন এক পা পিছু হটলেন। গান্ধীজি টেলিগ্রামে জানালেন, দাঁড়ান আসছি, মুখোমুখি কথা হবে। হল, সিমলায়। ২৭ আগস্ট সন্ধ্যায় গান্ধীর সঙ্গে উইলিংডনের 'দ্বিতীয়' যৌথ বিবৃতি বেরল। তাতে কংগ্রেসও নিজের স্বাধীনতা বজায় রাখল—'সরকারি ব্যবস্থায় কংগ্রেস যদি মনে করে, আইন-অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখা হলেও আত্মরক্ষার জন্য প্রত্যক্ষ কোনো আন্দোলন অনিবার্য হয়ে উঠেছে, তাহলে কংগ্রেস সেই সর্বোচ্চ কর্তব্য পালন করতে দ্বিধা করবে না।' ওয়েলিংডনের সঙ্গে সমঝোতায় এই কথাগুলি লেখা হল। ২৭ আগস্ট সন্ধে ৭-টায় এই সমঝোতায় সই পড়ল। এস. এস. রাজপুতানা জাহাজ বোম্বাই থেকে ছাড়বে ২৯ আগস্ট। জাহাজ ধরিয়ে দেয়ার জন্য সিমলা থেকে কালকা একটা স্পেশ্যাল ট্রেন গান্ধী ও অন্যান্যদের নিয়ে গেল। আর তারপর কালকা থেকে বোম্বাই পৌঁছুবার রেলপথে অন্যান্য সব গাড়ি থামিয়ে রেখে গান্ধীর গাড়ি ছেড়ে-দেয়ার ব্যবস্থা হল।

গোলটেবিলে ১৩ নভেম্বর ১৯৩১-এ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড 'সংখ্যালঘুদের চুক্তি ও অনুন্নত শ্রেণির দাবিপত্র' সরকারিভাবে মেনে নেয়ার কথা বললে গান্ধীজি প্রশ্ন তুললেন, '...সংখ্যালঘু সমস্যা মেটানোর জন্যই কি ৬০০০ মাইল দূর থেকে আমাদের নিয়ে আসা হয়েছে?...আর, সমস্ত রকমের সাম্প্রদায়িক বা অন্য সব গোষ্ঠীকে ভারতের জাতীয়তার ধারণার ওপর তীব্রতম আক্রমণের সময় ও সুযোগ দেয়া হয়েছে? আমাদের কাজ তো ছিল সংবিধান তৈরি করা নিয়ে কথা বলা। স্যার হিউবার্ট কার [এক ব্রিটিশ শিল্পপতি] ও তাঁর বন্ধুদের সংখ্যালঘু পরিকল্পনা নিয়ে এত খুশি হওয়ার কারণ আমি বুঝি। আমার মতে, তাঁরা মড়ির পাশে অপেক্ষায় বসেছিলেন ও এখন সেই মড়িটাকে ছেঁড়াছেঁড়ি করার কাজে মেতেছেন। অন্যান্য সংখ্যালঘুরা যেসব দাবিদাওয়া তুলেছেন, সেগুলো অনেকটা বুঝতে পেরেছি কিন্তু সবচেয়ে নিষ্ঠুর আঘাত এসেছে ভারতের অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীর নাম করে যে-দাবিগুলি তোলা হল, সেই দাবিগুলি থেকে। ...ভারতের স্বাধীনতার জন্য অস্পৃশ্যদের জীবনমরণের প্রশ্ন আমি বেচে দিতে পারি না। আমি এই দাবি করি যে আমার এই শরীর দিয়ে আমি ভারতের অগণন অস্পৃশ্যের প্রতিনিধিত্ব করছি। আমি দাবি করছি এই বিষয় নিয়ে কোনো গণভোটে যেতেও আমি তৈরি। কারণ তেমন ভোটে আমিই সবচেয়ে বেশি ভোট পাব। আমাদের আদমসুমারিতে ও দলিলপত্রে অস্পৃশ্যদের চিরকালের জন্য 'অস্পৃশ্য' বলে বর্ণনা করতে আমরা চাই না। এটা যদি আমাকে একা ঠেকাতে

হয়, আমি একাই ঠেকাব। ...৩৫ কোটি মানুষের এই জাতির হাতে আততায়ীর ছুরির কোনো দরকার নেই, বিষের বাটিরও কোনো দরকার নেই, তরবারির দরকার নেই, বর্শার দরকার নেই, বুলেটের দরকার নেই। সেই জাতির শুধু দরকার নিজের কণ্ঠস্বরে 'না' বলার আকাঙ্ক্ষা। সেই জাতি আজ সেই 'না' বলতে শিখেছে।' গান্ধীজি কোনো সমাধান নিয়ে আসতে পারলেন না। কিন্তু তিনি তাঁর প্রত্যাখ্যানকে শক্তি হিশেবে দেখাতে পারলেন। ফেরার পথে ফ্রান্সে তিনি রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে দেখা করে রোলাঁর হাতে বিঠোভেন শুনতে চাইলেন। ১৯৩১-এর গোলটেবিলের শুরুতেই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছিলেন, আপনারা যদি একমত হতে না পারেন, আমরা রোয়েদাদ করব। গোলটেবিল পারল না, ম্যাকডোনাল্ড 'কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ড' ঘোষণা করলেন ১৯৩২-এর আগস্টে—পাঁচটি প্রদেশ মুসলিম প্রধান, মুসলমান ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষিত আসন, সংরক্ষিত আসনে শুধু তারাই ভোট দেবে যারা সংরক্ষিত আসনের [ধর্মাবলম্বী পৃথক নির্বাচন]। গান্ধীজি গোলটেবিলের শেষ বৈঠকে ঘোষণা করেছিলেন, 'আমার প্রাণ দিয়েও আমি পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জন্য 'পৃথক নির্বাচন' রুখব।' ইয়েরভাদা জেলখানা থেকে তিনি ভাইসরয়কে নোটিশ দিলেন, তিনি তাঁর এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২০ সেপ্টেম্বর থেকে জেলখানাতে আমরণ অনশন শুরু করলেন।

আর, শুরু হল, তাঁর অনশনকে ঘিরে এক মড়ির অপেক্ষা, তাদের, যারা শুধু মৃত মাংস খায়। ভারতসচিব, ভাইসরয় ও তখনকার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী 'একান্ত গোপন' বার্তা-বিনিময়ে গান্ধীজিকে ঠগ, মিথ্যুক ও প্রতারক বললেন, 'ও নিশ্চয়ই গোপনে গ্লুকোজ খাচ্ছে।' যে-করেই হোক সেটা ধরার জন্য গোয়েন্দা লাগানো হল। আর, এদিকে গান্ধীজির অনশন রাজনৈতিক বিষয় না থেকে হয়ে পড়ল সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় বিষয়। সঙ্গে-সঙ্গে ভারতীয় শিল্পপতিদেরও বিচার্য বিষয়।

মঙ্গলবার অনশন শুরু হওয়ার কথা। শনিবার শেঠ মথুরাদাস বাসনজি, স্যার চুনিলাল মেহ্‌তা, স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস, জি ডি বিড়লা গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করলেন—সমাধানসূত্রের খোঁজে।

১৯ তারিখ বোম্বাইতে 'হিন্দু নেতৃ সম্মিলন' শুরু হল মদনমোহন মালব্যের সভাপতিত্বে ১০০ জন প্রতিনিধি নিয়ে। সপ্রু, জয়কার, রাজাগোপালাচারি, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, এম সি রাজা, ডক্টর আম্বেদকর, স্যার চিমনলাল শেতলবাদ, এম-সে আনে, ডক্টর মুনজে, পি বালু, কুঞ্জরু, এ ভি ঠক্ক—এঁরা সকলেই ছিলেন। গান্ধীজিকে অনশন থেকে নিবৃত্ত হতে বলে ও হিন্দু সমাজ থেকে অস্পৃশ্যতা দূর করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক আবেদনপত্রে এঁরা সকলেই সই করলেন। ডক্টর আম্বেদকর বললেন—নির্বাচন নিয়ে কোনো কথা তিনি বলবেন না গান্ধীজির কথা না, জেনে। তারপর শুরু হল—পুনায় ও বোম্বাইতে এইসব নেতাদের দরকষাকষি, দিনরাত, রাতদিন। বর্ণহিন্দু নেতাদের সমবেত চেষ্টা ছিল অস্পৃশ্য হিন্দু নেতাদের যত কম আসন যত কম দিনের জন্য দেয়া যায়। ডক্টর আম্বেদকরের নেতৃত্বে অস্পৃশ্য হিন্দু নেতাদের সমবেত চেষ্টা যত বেশি আসন আদায় করা যায়। মাঝখানে অনশনক্লিষ্ট গান্ধীর জীবনশূন্য শবদেহ—সমস্ত ভারত অদৃশ্যে সেই দেহ ঘিরে দাঁড়িয়ে। ভারতের রাজনীতিতে এর চাইতে হিংস্র দরকষাকষি আগে আর কখনো ঘটেনি।

পরে, অনেকই হয়েছে। তবে আন দারিদারদের মাঝখানে নিহত মাহবের পাহাড়।

সমাধান একটা হল।

আম্বেদকর এক শেষরাত্রিতে গান্ধীজিকে তাঁর জেলখানার কুঠুরিতে বললেন, 'আমাকে আমার

ক্ষতিপূরণ দিন।'

মৃত্যুস্পৃষ্ট স্বরে গান্ধীজি বললেন, 'তোমার কোনো যুক্তিরই কোনো কাটান নেই।...সংবিধানে ষোল আনা নিরাপত্তা চাইবার পূর্ণ অধিকার তোমার আছে। কিন্তু আমার এই চিতাশয্যা থেকে আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি—তুমি এই অধিকার প্রয়োগ করো না। তোমরা জন্মসূত্রে অস্পৃশ্য, আর, আমি অস্পৃশ্যতাকেই গ্রহণ করেছি। আজ আমি বর্ণহিন্দুদের জন্য একটু সময় চাইছি। আমাকে বর্ণহিন্দুদের মধ্যে কাজ করার সুযোগ দাও।'

আম্বেদকর বললেন, 'আপনি আমাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছেন। আপনি দুই স্তরের নির্বাচন ব্যবস্থায় আমাদের সুবিধে করে দিয়েছেন। আমরাও পৃথক ভোটের ব্যবস্থা থেকে সরে এসে যুক্তভোটের ব্যবস্থা মেনে নিয়েছি। শুধু এই একটি বিষয়ে আমরা ঠেকে আছি। অনুন্নত হিন্দুদের জন্য এই ব্যবস্থা অন্তত দশ বছর চলতে হবে।'

কথা শেষ করে দেয়ার স্বরে গান্ধীজি বললেন, 'পাঁচ বছর অথবা আমার প্রাণ।'

সমাধান হল। ব্রিটিশ সরকারও মেনে নিলেন। ২৬ সেপ্টেম্বর সোমবার বিকেল ৫টা ১৫-তে ইয়েরবাদা জেলপ্রাঙ্গণের এক গাছের তলায় রবীন্দ্রনাথ এক প্রার্থনাসভা পরিচালনা করলেন। গাইলেন, 'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো।' রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৭০। গান্ধীজি তাঁর অনশন ভাঙলেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে কি কখনো এমন নিষ্ঠুর ও জিঘাংশু এক প্রহসনের সঙ্গে ট্র্যাজেডির করুণা ও অসহায়তা অবিমিশ্র থেকে পরিবেশকে সত্য করে তুলেছে? চল্লিশ কোটি এই মানুষের দেশের অস্তিত্বের বিগ্রহকে, চল্লিশ কোটি এই মানুষের কণ্ঠস্বরের প্রতিনিধি যখন গানে-গানে এক করুণাধারার তীরে নিয়ে যান।

আর তাঁদের ঘিরে থাকে চতুর শেয়ালেরা, নেকড়েরা, রক্তচোষা বাদুড়েরা, ঘাসরঙের সর্পকুল, শকুনের পাল—লন্ডনে, দিল্লিতে, বোম্বাইয়ে, কলকাতায়, মাদ্রাজে।

আইন-অমান্য, গোলটেবিল, সামরিক আইন, মুখোমুখি যুদ্ধ, বেআইনি ঘোষিত রাজনীতি, অনশন, দরকষাকষি—এতকিছুর পর ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ও তার ভিত 'কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ড' ঘোষিত হল। ১৯৩৫-এর ফেব্রুয়ারির সেই দিনটিতে কেন্দ্রীয় আইসভায় একমাত্র জিন্না-র গলাতেই ছিল যুক্তি, আধুনিকতা, সম্প্রদায়-বিরোধিতা, সংখ্যালঘুর সংজ্ঞা। জিন্নার সেই বক্তৃতা যেন যুক্ত হতে চাইছিল তিরিশ মাস আগে ইয়েরবাদা জেলপ্রাঙ্গণের বৃক্ষতলের প্রহসন আর ট্র্যাজেডির করুণাঘন সংগীতের সঙ্গে।

'কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ডে আমি খুশি নই। আমার আত্মসম্মানে লাগে যে আমরা আমাদের সমাধান বের করতে পারিনি। রাজনীতিতে ধর্মের কোনো জায়গা নেই। কথাটা সংখ্যালঘুদের নিয়ে ও এটা রাজনীতির বিষয়। সংখ্যালঘু কে বা কারা? হতে পারে, একটি দেশের অন্য নাগরিকদের থেকে একজন সংখ্যালঘুর ধর্ম আলাদা, তাঁদের ভাষা আলাদা হতে পারে, তাদের জাত্ আলাদা হতে পারে, তাঁদের সংস্কৃতি আলাদা হতে পারে এবং এই সবকিছুর—এই ধর্ম, ভাষা, জাত, সংস্কৃতি, শিল্পকলা, সংগীত ইত্যাদি সবকিছু মিলে একই রাষ্ট্রের ভিতরে সংখ্যালঘুর অস্তিত্ব স্বতন্ত্র হয়ে যায়। সেই স্বাতন্ত্র্যের কিছু রক্ষাকবচ দরকার হয়। সেই কারণেই এই প্রশ্নটিকে রাজনৈতিক বিষয় হিশেবেই আমরা বিবেচনা করব। এটার সমাধান করতে হবে। এটা এড়িয়ে যাওয়া চলবে না।'

ভারতের মত বিবিধ ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির বিশাল ভূখণ্ডে কোটি-কোটি মানুষের হাজার-হাজার বছরের জীবনে সংখ্যালঘুতার ধারণার এমন সঠিক, নিরপেক্ষ ও বাস্তব ব্যাখ্যা

তার আগে বা তার পরে আর-কেউ করেননি।

গান্ধী ও কংগ্রেস, অনিংরেজ স্বাধীন ভারতের যে-ধারণার আভাসের মধ্যে ঘোরাফেরা করেছিলেন, তাতে তাঁদের নিকটতম, ঘনিষ্ঠতম অথচ অদৃশ্য আত্মীয় ছিলেন, একমাত্র জিন্না। গান্ধী ও কংগ্রেস, অনিংরেজ স্বাধীন ভারতের যে-ধারণার আভাসের মধ্যে ঘোরাফেরা করছিলেন, তাতে এঁদের দূরতম, বিদ্বিষ্টতম অথচ দৃশ্যতম অনাত্মীয় ছিলেন গান্ধী নিজে ও কংগ্রেস। গান্ধী, কংগ্রেস ও জিন্না এইসব বিষয়ে একমত ছিলেন—শক্ত প্রশাসনের একক কেন্দ্র, সৈন্যবাহিনীর ওপর ভারতীয় [কেন্দ্রীয়] সম্পূর্ণ অধিকার, সর্বজনীন ভোটাধিকার, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অনুশাসিত [রেসিডুয়্যাল] ক্ষমতা নতুন কেন্দ্রে ন্যস্ত হবে, ভোটে কোনো সংরক্ষিত আসন থাকবে না। ১৯৩৭-এর ভোটের পরও জিন্না এই কর্মসূচিতে কংগ্রেসের সঙ্গে ঐক্যে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস প্রস্তুত ছিল না।

ততদিনে কংগ্রেসের হিন্দুলবি স্বাধীন ভারতের এই ধারণায় থিতু হয়ে গেছে যে সেখানে জিন্না ও মুসলিম লিগের কোনো জায়গা থাকবে না। গান্ধীজিও তাঁর অনশনের মধ্যে বলেছিলেন, 'প্রাণ থাকতে হিন্দু সমাজকে ভাগ হতে দেব না।' প্রাদেশিক ভোটে সারা ভারতে জিতে (বাদে বাংলা ও পাঞ্জাব) কট্টর হিন্দু কংগ্রেসিরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে একেবারে জমাট বেঁধে শক্ত হয়ে গেল। বাংলা ও পাঞ্জাবে দশ-দশ বছরের কায়েমি মন্ত্রিসভা চালিয়ে অন্তরিসলাম নানা রাজনৈতিক পার্থক্য ডুবিয়ে ভাসিয়ে দিয়ে, নেতাদের নিজ-নিজ আঞ্চলিক বা আর্থিক দাবিপ্রাধান্য লোপাট করে, দেখতে না-দেখতে মুসলমানরা কট্টর হয়ে গেল। দুদিকের কট্টররা যেন হাওয়ায়-হাওয়ায় এক হয়ে গেল। দুদিকের আক্কেলি মানুষজন যেন হাওয়ায়-হাওয়ায় কর্পূরের মত উপে গেল।

হয়ত-বা অসহযোগ, আইন অমান্য এইসব থেকে পুরো দেশটাই ভোটের দিকে মুখ ফেরাল। বা, হয়ত এ-কথা ঠিক নয়। বা, হয়ত ভোটেরই ফলে দূরদূর সব জায়গা থেকে ধুলো পায়ে নাম-না-জানা মানুষজন আইনসভায় ঢুকে, নেতা হিশেবে প্রতিষ্ঠা পেলেন। বা, হয়ত ভোটেরই ফলে, বাংলার জমিদাররা তাঁদের প্রথাগত সামাজিক-রাজনৈতিক নেতৃত্ব হারিয়ে কট্টর হয়ে গেলেন—মুসলমান বিদ্বেষী, শিডিউল্ড কাস্ট বা ছোটলোক বিরোধী ও প্রজাবিরোধী।

কৃষক কেন মুসলমান হয়ে গেল ও মুসলমান হিশেবেই রাজনীতিক ক্ষমতার ভাগ চাইল—এটাই এই সব সন্ধানের মূল কারণ। তাই ধর্মীয় দাঙ্গাকেও রাজনৈতিক কর্মসূচির অংশ করে নেওয়া হল। ১৯১১ ও ৩২-এর সেনসাসে হিন্দুদের অচ্ছুৎ অংশ নানা সময় নানা পরিচয় লিখিয়েছে। শাহেবদের লেখা কিছু সেট্‌লমেন্ট রিপোর্ট আছে। ঐ সময়কার দলিলপত্র একাইভাগে এসে গেছে, ফলে দারোগাদের রিপোর্ট কমিশনারদের রিপোর্ট, কাউন্সিল ও অ্যাসেম্বলির তর্কবিতর্ক আমাদের পেছনের ধাপগুলি তৈরি করে দিয়েছে।

পেছন ফিরে সিঁড়ি বেঁয়ে যে একটু ওপর থেকে দেখছি আমরা, তাতে যেন একটু বেশি জানা যাবে। এমন আন্দাজ থেকে কতকগুলি অনুমান প্রায়-প্রমাণের ইজ্জত পাচ্ছে। যেমন—অখণ্ড বাংলায় জমিদাররা ছিল হিন্দু, মুসলমানরা ছিল রায়তপ্রজা। যেমন, জমিদাররা মহাজনিও করছিল অমানুষিক সুদে। যেমন, জমিদারদের আবাওয়াব ও হাটঘাট। পাটের দর বেঁধে না দেয়া। এমন আরো সব কারণে মুসলমান কৃষকরা হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ও একটি পরাক্রান্ত কৃষক আন্দোলন ভেঙেচুরে হয়ে গেল দাঙ্গাবাজি।

এই প্রায়—প্রমাণগুলিতে কিন্তু জানার চেষ্টাই হল না—জমিদার থেকে দিনমজুর, একটা হালের জমিতেও কত স্তরান্তক ছিল? এক-এক জিলায় এক-এক রকম নয়। এক জিলাতেও

কত রকম। খাজনা-আদায়ী জমিদার খাজনা আদায়ের জন্য তৈরি করেছিলেন একদল কৃষক, যাঁরা জমিদারকে খাজনা দিত নির্দিষ্ট পরিমান, প্রজাদের কাছে জমিদারকে খাজনা দিত নির্দিষ্ট পরিমান, প্রজাদের কাছে আদায় করত ফসলে।

এই সমস্ত হিশেবনিকেশ আজকাল হচ্ছে পেছন ফিরে সিঁড়ি বেঙে। সামনে আছে এখনকার পশ্চিমবাংলা। এখনকার বাংলাদেশ বা তখনকার পূর্ব পাকিস্তান সেই সম্মুখে ভূমিকে নেই। অর্থাৎ আমাদের লক্ষে নেই বাংলাদেশসহ অখণ্ড বাংলার জমিজমা। এই উঁইয়ে খাওয়া পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কৃষি সংস্কারের কতকগুলি বিষয়, ভারতীয় অর্থ-রাজনীতি বোঝার পক্ষে দরকারি হয়ে উঠেছে। ভূমির মালিকানার বদল, জমিদারি উচ্ছেদ, বেশি জমির মালিকের হাতে বেশির ভাগ জমি নেই, বামফ্রন্টের আমলে (১৯৭৭ থেকে ২০০৮) কৃষি উৎপাদনে দেশে উচ্চতম হার রক্ষা, কৃষি বিপণনে চাষির স্বার্থ। এরই সঙ্গে থাকছে—নিয়মিত ভোটে পঞ্চায়েতের কর্তৃত্বের প্রসার, স্থানীয় কৃষির দাবিদাওয়ায় সমাবেশ ও চাষিদের রাজনৈতিক ক্ষমতা পাওয়া।

১৯২০ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত কৃষি নিয়ে তৈরি নানা আইনকানুনের দরকার ও তার ফলে বাংলার চাষিদের কী বদল ঘটেছিল—এই অনুসন্ধানের সঙ্গে একেবারে জড়িয়ে আছে কৃষিতে হিন্দু-মুসলমানের আনুপাতিক স্থান, কৃষি—জনসাধারণের হিন্দু ও মুসলমানে খাড়াখাড়ি ভাগ, দাঙ্গা—যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে রাজধানী কলকাতা ও প্রান্তীয় নোয়াখালির গ্রাম। ফলে শহরের সাম্প্রদায়িকতা, গ্রামের সাম্প্রদায়িকতা, এলিটের সাম্প্রদায়িকতা ও পাবলিকের সাম্প্রদায়িকতা।

একটু হয়ত দেরিতে, কিন্তু পৌঁছে গেল যোগেন

১৯৩৭-এর আইনসভা ভোটের এই অজস্র টানাপোড়েনের ফল। এইসব টুকরোটাকরা হিশেব মিলে একটা কোনো কথা তৈরি হয়নি, এখন যাকে বলে 'বক্তব্য' বা 'ইশতেহার' বা 'সমীক্ষা'।

২৯

কিন্তু মানুষজনের মুখের কথা তো চারাগাছের মতন, যত দিন যায় ততই সেটা খাড়া হয়, তত তার ডালপালা বেরয়, তত তার পাতা গজায়, সেইসব ডালপালা-পাতার ভিতর দিয়ে নতুন হাওয়া বয়। অনেককাল পরে খেয়াল হয়—গাছটা তাহলে এই হাওয়াটাই বইয়েছিল।

ফজলুল হকের প্রথম কথা ছিল—জমিদারি উচ্ছেদ। তাঁর দ্বিতীয় কথা ছিল—ঋণমকুব, চাষির। জমিদার হিন্দু আর চাষি-মুসলমান, সারা বাংলায় ছকটা এরকম মনে করলেও এসব বলা যেত? মুসলমান জমিদার ও তার নিচে মুসলমানদের নানা ধরণের—এই স্বার্থ-সংঘাত থেকেই হকশাহেবের রাজনীতি এমন সামর্থ্য পেয়েছিল।

আবার, হয়তো বলা যেতও। কারণ হকশাহেবের কৃষক-প্রজা পার্টির এই দুটো কথা—জমিদারি উচ্ছেদ আর ঋণখালাশ সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। আর, মাত্র এই দুটো কথা একেবারে বাংলার হেলে মাটির চষা ক্ষেতের একেবারে ভিতরে সেঁদিয়ে গিয়েছিল। জমিদারি উচ্ছেদ—তা, সে-জমিদার হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক। ঋণখালাশ—এ কি কোনোদিন বাংলার চাষি-রায়ত স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছে যে ধান-মাড়াইয়ের পর তাকে খালি হাতে বাড়ি ফিরতে হবে না। সে ছোট-রায়ত বা চাষি হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক। ফজলুল হকের

কল্পিত বাংলায়, বাংলার জমিদার আর মহাজনদের বিরুদ্ধে রায়ত-কৃষকের অর্থনীতিই হয়ে উঠেছিল রাজনীতি।

যোগেনের ভোটাভুটির ভাগ বা শত্রুমিত্রের ভাগ এমন সোজা লাইনে ছিল না। তার পক্ষে জমিদারি উচ্ছেদের কথা সরাসরি বলা সম্ভব ছিল না—কারণ গৌরনদীর অনেক হিন্দু জমিদার তাকে সমর্থন করেছে। ঋণখালাশের কথা সে কিছুটা বলতে পারত। গৌরনদীর বড়-বড় সব উপস্বত্বভোগীরা চাষির হাতে ধরা ছাতার ছায়া ছাড়া বেরতেন না যদিও, তবে তাঁদেরও মহাজনের দরজায়-দরজায় ঘুরতে হত। যোগেনের পক্ষে মুসলিম লিগের বিরোধিতাও খুব কোমর কষে করা সম্ভব ছিল না। লিগ আর কৃষক-প্রজার মধ্যে কোথাকার মুসলমান কার দলে বোঝা যাবে কী করে, তখন, প্রথম ভোটেই? যোগেন যদি তার উদ্দেশ্য-বিধেয়কে প্রথম ভোটেই এত মোটা করে দাগিয়ে দিত, তাহলে বর্ণহিন্দুরা তাকে হিন্দু বলে মানত না, নমশূদ্ররা তাকে শূদ্র বলতে চাইত না। আবার, মুসলমান চাষিরাও তাকে হিন্দু ভেবে ফেলতে পারে।

যোগেন তাহলে ছিলই-বা কী, হবেই-বা কী? সে যদি নমশূদ্রই শুধু হত, তাহলে মুসলমানরা তাকে ভরসা করত, যেমন চিরকাল, চাঁড়াল-যবন ভাইভাই। কিন্তু সে যদি নমশূদ্রই শুধু থাকতে চাইত তাহলে তো সে রিজার্ভড সিটে দাঁড়ালেই পারত। সে যদি বরিশাল কোর্টের উকিল না হত তাহলে কি জমিদাররা তাকে ভরসা করত? যেন, উকিলিতে যোগেনের চণ্ডালি একটু ধোপদুরস্ত হয়েছে! যোগেন যদি পুরো কংগ্রেসি হতে চাইত, তাহলে নমশূদ্রদের পুরনো নেতারা তাকে সন্দেহ করতেন—রসিকলাল বিশ্বাস, যজ্ঞেশ্বর মণ্ডল, রাইচরণ বিশ্বাস, ডক্টর মোহিনীমোহন দাস, জগৎ মণ্ডল, বিরাট মণ্ডল, তা ছাড়া, মল্লিকদের তিনভাই—মুকুন্দবিহারী, নীরদবিহারী, পুলিনবিহারী—এঁরা যাতে তাকে তাঁদেরই অনুগামী মনে করেন, এটা যোগেনের পক্ষে ছিল খুবই দরকার। এঁরা সকলেই যে কংগ্রেসি ছিলেন, তা নয়। ১৯৩০-৩২-এর আগে পার্টিপুর্টিতে তো ভাগাভাগি শুরু হয়নি। তাই কখনো-কখনো 'কংগ্রেসি' হতে তাঁদের আপত্তি ছিল না আর তেমন হওয়াটার মধ্যে কোনো সুবিধেবাদও ছিল না। কৃষকনেতা নৌসের আলি ও রসিককৃষ্ণ বিশ্বাস মিলে ১৯২৯-৩৩-এ যশোর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও ভাইসচেয়ারম্যানের পদ দুটি দখলে রেখেছিলেন। আবার, শিক্ষাদীক্ষায় নমশূদ্রদের মধ্যে বিশিষ্ট হয়ে ওঠার সুবাদে সরকারি সম্মান, সুযোগ ও সুবিধে পাওয়ার দিকে এঁদের চোখ খাড়া থাকত। রায়শাহেব, রায়বাহাদুর, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের নমিনেশন, কাউন্সিলে নমিনেশন এসব দৌড়ে তাঁরা নিশ্চয়ই যোগেন্দ্রনাথের মত যোগ্য ও তরুণ প্রতিযোগী চাইতেন না।

এখন ভাবলে মনে হয়—যেমন চারাগাছটি মহাদ্রুম হলে বোঝা যায়—যোগেন ভোটের মুখে কোনো কিছুতেই সম্পূর্ণ ছিল না, সবকিছুই ছিল একটু-আধটু—বুড়িছোঁয়ার চাইতে বেশি, ডুবন্ত মানুষের জল-ঝাপটানোর চাইতে কম। একটু 'জাতীয়তাবাদী', একটু বর্ণহিন্দুবিরোধী, একটু হিন্দুও, একটু অচ্ছুৎ, একটু উকিল, একটু মুসলিমঘেঁষা, একটু হিন্দুঘেঁষা, একটু গান্ধীবাদী, একটু-আধটু গাইতে পারে, একটু ভাষণও দিতে পারে, লিখতেও পারে।

এটাই যোগেনের স্বভাব ছিল। পূর্বপ্রস্তুত কোনো নকশা অনুযায়ী যে-কোনো পরিস্থিতিকে সে সাজিয়ে নিত না। কিন্তু যে-কোনো পরিস্থিতির জন্য পূর্বপ্রস্তুত থাকত এমনকী প্রস্তুতি বলতে যেসব উপাদান-উপকরণ দরকার তা কোথাও না-থাকলেও। যোগেনের এই স্বভাব তার ব্যক্তিগত-স্বভাব ছিল না। বামুন-কায়েতদের সামাজিক-ধার্মিক দাপটের তলায় কোনো নমশূদ্রের পক্ষেই কোনো পরিকল্পনা ভেবে রাখা সম্ভব ছিল না। নমশূদ্র কি দিন কাটাতে পারে কোত্থেকে বামুন-কায়েতরা আক্রমণ করতে পারে তার দিকে চোখ না রেখে?

যুদ্ধের ইতিহাসে এক বিশেষ ধরণের সেনাপতিদের কথা জানা যায়। তাঁরা যেন কিছুতেই কোনো লড়াই লাগাতে চান না। এই একটু-আধটু, দুই-একদিন, কোনো-কোনো সময় একটু পেছিয়ে আসা, একবারও আক্রমণ না-করা। তেমন সেনাপতিদের নিয়ে শত্রুপক্ষও বিরক্ত হয়ে উঠত। লোকটা যুদ্ধেও নামে না, যুদ্ধ ছাড়েও না। এমন একটা যুদ্ধের জন্য আর-কতদিন বসে থাকা যায়! এমন একটা বেযুদ্ধে এত সৈন্যকে বসে-বসে খাওয়ানো যায়? তারা গোপনে সৈন্যসংখ্যা কমায় আর প্রকাশ্যে এক-একদিন ঐ সেনাপতিকে খুচরো আক্রমণ করে। সেই সেনাপতি পেছন দিকে এগতে-এগতে এমন একটা জায়গায় পৌঁছন, যেন সেই জায়গাটিতেই তিনি আসতে চাইছিলেন। তাঁর সৈন্যবাহিনীর কোনো পেছন নাই, যেন তিনি সেই পেছনেই পিঠ ঠেকিয়েছেন। তাঁর সৈন্যবাহিনীকে ডান বা বাঁ থেকে কোনো আক্রমণ শত্রুপক্ষ করতে পারবে না। তাঁর শুধু সম্মুখ আছে। তারও পর তিনি যখন নিশ্চিত যে শত্রুপক্ষ তাঁকে মৃত, পরাজিত বা পলাতক ধরে নিয়ে সৈন্যসংখ্যা আরো কমিয়ে দিয়েছে ও তাঁর পেছনে ভয়ংকর বর্ষা বা তুষারপাত বা হিমবাহ বিস্ফার শুরু হয়ে গেছে—তখন একদিন তিনি আক্রমণ শুরু করতেন। শ্বাস টানতেও একবারের জন্য থামতেন না। বর্ষা বা তুষারপাত বা হিমবাহ বিস্ফার বা দাবাগ্নি এই সব প্রাকৃতিক ঘটনা তাঁর সেনাবাহিনীর পেছনের লাইন রক্ষা করছে।

তবে এমন সেনাপতিত্বের কোনো শফরসূচি থাকে না। এঁদের পৌঁছনোর কোনো সময় বাঁধা থাকে না। তাঁরা যখন হাজির নেই, তখনো তাঁরা যুদ্ধেই থাকেন। যে-সব যুদ্ধে তাঁরা নেতৃত্ব দেন, সেগুলো ফৌত হতে যে কত সময়ই লাগে। একশ বছর তো কিছুই নয়—সবে শাদাদের তৈরি শ্বেতগৃহে একটা কাল মানুষকে বসানো হয়েছে, যাতে কালরা আর অশ্বেত না দেখায়! যোগেন তো লড়েই যাচ্ছে—মণ্ডল, সাচার এরা তো নতুন সীমান্তগুলি খুলে দিচ্ছেন। যোগেন এই একই যুদ্ধের নতুন সীমান্তের দিকে ছুটবে।

যোগেন এমন এক সেনাপতি। তার পৌঁছুতে একটু দেরি হয় কী হয়নি। এসে তো গেছে।

যোগেন এমএলএ কলকাতায়

৩০

বরিশাল এক্সপ্রেস সকাল ৭টা ১০-এ শেয়ালদায় ঢুকতে-না-ঢুকতেই যোগেন এক বগলে নারকেল দড়ি দিয়ে বাঁধা শতরঞ্চির পোঁটলা আর সেই হাতেই ছোট একটা টিনের সুটকেস নিয়ে আর-এক হাতে ফার্স্ট ক্লাশের দরজা খুলে নেমে পড়ে। হকশাহেব দরজার দিকে পেছন ফিরে তাঁর চাপকানের বোতাম আটকাচ্ছিলেন—টের পায়নি। টের পেয়ে যখন চেঁচাতে শুরু করেছেন, 'হে-ই মণ্ডল, মণ্ডল, আরে খাড়াও এডডু, ট্রেন থাইমব তো', যোগেন ততক্ষণে এগিয়ে গেছে। আর কালো পোশাকের এক শাহেব চেকার এসে তাকে টিকিট দেখাতে বলে, 'ইউ গট ডাউন ফ্রম ফার্স্ট ক্লাশ?'

যোগেন একটু হেসে তার সুটকেস নামিয়ে ও শতরঞ্চি না-নামিয়ে ভিতরের পকেট থেকে টিকিটটা বের করে দিল। চেকার দেখে পাঞ্চ করে বলে, 'গট ডাউন ফ্রম দ্যাট ফার্স্ট ক্লাশ?'

যোগেন টিকিটটা ফেরত নিতে হাতটা বাড়িয়ে বলে, 'হোপ ইউ নো ফার্স্ট ক্লাশ টিকেটস্।' শাহেব নির্লজ্জের মত দাঁত বের করে হাসে—নিচের সারির ডান দিকের দুটো দাঁত নেই। যোগেন তার আঙুল থেকে টিকিটটা প্রায় কেড়েই নিয়ে গেটের দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়। টিকিটটা আর পকেটে ঢোকায় না, আঙুলে ধরে রেখে সুটকেসটা ঝুলিয়ে নেয়। গেটে জমা দিতে গিয়ে চেকারের বুকে সুটকেসটা লেগে যাচ্ছিল—চেকার ঠিক সময়ে বুকটা সরিয়ে নেয়। ওদের অভ্যেস হয়ে গেছে। সকলেরই তো টিনের সুটকেস, শতরঞ্চির পোঁটলা, কারো-কারো আবার ছাতা-লাঠি-বস্তাও।

যোগেন দেখে, ডানদিকের আর-একটা গেটে কৃষক-প্রজা পার্টির পতাকা নিয়ে কিছু লোক চিৎকার করছে, 'বাংলার নেতা ফজলুল হক—জয় জয়,' 'কৃষক-প্রজা পার্টি—জয় জয়,' 'মুসলিম লিগ'—'হায় হায়'। ভিড়ের পেছনে কোনো কোনো ভদ্রলোকের সুট-পরা। তাদের কারো হাতে ফুলের তোড়া। হকশাহেবকে নিতে এসেছে। যোগেন হঠাৎ নিজের কাছে লজ্জা পায়—তারও তো ঐ গেট দিয়েই বেরবার কথা, ফার্স্ট ক্লাশের গেট। অনভ্যাসে চন্দনের ফোঁটাও চড়চড়ায়। হকশাহেবের হাত থেকে যে ফসকানো গেল—এটাই বাঁচোয়া। না-হলে তার কাজকর্ম শিকেয় উঠত। আজ আটই ফেব্রুয়ারি, সোমবার। হেমচন্দ্র নস্কর মশায় লোক পাঠিয়ে বরিশালে খবর দিয়েছিলেন, আপনি যেদিনই আসুন, আগে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। সেই লোকটির হাতেই যোগেন জবাবি চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছে যে সে ৮-তারিখ সোমবার বাসায় মালপত্র রেখে আর দুটো মুখে দিয়েই নস্কর মশায়ের সঙ্গে চিংড়িঘাটায় তার বাড়িতে দেখা করবে। খুব বেশি দেরি

হলেও দুপুরবেলা বারটার অধিক হবে না ভরসা করি।

ট্রামডিপোর গা-ঘেঁষা উত্তরের গেট দিয়ে বেরিয়ে যোগেন দাঁড়িয়ে একটু ডাইনে-বাঁয়ে দেখে। কলকাতায় রাস্তা পার হওয়া মানে লংজাম্প প্র্যাকটিস করা। বগলে শতরঞ্চির পোঁটলা আর হাতে সুটকেস ঝুলিয়ে লংজাম্প প্র্যাকটিস হয় না। তার ওপর সার্কুলার রোড-হ্যারিসন রোড-বৈঠকখানা রোডের এই মোড়টায় চোখমাথা ঠিক রাখা যায় না। বাস-ট্রাক-ঠেলা-রিকশা-ট্যাক্সি-ঝাঁকা মাথায় কুলি-ঠেলাভর্তি কাঁচা তরকারি নিয়ে ঠেলা ঠেলতে-ঠেলতে ও টানতে-টানতে কুলিদের ছুটে যাওয়া, কাগজের হকারদের গরম-খবর গরম-খবর বলে ছোটাছুটি, যেখানে যোগেন দাঁড়িয়ে রাস্তা পেরবার তাক করছে তার ডানহাতি ফুটের ভিতরের দোকান থেকে কচুরি ভাজার গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে, মটরশুঁটি দিয়েছে, মটরশুঁটি তো বরিশালেও হয় কিন্তু সেখানে কি আর কেউ রুটি সেঁকতেই জানে, কচুরি তো দূরস্থান আর হালকা হিঙের গন্ধ মেশানো ছোলার ডাল। সুযোগ বুঝে যোগেন রাস্তা পার হয়—লংজাম্পে না, তবে সবার সঙ্গে মিশে প্রায় দৌড়েই। এপাড়ের সেই তেকোণ ফুটপাথে উঠে শ্বাস ফেলে যোগেন। এই মোড়টা পেরতে তার সবচেয়ে ভয় ট্রামগুলোকে। রাজাবাজারের দিক থেকে আসা ট্রামগুলো হঠাৎ এই জায়গাটিতে কোমর হেলায়। সে না-হয় হেলাক—সরে দাঁড়ালেই হল। বোঝা তো যায় না, ট্রামটা হেলে আবার সোজা হয়ে শেয়ালদা সাউথের দিকে গড়াবে, নাকী আরো হেলে বাঁয়ে একেবারে ডিপোর মধ্যে ঢুকে যাবে। তখনই যদি পার্ক সার্কাস—রাজাবাজারের ট্রাম দক্ষিণ থেকে গড়িয়ে আসে, তাহলে দুই বা তিন উটোমুখো আর কোণাকুণি ট্রামের মাঝখানে পড়ে যেতে হবে। যোগেনকে তেমন পড়তে হয়নি কখনো কিন্তু অত জ্বলজ্বলে ইস্পাত গায়ে গা লাগিয়ে পড়ে আছে—এটা দেখতে তার ভালো লাগে না।

হ্যারিসন রোড আর সার্কুলার রোডের কোণটায় উঠে পড়লেই যোগেন নিশ্চিন্ত। ল-কলেজে পড়ার সময়, স্মল কজেস কোর্টে নাম লেখানোর পরও, নিজের খরচা চালাতে তো এই পাড়ার অলিগলিতে প্রেশে প্রুফ দেখে বেড়াতে হত। এখানকার গালিঘুঁজি তার পায়ের আঙুলের ডগায়—চোখ বুজে ঠিক রাস্তায় পা ফেলবে। সে 'প্যারাডাইস' সিনেমা হলের পাশ দিয়ে কলেজ স্ট্রিটের মোড়ের দিকে চলে। এই তো পৌঁছে গেল। এটুকু না-হাঁটলে ট্রামেবাসেই তো সব পয়সা খরচা হয়ে যাবে।

যোগেন সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটে ঢুকে পড়ে। কলেজ স্ট্রিট-হ্যারিসন রোডের মোড় থেকে সে ডাইনে ঘুরে কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট ধরবে। সেখানে হেদোটেদো পেরিয়ে একেবারে ফুটপাথের ওপর চাঁদসির বিখ্যাত ডাক্তার প্যারীমোহন দাশের বাড়ি। ওটাও হাঁটাপথই। যোগেন ওটুকু হেঁটেই যাতায়াত করে। কিন্তু এখন করবে কি না—ঠিক করতে পারে না। তাতে তো আবার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হেম নস্করের সঙ্গে দেখা করতে হবে। বুনের বাড়িতে উঠেই তো আর বলা যায় না—চললাম। তারাও তো দু-চার কথা জানতে চাইবে। তাকে তো স্নানাহার সারতে হবে। যদি হেঁটে যাওয়া সাব্যস্ত করত, তাহলে ডাইনে-ডাইনে আরো ঘুরে ঝামাপুকুর দিয়ে কর্নওয়ালিশ ধরত। আর, ট্রামই যদি ধরে, তাহলে বরং কলেজ রো ধরে যাওয়া ভালো।

প্যারীমোহন দাশ ডাক্তারের বাড়িতেই যোগেনের কলকাতার ঠাঁই। এখন তো সে এমএলএ, যদিও আইনসভা এখনো বসেনি আর সে-কলকাতা পৌঁছেছে কয়েক মিনিট আগে। এখন যোগেনের ওঠার জায়গার অভাব নেই। তাদের জাতভাইরা অনেকেই অনেকদিন হল কলকাতার বাসিন্দে। তাদের দেশের বাড়িঘরও আছে, সেখানে যাতায়াতও আছে, কিন্তু ঠাঁই পাকা হয়ে গেছে কলকাতায়। বনমালী দাশমশাই দু-হাতে কামাই করেছেন, চার-হাতে খরচা করেছেন।

প্রথম যুদ্ধের সময়ই তিনি 'নমশূদ্র শিক্ষা সমিতি' আর 'বাণীভবন' নামে শুধু তাঁর জাতিভাইদের জন্য একটা মেসবাড়ি তৈরি করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে সে আর থাকবে কী করে? খরচ জোগাবে কে? ডালমিয়া সিমেন্ট কোম্পানির প্রোডাকশন ম্যানেজার অমিয় দাশদের বাড়ি আছে। ঢাকার মোহিনী দাশের ছেলেমেয়েরাও তো এই শহরেই নানা জায়গায় থাকে। মল্লিকদের তিন ভাইয়ের কথা যদি বাদও দেয়া যায়, তাহলেও, কলকাতা শহরে যোগেনের থাকা-খাওয়ার জায়গা একটা জুটে যেত। এখন। কিন্তু আইন পড়তে যখন এসেছিল, তখন যোগেনের মনেও পড়েনি—এদের কারো কথা। তাদের জাতের পক্ষে, বাড়ির পক্ষে তো বটেই, পাঠশালা পেরনোর পর মিডল স্কুলে পড়াই তো প্রায় যুদ্ধ জয়, তারপর হাইস্কুলে ঢোকা মহাযুদ্ধ জয়। ম্যাট্রিক পাস হলে তো রাজা ত্রিশঙ্কুর অবস্থা—এত শিক্ষিত ছেলে না-পারবে হাল ধরতে, না-পারবে করাত ধরতে। তাদের ছেলে বামুন-কায়েত হয়ে গেলে সংসারে কামাই করবে কে? যোগেন তো অভিশপ্ত নল রাজা—সে গিয়ে কলেজে ঢুকল। তাতেও কুলল না—সে পূর্বজন্মের অভিশাপের শর্ত পূরণ করতে কলকাতায় এসে আইনি কলেজেও ঢুকল। যোগেনের জাতভাইদের মধ্যে ভাবভালোবাসা আছে। কারো অবস্থা একটু ভালো হলে, সে জাতিগুষ্টিকে দূর-দূর করে না। তার একটা কারণ, যোগেন বুঝে নিয়েছে—যত ভালো অবস্থাই হোক, নমশূদ্রের হাতে বামুন-কায়েক-বদ্যি তো জল খাবে না। অবস্থা ভালো হলে তো অভিমানও বাড়ে। সেই অভিমানই তার জাতভাইদের মধ্যে মিলমিশটুকু রেখেছে। সেই মিলমিশটুকুর খাতিরে এমএলএ যোগেন মণ্ডলকে নিজের বাড়িতে যত্নে আদরে রাখার লোক জুটবে।

যোগেন যখন আইন পড়তে এসেছিল, তখন তো যোগেন ছিল অপরাধী—তার জ্ঞাতিগোত্রের কাছে, তার বাড়ির কাছে, তার নিজের কাছেও। বিএ পাশ করেও তার হল না, এখন সে বিএলও হবে? অথচ যোগেন তার এই উচ্চাশার পক্ষে কোনো যুক্তি দিতে পারত না। কী যুক্তি দেবে? উকিল হলেই শয়ে-শয়ে টাকা কামাই করবে? কে আসবে নম-উকিলকে মামলা দিতে? যোগেন বলতে পারত—'বাবু হব।' কিন্তু তাদের জাতের মধ্যে তখনো বাবু-হওয়াটা উচ্চাশার বিষয় নয়। উপহাসের বিষয়—'বাবু হবা?' এমন একটা উপহাস্য কাজে কে যোগেনকে সাহায্য করবে—তার নিজের সমাজের কে? তার নিজের সমাজের যারা কলকাতায় একটু ভালো আছে—তাদের মধ্যেই-বা কে? কারণ, তাদের কারো জানা ছিল না—'কেন', এই প্রশ্নটির জবাব। যোগেন কেন ল পাস করবে? যোগেনকে আইন-কলেজেই ভর্তি হতে হবে কেন? যোগেন যদি আইনই ভালোবাসে, তাহলে মোক্তারি পরীক্ষা দিচ্ছে না কেন?

যোগেন যে তখন প্যারীমোহন ডাক্তারের বাড়িতে ঠাঁই গেড়েছিল, তার কারণগুলোর মধ্যে কোনো মিল নেই। প্যারীমোহন একেবারে কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের ওপর একটা একতলা বাড়ি কিনেছিলেন—দু-চার বছর আগে। প্যারীমোহন যদি বাড়ি কিনতে পারেন, তাহলে যোগেন মণ্ডল সেখানে থেকে ওকালতি পড়তে পারে। এই কারণটির গাঁটগুলো খুব পাকা নয়, বাইরে থেকে। একজন বাড়ি করলে আর-একজনের সেখানে থাকার হক আসে কোত্থেকে? প্যারীমোহন দাশ, চাঁদসি-ডাক্তার, খাশ কলকাতায়, খাশ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের ওপর, খাশ থিয়েটার-পাড়ায় যদি একটা বাড়িই কিনতে পারে আর তার ছেলেদের নাম দিতে পারে—পরিমল, সুবিমল, —সুকোমল তখনো হামা টানে—তাহলে কি দেশস্থ ও জাতস্থ একটি ছেলে গ্র্যাজুয়েট হয়ে এসে আইন পড়তে শুরু করলে ডাক্তার 'না' করতে পারে? ডাক্তারও তার কাজ গুছিয়ে নেয়—যোগেন তার দুই ছেলে, পরিমল ও সুবিমলকে গ্র্যাজুয়েট করে দেবে। একে বলে—থেকে যাওয়া আর লেগে যাওয়া।

কিন্তু থাকা ও লাগার জন্যও প্যারীমোহনের বাড়ির কথা মনে এল কেন?

চাঁদসি, বারথি, মৈস্তারকান্দি, গৌরনদী, মাহিলারা একই থানার মধ্যে। শুধু তাই নয়। একই ইউনিয়নে। শুধু তাই নয়। চাঁদসি আর মৈস্তারকান্দি একই সড়কের ডাইনে-বাঁয়ে। শুধু তাই নয়। মৈস্তারকান্দি বললে একটু দূরের কেউ চিনবে না, চাঁদসি বললে দুনিয়ার সবাই চিনবে। তাহলে, যোগেন তো চাঁদসি-রই ছেলে। চাঁদসির দাশ-ডাক্তারদের কথা পৃথিবীর কে না জানে? সেই চাঁদসির ডাক্তারবাড়ির ছেলে প্যারীমোহন দাশের স্ত্রীকে যদি যোগেন 'বুন' বলে ডেকে থাকে, বরাবরই, আর সেই 'বুন' যদি যোগেনকে 'ভাই' বলেই ডেকে থাকে, বরাবরই, তাহলে প্যারীমোহন তো যোগেনের সাক্ষাৎ ভগ্নীপতিই হয়। নমশূদ্রদের তো আর কুলপঞ্জিকা থাকে না যে কার মেলে, কার গাঁইয়ে, কে কার কী হয় তা লেখাপড়া থাকবে? প্যারীমোহনের ছেলেরা—পরিমল, সুবিমল—যোগেনকে 'মামা' ডাকে।

যোগেন হয়তো সম্পর্কের এই নিবিড়তাটুকু চায়। সেই নিবিড়তায় একটা গন্ধ পায়—যেন সে অনেক পুরনো ও ছড়ানো সময়ে বাঁধা। সেই গন্ধ পায় বলেই সে গঙ্গাজলের কলে ফুটপাথে স্নান করে।

যোগেন রাস্তা টপকে ডাবপট্টির স্টপে দাঁড়িয়ে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করে। এখান থেকে হেদো তো কখনো সে ট্রামবাসে যায়নি। কতক্ষণই বা লাগবে। যোগেন ঘড়ি দেখে, সাড়ে সাতটা, সময় আছে তো, হেঁটে গেলেই হয়, এই ভাবতে-ভাবতেই দেখতে পায় প্রেসিডেন্সি কলেজের স্টপে একটা ট্রামের লগি দেখা যাচ্ছে।

বান্ডিল আর সুটকেস নিয়ে যোগেনকে ট্রামে উঠতে একটু অসুবিধেয় পড়তে হয়। উঠতে তো হ্যান্ডেলটা একটু ধরতে হয়। অসুবিধেটা যে হবে তা যোগেন জানত। সে বান্ডিলটা পাদানিতে ছুঁড়ে দিয়ে সুটকেসটা নিয়ে উঠে পড়ে। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ট্রামটা চলা শুরু করতেই কলকাতার ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধের শীতের হাওয়ায় শরীর-মাথা জুড়িয়ে যায় যোগেনের। সে একটু ঘেমেও গিয়েছিল। কনডাকটার টিকিট চাইতে এসে বলে, 'বসে যান'। যোগেন তাকে একটা ডবল পয়সা দিয়ে বলে, 'এই বড়তলায় নামব'।

কতদিন পর যোগেন কলকাতা এল? সেটা সে হিশেব কষতে চায় না কারণ তার এমন মনেই হয়নি যে কলকাতার সঙ্গে কোনো ছাড়াছাড়ির কিছু আছে। কত লোকই তো আছে জীবনে কোনোদিনই কলকাতায় আসেনি। কত লোক কেন, বেশিরভাগ লোকই তো তাই। বরিশাল, ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা—এ-সব জায়গায় থাকতে-ঘুরতে ঘরসংসার-কাজকম্ম করতে-করতে খামোখা মানুষের মনে হতে যাবে কেন, যাঁই, এড়ুড কইলকাত্‌তা পাক দিয়্যা আসি!

না, তেমন মনে হয় না। আবার এখন শহরের এত চওড়া রাস্তা দিয়ে ট্রামটা এমন ছুটে যাচ্ছে বলেই যে ঠান্ডা হাওয়া লাগছে আর হাতছোঁয়া যে দূরত্বে পেছনে পড়ে যাচ্ছে, ঠনঠনে, মেট্রপলিটন, হেদোর জলের ওপর আবছা কুয়াশার জাল ছিঁড়ে জলে কারো সাঁতার কাটার উচ্ছ্রিত জলকণা, গির্জার মাথা, স্কটিশ, বেথুন, ডান্ডাস যে হিশেবনিকেশ ছাড়াই কলকাতা যোগেনের ভালো লাগতে থাকে।

ট্রামস্টপটা প্যারীমোহনের বাড়ি ছাড়িয়ে, দু-বাড়ি পরে। যোগেন সেকেন্ড ক্লাশের পা-দানিতে শতরঞ্চির বান্ডিল আর সুটকেস—দুটোই রেখেছিল। স্টপ আসতেই সে সিট থেকে উঠে পাদানিতে নেমে সুটকেসটা হাতে তুলে, বান্ডিলটা বগলদাবার উদ্যোগ নিতেই কনডাকটার এসে বান্ডিলটা তুলে নেয়। যোগেন নেমে গেলে সে বান্ডিলটা এগিয়ে দেয়। প্যারীমোহনের বাড়িতে

ঢোকার সদর আর তার রোগী দেখার চেম্বার একই ঘরে। রোগীরা বেঞ্চিতে অপেক্ষা করে। পর্দা দিয়ে করা একটু আড়ালে ডাক্তার রোগী দেখে। ওষুধ বানানো হয় ভিতরে ঢোকার সিঁড়ির পাশে।

এই সাতসকালেই দুই রোগী বসে আছে।

তাদের পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢুকে দোতলায় ওঠার সিঁড়িতে পা দিয়েই যোগেন হাঁক ছাড়ে—'আরে এ বাড়িতে কি অলক্ষ্মী বাসা বাইনধছে? সাতসকালে কুটুম আসে, পা ধোয়ার জল নাই। আরে গাড়ু না-হয় নাই দিল্যা, বদনা একটা দিবা তো!'

বাড়িটা কেনা হয়েছিল একতলা, পরে দোতলা করা হয়েছে। জায়গা বাঁচাতে সিঁড়িটা উঁচু ধাপের হয়ে গেছে। বাঁকে পৌঁছতে-পৌঁছতেই সিঁড়ির মাথায় প্যারীমোহন আর তার স্ত্রী এসে দাঁড়ায়।

প্যারীমোহনের স্ত্রী বলে ওঠে, 'আরে, বগলে বিছন্যা লইয়া ঢুইকতেছেন বড় কুটুম। আরে, থোও না ভাই, ঐ হানে, তোমার ছাত্তররা নিয়্যা আইব।'

বলতে-বলতেই উদদুর-খুদদুর, দুই ভাই, লাফিয়ে সিঁড়ি গড়িয়ে নেমে আসে। তারা সেই শতরঞ্চির বান্ডিল আর সুটকেস নিয়ে ওপরে উঠে এল, তাদের পেছনে যোগেন।

উদদুর যুবক—আগের বছর বিএ পাশ করে, এ-বছর ল-তে ঢুকেছে। খুদদুর এখনো হাইস্কুলে।

যোগেন জুতোজোড়া বাইরে খুলে রেখে পাঞ্জাবিটাও খুলতে-খুলতে ঘরে গিয়ে ঢোকে আর পেছনে প্যারীমোহন বলে ওঠে, 'এই এড্ডা জিতাজিতির মইধ্যে মোহিনীকাহারে হারাইন্যার কামডা কী ছিল?'

যোগেন জামা খুলে ফেলেছিল। জামাটাকে দরজার কানছিতে ঝোলাতে-ঝোলাতে বলে, 'ক্যা, আরো তো হারাইছি, অমূল্য রায়, শরৎ বল—পুরানা কাউন্সিলের সব নেতা। মোহিনী ডাকতারের কাম কী আইছিল কংগ্রেসি হইয়্যা খাড়াইব্যার? সরকার তোমারে শিডিউল বইল্যা কংগ্রেস থিক্যা পৃথক দিল আর তুমি গিয়্যা সেই কংগ্রেসের নামে খাড়াইল্যা?'

'ভাই, দুদ খাবা তো এক গেলাস?'

'বুন, দেরি করার কিন্তু উপায় নাই, বুন। আরে, হেম নস্কর মশাই খবর পাঠাইছেন, শিডিউল মেম্বারগ তার বাড়িত্ বেলা এগারডায় মিটিং কইরব্যার লাগব। কম তো না, আট গণ্ডা এমএলএ। তার মইধ্যে নমশূদ্রই তো তেরডা। বুন, দুইগা ভাত ফুট্যাইয়া দ্যাও। আমি নায়্যা আসি নে। এডডু সইরষ্যার ত্যাল নি মিলে বু—ন—'

বাইরে থেকে বোনের জবাব আসে, 'হ। দেই। সইরষ্যা ক্যান? এমন জেতা-মেম্বার, অ্যাহন তো জবা কুসুম তৈল ব্যাভার করা লাগে। নাইলে তোমহার গা থিক্যা জিতার বাস পাবে নে কে?'

যোগেন গলা তুলে জিজ্ঞাসা করে, 'অ্যাহন কি আমার শরীর থিক্যা বাঘের বোঁটকা গন্ধ পাও'?

বাইরে থেকে বোনও গলা তুলে বলে, 'কীসের গন্ধ?'

'বড় বিলাইয়ের।'

বোন তেলের বাটি নিয়ে ঢোকে, 'ক্যা? বড় বিলাইয়ের গন্ধ তোমার গায়ে আসে ক্যামনে ভাই?'

'আরে, কাইল দুপর থিক্যা তো বড় বিলাইয়ের লগে ছিল্যাম, বুন। এহেবারে খাঁচার মইদ্যে।

আর আমারে যে তার পরের একত্‌তিরিশ ঘণ্টায় মুখে ঢুকাইয়্যা চিব্যায়্যা গিলে নাই সে তো এক বনবিবির দয়া।'

'ষাইট। ওডা কী কথা?'

যোগেন বাটি থেকে আঙুলে তেল তুলে দুই কানে দেয়, দুই নাকে টানে আর প্যারীমোহন বলে ওঠে, 'আ-রে সম্বুন্ধির তো দেহি ঘড়ি হইছে একখান! কেডা দিছে জিতার পুরস্কার?'

প্যারীমোহনের কথাতে যোগেনের নিজের মনে পড়ে যায়, ঘড়ির কথা। সে-ও তাকিয়ে দেখে।

'আশু মাস্টার দিছেন। পেনও একখান।'

'তো ঘড়িডা খুইল্যা রাখো। নাকী ঘড়ির গায়েও ত্যাল মাখাবা? শরীরের ত্যাল আর ঘড়ির ত্যাল তো আলাদা', প্যারীমোহনের কথায় যোগেন হেসে ঘড়িটা খুলতে যায় কিন্তু তেল লেগে থাকায় আঙুল পিছলে যায়, 'বুন, এই বকলেসখান্ খুলো দেহি।'

'ঐ বান্দাখুলা আমার কাম না। চাঁদসির ডাক্তাররে কও। সারাদিন তো দুনিয়ার মানুষের হাগা বান্ধে আর খোলে', বোনের কথায় একটু ঠেস ছিল অর্শরোগের চিকিৎসায় চাঁদসির বিশেষ পদ্ধতি নিয়ে। প্যারীমোহন এসে যোগেনের সামনে বসে তার ঘড়ির ব্যান্ডটা খুলে চৌকির ওপর রাখে। তার স্ত্রী দাঁড়িয়েই ছিল। সে যোগেনকে সূত্র ধরিয়ে দেয়, 'তোমারে বড় বিল্যাই না খাইয়্যা ছাইড়া দিল?'

যোগেন আবার একচোট হাসে, 'ছাড়ে নি? ভাইবছে এইডা তো গায়ের পোকার নাখান, খাঁচায় যহন ঢুইকছে, তহন গলা দিয়্যাও ঢুকব। ঢুকবই যহন, তহন আর আগে ঢুকাই ক্যা? অদ্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণ। শিয়ালদায় বরিশাল এক্সপ্রেস ঢুইকছে কী ঢোকে নাই, জয় বন্ধু বইল্যা খাঁচা থিক্যা দিল্যাম এক ঝাঁপ পড়িমরি কইর‍্যা। বড়-বিড়াল ট্যার পাইতে-না-পাইতে পগাড়-পাড়।'

'সে বাঘের নাম কী?'

'জনাব মৌলবি আবুল কাশেম ফজলুল হক'!

প্যারী বলে, 'স্যায় তো প্রাইম মিনিস্টার হইব কাগজে লিখে।'

'তা হয় তো হব। নাজিমুদ্দিনরে যে-ঘোল খাওয়াইল পটুয়াখালিতে তারপর তার থিক্যা ফিট আবার কেউ কি আছে প্রাইম মিনিস্টার হব্যার নাগাল!'

'বাঃ, এই কইলা বাঘ আর এই বলো চিবাইব', প্যারীমোহনের স্ত্রী বলে। আর প্যারীমোহন প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বলে ওঠে, 'তুমি নি হকশাহেবের লগে আইল্যা?'

'না, না, আমার কী খ্যামতা তার সঙ্গ পাওয়ার? স্যায়ই.আমারে তার লগে বাইন্ধ্যা আনছে।'

'বাইন্ধ্যা আইনছে? হকশাহেব নিজে? তোমারে কি মন্ত্রী বানাইব?' যোগেন পিঠে তেল মাখছিল বলে তার ঘাড় ঘুরে গেছে। তার কথা একটু ভিন্ন স্বরের শোনাল, 'আরে, মন্ত্রী কি হকশাহেবের ইচ্ছায় হয়?'

'তয়?'

'যেই সব পার্টির ইচ্ছা, হকশাহেবই হোক প্রাইম মিনিস্টার, তাদের ইচ্ছায় মন্ত্রী হয়।'

'তাগ বাড়া ভাতে কি তুমি ছাই? তারা ক্যান আপেত্ত দ্যায়? হিশাবডা বুঝাও তো?' প্যারীমোহন বলে।

'বুন, বাঘের মুখ থিক্যা বাইচ্যা আইলাম, অ্যাহন কি শিয়ালের গুতে আছাড় খাব? বুন, তুমি গল্প শুইনব্যার বইসল্যা, আমারে ভাত দিব কেডা? স্নান, ধরো, হইয়্যাই গেল'—জিভ কেটে বোন ঘর থেকে বেরিয়ে যায় আর টিনের সুটকেসটা খুলে একটা ধুতি আর গামছা বের

করে কাঁধে রেখে উঠে দাঁড়ায় যোগেন।

'হিশাব দিল্যা না তো?' প্যারীমোহনও দাঁড়ায়।

'থাইকলে তো দিব হিশাব? আড়াইশখান সিটের আট আনি—লাল পয়সা মেম্বার পার্টিছাড়া। এক-বেশি সোয়া-শ মেম্বারের হাত তোলা ছাড়া তো আর মন্ত্রিসভা হয় না।'

'কম পড়ল কীসে? মুন্ডুতে না হাতে?'

'তফাত কীসের? মুন্ডু আর হাতের?'

'তুমিই তো কইল্যা হাততোলা ছাড়া মন্ত্রী হইব না।'

'হ্যাঁ। এড্ডা মুন্ডুর তো এডডাই হাত।'

'এই তোমার ভোটের অঙ্ক? একখান হাত নুলা?'

'হাত তুইল্যা তো জানান দিব্যার লাগে, আছি আছি, ইশকুল-কলেজের নাগাল।'

'আমি আবার ইশকুল গ্যালাম কবে? কিততন ছাড়া তো হাত তুলি নাই। কিততনে তো দুইহাতই তুইলব্যার লাগে। এক কুকুরই তো দেহি পেচ্ছাব করার লগে একখান পাও তোলে। আর তুম্‌রা অ্যাহন ভোট কইর‍্যা একখান হাত তুইলব্যা।'

'ডাক্তার, অ্যাসেমব্লিতে তো কীর্তন হয় না। আইন পাশ হয়। কীর্তন গাইব্যা তো গাও দুই হাত তুইল্যা', বলে যোগেন কাঁধে ধুতি-গামছাসহ দুই হাত মাথার ওপর তুলে গান ধরে আর ধরতে-না-ধরতেই প্যারীমোহন গলা মিলিয়ে দুইহাত তুলে নাচের ভঙ্গিতে ঘোরে। ঘরের মেঝেটুকুতে দুইজনের কীর্তন গাওয়া ও নাচ চলে।

> তুমি হে ক্ষীরদশায়ী, নীরদবরণ,
> মরণ বাঁচন স্মরণ চরণ অসাধারণ,
> রূপ করিলে ধারণ—

বাইরে থেকে প্যারীমোহনের স্ত্রী তীক্ষ্ণ গলা এসে মেশে, 'গৌর হে গৌর'।

হঠাৎ গান-নাচ থামিয়ে যোগেন বলে ওঠে, 'আরে, বাঘের হাত থিক্যা বাইচ্যা দেহি এহানে কুমিরে খায়। দিল আমার কাজকামের সব্বনাশ কইর‍্যা।'

'ভাই, আমারে দুইষো না। ভাত নামাই। তোমার তো নাওয়া হয় নাই।'

'হইছে বুন হইছে, হইছে,' যোগেন সিঁড়িবেয়ে তরতরিয়ে নামে। দুই তলাতেই কলঘর আছে। কিন্তু যোগেন স্নান করে ফুটপাথের গঙ্গাজলে।

তপশিলিদের মিটিং

পয়সা না-থাকার সুবিধে কত! পয়সা ছিল না বলেই তো হেঁটে-হেঁটে এই শহরটাকে যোগেন এমন চিনে নিতে পেরেছে যে যার জন্মকন্ম সবই এই শহরে, তারপক্ষেও অতটা চেনা সম্ভব

৩১

নয়। হেম নস্কর মশায়ের বাড়িতে এই আট তারিখে সকাল এগারটায় হাজির হতে হবে খবর পাওয়ার পর তাঁর বাড়ি কোথায় এটা কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হয়নি। তার একটা টিউশনি ছিল পামর বাজার রোডে। ক্লাশ এইটের ছেলে, মাইনে আর পামর বাজার বলেই জুটেছিল। ওখানে মাস্টার পাওয়া যাচ্ছিল না। যোগেন দশ টাকা শুনে যতটা খুশি হয়েছিল, পড়াতে গিয়ে চুপসে গেল। বেলেঘাটায় তো আর ট্রাম নেই, সুতরাং সেকেন্ড ক্লাশও নেই, একমাত্র ভরসা ধাপার বাস—সতের নম্বর। তার ভাড়া শেয়ালদা বি আর সিং থেকে দেড় আনা—মানে একটা এক-আনি, আর আরেকটা ডবল পয়সা। তার মানে প্রতিদিন যাতায়াতে তিন আনা, সপ্তাহে ছ-দিনে আঠার আনা, মাসে প্রায় পাঁচ টাকা। তাহলে তো তার মাইনে দাঁড়ায়, মাসে পাঁচ টাকা। যোগেন বাসে যেত না। শেয়ালদা সাউথ দিয়ে শর্টকাট করে বেরিয়ে হেঁটে মেরে দিত। হাঁটতে-হাঁটতেই তার জানা হয়ে গেল দুই নম্বর রেলব্রিজ পার হয়ে সে যদি বেলেঘাটা মেন ছেড়ে ডানদিকের রাস্তা ধরে, তাহলে বাসের চাইতে আগেই পৌঁছে যেতে পারে।

সেই সুবাদে বেলেঘাটা মেন রোডের পুব সীমায় জোড়ামন্দিরে হেম নস্কর মশায়ের বাড়ি সে চেনেনি। এদিক থেকে জোড়ামন্দির ছাড়িয়ে চিংড়িঘাটা বলে একটি জায়গায় রাস্তা শেষ, তারপর বাঁধ। ঐ চিংড়িঘাটাতেই নমশুদ্র জমিদার দাসচৌধুরীদের বিখ্যাত প্রাসাদ ও বিখ্যাততর রাধাশ্যাম মন্দির। দাসচৌধুরীদের একটা আলাদা টানা ঘরই আছে—নমশূদ্র ছাত্রদের জন্য। ছাত্ররা তো থাকতই আর কাজেকর্মে কলকাতায় এলেও কেউ-কেউ ওখানে থেকে যায়, লোকের মুখে তাই ধর্মশালা কথাটাই চালু। প্রতিদিনই রাধেশ্যামের ভোগ খায় অনেকেই। যোগেনের পক্ষে এত দূর থেকে যাতায়াত কঠিন হয় বলেই সে দাসচৌধুরীদের ধর্মশালায় থাকেনি। কিন্তু রাসে কী ঝুলনে কী দোলে দাসচৌধুরীদের মন্দিরে গিয়ে গান গেয়েছে আর গব্যঘৃতে রান্না ভোগ খেয়েছে। তখনই জোড়ামন্দিরে নস্করদের বাড়ি তার দেখা, মন্দিরটাও দেখা—না দেখে উপায় নেই।

পাঁচ মাথার মোড় থেকে যোগেন কপালগুণে শেয়ালদারই ট্রাম পেয়ে গেল। নেমে সেই শর্টকাটে বি-আর সিঙে পৌঁছে টাইমঘরে খোঁজ করে শোনে, সোজা কোনো বাস চিংড়িঘাটা যাবে না, এখান থেকে রথতলা দিয়ে নারকেলডাঙা যাবে। রথতলায় নেমে আর-একটা বাস নিতে হবে। দুটো বাস? তার মানে তো অন্তত দু আনা। বাসে তো আর ডবল পয়সার টিকিট হয় না। তবে, রথতলা থেকে জোড়ামন্দির তো হাঁটা পথ! ওটুকু হেঁটে যাবে ভেবে যোগেন বাসে ওঠে।

সিটে বসে যোগেন নিজের মনে একটু মুচকি হাসে। কাল স্টিমারে কেবিনে, তারপর ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাসে শেয়ালদায় পৌঁছে সে এখন বাসের ভাড়া বাঁচিয়ে এমএলএ-দের মিটিঙে যাচ্ছে। কলকাতা বলেই সম্ভব। কে কাকে চেনে? তাছাড়া, যাতায়াতে পয়সা দিতে হলে যোগেনের খুব গায়ে লাগে। যেন, ঐ পয়সাটা তাকে ঠকিয়ে নেয়া হচ্ছে।

নস্করমশায় তাঁর বিখ্যাত পাকানো গোঁফ নিয়ে আদ্দির একটা ফতুয়া আর কোঁচা-উলটো

ধুতি পরে বারান্দায় থামের পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। যোগেনকে দেখেই নমস্কার করে, 'আসুন, আসুন' বলে অভ্যর্থনা করেন। যোগেনের গৌরব বোধ হয়—তাকে নস্করমশায় অভ্যর্থনা করছেন বলে নয়, নস্করমশায় কুলীন সব বামুন জমিদারদের মতই নিজের আভিজাত্য অনুযায়ী ব্যবহার জানেন। যেন, নস্করমশায় অনুন্নত শ্রেণির লোক হয়ে যোগেনের সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছেন। যোগেন গিয়ে প্রণাম করে—তার সঙ্গে নস্করমশায়ের কোনো পরিচয় নেই। যোগেন সোজা হয়ে দাঁড়াতেই তিনি যোগেনের দুই বাহু ধরে জিজ্ঞাসা করেন, 'ভাই?'

'যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল।'

'আরে ভাই, আপনি তো চ্যাম্পিয়ান, কী জেতা জিতে এসেছেন, আমাদের গৌরব।'

'সে-পরীক্ষা তো এখন শুরু, জিতার পর। তবে পরীক্ষা একা দিতে হবে না—এই যা রক্ষা।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেজন্যই তো আপনাদের ডাকলাম। নিজেদের মধ্যে পরিচয়ও হওয়া দরকার আর আমরা, মানে, ডিপ্রেসড ক্লাশের যারা তারা একজোট হতে পারি কীনা, ভিতরে গিয়ে বসুন, কথাবার্তা শুরু করুন।'

'সবাই এসে গেছেন?'

'অনেকেই এসে গেছেন, এসে পড়বেন সবাই।' হেম নস্কর নতুন কাউকে আসতে দেখে নমস্কার করে 'আসুন, আসুন' বলে উঠলেন।

যোগেন ভিতরে ঢুকে দেখে—একটা হলঘরের মত বড় ঘর। বড়-বড় জানলা। উলটো দেয়ালে একটা চৌকির ওপর শতরঞ্চি পাতা। তার পাশে দেয়াল ঘেঁষে একটা লম্বা হেলানবেঞ্চ। তার উলটো দেয়ালে কাঠের চেয়ার আছে কয়েকটা। আর যে-দরজা দিয়ে যোগেন ঢুকল তার পাশে একটা গদিওয়ালা নিচু কৌচ, পাশে ছোট একটা টেবিলে গড়গড়া আর খানিকটা ফাঁক দিয়ে দেয়াল ঘেঁষে একই রকম গদির একটা সোফা, সেটায় চারজন বসতে পারে, দু-একজন যদি রোগা হয় কিন্তু যোগেনের নিজের সাইজের তিনজনের বেশি ধরবে না।

'যোগেন—এসো এখানে', শুনে যোগেন দেখে পুলিন মল্লিক ডাকছে। মল্লিকভাইদের একজন—এদিকে কোথাও থেকে জিতেছে। চেয়ারে বসে আছে।

'যোগেন—যশোর ছেড়ে হাওড়ায় যায়ো না', রসিককাকা ডাকছেন—সেই হেলানবেঞ্চের হাতলে কনুই রেখে। পুলিন যদি চেয়ারে না বসে, তাহলে চেয়ার আছে কেন? আর, কোণাকানছিতে যদি এলিয়ে বসা না যায় তাহলে রসিককাকা বসবেন কোথায়, দুই পা তুলে, হাত-পা-ঘাড় কনুই যথাস্থানে রেখে। পুলিন তাকে ডেকেছে। ভদ্রতার খাতিরে তাকে হাত তুলে 'খাড়ান, আসি' বলে যোগেন যায় রসিককাকার দিকে। রসিককাকা তাঁর কোনো ভঙ্গিরই কোনো বদল না করে চোখ বুজেই জিজ্ঞাসা করেন, 'কী? তোমার ডিসিশন নেয়া হয়্যা গেছে?'

'ডিসিশন কীসের? কথাই তো শুরু হয় নাই।'

'আরে, সে-কথা কই না। তুমি কোথায় বইসব্যা সেই ডিসিশন—চেয়ারে না বেঞ্চিতে না শতরঞ্চিতে।'

'ঐখানে তো পুলিন বইসছে। পুলিনের লগে বসা যায়?'

'ক্যা? তোর যে পুলিনের সঙ্গে এমন ভাব তা তো জাইনত্যাম না রে?'

'ও চেয়ারে বইসেছে ক্যান্? দেখছে তো আপনি এইহানে।'

'ও নিজেকে চেয়ারের মানুষ ভাবে, তাই চেয়ারে বইসছে। তোরেও ডাক দিছে।'

'ও আমারে 'তুমি' কইয়্যা ডাকে ক্যান্, এড্ডেরে তো সমান বয়স।'

'তুই ওডারে কী ডাকিস?'

'আপনে। আমার অত 'তুমি' আসে না।'

'বয়। এইহানে বয়। চেয়ারও না। শতরঞ্চিও না।'

যোগেন বসে বলে, 'য্যান্ আপনি চেয়ার চিনেন না! অ্যাহনই তো ডাক পড়ব—রসিকবাবু আসেন, মিটিং শুরু করি।'

'অ্যাহন যাব নে। দ্যাখ ছ্যামড়া, শতরঞ্চি থিক্যা কাউরে ডাইক্যা বেঞ্চিতে তোলা যায়, বেঞ্চি থিক্যা ডাইক্যা চেয়ারে তোলা যায়। কিন্তু চেয়ার থিক্যা শতরঞ্চিতে ডাকা যায় না।'

'তত্ত্বখান কি এড্ডু খুইল্যা বলার নিষেধ আছে?'

'এর আবার খুলা ঢাকা কী? আমাগ শুদ্দুরগ একসময় দাবি ছিল—বাবুরা আমাগ চেয়ারে বইসব্যার দ্যায় না।'

'দাবিডার ভিতরে অন্যায্যডা কী?'

'ন্যায্য কথাডা তো উলট্যায়াও কওয়া যায়? যায় না?'

'কথাডাও ন্যায্য আর উলট্যাডাও ন্যায্য?'

'হ্যাঁ। উকিলগ মত। আসামির উকিল হইলে বাদী অন্যায্য আর বাদী উকিল হইলে আসামি অন্যায্য।'

'ভাগ্যিস ওকালতিডা করেন নাই। আশু মুখার্জির ভাত জুইটত না।' যে-বছর যোগেন ল-কলেজ ঢোকে, সেই বছর রসিক বিশ্বাস ওকালতি পাশ করে বেরন। কিছুদিন ওকালতি করার পর ভালো লাগেনি বলে ছেড়ে দিয়ে কর্পোরেশন স্কুলে মাস্টারি নেন।

'ক্যা? আমার ওকালতির ত্রুটি হইল কনে। কথাডা উলট্যায়া ভাবছস যোগেন? আমরা বাবুদের কাছে গেলে আমাগ বসার চেয়ার দিব্যার লাগব—এই তো দাবি। উলট্যাইয়া দ্যাখ আরো কত সত্যি শুনায়—আমরা বাবুগ কাছে গিয়্যা খাড়াইলে বাবুগ চেয়ার ছাইড়্যা খাড়াইবার লাগব।'

যোগেন হো হো হেসে ফেলে। রসিক বিশ্বাস চাপা গলায় বলেন, 'থো। এমন কংসের মতন হাসস্ ক্যা। দশে ভাইব্ব—আমরা রসের কথা কানাকানি করি। কেউ নি বুইজবে আমরা অট্টহাস্যসহ পলিটিকস আলোচনা কইরতেছি।'

যোগেন আরো জোরে হেসে ওঠে।

'তুই উঠ তো এইহান থিক্যা। শ্যাষে লোকজন আমারে দুশ্চরিত্তির ভাইব্ব।'

'বিরাটকাহা আইছে। সেবা দিয়্যা আসি।'

'এই বয়সে স্ত্রী বিয়োগ হইল দাদার। তার মইধ্যে ভোটাভুটি। ক্যামন শুকাইয়্যা পড়ছে মানুষডা।'

যোগেন উঠে বিরাট মণ্ডলের কাছে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে, 'কাহা, শরীরের কুশল তো?'

'বেয়াল্লিশ বছরে কী কুশল চাও?'

'ক্যা? বয়সে কি কুশল কমে কাহা? তবে আপনার তো ব্যাবসাবাণিজ্যি আর শ্রমিক ইউনিয়ন—উদ্বেগের পক্ষে তো যথেষ্ট।'

রেল শ্রমিক ইউনিয়ন বোধয় কমিনিস্ট বা লেবার পার্টি কাইড়্যা নিবে। জুটের ইউনিয়নের মত নতুন দাবিদাওয়া নাই রেলে, কিন্তু মজুরও তো বিস্তর। তুমি কী কইরব্যা? শুদু এমএলএ-তে কি সংসার চলবে?'

এর মধ্যে ঘরের সকলেই একটু চুপ করে যায়। মুকুন্দ মল্লিক আর পি-আর ঠাকুর এলেন। নমশূদ্র সমাজের তো বটেই, ডিপ্রেসড ক্লাশের, সবচেয়ে নাম করা নেতা। মুকুন্দ মল্লিক

নমশূদ্রদের মধ্যে প্রথম এমএ-বিএল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি-র প্রফেসর আর পি-আর ঠাকুর নমশূদ্রদের মধ্যে প্রথম বিলেত-ফেরত ব্যারিস্টার, তার ওপর হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুরের বংশ, গুরুচাঁদ এখনো বেঁচে, মতুয়া ধর্মের গুরু, সমস্ত নমশূদ্রের গুরু বংশ। এইবার মিটিং শুরু হবে বুঝে যোগেন গিয়ে মুকুন্দ মল্লিকের সামনে দাঁড়ায়, 'স্যা-র'।

'যোগেন, তুমি তো ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট। তোমার মত যদি আমরা সবাই পারতাম—সেটাই হত ঠিক কাজ। রিজার্ভেশন লাগবে না। আমরা জেনারেল সিটেই কংগ্রেসকে হারাতে পারি। কিন্তু আমাদের তো আর তোমার মত মাসকনট্যাক্ট নেই।' যোগেন প্রণাম করে।

পি-আর ঠাকুর বলেন, 'যোগেনবাবু, আপনি সত্যি আমাদের জোর বাড়িয়ে দিয়েছেন। ভালো খবরের তো সময়-অসময় নেই। কনগ্র্যাচুলেশনস।' তাদের সমাজে বাবু বা আপনি সম্বোধন খুব চালু নয়। পি-আর ঠাকুর যোগেনকে বরাবরই বাবু বলেন ও আপনি বলেন। একটা কারণ যে ওঁদের পরিচয় হয়েছে পরে।

হেম নস্কর মশায় কথা বলতে শুরু করেছেন উঁচু গলায়। যোগেন তাড়াতাড়ি শতরঞ্চিতেই বসে পড়ে। হেম নস্কর তখন বলছেন, 'ভ্রাতৃগণ! আমার গৃহে আপনারা পদার্পণ করায় আমি ধন্যবোধ করিতেছি। কিন্তু ইহা আমার ব্যক্তিগত কোনো অনুষ্ঠান নয়। পরিবারের কোনো অনুষ্ঠান হইলে সমাজের রীতি অনুযায়ী অভ্যর্থনা করিতে হয়। কিন্তু তেমন অভ্যর্থনা করা কতটা উচিত তাহা বুঝিতে না পারায় নিশ্চয়ই কিছু ত্রুটি ঘটিবেই। তাহার জন্য আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমার কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু জানাইয়াছেন যে আইনসভায় আমরা যদি একটি কোনো পার্টির প্রতিনিধি রূপে নিজেদের পরিচয় না দিতে পারি, তাহা হইলে আমরা প্রত্যেকেই পৃথক স্বতন্ত্র মেম্বার হইয়া যাইব। ইহা আর কে না বুঝে যে একটা লাঠি হইতে দশ-লাঠি জোট হইলে ভালো। তেমন শক্তিবৃদ্ধি সম্ভব কী না ও কতদূর সম্ভব তাহা আলোচনা করিবার জন্য আমরা মিলিত হইয়াছি। নীহারেন্দু দত্তমজুমদার মহাশয় এই সব ভোটাভুটি ও আইনসভার ভিতরবাহির সম্পর্কে বিদ্বান ব্যক্তি। আমি তাঁহাকে ও হুমায়ুন কবির শাহেবকে এই বিষয়টি বুঝাইয়া দেয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছি। আজিকার সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য আমি শ্রীমুকুন্দবিহারী মল্লিক মহাশয়ের নাম প্রস্তাব করি।'

পি-আর উঠে বলেন, 'আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করি।'

মুকুন্দবিহারীকে সভাপতির নির্দিষ্ট চেয়ারে বসতে হয়। তিনি বসেছিলেন বড় সোফার এক কোণে। মুকুন্দবিহারীর হাতে একজন একটা কাগজ ধরিয়ে দেয়। তিনি সে-কাগজটি সম্পূর্ণ পড়েন। তারপর ঘাড় একটু ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'নীহারেন্দুবাবু, আপনি আসুন।' তারপর সভার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'নীহারেন্দুবাবু কিন্তু ডিপ্রেসড ক্লাশের মেম্বার নন। তিনি আজকের সভায় নিমন্ত্রণকর্তা কর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়েছেন বিশেষজ্ঞ হিশেবে। এই ধরণের নির্বাচন ও মন্ত্রী নিয়োগ ও মন্ত্রিসভা গঠন আমাদের দেশে সম্পূর্ণ নতুন। ইতিপূর্বে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল বা আইন পরিষদ ছিল। তাতে নির্বাচন হত খুব কম-সংখ্যক ভোটারের মধ্যে। আবার, তাতে অনেকে মনোনীত সদস্যও থাকিতেন। আইন পরিষদও একটি মন্ত্রিসভা তৈরি করত। এই সভাতে দু-একজন আছেন, যাঁরা এখনো আইন পরিষদের মন্ত্রী। আইন পরিষদের সঙ্গে বর্তমান আইনসভা বা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির প্রধান তফাত হচ্ছে—সভা তৈরি হয়েছে নতুন আইন-অনুযায়ী ভোটার লিস্ট তৈরি করে। তাতে ভোটার-সংখ্যা অনেক গুণ বেড়ে গেছে। দ্বিতীয় প্রধান তফাত হচ্ছে—পরিষদের মন্ত্রিসভা ছিল গভর্নর বা লাটশাহেবকে পরামর্শ দেয়ার জন্য। আর সভায় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভা সভার অনুগত থাকবে। অনেকে মনে করেন গভর্নরকে

আলংকারিক পদাধিকারী করে আইনসভাকে ক্ষমতা দেয়া ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করা, বস্তুত আমাদের স্বাধীন সরকার গঠনের দিকে কার্যকর প্রধান পদক্ষেপ। আইনসভার বিষয়টি নীহারেন্দু দত্তমজুমদার মহাশয় বুঝিয়ে দেবেন। তিনি লেবার পার্টির নেতা ও সেই পার্টি থেকে জিতে এবার মেম্বার হয়েছেন। তিনি বিশেষ রকম শিক্ষিত ব্যক্তি। বিশেষ করে এই সব ব্যাপারে। তিনি আমাদের সাহায্য করতে এসেছেন। তিনি কোনো নির্দেশ দেবেন না ও ঔচিত ব্যাখ্যা করবেন না। আমাদের এই সভা ডিপ্রেসড ক্লাশ থেকে নির্বাচিত মেম্বারদের সভা। এই সভায় আপনারা যে-সিদ্ধান্ত নেবেন তার কোনো দায় নীহারেন্দুবাবুর ওপর বর্তাবে না। তেমনি নীহারেন্দুবাবুর বক্তব্যের কোনো দায়ও এই সভার ওপর বর্তাবে না। নীহারেন্দুবাবুর বক্তৃতার পর তাঁকে প্রশ্ন করে আপনারা জিজ্ঞাসিত বিষয় জেনে নিতে পারেন। কিন্তু তাঁর বক্তৃতার মাঝখানে কেউ কোনো বাধা দেবেন না। আসুন, নীহারেন্দুবাবু।'

সভাপতির পাশে দাঁড়িয়ে নীহারেন্দু দত্তমজুমদার বলতে শুরু করেন। 'অধ্যাপক মুকুন্দবিহারী মল্লিক মহাশয় যেরকম করে ব্যাখ্যা করে দিলেন আইনপরিষদ ও আইনসভার পার্থক্য কোথায়, তারপর আমার আর কিছু বলা উচিত নয়। আসলে, তাঁর আগে যদি আমাকে বলতে হত তাহলে আমি পুরনো আইনের আইনপরিষদ ও নতুন-আইনের আইনসভার পার্থক্য ও নতুনত্বের কথা জটিল করে ফেলতাম। অধ্যাপক কেমন সোজা করে দিলেন—লাটশাহেবের আইন-পরিষদ ও প্রধানমন্ত্রীর আইনসভা। কিন্তু এই সোজা কথার মধ্যে একটু-আধটু খটকা ও বাঁক আছে। যেমন, আইনসভার ভোটে যে-দল বা পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ, লাটশাহেব তার নেতাকে, মানে, সেই দল বা পার্টির নেতা কে তা শুধু সেই দলের এমএলএরা মিটিং করে লাটশাহেবকে জানানোর পর লাটশাহেব তাঁকে ডেকে বলবেন, আপনি আপনার মন্ত্রিসভা গঠন করুন। লাটশাহেব প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সুপারিশ-করা মন্ত্রীদের শপথবাক্য পাঠ করিয়ে সরকার তৈরি করবেন। লাটশাহেবের যদি মনে হয়, কোনো কারণে এই সরকার আর চলছে না, তাহলে তিনি সরকার ভেঙে দিয়ে নিজের হাতে ক্ষমতা নিতে পারেন।'

একজন উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ—,' সভাপতি হাত তুলে তাঁকে বসার ইঙ্গিত করে বলেন, 'ওঁর বক্তৃতার পর বলবেন।'

না-বসে সেই সদস্য বলেন, 'না, স্যার, আমার কুনো প্রশ্ন নাই। আমার অনুরোধ—এই বিষয়ডা আমি ভোটের আগেও বুঝি নাই, পরেও বুঝি নাই। এইডা যদি নীহারবাবু এডডু কন বিস্তারিতে যে আইনসভা প্রধানমন্ত্রী বানাবার পারে, লাটশাহেব পারেন না। আর, লাটশাহেব প্রধানমন্ত্রীকে খেদাইব্যার পারেন কিন্তু আইনসভা তার নিজের প্রধানমন্ত্রীকে রক্ষা করতে পারেন না। এই দুইডা উলডা ব্যবস্থা চলে কোন আইনে?' প্রশ্নকর্তা বসে পড়েন।

সভায় একটু গুঞ্জন ওঠে, 'কে? মেম্বারটা কে?' সভাপতি ও নীহারেন্দুবাবুও চেনেন না—তাঁরা একটু অপ্রস্তুত হাসেন। নীহারেন্দুবাবু অবস্থা সামলাতে সবে হাঁ করেছেন, একজন পেছন থেকে সভাপতির কানে-কানে কিছু বলে দেন। সভাপতি ডানহাত তুলে বলেন, 'যিনি প্রশ্ন করলেন তিনি অনেকের চেনা নন। উনি মৈমনসিং পশ্চিম থেকে মেম্বার হয়েছেন। ওঁর নাম অনন্তলাল মণ্ডল।'

সভায় আবার একটা গোলমাল ওঠে। একজন দাঁড়িয়ে উঠে খুব উঁচুগলায় বলেন, 'অনন্তলাল না। উঁয়ার নাম অমৃতলাল মণ্ডল। মৈমনসিং জিলা বোর্ডের অনেক দিনের মেম্বার।'

নীহারেন্দুবাবু গলা তুলে বলেন, 'অমৃতলাল মণ্ডল মশায় খুব সাহায্য করলেন। আমরা সবাই যদি স্পষ্ট করে আমাদের অসুবিধেগুলি জানাই, তাহলে আমরা এই নতুন আইনটা ভালো করে

বুঝতে পারব। সাধারণভাবে ধরে নেয়া হয় যে ডিপ্রেসড কাস্ট বা পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী মানেই অশিক্ষিত। সেই কারণে, তাঁরা সব কথা তাঁদের জানাতে চান না যে অশিক্ষিতরা ওসব কথা বুঝবে না। কথা যদি পরিষ্কার না-হয় তাহলে মহাশিক্ষিতরাও বোঝেন না। আর কথা যদি শাদা হয়, তাহলে যিনি নিজের নাম সই করতে পারেন না তিনিও নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় সেটা বুঝে নেন। এই সভায় একটু চোখ বোলালেই এমন অনেক মানুষকে দেখা যাবে যাঁরা উঁচুজাতের মানুষের চাইতে বহুগুণ শিক্ষিত। এই-যে নিকুঞ্জবিহারী মাইতি মশায় মেদিনীপুরের, হাওড়ার রাধানাথ দাস, দিনাজপুরের শ্যামাপ্রসাদ বর্মন, জলপাইগুড়ির উপেন্দ্রনাথ বর্মন, রংপুরের পুষ্পজিৎ বর্মন, বরিশালের যোগেন মণ্ডল—এঁরা কেউ এমএ-বিএল, কেউ বিএ-বিএল। এঁরা এসব আইন গুলে খেয়েছেন। আমি শুধু তরুণ নেতাদের কথা বললাম—যাঁদের আমি চিনি। এই সভার সভাপতি মুকুন্দবিহারী মল্লিক ও তাঁর ভাইরা, রসিকলাল বিশ্বাস, বিরাট মণ্ডল মশায়, পি-আর ঠাকুরের কথা সারা বাংলায় কে না জানে? আমার তো মনে হচ্ছে—ধরুন, এই ৩২ জন পিছিয়েথাকা জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি মেম্বারদের মধ্যে যোগ্যতার বিচারে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মেম্বার আছেন। কংগ্রেস, কেপিপি বা লিগের মধ্যে এর চাইতে যোগ্য মানুষ এত সংখ্যায় নেই।'

সভার অনেকেই হাততালি দিয়ে ওঠে।

নীহারেন্দুবাবু বলেন—'আমি প্রথমেই বলছি, অমৃতলালবাবু যা বোঝেননি, তা বোঝা যায় না বলেই বোঝেননি। শাসন করার অধিকার, সর্বোচ্চ অধিকার তো আর ভাগাভাগি হয় না। একজনকে যদি ফাঁসির হুকুম দেয়া হয়, সেটা তো সমান ক্ষমতার দুটো কোর্ট দিতে পারে না। একটা কোর্টকেই দিতে হয়। আইনসভা তার মন্ত্রিসভার তৈরি করার একমাত্র অধিকারী। আবার, এই মন্ত্রিসভাকে খারিজ করার একমাত্র অধিকারী লাটশাহেব। এই ৯৩-ধারার বিরুদ্ধে আমরা, কংগ্রেসের বামপন্থীরা, ভোটে যোগ দেয়ার বিরুদ্ধে ছিলাম। কিন্তু আইনে এই ব্যবস্থা বহাল আছে। আপনারা যদি এই আইন অনুযায়ী ভোটে জিতে মেম্বার হয়ে থাকেন, তাহলে এই আইন অনুযায়ী সরকার করতে হবে ও চালাতে হবে। কংগ্রেস থেকে এই ধারার বিরুদ্ধে আপত্তি করে কেউ-কেউ চেয়েছিলেন ভোটে না-যেতে। শেষ পর্যন্ত অবিশ্যি কংগ্রেস ভোটে এসেছে।'

'আমরা তো এহানে যারা জড়ো তারা সবাই একই শ্রেণির লোক, অনগ্রসর শ্রেণি। এখন বলা হচ্ছে শিডিউল্ড কাস্ট, আরো আগে কওয়া হত শূদ্র বা অস্পৃশ্য, গান্ধীজি ডাহেন হরিজন। সবাইই নতুন-নতুন নাম দিছেন। কিন্তু সরকার চালানোর মত এত উঁচু কাজে আমাদের জাতের ৩২ জনকে কেউ আগে ডাকছে?' রসিকলাল বিশ্বাস বেশ ধমকে জিজ্ঞাসা করেন।

শুধু হিন্দুও নয়, শুধু মুসলমানও নয়

'তা এইবার ডাকাডা কইরলা কে গ?'

'লাটশাহেব। বড় লাটশাহেব। বিলাতের শাহেবমন্ত্রীরা। বিলাতের রাজা। আবার কেডা। এডা

৩২ তো ভালো হইল আমাগ। না-হইলে ঐ কংগ্রেসি বামুন-কায়েতগ লগে প্যাঁচের খেলায় আমরা নি পারি?' রসিকলাল তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসের ইংরেজ-নির্ভরতা নিয়ে কোনো ঢাকঢাক রাখেন না। সভায় একটু গুঞ্জন ওঠে। কেউ একজন খুব জোরে যেন কাউকে দাবড়ায়, 'চুপ দে তো কানাই। এই কংগ্রেসের হইয়্যা কাকা খাড়িল ক্যান? কংগ্রেসওয়ালারে বেবাক শুদ্দুর বানাইবেন বইল্যা! চুপ দে কানাই—'।

'যাউক গিয়্যা। এই কথাড্যা কেউ-না-কেউ জিগ্যাইবে, এই আশায় তো বইস্যা আছি। হেলান দেই নাই। আমরা তো ভোটে জিততে আইজ কংগ্রেস, কাইল কেপিপি হব্যার পারিই। এরা কুনডা আমার শুদ্দুর পরিচয় ঘুচ্যাবার পারে? বর্ণ এ শুদ্দুর, ডাই এ শুদ্দুর।'

'রসিকবাবু কিন্তু আসল কথাটা তুলেছেন। বিশেষ করে আপনাদের দুইটা পরিচয় আছে। একটা পরিচয় আমরা ভোটারকে দিয়েছি—কেউ কংগ্রেস, কেউ স্বতন্ত্র, কেউ লিগ আর কেউ কেপিপি। যদি কোনো একটা দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেত তাহলে ঐ একটা পরিচয়েই চলত। কিন্তু যেহেতু তা পায়নি, তাই আপনাদের দ্বিতীয় পরিচয়টা এখন বের করতে হবে যে আপনারা সকলেই শিডিউল্ড কাস্ট। কংগ্রেসি শিডিউল্ড কাস্ট, লিগ শিডিউল্ড, কেপিপি শিডিউল্ড, এই সব। আপনারা যদি এখানে শিডিউল্ড কাস্ট অ্যাসেমব্লি পার্টি তৈরি করেন, তাহলে তো রসিকলালবাবু সেই পার্টির মেম্বার হবেন।'

'কাহা শুদ্যা মেম্বার হয় না। প্রেসিডেন হবে।'

'মেম্বার না হলে তো আর প্রেসিডেন্ট হতে পারবেন না। বাইরে কংগ্রেস। আর অ্যাসেমব্লির ভিতরে শিডিউল পার্টি। এটা পার্লামেন্টারি পদ্ধতি, মেম্বারদের বিশেষ অধিকার।'

কেউ একজন বেশ চেঁচিয়েই বলে, 'তা না হইলে রসিক কীসে, যদি না থাকে দুই মিনসে?'

নীহারেন্দুবাবু না-থামায় আওয়াজটা থেকে আর পালটা আওয়াজ বেরল না, 'আমরা যারা কংগ্রেসের মধ্যে আছি তেমন চারজন মেম্বার, বঙ্কিম মুখার্জি আছেন, শিবনাথ ব্যানার্জি আছেন, সোস্যালিস্ট লেজিসলেটারদের ব্লক তৈরি করা নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছি।'

'একটা কথা একটু হওয়া দরকার। ডিপ্রেসড বলেন, শিডিউল্ডই বলেন, মুসলমানদের তার মধ্যে ধরা হচ্ছে না কেন? ধরেন, আজকার মিটিঙে একজনও মুসলমান নাই কেন?' বর্ধমানের বঙ্কুবিহারী মণ্ডল কথাটা তুলতেই শার্টপ্যান্ট পরা ছোটখাটো হুমায়ুন কবির চট করে দাঁড়িয়ে বলেন, 'সভাপতিমশায়, আমাকে কি একশ শতাংশ মুসলমান ধরা হচ্ছে না?'

কবির কখন এসে এক কোণে বসে পড়েছেন, সবার চোখে পড়েনি। সেই চমকে হাততালি ওঠে। নীহারেন্দুবাবু বলেন, 'এখন কবির শাহেব বলুন। আমি তো অনেকক্ষণ বলেছি।'

যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, কবির সেখান থেকেই বলতে শুরু করেন, 'আসলে ইলেকটেড গবর্মেন্টে, মানে পার্লামেন্টারি সিস্টেমে নাম্বার মানে সংখ্যাটা, সবচেয়ে দরকারি। ধরুন যে-ভোট হয়ে গেল তাতে সংখ্যার অনুপাত কী? আইনসভায় জেতা সদস্যদের আটভাগে ভাগ করা যায়। কংগ্রেসের ৫৪, স্বতন্ত্র হিন্দু উচ্চবর্ণ ১৪, স্বতন্ত্র শিডিউল্ড কাস্ট ২৩, হিন্দু ন্যাশন্যালিস্ট মানে মালব্যজির পার্টি ৩, হিন্দুসভা ২, মুসলিম লিগ ৪০, কৃষক-প্রজা পার্টি ৩৮, স্বতন্ত্র মুসলিম

৪৩ আর ইয়োরোপিয়ান-অ্যাংলো ইন্ডিয়ান-খ্রিস্টান ভারতীয় ৩১। মোট ২৪৮। দুজন দুটো কেন্দ্র থেকে জিতেছেন। আমি যেরকম ভাগ করলাম, তার চাইতে আলাদা-আলাদা ভাগও করা যায়। ধরুন জমিদার ক-জন, উকিল-ডাক্তার-মাস্টার ক-জন সেটাও একটা ভাগ হতে পারে। আমি যে-আটভাগ করেছি তাকে আবার সোজাসুজি তিনভাগ করা যায়—হিন্দু, মুসলিম ও খ্রিস্টান। তাতে দেখা যাবে কংগ্রেসকে ধরে হিন্দু মেম্বার ৯৪, মুসলিম ১২১, আর খ্রিস্টান ৩১। সরকার তৈরি করতে হলে কমপক্ষে ১২৬ জনকে সরকারের পক্ষে দরকার। সেই সংখ্যার সবচেয়ে কাছে আছে মুসলিম মেম্বাররা। সুতরাং এটা একটা সম্ভাবনা।'

সভায় চাপা গুঞ্জন ওঠায় কবির শাহেব বলেন, 'না, না, আপনাদের চমকে দেয়ার জন্য আমি এই সম্ভাবনার কথা বলিনি। বলেছি সংখ্যার হিশেবে ১২৬-এর সবচেয়ে কাছে কারা। আবার ধরুন, হিন্দু-মুসলমান ভুলে গিয়ে যদি ধরি, কংগ্রেস আর কৃষক-প্রজা পার্টি মিলে হয় ৯২। যদি শাহেবদের ৩১ যোগ করা যায় তাহলে হয় ১২৩। ঐ ১২৬-এর আরো কাছে। এর সঙ্গে স্বতন্ত্র শিডিউল কাস্টের ২৩ যোগ হলে দাঁড়ায় ১৪৯। বেশ শক্তপোক্ত একটা সংখ্যা। এই সরকার তৈরি হওয়ার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি। ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই ফজলুল হকশাহেবের সঙ্গে শরৎচন্দ্র বসুর কথাবার্তা শুরু হয়ে গেছে।

'ধরুন, কংগ্রেস-প্রজাপার্টির সরকার হলে স্বতন্ত্র শিডিউল কাস্টরা তাকে সমর্থন নাও করতে পারে। কারণ তারা কংগ্রেসকে বর্ণহিন্দুর পার্টি মনে করে। এখন এমন একজন নেতাকে যদি পাওয়া যায় যিনি কংগ্রেসের কিছু সমর্থন পাবেন, স্বতন্ত্র বর্ণহিন্দুদের সমর্থন পাবেন, শিডিউল স্বতন্ত্রদেরও সমর্থন পাবেন আর শাহেবদের তো পাবেনই, তাহলে কিন্তু তিনি ১২৬ পেরিয়ে যেতে পারেন।'

কবির শাহেব একটু থামলেন—সম্ভবত কিছু প্রশ্ন উঠতে পারে ভেবে। প্রশ্নটা উঠল আর তুললেন পি আর ঠাকুর। সভা একেবারে নিঃশব্দ হয়ে গেল। কবির আর ঠাকুর একেবারে শেয়ানে-শেয়ানে। সভাপতি মুকুন্দবিহারীর বিস্ময় সকলের চোখে পড়ে।

'আপনি যে এই থার্ড অলটারনেটিভটা দিলেন, প্রফেসর কবির...'

'না, না, আমি কোনো অলটারনেটিভ দিইনি মিস্টার ঠাকুর। আমি সংখ্যাগুলো কতভাবে সাজানো যায়, বলছিলাম, স্ট্যাটিসটিক্যাল প্রব্যাবিলিটিস।'

'আই স্ট্যান্ড কারেকটেড। যে থার্ড প্রব্যাবিলিটিটা সাজালেন তার দুটো বেসিক ডিফেক্ট আছে। এক নম্বর ডিফেক্ট—আপনার কাল্পনিক নেতার সমর্থনে আপনি প্রায় সব পার্টি থেকেই একটা অংশ জড়ো করেছেন। কিন্তু সংখ্যাটি সব জায়গাতেই আন্দাজি। দুই নম্বর ডিফেক্ট—এমন একজন নেতা কল্পনা করা যায় না। তাঁকে রক্তমাংসে দেখা যায়। ধরুন, আমরা সবাই জানি—ফজলুল হক শাহেব সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী। ধরুন আমরা মনে করে নিতে পারি—শরৎ বোস মশায়ও তেমন সমর্থন পেতে পারেন। আপনার ইঙ্গিত কিন্তু তৃতীয় কারো দিকে। এটা আপনি স্পষ্ট করুন।'

'প্রব্যাবিলিটি কি এর চাইতে স্পষ্ট হয়?'

'এমন কি কোনো প্রব্যাবিলিটি হয়, যার কোনো পসিবিলিটি নেই?'

'ধরুন, আপনিই, মিস্টার ঠাকুর।'

কবির এতই স্বাভাবিক স্বরে কথাটা বলেন যেন এটা খুবই সম্ভব। কিন্তু সেই স্বাভাবিকতায় চালাকি মেশানো ছিল। ফলে সবার হেসে উঠতে একটু দেরি হয়। সবচেয়ে শেষে হাসেন পি আর ঠাকুর। একটু থতমত ভঙ্গিতে যেন বুঝতে চান—কবির চাইছেনটা কী।

'আমার ব্যক্তিগত কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু একজন শিডিউল্ড কাস্টকে প্রধানমন্ত্রী দেখতে তো কেউই রাজি হবে না—মুসলমানরাও না, হিন্দুরাও না।'

'এতটা নিশ্চিত করে কি বলা যায় মিস্টার ঠাকুর। উলটোটাও তো হতে পারে। হিন্দুরা চায় না কোনো মুসলমান প্রধানমন্ত্রী। মুসলমানরা চায় না কোনো হিন্দু প্রধানমন্ত্রী। সুতরাং একজন শিডিউল্ড কাস্ট প্রধানমন্ত্রীতে দু-পক্ষই রাজি হয়ে গেল।'

'আপনি যে আইন-পরিষদের মেম্বার সেখানে কিন্তু সংরক্ষণের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য আপনারা তৈরি করেছিলেন। তার বিরুদ্ধে সাতজন শিডিউল্ড কাস্ট সদস্যও একমত হয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত, এমন কোনো রেকর্ড নেই যে, শিডিউল্ড কাস্টের বাইরের কেউ শিডিউল্ড কাস্টদের সমর্থন করছেন। তাই, আপনার তৃতীয় সম্ভাবনার উদাহরণ হিশেবে আমার বা এই সভার আর-কারো নাম বলার অর্থ একটাই—আপনি নামটা বলতে চান না। তার নিশ্চয়ই কারণ আছে।' পি আর ঠাকুর বসে পড়লেন। সারা ঘর জুড়ে হাততালি ওঠে। কবির শাহেব প্যান্টের পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মোছেন।

হাততালি থামলেও গুঞ্জন চলে। কবির শাহেব বাঁ হাত তুলে ইশারা করেন. গুঞ্জন একটু কমতেই তিনি বলেন, 'আমি ধরা পড়ে গিয়েছি। যদিও আমি নিরাপরাধ। আমি যখন পি আর ঠাকুরকে বলেছি, উনিই সম্ভাব্য তৃতীয় বিকল্প হতে পারেন, তখন আমি কোনো হিন্দু বা মুসলমান বা শিডিউল্ড কাস্ট মেম্বারকে সে-কথা বলিনি। বলছি, পি আর ঠাকুরকেই, যিনি ভারতীয় রাজনীতির নতুন নেতা। তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা থেকেই কথাটা বেরিয়ে এসেছে। তবে, এখন যদি আমি সত্যি করেই কার কথা ভেবে তৃতীয় সম্ভাবনার কথা বলেছি তার নাম না বলি, তাহলে আপনারা আমাকে মিথ্যেবাদী ভাববেন। আমিও নিজেকে তাই ভাবব। আমি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির কথা ভেবেই বলেছি—আপনারা কেন তাঁকে সমর্থন করবেন না?'

কবির শাহেব বসে পড়েন। কারো মুখ থেকেই কোনো কথা বেরয় না। মুকুন্দবিহারী মল্লিক একবার পেছন দিকে তাকান। যে-লোকটি সভাপতিকে কখনো-কখনো কানে-কানে কিছু বলে যাচ্ছিল, সে এবার তাঁর কানের অতটা কাছে না গিয়েও কথাগুলি বলেন ও সভাপতি কী করণীয় তা বুঝে নিয়ে বলেন, 'আমাদের আজকের সভার কর্তব্য এই সিদ্ধান্ত বিচার করা যে আমরা শিডিউল্ড কাস্টের ৩২ জন সদস্য আইনসভায় একত্রিত হতে পারি কী না।'

বিরাট মণ্ডলমশায় বসেবসেই বললেন উঁচু গলায়, 'খুবই পারি। আমি প্রস্তাব করছি এই সভা থেকে 'বেঙ্গল অ্যাসেম্বলিজ ইনডিপেনডেন্ট শিডিউল্ড কাস্ট মেম্বার্স লিগ' তৈরি হোক। তার সভাপতি হন, হেমচন্দ্র নস্কর আর সম্পাদক হন, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল।'

'আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করে বলছি আপাতত ২৩ জন স্বতন্ত্র শিডিউলদের নিয়ে এই পার্টিটা হোক। বাকি নয়জনের মধ্যে তো অদ্বৈত মাঝি ও রসিকলাল বিশ্বাসের মত হিন্দুসভার দুই আর কংগ্রেসের সাত মেম্বার আছেন। আপাতত এই নয় মেম্বারকে বাইরে রাখেন যাতে তাঁরা দুই নৌকোয় পা-রাখার সুযোগে আমাদের ডোবাতে না পারেন,' কথাটা বললেন রসিকলালই। এটা যে রসিকলালেরই কথাবলার ধরুণ, তা নয়, খুলনা-ফরিদপুর-বরিশালের লোকদেরই কথাবলার এই উলটো ধাঁচা। আর ঢাকার লোকের কথা বলার ধরণেই বোঝা যায় তাদের হাতে কোনো সময় নেই। ফলে, এদের সঙ্গে বীরভূম, আবাদ, দামোদর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদের কোনো কথাবার্তা শুরু হতে সবসময়ই একটু দেরি হয়।

যোগেন তার নাম শুনে অবাক হলেও কিছু বলে না। সে বুঝে যায়, বিরাট মণ্ডলের মত নেতা পার্টির নাম, প্রেসিডেন্ট-সেক্রেটারির নাম এমন সভায় প্রস্তাবের অর্থ—এটা ওঁরা স্থির

করেছেন। ওঁরা, মানে নমশূদ্র সমাজের সর্বজনমান্য নেতারা ঠিক করে ফেলেছেন। যোগেন আগে কলকাতায় আসেনি তাই ওঁরা তার সঙ্গে কথা বলেননি। আগে এলেও যে বলা হত, তাও নয়। রসিকলাল, বিরাট মণ্ডল, মুকুন্দবিহারী কোনো কিছুতে একমত হয়ে গেলে, সেটা ঠেকানো মুশকিল। পি আর ঠাকুর এঁদের সঙ্গে থাকতে পারেন, নাও পারেন। যোগেন ধরতে পারে না উদ্দেশ্যই? পি আর থাকতে সে কেন?

রসিকলালের কথা ততক্ষণে যশোর-খুলনা-বরিশালের বাইরের মেম্বারদেরও বোঝা হয়ে গেছে। কে একজন গলায় সুর খেলিয়ে বলে, 'উঁয়াদের একটা কইরে পা-ও কাইটে দেয়া যায় না? অবশিষ্ট ও তো দুই নৌকায় রাখা চলে না।'

'কেডা রে তর্কপঞ্চানন, পাও-কাটার বিধান দেয়', রসিকলাল তাঁর গলা গম্ভীর করে বলেন।

'কেন, নীহারেন্দুবাবু যে পড়ালেন গ, ভোটে-জেতার আগের পার্টি জেতার-পর বদলান্ আইন-মোতাবেক।'

পি আর ঠাকুর দাঁড়ালেন। যোগেন তাতে একটু স্বস্তি পায়—পি আর ঠাকুরের মত বা মন আন্দাজ করাটা তার পক্ষে খুব দরকার। তপশিলি সংরক্ষিত তিরিশটি আসনের মধ্যে নমশূদ্র আর রাজবংশীরাই প্রধান। এ নিয়ে ভোটের আগে ছোটখাটো জাতগুলির পক্ষ থেকে আপত্তিও উঠেছিল যে নমশূদ্র আর রাজবংশীরা তাদের গিলে ফেলবে। নমশূদ্রদের ভিতর শিক্ষাদীক্ষা এত বেড়েছে যে তাদের জন্য সংরক্ষণ দরকার নেই—এমন কথা নিয়ে বিলেতে আর্জি পাঠানো হয়েছিল। শাহেবরা কান দেয়নি। সেই নমশূদ্ররা ৩০টি আসনে ১৩ জন জিতে এসেছে। রসিকলাল, বিরাট মণ্ডল, মুকুন্দবিহারী আর পি আর ঠাকুর যদি একমত হয়ে কোনো কিছু স্থির করেন, তাহলে নমশূদ্রদের পক্ষে সে-কথার উলটো কাজ করা সম্ভব নয়। তার ভিতর পি আর ঠাকুরের আলাদা জায়গা। নমশূদ্রদের মধ্যে তিনিই প্রথম বিলেত-ফেরত ব্যারিস্টার, কলকাতা হাইকোর্টে তাঁর প্র্যাকটিস। তার ওপর তিনি নমশূদ্রদের গুরুবংশের প্রতিনিধি। হরিচাঁদ ঠাকুরের ছেলে ও পি আর ঠাকুরের ঠাকুরদা গুরুচাঁদ ঠাকুর এখনো বেঁচে আছেন। গুরুগিরি ও মতুয়া মন্দির থেকে তাঁদের আয়ের জোরেই তাঁরা বড়লোক। হরিচাঁদ-গুরুচাঁদের গুরু হিশেবে প্রতিষ্ঠার সুফল পিআরএ বর্তেছে।

'আমারও মনে হয় আইনসভায় আমাদের একটা আলাদা ব্লক বা গ্রুপ হলে সরকারকে বাধ্য করা সহজ হবে। সে যে-সরকারই হোক। আর, রসিকলালবাবুও এ-কথা ঠিক বলেছেন যে, যে-নয়জন তপশিলি সদস্য কোনো দলের হয়ে জিতেছেন তাঁরা বরং শুরুতে এই ব্লকের বাইরেই থাকুন, অন্তত নামে। সভাপতি হিশেবে হেমচন্দ্র নস্কর ও সম্পাদক হিশেবে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের নাম আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।'

হাততালি দিয়ে যেন সভার সমাপ্তি সভ্যরা নিজেদের কাছেই ঘোষণা করেন। হুমায়ুন কবির দাঁড়িয়ে উঠে দু-হাত তুলে কিছু বলতে শুরু করলে গোলমালটা থেমে যায় বটে কিন্তু কেউ আর নিজের জায়গায় ফিরে বসেন না, দাঁড়িয়েই শোনেন।

'এবারের ভোটের ফলটা একটু বিশ্লেষণ করবেন আপনারা। কেপিপি শহরে কোনো আসন পায়নি আর গ্রামে লিগ কোনো আসন পায়নি—এই কারণে শহর আর গ্রামের মুসলমানদের দু-ভাগ করে ভাবা ভুল হবে। গ্রামের আসনের অনেকগুলিতেই জিলা ও মহকুমার শহরের ভাগ আছে। দ্বিতীয়ত, পটুয়াখালির ভোটে নাজিমুদ্দিন শাহেব সাম্প্রদায়িকতার চূড়ান্ত করা সত্ত্বেও জিততে পারেননি। মানে, তেমন সুযোগ পেলে মুসলমানরাও ধর্মের পতাকা ছেড়ে আসতে পারে। মোট মুসলিম ভোটের প্রায় ৩২ শতাংশ ভোট পেয়েছে কৃষক-প্রজা আর লিগ পেয়েছে

২৮ শতাংশের মত। অথচ লিগ জিতল বেশি আসন। আমি তিনটি ঘটনার কথা বলছি। আপনাদের ভিতর যাঁরা এ বিষয়ে উৎসাহী, তাঁরা ভোটের ফলাফল থেকে এই ঘটনাগুলির অর্থ বের করার চেষ্টা করতে পারেন। এক, কংগ্রেস কোনো মুসলিম আসনে প্রার্থী দেয়নি। দুই, কৃষক প্রজা কোনো সাধারণ বা তপশিলি সংরক্ষিত আসনে প্রার্থী দেয়নি। আর, ৩৯ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী সংরক্ষিত মুসলিম আসনে জিতেছেন—তাঁরা কোনো দলের নয়। এই তিনটি ঘটনার কারণ বের করতে না-পারলে এই ভোট কী বোঝাচ্ছে তা বোঝা যাবে না।'

মুকুন্দবিহারী দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে থেকেই বললেন, 'আমি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করছি।' কেউ দাঁড়িয়ে কেউ বসে এমন একটা ভেঙে-যাওয়া সভার দিকে তাকিয়ে তিনি বলে যেতে থাকেন, 'খুব মূল্যবান সব কথা হল। সব ভেবে দেখতে হবে।' যেন তিনি জানেন না তিনি কী বলতে চান, 'একটা অ্যাসেমব্লি পার্টি তৈরি হল। আমাদের তাতে শক্তিবৃদ্ধি হবে, মানে, যদি আমরা বৃদ্ধি হবে, মানে, যদি আমরা বৃদ্ধি চাই।' উনি একটু হেসে থেমে গেলেন, দু-একজন দু-এক পা বাঁড়ালেন। উনি আবার বলতে শুরু করলেন, 'একটা গল্প বলি। মনে পড়ে গেল, কবির শাহেবের শেষ কথায়। এই ভোটটা কী বোঝাল। এক দেশে কেউ কোনোদিন শূকর দেখেনি। হঠাৎ এক শূকর এসে সব মাটিতে গর্ত করতে লাগল। লোকজন প্রথমে ভাবল, বাঃ, বিনে পয়সায় হাল দেয়া হয়ে গেল। তারপরে দেখল ঐ পশুর ব্যবহার সবটাই লাভজনক নয়। তাঁরা রাজামশায়কে গিয়ে ধরলেন, রাজামশায়, একটা ব্যবস্থা করুন। রাজামশায় বললেন, আরে, জন্তুটা কী তা বোঝা না গেলে ব্যবস্থা হবে কী করে। তখন পণ্ডিতরা এলেন বুঝতে ও বোঝাতে। পণ্ডিত মানেই বামুন। তারা রাজামশায়কে বলল, রাজামশায়, জন্তুটাকে বুঝতে পেরেছি বটে কিন্তু শেষ বুঝতে পারিনি। এ-জন্তুটা হয় গজহ্রাস, মানে হাতি ক্ষয় হতে-হতে এই হয়েছে। নয় তো জন্তুটা মুষিকবৃদ্ধি, মানে ইঁদুরের মেদ বেড়ে-বেড়ে এই হয়েছে। এখন আপনারা ভোট খুঁটিয়ে বিচার করুন। দেখবেন আপনি যা চাইছেন, ঠিক সেই জবাবটা পেয়ে যাবেন। তাই প্রোফেসর কবিরের শেষ কথায় আমি এই পরিশিষ্ট মন্তব্য যোগ করি, আগে দেখুন, ইচ্ছেটা কী?'

মুকুন্দবিহারী সভাপতির ভাষণেই কথাগুলো বললেন, নাকী, সভা ভেঙে দিয়ে কথাগুলি বললেন—সেটা বোঝা গেল না। তিনি নিজেও দাঁড়িয়েছিলেন, সভারও অনেকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন, তবু, সভা একেবারে চুপ হয়ে গিয়েছিল, কী বলছেন মুকুন্দবিহারী সেটা শুনতে। মুকুন্দবিহারী এত ভালো বক্তা যে এমন ঘরোয়া সভায় তিনি মিটিঙের ভাষণ দিতে চান না বলেই দেননি। আবার, তিনি যদি চাইতেন, তাহলে, সবাইকে বসিয়ে নিজের কথাটা বলে দিতেন। এটা যেন হল, তিনি যে কোনো মত দিলেন না বা কোনো একটি হিশেবের পক্ষে গেলেন না—সেইটুকুমাত্র বুঝিয়ে দিলেন। বেরতে-বেরতে কবির শাহেব তাঁর পাশে গিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে বললেন, 'স্যার, এই অ্যানেকডটস ব্যবহারের সুবিধে হচ্ছে, আপনি যা চান তাকেই যুক্তির চেহারা দিতে পারেন।'

মুকুন্দবিহারী খুব লম্বা আর তাঁর পাশে কবির শাাহেব যেন আরো বেঁটে। কবির শাহেবের মাথার দিকে তাকিয়ে মুকুন্দবিহারী বলেন, 'হ্যাঁ, প্রফেসর কবির, যদি ঠিক সময়ে ঠিক গল্পটা মনে পড়ে। পাবলিক মাইন্ডের ওপর এগুলোর প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ যুক্তির চাইতে অনেক বেশি।'

'হিন্দু এপিকস তো গল্প আর বিপরীত গল্পে ঠাসা। গল্প না হলে প্রমাণ হল না', নীহারেন্দুবাবু বলেন, নীহারেন্দুও মুকুন্দবিহারীর পাশে খাটো বটে কিন্তু কান বরাবর। মুকুন্দবিহারী বাঁয়ে কাঁধ ঘুরিয়ে নীহারেন্দুকে চোখে-চোখেই বলতে পারেন, 'মানে, আপনি রামায়ণ-মহাভারতকে

হিন্দু-পুরাণ বলছেন? ভারতীয় পুরাণ বলছেন না?'

'ভারতীয় পুরাণ বললে কি এগুলোর বা আরো সব পুরাণের হিন্দুত্ব কিছু কমে যায়? এগুলো তো হিন্দু জীবনেরই তত্ত্ব।'

'ভারতীয় জীবন তো শুধু হিন্দুতে বা শুধু মুসলমানে বা শুধু শিডিউল্ড কাস্টে বাঁধা নয়', পেছন থেকে বললেন উপেন্দ্রনাথ বর্মন—রাজবংশী এমএলএ।

শুদ্দুর থাইকলেও নাই

৩৩

যোগেন যখন কোনো কিছু বুঝে নিতে চায় ও তেমন বোঝাবুঝির ওপর তার কী করণীয় তা নির্ভর করে, তার চলাফেরা হয় বাঘের মত—একেবারে একা হয়ে যায় ও তার পায়ের তলায় কোনো আওয়াজ থাকে না। আবার, সে যখন ঠিক করে ফেলেছে তার করণীয় কী, তখন তার গতিবিধি হয় ঘোড়েল কুমিরের মত। যেন, জলের কিনারার ডাঙাটুকুতে রোদ পোহাচ্ছে, ঠোঁটে একটু তৃপ্তি লেপে। কেউ তার কাছাকাছি চলে এলে যে-লেজটার শেষটুকু জলেরই ভিতর ছিল সেই লেজটা যেন ঘুরে গিয়ে হাতির শুঁড়ের মত ঝটকায় লোকটিকে ফেলে দেয় আর সে জলের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে যায় তার দাঁতের কপাটিতে লোকটাকে বিঁধিয়ে, যেন বকের ঠোঁটে স্রোতের ট্যাংরা মাছ।

যখন তার স্বভাবের এই শক্তিগুলির প্রয়োজন হয় না তখন আলসেমিতে, গল্পগুজবে, গানে-খাওয়ায় সে নিজেকে কপাটহীন খুলে দেয়। এটাও তার স্বভাব—সে কপাটহীন হতে পারে। নিজেরই কোনো বিগ্রহ তাকে নিজের কাঁধে বইতে হয় না।

যোগেন সকলেরই চেনাজানা, সকলেরই ভাবভালোবাসা সে পায় আর সেগুলো সে রক্ষা করতেও চায়। ফলে, তার স্বভাবের ভিতরের এই সব চোরাস্রোতের কাটাকুটি এখনো সকলের কাছে পরিষ্কার নয়। পরিষ্কার নয় বলেই—তার ওপর সকলেই নির্ভর করে।

মিটিং ভাঙতে-না-ভাঙতেই যোগেন তাড়াতাড়ি হেম নস্করের কাছে গিয়ে বলে, 'আপনি কি ভোটের এইসব নথিপত্তর পাইয়্যা গিছেন? আমি তো আজ সকালেই আসছি। আপনার কাগজগুলা এডডু দ্যান না। নিজে-নিজে দেহি কী বোঝা যায়।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়', বলে নস্করমশায় সেই যুবকটিকে ডাকলেন যে সভাপতির সঙ্গে কানে-কানে বারবার কথা বলছিল।

'এই ভোটের যা-সব কাগজপত্র জোগাড় করেছ এঁকে দিতে হবে, গোছানো আছে তো?'

'তা আছে। মানে, আমাদের তো আবার কাজে লাগতে পারে—' যুবকটির আপত্তি বোঝা যায়, সে যোগেনকে চেনে না।

'উনি যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। জেনারেল সিট থেকে জিতে এসেছেন। বরিশাল থেকে কলকাতা এসেছেন মাত্র গতকাল। তাই কাগজপত্র সংগ্রহ করতে পারেননি। ওঁর কাজটাও তো দেখতে হবে। কাজ হয়ে গেলে উনি ফেরত দেবেন। আর, যোগেনবাবু, যেদিন ফেরত দিতে আসবেন, হয় ওর হাতে দেবেন, নয় আমার হাতে দেবেন। না-হলে আপনার দেনা চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তেই থাকবে'—হেমচন্দ্র হেসে যোগেনের কাঁধে হাত রাখেন।

সেই কাগজের ছোট বান্ডিল নিয়ে পথে নেমে ঘড়িটা একবার দেখে নেয় ও নিজের মনেই মুচকি হাসে—দেখো, ঘড়ির যখন কাম তখন ঘড়ি দেখার অভ্যাসও কেমন তৈরি হয়। শীতের বেলা আঁচ করা যায় না। যোগেন পয়সার হিশেব করে না, প্রথম বাসটিতেই উঠে পড়ে, বসার জায়গা ছিল—বসে না, তার তো তিন-চার স্টপের ব্যাপার। রথতলায় নেমে বাস বদলাবে।

যোগেন যখন বড়তলায় পৌঁছয় তখন আলো জ্বলে গেছে। সে কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে দাশগুপ্তের বইয়ের দোকানে গিয়েছিল পার্লামেন্টারি প্র্যাকটিসের বই কিনতে। এই ক-দিনে এটাই যে তার আসল কাজ এটা সে ঠিক করে ফেলেছিল। এরপর দিন যখন তারা মিটিঙে বসবে, তখন যেন যোগেন পার্লামেন্ট-অভিজ্ঞ হিশেবে কথা বলতে পারে। আজকের সভায় যোগেনের কিছু বলার ছিল না। এ মিটিংটা ডাকা হয়েছিল—মেম্বারদের একটু তৈরি করে দিতে আর ঐ অ্যাসেমব্লি পার্টিটা তৈরি করতে। মেম্বারদের মধ্যে যে-কজন আগে কাউন্সিল মেম্বার ছিলেন, তাঁরা তো নিয়মকানুন জানেন। যোগেনও কিছুটা জানে, কিছুটা আন্দাজ করতে পারে—ওকালতি ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সুবাদে। কিন্তু বত্রিশ জন শিডিউল মেম্বারের পঁচিশ জনই জানে না। নবাব-জমিদাররা জানতে চান না। আর, কিছু মেম্বার তো থাকেই যারা নিজের নেতৃত্বে বিশ্বাস করে, আইনে নির্ভর করে না। যোগেন মনে করে-করে কর গুনছিল—নমশূদ্র আর রাজবংশী মেম্বারই তো সব। চব্বিশ পরগনার হেম নস্কর, বর্ধমানের অদ্বৈত মাজি, আর মেদিনীপুরের হরেন দলুই, ঈশ্বর মাল—নমশূদ্র-রাজবংশীর বাইরে তো এই মোটে একগণ্ডা। আরো হয়ত এক-আধজন অন্য জাত থেকে জিততে পারে—যোগেন জানে না আর পদবী থেকে জানা যায় না। যাইহোক, ডিপ্রেসড কাস্টের নেতা অথচ যোগেন কোনোদিন নামই শোনেনি—এমন হওয়া আর কতটা সম্ভব। তাহলে জেনেশুনে বলাকওয়ার লোক শিডিউলদের মধ্যে তো থাকে—মল্লিকরা দুইভাই, রসিকলাল, উপেন বর্মন, পুষ্পজিৎ বর্মন, পি আর ঠাকুর, বিরাট মণ্ডল। এর মধ্যে মল্লিকরা বলবেন কী বলবেন না সেটা নির্ভর করে তাদের গোপন উদ্দেশ্যের ওপর। রসিকদাদাকে সভার নিয়মকানুনে বাঁধা যাবে না। নৌসের আলি-র সঙ্গে যশোর মিউনিসিপ্যালিটি চালিয়ে-চালিয়ে জোতদারদের মত ভাবসাব হয়েছে, যেন ওঁর কথা শোনার জন্য সবাই হাঁ করে আছে। বিরাট কাহার সবে বৌ মারা গেছে, এখনো শোক সামলাতে পারেননি। পি আর ঠাকুর যদি পুরো সময় দিতে পারতেন, তাহলে কথা ছিল না। কিন্তু তাঁরও তো ব্যারিস্টারি আছে। উপেন বর্মন মশায় ধীরস্থির মানুষ, বলতে হলে বলবেন, কিন্তু গোলমাল বাধাবেন না। বাকি থাকল পুষ্পজিৎ। হ্যাঁ—বলাকওয়া মানুষ। তাহলে একটা অ্যাসেমব্লি তৈরি হয়ে লাভ হবে কী? সেই বামুন-কায়েতদের মধ্যে যারা শাহেব, তাদের কথাবার্তা-বক্তৃতা শুনতে হবে? তাও আবার ইংরেজিতে। বিলেত-ফেরত ইংরেজিতে। শরৎ বোস, তুলসী গোস্বামী, কিরণশঙ্কর রায়, জে সি গুপ্ত, বরদা পাইন, শশাঙ্ক সান্যাল, সারওয়ারদি, আবু হোসেন সরকার, শাহাবুদ্দিন, সামসুল হুদা, স্যার ফারুকি, আবদুর রহিম, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি—এ তো হিন্দু-মুসলমান মিলে কুলীন বামুন-কায়েত সব। মুসলমানদের মধ্যে সব উর্দুওয়ালার ভিড় আর, হিন্দুদের মধ্যে সব ইংরেজিওয়ালার। বাকি সব শিডিউল আর বাঙালি মুসলমান মেম্বাররা তো বুঝতেই পারবে না কী নিয়ে কী কথা হচ্ছে।

যোগেন তাই দাশগুপ্তের দোকানে গিয়ে পার্লামেন্টারি প্র্যাকটিসের বই খুঁজছিল। কেরফোর্ট-এর পার্লামেন্টারি ল পেয়েছিল, ব্লার্ব পড়ে দ্যাখে ১৮৯৯-এ প্রথম বেরিয়েছে। তার মানে ভারী বই। কিন্তু ব্রিটিশ ল আর এখানকার ল তো এক নয়। এক ল বলেই ব্রিটিশ ল জানা থাকলে ভালো—তারা তো আইনই তৈরি করবে। বইটি তাকে কিনতে হবেই। আজ সে

মিশিগান হিস্টরিক্যাল রিপোর্টের 'এ ম্যানুয়াল অব পার্লিয়ামেন্টারি প্র্যাকটিস' নামের প্রকাণ্ড বইটা কিনে আনে। যোগেন একটা আন্দাজ পায়—সে যে পার্লিয়ামেন্টারি নিয়মকানুনে সড়গড় সেটা জাহির করাটাই প্রথম কাজ। সে হিন্দু-মুসলমান দুই ধর্মেরই বামুন-কায়েতদের চেনে—যোগেন যেই জাহির করবে তার জোর, সঙ্গে-সঙ্গে ওরা পালটা প্যাঁচে তাকে জব্দ করার চেষ্টা করবে। আফটার অল, এ চাঁড়াল ইজ এ চাঁড়াল। সদর দরজা দিয়ে বই আর কাগজের ভার নিয়ে নীচের ঘরে ঢুকতেই প্যারীডাক্তার বলে ওঠে, 'বাড়িতে কি বালিশ কম পইড়ছে?'

'পড়ারই তো কথা। এক বালিশে তো অ্যাডডা মুন্ডুই গড়াগড়ি দিব, নাকী?' বলে যোগেন ভিতরের দরজার দিকে পা বাড়ায়।

'কাগজের যা বহর তাও তো সন্দ হবার পারে—মুন্ডু একখান না দশখান?'

'হিন্দুগ আর কুন দেবতার একখান মুন্ডু,—তিন মুন্ডু, চার মুন্ডু, পাঁচ মুন্ডু, ছয় মুন্ডুর কম তো নাই।'

যোগেন দোতলার সিঁড়িতে পা দেয়।

তার পায়ের আওয়াজেই উদ্‌দুর-খুদ্‌দুর দুই ভাই ছুটে আসে, 'মামা আসচে, মামা আসচে।' সিঁড়ির মাথায় ওদের মা এসে দাঁড়ায়।

যোগেন জুতো খুলে ঘরে ঢুকে চৌকিতে বসে। বুন বলে, 'সারাদিন প্যাটে কিছু পইড়ছে নাহি সকালের ঐ দুগা ভাতই সার।'

'শুনো বুন! তুমি তো সকলগের বিচারে কলিকাতাবাসিনী—'

'কোন্ দুঃখে? বরিশাল থাইকতে?'

'বরিশাল তো বরিশালেই আছে। তুমি তো আছ কইলকাতায়। কইলকাতায় কেউ কারো বাড়ি গেলে খাওয়া দ্যায় না। জলপানি দ্যায়। অ্যাডডাই গেলাশ। এগবার জল, এগবার পানি। তুমি আমারে এক ধামা মুড়ি দিব্যার পার। আমরা মামা-ভাইগন্যারা খাই। সরষ্যার ত্যাল এডডু বেশি দিয়ো বুন, য্যান, ঝাঁঝ লাগে, আর ধরো, তিন-চাইরড্যা ধানি মরিচ।'

'ধানি মরিচ কইলকাত্তায় পাব কনে?'

বোন বেরিয়ে গেলে যোগেন বলে, 'উদ্‌দুর, দ্যাখ তো রে বাপ, আমার বাক্সডায় আলোয়ান আছে—'। পরিমল বেরিয়ে যায়, বাক্সটা পাশের ঘরে। আর, যোগেন দাঁড়িয়ে জামা খুলে দরজার কোণে ঝুলিয়ে দেয়। তার দাদা মামা-র বাক্স খুলে চাদর আনার মত কাজ পেল, সেই হিংসেয় খুদ্‌দুর বা সুবিমল, আলমারির ফাঁক থেকে মেদিনীপুরি মাদুরটা টেনে বের করে মেঝেতে ছড়িয়ে দেয়। মামা এখন ঐখানেই বসবে, বরাবর তাই বসে—সেটা ছোটভাইয়ের মনে আছে। দেখে যোগেন ডেকে ওঠে, 'অ বুন, বুন, দেইখ্যা যাও, খুদদুরের বুদ্ধি।' বোন ছুটে আসে। যোগেন তখন তাকে মাদুর দেখিয়ে বলে, 'সাত বচ্ছর আগে তো দুই ভাইরে এইহানে বইয়্যাই পড়াইত্যাম। খুদ্‌দুর তহন এই আঙুলডার নাগাল খাটো। যুক্ত অক্ষর লিখব্যার পারে না, পইড়ব্যার পারে। কিন্তু ওর কথাডা তো মনে আছে। তাই মাদুর পাইত্যা দিল। আয় বাবা, বুকে আয়', যোগেন মাদুরের ওপর চাদর গায়ে থপ করে বসে পড়ে।

'খাড়াও, মুড়ি দেই, না তো মুইদ্যা যাবে', বোন মুড়ি আনতে ছোটে।

'কাগজপত্তর রাইখলি কনে', যোগেন এদিকওদিক তাকায় আর খুদ্‌দুর গিয়ে কাগজের প্যাকেটটা মাথায় করে এনে, যোগেনের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে নামিয়ে দেয়। খুদ্‌দুর বইটা আনেনি বা আনতে পারেনি দেখে উদ্‌দুর ছুটে গিয়ে বইটা নিয়ে আসে।

'খাতা-পেন্সিল লাগে যে অ্যাড্‌ডা', যোগেনের এই কথা শুনে খুদ্‌দুর লাফিয়ে উঠে ছুটে

গিয়ে তার ব্যাগের ভিতর থেকে একটা পেন্সিল আর একটি রাফ খাতা নিয়ে আসে।

'উদ্‌দুর, খাতা একখান লাগব। কিন্যা আন। তক্তা সাইজের। হাফতক্তা না। পকেট থিক্যা পয়সা নিয়্যা যা।'

উদ্‌দুর বেরিয়ে গেলে খুদ্‌দুরকে যোগেন বোঝায়—'দ্যাহো, ছোট ভাইগন্যা। কথাডা তো তোমারে বুইঝব্যার লাগব। আমি যদি তোমার রাফখাতার পাতা ধ্বংস করি, কাইল তো তোমার ক্লাশটিচার তোমারে ধ্বংস কইরবে।'

'আমি একটা নতুন খাতা বানিয়ে নেব—'

'তাতেও তোমার ক্লাশটিচার কইব্যার পারে, বছরের মধ্যিখানে নতুন খাতা ক্যান রে। পুরানডা কি কচুরি বানাইছস?'

শুনে উদদুর হেসে ফেলে ঠোঁটে হাত চাপা দেয়, তার হাসিটা লুকতে, সামনে দু-একটা দাঁত তার পড়ে গেছে। বোন একটা বড় বগি থালায় মুড়িখানা নামিয়ে দেয়। এক মুঠ মুড়ি তুলে হাতের তেলোয় একটু নাচাতে-নাচাতে যোগেন হেসে বলে, 'কইব-না, ক্লাশটিচার?'

'কচুরি বলবে, বানাইছস বলবে না।'

'সে তো তোর টিচার বরিশালি জানে না বইল্যা কইব না। কইবডা কী?'

'বানিয়ে খেয়েছিস—বলবে।'

'আরে রে, আমাগ খুদ্‌দুর তো ঘটি হইয়্যা গিছে গা।'

এইরকম আলাপের মধ্যে মুড়ি চিবনো চলে আর সেই বান্ডিলের কাগজগুলো একটা-একটা করে যোগেন দেখতে থাকে। তারপর একটু থেমে তাকে ভাবতে হয়—কাগজগুলো বোধহয় ভাগ করা দরকার। ভাগ করার আগে একবার দেখা দরকার—কোনো নিয়ম অনুযায়ী ভাগ করা আছে কী না। যদি থাকে তাহলে সেটা বুঝে নিতে হবে। কিছু আছে—কাগজের কাটিং, আঠা দিয়ে সাঁটা—স্টার অব ইনডিয়া, স্টেটসম্যান, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, অমৃতবাজার, যুগান্তর, বঙ্গবাসী, বসুমতী। কিছু-কিছু আছে—গবমেন্টের প্রেসনোট, কিছু আছে লাটশাহেবের সেক্রেটারির স্টেটমেন্ট। ২২ সাল থেকে ৩৬ সাল পর্যন্ত ১৪ বছর হেম নস্কর মশায় তো টানা মেম্বার, কাউন্সিলের। তাঁর কাছে কাউন্সিলের কাগজপত্র, মিনিটস, আলোচনা ও বিলের খশড়া, বাজেট পেপারস, আরো এমন অজস্র কাগজ আসে। সেগুলোও বান্ডিলে বাঁধা। বিতর্কের খশড়াগুলি আছে দেখে, একটু ভেবে, যোগেন খুব খুশি হয়। এগুলো খুব কাজে লাগবে—প্র্যাকটিক্যাল করার মত।

'উদ্‌দুর, একটা কাজ করতে পারবি? এই বান্ডিলের যে-কাগজগুলির উপুর বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ছাপা আছে, সেইগুল্যা এক বান্ডিল করবি আর যেগুল্যার উপুর খবরের কাগজের কাটা টুকরা সাঁটা আছে সেইগুল্যা এক বান্ডিল করবি। স-ব তারিখ ধইর্‌য়া। পারবি তো?'

'তোমারই তো ছাত্তর। এই কামডাও যদি না পারে, তাহাইলে তো বুঝায় চৈত্যা গুরুর মৈত্যা শিষ্য।' প্যারীমোহন উবু হয়ে বসে থালা থেকে একমুঠো মুড়ি তুলে মুখে ফেলেন,

'অ্যা? মুড়িতে য্যান ঘানির গন্ধ পাই। এতডা তেল। তা কও, মিটিঙে কী হইল, না হইল। ক্যারে, খুদ্‌দুর, তোর মুহে ব্যথা ক্যান?'

'আমি কইছিল্যাম বুনকে, ত্যাল বেশি দিতে। কইলকাতার ঠান্ডা তো, আধখান ধানি মরিচেই ঠান্ডা। তোমার বাজারে নাহি ধানিলঙ্কা উঠে না। তহন কইল্যাম—তাহালি খোলা হাতে এডডু ত্যাল দিও।'

'খুদ্দুর, কী হইছে বাবা, মুখখান এমন ভার মামারে পাইয়্যাও। মামায় আদর দেয় নাই?'

যোগেন খুদ্দুরকে কোলে টেনে গিয়ে, চাদর দিয়ে ঢেকে বলে, 'গোসা ক্যান, তা আমি জানি। আমার তো মনে হইছিল অঙ্কডা আমাগো খুদুই বেশি বোঝে।'

'বুঝে তো, কত বুঝে, ক্যা, অঙ্ক লইয়্যা আবার কী হইল? খুদু পারে নাই?'

প্যারীমোহন তার ছোট ছেলের প্রতি স্নেহাতুর হয়ে ওঠে।

'আরে, দিল্যাম আর কই? উদুরে কইল্যাম—কাউন্সিল আর খবরের কাগজগুলিরে আলাদা কইরব্যার। ঐ তো করব্যার লাগছে। কিন্তু উদুর ভাগাভাগি শ্যাষ হওয়ার পর খুদুর ভাগে পইড়ব খুদুর ভাগ। সেই ভাগের ভাগাভাগি কি উদু পারে? অয় তো অ্যাহন ধারাপাত তাবৎ ভুইল্যা গিছে। খুদু, বাবা, উদুর ভাগ হয়্যা গেলে বাকি কাগজগুল্যা তুমি কাগজের মাথার ওয়ান, টু, থ্রি দেইখ্যা সাজাইবা। তুমি ওয়ান, টু, চেনো তো, নাকী বাংলা এক-দুই?'

যোগেনের কোলের মধ্যে খুদু ঘাড় হেলিয়ে জানায়, সে জানে আর প্যারীমোহন বলে ওঠে, 'আরে, অয় তো স্কটিশ কলেজিয়েটে ভর্তি হইয়া গিছে, পুরা শাহেব।'

প্যারীমোহন যোগেনকে জিজ্ঞাসা করে—'মিটিং থিক্যা যে মণখানিক কাগজ কান্ধে ফিরল্যা, মিনিস্টার হবা তো? হইল কী মিটিঙে?'

নিজেকে যে সে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে সেই খুশিতে যোগেনের চাদরের ভিতর থেকে বেরিয়ে খুদ্দুর হামাগুড়ি দিয়ে দাদার পাশে বসে—কখন দাদার কাজ শেষ হবে, তার অপেক্ষায়।

'এডা তো শিডিউল মেম্বারদের মিটিং ছিল। মন্ত্রিসভা তো আর শুধু শিডিউলগ দিয়্যা হবে না।'

'তা হব ক্যা? সে তো শুদু বামুন-কায়েতগো দিয়্যাও হব না—তারাও তো তত জিতে নাই, কংগ্রেস। মুসলমানগো দিয়্যাও হব না—তাগো তো একডা কোনো দল নাই।'

'আইজক্যার মিটিঙে একডা এই কাজ হইছে যে জিতা শিডিউল মেম্বাররা অ্যাসেমব্লির ভিতরে এডডা পার্টি হইছে। শিডিউল কাস্ট অ্যাসেমব্লি পার্টি। হেম নস্কর প্রেসিডেন্ট আর আমারে বানাইছে সেক্রেটারি। এডা কি তোমার আপাতত পছন্দ, মন্ত্রী হওয়ার আগে?'

'অপছন্দের কিছু নাই। অ্যাডডা কিছু তো হওয়া লাগে।'

'শুদু মেম্বারে কুলায় না?'

'আরে, আমরা তো অকুলানের জাত। না-কুল্যাইলে কুল্যাবে না। তাতে আর নতুন কী? কিন্তু যদি পছন্দ দ্যাও, তাহালি উথলানো দুধ চাই, কড়াইয়ে য্যান কুল্যায় না। হেম নস্কর তো সেই পুরানা হেম নস্কর? কংগ্রেস ছিল না? স্যায় তো সি আর দাশের দলে খাড়াইত আর জিতত কাউন্সিলে।'

'এইবার স্বতন্ত্র শিডিউল হইয়া অ্যাসেমব্লিতে আইসছে। তবে, বিশ্বাস নাই।'

'কীসের বিশ্বাস?'

'যে মন্ত্রী বানাইব, তাগ দলে ভিড়ব।'

'সেইডা আবার দোষ ধরো ক্যা? মন্ত্রী হওয়ার লগেই তো মেম্বার হওয়া।'

'মন্ত্রী হওয়ার লগে না, মন্ত্রী-করার লগে মেম্বার হওয়া।'

'এইডা কি তোমার ন্যায্য কথা যোগেন? আর-কারুরে মন্ত্রী বানাইব্যার লগে কেউ খাটাখুইট্যা ভোটে জিতে? কী যে কও?'

'মানে, এই দুই শ পঞ্চাশজন মেম্বাররেই মন্ত্রী কইরব্যার লাইগব?' খুদ্দুর-খুদ্দুরের মা এসে বলে,-'ভাই, ভাত নামাই?'

উদ্দুর ঘাড় না তুলে, হাত তুলে বলে, 'মা, পাঁচ মিনিট। না-হলে গোনা ভুল হয়ে যাবে।'

খুদ্দুর বলে ওঠে, 'তুই শেষ না করলে তো আমি শুরু করতেই পারব না। খাব কী করে?'

'তোমাগো কি আইজ নিশিপালন', মা বলে। খুদ্দুর অনিশ্চিত চোখে তাকায়, 'তাহলে আমি করব কখন?'

'খাইয়্যা আইস্যা। প্যাটে গরম ভাত পইড়লে দেখবা মাথা ক্যামন ব্যালের লাগান ফাইট্যা যায়,' যোগেন খুদ্দুরকে আশ্বস্ত করে।

'আমার তো খেয়ে উঠে ঘুম পায়।'

'তো ঘুমাইব্যা, সোনা।'

'তাহলে আমার ভাগের কাজ?'

'তোমারই থাইকব। কাল সক্কালে উইঠ্যা ভাগ নিয়া বসবা।'

'দাদা আমার ভাগ নিয়ে নেবে।'

'নিলেই হইল? এই উদু, ছাড়ান দে। খাওয়ার ডাক কানে আইস্যা গেলে অপেক্ষা অলক্ষ্মী। যোগেন দাঁড়ায়, ডাক্তারও। খুদুর দিকে আঙুল বাড়িয়ে যোগেন বলে, 'সোনা, চলো, ভাত খাইয়্যা আইস্যা তোমার ভাগ দড়ি দিয়্যা বাইন্ধ্যা শিয়রে নিয়্যা নিদ্রা যাইব্যা। চলো।'

উদ্দুর তিন থাক কাগজের ওপর একটা আড়কাঠ চাপা দিয়ে উঠে পড়ে। দাদার পেছন-পেছন যেতে-যেতে খুদু বলে, 'দাদা, আমারটা চাপা দিলি না?'

'বাঁধা আছে, চাপা দিতে হবে না।'

দুই ভাইয়ের প্রস্থানের দিকে তাকিয়ে যোগেন বলে, 'এইডা তোমার খুব ভালো ডিসিশন হইছে ডাক্তার। কইলকাত্যায় থাইক্যা যাওয়া। দেহো, ঐ দুই পোলারে দেইখ্যা কারো কওয়ার সাইধ্য আছে—নমশূদ্র। যেমন ধলা রং, তেমন খাড়া নাক। বাবুর ঘরের ছাওয়ালদের সঙ্গে কোনো তফাত করা যায়? উদু-খুদু বড় হইতে-হইতে শুদ্দুর-চাঁড়াল উঠ্যা যাবে না?'

'তুমি কি তুলব্যার চাও?'

'তুমি দেহি জিগ্যাও—হেই শালা শুদ্দুর, কয়খান জুতা খাবি? বাবু, একখানও না। আর যদি বাইন্ধ্যা মারি? তাহাইলে যত মাইরবেন।'

'আমার তো ত্যামন ঠ্যাহে না। বামুন-কায়েত থাইক্যা গেল আর নমশূদ্র উইঠ্যা গেল, এ হয়?'

'তো কী হয়?'

'আরে, শুদ্দুর যদি না থাকে বামুন-কায়েত তাইলে বামুন-কায়েত থাকবে ক্যামনে?'

'আমি তো তাই কইল্যাম।'

'কইল্যা তো কইল্যা। বামুন-কায়েতগো তুলব্যার পারে এক বামুন-কায়েতই। আমরা তুইলব ক্যামনে?'

'মন খারাপ কইর‌্যা দিও না ডাক্তার!'

'ডাক্তার বইল্যাই তো কই—ব্যাধির চরম দশা না দেইখলে ব্যাধি সারান্ যায় না। তোমরা তো ব্যাধির উপশম চাও। আরোগ্য চাও না। শুদ্দুর থাইকলেও লস্ নাই। নাই যদি তাহালি শুদ্দুর থাকাই ভালো।'

'সে না-হয় তোমার ভালো আমার ভালো। তোমার ছাওয়ালগো আমার ছাওয়ালগোরও সেই ভালো থাইকব? অরাও শুদ্দুরই থাইকব্যার চাইব?'

যোগেনের বোঝাবুঝি

৩৪

যহন এই বাড়িতে থেকে ল পড়ত যোগেন, তখনো এই ঘরের মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে একটা বালিশে মাথা রেখে ঘুমোত। বাড়ির ছেলেমেয়েরা ঘুমোত চৌকিতে। যোগেনের এটাই পছন্দ—'কইলকাতার আরাম কী কী? মশা নাই। টিপি দিলেই আলো। গঙ্গাজলের কল। আর যেহানে ইচ্ছা শয়ন।'

সেই মেঝের ওপর মাদুরে হেম নস্করের কাছ থেকে আনা কাগজপত্র থেকে যোগেন এই ভোটটাকে তার মত করে বুঝে নিতে চায়—যেমন করে নীহারেন্দুবাবু আর কবির শাহেব বুঝে নিয়েছেন। ওঁদের বোঝাবুঝিটা যে হিশেবের বোঝাবুঝি তার একটা কারণ এই ভোট থেকে ওঁদের নিজেদের কোনো লাভ নেই। লাভ কি আর নেই? কবির শাহেব তো বলেই দিলেন—শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির কথা। বলে দিলেন বটে কিন্তু বুঝতে দিলেন না—ওটা কি তাঁর কথার উদাহরণ মাত্র? তিনি কি ওঁকে প্রধানমন্ত্রী চান? নাকী শুধু মন্ত্রিসভায় চান। এই হচ্ছে কবির-শাহেবের ওস্তাদি। যা বলার বলে দিলেন কিন্তু ধরাছোঁয়া যাবে না। ওঁরা তো আর মন্ত্রী হতে পারবেন না। কংগ্রেসও ওঁদের পাঠাবে না, প্রজা পার্টিও পাঠাবে না। যোগেন তার মত করে একটা খাঁটি হিশেব বুঝে নিতে চায়। সেই খাঁটি হিশেবের হয়তো হেডটেল আছে। অন্যদের মত যোগেনও চায় তার নিজের দর বাড়াতে। নমশূদ্রদের বা ডিপ্রেসড কাস্ট-এর তার মত আনকোরা নেতা আর-কেউ নেই। জমিদার-জোতদার না, বড়লোক না, ভদ্রলোকের মত শিক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য। তার বাপঠাকুরদারও কোনো পরিচয় নেই—গুরু বা নেতা হিশেবে। নমশূদ্রদের ভদ্রলোক—যোগেনের এই পরিচয়টা বের করতে পেরে যোগেন খুশি হয়। শিডিউলদের পক্ষে যে-নীতি ভালো নয়, যোগেনের পক্ষেও সে-নীতি ভালো হবে না। এটা একটা বড় হিশাব—সবাইকে এটা পরিষ্কার করে দিতে হবে।

কিন্তু ভদ্রলোকদের আর নতুন ভদ্রলোক দরকার নেই যদিও, যারা আছে তারাই নিজেদের কাছা সামলাতে পারছে না, কিন্তু এই আইনে ভদ্রলোকদেরও তো নমশূদ্র দরকার হবে। তাহলে যোগেন ভদ্রলোকদের মধ্যে নমশূদ্রও হতে পারে। এটাও একটা বড় হিশাব—এটাও সবাইকে পরিষ্কার করে দিতে হবে।

কিন্তু যোগেন নিজে যদি না বোঝে—হলটা কী, তাহলে সে কী করে ধরতে পারবে হবেটা কী।

যে পার্টি যতই জিতুক—শাহেবরা যাকে বা যে-পার্টিকে চায় না, সে সরকার দু-দিনও টিকবে না। ৯৩ ধারায় গভর্নর সরকার বাতিল করে দিতে পারে—কেবল এই আইনের জোরই শাহেবদের একমাত্র জোর নয়। কংগ্রেস একটা ছুতো করে রেখেছে ৯৩-ধারাকে। আসন বরাদ্দের ব্যবস্থা যা তাতে কোনো ৯৩ ছাড়াই আইন সভার মধ্যেই তো হাঁটুতে মাথা ঠেকিয়ে সরকার নিজেই নিজের কীচকবধ ঘটাতে পারে। ২৫০ জনের আইনসভায় সরকারের নিজের শাহেব আর ফিরিঙ্গি মেম্বার ৩০-জন। মুসলিম লিগ থেকে ঢাকার নবাব শাহাবুদ্দিনের আত্মীয়স্বজন জিতেছে নয়জন। কমার্স আর ইনডাসট্রি থেকে কোনো ভোট ছাড়াই জিতে এসেছে ১৯ জন। হিন্দু জমিদাররা পাঁচজন। কলকাতা আর মিউনিসিপ্যালিটিগুলো থেকে, ঢাকার নবাবকে বাদ ধরলেও, যারা প্রায় বিনা ভোটে জিতে এসেছে—সারওয়ার্দি, ইস্পাহানি, নুরুদ্দিন, সুলেমান মৌলবি—এই চারজনের কেউই বাঙালি না ও এদের কেউ গভর্নরের বিরুদ্ধে যাবে না। এমন একটা আলগা হিশেবেও

তো পরিষ্কার যে মোট মেম্বারের ছ-আনা গভর্নরের নিজের মেম্বার। ছ-আনা মেম্বার একজোট থাকলে তারাই হয় সরকারের মালিক। এটা তো সেই পাগলও বুঝবে—হাটের চালা ছাড়া মাথায় যার চালা নেই—যদি কেউ স্বরাজ বা স্বাধীনতা চায় আর শাহেবদের এ-দেশ থেকে তাড়াতে চায়, তবে সে এই আইন সভাকে মানতে পারে না। আবার, সেই পাগল এটাও বোঝে—শাহেব-রাজত্ব রক্ষার জন্যই হিন্দুদের আসন এতটা কম করে দেয়া হয়েছে। যাতে আরো কম [illegible] হিন্দুদের আসন—তাই ডিপ্রেসড কাস্টকে লিস্টি করে তাদের জন্য রাখা ৩০টি আসনও হিন্দু কোটা থেকে নেয়া—এ্যাকে ভগৎ সিং, তারপর চিটাগঙ, তারপর অসহযোগ, আইন-অমান্য—যোগেন অন্য সব প্রদেশের খবর খুব একটা ভালো জানে না—এই সবের পর কোনো হিন্দু-ভদ্রলোক ভাবতেও পারে না—ইংরেজ-রাজত্ব অক্ষয় হোক।

ওকালতিতে এখন এইটুকুমাত্র শিখেছে যোগেন সে একটা কেসের মেরিট-ডিমেরিট আন্দাজ করতে পারে। সেই অনুমানবোধ থেকেই সেই রাতে শুধু তারই চোখের সম্মুখে শাদা কাগজ আর কাল শ্লেটে লেখা সংখ্যাগুলির ভিতরকার সম্পর্ক সে দেখতে পাচ্ছিল। হ্যাঁ, কেপিপি গ্রামের সিটগুলোতে লিগের চাইতে ছটা সিট বেশি পেয়েছে—কেপিপি ৩৩ আর লিগ ২৭। এটাও সত্যি যে লিগ শহর বলে দাগ দেয়া ছটি সিটের ছটিই জিতেছে। শুধু তাই নয়। গ্রামীণ আসন বলে দাগ দেয়া আধা-শহুরে আসনও লিগই বেশি জিতেছে—চব্বিশ পরগনা, ঢাকা ও রংপুরে, এটাও তো দেখা যাচ্ছে,—মোট মুসলমান ভোটের প্রায় ৩২ শতাংশ পেয়েছে কৃষক-প্রজা অথচ সিট পেয়েছে ৩৬টি আর এই ভোটের প্রায় ২৭ শতাংশ পেয়ে লিগ জিতেছে। মুসলমানদের বাকি ৩৯টি আসনে জিতেছে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা—তাদের নিজেদের জায়গায় তাদের নিজেদের জোরে।

এই অঙ্কটা যোগেন মেলাতে পারে না। সারাটা দিন ঘোরাঘুরির মধ্যে এই অঙ্কের কথাটা তো একবারও সে শোনেনি। যেন, এই স্বতন্ত্র মুসলমান জয়ীরা হিশেবে আসে না। যেন, তারা যেন স্বতন্ত্র বলেই তাদের পাওয়া ভোট, মুসলমান-ভোট না। যেন, তারা সকলেই অপেক্ষা করে আছে যে-দল বেশি দর দেবে, তার দলে যাবে। অথচ তার এই নৈশগণিতে যোগেন তো দেখতে পাচ্ছে, মুসলমান-আসনের মোট ভোটের ৪০ শতাংশই এই স্বতন্ত্র প্রার্থীরা পেয়েছে। ত্রিপুরার কৃষক সমিতির পাওয়া ভোট বাদ দিলেও তো স্বতন্ত্র প্রার্থীর ভোটের ভাগ—লিগ বা কেপিপির নীচে নামবে না। ত্রিপুরায় কেন্দ্রীয় আসনে ত্রিপুরা কৃষকসভার নেতা ওয়াসামুদ্দিন আমেদ সেখানকার নবাব, জমিদার, মন্ত্রী, স্যার ফারুকি-কে হারিয়ে দিয়েছে। সে-হারানো পটুয়াখালিতে হকশাহেব যে নাজিমুদ্দিনকে হারিয়েছেন, তার চাইতে অনেক বড় ব্যাপার। কোথায় হকশাহেব আর কোথায় ওয়াসামুদ্দিন? স্যার ফারুকি তো স্যার নাজিমুদ্দিনের চাইতে কিছু ছোট না। কিন্তু এ-কথাটায় পৌঁছুতে যোগেনকে এই মাঝরাতে জোড়াসনে বসে শববাহীদের চিৎকার শুনতে হয়—বলো হরি হরিবোল?

ভোটের অঙ্ক থেকে যোগেন যে-ফল পাচ্ছে বলে মনে করে, ভোটের অঙ্কের প্রকাশ্য ফলের সঙ্গে তা মেলে না। যোগেন সে-কথা কারো কাছে জানতে চাইবে না। শুধু অঙ্ক হিশেবেও জানতে চাইবে না, কবিরশাহেব বা দত্তমজুমদারের কাছে। ভোটে মুসলমান ভোট তিন ভাগ হয়েছে—লিগ, প্রজা ও স্বতন্ত্র। আর, এটাতেই যোগেনের আশ্চর্য ঠেকে যে মোট মুসলমান-ভোটের প্রত্যেক ভাগের ভোটই সমান। ঐ ৩০ শতাংশের এদিক-ওদিক। তিনের এক ভাগ—হিন্দুবিরোধী, তিনের একভাগ—জমিদারবিরোধী, আর তিনের একভাগ হিন্দুবিরোধী নয়, জমিদারবিরোধীও নয়—বরং বোধ হয় তাদের কেউ-কেউ নিজেরাই জমিদার বা কেউ-কেউ

চায়, জমিদারদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ভাগ আর আদায় কমিয়ে তাদের জমিদার রেখে দিতে। যোগেন যেন বুঝে নিতে চায়—এই ভোটের ফল নিয়ে মুসলিম লিগ যতই লাফাক, মুসলিম লিগের হিন্দুবিরোধী মত ও 'ইসলাম বিপন্ন' আওয়াজে ভবী ভোলেনি। লিগ পাঞ্জাবে বা সিন্ধুপ্রদেশে যে গোহারান হেরেছে, সে-তুলনায় বাংলায় দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হওয়ায় তাদের অন্তত মুখ-রক্ষা হয়েছে। তার মানে তো অবাঙালি মুসলমানরা বাংলার রাজনীতিতে জায়গা পাবে?

তপশিলি জাতির জন্য আলাদা আসন না-থাকলে তেরজন নমশূদ্র প্রার্থীকে তো নমশূদ্র বলে আলাদা করা যেত না, ভোটে জিতলেও লোকে তো তাকে নমশূদ্র বলেই জানত না। যোগেন যদি নিজেকে বাদ দেয় আর এক কংগ্রেসিকে বাদ দেয়, তাহলেও তো ১১ জন জিতেছে নমশূদ্র জাতিপরিচয়েই। এটা কি কম কথা?

খুব কি বড় কথাও?

যোগেনের হাই ওঠে। সে হাইও তোলে আবার একটু না-হেসেও পারে না, ঠোঁটের কোণে। চোখটাও বন্ধ করে। নমশূদ্রদের ভোটের হিশেবে এসে যেন যোগেন একটু গা ছেড়ে দেয়। রসিকলাল বিশ্বাস আর মুকুন্দবিহারী মল্লিকের মত জাতের প্রধানরা এ ওকে হারায়। একজন তাঁদের কংগ্রেসি, আর-একজন ডিপ্রেসড ক্লাশ ফেডারেশন। পি আর ঠাকুরের ভাই মন্মথরঞ্জন ঠাকুর হেরে গেল যার কাছে সে নমশূদ্র নয়। মুকুন্দ মল্লিকের ভাই পুলিন জিতল হাওড়া থেকে আর ঢাকার মোহিনী ডাক্তার, দেশবন্ধুর সঙ্গে রাজনীতি করেছেন, হেরে গেলেন কে-এক ধনঞ্জয় রায়-এর কাছে। পি আর ঠাকুর আর বিরাট মণ্ডল এসেছেন, ললিত জ্যাঠা হেরে গেলেন-একবার এর কাছে।

যোগেন ঠিক বুঝেই উঠতে পারে না—ললিত জ্যাঠা জিতলে কি সে খুশি হত? বা, সে কী সে খুশি হত? বা, সে কি চায়নি, একবার জিতলে ভালোই। নতুন নেতা, কম বয়স, লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা বেশি। কিন্তু এমন রাতে নিজের কাছেও মানতে পারা তার পক্ষে অসম্ভব যে ললিত জ্যাঠা হেরে যাওয়ায় তার দুঃখ হচ্ছে না।

নমশূদ্রদের পুরনো নেতারা যে তাদের ভাই-বেরাদরদের ভোটে দাঁড় করিয়েছিলেন, সেটা যোগেন পছন্দ করেনি। কিন্তু সে-কথা জানাবার তো কোনো জায়গা ছিল না। জায়গা থাকলেও জানানো যেত না। সব জাতেরই তো একটা রীত্‌নীত্‌ আছে, মানীজন-গুণীজন আছে। নমশূদ্রদের মধ্যে যারা জিতেছে, তাদের বেশিরভাগই মুকুন্দ মল্লিকের লোক। নমশূদ্ররা শূদ্র না বামুন সে-সব বিচারের চাইতে অনেক বড় বিষয়—নমশূদ্ররাও দুই পেয়ে মানুষ। তাহলে, ক্ষমতার ভাগ তারা পাবে না কেন? ক্ষমতার সেই ভাগ জুটল বটে কিন্তু মুকুন্দ মল্লিকের হাত দিয়ে? হ্যাঁ, তারা খুব মান্যগণ্য বাড়ি, নমশূদ্রদের গৌরব, কিন্তু নমশূদ্ররা কি তাদের পরিবারের গৌরব? যোগেন নমশূদ্র হয়েও সাধারণ আসনে দাঁড়ানোতে তো তার বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রচার করেছিল—যোগেন নাকী নমশূদ্র পরিচয় দিতে লজ্জা পায়। কথাটা ভোটারদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলেও যায়—কে আর শুদ্দুর থাকতে চায়। হ্যাঁ। কিন্তু বামুন-কায়েতরাও তো চাঁড়ালদের সঙ্গে এক আসনে দাঁড়াতে চায় না—এমনও হতে পারে। যোগেন তার জাতভাইদের সম্মান বাড়িয়েছে। তাতে তার ভালোই লাগে। হ্যাঁ—আ। নমশূদ্র মানে দুটো-তিনটে মুকুন্দ মল্লিক না।

সে না-হয় হল—নমশূদ্র মানে যোগেন মণ্ডলই হল। কিন্তু এই নতুন আইনে যদি 'শিডিউল্ড ক্লাশ' বলে একটা জাত্‌ তৈরি না হয়, তাহলে কি মৎস্য-অবতার জল থেকে ডাঙায় উঠে বরাহ-অবতার হতে পারত। সেই বরাহ-অবতার কি তৈরি করতে পারত ইংরেজরা, যদি মৈনাক পর্বতের ডানা কেটে ও হাঁটু ভেঙে দিয়ে সমুদ্রের জলে তাকে কবর দেয়া না হত। অন্তত

এই শেষ রাতে ভোটের সব সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে দরজা-সাইজের জানলা দিয়ে বাইরের আলোধোয়া কলকাতার দিকে চোখ ফেলে রেখে যোগেন কী করে অস্বীকার করবে যে একমাত্র স্বাধীনতাকামী পার্টি হিশেবে কংগ্রেসই সারা দেশের স্বীকৃতি আদায় করতে পেরেছে। ৩৫ সালের আইন-অনুযায়ী এই প্রথম ভোটের পর জওহরলাল বলেছিলেন, এটা পরিষ্কার যে দেশের রাজনীতিতে দুটি মাত্র পক্ষ আছে—কংগ্রেস আর ইংরেজ। ঘটনাও তাই, ইংরেজরাও মনে করে তাই। আবার, এই কংগ্রেস তো হিন্দু পার্টি নিশ্চয়। তাহলে কংগ্রেসকে ডোবাতে হলে হিন্দুদের কাটা ছাড়া ইংরেজদের উপায়ান্তর ছিল না। এক-ডানা কাটা হল, জনসংখ্যার অনুপাতে আসনসংখ্যা কমিয়ে—হিন্দুদেরও, মুসলমানদেরও। আর-এক ডানা কাটা হল—শিডিউল তৈরি করে নতুন হিন্দু বানিয়ে।

যোগেন এটা নিজের কাছে না-মেনে পারে না যে বাংলার কংগ্রেসের বা হিন্দু ভদ্রলোকদের ঠেকাতে এই অচ্ছুৎ হিন্দুদের আর মুসলমানদের ইংরেজরাই কিছু ক্ষমতার ভাগ দিয়েছে। তাহলে তো সে ইংরেজদের কাছে ঋণী। হ্যাঁ, ঋণীই। ইংরেজ না-থাকলে কি এ-ক্ষমতা তাদের জুটত? কিন্তু এটা তো কোনো নতুন প্রশ্ন নয়। ইংরেজরা না থাকলে চাকরি আর জমিদারির জোরে হিন্দুরা ভদ্দরলোক হতে পারত?

ইংরেজদের কাছে এই ঋণ তো যোগেন বা ফজলুল হক কেউই প্রকাশ্যে স্বীকার করতে পারবে না। কারণ, সেই স্বীকারের মধ্যে আরো কিছু স্বীকৃতিটুকুও লেগে থাকে। ইংরেজরা কংগ্রেস-ভাঙার কাজে ও কংগ্রেসকে পুরো ভারতের একমাত্র প্রতিনিধিত্ব থেকে সরানোর কাজে শিডিউলদের ও মুসলমানদের ঘুঁটি সাজিয়েছে। যোগেন একটা হাই তুলে নিজের মন থেকে অবস্থার এই গ্লানিকর সত্য সরিয়ে রাখতে চায়। ঘুঁটি যখন বোঝে সে ঘুঁটি, তখন তার ঘুঁটি হওয়ার দাম-আদায় আর কোনোদিনই শেষ হয় না। যোগেন তেতো হাসে। শুধু সংখ্যার জোরে হিন্দুরা এই সত্য কায়েম করেছে যে শাহেবরা আমাদের সভ্য বানিয়েছে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিদ্রোহকে বলেছে ডাকাতি। আবার, এই সত্যও কায়েম করেছে যে হিন্দুরাই স্বাধীনতার জন্য দাম দিয়েছে। এটা শুধুই সংখ্যার গুণে ইতিহাস।

যোগেন ঠিক করে উঠতে পারে না—নমশূদ্র হিশেবে পৃথক রাজনৈতিক পরিচয় তৈরি করে তোলা ও সেই পরিচয়ের জোরেই ভারতের স্বাধীনতা পাওয়ার কাজে তার জায়গার হদিশ করে নেয়া কী করে সম্ভব? সম্ভব হত—কংগ্রেস যদি শুধুই বাবুহিন্দুদের পার্টি না হত। সম্ভব হত—শিডিউলদের যদি হিন্দু-পরিচয় থেকে একেবারে বাদ দেয়া হত। কিন্তু কংগ্রেসের পৈতে যত ছেঁড়াই হোক—কংগ্রেস সে-পৈতে খুলে ছুঁড়ে ফেলতে পারবে না। সারা বাংলায় কংগ্রেসে মাঝারি মাপের কোনো মুসলমান নেতা আছে বা কোনো নিচুজাতের নেতা আছে? সারা বাংলায়? কোনো মুসলমান-আসনে কংগ্রেস কোনো প্রার্থী দেয়নি। যতই বলুক—মুসলমান ভোট কাটতে চায়নি বলে দেয়নি, প্রজাপার্টি যাতে জেতে সেই উদ্দেশ্যে দেয়নি, মুসলিম লিগ যাতে এত আসন না পায় যে তারা নিজেদের 'অদ্বিতীয়' ও মুসলমানদের 'একমাত্র'-মোক্তার হিশেবে পরিচয় দিতে পারে। আসল কথা হল, কোনো মুসলমান কংগ্রেসের প্রার্থী হতে রাজি হয়নি। তবুও কংগ্রেস সবচেয়ে বেশি সিট পেয়েছে তার কারণ, সারা রাত ধরে অঙ্ক কষে-কষে যোগেন বের করল—মধ্যবঙ্গে, বর্ধমান-বীরভূম-নদীয়া-যশোরের পশ্চিমভাগটা, হাওড়া-হুগলি-বর্ধমান-মেদিনীপুরে—কংগ্রেসের বহু পুরনো সংগঠন ও নেতা, ইউনিয়ন বোর্ডের ওপর কংগ্রেসের দখল, ভোটার সংখ্যা ও ভোট দেয়ার পরিমাণও বেশি।

সম্ভব একটা কারণও সে পেয়েছে কিন্তু সেটা বলা যায় না। বাংলার মোট নিচু হিন্দুর

সংখ্যার তুলনায় এই জায়গাগুলিতেই নিচুহিন্দু সংখ্যায় কম। এ-কথা জানা গেলেও বলা যায় না—বললে মনের সন্দেহ বেরিয়ে পড়বে—মুসলমান ও নিচুহিন্দুরা কংগ্রেসের বিপক্ষে ভোট করেছে।

মাহিষ্য, নমশূদ্র আর রাজবংশী এই তিন জাত মিলেই তো মোট বাঙালির প্রায় তিনভাগের একভাগ, ঠিকঠাক হিশেবে পাঁচ আনি আর বামুন-কায়েতেরা আটভাগের একভাগ, ঠিকঠাক হিশেবে দুই-আনি দুই-পয়সা। যদি দেশবন্ধু মারা না যেতেন তবে তাঁর বেঙ্গল প্যাক্টে ১৬ জিলাতেই তো লোক্যাল বোর্ডগুলি যেত মুসলমানদের দখলে। ৯টা জিলায় থাকত হিন্দু, মানে কংগ্রেস। কিন্তু তখন তো আর শিডিউল কাস্ট তৈরি হয়নি যে সে ৯টা জিলাতেও লোক্যাল বোর্ড বামুন-কায়েতদের হাত থেকে চাঁড়ালদের দখলে আসবে।

যোগেন দাঁড়ায় ও দুই হাত মাথার ওপর তুলে আড়মুড়ি ভাঙে। দরজা সাইজের বড় জানলাটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ট্রামের তার আর লাইন কিছু-কিছু জায়গায় চকচক করছে। সামনের গলির ভিতর থেকে একটা কুকুর ছুটে এসে ট্রামলাইনের সামনে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকায়, তারপর ঘুরে ছুটে আবার গলির ভিতর ঢুকে যায়। এতটা ফাঁকা দেখে ভয় পেয়েছে, নাকী, ওর রোজকার অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নিল। বহু দূর থেকে একটা যান্ত্রিক ক্রেংকার কানে আসাতে যোগেন অপেক্ষা করে। দেখতে-না-দেখতে শ্যামবাজার ডিপো থেকে প্রথম ট্রাম স্টপে না-দাঁড়িয়ে সোজা চলে যায়। এটাকে বলা হয় গঙ্গাস্নানের ট্রাম। সেকেন্ড ক্লাশে সেই সংকীর্তনের দলটা গান গাইতে-গাইতে যাচ্ছে।

সেক্রেটারি শিডিউল্ড কাস্ট অ্যাসেম্বলি পার্টি

৩৫

ঘণ্টা পাঁচ ঘুমিয়ে ন-তারিখ সকাল থেকেই যোগেন তার ছাড়া সুতো ধরে ফেলে, সে যেন ঘুমের মধ্যেও সুতো ছাড়ছিল। ডাক্তার রোগী নিয়ে, বুন রান্নাঘরে আর ছেলেরা তাদের স্কুলকলেজে ব্যস্ত। মেঝে থেকে মাদুরের বিছানা তুলে নিয়েছে যোগেন—দিনে কাজকর্মে ঘরটা লাগে। হেম নস্করের কাগজের ভিতরে আবার ডুব দিতে গিয়েই যেন যোগেনের মনে পড়ে যায় দেশবন্ধুর স্বরাজ্য পার্টির প্রার্থী হয়ে সেই ২২-২৩ সাল থেকে কাউন্সিলের মেম্বার ছিলেন নস্করমশায়, দেশবন্ধু মারা যাওয়ার পরও। কিন্তু সংরক্ষণের সুযোগে এবার শিডিউল কাস্ট হিশেবে স্বতন্ত্র দাঁড়িয়ে এমএলএ হয়েছেন। তাহলে, লাভ বুঝলে নতুন করে শিডিউলও হওয়া যায়।

কিন্তু পৈতে পরে পদবী বদলে নতুন করে পুরাণ লিখে সেই তার বাপঠাকুরদার আমলের কর্তারা যে বামুন-কায়েত হতে চেয়েছিল, তা তো তারা হতে পারেনি, বরং ভদ্রলোকরা তাদের ঠাট্টা করত ‘সিকি পয়সার পৈতেধারী’ বলে। যোগেন নিজের জীবনের দেখাশোনা একটু ছাঁকতে চায়। বাপঠাকুরদার আমলের কর্তারা পৈতে পরেছিলেন আর যোগেনও তো ইংরেজি আর সংস্কৃত পড়েছে, উকিল হয়েছে। সেও তো একরকমের পৈতেই হল—সুঁতোর না-হয়ে কাগজের। প্যাঁচে পড়ে গেল নাকী যোগেন? যেন মনে হয়, হরিচাঁদ-গুরুচাঁদের মত একটা নতুন ধর্মে—মতুয়া ধর্মে—লোকজনকে জড়ো করতে পারলে নিজেদের জাতের একটা দিশা হত।

যোগেন তার মনে-মনে জানা সত্যটার আঁচ পায়। চিকিৎসা আর গুরুগিরিও তো বামনাই। সে কলেজে পড়ার সময় বরিশাল কালীবাড়িতে হাঙ্গামা বাধিয়েছিল না—শুদ্দুর বলে একটা ছেলেকে বের করে দেয়া হয়েছিল বলে? সেটাও তো বাবু-হওয়াই। বাবুরা যেমন নিজেদের মত করে শাহেব হয়েছে। এখন শিডিউল হিশেবে আলাদা হওয়ায় যোগেন কী হবে? সেটা কোনোদিন জানা হয়নি বলেই, বা জানা যায়নি বলেই—কি জাতধর্ম অটুট রাখতে তারাই—নমশূদ্র-মাহিষ্য-রাজবংশীরা—ঘাড় দিয়েছে, পিঠ দিয়েছে!

কিন্তু দেয়ও তো নি।

ফরিদপুরে নমশূদ্ররা বামুন-কায়েতদের বয়কট করেছিল তিনমাস না ছয়মাস—শূদ্রের মাতৃশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হয়ে তারা আসেনি বলে। হিন্দু বামুন-কায়েত জমিদার বাড়িতে নিয়ম করে ডাকাতি করেনি নমশূদ্ররা? এবারের ভোটে নমশূদ্র-মুসলমান চাষিরা খেপে ওঠেনি—গজনভি আর ব্যোমকেশ চক্কোত্তির মন্ত্রীগিরির বিরুদ্ধে। স্যার ফারুকি, স্যার নাজিমুদ্দিন টাকা আর ইসলাম ছড়িয়েও হারল। সরল দত্ত মশায় না হলে হারতেন?

যোগেন তার নিজের সঙ্গে একটা মুখোমুখি কথা বারবার এড়ায়। তারা, এখন যাদের শিডিউল কাস্ট বলা হচ্ছে, আমরা কি হিন্দু? হিন্দু হিশেবে কি আমরা কিছু সুযোগসুবিধে আদায় করতে চাই? তাই যদি চাই, তাহলে এই লিস্টি বানিয়ে যে আমাদের দেগে দেয়া হল, সেটা আমাদের মেনে নেওয়া ঠিক হয়নি? আমরা তো দশটা আসন থেকে তিরিশ-চল্লিশটার জন্য দরবার করতে লাগলাম! যদি এই আসনগুলি রিজার্ভ রাখা না হত, তাহলে কি আমরা এতজন এই ক্ষমতার ভাগীদার হতে পারতাম? এটা কেন হিন্দু হয়ে ক্ষমতার ভাগ পাওয়া? আলাদা লিস্টি যখন করা হয়েছে তখন আমরা সেটাকে হিন্দুদের সঙ্গে পৃথক হওয়ার কাজে ব্যবহার করব না কেন? সেটায় কি আমরা নিজেরা নিজেদের রাজি করাতে পারব? আমরা হিন্দু থাকতে চাই কিন্তু বলতে চাই না? কংগ্রেস যদি হিন্দু না হত, তাহলে কি আমরা খুশি হতাম? আমাদের যদি আলাদা একটা পাওয়ার গ্রুপ হিশেবে কাজ করতে হয়, তবে, সে-পাওয়ার গ্রুপ চাইবেটা কী? নিশ্চয়ই আরো পাওয়ার? মানে, মন্ত্রিসভায় বেশি শিডিউল মন্ত্রী? নাকী একজনও মন্ত্রী চাই না কিন্তু আমাদের জন্য কাজ চাই? কাজটা কী? মন্দিরে পুজো দেয়ার অধিকার? নাকী সিলেটের নমশূদ্রদের মতো জুতো পরার অধিকার?

যোগেন নিজেকে এমন একটা গোলমেলে জায়গায় নিয়ে যেতে পেরে খুশিই হয়। সে যে নিজেই নিজেকে এড়াচ্ছে এতেও তার চনমনে লাগে—অনেকটা সময় খালে সাঁতার কাটলে যেমন ছিমছাম ও ঝিমঝিম লাগে, সেরকম। হ্যাঁ। এই ভোট নিয়ে এখন সে তার কথা বলতে পারবে। আর, বলতে-বলতেই সে-কথা আরো পরিষ্কার হবে। আরো সব পার্টির আরো সব কথা 'চাইলতে-চাইলতে' যোগেনের কথাটা 'চাইল্যান' হয়ে যাবে।

সন্ধের মুখে একটি লোক এসে একটা হাত চিঠি দিয়ে গেল। প্রজা পার্টির পক্ষে কেপিপির পার্লামেন্টারি বোর্ডের সেক্রেটারি শামসুদ্দিন আমেদ জানিয়েছেন, ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টায় দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের গৃহে কংগ্রেস পার্লামেন্টারি বোর্ড ও কৃষক-প্রজা পার্টির পার্লামেন্টারি বোর্ড-এর মিলিত সভা হবে। এই সভার একমাত্র আলোচ্য—দুই পার্টির মধ্যে মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে চুক্তি সম্পাদন। আপনাকে এই সভায় উপস্থিত হয়ে প্রস্তাবিত মন্ত্রিসভাকে আপনার/ইয়োর মেম্বারস সমর্থন জানাবার জন্য একান্ত অনুরোধ করছি।

মেনিফোল্ড পেপারে টাইপ করা ইংরেজি চিঠি একটু অস্পষ্ট বটে তবে পড়তে কোনো অসুবিধে হয় না। কম তো আর টাইপ করতে হয়নি—প্রত্যেক স্বতন্ত্র মেম্বারকেই যদি দেয়া

হয়ে থাকে। খুব ভালো মেনিফোল্ডে তো এক-টাইপে, খুব বেশি হলে, ছ-কপি হয়—তাও নতুন কার্বন পেপারে ও নতুন ফিতেয়। তাও ছ-কপির শেষ কপিটা পড়ার জন্য দেয়া হয় না, শুধু দলিল হিশেবে রাখার জন্য দেয়া হয়। বরিশাল কোর্টে তো এরকমই। কলকাতায় একটু আলাদা হতে পারে।

চিঠিটা ভালো করে দেখতে গিয়ে যোগেন দেখে তার চিঠিতে 'ইয়োর'-টা কেটে দেয়া। 'ইয়োর মেম্বারস'টা রাখা। যোগেনকে সম্বোধন করা হয়েছে—সেক্রেটারি, শিডিউল কাস্ট অ্যাসেমব্লি পার্টি বলে।

পরদিন যোগেন যতীন্দ্রমোহনের বাড়িতে পৌঁছে যায় ঘণ্টাখানেক আগে। তখনো প্রায় কেউই আসেনি। কে কে আসবে, তা অবিশ্যি যোগেন জানে না। নিশ্চয়ই কেপিপি আর কংগ্রেসের সব এমএলএরা আসবে না। চুক্তি হবে একটা, দুই দলের নেতাদের মধ্যে—চুক্তি বললে চুক্তি, ঘোষণা বললে ঘোষণা, আজকাল আবার বিবৃতি কথাটাও চলছে। 'আজাদ' লেখে সমঝোতা। যে-করেই হোক—আইনসিদ্ধ একটা দলিল হবে, প্রস্তাবের আকারেও হতে পারে যে কংগ্রেস আর কেপিপি মিলে এই সরকার তৈরি করছে—তাদের পক্ষে বেশিরভাগ মেম্বারের সমর্থন আছে। সেই প্রস্তাবের জোরে ফজলুল হকশাহেব লাটশাহেবের সঙ্গে দেখা করে সরকার তৈরি করতে চাইবেন, যদি এই ভোটের আগে ও পরে রাজনীতি নিয়ে যোগেন যদ্দুর শুনেছে, আর ভোটের মধ্য দিয়ে তো এই সিদ্ধান্তই বহাল হয়েছে, সেটাই এখনো টিকে থাকে। হ্যাঁ। বদলে যেতে পারে নিশ্চয়ই, তবে তেমন কিছু যোগেনের কানে আসেনি। সে অবিশ্যি বাড়ি থেকে বেরও হয়নি।

ঘরে অনেক ফটো টাঙানো। টেবিলের ওপর, আলমারির ওপর, দেয়ালে ও তাকে। এত বড় ঘরের একটা দিকে চৌকো করে সোফাটোফা সাজানো। এটাই যদি সভার জায়গা হয় তাহলে খুব বেশি কেউ আসছে না।

জুতো খুলে রেখে যোগেন দেয়ালের ছবিগুলো দেখে। যে-ছবিগুলি দেখলেই বোঝা যায় বাড়ির কেউ, সেগুলো যোগেন আর চিনবে কী করে? কিন্তু সে অনুমান করে নিতে পারে চট্টগ্রামে যতীন্দ্রমোহনের প্রাসাদ ও বাগান, নেলী সেনগুপ্তের কম বয়স, জাহাজ থেকে দেখা কোনো বন্দর, বন্দর থেকে দেখা কোনো জাহাজ, সুট-টাইয়ে যুবক. যতীন্দ্রমোহন, ধুতি-পাঞ্জাবি-গান্ধীটুপিতে যতীন্দ্রমোহন, কলকাতা কর্পোরেশনে, দুটো গ্রুপ ছবি—একটা বেশ সাজিয়েগুছিয়ে বসা ও তিন লাইনে দাঁড়ানো অনেকে। দেখে মনে হয় বিলেতের। আর-একটাতে মাঝখানের চেয়ারে গান্ধীজি চশমা পরে—হাঁটুর ওপর হাঁটু দিয়ে, হাতলে হাত রাখেননি। তাঁর দু-পাশে ও পেছনে যাঁরা দাঁড়িয়ে ও বসে তাঁদের মধ্যে রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মৌলানা আজাদ, জওহরলাল, গোবিন্দ বল্লভ পান্থ আর রাজাগোপালাচারিকে যোগেন চিনতে পারে।

'ও, আপনি একা-একা বসে আছেন,' নেলী সেনগুপ্ত দোতলা থেকে নামার সিঁড়ির মাঝখান থেকে বলেন। যোগেন ঘুরে নমস্কার করে, 'আমি একটু আগে আসছি। ভালই হল। ছবিগুলো দেখা গেল। কম বয়সে দেশপ্রিয়কে দেখতে এত সুন্দর ছিল।'

'উনি আর বুড়ো হওয়ার সময় পেলেন কোথায়? আটচল্লিশেই তো চলে গেলেন।'

'কী একটা কথা আছে-না, ভগবান যাদের ভালবাসেন, তাদের—'

'তাড়াতাড়ি কাছে টেনে নেন। কিন্তু ভগবান তো আমাদেরও ভালবাসতে পারেন।'

'সে তো বটেই আর আপনারা দুজন মিলে তো একজন ছিলেন।'

'বাঃ! কথাটা আর-একবার বলবেন? এমন করে তো কেউ বলেননি।'

'মিসেস সেনগুপ্তা, গুড মর্নিং', বলতে-বলতে শরৎ বোস ঢুকলেন, একেবারে নতুন নীল স্যুটে, সরু দাগ কাটা। শরৎ বোসের পেছন-পেছন তুলসী গোস্বামী ও কিরণশঙ্কর রায় ঢুকলেন। বসলেন কিরণশঙ্করের পরনে খুব পাতলা খদ্দরের ধুতিপাঞ্জাবি আর গায়ে বগলের তলা দিয়ে শ্যাওলা রঙের একটা বালাপোশ। তুলসী গোঁসাইয়ের শাহেবিয়ানা নিয়ে কত গল্প যে রটানো হয়। এরা সকলেই এত নামকরা, প্রত্যেকেই এত সাকসেসফুল, এত বড়লোক, এত ফরসা, যেন এঁরা শেষ কথা বলতেই জন্মেছেন। ততক্ষণে একটু পেছনে পড়ে যাওয়া যোগেন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। এদের পেছনে রেখে সামনে যাওয়া যায় নাকী!

বাইরে হর্ন বাজিয়ে গাড়ি থামার আওয়াজে শরৎ বোস উদার হেসে বলেন, 'কেউ বেট রাখবেন, কে এলেন?'

'এটা একটা বেট হল? ডক্টর আমেদ-এর গাড়ির হর্ন শুনলে তো আমাদের গলির ষাঁড়রাও পথ দেয় না,' কিরণশঙ্কর বলেন।

ডাক্তার আমেদ তখন ঢুকে গিয়েছেন, সঙ্গে হুমায়ুন কবির, 'সে তো কিরণ, তোমার গলির ষাঁড় যদি কমিউন্যাল না-হয় তবে তো তোমার ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বারশিপ মালব্যজি কেটে নেবেন।'

হাসির হুল্লোড়ে কেউ খেয়াল করেনি, হকশাহেব ঢুকে পড়েছেন, 'এত হাসি থেকে বঞ্চিত রেখো না মোরে, দিও কিঞ্চিৎ না করো বঞ্চিত।' বলে বসলেন।

শরৎ বোস বললেন, 'হকশাহেব, প্রত্যেকটা পরিস্থিতির, মানে সিচুয়েশনের, একটা ইউনিকনেস আর ইনএভিটেবিলিটি থাকে। সেটা রিপিট করা যায় না, এমনকী নাজিমুদ্দিন-জয়ী ফজলুল হকের খাতিরেও না। তবে, ফর ইয়োর নলেজ—ডক্টর আমেদ বলেছেন কিরণশঙ্কর নাকী ওর গলির ষাঁড়দের পর্যন্ত এত কমিউন্যাল বানিয়েছে যে তারা ডক্টর আমেদ-এর গাড়ির হর্ন শুনলেও পথ দেয় না।'

হকশাহেব সেকেন্ড কয়েক চোখ গোল করে হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন। তারপর উলটো দিক থেকে হাসতে শুরু করেন। কাল শেরওয়ানি-র গলার বোতামও সাঁটা, মাথায় কাল পারসিয়ান টুপি, খুব সরু একটা চেনে পকেটঘড়ি শেরওয়ানি-র বুকপকেটে। হকশাহেব কথাটা শুনে খুব ছোট একটু দুলুনির হাসি হাসলেন—আওয়াজ করে। তারপরই ওঁর হাঁ বন্ধ হয়ে গেল, চোখের পাতাও নেমে এল। নিজের হাসিটা চুকিয়ে দেয়ার পর হকশাহেবের মনে পড়ল আবার কথাটা! আমেদ বলেছে, কিরণশঙ্কর ষাঁড়গুলোকে কমিউন্যাল বানিয়েছে? হকশাহেব আবার একটা ফিরতি হাসি হেসে চুপ করে যান। তিনি যখন মনে-মনে ভেবে নিয়েছেন, বিষয়-অনুযায়ী হাসা তাঁর হাসা হয়েছে, তখনই তাঁর মনে পড়ে ষাঁড়দের এই কমিউন্যাল ব্যবহারের প্রমাণ কী? আমেদের গাড়ির হর্ন! এবার তিনি তৃতীয় বার হেসে ওঠেন একটু বেশি গমকে। এবারের হাসি তাঁর মুখের পেশিগুলিকে একটু ছুঁয়ে গেল। সেটা হয়তো প্রধানত আমেদের গাড়ির হর্নের স্মৃতিতেই। কিন্তু সেই তৃতীয় হাসি শেষ হওয়ার পর হকশাহেবের মনে এসে যায়—কিরণ বলদগুলোর শুদ্ধি করল কী করে, ওগুলোর তো সুন্নত হয়ে গেছে, কিরণ কি লস্ট ফোর স্কিন সেলাই করে দিয়েছে বলদগুলোর? কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় তিনি চতুর্থ হাসিটা বেরতে না-দিয়ে এইটুকু বলতে পারেন, 'কিরণ বলদগুলিকে ডিসুন্নত করল কী করে।' কথাটা খুব পরিষ্কার করে বলে হকশাহেব হিমবাহের মত কেঁপে-কেঁপে উঠে গড়িয়ে যেতে থাকলেন। কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ডের সময় থেকেই কংগ্রেসের এক অংশ, হিন্দুসভা, আর্যসমাজ—শুদ্ধিকরণ কর্মসূচি শুরু করেছিল। এঁরা মনে করতেন যে বাংলা-বিহারের মুসলমানরা হিন্দু ছোট জাত ছিল। মাত্র কয়েকশ

বছর আগে তাদের মুসলমান করা হয়। জন্ম-মুসলিম আর বানানো-মুসলিম—এই দুইভাগ রাজনীতিতে এসে গেছে। আর-সব ধর্ম গ্রহণ করা যায়, হিন্দু হতে হলে হিন্দু হয়ে জন্মাতে হয়। ইসলাম বা খ্রিস্টধর্মে নতুন লোক নেয়া যায়, হিন্দুধর্মে নতুন লোক নেয়া যায় না। সেই কারণে হিন্দুদের যা কিছু আছে, তা থেকে কেটেই অন্য ধর্মীয়দের দেয়া হয়। ফলে হিন্দুর সংখ্যা কমে যাচ্ছে আর হিন্দুদেরই খ্রিস্টান বা মুসলমান বানিয়ে তাদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। হিন্দুদের অন্য কোনো ধর্মে নেয়া চলবে না আর যাদের নেয়া হয়েছে তাদের শুদ্ধি করিয়ে হিন্দুত্বে ফেরত নেয়া যাবে—এই এক রাজনীতি বেশ জমে উঠছিল। তাতে কংগ্রেসের নেতাদের কেউ-কেউ ছিলেন। কিরণশঙ্কর রায় তাঁর গলির বলদগুলিকে শুদ্ধি করিয়েছেন—সেই রাজনীতিরই লব্জ।

হকশাহেবের সারা শরীর কাঁপছিল—মাঝে-মাঝে শ্বাস টানছিলেন, আবার নিজের শরীরে ভূমিকম্প ঘটাচ্ছিলেন, মাঝে-মাঝে 'কিরণ', 'কিরণ', আওয়াজ উঠছিল। তুলসী গোঁসাই যে হকশাহেবের গলার বোতামটা খুলে দিতে বলছেন, অন্তত 'স্ট্র্যাংগুলেশন' থেকে বাঁচাতে, তাঁর উচ্চারণ কেউ বুঝতে পারে না। তবে 'বাট্‌ন' বা 'বট্‌ন্‌' এমন আওয়াজ থেকে আন্দাজ করে একজন হকশাহেবের জুতোর ফিতে খুলতে গেলে, হকশাহেব তাকে কিক মেরে সরিয়ে দেন। নেলী সেনগুপ্ত এক গ্লাস জল নিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে, 'মিস্টার হক, প্লি-ই-জ, জলটা খেয়ে নিন।'

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের আইন-অনুযায়ী বাংলার প্রথম নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সরকার তৈরির জন্য চরম এই আলোচনাসভা ডাক্তার আমেদ-এর গাড়ির হর্ন, কিরণশঙ্কর রায়ের ষাঁড়, তুলসী গোঁসাই-এর ইংরেজি আর ফজলুল হকের হাসিতে ভেঙে ভেসে যাচ্ছিল।

কংগ্রেস-হক আলোচনা

কোনো এক সময় হকশাহেবের হাসি নিশ্চয় থেমেছিল ও যা নিয়ে মিটিং তা নিয়েই কথাবার্তা শুরু হয়।

৩৬

'কী, করতে হবেটা কী?' বিধান রায় একটু চড়া সুরেই বললেন।

'যা করতে হবে, সেটা ডক্টর রায় থাকতে আমরা বলব কী করে? আপনি তো চোখ না-খুলেই দেখতে পাচ্ছেন কার শ্বাস উঠেছে আর কে জোয়ান হয়ে উঠেছে। এখন প্রেসক্রিপশনটা দিয়ে দিন, আমরা সেই অনুযায়ী রোগীর দেখাশুনো করি। যত তাড়াতাড়ি হয়, ততই ভাল', বলে বসলেন নৌসের আলি।

বিধান রায় রেগে গেলে লম্বা ঘাড়টা নামিয়ে কথা বলতেন। এমনিতেই ওঁর কথাবলার বাঁধুনি নেই, ইংরেজিতে নয়, বাংলাতেও নয়। তার ওপর বাংলাকে উনি চেনেনও না ঠিকঠাক—কে কোথাকার কেমন লিডার সে-খবরও গোলমাল করে ফেলেন। তার ওপর তাঁর বিরোধী যাঁরা কংগ্রেসে, তাঁরাই এখন প্রদেশ কংগ্রেসের সর্বেসর্বা—শরৎ বোস, কিরণশঙ্কর রায়, প্রফুল্লঘোষেরা। প্রদেশ কংগ্রেসের রাজনীতির ওপর সুভাষ বোসের নিয়ন্ত্রণই প্রধান। তার ওপর বিধান রায় নিখিল ভারত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির মুখপাত্র বলেই বাংলার রাজনীতিতে পরিচিত।

বিধানবাবু তাঁর ঘাড়টা নামিয়ে কী একটা কথা বললেন, যার মানে কেউই বুঝল না, 'পেশেন্ট কে আউটডোরে না ইনডোরে সেসব তাহলে বলা হোক।'

অস্বস্তি কাটাতে শরৎ বোস একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নেন, বিধান রায়ের হেনস্তটা ততক্ষণে সবার কাছেই পরিষ্কার, শরৎ বোস বললেন, 'ডক্টর রায় জানতে চেয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেসের কাছে আপনারা কী চাইছেন? কী করতে হবে আমাদের?'

'এইডা একডা জবর কথা কইলেন বোসশাহেব। এক বিয়াতি মাইয়্যা পোয়াতি হইয়্যা বাপের বাড়ি আইসছে। তার যহন অ্যাহন-তহন, তার পাইল ঘুম। স্যায় তার মায়েরে ডাইক্যা কয়, মা রে, আমার বড় ঘুম পায়, আমি ঘুমাই, আমার প্রসববেদনা উইঠলে আমারে ডাইক্যা দিও।'

কথাটাতে বেশ বড় হাসির একটা রোল উঠে থেমে গেল। বলেছিলেন মুক্তাগাছার মেম্বার আবদুল করিম। তাঁকে বিধান রায় চেনেন না অথচ তিনি এত উঁচু গলায় বিধান রায়কে উদ্দেশ্য করেই বলেছেন যে তাঁকে না-চেনা যায় না। বিধান রায় তাঁর দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করলেন।

নৌসের আলি বলে দেন, 'মুক্তাগাছার মেম্বার আমাদের আবদুল করিম।'

তুলসী গোঁসাই ইংরেজিতে কিছু একটা বললেন, চাপা স্বরে। কিরণশঙ্কর হেসে উঠে ডক্টর আমেদকে বললেন, 'এই-যে ডক্টর আমেদ, মিস্টার গোস্বামী বলছেন কী, ক্যাপস আর মোর দ্যান ফ্ল্যাগস—টুপিতেই নাকী চেনা যায় কে কোন পার্টির। নামাজিয়া টুপিতে প্রজা পার্টি আর গান্ধী টুপিতে কংগ্রেস যোগেন বলে বসে, 'হোয়াট হ্যাপেনস টু দি বিয়ার হেডেড লাইক আস?' যোগেন যে খুব ভেবেচিন্তে কথাটা বলেছে, তা নয়—মুখে এসে গেল, বলে দিল। ইংরেজিতে এসে গেল। ইংরেজিতেই বলল, তাই। এগুলো হচ্ছে ওকালতির অভ্যাস।

যোগেনকে যে সবাই খুব চেনে তা নয়, তবে চিনে ফেলল তার তৎপরতায়। শরৎ বোস বলে ওঠেন, 'আপনাদের তো কোনো সমস্যাই নেই। দুই পকেটে দুটো টুপি রাখবেন—গান্ধী আর নামাজিয়া। যখন যেটা দরকার পরে নেবেন।'

হকশাহেব বলে ওঠেন, 'আরে, রাখছিলই তো দুইখান টুপি দুই পকেটে। আরো একখান থুইছিল বুকপকেটে—লিগের চাঁদতারা। পিরানের যেইডা লুকানা পকেট—তাওতেও তো ছিল ন্যাশনালিস্ট। ন্যাশনালিস্ট হিন্দু হইলে হিন্দু, মুসলমান হইলে মুসলমান।'

'পকেট তো বেড়েই যাচ্ছে। অসুবিধে কোথায়?' বিধান রায় অপ্রাসঙ্গিক বলেন, সম্ভবত এই আলোচনায় তাঁর একটা ভূমিকার সাক্ষ্য তিনি রাখতে চাইছিলেন।

'ডাক্তার, পকেট তো বাড়েই। পকেটের মাল তো তাতে বাড়ে না। খুচরা পয়সায় হাজার টাকা দিলে কি আর পিরানের পকেট সামলাইব্যার পারে? দ্যান, এড্ডা হাজার টাকার একখান নোট, এক পকেটের কোণায় পইড়্যা থাকব—গেল রাত্তিরের খুলনা এক্সপ্রেসের টিকিটের লাগান।'

নলিনী সরকার বলে ওঠেন, 'তোমাদের কথা চালাচালি তো কোনোদিনই শেষ হবে না। কথায় কখন আসবে?'

হকশাহেব হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে বলেন, 'কথাই তো গড়াব্যার ধইরছে নলিনীদা। রাগেন না!'

'কী কথা গড়াচ্ছে। কংগ্রেস আর কেপিপি-র মন্ত্রিসভা হবে কোন্ কাজের ভিত্তিতে। তোমরা তো কথা বলেই যাচ্ছো। কেউই তো কারো কোনো কথাই বুঝছ না।'

'ক্যা নলিনীদা। কে কী বুইঝব্যার চাইল কিন্তু পাইরল না? কোন্ কথা কেডা বোঝে নাই, কন।'

'এই তো তোমার মেম্বার, ডক্টর রায়কে কী বললেন, ডক্টর রায় কি তার কিছু বুঝলেন?'

আবদুল করিম বলে ওঠেন, 'আমি তো না-বোঝনের কিছু কই নাই। জন্মকাল থিক্যা শুইন্যা আসছি, আম্মজান কয়—চল্, তোরে বিধান রায়রে দেখ্যায়্যা আসি। কবর্যাজের উপর রাগ হইলে আব্বা কয়—আইলেন আমার বিধান রায়। আমি তো জাইনত্যাম, বিধান রায় একখান লাল সিগন্যালের নাম—রেলগাড়ির ইস্টেশনের। খাড়া থাহে না।' আর এহানে আইস্যা দেহি—বিধান রায় নাকী একখান মানুষ? সিগন্যালরে মানুষ হবার দেইখলে আটাশ কইর্যা হাঁ হয়্যা খাড়াব না?'

'অ্যাহন তো তোমার হাঁ হওয়া শ্যাষ হওয়ার কথা। অ্যাহন মুখখান বন্ধ করো, চক্ষু দুইডা খোলা রাখো।'

'হ্যাঁ, হকশাহেব তাহলে বলুন। মানে, আপনাকে প্রাইম মিনিস্টার রেখে আমরা দুই পার্টি ও নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র মেম্বাররাও অনেকে আসবেন, একটা সরকার তৈরি করতে পারি। তার জন্য তো একটা যুক্ত প্রোগ্রাম চাই। তাহলে প্রোগ্রাম নিয়েই কথা শুরু হোক,' শরৎ বোস মিটিংটাকে বিধান রায় থেকে তাঁর দিকে ঘুরিয়ে নিলেন।'

'যদি আপনারা মেম্বারের সংখ্যায় ঠিক করতে চান, তাহাইলে কংগ্রেস নিশ্চয়ই প্রাইম মিনিস্টারের পোস্ট চাইতে পারে। তেমন কিছু হইলে আমরা কংগ্রেসকে সাপোর্ট দিব কিন্তু সরকারে যাব না'—হকশাহেব বলেন।

'এ-প্রস্তাবটা আপনি না দিলেই পারতেন, হকশাহেব। আপনি তো আমাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন মানুষ। ধরুন, আপনি যদি আজ কংগ্রেসের হয়ে এই বৈঠক করতেন, হতেও তো পারত, আপনি তো আর বাঙালির স্বার্থ অবাঙালি লিগের কাছে বিকিয়ে দেননি, তাহলে আপনি কি এমন একটা সরকার তৈরি করতে রাজি হতেন, যে-সরকারকে টিকে থাকার জন্য সব সময় সমর্থক পার্টির দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। সেই সমর্থক পার্টির কোনো দায়দায়িত্ব নেই কিন্তু ভেটো ক্ষমতা থাকল?' শরৎ বোস বেশ ঠান্ডা গলায় বললেন।

কিরণশঙ্কর বলে উঠলেন, 'মানে আমরা কংগ্রেসে ৯৩ ধারায় গভর্নরের আইনসভা ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতার বিরোধিতা করছি। আপনাদের প্রস্তাব মেনে যদি আমরা একটা সরকার করি আর আপনারা বাইরে থাকেন তাহলে আপনারাই তো ইচ্ছে মত ৯৩ ধারা করে সরকার, ফেলে দেবেন।

'হোয়াট ডু ইউ মিন কিরণ? ইজ দি কংগ্রেস ইনটারেসটেড ইন ফর্মিং দি গবমেন্ট?' শরৎ বসু কথাটা শুরু করেন কিরণশঙ্করের দিকে তাকিয়ে কিন্তু শেষ করেন বিধান রায়ের দিকে তাকিয়ে, দুই ভুরুর মাঝখানে গভীর দাগ ফেলে।

প্রদেশ কংগ্রেসের তো বার রাজপুত তের হাঁড়ি। এমনিতেই তো—নির্মল চন্দ্র, তুলসী গোঁসাই, কিরণশঙ্কর রায়, নলিনী সরকার আর সুভাষ-শরৎ। সুভাষ এখন ইয়োরোপে। শরৎ বোস বছর খানেক হল জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি শরৎ বোসের ঘাড়ে চড়ে আইনসভার এই প্রথম ভোট পার হতে চেয়ে তাঁকে প্রদেশ কংগ্রেসের সর্বময় কর্তা করে দিয়েছে। এদিকে অস্থায়ী সভাপতি, অন্যদিকে পার্লামেন্টারি বোর্ডেরও বেশ মাতব্বর মেম্বার। অথচ বিধান রায় বরাবরই হাইকম্যান্ডের লোক। প্রদেশ কংগ্রেস আর ওয়ার্কিং কমিটির ঝগড়া কাগজের নিত্য খবর। শরৎ বোস টের পেয়েছিলেন, যে বাংলায় কংগ্রেসকে যদি ভোট পেতে হয়, তাহলে কংগ্রেসকে হিন্দু ভোটের ওপরই সবটা নির্ভর করতে হবে। কিন্তু কংগ্রেসের হিন্দুভোটেই ফাটল ধরে গেছে। যে-আইনের জোরে ভোট হচ্ছে তাতে মুসলমানদের জন্য রিজার্ভ সিট আছে। হিন্দুদের মধ্যে শিডিউল্ড কাস্টের জন্যও রিজার্ভ সিট আছে—সেও গেছে হিন্দুদের কোটা থেকেই। ফলে 'সাধারণ'—আসন নামে ৭৮ হলেও, তার ৩০টিই শিডিউল্ড কাস্টের জন্য রিজার্ভ। তাহলে খোলা-আসন, মানে, যার ইচ্ছে সে-ই দাঁড়াতে পারে, হয়ে গেল ৪৮। এই ৪৮টি আসনই মাত্র খোলা থাকল—বর্ণহিন্দু ভদ্রলোকদের জন্য। এঁরাই ছিলেন সারা বাংলায় কংগ্রেসের ভিত। এঁদের ঘর থেকেই ছেলেরা সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়ে ফাঁসি গেছে, দ্বীপান্তরে গেছে, জেল খাটছে দেউলি আর বক্সার বিশেষ বন্দী শিবিরে। যারা কংগ্রেস বানাল, কংগ্রেস করল, যারা বন্দেমাতরম্ শেখাল, খদ্দর পরল, যারা বুকে সাহস বেঁধে সাত বছর ধরে নিজেদের বাড়ির বাইরের আঙিনায় জাতীয় পতাকা তুলে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করেছে ২৬ জানুয়ারি, জিলায় জিলায় মহকুমায় মহকুমায় যারা কংগ্রেস ভবন তৈরি করল, অনেকেই খদ্দর পরল, ছেলেমেয়ের বিয়েতে অচ্ছুৎদেরও নেমন্তন্ন করল—তাদের জন্য বরাদ্দ ২৫০-র মধ্যে মাত্র ৫০টি আসন। আর, যারা কিছুই করল না—লুঙ্গি পরে নামাজ পড়া ছাড়া, দশ গাঁ ঘুরলে যে-মুসলমানদের মধ্যে একটা ম্যাট্রিকুলেট পাওয়া যাবে না, যারা খেতে না পেলেও অন্তত চার-পাঁচটি বিয়ে করে, দেশের নাম বললে যারা মক্কা-শরিফ বলে, যারা সূর্যোদয় না দেখে সূর্যাস্তের দিকে মুখ

করে নামাজ পড়ে—সেই মুসলমানদের জন্য ১১৭টা আসন সংরক্ষণ? বাকি নয়টা দিলেই তো ওরা একা-একাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে পারত। হবেও তা। চাঁড়াল-শুদ্দুরদেরও তো ৩০টা আসন। দশটা টাকা হাতে ধরিয়ে দিলেই তো ওরা মুসলমানদের পক্ষে চলে যাবে। কোথায় রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ—কোথায় আজ তোমাদের বাং

এইই ছিল হিন্দু-ভদ্রলোকদের মত। তাঁদের মধ্যে যাঁরা জনসংখ্যার অনুপাতে আসনসংখ্যার নিয়ম জানতেন—তাঁরাও বিশ্বাস করতেন ও বলতেন ভেড়া থাকে পাল বেঁধে আর বাঘ থাকে একা—বাংলার হিন্দুপ্রতিভার সঙ্গে মুসলমানদের সংখ্যা দিয়ে কোনো তুলনা করা যায়?

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ঘোষণার পর সরকারের কাছে এক স্মারকপত্রে আরো অনেকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, এশিয়াটিক সোসাইটি-কলকাতার সভামুখ্য, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, প্রফুল্লচন্দ্র রায় সই দেন। তাতে বলা হয়—মননে, সংস্কৃতিতে, রাজনীতিতে বৃত্তিতে, ব্যবসায়ে এই প্রদেশের হিন্দুরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে অসামান্য ভূমিকা পালন করেছে। তারা সংখ্যায় কম হতে পারে কিন্তু শিক্ষিত জনসাধারণের ৬৪ শতাংশ।

এক কংগ্রেসের কটা ঘর

১৯৩৬-এ জেল থেকে বেড়িয়েই শরৎ বোস বুঝে যান—হিন্দু ভোটও কংগ্রেস পাবে কী না সন্দেহ, অন্য সব সংরক্ষিত আসনে তো কথাই নেই। এআইসিসি-কে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস

৩৭

আগস্ট-সেপ্টেম্বরে শরৎ বোসের সভামুখ্যতায় দুটো প্রস্তাব পাঠাল। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাঁদের বিরুদ্ধে ও সর্বজনীন ভোটাধিকার আর যুক্ত-আসনের পক্ষে আন্দোলন করার স্বাধীনতা প্রদেশ কংগ্রেসকে দেয়া হোক।

কংগ্রেস রাষ্ট্রপতি জওহরলাল জানিয়ে দিলেন—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ্য নীতির বিরুদ্ধে কোনো কাজ করা চলবে না।

কাগজে খবর বেরতে শুরু করল—বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস আলাদা হয়ে যাচ্ছে।

শরৎ বোস দুঁদে ব্যারিস্টার। বুঝে গেলেন, এআইসিসি কখনোই অনুমতি দেবে না। কারণ যুক্ত প্রদেশের আইনসভার মোট আসন সংখ্যা অনেক বেশি। লখনৌয়ে সংরক্ষিত মুসলমান আসনেও কংগ্রেস জিততে চায়। যুক্ত প্রদেশের মুসলমানদের ওপর কংগ্রেসের বেশ একটা প্রভাব আছে—বিশেষ করে মোমেন, উলেমা ও আহরদের ওপর। তার সঙ্গে আছে সিয়া-সুন্নি সংঘাত। কংগ্রেস জওহরলালের নেতৃত্বে মুসলমানদের সঙ্গে জনসংযোগকে আন্দোলনের আকার দিয়েছে। সম্প্রদায়ভিত্তিক সংরক্ষণের বিরোধিতা করলে যুক্ত প্রদেশে মুসলমানদের ভোট কংগ্রেস পাবে না। সুতরাং বাংলাতেও তা করা চলবে না। শরৎ বোস একটা বিবৃতিতে জানিয়ে দিলেন—কেন্দ্রীয় কংগ্রেস থেকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কোনো কারণেই বেরিয়ে আসছে না। তবে একই সঙ্গে ৩৫-এর আইনের বিরুদ্ধে সরব-হওয়া আর সংরক্ষণ নিয়ে নীরব-থাকা যায় না।

এইসব যখন ঘটছিল তখন নলিনী সরকার, তুলসী গোস্বামী, কিরণশঙ্কর রায় এঁরা শরৎ বোসের ঘোঁটে ছিলেন। বিধান রায় ভাবলেন, তিনি নিজে যদি বলেন তাহলে গান্ধীজি না করতে

পারবেন না। তিনি কাউকে না-জানিয়ে একা-একা ওয়ার্ধায় গিয়ে গান্ধীজিকে বাংলার অবস্থাই শুধু বোঝালেন না, একটা বুদ্ধিও বাতলে দিলেন, 'শরৎ বোসের ব্যারিস্টারি কথাবার্তা বাদ দিন। অত ম্যানিফেস্টো-ট্যানিফেস্টো লেখালেখির দরকার নেই। আমরা বাংলায় যা বললে ভোটে জেতা যায়, তাই বলব—দুটোই বর্জন করো, এই ভারত-শাসন আইন আর এই সংরক্ষণ। আপনারা চোখ ঘুরিয়ে থাকুন। আপনারা না-দেখলে আর জানবেন কী করে।'

বছর দুই-আড়াই হল গান্ধীজি কংগ্রেসের চার-আনার মেম্বারও নন। তিনি এড়িয়ে যেতে পারতেন বা বিধান রায়কে জওহরলালের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারতেন। কোনোটাই না করে তিনি বিধান রায়কে মোড়া দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'বাংলাপ্রদেশে কংগ্রেসের যাঁরা হিন্দুস্বার্থ দেখতে চান, তাঁদের তো মালব্যজির ন্যাশন্যাল পার্টিতে যোগ দেয়াই ভাল। মালব্যজি তাই বলেছেন—না? ন্যাশন্যাল পার্টি হল কংগ্রেস আর হিন্দুসভার যোগফল।'

বিধান রায় রাজনীতিতে এতটাই আনাড়ি ছিলেন যে এরপরও জিজ্ঞাসা করে বসেন, 'ও। তাহলে ন্যাশন্যালিস্ট পার্টি কংগ্রেসেই থাকছে।'

তখন গান্ধীজি চরকার চাকায় মন দিয়ে, না তাকিয়ে, আঙুল তুলে দরজা দেখিয়ে বলেন, 'দেখবেন, আপনি যা লম্বা, দেখবেন, আমার ছোট চৌকাঠে ধাক্কা খাবেন না।'

বিধান রায় কাউকে কিছু না বলে ওয়ার্ধা থেকে কলকাতা ফিরলেন। কাকপক্ষীও যে তাঁর এই যাতায়াত টের পায়নি সে ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। লখনৌয়ে ব্রেকফাস্টের সঙ্গে কাগজ দিয়ে গেল 'ন্যাশন্যাল হেরাল্ড।' ডানদিকে বড় বড় করে ছাপা, 'বাপু ডক্টরস হিজ ডক্টর।' তাতে সমস্ত ঘটনা বলা আছে। এর ফলে নাকী যুক্তপ্রদেশে কংগ্রেসের পক্ষে মুসলমান ভোট আরো বেড়ে গিয়েছিল।

বাংলায় ভোটে কংগ্রেস সবচেয়ে বেশি আসন জিতবে—এটা ভাবাই যেত না। কে দেবে ভোট? মুসলমানরা দেবে না। শিডিউল্ড কাস্টরা দেবে না। গ্রামের হিন্দুরাও দেবে না। শহরের মুসলমানরাও দেবে না। এক দেবে জমিদাররা। আর মিউনিসিপ্যালিটি এইসব আসন। বাংলার পরিস্থিতি যা ছিল, তাতে ভোটে দাঁড়ানোই ছিল অবাস্তব। কংগ্রেসের একমাত্র ভরসা জমিদাররা শহরে চলে এসেছে। সদরে—সে জিলারই হোক, মহকুমারই হোক আর কলকাতাতেই হোক। যাদের একটু-আধটু আয় আছে, তারাও মফস্বলের সদরে আর কলকাতায় একটা করে বাড়ি বানাতেন আর সে বাড়ির নাম দিতেন জমিদারির নামে—তেহাট্টা হাউশ, বর্ধমান প্যালেস, শেতলাই হাউশ, ঢাকা হাউশ ইত্যাদি। তারা তো গ্রামের রাস্তা ভুলে গেছে—গ্রাম থেকে ভোট আনবে কী?

কিন্তু তাও যে কংগ্রেসই ভোটে সবচেয়ে বেশি জিতেছে, ৫৪টি সিট, তার একটি কারণ কংগ্রেস-ছাড়া আর কোনো পার্টিকেই ভোটাররা চিনত না। মুসলিম লিগকে তো একেবারেই না। কংগ্রেস যেমন কোনো মুসলমান সিটে প্রার্থী দেয়নি, প্রজা পার্টিও তেমনি অসংরক্ষিত, বা খোলা, বা হিন্দু, বা ভদ্দরলোকি আসনে প্রার্থী দেয়নি। প্রজা পার্টি যদি তাঁদের আসনের প্রার্থীর পক্ষে কংগ্রেসের ভোট না পেত, তাহলে কি তারা আসনে তিন নম্বর হয়েও সরকার গড়তে চাইতে পারত? একটা অঘোষিত ফ্রন্ট তো সত্যিই কাজ করেছে প্রজা পার্টি ও কংগ্রেসের মধ্যে। সেই কারণেই এই ভোটে হিন্দু-মুসলমান ভাগাভাগি হল না। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি তো সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে যে তারা কোনো যুক্ত সরকারে যাবে না! তারা হককে শর্তসাপেক্ষ সমর্থন দেবে মাত্র। তাও দেবে কী না, সন্দেহ!

তাহলে কিরণশঙ্কর এমন একটা কথা বলল কেন, যার জবাবে প্রজা পার্টির একমাত্র বলার থাকতে পারে, হ্যাঁ, আমরা রাজি। আপনারা কংগ্রেসি সরকার বানান। আমরা কথা দিচ্ছি,

আমাদের ফ্রন্ট না-ভেঙে আমরা সরকার ফেলব না। তাহলে কি দিল্লি থেকে কোনো খবর আনিয়েছে কিরণ যে যদি কংগ্রেস তার নিজের ৫৪-র সঙ্গে আরো কিছু মেম্বার জোটাতে পারে, তারা মুসলমান হলেও ওয়ার্কিং কমিটি খুব কিছু আপত্তি করবে না? কিরণ কি বিধান রায়ের ঘোঁটে ঢুকল? নইলে কথাটা ওঠালো কেন কিরণ?

বিধান রায় ভুরু কুঁচকেই জবাব দেন, সেটা তোমারই জানার কথা, শরৎ, তুমিই তো আমাদের অ্যাসেমব্লি পার্টির নেতা।'

শরৎ বোস একটা খোলা হাসিতে মুখ ভরিয়ে দিয়ে বললেন, 'যা হোক। অন্তত জানা গেল যে চাকরিটা আছে। কোনো ড্রাফট করেছেন নাকী হকশাহেব।'

'আপনি, কিরণ, গোঁসাই এরা সব থাইকতে ড্র্যাফট করব আমার হেলে-চাষা? আপনি কন-না, সামসুদ্দিন, ডিকটেশন ন্যাও।'

শরৎ বোস হাত বাড়িয়ে বলেন, 'ম্যানিফেস্টো দুটো পাওয়া যাবে?'

একজন কমবয়েসি বেঁটেখাটো লোক গিয়ে শরৎবাবুর হাতে দুটো ম্যানিফেস্টো দিয়ে আসে। পরে জানা গিয়েছিল, এঁর নাম নীরদ চৌধুরী, শরৎবাবুর রাজনীতি বিষয়ক সেক্রেটারি, বিরাট পণ্ডিত।

শরৎ বোস 'এ ভাবেই তো বলা ভাল'—বলেই তিনি যেন বক্তৃতা দিতে থাকেন, 'অ্যাজ দিস ফেনোমেনন হ্যাজ বিন রিভিল্ড ইন দি রিসেন্ট ইলেকশনস টু দি লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লি অব দি প্রোভিন্স অব বেঙ্গল, কমিউন্যালিস্টিক পলিটিকস অব অল ব্রান্ডস হ্যাভ বিন রিজেকটেড বাই দি ইলেকটোরেট অব অল রিজার্ভড অর আনরিজার্ভড কনস্টিটুয়েনসিস, উই, দি বেঙ্গল প্রভিন্সিয়্যাল কংগ্রেস কমিটি অ্যান্ড দি কৃষক-প্রজা পার্টি ইউনাইটেডলি ডিক্লেয়ার হিয়ার টু ফর্ম এ ক্যাবিনেট আন্ডার দি লিডারশিপ অব মিস্টার এ কে ফজলুল হক ফর দি ওয়েলবিং অব দি পিপ্‌ল অব বেঙ্গল বাই ইমপ্লিমেন্টিং দি প্রোগ্রামস অ্যান্ড প্রোপোজ্যালস অ্যাজ প্রমিজড বাই আস টু দি পিপল অব বেঙ্গল...'

'আরে শরৎ করো কী, একডা সেনটেন্সেই কি পুরা চুক্তি কইয়্যা দিব্যা নি? ফুলিস্টপ তো নাই-ই, কমা দ্যাও, কমা দ্যাও—'

'কমা তো টাইপিস্ট দেয়, দাদা। যখন বাংলা করবে তখন যেন কমাটমা দিয়ে নেয়।' শরৎ বোস বলে যাওয়ার ঝোঁকে বলে যান, 'অ্যান্ড ইন দিস কানেকশনস উই আর রেসপনডিং টু দি ম্যানডেট অব দি পিপল অব বেঙ্গল হুইচ, ইজ এ ক্লিয়ার ভারডিক্ট এগেইনস্ট এনি অ্যালায়েন্স উইথ এনি কাইন্ড অব কমিউন্যালিজম অ্যান্ড দাস পেভস দ্য ওয়ে টুদি ফর্মেশন অব এ ম্যানিফ্যাস্টলি নন-কমিউন্যাল গবর্নমেন্ট অ্যান্ড...'

'শরৎ, ক্ষ্যামা দ্যাও ভাই, ক্ষ্যামা দ্যাও। জজশাহেবের চোখ যে ঘুমে ভাইঙ্গ্যা আসে, শরৎ, ভাইডা আমার, এইবার আসল কথাডা কও'—হকশাহেব দু-হাত তোলেন, আর ঘাড় ঘোরান (যেন) তাঁর বসাটা উলটো হয়েছে, তাঁর পেছনে তাঁর দলবল—আর তারা তাঁকে দেখতেই পাচ্ছে না।

'প্রপারলি কমপেনসেট দি পিপল হু হ্যাভ সাফার্ড ফর লং ফর দেয়ার রিলিজিয়াস আইডেনটিটি।

হকশাহেব হাত তালি দিয়ে ওঠেন, 'ওঃ, শরৎ তোমার ওকালতি প্রতিভায় মুগ্ধ এই অধমের সেলাম গ্রহণ করো,' হকশাহেব দাঁড়িয়ে উঠে শরৎ বোসের দিকে তাঁর কোমর বেঁকিয়ে ডান হাতটা আড়াআড়ি পেটের ওপর রাখেন, 'ওঃ, পেভ দি ওয়ে ফর দি নন-কমিউন্যাল গভর্নমেন্ট

অ্যান্ড কমপেনসেট দি রিলিজিয়াস সাফারার্স।'

'আপনি তো টাইমই দিলেন না দাদা। ফাঁসির আসামি যদি উকিলবাবুর আরগুমেন্টের সময় শুধু গাউন ধরে টানে, তাহলে আরগুমেন্ট কি করা যায়। আপনি নিজে এত বড় অ্যাডভোকেট হয়ে গাউন ধরে টানেন! আপনার গাউন টানলে আপনি কী করতেন?'

'না-ঘুইর‍্যাই বাঁ-হাতে একডা সাড়ে বিরাশি সিক্কার থাবড় কইসত্যাম।'

'কনটেম্পট অব কোর্ট'—জে. সি. গুপ্ত, ব্যারিস্টার এক কোণ থেকে খুব নিচু কিন্তু ভারী স্বরে বলে ওঠেন, তাঁর বাঁ-হাতের আঙুলগুলি চিবুকে।

সেদিকে ফিরে হকশাহেব বলে ওঠেন, 'ইয়োর অনার, আই প্লিড গিল্টি মোস্ট হ্যাপিলি অ্যান্ড ওয়েট ফর দি পানিশমেন্ট। বাট স্যার, আই উইল এগেইন অ্যান্ড অলওয়েজ স্ল্যাপ এ ব্ল্যাবলার হোয়েন মাই অনার ইজ হিয়ারিং ল।'

সবাই হাত তালি দিয়ে উঠলেন—বেশ একটা মজার নাটক হল।

'এই নাট্যরস কি আমরা এড্ডু আস্বাদ কইরব্যার পারি না?' মৈমনসিঙের জব্বর পালোয়ান জিজ্ঞাসা করেন। হকশাহেব বসতে-বসতে বলেন, 'এই ধরেন মিয়াবিবির সওয়াল। এতগুলা উকিল-ব্যারিস্টার এই অ্যাডডা ঘরে জিয়াল মাছের নাগাল ভাইসত্যাছে, এ গ এক-একজনের আয় দিনে পঞ্চাশ হাজার টাকা', ফজলুল হক বসে পড়েন।

যোগেন বলে ওঠে, 'জনাব, শাহেব গ হাত মিয়্যা উদ্ধার যদি-বা পান, উকিল-ব্যারিস্টারের হাত থিয়্যায় কুনো উদ্ধার নাই। কংগ্রেস আর প্রজা পার্টি মিল্যা তো অ্যাড্ডা সনসার হইল। সেই খবরডা তো পাবলিকরে দিব্যার লাগে।'

'পাবলিক কেডা?' পালোয়ান জিজ্ঞাসা করে।

'ভোটার। ভোটার। তাইনর‍্যা ভোট দিলে-না মেম্বার!'

'অ। ভোটার? যাগ জনসাধারণ কয়?'

'ঐ যার যা পছন্দ, তাই বইল্যা ডাকে।'

'তা ঐ আমাগ জনসাধারণ ইংরাজি জানে?'

'বাংলায়ও হবে, বাংলায়ও হবে।'

'আরে, বাংলাডা কেউ কইয়্যা দ্যাও-না', হকশাহেব বলে ওঠেন।

'আমি বলছি'—টানা লম্বা রোগা চেহারা। গায়ে পাঞ্জাবি, পরনে কোঁচা ছাড়া ধুতি। কংগ্রেসের হয়ে জিতে এসেছে আসানসোলের শ্রমিক আসন। কমিউনিস্ট, কংগ্রেসের ভিতরে। বঙ্কিমের গলা গমগমিয়ে ওঠে।

'শরৎ বোস মশায় যে-প্রস্তাবটা লিখেছেন, তাতে ওঁর ধারণা, সাপটি গর্তে গিয়ে নিশ্চয় মরেছে কিন্তু তাঁর হাতের লাঠিটা কোথায় ভেঙেছে তা দেখতে পাচ্ছেন না।'

'কথাখান তো সাপ মরব, লাঠি ভাঙব না। কথা ঘুরান ক্যান।'

'আমি ঘুরাইনি। শরৎবাবু ঘুরিয়েছেন। বলেছেন, ভোটে প্রমাণ হয়ে গেছে আমাদের জনসাধারণ এমন একটা সরকার চান, যে সরকার কোনো ধর্মের সরকার নয়। কিন্তু কোনো ধর্মের জনসাধারণের প্রতি যদি অবিচার হয়ে থাকে তা সংশোধন করা হবে।' বঙ্কিমবাবু থামলেন।

কিরণশঙ্কর একটু চাপা স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ তাতে ক্ষতি কী হল? হিন্দুর ওপর অন্যায় হয়ে থাকলে সরকার হিন্দুদের দেখবে। মুসলমানদের ওপর অন্যায় হয়ে থাকলে মুসলমানদের দেখবে।' এতক্ষণ যাঁরা কথা বলছিলেন তাঁদের সবার গলাই ছিল উঁচুতে—শরৎ বোস, হকশাহেব, যোগেন, পালোয়ান, বঙ্কিম মুখার্জি। এক জে সি গুপ্ত চাপা গলায় রসিকতা করেছিলেন, আর

এই কিরণশঙ্কর রায় চাপা স্বরে একটা ভাবনার কথা বললেন।

বঙ্কিমবাবু একটু হেসে বললেন, 'একেই তো বলে ধরি মাছ না ছুঁই পানি। কংগ্রেস ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সংরক্ষিত মুসলিম আসনে জেতার আশায় আর জিতেছেও তো, পুরো নির্বাচনই করল কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ডের বিরুদ্ধে। যাতে সব হিন্দু ভোট পায়। কিন্তু সংরক্ষণ নিয়ে কোনো কথা না-বলে। মাছও ধরল, হাতও শুকনো রইল।'

'বেশ। তার সঙ্গে শরৎবাবুর ড্রাফটের মিল কোথায়? আমরা তো জানি, তাঁর সঙ্গে মানে প্রদেশ কংগ্রেসের সঙ্গে কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের নীতি নিয়ে বিরোধই ছিল,' কিরণশঙ্কর বঙ্কিমবাবুকে বললেন।

'আমার সন্দেহ—শরৎবাবু নন—কমিউন্যাল বলতে কমিউন্যাল মুসলিম লিগকে বুঝিয়েছেন আর অপ্রেসড বলতে মুসলমানদের বুঝিয়েছেন।'

'তাতে কি আপনার আপত্তি আছে?'

'হ্যাঁ, আছে। এই ভোটে নিশ্চয়ই প্রমাণ হয়েছে, বাংলার কৃষক ধর্মীয় স্লোগানে ভোলে না। তার সঙ্গে-সঙ্গে এও তো প্রমাণিত হয়েছে, মুসলিম লিগের শক্তিও কিছু কম নয়।'

'তাহলে কী করতে হবে।'

'জনসাধারণকে জনসাধারণই বলুন। হিন্দু-মুসলমান বলার দরকার নেই।'

'কোথাও তো বলা হয়নি।'

'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না। কমিউন্যাল, নন-কমিউন্যাল বলতে কাকে বলছেন সেটা কি কেউ বুঝবে না? তার চাইতে 'শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত' বলুন। তারাই তো সাপ মারার সেই ডান্ডা যা ভাঙবে না।'

হকশাহেবের জনসাধারণ ও তুলসী গোঁসাইয়ের বক্তৃতা

৩৮

'না, না, না—এই সব অ্যানো না। শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত কইলে কী বেশি বুঝায়? কৃষক বললে কি প্রজারে বুঝায়? জমিদাররা কি মধ্যবিত্ত? গরুর গাড়োয়ান কি শ্রমিক? উকিল-ব্যারিস্টাররে কী ডাইকব্যা? চালু নাম চালু রাখো, নতুন সব নাম দিয়্যা বিভ্রাট বাধাইও না,' হকশাহেব দু-হাত মাথার ওপর তুলে এমন ঘোরাতে থাকেন যেন আচমকা ধুলোর ঘূর্ণিতে পড়ে গেছেন, চোখমুখ বাঁচাচ্ছেন।

বিধান রায় বললেন, 'আরো কিছু বাকি থাকল?'

শরৎ বোস বলেন, 'ঐ প্রোগ্রামের আয়টেমগুলো দিতে হবে।'

'প্রোগ্রামের আয়টেম আবার কী?'

'মানে গবমেন্ট কোন-কোন কাজ আগে করবে—'

'কোনো কাজই তো করা হয়নি। তার আবার আগে পরে কী? যে কাজ করবেন, সেটাই কাজ হবে। দেখুন—'

'ডাক্তার শাহেব, আমি তো ভোটে কয়্যা দিচ্ছি—জমিদারি উচ্ছেদ হচ্ছে আমাগো এক নম্বর কাজ।'

তুলসী গোঁসাই ইংরেজিতেই চিবিয়ে বলে ওঠেন কিছু কিন্তু ওঁর উচ্চারণ এত শাহেবি যে কেউই কিছু বুঝে উঠতে পারেন না।

'অ্যারে এর লগেই তো জমিদারি উচ্ছেদ চাই সর্বাগ্রে। দ্যাহো, এই বাড়িডা তো একডা খাশ মেমশাহেবের বাড়ি। না? দ্যাহো, কতগুলা বিলাত ফেরত এক লগে বইসচ্ছে। তাতে তো বাতাস কম পড়ার কথা। যারা বিলাত যায় নাই, অথচ ইংরাজি কয় য্যান কাল বৈশাখীতে কচি আমের মতন। কিন্তু তুলসী গোঁসাই একমাত্র মানুষ যার ইংরাজি এক নিজেই কয়, নিজেই শোনে'—হকশাহেব বলে ওঠেন, তারপর নিজেই হেসে ওঠেন। তুলসী গোঁসাইয়ের ফরসা মুখ, এই ভিড়ে একটু বেশিই ফরসা দেখাচ্ছিল, লালচে হয়ে উঠেছিল। তাঁর ঠোঁট একটু নড়ে কিন্তু কিচ্ছু শোনা যায় না।

'এই ধাঁধাডার কেউ জব দিবার পারো?' হকশাহেব জিজ্ঞাসা করেন।

'পারি', বলে যোগেন হাসিমুখে তাকিয়ে থাকে যেন আদেশের অপেক্ষায়।

'অ, মণ্ডল, ভোটে না-হয় জিতচ্ছই, তাই বইল্যা এই ধাঁধাডাও পারবা? পারো তো কও।'

'সব বিলাতফেরতেরই মক্কেল আর খরিদ্দার তো দেশি মানুষ। কথা না বুইঝলে শরৎ বোসরেও মোহর দিব না, বিধান রায়রেও ভিজিট দিব না। গোঁসাই শাহেবের না আছে মক্কেল, না আছে খরিদ্দার। ওনার কথা তো শুনে এক চাষাভুষা। তাগো তো কুনো ভাষাই নাই। ইংরাজি কইলে যা শোনে, জার্মান কইলেও তাই শোনে। তুলসীবাবু তাই ঐ বিড়বিড়াইয়া সাপের মন্ত্র পড়েন,' যোগেনের তো কথার পিঠে কথা বলার মাপ একেবারে গণেশ জননীর সন্তান প্রসবের মত নিখুঁত, নিবেদ্না।'

একটা হাসির কোরাস তৈরি হয়। সেটা হঠাৎ একটা ঢেউয়ের মত উঠতেই থাকে, ভাঙে আর না। শেষে কলকল করে যেন জলে ফিরে যায়।

শরৎ বোস মিটিংটা গোছাতে বলেন, 'দাদা, ইন কার্টেসি টু তুলসী, এ নিয়ে আর কথা তুলবেন না। রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিটা প্রথম যাক আর তারপর চিরস্থায়ী বন্দবস্ত উচ্ছেদ করুন।'

তুলসী গোঁসাই আঙুল তুলে জানান তিনি কিছু বলবেন। বলেন, 'আমি ইংরেজিতে বলতেই সুবিধে পাই। কিন্তু এই অট্টহাস্যের পর সাহস পাচ্ছি না। থ্যাঙ্ক ইউ অল ফর দি লাফ অ্যান্ড থ্যাঙ্ক ইউ স্পেশ্যালি মিস্টার মণ্ডল। কিন্তু আমারও এখন মক্কেল ও খদ্দের দরকার। আমার পজিশনটার ব্যাখ্যা দিতে হবে তো। সেটা দেয়া আমার পক্ষে সুবিধের হত যদি আমার নিজের এমন একটা অভিশপ্ত জমিদারি না থাকত। কিন্তু আমার জমিদারি থাকার সুবিধে তো কংগ্রেসও ভোগ করে। আইন-অমান্য শুরু হতেই কংগ্রেসে আমার বন্ধুরা আরামবাগ থেকে দল পাঠালেন আমার জমিদারিতে নো-ট্যাক্স প্রচারে। কংগ্রেসিদের জমিদারি আর খাশমহলের জমি ছাড়া জমিদারি উচ্ছেদের বা নো-ট্যাক্স আন্দোলনের জায়গা তো কংগ্রেসের নেই। নিজের কথা দিয়েই কথা বলার সুবিধে বলে আমি নিজের কথা আর আমার দলের কথা বলছি। 'জমিদারি তুলে দাও'—এই দাবিটা হয়ে উঠেছে সবচেয়ে অ্যাভেলেবল,' তুলসী, শরৎ বোসের দিকে তাকালে তিনি বলে দেন, 'হাতের মোয়া', তুলসী বুঝে উঠতে পারেন না কথাটা ঠিক কী না, তিনি বলেন, 'কাভার' বলে তিনি আবার শরৎ বোসের দিকে তাকান, শরৎ বোস বলে দেন, 'পালাবার গর্ত,' তুলসী বলে যান, 'যাতে আমাদের আরো জটিল ও কঠিন রাজনীতি না করতে হয়। আমাদের এই ভোটাভুটি, সরকার তৈরি করা—এসবই কিন্তু আমাদের সারা ভারতের জন্য স্বাধীনতা আদায়ের আন্দোলনের ভিতরে পড়ে। সেটা ভুলে যাবেন না। চিরস্থায়ী বন্দবস্ত তুলে দাও—এ-কথাটা তো রাজনীতি দিয়ে বলতে হবে। ভারতের সব জায়গায় তো চিরস্থায়ী বন্দবস্ত

নেই। বেশিরভাগ জায়গাতেই নেই। বাংলা প্রদেশ, ওড়িশার উত্তর আর বিহারের পুবের কোনো-কোনো অংশ ছাড়া কোথাওই নেই। এই বাংলা প্রদেশেরও সব জায়গায়ই নেই। শুধু ইস্টবেঙ্গলের পাঁচটি আর সেন্ট্রাল বেঙ্গলের পাঁচটি জেলার একটা ল্যান্ড টেনিয়রকে সারা ভারতের রাজনীতি বলে গুলিয়ে ফেলবেন না। এটা তো কোনো রাজনৈতিক বিষয়ই না। আপনারা সরকার তৈরি করুন আর একটা আইন করে জমিদারি তুলে দিন। আমরা তো ক্ষমতার জন্য আন্দোলন করছি। ইংরেজ সরকার তার রেসিডিউয়্যাল পাওয়ার দিয়ে আমাদের দেশের মানুষদের জেলখানায় আটকে রেখেছে, আন্দামানে, বকশায়, দেওলিতে এক্সাইলে রেখেছে। বাংলার প্রথম এই লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লি তো সবার আগে বলবে—তোমার রেসিডিউয়্যাল পাওয়ার তো আমার ফান্ডামেন্টাল পাওয়ারের বিরুদ্ধে যেতে পারে না। রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে হবে—এর চাইতে ইমেডিয়েট রাজনৈতিক প্রোগ্রাম আর-কিছু হতে পারে না।'

তুলসী গোঁসাইয়ের বক্তৃতায় যেন মিটিংটা আচ্ছন্ন হয়ে থাকল। শরৎ বোস শুধু আপনমনে বলে উঠলেন, 'ওয়ান্ডারফুল! কথা-বলার জোর যে এত, এক তুলসীর বক্তৃতা শুনলে বোঝা যায়।'

সভার আচ্ছন্নতা সম্পূর্ণ কাটার আগেই প্রজা পার্টির সম্পাদক সামসুদ্দিন জিজ্ঞাসা করেন, 'সরকারটাকে তৈরি করা ও টেঁকানোটাই তো এখনকার সবচেয়ে বড় কাজ? নাকী? এটা আপনারা সাফ করে বলেন।'

কেউই কোনো জবাব না-দেয়ায় সামসুদ্দিন নিজেই জবাব দেন, 'রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিকে প্রথম ও প্রধান দাবি করলে গভর্নর তো ৯৩ ধারায় সরকার ভেঙে দেবে। সেটা তো হবে রাজনীতিরই পরাজয়। আমরা ভোট করলাম কিন্তু সরকার রাখতে পারলাম না। আরো আছে। যাদের কাছে কথা দিয়ে ভোটে জিতলাম, তাদের কিছু কাজ আমরা করতে চাই। সেটা জেনেশুনেই আমরা সরকার করতে পারি। সেটাও একটা রাজনীতি হতেই পারে। কংগ্রেস কি সেটাই করতে চায়? এটাকে একটু সোজা করে বলেন। আমরা সোজা করে বলছি—আমাদের রাজনীতি তা নয়। সেই কাজ করার মত পরিবেশও চাই।

একটু চুপচাপের মধ্যেই নলিনী সরকার বলেন, সে-কাজ করতে বাধা কোথায়? কথা তো হচ্ছে একটা জয়েন্ট প্রোগ্রাম নিয়ে। প্রজা পার্টি কি রাজবন্দীদের মুক্তি চায় না?'

হকশাহেব গুমরে বলেন, 'তারা আমাদের ভাই ছেলে আর তাদের আমরা জেল থেকে ছাড়াতে চাব না? চলো, আমি এখনই প্রেসিডেন্সি জেলে গিয়্যা তালা ভাঙতে রাজি। চলো, কেডা যাবা?' হকশাহেবের স্বরে যে একটা প্রতিকারমুখী অস্থিরতা থাকে, তাঁর গলায় সেটা এল না। বরং যেন একটু কূটনীতিই শোনা গেল। বোঝাই গেল তিনি জানেন, এ ভাবে রাজবন্দীদের মুক্তি আদায় করা যায় না।

'তাতে রাজবন্দীর সংখ্যা কিছু বাড়তে পারে মাত্র। একজনও কমবে না।' শরৎ বোস একটু হাসি মিশিয়ে বলেন, যেন বাতাসটাকে একটু হালকা করতে।

প্রজা পার্টির তসমুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'সাপের গর্তডা যদি চেনাই থাহে শরৎদা, তাহাইলে আর ঝোপ খোঁজনের কাম কী?'

বিধান রায় হঠাৎ কিরণশঙ্করকে জিজ্ঞাসা করে বসেন, 'এরা যে সাপের কথা বলছে, সাপটা কে?'

কিরণশঙ্কর হেসে ফেলে বলেন, 'এ-কথা, সে-কথা, দে বুড়ি আলাপাতা। দেখুন ডাক্তারের চোখে পড়েছে ঠিক। ডাক্তার রায় জিজ্ঞাসা করছেন সাপটা কে?'

'সাপের শঙ্খ লাগছে ডাক্তার। মেটিং মেটিং। ব্রিটিশ গবমেন্ট আর জমিদাররা। আমরা

কই—মারো দুইডারে লাঠির এক বাড়িতে। আপনার পার্টি কয়—আরে শঙ্খ লাগা সাপ তো থাকবেনেই, শঙ্খ একবার লাগলে কি আর ছাড়ান যায়। কুত্তাগুলাক দেখেন না? থাউক অরা জট পাকাইয়্যা, আমরা চলো, রাম-লক্ষ্মণরে ডাইক্যা আনি গা। কই আছেন রাম-লক্ষ্মণ? ক্যা? লঙ্কায়।' হকশাহেব বলেন।

বিধান রায় বলে ওঠেন, 'আমাকে মাপ করবেন হকশাহেব। এত বড়-বড় সব অসুখ বুঝি, কিন্তু আপনার কথা বুঝি না। কোথাও বুঝি না—কর্পোরেশনে না, কাউন্সিলে না। প্রথমে ভাবতাম বোধহয় ভাষার জন্য বুঝি না। বাঙাল আর ঘটিদের ভাষা তো আলাদা। কিন্তু আপনি তো ভোলক্যানোর স্পিডে ইংরেজি বলেন। তাও বুঝি না।'

বিধান রায়ের কথা শেষ হতেই কিরণশঙ্কর একটু সরু গলায় বলে ওঠেন, 'ডাক্তার রায় সাহস করে বলে ফেললেন, তাই বলছি। হকশাহেবকে নিয়ে এই এক অসুবিধে। তিনি সব গুলিয়ে দিয়ে এমন করে বলেন যেন কথাটা সত্য। অথচ তিনি যে গল্প বলছেন—সেটা আর কারো মনে থাকে না। এই যে উনি বললেন, আমাদের সবার সামনেই বললেন—ব্রিটিশ গবমেন্ট আর জমিদারদের স্বার্থ এক হয়ে গেছে। হয়তো কোনো-কোনো জমিদার ব্রিটিশ গবমেন্টের কর্তাভজা। কিন্তু বাংলার জমিদাররা ছাড়া আমাদের ন্যাশন্যাল মুভমেন্ট হত? ইউনিয়ন বোর্ডে যা একটু দেশগাঁয়ের উন্নতি হয়েছে, তা হত?'

'হ। কথাডা তো সত্যি। কিন্তু এডা তো আমার রক্তের দোষ। আব্বাজান ওয়াজেদ আলি শাহেবের সওয়ালের গল্প শুনতে-শুনতে জিলা জজের মেমশাহেব একদিন এজলাশে আইস্যা বইস্যা ছিলেন। আমিও তো বুঝি না কিরণ, আমার কথা মাইনষে বিশ্বাস করে ক্যান? তা আমি অ্যাডডা মীমাংসা পাইছি। শুনো। তোমরা সবাই ছোট-ছোট খাটো-খাটো কথা কও। বাড়ির কর্তাগো নাগাল। হ্যাঁ, এইডা হইব। না, ঐডা হইব না। আর আমি কই সব অসম্ভব কথা। দিব চিরস্থায়ী বন্দবস্তরে নোয়াখালির দরিয়ার পানিতে ফ্যালাইয়া। দিব রাইটার্সরে লালদিঘিতে ফ্যালাইয়া। আমার চাষাভুসার পাছায় পট্টি নাই, প্যাটে ভাত নাই। জমিদারবাবুর লগে হিশাবপত্তর শুইন্যা-শুইন্যা অয় তো অ্যাল্যায়া আছে। জিন-হুরী-পরী-এইসব লম্বাচওড়া কথা ছাড়া কিছু আর তার কানে ঢোকে? আর, তুমি কও মিটিং ডাইক্যা, আমি কই আইলে বইস্যা এক হুঁকায় তামাক টাইন্যা।'

শরৎ বোস বলে ওঠেন ডান হাত তুলে পাঁচটি আঙুল ছড়িয়ে, 'ওয়েল, দাদা, উই অল নো, দ্যাট হাউ এভার উই ট্রাই, উই ক্যান্ট বি এ ফজলুল হক। কিন্তু আমাদের কংগ্রেসের তো বড় পরিবার, অনেক জ্যাঠা-কাকা, জ্ঞাতিগুঁতি। রাজবন্দীদের মুক্তি চাইটাকে প্রোগ্রামের প্রথমে না-রাখলে চলবে না। তাতে গভর্নর ৯৩ করলে ৯৩, সরকার না-হলে হবে না। তোমাদের সঙ্গে এগ্রিমেন্ট না হলে, আমরা পাবলিককে কিন্তু এই কথাই বলব, দাদা, যে প্রজা পার্টি রাজবন্দীদের মুক্তি চায় না।'

'সে তো আমরাও বলব যে কংগ্রেস চিরস্থায়ী বন্দবস্ত বহাল রাখতে চায়। আর আপনাদের কাউন্সিলের ভোটেও তো দশ বছর আগে থেকে তার প্রমাণও আছে। কিন্তু কথাটা আপনারা এত্দিন পার খোলসা করলেন কেন?' সামসুদ্দিন বলে ওঠে।

'সামসুদ্দিন, জজশাহেব যদি শুনানির দিন ঠিক করে তাহলে সেদিনই তো মুখতিয়ার তার কথা বলবে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি পাকা করে ফেলেছে যে-কোনো প্রদেশেই কোয়ালিশন সরকারে যাবে না। বেঙ্গলে যদি তারা প্রদেশ-কংগ্রেসকে অনুমতি দেয় কোয়ালিশন করতে, তাহলে যুক্তপ্রদেশে মুসলিম লিগের সঙ্গে কোয়ালিশন ঠেকাবে কী করে? আমরা অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস পলিটিকসের জাঁতাকলে পড়ে গেলাম।'

'শরৎ তোমরা থাকতে, রাজা-মহারাজাদের কথা বাদ দাও, তোমাদের মত বাংলার মণিরত্ন থাকতে, এখনো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বটগাছের মতন আছেন, এতগুলো আসন আমরা মুসলিম লিগরে হারাইয়্যা আনলাম। তাও তোমরা আমাদের সঙ্গে একপাতে বসবা না? কংগ্রেসও কি মুসলিম লিগের মতন অবাঙালির স্বার্থ দেখার দল হইয়া গেল? তোমরা আমারে সেই নেকড়ে গুলানের হাঁ-মুখের সামনে ফেল্যায়া দিল্যা? শরৎ, এটাই কিন্তু আমাদের শেষ সুযোগ ছিল। শরৎ, চলো-না আমরা সবাই মিল্যা কবির কাছে যাই, তিনি অ্যাহন কুথায়? জোড়াসাঁকোয় না শান্তিনিকেতনে? শরৎ? যাবা?'

'কবি তো তাঁর পজিশন পরিষ্কার করে দিয়েছেন পাঁচ বছর ধরে। উনি কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ডের বিরুদ্ধে। উনি রিজার্ভেশনের বিরুদ্ধে। উনি কাস্ট হিন্দুদের কালচার্যাল সুপিরিয়রিটির পক্ষে। উনি এ-ব্যাপারে কী করবেন? আমরাই-বা কী বলব?' তুলসী গোস্বামী জানাল।

মিটিংটা শেষ হয়ে গেল কী না সেটা সবাই পাকাপাকি বুঝে ওঠার আগেই নলিনী সরকার খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন, তাঁর কোঁচা পকেটে গুঁজতে-গুঁজতে যেন এতক্ষণ ধরে তাঁর একটা জরুরি কাজ পড়ে আছে।

তাঁর এই প্রস্থানেই মিটিংটা ভেঙে গেল।

প্রায় সকলেই দাঁড়িয়ে। কেউ একজন ভিড়ের ভিতর থেকে বললেন, 'রাজবন্দী আর জমিদারদের সিরিয়্যাল নাম্বার নিয়ে মত পার্থক্যের কারণে প্রজা পার্টি আর কংগ্রেসের সরকার হল না—এটা কি লোকে বিশ্বাস করবে?'

বিধান রায় একটু হাসি লাগিয়ে দরজার দিকে এগচ্ছিলেন। মাথায় তাঁর সমান বঙ্কিম মুখার্জি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কংগ্রেস কী স্টেটমেন্ট করবে?'

বিধানবাবু বললেন, 'ঐ যা ঠিক হল।'

'কী ঠিক হল?'

'যে গবমেন্ট হবে না।'

'গবমেন্ট করার লোকের কি অভাব হবে? বলুন—কংগ্রেস গবর্মেন্ট করবে না।'

'ঐ! যে-ভাবেই বলুন।

'নাকী কংগ্রেস অন্য কোনো কমবিনেশন করতে চায়?'

'না। নতুন কমবিনেশন মানে তো মুসলিম লিগের সঙ্গে।'

'কংগ্রেস যে মুসলিম লিগের সঙ্গে কোথাও কোনো গবমেন্ট করবে না—এটা কিন্তু কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি কোনো প্রস্তাবে বলেনি।'

'বলেনি? তাহলে বলে দেবে।'

'সে তো ভবিষ্যতের কথা। বলার আগেই তো ইউনাইটেড প্রভিন্সে আপনারা লিগকে মন্ত্রিসভায় নিলেন না। এখানেও গেলেন না।'

'এখানে তো লিগ না। এখানে তো হকশাহেবের পার্টি। কী যেন নাম!'

'যে নামই হোক, এঁরাও কিন্তু মুসলমান।'

'হ্যাঁ। সে কী করা যাবে'

'কংগ্রেস কি মুসলমানদের থেকে নিজেদের আলাদা করে নিচ্ছে না?'

'না। না। কংগ্রেসে তো হিন্দু-মুসলমান নেই। শুধু কংগ্রেস আছে। কংগ্রেসে কত মুসলমান নেতা আছেন। ন্যাশন্যালিস্ট।'

'সেটা বললেই লোকে বিশ্বাস করবে? খিলাফৎ আর বেঙ্গল প্যাক্ট ভাঙিয়ে আর মুসলমানদের

ঠকানো যাবে না। আমি তো কংগ্রেসের নেতা। কংগ্রেসপ্রার্থী হিশেবে ভেটে জিতে এসেছি। আমিই তো বিশ্বাস করছি এখন যে কংগ্রেস এমনি আলাদা লোক হিশেবে কোনো মুসলমানকে খাতির করতে পারে, কিন্তু কোনো সংগঠিত মুসলিম শক্তিকে স্বীকার করবে না—সে লিগই হোক আর প্রজা পার্টিই হোক।'

'ওসব হিন্দু-মুসলমানের ব্যাপার নয়। ওদের সঙ্গে আমাদের মত মিলছে না। ওরা তো জমিদারি তুলে দিতে চায়। জমিদারি তুলে দিলে আমাদের কংগ্রেসে আর আসবে কে? কংগ্রেসি মানেই তো জমিদার। আপনিও তো বললেন কংগ্রেস। আপনিও জমিদার নাকী?'

'সে আমার বাপ-ঠাকুরদাদারা হয়তো। আমি নই। আপনারও তো জমিদারি আছে, ডাক্তার রায়, টাকিতে।'

'সে তো যারা ওখানে আছে, তাদের কাজে লাগে। উঠে গেলে, যাবে। কিন্তু জমিদারিই যাদের প্রধান বা একমাত্র আয় তারা কী তা মানতে পারে?'

'শুধু জমিদারদের বাঁচাতে মুসলমানদের আলাদা করে দেবেন? কিন্তু বাংলায় তাহলে হবে কী? এখানে তো প্রতি তিনজনে দুজন মুসলমান।'

'সে আমরা কী করব? একটা নীতি নিয়ে তো চলতে হবে।'

'আপনারা কিন্তু মুসলমানদের মুসলমান করে দিচ্ছেন। এরপর আপনারা ডাকলেও তারা ফিরবে না। ইউনাইটেড প্রভিন্সে লিগ তো কোনো ক্ষমতা দেখাতে পারেনি। তাই তারা অচ্ছুৎ। বাংলায় হকশাহেব লিগ থেকে বেরিয়ে এসে একটা ক্ষমতা দেখালেন, সেই কারণে তিনি এখানে অচ্ছুৎ।'

'সে ভাবে ভাবছেন কেন?'

'ঘটনা যা হল তাতে আমার মত করেই যদি কংগ্রেসের কেউ-কেউ ভাবেন তাঁদের কি দোষ দেয়া যায়?'

'সে তো একটা ডিসিশন হয়ে গেছে।'

'বাংলার মানুষজন ভাবতে শুরু করছিল—হকশাহেব প্রধানমন্ত্রী, শরৎ বোস হোম মিনিস্টার আপনি হেল্‌থে, নৌসেরা আলি শাহেব আইনে—'

'মন্ত্রিসভাও তৈরি করে ফেলেছেন?'

'আমি করিনি। বাংলার জমিদাররাও ভেবেছে, চাষিরাও ভেবেছে। হকশাহেব, শরৎ বোস, নৌসের আলি বা আপনাকে কেউ কমিউন্যাল ভাবে না। বরং হিন্দুরা হকশাহেব-নৌসের আলিকে ভরসা করেন, মুসলমানরাও আপনাকে-শরৎ বোসকে ভরসা করে। সেটাই বোধ হয় কাল হল। বঙ্গজননী একটু বেশি রত্নপ্রসবা। তাই তিনি গঙ্গা পেলেন না। আপনারা এই কথাটুকু মানলেন না—কংগ্রেসে যেমন গোঁড়া হিন্দু ও স্বদেশী দুই-ই আছেন, লিগেও তেমন গোঁড়া মুসলমান ও স্বদেশী আছেন।'

'নিশ্চয়ই আছেন। এ দুটো তো শাদাকালো ভাগ নয়। ডাক্তারিতে আমরা বলি কনট্রা-সিনড্রোম। তা তো নয়। আপনার নামটা কিন্তু জানা হল না। জেনেও লাভ নেই। প্রপার নেমস আমার মনে থাকে না।'

'তাহলে যখন জানার তখনই জানবেন। আমি কিন্তু আপনাকে জেনেই কথা বলছি।'

বিধান রায় খ্যাতিমানের বিড়ম্বিত হাসি হাসতেই বঙ্কিম মুখার্জি বললেন, একটা আঙুল উঁচিয়ে, 'না, না, ডাক্তার হিশেবে নয়। আমি কংগ্রেসের এমএলএ। আপনি কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির প্রেসিডেন্ট। এ সিদ্ধান্তের দায় আপনার।'

নলিনী সরকার মাঠে নামেন

নলিনী সরকার মিটিং থেকে বেরিয়ে কারো সঙ্গে কোনো কথা না বলে সোজা তাঁর অফিস, হিন্দুস্থান ইনসিয়োরেন্সে চলে আসেন। কোনো দিকে না তাকিয়ে তিনি তাঁর ঘরে ঢুকে যান। তাঁর সেক্রেটারি একটা খোলা খাতা নিয়ে পেন্সিল তুলে দাঁড়িয়ে থাকেন।

৩৯

'দেখো তো ঢাকার হবিবুল্লাহকে ট্রাঙ্ককল করা যায় কী না।'

হাবিবুল্লাহ ঢাকার নবাব। মুসলিম লিগের প্রায় সবচেয়ে বড় নেতা। এবার তাঁর ১২ জন আত্মীয়কে নিয়ে জিতে আইনসভায় এসেছেন। তিনি মুসলিম লিগের প্রাদেশিক কমিটির প্রেসিডেন্ট। ভোটের আগে জিন্নার পরামর্শে তাঁরা এক ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি খাড়া করে ফজলুল হককে পুরতে চেয়েছিলেন। হকশাহেব প্রথমে নিমরাজি ভাব দেখিয়ে লেজের এমন ঝটকা মারলেন যে ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি একেবারে ছত্রখান। পটুয়াখালিতে নাজিমুদ্দিনকে এমন চোবানো চুবিয়েছে যে নাজিমুদ্দিনের এখনো শ্বাস পড়েনি। হ্যাঁ, মুসলিম লিগ অনেক সিট পেয়েছে, তাই বলে তো আর হবিবুল্লহ মন্ত্রী হতে পারবেন না। হতে হলে লিগকে হয় কংগ্রেসের সঙ্গে, না-হয় প্রজাপার্টির সঙ্গে সমঝোতা করতে হয়। তেমন সমঝোতা যদি হতেই পারত, তাহলে লঙ্কাকাণ্ডও হত না। কুরুক্ষেত্রও হত না।

সেক্রেটারি এসে বলেন, 'আপনি কি স্যার এখন অফিসে বসবেন?'

নলিনী সরকারের মুখটা ঝুলে গেছে। তিনি যে বেশিরভাগ সময় মাথা হেঁট করে থাকেন, তাতে আগে তাঁকে চিন্তাশীল মনে হত, এখন মনে হয়, ঝিমুচ্ছেন নাকী। অথচ ওঁর প্রায় স্থবির চোখমুখে কী একটা গোপন ব্যস্ততা ধরা পড়ে যায়। ঠিক ব্যস্ততাও নয়—যেন গোপন আত্মরক্ষা। হুলো বেড়ালের মত—নিজের লক্ষ্য সম্পর্কে নিশ্চিত আর সেখানে পৌঁছুতে যে অনবরত দাঁড়ানোর জায়গা, বদলাতে হয় সেই জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা তাঁর শরীরের ভঙ্গিতে এসে গেছে। ফুটবল-খেলোয়াড়দের মত তিনি যেন জানেন—কখন দৌড়তে হয়, কখন পাস দিতে হয়, কখন পাস নিতে হয়, কখন কর্নার করে গোল ঠেকাতে হয়, কখন অফসাইড হয়ে যেতে হয়, আর কখন তিন খুটির ভিতর নির্ভুল শর্টটা নিতে হয়। ফুটবল-খেলোয়াড় আর হুলো বেড়ালের দৃষ্টান্ত সমার্থক নয়। কিন্তু বেড়ালটাকে খুলনা-বরিশালের ঘ্যাঙো বাঘ ভেবে নিলে হয়ত সমার্থকতা আসতেও পারে। এলে আসুক।

নলিনী সরকার নিজের সাফল্যে পূর্ণ বিশ্বাস করেন। নিজের বাইরে কাউকে বিশ্বাস করেন না। তাঁকেও যে কেউ বিশ্বাস করে না—সেটা তিনি একটু বেশিই জানেন। তিনি বিশ্বাস করেন না যে রাজবন্দীদের মুক্তি আর জমিদারি উচ্ছেদের কোনটা আগে তাই নিয়ে মতপার্থক্যে কংগ্রেস ফজলুল হককে সমর্থন দিল না। এমনকী শরৎ বোস যে সত্যি কথাটা বলল ওয়ার্কিং কমিটি কোনো প্রদেশেই যুক্ত সরকারের পক্ষপাতী নয়, তাই প্রদেশের হাত-পা বাঁধা, সেটাও তিনি বিশ্বাস করেন না। নলিনী সরকারের এটাই সবচেয়ে বড় জোর ও বড় অসুখ যে নিজেকে না জড়িয়ে কোনো ঘটনা তিনি বুঝতে চান না, পারেনও না। তিনি তাই নিশ্চিত জানে যে ফজলুল হক তাঁকে অর্থমন্ত্রী করবে এটা কংগ্রেস চায় না। কোন কংগ্রেস—ওয়ার্কিং কমিটি, না প্রদেশ, না শরৎ বোস, না গান্ধী, এটা তাঁর জানার কোনো ইচ্ছে নেই।

ফোন বেজে উঠতেই নলিনী সরকার তুলে বলেন, 'নবাব শাহেবকে দিন। আমি কলকাতা থেকে নলিনী সরকার বলছি।'

'নবাব শাহ তো আলাদা ঘরে নিদ্ যাইতেছেন। ফোন ধইরতে হলে তো তাঁক জাগাইয়্যা এই ঘরে ডাইকব্যার লাগে।'

নলিনী সরকার বিরক্ত হন—করবে পার্লামেন্টরি পলিটিকস আর দুপুরে ঘুমুবে! ফোনটোনের জন্য একটা সেক্রেটারিও রাখবে না—ঢাকার বাঙাল চাকর দিয়েই কাজ সারবেন। এই বিরক্তি সত্ত্বেও তিনি একবার ভেবে নিলেন—নবাবশাহেবকে দিবানিদ্রা থেকে তুলে ফোনের ঘরে টেনে আনাটা আদবকায়দা সম্মত হবে কী না। কিন্তু স্বার্থ তো নবাবশাহেবেরও। ঢাকার ফোন পাওয়া কি সোজা? না হলে তো হাতচিঠিতে বিস্তারিত লিখে লোক পাঠাতে হয় আজ রাতের ঢাকা মেলে।

'হ্যালো। কলকাতা থেকে নলিনী সরকার বলছি। আপনি কি আমাকে চেনেন?'

'আমার মত ছোট মানুষ আপনারে চিনব কী কইর‍্যা? আর নবাবশাহেবরে ডাকাও আমার খ্যামতায় নাই। যদি কন তাহাইলে আমি কাউরে ডাইকব্যার পারি।'

ফোনে আওয়াজ পাওয়া গেল লোকটা ফোনটা কাঠের ওপর রাখল। লাইন থাকবে কি থাকবে না। এবার আবার কে ধরবে। নলিনী সরকার সেক্রেটারিকে ডেকে রিসিভারটা দিয়ে বললেন, 'ওদিকে হবিবুল্লাহ ধরলে আমাকে দিয়ো।'

সেক্রেটারি রিসিভার হাতে দাঁড়িয়ে নলিনী সরকার তাঁর রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিয়ে আঙুল-জড়ানো হাতদুটো থুতনিতে রাখা।

'হ্যালো। হ্যাঁ। কলকাতা থেকে স্যার নলিনীরঞ্জন সরকার নবাবশাহেবের সঙ্গে কথা বলতে চান।' সেক্রেটারি ওদিককার কথা শোনার জন্য চুপ করে থাকলে নলিনী সরকার বলেন, 'ঘুম থেকে তুলতে বলো। বলো এমারজেন্সি।'

'হ্যাঁ। কিন্তু খুব কি কষ্ট হবে নবাবশাহেবের? ব্যাপরাটা এমার্জেন্সি। স্যার বসে আছেন', সেক্রেটারি টেবিলের সার্জের ওপর ফোনটা রাখতে-রাখতে বলে, 'ডাকতে গেল বোধহয়।'

সেক্রেটারি বেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও নলিনী সরকার রিসিভার তোলেন না। নবাব-বাদশা-র ব্যাপার কতক্ষণ লাগবে কে জানে। মুখটায় বিরক্তি নিয়েই ফোনটা কানে চেপে রাখেন।

'হেলো।'

'হ্যাঁ, হ্যালো, নবাবশাহেব, আমার সেলাম নিবেন। আমি নলিনী সরকার, কলকাতা থেকে।'

'হাঁ, হাঁ, সেলাম, সেলাম। আপকে ফোন উ তো মেহেরবান হো। ফরমাইয়ে জি—'

'শুনুন, খুব তাড়াতাড়ি চূড়ান্ত একটা পোলিটিক্যাল ডেভেলাপমেন্ট হয়েছে, মিনিস্ট্রি মেকিংয়ের ব্যাপারে—'

'মিনিস্ট্রি কি হয়ে গেল? হক ওথ নিয়ে নিল? আপনি কি শ্যামা মুখার্জির ব্যাপারে কিছু বলতে চান?'

'মিনিস্ট্রি কী করে হবে? কংগ্রেসের সঙ্গে আজ সকালে মিটিং ছিল। ভেস্তে গেছে।'

'প্লিইজ, সরকারজি, কিয়া মতলব? কিয়া তোড় গয়া? কৌনসে তোড়া? ওরা তো কেউ আমাকে কিছু জানাল না।'

'ওরা এখনো জানেই না। জানবে কীনা এ নিয়েও সন্দেহ আছে। রোজই তো কত মিটিং হচ্ছে। আর সব মিটিংয়ের কথা তো একটাই মিনিস্ট্রি মেকিং। আমি মিটিং থেকে বেরিয়ে আপনাকে ফোন করছি। এর পরও কংগ্রেসের সঙ্গে হকশাহেবের মিটিং হতে পারে। তাতে কিছু এসে যাবে না। কংগ্রেস ফাইন্যালি বলেই দিয়েছে, তারা মিনিস্ট্রি মেকিং-এ নেই।'

'শোভানাল্লা। গোলমাল কী নিয়ে হল সরকারজি? মন্ত্রী নিয়ে না নাম নিয়ে?'

'কংগ্রেস চায় না আমাকে মন্ত্রী করা হোক। আপনারা কি চান?'

নবাবশাহেব একটু চুপ করে গেলেন। নলিনী সরকারও কোনো আওয়াজ করলেন না। তিনি নবাবশাহেবকে অস্বস্তিতে থাকতে দিলেন। তিনি তাঁর সম্পর্কে লিগের মতামতটা বুঝে নিতে চান। লিগেরও কি কংগ্রেসের মত তাঁর ব্যাপারে কোনো আপত্তি থাকতে পারে? কংগ্রেসের আপত্তির কারণ কি তিনি ধরতে পেয়েছেন? ভোটের জন্য ফজলুল হককে টাকা দেয়া? সে তো কংগ্রেসকেও দিয়েছেন। হকশাহেবকে কংগ্রেসও যদি গোপনে সাহায্য না করত, তাহলে কংগ্রেসও কি এতগুলো সিট পেত। আর, এতগুলো মুসলমান এমএলএ কি স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়াতে পারে?

'আপনার মাফিক একজন আদমিকে কি আমি মিনিস্টার করার হক রাখি?'

'নবাবশাহেব—কথাটা কিন্তু সিরিয়াস। কংগ্রেসের সঙ্গে হকশাহেবের কথা ভেঙে গেছে। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছি না—কংগ্রেস কেন রাজি হল না।'

'আপনি ভি সমঝালেন না?'

'একটা কথা ক-দিন ধরে খুব রটেছিল যে আমাকে মন্ত্রী করলে কংগ্রেস হককে মন্ত্রিসভা করতে দেবে না। এটাও রটেছে যে হকশাহেব কংগ্রেসকে বলে দিয়েছেন—আমাকে ছাড়া উনি মন্ত্রিসভা করবেন না। কিন্তু হকশাহেব ও আমার মধ্যে কোনো কথা হয়নি।'

'এটা কি কোনো হোনেবালা বাৎ হল? আপনার মত উমেদার আদমি বাংলামে ঔর কৌন আছে?'

'সে না-হয় আপনি বললেন, আপনার পার্টি বা নেতা কি তা বলবেন?'

'কৌনসে পার্টি সরকারজি? কৌন সে লিডার?'

'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগ আর মিস্টার জিন্না।'

'কিন্তু আপনি কি কংগ্রেসে থাকছেন ওর মিনিস্টারভি হচ্ছেন? সে তো মুশকিলের বাত্‌।'

'তা কী করে হবে? আমি কংগ্রেসে নেই।'

'আপনি কংগ্রেস ছেড়ে দিলেন? পাবলিক জানে?'

'জানে। জানা উচিত। সেই কারণেই হয়ত কংগ্রেস আপত্তি করেছে, আমার মন্ত্রী হওয়ায়।'

'কংগ্রেসের এইটা তো খুব মুশকিলের বাৎ। কে কখন কংগ্রেসে আছে কী নাই, তা কারো হিশাব নাই। মালব্যজি কি কংগ্রেসের নেতা নাকী পুরাপুরি বাহিরালা—তার কি নিকাশ হল? ভোট তো হয়ে গেল।'

'এখানকার কংগ্রেস তো বলছে না আমি কংগ্রেসের। আমিও বলছি না আমি কংগ্রেসের?'

'হাঁ, দুটো পয়েন্ট তো সাফ হল আপনার বাতে। এক—কংগ্রেস আর হকের মিলমিশ হচ্ছে না। ঔর, দুই, আপনাকে মিনিস্টার আমরা চাই কী না চাই।'

'ঐ দুই নম্বরে যদি আপনাদের সাপোর্ট থাকে, তাহলে, আমি হকশাহেবকে বলতে পারি যে আপনার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আমার নামে আপনাদের আপত্তি নেই। এইটুকু জানলেই হকের পার্টির নেতারা আর আপনার পার্টির নেতারা কলকাতায় কথা শুরু করতে পারে। আর আপনি যদি ফোনে ইস্পাহানি বা সারোয়ার্দি বা নাজিমুদ্দিনকে ধরতে পারেন, আপনিও বলে দেবেন। একদিনও দেরি করা উচিত হবে না। যত তাড়াতাড়ি হয় জানানো দরকার যে সরকার তৈরি হচ্ছে।'

'এ ভি জানকারি করনে হোগা যে আপনি-ভি মিনিস্টার হচ্ছেন।'

'তার সঙ্গে প্রজাপার্টি-লিগের সরকারের সম্পর্ক কী?'

'প্রজাপার্টি আর লিগের সরকার মানে তো ভোটের আগে আমরা নিজেরা মারামারি করে মুসলমান-সরকার তৈরির সব ফায়দা যে গোর দিলাম, তার মেরামতি। মুসলিম পাবলিক আমাদের উপর গোস্‌সা করছে। তারা চায় আমরা মিলমিশ হই। আপ তো উহি নই মুসলিম ইউনিটিকো ইমানদার। যো-ইউনিটি করলে সব মুসলিম লিডার লোক ফেইল কিয়া, আপ হামলোগকো মিলা দিয়া।'

নবাবশাহেবের কথাটা নলিনী সরকারের ভাল লাগল। এ ভাবেও তো ব্যাপারটিকে দেখা যায়। আগে তিনি কেন এটা ভাবেননি, এ নিয়ে তাঁর মনে কোনো পুনর্ভাবনা এল না। তিনি তো মুসলিম ইউনিটি তৈরি করতে ঢাকার নবাবকে ফোন করেননি। তিনি তো ফজলুল হককে ভোটের সময় টাকাপয়সা দিয়েছেন, তা তো বরং মুসলিম ইউনিটি ভাঙতে। ভাঙলে, কোনো দলই একা সরকার তৈরি করতে পারবে না। আর, না পারলে নলিনী সরকারের মত লোকদের ডাক পড়বেই। দু-নৌকোয় দুই পা রাখা যায় বিপদের ঝুক্কি নিয়েও। মানুষের তো আর তিনটি পা নেই—তিন নৌকোয় দখল রাখবে কী করে? সেখানে নলিনী সরকার তো চার নৌকোর সওয়ার হয়েছেন। প্রথম নৌকো কংগ্রেস-প্রজাপার্টির সরকার। কংগ্রেস যে তাঁকে এতটা ঠেকাবে, তা তিনি আন্দাজ করেননি। কংগ্রেসে কতকগুলি মোটা-মোটা কথা আছে—সারা ভারত, গণতন্ত্র, স্বরাজ, অহিংসা আর গান্ধী। কিন্তু এই মোটা কথাগুলিকে যে যার মত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাগ করে নিতে পরে, নিজের সুবিধের জন্য। কংগ্রেসের তাঁর এতটা বিরোধী কোনো নেতা তো থাকতে পারে না। নলিনী সরকারের সন্দেহ কংগ্রেসে একমাত্র গান্ধীই পারেন, নিজের অপছন্দকে প্রমাণহীন চারিয়ে দিতে। নলিনী সরকারের তিন নম্বর নৌকো ছিল প্রজা পার্টি ও লিগের সরকার। সেই নৌকোতেই এখন তিনি আছেন। তাঁকে বাদ দিয়ে এরকম সরকার তৈরিই হবে না। তাঁর চার নম্বর নৌকো ছিল লাটশাহেবের ইচ্ছা। তিনি যদি মুসলিম ঐক্যের নতুন ভগীরথ হন, তাতে তাঁর আপত্তির কী আছে? তিনি তো হিশেবে বুঝে নিয়েছেন—এই আইনের বলেই কোনো একরকমের স্বাধীন বা স্বরাজ সরকার তৈরি হবে খুব তাড়াতাড়ি, হয়ত পরের ভোটেই। সেই স্বাধীন বা স্বরাজ সরকার মুসলমানদের পুরো সমর্থন ছাড়া হতেই পারে না। আবার উঁচু জাতের হিন্দুরা না থাকলে কোনো সরকারই এ প্রভিন্সে চলবে না। তেমন অদূর ভবিষ্যতে নলিনী সরকারই একমাত্র গ্রহণযোগ্য প্রধানমন্ত্রী। ঘটনা যদি তেমনই ঘটে, তাহলে তেমনই তো ঘটানো উচিত। নবাবশাহেব তো তাই-ই বললেন।

অথচ তেমন একটা ভবিষ্যৎ তৈরি করে তোলার কথা ভাবতেই নলিনী সরকারের রক্ত ঠান্ডা বইল। নলিনী সরকার ভয় পেয়ে গেলেন—উঁচু জাতের হিন্দুর একেবারে মৌলিক ভয়। মুসলমানদের ওপর এতটা নির্ভর করে যদি তিনি তাঁর জীবন ও দেশের, অন্তত বাংলা প্রভিন্সের ইতিহাস তৈরি করতে চান তাহলে হিন্দুরা তাঁকে ছেড়ে কথা বলবে না। হিন্দুদের সঙ্গে থাকবে কংগ্রেস। নলিনী সরকার জাতের ভয় পেলেন। কোনো হিন্দুই মুসলমানদের পক্ষে যেতে পারে না অথচ অনেক মুসলমানই হিন্দুদের পক্ষে যেতে পারে—যদি একটা নলচের আড়াল থাকে, তাহলে তো পারেই। ফললুল হক তেমন একটা নলচে তৈরি করেছেন। এখন এই পর্যন্তই।

'না, নবাবশাহেব, আপনার যদি সম্মতি থাকে তাহলে আজ সন্ধেতেই কথা শুরু করা যায়। কিন্তু আমার নাম সরাসরি জড়াবেন না।'

'সরাসরি কেন জড়াব? নিউজপেপারে হেডিং দেব না, লেকিন রটাব না কেন? কংগ্রেস তো রটাল আপনাকে মন্ত্রী বানানোর জিদেই হকশাহেবের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হল। কার মোকামে বসতে চান?'

'আজকের মিটিংটা গোপনে হওয়া দরকার। যাতে দুই দলের মিটমাট না হলেও কেউ টের না পায় যে মিটমাটের চেষ্টাও হয়েছিল।'

'আমার কলকাতার মোকামে বসতে পারেন। আমি নাই। কারো সন্দেহ ভি হবে না।'

'সে তো আপনাকে এখানে আপনার বাড়িতে ফোন করতে হবে। ফোন পাবেন কী পাবেন না। এদিকে সবাই গিয়ে হাজির। একটা স্ক্যান্ডাল হয়ে যাবে। বরং আমার বাড়িতেই হোক। আমি কিন্তু সবাইকে জানাব আপনি প্রজা পার্টির সঙ্গে লিগের সরকারে রাজি।

'হ্যাঁ। বলবেন। প্রজা পার্টির সঙ্গে সরকার তৈরির বাতচিতে রাজি বলেন। এটা তো পাবলিক হচ্ছে না। লিগের লিডার দু-চারজন তো? বলেন।'

হকশাহেব-সামসুদ্দিন-নাজিমুদ্দিন-সারওয়ারদিদের নৈশভোজ

নলিনীরঞ্জন সবাইকেই সময় দিয়েছিলেন, সন্ধে আটটা। শীতের কলকাতার পক্ষে একটু হয়ত বেশি রাত। উপায় ছিল না। কথাটা আজই শুরু হওয়া দরকার, বিশেষ করে নবাবশাহেবের

৪০

সম্মতির পর। শেষদিকে নবাবশাহেব বোধহয় একটু সামলে নিলেন। তা তো হতেই পারে। মন্ত্রী না-হওয়ার দুঃখে যে-নবাব দুপুরে ঘুমচ্ছিলেন, তাঁকে যদি ফোনে ডেকে বলা হয়, 'আসুন, মন্ত্রী হবেন,' তাহলে তিনি তো বেশামাল হতেই পারেন। তারপর, সামলেও নিতে হবে। নলিনী সরকার ভাবেনইনি—এতটা এগবে।

নলিনীরঞ্জন অফিসেই একটা স্লিপ লিখতে গিয়ে গুটি পাকিয়ে ফেলে দিলেন। সেক্রেটারিকে বললেন, 'আমাকে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে যাও। হকশাহেব, সামসুদ্দিন, সারওয়ারদি, নাজিমুদ্দিন, ইস্পাহানির কাছে গিয়ে বলো—তাঁরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যেন কথা বলেন, আমার সঙ্গে, ফোনে। আবুল হাসিম আর আমেদকেও বলো। আমি ফোনের পাশেই থাকব।'

নলিনীরঞ্জন যে নামগুলো নিয়ে খুব ভেবেছেন, তা নয়। বাংলার মুসলিম রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে হলে এদের সঙ্গেই বলতে হয়। প্রজাপার্টির ভিতর মিলমিশ বেশি। সকলেই হকশাহেবকে নেতা মানে। হক একা থাকলেই হত। কিন্তু সামসুদ্দিন একটু বেশি রোখা, তার ওপর প্রজাপার্টির সেক্রেটারি। আর, আবুল হাসিম লিগের এখনকার সম্পাদক। ওর বাবাও ছিলেন বর্ধমানের বড় নেতা। ওকালতি ছেড়ে দিয়ে ছেলেটা লিগে এসেছে। ওর বাবা মারা যাওয়ার ফলেই ওকে বর্ধমানের নেতা হতে হল। আমেদ প্রজাপার্টির নতুন নেতা। ঐ তো তুলল প্রায়োরিটির কথা—জমিদারি উচ্ছেদ আগে না রাজবন্দীদের মুক্তি আগে।

মাঘের সন্ধ্যা। নলিনী সরকার একটা বালাপোশ জড়িয়ে তাঁর বৈঠকখানাতেই বসেছিলেন। তবে, এটি নীচের তলার খোলা বৈঠকখানা নয়—দোতলায় প্রাইভেট বৈঠকখানা। পুবদিকে একটা ভাঁজ-করা বড় দরজা আছে—খুলে দিলে অনেকটা দেখা যায়, পার্কের। শীতকাল বলে বন্ধ করা।

রাত আটটা হলে তো এদের রাতের খাওয়া খেতে বলতে হয়। মুসলিম সমাজে এ-সব আদবকায়দার মূল্য আছে। বিশেষ করে শাহেব-মুসলমানদের।

নলিনীরঞ্জন কাউকে ডাকার মত একটা আওয়াজ করলেন, সশব্দ ঢেকুর তোলার মত।

ধুতি-ফুলশার্ট পরা র‍্যাপার জড়ানো একজন এসে দাঁড়ায়। নলিনীরঞ্জন বলেন, 'কয়েকজন আসবেন, জনা ছ-সাত, রাতে খেয়ে যাবেন।'

এই লোকটি নায়েব-গোমস্তার মত। তবে নলিনীরঞ্জনের জমিদারি নেই, তিনি উকিল-ব্যারিস্টারও নন। তিনি আধুনিক ব্যবসায়ী। এই লোকটিকে তাই ম্যানেজারবাবু বলেই ডাকে। বাড়ির দেখাশোনার দায়িত্ব এরই ওপর।

ম্যানেজারবাবু জিজ্ঞাসা করে, 'সবাই নিরামিষ?'

ব্যাবসার যোগাযোগে অনেক সময়ই অনেক মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী তো আসেন—নলিনীরঞ্জন দুটো চেম্বারেরই প্রেসিডেন্ট।

'না, না, মাংস করতে বলো।'

একমাত্র সামসুদ্দিন আর আমেদ ফোন করেনি। ওদের পায়নি। এখনো খুঁজছে খুঁজছে। হকশাহেবকে নলিনীরঞ্জন বলে দিয়েছেন—ওদের দু-জনকে খবর দিতে। সামসুদ্দিনের থাকাটা দরকার। ওর পলিটিকসটাও র‍্যাডিক্যাল। এক হকশাহেবকেই নলিনীরঞ্জন এটুকু বলেছেন যে নবাবশাহেবের সঙ্গে তাঁর আজ কথা হয়েছে, তিনি বলেছেন লিগ লিডারদের সঙ্গে কথা বলতে। সারওয়ারদি, ইস্পাহানি, নাজিমুদ্দিন আসবেন। হকশাহেব যেন সামসুদ্দিন আর আমেদকে নিয়ে চলে আসেন। হকশাহেব একটু চুপ থেকে জিজ্ঞেসা করেন। তিনি একটু আগে আসবেন কী না। নলিনী সরকার বলেন, না একসঙ্গেই আসা ভাল।

এদের মধ্যে হক ইস্পাহানিই ব্যবসায়ী। ফোনে সে কিছু আন্দাজেরও চেষ্টা করেনি। প্রথমেই বলেছে, 'স্যার, কীয়া ফরমান?' তারপর আটটার সময় সরকারের ওখানে আসতে হবে শুনে বলে 'তব তো জরুর বড়া দাওয়াত? জরুর টাইমে পৌঁছ যাবে। লেকিন সোচতা হ্যায় হাম এত্‌না গ্লাটন হ্যায় কি টাইমসে পহেলা পৌঁছ যায় গা', হো হো হেসে ফোন রেখে দিল। নলিনীরঞ্জনই বরং সন্দেহ করলেন, নবাবশাহেবের সঙ্গে, ও জিন্নার সঙ্গেও, ফোনে ওর কথা হয়ে থাকবে। তিনিই-বা আন্দাজ করতে চাইছেন কেন, আনাড়ির মত। এটা ধরে নেয়াই তো উচিত যে লিগের লিডাররা বিষয়টা জেনেই আসছেন। সবচেয়ে কম জেনে আসছেন হকশাহেব নিজে।

কিন্তু হকশাহেব এদের মধ্যে সবচেয়ে ওস্তাদ খেলোয়াড়। তিনি ঢুকলেন সবার শেষে একা। আমেদ শহরে নেই। সামসুদ্দিন নিজের মত চলে এসেছে। হকশাহেবের ঐ দৈর্ঘ্যপ্রস্থ আর গলার স্বর তাঁকে সব জায়গাতেই একটা প্রাধান্য দেয়। তিনিও সেটা জানেন। তাই মজার-মজার কথা বলে ও নিজেকে ঠাট্টা করে পরিবেশটা হালকা করে দেন। কিন্তু এখানে তিনি ঢুকলেন, চোখটা একটু নামিয়ে, দরজার মুখোমুখি ছিলেন সারওয়ারদি। তাঁকে ও পর পর আরো যাঁরা ছিলেন, তাঁদের আদাব জানিয়ে একটা ফাঁকা সোফায় বসলেন। সোফাটাতে খুব বেশি হেলিয়ে পড়ার জায়গা ছিল না। ফলে হকশাহেবকে একটু খাড়াই বসতে হয়। নলিনী সরকার যখন কথা শুরু করেন, তখনো হকশাহেব তাঁর দিকে তাকাননি। নলিনী সরকারেরও অভ্যেস চোখ নামিয়ে বিড়বিড়িয়ে কথা বলা। আর সকলেই ভাবলেন—হকশাহেব সবই জানেন।

'আপনারা হয়ত ইতিমধ্যে জেনে গেছেন যে কৃষক-প্রজা পার্টি' আর প্রদেশ কংগ্রেসের মধ্যে সরকার তৈরি করা নিয়ে যে কথাবার্তা চলছিল, তা আজ সকালে ভেঙে গেছে।'

সারওয়ারদি একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইজ ইট টোট্যালি ব্রোকেন? অর ওনলি অ্যাডজোর্নড?'

ইস্পাহানিও বললেন, 'দেয়ার'স নো ইস্যু অব এনি নিউজপেপার, নো টেলিগ্রাফ এডিশন,

ইজ ইট ফরম্যালি ব্রোকেন? আই থিঙ্ক, নো।'

'আই ডু নট নো হাউ ডু সাচ টক্‌স্ কোল্যাপ্স ফরম্যালি। টু পার্টিজ ওয়্যার ইন ইররিট্রিভেবল কাউন্টারপোসল।' নলিনী সরকার বলেন 'ডিড দে অ্যাগরিড টু ডিজঅ্যাগ্রি', সারওয়ারদি আসলে জানতে চান প্রজা পার্টি কি এখন সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে ও লিগের সমর্থন চাইছে। নাকী কংগ্রেসের সঙ্গে কথাবার্তায় তাদের ওজন বাড়াবার জন্য লিগের নেতাদের সঙ্গে বসেছে। এখন সন্ধ্যা আটটা পেরিয়ে গেছে। যদি কোনো খবর থাকে—কাগজ সেটা ছাপতে পারবে না। এই মিটিংয়ের খবরও ছাপতে পারবে না। সারওয়ারদি আন্দাজ করেন—কাগজকে এড়ানোর জন্যই কেউ মুখ খুলছে না—না, কংগ্রেস, না-প্রজাপার্টি। যে-প্রথম বলবে—কথাবার্তা ভেঙে গেছে, সে-ই অসুবিধেয় পড়বে। অপরপক্ষ বলবে—আমরা তো জানি কথাবার্তা চলছে, ওঁরাই তাহলে ভেঙে দিলেন।

ইস্পাহানি বলে উঠলেন, 'দেন দিস মাচ অব অ্যাগ্রিমেন্ট অ্যাট লিস্ট হ্যাজ বিন রিচড দ্যাট দো এ গবমেন্ট ইজ নট ইন দি অফিং, এ পাবলিক ইজ অলরেডি দেয়ার। অ্যান্ড অ্যাপরিহেনডিং দিস পাবলিকস রিয়্যাকশন বোথ পার্টিজ আর উইথ হোলডিং দি কনক্লুজন। দেন লেট আস ডিসকাস ফার্স্ট, ইজ দেয়ার এনি অ্যাগ্রিমেন্ট অ্যামং আস, হু আর প্রেজেন্ট হিয়ার অ্যাবাউট দি কমপোজিশন অব দিজ পাবলিক র‍্যাদার দ্যান হানটিং ফর এ গবমেন্ট!'

নলিনীরঞ্জন ও হকশাহেব দু-জনই বুঝে ফেলেন—ইস্পাহানি জিন্নার সঙ্গে কথা বলেছেন। যুক্তির এ প্যাঁচ জিন্না ছাড়া কারো মাথা থেকে বেরতে পারে না।

কিছু বলার জন্যই কী না বোঝা যায় না, হকশাহেব একটা ভুরু তুলে চোখটা উঁচু করেন কিন্তু নলিনী সরকার কথা বলতে শুরু করেছেন দেখে হকশাহেব ভুরু ও চোখ দুটোই নামিয়ে নেন। এ একেবারে অন্য ফজলুল হক। কঠিন মামলায় ল-পয়েন্ট খুঁজছেন—আশু মুখার্জির জুনিয়ার। ফজলুল হকের নীরবতা। তাঁর সরবতার চাইতে অনেক বেশি ভয় ছড়িয়ে দিতে পারে।

'দেখুন, আজ দুপুরবেলায় কংগ্রেসের সঙ্গে মিটিং শেষ হয়েছে। সকলেই এই এতগুলো মিটিংয়ে শাক দিয়ে মাছ ঢেকে চলছিল। হঠাৎ আজ, সই-সাবুদ হওয়ার ঠিক আগে ওরা কী সব কথা তুলল—রাজবন্দী-জমিদার কোন্‌টা আগে, কোন্‌টা পরে, এই নিয়ে। বুঝতেই তো পারিনি যে এটা ওদের আলটিমেটাম ছিল। ওরা প্রত্যেকেই জানত যে হকশাহেবকে সরকার তৈরি করতে দেয়া হবে না। তারপরই নবাবশাহেবের সঙ্গে আমার ফোনে কথা হয়। উনিই বলেন, আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে। আপনারাও তো অল ইনডিয়া পার্টি। সুতরাং আপনারা শুরুতেই এই কথাটা পরিষ্কার করে দিন বা যদি একদিন সময় নিতে হয়, তাই নিন। আপনারা হকশাহেবকে সরকার গড়তে সমর্থন দেবেন কী না। দুই নম্বর—কারো ব্যাপারে আপনাদের কি এমন শর্ত আছে যে তাকে মন্ত্রী করতেই হবে, বা, তাকে কিছুতেই মন্ত্রী করা যাবে না। এই দুটো প্রশ্নে একমত হলে বাকি কোনো কথায় আটকাবে না—কার পাবলিক, কার ভোট, কী প্রোগ্রাম—এগুলো তো কাগজের জন্য বানানো কথা। সেসব তো ঠিকই আছে। লিখতে আর কতক্ষণ লাগবে।'

ইস্পাহানির যুক্তিটাকেই মারলেন নলিনী সরকার—খুব খোলাখুলি সত্যি কথাটা বলে দিয়ে। ইস্পাহানিও তো বড় ব্যবসায়ী, তিনি নলিনী সরকারের কৌশলটা বুঝলেন ও চুপ করে থাকলেন।

সারওয়ারদিই বললেন, 'হকশাহেব আমাদের কাছে কী সমর্থন চান, সেটা তো জানতে হবে।'

হকশাহেব তাঁর সেই ভঙ্গিতে ফিরে গেলেন, একটা চোখের ভুরু ও দুটো চোখের দৃষ্টি তুলে। তারপর চাপা স্বরে স্পষ্ট করে বললেন, 'প্রজা পার্টি ও লিগ একত্রে সরকার করুক।'

লিগের কেউই এটা ভাবতে পারেনি, এমনকী নলিনী সরকারও নয়। তাঁর সঙ্গে হকশাহেবের এ নিয়ে কোনো কথাই হয়নি। তিনিও তৈরি ছিলেন, লিগের সমর্থনটুকুর জন্য। হকশাহেব যে এই কথা ভেবেছেন, তা কেউ জানত না।

সামসুদ্দিন বলে উঠলেন, 'কোয়ালিশন?'

'হ্যাঁ। আমরা তো কংগ্রেসকেও কোয়ালিশনের কথাই বইলছি। আমরা এডাও বইলছি কংগ্রেস যদি চায় কংগ্রেস সরকার তৈরি করুক। আমরা সাপোর্ট দিব। আর সাপোর্ট দেয়ার লগে ফ্রন্টও করব। আমরা এই সেকেন্ড অফারডা লিগকে দিচ্ছি না। কিন্তু লিগকে ফার্স্ট অফারডা কেন দিব না?'

সামসুদ্দিনই বলে উঠলেন, 'এই কথাডা ভোটের আগে ঠিক হইলে ভাল হইত না? যারা এডা চায় না, তাদের প্রজাপার্টি কইরবার লাইগত না।'

'কথাডা জন্মাইল ভোটের পরে, ভোটের আগে সেটা কওয়া যাবে ক্যামনে?' হকশাহেব বললেন। তাঁর পার্টির ভিতরে নানা মতের লোক আছে—তা গোপন কিছু না। কংগ্রেসের ভিতরে ভাগাভাগি ছাড়া আর কিছু নেই। লিগের মধ্যেই সবচেয়ে কম যেহেতু তাদের প্রধান কথা—ইসলাম বাঁচাও। সামসুদ্দিনের কথার উত্তর দিয়ে ও উত্তরটা বিস্তারিত না করে, হকশাহেব একই সঙ্গে লিগের নেতাদের জানিয়ে দিলেন যে তাঁর পার্টিতে লিগবিরোধীরা কতটাই শক্তিশালী আর সামসুদ্দিনকেও জানালেন—তিনি নিজের নেতৃত্ব রাখতে কতটাই ছাড়তে পারেন।

লিগের নেতারা এতটা ভড়কে গেছেন যে তাঁরা কেউই এমন কোনো কথা মনে আনতে পারছে না, যেটা বলে একটু হাঁফ ছাড়া যায়।

শেষ পর্যন্ত ইস্পাহানিই কথা বলে উঠতে পারলেন, 'থ্যাঙ্কস মিস্টার হক। বাট ইয়োর অফার অব মেকিং এ কোয়ালিশন গবমেন্ট শুড বি সিন অ্যাজ পার্ট অব দি অল ইনডিয়া ক্যানভ্যাস। বাট, দিস ইভনিং উই আর প্লেজিং আওয়ার আনকনডিশন্যাল সাপোর্ট টু দি মেকিং অব এ গবর্নমেন্ট আন্ডার ইউ।'

'এটাই তো যথেষ্ট। এটা কি আজই আমরা কোনো স্টেটমেন্টে জানিয়ে দিতে পারি?' নলিনী সরকার জিজ্ঞেসা করেন। তিনি সবার মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে বলেন।

'তা হয়ত করা যায়,' নাজিমুদ্দিন এই প্রথম মুখ খুললেন, কলকাতায় খবরের কাগজের ব্যাবসা তিনি বদলে দিয়েছেন—শাহেব সম্পাদক দিয়ে বের করেছেন ইংরেজি 'স্টার অব ইনডিয়া।' তাছাড়া আকরাম খাঁর 'আজাদ' তো আছেই। এটা প্রায় ঠিকই ছিল যে তিনিই প্রধানমন্ত্রী হবেন। কিন্তু পটুয়াখালিতে তিনি এমন হার হারবেন, কল্পনাও করতে পারেননি। পটুয়াখালির হারটা ভুলতে বারবারই একটা সান্ত্বনাই তাঁর মনে আসছে—জিতলেও তো প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন না, মুসলিম লিগ যা সিট পেয়েছে তাতে প্রধানমন্ত্রী হওয়া যায় না। এই মাত্র যা ঘটল, তাতে মন্ত্রী তো হওয়া সম্ভব। নাজিমুদ্দিন ভোটে হেরে এমন ভয় পেয়েছেন—যে-কোনো সিদ্ধান্ত নিতেই দ্বিধা আসছে।

নাজিমুদ্দিন দ্বিধা নিয়েই বলেন—'দেখুন আপনারা, ঠিক যেটুকু কথা হল, সে-টুকুকে, ইস্পাহানি যে-ভাষায় বললেন সেই ভাষাতেই স্টেটমেন্ট করে দেয়া যায়। কিন্তু সেটা আবার অসুবিধে হয়ে যাবে না তো?'

নলিনী সরকার ঠোঁট থেকে বালাপোশের আড়াল সরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কার অসুবিধের কথা বলছেন।'

নাজিমুদ্দিন কিছু বললেন না। বাকিরা তাঁকে ভাবার সময় দিলেন, তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে।

নাজিমুদ্দিন বললেন, 'সবাই সব জানে অথচ এটা এখনো কেন নিউজ হল না যে কংগ্রেস-প্রজাপার্টি সরকার হচ্ছে না। হকশাহেব যদি একই সঙ্গে খবরটা ভাঙেন ও বলেন, লিগ তাঁর মন্ত্রিসভাকে সমর্থন দেবে—সঙ্গে-সঙ্গে তো কংগ্রেসের হিন্দুনেতারা বলে বসবেন—আগে থাকতেই সব ঠিক ছিল। লোকে চায় সবচেয়ে সহজ কথাটা বিশ্বাস করতে আর তার বুদ্ধির বাইরে কিছু হচ্ছে—এটা না-মানতে।'

এটা কি আপনার পটুয়াখালিতে শেখা? সামসুদ্দিন বলে বসে। এখানে যে-স্বরে ও যে-ভাষায় কথাবার্তা চলছিল তাতে সকলেই এটা মনে-মনে মেনে নিয়েছিলেন যে কেউ কাউকে আক্রমণ করবেন না, মতে না মিললে অন্য গল্প করবেন। সামসুদ্দিন সেই অনুচ্চারিত কিন্তু স্বীকৃত আদব ভেঙে দিলেন, অসাবধানতায় নয়, হয়ত ইচ্ছে করেই।'

কিন্তু নাজিমুদ্দিন আঘাতটা নিলেনও না, ফিরিয়েও দিলেন না, একই গলায় বললেন, 'বোধ, হয় আপনি ঠিকই বলেছেন, সামসুদ্দিন ভাই। বা, পটুয়াখালি দিয়ে কথাটা বলার সুবিধে আছে। পটুয়াখালিতে তো আমার হারার কোনো কারণ নেই। আমি ওখানকার জমিদার, নবাবশাহেবের জায়গির, গভর্নর গিয়ে আমাকে ভোট দেয়ার কথা বলেছেন, মানুষ তো বড় গাছেই নৌকো বাঁধতে চায়। কৃষক তো কৃষকই। কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান। হিন্দু কৃষক যদি তার হিন্দু জমিদারকে ভোট দিতে পারে, তাহলে মুসলমান কৃষক তার মুসলমান জমিদারকে ভোট দেবে না কেন?'

'মুসলমান জমিদার ইজ নট ভেরি কমন ইন ইস্টবেঙ্গল। দি মুসলিম পেজ্যান্টস হ্যাভ নট ফমর্ড এনি হ্যাবিচুয়্যাল সাপোর্ট ফর মুসলিম জমিনদারস', ইস্পাহানি জিজ্ঞাসুর ভঙ্গিতেই বললেন তাঁর দুই উরুর ওপর দুই হাত আকনুই রেখে।

'হ্যাঁ হতে পারে। তবে আমার মনে হয়, হকশাহেব যে সহজ করে দিলেন, বিষয়টা, ডালভাতের ব্যবস্থা আর জমিদারি উচ্ছেদ—কৃষক তার অভিজ্ঞতায় এটাকে সাজিয়ে নিতে পারল—সত্যি তো তাই, জমিদারি যদি উচ্ছেদই হয়ে যায় তাহলে ডালভাত তো নিজেরাই বাড়িতে করতে পারব। কৃষক তার অভিজ্ঞতার ভিতরে সমস্যাটা এনে ফেলতে পারল—জমিদারি উচ্ছেদের জন্য একজন বড় নেতা দরকার—হকশাহেব। আর ডালভাত ফলানোর জন্য আমাদের দরকার—কৃষক।'

'তাহলে আজকের বোঝাপড়া জানানোর দরকার নেই, তাই তো?' সারওয়ারদি জিজ্ঞাসা করেন।

'যদি লিগ করে, তাহলে যা বলার বলবেন, কিন্তু হকশাহেবকে একদিন অন্তত টাইম দিন। যে-ফ্রেম অব রেফারেন্সে উনি কংগ্রেসের সঙ্গে কথা বলেছেন, আমাদের সঙ্গে তো আর তা বলছেন না, আজ ১০ তারিখ। আমরা কালকে আবার বসি। দরকারে ১২ তারিখ সকালেও বসি। সন্ধ্যায় না-হয় একটা স্টেটমেন্ট দেয়া যাবে।'

'ঠিক আছে। সেটাই ভাল। দুই পার্টিই দুই পার্টির নামে এত খারাপ কথা বলেছে যে সেগুলো ভোলা ও ভোলানোর জন্য অন্তত একটা রাত্রি তো দরকার। আজকের কথাবার্তা থেকে এটুকু কি আমরা নিজেরা ধরে নিতে পারি যে ডিলটা ফাইন্যাল হয়ে গেল। নাকী এখনো কিছু অনিশ্চয়তা থাকল। আপনাদের সবাইকেই জিজ্ঞাসা করছি। কিন্তু মিস্টার সারওয়ারদি যদি লিগ পার্লামেন্টারি বোর্ডের সেক্রেটারি হিশেবে বলেন, তাহলে খানিকটা ফর্ম্যাল হয়।

'দি ডিল ইজ ডান। উই উইল টেক এ নাইট টু সিল ইট। এটা আমাদের কাছে গডসেন্ড।'

নলিনী সরকারের অসাম্প্রদায়িক ডিনার

নলিনী সরকার আবার সেই ঢেকুর তোলার মত আওয়াজ করলেন। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ম্যানেজারবাবু এলেন। নলিনী সরকার জিজ্ঞেস করলেন, 'কী? তোমাদের হল।'

৪১

'হ্যাঁ, পাত তো পাতা হয়েছে। আপনারা গিয়ে বসলেই হয়।'

'হ্যাঁ। তাহলে চলুন সবাই।'

সামসুদ্দিন হঠাৎ নলিনী সরকারের পেছনে এসে বলেন, 'স্যার, আমারে একটু মাপ দিতে হবে।'

'কী হল?'

'আমি একদিন এইসে একা খেয়ে যাব। আজ তো আমাকে যেইতেই হবে।'

'খেয়ে যাও। কোথায় যাবে?'

'আমার দিদি তো থাকে চাঁপদানিতে। আইজ তলব দিছিল্যাম, যাব বইল্যে। ভাইগন্যা-ভাইগনি গুইল্যা না-খাইয়্যা থাইকবে, স্যার, আমারে মাপ দ্যান।'

'আরে এটা কোনো কথা হল? সংসারের ব্যাপার। তুমি আর-একদিন এসো। কিন্তু তুমি যাবে কীসে?'

'ট্রামবাসে হাওড়া পৌঁছাইলেই তো ট্রেন পাব।'

'তাহলে তোমাকে হাওড়ায় পৌঁছে দিয়ে আসুক', নলিনী সরকার আবার ঢেকুর তুললেন। ম্যানেজারবাবু এলে বললেন, 'ও থাকতে পারছে না। চাঁপদানিতে দিদির কাছে যেতে হবে। হাওয়া স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে টিকিট কেটে ট্রেনে তুলে দেয় যেন।'

'স্যার, এসবের দরকার নেই। আমি তো যাতায়াত করি।'

'এত ভাবছ কেন—দিদির কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে। আমি না আটকালে তো এতক্ষণ পৌঁছে যেতে।'

ম্যানেজারবাবু সামসুদ্দিনকে ডাকেন, 'আসুন'।

নলিনী সরকারের বাড়িতে খাওয়ার টেবিল নেই। কোনো হিন্দুনেতার বাড়িতেই নেই। শাহেবসুবো গোছের কাউকে আপ্যায়ন করতে হলে তিনি।...এই যান। তাঁর অফিস থেকে কাছে হয়। কিন্তু বাড়িতে রান্না করে ওড়িশার বামুন। রান্নাঘরের কাজও করে দুই বামুন। আসন পেতে খাওয়া হয়। তাঁর সেটাই পছন্দ। অনেক বছর আগে এই ঠাকুর-চাকর যখন কাজে ঢোকে তখন নাকী ম্যানেজরবাবুকে বলেছিল—হোটেলের মত খাওয়া হলে তারা কাজ করবে না। হোটেলের মত মানে টেবিল-চেয়ারে।

আসন দেখে ইস্পাহানি বলে ওঠেন, 'দাদা, দিস ইজ ক্রুয়েলটি টু এনিম্যালস। বেটার ইউ ইসু এ ড্রেসকোড—ফর মুসলিমস, লুঙি অনলি।'

নলিনী সরকার বসলেন না। এঁদের প্রত্যেকের সামনে চওড়া জলচৌকি দেয়া হল।

তারপর বেশ দামী সেরামিক ডিশে এঁদের সামনে পোলাও রাখা হল। তার সঙ্গে মেলানো সেরামিকের বাটিতে মাছ-মাংস-ব্যঞ্জন ও একটা ডিশে একজোড়া তপসে ভাজা সাজিয়ে দেয়া হল।

নলিনীরঞ্জন খুব একটা নজর করলেন না, তিনি জানেন, এমনই হয়ে আসছে। বামুনঠাকুর ও চাকর দুটি রান্না করে দিয়েছে মাত্র, যেহেতু, যা রাঁধতে হয়েছে তা বামুনদেরও খাদ্য। কিন্তু

মুসলমানরা খাবে বলে এ রান্না তারা করবে না বলার মত জাতি-অভিমান দেখানো আর্থিক দিক থেকে পোষায় না। ম্যানেজারবাবু এসব মধ্যপথ ঠিক করে রেখেছেন। পার্কের ওদিককার বস্তিতে বাঙালি মুচিদের একটা মহল্লা আছে। খবর দিলেই ওরা খাবারগুলো সাজিয়ে নিমন্ত্রিতদের সামনে দিয়ে আসে। খাওয়াদাওয়া পর যে-খাবার বাকি থাকে, সেটা বাড়ি নিয়ে যেতে একটা-দুটো ডেকচিগোছের তারা সঙ্গেই নিয়ে আসে। আলাদা-আলাদা খাদ্যের জন্য আলাদা-আলাদা পাত্র তাদের থাকে না। খাওয়া হয়ে গেলে—সব বাসন ধুয়ে সাজিয়ে রেখে চলে যায়।

এগুলো সবই ম্যানেজারবাবু উপস্থিত বুদ্ধির ফল। মুসলমানদের জন্য রান্না ও খাওয়ার বাসন আলাদা। রান্নার বাসন আলাদা না করলেও চলত কারণ কারা সেই রান্না খাবে এটা জানা ঠাকুরমশায়ের অধিকারের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু খাবারগুলো রান্নার পর যে-পাত্রে ঢালা হয়, সেটা তো আবার মুচিরা ছোঁয়। মুচিদের দিয়ে পরিবেশন করে মুসলমানদের খাওয়ানো যায় কারণ মুচিরা তো মুসলমানের অচ্ছুৎ নয়। কিন্তু মুচির ছোঁয়া বাসন ফের হেঁশেলে নেবে কী করে বামুনঠাকুর, কারণ মুচিরা তো বামুনের অচ্ছুৎ। ম্যানেজারবাবু একবার যেন কবে কী রকম করে জানতে চেয়েছিলেন—মুচিদের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ির সীমাটা কোথায় ধরা হবে। রান্না পাত্রে ঢালার পর চৌকাঠের ওপারে, যদি মুচিরা ধরে তাহলে সে-খান তো অচ্ছুৎ। সমস্যাটার সঙ্গে ম্যানেজারবাবুরও সায় ছিল। নলিনী সরকারও হয়ত সমস্যাটা মানতেন—নইলে তিনি কেন মুসলমানদের সঙ্গে খেতে পারেন না। কিন্তু বাড়ির রান্নাঘর পর্যন্ত তিনি সমস্যাটাকে ছড়িয়ে দিতে চান না। ম্যানেজারবাবুকে বলে দিয়েছিলেন—'গঙ্গাজলে ধুয়ে নিলে তো হয়।' তেমনই চলছে।

ইস্পাহানি আর সারওয়ারদির কোনো অসুবিধে হচ্ছিল না, ওরা তো স্যুট পরে আছে। হকশাহেব আর নাজিমুদ্দিনের ছিল চুড়িদার আর শেরোয়ানি পরা। তাও নাজিমুদ্দিন ছোটখাটো মানুষ, একরকম গুছিয়ে নিয়েছেন, হকশাহেবের বড় শরীর—একেবারে হাঁফিয়ে গেছেন। বলে উঠলেন, 'আরে, মাছভাজা দিছ, ডাইল নাই? ডাইল না থাইকলে খামু কী দিয়া?'

'তাছাড়া, ডাল না খেলে তো আপনার ইলেকশন প্লেজ ব্রেক করা হবে—বাঙালির ডালভাত।' সারওয়রদি বলেন।

ডাল আসতে দেরি হওয়ায় নলিনী সরকার সন্দেহ করলেন কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। ঠাকুররা কি তল্লাটেই নেই? তিনি একটু এগিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখেন—ভাঁড়ারে মুচিরা দাঁড়িয়ে আর রান্নাঘরে ম্যানেজারবাবু ডালের বাটি হাতে।

'কী হল?'

'এটা তো তুলে যায়নি', মানে পরিবেশনের পাত্রে। ম্যানেজারবাবুও পরিবেশন করতে সংকোচ করছেন। নলিমী সরকার হাতটা বাড়িয়ে বাটিটা নিয়ে খাওয়ার ঘরে গিয়ে নিজেই নিচু হয়ে হকশাহেবের ডিশে এক হাতা ডাল দিলেন। 'আবার ভ্যারাইটি চাইবেন না।'

'আরে, আপনারে আইনতে হইল। ডাইল কত দুর্মূল্য দ্যাহেন। এক্ষেত্রে ডাইলডা অনুপান, তপসে ভাজার।'

'আপনাদের কারো লাগবে নাকী?'

'নো দাদা, লেট ইট বি এক্সক্লুসিভ টু হকশাহেব,' ইস্পাহানি বলাতে ডালের বাটিটা একটু আলগা ধরে রেখে নলিনী সরকার আর-একহাতে গড়ানো বালাপোশের কোণাটা কাঁধে ফেলেন। ম্যানেজারবাবু এসে ডালের বাটিটা নিয়ে গিয়ে একটা কাঁসার বাটিতে জল এনে নলিনীরঞ্জনের

সামনে ধরলে তিনি এঁটো আঙুলগুলো ডুবিয়ে নেন।

খাওয়া সেরে বেরবার আগে নাজিমুদ্দিন গোপনে সারওয়ারদিকে কিছু বলেন। সারওয়ারদি স্বাভাবিকের চাইতেও নিচু গলায় বলেন, 'কাল সকালে তো এগারটায়? আমাকে তো একটা কনস্টিটুয়েন্সি ছেড়ে দিতে হল। সেখানে নাজিমুদ্দিনশাহেবকে দাঁড় করানো ঠিক ছিল। কিন্তু হকশাহেব ওখানে সেকেন্ড পটুয়াখালি করার জন্য আলতাফকে দাঁড় করানোয়...।'

খবর ফাঁসাতে সামসুদ্দিন অমৃতবাজারে

৪২

সামসুদ্দিনকে নলিনী সরকারের ড্রাইভার টিকিট কেটে তুলে দিয়েছিল। সামসুদ্দিন পরের স্টেশন সাঁতরাগাছিতে নেমে, বাসস্ট্যান্ডে চলে গিয়ে বাগবাজারের বাস ধরলেন। এত রাতের বাস—তাড়াতাড়িই যাচ্ছিল। যেতে-যেতেই সামসুদ্দিন আরো ভাবতে লাগলেন—কেপিপি-লিগ সরকার তৈরি আটকানোর জন্য আর কী কী করা যায়। সে-ই নবাবজাদা নাজিমুদ্দিন আর কলকাতার ব্যারিস্টার সারওয়ারদি যদি সরকারে আসে, তাহলে কৃষকের ঋণসালিশিরই-বা কী হবে, জমিদারি উচ্ছেদেরই-বা কী হবে। হকশাহেব তাদের কারো সঙ্গে কোনো কথা না বলে লিগকে প্রস্তাব দিয়ে বসলেন? লোকের কাছে মুখ দেখাবেন কী করে? কংগ্রেস কেন রাজি হল না? তাই তো ঠিক ছিল। ওয়ার্কিং কমিটি নাকী অনুমতি দেয়নি। সেটা তো কথার কথা, ভোটের আগে তো শরৎ বোসরা চেয়েছিল—ইলেকশনে তারা কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ডের বিরোধিতা করবে—নইলে হিন্দু ভোটও পাবে না। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট জওহরলাল সোজা জানিয়ে দিলেন, সেটা করা চলবে না। তাহলে এবার কেন চিঠি-প্রস্তাব কিছু এল না যে হকশাহেবের সঙ্গে মন্ত্রিসভা করা যাবে না। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ডই তো তাদের প্রার্থী ঠিক করেছে। তাহলে, কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতারা জানতেন না যে কৃষক-প্রজার সঙ্গে কংগ্রেসের বোঝাপড়া আছে। নইলে কংগ্রেস কোনো মুসলিম আসনে প্রার্থী দেয়নি কেন। ভোটের আগের বোঝাপড়া ভোটের পরই বাতিল? কংগ্রেসই-বা মুখ দেখাবে কী করে? নাকী কংগ্রেসও জমিদারি-উচ্ছেদ চায় না? কিন্তু কোনো দলিল ছাড়া, প্রস্তাব ছাড়া কংগ্রেস বলতে পারে যে কোনো সরকার করব না, কোনো সরকারকে সমর্থনও দেব না? 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র অফিসে ঢোকার আগে সামসুদ্দিনের মনে পড়ে যে ভোটের আগেও তো প্রজাপার্টি আর কংগ্রেসের মধ্যে কোনো লেখালেখি হয়নি। নিউজ ডিপার্টমেন্ট খুঁজে বের করে যিনি দায়িত্বে আছেন তাঁর সামনের চেয়ারে বসতে-বসতেও সামসুদ্দিনের সন্দেহ হয়—এগারটি প্রদেশে জিতে মন্ত্রিসভা করার খোয়াবে, কংগ্রেস কোথাও আর-কাউকে স্বীকার করবে না। পাঞ্জাবে তো ফেডারেশন পার্টি আর বাংলায় নতুন কেপিপি। জওহরলাল তো বলে দিয়েছেন—ভোটে এটাই প্রমাণ হল যে দেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে কথা বলতে দুটি পার্টিই আছে—গবমেন্ট আর কংগ্রেস।

তাহলে কি প্রধানত মুসলমানদের পার্টি বলেই কংগ্রেস হকশাহেবকে মেনে নিল না? হকশাহেব যদি লিগে চলে যান! আর তাই তো গেলেন।

'আমি আপনাদের একটা চূড়ান্ত রাজনৈতিক খবর দিইতে এইসছি।'

'দিয়ে যান। কাল নিউজ-এডিটার দেখে যা করার করবেন।'

'খবরটা তো কাল সকালেই বেরনো দরকার।'

'কালকের কাগজ তো এখন ছাপা হচ্ছে।'

'সব তো আর ছাপা হয়নি। যেগুলো ছাপা হয়নি, সেগুলোতে তো দিতে পারেন।'

'সেটা যে একেবারে অসম্ভব, তা নয়। কিন্তু সেটা করার এক্তিয়ার আমার নেই।'

'কার আছে?'

'সম্পাদকদের। আমাদের কাগজের মালিকের।'

'তাঁদের জানানো যায় না?'

'তা যায়। কিন্তু আপনার পরিচয় বা খবর কিছুই তো আপনি বলেননি।'

'আমার নাম ও পরিচয়টা গোপন রাখতে চাই।'

'খবরটাও?'

'তাহলে আর আসা কেন?'

'খবরটা আমি কর্তাব্যক্তিদের জানাব এমন কথা দিচ্ছি না। এরপরও যদি খবরটা বলতে চান, বলতে পারেন।'

'কিন্তু ব্যাপারটা তো দেশের ব্যাপার।'

'দেশ? মানে?'

'বাংলাপ্রদেশের।'

'রাজনীতি ঘটিত? আজও তো কোনো ডিসিশন হয়নি। বোধহয়, আরো কথা হবে।'

'ডিসিশন হয়ে গেছে। কিন্তু কেউই সেটা প্রকাশ করছেন না।'

'প্রকাশ আবার করবে কে? এ-কাগজদের মালিকরা তো ডিসিশনের শরিক। এঁরা জানবেন না?'

'কংগ্রেস কেপিপিকে সমর্থন করবে না।'

'তা তো কংগ্রেস বলেনি। আমাদের তো নিউজ আছে। প্রোগ্রামও ঠিক হয়েছে। কোন্‌টা একনম্বর আর কোন্‌টা দুই নম্বর এই নিয়ে কথা চলছে।'

'কথা চইল্‌ছে না, কথা চইল্‌বেও না। এখন দুই পার্টিই ওজর খুঁজছে। আইজ সন্ধ্যায় নলিনী সরকারের বাড়িতে লিগের নেতাদের সঙ্গে হকশাহেবের মিটিং ছিল। তাতে লিগ হকশাহেবকে নিঃশর্ত সমর্থন দেইবে বলে কথা পাকা হইয়ে গেইছে।'

ভদ্রলোক এত বড় খবরটা শুনে একটাও কথা বললেন না। কথাটা যে তিনি জানেন না সেটা তাঁর মুখ দেখে সামসুদ্দিন বুঝলেন। গায়ে একটা আলোয়ান ছিল, সেই আলোয়ানের একটা কোণ দিয়ে চিবুকটা ঢেকে চশমাটা নামালেন। সামসুদ্দিন তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছে দেখে তিনি সামসুদ্দিনের চোখে চোখ মেলালেন না। টেবিল থেকে একটা কাগজ তুলে চোখের সামনে মেলে আবার রেখে দিলেন। একবার তাঁর টেবিলের ফোনটার দিকেও তাকালেন। তারপর, চেয়ারটা টেনে সোজা হয়ে বসে টেবিলে দুই কনুই রাখলেন। এতক্ষণ ওঁর চেয়ারটা তেরছা ছিল।

'খুব সম্ভবত আপনার খবরটা ঠিক।' কিছু বলার জন্য সামসুদ্দিন হাঁ করেছিল, ভদ্রলোক হাত তুলে তাঁকে থামতে ইঙ্গিত করে বললেন, 'আপনার পরিচয় আপনি দেননি। আমার অনুরোধ, দেবেন না। আমি আপনাকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করব কিন্তু হয়ত পারব না। আপনি নিশ্চয়ই কেপিপির খুব বড় নেতাদের একজন। তাই আপনাকে ভুলে-যাওয়া কঠিন। খবরটা

আমরা ছাপার কোনো চেষ্টা করব না—আমার স্বার্থে ও আপনার স্বার্থে। আমার স্বার্থটা কোথায় বলছি। এই কাগজ যাঁরা বের করেন, তাঁরা শুধু কাগজই করেন না, তাঁরা রাজনীতির নেতা। রাজনীতির প্রকাশ্য কাজকর্মে যত, এঁদের আগ্রহ তার চাইতে অনেক বেশি নেপথ্যে। বাংলাপ্রদেশে নতুন ও প্রথম মন্ত্রিসভা হচ্ছে আর ওঁরা তা জানেন না, এটা ওঁরা কখনো মানতে পারবেন না। এঁদের হাত আছে,—শেষ মুহূর্তে কংগ্রেসকে ঠেকিয়ে দেয়ায়। আমি দেউলি, হ্যাঁ, রাজপুতানার দেউলি ক্যাম্পে ছিলাম। বছর খানেক হল ছাড়া পেয়েছি আর এঁরা জেনেশুনেই আমাকে প্রায় ডেকে এই চাকরি দিয়েছেন—সেটা বোধহয় ইংরেজির এমএ পরীক্ষার রেজাল্টের গুণে—জেল থেকে দিয়েছিলাম। যে বিপ্লবী রাজনীতির অপরাধে দেউলিতে ছিলাম। দেউলিতেই সেই রাজনীতি থেকে সরে এসেছি, বিপ্লব বলতে যা বুঝেছিলাম, তাও বদলেছে। কিন্তু আমরা অনেকেই এখনো খুব পরিষ্কার জানি না, এখন আমরা রাজনীতি ও বিন্যাস বলতে কী বুঝতে চাই। সেই বোঝার পক্ষে এই চাকরিটা আমাকে সাহায্য করবে। বইপত্র আসেও কম, দামও এত বেশি। এখন যদি কর্তাব্যক্তিদের কাছে সব জানাই ও আমাকে কী করতে হবে, জানতে চাই—তাহলে তাঁরা অপমানিত বোধ করতে পারেন—আরে, এত বাসি খবর এত রাতে কোত্থেকে পেলে। উলটোটাও হতে পারে—আরে, তাই নাকী, দাঁড়াও, দাঁড়াও, লোকটাকে আটকে রাখো। এতটা উলটোপালটা। ব্যাপারে আমি যেতে চাই না। আপনিও তোতাহলে নিজের নাম-পরিচয় গোপন রাখতে পারবেন না। সুতরাং আমাদের দু-জনেরই স্বার্থ—এমন কোনো ব্যাপার, মানে আপনার-আমার দেখাশোনা কথাবার্তা যে হয়েছে সেটা এই মুহূর্তেই ভুলে যাওয়া। আমি ভুলে যাব ও কখনো বিশ্বাসই করব না যে আপনি এই খবর নিয়ে এসেছিলেন। তবে, আপনি তো রাজনীতি করেন। তার প্রয়োজনে আপনি বলতে পারেন যে আপনি এই পত্রিকায় এসেছিলেন অথচ এরা খবরটি ছাপেনি। আপনি আমার নাম জানেন না। আমিও তো আপনার নাম জানি না।'

সামসুদ্দিন বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে ও তর্জনীতে কপালের মাঝখানটা চেপে ধরে—'তাহলে বাংলার মুসলমান কৃষককে এখন শুধু মুসলমান হতে হবে। কৃষক না-হলেও চলবে?'

ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন, সামসুদ্দিনকেও দাঁড়াতে হল।

'আপনার কথা শুনতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু এখানে কেউ আপনাকে চিনে ফেলতে পারে। আমাকেও একটু টেলিপ্রিন্টারের খবরগুলি দেখতে হবে। খবরের কাগজে খবর ফাঁস করে কি কৃষকের মুসলমান হওয়া ঠেকাতে পারবেন? কৃষককেই সেটা ঠেকাতে হবে।'

'আমাদের না-খেতে-পাওয়া, নিরক্ষর, ধার আর সুদে নাকও ডুবে গেছে, এর বেইশি কত ঠেকাবে? না অইলে আমরা দিইতাম নাকী হকশাহিবই জিইতত? পচ্চিমা উলেম, আইল্যা কত নামাজ যে পড়াইল। তাও তো ঠেইকেছে?

দোতলা থেকে নামার সিঁড়ির সামনে এসে ভদ্রলোক দাঁড়ালেন, 'তাহলে আসুন।'

সামসুদ্দিন সিঁড়ি বেয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এলেন। তাকে তো সত্যিই চাঁপদানি যেতে হবে।

কংগ্রেস-এর হকত্যাগ ও হকশাহেবের লিগ প্রবেশের ফলাফল

৪৩

ভোট নিয়ে, ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি নিয়ে, কৃষক-প্রজা নিয়ে, এর সঙ্গে ওর ঐক্য হওয়া ও না-হওয়া নিয়ে, কী কী সরকার তৈরি হতে পারে তা নিয়ে আর সবার ওপরে পটুয়াখালিতে নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে ফজলুল হকের লড়ালড়ি নিয়ে কলকাতার ইংরেজি-বাংলা কাগজগুলোতে ১৯৩৬-এর পুজোর পর থেকে ১৯৩৭-এর এই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত খবরের আর শেষ ছিল না। আকরাম খাঁ-র সাপ্তাহিক ও মাসিক 'মোহম্মদী', আকরাম খাঁর 'আজাদ', নাজিমুদ্দিনের 'স্টার অব ইনডিয়া', বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের 'বসুমতী', সুরেশ মজুমদারের 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ঘোষদের 'অমৃতবাজার পত্রিকা' শরৎ বোসদের 'ফরোয়ার্ড'—এদের প্রত্যেকটা কাগজই ছিল কোনো-না-কোনো পার্টির প্রচারপত্র ও বলা বাহুল্য পরস্পরের স্বার্থবিরোধী। কিন্তু এতসব কাগজের এতসব পুরনো ও জিয়নো স্বার্থ এমন এক হয়ে গেল কী করে ও কেন যে কংগ্রেস প্রজাপার্টির আলোচনা ভেঙে যাওয়ার খবর ১১ তারিখের সকালেও কোনো কাগজে বেরল না।

এমনকী নবাব হবিবুল্লাহের সঙ্গে ফোনাফুনির খবরও ১১ তারিখের সকালে বেরল না। এমনকী নলিনী সরকারের বাড়ির ১০ তারিখের নৈশভোজের খবরও কোথাও বেরল না। এমনকী ১২ তারিখের সকালের মিটিংয়ের খবর পর্যন্ত না।

বাংলায় রাজনীতি ও সমাজসংস্কার নিয়ে সেই ১৮১৮ সাল থেকে নানা মতের খবরের কাগজ বেরিয়েই আসছে। মুসলিম মালিকানায় দায়িত্ববান কাগজ বেরতে-বেরতে হয়ত উনিশ শতক পেরিয়ে গেছে কিন্তু মুসলিম সমাজের স্বার্থ নিয়ে কাগজে লেখালেখিও বাংলা খবরের কাগজ শুরু হওয়ার সময় থেকেই আছে। সিপাহি বিদ্রোহের সময় বাংলা কাগজে মুসলমানদের বিপক্ষে প্রকাশ্য লেখা হয়েছিল। তারপরই নীলবিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ (বিভিন্ন পর্যায়ের), চুয়ার বিদ্রোহ, পাবনা বিদ্রোহে কৃষক ও রায়তদের সম্পর্কে কিছুটা পক্ষপাতী লেখার সুবাদে মুসলমান-বিরোধিতা প্রধান হয়ে উঠতে পারেনি। উনিশ শতকের শেষ বিশ-পঁচিশ বছরের নব্য হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার লক্ষ ছিল, হিন্দু সমাজের সংরক্ষণ। বিশ শতকের শুরু থেকেই, বিশেষ করে প্রথম বঙ্গভঙ্গে হিন্দু ও মুসলিম সাংবাদিকতা আলাদা হয়ে যায় ও সাম্প্রদায়িক হয়ে পড়ে।

সাংবাদিকতার এত পুরনো ইতিহাস ও বিদ্বিষ্ট সাম্প্রদায়িক প্রচারে খবরের কাগজকে কাজে লাগানোর কায়দাকানুন আয়ত্তে থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস আর প্রজা পার্টির আলোচনা ভেস্তে যাওয়া ও লিগপ্রজা কথা-শুরু খবরটা ১৩ ফেব্রুয়ারি 'স্টার অব ইনডিয়া'র টেলিগ্রাফ-সংস্করণে ফজলুল হক, ইস্পাহানি, সামসুদ্দিন আমেদ, সারওয়ারদি ও ঢাকার নবাব খাজা হবিবুল্লাহের বিবৃতির আগে কোথাও বেরল না। সেই ইংরেজি বিবৃতিতে ছিল, 'বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লির নির্বাচিত সমস্ত মুসলমান সদস্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করুন—সারা প্রদেশে ব্যস্ত অত্যন্ত গভীর আবেগপ্রসূত এই আকাঙ্ক্ষার প্রতি স্বীকৃতি জানিয়ে ও এই প্রস্তাব কার্যকর করার সম্ভাবনা সম্পর্কে সদস্যদের পূর্ণ বিশ্বাস জ্ঞাত হওয়ার পর, লিগ ও প্রজাপার্টির নেতাগণ মতবিনিময়ের মধ্য দিয়ে সংবিধানকে কার্যকর রাখার উদ্দেশ্যে এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে সহযোগিতা করার সম্মতিতে পৌঁছেছেন, পার্টি দুইটির অনুমোদন সাপেক্ষে।'

এই বিবৃতি বেরল ১৩ তারিখ সকালে। পরদিনই ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রজা পার্টির কর্মসমিতি ও তার পরদিন ১৫ ফেব্রুয়ারি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লিগের কর্মসমিতি নেতাদের এই প্রস্তাব

অনুমোদন করল। দশদিন পর ২৬ ফেব্রুয়ারি একে ফজলুল হক ও ঢাকার নবাব এক যৌথ বিবৃতিতে জানান যে এ-বিষয়ে আইনসঙ্গত চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেছে।

মাঝখানে ২২ ফেব্রুয়ারি 'ফরোয়ার্ড' কাগজে লেখা হল, 'এ-কথা জানাবার অবস্থায় আমরা পৌঁছেছি যে বাংলাপ্রদেশে, প্রথম মন্ত্রিসভা তৈরির জন্য কংগ্রেস পার্টি ও প্রজাপার্টির মধ্যে সমঝওতার প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছে। প্রজা পার্টির কর্মসূচিতে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবি অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এই প্রত্যাশা জাগরুক হয়েছিল যে কংগ্রেস পার্টি ও প্রজা পার্টি বিরোধীপক্ষেই হোক আর সরকারপক্ষেই হোক একযোগে কাজ করতে পারবে কিন্তু দেখা গেল যে প্রজানেতারা রাজবন্দীদের মুক্তিদাবিকে গভর্নরের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণার একটি বিষয় করতে চায় না, তাঁরা শুধু রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে আইনসভায় নানা প্রস্তাব গ্রহণ পর্যন্ত যেতে রাজি।...এই শর্ত মেনে নেয়া কংগ্রেসের পক্ষে অসম্ভব। কারণ এই শর্ত মেনে নেয়ার অর্থ দাঁড়ায় কংগ্রেস সদস্যরাও পরোক্ষত মনে করেন যে রাজবন্দীদের মুক্তি দেয়াটা বিপজ্জনক হতে পারে।'

১৯৪৭-এ দেশভাগের ভিত্তিতে স্বাধীনতা মেনে নেয়া উচিত হয়েছিল কী অনুচিত-এমন একটা নীতিগত প্রশ্নের মীমাংসা থেকে তখনকার বাস্তব বিকল্পগুলি খোঁজাই যাবে না।

এটা তো প্রমাণ হয়ে গেছে—ইসলাম আনুগত্যের প্রাদেশিক জনসংখ্যার কমবেশি ধরে যে পাকিস্তান কল্পনা করা হয়েছিল, সে কল্পনা এক দশকও অটুট থাকেনি। পাকিস্তানের কোনো সংবিধান বা গণতন্ত্র গড়েই উঠতে পারেনি। গণতন্ত্রকে অনিশ্চিত করে দেয় আর-একটি কোনো বিকল্প সমাবেশ—সেনাবাহিনী।

এখন হয়ত এ-কথাও বলা যায়, ভারত-পাকিস্তানের স্বতন্ত্র স্বাধীনতা দিয়ে উপনিবেশ-মুক্তির প্রথম প্রহর শুরু হয়েছিল। মাত্র বার-চোদ্দ বছরের মধ্যে নতুন-নতুন সব স্বাধীন দেশ তাদের সত্তা হারিয়ে ফেলল সেনাবাহিনীর সমর্থিত কোনো এক প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রীর দৈত্যাকার ছায়ার ভিতরে। সেসব সেনাবাহিনীও বেশিরভাগ সময় বাইরের দেশ থেকে আসা ও কোনো বাইরের দেশের ইচ্ছেতেই রাষ্ট্রগুলির বদলে রাষ্ট্রের ছায়াগুলি এমন সত্তাগ্রাসী আকার পায়। এই দেশগুলির মধ্যে এখন পাকিস্তান প্রবীণতম। সে হিশেবে পাকিস্তানকে এখন ষাট বছরের পুরনো বিশ্বব্যবস্থার স্মারকচিহ্ন বা রেলিকও বলা যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরের পৃথিবীর নতুন দেশবিন্যাসে পাকিস্তানই প্রথম দেশ যারা নিজেদের ইসলামি ঘোষণা করেছিল। প্রবীণ পাকিস্তানের একটি অংশ এখন দুনিয়ার অন্যতম নবীন রাষ্ট্র। বাংলাদেশ। সেখানে ভাষা স্বাদেশিকতার বোধ রাজনৈতিক ক্ষমতার আধার হয়েছে বটে—যেমন মধ্য ইয়োরোপে ঘটেছে—আলবানিয়া, রোমানিয়া, সারাজেভো সার্বিয়ায়, তবু বাংলাদেশে তাদের ভাষা-স্বাদেশিকতা থেকে স্থায়ী কোনো রাষ্ট্ররূপ তৈরি হয়ে ওঠেনি। বাংলাদেশের মানুষের মনে একটা অস্পষ্ট অপরাধবোধ কাজ করে যে জিন্না-র নেতৃত্বের পাকিস্তান পরিকল্পনার অনুগামী হিশেবে তারাও তো দেশভাগের পক্ষেই কাজ করেছে। ফলে যে-মধ্যবিত্ত তার উত্থানের সমস্ত শক্তি দিয়ে বাংলাভাষাকে আন্তর্জাতিক করে তুলছে, তারা বাংলাদেশের সহযোগী সত্তা হিশেবে পশ্চিমবঙ্গকে পাচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসায়-রাজনীতি-পঠনপাঠন-গবেষণা, প্রতিষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা অধস্তন হয়ে রয়েছে।

ইতিহাস তো বিচারক নয়। হবেই-বা কী করে? তামাদি ঘটনা ছাড়া তো ইতিহাস হয় না। আর এখনকার ঘটনা ছাড়া তো কোনো বিচার হয় না। হ্যাঁ—আ, এখনকার দরকার থেকেই ইতিহাস খোঁজা হয়—এমন একটা গদগদে কথা যদিও-বা মানা যায়, ইতিহাস ছাড়া কার্যকারণ

জানা যাবে না—এমন আহাম্মকি কথার এক পয়সারও ক্রয়ক্ষমতা নেই, যুদ্ধে পরাস্ত রাষ্ট্রের নোট বা খুচরোর মত। ইতিহাসের আছে মাত্র কতকগুলি পদ্ধতি। সে-পদ্ধতি থেকে সত্য তৈরি হয়, সত্য বাতিলও হয়। সত্যনির্মাণ ও সত্যবিনির্মাণের এই পদ্ধতির কারণেই ইতিহাসের ভিতরে নীতিগত ভালমন্দ, উচিত-অনুচিতের ভেজাল মিশে যায়। ভারতে আবার সেই নীতিবোধগুলি মিথ্যা দিয়ে ঠাসা। ভারতের নানা ধর্মের মানুষের বৈচিত্র্য আছে বটে কিন্তু সত্য কী হওয়া উচিত আর মিথ্যা কী হওয়া উচিত—সব ঠিক করা আছে। শুধু মিলিয়ে দিতে হয়। সেই ভেজাল থেকে আবার কতকগুলি সরবতা-নীরবতা তৈরি হয়। যন্ত্র বা যুক্তির শৃঙ্খলা। আসলে সে-সবের বালাই সেই সরবতা—নীরবতার সঙ্গতি রেখে নেতারা ঘটনা জানিয়ে দেন। বা, বানানো ঘটনার ব্যাখা বদলে দেন। সেই নতুন ঘটনা আবার নতুন সরবতা-নীরবতার দিকে চলে যায়।

ফজলুল হকের সঙ্গে কংগ্রেসের আপোশ প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেল। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি চেয়েছিল, বাতিল হোক। সে-চাওয়াটা নিয়ে তারা সরব হয়নি। শরৎ বোসের মত নেতারা চেয়েছিলেন, মন্ত্রিসভা তৈরি হোক। সে-চাওয়াটা নিয়ে তারা সরব হয়নি। সরব না-হওয়ার একটা কারণ হয়ত ছিল প্রদেশ কংগ্রেসের নেতাদের ভিতরে অমিল। সে মতানৈক্য এতই গভীর ছিল যে একটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে সেই নেতাদের থাকারই কথা নয়। মুসলিম লিগের নেতাদের মধ্যেও অনৈক্য ছিল কিন্তু তাদের পার্টি তখন এত ছোট যে সেই অনৈক্য সত্ত্বেও তাদের এক পার্টিতেই থাকতে হত। ফজলুল হক তাঁর মতবদল, দলবদল, কোনো গোপন বাধ্যতার ওপর ছেড়ে দেননি। ইউনাইটেড মুসলিম পার্টির উদ্দেশ্য যে তিনি ধরে ফেলেছেন, তা, কোথাও গোপন করেননি। ইউনাইটেড মুসলিম পার্টিও গোপন করেনি।

এতটা প্রকাশ্যতা সত্ত্বেও প্রজা পার্টি ও কংগ্রেসের আলোচনার ব্যর্থতা নিয়ে কোনো একটি কথাও কেউ বললেন না কেন, মুসলিম লিগের সঙ্গে প্রজা পার্টির সমঝওতার খবর প্রকাশ্য বিবৃতিতে প্রচারিত হওয়ার আগে?

সে-নীরবতায় কি নিহিত ছিল বাঙালির সমষ্টিগত কোনো সদিচ্ছা বা সম্মতি। জমিদারি উচ্ছেদ হকশাহেবের অন্যতম প্রধান কর্মসূচি হলেও কংগ্রেসের সঙ্গে বাঁধা থাকলে মধ্যস্বত্ব আরো কিছুদিন থেকে যাবে—হিন্দুদের এমন একটা আশা ছিল? কিশোরগঞ্জ দাঙ্গা, নেয়াখালিতে হিন্দু মহাজনের বাড়ি আক্রমণ ও লুট—এই সব ঘটনা সত্ত্বেও কৃষক-প্রজা পার্টির নামকরণে 'প্রজা' বলে যাদের চিহ্নিত করা হয়েছিল, তারাও কিন্তু চাষি-জমিদার সম্পর্কের ধাঁচার বাইরে যেতে চায়নি। কংগ্রেসের ভিতরে থেকেই বামপন্থীরা—সোস্যালিস্ট ও কমিউনিস্টরা—জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বা কলেজের পড়াশুনো শেষ করে বাংলার বেশ দুর্গম জায়গাতেও জমিদার-জোতদারের নানা ছুতোর আদায় না দিতে কৃষকদের সংগঠিত করছে, জমিদার-জোতদার-মহাজনের হাট ভেঙে দিয়ে 'দশের হাট' বসাচ্ছে। হিন্দু মধ্যশ্রেণির একটা বড় ভরসা ছিল হকশাহেবের ওপর। সেই সম্মতির কারণেই কি ঐ নীরবতা রক্ষা করা হয়েছিল ১০ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি? সে-নীরবতার ভিতর কি ছিল এমন প্রত্যাশা যে কংগ্রেস সমর্থন না করলেও তপশিলি জাতিগুলির সংরক্ষিত আসনের মেম্বারদের মধ্য থেকে ও স্বতন্ত্র মুসলিম মেম্বারদের মধ্য থেকে কিছু সমর্থন হয়ত হকশাহেবকে একটা সুযোগ তৈরি করে দেবে।

এর উলটোটাও একইরকম সত্য হতে পারে।

বাংলার মানুষজন হিন্দু-মুসলমানে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। গ্রাম-শহরের হিন্দুরা ভয় পেয়েছিল। লিগ ও প্রজাপার্টির মধ্যে মুসলিম ভোটের ভাগাভাগিতে নতুন সরকারের ওপর মুসলমানদের আধিপত্য থেকে রেহাইয়ের একটা সম্ভাবনা হিন্দুরা হিশেবে এনেছিল। কংগ্রেস সমর্থন দিতে

আপত্তি করায় হিন্দুদের তেমন কিছু আশা করার মত থাকল না। পরন্তু প্রজা পার্টি ও মুসলিম লিগ একত্র হওয়ায় মুসলমান জনসাধারণ নতুন আশা পেয়েছিল। ঐ নীরবতা তৈরি হয়েছিল সেই ভয়ে ও আশায়।

বড়লাট লিনলিথগোকে লেখা ছোটলাট অ্যান্ডারসনের গোপন চিঠি

৪৪

১৯৩৫-এর ভারত-শাসন আইন পাশ হওয়ার পর ভারতের ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো নিয়ম করেছিলেন প্রত্যেক প্রাদেশিক গভর্নর পনের দিন অন্তত নিজ-নিজ প্রদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি জানিয়ে ভাইসরয়কে একটা গোপন রিপোর্ট দেবেন। ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট পর্যন্ত এই নিয়ম মেনে চলা হয়েছে। ১৯৩৭-এর ২৬ ফেব্রুয়ারি ফজলুল হক ও ঢাকার নবাব যৌথ বিবৃতিতে প্রজালিগ মন্ত্রিসভা গঠনের সংবাদ দিলে ও তার আগে 'ফরোয়ার্ড' কাগজে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রজা-কংগ্রেস আলোচনার ব্যর্থতা স্বীকার করে নিলে, বাংলার গভর্নর জন অ্যানডারসন এই চিঠি লিখলেন ভারতের ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগোকে।

গভর্নমেন্ট হাউস ৯ মার্চ, ১৯৩৭
ক্যালকাটা
মাই ডিয়ার লিনলিথগো,

কী হতে যাচ্ছে সে বিষয়ে নিশ্চিত জায়গায় না পৌঁছে তোমাকে কিছু জানাতে চাইনি বলে ফেব্রুয়ারির মাসিক রিপোর্টটা আমি আটকে রেখেছিলাম। আমি এখন ফজলুল হককে নির্দিষ্ট প্রস্তাব দিয়েছি—মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে তাঁর মতামত জানাতে। তিনি সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন।

২. ফেব্রুয়ারির পুরোটা জুড়ে বিভিন্ন পার্টি, গ্রুপ ও নানা ধরনের লোকজন দর কষাকষি করেছে, সে সমস্ত কথা জেনে তোমার খুব একটা লাভ হবে না। তাই আমি চাইছি—এ-রিপোর্টে শুধু প্রধান ঘটনাগুলি জানাব। তা থেকে বোঝা যাবে কী করে এখনকার পরিস্থিতিতে পৌঁছুনো গেল। যতক্ষণ-না পরিস্থিতি দানা বেঁধে ওঠে, ততক্ষণ আমি সব নেতাদেরই নিষ্ঠুরভাবে এক করে রেখেছিলাম। তারপর প্রধান দলগুলির সেক্রেটারিদের কাছে চিঠি পাঠিয়ে তাঁদের নির্বাচিত সদস্যদের সম্পর্কে আমাকে তথ্য জানাতে অনুরোধ করি—এমএলএদের সংখ্যা, ও আপত্তি না থাকলে তাঁদের নাম—যাঁরা দলের হুইপ মেনে চলতে রাজি আছেন। যাতে গুজব না-ছড়ায় ও এক-এক পার্টি এমএলএদের সংখ্যা বাড়িয়ে না রটায়, সেই উদ্দেশ্যে আমি একটু ইশারাও দিয়েছিলাম যে প্রয়োজনে এই চিঠিপত্র প্রকাশ করা হতে পারে। কংগ্রেসসহ সব পার্টিই যথাযথ জবাব দিয়েছে। কংগ্রেস বলেছে, তারা এমএলএদের নাম দিতে পারবে না। আমি অনেক নেতার সঙ্গেই দেখা করেছি, কথা বলেছি ও মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে তাঁদের মত জানতে চেয়েছি। কংগ্রেসের শরৎ বোস জানালেন, তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে পারেন কী না সেটা জওহরলালকে জিজ্ঞাসা না করে তিনি বলতে পারছেন না। তাছাড়া এআইসিসি অধিবেশনের আগে তাঁর পার্টির

মত সম্পর্কেও তিনি কিছু বলতে পারবেন না। এসব সত্ত্বেও আমি যদি চাই, তাহলে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে পারেন। আমি তাঁকে আসতে আমন্ত্রণ করি। আমাদের দু-জনের মধ্যে বেশ সুন্দর ব্যক্তিগত কথাবার্তা হল। উনি বোধ হয় হাইকোর্টে যাচ্ছিলেন, একটা খুব সুন্দর সুট পরে এসেছিলেন। যা হোক, উনি অন্তত আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন বলেই তাঁর অনভ্যস্ত খদ্দর পরে আসেননি। রক্ষে।

৩. একই সময়ে ও প্রধান পার্টিগুলিকে আমার জিজ্ঞাসাবাদে উৎসাহিত হয়ে ২২ জন তপশিলি এমএলএ সাততাড়াতাড়ি এক পার্টি খাড়া করেছেন—একজন বেশ বড়লোক জমিদারকে প্রেসিডেন্ট বানিয়ে, লিডার বানিয়েছেন দু-জন ও আরো বেশ কয়েকজন মান্যগণ্য মেম্বারকে জুটিয়ে। এটা একটা দর-বাড়ানো কল। প্রধান পার্টিগুলির সঙ্গে আমার কথাবার্তার পর আমি দু-জন তপশিলি নেতার সঙ্গে দেখা করতে চাই, আইনসভায় একটি গুরুত্বশীল সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিশেবে। ইচ্ছে করেই চিঠিটি দেয়া হয়েছিল সেক্রেটারিকে। তিনি প্রেসিডেন্টকে বা আর কাউকে কিছু না-জানিয়ে স্বয়ং এসে হাজির।

৪. এখন, প্রধান পার্টিগুলির অবস্থা এরকম

লিগ—বলছে ৬৯, সম্ভবত ৬০-এর মত।

প্রজা—বলছে তাদের টিকিটে জিতেছেন ৪৮ জন কিন্তু লিগের সঙ্গে মিলে তারা মোট ১১২ জনের সমর্থন পাবে বলে দাবি করছে—এদের মধ্যে কয়েকজন আবার স্বতন্ত্র।

কংগ্রেস—সব শুদ্ধু ৬০ বলছে।

ন্যাশন্যালিস্ট—বর্ণ হিন্দুদের একটা গ্রুপ, ১৪ জন বলে বলছে, কিন্তু আগে যে ২২ জন তপশিলি মেম্বারের কথা বলা হয়েছে, তাদের সঙ্গে এদের শর্তসাপেক্ষ বোঝাপড়া আছে—জানিয়েছে। এরা সাহায্যই করতে চায়।

ইয়োরোপীয়—২৫ জন।

সংক্ষেপে এটুকু বলা দরকার—কী করে এই গ্রুপগুলি তৈরি হয়েছে ও ভবিষ্যতে তারা কে কী করতে পারে।

৫. আগের চিঠিতে সাধারণ ও ব্যক্তিগত যেসব ঝোঁকের কথা বলেছিলাম, সেসবই প্রত্যাশামত জাহির হয়েছে, কিন্তু একটি ঝোঁক সম্পর্কে যা আন্দাজ করা গিয়েছিল সেটা অনেক জোরালো হয়ে উঠেছে। মুসলিমরা গভীর আশায় আছেন, যে-করেই হোক তাঁদের নেতাদের একসঙ্গে হতে হবে। 'স্বতন্ত্র' প্রার্থী হিশেবে যাঁরা জিতেছেন তাঁদের মনোভাব ফজলুল হকের কাছে স্যার নাজিমুদ্দিনের হার—নৈতিকভাবে স্থির করে দিয়েছে যে-কোনো মুসলিম মেম্বারদের নিয়ে মন্ত্রিসভা হলে, ফজলুল হকই তার নেতা হবেন। অন্যদিকে মুসলিম ঐক্য ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ সত্ত্বেও, তাঁরা সে-সুযোগ নষ্ট করলেন—এমন অপরাধে তিনি বা মুসলিম লিগ কেউই মুসলিমদের কাছে দোষী হতে চান না। তাঁদের নিজেদের চেষ্টাতেই একটা কোয়ালিশন তৈরি হয়েছে। কলকাতার একটি উপনির্বাচনে তা হাতেনাতে বোঝাও গেল। তাঁর বিরুদ্ধ-প্রার্থী, কংগ্রেসের এক রিট্যায়ার্ড সরকারি চাকুরেকে গো-হারান হারিয়ে স্যার নাজিমুদ্দিন জিতেছেন।

৬. কোয়ালিশনে যে মুসলিম মন্ত্রিত্বগুলি পাওয়া যাবে ও আরো যেসব পদ খালি আছে—সেসব

জায়গাতেই দুই পার্টির প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের মধ্যে ভাগের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু ফজলুল হকের প্রধান কর্মসূচির দাবিগুলির ধার অনেক ভোঁতা করা হয়েছে। 'দমননীতি বন্ধ করা ও রাজবন্দী ও নজরবন্দীদের মুক্তি দেয়ার' দাবির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, 'জনসাধারণের নিরাপত্তার সঙ্গতিপূর্ণ।' প্রাথমিক শিক্ষা বিনামূল্যে দেয়ার বদলে এখন 'যে-গরিব মানুষজনের পক্ষে করের ভার বওয়া সম্ভব নয় তাদের জন্য বিনামূল্যে'—এ-কথা থেকে কিছুই স্পষ্ট করে বোঝা যায় না। চিরস্থায়ী বন্দবস্তের হালসুরত নিয়ে একটি অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করা হবে। মন্ত্রিদের মাইনে একটা হাস্যকরস্তরে নামিয়ে আনা নিয়ে কোয়ালিশনের যুক্ত-ইশতেহারে কিছু বলা হয়নি। স্বভাবতই, কর্মসূচির স্বর নরম করা আর ফজলুল হকের সমর্থন তাদের হাতে থাকল।

৭. নিজেদের ভিতর থেকে কোয়ালিশনে ঝামেলা পাকতে পারে। ফারুকি শেষ দানও নিজের হাতে রেখে খেলেছে কিন্তু মুসলিম মনোভাবের চাপ এড়াতে না পেরে লিগের পক্ষে সই দিয়েছে, কোয়ালিশনের পক্ষে মত দিয়েছে কিন্তু যদি তাকে মন্ত্রিসভায় নেয়া না হয় তাহলে সর্বক্ষণ গোলমাল পাকানোর ফাঁক খুঁজবে। এক নবাব মুসারফ হোসেন, উত্তরবাংলায় এক বড়লোক ও ধুরন্ধর ব্যবসায়ী, কম দিনের জন্য মন্ত্রীও হয়েছিলেন, আজকাল তাঁর কথা খুব একটা শোনাও যাচ্ছিল না। কোয়ালিশনের মধ্যে এক 'উত্তরবঙ্গ গ্রুপ' নিয়ে খুব নড়াচড়া শুরু করেছেন—বেশ স্পষ্ট কারণেই। তদুপরি, আমি আগেই বলেছি ফজলুল হকই সবচেয়ে নড়বড়ে মাল। আজ হোক, কাল হোক, কংগ্রেস যদি ক্ষমতায় আসতে চায়, তাহলে ফজলুল হক নিজেই কোয়ালিশনের ভিতর কত কাঠি ঢোকাবে। এদের একসঙ্গে, রাখার সবচেয়ে বাস্তব কারণ—ভয়। যদি কাউকে প্রকাশ্যত মুসলিম ঐক্য নষ্ট করার জন্য দায়ী করা যায়—তাহলে মুসলিম জনসাধারণের কাছে তার আর কোনো উদ্ধার নেই। এই ভয় সত্ত্বেও মেম্বাররা যে গোপনে আখের গোছানোর বা পয়সা কামাইয়ের চেষ্টা করবে না তা নয়। সুযোগ পেলেই করবে।

৮. ন্যাশন্যালিস্ট পার্টির কথা আগে বলেছি। জে এন বসু বলে কলকাতার এক নামজাদা সলিসিটার ও লিব্যারাল এর নেতা। এদের ১৪ জন বর্ণ হিন্দু মেম্বার, বেশিরভাগই জমিদার। তপশিলি মেম্বারদের ২২ জনের একটা গ্রুপ 'শর্তসাপেক্ষে' এদের সঙ্গে কোয়ালিশন করতে চান—'শর্তগুলি এখনো জানা যায়নি।' বলা বাহুল্য, লুটের বখরা চাই।

বর্ণহিন্দুদের মধ্যে স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় (বর্তমানে মন্ত্রী) ও বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের নলিনীরঞ্জন সরকার বিশিষ্ট লোক।...জে এন বসু মন্ত্রী হতে চান না। কিন্তু অন্য সব উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে আছেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও এক কুমার শিবশেখরেশ্বর—দু-জনেরই ঝোঁক কংগ্রেসের দিকে। প্রথম জন সম্পর্কে ধারণা—বিরোধী পক্ষে গেলে ওর দক্ষতার কারণেই বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু তিনি যেভাবে বিশ্ববিদ্যালয় চালাচ্ছেন তাতে মুসলিমরা তাঁকে অন্তর থেকে অপছন্দ করে। আর, দ্বিতীয়জন ১৯৩০-এ অল্পদিনের জন্য মন্ত্রী হয়েছিলেন, বিশেষ কিছু করেননি, তারপর তাঁর কথা শোনা যায়নি।

৯. ন্যাশন্যালিস্ট পার্টি আর মুসলিম কোয়ালিফিকেশনের মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন—মন্ত্রিসভায় হিন্দুদের ভার কতটা থাকবে। মুসলিমরা বলছেন, একজনও নয়। বড়জোর দু-জন ডেপুটি মিনিস্টার। যাঁরা কোয়ালিশনকে সমর্থন দেবে তেমন হিন্দু মেম্বারের সংখ্যা এতই কম যে

সরকারের টেকা-না-টেকার ওপর তাঁদের কোনো প্রভাবই পড়বে না, তা ছাড়া তাঁরা আলাদা-আলাদা সব লোকের মধ্যে বাছাবাছি করতে পারবে না ও তাছাড়াও মন্ত্রিসভায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে মুসলিম জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষা—এই যুক্তিতে মুসলিমরা কিছুতেই ৬ : ৩ অনুপাতের বেশি হিন্দুদের জন্য ছাড়তে রাজি না। হিন্দুরা মন্ত্রিসভায় সমানুপাত চায় ও কিছুতেই ৯-এর মধ্যে ৪-এর কম না। হিন্দুদের নিজেদের মধ্যেও গোলমাল—তপশিলি গ্রুপের চাপ নিয়ে।

১০. ফজলুল হককে আমি আমার মত বোঝাতে পেরেছি যে যতদিন—না হিন্দু মন্ত্রীরা দেশের কাছে প্রমাণিত হন যে তাঁরা কোনো কাজের যোগ্য নন, ততদিন পর্যন্ত এমন ভ্রাতৃপ্রতিম সম্প্রদায়কে এই ন্যায়সঙ্গত অভিযোগ নিয়ে মন্ত্রিসভায় ডাকা যায় না—যে-অভিযোগের কারণে তাঁদের মধ্যে যাঁরা বিশিষ্ট ও যোগ্যতম, তাঁরা মন্ত্রিসভায় আসতে রাজি হবেন না। ৬ : ৩ অনুপাত বলা হয়েছে ভুল হিশেবের ওপর নির্ভর করে। সঠিক অনুপাত হবে ৫জন মুসলিম ও ৪জন হিন্দু। ফজলুল হক কথাটা ধরতে পেরেছেন। কিন্তু তাঁকেও তো স্বধর্মীদের সামলাতে হচ্ছে ও যাঁদের কথা দেয়া হয়েছে তাঁদের কাছে দায় আছে—নইলে তো কোয়ালিশনই টিকবে না।

১১. ইয়োরোপিয়ানরা আপাতত ফজলুল হক সম্পর্কে তাঁদের গভীর অপছন্দ ভুলে থাকতে চান ও তাঁর নেতৃত্বে একটা শক্তিশালী সাংবিধানিক সরকারকে সমর্থন দিতে চান যতদিন এই সরকার ইয়োরোপীয় স্বার্থে ও ধ্যানধারণার ওপর কোনো আক্রমণ না করেন। তাঁরা মন্ত্রী হতে চান না কিন্তু ফজলুল হক যদি অনুরোধ করেন, তাহলে, আইনশৃঙ্খলা ছাড়া যে-কোনো 'জাতিনির্মাণ'—সংলগ্ন দপ্তর নিতে রাজি হতে পারেন। ওঁদের এই প্রস্তাবে হয়ত ফজলুল হক এই সাম্প্রদায়িক জট থেকে বেরবার একটা রাস্তা পেতেও পারেন। আমার অবিশ্যি মনে হয় এঁদের এখনই মন্ত্রিসভায় ঢোকা উচিত নয়।

১২. কংগ্রেসের শরৎ বোস তাঁর ব্যক্তিগত মতটুকুই জানাতে পারেন, বলেছিলেন। তিনি নিজে সরকারে যাওয়ার বিপক্ষে। কিন্তু কংগ্রেস যদি যে-প্রদেশে সংখ্যাগুরু সে-প্রদেশে সরকারের যেতে রাজি হয়, তাহলে কংগ্রেসের উচিত হবে অন্যত্রও কোয়ালিশনের চেষ্টা করা, প্রথমদিকে হয়ত কেউ রাজি হবে না। পরে অবস্থা বদলাতেও পারে। মন্ত্রিসভায় হিন্দুদের সংখ্যার অনুপাত বাড়ানোতে খুশি হলেও তাতে কংগ্রেসর মনোভাব কেন বদলাবে না—সেটাও তিনি বিস্তারিত বলেন। আমি অন্যদের কাছে শুনেছি, তিনি নিজে অবিশ্যি কিছু বলেননি যে তাঁর নিজের পার্টির দলাদলি ও লাগালাগিতে তাঁর মন খুব খারাপ আর তিনি মনেও করেন না যে বাংলায় কংগ্রেস চিরস্থায়ী বিরোধীপক্ষ হয়ে থাকবে।

১৩. আর কোনো কথা যে তোমাকে এখনই জানানো দরকার, তা তো মনে হচ্ছে না। আমি ফজলুল হককে বারবার বলেছি, পার্টিনেতাদের সঙ্গে ওঁর বিশদ আলোচনা খুবই দরকার। তাঁকে এ-ইশারাও দিয়েছি যে এক্ষুনি তেমন তাড়াহুড়োর কোনো দরকার নেই। এ-মাসের ২০ তারিখ নাগাদ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য তা নিতে পারলেই বলা যাবে—যথেষ্ট তাড়াতাড়িই তো হল।

তোমার একান্ত

জন অ্যানডারসন

নবাব ফারুকির প্রস্তাব স্যার রহিমকে মন্ত্রিসভা গড়তে ডাকুন

৪৫

১ এপ্রিলই তাঁর মন্ত্রিসভা তৈরি করে গভর্নর অ্যানডারসন ঠাট্টাতামাশার পাত্র হতে চাননি। কিন্তু তিনটি ঘটনার ফলে তিনি আর দেরি করতে পারেননি। প্রথম কারণটা হল এপ্রিল থেকে সরকারের আর্থিক বছর শুরু। অন অ্যাকাউন্ট একটা বাজেট বা টাকা বরাদ্দ না করলে নতুন আইনে সরকারের সমস্ত লেনদেন বন্ধ হয়ে যাবে। গভর্নর হয়তো বিশেষ ক্ষমতায় একটা বরাদ্দ চালু করতে পারতেন কিন্তু বিশেষ করে বাংলার রাজনীতিতে তাহলে আগুন জ্বলে উঠত। ভোট করে আইনসভা তৈরি হওয়ার পর গভর্নরের প্রথম কাজ বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার? একে এখন কংগ্রেসের ভিতর নানা ধরণের সোস্যালিস্ট ও কমিউনিস্টরা গিয়ে ঢুকেছে। তারাও অনেকে শিক্ষিত ভদ্রলোক, জমিদারদের ছেলে, বিলেতফেরত ও ব্যারিস্টার। বাংলায় কংগ্রেসের যে অষ্টবক্র দশা তাতে কোন্ নেতা কোন্ নেতার বিরুদ্ধে কী ঘোঁট পাকাচ্ছে—সেটা আন্দাজ করাও অসম্ভব। শরৎ বোস এইসব সোস্যালিস্ট—কমিউনিস্টদের তোল্লা দিতে পারে। জুটমিলগুলিতে স্ট্রাইকের কথা উঠেছে। তার ওপর প্রজা পার্টির আবার একটা ভাগ আছে, তারা লিগের সঙ্গে এই কোয়ালিশনে খাপ্পা। প্রজাপার্টির আর কংগ্রেসের নানারকম কৃষক সভা ও কৃষক সমিতি আছে। দুই পার্টিরই কৃষক সভার আঞ্চলিক নেতা আছে। প্রজা পার্টির নেতারা সত্যিই সেখানকার লোক ও জোতদার। মাইনে করা কিছু কর্মীকে কংগ্রেস এক-একটা অঞ্চলে কৃষক সভা তৈরির কাজে বসাচ্ছে। কংগ্রেসের কৃষক বলতে তো জমিদার। তারা তো আর কৃষক সভা করবে না। কংগ্রেস কৃষকদের বলবেই-বা কী। কংগ্রেস কী বলবে সেটা ঠিক করছে জেল থেকে ছাড়া পাওয়া রাজবন্দীরা—যারা টেররিস্ট হয়ে জেলে ঢুকে কমিউনিস্ট হয়ে জেল থেকে বেরচ্ছে বা নজরবন্দী হয়ে দূরের গ্রামে. থানার নজরদারিতে আছে। কোন্ গ্রামে এক স্বদেশী নজরবন্দী হয়ে আছে—রাতে চৌকিদার একবার হাঁক দিয়ে তার ওপর নজর রাখবে? তাঁর না-হয় যাতায়াতে নিষেধ আছে, তাঁর কাছে তো লোক আসায় বাধা নেই। ফজলুল হক তো 'জমিদারি ব্যবস্থা বেআইনি করো', আর, 'লাঙল যার জমি তার'—এই দুই আওয়াজকে আইনি করে দিয়েছেন। তাঁর আরো সাতসতের দাবিদাওয়ার মধ্যে ততটা খেয়াল করা হয়নি যে কংগ্রেসের ভিতরকার কমিউনিস্টরা আওয়াজ দুটো ঠোঁটে নিয়েছে আর এই আওয়াজদুটো থেকে ভোট ঝরিয়ে দিয়ে যতটা সম্ভব গ্রামের দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে—দেশান্তরী টিয়াপাখির ঝাঁক যেমন এক দেশের ফসলের বীজ আর-এক দেশের মাটিতে ফেলে যায়। নোয়াখালি, দিনাজপুর, মেদিনীপুর আর ত্রিপুরায় এসব

আওয়াজ ছড়াচ্ছে। মেদিনীপুরে কংগ্রেস-নেতারাই কৃষকদের নিয়ে মিটিং করছেন। বাংলার প্রদেশ-কংগ্রেস থেকে মেদিনীপুর বরাবরই আলাদা। তারাও প্রদেশকে পাত্তা দেয় না আর তাদেরও প্রদেশ পাত্তা দেয় না। টেররিস্ট আন্দোলনও মেদিনীপুরে সবচেয়ে জোরালো হয়েছিল—পরপর ১২ জন এসপিকে তারা মারে। এখন ভোটের পরও যদি গভর্নরকে বিশেষ ক্ষমতায় বাজেট বরাদ্দ করতে হয় তাহলে এই একটা হুকুমেই কলকাতার চটকল থেকে নোয়াখালির কৃষক পর্যন্ত এক করে দেয়া হবে—কংগ্রেসের তাহলে পোয়া বার।

১ এপ্রিল, অল ফুলস ডে হওয়া সত্ত্বেও এই দিনই যে মন্ত্রিসভা তৈরি করা হল তার দ্বিতীয় কারণ—লাটশাহেব তাঁর নিজের লোকজনের কাজ থেকে খবর পাচ্ছিলেন যে মন্ত্রিসভা নিয়ে অনিশ্চয়তাটা দিনেদিনেই পাকিয়ে উঠছে। লেখাপড়া করা, রাজনীতি বোঝা সব লোকই তো হিন্দু। হিন্দু ভদ্রলোক। তারা কেউ মন থেকে মেনে নিতেই পারছে না যে তাদের একটা মুসলিম সরকারের অধীনে থাকতে হবে। হ্যাঁ, আগেও মন্ত্রিটন্ত্রি থাকত কিন্তু সে তো ছিল কাউন্সিল। কারো কাছে কারো কোনো দায়িত্ব নেই। সবার ওপরে ছিলেন লাটশায়েব। তিনি হ্যাঁ না-বললে কোনো হুকুমই হুকুম না, কোনো আইনই আইন না।

লাটশাহেব নিজেও টের পাচ্ছিলেন—ফজলুল হকের মন্ত্রিসভাটা যাতে না হতে পারে, তার জন্য গোপনে একটা চেষ্টা চলছে—একটা চেষ্টা নয়, একাধিক চেষ্টা—কিন্তু লাটশাহেব বুঝতে পারছিলেন না—যাকে একাধিক চেষ্টা ভাবছেন সেটা আসলে এক চেষ্টারই দুই কায়দা নাকী! তাঁর সঙ্গে একদিন ত্রিপুরার স্যার ফারুকি দেখা করতে এল। ফারুকির সঙ্গে সব লাটশাহেবেরই ভাবসাব থাকে। খুবই কাজের লোক। খেলাধুলোয় ফুর্তিফার্তিতে আছে। কেউ বলতে পারবে না, ফারুকি তার লোক। নিজের স্বার্থ ছাড়া অন্য কারো স্বার্থে কোনো কাজ করে না। ফারুকি এসেই মজা করে বলল, 'স্যার, আপনি চাইলেই কি আর সব মুসলমান মিলে একটা পার্টি করবে? ইলেকশনের আগেই আমি বলেছিলাম—হিন্দুদের একটা কংগ্রেস আছে বলেই কি আর মুসলিমদের একটা পার্টি হতে পারে? ওরা কত্দিনের পার্টি!'

লাটশাহেবও মজা করেই বললেন, 'মুসলিম লিগ তো কংগ্রেসের চাইতে মাত্র ২১ বছরের ছোট।'

'২১ বছর তো একটা জেনারেশন স্যার। ২১-এ তো সাবালক। আমাদের মুসলিমদের তো ২১ বছরে দুটো বাচ্চা পয়দা না করলে ছেলের আবার সুন্নত করতে হবে। তার ওপর দেখুন, কংগ্রেসের বয়স তিরিশ হতে-না-হতেই আফ্রিকা থেকে এক গান্ধী আমদানি করল।'

এ-কথায় কারোপক্ষেই না-হাসা সম্ভব নয়, 'মিস্টার ফারুকি, আপনার সঙ্গে নিভৃতে দেখা করা খুব বিপদের। এ-কথা কেউ শুনে ফেললে ভাববে আমি আপনার রাজনীতি-ইতিহাসের ব্যাখ্যা শেয়ার করি।'

'স্যার, আমার তো মন খুলে কথা বলার এই একটিই জায়গা—গবমেন্ট প্লেস। সে-ও আপনাদের গুণে। রসিকতা ভালোবাসেন ও আড্ডাকে আড্ডাই রাখেন।'

'ইংরেজদের তো আড্ডাবাজ বলে খুব সুনাম নেই। আড্ডা-র কোনো ইংরেজি হয় না। ফরাসিরা খুব আড্ডা মারতে ভালোবাসে। ওদের ভাষাতেও আড্ডার কত নাম।

'আপনারা স্যার আমাদের দেশের অনেক উপকার করেছেন। মুসলিমদের সবচে খারাপ শব্দ নেমকহারাম। নেমকহারামি করতে পারব না। খোলা গলায় বলব—আপনারা আমাদের সভ্য করেছেন। কিন্তু একটা স্যার বড় ক্ষতি করে দিয়েছেন।'

'মাত্র একটা ক্ষতি? তাহলে তো জাতির স্বার্থে সেটা শুনতেই হয়।'

'আপনাদের আড্ডা নেই। নেই তো নেই। সেই জন্য আড্ডার ইংরেজি করবেন মিটিং? দু-জন কথা বললেও মিটিং। দশ হাজার লোক কথা বললেও মিটিং। কোনো কথা হল না, দেখা হল, তাও মিটিং। প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে গেলেও মিটিং। কর্পোরেশনে গেলেও মিটিং।'

লাটশাহেব হো হো হেসে গড়িয়ে পড়লেন, 'আপনাদের বুঝি অনেক শব্দ মিটিঙের?'

'সব শব্দ কি আর আমি জানি স্যার? যা জানি তাই তো ডজনখানেক হবে। আড্ডা, মজলিশ, মোলাকাত, পয়চান, জমায়েত, জলুশ—'

'এই মিস্টার ফারুকি, আমি জানি না বলে আমাকে ঠকাবেন? উর্দুকে বাংলা বলে চালাবেন?'

'কেন স্যার? এগুলো তো বাঙালি মুসলমানেরও জবান। মেজরিটির ভাষাকে ভাষা মানবেন না?'

'নিশ্চয়। সত্যি বলতে গেলে আমার একটা ব্যক্তিগত অসুবিধের কথা খোলশা করতে হয়। ঐ, আপনি যে-ভাষা বললেন, সেটা তাও বুঝতে পারি। কিন্তু শিক্ষিত বাবুদের কথা একেবারে বুঝতে পারি না। মনে হয়, ওঁরা সবাই সংস্কৃতে কথা বলেন।'

'ও! আপনি বাঙালি বাবুদের কথা বলছেন? ঐ যারা কাগজে লেখে, মিটিঙে ভাষণ দেয়? বাবুরা তো স্যার ইংরেজি গড়গড়িয়ে বলতে পারে না, ওরা তাই বাংলাটাকে বদলে নিয়েছে।'

'সে বদলাবে না কেন? কিন্তু আমাদের কমিশনারদের মধ্যে কত বিদ্বান বাঙালি আছেন। দিশি কাগজের কোনো লেখা পড়ে হয়তো তাঁদের কাছে মানে বুঝতে চাই, তাঁরা বেশ অনেকক্ষণ পড়ে বললেন, বিষয়টা কী ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।'

'সে জন্যই তো স্যার একটা কথা উঠেছে, হিন্দু-মুসলমান সব ধর্মেরই শিক্ষিতদের মধ্যে—প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনে যতটা স্বায়ত্ত কায়েম হবে, ততটা শাসন হবে না। তাঁরা চাইছেন—ভোটাভুটি করে না-হয় আইনসভার মেম্বার ঠিক হল কিন্তু মন্ত্রিটন্ত্রি লাটশাহেবের হাতেই থাকা ভালো।'

ওঁ! আপনি তো টানা সাতবছর মন্ত্রী আছেন, তাই বলছেন ঐ ব্যবস্থাই ভালো। তবে আপনার চরম শত্রুও তো বলতে পারবে না—মন্ত্রি হিশেবে আপনার কাজে কোথাও কোনো খুঁৎ ছিল। আর, আপনার পার্লামেন্টারি দক্ষতা তো ঈর্ষণীয়।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। কিন্তু আমি স্যার এসব বলব বলে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইনি।'

'তা চাইলেও কিছু দোষের হত না। আর আপনি তো বলেইছেন—গবমেন্ট প্লেসে আসেন শুধু মন খুলে কথা বলতে। আমার তো ভালো লাগল।'

'যে-কথা বলতে এসেছিলাম স্যার, আপনার দার্জিলিং যাত্রা কি এবারও ১৫ই এপ্রিলই?'

'অন্যরকম হবে কী করে? এটা তো সরকারি বিধি যে ১৫ এপ্রিল থেকে প্রাদেশিক গবমেন্ট দার্জিলিংকে সদর করবে।'

'১৫ই এপ্রিলের মধ্যে স্যার মন্ত্রিসভা, আইনসভা সব হয়ে যাবে স্যার? এখনো তো কিছু দানা বাঁধল না। তবে আপনি যখন বলছেন স্যার নিশ্চয়ই হয়ে যাবে।'

'আমি হয়তো দু-চার দিন পরে মুভ করতে পারি। কিন্তু সেক্রেটারিয়েটকে তো তারিখ মেনেই যেতে হবে।'

'স্যার, আমি এসেছিলাম আপনাকে একটু অনুরোধ করতে—এবার দার্জিলিংটা একটু শর্টকাটে চলুন। আমাদের নদীর কাশবনগুলো এই বর্ষায় ঘন হয়ে যাচ্ছে। দুটো-একটা লেপার্ড পাবেনই। আর, ডাক, একেবারে তুলতুল করছে ভিতরের তেলের আঁচে।'

এর কয়েকদিনের মধ্যেই হোম সেক্রেটারি নিজে এসে জানতে চায়, নোটে নয়, মুখোমুখি—এমন কোনো মুভ কি নেয়া হচ্ছে, ইন দি হায়েস্ট লেবেল, যে স্যার আবদুর রহিমকে এখানে মন্ত্রিসভা তৈরি করতে ডাকা হবে?

অ্যানডারসন প্রথমে বুঝতেই পারেননি, 'স্যার, আবদুর, রহিম? মানে সেন্ট্রাল কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট?'

'আইজি নিজে জানালেন, ইনটেলিজেন্স থেকে নোট দিয়েছে।'

'তাহলে তো সিরিয়াস কথা। এমনি গুজব নয়। যারা জানে তারা কেউ জড়ানো আছে। না। তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো, আমি যতটা জানি, এখনো, তাতে এমন কোনো কথা লন্ডনে বা দিল্লিতে কেউ ভাবেননি। তুমি সেটা ধরে নিয়ে ইনটেলিজেন্সকে বলো—সোর্সটা ইমেডিয়েটলি জানাতে।'

'আমি স্যার সেই কারণেই নিজে এলাম। পার্টিকুলারলি স্যার আবদুরের নামটা উঠেছে বলে। সকলে সম্মান করে, বিশ্বাস করে, ওঁর যোগ্যতা তো কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এরকম একটা ভ্যাকুয়ামে তো এমন মানুষ কাজে আসতে পারেন।'

'তুমি কি এমন একটা বিকল্প ভাবছ?'

'না স্যার। ভাবছি, এমন একটা সমাধান ভেবে বের করা বেশ পাকা মাথার কাজ।'

'খুব কি পাকা মাথা? আপাতত বলটা কোর্টের বাইরে ঠেলে দেয়া। খেলা যদি চলে, বল তো আর কোর্টের বাইরে থাকবে না। কেবিনেট, প্রাইম মিনিস্টার—এসব তো পোলিটিক্যাল ব্যবস্থা। স্যার আবদুর তো পাবলিক পোলিটিকসে কিছু করতে পারেননি। একটা কাউন্সিল ইলেকশনে তাঁর দল বেঙ্গল মুসলিম পার্টি সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়ে এসেছিল বটে কিন্তু পরের বছর তাঁকে মন্ত্রী করা হলে দু-দিনের মধ্যে তিনি রিজাইন করলেন—কাউন্সিলেও তিনি সমর্থন পেলেন না। পার্লিয়ামেন্টারি পোলিটিকস তো অন্য খেলা।'

'আপনার কাছে আসার আগে আমিও স্যার ভাবছিলাম, ওঁর নামটাই উঠল কেন।'

'সেটা এমন কী সমস্যা? যেহেতু দ্বিতীয় কোনো স্যার আবদুর রহিম নেই। হিন্দুদের মধ্যেও না।'

'আমার অন্য একটা কথা মনে হয়েছিল। যেহেতু উনি প্রজা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা, তাই তাঁকে এনে হকশাহেবকে পাশে ঠেলে দেয়া।'

'এখন তো লিগ-হক মিলে গেছে।'

'সেই মেলা থেকে তো আবার নতুন খেলা শুরু হবে। যাঁরা অল ইনডিয়া পোলিটিকসকে প্রাধান্য দিয়ে সিদ্ধান্ত নেন, তাঁরা এই প্রদেশের মুসলমানদের নেতা হিশেবে হকশাহেবকে আর উঠতে দিতে চান না। বাংলা আর পাঞ্জাব চলে গেলে মুসলিম লিগের অল ইনডিয়াটা হবে কোত্থেকে। কংগ্রেস তো সেই অল ইনডিয়ার স্বার্থে প্রদেশ কংগ্রেসকে কেমন ডাম্প করে দিল।'

'হ্যাঁ, এটা অবিশ্যি হতে পারে। তুমি দেখো-না, কাল সকালের মধ্যে ইনটেলিজেন্স জানাতে পারে কী না, সোর্সটা কোথায়? তাহলে আমরা নিজেদের জায়গা খুঁজে পাব।'

হোম সেক্রেটারি চলে যাবার পর আগের দিন ফারুকি-র কথার ভিতরটা যেন ঝলসে উঠল। অ্যান্ডারসন নিজের কাছে একটু অপ্রস্তুত হলেন। এটা বুঝতে তাঁর স্যার আবদুর রহিমের নাম দরকার হল?

প্রায় দুশ-বছর শাহেবদের শাসনে থাকতে-থাকতে একটা বেশ বড় সংখ্যার ভারতীয় তো এইসব নতুন আইন, নতুন মন্ত্রিসভায় ভয় পেয়ে যেতেই পারে। তারা ভাবতেও পারে—শাহেবদের শাসন না-থাকলে চলে নাকী। তারা চাইতেই পারে—লাটশাহেবের অধীনেই

সব হোক। অ্যান্ডারসন ভাবেন, এঁরাই তো প্রোগ্রেসিভ লিবার‍্যাল। তাঁর মন্ত্রী আজিজুল হক বা স্যার বি পি সিংহ রায়ের মত। দেশের লোকজন ওঁদের মানে আর ওঁরা মানেন ব্রিটিশ সরকারকে। এঁরা তো রাজনীতির দিক থেকেই এমন একটা ব্যবস্থার কথা ভাবতে পারেন।

লাটশাহেব মন্ত্রিসভা তৈরি করতে যে আর দেরি করলেন না, তার তৃতীয় কারণ হিন্দুদের ভিতর থেকেও একটা চেষ্টা ধীরে-ধীরে পাকিয়ে উঠছে যে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বা স্যার বি পি সিংহরায়ের মত কোনো হিন্দুনেতা অথচ কংগ্রেসি নয় এমন, কাউকে প্রধান করে মন্ত্রিসভা তৈরি হোক। ভোটের আগেই এমন একটা কথা উঠেছিল। স্যার আবদুল হালিম গজনভি বর্ধমানের মহারাজার কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলেন—এইসব পার্টিপুর্টির কথা ছেড়ে দিয়ে সিধে চাকরির বেলায় ৫০ ৫০ অনুপাত আর দশ বছরের চুক্তিতে নমিনেটেড ক্যাবিনেট হোক। হালিম বড় ব্যবসায়ী ও তাঁর সঙ্গে মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদের সম্পর্ক খুবই ভাল। তিনি এসব গ্রাম-রাজনীতি ও কৃষি-অর্থনীতিকে একেবারে পাত্তা দেন না। বর্ধমানের মহারাজাও লোক খারাপ নন কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত ক্ষমতা-প্রতিপত্তি ছাড়া তাঁর কাছে আরো জরুরি কোনো কথা নেই। তিনি নিজের ছেলেকে এমএলএ করবেন বলে স্যার বিপিকে তাঁর পুরনো আসন ছাড়তে বাধ্য করেছেন। জমিদারদের মধ্যে যাঁরা রাজা-মহারাজা তাঁরা কে কার চাইতে বড় এই নিয়ে নানারকম গোলমাল পাকাতে ব্যস্ত থাকেন। এঁদের একটাই গুণ—কেউই কোনো পার্টির অনুগত নন, বরং সব পার্টিই এঁদের অনুগত। ব্রিটিশ ইনডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ছাড়া এঁদের মেলামেশারও জায়গা নেই। এটা ঠিকই এদের নিয়ে একটা মন্ত্রিসভা যদি গজনভি করতে পারতেন তাহলে গবমেন্টের পক্ষে খারাপ হত না। গজনভি সারা ভারতের মুসলিম রাজনীতি থেকে সরে থেকেও, তার সঙ্গে লেগে থাকতে চান। সেইজন্য তিনি আগা খাঁ-কে মুরুব্বি ধরেছেন ও আগা খাঁ-র খোঁজে কলকাতা ছেড়ে দিল্লি-বোম্বাই গেছেন। গজনভি যদি আগা খাঁ-র কাছ থেকে ফিরে এসে আগা খাঁর সমর্থন ঘোষণা করেন, তাহলে অবস্থা খারাপ হবে। গজনভি-র আগা খাঁ সত্যিই হতে পারে, জালিও হতে পারে। বরং গজনভি ফেরত আসার আগেই মন্ত্রিসভা তৈরি করে ফেললে নতুন করে গোলমাল পাকানো যাবে না। গজনভির মন্ত্রিসভা তৈরিও তাড়াতাড়ি হবে না।

৪৬

হকশাহেবকে ডাকেন ছোটলাট, পরদিন মন্ত্রী হওয়ার লাইন

৩১ মার্চই সকালে অ্যান্ডারসন হকশাহেবকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'আজ সন্ধ্যাতেই মন্ত্রিসভা তৈরি করতে হবে। আপনার লিস্ট দিন।'

আজ সকালে ডেকে স্যার বলছেন সন্ধ্যায় মন্ত্রিসভা? একটু তো সময় দেবেন স্যার? আমার তো লিস্ট শেষ হয়নি।'

'এত সময় পেয়েও যদি লিস্ট না-হয়ে থাকে, তাহলে আর-কোনোদিনই হবে না। যা হয়েছে সেটাই দেখান। তারাই আজ মন্ত্রী হবে। বাকিরা না-হয় পরের কোনোদিন হবে।'

'মন্ত্রির পদ না-বাড়ালে স্যার এরকম কোয়ালিশন সরকার তৈরি করা যায় না।

'এটা একটা কোনো কাজের কথা হল? যত জন মন্ত্রী হতে চান, মন্ত্রিসভায় ততগুলো খালি পোস্ট বানাতে হবে? এ তো ভালো আবদার!'

হকশাহেব একটু হেসে বলেন, 'তাহলে স্যার, পিএসসি-কে বলুন—একটা ইনটারভিউ নিয়ে লিস্ট বানাতে।'

'কমিউন্যাল প্রোপরশন কী রেখেছেন?'

'স্যার, লিগ কিছুতেই ৫ ২-এর বেশি রাজি না। পাঁচজন মুসলমান পিছু দু-জন হিন্দু।'

'এ কখনো হতে পারে? হিন্দুরা এমনিতেই ক্ষেপে আছে, তারপর মাত্র দুই মন্ত্রি। আপনার মন্ত্রিসভা আপনি করতে পারেন। তার আগেই হিন্দুরা দাঙ্গা বাঁধিয়ে দেবে। প্রোপরশন ৪ ৩ করে দিন।'

'আমার খুব আপত্তি নেই, তবে লিগকে ডেকে বোঝান।'

'তাহলে আজ সাড়ে ছটায় আসুন।'

'তাহলে তো আজ মন্ত্রিসভা হচ্ছে না?'

'সময় থাকলে হবে কিন্তু কোনো অবস্থাতেই কাল সন্ধ্যার পর নয়। বেটার, আপনারা কাল লাঞ্চ সেরেই আসুন। দুই পার্টির দু-জন করে। আপনি আর আমি। আপনারা তো আজ কথা বলবেন। কতক্ষণ আর লাগবে। আমি আমার সেক্রেটারিদের বলে রাখছি। প্রেসকেও বলে রাখতে বলব। আপনারা একেবারে মন্ত্রির মেকআপ নিয়ে আসবেন। চেঞ্জ করার জন্য আর বাড়ি যেতে চাইবেন না।'

পরদিন বেলা একটা থেকেই একে-একে সবাই আসতে লাগলেন এবং সেজেগুজেই। নলিনী সরকারই প্রথম এলেন—আদ্দির ধুতিপাঞ্জাবির ওপর শাল জড়িয়ে। গভর্নরের সেক্রেটারি তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন, 'আসুন স্যার, অলওয়েজ প্যাংচুয়াল—'। নলিনী সরকার খুব একটা সৌজন্য দেখাতে পারেন না, তার ওপর তাঁর গাল-কপালের ভাঁজে-ভাঁজে বিরক্তি যেন স্থায়ী হয়ে গেছে। সেক্রেটারির নির্দেশে তিনি কোঁচাটা একটু তুলে সিঁড়ি ভাঙতে লাগলেন। সিঁড়ির মাঝামাঝি যখন তিনি, তখন এলেন কাশিমপুরের মহারাজা শ্রীশ কুমার নন্দী। ছোটখাটো মানুষটি যেন আরো ছোট হতে চেষ্টা করেন, সকলেই নমস্কার করেন—কারো দিকেই না তাকিয়ে। তাঁর গায়ে বেনারসির কাজ করা একটা ভারী শাল—সেটার ভারে তিনি যেন আরো নুয়ে গেছেন।

মুকুন্দবিহারী এলেন একটা ট্যাক্সিতে। তিনি পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করতেই সেক্রেটারি এগিয়ে এসে বললেন, 'আমাদেরই ভুল হয়ে গেছে স্যার। কনভেয়ান্সের কথাটা জিগগেস করা হয়নি।' সেক্রেটারি কাউকে ইঙ্গিত করলেন, ভাড়া মিটিয়ে দিতে, তারপর মুকুন্দবিহারীকে বললেন, 'এই দিকে, প্রফেসর।' মুকুন্দবিহারী তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসলেন, সরকারি জায়গায় 'স্যার'-এর বদলে 'প্রফেসর' শুনতে তাঁর ভাল লাগল। তাঁর একটা গলাবন্ধ তসরের কোট, কাঁধে একটা নকশাহীন চাদর ভাঁজ করা। লম্বা মানুষ, সোজা উঠে গেলেন, সিঁড়ির দিকে একবারও না-তাকিয়ে।

ফজলুল হকের গাড়ি আসতেই, যাঁরা এঁদের অভ্যর্থনা করছিলেন তাঁদের মুখে হাসি ফোটে। গাড়ি থেকে নামতে তাঁর একটু সময় লাগে। একটু মেটে রঙের আচকান, লম্বা ঝুলের, মাথায় একই রঙের টুপি। তিনি নামার আগেই সারওয়ারদি তাঁর ছোট গাড়ি থেকে নেমে তরতরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেছেন। সারওয়ারদি টেরই পাননি—হকশাহেব নামছেন। হকশাহেব ততক্ষণে নেমে, দাঁড়িয়ে, সিঁড়ির মাথায় সারওয়ারদির দিকে আঙুল তুলে, সেক্রেটারি ও তাঁর দলবলকে বলছেন, 'ছোটখাটো হওয়ার সুবিধা কত', বাঙালিরা হাসলেন, শাহেব-সেক্রেটারি হাসি-হাসি মুখে তাকিয়ে থাকলেন। হকশাহেব তাঁর দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতেই বললেন, 'একটা গল্প শুনুন, গল্প না ফ্যাক্ট। সেকেন্ড রাউন্ড টেবল কনফারেন্সে গেছি। একদিন শুনলাম রাজপ্রাসাদে,

বাকিংহামেই, সম্রাট আমাদের চা-পানে আপ্যায়িত করবেন। ছাপা কার্ডও এল। যাওয়াও হল সবাই মিলে। আমরা ঘুরেফিরে চা খাচ্ছি, কথা বলছি। আমি যখন রাজমাতার সামনে পড়েছি, উনি আমার বৃহদাকার মাথা থেকে পা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—আমাদের ইনডিয়ার কোন্ প্রদেশ থেকে আপনি আসছেন? আমি বললাম—ফ্রম দি প্রোভিন্স অফ বেঙ্গল, ইয়োর মেজেস্টি। উনি বললেন—ওখানকার সব লোকই কি তোমার মত লম্বা-চওড়া? আমি বললাম—লজ্জার কথা, ইয়োর মেজেস্টি, তাদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে ছোটখাটো।'

কেতা ভুলে সবাই জোরে হেসে উঠেই থেমে যায়। সেক্রেটারি হকশাহেবকে নিয়ে সিঁড়ি ভাঙেন।

এ সবই হচ্ছিল গভর্নরস প্লেসের উত্তর গেটে। ধুতিপাঞ্জাবি পরা, কাঁধে একটা চাদর, হাতে একটা ব্যাগ নিয়ে একজন হেঁটে আসছিলেন। গভর্নরস প্লেসের আঙিনা জোরা মারাম পাথরের জন্য তিনি তাড়াতাড়ি আসতে পারছিলেন না। সেক্রেটারি তাঁর দলবলের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বললেন, 'পায়ে হেঁটে যাঁরা আসবেন, তাঁদের জন্য গেটে গাড়ি রাখোনি কেন।' নিজেই আগন্তুকের দিকে এগলেন, 'সরি স্যার। আমাদের উচিত ছিল কনভেয়ান্সের কথা জেনে নেয়া। আপনার নামটা স্যার?'

'যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। আমি তো আমার কনভেয়ান্সেই এসেছি। আমার বাড়ির সিঁড়ির গোড়া থেকে উঠেছি। আপনাদের বাড়ির সিঁড়ির গোড়ায় নেমেছি, বাই দি কার্টসি অব ক্যালক্যাটা ট্র্যামওয়েজ কোম্পানি।'

শাহেব একগাল হেসে সোপানরাজি দেখিয়ে বলেন, 'আসুন, স্যার।'

গভমেন্ট প্লেসের একতলার দরবার হলে সবাই দেয়ালে সারি দেয়া সোনালি হাতলের মেরুনগদির চেয়ারে বসে আছেন। কিন্তু এঁরা সকলে তাঁরা কেন একটাই কারণ জানেন না, তাঁরা কেন এখানে এসেছেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এসে হকশাহেবের পাশের খালি চেয়ারটাতে বসে হকশায়েবের কাঁধ চাপড়ালে একটু অবাক হন অনেকেই কারণ বেশিরভাগই জানেন না, হকশাহেবের সঙ্গে স্যার আশুতোষের পারিবারিক সম্পর্ক।

শ্যামাপ্রসাদের প্রবেশে—যাঁরা যা জানতেন, এখানে তাঁর নিজের আসার কারণ কী, তাও গুলিয়ে ফেললেন। কেউ-কেউ ভেবেছিলেন—মন্ত্রি হতে ডাকা হয়েছে। যাঁদের প্রচেষ্টা ও প্রত্যাশার মধ্যে সেটা ছিল, তাঁরা নতুন করে ভাবলেন—হয়তো দু-চারজনকে অতিথি হিশেবেই ডাকা হয়েছে। কিন্তু অতিথি হিশেবে যদি কাউকেই ডাকা হয়ে থাকে, তাহলে যাঁরা অনিবার্য, তাঁদের তো অনেকেই নেই। বিশেষত কংগ্রেসের। কংগ্রেসের একজনও নেই। হতে পারে, প্রদেশ কংগ্রেস বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হতে পারে, ওয়ার্কিং কমিটি থেকে নিষেধ এসেছে। মন্ত্রিসভা ঘোষণা হলে তো তার একটা বন্দবস্ত থাকবে। দেখে তো মনে হচ্ছে না। কিন্তু এখানে তো কাউকে জিজ্ঞাসা করাও সম্ভব নয়।

স্যার বি পি সিংহ রায় আর স্যার ফারুকি বসেছিলেন পাশাপাশি। ওঁরা বহুকালের মন্ত্রি। গবমেন্ট প্লেসে তাঁরা এসেওছেন অনেক বার। তাঁরা স্বচ্ছন্দ ছিলেন। স্যার ফারুকি স্যার বি পিকে বললেন, 'আচ্ছা, একবারও না আটকে আপনি ছোট-বর্ধমানের নামটা বলতে পারবেন?'

'আপনি বলাতে সন্দেহ হচ্ছে পুরো নামটা আমি বোধহয় জানিই না।'

ঢাকার নবাব হবিবুল্লাকে শাহেবরা যেখানে বসালেন, তিনি সেখানেই বসলেন কিন্তু বসে খুশি হলেন না। তাঁর বাঁ হাতের লোকটিকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার সঙ্গে বোধহয় পরিচয় হয় নাই আমার। আপনার জায়গার নামটা বলবেন?' 'কবিরুদ্দিন। মৈমনসিং'। বসার

জায়গা নিয়ে নবাবশাহেবকে তো কখনো ভাবতে হয়নি। মিটিং যারা ডাকে তারা অথবা নবাবশাহেবের নিজের লোকরাই আগে থেকে চেয়ারটেয়ার ঠিক করে রাখে আর তাঁর পাশে চেয়ারে কারা বসবেন, তাও ঠিকই থাকে। এটা তো লাটশাহেবের ডাকা মিটিং। এখানে তো তাঁর লোকজনকে ঢুকতেই দেবে না। তাঁর একটু দেরিই হয়েছে—সময়ে এলে নিজের পছন্দমত জায়গায়, নিজের পছন্দমত লোকজনের মধ্যে বসতে পারতেন।

তিনি তাঁর ডানহাতি লোকটিকেও তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় সে ভদ্রলোক পরিস্থিতি-শোভন গলা নাবিয়ে বললেন, 'নোয়াখালি-র। মানে সৈয়দ গোলাম সারওয়ার হোসেইনি'। এঁকেও নবাবশাহেব চিনতে পারলেন না আর এঁরাও এমন কোনো জানান দিলেন না যে এঁরা নবাবশাহেবকে ঢাকার নবাব বলে চিনেছেন। তাঁর ডান হাতে যিনি, তাঁর নিজের নাম ছোট না করায় ও নিচু স্বরেও গলাটা একইরকম শোনানোয় মনে হয় তিনি অন্তত আশা করেছিলেন, তাঁর নাম শুনলেই তাঁকে চেনা যাবে।

নবাবশাহেব দু-জনের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে বললেন, 'এইটাই সবসে বড়া বাত্। হামনে—এতনা মুসলিম লোগ, হামাদের জানপয়চান নাই। লেকিন আভি ইসলাম ইউনিটি কো বাদ হামলোগকে জানপয়চান হবে। এইটাই সবসে বড়াবাত্। মুসলিম ইউনিটি।'

'হুজুর, জমিদার যদি মুসলিম হয় তয় এই ইউনিটি থাকব তো?' শাহেবরা বলে।

'কেন? শোচতা কিয়া?'

'ধরেন, হিন্দু জমিদারের জইন্য এক আইন আর মুসলমান জমিদারের জইন্য এক আইন হওয়ার দুষ কী?'

'উ কেইসে হোনা শেকতা? আইন জরুর এক হোগা।'

'হুজুর, মুগল-বাদশাগো টাইমে ছিল তো এমন আইন? অ্যাহন যুদি মুসলমানের রাজত্ব হয় তেমন আইন হওনের বাদা কী?'

'হুজুর' বলায় নবাবশাহেব বুঝতে পারেন, লোকটি তাকে চিনেছে। এতে খুশি হয়ে তিনি বলেন, 'বাদশাকো বেটা বাদশাজাদা। আপ তো ভোট কো বেটা ভোটজাদা, নবাবশাহেব নিজেই যথাযথ হেসে তাঁর ডান ও বাঁকে জানিয়ে দিলেন এটা রসিকতা। বাঁ হাসলেন না।' ডান হাসলেন।

যে-দরজা দিয়ে ঢুকেছে, তার ডান হাতি সারির মাঝামাঝি বসেছিল। সে খানিকক্ষণ এই দরবার ঘরের গড়নটা দেখে। চার দেয়ালে চারটি বিশাল সিংহদ্বার। যোগেন যেখানে বসেছিল সেখান থেকে দক্ষিণের দরজার ওপারে পাথরের বারান্দা আর সিঁড়ি খানিকটা দেখতে পায়। দক্ষিণই তো হবে ওদিকটা। এত বড় বাড়ি, এত বড় দরজা, এত বড় ঘর, এত বড়-বড় চেয়ার—যোগেনের মত যারা বসে আছে তাদের সবাইকেই ছোট লাগছে। নলিনী সরকার মশায়, খাজা নাজিমুদ্দিন, স্যার ফারুকি, স্যার বিপি—এরা যখন, জনসভা করে বা ঘরের মধ্যে মিটিং করে, তখন তো সবাই সমান। সেই সমানের মধ্যেও ওঁরা সমান থাকেন না। নিজেরা যে নিজেদের আলাদা করেন, তা নয়। সব মিলিয়ে ওঁরা আলাদা হয়ে যান। যারা মিটিং ডাকে, তাদেরও দেখাতে হয় যে কত বড় নেতাকে তারা এনেছে। যাঁরা আসেন, তাঁরাও দেখান যে তাঁরা এসেছেন। কিন্তু এখানে কেমন শ্মশানের একতা—কারণ, যিনি সভা ডেকেছেন, তাঁর, লাটশাহেবের, মাপ অনুযায়ী মাথা পিছু একটা চেয়ার। যোগেন আলো দেখছিল। এক পশ্চিমের দরজাটাই বন্ধ। সেখানে শাহেবসুবো অফিসাররা দাঁড়িয়ে। পাগড়িপরা চাপরাশিরা কাচের গ্লাসে ঠান্ডা জল আর চিনেমাটির কাপে চা নিয়ে ঘুরছে। আলো তো কিছু কম না, যদিও মাঝখানের ঝাড়টা জ্বালানো হয়নি। তবু ঠিক চেনাই যাচ্ছে না—কোন্ চেয়ারে কে বসে। অথচ দাঁড়ানো

শাহেবদের মুখগুলো তো দিব্যি পরিষ্কার। সে হয়তো তাঁরা যোগেনের কাছাকাছি বলে। বা, শাদা চামড়ায় আলো ঠিকরয়।

যোগেন তার বাঁয়ে বাখরগঞ্জেরই আফতাব খাঁকে বলে, 'এই একখান ঘর যদি আপনারে দেয়া হয়, নিবেন?'

'শুদু ঘরখান? নাকী লাটশাহেবের বেতনসহ?'

'আপাতত ঘরখানই থাউক। বেতনটা মুলতুবি থাক।'

'বেতন না হইলে এই ঘরখান ধোয়ামোছার খরচা আইসবেনে কোত্থন?'

'এইডা তো বরিশাইল্যা বুদ্ধি। দিল্যাম একখান ঘর, কয় যে ধোয়ামোছার পয়সা দ্যাও। লাটশাহেবের ব্যাতন যত বেশিই হোক গা, উনি কি বেতন খরচা কইর‍্যা ঘর মোছেন।'

'তয়? এমন একখান মোকানের ঘরদ্বার সাফ রাহা কি চাড্ডিখান পয়সার কথা?'

'স্যায় খরচা তো সরকার দ্যায়।'

'কুন সরকার?'

'য্যায় লাটশাহেব চাকরি দ্যায়—'

'এই যে-সরকার হইব আইজ, হকশাহেবরে নিয়্যা?'

'সে-সরকার তো হকশাহেব আর আর-আর মন্ত্রীগ মায়না দিব্যার পারে। হকশাহেব তো মন্ত্রী কইরব্যার পারে, লাটশাহেব পাইব কোথায়?'

'তাহাইলে তুমিই-বা এই ঘরখান আমারে দিব্যার চাও কোন সুবাদে? লাটশাহেবি বাদ, শুদু ঘর? এ তো তোমার বরিশ্যাইল্যা বাণিজ্য। পাথরডাঙা জমিরে দ্যাও ব্রহ্মোত্তরে।'

যোগেন হেসে ফেলে মুখ চাপা দেয়, 'দিল্যাম একখান এমন ঘর। ব্রহ্মোত্তর কইর‍্যা নিল্যা না? না-নিল্যা!'

'অত দানছত্র না-বাঁধায়ইয়া কও তো আমাগ এইহানে ইদের কোরবানির উটের নাগাল খাড়াইয়া থুইছে ক্যান? জানো কিছু?'

'আমি নি জীবনে লাটশাহেবের দাওয়াত খাইছি তোমার থে বেশি? ক্যামনে জানি?'

'এটুক্ তো জানা লাগে—কোরবানি দিলে আজই দিব তো?'

'এইটুক্ই জানি—বামুনবাড়ি নেমন্তন্ন, না-আঁচাইলে বিশ্বাস নাই।'

দরবার ঘরের পশ্চিমের দরজাটা খুলে গেল, যেন নিজের থেকেই। অত বড় দরজাটার খুলে যাওয়াটাও তো দেখার মত। সেই দরজা দিয়ে ঘরের ভিতর এগিয়ে এলেন সুট-বুট-টাইয়ে গণ্ডাখানেক শাহেব। যোগেন কাছাকাছি ছিল বলে চিনতে পারে—এঁদের মধ্যে লাটশাহেব নেই, কারণ, লাটশাহেবের সঙ্গে তার একদিন কথা হয়েছে অল বেঙ্গল সিডিউল্ড কাস্ট লেজিসলেচার পার্টির সম্পাদক হিশেবে—লাটশাহেবই ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

মাঝখানের শাহেব কয়েক-পা এগিয়ে এসে বলেন, 'লেডিজ অ্যান্ড জেনটেলমেন', তারপর সবার ওপরই খুব তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে হেসে বলেন, 'কিন্তু এখানে একজনও মহিলা নেই বলে আমি সরি বলছি না। মহিলারা না থাকলে জেন্টেলমেনেরাও জেন্টেলমেন হন না।' কেউ-কেউ বুঝল, কেউ-কেউ বুঝল না, ছোট্ট একটা হাসি যে-উঠল, সেটাও শাহেবরাই হাসলেন।

'ওয়েল। হিজ এক্সেলেন্সি আমাকে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম ও থ্যাঙ্কস জানাতে বলেছেন। আপনারা যে এত শর্ট নোটিশে সবাই এখানে এসেছেন, তাতে তিনি খুবই আশাবাদী। হিজ এক্সেলেন্সি আজই তাঁর নতুন মন্ত্রিসভার নাম প্রকাশ করবেন ও মন্ত্রিরা আজ থেকেই

তাঁদের দায়িত্ব বুঝে নেবেন। মন্ত্রিসভা ঘোষণার আগে হিজ এক্সেলেন্সি একটা আলাদা বৈঠকে এই আসন্ন মন্ত্রিসভার কোয়ালিশনের প্রধান দলগুলির সঙ্গে একটা মিটিং করে নেবেন ও আমরা আশা করি সে-মিটিংটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ হবে। আমি মিস্টার এ-কে ফজলুল হক, মিস্টার নৌসের আলি, মিস্টার তামিজ-উদ্দিন আহমেদ, স্যার নাজিমুদ্দিন, মিস্টার সারওয়ারদি অ্যান্ড মিস্টার জে.এন. মণ্ডল—এই ছয় ভদ্রলোককে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাকে অনুসরণ করে হিজ এক্সেলেন্সির কাছে নিজেদের উপস্থিত করতে—টু ফলো মি টু প্রেজেন্ট দেমসেলভস বিফোর হিজ এক্সলেন্সি। আমাদের পরবর্তী ঘোষণার আগে আপনারা পরস্পরকে সঙ্গ দিন।'

যাঁদের নাম বললেন চিফ সেক্রেটারি তাঁদের সকলেই নিজের-নিজের চেয়ার থেকে উঠে এগিয়ে গেলেন। হয়, যে-চেয়ার থেকে তাঁরা উঠলেন, সেই চেয়ারগুলির গড়নের কারণেই সেটাতে বসা ও সেটা থেকে ওঠা বেশ স্মার্ট দেখায়, নয়তো ঘর জোড়া নরম কার্পেটই তাঁদের অমন হাঁটিয়ে দিল—যেন তাঁরা জানেন তাঁদের আলাদা মিটিঙে ডাকা হবে। যোগেন দরজাটার সবচেয়ে কাছে ছিল। তার নামটাও ডাকা হয়েছে শেষে। সে সত্যি জানত না, তাকে ডাকা হবে। এর ভিতর তার ডানপায়ের স্যান্ডেলটা খুলে গিয়েছিল, সেটা আর পায়ে না নিয়ে সে বরং বসে-বসে কার্পেটটার নরম স্বাদ নিচ্ছিল ডানপায়ের আঙুলগুলির তলায়। ফলে, তার নাম শুনে একটু চমকে ডানপায়ের স্যান্ডেলটা আবার গলিয়ে নিতে-নিতে স্যার নাজিমুদ্দিন আর তামিজউদ্দিন দরজা দিয়ে গলে গেছেন, সারওয়ারদির পেছনে হকশাহেব, যোগেন হকশাহেবের পেছন-পেছন ঢোকে। দু-জন শাহেব বাদে বাকিরাও এঁদের সঙ্গে ঢোকেন। যোগেন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে, তাদের পেছনে সেই দরজার প্রকাণ্ড পাল্লাদুটো আস্তে-আস্তে জোড়া লেগে যাচ্ছে, যতক্ষণ তারা ডানহাতি একটা ঘরে ঢুকে দেখে বেশ একটা বড় টেবিলের ওধারে লাটশাহেব বসে, তাঁর চোখের সামনে একটা কাগজ। ঐ হলঘরের চেয়ারের মতই চেয়ার সাজানো—একটু উঁচু পিঠ, একটু লম্বা বাঁকানো হাতল ও সামনের পায়া দুটি থাবার মত এগনো। পিঠের মাথা, হাতল ও পায়ার বাঁক সোনালিতে চকচক করছে। হকশাহেব, সারওয়ারদি, নৌসের আলি প্রথম সারিতে বসে গেছেন। দ্বিতীয় সারিতে যে তাঁকে বসতে হল এতে স্যার নাজিমুদ্দিন খুশি হননি—তিনি দ্বিতীয় সারির প্রথম চেয়ারটিতে বসতেই তমিজউদ্দিন এসে তাঁকে ইঙ্গিত করে সরে বসতে কিন্তু স্যার নাজিমুদ্দিন হাত দেখিয়ে তাকে ভিতরে বসতে বলেন। এমন সারি দেয়া চেয়ারে সাধারণত ভিতরে ঢোকার জায়গা থাকে না। এখানে অবিশ্যি অনেকটা ফাঁক ছিল। যোগেন অন্য দিক দিয়ে ঢুকে তমিজউদ্দিনের পাশের চেয়ারে বসে পড়ল। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে, না, চেয়ারের কোনো অভাব নেই, সে পেছনেও বসতে পারত।

ততক্ষণে লাটশাহেব চাপা গলায় গরগরাতে শুরু করেছেন আর শাহেবরাও একটু ছড়িয়েছিটিয়ে বসে কাগজ কলম ধরেছে।

'ওয়েলকাম। আপনারা বুঝতেই পারছেন, আমার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করতে আজ মন্ত্রিসভাকে কর্মভার দেব। মিস্টার ফজলুল হক—যিনি এই মন্ত্রিসভার প্রধান হবেন বলে কোয়ালিশন পার্টিগুলি, অল ইনডিয়া মুসলিম লিগ ও কৃষক-প্রজা পার্টি একমত হয়েছেন—তাঁকে আমি জানিয়েছিলাম যে আজই মন্ত্রিসভা গঠিত হবে। মিস্টার হক আমাকে জানিয়েছিলেন যে মন্ত্রিসভার হিন্দু-মুসলমান অনুপাত এখনো স্থির হয়নি ও কারা-কারা মন্ত্রী হবেন সেটাও পাস হয়নি। আমি এগুলোকে মন্ত্রিসভা গঠনের কাজ পেছিয়ে দেয়ার পক্ষে যথেষ্ট কারণ মনে করি না। আপনারা নিজেদের মধ্যে নিশ্চয়ই অসংখ্যবার কথা বলেছেন। সুতরাং এখনো ঐ দুটি বিষয়

আলোচনা চলতেই থাকলে, খুবই আশঙ্কা হচ্ছে, একই যুক্তি ফিরে-ফিরে আসবে। মিস্টার হকের সঙ্গে কথা বলে মন্ত্রিসভার সদস্য হিশেবে আপনারা যাঁদের নামে একমত হয়েছেন ও যাঁদের নাম নিয়ে মতভেদ আছে—তাঁদের সকলকেই আমি আজ এখানে আসতে বলেছি। কাদের আসতে বলা হবে—সেটা আমি নিজের দায়িত্বে স্থির করেছি। সে-বিষয়ে মিস্টার হকের কোনো দায়িত্ব নেই। আমি আপনাদের অনুরোধ করছি, মন্ত্রিসভার ধর্মীয় আনুপাতিক হার নিয়ে পুরনো যুক্তিগুলির পুনরুক্তি করবেন না। মনে করুন সকলেরই হ্যাঁ ও না-বলার অধিকারটুকুমাত্র আছে। আমারও তাই। আমি কিছু কারণ জানতে চাইলে, জানাবেন। আপনারা কোনো কারণ নিয়ে কিছু বলবেন না যেহেতু আপনারা কারণগুলি জানেন। মিটিঙের কাজ দ্রুত শেষ করার উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের আলাপ-আলোচনার পরিধি ছোট করে আনতে চাই। যে-নামগুলি নিয়ে কোনো মতান্তর নেই, সেইগুলো আমরা আগে নিচ্ছি। জেন্টলমেন, নতুন বাংলা সরকারের নেতা আপনারা। আপনারা আপনাদের প্রথম কাজটি সম্পন্ন করুন।'

লাটশাহেব তাঁর চোখের সামনে ধরা কাগজটি থেকে পড়তে থাকেন, 'মিস্টার ফজলুল হক, মিস্টার নলিনীরঞ্জন সরকার, স্যার নাজিমুদ্দিন, স্যার হবিবুল্লাহ, স্যার বি পি সিংহ রায় অ্যান্ড মিস্টার সারওয়ারদি। এই ছ-জনকে নিয়ে কোনো মতান্তর নেই।'

একটা আঙুল তুলে দাঁড়িয়ে সারওয়ারদি বলেন, 'মন্ত্রিসভায় আমার থাকা-না-থাকা নির্ভর করে আমাকে কোন্ দপ্তর দেয়া হয় তার ওপর।'

'আপনি প্লিজ বসুন। যখন দপ্তর নিয়ে কথা হবে, তখন দপ্তরের কথা বলবেন। আমরা এখন ব্যক্তি নিয়ে কথা বলছি—এটা ধরে নিয়ে যে এই ছ-জন যে-কোনো দপ্তরের দায়িত্ব নিতে সমর্থ। যে-নামগুলি জানালাম তাতে ধর্মীয় অনুপাত দাঁড়ায় ৪ ২। আমরা মুসলমান সমাজ থেকে আরো দু-জন ও হিন্দু সমাজ থেকে আরো তিনজন নেব। আমার সুপারিশ—নৌসের আলি, স্যার ফারুকি, এস-পি মুখার্জি, মুকুন্দবিহারী মল্লিক আর মিস্টার রায়কত। নো রিজন্। আমরা সবাইই তা জানি। আপনারা কি আমার সুপারিশের সঙ্গে একমত? তাহলে, আমি মিস্টার হককে দপ্তরগুলো কীভাবে ভাগ করতে চান সে-কথা বলতে বলব।

হকশাহেব বলে ওঠেন, 'সে তো বলছি। কিন্তু ফারুকির সঙ্গে এক মন্ত্রিসভায় আমি কাজ করতে পারব না। আমি যাদের কাছে টাকা ধার করেছি, উনি তাদের একজোট করে আমার বিরুদ্ধে কোর্টের ডিক্রি বের করেছেন।'

'মিস্টার হক, প্লিজ নো রিজন। আপনার সাজেশনটা বলুন।'

'সামসুদ্দিন। তাতে পার্টি প্যারটিটাও থাকবে।'

'ঠিক আছে। অন্য কোনো নাম নিয়ে তো আপনার আপত্তি নেই?'

'না। ঠিক আছে।'

'আর কারো কি কোনো নামে আপত্তি আছে অ্যাজ সিভিয়ার অ্যাজ হকশাহিব্স? আমি আবার পড়ছি—নৌসের আলি, সামসুদ্দিন, এস পি মুখার্জি, মুকুন্দবিহারী আর রায়কত।'

নাজিমুদ্দিন জিজ্ঞাসা করেন, 'এস পি মুখার্জি বলছেন? কী, শ্যামাপ্রসাদ?'

'হু এলস? দি ভাইসচ্যান্সেলর।'

'ওঁকে নিলে তো মুসলমানরা এতটাই অপমান বোধ করবেন যে ব্যাপারটা ল অ্যান্ড অর্ডার প্রবলেম হয়ে যেতে পারে। দরকারটা কী?'

'মন্ত্রিসভার প্রত্যেকেই নিশ্চয়ই যোগ্য। এঁদের প্রত্যেকের পেছনেই জনসাধারণের এক-এক অংশের সমর্থন আছে। তৎসত্ত্বেও আপনাদের তো এমন কিছু অত্যন্ত দক্ষ ও অভিজ্ঞ মন্ত্রী

দরকার। এঁদের পেছনে হয়তো রাজনৈতিক জনসাধারণের কোনো গোষ্ঠী নেই। কিন্তু এঁদের দক্ষতা-কৃতিত্ব নিয়ে কারো কোনো সন্দেহ নেই। মিস্টার নলিনীরঞ্জন সরকার ও ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি যুক্ত থাকলে এ মন্ত্রিসভার গ্রহণযোগ্যতা রাতারাতি বেড়ে যাবে।

'সঙ্গে-সঙ্গে তো কমিউন্যাল টেনশনও বেড়ে যাবে। এটা জনমতের বিরুদ্ধতা করা হবে—বার আনি, মুসলমানদের পুরো মানে আট আনি, আর হিন্দুদের অন্তত চার আনি'।

'বুঝেছি। আপনাদের মত নেই,' এক শাহেব এসে লাটশাহেবের সামনে একটা ছাপানো কাগজ রেখে দিল। লাটশাহেব চোখ নামিয়ে দেখেন আর তারপর কাগজটা হাতে তুলে নিয়ে বললেন, 'আপনাদের নজরে পড়েছে নাকী? ক্যালকাটা মজলিশের খবর। কাল সন্ধ্যায় ওদের নেতারা মিটিং করে বলেছেন যে আমরা খবর পেলাম অধ্যাপক হুমায়ুন কবির ও আরো কয়েকজন নেতা মন্ত্রিসভায় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে ঢোকাবার ষড়যন্ত্র করছেন। আমরা এতে তীব্র আপত্তি জানাই। কিছুদিন যাবৎ কলকাতা বিশ্ববিদ্যায়ের শিক্ষক নিয়োগ ও শিল তৈরি নিয়ে ডক্টর মুখার্জি যে সাম্প্রদায়িক একগুঁয়েমির প্রমাণ দিয়েছেন তাতে নিশ্চিতরূপে বলা যায়—শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি যদি বাংলার মন্ত্রিসভায় নিযুক্ত হন তাহলে আমরা অন্তত রক্তগঙ্গা বইয়ে দেব।'

লাটশাহেব কাগজটা রেখে বললেন, 'যদিও আমার মনে হয় মিস্টার মুখার্জিকে মন্ত্রিসভায় রাখলে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন উপকৃত হত, তবু আমি আপনাদের অসম্মতি মেনে নিলাম। সেখানে মহারাজ শ্রীশ কুমার নন্দীকে নেয়া হোক। পুরনো মানুষ, অনেক দিন কাউন্সিলে আছেন আর সম্ভবত ওঁর সবচেয়ে বড় গুণ—ওঁর কোনো বিরোধী পক্ষ নেই।'

কেউ কোনো কথা বললেন না। লাটশাহেব বললেন—'বাকি দুজনের একজন সবচেয়ে বড় শিডিউল্ড কাস্ট, রাজবংশীদের প্রতিনিধি, আরেকজন প্রায় সমপরিমাণ বড় নমশূদ্রদের প্রতিনিধি। তাহলে চলুন। আমরা ওদের অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি। মিস্টার হক এখনই দপ্তর ঘোষণা করতে পারেন। নইলে, আজই একটু পরে, বা কাল, সকালে।' লাটশাহেব উঠে দাঁড়ালেন, সঙ্গে-সঙ্গে এঁরাও।'

সবাই দাঁড়ানোয় যোগেন পেছনে ও আড়ালে পড়ে যায়। সে চেয়ারের সারির শেষ সারি ঘুরে লাটশাহেবের পথ আগলে দাঁড়ালে লাটশাহেব থেমে যান।

'ইয়োর এক্সেলেন্সি, আমাকে কেন ডাকা হয়েছিল বুঝতে পারলাম না।'

যোগেনকে চেনার কোনো কারণ ছিল না। লাটশাহেব অফিসারদের দিকে তাকালে চিফ সেক্রেটারি চাপাস্বরে তাঁকে কিছু বলেন। লাটশাহেব আবার কিছু জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু চিফ সেক্রেটারির জবাব পুরোটা না শুনেই ঘাড় ঘুরিয়ে যোগেনকে হেসে বলেন ও তার কাঁধে হাত দেন, 'দে উইল এক্সপ্লেন। বাট ফর আস, টু গিভ কোম্পানি।'

যোগেনের কাঁধে হাত রেখে পরের পা ফেলতেই লাটশাহেবের হাতটা খসে গেল। এঁরা সকলেই সেই বড় দরজার দিকে চললেন কিন্তু লাটশাহেব তাড়াতাড়ি হাঁটায় এঁদেরও তাড়াতাড়ি হাঁটতে হচ্ছিল। এইটুকু আসতেই কেউ-কেউ পেছিয়ে পড়ছিলেন, তাঁরা আবার দু-পা দৌড়ে ভিড়টায় ভিড়ছিলেন। দরজাটা খুলতে শুরু করে।

দরবার-ঘরের সবাই দাঁড়িয়ে পড়েন। লাটশাহেব বসেন না—তাই কেউই আর বসেন না। নবাব হবিবুল্লার দাঁড়িয়ে থাকায় হাঁটুর সমস্যা আছে। তিনি পেছনে হাত দিয়ে চেয়ারের হাতলটা ধরে সোজা থাকেন। 'আপনাদের একটা শুভসংবাদ দেব বলে এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছি। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত প্রথম নির্বাচনের ফলাফল ও বিভিন্ন পার্টির সঙ্গে

আলোচনার পর মিস্টার ফজলুল হককে মন্ত্রিসভা গঠন করতে আহ্বান করি ও আজ সেই মন্ত্রিসভা ঘোষিত হচ্ছে।'

হাততালির জন্য লাটশাহেব থেমেছিলেন। তাঁর পেছনে শাহেবরা হাততালি শুরু করলে, হাততালি ছড়িয়ে পড়ে ও ক্রমোচ্চ হয়।

পেছন থেকে চিফ সেক্রেটারি একটা কাগজ লাটশাহেবের সামনে মেলে ধরেন। একটু ভুরু কুঁচকে পড়ে লাটশাহেব কাগজটা হাতে নেন। তখনই হাততালিটা সবচেয়ে উঁচুতে। তার পাশে দাঁড়ানো হকশাহেবকে লাটশাহেব কাগজটা পড়ান। অভ্যাসবশে হকশাহেব পড়লেন—'সামসুদ্দিনের বিরুদ্ধে উগ্রপন্থী রাজনীতির রিপোর্টের কোনো নিষ্পত্তি হয়নি।'

হাততালি থেমে আসছিল। লাটশাহেব হকশাহেবকে বললেন, 'হি মাস্ট বি ড্রপড। ডু ইউ হ্যাভ এনি আদার নেম?' হকশাহেব চুপ করে থাকলেন। হাততালি থেমে যেতেই লাটশাহেব বলতে শুরু করেন, 'মিস্টার ফজলুল হক, প্রাইম মিনিস্টার।' আবার হাততালি ওঠে। সেই বিরতিতে চিফ সেক্রেটারি পেছন থেকে আবার একটা স্লিপ এগিয়ে দেন। লাটশাহেব পড়ে হকশাহেবকে দেখান। হকশাহেব তখন হাততালির জবাবে হাত নাড়াচ্ছিলেন। তার মধ্যেই লাটশাহেব কাগজটা তাঁকে দেখালে তিনি পড়েন, 'নবাব মুসারফ হোসেন।' হাত নাড়াতে-নাড়াতেই হকশাহেব লাটশাহেবের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে সম্মতি জানিয়ে ঘাড় হেলান।

আইনসভার প্রথম অধিবেশন ৭ এপ্রিল, ১৯৩৭
নামাজহেতু বিলম্ব

মন্ত্রিসভা হল পয়লা কিন্তু আইনসভা ডাকা হল সাত তারিখে। দেড়টায় অধিবেশন। স্পিকার-ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন।

৪৭

যোগেন ট্রামে উঠে বসে ঝিমুতে-ঝিমুতে কার্জন পার্কে নামল একটায়। কার্জন পার্কের পশ্চিম সারির কৃষ্ণচূড়া গাছগুলিতে লালরং ফেটে পড়ছে। তার মধ্যে ঝাঁকড়া একটা গুলমোহর গাছ থেকে সোনারঙের ফুলের ঝালর যেন আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। দেশে গাছের কি এত বাহার আছে? কী করে থাকবে? দেশে তো সব গাছই মাটি ফুঁড়ে ওঠা। সব জায়গাতেই তো তাই। মাটির তলায় কোন্ গাছ আছে—সেটা আর বোঝা যাবে কী করে। কিন্তু এ-গাছ তো মাটিতে চারা লাগিয়ে বানানো। যে-বানায় তাদের তো এটুকু জানতে হয়—কোন্ গাছে কী ফুল ফোটে কোন্মাসে। শহর ছাড়া বাগান হয় না, শাহেব ছাড়া শহর হয় না। সব জিলা সদর ও জজকোর্ট—কেমন লাল ইঁটের ঢালু ছাদের সব দালান ঘিরে কতটা সবুজ মাঠ আর রঙিন ফুল। দেখালে তো মানুষ দেখবে, না হলে সবুজ ঘাস আর লাল ফুল তো সবখানেই আছে।

আইনসভার লোহার গেটটা আটকানো ছিল—তবে বারান্দায় অনেক মেম্বার দাঁড়িয়ে আছেন, কেউ-কেউ নিচু রেলিঙের ওপর বসেই আছেন।

যোগেন লোহার গেটটায় হাত দিতেই তার পেছনে এত জোরে একটা হর্ন বেজে ওঠে যে সে লাফিয়ে সরে যায়—হ্যাঁ, একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। যোগেনও তো যাবে—তবে

তাকে হর্ন দিল কেন। পাগড়ি আর খাকি জামায় এক লম্বা দারোয়ান ছুটে এসে গেটটা খুলে দেয়, দুটো পাল্লাই। গাড়িটা ঢুকেই যাচ্ছিল কিন্তু যোগেন তার হাত তুলে গাড়িটাকে থামিয়ে রেখে আগে ঢুকে যায়। গাড়িটাও তাকে অনুসরণ করে কিন্তু পেরিয়ে যায় না। যোগেনের পাশে এসে গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ে। 'যোগেনবাবু' বলে ডেকে গাড়ি থেকে নামেন মৈমনসিঙের এক-ডাকে চেনা জমিদার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। ফিনফিনে আদ্দির ভিতর থেকে নেটের গেঞ্জি ফুটে বেরচ্ছে। ধুতির পাড়ে জরি আছে, কোঁচাটা হাতে ধরে আছেন পাঞ্জাবির তলার বোতামটার কাছে। সেই বোতাম থেকে একটু কমলা আভা ধুতির ওপর পড়েছে। একে বলে, রাজসজ্জা। শুধু দেখতেই কতটা সময় লাগে!

বীরেন্দ্রকিশোর গাড়ির ভিতর থেকে বাঁ-পা-বাড়িয়ে ফুটবোর্ডে রেখে ডান পাটা সরাসরি মাটিতে নামান। সুতরাং দেখার সময়টা যোগেন পায়। লজ্জাটা কাটিয়ে ওঠার সময়টুকুও পায়। বীরেন্দ্রকিশোর বুঝতে পেরেছেন—তাঁর গাড়ির হর্নে যোগেন ক্ষুণ্ণ হয়েছে, তাই এখানে, তার পাশে নেমে পড়ছেন। যোগেনের একটু খারাপ লাগে—তারই-বা এমন বিধবার একাদশী নষ্ট হওয়ার ভাব কেন?

'চলেন যোগেনবাবু, কয়-পা হাঁটি আপনার সঙ্গে, তাইলে আর আপনি আগে-আগে যাইবার পারেন না।'

'কী যে কন, দুইডা পায়ে হাঁইট্যা আর কদ্দুরডা যাওয়া যায়?'

'আদি ও অকৃত্রিম—। মোস্ট ডিপেনডেবল। নিজের বইল্যা কথা? যে জীবজন্তুরা আদি ও অকৃত্রিম চার পাইয়্যা, তাগো সঙ্গে মানুষ পাল্লা দিবার পারে বানানো চার পা নিয়্যা?'

ওঁরা একসঙ্গেই হাসতে-হাসতে বারান্দায় ওঠেন।

'এই তো পণ্ডিত এসে গেছেন, বসেন। ছোট মতন একটা তুক হৌক-না মহারাজ। শুকনো মুখে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব?' এগিয়ে এলেন, নদীয়ার হরিপদ চট্টোপাধ্যায়। আসলে কৃষ্ণনগরের। গানের বাড়ি।

'ক্যা? খাড়া থাইকবেন ক্যা? দরজা খুলে নাই নাকী মিটিঙের—'

'দরজা তো খুলেছে কিন্তু ভেতরে তো কেউ নেই—'

'আপনারা বারবাড়িতে থাইকলে অন্তঃপুর তো শূন্য থাইকবেই,' বীরেন্দ্রকিশোর গুনগুনিয়ে উঠলেন, দরওয়াজা তোড় দে বাবুল—'

হরিপদবাবু চোখ বুজে ফেললেন, কিন্তু তাঁর মুখটা এমন আলোমাখা হয়ে গেল, যেন চোখ বন্ধ করেই তিনি বেশি দেখছেন, 'আহা—হা'। আরো দু-চারজন তাঁদের দিকে এলেন।

যোগেন একটু এগিয়ে যায়। উপেন বর্মণ, জলপাইগুড়ির ক্ষত্রিয় সমিতির, দাঁড়িয়েছিলেন, 'আইসেন মণ্ডলমশায় কিন্তু আমরা বোধহয় একটু আগে এসে গেছি।'

'কেন? কী হইল? এহানেই তো?'

'তাছাড়া আর কোথায় হবে? আপনাদের অ্যাসেমব্লি হবে কী না-হবে, তা ঠিক হওয়ার চার-বছর আগেই-না লেজিসলেচারের বিল্ডিং তৈরি হল। আমি অবশ্য জানি না—কাউন্সিল তো টাউনহলে বসত।'

'এই যোগেন,' ত্রিপুরার জগৎ মণ্ডল ডাকে।

যোগেন তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'বিষয়ডা কী? জায়গা ভুল? সব কাউয়া-বামুনগো নাগাল বইস্যা আছে ক্যান? বেত্তান্তডা কী?'

'আমারে কে জানাইছে যে আমি তোমার জানাব?'

'আমার আগে তুমি আইস্যা যদি ঠাহর না পাইয়া থাকো তাইলে তোমার দৃষ্টিশক্তির খুব-একটা প্রশংসা করা যায় না—'

'বেশ। আমারে যে তুমি কানা কইল্যা তাতে আমার আপত্ত নাই। কিন্তু তুমি অ্যাহন চারিদিগ ভাল কইর্যা দেইখ্যা-শুইন্যা যদি চোখের পাত সাতবার ফেলার আগে বেত্তান্তের আন্দাজ না পাও, তাইলে হানিফ-খলিফার দুকানে যাইয়্যা মগজখান মাইপ্যা আইসো—'

যোগেন লোকজন দেখার জন্য চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে বলে, 'হানিফ খলিফা? বইসে কুথায়? আরে, মান্যিগণ্যি সব মানুষজন তো আইসব্যার ধইরছে—এরা তো সব মন্ত্রী হইল স্যাদিন, না? মল্লিকদের বড় ভাই, বর্ধমানের মহারাজা, সাইরছে—কইল্যা-না, কই বসে হানিফ খলিফা?'

'এড্ডা বটপাকুরের বিয়্যা হইল না, তার তলায়।'

যোগেন তখনো আনমনে দেখছে—কারা আসছে। কারা আসেনি। নাকী সকলেই আসছে। কোনো গোলমাল নেই। তাহলে গোলমাল একটা কিছু ঘটেছে বলা হচ্ছে কেন। ত্রিপুরার জগৎ সেটা বেশি জানে কী করে?

'চেনা যাইব কী কইর্যা—কুনডা তোমার হানিফ খলিফার মিয়াবিবি বটপাকুড়?'

'ক্যা? হানিফ খলিফা যে বটপাকুড়ের তলায় মাপ নেয়, সেই বটপাকুড়। হানিফ খলিফা কিন্তু পাঁচগাছির মঙ্গলবারের হাটে মাপ নেয় আর শুকুরবারের হাটে ডেলিভারি। ডেলিভারির হাটের দিন মাপ দিব্যার গ্যালে মাপ নিব না।'

যোগেন একবারও জগতের দিকে তাকাচ্ছিল না—সে জগতের সামনে থেকে নড়ছিলও না। শালিখ পাখির মত চারদিকে তাকাচ্ছিল—'আমারে তো কইল্যা মগজ মাপাইতে। মগজের মাপের আবার ডেলিভারি কী? আমি ঐ মাপামাপির দিনই যাব। সত্যিই, মগজ মাপানো লাগে। কইয়্যা দ্যাও তোমার এই পাঁচগাছিডার নদীর নামডা কী?'

'ক্যা? সেডা তো বিশ্ববিখ্যাত নদী, ভুলাগাদা-নুলিয়াডা।'

'নদীর মুন্সিগঞ্জের তলায়?'

'মাথা আর তলা কি ঠিকঠাক কওয়া যায়? সে-তুমি তো মতলবের মাথায়ও কইব্যার পারো। তাইলে সাব্যস্ত, হইলডা কী, মগজখান তোমার মাপাইবার লাগবই?'

'লাইগ্‌ব-না? এই মগজ নিয়্যা কইলকাত্‌তা শহরে দিকদিশা ঠিক থাহে? এইডা একখান্ মগজ? এতডা টাইম দিল্যা—এড্‌ডু খুইলল না—'

'তা মাপাও হানিফ খলিফার কাছে পাঁচগাছির ভুলাগাদা—নুলিয়াডা নদীর পাড়ে বিয়াতি বটপাকুড়ের তলাতে। মঙ্গলবারের হাটে মাপ আর শুক্কুরবারের হাটে ডেলিভারি।'

'কইল্যাম যে আমার ডেলিভারি নাই—'

'আরে, যাইবি নে এতখান দূর কুমিল্লায়, এড্ডা ডেলিভারি নিবা না? অন্তত মগজ ঢাকা একখান নমাজি খুলিটুপি ডেলিভারি ন্যাও। সুতার না। দাম পাইয়া যাইব, ছিটের নিও।'

'আরে জগৎ! এবারের মত মগজডা বাইচ্যা গেল।'

'এবার বাইচলে, পছন্দ হয়, জন্মের মতনই বাইচল্যা। বুঝলাডা কী?'

'বুইঝল্যাম—টুপি-মাথায় কেউ নাই, শাহেবরাও নাই, মিয়াশাহেবরাও নাই। গেল কই সব?'

'মাত্তর একজনের মুখ থিক্যা বিত্তান্ত শুইন্যা দশরথরাজার সংসারও গেল, রাবণরাজার সংসারও গেল। এবার তুমি দশমুখের বিত্তান্ত যাচাই কইর্যা আইয়্যা আমারে কও।'

এর মধ্যে আরো অনেকে এসে গেছেন, ব্যাপারটা একটু গোলমেলেই হয়ে উঠছিল। শরৎ

বোস আসতেই ন্যাশন্যাল চেম্বারের স্যার হরিশঙ্কর পাল তাঁর কাছে গিয়ে নিচু গলায় কথা শুরু করলেন। শরৎ বোস তাঁর কথা শুনে দুই হাত উলটে দিলেন। কোনো কথা না-বলে একটু সরে গেলেন। স্যার হরিশঙ্করও ইশারাটা বুঝলেন—ঘটনাটা নিয়ে শরৎ বোস কোনো কথা বলতে চান না। রাজা শিবশেখরেশ্বর তো স্বরাজ্য পার্টির আমল থেকেই মন্ত্রী, এবার তো স্পিকারের জন্য কংগ্রেসপ্রার্থী। স্যার হরিশঙ্কর পাল তাঁকে নমস্কার করে, তাঁর সঙ্গেও একটু কথা বললেন, সেটা ঠিক সৌজন্য বিনিময়ের মত দেখাল না। শিবশেখরেশ্বর, স্যার হরিশঙ্করের সঙ্গে একটুক্ষণ কথা বললেন। ততক্ষণে কানাকানিতে জানা হয়ে যাচ্ছিল যে জোহরের নমাজ সেরে সবাই নিজের-নিজের মশজিদ থেকে দেড়টার মধ্যে পৌঁছুতে পারবে না, অথচ, আজ স্পিকার ইলেকশন—যদি অ্যাসেমব্লি বসতে দেয় কংগ্রেস। তাই সময়টা পেছিয়ে হয়েছে দুটো পনের।

শ্যামাপ্রসাদ আসতেই স্যার নলিনীরঞ্জন তাঁর কাছে গিয়ে নিচু গলায় কিন্তু আঙুল নাচিয়ে কিছু বললেন। শ্যামাপ্রসাদ আর স্যার নলিনীরঞ্জন কারো মুখেই হাসি খেলে না—অনেকের মুখমণ্ডল এমন হয়, যে-কোনো কারণে, মুখের ওপরটায় হাসি বয়ে যাওয়ার মত কোনো নিশ্চিত জায়গা পায় না। তবু যদি হাসতেই হয়, তাহলে বেশিরভাগ সময়ই মনে হয়, ঠাট্টা করছেন অথবা ভয় দেখাচ্ছেন। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ হাসলেন, হাসলেন শুধু না—নলিনীরঞ্জনের বাহুতে হাত রাখলেন। ওঁরা খুব চাপা স্বরে কথা বলছিলেন না। পাশাপাশি যাঁরা ছিলেন তাঁরা তো শুনছিলেনই, আরো অনেকে শোনার জন্য তাঁদের পাশে চলে আসছিলেন।

শ্যামাপ্রসাদ বললেন, 'এ কী নলিনীদা, আপনি তো ট্রেজারিতে, এসব কথা আপনি ক্যাবিনেটে বলতেও পারেন, কিন্তু আপনি অ্যাসেমব্লি বসার আগেই এরকম একটা কথা তুলবেন না।'

'দেখো শ্যামাপ্রসাদ, আমি তো শুধু কথা তুলছি, আর যারা ঘটনাটা ঘটিয়ে দিল, তারা তো তোমার সৎ-পরামর্শের জন্য অপেক্ষা করেনি। নমাজপড়ার টাইম দিতে অ্যাসেমব্লি-বসার নোটিফায়েড সময় পেছিয়ে যাবে?'

'আগে দেখুন, সত্যি কি পিছিয়েছে, কে পিছিয়েছে। আপনি তো এই ক্যাবিনেটের ফাদারফিগার—'

'সে তো তোমাদের কংগ্রেসিওয়ালাদের ফ্যাকসন্যালিজমের দৌলতে। কংগ্রেস মন্ত্রিসভায় না-এসে দায়িত্বহীনতা না-দেখালে আজ নমাজের জন্য অ্যাসেমব্লির টাইম পেছুত না।'

'নলিনীদা, প্লি-ই-জ, আপনি তো গবমেন্ট ফাংশন করার আগেই নো-কনফিডেন্স আনছেন।'

'আমি না শ্যামাপ্রসাদ, নো-কনফিডেন্স আনছে কংগ্রেস। তারা মেম্বারদের সই নিচ্ছে। ওদের নিজেদের তো ৫৪। আর ২৯টা ভোটের জন্য ওরা ইনডিপেনডেন্ট এস-সি আর কেপিপি ডিসেনড্যান্টদের ওপর নির্ভর করছে। তাহলে আজ স্পিকার ইলেকশন হতেই পারবে না।'

কানাকানিতে তত নয়, যতটা এখন মুখেমুখেই রটছে বারান্দায়।

দুপুরের নমাজের জন্য অ্যাসেমব্লির সময় পিছিয়ে দেয়ার কথা শুনে লাটশাহেব নাকী এত রেগে যান যে বলেন যে ৭৫ বছর ধরে এতগুলো অ্যামেন্ডমেন্টের মধ্য দিয়ে নমিনেটেড কাউন্সিল থেকে ইলেকটেড কাউন্সিল হয়েছে, তাতে তো মন্ত্রীরাও ছিলেন কিন্তু নমাজের জন্য কাউন্সিলের মিটিঙের সময় বদলাবার কোনো পূর্বদৃষ্টান্ত নেই। এসব সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে কোনোভাবেই গবমেন্ট নিজেকে জড়াবে না। টেল দি পি এম।

শুনে পি এম, মানে হকশাহেব, নাকী সোজা লাটশাহেবের কাছে গিয়ে বলেন—আমরা কোথায় কাউন্সিলের দৃষ্টান্ত নিচ্ছি? আপনিই তো কাউন্সিলের কথা তুললেন। কাউন্সিলে কি এত বড় ভোট হত? কাউন্সিল কি রিপ্রেজেনটেটিভ গবমেন্ট ছিল? কাউন্সিলে কি পি এম থাকত

বা লিডার অব দি হাউস থাকত? এটা তো আপনার স্পেশ্যাল পাওয়ারের মধ্যে পড়ে না। আমি কি তাহলে ভোটমারানি প্রাইম মিনিস্টার?'

এসব গল্পের সুবিধে হচ্ছে—পাত্রপাত্রীদের স্বভাব জানা থাকলে গল্পটা ক্রমেই লম্বা হতে থাকে। হকশাহেব যে প্রতি মুহূর্তে বদলে যেতে পারেন সেটা যার জানা, তার কাছে এটা বিশ্বাস্য ঠেকে। 'ভোটমারানি'-র কারণেই। অনেকে জানতেও চায়, ভোটমারানির কী ইংরেজি করেছিলেন হকশাহেব।

যাঁরা কোনো কারণে গল্পটা বিশ্বাস করতে চান, তারা একটা মত দেন যে ভোটমারানির কোনো ইংরেজি হয় না, হকশাহেব বরিশালি ভাষায় 'ভোটমারানি'—শব্দটিই বলেছিলেন, বরিশালি অঙ্গভঙ্গিসহ। তাতেই নাকী লাটশাহেব বুঝে ফেলেন যে হকশাহেব, রিপ্রেজেনটেটিভ গবমেন্ট, অ্যাসেমব্লির সার্বভৌমতা ও লিডার অব দি হাউসের অধিকার নিয়ে একেবারে আইনি কথা তুলেছেন। লাটশাহেব যদি জিদ করেন, তাহলে লাটশাহেবের মুখে চুনকালি পড়বে যে তিনি কনসটিটিউশন্যাল গবমেন্টকে কাজ করতে দিচ্ছেন না। তিনি হকশাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনার কি মনে হয় না এতে কমিউন্যাল টেনশন তৈরি হবে।'

হকশাহেব তাতে নাকী বলে ওঠেন, ডেফিনিটলি। আমাগো বেবাক ভোটার কি হুদাওনইয়া গিছে। দে ভোটেড ফর অলমোস্ট হাফ দি নামবার অব টোট্যাল সিটস ফর দি মুসলিমস। আমি তাগোই আগে সংবাদ দিব যে এ গবমেন্ট নমাজ-সরিয়তির গবমেন্ট নাকী নিজের হোগায় আউখ্যাওয়ালা বাঁশ দিব? ফজলুল হক ছাড়া আছে কেউ বাপের বেটা যে লাটশাহেবরে ইংরাজিতে হোগায় আউখ্যাওয়ালা বাঁশ দিতে পারে?

লাটশাহেব তখন বলেন, তাহলে হোক। সে দেখুন, আপনি যা ভাল মনে করেন, কিন্তু কারেকশনে কারণটা না বলে, এরকম বলাই ভাল যে বিশেষ পরিস্থিতির কারণে ইত্যাদি।

অনেক মেম্বার দ্বিতীয় নোটিশটা হাতেই পায়নি, অনেক মেম্বার বুঝেও উঠতে পারেনি ঘটনাটা কী। সেই কবে ভোট গিয়েছে এখনো অ্যাসেমব্লিতেই বসা হল না—অনেক মেম্বারের মনে এমন একটা আক্ষেপ ছিল, তাই, মিনিট পঁয়তাল্লিশ সময় পেছুনো-এগুনো গ্রাহ্য না করে, বেলা একটা থেকেই তাঁরা একে-একে আসা শুরু করেছেন। শেষে দেখা গেল, অনেকেই জানেন না সময় পেছুনো হয়েছে। আর যাঁরা জানেন, তাঁরাও আসল কারণটা জানেন না, মানে, লাটশাহেব-প্রধানমন্ত্রীর কথাবার্তা। সেটা যাঁরা জানেন তাঁদেরও অনেকে জানেন না—আসল কারণটা হল দুই নমাজের ফাঁক।

তবে, সব মেম্বার তো আর একসঙ্গে আসেননি, তাই গল্পটা ছড়াচ্ছিল। এসব গল্প একবার গড়ালে গড়াতেই থাকে। ইয়োরোপীয় ব্লকের একজনও যখন আসেনি, তখন তাদের খবর দেয়ার ব্যবস্থাটা তাদের স্বজাতরা খেয়াল রেখেছে, বোঝা গেল।

এর ভিতর যে একটা হিন্দু-মুসলমানি ব্যাপার আছে—সেটা নলিনীরঞ্জনই প্রথম এমন খোলাখুলি বললেন। তবে বলার জন্য তাঁকে শ্যামাপ্রসাদের জন্য অপেক্ষা করতে হল—হিন্দু নিয়ে আর কোনো পার্টির কোনো নেতা তো কথা বলে না। তাঁরা মুখে কিছু না-বলে কাজে করে। শ্যামাপ্রসাদ এখনো আশা করে আছে—সে মন্ত্রী হবে। তাই নলিনীরঞ্জনকে প্রকাশ্যে নিষেধ করল—এ-কথা বলতে। মুসলিম লিগের নাজিমুদ্দিন-সারওয়ারদি-হবিবুল্লা ও প্রজা পার্টির হকশাহেবের কাছে ঠিকঠাক খবর পৌঁছে যাবে যে নলিনীরঞ্জন কতটা মুসলিমবিদ্বেষী ও শ্যামাপ্রসাদ, অন্তত ব্যক্তিগতভাবে, কতটাই অসাম্প্রদায়িক। এতে হুমায়ুন কবিররা জোর পাবে জিদ ধরতে যে শ্যামাপ্রসাদকে ক্যাবিনেটে নেয়া হোক। শ্যামাপ্রসাদকে কি নলিনীরঞ্জনও চান,

মন্ত্রিসভার হিন্দু-মুসলমানের অনুপাতটা বদলাতে। নইলে তো বোঝা যাচ্ছে না—নলিনী সরকার আগে এসে বারান্দায় সবার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন কেন। তাঁকে না-জানিয়ে তো আর সময় বদলানো সম্ভব নয়।

'কংগ্রেস যেন স্পিকারপদে প্রার্থী না দেয়'

নমাজ সেরে বা আনুমানিক হিশেবে নমাজ যখন শেষ হতে পারে বেলা দুটো নাগাদ গাড়ি ঢুকতে শুরু করে, কেউ-কেউ পায়ে হেঁটেও।

৪৮

হকশাহেবের গাড়ি তাঁকে নিয়ে একটু এগিয়ে গিয়েছিল, পেছনে আর-একটা গাড়ি এসে পড়ায়, তাঁর গাড়িটা পেছুনো গেল না। সেই গাড়িটা থেকে সারওয়ারদি নেমে দুই ধাপ একসঙ্গে পেরিয়ে বারান্দায় উঠে পড়ে। হকশাহেব গাড়ি পেছতে বারণ করে পায়ে হেঁটে পেছিয়ে এসে বারান্দায় উঠতে না-উঠতে সেলাম আলে কুম ও নমস্কার শুনতে-শুনতে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সামনে পেলেন কুমিল্লার ধীরেন দত্তকে। সামনে অনেকেই ছিলেন তবে হকশাহেব ধীরেন দত্তকেই বাছলেন, 'ধীরেন, ঐ-যে এড্ডা কি অঙ্ক আছে না, কচ্ছপ আর খরগোশের দৌড়ে শেষ পর্যন্ত কচ্ছপই জেতে, ঐডা বদলাও।'

'ঐডা ইসপস ফেবলসের গল্প-না? মোর‍্যাল স্টরি। স্লো বাট স্টেডি উইনস দি রেস—'

'থোও তোমার মোর‍্যাল টেল। বেসিক্যালি তো ম্যাথমেটিক্স—যহন এডডা রেস ইনভলভবড, যে-জিতব তারে তো আগে পৌঁছবার লাগবই। শুদাশুদি ইষ্ট নাম জপ কইরলে তো রেস জেতা যাইব না। অঙ্কডা বদলাও। মোর‍্যাল হইব—অনলি এ স্টেডি টাইম উইনস দি রেস—'

'অঙ্ক যদি বদল্যাবার লাগে হকশাহেব, তাইলে আপনারই উচিত আপনার স্যাররে বলা। আমি আপনার মুখোমুখি পইড়্যা গেছি বইল্যা আমারে ক্যান অঙ্কে ঠ্যালেন'—ধীরেন দত্ত বলেন।

স্যার মানে, স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, পি সি রায়। হকশাহেব তাঁর প্রিয় ছাত্র ছিলেন।

'আরে কইতেছি সারওয়ার্দির কথা—দ্যাহ, সব সময় ফাস্ট, ছোড ফিগার তো, রাইট ইনে ভাল খেইলব। এর মইদ্যে তুমি আবার স্যারের কথা তোলো ক্যান। আরে, সত্তি অ্যাকডা অঙ্ক আছে। ভুইল্যা গেছি। অ্যাহন কি বুড়া বয়সে স্ট্যান্ড আপ অন দি বেঞ্চ হব?'

হকশাহেবের একটু জানাচেনা মহলে একটা কথা চালু আছে—'দরকারি কাম থাইকলে হকশাহেবেরে তোমার চক্ষুর লগে চক্ষু মিল্যাইবার দিয়ো না। এমন কথা ফান্দব, তার মাথা ল্যাজা বাইর কইরতে একবেলা কাইট্যা যাবে।'

বর্ধমানের আবুল হাসিম তাড়াতাড়ি হেঁটে শরৎ বোসের কাছে গিয়ে বলেন, 'আপনার সঙ্গে একটু কথা—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন-না'—

হাসিম শাহেবের ভঙ্গিতে বোঝা গেল, তিনি শুধু শরৎ বোসের সঙ্গেই কথাটা বলতে চান। হাসিমশাহেব তাঁর বাপখুড়োর সুবাদেই পরিচিত। বর্ধমানে উকিল হিশেবে মান্যগণ্য। ওঁকে কেউ সাম্প্রদায়িক বলে না যদিও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো অসত্য অভিযোগ করলে, তিনি স্পষ্টভাষায় জবাব দেন।

শরৎবাবু একটু সরে এলে হাশিম শাহেব বলেন, 'আমার কোনো অ্যাসেমব্লি স্ট্যাটাস নেই, আমি কেবলই একজন ইনডিপেনডেন্ট মুসলিম মেম্বার—'

'দ্যাট মে বি ইয়োর গ্রেটেস্ট স্ট্যাটাস। বলুন। আমি কংগ্রেস লেজিসলেচার পার্টির লিডার বলে ডোন্ট স্ট্যান্ড অন ফর্মালিটিজ—'।

'আপনারা কি স্পিকার ইলেকশনে ক্যানডিডেট দেবেন?'

'হ্যাঁ। নিশ্চয়ই! শিবশেখরেশ্বর তো ক্যানডিডেট। ওর তো কাউন্সিলের চেয়ারিং-করার অভিজ্ঞতাও আছে। কেন, বলুন তো?'

'এটা তো কোনো চাকরির ভেকান্সি নয়। এক্সপিরিয়েন্সে কী হবে। মেম্বারদের যে-কেউই ভাল স্পিকার হবেন।'

'নিশ্চয়ই। অন দ্যাট কাউন্ট অলসো শিবশেখরেশ্বর ডাজ্‌নট্ ফেইল—'

হাসিম শাহেব নিজেকে সামলান। কথার পিঠে কথা বলে তিনি ইস্যুটাকে হালকা করে দিলেন কেন? তিনি তো একটা রাজনীতির কথা বলতে এসেছেন।

'আমি, মানে, আমরা অনেকেই এটা ঠিক চাইছি না যে মুসলিম মাসের কাছে কংগ্রেস শুধুই হিন্দুপার্টি হয়ে থাক। হিন্দুমাসের তুলনায় বাংলায় মুসলিমমাস শিক্ষাদীক্ষায় পেছিয়ে আছে। তাদের তো অবাঙালি মুসলিম নেতাদের নেতৃত্ব মেনে নেয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। উপায় থাকলে কী হতে পারে, হকশাহেব তো তা প্রমাণ করে দিয়েছেন। মুসলিমমাসকে অলটারনেটিভ দিলে তারা নিজেদের লয়্যালটি ঠিক করতে পারে। নিজেরা তো সেই অলটারনেটিভ তৈরি করতে পারে না। আপনি কি আমার এই ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত?'

'বলতে পারেন, সম্পূর্ণ দ্বিমত নই। মুসলিম ভোটারদের ডিভিশন বিটউইন লিগ অ্যান্ড কেপিপি, ইজ এ কমপ্লেক্স ঘটনা। এটা চট করে বুঝে যাওয়া ঠিক নয়। অল ইন্ডিয়ার পার্সপেকটিভ মাছিমারা কেরানির মত বাংলা, পাঞ্জাব বা সিন্ধের মত মুসলিম মেজরিটি প্রভিন্সে কপি করাটাও যেমন ঠিক নয়। অথচ, আমার পার্টি তো তাই করল—'

'এই পর্যন্ত একমত হলেই আপাতত চলবে। কংগ্রেস যে অ্যান্টি-মুসলিম নয় তা প্রমাণ করার এই সুযোগটা আপনারা ব্যবহার করছেন না কেন? স্পিকার ইলেকশনে আপনারা কেন ক্যানডিডেট দিচ্ছেন? আপনারা কোনো হিশেবেই জিততে পারবেন না। লিগ আর কেপিপির জয়েন্ট ক্যানডিডেট আজিজুল হককে সাপোর্ট দিলে সেটা তো গুডউইল জেশ্চার হিশেবেই সবাই মেনে নিতে বাধ্য হত।'

'সেটা তো হয় না হাসিম শাহেব, হিন্দুমাসও তো একটা মাস। সেটার সঙ্গে কংগ্রেসমাসের একটা ওভারল্যাপিং হচ্ছে, এটাও বিপদের। তারা এটা মেনে নেবে না যে লিগকে কংগ্রেস ওয়াকওভার দিল।'

'তাহলে আপনারা কেপিপি ডিসিডেন্টদের তমিজউদ্দিনকে সাপোর্ট করুন। আপনার মাসকে তো আপনি বোঝাতে পারবেন—লিগকে আটকাতেই আপনারা ডিসিডেন্ট কেপিপিকে সাপোর্ট দিচ্ছেন। কংগ্রেস মাসের সেই অংশটাই হিন্দু-আইজ্‌ড হয়নি, যারা হকশাহেবকে অ্যান্টি-কমিউন্যাল মনে করে।'

'কিন্তু তমিজউদ্দিন তো অ্যান্টি-হকশাহেব—'

'হ্যাঁ। বাট ফ্রম দি লেফট। তারা প্রধানত অ্যান্টিলিগ'।

'হ্যাঁ—আ-আ। আমরাও তো গবমেন্টকে লেফ্‌ট থেকেই চাপব। তাহলে তমিজউদ্দিনের ডিসিডেন্ট-কেপিপি আর কংগ্রেস মিলে লিগকে আইসোলেট করা যায়। কিন্তু এ-বুদ্ধিটা আমাদের

পার্টির কারো মাথায় এল না কেন?'

'সেটাই বোধহয় কংগ্রেসিদের, মানে কংগ্রেস পার্টির মৃত্যুবীজ। গান্ধীজির মডেলে প্রত্যেকেই নিজেকে পার্টির ওপরে ভাবেন। কিন্তু গান্ধীজি তো আর দুটো হয় না। ফলে, শেষে, দেখা যায়—যে যার নিজের কথা ভাবছেন, পার্টির কথা কেউই ভাবছেন না।'

শরৎ বোস এবার হো-হো হেসে উঠলেন আর তাঁর হাসির সঙ্গে মিল রেখেই যেন অ্যাসেমব্লির ঘণ্টা বেজে উঠল—অধিবেশন শুরু হবে।

হাসিমশাহেব বলে উঠলেন, 'এত হাসির কথা তো কিছু বলিনি।'

'না। সে কারণে হাসিনি। এটা তো টু উ সিম্পল অ্যান্ড কমন এক্সপ্ল্যানেশন টু কাম ফ্রম ইউ। কথাটা এভাবে বললে তো সিকিভাগ সত্য বড়জোর। লিগের জেনারেল আছেন, এ জেনারেল ইন সার্চ অব অ্যান আর্মি। কংগ্রেসের জেনারেলও আছেন, আর্মিও আছে, নেই এরিয়া-কম্যান্ডার। কিন্তু আমি হেসে উঠেছি, আপনার কথা ভেবে—আপনার ইনটারেস্টটা কী? আপনি তো কংগ্রেসেরও নন, লিগেরও নন, কেপিপিরও নন। স্পিকার হিশেবে কংগ্রেস প্রার্থী দেবে কীনা বা কাকে সমর্থন করবে—এ নিয়ে আপনার কী এসে যায়?'

'আমার পলিটিক্সের তো এসে-যায়।'

'সেটা কী?'

'কংগ্রেসকে যেন মানুষজন শুধুই মুসলিম বিরোধী ভেবে না নেয়।'

'চ-লু-ন। ভেতরে যেতে হবে। আমি একটা লাস্ট মিনিট ড্রামার চেষ্টা করব, শিবশেখরেশ্বরকে ড্রপ করে তমিজুদ্দিনকে সাপোর্ট দিতে। তবে আমাদের পার্টি তো! মনে হয় না—কেউ রাজি হবে। থ্যাঙ্ক ইউ ফর এ গুড সাজেশন।'

স্পিকার ভোট ঠেকে থাকে অনাস্থার কাগজে কংগ্রেস সই জোগাড়ে লাগে

৪৯

অ্যাসেমব্লির ভিতরে যে এমন গোহাটা বসেছে বাইরে থেকে কোনো আওয়াজই পাওয়া যাচ্ছিল না। এক সঙ্গে চার-পাঁচজন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে। আরো চার-পাঁচজন দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু কোনো কথা বলছে না। তারা বোধ হয়, ভেবেছে সামনে এমন কিছু নাটক হচ্ছে, যা তারা পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছে না। কিরণশঙ্কর রায় একটা চেয়ার সরে গিয়ে শরৎ বোসকে জায়গা দেয়। হাশিমশাহেব এক ফালি কার্পেট পাঁড়িয়ে আনুমানিক পেছন দিকে চলে যান ও বাঁয়ের প্রথম যে-চেয়ারটা খালি পান, সেটাতেই বসে পড়েন আর পাশের মেম্বারকে জিজ্ঞেস করেন—'হচ্ছে কী?'

জিজ্ঞাসা করার পর দেখেন, তিনি মেম্বারটিকে চেনেন না। তাড়াতাড়ি ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলেন, 'সালামআলে কুম। আমি বর্ধমানের আবুল হাসিম।'

ভদ্রলোক হাতজোড় করে প্রতি নমস্কার করে বলেন, 'আমি যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, বাখরগঞ্জ।' হাসিম একটু হেসে বলেন, 'আরে, আপনিই তো এবার ইলেকশনের চ্যাম্পিয়ন? জেনারেল সিট থেকে শিডিউল্ড কাস্ট।'

'চ্যাম্পিয়ন হওয়ার বাসনা তো আমার না। সরকার আমারে শিডিউল কাস্ট বানাইছে আবার সরকারই আমার সিটটাকে জেনারেল কইর‍্যা দিছে। আপনার সঙ্গে যদিও সাক্ষাৎ পরিচয় নাই, তবে গোপালগঞ্জের মৌলবি মিরদ্যা-র কাছে দিনরাইত আপনারে নিয়্যা বিলাপ শুইনছি।'

'বিলাপের কারণ কিছু আছে নিশ্চয়ই—'

'ঐ মৌলবি তো তহন প্রজা পার্টি খাড়া কইরতে মাথায় গামছা বাইন্ধ্যা ফাল পাইড়তেছে। দেহা হইলেই কয়—ভাইরে, বর্ধমানের আবুল হাসিমরে যদি টাইনতে পাইরত্যাম, তালি দেইখত্যা প্রজার নৌকা উজানেও চলে।'

একটু হেসে হাসিমশাহেব বলেন, 'এখন হচ্ছেটা কী? ঠিক জায়গায় বসেছি কী না তাও তো বুঝছি না।'

'অ্যাহনো তো বেঞ্চ অ্যালটমেন্ট হয় নাই। সেডা বোধহয় স্পিকাররে কইরতে হয়—'

'হ্যাঁ। তবে এখন হচ্ছেটা কী?'

'যা প্রত্যক্ষ কইরতেছেন, তার অধিক কিছু না। ঐ কেউ-কেউ জিগ্যাব্যার ধইরছে—দুপুরের নমাজের জন্য অ্যাসেমব্লি সময় পিছানো হইল ক্যানো। আর কেউ-কেউ চিল্লাবার ধইরছে—সেডা তো ধর্মের অধিকার। এই আর-কী?'

'সময় পেছুল কে? সত্যি পিছিয়েছে? আমি অবিশ্যি ফজর নমাজই সারি—কোর্ট হাকিম আর মক্কেলদের সঙ্গ এত বিষয়-আশয়ের কতা বলতে হয় যে খোদাতাল্লার দোয়া চাইতে লজ্জা হয়।'

স্পিকারের জন্য নির্ধারিত সিংহাসনের মত খাড়া চেয়ারের পাশে এক শাহেব দাঁড়িয়েছিল—লম্বা তো বটেই, দশাসই, টাইকোট নিখুঁত। সে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বুকের কাছে জড়ানো দুই হাতের কখনো একটা, কখনো আর-একটা তুলে যেন চোখ মোছে। চিবুকে হাত বোলায় আর কপালে ভাঁজ ফেলে। যারা চেঁচামেচি করছে, তাদের দিকে সে একবারও তাকাচ্ছিল না।

ইয়োরোপিয়ানরা একজায়গাতেই বসেছিল। তাদের মধ্যে একজন উঠে দাঁড়িয়ে বুড়ো মানুষদের শ্লেষ্মাজড়ানো স্বরে জিজ্ঞেসা করলেন, ইংরেজিতেই, 'যদি অ্যাসেমব্লির সময় পেছিয়ে দেয়া হয়ে থাকে তবে সেটা তো জানার ব্যাপার। কিন্তু যদি পেছুনো হয়ে থাকে, তাহলে, যতটা পেছুনো হয়েছে বলে বলা হচ্ছে, তার চাইতে অনেক বেশি সময় তো এখানে পেছিয়ে দেয়া হচ্ছে ও কারা সেটা করছে তাও তো দেখতে পাচ্ছি।'

এইবার চেয়ারের পাশে দাঁড়ানো শাহেব জিজ্ঞাসু শাহেবের দিকে তাকিয়ে, দু-হাত দু-দিকে ছড়িয়ে ঘাড়টা নামিয়ে বলল,—'আমি এই সভার কেউ নয়। আমি আমার কর্তৃপক্ষের নির্দেশে এখানে স্পিকার নির্বাচনের ভোট করতে এসেছি। মেম্বাররা যদি ভোট করতে না চান, আমি চলে যাচ্ছি।'

কেউ একজন গম্ভীর অথচ উঁচু গলায় বলে উঠলেন, 'মনে হয়, লিডার অব দি হাউসের হস্তক্ষেপ করা উচিত।'

এ কথার পরই সারওয়ারদি হকশাহেবের দিকে হাত দেখিয়ে বললেন, 'মিস্টার হক'।

হকশাহেব সারওয়ারদির ইঙ্গিত যেন দেখতেই পেলেন না। তখন কমবয়েসি একজন হকশাহেবের পেছনে দাঁড়িয়ে বলে, 'এ কিন্তু স্যার সব কংগ্রেসের চক্রান্ত। আপনি কিছু একটা বলুন—'

হকশাহেব তাঁর চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে, ঘুরে, পেছনের ছেলেটিকে একটু ধমকের সুরেই বললেন, কিন্তু হকশাহেব যেন পুরো সভাকেই বলছেন, কারণ—তিনি যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন

সেখান থেকে সব মেম্বারেরই তিনি মুখোমুখি। গলাটাও তিনি সবার শোনার মত উঁচু করে নিলেন, 'যদি আমাকে হাউসের লিডারি করতেই হয়, তাহলে হাউসটাকে তো হাউস হতে হয়। এটা তো কোনো হাউসই নয় এখন। হাউস হতে হলে আগে তো বাড়ির কর্তা কাউকে হতে হবে। হিন্দু উচ্চবর্ণের যেরকম, ছেলের বা মেয়ের বিয়ের সময় একজন নিমন্ত্রণকর্তা দরকার হয়। আগে স্পিকার ঠিক করুন, তিনি আমাদের পার্টি অনুযায়ী বসার জায়গা বলে দিন, আগে হাউস বানান, তারপর তো লিডার! লিডারের অভাব হবে না।' হকশাহেব ঘুরে আবার চেয়ারে বসে পড়লেন।

হকশাহেবের বক্তৃতার খ্যাতি এতই ব্যাপক যে তাঁর যে-কোনো কথাতেই হেসে ওঠা বা হাততালি দেয়া অনেকের অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। আবার, বক্তা হিশেবে হকশাহেবেরও অভ্যেস দাঁড়িয়ে গেছে—যা বলছেন তাতে একটু মোচড় দেয়া। তেমন হাততালি-হাসাহাসি হল। চেয়ারের পাশে দাঁড়ানো শাহেব এবার সরাসরি মেম্বারদের মাথার ওপর দিয়ে তাকালেন, ভাঁজপড়া কপাল সহই।

মনে হয়েছিল, গোলমালটা বাড়ল। কিন্তু যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের একজন হাত তুলে আঙুল নাড়িয়ে আবার চেঁচাতে লাগল। শাহেব চোখ ঘুরিয়ে নেয়।

হুগলির রাধাকান্ত দাস কংগ্রেসের সবে ধন নমশূদ্র-শিডিউল—দলে তার খাতির বেড়েছে। ডেপুটি হুইপ। এসে যোগেনকে ডাকে, 'একটু আসবেন?' আর হাসিমশাহেবকে বলে, 'বেছে-বেছে বাঙাল সঙ্গ করছেন!'

'আরে, বাঙাল হওয়ার বিপদ দেহি বড়, সবাইই সঙ্গ চায়। দাদা, মঞ্চে এখন হইছে কী', যোগেন চেয়ার থেকে উঠে রাধাকান্তর সঙ্গে পেছিয়ে যায়।

'ওটা চলবে এখন। আমাদের পার্টি এখন শেষ মুহূর্তে ভাবছে, স্পিকারে ক্যানডিডেট না দিয়ে ইনডিপেনডেন্ট কেপিপির তমিজউদ্দিন শাহেবকে সাপোর্ট দেবে।'

'শেষ মুহূর্তে চিন্তার এতটা বদলের হেতু কী?'

'হাশিমশাহেবের মত গণ্যমান্য লোক শরৎবাবুকে ঢোকার আগে বলেছেন, তিনি চান না কংগ্রেস অ্যান্টিমুসলিম হিন্দুপার্টি বলে নিজেকে জাহির করুক।'

'হাশিমশাহেব তো ইনডিপেনডেন্ট?'

'হ্যাঁ। সেই কারণেই বলতে পেরেছেন—'

'হাশিমশাহেব বলার আগে আপনাগ মাথায় খেলে নাই কথাডা কারো?'

'বলার পরও তো ঢুকছে না। তাই নিয়ে আমাদের মেম্বরদের মিটিং চলছে। মনে হয় না, একমত হবে। যে-মতই হোক, কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের আগে অ্যাসেমব্লি বসছে না, গোলমালই থামবে না। সিদ্ধান্ত হলেই থেমে যাবে। ফ্রেন্ডলি ম্যাচ চলছে।'

'আর, হাশিমশাহেব যে আমার পাশে বইস্যা হাসি-হাসি মুখে সব দেখতিছেন? খ্যাড়ে কুটে আগুন জ্বালাইয়া, পেত্নি বইসছেন আলগোছ হইয়্যা—'

'কী যে বলেন! হাশিম শাহেবের পক্ষে কি ঐ চ্যাংড়া পার্টি হওয়া সম্ভব। শুনুন। কংগ্রেসের আর-একটা মুভ হচ্ছে—এ গভমেন্টকে আঁতুড়েই মারবে। সংখ্যালঘু সরকার। অনাস্থা প্রস্তাব ওঠানোর জন্য সই জোগাড় শুরু করেছি। যদি সব সই পাওয়া যায়, তাহলে স্পিকার ভোটের পরই নোটিশ পড়বে।'

'মানে, স্পিকারশাহেব অ্যাসেমব্লিকে যখন নতুন এই সরকারের কথা জানাবেন, তখনই, মৃত্তিকা টানিয়া লইবে কর্ণের রথচক্র?' দু-জনেই চাপা হাসে, যেন সম্মতিতে।

'দাদা, বুদ্ধিটা যার মাথা থিক্যাই বারাক সে-মাথার দাম আছে। একে সংখ্যালঘু মন্ত্রিসভা—মন্ত্রিসভায় যে-যে পার্টি আছে তাগো টোট্যাল মেম্বার যত, মন্ত্রিসভার বাইরে পার্টির মেম্বার তার থিক্যা বেশি। তেমন কোনো ভাগাভাগি হইলে মন্ত্রিসভাকে আর রক্ষা করা যাবে না। তার উপর, কোয়ালিশনের প্রধান দুই পার্টি—লিগ আর প্রজা—যদি কোনো একটা বিষয়ে এরা একমত না-হয় তাইলেও কোয়ালিশনের পতন। এমন শ্বাস-ওঠা প্রসূতিকে আর স্বর্ণভস্ম প্রয়োগে আর কয়েকটা শ্বাস বাঁচাইয়া রাইখ্যা উবগার কী? তার চাইতে মৃতবৎস' কইর‍্যা দাও।

'বুদ্ধিটা যারই হোক, হিশেবটা পাকা। কংগ্রেসের নিজের দলে আছে ৫৪। কংগ্রেস থেকে কিছু ক্রশভোট হবে না তাও কি সম্ভব? ক্রশভোট ধরলেও ৫০টা ভোট পাওয়া যাবে। মন্ত্রী হতে না-পারায় লিগ আর প্রজার ক্ষুব্ধ মেম্বার ঠিক আন্দাজ করা যায় না। ১৭ জন তো নোলা বাড়িয়ে ইনডিপেনডেন্ট প্রজা হয়েছে। ১৭ জনের মধ্যে ১৫ জনও যদি অনাস্থা ভোটে মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ঠিক থাকে তাহলেও সংখ্যা দাঁড়াবে ৬৫ বা ৬৭। এই বাকি ১৮-২০টা ভোট নির্ভর করে স্বতন্ত্র মুসলিম আর তপশিলি মেম্বারদের ভোটের ওপর। বিক্ষুব্ধ হলেও ১৮-২০টা ভোট আসতে পারে না—যদি মত পার্থক্য প্রকাশ্য না-হয়ে থাকে। কিন্তু তপশিলি আর বিক্ষুব্ধ-ভোটে কানের পাশ দিয়ে হলেও অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ জিতেও যেতে পারে। আরো একটা সুবিধে যে ইনডিপেনডেন্টরা এত ঘন-ঘন দল পালটাচ্ছে যে কারোপক্ষে খেয়ালই রাখা সম্ভব নয়—কে কখন কোন্ দলে আছে।'

কংগ্রেসের বকলমে তপশিলিদের সইয়ের দায়িত্ব ছিল হুগলির রাধাকান্ত দাসের ওপর। ১৩ জন নমশূদ্র এমএসএর মধ্যে কংগ্রেসের এই সবেধন। তাই তার এখন কদর বেড়েছে—কংগ্রেসে। লেজিলশেচার পার্টির ডেপুটি হুইপ।'

যোগেন বলে—'একদিকে ফ্রেন্ডলি ম্যাচে নিজেদের ক্যানডিডেট তুলে নেয়া, আর-একই সঙ্গে অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ সই করানো। দাদা, আপনারে এই কার্যে বহাল কইরল কেডা?'

রাধাকান্ত হুগলির নেতা, বরিশালের নয়। ওর পক্ষে কংগ্রেস করাটা স্বাভাবিক। সে ভদ্রলোকের ভাষাতেই বলে, 'কোন্ কাজের কথা হচ্ছে?'

'এই-যে মড়াসরানোর কাজ?'

'ওঃ এটা? কংগ্রেস, আমার পার্টি।'

'কংগ্রেস-না বড়-বড় বিলাইত-ফেরত ব্যারিস্টারের এত ভিড় যে এরা একসঙ্গে স্টিমারে উঠলে স্টিমার ফাঁসবেই, সে জলেই হোক আর চরেই হোক। এই গর্ভপাতের টাইমে তাদের কাউকে পাওয়া গেল না—একমাত্র-শুদ্দুর মেম্বারডা ছাড়া? তারা কেউ দিছেন? সই?'

'দেবেন। ৮০ বা ৮১টা সই উঠলেই আমাদের নেতারা সই দেবেন। কিন্তু যদি এটা শেষ পর্যন্ত কার্যকর না হয়, তাহলে তো দলের নাম ডুববে।'

'দাদা, কংগ্রেসের নামের সঙ্গে সোয়াশ মণের উপর একটা বাটখারা বাইন্ধ্যা দিছেন আপনারা আর ডুবানোর দোষ বাইরের লোকের? কংগ্রেসের হয় মতিভ্রম হইছে, না-হয় তো ভীমরতি। সারা ভারতের একডা পার্টি। সেইডা কী না তপশিল নিয়্যা মনস্থির কইরব্যার পারল না? নাইলে হকশাহেবরে এমন ডুবান ডুবায়?'

'সে তো ঐ মুশারফ হোসেন আর...

'ছাড়ান দ্যান দাদা। ঐ গুলা খোশগল্প। কংগ্রেসে তো মুশারফ হোসেনের বাপখুড়া আছে। কয় আমরা জাতীয় দল। তয় একডা মুসলমান নাই ক্যান। কয় যে আমরাই তো হিন্দুগ দল, তপশিলিরা আলাদা থাইকবে ক্যান, তপশিলিরা বরং হিন্দুগো মন্দিরে প্রবেশ করুক। জোর কইর‍্যা

প্রবেশ কইরলে বলব—তোমরা আহিংসা ভায়োলেট করছ। হিন্দুসভায় গ্যালে কইব—আমরা থাইকতে আবার হিন্দুগ আলাদা পার্টি ক্যা?'

'আপনি যা বলছেন সে সবই তো ঠিক কথা। কংগ্রেসকে যে-ব্যবস্থা নিতে হবে, সেটা তো সারা দেশের জন্য।'

'অ! আপনি তালি ফ্যাড়ে পইড়্যা গিছেন?'

'এর মধ্যে ফ্যাড়াফিড়ি কী দেখেন। এ তো আইনসভার মাথাগনা। যে-পার্টির বেশি, সে-পার্টির মন্ত্রী। যদি প্রমাণ হয় তারা বেশি, তাহলে তারাই মন্ত্রী থাকবে। আইনসভার রাজনীতি তো আইনসভার নিয়মেই চলবে।'

'তা তো বটেই। শাহেবরাও তো সাধ কইর‍্যা আমাগো আইনসভা দ্যায় নাই। এই-যে তোমাগো ভোট দিল্যাম, তোমাগো আইনসভা দিল্যাম, তোমাগো আইনসভার মেম্বার কইরল্যাম, তোমাগো মন্ত্রী বানাইল্যাম—এইক্ষণ থিক্যা রাজনীতি মাজনীতি সব আইনসভায় হব। আর কংগ্রেস, এত পুরনো বংশ, এত চওড়া—স্যা-র এডডা আন্দাজ হইল না যে লিগ-ছাড়া মুসলমান্‌গ এড্ডা পার্টি যদি হকশাহেবের মতন নেতা নিয়্যা খাড়ায়, তাহাইলে তাগোও মুসলমান বইল্যা অচ্ছুৎ কইরব? কী? না, কংগ্রেসের বাইরে মুসলমান নাই।'

'সারা দেশে তো তাই প্রমাণ হল। মুসলমানরা তো কংগ্রেসকেই চায়—এতগুলো প্রদেশে কংগ্রেস সরকার—'

'অ্যাহনো হয় নাই। কংগ্রেসের সুবুদ্ধি হইলে হব। সেইডাই তো আরো কারণ দাদা, সারা দ্যাশে মুসলমানরা যদি কংগ্রেসরেই চায়, এই বাংলা প্রভিন্সেও তো কংগ্রেসই সবার থিক্যা বেশি জিতল, তাইলে কংগ্রেসের মধ্যে লিগ ছাড়া মুসলমানগর অ্যাড্ডা জায়গা রাখি। সে-জায়গা খালি না রাইখলে তো ফজলুল হক লিগের কাছেই যাবে। তপশিলি শুদ্দুরদের যদি জায়গা খালি না রাখে, বইসব্যার আসন না দ্যাও, তাহাইলে তো তপশিলিরাও লিগের ঘরে যাবে। অ্যাহন, আপনার হাতে কাগজ ঝুল্যাইয়া ঘুরবার কয় কংস রাজার আদেশ যে-সরকার অ্যাহনো রা কাড়ে নাই, তারে নুন চাপা দিয়্যা মার। দাদা, আপনি তো কংগ্রেসে, আপনি কেন অগ বুঝান না?'

'ওদের বোঝাবার আগে তো নিজেকে বুঝতে হবে। আগে পরিষ্কার জানা ছিল যে হিন্দু সমাজে আমরা ছোট জাত বলে দুঃখকষ্ট পাই, অপমান পাই। সবই সত্যি। কিন্তু হিন্দুর ভিতরেই আমরা আছি। এখন শুনছি—গান্ধীজি একা সেই পুরনো কথাতেই আছেন যে হরিজনদের আলাদা করে ধরলে হিন্দুদের সর্বনাশ, হিন্দুদের অস্পৃশ্যতা, নিষেধ, প্রায়শ্চিত্ত এই সব কু-আচার ছাড়তে হবে। কিন্তু কংগ্রেসের অন্য অনেক নেতা তো সেই আগের মতই ঘৃণা করে বলছেন, শুদ্দুররা কী করে শিডিউল-জাত হয়?'

'দাদা, অ্যাডডা কথা জিগাই। আমরা শুদ্দুররা কী জাইত, সেডা ঠিক করার মালিক কেমন কইর‍্যা শাহেব হয়, বা গান্ধী হয়, বা ফুরফুরার পির হয়। আমরা কী জাইত, তা তো আমরা ঠিক করব। নাকী?'

'সেটা কী করে হবে? জাত মানে তো সমাজ। সমাজ যদি আপনাকে স্বীকার না করে, তাহলে আপনি যা হতে চাইছেন, তা হবে কী করে? পৈতে পড়লেও তো আমাদের বাপঠাকুরদা, বামুন দূরের কথা, কায়েতও হতে পারেনি।'

'আপনার কথার খানিকডা ঠিক। পুরাটা না। সেনসাসে যে জাত জিগায় স্যায় তো আমারে জিগায় নাকী সমাজের কাছে জিগায় যে যোগেনের জাতডা কী?'

'হ্যাঁ। কিন্তু ব্যবহারে তো লোকে সেনসাস দেখে বলবে না—না, ও বলেছে ও বামুন, বসার

চেয়ার দে।'

'আচ্ছা দাদা, মনুসংহিতায় তো চেয়ার থাহার কথা না। বড়জোর আসন থাইকব্যার পারে। তাহাইলে বামুনরা এই বিধান কোথ্থিক্যা পাইল যে শুদ্দুর গ চেয়ার দিবি না। বড়জোর কইতে পারে—আসন দিবি না। যাই হোক, আমি আপনার ঐ কাগজে সই দিব না।'

'সে না-হয় না দিলেন যদিও আপনার সই দেখলে আরো কটা সই হয়ত পাওয়া যেত। আপনি কি এর সঙ্গে কংগ্রেস আছে বলেই সই দিলেন না?'

'অনেকডা তাই—ভোটের আগে থিক্যাই কংগ্রেসের ভাবসাব পরিষ্কার না। হকশাহেবেরও না। নাইলে কংগ্রেসের সঙ্গে ভোট কইর‍্যা লিগের সঙ্গে সরকার করা যায়? কংগ্রেস সরকার চায় না। ক্যান? এডা কে না বুঝে, সরকার হইলে মুসলমান-তপশিলের সরকার হব। ভোটের পরও হকশাহেবের কাছে দেয়া কথা কংগ্রেস মানে নাই। অ্যাহন আপনারে দরখাস্ত ধরাইয়া দিছে। আমি এই সরকারডা থাউক চাই যদিও আমরা বিরোধীপক্ষেই বসব।'

'সে, আপনি চাইতেই পারেন। তাহলে তো আপনাকে সরকারিপক্ষে বসতে হয়, আমাদের পক্ষে, মানে বিরোধীপক্ষে বসছেন কেন। বিরোধীপক্ষ মানে তো, আপনি এই সরকার চান না।'

'এই সরকার কি চাওয়া যায়, দাদা? এই সরকার তো আহশান মঞ্জিলের দরবার। এগো কি লাজলজ্জাও নাই দাদা? যে-হকশাহেবের কাছে তোর মান-ইজ্জত-বংশের নাম খোয়াইলি, সেই হকশাহেবের দয়ায় আবার এমএলএ হইয়্যা তারই আশ্রয়ে মন্ত্রী হলি? পাঁচজন নাকী হিন্দু? তাও আবার আমাগো সমাজের—প্রসন্নদেব রাজা, শ্রীশ নন্দী রাজা আর মল্লিকমশায়। সামসুদ্দিন থাইকলে তাও এড্ডু ভরসা থাইক্‌ত। তারে ফেলাইয়া ঢুইকল মুশারফ নবাব। এমন মন্ত্রিসভা যেহানে প্রধানমন্ত্রীই মাইনরিটি—এই সরকার কি এড্ডা চাওয়ার মতন সরকার, দাদা? ভিক্ষার চালের কাঁড়া-আকাঁড়া নাই ঠিহই কিন্তু বালি আর চালের তো প্রভেদ আছে—'

'আপনি তাহলে কেনই-বা এই প্রস্তাবে সই করবেন না আর কেনই-বা এই সরকারকে সমর্থন দেবেন। নিজের বোঝার খেলাপ নিজেই করবেন?'

'তা ক্যান করব। আমরা তো বিরোধীপক্ষে এই সব কথা সভায় তুলব তো বটেই। কিন্তু আপনাগো পার্টির সঙ্গে তো যাওয়া যায় না—এত কথাখেলাপি পার্টি? আপনারা হকশাহেবরে সমর্থন দিলে কাণ্ডডা কী হইত, ভাবছেন কি? আমি চাই একডা সরকার হৌক। আর আপনারা চান—হাটখান ভাইঙ্গ্যা দেমা। লুইট্যাপুইট্যা খাই। আর আমার কেমন সন্দ দাদা—আপনিও আপনার পার্টির সব কথা জানেন না।'

'সে আর কী করে জানব? নেতারা জানালে তো জানব। গান্ধীজির ডাকে আন্দোলন করে জেল খেটেছি মাস-ছয়। আমার পক্ষে কংগ্রেস ছাড়া কি সম্ভব? সম্ভব না। তবে আমি, মণ্ডলমশায়, পথেঘাটে সদরেবাজারে কাজ করতেই ভালবাসি।'

শরৎ বোস তাঁর চেয়ার থেকে বেরিয়ে এসে এদিকওদিক তাকিয়ে কাউকে খুঁজছিলেন। আবুল হাসিমকে দেখে তিনি তাঁর দিকে এগিয়ে আসেন।

হাসিমশাহেব উঠে দাঁড়ান। যারা চেঁচামেচি করছিল, তাদের ভিতর একটা নতুন গলা শোনা গেল। তার গলা ও বলায় এমন ভাব ছিল যে সবাইই তাকায়, শরৎবাবুও। সে তখন বলছিল, 'আমাদের হিন্দুভাইদের সাধারণ ভদ্রতাবোধ পর্যন্ত মুসলমানদের বিষয়ে লোপ পেয়েছে। একজন শাহেবকে গির্জা থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে তাঁরা কি তাকে জিজ্ঞাসা করবেন—আপনি এখানে কেন গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা একজন মুসলমানকে বলতে পারেন—তোমার নমাজ পড়ার জন্য

আমি কেন তোমাকে ছুটি দেব?'

হাসিমশাহেব জিজ্ঞাসা করেন, 'এ-সবই কি আজ সারাদিন চলবে নাকী?'

শরৎ বোস বললেন, 'সরি, মিস্টার হাসিম। আপনার সঙ্গে আমি একমত ছিলাম। কিন্তু আমাদের পার্টি সমবেত আত্মহত্যার শপথ নিয়েছে। তাঁরা রাজি নন'।

'কারণটা কী? এটা তে কমনসেন্সের ব্যাপার—'

'কারণটা-ঐ যে ঐ ছেলেটি বলছে! আমাদের নেতারাও ঐ যুক্তিই দিচ্ছেন। বলছেন, এর ফলে আমরা আমাদের হিন্দু ভোটার লুজ করব কিন্তু মুসলিম ভোটাররা আমাদের এই কাজের কোনো স্বীকৃতি দেবে কী না সেটাও জানি না। ওঁরা কেউ-কেউ অবিশ্যি বললেন কোনো শাহেবকে স্পিকার করলে নাকী আমরা সাপোর্ট দিতে পারি। সেটা তো একেবারে নতুন প্রস্তাব।'

'ভোট আর রাজনীতি এক করে দেখছে—কংগ্রেস? আপনাদের বায়ান্ন বছরের পার্টি তো ভোট করছে এই প্রথম।'

'থ্যাঙ্ক ইউ ফর এ গুড সাজেশন', শরৎ বোস ঘুরে নিজের চেয়ারের দিকে চলে গেলেন।

স্পিকারের চেয়ারের পাশে দাঁড়ানো সেই শাহেব হঠাৎ জোরগলায় বলে উঠলেন, 'অনারেবল মেম্বারস ইউ আর গোয়িং টু ইলেক্ট এ স্পিকার অ্যান্ড হিজ ডেপুটি। নমিনেশন প্লিইজ।'

যোগেন আইনসভায় রপ্ত হচ্ছে

৫০

অ্যাসেমব্লির সেশন-এর এই চার-পাঁচ মাস জুড়ে যোগেনের কাজকর্ম যে খুব একটা বদলে দিয়েছে, তা নয়। বেশিরভাগ দিনই তো আফটার লাঞ্চ, তার ওপর শনি, রবি ও অন্যান্য সরকারি ছুটির দিন অ্যাসেমব্লি বসে না। তাছাড়াও, হিন্দুদের পুজোপরবে আগে সরকারি যত ছুটি ছিল, মুসলমানদের পুজোপরবে তত ছুটি ছিল না। এখন আইনসভা হিন্দুপরবের সমানসংখ্যক দিন মুসলমানিপরবের জন্যও ছুটির সিদ্ধান্ত দিয়েছে। এটা সরকারি ছুটিতে এখনো পরিণত হয়নি ; লাটশাহেবের আপত্তিতে। কিন্তু আইনসভা এই ছুটি নিতে শুরু করেছে।

হিশেব কষলে তো দেখা যাবে, যোগেন এত আরামে এত কম কাজ করেনি কোনোদিন। ছাত্রজীবনের কথা না-ধরলেও প্র্যাকটিশের জীবনেও তো রাত জেগে নথি দেখা আর আইনের বই পড়া আর দশটা বাজতে-না-বাজতেই দুটো মুখে দিয়েই কোর্টে হাজিরা দেয়—কী কলকাতায়, কী বরিশালে। যোগেন হাড়ে মজ্জায় জানত, উকিল বলে যদি জজকোর্টে বা স্মল কজেস কোর্টে খাতির না পায়, তাহলে কোনো খাতিরই আর খাতির থাকবে না। অ্যাসেমব্লির মেম্বার হলেই তো আর ওকালতির খাতির হয় না! হিন্দু উচ্চবর্ণের মেম্বারকে নিজের ক্ষমতা জাহির করতে হয় না—তাদের বাপঠাকুরদার নাম আর জমিদারির হদিশই তাদের ক্ষমতা তৈরি করে দেয়। মুসলমানদের বেলাতেও আশরফ বা জমিদারকে বা ব্যবসায়ীকে তার ক্ষমতার প্রমাণ দিতে হয় না। নাকী ঠিকানা, কোন্ বংশে জন্ম, ব্যাবসা কী তা থেকেই তাদের ক্ষমতা পূর্ব-প্রমাণিত। আর, কিছু মানুষ তো আছেনই, যাঁরা জ্ঞানীগুণী বলেই পরিচিত।

ঝামেলা যত মুসলিম লিগ আর কৃষক-প্রজার নতুন সব মেম্বারদের নিয়ে আর তাদের মত শিডিউল কাস্ট মেম্বারদের নিয়ে। তাঁদের মধ্যেও বিরাট বাধা, রসিক কাকার মত নামডাকের মানুষ আছেন, হাশিমশাহেব-হাসানআলির মত মান্যগণ্য মানুষও আছেন। কিন্তু এই মাস পাঁচ-ছয়েই যোগেন টের পেয়ে গেছে—মুসলমান আর শিডিউল কাস্ট মেম্বারদের সম্পর্কে সবাই মনে করে যে এদের একমাত্র উদ্দেশ্য কোটায় চাকরি পাওয়া আর চাকরির কোটা বাড়ানো। স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারকাছ দিয়েও নেই। সবাই মনে করে, মানে, হিন্দুরাই বটে কিন্তু বড়লোক মুসলমানরাও ওরকম ভাবে। বাংলার রাজনীতিতে বিধান রায়ের সঙ্গে স্যার আবদুর রহিমের এক বাদানুবাদ লোককথা হয়ে গেছে। এক বৈঠকে বিধান রায় বলেছিলেন, 'মুসলমানদের তো ঐ এক কথা—দেশের জন্য কিছু করব না কিন্তু চাকরির ভাগ দাও।' স্যার আবদুর রহিম সঙ্গে-সঙ্গে বলে ওঠেন, 'তাহলে হিন্দুদেরও তো এককথা—চাকরির ভাগ দেব না কিন্তু দেশোদ্ধারে এসো। হিন্দুদের লড়াই তো একটা ফ্রন্টে—ব্রিটিশরাজের সঙ্গে। আর মুসলমানদের লড়াই তিন ফ্রন্টে—সামনে ব্রিটিশ, ডাইনে হিন্দুরা আর বাঁয়ে মোল্লারা।' এই ক-মাসে এই গল্পটা যোগেনের মনে ফিরে ফিরে এসেছে—তাইলে আমাগ, চাঁড়ালগ, শিডিউল, কয়ডা লড়াই? সামনে শাহেব। ডাইনে হিন্দু। আর বাঁয়ে মোল্লা? তাইলে মুসলমান আর চাঁড়ালগ লড়াই তো একডাই দাঁড়ায়।

কিন্তু কথাটা সে কোথাও বলে না। এমন কথা বলার দিনক্ষণ আছে, স্যার আবদুর রহিমের মত নেতা না-হলে এ-কথা বলা যায় না। নেতাহলেও বলা যায় না, যদি কথাটা বলার মত আসন না পাওয়া যায়। আসন পেলেও বলা যায় না, যদি এ-কথা বলার সময়টায় পৌঁছুনো না-যায়। যোগেন তো নেহাতই এক ইনডিপেনডেন্ট শিডিউল কাস্ট অ্যাসেমব্লি পার্টির সেক্রেটারি। সেটা তো আইনসভার ভিতরে একটা ভোটের পার্টি। ধরে নেয়া হয় যে বাইরেও পার্টিটা আছে, না-হলে ভিতরে ঢুকল কী করে? কিন্তু সেটা তো সত্যি না। নমশূদ্রদের অত বড় নেতা বিরাট মণ্ডল তো প্রজাপার্টির হুইপ। মুকুন্দ মল্লিক তো মন্ত্রী। এই মন্ত্রিসভার মন্ত্রী—যাকে মুসলিম লিগের সরকারই বলা হয়। অথচ সে তো মুসলমানদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের আন্দোলমেরও নেতাগিরি করে। রসিক কাকা তো কংগ্রেসে। পিআর ঠাকুর জিতল কিন্তু তার ভাই তো হারল কংগ্রেসের কাছে। যে জিতল সে নমশূদ্র না। মোহিনীমোহন দাশের মত বড় নমশূদ্র নেতা কংগ্রেসে। যজ্ঞেশ্বর মণ্ডলও কংগ্রেসে। আবার এরা যে নমশূদ্রদের জাতি-আন্দোলনে থাকে না, তাও না। এরা হিন্দু নমশূদ্র—শুধু নমশূদ্র না। শুধু নমশূদ্রটা কী? যোগেন জানে?

এই পাঁচ-ছ মাসে যোগেনের কলকাতার কাজ ঠিকঠাক হওয়ার সুবাদে প্যারী সরকারের বাড়ির ধরণ-ধারণ বদলে গেছে। বদলটা যে কেউ ইচ্ছে করে ঘটিয়েছে তা নয় বা কারো নজরে পড়েছে তাও নয়। ডাক্তারের বাড়ির লোক বলতে তো তারা স্বামী-স্ত্রী আর দুই ছেলে। কিন্তু তারা তো কলকাতায় এই বাড়িকরার সঙ্গে-সঙ্গে তাদের গ্রামের সমাজের জীবন থেকে নিজেদের আলাদা করতে চায়নি। তাদের সমাজে মানুষের বাড়িঘর যেন পুষ্করনির মত—শুকনো ডোবা এক রাতের বৃষ্টিতে বা বরিশালের একটা বড় জোয়ারের ধাক্কায় কচুরিপানা, গাছগাছড়া, ছোট-ছোট মাছ নিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়ায় তেরাত্তিরের কুটুমের মত, তারপর, কুটুমের মতই ঘরেও ঢুকতে চায়। তাদের সমাজে বাড়ির মানুষের মাথা গনা হয় না। ডাক্তারের বাড়িতেও তাই। ইটকাঠের দোতলা বাড়ি হলেও, মানুষের কাজে সে-বাড়ির ওসার-বহর বাড়তেই থাকে।

সকালে এখন যোগেনের কাছে একটা ভিড় হয় আর ডাক্তারের রোগীর ভিড় তো আছেই। যোগেন এ-পাড়ার চেনা মুখ। সেই চেনা মুখের মানুষটা এমএলএ হয়েছে, তাতে পাড়ার লোকের

বুক ফুলবে না? যে-লোকটাকে রাতেদিনে কলেজে পড়তে আর নানারকম কামাইয়ের কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখেছে, সেই লোকটার নাম ও কথা যদি মাঝে-মাঝে খবরের কাগজে পড়তে হয়, তাহলে, তার সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ও তো বাড়াতে হয়। কারো-কারো একটু-আধটু কাজও থাকে—বাজারের কোনো একটা জলের কল ভেঙে আছে, বা গলিতে একটা গ্যাসের আলো দরকার, বা, কলাবাগানের পুব বস্তিতে কারা আইন জারি করেছে যে মুসলমানের ছাড়া ঘরের দখল মুসলমান ছাড়া পাবে না। যোগেন স্থানীয় কাউন্সিলারকে জানিয়ে দেয়।

এই ভিড়টা ওপরে এসেই কথা বলে যোগেনের সঙ্গে কিন্তু মাঝেমধ্যে বিশিষ্ট লোকজনও এসে পড়ে। তখন তারা প্রথমে বসে ডাক্তারের ভগন্দরের রোগীদের সঙ্গে। ওপরে ডেকে নিয়ে গেলেও সেখানে একটা ভাঙা চেয়ারও নেই।

রাত নটা-সাড়ে নটা নাগাদ শুরু হয় উদ্‌দুর-খুদ্‌দুরের ছোটাছুটি। ট্রামের আওয়াজ হল কী না-হল অমনি ছুটে জানলায় গিয়ে দেখবে যোগেন ফিরল কী না। আর, মাঝেমধ্যেই কাল ফোনটা ধরে কানে না-লাগিয়েই 'হ্যালো' বলে রেখে দেয়া।

এমএলএ-র সম্পত্তি এই ফোন। যদি একবার ক্রি-ই-ই-ই-ং বাজতে শুরু করে, যেখানেই থাক, উদ্‌দুর-খুদ্‌দুর ঝাঁপিয়ে এসে ধরেই 'হ্যা লো।' যোগেন বলেছিল প্যারী সরকারকে, 'তোমার রোগীদের কারো-কারোকে তো দিবার পার ডাক্তার, ফোনের নম্বরডা, তাহাইলে একডা কথা জিগ্যাইবার লগে তাগো দশডা মাইল ঠেঙাবার লাগে না।' প্যারী সরকার বলে ওঠে, 'রাহো তো, নিজের মাগ্‌গ দেইখব্যার পারে না তো ফোনের মাগ্‌গ চিনব?'

উদ্‌দুর-খুদ্‌দুরের আর-এক সম্পত্তি যোগেনের চামড়ার ব্যাগটা—হ্যানডেল-দেয়া, বরিশাল থেকে নিয়ে এসেছে ওকালতির ব্যাগটা। বাড়ি থেকে যখন বেরয় তখনই তো ভর্তি। যখন ফেরে তখন এত ভর্তি যে বকলেশ খুলে যায়। যোগেন এলেই সিঁড়ির মাঝখান থেকে উদ্‌দুর-খুদ্‌দুর ব্যাগটা টেনে নিয়ে মাথায় করে ওপরে আনে। তার পর ব্যাগের ভিতর থেকে খবরের কাগজগুলো বের করে মেঝেতে ছড়িয়ে বসে চিৎকার করে পড়তে শুরু করে। এটা যোগেনই ওদের অভ্যাস করিয়েছে। 'উদ্‌দুর-খুদ্‌দুর চিল্লায়্যা পড়ুক।'

আর খবরের কাগজের কথা বাদ দিলেও, আইনসভার কাগজের চাপেই তো শ্বাস কষ্ট হওয়ার কথা। এত কাগজ পড়ে কে? আর যদি পড়তে পারতও তাহলেও-বা বুঝবে ক-জন? যা ওকালতির প্যাঁচ। একটা পাতাজোড়া সেনটেন্সই শেষ হয় না।

সারাদিনের সব খবরের কাগজ নিয়ে যোগেন বাড়ি ফেরে। সব তার পড়া। কোনো-কোনো লেখা বা খবরের ওপর মোটা লাল পেন্সিলের লম্বা টিক দেয়া। উদ্দুর লেখাগুলি কাটে আর একটা লম্বা খাতায় সাঁটে। খুদ্‌দুরের তো সব কিছুতে দাদার সঙ্গে হিংসে। সে বলেছিল, 'দাদাই যদি কাটে আর দাদাই যদি সাঁটে, তাহলে সে কী করবে?' যোগেন তখন এই সমাধান করেছিল—দাগাবে যোগেন, কাটবে উদ্‌দুর আর সাঁটবে খুদ্‌দুর। সাঁটবে আর উদ্‌দুর তার নীচে কাগজের নাম-তারিখ-বার লিখে রাখবে।' খুদ্‌দুর তাও খুশি হয়নি—'দাদার একটা কাজ বেশি কেন?' যোগে তখন তাকে নিরস্ত করতে বলেছিল, 'আমার কথা শ্যাষ হওয়ার আগেই যদি তোমার কাজ গনা শ্যাষ হয়, তাইলে তোমার একডা কাজ কম থাকাই ভাল। শোনো, দাদা ঐ নাম-তারিখ লেখার পর তোমাকে ঐ তাড়া-তাড়া কাগজ গুইছ্যা রাইখতে হবে। আমি যখন কব—ঐ তারিখের ঐ লেখাটা দে, তোমারেই তহন খুঁইজ্যা দিবার লাগব। আর যদি তারিখ না মনে থাকে আমার, তাইলে বিষয়ড্যা কইল্যাম আর তুমি সেই বিষয়ডা নিয়্যা যত কাগজে যত লেখা বারাইছে সব আম্যারে দিলে। হইল তো তোমার এক গণ্ডা কাজ?'

রাত্রির এই সময়টা ওদের বাড়ির একেবারে নিজস্ব। উদ্দুর-খুদ্দুর্ চেঁচিয়ে কাগজ পড়ে, কখনো যোগেন কিছু বলে, কখনো ডাক্তার কিছু মন্তব্য করে। কখনো উদ্দুর-খুদ্দুরের মা কোনো খবর শুনে কোনো গল্প বলে। এই রাতের আড্ডাই ডাক্তারবাড়িতে যোগেনের অবদান।

জুলাইয়ে আইনসভার শেষ অধিবেশনের পর সেদিন রাতে যোগেন কাগজপত্র গোছাচ্ছিল। কাল সে বরিশাল যাবে। কিছু কাগজ সঙ্গে নিতে চায়—বরিশালে এই খবর বা মতামত তো রোজ পৌঁছয় না।

উদ্দুর জোরে জোরে পড়ছিল, 'আইনসভাতে এমন এক প্রস্তাব উঠিয়াছে যাহার কোনো অর্থোদ্ধার করা আমাদিগের পক্ষে সম্ভব নয়। সেই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, বিভিন্ন স্থান ও সূত্র হইতে এমন সংবাদ আসায় আইনসভা নিরুদ্বেগ থাকিতে পারিতেছে না 'নিরুদ্বেগ মানে কী মামা?'

'যার দুশ্চিন্তা নাই।'

'তাহলে আইনসভার দুশ্চিন্তা নাই?'

'না। উলটা। তাহলে আইনসভার দুশ্চিন্তা না হয়ে কি পারে?'

খুদ্দুর বলে ওঠে, 'তুই কোনো মানে বুঝিস না কেন রে দাদা? সকাল দশটা বাজলে কি তুই স্কুলে না গিয়ে পারিস?'

খুদ্দুরের মা, মামা, বাবা—সকলে হাততালি দিয়ে ওঠে, খুদ্দুরের মা আহ্লাদ করে বলে ওঠে, 'ওরে আমার তর্কপঞ্চানন—।'

'যে জমিদারের কাছারিতে খাজনা জমা করা ও অন্যান্য বিবিধকর্মে প্রজাগণকে প্রতিদিনই যাইতে হয় কিন্তু কাছারিতে নিম্নবর্ণের জল-অচল হিন্দু ও মুসলমান প্রজাগণকে বসিতে দেয়া হয় না, এমনকী তাহারা যদি দাওয়ায় বা মাটিতে বসিতে যায়, তাহাতেও নিষেধ করা হয়। এমন সন্দেহ করিবার উপযুক্ত কারণ আছে যে উচ্চবর্ণের হিন্দু-জমিদারগণ বর্ণভেদ প্রথা অনুসরণ করিতেছেন। কারণ, বর্ণহিন্দু প্রজাগণকে এই নিষেধ করা হয় না, বরং সেরেস্তার শতরঞ্চে অতিশয় দরিদ্র ও অবিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণকে বসিতে দেয়ার ব্যবস্থা আছে। সুতরাং আইনসভা কিছু জমিদার মহাশয়দিগকে জানাইতেছে যে এই অব্যবস্থার পরিবর্তন আশু প্রয়োজন। প্রধান প্রজাদিগের বসিবার জন্য একটি বাঁশের মাচা কাছারিতে রাখিতে হইবে। তাহা হইতে নিম্নোচ্চ আর-একটি মাচা অপ্রধান প্রজাদিগের জন্য রাখিতে হইবে।

'আইনসভার এই প্রস্তাব সম্পর্কে আমাদের অভিমত এই যে জমিদারের কাছারি কোনো সওদাগরি বা সরকারি কর্মশালার সঙ্গে আদৌ তুলনীয় নয়। ঐতিহাসিকভাবে জমিদার কাছারি জমিদারভবনের অংশ ও সেই ভবন যে-গ্রামে অবস্থিত তাহার সামাজিক কেন্দ্র। অনেক ব্যক্তি কোনো কাজ ছাড়াই জমিদারের কাছারিতে যায়। অনেক সময় সারাদিনই সেইখানে বসিয়া থাকে। যেহেতু বর্ণভাগ হিন্দুশাস্ত্র নির্ধারিত ও ইংরাজের আইনেও নিষিদ্ধ নয় সুতরাং হিন্দু নিম্নবর্ণের সহিত শাস্ত্রীয় ব্যবহারই করা হইয়া থাকে। সাম্প্রদায়িক বিধান প্রয়োগ করিয়া হিন্দুসমাজের উপসম্প্রদায়গুলিকে নতুন একটি সম্প্রদায়, যাহা তপশিলি জাতি বলিয়া কথিত, বলিয়া বিধিবদ্ধ করিয়া এখন বর্ণহিন্দু সমাজের শাস্ত্রীয় রীতিবিধি ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

'এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন স্বতন্ত্র নমশূদ্র এমএলএ শ্রী যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ও সমর্থন করিয়াছিলেন কলিকাতার নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সদস্য শ্রীমতী মীরা দত্তগুপ্ত।

'মুসলিম লিগ কর্তৃক পরিচালিত একটি আইন সভায় নমশূদ্র সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত এই প্রস্তাব বঙ্গপ্রদেশে সাম্প্রদায়িকতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গৃহীত হইয়াছে। আমাদের দুঃখ কংগ্রেসের

এক নেত্রী এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা অধিকতর দুঃখ এই যে আইনসভা সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। ইহা অপেক্ষাও অধিকতম শোকের কারণ এই যে আইনসভায় ১৪/১৫ জন ব্রাহ্মণ থাকা সত্ত্বেও এই প্রস্তাবের কোনো বিরোধিতা তাঁহারা করেন নাই।'

'এইডা কী করছ ভাই? যারে বসাইব্যার লগে মাচা বাইন্ধাছ স্যায়রা বইসবে ঐ মাচায়?' ডাক্তারের স্ত্রী বলে, 'এইগুলা হইছে তোমাগ পায়ে পা দিয়্যা ঝগড়া—'

'বসব না ক্যা? প্রথমে লজ্জা হইব, তারপরে বইসব। বইসব', ডাক্তার বলে।

'বসার কি সত্যি নিষেধ আছে ভাই?'

'সিদ্ধ না নিষিদ্ধ সেডা জাইনব্যা কী কইর‍্যা বুন। নোয়াখালির অফিসার এক রিপোর্ট দিছেন। সেইডা হোম মিনিস্টার নাজিমুদ্দিন হাউসে প্লেস কইরল। ইচ্ছা কইর‍্যাই করছে। নোয়াখালিতে তো হিন্দু জমিদার কম, যা আছে তাও কাঁচকলাখাওয়া। সে-জমিদারের কাছারি বইল্যা কিছু আছে কী না তাও জানা নাই। আইন-মোতাবেক মধ্যস্বত্বভোগী। পত্নিদারের কাছে জমির বন্দবস্ত পতনি দিয়া অন্নে সংসার চালায়। জমিদার হইলেও তো বামুন। আর বামুনের তো ভিক্ষার অন্নে আপত্তি নাই। তেমনি কোনো-এক জমিদারের সেরেস্তায় বইস্যা ছিল—বামুন— জমিদারের বৌয়ের এক ভাইয়ের বেটা। জমিদারনি পিসির জমিদারি দেইখতে। একদিন সকালে এক বড় মুসলমান পাত্নিদার কাছারি ঘরে ঢুইক্যা এক টিনের চেয়ারে বইস্যা কইছে, 'আছে কেডা, ঠাকুরবেটা? ডাহো এডড়ু'। সেই ভাইয়ের-বেটা পত্নিদারকে ধমকাইয়া উঠে—তুমি চেয়ারে বইল্যা কেন? উঠো। পত্নিদার আসলে ঐ জমিদারের যারে কয় অন্নদাতা, তার এমন অনেক জমিদারি-অংশ পত্নি নেয়া আছে। অর টাহাতেই ঐ বামুন জমিদারের ভাত জোটে। তাও, সভায় হয়তো চেয়ারে বইসত না। ঘর খালি দেইখ্যা বইসছে। সেই ভাইয়ের-বেটা ঐ টিনের চেহারডা নিয়া বাইরে যায়। পত্নিদারও যায়। সেই ভায়ের বেটা সামনের পুকুরে চেয়ারডা ফেইল্যা নিজেও জলে নাইম্যা তিন ডুব দিয়্যা, চেয়ারডারেও তিন ডুব খাওয়াইয়া উইঠ্যা আসে। পত্নিদার হাইস্যা খুন—'দেহো, ঠাকুর বেটার কাম!' তারপর সে চইল্যাও যায়। এর পরে কী ঘটেছিল তা রিপোর্টে নাই। হবার পারে ঐ পত্নিদারের মনের অপমান কাঠগুঁড়ার আগুনের নাগাল দপ্ধাইছে। হবার পারে পত্নিদার মজা কইর‍্যা কাউরে কইছে। সে যাই হোক, সন্ধ্যার আগে মুসলমান কৃষকদের এক বিরাট দল মশাল জ্বালাইয়া, হাতে বর্শা নিয়্যা, কাছের এক গঞ্জে চড়াও হইয়্যা বাইছ্যা-বাইছ্যা হিন্দু মহাজনগো দুকান আর গুদাম পুড়াইয়্যা ছাই কইর‍্যা দ্যায় কিন্তু কারো গায়ে হাত দেয় নাই। এই রিপোর্ট হাউসে প্লেস কইর‍্যা একডা লাইনে মিনিস্টার্ কইল—এডাতেই পরিষ্কার হিন্দুরা কত তুচ্ছ কারণে মুসলমানদের অপমান করে একটা দাঙ্গা পরিস্থিতি পাকাইয়্যা তুলে। নাজিমুদ্দিন হয়তো ঐডুকই চাইছিল। আমি খাড়াইয়্যা এই প্রস্তাব কইল্যাম—থাউক রেকর্ড। মীরাদিদি উইঠ্যা সমর্থন দিলেন। এড্ডা কথাও আর-কেউ তোলে নাই।'

'ভাই, এইডা তোমার যোগ্য কাম হয় নাই।'

'কী যে কও উদ্দুরের মা, অযোগ্য কাম হইলে ঐ সভার অতগুলো মেম্বার চুপ কইর‍্যা মণ্ডলের প্রস্তাব মাইন্যা নিল?'

'শোনো, কথাডা উইঠলে না মাইন্যা কী উপায়? কিন্তু কথাডা তো লজ্জার। লজ্জার কথা দুই কান হইলেও লজ্জা বাড়ে। কমে না।'

'বুন, এই সব মিটিঙে কিছু কথা কইব্যার লাগে—প্রমাণ রাইখতে। তাই কওয়া। দেখ,

না-কইলে মীরাদিদির মতন বিদ্বান পণ্ডিত তো খাড়াইতেন না। না কইলে তো পুরা মিটিং চুপ মাইর‍্যা যাইত না?'

খুদ্দুর তখন দাদার মত করে একটি কাগজ চোখের সামনে মেলে কচি গলায় তারস্বরে পড়তে শুরু করেছে—

'এত ঢক্কা—'

'মামা, ঢক্কা কী?'

'তারপরে কী আছে?'

'নিনাদ। নিনাদ কী?'

'দুইডা মিল্যা ঢাকের বাজনা।'

'এত ঢক্কানিনাদের পর বাংলার মাননীয় গভর্নরশাহেব ফজলুল হককে নৈবেদ্যের কাঁচা কলা করিয়া যে-মন্ত্রিসভা বাঙালিকে উপহার দিলেন, তাহা এক প্রকারের গজকচ্ছপ—'

'মামা, গজকচ্ছপ কী?'

'খানিকটা হাতি আর খানিকটা কাউঠা মিশাইয়া যে-জন্তু বানানো হয়—'

'সানানো? না, সত্যিকারের?'

'বানানো—'

'মাটির? যেমন গণেশের ইঁদুর?'

'ইঁদুরডা যে বানায় সেডা তো সত্যিকারেরই। তফাত সত্যিকারের ইঁদুর কিন্তু জ্যান্ত, আর বানানো ইঁদুর ইঁদুরেরই মত বটে কিন্তু জ্যান্ত হয় না।'

'তাহলে গজকচ্ছপ সত্যিকারের কার মত?'

'কারো মতই না। হাতি আর কচ্ছপের কি মিল হয়—ভাইব্যা দেখো।'

খুদ্দুরের মনে পড়ে সে হাতি দেখেছে, দুইবার—একবার চিড়িয়াখানায়, আর-একবায় সিংহিবাগানের সার্কাসে। কচ্ছপও একবার দেখেছে বটে কিন্তু মনে করতে পারছে না সেটা জ্যান্ত না ছবি।

যোগেন বলে, 'গজকচ্ছপ তো পুরানা খবর। পুরানা খবর পড়নে কাম কী? নতুন খবরের কি অভাব পইড়ছে?'

'আমি তো তোমার খাতা থেকে পড়ছি।'

'তোমারে পইড়তে কই নাই সোনা। খাতাডা দ্যাশে নিয়্যা যাব, কাইল, তাই নামাইতে কইছি।'

'নিয়ে যাবে, আবার ফেরত আনবে তো?'

এরা তিনজন একসঙ্গে হেসে ওঠে। ডাক্তার বলে, 'বুদ্ধিডা তো পাইকতেছে সুদখোর মহাজনের নাগাল—'

'ভাই, তুই মেম্বার হইছ বইল্যা বুকডা দশ হাত ফুলছিল। অ্যাহন তোমার কথাবার্তা শুইন্যা তো ডরে বুকের মইধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়ে। কেউ ক্যান সবুর ধরে না?'

'আরে, সবুর কইরলে যদি প্যায়রা পাইকত, তালি কি আর সবাই নাবাতি প্যায়রা কামড়াইয়া দাঁত ভাঙত?' প্যারী সরকার নিজেই একটা তালি বাজায়।

'এইডা তো ডাক্তার ঠিকই কইছে। সবাই ভাইব্যার ধইরছে—এই মহোচ্ছবই শ্যাষ মহোচ্ছব। হিন্দু আর মুসলমান দুইই ভাবে—স্যায় যদি মন্ত্রী না হয় তো শাহেবরাই থাউক, দেশ স্বাধীনের দরকার নাই।'

'বামুনগো সতিনের যুদ্ধের নাগাল। সোয়ামিরে আমি যদি না পাই, তো পাইল্যাম না। ভাইবব,

বিধ্‌বা হইছি। কিন্তু সতিন য্যান না পায়। দরকার হইলে সোয়ামির আর ঘরে নটী ঢুকাইব, কিন্তু সতিনে য্যান না পায়। দরকার হইলে সোয়ামির আর—একডা বিয়া দিব, কিন্তু সতিনে য্যান সোয়ামিক না পায়।'

'ভালই কইছ বুন তবে কথাডা ন্যায্য না। বড় সতিনের তো আর বেশি খ্যামতা নাই। স্যায় শুধু পারে এক সতিনের জায়গায় দুই সতিন বানাইতে। বামনির যদি আমাগো সমাজের মাইয়াগোর নাগাল খ্যামতা থাইকত, তাইলে সোয়ামি সতিন আইনলে বৌ—একখান সোয়ামি আনত।'

'এইডা কী কুকথা কও ভাই? এডা কি এড়্ডা ভদ্দর সমাজের কথা?'

'বু-ন, আমরা তো ভদ্দরসমাজ না, আমরা তো শুদ্দুর! আইনসভার দলাদলি সতিনের ঝগড়া না। ক্ষমতার লড়াই। এডডা আড়াই গণ্ডার জমিদারের যদি নজরে পড়ে কোনো শুদ্দুরের মাইয়্যা—তাইলে সেই মাইয়্যাডারে, বাঁচাইব্যার লগে তারে নিয়্যা পুরা একখান বাড়িভরা মানুষ রাতারাতি মেঘনার চরে নিরুদ্দেশ হইয়্যা যায় সারা জীবনের মতন। দ্যাহো নাই বুন?'

বাইরে ট্র্যামের আওয়াজে এ-ঘরটা যে হঠাৎ চুপ হয়ে গেছে—বোঝা যায়।

উদদুর-খুদদুরের মায়ের গলার ভিতর থেকে স্মৃতিময় ও আশঙ্কাময় এক হাহাকার বেরিয়ে আসছিল। সে সেটা গিলে ফেলে রুদ্ধ গলায় ডেকে ওঠে, 'বন্ধু হে, বন্ধু।'

'যোগেনও যেন ঘুমের ঘোরে বলে যায়—'স্যার ফারুকিরে মন্ত্রী কইরব্যা না, আর ফারুকি স্যার বুড়া আঙ্গুলখান চুইষ্যা চুইষ্যা কইড়্যা আঙ্গুল বানাইব?'

'ফারুকি না হাইরল?'

'হাইরল তো আইনসভার ভোটে। কাউন্সিল নাই? কাউন্সিলে তো পার্মানেন্ট মেম্বার? অগ হার নাই। তোমার শ্যামাপ্রসাদ ছাইড়্যা দিবে—তারে মন্ত্রী কর নাই—বাংলার বাঘের সুপুত্তুর? দেইখল্যাম-না সেইদিন? মন্ত্রী হওয়ার দরখাস্ত নিয়্যা নবাব আর মহারাজারা বামুনের শ্রাদ্ধের কাকের মতন সারি দিয়্যা বইস্যা আছে। নিজের কাছেও তো নিজের একডা মান থাহে। মন্ত্রী হইবার লগে এরা চুরি-ডাকাইতি জালাসাক্ষী সব কইরব্যার পারে বিশ্বাস কইরব্যা, আমার নিজের চক্ষুতে দেখা না হইলে আমি কইত্যাম না। তোমাগোই প্রথম আর শ্যাষ বলা। আমি তো ঐ শাহেব—লাটশাহেবের ভিড়ের মইধ্যে চিড়াচ্যাপটা। নড়নচড়নের উপায় নাই। লাটশাহেব এক-এক মন্ত্রীর নাম ডাকে আর হাততালি। আমার য্যান সন্দ হইল, লাটশাহেব য্যান একখান নাম বাদ দিলেন। এক মিনিট আগে-না ঠিক হইল সামসুদ্দিন মন্ত্রী হইব। আমারই মাথার উপর দিয়্যা রাজশাহি ডিভিশনের কমিশনারশাহেব লম্বা হাত বাড়াইয়্যা লাটশাহেবরে একডা কাগজ ধরাইল আর লাটশাহেব সেই কাগজ দেইখ্যা গড়গড়ায়্যা পইড়্যা দিলেন—নবাব মুশারফ হোসেন। এর নাম তো একবারও শুনি নাই লাটশাহেবের ঘরে। হইলডা কী? মিনিটে-মিনিটে মন্ত্রীবদল?'

'তুমি কি ভাইব্‌ল্যা, তোমারই কানের দোষ!'

'ভাইবল্যাম তো. কিন্তু শুইনল্যাম যে—'

'তুমি তো লাটশাহেবের আওয়াজ শুইনল্যা। কইল্যা যে, তোমার মাথার উপুর দিয়্যা লাটশাহেবরে এক কাগজ বাড়াইয়া দিল কুন শাহেব? সেই কাগজে কী লিখা ছিল স্যাড্যা তো তুমি দেহ নাই?'

'দ্যাখব ক্যামনে? স্যায় তো রাজশাই ডিভিশনের কমিশনার। তার হাত তো প্রমাণসাইজের তিনগুণ লম্বা—'

'এ তো একই কথা। কিংবা তুমিই প্রমাণ সাইজের তিনভাগ বাঁইট্যা—বাঁইট্যা হইলে তো

তোমার দুইডা কানই শাহেব গ ঠোঁটের অনেক খান নীচে। মানে, তোমার আর সত্য ঘটনাডা জানার কুনো উপায় নাই। সাইজের দোষ। চোখডাও নীচে। কানডাও নীচে।'

'আমার সাইজ দিয়্যা কি কথাডার কুনো আন্দাজ পাইল্যা ডাক্তার? ঘটনাডা কী হইছিল।'

'ক্যা? এই যে এতগুলা মাস গ্যাল, শোনো নাই কিছু?'

'আরে সেই কথাডাই তো রোজ একটা কইর‍্যা ফেবড়ি বাড়াইব্যার ধইরছে। শুনি—সামসুদ্দিনরে যে মন্ত্রী করা যাবে না সেডা হকশাহেবের জানাতে ছিল। শুনি—কথাডা নাকী হকশায়েবেরই, বুদ্ধিডাও তার। স্যায় নাকি লাটশাহেবরে কইছে—সামসুদ্দিনের মাথা ঠিক নাই, অ আমার পার্টির লোক হইয়্যাও আমারে ফ্যালাইয়া দিবে। শুনি—শাহেব গ—মানে, চেম্বারের শাহেব গ থিক্যাই নাকী কথাটা এতখান। সরকারি-ব্যাসরকারি সব শাহেব নাকী লাটশাহেবকে বলে, নো মুশরফ—নো গবমেন্ট। নতুন একডা মন্ত্রিসভা হইল। কিন্তু শাসকজাত বইল্যা শাহেবরা তো কিছুই পায় নাই। মুশারফও না থাইকলে, আমাগো নর্থ বেঙ্গল টি গার্ডেনস, টাইগার হানটিং, আদার প্লেজার্স—এসবের কী হব? তখন লাটশাহেবই নাকী এই কৌশল করেন।' শাহেব অফিসাররা নাকী লাটশাহেবরে আলটিমেটাম দিছে—তারা হোমে ফিরে যাবে আর হোম থিকে কোনো সার্ভিসে নতুন কেউ আসব না। মুশারফও নাই, ফারুকিও নেই—এ-মন্ত্রিসভা দিয়া হবেটা কী? 'অফিসারদের বিদ্রোহ।'

উদ্‌দুর-খুদ্দুর জোরে-জোরে পড়েই যাচ্ছিল। এদের কানে কিছু আসছিল, কিছু আসছিল না। ওদের একজন যখন থেমে যাচ্ছিল, তখন বরং এদের খেয়াল হচ্ছিল। তেমনি এক বিরতি দিয়ে থেমে উদ্‌দুর জিজ্ঞাসা করে, 'মামা, চৌদ্দ দফা কী?'

'এডার মানে তো বাবা কোথায় কে বলছে, তাই দিয়্যা ঠিক হয়। পড়্ এডডু—'

'চৌদ্দদফার দফারফা। অবশেষে আইনসভার প্রথম দরবার শেষ হইল। মাহিনা দুই শান্তিতে থাকা যাইবে। সেপ্টেম্বর মাসে আবার তলব হইবে. প্রজালিগ মন্ত্রিসভাকে এখন কোয়ালিশন-ভায়োলেশন মন্ত্রিসভা বলিলে কোনো গুনাহ্ নাই। চিরস্থায়ী বন্দবস্ত বা জমিদারি ব্যবস্থা সর্বপ্রথম তুলিয়া দেয়ার জবান দিয়া হকশাহেব ও প্রজাপার্টি কৃষক ও প্রজার যে-ভোট হাত করিয়াছিলেন, সেই কথা নিয়া কোনো সাড়াশব্দ হয় নাই। বরং বৈঠক শেষ হইবার আগে সদস্যদের জানানো হইয়াছে যে আগামী বৈঠকে ১৯২৮ সালে কাউন্সিলে ভূমিস্বত্ত্ব আইনের যে-সংশোধনগুলি হিন্দু জমিদার ও কংগ্রেসের ভোটে হারিয়া গিয়াছিল, সেইগুলি নতুন বিল হইয়া আসিবে। এ বঙ্গদেশে আবওয়াব সেলামি, আদায় ও ভূমিদরের চতুর্থ ভাগের উপর নির্ভর করিয়া যুগযুগান্ত হইতে সমস্ত পৃথিবীর কাছে হিন্দুদের যে-গৌরব প্রচারিত, প্রমাণিত ও স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে সে-গৌরব চিরকালের জন্য অস্তমিত হইবে।'

'এইডা আবার কেডা কয়? প্রথমে তো ঠেকছিল কংগ্রেস—'

'ডাক্তার, গলা শুইন্যা মানুষ বা পার্টি চেনা, শিয়ালের রাও শুইন্যা শিয়াল বাছার থিক্যাও কঠিন হইয়া গিছে। বলো—কুন পার্টি বুক ঠুইক্যা না বলে যে জমিদারি উচ্ছেদ হোক, কৃষকের দুঃখ দূর হোক, বেবাক মানুষ ডাইল ভাতডা খাক। দ্যাহো ডাক্তার, সব পার্টির এক কথা কিন্তু কুনো পার্টি এক না। কংগ্রেসের তো যত মাথা তত দল। লিগের ইস্পাহানি, নাজিমুদ্দিন, সোরাবর্দি তিন দল—এ ওর দিকে পিছন ফিরা নমাজ পড়ে। প্রজাপার্টি যে কয় টুকরা তা গণনের বাইর। অ্যাডডা ইনডিপেনডেন্ট, অ্যাডডা ডিসিডেন্ট, অ্যাডডা মিনিস্ট্রিয়্যাল। আর শিডিউলগর মোট মেম্বার আমারে ধইর‍্যা ৩২ কিন্তু এডডাও পার্টি নাই। মন্ত্রী আছে তিনডা।'

'দেখছ নি কাণ্ড। ভাই, তাইলে আমাগো হকশাহেবেরও কি কুনো পার্টি নাই, তোমাগ যদি

তিনমন্ত্রী থাইক্যাও এড্ডা পার্টি না থাকে।'

'বুন, তুমি কোন্ দেশের কইন্যা?'

'বরিশালের।'

'ডাক্তার কোন্ দেশের মানুষ?'

'বরিশালের।'

'হকশাহেব কোন্ দেশের মানুষ?'

'বরিশালের।'

'কইতে ক্যামন বুকডা ফুইল্যা উঠে না বুন?'

'উইঠব না ভাই। বরিশাল ছাড়া দেশ হয়।'

'আছে কী বরিশালের—?'

'মানুষ আছে, সাগর আছে, পোষা বাঘ আছে, এত খাল যা গুইন্যা শেষ করা যায় না—ভাই, বরিশালের মানুষের অসাধ্য কোনো কাজ আছে দুনিয়ায়?'

'হয়। হকশাহেব অ্যাহন সেই খেলাই দ্যাখাইয়্যা বেবাক মানুষরে আটাশ খাওয়াইছে। চিরডা কাল সব মানুষ শুইন্যা আইসছে দুই নৌকায় পা রাইখতে নাই। হকশাহেব অ্যাহন শিক্ষা দিছেন—মানুষের তো পা দুইডা, দুইডা নৌকা নাইলে দুইপা যুবে কোথায়? তাই হকশাহেব লিগেরও প্রেসিডেন্ট, প্রজাপার্টিরও প্রেসিডেন্ট। দুইডার সিলই হকশাহেবের দুই পকেটে। যহন যেটা দরকার তহন সেই সিল লাগান। গোলমাল পাকাইতে হইলে সিলগুলা অদলবদল কইর‍্যা লাগান। কেউ যদি কয় একডা পার্টি ছাড়েন, সাফ জবাব লিগকে আমি খাজাগজার পার্টি কইরতে দিতে পারি না। একডা, আলাদা পার্টি ছাড়া বাংলার কৃষক-প্রজারে বাঁচাইব ক্যামনে?'

৫১

যোগেন এল বরিশালে

সন্ধ্যা পার করে বরিশাল পৌঁছল যোগেন।

সদর রোড থেকে একটা টমটমে যোগেন তার নিবাসে পৌঁছে যায়। বাড়ির দরজাটা যেন খোলাবন্ধের জন্য বসানো না, লোকে কোথা দিয়ে ঢুকবে—তার ফাঁক। কলকাতার লোকদের বিশ্বাস করানো যায় না যে দরজাটা কপাট দেয়ার জন্য না।

যোগেন তার কাগজভরা ব্যাগটা সেরেস্তা ঘরের চৌকিটার ওপর ছুড়ে দেয়। আর-একটা ব্যাগ, মানুষের রোজকার জিনিশের, যোগেন টেবিলের পায়ার কাছে নামিয়ে রেখে ভিতর-বারান্দায় সিঁড়ির গিয়ে দাঁড়িয়ে একটু উঁচু স্বরেই বলে—'ধর্মশালাটালাতেও তো বানর-হনুমান থাহে, এ তো দেহি জনশূন্য অযোধ্যা, সবাই গিছে রামেরে আগাইতে।'

প্রহ্লাদ দত্তের বাড়ির পুবদিকে একটা চেগার থাকারই কথা, কিন্তু কোনোদিনই ছিল না। একটা তুলসীতলা আছে—সেটাকে সীমানা ধরলেও চলে, ভদ্রাসনের কেন্দ্র ধরলেও চলে। সেই একটু আবছা থেকে প্রহ্লাদ দত্ত বেরিয়ে বলতে-বলতে এগয়, 'তোমারে ছাইড়্যা দিল? খালাস না জামিন? সিপাই-চোকিদাররে বসাইল্যা কোথায়?'

'আইলে তো বসাব! আমরা তো সিপির আন্ডারে, ক্যালকাটা পুলিশ। আর তোমরা তো বিপির আন্ডারে। বেঙ্গল পুলিশ।'

'আইনসভায় তোমার লেকচার শুইন্যা নাহি মেমশাহেবরা চক্ষুভাসান?'

'এতগুলা মেয়েছেলে গুইনল্যা কোথায়। আমি তো চক্ষু মুইদ্যাও পৌনে তিনখানার বেশি মেয়ে মানুষ দেখি নাই। তার উপর একজনের মাথামুণ্ডু ঢাকা বোরখা, আর-একজনের পাও পিছন শেমিজে ঢাকা। গুইনলে তো ছয়ডার বেশি চক্ষু হয় না, ছয় চোক্ষে আর কত জল ধইরবে।'

'কাগজে লিখছে যে ছাপার-তিহারবাজার লুট নিয়া অ্যাত কথা, তোমার কথা—'

'কথার আর দোষ কী—যত ভিজাবা ততই ফুলব। কুথাকার এক চ্যাংড়া বামুন, পত্নিদার মিঁয়ারে চেয়ার থিক্যা তুইলা চেয়ার ধুইছে। ঐ পত্নদারের দেয়া ধানে সে-বাড়ির দুই বেলা খাওয়া জোটে। নাজিমুদ্দিন কথাডা হাউসে ফেইল্যা হিন্দু—জমিদারগ বাপান্ত করার ধইরল। তাঁতে আমার আর আপত্তি কী সেই ফাঁকে কয়্যা দিল্যাম—কাছারিবাড়িতে বসার ব্যবস্থা চাই। আমি ভাবছি এডড়ু কথাবার্তা চেচাঁমেচি হইয়া থাইম্যা যাবে। মীরাদিদি খাড়াইয়া সমর্থন বলায় ঘটনাডা এমন ফুইল্যা-ফাঁইপ্যা উইঠছে।'

'তুমি যে বরিশালে আইসত্যেছ, সে সংবাদ কেউ জানে না। এমন একা-একা?'

'অন্তত তুমি যে জানো না তা বুঝছি। তুমি যদি না-জানো লোকজন জাইনবো কোয়থিক্যা?'

'জানাও নাই ক্যান? কারণ আছে কুনো?'

'নিজে মনস্থির কইরলে তো জানাব তোমারে? সেশন নাই। মাসখানেক ছুটি। দ্যাশে আইসব না?'

'চোরের মত আইসব্যা? অমাবস্যার রাইতে?'

'শোনো। আগৈলঝরার ইশকুলে একডা মিটিং ডাকা আছে, কাইল বাদে পরশু। মনে করছিল্যাম, বরিশালে না-নাইম্যা সিধা যাই মৈস্তারকান্দি। দুইদিন থাইক্যা গোপালগঞ্জ যাব একদিনের লগে। তারপর মিটিং সাইর‍্যা, সদরে আইস্যা বসব। তালে যত্দিন হয় বরিশাল থাকা হবে। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা স্টিমার ঘাটা থিক্যা গৌরনদীর লঞ্চ ধইরতে আর মন সইরল না। তহন ভাইবল্যাম—বরিশাল হইয়্যা না-হয় বাড়ি যাই। অ্যাহন তোমার কাম হইল আগৈলঝরা খবর করা যে আসামি আইস্যা গিছে।'

'যাউক গিয়া, সেইসব হবে নে। আমি তো ভাইব্যার ধরছি—ভালমানুষডাকে কইলকাত্তায় পাঠানটা কি গুখোরি কাম হইল। অ্যাহন তুমি যদি বরিশাল সদরে হাজির রেকর্ড না-কইর‍্যা গৌরনদীতে যাইত্যা, তালি সন্দটা সইত্য হইত—মানুষডার বুদ্ধিনাশ হইছে।'

'তুমি তো কইলক্যাতায় যাও নাই। তালি তোমার এমন বুদ্ধিনাশের কারণডা কী?'

'ক্যা? নাশ হইব ক্যা? আমার বুদ্ধি আমারই আছে।'

'দেইখ্যাশুইন্যা মনে নেয় না। অসময়ে অতিথ। আদর নাই, আপ্যায়ন নাই। আগে জবানবন্দি। আরো, দুনিয়ার সব মানুষরে মক্কেল ভাব কেন। দুইডা-একডা তো ভদ্দরলোকও আইসব্যার পারে।'

'তুমিই তো কপাট আগলাইয়্যা খাড়া থাহো, তালি আপ্যায়নও এমন। চলো, ঘরে গিয়া বসি। প্রহ্লাদ সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসে।'

চেয়ারটা প্রহ্লাদকে ছেড়ে দিয়ে যোগেন চৌকিটাতে বসে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার কি মাতৃদায়, না তালাক খাইছ?'

'মায়ে তো ঐ ঘরে ঝিমায় আর তালাক তো গিছে বাপের বাড়ি—'

'সম্ভাবনা শুভ?'

যোগেনের জিজ্ঞাসায় প্রহ্লাদ কেমন হাঁ হয়ে যায়, চোখটাও স্থির, সে যেন হঠাৎ কিছু মনে করতে পারে, যা তার দুদিন আগে মনে পড়া উচিত ছিল। সে বলে ওঠে, 'দ্যাহো কাণ্ড! এ-কথাডা মাথায় আইল না একবার? আমারে কইল, বাখরগঞ্জ ঘুইর‍্যা আসি দুই রাত্তির। আমি আবার কইল্যাম—যে নৌকায় যাও সেই নৌকায় ফির। রংসিঁড়িতে নৌকা বাইন্ধ্যা রাইখো। নৌকাও তো ঠিক কইর‍্যা দিল্যাম—বড় নিমাই। তুইল্যাও তো দিল্যাম—ছাওয়ালরে সঙ্গে নিয়্যা গেল। তহনো তো বুঝি নাই—'

'তো অ্যাহন শ্বশুরবাড়ি যাও, রংসিঁড়ি। আমি থাহি। কেষ্টা আর আমি। তুমি বৌদিদিরে জিগ্যাইয়াই ফিরত আইসো।'

'খাইছে! যা করছি তার তো অকরণ নাই। অ্যাহন তোমার কথা শুইন্যা পাঁচ কান কইর‍্যা দুই কান কাটা হই।'

'খাড়াও, মায় য্যান ডাকে,' প্রহ্লাদ উঠে গিয়ে আলো উশকে দিয়ে ডাকে, 'মা কি ডাহ?'

'ডাহি তো—'

'কও। কী কইব্যা?'

'তোগো শরীরে কোনো দয়ামায়া নাই—'

'সেডা তো নতুন সংবাদ কিছু না। নতুনডা কী?'

'আমার তো ঘুম নাই, শুধু ঝিম আছে। সেই ঝিমের মইদ্যে, পেল্লাদ, য্যান যোগেনের গলা শুইনল্যাম। আবার ঝিম ধইরল। আবার শুনি। আবার ঝিম ধইরল। আবার শুনি। তিন-তিনবার রে পেল্লাদ, তিন-তিন বার। শাস্ত্রে কয়ত-দূরের মানুষের গলা যদি তিন-তিনবার শুনো, তয় বুইজব্যা স্যায় দূরের মানুষ তোমারে বিস্মরণ দিছে। যোগার অ্যাড্ডা খবর নে।'

'তা তুমি নিজে নিলেই পার। আমারে ডাকো ক্যা?'

'তা তো কবিই রে পেল্লাদ অ্যাহন। এককালে পাইরত্যাম রে।'

'অ্যাহন তুমি আর তোমার মাসকলাই ঢাইল্যা ডাকাইত ধরার গল্প বাধায়ো না। তোমার যোগারে যা জিগ্যাবার জিগ্যাও। স্যায় সশরীরেই আইছে। জ্যান্ত মানুষের গলাই শুইনছ। যোগা তোমারে বিস্মরণ দেয় নাই। এই যোগেন, মায়ে ডাকে।'

যোগেন এই ঘর থেকে উঁচু গলায় গেয়ে ওঠে, 'অ সই, যমুনায়
কে বাঁশি বাজায়
স্যায় কি রাই না রায়—

গাইতে-গাইতে যোগেন রাইয়ের ঘরের দিকে এগয়। রাই, তখন বিছানায় খাড়া হয়ে বসে একমুখ হাসিতে বলে ওঠে, 'তুই কহন আইলি, সোনা—।'

যোগেনের মনে হয় বুড়ি যেন তাকে ঠাহর করতে পারছে না। সে একটু ভিতরে বলে—'কহন আইস্যা এঘর, ওঘর করি, ভরা সন্ধ্যায় এমন শূন্য বাড়ি দেইখলে গা ছমছম করে। আর তুমি নারী জীবন্ত জগৎসিংহকে নয়ন সম্মুখে দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে পারো না—সত্যিই কি এ জগৎ সিংহ?'

কথাগুলি বুড়ি শুনে যে খুশি হয়, তা তার চোখে আসে না। 'আয়, এডডু কাছে আয়।'

যোগেন এগিয়ে তার কোলের ওপর মাথা রাখে। বুড়ি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। তার কোলের ভিতর থেকে যোগেন বলে ওঠে, 'মাথা হাতাচ্ছ হাতাও, চক্ষুতে য্যান জল না গড়ায়।'

'কী যে কস রাই! চক্ষুতে যদি জলই না গড়াইল তাইলে আনন্দডা পূর্ণ হয় নাকী, বোকা।'

'আচ্ছা, অ্যাহন এডডু কম উছাও। শুইয়্যা থাহো। প্রহ্লাদদার সঙ্গে জরুরি সব কথা আছে। সাইর‍্যা নেই।

'তুই কিন্তু আমার কাছে শুবি রাই—'

'শুব। অ্যাহন ঘুমাও।'

বাইরে এসে যোগেন প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করে, 'বুড়ির কি দৃষ্টির গোলমাল হইছে?'

'রাত্তিরে তো বরাবরই কম দ্যাহে। অ্যাহন বোধহয় রাইতকানাই হইছে। মায়ের তো রাইতে চক্ষুর কোনো কামও নাই। দিনেরবেলায় তো নজর পরিষ্কারই।'

'শোনো, প্রহ্লাদ দাদা। কাইল অ্যাডডা মিটিং ডাকো।'

'কাইল? আইজ না রাইত!'

'আইজ রাইত কাইল সকাল। বিকালে মিটিং। কয়ডা মানুষরে খবর দিতে অইব? তুমি বারাও অ্যাহনি সাইকেল নিয়্যা—'

'আমি অ্যাহন বাইর হইলে তোমার নৈশ স্যাবার কী হইব?'

'নিশিপালন। না-হয় তো আমারে চাইল-তরকারি বাইর কইর‍্যা দ্যাও। আমি আখা জ্বালাইয়্যা

নিত্যানন্দভোগ চড়াইয়া দেই।'

'এইডা তো ভাল ওকালতি প্যাঁচ দিছ—বারাইতে আমার হইব—মূল্য হিশাবে হয় নিশিপালন না-হয় নিত্যানন্দ ভোগ। তো কও গিয়্যা শমনডা কী ঝাইরতে হব? কারে-কারে বলাইরতে হইব। শমন তো তোমার নামে হইব—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল এমএল এ ওয়ান্টস টু মিট ইউ...

'খাইছে। এই শমনখান লইয়্যা তুমি সেনমশাই, দাশগুপ্ত স্যার, বিপিন গুপ্ত, ছোটবাড়ির মাইঝ্যান কর্তা, পণ্ডিতমশায় এইসব মান্যিগন্যি মানুষরে তলব দিবা?'

'পাঠাও তো তলব দিবার। আবার কও যে তলব দিলে অমান্যি। তোমার তো পার্টি নাই। নাকী হইছে?"

'মাইনষের কুদৃষ্টি টানো কেন? কইব্যার ধইরবে পাঠাইল্যাম মেম্বার কইরা, লগে আইলাম এক পার্টি। ডঙ্কা বাজাইয়া সেন কর্তারে গিয়্যা কই ক্যামনে—কাইল যোগেন মণ্ডলের মিটিংয়ে আসেন। পার্টি হইলে নায় কওয়া যাইত—। অ্যাহন যদি জিগান যোগেন নিজে আইল না ক্যা? তহন জব দিব কী?'

'পহ্লাদদা তোমার এই মুকতারি-জন্মখান বৃথা গেল। কইব্যা—কইলকাত্‌তা থিক্যা খবর দিছে ফোনে, কাইল আইসব আর আপনাগ সঙ্গে কথা কইবার দরকার খুব। তাই আপনারে এডডু কাইল সার্কিট হাউসে পায়ের ধুলা দিতে হয়—হেই আনুমানিক তিনডা বেলায়—আরে কইব্যা তো সেনকর্তারে, আর আমার দুই সিনিয়াররে, মাইঝ্যান বাবুরে, পণ্ডিতমশায়রে আর মকলেশ্বর শাহেবরে।'

যোগেন, এতগুলা মান্যিগণ্যি মানুষগো এতগুলা মিথ্যা কওয়া যায়?

মিথ্যা তো একডা—যোগেন কাইল আইসব। তাও পুরা মিথ্যা না—অ্যাহনো তো কেষ্টা ছাড়া কেউ সাক্ষী নাই যে আমার আগমন ঘইটছে। আর তুমি তো কইল্যা, কেষ্টার অ্যাহন রাতকানা ধইরছে। তাই সেই সাক্ষীও খাড়াবে না। একডা মিথ্যা পাঁচ জায়গায় কইলে তো মিথ্যা একডাই থাহে। থাহে না?'

'সেডা খুব বড় কথা না, যোগেন। তুমি সার্কিট হাউসে মিটিং ডাইকল্যা—সেডা সরকারি পিয়ন নোটিশ দিলেই তো ভাল হইত।'

'তা হইত! অ্যাহন সরকাররে পাই কই?'

যোগেনের ডাকা মিটিঙের দূত মুহুরি শিবু

৫২

সকালে মুহুরি শিবু হালদার আসতেই যোগেন একটা চিঠি লিখে তার হাতে দিয়ে বলে, 'এহানে তো খাম খোঁজা নিরর্থক। আপনি এডডা কিন্যা চিঠিখান ভইর‍্যা নিবেন। আইজ তিনডার সময় সার্কিট হাউসে আমি এখানকার কয়েকজন গণমান্য মানুষের সঙ্গে মিটিং করব। তার খবর তো তাগো আগে জানান্‌ হয় নাই—' বিস্ময় গোপন করার অভ্যেস থেকেই শিবু হালদার পারল তার গোল হয়ে যাওয়া চোখের মণিটাকে ঠিকরনো থেকে বাঁচাতে ও তার ঠোঁটটা কিছুতেই ফাঁক না-করতে। মক্কেলকে তার এমন অহর্নিশি বোঝাতে হয়—কত বড় বিপদ মক্কেলের সামনে। তবু তার মুখ থেকে 'সা র কি ট হাউস' কথাটা সে

ঠেকাতে পারে না। পরমুহূর্তেই সে সচেতন হয়ে যায় 'এসডিওকে তো?'

'হ্যাঁ, তাই দ্যান, উনি যারে জানানোর জানান। সার্কিট হাউস বোধহয় পিডবলুডি-র আন্ডারে। সে আপনে যা ভাল বুঝেন। মোট কথা তিনডার সময় কেও য্যান আইস্যা ফির‍্যা না যান। তাইলে আমার মাথাকাটা যাবে।'

ঠোঁটের এক প্রান্তে, সামান্যতম মুচকি হেসে শিবু হালদার চলে যায়—যেন ম্যাজিস্ট্রেট, কমিশনার ইনজিনিয়ার তার ডালভাত।

বড় রাস্তায় পড়তে যেটুকু গলি পেরতে হয় তারমধ্যেই হালদার আর তার বিস্ময় নিজের কাছেও গোপন রাখতে পারে না। যোগেন মণ্ডলকে ভোটে দাঁড় করানোর প্রায় সব কৃতিত্বই তার। দশজন তাবলে বটে আর যোগেনের জেতায় তার মানমর্যাদা সে একটু বাড়িয়েও নিয়েছে বটে কিন্তু তার মানে যে যোগেন এখন সার্কিট হাউসেও মিটিং ডাকার হকদার—এটা তো সে ভাবতেও পারে না, দু-এক পাত্র রস খাওয়ার ফলে পেট গরমের দুঃস্বপ্নেও পারে না। সার্কিট হাউসের ওপর যোগেনের দখল কায়েম হওয়ার মানে শিবু হালদারের দখলও কায়েম হওয়া—ষোল আনা নয় নিশ্চয়ই কিন্তু লালপয়সা অন্তত। লালপয়সা হলেই শিবুর যথেষ্ট। তাতেই সে মুহুরি গিরির রেট ডবল করে দিতে পারবে। আর, লোকজনের চিঠি মুশাবিদার রেটও ডবল করে নিতে পারে। এমএলএ-র কাছে সরাসরি চিঠির মুশাবিদার জন্য আলাদা একটা রেটও তৈরি করতে পারে। এমএলএ-র কাছে সুপারিশের জন্যও...। শিবু যেন জোর করেই এই সুযোগ-তৈরির কথা পুরো ভাবা থামিয়ে দেয়। সেই ব্যক্তিগত সুপারিশ, ন্যায্য হবে কী না—এ-সংশয় তার ঘোচে না। সেই সংশয়ের কারণে শিবু হঠাৎ এই দায়িত্ব পালনের তাগাদা বোধ করে আর একটা টমটম ডেকে বসে। কাছারি যেতে টমটম—শিবু হালদার সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ভাবতে পারে না।

কিছুটা দুর যেতে-না-যেতেই শিবুর আক্কেল ফিরে আসে—সার্কিট হাউসের বন্দবস্তের জন্য সে তো যাচ্ছে কাছারিতে—এসডি ও শাহেবের কাছে? মেম্বারের চিঠি নিয়ে? মেম্বার তো চিঠি লিখতেও পারেন, পাঠাতেও পারেন—হাতচিঠি বা ডাকচিঠি! তাই বলে কি শিবু সরাসরি এসডিও শাহেবের সামনে গিয়ে নিজের হাতে সে চিঠি দিতে পারে? হাকিম যখন উকিলবাবুর কাছে কোনো দলিল বা নথি চান, সেই দলিল বা নথি কি শিবু নিজে দিতে পারে হাকিমকে? হাকিমশাহেব দেখতেই পাবেন না তাকে। শিবু দেবে প্লিডারের হাতে, প্লিডার দেবেন হাকিমের চাপরাশিকে, চাপরাশি রাখবে হুজুরের টেবিলে। শিবু হঠাৎ কোচয়ানকে ডাকে, 'এই, খাড়ারে ভাই, খাড়া। শিবু দুটো ডবল পয়সা কোচয়ানের হাতে দেয়। শ্রীরাধা না চন্দ্রাবলী—ঠিক হয় নাই? হইলডা কী? কোচয়ান ঘোড়ার দড়ি টেনে এগুনোর ইশারা দেয় আর দুটো ডবল-পয়সাই কানের ফুটোয় গুঁজে রাখে। ভাগ্যিস, শিবুর আক্কেল টাইম মত ফিরল, এসডিও অফিসের বড়বাবুর চাপরাশি ফরজ আলি থাকে এই রাস্তার চাপাডালির মোড়ের বৌয়ের রাস্তায়। ওর কাছে অফিসের বড়বাবুর চাপরাশি থাকে। তার কাছে চিঠিটা দিয়ে, তার সঙ্গেই শিবু কোর্টে যাবে। একেবারে পাঁঠা নিয়্যা কশাইখানায়।

পেছনের ক্যারিয়ারে প্রহ্লাদকে বসিয়ে সাইকেলে যোগেন এসে পৌঁছয় তিনটে বাজার দু-চার মিনিট আগে। প্রহ্লাদ আগেই ক্যারিয়ার থেকে নেমে যায় আর যোগেন সার্কিট হাউসের সিঁড়িতে একটি পা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। চওড়া বারান্দা এতই চওড়া যে বারান্দার পেছন দেয়ালটায় মেঝের ছায়া পড়ে।

'যোগেন আবার পেল্লাদের সাইকেলের গাড়োয়ানি লিল কব্ থিক্যা'।

যোগেন গলাটা চিনতে পারে না, সে একটা এমন জবাব দিল যা সব জায়গাতেই খাটে, 'আইজক্যাল কি কেউ এড্ডা পেশা নিয়্যা জীবন নির্বাহ কইরতে পারে, সব চাকরিই এডডু-আধডু অবভ্যাস রাখা ভাল স্যার।'

আবার সেই আবছায়া থেকে গলা এল, 'শুইনব্যার পাই এই বছরই নাকী লাটশাহেব-বদলি। সেই লাটগিরিও অভ্যাস কইরো এড্ডু'।

যোগেন সাইকেলের হ্যানডেল ধরে কথা বলছিল, সিট থেকে নেমেও সাইকেলটা সে ধরেই রেখেছিল। বেয়ারা-চাপরাশি-পিয়নটিয়ন কেউ এসে সাইকেলটা নিয়ে স্ট্যান্ডে রেখে দেওয়ার কথা। ভিতর থেকে ঐ গলার স্বর আর বাইরে তার সাইকেল ধরা-রাখা নিয়ে সম্ভাব্য অনিশ্চয়তায় যোগেন সেই আবছায়া থেকে উঁচু স্বরে ভেজা বিদ্রূপের জবাবে তীব্র হেসে উঠে বলে, 'আরে স্যার, তার লগেই তো আমারে আপনার লগে পাঠাইল। কইল যে আপনার মত একখান রিট্যায়ার লাটশাহেব ভূভারতে নাই। চিঠি পান নাইই স্যার—'

বলতে-বলতে যোগেন এদিকওদিক তাকাচ্ছিল, তার চেনা কেউ আছে কী না—সাইকেলটা ধরার মত। ইতিমধ্যেই এক কনস্টেবল এসে সাইকেলটা নিয়ে চলে যায় আর যোগেন সেই বারান্দায় ঢুকে পড়ে। বারান্দার অন্য প্রান্তে গদি-চেয়ারে বেশ কয়েকজন বসে আছেন। সদর এসডিও. কাছে এসে নমস্কার করে জিজ্ঞাসা করেন, 'স্যার, গবমেন্ট কি থাকবে আপনার মিটিঙে? কিছু কি মিনিট করতে হবে?'

এর জবাব দিতে যোগেনকে একটু দাঁড়াতে হয়। 'দ্যাহেন। সেশন শ্যাষ হতেই আমি আসছি। এঁরা আমার কনস্টিটুয়েন্সির মান্য মানুষজন। এঁদের নিকট আমি শুনতে চাই—তাঁরা এই গবমেন্টকে কী ভাবে দেখছেন। আমি এঁদের কাছে বইলতে চাই—আমি এই গবমেন্টকে কী ভাবে দেখছি। আর, আমার কনিস্টটুয়েন্সিতে কোন্ কোন্ কাজের ওপর জোর দিতে চাই সেটা বলব। এই লাস্ট পার্টটা মিনিটেড অইলে ভাল হয়। তবে আমি তো আপনাগো প্রেমিসেসে মিটিং ডাকছি। আপনারা যদি চান—পুরা মিটিংটা মিনিট করতে, করেন। আমার কোনো আপত্তি নাই।'

যোগেনের সঙ্গে বরিশালের কর্তাব্যক্তিদের কথোপকথন

এগিয়ে গিয়ে যোগেন দুর্গামোহন সেন, পণ্ডিতমশায়, দীনবন্ধু রায়চৌধুরী, মেজকর্তা—এঁদের প্রণাম করে। ছোনাউল্লাশাহেবকে সেলাম দেয়। তারপর তার জন্য রাখা চেয়ারটিতে বসে বলে,

'মকলেশ্বর শাহাব কি সদরে নাই?'

৫৩

শিবু হালদার পেছন থেকে খুব চাপা গলায় জানিয়ে দেয়—সদরে নাই। বাড়িত গিছেন।'

'তাইলে কাইল দেখা হইব আগৈলঝরায়। আর হাসেম শাহাব? প্রেসিডেন্ট?'

'আইসবেন বইলছেন।'

'তাইলে আর দুই-পাঁচ মিনিট দেখা যাউক, কী কন? আপনে এড্ডু দেহেন। আর প্রহ্লাদদা

যায় কৈ?'

শিবু হালদারকে এ-মিটিংয়ে কোনো কাজকর্ম করতে বলেনি যোগেন। শিবু নিজেই ঠিক করেছে, তার হাজির থাকা উচিত—কখন কী দরকার পড়ে। তেমন ফাইফরমাশ খাটলেই তো ভিতরের আর বাইরের মধ্যে সেতু বলে লোকজন তাকে মানবে। শিবু মিটিঙে নেই, থাকতেই পারে না, কিন্তু তাকে তো ঐ চওড়া বারান্দার মাঝ বরাবর দাঁড়াতে হয়। সেই মাঝখান দিয়েই কোতোয়ালির বড় দারোগা শাহেব ঘোরাঘুরি করছেন। শিবুকে তিনি দেখেও যে কিছু বললেন না, তাতেই শিবু বুঝে যায়—সরকারি লোকজন শিবুর নতুন গুরুত্ব মেনে নিল।

যোগেন বলছিল, 'আমি স্যার আপনাগো বেবাকের সঙ্গে একত্রে কথা বইলতে চাইছিলাম। তাই আপনাগো এই কষ্ট দিতে হল। কিন্তু এডা ছাড়া অন্য কোনো উপায় তো মাথায় আইল না। আপনাগো মনে হইলে কন, তাই হবে।'

মেজকর্তা বলে ওঠেন, 'পয়লা হিয়ারিঙে ফুলবেঞ্চ ডাইক্যা দিল্যা। ডিভিশন বেঞ্চ ঘুরাইয়া আনলে মামলাডা এড্ডু সাফসুরুৎ হইত না?'

'স্যার, আমার তো কোনো মামলা নাই। আইনসভায় স্যার এইসব দলের উকিল-ব্যারিস্টাররা আর-কাউরে কথা কইব্যারই দেয় না।'

'তোমার তো তাইতে বাধা পাওনের কথা নাই। তুমি তো কিছু ফেলনা উকিল না—'

'আমি তো স্যার বাই বার্থ ফেল্‌না। অ্যাকে বরিশালের ডাকাইত। তায় ডাকাইতের ডাকাইত নমশুদ্দুর। আমারে তো স্যার পর-পর মামলায় জিপি বা পিসিকে হারাইয়্যা মামলা জিত্যা প্রমাণ দিতে হয়—যারে তুমি ফেলনা ভাবো, সে কিন্তু অত ফেলনা নয়।'

সবাই হেসে উঠল, একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা কলকাতার শাহেব ব্যারিস্টাররা বুইজল কিছু তোমার দর?'

'বরিশাইল্যা যদি কুনো দর হাঁকে, স্যায়, কি তা না-বুঝ্যাইয়া ছাইড়ব? আপনাগো শিক্ষায় পাঁচ মাসে যা হওয়ার তার থিক্যা বেশিই হইছে। কিন্তু স্যার ও শরৎ বোস, নাজিমুদ্দিন, আবুল হাসিম, তুলসী গোঁসাই—এগুলা তো এক-একডা প্রকাণ্ড কাণ্ড। আমাগো পোলিটিক্যাল পজিশনডা এডডু সুযোগ দিছে ভাল—'

'দেহো বাপ, সুযোগ আবার পিছল্যা না হয়—'

হাশেম আলি শাহেব গট গট করে হেঁটে আসেন। তাঁর পেছনে শিবু হালদার যেন ছুটতে-ছুটতে আসছে।

হাশেম আলি চেয়ারে বসেই বলে ওঠেন, 'আরে, এই শিবুডা আমারে হাত ধইর্যা-ধইর্যা পিছন থিক্যা আগালায়্যা আইনবার চায়। য্যান মুই ফিরাইয়া আনব। অরে, পারবি আমার সঙ্গে হাঁইটবার?'

শিবু হালদার দূরে দাঁড়িয়ে হাত কচলে হাসে।

যোগেন বলে, 'না-পিছলানো খুব কঠিন স্যার। পায়ের আঙুলে স্যার, কাঁকড়ার দাঁড়া থাকার লাগে। দাঁতে স্যার ঘড়িয়ালের কামড় থাকা লাগে। চোখে স্যার, পথকুক্কুরের সন্দ থাকা লাগে। আর এইসবগুলা যদি একসঙ্গে ফাংশন করানো যায়, তাইলে পা নাও পিছলাইতে পারে। ভোটের আগের পোলিটিক্যাল পজিশনগুলা তো উলোটপালোট হইয়্যা গেল। প্রজাপার্টি হইল তিন টুকরো। কংগ্রেস গেল চুপসাইয়্যা। মুসলিম লিগের পোয়া বার। আমরা স্যার বরিশালের কায়দায় এক লগিতে দুই নৌকা ঠেলতেছি। কংগ্রেস আর প্রজাপার্টির ফালিগুল্যা তো সব ব্যাপারেই মারকাটারি অপোজিশন। আমরা বসি স্যার অপোজিশনে, কিন্তু সরকাররে সাপোর্টও দেই।

ক্রিটিক্যাল সাপোর্ট।'

'ক্রিটিকটা কনে আর সাপোর্টটা কনে—এডা এডড়ু গলা ঝাইড়্যা কও। তোমাদের মতই যে থাকব, তা না। কিন্তু কাগজ পইড়্যা তো আইনসভার ভিতরে কে কী চাইব্যার চায় তাও বুঝা যায় না, কে কীসে সমর্থন দেয় তাও বুঝা যায় না।'

'বুঝাডা তো এডড়ু মুশকিলই স্যার, বাহির থিক্যা। খুনের মামলাতেও না-হয় একডা আন্দাজ পাওয়া যায় জাজমেন্টের। আইনসভায় সে-আন্দাজও তো করা যায় না। আমি এডডা সার কথা বুইঝ্যা নিছি স্যার। যাগো সরকার, স্যায়রা চায় অন্য দল থিক্যা মেম্বার ভাগাইতে। তালি তাদের মেজরিটি বাড়ব। আর সরকারের বিরুদ্ধে যারা, তারাও চায় শাসকদলের মেম্বার কমাইতে। তাই বাইছ্যা-বাইছ্যা এমনসব প্রস্তাব বা আইন দুই পক্ষই তোলে যাতে অপরপক্ষের কোনো একটা দলের জাতস্বার্থে লাগে। নতুন কথা উইঠলেই আমি স্যার বুইঝবার লগে ধর্মবকের মত গলা বাড়াইয়া দেই—কয়ডা জালিয়া কৈবর্ত আছে শিডিউল কাস্টের লিস্টে? স্যার, এই মন্ত্রিসভাডার নিজের হাঁটুর জোর নাই। নিজেরাই জানে না—সরকারের সাপোর্ট আইজ কত?

'বুইঝল্যাম। কিন্তু তোমার ক্রিটিকডা কী?'

'সে-ও একডা সোজা বুদ্ধি করছি। সমাজ-উন্নয়ন বইল্যা নতুন এডডা মন্ত্রক বানাইছে। তাগো কাজ পুরানা সব ছোট খাটো পতিত কাজ খুঁইজ্যা বাহির করা—মহাভারতের টাইম থিক্যা যুধিষ্ঠির-দুর্যোধন কয়্যা আসতিছে—এই কাজডা অ্যাতদিন কেন হয় না। কিন্তু হয় নাই। ধরেন—বাঁধ কাটা বা বাঁধ তোলা, খালকাটা, খালের জল নিকাশী, প্রাইমারি স্কুল—এইসব কাজে আমরা গবমেন্টের পক্ষে আর ঋণ (সলিসি) বোর্ড, জিলা বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, নানারকমের বোর্ড—এইসবে আমরা কোটা চাই—শিডিউল কাস্ট কোটা। কংগ্রেস চায় না আমাগো কোটা। কিন্তু লিগ চায়। ষোল আনার চায়্যা আঠার আনা চায়। সে কোটাভাবে স্যার, গবমেন্ট আমাদের সার্পোট করে। আমি তেমন দুইডা কাজ বাইর কইর্যা কাজ আরম্ভ কইরতে আসছি স্যার—আগৈলঝরা ইস্কুলরে মডেল ইস্কুল করা আর মাইলারার পচ্ছিমে খাল কাইট্যা জল বাইর কইর্যা চাষের জমি বাইর কইরতে লাগব। কিন্তু এইসব প্রজেক্টে, স্যার, লোক্যাল ইনিসিয়েটিভ প্রমাণ করব্যার লাগে। সেইডার অবস্থা কী তা এডড়ু বুইঝ্যা যাই।'

দুর্গামোহন সেন মশায় আঙুল তুললেন। সাধারণত কোনো মিটিঙেই তিনি কিছু বলেন না। মিটিঙের বিষয় নিয়ে পরে কাগজে লেখেন। তাঁর কথাবলার সময় জিভের কিছু অসুবিধা ঘটে।

'এইডা এডড়ু অদ্ভুত লাগে মণ্ডল। ধরো, জেলা বোর্ডে আগেকার আইনে যখন হাসেম আলি শাহেব মনোনীত হন, তাতে আমাদের কারো আপত্তি থাকলেও কোনো উপায় নাই। ইটস অ্যান অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাই দি গবর্মেন্টি। কিন্তু অ্যাহন তো ঐ একই হাশিম শেখ ঐ একই গবমেন্ট নমিনেশনে আইসতেছেন বাট অ্যাজ এ মুসলিম। ইন দ্যাট কেস, হি লুজেস সাব্‌সটেনশিয়ালি ফ্রম দি পোটেনশিয়াল পাওয়ার অব হিজ নমিনেশন। তোমরা এই কোটা-সিস্টেমরে আরো বাড়াইতে চাও কেন?'

'স্যার, এডা তো ন্যায্য কথা। কেডা না বুঝে? কিন্তু পুরানা, আইনেও স্যার গোপন কোটা থাহে। এ-বছর খাঁশাহেব, তো পরের বছর রায়শাহেব। বিধি যদি এমনই হয়, তালি স্যার, মুসলমান প্রধান অঞ্চলে যদি-বা কোনো ভাদ্দর পূর্ণিমায় মুসলমানের কপালে শিকা ছিঁড়লেও ছিঁড়তে পারে কিন্তু সূর্য-চন্দ্র যত্‌দিন তত্‌দিনের মইধ্যে কোনো শুদ্দুর বা চাঁড়াল কোনো বোর্ডের মেম্বার হইব্যার পারব না—এই গ্যারান্টি আপনাগর দিচ্ছি।'

দুর্গা সেন চট করে এ-কথার কোনো জবাব দেন না। তাঁর কথা বলার অসুবিধের কথা

সকলের জানা।

এতটা সময় যায় যে কারো মনে হতেই পারে যে দুর্গা সেন আর কিছু বলবেন না। তিনি তাঁর আঙুলও তোলেননি জানাতে যে তাঁর কথা শেষ হয়নি। গুমোট কাটাতে বরদাবাবু উকিলই চাপা স্বরে জিজ্ঞাসা করেন, একটু হালকা ভঙ্গিতে—'হাশেমশাহেব কোন্‌টা পছন্দ করবেন—ফ্রি-নমিনেশন না কোটা।'

হাশেম শেখ তাঁর চিবুকের দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলেন, 'প্রশ্নডাকে ভবিষ্যৎকালে নিয়্যা দ্যাহেন। নাহলে পার্সপেকটিভ পাবেন না। ধরেন, আমার ইনতেকাল হইছে। গবমেন্টের মনে লয়—না হাসিম শেখই যহন নাই, তহন শ্রীশ চন্দ্র ন্যায়রত্নরে এবার প্রেসিডেন্ট করো। তিনি তো আমার থিক্যা শতগুণ যোগ্য। কিন্তু তাতে তো মুসলমানগো কোনো রিপ্রেজেন্টেশন হইব না। সেদিক দিয়্যা কোটা সিস্টেম ইজ এ গুড সেফ গার্ড।'

'তুমি য্যান সোস্যাল ওয়েলফেয়ার নিয়্যা কী একডা কইল্যা?' দিনু চক্রবর্তী যোগেনকে জিজ্ঞাসা করেন।

'অ্যাড্‌ডা স্যার উদ্যোগ হইছে, বিশেষ কইরা গ্রামের নমশূদ্র ও মুসলমান প্রধান অঞ্চলে যদি স্থানীয় মানুষজন জমিজমা টাকাপয়সা দ্যায়, তাইলে সরকার ইশকুল কইর‍্যা দিবে। আবার কুনো একডা বাৎসরিক বন্যা ঠেকাইবার বাঁধের জইন্য বা ধরেন বিশেষ কইর‍্যা যশোর-খুলনা-বরিশালে লোনাজলের বিলা জায়গায় বাঁধ-ফাঁদ দিয়্যা কিছু চাষ-আবাদের ব্যবস্থা হয় তাইলে সরকার সাহায্য দিবে। এই কামে এক ডিরেকটরও নিয়োগ করা গিছে।'

'কোন জাইত থিক্যা বাছা হইল?'

'মুসলমান।'

'তাইলে মুসলমানদের, মানে গরিব ভোটারদের ভোট কায়েম করার লাইগ্যাই সমাজকল্যাণ?'

'তা তো নিশ্চয়ই স্যার। হিন্দু-প্রধান অঞ্চলে তো এই সমস্যা নাই। আপনাগ তো ঘরে-ঘরে গ্র্যাজুয়েট। আমি এই সুযোগডা নিয়্যা এইহানে অন্তত দুইডা-একডা কাজ কইরব্যার চাই। তার লগে আপনাগো আশীর্বাদ তো দরকার। যেমন ধরেন, আগৈলঝরা ইস্কুলটাকে প্রথমে মডেল ইস্কুল ক্লাশ সিক্স পর্যন্ত কইরব্যার চাই। আপনারা যদি দুই-চার কথা বলেন, লেখেন, তাইলে সুবিধা হয়। ভর্তার বিল নিয়্যাও এক কথা।'

'সবই তো ভাল কাজ যোগেন কিন্তু যাগো ভাল কইরব্যার চাও, তারা নিজেগো ভাল চায় তো? এহানকার জমিদাররা তো মহাশয় মানুষ ছিলেন। তারা কিন্তু কম ইশকুল বানান নাই, কম রাস্তা বাঁধান নাই, কম ডিসপেনশরি খোলেন নাই। কিন্তু যাগো লাইগ্যা এইসব করা, তারা কিন্তু এই কাজগুলা রক্ষা কইরব্যার পারে নাই—' মেজকর্তা বলে যাচ্ছিলেন।

তাঁর কথার মধ্যে হাশেম শেখ বলে ওঠেন—'ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডেরও তো সেই অবস্থা। নতুন কাজের থিক্যা দরকারি কাম হইছে পুরানা সুবিধাগুলি বাঁচান—টিউবওয়েলের রবার চাক্কি না-ভাঙা, হাটগুদামের চাল থিক্যা টিন খুইল্যা নিয়া না আসা, পিডবলিউডির লাগান রাস্তার কাঁঠালগাছ গুল্যা থিক্যা নাবাতি কাঁঠালগুল্যাক না কাটা, সরকারির ফেরির নৌকা চুরি না-করা।'

হাশেম আলিকে থামিয়ে দিয়ে হঠাৎ পণ্ডিতমশায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান, 'আমারে ক্ষমা দিবেন। এইসব আকামা কথায় কামডা কী। মেজকর্তাও কইলেন, শেখশাহেবও কইলেন—আগে সত্যযুগ বানাও তারপর হনুমানের মত বান্দর পাইবা। যোগেন তো গন্ধমাদন পর্বত আইনব্যার কথা কয় নাই। কইল ছোট ছোট সব কামের কথা। আগৈলঝরার ইশকুলডা উঁচা আর বড় হইলে ক্ষতি না লাভ। আমি তো লাভই দেহি। কাইল দেখা হইব নে আগৈলঝরার মাঠে।'

আগৈলঝরায় যোগেনের মিটিং

৫৪

আগৈলঝরার মিটিঙে যে এত লোকের ভিড় হবে তা যোগেনের ধারণার মধ্যেই ছিল না। সে তো মৈস্তারকান্দি পৌঁছে গেছে বেলা দশটা নাগাদ—সঙ্গে প্রহ্লাদ, শিবু হালদার, পণ্ডিতমশায়, তার মামাতো ভাই—যে ছিল ভোটের নেতা। এদের নিয়ে বাড়িতে ভাত খেয়ে তারা এক ছোট নৌকায় রওনা দিল।

মৈস্তারকান্দি তো বড় গ্রাম—যোগেনদের বাড়ি সেই সুবাদেই মৈস্তারকান্দি। ডাঙা থেকে দুই দিকের ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে উত্তরে ও দক্ষিণে দুটো রাস্তা যায় পুবমুখে, মৈস্তারকান্দিকে ঘিরতে। উত্তর আর দক্ষিণের দুই রাস্তার মধ্যে একর বিশেক ক্ষেত। উত্তরের রাস্তা ধরে শ-খানেক পা হাঁটতেই একটা ছোট নালী দিয়ে দক্ষিণের ক্ষেত থেকে জল ঢুকছে উত্তরের জমিতে। কিন্তু উত্তরে কোনো খাল চোখে পড়ে না। যেটুকু জল ধানক্ষেতের গোড়ায় তাতে বাতাসের দাগ পড়ে বটে কিন্তু সেটা কোনো মতেই খাল নয়। ঐ ছোট নালাটাতে বোঝা যায় জলে জমির রং। খালের রং জলে নেই। সে-নালা তো চ্যাংড়ারা এক লাফেই পেরিয়ে যায়। জোয়ানরাও। ভারী বয়সের কেউ-কেউ জলের একেবারে কিনারায় গিয়ে জলের ভিতর দিয়ে পা বাড়িয়ে পেরতে পারে। কিন্তু বুড়োবুড়িদের জলে নেমে পেরতে হয়। হাত তিনেকের একটা বাঁশ ফেলা থাকলে সকলেই পারত তার ওপর আঙুলের ভর রেখে পেরিয়ে যেতে। বরিশালের এমন দেড়-দু হাতি নালার ওপর যদি বাঁশ ফেলতে হয়, তাহলে মরা-মানুষকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার বাঁশ পাওয়া যাবে না। আরো শ-খানেক পা হাঁটতেই যেটাকে রাস্তা মনে হয়েছিল সেটাই হয়ে যায় একটা বড় খালের বাঁক। ঐ বাঁক থেকে একটা সুতো ঢুকেছে উত্তরের ক্ষেতটাতে। যেটাকে মনে হয়েছিল ধানক্ষেতের জল, সেটা আসলে খাল।

এ-খালের কোনো ছবি বা ম্যাপ আঁকা যায় না। প্লেন থেকে তোলা ছবিতে হয়ত বোঝা যায়, অজস্র রঙের বিচ্ছিন্নতা। সে-বিচ্ছিন্নতাগুলিই জল, নাকী রংগুলোই জল, তার কোনো হদিশ মেলে না-হদিশ বানানো যায় এমন কোনো চিহ্ন নেই। আকাশ থেকে তোলা সেই ছবিতে কি এই আকারটা আসবে—প্রান্তর থেকে প্রান্তর যেখানে শুধুই সর্পিল। তাছাড়া, উচ্চাবচতার সূক্ষ্মতাগুলি মুছে যাবে। শুধু মেঘের যেমন কোনো ছবি হয় না, মেঘের আকারের তো কোনো গড়ন নেই, মহাকাশযানের যাত্রীদের যেমন গতিবোধ থাকে না, তেমনি বরিশালের জলের কোনো ছবি হয় না। বরিশালের ছোটখাল-বড়খালের জলে, ছোটখাল-বড়খাল ছোটনদীর জলে, ছোটখালের চাইতেও ছোট জোলায়, বড়খাল-ছোট নদীর জলে, নদী থেকে নদীর জলে অনেক অনেক তফাত কিন্তু সেই তফাত থেকে কোনো বাইরের জীবন তৈরি হয় না। হলে, হয়ত জলের এই তফাত হয়ে উঠতে পারত জলবৈচিত্র্য। বরিশালের জলই একটা জীবন। নেহাৎ দরকারি ফাঁকটুকুও নেই জলের সঙ্গে জীবনের। জলের বহতা, বীচিক্ষেপ, আকারহীনতা, অনচ্ছতাগুলি মানুষের শরীরের রেখা হয়ে উঠে, আবার জল হয়ে যায়। জলের তো কোনো আকার স্থায়ী নয়। বরিশালের মানুষের জীবন তেমনই জলেগড়া মূর্তি।

উত্তরের পথটা ধরে ডাঙায়-ডাঙায় কিছু দূর বেশ সোজাই চলে যাওয়া যায় জলহীন ক্ষেতহীন, বনবাদড় ও দুয়ার পেরিয়ে-পেরিয়ে। তারপরই শুরু হয়—প্রায় প্রতি পনের-বিশ পায়ে এক-একটা খাড়া খাত, সে খাতগুলির একটা পাড় ঘাসহীন, দৃশ্যত পাথুরে আর সে খাতগুলির অনেক নীচে, বহমান জল। খাল বললে তো একটা নিরীহ গার্হস্থ্যের ভাব আসে। কিন্তু এই

খাতের খালগুলিতে কোনো গার্হস্থ্য নেই। আছে গৃহহীন বন্যতা আর নিষেধ। ইতিহাস বা সাহিত্যপুষ্ট মানুষ একটা ছকে আনতে চায়, যেন পৃথিবী সব জায়গাই ট্যুরিস্ট স্পট। গ্রান্ড ক্যানিয়ন বা নায়াগ্রা বা উত্তর-দক্ষিণ মেরুর মত অমানুষ শূন্যতাকেও কয়েক মিনিটের জন্য কনডাক্ট করা যায়। বরিশালের এই খালের মাটিকে কোনো ছকে ধরা যায় না, তেমন কোনো ছক হয় না। বরং, বাচ্চাদের ছোটাছুটি আর যুবকদের নানা রঙা বিদেশী গেঞ্জি বা জ্যাকেটে এক আশ্বাস জড়িয়ে থাকে। সেই খাড়া খাতগুলির ওপর কোথাও বাঁশের সাঁকোতে, কোথাও ফেরির নৌকোয় অপর পারের সংযোগ। এই রকমই এক দুর্ভেদ্য সংযোগের ওপারে যোগেন মণ্ডলের মৈস্তারকান্দি। এতক্ষণ অদৃশ্য আর-এক খালের পাকে-পাকে বাঁধা। যোগেনকে সেই সব পাক প্রতিদিন তো পেরতে হয়েছে। মৈস্তারকান্দি থেকে যোগেনকে প্রতিদিন যেতে হত আগৈলঝরার স্কুলে।

মৈস্তারকান্দি বলেই যোগেনের গ্রামটি মুখে-মুখে চেনা। মুখচেনার চাইতে বেশি চেনার জন্য যা দরকার, যোগেনের এই গ্রামে তার কিছুই ছিল না। না কোনো মান্যগণ্য মানুষ, না কোনো মান্যগণ্য সমাজ, না কোনো উচ্চবর্ণের হিন্দু, না কোনো সৈয়দ মুসলমান, না কোনো স্কুল বা মন্দির, না কোনো বিশাল নদী, কিছু না, কিছু না। জায়গাটা সেই আগৈলঝরা আর মাদারিপুরের খাল থেকে এতটা দিগন্তে উঁচু, খাড়া, শক্ত ও খাদের নদীতে এমন পাকানো যে সেটাকে কোনো বসতি বলে কল্পনা করা একমাত্র তেমন কোনো উৎখাত, নিরুপায়, আতঙ্কিত মানুষের দলের পক্ষেই সম্ভব। আর, নদীর চর থেকে বন্যায় বা জমিদারের হুকুমে, বা হঠাৎ-কোনো হিশেব ছাড়া জোয়ারের বানে মুহূর্তে উৎখাত কোনো খালপাড় থেকে উচ্ছিন্ন মানুষ, দল বেঁধে এখানে পৌঁছুনো খুব কিছু নতুন ব্যাপার নয় বরিশালের গ্রামে। এখানেই কেন—এমন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রশ্ন প্রাসঙ্গিকই নয়। আর, ওরা যে এখানে বসতি গাড়ল, তাই-বা কার জানা দরকার?

হয়ত সেটাই ছিল প্রধানতম কারণ। যে মানুষদের, শয়ে-শয়ে হাজারে-হাজারে মানুষদের, একেবারে নিজস্ব স্বামী-স্ত্রী, বাপবেটা, বিধবা বোন, অধবা ভাগ্নি, মামার এক শ্যালক—ইত্যাদি অভঙ্গুর এইসব সম্বন্ধ নিয়ে বাসভূমি তৈরি করতে হয় সমুদ্রমোহনার খালি চরে, বা পাহাড়পর্বতের জঙ্গলে, বা নদী যেখানে ভাঙছে সেখানে, তারা গন্ধ পায় কোনো জমিটার মালিকানা তখনো তেমন জারি নেই। বেদে-যাযাবরের মত গৃহ-বা গ্রামহীনতা নয়। কিন্তু সদা উদ্বাস্তু গৃহবাসী গ্রামবাসী মানুষের নিবাসভূমিগুলি এইভাবেই বাছা।

দুটো-তিনটে বাঁশ মাথায়-মাথায় বেঁধে ও খালের ওপর ফেলে যাতায়াতের একটা সহজ উপায় তৈরি থাকে বটে, একদিকে সে খাদটা বড় বেশি খাড়া বলে, তবে খাল আর নৌকাই সবদিকের বড় সড়ক। বসত জায়গাটা যেন এক ক্ষয়া পাড়ের অবশেষ, অজস্র অজস্র বাঁকে-বাঁকে ঘেরা। জলের এত বিস্তার ও বাঁক দেখে ভুলে যেতে হয় বসতটা কিন্তু তৈরি হয়েছিল, জলের সুবাদে নয়, মাটির সুবাদে। সেই বাঁধে-বাঁধে, চক্রাকারে, এক-একটা নিচু ঘর, সব মিলিয়ে বাড়িঘর। এমন বাঁকচুরের মধ্যেও আবার চড়াইউৎরাই আছে। যোগেনদের বাড়িটা একটা চড়াইয়ের মাথায়। তার আগের বাঁকটা থেকে কয়েক ধাপ উঠতে হয়। সেখানেই বসত শেষ নয়, যদিও এতক্ষণ ধরে শুধু ডাইনে পাক খেতে-খেতে মাথায় ঘূর্ণি লাগে, যোগেনদের উঠোন দিয়েও ডানপাক ঘুরতে গিয়ে তাদের রান্নাবান্নার জায়গার সামনে পড়ে গিয়ে। তবে, এটাও সহজ বুদ্ধিতেই এসে যায় যে ঐ জায়গাটুকু পথও বর্ষে। যোগেনদের উঠোন থেকে বাঁয়ে বাঁক শুরু হয় ও বাঁয়ে বাঁক চলতেই থাকে খালের জল পর্যন্ত। খালের পাড়ের জলটুকুও রাস্তার অংশস—সেটুকু জলের ভিতর দিয়ে হাঁটা। তারপর আবার একটা চড়াইয়ে উঠলে আবার সেই

সাঁকো।

খালের ভিতরকার এই ডাঙার আরম্ভও নেই, শেষও নেই। আবার, সে-ডাঙা যে একটা বৃত্ত, তাও নয়। আবার সে-ডাঙা যে পাকদণ্ডি ঘেরা একটা টিলা, তাও নয়। খালের জল যেমন জলের সমোচ্চশীল ধর্মের বাধ্যতায় ছোটবড় সব অসমতলতাকে জলের নীচে ঢেকে ফেলে জলতল রচনা করে, এই ডাঙাটিও তার অসমতলতার ধর্ম অনুযায়ী সব উঁচুনিচু-গিঁঠগাঁঠ, ঢেউ গর্তকে পাঁজা করে রেখেছে, পাঁজার কোনো আকার থাকে না।

দুপুরের খাওয়া সারা হলে যোগেন চেঁচায়—'আর বেলা কাটানোর বেলা নাই, খাঁনবাহাদুর আগে আইস্যা বইস্যা থাইকলে মুখদেখান যাবে না। যোগামা—'

এ-বাড়িতে কোনো আড়াল তৈরি করা খুব কঠিন। যোগামা ঘোমটায় গলা ঢেকে বাইরে আসে। 'তুই কি আগৈলঝরা থিক্যা আইজ খাগবাড়ি যাইবি, বাপ। তাইলে ঐখান থিক্যা খবর দিলে হয় যে তুই যাবিনি আইজ—'

যোগেনের বাবা রামদয়াল তখন আখার সামনে উঁচু হয়ে কাঠকয়লার একটা জ্বলন্ত টুকরো তোলার চেষ্টা করছিল ভাতের হাতা দিয়ে। তার বাঁ হাতে ছিল হুকোটা—কলকেসহ। যে-কারণেই হোক, আখার ভিতরের গরম ছাই উড়ে তার মুখে পড়ছিল। সে তাড়াতাড়ি মুখটা সরিয়ে নেয় আর ভাতের হাতটা পড়ে গেল আখার মধ্যে। সেটা এমন কিছু ঘটনা নয়, যে-কেউ দুই আঙুলে তুলে আনবে হাতা। কিন্তু রামদয়ালের তো আগুনটা তোলা হল না। এখন তামাক জ্বালাবে কী করে। লাভের মধ্যে আখার গরম ছাইয়ে মুখে লাগল ছেঁকা।

যোগামা-র কথা শুনে রামদয়াল তার রোগা শরীরে একটা এমন ঝাঁকি দিয়ে খাড়া হয়ে ওঠে যে হুঁকোর মাথা থেকে তার না-জ্বালানো কলকেটা ছিটকে মাটিতে পড়ে। ফাঁকা হুঁকোটাই শূন্যে তুলে রামদয়াল চিৎকার করে ওঠে, 'যাইতত হোগায়ায়ানি কথা। কী, না, জামাই যাইব মিটিঙে আর শ্বশুরবাড়িতে খবর দিবে জিভ ভাড়া দিব। সব্যতা সমাজ কিছু তার থাইগ্‌লে সব হোগায়—'

এমন আচমকা চিৎকারে ঐ ভিড়ের কিছু এল গেল না। ভিড়টা তো ছোটও না। বরিশাল থেকে যোগেনের সঙ্গী সাত-আটজন, এখানকার সঙ্গীও দু-একজন, বাড়ির বৌরা, চ্যাংড়াপ্যাংড়ারা, খুড়ারা। তারমধ্যে যোগামা-যোগেনের কথা শুনে যোগেনের বাপ রামদয়াল এমন চুর রাগ রাগল কেন, সেটা কারো জিজ্ঞাস্যই না। জামাই নিজেই শ্বশুরবাড়িতে খবর পাঠাচ্ছে যে সে রাতে ওখানে থাকবে—এর মধ্যে সমাজ-সভ্যতা লংঘনের কিছু নেই। সেটাই যখন ঘটবে, তখন আগাম খবরটা দেয়াই তো ভাল—বামুনঠাকুররাও তো তাই দেয়। আর বৌ তো পোয়াতির সময় বাপের বাড়িতেই চিরকাল থাকে। যোগেনের বৌ কমলার তো এখন ভরা মাস। এতদিন পর এসে বৌয়ের সঙ্গে দেখা না করে চলে যাবে। এটা আগেই ঠিক করা আছে যে আগৈলঝরার মিটিং থেকে যোগেন যাবে খাগপুরে।

যোগেন পকেট থেকে দশটাকার নোট কিছু বের করে যোগামাকে দিয়ে বলে, 'এইহানে পাঁচকুড়ি থাইকল। বাড়িতে গুড়া-বুড়া-মাইয়াগ দুইবেলা ধানের বিচি জোটে তো যোগামা? তেমন দরকারে বরিশালে পেল্লাদদার খবর কইরো।' তারপর যোগামার কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলে, 'বৌয়ের কিছু টাকাপয়সা দিব্যার লাগব না?'

'লাগারই তো কথা। অ্যাহন তোমার পিরানে আর তার হাতে কী কথা হইব, বাপ, আমি জানি ক্যামনে? বৌরে খুশি দিয়ো। ভরপোয়তির বৌরা কীসে খুশি হয় তা তো তোমার এই

মায় জানে না রে বাপ।'

যোগেন গিয়ে বাপের কলকেটা তোলে, তারপর তাকিয়ে দেখে তামাকটা পড়েনি। সে তামাকটা একটু টিপে দিয়ে আখার সামনে উবু হয়ে বসে। তারপর দেখে ভাতের হাতা আখার ভিতরে। সে আওয়াজ করে হাসতে-হাসতে পাঞ্জাবির হাতাটা গুটিয়ে, আখার ভিতর থেকে ছোট্ট একটুকরো আগুন, দুই আঙুলে তুলে এনে কলকিতে ফেলে, কলকির মুখটা চেপে নাড়াতে-নাড়াতে এগিয়ে বাপের কাছে গিয়ে তার হুঁকোটা নিয়ে কলকেটা পরিয়ে দিয়ে বলে, 'শ্বশুরমশায় তো মিটিঙে আইসবোই। তা নিমন্তন দিবে না? আমারে কইতে হবে ক্যা? যোগামা—বাবা ভাতের হাতা আখায় ফেইলছে। তুইল্যা রাখো।'

ওরা ডানহাতি ঘুরে নেমে যায়। সামনে যে-নৌকোটা পায়, তাতেই উঠে বসে। জলে নেমে কেউ নৌকোর কানা ধরেনি—তাই এক-একজন ওঠে আর নৌকা টলমল করে।'

নৌকোটা ছাড়ল কে সেটা দেখতে যোগেন একবার ঘাড় ঘোরায়—ষষ্ঠী, তার ছোট ভাগনে, লোকজন আছে বলে ইজের পরে আছে। ওদের আগৈলঝরার পথে চড়িয়ে দিয়ে ফিরে আসবে। খালেজলে গেলে আর কয় লগিঠেলার ব্যাপার? ষষ্ঠী বলে একটু হয়ত বেশি—তাই-বা কটা।

তাও কটা তো! পেটভরা। মাথার ওপরে শ্রাবণের মেঘের ঢাকনা নেমে আসছে। দশদিক এত খোলা থাকলে কোথাও-না-কোথাও থেকে হাওয়া তো একটু খেলেই। চোখ খোলা রাখে বঙ্গমাতার কোন কুসন্তান। যে-রাস্তায় নামার কথা, সেই জায়গা আসতেই ঘুমের জড়তা মাখানো গলায় যোগেন বলে, 'ষষ্ঠীবাবা, আমাগো আগৈলঝরায় নামাইয়া দে, বাবা। দুঃখ হবে রে?'

'না মামা, নৌকার মুখ ঘুরাই—' আট-দশ বছরের ষষ্ঠী, উলটোদিকে লগি মেরে, নৌকার মুখটা ঘোরায় ষাট ডিগ্রির মত।

নৌকোভর্তি তার বাপ-জেঠা-খুড়া, মামা-মাইস্যা-পিইস্যা, আর সদর থিক্যা আসা বড় মানুষদের মাথাগুলো নিজের-নিজের ঘাড়ের ওপরে একলা এক-একডা কাঁঠালের মতন দোলে। গাছের গোড়ার কাঁঠাল না—সেগুলো আর দুলবে কী করে। গোড়া থেকে যে ডালপালার ফেবরি বেরয়, তাতে ঝুলে থাকা কাঁঠালের মত। সেগুলো বাতাসে দোলে। ষষ্ঠী হেসে ফেলে। এক নৌকো বুড়া মাইনষেড়ে ষষ্ঠী দোল দিয়্যা ঘুম পাড়ায়নি?

ষষ্ঠী হেসে ফেলে বয়সের দোষে—গণ্ডা দুই-তিন পাকা আর টাউক্যা মাথারে ঘুমের ঘোরে দুলব্যার দেইখলে হাসি আসবে না আট-দশ বছরের ষষ্ঠীর?

পরমুহূর্তেই সে হাসি মুছে ফেলে তার কর্তব্যের ভারে সামনে তাকায় ও মাথা নিচু করে।

যে-জল ঠেলে নৌকোটাকে মাইল পাঁচ দূরে আগৈলঝরাতে নিয়ে যেতে হবে সেটা ঠিক খাল নয়—ধানক্ষেত। আবার, সবটা ধানক্ষেতও নয়, খালও বটে। ধানক্ষেতই হোক আর খালই হোক, এখন জল দেখা যায় না, জলের ওপরে নৌকোয় দাঁড়িয়েও না। কচি সবুজ ধানের বিস্তার জল ঢেকে দিয়েছে। সেই ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে লগি ঠেলে ছাড়া এগবার আর কোনো উপায় নেই। এ জল কার্তিকেও শুকোয় না, যদিও তখন জলের মধ্যেই ধানকাটা শুরু হয়ে যায়। ষষ্ঠীর বয়স আট-দশ। গ্রামের নিয়মেও ওর এখন অন্তত ক্লাশ ওয়ান-টুতে পড়ার কথা। ষষ্ঠী লগি ঠেলছে যে-বয়সে, পঁচিশ বছর আগে সেই বয়সে যোগেনের পাঠশালায় পড়াও শেষ হয়নি। বছর আটেক বয়সে সে জলিল মাস্টারের পাঠশালায় বসেছিল বটে—তারপর কী সব কারণে সেই পাঠশালাটিই বন্ধ হয়ে যায়। যোগেনকে তখন যোগামা-র ইচ্ছা ও জেদে আগৈলঝরার প্রাইমারি স্কুলে দেয়া হয়—লোয়ার প্রাইমারি, ক্লাশ টু পর্যন্ত। যোগেনের বয়স তখন প্রায় নয়-দশ—এই এখনকার ষষ্ঠীর মত। তাকে রোজ স্কুলে যেতে হত ডিঙি করে লগি ঠেলে।

তারপর তাকে দেয়া হল বড় স্কুলে—বার্থী হাই স্কুলে। সেখানেও তাকে যেতে হত লগি ঠেলে—মাইল-দুই-তিন। আজ যদি ষষ্ঠীকে, যোগেনের সেই বয়সের চব্বিশ-পঁচিশ বছর পরেও, ক্লাশ ওয়ানে পড়তে হয়, তাহলে রোজ পাঁচ মাইল লগি ঠেলে উত্তরে ঐ বার্থীতেই যেতে হবে। আট-দশ বছর বয়সে লগিঠেলা এমন কিছু কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়।

এখন এই শ্রাবণে একটা অসুবিধে হচ্ছে ক্ষেত ও খাল তো জলে একেবারে টুপটুপ। বাতাসের জোরে একটা স্রোতও বয় পশ্চিম থেকে পুবে—ঐ, ধানক্ষেতে যেটুকু স্রোত বয় সেটুকুই। তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু লগি তো ঠেলতে হয় স্রোতের আড়াআড়ি। পুরো না হলেও অনেকটা। তাতে দুটো-একটা খালমত ঢালে একটু অসুবিধে হয়, ঘন-ঘন লগি মেরে নৌকো সিধে রাখতে। ওরকম অসুবিধে তো সবসময়ই কিছু-না-কিছু থাকে। এখন তো আবার জলের নীচের ডোবা-আলে নৌকা আটকে যায় না! ষষ্ঠীর না-হয় ইজের পরে থাকার বয়সও পুরো হয়নি। কিন্তু কখনোসখনো পরার বয়স তো হয়েছে। তাতেও যদি সে তাদের সেই গ্রাম মৈস্তারকান্দি থেকে আগৈলঝরা মাইল পাঁচ ধানক্ষেত বেয়ে নৌকো চালানোর সময়মাফিক-সমস্যা বোঝার মত অধিবিদ্যা আয়ত্ত করে না থাকে—তাহলে ওকে কোনোদিনই আর কোমরের নীচে কাপড়ঢাকার সাবালকতায় পৌঁছুতে হবে না—মুখ দিয়ে লালা পড়বে, কথা সব জড়িয়ে যাবে, বাঁদিক কেতরে হাঁটবে আর দৃষ্টি হয়ে যাবে ঘোলা। যাকে বলে, 'আউলাইয়া গিছে'। বরিশালে কোলের শিশুকেও 'মা' ডাকার আগে জলস্থলের অধিবিদ্যা আয়ত্ত করে ফেলতে হয়, এখনো, যোগেন্দ্রনাথের বিদ্যাভ্যাসের পঁচিশ-পঁচিশ বছর পরও, সেই অপরিবর্তনীয়তাতেই ষষ্ঠী লগি ঠেলে আগৈলঝরা প্রায় পৌঁছে যায়।

লগি ঠেলতেঠেলতেই ষষ্ঠী বেশ মজা পাচ্ছিল—ধানের শিষ কানের মধ্যে, ঘাড়ে, গালে লেগে যাওয়ায় কেমন সুড়সুড়িতে নৌকোর কানায় যারা বসেছে, তাদের কেউ-কেউ বিরক্ত হয়েও আবার ঘুমিয়ে পড়ছে। আগৈলঝরার কাছাকাছি বোধহয় একটা বড় শিষই কারো নাকের ভিতর ঢুকে গিয়েছিল। সে এমন জোরে হেঁচে ওঠে যে নিজের হাঁচিতে নিজেই চমকে জেগে যায়, যে-দুচারটি ধানপাখি নৌকোর গলুইয়ে বসে কিচিরমিচির করছিল সেগুলো একঝাঁকে উড়ে যায় আর প্রায় সকলেই চটকা ভাঙে। যোগেন গলা না-তুলেই বলে, 'কী রে? আয়্যা গেলি।' বলে নৌকো থেকে নামতে দাঁড়িয়ে পড়ে।

ষষ্ঠী অনেক আগে থেকেই মনে-মনে হাসছিল—ঐ যখন কেউ ঘাড় বা কান চুলকোচ্ছিল। কেউ ভাবছে পোকা, কেউ ভাবছে মশা, কেউ ভাবছে খোঁচা। কেউই ভাবছে না—ধানের শিষ। ধানের শিষ এড়াতে তো গলুইয়ে বসে দু-হাতে ধানের গোছা সরিয়ে নৌকোর রাস্তা খুলে দিতে হয়—নইলে ধানের শিষের ধারে গাল কেটে, কান কেটে, চোখ কেটে যায়। এ ধানগাছের কতটুকু আর নৌকোর ওপরে ওঠে? যেগুলি ওঠে, সেগুলো হয়ত ধানগাছই নয়। শ্রাবণ-ভাদ্রের জলে শনশনিয়ে বেড়ে উঠলে ধানের শিষের, ধানের পাতার, ধার হবে শানানো। তখন আর মশার কামড় ভেবে দুই হাত চড়ানো যাবে না বা কড়ে আঙুলে কান চুলকোনো যাবে না।

হাসির ধাক্কায় ষষ্ঠীর লগি থেমে গিয়েছিল। যোগেন নৌকো থেকে নামার জন্য দাঁড়িয়ে ওঠায়, তার হাত থেকে লগি পড়ে যাওয়ার দাখিল—সে এমনই হাসতে থাকে। এইসব গোলমালে ঝিমুনো ভাব কেটে যাওয়ায় কেউ-কেউ হঠাৎ মনে করে বসে—সত্যি বুঝি কিছু গোলমাল ঘটেছে। তারা 'হইলডা কী, হইলডা কী' বলে চেঁচিয়ে ওঠায় ষষ্ঠী লগি ফেলে দুই হাতে পেট ধরে বসে পড়ে হাসতে-হাসতে।

খান বাহাদুর বললেন, তারপর প্রহ্লাদদা বললেন, তারপর কংগ্রেসের থানা কমিটির প্রেসিডেন্ট

বললেন, সেই সুবাদে লিগের থানা কমিটির প্রেসিডেন্টও বলতে চাইলেন। কে কী বলতে চাইছেন, সেটা বোঝা যাচ্ছিল না। এক খানবাহাদুর তাও কিছু রাস্তাঘাট, নদীনালার কথা বললেন। আর, সকলেই শুধু যোগেনের কথা বলে, 'আমাগো গৌরব', 'এই পরথম আগৈলঝরার মানুষ এমন উঁচা জায়গায় উইঠিছে,' 'নতুন সূর্যোদয়।' এইসব।

যোগেনের একটা উদ্দেশ্য ছিল এই মিটিং-ডাকার। তপশিলি জাতিগুলির শিক্ষাসংস্কৃতির জন্য পাঁচ লাখ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। সমস্যার মাপে টাকার পরিমাণ মাছের মায়ের চোখের জলের মত। পিপাসা অগস্ত্য-র আর জল বদনার অর্ধেক। যাদের শিক্ষার জন্য বরাদ্দ তারা জানার আগেই এ টাকার কোনো অবশেষ থাকবে না। সরকারের সেক্রেটারিরা একটা শর্ত লাগিয়ে খানিকটা সামাল দেয়ার চেষ্টা করেছে। সরকারের টাকা হবে ম্যাচিং গ্র্যান্ট। জিলার স্কুল ইনস্পেকটরের তালিকা অনুযায়ী গ্রান্টের যোগ্য তালিকা তৈরি হবে। স্থানীয়ভাবে যে-টাকা সংগ্রহ হবে, সরকার তার অনুপাতে টাকা দেবে। যোগেন চায় আগৈলঝরা ইস্কুলের জন্য টাকা তুলতে যাতে আনুপাতিক সরকারি টাকা আদায় করে স্কুলটাকে হাইস্কুলে উন্নত করা যায়। সভা ভেঙে গেলে যে যার মত চলে যাবে—কাউকে ধরাছোঁয়া যাবে না। এদিকে কলকাতায় যোগেন, অর্থমন্ত্রী নলিনী সরকারের সঙ্গে কথা বলে রেখেছে। উনি কথা দিয়েছেন—লোক্যাল কালেকশন ঠিকমত হলে, মানে, গবর্মেন্ট যদি বোঝে সব স্কুল ভূতের স্কুল না, তাহলেই উনি যথাসাধ্য সাহায্য করবেন।

যোগেন খানবাহাদুরকে বলে, 'এবার আমি কই?'

'তুমি কয়্যা ফেইললে তো মিটিং শ্যাষ। সবাই তো তার লগেই বইস্যা আছে। কও কয়্যা ফেলাও। আমারও তো শুনাজানার ইচ্ছা।'

যোগেনের নাড়ীজ্ঞান নির্ভুল—বিশেষ করে মানুষজনের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে। আইনসভায় যে জননেতা হিশেবে তার এই শক্তির পরিচয় ততটা কেউ আন্দাজ করতে পারেনি, তার সবচেয়ে বড় কারণ সে তো কোনো পার্টির মূলধন খাটাচ্ছে না। মাত্র মাস চারেকেই সে তো নিজেকে আলাদা করে ফেলতে পেরেছে তার মতামতের সূক্ষ্মতা ও মৌলিকতা দিয়ে। সে এখনো কোনো পার্টি তৈরি করেনি, এ নিয়ে কোনো তাড়াহুড়োও তার নেই। তবু, সে তো এটুকু করতে পেরেছে যে মল্লিক ব্রাদার্সের মত কুলীন শিডিউল কাস্টরা ছাড়া অন্য সব সিডিউল কাস্ট এমএলএ তার ওপর অনেকটা পর্যন্ত ভরসা করে। জননেতার সম্মান সে কোনোদিনই কি পাবে? বংশ, শিক্ষা, জাত, পূর্ব পুরুষ, টাকাপয়সা, মেলামেশা—এইসব যা দিয়ে কিছু-হওয়ার জমি তৈরি থাকে তার একটিও তার নেই। তার আছে, যা থাকার কোনো দরকারই নেই। নিজের ওপর বিশ্বাস আর যে মানুষজনদের সঙ্গে তার সম্পর্ক সেই একটুকরো মানবসমাজেরও তার ওপর বিশ্বাস। সে বিশ্বাসের বাজারদর উঠলেই তার মালিক হয়ে উঠবেন—শরৎ বোস বা সারওয়ারদি বা শ্যামাপ্রসাদ বা নাজিমুদ্দিন।

এ তো শুধু যোগেন নয়, জননেতা হিশেবেই যারা জিতে আইনসভায় এসেছে—তারা তো আইনসভার ভাষাই জানে না। তাহলে তারা আইনসভাকে নেতৃত্ব দেবে কী করে? আইনসভাও তো জনসভার ভাষা বোঝে না। তাহলে আইনসভাই-বা জনসভাকে নেতৃত্ব দেবে কীভাবে।

সেই নাড়ীজ্ঞন নিয়েই যোগেন যেন হাল কাধের গুঁড়িতে আগুন লাগাতে চায়। না-লাগলে, লাগবে না। কিন্তু লেগে গেলে নিববে না।

'আমারে নিয়্যা আপনাগো যে গৌরব সেই কথা এতবার শুইনতে লজ্জা হয়। মায়ে কি তার ছাওয়ালের কোনো বড় কামের জইন্য গৌরব জানায়? যহন সীতারে বিয়্যা কইর‍্যা আইল

রামচন্দ্র, তহন কি রানী কৌশল্যা, রামচন্দ্রের মা, আইস্যা কইছিল, বাপ রাম রে, অ্যামন অ্যাডডা বৌ আইন্যা বাপ, আমার মুখ উজ্জ্বল করলি।

কইব ক্যামন কইর‍্যা? সারাডা পৃথিবীর মানুষ জানে যে রামচন্দ্রের থিক্যা উজ্জ্বল কেউ নাই, কেউ হয় না।'

যোগেন দেখে তার একেবারে নাকের নীচে বসে এক বুড়ি চোখের জল মোছে। বুড়ির চোখে কি সত্যি জল না ময়লা, তা স্থির করতে যোগেন বলে, 'জানে না শুধু তার গর্ভধারিণী মা? স্যায় তো রামচন্দ্ররে জানে—রামচন্দ্রের জন্মের আগে থিক্যা। তাই কৌশল্যা রানী কইলেন, বাবা রাম, মা সীতা, এতটা পথ আইস্যা তো তোমাগো দুঃখ লাগার কথা। যাও, হাত মুখ ধুইয়্যা এডডু জিরায়্যা ন্যাও। যা-ও।

'আপনারা সকলে মিল্যা তো আমার কৌশল্যা মা। সে পুরুষই হন আর নারীই হন—আমার মা।'

যোগেন দেখে তার নাকের নীচের সেই বুড়ি নিজের কান্না গোপন করতে দুই হাতের তেলো দিয়ে মুখ ঢাকল। তার মাথাটুকু কেঁপে-কেঁপে উঠছিল। বক্তৃতা করতে-করতেই স্বভাববশে যোগেনের মনে পড়ে যায়—একজনই শুধু কাঁদিল না—সে গত বছর সাগরসংগমে সন্তান-বিসর্জন দিয়াছে।

'মায়ের কাছে কুনো কথা গোপন করা যায় না। আমিও করব না। কইলকাতায় কী হইতেছে, তার কিছু খবর আপনাদের কানেও আইসছে। কিন্তু আসল খবরটা আরো বিপদের, আরো ভয়ের। কংগ্রেস হকশাহেবের সঙ্গে ভোটের আগের কথা ভাইঙ্গ্যা দিছে। তারা হকশাহেবর প্রধানমন্ত্রী কইরব্যার চায় নাই। তহন লিগ আইস্যা হকশাহেবের দখল নিয়্যা চাইর পাশ থিক্যা এক্কেরে বাইন্ধ্যা ফেইলছে। আর হকশাহেবের কৃষক-প্রজা ছালাফাটা বেগুনের নাগাল ছিটকাইয়্যা পইড়ছে। কিন্তু আমাগো বিশ্বাস আছে হকশাহেবরে এডডু সময় পরেই ঘুইর‍্যা খাড়াব বাংলার বাঘ।

'অ্যাহন শুভ সংবাদ এইডা আমরা যারা শূদ্র, তাগো মইধ্যে এডডু মিলমিশ হইছে। আমরা শূদ্ররা তো নবাব-বাদশাগোরের কাছে অচ্ছুৎ। কিন্তু যারা সাধারণ মুসলমান মেম্বার, তাদের সঙ্গে আমাগো মিলমিশ হইছে। সেই বাদে আমরা আদায় করছি, সমস্ত চাকরিতে শুদ্দুরদের কোটা থাইকব্যার লাগব। আর শুদ্দুরপ্রধান অঞ্চলে সরকাররে হাই স্কুল কইর‍্যা দিব্যার লাগব। সরকার রাজি হইছে, কিন্তু এডডা শর্ত দিছে। এই ইশকুলের লগে বাড়ি জমি আর কিছু নগদ জমা দিব্যার লাইগব গ্রামবাসীদের। আমি রাজি হইছি আর এই ভেগাই হালদারের ইশকুলের নাম দিছি। ক্যা? না, ভেগাই হালদার আমাগো পিতামহ ভীষ্ম। যদ্দিন কুরুক্ষেত্রর যুদ্ধ চইলল, তদ্দিন শরশয্যায় শুইয়া থাইকলেন। রাত্রিবেলা তো যুদ্ধ নিষেধ। তাই, সারাদিনের শেষে আঁধারে গা ঘইষ্যা যুধিষ্ঠির আর দুর্যোধন বেবাক কুরু-পাণ্ডব যাইয়া তার লগে দেখা কইয়্যা জাইনতে যায় পরের দিনের যুদ্ধের কৌশল। সকলেই তো মহাবীর, যুদ্ধে তো সবাইগোর হাতেই কোনো-না-কোনো দেব্‌দেব্‌তার বর আর অস্তর। বিষ্ণুর বরের অস্ত্রকে কাইট্যা ফেলায় ব্রহ্মাস্ত্র। ব্রহ্মাস্ত্র কাইট্যা দ্যায় শিবাস্ত্র। শিবের একডা বরের অস্ত্র কাইট্যা দ্যায় আর-একডা বরের অস্ত্র। আর এ দিগে পিতামহ ভীষ্ম, আমাগো ভেগাই হালদার, হইতে পাইরত ভারতের সম্রাট, অ্যাহন শুইয়া আছে একা যুদ্ধের মাঠে। দ্যাবতাগো বরে তো ঘাড় নুইয়্যা যায়—কুনো বরই কাজে লাগায় না, এক ইচ্ছামৃত্যুর বর ছাড়া। আমাগো ভেগাইয়ের নিজের নাই এক ছটাক জমি, সেই জমি দান কইর‍্যা দিল এডডা ক্লাশ টু ইস্কুল কইরব্যার লগে। সেই ইস্কুলে আমি পড়ছি। আমি

আগৈলঝরা স্কুলের ছাত্র। কর্তাগো কার সুমতিতে সেই ইশকুলের ক্লাশ ফোর গেল কাটা। আবার ক্লাশ টু। আইজ দ্যাহেন স্কুলের দশা। পাছা বাঁচাইতে গরুও ঢুইকব্যার চায় না। কিন্তু চাকরির কোটা আদায় কইর‍্যা লাভ হব কী, যদি আপনাগো ছাওয়াল-পাওয়ালগো লেখাপড়া না শিখান। ধরেন, আইজ যে-ছাওয়াল ক্লাশ ওয়ানে পড়ব—এইসরকার থাইকতে-থাইকতে তো স্যায়া ক্লাশ ফোরে উঠব। তালি তো এই স্কুলড্যাক অন্তত ক্লাশ ফোর বানাইব্যার লাগে। দুই বছরে ক্লাশ ফোর হইয়া গেলে ক্লাশ সিক্স, মডেল স্কুল খুইলবার লাগব। তার বাদে হাই স্কুল। বানাইব কেডা? শিখব যার বেটা। জমিদার বা সরকার তাগো বাপ ঠাকুরদার নামে স্কুল বানাইবে আর সেই স্কুলে পইড়ব আমাগো নাতিনাতনি—স্যা সব দিন শ্যাস। পইড়তে যদি চাও নিজেরা স্কুল বানাও। সেই স্কুলে যদি মাস্টার আসে, ছাত্র আসে, পড়া আসে, লেখা আসে—তহন সরকারও আইসব। ভবানন্দ মজুমদারের বাড়িতই লক্ষ্মী ঢোকেন। গায়ের গয়নাগুলার ওজন ভাইবছেন নি? ভরি-র মাপে কুলাইবে না, মণের মাপ লাগব। মা-লক্ষ্মী সোনার গন্ধ পান। আমাগ ভবানন্দ মজুমদার হব্যার লাগব। আমাগ নিজের পকেটের টাকা দিয়্যা এই স্কুল তৈরির শ্যাষে সরকারে খবর পাঠাইব্যার লাইগব—আমরা রেডি। এইবার লক্ষ্মীরে পাঠাইন—ডাকাইতের ভয়ডর নাই। তাই আইজ আমরা নিজেরা চান্দা দিব, চান্দা তুইলব, জেলখাটা আসামির তুল্য ছাত্রছাত্রী জুগাইব—যাইতে পুরা মেয়াদ খাটার আগে য্যান ছাড়া না পায়। আপনারা জিগ্যাইব্যার পারেন—এমন ইস্টিমার ফ্যালের ডরে নোরপাড়ার কাম কী? কামডা এই যে সত্যি-সত্যি ইস্টিমারডা আইসছে। সরকার এইবারের বাজেটে অনুন্নত সম্প্রদায়ের বসবাসের জায়গায় স্কুল তৈরির জইন্য পাঁচ লাখ টাকা বরাদ্দ করছেন। মাত্র পাঁচ লাখ টাকা দেখতে-না-দেখতে ফুড্রুত হইয়া যাবে। পরের বছর যে এই বরাদ্দ থাইকবেই তার তো কুনো ঠিক নাই। তো আমাগো হাতে তো টাইম নাই। ইস্টিমার তো ছাইড়ব্যার বাঁশি বাজাইল বইল্যা। আমাগো এড্ডা স্কুল তো আছে, ভাঙাচোরা যাই হোক। সেই স্কুলডার সঙ্গে মহাত্মা ভেগাই হালদারের নামডাও তো জড়ান আছে। আমরা যদি একডা তহবিল এখনই তৈর কইরব্যার পারি, তালি কইলকাতায় ফির‍্যাই আমি শিক্ষামন্ত্রীরে কইব্যার পারব—আমাগ স্কুল তৈরি আছে, আমাগ তহবিল তৈরি হইছে, তাইলে আমাগ ক্লাশ ফোর পর্যন্ত খুইল্যা দেন আর আমাগো অর্থ সাহায্য করেন। একডা শর্তে আমরা কমতি আছি। সেইডার দায়িত্ব আপনাগো নিব্যার লাগব। স্কুলের ছাত্র বাড়াইয়্যা তিনগুণ করা লাগব। মিথ্যা কইর‍্যাও যদি কই অ্যাহন ছাত্র শখানেক তাইলি সামনের পূজার ছুটির মুখে সেডা সত্যিকারের তিনশ কইরব্যার লাইগবই। না হইলে দ্যাশের সম্মুখে আমার মুখ থাইকব না। আমি এই তহবিল গঠন বাবদ খান বাহাদুরের নিকট আমার বাপের নামে আর আমার শ্বশুর বাপের নামে মোট আড়াইশত টাকা জমা কইরল্যাম। টাকাডা আড়াইশ ক্যান হইল, তার জবাব সঙ্গে আমার আর টাকা নাই। কইলকাতায় ফিরার খরচাপাতি ধার কইরতে লাগব।' পকেট থেকে টাকা বের করে খানবাহাদুরের সামনে রাখতেই যোগেনের শ্বশুর খাগবাড়ির প্রহ্লাদচন্দ্র বারুই দাঁড়িয়েই উঠে তার তপনের পকেট থেকে টাকা বের করে খানবাহাদুরের সামনে রেখে বলেন, 'আমার জামাই শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল বিএ, বিএল, এমএল-এর নামে তিনশত টাকা জমা দিলাম।' এরপর একের-পর-এক মাতব্বর দাঁড়িয়ে তার চাঁদা ঘোষণা শুরু করল।

দেখতে-দেখতে এক-একজনের ওঠা, চাঁদা দেয়া এই সবের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা এসে পড়ল। সবাই সভার দিকে তাকিয়ে টাকা ঘোষণা করছেন, তারপর সেটা খানবাহাদুরের হাতে দিচ্ছেন আর প্রহ্লাদ একটা কাগজ ডামি কাগজের মত ভাঁজ করে দাতার নাম ও টাকার অঙ্ক লিখছেন।

খানবাহাদুর আবার নেয়ার সময় টাকা গুনেও নিচ্ছেন। দু-একবার জিজ্ঞাসাও করলেন, 'কত য্যান?'

চাঁদা-আদায়ের শেষে যোগেন খানবাহাদুরকে বলে, 'সবাই তো আইজ সঙ্গে টাকা নিয়্যা আসেন নাই। পরের একডা দিন ঠিক করেন—চান্দা আর ছাত্তর একসঙ্গে জমা হবে।'

খানবাহাদুর সে-কথা জানাতে দিন নিয়ে কথা শুরু হল। কেউ একজন জিজ্ঞাসা করল—সেদিন যোগেন থাকবে কী না। যোগেন বলল, 'শ্রাবণের মাঝামাঝি পর্যন্ত তো থাহারই কথা।' সেই কথা খেয়াল রেখেই দিন একটা ঠিক হল। খান বাহাদুর গলা তুলে জানায় 'আমাগো প্রহ্লাদবাবু হিশাব কইর‍্যা ফেলছেন, আইজকার মোট আদায় সাতাইশ শত টাকা—'

'প্রহ্লাদবাবুরে আর-একবার গুইনতে কন। এতগুলা টাকায় কি সাতাইশ টাকা হবার পারে?'

খানবাহাদুর দুই হাত তুলে চেঁচিয়ে বলে, 'সাতাইশ শ। সাতাইশ শ। দুই হাজার সাত শ! আমার মতন বয়স হোক, দাঁতগুলা পইড়লে বুইঝব্যা দুইডা শ' একত্রে বলা কত কঠিন। যারা আইজ দিতে পারেন নাই, তাগো দিন ধার্য হইছে—শ্রাবণের এগার, এইখানে।'

সভা তখন ভেঙে যাচ্ছে। পণ্ডিতমশায় পেছন থেকে বলে ওঠেন, 'আমার এড্ডু নিবেদন আছে।'

খানবাহাদুর তাঁকে ডাকে, 'আসেন, আগাইয়া আসেন।'

পণ্ডিতমশায় খানবাহাদুরের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, 'খানবাহাদুরশাহেব, যোগেন আরো-আরো সবাই কইছেন, যারা আজ চান্দা দিছে আর যারা পরের দিন চান্দা দিব তাগ কথা। কিন্তু এই দুই দলকে ছাইড়্যা দিলেও তো একডা দল থাহে। সেই দলডা, পছন্দ হয়, এই দুই দল মিলাইলে যত জন হয়, তারও থিক্যা বেশি।'

পণ্ডিতমশায় থেমে যান আর লোকজন পণ্ডিতমশায়ের দিকে তাকিয়ে একেবারে চুপ করে থাকেন। বেশিরভাগই দাঁড়িয়ে, কেউ-কেউ বসে। নৈঃশব্দ্যটা তাঁর আকাঙ্ক্ষিত পরিমাণে পৌঁছুলে পণ্ডিতমশায় বলে ওঠেন, 'সেই তৃতীয় দলটা হচ্ছে আমাগ নিয়্যা, যারা আইজও চাঁদা দ্যায় নাই, পরের দিনও চাঁদা দিবে না, ইহকালেও দিবে না, পরকালেও দিবে না। কারণ? কারণ, চান্দা দেয়ার পয়সা আমাগো কুনোদিনই নাই, কুনোদিনই হব না, পরজন্মেও হব না।'

মিটিঙের লোকজন ততক্ষণে মজা পেয়েছে।

'কিন্তু আমরা যদি চান্দা না দেই তাইলে এই জাগরণ, এই উৎসব মিথ্যা হইয়্যা যাবে। বিশ্বের কাছে যিনি আমাগো মনের কথা কইয়্যা আমাগো সম্মান ফিরাইয়্যা দিছেন সেই কবি বইল্যা দিছেন—তবে মিছে সহকার শাখা, তবে মিছে মঙ্গলকলস। তাই আমরা এই গৌরন্দি-আগৈলঝরা-বাখরগঞ্জ-বরিশালের সর্বত্র আমাগ সব মাইনষের কাছ থিক্যা ভিক্ষা কইর‍্যা পয়সা আইন্যা দিব। একডা লাল পয়সা দিলেও আমরা সেব্যা দিয়্যা নিব। আর, আমরা বিশেষ কইর‍্যা গৌরনদী আর আগৈলঝরা থিক্যা ছাত্তর আইন্যা দিব আর নিজেরা পাহারা দিব সে ছাত্তর য্যান না পলায়। কুনো বামুনবৈদ্য জমিদারের বাপঠাকুরদার নামে না। আমাগো ভেগাই হালদারের নামে আমরা ইশকুল কইরব। সে-ইশকুল থিক্যা কোনো পলায়ন নাই। জয় ভেগাই হালদারের জয়। এই ইশকুলের লগে একডা কিছু আমাগো দিব্যার লাইগবো—

টাকা থাইকলে চান্দা দ্যাও,
না থাইকলে ভিক্ষা করো,
ছাওয়াল থাইকলে ছাওয়াল দ্যাও,
না থাইকলে পয়দা করো।'

মিটিঙের মানুষজন এতে খুশি জানাল হৈহৈ করে নানা আওয়াজ তুলে। একজায়গায় জড়ো হওয়া—সবসময়ই যেন উৎসব।

শ্বশুরবাড়িতে যোগেন

৫৫

আগৈলঝরার মিটিং সেরে শ্বশুরমশায় আর তাঁর লোকজনের সঙ্গে খাগবাড়ির নৌকোয় উঠে যোগেন হাতের ঘড়িতে সময় দেখে সাতটা কুড়ি, মানে সূর্যাস্তের পর এক ঘণ্টার ওপর, মানে এই মিটিঙের সুবাদে আগৈলঝরায় রাত্রির প্রথম প্রহর ঘণ্টাখানেক লেট, মৈস্তারকান্দিতে দ্বিতীয় প্রহরও পার হয়ে গেছে। যে দুটি-একটি লণ্ঠন, একটি পাটের মশাল আর কয়েকটা কুপি আর এইসব আলো ও ছায়ায় গুণিত মানুষের ভিড় যোগেনকে নৌকো পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিল, নৌকো খুলতে না-খুলতেই সে-সব যেন মুহূর্তে মুছে যায়। যোগেনের নৌকোই বের হয়ে গেছে ঐ আলোর প্রতিবিম্ব থেকে। এখন শুধু দেখা যায় অসম আকারের আলোবিন্দুর বাঁকা রেখা।

আগৈলঝরা থেকে খাগবাড়ি একটু পুব কোণে। মৈস্তারকান্দি থেকে সময় কম লাগে। একটা ডাঙা জমি ঘের দিতে গিয়ে একটু দেরি হয়। অন্ধকারে অন্ধকার ডাঙাটাকে মনে হয় যেন দিগন্ত। গাঁয়ের নাম ভুলকাঠি। নাম নাকী আসলে ফুলকাঠি। বরিশালি জিভে প, ফ, কিছুই খেলে না। তাই হয়ে গেছে, ভুলকাঠি।

খাগবাড়িতে বারুইদের ঘাটে নৌকা লাগতেই নৌকোর ভিতর থেকে কেউ চেঁচায়, 'আরে, আছে কেডা, আলো দেহাও।' দু-একজন লাফ দিয়ে নেমে যায় নৌকো দুলিয়ে। তাদের পায়ের মাপ আছে—এক যদি এর মধ্যে জোয়ার খেলে গিয়ে না থাকে। আর, থাকলেই-বা কী, বড় জোর একটা চুবান।

ঘাটে আলো আসতে একটু তো দেরি হবেই।

'যোগেন, বইস্যাই থাহো, খাড়াইয়ো না—'

যোগেন একটু আওয়াজ তুলে হাসে, 'বইস্যাই আছি, শুইয়্যা পড়ি নাই।'

আলো আসছিল। গাছপালার মাথায় খুব হালকা একটা ভেজা আলো ধানক্ষেতের জলের মত কাঁপছিল। সেই আলোটাই দুলছিল না এই নৌকোটাই দুলছিল—বোঝা যায় না। বুঝতে-না-বুঝতেই আলোটাতে মানুষের স্বর লাগে আর ঘাটটাকে উদ্ভাসিত দেখায়। জল তো নীচে। সেই নীচের কয়েক ধাপ গড়াতেই আলো যায় ফুরিয়ে কিন্তু নৌকোর জলের এদিকে-ওদিকে-সেদিকে দুটো লণ্ঠনের শিখা ভেঙেচুরে ডুবে যেতে থাকে।

পাড় থেকে মেয়েদের কারো গলা এল, 'এবার কি সত্যি জামাই? নাকী এবারও জামাইয়ের খবর?'

'সে আবার কী? গোটা এডডা জামাই নিয়্যা আইল্যাম, স্যায়ের ভারে নৌকা ডুইবতে ডুইবতে ভাইস্যা আইল হাঁসের নাগাল। অ্যারেও যদি কও জামাই না, জামাইয়ের খবর, তাইলে জামাই আইনব্যার জইন্য গয়নার নাও পাঠাইয়ো।'

'ঠাউরবেটা, মিছা কই না। স্যায় ধরো দুপুরের পর থিক্যা অ্যাহের পর অ্যাহ খ্যাপ আসে

আর কয় আপনাগ জামাই আইসবে মিটিং সাইর‍্যা, আপনাগ জামাই আইসবেন মিটিং থিক্যা, আপনাগ জামাই ছাইড়ছে মৈস্তারকান্দি, আপনাগ কেউ গেছে নি আগলঝারা। শ্যাষে দিদি কইল, জিগা-না, কেথ্থন আইসছে। আমি চিক্কুর দিল্যাম, 'মাঝি, কইয়্যা য্যান, আইলেন কোথথন্।' কইল য্যান কিছু। শুইনব্যার পাইল্যাম না।'

'তারপরেও না আইল দুই পাক?'

'তাতে কি তোমাগো ক্ষতি হইছে কুনো? খবর দিছে। খবর শোনো।'

'আমারাও তো সেডাই ভাবব্যার ধইরছি দাদা, ক্ষতি কইরলাম নাকী কিছু? আমাগ কি নৌকা পাঠাইতে কইল? না, মানুষ পাঠাইতে কইল?'

'বাব্বা, আমাগ অম্লা যে শ্বশুরবাড়ি কইর‍্যা বুদ্ধিশুদ্ধি, অ্যাককেরে পালটি জোয়ারের ধাক্কায় হোলগা ঘাসের নাগাল, ফনফনাইয়া বাইড়ায় আইনছে। মানুষ কইল না নৌকা কইল?'

এইসব কথাবার্তার মধ্যেই নৌকো থেকে নামা, ঘাট বেয়ে ওঠা, ঘরের দিকে যাওয়া ঘটছিল। এসব কথা তো মুখের দিকে তাকিয়ে হয় না, স্বর চিনে হয়। সূর্যাস্তের পর যেটুকু সময় জাগরণ, তাতে তো কেউ কারো মুখ দেখতে পায় না, শুধু স্বর শুনতে পায়। স্বর যদি কেউ না তোলে তাকেও শুনতে পায়। জন্ম-মৃত্যু আপদ-বিপদের তো আর আলো-অন্ধকার নেই, বেলা-কালবেলা নেই। আপদ-বিপদের প্রধান যেটা, ডাকাতি, সেটা খাগবাড়িতে হয় না। বরং এদেরই কেউ-কেউ বছরে দু-একটা ডাকাতি করতে বেরয়। পেটের ছেলে বেরবার তো আর রাতবিরেত নেই। জন্ম যদি নেহাৎ ঘটতেই থাকে তাহলে কুলসুখ বা তার মাকে ডাকতে হয়। রাতবিরেতে এখন কুলসুখই বেরয়—ওর তালাক হয়ে যাওয়ার পর থেকে। খাগবাড়ির মত একমুঠো গ্রামে পেটের সব বাচ্চাই তো আর রাতেই বেরয় না। বা, একই রাতে দু-দুটো পেট থেকে তো আর বাচ্চা বেরয় না। মৃত্যু যদি অন্ধকার বেলায় হয়, তাহলে আর কী, যেন মরণ হয়নি ভেবে নিয়ে অন্ধকার কাটিয়ে দিতে হয়।

এদের রোজকার অভ্যেস থেকে আজ রাত তো বেড়েইছে, এমনকী জামাইয়ের আসার মত উপলক্ষের পক্ষেও, এমনকী, এমএলএ জামাইয়ের মত ব্যতিক্রম উপলক্ষের পক্ষেও। বাড়ির দুয়ারে ঢুকে আবছায়া দাওয়াগুলিতে লোকজন-বসতে না-বসতেই, লম্বা সরু মাটির দাওয়ায় দরজার এক পাশে একটা, আর-এক পাশে একটা, আসন পেতে আর বাকি দাওয়া খালি রেখেই, দাওয়াজোড়া খাওয়ার জায়গা পড়ে। এ সমাজে খাওয়ার জায়গা সাজানোর কোনো রীত নেই। আইল যেহানে খুশি বইল, ভাত-ডাইল্-তরকারি-মাছ এক শানকিতে বা বাটিতে দেয়া হইল, গাবুরগবুর খাইয়্যা, শানকি ধুইয়্যা রাইখ্যা ঢকঢকাইয়া এক প্যাট জল খাইয়্যা যেহানে যাওয়ার দবদবাইয়্যা গেল। বারুই বাড়িতে জামাইখাওয়ানোর জন্য এমন আয়োজন। কেউ কেউ দুয়ারে দুই পা ফাঁক করে মাঝখানে কলাপাতা নিয়ে বসে গেছে। জলের একটা চুমকি, মাটির, জামাইয়ের আসনের সামনের বাঁশের গোড়ায়। ওটা থেকেই সবাই ঢকঢকিয়ে জল খায়। বারুইমশায় সম্পন্ন মানুষ, পুরো গ্রামেই চেনাজানা আছে। একটা বড় মাটির হাঁড়ি, ভাতের, দুইজন ধরাধরি করে দাওয়ার তলায় রাখে।

এই-যে লোক খাওয়ানোর আয়োজন, দাওয়ায় লাইন পেতে বসা, পাতে-পাতে পরিবেষণ, একটুআধটু যাচন—এসব বড় জাতের কাছ থেকে শিক্ষা। বামুনবাড়ি-বদ্যিবাড়ি-তেমন-তেমন কায়েতবাড়ির সঙ্গে বিশেষ করে নমশূদ্রদের জীবনের এত মাখামাখি যে ছোঁয়াছুঁয়ির মত কঠিন রীতিকানুনও দুইপক্ষই এমন অগোচরে মেনে চলে যে তা থেকে কোনোরকম ঠোকাঠুকি লাগে না। কত বছর থেকে এই লেনদেন চলে আসছে যে নমশূদ্রদের মধ্যে অনেকেই, মেয়ে-পুরুষ

যাই হোক, বয়েস যাই হোক, অনেকেই এমন একটা কল্পনাকেই জীবনযাপনের আধার বলে অচেতনে মেনে নেয়—বামুন-শুদ্দুরের একটাই জীবন, শুদ্দুরের কাজ না পেলে বামুনের পেট ভরবে? আর, বামুনদের ছায়া না পেলে শুদ্দুরের শ্বাস বইবে? ছুঁত-অচ্ছুত, জলচল-জলঅচল, ছোঁয়াছুঁয়ি, খাওয়া-দাওয়া এইসব এত শ শ বছর ধরে এমন পাকাপোক্ত ঠিক হয়ে আছে যে বামুনেরও মনে থাকে না, শুদ্দুরেরও মনে থাকে না, সীমা একটা আছে। মনে থাকে না কারণ তারা কেউই এটা শেখেনি, সবারই এটা অভ্যাস। কোন্ এমন বামুনদের গাঁ আছে কোথায়, যে গাঁয়ের বামুনদের ছাওয়াল-পাওয়াল শুদ্দুর মাদের বুকের দুধ ছাড়া চার-পাঁচ বছর বেঁচে থাকে, শুদ্দুর মায়ের হাতে বানানো মুড়কিমোয়া খায় না? কী-যে খায় না, তার লিস্টি এত ছোট ও গোপন যে দুইপক্ষের কোনোপক্ষ না-জানলেও লঙ্ঘন হয় না। এমন একটা ওতপ্রোত জীবনযাপনে অস্পৃশ্যতা বামুনদের দিক থেকেও এত অবান্তরও যে সত্যি একটা সমগ্র জীবনেরই মায়া তৈরি হয়। খুব নিবিষ্ট বিচারে কারো মনে হতে পারে—তাহলে জাতপাত নিয়ে এত কথা যে ওঠে, বামুনরাও যে কখনো-সখনো স্পর্শদোষে পতিত হয়, শূদ্ররাও যে অনেক সময় স্পর্শগুণেও উন্নত হয় না—এসব কি জীবনযাপনের বাইরে? এমন প্রশ্নের উত্তরেও কারো মনে হতে পারে, এই জীবনযাপনেরই ভাগিদার কারো মনে হতে পারে—বোধহয় তাই, এটা সত্যিকারের জীবনযাপনের বাইরেরই ব্যাপার। কিন্তু কত কাল যে এই ভিতর-বাহির আছে তা কারো জানা নয়। সেই অনন্তকালই হয়ত একটা ফাঁক চাঁদের আলোয় ছায়ার মত আবছা হয়ে আছে—চাঁদ আস্তে পারলেই ছায়ারা চলে যাবে। কত কত হাজার বছর ধরে চন্দ্রাস্ত ঘটে গেল, ছায়া ঘুচল না। যেন, ওটা ছায়া না। ওটা বিন্ধ্য পাহাড়ের নমস্কার। সীমানা। বাহির বাহিরেই ও ভিতর ভিতরেই থাকবে। ব্যবধান ঘুচবে না।

জীবনযাপন মানে তো খাওয়াপরা, ছেলেপেলের জন্ম দেয়া, ছেলেপেলে বড় করা, ছেলেপেলেদের শিক্ষা দেয়া—বামুনরা শেখায় লেখাপড়া, শুদ্দুররা শেখায় জাতকর্ম—স্বামী-স্ত্রীর মেলামেশা—এর কোন্ একটা কাজ বামুনবাড়িতে শুদ্দুর ছাড়া চলে? পুরুষরা কর্তার খাশ জমির কৃষানি থেকে কর্তার ডাকা নদীর জেলেগিরি পর্যন্ত কী কাজ করে না? আর মেয়েরা? রান্নাঘরের বারান্দা থেকে বামুনমার কথামত হলুদ বেটে, জিরে বেটে, পেঁয়াজ বেটে, রসুন বেটে, আদা বেটে, ডাঁটা কেটে, ডাঁটার আঁশ তুলে, লাউয়ের খোসা কুচি করে, মোচা কুচি করে—এক-এক নমশূদ্র মেয়ে এমন ওস্তাদ হয়ে ওঠে যে রান্নাঘরের চৌকাঠটা কার্যত উবে যায়।

এই সত্য আর এর বিরুদ্ধে পালটা অসত্য তো একসঙ্গেই চলতে থাকে। বামুনবাড়ির রান্নাশালে শুদ্দুরনী ঢোকে ক্যামনে? যদি-বা ঢোকেও, আগুন ছোঁয় ক্যামনে? যদি-বা ছোঁয়ও, জল ঢালে ক্যামনে? আর যদি ঢালেও, সেই রান্না সাজাইয়াগুছাইয়া ঢাইক্যা-ঢুইক্যা রাখে ক্যামনে? আর যদি রাখেও, সেই ঢাকা খুইল্যা সেই খাদ্য বামুনবাড়ির মাইয়া-বৌরা তাগো বাপ-স্বামী-ছেলের পাতে তুইল্যা দেয় ক্যামনে?

আরে, এইসব কি আর মুনশেফের হুকুম নিয়ে হয়, কিন্তু হয়। বড়-বড় সব বাড়িতে তো রান্নাঘরের কর্ত্রী একটা পোস্ট। আর ভিতরবাড়ির কূটনীতিতে এক বিন্দুও রোম্যান্স নেই। জমিদার বামুন-বদ্যি-কায়েতের অন্তঃপুর প্রতি মুহূর্তে রক্তাক্ত। এতটা রক্তাক্ততা সত্ত্বেও সেখানে কোনো নাটক নেই।

সময় মত ও দরকার মত কর্তার কোনো বোন বিধবা হয়ে দু-চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে এসে থাকে। বা, গিন্নির কোনো মামাতো ভাইও সংসারসহ এসে পড়তে পারে। বা, কর্তাদের কোনো এক ভাই আধপাগলা, আধা সন্ন্যাসী, উদাসী, স্বদেশী, থাকতে পারে। বিয়ের আগে থেকেই

সে এরকম। বিয়ে দিলে এসব সেরে যায়—ধারণায় তাকে বিয়েও দেয়া হয়। বিয়ের ফল ফলতেই থাকে। তখন তার বৌ নিজের স্বামীর, নিজের, নিজের ছেলেমেয়েদের ডালভাত নিশ্চিত করতে রান্নাঘরে গোখাটনি খাটতে শুরু করে। বামুনরা আসলে গতর সোহাগি। গতর যদি বাঁচাতে পারে, তাহলে দুটো ভাত জোটাতে তাদের আপত্তি নেই। আর সে ভাইবৌও তো বামনি। এগুলো হচ্ছে একান্নবর্তিতার সুবিধে।

এর অন্য প্রকারও আছে।

এই গিন্নি যদি কর্তার দ্বিতীয় বা তৃতীয় পক্ষ হন, যদি কর্তার ধাতে মেয়ের বিছন থাকে বেশি কিন্তু এই শেষ পক্ষে দু-চারটি ছেলে জন্মে গেছে, প্রমাণত নতুন গিন্নির ধাতে, যদি পুত্রবধূরা বাড়িতে ঢুকতে শুরু করে থাকে—তাহলে, গিন্নিমা রান্নাঘরের কালি-ঝুলি-তেল-তাপের মধ্যে থাকেন সেটা কর্তাবাবু চান না, গিন্নিমাও চান না। কিন্তু রান্নঘরের দখল কী করে ছাড়বেন? তখন, প্রথমত তিনি বৌমাদের সে-দায়িত্ব থেকে ছাড় দেন, 'তেল-ঝোল মেখে চেহারা নষ্ট করো না, চেহারাতেই পরিচয়', আর সেই বাটনা-বাটা শুদ্দুরনী চৌকাঠ ডিঙিয়ে রাঁধুনীও হয়ে যায়।

এই খেলাটা খেলতে, গিন্নিমার ইঙ্গিত বুঝতে, নমশূদ্র মেয়েরা ভালই বাসে। তারা এটা দশকান করে না যদিও দশকান হয়ে যায়। হয়ে যায় বটে কিন্তু তারা কেউ মাথাটি হেলায় না। তাদের হাতে যে বামুনবাড়ির সবাই খাচ্ছে, এটা তাদের একটা মর্যাদা দেয়, নিজের কাছে। বামুনের জাত মারা যাচ্ছে, গোপনে—এ থেকে তাদের ব্যক্তিগত বা সামাজিক কোনো জয়বোধ জাগে না। বরং তারা যেন অনেকটা বামনী হয়ে গেল—এই গৌরববোধটা তাদের হাঁটাচলায় এসে যায়।

এইসব বিনিময়—গোপন ও প্রকাশ্য—খাওয়ার জায়গা দেয়া, সাজিয়ে খাবার দেয়া, পরিবেষণ ইত্যাদি এ-সমাজে ঢুকে যাচ্ছে—সেটুকু যে পারে।

হাঁড়ির ভিতর একটা শানকি ডুবিয়ে ভাত তুলে দেয়া হচ্ছিল, যোগেনের পাতে। দিচ্ছিল দুই বৌ, ঘোমটা তাদের মাথার আধবরাবর।

যোগেন খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে বলে, 'আমার একডা সাফা-হওয়া আছিল—'

'সন্দডা না-জাইনলে সাফা হইবা ক্যামনে?'

'আমার হিশাবে তো সন্দ নাই। আমি তো এই বাড়ির এগার বছরের পুরানা জামাই।'

'হইল্যা। কেডা অস্বীকার দিচ্ছে? যে জবাব দিচ্ছে সে যেন এ-খেলার নিয়ম জানে।'

'এগার বছরে তো পুরানা জামাই ঘরজামাই হইয়্যা যায়।'

'তোমার কি হওনের ইচ্ছা? আমাগোরও অনিচ্ছা নাই। কিন্তু খাগবাড়িতে তো আইনসভা নাই'—সমবেত হাসিতে বোঝা যায় সবাই মজা পাচ্ছে।

'সে-কথা না। আমার বেলায় দেখত্যাছি আমি যতই পুরানা হয়্যা যাচ্ছি জামাই বইল্যা, আমার সঙ্গে ততই ব্যাভার করা হচ্ছে য্যান, আমি নতুন জামাই।'

'মানে কইতে আছ যে জামাইয়ের আদর কমে নাই। সে তো আমাগ গৌরবের কথা। তোমারও গৌরবের কথা যে তোমার শ্বশুরবাড়ি আদর কম্যাইয়া জামাই তাড়ায় না।'

'সে না-হয় এডডু গুমর হওয়ারই পারত। কিন্তু আমার তো ডর লাগে—'

'ডরের হেতু?'

'যে-রেটে আমারে আপনারা পুরান থিক্যা নতুন বানাবার ধরছেন, সেই রেটে তো দুই-চার বছরের মইধ্যে আপনারা বলাকওয়া শুরু কইরবেন—মৈস্তারকান্দির যোগেনের সঙ্গে আমাগ

মাইয়ার বিয়ার কথা চইলতেছে মাত্র, বিয়া হয় নাই। তহন আমি কী কইব?'

যোগেনের কথাটাতে একটু যে পেঁচানো রসিকতা ছিল সেটা একটু-আধটু আন্দাজ করলেও, সবাই ঠিকঠাক ধরতে পারছিল না। অথচ উত্তরের সময় বয়ে যাচ্ছে।

ফলে, এবার পালটাপক্ষ বদলে গেল। কেউ একজন নতুন গলায় বলে, 'এইডা তুমি কী কইল্যা যোগেন। এক বামুনের বিধবার এক পোলা আছিল। ঐ যেমন হয়, গায়ের রং ধলা আর এডড়ু হাবাগোবা। তার তো বিয়্যা হইল। দ্বিরাগমনে পাঠাইবার কালে মা ছাওয়ালরে উপদেশ দিল—মানুষজনের সঙ্গে এড্ডু-আধড়ু কথাবার্তা কস, নইলে তো তোরে বোবা ভাইবব। বেশি কথা কস না—তাইলে তো বেবাকে জাইন্যা ফেইলবে তুই বোগ্দা। তো সে ছাওয়াল শ্বশুরবাড়ি যাইয়্যা শ্বশুরের সঙ্গে আলাপে বইস্ল। সামনে-শ্বশুরবাড়ির বড় পুকুর। সেইদিকে চাইয়্যা-চাইয়্যা বামুনের পোলার ভাবোদয় ঘইটল। কয় যে, আচ্ছা শ্বশুরমশাই, এই-যে এত বড় পুকুর কাটাইছেন, এর এত মাটি কী কইরলেন। শ্বশুরমশায় জবাবে বলেন—বাবা, সে-মাটির অর্ধেক খাইছেন তোমার মায়। নাইলে এমন পণ্ডিত ছাওয়াল হয়? আর অর্ধেক খাইছি আমি। নাইলে তোমার হাতে মেয়ে দেই?'

হাসির কোলাহলে সবচেয়ে উঁচুতে উঠল যোগেনের গলা। যোগেনের গলার এ হাসি শুনলে মনে হয়—আষাঢ়ের মেঘ ডাকছে।

রোল থামলে যোগেন বলে, 'জবর কইছেন। কিন্তু আমি তো তা কই নাই?'

'কী কও নাই?'

'এই-যে এতখান খাল আগৈলঝরা থিক্যা এক-নৌকায় ছাগল গাদাগাদি হইয়্যা আইল্যাম, আমি তো একবারও বাবারে কই নাই—বাবা, দুইডা-একডা মাগঙ্গার বাহনের লাগইগ্যা খালে ফেলাইয়া দেন। কইব্যার তো পাইরতাম। কই নাই। বাবা, কইছি?'

বারুইমশায় খাওয়াতে ব্যস্ত ছিল, তাই প্রথমে ঘাড় নাড়িয়ে জানাল যে এমন কথা যোগেন বলেনি। তারপর ঢোঁক গিলে, মুখে বলল, 'না বাবা, কও নাই', তারপর আবার ঢোঁক গিলে আরো একটু পরিষ্কার গলায় বলল, 'কও নাই। সে তো তোমার আত্মরক্ষার কারণে। কইলে তো তোমার কথা রাইখব্যার লগে তোমারেই আগে খালে ফেইল্যা নৌকার ভার কমাইতে হত।'

এবার হাসির লহর উঠল, একবারে থামে না, বারবার নতুন করে ওঠে আর সব লহরেই যোগেনের গলা সবার ওপরে।

এক সময় হাসি থামে। সেই চুপচাপে মনে হয়—এই কথার খেলা বা লড়াই বোধহয় শেষ হল। ঠিক তখনই সকলে শুনতে পেল যোগেনের গলা, একটু নিচু স্বরে, 'এইডা একডা কথার মত কথা। কেডা জানে না যে মহাদেব যোগেন্দ্রনাথের শ্বশুর দক্ষ আর তার মুন্ডুটা—। থাউক, সর্বদা সত্য কওয়া ঠিক না, বিশেষ কইর‍্যা চাক্ষুষ সত্য।'

যোগনের কথায় আগের মত হাসি উঠল না বটে কিন্তু যে-হাসি উঠল তার সবটাই পরিণত বুদ্ধির হাসি।

'বাঃ বাঃ, বারুই, তোমার জামাইরে ঠেহানোর কেউ নাই। এ এক্কেরে কলির পরশুরাম। কবির দল গইড়লে দেখতা রাজেন সরকারের উপুর দিয়্যা যায়। ওকালতি কইরলে দেখতা জজশাহেবরে কানমলা দেয়। আর এই-যে মেম্বার হইছে সেইডার কাজকামের খবর তো জানি না—পসন্দ হয় সেহানেও ওর সমান কেউ নাই। হাতির নাগাল স্মৃতিশক্তি, ইন্দুরের মত দাঁত, শকুনের নাগাল চোখ আর বাঘের নাগাল ঘ্রাণশক্তি।'

'থাইমা গ্যালেন, তালে মশায়? প্যাটের কথা কইলেন না? ঐডাই নাহি আমার প্রধান ইন্দ্রিয়।

কিন্তু সেটা যে কোথায়—তা তো ট্যার পাই না। দেওয়া শ্যাষ না হইলে তো আমার খাওয়া শ্যাষ হয় না। সেই কথাডাই তো কইতেছিলাম। শ্বশুরবাড়ি হইলেও আমি তো এ-বাড়িতে অন্নসেবা করি নাই। যারা পরিবেষণ কইরতেছেন, তাগো হস্তসংবরণের অনুরোধ করি।'

যোগেনের স্ত্রী-সম্ভাষণ

খাওয়ার পর খালে গিয়ে মুখ ধুয়ে আসতে-না-আসতেই ফাঁকা।

৫৬

পাড়ার যারা, তারা তাদের বাড়ির দিকে চলে গেল। বাড়ির যারা তারাও কেমন আলগা হয়ে গেল। একটি মেয়ে এসে আলো দেখিয়ে যোগেনকে বাইরের দিকে একটা ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে জিগগেস করে 'কিছু আর লাগবে নি?' যোগেন দেখে, কাঠের চৌকিতে পাতা বিছানা, বালিশসহ। সে তাড়াতাড়ি বলে, 'কিছু লাইগব না। এডডু খাড়াও, এডডু—'

বলে সে পাঞ্জাবিটা খোলে, কোথায় ঝোলাবে খুঁজতেই মেয়েটি যোগেনের হাত থেকে নিয়ে দরজার পাশের একটা পেরেকে ঝুলিয়ে দিল। যোগেন ধুতির কষের বাঁধন একটু ঢিলে করে বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ে, 'তুমি তো আলো নিয়্যা যাব্যা? যাও গা। আমার আর-কিছু লাইগব না?'

'দরজায় খিল দিবেন না?'

'ও তুমি বাইরে থিক্যা শিকল টাইন্যা দিয়ো।'

চিৎ থেকে যোগেন কাত হয়। তার অভ্যেস অনুযায়ী এই কাত থেকেই কাল সকালে সে দাঁড়িয়ে পড়বে। সেই ঘুমটার ভিতর ঢুকে যেতে সে মাত্র এইটুকু ভাবতে পারে, 'ম্যায়-না আইছে তার বৌরে দেইখতে, পোয়াতি বৌ বৌ তো দেইখল না এমন অবস্থায় কি রাত্রিবাস নিষিদ্ধ। বিহানে দেইখব—'

কিন্তু তাকে রাতেই দেখতে হল, কুম্ভকর্ণের মত অসময়ে হঠাৎ জেগে উঠে। তার কীর্তিত সব ইন্দ্রিয়শক্তির গভীরতম নিষ্ক্রিয়তা ছাড়া তো এমন ঘুম আসতে পারে না। সেই ঘুমের ভিতর সে তাঁতির ঘরের নতুন শাড়ির গন্ধ পায়, আওয়াজও শোনে। তারপরই জেগে ওঠে। ঘরে খুব চাপা একটা আলো—হয়ত এমন আলো থাকেই এ ঘরে—লণ্ঠনের আলোতে তখন যোগেন বুঝতে পারেনি। যোগেন চমকায় না। শুধু ঘাড়টা ফিরিয়ে দেখে, 'আরে? তুমি? অনেকক্ষণ আইছ? ডাকছ? বসো। আলোডা রাহো কোথাও—'

কমলা দরজার কাছেই দাঁড়িয়েছিল, আলোটা তার মুখে পড়েছে। আলোর আভায় তার পেটটাকে দেখাচ্ছে ঢাউস। যোগেন বিছানা থেকে নেমে আলোটা ধরে। আর-এক হাতে কমলাকে ধরে, বাহুতে, বিছানায় এনে বসায়। পেটটা তাও একটু কম উঁচু লাগছে। যোগেন সারা ঘরে আলোটা রাখার কোনো জায়গা পায় না। শেষে, আলোর কেরসিন-ভরার জায়গাটাতে একটা ব্র্যাকেট পায়, পেরেকে ঝুলনোর মত। সে পেরেক থেকে তার পাঞ্জাবি খুলে ছুড়ে দেয় বিছানার ওপর, তারপর ডিমলাইটটা লাগিয়ে দেয়—লেগেও যায় লাইটটা, যেন প্রতিরাতেই এমন লেগে থাকে। যোগেন দুই হাত কচলে বলে, 'বাঃ'। কমলার দিকে ফিরে বলে, 'ঘুমাইতে আইসতে

এত দেরি যে আর-একজনের এক ঘুম শ্যাষ? না, ঘুম তো ঘুমায় জাগার লগেই। তোমার শরীর খারাপ না তো? শুইয়া পড়লে আরাম হইব? তায় শোও না, শোও।'

'না। আমি শুব না। মা কইছে এই সময় আপনার সঙ্গে শোয়া ভালো না।'

'পাইল্যা কুথায় আমারে? দেখাশোনাই হয় না, তার আবার শোয়ার শুভক্ষণ আর কালবেলা!'

'দেখাশুনা হবে ক্যামনে? আমার তো পাখা নাই। আপনি-যে সেই মাঘ মাসে চইল্যা গেলেন, তারপর ছয় মাস তো মানুষডার কুনো খবর নাই—'

'এমন তো হয়ই কমলা, যারা কইলকাতা কি ঢাকায় কি অন্য কোথাও চাকরি করে তাগো খবর তো নয়মাসে ছয়মাসে একবারই মেলে। ছাড়ান দ্যাও ঐ কথা। তোমার শরীর ভালো আছে তো?'

'অ্যাহন ভালো। প্রথম তিন-চাইর মাস খুব কষ্ট গিছে। বমি আর মাথাঘোরা। মায়ে আর কাহিমায় সারাইয়্যা তুইলল। আপনার শরীর গতি ভালো থাকে তো?'

'দেইখ্যা কী ঠাহর হয়?'

'খুব কি খাটনি?'

'তোমারে যদি কেউ শুধায়, প্যাটে বাচ্চা-ধরা খুব কি খাটনি—তুমি কী কইব্যা?'

কমলা যোগেনের দিকে চোখ তুলে তাকায় ও হাসে। বলে, 'আপনি বসেন', কমলা তার পাশের জায়গাটায় হাত রাখে।

যোগেন বসতে-বসতে বলে, 'আমি কই—বৌ দেইখতে আইল্যাম শ্বশুরবাড়ি, দেখি শুদু খুড়শাশুড়ি—'

কমলা হেসে হাত তুলে হাসি চাপা দেয়, 'আইলেন তো বেলা গড়াইয়া! আপনি কি মুখে-মুখে ছড়া বানান?'

'তুমি কি আমারে কবিগানের কবি ভাইবল্যা? ধু-র।'

'খাওয়ার সময় যে বেবাকরে হাসাইয়্যা ডুবাইলেন?'

'তুমি শুইনতাছিলা? হাসতেছিলা?'

'সবাই-ই তো। আমিও তো। মা-কাহিমারা কইতেছিল আপনার নাগাল বড়মানুষ হয় না—'

'বড় কী সে? খাওয়ায় না শরীরে?'

'বড় কাহিমা কইছিল—দেহা সুখ, খাওয়াইয়া সুখ, শুইন্যা সুখ—'

'তুমিও তাই ভাব? না, একডু বেশি ভাব?'

'বেশি আর কী ভাবব?'

'ধরো, ছুঁইয়্যা সুখ—'

'কমলা ফিক করে হেসে ফেলে বলে, 'পা দুইডা তোলেন।'

'ক্যা? পা ধইর‍্যা কি টাইনব্যা?'

'নিচু হইয়া সেবা দিতে আমার কষ্ট হয় না?'

'ও সেবা দিব্যা? দ্যাও'—যোগেন দুই পা তুলে জোড়াসনে বসে। দুই হাত দিয়ে তার দুই পা সাপটে কমলা প্রথমে কপালে, তারপর চুলে, তারপর সারা মুখে মাখে।

'সেবা য্যান এডডু বেশি ঠেহে—'

'মাইপলেন কী দিয়্যা? য্যান রোজই সেবা নিব্যার আয়েন—'

'রোজ আইলেও সেবা অ্যাই থাইকত?'

'থাইকত কি না-থাইকত সেডা মাইপবেন ক্যামনে আপনি? আপনার আগমন তো বছরে

একবার সূর্যগ্রহণ। সেডার তাও এডডা তারিখ পাঁজি-পঞ্জিকার থাহে। ঠাকুরগ থিক্যা জানা যায়। আপনারডা তাও যায় না।'

'যার যা কাম কমলা। ধরো আমাগো গাঁয়ের কী তোমাগো গাঁয়ের যে-সব মানুষ খালাশি-লশকর হইয়া জাহাজে পাড়ি দ্যায়—কুনো সংবাদ নাই, আছে কি নাই সেই সংবাদডাও নাই, বছর পুইয়্যা যায় ফিরা আইসতে। কী করব? কাম তো কইরব্যার লাগল। কামের ফুর্তি যদি চাও তো কামের ভারও তো বইব্যার লাগব। না?'

'এইডা তো এডডা অবিচার।'

'কোনডা?'

'এই-যে আমি খেইলতেছিলাম বারদুয়ারে, ভাঙা খুপড়ির টুকরা লইয়্যা, ছয় কোটে ফাল পাড়া খেলা। বড়খুড়ি আইস্যা ডানা ধইর‍্যা টাইন্যা নিয়্যা কয়, চল, বিয়া বসবি। তারপর থিক্যা আপনার দেখাসাক্ষাৎ পাই-বা-না-পাই, সংবাদ তো আমার এগডাই। আপনে। এইডা এড্ডা অবিচার না? সারাডা জীবন, সারাডা মরণ একজনের সংবাদই কেবল সংবাদ। সেই মানুষডার সাক্ষাৎ তো কোনো এক লাল পরশুদিন—'

'আমাগ অবস্থা তার চায়্যা সুবিধার হবার পারে। যদি আমি তোমারে চিঠি লিহি। বড়-বড় অক্ষরে লিখলে তুমি তো পার, পইড়তে? পার না?'

'পারি-বা-না-পারি, অক্ষর বড় হউক আর ছোট হউক—ঐ কামও কইরবেন না। চিঠি লিখবেন না। বিয়াতী মাইয়ারা বারমাস বাপের বাড়ি থাইকলে আর নিন্দা কী? তার যদি চিঠি আসে, তাইলে বড় অপবাদ হয়।'

'কইছে? অ্যাহন তোমার কাছে আমার বাদ-অপবাদের গল্প শুইনব্যার হবে? যত্ত কুলনী বামুনগো বাড়ির গল্প নিজের গল্প ভাবো?'

'কুলীন মাইয়্যার লগে আমার তফাতডা কী?'

'স্যায় কুলনী, তুমি কুলনী-না—এর বেশি তফাতের কাম আছে নাহি?'

'তারও সাক্ষাৎ নাই, আমারও সাক্ষাৎ নাই—এর বেশি মিলের কাম কী?'

'কমলা, গেলা তো হাইর‍্যা। কুলীনের মাইয়্যা তার স্বামীর লগে কোনো সংবাদ পায় না, কোনো সংবাদ নাই। শুদু সাক্ষাৎ আছে। সারা জীবনে একবার বা দুইবার। বা, তেমন ভাইগ্য থাইকলে বছরে-বছর পালখাওয়া একবার কইর‍্যা। আর জামাই যদি নিজের বদলে নাপিত পাঠায়—তাইলে সাক্ষাৎও তো বকলম। মিল পাওনি তোমার লগে?

সেই ডিমলাইটটার ছোট্ট এক টুকরো চিমনির মাথার একচিলতে ঘেরটায় কালি পড়ছিল। আলোও যে কমে আসছিল, তা এরা বুঝতে পারে না।

যোগেনের চোখে গৃহস্থ অশ্লীলতার ঘোর লাগে।

'নাপিত ক্যান? নাপিতের কামডা কী?' এমন একটা আয়াসে কমলা তার বাঁ বাহু ছড়িয়ে বাঁ হাতের ওপর মাথা রেখেছিল—যাতে বোঝা যায় না, নাপিতের গল্পটা সে জানে কী জানে না।

খুব করে হেসে যোগেন গিয়ে ডিমলাইটটা নিবিয়ে দিয়ে ফিরে আসে। কমলা বলে, 'বড় খুড়িমা নিষেধ দিছে, সাতমাসে পইড়্যা গেলে স্বামী-স্ত্রী এক বিছানায় থাহে না—'

'তুমি যে জিগাইল্যা—নাপিত ক্যান? নাপিত কুলীনের বংশবৃদ্ধি করে। কুলীন-বংশ ধ্বংস হইয়্যা গেলে নাপিতই-বা খাইবে কী, কুলনীই-বা খাইব কী।'

'বড় খুড়িমা নিষেধ দিছিল।'

আলো শরীরে কতটা বোঝাবুঝি বইয়ে দেয়, অজানিতে, সেটা ঠিক ঠাহরে আসে

না—শরীরের কোনো একটা ছোট শিরাও তো আলোতে পলকের জন্যও থেমে থাকে না, এখানে, খাগবাড়িই হোক, আর মৈস্তারকান্দিই হোক, আর পটুয়াখালিই হোক, আর বরিশালই হোক। পয়লা পাখিটা ডাকে সকাল সাড়ে চারটেয়, এদিকে। গলাটা যেন পুরো বল পায় না। ছানাপাখি হয়ত। একবার ডাকল-কী-ডাকল না, চুপ করে গেল। আশুবাবুর ঘড়ি থাকলেও কতটা চুপ করে থাকল, মাপা যায় না—আলো নেই। বড়সড় শক্তপোক্ত একটা টর্চ কলকাতা থেকে কিনে আনায় আর আটক কোথায়? কোথাও আটক নেই। তবু যোগেন কখনো আনে না। এত বছর ধরেই আনে না যে না-আনার কারণটাই এখন অনেকগুলি আকার নিচ্ছে—তার নিজের কাছে ও আরো দশজনের কাছে। নিজের একটা আলাদা আলো কি জ্বালানো যায় এমন প্রাকৃতিক অন্ধকারে? তাহলে তো তার শরীর অন্ধকারে কর্মময় হয়ে উঠতে পারবে না—সেই অন্ধকার, হাই তোলার আওয়াজ বা নিজের শরীরে সশব্দ কোনো চাপড় বা কোনো উদ্‌গার বা কোনো নিদ্রাক্ত 'বন্ধু জয় বন্ধু' ডাক, সেই অন্ধকার। যোগেন প্রথম ট্রামের নামকীর্তনের মিলিয়ে যাওয়া শুনতে কান খাড়া করে না, শ্বাস গোনে—ক-শ্বাসের পর সেই পয়লা পাখি আবার ডাকবে। যোগেন ডান হাতটা বাড়িয়ে কমলাকে বেষ্টন করে নিজের দিকে ফেরায় আর তার শ্বাসের সঙ্গে কমলার শ্বাস মিশে গিয়ে পাখি কতক্ষণ পরে ডেকে উঠছে সেই হিশেব-রাখার উপায় বিপর্যস্ত করে দেয়। না, বরিশালেও পাখির ডাকে রাত ভাঙে না। খুলনা লাইনের প্রথম লঞ্চটা ছাড়ে অন্ধকার থাকতেই—রিক্সা আর ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ পাওয়া যায়। পাখিটার দ্বিতীয় ডাকের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কমলা কথা বলে ওঠে, 'আইজ কি আগৈলঝরায় নতুন ইশকুল খুইললেন?' পাখির শিসের হিসেব পরে দেখা যাবে ভেবে নিয়ে যোগেন গুনগুনিয়েই জবাব দেয়, 'তুমি নি, সারা রাইতই জাগরণ?'

'জাগার সময় তো হইলই। না? বড় খুড়িরে কী কইর‍্যা মুখ দেখাই? এত কইর‍্যা না কইরল! আমি বরং অ্যাহনই উইঠ্যা যাই—'

'তাতে কি লজ্জা বাঁচব? কী য্যান কইল্যা ইশকুল নিয়্যা? নতুন ইশকুলের কথা উঠে ক্যামনে? পুরানাডাই তো ভাইঙ্গ্যা পইড়তেছে।'

'আপনে কি ঘরামি? ভাঙ্গা ঘর তুইল্যা দিবেন।'

'তালি তো মাইনতে হয়—ঘরডা সারাইবার ইচ্ছা কারো আছে। মাস্টারও নাই। ছাত্তরও নাই।'

'বৌদিদি মিছা কথা কয়।'

'কোন্ বৌদিদি?'

'আপনে তো ঘরের কাউরেও চেনেন না। মিটিঙের মানুষ হইলে চেনেন। বৌদিদি মিটিঙে যায় নাই—সারা দিন মিটিঙের কথাই কইল। কান এক্কেরে ঝালাপালা। কয়—নিজের ছাওয়ালের লগে মণ্ডল ইশকুল খুইলবার লাগছে।'

'কথাডা তো ভুল না কিছু।'

'আমিও শুন্যাইয়া দিছি। পুত্রের জইন্য ভাবে না কেডা? মণ্ডলমশায়ের দোষডা কী?'

'কইল্যা? এই কথা?'

'ক্যান কইব না? কথাবার্তার রীতনিত্ নাই। মণ্ডল-মণ্ডল যে কইতে নাই, এই শিক্ষাডাও নাই। তবে, বৌদিদিও আমারে পালটা ঝামটা দিছে।'

'বাবা, এ তো দেহি সতিন-ঝগড়া। কইল কী?'

'কইব আবার কী! কইল—ছাওয়ালের সাধে ইশকুল করাইলি—বারাইলে দেখলি মাইয়্যা।

তহন? আপনাগো ইশকুলে কি মাইয়্যারা পইড়বার পারব না?'

'আরে, এমন যে এডডা কথা উইঠব্যার পারে, সেডাই তো শুইনল্যাম এই প্রথম। আইন তো দেহি নাই।'

'আইন না-থাইকলে একখান আইন লিখ্যা বসাইয়া দিবেন।'

মনে হয়, লোয়ার প্রাইমারিতে এমন নিষেধ নাই। আপার প্রাইমারিতে থাইকব্যারও পারে। কী কইরলে যে কার ভালো হয়—সেইডা দিনে দিনে গোল পাকাইয়া উঠছে।'

'যার যার ভালো স্যায় স্যায় করুক। আপনার কী কাম?'

'ধরো, আইন হইল, বা ধরো আইন আছে, যে ছাওয়াল-মাইয়্যারা একই ক্লাশে পইড়বার পারব। যেই তুমি কইব্যা অমনি সব মুন্ডু নাড়াইয়্যা চিল্লান ধইরবে—মাইয়াগুলার পর্দা না দেয়া হারাম।'

'মুসলমানগ বোধহয় এইসব বেশি।'

'তুমি তো মুসলমান না। তালি তুমি ক্যান পড় নাই?'

'আমরা তো বামুনও না। আমরা তো টুপশালি।'

'এই নামডা কবে জানা হইল? টুপশালি হয় কারা?'

'খ্যাড়ে কুটে আগুন জ্বালাইয়'।

'পেত্নী বইসছেন আলগোছ হইয়্যা।'

আপনেই নাকী এইসব বানাইছেন। যারা হিন্দুও না, মুসলমানও না, তারা টুপশালি।'

'তুমি হিন্দু না? তাইলে সিঁদুর দ্যাও ক্যা?'

'যার সাইজবার সাইধ জাগে স্যায় দ্যায়। আমাগো জাইতে কি বামুন-কায়েতগ লাগান কপাল-সিঁথি টকটকাইয়া চলে? খুব হাউস হইলে বিবিগ নাগান টিপ পরে।'

'তাইলে দুর্গাপূজায় যাও ক্যান?'

'যাইলেও য্যান যাইবার দিচ্ছে। বড় আইলের নীচে খাড়া হইয়া থাইকতে হয়—'

'অ্যাহন তো গান্ধীজি কইয়্যা দিছে—সব পূজায় আর মন্দিরে, অচ্ছুৎগ, মানে মেথর-ডোমগো, কী য্যান তুমি নাম কইল্যা রূপশালি—'

'রূপশালি তো ধান। টুপশালি হইল জাইত।'

'গান্ধীও তো এডডা নতুন নাম দিছেন—হরিজন। মানে, বামুনরা তো কয় অচ্ছুৎ, তাই গান্ধী কইলেন—হরির মানুষ।'

'ঢুইকব্যার দিলেই ঢুইকব্যার যাবে নে কেডা? অগো দ্যাবদেবতারে দ্যাহেন না—দুই হাতে-দশ হাতে মানুষ মারে—কালী, দুর্গা। আমাগ ঐ দ্যাবতাগুলার নিকট নিয়া গেলে কি ডর ভাঙব, আমাগ? তার থিক্যা ইদ ভালো।'

'ইদ আবার ভালো কও ক্যান? হিন্দুগ নিয়্যা কথা উইঠলেই মুসলমান টানার কী আছে? মুসলমান ছাড়া হিন্দু হয় না? নাকি হিন্দু ছাড়া মুসলমান হয় না?'

'আমি কইছি—আমরা যারা টুপশালি তাগো লাইগ্যা ইদ্ সুবিধা। বামুন-কায়েত নাই, ছোঁয়াছুঁয়ির বালাই নাই। শিরনির মিষ্টি সবার লগে এক। সবার লগেই কোলাকুলি। সব চ্যাংড়া-প্যাঁংড়ারই মাথায় রঙিন কাগজের টুপি। আপনার ভাল্ লাগে না, ইদ?'

'কী যে কও! মানুষরে সমান কইয়্যা বুকে টাইনলে, সেই মেলা ভাল্ না-লাইগ্যা পারে? আমার ঐ 'হরিজন' শুইনতে তো ভাল্ লাগে না। বছর দুই আগে যাগ বামুন-কায়েতরা ডাকে নাই—তাগ অ্যাহন 'হরিজন' ছাড়া ডাহে না। আগে মানুষের জন, তার বাদে তো হরিজন।

কী কইছে য্যান, তোমার খুড়িমা আর বৌদিদি—?'

'কী কইছে? কীয়ের লাইগ্যা—'

'কইল্যা-না কী কইসে ইশকুল নিয়্যা?'

'ও স্যায় বাসি কথা! কইছিল, নিজের ছাওয়ালের জন্য ইশকুল বাইন্ধব্যার ধইরছে মণ্ডল মশায়।'

'কমলা—কথাডা ভয়ংকর সইত্য আগে ভাবি নাই। যেন বটগাছের বিছন। এই কথাডা। দ্যাহো, কথাডা কিন্তু ঠিকই খাড়াইল—আগৈলঝরা ইস্কুলডায় পড়ার ছাত্র হইব কেডা? তোমার আমার পুত্রকইন্যা বাদে?'

'এক-এক ছাত্রের লগে এক-একখান ইশকুল?'

'উলট্যা কইর‍্যা ধরো ক্যান কথাডা? ধরো, লোয়ার প্রাইমারি ইশকুলে যা পড়ায়, একদুই গোনা আর অ-আ-ক-খ চেনা, সেগুলা তো বাউনবাড়ির ছাওয়ালরা প্যাট থিক্যা পইড়্যাই শেখে। আর, কী য্যান নাম কইল্যা হরিজনগ—'

'টুপশালি?'

'আর, টুপশালির মানুষরা কাঠের তলায় যাওয়ার পরেও ঐগুলা শেখে না। যদি কাঠ জোটে। মুসলমানগ অ-আ-ক-খ তো আলাদা। চিল্লায়-না মকতবে? তাইলে আগৈলঝরার জইন্য বাকি থাহে তো এক আমাগো ছাওয়ালপাওয়াল। আমরা যদি তাগ শিক্ষা দিব্যার চাই, তাইলে ইশকুল চইলবে, না-হয় তো চইলবে না।'

এই কথাডা শুনার আগে 'এই হিশাবটা আপনার মাথায় ঢুকে নাই?'

'সত্যি কথা কই? ঢোকে নাই। ইশকুল—কলেজ ভাইবলেই তো মনে আসে সবাই মিল্যা পইড়তেছে। আমার ভাইয়ের ব্যাটাটা আইজ লগি ঠেইলা আমাগো পৌঁছায়া দিল। ওর বয়সে আমিও লগি ঠেইলছি। সে তো ইশকুলে আসার লগে। দেহো, আমার উদাহরণও কোনো কামে আইল না, আমারই বাড়িতে?'

'আর-একজনের আর-এক বাড়িতে আর-কারো কাজে লাগব।'

যোগেনের গোপালগঞ্জ যাত্রা ও প্রহ্লাদ আর শিবুর কাছে নিজের রাজনৈতিক দর্শন উত্থাপন

৫৭

পরদিন সকালে যোগেন খাগবাড়ি ছেড়ে ফরিদপুরের গোপালগঞ্জে রওনা হল, নৌকোয়, সেরকমই ঠিক ছিল। যদি তেমন কিছু দরকার পড়ে, তাহলে গোপালগঞ্জ থেকে বরিশাল হয়ে কলকাতায় ফিরবে। গোপালগঞ্জ আর এই খাগবাড়ি থেকে কী দূর—খালের পাড়ে খাড়াইয়্যা একখান যুতমত ঢিল ছুঁড়লেই তো গিয়া গোপালগঞ্জের কোনো মানুষের মাথায় পড়বে। অবিশ্যি, তেমন একটা যুতসই ঢিল আর ঢিলছোঁড়ার মানুষ খুঁজে বের করতে হবে। যোগেন, প্রহ্লাদ, শিবু হালদার আর অচেনা একজন নৌকোয়—পথে কোথাও নেমে যাবে হয়ত। ওড়কান্দিও যাওয়া হতে পারে শুনে যোগেনের শাশুড়ি ওদের হাত দিয়ে পুজো পাঠিয়ে দিলেন। শাশুড়ি যখন যোগেনকে তার ইচ্ছের কথা বলে, যোগেন উত্তর দেয়, 'এডা তো আমারই কহনের কথা। ঠাকুরবাড়ি যাব—হাতে পূজা নাই? প্রহ্লাদদারে বুঝাইয়্যা দ্যান। তবে সে আর-এডডা ঘটনাও ঘইটব্যার পারে, আপনার পূজাডা আমার নামে গেল।'

শাশুড়ি গলবস্ত্রই ছিল। হাতদুটি জোড় করে বলেন, 'আমার আবার পূজা কী, বাবা? সব পূজাই তো তোমাগো লগে। ঠাকুরের ইচ্ছাডাও দেহো। একজন তো আইসবেন, তাই তার বাপরে পাঠাইলেন নিজের পূজা আদায়ে।'

যোগেন ঘাটের দিকেই বেরচ্ছিল। শাশুড়ির কথা শুনে কিছু না-ভেবেই ভাল লেগেছিল। ওড়কান্দি হচ্ছে ঠাকুর হরিচাঁদ-গুরুচাঁদের থান, মতুয়া ধর্মের কেন্দ্র—হিন্দুদের যেমন কাশী, মুসলমানদের যেমন মক্কা, খ্রিস্টানদের যেমন রোম। নমশূদ্রদের সবচেয়ে বড় তীর্থ। গেল বছর দেহ রাখলেন গুরু চাঁদ সেটা বোধহয় ভালই হল, না-হলে মতুয়া ধর্ম দিয়ে তো আর শাসকশক্তি হওয়া যায় না—সমাজের, দেশের, দশের শাসক হওয়া যায় না, নিজের শাসক হওয়া যায়। একটা কোনো ধর্ম না-হলে নমশূদ্রদের তো চলে না, বড় ভক্ত জাত। এত ভক্ত, যার ইচ্ছে সে-ই তার মাথায় নিজের দুই পা রাখে। কিন্তু এখন তো দেশের মানুষের হাতে ক্ষমতা আসছে—এখনো নমশূদ্ররা 'হাতে কাম আর কানে নাম' নিয়েই থাকবে?

যোগেন এইরকম করেই ভাবছিল, তা নয়। শাশুড়ির পুজো দেয়ার প্রসঙ্গে এইসব ভাবনা তার মাথায় এসেছিল। কিন্তু চলৎরিয় গেল না। এই দুই-এক মিনিট আগে বলা শাশুড়ির কথাগুলির স্মৃতি বিরক্তি হয়ে ফিরে এল—এমন বিরক্তি যা প্রকাশও করা যায় না, প্রমাণও করা যায় না। তার শাশুড়ির কথা, বা বলা, যেন বামুন-কায়েতের নকল। খুব খেয়াল করে নকলকরার মত মানুষ তার শাশুড়ি নয়। তবু কেন নকলি এসে যায়? তার যোগামার কথায় বা কাল রাতে কমলার কথায় তো তেমন নকলি আসেনি। নাকী এসেছে? কিন্তু যোগামা বা কমলার গলায় নকলি তার কানে লাগেনি, তারা তার মা আর বৌ বলে? যোগেন এই বৈপরীত্যগুলি মেনে নিয়েও গোঁ ছাড়ে না—ওরা কি আমাগো নাগাল ভক্তি দিবার পারে, তাইলে আমরা কেন আগের মত পূজা দিব?

নৌকোয় পুজোটা তুলে দেয়ার জন্যই ঘাটে দু-চারজন বৌ এসে নৌকোর গলুইটা ধুয়ে, নতুন একটা গামছা পেতে, তার মাঝখানে একখুনি নতুন খড় থেকে পাকানো একটা বিড়ে বসিয়ে, লাল একটা হাঁড়ি বসিয়ে নতুন সরা দিয়ে ঢেকে দিল। পুজো যা, তা হাঁড়ির ভিতরে আছে। সেই দুই-চারজন বৌয়ের মধ্যে, যোগেন কমলাকে ঠিক খোঁজেনি, কিন্তু কমলা থাকলে তার চোখে পড়ত পড়ত কি? কমলাকে কি তেমন করে দেখা হয়েছে যোগেনের?

যোগেন উঠে বসতেই নৌকো ছেড়ে দিল আর মেয়েরা উলু দিয়ে উঠল। তিন ঝাঁক উলু শেষ হতে-হতে নৌকো মাঝখানে। উলুটা কেমন মিশে গেল খালের জলধ্বনিতে। অথবা, ধ্বনি বদলে যাওয়ায় যোগেনের কানে একটা বিভ্রম খেলল। সে একটা তৃপ্ত ঠোঁটে খালের মাঝখান থেকে নিকট-পাড়ের দিকে চাইল, যেন তার আজন্মের ভঙ্গিতে, বরিশালের খালের ভিতর থেকে পাড়ের দিকে তাকানো। নিজেরই ভঙ্গিগুলো নিজের অচেনা, উচ্চবর্ণের কেউ যদি চিনিয়ে না দেয়।

এটা একটা ছোট ছিপ নৌকো। তাতে একজনেরই এক গলুইয়ে বসে ভাটিতে ভাসার কথা—তা না, একে বারে দুই গলুইয়ে দুই লগি, মাঝখানে আবার দুই বৈঠা নিয়ে দুজন। একটুখানি জায়গায় তিনটা পাটাতন পাতা—বসার জন্য। বাকিটা খালি। খাগবাড়ি থেকে গোপালগঞ্জ, ঠিকই, এক ঢিলেরই দূরত্ব যেন, তবু, সেই দূরত্বটুকু জুড়ে আছে এই আগৈলঝরার খালের দক্ষিণ পার, বিষাইকান্দির খালটা আড়াআড়ি, বাগধার বিলের উত্তর কোণ আর মধুমতী নদীর কিছুটা। তারপর গোপালগঞ্জ। কাশিয়ানি বা আড়কান্দি যেতে হলে আর গোপালগঞ্জে ঠেকবে কেন? ভাটির মধুমতীতে ভাসলেই হল।

মুখে বললে যে-কোনো রাস্তাই লম্বা শোনায়। কিন্তু এইটুকু রাস্তায় যদি দুটো আল, একটা বিল, একটা নদী পার হতে হয় দুই-মানুষ সমান একটা ছিপে দুই-দুইজন লগি আর দুই-দুইজন বৈঠা নিয়ে, তাহলে তো যাত্রাটা ভারীই দেখায়। রাস্তা সোজা, দূরও হাতের মুঠোয়, সময়েরও তাড়া নেই তবু পথটা যত্রতত্র অপথ-কুপথ হয়ে যেতে পারে। বিষাইকান্দির খালটাকে নদী বললেই চলে। নদী মানে বিস্তার আর স্রোত। বিস্তার আর স্রোত মানে বিপদের বিস্তার আর স্রোতের প্রতিঘাত। আবার সেই কারণেই পার পাওয়ার বহু রাস্তা। কিন্তু বিলা-জায়গায় যদি নৌকো একবার ঠেকে তাহলে প্রধান বিপদ হচ্ছে—কোনদিকে ঠেললে নৌকো জল পাবে সেটা বোঝা। লগির ঠেলায় নৌকো হয়ত আরো ডাঙার দিকে উঠে আরো ফাঁসল। বিলের সে-ডাঙা তো আর শুকনো, খটখটে, ঘাসে-যাওয়া কোনো জায়গা নয়। হয়ত ঘণ্টা দুই জল নেমে গেছে, না-হয়, দুদিনই হল, থকথকে কাদা, সেখানে সাঁতার কাটা যায় না, সেখানে জলের তলে পা-রাখার কোনো মাটি পাওয়া যায় না, সেখানে ডুবলে আর ভেসে ওঠা যায় না। এইটুকু একটা ছিপ নৌকোকে নাড়াতে সাত-আটজন লোককেও তখন মনে হয় হারানো মানুষ। সেই সব ভেবেই ছিপ নৌকো, পাতলা, দরকারে হাতে নাড়ানো যায়। সেইজন্যই দুই বৈঠা—, হঠাৎ যদি জল বেড়ে যায়, তাহলে তো লগি ঠেলা যাবে না। বরিশালের খালবিলের জলের কোনো স্থায়ী মাপ নেই, তবে খুব বেশি চলনদারির জলের তো মোটামুটি একটা আন্দাজ হয়ে যায়। সমুদ্রের জল অজস্র নদী ও খালপথে ঢুকে পড়ে এমনই সহসা বদলে দিতে পারে অভিজ্ঞতার আন্দাজ যে কারণ-খোঁজার সময় পাওয়া যায় না। কারণ অবিশ্যি কেউ খোঁজেও না—জলের বিপদ তো রয়েসয়ে আসে না যে ধীরেসুস্থে ভাবার সময় পাওয়া যায়। তবে, পাড়ির সময় একবার মনে করা ভাল—সঙ্গে আর কিছু নেবে কী না।

এসব ভেবেই হয়ত খাগবাড়ি থেকে গোপালগঞ্জের এক ঢিল দূরত্বের জন্যও নৌকো ভাবা ও সাজানো হয়েছে বেশ ভাল। ছই একটা লাগিয়ে নিলে হত বটে কিন্তু নৌকোর ওজন যেত বেড়ে আর গতিও যেত কমে। কিন্তু শ্রাবণের মাঝামাঝি তো—পরপর কয়েকদিন বৃষ্টি হয়নি। নৌকো যখন ছেড়েছে তখন সকালের রোদ চড়েনি। বড় জলে—বিলে বা নদীতে রোদ তাড়াতাড়ি চড়ে—খালে দু-পাড়ের গাছগাছড়া বাড়িঘরের আড়াল থাকে বলে রোদ চড়তে পারে না। বিষাইকান্দির খালটা পেরতেই বেশ গরম লাগে। বাগধার বিলে ঢুকতেই যোগেন তার কোঁচা খুলে মাথায় দেয়। ছোট্ট একটা ছই যদি থাকত, তাহলে মাথাটা তার ভিতরে গুঁজে কী সুন্দর ঘুমটাই না ভাঙত গোপালগঞ্জে—সে কী রে, এর মধ্যে পৌঁছে গেলি।

নৌকোর মাঝিদের একটা অভ্যেস আছে—জলে কোনো বিপদের ভয় পেলে কথা বন্ধ করে দেয়। বরিশালে যারা যাতায়াত করে, অনেক সময় তারা মাঝিদের চাইতে বেশি সময় জলে থাকে। তাদেরও একটা মুদ্রাদোষ আছে—যেমন-তেমন জায়গায় মাঝিদের যাচাই করতে তাদের সঙ্গে ছোটখাটো আলাপ শুরু করে দেয়। এ আর কতটুকু যাওয়া? তবু তো যাওয়াই, খাল-বিল-নদীর জল ভেঙে যাওয়া, বাগধার বিলের মাঝখানে নৌকোটাকে যেন আরো ছোট মনে হয়। শিবু হালদার তার মুখোমুখি মাঝিকে ডাকে, 'ও মিয়া, বিড়ি খাবানে একডা?'

দুই মাঝি, দুই বৈঠা, যোগেন বাদে তিন প্যাসেঞ্জারের বিড়ির ধোঁয়ায় বেশ একটা নির্ভরযোগ্য নিরাপত্তার গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। মাথার কাপড়ের ভিতর থেকে যোগেন বলে ওঠে, 'প্রহ্লাদদা, তোমার য্যান ক্যামন অতিথিসেবা কম। তুমি কোনোদিন আশ্রম-ব্যাবসায় ঢুইকো না।' নামশূদ্রদের মধ্যে কোনো-কোনো বিশিষ্ট মানুষের আশ্রম-খোলার বাতিক আছে। বাতিক ছিল বলাই ভাল—এখন কমে এসেছে। তাঁদের গুণও থাকে কিছু—বেশিরভাগই টোটকা ঘটিত। কেউ হয়ত

বছরভর খুকখুক কাশি, কাশির সঙ্গে দু-এক ফোঁটা রক্ত, সারিয়ে দিতে পারে। কেউ হয়ত হঠাৎ-কাশির দমক সারান। কারো নাম ডাক ঘা-কাটাছড়া সারানোয়। হাঁটুর বাত কেউ সারিয়ে দেন। যাকে বলে পেটখারাপ তা নয় কিন্তু খাওয়ার পরই বাহ্যে, ছোটা কারো ওষুধে সেরে যায়। আমাশা, রক্ত-আমাশা, অম্বল, অজীর্ণ, শূলব্যথা, প্রথম বা শেষ রাতের অনিদ্রা, মেয়েদের শ্বেতস্রাব, ঋতুকালে তলপেটব্যথা, স্তনের কাঁচা ফোঁড়া—এগুলি তো আছেই। টোটকা মানে স্বপ্নলব্ধ বা গুরুর কাছ থেকে পাওয়া গোপন বিদ্যা। এটা বেচা যায় না। তাই, শিষ্যসামন্ত নিয়ে এক-একটা আশ্রম খুলে বসেন। চাঁদসি-তে যাঁদের নামডাক হয়, তাঁদের তো আশ্রম রাখতেই হয়—নইলে অত রোগী থাকবে কোথায়, তাদের দেখাশোনাই-বা হবে কী করে?

'ত্রুটিডা কও। অ্যাহন কি সেটা সংশোধনের উপায় করা যাবে? যদি না-যায় পাড়ে নাইম্যাই তোমার সেবার অভাব দূর করব।'

'নিজের নেশাডা পকেট কইর‍্যা আইনছ, আমার নেশাডা আইনল্যা না।'

'দেহো যোগেন, সবকিছুর একডা নিত্যকর্ম আছে। নেশা কয় কারে। যেডা তোমার শরীরের প্রত্যঙ্গ হইয়্যা যায়। নেশার দ্রব্য সঙ্গে রাইখতে যে-মানুষ ভুইল্যা যায়, স্যায় তো দম টানিব্যার ভুইলে মইর‍্যা যাইব্যার পারে। তাইলে? যা তোমার শরীরের তাপ ছাড়া বাঁচে না, তাহাই তোমার নেশা।' প্রহ্লাদ কথাটা শেষ করে দেয়ার ভঙ্গিতে বিড়িতে টান দেয়।

'আদ্ধেকখান গাছের পাতার জন্যে এতখান কথা? তোমার মোক্তারি-পেশা সার্থক।' যোগেন কখনোসখনো পান খায়, তাই নিয়েই কথা।

'যোগেন, তোমার সঙ্গে জরুরি কথাডা কি অ্যাহন কহা যায়। তোমার অ্যাসেম্বলি য্যান কবে?'

'২৯শে জুলাই। গভর্নরস অ্যাডড্রেস।'

'তাইলে ২৮শের পর তো তুমি নাই।'

'২৭ সকালের মইধ্যে পৌঁছালে নিরাপদ। কইলকাতার খবরটবর তো জাইন্যা নিতে দিন দুই লাইগব। কথাডা যদি জরুরি হয় তাইলে অ্যাহন কওয়া-বলা যায় না? ধীর সমীরে যমুনা পুলিনে—'

'তা হয়ত কওয়া যায়। ইতিপূর্বেও আমি দুই-এক বার চেষ্টা করছি। কিন্তু আমার মোক্তারি বুদ্ধিতে বুইঝব্যার পারি নাই—তুমি কথাডাতে ইনটারেস্টেড কী না। এ-বিষয়ে তোমার সিদ্ধান্তই বহাল।'

'বিষয়ডা কী?'

'ধরো, ইলেকশনের পর ছয় মাস পার হওয়ার চইলল, তুমি অ্যাহনো কোনো পার্টি-তৈরির বা কোনো পার্টিতে জয়েনের কোনো ইশারা দ্যাও নাই।'

'ভোট না-হয় হইছে ছয়মাস, সরকার তো হইছে তিনমাস, তাও আবার বাহাত্তুর‍্যা বুড়্যার নাগাল দুইখান দাঁত শুলিয়ে—আছে, না গিছে, না নিজের দাঁত নিজেই গিল্যা ফেইলছি। এই হাঙ্গামারা মইধ্যে তোমার একডা পার্টি হইল কী হইল না নিয়্যা কার মাথাব্যথা? গোলে তো সব হরিবোল হইয়্যা যাবে নে—'

'তুমিই সব থিক্যা ভালো বুঝবা। না-হয় পরেই হবে। কিন্তু পরে যদি হওয়া লাগে তাইলেও তো আমাগো রেডি থাইকব্যার লাইগব।'

শিবু হালদার হঠাৎ বলে ওঠে, 'আমার কিন্তু মনে লাগে অন্তত বরিশালের জইন্য একডা পার্টি খাড়া করা দরকার। নাইলে মানুষজন কুথায় খুইজব, আপনার লগে একডা সংবাদ দিতে? মানুষের তো ভালোমন্দ আছে।'

'ক্যা? মানুষজনের কি ইতিমধ্যে জানা হইয়্যা যায় নাই যে আসল এমএলএ-র নাম শিবু হালদার মশায়?'

'স্যায় তো ব্যাবাকই জানে আর আসেও তো কোর্টে, বাড়িতে, সেরেস্তাতে এইডা-ঐডার কথা কইব্যার লগে কইর‍্যাও তো দেই, প্রহ্লাদদারেও জানাই কিন্তু সে তো আর এমএলএ-র কাম না; এমএল-এর কাম কইরব্যার লাইগলে পার্টি চাই অবশ্যই'।

'অ্যাহন যে কামগুলা করেন সেগুল্যা কীসের কাম?'

'সেগুলা তো জনসেবামূলক—আমাগো বরিশালে তো সেডা কিছু নতুন কথা না—অসুখ হইছে—ডাক্তার-কবরাজের পয়সা নাই, ক্যান জানি না, সামলা কিন্তু কইস্যা গিছে আর অসুখবিসুখ বাইর‍্যা গিছে।'

'তাইলে তো আপনি একডা পার্টি খুইল্যা মামলার সংখ্যা বাড়াইব্যার চান—'

'এমন সরাসরি কইলে তো 'হ্যাঁ'-কওয়া খারাপ শুনায় কিন্তু বস্তুডা একই। মামলা-মোকদ্দমা তো ক্ষমতা-প্রদর্শনের ক্ষেত্র। পার্টি ধইরলে স্যায় ক্ষমতা শক্তি এইসব জুগানে সুবিধাসুযোগ থাকে। পার্টিই যদি না কইরবেন, তালি মিছামিছি ভোটে খাড়াইলেন ক্যা?'

'আমি তো জিগায়্যাই যাচ্ছি, এমএল-এর কামডা কী।'

'ধরেন, ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বারের কাম যেমন নিজের গ্রামের রাস্তাডা নতুন করা, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বারের কাম যেমন নিজের মহকুমাডায় হাসপাতাল বসানো, হাসপাতাল যদি নাও হয়, তালি বিনা মূল্যে চিকিৎসালয় আর এমএল-এর কাম আপনি যা কইর‍্যা অ্যালেন কাইল, নিজের পকেডের পয়সা দিয়্যা অন্যের বাবার-নামের ইশকুলের ভাঙা বেড়া সিধা কর‍্যা।'

লগিমারার সুবিধের জন্য মাঝিরা কোদোবনের ভিতর ঢুকেছিল, খাড়া কোদোঘাস নৌকোর মানুষজনের মাথায় মুখে লাগছিল, শুড়শুড়ি দিচ্ছিল, দু-একটা হাঁচিও পড়েছে, নৌকোটা এগচ্ছিল তরতরিয়ে, রোদটাও সরাসরি লাগছিল না। শিবু হালদারের কথায় প্রহ্লাদ আর যোগেন এত জোরে হেসে ওঠে যে কেদো বনের ভিতর থেকে কয়েক ঝাঁক পানিছাঁচা পাখি একসঙ্গে আকাশে উঠে যায়—এত দিক থেকে, যেন নীচে জল নয়, শুধু পানিছাঁচা পাখিই ছিল।'

যোগেন বলে, 'তয় তো আসল কথাডাই ধইর‍্যা ফেলাইছে। কও লিডার ছাড়া কেউ এমএল-এ হবার পারে? পারে না। তাইলে কও দেহি, অশ্বিনী দত্ত শুইন্ধ্যা কোন মানুষ আছে যে নিজের পকেট নিজে না-কাইট্যা লিডার হইছে।'

শিবু বলে, 'হ্যায় যদি আপনার পকেটের উপুরের ফাঁক গইল্যা টাহা ঢোকে, তাইলে, তলার ফুটা দিয়া কিছু টাকা না-হয় লিডারিবাবদ দ্যান গিয়া। কিন্তু পার্টি একডা দরকার। একডা সাইনবোর্ডে—পার্টির নাম, আপনার নাম, এম. এল-এ, যে-কোনো প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন।'

'এইডা কোথায় টাঙাবেন!'

'আপাতত প্রহ্লাদদার বাড়িতে', শিবুর কথায় বোঝা যায়—সবগুলো কথাই সে ভেবেচিন্তে ঠিক করে রেখেছে। তার এতটা প্রস্তুতি ও প্রয়োজনকে তুচ্ছ করা যায় না।

যোগেন বলে, 'অ্যাসেম্বলিতে আমাদের তো একটা নাম নিতে হইছে, সেডাই তো আমাগো পরিচয়। বেঙ্গল অ্যাসেম্বলি ইনডিপেনডেন্ড শিডিউল কাস্ট মেম্বারস লিগ। হেমচন্দ্র নস্কর, চব্বিশ পরগনার নেতা, প্রেসিডেন্ট আর আমি সেক্রেটারি। সেইডা লাগাইতে পারো। তাতে যদি কামের সুখসুবিধা হয়, তো হোক।'

শিবু বলল, 'নামটা আর-একবার করেন? আপনাগো সব কাজেই চাঁদশির গিঠি। সব পার্টির নাম দ্যাহেন—জিভের ডগা থিক্যা খসার আগেই ইষ্টমন্ত্রের মত কর্ণমূলে ঢুকব। কংগ্রেস, লিগ,

হিন্দুসভা, প্রজাপার্টি, আরেসপি। আর আপনারা, কী কইলেন য্যান?'

'বেঙ্গল অ্যাসেম্বলি ইনডিপেন্ডেন্ট সিডিউল্ড কাস্ট মেমবার্স লিগ।'

'এইডা মনে রাখা আমার কাম? এ নামডা তো বামুনগ, চোদ্দ পুরুষের নাগাল লম্বা। শ্যাষে আবার একডা 'লিগ' থুইলেন ক্যা?'

'শোনেন শিবুদা, আমরা তো কুনো পার্টি হবার পারি না।'

'নিষেধডা কার? শুদ্দুররা মেম্বার হইবার পারব কিন্তু পার্টি হইব্যার পারব না?'

'অইলে আর ঠেগায় কেডা? হও।'

'না। কথাডা বুঝান। আপনি একা বুইঝ্যা গাঁজা-খাওয়া সাধুর মতন গাল ফুল্যাইয়া বইস্যা থাইকলে হব? আমি বুইঝলে তো আরো দশে বুইঝব। কন।'

'ভোটে তো শিডিউলগো সিট ছিল বত্তিরিশডা?'

'আপনি যে শিডিউল হইয়্যা জেনারেলে গেলেন তার আদায় দিব কেডা?'

'তার আর আদায় নাই। বাধা দিবেন না। বুইঝ্যালন। শিডিউলগো সিট বত্তিরিশডা। তাইলে মেম্বারও হইল বত্তিরিশডা শিডিউল। ধরেন, আমরা আছি তের, তেমনি রাজবংশী আছে। আমরা দুই জাইতই বেশি। প্রথম সুযোগেই আমরা এই বত্তিরিশজন শিডিউল একসঙ্গে বইসল্যাম হেম নস্করের বাড়িতে। কৃষকপ্রজা আর কংগ্রেসেরও বড় নেতারা ছিলেন। অ্যাহন, সেই মিটিঙে আমাগো বত্তিরিশ শিডিউলের মইধ্যে তো কংগ্রেসও ছিল, রসিক কাহা যেমন। পাতিরাম রায়, খুলন্যার, যেমন, ঐ দিকের প্রেসিডেন্সি ডিভিশনে, তো বেবাকই কংগ্রেস। আবার মল্লিক ভাইরাও ছিল—যে-পার্টি মন্ত্রী কইরব, সেই পার্টিতে যাইব। তেমন পরিস্থিতিতে আমাগো এইটুক্ দেখানোই কর্তব্য ছিল, আমরা যে যে-পার্টিরই হই না ক্যান, আইনসভায় আমরা শিডিউল হিশাবে একটা বোঝাপড়ায় চইলব। নস্করমশায়রে কইরল প্রেসিডেন্ট, আমারে কইরল সেক্রেটারি। তাই নামডা হইল, 'লিগ'। নামডায় 'পার্টি' তো দেয়া যায় না। তবে অ্যাহন তো মনে হইতেছে, 'লিগ' না কইয়্যা গ্রুপ কইলেই হইত। আসলে 'লিগ' 'লিগ' শুইনতে-শুইনতে গোলে হরিবোল হইয়্যা গিছে। অ্যাহন কন বরিশালে গোলে হরিবোল হইয়্যা গিছে। অ্যাহন কন বরিশালে একখান পার্টি বানাইলে আমাগো লাভ বেশি? না কী কইলকাতায় সব শিডিউলরে জড়ো রাইখ্যা এডডা কিছু খাড়া করা ভাল?'

যোগেনের কীর্তিতে প্রহ্লাদ ও শিবুর গৌরব

যোগেনের কথার পর বেশ কিছুক্ষণ শুধু কেদো বন দিয়ে হাওয়া বইবার আওয়াজ আর নৌকোর সঙ্গে কেদো ঘাসের ঘর্ষধ্বনি। কেদো বনের সীমা বোধহয় শেষ হয়ে আসছে। এবার হয়ত নদীতে পড়বে, মধুমতীতে, দু-একবার বৈঠার ছপছপ ওঠে।

৫৮

প্রহ্লাদ ধীর গলায় বলে, 'তুমি যেডা কইল্যা সেডা তো ঠিক কথাই। ১৩ জন নমশূদ্রই তো এক-হাঁড়ি হইব না। তাইলে আর বাইরের কেডা পাত্তা দিব আমাগ?'

'এইডাই তো কথা প্রহ্লাদদা। তোমার পাত্তাডা তোমারেই ঠিক কইরব্যার লাইগব। এই মাস ছয়ে আমার এইডাই শিক্ষা হইল—এ-জন্মের যত পাপ অ্যাদ্দিন ধইর‍্যা করছি আর যত্দিন বাঁচব

তার প্রত্যেকডা দিন, সেই পাপগুল্যা আবার করব। সামনের জন্মেও কইরব। এই পাপের পাহাড়ডা হইল আইনসভায় মেম্বারের জামানত। নেতাগ কথা কই। আমাগো মত যারা চ্যাংড়ার দল তাগো ট্রেনিং দেয়ার ইশকুল হইল আইনসভা। বেশি দিন না—পাঁচ-সাত বছরেই তোমাগ মালুম দিবে আমরা কেমন কোপান ছাড়া মাথা কাটা শিখছি। রক্তপাত নাই, থানাহাজত নাই, অস্ত্রশস্ত্র নাই কিন্তু বেবাক মানুষ সাফ। এইডাই কাম—লাটশাহেব থিক্যা চাপরাশি।'

'লাটশাহেবও? তাইলে অ্যাপিল কার কাছে?' শিবুর স্বরে একটু নিরাশ্রয়তা আসে। এটা হয়ত তার বিশ্বাসের অংশ।

'শুনো। মন্ত্রী করার মিটিঙে আমারে ডাকছিল। মিটিং শ্যাষ হওয়ার পর দেহি, আমারে ডাকার তো কোনো প্রয়োজন ছিল না। কীরকম রাগ উইঠ্যা গেল। লাটশাহেবের পথ আটকাইয়্যা কইল্যাম, 'স্যার, আমারে ক্যান ডাকা হইছিল সেডা তো বোঝা গেল না'।'

'কইল্যা? যোগেন? লাটশাহেবরে?' প্রহ্লাদ বিস্ময় লুকোতে পারে না, মধুমতীর নীল বিস্তারে সে-বিস্ময় যতই কেন না অবান্তর দেখাক।

শিবু হালদারের চোখ কোটর থেকে বেরিয়ে আসে যেন, 'দিল্যান কইয়া? সিধা? বুক চিতাইয়া?'

'কইত্যাম না। ঐ গোপন মিটিংডায় হকশাহেব, খাজা, সুরাবর্দি, আর দুই-একজন ছিল। অগ ঘরুয়া কোন্দলের উপর লাটশাহেব হুকুম জারি কইরবে বইল্যা। তার মইধ্যে আমারে ডাইকবে ক্যা? ভুলই কইরছে হয়ত। কিন্তু ঐহানে যেসব কথা নিয়্যা রাগারাগি ঘইটল, সেডা তো একডা ভুল-কইর‍্যা ডাকা মানুষের সামনে হওয়া ঠিক না।

'সে মানুষডা রক্তে তো চাঁড়াল। রাগ উইঠ্যা গেল রগে—চিরডা কাল বামুন-কায়েতরা এমন কইর‍্যা তাকায় য্যান ঐহানে কুনো মানুষ নাই। ক্যা? এই হানে তো আমি সরাসরি ভোটে জিত্যা আসছি। হকশাহেবও যা, আমিও তা। বরাং খাজা-র থিক্যা আমি বড়। পটুয়াখালিতে হকশাহেবের কাছে ঐ চুব্যান খাইয়্যা সেই হকশাহেবরে হাতপায় ধইর‍্যা মেম্বার হইয়্যা মন্ত্রী হবি। হঠাৎ মনে আইস্যা গেল—কেডা রে লাটশাহেব? আমারে যে মানুষগুল্যা ভোট দিছে—তাগো অপ্মান হইল না? সিধ্যা কয়্যা দিল্যাম লাটশাহেবরে, বুক চিতাইয়া, একবারও ভগবানের নাম না-নিয়া?'

'লাটশাহেব আপনারে চিনছে?' শিবু জিজ্ঞাসা করে।

'আরে, এগ চেনা-অচেনা কে বুঝে? লাটশাহেব থমক্যাইয়া আমার ঘাড়ে হাত রাইখ্যা জাইনতে চালেন। জাইন্যা, পিছন চিফ সেক্রেটারিরে জিগাইলেন। চিফ সেক্রেটারি আমার আর-এক পাশে খাড়াইয়্যা কইল, মিস্টার মণ্ডল, আপনারে পরে ব্যাপারডা বুঝায়্যা দিব।'

'সেই পর আর আসে নাই, এই তো? এ তো আমাগো ইজ্‌রা হাটে রোজ একশ দিনের ঘটনা। আপনারে শ্যাষে এতগুলা মানুষ ভোট দিয়্যা ইজ্‌রার হাটে পাঠাইলাম? ওকালতি ব্যাবসা গেল, জিলা বোর্ডের এড্ডু-আধডু কামকাজ হইবার যা আশা ছিল, গেল। ইজরার হাটেই যদি যাইব্যার লগে, তাইলে দ্যাশের ইজ্‌রার হাটে বসাই ভাল। মিছা কইর‍্যা কইলকাতার ইজ্‌রার হাটে ঢুকার কাম কী? অগোডা অগৌহ থাউক। লোকসানের ব্যাবসায় হালখাতা বছরে সাত্‌বার। কামডা কী?' শিবু হালদারের মুখটা তেতো দেখায়—ঠোঁট বেঁকা, চোখ ট্যারা, কপালে ভাঁজ।

'শিবু, তোমার এই দোষটা ছাড়ো। কথা শুইন্যাই কথাডারে একডা পাথ্থর, ভাবার কাম কী? যোগেন কী অবস্থায় কী করে সেডা তো স্যায় আগৈলঝরার জনসভায় বা আড়কান্দির ঠাকুরবাড়িতে কীর্তন গাইয়্যা বইলব্যার পাইরব না। সেডা তো ওর লগে পরামর্শ কইর‍্যা জাইনব্যার লাইগব। যোগেনকেও তো জানাইব্যার লাগব। একটা কথার কতগুল্যা সুত্যা? শিবু—'

'যতগুল্যাই হোক, শুইন্যা ফেলি। কয় কী লাটশাহেব—'

'যোগেন, কও, আগে শুনি তো, কী করা তা পরে ভাবা—'

নৌকোটা মধুমতীর একটু ভিতর দিকে ঢুকছে। বৈঠার আওয়াজের সঙ্গে এবার জলের আওয়াজটাও উঠছে। উত্তর-পুব থেকে একটা বেশ জোর হাওয়া খেপে-খেপে আসছে, তাই আসে, ওদিকে বিসাদির বিলের ওপরের ফাঁকটা, নদীতে তো হাওয়া থাকবেই। নদীর স্বাভাবিক হাওয়া বয় সমান গতিতে—সে প্রায় বাড়তেও পারে কিন্তু বোঝা যায়, সে-বাতাসের পেছনে ঝড় নেই। হাওয়া যদি খেপে-খেপে আসে, তাহলে মাঝিকে একবার আকাশ দেখতেই হয়।

যোগেন ঘাড় ঘুরিয়ে উত্তর-পুবের আকাশটা একপলক দেখে নিয়ে বলে, 'আইস্যা পইড়ল্যাম তো!'

'আইস্যা পড়লেন না, আইস্যা গেলেন। কিন্তু কথাডা—'

'কথাডা যহন তুইল্যাই ফেলছি, পুরাটাই কওয়া দরকার। আমি সেই লাটশাহেবের আশপাশের ভিড়ে গেলাম আইটক্যা। বারানোর পথ পাই না। দেহি, আবার মাথার উপর দিয়্যা একডা টুকরা কাগজ কে বাড়াইয়্যা ধইরল লাটশাহেবের দিকে। লাটশাহেব তহন মন্ত্রীগ লিস্টি পইড়তেছিল। স্যায়, একবার ট্যারাইয়া হাতের সেই শিলিপডা দেইখ্যা, হকশাহেবরে কী দেখাইল। হকশাহেব তহন হাততালি দিয়্যাই চলছে, একবার মুখটাই হাসি রাইখ্যা চক্ষুডা ট্যরায়,' যোগেন অভিনয় করে দেখায় আর তাতে এদের দু-জন হেসে ওঠে, 'আরো, কী কইব, লাটশাহেব নাম কইল—মুশারফ হোসেন, জলপাইগুড়ির নবাবশাহেব। কী কইরব, এই নামখান একবারে জইন্যও সেই মিটিঙে উঠে নাই। কওয়া নাই, বার্তা নই, ফরিয়াদি নাই, সাক্ষী নাই, এক মন্ত্রীর নাম মুইছ্যা আর-এক মন্ত্রীর নাম আইস্যা গেল। লাটশাহেবের মুখ থিক্যা। বুইঝল্যা—কীসের মধ্যে আছি?'

'আপনি কইলেন-না ক্যা? কই, এই নামডা তো মিটিংয়ে পাস হয় নাই?'

'ক্যান কই নাই? সেডা কই। প্রথমত, আমার গলা বাড়াইব্যার কোনো ফাঁক ছিল না। আমি যদি চিল্লাবার ধরতাম, ঐহানে কেউ ট্যার পাইত না—কথাডা উঠে কোথ্ থিক্যা।'

'আর যে-কইল আপনারে পরে বুঝাইয়্যা দিবে আপনারে ঐ মিটিঙে ডাকছিল ক্যা?'

'সে তো কইল আমারে, ঐ ভিড় ভাঙতে-না-ভাঙতেই। কী য্যান কইল হাইস্যা-হাইস্যা। কিন্তু আমার ততক্ষণে হিশাব বুঝা সারা। আমারে বস্যাইয়্যা রাইখছিল সাক্ষী গোপাল কইর‍্যা। লাটশাহেব সেদিন মন্ত্রিসভা বানাইবই। আমি তো নতুন তৈরি শিডিউল কাস্ট অ্যাসেম্বলি পার্টির নেতা। আমার হাতে তো কম কইর‍্যাও তিরিশ মেম্বার, আরো কম কইর‍্যা ধইরলেও তেইশ মেম্বার। হকশাহেবই হোক আর খাজাশাহেবই হোক—বেশি ব্যাগরবাই কইরলে দুইডারেই বাদ দিয়্যা পছন্দের কাউরে প্রধানমন্ত্রী কইরত। তার লাইগ্যা আমারে একবার জিগাইত—তোমরা কি সাপোর্ট দিব্যা? এক লপ্তে তিরিশডা ভোট কি দুইডা কথা? জামিন রাখছিল, জামিন।

'তাইলে জিগাইল না ক্যান তোমারে?'

'জিগ্যাবার কাম নাই বইল্যা। হকশাহেব আর খাজাশাহেব আমারে ঘরে দেইখ্যাই বুইঝ্যা গিছে—তাগ বদ্‌লা রেডি আছে।'

'মন্ত্রী যে বদলাইল—'

'আমি কই সে-কথা? মুখের উপর কইয়্যা দিবে লাটশাহেব মন্ত্রিনিয়োগ কইরতেছেন, তুমি কেডা কবার? যতবার ইচ্ছা ততবার বদলাইব।'

'তাইলে শুইনল্যাম স্বাধীন হওয়ার আগে এইডাই শ্যাষ ধাপ। আইনসভা তৈরি হইয়্যা

থাইকল—অ্যাহন বুইঝ্যা-শুইঝ্যা একদিন স্বরাজডা পাশ করায়্যা দিবে,' শিবু বলে।

ভাবখান তাই। খানিকডা হওয়ারও পাইরত কংগ্রেস যদি হকশাহেবের লগে এই মিরজাফারি না কইরত। হকশাহেব, শরৎ বোস, কিরণশঙ্কর, শামসুদ্দিন, নৌসের আলি, মুকুন্দমল্লিকরে নিয়্যা মন্ত্রিসভা হইলে সেডা স্বাধীনের থিক্যা কম হইত কী সে?'

'যোগেন, কংগ্রেস এমনডা কইরল ক্যা, কিছু জানব্যার পার পরে?'

'পরে ক্যা? তহনি তো হাঁড়ি ভাইঙ্গ্যা গেল। এ হানের কংগ্রেসের ইচ্ছাই ছিল। গান্ধীজি আর পণ্ডিতজির হুকুম—মন্ত্রিসভায় যাবা না। মুসলমানগ সাথে মন্ত্রিসভায় গ্যালে সারা ভারতের মুসলমানরা টি-টি কইরবে।

'লিগের মুসলমান আর প্রজার মুসলমান যে এক না—এইডা বোঝার মতন একটা মানুষ ছিল না কংগ্রেসে?' প্রহ্লাদ খুব দুঃখ পায়।

'কংগ্রেসের লিডার সারা ভারত নিয়্যা একডা হিশাব ছিল, ভয়ও ছিল এহানে সিটে মুসলমান বেশি। তাগ তো ভাবনা অন্য সব প্রভিন্স লইয়্যাও। সেখানকার মুসলমানরা লিগরে ভোট না দিয়্যা কংগ্রেসরে দিছে। তাগো জোটে রাখাডা তো কংগ্রেসের প্রধান লক্ষ। বাংলায় মোট সিটে লিগ-প্রজা ছাড়াও আছে স্বতন্ত্র মুসলমান—তাগ লিগ বা প্রজায় টাইনতে আর কতক্ষণ। আর, আছে তেইশডা বা বত্‌তিরিশডা শিডিউল। টুপশালি। তারা কংগ্রেসরে সমর্থন দিলেও, দড়ির উপর দিয়্যা হাঁটা। মুসলমানরা বেবাক এক হইলে কংগ্রেস বেইজ্জত হইয়্যা পইড়বে। আসল কথা—বাংলার প্রদেশ কংগ্রেসরেই তো নিখিল ভারত কংগ্রেস বিশ্বাসে নেয় না।'

পাড়ের কাছাকাছি আসতেই সেই অচেনা লোকটি প্রথম মুখ খুলল—'আপনারা তো নাইমবেন এইখানে? না আগুইয়্যা যাব?'

'এইহানে কি ঘাট আছে', একটু সোজা হয়ে শিবু ঘাট খোঁজে,'

'কই মিয়া, ঘাট তো দেহি না।'

'সব ঘাট কি সদরঘাট। এইহানেই তো নামাইব্যার কইছে—' অচেনা লোকটি বলে।

'তোমাক কইছে? কেডা' শিবু প্রশ্ন করে।'

'যে-মাত্‌বর আমারে ডাইক্যা নিল।'

'আরে, আমরা তো খাগবাড়ি ছাড়ার পর কোনো ঘাটে থামি নাই, ঘাটও দেহি নাই, তোমারে কানে-কানে কইয়্যা গেল কোন্ ঘাটের মাতবর?' শিবু জেরা করতে থাকে।'

'আপনেই তো কইলেন, সেই যেহান থিক্যা ছাইড়লেন, যেহানে নাওয়ে উইঠলেন।'

'খাগবাড়ি—?'

'ইচ্ছা হইলে, কবার পারেন। তাই কন—খাগবাড়িই কন।'

'খাগবাড়ি হইলে তো খাগবাড়ি কব? তুমি খাগবাড়ি চিনে না?'

'খাগবাড়ি আবার না-চিননের কী আছে? এত বড় নদী, এতগুল্যা খাল—তার মইধ্যে খাগবাড়ি কি একডা?'

নৌকো তখন্ পাড়ে ঠেকে গেছে। দাঁড়িয়ে, যতদূর চোখ যায় দেখে, বলে, 'এইডা ঠিক পাড় তো? গোপালগঞ্জের? কিছুই তো দেহি না। ভুল জায়গায় নামাও না কী?'

'আপনাগ জায়গার ভুল-ঠিক আমি বুইঝব ক্যামনে? আমারে যদি রওনার ঘাটে ফির্যা যাইব্যার কন, চলেন গিয়্যা।'

'এই শিবু, খাড়াও। মানুষডার মাথা ঘুর‍্যায়্যা দিও না। এহানে নাইম্যা কোহানে যাব, তাও তো বুঝি না,' প্রহ্লাদ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, সে পায়ের আঙুলের ভর দিয়ে লম্বা হয়। সঙ্গে সঙ্গে

হাতও উঁচু করে নিষেধ বা ডাকার ভঙ্গিতে।

যোগেন আন্দাজ করে, গোলমাল কিছু হয়েছে জিগাবই।

যোগেন খুব ঠান্ডা গলায় লোকটিকে জিজ্ঞাসা করে, যেন শিবু আর প্রহ্লাদের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, যেন এটা নৌকো না, একটা লঞ্চ, নানা ঘাটের যাত্রী নানা ঘাটে নামে—'মিয়ার বাড়ি কনে? গোপালগঞ্জে?'

'আমরা সাতপুরুষ্যা সাত্‌লাবিল্যা। গোপালগঞ্জ হব ক্যা?'

যেন ও বেশ দেখেশুনে বেছেবুছেই সাতলাবিলে থাকে, যেন গোপালগঞ্জ তার পক্ষে ঠিক জায়গা না। বিলের মানুষ বিলের কাছছাড়া হয় না, নদীর মানুষ নদীর কাছছাড়া হয় না, বনের মানুষ বনের কোল ছাড়ে না। এর কারণ খুব কিছু দুর্বোধ্য নয় তবু এই ঘটনাটাকে একটু রহস্যে ঘিরতে ভালবাসে।'

যোগেন আবার জিজ্ঞাসা করে, 'খ্যাপ মারেন কোন্ খালে—মাদারিপুর না বিষখান্দিতে?'

'ক্যা? এই দুইখান ছাড়া খ্যাপ নাই নাকী? হে দেশে বেবাকই তো খ্যাপ—'

'সে কথাডা তো ঠিকই। এইডা তো বড় খ্যাপ ছিল, রোজ তো আর এই খ্যাপ হয় না, চেনা খ্যাপে তো দুইডা চক্ষু বন্ধ কইর‍্যা, দুইডা না-হইলে একডা, অন্তত একডা চক্ষু বন্ধ কইর‍্যা, নাও চালান যায় জলের গন্ধ শুঁইক্যা। না? কিন্তু যে-একখ্যাপ রোজের না, তাতে তো জলের গন্ধও চিনা না, তাতে কিন্তু মিয়া, আধখানা মোদ্যা চোখের আধখান ঝিমানিতেই জলের দিশ্যা বদলাইয়্যা যাওয়ার পারে। পারে না?

যোগেন কথাগুলি বলছিল বেশ রসিয়ে-রসিয়ে একটু-আধটু অভিনয় করেও—দু-চোখ বন্ধ মুখ নিয়ে নৌকো-চালানো কেমন, একচোখ বন্ধ ঘুম কেমন, আধচোখ বন্ধ ঘুম কেমন। যোগেনের কথা শুনে ও বলা দেখে বৈঠা আর লগির চার জোয়ান হেসে ফেলে। হেসে ফেলে, কেউ হাত দিয়ে, কেউ গামছা দিয়ে হাসির আওয়াজ আটকায়।

শিবু আর প্রহ্লাদ পাড়ে উঠে গেছে জায়গাটার হদিশ করতে। যোগেন টের পায়, লোকটি একটা কোনো ভুলের দায় থেকে পিছলতে চাইছে। আর, তাদের এদিককার রীতিনীতি পুরোপুরি মেনেই সে পিছলচ্ছে, যাতে তাকে দোষী ধরা না যায়। তার শ্বশুরবাড়ির ঘাটকে খাগবাড়ির ঘাটেই বলে কী না, তা তো যোগেনই জানে না। এইসব নাম বলে জায়গা বের করা—অসাধ্য ব্যাপার। হয়ত, পুবদিকের খাল দিয়ে ঘাটে নৌকা এলে বলে মাগবাড়ি দিয়া আল্যাম। হয়ত ঐ ঘাটে বাঁধা নৌকো পশ্চিম দিকে গলুই নিয়ে যখন ছাড়ল তখন বলল, খাগবাড়ি দিয়্যা যাই। আর, মাত্‌ব্বরের নাম? মাতব্বর নিজে নি জানে? এই ভোটে নামপত্তরের দরকারডা বোঝা গেইছে মাত্তর। ওরা যে জলপথ দিয়ে এসেছে সেটা ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ ছাড়া অন্য কোনো জায়গা হতেই পারে না। খুলনা-যশোর-ফরিদপুর-বরিশাল-ঢাকাতে ছড়ানো এই তো যোগেনের শূদ্রভূমি। এর আর ঠিক-ভুল কী? কিন্তু গোপালগঞ্জর হওয়ার পক্ষে ঘাটটা একটু বেশি নিরালা ও নির্জন। হয়ত আর একটু তলা বা আর-একটু উঁচুর দিকে গেলেই গোপালগঞ্জের সেই ঘাটটা পাওয়া যাবে, যেটা মানানসই। তাদের নিয়ে যাওয়ার লোকজনও হয়ত সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। মাঝিরা যে জলপথে আরো ঘুর না দিয়ে একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছে—সেটাই তো বাঁচোয়া। না-হলে তো তাদের জলে-জলে পাক খেয়ে যেতে হত। মাঝিটি এইটুকুমাত্র নিশ্চিন্ত হতে চাইছে যে সে তার প্যাসেঞ্জারদের গোপালগঞ্জেই নামিয়ে দিয়েছে। না-হলে মাঝির পুরো টাকাটাই তো মাতবর মেরে দেবে।

লগির একটি ছেলে যোগেনকে বলে, 'আমরা তো ঐ ঘাট থিক্যাই ছাড়ছি, যে-ঘাটে ঠাকুরের

পূজা তুল্যা দিলেন মা-ঠাইর্যানরা। ঐ বাড়ির মাতব্বরই তো ওকে ডাকাইছে আর কইছে গোপালগঞ্জে যাব্যার—'

যোগেন এতই প্রাণ খুলে হাসে যে চার তরুণ মাঝি তার সঙ্গে যোগ না দিয়ে পারে না। যে মিঞাকে নিয়ে এত কথা সে হাসল না বটে, তবে চোখ ঘুরিয়ে এদের দেখছিল। যোগেন তার সেই হাসির গলাতেই বলে ওঠে, 'দেইখছ নি? কতখান বুদ্ধি আমার পোলার। পূজার ঘট নিয়্যা আইস্যা, পুজা ভুইল্যা, ঘট ভুইল্যা, মন্দির খুঁইজবার লাগছে? হ, হ, সোনাই, আমরা ওড়কান্দিই নামি? তাইলে কি এইহানে নামলে হব না, আর—আড়ডা য্যান ঘাট আছে না—নীচের দিকের কয়েক ধাপ বাঁধান? আছে-না? তোমারই ঠিক কইর্যা দ্যাও বাবা, আমাগ কোথায় নাইমলে সুবিদা। অগ ডাকো, প্রহ্লাদদা, অ প্রহ্লাদদা, শিবুবাবু, অ শিবুবাবু। বাবা, তোমরা একজন নোর পাইড়্যা অগ একজনকে ধইর্যা কও যে জায়গা পাওয়া গিছে, আমি ওদের ডাইকত্যাছি।

একটি বৈঠার ছেলে যেন উড়ে গেল—পাড়ে।

ওরাও গল্পে-গল্পে খেয়াল করেনি, আর মিয়ারও একটু ঝিম লেগে থাকতে পারে—যে-বাঁক নিয়ে ওরা মধুমতী থেকে বাঁয়ে ঘুরেছিল, ঘোরাটা উচিত ছিল তার আগের বাঁকে। তাহলে ঠিক জায়গায় পড়ত। সেই দিকেই এখন যাবে। একটা জায়গাকে যদি যখন যে-নামে ইচ্ছে সে-নামে ডাকা হয় তাহলে জায়গাটার একটা হদিশ হয়ত পাওয়া যায় আর ফৌজদারির আসামি ছাড়া বেশিরভাগ লোকজন তো হদিশ দিয়ে বা নিয়ে কাজ সারে। গোপালগঞ্জ কি একটুকরো জায়গা? বরিশাল থেকে যখন আসছ তখন গোপালগঞ্জ বললেই হদিশ। গোপালগঞ্জে এসে আবারই হদিশ—কোটালিপাড়া না কাশিয়নি, পুবপাড় না পশ্চিমপাড়। সেইটা হদিশের পরও তো হদিশ দরকার—ওড়কান্দি না পদ্মবিল্যা।

প্রহ্লাদ ও শিবুকে নিয়ে সেই ছেলেটি ফিরে আসে। সে পাড় থেকে এক লাফে নৌকোয় নামে, নৌকোটা দুলে ওঠে। প্রহ্লাদ পাড় থেকে চেঁচিয়ে বলে, 'এইহানে নাইমলেও হাঁইট্যা যাওয়া যায়। তুমি ডাইকল্যা ক্যা?'

'এর মইধ্যে নিজের পেশাডা ঝালাইয়্যা নিলাম। এই মিঞারেই শ্বশুরমশায় খাগবাড়ি থিক্যা ঠিক কইর্যা দিছেন। পছন্দ হয়, শ্বশুরমশায় কোথায় যাইতে হইব বইলতে গিয়্যা ফরিদপুরে, গোপালগঞ্জ, ওপার, ঠাকুরবাড়ি, পদ্মবিলা—সব নামই একবার-না-একবার কইছেন। অ্যাহন, এই আমার সোনার পোলাডা মনে করাইয়্যা দিল—পূজার ঘটের কথা। তোমরা তো নদী আর পৃথিবী খুঁইজ্যা অস্থির। পূজার ঘট দ্যাহ নাই। নাইম্যা আইসো। মিয়া আমাগো ওড়কান্দির ঘাটেই নামাইব। নাইম্যা আইসো।'

প্রহ্লাদ আর শিবু যে খুব সাবধানে পাড় ভাঙে, তা নয়, তবে এটুকু সময় তো তাদের লাগবেই। নৌকোয় উঠে বসতে-বসতে প্রহ্লাদ বলে, 'নদী এইহানে এডডু আড়াল। এহান থিক্যা হাঁইট্যা যাওয়া যায়, আবার নদী দিয়্যা নাওয়েও যাওয়া যায়।'

'এডা কী কইল্যা প্রহ্লাদদা? হাঁইট্যা আর নাওয়ে তো পৃথিবীর সব জায়গাতেই যাওয়া যায়। তিনভাগ জল, একভাগ স্থল। তাইলে হাঁইট্যা যাওয়ার অসুবিধাডা কী? একডা দরকারি কথা শুরু হইছিল, হাঁটতে-হাঁটতে চইললে তো কথাডা কওয়া যাইত। আর, নাওয়য়ে তো লগির একখান খোঁচা দিব আর ওড়কান্দির ঘাটে নামা লাগব। কথার কাম শ্যাষ। চলো, হাঁইট্যাই যাই। চ-লো।'

যোগেন দাঁড়িয়ে পড়ে। রোদের তাপ থেকে মাথা বাঁচাতে সে যে একটু কাপড় মাথায় দিয়েছিল, তাতে তার কোঁচার খানিকটা খুলে গিয়েছিল। আবার কোঁচাতে যেতেই ধুতিটা নদীর

হাওয়ায় পালের মত ফুলে ওঠে। মাঝি-ছেলেরা মুখের হাসি হাত চাপা দেয়। ততক্ষণে ঘটটা মাথায় তুলে নিয়ে শিবু নেমে গেছে, পেছনে প্রহ্লাদ।

যোগেন যখন নামে এরা উঠে দাঁড়ায়।

'চলি বাজানরা', 'সালাম মিয়াভাই' বলে যোগেন এক লাফে পাড়ে নামে।

বিলের পথে রাজনীতি

৫৯

কোর্টে যেমন এককোণে দাঁড়িয়ে দুই কাল কোট গোপন কথা বলে, তেমনি স্বরে যোগেন কথা বলছিল। ভাল করে শোনার জন্য একদিক থেকে প্রহ্লাদ, আর-এক দিক থেকে শিবু ঘাড় হেলিয়ে দিচ্ছিল যোগেনের দিকে। প্রহ্লাদ সব থেকে খাটো, ফলে তাকে মাঝেমধ্যেই পায়ের আঙুলের ওপর হাঁটতে হয়। শিবুর মাথায় ঘট, ঘাড় হেলাতে তাকে বাঁ-হাতে ঘটটাকে সামলাতে হয়।

'কথাডা শ্যাষ হইব না। কিন্তু উত্থাপনডা হৌক। কও প্রহ্লাদদা, নমশুদ্দুররা তো কবে থিক্যাই নমশুদ্দুর, রাজবংশী তো কবে থিক্যাই রাজবংশী, বাগদিরা তো কবে থিক্যাই বাগদি। মানে, কই, এইসব মানুষকে এক কইর‍্যা শুদ্দুর, চাঁড়াল এমন কইর‍্যা কথা বলা হয় ঠিকই কিন্তু এই ভোটের আগে কুনোদিন এই হিশাব কারো মাথায় আসে নাই যে বাংলায় এইসব জাইত একসঙ্গে বত্‌তিরিশডা মেম্বার হব্যার পারে। এইড়া, এই এক-কইর‍্যা বলা সম্ভব হইল তো কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ডের লগে। হ্যাঁ। এডা তো ঠিক কথা—ঐ ৩২ জনের মইধ্যে সাতজন পুরানা কংগ্রেসি, একজন পুরানা হিন্দু। হইল। কিন্তু মাথা-গণতিতেও তো আইনসভার মোট মেম্বারগ দুই আনা তপশিলি। এইডা কহনো ঘটে নাই, কহনো ঘটে নাই। তাইলে আমাগ চাওয়া, আমাগ দাবিদাওয়া এসবও তো বদল দরকার, অ্যাহেবারে পুরাখান বদল। অ্যাদ্দিন কী ছিল, যত বড়লোকই হও, যত বিদ্বানই হও, যত বড় ডাক্তারই হও তুমি যদি শুদ্দুর হও, তাইলে তুমি কিছুই পাবা না। ২৫-এর কাউন্সিলের ভোটে এডডা নমশুদ্দুর জিতল? মুকুন্দ মল্লিকও না। আর আমরা সরকারের কাছে গিয়্যা ভিক্ষা চাই—আমরা তো শাহেবগ অনুগত প্রজা, আমাগ ক্যান দয়া করেন না?'

'এইসব কথা তোমার ঠিক না যোগেন। আমাগ পিতৃপুরুষরা কম আন্দোলন কইরছেন? সেগুল্যা তো অ্যাহন ইতিহাস হইয়া গিছে। ব্রাহ্মণগ বয়কট করা, বামুনগ কাজ না-করা, বামুনরা দ্যাশের কথা যা কয় তা বিশ্বাস না করা, কোথায় য্যান কালীপূজা নিয়া দাঙ্গা বাধছিল আমাগ সঙ্গে বামুনগ। আমাগ বাপঠাকুরদাগ জাতি নিয়া খুব অভিমান ছিল।'

'শুনো—আমরা তো কথা কইতেছি ১৯৩৭-এর ভোটের পরের মন্ত্রিসভা আর আইনসভা নিয়্যা? এর আগে কুনো ভোট ছিল? কুনো আইনসভা ছিল, কোনো মন্ত্রিসভা ছিল? ছিল না তো? তহন বামুন-কায়েত ছিল—আমাগ বাপঠাকুরদাদারা নিজেরা বামুন হইব্যার চাইত। কত জন তো স্যায় সুযোগে কায়স্থ হয়্যা গেল। সেইডা তো ইতিহাস। কিন্তু অ্যাহন তো ইতিহাস নাই। অ্যাহন তো তোমাগ বামুন-কায়েতের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি, চেয়ারে বইস্যা এক গেলাশ থিক্যা জল খাইব্যা, এক-একডা আইন পাশ হইব। সেইহানে হিন্দুগর ভিতরে অনুন্নত টুকর‍্যা বইল্যা নিজের পরিচয় দিব্যা, নাকী নিজের পরিচয় দিবা এই বইল্যা যে দ্যাশের সব মানুষ

হিন্দু-মুসলমানে ভাগ হইয়্যা যায় নাই। আমরা স্বতন্ত্র জাইত। হিন্দুও না, মুসলমানও না। আমরা তপশিল জাতি। আমাদের স্বার্থে কাজ হইলে সরকার রাইখব। আমাগ বিপক্ষে কাম হইলে সরকার, ফেল্যায়া দিব। এই কথাটা জোর দিয়া কব্যার দিব্যা, কি দিব্যা না?'

'কবে কেডা? আমিই-বা তার কোন্ মামাশ্বশুর? বইলতে না-দেয়ার কেডা?'

'ধরো আমি কইব্যার চাই যে আমাগ, মানে তপশিলি জাইতের মানুষগ হিন্দু বইল্যা ধরা চইলব না। ক্যান চইলব না—তার ধরো সব অকাট্য যুক্তি আছে। যুক্তি শুইন্যা তো মানুষ মত ঠিক করে না। মত ঠিকই থাহে। বিরুদ্ধের যুক্তির জোর থাইকলে নিজের মতডারে আরো আঁকড়াইয়া ধরে। আমার যুক্তি মাইন্যা যে হিন্দুরা কইব—তুই তো ঠিক কথাই কইছিস, যা, তোরে ছাইড়্যা দিল্যাম—এ-কথা ভাইব না প্রহ্লাদদা। একবার যদি বইল্যা ফ্যালা যায়, আমরা হিন্দু না দেইখব্যা কী ভূমিকম্প শুরু হয়—'

'সে শুরু হোক গিয়্যা। তোমার তো তা নিয়্যা ভাবনা নাই। তুমি তো ভূমিকম্পই সৃষ্টি কইরব্যার চাও। কিন্তু বিপদডা তো তোমারই ভিতর থিক্যা পাক দিয়্যা উইঠব—অ্যাঁ, তাইলে কি যোগেন মণ্ডল আমাগ হিন্দুর বাইরে গিয়্যা মুসলমান বানাবার চায়?'

'ঠিক। ঠিক। এই কথাডাও উইঠবই। আজ থিক্যা একশ বছর পর কইলেও উইঠব। তাইলে আর কইল্যাম ক্যা—আগে কি কহনো শিডিউল বইল্যা কুনো জাইত ছিল? ছিল না। তহন আলাদা-আলাদা জাইত ছিল—চাঁড়াল, মেথর, ডোম, ধাঙর, রাজবংশী। এই আলাদা জাইতগুল্যা কিন্তু হিন্দুধর্মের বিধান। অ্যাহন যদি সেই সব মিল্যা শিডিউল হয়, তাইলে তো ব্রিটিশ গবনর্মেন্টের আইন-মোতাবেক শিডিউল। তয়? সরকার নতুন একডা জাইত দিল আর আমরা নি না!'

'একডা কথা জিগ্যাব? কথাডা কি আপনে সবে ভাবা শ্যাষ করছেন, না, শুরু করছেন? আর কারো সঙ্গে কি এই নিয়্যা কথা হইছে?' শিবু হালদার এই প্রথম কথা বলল। লম্বা ও রোগা মানুষটির সারা মুখে অজস্র রেখা উঠে ভেঙে-ভেঙে যাচ্ছে! মাথার ওপরের ঘটটাকে সামাল দিতেই যেন, শিবু হালদারের বাঁ হাতের আঙুলগুলি কাঁকড়ার দাঁড়ার মত হয়ে যায়।

'ঠিকই কইছেন শিবু বাবু। ভাবনা তো আর ফৌজদারি কেস না, যে এফআইআর দিয়্যা শুরু আর জাজমেন্ট দিয়্যা শেষ? বরং কইব্যার পারেন, ঠিক মনে আসে নাকী কইবার পারেন—ধরেন, শিশু বয়স থিক্যা তো আমি পালা গাই। রাধা যহন কৃষ্ণের বাঁশি শুনগা মইধ্য রাইতে, পাশে স্বামী আয়ান, দরজায় ননদিনীরা পাহারায়, তার উপর বৃষ্টি আর বাজ, যেহানে রাধা আছে সেহান থিক্যা কৃষ্ণের কাছে যাওয়ার তো কোনো উপায়ই নাই। কিন্তু রাধার আর, সব নিয়্যা দুশ্চিন্তা আছে-ক্যামনে স্বামীর পাশ থিক্যা উইঠবে, ক্যামনে একডুও আওয়াজ না তুইল্যা একে-একে পা দুখান পালঙ্ক থিক্যা নামাইবে, দরজার খিল খুইলব ক্যামনে, কপাট ফাঁককইর‍্যা গইল্যা যাইবে তারওপর, যে-বৃষ্টিতে আকাশখান আর আপনে ধইর‍্যা রাইখবার পারে না, সেই বৃষ্টিরে রাধা ছত্র কইর‍্যা নিবে, চিকুরের আলো দিয়্যা রাধা বর্ষায় বদলাইয়্যা-যাওয়া ঘাট চিন্যা নিবে, বাজের আওয়াজে রাধা নিজের বুকের আওয়াজরে লুকায়া থুবে—এইসব কঠিন-কঠিন দুশ্চিন্তা রাধা দুই শ্বাসের মধ্যিখানের ফাঁকডাতেই মিট্যাইয়া নেয়—শুধু একডা কথা নিয়্যা রাধার কুনো দুশ্চিন্তাই নাই যে সে কৃষ্ণের কাছে পৌছাইয়্যা যাইবে ঠিক, না-পৌছান্ যায়? ভাবনাডা তেমন কিছু? না ভাবা যায়?'

যোগেনের এই কথাতে শিবুর মুখের রেখাগুলি বদলে গেল, শিবুর ঠোঁটের দুই কোন বেশ শক্ত হয়ে বেঁকে গেল নীচের দিকে, এত ভাঙচুরের মধ্যেও চিবুকটা তীক্ষ্ণই থাকল। যোগেনের কথার পর সে চুপ করেই ডানদিকে একটু সরে যায়।

ওরা তিনজন হাঁটতে-হাঁটতে রাস্তা-পথঘাট কোনো কিছুই দেখছিল না। আবার, যাদের নিত্যি চব্বিশ ঘণ্টা যাতায়াত এই পথে, তাদের চলার ব্যস্ততা বা অভ্যাসও এদের পায়ে ছিল না। বরং এরা যেন একটু আনমনাই হয়ে যায়, এমন পথিক মানুষ যেমন আনমনায় পথের দূরত্ব অতিবাহন করে। প্রতিদিনের আসাযাওয়ায়, প্রতিদিনের হাঁটাচলায়, প্রতিদিনের এই শ্রাবণ-প্রান্তর ও শ্রাবণ-আকাশের ভিতর পথ তৈরি করায়, নিকট এক আত্মীয়তাই ব্যাপ্ত ছিল এই নিসর্গে।

এখনো তারা যেন উত্তর বরিশালের ভর্তার বিল, সতারের বিল দিয়েই হাঁটছে। মাঝখানে যে-একটু নদী পার হতে হল, তা না পেরলেও ক্ষতি ছিল না। সেই নদী পেরবার পর নদীটা তাদের স্মৃতিতে থাকে না, চট করে নামটাও মনে না-পড়তে পারে। এমন সব টুকরোটাকরা নদী, এমন সব আকাবাঁকা খাল, এমন সব কেদো বন বা নলবন, এমন সব ধানশিষ তাদের শরীরের ভিতরে এত গেড়ে গেছে যে শরীরের বাইরে সেসব দেখাও সম্ভব নয়।

বিলে একইরকমের ধান রোয়া হয় না।

যেখানে সারা বছর জল থাকে—ছপছপানো জল, সেখানে বিছন-ছিটনো চাষ হয় সারা বছর। এইসব বারমাসি ধান নিয়েই ছড়া আর গল্প তৈরি হয়—সেই পুবের পাহাড়তলির সোলা নাই-এর ঝিল থেকে, পশ্চিমে নীচা-ভৈরবের বিল, উত্তরে সেই সিলেটের বাওর-বিল, পশ্চিমের দিকের উত্তরে পাবনা-রাজশাহি দুই জেলা জোড়া চলন বিল। সন্ধ্যায় সূর্য পাটে বসলে শোয়ার আগে একমুঠো বিছন দিল ছড়িয়ে আর বৌ সকালে সেই ধান কেটে, ঝেড়ে, কুটে ভাত রান্না করে ফেলল, তার যেমন স্বাদ তেমনি বাস। এই রাতের আকাশে তারা-ছিটনোর মত, সন্ধ্যার ক্ষেতে বিছন—ছড়ানো একরাতে পেকে-যাওয়া ধানের নামের বাহার কত—ছিটানশালি, গুড়জালি, পুঁটিধান, খৈশিষ, হাওরের আগুরি, চলনবালাম, কাটারি। নামের কোনো শেষ নেই। আর, সব মিলিয়ে এই একরাতে পাকা বিল্যাধানকে বলে মনপড়ানি ঠাকুরদানি আঁচলবাঁধনি। কিন্তু পৃথিবীতে, বা, যশোর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকার এই বিলাঞ্চলে বা পাবনা-রাজশাহি থেকে সিলেটের হাওড় পর্যন্ত বিলগুলিতে কোনো কৃষককে জিজ্ঞাসা করলে, তারা কিন্তু একজনও স্বীকার করে না এমন রাতপোহানি ধানের ভাত সে খেয়েছে কখনো। আরো ধানের নাম করে যায় 'আমার হাতে, 'আমার ক্ষ্যাতে এই ভাত যে হইছে, সেই ডাই তো আমাগ চোদ্দ পুরুষের পুণ্য, ঐ-ধান আইঠ্যা কইরলে আমাদের পরের চোদ্দ পুরুষের পতন।

কিন্তু একটু আড়াল বা নিভৃতি পেলে বা একা হয়ে গেলে প্রায় সবাই একই জবাব দেয়—স্বীকারোক্তির সেটাই শেষ সীমা, 'য্যান একবার শুইনছিল্যাম আমার মুখ-অ্যাঁইঠ্যা করার সময় দিছিল। কিন্তু কোনো স্বাদ স্মরণ নাই।'

যে-ধানের স্মরণ থাকে না, সে-ধান তাহলে এখনো চাষ হয় কী করে?

নিজের খাটনি-কামাইয়ের জায়গাই যখন মানুষের রূপকথার আঙিনা হয়ে ওঠে, তখন সে কোনো কারণেই সে-আঙিনার দখল ছাড়ে না। সে-যে ধানের দখল ছাড়ছে না সেটা জানানোর একটা স্বর বা স্তর আছে। খুলনার মুখের কথা তো ফরিদপুরে চলে না, ফরিদপুরের কথা সিলেটে চলে না, সিলেটিরা নিজেরাই নিজেদের কথা বোঝে না, কিন্তু এইসব ভাষার স্বরে একটা মিল এসে যায়, গলার স্বরে, সেই স্বরে জোর দেয়ার ধাঁচটা আলাদা হয়ে যেতে পারে, কিন্তু স্বর না কী সুর, তাতে বদলায় না, 'সারাজীবন তো স্যায় বিছনই ছড়াই, হয় কী হয় না কে জানে,' 'ঐ বিছন-ছাড়া কি এই বিল্যাজলে চাষ হয়—আমার তো ছয় ছাওয়াল-পাওয়াল, মুখের ছাঁচ ক্যান আলাদা, আবার দেইখলে ঠাহর হয় ভাইবুন,' 'কী কইর‍্যা জানা হইল যে

ঐ ধান আর হয় না? হয়, কিন্তু অন্য সব ধানের মইধ্যে লুকাইয়্যা থাহে', 'দেবদেবতার ধান নিয়্যা কথা এত ক্যান', 'এ-ধানের নাম মনপড়ানি, মনপড়ানি, কী মনে পড়ায়?'

যশোর থেকে সিলেট যদি উচ্চারণ-অনুযায়ী বর্ণমালা বানানো যায়, তাহলে শোনায় যেন প্রাকৃতিক, গভীর রাতে চেনা জলের আওয়াজের মত প্রাকৃতিক, বা দূরের একটা চেনা গাছের বুড়োবুড়ি প্যাঁচাপ্যাঁচানীর মত প্রাকৃতিক, রাতে জল থেকে উঠে আসা দলবাঁধা ভোদরের দৌড়নোর মত প্রাকৃতিক। কিন্তু 'মনপড়ানি ধান,' 'মনপড়ানি' ধানই হয়—সেটার আর ফরিদপুরি বা বরিশালি বা সিলেটি বিছন হয় না। কেউ যদি 'মনপোড়ানি,' বলে, তাহলে কেউ-না-কেউ বলে দেয়—'হেই কবে পড়ছে খেজুরের ডাল, শুকায়্যা হইছে ফালফাল্, পুইড়ব না তো ভিজব না কী,' বা 'পোড়ে তো পানি ঢাল্', বা, 'ঠাকুরদেবতা নিয়্যা এত পোড়াপুড়ি ক্যা?'

ভুল স্বীকারের কোনো পদ্ধতি এ-সমাজে নেই—'কী এমন দোষ ঠেকছে, মনপোড়ানি কওয়ায়?'

'আমি কি বামুনঠাউর যে দোষগুণ জানি? যা জানার হেটুক জাইনলে তো মরণ পর্যন্ত চল্যা যায়। বলদের বাঁট নাই। নিজের হোগা নিজে দেখা যায় না। চক্ষু দুইডা বইল্যা দুইড্যা জিনিস দেখা যায় না। মাগের উপুর উইঠলে আর তলার শ্বাস শুইনো না।—এইসব কি বামুনগ কাছে শিখা? গল্পডা না জাইনলে, গল্পডা জাইন্যা রাখ।'

শিব তো ভিক্ষা চাইয়্যা বইসছে অন্নপূর্ণার সামনে হাত পাইত্যা। হাত তো পাতাই যায়। পাতলেই কি কিছু দেয়া যায় স্যায় পাতা-হাতে? কোলের ছাওয়াল হাত পাইতলে মাই দেয়া যায়। সই হাত পাইতলে মুখের পানের ভাগ দেয়া যায়। রাবণরাজা হাত পাইতলে ভিক্ষা দেয়া যায়। আবার গোপাল হাত পাইতলে নাড়ু দেয়া যায়। জামাই আইস্যা হাত পাইতলে ঝি-রে দেয়া যায়। ঠাকুর স্বপ্নে হাত পাইতলে পূজা দেয়া যায়। যমরাজা আইস্যা হাত পাইতলে পরান দেয়া যায়। বাপ আইস্যা হাত পাইতলে কপাল দেয়া যায়। নদী আইস্যা হাত পাইতলে চক্ষু দেয়া যায়। গাছ আইস্যা হাত পাইতলে জিরান দেয়া যায়।

কিন্তু শিব আইস্যা হাত পাইতলে অন্ন দেয়া যায়? যায় না। অন্নপূর্ণা হইলেও যায় না। ঐ ভিক্ষার হাতখান পুরাইতে অন্নপূর্ণার অন্নের পাহাড় হইয়্যা যাবে নে ইদুঁরের গর্তের মাটি।

তাইলে, শিবের পাতা হাত ভরব কীসে অন্নপূর্ণা? তাইলে, এত অন্নকূট সাজাইল ক্যা অন্নপূর্ণা?

তাইলে?

এই স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল জুড়ান্ খিদা শিবের মিটায় ক্যামনে অন্নপূর্ণা? ঠারে চাইয়া দ্যাহে হাতখান পাতাই আছে, সেই ভিখারির হাত, পাতাই আছে, সরে নাই।

তহন, তহনই, চিকুর খেলে অন্নপূর্ণার মাথায়। একবারই খেলে। সে-চিকুরের আলো আছে, আওয়াজ নাই। য্যামন চিকুর জ্বইল্যা উঠে বিলের শ্যাষ আকাশে। যেমন চিকুর চক্ষু ধাঁধাঁয় দুইডা পাড়ের নদীর আর-এক পাড়ে। যেমন চিকুর চাঁদের রাইতে চাঁদের ভিতর লুক্যাইয়া জ্বলে। তেমন একডা চিকুর খেলে অন্নপূর্ণার মনে।

মনে পইড়্যা যায়—শিবের অন্নের তরে-না অন্নপূর্ণা একমুঠ এই ধান বাইন্ধ্যা গিঁঠ দিয়্যা রাইখছে আঁচলে!

সেই গিঁঠ খুইল্যা, দুই হাতের পাতা ভইর্য়া সেই ধান নিয়্যা অন্নপূর্ণা ঝরাইয়্যা দ্যায় তার ভিখারির পাতা হাতে। সেই মনপড়ানি ধান অন্নপূর্ণার হাত থিক্যা শিবের হাতে পড়ে, য্যান দুধের স্রোত। সে ধান কি মন পোড়াইবার পারে? সে ধান তো মনে আইন্যা দেয়—বাঁচন আছে,

বাঁচন আছে। মন পুড়ব ক্যা? মনে পইড়ব। ঠাকুরদানি আঁচলবাধনি।

ওরা—যোগেন-প্রহ্লাদ-শিবু—এইসব উপকথা দিয়েই হাঁটছিল।

শিবু বলে, 'তাইলে হরিচাঁদ-গুরুচাঁদের মতুয়া ধর্মের নাগাল একডা নতুন ধর্ম কইরবেন, শিডিউল ধর্ম? জিত্যা মেম্বার হইয়্যা গুরু সাইজবেন তা গুরু তো সাইজলেই হইত। আপনে তো চাঁদশিও জানেন, ইংরাজিও জানেন, গানের গলাও তো ভাল। তাই যদি হবেন তাইলে এই ভোটাভুটি, কইলকাত্তা—বরিশাল, হকশাহেব-লাটশাহেব এত ভেজাল পাকাইলেন ক্যা? আমাগ তো গুরুর কোনো অভাব কোনো কালে ছিল বইল্যা শুনি নাই। শুধু একডা যুতমত গাছ-খোঁজার হ্যাঙ্গাম। জোড়া-পাকুড় বা উজির পুরের কাটাগাছ হইলে তো কথাই নাই।

'শিবুবাবু, আপনি অ্যাদ্দিনের সাবেক মুহুরি যে দলিলের সীমানার বরই গাছকে বানাইয়্যা দ্যান জিক্যা গাছ, আর আপনে আমার এতডা কথা শুইন্যা বুইঝলেন আমি অ্যাহন আশ্রম খুইল্যা গুরু সাইঝবার চাই। গুরুই যদি সাজার সাধ, আপনার সেরেস্তা কী দোষ কইরাছিল?'

'আমিও তো সেইডাই জিগাই—শেরেস্তা দোষ করছিল কী?'

'আমি ঠিক এর উল্ডা কথাডা কব্যার চাই। তা আপনাগো কাছেই সে-কথার যদি এই মানে খাড়ায় তাইলে দশে তো আরো কী বুইঝব কেডা জানে?'

'যোগেন, তুমি বলো-না। এই তো প্রথম কইতেছ, তোমারও এডডু জড়তা আছে, শিবুরও আছে, তুমি কইব্যার ধরো।'

'এ কি নিমাইসন্ন্যাস-পালার রিহার্সেল নাকী। আচ্ছা, তত্ত্বকথাডা বাদ দেন। কামের কথা দিয়্যা কইলে বোধহয় কওয়ায় সুবিধা হয়। শিবুবাবু, যেইখানে ঠেকবেন সেইখানে জিগাবেন।'

মাথায় একডা হাঁড়ি নিয়্যা কি কান অত খাড়া রাহা যায়?'

'দ্যাও-না, আমারে দ্যাও, খানিকডা নেই,' প্রহ্লাদ হাত বাড়ায়।

'না, না, তার কাম কী, ঠিক আছে। কন।'

'শিবুবাবু—মহাত্মা গান্ধী আর কংগ্রেস মিল্যা যে নতুন জিগির তুইলছে, ছোঁয়াছুঁয়ি মানা চইলবে না, শুদ্দুরগ সব মন্দিরে ঢুইকব্যার দিবার লাইগব আর শুদ্দুরগ সঙ্গে ভাত খাবার লাগব আর শুদ্দুরগ দেয়া জল বামুনগ খাবার লাগব—আপনি কি এডায় আছেন? না, নাই?'

'আমার নাহাল এড্ডা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মনুষ্যের কি সেই জোর থাইকব্যার পারে যে মন্দিরে ডাইকলে বা বামুনবাড়িতে ভাত দিলে যাব না, খাব না?'

'বে—শ। আপনে আর আমি দুইজনই তো শূদ্র। শূদ্রের তো আর উঁচা-নিচা নাই।'

'থাইকব না ক্যা? সৎশূদ্র বইল্যা ২১-সালের সেনসাসে দুনিয়ার সাহা-শুঁড়ি সব কায়েত হইল না?'

'আপনি কি চান সৎশূদ্র হইব্যার?'

'আমি ঠিক জানি না নিজে-নিজেই কি সৎশূদ্র হওয়া যায়? বামুনগ বিধান লাগে না?'

'বিধান তো পাইছেন। কংগ্রেস দিছে, গান্ধী দিছে। মুসলমানগ হিন্দু করাও তো শুরু হইছে। আমি এইডা দশের সামনে বুক ফুল্যাইয়্যা কইব্যার চাই—আমারে ঢুইকতে দিলেও আমি মন্দিরে ঢুইকব না, আমার কাছে গঙ্গাযাত্রী বামুনও যদি জল চায় আমি দিব না। আমি অস্পৃশ্যই থাইকব্যার চাই। মুসলমানগ হিন্দু বানানোওতে আমার মত নাই। আমি নমশূদ্রই থাইকবার চাই।'

'তাতে তো কুনো অসুবিধা নাই। মন্দিরে ঢুইকলে বা পংক্তিভোজনেও শূদ্র তো শূদ্রই থাকব। শুধু উঁচা বর্ণের বিধি ব্যবহার বদলাব। খুব প্যাঁচ আছে—তুই আলি না, তাই খালি না। আইন না আইলে আর তুই আইলেও তোর খাওয়া হইত না। পাশে বসার বামুন না থাইকলে পংক্তিভোজন

ক্যা? অহন তো তোগো নতুন দুর্দশা। বামুন জোগাড় না-হইলে খাওয়া হইব না।'

'দ্যাহেন, আমাগ শুদ্দুর সমাজেও তো উঁচানীচা আছে। আমাগ মইধ্যে যারা নীচস্য নীচ তাগো কথা আমি জানি না, কিন্তু যারাই এড্ডু জানলা—দরজা দিয়্যা চায়, তারা বেবাকে ভাবে—বামুনগ মন্দিরের দেবতা তাদের পূজা নেয় না বল্যাই তাগ দুঃখ যায় না। স্যাও ভাবে—বামুনরা উচ্চজাত।'

উপকথাময় সেই দেশ

৬০

ওরা এই উপকথাময় দেশের ভিতর দিয়ে হাঁটছিল। এই উপকথাময় দেশ তাদের এত চেনা, এত জানা যে তারা সেই দেশের দিকে চোখও ফেরাচ্ছিল না, পা একটু সরে গেলেই সে-দেশের শ্রাবণের ক্ষেত, তার রোয়াগাড়া ধানে তাদের চুবিয়ে দেবে। তেমন পিছলনোর কোনো ভয়ই ছিল না, পথ ছিল এতই বিশ্বস্ত। যেখানে দুজনও পাশাপাশি পা ফেলা যায় না—পথই সেখানে তাদের আলাদা করে দিচ্ছিল। শিবুর মাথায় ঘট—তাকে একটু খেয়াল রেখে চলতে হচ্ছিল। কোথাও ছোট নালী কেটে বাঁয়ের জমির জল ডাইনে নেয়া হচ্ছে। কোথাও তার চাইতে একটু চওড়া নালী কেটে কোনো চ্যাঁড়া ডোঙায় জল ঢালছিল এক জমিতে, আর-এক জমি থেকে—রোয়াগাড়ার মত কাদা বানাতে। কোথাও হঠাৎ একটু জমিতে অনেক মানুষ মিলে একই ভঙ্গিতে রোয়া গেড়ে চলছিল। এগুলো তাদের তিনজনের কারো কাছেই কোনো দৃশ্য হয়ে উঠছিল না। শ্রাবণ মাসের শুরুতে যদি রোয়াগাড়া না হয়, তাহলে আমন পাকবে কবে? চাষির চোখের হিশেব আর হাতের হিশেবের মধ্যে কোথাও কোনো গোলমাল নেই। তিন মাস পুরবার আগেই যদি নতুন চালের ভাত মুখে না ঢোকে, তাহলে তিন মাস পরে যাওয়ার পরও অঘ্রাণে, কোনো ক্ষেতের ধানই পাকবে না। কিন্তু এটা তো কৃষি-জমির কাদা-রোয় গাড়ায় ব্যস্ত কোনো পুরুষ বা রমণীর নিজের জানা হিশেব। তার জানার বাইরের বিপদ অনেক বেশি। নদী বান হয়ে উঠে আসতে থাকবে, বা, ক্ষেতের পর ক্ষেত জ্বলে যাবে গাছের না-জানা অসুখে। আবার এমনও হতে পারে—রোয়াগাড়ার আশি দিন কেটে যাওয়ার পর, এই ধান শরীরের ভিতরে বইতে থাকবে। তেমন বওয়ারই তো কথা। উজানে, পশ্চিমে জমিদারের জমিতে ক্ষেত বড়, চাষ বড়, লাভ বড়, ক্ষতিও বড়। গ্রাম থেকে বাইরে নদীর পাড়, লোকে মুখে-মুখে যে জমিকে বলে বিলা-পাড়, যে-জমিতে টাকাপয়সার পুঁজি খাটাতে হয় না, নিজের ও বাড়ির লোকজনের গতরের জোরেই ফলন উঠে আসে, সেই ক্ষেতের জমির আদল এত আলাদা, বা, একই জমির ক্ষেতগুলির আদলের এত তফাত, যে, দুই হালি জমিতে তিন রকমের চাষ না দিলে, কোনো চাষই ঘরে তোলা যায় না। হঠাৎ করে জল ঢুকে একটা চাষ উপড়ে নিয়ে গেল, সেই একই জল, একই হঠাৎ তার-গায়ে-লাগা আর-একটা চাকে জাগিয়ে দিল। এ কোনো গৌরকীর্তন না—'যে চক্ষুতে হাসাইল্যা গৌর, সেই চক্ষে নি কাঁদাও। এ একেবারে হিশেবের ব্যাপার। জায়গাটা তো জলের। তুমি তাতে ধান লাগালে জল কি তার স্বত্ব ছেড়ে দেবে? তাই তার পাশে এমন ধান লাগাও যে-ধান জলে আরো বাড়ে। অন্নপূর্ণাকে যদি ধানপিছু আঁচল রাখতে হত তাহলে আঁচলটা কত লম্বা লাগে? যতরকম ধান, ততরকম

গুছি? আরে, গুছি তো একটাই থাকে—না-হলে কি মনে পড়ে?

গুছি একটাই। মনে-পড়াও একটাই। কিন্তু গল্প তো দশ গুণ, বিশ গুণ। যদি যোগ হয় গন্ধের কথা, যদি যোগ হয় স্বাদের কথা। যদি যোগ হয় ধানের বাঁচার কথা—জলের সঙ্গে লতিয়ে বেড়ে নিজেকে বাঁচায়। স্রোতের মুখে গা এলিয়ে নিজেকে বাঁচায়। মরণ নিশ্চিত বুঝে নিজেকে তুলো গাছে বদলে নিয়ে নিজেকে বাঁচায়। ধানের বাঁচার কত রহস্য।

যোগেন-প্রহ্লাদ-শিবু এখন সেই রহস্যময় ও উপকথাময় ডাঙাজলে দূরত্ব ভাঙছে। এই জায়গাটা ফরিদপুর জিলার গোপালগঞ্জ মহকুমায়। তেমনি ডাঙাজল থাকতে পারত খুলনা—নড়াইলে বা, নীচা-ভৈরব-মাতলায়। বা, বাখরগঞ্জ-পুরানাকুমারে। বা, বাগের হাট-চাঁদপুরে। সিলেটেও। পাবনা-রাজসাহিতেও আরো কত, আরো কত।

এই-যে দেশের ভিতরে দেশসকল, সেগুলি একটা কোনো দেশ নয়। এই দেশসকলের পরস্পরের মধ্যে কোনো যোগ নেই। চারপাশের সঙ্গেও যোগ নেই। পৃথিবীতে এমন আর দ্বিতীয় নেই। এগুলিকে বিল বলে। এই বিলের ভিতর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে যোগেন-প্রহ্লাদ-শিবু নমশূদ্রদের সম্ভাব্য কর্মসূচি নিয়ে যে-আলাপ করছে, এটা খুব মানানসই। খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, বরিশাল, ঢাকা, কুমিল্লা, পাবনার বিলগুলিতে প্রধানত বা একমাত্র নমশূদ্ররাই থাকে। কিন্তু বিল কী? সেখানে নমশূদ্ররাই-বা এল কেন?

যদি শাহেবদের বেঙ্গলের ম্যাপের সাড়ে ২৪ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ বরাবর লাইন দাগানো যায়, বা, যদি একটু সহজ করে নিতে, কর্কটক্রান্তি রেখাটিকেই ধরা যায় তাহলে তার নীচে সেই বেঙ্গলকে শাহেবদের নির্দেশে নানা ভাগে ভাগ করা যায়। শাহেবরা সামুদ্রিক জাত বলে তারা কাজটা খুব ভাল ও স্পষ্ট করতে চেয়েছিল। কিন্তু শাহেবদের সমুদ্র আর এই সমুদ্র একেবারে আলাদা রকমের বলে সেসব গাঁই-গোত্র সব সময়ই ভেসে যেত। শাহেবরা আবার নতুন সম্বন্ধনির্ণয় বের করত। এখন মোটামুটি আন্দাজ করা যায়, যদি আন্দাজ করারও ভুল করার সাহস থাকে।

ঐ রেখায় লাগোয়া পূর্ব-পশ্চিম জায়গাটি—নদীসমতল, এখনকার সিলেট, ময়মনসিং, পাবনা, রাজশাহি, মুর্শিদাবাদ। তার নীচে প্রায় সম-আয়তনের মধ্য-সমতল, এখনকার কুমিল্লা, নারায়ণগঞ্জ, ফরিদপুর, যশোর খুলনা। তার নীচে ডানদিকের ভাগটি বদ্বীপ। বাঁদিকের ভাগটি নদী-অববাহিকা। ভূগোল ও জলতল বিষয়ে শাহেবদের কোনো ভুল হয়নি। অববাহিকা অঞ্চলে হাওড়া-হুগলি-মেদিনীপুর-নদীয়া। বদ্বীপ অঞ্চলে বরিশাল, নোয়াখালি, ফেনি। অববাহিকা ও বদ্বীপের মাঝখানে খুলনার সমতলে বদ্বীপ হয়ে যাচ্ছে অববাহিকা, অববাহিকা হয়ে যাচ্ছে জলবিভাজিকা। ঐখানেই একটু গরমিল। বদ্বীপ আর অববাহিকা সব সময় একরকম বা আলাদা থাকে না। তার ওপর বদ্বীপ হওয়া শেষ হয়েছে কী হয়নি—এটাও গোলমেলে।

শাহেবদের এই বিভাজনে 'অববাহিকা' বলতে বোঝানো হয় যে-জায়গা দিয়ে নদীগুলি সমুদ্রে যাচ্ছে সেই জায়গাগুলি। আর বদ্বীপ বলতে বোঝানো হয় যে-জায়গা দিয়ে সমুদ্র স্থলদেশে ঢোকে সেই জায়গাগুলি। এগুলো সন্নিহিত।

ভূখণ্ড হিশেবে অদ্বিতীয়তা তৈরি হয়েছে ঐ অববাহিকা আর বদ্বীপ মিলিয়ে মাত্র দেড়শ-দুশ কিলোমিটারের সমতল ভেঙে প্রায় পাঁচশ, কারো মতে হাজার, নদীখাত দিয়ে ১ কোটি কিউসেক জল গিয়ে পড়ছে সাগরে। শীত-গ্রীষ্মেও তা ৫০ লক্ষ কিউসেকের নীচে নামে না। তাহলে বোধহয় উলটো করে বললেই বলাটা সুবিধে। মাত্রই দেড়শ-দুশ কিলোমিটারের দূরত্ব এক কোটি কিউসেক জল যখন ভাঙে, তখন তো ঐ দেড়শ-দুশ কিলোমিটারে কোনো স্থলভাগ থাকাই

সম্ভব নয়। জল সবসময় সমান উঁচু বয়ে যায় বলেই এখানে-ওখানে কিছু ডাঙা খাড়া থাকে—সে-ডাঙা কলকাতা শহর হলেও। এই স্রোতস্বী জলময়তাই এই অববাহিকা আর বদ্বীপকে সম্ভব করে তুলেছে। এই দুশ বাই চারশ কিলোমিটার সমতল নয়। বনতল নয়—শুধুই নদীতল, কেবলই নদীতল। এ এক অদ্ভুত ভূখণ্ড—যেখানে গুনে নদী ফুরনো যায় না। গোনা শেষ হওয়ার আগেই নতুন নদী বইতে শুরু করে। এ এক অদ্ভুত নদীময় দেশ, তারাময় আকাশের মত—গোনার বাইরে। এক তারা কোন্-এক নিকট, আর কোন্ এক দূর, তারার সঙ্গে মিলে রাশিমণ্ডল তৈরি করে, এক নদী কোন্ এক পাশের নদী, আর কোন্ এক দিগন্তদূর নদীর, সঙ্গে মিলে নদীমণ্ডল তৈরি করে। এ এক অদ্ভুত নদীময় দেশ, যেখানে নদী-হীন কোনো উপকথা হয় না, মানুষও হয় না। এ এক অদ্ভুত নদীময় দেশ, যেখানে নদী তার নিজের গোত্রের মানুষ গড়ে নেয়।

নদীর আর এই নদীর মানুষদের বেঁচে থাকার উপায় একটিই—শুধু বাঁক নাও, শুধু বাঁক নাও, আর এক-এক বাঁকে দশজন্ম করে বাঁচো।

যেখানে বাঁচা সম্ভব নয়, সেখানেই তো বাঁচছে এই নদীগুলি আর তার শূদ্র মানুষগুলি।

পদ্মাকে যদি একটু ভুলে থাকা যায়—তাহলে পদ্মা থেকে তার দক্ষিণ-পশ্চিমের ভূমিঢাল কী করে ভেসে না যায়, মাত্র দেড়-দুশ কিমি সেই ঢাল, হাজারখানেক নদীর জল বইতে-বইতে?

যমুনা, ইছামতী, করতোয়া, ধলেশ্বরী, পুংলি, বংশী, লৌহজং—এইসব মানচিত্রখ্যাত নদীগুলি পদ্মার উত্তর-পুব আর উত্তর-পশ্চিম থেকে নেমে নারায়ণগঞ্জ আর মানিকগঞ্জের মাঝখানে একটা ঘূর্ণি পাকিয়ে তুলেছে। খাড়াই থেকে এতগুলো নদী যদি ওপরের নদীর ধাক্কায়-ধাক্কায় পাড়কুলো হতে থাকে, তাহলে, ঘূর্ণি পাকিয়ে পাতালে ঢোকা ছাড়া নদীর আর বাঁচার উপায় কোথায়?

কিন্তু সে-ঘূর্ণি স্থায়ী কী অস্থায়ী সেটা ঠিক করত কে—শাহেবদের বেঙ্গলের আগে? শাহেবরা নদীতে ঢুকতে ভয় পেত—ঘূর্ণি চিনত না। আবার, বিভ্রমময় কুহকময় এইসব ঘূর্ণি বাণিজ্যগামী ও বাণিজ্য-ফেরত পুরনো, বিশ্বাসী ও অভিজ্ঞ মাঝিমাল্লাদের চেনা হয়ে যায়। চেনা হয়ে যাওয়া মানে—শুরুতে যেখানে যা দেখেছে, ফিরলেও সেখানে তাই দেখেছে। তাহলে নিজেরা টের পাওয়ার আগেই দাঁতে দাঁতে লেগে বা তালুতে জিভ ঠেকে কিছু আওয়াজ বেরয়। তবে, নিজে না বাঁচলে আর বাপকে ডাকবে কে? ঐ জলপ্রান্তরে বাঁচামরাটা খুব আর আলাদা ব্যাপার থাকে না। যত ভয়ডরের যত ব্যবস্থা বংশানুক্রমে জানা আছে, সব একসঙ্গে মনে পড়ে। মাঝিমাল্লারা সকলেই তো অচ্ছুৎ—সে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক। পাছে স্পর্শদোষ ঘটে যায়, বামুনদের কোনো দেবদেবতার নাম তারা ধরে না. এমনকী, তাদের একেবারে ঘরোয়া ঠাকুর শ্রীচৈতন্যকেও ডাকে না। চৈতন্য তো বামুন। 'গৌর, গৌর' ডাকে—গৌরের তো পৈতে নেই।

অববাহিকা ও বদ্বীপের অসংখ্য, অগুনতি জলমুখে এত সব অদ্ভুত শব্দ দিয়ে জল চেনা হয় কেন, যে শব্দগুলির কোনো ভাষা নেই। খণ্ডেশ্বর, লাটিকের ঘট, কাঁচনা, বিজুসিজু, খুরপানি, উলডাকালী, গিলাহাটি—এইসব।

সম্ভবত এগুলো কোনো শব্দই নয় কারণ এগুলোর কোনো অর্থ নেই। অর্থ ও ভাষ্য ছাড়া যদি কোনো শব্দ হতে পারে, তাহলে বলদও বিয়তে পারে। কিছু শব্দচাখা মানুষ এইসব শব্দ নিজেদের জিভের ওপর ফেলে টাকরায় আওয়াজ তোলে, যেন রুপার টাকা বাতাসে ওড়াচ্ছে। তারা কেউ-কেউ বলল—খুরপানি শব্দটা নাকী সংস্কৃত—যে-জল ক্ষুরের মত ধারালো। পরে, যখন আবার নতুন কিছু শব্দচাখা এল, তারা বলল, কথাটা আসলে 'খুরপাদানি,' নিম্নবর্গের মানুষরা তো অর্থ বোঝাতে কথা বলে না, একটা পরিস্থিতি বোঝাতে বলে। 'এমন এড়ড়া বেকায়দা খুরপ্যাদানি কামে কেউ হাত দেয়।' 'উলটা কালী' নিয়ে গোলমালটা শব্দচাখারা শুরু

করেও সামলাতে পারেনি, শেষে চৌকিদার-গোছের একটা লাঠিয়ালের দল দরকার হয়েছিল। এক শব্দচাখা বলেছিল, 'কালী কী করে নিম্নবর্গের উপমা হয়?'

কথাটা নমশূদ্র-মুসলমানদের বোঝানো হল—'তোমরা নাকী কালী মানো না?'

'কোন্ চুদির ভাই কইছে? জানে না—সোজা কালী হিদুগ আর উলটা কালী' শুদ্দুর-মুসলমানগ?' 'কালীরে উলট্যা, তো তার ল্যাংটা দেখা যাইত। সেটা ত যায় নাই।'

এমন কথায় বজ্রগর্জনে কেউ নাকী ধমকে উঠেছিল, মাকে বিয়্যা করলেই কি আর বাপ হওয়া যায়? কোন্ চুতমারানি কালীমারে উলটায়ে ল্যাংটা খোঁজে? হালার হোগা মারানি পোলা কি রাইতকানা? বিবির বোদার বদলে হোগায় ঢুক্যায়? আরে, কালীমায়ের খাড়া-উলটা তো একই ল্যাংটা। মা কালীর পরনে কিছু থাকে নি, ছাগলচোদার জামাই?'

নামকরণের শব্দযোগ্যতা নিয়ে এমন বিবাদের ভিতর কিছু শৌখিনতা থাকে। সে-শৌখিনতা চর্চা করা যায় না, মানে সে-শৌখিনতার সময় মেলে না যখন অববাহিকা আর বদ্বীপের পাঁচশ নদী যেন পাতাল থেকে এসে আবার পাতালে ঢুকে যেতে জলের ভিতরের মাটি আর ডাঙার ভিতরের জল—দুটোকেই উপড়ে আনে ওপরে। প্রতিদিনের প্রতি প্রহরের এই মন্থনে নদীই কি নদীর খাত চিনতে পারে?

নদী যে চর ফেলে এটা শাহেবদের বেঙ্গলের মানুষদের অন্তত জানা ছিল।

১৭৬৫ সাল থেকে শাহেবরা যখন বেঙ্গলের রাজস্ব আদায়ের দখল পেল, তারপর থেকেই নদীর ভিতর জেগে থাকা সবুজ চরজমিগুলি তাদের নজরে পড়ল, যারা শাহেবদের এই রাজস্বটা আদায় করে দিত। এই আদায়কারী নিয়োগে শাহেবদের কোনো হিন্দু-মুসলমান ভাগ ছিল না। রেজা খাঁ যেমন ছিল, তেমনি ছিল গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ—পরে দেওয়ান ও রাজা। শাহেবরা নিজেরাই যখন মুর্শিদাবাদ লুটের সব সোনার টাকা জাহাজের খোল ভরে দেশে পাঠাতে পারেনি—সেই আমলে গঙ্গাগোবিন্দদের দু-একবার চাকরি গিয়েছিল ও প্রতিবারই আবার তাকে চাকরিতে ডেকে নেয়া হয়েছিল। সেই প্রথম রাজস্ব-আদায় রাষ্ট্রের প্রায় একমাত্র কাজ হয়ে উঠল। রাষ্ট্র কি আর মুর্শিদাবাদ বা ঢাকা বা দিল্লিতে থাকে? রাষ্ট্রের প্রধান কাজ যে নিজের স্বার্থে বদলে নিতে পারে—সেই রাষ্ট্র। রাজস্ব আদায় আর সেই রাজস্বের ভাগ নেয়া যদি রাষ্ট্রব্যাপারে ক্ষমতার একমাত্র নিয়ামক হয়, তাহলে, ভাগীরথী, পদ্মা, মলঙ্গী, মেঘনা এইসব নদীগুলিতে শুধুই জল নেই, মাটিও আছে ও সে-মাটি থেকে ফলনও ওঠে আর যখন যদি ওঠে, তাহলে খাজনা উঠবে না কেন?

জমিদার থেকে দিনমজুর একই ভূগোলে লেপ্টে যদি আটচল্লিশ ঘণ্টা হত, তাহলে আটচল্লিশ ঘণ্টাই কাটাত, একই রোদেজলে। এই নদীচর কি তাদের চোখের আড়ালে ছিল শাহেবদের বেঙ্গলের আগের বাংলায়? সে কী করে সম্ভব?

পিঁপড়েরা লাইন মেরে গাছে উঠতে থাকলে, লোকজন ঘরের খুঁটিতে নতুন দড়ির বাঁধন লাগায়। বাড়ির আঙিনার কোণে পাখি বসার জন্য যে-চৌকা পাতা থাকে বাঁশের মাথায়, সে-চৌকায় যদি বাসাফেরা পাখিরা না বসে, তাহলে, লোকজন পুবশিয়রের জানলা খুলে শোয়—রাতে আরো গরম পড়বে। ধানকাটার মুখে আলোপোকা বেশি না কম দেখে আন্দাজ হয় শীত কেমন পড়বে। আর এত সব বড়-বড় নদীতে যে শুধু জল নেই, মাটিও আছে আর সে-মাটিতে যে চাষও হয় তা জানবে না সেই সব উচ্চবর্ণ, যারা পরের ঘাড়ে খায়?

চোখ তো পড়েই। ধান কাটা হয়ে গেলে মাঠ থেকে কারা এসে ঝরা ধান কুড়িয়ে নিয়ে যায়—এও যাদের চোখে পড়ে, তারা কী না দেখেনি চরের চাষ, শাহেবদের বেঙ্গলের আগে?

এ সম্ভব?

সম্ভব না হলেও দেশধর্ম, কালধর্ম, প্রজাধর্ম তো আছে। চরের জমি যে কতটাই বিপদের, তা তো এরা জানেই। না-গিয়েই জানে বলে বেশিই জানে। সাপখোপ, বাঘ-ভালুক, এসব তো আছেই। তাছাড়াও আছে—চর কি পুরোটা জাগা না আধডোরা—সেটা তো জানা যায় মধ্যরাতে চারটে বাঁশের ওপর তোলা টুঙ্গি, লোকজনসমেত মাটির ভিতর সেঁদিয়ে গেলে। এমন মরণের দাঁত থেকে ধান কেড়ে আনতে হত গরিব নমশূদ্র ও মুসলমানদের। সে যদি দেখাও থাকে, সে দেখা কি স্বীকার করা যায়?

নতুন চাষের জন্য তিনটা গ্রহ দরকার। এক : চাষি বাড়া, দুই : চাষির বেরনো আর তিন : নতুন ফসল।

১৮৮০-৮৫তেই এসে গেল পাট। হাসান মোল্লা তার গানে কৃষিকাজের মধ্যে পাট ধরেনি। পাটে তো কোনো চাষ নেই।

মন রে, কৃষিকাজ কইরো না।
ওমা, আ লো, আমারে দিস না তবিলদারি
তোর জমি ভাসে অঘ্রান মাসে
কত আর কষি খাজনাদারি
ওমা আ লো, আমারে দিস না তবিলদারি।

(মন রে, কৃষিকাজ কইরো না)॥

ওমা, আ লো, আমারে দিস না মা তোর দিনমজুরি।
তোর দিন চলে মা, মুজরি চলে নি,
কত আর করি, দিনগুজারি।
ওমা, আ লো, আমারে দিস না দিনমজুরি।

ওমা, আ লো, আমারে দিস না তালুকদারি।
কত আর করি পুকুরচুরি।
আ লো মা, আমারে দিস না তালুকদারি।

(মন রে কৃষিকাজ কইরো না)॥

ওমা আ লো, আমারে দিস না মা তোর কোর্ফা গিরি।
কত আর ফিরি পিঁপড়াগিরি
ওমা আ লো, আমারে দিস না মা তোর কোর্ফাগিরি।
ওমা আ লো, আমারে দিস না মা তোর চুকানদারি।
দরাদরি চুকানদারি
শেষ নাই মা এই চুকানদারি।

(মন রে, কৃষিকাজ কইরো না)॥

ওমা আ লো আমারে দিস না তোর বর্গাদারি।
কার বগ্‌গো কার মাগ্‌গো মাগো
ওমা এত কী যায় ছাড়ানদারি?
ওমা আ লো, আমারে দিস না মা তোর খাজনাদারি।
সময় ধইরে খাজনা জমা এইডা তো মা কী দিগদারি।

(মন রে, কৃষিকাজ কইরো না)॥

ওমা আমারে মা পতিত্ রাখো।
এমন পতিত আবাদ-অতীত
সোনাদানা য্যান ফলে না।
ওমা, আলো মা, মুই কৃষি কাজ জানো না,
মুই তো কেবল চষতে জানি,
সে-চাষে মা কিছু ফলে না।

(মন রে, কৃষিকাজ কইরো না)॥

ওমা, আমারে কৃষি কাজ দিয়ো না—
সেনসাসে মা কওয়া লাগে দখলি না হাউলি চাষী।
তার চে ভাল পতিত চাষী।'

যার ইচ্ছে সে-ই পতিত ক্ষেতে, ক্ষেতের ফেলে রাখা টুকরোয় পাট চাষ করতে লাগল। ফড়ে আর ব্যাপারিরা বাড়ি বয়ে এসে পাট কিনে নেয়। নমশূদ্র ও ফরাজি মুসলমানরা শাহেবদের বেঙ্গলের চাষ বদলে দিল—তখনই তো বেসিনবেঙ্গল না-বলে, বলা হতে লাগল লোয়ারবেঙ্গল। জমিদাররা তাদের জমিদারিতে রাজপ্রাসাদ তুললেন, জিলাসদরে জমিদারির নামে বাড়ি তুললেন।

শেতলাই হাউস, নাটোর পার্ক, নারায়ণ ডহর এস্টেট, উড়ানিয়া মনজিল।

কায়েম চাষের বদলে চরের চাষ, চরের চাষের বদলে বিল চাষ, ধানের বদলে পাট চাষ—এলেও নমশূদ্রদের অবস্থা কিছু বদলাল না—সামাজিক দিক থেকেও নয়, আর্থিক দিক থেকেও নয়. বা, দুদিক থেকেই মাত্র দুই-এক সুত্র বদলাল।

নমশূদ্রদের অবস্থা আবার এমনও ছিল না যে, যে-ভাত খাচ্ছে সেটাই বুঝি এখনকার মত শেষ ভাত। না। শাদামাঠা খাওয়ার অভাব ছিল না।

তবু নমশূদ্র চাষিদের খাওয়ার সিকিভাগ ধান কিনতেই হত। নিজের চাষ থেকে থাকত না।

তার কারণ এই নমশূদ্রমুলুকে বা বিলে একজন কৃষক বড় জোর দেড় থেকে তিন বিঘে জমি চষত। তার বেশি চষা যেত না। জমিদারের খাজনার কোনো স্থিরতা ছিল না—প্রত্যেক বছরেই বাড়ছে। ফলে বিল-এলাকার নতুন জায়গা চাষে আনলেও চাষির কিছু লাভ হত না। আবার, পাটচাষ শুরু হতেই কোনো-কোনো জমিদার নগদ খাজনার বদলে ফলন-খাজনা চালু করল। তাতে তো একেবারে শিয়রে সর্পদংশন।

তবু এটা সত্য পাট চাষ শুরু হওয়ার পর ও পাটের বাজার যতদিন চড়া ছিল, ঐ ১৯২৫ পর্যন্ত নমশূদ্ররা সামান্য একটু ভাল ছিল। কোনো-কোনো বাড়িতে পড়াশুনো ঢোকে।

কারো-কারো একটু সামাজিক সম্মান জোটে। সেও কিছু না এমন। তবু এই চল্লিশ বছরে নমশূদ্রদের ভাবসাব বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কোথাও-কোথাও উচ্চবর্ণের লোকদের বয়কটও করা হয়। নতুন তৈরি 'আসাম ও পূর্ববঙ্গ প্রদেশ'-এর লেফটেনান্ট-গভর্নর নমশূদ্র নেতাদের একটু খাতিরও দেন। গুরুচাঁদ ঠাকুরের মতুয়া ধর্ম আন্দোলন বেশ ছড়ায়-গুছোয়।

তাঁরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, তাঁরা স্বাধীনতার বিপক্ষে ও ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে। এটা যে একটা ঘোষণার বিষয়—সেটা জানাও তো মস্ত জানা।

নমশূদ্রদের পক্ষে এই একটু ভাল চল্লিশ বছরে এই নমমুল্লুকে খ্রিস্টান মিশনারিরা নমশূদ্রদের মধ্যে বহু বছর ধরে কাজ করেছিলেন। বাখরগঞ্জ-ফরিদপুর-যশোর-খুলনায়। তাতে কী কী উপকার হয়েছিল সেসব জানা যায়নি। কিন্তু একজন শাহেব সপরিবার এখানে বসবাস করছেন—তার কি একটা প্রভাব না থেকে পারে? একটা প্রভাব তো বেশ দেখাই যায় চোখে। গুরুচাঁদ ঠাকুররের বাড়িতে বা মন্দিরে শাহেবের যাতায়াতের ফলে নমশূদ্রদের নিজস্ব ধর্ম, মতুয়া ধর্ম প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত হয়েছিল ও গুরুচাঁদ একই সঙ্গে সেই ধর্মের প্রধান ও সেই ধর্মীয় নমশূদ্র-সমাজে গুরু ও নেতার পদে মান্যতা পেয়েছিলেন। এ-মান্যতাটা প্রথম দিকে খুব একটা কাজের কিছু ছিল না। পরে, মান্যতাটা তৈরি করা হয়েছিল। এই ৩৭ সালেই গুরুচাঁদ মারা যান। ফাল্গুনে। মরা মানুষ বাঁচানোই তাঁর চিকিৎসার গুণ, এ-রকম বিশ্বাস এত মানুষকে এত বার বাঁচিয়েছে যে তাঁর নিজের মুহূর্তে কাজে লাগল না আর। লাগল না—কথাটি কি এত সহজে ব্যবহার করা উচিত? যদিও ১৯৩২ সাল নাগাদই সামনের ভোট ঘোষিত হল ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী হিশেবে আরো অনেক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে নমশূদ্ররা সংরক্ষিত আসন পেল।

ঐ চল্লিশ বছর, ১৮৮০ থেকে ১৯২০ বা ১৮৮৫ থেকে ১৯২৫—পাটের সুবাদে নমশূদ্রদের একটু-আধটু ভাল-থাকা থেকেই তাদের সামাজিক মর্যাদার কথা তারা তুলতে লাগল। 'চণ্ডাল' নামের বদলে 'নমশূদ্র' নাম চাওয়া হল, দেয়া হল, অথচ আজও জানা যায়নি—নমশূদ্র শব্দটিতে কী বোঝানো হল? সৎচাষি, সদ্‌-গোপ, নবশাখ—হিন্দু সমাজের নিম্নতম স্তরে নতুন নাম-পরিচয় যেমন তৈরি হচ্ছিল, নমশূদ্রও সেরকমই একটা শব্দ। কিন্তু এর পরিচয়টা কী? সেটা জানা গেল না, জানা যাবে কী না সন্দেহ। কেন 'নমশূদ্র' নাম—চাওয়া হল, দেয়া হল, অথচ আজও জানা যায়নি—নমশূদ্র শব্দটিতে কী বোঝানো হল? জানা যাচ্ছে। জানা যাচ্ছে না শব্দটির গঠন। কেন নামটা 'নমশূদ্র'ই হল? 'শূদ্র' শব্দটি না-বদলে নিজেদের মনুস্মৃতির অন্তর্গত যেমন করা হয়েছে, তেমনি এই জনগোষ্ঠীর বিপুলতর সাধারণকে আশ্বস্তও করা হয়েছে? এ নামে বর্ণভেদপ্রথার বিরোধিতা নেই, পোষকতা আছে।

আর-একটা দরকারি কথা। বেশ তো, ১৮৮০-৮৫-র পাটের কথার আগে এটাও তো জানার ছিল না এরা এখানেই বসবাস গাড়ল কেন?

'এখানে' বলতে যেমন প্রশাসনিক খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, বরিশাল জেলাগুলির যথাক্রমে উত্তর, উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর-পশ্চিম, পুব ও দক্ষিণকে বোঝায়, তেমনি 'এখানে' বলতে এই জায়গাগুলির চেহারা চরিত্রের মিলের দিকেও যেন একটু নজর আসে। এসবই বিল। এত ছোট নামে বোঝানো যায় কী না, সেই সন্দেহ থেকে শিক্ষিত উচ্চবর্ণের কেউ-কেউ 'বিল' শব্দটিকে বিশেষণ করে দেন—বিল্যা জায়গা, বিল্যা এলাকা, বিলাঞ্চল, নিচুজমি, ইংরেজিতে ওয়েটল্যান্ড, মার্সিল্যান্ড—এ-রকম। যে-প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হয়, সে-প্রসঙ্গে হয়ত এই বিবরণগুলি সাহায্যই করে কিন্তু 'বিল' কথাটির পরিচয় কেন স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, যেমন, নদী, চর, খাল, পুকুর, পাহাড়, ক্ষেত, সুখা? 'নমশূদ্র' ও 'বিল' এই দুটো কোনো একটিরও গঠন না-জানলে

কী করে তৈরি হবে সেই অর্থ যা মানুষ ও প্রকৃতিকে দেয় তার স্থানাঙ্ক। নমশূদ্ররা প্রধানতই বিলবাসী বা বিলচাষি কেন? একটা বিশেষ ধরণের স্থান ও প্রধানত কৃষক এক জনগোষ্ঠী—এই দুইয়ের মধ্যে এমন মিল ঘটল কেন? মিলটা টিঁকলই-বা কেন?

'বিল'—শব্দটি চতুর্বেদে আছে আর তার অর্থও এখনকার মতই—নিচু জায়গা, গর্ত, খোঁদল, যেন হাতার বা চামচের মাথা ইত্যাদি। এতে প্রমাণ হয় না, যাঁরা বেদ বানিয়েছেন, তাঁরা বিল দেখেছেন। পরে, হয়ত জেনে নিয়ে বৈদিক ভাষায় ঢুকিয়ে নিয়েছেন। সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারে এমন অপহৃত শব্দের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু তার মানে কখনোই এমন সোজা নয় যে এমন যারা নমশূদ্র, আর শূদ্র যেহেতু আর্যবিজয়ের ফল, সুতরাং এই নমশূদ্ররাও বৈদিক ও এই বিলও বৈদিক। কারণ, মাটির বয়স নির্ভুল মাপার অঙ্ক বেশ পুরনো। সেই অঙ্কে বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, যশোর খুলনার মাটির বয়স ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না। ওগুলো এখনো পাকাপাকি মাটি হয়নি। যে-কোনোদিন জলে ফিরে যেতে পারে।

১৭৬৯-৭০ সালে পরপর দু-বছর শ্রাবণ-ভাদ্রের বৃষ্টি না-পাওয়ায়, যাকে শাহেবরা বলে সেন্ট্রাল প্লেইনস অব বেঙ্গল, সেখানে এমন দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, যা দেখতে গিয়ে হান্টারশাহেব একটা বই লিখে বিশ্ববিখ্যাত হয়ে যান—'অ্যানালস অব রুর‍্যাল বেঙ্গল।' বাঙালিরা যারা দুর্ভিক্ষে মরেনি তারা একটা প্রবাদই তৈরি করে ফেলল—ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। শাহেবদের হিশেবেই যত লোক ঐ জায়গাগুলিতে—এখনকার বীরভূম, বর্ধমান, নদীয়ার অংশ—থাকত, তাদের পাঁচ আনি গেল মরে, তার বাকি পাঁচ আনি গেল পালিয়ে। তাদের সকলেই চাষি, খাজনা-বন্দবস্তে সাবেকি চাষি। তারা জমিদারের খাজনা ও আবওয়াবের ভয়ে পালিয়েছিল নাকী চালের অভাবে দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল—এ-নিয়ে এখন দুনিয়া জোড়া বিশেষজ্ঞদের তর্ক। এসব তর্কের তো মীমাংসা হয় না। সবগুলি মতই সত্য হওয়া ভাল। এবং সম্ভবত।

মানে, শাহেবরা লিখেছেন, এইসব বড়-বড় গ্রাম একেবারে খাঁ খাঁ করছে। মানুষজনের ঘরবাড়ি পড়ে আছে—মানুষজনও নেই, তাদের হাল-বলদও নেই। রাস্তাঘাট, হাটবাজার শুনশান। যে-ছ আনি লোকজন থেকে গেছে তারা গ্রামগুলিতে আধা-পাগলের মত ঘুরে-ঘুরে খুঁজে বেড়াচ্ছে, 'আমার কিষাণটাকে দেখেছ গো, একটা কিষান জোগাবে গো।' যে-পথেই হাঁটো, দু-পাশে শুধু খড়ো ধানক্ষেত। ধানও নেই। মানুষও নেই।

পরের বছর, ১৭৭১ সালে মা-লক্ষ্মীর স্নেহ-মাখা বকুনিও শোনা যেত—আর-একটু জমি রাখিসনি হতভাগা, ধান দেব কোথায়।

কথায় বলে—চাষার কাছে খরাও যা, বানাও তাই। এত ধান বাজারে এল যে ধকধকিয়ে ধানের দাম ঠেকল তলায় যেমন গাড়ির এক দিকের বলদ জোয়ালের ভার ও পাঁচনের মার সত্ত্বেও নেমে পড়ে কাদায়। এমন তলায় যে খাওয়ার ধান বেচে দিয়েও জমিদারের খাজনা শোধ হয় না—বকেয়া দু-বছরের আর নগদ হাল সনের। তারও ওপর, শাহেবের শাহেব ওয়ারেন হেস্টিংস নতুন এক খাজনা বসালেন, নজিরা। তোমার জমি বা বাড়ির পাশ থেকে যদি কোনো চাষি পালিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তোমাদের সেই জমির ন্যায্য পাওনা শোধ করতে হবে।

দুই-দুই খরা ও এক অতিফলনের দুর্ভিক্ষের পরের পরের বছর আবার খরা—সন ১৭৭৩-এ।

তাহলে দুটো দুর্ভিক্ষে যে-জমিগুলি পতিত্ হয়ে গেল, আবার নতুন দুর্ভিক্ষে আরো যে জমি নতুন পতিত্ হল—এ থেকে বাঁচবে কী করে জমিদার, জাহাঙ্গির বাদশার পাট্টা পাওয়া জমিদার? চাষি না-থাকলে জমি কীসের, জমি না-থাকলে জমিদার কীসের, জমিদার না-থাকলে খাজনা কীসের, খাজনা না-থাকলে শাহেব কীসের।

এরকম গোলকধাঁধার ফেরে যখন সব মানুষ একসঙ্গে পড়ে, তখন কী করে, কী করে যেন ধাঁধাটা কেটেও যায়।

ঢাকায় বা শাহেবদের বেঙ্গলে যেটা অববাহিকা অঞ্চল, পরে, যেটার নামই হয়ে যায় পূর্ব বাংলা, সেখানে তিনটি দুর্ভিক্ষের একটিও হয়নি। কিন্তু ১৭৭৮ সালে এমন বন্যা নামল যে কোন্ নদীর জল, কোন্ নদী দিয়ে ভীমবেগে নামছে, তা সে নদীও জানে না, নদীর পাড়ের মানুষও জানে না। গঙ্গার মর্ত্যে আগমনের ঘটনাটা সকলের জানা—পালা গান, কবিগানও হয়েছে। ৭৮-এর ঢাকার বন্যায় অন্তত শ-খানেক গঙ্গা মহাদেবের জটায় লাফিয়ে পড়েছে। মহাদেবের মুখ চার-পাঁচটা হয়ত—কিন্তু মুখ মানে কি মাথাও চার-পাঁচটি? যদি হয়ও, তাতেই-বা সামলাত কী? একশ গঙ্গাবতরণের জন্য কতগুলি নদী দরকার?

ফলে, পুবের জমিজমা, বাড়িঘর, বনজঙ্গল, ঘাটপাট, রাজাপ্রজা, জলমাটি সব মিলেমিশে কুরুক্ষেত্র।

বন্যার জল নেমে গেলে ও নদীখালগুলি তাদের চেনা তলাকারে ফিরে এলে অববাহিকাকে আবার একটা জায়গা বলে চিনতে মন চাইল। চাইলেও অবিশ্যি চেনাজানা গেল না। কারণ কোনো দিক চেনানো গাছই আর খাড়া নেই। নিজের শিকড়ের গর্ত থেকে উৎপাটিত হয়ে গর্তের পাশে পড়ে আছে। বা, বন্যার স্রোতের মুখে ভেসে চলে গেছে।

কেউ-কেউ অবিশ্যি চেষ্টা করেছিল, নদী বা খাল ধরে ভাটি পথে গাছগুলোকে খুঁজে বের করতে। শোকের প্রথম আঘাতে এমন বুদ্ধিবিভ্রাট ঘটে বটে। কিছু-কিছু সময়।

শিডিউল আর মুসলমানদের মিলমিশই বেশি

৬১

যোগেন-প্রহ্লাদ-শিবু চলছিল এইসব বলাবলি করতে করতে। সরকারি আইনে তো নমশূদ্ররা আলাদা জাত হিশেবে স্বীকৃত। দু-জন মন্ত্রীও করা হয়েছে তপশিলি থেকে। মন্ত্রিসভায় হিন্দু-মুসলিম অনুপাত হিন্দুদের পক্ষে দেখাতে তপশিলি মন্ত্রীদের হিন্দু বলা হয়। আবার, শাহেবদের বেঙ্গলের সব জাতপাত নিয়েই যে এই সরকার, তা বোঝাতে তপশিলিদের আলাদা করে তপশিলিই বলা হয়। শাহেবরা চায় তপশিলিরা আলাদা থাকে।

আলাদা মানে, আলাদা জাত হিশেবে মুসলমানরা শিক্ষা, সরকারি চাকরি ইত্যাদিতে যেমন শতকরা ভাগ পেয়েছে, শিডিউলরাও তাই চায়। তার মধ্যে রাজবংশী ও নমশূদ্রই প্রধান। শিডিউলদের আর মুসলমানদের তো বামুন-কায়েত-বৈদ্যরা গ্রামের ভিতরে থাকতেই দিত না। চণ্ডাল ও যবন বলে তাদের গ্রামের বাইরে, প্রায় দেশের বাইরেই, থাকতে হত। এক সৈয়দ মুসলমানদের কেউ-কেউ গ্রামের ভিতরেই থাকত। শিডিউল আর মুসলমানদের মধ্যে কোনো গোলমাল নেই। গোলমাল পাকালে দুই সম্প্রদায়েরই ক্ষতি। দুই সম্প্রদায়ের ঐক্যের সুযোগ এর আগে কখনো এতটা নাগালে আসেনি।

কথাগুলো যে এমন করে ভাবা হচ্ছে, বলা যাচ্ছে তার সবচেয়ে বড় কারণ শাহেবদের সমর্থনে কথাটা আর বামুন-শুদ্দুরে আটকে নেই। আরো অনেক কথাই উঠছে ও উঠবে। বাংলার কৃষিতে কী কী ভাগ ছিল, বাংলার নদীগুলিতে কতটা জল ছিল, কী করে এই বিলগুলি তৈরি

হল, নমশূদ্রদের এখানেই আসতে হল কেন, গরিব মুসলমানদেরও, নদী কেন শাহেবদের বেঙ্গলে মুখ ফেরায়, পাট চাষ শুরু হল ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের আর ঢাকা বন্যার একশ বছর পর, তারপরের চল্লিশ বছর কমবেশি সকলেই, হিন্দু-মুসলমান, সৈয়দ-নেড়ে, বামুন-শুদ্দুর, জমিদার-চাষি সকলেরই তো একটু ভাল হল।

নমশূদ্রদের যে চলে আসতে হল এই বিল-এলাকায় সেই বিচ্ছিন্নতাই কি একটা বিশেষ সময়ে রাজনীতির একটা পৃথক শক্তি হওয়ার দিকে ঠেলছিল? মুসলমানদেরও কি অনেকটা তাই? নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বুঝতেও মুসলমানদের সময় লেগেছে। সমাজ-অধিকারের অভাব বুঝতে এক বেলার হাটই যথেষ্ঠ। সমানাধিকারে অভাব থেকেই কি মুসলমানরা পৃথক শক্তি হয়ে উঠছিল?

বিলগুলি ১৭৭৮-এর ঢাকা বন্যার ফল। নদী খাত বদলেছে, খাতটা থেকে গেছে, এমন, যেন নদীটা আছে। খাত বদলানো নদীর পক্ষে খুব স্বাভাবিক নয়। খাতটা তৈরিই হয়, নদীর বা প্রবহমাণ জলরাশির স্বভাবে। যেদিকে ঢাল, নদী তো সেদিকেই বয়। কোনো কারণে মাটির ঢাল যদি বদলে যায়, ধীরে-ধীরে, নদী যে-পলি টানছে সেটাই কোনো একটা জায়গায় জলের তলে যদি জমে উঠতে থাকে, তাহলে, ঐ পথে নৌকো নিয়ে যাদের রোজ যাতায়াত তারা জলের রঙেও বোঝে, স্রোতের হেরফেরেও বোঝে, আরো কী কী ভাবে বোঝে তা আর কে জানে, কিন্তু বোঝে। অববাহিকার নদী এক ধাক্কায় ঐ ডোবা চর ভাসিয়েও দিতে পারে, যদি খুব কম সময়ে খুব বেশি বৃষ্টি হয়।

আবার উলটোটাও তো হয়, বেশিই হয়।

শাহেবদের বেঙ্গলে নদীর সরে যাওয়া, নদীর পাড় ছেড়ে যাওয়া, নদীর পাশ ফেরা, নদীর মুখফেরানো, পুরুষ-নারীর সম্পর্কের আদল পেয়ে গেল নাকী শাহেবদের বেঙ্গলে কি নদীগুলোর স্বভাব-চরিত্র বদলাল?

আগে, শাহেবদের আগে, নদী ছিল পাড়ে বাঁধা। শাহেবদের আগে নদী ছিল দেশান্তর, আবার, দেশান্তরে যাওয়ার, বা দেশান্তর থেকে ফেরার সাঁকো। শাহেবদের আগে নদীর জল ছিল আত্মরক্ষার অন্তঃপুর।

সৈ সৈ সৈ, আর কী দেখা
ঘাটের কূলে?
দেখি, সারি সারি মাইয়্যা।
পাও দিয়্যা জলে
আউল্যা দিছে চুলে।
মেয়ে না, মেয়ে না, ঐগুলা
নদীর ঢেউয়ের ছলা।
ঢেউ থ্যামল ভাঙে তেমন
ঘোমটা টাইন্যা মাথায়
ডুব দিল জলে।
সৈ সৈ সৈ, লরম বাসিস কীরে?
ঐ দ্যাহো না কানাই ঠাকুর
জলের সাঁকো বায়।
লাজ বাইসল্যাম তারে।

শাহেবদের পরে গ্রামের ছোট খালটাও হয়ে যায় কূলহীন, পাড় হীন, শক্তিমনে।

কোঁয়ারি লো,

বন্ধুরে ফিরায়্যা দ্যাও ভালমতে

বরিশালে উনিশ শতকের মাঝামাঝিও মুসলমান মেয়ে খেয়ামাঝি ছিল—খোলাসচন্দ্র লিখে রেখে গেছেন। তখনো তাকে নিয়ে মশকরা ছিল—

তোর নিজের কোমরের যা ওজন
তোর ডিঙা ডুবতে কতক্ষণ?

এই উপকথাময় বিলময় প্রদেশে নদীর মুখফেরানোর নতুন উপমা তৈরি হতে লাগল নতুন-নতুন চাষের মত। কত বড় নদী খাল দিয়ে বইল, কত নদী তার পাড় হারিয়ে ফেলল, যে শূদ্রানী আর যবনী ছাড়া খেয়া পারাপার চলে না।

যদি একটা কথা তোলা না হয় যে নমশূদ্রদের আদিবাস কোথায় ছিল—তাহলে শাদাসিধে একটা পথের হদিশ করা যায় ১৭৬৯ থেকে ১৭৭৯ পর্যন্ত। এই দশটা বছরে নমশূদ্রদের পৌঁছে দেয়া যায় দুর্ভিক্ষ—মৃত্যুর কোনো প্রদেশ থেকে পলাতক জনগোষ্ঠী হিশেবে ৭৮-এর বন্যায় তৈরি এই বিলগুলিতে।

নমশূদ্রদের এই দীর্ঘ বহির্যাত্রায় প্রতিষ্ঠিত প্রদেশের বাইরে তাদের চলে আসায় উচ্চ হিন্দুদের শাস্ত্রীয় বচনের অনুসরণ থাকতে পারে—চণ্ডালরা জনপদের বাইরে থাকবে। এর চাইতে বাহির তো আর ছিল না, নদীগুলি যেখানে এসে শেষ হয়ে যায়। এমন সে-জায়গা, যে নিজেদের যাতায়াতের জন্য সেই সব জায়গার নতুন-নতুন নাম দরকার হয়। পদ্মা, উত্তর থেকে ঢুকে ফরিদপুরের উত্তর-পুব দিয়ে নেমে যাওয়ার পথে, একবার কুমার নদীতে ঢুকে, আর-একবার আড়িয়াল খাঁতে ঢুকে দুটো আবর্ত তৈরি করেছে। কুমার নদীর পুরনো সোঁতা এখনো আছে—কুমোরের পুরনো-সোঁতা বলেই। এই দুই আবর্তের মধ্যে ও আশপাশে যে-জমিগুলি পড়ে ছিল বা গড়ে উঠেছিল ১৭৭৮-এর বন্যার পর, সেখানে সব গ্রামেরই নাম 'চর' দিয়ে। চর মাধবদিয়া, উত্তর চর মাধবদিয়া, চর টেপুয়া-কান্দি, ডিক্রির চর, চর হরিনামপুর, চর মহানামিয়া, চর ইজদ্দিন, চর মাইজাদ্দিন, চর আমরাপুর, চর চাঁদপুর, চর বিষ্ণুপুর, আক্তার চর, বুড়ি রায়ের চর, ভাসান চর, চর মোনাইর। অথচ ফরিদপুরের অন্য কোথাও এমন 'চর' দিয়ে গ্রামের নাম হয় না। নদী ছাড়া চর হয় না, সে-চরে নদী আর কোনো দখল রাখে না। নদী ছাড়া বিলও হয় না, বিলে নদীর চিহ্ন থাকে, দখলও থাকে একটু-আধটু। নদীর যেমন বিস্তার থাকে, বিলেরও থাকে তেমন বিস্তার—কিন্তু ধ্বংসের মত, ছন্নছাড়া, কাউকে আহ্বান করে না। জলও আছে বিলের, টানা জল, নানা গভীরতার। আবার ছেঁড়া জল নেমে গেছে গুহার মত। বিলের নদীরও নাম থাকে কিন্তু সে-নাম রক্ষা করা খুব কঠিন। বেশ মাইল-মাইল তফাতের চার নদী বর্ষায় হয়ে গেল মিলেমিশে একটাই হাওড়।

মাইলের পর মাইল শুকনো গাছের জঙ্গল সে-জঙ্গলের পাতা গরু-ছাগলে খায় না। আবার এক বাঁকে টলটলায় পদ্মপাতা। পদ্মপাতায় আর পানিখোঁচা পাখিতে সে পদ্মবিলের জল দেখা যায় না। বিলে কোনোকিছুরই পরম্পরা নেই, ধারাক্রম নেই—পাখির না, জলের না, মাটির না, গাছের না, মাছের না, বাতাসের না। খুব একটা ছোট জায়গা যদি অজস্র-অজস্র নদীর জলের পলিতে তৈরি হয়ে থাকে, বা তত তৈরিও থাকে না, আর সেই জলস্রোতে ভেজা জায়গাটুকুতে অতগুলো নদী যদি আবার নিজেদের ভিতর জলবিনিময় করতেই থাকে, যাকে বলে ছিনিমিনি খেলা, জলের—একমাত্র তাহলেই সেখানে বিল তৈরি হতে পারে। বিলের পক্ষে

মানুষের থাকা-না-থাকা খুব দরকারি নয়। কতটুকু জায়গা আর এই অববাহিকা-বদ্বীপ, সুন্দরবন থেকে উত্তরে করতোয়া—করতোয়াই তো সীমা, আর আড়াআড়ি মেহেরপুর থেকে পদ্মা। এর মধ্যে একেবারে তলা থেকে যে-বিলের ডাকনাম আছে, সেই বিলগুলির নাম বলা যায় যদি তাহলেও তো সেইসব নাম থেকে এক জনপদের আভাস আসে মনে। আমাদের অভ্যাসে নেই জনপদ-ছাড়া কোনো স্থান নাম। আমাদের অভ্যাসে নেই সংযোগহীন কোনো বিস্তার। নিচা-ভৈরবের বিল, উঁচা-ভৈরবের বিল, বাগেরহাটে মাটি যতটা—বাঘিয়া বিল-সাতলা বিল মিলে ততটাই জায়গা, বাখিয়া-সাতলা বিল জুড়ে গোপালগঞ্জ—এখন গোপালগঞ্জই চেনা নাম, পুরনো কুমারের বিল, দুর্গাদহের বিল, শিব-আত্রাইয়ের বিল, পাবনার দক্ষিণপুব আর রাজশাহির উত্তর-পশ্চিম জোড়া চলন বিল। মাঝখানে এক ডাঙার পরে গোদাই বিল। চলন আর গোদাই মিলে যেন একটা সমুদ্রের শুকনো তল।

কম-বেশি ১৭৮০ সনের এই বিল দিয়ে যোগেন-প্রহ্লাদ-শিবু হাঁটছিল ১৩৪৩-এর স্নানযাত্রার দিন। স্নান হয় ওড়কান্দির ঠাকুরবাড়িতে। এবার জ্যৈষ্ঠের পূর্ণিমা পড়ছে আষাঢ়ে। তাই স্নানযাত্রা চলে এসেছে শ্রাবণের দোসরা। বছর আট-দশ হল স্নানযাত্রার সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়েছে, 'নমশূদ্র বিজয়যাত্রা'। যারা মেলায় যাওয়ার আগে মেলার নাম-ঠিকানা জেনে নেয় তেমন লোক এখানে নেই। 'মেলা'তেই চলে যায়। বড়জোর 'ওড়কান্দির মেলা' বা 'গোপালগঞ্জের মেলা।'

'স্নানযাত্রা'র সঙ্গে 'বিজয়যাত্রা' জোটে কবে থেকে তার হিশেব-নিকেশ কারোপক্ষেই খুব দরকারি নয়। যদি কারো কোনোদিন উৎসাহ হয়, তাহলে সে নিজেই হিশেব করে নিতে পারে। ১৯২৩ সাল থেকে ২৬ সাল পর্যন্ত এই পদ্মবিলায় নমশূদ্র—মুসলমানদের চতুর্বর্ষব্যাপী যুদ্ধ চলে। ১৯২৬-এ তার নিষ্পত্তি হয়। তারই দু-এক বছর পর থেকে স্নানযাত্রার সঙ্গে বিজয়যাত্রা যুক্ত হয়ে থাকতে পারে। মানে, আজকের এই মেলা থেকে বছর ন-দশ আগে।

কিন্তু এ নিয়ে তো কোনো তর্ক নেই। তর্ক উঠতে পারত—পদ্মবিলায় সত্যি-সত্যি ১৯২৩-এ কোনো দাঙ্গা হয়েছিল কী না, সেটা নমশূদ্র-মুসলমান দাঙ্গা ছিল কী না, সে দাঙ্গা চার বছর ধরে চলেছিল কী না ও ১৯২৬-এ নমশূদ্রদের বিজয়ে সে-দাঙ্গার নিষ্পত্তি ঘটেছিল কী না—এইসব নিয়ে তর্ক উঠতে পারত। ভবিষ্যতেও উঠতে পারে। কিন্তু এখনো ওঠেনি।

ওঠেনি যখন, তুলে দরকার কী? যখন ওঠার, উঠবে। ঐ 'বিজয়যাত্রা' জুড়ে দেওয়ার বছরখানেক পর ঐ পিরশাহেবেরা কথাটা তুলেছিল যে মুসলমানরাও তাহলে সবেবরাতের মেলার সঙ্গে বিজয়মালা করবে। সেটা যে শেষ পর্যন্ত হয়নি তার কারণ ফরাজিদের মেজাজ। তারা পিরশাহেবের মুখের উপরই বলে দিয়েছে, 'লতুন লতুন হাঙ্গাম বাধাইব্যার কামডা কী? দাঙ্গায় আবার জিতাজিতি কী? অগ স্নানযাত্রা তো পুরানা। আমরা তো যাই। এর লগে সবে-বরাতের মিল কীসের?'

যোগেন যে-কথাগুলি প্রহ্লাদ-শিবুকে বলছিল, সেগুলো সে ভেবেচিন্তে ঠিক করেনি বলেই তার জানা ছিল না—আরো এত সব ইচ্ছের কথা প্রহ্লাদ আর শিবুকে সে বলতে চাইবে, অপ্রস্তুতির দেয়াল একবার ভেঙে গেলে আর মেরামতি চলে না, তখন আর-কাউকে ডেকে জুটিয়ে ভাঙনটাকে সমবেত ইচ্ছের প্রকাশ করে তোলারই চেষ্টা হয়। তার আর জয়পরাজয় থাকে না।

যোগেন বলছিল—বুঝ্যা কন, কর্তা, তালি হিন্দুরা আমাগ সিট দিলে আমরা মেম্বার, মুসলমানরা আমাগ চাকরি দিলে আমরা মিনিস্টার, তাইলে আমরা নিজেরা হইল্যামডা কী? অ্যাহন তো টাইম আইস্যা গিছে। কিছু তো আপনার হওয়া লাগব। ধরেন, এ-বছর থিক্যা তো আমরা কইতে পাইরতাম, এই মেলায় উচ্চ বর্ণহিন্দুগ ঢোকা নাই।'

‘কথাডা কী কও যোগেন, তোমার কী কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাইল। ঠাকুর-কায়েতগো এ-মেলাতে যোগদানে এটাও তো-প্রমাণ হয় যে আমাগ রীতিনীতি স্বীকার ধইরল।’

‘আমার কথড একেবারে মাড়াইয়্যা দিলেন? আপনার রীতিনীতি আপনার কী না তা স্বীকারের লগে বামুন-কায়েতগ ডাইক্যা-পুইখ্যা আইনতে হব? আইনতেছেন তো স্যায় কম কইর‍্যাও পঞ্চাশ বছর পঞ্চাশডা বছরে একডা চুলও তো পাইকব? না কী?’

‘তাই বইল্যা কি মালায় সাইনবোর্ড ঝুলান যায়—উচ্চবর্ণের যোগদান নিষেধ। কাইল তাইলে মুখ দেখাইবার পারবা?’

‘কষ্ট হব্যার পারে অভ্যাস নাই তো। ঠাকুরমশাইগ, মা-গোঁসাইগ মুখ তো কালা হয় না। মা-দুগ্‌গার পূজার বাড়ির ছায়ার মধ্যেও যহন আমাগ ঢুইকবার দ্যায় না। করনির মাও, জগার তাপ, জিরান, দীরা, পুননজেঠা—এরা তো সব ঘোষাল বাড়ির ভিতরের মানুষ। সবাই রোজ দ্যাহে না ছোট ঘোষাল কর্তারছোট ছাওয়ালডা রাতদিন টুনির কাঁখে আর টুনির বোঁটা কামড়াইয়্যা রক্ত বাইর কইর‍্যা দ্যায়? এগ দেইখ্যা তো অগ মুখ কালা হয় না।

‘হয়। হয়। হয় বইল্যাই তো রাস্তায় নামছি। এডাও তো ভাইব—ব্যার লাইগব যোগেন যে ছোঁয়াছুঁয়ির বিরুদ্ধে আর মন্দিরে ঢোকাঢুকির বিরুদ্ধে উচ্চবর্ণ হিন্দুও খাড়াইব্যার ধইরছে। মহাত্মা—’

‘এইসব ভোগবাজির কথা বাদ দ্যাও প্রহ্লাদদা। তোমায় যদি মানস হয় তয় না-হয় বামুনগ একডা মহোচ্ছব দিয়্যা দ্যাও।’ যোগেন হেসে ফেলে যোগ করে, ‘কিন্তু সেইহানে কোনো নম বা গান্ধীর হরিজন বইসব্যার পারব না। তেমনি যহন আমাগ মহোচ্ছবের লাইন ফেইলবা সেইখানে আমরা থাকব আর মুসলমানরা থাকব—কোনো বামুন-কায়েত, বদ্যি থাকব না।’

‘আমার মহোচ্ছব দেয়ারও কাম নাই আর তোমার বামুনগ নিমন্ত্রণ কাটারও কাম নাই।’

‘মানে অ্যাহন যেটুক যা পাইছ, তা ভালই পাইছ একডা যোগেন মেম্বার।’

‘হাঁ কমডা কী?’ মেম্বার থিক্যা মিনিস্টার হইবা।’

‘আর যোগেনডা মিনিস্টার হইলে তো নমশূদ্র জাতির উদ্ধার?’

‘কথাডাতো সইত্য যে যোগেন মন্ত্রী হইলে আমাগ সমাজডার সম্মান এডডু বাড়ে। এমন মানুষ তো আমাগে মইধ্যে খুব বেশি নাই।’

‘কী যে কও প্রহ্লাদদা। চিরডাকালই তো আমাগ কেউ না কেউ মন্ত্রী। তার নিট ফল হইল আগৈলঝরা ইসকুলের বেড়াও নাই ছাত্তরও নাই। আমার ভাইব্যাটা ষষ্ঠী আমাগ লগি ঠেলে। আমাগ গুরুও বেশি, মন্ত্রীও বেশি। ঐ সব হইয়্যা কিছু হইব না। আমাগ চাই নেতা। নেতা। মাইন্য কইরবার মত মানুষ মাইন্যাব্যার মত মানুষ।’

‘সে তো কতই ভজায়—আমারে মানো, আমারে মানো।’

‘এই তোমার স্নানযাত্রার বিজয়যাত্রা বানায়্যা জয়যাত্রার মেলা যে বসাও যদি কোনো দাঙ্গা হইয়্যাও থাকে চাইর বছর ধইর‍্যা, সেডার বিজয়ডাই-বা কী, তাতে গুরু গুরুচাঁদের দানডাই-বা কী?’

‘গুরুই তো কইল, আমরা স্বাধীনতা চাই না! আমরা শাহেবগো অধীনতা চাই—তাইতে শাহেবরা খুউব বাহবা দিছিল।’

‘বাহবা দিছিল ক্যা? না, পদ্মবিল্যার মুসলমানরা তহন গান্ধীর চেলা হইয়্যা খিলাফৎ কইরব্যার ধইরছিল। তাই শাহেবগোর কাছে শুদ্দুররা তহন ভাল।’

পদ্মবিল্যা কাইজ্যা আদিকথা

৬২

১৯২১-এ গান্ধীর নেতৃত্বে প্রথম অসহযোগ আন্দোলনে শুরু থেকেই নমশূদ্রেরা বিপক্ষে। গুরু গুরুচাঁদ ব্যাখ্যা করেছিলেন—অসহযোগে ভদ্দরলোকদের আর কী এসে যায়। এক ভাই উকিল, এক ভাই মাস্টার আর-একাভাইয়ের ব্যাবসা। উকিল গেল অসহযোগ করে জেলখানায়, মাস্টার নিল সংসারের দায় আর ব্যবসায়ী খাদ্দর বেচে লাভ করল। এগুলো তাদের সাজে। নমশূদ্ররা চাষ ছেড়ে অসহযোগে গেলে, তার সে-বছরের চাষ তো গয়া-গঙ্গা।

নীরদ মল্লিক কাউন্সিলে বলল, 'পচা ঘায়ে যেমন মাছি বসে তেমনি কিছু অসহযোগী আমাদের জীবনযাপনকে দুর্বিষহ করছে।

বাখরগঞ্জে কংগ্রেসের ডাকা হরতাল, নমশূদ্র বাজারিরা দিল ভেঙে। পটুয়াখালিতে হরতাল হল বটে কিন্তু পুলিশ-নমশূদ্র মিলে তা ভাঙার চেষ্টা করল। পিরোজপুরে প্রিন্স অব ওয়েলস-এর শুভাগমন উপলক্ষে সরকারি উৎসব নমশূদ্ররাই ভরিয়ে দিল।

১৯২২-এ অসহযোগ আন্দোলন গান্ধী তুলে নিলেন, আর তারপরই শুরু হয়ে গেল নানা আকারে নমশূদ্র সম্মিলন। সেসব সম্মিলনে এমনসব নতুন-নতুন কথা উঠল যা এর আগে কখনো শোনা যায়নি। জমির খাজনাহারের বদল চাই, জমির মালিকের বদল চাই। ভীষ্মদেব মণ্ডল কাউন্সিলে বললেন, ভদ্রলোকের ছেলেরা তো পড়াশুনো শিখবেই কারণ গ্র্যাজুয়েট হলেই বাঁধা চাকরি, নমশূদ্রের ছেলের যদি অমন চাকরি বাঁধা হত, তাহলে সে-ও গ্র্যাজুয়েট হত। নমশূদ্রদের রাজনীতি ও তার সমাজবদলের কর্মসূচি মিশে গেল। ফলে তাদের মধ্যে ভাগাভাগিও শুরু হল—কেউ বয়কট আর বিধবাবিবাহ দুয়েরই বিপক্ষে, কেউ বয়কট আর বিধবাবিবাহ দুয়েরই পক্ষে, কেউ বয়কটের পক্ষে কিন্তু বিধবাবিবাহের বিপক্ষে।

খিলাফৎ আর অসহযোগ তো একসঙ্গেই শুরু। খিলাফতের নেতা বাদশা মিয়া এসে মুসলমানদের ডাক দিলেন ইসলামের জন্য কোরবানি দাও। আর, গোপালগঞ্জের খিলাফৎ-মৌলবি ডাক্তারশাহেব বিশেষ করে শাহেবদের বিরুদ্ধে ঘৃণার বন্যা এমন ডাকালেন যে হাওয়া গরম হয়ে উঠল। ঘৃণার বন্যা সত্যিই বন্যার জলকাদার মত—কোনো-না-কোনো ভাবে বন্যা তোমাকে ছোঁবেই। হয় তোমার প্রতিদিনের যাতায়াতের পথ হয়ে যাবে হাঁটুসমান কাদা, না-হয় তোমার বসবাসের ঘরে ঢুকবে মরা পশুপাখি নিয়ে বন্যার জল, না-হয় তোমার চষা ক্ষেত যাবে ভেসে। বন্যা থেকে বাঁচা যায় না। ঘৃণার বন্যা থেকেও বাঁচা যায় না। খিলাফতি নেতারা সেই বাখরগঞ্জ, পিরোজপুর, মাগুরা, গোপালগঞ্জ, কুমিল্লা পর্যন্ত ঘৃণার বিষ বইয়ে দিল। নইলে, বাথাডাঙা হাটের মত দূরের হাট থেকে গোলমাল বাঁধে? বাখরগঞ্জ, মানিকগঞ্জ থাকতে বাথাডাঙা হাটে বাধল কংগ্রেসি-খিলাফতির সঙ্গে বয়কটবিরোধী শুদ্দুরদের লড়াই।

বাথাডাঙা হাট ছোট বটে কিন্তু দরকারি হাট। পূর্ববঙ্গে এমন দরকারি হাট না হলে মালপত্র নৌকো করে বাইরে নেয়া যায় না, নৌকো করে বিক্রির মালও আনা যায় না। এগুলো সব ডাকের হাট—সরকার থেকে এক বছরের ইজারা দেয়। বাঁধা মাল, বাঁধা বেচনদার, বাঁধা খরিদ্দার, বাইরের ফড়িয়া-ব্যাপারী-দালালেরা আসেই না, হাটশুদ্ধু লোক এ-ওকে চেনে। ঐ ১৯২২-এই, অসহযোগ তখন হয়ত উঠেই গেছে, হাটের দুই মুসলমান ইজারাদার একেবারে হঠাৎ খিলাফতি রাগে ফেটে পড়ল। নমশূদ্রদের তারা বিলেতি জিনিশ বিক্রি করতে দেবে না—কাপড়চোপড়ও

না, নুনও না, নীলও না, লোহাও না। ওরা তো এগুলোই বেচে—বয়কটের মধ্যে কাপড়চোপড়ও হয়ত পড়ে—বাকি কিছু তো তেমন পড়েও না। এমন একটা নিষিদ্ধতা জারি হওয়ার আগে তো খবর রটে, জানাজানি হয় শুরু হয়ে গেছে। সেসব কিছু নেই। মাঝখানে এসে তম্বি করে দোকানভাঙা। এদিককার ফরাজি মুসলমানদের কখন যে রাগ থাকে না আর কার ওপর থাকে না—তার কোনো আন্দাজ পাওয়া যায় না। একটু ছাড়ান দিলে ওদের রা পড়ে যায় বা সরে যায়। ফরাজি কেউ যদি তার জমিদারকেও বলে, 'আপনে বইস্যা থাহেন গন্শার নাগাল আর হাগেন জোড় লাগানর লাগান,' তাহলেও, বেশিরভাগ সময় জমিদারবাবুকে হাসতে হয়।

ব্যথাডাঙার হাটে নমশূদ্ররা প্রথমে ভেবেছে—ফরাজি খ্যাপামি। তারা এড়িয়েই যাচ্ছিল। কিন্তু একটা হাটে কেনাবেচার ক্ষতি হলে সে-খরচা তারা পোষাবে কী করে? তাদের একটু সময়ও লাগল বুঝতে যে এটা খিলাফতি কাণ্ড। বা, ইচ্ছে করেই তারা বুঝছিল না। তারা এই পর্যন্তও বলেছিল নাকী, 'এই হাটটা ছাইড়্যা দে, সামনের হাটে আনুম না।' নমশূদ্ররাও কিছু বাপের সুপুত্র না। তারা যখন বুঝে গেল, পাইকারি বিক্রির সময় চলে গেল, তখন তারা এ ও-কে ডাকাডাকি করে, সব মালপত্র তুলে নিয়ে, তাদের মধ্যে বোকামত কেউ যদি বেকায়দা প্রশ্ন করে তবে তাকে, 'হালা মাগগাশুখানি মাগরে জিগা,' বলে থামিয়ে দিয়ে হাট ছেড়ে চলে যায়। যাওয়ার সময় সবাইকে শুনিয়ে চিৎকার করে বলে যায়, 'তোগ ধনের কাটা আগা খুইজতে যদি আমাগ ধনের পাও না ধরাই—তবে আমরা কেউ বাপচোদা-ছাওয়াল না—।'

পরের হাটেই বোঝা গেল নমশূদ্ররা ফাঁকা আওয়াজ ছাড়েনি। বাথা ডাঙা হাটের বিঘাটেক পশ্চিমে শুকনো, টনটনা একলপ্ত জমিতে নমশূদ্ররা আলাদা হাট বসাল। এমন হাটভাঙা হাট বসানো চালু প্রথা, নাম হত 'দশের হাট'। কিন্তু এই দশের হাটটা যে-জায়গায় বসল তার নামডাক বাথাডাঙা থেকে বেশি। 'পদ্মবিলা'।

এটা ফরাজিদের ধারণার বাইরে ছিল। তারা ফুঁসছিল কিন্তু কোনো উপায় পাচ্ছিল না। দশের হাট ভেঙে তো আর ডাকাহাট বসানো যায় না। দেখতে-দেখতে পদ্মবিলার হাট জমে গেল। জমে তো যাবেই—বাথাডাঙা আর পদ্মবিল্যা তো একই জায়গা। বাথাডাঙায় বসার বদলে পদ্মবিল্যায় বসবে না কেন, যদি ইজারাদারকে টিকিটের দাম দিতে না-হয়। সরকারের কাছে টাকা জমা দিয়ে ডাকাহাটে ইজারাদার যদি দোকানিদের কাছ থেকে মাশুল না তোলে, তাহলে ইজারাদার খাবে কী? কিন্তু দশের হাটের জন্য তো সরকারকে টাকা দিতে হয়নি, তাহলে মাশুল নেয়া হবে কেন। তার ওপর কোনো নমশূদ্র তো বাথাডাঙার হাটে বসবে না, অন্যদিকে মুসলমান ব্যাপারীরাও তো পদ্মবিল্যায় যাওয়া শুরু করেছে। দেখতে-দেখতে বছর খানেকের মাথায় বাথাডাঙার হাট, রাতে হঠাৎ-হঠাৎ জ্বলে উঠে, বিলের জলের আলোর মত নিবে যেতে লাগল।

ফরাজিরা দাঁতে দাঁত চিপে অপেক্ষা করছিল। এক বছর শেষ হওয়ার মুখে এক রাতে চল্লিশজনের এক ছিপ নৌকোয় পদ্মাবিলার লাগোয়া তিনটি নমশূদ্র গ্রাম থেকে শ-খানেক গরু ডাকাতি করে নিজেদের চরগুলিতে ছড়িয়ে দেয়। এই গরু ডাকাতির পরিকল্পনা ও এটাকে কার্যকর করা যে-কোনো যুদ্ধের একটা ফ্রন্টের লড়াইয়ের তুলনীয়। ছিপ নৌকোটা বাছাই-বাছাই গ্রামে পাঁচ-সাতজনকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে। বা, চলে যেতে-যেতে নামিয়ে দিয়েছে। সেই পাঁচ-সাতজন রাত্রির বিলের জলের অন্ধকারের সঙ্গে, গাছের সঙ্গে, মাটির সঙ্গে মিশে এক-একটা গ্রামের গরুগুলোকে গোয়াল থেকে ছেড়ে জলে নামিয়ে ভেসে পড়ে। এরকম কাণ্ড ঘটতে পারে, জানা থাকলে, হয়ত জলের শব্দ ও রাতের আওয়াজের ভিতর কোনো ইশারা নমশূদ্ররা পেয়ে যেত—চেনা জানা ও আশঙ্কিত বিপদের আওয়াজ ফরাজি ও নমশূদ্রদের একই রকম

জাগিয়ে দেয়। ফরাজিরাও সেটা জেনেবুঝেই এই গরুডাকাতি করেছে। রাতের অন্ধকারে জল যেন আকারে দশবিশগুণ বেড়ে যায়, আকাশের উচ্চতা যেন নেমে আসে চোখের সামনে। সেই অন্ধকার ও জলের ভিতর একরাতে পাঁচগ্রাম থেকে একশ গরুকে বিলে ভাসিয়ে নিজেদের জায়গায় তোলার ক্ষমতা কি সকলের থাকে? রাতের বিল বা বিলঘেঁষা নদী নমশূদ্র আর ফরাজি সকলেই এড়িয়ে যায়। আলোর এত অভাব যে চেনা জলও অচেনা হয়ে যায়। উলটে আবার কেউ-কেউ আছে যারা রাতের বিলেরই মানুষ। আরো পুবে তাদের মগ বলে। তারা নিজেরাও জলডাকাতি করে বড় নদীতে। কিন্তু বেশিরভাগই জমিদারদের কাছ থেকে এক-এক বায়না পায়—কোনো গ্রামকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার বায়না, কোনো পড়েথাকা চরে, রাতারাতি পুরনো বসতি, একেবারে মানুষজন বাচ্চাকাচ্চাসহ, কলাগাছ-লাউগাছ-গোয়ালঘরসহ একটা বসতি বসিয়ে দেয়।

নমশূদ্রদের মাথা কাটা গেল।

একবারেই তো সবটা জানা যায়নি। যতই জানা জানা যেতে লাগল, তাদের মাথা গনতিতে ততই বাড়তে লাগল। এটা কী কইরল শ্যাখেরা। এক রাইতে এতগুলা চরে ডাকাতি কইরল অথচ একডা প্যাঁচাও তো কুক দিল না। সামরিক পরাজয়ের গ্লানি থেকে মুক্ত হতে চাইছিল নমশূদ্ররা। কিন্তু শেখরা যে-অসম্ভবকে সম্ভব করেছে সে তো বিলের সকালের জলের মত টলটলা। নমশূদ্ররা বলল—শ্যাখরা গুনিন উড়াইয়্যা আইনছে খুইলন্যার তরাসডাঙা নদীর পাড়ের মিঠা তেঁতুলের গাছ থিক্যা। খুলনার এই গুনিনের নামডাক আছে, গাছ উড়িয়ে না কী যাতায়াত করে। একেবারে সবচেয়ে বড় কাজ ছাড়া হাতে নেয় না। তার ওপর তার কাছে পৌঁছনোই তো অসম্ভব। যতই জিজ্ঞাসা করুন, তরাসডাঙা নদীর সোঁতা কোনটা, ততই আপনাকে পালটা প্রশ্ন করবে, যাবেন কুথায়, নদী পার হইয়্যা না মিঠা তেতুলের ঘাটে। আপনি ঠিকঠাক উত্তর দিলেন—গুনিনের নিকট। যে-পথের নিশানা পেলেন সেই নদীতে নৌকো চালাতে-চালাতে হাত-পায়ে খিল ধরিয়ে দেখলেন, সেই শুরুর জায়গাটিতেই ফিরে এসেছেন। এবার নতুন একটা লোককে পুরনো প্রশ্নটাই করলেন। সে লোকটাও পুরনো প্রশ্নটাই করল। আপনি মিথ্যে করে বললেন, কী যে কন, আমরা নি গুনিনের সহবৎ জানি? তরাসডাঙা নদীডা পার হইয়্যা বাঁ-হাতি স্রোত ধইর‍্যা উজান একঘাট যাব। সে আপনার মিথ্যে কথার উত্তরেও সেই পুরনো হদিশটাই দিল। যে-পথের নিশানা পেলেন, সেই নদীতে নৌকো চালাতে-চালাতে যখন আপনার পাঁজরার হাড়ের ভিতর থেকে ঢেঁকির পাড়ের মত হাঁফ বেরচ্ছে, তখন দেখলেন, আপনি সেই শুরুর জায়গাতেই ফিরে এসেছেন। সেখানে একটা নতুন লোক দাঁড়িয়ে। আপনার পুরনো প্রশ্নের পুরনো জবাবটা দেয়ার জন্য লোকটা ঠোঁট খুলেই আছে, মুখের ভিতরে তার জিভের ডগার নড়াচড়াও দেখা যাচ্ছে। আপনি বাঁচবেন না মরবেন, সেনা নির্ভর করে, আপনার বাঁচার ইচ্ছেটা তখনো ঢেকুর তোলে, কী না তার ওপর। তাহলে আপনি ঐ লোকটাকে ঐ পুরনো প্রশ্নটাই করবেন, পুরনো উত্তরটাই শুনবেন আর হয়ত সেই পাকেই আপনার বৈঠা, নৌকো থেকে জলে পড়ে থাকবে কিন্তু বাইবে না। যদি আপনার বাঁচার ইচ্ছেটা থেকে কোনো ফাঁপা ঢেকুরও না ওঠে, আপনি লোকটির কাছে পথ জানতে চান না, লোকটিও আপনাকে পথ-জানাবার আগের প্রশ্নটা করতে পারে না, তাহলে, হতে পারে, আপনার বৈঠাটায় ছপছপ আওয়াজ উঠতেই থাকবে।

শ্যাখেরা এই তরাসডাঙার গুনিনকে এক বছরের চেষ্টায় ধরে এনে এক রাতে একশ গরু ডাকাতি করেছে।

পালটা গুনিনের খোঁজ শুরু হল। কিন্তু গরু ছাড়া তো চাষ-আবাদ বন্ধ। শেষে কাশিয়ানি থানার ছোটবাবু গরুগুলি উদ্ধার করে দিলেন কিন্তু একজনকেও চালান দিলেন না। ছোটবাবু অন্য জায়গার লোক, ওঁর সব কথা বোঝা যায় না। বললেন—দারোগা, আমি তো একডা পুলিশ, চুরি-ডাকাতি-স্বদেশী ধরি। গরু তো ফিরৎ পালি। অ্যাহন ডাকাত ধরা তো গুনিনের কাজ। খোঁজো একডা গুনিন।'

কাঠের গুঁড়োর আগুনের ওপর আরো গুঁড়ো চাপা দিলে, আগুন নেবে না, বাড়ে। কয়েকদিনের মধ্যেই, সন্ধ্যার পর, কী এক ছোট গোলমাল উঠল কী উঠল-না, আলোও বেশি ছিল না, লোকজন যেমন ছুটে এসেছিল তেমনি ছুটে চলে গেল। বেশ অনেক রাতে দুই মাতাল ডোম এসে কাশিয়ানি থানায় জানাল, এডডা খুনা হইসেন। খুন্যা মানুষটো পইড়ে আছে গ।

তাদের কাছে অনেক জিজ্ঞাসা করেও জানা গেল না কোথায়। কারণ ওরা দেখেইনি। যে-বাবু তাদের মড়াটা সরিয়ে দেয়ার জন্য ডেকেছিল, সে-বাবু বলেনি, কোথায় সরাতে হবে। সেই বাবুকে আমরাও কিছু বলিনি। এটা আবার বলার কী? বাবু বলেছে। একটা পুরো গোটা নোট দিয়েছে। ডোম মড়া সরাবে। এর ভিতর আর কথাবলার জায়গা কোথায়। আমরা দুইজন আগে গেলাম বিলধারে। পুরো একটা এক টাকার নোটে অনেক নেশা হল, একটু ঘুমও হল, ঐ বিলধারে। তারপর যখন বলল, আমাদের আর নেশা পাওনা নেই, তখন আমরা প্রথম খেয়াল করলাম—কোথায় সরাতে হবে মড়াটা সেটা তো জানা হয়ইনি, কোথা থেকে সরাতে হবে সেটা তারা জানত কী না তাও মনে নেই। তাই আমরা দুইজন থানায় এলাম। মড়া সরানো হয়নি বলে থানাদার শাহেবকে তো ঐ বাবু নালিশ করবে, তখন থানাদার শাহেব তো আমাদের গারদ দেবে। তাহলে থানাদারশাহেবকেই সব বলতে এলাম। এখন থানাদারশাহেবের যা ঠিক মনে হয়, তাই করবেন। যদি মড়াটা কোথায় বলে দেন আর কোথায় সরাতে হবে বলে দেন, তাহলে ওরা থানাদারের হুকুম পালন করবে। আর, থানাদার যদি তাদের গরাদে ঢুকতে বলেন, তাহলে ওরা থানাদারের হুকুম পালন করবে।

কোন বাবু তার বলেছিল, সেটা তারা একেবারেই বলতে পারল না। একই উত্তর দিতে লাগল—'বাবু। বাবুকে চিনব কী করে। সব বাবুর মুখ তো একরকম। বাবু। বাবুকে কী দিয়ে চিনব?'

সেটাই ছিল পদ্মবিলা দাঙ্গার প্রথম রক্তপাত, প্রথম খুন। শেখদের একজন।

পদ্মবিল্যা কাইজ্যা মধ্য কথা

৬৩

পুরো গোপালগঞ্জ-পদ্মবিলায় সকলে থমকে গেল—মুসলমানরাও, নমশূদ্ররাও। খুনোখুনি হয় না, তা তো নয়। খুন করে ফেলাটা ফরাজিদের আর নমশূদ্রদের কাছে, এখানে, সব চেয়ে সহজ পথ হাঙ্গামা মেটানোর। এক কোপে মাথা নামাও, লগি ঠেলে পুঁতে দাও। বড় নদী হলে তারও দরকার নেই। নৌকো থেকে ফেলে দিলেই মিটে গেল—হাঙর খেয়ে নেয়। হঠাৎ রাগে খুন করে ফেললে যেমন, তেমনি হঠাৎ রাগারাগি তৈরিও করে খুনের অছিলা বানাতে। একেবারে ভাবনাচিন্তা যে থাকে না, খুনের পেছনে, তাও ঠিক নয়। মাপজোঁক থাকে। সঙ্গের লোকজনও বেছে নেয়া হয়। আবার কোনো দখল নিয়ে, সে-চরই হোক, মাছের বিলই হোক, পাটের কম দর দেয়াই হোক—দল দুটো থাকে, এক-এক দলে অনেকেই সশস্ত্র থাকে, বোঝাই যায়, দুই দলই খুনোখুনি করেই আপত্তি মেটাতে চায়। চরেও হয়, ডাঙাতেও হয়, জলেও হয়, নৌকোতেও হয়।

তাতে যে হিন্দু-মুসলমান ভাগ থাকত না, তা হিন্দু-মুসলমান থাকতই। হিন্দু মানে নমশূদ্র নয়। বিশেষ করে যশোর-খুলনার জমিদারিবাবুদের মামলা মেটাতে যদি এইসব মারামারি ঘটানো হত, তাহলে তো হিন্দু-মুসলমান থাকতই। হিন্দুমানে নমশূদ্র নমশূদ্র ছাড়া হিন্দু-জমিদারদের বা বাবুদের বাঁচাবে কে? জমিদার বাবুদের কত সব সর্দার লেঠেলের গল্প। তাদের কেরামতি, সাহস, সাধুতা প্রভুভক্তি। হয় মুসলমান, নয় নমশূদ্র। জমিদারির দাঙ্গাহাঙ্গামাতেও শেখ-শুদ্দুর ভাগাভাগি থাকত কিন্তু সেটা সবচেয়ে বড় ভাগাভাগি ছিল না। জমিদাররাই নিজেরাই বড় ভাগ হয়ে থাকত। তারা তো হিন্দু।

কাশিয়ানির খুনটা এসবের বাইরে। বিলের লোকরা এ খুন চেনে না। শুরু হয়েছে বাথাডাঙা হাট ভাঙা নিয়ে। চলছেই। খিলাফতি ইজারাদারকে তো কংগ্রেসি হিন্দুরা বোঝাতে পারত। নমশূদ্রদেরও তো বাবুরা ডেকে বলতে পারত। কেউই তা করেনি। ফলে, গরু-ডাকাতি ঘটাটাই যথেষ্ট খারাপ ঘটনা। তাতেও যেন শেখ-শূদ্রদের বীরত্বজ্ঞাপক হিংসাহিংসি ছিল।

কিন্তু রাতে, অন্ধকারে, লোকজন-কম জায়গায়, সবাই সবাইকে চিনে উঠতেই পারছে না এমন একটা ভিড়ে, কী নিয়ে ঝগড়া সেসব কেউ জানাবোঝার আগেই যেমন আচমকা দঙ্গলটা শুরু হয়েছিল, সেরকমই আচমকা দঙ্গলটা ভেঙে ছিটিয়ে গেল। অনেক পরে দেখা গেল, একজন মুসলমান খুন হয়ে পড়ে আছে।

এ ঘটনায় ভয় ছড়িয়ে পড়ল।

এরকম করে সুযোগ বানিয়ে যে-কোনো একজন মুসলমানকে মারা—এটা এখানকার মানুষদের জীবনে ঘটে না। ঐ লোকটাকে না মেরে খুনি আর-একটা লোককেও মারতে পারত—মুসলমান হলেই হল। হ্যাঁ, এই বিলে চরে জলে ধর্ম নিয়ে মানুষজন খুব একটা ব্যস্ত থাকতে পারে না। তার মানে যে হিন্দু-মুসলমান এক—মোটেই তা নয়। বরং তার উলটো। হিন্দুদের নিজেদের মধ্যে মারামারি ছিল। ফরাজিদের সঙ্গে অন্য মুসলমানদেরও মারামারি ছিল।

কিন্তু যেটা একেবারে ছিল না, সেটা হল কোনো ধর্মেরই পুজো-আর্চা বা বিধিবিধান নিয়ে কারো কোনো মাথাব্যথা ছিল না। তার প্রধান কারণ, সময়াভাব ও অর্থাভাব। প্রধান ভয়, একবার যদি বামুন-মোল্লা ঢোকে তাহলে তারা পরকালের ভয় দেখিয়ে ইহকালের সর্বনাশ করবে। তার মানে আবার এও নয় যে এই স্থলসীমানে, জলেবিলে, বেঁচে থাকার বাস্তব কষ্টে মানুষজনের

ধর্মবিলাসের সময় ছিল না। আর তাদের জীবনযাপনের পক্ষে একটা ঐহিকতাই বেশি দরকারও ছিল। হিন্দু-মুসলমান কোনো দিন মিলিত সামাজিক জীবন তৈরি করেনি। হিন্দুদেরই সব জাতের মধ্যে জলচল ছিল না, তার আবার মুসলমান! হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক-সামাজিক ঐক্য হিন্দু উচ্চবর্ণের বানানো—মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে।

কাশিয়ানি খুন থেকে তৈরি হয়েছিল আত্মরক্ষার প্রস্তুতি। সেই ভয় আর প্রস্তুতি থেকেই সাপ ছোবল মারে।

১৯২৩-এর মাঝামাঝি থেকেই বাংলায় খিলাফৎ পার্টির আলাদা কোনো প্রাধান্য ছিল না। কিন্তু আন্দোলন তো সত্যি একটা চেতনা তৈরি করেছিল। আন্দোলন অবান্তর হয়ে যাওয়ার পর কিছু খিলাফতি নেতা খিলফতের নাম করে তার সুবিধে ভোগ করতে চাইছিলেন। তাঁদের প্রধান অস্ত্র ছিল—হিন্দুধর্ম বিরোধিতা ও 'ইসলাম বিপন্ন' আওয়াজ তোলা। এই খিলাফতি পির ও মোল্লারা বাংলার সমাজে একটা সাম্প্রদায়িক উদ্বেগ এনে দিয়েছিল।

ফরিদপুরে দুটো সামান্য ঘটনা থেকে ব্যাপক এক দাঙ্গা আকার নিল। যে-পদ্মবিলায় নমশূদ্ররা বছর দুই আগে দশের হাট বসিয়েছিল, সেই হাট থেকে মাইল দুই দূরে শ্রীপুর গ্রামে, এক নমশূদ্র ছেলের সঙ্গে কয়েকটি মুসলমান ছেলের ঝগড়া বেঁধেছিল তার বেশি কিছু নয়। দুদিন পর ১০ মে শুদ্দুরদের কয়েকটি গরু শ্রীপুরের দুই মুসলমানের ধানজমিতে ঢুকে পড়ে। জমির মালিকরা গরুগুলিকে আটকে রাখে।

নমশূদ্ররা খবর পেয়েই ছুটতে-ছুটতে হাজির। তারা শুধু এটুকুই শুনে দৌড়ে এসেছে যে তাদের গরু আটকেছে। এখন, সেটা ছিল বৈশাখের শেষ। কোনো মাঠেই ধান দাঁড়িয়ে থাকার কথা নয়। তবু গরুর স্বভাবই অন্যের জমিতে নাক ঢোকানো। বৈশাখ-মাস অবিশ্যি গরু-আটকানোর মাস নয়।

ওরা ছুটতে-ছুটতে এসে দেখে—সত্যিই তাদের চার-পাঁচটা গরু, কটা ঠিক গোনাও যাচ্ছে না, শেখদের এক পেছনের জমিতে খুঁটোয় বাঁধা।

গরু আটকালে গরু খালাশ করাটা প্রথম কাজ। তারপর ঠিক হবে—দোষ গরুর না মানুষের। গরুচুরি এক জিনিশ কিন্তু গরু-আটকানো, তাও বৈশাখমাসের শূন্য মাঠে, একেবারে বুকঠোকা ডাকাতি, আটক্যালাম তো গরু—পারিস যদি খুইল্যা নে, বাপের বেটা।

নমশূদ্রদের ক-জন ছুটে এসেছে, কে কে ছুটে এসেছে সেটা আর কে দেখে। এইসব আওয়াজ কানে গেলেই আওয়াজের দিকে মুখ করে সোজা দৌড়—'গরু আটকাইছে', 'নাও ভাসা-য়,' 'আগুন', 'ডাকাইত—লো-লো-লো'। আওয়াজগুলোর দিনক্ষণ একটা থাকে বটে। সকালবেলা তো আর ডাকাত-পড়ার কথা না। কিন্তু নিষেধও তো নাই। তার ওপর যদি বৌ নিয়ে মামলা থাকে। আমার বৌকে আমার শালা-সম্বন্ধীরা হাটের পথে তুইল্যা আনছিল, আমরা প্রাতঃকালে তারে উঠ্যায়া নিয়া যাচ্ছি। তেমনি, অন্য কোথাও থেকে চুরি করে এনে এখানে, একটু আড়ালে বিলের কাদায় নৌকো যদি গুঁজে দিয়ে লুকিয়ে রাখে, তাহলে, খবর পাওয়ার পরও, নৌকার মালিক কি ঠাকুরমশায়ের কাছে একবেলা বসে থেকে যাত্রার মাহেন্দ্রক্ষণ জেনে আসবে? আওয়াজমাত্র ছোটো—আগল্যাও, নিব্যাও, আটক্যাও, খুইল্যা দ্যাও।

যারা ছুটে এসেছিল তাদের মধ্যে একজন ছিল—বিজয় দাস। পুরো মাথা শাদা বাবরি। সে নাকী নৌকাযাত্রা পালায় সখীর গান গায়। তার মুণ্ডুটা যখন সে কোনো উঁচু আলের ওপর থেকে আকাশের দিকে তোলে বা আসরে মুণ্ডুটা হারমানিয়ামের ওপর গড়িয়ে নৌকো না-নাড়াতে মিনতি করে কেষ্টকে, তখন, মুখের পেশিগুলো কাদার তালের মত চাপড়া-চাপড়া হয়ে তাকে।

সে বুড়ো হয়েছে বলে তার নামে ছেলেছোকরারা নানারকম গল্প বলে। 'বিজ্যা জ্যাঠা হারমনিতে একডা সুরই বাজাইব্যার শিখছিল, ঐ সুরডাই বাজায়্যা নতুন সব গান গাইয়্যা যায়।'

দৌড়তে-দৌড়তে এক উঁচু আলে উঠে বিজ্যা ব্যাপার কী বুঝে ফেলে—গরু আটকেছে।

বিজ্যা এক লাফে উঁচু-আল থেকে নেমে উলটোদিকে একই বেগে ছুটতে থাকে। নমশূদ্ররা তখনো দুই-একজন করে ছুটছে ঘটনার দিকে। তারা বিজ্যাকে উলটো দিকে ছুটতে দেখে থমকে দাঁড়ায়, 'হইলডা কী?'

বিজ্যা সেই দুই-একজনকেই আঙুল তুলে দিক দেখিয়ে বলে, 'সিধা যাওনের কাম নাই—বাঁয়ে ঘোর। ঘুইর‍্যা গিয়া টিনু মিয়ার জমির মইধ্যে আমাগ গরুগে বাইন্ধ্যা থুইছে। তোরা ঘুইর‍্যা গিয়্যা খুইল্যা দে।'

এসব পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা এমনই অভ্যাস্ত এরা যে বিজ্যাকে সব কথা শেষ করতেও দেয় না। সামনের দিকে মারামারি হইব, পিছন থিক্যা গরু ফাঁক। তাদের পেছনে বিজ্যা তার কাঁচিটা ছুঁড়ে দিয়ে বলে, 'কাঁচিডা নিয়্যা যা।'

বিজ্যার এই ফন্দিতেই সামনে দুই দলে যখন মারামারি কাটাকুটি চলছে, গরুগুলো তখন 'হা-ম্বা হা-ম্বা' আওয়াজে নিজেদের গোয়ালের দিকে ছুটছে। গরুগুলো ছাড়া-পাওয়ার পর মারামারিটা যে নিরর্থক সেটা বুঝতে একটু সময় লাগে।

কারো না কারো ফন্দিতে কেউ না কেউ জিতে যায়, মারামারি মিটে যায়, ছোটবড় যাই হোক।

কিন্তু এবার যেন তেমনটা হল না। এবার নমশূদ্রদের মনে রাগ থেকে গেল—শেখেরা জিতে গেছে। এমন ক্ষত বেরিয়ে পড়ার কারণ—সামনে থেকে যারা শেখদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সেই নমশূদ্ররা শেখদের হাতে খুব মার খেয়েছে। শেখরা তৈরি ছিল। নমশূদ্ররা আওয়াজ শুনেই ছুটেছে। কারো হাতে একটা ঢিল পর্যন্ত নেই। শেখেরা মনের সাধ মিটিয়ে পিটিয়েছে। কারো-কারো বুকপিঠে পাকা লাঠির বাড়ি, লাঠির মার বরাবর রক্ত জমাট বেঁধে আছে। একজনের হাঁটুর চোট এমন যে কাঁধে করে ফেরত আনতে হল। একজনেরই মাথা ফেটেছে নাকী খুলি ছেঁচড়ে গেছে। গরু খালাশ করে তারা এনেছে ঠিকই, কিন্তু শুদ্দুরদেরদের পাড়ায়-পাড়ায়, জ্বর-জখম-জ্বালা। এ থেকে কি আর এতদূর ভাবা যায় যে শ্যাখের বেটাদের ঠিকঠিক শিক্ষা দেয়া হয়েছে? সেটা যে ভাবার চেষ্টা হয়নি, তা নয়। কিন্তু সত্যটা দিন দুইয়ের মধ্যেই স্পষ্ট। হয়ে ওঠে—শেখেরা কাশিয়ানি খুনের বদলা নিল। দু-বছর আগে সেই হাটভাঙা-হাটবসানো নিয়ে শুরু। এখন বয়কটই-বা কোথায়, খিলাফতিই-বা কোথায়? কিন্তু বদলাবদলি তো চলছেই। ফরাজি আর নমশূদ্রদের মধ্যে স্বভাবের এই এক মিল যে তারা হাতের কাজ ফেলে রাখতে পারে না। বদলাবদলি যখন হচ্ছেই তো হোক।

গরু-আটকানোর দিন দুই পর একদিন সাতসকালে পদ্মবিলা আর গোয়ালগ্রামের দুই পাড়ে সারি দিয়ে হাজার দুই লোক বর্শা, তীর-ধনুক, লাঠি নিয়ে খাড়া। পদ্মবিলা নমশূদ্ররা বেশি আর গোয়ালগ্রাম তো গায়ে গা-লাগানো—শেখরাই মাথাগনতিতে বেশি। হাজার দুই মানুষ, শ্যাখ ও শুদ্দুর মিসিল বাইন্ধ্যা খাড়া, অস্ত্র নিয়্যা, কেউ-কেউ বলে গোপনে দুই পক্ষেই বন্দুকও ছিল। মত অফিশারদের মুখগুলি, তর কিন্তু দুই দলই খাড়া। কেউ কারো দিকে আগায় না। থানার ছোটবাবুর মালখানায় ছিল দুটো বন্দুক আর দুটো লাঠি-পুলিশ। তিনিও এই অস্ত্র নিয়ে এসে পড়েন ও ঢুকতে-ঢুকতেই প্রত্যেক বন্দুক থেকে একটা করে ফাঁকা আওয়াজ করেন। যাই হোক, দারোগাবাবুর কথায় দুই পক্ষই দাঙ্গা থেকে বিরত হয়। কিন্তু দারোগাবাবু যখনই শেখদের গ্রামে

ফিরে যেতে বলে, তখনই শেখরা বলে, 'ওরা আগে সরুক।' দারোগাবাবু যখন শুদ্দুরদের কাছে এসে একই কথা বললেন তখন তারাও একই জবাব দেয়, 'আগে শাখদের সইরব্যার কন।' শেষে সূর্য পাটে পড়তেই মুসলমানরা মাঠ ছেড়ে তাদের গোয়ালগ্রামের দিকে রওনা দিল। তারা রোজায় ছিল, রোজা ভাঙতে হবে। নমশূদ্রদের সুযোগ ছিল, পেছন থেকে পালটা আক্রমণের। কিন্তু সে-ই তখন দাঙ্গাদাঙ্গির অবস্থা এত খারাপ হয়নি—রোজা রাখা মুসলমানকে পেছন থেকে মারাই হিন্দুধর্ম। মুসলমানরাও এটা জানল, বলেই সূর্যাস্তে পেছন ফিরেছিল। এতে অবিশ্যি একটা ধারণা চাউড় হল যে আসলে কোনোপক্ষই মারামারি লাগাতে চায় না।

পরের দিন সাতসকালে সেই একই জায়গায় আবার যুদ্ধ-সমাবেশ। নমশূদ্ররা সাড়ে তিন হাজার। মুসলমানরা আড়াই হাজার। দাঙ্গার হিশেব যে কী করে এত ঠিকঠাক হয় সে এক সাব-ইনস্পেক্টরই জানে, যাকে প্রাথমিক রিপোর্ট লিখতে হয়েছে। দুই দলের কোনো দলই এগচ্ছিল না আর তাদের মাঝখান দিয়ে সাব-ইনস্পেক্টার তার চার বন্দুক নিয়ে ফৌজি কায়দায় চলাফেরা করছিল। ভোর ছ-টা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত দশঘণ্টায় সাব-ইনস্পেক্টর তিনবার বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করেছে। তার বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল, সেই তিনটি আওয়াজেই দাঙ্গাটা ঠেকে আছে। সে তখন দুই দলের সামনেই চিৎকার করে হুকুম জানাল, যদি এই মুহূর্তে সবাই নিজের নিজের গ্রামে ফিরে না যায়, তাহলে, সে পরের গুলিটা আকাশে ছুড়বে না, তাদের বুকে-মাথায় ছুড়বে।

এ-পর্যন্তও একরকম ছিল।

সে হঠাৎ এক নমশূদ্রের হাত থেকে বর্শাটা কেড়ে নিয়ে মাটিতে ফেলে দিল।

তৎক্ষণাৎ তাকে সবাই ঘিরে ধরে চিৎকার করতে লাগল। হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেয়াটা একটা নতুন কাজ। সাব-ইনস্পেক্টর সেটা হিশেব কষেনি যে এর ফলে নিজেই প্রতিপক্ষ প্রতিপন্ন হয়ে যাবে।

'যা করার করেন, হাতিয়ারে হাত ছোঁয়াবেন না, হাতিয়ার ফিরত দ্যান।'

'শ্যাখগ বর্শা কি ভোঁতা? বেন্ধে না?'

'হাতিয়ার ফিরত না দিলে পুলিশের ছাড় নাই।'

'হাতিয়ার ফিরত দ্যান।'

'আপনার লগে তো কোনো বিবাদ নাই। বিবাদ বাঁধান ক্যা? হাতিয়ার ফিরত দ্যান।'

'শ্যাখরা কিন্তু নিজেগ চক্ষুতে দেইখল—পুলিশ তাগ পক্ষে। এইবার অরা অস্ত্র চালাইব। হাতিয়ার ফিরত দ্যান।'

সাব-ইনস্পেক্টরটি তখন বুঝে গেছে, সে দাঙ্গায় পুলিশের সবচেয়ে ভুল কাজটি করে ফেলেছে। এক্ষুনি যদি এর উলটো কিছু না-করা যায় তাহলে এই নমশূদ্ররা খুব ঠান্ডা মাথায় তার গায়ের চামড়া খুলে নিয়ে, তার চামড়াখসা শরীটা পদ্মবিলায় ভাসিয়ে দিতে পারে। এখানে প্রতিপক্ষতা ঐ পর্যন্ত ও যেতে পারে স্বাভাবিক গতিতে। ইনস্পেক্টরটি ভয় পেয়ে যায়। তার বয়স এতই কম যে চার বন্দুক, চার সেপাই, তাকে কোনো ভরসা দিতে পারল না। বৃহত্তর কোনো রাষ্ট্রের সব চিহ্নগুলো, এসডিও বা জিলা-ম্যাজিস্ট্রেট বা এসপির মত অফিশারদের মুখগুলি তার তখন তার চোখে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল। এদের কারো মুখই সে কখনো দেখেনি। সব মুখই তার ধারণায় আঁকা। সে বর্শাটা মাটি থেকে তুলে, যার বর্শা তাকে ফেরত দেয়। ফেরতের সময় তুচ্ছ একটা গোলমাল করে ফেলেছিল। কার হাত থেকে বর্শাটা সে কেড়েছিল সেটা আর তার মনে থাকবে কী করে? মাটি থেকে বর্শাটা তুলে, সে সবচেয়ে কাছে যাকে

পেল, তার হাতে বর্শাটা তুলে দিল। সে-লোকটা কিন্তু সামান্য অপ্রস্তুতও হল না—তুলে দেয়া বর্শাটা আগের লাইনের কোনামারা ডানহাতি লোকটাকে এগিয়ে দিল। এতে কারো কিছুই মনে হবে কী করে দারোগারা তো সবসময়ই লোক দিয়েই কাজ করায়। এখানে বর্শা দিইয়েছে। সাব-ইনস্পেক্টার যে ভুললোকটির ভঙ্গি দেখে নিজের ভুল সংশোধনের জন্য হঠাৎ জাগ্রতের মত নিজে হাত বাড়িয়েই গুটিয়ে নিয়েছিল—সেটা চোখে পড়বার মত আকারের কিছু না হলেও তো চোখে পড়ে থাকতেও পারে কারো, কারো-কারো, বা একজন কারো। যেসব ভঙ্গি থেকে সমাবেশ জেনে যায়, সরকার ক্ষমতা ছেড়ে দিল, সেসব ভঙ্গি অন্তত একজন কেউ ঠিকই দেখে ফেলে, পলকে, আর সঙ্গে-সঙ্গে একটা ঢিল তুলে ছোঁড়ে প্রতিপক্ষের দিকে। ব্যস, দিনের শেষে শুরু হয়ে গেল—ঢেলাঢিলি। মাটির শক্ত টুকরো, বাঁশকাটা একহাতি সব লাঠি, বর্শা, গোটা খাটো বাঁশ বনবন করতে-করতে বাতাস কাটে। সন্ধ্যার পর যে যার গ্রামে ফিরে খোঁজখবর নিয়ে জানল—নমশূদ্রদের কেউ মারা যায়নি আর-একজনের জখম খারাপ। শেখদের একজন মারা গেছে আর কয়েকজনের জখম খারাপ। তাহলে তো জয়ই হল শূদ্রদের?

পদ্মবিল্যা কাইজ্যা শেখদের প্রতিশোধ

পরের দিন সকালেও মুসলমানরা পদ্মবিলের পাড়ে জমা হতে শুরু করে বটে কিন্তু জমা হতে পারেনি। আগের রাতেই গোপালগঞ্জের এসডিও নতুন পুলিশ নিয়ে পদ্মবিলায় পৌঁছেছেন।

৬৪

সরকারের সাব-ইনস্পেক্টার ভয় পেতে পারে, সে তো একটা মানুষ। সরকার ভয় পেতে পারে না। সে তো মানুষ নয়।

দু-তিনদিন পরেই ফরিদপুরের জিলা-ম্যাজিস্ট্রেট ও এসপি মার্চ করতে-করতে পদ্মবিলার দিকে রওনা দেন। ঐরকম পুলিশ ও শাহেব দেখে গ্রামের লোকজন, বিশেষ করে মেয়েরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। এর আগে তারা কোনোদিন এত কাছ থেকে কোনো বাহিনীও দেখেনি। তাদের ভয় পাওয়ারই কথা কিন্তু সাতদিন সাতরাত ধরে কী হয়, কী হয় ভেবে অস্থিরতার পর পুলিশ আর শাহেব দেখে আনন্দে মেয়েরা এদের ঘিরে হুলাহুলি দিতে লাগল, ঘর থেকে মুড়ি-মুড়কি এনে তাদের খাওয়াতে লাগল। এরা নমশূদ্র মেয়ে। রোজা চলছিল বলে মুসলমান মেয়েরা আনন্দ করতে পারেনি বা মুড়ি-মুড়কি খাওয়াতে পারেনি। কিন্তু তারা নমশূদ্র মেয়েদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। শাহেব আসছে শুনেই দাঙ্গা-হাঙ্গামা বন্ধ। শাহেবরা সব বাড়িঘর সার্চ করে, খবর নিয়ে, জানলেন—দাঙ্গায় তিনজন মুসলমান মারা গেছে, অনেকে জখম হয়েছে। নমশূদ্রদের একজনও মারা যায়নি। খুব বেশি জখমও হয়নি। এই ঠান্ডা ভাবটা গেঁড়ে বসতে-না-বসতেই হঠাৎ শুকনো কাশবনে আগুন লাগার মত রটে গেল যে পদ্মবিলা থেকে মাইল দুই পশ্চিমে পাশাপাশি সদরবন্দর থেকে হাজারে-হাজারে মুসলমান জমা হয়েছে। তারা সমস্ত নমশূদ্র-গ্রাম পুড়িয়ে ছাই ওড়াবে। এসব খবর কেউ যাচাই করে না। এ তো বাঁচাবাঁচানোর ব্যাপার। 'আইছে, আইছে' শুনলেই ঘর থেকে বেরিয়ে দৌড়াও। পেছনে মধুমতী বান হয়ে আকাশ ছুঁয়ে ধেয়ে আসতে পারে, বাঘ বেরিয়ে এসে থাকতে পারে গরানজঙ্গল থেকে, জঙ্গলের দক্ষিণের সমুদ্র থেকে সমুদ্রের ঘুরনা এসে থাকতে পারে, জমিদার ডাকাইত পাঠাতে পারে।

এ জমিতে যারা থাকে সকলেই তো তাদের শত্রু, দেখতে-দেখতে মেয়েরা বাচ্চা কোলে ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটতে শুরু করে—কোথায় যাচ্ছে তা না-জেনেই। নমশূদ্র পুরুষরা শোনামাত্র যে যা হাতে পেল নিয়ে পদ্মবিলার পাড়ে জমা হল—জমা-হওয়ার অভ্যাসে। পদ্মবিলার পাড় দিয়েই মেয়েরা-বাচ্চারা ছুটছিল গ্রাম থেকে বেরিয়ে যেতে। ফলে পদ্মবিলার পাড়ে যেন, যে-যুদ্ধ হয়নি সেই যুদ্ধশেষ ঘটছিল। বাচ্চারা মাটিতে লুটিয়ে কাঁদছে, মেয়েরা মাথায় পোটলা ও বুকে বাচ্চা নিয়ে চিৎকার তুলে পালাচ্ছে। দুই-একজন বুড়ি পাড়ে পড়ে আছে—দুই পা ছড়িয়ে, দুই হাতে বুক থাবড়ে কাঁদছে—তাদের বাড়ির লোকজন তাকে ফেলে রেখে চলে গেছে। লাঠিসোঁটা বর্শা-শড়কি হাতে ছুটন্ত পুরুষরা মুখেও হুলাহুলির মত আওয়াজ তুলছিল পরস্পরকে ডাকতে। তাদের পদ্মবিলার পাড়েই আসতে হয়েছে। সেখানে তারা সত্যি-সত্যি গোলমালে পড়ে যায়—কোন্ কাজটা আগে করবে ঠিক করতে পারে না। মেয়েদের ও বাচ্চাদের নিরাপদ কোনো জায়গায় নিয়ে রাখবে আগে, নাকী, দু-মাইল পশ্চিম থেকে যে-শেখ-সৈন্য ছুটে আসছে তাদের ঠেকাবে? এমনকী আচমকা যা মনে আসে তাই বলে চিৎকার করার মত সূদনের লুলা ল্যাংটা আধপাগলা বাপটাও ছিল না। থাকলে তার সেই বলদের মত চিৎকারটায় কত অর্থ বসিয়ে একটা হুকুম কল্পনা করে পালন করা যেত। পুরুষদের কেউ একজন হয়ত বলে থাকবে, বা বলেছে বলে কেউ শুনে থাকবে—আরে, আগে তো ঠ্যাকাবা, নইলে কী বাঁচাবা। এরকম কথা কেউ-কেউ শুনেছে ভেবে নিয়ে হাতের লাঠিসোঁটা নিয়ে মাইল দুই পশ্চিমের দিকে ছুটল। ছুটতে-ছুটতেই দেখে তাদের মুখোমুখি বন্দুক উঁচিয়ে সার দিয়ে পুলিশ আর সেই পুলিশের সারের সামনে দুই শাহেব, তাদের হাতেও বাইট্যা বন্দুক, অন্যরকম দেখতে। শাহেব, তার সঙ্গে পুলিশ, তাদেরই সঙ্গে বন্দুক—এই তিনটি একজায়গায় দেখলে লাফানো বাঘও বাতাসে পালটি খায়। এ তো আর কাশিয়ানি থানার সাব-ইনস্পেক্টরের বর্শা কাড়া না। চার পুলিশের আকাশে ফাঁকা আওয়াজ করাও না। বন্দুক এখন শাহেবদের হাতে, বন্দুকের নল এখন নমশূদ্রদের বুকের দিকে তোলা। বন্দুকের গুলি চালানোর মতই মানুষের একটা গলা শোনা গেল। সামনে যারা ছিল, তারা বসে পড়ল। তাদের দেখাদেখি, পেছনে যারা ছিল তারাও। তাদের দেখাদেখি তখনো যারা ছুটে আসছিল, তারাও। 'শাহেব অর্ডার দিছে, বইস্যা পড়। শাহেব অর্ডার দিছে, বইস্যা পড়। বইস্যা পড়। এইহানে।' এমন একটা কথা ছড়িয়ে পড়ছিল।

পরে, অবিশ্যি সবই জানা গেল।

এক-বাহিনী পুলিশ নিয়ে দুই শাহেব গেছে দুই মাইল পশ্চিমে শেখদের ঠেকাতে আর, এক শাহেব আর-এক-বাহিনী নিয়ে পদ্মবিলায় থাকল শুদ্দুরগ আটকাতে।

সন্ধ্যা-নাগাদই খবর আসে। জানা গেল—শেখরা সত্যিই এসেছিল, নৌকো করে, এমনকী যশোর থেকেও শাহেবরা গিয়ে তাদের বুঝিয়েসুঝিয়ে ভয় দেখিয়ে যার-যার দেশে ফেরত পাঠায়। নমশূদ্ররাও তো পদ্মবিলায় এসেছিল, মধুমতী পেরিয়ে, এমন কী মুকসুদপুর থানা থেকেও, এমনকী ভাঙা থেকেও। থানা, জিলা, সদর, নদী, বিল পার হয়ে নিজের জাত ধর্মের জন্য তাহলে জড়ো হয়ে যেতে পারে শেখরাও, শূদ্ররাও। তা তো পেরেই এসেছে এত কাল, একসঙ্গে। ডাকাত ঠেকাতে বা জমিদারের পাঠানো লেঠেল ঠেকাতে। কিন্তু এ ওকে মারতেও যে আলাদা করে শেখরা ও শুদ্দুররা অ্যালায় জোট বাঁধতে পারে, পদ্মবিলায় সেটাই দেখা গেল। ফলে, আঁচ লাগল যশোর-খুলনাতেও।

এরই মধ্যে কে বা কারা রটিয়ে দিল—ভাদ্রসংক্রান্তির দিন মুসলমানরা ওড়াকান্দির গুরুচাঁদ-আশ্রম আক্রমণ করবে। কেন করবে সেটা কারো মাথায় এল না। পদ্মবিলার দাঙ্গাতেও

তো মুসলমানরা নমশূদ্রদের জাতধর্ম নিয়ে কিছু বলেনি। নমশূদ্ররাও বলেনি। ওড়াকান্দি তো নমশূদ্রদের কেন্দ্র। সেখানে উৎসবে-পুজোয় শেখেরাও আসে। দূর-দূর থেকে নৌকো করে নিয়ে আসে বাড়ির রোগীকে, বিশেষ করে পুরনো ঘায়ের চিকিৎসায়। শেখরা ওড়াকান্দি আক্রমণ করবে কেন তার মাথামুন্ডু বোঝা না গেলেও প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা তো রাখতেই হয়। এই পুরো চার বছরের দাঙ্গায় এই কিন্তু প্রথম আত্মরক্ষা—প্রতিরক্ষার জন্য সংগঠন করতে হল।

পদ্মবিল্যা কাইজ্যা কবিগান

৬৫

নমশূদ্রদের মধ্যে কবিগান বানানোর খুব রেওয়াজ। গুরুচাঁদের এক বেশ বড় শিষ্য কলকাতার পাটোয়ার বাগানে বইটই নিয়ে কোনো চাকরি করত। এ-চাকরি মুসলমানদের একচেটিয়া, তাও হাওড়া-হুগলি আর যশোরের মুসলমানদের। যশোরের মানুবুড়া এই কাজের পুরনো কারিগর। কয়েক বছর আগে, খালাতভাইয়ের শাদি দিতে মানুবুড়া এসেছিল ফুলতলা থেকে বিলদুলি-তে, এই গোপালগঞ্জেরই। সেই বিয়ের আসরে গুরুচাঁদের শিষ্য হারানচন্দ্র সূত্রধর কবিগানে কৈকেয়ীর ঝি মন্থরার সঙ্গে, কৌশল্যার ঝি ফক্কড়ার ঝগড়া এমন জমিয়েছিল যে মানুবুড়া তাকে ফক্কড়া। সঙ্গে নিয়ে ফেরে, 'আই রে, দেখছে নি মণি। মায়ের প্যাটের ভিতর থাকার টাইম থিক্যা রামায়ণ শুইন্যা আসছি। শূর্পনখার স্বামীর নাম শুদ্ধ্যা জানি। আর বিলদুলিতে আইসে জানতি হইল কৌশল্যারও এক মন্থরা আছিল। তার নাম ফক্কড়া। এমন পণ্ডিত কবিয়ালরে বিলদুলিতে ফেইলে রাইখলে দুনিয়া জাইনবে ক্যামনে? চলো, বাবা, আমার লগে কইলকাতায় চলো।' কলকাতায় সে যে-কারখানায় কাজ করে সেই কারখানায় ঢুকিয়ে নেয়। কলকাতায় মানুবুড়ার সন্ধ্যাকাটানোর কোনো সমস্যা নেই—এত আলো। দেশের কথা বলার লোকেরও অভাব নেই—যশোরের লোক এত। কিন্তু হারানচন্দ্রের কবিগান কে শোনাবে। হারানচন্দ্রের কবিগাওয়ার ছদ্ম নাম ছিল আলাদা—গুরুচাঁদদাস বৈরাগী। গুরুচাঁদের নাম থাকলে সম্মান বাড়ে। আর ভনিতায় ছন্দ মেলানোর জন্য বৈরাগীটা খাপ খায়। 'সূত্রধর' বলে ভনিতা দিলে একটু ছোট লাগে। সেই সূত্রধর বা বৈরাগী দেশ থেকে এই ভাদ্রসংক্রান্তিতে শেখ আক্রমণের খবর পেল। তকে যেতে হবে। গান গাইতে না, যুদ্ধ করতে ছোট একটা কবিগান লিখে একেবারে ছাপিয়ে নিয়ে এসে ওড়াকান্দিতে হৈহৈ ফেলে দেয়। সূত্রধর বা বৈরাগী কবি ছিল বটে কিন্তু লিখতে পারত না। বড় মোটা হরফে ছাপা বই কেঁদেকঁকিয়ে পড়তে পারত কিন্তু সে-পড়ায় তো ছন্দটা আসত না। তাই তার পড়া ছিল শুনে-শুনে আর লেখা ছিল মনে-মনে। এই গানটা যখন প্রায় শেষ করে এনেছে, মানুবুড়াকে শুনিয়েছে। মানুবুড়া মুগ্ধ। গানটাতে মুসলমানদের খুব খারাপ-খারাপ কথা বলা আছে। তাতে মানুবুড়া বলে, 'আরে গীতডা তৈরি হইল গালাগাল দিয়ার লগে, সেইহানে হরিসংকীর্তন আইসব ক্যামনে?' সে তাকে নিয়ে যায় ঐ রাস্তারই এক ছোট ছাপাখানার পেছনের ঘরে। সেটা কাগজের ছোটখাটো গুদাম। যার কাছে নিয়ে গেল মানু, সে নাকী কলেজে পড়ে। মানুবুড়া তাকে বলল, 'ভাইজান, এই আমাগ দ্যাশের ছাওয়াল ছুতার—'।

হারান তাতে আপত্তি করে বলে, 'বৈরাগী।'

মানুবুড়া একটা চড় মারে বাতাসে, 'স্যায়, যহন গাইব্যা তহন বৈরাগী হইয়ো। ভাইজানের কাছে বানান্-নাম নি কওয়া যায়? ভাইজান, ও একডা গান বাইন্ধছে। ও গাউক। তুমি এড্ডু কাগজে লিখ্যা দ্যাও।'

সিলিঙের কাছাকাছি কাগজের গাদার ওপর থেকে ভাইজান নীচে তাকিয়ে বলল, 'সে আবার কী? উনি বাঁধলেন গান আর সেটা উনি লিখতে পারবেন না?'

'তোমাগো নিয়্যা এই এক কাইজ্যা ভাইজান। গান বান্ধে বইল্যা কি ও অক্ষর লিখবার পারে?'

'ও—' বলে ভাইজানকে ব্যাপারটা বুঝে নিতে একটু চুপ করে থাকতে হয়, সেই উচ্চতায়। তারপর বলে, 'কিন্তু নীচে তো লাইট নেই। লিখব কী করে?'

মানুবুড়া এবারও ভাইজানের সমস্যা বুঝতে পারে না।

'যেইখানে আলো সেইখান ছাড়া কি লিখন যায়?'

'তাহলে কাল সকালে আসুন।'

'কী যে কন ভাইজান? আমাগ কি আসনের সকাল আছে। ও তলা থিক্যা গাউক, আপনি উঁচা থিক্যা ল্যাহেন। ছাপাইয়া দ্যাশে নিয়া যাবে।'

'ও। ওঁকে গাইতে হবে কেন? বলুন-না, বললেই হবে।'

'ভাইজান, তোমাগো বিদ্যা আছে, বুদ্ধি নাই। আরে গান যে-বাইন্ধে স্যায় কি না-গাইয়া কইতি পারে? নে, গা—'

সেই গুদামের অন্ধকার মেঝে থেকে হারান গান গায়, ঘুরিয়েফিরিয়ে, তাল ছেড়ে, তাল দিয়ে, ঘাড় দুলিয়ে। আর সেই গুদামের একটা বাল্বজ্বলা আলোর নীচে কাগজের পাহাড়ের মাথায় বসে ভাইজান মাঝেমধ্যে লেখে আর বেশিরভাগ সময়ই তার নিজের ও কাগজের ছায়াতে ঢাকা হারানের গান বাঁধা দেখে।

সেই গান পরের সন্ধ্যায় মানুবুড়া নিয়ে যায় দুই কোঠা দূরে একটা প্রেসে যেখানে ট্রেডল মেসিন আর মেশিনম্যান ছাড়া একটা ধেড়ে ইঁদুরও যেতে পারবে না। মানুবুড়া কাগজটা এগিয়ে বলে, 'বা-জান, এইডা, প্রজারে দিয়্যা কম্পোজ করাইয়্যা বিকালের শ্যাষে দুইশ শিলিপ টাইন্যা দিয়ো—'

'সাইজ?'

'ক্রাউনরে আটভাঁজি দিয়ো। ছোড তো!'

ছেলেটি ততক্ষণে গানটার চেহারা দেখে নিয়েছে, বলল, 'ও? কবিতা?'

সেই কবিতা বা গানের ছাপানো প্যাকেট নিয়ে সেবারের, মানে ২৫ সালের বা ২৬ সালের, ভাদ্রসংক্রান্তির দুইদিন আগে, তিনদিনই বলা যায়—হারান তো পৌঁছেছিল সন্ধ্যারও পর, রাতও বলা যায়—খুলনা থেকে লঞ্চ লাইন বন্ধ ছিল, হারান একটা সাট্‌ল্ লঞ্চে মোল্লাহাট হয়ে গোপালগঞ্জে আসে। সে তো আসবেই কিন্তু ওড়াকান্দির আশ্রমে দড়ি খুলে সে যখন ঐ ছাপানো গান সকলের হাতে হাতে দেয় তখন 'জয়গুরু গুরুচাঁদ' আওয়াজে অনেকে ভয় পেয়েছিল, বুঝি শেখেরা দিনদুই আগেই আক্রমণটা করল। হারান আর ক-জনের হাতে দিল? তাদের বেশির ভাগই পড়তে জানে না। ঠাকুরবাড়িতে তো সকলেই পণ্ডিত কিন্তু তারা তো তখন ঘুমোয়। শেষে এক ভক্ত, বয়সও সকলের চাইতে বেশি, পদমর্যাদাতেও—সে ছিল গুরুর আশ্রমের বারবাড়ির কর্তা, বলে উঠল, 'এইডা কী কথা? শ্যাখগোর সঙ্গে যুদ্ধে একডা কামান কান্ধে লয়্যা বৈরাগী সেই কইলকাতা থিক্যা, তিন বিল হাঁইট্যা আর চাইর বিল সাঁতরাইয়া ওড়াকান্দি আইসতে পারে আর সেই কামান গুরু নিজের চক্ষে দেইখবেনে না?' সে দুটো ছাপানো পাতা

হাতে নিয়ে ভিতরবাড়ির দিকে চলে যায়। গুরুর শয়নকক্ষে।

গুরু দেশেশুনে এমন মোহিত যে তখনই দু-চারটে লণ্ঠন জ্বালানো হয়, হাঁক পেড়ে লোকজন ডাকা হয়, হারানকেও। হারান গুরুর সামনে দাঁড়িয়ে গানটা গেয়ে চলে আর গুরু তার পড়ার যে-চশমা ঢাকা থেকে বানিয়ে এনেছেন, সেইটি নাকে লাগিয়ে গাওয়া গানের সঙ্গে ছাপা গান মেলান। যদিও এদের সকলেরই চেনাজানা ঘটনা—এই পদ্মবিলার দাঙ্গা, কেই-বা সেদিন ছিল না পদ্মবিলার পাড়ে—তবু গানে বললেই যেন সবকিছু বদলে যায়। গানে সেদিনের নমশূদ্র-সমাবেশের পেছনবরাবর ঠাকুর গুরুচাঁদের তাঁর শূদ্রবাহিনীকে উৎসাহদানের কথা বলা হয়েছে। ঠাকুর এত উঁচু দিয়ে হাঁটছেন, যেন রণপায়ে উঠেছেন। ঠাকুর এক পায়ের পর আর-এক পা ফেলছেন, যেন রণপা-র পা ফেলছেন।

এগুলো তো গান-ছাড়া ঘটে না। পদ্মবিলার দাঙ্গা তো চলচিল চার-পাঁচ বছর। চার-পাঁচ বছরে চার-পাঁচটি ঘটনা—সেই হাটভাঙা, গরুডাকাতি, গরুবাঁধা, কাইসিনি মার্ডার, তারপর, দুই-তিন দিন পদ্মবিলায় দুই-তিন হাজার শুদ্র জমায়েত—যারা এই সবগুলোতেই হাজির ছিল, সবগুলোর মাত্বর ছিল তাদের একজনও এই চার-পাঁচ বছরের কোনো ঘটনায় ঠাকুর গুরুচাঁদকে সশরীর আসতে দেখেনি। অথচ বৈরাগীর গানে ঠাকুরই সেনাপতি। তার ওপর বৈরাগী যখন গলার-গান কাগজে ছেপে এনেছে, তখন তো কথাই নেই। যারা অক্ষর চেনে, তাদের জন্য বৈরাগীর ছাপা গান। আর যারা গলা চেনে, তাদের জন্য বৈরাগীর গলার গান। শেখেরা চারদিক থেকে এসে ওড়াকান্দি আক্রমণ করবে, এমন একটা ভয়, একেবারে গুজব হয়ে গেল। সেই গুজবের যুদ্ধের ভাদ্রসংক্রান্তিতে এই গানটা কলকাতা থেকে কামানের মত এসে পড়ায়, কয়টা ভাদ্রসংক্রান্তির পরে, ওড়াকান্দির স্নানযাত্রার মেলার সঙ্গে নমশূদ্রের জয়যাত্রার মেলাও মিশে গেল।

এখন, ১৯৩৭-এর জুলাই মাসে, ১৯৩৫-এর ভারতশাসন আইন ও কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ড অনুযায়ী ভোটে তৈরি আইনসভার প্রথম অধিবেশনের শেষে ও দ্বিতীয় অধিবেশনের আগে, সারা ভারতে সাধারণ বা জেনারেল সিটে দাঁড়ানো একমাত্র বিজয়ী নমশূদ্র তথা শিডিউল্ড কাস্ট প্রার্থী বরিশালের যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল তাঁর নির্বাচনক্ষেত্র, বসতবাড়ি, স্ত্রী ও ওড়াকান্দির স্নানযাত্রা সফর শেষে কলকাতায় ফিরে যাবেন—২৯ জুলাই ৩৭ লাটশাহেবের ভাষণ, আইনসভায়।

তাঁর দুই সঙ্গীকে তিনি এই স্নানযাত্রা-জয়যাত্রায় আসার পথে বলে ফেললেন, যে, নমশূদ্রদের তো নতুন শক্তি তৈরি হয়েছে—অন্যান্য শিডিউল্ড কাস্ট। এখন এই পুরনো গুরুগিরি করে নিজেদের খুব খাঁটি অথচ আলাদা হিন্দু হিশেবে জাহিরের দরকার নেই। আরো দরকার নেই, হিন্দু সেজে মুসলমানদের সঙ্গে দাঙ্গা করার। মুসলমানদের সঙ্গে যদি দাঙ্গা বাধাবার শখ হয়, তাহলে সে-দাঙ্গাটা বামুন-কায়েত-বৈদ্যরাই করুক।

আরো দরকার নেই, মুসলমানদের সঙ্গে বিবাদের। মুসলমানদের সঙ্গে নমশূদ্রদের কোনো বিবাদই নেই। ঐ খিলাফৎ—অসহযোগের দুই দিককার ভদ্রলোকরা মিলে নমশূদ্রদের সঙ্গে বিবাদ বাধিয়েছিল। সে খিলাফৎ-ও নেই, সেই আইন-অমান্যও নেই। কংগ্রেসের ইউনিয়ন বোর্ড বয়কট গিয়ে থেমেছে আইনসভায়। শেখ আর শূদ্ররা ইউনিয়ন বোর্ডে যাচ্ছে দেখে সাত তাড়াতাড়ি কংগ্রেস এসে লাইন দিয়েছে, যাতে বোর্ডগুলো হাতছাড়া না হয়। তাহলে তো এখনই সময়—মুসলমানদের সঙ্গে মিলে নিজেদের জাতের ছেলেমেয়েদের পড়ার স্কুল-কলেজ, থাকার হস্টেল, কারণ হিন্দুহস্টেলে নমশূদ্র ছাত্রদের থাকতে দেয় না স্কলারশিপ, সাহায্য ও কবার চাকরিবাকরি করার, হিন্দুদের আটকানো খাল কেটে দেয়। হিন্দুদের বাড়তি জলের খালে বাঁধ বসানোর কোটা আদায়ের।

যোগেন মণ্ডল যে এই কথাগুলি এমন সাজিয়েগুছিয়ে বলেছে তা একেবারে নয়। কিন্তু এই কথাবার্তা থেকেই কথাগুলির সাজগোছ তৈরি হচ্ছিল—সেই ৩৭ সালের জুলাইয়ে যোগেন, প্রহ্লাদ আর শিবু তখন বিলপথ দিয়ে হেঁটে ওড়াকান্দির গুরুচাঁদ ঠাকুরের আশ্রমে যাচ্ছিল, শিবুর মাথায় একটা মাটির কলসী—সেটা যোগেনের শাশুড়ি দিয়েছে যোগেনের ছেলে যাতে ভালভাবে হয় সেই মানতে।

'হিন্দুরা আমাগ হিন্দু মাইনব না, তাও আমাগ হিন্দুই হওয়ার লাগব। যাও, মন্দিরে ঢুইক্যা ফুল ছিটাইয়্যা আর এক বামুন জুটাইয়্যা তার পাশে বইস্যা পংক্তিতে খাইয়্যা কংগ্রেসের অস্পৃশ্য দূর করো গিয়্যা।'

এর পরের দশ বছর ধরে তো অনেক ঘটনা ঘটবে। সেসব ঘটনার ঘটক সারা দেশও সাম্রাজ্যে ছড়ানো অজস্র-অজস্র অণুঘটক ছাড়া এইসব ঘটনা ঘটতে পারত না।

আবার ঐসব ঘটনা না-ঘটলে, ইতিহাসও তৈরি হত না। মনে হয় যেন, পাওয়ার- জেনারেশন কাইসিনি বিদ্যুত-উৎপাদন পাওয়ার-ডিভোলিউশন বা বিদ্যুৎ-হস্তান্তরের কারিগরি প্রক্রিয়ার সঙ্গে এই ঘটনা-অণুঘটক থেকে ইতিহাস-উৎপাদন ও ইতিহাস-হস্তান্তর ঘটনার কাব্যিক মিল আছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন না-করলে বিদ্যুতের হস্তান্তরণ সম্ভব নয়। কোনো উৎপন্ন জিনিশেরই তেমন হস্তান্তরণ সম্ভব নয়। তেমনি অন্য জিনিশের সঙ্গে বিদ্যুতের এই একটি বড় তফাত যে বিদ্যুতের উৎপাদন মানেই বিদ্যুতের হস্তান্তরণ—এটা একটাই প্রক্রিয়া। হস্তান্তরণ খুব জটিল ও সেটা ঘটতে থাকে ব্যাপকতম দেশে। লোহার বা কংক্রিটের থাম ও টাওয়ার দরকার হয়। বিদ্যুতের তাপ অনুযায়ী বিভিন্ন ধাতুর ও বেধের তার দরকার হয়—লোহা, তামা, এলুমিনিয়াম। কত পরিমাণ বিদ্যুৎ হস্তান্তরণ করা হচ্ছে সেই অনুপাতে বাহকস্তম্ভ বদলাতে হয়। আরো নিশ্চয়ই কত সূক্ষ্ম ও অতিসূক্ষ্ম জটিলতা ব্যবস্থাটিতেই আছে। তেমন জটিলতা ছাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদন ও হস্তান্তরণ সম্ভবই নয়। বিদ্যুতের এ-জটিলতা বিদ্যুতের অস্তিত্বের একটা প্রকার। যেমন, কোনো সৌরগ্রহে জল খুঁজে পাওয়ার আগে সাঁতারু খুঁজে পাওয়া যাবে না। যেমন, এমন কোনো মানুষ সম্পূর্ণ মানুষ নয় যার মস্তিষ্কের ভিতরটায় মানুষের সম্পূর্ণতা নেই। পাওয়ার-জেনারেশন ও পাওয়ার-ডিভোলিউশন ঘটনা-অণুঘটনা-নির্ভর ইতিহাস তৈরির প্রক্রিয়ার, আর-বেশিদূর টানা ঠিক হবে না, মনে হয়। কারণ, এরপর অমিলই বেশি। যা উৎপন্ন ও হস্তান্তরণ হচ্ছে, তা বিদ্যুৎ কীনা সেটা পরীক্ষা করা যায়। ইতিহাস তেমন পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। বিদ্যুৎব্যবস্থার সঙ্গে কারো কোনো নিজস্ব সম্পর্ক থাকতে পারে না—চিফ ইনজিনিয়ার, অ্যাডিশন্যাল চিফ, গ্যাংম্যান, মন্ত্রী বা উপদেশক, সচিব। ব্যক্তিগত সম্পর্ক না-থাকলে ইতিহাস বলে কিছু ঘটেই না।

এসব আভাস দেয়ার উদ্দেশ্য—পরের দশ বছরের নানা অণুঘটনার সংকেত দশবছর পরে, ১৯৩৭-এর জুলাইয়ের এই স্নান-বিজয় যাত্রায় খোঁজা হতে পারে।

ভাদ্রের স্নানযাত্রা আর নমশূদ্রবিজয় যাত্রা

৬৬

ওরা ঠাকুরবাড়িতে পৌঁছেই গিয়েছিল প্রায়। রাস্তায় লোকজন বাড়ছে, তবে, তেমন কিছু নয়। ভিড় বাড়বে দুপুরের মহোচ্ছবের সময় থেকে রাত পর্যন্ত। আলোর একটা ব্যবস্থা থাকে—দুটো-চারটে হ্যাজাক বা ডেলাইট। যারা আসে তাদের সঙ্গে না-জ্বালানো হ্যারিকেন থাকেই। এত বেশি প্রাকৃতিক আলো ও অন্ধকারে এই মানুষজনের বসবাস, যে দুটো-চারটে হ্যাজাক বা ডেলাইটের অপ্রাকৃত দীপ্তিতে এত মানুষজনের মুখগুলিকে এত দীপিত দেখা ছেড়ে উঠতে মন চায় না। বিকেলের দিক থেকেই তাই ভিড় বাড়তে থাকে।

কিন্তু যারা মোড়ল-মাতব্বর-নেতা তাদের আসার সময় ঐ দুপুরের ভোগের মুখে-মুখে। পুজোআর্চায় ভোগই তো আসল অনুষ্ঠান। ভোগের সময় ভাতের ও ধূপের গন্ধ মিলিয়ে একটা গন্ধ ছড়ায়। সব মিলিয়ে মনে থাকে না—এটা নমশূদ্রদের পরব। কিছু মুসলমানও এটাকে পরব মানে।

এগতে-এগতে দেখা হয় ওদের সঙ্গে চেনাজানা মানুষের। দাঁড়িয়ে একটু কথা বলতে হয়। যার সঙ্গে যা সম্পর্ক সেই ধরে ডাকাডাকিও চলে, 'ও মিয়াশাহেব', 'মুহুরিমশায়,' 'ঠাকুরবাড়ি মুহুরি কেডা, বেবাক মাগুইর‍্যা', 'মা তো দিনে ভালো, রাইতে কানা'।

এরাও তো মানুষজনকে ডেকে জানান দেয়। 'ও, তালই, তালইই আছো নাকী বেহাই হইছ।'

'ধুত শালা, এমএল হইছ, লগে ব্যান্ডপার্টি নাই।'

চেনা-আত্মীয়-কুটুম মেয়েদের সঙ্গে, গিন্নিদের সঙ্গে তো এই দেখায় আলাদা করে কথা না বললে তাদের দুঃখ হয়। যোগেনেরও হয়, দুঃখ।

'মেলার মইধ্যে খেলার কথা কই ক্যামনে?'

'ক্যা? কেষ্ট ঠাউর তো সেই ব্যবস্থাই কইর‍্যা দিছেন। বারমাসে বার যাত্রা।'

'কবর‍্যাজ ব্যবস্থা দিলেই তো পাঁচন উইড়্যা আসে না।'

'পাচন উইড়ব্যার যাইব ক্যান? উইড়লে উইড়ব শরবৎ। 'কইলকাতাত নি বুলিশেখার ইশকুল আছে?'

'জ্যাঠা, আমারে তুমি চিইনব্যার পারো নাই!'

'খাড়া, নজর কইর‍্যা দেহি মা কী কী বদলাইছ? নড়াইলের জল য্যান ধলা—'

'জ্যাঠা, চিইনব্যার পারছ?'

'সেই দুঃখে নি কাঁদিস? বোকা মাইয়া।'

'জ্যাঠা, এইহান থিক্যা এইহান, একখানই তো নদী, এত দূর ঠ্যাকে ক্যা?'

'ঐডা তোমার সংসার, তোমার নিজের সংসার। দূর হইব ক্যা? জামাই আইছে?'

'আইসব্যার চাইছিল। আমি কই, না, থাহ। আমি এডডু বাপের বাড়ি কইর‍্যা আসি।'

'খাঁশাহেব, অ্যাহনো কি ছুঁচে সুতো পরাবার পারেন?'

'ম ন ড ল! বুকে আইস। তোমার তেমন সন্দেহের হেতু কি কিছু ঘটছে বাপ?'

'এর থিক্যা দুর্ঘটন আর কী ঘইটব্যার পারে? আপনার নমাজি টুপির সুতির কাম দেইখতে বেবাক মানুষ আসে দুনিয়া থিক্যা। তেমন যার সূক্ষ্মদৃষ্টি স্যায় কী না আমার নাগাল একডা মহিষরে দেইখবার পায় না?'

'ম ণ ড ল। বাপ। বুকে আইসো। অমন কর‍্যার নাই। দুঃখ লাগে। তুমি বাপ কি শুধু চক্ষুতে আঁটা?'

'মোক্তার কর্তা! ঐ জালচুরির মামলাডা মিটাইয়্যা নিছি।'

'ভালো৷ কইরছ। আমার পয়সাডা দিয়া আইস।'

এমন সব কথাবার্তার-দেখাশোনার মধ্যে, তারা যে-আলাপ করছিল, সেটা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে যায়। তারপর ওরা যেন ভুলেও যায়।

শিবু বলে, 'আমি এডডু তাড়াতাড়ি চইলল্যাম—ভোগের আগে তো পূজাডা দেয়া লাগে।'

পি আর ঠাকুর এগিয়ে আসছে। খুব শাদা একটা ধুতি লম্বা করে পরা, খুঁটটা গায়ে জড়ানো। পাতলা, ধবধবে, একটা নেটের গেঞ্জির ওপর। ঠাকুরদা গুরুচাঁদ তো আর শুধু ঠাকুরদাই ছিলেন না, ছিলেন একটা প্রতিষ্ঠান। সে দায়দায়িত্ব তো পি-আর-এর ওপরই পড়েছে। সেই ধরলে একটু রোগা দেখায়। গত আইনসভা তো করতেই পারেনি।

'যোগেনবাবু যে এসেছেন, শুনেছি। দেখা করতে যাওয়ারও খুব দরকার ছিল। সে তো হলই না। আজও তো হবে না। আমি তো লাস্ট সেশনে মুখ দেখাতেও পারিনি। এবার একসঙ্গে এতগুলো বিল! আপনি দেখেছেন নাকী ড্র্যাফট?'

'এড্ডু আধডু চোখ বুলাইছি। আমাগ খুব মুশকিল।'

'আমাগর সিংগুলার নাম্বারটা কী?'

'আমি আপনার জেরার যোগ্য পাত্র না, ঠাকুর।'

'এই সিংগুলারহীন প্লুর‍্যাল প্রোনাউন হচ্ছে সবচেয়ে বিপদের।'

'তাইলে তো আপনে ধইর‍্যাই ফেইলছেন—আমাগর সিংগুলারও আমাগ।'

হাসির একটা হুল্লোর ওঠে—সবচেয়ে জোরে হাসে যোগেন।

হাসি থামলে যোগেন বলে—'অ্যাহন আপনার ঘাড়ে এই যজ্ঞিবাড়ি। অ্যাহন যজ্ঞি সামলান। পরে কথা তো হইবই।'

'একটু ইশারা দিয়ে যান—বিপদটা কোন্‌দিকের? না হলে কলকাতায় গিয়ে তো বোকা বনব।'

'আপনার পক্ষে বোকা হওয়াডা খুবই পরিশ্রমসাধ্য। অতডা খাটনি এই শরীরে পুষায়? তার থিক্যা অ্যাহন মানুষজন দ্যাহেন। আপনারে আমার বগলে রাখাডা খারাপ দেহায়। আমিও একডা ঘুরান দিয়্যা মানুষজন দেহি।'

'সে তো দেখবেনই। মানুষজনও তো আপনারে দেখবে।'

'এই তো দিলেন আটকাইয়া। আরে, শেষে কি প্রিভি কাউন্সিলের ব্যারিস্টারের কাছে জজ কোর্টের উকিল পারে? আমাগ খুব মুশকিল কইছি ক্যা? বেবাকেরই তো মুশকিল। ধরেন, কংগ্রেসের মত একডা অল ইন্ডিয়া পার্টি, সত্যিকারের অল ইন্ডিয়া। শুধু বেঙ্গলের গবর্মেন্টি নিয়্যা কোনো অ্যাটিচুড ঠিক কইরব্যার পারে না। আমাগ নাগাল লোক্যাল ফ্যাক্টররে ছাইড়া দ্যান।

'হ্যাঁ। সেটা তো কংগ্রেসের বিপদ। সব জায়গায় কংগ্রেসের গবর্মেন্টি আর এখানেও হতে পারত। ওরা ঠিক মেনে নিতেই পারছে না ওরা গবর্মেন্টে নেই।'

'সেইডা বিপদ না? আমাগ? সিস্টেমডা খাড়াইব ক্যামনে?'

'এই তো সেদিন গবর্মেন্টি হল। তাও তিল কুড়িয়ে বেল। ও সেট্‌ল্ করে যাবে।'

'সেট্‌লডা করব কে—হকসাহেব, না লিগ, না গবর্নর?'

'হ্যাঁ। এটা সিরিয়াস ব্যাপার। গবর্নরও বোধহয় এমনই চান।'

'তাইলে আমাগ বিপদডা বাড়ে না? শিডিউল এমএলএগ তো প্রধান টানডা শিডিউলের দিকে। এদিকে অন্য পার্টির টানাটানি।'

'আপনার মুখে এত পরিষ্কার কথা শুনলে সন্দেহ হয়, উলটো কথাটা আপনি আমাকে দিয়ে বলাতে চান। না, আমারও মনে হয়, কারণ আলাদা-আলাদা হতে পারে কিন্তু শিডিউল মেম্বারদের অনেস্ট অবলিগেশন একটা আছে।'

'ভালা কইছেন। আপনার কাছে আমার অবলিগেশনের অনেস্টি বোঝার কোনো পরীক্ষার যন্তর আছে? মনে-মনেও?'

'সেটা আমার থাকবে কী করে? কথাটা কিন্তু আপনি বললেন—যে এই চাওয়াটায় শিডিউল মেম্বারদের কোনো ফাঁকি নেই।'

'এই কথাডা কিন্তু ভাইব্যাই বলছিল্যাম। অ্যাহন বড়জোর যোগ কইরব্যার চায়—ইফ অ্যালাউড'।

'যোগেনবাবু, এরপরও বলতে হবে—টুবি অনেস্ট, অথবা, টুবি অব স্পেশ্যাল ক্যাটিগরি, আর এটাও তো বলতে চাই কথাটা কিন্তু পুরনো যে ডিপ্রেসড ক্লাসকে অ্যান্টি-ন্যাশন্যালিস্টরা কাজে লাগাচ্ছে। আপনিও তো সেরকমই যেন বলছেন যে আমাদের চাওয়ার অনেস্টি ততদিন খাঁটি থাকবে, যতক্ষণ তেমন থাকতে দেয়া হবে, মানে বাইরের কেউ দেবে, সেটা শাহেবরাও হতে পারে, সেটা স্বদেশীরাও হতে পারে, সেটা আমরা নিজেরাও হতে পারি। আপনি কথাটা শেষ করলেন না।'

'আমি কে শেষ করার, যদি নিজে থেকে শেষ না হয়। ঐ যে শিডিউল ইউনিটি কি রাখতে চাব্যার পারে কেউ, ধরেন, রসিক কাকার মত কেউ, যিনি বিপদের সময় কংগ্রেসে গিছেন আর তাঁর কপালে শুধু জুটেছে গালি। তাঁর কাছে কোন্টা বড়—প্রসন্নদেব রায়কতকে শিডিউল্ড কাস্ট মিনিস্টার বইল্যা মানা। নাকী কংগ্রেসকে শিডিউল্ড কাস্ট সম্পর্কে সচেতন করা?'

'দুটো একসঙ্গে হবে না—মনে করছেন?'

'সব পার্টিই তো শিডিউল কাস্ট মেম্বারদের সম্পর্কে অনেক নরম। গান্ধীও এখন কংগ্রেসের কর্মসূচিতে শিডিউলদের দাবিদাওয়ার জায়গা কইরছেন। কিন্তু পার্টি কি তার মেম্বারদের হুইপ দিবে না? ধরেন, যদি একডা এমন বিষয় ওঠে—যে-বিষয়ে কংগ্রেসের আর শিডিউলগ ইনটারেস্ট আলাদা, তহন আমরা কার কথা শুইনব বা কইলব?'

ভীষ্মদেব দাশ এসে এদের আড্ডা ভেঙে দিল, 'আচ্ছা, ঠাকুর আর মণ্ডল কি অ্যাসেম্বলি ছাড়া কোনো কথা কইছে?' একমাত্র সাক্ষী প্রহ্লাদ, হাসে। 'তোমার পিতৃদায়! আর এখানে খাড়াইয়্যা আইনসভা কইরতেছ?'

'আজ আমার পিতৃদায় কেন হবে? সে তো যখন হয়েছে তখন ওড়াকান্দির বাইরে এক পাও যাইনি, দশদিন হবিষ্যি করেছি। আজ তো মেলা। আজ বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে না?'

'নিশ্চয়ই দেখা হবে। কিন্তু যদি বন্ধু বন্ধুকে দেখলেই ধর্মের ষাঁড়ের মত লেজ তুলে সামনের দুই পা তুলে দিতে চায়—তাহলে লাঠিপেটা করতে হবে।'

যথোচিত হাসির পর যোগেন ভীষ্মদেবের কাঁধে হাত রেখে বলে, 'বাপের জামাই, এই মেলায় তো গানটান হবে। তার লগে লাগাইয়্যা দ্যাও একডা খামার-কীর্তন—'

সকলের হাসির মধ্যে ভীষ্মদেব বলে, 'তোদের বরিশাল-বাকলার সঙ্গে কেউ কি খামারে পারে? দেখিস না? দেখ্, গোপালগঞ্জের সবই কেমন নেতানো, দেখেই বোঝা যায়, এ-দেশে খাড়াইন্যা পুরুষের অভাব।'

'বলব নাকী ডেকে একটু পৌরুষ দেখাতে?' ঠাকুর যোগ করে, 'কাকা, একটা খবর দেয়ার আছে। আমরা বাড়ির সবাই একমত হয়ে এই ঠাকুরবাড়িকে 'গুরুচাঁদ মিশন' করেছি। ওঁর থাকা

আর না-থাকাটার মধ্যে তফাত বিস্তর। উনি উপস্থিত না-থাকলে আশ্রম কি আর আগের মত থাকতে পারে। তার চাইতে 'মিশন' করলে আমরা সব জায়গাতেই কাজ করতে পারব—রামকৃষ্ণ মিশন বা ভারত সেবাশ্রমের মত।'

ভীষ্মদেব বলে, 'তুমি উদাহরণটা দিলা তাই বলি ওদের সঙ্গে যেন শিষ্যা না যায়, অন কমিউন্যাল কোশ্চেন।'

'এ-কথাডা কি অ্যাহন প্রকাশ্যে বলাকওয়া শুরু হওয়া উচিত না জামাই যে নমশূদ্ররা কোনোভাবেই হিন্দুসভা কী মিশন কী সেবাশ্রম কী কংগ্রেসের ফর্মুলায় নিজেদের কমিউন্যাল পজিশন ঠিক কইরবে না। এই জায়গাডা গোলমাল হয়্যা আছে।'

'খুব বেশি আছে? একটু কুয়াশা থাকা তো ভাল। ধর্মের ব্যাপার তো। সবারই নিজের সেন্টিমেন্ট থাকে তাছাড়া, তাত্ত্বিক কথা হিশেবে কেউ বলতে পারে। তুমি বোধহয় অর্গানাইজেশন্যালি বলতে চাও? তাতে কি আমাদের সমাজের সবাই একমত?'

এর মধ্যে একটা হৈচৈ পড়ে যায়। পি আর ঠাকুর বলে, 'ভোগ দেয়া শুরু হল—'

প্রহ্লাদ বলে ওঠে, 'এই যোগেন, চলো, চলো, শেষে জায়গা পাব না—নোর পাইর‍্যা চলো, বিশ্ব জ্যাঠা চলেন। ততক্ষণে মাঠের মধ্যে লাইন দিয়ে লোক বসে যেতে শুরু করেছে—হাতে কলাপাতা আর মাটির খুড়ি নিয়ে। যে-জায়গাটাকে লক্ষ করে প্রহ্লাদ, ভীষ্মদেব আর যোগেন ছুটছিলই প্রায়, তার কাছাকাছি হতেই প্রহ্লাদ চেঁচিয়ে ওঠে, 'কাম সাইরছে। তোমাগো লেকচার মারাইতে গিয়া তো কলাপাতা-খুড়ি সংগ্রহ হয় নাই।'

যোগেন বলে ওঠে, 'আপনারা বইস্যা পড়েন, আমার জায়গাডা রাইখবেন, আমি পাতাখুড়ি আইনতেছি।'

আরো অনেকের সঙ্গে যোগেনও দৌড়য়। কোঁচার কাপড়টা আর জুতোটায় জড়িয়ে পড়ছিল বলে যোগেন একহাতে কাপড়টাই তুলে নেয় হাঁটুর কাছে। দৌড়তে গিয়ে যোগেন দেখে, সে যতটা দ্রুত দৌড়য় বলে তার ধারণা, কিছুতেই সেই বেগটা পাচ্ছে না। তারপর, জোর দিয়ে চেষ্টা করতে গিয়ে বোঝে জুতোটা বাধা হচ্ছে। যোগেন মুখে যদিও বলেনি, মনে মনে কয়েকবার 'শালা জুতামারানি' বলে রাগ জানালেও জুতোটা কিন্তু পা থেকে খুলে ছুঁড়ে দেয়নি—দামের হিশেবটা তার খেয়াল ছিল। সে-খেয়ালে এটাও ছিল যে কোর্টে যাওয়ার জন্য প্যান্টকোটের সঙ্গে পরার বুটজুতোটা এখন ব্যবহারই করা হয় না।

কলাপাতাগুলো পাঁজা করা ছিল না—গোটা পাতা ডাঁই করা ছিল। নিজেদের সাইজ করে নিতে হবে। যোগেন টান দিয়ে পাতা বের করে কিন্তু কাটবে কী করে? যোগেন টেনেছিল একটা মোটা ডাঁটের দু-পাতি পাতা। সে সেটা ডাঁইয়ে ফেলে, একটা সরু ডাঁটের একপাতি পাতা টানে, যেন তার ফলে সাইজ করার চাকু বা দা তার হাতে এসে যাবে। যোগেন একটা বাঁশের বাতার চাঁচ চেগার থেকে একটা টেনে ভেঙে দুটো দুই-হাতে নিয়ে খাওয়ার জায়গার দিকে দৌড়তে গিয়ে দেখে আবার সেই কোঁচা-জুতোয় জড়িয়ে যাচ্ছে। 'শালা, য্যান মারানশিলা নিয়্যা যাত্যাছি,' নিজেকে এই গালটা দিয়ে সে বাতাধরা হাতটি দিয়ে কোঁচা টেনে তোলে। 'এর মইধ্যে প্রহ্লাদদা একপাক ঘুইর‍্যা গ্যাল না কী?'

ওড়াকান্দির স্নানযাত্রার মেলায় নিয়ম—কেউ কারো কাজ করে দেবে না। 'বেগাড় নাই।' কেউ কারো জন্যে প্রসাদ এনে দিলে কিংবা পাতা এনে দিলে কিংবা জল এনে দিলে কিংবা পাতা কুড়িয়ে নিলে ঠাকুরের অসম্মান হয়। গুরুচাঁদের বাণী আছে—সারা বচ্ছর বেগাড় দেই/একডা দিন শোধ নেই। এখানে স্নানযাত্রার মেলায় গড়াতে গড়াতে আসা বুড়িও কারো

হাত থেকে জল নেয় না, মেলায়।

যোগেন এইসব নমশূদ্র ধর্মীয় গুরু গিরিটিরির ধারেকাছে নেই। সে যে নিজে হাতে পাতা আনতে ছোটে, সেটা একটা যৌথ-আচারের প্রতি অচেতন আনুগত্য। সে-আচারে এটুকু ভেজাল তো ঢুকেইছে যে দু-জন জায়গা রাখল তিনজনের জন্য, বা একজন পাতা আনল তিনজনের। বা, তারা পাতাকাটা শুরু করার আগেই নোস্তা শেখ এসে বলে, 'এ-ই, পেল্লাদ, এডডু হোগা গুটাইয়্যা সর্', মানে উনি লাইন টপকে এখানে এদের মধ্যেই বসবেন। ওরা নোস্তা শেখকেও পাতা এগিয়ে দেয়। নোস্তা শেখ সেটা উলটো করে পাতে।

গলা খিচুড়ির একটা বিশাল হাঁড়ি কয়েকজন মিলে টেনে এনে রাখে। তার ভিতরে নারকেলের অর্ধেক মালই একটা হাতার মত লাঠি দিয়ে গাঁথা। সেই হাতায় নিজেকে প্রসাদ পরিবেষণ করতে হয়। কলাপাতায় আর গলা খিঁচুড়ি কতটুকু আঁটবে? বেশি নিলে তো আবার গড়িয়ে পড়ে। পড়েও। কম নিলে তো আবার পেট ভরে না। যতক্ষণ প্রসাদ খাওয়া চলে, ততক্ষণ বেশিরভাগই সেই ডেকচি ঘিরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে খায় আর মাঝেমধ্যে হাতা ডুবিয়ে খিচুড়ি তোলে পাতে।

যোগেনের কবিগান শেখশুদ্দুর মিলন

৬৭

বিলের মানুষ যদি সমাজ পায়, মহোচ্ছব পায়, সে একটুও ছাড়ে না। এদের মধ্যে টাকাপয়সার ব্যবধান, কম হলেও, তো আছে। মহোচ্ছবে সেসব মাটির ডেলার মত ভেঙে শুকিয়ে ঝরে যায়। জমির খাজনাদার আর গতরদার পাশাপাশি, বসে বা দাঁড়িয়ে হাপুসহুপুস মহাপ্রসাদ খেতে থাকে, বারবার নেয় সেই নারকেলের মালাই ডুবিয়ে, আর শপ শপ আওয়াজ তুলে খেতে যায়, যেন, খেয়ে না-নিলে ফুরিয়ে যাবে, বা এমন মহোচ্ছব ভেঙেও যেতে পারে, বা কেড়েও নিতে পারে কেউ। সেই একরকম ভয়, এতগুলি মানুষের সঙ্গে মিলে হাত পুড়িয়ে, জিভ পুড়িয়ে প্রসাদ-খাওয়ায় উৎসবটাকে এতটা তাতিয়ে দেয়। সেই তাপে বছরের বাকি সব দিনগুলির একাকিত্বও কেটে যায়।

যেখানে খাওয়া হচ্ছিল, সেখানেই কোনো এক সময় গানবাজনা শুরু হয়ে যায়। তেমন ব্যবস্থা করা থাকে বা তেমনই হয়ে আসে—এমন কোনো কারণে না। সে হয়ত কোনো-কোনো বছর ঢাকা থেকে কোনো নাট্যকোম্পানি আসে, সেসব হয় সন্ধের পর। এবার গুরুদশার বছর বলে তেমন দল আসেনি। না-এলেও হ্যাজাক-ডেলাইট জ্বলবেই। কিন্তু জ্বলার আগেই এই মাঠে কত-যে গান শুরু হয়ে যায়, জমে যায়, ভেঙে যায়। দুটো-একটা গান তো সকলের জানা। তাদের ধরে-ধরে এনে গাওয়ানো হয়। তারপর সে যখন আর কিছুতেই থামে না তখন আবার জোর করে থামাতেও হয়। এই গানের আসরগুলোতে যেসব গান কোনো-এক সময় খুব চলত, সেসব গান শোনা যায়। গায়করা গোপনে কোনো একটা গান জোগাড় করে রাখে হয়ত—প্রথম গায় এই মেলায়। খুব নামডাক যাদের তেমন কবিরা অনেকে আসে—বিজয়কৃষ্ণ সরকার, নিশ্চিন্ত সরকার, রাজেন সরকার, নকুল দত্ত, হরিবর সরকার, মহিমাচরণ সরকার। এবার রাজেন সরকার, নিশিকান্ত, বিজয় সরকার কলকাতার বিড়ন্ স্ট্রিটে থেকে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কাজি নজরুল

ইসলাম এঁদের সাহায্যে কবিগানের প্রচারের কাজে ব্যস্ত বলে আসতে পারেননি।

কাছাকাছির এক আসরে এক বাবড়িওয়ালা চ্যাংড়া গান গাইছিল—'পোষা পাকি উড়ে যাবে সজনি।' শুরু শুনেই প্রহ্লাদ বলে উঠল, 'আর রে! বড় মরমি গান-খান ধইরছে রে। কেডারে পোলা?'

তখন গায়ক গাইছে, 'আগে তো ভাবি নাই জীবনে।'

প্রহ্লাদ রেগে ওঠে, 'দিল কাঁচাইয়া। আরে এতো বিজয় সরকারের গান, ওর প্রথম বৌ গত হওয়ার পর লেখা। লোকের গলায়-গলায় ফিরত। তুমি তো জানো, যোগেন?'

তখন গায়ক আবারও গাইছে, 'পোষা পাখি উড়ে যাবে সজনি/আগে তো ভাবি নাই জীবনে।'

'দিল গানটারে খুন কইরা। পদ মুখস্ত করে নাই? 'সজনি'র সঙ্গে কি 'জীবনে' মেলে?' প্রহ্লাদ গুনগুনিয়ে শুদ্ধ স্বরটা গায়, 'আগে তো জীবনে ভাবি নি', 'সজনি—ভাবিনি।'

যোগেন বলে, 'যাও-না, গাইয়্যা দ্যাও।'

মাঠের যেখানে বসে ওরা গান শুনছিল, সেখানে আরো অনেকে ছিল। এক রোগা লম্বা বৌ উঠে গটগটিয়ে গায়কের কাছে গিয়ে বলে, 'আর গাইব্যার কাম নাই। পদ ভুইজা তো উঠো।'

'আমি বুইঝছি তা। এইবার ঠিক হব,' বলে সে আবার গেয়ে ওঠে একটু তাড়াহুড়ো করে 'পোষা পাখি উড়ে যাবে সজনি'—এই প্রথম লাইনটা। তারপর একটু হেসে তাল রেখে—'আগে তো ভাবিনি জীবনী।'

এরপর আর উঠে না গিয়ে সে কী করে?

কোথা থেকে একটা মেয়ের তীক্ষ্ম গলা শোনা যায় আচমকা, 'আমার দ্যাহ রাজ্য হইল পরাধীন।' যেদিক থেকে গানটা উড়ে আসছিল সেই দিকের আকাশে সবাই তাকায়। সবাই কান খাড়া থাকে সুরটা আবার ফিরে আসার অপেক্ষায়। কিন্তু হল না। গানটা বোধহয় শুরু হয়েছিল, এখানে যখন 'ভারি নি জীবনী' এইসব নিয়ে কেরামতি চলছিল।

চারদিকে যে এই নানারকমের সুর-বেসুরের হাওয়া উঠছিল, তাতেই যোগেনও গুনগুনিয়ে ওঠে।

এমন সময় একেবারে যাত্রার কনসার্ট বাজিয়ে বৈরাগী এসে তার দলবল নিয়ে গাইতে থাকে—

যত নমশূদ্রে ভাব সমুদ্রে করে সন্তরণ

যোগেন খুব হেসে উঠে, নিজের হাসি হাতের তেলো দিয়ে ঠেকায়। প্রহ্লাদকে বলে, 'আরে, হারামজাদা তো নাচেও দেহি। আবার দ্যাহো ধুয়ার জন্য পোলাপান জুটাইছে কত।' সেই ধুয়োর দল তখন একসঙ্গে গাইছিল 'করে সন্তরণ'। সঙ্গে বাজে একটা ছোট ঢোল আর কাঁশি।

'কও কি যোগেন। ওর ঠিকঠিকানা নিয়া রাইখো। ও তো কইলকাতায় প্যাকটিস করে। তোমার আবার কবে কোন্ লাটশাহেবরে ফরিদপুরের কবি শোনাইবার ডাক আসে।'

'হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ সূর্যচন্দ্রে করেন বিচরণ'

ধুয়োরা গেয়ে ওঠে, 'করেন বিচরণ।'

যোগেন জিজ্ঞসা করে, 'কইলকাতায় হরিচাঁদ গুরুচাঁদ গায়? শোনে কেডা?'

'আরে, মেলায় আইছে, হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ না গাইলে চলে? কইলকাতার গান আলাদা।'

'না, প্রহ্লাদদা, তা না। কইলকাতায় ভক্ত নাই? তারা শোনে। আর যারা নাম শোনে নাই, তারা ভাইব্যা ন্যায় কিছু।'

'ও তো থাহে মুসলমান পাড়ায়। বেবাকই মুসলমান। বই বান্ধায়। মুসলমানগ মইধ্যে যশোর-খুলনার মানুষ অনেক। তারা তো হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ জানে। তারাও আবার বৈরাগীরে তাগ গুরুসাঁইয়ের গল্প কয়। বৈরাগী তাই নিয়্যাও তো গান বান্ধে।'

'শুইনছি। সেইগুলা আরো ভাল গান। আমি গ্যান শুইনছিল্যাম লায়লা-মজনু। সেইগুল্যা গাউক-না!'

'হ্যাঁ? আইছে ওড়াকান্দির স্নানযাত্রা আর নমবিজয় যাত্রায় আর গাইব লায়লা-মজনু?'

তখন ধুয়োরা গাইছে, 'করেন রক্ষণ।'

'খাড়াও। হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ বন্দন দিয়্যা শুরু কইরছে। এইবারই 'নমবিজয়ে' ঢুইকবে, পদ্মবিলা নিয়া?'

'আরে শুইনছি দাদা। সেই মুসলমানগো ছেরাদ্দ।'

'তাইলে পরে শুইনছ! তুমি তো তহন কলেজে। না?'

'কলেজেই যাই আর যেহানেই যাই, আমি তো তহনো, নম, অ্যাহনো নম। আমার উপায় আছে নি নমবিজয় না-শোনার?'

'তোমার তো পছন্দ হয় নাই?'

'কীসের কথা জিগান?'

'ঐ গানডার কথা—'

'গানের আবার পছন্দ-অপছন্দ কী? ভালই। যুদ্ধ-যুদ্ধ ভাব উঠে। সেইডা তো অনেক কালের ঘটনা। না? তোমারও তহন বয়স হয় নাই—'

'তা হইব না ক্যা? তবে ঘটনাডা তো পুরনাই। ধরো গনতিতে খাড়াইব, হ্যাঁ বছর পনের আগে শুরু আর বছর এগার-বার আগে সমাপন, 'সংখ্যাদুটি বলার সময় প্রহ্লাদকে কর গুণতে হয়।

ধুয়োরা তখন গাইছে, 'করি সমাপন।'

'কতকগুল্যান মিথ্যা-মিথ্যা কথা সাজাইয়্যা নমবিজয় গীত বানাইছে।'

'সব মিছা কথা নি? য্যান তহন শুইনছিলামও'।

'গীত বানাইলে মিছা হব না? গীতের তালবাদ্যি আছে, নর্তক-কুর্দন আছে, হুংকারটুংকার আছে। এইগুলা না হইলে গীত হয়? এগুলা মিছা ছাড়া সত্যি হয়? চারচায়ড্যা বছর ধইর‍্যা কুনো কাইজ্যা হবার দেখছ নি? তাই আবার বছরে একদিন কইব। সেডারে দাঙ্গা কয় কেডা? চাইরড্যা বছরে দশটা কাইজ্যাও হবার পারে প্রহ্লাদদা কিন্তু একটা কাইজা চাইর বছর ধইর‍্যা চইলব্যার পারে না—জমিদারে-জমিদারে দখলের কাইজ্যা ছাড়া।'

ততক্ষণে বৈরাগীর ঢোল-কাঁশি খুব জোরে-জোরে বেজে উঠেছে। যুদ্ধের একটা আবহাওয়া যেন তৈরি হচ্ছে। সেই ভূমিকাটুকু শেষ হলে বৈরাগী লাফ দিয়ে সামনে এসে দুই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে, দুই হাত জড়ো করে, পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণে নমস্কার করে হঠাৎ লাফিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

ঢোলের একটা বড় আওয়াজের সঙ্গে দূর আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বৈরাগী গেয়ে ওঠে—

ঐ দেখো ঐ দেখো ছুটে মুসলমানেরা

প্রায় সকলেই তার অঙ্গুলিনির্দেশে আকাশের সেই কোণে তাকায়।

ভাদ্রমাসী গঙ্গা হেন স্রোত দিশাহারা।

দর্শক-শ্রোতাদের দৃষ্টি তার স্বর ফিরে এলে বৈরাগী গায়,

আল্লা হো আকবর বলি ছাড়িল জিগির।
কত মত দাড়ি নিয়া করিল ফিকির।

যারা শুনছিল তারা কেউ-কেউ হয়ত পরের ঘটনাগুলি মনে করতে পেরে আগেই হেসে উঠছিল। বৈরাগী গায়,

পশ্চিমে সূর্যের অস্ত সে মুখে নমাজ।
যত করে মুসলমান সকলি অকাজ॥
লুঙ্গিতে ঢাকি রাকি সুন্নত ধন।
ঐ মুসলমান আসে শূদ্র করিতে নিধন॥

ঢোল-কাঁশির বাজনার তালটা সামান্য একটু বদলায়।

অনিবার্য মৃত্যুর কোলে পড়িতে ঝাঁপায়ে।
বীরমূর্তি নমশূদ্র রয়েছে দাঁড়ায়ে॥
নমশূদ্র পক্ষে বীর অনন্ত সর্দার।
পরানপুরেতে আসি বান্ধিয়াছে ঘর॥
কুমারিয়া, লক্ষ্মীপুরা, পদ্মবিলা বাসী।
শূদ্র প্রধান যত উপস্থিত আসি॥
গুরুচাঁদ আগুয়ান—সম্মুখ সমরে।
মুসলমানে নির্বংশ করিবার তরে॥

দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যে মুসলমান গৃহস্থ, মেয়েরা, বাচ্চারা আছে। তারাও এই গান শুনে আনন্দ পাচ্ছে, হাসছে, এলোমেলো হাততালিও দিচ্ছে। তারা এটাকে শুধুই একটা গান বলে শুনছে, দেখছে। এরকম গানে দুই পক্ষ না-হলে গানটা হবে কী করে?' হিন্দু মুসলমান গানের দুই পক্ষ।

যোগেন গানটাকে গান বলে নিতেই পারছিল না।

নমশূদ্রকে হিন্দু করে মুসলমানের সঙ্গে লড়িয়ে দেয়া কী করে গান হয়? তাহলে যা প্রতিদিন, অষ্টপ্রহর, নিত্যি, চব্বিশ ঘণ্টা ঘটে সেটা নিয়ে দুই পক্ষ হয় না কেন। থানায় রোজ যে এফআইআর হয়, যে-কোনো থানায়, তার দশটার মধ্যে সাতটা তো ভাগচাষী রায়ত, সে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, তার বিরুদ্ধে কিছু জমিদারের এজাহার। এজাহার পড়লেই বোঝা যায়—রায়তকে অন্তত কিছুদিনের জন্য জেল-কাস্টডিতে রাখা জমিদারের পক্ষে নিতান্ত দরকার। কেন? যে-কোনো উদ্দেশ্যই একইরকম তুচ্ছ। হয়ত রায়তের অধীনস্থ পুকুরের মাছের জন্য জমিদার কোনো জাইল্যা-পাইকারের কাছ থেকে টাকা জমা নিয়ে নিয়েছে। রায়ত দু-দিনের জন্য চোখের আড়াল হলে, জালিয়া, দু-তিন রাতেই পুকুর খালি করে দিতে পারবে। বা, রায়তবাড়ি কোনো মেয়েকে বাড়ির কাজে বহাল করতে চায় জমিদার, যাতে মেয়েটিকে চোখের সামনে যখনতখন এলোমেলো দেখতে পারে জমিদারবাবু। রায়ত দুদিন চোখের বাইরে না-গেলে জমিদার কী করে বলে, 'আর দিনকাল খারাপ, কোনোদিন ডাকাইতি কইর‍্যা নিয়্যা যাবে মেয়েডারে। আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিস—যে-কয়দিন রায়ত না খালাস হয়।' দশটা এজাহারের মধ্যে সাতটাই এই। আরো খানদুই পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে সেই মেয়েছেলে নিয়ে—হতে পারে কোনো মার্ডারের ইতিহাস পাকানো। তার, দশটা এফআইআর-এর মধ্যে একটা হয়ত আইনসঙ্গত অভিযোগ। তাও কে কোন্ জমি চাষ করছে কয় পুরুষ আর সে জমির জন্য খাজনা জমা দিচ্ছে

কোনো জমিদার কয় পুরুষ—তাতেই ঠাসা। গানের জন্য এই দুই পক্ষ, জমিদার আর চাষি, কেন চোখে পড়ে না, অথচ বারবারই চোখে পড়ে হিন্দু-মুসলমান। এই গানটা, এই বৈরাগীর গানটা তৈরি হয়েছিল পদ্মবিলা দাঙ্গার সময় হিন্দুগ গরম করার জন্য। তারপরে না-হয় সকলেই এখন হিন্দু-মুসলমান ভুলে গেছে—'আরে, গানে একটু রস নাইলে চলে?' দু-চার বছর পরে এমন একটা দিন আবারও আসতে পারে, যেদিন মুসলমানরা আর এই গানটাকে গান না-ভেবে, মুসলিম বিরোধী প্রচারই ভাববে। নমশূদ্র আর মুসলমান নিয়ে তো কত পিরিতি আর ছাড়াছাড়ির গান।

যোগেন উঠে দাঁড়ায়। আওয়াজ করে হাই তুলে, দু-দিকে দু-হাত ছড়িয়ে আড় ভাঙে। দু-এক পা হেঁটে একটুখানি সরে যায়। এদিক-ওদিক তাকায়। বৈরাগী তখন ঢোল-কাঁশি পিটিয়ে যুদ্ধ করে দিয়েছে

কত কত হাজি
কত কত কাজি
ধাইল ছাড়ি নমাজে
বড় বড় দাড়ি
চামের ঝাড়ি
গোঁফ উঠে শির
নমশূদ্রের গুরু
গুরুচাঁদ গুরু
সমরে যখন নিধিতেছে।

যারা শুনছে তাদের ভাল লাগছে—বাচ্চা বা বুড়োবুড়িরা হাসছে বেশ জোরে। মাঝারি ভারী গলায় বাহবাও শোনা যায়। বৈরাগীর এখানেই সবচেয়ে বেশি ভিড়। এতদিন ধরে গানটার তারিফ চলছে কিন্তু বৈরাগী ছাড়া তো কেউ গানটার লেজামুন্ডু জানে না। তারা এই গানের টুকরোটাকরা গায়।

যোগেন পায়ে-পায়ে গিয়ে দাঁড়ায় বৈরাগীর পাশে। বৈরাগী মাটি ছুঁয়ে নমস্কার করে ঘুরে ঢোলওয়ালার গলা থেকে ঝোলানো ঢোলটা খুলে এনে যোগেনকে পরিয়ে দেয়। যোগেন, ঢোলে টোকা দিয়ে চারদিকে তাকিয়ে চোখদুটো ঢোলে ফিরিয়ে এনে কিছু জিজ্ঞাসা করে বৈরাগীকে। বৈরাগী হেসে সম্মতি দেয়।

ঢোলটা যোগেনের টোকায় জোরে বেজে উঠতেই যোগেন বেশ উঁচু গলায় গানের সুরে বৈরাগীকে জিজ্ঞাসা করে।

প্রশ্ন যোগেন
পদ্মবিলায় যাবৎ যবন যদি নিধনই করিলা।
তাইলে এত মজুত যবন কোথাথিক্যা পাইলা॥

হাসির সঙ্গে হাততালি ও গলার আওয়াজে শ্রোতারা তাদের সমর্থন জানিয়ে দেয়। তারা বুঝে গেছে ধাঁধা খেলা শুরু হল। প্রাথমিক এইসব প্রস্তাবন-গ্রহণে একটু সময় গেল। সেই সময়টুকু বৈরাগী উত্তরটা ভেবে নিয়েছে। যোগেন মণ্ডল নিশ্চয়ই তার কাছা খুলে জব্দ করতে চায় না। বৈরাগীর তো রাজি না-হয়ে কোনো উপায়ই ছিল না। মণ্ডলমশায় তার সঙ্গে তরজায় নেমেছে, এ তো বৈরাগীর পক্ষে সৌভাগ্য। সে গলাটা তুলে বেশ ভাল করেই জবাব দেয়।

উত্তর বৈরাগী

এক মরদে চাইর বিবি ফরজ যদি হয়।
একই দিনে চাইর সুরতে চাইর পোয়াতি হয়॥

যোগেন হেসে ফেলে। যোগেন উঠে এসেছে তো পালটা-করি গাইতো। বৈরাগী তাকে যেন না টেনে রাখে। ঢোল আর-একটু সরব হয়,

প্রশ্ন যোগেন

এ তো বিবি চাইরজন, এক আঙুলে গনা,
এক কেষ্ঠ ঠাকুরের পত্নী সাতাইশ হাজার জনা।
বৌ গুইন্যা শ্যাষ হব হিন্দু-শেখ মানা?

যোগেন ঢোলে বাঁ-হাতে একটা উঁচু শব্দ তুলে জিজ্ঞাসা করে, 'হিন্দু কয় কারে?'

উত্তর বৈরাগী

বেদ-ধর্ম মাইন্যা যারা চলে এ-সংসারে।

প্রশ্ন যোগেন

মাইন্‌তে চাহিলেও কাগো তেমন মানা অপরাধ?

উত্তর বৈরাগী

শুদ্দুর আর যবন হইল বেদ থিক্যা বাদ।

প্রশ্ন যোগেন

শূদ্র আর শ্যাখ তাইলে আত্মীয় দাঁড়ায়?

উত্তর বৈরাগী

ক্যামনে আত্মীয়তার সম্বন্ধ-বন্ধন?

প্রশ্ন যোগেন

প্রকৃতি-পুরুষে যেমন সন্তান ধারণ।

যোগেন

শ্রীরামচন্দ্রের কী হন শ্রীমান লক্ষ্মণ?

বৈরাগী

এক গর্ভ হইতে এক যমজ যেমন।

যোগেন

রাম ও লক্ষ্মণ কিন্তু সাতাইল্যা ভাই।

বৈমাত্রেয় দুই ভাই তাতে সন্দ নাই॥

বৈরাগী
সত্যাইল্যা হইয়াও সহোদর আমি।

যোগেন
সাতাইটাও তাইলে তোর গায়ে।

প্রাণাধিক
তেমনি প্রাণাধি হেয় শুদ্দুর মুসলমান।

শেখ আর শুদ্দুরের একই দুশমন॥
বামুন-কায়েত-বৈদ্য উচ্চ হিন্দুগণ।
পদ্মবিলায় কুনো কালে কাইজ্যা হয় না॥
কাইজ্যার গল্প-গান সব মিথ্যা রটনা॥

তরজা শেষ। বৈরাগী এসে যোগেনের হাঁটু ছুঁয়ে সেবা দেয়। যোগেন তাকে বলে, 'যাইয়ো না। খাড়াও।'

ঢোলটা বাজাতে-বাজাতে ভিড়ের নড়াচড়া দেখে যোগেন বোঝে—তরজার শেষ বলতে দেখতে-শুনতে-বুঝতে এদের যে-ধারণা—তার সঙ্গে এই শেষ-হওয়াটা মেলে না। শেষে একটা গৌরগান গাইলে হত। পদ তৈরি করতে-করতে যোগেনের খেয়াল ছিল না। অন্য তরজায় তো এই খেয়ালের দরকার পড়ে না। পদের পর পদই গৌরপদে পৌঁছে দেয়। যোগেন যে এতদূর পর্যন্ত বলে ফেলবে, বামুন-কায়েত-বৈদ্যরাই হচ্ছে শূদ্র-মুসলমানের একমাত্র শত্রু, সে নিজে অতটা প্রস্তুতি ছিল না। পদ তৈরির বাধ্যতায় ঐ কথাটি অত সরল হয়ে তার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল। তার আর উপায় ছিল না। শেষ কথাটি না বলে, 'পদ্মবিল্যায় কোনোকালে কাইজ্যা হয় নাই।'

এই এত লোকজন স্নানযাত্রায় ওড়াকান্দির মেলায় এসেছে। সেই মেলার সঙ্গে 'নমশূদ্র বিজয়' যোগ করে মেলাটাকে আত্মসাৎ করা তার কোনো দিনই পছন্দ না আর আইনসভা থেকেই খুব আবছা এই একটা ধারণা তার মাথায় ঢুকেছে—হিন্দু-মুসলমান কাইজ্যায় নমশূদ্র বা শিডিউল্ড কাস্টরা কেন হিন্দুপক্ষ হবে? এই গান বানাতে-বানাতে সেই আবছাটা কেটে গেল তার।

তার আবছা কেটে গেলেও, সে বুঝল, ভিড়ের কাছে আবছা হয়ে গেল। ভিড়টাকে যোগেন কি একটু উদ্বিগ্ন করে ফেলল? তেমন উদ্বেগ তৈরি না করে কি যোগেন তার কথা বলতে পারত? যোগেন চাইল—এই ভিড়টাকে তার অভ্যস্ত ও প্রত্যাশিত আনন্দে ফিরিয়ে নিতে। বৈরাগীকে সে বলে, 'গলা দ্যাও।' তারপর ঢোলে দুই নরম টোকা দিয়ে নরম করে গেয়ে উঠল—'তিলেক দাঁড়াও শ্যাম রায়।' ভিড়টা একসঙ্গে আঃ বলে শ্বাস ফেলল। দু-একজন দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তারা ধপধপ করে বসে পড়ে। সকলের প্রাণের গান।

কোন্ রন্ধ্রে পুরে বাঁশি কুলবতীর মন
কোন্ রন্ধ্রে পুরে বাঁশি রাধায় কর উদাসিনী
সাক্ষাতে বাজাও, শুনি। আমার মাথা খাও।

বন্দীমুক্তি আন্দোলনে যোগেন পথ পায় না

৬৮

নোটিশে লেখাই ছিল—২৯ জুলাই গভর্নর বেলা দুটোতে আইনপরিষদ ও আইনসভার সম্মিলিত অধিবেশনে তাঁর ভাষণ দেবেন ও সদস্যদের নিশ্চয়ই পনের মিনিট আগে নিজেদের আসনে বসতে হবে, কারণ একটা পঁয়তাল্লিশের পর হলে কাউকে ঢুকতে দেয়া হবে না। যোগেন এসে গিয়েছিল দেড়টার আগেই। সাধারণত যোগেন বাড়ির সামনে থেকে ট্রামে কার্জন পার্কে নেমে হেঁটে আইনসভায় আসে। কাল শেষ রাত থেকে শ্রাবণের ঢল নেমেছে, মাঝে-মাঝে থেমে-থেমে। যখনই নামছে তখন একেবারে আকাশ উপুড় করে নামছে। ফলে, ছাতা নিয়েই বেরতে হল। ঠনঠনেতে বেশি জল জমে গেলে ট্রাম চলবে না—এ-ভয়ও ছিল। ভায়া বৌবাজার-ডালহৌসি একটা ট্রাম এসে গেলে যোগেন সেটাতেই উঠে পড়ে। ছাতা নিয়ে বাসে উঠতে হলে নিজেও ভিজতে হয়, অন্যকেও ভেজানো হয়। যোগেনের ধারণা হয়েছে, পাঞ্জাবি কনডাকটাররা ছাতাওয়ালা লোক দেখলে বৃষ্টির মধ্যে বাস থামায় না। ট্রাম সেদিক থেকে অত্যন্ত ভদ্র। পাদানির চওড়া জায়গায় দাঁড়িয়ে নির্বিঘ্নে ছাতা বন্ধ করা যায়।

বৌবাজারে ডানদিকে ঘুরতেই মনে হল বৃষ্টিটা ধরে এসেছে। যোগেনের ল-কলেজ ধরলে তো কলকাতায় টানা থাকা তো প্রায় বছর সাতেক। তাকে হেঁটেই ঘুরতে হত, ট্রাম বা বাসে চড়ার পয়সা ছিল না। নানারকম ঠিকে কাজ—টিউশনি, প্রুফ দেখা, নোটবই লেখা, শেয়ালদা কোর্টের বাইরে বসে নানারকমের দরখাস্ত লেখা—তাকে সারা শহর হেঁটে-হেঁটে করতে হত। দক্ষিণে কালীঘাট-ভবানীপুর আর উত্তরে আলমবাজার-বরানগর। শহরটাকে সে তাই তন্নতন্ন চেনে। বরং হাঁটলেই তার সুবিধে লাগে। মনে হয়, এ-গলি ও-গলি দিয়ে নিজের মত শর্ট কাট করে নিতে পারত। কলকাতার যেটাকে সে জুত করতে পারেনি, সেটা হল বর্ষা। বরিশালের ছেলে সে। বরিশালে যদি কেউ বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচানোর চেষ্টা করে, তাহলে তাকে খেপানো হয়—'এই এই এই চ্যাংড়া, তোর একখান পাও যে ভিজ্যা গেল।'

যোগেনের বাড়ির অবস্থা যা, তাতে ছাতা কেনার কথাই ওঠে না। যদি পয়সা জোগাড় করা যেত, তাহলেও সম্ভব ছিল না। হালুয়া নমশূদ্রের বাড়ি, হালের জমির কোনো নিশ্চয়তা নেই, সে যাবে মাথার ওপর ছাতা মেলে? মৈস্তারকান্দিতে কোনো জমিদার-ইজারাদারের বাড়ি ছিল না। থাকলেও মৈস্তারকান্দিতে ছাতামাথায় হাঁটার কোনো রাস্তা নেই। বেবাক খাল। নৌকোতে যাও[illegible] কেউ ছাতা মাথায় রোদজল ঠেকাবে? দেশে কি

বামুন-কায়েত সৈয়দ-আসরফ উঠে গেল? নমরাও মাথায় ছাতা দেবে? ছাতায় মাথা ঢাকে এক বাবুরা আর সৈয়দরা—বার মাস তিরিশ দিন।

বরিশালে যোগেনের কখনো মনেই আসে না—বৃষ্টির জন্য ছাতা দরকার। ছোটবেলায় তো অত বড় আকাশের কোথায় মেঘ ভাঙছে দেখে আর এক গাঁয়ে পৌঁছুনোর জন্য দৌড়ত—বৃষ্টিকে হারাতে। বৃষ্টি তাকে ধরার আগে সে পৌঁছে যাবে। বেশি বয়সে দৌড়ত না বটে কিন্তু আকাশে একটু চোখ বোলালেই বর্ষবাদল বুঝে ফেলত। বৃষ্টির জন্য কোথাও আটকে পড়া যায় না কী?

কলকাতায় বৃষ্টির জন্য আটকা পড়তে হয় কেন—এটা যোগেনকে বিরক্তি করত বটে, তবে, সে খুব একটা ভাবেনি এই নিয়ে, কারণ, ছাতা থাকলেই তাকে আটকে পড়তে হত না—এই সহজ সমাধানটাই তার মাথা জুড়ে ছিল। তবু, বাড়ি থেকে বেরল শুকনো, বেলেঘাটায় দেখে ঝড়বৃষ্টি। শহরের আবহাওয়ার এমন অনিশ্চতা থেকেই যোগেন এক সময় বুঝে যায়—কলকাতা বড় শহর বলে কোথাও রোদ, কোথাও জল হয়—এমন হয় না। কলকাতার আকাশটা বরিশালের মত বড় না। তাই রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ের আন্দাজ আসে না।

ডালহৌসি স্কোয়্যারের পুব-দক্ষিণ কোণে নামার জন্য যোগেন ব্যাগ আর ছাতা হাতে পাদানি পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়েছিল। তার আগে দু-জন আর তার দু-হাত আটকা। ট্র্যামটা পুরো না-থামলে তার পক্ষে নামা সম্ভব নয়। তার সামনে যারা ছিল তার চলন্ত ট্র্যাম থেকেই টুপটাপ নেমে গেল। যোগেনকে খাড়া থাকতে হয়, র‍্যাংকিনের উলটো ফুটে ঘোড়ার-জিন তৈরির বিরাট দোকানটার স্টপের জন্য।

বেশ হেলেদুলেই রাস্তা পেরল যোগেন, এক হাতে ছাতা ও আর-এক হাতে তার পোর্টফোলিয়োটা ঝুলিয়ে। তার উলটোদিক থেকে অসমবয়সী দুই মেমশাহেব আসছিলেন। মেমশায়েবদের বয়স বোঝার বিশেষ উপায় যোগেনর জানা নেই কারণ তেমন বিশেষ সুযোগই তার কখনো ঘটেনি। কিন্তু এদের বয়সের পার্থক্য বুঝতে কোনো পারদর্শিতা দরকার ছিল না। একটা বেশ বড় ছাতার নীচে দু-জন হেঁটে আসছে। ছাতাটা রঙিন বলেই মেঘলা আকাশের নীচে ছবির মত লাগছিল। যোগেন যখন তাদের ক্রস করল, দুজনই খুব জোরে হেসে উঠল। যোগেন ঘাড় ঘুরিয়ে একবার দেখে, যেন সেভাবে দেখা যায়, মেমশাহেবরা তাকে দেখেই হাসল কী না। তবে, হেসেই তো থাকে—এমন ফাঁকা রাস্তায়, অকৃষ্ঠসংরম্ভ মেঘের তলায়, রঙিন ছাতার ঢাকনিতে, যদি এক কালো, মোটা, একটু লম্বা বাঙালিবাবুকে এক হাতে ছাতা ও আর-এক হাতে পোর্টফোলিয়ো নিয়ে হেলতে-হেলতে দুলতে-দুলতে এগতে দেখেও যদি তারা না হাসে, তাহলে—এইসবই তো বৃথা। তবে ওরা এমন হাসে, প্রায় মুখের ওপরেই হাসে, যদি রাস্তায় খুব ভিড় না থাকে। এমন কী, তার ছাত্রজীবনে যখন টিউশনি করতে যেত, তখন পামার-বাজারের ঐ সব মিস্তিরি গোছের শাহেব মেমরাও হাসত, দু-হাতই ছাতা ও পোর্টফোলিয়োতে আটক না-থাকলেও হাসে, হেলেদুলে না হেঁটে যোগেন গটগটিয়ে হাঁটলেও, হাসে। হাসিই, হাসির বেশি কিছু নয়। হাসিই কী না, তাও তো ঠিকঠাক জানা নেই, তবু এমন বিদেশী-অধ্যুষিত নির্জনতায় যোগেন এমন অশনাক্ত হাসির মুখোমুখি হতে চায় না।

যোগেন যেই বাঁ-হাতের কাউন্সিল হাউস স্ট্রিটে ঢোকার জন্য ঘুরেছে, একদল ছুটন্ত মানুষ যেন প্রাণভয়ে তেড়ে আসে তারই দিকে। মুহূর্তে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে তার পেছনে রাস্তাটায় জনমনিষ্যি নেই। ততক্ষণে সেই তেড়ে-আসা বা তাড়া-খাওয়া ভিড়টা কাছাকাছি এসে পড়তেই সে দেখে নিতে পারে—তাদের লক্ষে সে নেই আর খবরের কাগজের ওপর লাল কালিতে লেখা পড়ে ফেলে সে জেনে গেছে—রাজবন্দীর মুক্তির দাবিতে ছাত্ররা এসেছে, দু-একটি নিশান

দেখে কংগ্রেসি চেনা গেল—কিন্তু দু-তিনটি লালঝাণ্ডাও ছিল ও অন্তত একটি চাঁদ-তারা আঁকা, মুসলিম লিগেরই মত কিন্তু নিশ্চয়ই 'প্রগতিশীল' কিছু ও তারও পর শাড়িপরা কিছু মহিলা ছুটে আসে।

যোগেন কয়েক পা পেছিয়ে যে-ডালহৌসি স্কোয়ার নর্থ দিয়ে এসে কাউন্সিল হাউস স্ট্রিটে ঢুকেছিল, টাউন হলের পাশ দিয়ে আইনসভায় পৌছুতে, সেখানেই দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার ঘাড় বাঁ-দিকে ফেরানো। সেই রাস্তা দিয়ে লোকজন ছুটতে ছুটতে আসছে আর যোগেন শিউরে-শিউরে উঠছে, তারা তো জানেই না, যোগেনের মত কেউ অমন দেয়ালের খিলানে ঢুকে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে, শুধু তার ডান-বাঁ-সম্মুখের রাস্তা তিনটি, দরকার হলে অন্য কোর্ট হাউস লেন, ওল্ট কোর্ট হাউস রাস্তাটিও। এমন কী ওদিকে ফেয়ারলি প্লেস দিয়ে স্ট্র্যান্ডেও চলে যাওয়া যাবে। সবগুলো পালানের পথ নিজের সামনে-পিছনে খোলা রেখে যোগেন ঢুকে ছিল এক বহির্দেয়ালের খিলানে।

সেখান থেকে, যেন আত্মগোপনের কোনো কুঠুরির গোপন ঘুলঘুলি দিয়ে, যোগেন লাল কালিতে লেখা পোস্টারগুলি পড়ে জেনে গেছে—এরা রাজবন্দীদের মুক্তি চাইছে ও বিশেষ করে আন্দামানে দ্বীপান্তরিত রাজবন্দীদের। ভোটের পর কলকাতায় এত পার্টির এত মিটিং করতে-করতে যোগেন বুঝে গেছে, রাজবন্দীদের মুক্তি বাংলার রাজনীতির একটা খুব কঠিন বিষয়। কংগ্রেসের এটাই সবচেয়ে বড় আন্দোলন।

রাজবন্দীদের মুক্তি আর জমিদারি উচ্ছেদ—এই দুটোর মধ্যে কর্মসূচিতে কোনটা এক নম্বরে যাবে এই নিয়ে প্রজাপার্টির সঙ্গে আলোচনা ভেস্তে দিল কংগ্রেস। আবার লিগ-প্রজাপার্টির কর্মসূচিতে এর কোনোটাই এক নম্বরে থাকল না। কারা কোথায় কেন বন্দী হয়ে আছে, কতদিন ধরে বন্দী হয়ে আছে—এ নিয়ে আইনসভাতেও দু-একবার কথা উঠেছে কিন্তু যোগেন এই বিষয়টির ভার ও জট কিছুই জানে না। ছাত্র থাকার সময়ই হক আর কাজকর্মের সময়ই হক, যোগেনকে এটা জানতে হয়নি। সে এটার বিরোধী বলেই যে জানতে হয়নি—তাও নয়, কারণ যোগেন এই প্রশ্নটার মুখোমুখিই কখনো হয়নি যে সে এই ঘটনাগুলি তার পক্ষে কতটা প্রাসঙ্গিক। তার পক্ষে মানে একজন শিক্ষিত নমশূদ্রের পক্ষে। তার নিজের সমাজের উন্নতিই তার প্রধান কাজ—এ নিয়ে তার কোনো দ্বিধা ছিল না। এই নির্দ্বিধা তৈরি হয়েছিল—সেই বালক বয়স থেকে উচ্চবর্ণের কাছ থেকে পাওয়া শান্তিহীন অপমানের, নমশূদ্র-সমাজের প্রধান ব্যক্তিদের বামুন-কায়েত সাজার চেষ্টায় আর-একদল সম্পন্ন মানুষজনের উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেয়ে অন্ধ স্বার্থপরতায়। যোগেনের তাই নিজের ভিতর থেকে কোনো তাড়া ছিল না—ইংরেজ দখল থেকে দেশকে স্বাধীন করার। বরং শাহেবদের কাছ থেকে নমশূদ্র বলেই কোনো বিশেষ ধরণের অপমান তাদের জুইত না বলেই তাদের কাছে স্বাধীনতা কোনো কর্মসূচি বা জীবনকৃত্য হয়ে ওঠেনি। 'রাজবন্দীদের মুক্তি চাই' এমন স্লোগান শোনামাত্র সে আত্মরক্ষায় আড়াল খোঁজে।

ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল।

বোধহয় সেই কারণেই রাস্তাটা খালি হয়ে গেল। দেয়ালের সেই খাঁজটায় যোগেন ভিজে যাচ্ছিল—সে তাড়াতাড়ি ছাতাটা খোলে।

ঘড়িতে দেখে—তার হাতে সময় নেই, তার ওপর তার ঘড়িটা ফাস্টও তো হতে পারে। পৌনে দুটোর মধ্যে নিজের-নিজের চেয়ারে বসে পড়তে হবে। পৌনে দুটো। লাটশাহেব ঢুকবেন দুটোয়। যোগেন বৃষ্টির মধ্যেই ছাতা মাথায় বেরিয়ে পড়ে। সে আর ওল্ড কোর্ট হাউস লেনে ঢোকে না। রাস্তা পেরিয়ে যায়—কাউন্সিল হাউস স্ট্রিটের দিকে যায়। কাউন্সিল হাউস স্ট্রিটে

পারছে না।

ফলে, তাকে চেষ্টাহীন দেখে যেতে হয় যে তার পরনের ধুতির একটি অংশ, পরনে থেকেও বাতাসে উড়ছে। শাহেব ঘ্যাঁচ করে তার বাইক থামায়। যোগেন প্রথমে বুঝতে পারেনি সে অ্যাসেমব্লি হাউসে পৌঁছে গেছে। সে ঢোকে তো অন্য গেট দিয়ে।

যোগেন এক লাফে নেমে পড়ে, ততক্ষণে গুটিয়ে আসা কোঁচাটাকে আবার কুঁচিয়ে গোঁজে ও দেখতে পায় তার ধুতির নীচের পাড় বরাবর রাস্তার কাদা লেস্টে আছে, ছিটিয়ে গেছে। শাহেবের বাড়িয়ে দেয়া ব্যাগটা নিয়ে একটু হেসে ঘাড় হেলাতেই বিকট আওয়াজ তুলে শাহেবের প্রস্থান।

হাউসের বারান্দায় উঠতে-উঠতে যোগেন ঠিক করে ফেলে, আগে বাথরুমে ঢুকে ধুতিটার অবস্থা দেখবে। সে ছাতা আর ব্যাগটা জেনিটরের ডেস্কে রেখে বাথরুমের দিকে যেতে-যেতে আরো ভেবে নেয়—যদি বোঝে ধুতির পায়ের ঝুলটা উলটে কোমরে নিয়ে এলে, কাদাটা পাঞ্জাবিতে ঢাকা পড়ে যাবে, তাহলে ধুতিটা গিঁঠি পালটে পরে নেবে। কিন্তু ধুতির কাদাটা তো ভেজা। চেয়ারে বসলে তো সেই কাদায় পাঞ্জাবিটা বিশ্রী ভিজে উঠবে। বাথরুমে ঢোকার আগেই যোগেন বুদ্ধি পেয়ে যায়, তাহলে, চেয়ারে যখন বসবে, তখন পাঞ্জাবির পেছন-ঝুলটার ওপর চেপে বসবে না, বরং ঝুলটা ঝুলিয়ে দেবে।

বেশ এতটা বদলাতে একটু সময় তো লাগবেই। এর মধ্যে বাথরুমের ভিতরে ধাতব বৈদ্যুতিক কলিংবেলটা প্রথম থেকেই সবচেয়ে জোরে ক্রি-ই-ইং বাজতেই থাকে। সেসনে ভোটাভুটি হওয়ার আগে এই বেলগুলো বাজানো হয়। যোগেন ধরেই নেয়, কোনো কারণ ছাড়াই ধরে নেয়, এটা ফার্স্ট বেলই হবে। কিন্তু বেল যখন বেজেই চলে, থামে না তখন সে ভেবে নিতে চায়, তাহলে সেকেন্ড বেলই হবে, কিন্তু তার ধুতিপরা তখনো শেষ হয় না। ততক্ষণে বেলটার ক্রেংকার যেন যোগেনের সারাটা শরীর এত কাঁপিয়ে দিচ্ছে যে সে আঙুল চালাতেও পারছে না। ঐ ক্রেংকার থেকে বাঁচতে যোগেন দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে আসে।

আইনসভায় গভর্নরের ভাষণ

৬৯

শেষপর্যন্ত যোগেন দরজা বন্ধ হওয়ার আগেই ঢুকতে পারে। তারপরও কেউ-কেউ ঢুকেছে। নিজের জায়গা খুঁজে বসতে-বসতেই সে হাঁফ ছাড়ে। অন্যদিন কেমন ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে আসে, আর আজই কী না বৃষ্টি, রাজবন্দী, পুলিশ, ধুতিতে কাদা, যা হোক, শেষ পর্যন্ত তো পৌঁছে যেতে পেরেছে। অ্যাসেম্বলির আলোগুলো একটু অন্যরকম—এখন সেটা অভ্যেস এসে গেছে। এই যুক্ত অধিবেশনেরা আলোগুলো আরো অন্যরকম। আলোছায়ার একটু ব্যবধান আছে। স্পিকারের শূন্য চেয়ারটার ওপর, যেখানে দাঁড়িয়ে লাটশাহেব তাঁর ভাষণ পড়বেন ফাঁকা সেই লেকটার্নটার ওপর উজ্জ্বল আলো। বাকি ঘরটাতে সমান মাপের আলো ছড়ানো। যোগেন দেখে ফেলে, ট্রেজারি বেঞ্চে শ্রীশ নন্দী আর প্রসন্নদেব মাথায় কী একটা পাগড়ির মত পরেছে, একটু ঝলমল চকমক করছে। প্রথমে বুঝতে পারেনি ঢাকার নবাবশাহেব কোথায়, উনি খুব একটা হালকা রঙের শেরোয়ানি পরেছেন, সেই কারণে একটু

আড়ালে পড়ে গেছেন। উনি আড়ালে থাকার জিনিশ নয়, কোনো একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে। নলিনী সরকার, স্যার বিজয় যেমন রোজ আসেন, ধুতিপাঞ্জাবিতে, তেমনি। খাজা আর সুরাওয়ার্দি দু-জনেই সুট-টাই পরেছে, তুলসী গোঁসাইও তাই, শরৎ বোস খদ্দরে। গভর্নরের বক্তৃতা তো আইনসভার সবচেয়ে বড় আচার, যেমন বাজেটও। অ্যান্ডারসন শাহেবও আর থাকবেন না। শোনা যাচ্ছে, এই বছরই তাঁর শেষ বছর। তাঁর আমলেই ভোট হয়েছে, তাঁর হাতেই মন্ত্রিসভা তৈরি হয়েছে, তিনিই মন্ত্রিসভার আনুষ্ঠানিক সভায় সভাপতিত্ব করেন—সেটা করার কথা প্রধানমন্ত্রীর। কিন্তু প্রথম বৈঠকই মন্ত্রিসভা তাঁর সভাপতিত্বের শেষ বৈঠক, এ-কথা ঘোষণার পর, সমস্ত মন্ত্রিসভা একজোট ও একমত হয়ে তাঁকে অনুরোধ করে, তিনি তাঁর সৎ বুদ্ধি ও সুপরামর্শ দিয়ে যদি মন্ত্রিসভাকে পরিচালনা করেন, একমাত্র তাহলেই মন্ত্রিসভার পক্ষে ঠিক পথে চলা সম্ভব। অ্যান্ডারসন শাহেব আর আপত্তি করেননি। তিনিই মন্ত্রিসভার বৈঠক পরিচালনা করেন।

একটা প্রদেশের ভালমন্দ ও প্রতিদিনের সঙ্গে এতটা জড়িয়ে থাকলে, লাটশাহেব হলেও, একটা মানুষের মনে এই জায়গাটি ও তার লোকজনকে নিয়ে কিছু মমতা তো থাকতেই পারে। তাঁর প্রথম বক্তৃতাই যদি শেষ বক্তৃতা হয়—তাহলে সে-মমতা আরো বেশি করে তাঁর নিজেরই হতে পারে।

সব মিলিয়ে উপলক্ষটিকে বেশ বড় করে তোলা হয়েছে। সকলেই তাঁদের পছন্দের ভাল পোশাক-আশাক পরে এসেছেন। যোগেনের পোশাকের আর ভালমন্দ কী? সেই ধুতি পাঞ্জাবি। তাতেও কাদা লেগে গেল। যোগেনের পেছনে ঠান্ডা বোধ হয়—তাহলে কাপড়টা ভিজেও গেছে।

প্রথমে একজন সান্ত্রী ঢুকল। পাগড়ি থেকে পায়ের নাগরা পর্যন্ত লালে মোড়া। তার ওপর জরির কাজ। কোমরবন্ধ জরির। তার হাতে একটা দণ্ড, মেজ, যোগেন জানে, এটা রাজদণ্ড। সে সেই রাজদণ্ডটা বসিয়ে দিল। সেনাবাহিনীর পোশাকে দু-জন মার্চ করতে-করতে ঢুকল। সেই দু-জনের মাঝখানের ফাঁকাটাতে পেছনে আইনসভার স্পিকার আজিজুল হক। এই মিছিলে একমাত্র চেনা লোক। তাঁর পেছনে গভর্নর অ্যান্ডারসন। তাঁর পেছনে তাঁর এডিকংরা, সামরিক পোশাকে। যোগেন আর-একটু স্পষ্ট করে দেখতে পাবে ভেবেছিল। যোগেন জানে, পড়েওছে, ছবিও দেখেছে, ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে এসব আচার-আচরণ কেমন। সেসব থেকেই এগুলো নেয়া। সেটা জানে বলেই যোগেনের কাছে এই অনুষ্ঠান, আসলের নিকটতম প্রতিবিম্বন। লাটশাহেব এসে তাঁর বক্তৃতার জায়গায় দাঁড়াতেই স্পিকারের আসনের পেছনে ওপরে একটা ব্যালকনি আলোকিত দেখা গেল। শাদা পোশাকে একদল কিন্নর-কিন্নরী গেয়ে উঠল, 'লং লিভ দি কিং'। প্রত্যেকে তাদের চেয়ারের সামনে উঠে দাঁড়াল। ইয়োরোপিয়ান ব্লকের কেউ-কেউ গানে যোগ দিয়েছেন বোঝা গেল তাদের ঠোঁটনড়া দেখে। লাটশাহেব মূর্তির মত দাঁড়িয়ে গানের সঙ্গে গলা মেলাচ্ছিলেন। গানটা যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎ থেমে গেল। সবাই বসে পড়ল।

লাটশাহেব খুব খাদে পড়ছিলেন। যাঁরা জানেন, তাঁদের কথাই শোনা হচ্ছে, তাঁরা খাদেই বলেন। লাটশাহেবের সঙ্গে যোগেন কথা বলেছে, ছোট মিটিংয়ে ওঁর কথা শুনেছে, বড় হলভর্তি ভিড়ে ওঁকে মন্ত্রিসভা ঘোষণা করতেও তো দেখেছে। গলার স্বরটা তার চেনা হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু বারবার চেষ্টা করেও যোগেন কিছুতেই চেনা ঠেকাতে পারল না। সে এমনও ভাবল—হয়ত এই হল, আলো, দাঁড়াবার জায়গা—এইসব কারণে সে চিনে উঠতে পারছে না।

তাই সে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করেও শুনল। তাতেও কোনো ইশারা পেল না এমন, যা থেকে চেনা ঠেকে। গলা আলাদা, বলা আলাদা, একটা গুরুগুর আওয়াজও আছে। শুনলে মনে হয়, গলাটা ঝেড়ে নিলে পারে। যোগেন বেশ মন দিয়েও কিছুই বুঝতে পারে না। তারপর দুটো-একটা শব্দ থেকে আন্দাজ করতে পারে, বোধহয়, ১৯৩৫-এর আইনটা ব্যাখ্যা করছেন। তারও পর, হ্যাঁ, যোগেন ধরতে পারে, বলছেন গভর্নর ও আইনসভা, আইনসভা ও মন্ত্রিসভা, মন্ত্রিসভা ও গভর্নর—এদের ভিতরকার ক্ষমতার বিলি-বন্দরবস্তের ব্যবস্থাটা বিশদে বলছেন—

সাংবিধানিক ক্ষমতা ছড়িয়ে দেয়া, অথচ সেই ক্ষমতা যাতে সব সময় প্রস্তুত থাকে ও প্রশাসনসহ সরকারের অন্য সব বিভাগকে সচল রাখে—যে-কোনো সাংবিধানিক পরিবর্তনের এটাই একমাত্র লক্ষ। কেন সেই পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠেছে বা নানা বিকল্পের মধ্যে এই পরিবর্তনটাই কেন গৃহীত হল—সেটা নিশ্চয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঐতিহাসকি প্রশ্ন। কিন্তু এ-প্রশ্নের কোনো অব্যবহিত জবাব হতে পারে না ও প্রতিদিনের প্রশাসন এমন দীর্ঘমেয়াদি ও বহুবিকল্পসমন্বিত সাংবিধানিক পরিবর্তনের কারণ খোঁজায় ব্যস্ত থাকতে পারে না। সে-দায়িত্ব ভবিষ্যতের গবেষকদের জন্য মজুত রেখে, আমরা, যারা এই পরিবর্তনের ফলভাগী ও এই পরিবর্তনকে ফলপ্রসূ করার দায়িত্বে আছি, তাদের এই মুহূর্তের কর্তব্য, গভর্নর, আইনসভা, মন্ত্রিসভা, প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা এই প্রত্যেকটি ক্ষমতাংশের নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ।

যোগেন মন দিয়ে ফেলেছে।

প্রদেশের গভর্নরের বিশেষ ক্ষমতা ও সেই ক্ষমতা ব্যবহারের উপায় আর মন্ত্রিসভার ক্ষমতা ও সেই ক্ষমতা-ব্যবহারের উপায়গুলির মধ্যে কোনো সংঘাতের জায়গা নেই, যদিও কোনো রাজনৈতিক শক্তি মনে করেন যে এমন একটা সন্দেহক্ষেত্র আছে। এ-বিষয়ে কোনো অস্পষ্টতা নেই যে সংবিধান অনুযায়ী তার নিজস্ব এলাকায় আইনরচনার অধিকার আইনসভা ছাড়া আর কারো নেই। এ-বিষয়ে আইনপরিষদ ও গভর্নরের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। প্রশাসনের ওপর জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতিনিধি যে-মন্ত্রিসভা, তাদের কর্তৃত্বও নির্দিষ্ট। আবার, প্রশাসনের নিজস্ব সাংগঠনিক শৃঙ্খলার কর্তৃত্বও নির্দিষ্ট। আমাদের অফিসাররা অত্যন্ত উচ্চ শিক্ষিত, যাঁরা ইংল্যান্ড থেকে এখানকার সিবিল সার্ভিসে এসেছেন তাঁদের অনেকেরই সম্মুখে অন্য অনেক লোভনীয় চাকরি ছিল। সেগুলি ছেড়ে তাঁরা যে এই দেশে এসেছেন তার কারণগুলি মধ্যে একটি একটি কারণ নিশ্চয়ই এই দেশ সম্পর্কে কোনো টান। যে-ভারতীয়রা প্রধানত এ-দেশের স্কুলকলেজে পড়াশুনো সেরে সিভিল সার্ভিসের যোগ্যতার পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, তাঁরাও হয়ে উঠেছেন এ-দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের সুফলের প্রতীক ও এই চাকরি বেছে নেয়ার অজস্র কারণ তাঁদেরও থাকতে পারে কিন্তু একটি কারণ নিশ্চয়ই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক দক্ষতা ও শৃঙ্খলার প্রতি তাঁদের টান। এ বিষয়ে আমরা গৌরববোধ করতে পারি যে ভারতীয় সমাজের বহু প্রশংসিত ও বহু নিন্দিত বর্ণভেদ ও সম্প্রদায়ভেদ আমাদের প্রশাসক নির্বাচন পদ্ধতিতে কোনো প্রভাব ফেলেনি। গভর্নরের বিশেষ ক্ষমতাপ্রয়োগের বিষয় হিশেবে ডেটিনিউদের মুক্তি দেয়ার কথাটি সম্প্রতিকালে বারবার উঠছে। এই বিষয়টি আইনসভা-মন্ত্রিসভার অন্তর্গত নয় অথচ সংবাদপত্রে ও অন্যান্য সব উপায়ে আমার মন্ত্রীদের নানাভাবে দায়ী করা হচ্ছে। এই নিয়ে নানা ধরণের সমাবেশ নাগরিক জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে ফেলছে। আজ, এখন, আমি আপনাদের সামনে আমার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করে বক্তৃতা দিচ্ছি। আর, ঠিক এখনই, এই বাড়ি থেকে ঢিলছোঁড়া দূরত্বে টাউনহলে ডেটিনিউদের বিনাশর্তে মুক্তির দাবিতে কয়েকশ মানুষ তাঁদের একাধিক নেতার আহ্বানে সমাবেত হয়ে

সভ্যতা-ও আইন বহির্ভূত সব দাবিদাওয়া করছেন। সেগুলি যে মেনে নেয়া অসম্ভব সে-কথা যে-কোনো লোকই বুঝতে পারবেন। দেশের আইনে এই কথাগুলি বলাই শাস্তিযোগ্য অপরাধ।'

গভর্নর ভয় পেলেন

৭০

শাহেব যে তাঁর ভাষণ শেষ করে দিলেন, তা যোগেন তো বুঝতে পারেইনি, আর-কেউ পেরেছে বলেও যোগেনের মনে হল না। তারা যেভাবে বক্তৃতা করে তাতে গলার ওঠানামা থাকে, কিছু-কিছু মজাও থাকে, ঠাট্টাও থাকে। আন্দাজ পাওয়া যায়—এবার শেষ হবে। কিন্তু এ-বক্তৃতায় তো তেমন আন্দাজের কোনো জায়গায় নেই। শাহেব 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলার পর সবাই হাততালি দিতে থাকল। শাহেব সোজা হয়েই দাঁড়িয়েছিলেন। আবার, স্পিকারের চেয়ারের ওপরে ব্যালকনি জ্বলে উঠল ও শাদা পোশাকের বালক-বালিকা পরীদের গলায় বেজে উঠল, 'লং লিভ দি কিং।' গান শেষ হওয়ার পর সবাই নিজ-নিজ আসনে বসে পড়ল। এবার লাটশাহেব আবার সেই মিছিল করে বেরিয়ে যাবেন। লাটশাহেবের দুই অ্যাডিকং সেরকম একটা ভঙ্গিতে যেন নিচ্ছিল। হঠাৎ একটা গলা চিৎকার করে উঠল, হাতও তুলল যে তার একটি পয়েন্ট অব অর্ডার আছে। স্পিকার ও আইন পরিষদের চেয়ারম্যান পাশাপাশি বসেছিলেন। চেয়ারম্যান যখন প্রশ্ন—উত্থাপককে তাঁর বক্তব্য বলতে বললেন, তখন বোঝা গেল, তিনিই সভা চালাচ্ছেন। সেই মেম্বার তখন দাঁড়িয়ে উঠে ভালভাবেই বলেন—'যেহেতু নতুন বিধান মতে এটাই প্রথম আইনসভা ও পরিষদের মিলিত সভা যেখানে হিজ এক্সেলেন্সি ভাষণ দিলেন ও যেহেতু এখানে আমরা যে আদবকায়দা তৈরি করব, তাই ভবিষ্যতে অনুসরণ করা হবে, তাই আমি প্রস্তাব করছি হিজ এক্সেলেন্সির ভাষণের একটি প্রতিভাষণ গৃহীত হোক।' মেম্বার বসে পড়ল। কংগ্রেস বেঞ্চ থেকে লম্বা হাততালি শুরু হল ও কংগ্রেসের চিফ হুইপকে আঙুল নাচিয়ে কিছু বলতেও দেখা গেল।

কংগ্রেস থেকেই যে কিছু বলা হল, সেটা তো পরিষ্কারই বোঝা গেল কিন্তু কী বলা হল সেটি বোঝা গেল না। এতক্ষণ যে বাঁধা গতে পুরো অনুষ্ঠান চলছিল, তাতে লাটশাহেবের প্রতিটি পা ফেলা ও ঘাড় ঝাঁকানোর পূর্ব নির্দিষ্টতাই কৌতূহল ছড়িয়েছিল। তাতে নিশ্চয়ই এমন আচমকা এমন এক মেম্বারের এমন এক প্রস্তাবে লাটশাহেবের অঙ্গভঙ্গিও মুখভঙ্গি সম্পর্কে নির্দেশ ছিল না ও থাকার কথাও নয়। সেটা সমস্ত মেম্বারের কাছে ধরা পড়ে গেল তাঁর দাঁড়াবার জায়গায় লাটশাহেব হঠাৎ যেন টাল খেয়ে কংগ্রেস বেঞ্চের দিকে তাকালেন, তাতে তাঁর বিরক্তি তো বোঝা গেলই, এটাও বোঝা গেল যে তিনি কংগ্রেসকেই দায়ী করছেন তাঁর পেছনে লাগার এই মতলবের জন্য। এই-যে একটু, একটুকুনি, সময়ের ফাঁক ঘটল, তাতেই চেয়ারম্যান বলে উঠলেন, 'প্রস্তাব গৃহীত। পরিষদে খশড়া পেশ করবেন।' লাটশাহেব চেয়ারম্যানের ওপরও চটে উঠলেন, আরে, উনি কংগ্রেসের মতলবটাই ধরতে পারেননি, উলটে লাটশাহেবকেও প্যাঁচে ফেললেন ও নিজেকেও প্যাঁচে ফেললেন। এতক্ষণ সংবিধানের নানা ক্ষমতা ও নানা প্রতিষ্ঠানের ভিতরকার অন্তসম্পর্ক নিয়ে যত সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা তিনি দিলেন, সেইসব কিছু মাড়িয়ে অ্যান্ডারসন পুরো সভার দিকে পেছন ফিরে চেয়ারম্যানকে আঙুল দেখিয়ে ধমকে উঠলেন, 'আই ওভার

রুল'।

দুই অ্যাডিকং অত্যন্ত দ্রুত পাশাপাশি সামরিক পদ্ধতিতে দাঁড়িয়ে একটা পা এগিয়ে দিল ও দ্বিতীয় পাটাও তুলে পরিষ্কার করে দিল—তাদের প্রস্থান সময় এসে গেছে। অ্যান্ডারসন তাঁর নিজের অ্যাডিকংদের অনুসরণ করলেন।

লাটশাহেব নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পর কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বেশ উঁচু গলায় ঘোষণা করলেন, 'আহুত বিশেষ যুক্ত অধিবেশন শেষ হল। এক ঘণ্টা বিরতির পর আজ বিকেলে যথাসময়ে আইনপরিষদ ও আইনসভার অধিবেশন নিজ-নিজ সভাগৃহে, আবার বলছি, এক ঘণ্টা বিরতির পর কাউন্সিল ও অ্যাসেম্বলি তাদের নিজেদের হলে স্বতন্ত্র বৈঠকে বসবে। বিরতির সময় এক ঘণ্টা।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াচ্ছে কেউ-কেউ, কেউ-কেউ এগচ্ছে, কেউ-কেউ আবার বসেই আছে। যোগেন দাঁড়িয়ে উঠলে বোঝে, কাদায় জলে তার ধুতি তার পেছনে একেবারে সেঁটে গেছে। সেটা আলগা করতে-করতে যোগেনের এখন সন্দেহ হয়—সে কি ভুল দেখল? বা, তার কি ভুলই মনে হল? লাটশাহেব কী রকম চটে উঠলেন না? একজন মেম্বার কী রকম বলেছে—জয়েন্ট সেসনে—তাতে লাটশাহেববের খড় বেরিয়ে গেল। যোগেনের ধুতিটা তার পেছনে এত লেপ্টে গেছে যে হাঁটতে তার অসুবিধেই হচ্ছে।

না। না। তারই কোনো ভুল হয়েছে। ঐ মেম্বার হয়ত লাটশাহেবকে জড়িয়েটড়িয়ে কিছু বলেছে। কিন্তু মেম্বারের গলাটাও তেমন ছিল না, বলাটাও তেমন ছিল না। আর, তাহলে কি চেয়ারম্যান সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে পরের সভায় তার খশড়া পেশ করতে বলতেন? এটা তো পরিষ্কার যে লাটশাহেব সভার নিয়মকানুন গঙ্গায় দিয়ে মিটিংয়ের দিকে পেছন ফিরে আঙুল তুলে, আঙুল কি তুলেছিলেন, বেশ, যদি নাই তুলে থাকেন, গলা তো তুলেছিলেন, 'আই ওভাররুল' বলে? ওভাররুল উনি নিশ্চয়ই করতে পারেন, সেটা তো কাগজকলমের ব্যাপার। এভাবে কি ওভাররুল করা যায়? পুরুতঠাকুরের ফুল ছোঁড়ার মত? ওঁ স্বাহায়, ওঁ শিবায়।

তারই যে-কোনো ভুল হয়েছে এটা নিশ্চিত করতে যোগেন তার অভ্যস্ত আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে ঢুকে পড়তে চায়। আমি চোদ্দ পুরুষের চাঁড়াল, জীবনে কোনোদিন লাটশাহেব দেখেছি যে তার মান-অভিমান রাগবিরাগ পর্যন্ত চোখের নিমেষে বুঝতে পারব? নিজের বার-তের বছরের বৌ, তার নিজের সন্তানের গর্ভধারিণী সেই বৌ, তার মুখচোখেই কিছু বোঝে না, আর, এ তো লাটশাহেব। যদি লাটশাহেব, ঐ চেয়ারম্যানকে ধমকেই থাকে, তাহলে লাটশাহেব বেরিয়ে যাওয়ার পর চেয়ারম্যানেরা চোখমুখ দেখে বোঝা যেত না। সে তো দিব্যি খোশাছাড়ানো সেদ্ধ আলুর মত মুখ নিয়ে দু-বার না তিনবার বোঝাতে লাগল—এরপর আজই অ্যাসেম্বলি ও কাউন্সিলের আলাদা-আলাদা সেসন বসবে এক ঘণ্টা পর? নিজের নিজের হলে। এ কি স্কুলের ড্রিলস্যার না কী—স্পোর্টসের সময় বারবার বলে-না, ক্লাস সিক্স, বাঁ-দিকের টেন্টে যাও—।

যোগেন দরজার প্রায় কাছে এসে আবার তার আত্মলাঞ্ছনার ছলনায় ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করে—আরে, ভদ্রলোকদের মধ্যে ওরকম সেদ্ধ আলু মার্কা মুখ অনেকের থাকে, মাথায় যদি টাক থাকে আর দাড়িগোঁফও যদি না থাকে, তাহলে সেদ্ধ আলুর মত দেখাবে না তো কী? এসব লোকই বিধাবা ভ্রাতৃবধুর সম্পত্তি গ্রাস করে দলিল জাল করে বা জমিদারির কোনো অবাধ্য তালুকের সমস্ত ঘরবাড়ি পুড়িয়ে ছাই করে রাতারাতি ঘাস গজিয়ে দিয়ে সেখানে মনুষ্যবসতির সব চিহ্ন ধুয়ে মুছে দেয়।

যোগেন প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বোঝে চেয়ারম্যানের প্রতিক্রিয়ার সাক্ষ্যটাকে সে একেবারে

প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য করে তুলছে। চেয়ারম্যান তো এক শাদামাঠা লোকও হতে পারে যার আক্কেল আছে। যদি লাটশাহেব তাঁকে ধমক দিয়ে থাকেন আর তা নিয়ে কথা তোলার ও বলার জন্য যখন অনন্তকাল পড়ে আছে, তখন চেয়ারম্যান আজকের ভাঙা হাটে সেসব নিয়ে কথা তুলবেন কেন?

যোগেন দরজার হ্যান্ডেলটা জোর দিয়ে আঁকড়ে টেনে খোলে ও দরজার সেই ফাঁকটুকু দিয়ে গলে যেতে-যেতে সামান্য একটু হাসে।

যতই এপাশ-ওপাশ করুক যোগেন সে যা দেখে ফেলেছে, তা আর না-দেখবে কী করে?

রাস্তার যে-কুকুরটাকে এত লড়াই করে রাস্তার ঐ টুকরো জায়গাটিতে থেকেযাওয়ার হক আদায় করতে হয়েছে—সবচেয়ে কঠিন ও আক্রমণী লড়াই তো ছিল তারই জাতিভাইদের সঙ্গে সে কি কখনো বোঝায় ভুল করতে কোনো নতুন আক্রমণের ইন্দ্রিয়াতীত ধ্বনির সংকেত বোঝায়?

চাঁড়ালের চোখ যদি এত ভুল দেখত, তাহলে কি চাঁড়াল বাঁচত? লাটশাহেডা ভয় পাইছিল ক্যান?

ক্যাবিনেট লাটশাহেবই চেয়ারে অনুরোধক্রমে

একটা খুব জরুরি ক্যাবিনেট মিটিং ডাকা হয়েছে এই একঘণ্টার বিরতিতে। গভর্নর্স প্লেসের পশ্চিমের গেট দিয়ে ঢুকতেও দেখা গেল টাউন হলের বারান্দায় সমাবেশ চলছে ও বৃষ্টি পড়ছে।

৭১

ক্যাবিনেট মিটিংয়ে প্রধানমন্ত্রীই তো এজেন্ডা বলবেন। কিন্তু দরবার হলের টেবিলটাতে বসতে-না-বসতেই অ্যান্ডারসন বলে উঠলেন, 'বন্দীমুক্তি নিয়ে কংগ্রেস ও ছাত্ররা যে-বাড়াবাড়ি করছে, তাতে বন্দীদের মুক্তি দেয়া আরো কঠিন হয়ে পড়ছে। প্রথমত, প্রত্যেকটি কেস আলাদাভাবে বিচার না-করে কাউকে মুক্তি দেয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, দেউলি ও আন্দামান থেকে সমস্ত বন্দীকে একবারে দেশে ফিরিয়ে আনার মত ব্যবস্থা সরকারের নেই। আমি এটা মন্ত্রিসভার কাছ থেকে সরাসরি জানতে চাই—এ-ব্যাপারে তাঁরা কি আমার সঙ্গে একমত? ও, যদি একমত না হন, তাহলে, বিষয়টিকে গভর্নরের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগে, তাঁদের সম্মতি বা আপত্তি আছে কী না।'

গভর্নর এও বললেন, 'আমাদের আধ ঘণ্টার মধ্যেই এ-বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে ও তার পরা আইনসভাতে গিয়ে আপনাদের সেই সিদ্ধান্তের পক্ষে সদস্যদের জড়ো করতে হবে। তাই, যাঁরা মন্ত্রিসভার বৈঠকে সবচেয়ে কম কথা বলেন বা প্রায় বলেনই না, তাঁরাই শুরু করুন। যাতে যাঁরা তর্ক করতে ভালবাসেন তাঁদের নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়ার জন্য খুব বেশি সময় হাতে না থাকে।'

তাঁর সামনে একটা কাগজের দিকে একপলক তাকিয়ে তিনি বলেন, 'তাহলে বনমন্ত্রী শুরু করুন।'

বনমন্ত্রী প্রসন্নদের রায়কত বুঝতেই পারেননি লাটশাহেব তাঁর মত জানতে চাইছেন। তাঁর কাছাকাছি ছিলেন স্যার বিজয়। তিনিই বললেন, 'মিস্টার রায়কত-রায়কত, যেন ঘুম থেকে

চমকে জেগে উঠে, জিজ্ঞাসা করলেন, 'অ্যাঁ?'

হকশাহেব তাঁর গলাও তুলে বলেন, 'আপনি তো জানেন, রাজবন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে একটা অ্যাডজর্নমেন্ট মোশন আপনার জইন্য আইনসভায় আপেক্ষায় আছে। হিজ এক্সেলেন্সি জানতে চান, আপনার নিকট, কী করনের সাধ আপনার?'

'আমি আলাদা কী করব? সবাই যা বলিবেন—'

'আপনারে তো সেই সগলের পার্ট হিশাবেই কওয়া হচ্ছে—'

'গবর্নমেন্ট যা ভাল বুঝিবেন—'

'আরে, আপনেই তো গবর্নমেন্ট—'

'না। আমি ক্যানং গবর্নমেন্ট হব?'

'তো আপনি তাইলে কোন্ নিমন্তন্নে এইখানে মিটিং করতেছেন।'

'কেনে? অ্যাজ মিনিস্টার।'

এই বিনিময়ে অনেক মন্ত্রী একটু নড়েচড়ে বসে কী বলবেন, সেটা মনে-মনে ঠিক করতে থাকেন।

'যোগাযোগ মন্ত্রী—' লাটশাহেব যেন রোল কল করেন।

শ্রীশ নন্দী তৈরি ছিলেন, 'অ্যাডজোর্নমেন্ট কেন? কী নিয়ে?'

'ডেটিনিউদের ছাড়া নিয়ে—' স্যার বিজয়ই বলেন। লাটশাহেব তাতে বাধা দিয়ে বলেন, 'না, না, মাননীয় মন্ত্রীর প্রশ্নের একটা অর্থ আছে। আজ তো ছাত্ররা কংগ্রেসের সাহায্যে সারাদিন টাউনহলে রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে সমাবেশ করছেন। আমরা জানতে পেরেছি—দিনের মাঝামাঝি জানতে পেরেছি আন্দামানে আটক বন্দীরা অনশন ধর্মঘটের নোটিশ দিয়েছেন। সেটাই আজকের সমাবেশের দাবি ও অ্যাডজোর্নমেন্টের বিষয়।'

এ কথাটা সভায় বলাই হয়নি, সব মন্ত্রীও এটা জানতেন না। শ্রীশ নন্দী তাঁর অভিজ্ঞতায় এটা ধরতে পেরেছেন। উনি ধীরস্থির মানুষ, বহুকাল সরকারের সঙ্গে জড়িত, কোনোদিনই কোনো দলে নাম লেখাননি।

ওঁকে নিয়ে ঠাট্টা আছে যে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হলে উনি এমএ পাস করতেই সঙ্গে-সঙ্গে গবর্নমেন্ট তাঁকে গ্রেপ্তার করে ১৯১৯ সালের নতুন আইন-অনুযায়ী মন্ত্রীপদে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেন। কাউন্সিলের মনোনীত-সদস্য ও মন্ত্রীও ছিলেন। তাতে অবিশ্যি তাঁর এমন পদ্ধতিজ্ঞান প্রয়োগের কথা নয় যে অ্যাসেম্বলি, মানে, পার্লামেন্টের মুলতুবি প্রস্তাব কী ভাবে ওঠে। বহুদিন ধরে চুপচাপ একা-একা কাজ করে গেলে এসব ক্ষমতা তৈরি হয়। সবচেয়ে বড় সুবিধে ওঁর যে কোনো দল সামলাতে হয় না। ওঁর পছন্দ হলে, যে ডাকে তার কাজই করে দেন। সরকারের মন্ত্রীগিরির কাজও—১৯১৯-এও, ১৯৩৭-এও।

'তাহলে অ্যাডজোর্নমেন্ট চাওয়া হবে, আন্দামান বন্দীদের অনশন ধর্মঘটসংক্রান্ত উদ্বেগের কারণে?'

শ্রীশ নন্দী ভেবেছিলেন, তাঁর বলার সময় পেরিয়ে গেছে। তিনি নতুন করে কিছু বলেন না। কিন্তু লাটশাহেব যেন তাঁর কথা থেকে একটা পরামর্শের আঁচ পান। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'অ্যাডজোর্নমেন্ট মোশনটা অ্যাডমিট করা নিয়ে আপনার কিছু বলার আছে?'

'সেটা তো আমাদের ওপর নির্ভর করে। দেশের এতগুলো সোনার চাঁদ ছেলে কোন্ পাণ্ডববর্জিত দেশে না খেয়ে-খেয়ে দিন কাটাচ্ছে...'

'কাটাচ্ছে কী না আমরা জানি না। তেমন কিছু করার নোটিশ দিয়েছে—' নলিনী সরকার

মনে করিয়ে দেন।

'ওটা তো নলিনীবাবু, আমাদের ব্যাপার। আমরা কখন কতটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হব, সেটা তো আমাদের ব্যাপার। কিন্তু আমাদেরই তো ছেলেপিলে সব, বয়সও তো সব বিশের কোঠায়। মামলার সুবাদে জেলে বসে বড় হওয়ার যে সময়টুকু পেয়েছে তাতেই বড় হয়ে ওঠার যেটুকু সময় পেয়েছে। তবে সরকার তো সব দিক দেখেই চলবে। উদ্বেগ প্রকাশ করলেও তো তাদের প্রশ্রয় দেয়া হয়ে যেতে পারে।

'কিন্তু এই ধরণের ব্ল্যাকমেইলকে কি পলিটিক্যাল প্রসেস বলে স্বীকার করা উচিত?'

শ্রীশ নন্দী মনে-মনে একটা জবাব ভাবেন।

তাহলে সেটাই তো বললে হয়, আমরা যথেষ্ট উদ্বিগ্ন, আমাদের আর ব্ল্যাকমেইল করো না।

কিন্তু তিনি সেটা বলেন না। বললে তাঁর একটা পক্ষপাত সবাই আন্দাজ করবে। অথচ তেমন পক্ষপাত থেকে তিনি কথাটা বলেননি। তাঁর সম্পর্কে এমন একটা ধারণা তিনি তৈরি হতে দিতে চান না, যে, শ্রীশ নন্দী চেপে ধরাতেই অ্যাডজোর্নমেন্ট হল। প্রতিপক্ষতা তাঁর স্বভাবে নেই।

শ্রীশ নন্দী নতুন করে কিছু বলবে না বুঝতে পেরে, লাটশাহেব বলে ওঠেন, 'কিন্তু তারা তো দেশের বিচারব্যবস্থা কর্তৃক দেশের আইনে, নির্ধারিত শাস্তি ভোগ করছে। গবর্নমেন্ট তাদের ব্ল্যাকমেইলিং পদ্ধতিকে পরোক্ষ স্বীকৃতি দিলেও তো পরোক্ষভাবে প্রশাসন ও বিচারব্যস্থাকে খাটো করা হবে। তাই না? ওয়েল, নওয়াব সাব—'

কোনো একটা বোঝাবুঝির ভুলে নবাব হবিবুল্লাহ আর নবাব মুশারফ হোসেন একসঙ্গে কথা বলে উঠে একসঙ্গেই থেমে গিয়ে হাত দেখিয়ে পরস্পরকে আগে বলতে বলেন। হো হো হাসিতে হকশাহেব বলে ওঠেন, 'আরে, মুশারফ, নিজে নবাব হইয়্যাও জান নাই যে ঢাকার নবাব উপস্থিত থাইকলে আর-কোনো নবাবের নবাবি থাহে না—'

পরপরই বললেন দুই নবাব—ঢাকার নবাব উর্দু-আরবি-বাংলা মিশিয়ে আর জলপাইগুড়ির নবাব নোয়াখালি-ঘটি-ইংরেজি মিশিয়ে। তাঁদের বলা শেষ হলে লাটশাহেব, বলে ওঠেন, 'আপনারা আমার একটা ধাঁধা মিটিয়ে দিন-না।' সকলেই তাঁর দিকে তাকান।

'আমি যদ্দূর বুঝতে পারছি—ঢাকা ও জলপাইগুড়ি বোধহয় এক ভাষায় কথা বললেন না। অন্যদিকে, জলপাইগুড়ির নবাব ও রাজা এক ভাষায় কথা বললেন না। তাহলে, রাজনৈতিক সমীকরণগুলি কী করে তৈরি হয়?'

হকশাহেব একাই সবার হাসি হেসে দিয়ে বলেন, 'ইয়োর এক্সেলেন্সি, আপনাগো মূল আন্দাজডাই তো বরবাদ। আপনারা শিখ্যা নিচ্ছেন যে—মামুলি-স্বত্ব কায়েম হইব্যার পারে না কাবুলিয়ৎ ছাড়া। ইজমেন্ট ইজ নট ভ্যালিড টিল দি পার্টিজ এগ্রি। তাই তো? অস্যার্থ—ঢাহার নবাব জনাব হবিবুল্লাহ আর জলপাইগুড়ির নবাব জনাব মুশারফ হোসেন কুনো মামুলি স্বত্ব, ইন দিস কেস স্যার দি গবর্নমেন্ট, সরকারডাই স্যার স্বত্ব, আমরা দুইজনে সরকার বানাইব—এইডাই স্যার স্বত্ব, ওনারশিপ, আপনাগো ভুল শিক্ষায় স্যার আপনারা শিখেন স্যার, কোনো ওনারশিপ কি মামুলি হইব্যার পারে ইফ দি পার্টিস এ ওর ভাষাডাই জানে না। কিন্তু আমাগো স্যার, ইনডিয়ানগো স্যার, হিন্দু-মুসলমান বেবাক মানুষগো স্যার কায়েমি স্বত্বের জন্য ভাষার ডকুমেন্ট লাগে না। কারণ, হিন্দুই বলেন আর মুসলমানই বলেন আমাগো স্যার স্বামী-স্ত্রী, ম্যান অ্যান্ড ওয়াইফের, কোনো কনট্যাক্ট, স্যার আলোতে হওয়া, ইন এনি ভিজবল, লাইট ধর্মত

নিষিদ্ধ। মানে নট ইভেন এক্সচেঞ্জ অব লুকস, অর এক্সচেঞ্জ অব ওয়ার্ডস। সো ইন ইনভিজিবল ডার্কনেস স্যার আমাগো তো স্যার ম্যান অ্যান্ড ওয়াইফের মধ্যে ফিজিক্যাল কনট্যাক্ট ছাড়া কোনো কনট্যাক্ট হবারই পারে না। ফিজিক্যাল কনট্যাক্টের প্রুফ তো স্যার একমাত্র প্রতি সালে একটি সন্তান। সেই নীতি মোতাবেক দি নবাব অব ঢাকা অ্যান্ড দি নবাব অব জলপাইগুড়ির কোনো লিঙ্গুয়িস্টিক এক্সচেঞ্জ অর ইকুয়েশনের কোনো প্রয়োজন হয় না। বাট দি প্রুফ অব দি অ্যাকচুয়ালিটি অব দেয়ার কনট্যাক্ট ইজ দি এসট্যাবলিশমেন্ট অব দিস গভর্নমেন্ট।'

লাটশাহেব বললেন, 'একদিনের পক্ষে শেখা একটু বেশি হয়ে গেল। কিন্তু আমাদের এখনই তো অ্যাডজোর্নমেন্ট মোশনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। মিস্টার সরকার—'

'ব্যাপারটা কিন্তু জট পাকিয়ে যাবে, যদি এখনই কিছু না করা হয়। ২০০০ রাজবন্দী, তা মধ্যে বোধহয় ১৮০০ই আন্দামানে। আন্দামানের পরিবেশ নিয়ে যা আমরা শুনেছি, তাতে আমাদেরই তো ধারণা সেখান থেকে বেঁচে ফেরা মুশকিল। বেঙ্গলের সমস্ত মধ্যবিত্ত পরিবার যদি তাদের ছেলেদের বাঁচামরা নিয়ে এমন দুশ্চিন্তায় থাকে, তাহলে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামলাতে পারা যাবে না। তাছাড়া—এই আন্দোলনের ফ্যাক্টর কিন্তু আমাদের চেনা নয়। এরা ইয়ং পিপল, মোস্ট অব দেম ছাত্র। কংগ্রেসের ক্ষমতা নেই, এত ছাত্র জোগাড় করা। পরন্তু এই রাজবন্দীরা তো কংগ্রেসের বিরোধিতা করেই খুনডাকাতি করেছে। সুতরাং কংগ্রেস এদের উশকোতে পারছে না। এরা নিজেরাই গোপনে সংগঠিত। গভর্নমেন্টের যে-কোনো সাধু চেষ্টাকে এরা নতুন গোলমাল শুরু অছিলা করতে পাবে।'

হকশাহেব বলে উঠলেন, 'এক্কেরে ঠিক তাই। যদি একবার অ্যাডজোর্নমেন্ট মেনে নেয়া হয়, তাহলে তার ওপর তো বক্তৃতা হব। দুই দিন ধইর‍্যা। সেইসব লিখা থিক্যা তো আগুন ছিটকাইব। অ্যাডজোর্নমেন্টে কাম নাই।'

'কাম তো নাই। ওরা ছাড়বে য্যা?' শুরওয়ারদি বাংলা বলতে পারে না, তিনি বাঙাল-ভাষায় নকল করে বলতে গেলেন।

আমাদের সিমপ্যাথিডা জানান্ দরকার। সিরিয়াস কনসার্ন তালেই ফ্যামিলি ওরিজ কিছু কমবে। তার সঙ্গে গভর্নরের একডা স্টেটমেন্ট যদি থাকে, এই ব্যাপারে কী করা যায় তা নিয়ে আমরাও ভাইবত্যাছি—তাইলে বাড়ির মানুষদের মনডা একটু শান্তি পায়।' হকশাহেবের এই কথা শেষ হতেই লাটশাহেব একটু জোর দিয়ে বলে ওঠেন, 'আমি মনে করি না যে কোনোভাবে সরকারকে কোনো কমিটমেন্টের আভাসের সঙ্গেও মেলানো উচিত হবে। এটা তো গভর্নমেন্ট অব ইনডিয়ারও ব্যাপার। ইন দ্যাট কেস দি কলোনিয়্যাল পলিসি ইজ ইনভলভ্ড। উই ক্যান ইন নো ওয়ে, কোনোভাবে, আমরা আমরণ অনশনের কোনো ধমককে আইনের মর্যাদা দিতে পারি না।'

'তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়ে দিন। দুটো হোম ডিপার্টমেন্ট তো আর-একটা ইস্যু নিয়ে ঝগড়াতর্ক করে যেতে পারে না। সেন্টার যা বলবে, আমরা সেটাই মেনে নেব'—খাজা এই প্রথম কথা বলল, উর্দু আর ইংরেজি মিশিয়ে।

'কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারে তো কোনো নির্বাচিত সরকার নেই। গভর্নর-জেনারেলকে তাঁর প্রাদেশিক গভর্নর কিছু বলতে পারেন। বলেছেন কী বলেননি, সেটা তিনি আমাদের জানাননি। জানাতে বাধ্যও নন। মন্ত্রিসভা থেকে তাঁকে কি কিছু বলা সাংবিধানিক দিক থেকে ঠিক হবে?' নৌসের আলি বলে।

সকলেই একটু চুপ করে থাকে। নৌসের আলি কথাটা বলেছে বলে একটা সন্দেহ জড়িয়ে পড়ে। তার সঙ্গে কারো সম্পর্কই ভাল নয়—গভর্নরেরও নয়, প্রাইম মিনিস্টারেরও নয়, অন্য

কোনো মন্ত্রীরও নয়। কিন্তু এসব ব্যাপারে নৌসের আলি-র কথা ফেলা যায় না।

লাটশাহেব বললেন, 'মিস্টার আলি ইজ প্রোফাউণ্ডলি কারেক্ট। মে হি হেল্প এ লিটল মোর?'

নৌসের আলি বলে উঠলেন, 'সদুপদেশের জন্য যদিও আমি খুব বিখ্যাত নই, তবু আমার মনে হচ্ছে, গভর্নমেন্ট খুব প্যাঁচে পড়ে গেছে। অ্যাডজোর্নমেন্ট মোশন মেনে নিলে অন্তত দুদিন ধরে দি হিন্দু কমিউন্যাল প্রেস উইল গো অন পাবলিশিং হাউ দেয়ার বয়েজ আর বিয়িং ট্রিটেড ইন দেয়ার জেইলস। ঘটনাচক্রে তার মধ্যে একজনও মুসলমান ছেলে নেই। আর, বেশিরভাগ ছেলেই উচ্চবর্ণের হিন্দু। সুতরাং অ্যাডজোর্নমেন্ট মোশনের ওপর বক্তৃতা থেকে কমিউন্যাল টেনশন খুব সহজেই তৈরি হবে। অন্যদিকে গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে কোনো সহানুভূতি সততার সঙ্গে প্রমাণিত না-হলে, কলকাতায় যে-ছাত্ররা বন্দীমুক্তি আন্দোলন করছে তাদের চরমপন্থী কেউ যদি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে কোনো সরকারি অফিসারকে খুন করে—তাহলে বাংলায় আবার সন্ত্রাসবাদ দ্রুত মাথা চাড়া দেবে। এই ব্যাখ্যার ওপর নির্ভর করে আমার পরামর্শ, এক, প্রধানমন্ত্রী স্কুলকলেজের হেডমাস্টার ও প্রিন্সিপ্যালদের কাছে আন্তরিক আবেদন করুন—বাংলার যুবশক্তিরা লোকশান আর না-বাড়িয়ে ও বন্দীমুক্তির ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থাদিতে অসুবিধে তৈরি না করে দয়া করে ছাত্রদের এই আন্দোলন থেকে দূরে রাখুন। দুই, গবর্নমেন্টের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতিতে বলা যে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি ও করব। সঙ্গে, কংগ্রেস প্রদেশগুলির বন্দীমুক্তির হার ও বেঙ্গলের হার ছেপে দিন।'

নৌসের আলি-র পরামর্শটাই যে ঠিক এটা বুঝে নিতে সবাই চুপ করে থাকে একটু। লাটশাহেবই মুখ খোলেন প্রথম, 'তাহলে প্রাইম মিনিস্টার সমস্ত স্কুলকলেজের প্রধানদের কাছে একটা 'হোয়াট শুড আই সে, এ স্টেটমেন্ট? দ্যাটস এ লিটল নিউট্র্যাল, হোয়াট নট অ্যান অ্যাপিল', কোনো কিছু প্রতিশ্রুতি না দিয়ে উনি সাহায্য চাইতে পারেন। ইন দি অ্যাসেম্বলি লেট হোম হ্যান্ডল দি অ্যাডজোর্নমেন্ট। গবর্মেন্ট শুড স্টেডিলি ফেস ইট উইদাউট বিয়িং প্যানিকি। প্রধামন্ত্রী যদি জবাব দেন, তাহলে হয়ত উনি অনশন ধর্মঘটের ওপর জোর দেবেন, বন্দীদের কষ্টের ওপর জোর দেবেন। আমরা এটা বলতে চাই যে অনশন ধর্মঘটকে একটা রাজনৈতিক কৌশল হিশেবে ব্যবহার করা অনুচিত ও তাতে গবর্মেন্ট তার নীতি থেকে সরবে না।'

'কিন্তু আপনারা তো অন এ হায়ার লেভেল গান্ধীজির অনশনকে রাজনৈতিক কর্মসূচি হিশেবে স্বীকৃতি দিছেন। নাহলে কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ড তৈরি হইত না। আমি অ্যাসেম্বলিতে বইলতে চাই না। কিন্তু আমরা য্যান অনশনের বিষয়ডাকে হালকা না করি। মানুষের জীবন নিয়্যা কথা! আর, একডা কিছু তো বলা দরকার যে আমরা কনসার্নড।'

লাটশাহেব বলেন, 'আমাদের তো উভয়সংকট। আপনি তো কনসার্ন দেখাতে গিয়ে কমিট করবেন। আর স্যার নাজিমুদ্দিন হয়ত মুখ বেশি শক্ত করে ফেলবেন।'

নলিনী সরকার হকশাহেবকে বলেন, 'খাজাই করুক। গবর্নমেন্ট যে ইতিমধ্যেই ৩২ জনকে ফিরিয়ে এনেছে সেটা যেন বলে দেয়—'

লাটশাহেব সভা শেষ করে দিলেন কিন্তু চেয়ার ছাড়লেন না। চিফ সেক্রেটারি থেকে শুরু করে অন্য সেক্রেটারিরা ও ডিআইজি দেয়ালে সারি দেয়া চেয়ারে বসেছিলেন, ক্যাবিনেটে তো থাকতেই হয়। তাঁরাও চেয়ার ছেড়ে টেবিলের কাছে এলেন ও মন্ত্রীরা বেরতেই তাঁদের ছাড়া চেয়ারে বসলেন। বেরতে-বেরতে নৌসের আলি বলেন, 'আমরাই কি গ্রিনরুম থেইকে স্টেজে যাতিছি। নাকি সেক্রেটারিশাহেবরা গ্রিনরুম থিক্যা স্টেজে ঢুইকল? কী য্যান!'

যোগেনের এমএলএগিরি মন্ত্রীর সঙ্গে

সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে যোগেন এক চিঠিতে জানল যে ঐ এলাকার সাব-ইনস্পেক্টর পাশ করে দিলেও ইনস্পেক্টর আগৈলঝরা স্কুলের মডেল স্কুল হওয়ার প্রথম ধাপেই বাগড়া দিয়েছে।

৭২

ক্লাশ ফোর পর্যন্ত খোলারও অনুমতি দেয়নি। এরকম একটা বাধা যে আসবে সেটা যোগেনের হিশেবে ছিল না। আর, অকুস্থলে না-থাকলে বোঝা যায় না—কার সঙ্গে কার কী সম্পর্কের জন্য কী ঘটছে। আগৈলঝরায় একটা হাই, উঁচু স্কুলকে নামিয়ে দেয়া হয়েছিল। আসলে তো উঠেই গিয়েছিল স্কুলটা। তার কারণও ছিল। এখন যদি লোকজন উদ্যোগ আয়োজন করে—তাতে কার ক্ষতি হতে পারে। যোগেন ব্যাপারটা বোঝার জন্য মনে-মনে হাসে—কোন্‌টা কঠিনতর জাতীয় কর্তব্য—জমিদারি ব্যবস্থার উচ্ছেদ না ভেগাই হালদার স্কুলের অনুমোদন? শিক্ষাবিভাগ তো হকশাহেবের নিজের দপ্তর। গিয়ে বললেই তো তৎক্ষণাৎ মঞ্জুর হয়ে যাবে, ভাল করে জানতেও চাইবেন না—ভেগাই হালদার স্কুলটা হাই স্কুল হইলে ক্ষতি হইব কেডার? ফলে কাজটা হবে না। ঢাকা ডিভিশনের স্কুল-ইনস্পেক্টর খান বাহাদুর আবদুল হাকিম। হকশাহেবের বিখ্যাত লেফটেনান্ট। তাঁর সঙ্গে হকশাহেবের এই বন্ধুত্বে হকশাহেবেরও স্বার্থ আছে, বরং খাঁনবাহাদুরের হয়ত ততটা স্বার্থ নেই। মুসলিম লিগের সদর দুর্গ হচ্ছে ঢাকা। নবাব স্বয়ং, তার বার-না-বাইশ এমএলএ, গোটা কয়েক মন্ত্রী ফজলুল হক যাতে সরকার চালাতে না পারে আর সম্পূর্ণ একটি মুসলিম লিগের সরকার যাতে হয়, তার জন্য ঘুঁটি চালাচালি করেই যাচ্ছে। সেই ঘুঁটি চালাচালির মূল বন্দর হল ঢাকা। তারা চায়, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হকশাহেবের সরকার ফেলে দিয়ে খাজা নাজিমুদ্দিনের সরকার করতে। খাজা তো আইনসভায় চলাফেরা করে প্রধানমন্ত্রীর চালে। মাসখানেক আগে লাটশাহেব, হকশাহেব আর খাজা একসঙ্গে ঢাকা গিয়েছিল—কনভোকেশন ছিল, আরো কিছু ছিল। আসল ব্যাপারটা ছিল অ্যানডারসনশাহেবের আসন্ন বিদায় উপলক্ষে সংবর্ধনা। সেখানে বেশ ঝামেলা পেকেছিল। হকশাহেব যে তাঁর শত্রুদের জায়গায় এসেছেন সেটা তাঁকে বেশ স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছিল। পুলিশ-প্যারাডে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্যালুট নিলেন, গভর্নর ছিলেন প্রধান অতিথি আর হকশাহেবকে বানানো হয়েছিল প্রধান দর্শক। হকশাহেব যাতে প্যারেডে না যান, তেমন উশকানোর লোকও কিছু কম ছিল না। কিন্তু হকশাহেব সেসব পরামর্শ শোনেননি। কনভোকেশন বয়কট করেছিল হিন্দু ছাত্ররা। তাদের বক্তব্য ছিল—যে-মন্ত্রিসভা রাজবন্দীদের মুক্তি দেয় না, তাকে আবার মানপত্র কীসের? হিন্দু ছাত্রছাত্রীরাই ছিল বয়কটে কিন্তু বয়কটটার আসল নেতা ছিল বিপ্লবীরা, তাদের অনেকেই কমিউনিস্ট। খাজা-র লোকরাই নাকী তাদের এই বয়কটের বুদ্ধি দিয়েছিল। কনভোকেশনে প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী হকশাহেব উপস্থিত, সুতরাং তাঁকেই এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। মন্ত্রিসভার সকলেই এ-প্রশ্নটা এড়াতে চায়—বাংলার হিন্দু ভদ্রলোকরা এই প্রশ্নটাকেই প্রধান করে তুলেছেন। যা-হোক, হকশাহেব লাটশাহেবের সামনেই, যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য ফাঁসি গিয়েছেন, দ্বীপান্তরে আছেন, জেল খাটছেন—তাঁদের সবাইকে অভিনন্দন জানান তাঁদের আত্মত্যাগের জন্য। সঙ্গে এ-কথাও বলেন, সবকিছুরই তো কতকগুলি ধাপ আছে। বন্দীমুক্তিরও তাই। ১৮০০ বন্দীর মধ্যে তেরশ বন্দীকে ছাড়া হয়েছে। আন্দামান থেকে এক ক্ষেপ বন্দীকে নিয়ে আসা হয়েছে। প্রত্যেক বন্দীর 'কেস' আলাদা করে বিচার হচ্ছে। তারপর হকশাহেব ছাত্রদের রাজনীতি করার বিরুদ্ধে এমন কিছু কটু ও কঠিন কথা বলেন—যা এমন

কী মুসলমানদেরও কারো-কারো ভালো লাগেনি আর যে-হিন্দুরা হকশাহেবের ভরসা তারাও ভেবে নিল— হকশাহেবেরই ইচ্ছা না ছেলেদের ছাড়ানো।

এই অবস্থায় হকশাহেব সত্যি-সত্যি চেষ্টা করলেও আগৈলঝরা স্কুলের অনুমোদন দেয়াতে পারবেন না। কারণ, খান বাহাদুর আবদুল হাকিমের কোনো কারণ আছে। সে-কারণটা নিশ্চয়ই রাজনীতি নিয়েই, হকশাহবের স্বার্থে। আবার, নিশ্চয়ই খানবাহাদুর নিজেও কারণটার সঙ্গে জড়িত।

কলকাতায় বসে কি আর আন্দাজ করা যায় খাঁনবাহাদুরের নিজের কারণটা কী? আগৈলঝরাতে বসে বা গৌরনদীতে ঘুরে বুঝে ফেলতে হয় ও তার প্রতিকার করতে হয়। হকশাহেব বা খাঁনবাহাদুর যাঁরই নিজের কারণে আগৈলঝরা বাদ গেছে, তাঁদের সেই কারণটা খুঁজে বুঝে তার নিষ্পত্তি না করলে খাঁনবাহাদুর তাঁর অধীনস্থ সাব-ইনস্পেক্টরের রিপোর্ট ডিপিআই শাহেবকে পাঠাবেন না।

সমস্যাটা এরকম সাজিয়ে নেয়ার পর যোগেনের খারাপ লাগে না। মুরুব্বি-ধরা খেলায় সে অনিচ্ছুক তো নয়ই, বরং উলটো। নমশূদ্র কোনো ছেলের পক্ষে বা ছেলের বাবার পক্ষে মুরুব্বি ছাড়া চলে? চাষও চলে না, বাসও চলে না, পড়াশুনোও চলে না, এমন কী ইষ্টনাম জপাও চলে না। যোগেনের কি পড়াশুনো হত আশবাবুস্যার না থাকলে?

কিন্তু আগৈলঝরার মুরুব্বি কি কলকাতায় মেলে?

নানা নাম যোগেনের মনে এল কিন্তু কোনো একটা নামে সে ভরসা পাচ্ছিল না। হয় তাদের সমাজের কাউকে মনে পড়ে কিন্তু তারা সরকারের কাজের অলিগলি কি চেনে। তারা সামাজিক ব্যাপারেই সারা জীবন কাটিয়েছে। ইয়োরোপিয়ান কোনো মেম্বারের সঙ্গে তো তার আলাপই নেই। মুকুন্দবিহারী নিজেই তো মন্ত্রী, আগৈলঝরাও চেনে, যোগেনকেও জানে। পারলেও করবে না। যোগেন নেতা হোক, এটা উনি চান না। পিআর ঠাকুর ছাড়া অন্য কোনো নামে সে ঠেকল না। ঠাকুরের ঠাকুরদাদা মারা গেছে— তাকে আর আইনসভায় পাবে কবে? ঠাকুর কি অফিসারদের সঙ্গে চেনাশুনো করে নিতে পেরেছে?

আইনসভার লবিতে একদিন শরৎ বোসকে দেখে যোগেন উঠে গটগট করে তার কাছে গিয়ে বলল, 'আমাদের ওখানকার একটা স্কুলের রেকগনিশন এডডু আটকাইয়া গিছে—'

'আপনারই এলাকার স্কুল? আপনারই এলাকার?'

'হ্যাঁ। যদিও সেটা বড় কথা নয়।'

'সেটাই তো সবচেয়ে বড় কথা। আপনার এলাকার স্কুল। আপনি রিকমেন্ড করছেন। এর চাইতে বড় কথা কী।'

'আমাদের তো গ্রাম। সেখানে আমার এমন ক্ষমতা দেখানো মানায় না। গুরুজনদেরও ভাল লাইগবে না। বন্ধুরাও পছন্দ কইরবে না।'

'আপনাকে ভোট দিয়ে পাঠাল ক্ষমতা দেখাতে আর ক্ষমতা দেখালে গুরুজনরা রাগ করবেন? এই সবই তো আমাদের ব্যাকওয়ার্ড করে রেখেছে। আপনি জিরো আওয়ারে কথাটা তুলুন তো, আমি ফুল সাপোর্ট দেব। তুলুন। এগুলো সব লোক্যাল অফিসারদের শয়তানি। আরে, আপনি হকশাহেবকে বলুন-না। এডুকেশনও ওর, বরিশালও ওর।'

'আমি আপ্নাকে ঠিক কনভে কইরতে পারছি না। মানে, লাস্ট জুলাইয়ের রিসেসে আমিই লোকজন জড়ো কইর‍্যা লোক্যাল স্কুলডার উন্নতির চেষ্টা নেই। স্কুলডা হাইস্কুলই ছিল। কয়েকবছর আগে ইউনিভার্সিটি হাইস্কুলের অ্যাফিলিয়েশন কাইট্যা সিক্স কইর‍্যা দেয়। সব ঠিকঠাক

হইয়া গেল, টাকা উঠল, জমিও পাওয়া গেল, সাব-ইনস্পেক্টরের রিপোর্টও ভাল, কিন্তু ডিভিশন্যাল ইনস্পেক্টর সেডা আর ডিপিআইকে পাঠায় না।'

'ডিভিশন্যাল ইনস্পেক্টর হিন্দু না মুসলমান?'

'খাঁনবাহাদুর আবদুল হাকিম।'

'আর সাব-ইনস্পেক্টর?'

'ডাক্তার জ্যোতিষচন্দ্র সেন।'

'কীসের ডাক্তার?'

'সেটা আমি ঠিক জানি না—হয়ত হোমিওপ্যাথি।'

'মিস্টার মণ্ডল, ঝামেলাটা তো শিকড়ে। খাঁনবাহাদুর ইনস্পেক্টর কি বদ্যি সাব-ইনস্পেক্টরের সুপারিশ পাঠাতে পারে ডিপিআইকে?'

'তাই? আমরা তো উলটা হিশাব দেহি যে শিডিউল কোটা কাস্ট হিন্দু অফিসাররা মানতেছেন না। আমি আরো কিছু খবর পাওয়ার পর অ্যাসেম্বলিতে তুলব।'

'পালটাপালটি না-হলে আর খাঁনবাহাদুরের কমিউন্যালিজম আসবে কোত্থেকে। আপনি একটা কাজ করুন। আমি শ্যামাপ্রসাদকে ফোনে বলে রাখব। আপনি আমার কাছে জেনে নেবেন। আর নলিনীদা, নলিনী সরকার, ওঁর সঙ্গে একটা দিন ঠিক করে নিয়ে রাইটার্সে গিয়ে সবটা জানান। যদি বলেন, আমি নলিনীদাকেও ফোন করে আপনার জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইতে পারি। তাতে কি সুবিধে হবে আপনার?'

'না, না, অ্যাপয়েন্টমেন্ট চালে উনি দিবেন না কেন। কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে তো আমি পারসোনা নন গ্রাটা। রেফারেন্স না থাকলে ভাইস-চ্যান্সেলার আমার সঙ্গে দেখা করবেন ক্যান?'

'সেটাই তো কথা। তবে আপনি নিজেকে যতটা অপরিচিত ভাবছেন, ততটা কিন্তু সত্য নয়। আর সেটা হয়েছে কোনো রেফারেন্সের জোরে না, আপনার যোগ্যতার জোরে।'

যোগেন আর দেরি করেনি। সেদিনই নলিনী সরকার ঢুকে তার চেয়ারে বসা মাত্র, যোগেন তার পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়, 'মিস্টার সরকার, আমাকে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে হবে। রাইটার্সে।'

নলিনী সরকার সেই ভুরু-পাকানো অসন্তুষ্ট চোখেই বলেন, 'যেদিন ইচ্ছে আসুন। এখানে বলা যায় না? রাইটার্স পর্যন্ত যেতে হবে?'

যোগেন ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, কোথায় তার কথা বলার সুবিধে। কিন্তু নলিনী সরকার বুঝে নেন, 'কালই আসুন-না। আফটার দেড়টা। ফার্স্ট আওয়ারে অফিসারদের ভিড় থাকে। কালই।'

পরদিন সকালে যোগেন ভাবে, নলিনীবাবুর সঙ্গে কাজ আর কতক্ষণ, যাচ্ছেই যখন রাইটার্সে হোম বা ল্যান্ড-রেভিনিউ সেক্রেটারির সঙ্গেও দেখা করে আসবে। বেঙ্গল টেনান্সি অ্যাক্ট বুঝতে তার কিছু তথ্য দরকার। সেগুলি তো রেভিনিউ সেক্রেটারির কাছেই পাওয়া উচিত। কিন্তু তার ওকালতি বুদ্ধিতে সে আন্দাজ করল— টেন্যান্সি অ্যাক্টের সংশোধন যে-কারণে জরুরি হয়ে উঠেছে সেই কারণগুলি রেভিনিউ সেক্রেটারির কাছে পাওয়া যাবে না, বরং হোম তার প্রশ্নগুলির উদ্দেশ্য, ইচ্ছে করলে, ধরতে পারবে বেশি। বা, হয়ত কোথাওই পাওয়া যাবে না।

ফোন ধরল হোমের পিএ। যোগেন নিজের পরিচয় দিল, 'বাখরগঞ্জের জেনারেল সিটের এমএলএ', সেদিনই বেলা দুটো নাগাদ হোম সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করতে চায়। 'এক মিনিট স্যার,' বলে একটু পরেই জানাল, হ্যাঁ, আসুন স্যার, ঐ দুটোতে।'

রাইটার্সে এর আগে কখনো আসেনি যোগেন। ফলে পৌঁছে দেখে দেড়টা বাজতে তখনো মিনিট বিশেক বাকি। এক পুলিশ অফিসারই অপেক্ষার ঘর দেখিয়ে দিল। ঠিক সময়ে এসে বলল, 'স্যার, অনারেব্‌ল মিনিস্টার অব ফাইন্যান্সের সঙ্গে আপনার দেড়টায় দেখা করার কথা, স্যার, আসুন।' যোগেন দাঁড়ালে সেই অফিসারই তাকে ছোট একটা লিফটের সামনে নিয়ে গিয়ে দরজা খুলে, লিফটম্যানকে কিছু বলল। এর আগে যোগেন কখনো লিফটে চাপেনি, কিন্তু লিফ্‌ট দেখেছে। সে একটু নার্ভাস হয়ে ভাবে—নলিনীবাবু কোন্ তলায় তাও তো জেনে নেয়নি। আর, থামতে না-বললে লিফ্‌ট তো উঠতেই থাকবে। সে একটা আঙুল তুলে বলে, 'মিনিস্টার অব ফাইন্যাস—।'

লিফটম্যান লিফ্‌ট থামিয়ে, 'আ গয়া জি' বলে দুটো দরজা খুলে, নিজে আগে বেরিয়ে, যোগেনকেও আসতে আমন্ত্রণ করে। লিফট থেকে বেরিয়ে বাঁয়ে একটা বাঁক নিতেই লিফ্‌টম্যান, তারই মত একজনের হাতে যোগেনকে সঙ্গে দিয়ে, 'এফএম, এফএম' বলে একটা স্যালুট দিয়ে দৌড়ে, লিফটেই বোধহয়, ফিরে গেল।

নলিনীবাবু বললেন, 'কোনো অসুবিধে হয়নি তো!'

'অসুবিধে হওয়ার তো কোনো ব্যবস্থাই রাখেননি।' আপৈলঝরা স্কুলের ঘটনাটা শুনে ভুরু কুঁচকে নিজের মনে কিছু বললেন।

তারপর বললেন, 'আচ্ছা, যোগেনবাবু, বাঘ বেশি মানুষ মারে না মশা বেশি মানুষ মারে।'

যোগেন চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি ডকুমেন্টস কিছু দেখবেন!'

'কীসের? ঐ স্কুলের? আপনার কথা কি যথেষ্ট নয়? আমি ভেবেছি আপনার কোনো পার্সোন্যাল ম্যাটার। আমার কাছে কেউ এমন পাবলিক ম্যাটার নিয়ে আসে না। বোধহয় ডিপার্টমেন্টে যায়। আপনাকে বলা থাকল—যে-কোনো দরকারে আপনি সোজা আমার কাছে চলে আসবেন। স্কুলের ব্যাপারটি নিয়ে ভাববেন না—অ্যাসেম্বলিতে আপনাকে জানিয়ে দেব। রাইটার্সে কি আর-কোনো কাজ আছে?' হোম-সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা-করার কথা শুনে কাউকে ডেকে যোগেনকে পৌঁছে দিতে বললেন।

৭৩

যোগেনের এমএলএগিরি সেক্রেটারির সঙ্গে

হোম-সেক্রেটারির ঘরে ঢোকার আগে যোগেনের কেবলই মনে হতে থাকে—বোধহয় সে আপৈলঝরা স্কুলের ব্যাপার সবটা নলিনীবাবুকে বলতে পারেনি। নিজে নিশ্চিত হওয়ার আগেই সে হোমের ঘরে ঢুকে পড়ে আর ঢুকতেই তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন, 'হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ?'

এই জায়গাতেই যোগেনের অসুবিধে—সে সেক্রেটারিয়টের এই আদবকায়দাগুলি আয়ত্ত করতে পারছে না। সে তো মোটামুটি জেনে গেছে কী করতে হয়। 'হাউ ডু ইউ ডু', 'মে আই হেল্প ইউ,' 'থ্যাঙ্ক ইউ এ লট,' 'আই থিঙ্ক ইটস বেয়ন্ড মি'—এই কথাগুলি উপলক্ষ অনুযায়ী বলতে হয়। দেখা হলেই 'গুডমর্নিং', 'গুড আফটার নুন', 'গুড ইভনিং' করতে হয়। এমন কিছু ব্যাপার না। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে তো শাহেবদের সঙ্গে মিটিং করেছে আর ওকালতিতেও

তো এইসব লব্‌জ লাগে। কোথাও তেমন কোনো অসুবিধে হয়নি। আইনসভায় ও সেক্রেটারিয়েটের পরিবেশটাই শাহেবি। বা, আইনকানুনে ঠাসা। বা, আদবকায়দা দুরস্ত। বা, কেতাটা অচেনা। যেন অনেকটা বামুনবাড়ি ঢোকার মত, কী যে ছুঁয়ে দেবে সেই ভয় মরা পর্যন্ত কাটে না। যোগেন তো বলিয়েকইয়ে চালাকচতুর। সে তো খুব অপ্রস্তুত হয় না।

কোর্টে তার দেশেরই একটা লোক আসামি, দুটো লোক সাক্ষী, আরো একটা লোক উকিল—এটাই পরিবেশ বদলে দেয়। তাকে আশ্বস্ত করে যে সে নিজের জায়গাতেই আছে। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড মিটিঙে কালেক্টারের সঙ্গে দেখা হলে সে রসিকতাও করত, 'হ্যাভ ইউ বাই দিস টাইম লার্ন্ট' টু সেপারেট দি বোনস ফ্রম দি ফিশ?' কালেক্টারও হয়ত বলতেন, 'বেছ্ছে খাওয়া।' পুরনো আলাপের একটা সুতো থাকে—সে, মাছের কাঁটাবাছা নিয়েই হোক। মাছটা তো বরিশালের।

কিন্তু এই আইনসভায় বা সেক্রেটারিয়েটে যোগেন এখনো কিছু পায়নি যা তাকে স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারে। চেনা মানুষজনের চেনা কথাবার্তা, চেনা জায়গা, চেনাজানা কোনো বিষয়, চেনাজানা ঘর কিছুই নেই। সেখানে যোগেন কী করে 'হাউ ডু ইউ ডু' বলে। সে হাসি দিয়ে ম্যানেজ করে।

'বলুন, মিস্টার মণ্ডল, আমরা কী করতে পারি!'

'আমাদের ভাষায় বলে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। এর ইংরেজি কী হতে পারে? ধরুন, দণ্ড মানে পানিশমেন্ট আর মুণ্ডু মানে হেড। তাহলে তো বোঝানো উচিত ইউ আর দি মাস্টার অব মাই হেড অ্যান্ড মাই ওয়ার্কস।'

শাহেব হাসলেন বটে, বোঝাই গেল বোঝেননি। যোগেন কথাটা ইংরেজিতে ঠিকঠাক বলতে পারেনি, কেন যে গেল বলতে। তাছাড়া, তার উচ্চারণের কারণেও শাহেব না বুঝতে পারে। হঠাৎ যোগেন সংশোধন করে, 'না। এটা বরং ঠিক হবে—দি লর্ড ওভার মাই হেড অ্যান্ড হার্থ—।'

শাহেব 'ওভার মাই হেড অ্যান্ড আর্থ' বলে আরো জোরে হেসে ওঠেন। তারপর বলে, 'লাভ পোয়েম? লর্ড ওভার মাই হেড অ্যান্ড আর্থ—'

যোগেন আবার শুরু করতে যায় দণ্ডমুণ্ডের কর্তা থেকে কিন্তু এতটা তাকে বোঝাতে হবে আর শাহেবের ভুল হাসি এতবার শুনতে হবে যে, সে ছেড়ে দেয়। যেটুকু বিরতির পর বোঝানো যায় সে এবার কাজের কথাটা বলছে, সেটুকু সময়ের পর যোগেন বলে, 'টেন্যান্সি অ্যাক্ট তো ইনট্রোডিউসড হয়েছে। বেঙ্গল এগ্রিকালচার‍্যাল ল্যান্ডে এর ফলে কী বদল ঘটবে—তার তো কোনো ডাইরেকশন নেই।'

শাহেব একটু চুপ করে থেকে পেন্সিলটা ঠোঁটের ওপর দু-বার বুলিয়ে গলার স্বর বদলে প্রশ্ন করেন, 'কেন দরকার হবে, বলুন তো! আমরা তো একটা আইন তৈরি করতে চাই। যে-আইনে রায়তরা উ'ল এনজয় এ শেয়ার অব দি ওনারশিপ, ইরেস পেকটিভ অব দি জামিন্‌দার্স। কেন এমন আইন দরকার হচ্ছে আর এই আইনের উদ্দেশ্য কী, ইনট্রোডাকশনে তো সেসবই বলা আছে। আইন যাঁরা বানাচ্ছেন, তাঁরা এই দুটো কথা পর্যন্ত জানিয়ে দিতে পারেন যাতে গবর্নমেন্টের কাছে পরিষ্কার থাকে—কী করতে চাওয়া হচ্ছে। যাতে, একজিকিউশনের সময় কোনো অস্পষ্টতা না থাকে। কিন্তু সোস্যাল ডাইমেনশন, লাভক্ষতি এসব গভ্‌মেন্টের বিবেচ্য হবে কেন।'

যোগেন শাহেবদের সঙ্গে কাজের কথা বলতে পারে ভাল। তাদের জিলায় তো সেসন, সাবডিভিশন্যাল কোর্ট, এসপি, ডিএসপি, হাসপাতালের সিবিল সার্জেন—এদের সঙ্গে সবাইকেই

অনবরত কাজ করতে হয়। তার ওপর আছে লঞ্চ কোম্পানিগুলির শাহেব—বেশির ভাগই অ্যাংলো। শাহেব-অফিসারদের মধ্যে কেউ-কেউ থাকে—নতুন কথা বা প্রস্তাব শোনামাত্রই নাকচ করে। তারপর যদি লেগে থাকা যায় তাহলে একইরকম হঠাৎ রাজি হয়ে যায়। কেউ-কেউ আবার প্রথমদিকে কোনো কথাই বলে না। শুনতে-শুনতে, যে-বলছে, তার বলাই ফুরিয়ে দেয়। তারপর, বলতে শুরু করে প্রস্তাবটা খুব ভাল তবে অসম্পূর্ণ। সম্পূর্ণতার জন্য যা-যা দরকার তা শাহেব বলতে শুরু করে আর বলতে-বলতে, যে-বলতে এসেছে তার বলা ফুরিয়ে দেয়। শাহেবরা সাধারণত ভিতু হয় আর সবকিছুকে সন্দেহ করে। এখন তো যোগেন চেহারা ও ভাবসাব দেখে বুঝতে পারে কে স্কটল্যান্ডের, আর কে আয়ার্ল্যান্ড বা ওয়েলসের। কারাই বা স্যাক্সন। ম্যাপট্যাপ এঁকে, আড্ডা মারতে-মারতে, নানা মজা করে, একটু-আধটু অ্যাকটিং করে যোগেনকে এসব খুব ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছিল দুই রাত্রির এক লঞ্চ যাত্রায়, বোরিস বলে এক বছর বাইশ-তেইশের শাহেব—আইসিএস-এর প্রোবেশনে এসেছিল। বরিশালের একেবারে দক্ষিণ-পুব মেঘনার একটা চর আছে, মনপুরা। জনবসতি কম। কিন্তু ফলন ভাল বলে জমির দর বেশ চড়া। মুসলমানদের আইন আছে, কেউ ইচ্ছা করলে মৃত্যুর আগে বা মৃত্যুর সময়ও, 'ইকরারনামা' তৈরি করতে পারে— তার অন্য সব দলিলদস্তাবেজের বা উত্তরাধিকারের ওপর ইকরারনামা। ফলে, বড়-বড় সব মালিকের ছেলেমেয়েরা বা ভাইরা বা জামাই-বৌরা অন্য সব অনুপস্থিত হকদারের পাওনা ঠকিয়ে জালি ইকরার নামা বানিয়ে সম্পত্তির দখল নিতে থাকে—বিশেষ করে দুর্গম গ্রামে। ইসলামি আইন অনুযায়ী নিকটতম মশজিদের ইমাম এই ইকরারনামা-র একমাত্র প্রয়োজনীয় সাক্ষী। এই ইকরারনামা-র সুযোগ নিতেই মুসলমান মালিক প্রধান দুর্গম সব জায়গায় মশজিদ তৈরি হতে থাকে। শেষে সরকারকে বাধ্য হয়ে ১৮৯৫-এ এই আইন বানাতে হয় যে একজন ওকালতনামা ভুক্ত উকিল ও একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মর্যাদার সরকারি অফিসারের সাক্ষ্য ছাড়া ইকরারনামা গ্রাহ্য হবে না। তখন শুরু হল, দূরদূরান্ত থেকে সময়ে-অসময়ে সদরে এসে দল বেঁধে কান্নাকাটি—আমার নানার শ্বাস উঠেছে, এখনো বেঁচে আছে কী না সন্দেহ, উনি ইকরারনামা করবেন। শিগগির চলুন। সরকারি অফিসারদেরও ঘ্রাণশক্তি বাড়ে। বাড়ির মালিক মারা যাচ্ছে আর তোমরা বাড়িশুদ্ধু সদরে এসেছ? কোনো-কোনো থানা-অফিসার, সংবাদ যে নিয়ে এসেছে, তাকে পেটাই দিয়ে হাজতে ঢোকানোর হুকুম দিতেন। তখন সত্যি কথা বেরিয়ে পড়ত। ফলে ইকরারনামা ঘটিত জালিয়াতি কমেছে।

মনপুরচরের বায়েত্ মামুদ নাম করা বড় চাষি। তাঁর উকিলই কোর্টকে জানায় যে বায়েত্‌শাহেবের শরীর অনেকদিন ধরেই খারাপ চলছে। এখন ওঁর ভয় হচ্ছে —হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হলে সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা কী হবে। তিনি যথাযথ একটি ইকরারনামা করে শেষদিনের জন্য তৈরি হতে চান।

বায়েত্ মামুদ শাহেবের ইচ্ছার অসম্মান করা যায় না। আর কাজটা তখনই করতে হবে। সরকারি উকিল এজলাশের এদিকওদিক তাকালেন। এজলাশ ফাঁকা। যোগেন বসেছিল তার সিনিয়ারের পেছনে। তারও পেছনে বেঞ্চের এক কোণে বসে ছিল বোরিস, হাতে একটা বই কিন্তু সেটা খোলা নয়। যোগেন তখনো আর্টিকেল্ড। হঠাৎ তারই সিনিয়ার কোর্টকে বলে বসলেন, 'যোগেনরে পাঠাইয়্যা দ্যান। বায়েৎশাহেবের কাজে তো কোনো জালজোচ্চুরির ভয় নাই। গিয়া দেইখব সব রেডিই আছে।'

মনপুরার চর মানে তো তেঁতুলিয়া দিয়ে মেঘনা।

যোগেন শুধু বলেছে, 'সে তো দুইদিনের লঞ্চযাত্রা—' আর তার সিনিয়ার খেঁকিয়ে ওঠেন—

'বরিশালে ওকালতি করতে আইছ, খালনদী ছাড়া পথ নাই ; তোমার অসুবিধাটা কীসে, টাইমে না লঞ্চে না নদীতে?'

যোগেন শুধু বলতে পারে, 'আমি তো যাবই। ডেপুটিডা ঠিক কইর‍্যা দ্যান। পাইরলে আইজই রওনা দেই।'

হঠাৎ বোরিস দাঁড়িয়ে বলে, 'ওঁর সঙ্গে যেতে চাইলে আমাকে কি যেতে দেয়া হবে?'

সরকারি উকিল তাকে জানিয়ে দেয়, 'অফ কোর্স। ইউ আর অন প্রবেশন। ইউ সুড গো ইফ ইউ ক্যান।'

বোরিস হেসে যোগেনকে ডাকে, 'চলো, তাহলে আমরা রওনা হই? সারারাত ধরে নদীর জলে?'

বোরিসের সুবাদে সরকারি একটা ডিঙিবোট পাওয়া গিয়েছিল।

সেই-সেই যাত্রায় নদীর ঐ ব্যাপ্তি ও বেগ দেখে বোরিসের উচ্ছ্বাস একটু অন্য খাতে বইল রাত্রির অন্ধকার নদীকে দৃশ্যত ঢেকে দিলে। তখন শোনা যাচ্ছে শুধু জলকল্লোল, শুধুই। আর যেহেতু দেখা যাচ্ছে না, স্রোতের ধ্বনিই দৃশ্য হয়ে উঠছিল। সেই ধ্বনিময় বারিপ্রবাহে বোরিস যেন একাই ভাসছে, তারার আলোগুলিতে জলে ছায়া ফেলে। পরে, যোগেন জেনেছিল, বোরিস কবিতা আওড়াচ্ছিল, কিটসের।

বোরিসের কাছেই যোগেন জেনেছিল—ভারতে সিবিল সার্ভিসে আসা গ্রেট ব্রিটেনে—কতটা সম্মানের। সিবিল সার্ভিস তো আরো কত দেশের আছে—নিউজিল্যান্ড, কানাডা, ইজিপ্ট, রোডেশিয়া, প্রেটোরিয়া কোথায়-না? কিন্তু কোনোটাই ইন্ডিয়ার সমতুল্য নয়। একমাত্র ইন্ডিয়ার বেলাতেই ভাবা হয়—একটা সিভিলাইজেশনে ঢুকছ। 'ইয়োর গান্ধী হ্যাজ ডান মিরাক্‌লস উইথ অ্যান্টিকুইটি।' ভেঙিয়ে-ভেঙিয়ে দেখিয়েছিল, স্কটিশদের সঙ্গে পালটা চেঁচালেই কাজ হয় আর আইরিশদের প্যাঁচে ফেলার উপায় কথা না-বলা, 'দে ডোন্ট বিলিভ ইন এনি ওয়ার্ক, দ্যাট ডাস নট প্রোডিউস ওয়ার্ডস', একটু সন্দেহবাতিক সত্ত্বেও ওয়েলসের লোকরা হেল্পফুল, এবং কোনো স্যাক্সনকে কখনো বিশ্বাস করবে না।

বোরিসের শেখানো সব লক্ষণ দিয়ে যোগেন আন্দাজের চেষ্টা করে, হোম-সেক্রেটারি কি তাহলে স্কট, যেমন, প্রথমেই, যোগেন যা বলছে, সেটা নাকচ করে দিল। তাহলে বোরিস-এর সূত্র অনুযায়ী পাল্টা গরম দিতে হয়।

'আপনারা এত ওভারসিয়োর হন কী করে? গবমেন্ট সোস্যাল ডাইমেনশন, লাভক্ষতি এসব নিয়ে ভাববে না? আপনারা ভাবেন না? তাহলে সার্‌দার অ্যাক্টে কোনো মুসলমানকে কোনোদিন ধরেন না কেন? অগ বা আমাগ সমাজে তো বিয়্যাশাদি বাল্যকাল ছাড়া হওয়াই পাপ। কিন্তু মুসলমানদের কি আপনারা রেয়াৎ করেন না, পাছে রায়ট লাগিয়ে দেয়? আপনারা পাটের দর বাঁধছেন না কেন, নামতে দিচ্ছেন কেন—যাতে মিলগুলা শস্তায় কিনতে পারে বলে নয়?'

হোম-সেক্রেটারি পেন্সিলটা টেবিলের ওপর ফেলে দিয়ে চোখ বড়বড় করে বলেন, 'আরেববাপ, আপনি তো একেবারে স্পিচ রেডি করে এসেছেন। বলুন, আপনার কী কী ফ্যাক্টস চাই—'। হোম একটা কাগজে পেন্সিল ঠেকান।

স্কটরা কি একটা পালটা-ধমকেই ঢিট হয়ে যায়। না কী হোম, ওয়েলস-এর? সন্দেহবাতিক আছে কিন্তু হেল্পফুল।

'আপনি ঝগড়া করলে ঝগড়া করতে পারি, তাই বলে কি আমি জানি, কী কী ফ্যাক্টস চাই?'

'মাই গ—ড', হোম দুই হাত মাথার ওপর তুলে হো হো হাসতে থাকেন, 'মিস্টার মণ্ডল,

এই একটা জ্যান্ত অ্যাসেম্বলির আপনাদের মত ইগার অ্যান্ড ইউথফুল মেম্বারদের সঙ্গে কাজ করার এক্সপিরিয়েন্সটাই আলাদা—'

'কেন, মন্ত্রী তো আপনাদের আগেও ছিল।'

'তা ছিল। কিন্তু তাঁদের তো কোনো অ্যাসেম্বলি ছিল না। রেসপনসিব্‌ল টু দি অ্যাসেম্বলি, ইলেকটেড অ্যাসেম্বলি,—এটা তো অ্যাজ গুড অ্যাজ পার্লিয়ামেন্টারি ডেমোক্রেসি।'

যোগেন বুঝতে পারে না, হোম, তাকেই পরীক্ষা করছে কী না। সে তর্কে না গিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ইংরেজরা ভোট ভালবাসে খুব। আর, বোধহয় কমিটি।'

'এটা একেবারে ঠিক। বোধহয় আমাদের আত্মবিশ্বাস কম, তাই নিজের ওপর ভরসা না-রেখে কালেকটিভের ওপর চাপিয়ে দিই। সমাজের দিক থেকে সেটা অবিশ্যি সেফ'।

'নিশ্চয়ই। আমাদের দেশে তো নিশ্চয়ই। কিন্তু আমাদের দেশে তো আপনারা একটা লেজুড় রেখেছেন। জনমত ইজ অ্যাকসেপ্টেড অ্যাজ জনমত অনলি হোয়েন হিজ এক্সেলেন্সিজ টেক ইট টু বি জনমত।'

হোম একটু চুপ করে গেলেন, চোখটা নামালেন। যোগেনের এ-কথাটা ওঁর পক্ষে শেয়ারকরা সম্ভব নয়। আর, কথার ঝোঁকে যোগেন ঠাট্টা করে ফেলেছে বেশি। সে একটু নিচু স্বরে বলল, 'কিন্তু আমাদের দেশে কালেকটিভগুলি অনেক সময়ই এত কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও সেকেলে যে অনেক সময়ই ধর্মীয় কারণে আইনকে বা আইনসভাকে কাজে লাগাতে চায়। একটা লাস্ট চেকিং অথরিটি দরকার। যুক্ত প্রদেশে তো কংগ্রেস আইন পাশ করে নিয়েছিল যে গরুকাটা বেআইনি। লাটশাহেব ফিরিয়ে না দিলে আইন পাশ হয়ে যেত।'

একটু চুপ করে থেকে হোম বলে, 'আপনি কী ফ্যাক্টসের কথা বলছিলেন?'

'আমার মনে হচ্ছে, টেন্যান্সি অ্যাক্টের এই সংশোধনে শুধুই রায়তি প্রজার কথা ভাবা হয়েছে। স্থায়ী রায়তদের কথা। কিন্তু লিগ্যালি অ্যান্ড মোরালি টেনান্সি শুড মিন দি ল্যান্ড ইউজ প্যাটার্ন যার হেতু নানারকম মালিক তার অধীনস্থ কৃষকের কাছ থেকে নানারকমের খাজনা আদায় কর‍্যাই চইলছে। এইডা কি বাইর করা যায়—টেনান্সি সংশোধনে সুবিধাপাওয়া রায়তি প্রজার জেলা ওয়ারি সংখ্যা কত। আর নমশুদ্দুর সমাজের কত শতাংশ কৃষিকাজের কোন্ স্তরে যুক্ত।'

'এত কঠিন হোমটাস্ক আমাদের দিলেন? এটা তো ল্যান্ড ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার—'

'ওদের কাছ থেকে আপনি আনান্যা নেন, আমাদের কাছে, হোম, সুইট হোম।'

যোগেন হাসতে-হাসতে দাঁড়িয়ে উঠেছিল, শাহেব চেয়ারে বসে থেকেই জিগগেস করলেন, 'আপনি কি খুব ব্যস্ত'?

'না তো, কিছু বলবেন?'

'আপনাকে একটা অনুরোধ করব?'

'নিশ্চয়ই', যোগেন বসে।

'আপনি কি হবিগঞ্জের কোনো খবর পেয়েছেন?'

'হবিগঞ্জের? মানে সিলেটে তো?'

'সেখানকার ইন্দ্রাহিন্দু রায়টটা তো আবার মাথা চাড়া দিয়েছে। প্রায় বছরখানেক হল আমরা গবমেন্ট থেকে সামলানোর চেষ্টা করছি। কিন্তু যেই ভাবছি থামল, অমনি একটা নতুন গোলমাল বাধছে। সত্যি দায়িত্ব পুরোটাই উঁচুজাতের হিন্দুদের। আর নমশূদ্ররাও এখন তাদের জিদ ছাড়ছে না। কাল আমি আসামের হোম-এর একটা রেডিয়োগ্রাম পেয়েছি—সঙ্গে সিলেটের ডিএম-এর রেডিয়োগ্রাম। আপনাকে দেখে মনে হল—আপনার মত কেউ একজন, যাঁকে গবমেন্টসহ

তিনপক্ষই মানতে পারে ওখানে যদি যান, সবার সঙ্গে কথা বলেন, তাহলে একটা সমাধান বেরতে পারে—আমরাও, মানে ওখানকার গবমেন্ট, সেই সূত্র ধরে আর-একটু শক্ত হতে পারি।

বাঙালিরা জড়িয়ে আছে বলেই আসাম গবমেন্ট খুব একটা মেজার নিতে সংকোচ করছেন। শেষে একটা ছোট রায়ট ঠেকাতে গিয়ে আসামি-বাঙালি রায়ট বেধে না যায়।'

যোগেন একটু গম্ভীর হয়ে চুপ করে থাকল, কপালে ভাঁজ ফেলে একটু অন্যমনস্ক তাকিয়ে থাকল—এটা যোগেনের ভঙ্গি একটা—যখন সে নাকের ডগার চাইতে বেশি দেখতে পায়।

'হ্যাঁ। আমি যাব। ব্যবস্থা আপনারা করবেন, না আমিই করে নেব?'

'না, না, সে কী? আপনি তো গবমেন্টের অনুরোধে যাচ্ছেন। আমরা বাধিত। আপনি কবে যেতে পারবেন, বলুন।'

'আজই। সন্ধেবেলা ঢাকা মেলে। তাহলে কালকের মধ্যে পৌঁছে যাব।'

'এর চাইতে ভাল আর কী হতে পারে।' শাহেব বেল টিপে কাউকে ডাকলেন। যে এল, তাকে বললেন, কোনো একজন পালিতবাবুকে ডেকে দিতে। পালিতবাবু শব্দটা যোগেনের কানে এল, শাহেব 'প্যা' না বলে 'পা' বলার চেষ্টা করায়।

যোগেন মনে-মনে ছকে নিচ্ছিল সিলেটের ও হবিগঞ্জের নকশাটা। ছকে নিচ্ছিল না ঠিক, মনে এসে গিয়েছিল। যোগেন সেটা বরং মুছে দিল— সেই নকশাটার দরকার নেই বলে। হবিগঞ্জে এমন একটা গোলমালের খবর তার কানে এসেছে, সে শুনেছে, কিন্তু খবরটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েনি। জড়িয়ে পড়েনি মানে তার বা অন্য কোনো নেতার কাছে কোনো তেমন দরকারের কথা পৌঁছয়নি।

যোগেনের এমএলএগিরি বড়বাবুর সঙ্গে

৭৪

শাদা লংক্লথের ফুলশার্ট, হাতায় বোতাম আঁটা, মালকোঁচা ধুতি ও কাবলি স্যান্ডালে যিনি এলেন তিনি পালিতবাবু ছাড়া কেউ হতেই পারে না। পালিতবাবু বসেন না। হোম যোগেনের দিকে হাত দেখিয়ে বলেন, 'মিস্টার জে এন মণ্ডল এমএলএ। উনি আজ সন্ধ্যার কোনো ট্রেনে সিলেটের জন্য রওনা হবেন। মানে, আমরা ওঁকে অনুরোধ করেছি। উনি সঙ্গে-সঙ্গে দয়া করে রাজি হয়েছেন। ওঁকে পৌঁছুতে হবে হবিগঞ্জে অত্যন্ত দরকারি সরকারি কাজে—আসাম ও দিল্লিও জড়িয়ে আছে। এত কথা বলছি এই কারণে যে, এমএলএদের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা আমাদের এখনো হয়নি বলে অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটি হয়ে যায়। এটা যেসব এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এরিয়ার মধ্য দিয়ে উনি যাবেন, মানে ওঁকে যেতে হবে সেসব জায়গার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হেডকে জানিয়ে দেবেন আমার নামে।'

পালিতবাবু যোগেনকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কোন্ ট্রেনে যাবেন স্যার?'

'দেখুন, কোন্ ট্রেনে যাওয়া যায়? ঢাকা মেল হলেই ভাল।'

'ঢাকা মেলেই হবে স্যার। এ তো আমাদের রিকিউজিশন।'

হোম বললেন, 'একটা গাড়ি নিয়ে ওঁর বাড়ি হয়ে স্টেশনে পৌঁছে দেয়া যাবে না?'

নিজের ক্ষমতার ভিতর থেকে পালিতবাবু বলেন, 'নিশ্চয়ই হবে স্যার। টেলিগ্রামগুলো

পাঠিয়ে আমি ওঁকে নিয়ে বেরব।' যোগেনকে বলেন, 'আপনি তাহলে চলুন, আমাদের ওখানে—'

যোগেন অপ্রস্তুত উঠে পড়ে বেরিয়ে আসে, 'এটা স্যার কী বলছেন? ঢাকা মেল ধরতে সঙ্গে লোক?'

হোম হেসে হাত নাড়ান আর পালিতবাবুর পেছন-পেছন যোগেন শাহেবের পি-এর ঘরের ফালিতে ঢুকে দোলাদরজা ঠেলে রাইটার্সের বিখ্যাত দোতলার বারান্দায় পড়ে। সামনে ডালহৌসি স্কোয়ারের জল পাড়ের গাছের ছায়ায় সবুজ হয়ে আছে আর দক্ষিণে আরো নানা সবুজে যোগেন চিনে ফেলে ইডেন। একটু হাসেও—চিরকাল ঐ জায়গাগুলিতে দাঁড়িয়ে রাইটার্স দেখেছে, আজ রাইটার্স থেকে ঐ জায়গাগুলি দেখছে। যোগেনের বাঁয়ে একটার পর একটা সিংদরোজার পাশে দেয়ালে ঝকঝকে পিতলের নেমপ্লেটে ইংরেজি হস্তলিপির লতানে বাহার। নামগুলি পড়া যায় না, শুধু 'সেক্রেটারি' আর 'আইসিএস' পড়া যায়। দুটোতে দেখল অতিরিক্ত বিএ (ক্যান্টার) আর বিএ (অক্সফোর্ড)। একটা নামের শেষটুকু পড়তে পারল 'উল্লা'।

'এখানে কি সেক্রেটারিরা বসেন?'

'কমিশনাররাও বসেন। মন্ত্রীরা ঐ দিকের শেষে আর পেছন দিকের শেষে। তবে মন্ত্রীদের নেমপ্লেটগুলো পিতলের নয়, কাঠের।'

'কেন?'

'বদলায় তো!' পালিতবাবু গলাটা নামিয়ে প্রায় ফিসফিসিয়ে বলেন, 'এইটা মিস্টার সিম্পসনের ঘর ছিল, আইজি অব প্রিজনস, তিনজন টেররিস্ট সোজা ওর ঘরে ঢুকে গুলি করল—না, বছর সাত আগে? এই করিডর দিয়েই দৌড়ে পুলিশ কমিশনার টেগার্টের ঘরে ঢুকেছিল। টেগার্ট ছিল না ঘরে, বেঁচে গেল। একজন টেররিস্ট এখানেই মরে গেল। আর-একজন শুনেছি হাসপাতালে। একজনেরই ফাঁসি হল।'

যোগেন যেসব কথা শুনতে পেল, তা নয়। আর রাইটার্সের সেই বিপ্লবী যুদ্ধের কথা সে এতটা জানেই না যে-যেটুকু জানে না, সেটুকু ভরে নিতে পারবে। সেদিনকার বিক্ষোভ তাহলে ছিল যে-বিপ্লবীদের ফাঁসি না দিয়ে আন্দামানে পাঠানো হয়েছে। এসবও তার অর্ধেক শোনা কথা। কিন্তু সেদিনের বিক্ষোভের লক্ষ তো ছিল সে-ও। সে জেনে নিল না কেন? চোখের সামনে সেই ঘরগুলো দেখে যোগেনের চোখের সামনে বিপ্লব ও যুদ্ধ ধারণাটা সত্য হয়ে উঠল।

পাশের একটা প্যাসেজে দুই রাইফেলধারীর মাঝখান দিয়ে পেছনের একটা সরু বারান্দায় পড়ে ওদের বাঁয়ে ঘুরতে হল। পালিতবাবুর গলাও একটু উঁচু হয়, 'শাহেবরা খুব ভয় পেয়ে গেছে তখন থেকেই। ভাব দেখায়—এসব কেয়ার করে না। কিন্তু কোনো এদেশী ভিড়ের কাছাকাছিও যায় না। কাল লোক দেখলেই যেন ভূত দেখে। ভূতই তো। কার ওপর টেররিস্ট কখন ঝাঁপাবে কিছু ঠিক আছে? মরতে ভয় পায় না, এমন ভূত দেখে কে আর ভয় না পাবে?'

'সে তো বটেই। প্রাণের ভয় আর কার নেই। তাও সেগুলো তো জানা ভয়—এই নদীতে এইখানে ডাকাতি হয়, এই রাস্তার ঐ মাঠে একটা ব্রহ্মদৈত্য থাকে। কিন্তু কে কোথায় আমাকে গুলি করে মেরে ফেলবে—এমন আন্দাজি ভয়ে তো ভয় পেতে-পেতে মরেই যেতে হয়'। যোগেন আচমকা থেমে গেল। মনে হল সে তার অজ্ঞানতা ঢাকতে পারছে না। এমন অজ্ঞানতা অপরাধ কী না, যোগেন জানেই না। ৩০ থেকে ৩৫ তো সে কলকাতাতেই থাকে—আইন পড়তে, আর্টিক্লড থাকতে। সে যে-সমাজে বাস করে, প্রতিদিন চলাফেরা করে সেই সমাজের কারো কাছ থেকেও তো সে শোনেনি।

'তিরিশ-একত্রিশ থেকে শাহেব-মারার ধুম লেগে গিয়েছিল। চট্টগ্রাম। আলিপুরের সেসনজজ

গার্লিক। মেদিনীপুরের ডিএম, ডগলাস। গভর্নর স্যাকশন—মরেনি অবিশ্যি। এই গভর্নর অ্যানডারসন—'

'এই, আমাদের লাটশাহেব?'

'হ্যাঁ—আ। লেবঙে। দার্জিলিঙে গুলি মারল না? বছর তিন আগে। বাইরে থেকে বোঝা যায় না, লোকে তো বলে ডান পাঁজরে নাকী একটা গুলি বিঁধে আছে। বের করতে পারেনি। খুব ভয় পায়। এখনো।'

'এই লাটশাহেব? এই-যে আমাদের অ্যাসেম্বলিতে স্পিচ দিলেন? এই গভর্নর?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ। আপনি জিজ্ঞাসা করছিলেন না কে কোথায় বসে। সেসব রাইটার্সে আর ঠিক নেই। একজনের নেমপ্লেটে আর-একজন বসে। নতুন সব দরজা বসেছে। আগে তো রাইটার্স গমগম করত। কত লোক আসত। এক শাহেবের গল্প আছে, কী নাম ঠিক জানি না। বদলাতে-বদলাতে এখন মুলাশাহেবে দাঁড়িয়েছে। চিফ সেক্রেটারি ছিলেন, উনি নাকী শীতকালে রাইটার্সের ঐ বারান্দায় রোদ পোয়াতে-পোয়াতে অফিস করতেন। একদিন নাকী ওপর থেকে দেখেন ড্যালহৌসি স্কোয়্যারে বাঁদর নাচ হচ্ছে। সঙ্গে-সঙ্গে দুই বেয়ারা পাঠিয়ে বাঁদরওয়ালাকে ওপরে আনান। তারপর রাইটার্সের বারান্দায় সেই বাঁদরওয়ালার ডুগডুগিসহ বাঁদর নাচ। সারা রাইটার্স ভেঙে পড়েছে দেখতে—'

'কদ্দিন আগের কথা?'

'সে বলা মুশকিল। শাহেবের নামটাই বদলে গেছে। এই ঘরে স্যার', বলে বাঁদিকের ঘরটাতে ঢুকলেন। এটা যোগেনের চেনা—এরকম ঘর। তিনটি আলমারির পেছন দিয়ে একটা আড়াল। আলমারির মাথায়, টেবিলের ওপর, মেঝের ওপর শুধু কাগজ, শুধু কাগজ, ধুলোপড়া ছাইরঙা কাগজ।

'চা খাবেন, স্যার?'

'না থাক—'

'এ স্যার সেক্রেটারির ঘর না যে পরের ভিজিটার এসে আগের ভিজিটারের জন্য বলা চা খাবেন। তাও ঠান্ডা। এটা স্যার, রাইটার্সের পাবলিক এরিয়া। বলা মাত্র ধোঁয়া বেরনো চা। ল্যাংচার সাইজও স্যার, স্পেশ্যাল। বলে আসছি, স্যার।' পালিতবাবু বেরিয়ে যাওয়ার পর যোগেন যেন একটু থিতু হতে পারে। হোমের ঘরে তার হঠাৎ মনে হয়ে গিয়েছিল, তাকে ইচ্ছে করেই নিজের সঙ্গে নিয়ে এলেন পালিতবাবু, হোমকে রিলিফ দিতে। কিন্তু তখন পালিত, তাকে 'স্যার' বলেনি। সে মণ্ডল বলে? পরে অবিশ্যি 'স্যার', 'স্যার' করেছে এতবার যে ঐ সন্দেহটা আর ঠেকানো যায় না।

ঐ শাহেব খুনের গল্প শুনতে-শুনতে আরো একটা কারণে মনে হয়েছিল যোগেনের যে সে মণ্ডল বলেই এই বীরত্বের অংশ তো নয়ই, এমনকী সেই ইতিহাসের শ্রোতাও নয়। নিজেকে তার নিরবলম্ব ঠেকা থেকে বাঁচাতে পারছিল না।

একেবারেই আচমকা লাটশাহেব অ্যানডারসনের গুলিখাওয়া ও ভয়পাওয়ার ঘটনা জেনে ফেলায় যেন মাসখানেক-মাসদেড়েক আগের ২৯ জুলাইয়ের 'রাজবন্দীদের মুক্তি চাই'—ধ্বনিত চেম্বারে শান্ত বক্তৃতার শেষে হঠাৎ সদস্যদের দিকে পেছন ফিরে লাটশাহেবের অবোধ্য ও চিৎকৃত ভয়ের অন্ধকার যোগেনের চোখে বিদ্যুদাঘাতে চিরে যায়। যোগেন স্বস্তি পায় কেন যে লাটশাহেবের ভয় পাওয়ার কারণের মধ্যে সেও আছে। 'মণ্ডল' বলে সে অচ্ছুৎ নয়, শাহেবের ত্রাস হিশেবে। পালিতবাবু ফিরে আসতে-আসতে যোগেন স্বস্থ হয়।

'নতুন 'রুলস অব বিজনেস' 'তো এসে গেছে। আপনারা পেয়েছেন তো?'

'পেয়েছি তো। রুলস অব বিজনেসের খোঁজ পড়ে তো গোলমালের সময়। বিজনেস অ্যাজ ইউজুয়্যালের সময় রুলস দেখে কে?'

'আমার তো স্যার, পঁচিশ বছর হল সার্ভিস, তার মধ্যে সেক্রেটারিয়েটে সাত বছর। আমাদের এতরকম কাজ, এতরকমের অর্ডার, এত আইনকানুন, দিনেদিনেই বাড়ছে, তাছাড়া কোর্ট এখন স্টে-অর্ডার দিচ্ছে ঘনঘন, যে, বিজনেস ইউজুয়্যাল বলতে কিছু আর নেই। সবই আনইউজুয়্যাল। তাছাড়া কাজের এফিসিয়েনসিও কমে যাচ্ছে, স্যার।'

পালিতবাবু একটা শাদা কাগজে কালি দিয়ে লিখতে লাগলেন, হ্যান্ডেল কলমের নিব দোয়াতে ডুবিয়ে-ডুবিয়ে। যোগেন বসে থাকল। লেখা শেষ করে পালিতবাবু বললেন, 'টেলিগ্রামটা একটু শুনুন স্যার। মিস্টার যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, মেম্বার, বিপিএলএ, ইজ অন ট্যুর ইন সিলেট, হবিগঞ্জ অ্যান্ড নেইবারিং এরিয়াজ টু রেসটোর কমিউন্যাল হার্মনি। গবমেন্ট কনসিডারস ইট এ ভেরি ইমপর্ট্যান্ট ইভেন্ট। মিস্টার মণ্ডল বি রিসিভড ইন কিশোরগঞ্জ অর হবিগঞ্জ অ্যান্ড হি বি গিভন ভেহিকলস, অ্যাকোমেডেশন, অ্যান্ড অল সাচ আদার হেল্প অ্যাজ হি আসক্স ফর...'

'এর আর ঠিক-বেঠিক কী? গবমেন্ট অর্ডার—'

'সেটাই তো বলছিলাম স্যার। এটা গবমেন্ট অর্ডার। কিন্তু আপনি ধরুন কিশোরগঞ্জ বা হবিগঞ্জে না নেমে সিলেটে নামলেন এবং কোনো অফিসার সেখানে আপনাকে রিসিভ করার জন্য থাকল না। পরে, আমরা যখন এখান থেকে জানতে চাইব—কেন ছিল না। সঙ্গে-সঙ্গে ওদিক থেকে জবাব আসবে—অর্ডারে সিলেটের নাম ছিল না।'

পালিতবাবু একজনকে ডেকেছিলেন।

সে এলে তাকে কাগজটা দিয়ে বললেন, 'সুখময়, এটা একটু টরেটক্কা করে দাও ভাই। একটু জানিয়ে যেও। অ্যাঁ?'

'এই টেলিগ্রামটা চলে গেছে জেনে আমরা বেরিয়ে যাব স্যার। শেষে দেখলেন, আপনি পৌঁছুলেন কিন্তু টেলিগ্রাম পৌঁছুল না। সু—খ—ম—য়।'

সুখময় কাগজটা হাতে ঝুলিয়েই ঢোকে।

পালিতবাবু বললেন, হাত বাড়িয়ে, 'এইখানে একটু যোগ করে দাও ভাই, ভেহিক্‌ল-এর পর অ্যান্ড প্যাসেজেস ইন রেলওয়েজ অ্যান্ড রিভারওয়েজ।

পালিতবাবু নিজেই লিখে দিলেন। সুখময় চলে যাওয়ার পর যোগেন একটু সশব্দ হেসে বলেন, 'আপনাদের এখানে তো দেখছি উকিলমোক্তার ছাড়া কেউ চাকরি পাবে না—'

'দিনে-দিনে এরকম হচ্ছে স্যার। একেকটা প্রেসিডেন্স তৈরি হয় আর কাজ বাড়ে। আগে তো সুখময়কে ডেকে বললেই হত—এই ব্যাপারে একটা টেলিগ্রাম পাঠাও। ও নিজেই ড্র্যাফট করে পাঠিয়ে দিত। এ তো বাঁধা লব্‌জ, পারবে না কেন? আমাদের ডিপার্টমেন্টেই একটা খুব খারাপ ভুলের ফলে খুব গোলমাল বেধেছিল। তাতে অপারেটার বলল, ড্র্যাফটে ছিল না। দেখাও ড্র্যাফট। তখন আর ড্র্যাফট কোথায়? ব্যস, রুল হয়ে গেল, অপারেটারকে যিনি বলবেন তিনিই সই করে ড্র্যাফটটা দেবেন। তিনমাস পর্যন্ত ড্র্যাফট থাকে এখন। শাহেবরা এখন সবকিছুতেই পলিটিকস আর টেররিজমের ভয় পায়। রিজার্ভেশন কোটায় চাকরি হওয়ার পর এই ইনএফিসিয়েনসি বেড়ে গেছে স্যার।'

'এটা বোধহয় ভুল ধারণা আপনাদের। শতাংশের অনুপাতে মুসলিম বা তপশিলিরা যে-চাকরি

পান, সেখানে জিওফিও যায় না।'

'ওদের কোনো ফ্যামিলি ট্র্যাডিশন নেই তো স্যার। আমরা তো জন্মের পর থেকেই শিখি—অর্ডার, সার্কুলার, স্টেটমেন্ট, অন অ্যাকাউন্ট—এইসব।'

'মানে—আপনারা এখন গবমেন্ট ছাড়া চাকরি করতে পারবেন না। আর ঐ কোটার প্রার্থীরা কোনো গবমেন্ট চাকরি পাবে না।'

যোগেনের এমএলএগিরি ঢাকা মেলে

৭৫

ঢাকা মেল রানাঘাটে পৌঁছুবার অনেক আগেই যোগেন একেবারে গভীর ঘুমে নাক ডাকছে। ট্রেনের আওয়াজ সত্ত্বেও তার নাকডাকার আওয়াজ, কামরায় কেউ শোনার থাকলে, শুনে যেতে পারত। যোগেন তার সেই ওকালতির ব্যাগটাতে দুটো ধুতি আর পাঞ্জাবি ঢুকিয়ে নিয়েছিল আর ভাল করে পড়ার জন্য বেঙ্গল টেন্যান্সি অ্যাক্ট অ্যামেন্ডমেন্টের একটা কপি। এখন অ্যাসেম্বলিতে তর্কবিতর্ক চলছে। সে তর্কবিতর্ক ধাঁধার চাইতে কঠিন। যে-বলছে, তার জমিদারি না জোতদারি, সে বড় জমিদার না ছোট জমিদার, সে বড় জোতদার না ছোট জোতদার, তার ভূসম্পত্তির জন্য সে কি সরাসরি ট্যাক্স আদায় করে, নাকী দখলিদারের আর তার মধ্যে আরো সব নানারকমের স্বত্বভোগী আছে সেই সব ব্যক্তিগত খবর না জানলে, সে-মেম্বারের কোনো কথার মানেই বোঝা যাবে না। সে কোন্ পার্টি আর সেই পার্টি কী বলে—সেসবের কোনো যোগাযোগই নেই। যোগেনের এ নিয়ে খুব স্বচ্ছ ধারণাই থাকা উচিত ছিল, কারণ, লোকে যেমন নির্বংশ হয়—তারা, সে ও তার পরিবার, সেইরকম নির্জমি। এমন কী তাদের বাড়িতে জমিজমা নিয়ে কোনো পুরনো গল্পও নেই।

কিন্তু ঢাকা মেলের ফার্স্ট ক্লাশে স্প্রিঙের ওপর কয়েক তাক গদিবসানো সোফায় বসে, সে-ক্যুপে দ্বিতীয় কেউ নেই, দ্বিতীয় কারো জায়গাই নেই, বসে, আরাম করে পা-দুটো সোফায় তুলে কাগজটা চোখের সামনে ধরে বড়জোর খড়দা-সোদপুর পার হয়েছে কী হয়নি—কাগজ তার হাত থেকে খসে পড়ল মেঝেতে। যোগেন জেগে থাকার কোনো চেষ্টাই করল না—সে সোফায় এলিয়ে পড়ল, তারপর ঘুমের নিয়মেই তার শরীর ছড়িয়ে গেল ও কিছু পরে নাকও ডাকতে লাগল।

রানাঘাটে ঘুমটা হয়ত একটু চটেছিল, বা, হয়ত খিদেই পেয়েছিল, গার্ড এসে, 'স্যার, স্যার' বলে দু-একবার ডাকতেই যোগেন প্রথমে চোখ খুলল, গার্ডকে দেখে অবাক হল, একই দৃষ্টিতে সিলিঙের দিকে তাকাল ও তারও পর একটু ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে কামরার দরজাটাও দেখতে হয়—সে কোথায় ও কেন সেটা মনে করলে। মনে করার পর যোগেন শান্তভাবেই উঠে বসে গার্ডের দিকে তাকায়। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, লম্বা, চোয়ালভাঙা লোকটি একটু নিচু হয়ে যোগেনের দিকে, 'বেঙ্গল টেন্যাখি অ্যাক্ট অ্যামেন্ড্‌মেন্ট'—এর কাগজগুলো এগিয়ে দেয়। যেন যোগেন তাকে কাগজগুলো আনতেই বলেছিল, এমন ভঙ্গিতে যোগেন কাগজগুলো নিয়ে, কী কাগজ একবার দেখে নিয়ে পাশে রেখে দিল। গার্ড তখন তাকে বলে, ইংরেজিতেই, 'স্যার, আপনার ডিনার কি সার্ভ করবে?'

যোগেন যেন সেই প্রশ্নের জবাবেই জিজ্ঞাসা করে, 'এটা কোন্ স্টেশন?'

'রানাঘাট স্যার। নৈহাটিতেও এসেছিলাম স্যার। আপনাকে ডিসটার্ব করিনি। রানাঘাটের পর কোনো স্টেশনে তো রেলওয়ে ক্যাটারিং সার্ভিস নেই। তাই...।'

'হ্যাঁ। দিতে বলুন,' যোগেন পা দিয়ে তার স্যান্ডেল খুঁজছিল।

'এনি ড্রিঙ্ক স্যার?'

'নো', বলে যোগেন উঠে দাঁড়ায়—বাথরুমে যেতে। গার্ড দু-পা পেছিয়ে ঘুরে, ভিতরের একটা দরজা খুলে বেরিয়ে যায়। যোগেন একটু অবাক হয়। ওদিক দিয়ে কোথায় গেল। ওখানে যে একটা দরজা আছে—যোগেন তা দেখেইনি। সে গার্ডের পিছু-পিছু গিয়ে বন্ধ দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে দরজাটা মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে। একটু সরু। এটা নিশ্চয়ই বাথরুমের দরজা হতে পারে না। যদি বাথরুমই হয়, তাহলে গার্ড এই দরজা খুলে যাবে কোথায়? গার্ডের বাথরুম পেতে পারে—এমন কিছু ভেবে যোগেন একটু অপেক্ষা করে হ্যান্ডেলটায় হাত দেয়। নিঃশব্দেই খুলতে চেয়েছিল যোগেন, দরজাটা নিঃশব্দেই খুলল কিন্তু রেলের ভারী দরজাটাকে টানতে হল। আর-একটা সরু ফাঁকা কামরা—রেলের যে-কামরা যোগেন চেনে। আর, চেনার পর যোগেন, কামরাটাকে আরো নির্ভুল চেনে—'অ্যাটেনড্যান্ট' লেখা কামরা, প্ল্যাটফর্ম থেকে বরাবর দেখেছে, বড়-বড় মেল ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাশের সঙ্গে লাগানো থাকে।

যোগেন মাত্র এক পা পেছিয়ে তার কামরায় ঢুকে যায় ও ঐ দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

বাথরুমেই যেতে চাইছিল যোগেন, সেটার আন্দাজও পায়, ডানহাতি দরজাটাই হবে। কিন্তু বাঁদিকেও একটা দরজা দেওয়া। সেটা একটু খুলে কোনো কিছু ঝুলিয়ে রাখতে—পর্যন্ত বুঝে যোগেন নিশ্চিত হয়, শাহেবদের সুটটুটের জন্য।

এবার যোগেন বাথরুমে ঢোকে ও তাকে দরজাতেই দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

তার সামনের উলটো দেয়ালের তলাটুকু জুড়ে ধবধবে শ্বেতপাথরের বাথটাব। তার মাথায় একটু উঁচুতে ভাঁজ করে রাখা ধবধবে কিছু তোয়ালে। একটা সাবানবাক্স। ঝকঝকে রুপোর দুটো কল। কলের মাথায় ইংরেজি হরফে 'এইচ' ও 'সি' পড়তেই যেন যোগেন ভিতরে ঢুকে দেখে, তার ডানহাতে শাদা শ্বেতপাথরের মুখধোয়ার জায়গা—ওপরে সেই 'এইচ' ও 'সি'। আর বাঁয়ে, ওরকমই কিছু ঢাকনা ফেলা, জিনিশটার নাম ভুলে যাচ্ছে কিন্তু সেই আসনের পাশেই গোলাপি কাগজের একটা চাকতি—শাহেবদের হাগামোতার জায়গা—'কমোড'—মনে পড়ে যোগেনের।

যোগেনকে সেটা একটু ব্যবহার করতে হয়। সে মুখধোয়ার জায়গায় চোখেমুখে জল দেয়, সাবান দিয়ে হাত ধোয়, কুলকুচি করে ও মোছার জন্য কোঁচা তুলতে গিয়ে পাশের রেলিঙে ঝোলানো তোয়ালেটাই টেনে নেয় ও বেশ শুকনো করে মুখহাত মুছে সে তোয়ালেটা রেলিঙে আগের মতই ঝুলিয়ে রাখে—যাতে কোনো চিহ্ন না থাকে তার ব্যবহারের। দরজা খুলে বেরবার আগে, সে একটু অগোছালো করে দেয় তোয়ালেটাকে—সে যে ব্যবহার করেছে সেটা জানাতে।

হকশাহেবের সঙ্গে তো ফার্স্টক্লাশেই এসেছিল যোগেন, তখন দেখেনি এসব? কী করে দেখবে—সে তো সিঁটিয়ে ছিল বলির পাঁঠার মত। একবার বাথরুমে যেতে হয়েছিল, তাই কমোডটা চেনে। তাও বড় কর্ম হলে না-হয়, ঠেসে বসে দেখা যেত। ছোট কর্মে নিজের জলছাড়াটুকু দেখে কোনোরকমে বেরিয়ে এসেছিল।

যোগেন দেখে—একটা টেবিলে ধবধবে চাদরের ওপর ধবধবে চিনে মাটির বাটিগুলিতে তার ডিনার ঢাকা, টেবিলের সামনে একটা সোজাপিঠ কাঠের চেয়ার, নানারকমের চামচ একটা ছোট চৌকো ডালার ওপর সাজানো, একটা কাচের গ্লাশে একটা শাদা রুমাল ফুলদানির ফুলের

মত। দু-জন পাগড়িপরা বেয়ারা একটু পেছনে দাঁড়িয়ে। এগুলো যে সুখাদ্য—সে-বিষয়ে মুহূর্তে নিশ্চিত হয়ে যায় যোগেন। টেবিল-চেয়ারের ব্যবস্থায় সে খুশি হয়—গদিতে এলিয়ে এগুলো খাওয়া যেত না। খাদ্যের দিকে তার মন চলে যাওয়ায়, এই সব অচেনা সাজসরঞ্জামের ব্যবহার নিয়ে তার সংকোচ যোগেনের মাথা থেকে একেবারে বেমালুম উপে যায়। সে দরজাটা খুলতেই এক বেয়ারা তার হাত থেকে নিয়ে সেকেন্ড-ব্র্যাকেট ঝোলানো ঘরে ঝুলিয়ে রেখে এল। যোগেন চেয়ারটা একটু কোনাচে করে নিয়ে বসে।

বেয়ারা তার সামনে একটা ছোট জামবাটি, পাশে একটা বড়গর্তের চামচ, সামনে তিন-চারটি ফুটোদানি সাজিয়ে একটা ফ্লাস্ক থেকে ধোঁয়াওঠা তরল ঢেলে বলে, 'সুপ, স্যার'।

দু-চার চামচ খেতেই আরাম লাগে যোগেনের। সে বলে, 'গোলমরিচ আছে না কী তোমাদের। একটু নুন দাও।' একজন এগিয়ে এসে সামনের ফুটোদানিগুলো থেকে একটা তুলে সুপের ওপর ঝাঁকায় কিন্তু ফুটো দিয়ে কিছু পড়ে না। বেয়ারা তাড়াতাড়ি দানির পেছনটা খুলে সুপের ওপর এনে জিগগেস করে—'কতটা দেব স্যার?'

'ওভাবে তো আন্দাজ পাইবো না। বেশি পইড়্যা গেলে নুনে পোড়া হয়্যা যাবে। দুই চিমটি দাও তো আগে', বাঁহাতের দুটো আঙুলে যোগেন চিমটি বোঝায়। একটা লম্বা হুইসলের শেষ দিকে ট্রেনটা ধীরে-ধীরে নড়ে উঠে চাকার আওয়াজ তোলে। ছোট একটি চামচের হাতলের গোড়াটুকু দিয়ে নুন তুলে বেয়ারাটি যোগেনকে দেখায়, 'স্যার, দিব?'

'হ্যাঁ, দ্যাও, বাঃ, তোমার তো বুদ্ধি আছে।'

সুপ পুরোটা খেল না যোগেন। সে চামচেটা বাটিতে রেখে দিতেই বেয়ারা সরিয়ে নিয়ে গেল, আর-একজন একটা ডালার ওপরের কাগজের ঢাকনা খুলে নতুন ডিশ এগিয়ে দিল। চাচার জোড়া কাটলেট। প্রায় উলটোদিকেই, প্যারী ডাক্তারের বাড়ির। ইচ্ছে করলে উলটোদিকের ফুটে গিয়ে গন্ধও টানা যায়। চিরকালের সেই আকাঙ্ক্ষা মিটছে আজ, ঢাকা মেলের ফার্স্ট ক্লাশের সুবাদে। কিন্তু চাচা তো ফার্স্ট ক্লাশের নয়, বড়জোর ইনটার ক্লাশের। ফার্স্ট ক্লাশের কাটলেটের গন্ধও যোগেন শুঁকেছে, সেটা সবটা কাটলেটেরই গন্ধ কী না, তা যোগেন বলতে পারবে না। বরং এইটুকু বলা যায়, যেসব গন্ধের সঙ্গে ভাল পাউরুটি, টোস্ট, মাখন, বিস্কুট, চপ, কাটলেট জড়ানো, সেসব গন্ধ যোগেনের নাকে এসেছে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলকে বাঁ হাতে রেখে ঘুরলে আর ফারপো-র পাশ দিয়ে যেতে। সেগুলোই তো ফার্স্ট ক্লাশের হওয়া উচিত।

অথচ যোগেন নিজের সম্মানের খাতিরেই তার সামনের এই ডিশজোড়া কাটলেটদুটিকে কিছুতেই চাচার কাটলেটের ওপরে তুলতে চায় না। ঢাকা মেলের ফার্স্ট ক্লাশে দিয়েছে বলেই শাহেবসুবোদের হোটেল থেকে আসতে হবে? চাচা নয় কেন? হেদোয় বলে?

এই কাটলেটটার একটুও তো সে এখনো মুখে দেয়নি। তবু যে নিজের সঙ্গে তর্কবিতর্কে জুড়ে যায় তার কারণ যোগেন এমন একটা অনুচ্চারিত, বাড়তি অথচ আসল যুক্তিটা শুনতে পাচ্ছিল—খেয়েছে তো বড়জোর চাচার হোটেলের কাটলেট, ও কী করে কাটলেট বুঝবে?

বেয়ারাটিকে যোগেন জিগগেস করে বসে, 'ভাই এডডু কাসুন্দি দিবা? এত সুন্দর কাটলেটটার অযত্ন ইচ্ছা করে না।'

বেয়ারা বলে ওঠে, 'কাসুন্দি তো আমরা রাহি না। শাহেবরা তো কাসুন্দি জানেই না। তবে স্যার শাহেবগোর কাসুন্দি আছে, মাসটার্ড। মাসটার্ড স্যার?'

'তুমি তো রোজই কত শাহেবসুবারে খাওয়াচ্ছ। তোমার কথা ভুল হওয়ার না। হ্যাঁ, আনো দেখি।'

'আপনার ঝাল বেশি না তো স্যার? তাইলে ভাল সস আছে হল্যান্ডের—'

'হল্যান্ডের?' যোগেন অন্য কোনো দেশের নাম করতে চায়, কিন্তু মাস্টার্ড, হল্যান্ড—এমন কোনো নাম তার মনে এল না। সে বলল, 'আমি তো বরিশালের পোলা। তার থিক্যাও ঝা-ল? এডড়ু বেশি কইর‍্যা আনো—মাস্টার্ড।' বেয়ারাটি বেরিয়ে গেল!

আর-একজন যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখান থেকেই বলে, 'আমার স্যার ফেনি।'

'দেহ কাণ্ড! ফেনির পোলা জাহাজে না-ভাইস্যা রেলের চাকায় গড়গড়ায় ক্যান?'

'জাহাজ ধইরলে অনেক দিন দ্যাশে আসা যায় না, স্যার। আপনারে দেইখ্যা স্যার আমাগো খুব ভাল লাইগছে।'

'খাইছে। জামাই করবানি? মাইয়া কত বড়?'

মাস্টার্ড ঢোকে। বেয়ারাটি তখন বলে যাচ্ছে, 'না, স্যার, সেইসব কথা না। ধুতিপরা বাবুরা তো কেউ ফার্স্টক্লাশে যায় না।'

'স্যার, আলাদা ডিশে দেই। আগে আঙ্গুলে, লাগাইয়্যা চাইখ্যা নেন। শ্যাষে আপনার কষ্ট হবে নে।'

যোগেন এক আঙুলে খানিকটা মাস্টার্ড নিয়ে চাখে। স্বাদটা ঠিক বুঝতে না পেরে আবার একবার চাখে। তারপর হেসে বলে, 'তুমি নি মাস্টার্ড আনার নামে পোড়াবাড়ির চমচম আইনছ?'

বেয়ারাটি হাসিমুখে কাটলেটের ডিশটা টেনে নিয়ে বলে, 'আমি মাখাইয়্যা দেই স্যার! আপনি আবার চ্যাটাইয়া ফেইলবেন। তারপর আবার সেই আঙ্গুল চোক্ষে দিবেন।'

'দিব্যার চাহ তো দ্যাও! তবে তুমি বাবা অ্যাডড়ু বেশি ডর খাওয়াইল্যা—তোমার মাস্টার্ড নিয়্যা।'

'কইল্যাম—না, স্যার আপনারে ফার্স্টক্লাশে দেইখ্যা আমাগো খুব ভাল লাইগছে। ধুতিপরা কেউ তো উঠে না।'

'ফার্স্টক্লাশের টিকিডের দাম জানো? 'ধুতিতে কুলায় না?'

'যতই দাম হোক। আমাগো বামুন-কায়েতগো মইধ্যে তো কত জমিদার। তা না স্যার। রেইল কোম্পানিই টিকিট দ্যায় না, কয়—যে সব ভর্তি।'

কাটলেটটাতে একটা কামড় দিয়ে বড় স্বাদ পায় যোগেন। সেই স্বাদটা সে মুখের ভিতরে মাখিয়ে নিতে চায়।

'রেলকোম্পানিরে না-বেচা টিকিটের উপর চক্রবৃদ্ধি দেয় কেডা? টিকেট না বেচলে ক্ষতিডা কার?'

'লাভক্ষতির কথা না স্যার। এই ট্রেনডায় তো কাছার-সিলেটের চা-বাগানের শাহেবরাই বেশি যাতায়াত করে—বর্ষার কয়েকমাস বাদ দিলে। শাহেবরা স্যার কোনো বাঙালির সঙ্গে যাব্যার চায় না।'

'ডরও খায় বুঝি, শাহেবরা।'

'বাঙালি যদি বোমা মারে কী গুলি করে। পিট্যাইবারও পারে। বাঙালি জমিদারবাবুরাও তাই এই গাড়িতে স্যার সেকেন্ড ক্লাশেই যায়। খুইলন্যা লাইনে স্যার এই সব ঝামেলা নাই।'

'ঝামলা কও কোনডারে? শাহেবরে না জমিদাররে?

'ঐ লাইনে স্যার জমিদারবাবুরা ফার্স্টক্ল্যাশেই যান। শাহেব নাই তো। খুইলন্যা লাইনে।'

'তাইলে তো মাস্টার্ডও নাই। তোমরা কিন্তু খাওয়াইল্যা ভাল। এমন কাটলেট কি খুলনা

লাইনে হয়? তাই শাহেবরা আইস্যা তোমাগো এই ট্রেনে ভিড় করে। কাটলেটটা কীসের ছিল?'

'মাটন স্যার। আমাগো কি ধর্মবুদ্ধি নাই যে বামুন-কায়েতগো ফাউল দিব?'

'আরে, আমারে তোমরা বাউন ঠ্যাওর্যালা? আমি তো নমশূদ্র।'

এরমধ্যে এক বেয়ারা লম্বা-লম্বা আলুভাজায় ঢাকা একটা ডিশ নিয়ে এল। ওপরে গাওয়া-ঘি-র রঙের কিছু লেপা। খুব লোভনীয় একটা গন্ধ বেরোচ্ছিল, 'স্যার, মাখাইয়্যা দিল্যাম স্যার হল্যান্ড সস। দ্যাহেন টেস্ট ক্যামন?

'বস্তুডা কী সেইজ কও, শ্যাষে তোমাগো হাতে জাইত খোয়াই? এর মধ্যেই সে-কম্ম হইয়্যা গেল নাহি কে জানে?

'এডা স্যার, রাইস উইথ ফেরেঞ্চ ফিগার—'

'ও। রাইস তো। জাইত কইল্যা না?'

'আমি তো স্যার ফরিদপুরের। ও স্যার ফেনি-র।'

'সে তো দুইডা জায়গার নাম। ফরিদপুর আর ফেনি বইল্যা কুনো জাইত আছে বইল্যা তো শোনা নাই।'

'জায়গার নাম শুইনলেই তো স্যার জাইত জানা যায়। ফেনির লোক হইলেই মুসলমান। আর ফরিদপুর হইলে কায়েত।'

ফেনির লোকটি বলে, 'হিন্দুই যহন সাইজলি, আধাআধি হবি ক্যা। তার থিক্যা বল্—বামুন।'

যোগেন ফরিদপুরের লোকটিকে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার বাপও তো কায়েত ছিল? নিয়মমত তো তাই হব্যার লাগে। কায়াতের পোলা না হইলে তো কায়েত হয় না।'

'আমার বাবার যে মাথাগোনা হইছিল, ধরেন, বছর পাঁচ-সাত আগে, তাতে বাবা কায়েত লেখায় নাই। কিন্তু তার বছর-দশ আগে যে মাথাগোনা হইছিল, তাতে আমার ঠাকুরদাদা কায়েতই লিখাইছিল। কায়েতের নাতি হইলে তো স্যার কায়েত হবার পারে। এই, সুইটডিশটা আন্। স্যার, হাতডা ধুইয়্যা আইসবেন-না?'

'হয়। ধুই। মিষ্টি তো চামুচেই খাওয়া যায়', যোগেন বাথরুমের দিকে পা-বাড়াতেই এক বেয়ারা দরজা খুলে ধরে থাকে। দরজাটা আর বন্ধ করে না যোগেন। সে ভাল করেই হাতমুখ ও মুখবিবর ধুয়ে তোয়ালেটা দিয়ে মুছতে-মুছতে বেরিয়ে আসে—একেবারে শেষে—সে নাকও ঝাড়ে তোয়ালেটায়। তোয়ালেটা এক বেয়ারার হাতে দিয়ে দেয়।

যোগেন দেখে টেবিলে একটা গর্তওয়ালা ডিশে দুটো রসগোল্লা—বড় সাইজের। আর-একটা হাতের তেলোর সাইজের লম্বা ডিশে হলদে মিষ্টি একটা, শোয়ানো।

'কোন্ডা আগে খাব, কয়্যা দ্যাও'—

'রসগোল্লাডাই আগে খান স্যার, নাইলে তো সরপুইর্যার বাদে মিষ্টি কম লাইগবার পারে।'

'ও! এইডাই সরপুরিয়া। জগৎবিখ্যাত। দ্যাহ, ধরো, আমার বরিশাল, কী তোমাগো ফেনি-ফরিদপুরের এই এমন অমৃতের নাগাল মিষ্টি কেউ বানাবার পারে।'

'ক্যা স্যার? পোড়াদার চমচম?'

'এর কাছে?'

'ক্যা স্যার? নাটোরের কাঁচাগোল্লা।'

'এইডা কইব্যার পার—সমানে—সমানে।'

'ঈশ্বরদির দই'—

'ক্ষেমা দ্যাও ভাই। তোমাগ জিভ আমার জিভের নাগালই, ঠাকুরদাদার ঠাকুরদাদার টাইম

থিক্যা শুখাইয়া গিছে। ঐ জিভে এই মিষ্টির স্বাদ পাওয়া যায়?'

যোগেনের মিষ্টি খাওয়া শেষ হতে-না-হতেই ওরা ক্ষিপ্র হাতে যোগেনের বিছানা পেতে দেয়। চাদর পাতার ভাঁজাভাঁজি আছে। এক ভাঁজ না-ভেঙে, আর-এক ভাঁজের ভিতরে ঢুকে যেতে হবে।

'স্যার, যহন যা দরকার ডাইকবেন। আমরা পাশের ঘরেই আছি। নাহি দরজা আগলাইয়া রাইখবেন?'

'শাহেবরা কী করে?'

'পাইরলে আরো দুইডা দরজা বসায়—কত গুলান ভয়—বোমা, গুলি, পিটাইনি।'

'তাইলে আলগাই থাক—তোমাগোর মইধ্যে একজন তো আবার কুলীন-কায়েত—তারও তো ডর আছে—দ্যাহ সে কী কয়। আর-একজন, মুসলমান আর আমি নমশুদ্দুর। আমাগ ডর নাই।'

গাড়ি গোয়ালন্দে এল সকাল সোয়া ছটায়। যোগেনের ঘুম ভেঙেছে সাড়ে পাঁচটায়। বাথরুমটাথরুম সেরে, চুলটা আঙুলে আঁচড়ে, স্নান করবে কী করবে না দ্বিধা করে। কেন খামোখা স্নান করবে রাত না-পোহাতেই? সেরকম করে না যে কখনোসখনো, তাও তো নয়। গরমজলের কলটা খুলে জল সত্যিই গরম কী না পরীক্ষা করে। গরম। তাহলে তো স্নানের বিপক্ষে কোনো যুক্তিই নেই। কেন, যোগেন আবার গরমজল ধরল কবে?

চলাফেরার সময় সকালে স্নান সেরে বেরলে শরীর মন ভালও থাকে। জল যখন গরমই।

যোগেন এখান থেকে উলটো কথা ধরে।

জল যখন গরম তখন তো স্নানের কথা আসেই না—এত কিছু করে ও ভেবে ও না-করে যোগেন তার আসনে এসে বসে—পা-দুটো সামনে ছড়িয়ে। তার বাঁ-হাতি জানলাটা খুলতে থাকে—প্রথমে কাচেরটা, তারপর জালেরটা, তারপর কাঠেরটা খুলতেই হু হু বাতাস যেন ঝড় তোলে—পদ্মার দিক থেকে। যত গরমই পড়ুক, নদীর পাড়ে, বিশেষ করে পদ্মার মত বড় নদীর পাড়ে ঠান্ডা বাতাসে শিউরে যেতেই হবে। যোগেন কাচের জানলাটা নামাতে গিয়ে কাঠের জানলাটা নামিয়ে ফেললে কামরাটা আবছা আঁধার হয়ে যায়। যোগেনের অস্বস্তি হয়—তাহলে তার ঘুম থেকে জেগেওঠাটা বৃথাই গেল। সে তখন বাঁ-হাঁটুটা গদির ওপর ভেঙে এবার দু-হাতে কাঠের জানলাটা তুলে কাচের জানলা নামিয়ে তার সাপ্লিমেন্টারি বাজেটটা চোখের সামনে মেলে ধরে। আগেও দেখেছে, এ নিয়ে কথাবার্তাও হয়েছে কিন্তু পুরো প্রদেশে তপশিলিদের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের জন্য বরাদ্দ হয়েছে মাত্র পাঁচ হাজার টাকা। এ তো নামরক্ষা মাত্র। গ্রামের স্কুলে তপশিলি ছাত্রদের মাইনে মকুব করার জন্য যোগেন প্রস্তাব দিয়েছিল। তর্কাতর্কিতে সবাইই বলল—যে পারে সে কেন মাইনে দেবে না। আবার, পুলিন মল্লিক বক্তৃতা করল—এরকম ফ্রি করে দিলে তো যাঁরা মাইনে দিতে চান ও পারেন তাঁরা অপমানিত বোধ করবেন। পুলিন মল্লিক মোক্ষম যুক্তিটা দিয়েছিল যে, কতকগুলি জনগোষ্ঠীকে একটা লিস্টে ঢোকানোর অর্থ তো এটা নয় যে, সেই জাতের সবাই অশিক্ষিত, বন্য, জংলি বা বর্বর। শিডিউলের অর্থ—যোগ্যতা সত্ত্বেও তারা চাকরিবাকরিতে কী লোক্যাল বোর্ডে নিযুক্ত হতে না-পারার বাধা দূর করা।

ব্যস, সবাই পুলিন মল্লিকের কথায় সায় দিল। ঠিক হল—ছাত্রের পারিবারিক ও আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে ব্যবস্থা নেয়া হবে। যোগেন চিৎকার করে বলে—তাহলে নতুনটা কী হল, এখনো তো তাই হয়। সবার কানেই কথাটা যে পৌঁছুল সেটা বোঝা গেল বটে, কিন্তু সেটা যোগেনের গলার জোরে।

যোগেনের এমএলএগিরি রাজবাড়ির এসডিওর সঙ্গে

গোয়ালন্দ ঘাটে ট্রেন থামতেই রাজবাড়ির এসডিও কামরায় উঠে নমস্কার করে বললেন, 'স্যার, রাস্তায় কোনো কষ্ট হয়নি তো? বাঙালি ও কমবয়েসি। বাঙালিদের ভিতর যাদের মহকুমার

৭৬

দায়িত্ব দেয়া হয়, তাদের রিট্যায়ার করার দু-চার বছর মাত্র বাকি থাকে। এমন কম বয়সে এসডিও?

'না, না। এ তো আরামে আসা। আপনার নাম কী? এত কম বয়সে এত উচ্চপদে—?'

'আমার নাম স্যার, সুজা আলম।'

যোগেন স্বভাব-অনুযায়ী বিস্ময় গোপন করল। মুসলমান বলেই কি প্রমোশন দেয়া হয়েছে? তেমন কথা যে হোম-মিনিস্টারের বিরুদ্ধে উঠছে না, তা নয়। বিশেষ করে হিন্দু প্রেসে। তারা আবার সব বিষয়েই এত মুসলমান স্বার্থরক্ষার কথা রটায় যে বিশ্বাস করা শক্ত। আবার, এর মধ্যেই গ্রামের দিকে যে নতুন সব পদ তৈরি করে অল্পশিক্ষিত মুসলমানদের সরকারের সঙ্গে ও লিগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে নিয়ে আসা হচ্ছে, প্রধানত সারওয়াদি শাহেবের নেতৃত্বে, তিনি প্রাদেশিক মুসলিম লিগেরও সম্পাদক, সেটা তো বেশ পরিষ্কার, সকলের কাছে। এ নিয়ে হিন্দু-কংগ্রেসি প্রেসও কোনো শোরগোল তোলেনি। গ্রাম-মহকুমার অল্প শিক্ষিত মুসলমানরা, ওপরের ও পরের চৌদ্দ-চৌদ্দ আটাশ পুরুষে চাকরি যে-করা যায়, তা কখনো জানেনি, চাকরি তো করে হিন্দুরা, তারা সত্যি করেই একটা নতুন রকমের জীবনের আঁচ যেন এতে পায়। সেই মুসলমানদের মধ্যে তো কংগ্রেসের ভোটারও আছে। সেই মুসলিম-ভোট এখন কংগ্রেসের একমাত্র লক্ষ। সুরাবরদি শাহেব জিলাগুলিতে মোট ২৭-জন গ্রাম-উন্নয়ন অফিসারের ও ২৬জন প্রচার-অফিসারের পদ ও থানাগুলিতে মোট ২৫০ অর্গানাইজারের পদ ঘোষণা করে দিলেন ও এটাও বলে দিলেন যে সামনের বাজেটে অর্গানাইজারের পদ ৬০০-তে উঠবে। কংগ্রেস এটার বিরোধিতা বেশি করলে লিগের কথাই সত্য প্রমাণিত হবে যে কংগ্রেস হিন্দুদের পার্টি। ফলে, কংগ্রেসের চোরের মা-র পুত্রশোকের দশা।

'স্যার, আপনার ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা কি এখানেই করব?' এসডিওর কথায় যোগেন বলে ওঠে, 'আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসেন,' একটু সরেও যায় যোগেন জায়গা দিতে, 'এখানে তো ব্রেকজার্নি, ব্রেকফাস্ট হবে কী করে?' এসডিও যথোচিত হাসলেন। যোগেন নিজেই জানত না কথাটা এইভাবে বলবে। হিন্দু বা সরকারি অফিসারদের মধ্যে নিজেকে জাহির করতে যোগেন এমন সুরে কথা সাজায় বটে কিন্তু এখানে তো তেমন দরকার কিছু ছিল না। কমবয়েসি মুসলমান এসডিও দেখে যোগেনের তো বেশ ফুর্তি করে বলার কথা—যাক বাবা, একটু চোখ বদলাল, বামুন-কায়েত এসডিও দেখতে হল না। সে তেমন একটা ভাবেনি কেন—যোগেন যখন ভাবতে শুরু করে, তখনই শোনে, এসডিও বলছেন, বলছিলাম, এখানেও ব্যবস্থা রেখেছি, আর স্টিমার সার্ভিসে তো থাকেই।'

যোগেন নিজের কাছে নিজের সম্মান উদ্ধারের জন্য একটু নিম্নস্বরে বলে, 'এত সকালে কিছু খেতে ভাল লাগবে না। বরং একটু চা নিয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ করি না? স্টিমার নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবে না?'

'সে কী স্যার? একমিনিট', এসডিও ত্বরিত নেমে যায়। দেখতে ভাল লাগে। যোগেন এবার

নিজেকে বুঝতে পারে—মুসলমান বলেই ভাল লাগছে। নমশূদ্র হলে আরো ভাল লাগত। বর্ণহিন্দু হলে সন্দেহ লাগত।

ট্রেন দাঁড়িয়েই ছিল। গোয়ালন্দ থেকেই পদ্মা-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্র বাংলাপ্রদেশকে দুইভাগ করে দিয়েছে। উঁচু বাংলা আর নিচু বাংলা। উত্তরে রাজশাহি ডিভিশন—রাজশাহি, পাবনা, মালদা, বগুড়া, দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি আর দার্জিলিং। ঢাকা-মৈমনসিং—ত্রিপুরা গিয়ে ঠেকেছে আসামে। আর, দক্ষিণে—বর্ধমান আর প্রেসিডেন্সি ডিভিশন। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, হাওড়া-হুগলি-কলকাতা। ১৯০৫-এ শাহেবরা যে কী বুদ্ধিতে পূর্ববঙ্গ আর আসাম প্রদেশ তৈরি করেছিল! তা থেকেই পূর্ববঙ্গ একটা ধারণা হয়ে গেছে। ধারণা একবার তৈরি হয়ে গেলে আর মোছা যায় না। পূর্ববঙ্গ তেমনি একটা ধারণা। পুব থাকলে তো তার একটা পশ্চিমও থাকতে হয়। বাংলাপ্রদেশের পশ্চিমটা কোথায়? আর পূর্ব বাংলার জমিদারদেরও পুলকের শেষ নাই—কীসের মধ্যে কী, এক ফুটবল ক্লাব বানাল, তার নাম দিল ইস্টবেঙ্গল। শাহেবদের দেয়া নামে তো আর ভূগোল বদলায় না। চোখে কি দেখে না—পদ্মা-মেঘনা—ব্রহ্মপুত্র দিয়েই বাংলার জল সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে!

গোয়ালন্দ থেকে এই তিন নদীর অববাহিকা ধরে নৌকো, লঞ্চ, স্টিমারে বাংলার উত্তর-দক্ষিণের সব জায়গাগুলিতে মানুষ চলে যায়। পদ্মার ওপর ব্রিজ বলতে তো এক সাঁরা ব্রিজ—সে তো শাহেবদের চা-তামাক-কাঠের ব্যাবসা আর দার্জিলিঙের পাহাড়ের শীতে আরামের জন্য। পদ্মা-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্রের আর কোথাও ব্রিজ আছে? ব্রিজ দিয়া করবড়া কী? হাঁসরে নি কহা যায়, বাড়ির হাঁসরেও, রোজ বারমাস তোগো খাল-পুকুর থিক্যা বাড়ি ফিরার কষ্ট দেইখ্যা পরান ফাটে—তোরে দেই অ্যাড্ডা ব্রিজ বানাইয়া? হাঁস কি বুঝবে নি সদুপদেশডা? নাহি ঠ্যাঙা বগের একখান পাওয়ের নীচে অ্যাড্ডা পিঁড়া দিলে বগের পায়ের ব্যথার আরাম হয়? জলের মানুষ জলে থাইকব—এর মইধ্যে কথা কীসের?

সে ট্রেনের কামরায় বসে আর মানুষজন ঘাটের দিকে ছুটছে, গোয়ালন্দের বিখ্যাত হোটেলের ছোকরারা কত ভাষায় চেঁচাচ্ছে—'হিন্দু হোটেল', 'পবিত্র হোটেল', গরম ভাতে ইলিশের ঝোল—অ্যাহনো কড়াই নামানো হয় নাই', 'মাণিকগঞ্জ হোটেল', 'টাঙ্গাইল-টাঙ্গাইল', 'বামুনঠাকুরের হোটেল—হিন্দু ব্রাহ্মণদের জন্য', 'ধলেশ্বরী হোটেল', 'বিখ্যাত চাঁদপুর হোটেল।'

এসডিও ফিরে আসেন, তাঁর পেছনেই এক বেয়ারা, নেহাৎই লুঙ্গিপরা, কাঁধে গামছা—শাহেবদের চা-খাওয়ার নানা উঁচুনিচু বাটি নিয়ে কামরার সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়ায়। সে ঐ ডালা নিয়ে উঠবে কী করে। অগত্যা এসডিওই নিচু হয়ে তার হাত থেকে ডালাটা নিয়ে টেবিলে রাখেন। যোগেন হে-হে করে দাঁড়িয়ে পড়ে, 'আরে, আপনি একডা এসডিও শাহেব হইয়্যা নিজের হাতে আমার জইন্যে চা আইনলেন। ক্যা? আমারে ডাইকলেই তো আমি ব্যাগডা নিয়্যা আপনার লগে যাইত্যাম।'

'সে কী কথা, স্যার! আপনাকে দেখাশোনা করাটা আমার ডিউটি অ্যাজ পার গবমেন্ট অর্ডার। তাছাড়া, এটা কি একটা কাজ হল?'

বাইরে পায়ে-পায়ে বালি উড়ছিল। যোগেন ইচ্ছে করেই জানলা নামায়নি। এসডিওর চোখে হয়ত দু-এক কণা ঢুকে গিয়েছিল। উনি তাড়াতাড়ি রুমাল বের করে চোখে দেন।

যোগেন বলে ওঠে, 'আপনি ঐ স্নানের ঘরে যান, ভাল কইর‍্যা চোখ ধুইয়্যা আসেন। খোলা চোখে জলের ঝাপটা নিতে পারেন তো?' তার পেছন-পেছন গিয়ে যোগেন বলতে থাকে,

'না পাইরলে চোখের পাতাখান উলটাইয়্যা নিবেন। ঐ পিছনে তোয়ালা—'

যোগেন নিজেই বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করে দেয়। দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর চাটা ছেঁকে নিতে বসে।

বাথরুম থেকে এসডিও ফিরে আসতে-আসতে যোগেন চা ছেঁকে ফেলেছে।

'দেহি, চোখদুইডা বড় কইর‍্যা তাকান।'

'ও ঠিক আছে স্যার—'

'বসেন। চা খান।'

কাপটা তুলে নিতে-নিতে এসডিও বলেন, 'দেখুন স্যার, কোথায় আমি আপনাকে চা করে খাওয়াব, না, আপনি—

'বসেন, বসেন। আপনি একটা এসডিও। সেপাই শান্ত্রী সঙ্গে নাই ক্যামন?'

'না, আছে। ওঁদের একজন আপনার সঙ্গে যাবে। আমার একটা এনকোয়ারির অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে—ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে। এক বৃদ্ধ মুসলমানের উইল সরেজমিনে দেখতে হবে। আপনার কোনো আপত্তি নেই তো স্যার?'

'কী সে?'

'আপনাকে এসকর্ট করতে আমি যাচ্ছি না, আর-একজন যাচ্ছেন। কিন্তু উনি ঐ দিকটা খুব ভাল চেনেন স্যার। আপনার কোনো অসুবিধে হবে না।'

'মানে? আমার পিছনে কি পুলিশ লাগাইবেন?'

'না, না স্যার। উনি স্যার এখানকার সিনিয়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সার্টিফিকেট অফিসার।'

'সে-ব্যাচারেরে মিছামিছি ফেউয়ের খাটানি ক্যান?'

'ওঁর ভালই লাগবে, স্যার। বাড়িতেও ঘুরে আসতে পারবেন।'

'সেডা তো ভাল কথা। আপনার বাড়ি কোথায়?'

'আমরা স্যার নদীয়ার।'

'নদীয়া? তাই কও? না হইলে এমন মধুঝরা কথা?'

'কেন স্যার, সব ভাষাই তো মধুঝরা।'

'তা বটে। যার-যার ভাষা তার-তার কাছে। নদীয়ার কুথায় আপনার বাড়ি? এইডা কি প্রথম পোস্টিং?'

'শান্তিপুরও বলতে পারেন, কৃষ্ণনগরও বলতে পারেন—'

'বুঝছি, প্রাচীন পরিবার, বটগাছের ঝুড়ি, তালে বটগাছডার এড্‌ড়ু পরিচয় দিবেন। মানে, আপত্তি যদি না থাকে। এই বয়সে একটা সাব-ডিভিশনের চার্জে! জানতে ইচ্ছা হয়। তার উপর, যদি বামুন-কায়েত হইতেন, বুইঝ্যা নিতাম।'

'না স্যার। আইসিএসে তো স্যার জাতপাতে চলে না। কঠিন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে হয়।'

'বটেই তো। শাহেবরা ও-ব্যাপারে কোনো খাতির করে না। সাম্রাজ্য চালাতে হয় তো—আপনি কোন ইয়ারের ব্যাচ?'

'২৮ স্যার।'

'মাত্র নয়-দশ বছরে এসডিও। চাড্ডি কথা?'

'স্যার, আমার থানা-লেভেলে পোস্টিং ছিল, আরো দু-বছর ছিলাম স্যার চিটা গং-বার্মা বর্ডারে।'

'কিন্তু এতক্ষণেও ফ্যামিলি-ট্রিটার আভাস দিলেন না স্যার! আরে এইডা কতুটুনি দ্যাশ যে কোন্ বাড়ির পোলা এসডিও হইছে জানা যাবে না। সে-জানা তো মিনিট পাঁচের ব্যাপার। জাহাজের সিঁড়ি থিক্যা চিল্লাইব—রাজবাড়ির এসডিও কুন বাড়ির পোলা? বেবাক জাহাজ গলা মিল্যাইয়্যা জবাব দিবে। তবু আপনার মুখে শুইনলে এড্ডা আত্মীয়তা হইতে পারত।'

'সে কী স্যার, তা বলব না কেন, আমি তো স্যার নদীয়ার ছেলে, কেষ্টনগর থেকে বিএ পাশ করি। আমার বড় মামাও তাই স্যার—সেটা তো আমার জন্মবছর।

'বড়মামাডা কেডা?'

'আজিজুল হক, স্যার।'

'কেষ্টনগরের আজিজুল হক?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'আমাদের স্পিকার অ্যাসেম্বলির?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'আরে কও কী? তুমি না আমাগ ঘরের ছাওয়াল।'

এসডিও মুখ নিচু করে।

'আরে, হকশাহেবরে তো আমি দাদা ডাকি। তাইলে তোমারও তো আমি মামা খাড়াই।'

'আমার পোস্টিং কিন্তু স্যার বড়মামা ভোটে জেতার আগে—'

'আরে ছি ছি, এইডা তোমারে কইত হব? আজিজুল হকের পক্ষে তাঁর ভাইগন্যারে এমন শিক্ষিত করা সম্ভব যে সে তিরিশ বছরে পা না-দিতেই এসডিও হয়। কিন্তু তাঁর পক্ষে মুরুব্বি ধইর‍্যা এসডিও বানানো সম্ভব ন—য়। তালি সূর্যচন্দ্র উইঠত না। অ্যাহন তো ভাবছি—জাহাজে তুমি সঙ্গে গেলেই ভাল হইত, মামা-ভাইগন্যা সুখদুঃখের কথা কইতে-কইতে পদ্মা পাইড়্যাত্যাম।

'তাহলে স্যার আমাকে ঐ অ্যাপয়েন্টমেন্টটা ক্যানসেল করার খবর দিতে হবে। আপনি যদি চা—ন'।

'না, না, আমি চাইলেও হবে না। এডা আমার পক্ষে অন্যায় তোমার পক্ষেও অন্যায়—'

'অন্যায় কেন বলছেন। গবমেন্টই তো আমাকে আপনার চার্জ দিয়েছে।'

'তোমার কোনো কাজ নষ্ট না কইর‍্যাই তো তুমি সেই চার্জ পালন কইরছ। অ্যাহন কি ধামায় বসাইয়্যা আমারে নদী পাড়াব্যা?'

'স্যার, আপনার যাওয়াটা তো ফাইন্যাল করতে হয়। এখান থেকে চাঁদপুর হয়েই তো সিলেট যায়, সেসব রিজার্ভেশন হয়ে আছে স্যার। মানে, কাল সকাল দশটা নাগাদ সিলেট পৌঁছে যাবেন। আর-একটা ফেয়ার ওয়েদার রুট এখন খোলা আছে স্যার, মানে, কালীগঙ্গা নদীতে লঞ্চ যাওয়ার মত জল আছে। লঞ্চ সার্ভিসও চলছে। এখান থেকে সেই সার্ভিসে আপনি যদি দৌলতদিয়া হয়ে টুঙ্গি স্টেশন পর্যন্ত যেতে পারেন, তাহলে টুঙ্গি থেকে আসাম রেলের লাইনে হবিগঞ্জ পৌঁছে যেতে পারবেন, মনে হয়, আজ রাতেই। তাহলে আপনার সময় বাঁচে।

'এত ভাল একডা বিকল্প ব্যবস্থায় তোমার গলায় যেন কিন্তু-কিন্তু আছে, ভাইগন্যা, সেটার কারণটা কী?'

'দুটো বিষয়ে কিন্তু আছে। এক—কালীগঙ্গা লঞ্চ সার্ভিসে ফার্স্টক্লাশ নেই।'

'থার্ডক্লাশ আছে তো?'

'না, না, অতটা খারাপ হলে কি আমি আপনাকে পাঠাতে পারতাম?'

'তুমি এসডিও হইলেও নদীয়ার লোক। আর আমি এমএলএ হইলেও বরিশাইল্যা। সুতরাং

জল ও জলযানের ব্যাপারে আমার অগ্রাধিকার। কোনো-কোনো ছোট লাইনে লঞ্চ সার্ভিসে থার্ডক্লাশও নাই—নৌকার খোলের মইধ্যে গাদাগাদি কইর‍্যা বইসতে হয়।'

'না, না, ও-ভাবে যাবেন কেন? লঞ্চটা ছোট, দোতলায় একটা কেবিন আছে।'

'তালে বইল্যা যে ফার্স্টক্লাশ নাই?'

'লঞ্চ কোম্পানির খাতিরের জমিদার আর চা-বাগানের শাহেবদের জন্য ওটা দেয়। স্পেশ্যাল ক্লাশ।'

'তাইলে আর কিন্তু কী?'

'আপনার তো ব্রেকফাস্টও হয়নি। সেসব ব্যবস্থা ওদের আছে। লাঞ্চও করে দেবে চাঁদপুর লাইন থেকে ভাল। কিন্তু আমরা তো কেউ স্যার টুঙ্গি থেকে হবিগঞ্জের ট্রেনের টাইমটা জানি না। শেষে আপনাকে যদি টুঙ্গিতে ঠেকে যেতে হয়?'

যোগেন একটু চুপ করে থেকে রাস্তাঘাটটা ভেবে নিল, 'চাঁদপুর লাইনে জাহাজ তো এ-ঘাট ও-ঘাট করতে-করতে যাবে—'

'হ্যাঁ স্যার—'

'ঐ জলে বরফি আঁইকতে-আঁইকতে—'

'হ্যাঁ স্যার। ওতেই তো সময় যায়। কালীগঙ্গা লাইনে সেটা নেই স্যার, গোয়ালন্দ ঘাট থেকে সোজা পদ্মা পেরিয়ে কুতুবদিয়ার ঘাট। আপনার সঙ্গে তো আমাদের সার্টিফিকেট অফিসার থাকছেনই। ওসব ওঁর নখদর্পণে। ঘাটে তো আমার কাউন্টারপার্ট আপনাকে রিসিভ করবে। হবিগঞ্জের ট্রেন না-পেলেও আপনার অসুবিধে নেই। চাঁদপুরের স্টিমারে না-ঘুমিয়ে গবমেন্ট বাংলোতে ঘুমুবেন। তবু স্যার এটা তো রেগুলার লাইন না, ফেয়ারওয়েদার লাইন। কিছু হলে তো স্যার গবমেন্ট আমাকে বলতে পারে—তুমি এই সিজন্যাল লাইনে ওঁকে কেন পাঠালে।'

'তুমি জবাব দিব্যা, উনি এই লাইন ছাড়া যাইতে অসম্মত হইছেন।'

'সে তো স্যার মিথ্যে কথা বলে চাকরি বাঁচবে—দায়িত্বটা তো আমার।'

যোগেন চুপ করে এসডিওর দিকে তাকিয়ে থাকে। একটু অপ্রস্তুতও বোধ করে। চশমাটা খুলে একবার ধুতির খোঁটে মোছে। এগুলো যোগেনের ব্যবহারিক মুদ্রা—যখন তাকে কোনো জেদ থেকে সরে আসতে হয়। এটা যোগেনের বড় গুণ যে সে কোনো সিদ্ধান্তের সঙ্গে নিজের মানসম্মান জড়িয়ে ফেলে না। কিন্তু এটাও যোগেনের চেহারা ও কথাবার্তার মস্ত সুবিধে যে তাকে খুব জেদি ও রাগী মনে হয়। তার পেছিয়ে আসাটাকে কেউ কৌশল ভাবে না।

যোগেন বলে, 'আমি আমার কথাটা এড্ডু অ্যামেন্ড করতে চাই। সরকার যখন আমার টুরের এই অংশের দায়িত্ব তোমাকে দিয়েছেন, তুমি যা বলব্যা, একজন আইসিএস হিশাবে যা তোমার করণী কর্তব্য মনে কর, আমি তার অন্যথা করব না। দশ-বার ঘণ্টা আগেপরে পৌঁছানোর খুব একডা কিছু আসে যায় না।' যোগেন থামে, এসডিও তাকিয়ে থাকেন—এটা বুঝে যে যোগেনের কথা শেষ হয়নি।

'কিন্তু অফিসার হিশাবে এডাও তো তোমার কাছে আমাগো প্রত্যাশা যে পুরানা কাউন্সিলের নমিনেটেড মেম্বার সব খানবাহাদুর—রায়বাহাদুর থিক্যা আমরা আলাদা রকমের পোলিটিক্যাল ওয়ার্কার। তুমি যে আমার তাড়াতাড়ি পৌঁছনোর দরকারটাকে প্রায়োরিটি দিচ্ছ—সেডাই নির্বাচিত শাসনের মূল কথা।'

স্টিমারঘাটায় নানা সাইজের লঞ্চ, বোট, গাদাবোট, দোতলা-তিনতলা স্টিমার যেন নদীটাকে আড়াল করে রাখে। নৌকোর জন্য আলাদা জেটি আছে—একটু দক্ষিণে। কিন্তু গহনার

নৌকোগুলো সেখানে ভেড়ানো যায় না। গহনার নৌকো মানে তো এক গাদাবোট—রেলের স্টেশনের প্লাটফর্মের মতো। স্টিমার-লঞ্চকে তো আর পাকা রাস্তার গাড়ির মতো এক পাঁতিতে পাড় মুখো দাঁড় করানো যায় না। সেগুলোকে পাশাপাশি সার দিয়ে রাখতে হয়—নদীমুখো। গোয়ালন্দঘাটের পাড় থেকে আর নদী দেখা যাবে কী করে।

পদ্মায় ভাসমান যোগেনের এমএলএগিরি ডেপুটির সঙ্গে

৭৭

সেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট লঞ্চের ছাদের কেবিনটিতে পৌঁছে দিয়ে 'আসছি স্যার' বলে নেমে যাওয়ার পরও যোগেন নদী দেখতে পায় না—ভদ্রলোক আবার ঠেলা দরজাটাকে ঠেসে দিয়ে গেছেন। সুতরাং যোগেন কেবিনটাই দেখে—ক্যামবিশের চেয়ারে বসে। আরে, এ তো বড় জাহাজের কেবিন থেকেও ভাল। এসডিও এই নিয়ে এত ভাবছিল? শোয়ার জায়গা তাকবন্দি—তাও চওড়ায় আঠার ইঞ্চির বেশি আর ওপরের তাকটাও এক-পা উটকোলেই ওঠা যায়। বেশ চওড়া তো—এতটা জায়গা বড় জাহাজের কেবিনে নিশ্চয়ই মেলে না। সিলিংটা কী দিয়ে তৈরি যোগেন বুঝতে পারে না। বুঝতে হলে আরো কাছ থেকে দেখতে-ছুঁতে হয়। তাহলে তো একটা চেয়ার, কাঠের, চাইতে হয়। ক্যাম্বিশের চেয়ারে তো আর দাঁড়ানো সম্ভব নয়। দেখাচ্ছে কাঠের মতো, কাঠ নয়, আর, এত ছোবড়া-ছোবড়া দেখাচ্ছে কেন।

একটু-আধটু দুলছিলই লঞ্চটা, দু-একবার একটু বেশিই। কোনো ভারী মাল পাটাতনের ওপর ফেলায়। যোগেনকে ডাকতেই বোঝা গেল, লঞ্চটা এবার ছাড়বে। যোগেনকে একটা চওড়া জেটি পেরিয়ে, আর একটা জাহাজের প্যাসেজ-ওয়ে দিয়ে লঞ্চটায় উঠেই সোজা ধাপ ভেঙে ছাদে আসতে হল—তাতে তো তার মনে হল, সে ঢোকার পরই ব্রিজ তুলে দিয়েছে, দড়ি খুলে দিয়েছে। কিন্তু এসডিও তো নামবেন, 'স্যার, এদিকে এলে কিন্তু একটা খবর দেবেন, আমি নামছি, নইলে আপনারই দেরি হবে,' নমস্কার করে এসডিও বিদায় নিলেন, যোগেন কেবিনের ভিতরে পা রাখতেই তার পেছনের দরজাটা বন্ধ করার সামান্য আওয়াজের সঙ্গে, 'আসছি স্যার।'

যোগেন বুঝতে পারেনি, লঞ্চ ছেড়ে দিয়েছে। যোগেন তো বাইরেটা দেখতে পাচ্ছে না—ফলে পাড় থেকে সরে আসাটা বোঝেনি। লঞ্চের বাঁশি বেজেছিল কী বাজেনি, বুঝতে পারেনি। দুলুনিটা বরং থেমে গেল একটু, বাইরের মানুষের গলার আওয়াজ কমে আসায়, তাহলে কি লঞ্চ ছেড়ে দিল, সন্দেহবশে দরজা খোলার জন্য যোগেন না-উঠতেই দরজা খুলে গেল আর দরজা জুড়ে দাঁড়ানো ডেপুটিকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে হুড়মুড়িয়ে কেবিনে ঢুকে পড়ল পদ্মার হাওয়া, 'স্যার, দেরি হয়নি তো!' ডেপুটির এক হাতে একটা লম্বা হাঁড়ি—হয় গুড়ের নয় জিয়ল মাছের। আর-এক হাতে একটা ছালা—সেটাতে হাতে-ঝোলাবার জন্য নারকেল দড়ির পাকানো হ্যান্ডেলও আছে। ডেপুটির ঠোঁটে হাসি, মুখে ঘাম, 'আসছি স্যার, এগুলো রেখে, বলে দরজাটা হাটখোলা রেখেই সরে গেলেন। বাইরে পদ্মার বিস্তার সেই দরজার চৌকাঠ উথলে উঠল। এতটা জলের এমন গতি দেখে যোগেন আর ভিতরে বসে থাকতে পারল না, বেরিয়ে

এসে রেলিং ধরে দাঁড়াতেই তার কোঁচার কাপড় তার পেছনে দরজার ফাঁক দিয়ে কেবিনে ঢুকে নৌকোর পালের মতো উড়তে লাগল।

'কী আহাম্মুকি', যোগেন কোঁচার কাপড় টেনে ফিরিয়ে তার চশমাটা খুলে রেখে আসে, 'নদীর হাওয়ারে বিশ্বাস নেই।'

'ডেপুটি এসে পাশে দাঁড়ান। যোগেন জিজ্ঞাসা করে, 'কী বাজার কইরলেন, বাড়ির লগে?'

ডেপুটি রোগা, যোগেনের চাইতে লম্বা। ধুতিপাঞ্জাবি পরেছেন, মাথা পুরোটাই টাক—সেই কারণে দু-তিন লাছি চুল বাঁ থেকে ডাইনে এনে যতটা পারেন, ঢাকার চেষ্টা করেছেন, সরু কাঁচাপাকা গোঁফ, পাতলা ঠোঁটে ছোট-ছোট দাঁত, ঠোঁট খুললে বোঝা যায় পান খান।

'বাড়িতে তো একলা মানুষ আমি, এক-একটা প্রমোশন আর এক-একটা বদলি। মনে তো পড়ে না স্যার কোনোদিন বাড়িতে বসে সংসার করছি।'

যোগেন একটু সাবধান হয়—বদলি চাইবে না কী?

ডেপুটির গলাটি চাপা, পাতলা। দেখে বেশ খুশি লোকই মনে হয়। ডেপুটি বলছিলেন, 'সে স্যার কী করা যাবে? করব সরকারি চাকরি, তাও ডেপুটিগিরি আর সদরে-সদরে বদলি হব না—এ তো আর বলা চলে না।'

'আপনার দেশ কোথায়?'

'আপনার কি এদিকটাও চেনা আছে, স্যার?'

'না-চেনার মতো বৃহৎ ব্যাপার না কী?'

'না স্যার, এত বেশি চেনা স্যার যে কাউকে হদিশ দেয়া যায় না। ঢাকা জিলাতেই স্যার। আপনি তো টুঙ্গি থেকে ডাইনে ঘুরবেন, রেলে, আমি সোজা গিয়ে টুঙ্গির দুই স্টেশন পরে নামব।'

'বাবা। রেলস্টেশনে বাড়ি। আমাগ বরিশালে তো স্টিমার স্টেশনও নাই। কী স্টেশন?'

'পুবিয়ালি। তবে আমার বাড়ি স্যার সেখানে না। পুবিয়ালি থেকে ঘণ্টাখানেক হাঁটা—পুবে।'

'দ্যাহেন, আপনি কিন্তু কিছুতেই জায়গার নাম ভাঙলেন না। প্রথমে কইলেন ঢাকা। তারপর কইলেন টুঙ্গি। তারও পর কইলেন পুবিয়ালি। নিয়ম-অনুযায়ী এরপর তো আমারে থানা আর পোস্টাফিস জিগ্যাইতে হয়।'

'কী যে বলেন স্যার। থানা গাছা।'

'গাছা তো আমি চিনি। সেহান থিক্যা উত্তরে না পশ্চিমে? দক্ষিণেও না, পুবেও না।' তাই তো?'

'আপনি তো সবই চেনেন স্যার। উত্তর-পশ্চিমই বলা যায়—রেললাইন পার হলেই। পোস্টাফিস কেউ লেখে গাছা, কেউ বলে বাড়িয়া। বাড়িয়ার সাব পোস্টাফিসটা নতুন। তাই লোকজনের ভরসা হয় না।'

'ধরেন, গাছা-য় গিয়্যা আপনার নাম বললে সবাই আপনার গ্রামের হদিশ দিব্যার পারব?'

ডেপুটি একটু চুপ করে থেকে বলেন, 'তা হয়ত পারবে স্যার। আমার সুবাদে না। আমার চাকরির সুবাদে।'

'আরে, তাই তো, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কি থানাপিছু পাওয়া যায়। কিন্তু গ্রামের নামটা তাও কইলেন না, ঠিকানা তো কয়্যা দিলেন।'

'স্যার, আমাদের গ্রামের নামটা এত খারাপ যে ভদ্রলোকের সামনে বলা যায় না। চেষ্টা হচ্ছে নামটা বদলানোর। ইউনিয়ন বোর্ড যদি বদলায়। তবে সে-বদলানো নিয়েও স্যার, দলাদলি।'

'আরে, আপনে বরিশালের ছাওয়ালরে খারাপ-নাম শুন্যাবার লজ্জা পান? আমি গড়ড়া নাম বলি, তাও আসল নামডা তো মনে-মনেও মুখে আনা যায় না। উকিলমোক্তার আর দারোগাসেপাই মিল্যা নামডা লেখাজোখায় বদলাইয়া দিচ্ছে। এহন লেহা নয়, গড় মাইদ্যান কইছি। ইংরাজিতে লেখার সুবিদা আছে—জি-এ-আর—এইচে 'গড়' হইল আর 'এম-ওয়াই-ডি-এ-এন' —এতে হয়ে গেল ময়দান বা মাইদ্যান, যাই বলেন। কিন্তু এই নামডা ইংরাজিতে লিখতে বা বইলতে তো ইংরাজি জানা লাগে—অন্তত লিটারেট কনস্টেবলের মত বিদ্যাখান তো দরকার। যাগো গ্রাম, তারা 'জি-এ-আর-এইচ' যে-শব্দের ইংরাজি সেই শব্দটাই বলে 'জি'-এর সঙ্গে একটা চন্দ্রবিন্দু আর আকার দিয়্যা। মাইদ্যানেরও মূল শব্দটাই বলে। দুইডা মিল্যা যা খাড়ায়, সেডার দুর্গন্ধি তো পদ্মার হাওয়াতেও উইড়ব না।'

ডেপুটি চশমার ওপর বাঁহাত রেখে চোখ ঢাকেন—লজ্জায়। পাতলা ঠোঁটে হাসিটা ছিল।

'না স্যার। আমাদের বিপদ অতটা নয়। হাজইদ্যাঁ।'

'হাজইদ্যাঁ? এ তো ঋগবেদের মন্ত্রের মতো শুনায়। এডা বদলাইবার কারণডা কী?'

'কারণ যে খুব আছে, তা না। তবে লোকজন একটা নাম চায় শুনতে-বলতে ভাল—'

'এত লোকজন আইল কোত্থিক্যা, নতুন-নতুন কান লইয়্যা? তাগো হঠাৎ কইর‍্যা গ্রামের নামে গোসা?'

'গ্রামে চাকুরের সংখ্যা তো বেড়েছে। ডেইলি প্যাসেঞ্জার না-থাকলেও উইকলি বা ফর্টনাইটলি প্যাসেঞ্জার তো দু-একজন আছে। দুই বাড়ির বড় ছেলেরা কলকাতার হস্টেলে থাকে—তারা ছুটিছাটাতে এসে বলে, কী একটা নাম, লোককে বলা যায় না।'

'তাগো তো পুবিয়ালি রেলস্টেশন আছে—।'

'ঐ আর কী। নিজের গ্রামের নামটা ভাল হলে বলতে ভাল লাগে।'

'এরা নিশ্চয়ই বামুনবাড়ির পোলা। নাইলে গাঁওয়ের নাম নিয়া এত মাথাব্যথা?'

'আমাদের গ্রামটা ব্রাহ্ম-প্রধান স্যার। একটা পুরনো নিয়োগীবাড়ি আছে, বিরাট বারদুয়ার, খুব নামকরা দোলমঞ্চ হয় প্রতিবছর, ধামরাইয়ের রথের মতো বড় না-হলেও আশপাশে নেগিপাড়ার দোলের মেলার খ্যাতি আছে। এঁরা বাদে যারা নিচুবর্ণের তারা গ্রামের একেবারে সীমায় থাকে।'

'নামডা তো হইয়্যাই আছে। নেগিপাড়াই তো কয়, লোকে মুখে?'

'সবাইই বলে স্যার। কিন্তু ইউনিয়ন বোর্ডের তালিকায় নেগিপাড়া নাম দিলে বামুন—অবামুনে দাঙ্গা বেঁধে যাবে।'

'বামুনদের হাজইদ্যাঁতে আপত্তি কী? চন্দ্রবিন্দু আছে, য-ফলা আছে—'

'ওই দুটোতেই তো আপত্তি—নইলে শুধু হাজই বলতে আপত্তি ছিল না। হাজই তো ছোট নাম আর চেনা নাম—অ্যামাই, খাগড়াই, জামনা, গোরাই। কিন্তু স্যার, সে-কথা উঠতে না-উঠতেই ঐ নিচু হিন্দুদের ভিতর থেকে দল বেঁধে কথা তুলল যে দুশ বছর আগে ওখানে নাকী একটা হাজোবসতি ছিল। তারা ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। তারপর, ইংরেজরা তাদের গারো পাহাড় পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যায়। এখন তারা সেখানেই থাকে।'

'গারো-হাজংরা?'

'হ্যাঁ, স্যার—'

'এতটা নীচে ছিল? ওরা তো পাহাড়ি।'

'সে তো আজকের হিশেবে নীচে। তখন আর ময়মনসিং দিয়ে কতটুকু? হতেও পারে-না।

এ আর আমাদের হাজো-রা জানবে কোত্থেকে। প্রমথ সান্যাল নামে এক রাজবন্দীকে দেউলি থেকে সরিয়ে এনে ঐ স্যার পুবিয়ালি থেকে মাইল খানেক উত্তরে, আমাদের গ্রামের দিকে, ডেটিনিউ করে রেখেছিল। উনিই এই হাজোবিদ্রোহের কথা এখানকার হাজোদের জানিয়ে দেন। হাজো-ভাষায় নাকী 'ধাং' বলতে বোঝায় যে-জায়গা আমাদেরই ছিল কিন্তু ছেড়ে এসেছি। সুতরাং ধাং--টা বদলানো যাবে না। আমার সঙ্গে স্যার একদিন প্রমথ সান্যালের কথা হয়েছিল—উনিই বাড়িতে এসেছিলেন, ওঁর ডায়েরি সই করাতে, আমি এসেছি শুনে গাছা পর্যন্ত আর হাঁটেননি। আমি বললাম, 'আপনি আসাতে তো আমাদের গ্রামের নাম ইতিহাসে উঠে গেছে। আপনি এত খবর কোথায় পেলেন?' উনি বললেন, একদিন গাছাথানার ইনস্পেকটিং অফিসারের টেবিলের পাশের তাকে ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার দেখে উনি পড়তে চান। তাতে নাকী এইসব কথাই আছে। ইতিমধ্যে ইলেকশন এসে পড়ায় কোনো পার্টিই আর এ নিয়ে কথা তোলেনি—কথা তুললে হয় হিন্দুভোট হারাতে হবে না-হয় হাজো-ভোট হারাতে হবে।'

'আপনাদের এমএলএ কে?'

'ঢাকা সেন্টাল নর্থ। ফাকিরশাহেব।'

'আপনারা তো নিশ্চয়ই বামুন।

'হ্যাঁ স্যার, কিন্তু নিশ্চয়ই কেন?'

'বামুন-কায়েত-বৈদ্য ছাড়া ডেপুটি হওয়া যায় না কি! শতকরা হিশাব দেখছেন?'

'দেখেছি, অতটা বলা যাবে না। তবে জানি, স্যার।'

'আপনারা ভাইবোন কী?'

'চার ভাই তিন বোন।'

'দেশের বাড়িতে আর-কেডা থাকে?'

'বোনদের সকলেরই ভাল বিয়ে হয়ে গেছে স্যার।'

'বিষয়সম্পত্তি কি বাবার আমলে না তারও আগে?'

'ঠাকুরদা একটু-আধটু করেছিলেন, তবে বাবাই বাড়িয়েছেন। ঠাকুরদা পৌরোহিত্য করতেন মুন্সিগঞ্জের জমিদারবাড়িতে।'

'ওদিকে তো ঢিল মাইরলেই কোনো জমিদারের গায়ে লাগব। কাদের জমিদারি?'

'ঐ মুন্সিদেরই। ঠাকুরদার আমলে একটা তরফই ছিল, তারপর, যা হয়, ভাগাভাগি হয়েছে। বাবাকে ওঁরাই পড়িয়েছেন।'

'ও। বাবাও চাকরি করতেন?'

'ইচ্ছে করলে করতে পারতেন। কিন্তু বাবার বোধহয় দেশ ছেড়ে থাকতে ভাল লাগত না। উনি কলেজের পড়া ছেড়ে দেন। তারপর মোক্তারি পরীক্ষা দেন। ঠাকুরদার মৃত্যুর পর মুন্সিবাবুরা বাবাকেই পৌরোহিত্য দিলেন। কিন্তু বাবার নেশা ছিল জমিজমায়। উনিই ঘুরে-ঘুরে জমিজায়গা দেখে সম্পত্তি বাড়িয়েছেন। চার ভাইকে পড়াশুনো করিয়েছেন।'

'চারভাইই ডেপুটি এক বাড়িতে?'

'অতটা না স্যার। মেজভাই বংশের কাজটা করে—'

'কোন্ কাজডা? পৌরোহিত্য না সম্পত্তিরক্ষা?'

'দুটোই। আসলে তো একটাই—'

'অ্যানো একডাই আছে? জমিদারি কিনছেন নাকী? নাকি বাপেই কিন্যা রাইখছেন?'

'ইচ্ছা করলে পারতেন না, তা নয়। মুন্সিবাবুরাও চেয়েছিলেন। বাবা রাজি হননি। বাবা

বলতেন—জমিদারের অবস্থা মহাভারতের দ্রৌপদীর মতো। একে নিজের অতগুলি স্বামী, তার ওপর খুড়তুতো একশ দেওরও ভাবত তারাও কেন তার স্বামী না। তার ওপর এক থুতথুরে শ্বশুর, চোখে দেখতে পায় না অথচ কামনাবাসনা ষোল আনা, পাঁচ-পাঁচটা সতীর মধ্যে দ্রৌপদীর শাশুড়িরাই দুটো, তারও ওপর কেষ্ট ঠাকুর—শ্বশুরও বটে, ভাসুরও বটে, দেওরও বটে, তার ওপর বর পিছু গড়ে চারটা-পাঁচটা সতিন—কাকে কখন খুশি রাখবে সেই দুশ্চিন্তা দুই চোখের পাতা এক করার উপায় নেই। তার চেয়ে এই ভাল—নিজের জমির সঙ্গে রায়তি।'

'মহাভারতের এমন ব্যাখ্যা এর আগে কহনো শুনি নাই। তারপওর একেবারে পয়লা মরণ। আমার লগে তো বেঙ্গল টেনান্সি অ্যাক্টের প্রথম খশড়া নিয়্যা আসছি।'

'স্যার, কোনোদিন কি এমন ছিল যে কোনো টেন্যান্সি অ্যাক্টই নেই, যার যেমন ইচ্ছে আইন বানাচ্ছে?'

'ওকালতির অভিজ্ঞতায় দেখছি—সে আপনার আঠারশ বারই হোক, আঠারশ পঞ্চাশই হোক, আঠারশ পঁচাশিই হোক আর উনিশ শ আটাশই হোক টেন্যান্সির কোনো এমন অর্থ নাই, যার অদলবদল চলে না। স্থানীয় প্রথা, চাষ-আবাদের স্থানীয় রীতি, জমিদারের আদায় দেয়ার ভাগ, তার ওপর জমিদার-প্রজার সম্বন্ধ, আর সবার ওপরে কোনো মহাশক্তিধর জমিদারের সামাজিক প্রভাব—এইসব দেখ্যাশুইন্যা ম্যাজিস্ট্রেটকে রায় দিতে হয়। আপনি তো রায় দেন। বলেন, ঠিক কি বেঠিক?'

'সে তো বটেই, স্যার। মুর্শিদাবাদ-নদিয়া-বর্ধমানের সব জায়গাজমি যখন চাষে এসে গেছে, তখন স্যার শুরু হল বরিশাল-নোয়াখালি-ফরিদপুরের বন্দবস্ত। আর পাট চাষ শুরু হওয়ার পরই তো চাষটা বাণিজ্য হল।'

'তাতে কী প্রমাণ হয় ডেপুটিবাবু? কী যে প্রমাণ করতে চান, তাও বুঝি না। মানে কী যে চাষবাস বদলাইয়্যা গেল, খারাপ হইয়্যা গেল। কিন্তু যা বদলায় নাই সেইডার কথা ক্যান কন না? এক মামলায় দেখব্যার হইছিল কইল্যা দেখি—সব থিক্যা বেশি জমিদারির সংখ্যা কোথায়—মৈমনসিঙে। সব থিক্যা কম জমিদার রাজস্ব কোথায়—ওই মৈমনসিঙে। কত? বিঘা প্রতি পাঁচ আনা তিন পয়সা। আর যে-বেটা চাষ করে তার খাজনা বেশি কোথায়? ঐ মৈমনসিঙেই। বিঘা প্রতি গড়ে তিন টাকা। রাজস্ব আর খাজনার মইধ্যের ২ টাকা ১০ আনা ১ পয়সা ফাঁকড়া কিন্তু কমে না। খায় কে সেডা? খাওয়ার মুখ তো আছে একই জনার।'

কথা বলতে-বলতেই দুজন টের পান—হাওয়াটা যেন দিক বদলাল, যোগেন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে, পদ্মা লম্বালম্বি খুলে যাচ্ছে—বহু দূর পর্যন্ত ঘোলাটে সফেন স্রোতে ঢেউভাঙা শাদা ফেনার চমক আর ঠিক অতদূর পর্যন্তই যেন আকাশবিস্তার। যোগেন আরো নীচের জায়গার লোক, বলা যায় সমুদ্রের ভিতর মাথা তুলে থাকা কিছু ডাঙার মানুষ, বা অজস্র অজস্র জলে ডুবেথাকা মানুষ। বরিশালের কী কি বড় নদী নেই, কীর্তনখোলা, আড়িয়ালখাঁ, মেঘনা, তেঁতুলিয়া, লোহালিয়া, পাণ্ডাসিয়া, রাজগঞ্জ, বোহালিয়া, গলাচিপা, বারণাবাদ—নামের কি আর শেষ আছে আর নদীর মত বিস্তারের কত খালের যে নামই নেই—যোগেনের এখন মনে হয়, প্রায় দুপুরে পদ্মার এমন ছড়িয়ে থাকায় মনে হয়—বরিশালে নদীর এই জলময় বৈভব নেই। নেই কি—চাঁদপুরের দিকে শাহাবাজপুর নদীতে বা আরো নীচে মেঘনায়? যোগেন জানে—এসব তুলনা তাৎক্ষণিক। আবার সে-মুগ্ধতা থেকে যদি এমনই তুলনা ঝলসে না ওঠে, তাহলে সেই মুগ্ধতা ছেয়ে দেবে কী করে অন্তরবাহির। যোগেন এমন একটা মুহূর্তে পৌঁছে ছিল যেমন মুহূর্তে সে কিশোরবয়সে কখনোসখনো পৌঁছে যেত কেষ্টযাত্রায় রাধার পদ গাইতে-গাইতে—

'সখী রে, আমারে কালার ছায়া দেখা
একা এ নদীর জলে দেখা
নদীর টান সেই ছায়ারে ভাসায় না,
নদীর গহিন সেই ছায়ারে ডুবায় না,
সখী রে, অথির এ জলে মোর থির-ছায়া দেখা।'

সুরটা গুনগুনিয়েও উঠল যোগেন।

লঞ্চটা বাঁয়ে মাথা ঘোরাল কেন, সেটা বোঝা গেল লঞ্চের মাথাটা আবার সোজা হওয়ার পর—একটা বেশ বড় চর থেকে সরে যাচ্ছে, চরের কাছাকাছির কোনো নদীর তলের মাটিতে যদি লঞ্চ ফেঁসে যায়। আরো একটু এগনোর পর যোগেন ডেপুটিকে জিজ্ঞাসা করে, 'এত বড়! কাদের সঙ্গে লাগা না কী?' তাহলে তো চর হবে না, পাড় হবে, স্টিমার হয়ত আরো ভাঁটিতে

'না স্যার, চরই। দখলও শুরু হয়েছে—'

'কাগো দখল? জমিদার্‌গো?'

পদ্মা-মেঘনায় নতুন চর জেগে উঠলে সব জমিদারই দাবি করে—ওটা তাদের খতিয়ানভুক্ত। পরে চলে খুনোখুনি। তেমন খুনোখুনিতে বরিশালের ফরাজিদের ডাক পড়ে। ওঝা দেখলে সাপ ফণা নোয়ায়, ফরাজি দেখলে চর না কী ফরাজির নৌকোয় ওঠে।

চর দখলে আনা হয়ত সহজ, আবাদে আনা খুব কঠিন। সাপখোপ বাঘডাঁশের কথা যদি নাও দেয়া যায়, শুধু চরে পড়ে থাকার খাওয়া জুটবে কোথা থেকে? তখনই ঢোকে—জমিদারজোতদার আর মহাজনতবিলদার। তাদের ঢোকার আগে তিন-চার বছর শুধু মরতে হয় চরে। সে-মরণের হিশেব কেউ জানে না, রাখেও না। তিন-চার বছর ধরে মরার পর চরের মাটির দোষগুণের খবর জমিদারজোতদার—তবিলদারের কাছে পৌছয়—জমি কী রকম, কী চাষ হতে পারে, ফলন কী, খরচা কত।

'আপনারা স্যার অ্যাসেম্বলিতে এখনো মুখই খোলেন নাই কিন্তু কথাটা স্যার, হাওয়ার আগে ছড়িয়ে পড়েছে যে ২০ বছরের পুরনো চর আবাদে আনা হবে। পদ্মার এদিকে স্যার, ইছামতী—ধলেশ্বরীতেই বেশি, একটু-আধটু চরদখল শুরু হয়েছে। দাঙ্গাটাঙ্গা না-বাঁধে!'

'কোন্-কোন্ পার্টির মইধ্যে দাঙ্গা হওয়া সম্ভব চরজমি আবাদে আনার বিষয়ে?'

'স্যার, একটা কথা আপনাকে জানাতে চাই, যদি অভয় দেন তো বলি—'

'সে আবার কী? আপনারা না কইলে জানার আর কী উপায় খোলা?'

'এই ডেপুটিগিরি করতে-করতে স্যার আমি বহুবার দেখেছি গবমেন্ট স্যার বর্গাদারের পক্ষে। সে তো স্যার, স্বাভাবিক। বর্গাদার আর আন্ডার-রায়তই জনসংখ্যায় বেশি। যদি স্যার প্রজা আর কৃষক পার্টি হয়, তাহলে, যে-কোনো গবমেন্টই তো চায় তারা যেন কোনো গণ্ডগোল না পাকায়। এদিকে স্যার জমির মালিকের কাছে খাশ বলে যে-জমি দেখানো হচ্ছে, তার চাইতে অনেকগুণ জমি লুকনো থেকে যাচ্ছে। আমি স্যার ফরিদপুরে সেটলমেন্টে ছিলাম। সেখানে স্যার পার্মানেন্ট জমির কোনো হিশেব নেই। এখন গবমেন্ট একরকম করে হিশেবটা জানে। ল্যান্ড হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন আর-একরকম করে হিশেবটা জানে। ৩৫-এর আইনে ভোট এসে গেলে পার্টিও আরো-একরকম হিশেব জানে। পার্টিদের জানা নির্ভর করে স্যার তাদের স্থানীয় নেতাদের উপর। এই জায়গাতেই গোলমাল। স্থানীয় নেতা মানে স্যার বেশির ভাগ জায়গাতেই জোতদার না বড় রায়ত। তার স্বার্থ ষোল আনা স্যার জমিতে। এমনি একটা ছোটখাটো গোলমাল

জমির আল নিয়ে, এমনিই মিটে যেত, কিন্তু স্থানীয় নেতা জড়িয়ে পড়ে চট করে তাকে স্যার কমিউন্যাল চেহারা দিয়ে ফেলল। এই কথাটুকুই স্যার বলার ছিল—বেশির ভাগ কমিউন্যাল দাঙ্গাই কমিউন্যাল নয়। তার ওপর স্যার মিনিস্ট্রি হওয়ার পর কলকাতার কাগজগুলিই যেন দাঙ্গা লাগাতে চায়।'

'আপনার কথাডা ঠিক ধইরতে পারছি না। আমাদের তো কথা হইছিল চরের জমির দখল নিয়্যা দাঙ্গা লাইগতে পারে কি পারে না। আর আপনার কথাখান শ্যাষ হইল পার্টিগুল্যার নির্ভরতা লোক্যাল লিডারদের উপর। আপনার আগের কথা আর শেষের কথার মিলডা কোথায়?'

'খুব একটা মিল হয়ত নেই। আমি স্যার থার্টিতে কিশোরগঞ্জে ছিলাম। আমি ঠিক কিশোরগঞ্জে ছিলাম না—ছিলাম, পাশেই নালিতাবাড়িতে। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন মিস্টার ব্যারোজ। ঐ রায়ট সামলাতে—পাশাপাশি জায়গা থেকে কয়েকজন অফিসারকে এনেছিলেন। আমার নিজের চোখে দেখা স্যার, মিস্টার ব্যারোজের খাওয়া নেই, ঘুম নেই, রায়ট ঠেকাতে আর রায়ট বোঝাতে। বার লাইব্রেরিতে মিটিং করছেন, স্কুলকলেজের টিচারদের নিয়ে মিটিং করছেন, ব্যায়াম সমিতির ছেলেদের নিয়ে মিটিং করছেন আর আমাদের সঙ্গে তো করছেনই! একটাই ওঁর কথা স্যার—এটা হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা না। এটা মহাজনদের বিরুদ্ধে খাতক প্রজাদের বিদ্রোহ। খাতকদের প্রায় সবাই মুসলমান। মহাজনদের প্রায় সবাই হিন্দু। কিন্তু মহাজনছাড়া কাউকে আক্রমণ করা হয়নি, কোথাও। মুসলমান-মহাজনদের বিরুদ্ধেও আক্রমণ হয়েছে। শাহেব স্যার পরিষ্কার বলেছিলেন—আপনারা যদি কৃষি—অর্থনীতির জোয়ারভাঁটাকেও হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গায় বদলে যেতে দেন, তাহলে আর রক্ষা নেই। এরপর থেকে সব দাঙ্গাই হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা হয়ে যাবে। কৃষক-রায়ত—প্রজা-জমিদার আর কৃষক-রায়ত-প্রজা-জমিদার থাকবে না। তারা হয় হিন্দু, না-হয় মুসলমান হয়ে যাবে। বা, স্যার, মিস্টার ব্যারোজ বলেছিলেন স্যার, অর দি ওয়ার্স, কৃষির সঙ্গে যুক্ত যে-কেউ হয় হিন্দুবিরোধী, না-হয় মুসলিম-বিরোধী হয়ে যাবে। শাহেবের সেই কথাটাই বলছিলাম স্যার, এখন থেকে রায়ট ছাড়া দাঙ্গা নেই স্যার। ইলেকটোর‍্যাল পলিটিক্সই শুরু হওয়া মানে তো—একই ফ্যাক্টের কতগুলি ভার্সন একই সঙ্গে তৈরি হচ্ছে স্যার—এভাবে কি স্যার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চলে? জমিজমার ব্যাপার স্যার আইনের আওতায় থাকবে আর ডে-টু-ডে প্রবলেম স্যার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের আওতায়। তাহলেই স্যার এই ধর্ম থেকে লোককে সরিয়ে আনা সম্ভব।'

'আপনার যা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাতে আপনার সঙ্গে তর্ক করা কঠিন। আচ্ছা, এডডা কথা কি বুঝা যায়? সংখ্যায় মুসলমান খাতক বেশি আর হিন্দু-মহাজন বেশি, তাই এই ঋণ-খালাসি মুভমেন্টের একটা কমিউন্যাল চেহারাও কারো কাছে ধরা পড়তে পারে। এইডা আমার জানার ইচ্ছা—দাঙ্গা মানে তো দুই দঙ্গলে মারামারি। মুসলমান দঙ্গল না-হয় বুঝা গেল। কিন্তু হিন্দুদঙ্গল কাগো নিয়্যা হইত?'

'মহাজন-জমিদারদের তো নিজেদের পাইক-লেঠেল থাকে, তারাই—'

'সে পাইক—লেঠেল তো ব্যাবাক হিন্দু হবার পারে না, ডেপুটি শাহেব, মুসলমানও থাকার কথা। মহাজন-জমিদারের মুসলমান লাঠ্যাল পাইকরা কোন পাকে যাইত?

'ঋণখালাশির পক্ষে। মুসলমানদের পক্ষে। কিশোরগঞ্জে তো জমিদার গুলি চালিয়ে ছ-জন কৃষককে মেরে দিয়েছে। কৃষকরা ফিরে আসছিল স্যার। এমন সময় জমিদারবাড়ির এক বাচ্চা চাকর স্যার দৌড়ে এসে কৃষকদের খবর দেয়—তোমরা ফেরো, কর্তার গুলি শেষ। সেই কৃষকরা ফিরে এল, আগুন লাগাল, অন্তত চারজনকে মার্ডার করল। জমিদারবাড়ির বাচ্চা চাকরটি কিন্তু

স্যার হিন্দু ছিল। পরের দিকে এরকম ঘটনা কমই ঘটেছে। ততদিনে হিন্দু-মুসলমান ভাগটা বেড়ে গেছে।'

'তহন, হিন্দু হইল কারা?'

'প্রধানত নমশূদ্ররা। পাইক-মাল্লারাও।'

'তা—ই কন। শুদ্দুর—হিন্দু ছাড়া বামুন-হিন্দুগ বাঁচাইব কেডা? ঐ যে কিশোরগঞ্জের জমিদার কেষ্ট রায়ের বাড়ির বাচ্চা চাকরডার কথা কইলেন-না, যে, দৌড় প্যার‍্যা মুসলমানগ খবর দিল কর্তার গুলিগোলা শ্যাষ, ওডা জাতে ছিল চাঁড়াল। তারে ষোল-আনা হিন্দু বানাইয়্যা নিছেন আপনারা? চাঁড়াল-নেড়া মিলে তো এড্ডা সমাজ। এই কথাডা আপনারা ক্যান স্বীকার যান না ডেপুটি শাহেব?'

'সে কী করে হবে স্যার। ডিপ্রেসড ক্লাশের লোকরা তো আর মুসলিম ল-এর আন্ডারে না স্যার।'

'হিন্দু ল-এরও পুরোপুরি না। তাগ সম্পত্তিভাগ কি অ্যাজ পার হিন্দু ল হয়? তহন তো 'অ্যাজ পার ট্র্যাডিশন।' চণ্ডাল তখন হিন্দু, যখন সে দাস। চণ্ডাল আর মুসলমান যখন সামাজিক তখন এক। নিজের নিজের পেশায়, দ্যাশে ঘোরাফেরা করে, সেহানে তো সে দাস না। স্বাধীন। স্বাধীন শুদ্দুর আর স্বাধীন মুসলমান মিল্যা এক আলাদা সমাজ—যোগেন হো হো' দুর্বোধ্য হেসে ওঠে।

'একটু ধাঁধাঁ লাগছে স্যার—মানে, আপনি কি যেসব জাতের নাম শিডিউলে আছে, তাদের সবাইকে নন হিন্দু বলছেন স্যার?'

'তেমন সব জাতের নাম তো শিডিউলে নাই। যাগো নাম আছে আর যাগো নাই—সেই বেবাকই তো নন হিন্দু হওয়ার লাগে। এরা সগগলে তো হিন্দুগ বর্ণভেদের ফল। তাইলে কি আপনে রেজাল্টকেই, কজ কবেন ডেপুটি স্যার? ভিকটিমরেই আসামি কবেন?'

'স্যার, এটা তো আইনের ব্যাপার। আইন কি স্যার আমাকে অধিকার দিয়েছে—এদেরকে নন হিন্দু ধরে নেয়ার? মানে, স্যার, এরা, এই শিডিউলভুক্ত জাতের মানুষজন হিন্দু আইনের আওতায় পড়বে না?'

'হিন্দু আইন আবার কী আইন। এক হিন্দু আইনে কয়—মামাতো-পিসতুতো ভাইবোন হতেছে উত্তমোত্তম দাম্পত্যসম্বন্ধের পাত্রপাত্রী। কয় না?'

'হ্যাঁ স্যার, সে প্রভিশন তো হিন্দু ল-তেই আছে স্যার—দেশাচার মানতে হবে। সেটাই তো হিন্দু পার্সন্যাল ল।'

'নিশ্চয়ই। আমি স্যার অত কঠিন কথার মধ্যে যাচ্ছি না। আমি তো জজকোর্টের উকিল। তাই মফস্বলের ঘটনাই বেশি মনে পড়ে। যদি কর্ণাটকের মামাতো-পিসতুতো বিহারে এসে বিয়ে করে তাইলে কি সে-বিয়া আইনত সিদ্ধ?'

'হ্যাঁ সার। সিদ্ধ। যাদের নিয়ে কথা, তাদের দুইজনই বিউ কর্ণাটকি। তাদের দেশাচার—'

'দেশাচার মানে তো স্যার একডা দেশ লাইগব, অ্যান আয়ডান্টিফায়েবল টেরিটারি। স্যায় টেরিটরির বাইরে তো ঐ দেশাচার চইলবে না। এদিকে প্লেস অব অকারেন্স ইজ বিহার। সেহানে এই বিয়া শুধু অচল নয়—নিষিদ্ধ। তাইলে হিন্দু পার্সোন্যাল ল দিয়্যা কী বিচার হবে স্যার?'

'এতদিন তো হয়ে এসেছে স্যার। সে না-হয় আপনি সে-আইনের নাম না-হয় হিন্দু ল নাই দিলেন। ব্রিটিশ আইনে যাকে বলে কমন-ল।'

'মানে, আপনি তো বলছেন হিন্দুটিন্দু দিয়্যা কাম নাই। আইন তো একডা লাগবই—যারে

কয় 'ল ইন ফোর্স।' তাইলে আমি যদি কই যাগো শিডিউলে নাম করা হইছে, তারা অহিন্দু, তাইলে তাগো বেলায় কোন্ ল ব্যবহার করা হবে?'

'হ্যাঁ স্যার, এটাই তো মূল কথা। আইন তো চাই একটা 'ল ইন ফোর্স'—'

'কিন্তু আইন যদি না থাকে কোনো তাইলে ম্যাজিস্ট্রেট কেন মামলা খারিজ করব্যার পারব না?'

'সেটা কি হয় নাকী স্যার। তাহলে তো হাকিমদের ভাঙা বেড়া দেখানো হবে।'

'না, আমি আপনারে কর্ণার কইরতে চাই না। কথায়-কথায় বললাম—আইন অমান্য করা যদি দেশাচার হয় তাইলে সে-আইন যে শুধু লবণের আইন হওয়া লাগব—তাও তো না। অপরাধের শ্যাষ লিস্টি তো অ্যাহনো তৈয়ার হয় নাই। তাইলে আইনের শ্যাষ লিস্টি কী কইর‍্যা হব? হাকিম তো কইবারই পারে যেসব আইন লাগু আছে, লজ ইন ফোর্স, তার কোনোডা দিয়্যা এ মামলার নিকাশ নাই।'

'স্যার—আপনি আমাকে ডুবজলে ছেড়ে দিয়েছেন শিডিউল্ড কাস্টস আর নন হিন্দুজ বলে। এখন স্যার জুরিসপ্রুডেন্সের কথা তোলা থাক।'

'আচ্ছা তাই সই, তোলা থাক। মানে, কথাডা গোচর হইছে। মানে কিন্তু এডা না যে অ্যাহন আবার এইসব কথা ক্যা। কথাডা আছে। আর আমার কথাডা এডডু শুধর‍্যা নেন। আমার কথা হইল—শিডিউল্ড কাস্টস মাত্রেই হিন্দু না। আর নট নেসেসারিলি হিন্দুস।'

'আপনি বললেও শিডিউল্ড কাস্টরাই এ-কথা মানবে না। তারা তো কাস্ট হিন্দুই হতে চায়, তাহলে তারা হিন্দুগ-হতে চাইবে কেন। কিন্তু সে থাক স্যার। আমাকে স্যার একটা দিশা দিন। ম্যাজিস্ট্রেট হিশেবে আমরা কি তাহলে যে-শিডিউল্ড ক্লাশ নিজেকে হিন্দু বলবে, তাকে হিন্দু পার্সন্যাল ল অনুযায়ী বিচার করব? আর যে-শিডিউল্ড কাস্ট নিজেকে মুসলিম বলবে, তাকে মুসলিম পার্সন্যাল ল অনুযায়ী বিচার করব? এ তো স্যার সিরিয়াস ব্যাপার।'

'আচ্ছা ডেপুটি স্যার, আমি তো বলছি শিডিউল্ড কাস্ট ও যারা শিডিউল ভুক্ত নয়—তারা সকলেই হিন্দু ধইর‍্যা নেয়ার কোনো পরিস্থিতি নাই। ধরেন, জোলারা কি হিন্দু? তেমনি তাদের মুসলমান বল্যাও ধরার কোনো পরিস্থিতি নাই।'

'সেসব নিয়ে আমার কোনো জিজ্ঞাসা নেই। আমি স্যার জানতে চাইছি কোন্ আইন অনুযায়ী মামলা হবে?

'সে তো আপনাদের স্মৃতিশাস্ত্রেও বলা আছে, শাহেবদের কোডেও বলা আছে। যাজ্ঞবল্ক্যই তো, না কী জৈমিনী, যে, শাস্ত্র যাই বলুক, যে-বিধান মান্য করলে লোকজন রেগে যাবে, বা পরে তোমার দুঃখ হবে সে-বিধান মাইনব্যা না। অস্বর্গ্যাম লোকাবিদ্বিষ্টং ধর্মম্ অপি আচারেন নতু। আর মেইনও তাঁর হিন্দু-লতে বলেছেন, I think it is impossible imagine that any body of could have obtained genyral acceptance through out India merely because it was inculcatad by Brachman writens?

'স্যার, আপনার স্মৃতিশক্তি তো...'

'পড়ছিলাম। ভাল লাগছিল। মনে থাইক্যা গিছে। তবে অ্যাহন তো মেইন-এর বইয়েও এডা পাবেন না। সপ্তম সংস্করণ পর্যন্ত পাবেন—ঐ সংস্করণ পর্যন্ত মেইন নিজে সংশোধন করছিলেন তো। তারপরে আমাগো বিশ্ববিখ্যাত ইন্ডিয়ান বিচারকরা সম্পাদনা কইরতে বইস্যা এই জায়গাগুলা বাইছ্যা-বাইছ্যা কাইট্যা দিছেন।'

'সত্যি স্যার? আপনি মিলিয়েছেন নাকী?'

যোগেন বেশ জোরে হেসে ওঠে, 'আমার মিলান্ দিয়্যা আপনার কাম চইলব? আমার তো আইনবিভাগ সম্বন্ধীয় কোনো বিশেষজ্ঞতা নাই। আমি তো মফস্বল কোর্টের উকিল।'

'এর আবার সদর-মফস্বল কী স্যার? এটা তো পড়াশুনোর ব্যাপার।'

'কী যে বলেন ডেপুটিস্যার? মেইন-এর বই এডিট কইরছেন প্রাতঃস্মরণীয় আইনকরা, আমার—আয়েঙ্গাররা। ঘটনাক্রমে তাঁরা সকলেই আবার উচ্চশ্রেণীর হিন্দু। মেইন-এর অরিজিন্যাল সেভেন্থ্ এডিশন করে বারাইছিল জানি না। আমি এইটিন-নাইনটি সিক্সের ফিফ্থ এডিশন পড়ছিল্যাম।'

'আপনার কি স্যার মনে হয় হিন্দু ল এখন প্রধান পলিটিক্যাল ইস্যু হয়ে উঠবে?'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু এই প্রথম কোশ্চেনডা উইডবে উলটা দিক থিক্যা—ফ্রম দি মুসলিমস অ্যান্ড নন-কাস্ট হিন্দুস?। আরে, যারে জাতীয়তাবাদ বইল্যা ফাল পাড়ে, সেডা তো উঁচা হিন্দুগ জাইন। বা, বইলব্যার পারেন, পোস্ট-খিলাফৎ।'

'শেষ পর্যন্ত স্যার ঐ কমন-লতেই আসতে হবে। প্রবাদে বলে না—যস্মিন্ দেশে যদাচার?'

'আরে এডা প্রবাদ না।'

'সে কী স্যার, প্রবাদও ভুল জানি?'

'প্রবাদ ভাইবলে ভুলই জানেন। এডা যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিসূত্র। বেবাগ হিন্দুগ বাঁচাইয়্যা দিছে। এর সঙ্গে যোগ কইর্যা নিব্যার পারেন—যাবৎ চণ্ডাল : ন বর্ততি।'

'এটাও যাজ্ঞবল্ক্য, স্যার?'

'না, না। এডারে কইব্যার পারেন যোগেন্দ্রসূত্র। আমি কিন্তু আপনি বামুন বইল্যা এইসব শুনাই নাই।'

ডেপুটি শোভন হাসে। সে-হাসিতে তার বুদ্ধির ঝিলিক পাওয়া যায়।

'পৈত্যা আছে তো?' যোগেন হো-হো হাসে 'আইয়্যা গেল না কী ওপার?' যোগেন দরজার ফাঁকে দেখে, তার বাঁয়ে পদ্মার তীরে-তীরে দৈনন্দিনের কিছু দূর চিত্র। নানা আকারের নৌকোর অসমতলে নদীতল ভেঙে-ভেঙে যায়। একটা ছিপ নৌকো উলটো দিক থেকে চোখ না-ফেলতেই লঞ্চ ছাড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। বেগটা যে নৌকোর না, তার লঞ্চেরই, সেটা জেনেও এই তঞ্চকতাটুকু খেলতে যোগেনের ভাল লাগে।

'হ্যাঁ, তবে এখনো দেরি আছে স্যার। উত্তরপারে এসে গেছে তো, এখন কিনারা ধরেই যাবে। আরচা আর হরিরামপুরের মাঝখান দিয়ে মাণিকগঞ্জের দক্ষিণ দিয়ে স্যার, কালীগঙ্গায় ঢুকবে। কালীগঙ্গা তো স্যার কার্তিকে ঠিক নেভিগেব্‌ল্ থাকে না। তবে এবার লেট মনসুন তো, হয়ত ওপরের দিকে ফিরতি মনসুনে কিছু ঝড়বৃষ্টি হয়েছে।'

'এদিকে কাতার ধান হয় না নাকী?'

'হয় স্যার, মৈমনসিং শুরু হলেই দেখবেন—দুই পারেই আউশ। তার মধ্যে কাতারই তো আগে পাকে।'

'তাহলে তো এই সময় বৃষ্টি হইলে আপনার—আমার না-হয় সুবিধা হইল লঞ্চে, চাষির তো মাথায় হাত।'

'তেমন কিছু হলে কি আর খবর হত না স্যার? মৈমনসিং, কিশোরগঞ্জ, সিলেটের নদীর ওঠানামা দেখে চাষবাসের জল বোঝা যায় না। এদিকে স্যার, নদীনালায় জল বাড়লে বরং বোঝা যায়, ডাঙা এখন শুকনো।'

'এডা কী কইলেন? আমাগো ভাটিবাংলায় কি বৃষ্টির জল নদীখাল দিয়্যা না-নাইম্যা, সূর্যের

তাপেই বেবাগ উইড়্যা যায়।'

'তা হয়ত যায় না, স্যার, এদিককার নদীনালায় একসঙ্গে অনেকটা জল নেমে যায়। আর কোস্ট্যাল বাংলায় স্যার এত বেশি খাল বিল জোলা ছোট নদী যে মোট জল এদিককার চাইতে যত বেশিই হোক জলের জায়গা কম পড়ে না। জোয়ারভাটা খেলে তো—সবসময়। একটু আসছি, স্যার, সারেঙ আবার শীতলখ্যায় ঢুকিয়ে না দেয়।'

ডেপুটি চলে যাওয়ার পর লঞ্চের ইঞ্জিনের আওয়াজে জলের কল্লোল চাপা পড়ে যায়। বরাবরই চাপা ছিল কিন্তু জলের জায়গার লোক বলে যোগেনের কানে স্রোতের নানা ধ্বনি পৌঁছে যায় একটু আড়াল থেকে। যখন সে-আড়াল ঘুচে যায় তখনই স্রোতের বিরুদ্ধ কোনো আওয়াজ প্রধান হয়ে ওঠে, সে যদি টিন বাজিয়ে কোনো ভিখারির গান হয়, তাহলেও। নৌকোয় এটা হয় না। নৌকোতে যাওয়া মানে জলের মধ্য দিয়ে যাওয়া, ভেসে, নিজেকে ঘেরা দশদিকের মধ্যে ন-দিকে ছোট একটা কানা তুলে পথ তৈরি করা। ছিপ নৌকো লম্বা ও চাপা বলে যে-গতি পায়, তাতে যোগেনের মনে হয়, যেন স্রোত কেটে চলে যাচ্ছে।

ডেপুটির সঙ্গে কথা বলে যোগেনের খুব ভাল লাগেনি। দুটো-একটা কথায় অবিশ্যি মনে হচ্ছিল—মানুষটি শাদাসিধে ও নির্ঝঞ্ঝাট, যেমন হয় আর কী। চাকরি বাঁচাতে ঘর্মাক্ত নয় হয়ত, চাকরি না-থাকলেও দেশে বসে চাষ-আবাদ করতে পারবে। এই নিরাপত্তা হয়ত ভদ্রলোককে সহাস্য ও নিরুদ্বেগ রেখেছে। যোগেন এই উঁচু চাকুরে হিন্দু-মুসলমানদের খুব ভিতর থেকে সন্দেহ করে। মুসলমান অফিসার আর ক-জন। যা আঙুলে গোনা যায়। থানা লেভেলে ও তার নীচে কিছু আছে। এই চাকুরে হিন্দুরা এখন মহকুমা পর্যন্ত রাজনৈতিক মত তৈরির প্রধান উপায়। কলকাতাতেও রকমফেরে তাই—পাড়ার মোড়ে, রকে, চায়ের দোকানে, অফিসকাছারিতে কলকাতার চাকুরেরা রাজনীতির শোনা কথা ও সম্ভাব্য কথা বয়ে নিয়ে যায় ও বয়ে নিয়ে ফেরে। যোগেন এদের পছন্দ করে না—হিংসুটে, তালেবর, ছুঁকছুঁকে, সবজান্তা, গোঁড়া, হাফ-স্বদেশী, অ্যান্টি-মুসলিম কিন্তু ক্বচিৎ-কদাচ চাকরিতে উঁচু পদের কোনো মুসলিম অফিসারের তুষ্টির জন্য হিন্দুদের ক্ষতি করতে হলে তাও করে দেয়—একটুও চিহ্ন না রেখে, তার মানে চাকরির সুবাদে অ্যান্টিহিন্দুও, নিঃসংশয়ে ঘুষখোর। এরাই সেই নতুন শ্রেণী কী না, যাদের ওপর বাংলার রাজনীতি নির্ভর করছে বা করবে—এটা যোগেন এখনো ঠিকঠাক জানে না, তবে তার সন্দেহ সেরকমই, আর ভোটে টাউনে এরাও যোগেনকে জিতিয়েছে। তা সম্ভব হয়েছিল—যোগেনের আসনটা সংরক্ষিত নয় বলে, যোগেন ওকালতি পাশ করে ওকালতি করছে বলে, যোগেন ভাল স্পিচ দেয় ইংরেজিতে, আর যোগেনকে স্বভাবচরিত্রে অনেকটা নন-চাঁড়াল মনে হয় বলে। কিন্তু যোগেন সন্দেহ করে—যোগেনকে সমর্থনের প্রধান কারণ—কাস্টহিন্দুদের হিংসাহিংসি গাছেরও খাবে তলারও কুড়ুবে এই নিয়ে কাস্টহিন্দুরা কংগ্রেসের ওপর ভরসা রাখতে পারছে না। কার মুখ, কার মত, কার জবাব—এ-সবই অজানা। বরিশাল শহরে আরএসপিও হয়েছে, সতীন সেনও আছেন, বাড়ছে। কাস্টহিন্দু বাবুদের বাড়ির ছেলেরা সেখান থেকেই হয়ত এত চড়া কথা বলতে শিখছে। তারাই হয়ত এই বাবুদের মুখে ঐ রাগী-রাগী কথাগুলি জুটিয়েছে। তাহলে দাঁড়াল কী—এরা দুমুখো, আবার সমাজতন্ত্রী, নিজের কথা ছাড়া এরা নিজের ছেলের কথাও ভাবে না।

ডেপুটিবাবু ফিরে আসায় যোগেন আবিষ্কার করে খোলা দরজা দিয়ে সে নদীর ওপরে চোখ মেলে আছে, রোদের ঝাঁঝে তার দুই চোখ কুঁচকে গেছে, ও তার একটু ঝিমুনিও এসেছে। খুনের আসামি গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আছে আর হাকিমকে যোগেন বুঝিয়ে যাচ্ছে, খুনের যে-সোপ

রিপোর্ট জমা পড়েছে, তার সঙ্গে ঐ আসামির কোথায়-কোথায় অমিল আর নিজেই নিজের গলার আওয়াজটা বিশ্বাস করছে—সত্যি এই লোকটির পক্ষে গোটা একটা খুন করা সম্ভব নয়—ডেপুটিকে ফেরত দেখে যোগেনের মনে হয়—এই ভদ্রলোক হয়ত সেরকম নয়।

'কী, লঞ্চের হাল ঘুর‌্যায়্যা দিলেন?'

'না স্যার, রিস্ক নেয়নি। এদের তো স্যার মন্ত্রী-মেম্বার পার করার এক্সপিরিয়েন্স হয়নি এখনো, না-হলে কোনো মহাজনের হয়ত জাহাজভর্তি মাল, সে দুটো টাকা ধরিয়ে দিয়ে লঞ্চ ঢুকিয়ে দিল শীতলখ্যায়। মাল খালাশ করে নিল। আড়াইহাজার হল শীতলখ্যার পুব পারে। মহাজন এ সুযোগ ছাড়ে? এগুলো তো স্যার রুটের লঞ্চ না, সিজন্যাল লঞ্চ। বললেই হল যে কালীগঙ্গায় জল ছিল না। তাই একটু বলে এলাম, ওসব করো না, এমএলএ যাচ্ছেন।

'মানে, মহাজনের দুইটাকার বদলি পাঁচটাহা দিলেন তো?'

'সে স্যার, যত বড় মহাজনই হোক, সরকার তো মহাজনেরও মহাজন। আগে সরকারকে পথ দাও, তারপর, দুটাকা-পাঁচটাকা কামাই করো'।

'এ তো সবই আপনার সন্দেহ, কোনোটাই প্রমাণিত সত্য নয়।'

'কোনটা স্যার?'

'এই, দু-পাঁচ টাকার ঘুষে কালীগঙ্গা ছেড়ে দেয়া আর শীতলখ্যায় ঢুকে পড়া—'

'সন্দেহ কেন স্যার। এই লাইনের সবার কাছেই শুনতে পাবেন। এটুকু না-জেনে কি ডিস্ট্রিক্টে কাজ করা যেত?'

'উপরে পিঞ্জরাবদ্ধ ডেপুটি ক্রোধে পায়চারি করিতেছে জানিয়াও সারেঙরা এতটা দুঃসাহসী হইবে কেমন করিয়া', কথা বলার ঢঙেই বোঝা যাচ্ছিল যোগেন কোনো নাটক থেকে পার্ট বলছে।

'আপনার সঙ্গে কথা বলা স্যার, রিগরাস পানিশমেন্ট, কখনো প্রিভি কাউন্সিলের ইংরেজি, কখনো যাজ্ঞবল্ক্যের সংস্কৃত, কখনো কোনো নাটক...

যোগেন খোলা গলায় হেসে ওঠে। জলের ঐ বিস্তার, লঞ্চের ইঞ্জিনের আওয়াজ, জলের আকাশে কিছু-কিছু পাখির সঙ্গে যোগেনের সেই হাসির সততা একেবারে এমনই মিশে গেল, যেন সে কোনো আলাপে এ হাসি হাসেনি, যেন তার হাসি এই জল-মাটি আকাশে মাখা।

যোগেন বলে উঠল, 'ধইর‌্যা ফেললেন?'

'কী স্যার? আমি তো কিছু ধরিনি।'

'মোক্ষম ধইরলেন—গর্তে হাত ঢুক্যায়া শোল মাছ আর কন ধরেন নাই?'

'শোলমাছ স্যার? না স্যার?'

'তাইলে কালাবাউশ—'

'না স্যার। ও নামে কোনো মাছ আছে নাকী?'

'ইয়েস স্যার। এবং সে-মাছ বর্তমানে আপনার চোখের সম্মুখে অবস্থিত। মিলাইয়া লউন—কালা এবং বাউস সমানচিহ্ন যোগেন মণ্ডল।'

ডেপুটি এত জোরে হেসে ফেলেন যে তাড়াতাড়ি ডান হাতে ঠোঁট চাপা দেন। সে-চাপাতেও হাসি ঠেকে না। যোগেনের সামনে এভাবে হাসা তার উচিত হচ্ছে না। কিন্তু উনি তো কথাটা শেষ করেননি, সে ঘরই বা ছাড়ে কী করে। যোগেন একটু নিঃশব্দে কিন্তু বড় হাসি হেসে তাকে আশ্বস্ত করেন, 'আরে ডেপুটি স্যার, এই ইংরাজি-সংস্কৃত লেকচারল্যারে আমাগো দ্যাশে কয় ঢপ, আপনাগ দ্যাশে কয় কাকতাড়ুয়া, শাহেবগ দ্যাশে কয় স্কেয়ারক্রো। বেগুনখেতে খাড়া

থাহে না ক্রশ করা কাঠির মাথায়, হাঁড়ি মাথায় কইর‍্যা? শীতকালের পাখিগ ভয় ডর—খাওয়াইতে? তেমনি। আমি এড্ডা সংস্কৃত, এড্ডা ইংরাজি, আর দুইডা-একডা ল্যাটিন প্রবাদ, যা কলেজে পড়াইছিল, ল-কলেজে, এইসব নতুন জায়গায় সুযোগ বুইঝ্যা ছাইড়্যা দেই। ব্যস, নাম ফাটে—স্কলার লেজিসলেটার বইল্যা। কিন্তু ক্যালকুলেশনডা খুব কঠিন, খুবই কঠিন স্যার। ভুল হইলেই কট্। ধরেন—আপনার সঙ্গে আমার নিকট ভবিষ্যতে আবার দেখা হওয়ার কোনো দুর্ভাবনা নাই। সেকেন্ড, পরের সাক্ষাৎ কোনো কালে হইলেও এইবার যে-কোটেশনগুলা দিছি, সেগুল্যা আপনার মনে থাকার কথা না। থার্ড, যদি পুনসাক্ষাৎ হয় তালি আপনিই আমার কাছে আইস্যা মনে করাইবেন তো, তহন সব কথা আমার মনের ভিতর থিক্যা ঢ্যাপের মোয়ার মতো ছিটকাইয়্যা নাও বারাইতে পারে। এত গুল্যা গ্যারান্টি সত্ত্বেও যে ঢপ দিবার পারে না, স্যায় আর যাই হোক, বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির মেম্বার হইবার পারবা না।

লঞ্চের গতি যেন কমে আসছে। ইঞ্জিনের আওয়াজটাও। যোগেন বাইরে তাকিয়ে দেখে, প্রায় কিনারায় গিয়ে ঠেকেছে লঞ্চ, প্রায়, কিন্তু পুরোটা নয়। পাড় থেকে কেউ লঞ্চে উঠতে পারবে না, লঞ্চ থেকেও কেউ নামতে পারবে না। 'খাইছে—চড়ায় ঠেইকল না কী?'

ডেপুটি মুগ্ধ হয়ে যোগেনের কথা শুনছিলেন, কথাটা শেষ হওয়ার পর লঞ্চ চড়ায় ঠেকা নিয়ে যোগেনের উদ্বেগে ডেপুটি একটু চমকে ওঠেন। বাইরে তাকান, 'না, স্যার, এটা তো স্যার বাঁচামারা, মাণিকগঞ্জে। স্টিমার রুটে পড়ে না। না, রুটে পড়ে কিন্তু স্টিমার থামে না। ক্রিশক্রশে ফাঁক পড়ে গেছে। এরা হয়ত কিছু প্যাসেঞ্জার নিয়েছে।'

'আপনারে একবার বরিশাল—বাখরগঞ্জ দ্যাখানো দরকার।'

'আমাকে কেন স্যার?'

'প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিঙ। এডা তো একডা খিটক্যাল বানাইয়া থুইছেন। যদি সিলেটের চা-বাগানের শাহেবের সুমতি আর ম্যাঘবৃষ্টির দ্যাবতার সুমতি মিল্যা যায় তাইলে কালীগঙ্গা লাইন খোলা থাইকব, আর রুটের ইস্টিমার যে-যে জায়গায় খাড়ায় না, সেই সব জায়গায় লোক তোলানামা নামাতোলা কইরতে-কইরতে যাইব। সে তো হাঁটনের চায়্যা জিরান বেশি। বরিশালে তো আমাগ খালের থিক্যা নৌকা বেশি। আ-হা-হা-রে, দ্যাহেন, মাইনষের দুর্গতি দ্যাহেন—'

ডেপুটি পাড়ের দিকে তাকিয়ে দেখে একের পর এক লোক মাথায় মাল নিয়ে লঞ্চ থেকে জলে নেমে সাঁতার কেটে পাড়ের দিকে যাচ্ছে।

যারা সাঁতার কেটে পাড়ে উঠছে আর যারা লঞ্চ থেকে দেখছে—সকলেই হাসছে।

'স্যার, সবার তো ফুর্তি। দুর্গতি কোথায়?'

'হ। তাই তো। আমার বিভ্রম ঘটছিল। গুলাইয়্যা ফেলছিল্যাম। দুর্গতি আর ফুর্তিতে।'

টুঙ্গিতে ডেপুটি যোগেনকে কাছেই ডাকবাংলোতে নিয়ে চা-টা খাইয়ে আনার চেষ্টা করেছিল কিন্তু যোগেন রাজি হল না—'ধুত মশাই, এডা তো হাজতখাটা। রেলের কামরায় একা, লঞ্চের ছাদে একা, অ্যাহন প্ল্যাটফর্মেও একা। বরং এই হানে বসি।'

হবিগঞ্জের ট্রেন টুঙ্গী থেকে ছাড়ে বেলা দেড়টা নাগাদ। ডেপুটি বিপদে পড়েছিল যোগেনের লাঞ্চ নিয়ে। হবিগঞ্জের ট্রেন মিটার গেজের। কোনো প্যানট্রি কার নেই। আর এই রুটে এমন কোনো স্টেশন নেই যেখানে রেলের টেলিগ্রাফে খবর পাঠালেও কোনোরকমের একটা লাঞ্চ ট্রেনে যোগেনকে পৌঁছে দিতে পারে।

যোগেন প্ল্যাটফর্মেই বসে থাকে। চাওয়ালাকে ডেকে নিজেও এক ভাঁড় নেয়, ডেপুটিকেও এক ভাঁড় দেয়। সেই সুযোগে ডেপুটি বলে, 'স্যার, অন্তত ওয়েটিং রুমে চলুন। দাঁড়ান, আমি পরিষ্কার করিয়ে রাখছি।'

'আরে, ওহানেও ওয়েটিং, এহানেও ওয়েটিং।'

'প্রায় ঘণ্টা দুই সময় তো হাতে, স্যার। এই স্টেশনের পাশেই স্যার, ডাকবাংলো, আপনার কোনো অসুবিধে হবে না, স্যার। স্নান করে লাঞ্চ সেরে আরামে ট্রেন ধরতে পারবেন। স্যা—র—'

'শুনেন ডেপুটি সাহেব। সবে তো সব মেম্বার হইছে, মন্ত্রী হইছে—তারা আসাযাওয়া শুরু কইরলে তাগ স্যাবা দিতে-দিতে শ্বাসকষ্ট উইঠবে আপনাগ। আমারে ছাইড়্যা দ্যান। আমি ঠিক সেবাযোগ্য মানুষ না।'

'সে তো স্যার বুঝতেই পারছি। কিন্তু আপনি কি একটা বেঞ্চ থাকলে চেয়ারে বসে রাত কাটাবেন, স্যার?'

যোগেন কোনো আওয়াজ না করে মুখটা হাসিতে ভরিয়ে ডেপুটির দিকে তাকায়। একটু পরে বলে, 'আপনে তো জবর আরগুমেন্ট দিছেন! এমন শত্রুর নিকট পরাজয় স্বীকার করাও গৌরবের। না স্যার, এডা আমার স্বভাববিরোধী। আমি নিজেকে বোকা প্রমাণ করতে পারি না। চলেন, ডাকবাংলাতেই চলেন। কিন্তু আমারও অ্যাডডা শর্ত আছে।'

'বলেন, স্যার—'

'এইখান থিক্যা আপনি আর আমারে এসকর্ট করবেন না। আমি এক ঘুমে দিন পোহাইয়্যা সন্ধ্যারাত্তিরে পৌঁছায়্যা যাব। আর আপনিও এহান থিক্যা ট্রেন ধইর‍্যা হাজইদ্যার বাড়ি পৌঁছায়্যা যাবেন। কী? রাজি?'

'সে দেখা যাবে ট্রেন এলে—এখন চলুন স্যার।' ডেপুটি বোধহয় একটু বাড়িয়েই বলেছিল—দু-ঘণ্টা বসে থাকতে হবে প্ল্যাটফর্মে। যোগেন ও ডেপুটি হেঁটে ডাকবাংলোতে গেল, তাতে লাগল সাত-আট মিনিট। রেলের কোয়াটার, মাঠ এসবেই রাস্তা ভরা। তারপরই ডাকবাংলো—সামনে অনেকটা মাঠের শেষে চারচালা টিনের বাড়ি—লম্বাটে। কাঠের রং সবুজ, টিনের রং লাল। ঘরে গিয়ে, প্রাতঃকৃত্য সেরে, বালতির গরম জলে স্নান করে, গরম বালাম চালের ভাত, গরম মটর ডাল, একটা মাছভাজা সহ আর দুই পিস বাঘের জিভের সাইজের রুইমাছের গাদা আর পেটি দিয়ে লাঞ্চ সেরে ডেপুটির সঙ্গে আবার সেই সাত-আট মিনিট হেঁটে যোগেন প্ল্যাটফর্মে ফিরে এল মাত্র চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিটে।

'আপনে তো মাথায় জলস্পর্শ কইরলেন না।'

'না স্যার, হাতমুখ ধুয়েছি, স্নানটা করিনি।'

'খাওয়াডাও তো খুব প্যাট ভইর‍্যা খাইলেন না। বাড়ি গিয়্যা নিজের পুকুরে সাঁতার কাইট্যা, নিজের বাড়ির বউগ রাঁধা নিজের ক্ষ্যাতের ভাত খাওয়ার স্বাদ আলাদা।'

'সে তো স্যার দেরি হবে।'

'এইডা কইরবেন না, ওয়ার্ড যখন দিছেন, সে-ওয়ার্ড রাইখবেন। আপনি আমারে আর এসকর্ট কইরবেন না।'

'আমাকে তো স্যার নেক্সট পারসনকে চার্জ বুঝিয়ে দিতে হবে। নইলে তো স্যার ডেরেলিকশন অব ডিউটি হবে।'

'সাক্ষী তো একা আমি। যদি কই আপনে আমার কাজে বাধা দিছেন?'

ট্রেন এসে গিয়েছিল। একটাই ফার্স্টক্লাশ। সেটায় উঠে যোগেনকে যতটা আরাম দিয়ে বসানো

সম্ভব বসিয়ে ডেপুটি বলে, 'আমার সারা সার্ভিস-লাইফে স্যার এমন ডিউটি কখনো করিনি স্যার। যাঁর ডিউটি তিনিই বলছেন—ডিউটি করলে ডেরেলিকশনের চার্জ দেবেন।'

ট্রেন ছাড়ার লম্বা ঘণ্টা বাজে। 'স্যার, কোনো দোষত্রুটি ঘটে থাকলে ক্ষমা করবেন, স্যার।'

গার্ডের হুইসল বাজে।

'আপনারে কী কষ্টটাই-না দিল্যাম—কন। কত আবোলতাবোল কথাই যে অফিসারগো শুইনতে হয় ঠোঁট চিপ্যা। আমারে ক্ষমা দিবেন।' ট্রেনের লম্বা হুইসল বেজে উঠতেই যোগেন ব্যস্ত হয়ে বলে, 'আরে নামেন, নামেন—।'

'হ্যাঁ, স্যার', ডেপুটি নমস্কার করে কামরা থেকে নামে, যোগেন দরজায় দাঁড়িয়ে তাকে হাত নাড়ে। ট্রেনের চাকা প্রথম ঘোরার একটা যান্ত্রিক আওয়াজ উঠতেই থাকে। ডেপুটি হাত নাড়ায়। যোগেন হাত নাড়াতে গিয়ে ট্রেনের চলার প্রথম ধাক্কায় একটু দুলে ওঠে, তাড়াতাড়ি হ্যান্ডেলটা ধরে, ডেপুটি হাত নাড়ায়। যোগেন আর দেখতে পায় না তাকে, তবু হাতটা নাড়িয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে বার্থে বসে জানলা দিয়ে তাকায়।

যোগেনের কেমন ধারণা হয়েছিল—ডাকবাংলোটা দেখা যাবে। প্ল্যাটফর্মের পর খানিকটা জায়গায় বাজারের পেছন দিকের মত টিনের ছাপড়া পেরতেই, দেখে মনে হয় পাথুরে, আসলে অ্যাসিডহীন জমির অসমতল বিস্তার। বরিশাল-নোয়াখালি-ফরিদপুরে এতটা সবুজহীন ঊষরতা ভাবাও যায় না। মৈমনসিং আর সিলেটের উত্তরে তো পাহাড়।

আর-একটু গড়াতেই শীতলখ্যার নীল বিস্তার থেকে ওঠা হাওয়া ট্রেনের হাওয়ার সঙ্গে মিশে যোগেনের ওপর এমন ঝাপটে পড়ে যে তার চোখ জড়িয়ে আসে।

যোগেন ইচ্ছানিদ্র মানুষ। সময় নেই, অসময় নেই, সে যদি বোঝে তার জেগে থাকার কোনো কারণ নেই, তাহলেই সে ঘুমিয়ে পড়তে পারে। তার ঘুম এমন মটকামারা না যে ঘুম ভেঙে গেলে তাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। বরং সে যেন একটু মুক্ত মনেই ঘুমুতে পারে হবিগঞ্জের ট্রেনে। কাল ঢাকা মেল থেকে শুরু আর চলছে তো চলছেই। মনে হচ্ছে সেই ঢাকা মেলের বাবুর্চি, গোয়ালন্দের এসডিও, লঞ্চের ডেপুটি এদের সঙ্গে দিতে-দিতে এল। কিন্তু মজা হচ্ছে, যোগেনের এদের সঙ্গ ভালও লাগছিল। কত দায়িত্ব নিয়ে এরা সব কাজ করছে একেবারে চষামাটির লেভেলে। একেই বলে ব্রিটিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন...

এইসব মনে-মনে নাড়াচাড়া করতে-করতেই যোগেন তার নিজস্ব ঘুমের গভীরতায় ঢুকে ডুবে যেতে পারে ও সেই ঘুমের মধ্যে কখনোসখনো সে ট্রেনের লাইন বদলাবার আওয়াজ বুঝতে পারে, কোনো ক্যালভার্ট পেরনো বুঝতে পারে, এমনকী কোনো-কোনো স্টেশনে গাড়ি দাঁড়ানোও বুঝতে পারে। বুঝতে পারতে-না-পারতেই আবার ঘুমে ডুবে যায়।

ঘণ্টা তিনেক পরে যোগেন চোখ মেলে জেগে উঠে আশুবাবুর ঘড়িতে দেখে বেলা তিনটে পঁচিশ। আরে, তার মানে তো টুঙ্গীতে ট্রেন ছাড়ার পর থেকেই সে এতক্ষণ ঘুমিয়েই আছে। এতডা টানা ঘুমের তো কারণ নাই। অতিরিক্ত কারণ আর কী দরকার? ছুটন্ত ট্রেনের মতো সুখশয্যা আর কী হয়। তাদের খুলনা মেল—ঢাকা মেল সবই ছাড়ে দুদিক থেকে সন্ধের পর। ফলে, ট্রেনে উঠে ঘুমিয়ে পড়া তাদের একটা বদভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। তার থার্ডক্লাশে মানুষের ঠেলাঠেলিতে, নামাওঠায়, প্ল্যাটফর্মগুলির চেঁচামেচিতে মাঝমধ্যে জেগে উঠতে হয়। এ তো একেবারে স্বর্ণলঙ্কা, একালঙ্কেশ্বর, কাকপক্ষীও নেই। গভীর নিদ্রা ছাড়া করণীয় কিছু নেই। তবু তিন-সাড়ে তিন ঘণ্টা তো কম সময় নয়—তাও দিনদুপুরে যোগেন জানলা দিয়ে বাইরে তাকায়।

শায়েস্তাগঞ্জে তো গাড়িবদল করতে হবে—পার হয়ে যায় নি তো? যোগেন যেন এটুকু অনিশ্চয়তা উপভোগ করে। গতকাল রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে এই এখন হবিগঞ্জে পৌঁছুবার ট্রেন পর্যন্ত চব্বিশ ঘণ্টায় যোগেনের জানা হয়ে গেছে—সে যদি চায়ও তাহলেও শায়েস্তাগঞ্জ পার হয়ে যেতে পারবে না। হবিগঞ্জের এসডিও হোক, জিলার ম্যাজিস্ট্রেট হোক আর ঢাকা ডিভিশনের কমিশনার হোক—কেউ-না-কেউ তাকে গ্রেপ্তার করে হবিগঞ্জে নিয়ে যাবেই। যদি তাকে নাও পায়, তাহলেও তারা একটা যোগেন মণ্ডল জোগাড় করে নেবে। তার হিশেব মত, বা, শোনা-কথা মত, বা, সিলেট-ময়মনসিঙে আগে যে একটু এসেছে সেই চেনাজানা মত পাঁচটার আগে ট্রেন শায়েস্তাগঞ্জে পৌঁছুবে না।

জানলা দিয়ে তাকিয়ে যোগেন দেখতে চায়—সে আগে দেখেনি এমন কিছু দৃশ্য। সে ঠিক জানেও না—লাইন কোথা দিয়ে গেছে। আর যদি জানতও তাতেও বাইরের দৃশ্য কিছু বদলাত না। যোগেন একটু হেসে ফেলে—সে তাকিয়ে ছিল নতুন দৃশ্যের আশায় কিন্তু বাইরে ট্রেনের জানলায় সে দেখে রাবণবধ নদীর পারে আমতলি। বরিশাল-পটুয়াখালির তো খালের প্যাঁচ-পায়জার নেই কিন্তু অনেকটা জায়গা জুড়ে খালই হোক আর বিলই হোক তার ভঙ্গিটা বড় সুন্দর লাগে চোখে।

যোগেন বুঝতে পারে—কেন আমতলির কথা মনে এল। বরিশাল-পটুয়াখালি-যোলকাঠি-ভোলা—প্রভৃতি সব জায়গায় তো তাদের নৌকোয়-নৌকোয় ঘুরতে হয়। খাল তো আর নদী না যে ছাদের কেবিনে বসে পদ্মা দেখতে-দেখতে ডেপুটিবাবুর সঙ্গে গল্প করা যাবে আর চোখ একটু সরালেই জলবিস্তার দেখা যাবে। খাল তো দুই পারে আটকা, কোথাও বড় জোর ডাইনে আড়াআড়ি পাঁচ বাঁশ, বাঁয়ে আড়াআড়ি পাঁচ বাঁশ, আবার কোথাও দুই পাড়েরই ঘাস ছেঁড়া যায়। যেন দুই দিক আটকানো, সামনে-পিছনে খোলা। নৌকার ছেয়ের মতো।

৭৮

সিলেটমুখী যোগেন, শায়েস্তাগঞ্জে

যোগেনকে আর-একবার হাসতে হয়। হামাগো বরিশাইল্যাগো তো র‍্যালে উইঠলেই মনে হয় গাঙচিলের মতন পাখা মেইলছি। র‍্যালগাড়ি তো লাইন ছাড়া চলে না আর লাইন পাতার লগে তো র‍্যালের উঁচা বাঁধ দিব্যা লাগে। র‍্যালের বাঁধের লগে তো অন্তত টানা বড় আইলের নাগাল জমি চাই। বরিশালে ঐ টানা আইল কোথায়? পায়ে হাইটব্যার গ্যালেই তো দশ পায়ে এক খাল। বরগুলা-আমতলির কথা স্মরণ হইছে—জুতা পাইয়্যা ঘোরা গিছিল বইল্যা।

যোগেনের আন্দাজ ঠিকই ছিল—শায়েস্তাগঞ্জে গাড়ি পৌঁছল সাড়ে পাঁচটার পর। শায়েস্তাগঞ্জের স্টেশনটা ঝলমলে—ইলেকট্রিক লাইট আছে। রেলের লোকজনের নীল ওভারল বা কোট পরে ছোটাছুটিও আছে। একজন বেশ হেলেদুলে লাল চিনে লণ্ঠন দোলাতে-দোলাতে পার হয়ে গেল। তারপর আর-একজন সবুজ চিনে লণ্ঠন দোলাতে-দোলাতে উলটো দিক থেকে এল। যোগেন নিজে ট্রেন থেকে নামার কোনো ভঙ্গিই করল না বরং জানলা দিয়ে তার মুখটা যতটা বাইরে ঠেলা সম্ভব, ঠেলল। সে নেমে গিয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করলে, যারা তাকে খুঁজে

বের করে হবিগঞ্জের ট্রেনে তুলে দিতে এসেছে—তারা আবার তাকে খুঁজে পাবে না। এমএলএ হয়ে তো এই উন্নতি হল—কলকাতা থেকে হবিগঞ্জ হয়ে গেল যেন মহাপ্রস্থান।

হঠাৎ একটা বেঁটে শাহেব হ্যান্ডেল ধরে, যেন একটু কষ্ট করেই কামরায় উঠে যেন হাঁফ ছাড়ে। যোগেন বুঝতে পারে না, দাঁড়িয়ে ওঠাটা ঠিক কী না। সে তার বার্থটা হাত দিয়ে দেখিয়ে বলে, 'দয়া করে বসুন।'

যোগেন কোনোদিন এত বেঁটে, হাঁফধরা, কী করতে হবে তা নিয়ে অনিশ্চিত শাহেব দেখেনি। যোগেনের কথায় শাহেব মুখ ভরে হাসল—দাঁতগুলো ঝকঝকে ও বড়-বড়। একটু বেশিক্ষণ হাসি ধরে রাখছে দেখে যোগেনের সন্দেহ হয়—দাঁতগুলো কি বাঁধানো?

শাহেবটা হাসি শেষ করে বাজখাঁই গলায় জানতে চাইল—সে কি মিস্টার মণ্ডল এমএলএ-র সঙ্গে কথা বলছে?

এবার যোগেন উঠে দাঁড়ায়, শাহেবকে দেখে যতটা অবাক হয়েছিল, শাহেবের গলা শুনে সে চমকে ওঠে। এইটুকু হাইট থেকে এমন মেঘগর্জন?

'হ্যাঁ, আমি কি জানতে পারি আমার কার সঙ্গে কথাবলার সৌভাগ্য হচ্ছে।

'সিওর। অ্যাম হিয়ার টু রিসিভ ইউ। হ্যাপন টু বি দি সুপারইনটেনডেন্ট অব কাছার ডিসট্রিক্ট।'

'আপনি আবার কষ্ট করতে গেলেন কেন। আমি ঠিকই পৌঁছে যেতাম হবিগঞ্জে।'

ছিপছিপে এক লম্বা যুবক কামরায় ঢুকে নমস্কার করে বাংলায় বলে, 'চলুন স্যার, নামি।' আমি হবিগঞ্জের সাব-ডিভিশন্যাল অফিসার, স্যার।'

'এ হানে তো চেঞ্জ কইরবার লাগব? চলেন'—যোগেন এসডিওকে নিয়ে দরজার দিকে এগতেই দেখে, শাহেব ততক্ষণে দু-দিকের হ্যান্ডেল ধরে ঝুলতে-ঝুলতে নামছে। এসডিও চট করে দরজার সামনে উটকো হয়ে বসে তার হাতটা শাহেবের দিকে বাড়িয়ে দেয়। যোগেন এসডিওর পেছনে দাঁড়িয়ে, তাকিয়ে বুঝতে পারে—হ্যান্ডেল শেষ হয়ে যাচ্ছে অথচ শাহেবের পা মাটি পায়নি। বেঁটে লোকদের এমন অসুবিধে হয়। এসডিও এটা জানে নিশ্চয়ই।

শাহেব নামার পর এসডিও দাঁড়িয়ে সরে যায় ও যোগেনকে নামার সংকেত দেয়। যোগেন নেমে যাওয়ার পিছু-পিছু এসডিও নেমে এসেছে।

ইতিমধ্যে তো রটে গেছে—এসপি ও এসডিও দু-জনই এসেছেন একজনকে রিসিভ করতে।

ঘটনাটা কী?

শায়েস্তাগঞ্জের স্টেশন মাস্টার, অ্যাসিস্ট্যান্ট মাস্টার, টিকিটবাবু সকলেই এসে এদের ঘিরে দাঁড়ায়।

'আপনারা কেন?' এসডিও জিজ্ঞাসা করে।

'আমি তো স্যার, আমার টেরিটরিতেই আছি। এহাস্তে তিনবজ্র সম্মিলন দেইখ্যা জিগ্যাইব নি—ব্যবস্থার কুনু দোষত্রুটি—'

শাহেব বলে ওঠে, 'উইল বি মু.   । নাথিং টু ডু উইথ ইউ।'

মাস্টার কোমর ঝুলিয়ে শাহেবের কানের কাছে মুখ নাবিয়ে বলেন- 'স্যাব, আমাব ঘরে বইস্যা শলাপরামর্শ করলে হয় না, স্যার?'

শাহেবের মেঘগর্জন শোনা যায়, 'নো, নো, ইয়োর চেয়ার্স কালটিভেট বেডবাগস—'

'স্যার, ইস্টিশনে—কাছারিতে তো বেবাগ লোগই আসে—বামুন-শাহিব-হাকিম-হেকিম মগগয়া আসে। অগো পরনের বস্ত্র থিক্যা ছারপোকা চেয়ারে ডিম পাড়ে। স্যার এত্তালা পাঠাইলেন না ক্যান? চেয়ার গরমজলে ধুইয়া রাইখতাম। স্যার, চলেন, চলেন।

শাহেব বলে ওঠেন, আমাদের হবিগঞ্জে যেতে হবে এঁকে নিয়ে।

মাস্টার জবাবে বলে, 'সে তো স্যার দুই ঘণ্টা পর ছাইরব। মাঝহানে তো চাইড্ডা ইস্টেশন। ঐ ছাড়া আর পৌছান্তে যা টাইম লাগে। লেট কইরব্যার লাগব স্যার?' তাহালি লেট কইর‍্যা ছাড়ব। কতডা লেট স্যার? এক ঘণ্টা না আধা ঘণ্টা?

শাহেব, এসডিওকে আঙুল তুলে বলে, সমস্যাটা বোঝাতে।

'শুনুন মাস্টারমশায়, আমরা তো গাড়ি নিয়ে এসেছি। রাস্তার যা অবস্থা তাতে তো ওঁর হাড়গোড় ভেঙে যাবে।'

'রেইল থাইকতে রাস্তা ক্যান?'

'হিশেবটা হচ্ছে—ট্রেন ছাড়তে এখনো দুই ঘণ্টা। পৌছুতে আরো ঘণ্টা দেড়। মানে এখন থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা পরে পৌছুব। আর এখনই গাড়িতে যদি রওনা দেই, তাহলে এই রাস্তাতেও ঘণ্টা দুয়ের বেশি লাগবে না। মানে গাড়িতে গেলে দেড় ঘণ্টা সময় আমরা বাঁচাচ্ছি। অন্তত।'

'যদি-না চাকা ফাটে?'

'সে তো বটেই। আপনার সিগন্যালও তো ডাউন হতে না-পারে।'

'এই রাস্তাডা, এই শায়েস্তাগঞ্জ থিক্যা হবিগঞ্জ—এই রাস্তাডা তো আপনাদের তিনজনের কথাবার্তা কইব্যার লাগে? উনি তো কোনো কাজে আইসেন?'

'হ্যাঁ। সে তো লাগবেই—'

'মোটর গাড়ির ভিতরে তো আটা মাটির যেমন, তেমন গড়ান খাইতে হব, একবার বাঁয়, একবার ডানে। কথা কবেন কখন?'

'সে তো ঠিকই। কিন্তু স্যার তো আপনার এখানে ট্রেনছাড়া পর্যন্ত বসতেই চাইছেন না। বলছেন—ঐ দুই ঘণ্টায় ছারপোকা আমাদের সব রক্ত শুষে নেবে।'

'বড় শাহেব এড্ডু বেশি-বেশি ডর খাউছ্ছেন। হয়, ছারপোকা এড্ডু আছে কিন্তু আপনারাও তো মানুষ তিনজন। ভাগাভাগি কইর‍্যা কামড়াইলে আর পার-পাছা কয়ডা পড়ে?'

যদিও যোগেন বা এসডিও কেউই হাসেনি তবু একটা ছোট্ট হাসি চাপা পড়ার আওয়াজ শাহেব পেয়ে যায়। এরা নিশ্চয়ই নিজেদের ভাষায় তাকে নিয়ে মজা করছে। ওদের মুখের ভিতরে দুর্বোধ্য আওয়াজগুলি যেন কুকুরের মাঝরাতের হাড়চিবুনোর মতো।

শাহেব এসডিও কে বলে, 'দেরি করলে তো দেরিই হচ্ছে। মিস্টার মণ্ডল তো প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা রাস্তায়!

যোগেন জিজ্ঞাসা করল, 'হোয়াট ওয়াজ দি অরিজিন্যাল প্ল্যান? আর ইউ চেঞ্জিং ইট ডিউ টু রোড-কনডিশন।

জবাবটা সাহেব দিলেন, সত্যি কথা বলতে কী, তেমন কোনও প্ল্যান করার সময়ই তো পাইনি। ডিএম কাল প্রায় মাঝরাতে জানান আপনি আসছেন ও আমাকে রিসিভ করতে হবে, ডিস্ট্রিক্ট লেভেলের আর-কোনো অফিসার নেই। আমার হেডকোয়াটার থেকে বাই রোড আসতে হয় না। রোড কনডিশন জানা ছিল না। আর ওকে যখন হবিগঞ্জে ওর অফিসে পৌছে বলি শায়েস্তাগঞ্জ যেতে হবে, ও সাততাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, রাস্তার কথা ওর বোধহয় মনে ছিল না।

যোগেন পালটা জিজ্ঞাসা করে বসে, 'আপনারা তো হবিগঞ্জেই আমাকে রিসিভ করতে পারতেন!'

শাহেব—'বাট হাউ কুড ইউ অ্যালাও অল এলোন টু মেক ইট টু হবিগঞ্জ আফটার এ চেঞ্জ অব ট্রেন।'

যোগেন—'সে তো বোঝা গেল। এখন সমস্যা হল হবিগঞ্জের ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করা অথবা সড়ক ধরে যাওয়া। যাই করেন, কোনোটাতেই আমার কোনো অসুবিধ নাই, ছারপোকাতেও না।

মাস্টার—'স্যার, আমি ট্রেন লেট কইর‍্যা ছাইড়তে পারি, এইখান থিক্যাই তো অরিজিনেট করে। লেট-করার আর হাঙ্গাম কী? অ্যাহন ইনকামিং ট্রেইনরেও বিফোর টাইম সিগন্যাল দিয়া ঢুকাইতে পারি। কিন্তু বিফোর টাইম ডিপার্চার তো স্যার হয় না।'

যোগেন সিদ্ধান্ত নেয়ার ভঙ্গিতেই এসডিওর দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে বলে এসপি-র জন্যই—দেখুন, আপনাদের কথাবার্তা থেকে বুঝতে পারছি ট্রেনে যেতেই আপনারা স্বস্তি পাবেন। তাহলে তো ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতেই হবে ছারপোকা আর নো ছারপোকা। আসুন না, হাঁটি, আপনাদের কথা শুনি।

যোগেন পা বাড়িয়ে দেয়। এসপি আর এসডিও তার পেছন-পেছন চলে।

ধীর পায়ে প্ল্যাটফর্মে তাদের তিনজনের হাঁটায় প্ল্যাটফর্মটা ধীরে-ধীরে খালি হয়ে যায়—ভয়ে।

যোগেন জিজ্ঞাসা করে, 'হোয়াট ইজ ইয়োর এস্টিমেট অব দি সিচুয়েশন—'

এসপি বলতে না-বললে তো এসডিও কথা বলতে পারে না। ফলে, তিনজনই চুপ করে থাকে। এসপিই কয়েক পা গিয়ে বলে, 'ভেরি ব্যাড সোস্যাল পোলারাইজেশন লিডিং টু সাডন ভায়োলেন্স।'

যোগেন জিজ্ঞাসা করে, রাজনীতি কিছু নেই?

এসপি—সৌভাগ্যবশত এখনও নেই কিন্তু হতে কতক্ষণ? বা, ইতিমধ্যে হয়েছে, আমরা খবর পাইনি এখনো।

যোগেন—এটা অদ্ভুত না? একবছর ধরে একটা রায়ট চলছে, দু-একজন মারাও যাচ্ছে, অথচ কেন হচ্ছে—বোঝা যাচ্ছে না?

এসপি—উচ্চবর্ণের হিন্দুদের গোঁড়ামি ও একগুঁয়েমি।

তারা প্ল্যাটফর্মের শেষে এসে গিয়েছিল। এমনিই ঘুরত। পেছন থেকে একটা ভয়খাওয়া চিৎকারে তারা ঘুরে দাঁড়ায়, 'স্যার, স্যার, স্যার।' স্টেশন মাস্টার দৌড়ে আসছে। তার পেছনে আরো কয়েকজন।

তাদের সামনে এসে স্টেশন মাস্টার একটু দম নেয়ার পর বলতে পারে, 'শায়েস্তাগঞ্জ কখনো স্যার ফেইল করতে পারে না। আপনাগো ভেলুয়েবল্ টাইম নষ্ট হবে স্যার, হয় হাঁইট্যা-হাঁইট্যা না-হয় ছারপোকার খাদ্য হইয়া? আমারে সার্ভিসে থাইক্যা এই দৃশ্য দেইখতে হবে? এর চায়া মৃত্যু ভাল।'

'আপনার বেঁচে থাকার কি কোনো বুদ্ধি বেরল?'—এসডিও জিজ্ঞাসা করে।

'হ্যাঁ স্যার, আমাগো ইনস্পেকশন ট্রলি আপনাগ তিনজনরে হবিগঞ্জে পৌছ্যায়া দিবে, ট্রেন ছাড়ার টাইমের আগেই। ফর্টি ফাইভ মিনিটস, স্যার। নো-স্টপ তো। অ্যাহন আপনাগো অনুমতি হইলে ট্রলিডা লাইনে ফেলতে কই?'

'আমাগো সঙ্গে কেউ থাইকব তো, রেলের?'

'সে কী কথা? চালাইব কেডা, লোক না থাইকলে! টু হ্যান্ডলার্স অ্যান্ড ওয়ান সিগন্যালার, তিনজন স্যার তিনজন, ওরা স্যার, নিজেগো মইধ্যে কাজ ভাগাভাগি কইর‍্যা নিবে। ব্রেকডা

স্যার, আপনাগো কারো পায়ের কাছে থাকবো, আপনারা তিনজন তো? অ্যাকোমোডেশন হবে না। ব্রেক আর লাগব কখন?'

এসডিও অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে। এসপি আর এমএলএ থাকতে তার হ্যাঁ-না করার অধিকার নেই। এসপিও চুপ করে থেকে জানিয়ে দেন—যোগেন যা বলবে, তাই হবে। ওদের যদি আপত্তি থাকত, তাহলে অবিশ্যি 'না' 'না' করে উঠত। যোগেন বলে, 'কোথায় আপনার ট্রলি।

'এই-যে স্যার, রেডি,' তারপর পেছনের লোকদের হুকুম করে, 'এই ট্রলি লাগাও!'

সবই তৈরি ছিল—হাঁকটা শোনার অপেক্ষায়। লাইনের ওপর দিয়ে একটা ট্রলি ঠেলে নিয়ে আসে দু-জন। আর-একজন পেছন-পেছন দৌড়াতে-দৌড়াতে আসে, লাল একটা লণ্ঠন নিয়ে।

যোগেন খুশি হয়ে বলে, 'আরে নদীর য্যামন ডিঙ্গা, রেলের তেমনি ট্রলি। চইড়ব ক্যামনে? এহান থিক্যা ফাল দিয়্যা?'

ট্রলিটা প্ল্যাটফর্মের অনেক নীচে।

'ফাল পাইড়বেন ক্যান স্যার! এই ঢাল দিয়্যা লাইনে নাইম্যা ধীরে সুস্থে আরাম কইর্যা বসেন,' আবার পেছন ফিরে বলে, 'এই ছাতা লাগাও নাই? ছাতা লাগাও, ছাতা লাগাও।'

প্ল্যাটফর্মের একটু ভিতরে ভিড় জমে ওঠে, তারা দেখতে চায়, ঘটছেটা কী, একেবারে ধার ঘেঁষে দাঁড়ানোর সাহস পায় না।

এরা তিনজন দাঁড়িয়ে ট্রলিটাকে একবার দেখে নেয়, হাসি-হাসি মুখেই।

'উঠেন স্যার, উঠেন।'

সৌজন্যবশে শাহেব যোগেনকে হাত দেখান উঠতে। যোগেন সামনের বেঞ্চিটাতে বসে, একেবারে ডান ধারে। তারপর একবার তার সহযাত্রী দুজনের দিকে তাকিয়ে হাসে, প্ল্যাটফর্মে যেই জটলা বাড়ছিল তাদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ে হাসিমুখেই। একেবারে শেষে স্টেশন মাস্টারের দিকে তাকিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে যেন—'আরে, এই রেল থাইকতে লোকে রেলগাড়িতে উঠে ক্যান? মাস্টারমশায় দেখালেন যা—'

এর মধ্যে কেউ এসে একটা গার্ডেন আমব্রেলা লোহার নলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে স্ক্রু এঁটে দেয়। মাথার ওপরে শাদা-কমলা-সবুজ ছাতায় মাথার ওপরের আকাশটা ঢাকা পড়ে কিন্তু আলোটা ছাতার কাপড় গলে নানা রঙে ঝরে পড়ে। যোগেন সেই নানা রঙে মাখা নিজের জামাকাপড় দেখে বলে ওঠে, 'আরে মাস্টার, বিয়ার আর বাকি রাইখলেন তো এক কইন্যা—'

যোগেন ডান ধারে যে বসেছিল আর সরেনি। এসপি আর এসডি. ওকে ঘুরে বাঁদিক দিয়ে উঠতে দেখে, 'আরে আরে, আমি সইর্যা বসি।'

শাহেব বলল—আপনি ঠিকই বসেছেন কারণ ওকে তো ব্রেকে বসতে হবে। আর আমার সাইজের সুবিধে এই যে, যে-কোনো জায়গায় সেঁটে যেতে পারি।

যোগেন আগেই লক্ষ করেছে, এখন নিশ্চিত হয়ে গেল, শাহেবের গলার একটাই স্বর—ঐ একই মেঘগর্জন।

জ্যৈষ্ঠ আর আষাঢ় আর আশ্বিনে কোনো হেরফের নেই।

'স্যার, আপনাগো কোনো অসুবিধা তো হওয়ার কথা না। ট্রায়াল রান দিবেন নাকি অ্যাডডা?'

'আর ট্রায়ালের কাম কী? ফাইন্যালই ছাড়েন, কী? ঘন্টি দিবেন তো? না কী হুইসল?'

'ঘন্টি তো স্যার এক ট্রেন ইন-আউটের টাইমে দেয়া যায়। হুইসল বাজানো চইলব্যার পারে কিন্তু হুইসল তো গার্ডের লগে, আমার লগে না।'

'দুইডা আঙ্গুল ঠোঁটে পুইর‍্যা মায়ের দুগ্ধ পানের নাগাল টান মারেন, দ্যাহেন, ক্যামন হুইসল বাজে।'

'সে কি আর বাজব স্যার, পাঁচ বছর বয়সে মায়ের দুধু ছাড়ছি আর অ্যাহন তো রিট্যায়ারের আর বছর-পাঁচ বাকি। চল্লিশ বছর পার হইয়্যা গিছে স্যার। মায়ের বুকেও দুধ নাই, আর আমারও তো স্যার বত্রিশ পাটি দাঁত—মায়ের ব্যথা লাইগব। বেল একখান চান তো—এই বেল বাজা।'

পেছনের বেঞ্চে তিনজন কুলি বসেছিল, একজনের মাথায় লাল ফেট্টি—আর দুইজনের ঘাড়ে গামছা ঝোলানো। তাদের কেউ লোহায় লোহা মারতেই ঢংঢং করে উঠল আর ট্রলি গড়াতে শুরু করে—রঙিন ছাতায় প্রায় নিঃশব্দ গড়িয়ে যাওয়ায় রথের মত লাগে—ধামরাইয়ের বিখ্যাত রথ।

পেছনের দুই কুলি দু-দিকে দুটো হ্যান্ডেল ঠেলছিল আর টানছিল। তাতেই চলছিল ট্রলিটা। সেই ঠেলা আর টানার যে একটা তাল ওঠে ও আওয়াজও ওঠে, সেটা বোঝা যায় শায়েস্তাগঞ্জ স্টেশন চত্বর থেকে বেরিয়ে জংলা মাঠ আর মাঝেমধ্যে খাল ডোবার ভিতর দিয়ে যেতে-যেতে। ভাদ্রমাস—তাই এখনো সূর্যাস্ত হয়নি বা সূর্যাস্তের পরের আলো মাঠ-ঘাট-আকাশে ছড়িয়ে। কিছুক্ষণ এই ট্রলিযাত্রার নতুনত্বে তিনজনই অভিভূত। যোগেন বলে ওঠে, 'হবিগঞ্জে আগমন সারাডা জীবনে আমার অবিস্মরণীয় হইয়্যা গেল-আনফরগেটেবল। এই তো শুরু হইয়্যা।

স্যার, হাইলের সাউথ। এটা ঠিক হাইল না স্যার, এটা খোয়াই'—এসডিও একটু ব্যাখ্যা করেন।

'আমি তো বরিশালের পোলা—হাওড় বুঝি, আমাগ হাওড় আর সিলেটি হাওড় এক না। এহানে তো ছোট বিল্যা জায়গারে হাওড় কয়। আমাগ দ্যাশে বড় নদী ছাড়া হাওড় নাই। সে নদীর জল এগগরে সোতে-সোতে ধাক্কা খাইয়া পাক খাইয়া মাথায় উঠে, কমলে কামিনী দেহায়। হাইলডারে আমরা কী কই?'

'এইটা কিন্তু স্যার, খোয়াই—নদীর বা জলের স্রোতে শক্ত মাটি ক্ষয়ে গেছে। কুমিল্লাতেও আছে স্যার।'

'দ্যাহেন, এসডিও শাহেব, বরিশালে কুনো মাটিই নাই, জলে কি আর জল ক্ষয় হয়?'

শাহেব সেই একই মেঘগর্জনে বলে ওঠেন, আপনি তো নিশ্চয়ই সেক্রেটারিয়েট থেকে সব জেনে এসেছেন। তবু স্থানীয় অবস্থাটা কি শুনে নেবেন। তাহলে ও বলতে পারে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খানিকটা তো শুনল্যাম। একবছর ধইর‍্যা একডা দাঙ্গা চলে কী কইর‍্যা? পলিটিকস তো নাই। তাইলে ইন্টারেস্ট গ্রুপ কিছু পাইছেন? সে যে দিকেই হউকগ্যা—'

এসডিও একটু চিন্তিত মুখে বলে, 'ইনটারেস্ট গ্রুপ? তেমন তো কিছু শুনিনি স্যার?'

'আপনে তো এহানেই আছেন এই একবছর?'

'একবছরের বেশি, স্যার?'

যোগেন এবার ইংরেজিতে বলে শাহেবের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে, আবার এসডিওর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে, একটা বছর তো কম সময় না। এর মধ্যে আপনাদের কাছে কোনো খবর আসেনি, যে দাঙ্গাটা চালিয়ে লাভটা কার হচ্ছে। মানে, এমন আকাট পাগলও তো থাকতে পারে—কিছুদিন পরপর দাঙ্গাহাঙ্গামা না হলে যার ভাল লাগে না। আপনাদের ইনফর্মার স্পাইরা কোনো খবর দেয়নি?

এসডিও শাহেবকে দেখায়।

শাহেবের গলা ট্রলির হ্যান্ডেলের চাইতে উঁচু শোনায়—আমার কাছ পর্যন্ত আসেনি, হয়ত

ওখানকার ডিএসপি-ও জানেন।

এটা কি স্থানীয়ভাবে দেখা হচ্ছে, ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে আপনারা ইনভলভড না?

না, না, মিস্টার মণ্ডল। পুরো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইনভলভড। কিন্তু ঘটনা যখন ঘটে, তখন তো সামলাতে হয় লোক্যাল অফিসারদেরই। আমাদের যেটা এখন সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা—এ থেকে আবার পাশাপাশি জায়গাগুলিতে উত্তেজনা না ছড়ায়।

নমশূদ্রদের জুতো পায়ে দেয়া চলবে না—এডাই তো আসল কথা?

'হ্যাঁ স্যার, ঠিকই। কিন্তু একটা পার্টিকুলার গ্রাম তো, ইনটিরিয়ারে, শিমূলঘর, খুব পুরনো মন্দির, কেউ-কেউ তো বলেন এক হাজার বছর আগের, পাঁচশর নীচে কেউ নামেন না। সেই মন্দির বেশ বড় ল্যান্ডলর্ড। সেই মন্দিরের আশপাশের সব জমিই দেবত্র, প্রায় গোটা গ্রামই বলতে পারেন। সুতরাং সেখান দিয়ে কেউ জুতো পরে যেতে পারবে না।'

'কেউ পারবে না? না কী শুধু নমশূদ্রেরা পারবে না? বামুন-কায়েতরা পরে? মুসলমানরা?

'এভাবে ঠিক বলা যাবে না। ব্যাপরাটা ঘোরালো হয়ে উঠেছে। হায়্যার কাস্টরা ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রশনের সঙ্গে মিটিঙে জোর দিয়ে বলেন যে তাঁরাও না কী জুতো পরেন না। কিন্তু আমরা জানি—ওঁরা ঠিক কথা বলছেন না।'

পেছনে সিগন্যালার কখন দাঁড়িয়ে লাল লণ্ঠনটা ঘোরাতে শুরু করেছে, ওরা কেউ বোঝেনি। হঠাৎ ট্রলির সামনের রেললাইনে লাল আলোর প্রতিফলন ও লাইন ধরে ছুটছে দেখে, ওরা ঘিরে ধরা অন্ধকারটা দেখে।

'তাহলে কাল বেলা দুটো-আড়াইটে নাগাদ সবাইকে মন্দিরেই ডাকেন' দুই কুলির শ্বাসের আওয়াজ পাওয়া যায়।

যোগেন বলেই দিয়েছিল, সে কোনো ডাকবাংলো বা সারকিট হাউসে উঠবে না, তার আত্মীয়বাড়িতে উঠবে। এসডিও যদি বাড়িটা চিনে রাখেন তাহলে কাল মিটিঙের আগে এসে তাঁকে নিয়ে যেতে পারবেন।

আত্মীয়বাড়ি বলেই যে হবিগঞ্জে তুলসীমালা বৈষ্ণবের বাড়িতে উঠল যোগেন তা নয়। নয়ই-বা কেন? সব চাঁড়ালই সব চাঁড়ালের আত্মীয় না-হলে একা-একা কোন্ চাঁড়াল বাঁচে। সহোদর ভাইদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ নেই অথচ জাতভাইরা সহোদরাধিক। সিলেটে এসে তুলসীমালাকে সেবা না দিয়ে যে যাবে সে আর যাই হোক নমশূদ্র না। ভক্ত বৈষ্ণব বলে সারা সিলেট-কুমিল্লাতেই তুলসীমালাকে সব জাতের মানুষই সম্মান করে, ওঁর শিষ্যও আছে অনেক। তুলসীমালার বাড়িতে গেলেই সব খবর পাওয়া যাবে, জাতভাইরাও সংবাদ পাবে, তাদের সঙ্গে কথা বলে ঘটনাটা ঠিকঠাক জানা যাবে, কী করণীয় তাও স্থির করা যাবে। তাছাড়া ভোটে জেতার পর এদিকে আসা হয়নি—গবর্মেন্টের দূত হিশেবে যোগেন দাঙ্গাবন্ধের মিটিঙে হাজির হতে চায় না। সে তার আপন জাতের বিপদে তাদের কাছে এসেছে এটা জানাতে যে এখন তারাও সরকারের অংশ। তার জাতভাইরা যদি নিজেরা নিজের চোখে দেখে ও বোঝে যে যোগেনের কথা ডিসি, এসপি কেমন মান্য করে, তাহলে এদের গর্ব অনেক বেশি হবে। যাই ঠিক হোক, তাতে তুলসীমালার মত আছে—এটা জানাজানি হলে যোগেনের কাজও অনেক সোজা হবে।

হবিগঞ্জে তুলসীমালা

৭৯

তুলসীমালার বাড়ি বা মণ্ডপ বা মন্দির বা আখরা বা ঠাঁট—একটা গলির মধ্যে, গলিটা বেরিয়েছে উত্তরের আর-একটু চওড়া রাস্তা থেকে, সেটা আবার বেরিয়েছে কয়েক পা পশ্চিমের আর একটু বড় রাস্তা থেকে। সেটা হবিগঞ্জের বাজারের পেছন পাড়া তুলসীমালার বাড়ি থেকেই শুরু বলতে হয় দক্ষিণ পাড়া বা নমপাড়ার। আগে বলা হত, ঐ বাড়িতে নমশূদ্র পাড়া শেষ, তখন দক্ষিণ থেকে একটা রাস্তা ধরে তুলসীমালার বাড়ি বা মন্দিরে এসে পেছন পাড়ায় চলে যেত তখন এটা ছিল দক্ষিণপাড়া বা নমপাড়ার শেষ। তুলসীমালার যখন খুব নামডাক আর তুলসীমালার রাসমেলা যখন হয়ে উঠেছে—এই পুরো মহকুমার তো বটেই, মহকুমার বাইরেরও বড় মেলা, ঠিক তখনই সেই সাবেকি দক্ষিণ পাড়ার ক্ষীরোদ সাহা তার বাড়ির পাশে রাস্তাটা দিল আটকে। রাতারাতি একেবারে মুলি বাঁশের বাতা দিয়ে। কোনো ফাঁক নেই কোথাও। কী? না, ক্ষীরোদ সাহা ওখানে টিউবঅয়েল বসাবে। বসাবে মিউনিসিপ্যালিটি। সরকারই না কী মিউনিসিপ্যালিটিকে দিয়েছে—বিলাতের কোনো রাজা-রানীর রাজত্বের ২৫ বছর উপলক্ষে। ক্ষীরোদ সাহার ওঠাবসা, ব্যাবসাবাণিজ্য আছে বাবুদের সঙ্গে, তার অবস্থাই দক্ষিণ পাড়ায় তখন উঠতি, শোনা যায়—সুদের কারবার করে। বাবুরা না কী তাকে বলেন, জমি ঠিক করে আলাদা বেড়া দিলে তারা টিউবঅয়েলটা দেবে। তাই বেড়া।

এই নিয়ে কোনো গোলমাল হয়নি কারণ দক্ষিণপাড়ায় একটা টিউবঅয়েলে পাড়ার সম্মান বাড়ে। বেড়া থাকল, টিউবঅয়েল বসল, ক্ষীরোদ সাহা তলাটা সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়েও দিল। দেবেই-বা না কেন? কলটা তো তার বাড়ির কলই প্রায়। কিন্তু সারা দক্ষিণপাড়া তখন টিউবঅয়েলের গৌরবে গর্বে মাতাল। টিউবওয়েল বা ক্ষীরোদ সাহার নিন্দে করলে সঙ্গে-সঙ্গে কেউ পালটা বলে, 'ক্যা রে' তুই হ্যান্ডেল মারলে কি জলডা কম উঠে?'

ঐ রাস্তাটায় চলাচলের পথ না—থাকায় দক্ষিণ পাড়ার লোকদের বাজারের পেছন-পাড়ায় যাওয়া-আসার বদল হয়ে গেল, চেনামুখগুলিও বদল হয়ে গেল। এক টিউবওয়েলে যেন দক্ষিণপাড়া বা নমপাড়াটাকে টাউনের ভিতর থেকে বাইরের দিকে ঠেলে দিল। তবে মানুষজনের গতায়াত ঘটলে নতুন পথ পুরনো-চেনা পথ হয়ে যেতে আর কদিন?

আইলে-গেইলে। জলও পথ দেয়—

না-আওয়া না-যাওয়ায় স্বামীস্তিরির মধ্যেও চর জাগায়। তবে, এই এক টিউবঅয়েলে যে তুলসীমালাকে দক্ষিণপাড়া থেকে আলাদা করে পেছনপাড়ার ভিতরে নেয়া হল আর সেই মন্দির বা ঠাঁট বা আখরা হয়ে গেল ওগো, বামুন কায়েতগো মন্দির—সেখানে রাসের মেলা দিনদিনই বাড়ছে, তেমন সন্দেহ কারো-কারো মনে উঠতে দুই রাস কেটে গেল।

মন্দিরের সামনে বাঁশের তোরণে সবদিক থেকে মাধবীলতা আর একদিক থেকে মালতী লতা লতিয়ে উঠেছে। দুই সারির ফুল ও পাতাগাছের শেষে ছোট ধাপের ওপর একটা বেশ বড় দাওয়া ; অনেকে একসঙ্গে বসতে পারে। দাওয়ার পুবে ফুলে-আলোতে সাজানো রাধামাধব, কষ্টিপাথরের বলেই সবার জানা, যদিও কষ্টিপাথরটা কী তা ঠিক জানা নেই, নবদ্বীপ থেকে এনে দিয়েছিলেন মৈমনসিং-এর ধনবাড়িয়া নবাবশাহেব। একজন ব্রাহ্মণের হাত দিয়ে পাঠিয়ে খবর দিয়েছিলেন, 'যবনস্পর্শমুক্ত এই যুগলমূর্তি গ্রহণ ও স্থাপন করিয়া খোদাতালার ইচ্ছা পূরণ করিবেন দোয়া করি। কৃষ্ণনগরে এক শাদিতে গিয়াছিলাম। ফেরার সময় এই মূর্তিটি দেখিয়া

বড় ভাল লাগিল। আপনি ভক্ত, মরহুম, তাই আপনি এর প্রকৃতরস সোয়াদ করিতে পারিবেন। সেলাম আলে কুম...

তারপর থেকে এই রাধামাধব যুগলমূর্তি তুলসীমালার আখরার প্রধান বিগ্রহ হয়ে উঠেছে। লোকের মুখে-মুখেও একটা নতুন নাম তৈরি হয়েছে, রাধামাধব মন্দির। বর্ণহিন্দুরাই এই নাম বেশি বলে। একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত বিগ্রহের নিত্য পূজা সেরে দিয়ে যান।

নমশূদ্ররা অবিশ্যি তাদের পুরনো নামেই ডাকে, নামতলা বা ঠাট! তাদের দেবতা বলতে তো এক গৌর, আর তাদের মন্ত্র তো মুখে নাম, হাতে কাম।' গৌরাঙ্গ ও জগদ্বন্ধু প্রভুর দুটি ছবি আলাদা জায়গায় পূজা হয়। তুলসীমালার বয়স হয়ে গিয়েছে। এখন শয্যাসায়ী। মুখের কথাও বোঝা যায় না। এখন তাঁর বংশগত গুরুগিরি ও এই মন্দির নামতলার দায়িত্ব পড়েছে তাঁর বড় ছেলে প্রভুদয়া বৈষ্ণবের ওপর। তুলসীমালা যতদিন সুস্থ ছিল ও নিজেই সব করত, তখনো সে কখনো রাধামাধব মন্দিরের দাওয়ায় ওঠেনি। বলত, 'গেরস্তবাড়ি আর বাবুর বাড়ি থিক্যা মা-বৌ-মাইয়্যারা পূজা দিব্যার আসে, স্নান কইর‍্যা, শুদ্ধ হইয়া, ভক্ত মনে। আমার মত শূদ্রকে মন্দিরে দেইখলে তাগো ভক্তিতে চোট লাইগবে। আমার রাধামাধব যদি তাগ পূজা-ভক্তি নেন, তা হাইলেই তো তুলসীমাল ধইন্য, ধইন্য। রাধামাধব যারে যেহানে বহাইছেন—বামুনরে বসাইছেন নিকডে, মা-জননীগো বসাইছেন দাওয়ায় আর তাঁর দাসস্য দাস তুলসীমালরে বসাইছেন দাওয়ার তলায়, মাটিতে। রাধমাধব যদি কন আমি ঐ পিছনপাড়ার মোড়ে গিয়্যাও বয়্যা থাইকবার পারি।'

রাজারানীদের বংশের পঁচিশ বছরের পার্বণী টিউবওয়েল একটা দক্ষিণপাড়ার গলিতে টেনে এনে গেড়ে দেয়া কম ক্ষমতার কাজ? ক্ষীরোদ সাহা বলেই পারল!

তারজন্য বেড়া দিতে হলে, বেড়া দিতে হবে।

প্রথম ক্ষমতাটা কাজে লাগাতে হলে, দ্বিতীয় কাজটারও ক্ষমতা থাকা চাই।

রাস্তার মধ্যে বেড়া দিলে রাস্তা তো আটকাবেই। এইটুকু ঘুরে যাওয়ায় ক্ষমতা নেই?

নমশূদ্র হয়ে বৈষ্ণবগুরু তো হওয়াই যায়। গৌরই তো চণ্ডালের উদ্ধার—'আচন্ডালে দেহ কোল।' সে গুরুগিরির ক্ষমতা তো তুলসীমালা দেখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আর কেউ কি এমন ক্ষমতা রাখে যে বামুন-কায়েতদের রাধামাধব যুগলে হেঁটে চাঁড়ালের মন্দিরের বিগ্রহ হন?

ক্ষমতা কোন্‌টা—নিজের বাড়ির নামতলার মাটিতে বসে থেকে বামুন-কায়েতদের দাওয়া ছেড়ে দিয়ে বলা যে আমি চাঁড়াল, চাঁড়ালই আছি, আপনাদের স্পর্শদোষ ঘটবে না। নাকী, রাধামাধবের পাশে দাঁড়িয়ে জমিদারদের মত চিৎকার করে বলা—ঠাকুর মানতে চাও তো চাঁড়ালকে আগে মানো।

তুলসীমালা রাধামাধবের মন্দির সাজিয়ে, বামুন-কায়েতদের সেবা দিয়ে শুদ্দুরের গুরুগিরি করেও সারাটা দেশের শূদ্রদের কাছে মান্যগণ্য হন? হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুরের পরই তো তুলসীমালার প্রতিষ্ঠা।

নামতলায় ঢুকতে-ঢুকতে যোগেন চেঁচায়—'আরে, বড়গোঁসাই না পৌছাতেই সন্ধ্যারতি শ্যাষ?'

যোগেন যে আসবে সে-কথা কারোই জানা ছিল না। ফলে ঠাহর করে নিতে যা একটু সময় যায়। তারপরই বোঝা যায় ভিতর দুয়ারে সন্ধ্যার ছায়ায় কত মানুষ ছড়িয়ে ছিল। মেয়েরা ফূর্তিতে উলু দিয়ে ওঠে, সে উলু যেন শ্রীখোলের বাদ্য হয়ে আকাশের দিকে উড়ে যায়। উলু থামতেই নারী-পুরুষের মিলিতস্বরে পরিত্রাণের প্রার্থনা ওঠে, 'গৌর হে, বন্ধু হে, গৌর হে।'

কে একজন হন্তদন্ত হয়ে দবদবিয়ে দুয়ারে ঢুকে চেঁচায়, 'আরে, হইলডা কী, ডাকাইত পইড়ছে না কী?'

'ডাকাইত যদি পইড়তই তা হাইলে কি তুমি অ্যাহনো নিজের স্কন্ধে নিজেরই মস্তক বহন করিতে? জানো না কী তাতার বালক মাতৃক্রোড় হতে ছুটে যায় ব্যাঘ্র সনে করিবারে রণ?'

যে এসেছিল সে যোগেনের কথা থেকে বোঝে, যোগেনই এসেছে। বোঝার পর এক লাফে সে যোগেনের সামনে এসে পড়ে হাঁকার দেয়, 'আরে, আরে, আরে, দেখছনি বড় ভগ্নীপতি বাড়িত্ ঢুইক্যা পইড়ছে একখানও আওয়াজ না-তুইল্যা? হালা, ভগ্নীপতিগ চরিত্তির চিরকালই খারাপ!'

এরমধ্যে দুয়ারে একটা ঝকঝকে লণ্ঠন আর গোটা কয়েক কুপি এসে গেছে। সেই আলোতে আলো পেয়ে যোগেন তাকে জবাব দেয়, 'আরে, তোর না-হয় ভগ্নীপতি, তোর বাপের তো জামাই!'

লোকটি একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে বলে ওঠে, 'অ্যাঁ?'

আর মেয়েদের ভিতর থেকে এক বেশ বয়স্কা বলে, 'দিছে তো জব বন্ধ কইর‍্যা? বলদের বুদ্ধি নিয়্যা গিছ মণ্ডলরে খোঁচাইতে। তাও তো অ্যাহনো ইংরাজি খোলে নাই। ঠাউরজামাই এড্ডু শুনাও।'

'থামো তো! শাহেব যে এমন বাঁইট্যার বাঁইট্যা হয়! সারাডা রাস্তায় বাঁইট্যা ইংরাজি কইতে কইতে তো জিভে মইরচ্যা ধরল—'

'ঠাকুরজামাই, ঐ দিকে যে ডাক পাইড়্যা-পাইড়্যা শ্বাস উইঠল। যাও, এডডু মুখডা দেখাইয়া আইগ।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কোন ঘরে?'

লণ্ঠন নিয়ে একজন দুয়ার পেরিয়ে পথ দেখায়—যোগেন সেদিকে যায়। সঙ্গে সেই 'শ্যালক', সেই শ্যালকের বৌ, যে যোগেনকে ঠাকুরজামাই ডাকে, আরো কেউ-কেউ। যোগেন শয্যাশায়ী তুলসীমালার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে।

ঘরটা বড়, কাঠের সিলিং, ওপরে টিন। একটা বড় আলো জ্বলছিল ঘরে, লম্বা চিমনির। তুলসীমালার বুকেপিঠে রসুনভাজা সর্ষের তেল মাখানো হচ্ছে—কোনো বৌ মাখিয়ে দিচ্ছিল। তুলসীমালার স্ত্রী তো কয়েক বছর আগে গত হয়েছে। যে-বৌটি তেল মাখাচ্ছিল, সে ঘোমটা টেনে সরে যায়। নতুন বিয়ে হয়ে এসেছে হয়ত। যোগেনকে চেনে না।

যোগেনকে দেখে তুলসীমালা দু-হাত তুলে হাউ মাউ করে কথা বলে ওঠে—যতটা উঁচু গলায় সম্ভব।

পেছন থেকে যোগেনের শ্যালক-বৌ বলে ওঠে, 'ঠাকুরজামাই, যাও, বিছানায় বইস্যা হাত ধরো। জিগ্যায়—তুই ক্যান হঠাৎ, কুনো দুঃসংবাদ না কী?'

যোগেন জানত যে তুলসীমালা অসুস্থ। কিন্তু এতটা, তা আন্দাজ করতে পারেনি। নমশূদ্রদের যা খাওয়াপরার হাল, তাতে সব বাড়িতেই দুই-একজন নুলো ছেলেমেয়ে আর শ্বাসওঠা বুড়োবুড়ি থাকে। পরস্পরের খবরাখবরে তাই কে কেমন আছে—এইসব কুশল জিজ্ঞাসার কোনো জায়গাই নেই। অসুখ বুঝলে তো অসুখ। না-বেঁচে থাকলে যেমন মরণ।

শ্যালক-বৌয়ের কথামত যোগেন বিছানায় গিয়ে বসে, তুলসীমালার হাত ধরে তাকে শুইয়ে দেয়, তারও পরে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে, 'আমার আবার দুঃসংবাদ কী? আপনেই তো দুঃসংবাদ হইয়্যা পইড়্যা আছেন।'

তুলসীমালা দু-হাত তুলে আবার হাউমাউ করে কিছু বলে। শ্যালক-বৌ বলে, 'চক্ষু দুইডা দ্যাহো মাটি থিক্যা সূঁচ খুঁজব্যার পারে। তোমারে জিগায়, ঠাকুরজামাই, মুখডা মলিন দেহি ক্যা?

যোগেন একটু আত্মচেতন হয়ে পড়ে। সে তুলসীমালার ঘরে ঢুকে তার অবস্থা দেখে একটু অপ্রস্তুতই হয়ে গিয়েছিল। তাদের সমাজের আত্মীয়জনদের মধ্যে এমন কেউ অপ্রস্তুত হয় না। যোগেনও যে হয়েছে তার কারণ যোগেন এখন তার সমাজের মধ্যে বাস করে না। হিশাব মত করে বৈকী, প্যারি ডাক্তারের বাড়ি কি তার সমাজের মধ্যে পড়ে না? আইনে নিশ্চয়ই পড়ে। বেআইনে পড়ে না। যোগেন এ-বাড়িতে ঢুকতে-ঢুকতেই যে হৈহৈ বাধিয়ে দিয়েছে, সেটা এ-বাড়ির বেটাছেলে মেয়েছেলেদের চেনা। যদি সেই চেনাটা না দিত, সেটা তো বরং এ-বাড়ির লোকদের কাছে অচেনা ঠেকত। যোগেন তাই নিজের স্বভাবের নকল করেছে। এ-ঘরে এসে সে ভুলে গেছে, তার কাছে কী রকম কথাবার্তা শুনতে চাওয়া হতে পারে। তুলসীমালার চোখে সেটাই ধরা পড়ে গেছে।

'হাজারবার কইছিল্যাম না, তা ঐ মশায়, তুলসীমালা তো স্ত্রীলিঙ্গ, ওডারে পুংলিঙ্গ কইর‍্যা ন্যান। শুইন্যা আমার উপরে কী চোটের চোট—হ, তুলসীমালা শুইনতে ভাল, তুলসীমাল্য শুইনলে মনে লয় সিলেটি বামুন, মন্ত্র কইলে দেব্‌তা বোঝে না। ক্যা? দেব্‌তা তো আর সিলেটি না। অ্যাহন, কি দেব্‌তা পাইছেন? সেডা নারী-পুরুষ বুঝে তো?'

তুলসীমালার ঐ শরীরে যতটা জোরে হাসা সম্ভব, সে তত জোরেই হাসে, তার ঐটুকু শরীর কেঁপে ওঠে হাসিতে। সেই হাসিটা দেখে, যোগেনও হেসে ওঠে আর মুহূর্তে তার অপ্রস্তুতিটা কেটে যায়। মরণরোগীও যদি হাসতে পারে এমন, তাহলে যোগেনের হাসাটা কেন বানানো হবে?

হাসি থামিয়ে তুলসীমালা আবার সেই দুর্বোধ্য উচ্চারণে কিছু বলে। যোগেন এবার বুঝতে পারে—তুলসীমালার জিভ নড়ে না, সে শুধু গলা আর ঠোঁট দিয়ে কথা বলছে।

শালাবৌ আঁচলে ঠোঁট ঢাকে।

'কী কইল? কইলডা কী?'

'ঐ সব আগড়বাগড় কথা আমি কইব্যার পারব না। আমি তো মাইয়াছাওয়াল। আমার তো লজ্জা লাগে।'

তুলসীমালা এ-কথাতে যোগেনের শালাবৌকে ধমকে কিছু বলে। শালাবৌ তাতে ঝামটা দিয়ে ওঠে, 'আ হা হা রে। জিভ নাই তবু ছুকছুক আছে বুড়ার। নাক দিয়্যা কি আর গুড় চাটা যায়? হুনো, ঠাকুরজামাই, তোমার তাঐয়ে কয়—দ্যাবতা চিনলেও চিনব্যার পারে। কিন্তু তোমার তাঐয়ের শরীলে স্যায় চিহ্ন থাকলে তো খুঁইজ্যা পাব। বেবাক চিহ্ন গোবরলেপা।'

শুনতে-শুনতে তুলসীমালাই সবচেয়ে আগে হেসে ওঠে, কিন্তু হাসিটা চেপে রাখে যোগেনের শেষ কথাটা শুনতে। শালাবৌ আর যোগেনের হাসি একসঙ্গে চলে।

এই হাসিতে যোগেনের আত্মসচেতনতা, খালের জল যেমন ভাটির টানে নেমে যায়, সেই রকম ভেসে যায়। তাদের সমাজে সব কথাতেই স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্কের যৌনতা আসবেই। বয়সের তফাত নেই, সম্পর্কের তফাত নেই, সময়-অসময় নেই। যে যত ঘুরপথে সেই যৌনতায় ঢুকতে পারে, তার তত বাহাদুরি। তুলসীমাল্য-র নাম যে তুলসীমালাই থেকে গেল, যোগেন সেই কথা তুলে একটু আলগা টোকা দিতেই তুলসীমালা সেই ভাঙাবেড়া দিয়ে ঢুকে পড়ল।

এদিকে এ-ঘরে বেশ উঁচু গলায় কথা হচ্ছে শুনে—একে-একে সবাই ঘরে এসে ঢোকে। তার মধ্যে তুলসীমালার নাতিরাও আছে, ছেলেরাও আছে, ছেলেবৌরা তো আছে, সম্ভবত

নাতবৌও দু-একজন থাকতে পারে। যোগেন এদের সবাইকে চিনবে-জানবে কী করে। বিএ পাশের পর শ্বশুর আর তার কলকাতা গিয়ে ল-পড়ার খরচা দিতে রাজি ছিল না। সেই সময়ই তার বড়দিদি বিধবা হল। তখন বড়দিদির দেখাশোনা করতে যোগেনকে প্রায় বছরখানেক থাকতে হয়েছিল জামালপুরে। ওকালতি পড়তে না-পারার দুঃখ, দিদির বাড়িতে শোকতাপ। দিদির সম্পত্তি ছিল একটু—সেটা যাতে বেহাত করে না নেয় সেটা সামলাতেই যোগেনের আসা। যোগেন আসার ফলে দিদিকে অন্তত কেউ অসহায় ভাবার সাহসে করেনি। যোগেন বুঝেছিল—দিদি, জামাইবাবুর কাছ থেকে কাজকর্ম শিখে নিয়েছিল। সেটাই যোগেনের জীবনের সবচেয়ে দুর্বৎসর। মা মারা গেছে—সে শোক যোগেনের খুব লাগেনি। তার তো যোগামা ছিল। কিন্তু যোগেন কেন জামালপুরে থাকে? না, তার কাছে জামালপুরও যা, মৈস্তারকান্দিও তা—কোনো জায়গাতেই তো তার কোনো কাজ নেই। বিএ পাশ করে সে কি অবরেসবরে কাকা-বাবার বরাত-আনা নৌকা বানানোর মিস্তিরি হবে? বরং জামালপুরে তার কাজ না-থাকাটা মানায় বেশি। দিদির দুঃসময়ে ভাই এসেছে।

জামালপুরে এসে জামাইবাবুর কাজকর্ম সম্পত্তির যা একটু আন্দাজ পেয়েছিল যোগেন, তাতে তার মনে হয়েছিল দিদি তাকে কলকাতায় পড়ার জন্য মাসে দশ-পনের টাকা পাঠানোর ক্ষমতা রাখে। যোগেন চেয়েওছিল বলতে। বলে ফেলতও, কাজটা বেঠিক জেনেও। কোথায় তাদেরই উচিত দিদিকে সাহায্য করা, তা না, জামাইবাবু চোখ বুজতে-না-বুজতেই দিদির ঘাড় ভাঙা। তাদের সমাজে পুরনো বিয়াতী মেয়ের সঙ্গে বাপের বাড়ির সম্পর্ক খুব ঘন হয় না, তাও যদি কাছাকাছি হয়, তাহলে একরকম, শারদার সঙ্গে যেমন। কিন্তু কোথায় গৌর নদী আর কোথায় জামালপুর।

শেষ পর্যন্ত যে দিদিকে এটা বলে উঠতে পারল না, তার কারণ, এই কথাটাই ভাবতে-ভাবতে নিজের মনেই যোগেন বুঝে ফেলে, দিদির পক্ষে কথাটা বোঝাই সম্ভব না। কলেজে পড়াটাই দিদির কাছে এক অদ্ভুত ঘটনা ; কিন্তু কলেজের পরে কলকাতা গিয়ে আইন পড়াটা শুধু অদ্ভুত না, রহস্যমাখা। যোগেন তাকে ঠকিয়ে টাকা নিচ্ছে ভেবে সে বড়জোর পাঁচটা টাকা ধরিয়ে তাকে দেশে চলে যেতে বলবে। যোগেন যে কী করে ভাবল, দিদি একটা দু-বছরের মাসিক খরচের মধ্যে ঢুকতে রাজি হবে—এটা ভেবেই যোগেন নাকখত দেয়।

সেই সময়, সেই ২৯ সালে, বছর নয় আগে, যোগেন মাঝেমধ্যে হবিগঞ্জের এই তুলসীমালার বাড়িতে আসত। তাদের সমাজে সবাই সবার জ্ঞাতি। তাই সম্বন্ধ দিয়ে সম্পর্ক থাকে না। তবু, নামতলার সঙ্গে জামালপুর আর যোগেনের শ্বশুরবাড়ি খাগবাড়ির বারুইদের সঙ্গে সম্বন্ধও একটা ছিল।

যোগেনের জামালপুরের জামাইবাবুর বড় দিদি, মানে ক্ষীরোদার, ননাসের সঙ্গে এ-বাড়ির এই নামতলার, বড়ভাইয়ের বিয়ে হয়েছিল। জামাইবাবুর মায়ের বয়সি দিদি, কিন্তু বাবার আগের পক্ষের স্ত্রীর মেয়ে হলেও দিদি তো দিদিই। যোগেনের জামাইবাবু যদি তুলীমালার বড়ভাইয়ের শ্যালক হয়, তাহলে সে-শ্যালকের বয়স যদি উনিশকুড়িও হয়, তাকেও তো তুলসীমালাকে দাদা বলেই ডাকতে হয়। তাকে তুলসীমালা চিরকাল বলরাম-দাদা বলে ডেকে এসেছে। বলরামদাদার শালা যোগেন, তাহলে দাঁড়ায় তুলসীমালার দাদার শালার শালা। আবার, আর-একদিক থেকে যোগেনের শ্বশুরের বড়ভাইয়ের বড় মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তুলসীমালাদের মামাতো বড় ভাইয়ের ছেলের সঙ্গে। তাহলে, যোগেনের বড় ভায়রা দাঁড়ায় তুলসীমালারও জামাই। যোগেন একই সঙ্গে, তুলসীমালার দাদার শালার শালা আবার আর-এক দাদার (মামাতো) ছেলের ভায়রা।

মানে, তুলসীমালা দাঁড়ায় যোগেনের শ্বশুর। তুলসীমালার সঙ্গে যোগেনের বয়সের তফাত বাপছেলের চাইতেও বেশি। দু-জনের সম্পর্ক বরাবরই সমবয়স্ক বন্ধুর চাইতেও ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়। তুলসীমালাকে যোগেন ডাকে তালই বলে আর যোগেনকে তুলসীমালা ডাকেন ভাইগনা বলে। সেই ডাকাডাকি নিয়েও গল্প আছে। কোন্ পুরাণে নাকী বলা আছে—দেবতাদের পুরুত নারদের এক ভাগ্নে ছিল, তার নাম পর্বত। এক রাজকন্যাকে, তার নাম দময়ন্তী, নারদ আর তার ভাগ্নে পর্বত—দুজনই খুব বিয়ে করতে চাইত। রাজকন্যা দময়ন্তীও তাদের দু-জনেরই বীণা বাজানো খুব ভালবাসত। এর মধ্যে একদিন দময়ন্তীর বাবা, রাজা ঘোষণা জানালেন যে, তাঁর মেয়ে স্বয়ম্বরা হবে, সুতরাং দেব-মানব-দানব, যারই ইচ্ছে সে ঐ নির্দিষ্ট দিনে এসে লাইন দিতে পারেন। দুপুরের ভোগের জন্য ঘণ্টা দেড় বাদ দিয়ে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সভা চলবে। পাত্র-মনোনয়ন হওয়া মাত্রই স্বয়ম্বর অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবে। নারদ সঙ্গে-সঙ্গে ঠিক করে ফেলল যে, সে স্বয়ম্বরে যাবে। ভাগ্নে পর্বতকে কোনো খবরই সে জানাল না, উলটে দৌড়ে গেল, দেব্তাদের তিন কর্তা-দেবতার একজন, বিষ্ণুর কাছে। বিষ্ণুকে নারদ সব জানিয়ে অনুরোধ করল, তিনি এমনই কিছু বর দিন বা শাপ দিন যাতে পর্বতকে মুখপোড়া হনুমানের মত দেখতে লাগে। স্বয়ম্বর সভার খবর পর্বতও পেয়েছিল, সে-ও নারদকে কিছু না জানিয়ে ঐ বিষ্ণুকেই গিয়ে ধরল্ একটা কিছু বর বা শাপ দিয়ে নারদের মুখটা পুড়িয়ে দেয়া হোক, সঙ্গে গুহ্যদ্বারটাকে আগুনে পুড়ছে, এমন টকটকে করে দেওয়া হোক। বিষ্ণু দু-জনকেই খুব প্রশংসা করলেন ও দু-জনের প্রার্থনাই মঞ্জুর করলেন। স্বয়ম্বরের দিনে নারদ দেখে, তার ভাগ্নে পর্বতের মুখটা পোড়াকাঠের মত পোড়া। আর পর্বত দেখল, তার মামা নারদের মুখটা তো পোড়াই, তার ওপর তার বাহ্যদ্বারটা পোড়া বেগুনের মত ঝুলছে, আর যেন তখনো পুড়ছে এমনই লাল। ওদের দু-জনের কারো কাছেই আয়না ছিল না, সুতরাং তারা দু-জনই নিশ্চিত ছিল যে তার প্রতিপক্ষ হারবে ও সে জিতবে। এদিকে রাজকন্যা যেই বর খুঁজতে বেরিয়েছে, অমনি গরুড় পাখির পিঠে চড়ে বিষ্ণু মারল এক গোত্তা, আর চামচিকে যেন পাখাগজানো উইঁপোকা খাচ্ছে এমন সহজে, গরুড়রাজকন্যাকে ঠোঁটে তুলে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'আরে, এমন লম্পট ভগবান থাকতে, পর্বত, মেয়েছেলে পাবি তুই?' তুলসীমালা বলে।

'আরে তালই, ভাগ্নের মেয়েছেলে ছাড়া তোমার মেয়ে জোটে না? তোমার আর থাইকলডা কী?'

'তু-ল-সী মা-লা—'

'নিজের লিঙ্গটাও বদল্যায়া দিছ নিজের নামে?'

'সে তো তোগো শুদ্দুরগো জিভে মরচ্যা। তোরা য-ফলা বলব্যার পারিস না—মাল্য-রে বলিস মালা।'

এইসব পারস্পরিক সম্ভাষণ শোনার লোভেই ঘরে ভিড় বেড়ে যেতে থাকে—যারা আগে শুনেছে তারা তো এলই—যারা এসবের গল্প শুনেছে কিন্তু নিজেরা দেখেনি, তারাও ছুটে আসে।

তখন, সেই বছর দশ আগে, জামালপুর থেকে নামতলা যাতায়াত করতে-করতে যোগেনের একসময় এমনও মনে হত যে নামতলার বাড়ি তাকে কলকাতার মাসখরচটা দিতে পারত। যদি এবাড়ির কোনো মেয়ের সঙ্গে সে বিয়া বসত। এবাড়িতে তো গণ্ডায়-গণ্ডায় মেয়ে। যোগেন তেমন একটা বৌ কি জোটাতে পারত না, যার সুবাদে তার কলকাতায় গিয়ে ল-পড়াটা হয়! বছর দেড়-দুই আগে বিয়ে করা এক-বৌ তার না হয় খাগবাড়িতে আছে। তার মুখও তো যোগেনের মনে নেই—তার বয়সও তো এগার-বার এখন। তাদের সমাজে এটা চলে, না

বামুন-কায়েতদের সমাজে তো চলে পাড়গড়ানো ভেলার মত, খুঁটো না ঠেকালেই ভেলা জলে ভাসে।

ল-পড়ার জন্য মাথা খারাপ হলেও আর এরকম করে ল-পড়ার তেমন কোনো সমাজিক দোষ না থাকলেও, শেষপর্যন্ত যোগেন কথাটা তুলতেও পারেনি। বিয়েটিয়ের কথা না তুলেও তো বলা যেত, তাও পারেনি। একটা লেনদেনের প্রস্তাব না-হয় বলা যায়—খেটে শোধ করব, এসব লেনদেন তাদের সমাজে চলে না। জামাই হিশেবে নিজেকে বন্ধক দেয়া ছাড়া আর কোনোরকমের লেনদেনের উপায় যোগেনের হাতে ছিল না। নিজের বিয়ে করা বৌকে নিয়ে কোনো অনুভবও তার বাধা হয়ে ছিল না।

তবু যে সে বলে উঠতে পারেনি। তার কারণ হয়ত ছিল অনেক গভীর সাগরজলের তলার উদ্ভিদগুলির প্রলম্বিত নিরলম্ব জড়িয়ে যাওয়া দেখে, ধূসর আবছা অচেনা নানা জলজীবের অদৃশ্য সব গতির উপথায়। যোগেন তো চাইছিল—নমশূদ্র হতে, ল-পড়ার জন্য তাহলে সে ভদ্রসমাজের ছেলেদের মত করে ভাবছে কেন?

তুলসীমালা সেই জিভহীন গলায় কিছু বলে ওঠে। কী, জানতে যোগেন ভিড়টার দিকে তাকায়। তুলসীমালার সেজছেলে বসেছিল মেঝের ওপর, যোগেনের থেকে অন্তত দুই-তিনজনের বড়, ডাকে, 'কী কয় শুইন্যা দ্যাও।'

সেই প্রথম বৌটি প্রায় ছুটেই আসে—এখানকার বেশি আলোতেও তার শাড়ির ডুরেগুলির রং আর তার চাঁছালো চিবুক ও নাকের ডগা চকচকিয়ে ওঠে।

'ক্যা? এই হানে কি ভাষাডা শিখ্যা ন্যাওনের আর কোনো পুরুষ নাই?' সে তুলসীমালার মুখের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কী জিগ্যাও, জিগ্যাও।'

তুলসীমালা সেই আওয়াজটা করে। আর শুনে, ঠোঁটে আঁচল চাপা দিয়ে বৌটি তুলসীমালাকে বলে, 'রসের মানুষরে পাইয়্যা রস তো এগবারে উথাল দিছে।' তুলসীমালা মাথাটা নাড়িয়ে মন্তব্যটা মেনে নেয়। সেই বৌটি তখন যোগেনকে বলে, 'তোমারে জিগায়, এইহানে কার মোক্তারি লইয়্যা আইল্যা?'

'আপনে ছাড়া আর কোন্ মক্কেল আছে আমার? গোলমাল বাধ্যায়া রাখছেন শিমুলগড়ে।'

তুলসীমালা ওরকম আওয়াজে কথা বলছে, তার কথা আবার বড় করে বলে সবাইকে জানানো হচ্ছে। তার টানে যোগেনও গলা উঁচিয়ে ফেলছিল। সেই বৌটি যোগেনকে বলে, 'কান ঠিক আছে। তোমাকে গলা তুইলতে লাগব না।'

'হাঙ্গাম কীসের? মামলাডা কী?'

'বামুনরা আপনাগ পিট্যায়, নাহি আপনারা বামুনগ পিটান—'

'পিটাপিটির কামডা কী? পিট চুলক্যায় কার?'

একটু পরেই ঘরের ভিতরে এতজনের নানা কথাবার্তায় যেন একটা সুর তাল এসে যায়। যোগেনের গলা, তার জবাবে তুলীমালার আওয়াজ, তারপরে মেয়েদের গলায় তুলসীমালা যা বলেছে তার পুনরুত্থাবণ। আবার একজনের গলা।

'অ্যাগো গিয়্যা বামুন পিটাইব্যার কামডা কী?'

'বামুন পিডাইল ক্যাডা? তারাই-না আমাগো পা থিক্যা টাইন্যা জুতা খুলায়?'

'সামাল দিয়া কথা কইয়ো মাইঝ্যা কর্তা। জুতা খুইল্যা হাঁটতে কইছে সেডা একডা কথা, আর বামুন হইয়া তোমাগো পদধুলিসহ জুত্যা খুইল্যা দিছে, সেইডা আর-এক কথা। বামুনগ আদেশ মাইনব্যার বাধা কী? 'আদেশ' পর্যন্ত বামুনগ যাইব্যার দেওয়া হইল ক্যা। আদেশ দিবার

আগেই আদেশ মাইন্যা নিলে আদেশ তো তৈরি হইব্যার টাইমও পায় না।'

'আপনি এইডা পাবলিকের সামনে কইবেন তালে?'

'মানে, আমাগ ভগবান কোমরের তলায় দুইখান কইর‍্যা নাম্বা ঠ্যাং দিছে কি মাথার চুলের মতন—শুধু শোভাবৃদ্ধির লগে? কামের লগে না?'

'তা তোমাগ পায়ের কাম একটাই—এইখান থিক্যা শিমুলগড় গিয়া আইন-অমান্য।'

'এডা কী কইলেন, তালে। নমশূদ্র বইল্যা জুতা পরা নিষেধ?'

'জুতা যদি পরোও এহ্যান থিক্যা শিমুলগড় পৌঁছাইতে-পৌঁছাইতে কয়বার নি তোমার জুত্যা খুইলব্যা? নদীর জল, খালের জল, জঙ্গল, বালু, কাদা—এইসব কি জুতা-পইর‍্যা পার হওন যায়, না জুত্যা বগলে দিয়া পার হওন লাগে?'

'কয় কী মানুষডা? এক সাল ধইর‍্যা মামলা চইলছে, দুই-দুইডা হইয়্যা গেল চাড়ালখুন, অ্যাহন আধগণ্ডা ব্রহ্মহত্যা না কইরলে তো সমান-সমান হইব না।'

'তাইলে তোমাগ মতডা কী খাড়াইল?'

'খাড়াইল—শিমূলগড়ের বামুনগ নাকখৎ দিয়্যা স্বীকার দিতে অইব—এমন অন্যায্য কাজ তারা আর কইরব্যান না।'

'ব্রহ্মহত্যা হওনের লগ্নখান কী স্থির হইল? নাকখতের পূর্বে না নাকখতের পর?'

সকলে হেসে ওঠায় বোঝা গেল, যোগেন যে সকলের মতটা মেনে নিয়েছে, তা তারা বুঝেছে। এই কথাবার্তা যে শুরু হয়েছে তার খবর নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে রটে গিয়েছে। ফলে, বাইরে থেকে সমাজের ক-জন মাতব্বরও এসে গেছে—যোগেন একবার উঠে গিয়ে জগমোহন ডাক্তারকে সেবা দিয়ে এসেছে, আর-এক তেলতেলে কাল পেশিতে কোঁদা কোঁকড়া চুলের এক যুবকের দিকে আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এডা কার বেটা।'

'সুধইন্যা, সুধইন্যা'—সমস্বরের পর কেউ একজন বলে, 'শিক্ষিত ছাওয়াল, সিলেট কলেজে পড়ে।'

যোগেন তাকে বলে 'সুধইন্যা—'

একজন সংশোধন করে, 'সুধইন্যা ওর বাপ, অ তো মুকুইনদ্যা।

'অ, মুকুন্দ, তোমাগ কী মত?'

মুকুন্দ একটু অপ্রস্তুত হয়ে যায়—এতসব লোকজনের মধ্যে তাকেই আলাদা জিজ্ঞাসা করায়। সে যত তাড়াতাড়ি সেটা সামলে নেয়, তাতে বোঝা যায়, তার আলাদা মত আছে। যোগেনের মনে পড়ে গিয়েছিল আগৈলঝরা প্রজা সম্মিলনীর কথা, তার বক্তৃতা, বক্তৃতার শেষে ভেগাই হালদারের বিরাশি সিক্কার একখান চড়।

'আমরা তো বুইঝতে পারি না বিবাদটা কী?'

'এই, শিমূলগড়ে যা চইলতেছে, বামুনগ সাথে, হাঙ্গামা।'

'আমাগ তো হাঙ্গাম নাই—'

'আমাগ দুই জন মানুষ যে বলি হইয়্যা গেল—'

'এডা কি একখান কথা অইল, কাহা? বলি হইল্যাম আমরা আর হাঙ্গামও আমাগ?'

যোগেন যেন মুকুন্দের গলায় তার নিজের দশ-বার বছর আগের গলা শুনতে পায়। আর, কথাও তো বানাতে পারে—হাঙ্গাম আর খুনটাকে কেমন আলাদা করে নিল।

যোগেনের ইচ্ছে হল—মুকুন্দের সঙ্গে আর-একটু কথা বলার।

'সে বাবা তুমি চক্ষু বন্ধ কইর‍্যা চালায় মাছ গুঁইজ্যা রাইখলে তো দুনিয়া জাইন্যাই যাইব

কোথায় রাইখল্যা, তোমার চোখ তো দুনিয়ার চক্ষু না।'

মুকুন্দ কথাটা ধরতে পারেনি। সেই শিমূলগড়ের ঘটনা থেকে কাকপাখির মাছগোঁজা, তার চোখ আর দুনিয়ায় চোখ—তাদের এই আড়ে-আড়ে ঠারে-ঠারে দূরে-দূরে কথা কওয়ার অভ্যাস মুকুন্দের এখনো আয়ত্ত হয়নি। হয়ত, কখনো হবেও না। দশ-বার বছর আগে যোগেন নিজে কথা বলত সোজাসাপ্টা কিন্তু তাদের সমাজের কথাবলার এই রীতও সে এতই ভাল জানত যে সভাসমিতি মিটিং কমিটি, কোর্টকাছারিতে কথাবলার ঐ রীত্ ব্যবহার করে সে বেশ সুযোগ বাড়িয়ে নিতে পারে। মুকুন্দ যে তার কথার ভাও বুঝল না—এতে যোগেন যেন খুশিই হয়, যেন ঐ-রীত্ ব্যবহারের মধ্যে কৌশল আছে। মুকুন্দ যদি চায় তাহলে, সেই কৌশল তার অপছন্দের হতে পারে। যার সঙ্গে তার কথা, তার ভাষাতেই মুকুন্দ কথা বলতে চায়।

'হাঙ্গাম যারা বাধাইছে, মিটাইব্যার দায় তো তাগ। বামুনগ এই হুকুমজারির দখল আইল কোথ্ থন? আমাগ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল তো আবার অর্ডার দিছেন জুতা না-পইর‍্যা কলেজে গেলে পার্সেন্টেজ নাই। তা কোন্ বামুনের কথা শুনব? শিমূলগড়ের না কলেজের?' কথাটির সোজা সরল গতিতে চমৎকৃত সবাই হেসে উঠে হাতে তালি দেয়। যোগেনও।

'আরে, এ ছাওয়াল তো আমাগরে চাকরি খাইব। কাইল তো আমি শিমূলগড়ে মিটিং ডাকছি বাবা। সেই হানে আমাগো পক্ষ থিক্যা কী কব।'

আবার তুলসীমালার গলার আওয়াজ ওঠে। নারীস্বরে সেটা শোনায়, 'কইব্যা যে আমরা জুত্যা পরা আসব না। কিন্তু একডা সীমা-সরহদ্দ থাকব তো। সেই সীমাখান ঠিক কইর‍্যা দ্যাও। বিবাদ মিটাও।'

'এই-যে মুকুন্দ, তালই-এর চায়্যা উঁচা গলা তো আর আমাগ মইদ্যে কারো না। কও এবার।'

'আমাগ জুতাপরার সীমা মাপার বামুনরা কে?' আমরা কি তাগ জমিদারি ভিতর জুতাপায়ে ঢুকি? তার থিক্যা কাইল আপনার মিটিঙে বেবাক মানুষ জুত্যা পইর‍্যা যাই। একা-একা জুত্যা পইরলে বামুনরা তার জুতা খুলাইতে পারে। বেবাক মানুষ জুত্যা পইর‍্যা গেলে কার জুতা খুলাবে?'

মুকুন্দের কথায় যোগেন একটা সম্ভাবনার আঁচ পায়। বামুনদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটা সমাবেশ যেন তৈরি হয়ে যেতে পারে। যোগেন ততক্ষণে তার একটা পা ভাঁজ করে বিছানায় তুলেছে আর মুদ্রাদোষে আর-একটা পা দোলাচ্ছে। তার ঠোঁটে হালকা হাসিটা লেগে আছে, কোনো একটা অবস্থা, সে বাইরেরই হোক, আর কোনো মামলারই হোক, মাপজোখ করে নেয়ার সময় অনেকক্ষণ যে-হাসিটা তার ঠোঁটে লেগে থাকে। যোগেন সবার মুখের ওপর দিয়ে তার দৃষ্টি ঘুরিয়ে আনে। বেবাক মানুষে জুত্যা পইর‍্যা কাইলকার মিটিঙে হাজির হওয়ার কথায় যে-হাসাহাসি ওঠা স্বাভাবিক ছিল তা ক্যান উইঠল না? বরং সবাই য্যান চুপ মাইর‍্যা গেল। ডর খাইল? না, যোগেনরে ভাবার সময় দিল? নাকী, অন্য একটা কিছু আছে, যার সঙ্গে মতামতের কোনো সম্পর্ক নাই। যোগেন একটু যাচাই করতে চায়।

'এই কথাডা ষোল আনার উপর আঠার আনা ঠিক যে, সরকার-লাটশাহেব-আইনসভা সবাই চায় সিলেটের এই দাঙ্গাহাঙ্গামা যত্ তাড়াতাড়ি হয়, মিট্যা যাক। এই কথাডাও আঠারো আনার উপর এক সিকা ঠিক যে, এনারা সগ্গলে মনে করে—দোষ উচ্চ বর্ণের, বামুন-কায়েতগো। তার এক নম্বর প্রমাণ—তা না হইলে সরকার আমারে তাগো প্রতিনিধি না পাঠাইয়্যা, কুনো বামুন-কায়েতরে পাঠাইত। দুই নম্বর প্রমাণ—সেক্রেটারির থিক্যা রাজবাড়ির এসডিও, আমারে লঞ্চ পারাইল যে স্যায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সিলেটের এসপি আর হবিগঞ্জের এসডিও আমারে

শায়েস্তাগঞ্জে লাইন বদল কইর‍্যা হবিগঞ্জ পর্যন্ত আইল—তারা প্রত্যেকডা মানুষ কইছে, দোষ উচ্চবর্ণের। তিনি নম্বর প্রমাণ—নমশুদ্দুরদের যদি এক পয়সা দোষও থাইকত, তাহাইলে দারোগা পুলিশ আইস্যা আমাগো ঘাড় মটকাইয়া হাজতে ঢুকাইত। দুইডা নমশূদ্রের বদলে যদি দুই বামুন খুন হইত, তাহাইলে দ্যাখত্যা কাণ্ডটা কী বাঁধে। সেদিক থিক্যা মুকুন্দর কথাডা ঠিক। অ্যাহন যহন সরকার আমাগ পক্ষে, তহন সমাজের বেবাক মানুষ এক হইয়া জুতা পইর‍্যা উচ্চবর্ণের হিন্দুগো বুঝান দেয়া যায়—আমরা তাগো হুকুমের দাস না। সরকার-পুলিশের আমাগো পাশে-পিছনে থাহার মতন অবস্থা ভবিষ্যতে নাও আইসতে পারে। এইডা যে আমাগো জোর দেখাইব্যার সুযোগ এড্ডা, তাই নিয়্যা তো সন্দ নাই।'

সবার ওপর চোখ বোলাতে-বোলাতে যোগেন তার কথাটা থামিয়ে দেয়। যোগেন টের পায় সবাই-ই এটা চায় কিন্তু অন্য কোনো অস্বস্তি হচ্ছে।

যোগেন এবার হেসে বলে, 'কিন্তু বাবা মুকুন্দ, আমাগো এড্ডা অসুবিধা তো আছে। আমাগো সগ্গলের তো জুতা নাই', যোগেন সারা শরীর দুলিয়ে হেসে ওঠে, মুহূর্তে সেই হাসিটা ছড়িয়ে পড়ে। নিজেদের নিয়ে ঠাট্টাতামাশায় ঘরের গুমোট কেটে যায়। কেউ একজন গলা তুলে বলে, 'যাগো আছে তাগো আবার পরার অভ্যাস নাই। পুরান শক্ত জুত্যা পায়ে পড়লেই ফোস্কা।' আরো একজন বলে ওঠে, 'পুর‍্যান জুতার দোষ দ্যাও ক্যা? কাইল সকালে নতুন একখান জুত্যা কিন্যা পইরলে পায় ফোস্কা পড়ব না?'

যোগেন আবার একচোট হাসে। হাসির মধ্যে ইঙ্গিত ছিল, নতুন একটা কিছু তার মনে এসেছে। সেই কথাটা শুনতে সবাই একটু চুপ করে থাকে।

'আরে সিলেটি বামুনগোর তো মাথার পিছনে টিকি নাই যে বুদ্ধিশুদ্ধি ঢুইকব্যার ফুটা পাবে। অগো তো টিকি আছে গুয়ায় আনারসের নাগাল। কাঁটা উঁচ্যাইয়া গুয়ার বুদ্ধির উপর বইস্যা থাহে। আমাগো জুতাই নাই, তা বিধান দিল চাঁড়ালগো জুতো পরা চইলবে না। বুদ্ধি কিছু থাইকলে তো বিধান দিত—সব চাঁড়ালরে জুত্যা পরনের লাগবই।'

যোগেনের এই কথায় একেবারে গড়াগড়ি শুরু হয়ে গেল, হাসির। কেউ কেউ তালিও দিয়ে উঠল।

তুলসীমালা আবার একটা আওয়াজ করল, যার শব্দগুলো দাঁড়ায়, 'বেবাক খালি পায়েই যাও।'

যোগেন তুলসীমালার হাঁটু জড়িয়ে ধরে বলে ওঠে, 'গুরুরে, তুমি কি সাধে গুরু? অ্যামন বুদ্ধি না-ইলে কি তুমি আমার গুরু? নিজের নাম থুইলা তুলসীমালা, যত কই, তালই, মালা তো স্ত্রীলিঙ্গ, ওডারে মাল্য করো, তত কয় মাল্য নিয়া তো সবাই গুরু হয়, মালা নিয়া এক তুলসীমালা। মুকুন্দ—তোমার কথা থাকল, সববাই মিল্যা যাত্রা আর তালই-এর কথাও থাইকল—সীমা মাপেন, বামুনঠাকুর। সবাই সকাল-সকাল যাবে, আলগা-আলগা থাইকবে কোনো সন্দ য্যান তৈরি না-হয়। বেলা দুইডায় মিটিঙ ডাইকব্যার কইছি। এসডিও আমারে নিয়্যা পৌঁছাইলে তোমরা একে-একে আইস্যা জড়ো হইবা, যেহানে মিটিঙ সেহানে। বইব্যা না। সবাই মিল্যা খাড়াইয়্যা থাকবা—'

'বোবার নাগাল?'

'ক্যা? কালার লাগান না? এগগেবারে বোবা-কালা। বলদের নাগাল। কেউ কিছু কইলেও কানে যায় না। সবাই গায়ে গা লাগায়্যা থইকো, গায়ে গা লাগায়্যা—'

দেবেন হঠাৎ বলে ওঠে, 'মাইয়া-ছাওয়ালরাও যাইব নি?'

'হঠাৎ মাইয়া-ছাওয়ালের কথা ক্যা?'

'ঐ যে কইলেন, গায়ে গা লাগাইয়া থাহার কথা। মাইয়া-ছাওয়াল না থাইকলে গাও পাব কোথথন?'

'অ হ হ রে ধর্মের ষাঁড় হইছেন বলদ আর দিব্যার চান পাল! ক্যা? পুরুষের কি ভাঙ্গা গতর যে ঠেকনা দিয়্যা সিধা হবার লাগব? প্রায় নিজে-নিজে খাড়ায় না, অরে খাড়া কইরব কেডা? যে যার নিজের গায়ে সাঁইট্যা থাইকো, লাগাইবার জইন্য আর-এক গাও খুঁইজো না—' তীক্ষ্ম স্বরে কথাগুলি বলল দেবেনের নিঃসন্তান বৌ।

এসডিও গাড়ি নিয়ে এলেন ঠিক দেড়টায়। এসডিও শাহেব এসেছেন—তাঁকে আপ্যায়ন করা হবে না? নামতলা-র বাড়িতে এটা কোনো আয়োজনের ব্যাপরই নয়। এবাড়ির সকলেই, দশ-বার বছর বয়স হয়েছে এমন সব ছেলেমেয়েরাও মানুষজনকে অভ্যর্থনার রীতিনিয়ম জেনে যায়। বাড়ির পুরুষদের কথাই নেই—তারা সকলেই যেন জ্যান্ত গুরু। লালপাড়ের ধোয়া ধুতি পরনে, সেটার মতই একটা উত্তরীয় গলায় ঝোলানো। যিনি এসেছেন, তাঁর অভ্যর্থনা যদি রাধামাধবের দাওয়ায় হয়, তাহলে ব্রাহ্মাণ পুরোহিত চরণামৃত দেন, আশীর্বাদী ফুল দেন, রাধামাধবের সামনে অহর্নিশ শিখায়িত বড় প্রদীপ থেকে নেয়া তাপে হাতের তেলো গরম করে, সেই তাপ অভ্যর্থিতের কপালে, মাথায় ও কণ্ঠদেশে ছুঁইয়ে দেন। এরা কেউ দাওয়ায় উঠবে না। কিন্তু ঐ ধুতিতে উত্তরীয় সেজে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। যে-করেই হোক অভ্যর্থিত অতিথি এটা জেনে যান—'রাধামাধব আমাদের ঘরে আইস্যা উঠছেন বইল্যা তারে আমাগো জাতে নামাতে পারি না। আমরা চণ্ডাল, চণ্ডালই থাকব। আমাগো অধিকার নামকেত্তন পর্যন্ত—গৌর যা দিয়্যা গিছেন। তার বেশি আমরা চাইব্যার পারি না।'

এমন মানুষ, যে আচমকা হবিগঞ্জে এসে পড়েছে আর তাকে নিয়ে আসা হয়েছে নামতলার রাধামাধবের মন্দিরে, এসে, যখন সে দেখে বা, বোঝে এই মন্দিরের কর্তৃত্ব এক নমশূদ্র পরিবারের ও সেই পরিবার শাস্ত্রীয় বর্ণভেদ অক্ষরে-অক্ষরে মেনে চলে, এমন কী দাওয়াতেও ওঠে না—তারা তখন অভিভূত হয়ে যায়। এও কি সম্ভব? এ কি সত্য?

কোনো-কোনো অভ্যর্থিতের হাতে কখনো-কখনো একটা ছোট পাতলা বই তুলে দেয়া হয়। খুব পাতলা লাল মলাটে, ইংরেজি ও বাংলায় মলাটে লেখা—'দি মিস্ট্রিজ অব রাধামাধব'স অ্যারাই ভ্যাল ইন দি নামতলা মন্দির অব গুরু তুলসীমালা বৈষ্ণব', 'নামতলায় গুরু তুলসীমালা বৈষ্ণবের মন্দিরে রাধামাধবের অবির্ভাব রহস্য।' চারপাতা বাংলা ও চারপাতা ইংরেজি। তাতে এই কাহিনী আছে যে গুরু তুলসীমালা বৈষ্ণব একদিন শেষরাতে স্বপ্নে দেখেন, রাধাকে সঙ্গে নিয়ে মাধব এসে দাঁড়িয়ে, তুলসীমালাকে জিগগেস করছেন—তোমার ঘরে কি আমাদের দু-জনের জায়গা হবে? 'গৌর গৌর' বলে তুলসীমালা জেগে উঠে দেখেন, পশ্চিমের আকাশে শুকতারায় নীল আকাশ, 'প্রভু, আমি যে শূদ্র' বলে কেঁদে উঠে তুলসীমালা বোঝে—সে স্বপ্নে ছিল, ও তার কথাটি যদিও তার জাগরণে বলা, তবুও সেই চেতন কথাগুলিতে স্বপ্ন মাখা ছিল।

এই স্বপ্ন দেখার পর চার বার রাসমেলা হয়। তারপরে মৈমনসিং-এর ধনবাড়ির নবাবশাহেব এক ব্রাহ্মণের হাত দিয়ে রাধামাধবসহ এই চিঠিটি পাঠান। সব মিলিয়ে অভ্যাগতের কাছে নামতলার এক বিরল নিজস্বতা তৈরি হয়ে যায়।

অভ্যর্থনা যখন মেয়েরা করে, বয়স্ক নারী থেকে বালিকা সকলে মিলে মাধবীমালতীর গেট দিয়ে অভ্যাগতকে নিয়ে আসে। সেই নিয়ে-আসার যে কোনো বিশেষ আকার আছে তা নয়।

কিন্তু এত বছর ধরে একটা এমন জায়গাকে তীর্থস্থানের সমতুল্য করে তুলতে একটা কোনো আচারের নকশা তো তৈরি হয়ে ওঠে। যারা সামনে থাকে সেই ছোট মেয়েরা যেমন বাঁ গালের পাশে ঘাড় হেলিয়ে একটা তালি বাজিয়েই ঘাড় ডাইনে হেলিয়ে তালি বাজায় তা, পেছনের মা-মাসি-বৌমারা নকল করে নেয় কিন্তু তাদের সাবালক শক্ত আকারে ভঙ্গি আর কত চঞ্চল হবে। গান তো সকলেরই জানা—গৌরবন্দনা—'গৌর আইল নদীয়ায়—'। দলে যে-মেয়েরা গুঁড়িও নয়, বুড়িও নয়—বাড়িরই বৌ কিংবা মেয়ে, তারা তাদের কোমর ভেঙে আবার ভেসে উঠতে পারে। গুঁড়িরা এটা নকল করতে পারে না আর বড়রা কোমর ভাঙতে গিয়ে হাঁটু ভেঙে যেতে পারে—এমন কোনো ভয়ে থাকে।

অভ্যর্থনার এই পুরো রেওয়াজ থেকে এসডিও শাহেবের কোনো রেহাই ছিল না। কিন্তু মিটিঙে যাওয়ার তাড়ায় বন্দনাটা বাকি থাকল। এসডিওশাহেব যে সত্যিই নামতলা—মাহাত্ম্য জানতেন না, এটা বোঝাই গেল তাঁর খেদে, 'আমার সাব-ডিভিশনে, অথচ আমিই জানি না! আশ্চর্য। এরকম একটা ইনস্ট্যান্স থাকতে এই জায়গাতে ইনট্রা-হিন্দু রায়ট চলছে কী করে?'

যোগেন সেটুকু দেরি করে মিটিঙে পৌঁছুতে চেয়েছিল, যেটুকু সময়ের মধ্যে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মিটিঙের জায়গায় জড়ো হতে পারে। যোগেনের নামে মিটিং ডাকা হলে, ওঁরা দেরি করে তো আসতই, কেউ-কেউ আসতই না। কিন্তু এসডিও শাহেবের ডাকা মিটিঙে অতটা বেয়াদপির সাহস হবে না। যোগেন মাত্র সেইটুকু দেরি করতে চেয়েছিল, যার মধ্যে সবাই এসে বসে থাকে আর তার দলবল জড়ো হয়ে যেতে শুরু করে।

ঘড়ি ধরে একেবারে তাই-ই ঘটল। শিমুলগড়ের সবচেয়ে পুরনো মন্দির, এর কাছাকাছি একটা তাম্রলিপিও মাটি খুঁড়ে বেরিয়েছিল। সেই তাম্রলিপির সঙ্গে যে এই মন্দিরের কোনো সম্পর্ক নেই—তা কালক্রমে প্রমাণও হয়েছে! সেসব গবেষণা, প্রতি-গবেষণা অনেক পরের ব্যাপার। মানুষজন যখন প্রথম এই লিপির কথা জানল, তখন সিলেটসহ আসাম ও পূর্ববঙ্গ আলাদা এক প্রদেশ হয়ে গেছে। তার অনেক আগে থেকেই মন্দিরটা মাটির ওপরে বনজঙ্গলে ঢাকা ছিল, ভিতরে কোনো দেবতাও ছিল না। জঙ্গলটা বা মন্দিরটাতে চুরি করার মতও কিছু ছিল না। এমনকী এই মন্দিরটাকে বোঝাবার জন্য কোনো নামও দরকার হয়নি কারো—তেমন বোঝানোর দরকারই হয়নি। ১৯১০-এ তাম্রলিপি পাওয়া মাত্র এমন একটা হৈহৈ উঠল যেন সকলেই মন্দিরটার ওপর দখল চায়। মালিকানা কেউ চাইল না। মালিকানা চাইল এক-এক সম্প্রদায়। মৌলভিবাজারের ও নবীগঞ্জের মুসলমানরা বললেন—ওটা মৌলভিবাজারের সবচেয়ে বেশি তাম্রলিপি পাওয়া গেছে যেখানে এটাও সেখানে পেতে বাধা কোথায়? বাধা তেমন ছিল না বলেই মুসলমানরা এও বললেন—এটা এত পুরনোও নয়, মন্দিরটা মশজিদ ছিল, তার দরজা তাই পশ্চিমদিকে খোলা, হিন্দুদের কোনো দেবতা কোনোকালে পশ্চিমদিকে মুখ করে দাঁড়ায় না। কথাটাতে একটা আচমকা যুক্তি আছে। সেই যুক্তিতে ধাঁধায় পড়ে গেলে—চোখের দেখাও গুলিয়ে যায়। মন্দিরের চার দেয়ালে এত বড়-বড় গোলাকার ফাঁক যে, সব দিকের ফাঁকটাকেই দরজা বলা যায়। যা হোক, কারো দায় পড়েনি পুব-পশ্চিম খোঁজার।

বছর তের আগে, ১৯২৪-এ ঢাকা-সিলেটের দাঙ্গা বেঁধে যায়। সে-দাঙ্গাতেই প্রথম কারা কোন জায়গার প্রাচীনতর অধিবাসী এই প্রশ্নটা উঠে পড়ে, যেন যে-নতুন চর উঠেছে, সেটা কার পুরনো জমি এই নিয়ে দখলের লড়াই। সেই দাঙ্গাতেই হঠাৎ 'হিন্দু মিশন'-এর সিলেটি নেতারা হাটে-মাঠে-ঘাটে প্রচার শুরু করে দিলেন—শ্রীহট্ট বরাবরই হিন্দু রাজ্য, তার শেষ হিন্দু রাজার নাম গৌড়গৌবিন্দ। তখন এক 'হট্টনাথের পাঁচালী' শ্রীহট্টের প্রাচীন গৌরবের বিবরণ

দিয়ে সর্বত্র পড়া হত। এই গোলমালে রটে গেল—যে-তাম্রলিপিটি ঐ মন্দিরের কাছে পাওয়া গিয়েছিল, তার আগের পাঠ ভুল, কারণ যে-পণ্ডিতজন ঐ লিপিটির পাঠোদ্ধার করেছিলেন, তাঁরা কেউই শ্রীহট্টে প্রচলিত ভাটেরা বর্ণমালা পড়তে পারতেন না। এখন সেটা ঠিকঠাক পড়ে জানা গেছে—ঐ তাম্রলিপিটিতে রাজা আদেশ দিয়েছেন, জয়রথ নামে কোনো এক ব্রাহ্মণের আবেদনে রাজা তাঁর প্রতিষ্ঠিত অনন্ত-শয়নে বিষ্ণু মূর্তি সমন্বিত মন্দিরটির ভরণপোষণ বাবদ ঐ মন্দিরের সংলগ্ন ১১১ একর জমি দান করলেন।

তাতেও কারো কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়।

কিন্তু 'হিন্দু মিশন'-এর ব্রাহ্মণ নেতারা রাতরাতি শ-শ লোক লাগিয়ে জঙ্গল সাফ করে, মন্দিরটির যেটুকু সংস্কার না করলে নয়—সেইটুকুমাত্র মেরামত করে সেখানে জীবন্ত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করলেন। বিগ্রহটি কীসের সেটা কারো কাছেই স্পষ্ট ছিল না। কেউ বললেন—ঐ শয়ন মন্দির, কেউ বললেন শ্যামা শিব—মানে মা-কালী শিবের মত বাঘছাল আর কোমরের ওপরটায়, অর্থাৎ উর্ধাঙ্গে মা-কালীই থেকে মানুষের গলা কাটছেন। পৃথিবীতে নাকী আর কোথাও মা-কালী ও মহাদেবের, শিবের ও শ্যামার, এমন অদ্বৈত মূর্তি নেই।

ব্রাহ্মণরা কোনো কথাতেই আপত্তি করেনি। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে মন্দিরটাকে ঘিরে তৈরি হয়ে গেল বামুনদের কলোনি। এরা সকলেই না কী সেই জয়রথের বংশধর। সেটাই শিমূলগড় বলে নাম করেছে। তারাই এ হুকুম জারি করেছে যে শূদ্ররা পায়ে জুতো পরতে পারবে না। হুকুম বহাল রাখতে এক বছরে দুই-দুই জন নমশূদ্র খুন হয়েছে। এই শিমূলগড়ের মন্দিরেই মিটিং ডাকা হয়েছে।

শিমূলগড়ে যোগেন তর্কলঙ্কারের তর্কযুদ্ধ

৮০

যোগেন গাড়ি থেকে নামার আগে এসডিওকে বলল, 'নানারকম কথা উইঠবে, নানা ভাষায় গালাগালি হব, আপনি ভদ্দরলোকের ছেলে, ইংরাজের অফিসার, আপনার পক্ষে দুঃসহ হব্যার পারে।'

'কিন্তু আমার তো ডিউটি, স্যার, আপনার সঙ্গে এই মিটিঙ করা—'

'তা তো কইরব্যানই। আপনি যে আমারে পৌছায়্যা গেলেন সেইডা দেইখ্যাই বামুনগো কানে জল গিছে। ঘণ্টাখান পরে আপনি ঘুইর‍্যা আসেন।

এসডিও গাড়ির ভিতর থেকে দেখে, যোগেন নেমে পায়ের জুতো খুলল, তারপর জুতোজোড়া বাঁহাতের আঙুলে ঝুলিয়ে ধুতিপাঞ্জাবিতে হেলেদুলে হাঁটতে-হাঁটতে সেই মন্দিরের দিকে যায়। এসডিও তার গাড়ি ঘুরিয়ে ধুলো উড়িয়ে বেরিয়ে যায়।

যোগেন সেই চাতালের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। শতরঞ্চির ওপর সারি দিয়ে বসে আছেন বামুনরা—প্রত্যেকের গলাতেই পৈতে। দু-একজনের গলায় উত্তরীয় ছিল, তারাও সেটা একটু সরিয়ে রেখেছে পৈতে দেখাতে। যোগেন সকলের ওপর দিয়ে যখন চোখ বোলায়, বামুনরা সকলে তখন এক যোগেনকেই দেখে।

যোগেন তার বাঁহাতের আঙুলে ঝোলানো জুতো জোড়া একটু সামনে এনে, ফিরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'জুতা রাইখব কোনখানে? এইখানে?' সে চাতালের নীচটা দেখায়। তারপর যেন

নিজের মনেই বলে, 'কুত্তা নাই তো?' সে ঘাড় ঘুরিয়ে যেন কুকুর খোঁজে।

বামুনরা রেগেই ছিল। তারা জানতই না মিটিঙটা যোগেনের। তার ওপর জুতো নিয়ে যোগেন যা করল, তাতে তাদের ন্যায়ত রেগে যাওয়ারই কথা।

এক বুড়ো বামুন কপালে অনেকগুলি ভাঁজ ফেলে যোগেনকে বলে উঠল, 'সেডা তো তুমি বাড়িতে রাইখ্যা অ্যালেই পারতা। এহানে হাতে ঝুল্যাইয়া আইস্যা আমাগো জিগাও—জুতা কো রাইখব্যা। আমাগো কাজ তোমার জুত্যা পাহারা দেয়া?'

যোগেন চুপ করে থেকে একঝলক ভেবে নেয়—সে কি একটু বেশি করে ফেলল? তেমন কোনো ইচ্ছে তার ছিল না। গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে মনে হল সে জুতো জোড়া খুলে হাতে ঝুলিয়েছিল। সে ভেবেছিল—তার অনুগত্যে বামুনরা খুশি হবে। খুশি নাও হতে পারে—এমন ভয়ও তার একেবারে হয়নি, তা নয়। কিন্তু ততক্ষণে তো বামুনরা তাকে দেখেই ফেলেছে—সে জুতো হাতে ঝুলিয়ে এগচ্ছে। তখন তো আর হাত থেকে ফেলে জুতো পায়ে পরা যায় না।

'ছি ছি বড় সিদ্ধান্তবাগীশ কর্তা, রাগের বশে নিজেরে এতখান ছোট কইরবেন না। আমাগো তাইলে সাহস বাইড়্যা যাবে। য্যান, আপনাগো অতডা ছোট করাডা অপরাধ না তত।'

'অ্যাদ্দিন যহন তোমার বিধান ছাড়া আমাগো চইলছে, বাকি কয়ডা দিনও কাটব।'

যোগন একটু সাবধান হয়—এরা কি তাকে বসতেও বলবে না। যদি এরা সত্যিই তেমন কিছু করে, তাহলে যোগেনকেও তো গলা তুলেই কথা বলতে হয়।

যোগেন বলে ওঠে, 'আমি বিধান দিলেও শোনার লোক কই? হাকিম না যে জুত্যা না পইর‍্যা সাক্ষাৎ কইরতে পারি। দেইখলেন তো হাকিমের লগে সাক্ষাৎ ছিল। সরকারের বিধান—কালাকোট আর জুত্যা না পইরলে হাকিম কথা শুইনব না। আর আপনাগো বিধান—চাঁড়াল জুইত্যা পইর‍্য কথা কইলে আপনারা কথা শুইনবেন না। দুই বিধানের টানাটানিতে জরাসন্ধ বধ তো হয় চাঁড়ালরাই। দ্যাহেন-না, নিজের জুইত্যা নিজে মাথায় কইর‍্যা রাখছি। আপনার খড়মজোড়া মাথায় নিলে তো তাও অন্তত কিছুডা পুইন্য জমত।'

'তোমার যা কওয়ার আছে, কও-না—' কেউ একজন বলে।

'আমার তো কওয়ার খুব একটা কিছু নাই। শুনার আছে। আপনাগো কাছ থিক্যা। আমার মাথা তো বামুনের মাথা না, তাই শুইনতে-বুইঝতে টাইম লাগে। যদি কন জুতা-হাতে খাড়াইয়্যা বেবাক কথা শুনা ও বুঝা যাবে—তাহাইলে তাই করব। কিন্তু আমারে তো পাঠাইছেন গভর্নর। আমারে তো রির্পোট দিবার লাগব। সেহানে তো আমারে কইতে হবে কোন্ সিচুয়েশনে কীভাবে আমারে খবরডা দেয়া হইছে। আই ওয়াজ নট ইভন অ্যালাউড টু সিট অ্যান্ড টক। আই হ্যাড টু টক স্ট্যান্ডিং। কথাডা কিন্তু ফৌজদারির, ক্রিমিন্যাল অ্যাকটিভিটি এগেইনস্ট পিস অ্যান্ড মার্ডার অব টু নমশূদ্রস।'

যোগেন ইচ্ছে করেই ইংরেজিতে বলল। এতক্ষণ তো বুড়ো বামুনরা টিকি নাড়াচ্ছে। কিন্তু এতগুলো বামুনের ঘরে কি পড়াশুনো জানা ছেলে কেউ নেই। আজকালকার ছেলে? স্বদেশী? ডেটিনিউ? যে ঐ বামুনের দঙ্গলে বসে যোগেনের যুক্তি বুঝবে? আর যুক্তিই-বা কেন শুধু? বামুন-শূদ্র এইসব বিভাজনের বিরুদ্ধে যেতে যার যুক্তি দরকার হয় না? যোগেনের আরো একটা লক্ষ ছিল—বামুনদের এই ভিড়ে কি দু-একজন সরকারি অফিসার নেই, অন্তত রিটায়ার্ড, যারা ফৌজদারি কেস বোঝে, যারা ক্রিমিন্যাল অ্যাকটিভিটি এগেইস্ট ল অ্যান্ড অর্ডার কথাটিতে ভয় পাবে? যদি এই বামুনের গুষ্টিতে এমন দ্বিভাজন বা ত্রিভাজন না-ঘটে, তাহলে যোগেন জুতো হাতে ঝুলিয়েই ফিরে যাবে। এতক্ষণে তাকে বসতে পর্যন্ত বলল না।

যোগেন চুপ করে দাঁড়িয়েছিল ও ভিতরে-ভিতরে ফুঁসছিল। নিজের মাথা ঠান্ডা রাখার চেষ্টাও যে সে করছিল না, তা নয়। কিন্তু সে নিজেকে বোঝাচ্ছিল—বামুনগো বেয়াড়া সামলানোর কথা একটু সময় দিয়ে ভাবতে হবে। সেটা আরো কঠিন ও জটিল কাজ। লিগ বা প্রজা পার্টির লোক্যাল লিডারদের সঙ্গে কথা বললে, কাল বিকেলেই পৈতে ফেলে দিয়ে সব বামুন ছুটবে নমপাড়ায়—'বাঁচা বাবা, হিন্দুদের মান বাঁচা'—তাহলে তো বামুন-শূদ্র দাঙ্গা বদলে দিতে হয় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায়। নমশূদ্র ছাড়া হিন্দুগো মুসলমানের সঙ্গে কোনো দাঙ্গা হতে পারে?

যোগেন দেখতে পাচ্ছিল, দু-একজন কানাকানি করছে, একজন হাফ-হাতা-পাঞ্জাবি পরা বাবু-বামুন গিয়ে গরদের পাঞ্জাবি আর চশমা পরা এক জমিদার-বামুনের পাশে বসে, কানে-কানে কিছু বলল ও তাঁর বলা কিছু কথাও শুনল। তাহলে কি বামুনগো কানে জল ঢুকল?

'আমি কিন্তু একডা কথা বুঝব্যার চাই কিন্তু পারি না যে, সেডি যে আমার বুদ্ধির অভাবের কারণেই ঘঠছে, সে-বিষয়ে আমার সন্দ নাই। আপনাদের কারো থাইগলেও সংশুধোন কইর‍্যা নিবেন।' কথা বলছেন খাদিমবাড়ির ছোটি ভাই। বিলেতফেরত। খুব বড় চাকরি করে দিল্লির দিকে। 'এই মিটিঙটা যে ডাকা হইছে সেইডা তো আমাগো কারো অবগতির বাইরে না। এই মিটিঙে যে মিস্টার মণ্ডল আইসবেন সেডাও এগগেরে কারো অবগতি ছিল না তাও না। তালে তারে এতডা সময় খাড়া কইর‍্যা রাখার কী অর্থ? যে আপনারা তারে বহিরাগত মনে করেন?'

'মিটিং তো আমরা ডাহি নাই। আমরা জাইনব কী কইর‍্যা কে অভ্যাগত আর কে বহিরাগত?'

'ছোড়্ঠাউর কত্তা, আমরা যহন এই মিটিঙটাত আসি, তহন তো এইসব কথা উঠে নাই। আমরা তো দিব্বি গটগটাইয়্যা আল্যাম।'

'উনিও তো গটগট্যায়াই আইলেন, কথাও কইলেন—'

'উনি তো জুইত্যা হাতে জুলাইয়্যা আইসছেন। তাতেই কি পরিষ্কার না—এহানকার জুতা পরা না পরার হাঙ্গামার সব বার্তা উনার জানা আর উনি সেই বিষয়েই এই মিটিঙে আইসছেন। একোমোডেট হিম।'

মিটিং একটু চুপ করে থাকে। ছোট ভাইও চুপ করে থাকে। তারপর গলা নামিয়ে গম্ভীর স্বরে বলেন, 'দেন বেটার আই লিভ দি মিটিং। আই ক্যানট বি এ পার্ট অব দিস ভায়োলেশন অব ম্যানার্স। মাই ফোরফাদার্স ওয়্যার পায়াস মেন অ্যান্ড দে হ্যাভ টট্ মি দ্যাট এ ব্রামহিন ইজ ব্রামহিন টু হিমসেলফ ফার্স্ট।'

'এইডা তো মন্দিরের পার্ট। আমরা এখানে একজন আনটাচেবলকে বসার অনুমতি দিতে পারি না।'

'বাধাও দিব্যার পারেন না। যদি মনে করেন এতে শাস্ত্র লঙ্ঘন ঘটিছে, তাইলে আপনাগো প্রায়শ্চিত্য বিধান খুইল্যা প্রাচিত্তির কইর‍্যা নিবেন।'

'বাঃ। দোষকারক উনি আর প্রাচিত্তির কারক আমরা।'

'এডা তো গোঁশাইজি আপনাগো সুয়ো মোটো ফাইন্ডিং যে মিস্টার মণ্ডল এইখানে বইস্যা দোষ স্পর্শ করলেন। তাইলে তো প্রাচিত্তিরও তো আপনাগোই করা লাগে—'

'এডা ভালো কইছ ছুডো ভাই। নববিধান। শূদ্রের অপরাধে ব্রাহ্মণের প্রায়শ্চিত্ত। মরার সময় কেউ কি পাঁজি পুথি দেইখে মরে যে কী কী দোষ স্পর্শ হইছে। মরার পর তো সেইসব বাহির হয়। এহানেও তাই। যোগেনবাবুরে বইসতে কন,' বলল হাফ-পিরান পরা, ত্রিবেদী বাড়ির স্বাদেশী ছেলে।

'তুমারে ছাইড়ল্ কবে?' খাদিম জিজ্ঞাসা করে ত্রিবেদীকে।

'ছাড়া বইলতে সরকার যা বোঝে, তাতে অ্যাহনো তো ছাড়ে নাই। নিজ গৃহে নজরবন্দি। এর আগে মাস সাতেক রাখছিল কুষ্টিয়ার ডেটিনু।'

'শরীরডা ঠিক আছে তো?'

'জেলখানায় তো শরীরের মাত্র দুইডা হাল হব্যার পারে। নো থার্ড চয়েস। হয় মুডাইয়া ভীমভবানী, না-হয় শুষ্কং কাষ্ঠং। না, না, বলা ভাল, দগ্ধম্ চিতাকাষ্ঠম্'।

খাদিম আর ত্রিবেদীর কথায় বামুনরা চুপ করেই ছিল, তাদের কেউ-একজন, নিজেকে না দেখিয়ে আঙুল নাড়িয়ে মণ্ডলকে ইশারা করে বসে পড়তে। তার ইশারা যোগেন দেখল কী করে। অথচ সে অনুমতি পেয়েছে ধরে নিয়েই জুতোজোড়া দাওয়ার নীচে রেখে পা গুটিয়ে দাওয়ায় বসে। তার সামনের দাওয়াটুকুতে শতরঞ্চি ছিল না। শতরঞ্চিতে বসতে হলে দু-পা উত্তরে যেতে হত। যোগেন শতরঞ্চি ছাড়া মেঝেতেই বসে পড়ল।

'মণ্ডল বিবাদডা কুতায় কও তো! তোমাগো মন্দির তোমরা জুত্যা পইর‍্যা, ধুতি পইর‍্যা, না পইর‍্যা তোমরা যাও গিয়া। আমাগো মন্দিরে আমরা কী পইর‍্যা আইসব সেডা তো আমাগো ব্যাপার। তোমরা ক্যান বামুন মন্দিরে হাত বাড়াও?' কথাটা বললেন সামনের সারির কেউ—খালি হাত মাথার ওপর লম্বা তুলে ও নির্দেশক আঙ্গুলটা নাচিয়ে।

যোগেন একেবারে নিচু গলায় বলে, 'স্যারম কিছু ঘইটছে বইল্যা তো শুনি নাই। আমরা তো এইডাই জিগ্যাবার চাই। মন্দিরডা তো আপনাগো। আমাগো নিয়্যা ট্যানটুনি কিতা, ঠাউর।'

'ও। তোমাগো তাইলে ভাগাভাগি শ্যাষ? এডা তোমাগো মন্দির না, এডা আমাগো মন্দির। যাউক গ্যা, তাও মন্দির বইল্যা স্বীকার দিছ!'

'ঠাউর কত্তা। অনেকডা সময় বৃথা যায়। এবার কাজের কথাডা তোলা হউক,' যোগেন গলা তুলে সবার মাথার ওপর দিয়ে দৃষ্টি ভাসিয়ে গম্ভীর গলায় বলল। সভার থমকে যাওয়াটা বোঝা গেল, যেমন বোঝা গেল সেই থমকে যাওয়া বদলাতে এক চ্যাংড়া বামুনের গলা, 'সময়ের সার্থব্যর্থ তো আমাগোও আছে।' যোগেন এই কথার কোনো পাত্তা না দিয়ে সভার ওপর দৃষ্টি ভাসিয়ে বলে, 'এই মন্দিরে বইস্যা নমশূদ্রগের জুত্যা পরায় বাধা দেয়া হইছে, একবচ্ছর ধইর‍্যা নমশূদ্রগো মারা হইত্যাছে। দুইডা শুদ্দুর মার্ডার হইছে। গবর্মেন্ট এডাকে ইনট্রা হিন্দু রায়ট, হিন্দুগ নিজেগো ভিতর দাঙ্গা বইল্যা মনে করে। আপনারা কী মনে করেন সেডা কন?'

'এইডা তুমি কী লিড কোশ্চেন কইরল্যা যোগেন, দ্যাশজোড়া তোমার নাম, তোমার আর্গুমেন্ট শুইনবো বইল্যা আসছি, আর তুমি ওপেনিং কোশ্চেন কইরল্যা—গবর্মেন্ট এইভাবে আপনারা কী ভাবেন? ডিফেন্সের সাক্ষী তো তোমারে পালটা কইব, সে কথাডা আপনারে কব ক্যান? তোমার পালটাপক্ষের উকিলরে এমন ভাঙা বেড়া দেখাইয়ো না। বি অ্যালার্ট টু দি প্রসিডিয়োর।'

'স্যা—র', বলে যোগেন জোড় হস্তে উঠে দাঁড়ায়, 'আপনি আইসছেন স্যার?' এহানে কয়-পা যাওয়ার রাইট আমার, তা তো জানি না। দূর থিক্যা পদসেবা দিল্যাম, স্যার, আপনি আইসছেন স্যার?' সিলেটের সবচেয়ে বড় উকিল, গোবিন্দ পুরকাইত, কলকাতা হাইকোর্টেও দাঁড়ান। ল-পয়েন্টে যেন কশাইয়ের মত ছুরি চালান। কশাই আর ডাক্তারে তফাত কী? কশাই ছুরি চালায় মড়ার ওপর আর ডাক্তার ছুরি চালায় জ্যান্তের ওপর। এদিককার উকিল মহলে, কলকাতাতেও, একটা কথা চালু হচ্ছে—পুরকাইতস ডিফেন্স।

'তুমি তো আসল কথাডা ধইরছ, মনি, রাইট. অব প্যাসেজ', তোমার কি আমার কাছে আইসব্যার রাইট, রাইট অ্যাজ পার ল, আছে কি নাই। কোশ্চেনডারে রিফাইন করো, মানে অ্যাবস্ট্রাক্ট করো। পদসেবাই হোউক আর চপেটাঘাতই হোউক, হোয়াট এভার বি মাই পারপাজ

দ্যাট ডাজ নট অ্যাফেক্ট মাই রাইট। অ্যাজ পারল এ রাইট ইজ অলওয়েজে উইদাউট কনডিশন। বাট উইথ কনডিশন ইট বিকামস এ পারমিট। দিইজ আর টু ডিফারেন্ট এরিয়াজ অব ল। হোয়েদার ইট ইজ মাই রাইট টু ওয়াক আপটু পুরকাইত অর নট। এবং তুমি যদি আমারে আঘাত করো দেন ওপেনস্ দি সেকেন্ড এরিয়া—ইউজ অব রাইট।'

যোগেন জোড় হাতেই দাঁড়িয়ে প্রায় কেঁদে ফেলে, 'স্যার, আমি স্যার সেকেন্ড মুনসেফের কোর্টে গরু খোঁয়াড়ে দেয়ার মামলার উকিল। আমারে স্যার ছাইড়্যা দ্যান।'

'নো। আই'ভ হার্ড অব ইউ। ওপেন উইথ দি কোশ্চেন অব রাইট,' সিট ডাউন—'

যোগেন যেন সত্যিই ইস্কুলের ছাত্র—ধপ করে বসে পড়ে বলল, 'আপনারা নিজ কর্ণেই শুইনলেন স্যার প্রথমেই অধিকারের কথা তুইলতে বললেন। তো আপনাগো তাইলে তো কওয়া লাগে আপনাগো অধিকারটা কী আর আমাগো শুদ্দুর গো অধিকারইবা কদ্দুর?'

কমবয়েসি এক যুবক বেশ রেগে গিয়ে বলে—'মন্দিরে জুত্যা পরার অধিকারডা কে কারে দিব? আমরাও তো বেবাকই খালি পায়ে আসি মন্দিরে। কেউ যদি ভুল কইর‍্যা আইস্যা পড়ে, তাইলে তাগো শিক্ষা দেয়া যাবে না? এর মইধ্যে আবার অধিকার-মধিকার কোথ্থন আসে?

'আপনি যা কইল্যান, ঘটনাটা স্যাটুক হইলে তো কুনো বিবাদই নাই। বামুনঠাকুরের পোলাও যদি জুইত্যা পইর‍্যা ঠাকুরঘরে ঢুকে তারে তো শিক্ষা দিব্যার লাগবই। তয় যে ডেপুটি কমিশনার, এসপি, এসডিও হগলেই কয়—বামুনে-শুদ্দুরে রায়ট চইলতেছে এহানে একবছরের উপর? দুইজন খুনও হইল। যদিও তারা নমশূদ্র। দুইজনই।'

'কে কারে কী বইল্যা বেড়ায় সেই দায়িত্ব এই শিমূলগুড়ির নতুন মন্দিরের সংলগ্ন অধিকারী বামুনগোক নিবার লাগব? এ তো বেশ ভালা কথা।'

'কথাডা ভালই তুইলছেন। শিমুলগড়ে তো এই মন্দিরডা নতুন—'

'নতুন? আরে কও প্রাচীন। শ্রীহট্টরাজের তাম্রপণে ভূমিদান লেখা।'

'আমি তো কই নাই। আপনারাই তো কইলেন। প্রাচীনে আমর আপত্ত নাই। কিন্তু অন্তত এমন কোনো সাক্ষীরে পাওয়া যাইব না য্যায় তার বৃদ্ধ প্রপিতামহস্য বৃদ্ধপ্রপিতামহস্য মুখাৎ শুইনছে যে এডা একখান মন্দির আছিল—'

'যহন ছিল না তখন আর থাইকব কী কইর‍্যা? তাম্রপত্রে যহন আছে, তহনই-বা না থাহে কী কইর‍্যা?' বেশ বুড়ো একজন কথাটা বলে খুব খুশি হয়ে শতরঞ্চির ওপর তাঁর ডানহাতের তেলো থাবড়ালেন দুইবার।

'আমিও তো তাই কই ঠাকুরমশায়—যা ছিল না, তা ছিল না। যা আছে, তা আছে। মন্দিরডা থাহার সময় যদি হাজার দেড়-হাজার বছর আগে হয় আর ফির‍্যা যদি দু-চার বছর হয়—তাইলে না-থাকার টাইমটাই তো হাজারগুণ বড়।'

'আরে, না-ছিলডা কী? আমাগো জ্ঞান ছিল না এইডা দেবতার মন্দির। মন্দির তো মন্দিরই ছিল। ঘুম থিক্যা প্রভাতকালে উইঠলে কি জাগ্রত ব্যক্তির পূর্ব অস্তিত্ব লোপ হয়'—এবারও সেই বুড়ো পণ্ডিতমশাই বলে ও বলে, খুশি হয়ে শতরঞ্চির ওপর হাতের তালু ঘষে।

'পণ্ডিতমশায়, মন্দিরডা নিয়্যা অজ্ঞান ছিলেন কিন্তু এই জায়গাডা নিয়্যা তো সগলেরই একডা জ্ঞান ছিল—এটা জংলা জায়গা, পায়ে হাঁইট্যা রাস্তা কমানো যায়, বড়ইগুল্যা খুব মিষ্টি, বড়ই পাইকলে মাঘ-ফাল্গুনে ঝাঁক-ঝাঁক টিয়াপাখি। আসে—এই জ্ঞানটা তো হাজার বছরের উপুর ন্যায্য।'

'ন্যায্য কয়ো না। কও প্রচল।'

'আরো ভাল। তাইলে কথাডা কি জমির দখল আর মন্দিরের এক্তিয়ার নিয়্যা বামুনগ সাথে শুদ্দুরগ বিরোধ। না কী প্রাচীন প্রচলের জ্ঞানের সঙ্গে নতুন তাম্রলিপির জ্ঞানের বিরোধ। আপনারা হয়ত ঐ তামার পাতখান পড়ছেন। বামুনগো অপাঠ্য আর কী আছে। আমাগো নমশুদ্দুরগো ভিতরে আধা-মানুষও একখান্ পাবেন না য্যায় ঐডা পইড়বার পারব। তাগো তো প্রচল দিয়্যই চইলবার লাগব। চাঁড়ালরে যদি গোপেটান পিটান তাইলেও তো তার জিভের কথাডা সে তামার পাতে চিনব্যার পাইরব না।'

'ওয়ান্ডারফুল, ওয়ান্ডারফুল, যোগেন, তুমি তো বোয়ালমাছের প্যাট থিক্যা আংটি বাইর কইর্যা ফেলছ মনি। কাস্টমারি ল অ্যান্ড টেক্সুয়্যাল ল।' পুরকায়েত চাপা গলায় বলে ওঠে—পাছে যোগেনের আর্গুমেনটেশনে বাধা ঘটে। যোগেন কোনো দিকে না তাকিয়ে তখন বলছে—'আমরা আমাগো হাত-পা-শরীরের জ্ঞানের রাইট চাই।'

'রাইট চাও, তো রাইট ন্যাও। আমাগো জড়াও ক্যান,' সেই কমবয়েসি ছোকরা বলে বসে।

যোগেন রুখে উঠে বলে, 'আপনারা দুইডা মিছা সাক্ষ্য দিচ্ছেন। একনম্বর—আপনারাও খালি পায়ে আসেন। দুই নম্বর—যার পায়ে জুত্যা আছে তারেই এক আপনারা নিষেধ করেন। এত বড় মিছা সাক্ষ্য এক বামুনরাই দিব্যার পারে—গঙ্গাজল আর গীতা ছুঁইয়্যা। খাড়ান—আমি প্রমাণ দেই। এ-ই এদিক আয়,' যোগেন তার দলবলকে ডাকে। তারা সব দৌড়ে এসে দাওয়ার নীচে যোগেনের পেছনে দঙ্গল বেঁধে দাঁড়ায়। মাথা থেকে পা ধুলোয় ঢাকা। বেশিরভাগেরই উদোম গা। একজনের পায়েও কোনো জুতো বা স্যান্ডেল নেই।

'দ্যাহেন, এতগুলা মানুষ, একজনের পায়েও জুতা খুঁইজ্যা পাবেন না। আর, আপনারা নাকী জুতাপরা শুদ্দুর ছাড়া শুদ্দুর দ্যাহেন না।

'আমাগো সাইডের শ্যাষ কথাডা আমি কয়্যা দিচ্ছি। বামুনগো থিক্যা আমরা শিক্ষা নিচ্ছি। আপনারা তো শুদ্দুরগো মাইরতেছেন—এই জায়গার উপর আপনাগো দখল কায়েম রাইখতে। যাতে বেবাক সম্পত্তি দেবোত্তর হিশাবে সরকার মাইন্যা নেয়। আর-একডা উদ্দেশ্য আপনাগো আছে—যাতে আর্কিওলজিক্যাল প্রোপার্টি অ্যাক্টে এই মন্দিরডারে ধরা না-হয়, তাই এভাবে জ্যান্ত মন্দির বইল্যা এসট্যাবলিস কইরবার চান। এ দুডাই বেআইনি মতলব। কিন্তু আমরা এই নিয়্যা কুনো মাথাব্যাথা কইরব না। জ্যান্ত মন্দির হইলে হোক, মানুষজন আইসবো, আমাগোও দুইডা পয়সা আইসে। কিন্তু কয়্যা রাইখল্যাম এডা জানান দিতে যে শুধু আইনের জোরে প্রিভি কাউন্সিলে যাওয়ার রাইট শুদ্দুরগো আছে। আমরা তা যাব না। আপনারা মন্দির নিয়্যা নিরাপদে বংশানুক্রমে জমিদারি করেন গিয়্যা। কিন্তু শুদ্দুরের প্রচলের রাইট বহাল থাকবে। আজ থিক্যা যদি কোনো শুদ্দুরের গায়ে কোনো বামুনের হাত পড়ে, তা আইলে মুসলমানগো সঙ্গে নিয়্যা আমরা হবিগঞ্জ থিক্যা সব বামুনগো ঐ তাম্রশাসনের নাগাল মাটিচাপা দিব। মুখাগ্নিও জুইটবে না।'

পুরকাইতের গলা শোনা গেল, 'যোগেন, এবার আমি যাই, তোমাগো তো অ্যাহন পলিটিক্স অইব। আই অ্যাম নো পার্টি টু দ্যাট। ইউ হ্যান্ডলড দি ল পয়েন্ট মাস্টারলি। ডোন্ট লিভ দি প্রফেশন। ও-য়ে-ল।'

যোগেনের হুংকার ও পুরকাইতের কথায় যেন বোঝা যায়—মিটিংটা শেষ হয়ে গেছে।

খাদিম বাড়ির বিলেতফেরত ছোটভাই দুই হাত মাথার ওপর তুলে বলে ওঠেন, 'শুনেন, শুনেন, কথাডা ভাল কইর্যা শ্যাষ কইরবার দ্যান। যদিও মিস্টার মণ্ডলের শেষ কথাটা আমার ভাল লাগে নাই—তবু উনি যে-কথা দিয়েছেন সেটা খুব ভাল কথা। এখানে এই মন্দির নিয়ে কোনো কমিউনিটি কোনো প্রশ্ন তুইলবে না, আর, কোনো কমিউনিটি অন্য কমিউনিটিকে অপমান

কইরবেন না। এই অ্যাসিওরেন্স তো আমাগো দিতে হবে।'

'আমরা সেই কথা দ্যাওয়ার কেডা?'

'আপনারা যে-সুবাদে এই সভায় হাজির হইছেন সেই সুবাদেই কন, উই সাম পিপ্‌ল বিলঙ্গিং টু দি হায়ার কাস্টস অব হিন্দুস অ্যাসিওর দি পিপ্‌ল অব আদার কাস্টস অব দি হিন্দুস দ্যাট দেয়ার উইল বি নো কেস অব অ্যাগ্রেশন এগেইনস্ট দেম...'

'এডায় সই করবে কেডা?'

'কেন? নিশ্চয়ই মন্দিরের কোনো বডি আছে।'

এইসব কথাবার্তায় আরো কিছু সময় কাটে। তারপর লেখা হয়। ছোটভাই যোগেনকে দেখতে দিয়ে বলে, 'আর কিছু কি লিখব্যার লাগব?'

'না। এডাই তো যথেষ্ট। দু-দিনের জইন্য বাড়ি আইস্যা ঝামেলায় পইড়লেন।'

'বলেন কী? বিলাতই হোক, দিল্লিই হোক, দ্যাশ তো হবিগঞ্জ। দাঙ্গাডা তো থামান্ লাগে। এডা কি আপনারে দিব?'

'আমাকে কপি দিব্যার পারেন। আমারে তো পাঠাইছে গবর্মেন্টি। তাগো রিপোর্ট কইরব্যার লাগব। কিন্তু ওরিজিন্যাল শুড গো টু দি এসডিও।'

ছোটভাই কপি করা, সই করানো সারতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। যোগেন দাওয়ার নীচে দাঁড়িয়ে দু-একজনের সঙ্গে কথা বলছে। হেডলাইট জ্বালিয়ে দুটো গাড়ি পরপর এসে দাঁড়ায়।

গাড়ি থেকে নেমে একজন এসে বলে, 'আমি জেলার চার্জে আছি। কাল আপনাকে রিসিভ করতে যেতে পারিনি। তার পরে তো শুনলাম, আপনারা জয় রাইড করে এসেছেন।'

যোগেন ঠোঁট খুলে হাসল। এসডিও এসে ডি-সিকে ডাকে, 'স্যা—র'। ওরা একটু একটেরে হয়ে কথা বলে। এসডিও গাড়ি থেকে নেমেই গিয়েছিল মিটিঙে কী হল জানতে। এরকম একটা বোঝাপড়ার শুভ সংবাদ ডিসিকে জানাল। ডিসি প্রায় ছুটে এসে যোগেনের হাত ধরে ঝাঁকায়, 'এত বড় একটা মিটমাট একটা মিটিঙে কী করে করলেন মিস্টার মণ্ডল? ব্রাহ্মণরা তো সব মনে হচ্ছিল—গোর্খা রেজিমেন্টের লোক। আপনি মিরাক্‌ল্ করেছেন সত্যি!'

'কেবল আমি না। এখানকার স্বনামখ্যাত কিছু সন্তান পরিস্থিতিটা তৈরি করে দিলেন। মিস্টার পুরকাইত—'

'ব্যারিস্টার?'

'হ্যাঁ'

'উনি এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ। বললেন অবিশ্যি আমার আরগুমেন্ট শুইনব্যার আইসছেন। আমার চোদ্দ পুরুষের ভাইগ্য। উনিও এই রায়টে খুব ডিস্টার্বড ছিলেন। সেইজন্যই এসেছিলেন। আর খাদিমদের ছোট ভাই—তিনি তো আপনাদের সার্ভিসেই, দাঁড়ান, আয়্যা পড়বেন।'

'আপনি আমার জন্য এত ভাল খবর নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন মিস্টার মণ্ডল—এর চাইতে বড় খবর অ্যাট দি মোমেন্ট আর কিছু নেই। কিন্তু আমি আপনাকে তার চাইতেও একটা ভাল খবর দিচ্ছি। গভর্নর আমাকে টেলিগ্রামে জানিয়েছেন তাঁর পক্ষ থেকে আপনাকে এই খবর দিতে, যে, আপনি কাল রাতে একটি পুত্ররত্ন লাভ করেছেন। হিজ এক্সেলেন্সি আপনাকে কনগ্র্যাচুলেট করেছেন ও আমাকে বলেছেন আপনাকে আরলিয়েস্ট আপনার গ্রামের বাড়িতে পৌঁছে দিতে। সুতরাং আজ আপনি আমাদের সঙ্গে এখন সিলেট যাচ্ছেন।'

'আমার ছেলে? হিজ এক্সেলেন্সি?'

লাট-বেলাটের দরবার ও বিপ্লবীদের বোমা-গুলি

৩৭ সালের নভেম্বরের শেষে ছোটলাট, বাংলার গভর্নর, স্যার জন অ্যানডারসন এই চাকরির শেষে বম্বে থেকে দেশে ফেরার জাহাজ ধরলেন। বম্বে জাহাজঘাটায় যাঁরা তাঁকে বিদায় জানাতে

৮১

জড়ো হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে গান্ধী বা জিন্নার মত খ্যাতিদীপ্ত কোনো-কোনো নেতাও যেন হাজির ছিলেন। তার চাইতে খাটো নেতারা তো ছিলেনই।

তাঁর চাকরিতে স্যার জনকে, পনের দিনে একটা গোপন চিঠি হিজ এক্সেলেন্সি ভাইসরয়কে লিখে খবরের পেছনের বা ভিতরের মারপ্যাঁচগুলি জানাতে হত। সব প্রাদেশিক গভর্নরকেই লিখতে হত। ১৯৩৬-এ ভাইসরয় হয়েই লিনলিথগো এটা চালু করেছিলেন। সেসব গোপন চিঠি ব্রিটিশ আইন অনুযায়ী ৫০ বছরের পুরনো দলিল হিশেবে যখন ১৯৮৬ থেকে বেরতে শুরু করল, তখন পড়াও শুরু হল নানারকম মজা তৈরি করে-করে। একসময়ের সবচেয়ে দামী ও গোপন খবর, মাত্র ৫০ বছরেই কেমন পুরনো, সরেস, উদ্ভট ও বেস্টসেলার হয়ে যায়, মজাটা ছিল ও আছে সেখানেই। মমি-টুটেনখামেন-এর মত। যেমন বেঁচে ছিল মহার্ঘ, হাজার-হাজার বছর আগে, তেমন মহার্ঘই ছিল তার মরে থাকা, হাজার-হাজার বছর ধরে। শুধু বুকটুকু ধুকপুক করে না, আর চোখের পলক পড়ে না। এটুকু মজাও না-থাকলে ৫০ বছরের বাসি এসব দলিল পড়তে যাবে কেন লোকজন? তাদের তো আর কোনো সত্য জানার ব্যাকুলতায় অনিদ্রা ধরেনি। বা তেমন কোনো সত্য তাদের জানবারই নেই হয়ত। কিন্তু ভাল লাগে তো, এতসব মজাও যে সাম্রাজ্য তৈরি ও রক্ষা করতে ও সেই সাম্রাজ্য ভাঙতে—ঘটে থাকে। ভারতে একজন ব্রিটিশ সম্রাটই একবার এসেছিলেন, ও এসেছিলেন সস্ত্রীক। সম্রাট পঞ্চম জর্জ। এর পরে প্রিন্স অব ওয়েলস বা সম্রাটের ভাইপো বা ভাগ্নেরা কেউ-কেউ এসেছে কিন্তু সম্রাট ঐ একবার, ১৯১১-তে। হ্যাঁ, সেই সম্রাট, যাঁর অমরত্ব প্রার্থনা ব্রিটিশদের ও তাদের দুনিয়াজোড়া প্রজাদের জাতীয় সংগীত ও যার প্রতি আনুগত্য, ঈশ্বরের প্রতি অনুগত্যের চাইতেও, অপরিহার্য। ভগবান বড়জোর পরলোকে শাস্তি দেবেন কিন্তু সম্রাটের মুখ খোদা না থাকলে তো একটা পেন্সও খরচা করা যাবে না। ঈশ্বর যেমন বাধ্যতা, আনুগত্য, অনতিক্রম্যতার একটা ধারণা মাত্র অথচ লোহার আকারের মতই বাস্তব—সম্রাটও তেমনি একটি ধারণা মাত্র।

এমন শক্তির এমন আধারের একটা ধারণাকে যদি হাগামোতা করতে দেখা যায়, কথা বলতে গিয়ে তোত্‌লাতে দেখা যায়—তাহলেও ধারণাটা টিকে যেতে পারে—এসব আর কতক্ষণ দেখা যাবে বা বোঝা যাবে। মুশ্‌কিলটা হয় তখন, যখন ধারণাটি নিজেই নিজেকে বিশ্বাস করে বসে।

সম্রাট হলেও পঞ্চম জর্জ একটু ভ্যাবলা গোছের মানুষ ছিলেন, তোতলাতেন, ফলে থুতু ছিটত, ফলে যাঁরা কথা বলছে তারা একটা জায়গা ও ভঙ্গি বাছত যাতে সম্রাটের মুখোমুখি পড়ে যেতে না-হয়, বোধহয় আমাদের ঐতিহাসিক নাটকের সেনাপতিদের স্টাইলে।

দিল্লির দরবার দেখে সম্রাট নিজেই আরো ভ্যাবলা হয়ে যান। মুঘলাই দরবারের কায়দায় সব সাজানো হয়েছে। দেশীয় রাজা আর নবাবরা তাদের কেতা আর চাল দেখাতে উট, ঘোড়া, হাতির পাল নামিয়ে দিয়েছে। এত মণিমুক্তো-হিরেপান্না পরেছে যে সেগুলোকে মেকি মনে হতে পারে। পাগড়িরই কত বাহার। ব্রিটেনের রাজা তো বিলাস-বৈভবে বড়জোর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদার। এমন মুঘলাই সমারোহ তার কল্পনারও বাইরে। সম্রাট পঞ্চম জর্জ এত ভেবলে গেছেন যে এইসব, এ—ই সব, এ—ই—স—ব যে তাঁরই এতেই তাঁর মুখ থেকে হাসি আর সরছিল না, লালাও তো একটু পড়ত। সত্যিই মনে হচ্ছিল—লোকজনের মুখের কথার গল্পে রাস্তা থেকে একটা বোকা লোককে ধরে এনে রাজা সাজিয়ে বসিয়ে দিলে, বিশ্বাসে-অবিশ্বাসে সে যেমন চোখ পিটপিট করে, হাসিতে ঠোঁট বন্ধ করতে পারে না—সম্রাট পঞ্চম জর্জের সেই অবস্থা। ভঙ্গিটা খুব অচেনা নয়—এখনো ভক্তি বোঝাতে এমনই মুগ্ধতা সিনেমাতেও দেখানো হয়। তবে, ভক্তির মুগ্ধতার তো কোনো ইষ্ট থাকেন। সম্রাট পঞ্চম জর্জের আবার ইষ্ট হবে কোত্থেকে—তিনি তো সকলের ইষ্ট। কিন্তু এত সমারোহ, এত ঐশ্বর্য, এত আয়োজন, এত বৈভব, এসবের একটা ইষ্ট থাকবে না? কৃতজ্ঞ ও অভিভূত সম্রাট এই সমগ্রতাকে ইষ্ট বলে মাথা নিচু করলেন।

সম্রাট পঞ্চম জর্জ তাঁর দরবারে দুটো ঘোষণা করলেন। নিজেই করলেন। আর, এমন যে একটা ঘোষণা হতে পারে তা লন্ডন ও দিল্লির জনা পনের লোক জানত—প্রধানমন্ত্রী, ভারতসচিব, ভাইসরয় হার্ডিঞ্জ সহ মাত্র জনা-পনের লোক। সম্রাটকেও নিষেধ করা ছিল—তিনি যেন কাউকে কিছু না-জানান। সম্রাট পঞ্চম জর্জ এমনিতেই অনুগত, তদুপরি একটু মজা হলে তাঁর ভালই লাগত। ১৯০৫-এ বঙ্গবিভাগের আগে তিনি একবার প্রিন্স অব ওয়েলস হিশেবে ভারতে এসেছিলেন ও ভারতে যে-ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর দেখাসাক্ষাৎ হয়েছিল—ভাইসরয়, প্রদেশের গভর্নররা, আইসিএসের অফিসাররা, বাহিনীর অফিসাররা—তাঁদের তাঁর ভাল লাগেনি। উনি ওঁর ডায়রিতে তখন লিখেছিলেন, 'শাহেবরা যেন হাতে মাথা কাটে। আরে, পরাধীন হয়েছে বলে কি ইন্ডিয়ানদের কোনো ইচ্ছে-অনিচ্ছে থাকবে না?'

একে তাঁকে 'না' করে দেয়া হয়েছে, তার ওপর তিনি আমোদগেঁড়ে, সুতরাং তিনি তাঁর স্ত্রী, মেরি-কেও বলেননি। তিনিও দরবারেই প্রথম শুনলেন।

দরবার শেষ হলে, সম্রাট তাঁর স্ত্রীসহ সবে মাত্র সেই স্বর্ণছত্র থেকে বেরিয়ে তাঁদের থাকার প্রাসাদের দিকে রওনা হয়েছেন আর দরবার-ফেরত হাজার-হাজার মানুষ হঠাৎ ছুটতে শুরু করে সেই সিংহাসনমঞ্চের দিকে। ছুটতে-ছুটতে তারা এসে দাঁড়ায় মঞ্চের সামনে। তখনো তারা হাঁফাচ্ছে, ডিসেম্বরের শীতেও ঘামছে। তারা ভারতীয় রীতিতে তাদের আট অঙ্গ দিয়ে সেই মঞ্চকে দণ্ডবৎ করে। একজনও মঞ্চের ওপর ওঠে না। হাজার-হাজার লোক উপুড় হয়ে শুয়ে—তাদের কপাল মাটিতে ঠেকানো তাদের দুই হাত তাদের দুই কানের পাশ দিয়ে গিয়ে করজোড় হয়ে গেছে। তারা কোনোদিন সম্রাট দেখেনি। কিন্তু তারা শুনে এসেছে তীর্থদেবতার সামনে ও সম্রাটের সম্মুখে কী ভঙ্গিতে প্রণিপাত করতে হয়। কোলের বাচ্চাদের কপালে ঐ ধুলো লাগিয়ে, তারা ফিরে যায় শ্লথ পায়ে তাদের মুলুকের দিকে ; সম্রাট ও তাঁর স্ত্রী ষোল ঘোড়ায় টানা এক শকটে ফিরছিলেন তাঁদের আবাসে। সারথি আগে বুঝতে পারে—

হাজার-হাজার মানুষ ছুটছে দরবারের সিংহাসন মঞ্চের দিকে। সে শকট থামিয়ে দেয়—সেই মানুষজনকে তাদের ইষ্টের দিকে ছুটবার সময় দিতে। সম্রাটের শকট ছিল সেই ছুটন্ত ভিড়ের পেছনে। সেই ভিড় ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছিল নিজেদের পা-ফেলায় উত্থিত ধুলোতে আড়াল হতে-হতে। সম্রাট তাদের পেছন থেকে তাদের দেখছেন—এ তারা জানতেও পারল না। যদি পারতও, তাহলেও তারা সম্রাটকে চিনতে পারত না। বরং তারা ষোল ঘোড়ায় টানা শকটটাকে মুগ্ধ হয়ে দেখত। তারা সম্রাটকে চাইছিল না, চাইছিল গর্ভগৃহের ধুলো, যেমন মন্দিরে চায়, দরগায় চায়, গুরুদ্বারে চায় যে গর্ভগৃহে ক্ষমতার বাস ও অন্তরাল।

কিন্তু সম্রাট যেন নিজেকে আবিষ্কার করলেন। যতই অনুগত, ভ্যাবলা ও আমোদগেঁড়ে হন না কেন, সম্রাট এটা জানতেন, হাড়েমজ্জায় জানতেন—সাম্রাজ্যটা একটা ব্যবস্থা আর সম্রাট কোনো মানুষ নয়।

ঈশ্বরের বিগ্রহ জানেনও না, ভোলেনও না। সম্রাটও তো কিছু জানেন না, ভোলেনও না। অথচ একটা মানুষ তো! একটা মানুষকে একটা ধারণা করে তোলা হয়েছে। সে ধারণার তো মানুষেরই মত হাগামোতা পায়, ঘুমও পায়, যৌনসঙ্গমের ইচ্ছেও পায়। নইলে তো সম্রাটদের ছেলেপুলে হত না। ছেলেপুলে না-হলে তো সম্রাটবংশ লোপ পেয়ে যেত। সেই ধাবমান হাজার-হাজার মানুষকে তাঁর সিংহাসন মঞ্চের দিকে ধেয়ে যেতে দেখে সম্রাটের চোখ ভিজে উঠেছিল। তিনি তাঁর স্ত্রীর হাতটার ওপর নিজের ডানহাতটা রাখলেন। শকট চলতে শুরু করতেই এক শারীরিক প্রতিবর্তক্রিয়ায় তাঁর বোধে এসে যায়—যেমন হঠাৎ শরীরের কোনো একটা জায়গা চুলকোয়, বা ব্যথা করে, বা যেমন হঠাৎ হেঁচে বা কেশে ফেলতে হয়—তেমনি তাঁর বোধে এসে যায় : তাঁকে যদি ব্যবস্থা মানতে হয়, তাহলে ব্যবস্থাও তো তাকে মানবে? কখনো-কখনো। বা ক্বচিৎ।

এটাকে চিন্তা বা ভাবনা বলা ভুল। একেবারে ভুল।

আবার, এর ভিতরে ব্যবস্থাকে জব্দ করার দুষ্টুমিটা আন্দাজে না-আনলে, সম্রাট এমন ভাবতে যাবেন কেন—এমন একটা র‍্যাশনালিস্ট তর্ক উঠে পড়বে।

ভ্যাবলা, অনুগত, আমোদগেঁড়ে, মজারুদের বোধ এমন বাঁকা পথ নেয়। আর নিলে সে-বোধ আর সোজা হয় না। ঐ বাঁকা পথেই চলে। যুক্তি দিয়ে না, ঝোঁক দিয়ে। যদিও ভিতরে-ভিতরে একটা যুক্তি এমন জোরালো ও ধারালো হতে থাকে যে অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপকরা তার ভার ও ধার টের পান। দুষ্টুমি-র যে-ঢং বা মুখোশটা সম্রাট ব্যবহার করে থাকেন চমকাতে বা চমকে উঠতে, সেটা অর্থহীনতা ঝেড়ে ফেলে প্রতিহিংস মুদ্রা হয়ে ওঠে যেন। আর, এই প্রক্রিয়ায় এই সব ভ্যাবলা, তোতলা, বাধ্য, আমোদগেঁড়ে, অনিশ্চিত ব্যবহারের লোকগুলোর ভিতরে একটা যুক্তিবিদ্যাও উলটো দিক থেকে সংগঠিত হতে থাকে। তখন, এ সব লোককে শয়তানও মনে হয়।

হ্যাঁ—প্রফেশন্যাল হ্যাজার্ড তো সব প্রফেশনেই থাকে। কোনো বেকারের হাতের আঙুল ঝলসে যেতে পারে। কোনো কশাইয়ের আঙুল কেটে যেতে পারে। যারা স্ট্রিং ইনস্ট্রুমেন্ট বাজায়, তাদের আঙুলে কড়া পড়তে পারে। সার্জেনদের, মানে শল্যবিদ্‌দের কোমরে ফিক ব্যথা হতে পারে। যারা জাহাজে কাজ করে তাদের শরীরের খোলা জায়গাগুলোতে নোনা ধরতে পারে। হাসপাতালের এমার্জেন্সিতে ডিউটি করতে-করতে অনিদ্রার অসুখ করতে পারে। এসব যে এইসব বৃত্তির সব লোকদেরই হবে, তা নয়। কিন্তু হতে পারে।

তেমনি—সমাজকে একটা ব্যবস্থা হিশেবে মেনে নিলে তার হ্যাজার্ড বা দুঃখকষ্ট মেনে নিতে

হয়। ঠিক ব্যবস্থাও তো নয়। ব্যবস্থার ধারণা। মেনে না নিলে, ব্যবস্থার ধারণাটা ধসে যাবে।

তাহলে—যে-লোকটাকে ও তার পরিবার-পরিজনদের কোনো ধারণার বিগ্রহ করা হয়, তাদের খেয়ালখুশিও তো ব্যবস্থার পক্ষে হ্যাজার্ড হতেইপারে।

সম্রাট তাঁর আবাসে ফিরে রাতের খাওয়ার টেবিলে পাশে বসা কাউকে জানিয়ে দিলেন যে তিনি ঠিক করে ফেলেছেন, তিনি ভারতবর্ষেরও সম্রাট হবেন ও তার জন্য এখানেই অভিষেক বা করোনেশন হবে।

পরে জিজ্ঞসা করলে সম্রাট মনে করতে পারেননি, তিনি কাকে বলেছিলেন। তাঁর বাঁদিকে তাঁর স্ত্রী অ্যান বসেছিলেন আর ডানদিকে বসেছিলেন ভাইসরয় হার্ডিঞ্জের স্ত্রী। তাঁদের কাছে এমন রাষ্ট্রীয় বিষয় বলা যদিও দস্তুর নয় তবে, সম্রাট পঞ্চম জর্জ, একটু হেসে, যেসব সম্রাটদের নিয়ে নাটকটাটক লেখা হত, তাদেরই কাউকে ভেংচে বললেন যেন, 'একজন সম্রাট কি এটুকু আশা করতে পারেন না যে তিনি যা বললেন, তা শুনে নেয়ার লোকের অভাব হবে না, তাঁর সাম্রাজ্যে?' আর কথাটা তিনি যে-স্বরে বললেন, তাতে কিছুতেই কেউ বুঝতে পারল না, তিনি এটা সত্যি-সত্যি বললেন, নাকী, পুরনো কারো নাটক থেকে মুখস্থ বললেন, নাকী কোনো অভিনেতার নকল করলেন। তাঁর বলার মধ্যে তিনটি সম্ভাবনাই সমপরিমাণে মিশে ছিল।

পরদিন প্রাতরাশের টেবিলে ভাইসরয় হার্ডিঞ্জ সম্রাটের ডানদিকের তৃতীয় চেয়ার থেকে সম্রাটকে জিজ্ঞাসা করলেন, হিজ মেজেস্টি কি চাইছেন, ভারতসম্রাট হিশেবে তাঁর স্বতন্ত্র কারোনেশনের বিষয়টি সম্পর্কে ক্যাবিনেটের মতামত জানতে চাওয়া হোক। ভাইসরয়, পদাধিকারে উপসম্রাট বা সম্রাটপ্রতিনিধি হতে পারেন কিন্তু সম্রাট স্বয়ং উপস্থিত থাকলে উপ বা প্রতিনিধি পদাধিকারীর আর কী করার থাকে। লর্ড হার্ডিঞ্জের ঠাকুরদাও ছিলেন কোম্পানির আমলের এক গভর্নর জেনারেল। সম্রাটের সম্রাটত্ব যেমন বংশানুক্রমিক, তাঁরও রাজপ্রতিনিধিত্ব তেমনি বংশানুক্রমিক। একই কথা দুবার জিগগেস করা উপসম্রাটের পক্ষে সম্ভব নয়। একই কথা দুবার সম্রাটকে বলা যায় না। সম্রাটের কোনো শুনতে না-পাওয়া নেই, অন্যমনস্কতাও নেই। হার্ডিঞ্জের প্রথম সমস্যা দাঁড়াল—সম্রাট পঞ্চম জর্জ নিজে সে-কথা জানলেন কী করে? কখনই-বা?

অনেক প্রশ্নই উঠেছিল। কী করে সেসব প্রশ্নোত্তর চলছিল, তা আন্দাজ করাও মুশকিল। ফোন নেই, টেলিগ্রাম নেই, এসএমএস নেই, ই-মেল নেই, চিঠি যাতায়াতে মাসখানেক বা বেশি। অথচ সাম্রাজ্য আছে, সম্রাট আছে, ধারণা আছে, ধারণার বিগ্রহ আছে। তবু বিষয়গুলিকে হয়ত এক রকম সাজানো যায়।

—কোন্ ক্রাউন পরতে চান সম্রাট? আসল ক্রাউন তো দেশের বাইরে কোথাও নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ।

—তাহলে নতুন ক্রাউন বানাও।

—রাজমুকুট তৈরি করে আসছে যারা পাঁচশ বছর, লন্ডনের সেই গেরার্ড জুয়েলার্স দর দিয়েছেন, অবিকল আগেরটার মত করতে ৪৬০০০ পাউন্ড।

—করোনেশন একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান। সেটা দুবার হয় না। বিধর্মীদের দেশেও হয় না।

—পার্লামেন্ট তো একবার করোনেশনের টাকা দিয়েছে। আবার কেন?

—গেরার্ডকে বলুন—একটা মুকুট তৈরি করে ভাড়া দিক। সম্রাট ফিরে এলে ফেরত দেয়া হবে। ভাড়া ৪ থেকে ৫ হাজার পাউন্ডের মধ্যে।

—আমরা বিজয়ী উইলিয়ামের সময় থেকে সারা ইয়োরোপের রাজমুকুট বানাই। মুকুট ভাড়া

দিতে শুরু করলে আমাদের গুডউইলের বারটা বাজবে। আপনারা বরং অন্য কোথাও দেখুন।

—দেশীয় রাজারাজরাড়া তো সম্রাটকে অনেক মণিমুক্তো সোনাদানা দেবে, সেগুলো দিয়ে বানানো হোক।

—একবার ফাঁস হয়ে গেলে সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় স্তম্ভ ভেঙে যাবে।

—তাহলে ভারতের সম্রাটের মুকুট ভারতীয় প্রজারা দিক।

তাই হল। সম্রাট পঞ্চম জর্জ সেই মুকুট নিজেই নিজের মাথায় পরে ভারতীয় প্রজাদের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। ভারতীয় প্রজাদের রাজভক্তিকে এই সামান্য স্বীকৃতি তাও সম্রাট দিলেন। সম্রাটের সঙ্গেই সেই ভারতের সম্রাটের মুকুট লন্ডনে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। আজও টাওয়ার অব লন্ডনে গেলে সেই দুই নম্বরি রাজমুকুট দেখা যায়।

পরের বছর থেকে করোনেশন ট্যাক্স বসল। কতদিন ধরে সে-ট্যাক্স আদায় হয়েছিল বা কোনোদিন বন্ধ হয়েছিল কীনা জানা যায়নি।

ঠিক একবছর পর, পঞ্চম জর্জের ডুপ্লিকেট রাজমুকুটের দাম তখনো ভারতীয়দের ট্যাক্সে সামান্যই শোধ হয়েছে, ১৯১২ সালের ডিসেম্বরে নতুন রাজধানী নয়াদিল্লিতে প্রবেশ করছিলেন ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ, হাতির মিছিল সাজিয়ে, হাতির ওপর সোনালি হাওদা। লর্ড হার্ডিঞ্জ অত উঁচুতে বসে-বসে দুলে-দুলে চলেছেন। তাঁর ঠিক পেছনে স্বর্ণচ্ছত্র ধরে দাঁড়িয়ে এক ভারতীয়, তাকে নগ্ন শরীরেই দাঁড়াকরানো হয়েছে—মালকোঁচা মারা ধুতির সঙ্গে। পুষ্ট তার পেশিগুলো ঢেউয়ের মত ভাঙছিল তার ভারতীয় শরীরে। কত রঙিন ফিতে দিয়ে তার শরীরের সেই ঢেউগুলি সাজানো। রাস্তার দুপাশে সারিদেয়া ভিড়। একবছর আগে দরবারের যেমন তারা এসেছিল সম্রাট দর্শনে, একবছর পরে তেমনি এসেছে রাজধানী দেখতে। লর্ড হার্ডিঞ্জ ডানহাত-বাঁহাত নাড়াচ্ছিলেন জড়োহওয়া দাঁড়িয়ে-থাকা ভারতীয় প্রজাপুঞ্জকে। এত বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য, এত বিশ্বস্ত ও অনুগত দেখাচ্ছিল সেই হাজার-হাজার মানুষের দাঁড়িয়ে-থাকা, তাকিয়ে-থাকা। হার্ডিঞ্জ ইয়োরোপীয় রাজনীতিতে পোড় খাওয়া রাজনীতিজ্ঞ। ভারতের চিরকালের শক্তিকেন্দ্র ও ভারতীয় এপিকগুলির ঘটনাস্থল হিশেবে প্রতিষ্ঠিত এই নতুন এক দিল্লিতে ইংরেজ শক্তির ভারতীয় কেন্দ্রকে সরিয়ে আনার যে ঘটনার তিনি নেতৃত্ব করছেন, তাকে এপিককালের ইতিহাসের সংযুক্ত না-করে দেখা, তাঁর পক্ষে সম্ভবই ছিল না। সেই মুহূর্তে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে কোনো ভারতবর্ষ তাঁর কাছে সত্য ছিল না। বা, ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও তাঁর কাছে সত্য ছিল না। সত্যিই—এটা একটা অনন্ত সম্বন্ধ।

ঢিলের মত একটা কিছু এসে পড়ে হার্ডিঞ্জের হাওদার ওপরে—ঢিলটা প্রথমে ওপরে উঠে তারপর পড়েছে ঐ সোনার ছাতার ওপরে। ভারতীয় কান তখনো বিস্ফোরণের এমন প্রতিধ্বনিময় আওয়াজে অভ্যস্ত হয়নি। মুহূর্তে হাওদা জ্বলে উঠল, সেই স্বর্ণচ্ছত্র জ্বলে কাত হয়ে পড়ল, ছত্রধারীর একটা হাত ছিটকে পড়ল মাটিতে, দাউদাউ আগুনের মাঝখানে লর্ড হার্ডিঞ্জকে দেখা গেল দুই হাত তুলে চিৎকার করতে, বিস্ফোরণে আঁতকে উঠে সেই প্রায় নয় ফুটি হাতি শুঁড় মাথার ওপর তুলে, বৃংহন দীর্ঘতর ও উচ্চতর করতে-করতে, পিঠে দাউদাউ আগুনে ছাই হতে থাকা সোনার ছাতা ও ইউনিয়ন জ্যাক ও জ্বলন্ত রাজপ্রতিনিধিকে নিয়ে অন্ধকারের দিকে ছুটল, অন্ধকারকেই আগুনের প্রতিকার বলে তার শরীর জেনে এসেছে অথচ সে-অন্ধকার সেই হস্তী-আরূঢ় বহ্নিকে আকাশের শূন্যতায় হারিয়ে যাওয়ার মত বেগবান করে তুলছিল। ভারতের বিপ্লবীদের সবচেয়ে উদ্ধত আক্রমণ—ভাইসরয়।

ভারতের রাজধানী দিল্লিতে নিয়ে আসায় খেপে গিয়েছিল বেসরকারি সব হৌসের শাহেবরা।

বরিশালের যোগেন

প্রায় পৌনে দুশ বছর হল এই হৌসগুলিই তো কলকাতাকে সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগর করে তুলেছে। অন্যান্য ইয়োরোপীয়রা কি পেরেছে ব্যান্ডেল, হুগলি, চন্দননগরকে মেট্রপলিস করে তুলতে? পৌনে দুশ বছর ধরে এই হৌসগুলিই তো ভারতের ব্যবসায়ী ইংরেজদের একটা জাত দিয়েছে। এই হৌসগুলি তো চাকরি দিয়ে গ্রামের হিন্দু-মুসলমান পরিবারগুলির সঙ্গে বংশানুক্রমিক বাঁধন তৈরি করেছে। এই হৌসগুলিই তো ব্যাবসাবাণিজ্যের সব গলি খুঁজি পর্যন্ত শাসন করে। দিল্লিতে কী আছে? সাম্রাজ্য মানে তো ব্যাবসা। সাম্রাজ্য মানে তো লাটশাহেবি করা নয়। তারা একটা দরখাস্তও পাঠাল লন্ডনে, ভারত সচিবের কাছে। রাজধানী কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হোক।

কলকাতা থেকে রাজধানী দিল্লিতে সরানোয় খুব খুশি হয়েছিল গবর্মেন্টের চাকুরে শাহেবরা। সিভিল সার্ভিসের শাহেবরা, ওকালতি ইত্যাদি পেশাভুক্ত লোকজন। কলকাতার প্রাইভেট শাহেবগুলো বার মাস চব্বিশ ঘণ্টা ঘোঁট পাকায়। তাদের ভাবসাব এমন যে তারাই তো গভমেন্ট, তারাই তো দেশ চালায়। দিল্লিতে কোনো প্রাইভেট শাহেব নেই, শুধুই অফিসাররা আছে। আর দিনে-দিনে সময়টা দুর্বোধ্য হয়ে উঠছিল। অফিসে বসে থাকলে প্রাইভেট শায়েবদের উদ্ভট সব প্রস্তাব শুনতে হয়। আর, বেরলে, বাইরে রিভলবার হাতে টেররিস্টরা। দৌড়ে পালানো বা পালটা আক্রমণ চলবে না। তাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অপমান। দিল্লিতে যেমন প্রাইভেটশাহেব নেই, তেমনি টেররিস্টও নেই।

রাজবন্দীদের মুক্তি নিয়ে গান্ধীজির মধ্যস্থতা। ফলে স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চে ইনফর্মার প্রথা চালু।

১৯৩৭-এর নভেম্বর বাংলার ছোটলাটগিরি শেষ করে দেশে ফিরে যাওয়ায় স্যার জ্যাক অ্যানডারসনের বেশ কেরামতি আছে। তিনি ভাইসরয়ের কাছে তাঁর শেষ গোপন চিঠিতে লিখেও ছিলেন, 'প্রদেশটাকে একটু ঠান্ডাই রেখে যাচ্ছি।'

৮২

তাঁর রেটকার্ডটা এরকম দাঁড়াতে পারে।

৩৫ সালের নতুন ভারত শাসন আইন, নতুন ভোটারলিস্ট, জাতপাত অনুযায়ী আসন, ভোটের পর দল ভাগাভাগি—এই সব গোলমাল সত্ত্বেও তিনি বেয়াক্কেলে কিছু করেননি। লিগকে বাধ্য করেছেন, হিন্দু মন্ত্রী বাড়াতে। হিন্দু মন্ত্রীরা এখন স্বস্তিতেই আছেন। রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন এখানেই সবচেয়ে বেশি হয়েছে। গান্ধীর সাহায্য নিয়ে আন্দামানবাদে ১১০০ বন্দীকে ছেড়ে দিয়েছেন। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা যাতে না-লাগে তার জন্য কোনো ব্যবস্থা নেননি, কারণ সে-দাঙ্গায় 'রাজ'-এর কোনো ক্ষতি নেই। টেররিজমে 'রাজ'-এর ক্ষতি, সে-আন্দোলনের শিরদাঁড়া তিনি বিষিয়ে দিয়েছেন।

টেররিস্টদের গুলি তিনি খেয়েছেন, দার্জিলিঙে লেবঙের রেসকোর্সে। একটা গুলি ডানদিকের পাঁজরায় ঢুকে আছে। বের করা যায়নি। তা থেকে তাঁর একটা খিঁচুনিরোগ ধরে গেছে। হঠাৎ-হঠাৎ সেটার আক্রমণে জায়গা, সময়, প্রসঙ্গ গোলমাল করে মৃগী রোগীর মত হয়ে যান। তার সঙ্গে মনের ভিতরে একটা ত্রাস স্থায়ী হয়ে গেছে—দেশী মানুষের ভিড়ে বেশিক্ষণ

থাকতে পারেন না, ঘামতে থাকেন। বিপ্লবীদের গুলি না-খেলে হয়ত টেররিস্টদের সম্পর্কে এমন নির্ভুল অনুভব তাঁর হত না ও সেই অনুভব থেকে তৈরি অ্যান্টিটেররিস্ট পলিসিও কার্যকর হত না। ঠিক পলিসি না, কোনো কৌশলও না, বরং বলা যায় অ্যাপ্রোচ। যদি মাঝে-মাঝে মৃগীরোগীর খিঁচুনি না উঠত, যদি পাঁচ-সাত জন দেশি লোক তাঁর কাছে এলে তিনি ঘামতে শুরু না-করতেন ভয়ে, তাহলে স্পেশ্যাল ব্র্যাঞ্চ থেকে যে হত্যা-তালিকা, টেররিস্টরা যাদের মেরেছে তাদের আর যাদের মারবে বলে ঠিক করেছে, তাদের, তাকে পাঠিয়েছে সেই কাগজগুলির দিকে তাকিয়ে থাকা অত ভাবলেশহীন হত না। এটা সম্পূর্ণতই আইজির বিষয়। তিনি এটাকে তাঁর ভাবার বিষয় করেননি। একজন নতুন ডিআইজি স্পেশ্যাল ব্র্যাঞ্চ নিযুক্ত হয়েছে। সরাসরি তাঁরই বিষয় এটি। মহাত্মা গান্ধী যখন কলকাতায় এসেছিলেন বন্দীমুক্তির ব্যাপারে আর সরকারের শর্ত অনুযায়ী সব জেলখানা ঘুরে-ঘুরে রাজবন্দীদের সঙ্গে দেখা করে জানতে ও সরকারকে জানাতে চাইছেন—যাঁরা বা সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাস করতেন তাঁদের বিশ্বাসের কোনো বদল ঘটেছে কী না—তখন এই ডিআইজি ছিলেন গান্ধীর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অফিসার। গান্ধীর সঙ্গে তাঁর ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা বৈঠক হত লিস্ট ধরে-ধরে। সেই ডিআইজি অফিসার গান্ধীর চক্করটা সবচেয়ে আগে ধরতে পেরেছিলেন। সেবার গান্ধী খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডক্টর জীবরাজ মেহেতা টেলিগ্রাম করে লাটশাহেবকে জানান, উনি যেন কিছুতেই না ফেরেন, ওঁকে যেন কলকাতায় আটকে রাখা হয়, দরকারে হাউস-অ্যারেস্ট করে। গান্ধী কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না, শেষে একদিন রাজি হয়ে গেলেন। থাকতেন, যেখানে তিনি উঠেছিলেন শরৎ বোসের সেই বাড়িতে। মাসখানেক ছিলেন গান্ধী। একদিন লাটশাহেবের ঠাট্টার উত্তরে প্রাসঙ্গিক হেসে সেই ডিআইজি বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, স্যার, গান্ধী আর শরৎ বোসকে পাহারা দেয়া, এমন অসম্ভব একটা কাজ যে এরকম কোনো কাজ থাকাই উচিত নয়। আমাকে যখন বলেছিলেন গান্ধী, 'যতক্ষণ আমার বিবেক শিবের জটার পানির মত এত স্বচ্ছ না-হয় যে একআঁজলা জলে নবগ্রহের প্রতিবিম্বন ঘটে, ততক্ষণ আমি ইংরেজ সরকারকে এই রাজবন্দীদের মতপরিবর্তন সম্পর্কে কোনো গ্যারান্টি দিতে পারি না। অথচ তাঁরা বলেছেন—আমার কথাই চূড়ান্ত। প্রেসিডেন্সি আর হিজলি জেলে, রাজবন্দীরা তাঁদের মনের কথা আমাকে অকম্পিত স্বরে জানিয়েছিলেন যে কোনোরকম মুচলেকা না দিয়ে তাঁরা শর্তহীন মুক্তি চান। আমিও তাঁদের কথা দিয়েছি—বন্দীদের পক্ষ থেকে কোনো আপোশপ্রস্তাব দেয়ার অধিকার আমার নেই। গবমেন্টের সঙ্গেও বন্দীমুক্তি ব্যাপারে আমার মত মেলেনি। তাঁরা বলছেন—প্রত্যেকটি ঘটনাকে স্বাধীন ঘটনা হিশেবে বিবেচনা করতে হবে। আর আমি বলছি—এগুলো সব একটাই ঘটনা, মত ও পথ যদি বদলাতে হয়, সবাইকেই বদলাতে হবে। তবু আমি সরকার ও রাজবন্দীদের উলটো কথা মেনে নিয়েছি, আমার স্বচ্ছতার জন্য।'

এমনিই স্যার গান্ধীজির কথা বোঝা শক্ত। তার সব কথাই শাদাসিধে, সরল। কোনো প্যাঁচঘোঁচ নেই, কোনো গিঁট নেই। সেই ঢঙেই যখন এমন কথা বলে যান যে সরকার ও রাজবন্দীরা উলটো কথা বলছে। তিনি সেটা মেনে নিয়েছেন—এই দুই পক্ষের কাছেই তাঁর নিজের পরিচ্ছন্নতা প্রমাণের জন্য। একথার মানে বোঝা, স্যার, আমার কথা? আমি পুলিশ, আমাকে ধরে আনতে বললে ধরে আনতে পারি কিন্তু ছাড়তে পারি না। অথচ স্যার, ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রত্যেকটি কেসের খুঁটিনট দেখছেন, জিজ্ঞাসা করছেন, এফআইআর-এর সঙ্গে চার্জশিটের অমিল বের করছেন। একদিন অনেকগুলি স্পাইমার্ডার কেস ছিল। আসল আসামীকে তো কবেই লটকে দেয়া হয়ে গেছে। দলের লোকরা কয়েদ খাটছে। গান্ধীজি কাগজের দিকে মুখ রেখেই বললেন,

'গুপ্তচরবৃত্তি চিরকাল একটা অসৎ কাজ। সেই অসুস্ততার ফলে কারো যদি ক্ষতি হয়, তাহলে সেই ক্ষতিগ্রস্ত তো ঐ গুপ্তচরকে হত্যা করতে প্ররোচিত হতে পারে। আইনত এগুলিকে প্ররোচিতহত্যা ধরা উচিত। অথচ তাদের বিচার হয়েছে ইচ্ছাকৃত খুন হিশেবে।'

গান্ধীজির এই কথাতে সেই ডিআইজি (স্পেশ্যাল ব্র্যাঞ্চ) স্বপ্নলব্ধ ওষুধ পাওয়ার পর ভোগেশঠার মত বুঝে ফেললেন—গান্ধীজির আগের একদিনের দুর্বোধ্য কথাটা—দুই শত্রুপক্ষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজের পরিচ্ছন্নতা রক্ষাই যদি গান্ধীজির প্রধান কাজ হয়, তাহলে, ডিআইজি (স্পেশ্যাল ব্র্যাঞ্চ)-র প্রধান কাজ হওয়া উচিত টেররিস্টদের ভড়কি দেয়া। ডিআইজি (স্পেশাল ব্যাঞ্চ)-র তো কোনো মাঝখান নেই। তিনি তো একপক্ষের লোক। মাঝখানের, দুইপক্ষের মাঝখানের জায়গাটা খালি পড়ে আছে। দিনের-পর-দিন গান্ধীজিকে দু-হাজারের ওপর (আন্দামানসহ) রাজবন্দীদের ফাইল দেখাতে না-হলে, গান্ধীজির কথা থেকে এই মাঝখানের জায়গাটা ডিআইজি দেখতে পেতেন না। তিনি ছোটলাট অ্যান্ডারসন-এর পূর্ণ সম্মতিতে স্পেশ্যাল ব্র্যাঞ্চে ইনফর্মার পদ্ধতি চালু করে দিলেন। আগে ছিল 'অ্যাপ্রুভার', রাজসাক্ষী, দলের ভিতর থেকে। এখন শুরু হল দলের বাইরে থেকে, পাড়া থেকে, বাড়ি থেকে, স্কুল থেকে, আত্মীয়দের মধ্য থেকে ইনফর্মার খোঁজা। খুঁজে বের করে অফিসাররাই। ইনফর্মার ঠিকঠাক খবর দিলে, সেই অফিসাররাও বেশ বড় দরের নগদ পুরস্কার পায়। অফিসার মানে থানার সেকেন্ড অফিসার পর্যন্ত। মুফতে এত নগদ টাকা বাঙালি, শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত হিন্দুদের বাড়িতে আয়ের একটা পথ খুলে দিয়েছিল। এরা একটুআধটু সম্পন্ন পরিবার, ডার্বি ঘোড়দৌড়ের টিকিটও কাটত। তিরিশ সালের পর কোনো বড় রকমের বিপ্লবী ঘটনার হদিশ ইনফর্মারদের কাছ থেকে ছাড়া পাওয়া যায়নি। বেশির ভাগই পারিবারিক ইনফর্মার। তখনো তো একান্নবর্তী বাড়িই বেশি। এক ভাই যদি সরকারি চাকরি করে, আর-এক ভাই যদি বাড়িতে বসে সম্পত্তি দেখাশুনো করে, আর-এক ভাই হয়ত বিপ্লবী দলে গিয়ে জুটেছে, আরো এক ভাই হয়ত পার্টটাইম ইনফর্মারের কাজ শুরু করল। বিপ্লবী ভাইয়ের কথাবার্তা থেকে আঁচ করে খবরটা পৌঁছে দেয়া। তারপর তো আর তার কোনো দায়িত্ব নেই। ব্যক্তিগত বা দলগত টেররিজম ৩৮-৩৯ সালের পর ক্রমেই কমে যেতে লাগল তার আসল কারণ বড়-বড় বিপ্লবী নেতা, যাঁরা সারা জীবনই ছেলে-দ্বীপান্তরে কাটাচ্ছিলেন, তাঁরা সন্ত্রাস-বিপ্লবে বিশ্বাস হারিয়ে, নতুন বিশ্বাস খুঁজে পেয়েছেন শ্রেণিবিপ্লবে। অ্যানডারসন শাহেবের আমলে বন্দীমুক্তি আন্দোলন প্রধান আন্দোলন হয়ে উঠল আর ৩৭ সাল থেকে গান্ধীজি প্রদেশগুলির সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে লাগলেন, বিশেষ করে বাংলায়, নিজে এসে। অ্যানডারসনশাহেব চলে যাওয়ার আগে ১১০০ রাজবন্দী ছাড়া পেয়েছিলেন। এটা একটা বাহাদুরি তো বটেই—সে-বাহাদুরি আমলাতান্ত্রিকই হোক, সাম্রাজ্যবাদীই হোক, প্রশাসনিকই হোক। বিপ্লবীদের খবর জানতে ইনফর্মার ব্যবস্থা চালু করা, তাদের ধরা, বিচার করা, শাস্তি দেয়া ও ছাড়া যদি একটা লোকই করে মাত্র দু-চার বছরে, তাহলে সেটা তার বাহাদুরি নয়?

তার চাইতেও বড় বাহাদুরি—একটা খিচুড়ি সরকারকে চালানোর কৌশলে। ফজলুল হকের মত প্রধানমন্ত্রী—তার কোনো পার্টি নেই, শুধু সে নিজে আছে। কিন্তু নিজে সে এমন সব হয়ে আছে ও নিজে ছাড়া তার কাছেও আর-কেউ এতটাই নেই যে অ্যানডারসন শাহেবকে কত গোপন নোট, 'টুবি ওপনড বাই অনলি হিজ মেজেস্টি,' বলে মার্কা দিয়ে ভাইসরয়কে পাঠাতে হয়েছে সেসব তো এখন বেরুচ্ছে, আর্কাইভ থেকে, সরকারি ফাইল থেকে, তাছাড়াও বড়-বড় লোকদের 'পেপার্স' থেকে। 'না, না, ফজলুল হক শাহেব যুক্ত প্রদেশে মুসলমানদের বলেছেন—এখানে মুসলমানদের ওপর অত্যাচার হলে, তার বদলা বাংলার হিন্দুদের ওপর নেয়া

হবে—এই বলে যে-খবর বেরিয়েছে সেটা একেবারেই তাঁর মনের কথা নয়। এ নিয়ে আমার সঙ্গে ওঁর কথা হয়েছে। উনি ওরকম মানুষই নন। হিন্দুরা তো ওঁকেই বিশ্বাস করে সবচেয়ে বেশি।' আপনি এ নিয়ে কিছু ভাববেন না।' 'হ্যাঁ, আপনি মদের ব্যাপারে যা শুনেছেন, কথাটা ঠিকই, তাতে বাকি অর্ধেকটা হয়ত আপনাকে এখনো জানানো হয়নি। আমাদের প্রধানমন্ত্রী হকশাহেব একটু বেশি রকম আবেগপ্রবণ ও একই সঙ্গে শেয়ালের মত ধূর্ত। উনি এক জায়গায় ঘোষণা করে দিয়েছিলেন—মদ্যপানবিরোধিতা কী করে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিষয় হয়? মদ্যপান তো আর শাহেবরা শেখায়নি। আমরা নিজ গুনেই শিখেছি। যদি বন্ধ করতে হয়, আমাদেরই করতে হবে আর সেটা করার জন্য সারা দেশ জুড়ে স্বরাজ-আন্দোলনের দরকার হয় না। এই আমি আপনাদের সামনে ঘোষণা করছি—আজ সন্ধে থেকে বাংলা প্রদেশের সীমার মধ্যে মদ্যপান নিষিদ্ধ। সমস্ত মদের দোকান বন্ধ থাকবে। কাউকে যদি খেতে হয় তাহলে তাকে হয় বিহার, না-হয় আসামে, না-হয় উড়িষ্যায় যেতে হবে। সোনার বাংলায় বসে রসের মদ-খাওয়া নিষিদ্ধ। এই ঘোষণার একটি কপি সহ আমার আবগারি মন্ত্রী মন্ত্রিসভায় এসে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকলেন আর অর্থমন্ত্রী বলে দিলেন, 'দি ইকনমি অব দি প্রভিন্স উইল ক্র্যাশ লাইক এ পাঁইট, ডিউ টু দি লস অব এক্সাইজ ডিউটি।' অনেক আলোচনার পর ঠিক হল—পরীক্ষা করার জন্য যে জেলায় সবচেয়ে কম মদ বিক্রি হয় অর্থাৎ সবচেয়ে কম আবগারি শুল্ক আদায় হয়, সেই জিলায় মদ্যপান নিষিদ্ধ হোক। মদের দোকানগুলিকে সেটা জানিয়ে দেয়া হোক। কিন্তু কোনোভাবেই যেন জিলাটিকে ভাগারের হাড়ের মত খটখটে করা না হয়। ওষুধ হিশেবে এর ব্যবহার চালু থাকবে। এই সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য আমরা যখন কথা বলছি, হকশাহেব একটিও আওয়াজ করেননি। সিদ্ধান্তের পর তাঁর সম্মতি চাইলে, তিনি কথা না বলে ঘাড় হেলালেন। অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক প্রাচীন। অর্থমন্ত্রী ওঁকে বললেন, 'তোমার মাথায় হঠাৎ মদ্যপান ঢুকল কেন।' প্রধানমন্ত্রী জবাব দিলেন—'মিটিঙে গান্ধীবাদী হিন্দু বেশি ছিল, তারা আমাদের নিন্দে করল, আমরা জাতীয় নীতি মানছি না বলেই স্বরাজ আসছে না। আমি কথাটা চ্যালেঞ্জ হিশেবে বলেছি।' 'আমাদের প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে কাগজ বা অন্য কোনো সূত্র থেকে কোনো খবর পেয়ে আপনি নিজেকে উদ্‌বিগ্ন করবেন না। ওঁর ধরণটাই একটু এলোমেলো। বাইরের লোকরাও তার সুযোগ নিয়ে যা ইচ্ছে তাই বানায়। আপনাকে একটা ঘটনা জানাই, তাহলে হয়ত আপনার ধারণা করতে সুবিধে হবে। কলকাতার দক্ষিণ-পশ্চিম শহরতলিতে সাবেকি ভাইসরিগ্যাল প্রাসাদের কাছাকাছি, বেহালা বলে একটি পুরনো গ্রামে একটা ডগরেস শুরু হয়েছে। জমিটা খাশ। একজন উদ্যোগ নিয়ে সেখানে বসবার গ্যালারি বানিয়ে ডগরেস শুরু করেছে। এখন সরকার থেকে তাদের বেটিঙে আপত্তি করায়, তারা উকিলের চিঠি দিয়ে মামলার ভয় দেখাচ্ছে। মামলা হলে হত—তা নিয়ে মন্ত্রিসভার মাথাব্যথা নেই। কিন্তু মামলায় তো হকশাহেবকে অস্বস্তিকর সব প্রশ্ন করে একটা রসালো কুৎসা পাকানো হবে। প্রধানমন্ত্রী বেশ কিছু দিন আগে কে-একটা চেনা লোককে ওখানো ডগরেসের অনুমিতসহ একটা চিঠি দেন। খাশজমিতে ওরকম রাইট দেয়া যায় না। তারপর লোকটির সঙ্গে আর কোনো দেখাই হয়নি। লোকটি এখন তার হাতের ঐ প্রমাণগুলি দিয়ে একটা মামলার হুমকি দিচ্ছে। ক্যাবিনেটের প্রতিটি সদস্য যে-সমবেদনা ও ভালবাসায় বিপদ থেকে হকশাহেবকে বাঁচাতে চেষ্টা করছিলেন, তা দেখে আমার সত্যি নোবিলিটি অব দি হিউম্যান কাইন্ডের কথা মনে এল। ঠিক হল যে এটা মিনিট হবে না। লোকটির সঙ্গে কথাবার্তা বলে একটা নিষ্পত্তি করা হবে। বিষয়টা প্রমোদকরের আওতায় সুতরাং অর্থমন্ত্রীর দায়িত্বে।' ১৯৩৭-এর এপ্রিল থেকে ১৯৩৯-এর আগস্ট পর্যন্ত ২৮

মাসে চার-চার জন ছোটলাট—অ্যান্ডারসন, ব্রেবোর্ন, রেইড ও উডহেড—ভাইসরয়কে তাঁদের গোপন পাক্ষিক চিঠিতে বেহালার এই ডগরেসের কথা জানিয়েছেন। ভাইসরয় লিনলিথগো ছুটিতে গেছেন। অস্থায়ী ভাইসরয়গিরি করে ব্রেবোর্ন কলকাতায় ফিরে এসে অস্থায়ী গভর্নর রেইডকে দায়িত্ব মুক্ত করেন। কিন্তু তারপর অসুস্থ হয়ে পড়েন ও রেইড আবার অস্থায়ী হন। ব্রেবোর্ণ ৩৮-এর জুনে মারা গেলে অপ্রস্তুত ভাইসরয় সাততাড়াতাড়ি উডহেড বলে একজনকে দার্জিলিঙে গভর্নর করে পাঠিয়ে দেন। কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারও তাকে দেয়ার সময় পাওয়া যায়নি। ৬ জুন দার্জিলিঙে পৌঁছুল, বোধহয় নিজেই গভর্নর্স প্লেসে গিয়ে নতুন লাটশাহেব বলে পরিচয় দিতে হয়েছে। নইলে তার শপথ গ্রহণ ১২ জুন পর্যন্ত পেছিয়ে যাবে কেন। শপথ নেয়ার এক সপ্তাহ পরে বেচারা নতুন লাট ভাইসরয়কে লিখছে, 'চাকরিতে কোন জাতের জন্য কত শতাংশ রাখা হবে, তা নিয়ে মন্ত্রিসভায় পুরো দমে আলোচনা হয়েছে, ভালই হয়েছে, সব জানতে-বুঝতে পারলাম। কিন্তু সত্যি বলতে প্রথমে আমার একটু মনখারাপ হয়ে গিয়েছিল—আমাকে তো ক্যাবিনেট মিটিঙে থাকতে হচ্ছে ইনফর্ম্যালি আর প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র দেখে মত দিতে হচ্ছে তৎক্ষনাৎ।' এমন করুণ চিঠিতেও সেই ডগরেস। আর মাত্র মাস চোদ্দ কাটতে-না-কাটতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবে অথচ তখনো গোপন খবর ডগরেস। এমন কি ৩৯ সালের ৬ আগস্ট গোপন চিঠিতে ডগরেস, যুদ্ধ শুরু হতে তখন ২৫ দিন মাত্র বাকি। সাম্রাজ্যের যুদ্ধ প্রস্তুতি এতটা আত্মসন্তুষ্ট? এতটা অপ্রস্তুত? ব্রিটিশরা সত্যি বিশ্বাস করেনি যে সারা পৃথিবী জুড়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবে, কয়েক মাসের মধ্যে—সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী থেকে গভর্নরদের গোপন রিপোর্টের পৌনঃপুণিক বিষয় ডগরেস, ডগরেস কি আবগারি শুল্কের আওতায় পড়ে, লোকটা গবমেন্টকে মামলা দেখাচ্ছে আর মন্ত্রিসভা প্রধানমন্ত্রীকে ফাঁসানো থেকে বাঁচাচ্ছে। অথচ মন্ত্রিসভার মধ্যে তো তাঁর চরম বিরোধীও আছেন। তারাও যে হকশাহেবকে ফাঁসাতে চান না তার এক ও একমাত্র কারণ হকশাহেব আছেন বলেই মন্ত্রীরা আছেন।

মহাজনি বন্ধ ও টেন্যান্সি নিয়ে যোগেনের উলটো ভাবনা

অ্যাসেম্বলি হাউসের বাগান দেখে যোগেনের মনে আসে ফাল্গুনের শেষ। এত সুন্দর বাগান যে বাগানের দিকে তাকিয়ে থাকলেই চোখ আর মন জুড়িয়ে যায়। সামনে ইডেনের সবুজ

৮৩

কত রকম ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যালের মাথায় ঘুরন্ত পরী। তার প্রায় পাশে প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালের লালবাড়ির আভাস। রেসকোর্সটাকে ঠিক বের করা যায় না। যেন মনে হয়, ময়দানটাই ওখানে একটু গড়িয়ে নেমে গেছে। ময়দানে গাছ একেবারেই নেই প্রায়, কিন্তু বহু-বহু ব্যবধানে সব গাছই যেন একটা আয়তন পেয়েছে। এই-যে অ্যাসেম্বলি হাউস থেকে যোগেন তাকিয়ে আছে—তাতে মনে হয়, এই বাগানটাও ঐ ময়দানের নকশাতেই করা। তা তো নয়—এতটা একসঙ্গে দেখা যায় বলেই সবটাকে একটা নকশা মনে হয়। নকশাটা কেউ বানিয়ে রাখেনি। যোগেনই বানিয়েছে।

যোগেন প্রকৃতি প্রেমিক নয়। প্রেমিক হওয়ার জন্য প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্নতা দরকার। যোগেনদের তো জীবনই প্রকৃতির ওতপ্রোত। মৈস্তারকান্দির কোনো ছেলে বা মেয়ে বা বৌ কি সাঁতার শিখে জলে নামে, নাকী হাঁসের মত বা গাঙশালিকের মত জলে যে-চলন লাগে,

সেই চলনই তার শরীর থেকে বেরয়। বরিশালের খাল তো আকাশের মত, যত বাড়াতে চাও, ততই বাড়বে, পাড়ও নেই, সীমাও নেই। সেই আকাশের জীব হয়ে কি আকাশটাকে আলাদা করে দেখা যায়? বিস্তার জুড়ে বিপুল জলস্রোতের বয়ে যাওয়ার দিকে যোগেন আবার কবে তাকিয়ে দেখে। নদী যেমন হয়, নদীতো তেমনি হবে। না-হলে বরং খেয়াল হয়—'আইজ কড়া জোয়ার খেলছে? নদীরে যেন্ গুমসান্ দেহি।' নদীর পাড়ে পৌঁছে এ-কথা যে বোঝে, সে কি নদী থেকে কখনো এতটা সরে যেতে পারে যে নদী যেন দৃশ্যই মাত্র, যা সব সময়ই ভাল।

যে নির্লেপ ছাড়া প্রকৃতিকে আলাদা দেখা সম্ভব নয়, সেটা হয়ত টানা কলকাতা-বাসের ফলে একটু একটু করে যোগেনের ভিতর ঢুকে গিয়ে, জমা হয়ে, তার স্বভাবের একটা ভঙ্গি হয়ে উঠতে চাইছে। গত বছরে তার জন্মদিনের পর কলকাতায় এসেছিল, ছ-মাস পরে জুলাইয়ে গিয়েছিল বরিশাল তারপর গোপালগঞ্জে পদ্মবিলার মেলা সেরে ফিরে এল কলকাতায়। সেপ্টেম্বরে গেল সিলেটে। সেখান থেকে বরিশালে গিয়ে পুত্রমুখ দেখে কলকাতা ফিরল। তারপর নতুন বছরেরও তিন মাস কাটল—ছ-মাসের মধ্যে যোগেন আর বরিশালে যায়নি। আগৈলঝরা স্কুলের অনুমোদন নিয়ে গোলমাল তো নলিনী সরকার আর শ্যামাপ্রসাদ মিটিয়ে দিলেন। ইনস্পেকশন ছাড়াই ডিপিআই জ্যাসকিনশাহেব অনুমোদন পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তাতে স্কুলের ঝামেলা মেটেনি। যে-জমির ওপর স্কুল, সেটা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের জমি—নামমাত্র খাজনায় স্কুলকে লিজ দেয়া হয়েছিল। সেই লিজও শেষ হয়ে গেল। বারবার বলা সত্ত্বেও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সেক্রেটারি লিজ রিনিউ তো করছিলেনই না, তার ওপর বোর্ড মিটিঙের এজেন্ডাতেও বিষয়টি রাখছিলেন না। যে-কারণে ইনস্পেক্টর রিপোর্ট পাঠাননি, সেই কারণেই ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সেক্রেটারিও জমির লিজ-রিনিউয়ের সময় পার করে দিচ্ছিলেন। গৌরনদী থানায় নমশূদ্ররাই সংখ্যাগুরু। সুতরাং মুসলমান অফিসাররা সব কাজে যতটা পারেন, বাধা দিচ্ছিলেন। যোগেন ইচ্ছে করেই ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী স্যার বিজয়ের সঙ্গে দেখা করল না। ঠিক করেছিল, পরের মিটিঙে যদি বোর্ডের এজেন্ডায় না-দেয়, তাহলে অ্যাসেম্বলিতে প্রশ্ন তুলবে। যোগেন্দ্রনাথ তখন এমএলএ হিশেবে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পদাধিকারি সদস্য। পরের মিটিঙের নোটিশ পেল মিটিঙের দুদিন আগে—শুক্রবার বেলা বারটায় মিটিঙ, নোটিশ পেল বিকেলের ডাকে বেলা তিনটে নাগাদ, বুধবারে। হঠাৎ ঠিক করে খুলনা মেল ধরে বৃহস্পতিবার বিকেলে বরিশালে সদর্ রোডে নেমেই ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট জন লিস্টার লিউলিন-এর সঙ্গে দেখা করলেন। যোগেন একে এমএলএ, তার ওপর স্কুলের সেক্রেটারি। কিন্তু শাহেবকে তিনি কোনো নালিশ করলেন না, তাতে তার সম্মান নষ্ট হত। যোগেন বলল—বোধহয় কেউ খেয়াল করেনি, লিজটা তো ল্যাপ্স করে যাবে যদি এ মিটিঙেও না-হয়। শাহেব ঠিকই সন্দেহ করল—এ-ধরণের রুটিন-ব্যাপার তো কারো খেয়ালের ওপর নির্ভর করে না, স্কুল থেকে নিশ্চয়ই ঠিক সময়ে চিঠি দেয়া হয়েছিল। শাহেব জানতেও চাইল—কোনো স্থানীয় রেশারেশি নেই তো? যোগেন সংক্ষিপ্ত 'না' বলল, যাতে শাহেব বুঝল, আছে। আপনি কাল বোর্ড মিটিঙে থাকছেন তো—শাহেবের প্রশ্নের জবাবে যোগেন জানায়—কাল নোটিশ পেয়ে দেখে সোজা খুলনা মেল ধরেছে, কাউকে কিছু বলেও আসতে পারেনি। শাহেব বলল—তবু আমি আপনাকে অনুরোধ করব—এসেইছেন যখন কাল মিটিঙটাতে থাকুন, স্কুলের লিজের জন্য নয়, ওটা তো রুটিন—অনুযায়ীই হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু আপনারা মিটিঙে থাকলে লোক্যাল সেলফ গবর্মেন্টটার কাজ অনেক দুরস্ত হয়।

ফেব্রুয়ারির ঐ এক রাতে প্রহ্লাদদার ওখানে থেকে, মিটিং সেরে, সন্ধ্যার লঞ্চ ধরল।

হিশেব করলে তাহলে সত্যি দাঁড়ায়—একবছরে দু-বার গেছে, দ্বিতীয়টাকে যদি যাওয়া ধরা

হয়। ছ-মাসে একবার। কিন্তু বরিশাল থেকে তো অনবরত লোকজন নানা কাজকম্ম নিয়ে কলকাতা আসছেই। মামলামোকদ্দমায় তো আসতেই হয়। যোগেনেরও স্বার্থ আছে—তাতে। তবে সিভিল কেস ছাড়া যোগেন নিচ্ছে না। ফৌজদারি মামলায় মক্কেলকে রিলিফ দেয়ার হাঙ্গামা অনেক। লোকজন ক্রমেই বেশি আসছে দুটো কারণে। নানারকম খবর রটে। তপশিলি হলেই নাকী পুলিশে চাকরি হচ্ছে। ঋণ-সালিশি বোর্ডের তদবির-তদারকিতে মহাজনি-চাষীরা আসছে বেশি করে, হিন্দুও মুসলমানও। এরা সুদে টাকা খাটায়। চাষী হিশেবে মাঝারি আয়ের—নিজের জমিও আছে, বর্গাতেও জমি নেয়া আছে। যদিও পাটের দর পড়ে গেছে, সেই পাটের টাকা থেকেই এদের হাতে নগদ এসেছে। ভদ্দরলোকরা হাতে বাড়তি টাকা এলে হয় সোনা কেনে, না-হয় জমিদারি কেনে। কথায় বলে—জমি আর সোনা/দর কখনো পড়ে না। আর, চাষীর হাতে বাড়তি টাকা জমলেই সে মহাজানি শুরু করে। তেমন চাষী-মহাজনরা কলকাতায় তদবির করতে এসে যোগেনের সঙ্গে দেখা করে বলে—আর কত ক্ষতির ব্যবস্থা দিবে তোমার এই সরকার। সালিশি কইর‍্যা ঋণ মকুব আর গেরস্তঘর থিক্যা জমি-কাটা—তাইলে আমাগো কী হইব? শুধু তো জমিদার আর বর্গাদারেরই জমি থাকে না। যে-মানুষগুল্যা জমিদারের মতন আবওয়াব পায় না, উলট্যা আবওয়াব দেয়া লাগে জমিদারগ, আবার যে মানুষগল্যা বর্গায় জমি নিব্যারও পারে না, নিজের যেটুকু জমিজমা সেইডা নাড়াচাড়া কইর‍্যা জীবন কাটায়—সেই গেরস্ত মানুষগুল্যার কী হবে। তোমার তো সবই জানা—সংসার তো আর কমে না, খাওয়ার মুখ বাড়ে। ছাওয়ালগ বিয়্যা হয়, নাতিনাতনি হয়, মাইয়্যারা কী বোনরা বেধবা হইয়্যা ফির‍্যা আসে, আর তোমারা আইন কইর‍্যা ঋণমকুব জমিমকুব করো।

এদের মধ্যে হিন্দুও আছে, মুসলমানও আছে—সংখ্যায় হিন্দুই বেশি, যোগেন, তার গ্রাম, থানা, জিলার অভিজ্ঞতাতে এটা কিছুটা জানে ও কিছুটা অনুমনে করে যে—এই গৃহস্থরা সত্যি কথা বলে না। তাঁরা শুধুই তাঁদের নিজেদের এখনকার অসুবিধের কথাটুকুই বলছে—কিছু পুরনো আইনে, কিছু নতুন আইনে ও কিছু আইনের গুজবে। তাদের কথা শুনে প্রথমে মনে হতে পারে যে তারা তো লেখাপড়া জানে না, তাই হয়ত দশ হাটে দশ রকম কথা শুনে কলকাতায় চলে এসেছে খবরটা কী জানতে, তাদের কী করতে হবে ঠিক করতে। যোগেন এদের কথা-অনুযায়ী সব দলিলদস্তাবেজ দেখে বোঝে—এদের কোনো আইনেই কোনো বিপদ নেই। গৃহস্থির যে জমিটুকুর ওপর ওদের সারা বছরের খাওয়াদাওয়ার নির্ভর তাতে তো কেউ হাত দিচ্ছে না। বর্গাদারের সঙ্গেও তাদের বিবাদ হওয়ার কথা নয়—কারণ এমন সব গৃহস্তিজমি যেমন পুরষানুক্রমিক, বর্গাদারও তেমনি পুরুষানুক্রমিক। পুরনো মালিকের জমি ছেড়ে দিতে যাবে কেন বর্গাদার? তবে, নতুন কোনো মালিকানার আভাস পেলেই প্রথম কোপটা পড়ে একা অধবা-বিধবা-অনাথ-নাবালকের ওপর। সেসব তো গ্রামের দশজনই মিটিয়ে দেয়। এই গৃহস্থ ভদ্রলোকদের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে যোগেন জেনে গেছে তাদের কারো কারো ছেলে স্কুলকলেজে পড়ছে।

ঠিক স্কুলকলেজ নয়। ম্যাট্রিক পর্যন্ত না। তবে একটুআধটু পড়াশুনো ঢুকছে—ক্লাশ এইট হলে জুনিয়ার মোক্তারি পরীক্ষায় বসা যায়। ঝোঁকটা সেদিকেই বেশি। ক্লাশ এইট বলে যে ক্লাশ এইটই হতে হবে, তা তো নয়। থানার হাইস্কুলের মাস্টারমশায়দের ধরলে মডেল স্কুলে ক্লাশ সিক্স পাশ করলেও ক্লাশ এইট পাশের সার্টিফিকেট জোগাড় করা যায়। ক্লাশ সিক্স পর্যন্ত পাশটা করতেই হবে, না-হলে হাই স্কুলের পুরো এক্তিয়ারে আসবে না।

সে কলকাতায় আছে, নানা আইন নিয়ে নানা তর্কবিতর্ক চলছে। তার সঙ্গে সত্যি কে কী

চাইছে তার কোনো সম্পর্ক নেই। কে কী চায় তার সঙ্গে সম্পর্ক কাদের ভোট পেয়ে তারা জিতেছে। মুখে যতই লম্বাচওড়া বক্তৃতা দিক—কংগ্রেসের কেউ কি সত্যি করে চাইতে পারে যে জমিদারিব্যবস্থা বাতিল হোক। হলে—কংগ্রেসকে ভোট দেবে কে? গত ভোটের হিশেবে তো ধরা পড়ে গেছে কংগ্রেসের ভোটার মানে হিন্দু জমিদারির সঙ্গে মাকড়সার জালের মত জড়ানো সব লোকজন। এককথায় তাদের 'বাবু' বললেও সবটা বলা হয় না। কোনো সাহা-কে তো আর কেউ 'বাবু' বলবে না। কিন্তু ব্যাবসাবাণিজ্যে সাহারা হিন্দু বলেই জমিদারবাবুর সঙ্গে তাদের একটা সম্পর্ক থাকে। তাদের লোকজন ডাকে কখনো 'মহাজন' কখনো 'সাহাবাবু' বলে।

কলকাতায় না-থাকলে যোগেন কি এটা এত স্পষ্ট দেখতে পেত যে গ্রামের মানুষজনের মধ্যে যাদের মাঝামাঝি বলে আলাদা করা যায়, বিশেষ করে তাদের নানারকম গোপন আয় আছে। বাড়ির খেজুর গাছের রসের জন্য জমা দেয়া—এর ভিতর তো আর গোপনীয় কিছু নেই। সকলেই জানে, সকলেই দেখে। কিন্তু গোপনতা এই কারণে দরকার যে নিজের খেজুর গাছগুলিকে মার্কা দিতে-দিতে প্রতিবেশীর কোনো খেজুর গাছেও মার্কা দিয়ে দেয়া হয়। তেমন সুযোগের প্রধান কারণ বাড়ির পুরুষকে বাইরে থাকতে হয়, মাসে বড়জোর একবার আসে। বাড়িতে গরুগুলোকে নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা গিন্নিমা ব্যস্ত। তার পক্ষে জানাই সম্ভব নয় তাদের খেজুর গাছের রস চুরি হয়ে যাচ্ছে। বা, ভাগের দিঘিতে জাল দিতে ছেলেদের ডাক দেয়া। জলের ওপর তো আর শরিকি চিহ্ন থাকে না—তাহলে নিজের জালফেলার বরাদ্দটাকে পনের দিন আগে ধরতে দোষ কী? বরিশালে সুপুরি চালান হয় নৌকা-নৌকা। গাছুয়া গাছে উঠে তিন কোপে গাছ শেষ করে নেমে আসে। কোনো বাড়িতে সুপুরিগাছ তো আর-একটা থাকে না—লাইন বেঁধে থাকে। এক গাছে উঠে, কেটে, আর-এক গাছে ওঠার সময় গাছু-র কি লাইন ভুল হয়ে যেতে পারে না?

এমন গোপন আয়ই যাদের প্রধান বিনিয়োগ তাদের অনেকেরই সবচেয়ে বড় আয় সুদে টাকা খাটানো। এমন কী গেরস্ত বাড়ির পুরনো বৌঠাকরুনরাও এ-ব্যবসা করেন। বন্ধকি ঘরে বসে টাকা। শুধু সোনা বন্ধক। বাজারে যা দাম হতে পারে, তার সিকিভাগও দেয় না। সিকিতে ষোল আনা লাভ তিন মাসে। মাসে লাভ দাঁড়ায় মুলের ছয় আনি।

বরিশালের বাইরে, কলকাতায় আছে বলেই ও প্রতিদিনই বরিশালের লোকজন এসে তাকে জানিয়ে যায় বলে—যোগেন এই বাস্তবটাকে বুঝতে পারে বন্ধকি লাইসেন্স আইন পাশ হবে এই গুজবে ঐ মাঝামাঝি গেরস্তদের কেন ভয়? যোগেন বুঝতে পারে জমিদার-চুকানিদার-দর চুকানিদার-বর্গাদার এইসব স্তরভাগে গ্রামের কৃষি অর্থনীতির গোপন অথচ কার্যকর সব অনাধিকারী আয়ের নিশানা মেলে না।

তাহলে বরিশাল থেকে দূরে থাকায় যোগেনের জ্ঞানবুদ্ধি সূক্ষ্ম হয়েছে। তেমনি কি তার একটা প্রকৃতিবোধও তৈরি হয়েছে? সেই প্রকৃতিবোধে, এই সাজানো প্রকৃতির নানারকম সবুজ, গাছগুলোর মধ্যে অনিয়মিত ব্যবধান, খুব দূরে ঐ সবুজ চিরে ট্রামগাড়ির নৌকোর মত হেলেদুলে আসা, কি তাকে এমন কোনো মনোভাবের দিকে, আলগা হলেও, ঠেলা দিতে পারে এখন না হয়, কোনো ভবিষ্যতে যে না-সাজালে প্রকৃতি সুন্দর হয় না? অথবা, এগুলোর, এই তাকিয়ে থাকা, এই ভাললাগা—এগুলোর এটুকু মূল্য ছাড়া কোনো মূল্য নেই।

সুভাষ ও শরৎ বোসের সঙ্গে যোগেনের দেখাশোনা

শরৎ বোস একদিন লবিতে যোগেনকে বললেন, 'মিস্টার মণ্ডল, সুভাষ আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল। আপনি যদি আসেন তো ভাল হয়।'

৮৪

'কী বলেন স্যার! সারা ভারতের রাষ্ট্রপতি আমার সঙ্গে কথা বলতে চান, এডা তো আমার সৌভাগ্য।'

'তাহলে সৌভাগ্য করুন তাড়াতাড়ি। কালই আসুন-না, সকালে, নটা-সাড়ে নটায়—'

'হ্যাঁ, স্যার, আমার কোনো অসুবিধা নাই।'

'একটাই ছাড়া যে আপনি আমার বাড়ি চেনেন না। আপনি তো আসেননি কোনোদিন। ৩৮/১ উডবার্ন পার্ক। ঐ এলগিন রোড থেকেই বেরিয়েছে। কয়েক পা।'

'আপনার বাড়ি চিনতে পারব না? সুভাষবাবু কি ওখানেই থাকবেন?'

'বলব, থাকতে, ঐ সকাল নটা-সাড়ে নটা। আপনাদের আপত্তি না থাকলে আমিও একটু বসতে পারি আপনাদের সঙ্গে—জাস্ট শুনতে—'

'আমাকে স্যার, এত লজ্জা দিচ্ছেন কেন?'

'বাঃ, একজন হচ্ছেন আমার পার্টির প্রেসিডেন্ট, যুক্ত প্রদেশের কংগ্রেসিরা, কেন জানি না, ডিকটেটার কথাটা বেশি পছন্দ করে, আর-একজন আমার কলিগ ইন দি অ্যাসেম্বলি। আপনাদের কথায় আমার তো কোনো জায়গা নেই, যদি আপনারা সেই জায়গা তৈরি করে না-দেন। আপনার সঙ্গে আমার কোনো কথা থাকলে তো এখানে আমার ঘরেই বসতে পারতাম।'

'তাইলে স্যার আমি আপনারে অনুমতি দেয়ার কে? আপনি আমারে একটা মিটিঙের খবর দিলেন, ঠিকানা দিলেন। এহন আপনি আমার কাছে চান পারমিশন, থাকার। সেডা আমি কে দেয়ার? মিটিং ডাকা একজনের। মিটিঙের জায়গা আর-একজনের। আর গোবধে খুড়া কর্তা হইল্যাম কী না আমি।'

শরৎ বোস একেবারে হো হো হেসে উঠলেন, 'এই রিপার্টি সত্যিই খুব জব্বর। মুখের মত জবাব! তাহলে কাল দেখা হবে, ঐ সকাল নটা-সাড়ে নটায়।'

পরদিন ২৮ ফেব্রুয়ারি যোগেন শরৎ বোসের বাড়িতে সকাল পৌনে নটায় হাজির। হাইকোর্টে যেমন চাপা পায়জামা আর গলাবন্ধ পরা বেয়ারারা থাকে জজশাহেবদের পেছন-পেছন, তেমনি একজন, পাগড়ি ছাড়া, দরজা খুলে দিল আর নাম বলতেই যোগেন কে ভিতরে আসতে বলল। একটা ফাঁকা, বেশ বড় হলঘর পেরিয়ে লোকটি যে-দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে পড়ল, যোগেন সেই চৌকাঠ পেরিয়ে দেখে একটা গোল টেবিলের দুটো চেয়ারে দুই ভাই—শরৎ বোস ও সুভাষ বোস বসে আছেন। সুভাষ বোসের পরনে ধুতি আর শাদা পাঞ্জাবি, শরৎ বোসের পরনে একটা লম্বা কোট মত, সেটাকে যোগেন 'ড্রেসিং গাউন' বলে জানত।

দুই ভাইই দাঁড়িয়ে যোগেনকে নমস্কার করে আর শরৎ বোস একাই বলে ওঠেন, 'আসুন, আসুন'। যোগেন নমস্কারের যুক্তকর না ভেঙে টেবিলের দিকে এগতে-এগতে বলে, 'আপনারা দয়া করে আমাকে বেশি পাংচুয়্যাল বলে প্রশংসা কইরবেন না। বাড়ি খোঁজার জন্য ১৫ মিনিট রাখছিল্যাম। ট্রাম থিক্যা এলগিন ডোডের মোড়ে নাইম্যা কয়েক পা হাঁটতে-না-হাঁটতেই দেহি বাড়িডাই আমারে খুঁইজ্যা নিল। একবার ভাইবল্যাম রাস্তায় হাঁইট্যা সময়ডা কাটাই। কিন্তু

কনফিডেন্স পাইল্যাম না, যদি আবার বাড়িডা হারাই।'

নিজের কথায় যোগেনই বেশি হাসল, শরৎ বোসও বেশ হো হো করলেন, সুভাষ সবসময়ই যেমন হেসে থাকেন, তেমনি ছিলেন।

'কিন্তু আমরা দেখুন, আপনি যে ওভার-পাংচুয়্যাল হতে পারেন সেটা বুঝে আগে থেকেই রেডি হয়ে বসে আছি, পাছে আবার লাটশাহেবের টেলিগ্রাম আসে।'

'সেটা আবার কী। লাটশাহেবের টেলিগ্রাম?' সুভাষ জিজ্ঞাসা করলে শরৎ বোস বলে ওঠেন, 'সেটা তুমি শোননি? কী করে শুনবে? হয় জেলখানায় থাকো, না-হয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হও,' সুভাষ এবার একটু আওয়াজ করে হাসেন, শরৎ বোস বলেই চলেন, 'না যাও হাইকোর্টের বার লাইব্রেরিতে, না যাও অ্যাসেম্বলিতে—গসিপ শুনবে আর কোথায়? যোগেনবাবুকে অনুরোধ করে গবমেন্ট সিলেটে পাঠায় ওখানে একটা কাস্ট দাঙ্গা নুইস্যান্স চলছিল বছর-খানেক সেটা যদি থামানো যায়। উনি তো গেছেন। কনসিলিয়েশন মিটিঙে ঝামেলা সব মিটিয়েছেন বেশ চড়া মেজাজে, পুরকাইত? সিলেটের? ফোনে বলছে—সে গিয়েছিল যোগেনবাবুর আর্গুমেন্ট শুনতে। সে তো ফোনেই আমাকে বকতে লাগল—এই সব ব্রিলিয়্যান্ট লিগ্যাল মাইন্ডকে তোমরা ঐ ডার্টি পার্টি পলিটিকসে ঢুকিয়ে করাপ্ট করে দিচ্ছ! যা হোক, মিটমাট করে, দাঙ্গা থামিয়ে, যোগেনবাবু সবে বেরিয়েছেন, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, এসপি এরা সব গাড়ি করে এসে হাজির। কী? না, আমাদের গভর্নর অ্যানডারসন টেলিগ্রাম করেছেন ডিএমকে, তাঁর হয়ে মিস্টার মণ্ডলকে কাল রাতে একটি পুত্রসন্তান লাভের জন্য আমার পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাও ও তিনি যাতে তাঁর বাড়িতে গিয়ে নবজাতককে ও তার মাকে ইন দ্যা নিয়ারেস্ট টাইম দেখে আসতে পারেন, তার ব্যবস্থা করো। তুমি ডিএম বেচারার কথা ভাবো। হিজ এক্সেলেন্সির অর্ডারে সিলেট তো আর বরিশালের পাশে যেতে পারে না আবার হিজ অনারেবল মেম্বারকেও তো তিনি সিলটে আটকে রাখতে পারেন না।' সুভাষ এবার ঠোঁট খুলে, গলা খুলে হাসতেই থাকেন। শরৎ বোসও সে হাসি বাড়িয়ে দেন। দুই ভাইয়ের হাসি একটু থামতেই যোগেন বলে ওঠে, 'এটা স্যার কী হল। আপনি তাহলে পুরাডা বলেন।'

'আমি তো আপনার চাইতে সিনিয়ার উকিল! হোয়াই শুড আই টেল দি আদার পার্ট দ্যাটস নট এ পার্ট অব মাই কেস।'

সুভাষ যোগেনের দিকে তাকান।

যোগেন তখন হেসে বলে, 'ঘটনা হিশেবে স্যার সবই ঠিক বলেছেন। কিন্তু লাটশাহেব কী করে জানলেন? আমি তো বরিশালের উত্তরের থানা গৌরনদীরও উত্তরের লোক। আমাদের জাইতের লোক ওখানে বেশি। তাদের ভিতর ঢেড়া সইয়ের লোক নাই, সব টিপসই। বার্থি স্কুলের এক মাস্টারমশায় আশু চ্যাটার্জি এক শুদ্দুরের ছেলেকে ক্লাশ এইটে পাইয়্যা তারে পিট্যাইয়া ঘোড়া বানাইবেনই। আশুবাবু স্যার ছাড়া আমার কিছু হইত না। এমএলএ জেতার পর নিজের স্টুডেন্ট লাইফে কেনা এই পেন আর নিজের রিয়্যায় পাওয়া এই ঘড়ি আমাকে পরয়্যা দিলেন। আমার স্ত্রী ছিলেন তাঁর বাবার কাছে। সন্তান হওয়ার পর আমার শ্বশুরমশায় আশুবাবু স্যারের কাছে ছুট্যা য্যান—এই খবরটা আমাকে জানানো যায় কী ভাবে। আশুবাবু শুইন্যাই বললেন—টেলিগ্রাম করো। মুশকিল হইল—আমাদের দ্যাশে কোনো কারণ পোস্টকার্ড আইসলে যে-পিয়ন নৌকা কইর‍্যা বিলি কইরব্যার আসে, তাকে বলে, তুমি কী কইর‍্যা জাইনল্যা এডা আমার চিঠি। সে কয়—ঠিকানা থিক্যা। তখন তাকে বলা হয়—তাইলে তো তুমি পড়ব্যার পারো, চিঠিটা পইড়্যা দ্যাও।

যোগেন জানে এখানে একটা হাসি ওঠে। সেই বিরতিটুকু দিয়ে সে বলে, 'পিয়নও তো বরিশালের পিয়ন। সে কম যায় কীসে। সে জবাবে কয়, 'আমি তো গবর্মেন্টের লোক। আমাগ ইংরাজিতে সব কাজ হয়। ঠিকানাডা ইংরাজিতে লেখা তাই পড়ছি। চিঠিডা বাংলায় লেখা তাই পড়তে পারি না।' সেই দেশে আশুবাবু কন টেলিগ্রাম কইরতে। আমার শ্বশুরমশায় চোদ্দ পুরুষে কোনোদিন টেলিগ্রাম দেখেন নাই। কিন্তু সম্পন্ন মানুষ তো, হাটেবন্দরে লোকে চেনেজানে। এটুক্ বোধহয় শুইন্যা থাইকবেন যে মরার খবর টেলিগ্রামে আসে। স্যায় আর কথা না বাড়াইয়্যা, নিজের নৌকায় আশুবাবু স্যারকে বরিশাল সদরে রওনা কইর‍্যা দিলেন, বরিশাল ছাড়া টেলিগ্রাম হয় না। কাপড়ের খুঁটে যে-কয়ডা টাকা ছিল আশুবাবুকে দিয়্যা, আর-এক নৌকা ধইর‍্যা বাড়ি ফিরলেন—কান্দার জইন্য। বাড়ির লোক যত জিজ্ঞাসা করে উনি কান্দেন আর কন—খবর শুইন্যা আশুবাবু সদরে গেলেন টেলিগ্রাম কইরতে। তহন বাড়ির সবাইও কান্দায় যোগ দ্যান। এদিকে নৌকায় একবেলার পথ পারায়্যা আশুবাবু টেলিগ্রাম অফিসে গিয়্যা যাতে সেটা গোলমাল না হয় সেই কারণে 'হিজ এক্সেলেন্সি জন অ্যানডারসন, গভর্নর অব বেঙ্গল' বলে তাঁকে অনুরোধ করেন এই সংবাদ তোমার লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির মেম্বার অমুককে জানাইও যে তাহার একটি ছেলে হইয়াছে।'

এই গল্পটার পর খুব হাসি উঠল না। একটু চুপ থাকার পর সুভাষ বললেন, 'আপনার স্যারকে আমার কিন্তু খুব ভাল লাগল।

'ঐডাই তো স্যারকে নিয়া মুশকিল। স্যারকে ভাল না লাগাবার কোনো উপায় তিনি খোলা রাখেন না। টেলিগ্রামটা তো লাটশাহেবকে না কইর‍্যা আর-কাউকে করলে আমার এই লজ্জাটা হত না—'

'সেটা তো আমার কাছে কোনো বিষয় নয়। উনি মনে করেছেন এটা টেলিগ্রাম করে জানানো উচিত। এই ভাবনায় তো কোনো ভুল নেই। সেই টেলিগ্রাম করার যে-হাঙ্গামা, নৌকো করে বরিশালে আসা, সেটাও তিনিই পুইয়েছেন। আর, তিনি যে রাজনৈতিক অধিকারবোধ দেখিয়েছেন, তাতে তো অবাক হয়ে যাচ্ছি। কোন দূর গ্রামের স্কুলের এক মাস্টারমশায়। তিনি তো এটা তাঁর অধিকারের মধ্যে ভাবছেন যে আমার প্রতিনিধি, ভোটে জেতা প্রতিনিধি, তাই এই খবরটা তাকে পৌঁছে দাও। খুব আদর্শ একজন মানুষের কথা শোনালেন। আমাদের দেশের যিনি মহত্তম নেতা তিনি তো এটাই আমাদের দিয়েছেন, এই অধিকারবোধ। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে—ভাইসরয় আরুইন মহাত্মাজির সঙ্গে কথা বলতে রাজি হওয়ায় চার্চিল কী বলেছিলেন—ভাবতে আমার...

সুভাষকে থামিয়ে শরৎ বোস বলেন, 'ওটা চার্চিলের নিজের ভাষায় বলো সুভাষ, বাংলায় ঐ অহংকার কি আসে?'

'সে তো উনি পড়েছেন, মেজদা।'

'না। আমি এটা জানি না।'

শরৎ বোস একটু নাটুকে ঢঙে বলে ওঠেন

যোগেন বলে, একটু হেসে, 'এ তো আমাদের দেশের বামুন জমিদারদের মত গর্জন। একটা গল্প আছে এ নিয়ে—বেশ মানানসই। এক জমিদার কী জোতদার কী চুকানিদার—না, এটা বোধহয় ঠিক বলা হইল না।' যোগেন বলতে-বলতে আবার নিজের শব্দ আর সমাজের ভিতরের সম্পর্কের টানে, সংশোধনও করছিল। 'বামুন হলে জমিদার বলতেই হবে, বামুনের থিক্যা নিচু উঁচা-হিন্দু—মানে বৈদ্য-কায়স্থ হইলে জোতদার-চুকানিদার হইতেও পারে। যাক গিয়্যা—গল্পটা

তো বাউল জমিদারের আপগণ্ড বড় ছেলেকে নিয়া। সে নিজের বৌ থাকতে—যা করে আর কী? আমাদের সমাজেরই এক মেয়ের সঙ্গে। ঐ আর কী। কিন্তু সবটাই তো গ্রামের মধ্যে। এটা তো উচ্চবর্ণের অধিকার—পৈতের মতনই—নমশূদ্র কোনো মেয়েকে চোখে লাগলে...। জমিদার বা শাহেবদের অত্যাচার বলতে যেমন মেয়েলুটের কথা বলা হয়, আমি যে-সম্পর্কের কথা বলছি, মেয়েলুটের মত নয় সেটা। এটা একটা সম্পর্কই। দুজনই সে-সম্পর্কে জড়ায়। মেয়েটির সম্মতিও থাকে। সেই সম্মতির পিছনে যে জোরই থাকে সব সময়, তাও না। মেয়েটার সম্মানও যেন বাড়ে একটু নিজের কাছে। কিন্তু শেষ বিচারে তো জোরটাই প্রধান। আমাদের সমাজের কোনো মেয়ের দিক থেকে কি কোনো বামুন বা বৈদ্য ভদ্দরলোককে পছন্দ করা সম্ভব? তবু এই সম্পর্কগুলোর মধ্যে দুই পক্ষেরই সম্পতির ঘটনা একটা ঘটে—কোনো একটা স্তরে। ফলে, এই মেয়েটি হয়ত বাবুর বাড়ির কাজই করে, এই সম্পর্ক হওয়ার পর কখনো বা সেই কাজের ধরণ বদলায়। ধরণ আর বদলাতে কী? বাবুর বাড়ির বড় গিন্নিকেও যে-কাজ করতে হয়, কাজের মেয়েদেরও সেই খাটনি খাটতে হয়। যাকে নিয়ে গল্প তার বেলা উলটো। ঐ বাবুর বড়ছেলেবাবু নিজেই ঐ মেয়েটির বাড়িতে বসবাস শুরু করলেন। গ্রামে তো আর কিছু কারো চোখের আড়ালে হয় না। সবাই দেখতেই পেত ধবধবে লম্বা পৈতায়, খালি গায়ে, খালি পায়ে, একটা আধাকাচা ধুতি কাছা দিয়ে পরা, ঐ বাড়ির বেড়া, পাটকাঠির বেড়া নতুন করে লাগাচ্ছে। কয়েকটা বাড়ি পরেই তার বাপের বিশাল জমিদারবাড়ি—সম্পত্তি, স্ত্রী, বংশগৌরব সহ। কিন্তু সে সেই শুদ্দুরনির ঘরের পাটকাঠির বেড়া সারাচ্ছে নিজের হাতে। আপনাদের হিন্দু শাস্ত্র-পুরাণে এসব সম্পর্ককে গয়নাগাটি পরিয়ে ঝলমলে করা হয়। রাধা-কৃষ্ণ, বিল্বমঙ্গল, নলদময়ন্তী। কিন্তু আমাদের গ্রামে অত গয়না পাওয়া যায় না তো। তাই যাতায়াতের পথে হয়ত ঐ ছেলেবাবুর বাবাও যাকে দাদা ডাকেন তেমন এক ঠাকুর মশায় দাঁড়িয়ে দেখলেন। তাঁর টাকে ভেজা গামছা ভাঁজকরা আর মাথার ওপরের ছাতাটার কাল রং ধুয়ে গেছে, রোদ্দুরেই বেশি। তিনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখে ডাকলেন, 'অ ঘুতু, ঘুতু'। ছেলেবাবু ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালে বললেন, 'তুমি কি তোমার বিরজারে এক্কেরে অসূর্যমপশ্যা বানাও? ছেলেবাবু এ-কথার অর্থই বুঝলেন না। তিনি বেশ হাসিমুখেই বললেন, 'না-না, আপনার কোনোরকম অসুবিদা নাই। যহন ইচ্ছা, আঙুল দিয়্যা পাটকাঠিগুল্যারে আলুইয়া নিবেন।' ছেলেবাবু বোকা না চালাক, তা নিয়ে কোনো মতৈক্য নেই আবার কেউ হয়ত বললেন '—ও ঘুতু, তোমার বেড়ার দড়ি ঘুরায় কেডা?' ঘাড় না ঘুরিয়েই ছেলেবাবু সুর ধরেন—

'ওমা, তুই নিজে হাতে ঘুরিয়ে দড়ি
আমার কপালে মারলি বাড়ি—'

শরৎ বোস বলে ওঠেন, 'আরে, আপনি গান জানেন?'

সুভাষ মৃদু হাসেন, শুধু ঠোঁটে।

'এখন গ্রামে কেউ যদি পাগল, অপয়া রটে যায়, তাহলে সকলেই তাকে পাগল বা অপয়া বলে খেপায়। তেমনি ঐ ছেলেবাবুকে নিয়েও একটা ঠাট্টা চালু ছিল। বয়স্ক মহলে গোপনে। ছেলেছোকরা মহল তো আর গোপনতা মানত না। এরকম লোক তো ভদ্রলোকদের মধ্যে ছিলই। আছেনও। আমাদের এই ছেলেবাবু সেই মেয়েটির বাড়ি থিক্যা বার হলেই সব বাচ্চাকাচ্চারা পেছন-পেছন তাকে খেপাতে-খেপাতে যেত। যে-ছড়া বলে খেপাত সেটা এতই খারাপ কথা যে আমি আপনাদের সম্মুখে মুখে আনতে পারব না। আর, ছেলেবাবু হঠাৎ রেগে উঠে চোখমুখ লাল করে সেই ছাওয়াল-পাওয়ালকে মারতে যেত, চিৎকার করতে-করতে—সেটাও ঠিক বলার

মত না, যা হোক এই চিৎকারটা করানোই ছিল ছাওয়ালপাওয়ালের খেলা। ছেলেবাবু পৈতাডা বুড়া আঙুলে আঁকশি বাঁধাইয়্যা টানটান কইর‍্যা চিৎকার করত বা তাড়াও করত বা রাস্তা থিক্যা ঢিল তুইল্যা ছুঁড়ত। আর কাউকে যেন হুকুম দিত—

'মার চাঁড়ালগো জুতার বাড়ি। টাকা যত লাগে আমি দিব।'

এই হুকুমটা ছেলেবাবুর মুখ থিকে বাইর হইলেই ছাওয়ালপাওয়ালরা হাততালি দিয়্যা চেঁচাত

জুতা মারবেন কুথা—

বামুনের পায়ে নাই জুতা

এইসব কথা যে এইসব কথাই, তা ঘটনার সময় বোঝা যাইতো না। কিন্তু ছেলেবাবুকে খেপানো যখন আরম্ভ, তখন এই কথাগুল্যাই শোনা তো, তাই চিৎকার হলেই বোঝা যাইত কী বলা হচ্ছে।

গান্ধীজি ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন শুনে চার্চিলশাহেব তো সেই ছেলেবাবুর মতই চেঁচাচ্ছেন—'মার জুতার বাড়ি, টাকা যত লাগে আমি দিব।'

গল্প বলাটা শেষ করতে-করতেই যোগেন বোঝে গল্পটা এঁদের ভাল লাগবে না, তাছাড়া এত গ্রাম্যতা ওদের পক্ষে সওয়াই তো মুশকিল। যখন বুঝেছে যোগেন, তখন গল্পটা থামিয়ে দেয়া যায় না। দ্বিধার ফলে শেষটা আরো অর্থহীন হয়ে গেল। তারও পারে, খড়কুটো ধরে বাঁচার মত করে চার্চিলের কথাটায় ফিরে আসায় যোগেন ভরাডুবি থেকে আর নিজেকে বাঁচাতে পারে না।

শরৎ বোস হয়ত আঁচ করতে পেরেছিলেন, যোগেন অপ্রস্তুত বোধ করছে। অ্যাসেমব্লিতে তো তিনি দেখছেন যোগেনকে—ভেরি কুইকউইট। শরৎ বোস বললেন, 'কিন্তু আপনার সেই বামুনবাবুর সঙ্গে চার্চিলের একটা তো বড় অমিল থেকে গেল—' যোগেন আর কী জিগগেস করেনি—'চার্চিলের তো পৈতে নেই, তাহলে ব্রহ্মশাপটা তো হচ্ছে না। সেটা তো গল্পটার মেজর পয়েন্ট—'

'কেন? শাহেবরা কি কার্স করে না?' সুভাষ বলে ওঠেন?

'আরে, তা করবে না কেন, কিন্তু বামুন পৈতে ছিঁড়ে ব্রহ্মশাপ দিচ্ছে চাঁড়াল বলে, তাদেরই একটি মেয়ের সঙ্গে অসামাজিক সম্বন্ধ ডিফাই করতে—এটার ভিতরে চার্চিলের সঙ্গে তুলনাটায় একটা ড্রামাটিক ইফেক্ট আছে না? সেই ইফেক্টটা আনতে না পারলে তো হবে না—, হকশাহেবের বাংলা বক্তৃতার এটাই তো ম্যাজিক, সুভাষ। ইংরেজি তো বলবেনই ভাল। কিন্তু ওঁর বাংলা বক্তৃতা 'ভাল' বলা যায় না, শুধু। বলা যায় পারফরমেন্স। এরকম সব গল্প অহবহ, লাগাচ্ছেন?

'তুমি কি এই গল্প বলা প্র্যাকটিস করছ, বক্তৃতায়?' সুভাষ প্রশ্ন করে। যোগেন বুঝে উঠতে পারে না, শরৎ বোস কি সান্ত্বনাটা একটু বেশি দিয়ে ফেলছেন না?

ঐ সেই হাইকোর্টের জজশাহেবদের বেয়ারাদের মত একজন বড় একটা ট্রে নিয়ে ঢোকে। সে ট্রেটা গোলটেবিলটার ওপর রেখে বেরিয়ে যাওয়ার পর মাঝবয়েসি এক মহিলা তাঁর গায়ের রঙে বৈধব্যের শাদা আলো ছড়িয়ে ঘরে ঢোকে। সুভাষ বললেনও মেজবৌদি। যোগেন উঠে তাঁকে নমস্কার করে।

উনি বললেন, বসুন, বসুন ভাবছিলাম কাজের বেলা তো হয়েছে, আপনাকে ভাত খাইয়ে দিলেই হয়। দেখি লুচি ভাজা হয়ে গেছে তখন।'

এতক্ষণে শরৎ বোস তাঁর দিকে মুখ না তুলেই বলেন, 'যোগেন মণ্ডল, বরিশালের, আমার কলিগ—হাইকোর্টেও, অ্যাসেমব্লিতেও—'

'তুমি তো বললে কাল রাতে। বসুন যোগেনবাবু, আমারই ভুলে আপনার ভাত-খাওয়া হল

না—'

'লুচির যা পরিমাণ, তাতে তো ভাতের অভাব কিছু দেখা যাচ্ছে না—'

'ও আবার কী কথা? লুচি খেয়ে কারো পেট ভরে নাকী? সুভাষ তুমি কি কিছু খাবে?'

'সুভাষ তার দিকে পুরো তাকিয়ে বললেন, 'চা দেবে তো? আমি ও-বাড়ি থেকে কিছু মুখে দিয়ে এসেছি। ভাল বিস্কুট থাকলে দুটো দিয়ো—'

'তুমি তো বেরবে কোর্টে?'

'হ্যাঁ, আমি উঠছি। একেবারে তৈরি হয়ে নেমে মিস্টার মণ্ডলকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যাব।'

উনি বেরতে-বেরতে ঘাড় ঘুরিয়ে জিগগেস করলেন 'সুভাষ, তুমি কি আলিগড়ি বিস্কুট খাচ্ছ এখন দুটো-একটা?'

'থাক বৌদি। বিস্কুটগুলো ভারী বেশি, মাখন বেশি, ডাক্তারবাবুর কাছে জেনে নিয়ো। লোভে পড়ে খাওয়া কি ঠিক?'

'আরে একটা ছোট বিস্কুট নো-বাটার, ড্রাই, পাউডারিস, দিয়ে গেছে, একটু সল্টি, ঐটা খাও, ভাল লাগবে,' শরৎ বোসের কথা শুনে সুভাষ বৌদির দিকে তাকিয়ে মাথা হেলায়। সুভাষের দিকে তাকিয়ে তখন যোগেনের মনে হয়—মানুষটা শীর্ণ, চোখও যেন ক্লান্ত, ভিতরের কোনো অসুখে বাঁধা।

শরৎ বোস বলেন, 'মিস্টার মণ্ডল, আপনি শুরু না করলে তো আমি উঠতে পারব না। আপনি খেতে-খেতে সুভাষের সঙ্গে কথা সেরে নিন। সুভাষ, তোমার বক্তব্য আর লুচির পরিমাণে কি কোনো ডিফারেনসিয়্যাল ক্যালকুলাস হবে?'

'সেটা কেন হবে। কথা শেষ না হলে লুচি ভরে দিলেই হবে। আর উনি কি আজই শেষ আসছেন নাকী? তুমি ধীরেসুস্থে তৈরি হয়ে এসো—'

শরৎ বোস 'ওয়েল' বলে বেরিয়ে যান। যোগেন একটা লুচি টুকরা করে ছোট টুকরোটা নারকেল ও কিসমিস দেয়া ছোলার ডালে ডুবিয়ে তোলে। এত স্বাদে তার চোখ নিবিড় হতে চায়, অভ্যাসে। যোগেন খেতে এত ভালবাসে ও এতই খেতে পারে যে খাওয়ার সময় সে অন্য কিছুতে মন দিতে পারে না। কিন্তু এখানে সুভাষ বাবুকে বসিয়ে রেখে তেমন অনন্যমনস্ক হওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়াও সে জানে, ঠেকেই জেনেছে, কলকাতায় তার খাওয়ার পরিমাণ ও তার জাতের মধ্যে কখনো-কখনো সমীকরণ করা হয়। শরৎ বোস সুভাষ বোসকে সে কী এমন চেনে যে তাদের এমন অভ্যাস আঁচ করতে পারবে? লোকাচারের জন্য যোগেন চেষ্টা করবে তার সমার্থ্য অনুযায়ী না-খেতে, দুটো-একটা ফেলতেও। কিন্তু এই লুচি, টুকরো করে খেলে সে সুখ পাবে না, মুখের ভিতরে কোথায় হারিয়ে যায়। সে এবার লুচিটা পুরোই ডালে ডুবিয়ে মুখে দেয়, চোখ বোঁজে না, সুভাষবাবুর দিকে তাকায়। সুভাষ বলেন, 'আপনার কথা তো ইলেকশনের সময়ই জানা, এখন মেজদার কাছে খুব শুনছি।'

যোগেন লুচিঠাসা মুখের ভিতরে জিভ দিয়ে একটা মাড়িকে ফাঁকা করে নিয়ে বলে, 'আপনে কী শুইনছেন না জাইন্যাই বলতে পারি—কথাগুলা সত্য না!'

'এর মধ্যে অসত্য ঢোকার ফাঁক কোথায়? আপনি শিডিউল হয়েও শিডিউল সিটে দাঁড়াননি। এটা তো সত্যি?'

লুচি মুখে ঠোঁটে হাসি যোগেন ঘাড় হেলায়।

'আপনি জেনারেল সিটে দাঁড়িয়েছেন, এটাও সত্যি?' যোগেন আবার ঘাড় হেলায়।

'আপনি শিডিউল কাস্ট হয়েও জেনারেল সিটে জিতেছেন?'

'যোগেন ঘাড় হেলায়।'

'তাহলে মিথ্যেটা কী?' যোগেনবাবু?

যোগেন ঢোঁক গিলে মুখের ভিতরটা ও গলাটা খালি করে বলল, 'আপনি তো এখন বলবেন, আর কেউ সারা ভারতে শিডিউল কাস্ট হয়ে জেনারেল সিটে জেতে নাই। আমি অদ্বিতীয়। ঐটা সত্যি না।'

যোগেন আবার একটা গোটা লুচি ডালে চুবিয়ে মুখে তোলার যে-ভঙ্গি করে, তাতে সুভাষের মনে হতে পারত, বোধহয় হয়েওছিল, যে যোগেন এখন এসব কথায় যেতে চায় না, কিন্তু সুভাষের তখন বলা হয়ে গেছে, 'এটা তো মতামতের ব্যাপার না, এটা তো কোনটা ফ্যাক্ট সেটা দেখে নেয়া।'

যোগেন এবার তাড়াতাড়ি গিলে ফেলে, কথাটা বলা যেন খুব জরুরি 'দেখেন সুভাষবাবু, আমাকে এই সম্মানটা দেয়া হয় ও আমি সেটা পছন্দও করি, আমার একটা স্ট্যাটাস বাড়ে। নমশূদ্র সমাজে এমন বড়-বড় নেতা আছেন যাঁদের নাম বললেই সবাই চেনে। কিন্তু আমাকে চিনবে কেন? আমার তো কোনো ফ্যামিলি স্ট্যাটাস নাই। সেখানে এই পরিচয়টা হেলপফুল। কী? না, ইনডিয়ার মধ্যে ফার্স্ট। কিন্ত আপনি তো রাষ্ট্রপতি, আমাদের দেশের সর্বোচ্চ নেতা। আপনার মত বড় নেতার সঙ্গে আমি আগে কখনো কথা বলি নাই।'

'অ্যাসেমব্লিতে তো রোজই দেখছেন।'

'থাকতে পারেন। তাঁদের সঙ্গে অ্যাসেম্বলির বাইরে তো কোথাও দেখাশোনা কথাবার্তা হয় না। শুধু অ্যাসেমব্লির ভিতরে। যাকে সমাজ, দেশ এসব কথা আসে, সেখানে অ্যাসেম্বলি একটা জায়গা হল?' এই কথার তোড়ে যোগেন আবার একটা লুচি ভিজিয়ে মুখে ঠেসে দেয়।

'আমাকে তাঁদের চাইতে আলাদা কী দেখলেন?'

সুভাষ যেন দ্বিধা কাটিয়ে কথাটা বলে ফেলেন। কথাটা তাই শোনায় যেন দোষ কবুলের মত। যোগেন হাত তুলে থামতে বলে, তারপর গিলে বলে, 'আমি তো আর-কাউকে এমন দেখি নাই সুভাষবাবু, পুলিশ অর্ডিন্যান্সে যাকে ধরে কাছাকাছি রাখতে সাহস পায় না। শিওনি, মান্দালয় এই সব দূর-দূর জায়গায় পাঁচ-সাত বছর আটকে রাখে, তারপর তার যক্ষ্মারোগের চিকিৎস্যার জন্য ছাড়তে বাধ্য হয়। নিজের শরীরের চিকিৎসার জন্য তাকে বিদেশে যেতে হয় নিজেরই খরচে। যখন সে ফেরে তখন বম্বে ডকে জাহাজ ভিড়বার আগেই তাকে আবার অ্যারেস্ট করে। যার নামে ১০ মে তে সারা ভারত সুভাষ-দিবস পালনের আহ্বান দেয়া হয়। ও তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁকে পরের বছরের জন্য কংগ্রেস রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে। আমার প্রসঙ্গে কোনো ভুল ধারণা বা খবর আপনার কাছে থাকা অনুচিত। এই সব তথ্যই তো আপনারা সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচির বিষয় করে তুলবেন। তাই বললাম—আমাকে শিডিউল কাস্টদের সারা ভারতের সবচেয়ে বড় নেতা ভাবলে ভয়ানক ভুল হবে,' যোগেন একেবারে এতটা বলে এবার লুচিটা তুলে আলুর দমের বাটিতে ডোবায়।

'মানে আপনি বলতে চাইছেন, আপনার এমন জেতার ভোটের মধ্যে অনেক অ্যান্টি-কংগ্রেস ভোট মিশে আছে। মানে ওখানকার স্থানীয় দল-উপদলের ভোট মিশে আছে। মনে ওখানকার স্থানীয় দল-উপদলের, কংগ্রেসেরই, ঝগড়াঝাঁটি আছে?'

'না-হলে এই রেজাল্ট হতে পারে?' যোগেন তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়। আর মাত্র দুটো লুচি পড়ে আছে। যোগেন ভেবেছিল, নতুন করে তো নেবেই না বরং দুটো লুচি ফেলে রাখবে। কিন্তু একটা আলু তো পড়ে আছে। সে একটা লুচি তুলে নেয়।

সুভাষ বলেন, 'অন্তত আমার নিজের প্রদেশের ভিতরে কংগ্রেসের নিজের মারামারি, কাটাকুটিটা তো বুঝতে হবে। নইলে অন্যান্য প্রদেশের ব্যাপার বুঝব কী করে? আমি জেলাগুলেতে ঘুরব একটু—'

'সেটা হয়ত ভাল হবে। আমি তো কংগ্রেসে নাই কিন্তু কংগ্রেস ভাবে, কংগ্রেসের বাইরে আবার কেউ থাকে নাকী? তারা ধরেই নেয় আমি কংগ্রেসি। ফলে—এই নেতার সঙ্গে ঐ নেতার ক্যাচাল, ফেউকানি—'

'ফেউকানি কী?'

'পিছনে লাগা। এই সবে আমাদের সব ভরসা উড়্যা গিছে। কংগ্রেস করতে হলি নেতা ধইরতে হব। তাছাড়াও, কংগ্রেস একটু কাস্ট হিন্দু প্রধান।'

'এই পুরো সময়টাই তো আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে আলিপুর, প্রেসিডেন্সি, সেন্ট্রাল প্রভিন্স, গুজরাট, মান্দালয় এইসব জেলে ঘুরিয়েছে। এর মধ্যে গোলটেবিল, কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ড, গান্ধীজির অনশন, পুণা প্যাক্ট, ১৯৩৫-এর শাসন-সংস্কার আইন তিন-না-চার বার পালটাল। আইনসভার প্রথম ভোট হল। আমি এই কোনো কিছুরই প্রতিক্রিয়া আন্দাজ করতেই পারিনি। এবার আমাকে সভাপতি না করলেই পারত। জানতে-জানতেই তো একবছর চলে যাবে। কাজ করব কখন?'

'কংগ্রেসকে জানাবোঝাটা একটু কঠিনই হয়্যা গেছে। বিশেষ কইর‍্যা এই প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাটভা হওয়ার পর আরো কঠিন।'

'যা হোক, শুরু তো করতে হবে, কোথাও। সেই কারণেই আপনার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম। ঠাকুর গুরুচাঁদের মৃত্যুর একবছর পূর্ণ হচ্ছে। সেই জন্য অ্যালবার্ট হলে একটা বড় সভা ডাকার আয়োজন করা হয়েছে ১৬ মার্চ—'

'কারা করছে? কংগ্রেস?'

'কংগ্রেস না। সবাইকেই বলছে। অ্যালবার্ট হলের লাইব্রেরিয়ান ভদ্রলোক আমার কাছে এসেছিলেন, বলতে, যেন আমি যাই। আরো সবার নাম করলেন। বোধহয়, এই কারণেই কোনো কমিটি-টমিটি হয়েছে। আমি যাব। আমার ইচ্ছে—আপনি এই ব্যাপারটায় জড়িয়ে থাকুন। আপনি মানে আপনাদের সবাই—'

যোগেন একটু চুপ থেকে বুঝতে চাইল, সুভাষবাবু 'সবাই' বলতে কাদের কথা বলছেন—১৩ নমশূদ্র এমএলএর কথা, নাকী ৩০+১ জন তপশিলি এমএলএর কথা? এটা ওঁকে জিগগেস করা যায় না। বুঝে নিতে হবে। কিন্তু গুরুচাঁদ ঠাকুরের সভা ঠিক করল, তার সঙ্গে কথা না বলে? কেমন অসম্ভব ঠেকল—মিটিংই তো, বড় হলে তো সবারই ভাল লাগবে। না, তপশিলিদের মধ্যে এখনো কংগ্রেসের মত দলাদলি শুরু হয়নি। যোগেন জিগগেস করে, ঠাকুর এসেছিল আপনার কাছে?'

'প্রথম ঠাকুর কে?'

'উনি তো গুরুচাঁদ ঠাকুরের নাতি। উনিই এখন প্রধান, আমাদের সমাজের প্রথম ব্যারিস্টার। এম-এল-এ হয়েছেন।'

'না তো। ঐ লাইব্রেরিয়ানই এসেছিলেন।'

যোগেন আশ্বস্ত হয়। তাহলে কারো মাথায় খেলেছে। এখনো মাথায় গামছা বাঁধা হয়নি। না, যোগেনকে বাদ দিয়ে কলকাতায় এত বড় একটা সভার কথা ভারার মত কেউ নমশূদ্রদের মধ্যে নেই।

যোগেন বলে, 'হ্যাঁ। আমি আজই যাচ্ছি। মানে, আপনি তো চাইছেন সবাই যাতে আসেন, নেতৃস্থানীয় যাঁরা, নইলে আপনি একা গেলে আপনার বিরোধীপক্ষ আবার রটাবে কংগ্রেসকে আজেবাজে ব্যাপারে জড়িয়ে ফেলা হচ্ছে।'

'এমন একটা অনুষ্ঠান তো সবাই মিলেই করা ভাল' একটা বেশ ভারী জুতো সিঁড়ি ভেঙে নামছে ও বাড়ছে। নিশ্চয়ই শরৎবাবুই নামছেন। তাদেরও তো কথা শেষ। যোগেন চেয়ার ছেড়ে উঠতে বসে থেকেই সোজা হল, জুতোর আওয়াজটা এই ঘরের দিকে আসছে, যোগেন বলে ফেলল, 'আমি যদি আর মিনিট পনের বসি আপনার কোনো অসুবিধে হবে?'

শরৎ বোস হাইকোর্ট যাওয়ার পোশাকে ঘরে ঢুকে বললেন, 'কী? আপনাদের কথাবার্তা হল?'

'না মেজদা। উনি আর-একটু বসবেন। তোমার জজ শাহেব আছেন তো। তুমি বরং চলেই যাও।'

শরৎ বোস সুপুরি বা মৌরি চিবুচ্ছিলেন। তিনি হাত তুলে 'ঠিক আছে' বলে বেরিয়ে গেলেন।

সুভাষ বোসের চাঁদসী চিকিৎসা করে যোগেন

৮৫

যোগেন একটু সময় দেয়, এই ঘরের হাওয়াটা যাতে একটু বদলায়। তারপর সে বলে, 'আপনি বোধহয় জানেন, আমাদের সমাজে, মানে নমশূদ্রদের মধ্যে একটা বিশিষ্ট চিকিৎসা পদ্ধতি আছে—সাধারণ ভাবে চাঁদসী চিকিৎসা বলে থাকে।'

'হ্যাঁ। আমি শুনেছি তো। যাতায়াতে সাইনবোর্ডও দেখেছি. কলকাতায়—'

'হ্যাঁ, অনেকেই এই চিকিৎসা করেন নানা জায়গায়। তাঁরা খ্যাতি-প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। বরিশালের যে-গ্রামে আমার বাড়ি তার নাম মৈস্তারকান্দি। এটা একেবারেই গণ্ডগ্রাম। কেউ নামও জানে না। তাই আমরা বলি চাঁদসী। চাঁদসী আমাদের বাড়ি বা গ্রাম থিকে খুবই নিকটে।'

'তাই? আচ্ছা—

'এটা বলার কারণ—চাঁদসী চিকিৎসায় যেহেতু উপকার হয়, তাই এটার বিকারও ঘটছে। চাঁদসী গ্রামে যাঁদের বাড়ি থেকে এই চিকিৎসার উদ্ভব তাঁদের প্রথম পুরুষ এই চিকিৎসাকে স্বপ্নাদ্য বলতেন। আমাদের সমাজ ও মুসলমান সমাজ গরিব, তাছাড়া শিক্ষাদীক্ষার দিক থেকে তাদের মনোভাব এমন যে এই ধরণের টোটকা, স্বপ্নাদ্য, জলপড়া, ধুলাপড়া, পীরখান, পুকুরের জল, কোনো বিশেষ ফল—এই ধরনের চিকিৎসায় বিশ্বাস বেশি। ঠাকুর গুরুচাঁদের প্রতি সবারই তো ভক্তিশ্রদ্ধা। তাঁর ওপর বিশ্বাসের একটা প্রধান কারণ ছিল—তাঁর টোটকা চিকিৎসা।'

'তাই? আমি তো এসব জানি না। কিন্তু টোটকা তো অভিজ্ঞতা থেকে জানা প্রতিকার। দ্রব্যের বস্তুগুণও তো সত্য। আমার শরীরে যে কত ব্যাধি, তা বলে শেষ করা যাবে না। একজন সন্ন্যাসী-মত মানুষ, জেলখানায় আমাকে এই আংটিটা দিয়ে বলেছিলেন—এটা আঙুল থেকে খুলবেন না, কখনো। আর, আংটিটার রং যখন একটু কালচে, মরা-মরা দেখাবে, বুঝবেন, আপনার শরীর খারাপ হতে শুরু করেছে। আমি বললাম—আমাকে তো কিছু করতে হচ্ছে

না, তাহলে পরব না কেন, মাঝে-মাঝে শুধু তাকাতে হবে। উনি বললেন, তাকাতেও হবে না, আংটিটাই তাকাবে। এট তো চিকিৎসা না। আগে নোটিশ পাওয়ার যেটুকু সুবিধে। আর আপনাদের যেরকম কাজ তাতে অনিয়ম হবেই।

'তিনিও কি ডেটিনিউ ছিলেন?'

'না। কয়েদি। জেলখানায় চুল দাড়ি কাটা খুব ঝামেলা। তাই অনেকেই চুলদাড়ি কাটে না। ডেটিনিউদেরও অনেকে। উনি আবার একটা তিলক পরতেন। আবার অনেকে জেলখানাতে দাড়ি কাটবেনই। তাও তো একটা কাজ। মান্দালয়ে আমি এত ঘন-ঘন এতরকম অসুখে কাহিল হয়ে পড়তাম যে স্ট্রেচারে করে হাসপাতালে নিতে হত। মাঝে-মাঝেই। ছোট জেল তো। সে একটা হুলুস্থুল ব্যাপার। কয়েদিরাও সবাই জানত। উনিও নিশ্চয়ই সেভাবে জানতেন—কোনো দিন গলা দিয়ে রক্ত, কখনো ঘুম-না-ভাঙা, কখনো পেটের যন্ত্রণা, কখনো বমি। উনি তাই আমাকে এটা পরিয়ে দিলেন। আমিও খুলিনি। এবং এটার ওপর একটা বিশ্বাসও জন্মে গেছে। লোকটিকে আমি সন্ন্যাসী ভেবেছিলাম, পরে জানলাম ও লাইফার। লখনৌ-এর দিকে কোথাও রেলে কিছু চাকরি করত। সকলের চোখের সামনে ওর গ্যাংলিডারকে খুন করেছিল। তাহলে দ্রব্যগুণ না-মেনে উপায় আছে? আপনি কী বলছিলেন, আমি বাধা দিলাম। বলুন।'

'যা বলছিলাম, তা আর বলার প্রয়োজন নাই আপনাকে। আমি এই চাঁদসী বিদ্যা একেবারে চাঁদসীর খোদ গুরুর কাছে শিক্ষা করছি, প্র্যাকটিসও করছি প্রধানত সহকারী হিশাবে। আপনার এই এতরকম অনিশ্চিত অসুখের মধ্যে যদি কোনো একটা জায়গায় স্থায়ী বা ফিক ব্যথার কষ্ট থাকে, কোথাও থিকে নিয়মিত বা অনিয়মিত রক্তপাত ঘটে—একই জায়গা থিকে বা হজমের একটা কষ্টই বারবার হয়, বা কোথাও একটা পুরাতন ঘা থাকে—বাড়েও না, কমেও না, সারেও না তাইলে অনুমতি দিলে আপনাকে আমি চাঁদসীর চিকিৎসা দিতে চাই।'

'বলেন কী, যোগেনবাবু। শরীর নিয়ে তো একেবারে নাজেহাল হয়ে আছি এই বয়সে। ইয়োরোপে তো সেই কারণেই যাওয়া। একটা লক্ষণ কমে তো আর-একটা বাড়ে। শেষে, ভিয়েনায় সাইকো অ্যানলিসিসও করিয়েছি। ওদের কথাটাই ঠিক মনে হল। ওরা কথা বলে যেতে বলে। আমি কী বলেছি তা পরে আর মনে করতে পারিনি। কিন্তু ওরা যখন বলল—বাইরে থেকে তোমার শরীরের ওপর এমন প্রচণ্ড আঘাত পড়েছে, আচমকা, যে তোমার সিস্টেম চেপটে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছে, একটা পয়সার ওপর দিয়ে ট্রাম চলে গেলে পয়সাটা যেমন অদ্ভুত সব শেপে বদলে যায়, কিন্তু গুঁড়িয়ে যায় না, তোমার সিস্টেমের কোনো কোনো জয়েন্টে সেরকম হয়েছে, এরপর সিস্টেম আর নিতে পারত না, তোমার সিস্টেম কোল্যাপ্স করত, যাকে লোকে মৃত্যু বলে—তখন আমার মনে হল আমি নিজে না বললে ওরা কী করে জানবে কার্জন পার্কে ২৬শে জানুয়ারির মিছিল নিয়ে ঢুকতেই পুলিশরা যেভাবে আমাকে লাঠিপেটা করছিল, তাতে তো মরে যাওয়ারই কথা, পরে শুনেছি আমার সহপাঠী বন্ধু, কর্পোরেশনের এডুকেশন অফিসার ক্ষিতীশ আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে বাঁচায়, আর-একবার আলিপুর জেলে নীচের ওয়ার্ডে পুলিশ বন্দীদের বেধড়ক মারছে দেখে আমি দোতলায় সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করছি, যে ইন্সপেক্টারটি এটা করছিল সে আমাকে দেখে ছুটে এসে বন্দুকের বাঁট দিয়ে মাথায় মারল, কানের ওপরে, আমি তো এক মারেই অজ্ঞান কিন্তু ওরা তাতে খুশি হবে কেন আর অন্য পুলিশরাই-বা বন্দুক দিয়ে পেটানোর শখ মেটাবে না কেন। সেবার বাঁচিয়েছিল সত্য বক্সী, ধাক্কা দিয়ে পুলিশদের সরিয়ে কোলে করে আমাকে দোতলায় নিয়ে যায়, তাহলে শরীরের যন্ত্রপাতির চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়ার দোষ কী? ওরাই কিন্তু বলেছিল তোমার যে-নানারকম শরীর

খারাপ হয়, সেটা নানারকম অসুখের কারণে নয়। একটাই 'ট্রমা'র ফল এগুলো। তবে তুমি তো ভারতবর্ষে থাকো, এখান থেকে তোমার চিকিৎসা করা যাবে না। ওরা বারবার কিন্তু সিস্টেমকে ইরিটেট করতে না করেছিল। সেটা কী করে সম্ভব সেটা আমি বুঝিনি—চিকিৎসা নেই যার, তার আর সব বুঝে কাজ কী?'

যোগেন একেবারে ভুরু কুঁচকে চোখ নিচু করে চোয়াল শক্ত করে সমস্ত কথা শুনল, একবারও বাধা দিল না। তারপর বলল, 'আমাকে এইটুক বলেন—স্থায়ী কোনো ফিক ব্যথা আছে কি?'

'একটা কেন? তিনটে। কোমরে, তলপেটে আর মাথায়। স্থায়ী ব্যথা বলতে এই তিনটেই বলা উচিত।'

'নিয়মিত রক্ত পড়ে কোথাও থেকে? অর্শ বা মাড়ি থেকে বা নাক থেকে বা গলা থেকে?'

'নিয়মিত বলতে কী বলছেন, জানি না, রক্ত যখন পড়ে একটা জায়গা থেকেই পড়ে—গলা।'

'হজমের কষ্টটা কী রকম? তীব্র ব্যথা। নাকি বদহজম?'

'ডিসপেপসিয়া বলতে যা বোঝায়—'

'আর পুরনো ঘা কোথাও? ঠিক ঘাও না। শুকনোও হতে পারে। বাড়েও না, কমেও না, সারেও না? সাধারণত ঘাড়ে, পিঠের কোণে বা হাঁটুর নীচে—'

'আপনি বলাতে মনে হচ্ছে পায়ের দিকে একটা ওরকম আছে।'

'আপনাকে একটু দেখব, পাঞ্জাবিটা খুলবেন?'

'এ-ঘরে তো শোয়ার কোনো জায়গা নেই—'

'না, শুতে হবে না। খালি গা করেন তাতেই হবে।'

সুভাষ পাঞ্জাবিটা খুললেন। নীচে ধবধবে হাফহাতা বেনিয়ান, পাতলা সুতোর।

যোগেন একটু হেসে বলে, 'আপনাদের এই একটা অসুবিধে—খদ্দরের তো আর গেঞ্জি হয় না?'

সুভাষ গেঞ্জির ভিতর থেকে বলেন, 'এটা তো ভাল বলেছেন। ৬ তারিখে, মহাত্মাজি তো আসবেন, ওঁকে বলব কথাটা।'

যোগেন সুভাষের হলদেটে ফরসা পিঠটা দেখে। এতটা ফরসা সে কখনো দেখেনি। মেমশাহেবদের ফরসাটা তো একঝলক দেখা—একঝলকে বোঝা যায় না। আর এ এমন ফরসা, পিঠটা তো অনেকটা জায়গা, তাতে গায়ের রঙের একটু হেরফেরও হয়, সুভাষবাবুর পিঠ দেখলে তেমন হেরফেরকে মনে হয় সোনার গয়নার ওপর আলোছায়া বয়ে যাওয়া। যোগেন হাত না লাগিয়ে ঘাড় নামিয়ে কানের পেছন আর ঘাড়টা দেখে।

'ধুতিটা একটু নামাবেন? কোমরটা—'

সুভাষ নামিয়ে দেন, যোগেন একটু ভাল করে দেখে সামনে গিয়ে তলপেটটাও দেখে।

সেদিন যোগেন ফেরার সময় অনেকটা পথ হাঁটল। এক বাদামওয়ালার কাছ থেকে এক আনার বাদাম কিনেছিল। বাদামওয়ালার তাড়া ছিল, সে মাথায় তার ফেরি নিয়ে দৌড়চ্ছিল। যোগেনকে পেরিয়ে যাওয়ার পর যোগেন বুঝতে পেরে তাকে চেঁচিয়ে ডাকে। যোগেন এক আনার বাদাম চাইলে লোকটা মাথার ওপরের ফেরি থেকে হাতড়ে একটা ঠোঙা নামিয়ে যোগেনকে দেয়। লম্বাটে ঠোঙায় ভরাই থাকে বাদাম। কিন্তু যোগেন সেটা নেবে না—'এটার মধ্যে অর্ধেক পচা আর অর্ধেক ফাঁপা। খোলা বাদাম দাও—ওজন করে।' লোকটি খুব বিরক্ত মুখে তার এক কাঁধে ঝোলানো বাঁশের বাতা দিয়ে তৈরি স্ট্যান্ডটা নামিয়ে, তার ওপর ফেরিটা নামায় আর আপন মনে বলতে থাকে—এমনিতেই তার দেরি হয়ে গেছে, বাবু আরো দেরি

করে দিচ্ছেন।

বাদামগুলো নিতে-নিতে যোগেন জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার তাড়া কীসের? বিক্রি করতেই তো বারাইছ। বিক্রি হইলে আবার গোসা কর।' যোগেনের কাছ থেকে আনিটা নিয়ে পকেটে রেখে, ফেরিটা মাথায় তুলে, স্ট্যান্ডটা কাঁধে ঝোলাতে-ঝোলাতে লোকটি বলে—ময়দানে বড় ফুটবল খেলা আছে, তাড়াতাড়ি না-গেলে সে দাঁড়াবার জায়গা পাবে না।

শুনে যোগেনের একবারের জন্য মনে হয়—যাবে নাকী ময়দানে, খেলা দেখতে? যেন তার হাতে অঢেল সময়। কিন্তু না গিয়ে সে বাদামের খোশা ভেঙে ভিতর থেকে বাদাম বের করে মুখে ফেলতে-ফেলতে হাঁটতে লাগল। অত সকালে বাড়ি থেকে ভাত খেয়ে বেরয়নি। দরকার নেই। লুচি নেহাৎ কম ছিল না।

যোগেন হাঁটে আর হাঁয়ে বাদাম ছোঁড়ে।

সে মনে করতে চাইছে—বাড়ি থেকে বেরনোর সময় সে কি ভেবেছিল, এত দেরি হবে। দেরি আর হল কোথায়, যোগেনই তো এত গল্প ফেঁদে বসল, তার ওপর চাঁদসী। নইলে কাজের কথা তো দশ মিনিটেই শেষ।

শরৎবাবু আশুস্যারের টেলিগ্রামের কথা উসকে না দিলে যোগেন কি অত গল্পে ঢুকত? না। টেলিগ্রামের কথা না উঠলে সে আর টেলিগ্রামের গল্প বলতে যাবে কেন?

বেশ। টেলিগ্রামের কথা না-হয় উঠেছে। চার্চিলের কথায়, ঘুতু রায়ের গল্প তুলতে গেল কেন যোগেন।

শরৎবাবু যখন জানালেন যে সুভাষবাবু তাকে ডেকেছেন তখন কি যোগেনের খুব আশ্চর্য ঠেকেছিল? বা, ভিতরে আনন্দও হয়েছিল? আশ্চর্যও হয়নি, আনন্দও হয়নি। অ্যাসেমব্লিতে রাজা গজা, মন্ত্রী-সেক্রেটারি, জমিদার-ব্যারিস্টারদের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেষি করতে-করতে, নামজাদা বড় মানুষদের সম্পর্কে তেমন বিস্ময় নেই। সত্যি তো—আইনসভা না-হলে কি সে স্যার বিজয়, নলিনী সরকার বা নবাব হবিবুল্লার সঙ্গে একই মর্যদায় বসতে পারত। এদের একজনের বাড়িতেও তো তাকে ঢুকতে দেবে না, দারোয়ান। এর মধ্যে যোগেন নিশ্চয়ই পার্লামেন্টিরয়ান হিশেবে তার জোর বোঝাতে পেরেছে। সেটা বোঝা যায়, তার কথা যে ভঙ্গিতে স্পিকার বা শরৎ বা নৌসের আলি বা নীহারন্দেুবাবু বা বঙ্কিমবাবু শোনেন, তা থেকে। বঙ্কিমবাবু বলেছেন, একদিন ডকমজদুর ইউনিয়নে নিয়ে যাবেন। নীহারেন্দুবাবু লবিতে অনেকদিনই তাঁর সঙ্গে অনেকটা সময় কথা বলেন। তিনি এমন কথাও বলেন যার জবাব যোগেন ঠিকমত দিতে পারে না। কথাগুলো যে ঠিকমত বুঝতে পারে তাও নয়। যোগেন ভাবত, বুঝতে না-পারাটা তারই জানার অভাব। পরে অনেকবার কথা বলায় বুঝেছে যে সে যদি বরিশালে বলে, তাহলে যেমন কলকাতার লোক বুঝবে না, নীহারোন্দুবাবুদের সেইরকম বরিশালি আছে। উনি জানতে চাইছিলেন, অ্যাসেম্বলিতে যোগেন কোন স্বার্থের প্রতিনিধি বলে নিজেকে মনে করেন। ব্যাখ্যাও করেছিলেন—প্রত্যেকেরই তো স্বার্থ থাকে, হয়ত স্বার্থটা তার পার্টিতে বোঝা যায়, কে হিন্দুস্বার্থের পক্ষে, কে মুসলিম স্বার্থের পক্ষে, কে ব্যবসায়ীদের পক্ষে, কে জমিদারদের পক্ষে, কে রায়ত বা কৃষকদের পক্ষে। আপনি নিজেকে কোন্ স্বার্থের মানুষ বলে ভাবেন। তখন যোগেন প্রশ্নটা বুঝে নিতে একটু আবছা করে বলে, 'শাস্ত্রে বলে স্বার্থ ত্যাগ করো, আর আপনি বলেন স্বার্থটা কী? য্যান, জাইনতে চান মতলবটা কী? আমার তো মতলব কিছু নাই। বেবাক মেম্বারের মত আমিও ভোটে জিত্যা আসছি। নীহারেন্দু বাবু তখন পালটা জিগগেস করেন, যদি না জিততেন? যোগেন তার পালটা জবাব দিয়ে হেসে ফেলেছিল—তাইলে মেম্বার হইত্যাম না। তাহলে

করতেনটা কী? এমনি সামাজিক কাজের কথা বলছি না। রাজনীতির কাজ। যোগেন তখন নীহারেন্দুবাবুকে বলার মত কথাটা পেয়ে গেছে। নীহারেন্দুবাবুদের জীবনযাপন থেকে কি যোগেনের রাজনীতি বা স্বার্থটা আন্দাজ করা সম্ভব। দুটো তো সম্পূর্ণ আলাদা জীবন। আপনি শহরের শিক্ষিত ধনীবাড়ির ছেলে। পড়াশোনা যতটা করতে চান ও যা করতে চান সেটা আপনারই ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। বিদেশ থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে এসেও আপনি নিজের স্বার্থ বা বিশ্বাস অনুযায়ী রাজনীতি করতে পারেন। আপনি কিন্তু ভাববেন না যে আপনাদের জীবনটাকে আমি হিংসে করছি বা ছোট করছি। আপনার জন্মটা তো আপনার হাতে না। বড়বাড়িতে জন্মেও বড়বাড়ির চালুজীবন থেকে আপনারা বেরিয়ে এসেছেন। এটা আপনার বা আপনাদের পক্ষে আত্মত্যাগ। কিন্তু আমার বেলায় বা আমার মত আরো অনেকের বেলায় তো এটা ত্যাগ নয়, বরং একটা ভোগ, বড়রকমের লাভই বলতে পারেন। আমি নমশূদ্র, এমএলএ ভোটে জেতাটা আমার নিজের পক্ষে তো বটেই, আমার জাতের পক্ষেও লাভ, মানে, কত বড় লাভ, সেটা বোধহয় আন্দাজ করা যায় না, নিজে না বুঝলে। বা, হয়ত যায়ও। আমি যদি আন্দাজ করতে পারি, আপনাদের আত্মত্যাগটা কোথায়, তাহলে আপনিও নিশ্চয় আন্দাজ করতে পারতে পারেন আমাদের, নমশূদ্র বা সমজাতীয়দের ভোগটা বা লাভটা কোথায়। বেশির ভাগ মুসলমানেরাও তাই। অহংকার বা লাভ, যাই বলুন। কার্যকারণে, যেখান থেকে সর্ব অর্থে আমরা, মানে শূদ্ররা আর মুসলমানরা অচ্ছুৎ, সেই ক্ষমতার জায়গায় পৌঁছানোটাই তো আমাদের স্বার্থ। তাও কি পৌঁছান যায়? কত যে বাধা! সব পথ আটকান। আপনি মুসলমান হয়্যা ক্ষমতার ভাগ নিবেন। দুই পা গিয়া দ্যাহেন, ঢাকার নবাব পথ আটকাইয়া, কয় যে মুসলমান তো আমি, তুই তো নেড়া। আপনি ছোট জাত বইল্যা ক্ষমতার ভাগ নিবেন। দুই পা আগাইয়া দেখেন। আমাদের মত দাগি শূদ্র বলতে রাজা প্রসন্নদের রায়কত। তাহলে, যাকে বলে সাম্প্রদায়িক কোটা, তার ব্যবহারটা কোথায়? তবু এটাই আমাদের স্বার্থ। ক্ষমতা চাই। ক্ষমতার প্রমাণ দিতে চাই।

ফেরার পথে যোগেনের কিছু ভাবনা

ঠিক এভাবেই যে সে কথা বলেছিল তা নয়। কিন্তু এখন সুভাষবাবুর বাড়ি থেকে হেঁটে-হেঁটে ফিরতি পথটাকে ইচ্ছাকৃত উদ্দেশ্যহীন করতে—যোগেন যেন নিজের সম্পর্কে নিজেরই করা এমন বিশদ ব্যাখ্যায় পৌঁছুতে চাইছিল।

৮৬

ব্যাখ্যাটা আছে, অন্য কারো করা, কোনো মুনি-ঋষির, দার্শনিকের, গুরুর করা, অনেক আগেই হয়ত, বা না-হয় এখানকারই কেউ, ব্যাখ্যাটা করে রেখে দিয়েছেন বা দিচ্ছেন, আমার, বা আমাদের মত সবার জন্য—আমার বা আমাদের মত সবাইকে সেই ব্যাখ্যা পর্যন্ত পৌঁছুতে হবে, তার পর কী সেটা তো ঠিক করতে হবে ঐ ব্যাখ্যার সূত্র ধরে-ধরেই—যোগেন এমন একটা পদ্ধতি তার বা তাদের বেলায় যথাযথ বলে মেনে উঠতে পারেনি, পদ্ধতিটা বর্জন যে করতে পেরেছে—তাও নয়। 'আমার' বা 'আমাদের মত সবারকে' মানে কোন্-আমার বা কোন্-আমাদের, সেটা একটু ঝাপসাই ছিল, তবু, এত কথা ওঠার উপলক্ষ তো এই ভোট, ভোট থেকে তৈরি আইনসভা, আইনসভার মেম্বাররা, তাদের ভিতর থেকে

তৈরি মন্ত্রিসভা—তারাই না-হয় হোক। এই ব্যবস্থাগুলি তো জানা, তৈরিও অনেকটা। 'আমাদের মত সবাইকে' সেই পর্যন্ত পৌঁছুতে হবে। তার পর ব্যবস্থা চলবে ব্যবস্থার নিয়মে।

কিন্তু যোগেন নিজেকে সেই 'আমাদের' মধ্যে ধরেও 'তার বা তাদের বেলায়' বলে কাদের সে আলাদা করে? নিশ্চয়ই শূদ্রদের, যারা আর-একটা প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা, হিন্দু বর্ণভেদ, তার আবর্জনা। নিশ্চয়ই বাঙালি মুসলমানরা, যারা আর-একটা প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা, মুসলিম বর্ণভেদ, তার আবর্জনা।

তারা কি নতুন কোনো ব্যবস্থার ভিতর নিজেদের জায়গা বের করতে পারে যেখানে এই পুরনো বর্ণভেদব্যবস্থাগুলি নেই?

এখন, যোগেন হেসে ফেলে হাঁ-মুখে বাদাম ছোঁড়ে। শূদ্র ও মুসলমান হওয়ার সুবাদে এই আইনসভার ব্যবস্থায় তারা ঢুকতে পেরেছে। অথচ এই ব্যবস্থার ভিত্ বর্ণভেদহীন এটা মেনে নিতে হয়েছে।

এই ছলনা, ব্যবস্থার এই ছলনা, যোগেনের কাছে ধরা পড়ে গেছে। তাহলে, শূদ্র বলতে সে আর প্রসন্নদের বা মুকুন্দবিহারী আর মুসলমান বলতে ঢাকার নবাব?

তাহলে বর্ণভেদ কি থাকল না ভাঙল?

হ্যাঁ—তাদের, মানে শূদ্রদের তো ভোট আছে। সুতরাং,

গান্ধীজি বললেন—বর্ণভেদ হিন্দুধর্মের অংশ কিন্তু অস্পৃশ্যতা নয়, মন্দিরে শূদ্ররা ঢুকুক হিন্দুধর্ম বলতে কী বোঝায় সেটা বদলে গেল। আগে ছিল—বামুন-কায়েত বৈদ্য এরা। এখন হিন্দুধর্ম বলতে তো বর্ণভেদের সবগুলি ভাগসহ গোটা হিন্দুধর্মকেই বোঝায়, মানে—দুটো পুরনো ব্যবস্থা, হিন্দু-মুসলমানের আলাদা-আলাদা বর্ণভেদ ও মিলিত ধর্মভেদ, এই নতুন আইনসভার ব্যবস্থার সঙ্গে এসে মিশেছে। যোগেন জানে না—পুরনো ব্যবস্থার কিছু উপাদান থেকেই যায় কীনা সব নতুন ব্যবস্থাতেই। এটা জানা কোনো ইচ্ছেও তার নেই। সে যদি মনে করত, নতুন ব্যবস্থাটাই সম্পূর্ণ নতুন ব্যবস্থা হয়ে উঠতে পারে, একমাত্র তাহলেই সে তল্লাশ চালাত, কোন্-কোন্ লুকানো ফাঁকফোকর দিয়ে পুরনো ব্যবস্থাটা কোনো-না-কোনো আকারে নতুন ব্যবস্থায় জায়গা করে নেয়। কংগ্রেসের ভিতরে ও বাইরে 'স্বরাজ', 'স্বাধীনতা', 'স্বায়ত্তশাসন' ও 'পূর্ণ স্বাধীনতা' এসব নিয়ে মারামারি কাটাকুটির দশ বছরের ইতিহাস যোগেনের জানা। খুব সূক্ষ্মভাবে না হলেও জানা। মাথার ওপরে শাহেব আছে কী নেই—এই প্রশ্নের চাইতেও গুরুতর প্রশ্ন যোগেনের তৈরি হয়ে গেছে—মাথার ওপরে ব্রাহ্মণ-কায়েত-সৈয়দ-মৌলানারা থাকবে কী থাকবে না? তাহলে যোগেন কি এই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশানে থেকে স্বায়ত্তশাসন যেতে চায় না? সেটা কী করে বলবে যোগেন, না জেনে যে স্বায়ত্তশাসনে শূদ্ররা কি স্বায়ত্ত না শাসিত,' পূর্ণ স্বাধীনতায় নমশূদ্ররাও কি পূর্ণ ও স্বাধীন? যোগেন জানে—যোগেনের জন্য নতুন ব্যবস্থায় জায়গা আছে—মন্ত্রী-টন্ত্রী হয়ে যাবে। কিন্তু নমশূদ্ররা?

নীহারেন্দুবাবু পরে তাঁকে ছোট্ট দুটি বই দিয়ে বলেছিলেন—আপনি যে প্রশ্ন করছেন, দেখুন তো এই বইদুটিতে সেই প্রশ্নগুলি আছে কী না। আপনি পড়ে নিন, তার পরে কথা হবে। বইদুটো মলাট দিয়ে রাখাই ভাল। রাশিয়ান বলশেভিজম, কমিউনিজম, রিভলিউশনারি ট্যাকটিক্স—এই সবে শাহেবদের এখন জলাতঙ্ক।' বইদুটি—'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' আর 'ক্লাশ-স্ট্রাগল ইন ফ্রান্স।' বইদুটো মুখস্ত হয়ে গেছে যোগেনের, এতবার পড়েছে। এ বই ভাললাগা খারাপলাগার বই না। নিজেকে চেনার বই, নিজের জীবন তৈরির বই। যোগেনের সব প্রশ্নই তো ওঠে—তার শূদ্র অস্তিত্ব থেকে। কোনো প্রশ্ন বা বিষয় যদি বর্ণভেদ বা ব্রাহ্মণ্যবাদ বা শূদ্রতার সঙ্গে কোনো

একরকমে বাঁধা না যায়, তাহলে বই থেকে যোগেন কিছুতেই বের করতে পারে না—তার প্রশ্নটা কী?

গুরুচাঁদ ঠাকুর যখন মারা গেলেন, গত বছর, তখন তাঁর কোনো শোকসভা হয়নি আর এ-বছর তাঁর মৃত্যুর বর্ষপূর্তি উপলক্ষে অ্যালবার্ট হলে?

কেন? গুরুচাঁদ ছিলেন নমশূদ্রদের জাতীয় আন্দোলনে ঢোকার প্রধান বাধা। তিনি কংগ্রেসকে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর মৃত্যুতে সেই প্রধান বাধা দূর হয়েছে। এখন নমশূদ্র বলতে তো বোঝায় একটা জনগোষ্ঠী। শিডিউল বানিয়ে বা শিডিউলের বাইরে এই জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক বাছাইয়ে একমত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তাই এমন একটা উপলক্ষ খুঁজে বের করা হয়েছে।

কিন্তু সে কেন? সে, যোগেন মণ্ডল, কেন। রসিক কাকা পুরনো কংগ্রেসি, এখনো কংগ্রেসি, বিরাট কাকা পুনা প্যাক্টে সই করেছিলেন। তাঁদের বাদ দিয়ে যোগেন কেন? নতুন বলে? পি আর ঠাকুর নন কেন? গুরুচাঁদের নাতি বলে? আর যোগেনের ঠাকুদার নাম সে নিজেই সব সময় মনে করতে পারে না বলে? নতুন নেতৃত্ব? উত্তরাধিকারহীন ও পূর্বপুরুষহীন বলে? না। যোগেন তপশিলি সংরক্ষণের বাইরে বর্ণহিন্দুদের দ্বারা সমর্থিত বলে?

যোগেন এলগিন-চৌরঙ্গি থেকে হাঁটছিল। থিয়েটার রোডে ঢুকে পড়ে। সুরাওয়ারদির বাড়ির সামনে দিয়ে, বাঁয়ে ঘুরে পার্ক স্ট্রিটের কবরখানার পাশ দিয়ে মল্লিকবাজারে পৌঁছয়। সে কোনো একটা ঠিকানার দিকে হাঁটছিল না। তবু তো দক্ষিণ থেকে উত্তরেই আসছিল। যোগেনের কাছে কলকাতার কোনো জায়গাই অচেনা নয় আর সবটাই হাঁটাপথ। বাস-ট্রাম ভাড়া বাঁচিয়ে, টিউশন করে, প্রুফ দেখে সে কলকাতায় তার জীবন কাটিয়েছে। সেটা তার অভ্যেসে ঢুকে গেছে—একা-একা হাঁটতে-হাঁটতে ভাবা। সে কিছু ভেবে থিয়েটার রোড দিয়ে পার্ক স্ট্রিট কবরখানার ধ্বংসস্তূপের পাশ দিয়ে মল্লিকবাজারে বাঁ মোড় নেয়নি। সে যে ভাবনায় ঢুকে পড়েছিল, তাতে একটু নিরালা-নীরবতা দরকার ছিল। সারা দেশে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে শুধু একটা মিটিঙে যেতে বলেছেন। সে নিজেই সে-মিটিঙে যেত। না-যাওয়া অসম্ভব। এখন তাকে যেতে হবে সুভাষের লোক হিশেবে? যোগেন যদি সুভাষের লোক বলে পরিচিত হতে না চায়, তাহলে, ব্যস, দেখা হল কথা হল, মিটে গেল। আর ওমুখো না-হলেই হল। কিন্তু সুভাষের চিকিৎসা? সে তো উপযাচক হয়ে সুভাষকে চাঁদসীর কথা বলল। হ্যাঁ, তার ইচ্ছে করেছিল বলতে। এত নয়নমনোহর একটি মানুষের শরীরের কষ্ট দূর করার ইচ্ছে হয়েছিল যোগেনের। অর্শ-ভগন্দর-নালীঘা তো বটেই যোগেন কপাল টিপে-টিপে আটকপালি, খেঁড়ি ও ঘাড়-আটকা ব্যথা সারাতে পারে, সারিয়েছেও অনেক। কিন্তু সে আন্দাজ করতেই পারেনি যে তার কথাটুকু মুখ থেকে বেরতে-না-বেরতেই সুভাষ জেলখানার কথা এত খোলাখুলি বলতে শুরু করবেন। কথাটা তো ছিল তাঁর শরীরের স্থায়ী অসুস্থতা নিয়ে। তার বিবরণে তো ময়দানে ও আলিপুরে পুলিশের মারের কথা আসবেই।

কিন্তু সুভাষ যে যোগেনের মুখে শুনেই যোগেনকে নির্ভর করে ফেললেন, তাতেই যোগেন এই প্রথম, এই প্রথম স্মৃতি আর কল্পনার এক আকস্মিক মিশ্র স্রোত তার শরীরে অনুভব করে। ভাসমান তার শরীরের পিঠের ওপর দিয়ে বয়ে যায় ঠান্ডা, ঠান্ডা জলস্রোত আর তার দুই হাত ও বুক ভেঙে চলে উষ্ণ জলস্রোত। সে কল্পনা করে নিতে পারে, সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, আপাদশির নিরস্ত্র একটা মানুষেরা ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে কিছু উর্দিপরা মানুষ, আপাদশির সশস্ত্র। তারা যে অতটা প্রকাশ্যতায়, অতটা সশস্ত্র হয়ে, অতটা নির্ভয়ে পাকা বাঁশের শক্ত ও পোক্ত লাঠি দিয়ে মেরে লোকটার মৃত্যু ঘটাতে পারে, তার একটি কারণ তো ওটা একটা জেলখানা যেখানে

পুলিশের উর্দি নীতি বা নিয়মের শেষ নির্ণায়ক, আর আরো একটি কারণ তো আক্রান্ত লোকটির সামনে কোনো প্রস্থান পথ নেই, যেমন সেই ছেলেটির ছিল না, তারই বয়সী সেই ছেলেটিরও ছিল না, তেঁতুলকাঠির হাটে, লোভ সামলাতে না পেরে সে, সেই ছেলেটি, ঘোষমশায়ের দোকানে সাজানো জিভে গজার স্তূপ থেকে একটা গজা চুরি করেছিল ও একটি কামড় দেয়ার আগে ধরা পড়েছিল। সঙ্গে-সঙ্গে ঘোষমশায়ের দোকানের লোকজন হাতের কাছে যা পায় তাই নিয়ে ছেলেটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লোহার লম্বা-লম্বা কাল হাতা, শিক, ডান্ডা নিয়ে ও শেষ পর্যন্ত মিষ্টির দোকানের বড় আখার জ্বলন্ত খড়ি নিয়ে। ছেলেটাকে আর দেখা যাচ্ছিল না। সেই কালো, লম্বা লোহাগুলো ও খড়িগুলো বাতাসে উঠছিল আর নামছিল। যোগেন দাঁড়িয়ে দেখছিল, তখন ক্লাশ সেভেনে, আর সবার মত দাঁড়িয়ে দেখছিল, ছেলেটিকে বাঁচাতে সে কিছু করতে পারে—এমন কোনো চিন্তা পলকের জন্যও তার মনে আসেনি যেমন যারা দেখছিল তাদের কারোই আসেনি। ঘোষমশায়ের লোকগুলো যখন কাজ শেষ করে খালের জলে তিন ডুব দিয়ে উঠে এল আর ঘোষমশায় যখন সেই জিভেগজার স্তূপটার নীচের বারকোষটা উলটে দিলেন মাটিতে আর তার ওপর হামলে পড়ল যত শুদ্দুরের ছেলেমেয়ে হাটে ছিল তারা সব, তখন, তখনই দুই হাতের মুঠোতে গোটা তিন-চার গজা নিয়ে খাড়া হওয়ায় ঘোষ মশায়ের গর্জন শুনে জানতে পেরেছিল, ছেলেটি ছিল শূদ্র, সে যদি একটা মিষ্টি চাইত ঘোষমশায় ওকে দুটো মিষ্টি দিতেন, তাই বলে ছুঁয়ে দিবি, এ-ঘোষকে সে-ঘোষ পাওনি, চাঁড়ালের ছোঁয়া মিষ্টি আমি খদ্দেরদের বেচতে পারব না, লাঠি কাঠি যা দিয়েই হোক চাঁড়ালের ছোঁয়া যার-যার লেগেছে, তারা তিন ডুব না দিয়ে দোকানে ঢুকতে পারবে না।

যোগেন শুনেছিল, যেমন আর-সবাই শুনেছিল। দু-হাতের দু-মুঠো ভর্তি কয়েকটা গজা নিয়ে যোগেন সেই ছেলেটিকে দেখতে মাটিতে পড়ে আছে যেখানে সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, খুব নজর করে তারও মনে হয়েছিল, ও কি মইর‍্যা গিছে—যেমন আরো সবার মনে হয়েছিল কিন্তু কিছু বলেনি, যেমন আর কেউও বলেনি। গজাগুলো যোগেন খেয়েছিল কী না—স্মৃতি থেকে এই তথ্যটা সে মুছে দিতে চেয়েছে।

যোগেন সুভাষের কথা থেকে কল্পনা করছিল, চোখে দেখার মত দেখছিল—আপাদমস্তক নিরস্ত্র একটি মানুষকে লাঠি পিটিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে যেহেতু এ-হত্যা আইনসঙ্গত ও লোকটি আইন-অসঙ্গত।

তার বয়সী সেই ছেলেটিকে মারা শুধুই দেখেছিল যোগেন, তার স্মৃতিকে চিরকালের জন্য বন্ধক দিয়ে। এখন, এত বছর পর, তারই বয়সী-প্রায় আর-একজন তার সামনে—তাকেও অচ্ছুৎ বলে মারা হয়েছে। তিনি ছুঁয়ে দিয়েছিলেন, দেশের শাসনতন্ত্র। ঠিক মিল নয়, কিন্তু যোগেন একটা কিছু ছায়া পায়, পারা-ওঠা আয়নায় যেমন ক্ষতলাঞ্ছিত ছায়া পড়ে তেমনি। সুভাষবাবুকে তো ইংল্যান্ডের কলেজটলেজে গিয়ে শাহেব হতে হয়েছিল শাহেবদের বিরুদ্ধতার প্রস্তুতিতে। এর ভিতর কি একটা বৈষম্য ঘটে যায় না? যোগেন-কে যে বর্ণহিন্দুর মত শিক্ষিত ও সফল হতে হয় বর্ণভেদের বিরুদ্ধতা করার অধিকার অর্জনের জন্য। একটা কি ফাঁকে পড়ে যাচ্ছে না সেই মানুষটি যে শূদ্র অথচ বর্ণহিন্দুর সমতুল্য নয়।

এমন একটা গোলমালে পড়ে যোগেন সুভাষবাবুর সঙ্গে একাত্ম বোধ করে ফেলেছে, তাঁর শরীরের সেবা করতে চেয়েছে, যেন কোথাও একটা সমতা তৈরির দায় আছে—বিদেশীরা যে-মার মেরেছে, তা থেকে সম্পূর্ণ দেশী চিকিৎসায় তাঁকে নিরাময় করে তোলার দায়। বৈঠকখানার মোড়ে পৌঁছুতে যোগেন এই পর্যন্তও ভাবতে পারে—গান্ধীর অনশন, পরোক্ষ প্রতিরোধন যে

দিবস, ছাগদুগ্ধও কি সেই দেশীয় সমতার সন্ধান।

যোগেন যে এর পরে আর ভাবে না তার কারণ কি বৈঠকখানা বাজারে ঢোকার পথে ঠেলা ও রিকশর ভিড় ঠেলে তাকে এগুতে হচ্ছিল বলে, নাকী সে সেই ছুতোয় তার ভাবনা থামিয়ে দিতে? যোগেন জানে—এভাবে ভাবনা থামানো যায় না, বরং ভাবনাটাকে বিপুল শক্তিতে ফিরে আসার সুযোগ দেয়া হয়, তেমন প্রত্যাঘাত আরো বিপদের।

এলগিন রোডের মোড় থেকে হাঁটতে-হাঁটতে যোগেন যে বৈঠকখানা বাজারেই ঢুকবে এটা কি সে জানত। জানত অথচ মানতে চাইছিল না যে জানে? তাই এমন আত্মছলনা তৈরি করতে হয় যে যদি গুরুচাঁদ স্মরণ সভার খবর নিতে হয়, তাহলেও ১৫ নম্বর হ্যারিসন রোডে যেতে হবে, রসিকলাল বিশ্বাসের বাড়িও ১/২ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট। কাকার সঙ্গেও কথা বলা যাবে।

বৈঠকখানা বাজারের এক তেতলা বাড়ির একতলার একটা ঘরে বরিশালের একজন লোক থাকে যে চাঁদসীর চিকিৎসার জন্য দরকারি ওষুধপত্র, তেলমালিশ তৈরি করে দেয়। এটাই তার জীবিকা। কলকাতায় তো চাঁদসীর ডাক্তার নেহাৎ কম নয়। তাদের রোগীও সব মিলিয়ে কম নয়। ফোঁড়া, শূলবেদনা, শরীরের অব্যবস্থায়, ঘামাচি থেকে হওয়া ঘায়ে, হাজায়, বদহজমে, অগ্নিমান্দ্যতে, অনিদ্রায়, শ্বেতস্রাবে, স্তনে দুধ না-আসায়, অন্ডকোষবৃদ্ধিতে, অর্শ-ভগন্দরে চাঁদসী কাজে লেগে যায়। এক ডাক্তারের কাছে না লাগলে আর-এক ডাক্তারের ওষুধ কাজে লাগে। অথচ দুই ডাক্তারকেই ওষুধ বানিয়ে দেয় এক ও অদ্বিতীয় অভিমন্যু বারুই।

অভিমন্যুকে পাওয়া গেল না। যোগেনেরই ভুল। এটা তো তার ডেলিভারি টাইম। অভিমন্যুর বৌ এক গলা ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে। এর সঙ্গে আর কী কথা বলবে?

'বড় ছেলেডা কই' যোগেনের প্রশ্নের উত্তরে বৌটি তারই পাশ দিয়ে বাইরে গেল। বাইরে মানে রাস্তা থেকে একটা প্যাসেজ এসেছে এই বাড়ি পর্যন্ত। সে-প্যাসেজও বাজার ঢুকে গেছে।

একটা বাজখাঁই বরিশালি হাঁক শুনে যোগেন চমকে যায়। ঘোমটা গলা পর্যন্ত। ঘোমটার আড়ালে এমন বজ্রনিনাদ। এক যোগেনই সেই ডাকের অর্থ বুঝল—হে বোগদার বেটা বাজার মারানো ছাইড়্যা এডডু গোয়ালে মুখ দেখাও। এমন করে ছেলেকে কি পৃথিবীর আর কোনো লোক ডাকতে পারে? একটা মাত্র ডাক দিয়ে গলা পর্যন্ত ঘোমটায় যোগেনের পাশ দিয়ে ভিতরে ঢোকে আর ছেলেটিও এসে হাজির।

'তুই আমার লগে পনের নম্বরে যাবি, সেখানে আমি একটা কাগজ লিখ্যা তোকে দিলে তুই বাড়ি ফিরে আসতে পারবি তো?'

ছেলেটির বয়স মনে হয় বার-র মত। প্রশ্নের জবাবে সে কোনো জবাব না দিয়ে ঠোঁটের ডানকোণে একটু ভাঁজ ফেলে একপা এগল, মানে, চলেন।

সুভাষের জন্য অভিমন্যুকে একটা তেল বানাতে বলবে। চাঁদসী চিকিৎসায় খুব নাম-করা তেল—স্নেহতৈল। স্ট্যান্ডার্ড ফরমুলার হলে অভিমন্যুর কাছে রেডিস্টকই পাওয়া যেত। কিন্তু যোগেন অনুপাত একটু বদলাতে চায়। রাস্তাতেই তার সেই বিচার হয়ে গেছে—কোন্ অনুপাত কী হবে।

পনের নম্বরে এসে একটা কাগজ টেনে খশখশ করে লিখে ফেলে। ছেলেটিকে ডেকে বলে, 'তোর বাবাকে বলবি, যেমন লেখা আছে, তেমন অনুপাত দিতে হবে।' কাগজটি ছেলেটির হাতে দেয়ার পর তার মনে পড়ে যায়, 'তোর বাবা তো পড়তে পারে না। তালে লিখ্যা দিয়্যা কী হব? এহানে আমি রাত নয়টা পর্যন্ত আছি। অভিমন্যুরে দেখা করতে বলিস। দেখা না হইলে কাইল সকালে বাড়িতে যাবার কবি।'

স্লিপটা ফেরত দেয়ার পর ছেলেটি বলে, 'এহানে পইড়্যা দিবার মানুষ আছে।' অভিমন্যু তার খদ্দেরদের সমস্ত প্রয়োজন মনে রাখতে পারে। কী যে ক্ষমতা ওর। যোগেন স্লিপটা ছেলেটিকে ফিরিয়ে দেয়।

পনের নম্বরে পাড়ার নেতারা এলে যোগেন তাদের খবর দেয়, মিটিঙের। সবটা বলেনা। শুধু এইটুকু বলে যে সুভাষ বোস জানিয়েছেন—শিডিউলরা সবাই মিলেমিশে যদি করে তাহলে তিনি আসবেন। ছেলেরা তো আনন্দ লুকতে পারে না, তারা যেন মনে-মনে চিৎকার করে উঠল, 'সু ভা ষ বো স?'

পি আর-কে যোগেন সবটাই বলতে পারে—উনি এলেনও দেরিতে, অফিসও তখন ফাঁকা।

সমস্যার কথাটাই বলে যোগেন—'সুভাষবাবু আসতে চান, মিটিং তো তালি করতেই হবে। 'ক্যালক্যাটা শিডিউল ক্লাশ লিগ'—এর নামেই হোক। প্রসন্নদাস তো আবার ওনাকে স্থানকাল কয়্যা থুয়্যা আইসছে। সুভাষবাবুকে তো আর নিজেদের কথা বলা যায় না। ১৩ মার্চ অ্যালবার্ট হল তো প্রসন্নের বুকিং। তাহলে কী করা হবে?'

ঠাকুর বলে, 'ও কিছু ঠেকবে না। প্রসন্নর সঙ্গে কথা বলে নেব। লিগের নামেই মিটিং ডাকা হোক।'

পি আর-এর মুখ দেখে তার মনের ভাব বোঝা যায় না। যোগেনের মনে হল, পি আর সব ঘটনাই জানে কিন্তু তাকে বলল না। সেটা জিগগেস করে জানতে তার মানে লাগে।

পি আর বলেন, 'সুভাষবাবু এলে তো মিটিংটা বড় করেই করতে হয়। জানাতে হবে সবাইকে। জানলে সকলেই আসবে। একটা নামের লিস্ট করবেন নাকী।'

যোগেন একটা লম্বা কাগজ কোর্টের ডেমি পেপারের মত খাড়াখাড়ি ভাঁজ করে বলে, 'অ্যাসেম্বলির পার্টি ধইর‍্যা বলবেন? এটা তো একটা সামাজিক ব্যাপার। পার্টি বাদ দিলে হয় না? বিশিষ্ট গণ্যমান্যদের ডাইকলে হয় না?'

পি আর একটু ভেবে সামান্য হেসে বলেন, 'পার্টির বাইরে মান্যগণ্য পাবেন?'

যোগেনও একটু হেসে ও ভেবে বলে, 'এইভাবে খাড়া হয় একডা—পার্টি ছাড়াও স্বীকৃতি পরিচয় খ্যাতি আছে। যেমন ধরেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বা ডাক্তার বিধান রায়—'

'বেশ তাই করুন, দেখা যাক কী দাঁড়ায়। একটা হ্যান্ডবিলও করুন সব জায়গায় বিলির জন্য।'

অ্যালবার্ট হলের গুরুচাঁদ স্মরণ সভার কাজের তোড়ে নাকানিচোবানি খেতেখেতেই যোগেনকে জেনে ফেলতে হয়—এসবই একটা প্ল্যানের অংশমাত্র। আর, মিটিঙের দিন আসতে-আসতে যোগেন বোঝে, নেতাগোছের এমন কেউ নেই যে এই সব জানে না। তবে এক যোগেন আর পি আরই পুরো ঘটনাটা কালক্রমিক ভাবতে পারে—দুজনের দুটো আলাদা ফাঁক সত্ত্বেও। পি আর-এর ফাঁক—সুভাষ বোসের ভূমিকা। আর যোগেনর ফাঁক—অ্যালবার্ট হল বুকিংটা কে করল? প্রসন্ন দাস ঐ মিটিঙের কথা সুভাষবাবুকে বলতে গিয়েছিল—মল্লিকদের লোক হিশেবে। চারদিকে গুজব রমরম করছে যে মন্ত্রিসভার অদলবদল হবে, শিডিউল কাস্ট মন্ত্রীদের অন্তত একজনকে ছাড়ানো হবে ও নতুন একজনকে নেয়া হবে। মুকুন্দবিহারী যাতে মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত না-হন তার অনুকূল অবস্থা তৈরি করার জন্য সুভাষবাবুকে নিয়ে একটা সভা করার বুদ্ধি খেলে পুলিন মল্লিকের মাথায়। উপলক্ষটা কী হবে সেটাই বের করা যাচ্ছিল না।

এমন সময় মুকুন্দবিহারীর লোক, অ্যালবার্ট হলের প্রসন্ন দাস, ওঁকে জানান—১৩ মার্চ

অ্যালবার্ট হল বুক করা হয়েছে গুরুচাঁদ ঠাকুরের স্মরণসভার জন্য কিন্তু কারা বুক করেছে সেটা বোঝা যাচ্ছে না। মুকুন্দবিহারীই পরামর্শ দেন—যারাই বুক করে থাক, বিষয়টা তো গুরুচাঁদ ঠাকুর, তাহলে হলের পক্ষ থেকে প্রসন্ন দাস দেখা করে সুভাষকে আমন্ত্রণ জানাক। সুভাষ অনুরোধের জবাবে প্রসন্নকে বলে এমন অনুষ্ঠানে না-যাওয়ার তো কোনো কারণ নেই, যদি সে কলকাতায় থাকে। শরৎ বোসের কাছে সুভাষ ঘটনাটা বললে, শরৎ বোস কোনো প্রসন্ন দাসকে চিনতে পারেন না। বলেন, অ্যালবার্ট হলই কি করছে? তাহলে তারা লাইব্রেরিয়ানকে তোমার কাছে পাঠাবেন কেন। তিনি তো ওখানে চাকরি করেন। তাহলে তো কর্তাব্যক্তিরা কেউ আসতেন। তারপর শরৎ বোসই উপায় বাতলে দেন—গুরুচাঁদ ঠাকুর মানে তো বরিশাল-ফরিদপুরের নমশূদ্রদের ব্যাপার। তাদের তো অনেক নতুন-পুরনো বড়-বড় নেতা আছে। পি আর ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুরের নাতি, ব্যারিস্টার হয়ে এসেছে। যোগেন মণ্ডল কংগ্রেসের ক্যানডিডেটকে হারিয়ে জিতেছে। এদের যার সঙ্গেই দেখা হোক, আমি বলব তুমি ডেকেছ। তারপরে ঠিক করো।'

অ্যালবার্ট হলের মিটিং

৮৭

১৩ মার্চ অ্যালবার্ট হলে গুরুচাঁদ ঠাকুরের প্রথম মৃত্যুবার্ষিক মিটিঙটা যে এত বড় ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে তা উদ্যোক্তারা কল্পনাও করতে পারেনি। সভাপতি হলেন কংগ্রেস লেজিসলেটিভ পার্টির চিপহুইপ জে সি গুপ্ত। কিন্তু জে সি গুপ্তের পরিচয় তো কংগ্রেস দিয়েও না, পদমর্যদা দিয়েও না। জে সি গুপ্ত মানে জে সি গুপ্ত। আর মিটিং চলার সময়ই এসে ঢুকলেন রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র। তখন বক্তৃতা করছিলেন কর্পোরেশনের নেতা সন্তোষ বোস। সন্তোষ বোস সুভাষের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। তিনি তো বক্তৃতা থামিয়ে বলে উঠলেন, 'ঠাকুর গুরু চাঁদের স্মরণে এই সভার জাতীয় গুরুত্ব যে কতটা তা সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠল এখন, যখন আমাদের প্রিয় নেতা সুভাষচন্দ্র সারা ভারতের রাষ্ট্রপতি হয়েও এই সভায় এসেছেন। আমি আর বক্তৃতা করতে চাই না, আমি এখন শুনতে চাই।'

সুভাষ গান্ধীটুপি পরে এসেছিলেন। তাঁর মুখে সব সময়ই এমন একটা শীর্ণ কমনীয়তা থাকে যে তাঁকে শুধু দেখতেই ভাল লাগে। সুভাষের রূপ নিয়ে একটু রটনাও আছে। গান্ধীটুপিতে তাঁর বয়স একটু বেশি দেখায় বলে কেউ-কেউ বলেন। কিন্তু টুপি না-পরলে তো মাথাভর্তি টাক। গায়ের রং আর টাক—বোস ভাইদের এই দুটো বংশচিহ্ন। মিটিং-টিটিঙে সুভাষ কোনো এমন অতিরিক্ত ভঙ্গি করেন না যাতে তিনি একটু বেশি নজরে পড়ে যেতে পারেন। কেউ যদি মঞ্চে তাঁর সঙ্গে কানে-কানে কথা বলে, সুভাষ যেন একটু এড়িয়েই যান। বাংলার মানুষজন তো প্রায় দশ-বার বছর, জেলখাটা ও নির্বাসনের বছরগুলো বাদ দিয়ে, তাকে নেতা হিশেবে মঞ্চে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কারো-কারো কাছে সুভাষ যেন দেশবন্ধুর উত্তরাধিকারী। সুভাষ ও যতীন্দ্রমোহনের প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময়ও দেশবন্ধুর মৃত্যুর আঘাত সুভাষকেই বইতে হচ্ছে বেশি—মনে হত। বাংলায় তো কোনোদিন নেতার অভাব নেই কিন্তু অতীতে বা এখনো কেউ ঠিক সুভাষের মত নন, নেতৃত্ব যাকে কোনো নতুন বৈভব দেয়নি, বরং তিনিই

নেতৃত্বকে বৈভব দিয়েছেন।

জে সি গুপ্ত সুভাষকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কি এখুনি বলবে?' সুভাষ হাত নেড়ে বলেন, 'শুনি একটু'। জে সি গুপ্ত পরবর্তী বক্তার নাম ঘোষণা করেন, 'বঙ্কিম মুখার্জি—'। একটা ছোট হাততালি বাজল। ধুতিপাঞ্জাবিতে দীর্ঘ দেহী বঙ্কিমবাবুকে, বিশেষত তাঁর চুলের বিন্যাসের জন্যই হয়ত, একটু নাটুকে লাগে। তিনি তাঁর জলদমন্দ্রস্বরে যখন কথা বলতে শুরু করেন ও সেই কথার টানেই গলা উঁচু নিচুতে খেলান—তখন নাটকটা আরো জমে যায়। হয়ত এই উপভোগ্যতার জন্যই তাঁর বক্তা হিশেবে জনপ্রিয়তা আছে। বঙ্কিমবাবুর খ্যাতির আর-একটা কারণ তাঁর বক্তৃতার দৈর্ঘ্য। তারসপ্তকে গলা খেলে, সুপুরুষ, গমগমে গলা, এতক্ষণ বলেন—তাঁর তো খ্যাতি হবেই। কিন্তু খ্যাতির প্রধান কারণ—সকলেই জানেন কংগ্রেসের বড় নেতা হলেও আসলে তিনি কমিউনিস্ট।

নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার বললেন বঙ্কিমবাবু পরে। তিনি বলেন—বঙ্কিমবাবুর উলটো ভঙ্গিতে। কোট কেটে। যুক্তিগুলোকে স্পষ্ট করে। যে-কথাটা বঙ্কিমবাবু অনেক ঘুরিয়ে ইঙ্গিতমাত্র করতে পেরেছিলেন এই ভরসায় যে যাঁরা বোঝার ঠিক-কথাটাই বুঝে নেবেন, সেই কথাটাই নীহারেন্দুবাবু স্পষ্ট করে দিলেন যে তাঁরা যে-সামাজিক আদর্শে ও তত্ত্বে বিশ্বাসী তাতে কোনোরকম গুরুবাদ বা ধর্মমতকে স্বীকৃতি দেয়া চলে না, বরং সদাসর্বদা বিরোধিতা করতে হয়। গুরুচাঁদ ঠাকুরের প্রতি সম্মান জানাতে তিনি এসেছেন তাঁর ধর্মমতের কারণে নয়। কারণ একটাই। তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যাদের সেই নমশূদ্র জনগণ, সবদিক থেকে অত্যাচারিত, শোষিত, পীড়িত, সুযোগ বঞ্চিত। হাজার বছর ধরে এই নমশূদ্ররা ব্রাহ্মণ্যধর্মের অস্পৃশ্য। সেই অস্পৃশ্যের জীবনে নেই জমির অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, সামাজিক অধিকার। আমাদের কাছে এই নমশূদ্র সমাজ তাই দেশব্যাপী প্রলেতারিয়েত, সর্বহারার, অংশ। তাদের কিছুই হারাবার নেই। তাঁদের যিনি আশ্রয় দিয়েছেন, নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁকে, ঠাকুর গুরুচাঁদকে, তাই আমরা শ্রদ্ধা করি।

ঠিক মঞ্চ তো নেই—তবু যেখানে প্রধান নেতারা বসেছিলেন, জে সি গুপ্ত, সুভাষ, বিরাট মণ্ডল, রসিকলাল বিশ্বাস, ডাক্তার গঙ্গাচরণ সরকার—তার পেছনে যোগেন, পি আর ঠাকুর, যজ্ঞেশ্বর মণ্ডল এঁরা দাঁড়িয়েও ছিল, এদিকওদিক যাচ্ছিল। নীহারেন্দুবাবু সেই লাইনেই একটা চেয়ারে বসলেন। যোগেন তাঁর পেছনে এসে তাঁর কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলে, 'একে বলে পেরেক ঠোকা কথা, হাতুরির একটা মারও পেরেকের মাথার বাইরে পড়ে নাই। কিন্তু এতটা ক্ল্যারিটি আবার কথাটাকে সোজা কইর‍্যা দ্যায় না তো?'

নীহারেন্দুবাবু একটু হাসলেন। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে যোগেনকে ডাকলেন, যোগেন মাথা নিচু করলে বললেন—'আপনার কথার সেকেন্ড পার্টটা কিন্তু ভাবার কথা—ভাবব, কথা হবে, আপনিও ভাববেন।'

আরো অনেকে বললেন, বললেন কর্পোরেশনের কাউন্সিলার বেগম শাকিনা মৌজিদদাজা, উর্দুতে। যাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আমি এসেছি তাঁকে আমি দেখিনি বা তাঁর কাজকর্মের কথাও আমি জানি না। কিন্তু তিনি যে কত বড় মানুষ ছিলেন, তা তো এই সভা দেখেই বোঝা যাচ্ছে—আপনারা নিজেরাই কত বড়। মির্জা গালিবের একটা শায়ের আছে, মির্জা বলছেন—বড় গাছের তলায় নাকী আর কোনো গাছ জন্মায় না, তাহলে, আল্লা, তোমার ছায়ায় আমরা দুনিয়া জোড়া এত মানুষ আছি কী করে?'

জে সি গুপ্ত বললেন, 'সুভাষ, এবার তুমি বলো। সবাই অপেক্ষা করে আছেন।'

'আমি কিন্তু আপনার কথা শুনব বলে অপেক্ষা করব। সাংবিধানিক দিক থেকে,' সুভাষ উঠে দাঁড়ালেন, সবাই হাততালি দিয়ে উঠল। সুভাষ নমস্কার করলেন ও হাত জোড়া রেখেই সব দিকে তাকালেন, বোঝাতে যে তিনি সবাইকেই নমস্কার জানাচ্ছেন। শ্রোতাদের অনেকে তাঁকে প্রতিনমস্কার জানাল।

সুভাষ একটু চুপ করে থাকেন।

হলেও এতটা নীরবতা যেন সকলের শ্বাস শোনা যায়।

এ-সভার লোকজন এসেছে নানারকম সম্পর্ক থেকে। গুরুচাঁদ ঠাকুরের ভক্ত নমশূদ্ররা এসেছে। এসেছে কংগ্রেসেরও ভিতরে যারা বামপন্থী, তারা, প্রধানত সুভাষের জন্য। শুধু সুভাষকে দেখতেই একটা ভিড় হয়েছে। কংগ্রেসের ভিতরে অনুশীলন-যুগান্তর দলের যে-জেলখাটা রাজবন্দীরা কংগ্রেসের কর্মসূচির মধ্যে নিজেদের বিপ্লবী কাজকর্মের একটা জায়গা করে নিয়েছেন, তাঁরাও এসেছেন, তাঁদেরই প্রার্থী হিশেবে সুভাষ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন। কর্পোরেশনের নেতা ও কর্মীরা এসেছে। ঠাকুর গুরুচাঁদের স্মৃতিসভার মত নিষ্কণ্টক উপলক্ষ আজকাল সচরাচর মেলে না।

কিন্তু আসেনি, নমশূদ্রদের একটি অংশ, মন্ত্রী মুকুন্দ বিহারী ও তাঁর ভাইদের দলবল। এই মিটিঙের খবর সবাই জানার পর কলকাতায় গুজব রটেছে যে কংগ্রেস শিডিউল কাস্টদের ভাগ করে দিতে পেরেছে, বেশিরভাগই আছে কংগ্রেসের সঙ্গে, তাদের নিয়ে আজকালের মধ্যেই কংগ্রেস হক-মন্ত্রিসভাকে ফেলে দেবে। এই গুজবটা দু-চারদিন পাক খাওয়ার পর পালটা গুজব একটা চলতে লাগল—হকশাহেব আরো একজন শিডিউল কাস্ট মন্ত্রী নেবেন, এই সেসনেই, তাহলে সরকার পড়বে না। 'বসুমতী', 'বঙ্গবাসী', 'নায়ক', 'আনন্দবাজার' অমৃতবাজার, অ্যাডভান্স, লিবার্টি ফরোয়ার্ড, সান অব ইন্ডিয়া'—য় সম্পাদকীয় বা মন্তব্য বা চিঠিপত্র বেরতে শুরু করেছে। মন্ত্রিসভা ও আইনসভার 'ইনডিপেনডেন্ট' মুসলিম ও সিডিউল মেম্বারদের ভিতর আঁচ করা শুরু হয়ে গেছে—কী হবে ও তারা কী করবে? মুকুন্দবিহারী যেকরেই হোক, মন্ত্রী থাকতে চান, মন্ত্রিসভা যেমনই হোক, মন্ত্রিসভা নাও থাকতে পারে কিন্তু মুকুন্দবিহারী যেন মন্ত্রী থাকেন। যদি রাজা-গজা বাদ দেয়া যায়, তাহলে শিডিউল কাস্টদের মধ্যে মুকুন্দবিহারী ও উপেন বর্মণের দাবির ওজন সবচেয়ে বেশি—তাদের মত এমএ পাশ কি আর-কেউ আছে। ৩৭-এর ভোটের পর অবিশ্যি বিএ-বিএলদেরও প্রতাপ বেড়েছে।

আজকের এই সভা সরকারবিরোধী সভা—এ বিষয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই। লিগের একজন নেতাও নেই, হিন্দু মিশনেরও নেই। হয়ত ইচ্ছে করেই দুই দলকেই বাদ রাখা হয়েছে। 'বিদ্রোহী' ও 'ইনডিপেনডেন্ট' কৃষকপ্রজার কেউ নেই, হকশাহেবের কৃষকপ্রজারও কেউ নেই। এই মন্ত্রিসভাকে ভেঙে দিলে বা নতুন মন্ত্রিসভা তৈরি হলে কি তার মত প্রাক্তন অনুগতদের কথা মনে রাখে কেউ—এই ধাঁধার জবাব না পেয়ে মুকুন্দবিহারী, তাঁর ভাইদের নিয়ে, তাঁর ভোটের জায়গা খুলনায় আগামীকাল একটা সভা ডেকেছেন। সে সভাও বড়ই হবে—মল্লিকদের নামে, নলিনী সরকারও যেতে পারেন, সেখানে এই সরকারকে সমর্থন দিয়ে প্রস্তাবও নেয়া হবে। ১৩ মার্চ অ্যালবার্ট হলের সভা। ১৪ মার্চ খুলনার সভা।

সুভাষ খুব নিচু গলায় কিন্তু স্পষ্ট উচ্চারণে বলছিলেন। তাঁর একটা ভঙ্গি আছে—একেবারে এখনকার সমস্যা নিয়ে তাঁর মত ব্যাখ্যা করতে-করতে টুপিশুদ্ধু ঘাড়টা একটু পেছনে হেলে—বিশেষ করে গোপনে যদি গান্ধী-সমালোচনা মেশানো থাকে।

'ঠাকুর গুরুচাঁদ ও তাঁর পিতা ঠাকুর হরিচাঁদ সর্বজনশ্রদ্ধেয় এমন মানুষ যে তাঁদের শ্রদ্ধা

জানিয়ে প্রতিদিনই আমরা দিন শুরু করতে পারি। এঁদেরই বলে প্রাতঃস্মরণীয়। মিটিং ডেকে আয়োজন করে একদিন তাঁদের স্মরণ করে, বাকি ৩৬৪ দিন তাঁদের ভুলে থাকার মত মানুষ তাঁরা নন। গুরুস্থানীয়দের এই দুই ভাগ করা যায়—এক দল নিত্যকর্মে স্মরণীয় আর-এক দল জীবনকর্মে স্মরণীয়। কিন্তু এই দুই ভাগের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, যিশু খ্রিস্ট, মোহম্মদ, রামানুজ, এঁরা আমাদের জীবনের নীতি শেখান—যেমন, যতমত তত পথ, বীরবাণী, অহিংসা, শরিয়ত, বৈষ্ণবধর্ম। আর-এক ভাগে যাঁরা তাঁরা আমাদের নিত্যকর্ম মনে করিয়ে দেন—চৈতন্য, নিত্যানন্দ, হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ, বুদ্ধদেব, মহাবীর। এঁরা আমাদের শিক্ষা দেন—হরির্নামৈব কেবলম্, হাতে কাম-মুখে নাম, নির্বাণ, অহিংসা করুণা।

'আমরা ভারতীয়রা, অবতারে বিশ্বাস করি। পাশ্চাত্য দর্শনে সেই অবতাররূপী মানুষকেই বলা হচ্ছে ''সুপারম্যান।'' গুরুচাঁদ ঠাকুর ছিলেন একজন অবতার, সুপারম্যান। তিনি বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে নবজীবন সঞ্চার করেছেন। তিনি তপশিলভুক্ত জনগণকে উন্নত করেছিলেন যাতে তারা রাজনীতিতে ও সমাজে বর্ণহিন্দুদের সমতুল্য হয়ে উঠতে পারে।

'বর্ণহিন্দু ও তপশিলভুক্ত হিন্দুরা মিলেই অখণ্ড হিন্দুসমাজ তৈরি হয়েছে। তাদের মধ্যে বস্তুত কোনো পার্থক্য নেই। ভারতীয়দের ক্রীতদাসে পরিণত করা হয়। ভারতীয়রা একটা পরাধীন জাত, অনগ্রসর, অত্যাচারিত, আক্রান্ত ও পরাজিত জাত। আপনারা শিডিউল কাস্টদের 'অনগ্রসর' জাতি বলবেন না, কারণ আমাদের পুরো জাতিটাই 'অনগ্রসর', 'ডিপ্রেসড'। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থরাও কোনো ব্যতিক্রম নয়। স্বাধীনতা পেলে এই সব প্রভেদপার্থক্য লুপ্ত হয়ে যাবে।

'আমাদের এই সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুপ্ত। তাঁর আইনজ্ঞানের ওপর ভর করে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের অনেকগুলি ধারা এখনো সক্রিয় থাকতে পারছে। আমি তাঁর কাছ থেকে এই তপশিলভুক্তির আইনি তাৎপর্য একটু জানতে চাই।'

জে সি গুপ্ত ছিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের খুবই ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। ফলে, সুভাষ ও তাঁর মধ্যে একটু আড় থাকা স্বাভাবিক। অনেকদিন যোগাযোগ নেই—সুভাষ হয় জেলে নয় বিদেশে। সুভাষ চান সেই আড়টা কাটাতে।

'সাধারণত সভাপতিই বলে দেন কী বিষয়ে বলতে হবে। যদিও আমি এ-সভার সভাপতি, তবু, সুভাষই আমাকে বলে দিয়েছে, কী বলতে হবে। আমি তার কথা মেনে নিচ্ছি। কারণ সে এখন আমাদের জাতির সভাপতি, সে দেশের রাষ্ট্রপতি, তার নির্দেশ আমাদের সকলকে কোনো প্রশ্ন না তুলে মানতে হবে।' এত জোরে হাত তালি ওঠে—জে সি গুপ্ত হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকেন। একবার সুভাষের দিকে তাকিয়ে তাকে দাঁড়াতে ইঙ্গিত করলে সুভাষ জোড় হাতে দাঁড়ান ও সবাইকে শান্ত হতে বলে দু-হাত তোলেন।

'কথাটা সুভাষ তুলেছে বলে বলছি বটে কিন্তু কথাটা এই মুহূর্তে আমার কাছে খুব জরুরি মনে হচ্ছে—আইনের দিকে থেকে ও রাজনীতির দিক থেকে।'

'আপনাদের অনেকেরই নিশ্চয় মনে আছে যে দ্বিতীয় রাউন্ডের গোলটেবিল বৈঠক গান্ধীজি উদ্বোধন করেছিলেন ও তিনি বলেছিলেন—আমাদের তো ডাকা হয়েছিল স্বাধীন ভারতের সম্ভাব্য সংবিধান নিয়ে মতবিনিময় করতে। এসে দেখছি, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তাঁদের পছন্দ ও সুবিধে মত একটা ভারত সাজিয়ে রেখেছেন। তাঁর এই কথার মধ্যে ইঙ্গিত ছিল আগা খাঁর প্রতি, শিখদের অনেক রকম প্রতিনিধির প্রতি, দক্ষিণ ভারতের জাতপাতের প্রতিনিধিদের প্রতি এবং ডক্টর আম্বেদকরের নেতৃত্বে ভারতের অস্পৃশ্য জাতিগুলির প্রতিনিধিদের প্রতি। তখন যাদের বলা হত, অচ্ছুৎ-জাত, পরে তাদের বলা হতে লাগল, 'অনুন্নত জাত', 'অবনত জাত।' এসব

নামে গান্ধীজির খুব আপত্তি ছিল, উনি বলেছিলেন, 'এইসব নাম দিয়ে ওদের হিন্দুসমাজ থেকে আলাদা করা হচ্ছে কেন—ওরা তো হিন্দুসমাজেরই ওতপ্রোত অংশ। তিনি এদের নাম দিলেন, 'হরিজন' ও একটা 'হরিজন সেবা সংঘ'ও তৈরি করলেন। গান্ধীজির কথাতে আমরাও কান দেইনি, অনগ্রসর শ্রেণীও কান দেননি। সম্ভবত ব্রিটিশরাই কান দিয়েছিল। তাই ম্যাকডোন্যাল্ড কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ডে একটা কাগজের শিটে এই জাতগুলির একটি তালিকা জুড়ে দিলেন। এই কাগজের শিটটাকে বলে শিডিউল। কিন্তু শাহেবদের রাজ্য-শাসনের জন্য, আমাদের প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের জন্য ও রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য একটাই কোনো নাম তখন দরকার হয়ে পড়েছিল। তাই আমরা সবাই ঐ জাতের নামের লিস্টিটাকেই তাদের জাতের নাম বলে ধরলাম। আমরা বলতে লাগলাম, শিডিউল কাস্টটাই একটা জাত, ও যাদের নাম ওখানে নেই তাদেরও আমরা শিডিউল বলেই বলতে লাগলাম। বলা যায়, শূদ্র বা চণ্ডাল বা চাঁড়াল থেকে ডিপ্রেসড, সাপ্রেসড, ব্যাকওয়ার্ড, আনডেভালোপড হয়ে আমরা শিডিউল কাস্টে এলাম।

'সুভাষ আমাকে আইনের দিকটা নিয়ে বলতে বলেছে—'

সুভাষ জে সি গুপ্তের দিকে তাকিয়ে বলেন—'সাংবিধানিক দিকটা—।'

'ঠিকই। আইনের দিকটা পরিষ্কার। সরকার তো বলবে, কয়েকটি জাতকে আমি কতকগুলি সুবিধে দিতে চাই। সেই জাতগুলির নাম আমি জানিয়ে দিয়েছি। যেমন, ইনকাম ট্যাক্স বা এক্সাইজ ট্যাক্স বা এক্সপোর্ট ট্যাক্সে বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী ট্যাক্স হয়, এখানেও তেমনি বিভিন্ন জাত-অনুযায়ী ঠিক হয়েছে নির্বাচনের ভিত্তিতে বিভিন্ন বোর্ড বা আইনসভায় জাত-অনুযায়ী প্রার্থীর অনুপাত কী হবে। সরকার বলবে, এটা আমার অধিকারের মধ্যে পড়ে। কারো এটা ভালো লাগতে পারে, কারো খারাপ লাগতে পারে কিন্তু এটা ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাশ করা আইন। গান্ধীজি এই আইনের বিরুদ্ধে অনশন করেছিলেন ৩২ সালে। সেই অনশনে আইন বাতিল হল না কিন্তু পুনা প্যাক্ট সই হল কতকগুলি সংশোধনের প্রস্তাব দিয়ে। সরকারও সেটা মেনে নিলেন, গান্ধীজিও কিন্তু মেনেই নিলেন, আইন অমান্য করলেন না। সাংবিধানিক দিক থেকে ধীরে-ধীরে একটা অসুবিধে পাকিয়ে উঠবে। সরকারই হোক, বা কোনো রাজনৈতিক দলই হোক, বা কোনো ব্যক্তিই হোক এই শিডিউল বা তালিকাকে ধরে একটা জাতীয় গ্রুপ বা পার্টি তৈরি করে না তোলে। আইনটা হচ্ছে রিজার্ভেশন নিয়ে। কিন্তু তালিকাগুলো মানে শিডিউলগুলি তো এক-এক রকম। যেমন ১৯০৯ সালের আগে মুসলমানদের বিশেষ সুবিধে বলে কিছু ছিল না। হিন্দুদেরও ছিল না। তবে এ-কথা স্বীকার না-করলে অত্যন্ত ভুল করা হবে যে নানা ঐতিহাসিক কারণে ইংরেজ সরকারের ব্যবস্থাগুলির সুযোগ হিন্দুরাই নিতে পেরেছিল বেশি। মুসলমানদের বঞ্চিত করে নয়। নিজেদের অধিকারে। তেমনি এটাও স্বীকার না-করা ভয়ংকর ভুল হবে যে সারা ভারতের সমস্ত প্রদেশে সেই একই সুবিধেগুলি মিলে মুসলমানদের নিজেদের একটা জাতীয়তাবাদ ও পার্টি তৈরি করার চেষ্টা চলছে। এই শিডিউল বা তালিকা থেকেও তেমনি বর্ণহিন্দুদের বাইরে যে-হিন্দুরা ছড়িয়ে আছেন তাঁরা একটা শিডিউল কাস্ট পার্টির দিকে চলে না যান। কথাটা খুব অবাস্তব যে নয় তা বম্বের দিকে তাকালে আমরা বুঝতে পারব। আম্বেদকারের নেতৃত্বে সেখানকার অবর্ণহিন্দুরা শেষ গোল টেবিলে তাঁদের দাবিপত্র হাজির করেছিলেন। এর প্রতিকার কী? যাতে হিন্দু, মুসলমান, শিখ এই সব ধর্মের বিকাশের সঙ্গে জড়িয়ে যে-আসাম্যগুলিও যুগ-যুগ ধরে জমে উঠেছে, সেসবের প্রতিকারের শর্টকাট হিশেবে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে ধর্মের ভিত্তিতে নতুন-নতুন জাতীয়তাবাদ তৈরি না-হয়। কিন্তু তাহলে এই যাঁরা হিন্দুধর্মের অন্তর্গত থেকেও বর্ণভেদ, কর্মভেদ, অধিকারভেদ, জলচলভেদের শিকার হয়ে আছেন, তাঁরা তাঁদের

দুরবস্থা কী করে জানাবেন?

'সুভাষ সাংবিধানিক যে-সমস্যার কথা জানতে চাইছে তার উত্তরে এটুকুই মাত্র আমার বলার আছে যে একটি সম্প্রদায় নিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত থেকে এই ধর্মীয়-সামাজিক অব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সংগ্রাম করতে হবে। বর্তমান ভারতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ছাড়া আর-কোনো সম্প্রদায় নিরপেক্ষ সর্বভারতীয় পার্টি নেই। কংগ্রেসের নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি স্বয়ং এই সভায় এসে গুরুচাঁদ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন ও নিম্নবর্ণ হিন্দুদের কংগ্রেসে আহ্বান করলেন। এটাই সময়োচিত রাজনৈতিক কর্মসূচি।

'আর-একটা কথা বলে আমি শেষ করব। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের এই সমস্যা মহাত্মাজির মত করে আর-কেউ বুঝে উঠতেই পারেননি। তিনি নিজেকে নিষ্ঠাবান ও বিশ্বাসী হিন্দু বলে পরিচয় দিয়েছেন। তিনি সবচেয়ে স্পষ্টভাষায় বলেছেন—হিন্দু সমাজের একটি বড় অংশের মধ্যে এই সংকট দেখা দিয়েছে উচ্চবর্ণ হিন্দুদের পাপে ও অপরাধে। গান্ধীজি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, তিনি বর্ণভেদে মানেন। কিন্তু সেই বর্ণভেদে বিশ্বাসের সঙ্গে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা অস্পৃশ্যতা, পংক্তি ভোজন, জল-অচলকে মিশিয়ে দিয়েছেন, সেটা তিনি মানেন না। তাই তিনি অন্ত্যজদের নতুন নাম দিয়েছেন। 'হরিজন'। সেই নামে কাগজ বের করেছেন।' হরিজন সেবা সঙ্ঘ' গঠন করছেন। সমস্ত মন্দিরে অন্ত্যজদের প্রবেশাধিকার আছে বলেছেন। বলেছেন যে-মন্দিরে অন্ত্যজদের ঢুকতে দেয়া হয় না, সে মন্দিরে ভগবান নেই।'

জে সি গুপ্তের বক্তৃতা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে হাততালি যে-উঠল না তার কারণ, তিনি যে শেষ করলেন তা বোঝা গেল তিনি চেয়ারের দিকে ঘোরার পর। সুভাষ দাঁড়িয়ে উঠে দুই হাত উঁচু করে হাততালি দিলেন। তবু সে-হাততালিকে স্বতঃস্ফূর্ত বোধহয় বলা যায় না। সবাই নিজের মত হাততালি হয়ত দিয়েছেন কিন্তু অন্যের সঙ্গে মেলাতে পারেননি।

শ্রোতারা নেমে যাচ্ছিলেন বঙ্কিম চ্যাটুজ্যে স্ট্রিটের দিকের বা সংস্কৃত কলেজের দিকের সিঁড়ি দিয়ে আর নেতারা নেমে যাচ্ছিলেন কলেজ স্ট্রিটের দিকের বা প্রেসিডেন্সি কলেজের দিকের সিঁড়ি দিয়ে। যাঁরা প্রথম দিকে বসেছিলেন, তাঁরাও নামছিলেন নেতাদের পিছু-পিছু।

জে সি গুপ্ত ফুটপাথে নেমে, দাঁড়িয়ে সুভাষের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাকে আবার করে ধরবে?' 'সে তো আপনি জানবেন, নইলে জামিন মুভ করবে কে?' 'তোমার নিজের বাড়িতে অমন ডাকসাইটে ব্যারিস্টার থাকতে তোমাকে জামিন মুভের কথা ভাবতে হবে? আমি ঠিক বুঝতে পারি না সুভাষ, শাহেবরা তোমাকে অতিরিক্ত ভয় পান বলেই কি তিন নম্বর রেগুলেশন ছাড়া তোমাকে ধরে না?' জে সি গুপ্তের কথা বলা আর ভাষণ একেবারে আলাদা। কথা বলার সময় একটু তাড়াতাড়ি কথা বলেন, একটু তোতলান, তোতলামিটাকে একটু স্টাইলাইজও করেন আর ভাষণের বা আর্গুমেন্টের সময় কোনো তোতলামি নেই, একেবারে সোজা, টানা, কঠিন কথা। জেরা করার সময় তিনি তোতলালে ও ভেঙে-ভেঙে বললেই বুঝতে হয়—এবার তিনি সাক্ষীকে সাঁড়াশি প্যাঁচ দিচ্ছেন। চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের একটা মামলায় চট্টগ্রামের কমিশনার নেলসনকে জেরার শুরুতেই জে সি গুপ্ত নাকী ওরকম তোতলিয়ে জিগগেস করেছিলেন, 'আপনি কি এ-বিষয়ে নিশ্চিত যে আপনিই মিস্টার নেলশন?'

নেলশন কাঁধ ঝাঁকিয়ে জবাব দিয়েছিল, 'আপনি কি আমাকে চেনার জন্য আমারই ওপর নির্ভরশীল।'

জে সি গুপ্ত নাকী তখন আরো তোতলিয়ে ও হেসে বলেছিলেন, 'কী করে বুঝতে পারলেন, বলুন তো' তাহলে আপনি নিশ্চয়ই নেলশন। কিন্তু চট্টগ্রামের কমিশনার নেলশন নিশ্চয়ই নন।

বরিশালের যোগেন মণ্ডল

আপনি নিশ্চয়ই বিখ্যাত ডিটেকটিভ লেখক, ও আমার সবচেয়ে প্রিয় লেখক নেলশন। অবিশ্যি যদি আপনি নেলশনই হন।

জে সি গুপ্তের কথায় কোনো নাটক থাকে না, তাঁর কোনো মতলবও ধরা যায় না। এমন কী তাঁকে চালাকচতুরও ঠেকে না। ফলে কমিশনার নেলশন ভেবে বসে সত্যি কিছু গোলমাল হচ্ছে। সে বেশ আন্তরিক ভাবেই বলে, 'তার প্রথম নামটা বলবেন, আপনার ডিটেকটিভ লেখক নেলশনের?'

জে সি গুপ্তের একটা ভঙ্গি ছিল, বাঁ-হাতের আঙুল দিয়ে কপালেরা শিরা চেপে ধরা—যেন কিছু মনে আনার চেষ্টা করছেন। তাঁর ঘনিষ্ঠরা জানতেন—ওটা তাঁর রিভলবারের ট্রিগার টেপার ভঙ্গি, 'দুঃখিত। মনে পড়ছে না ঠিক। কিন্তু আমি ওঁর শেষ রহস্য-উপন্যাসের নামটা বলতে পারি। বইয়ের নামটা একটু অদ্ভুত—সেই জন্যই মনে থেকে গেছে—অফিসিয়্যাল রিপোর্ট অব ইনকোয়ারি অব চিটাগাং রায়টস।'

শুনে শাহেব ভড়কেই যায়। জেরায় এমন প্রশ্নের ইতিহাস লম্বা। ঘটনাটা এরকম। চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার বিপ্লবীরা লুট করেন ১৮ এপ্রিল, ১৯৩১। চারদিন চট্টগ্রাম স্বাধীন। তার পর যা হওয়ার তাই হয়েছে। বিপ্লবীরাও সেটা জানতেন। সেটা হাওয়ানোর জন্য চার লঞ্চ ভর্তি সেনা আনতে হয়েছিল কলকাতা থেকে। ২২ এপ্রিল সেনাদের যুদ্ধ করতে হয়েছিল বিপ্লবীদের সঙ্গে।

এমনিতেই ঘটনাটা শাহেবদের পক্ষে লজ্জার। চট্টগ্রামের মত একটা বিভাগীয় সদরে এই ঘটনা ঘটে গেল, অথচ তারা তার বিন্দুবিসর্গ টের পায়নি। সারা দেশের ইয়োরোপীয়রা এতই ভয় পেয়ে যায় একটি কাগজে লেখা হয়—আমরা কি সিপাহি বিদ্রোহের প্রথমাঙ্কের জন্য তৈরি থাকব? কিন্তু চট্টগ্রামের প্রশাসন, বাংলার গভর্নর ও ইংরেজদের পক্ষে আরো লজ্জার ঘটনা ঘটতে থাকল এর পরে। হাজার চেষ্টা করেও পুলিশ কোথাও থেকে কোনো সূত্র জোগাড় করতে পারছে না। হিন্দু-মুসলমান সবাই ঠোঁটে তালা আটকে আছে। কেউ সামান্য কোনো আঁচও দিচ্ছে না।

অথচ বিপ্লবীদের সশস্ত্র অভিযান চলছে তো চলছে। ১৯১৯ থেকে ২৯ দশবছর ঘটেছে ৪৭টি অ্যাকশন, আর এক ১৯৩০-এই ৫৬টি—রাইটার্স বিল্ডিংস আক্রমণসহ। ঢাকা-কুমিল্লায় শাহেব খুন হয়। ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট ভার্গো শাহেব কোনোক্রমে প্রাণে বেঁচে যায়। মেদিনীপুরে ম্যাজিস্ট্রেট এলেই খুন—পেডি, ডগলাস, বার্জ। শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী দুটি স্কুলের মেয়ে কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে। টেগার্টের ওপর বোমা পড়ে কিন্তু টেগার্ট বেঁচে যায়। ঢাকায় পুলিশের বড় শাহেব লোম্যান মারা যায় গুলিতে। সেখানেই হাডসন জখম, জখম। কলকাতায় এক ব্যবসায়ী শাহেব ও 'স্টেটসম্যান'-এর সম্পাদক, ভিলিয়ার্স আর ওয়াটসন বোমা খেয়েই জাহাজে উঠে দেশে পালায়। বিখ্যাত টেগার্টও প্রাণভয়ে কেটে পড়ল। আলিপুরের জজ গার্লিক গুলিতে মরে। দিনদুপুরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হল গটগটিয়ে গিয়ে বীণা দাস সবার সামনে গুলি মারল লাটশাহেব জ্যাকসনকে। দার্জিলিঙে ছোটলাট অ্যান্ডারসনকে গুলি করে স্কুলের ছাত্র ভবানী ভট্টাচার্য। তার প্রধান সহায়ক ছিলেন আর-এক ছাত্রী—উজ্জ্বলা মজুমদার।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর ইয়োরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করলেন প্রীতিলতা।

কোনো-কোনো ঘটনায় বিপ্লবীরা ঘটনাস্থলেই গুলিতে বা সায়ানাইড খেয়ে মারা যান। কোনো-কোনো ঘটনায় বিপ্লবীরা ধরা পড়ে, তাদের বিচার ও ফাঁসি হয়। কিন্তু সেইসব ঘটনায় দেখা গেল বিপ্লবী সংগঠনের শিকড় চলে চলে গেছে স্কুলকলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আর গেরস্থ পরিবারের একেবারে হেঁসেলে। পুঁটে নামে এক বিপ্লবী মেয়ে আর এক বিপ্লবীর মিছিমিছি বৌ সেজে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের চার সেনাপতিকে নিয়ে চন্দননগরে বাসাবাড়ি করে সংসার করতে

লাগল। পুলিশ একদিন ঘিরে ফেললে গুলির যুদ্ধ শুরু হল। পুঁটেও বন্দুক ধরল। বঙ্গের গভর্নর হটসন এসেছিলেন ফার্গুশন কলেজ পরিদর্শনে। কলেজের এক ছাত্র তাঁকে গুলি করে দিল। বঙ্গের কাছে মাস্ডোয়া রেল স্টেশনে তিন বিপ্লবী মারাত্মক আক্রমণ করল লেফটেনান্ট হেক্সট্‌কে।

এইসব ঘটনাই ঘটে চলেছে চট্টগ্রাম বিদ্রোহের আগে পরে। কিন্তু পুলিশ কোনো একটা ফাঁক পাচ্ছে না—নেতাদের ধরবার।

এদিকে, ১৮ এপ্রিল ১৯৩০-এ যে-বিদ্রোহ হয়েছে ১২ সপ্তাহের মধ্যে তার চার্জশিট না দিলে তো সরকারি মামলা ফেঁসে যাবে। তখনো বেশির ভাগ নেতাই ধরা পড়েননি। ধরাপড়া তো দুরের কথা, কোনো হদিশই করতে পারছে না সর্বোচ্চ ব্রিটিশ শক্তি। অগত্যা অপ্রস্তুত সরকার বাধ্য হল মামলা রুজু করতে ১৯৩০-এরই ২৪ জুলাই। সেই মামলা যখন চলছে, তার মাধ্যই এক ফুটবল খেলার মাঠে স্কুলের এক ছাত্র, হরিপদ ভট্টাচার্য, হেঁটে এসে চট্টগ্রামের পুলিশ-সুপার আহ্‌সানউল্লাকে গুলি ছুঁড়ে মেরে ফেলল ৩০ আগস্ট ১৯৩১।

পুলিশ-প্রশাসনের উচ্চতম অফিসাররা সম্পূর্ণ এক নতুন উপায় ব্যবহার করে ফেলল। তারা এই হত্যা থেকে হিন্দুবিরোধী দাঙ্গা শুরু করে দিল। পুলিশরাই লুটপাট, আগুন-লাগানো, হিন্দুদের বাড়িঘর ভেঙে ঢোকা, যে-কোনো বয়সের কাউকে হিন্দু সন্দেহে মারা—এইসব হাঙ্গামা বাধিয়ে তারপর তাদের নির্দেশ মত গুণ্ডারা ও লুঠেরারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। আহসানউল্লাকে হত্যা করা হয় সন্ধে ছটায়, ৩০ আগস্ট। রাত দশটার মধ্যে পুলিশ শহরের দাগিদের জড়ো করে ফেলে। তারা সকলই মুসলমান নয়। কিন্তু তাদের শুধুই হিন্দুদের ওপর লেলিয়ে দেয়া হয়। তিনদিন ধরে চলে এই আক্রমণ। প্রশাসন থেকে রটিয়ে দেয়া হয়, তাদের একজন ইমানদার লোককে খুন করায় মুসলমানরা খেপে গেছে। চট্টগ্রাম থেকে ৫০ মাইল দূরের গ্রামে আর মুসলমানদের শিখণ্ডী করার দরকার হয়নি। শাহেবরা তাদের নিজেদের ইউনিফর্মেই ইস্টার্ন রাইফেলসের গোর্খা বাহিনীকে নিয়ে গ্রামের পর গ্রাম আগুন লাগিয়ে ছাই করতে করতে যাচ্ছিল—হিন্দু-মুসলমান বাছাবাছি না-করে।

ঘটনাটা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে যারা কোনোভাবেই কোনোরকম রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নয় ও ইংরেজ শাসনের পক্ষে—তাঁরা পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন। সরকার আর পুলিশ যদি প্রকাশ্যে দাঙ্গা করতে পারে, তাহলে বাঁচাবেই-বা কে, শান্তিশৃঙ্খলাই-বা রাখবে কে। যেভাবেই হোক, ঘটনাটার খবর লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস পর্যন্ত পৌঁছুল ও ভারত সচিব অস্বস্তিতে পড়লেন যে পার্লামেন্টে যদি কোনো ভারতবন্ধু এমপি কথাটা তোলেন তিনি কী বলবেন। তিনি ভাইসরয়কে, ভাইসরয় বাংলার লাটশাহেবকে ও লাটশাহেব চট্টগ্রামের কমিশনার নেলশনকে জানালেন—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা অফিসিয়াল এনকোয়্যারি করে তার রিপোর্ট ইন্ডিয়া অফিসে, ভাইসরয়কে ও লাটশাহেবকে পাঠাতে। ভারতসচিব তাঁর চিঠিতে বলেছিলেন—ঘটনার পদ্ধতি ও ধারা অনুসরণ করে আমার সন্দেহ হয়েছে যে কোনো-না-কোনোভাবে প্রশাসন ও পুলিশ এই দাঙ্গার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল, এই বিষয়টা বিশেষ করে জানা দরকার। নেলশনের পুরো রিপোর্টটাই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, প্রশাসন ও পুলিশের সাফাই। সে-সাফাইও এতটা নিলর্জ্জ ছিল যে তার ফাঁক দিয়ে সেই সত্যটা আরো সত্য হয়ে উঠছিল যেটা সে চাপা দিতে চাইছিল—কবর চোররা যেমন সামাল দিতে চায়। লন্ডন, দিল্লি বা কলকাতায় এ-রিপোর্ট এমনকী নিয়ন্ত্রিত ভাবেও প্রকাশ করা হয়নি। তবু একটু-আধটু জানাজানি হয়ে যায় ও একটা আনঅফিসয়্যাল কমিটি অব এনকোয়্যারি তৈরি হয়।

চিটাগাং সংক্রান্ত একটি মামলায় নেলসনকে জেরা করতে গিয়ে সেই অফিসিয়্যাল

রিপোর্টটাকে ইঙ্গিত করেই নেলসনকে বলেছিলেন—রাইটার অব ক্রাইম অ্যান্ড ডিটেকটিভ ফিকশনস।

যেমন মুখে-মুখে গল্প ছড়ায়, জে সি গুপ্তকে নিয়ে এই গল্পটা তেমনি চলেই আসছে।

এতটা ইতিহাস উড়িয়ে সুভাষ জে সি গুপ্তকে বলেন, 'আমার তো উলটোটা মনে হয়। পাছে আপনার বা মেজদার জেরায় পড়তে হয় সেই ভয়ে তিন আইন ছাড়া আমাকে ধরে না—যমের মত ছিঁড়ে নেয়।'

'তুমি তো নচিকেতা সুভাষ, যম তোমার কী করবে? ঠিক আছে। চলি। তুমি?' জে. সি. গুপ্ত হঠাৎ করে কথাটা বলে ফেলে লজ্জা পেয়ে যান। সুভাষও একটু অপ্রস্তুত।

'আমার গাড়ি আছে। আপনি এগন', বলে এগিয়ে সুভাষ জে সি গুপ্তের গাড়ির দরজা খুলে ধরেন ও জে সি গুপ্ত 'থ্যাঙ্কস' বলে ভিতরে ঢুকে গেলে সুভাষও দরজাটা ঠেলে দেন, জে সি গুপ্তও টেনে নেন। ড্রইভার হ্যান্ডেল নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়েছিল স্টার্ট দিতে।

অনেকেই দাঁড়িয়েছিল, যোগেনও। সুভাষ তাদের কাছে যেতেই সুভাষের বয়সী এক ভদ্রলোক, ফতুয়া গায়ে, পাট করে চুল আঁচড়ানো, নামস্কার করে বললেন, 'মা পাঠালেন। আমাদের বাড়িতে একটু যেতে হবে। আমাকে কি চিনতে পারলেন?'

'সে কী কথা! আপনি তো অভয়দা, মেজবৌদির দাদা। হ্যাঁ, এখানে এসে মাঐমাকে একটা প্রণাম না করে চলে যাওয়াটা ঠিক না। চলুন,' বলে সুভাষ দু-পা গিয়ে পেছন ফিরে অপেক্ষমাণদের বললেন, 'আমি চলে যাব, একটু মেজবৌদির পিত্রালয়ে দেখা করে যাই। এই দু-পা গেলেই। শ্যামাচরণ দে মশায়ের বাড়ি। আপনারা আর মিছিমিছি অপেক্ষা করবেন কেন?' সুভাষ তাঁর অভয়দার সঙ্গে এগিয়ে যান।

যাঁরা দাঁড়িয়েছিল, তার মধ্যে যোগেন তো ছিলই, রসিককৃষ্ণ বিশ্বাসও ছিলেন। আর ছিল অ্যালবার্ট হলের লাইব্রেরিয়ান প্রসন্ন দাস। কংগ্রেসের নেতা, উত্তর কলকাতা কমিটির প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারি, সুরেশ মজুমদার ও হেমন্ত বোসও ছিলেন। সুরেশবাবুই বললেন, 'তাহলে, আমরা আর দাঁড়িয়ে থাকি কেন? চলু—ন।' বলেই তিনি রাস্তা পার হয়ে ট্রামস্টপে দাঁড়ালেন। তাঁর সঙ্গে হেমন্তবাবুও।

রসিক কৃষ্ণ বললেন, 'তোরা দুইজন কি জোড়ায় ধরে-লক্ষ্মণ হইয়্যা খাড়ায়্যা থাকবি।'

'আপনার কি তাড়া আছে কাকা। তিন পা ফেললেই তো বাড়ি। না কী বুড়া বয়সের দোষ ধইরছে?'

'তুই তো বুড়া হস নাই যোগেন, বুড়া হওয়ার রস তুই বুঝবি ক্যামনে? তাগো বয়সে আবার রসারসি কীসের রে? সব তো তোগো খড়ি—ঢোকানোর কাম। আখার তাপ বাড়াও আর কড়াই নামাও। ওডা তো মহোচ্ছবের খাওয়া রে। বুড়া না হইলে কি কম আঁচে রান্নার স্বাদ মেলে রে?'

'প্রসন্ন আর যোগেন জোরে হেসে ওঠে। দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জায়গাটা একটু অন্ধকার ও নির্জন হয়ে গেছে। উলটোদিকের ট্রামবাস স্টপে তবু লোকজন আছে—শ্যামবাজারের দিকে যাওয়ার। ওয়েলিংটন, ওয়েলেসলি, পার্ক সার্কাসের ট্রামবাসের স্টপ, হ্যারিসন রোড পেরিয়ে।

'তোরা কি সুভাষবাবুর লগে খাড়াইয়্যা আছিস, বিদায় দিওয়ার লগে? তাইলে, ঐ দিকের রাস্তায় চল্, শরৎ বোসের শ্বশুর বাড়ির রাস্তায়' বলে রসিক হাঁটা শুরু করে দেন।

'কাকা, আমাগো সমাজের কারো কওয়া উচিত ছিল না?' যোগেন জিজ্ঞাসা করে।

'তা কইলেই পারতি। না কইরল কেডায়? প্রথম তো কইল—'

'আরে ওনার ঠাকুর্দাকে নিয়্যা মিটিং। সেডা তো কইবেনই। সেডা তো আমাগোর কথা কওয়া না। আপনার বা বিরাট কাকার কওয়া দরকার ছিল। বিরাট কাকা তো ব্যস্ত—'

'দ্বিতীয় বিয়্যা বসতেও কি ব্যস্ত হওয়ার লাগে। তাইলে আমি ওর মইধ্যে নাই।'

'আপনারে তো কেউ ডাকে নাই, কাকা, ব্যস্ত হওয়ার লগে দুই-নম্বর বিয়্যার লগ্ন আইস্যা পইড়ল। আপনার ঘরে তো বাইন্ধ্যা রাইখছেন দক্ষের মাইয়ারে আর হিমালয়ের মাইয়ারে, এক অঙ্গে। আর নিজে হইয়া আছেন রসিক নটবর। দুই নম্বর বৌ পাইতে তো আপনার বিয়া লাগে না।'

রসিক বেশ জোরে হেসে উঠে বলেন, 'এইডা জবর কইছিস। একই বৌরে দুইবার বিয়্যা করা—ভাবনাডা ক্যামন ভাইবছিল, ক? কী প্রসন্ন। ডিফারেন্সডা দ্যাহো—প্রথম বিয়্যার আগে গৌরীর লজ্জা য্যান আর কাটে না রে, লীলা-কমল পত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী। আর দ্বিতীয়বার বিয়্যার সময় তো এক্সপিরিয়েন্সড। শুভদৃষ্টি হইল কি হইল না, শিবের সিদ্ধি ঘোঁটা দেইখ্যা আর শিবের পরন নাই দেইখ্যা কোমরে আঁচল বাইন্ধ্যা দিল এক চিক্কুর, সিদ্ধি তো ঘুটাইল্যা, ছাঁকতা কী সে, পাছায় তো বস্ত্র নাই।'

ওদের হাসি শুনেই উলটো ফুটের বড় দরজা থেকে সুভাষবাবু বলেন, 'এত হাসি, আমরা একটু পাই না?' ওরা গাড়ির দিকে এগয়। ওদিক থেকে সুভাষবাবুকে এগিয়ে দিচ্ছেন, আত্মীয়জনেরা।

সুভাষ গাড়িতে উঠে বসলে, দরজা বন্ধের আওয়াজ হলে ও ড্রাইভারের প্রথম হ্যান্ডেল মারার পরপরই এদিকের জানলায় মুখ রেখে প্রসন্ন বলে, 'এক আপনি আসতেই সভাটা কেমন সুন্দর হয়ে গেল। আমাদের কথা একটু মনে রাখবেন।' সুভাষ প্রতি নমস্কার করতেই প্রসন্ন সরে যায়। যোগেন জানলায় এসে বলে, 'এই একটা তেল আপনাকে দিচ্ছি। রাইতের স্নানের আগে অনেকক্ষণ ধইর‍্যা মাথার মইধ্যখানে বসাইয়া নিবেন, অনেকক্ষণ ধইর‍্যা। ঘুম হইব্যার পারে, এডডু সর্দিও হবার পারে—'

সুভাষ বলে ওঠেন, 'আপনি তো কাছেই থাকেন? গাড়িতে উঠে আসুন-না।' সুভাষ নিজেই দরজা খুলে দেন। যোগেন ভিতরে ঢুকে বন্ধ করতেই গাড়ির চাকা ঘোরে। সুভাষ বাইরে একঝলক তাকিয়েই বলে ওঠেন, 'এই দাঁড়াও, দাঁড়াও, ওখানে কি রসিকবাবু দাঁড়িয়ে?'

'হ্যাঁ। ডাকব?' জিজ্ঞাসা করে যোগেন জানলায় গলা বাড়িয়ে ডাকে, 'কা—হা—।'

রসিকলাল এসে জানলায় নমস্কার করে দাঁড়াতেই সুভাষবাবু প্রতিনমস্কার করে বলেন, 'আপনি দেখা দিচ্ছিলেন না-যে!'

'না, ছিলাম তো মিটিঙে। আলাদা আর দেখা করিনি। চিনতে পারবেন কী পারবেন না—'

'সে কথা ভাবলেন? পলিটিকস বাদ দিন—আপনি তো আমার কলেজের অ্যালামনি। সেই থার্টির ডিসেম্বরে কলেজের সেনটিনারিতে দেখা হল না? আপনি তো আমাদের এক্স-স্টুডেন্টস অ্যাডড্রেসে নতুন পয়েন্ট দিয়েছিলেন। আপনি এখন থাকেন কোথায়?'

'বৈঠকখানায়—'উত্তর দেয় যোগেন।

'আপনি উঠুন। আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাই।' রসিকলালকে গাড়িতে ওঠাতে যোগেনকে সুভাষের দিকে আরো সরে বসতে হয়। তেমন বসতে তার বাধো-বাধো ঠেকে। সে বলে ওঠে, 'কাহা, আপনি এখানে বসেন, আমি সামনে যাচ্ছি—'। ততক্ষণে রসিকলাল ড্রাইভারের খুলে দেয়া সামনের দরজা দিয়ে ঢুকতে-ঢুকতে বলছেন, 'আপনার যে এতটা মনে আছে, এ আমি

কল্পনাও করতে পারি নাই। এখন মনে হচ্ছে— আমার উচিত ছিল আপনার কাছে যাওয়া। মার্জনা চাই।'

'সেটা করবেন না। মনে থাকা, মনে না-থাকা তো পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। যোগেনবাবু, এই তেলটা রাতে মাখতে হবে?'

'হ্যাঁ। মাথায় বসিয়ে দিতে হবে। তারপর স্নান বা দুই ঘটি জলে মাথা ধুইয়্যা নিবেন।'

'কী দিলি রে যোগেন, কী হইছে ওনার।'

'হইছে তো অনেক কিছু। ওষুধ দিয়্যা-দিয়্যা বুইঝবার লাগব। স্নেহ তৈল দিলাম। শরীর-মনডা যদি স্থির হয়।'

'এটা খুব ভাল তেল সুভাষবাবু আর যোগেন তো অন্য চাঁদসীদের মত মূর্খ না। ও বিচার-বিবেচনা করতে পারে। দেখেন, যদি উপকার হয়। আমরা এইখানেই নামি।

যোগেনেই গাড়িটা বাঁ-ফুট ঘেষে ধীরে-ধীরে দাঁড়ায়। রসিক দরজাটা খুলতে পারছিলেন না। ড্রাইভার ঝুঁকে এসে খুলে দেয়। 'ঐ কোণাকুনি কাকার বাড়ি, আর এই কোণাকুনি আমাদের অফিস ১৫ হ্যারিসন রোড।'

সুভাষবাবুর গাড়ি চলে গেলে যোগেন বলে, 'কাহা, এডডু অফিসে বসা যায় না?'

'চ—ল্। আমার আর আপেত্ত কী?'

'তয় চলেন, এডডু কথা কয়্যা বুঝতে চাই—'

'কী বুঝবি? কাগো লগে কথা?'

'কারো পক্ষেও না, কারো বিপক্ষেও না। আমার নিজের ভাবনা ঠিক কি বেঠিক মাইপ্যা নিতে—'

পনের নম্বরে উঠে দেখে পি. আর. ঠাকুর, আর মনোরঞ্জন বড়াল বসে আছেন। একটা বেঞ্চের ওপর বসেই যোগেন জিজ্ঞাসা করে, 'মিটিং কেমন লাগছে, আপনাগো?' —'এর চেয়ে আরো ভাল কিছু কি আপনি আশা করেছিলেন?' পি আর ঠাকুর-এর এ-কথায় যোগেন হেসে বলে, 'সেডা কইলে তো আত্মপ্রশংসা হইয়া যায়, আত্মহত্যার সমান। কিন্তু আমরা পাইল্যাম কী?'

বড়াল একটু শুদ্ধ ভাষায় কথা বলেন, 'আপনার প্রত্যাশা কী ছিল?'

'সে তো আপনারাও কইতে পারেন, আপনাগো কোন আশা পুরছে?'

'ধরুন, যোগেনবাবু, অ্যালবার্ট হলে গুরুচাঁদের প্রতি সুভাষচন্দ্র, জে সি গুপ্ত এই সব মানুষ শ্রদ্ধা জানালেন সেটাই তো নমশূদ্রদের একটা সামাজিক স্বীকৃতি।'

সে-স্বীকৃতি তো আমাগো জোরেই আদায় হইছে। এক জাইতেরই তের এমএলএ। স্বীকার না কইর‍্যা যাইব কোথায়। কিন্তু সুভাষবাবু আর গুপ্তশাহেব যে বারবার কইতেছিলেন— শূদ্ররা হিন্দুসমাজেরই অংশ, সেইডা আমার পছন্দ হয় নাই। গুরুচাঁদ ঠাকুর, ঠাকুর হইলেন কোন সুবাদে। তিনি এতদূর পর্যন্ত কইছিলেন যে বর্ণহিন্দুরা যে-স্বাধীনতা আন্দোলন করে, আমরা তাতে যাব না। আর আইজ সুভাষ বাবু কইলেন—তোমরা কিন্তু হিন্দু, এইডা ভুইলো না। আর গুপ্তশাহেব কইলেন—কয়ডা রিজার্ভ সিট জিত্যা আবার নতুন পার্টি খুইল্যা বসব্যান না। দুইডা মিল্যায়া খাড়ায়—শুদ্দুররা শুদ্দুর হইলেও হিন্দু আর কংগ্রেসই শুদ্দুরগো পার্টি। এটার কোনো-কোনোটাই কি সন্দেহ না রাইখ্যা মানা যায়?'

'তোক তো মাইনব্যার কয় নাই। তাগো মত তারা দিছে। তুই তর মত তাগো মানাইতে চাস ক্যা?' রসিক বলে।

বড়াল একটু বোঝানোর জন্য আঙুল নাড়ান— 'আমাদের সমাজকে একটা সময়ে একতাবদ্ধ করার প্রয়োজনে ঠাকুর গুরুচাঁদ এই বিধান ও সংগঠন দিয়েছিলেন ও করেছিলেন। এখন তো পরিবর্তিত অবস্থায়, আমাদেরও নতুন করে ভাবতে হবে।'

'আপনাগো নতুন ভাবনা কি বামুন-কায়েত ভাই বইল্যা ডাইকলেই নিত্যানন্দ হওয়া? আর কংগ্রেস পার্টিতে যোগ দেয়া? তো দ্যান।'

'যোগেন, কংগ্রেসের বদনাম কইরব্যা না, আমি যে কংগ্রেস তা ভুইলো না, বাপ।'

'যোগেনবাবু, আপনার এটা ঠিক কথা যে সুভাষ বোস ও জে সি গুপ্ত শিডিউল কাস্টদের হিন্দু ক্যাটিগরির মধ্যেই টেনেছেন, সঙ্গে কংগ্রেসকেই শিডিউল কাস্টদের ন্যাচারাল চয়েস বলেছেন। তেমনি নীহারেন্দুবাবু, বঙ্কিমবাবু, নৌসের আলি শাহেব—এঁরাও তো এঁদের নিজেদের মতই বলেছেন। আমাদের দিক থেকে লাভ এটাই যে আমরা ন্যাশন্যাল এজেন্ডার পার্ট হয়েছি। আমাদেরও তো এই কোয়ালিটি—শিফ্টটা নজরে রাখতে হবে—আমরা কীভাবে ভাবব সেটা স্থির করতে।'

'এই 'আমরা'টা কি 'আমরা'ই আছে পি-আর? আমাগো তো এই পরীক্ষাডা কহনো দিবার হয় নাই। কারণ, 'আমরা' ছাড়া আমাগো আর-কেউ ছিল না। অ্যাহন যে-মন্ত্রিসভাই হোক দুইডা-তিনডা মন্ত্রী তো আমরাই হব। তাই আমাগো বসুধৈব কুটুম্বকমের ভ্যাক ধইরবার সাধ হবার পারে। মিটিং কইর‍্যা কি এ বিবাদ মিটব পি. আর?'

এডা তো কারো ব্যক্তিগত বিবাদ না। নীতি নির্ধারণের বিষয়। খোলাখুলি কথা বলার লাগব। জষ্টি মাসের তের না চৌদ্দ তমলুকে বেঙ্গল নমশূদ্র অ্যাসোসিয়েশনের সম্মিলন ডাকা আছে। সেইহানে এইডা নিয়্যা কবির লড়াইডা হোক। সাবজেক্ট কমিটিরে জানাইয়্যা দ্যাও অ্যাহনই। আর অন্য তপশিলগোও ডাকা লাগে— বিশেষ কইর‍্যা উপেন বর্মন রে। চল্ যোগেন, আরে একডা মিটিং নিয়্যা বেগুনপোড়া মুখ কইর‍্যা থাকে না কী?' রসিকলাল যোগেনকে নিয়ে উঠে পড়েন।

কিন্তু যোগেনের কেন মনে হয়ে যাচ্ছে—সে ঠকে গেল।

শূদ্র জাত নিয়ে সুভাষ বোসের সঙ্গে যোগেনের একটু-আধটু তর্কবিতর্ক

১৩ তারিখ রাতে বাড়ি ফিরে ডাক্তার আর বোনের সঙ্গে গল্প ও হাসিঠাট্টা করতে-করতে তার মনে হল, সে ঠকে যায়নি, ঠকানো হয়েছে তাকে।

৮৮

কিন্তু নিজেই বুঝতে পারে না, ঠকানোটা হল কোথায়? সে-ই তো সুভাষবাবুর কাছ থেকে মিটিং-করার নির্দেশ এনে সবাইকে জানাল। মিটিং ডাকলেন সুভাষবাবু, গুরুচাঁদ ঠাকুর যোগেনের ঠাকুরদাদা নয়, পি আর ঠাকুরের ঠাকুরদাদা। মল্লিকভাইদের একটু ল্যাং দেয়া গেল—সেটা তো যোগেনেরও লাভ। রসিক কাকা তো বলেই দিলেন—এটা তমলুক সম্মিলনে তোলা হবে। কী তোলা হবে? যোগেনও জানে না।

মিটিঙের শেষে পনের নম্বরের ঐ ছোট আড্ডায় যোগেনের এটা বলার কোনো দরকার

ছিল না যে সুভাষ বোস আর জে সি গুপ্ত শিডিউলদের কংগ্রেসের তলায় নিয়ে যেতে চায়। কারণটা অবিশ্যি অদ্ভুত—উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ মিলেই হিন্দুধর্ম ও ভারত, কংগ্রেসে এ সবই আছে, সুতরাং শূদ্রদের কংগ্রেসে আসা উচিত। তার, যোগেনের, কথা শুনে পি আর ঠাকুর সাততাড়াতাড়ি তার ঠাকুরদার নীতি—কংগ্রেসে যাইবা না/বন্দেমাতরম্ কইবা না/শাহেবগো বিপক্ষে থাইকবা না/স্বরাজ-ফরাজে ভুইলবা না— বদলে দিয়ে বলল কী করে— সময়ের বদলের সঙ্গে-সঙ্গে আমাদেরও তো বদলাতে হবে দৃষ্টি, আমরা আমাদের রাইট ছাড়ব কেন। এইটাই যোগেনের গেড়োর জায়গা। কোন রাইট ছাড়ব-না আমরা, কোন রাইট কায়েম করব আমরা—উঁচুজাত-নিচুজাত মেশানো হিন্দুর রাইট? নাকী শিডিউল—অশিডিউল মেলানো রাজনীতির রাইট? সবে তো একটা ভোট হল—তাতে তো তারা খারাপ করেনি। তাহলে পরের ভোটের সঙ্গী তো এখনই বাছা দরকার। যোগেনেরও। তাহলে, যোগেনকে ঠকানোই বা হল কোথায়, ঠকালই-বা কে? যোগেন মিছি মিছি ভূত দেখছে।

১৩ তারিখের রাত কাটলে যোগেন বোঝে—সে নিজেকে যা বোঝানোর চেষ্টা করেছে, সে-কথা সে বোঝেনি। ওটা তো বোঝার ব্যাপার না, বিশ্বাসের ব্যাপার। ১৩ তারিখের মিটিংটা থেকে যা বেরল, তাতে তার বিশ্বাস নেই। অথচ মিটিঙে তো সকলেই দেখল, জানল, তার বিশ্বাস আছে— সুভাষ বোসের কথায়। ভারত এক, হিন্দু এক, কংগ্রেস এক, তাই এখন বর্ণভেদ নেই, সবাইকে কংগ্রেসে মিলতে হবে।

জে সি গুপ্তের কথার সঙ্গে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সম্বন্ধ নেই। বঙ্কিমবাবু ও নীহারেন্দুবাবুর কথাতেও না। ওঁরা ওঁদের চিন্তাদুশ্চিন্তা জানিয়েছেন। কংগ্রেসের ভোট কমবে কী না। তপশিলরা আলাদা পার্টি করবে কী না। মন্দিরে যদি শূদ্রদের ঢুকতে দেয়, তাহলেই অস্পৃশ্যতা আর থাকবে না। অস্পৃশ্যতা যদি না-থাকে তাহলে বামুন বামুনের মতো থাকারও অসুবিধে নেই, শূদ্রেরও শূদ্র থাকার অসুবিধে নেই। এ কথা নিয়ে হাসাহাসি করা চলে। মাদ্রাজ প্রদেশে রাজাগোপালচারির মতো বড় নেতা ও বড় হিন্দু, ব্যবস্থা করেছিলেন, এক-এক জায়গায় ভোট নেয়া হবে, তারপর ভোটের রায় অনুযায়ী সেখানকার মন্দিরে অস্পৃশ্যদের ঢুকতে দেয়া হবে, বা হবে না। এই ভোটাভুটিতে গোলমাল আরো বাড়ল দেখে রাজাগোপালচারি ইনডেমনিটি বিল আনলেন। যদি কোনো মন্দিরের ট্রাস্টিরা অস্পৃশ্যদের মন্দিরে ঢোকার অধিকার না দেন, তাহলে, সেখানকার সরকারি অফিসাররা কোনো ব্যবস্থা নিলে, তিনি সাধারণ আচরণবিধি লংঘনের দায়ে দোষী হবেন না। তাছাড়াও, রাজাগোপালচারি সত্যি-সত্যি বলেছিলেন, আরে বাবা, মন্দিরে ব্রাহ্মণরা ঢুকতে পারেন বলে কি সব বামুন মন্দিরে ঢুকছে? সময়-অসময়, পুজোআর্চা, ভোগের সময়টময় দেখে দু-জন একজন হরিজন গেলেন, দেখলেন এই তো ব্যাপার। এ নিয়ে আপনারা এমন তোলপাড় শুরু করেছেন কেন। স্যার শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার শাস্ত্রীর মতো আইনজ্ঞ আপত্তি করে বললেন, 'সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস দল যেন খুব সাবধানে ভেবেচিন্তে দেখে যে অস্পৃশ্যতা দূর করার মতো মহৎ একটা কাজ করার জন্য তারা ভুল সব পদ্ধতি নিয়ে নিজেদের কতটা বিপদে ফেলছে। শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারও তো কংগ্রেসকে ভোটের ভয়ই দেখালেন। এটা তো কৌশল নিয়ে কথা, ধর্ম নিয়েও কথা না, সংস্কার নিয়েও কথা না। বঙ্কিমবাবু—নীহারেন্দুবাবুর নিজেদের মতটা বলতে পারলেই হল—অং বং টং। জাতপাত কিছু না। এগুলো সব শ্রেণীদ্বন্দ্বের ফল্গু। যেন নিচুজাতের লোক মানে ওঁদের প্রলেতারিয়েত। প্রলেতারিয়েত তো বটেই। প্রলেতারিয়েত হলে সে নিচুজাত হতে পারে না? বরং সে তো ডবল-প্রলেতারিয়েত। ওঁদের শ্রেণী হিশেবে আবার জাতে নিচু বলে। নীহারেন্দুবাবুর দেয়া 'মেনিফেস্টো' যোগেনের মুখস্ত হয়ে গেছে। ওরকম

লেখা মুখস্ত না হয়ে পারে? 'মেনিফেস্টো'র প্রত্যেকটি কথাই চমকে দেয়। প্রলেতারিয়েতের কিছুই হারাবার নেই। মুগ্ধতা থেকেও তো মজা আসে। এই কথাটিতে যোগেন মজা করে ভাবে—তাহলে তাদের, শূদ্রদের, কিছু হারাবার না-থাকাটাও ডবল না-থাকা, ট্যাকেও কিছু নেই, জাতেও কিছু নেই। না-থাকার ডবল। সেটা মাপা যায় কী ভাবে। ওঁদের মতো একটা না-থাকা বাদ দিয়ে না। নীহারেন্দুবাবুদের ভাষণ শুনলে বিদ্যাসুন্দর-পালা মনে আসে। কাক তাড়ানোর ছলে সুন্দরকে সংকেত দেয় বিদ্যা—'পশ্চিমে কাউয়া উড়ে/ পুবে বিদ্যা ঢিল ছোঁড়ে।'

কিন্তু সুভাষবাবু কৌশলও করলেন না, কোনো মৌলিক তত্ত্বকথাও বললেন না। একটা লাগসই কথা বলে চমকে দিলেন। 'সারা দেশটাই পরাধীন, অপ্রেসড, ডিপ্রেসড, সাপ্রেসড। তাহলে কয়েকটি জাতের লোককে এইসব নাম দিয়ে আলাদা করা কেন। এখন আবার হয়েছে শিডিউল্ড। ভারতীয়মাত্রেই তো শিডিউল্ড ফর ফাঁসি, শিডিউল্ড ফর জেলখাটা, শিডিউল্ড ফর শাহেবের লাথি খাওয়া। যতদিন পরাধীনতা, ততদিন এসব থাকবে। পূর্ণ স্বাধীনতা না পেলে এগুলো দূর হবে না। একই হিন্দুধর্মের মধ্যে উঁচুনিচু ভেদ তো আর হিন্দুধর্মের অখণ্ডতা ও সমগ্রতা ভাঙতে পারে না। সেই সমগ্রতার কথা বলেছেন রামানুজ, শ্রীচৈতন্য, বিবেকানন্দ।'

যোগেন কোনো কিনারা করতে পারে না, মেনে নিতেও পারে না। শুধু কথা সাজানোর জন্য সুভাষ বাবু কি অপ্রেসড-ডিপ্রেসড-সাপ্রেসড এই ইংরেজি শব্দগুলি নিয়ে মজা করলেন। এগুলো তো শাহেবদের বানানো। সুভাষবাবু সেই খাঁটি বাংলা শব্দগুলি বললেন না কেন, যা চিরটা কাল বলে আসা হচ্ছে— চাঁড়াল, শুদ্দুরনি, মেথর, চামার, ধাঙর, দুলে, জোলা। সুভাষবাবু কি বলতে পারতেন, আমরা পরাধীন, আমরা সবাই চাঁড়াল, আমরা অতিশূদ্র।

এই, এই, এই জায়গাটাতেই যোগেনের দুঃখ। সে নিজেই জানত না—কখন সে ভেবে নিয়েছিল, সুভাষবাবু এই কথাটা বলতে পারেন। সুভাষবাবুরও তো গ্রাহক আছে। সে-গ্রাহক এটা সহ্য করত না, 'আমরা সবাই চাঁড়াল।'

সুভাষ বোস কি কোনোভাবে পাশ কাটাতে চাচ্ছিলেন জাতপাতের ব্যাপারটা। তাঁর ইচ্ছে হলে তিনি তা করতে পারেন। কিন্তু তার জন্য কেন গুরুচাঁদ ঠাকুরের মৃত্যুবার্ষিককে বা যোগেনের মতো কর্মীনেতাকে ব্যবহার করবেন? যোগেন গুরুচাঁদ ঠাকুরে বিশ্বাসী নয়। এই ঠাকুররা সুদে টাকা খাটায় আর টোটকা দিয়ে ভেলকি দেখায়। তার নাতি পি আরও তা জানে বলেই আধুনিক রাজনীতির সঙ্গে মতুয়া ধর্মকে মেশাতে চাইছে। যোগেন মনেপ্রাণে জানে—হরিচাঁদ-গুরুচাঁদরা হিন্দু উচ্চবর্ণ রাজনীতির পালটা নিজেদের একটা গোঁড়ামো খাড়া করেছিল। কিন্তু সুভাষবাবু যদি তাঁর সম্পর্কে ভাল করে না জেনে তাঁকে জাতীয়তা-ভূষিত করতে হিন্দু বর্ণভেদের সাহায্য নেন, তাহলে যোগেন নিশ্চয়ই বলবে, ওঁরা শূদ্র ও শূদ্রতা দিয়েই ওঁদের চিনতে হবে। যোগেন পড়াশুনো করেই জানে, বামুনরা দরকার মতো ব্রাহ্মণ—বিরোধীদের কেমন আত্মস্যাৎ করতে পারে। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, শাস্ত্র কী বদলায়নি। ব্রাহ্মণ্যবাদের চরম বিরোধী গৌতম বুদ্ধকে দশম অবতার বানিয়েছে, মেরেওছে। শ্রীচৈতন্যকে অবতার বানিয়েছে, মেরেওছে।

অনিদ্র যোগেন ট্রামের তারের ঘর্ষণের সঙ্গতে ভাবতে থাকে—চাঁড়াল জন্মের কী ভার, কী ভার মুসলমান জন্মের যে যাকে আমি মনে করি না চাঁড়াল বা মুসলমান, তাকেই আমার নেতা করে তুলতে হয়, চাঁড়ালের নেতা, মুসলমানের নেতা। ভুল নেতার কাছে কোরবানি দেয়া—কপাল, কপাল।

ঘুম না-হওয়ায় যোগেনকে বাথরুমে যেতে হয়। আলো জ্বালতে হয় না, বাইরের আলোই আসে। ঘরে, মেঝেতে, তার মাদুরে ফেরার সময় যোগেন শোনে উদ্দুর-খদ্দুরের মায়ের ডাক,

'ভাই—'।

কিছু না বলে যোগেন তাকায়। রাস্তার আলোতে সে তাকানো বোঝা যায়। 'ভাই।'

'কী কও বোন, ঘুমাও নাই?'

'তোমার মনে কী দুঃখ ভাই?'

'না। দুঃখ কুথায় দেহো।'

'তোমার খাওয়াতে নাই মন, ভাই, তুমি ঘুমাও না।'

'হ্যাঁ। দুঃখ একখান হইছে বোন। সে তো জন্মেরই দুঃখ। কপালও কব্যার পারো।'

'তোমার মতো আর—কেডা জন্মের দোষ কাট্যায়া নিজের খাড়া করছে?'

'বোন, তুমিও সেই ভুলই কইরল্যা। কেডা কইছে আম নমশূদ্র হইয়্যাও বড় মানুষ হবার চাই। বোন, আমি যে বড়মানুষ হইয়্যাও শূদ্রই থাকব্যার চাই। এরা আমারে শূদ্র থাকব্যার দিতে চায় না কেন বোন? আমি শুদ্দুর। ওরা আমারে হিন্দু বানায় ক্যান?'

'সে কী কথা ভাই? তুমি তো হিন্দু বইল্যাই শুদ্দুর। নিজের ধর্ম ছাইড়ো না ভাই।'

'হিন্দু-হওয়াডা নিজের ধর্ম ছাড়া না? আমি তো চাঁড়ালের বংশের চাঁড়াল। তোমাগো হিন্দুধর্মে তো পূর্বজন্ম আছে। কতগুলা পূর্বজন্মের চাঁড়াল আমি তার হিশাব কেউ জানে না— তাইলে আমি হিন্দুডা কোন পূর্বজন্মে ছিল্যাম, বোন।'

বোন কোনো কথা বলে না। তাদের জাগরণ ও নীরবতার মধ্য দিয়ে কলকাতার শেষ রাত রাস্তার নেড়ি কুকুরের মতো মাঝেমাঝেই খেঁকিয়ে ওঠে। যোগেন নিজেই টের পায় না—কখন্ সে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। যোগেনের ঘুম দেখে বোন উঠে চলে যায়।

পরদিন, ১৫ই সকালে, ঘুম থেকে উঠেই যোগেন ফোন করে সুভাষকে।

'আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা বলা দরকার।'

'ফোনে? বলুন—'

'না। ফোনে হবে না। আপনার ওখানে গেলে কি অসুবিধা?'

'কখন আসতে চান?'

'অ্যাসেম্বলি থিকে।'

'তাহলে, মেজদার সঙ্গেই তো আসতে পারেন। তাই আসুন। রাতে খেয়ে যাবেন।'

'খাওয়াটা আজ মুলতুবি থাক। তাইলে কথা হবে না।'

একটু চুপ করে থেকে সুভাষ বলেন, 'ঠিক আছে, আসুনতো।'

যোগেনের মনে হয়, সে বোধহয় তৎপরতা ফিরে পাচ্ছে। অ্যাসেম্বলিতে আজ জরুরি কোনো বিজনেস নেই। সে দুটোর মধ্যে পৌঁছে যায়।

লবিতেই শরৎ বোস তাকে ধরেন, 'মিস্টার মণ্ডল, কাল সন্ধেয় তো আমার ওখানে একটু আসতে হয়। একটু চা খাবেন, কয়েকজন নন-কংগ্রেস লিডারকে বলেছি। অ্যাসেম্বলি পলিটিক্স নিয়ে কথাবার্তা হবে।

'আমি তো আজ আপনার সঙ্গেই আপনার বাড়ি যাব।'

একটুও অবাক না হয়ে শরৎ বোস বললেন, 'আরে, সে তো ন্যাশন্যাল পলিটিকস। আমার তো একেবারে হাউসপলিটিকস। আজ তো তেমন কোনো বিজনেস নেই। যখন যাবেন, বলবেন। শরৎ বোস ভিতরে ঢোকার একটু পরে যোগেন ঢোকে। পাঁচ মিনিট যেতে-না-যেতেই মার্শাল তাকে একটা শ্লিপ ধরিয়ে দিল—তমিজুদ্দিন পাঠিয়েছে, 'তাহলে গুজব এখন স্বর্ণডিম্ব প্রসব করিতেছে।' লিখতে গিয়ে যোগেনকে একটু থমকাতে হল। তার অবসাদ-উদ্বেগ-অনিশ্চয়তায়

সে ভেবে উঠতে পারে না, তার কাছ থেকে তমিজুদ্দিন যে-সরস জবাব আশা করে, সেটা মাথায় আসছে না। একটু সামলে যোগেন জবাব দিল, 'ডিম্ব পাকিল কবে?' সেটা নিয়ে মার্শাল গেল, ফিরল সড়েগ্রামের হরেন্দ্র দোলুইয়ের স্লিপ নিয়ে—'নো কনফিডেন্স না রি অর্গানাইজেশন?' যোগেন জবাব দিল—'বাই হাডুডু গেমস'। আবুল হাশেম একটা স্লিপ পাঠালেন, 'যদি একটু লবিতে আসেন, বধিত হব।' যোগেন উঠে পেছনের দরজা দিয়ে লবিতে গিয়ে দেখে আবুল হাশেমশাহেব দাঁড়িয়ে। যোগেন নমস্কার করে দূর থেকেই বলতে-বলতে তাঁর কাছে আসে, 'হাশেমশাহেব, শেষ পর্যন্ত আপনেও আমারে বামুন বানাইলেন।' হাশেমশাহেব খুব শিষ্ট মানুষ, 'বামুন ছাড়া কি বামুন বানাতে পারে?'

'আমি সেই ক্লাশ সেভেনে সংস্কৃত বইয়ে পড়া বামুনের কথা বলতেছি— হাট থিকে পাঁঠা কিনে ঝুড়িতে নিয়্যা বাড়ি ফিরতেছিলেন। পর-পর দশটা লোক তাকে বলে, 'একী ঠাকুরমশায়, মাথায় কইর‍্যা কুকুর ন্যান ক্যা?' দশজনের পর বামুন নিশ্চিত হয়্যা গেল ওডা পাঁঠা না, কুকুর। ঝুড়িসহ ফেলাইয়া বাড়ি ফিরল খালি হাতে।'

'হাশেমশাহেব গল্পের মজাটায় খুব হেসে বললেন, 'যোগেনবাবু, মুশকিল হচ্ছে সব দলেই বামুনও থাকে আর পাবলিকও থাকে। জনসমর্থনে পাঁঠা হয়ে যায় কুকুর। আমাকে এইটুকু আশ্বস্ত করেন যে অনাস্থা প্রস্তাব কি আজই তোলা হবে?'

'আপনে আমাকে বিশ্বাস করেন হাশেম ভাই, অনাস্থা প্রস্তাব নিয়্যা কোনো কথা হয় নাই, অন্তত আমার সঙ্গে কারো হয় নাই। শরৎদা আমার কাছে ওঁর একটা কথা বলতে আসছিলেন।

'সে তো কালকের সন্ধ্যার টি-পার্টি, শুধু তপশিলিদের জন্য।'

'আপনি তো তালি সবই জানেন হাশেমশাহেব।'

'আমি তো যোগেনবাবু প্রত্যক্ষ সোর্স ছাড়া কোনো খবর বিশ্বাস করি না। এই কানাকানি, গোপনতা, ফিসফিসানি —এই পলিটিক্যাল কালচার ভাঙা দরকার। আমাদের সব মেম্বার তো হাজির নেই। চিফ হুইপ এসে বারবার বলছেন—শরৎবোস আর যোগেন মণ্ডলের মধ্যে কথা হয়ে গেছে, আপনি মেম্বারদের তলব করুন। শেষে আমি বললাম, আমি জেনে আসছি।'

'শরৎদারে জিগাইলেন না ক্যান?'

'সবকিছুর তো একটা তরিকা আছে। উনি লিডার অব দি অপোজিশন। আমি রুলিং পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি হয়ে তাঁকে কি বলতে পারি—আপনার ট্যাকটিকস কী বলুন। আপনার কাছে জানতে চাইতে পারি। তবে আরো একটা কারণ আছে। আমার প্রশ্ন থেকে শরৎবাবু ঠিক করে ফেলতে পারেন যে আজই মুভ করবেন। আমাকে মিথ্যে করে বলবেন, না।'

'আমি মিথ্যা কব না, এই গ্যারান্টি কে দিল?'

হাশেমশাহেব ভক্ত মুসলমানের মত দুই হাত ওপরে তুলে আল্লাকে নির্দেশ করে বললেন, 'আরে, শরৎবাবু হচ্ছেন সিজন্ড পার্লিয়ামেন্টেরিয়্যান। ওঁর উচিত-অনুচিত সব ঠিক হয় পার্লামেন্টের কৌশল হিশেবে। আমি কিন্তু তাহলে আপনার নাম করে বলব যে যোগেনবাবু বলেছেন, তিনি অন্তত জানেন না।'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করার কারণ কী, আপনার পার্টির?'

'হিশাব। আপনার ৩০ + ১ ভোট ছাড়া কোনো অনাস্থা হতে পারে কী?'

'তাইলে তো আমি অ্যাহন চইল্যা গ্যালে সবাই নিশ্চিত হবে।'

'তা হবে।'

'ঠিক আছে?' বলে যোগেন দরজার দিকে ঘোরে।

নিজের আসনে ফিরে এসে যোগেন একটু দম নেয়।

চৈত্র-বৈশাখেও তো বরিশালে এরকম আগুন লাগে না যে নেবানোর কোনো উপায় নেই। জলের, খালের, পুকুরের, নদীর তো আর অভাব নেই। কিন্তু এ-গুজব তো কলেরার মত—একের পর এক গ্রামে ঢোকে, সাফ করে দিয়ে আর-এক গ্রামে। তবু, কেন যেন, বোধহয় এত জল বা এতরকম জল বা এত জোয়ার ভাঁটার কারণেই কলেরাটা বরিশালে কম। টাইফয়েডটা বেশি। আন্ত্রিক জ্বর।

কিন্তু গুজবের জ্বর তো একই সঙ্গে আগুন লাগা, ওলাউঠা আর টাইফয়েড।

কয়েকদিন ধরেই রটছে—মন্ত্রিসভার রদবদল হবে বা স্পেশিলমন্ত্রীদের অদলবদল হবে। যোগেন শুনেছে কিন্তু পাত্তা দেয়নি। নানা লোকের নানা কারণ থাকে নানা গুজব রটানোর। এই মন্ত্রিসভা কংগ্রেসের দু-চোখের বিষ। যত দিন যাচ্ছে হিন্দুরা কংগ্রেসের বিপক্ষে চলে যাচ্ছে। সুতরাং কংগ্রেস চাইতেও পারে—একটা বদল। কিন্তু চাইলেই কি হয় না কী? হয়ত কাল শরৎবাবুর বাড়িতে সন্ধেবেলায় সেসব ঠিক হতে পারে। তাও তো কেমন অসম্ভব ঠেকে। এমন ঢাকঢোল বাজিয়ে অনাস্থা জানানো। তাও হয় বা হতে পারে। সেটা তো 'অনাস্থা'র ভয় দেখিয়ে সরকারকে ব্ল্যাক মেল করা। শরৎ বোস তার সঙ্গে কথা বলেছেন বলেই আজই 'অনাস্থা' আসবে? এখন সে আর শরৎবাবু যদি একসঙ্গে শরৎবাবুর গাড়িতে বেরিয়ে যায়, তাহলে আর দেখতে হবে না, গুজবের জোয়ারের ধাক্কায় ঘরবাড়ি গাছপালা সব ভাসবে।

তেমন কোনো বিজনেসও নেই হাউসে। সব ডিপার্টমেন্টাল ব্যাপার, বেশিরভাগই ইপসো ফ্যাকটো স্যাংসন, দু-চারটে কোশ্চেন— ডিপার্টমেন্টের লোকরাই এমএলএ বেছে বুঝিয়েসুজিয়ে কাগজপত্র দিয়ে যায়। যোগেন শরৎবাবুকে একটা শ্লিপ পাঠায়— রিউমার মেশিন উইল গ্রিন্ড ইন টপ স্পিড ইফ উই লিভ ইন এ কোম্পানি। আই অ্যাম মেকিং ইট অ্যালোন। স্লিপটা শরৎবাবু পড়লেন কিন্তু যোগেনের দিকে ফিরে তাকালেন না। যোগেন বেরিয়ে গেল।

বড় দরজাটা বন্ধ ছিল। যোগেন জানে না, কী করতে হবে। খুঁজে দেখে পাশে একটা ছোট দরজাও আছে। যোগেনের এই সব চেষ্টায় একটু আওয়াজ উঠে থাকবে। একজন ছুটে এল আর দরজা খুলে সুভাষও এলেন বেরিয়ে। যোগেনের একটু অশোভনই লাগছিল—সুভাষ তার জন্য দাঁড়িয়ে।

সুভাষ 'আসুন' বলে এগিয়ে যায়। বাইরের এই বড় ফাঁকা ঘরটা ভুলেই গিয়েছিল যোগেন।

সুভাষ যোগেনকে বললেন, 'এত কী জরুরি কথা যে খেতে গেলেও গুলিয়ে যাবে।'

যোগেন হেলান দেয় না। বসেও সোজা থেকে বলে, 'আপনাকে কে কী বলছেন, জানি না, কিন্তু আমি আপনাকে স্বমুখে ও সজ্ঞানে জানাই যে আমার কিন্তু কোনো পার্টি নাই, কোনো পলিটিক্সও নাই। মানে, পার্টিপলিটিক্স নাই।'

'বাঃ, কংগ্রেসের অফিসিয়্যাল ক্যানডিডেটকে হারিয়ে জিতে এখন বলছেন আপনার পার্টি নেই, পলিটিক্সও নেই। আপনি তো প্রমাণিত অ্যান্টিকংগ্রেস।'

'বেশ। মাইনলাম। তাতে একটা প্রমাণ হইল। কিন্তু আরো কত দল আছে অ্যান্টিকংগ্রেস—আমি কিন্তু তাদের কোনো দলেও নাই। আমি শুধু শিডিউল কাস্টদের নিয়ে আছি, আরো ঠিক করে বললে বলব নমশূদ্রদের নিয়েই আছি। যেসব শিডিউল সংখ্যায় কম ও আমাদের দিকে আরো কম—তাদের কথা আমি জানি না। এমন কী বরং বড়-বড় শিডিউল জাতের বড় বড় লোকজনের সঙ্গেও আমার সম্পর্কটা সবে তৈরি হচ্ছে। এই কথাটাই আপনাকে প্রথম জানাতে চাই। আমাকে কংগ্রেসি ভেবে নিলে ঠিক করা হবে না।'

'সে তো আপনি কংগ্রেস হননি বলে। হতে তো আর আপত্তি নেই?'

'হ্যাঁ, আছে। আমার কাছে সবার উপরে শূদ্র। হাজার-হাজার বছর ধর‍্যা উচ্চবর্ণের হিন্দুরা যাদের সবসময় একেবারে ধ্বংসের কিনারায় ঝুল্যায়্যা রাইখছে, পশুদের মতন।'

'বটেই তো। আপনি কি এই কথাগুলি শুনিয়ে দিয়েই চলে যাবেন ভেবেছিলেন। আর সেই জন্যই খাবেন না? উচ্চবর্ণের অত্যাচার তো ভারতেরই সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার বিষয়। মাদ্রাজে, বম্বেতে, গুজরাটে এই অত্যাচার তো সবচেয়ে বেশি।'

'আপনার মতো বড় নেতার পক্ষেই এমন নির্ভুল অনুমান সম্ভব। আমাদের রাজনৈতিক পরিচয়গুলি তো সাফসুরত না। কতজনকে দেখবেন লিগও করে, কংগ্রেসও করে। মুক্ত রাজবন্দীরা তো আপনাকে ঘিরে জমা হচ্ছেন। কংগ্রেসে কমিউনিস্টরাও আছে, সোস্যালিস্টরাও আছে। তাদের ভরসাও আপনি। তাই, আপনার পক্ষে এটা ভাবা খুবই স্বাভাবিক যে আমিও কংগ্রেসে থাকতে পারি।'

'পারেনই তো। আপনার মত নেতাকে কংগ্রেস যদি জায়গা করে না দিতে পারে, তাহলে কংগ্রেসেরই ক্ষতি। আপনি সতীন সেনের চেনা তো, পিরোজপুরের?'

'ওনাকে কে না চেনে? কিন্তু মনে হয় না উনি আমাকে চেনেন।'

'কেন, বলুন তো।'

'মনে হয় তপশিল নিয়ে আন্দোলনে ওঁর কিছু বাধা আছে।'

সুভাষবাবু, এই তুলনাটাই কি উচ্চবর্ণের মন বোঝার পক্ষে যথেষ্ট নয়? যখন কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ড অনুযায়ী অনুন্নত জাতের সিট কোথায় কত হবে, তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা হচ্ছে, অন সব বিখ্যাত ঐতিহাসিক আর বৈজ্ঞানিকরা বললেন—অন্য প্রদেশের সঙ্গে তুলনা করলে এটা বলা যায় না যে বাংলায় বর্ণভেদপ্রথা ও অস্পৃশ্যতা আছে। বলাবাহুল্য তারা সবাই কাস্ট হিন্দু। আর, আমাদের সমাজের লিডার বিরাটচন্দ্র মণ্ডল, তিনি এদের কারো থিক্যা কম পণ্ডিত না, গোলটেবিল— আলোচনার প্রস্তাব সমর্থন কর‍্যা টেলিগ্রাম পাঠাইয়্যা জানালেন, 'অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে ও নিম্নবর্ণের ওপর উচ্চবর্ণের অত্যাচারের প্রতিবিধান না কর‍্যা স্বরাজ বা স্বাধীনতার আলোচনা হতে পারে না।' আপনিও সেই তুলনা দিলেন অন্য প্রদেশের সঙ্গে। এটা কংগ্রেসের নীতি, উচ্চবর্ণের হিন্দুর নীতি, মহাত্মা গান্ধীর নীতি ও সুভাষচন্দ্রেরও নীতি। এ তো ব্রিটিশদের নীতি, খ্রিস্টানদের নীতি, হিন্দুদের নীতি—অন্যের যা নেই তার সঙ্গে তুলনা করে দেখো তোমার কত বেশি আছে। একটা ঘটনা বলি। বানানো গল্প না। কিন্তু এটা তো ইতিহাসে পাবেন না। আমাদের তো কাস্ট হিন্দু হিস্টরিয়্যান নাই। পাবনার এক বামুন জমিদার তার এক প্রজার, শুদ্দুর প্রজার, ডাইন হাতটা একেবারে বগল থিকে পুরা কাইট্যা দিয়্যা, পুরাটা হাত কাইট্যা দিয়া, তাকে বলছিল, 'যা, বাড়ি যা, তোর মত শুদ্দুরের দুইডা হাত দিয়্যা কী হইব। তোর যা জীবন, তাতে একডা হাতই তো বেশি।' সেই শূদ্রচাষী কিন্তু মাইন্যা নিল কথাটা মাথা হেলায়া। বামুন—জমিদার যখন বলে, 'যা! চইল্যা যা!' সে চলে যেতে শুরু করে। দুই পা যাতেই জমিদারের গর্জন, 'হেই চাঁড়াল, তোর কাটা হাত তুইল্যা নিয়্যা গেলি না, তোর রক্ত ছুঁব কেডা।' সেই শূদ্র দুইপা পিছায়া হাঁট্যা, মাটিতে পইড়্যা থাকা তার ডাইন হাতটা তুল্যা নিয়্যা চল্যা গেল। তুলছিল কাটা-ডানহাতের আঙুলগুল্যা ধইর‍্যা। হাত তো মানুষ তেমনি ধরে। তার কাটাহাতের উলটা বগল থিক্যা বড়-বড় ফোঁটায় রক্ত পড়ছিল, জমিদারের কাছারি থিক্যা তার বাড়ি পর্যন্ত তিন মাইলের কাঁচা রাস্তায়, আইলে, ক্ষেতের উপড়ানো মাটিতে, ঘাসে, খালের জলেও। দোষ কিন্তু ঐ শূদ্র একটা করছিল। জমিদারের তো এটা সদর ছিল না, কাছারি ছিল। নায়েব-সেপাইরাই

রাজ্য চালায়। এই লোকটার বাড়ি ছিল যেখানে, সেখানে একটা টানা আইল বান্ধা ছিল—আইলের ভিতরের দিকের একটু ঢাল-জমিটাকে বাঁচাতে। ঐ আইল বা ঐ জমি কিছুই ঐ চাঁড়ালের সম্পত্তি না। কিন্তু চাঁড়ালদের তো নিজেদের মতো কর‍্যাই নিজের থাকার স্থানটা বানায় নিতে হয়। এ চাঁড়াল ঐ বড় আইলে লাইন দিয়্যা কয়েকটা সুপুরি গাছ লাগাইছিল। বছরে দুইবার বেইচা নগদ টাকা পাত। কোনো বাধা হয় নাই। সে-বছরই প্রথম কাছারির বরকন্দাজ আসা হুকুম দ্যায় সবগুল্যা গাছ থিক্যা সুপুরি নামাইয়্যা তাদের সঙ্গে গিয়া কাছারিবাড়িতে পৌছায়া দিতে। সেই চাঁড়াল, তার বউ, তার ছেলেমেয়েরা বরকন্দাজদের হাতে পায়ে ধরে কান্নাকাটি জুড়ে—এ মালেক, জমিদারবাবুর কি সুপুরিগাছের অভাব আছে, এই কয়টা ছাড়্যা দ্যাও। সেই প্রার্থনার জবাবেই জমিদার ওকে বলছিলেন—তোর কি আর হাতের অভাব আছে, দুইট্যা নিয়া কী করবি, একটা কাট্যা দেই। তবে জমিদারের কথার পিছনেও রাজনৈতিক কারণ ছিল। বেশিদিন আগের কথা না, বছর দশেক, ধরেন সাতাশ-আটাশ সাল। তখন কাউন্সিলে, স্বরাজ পার্টির কাউন্সিলে খুব তর্ক বাধছিল যে রায়তপ্রজার জমিতে বা আলের উপরে যেসব গাছ, তার উপর রায়তপ্রজার কোনো দখল আছে কি নাই? কী কর‍্যা থাকব? কাউন্সিল ভর্তি তো হিন্দু আর মুসলমান রাজাগজা, নবাব-জমিদার। অনেক তর্কাতর্কির পর সাব্যস্ত হয়—রায়তপ্রজার একটা কাঁঠাল পাড়ারও দখল নাই। পাবনার সেই হাতকাটা চাঁড়াল আইলংঘন করছিল। জমিদারবাবু তাই আইনপ্রয়োগ করলেন। এটার একটা সহজ, ফাঁকির পথও ছিল। সেপাইরা যদি গাছে উইঠ্যা সুপুরি নামাইয়া বস্তায় নিয়্যা য্যাত। তার নায়েববাবুকেও জানাত না। বেমালুম চুরি। কিন্তু তাদের কোমর এতই ভারী হয়্যা গিছে যে সুপুরিগাছে উঠতে পারে না। ওদের মোটা কোমরের দাম শূদ্রের হাত।'

যোগেন এই কথাগুলি বলছিল, একটানা, একটু-আধটু দম নিয়ে বা এমনি একটু চুপ করে থেকে। একবারের জন্যও সে হেলন দেয়নি, এমনকী, সে বসেওনি পুরো আসনটা জুড়ে। দুই হাঁটুতক দুই হাতে শুইয়ে চাপা স্বরে যোগেন কথা বলছিল। তার চশমাটা একটু নেমে এসেছিল। তখন সে চশমার ওপর দিয়ে সুভাষবাবুকে দেখছিল।

সুভাষ ঠিক বুঝতেই পারেননি, তাঁকে কি যোগেনের কোনো অভিযোগ শুনতে হবে, কোনো সমস্যা, তারপর কোনো সমাধান দিতে হবে। একটু এগনোর পর তাঁর প্রথম সন্দেহ হয়—হয়ত যোগেন কিছু কথা বলতেই এসেছেন। নালিশ বা সমস্যা তেমন কিছু যোগেনের নেই। সেই নমশূদ্র চাষীর হাতকাটার কথার সময় সুভাষ তাঁর বাঁ পাঞ্জাটা দিয়ে চশমাটা ঢাকেন ও খুলে দেন। যোগেন লক্ষ করে, সুভাষবাবুর আঙুলগুলি রোগা, তাঁর কবজিটাও। যোগেন যখন থেমে যায় আচমকা, সুভাষ তখন বুঝতে পারেননি থামাটা। শোনার সময় যেমন তিনি তাকিয়েছিলেন একদৃষ্টিতে যোগেনের দিকে, যোগেন থামার পরও তেমনি তাকিয়েছিলেন। একটু পরে তিনি নিজের পায়ের পাতার দিকে চোখ ফেরালেন। তিনি বসেছিলেন, ডান হাঁটুর ওপর বাঁ পাটা তুলে। তাই অমন চোখ ফেরানো সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু সুভাষ তখনো যোগেন কী বলছে, তা বুঝতে পারছিলেন না।

বাধ্য হয়ে সুভাষ জিগগেস করলেন, 'ঐ জায়গায়, মানে গ্রামে কোনো প্রতিক্রিয়া হয়নি।' সুভাষ বুঝেই বলেছেন যে এটা নেহাৎই একটা কথার কথা হল—বীভৎস এই ঘটনা শোনার পর। আর যোগেনও সেই জায়গাটাই রগড়ে দিল—'প্রতিক্রিয়া? কীসের? প্রতিক্রিয়াটিয়া তো হয় কিছু আচমকা ঘটলে, যা ভাবা যায় নাই এমন কিছু ঘটলে। এটা তো তেমন কিছু না। রোজই তো হয় এমন—এইখানে-ঐখানে।'

'এখন একটু কমেনি? এই ভোটটোট হওয়ার পর?'

'কমছে বললে মিথ্যা বলা হয়, কমে নাই বললেও মিথ্যা বলা হয়। আমি যা বুঝছি সেটাই আপনাকে বলি। আপনি আমাকে বেঠিকও ভাইব্যা নিতে পারেন। একটু-আধটু কমছে সেই সব জায়গায়, যেগুলা মুসলমান প্রধান আর যে-যে খানে দাঙ্গা হইছে। অন্তত সেইসব জায়গায় মুসলমান বা শুদ্দুর প্রজাদের হাত-পা-জিভ কম কাটা হচ্ছে।'

'দাঙ্গা? মানে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা?'

'তাছাড়া আবার কী?'

'সে কী করে হয়, যোগেনবাবু? দাঙ্গা মানে তো দল বেঁধে আক্রমণ, তা থেকে দুই পক্ষের যুদ্ধ। যুদ্ধে কি হিংসা কমে না কী?'

'তা কমবে ক্যান? বাড়ে তো বটেই। একা যে দুষ্কর্ম করা যায় না, দঙ্গল বাঁইধলে সেটা কর্‌্যা ফ্যালা যায়। আমাকে তো আলাদা কইর‌্যা কেউ চিনে না। বিশেষ ক্ষেত্রে তো এমন দাঙ্গা একটা সমবেত অভিযানের অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস, এসবও দেয়। বেবাক জমিদার হিন্দু আর বেবাক চাষি মুসলমামান হইলে হিন্দু জমিদার তাঁর বড় মিয়াশাহেব প্রজার মাথার চুল অর্ধেক চ্যাঁছা দিতে, একদিকের কান কাইট্যা দিতে বা একটা হাত ভাইঙ্গ্যা দিতে—দুইবার তিনবার ভাবে। চণ্ডালদের থিকে অমন কিছু তো ঘটে নাই, তাই তাদের থিকে ভয়ডরও নাই। তাদের হাত-পা—মাথা কাটা চলছে তো চইলছে আগের মতো। দাঙ্গার একটা ভাল দিক এটা—গরিব মানুষজনের জোর বাড়ে। দঙ্গল না বাঁধলে কাস্ট হিন্দু জমিদারগো সাথে পারা কঠিন।'

'তাহলে এটা কি হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা, না, জমিদার-কৃষকদের দাঙ্গা?'

'দুটাই। একটা সদর কাছারির গ্রামে এমন আর কয়জন থাকে, যারা জমিদারির খায় না, পরে না? আত্মীয়স্বজনও থাকে, বামুন-পুরুত থিকে কায়েত গোমস্তাও থাকে আর পাইক-বরকন্দাজ, সব শূদ্র তো থাকেই। মুসলমানরা যখন দঙ্গল নিয়্যা ঢোকে তখন তো এই বেবাক হিন্দু ভয় পাবেই। ভয় না-পাওয়ার তো কিছু নাই। আবার হিন্দু হিশাবে তো এই পাইক-লাঠ্যাল—সর্দাররাই তো মুসলমানগো ফেস করে। বাবুরা তো করে না। ফলে সব দাঙ্গাই হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা হয়ে যায়।'

'শূদ্ররা তো হিন্দুই। না হলে তারা চতুর্থ বর্ণ হবে কোন সুবাদে? ধর্ম তো একটাই। গান্ধীজি তো বলছেন, বর্ণভেদও থাকবে, কিন্তু সব বর্ণই সমান হবে। উনি তো অস্পৃশ্যতা দূর করার জন্য আন্দোলন করছেন। কংগ্রেস-মন্ত্রিসভাগুলো থেকে তো আইন পাশ হয়েছে। আরো হচ্ছে।'

'আপনি কি তাই মনে করেন—অস্পৃশ্যতা আর বর্ণভেদ এক? পংক্তিভোজনে শুদ্দুরকে ডাকলেই শূদ্র আর শূদ্র থাকবে না?'

'অস্পৃশ্যতাকে যদি ধর্মাচরণের অংশ করে ফেলা হয়, তাহলে তা দূর করতে বলা তো সকলেরই উচিত।'

'আপনি কি জানেন, সুভাষবাবু, শূদ্রদের মধ্যে অস্পৃশ্যতা আছে আর তারা সেগুল্যা খুব কঠিনভাবে মানে। ধোপারা নমশূদ্রদের কাপড় কাচে না। মাত্র শ-খানেক বছর আগে নমশূদ্রদের বলা হত চণ্ডাল। তারা ছিল জেলখানার মেথর। তারপর এই নমশূদ্র নাম হয় কিছু সমাজ-নেতার দাবিতে সেনসাস-কমিশনারের দয়ায়। তাদের যে ঐ বৃত্তি থিক্যা সইর‌্যা আসা সম্ভব হয়, তার কারণ, আমার মনে হয়, বিহার থিক্যা এমন মানুষজনের কইলকাতায় আসা যারা নিজেদের এই পেশার অধিকারী বলে দাবি করে। সেই নমশূদ্ররা কোনো ধাঙরের ছোঁয়া খাওয়া খায় না। আবার, ধাঙররা চামারের ছোঁয়া খাওয়া খায় না। অস্পৃশ্যতা একটা রিলিজিয়াস কালচার,

সুভাষবাবু। উঁচু জাতগুলার উচ্চতা রক্ষার জইন্য তৈরি। তাদের নকলে নিচা জাতগুলাও যদি সেটা প্র্যাকটিশ না করে, তাইলে তাগো তো আর উঁচু হওয়া হয় না। তাছাড়াও এটা একটা ক্ষমতার ও একটা কৌশলের ব্যাপার। একটা হিন্দুধর্মের ছাতার নীচে যদি শূদ্র বা নীচজাতীয়দের রাখা যায়, তাইলে তারা মুসলমানগোর দাঙ্গারও মহড়া নিতে পারে আর উচ্চবর্ণের মানুষদের একটা হাইটও দিতে পারে। আপনি দেখছেন তো কংগ্রেসের প্রদেশগুলির আইনসভায় অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ করার আইন নিয়্যা কত বড়-বড় পণ্ডিত কত কথা বলতিছেন—'

'আপনি এইসব কাগজ পান কোথায়?'

'অ্যাসেম্বলি লাইব্রেরিতে তো সব প্রদেশের কাগজ আসে। বিলাতের কাগজও আসে—।

'এআইসিসিতে তো রাখে। থাকি তো কলকাতায়। দেখি, বিপিসিসিকে বলব। কিন্তু তারা তো ইনটারেস্টেড ড্রিস্ট্রিক্ট বোর্ড, স্কুল বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি নিয়ে। তার বাইরে যে—দুনিয়া আছে, তাও তাদের মনে থাকে না। আপনি কী বলছিলেন যেন, আমি বাধা দিলাম।'

'আমি এই কথাটা আপনাকে বলতে ছটফট করছি যে গুরুচাঁদ ঠাকুরের স্মরণ মিটিঙে আপনেও সেই একই কথা বললেন। আমি ভাবছি সুভাষচন্দ্র কী কইর‍্যা এই কথাডা কইলেন যে ধর্মও একডা, দেশেও একডা—তাতে আবার জাইতের ভাগ কেন? আপনিও হিন্দুধর্মকে ছাতা কইলেন, আপনিও তার সঙ্গে দেশ মিলাইলেন?'

'হ্যাঁ, আমি তো সেরকম একটা কথাই বললাম। সেটা বলা আসলে জাতিবৈরিতার বিরুদ্ধে। যারা এসব মানেন, তাদের সঙ্গে কথাবলার একটা জায়গা তৈরির জন্য। যাতে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধিতা করতে আমরা ব্রাহ্মণ্যদের অস্পৃশ্য করে না ফেলি। আমাকে তো অল ইনডিয়া ইমপ্যাক্টের কথা ভেবে কথা বলতে হয়।'

'তাইলে শূদ্রদের কথাডা কে বলবে। দেশের সব থিক্যা উঁচা আসন থিক্যা কে কবে—ঢাকার তাঁতিগো বুড়া-আঙুল কাটায় যদি জাতীয় প্রতিবাদ হবার পারে, তাইলে বরিশালের শূদ্রদের হাত কাইট্যা দেয়ায়, কান কাইট্যা দেয়ায় জাতীয় প্রতিবাদ হবে না কেন।'

সুভাষবাবু অনেকক্ষণ চুপ করে থাকেন। বোঝাই গেল, তিনি এই বিষয়ে কথা বলবেন না।

'আপনে যাতে আমারে ভুল না বুঝেন, তাই আপনাকে জানানোর জন্য আসছি—আমি কোনোভাবেই নিজেকে হিন্দু ভাবি না।'

'সামাজিক বা পারিবারিক ভাবেও না?'

'সেইসব ছোটখাটো কথা ছাইড়্যা দ্যান—বিয়া কি শ্রাদ্ধ কি এড্‌ডু-আধডু পূজাপার্বণ। আমি বিশ্বাসের কথা বলছি। আমার বিশ্বাস দিনে-দিনে গভীর হইছে যে শূদ্ররা এইসব শিডিউল-টিডিউল দিয়্যা যেটুকু খাড়াব্যার জায়গা পাইছে, সেই জায়গা অতলে ভাসাইয়্যা দিয়্যা শূদ্রদের গ্রাস করার জইন্য কংগ্রেস আর গান্ধীজি কর্মসূচি বানাবার লাগছেন। আমার বিশ্বাস, তপশিলদের স্বাভাবিক বন্ধু মুসলমানরা, কারণ, তারাও হিন্দু-অত্যাচারের শিকার। আমার কথায় আপনার মত মানুষ চিন্তা বদলাইতে পারেন না। কিন্তু আমার মত ক্ষুদ্র মানুষও তো আপনার মত মানুষকে আমারে নিয়্যা কোনো ভুল ধারণা পুষব্যার দিব্যার পারি না।

আমার কথাডা আপনাকে বলা থাইক্‌ল। আপনে আমারে যহন যে-কাজে ডাইকবেন, আমারে পাবেন। আপনার মতো নেতার সঙ্গে কাজ করা আমার মহাভাগ্য। তা থিক্যা আমাকে বঞ্চিত রাখবেন না। আপনার কাছে, আপনার নির্দেশে কাজ করলে আমি রাজনৈতিক নেতৃত্ব শিক্ষা করতে পারব। সে শিক্ষা তো আমার একেবারেই নাই। অথচ, আমার ভিতরে একটা নেতৃত্ব

যে তৈরি হচ্ছে, সেটা আমি নিজেই বুঝতে পারি।'

'সেটাই কি আপনার প্রধান ভয় যে সমবেত কাজে আপনার আলাদা চিন্তাভাবনাগুলি আপনার কাছে অপরিষ্কার হয়ে যেতে পারে।'

একটু চুপ করে থেকে যোগেন কথাটা বুঝে নিতে চায়। বুঝতে না পেরে সুভাষকে বলে, 'ঠিক বুঝলাম না। প্রত্যেকের ধারণা তো আলাদা হইতেও পারে। কিন্তু সেই পার্থক্য নিয়াও সবাই মিলে, সমবেত কাজ না-করলে আমার চিন্তা ভাবনার পরীক্ষাই-বা কী করে হবে?

'আপনি তো বললেন, কোনো পার্টির হয়ে, বা নেতার হয়ে আপনি কোনোদিন রাজনীতি করেননি। বলতে গেলে আপনি রাজনীতি শুরুই করলেন, এমএলএ হয়ে।

'এটাই ষোল আনা ঠিক কথা।'

'আপনার রাজনীতিতে তাহলে কোনো বংশ-পরিচয় নেই। আপনিও কোনো পার্টিকে আপনার জন্মমৃত্যুর সাক্ষী হওয়ার অধিকার দেননি। দিতে চানও না। নিজের স্বাধীনতা রাখতে চান।'

'একটু বেশি ঠিক শোনালেও, এটাই ঠিক কথা। আমার মনে হয়—আমার অভিজ্ঞতা বলতে তো বরিশাল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড আর গত বার-চোদ্দ মাসের অ্যাসেম্বলি। তাতেই মনে হইছে—কী করা হবে সেটা ঠিক হয় ঝোঁকে বা প্রতিক্রিয়ায় বা একজনের লাভালাভ ভাইব্যাও।'

'কিন্তু আপনাকে যদি প্রত্যেকদিনই রাজনীতির মধ্যেই থাকতে হয়, কাজ করতে হয়, কাজ তৈরি করতে হয়, তাহলে তো সবসময়ই ঝোঁক-নেয়া বা প্রতিক্রিয়া তৈরির জন্য ফ্রন্টের সৈনিকের মতো খাড়া থাকতে হয়। খুব একটা ধীরস্থির হওয়ার সময় থাকে না সব সময়।'

'তাইলে তো মাছ ধরার মত মানুষরেও টোপ দিয়্যা রাজনীতি কইরতে হয়।'

'হ্যাঁ, তাই তো। আমাদের দেশের রাজনীতি তো সব সময়ই মাস-পলিটিকস। জনসাধারণকে নিয়ে। গান্ধীজির আগের কংগ্রেসে হয়ত শুধু নেতাদের রাজনীতি হত। কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতা যদি লক্ষ হয়, তাহলে মাস-মোবিলাইজেশন ছাড়া সম্ভব নয়। গান্ধীজির স্বরাজের মানে কী, উনি একবছরের মধ্যে স্বরাজ এনে দেবেন বলার পর তো প্রায় কুড়িটা বছর কাটতে চলল, আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা চাই তাও তো সাত-আট বছর হল—কিন্তু স্বরাজের অর্থ তো এখনো পরিষ্কার হল না। ছোট দেশে বিপ্লবী দলরা নিজস্ব ও গোপন কর্মীদের নিয়ে সংগ্রাম করতে পারে—যেমন ডি-ভ্যালেরা বা হিটলারও অনেকটা।'

'তাইলে একডা জাইতের মানুষের উপর হাজার-হাজার বছরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কিছু করা হবে না কারণ তাদের কষ্ট সারা দেশের কষ্ট হিশাবে স্বীকার হয় নাই।'

যোগেন সুভাষবাবুর সঙ্গে তার উত্থাপিত বিষয়টা নিয়েই কথা বলছে—এটা সে বুঝতে পারে, এটাও বুঝতে পারে, সেই নিহিত বিষয়টিকে স্পষ্ট করলে এই কথাবার্তা থেমে যাবে।

'হ্যাঁ, হয়ই তো, অজস্র হয়। হওয়ার আরো সব কারণ থাকে। ধরুন—কোচিনের মোপলা বিদ্রোহ তো জাতীয় বিদ্রোহ কিন্তু সেটা এখন হয়ে গেছে, আমাদের কাছে, মুসলমানদের নিজেদের ভিতরকার দাঙ্গা।'

'এ কী কথা, সুভাষবাবু। ধরেন, আগের একটা ব্যবস্থা, খুব খারাপ, খুব সংকীর্ণ, মানুষকে ছোট করে রাখা ব্যবস্থা বদল্যা যে-নতুন ব্যবস্থাটা আনলেন সে-ব্যবস্থারও মাথায় থাকল সেই খারাপ, সংকীর্ণ, গোঁড়া গুষ্ঠি। তাইলে বদলডা হবে কোথায়। হইল কোথায়।'

'একটা বদল তো হয় যোগেনবাবু। যদি নতুন ব্যবস্থাটা ঐ জনগোষ্ঠীর পক্ষে থাকে, তাহলে সেই-যে বড় গুষ্টির কথা বলছেন, তারাও সেটা বুঝতে পারে। মানে—আগে ছিল গুষ্টির

অধিকার, নতুন, হল বেশি মানুষজনের অধিকার। এর চেয়ে আর বেশি বদল কী হতে পারে?

যোগেন মাথা নিচু করে, দুই হাঁটুর ওপর হাতদুটোর ফেলে রেখে বসে থাকে। বোঝা যায়—সে উৎসাহী হতে পারেনি। বোঝা যায়—একটা সমাজের একটা টুকরো যদি তার জাতের বাইরে শরিক খোঁজে, তাহলে, তাকে তা খুঁজতে দেয়া হবে না।

শরৎ বোসের টি-পার্টির রাজনীতি

৮৯

শরৎ বোস টি-পার্টি ডেকেছিলেন ১৬ মার্চ, শুধু শিডিউল এমএলএ আর নেতাদের কয়েকজনকে নিয়ে—গুরুচাঁদ স্মরণ সভার দু-দিন পর আর সুভাষ-যোগেনের আলাপের একদিন পর, যদিও তিনি সে-আলাপে ছিলেন না। সুভাষ রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর শরৎ বোস চেষ্টা করছিলেন—ফজলুল হককে রেখে লিগ-মন্ত্রিসভা ফেলে দিয়ে নতুন মন্ত্রিসভা করতে। হকশাহেবকে প্রধানমন্ত্রী রাখলে হিন্দুদের ও কংগ্রেসের আপত্তি হবে না। হকশাহেবের নিজের কোনো পার্টিও নেই, নিজের কোনো বিশেষ সমর্থক গোষ্ঠীও নেই। বরং, বলা যায়, তাঁকে অবিশ্বাস করেন অবাঙালি মুসলমানরা ও ব্যবসায়ী শাহেবরা। হকশাহেবের সঙ্গে শরৎবোসের কথা হয়েছে—লিগ মন্ত্রিসভা যদি শরৎ বোস ফেলে দিতে পারেন, তাহলে তিনি নতুন মন্ত্রিসভা তৈরি করতে রাজি আছেন। মন্ত্রিসভা তৈরি হওয়ার পর থেকেই তার আয়ু নিয়ে এত গুজব রটেছে যে তেমন আরো গুজব তৈরি করে, শরৎ বোস তাঁর আর হকশাহেবের মধ্যে যে-কথাবার্তা হয়েছে সেটাকে আড়াল করতে চান। নইলে এমন আলো-টালো জ্বালিয়ে এমন করে কেউ নিজের বাড়িতে টি-পার্টি দেয়। শরৎ বোসের অবিশ্যি খাওয়ানো-দাওয়ানোর বাতিক ছিল।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির তো নিষেধ ছিল যে কংগ্রেস কোনো কোয়ালিশনে যাবে না। ভোটে সাতটা প্রদেশে কংগ্রেস সরকার করল—একা-একা। মাস চার-পাঁচ যেতে-না-যেতেই কংগ্রেস ঠিক করল যে-চারটি প্রদেশে কংগ্রেস সরকার করতে পারেনি প্রধানত মুসলমান ভোট পায়নি বলে, সেই বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের যেখানে সম্ভব সরকারে গিয়ে মুসলমানদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির চেষ্টা করা যায় এটা প্রমাণের জন্য যে মুসলমান ভোটের ওপর কংগ্রেসেরও দখল আছে।

কোয়ালিসন সরকারে কংগ্রেসের যোগ দেয়া নিয়ে নিষেধ উঠে গেলে বাংলাতেও সেই সম্ভাবনা দেখা দিল। বাঙালি হিন্দুরা কংগ্রেসের ওপর চটে গিয়েছিল হকশাহেবের সঙ্গে কংগ্রেস কোয়ালিসনে না যাওয়ায়। রাগটা তাদের গিয়ে পড়েছিল কংগ্রেস হাইকম্যান্ডের ওপর। শরৎ বোসরা যে চেয়েছিলেন তা তিনি সবাইকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তবু মুসলমানি রাজত্বে বাস করার বাধ্যতায় কপাল চাপড়ানো হিন্দু ভদ্রলোকদের কমেনি। শরৎ বোস সেই জনমতটাকে নিজের পক্ষে আনতে চান বলেই এত আলোটালো জ্বেলে জানান দেয়া যে তিনি কয়েকজন তপশিল এমএলএ ও কয়েকজন নেতার সঙ্গে কথা বলছেন।

এরকমই তিনি চা খাওয়াবেন ইনডিপেনডেন্ট প্রজাপার্টির এমএল এদেরও যাঁরা হকশাহেব লিগের নজরবন্দি হয়ে গেছেন বলে কৃষক-প্রজা থেকে বেরিয়ে এসেছেন। ইনডিপেনডেন্ট

মুসলিম এমএলএ-দের কারো-কারো সঙ্গে বলবেন। এই ভাবে অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে একটা পরিবেশ তৈরি করে তোলা হবে। কয়েকদিন ছুটি যাবে। পরশুদিন, ১৮ মার্চ থেকে ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং হবে শরৎ বোসের বাড়িতেই। গান্ধী, জওহরলাল, প্যাটেল থাকবেনও এই বাড়িতেই।

শরৎ বোস সবার শোনার মতো করে জোরে-জোরে বললেন, 'আমি আপনাদের কাছে কংগ্রেস অ্যাসেম্বলি পার্টির হয়ে একটা প্রস্তাব দিতে চাই। আপনারা একমত হলে ভাল। দ্বিমত হওয়াতেও আমার কোনো আপত্তি নেই। আপনারা জনা বিশেক এখানে এসেছেন। নস্কর মশায়কে তাঁর দেশে যেতে হয়েছে —আমাকে জানিয়েই গেছেন। আমার প্রস্তাব হল—আপনারা, শিডিউল এমএলএ তিরিশ জন প্লাস মিস্টার যোগেন মণ্ডল, এই একত্রিশ জন টুকরো-টুকরো আলাদা-আলাদা থাকায় প্রেসার গ্রুপ হিশেবে আপনারা দাঁড়াতে পারছেন না। আমি আপনাদের কাছে এই প্রস্তাব দিচ্ছি যে, এক, আপনারা সবাই মিলে আইনসভার জন্য একটা নতুন পার্টি তৈরি করুন—ইনডিপেনডেন্ট শিডিউল্ড কাস্ট অ্যাসেম্বলি পার্টি। দুই—এটাও আপনাদের প্রস্তাবে থাক যে আপনারা হক-মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও ইনডিপেনডেন্ট প্রজাপার্টির সঙ্গে একযোগে কাজ করবেন। তাহলে এই তিন পার্টি মিলে ১১৫-র মত এমএলএ বিরোধীপক্ষে থাকবেন ও বাংলার রাজনীতিতে একটা ইফেকটিভ বদল ঘটানো যাবে। আমি আরো একটা কথা বলছি যদিও সেটা আপনাদের ব্যাপার, আমার কিছু বলা উচিত নয়, কিন্তু এটা তো কোনো মিটিং নয়, এটা একেবারেই একটা টি-পার্টি যেখানে যার যা ইচ্ছে সে তাই বলতে পারে। যদি আপনারা এই নতুন অ্যাসেমব্লি পার্টি তৈরি করতে সম্মত হন, তাহলে মিস্টার যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে তার সেক্রেটারি নির্বাচিত করুন। কারণ...

পেছন থেকে বেশ হেঁড়ে গলায় কেউ একজন বলল, 'আমাগো অনুরোধ, আপনে যোগেন মণ্ডলের পক্ষের কারণগুল্যা অ্যাহনি ফাঁস কইরবেন না। আপনার জেবে রাইখ্যা দ্যান। পরে কামে লাগব। আমরা অকারণেই যোগেন মণ্ডলরে মাইনল্যাম'—ততক্ষণে সকলেই দেখে নিয়েছেন ঢাকার এমএলএ ধনঞ্জয় রায় বলছেন।

যোগেন ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। শরৎ বোসের কথা ও তাতে সকলের প্রতিক্রিয়াতে মনে হয়, যেন এ নিয়ে আগে একটা মিটিঙে কথাবার্তা হয়ে গেছে। যোগেনকে ছাড়া তেমন কোনো কথাবার্তা হওয়া সম্ভব নয়। নাকি, সকলেই যোগেনের মতই এই প্রথম শুনলেন। আইনসভার কাজকর্মে এই তিন পার্টির মধ্যে একটা বোঝাপড়া স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—শরৎ বোসের জন্যই, আবার নৌসের আলি ও যোগেনের জন্যও। শরৎ বোসের প্রস্তাবটা সকলের একটা আনুমানিক জানাকে স্পষ্ট করল মাত্র। যোগেন আরো একটু ভাবে, গোপনে—টি-পার্টিতে তো এসেছে জনা বিশ, তাদের মধ্যে পি আর ঠাকুরের মতো বিলেতফেরত যেমন আছে, রসিককাকার মতো পুরনো লোক যেমন আছে, বেশিরভাগই তো যোগেনের মতো, মৈস্তারকান্দি থেকে কাপড় মাথায় বেঁধে গোটা বিশ খাল সাঁতরিয়ে উঠেছে শরৎ বোসের বাড়িতে। তাও তো যোগেনের ডিগ্রি আছে। এমএ পাশও কেউ-কেউ আছে। কিন্তু বাকি সব তো টিপসই-মারা। তাদের একটা স্বভাবই হল, যে-কথা যত কম বোঝে সে-কথায় তত বেশি মাথা ঝাঁকায়। প্রত্যেকেই ভাবছে—সে এই কথাটা জানে না, ধরা পড়লে তার আর মানসম্মান থাকবে না। এই ভিড়ে যদি জনা দুই বরিশাইল্যা ফরাজি থাকত, তাহলে সে অন্তত ধনঞ্জয়ের গলা দাবিয়ে দেয়ার জন্যই সঙ্গে-সঙ্গে একেবারে অবান্তর একটা কথা এমন তুলত যেন একটা হাতাহাতি ঘটতে যাচ্ছে মনে হত। যোগেন তার 'দেশের' মানুষের স্মৃতিতে আতুর হয়ে উঠল। কী মানুষ রে,

কী সিধা, কী ধলা, যেন যমুনার পানি। বেশ একটু পরে বোঝা যায়, কেউ একজন খুব নিচু গলায় কী যেন বলার চেষ্টা করছেন—গুরুপ্রসাদ বিশ্বাস। উনি এমএলএ নন, কর্পোরেশনেও নেই কিন্তু নমশূদ্র সমাজের মান্যগণ্য মানুষ। আগে 'সমাজ' বলতে বোঝাত দেশের ও প্রবাসের সমাজভুক্ত মানুষজনদের। ব্যবহারটা ধীরে-ধীরে বদলাচ্ছে। এখন কলকাতার নমশূদ্র সমাজ কলকাতারই কেবল। নানা জীবিকায় ব্যস্ত। অনেকেই বাড়িঘর করেছেন। তাঁদের স্বার্থটাই দেশের নমশূদ্রদের থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। সেটা সত্য বলেই তাঁরা সেটা মানতে চান না ও 'সামাজিক' কাজে সব সময়ই সাহায্য করেন—অফিসের জন্য ঘর দেয়া, থাকার জন্য ঘর দেয়া, নমশূদ্র-মেয়েদের জন্য নিজের বাড়ির কোনো তলায় হস্টেল করা ইত্যাদি। কলকাতায় এই যাঁরা প্রবাসী নমশূদ্র তাঁরা সবসময়ই প্রায় কাঁটা হয়ে থাকতেন, 'দেশের লোকরা আমাকে ভুলে যায়নি তো।' ফলে, একটা বিপদও ঘনিয়ে উঠছিল। সশস্ত্র বিপ্লবীরা কোনো-কোনো সময় আত্মগোপন করতে এঁদের বাড়ি ব্যবহার করতেন। গুরুপ্রসাদ বিশ্বাস তেমনই একজন।

'আগুইয়া আইসেন না বিশ্বাস মশায়—'

'উনি আর কত আগাইবেন, নিজেরা এড্‌ডু পাছান।'

গুরু প্রসাদ বিশ্বাসকে শেষ পর্যন্ত পেছন থেকে ঠেলে কেউ সামনে নিয়ে আসে। তিনি সেই অদৃশ্য চাপে এগনও। তাঁর মনে হয়, এই এগিয়ে যাওয়ার সময় নমস্কার করতে হয় সবাইকে। তাই তিনি নমস্কারের ভঙ্গিতে দুটো হাত জোড়া করেই থাকেন। সবাই সরে-সরে গিয়ে তাঁর পথ করে দেয় আর তিনি গন্তব্যে পৌঁছে গেলে সবাই গলায় কাঁড়া তোলে ও তারও পর হাততালি দেয়। টি-পার্টির পার্টি তখন মাথায়।

বিশ্বাসমশায় ঐ একই ভঙ্গিতে তখন বলে যাচ্ছেন, 'নিজেগো মইধ্যে কাইজা কইরলে নিজেগো ক্ষয়, শত্রুগো জয়। আর নিজেগো জোট ঠিক থাইলে শত্রুর ক্ষয়, নিজেগো জয়। আর নিজেগো জোট থাইকলে শত্রুর জয় আর নিজেগো ক্ষয়। না। নিজেগো ক্ষয় আর শত্রুগো—। কী য্যান কইতেছিলাম? জয় আর ক্ষয়। আমাগো আর শত্রুগো।' বিশ্বাস মশায়কে ঘিরে একটা ভিড় ক্রমেই জমতে থাকে। তাতে তাঁর কথা আরো জড়িয়ে যায়, 'শত্রুগো ক্ষয় হইলে আমাগো ক্ষয়—'

ভিড়ের ভিতর থেকে কেউ বলে ওঠে, 'আমাগো জয়।'

বিশ্বাসমশায় সঙ্গে-সঙ্গে বলেন, 'নিশ্চয়ই জয়। জয় নিশ্চয়। তাইলে নিজেগো নিশ্চয় জয়—' এই এত বড়-বড় লোকজন, আলো, আলোচনায় বিশ্বাসমশায়ের খুব একটা উৎসাহ এসে গেছে। কিন্তু তিনি তো গুছিয়ে কথা বলতে পারেন না, তাই গুলিয়ে ফেলছেন। বিশ্বাসমশায় তোতলাতে থাকেন। একটু আড়াল থেকে রসিকলাল বিশ্বাস এসে বিশ্বাসমশায়ের পাশে দাঁড়িয়ে জিগগেস করেন, 'আমি কয়্যা দেই আপনার কথাডা?'

বিশ্বাসমশায় যেন বেঁচে যান, তিনি তাঁর হাতের জোড় না-ভেঙে বলে যান, 'এইবার আর-এক বিশ্বাস আমার কথাডা কইয়্যা দিব। ইনিও বিশ্বাস, তবে রসিক। আমার মত বেরসিক গৌরাঙ্গপ্রসাদ না। আমার মতো রসহীন, কষহীন, শুটকা আখের ভাণ্ডার থিক্যা প্রসাদ-করার জইন্য রস বার কইরতে আর সেই রসরে প্রসাদ বানাইতে প্রভু গৌরকে কতই-না চিব্যাবার হইছে—'। রসিকলাল বিশ্বাস, গৌরাঙ্গ বিশ্বাস মশায়কে থামিয়েই যেন বলে ওঠেন, 'জোলার ছাওয়াল ফক্কর খান—তার সম্বন্ধী সৈয়দ জান। আপনাগোর যেমন কথার অর্থ জানার জন্য আকুলতা তাতে আমার মতন দাগি আসামিও ডরে আছে। গৌরাঙ্গপ্রসাদ বিশ্বাস মশায় আমাদের নমশূদ্র সমাজের গৌরব', বিশ্বাসমশায় হেসে নমস্কার করেন, 'হ্যার বাপও আছিলেন মহাপুরুষ।

কইলকাতার সমাজেও বিশ্বাসমশায় অতিশয় শ্রদ্ধেয় মানুষ। তাঁর এগডাই দোষ তিনি নমশূদ্র হইয়্যাও বৈষ্ণবের নবগুণ, নয়টি গুণ, আয়ত্ত কইরছেন। আমি এমন মানুষ আর দেখি নাই যিনি বৈষ্ণবের মহান্ত মর্যাদা পাইয়াও নিজের পরিচয় দ্যান শূদ্র বইল্যা। তিনি কখনোই কোনো সভাসমিতিতে যান না। আজ যে তিনি এই স্থানে আইছেন, তাতেই বুঝা যায়, নমশূদ্র ও পতিতদের সামনে আইজ যে সুবিধাডা উপস্থিত, তিনি চান আমরা য্যান তার সুযোগ নেই। বলছেন—আমরা যদি জোট বান্ধি আর জোটবদ্ধ থাকি, তাইলে আমাগো জয় হইবই। হইবই।'

টিপার্টি তো ভাঙেই সন্ধে একটু গড়াতেই।

যোগেন দেখে, সে, ধনঞ্জয় রায় আর ধনঞ্জয় দাস একসঙ্গে ট্রামরাস্তার দিকে এগচ্ছে। রায় বলল, 'মণ্ডল, তোমার উপুর কিন্তু দায়িত্ব পইড়ল কঠিন। সামাল দিব্যার পারবা তো?'

'বেশিডা কী হইল? আমার তো এহনো পাতলাই ঠেহে, গুরুভার তো ঠেহে না?'

'দ্যাহ মণ্ডল, যদি তোমার দায়িত্ব হইত এডডা নতুন পার্টি খাড়া করো, তাইলে ব্যাপারডা সোজাই থাইকত। ক্যা? একডা মানুষ একাই তো একডা পার্টি হবার পারে। সে যদি চায়—পারে না?

'পারবে না কেন? একা হকশাহেব তো প্রজাপার্টি, লিগ, প্রধান মন্ত্রী, সরকার? তাহলে একা একজন একটা পার্টি হতে পারবে না কেন,' দাস, কংগ্রেসের ডেপুটি হুইপ, বলেন।

'আরে, আপনে তো আমার কথাডাই কইলেন। যদি একডা পার্টি খাড়া করার কাজ হইত, সেইডা গুরুভার হইত না। কিন্তু মণ্ডলরে তো আগে অ্যাহনকার পার্টিগুলাক ভাঙব্যার লাগব পরথম। ভাইংল ভাল। কিন্তু তারপর আবার ঐ ভাঙাগুলিরেই জড়ো কইরব্যার লাগব, নতুন পার্টিতে।'

যোগেন বলে, 'স্যায়ও তো হকশাহেবের শিক্ষা আছে। যদি শক্ত হইয়্যা খাড়াইয়া থাহো, তাইলে পার্টি নিজের থিক্যাই ভাঙব—পদ্মা-মেঘনার পাড়ের নাগাল। নদী বইয়্যা যায় নদীর মতো। আর, পাড় ভাঙে পাড়ের মতন।'

ওরা তিনজন চৌরঙ্গি রোডের মহানাগরিক সন্ধ্যার পথের ওপর হো হো হেসে ফেলে। সে-হাসি আবার এক ধাক্কায় শেষ হয় না।

তিনজনই রাস্তা পেরিয়ে ট্রামস্টপে গিয়ে দাঁড়ায়। দাশ যাবে হাওড়ায়, রায় যাবে নিউ মার্কেটের পিছনে ওর হোটেলে আর যোগেন তো হেদো।

দাস বলেন, 'কংগ্রেস অ্যাসেম্বলি পার্টি থেকে পাস করিয়ে এনেছেন শরৎবাবু। কারোরই কোনো আপত্তি তো নেইই—কেএস রায় জিজ্ঞাসা করলেন, যা করবেন করুন, আগে এত মিটিংটিটিঙের দরকার কী? সাতকান করা। তাতে শরৎবাবু বলে উঠলেন, নেড়া বেলতলায় যায় যেন ক-বার। কেবিনেট ফর্মেশন নিয়ে যে-কানমলা খেয়েছি ওয়ার্কিং কমিটির কাছে, আমি কোনো ক্ল্যানডেস্টাইন ডিলে থাকতে পারব না। আপনারা যদি একমত হয়ে বলেন যে কংগ্রেস, সব পার্টিকে অপোজিশনে ডাকুক ও একটা নতুন অ্যাসেম্বলি পার্টি তৈরি করা হোক ও কংগ্রেস সেই নতুন পার্টির সঙ্গে একমত হয়ে কাজ করবে—একমাত্র তাহলেই আমি এগব, নইলে নয়। তখন কে যেন বললেন এটা এতটা প্রকাশ্য হয়ে গেলে, লিগও তো নেমে যাবে।'

একটা ট্রাম এসে গেলে রায় লাফিয়ে উঠতে যায়, পেছন থেকে তার কোমরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে মণ্ডল সরিয়ে আনে। ট্রামের ঘন্টি, শিস, চাকার আওয়াজ, রায়ের 'আরে, আরে, কাছা টানে কেডা', 'তোমার বোনাইয়ের সম্বন্ধী'—এই সব চেঁচামেচির পর যোগেন বলে, 'এইহ্যান থিক্যা এই হ্যান, বিশ পাও, হাঁইট্যা গ্যালেও মনে লাগে আর এড্ডু দূর হইলে ভাল হইত,

আর গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনা শেষ না কইর‍্যা, ফাল পাইড়্যা ট্রামে ওঠে।'

মণ্ডল দাসকে বলে, 'হ্যাঁ। শরৎ বোস আপনাগ মিটিঙের সব কথা কইয়্যা আমারে কইলেন, আপনাগো মেম্বাররা একমত হইয়্যা আমারে মোড়ল চাইছে। আমি কইল্যাম, আমি তো কংগ্রেস না। উনি কইলেন—তার জইন্যেই তো আপনে, এডা তো নন-কংগ্রেস, নন-লিগ পার্টি। কংগ্রেস লেফ্‌ট থেকে যোগেনের নাম নিয়ে খুব চেপে ধরেছিল আর কংগ্রেস রাইট চট করে কোনো ক্যানডিডেট পায়নি আর বোঝেওনি তারা মিছিমিছি যোগেনের বিরোধিতা করবে কেন?'

কালীঘাট-বাগবাজার ঝোলানো একটা ট্রাম এসে দাঁড়ায়। 'দাদা, আসেন-না, হাওড়ার ট্রাম ধইর‍্যা নিবেন মেট্রোর উলটাদিক থিক্যা? যোগেনের আহ্বানে দুই ধনঞ্জয়ই ওঠে। একেবারে ফাঁকা। ওরা ডান হাতি লম্বা সিটে বসে—তিনজন একসঙ্গে বসবে বলে। যোগেন বলে, 'দ্যাহেন। সব পার্টিরই দুশ্চিন্তা অন্য পার্টির দলাদলি নিয়্যা—।'

গান্ধী সকাশে

মাঝখানে মাত্র একটা দিন।

৯০

মার্চের ১৮ তারিখে সকাল ১০টায় গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা সুভাষই করে রেখেছিলেন। আইনসভার তপশিলি সদস্যদের সঙ্গে গান্ধীজি কথা বলবেন। যদিও বাংলার আইনসভায় পার্টিগত ভাগ তপশিলি সদস্যদের মধ্যে নেই বললেই চলে, এক কংগ্রেসের পাঁচজন, বাকি সব স্বতন্ত্র, আর যোগেন মণ্ডল—তবু সুভাষবাবু বলে দিয়েছিলেন কে কে আসবেন সেটা যেন দলটল দেখে না বাছা হয়।

একে-একে এসে ওঁদের শরৎ বোসের বাড়ির পাশে জমা হতে পৌনে দশটা হয়ে গেল কিন্তু তাঁরা বুঝতেই পারছিলেন না ঢুকবেন কী করে। বড় গেটটা আটকানো। তার সামনে বেশ একটা ভিড়। নানা বয়সের মানুষ—পাগড়ি-পরা বুড়োও আছেন, বাচ্চা কোলে মা-ও আছেন। দেখে মনে হয়, গ্রামের মানুষ দল পাকিয়ে তীর্থ করতে এসেছে। কাছে যাওয়ার পর বোঝা গেল—এরা কলকাতা শহরেরই নানা প্রদেশের মানুষ, কোনো এক ভাবে শুনেছেন, গান্ধীজি আজ সকালে এই বাড়িতে আছেন। শুনে বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে করে ছেলেমেয়ে নিয়ে নিজেদের সবচেয়ে ভাল পোশাক পরে এখানে এসে বসে আছে, গান্ধীবাবার দর্শনের জন্য। কোনো তাড়াহুড়ো নেই, ডাকাডাকি নেই, সারা দিনে কি আর দর্শন মিলবে না? গেট তো বন্ধ। এদের ঠেলে তো আর যাওয়া যায় না, গেটও তো খোলা নেই। শেষে হেম নস্কর মশাই তাদের গিয়ে বললেন, গান্ধীজি আমাদের দেখা করতে ডেকেছেন, সময় হয়ে গেছে, আমাদের একটু ভিতরে যেতে দিন। এঁদের দলটাকে দেখে বোঝাই যাচ্ছিল—এরা মিটিং করার লোক। সঙ্গে-সঙ্গে দু-ভাগ হয়ে ওঁদের জন্য রাস্তা করে দিল। একটি বউ বলে উঠল, 'আপনাদের সঙ্গে আমাদের নে যাবেন, আমরা এক পলক দেইখেই—'। একটা বেশ জবরদস্ত পুরুষ ধমকে ওঠে—' এই, চুপ। এক্কেরে চুপ।'

গেটটা খুলছে না, এদিকে সময় চলে যাচ্ছে। দরজায় আওয়াজ করাটা ঠিক হবে কীনা সেটাও বোঝা যাচ্ছে না। শেষে বরিশালের উপেন এদবার রেগে গিয়ে বলে ওঠে, 'ইস্টিমার-না

ফুঁ দিয়্যা দিছে'। এই পর্যন্ত বলতেই চাপা স্বরে এদবারকে থামাতে চাপা স্বরে বলে ওঠে, 'হেই চুপ, চুপ'। এদবার তখন তো কথাটা বলার মধ্যে, মাঝখানে যেটুকু নামানো সম্ভব নামিয়ে সে বাকি কথাটুকুও বলে দেয়, 'অ্যাহন না ঢুইগলে সিঁড়িও তুইল্যা নিবে।' সে শুধু কথাটাই শেষ করে, তা নয়। পকেট থেকে একটা দুই আনি বের করে গেটের পাতের ওপর পর-পর দুটো ও তারপরে একটা আওয়াজ করে। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই পাশের ছোট গেটটা খুলে যায়। এরা ঢুকতে শুরু করে। এদ্‌বার তার বাহাদুরির স্বীকৃতির জন্য ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকায় একমুখ হাসি নিয়ে আর তার পাশ থেকে বিরাট মণ্ডল চাপা গলায় শাসিয়ে ওঠেন, 'উহানে য্যান্ টুঁ-আওয়াজখানও কইরো না।'

ওঁরা ভিতরে ঢোকার পর দু-জন লোক এসে 'আসুন' বলে একটা হলঘরের ভিতর দিয়ে তাঁদের সিঁড়ির গোড়ায় নিয়ে যান।

দোতলার সিঁড়ির দরজায় আর-এক জন গান্ধী টুপি, ও খদ্দরের পাঞ্জাবি পরা ভদ্রলোক তাদের নিয়ে একটা ঘরের মধ্য দিয়ে বাইরের পোর্টিকোতে নিয়ে গিয়ে, হাত দেখিয়ে সবাইকে বসতে বললেন। পোর্টিকোজোড়া শতরঞ্চির ওপর শাদা চাদর ও কিছু ছোট-ছোট তাকিয়া ছড়ানো দেখেই বোঝা যায়—এটাই মিটিঙের জায়গা। একটা মাথায় আসন পাতা আছে।

এরা বসার পর দেখেন দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছেন— দরজার পাশে শরৎ বোস, তাঁর পাশে লম্বা বয়স্ক একজন, যোগেন পরে শুনেছে উত্তর প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী গোবিন্দ বল্লভ পন্থ, তাঁর পাশে সুভাষ বোস, এঁদের থেকে একটু দূরে একজন কথা বলছিলেন বল্লভ ভাই প্যাটেলের সঙ্গে, যিনি কথা বলছিলেন তিনি কে সেটা যোগেন তার দলের কারো কাছ থেকে জানতে না পেরে দু-একদিন পর শরৎ বোসকে জিজ্ঞাসা করে জানে, রবিশঙ্কর শুক্লা, সেন্ট্রাল প্রভিন্সের প্রধান মন্ত্রী। জওহরলাল বসে ছিলেন এদের মুখোমুখি, সেই পাতা আসনের ডান দিকে।

এতগুলো নেতাকে একসঙ্গে দেখে চোখ তো ধাঁধিয়ে যায়ই, তার ওপর এখন তো এঁরা শুধু নেতা নন, কেউ-কেউ তো প্রধানমন্ত্রী কোনো-কোনো প্রদেশের। প্রধানমন্ত্রীদের একটা আলাদা জেল্লা কি থাকে? যোগেন নিজেকে বোঝায়—যে দেখে, জেল্লা তো থাকে তার চোখে। এতগুলো নেতা যারা যখনতখন জেল খাটে তাদের দিকে তাকালে ভক্তি আসে, বিশ্বাস আসে। ক্ষমতা তো টানে। আবার একটু ঈর্ষাও জাগায়। ঈর্ষার জন্য যেটুকু মিল থাকা থাকা দরকার, এদের কারো সঙ্গে যে তার তেমন কোনো মিল নেই, সেটা জেনেও, বা জানে বলেই যোগেন তার পাশে বসা ঢাকার ধনঞ্জয়কে কানে-কানে বলে, 'এই রত্নসভায় আমাগো হকশাহেবরেও কম মানাইত না।' ধনঞ্জয় তার দিকে হাসি মুখ ফেরালে যোগেন একই স্বরে বলে, 'দোহাই—জোরে হাসস না—দোহাই।'

এঁদের মুখোমুখি ভিতর দিকের একটা দরজা দিয়ে পাশের একজনের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে গান্ধীজি দরজার কাছে তাঁর চপ্পলটা খুলে পোর্টিকোর ভিতরে ঢুকতেই সবাই উঠে দাঁড়াল। গান্ধীজি সেসব খেয়াল না করে তাঁর সঙ্গীর সঙ্গে কথাটা শেষ করলেন। চোখ যে এমন ধাঁধিয়ে গেল, যোগেন সেটা ভেবে বের করতে চেয়েছে। পারেনি। কিন্তু সে চেহারার টান-ধারণার কাছাকাছি পর্যন্ত যেতে পেরেছে। ক্ষমতা, পদ, কীর্তিকথা—'টান' আসতে পারে বটে, কিন্তু এই টানটা তা থেকে আলাদা। সুভাষবাবুর আছে, শরৎবাবুর নেই অথচ দুজনের চেহারায় এত মিল। তখনো গান্ধীজি ও সবাই দাঁড়িয়ে। গান্ধীজির খাড়া, কোনাচে ঘাড়, হাঁটুর মালাইচাকি, হাতের কনুইয়ের ফাঁক দিয়ে যোগেন একবার জওহরলালের দিকে তাকান। দাঁড়িয়ে আছেন, একটু আলগা—কিন্তু সে 'টান' নেই, সুভাষের মতো টানও নেই। গান্ধীজি যেখানে

দাঁড়িয়েছিলেন সেখানেই বসে পড়লেন, হাঁটুর ওপর হাঁটু তুলে। নেতাদের মধ্যে কেউ-কেউ আর দু-জন মহিলা এসে তাঁকে মিনতি করতে লাগলেন আসনে গিয়ে বসতে। তাঁদের কথা যেন তিনি শুনতেই পাচ্ছেন না, এমন ভঙ্গিতে, একটু চাপা স্বরে এঁদের বলছিলেন, হিন্দিতে, 'আমরা তো অনেক হোঁচটটোঁচট খেয়ে শেষপর্যন্ত ভোট, মন্ত্রিসভা, মন্ত্রী, আইনসভায় ঢুকে পড়েছি। তাই সব জায়গায় গিয়ে নতুন মন্ত্রী আর মেম্বারদের কাছে জানতে চাই, কেমন লাগছে ভাই, মন্ত্রী হয়ে? মন্ত্রী হওয়ার অসুবিধেগুলো কী?'

সেই দুই মহিলা আর দুই নেতা এসে গান্ধীজিকে আবার অনুরোধ করতে শুরু করলেন আসনে বসতে। গান্ধীজি তখন এঁদের বলছেন, 'আপনারা বলুন, আপনাদের কথা শুনি'। তারপর সেই মহিলা ও নেতাদের দিকে না তাকিয়ে হাতটা কাঁধের ওপর দিয়ে নাড়িয়ে বলে ওঠেন একই স্বরে, 'এটা তো মিটিঙের জায়গা। ওখানে তো রাষ্ট্রপতি বসবেন। সভা চালাবেন। সুভাষ কোথায়?' বলে তিনি দ্রুত চোখ ঘুরিয়ে সুভাষকে খুঁজলেন। ফিরতি চোখে পেলেন, সুভাষ তখন একটু এগিয়ে এসেছেন। গান্ধীজি তাঁকে বললেন, 'নিজের গদি ছেড়ে লুকিয়ে থেকে আমাকে ঝামেলায় ফেলছ কেন। যাও, তোমার সিটে যাও।' সুভাষচন্দ্র একটাও কথা না বলে গুটিগুটি হেঁটে এসে গান্ধীজির বাঁ দিকে, একটু পেছনে বসে পড়লেন। আসনটা আড়াল হয়ে গেল। সুভাষ ঘাড় ঘুরিয়ে জওহরলালকে তাঁর পাশে আসতে ইশারা করলেন। জওহরলাল একটা হাঁটু তুলে, সেই হাঁটুতে বাঁহাতের কনুই রেখে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলেন। সুভাষের ইশারা পেয়ে তিনি উঠে এসে সুভাষের পাশে বসলেন। সুভাষের চাইতে জওহরলাল তো অনেক বছরের বড়, আট-দশ তো হবেই, শরৎ বোসের সমান অথচ জওহরলালকে সুভাষের চাইতে কমবয়েসি দেখায় কেন? যোগেন এই সমস্যার সমাধান করে টাক দিয়ে। সুভাষের টাক আর জওহরলালের টুপি। নইলে জওহরলালও তো ধুতিপরা।

গান্ধীজিকে তখন উপেন বর্মন বলছেন, 'আমরা তো কেউ মন্ত্রী না। আমাদের থেকে মন্ত্রী হয়েছেন দু-জন মুকুন্দবিহারী মল্লিক, খুব বিদ্বান, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি পড়ান। আর, প্রসন্নদের রায়কত, ইনি জলপাইগুড়ির জমিদার।

গান্ধীজি বললেন, 'জলপাইগুড়িতে কংগ্রেসের একটা বড় অধিবেশন হয়েছিল, ১৯২৫-এ। আমি গিয়েছিলাম।

'জলপাইগুড়িতে একজন রায়কত আমাকে গান শুনিয়েছিলেন। তিনিও তো জমিদার, শুনেছিলাম। ইনি কি তিনি?'

'প্রসন্নদেব বাবু, বলুন-না।' তারপর গান্ধীজিকে উপেন বর্মন বললেন। 'আপনাকে জলপাইগুড়িতে আমি দেখেছি।'

'ও, আপনিও জলপাইগুড়ির?' গান্ধীজি হাসলেন। যোগেন দেখে ফেলল, গান্ধীজির হাসিতে কোনো বারণ নেই। আর উনি চোখেও হাসেন, যেন এতটা হাসি পুরোটা মুখে ধরে না।

প্রসন্নদেব বাধ্য হয়েই এসেছেন। পারলে ডুব দিতেন। কিন্তু সুভাষ বোস জানিয়েছেন, গান্ধীজি তপশিল মন্ত্রী ও এমএলএদের সঙ্গে কথা বলতে চান। প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, বুকে সাহস আছে তো গান্ধীর ডাক ফিরায়্যা দিবার। যাবেন না কেন। গভমেন্ট আনরিপ্রেজেন্টেড থাকবে ক্যান? প্রসন্নদেব সবাইয়ের সঙ্গে গা-ঢাকা দিয়ে কোনোরকমে ছিলেন। উপেন বর্মন দিলেন ফাঁসিয়ে।

প্রসন্নদেব জোড়হাত করে বললেন, 'স্যার, আমি আপনাকে গান শোনাইনি।' গান্ধীজিকে 'স্যার' বলে ফেলে প্রসন্নদেবও অপ্রস্তুত, চাপা একটা হাসিও উঠল। প্রসন্নদেবের আর-একটু

বলার ছিল। সাহস পাচ্ছিলেন না, আবার বসে পড়তেও পারছিলেন না।

উপেন বর্মন তাঁকে রক্ষা করলেন, 'সরোজদা গেয়েছিলেন না?'

'হ্যাঁ।' বলে প্রসন্নদেব বসে পড়লে উপেন বর্মন গান্ধীজিকে বলেন, 'আপনি যথার্থই বলেছেন। ওঁর এক ভাই আপনাকে গান শুনিয়েছিলেন। তিনিও রায়কত।'

'আপনার কেমন লাগছে, মন্ত্রীত্ব করতে?'

প্রসন্নদেব কোনোভাবেই দশজনের চোখে পড়তে চাইছিলেন না। কোনো রাজনীতির কারণে নয়, এমনি আলগা কোনো নৈতিক কারণেও নয়। বরং পাছে আবার ঐ সব কথা উঠে পড়ে যার কিছুই তিনি জানেন না। বা, অতি সামান্য যদি কিছু জানেনও তাহলে তিনি ভাবতে বা বলতে পারবেন না। কিছু ভাবা ও সেই কথা বলা—এটা তো একটা শারীরিক প্রক্রিয়া, সে-প্রক্রিয়াটা চালু করে না দিলে আগুনটা জ্বালবে কী করে, একটা ছোট সরু কাঠি দেশলাইয়ে না ঘষলে? প্রসন্নদেবের জীবনের অভ্যেসই হল, পুরনো আগুনে আঁচ নেয়া। মন্ত্রী-হওয়া যখন থেকে শুরু, উনি তখন থেকেই মন্ত্রী—কখনো দু-বছরের জন্য, একবার ছ-মাসের জন্য মন্ত্রী। কোন আইনে কখনো দু-বছর, কখন ছ-মাস এসব নিয়ে তাঁর কোনো কৌতূহলই ছিল না। তিনি এ-মিটিঙে এসেছেন, গান্ধীর মিটিঙের আমন্ত্রণ ফেরানো যায় না বলে। গান্ধীজির দর্শন পাওয়ার আগে থেকেই, তিনি কোনো অপরাধ করেছেন বলে তাঁর মনে হচ্ছিল। যেন, তাঁর মন্ত্রীত্ব ঝড়ে বক মরার মত। কিন্তু তাঁর কপালই এমন যে তাঁকেই কীনা গান্ধীজির প্রথম প্রশ্নের সামনে—তাও আবার এমনই উদ্ভট প্রশ্ন—কোনোদিন গান গেয়েছেন কী না। সেই প্রশ্নের জবাব গোলে হরিবোল হচ্ছে দেখেই তিনি বসে পড়ে আরো গভীরে চলে যান যেন মেঝেটা কোনো পুকুর, তার পাড়ে নানা ফোঁকর বা তার নানারকম ডুবজল।

গান্ধীজি তাঁকেই প্রশ্ন করলেন, 'মন্ত্রীত্ব করতে কেমন, লাগছে? একদিকে পার্টি আর-এক দিকে ডিপার্টমেন্টের দোটানায়?' প্রসন্নদেব দাঁড়িয়ে জোড় হাতে, 'ভাল কোনো অসুবিধা নাই। আগে যেমন ছিলাম—'

'আপনি আগেও মন্ত্রী ছিলেন? ব্যোমকেশ বাবুদের সঙ্গে? কোন পার্টি আপনার?'

'আমার কোনো পার্টি নাই। লাটশাহেব মন্ত্রী বানাইলেন, মন্ত্রী হছি। আর ডিপার্টের শাহেবদের সঙ্গে তো পূর্বচেনা।' প্রসন্নদেব বসে পড়েন আর তাঁদের কৌলিক পূজায় নবমীর সকালে মোষবলিটা হয়ে যাওয়ার পর যেমন, তেমনি হাঁফ ছাড়েন।

প্রসন্নদেব ঠিকই বলছিলেন। কথা চলছিল, স্বাধীনভাবেই, হিন্দি-ইংরেজি-বাংলা মিশিয়ে। ভাষা নিয়েও প্রসন্নদেবের কোনো সমস্যা থাকার কথা নয়। তাছাড়া, এখানে এতজন আছেন তাঁর কথাটা গান্ধীজির কাছে আর-একবার বলে দিতে। অসুবিধে, প্রসন্নদেবের, ছিল কথা নিয়েই। উনি কোনো কথা গুছিয়ে বলতে পারতেন না। এমনি গল্পগুজবে কারোই তো কথা গুছনো থাকে না—কথা নিজেই নিজেকে গুছিয়ে নেয়। প্রসন্নদেবের হয় এটা জানা ছিল না, নয় এটা তিনি বুঝতেন না। ফলে কোনো একটা কথাবলা তাঁর পক্ষে অনিবার্য হয়ে উঠতে থাকলে তিনি ঘামতে শুরু করতেন ও এতটা ঘামতেন যে ভিজে যেতেন। তাঁর কথাবলা, এখানে যাঁরা এসেছেন, সেই এমএলএদের এত চেনা যে একটু খোলা হাওয়া বয়েই যায়। হাওয়াটা বন্ধ হয়ে যায় উপেন বর্মনের একটা কথায় গান্ধীজির জবাবে।

উপেন বর্মন বলেছিলেন, 'প্রথম অ্যাওয়ার্ডে তো আমাদের মাত্র ১০টি আসন ছিল। আপনি সেটাকে একেবারে তুলে দিলেন ৩০-এ। আপনি আমাদের উপদেশ দিন, কী ভাবে আমরা ভালভাবে দেশের সেবা করতে পারি।

গান্ধীজি জবাবে বলেন—'সংরক্ষণটা কেন? সংরক্ষণ দরকার হবে কেন? আমি শুনেছি—বাঙালি-ওড়িয়াদের মধ্যে নাকী একটা রীত্ আছে মেয়েদের, বাড়ির ভাত রাঁধতে চাউল বেড়ে দেয়ার সময় মাপমত চাল নিয়ে, সেই চাল থেকে একমুঠো আবার ভাঁড়ারে ফেরত রাখতে। তাকে বলে লক্ষ্মীর ঝাঁপি। দু-মুঠো সঞ্চয় হলে চালের অভাবে পড়তে হবে না। তখন লক্ষ্মীর ঝাঁপি খোলা হবে।'

এখানে অনেকে আছেন যাঁরা জানেনই না চালের কোনো অভাব ঘটতে পারে। চাল তো সারা বছরই তৈরি হয়। আবার, অনেকে আছেন, যোগেনের মতো, যারা জন্মের পর থেকে শুধু ক্ষিধেতেই কষ্ট পেয়েছে। গান্ধীজির ঐটুকু কথায় সম্ভাব্য হাসি হেসে কেউ-কেউ সৌজন্য রাখলেন যদিও! তবে তার চাইতে বেশি শোনা গেল- তাদের নীরবতা, যারা বুঝতেই পারেনি—একমুঠ চাল যদি বেশিই পাওয়া গেল, সেটা আবার ফেরত কেন।

৯১

গান্ধীজির লুকনো দোস্ত

হতে পারে, গান্ধীজি নীরবতার বিস্তার আন্দাজ করতে পারলেন, উনি নাকী পারেন এমন বুঝতে, কিংবা পালটে দেয়া গল্পটা তাঁর কথাবলার রীত।

'অবিশ্যি এর একটা উলটো কথাও আমি শুনেছি। হিশেব মত যা নেয়ার নেয়া হল, তারপরেও এক মুঠো চাল নিতে হয়, অতিথের জন্য, কোনো উপোসির জন্য।' এবার সবাই মিলেই হাসলেন—এতে অভাবের কথা নেই। 'সংরক্ষণটাকে দুটোই ভাবতে পারেন। দুঃখের দিনের কথা ভেবে, লক্ষ্মীর ভাঁড়ার ভাঙা হল। বা, একমুঠো চাল বেশি নেয়া হল। যার যেভাবে ইচ্ছে, সেভাবে নিন।'

যোগেন ভিতরে-ভিতরে ফুঁসে উঠল। এই সব গল্পবানানো সে সহ্য করতে পারে না। তাদের সমাজে তো ঠাকুরগিরি করার হিড়িক আছে। তারাও এরকম আবোলতাবোল গল্প বানায় যার মাথামুণ্ডু নাই। আমি যদি বাড়ির লোকই হই, তাহলে আমার হিশাবের ভাতই আমি চাই। হয় লক্ষ্মীর ঝাঁপি, না-হয় তো অন্নপূর্ণার ঝাঁপি—এসব দিয়ে আমার কী হবে?

গান্ধীজি তখন বলছেন—'সারা দেশের মধ্যে একমাত্র কংগ্রেসেরই আছে দেশের সমস্ত মানুষের অভাব নিয়ে ভাবার ক্ষমতা ও সকলকে ক্ষমতাবান করার শক্তি। কংগ্রেসের সেই শক্তিটা নষ্ট করার জন্য একদিকে সরকার, আর-একদিকে নানা সাম্প্রদায়িক দল চেষ্টা করছে। কংগ্রেসের শক্তি নষ্ট করার অর্থ দেশের মানুষের শক্তি নষ্ট করা। সেটাকে রক্ষা করাটাই প্রধান কাজ। জাতপাঁত নিয়ে যে আসন ভাগাভাগির ফলে আপনারা ভোটে জিতে আইনসভায় এসেছেন, তাঁরা আইনসভার ভিতরে কংগ্রেসে যোগ দিন। তাহলে, যোগ্য জবাব দেয়া হবে। তোমরা আমাদের জাঁতপাঁতে ভাগ করছিলে। দেখো, সেই ভাগাভাগির সুযোগ নিয়ে আমরা আইনসভায় এসে আবার এক হয়ে গেছি।'

যোগেন ভাবেনি সে কিছু বলবে। কিছু সে নিজেই ঠিক বুঝতেই পারেনি, কখন এই বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান তার ভিতরে-ভিতরে ফুঁসছিল, সেই তের তারিখে অ্যালবার্ট হলে সুভাষ বোসের বক্তৃতা শোনার পর যেমন হয়েছিল। তাতে দুঃখ মাখা ছিল, এখন সমস্তটাই ক্রোধে লকলকে।

যোগেন গান্ধীজির কথা বলার ধরণে একটা আড় ফাঁকতাল পাচ্ছিল। তেমন কয়েকটা আড় তাল পার হয়ে যাওয়ার পর যোগেন ফাঁকটা পায়, প্রবেশের।

'কিন্তু কংগ্রেস তো উচ্চবর্ণ হিন্দুদের পার্টি। তাগ লাইগ্যাই তো আমাগর এই দুর্দশা। যে পার্টি আমাদের শূদ্র, চাঁড়াল বইল্যা অচ্ছুৎ কইর‍্যা রাখছে সেই পার্টিতে আমরা কেন যাব। আমরা শূদ্র ও অচ্ছুতই থাকতে চাই ও আমাদের নিজেদের পার্টি চাই। হিন্দুরও শিডিউল কাস্ট কংগ্রেসেরও শিডিউল কাস্ট?'

যোগেনের কথা মহাত্মাজি শুনলেন দুই হাতের মুঠোর ওপর খাড়া ভর দিয়ে বসে। ও নিজের কাঁধ দুটো চেতিয়ে। ঠোঁটদুটোর জোড় ভেঙে গেছে। ঘেঁটি আর মুন্ডুটা ঝুলে আছে মাটির দিকে। তেমন একটা অনড় মূর্তির চোখের চশমাটা থেকে কখনোসখনো ঝিলিক আসছিল। যোগেন বুঝে গিয়েছে, গান্ধীজি থামিয়ে দেবেন না ও যোগেনের কথার জবাব দেবেন।

যোগেন থামলে, গান্ধীজি তাঁর ভঙ্গি একটুও না-বদলে জিজ্ঞাসা করেন, 'আরো কথা যদি থাকে, তবে বলা হোক।'

কথাটা বলার পর গান্ধীজি মুখ তুললেন, যেন ভিড়ের পেছনটা দেখে নিতে। কেউই আর কিছু জিজ্ঞাসা না-করায় গান্ধীজি বলে উঠলেন, এমন একটা স্বরে, যেন অনেকক্ষণ কথা বলতে বলতে—নিজের কথার নিরর্থকতায় উনি নিজের গলা নিজেই ভাঙছেন। পুজোমণ্ডপ বা মহরমের মিছিলের বাজনদার ঢাকের টানটান চামড়া, বৃষ্টিতে রোদেঘামে যেমন আলগা ঢ্যাপঢ্যাপ হয়ে যায়। গান্ধীজির এই গলা শুনে প্যাটেলে একটু এগিয়ে এলেন। জওহরলালকে সুভাষ ইশারা করেন। উদ্বিগ্ন জওহরলাল একটু হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে এসে হাতের আঙুল নাড়িয়ে সুভাষকে আশ্বস্ত করেন।

'আমি আপনাদের কাছে ও সকলের কাছে একটা মাফি মাংছি। হাজার-হাজার বছর ধরে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিম্নবর্ণের মানুষের ওপর এত অত্যাচার, এত অন্যায়, এত ব্যভিচার করেছে যে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা এখন যে-প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে চান, সেই প্রতিকারের ব্যবস্থাই নিতে পারেন। এ নিয়ে তাঁদের স্বাধীনতা মেনে নিতে আমার কোনো পিছুটান নেই। আমার পেছুটান এই জায়গায় যে আমি একজন হিন্দু, বর্ণভেদেও বিশ্বাস করি, কিন্তু বর্ণবিদ্বেষ ও অস্পৃশ্যতাকে আমার অন্তরের সমস্ত ধর্মবোধ দিয়ে আমি বর্জন করি। মানুষের স্পর্শকে পাপ মনে করার মত অপরাধ আর কী হতে পারে? সেই কারণেই আমি 'হরিজন সেবা সংঘ' করেছি। এটাই এখন আমার জীবনের প্রধান কাজ। আর, মন্দিরে প্রবেশাধিকার দেয়ার জন্য বিভিন্ন প্রদেশের আইনসভাকে অনুরোধ করেছি।'

যোগেন জিজ্ঞাসা করে, 'মন্দিরে শূদ্রদের ঢুকতে দিলেই কি আমরা যারা পতিত, তাদের সমস্যা মিটবে?'

গান্ধীজি তাঁর দুই হাতের তেলো উলটে দিয়ে হেসে বললেন, 'মন্দিরেও যদি হিন্দুরা এক হতে না পারে, তাহলে কোথায় পারবে? আমি আবার বলছি মন্দিরে হরিজনদের প্রবেশাধিকারের আইন আমি চাইনি। আমি চেয়েছি, মন্দিরে হরিজনদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার অধিকার কারো থাকবে না—সেই আইন। আপনাদের কাছেও আমার অনুরোধ—আপনারা কংগ্রেসের বাইরে যাবেন না আর হিন্দুধর্মের বাইরে যাবেন না।'

যোগেন বলে বসে, 'এই দুই না-যাওয়ার অর্থ এক?'

গান্ধীজি সরাসরি যোগেনের চোখে চোখ রেখে হাসেন। যোগেন দেখে সে হাসিটা তাঁর চোখে দীপিত হয়ে আছে—অনেক অতীত ও অনেক ভবিষ্যৎ জুড়ে—পদ্মা-মেঘনার আকাশে

পূর্ণিমায় দুটো-একটা তারার মত। যোগেনের হঠাৎই মনে পড়ে—এই মানুষটিকে দর্শন করতে গেটের বাইরের মানুষগুলির মুখ, বুড়োদের, শিশুদের। এত মানুষের ভরসা এই একটা মানুষকে বইতে হয়।

গান্ধীজির এই তাকিয়ে থাকাকে বৈঠক শেষ হওয়ার সংকেত বুঝে সবারই একটু চাঞ্চল্য ঘটে।

গান্ধীজি যোগেনের দিকে সেই দৃষ্টি নির্নিমেষ রেখে গলাটা একটু বাড়িয়ে বলেন, 'আমার আর আপনাদের আর দেশের পক্ষে এক। এই তিনের সংযোগ না হলে, আলাদা।'

যোগেন বুঝে নিতে পারে, এই প্রথম সে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে চাক্ষুষ করছে—বর্ণভেদবিশ্বাসী নির্লজ্জ এক হিন্দু, স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নির্ভয় এক ভারতীয়। যোগেন যে তার নিজের অহিন্দু ভারতীয়তার ভিৎ খুঁজতে ডুবে আছে মহাসাগরের জলে।

যোগেনের দম আটকে আসছিল। এমন মানুষকে ফেরানো যায়? সে কেমন অপ্রস্তুতের মত হঠাৎ বলে বসে, 'আমাদের মধ্যে একজন আছেন যিনি পুনা প্যাকেট সই করেছিলেন, রসিকলাল বিশ্বাস।'

'আরে তাই? সেই দোস্তকে লুকিয়ে রেখেছেন? কোথায় তিনি?' গান্ধীজি খাড়া উঠে এঁদের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

বরিশালের তরল অন্ধকার

৯২

গান্ধীজির সঙ্গে আর তপশিলিদের কথা হল কতক্ষণ—বড়জোর আধঘণ্টা বা চল্লিশ মিনিট। কিন্তু সন্ধের মুখে ১৫ নম্বরে যত নেতা এসে জুটলেন, তাতে মনে হচ্ছিল—এঁরা সবাই গান্ধীজির প্রবীণ সহকর্মী, তাঁদের গান্ধী সম্পর্কিত সারা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই কথা বলছেন। যেন এঁরা সবাইই গান্ধীর কণ্ঠস্বরের স্বরলিপি গুনগুনিয়ে পড়ে দিতে পারেন—যদিও এঁদের ভিতর ঘরানা নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি লেগেই আছে—কেউ সেনী, কেউ আগ্রা, কেউ গোয়ালিয়র, কেউ-বা দেওবন্ধ। তাহলে গান্ধীজি কি একই সঙ্গে এতগুলি ঘরানায় কথা বলছিলেন, নাকী, গান্ধীজির কোনো ঘরানাই নেই, যা আছে তা নানা ঘরানার জগাখিচুড়ি। যোগেন আর নস্করমশায় পাশাপাশি দুই চেয়ারে বসে পা নাড়াচ্ছিলেন, কোনো পা না তুলে। যোগেনের ঠোঁটে একটা হাসির রেখা লেগে ছিল।

যাঁরা এখানে এসেছিলেন, এখন, তাঁরা সবাই তপশিলি নন। শেয়ালদা-হ্যারিসন রোডের মত সহজগম্য জায়গাও তো আর হয় না—একপাক, কোনো বিশেষ খবর জানা না-থাকলেও, ঘুরে যাওয়ার মত। কোনো খবরটবর যদি পাওয়া যায়—

প্রথম আইন-অমান্যে ছ-বছরের ফাটকখাটা শেয়ালদা-র মকবুল হুসেন বলছিলেন, 'দেখার একটা ইচ্ছা ছিল—আমরা তো দেখেছি ওঁকে আলিভাইদের সঙ্গে, রাজাবাজার ট্রামডিপোতে। ট্রামকর্মীরা ডিপোর দরজা খুলে দিয়েছেন আর ডিপো ভরাট হাজার-হাজার লোক দেখছিল আট হাতি কাপড় পরা, এক লিকলিকে আধবুড়ো। অলিভাইদের মাঝখানে নেহাতই না-লায়েক। কিন্তু খিলাফতের সঙ্গে স্বদেশী হিন্দুদের ভাগ্যের মিল কোথায় আর খিলাফতিদের আইন-অমান্যের

স্বার্থ কী—সেটা সেই নালায়েক নেতা সবচেয়ে স্পষ্ট বলেছিলেন। কথাটা এরপর থেকে সবার মুখে-মুখে ফিরত।

খিলাফত কী খিলাপ হুয়া ইস্তাম্বুলমে।

ইংরাজ-আইন খিলাপ হোগা হিন্দুস্তানমে। লেকিন, বিলকুল আইন নাহি।

এক ভি আইন নহি যো কো তোড় না যায়েংগে।'

মকবুলভাই এখন রাজনীতি করেন না। সকলেই কারণটা জানেন—তিনি মুসলিম লিগের মত মানেন না। এবার এটাও জানা গেল—প্রজাপার্টির মতও মানেন না। পাড়ার লোকেরা জবরদস্তি করে তাঁকে মুচিপাড়ার কাউন্সিলার করে দিয়েছেন।

হেমন্ত বোস তো কংগ্রেসের উত্তর কলকাতা জিলা কমিটির সম্পাদক, সুভাষবাবুর এক নম্বর চেলা, খুব ভাল দল করেন।

'হেমন্তদা, আপনি খোদ হেড-অফিসের লোক হয়ে আমাদের ব্র্যাঞ্চ অফিসে এসেছেন কেন? আপনার কাছ থেকে তো আমরাই খবর চাই—'

হেমন্ত উত্তর দেন, 'আমার কোনো ব্র্যাঞ্চ নাই', সবার হাততালি থামলে হেমন্তবাবু যোগ করেন, 'সব অফিসই হেড অফিস। বেছে-বেছে তপসিলিদেরই ডাকলেন কেন? গান্ধীজি বললেন? এদিকে এক নিউজ দিয়ে 'আজাদ' তো বাজার মাৎ করেছে। গান্ধীজি নাকী প্রদেশ কংগ্রেস আর লোক্যাল কংগ্রেসকে এড়াতেই সদর কলকাতায় মিটিং না-করে করেছেন সদরের বাইরে। শরৎ বোসের মঞ্জিলে। সে-মঞ্জিলের গেট মোটা লোহার। ঢুকতে না দিলে ঢোকা যায় না। এই রসিক, ছাড়ো না একটু।'

রসিকলাল সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠলেন, 'শালুক চিনছে গোপাল ঠাকুর। তুমি যা-যা কইতে শিখাইছিল্যা, বেবাক কইছেন—যে, যত আছো হরিজন/মন্দিরে কর গমন।'

'এটা কি একটা নতুন কথা? সে তো মন্দিরে ঢোকা মানুষের চাপে মানুষজন গাদা-গাদা মাটিতে পিস্ট হচ্ছে।'

পি আর বললেন, 'গান্ধীজি বললেন, কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলিতে তপশিলিদের উন্নয়নের কাজ ভাল হচ্ছে। আমি ভেবেছি উনি মন্দির আর মসজিদের জমি থেকে তপশিলিদের কিছু জমি পাওয়ার কথা বলবেন। ইউপিতে টেনান্সি অ্যাক্টে একটা ব্যবস্থার প্রস্তাব ছিল—কোথাও কোথাও কোনো-কোনো উঁচু জাতকে রাজস্ব ও খাজনায় কিছু ছাড় দেয়ার যে-রীতি চালু আছে, ল্যান্ড রেকর্ডস অফিসারের কাছে সেই জমির বিবরণ নথিভুক্ত করতে হবে। উদ্দেশ্য বর্ণভেদপ্রথার সঙ্গে জমির মালিকানার সম্বন্ধটা আলগা করা। পুরো আইনসভার সবাই মিলে—রাজা-মহারাজা, নবাব-বেগম এমন কী তপশিলি মেম্বাররা এমন আপত্তি করল যে সরকার এই প্রস্তাব তুলে নিতে বাধ্য হলেন। আমি ভেবেছিলাম, গান্ধীজি বোধহয় সরকারের প্রস্তাব তুলে নেয়ার ঘটনাটাই ইঙ্গিতে করছেন এটা বোঝাতে যে—কংগ্রেসের সরকার তো এগিয়ে আছে কিন্তু অন্য দলের মেম্বাররা তো পিছনে টানছেন। কিন্তু গান্ধীজি কংগ্রেসের সুশাসন বলতে বোঝালেন—মন্দিরে ঢোকার ব্যাপারে বিধিনিষেধ আরোপ না-করার আইন পাশের কথা।'

মকবুল হোসেন জিজ্ঞাসা করেন, 'তাহলে বাজান, তোমরা কংগ্রেসের সঙ্গে জোট পাকিয়ে এই হকসরকারটাকে ফেলছ কেন?' এই কথার মধ্যে যে একটু পেছু-লাগা ছিল সেটাতে সবাইই খুব মজা পায়, পি আরও। এই কথাতে যোগেনও বেশ বড় করে হাসে।

পি আর নিজে হেসেও একটু বাঁচাতে চাইলেন, 'হচ্ছে গান্ধীজির কথা, এর মধ্যে আমাদের কথা আসে কোত্থেকে?'

'একটু তো আসেই মণি। ধরো, বাংলার অ্যাসেম্বলিতে কাগো ভোটে ঠিক হব, সরকারডা কার। এক, বাংলার অ্যাসেম্বলি কাগো ভোটে ঠিক হবে, সরকারডা কার। এক ইয়োরোপিয়ান ব্লক—ভারতের আর কোনো প্রদেশে জনসংখ্যার উলটানীতিতে এতগুলা শাহেবের ব্লক নাই। একটা ঝোলা সরকারকে ফেলাইতে পঁচিশ-ছাব্বিশডা ভোট কি সামান্য ঘটনা? দুই শিডিউল্ড কাস্ট ব্লক—সে তো তিরিশজন, যোগেনরে ধইরলে একত্‌তিরিশ। তিন, ইনডিপেনডেন্ট মুসলিম ব্লক—এডার মেম্বার কয়জন তার হিশাব খুব দুরূহ। তাও ধরো জনাবিশ-পঁচিশ। তাইলে সরকাররে রাইখতে বা ফেলাইতে তরলতাধর্মী আমি জন মেম্বার মানে তো কংগ্রেস যে-কায়দায় সিন্ধে আল্লা বকসরে ঝুলাইয়্যা রাইখছে বা আসামে সাদুল্লারে কোতল কইরল, সেই কায়দাতেই এখানেই শিডিউলগ সঙ্গে দল পাকাইয়্যা হকশাহেবরে ফেলাইব। গান্ধীজি মহাত্মা, সে নিয়্যা তো কোনো সন্দ নাই। তিনি আসার দুইদিন আগে শরৎ বোস তোমাগো চা খাওয়াইয়া নতুন পার্টি খাড়া কইরল আর দুই দিন পর গান্ধীজি আইস্যা উপদেশ করেন—সবাই মিল্যা কংগ্রেস করো আর শিডিউল্‌রা মন্দিরে ঢোকো। এমন উপদেশের ভিতরে একডা অনুপদেশও থাহে—নতুন পার্টি কইর‍্যা কাম কী, পুরান কংগ্রেস থাইকতে? শরৎ বোসের টি-পার্টিরে কইতে পারো ফার্স্ট প্রেমিস—আপনারা সবাই মিল্যা একডা পার্টি বানান, কংগ্রেসের বাইরে। যদি তাই হয়, তাইলে কংগ্রেস ক্যান তার পুরানা চেহারা বদল কইর‍্যা নতুন পার্টিটাতে আসব না? আর এডডা মহাবিপদ কংগ্রেস কাজেকথায় সত্য হওয়ার দিকে যাচ্ছে। যে-যে প্রধানমন্ত্রীরে ফেলাচ্ছে, সকলেই মুসলমান আর সকলেই গান্ধীবাদী। সিন্ধুর মুর্তজা। আসামের সাদুল্লা। এডারে, কেন হিন্দু কমিউনালিজম কওয়া যাবে না? তার জন্যে একডা আর্যসমাজ, হিন্দুমিশনে লাগে ক্যা। এ নিয়্যা তো কোনো সাদ নাই যে কংগ্রেসই একমাত্র অল ইন্ডিয়া পার্টি আর কংগ্রেস মতাদর্শে সাম্প্রদায়িক না। তার ইতিহাসও খুব জটিল। কিন্তু আমাগ দেশের মত কলোনিতে ইডিয়োলজির থিক্যা স্ট্র্যাটেজিক মুভমেন্ট অনেক বেশি হয়। তাই যে-পার্টি যত ছোট সে-পার্টি কোনো-না-কোনো অর্থে তত কমিউন্যাল।'

কয়েকজন এসে দরজা থেকে কয়েক পা ভিতরে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কথা বলছিলেন, কোণের জানলার নীচে এক খাড়া টিনের চেয়ারে বসে লম্বা মাপের এক জোয়ান মানুষ। ডক্টর মেঘনাদ সাহা। বৈতালিক এলাম বাদ থেকে যায়।

যারা ঘরে ছিল, তারা কথাগুলি শুনছিল, চোখের পাতাও না-ফেলে যেন। বাইরে থেকেও সবে এসে গেছেন কলকাতায় পালিত-প্রফেসর হয়ে। ১৫ নম্বরে তিনি নিয়মিত আসেন না, কখনো-কখনো আচমকা চলে আসেন, কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে চলে যান। শিডিউল-ক্লাস রাজনীতিতে তিনি থাকেন-যে, তা বলা যায় না, কিন্তু যেখান থেকে রাজনীতি উঠে আসে সেই নিম্নবর্ণের আত্মচেতনা তিনি স্বজাতের মানুষজনের সঙ্গে ভাগ করে নিতেও চান, আবার, অন্যান্য সবার কাছ থেকে হয়ত নিজের আত্মচেতনার পুষ্টিও নিতে চান।

হেম নস্কর চেয়ার থেকে দু-হাত তুলে বলেন, 'স্যার, আপনি মাঝেমধ্যে এসে তো আমাদের ক্লাশ নিতে পারেন। তাহলে আমাদের বোঝার ক্ষমতা কিছু বাড়ে।'

'বলেন কী নস্করমশায়। রাজনীতি কি আর নাইটস্কুলে শিক্ষা দেয়া যায়। রাজনীতির পাঠশালা তো আমাদের মানুষের জীবন যদ্দুর ছড়াইছে, সেই খাল-বিল-জঙ্গল-নদী নালায়। এবারের ভোটে প্রজাপার্টি আর তপশিলরা তো রাজনীতির মোড়লগ ভাসাইয়্যা দিল। এগো থিক্যাই জাতির নেতা হওয়ার ভেলোসিটি তৈরি হয়। নাইট স্কুল খুইললে তো এগ চিন্তার থিক্যা নদীনালা খালবিল শুকাইয়্যা যাইব। গান্ধী তো মহাত্মা—সেডা ঐ একডা ক্ষমতায়। তারে দেইখলেই নদীনালা-

খালবিল মনে পড়ে। না, উঠি, অ্যাখন,' মেঘনাদ সাহা উঠে দাঁড়ালেন, অত বড় লম্বা মানুষটার মাথা সবার মাথা ছাড়িয়ে গেল। মেঘনাদ সাহা-র সঙ্গে প্রায় সকলেই উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। মকবুল হোসেন একটু এগিয়ে এসে মেঘনাদকে বলেন, 'প্রফেসরজি, নাইট স্কুল তো করবেন না। লাইট পোস্ট তো করবেন? কানা, ভাঙা রাস্তায় মানুষ যাতে পথ দেখতে পায়?'

মেঘনাদ, মকবুল হোসেনকে চেনেন না। বললেন, 'আপনারা পথ দেখতে প্যালে শাহেবদের তো অসুবিধা। অ্যাহন তো কর্পোরেশনেরও অসুবিধা। দেশবন্ধু যে সুভাষরে কী গলার কাঁটা দিয়্যা গ্যালেন!' মেঘনাদ সাহা, সুভাষের বন্ধু।

'সে তো বটেই। আমি সে-লাইটের কথা বলিনি। আমি আপনাদের মত বড় মানুষের কথা বলছি যাঁরা আমাদের আলো দিয়ে পথ দেখান। চলুন, আপনাকে দু-পা এগিয়ে দিতে-দিতে সেই আলোটা মাথায় মাখি।'

দেখতে-দেখতে পুরো ঘরটাই খালি হয়ে গেল। যোগেন ছাড়া সকলেই নেমে গেল। যোগেন ইচ্ছে করেই নামল না—সেটা কাউকে বুঝতেও দিল না। গান্ধীজিকে নিয়ে সেই সকাল থেকেই সে. একটা রহস্যে আছে। সেই রহস্য একটু ছুঁয়ে গেল বলেই কি মেঘনাদ সাহার কথাতে নাড়া খেয়ে গেল—'গান্ধীরে দেখলেই সবার নদীনালা-খালবিলের কথা মনে পড়ে'। বরিশালের ছেলে যোগেন—খুব সরু খালপথে নিশুতে নৌকা চলা তার জানা। দু-পাড় থেকে লতা, জঙ্গল, শোয়া খেজুরগাছ জলের প্রায় ওপরে এসে পড়ে। দৃষ্টি ফেলা যায় না। এক-এক সময় ভুল আলো দপ করে জ্বলে নিভে যায়। এক-এক সময়, পাতাল থেকে গুরগুর আওয়াজ ওঠে—জোয়ারের আওয়াজই, সামনে না পেছনে? এইসব যাত্রা, এইসব গমনাগমন, এইসব ভ্রমবিভ্রম কি গান্ধীজিকে দেখে মনে পড়ে?

যোগেনের তো মনটা হু হু করে উঠল বরিশালের সেই তরল অন্ধকারের জন্য!

নীহারেন্দুবাবু তাকে মার্ক্স-এর যে বইদুটি দিয়েছিল সে দুটো অনেকবার পড়েছে যোগেন, এখনো বইদুটি বুঝে নিতে অন্য বইপত্রও পড়ছে। বই দুটো শুধু যে যোগেনকে চমকে দিয়েছে তা নয়। তার বোঝাবুঝিতে বহু গিঁঠ পাকিয়েছে। যোগেন তো মার্ক্সের ধারণাটাই বুঝতে পারছিল না—যাকে বলে মেরিট অব দি কেস। জন্ম থেকে উঁচু জাত আর শূদ্রের জীবনযাত্রার, সম্পর্ক ও সংঘাতের মধ্যে তাকে বেঁচে থাকতে হয়েছে। সেই সম্পর্ক ও সংঘাতের প্রসঙ্গ দিয়েই ধারণা তৈরি করা তার অভ্যেস। সেই উঁচুনিচু তো মার্ক্সের নয়। কী করে মেলাবে যোগেন তার জীবন আর মার্ক্সের ব্যাখ্যা? একটা ছোট জায়গাতে যোগেন সেই পদ্ধতিটার ইশারা পেয়েছিল। তার পর থেকে সেই ইশারাটাকেই বেহুলার ভেলা করেছে। বিপ্লব যোগেনের অপরিচিত ধারণা নয়। সমগ্র বিপ্লবীরা এখানেই সে-ধারণাটা তৈরি করে দিয়েছে। কিন্তু বিপ্লবী শ্রেণী সংগ্রামের ধারণার সঙ্গে সে মেলাতে পারছিল না—জাতপাতের ব্যাপারে ইংরেজরা যে এই ভারত শাসন আইন বানিয়েছে তারই সুযোগে তো শুদ্দর আর মুসলমান একটু ক্ষমতায় এসেছে! একটা অন্তত সামাজিক কথাবার্তা জায়গা পেয়েছে, যেখনে জাতপাতের কোনো স্বীকৃতি নেই। তাহলে তো শুদ্দুরদের পক্ষেই কাজ করল শাহেবরা। কিন্তু গান্ধী বা কংগ্রেস এই খোলাখুলি জায়গাটা নিয়ে কোনো সময়ই খুলি না। শিডিউল বা মুসলমানদের আলাদা করে কোনো অধিকার দিলেই গান্ধীর বা কংগ্রেসের রাগ হয়—যেন, তাদের ভাগ কমে গেল। ঐ 'ক্লাস স্ট্রাগলস ইন ফ্রান্স'-এর একটি লেখায় মার্ক্স, বুর্জোয়া সমাজে বাইরের থেকে কেউ যদি ঢুকতে চায় তাহলে তার শাস্ত্রজ্ঞান ও আইনজ্ঞান তার 'গেট্স—এন্ট্রিকে দুরূহ করে তোলে। বুর্জোয়া সমাজ কী করে তার বাইরের সবকিছুকে হজম করে নেয়। যা বুর্জোয়া সমাজের সম্পত্তি নয়, তেমন সবকিছুকেই বুর্জোয়া

বানিয়ে নেয়। আমাদের বামুনদের মত। কিন্তু বামুনরা তো বুর্জোয়া নয়। তাহলে শুদ্দুররাই—বা প্রলেটারিয়েট হবে কী করে? যোগেন যদি বিএল পাশ না কর খুব কম সময়ের মধ্যে কোর্টে নিজেকে দাঁড় করাতে না পারত ও কথায়-কথায় সংস্কৃত আর ইংরেজি থেকে মুখস্ত বলতে না পারত, তাহলে ঐ সমাজের 'গেটস অব এনট্রি' পেরতে পারত? ঐ সমাজ-বলতে যোগেন যদিও বর্ণবিভক্ত হিন্দুসমাজ বুঝে নিয়েছে কিন্তু সেই বুঝেনেয়ার মধ্যে ইংরেজ-ভারতবাসীও আছে। মার্ক্সের সূত্র দিয়েই যোগেন যেন গান্ধীকে একরকম করে বুঝে নিচ্ছিল। গান্ধীকে সামনা সামনি না দেখলে, না শুনলে তাঁকে বোঝা সম্ভবই নয়, গান্ধী এতই নিখাদ গান্ধী। তাত্ত্বিক কচকচিতে কান দেন না, মতান্তর গ্রাহ্য করেন না, কেতাকানুনের কেয়ার করেন না, আধ্যাত্মিকতার ধার ঘেঁষেন না, নিজেকে সত্যের প্রমাণপত্র হিশেবে অ্যাপিডিভেড করেন, কত কমে একটা লোকের চলে তা সবসময়ই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন, জনসাধারণকে সর্বোচ্চ মনে করেন।

এতটাই গুছিয়ে ভাবতে পারল যোগেন ১৫ নম্বরের ফাঁকা ঘরে, একেবারে একা, জীবনে হয়ত এই প্রথম, তার আত্মপরীক্ষা প্রয়োজনে। এতদিন তো ছিল তার কেবলই শরীরে বেঁচে থাকা।

গান্ধীমুগ্ধতা কাটাতে যোগেনকে রীতিমত খাটতে হয়। ভিতরে-ভিতরে তার একটা জিদ ছিল যে সে গান্ধীজ্বরে কাত হবে না। তার কারণ, গান্ধীকে কেন্দ্র করে যে পরিধি প্রতিদিনই মাপে বড় হয়, সে কোনোদিনই তাঁর আশপাশ দিয়ে হাঁটেনি। তাদের সমাজে গান্ধীর আন্দোলনে যোগ দেয়ায় নিষেধ ছিল। গুরুচাঁদ ঠাকুরের নিষেধ ছাড়াও বা নিষেধের কারণেই, মনে হত, গান্ধী-আন্দোলন ভদ্রলোকদের বাড়ির ব্যাপারে। ওদের নেতারাও ভদ্রলোক। 'বয়কট', 'পরোক্ষ প্রতিরোধ', আইন অমান্য, অহিংসা, সত্যাগ্রহ, অনশন—এসব কোনো কথাই নমশূদ্র, অন্যান্য অন্ত্যজ বা মুসলিম সমাজের ভিতর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। বরং গান্ধীজিকে যে অবতার ভাবতেন অনেক হিন্দু, সেটা অন্তত নমশূদ্রদের মুসলমানদের সঙ্গে মিলতে পারত। রাজবংশীদের সঙ্গে মিলত না। তাদের সৃষ্টিতত্ত্বে বা জীবনাচরণে অবতার নেই। অন্যান্য অন্ত্যজরা আরো অজ্ঞাত। মুসলমান ও নমশূদ্ররা হজরত মোহম্মদ ও গৌরাঙ্গ অবতার থাকতে নতুন অবতার ধরতে যারে কেন। গান্ধী-সংক্রমণে যোগেন ভুগবে না—যোগেন নিশ্চিতই ছিল।

কিন্তু যোগেনের তো কখনো চোখের সম্মুখে দেখা নেই যে একটি মানুষের শারীরিক উপস্থিতি, উপস্থিত অন্য সব মানুষের বিবেচনাকে কতটা নিঃসাড় করে দিতে পারে। মন্দির প্রবেশের অধিকার নিচু জাতের একমাত্র পরিত্রাণ—শিক্ষায় ও অর্থনীতিতে এর ফলেই তারা তাদের পেছিয়ে থাকা কাটাতে পারে—এ-কথাটা যদি সত্যও হয়, তাহলেও তো খুবই গাঁটও গেরো পেরনোর কথা এই সত্যে পৌঁছুতে। একজন ডোম, ডোম হয় কেন আর-একজন বামুন, বামুন হয় কেন—শাস্ত্র, বিধি, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস ইত্যাদি থেকে যুক্তিটুক্তি না-এনে কী করে কোন্ আক্কেলে একজন বলতে পারে যে সে বর্ণভেদ মানে, অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ মানে না, অস্পৃশ্যতা কোনো ধর্ম নয়, উঁচুজাতের লোকদের অপরাধ ও পাপে নিচুজাতের লোকদের এই দশা, তারা উঁচুজাতের বিরুদ্ধে যে-নালিশ করছে, তার চাইতে হাজারগুণ বেশি রাগ দেখালেও নিচুজাতির লোকদের কোনো দোষ দেয়া যায় না, কিন্তু সেই কারণে হিন্দুধর্মকে ভাগ করা যায় না, সেটা নিজের ধর্মকে অস্বীকার করা হয়, মন্দির—প্রবেশের অধিকার বা মন্দির—প্রবেশের নিষেধ—অর্জন বা বর্জন—করার জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে থাকাই একমাত্র উপায়?

কিন্তু যোগেন তো নিজের চোখে দেখল—গান্ধীজি কত সরলভাবে এই কথাটা বললেন, এত বিলেত-ফেরতের একজনও হেসে উঠতে পারল না, আর, যোগেনের মত শূদ্রস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসীও সন্দেহ করতে পারল না যে লোকটি বোকা বা কথাটা ধোঁকা। ততক্ষণে যোগেন তো সেই প্যাঁচে পড়ে গেছে—ডোমের কাজটাও কাজ, বামুনের কাজটাও কাজ, কাজের পার্থক্য অনুযায়ী যদি জাতের পার্থক্য না করা হয় আর দু-জনই যদি একইরকম সম্মান পায়—তাহলে বর্ণভেদটাই তো থাকে না, বা থাকে—একজনের সামাজিক কাজের নির্দেশক হয়ে, আর এটা দূর করতে হলে মন্দিরে ঢোকার সম-অধিকার পেতে হবে, আর পেতে হলে, আন্দোলন করতে হবে, আর, আন্দোলন করতে হলে দেশের সবচেয়ে পুরনো ও সবচেয়ে প্রসারিত পার্টিতে, কংগ্রেসে, থাকতে হবে। যুক্তির এই সারল্যই হচ্ছে এ-যুক্তির সবচেয়ে বড় প্যাঁচ। সুভাষ বোস ১৯২৯-এ রংপুরে প্রাদেশিক সম্মিলনে নাকী বলেছিলেন, 'হয় সবাইকে বামুন বানিয়ে দাও, নয়তো সবাইকে শূদ্র বানিয়ে দাও।' কথাটা খুব ধরেছিল ও ছড়িয়েছিল। যোগেনের তখন খুব দুঃখের দিন—আইনপড়া চালাতে পারবে কী পারবে না। যোগেন পর্যন্তও কথাটা পৌঁছেছিল আর যোগেনের চমকও লেগেছিল বেশ—বর্ণভেদের সবচেয়ে সহজসরল উপায় মনে হয়েছিল। তারপর ভুলেও যায়—কথাটার ভিতর একটা মরীয়া ভাব আছে, তাতেই কথাটা বেয়াক্কেলে হয়ে যায়। আর, যোগেন তখনই জানে—অন্তত ৫০ বছর ধরে নমশূদ্ররা বামুন হতে পৈতে পরেও বামুন হতে পারেনি।

গান্ধীজির কথাটা যুক্তি হিশেবে টেঁকসই যে না, যোগেন তার ওকালতি বুদ্ধিতে টের পেলেও, সেটা সে এখন ভাবে না, ভাবতে চায় না, বরং সে আরো একটু গান্ধীমুগ্ধ হয়ে পড়ে—সত্যি তো, এই একজন মানুষ কংগ্রেসশাসিত সমস্ত প্রদেশ সরকারকে 'মন্দির প্রবেশ' আইন পাশ করতে বাধ্য করছেন সবচেয়ে জরুরি কাজ হিশেবে। এ তো কৌশলের চাইতে কিছু অধিক।

যোগেন বুঝে ফেলেছে—যতই সবাই মাথায় করে রাখুক, যতই সবাই দরজায় দর্শনের জন্য দাঁড়িয়ে থাক, যতই সবাই 'বাপু', করুক, 'বাপু' যতই সবাই গান্ধীরাজের কথা বলুক, গান্ধীকে তাঁর নিজের অবাস্তবতাকে রাজনীতির বাস্তবতায় বদলে নিতে কী দাঁড় বাইতে হয়, কী গুণ টানতে হয়, কী হাল ধরতে হয়? বছর দুই আগে কংগ্রেসে যখন জওহরলালের সোস্যালিজমের বান ডেকেছে, এমন কথাও বলা হচ্ছে—'গান্ধীজি একাই তো আর কংগ্রেস নয়', 'গান্ধীবাদ আর জাতীয়তাবাদ তো আর এক নয়', এমন সব কথা লেখা হচ্ছে—বাংলাতে তো রোজই লেখা হচ্ছিল—অহিংসা মানে তো ব্যবস্থাকে বিশৃঙ্খল না-করা, পরিবর্তন মানে বিপ্লব নাকী হৃদয়ে ঘটাতে হয় আগে—এইসব কথা কোনো কাজের কথা নয়, শুধুই ভাবের কথা।

আবার উলটোদিকে কংগ্রেস ছ-ছটি প্রদেশে যে মন্ত্রিসভা চালায় সেই মন্ত্রিসভার সব কাজকর্মের জন্যও গান্ধীই দায়ী—এমন কথা যে চাপা গলায় বলা হচ্ছে তাও নয়। এদিকে মুখে বলা হচ্ছে—পূর্ণ স্বাধীনতা চাই। অন্যদিকে কাজে বোঝানো হচ্ছে, প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনই-বা এমনকী অপূর্ণ। গান্ধীজি যেন বিদেশী শক্তির সরকারকে ভালভাবে চালিয়ে দেয়ার দাদন নিয়েছেন। কংগ্রেসের প্রদেশগুলি, গান্ধীবাদের আদর্শ অনুযায়ী, কৃষককে বা শ্রমিককে কোনো আন্দোলনের অধিকার দেয় না, উলটে, এইসব উদ্ভট কথাই রাজনীতির আসল উদ্দেশ্য বলে রটিয়ে বেড়ায় যে খদ্দর পরলে, চরকা কাটলে, অহিংস হলে, মদ্যপান নিষিদ্ধ করলে, মন্দিরে হরিজনরা ঢুকতে পারলেই পূর্ণ স্বাধীনতায় পৌঁছে যাওয়া যাবে। স্বাধীনতা তো একটা রাজনৈতিক অধিকার আর হরিজনসেবা তো একটা সামাজিক কর্তব্য। দেশ কি অস্পৃশ্যতার দোষে পরাধীন হয়েছিল। ক্লাইভ, মিরজাফর, রানি ভবানী, এরা তো দিব্বি এক টেবিলে বসেই প্ল্যান

করেছিল—ছোঁয়াছুঁয়িতে তো আটকায়নি। এখন পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে আর তিরুপতির মন্দিরে সকলে ঢুকতে পারলেই স্বাধীনতা পূর্ণ হবে? মানে, একটা সাইনবোর্ড টাঙালেই হল—'প্রবেশ অবাধ!'

একটা লেখা মনে করে যোগেন হেসে ফেলে। আর-কিছু মনে নেই, শুধু মনে আছে একটা জায়গা, বাংলা করলে দাঁড়ায়, গান্ধী চান যেন চটেমটে আমরাই কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসি। আমরাও শেয়ানা। কংগ্রেস তো কারো বাপের সম্পত্তি নয়, বা, কংগ্রেস তো কারো মালিকানায় তৈরি হয়নি যে মালিকের হুকুমে চলতে হবে!

এই জায়গাতেই যোগেন প্যাঁচে পড়ে গেছে। গান্ধীকে যদি সে না দেখত ও তার কথা বলা না শুনত, তাহলে, যোগেনও কিন্তু গান্ধীকে নিয়ে ঐসব কথাই ভাবত আর বলত। সেটাই তো যুক্তিযুক্ত—ওকালতিতে যুক্তিযুক্ততাকে এতদূর পর্যন্ত যুক্তিযুক্ত করা হয়েছে যে সন্দেহও যুক্তির বাইরে যেতে পারে না, অপরাধকে অপরাধ হতে হবে বেয়ন্ড রিজনেবল ডাউট। তা না হলে যেটুকু সন্দেহ দূর হল না, তার সুবিধে আসামি পাবে—'বেনিফিট অব দি ডাউট'। এমন যুক্তির গারদে ঠেসলে গান্ধীকে খালাশ দেবে কে? ছাগলের দুধ খেলে স্বরাজ আসবে। চরকা কাটলে স্বরাজ আসবে। প্রতিরোধ পরোক্ষ হলে স্বরাজ আসবে। এইসব কথা একটা লোক যদি আসমুদ্র হিমাচল রটিয়ে বেড়ায় তবে গুজব রটানোর দায়ে যে-কোনো তৃতীয় মুনশেফও তাকে হাজত খাটাবে!

এই মনে-মনে খেলাটাতে যোগেন মজা পাচ্ছিল।

গান্ধীকে দেখেশুনে সে নিজে জব্দ হয়েছে। তা থেকে সে ভাবতে চাইছে—কে হয় না, বা, হয়নি, বা, হত না? গান্ধী যুক্তির খেলাই খেলছেন কিন্তু সে-যুক্তি আমার যুক্তির পাল্টি নয়। সে-যুক্তি তাঁর নিজস্ব যুক্তি। সেসব জায়গায় গান্ধীজি বেশ চটেও যান, বেশ জোরে আঘাতও করেন, 'আমি কোন যুক্তিতে খেলব, সেটা তো আমার বাছাইয়ের ব্যাপার, এমন তো নয় বক্সিং খেলতে হলে রিঙেই নামতে হবে।'

গান্ধীজিকে কতটাই কঠিন বাস্তবে তাঁর বরফজমাট যুক্তিগুলিকে জমাটই রাখতে হয়, নিজেকে অবাস্তব করে না তুললে কী করে এই বিশ্বাস রক্ষা করা যাবে যে তিনি পোয়াতির কম প্রসবব্যথাও চড়িয়ে দিতে পারেন?

গান্ধী মুগ্ধতা থেকে পরিত্রাণ

৯৩

পরদিন, ১৯ মার্চ, যোগেন শেয়ালদায় পৌঁছুল একেবারে শেষ মুহূর্তে, হাতে তার সেই পোর্ট ফোলিও ব্যাগ। তাতে ঠাসা কাগজ। একটা ধুতি বা গামছাও নেই। না-থাকায় অসুবিধা তো হবেই। জামাকাপড় বদলানোর কোনো অভ্যেস যোগেনের কোনো কালেই ছিল না। থাকার কথাই ওঠে না। জোগাবে কে? অত ইতিহাস-ভূগোল না ঘেঁটেও বলা যায়—ওকালতিতে রোজ বার লাইব্রেরির অতজন ভদ্রলোক আর মুসলমান উকিলের সঙ্গে বসতে গেলে ও কোর্টে দাঁড়াতে গেলে তো আর এমন পোশাকে যাওয়া যায় না যে অন্নপ্রাশনে পরা আর শ্রাদ্ধে খোলা। বাড়িতে বাড়তি কাপড় পাবে কোথায়।

যোগেন যে দোনোমনো মন নিয়ে শেষ পর্যন্ত খুলনা মেল ধরতে শেয়ালদায় এল, সেটা তার নিজের খুব চেনা নয়। যোগামার জন্য, বাড়ির জন্য, মৈস্তারকান্দির জন্য, বরিশালের জন্য কোনোকালে তার মন খারাপ করেনি। মন আর সময় পাবে কোথায় খারাপ হতে? বাড়ি ছেড়ে, মৈস্তারকান্দি ছেড়ে, বরিশাল ছেড়ে বাইরে, আরো বাইরে পৌঁছুনোর হাঙ্গামাহুজ্জুতে তো দম ফেলতে পারত না। সেই বাইরে গিয়ে তিষ্টনোও তো ছিল এক রোজকার ঝামেলা। সেখানে আবার শখ হল তো বরিশাল চল্—এমন হুজুগ কি সম্ভব ছিল? বা, এখনো কি সম্ভব? কাল ২০ মার্চ, অল বেঙ্গল শিডিউল্ড ক্লাশ ফেডারেশনের সপ্তম সম্মিলন। সেখানে যোগেনের হাজির না থাকায় তো বজ্রপাত ঘটবে। মিটিং অবিশ্যি ঠেকবে না—ফেডারেশনের পুরনো নেতারা আছেন। কিন্তু তিন দিন আগেই না, শরৎ বোসের বাড়ির রাত্রির মিটিঙে যোগেন নতুন ইনডিপেনডেন্ট শিডিউল্ড ক্লাশ পার্টির সেক্রেটারি হল। আর, ২০ তারিখের সম্মিলনে গরহাজির! ক্যালক্যাটা শিডিউল্ড ক্লাশ লিগের সম্পাদক যোগেন—তারা ২৬ মার্চ শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সুভাষ বোসকে সংবর্ধনা দেবে। তাহলে?

এমন দাগকাটা সম্ভব-অসম্ভবের মধ্যে কোথাও কোনো ধোঁয়াটে জায়গা ছিল না। আজ সকালে যে সে কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের বাড়ি থেকে ধোঁয়াটে মন নিয়েই বেরিয়েছে, সেটা বুঝতে-বুঝতেই তো ট্রেনের সময় এসে গেল। আর-একটু কাটিয়ে দিলেই ট্রেন ছাড়ার সময় পেরিয়ে যাবে—১৫ নম্বরে বসে এমনও ভাবে। তারপরই এমন করে পাড় ভাঙার বেগে স্টেশনে পৌঁছনো।

যোগেন যে-কোনো কামরাতেই উঠে পড়বে ভেবেছিল। ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে দেখে তার মনে হল—সেটা তার ভাল লাগবে না, নিশ্চয়ই চেনাজানা মানুষজন বেরিয়ে পড়বে, খুলনা মেলে আবার কে কাকে চেনে না, তারপর যে-আলাপ শুরু হবে সেটা তার ভাল লাগবে না। ট্রেনের ভাড়া যদি পকেট থেকে দিতে হত, তাহলেও কি যোগেনের এমন সঙ্গী-এড়ানোর স্বাধীনতা থাকত, নিজেকে এইটুকু ঠাট্টা করেই যোগেন সুপারইনটেনডেন্টের কাটা দরজা ঠেলে ঢুকে নিজের পরিচয় দিয়ে বার্থের ব্যবস্থা চাইল। এ-শাহেব একটা ফিরিঙ্গি, সে একজনের সঙ্গে কথা বলছিল, আত্মপরিচয় দেয়ার পরও যোগেন দেখে সে কথা বলেই যাচ্ছে, যোগেনকে পাত্তা

দিচ্ছে না। ট্রেন তো ছেড়ে যাবে। যোগেন শাহেবকে বলল, 'আমার কথাটুকু তো একটু শুনতে হয়'। শাহেব যোগেনের দিকে না তাকিয়ে ডানহাত তুলে যোগেনকে বলল, 'ওনলি হোয়েন আই হ্যাভ ফিনিশ্‌ড উইথ হিম'। যোগেন একটু ঠান্ডা স্বরেই বলল, 'আই হ্যাভ টু ক্যাচ দি ট্রেন'। শাহেবও না-তাকিয়ে বলে, 'দেন, ক্যাচ ইট, ইটস অন দি লাইন্স রেডি টু লি-ই-ভ।' যোগেনকে আবারও বলতে হয়, 'কিন্তু আমার তো একটা বার্থ চাই'। লোকটির সঙ্গে কথা শেষ না করেই শাহেব যোগেনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, 'এটা শিয়ালদা স্টেশনের সুপারইনটেনডেন্টের অফিস, শিয়ালদা মার্কেটটা এর উলটোদিকে। সেখানে পয়সা দিলে বার্থও কিনতে পাবে।'

যোগেনের স্বভাব-অনুযায়ী জবাব ঠোঁটে এসে গিয়েছিল কিন্তু সে গিলে ফেলল, না, ঝগড়া করবে না, বলল, 'তাহলে আমাকে একটা সার্টিফিকেট দিন যে আমি চাওয়া সত্ত্বেও আমাকে বার্থ দেয়া হয়নি। কথাটা তো যোগেন রাগ চেপে বলল, তাই আঁচও বেরল একটু।

'কবে থেকে এমন নিয়ম চালু হল যে টিকিট না দিতে পারলে আমাদের এক্সপ্লানেশন দিতে হবে?'

'যবে থেকে এমএলএদের ট্রেনে নির্ধারিত অ্যাকোমোডেশন দেয়াটা টপমোস্ট প্রায়োরিটির লিস্টে এসেছে—'

'কে? এমএলএ? মানে অ্যাসেম্বলি তো? কে মেম্বার?'

'আপনাকে প্রথম থেকেই বলছি, আমি। আপনি তো তাকাচ্ছেনই না।'

লোকটি খুব লজ্জা বুঝিয়ে হেসে দাঁড়াল, 'এক্সট্রিমলি সরি। ইউ ডু নট লুক দ্যাট। প্লীইজ টেক ইয়োর সিট'।

তাকে দেখে এমএলএ মনে হয়নি—এতে অপমানিত বোধ করা ঠিক হবে কী না স্থির করার আগেই যোগেন চেয়ারে বসে পড়ল, তার পরে শাহেব বসল। আর, কাউকে ডাকল গলা তুলে। সঙ্গে-সঙ্গেই এসে দাঁড়ায় কুচকুচে কাল একজন বেঁটেখাটো লোক, নীল ইউনিফর্মে। শাহেব তাকে বলল, 'ইনি একজন মেম্বার অব লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি। এই ট্রেনেই যাবেন। ওঁকে প্রথমে একটা বার্থে বসিয়ে, তারপর টিকিটপত্র ও আরো সব ব্যবস্থা করে দিয়ো।'

'উনি স্যার বরং এখানে বসুন একটু। আমি বার্থ পজিশনটা দেখে একেবারে ওঁকে সেখানে নিয়ে যাচ্ছি', লোকটা অনুমতির জন্য অপেক্ষা না করে ছুটে বেরিয়ে গেল।

এই উত্তেজনা ও ঝগড়াটুকু না হলে যোগেন যে সত্যিই বরিশালে যাচ্ছে—এটা তার নিজের কাছেই পরিষ্কার হত না। তার প্রতি সৌজন্য দেখাতে শাহেব কোনো কাজে হাত দেয়নি। সৌজন্য দেখিয়ে যোগেনের কিছু বলা উচিত। তেমন কোনো যোগ্য কথা যোগেনের মনে এল না। সে শাহেবের ঘরের কাটা দরজা দিয়ে প্ল্যাটফর্মে ছুটন্ত নানা রকম পা দেখতে লাগল। তার দেখা শুরু করতেই প্ল্যাটফর্মের গোলমাল, আওয়াজ, ফেরিওয়ালাদের হাঁক, মেয়েগলার চিৎকার, বাচ্চাদের কান্না—এই সমস্ত একসঙ্গে শুনতে পেল। এখান থেকে সেই সব আওয়াজ তো সুরেলাই ঠেকে তার কাছে। যে-কোনো একটা কামরায় উঠে গেলেই হত। কত জায়গার কত রকম মানুষের সঙ্গে যাওয়া যেত। এখন সেটা করা অসম্ভব। তাছাড়াও, এত দ্রুত বিকল্পগুলি মনে আসছে বলে যোগেন নিজের ওপর বিরক্তও হয়। এমন দ্বিচারিতা তার স্বভাবে ঢুকল কখন?

খুলনায় নামতে-নামতে শেষ রাত। ট্রেন থেকে নেমে স্টিমারঘাটার দিকে যাত্রীরা চলে যেন ট্রেনের ভাঙা ঘুমটুকু জোড়া লাগাতে-লাগাতে। আবার, উলটোদিক থেকে লালজামা পরা বিহারী

কুলিরা ছুটতে-ছুটতে ট্রেনের লেজের দিকে যায়। এক খুলনাতেই এমন কুলি আছে, এদিকে যোগেনের মনে একবার খেলে যায়—রেলকোম্পানি শুধু বিহার থেকেই কেন কুলি নেয়, এর ভিতর শিডিউলদের জন্য একটা সংরক্ষণ কেন থাকবে না? কী এমন চেহারা এই কুলিদের যে নমশূদ্ররা ওদের মত মাল বইতে পারবে না?

যোগেনের যেন মনে হয়, অ্যাসেম্বলির সব অভ্যাস তার মধ্যে এত চারিয়ে গেছে যে স্টেশনের কুলি দেখলেও মনে হয় রিজার্ভেশনের কথা। কিন্তু ব্যাপারটা যদি এতই সহজ হবে, তাহলে সারা ভারতে এই কাজের ওপর একটা দখল তো চাইত মুসলিম লিগ। কোনো দিন তা চেয়েছে কি? কেন চায়নি? বাংলায় না-হয় জমিদাররা হতে দেয়নি, জমি চষার কৃষক পাওয়া যাবে না তাহলে? বিহারের এই কুলিদের কি বাড়িঘর জমিজমা নেই? নিশ্চয়ই আছে—এ দেশে চাষা নয় কে? তাহলে, ওদের কি জমি ছেড়ে কুলি খাটতে আসার সুবিধে আছে— ফলন কম, খাজনা বেশি, না কী এক-একটা জায়গা থেকে কুলি-আমদানিটা দস্তুর হয়ে গেছে? কলকাতায় যেমন পাঞ্জাবি ট্যাক্সিওয়ালা আর বিহারী ঠেলাওয়ালা?

যোগেন নিজেকে একটু ঠাট্টা করে কথাটা থেকে সরে আসতে চায়—কাউকে কিছু না জানিয়ে বাড়ি যাচ্ছে, কাউকে কিছু না জানিয়ে আজই আজই মৈস্তারকান্দি পৌঁছুবে আর সে কী না রেলের কুলির চাকরিতে মুসলমান ও তপশিলিদের সংরক্ষণের কথা ভেবে চলেছে? তাহলে আর লঞ্চে চড়ে কী হবে? বরং এখানেই অপেক্ষা করুক। আপ ট্রেনে আবার কলকাতায় ফিরে যাক—কলকাতাই যখন তাকে টানে? নিজেকে যোগেন এমন ঠাট্টা করলেও ও নদী থেকে বয়ে আসা হাওয়ার ঠান্ডা তার গায়ে লাগা সত্ত্বেও যোগেন টের পায়—কথাটাকে আপাতত ঠেলে রাখলেও, কথাটা তার মনে থেকে যাবে আর সে-ও নানাভাবে কথাটা জানতে চাইবে ও শেষ পর্যন্ত ঠিক বেরও করবে।

ঘাট থেকে লঞ্চে ওঠার সিঁড়ির কাছে লোকজন, মালপত্র, দোকানপাট, দৌড়োদৌড়ি, হোটেলের বাচ্চা ছেলেদের চিৎকার, দু-একটা হ্যাজাক, বেশির ভাগই কাল হয়ে যাওয়া চিমনির ভিতর লণ্ঠনের লাল আলো—এইসব মিলে একটা চলন্ত ভিড় আর হৈহৈ লেগেই থাকে।

সিঁড়ি বেয়ে লঞ্চের ভিতর ঢোকার আগে যোগেন বুঝে ফেলে, সে গেট ভুল করেছে, ফার্স্ট-সেকেন্ড ক্লাশের গেট তো আলাদা। তখনো সে ঘুরে ফিরে যেতে পারত। ঐ গেট দিয়ে ঢোকার সুবিধেটা হচ্ছে—লঞ্চে পা দিতে-না-দিতে ওপরে ওঠার সিঁড়ি, সিঁড়ি ভেঙে উঠতেই ফার্স্ট ক্লাশের ডেক আর ক্যাবিন। আর এই ডেকক্লাশের গেট দিয়ে ঢুকে এখন যোগেনকে পুরো লঞ্চটার ল্যাজা থেকে ঘুমন্ত প্যাসেঞ্জারদের পা মাড়িয়ে, বাচ্চা বাচ্চা মাথা না মাড়িয়ে, চাদরপাতা বিছানাগুলির ফাঁক দিয়ে, মানুষের শোয়ার অজস্র ভঙ্গিগুলির মধ্য দিয়ে আর একটা জায়গায় গা-গুলানো মাছের গন্ধ পেরিয়ে, লঞ্চটার আগায় গিয়ে সেই সিঁড়িটা দিয়ে উঠতে হবে ও ফার্স্ট ক্লাশে পৌঁছুতে হবে। খুলনা-বরিশালের এই সার্ভিসটাতে এই মাছের গন্ধের নামডাক আছে। এই লঞ্চটাই তো বরিশাল থেকে গোয়ালন্দে পৌঁছে এই মাছগুলি আনলোড করবে, সেগুলো মাছ অনুযায়ী সাইজ অনুযায়ী পেটিতে বেঁধে ডাউন ট্রেনে কলকাতা পাঠাবে তাতে না কী সময় কম লাগে, মাছগুলোও না কী শেষ রাতের বাতাসে ভাল থাকে। দুর্গাপুজোর পর থেকে মাস চার বাদ দিলে বাকি সাত আট মাস ইলিশের সাপ্লাইয়ের কারণেই হয়ত এটা বিশেষ ব্যবস্থা।

দোতলার ডেকে পৌঁছে যোগেনের গায়ে শেষ রাতের ঝড়ো হাওয়া এত জোরে আছরে পড়ে, তার ধুতির কোঁচা পেছনে ওড়ে আর কাছার দিকটা শরীরে আটকে যায়। যোগেনকে

রেলিঙ ধরে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াতে হয়। ঠোঁটের কোণে একটু হেসেও ফেলে যোগেন—বাতাসের এ ঝাপট যার চেনা নয়, সে ভয় পেয়ে যেতে পারে এই আওয়াজে ও ঝাপটে। বাড়ির লোক অনেকদিন পর অসময়ে বাড়ি ফিরলে গোয়ালের গাই যেমন ঐ অসময়েও ঠান্ডা লম্বা একটা ডাকে বাড়ির মানুষকে ঘুম থেকে জেগে উঠতে বলে, রূপসা-ভৈরবের এই হাওয়াও তেমনি।

ডেক একেবারে ভোঁ ভোঁ। সারি-সারি ডেকচেয়ারের শাদা ক্যানভ্যাসগুলো হাওয়ায় ফুলে উঠে গুটিয়ে যাচ্ছে। ডেকের আলোও জ্বলা নেই। শেষরাতে সুখঘুম ছেড়ে কার দায় পড়েছে ডেকে বসে থাকার। হাওয়ার একটা নতুন ঝাপটে একটা বা দুটো ডেক চেয়ার ঘুরে যায়। এদিকওদিক থেকে ছিটকে যে আলোর টুকরোটাকরা এসে ডেকের কোথাও-কোথাও ছড়িয়ে পড়েছে, সেগুলো নড়ছে। জলের আলো কখনো স্থির থাকে না। যোগেনের মনে হয় তাহলে এটা সত্যি হয়ে গেল, এই বাড়ি ফেরা।

সে ডেকটার পাশে পাড়ের দিকের রেলিঙের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। কোনো দৃশ্যের আশায় নয়, কোনো চেনা দৃশ্যের পুর্ণদর্শনের আশাতেও নয়। যোগেন তেমন মানুষই নয়। বা, শুদ্দুররা কেউই বুঝি তেমন হতে পারে না। জন্মের আগে থেকে উঁচুজাতের 'দূর দূর' শুনতে-শুনতে শুদ্দুররা সব সময়, সারা জীবন, পথ ভুলে বেপাড়ায় ঢুকে পড়া পথের কুকুরের মত লেজ গুটিয়ে, কোমর ভেঙে থাকে আত্মরক্ষার ব্যাপারে, শুদ্দুর হলেই, একটা অসাহস আর তরাস এসে যায়। কোনো শুদ্দুর কখনো কোনো হারানো জিনিশ ফিরে পেতে পারে না। সে জিনিশটা হারানোর আগেও যে তারই ছিল, এটাই সে বিশ্বাস করে না বিচ্ছিন্নতাবোধের ইন্দ্রিয়ই যার নেই, সে কী করে বিচ্ছিন্নতা কাটাবার মূল্য জানবে? শেষ রাতের নদীর হাওয়া যোগেনের ভাল লাগার কথা নয়। শেষ রাতের অন্ধকার জল দেখার জন্য চোখ মেলে তাকানোর কথাও যোগেনের নয়। বরং তার তাড়াতাড়ি নিজের ক্যাবিন খুঁজে বের করে যত দ্রুত সম্ভব ঘুমিয়ে পড়ার কথা। যখন জাগা থাকে, তখন যেমন জাগা থাকে, যখন জাগা থাকে না তখন যেমন জাগা থাকে না।

নিজের ব্যবহারের এই বদল-না-বুঝে পারে যোগেন? না-বুঝে কি নমশূদ্র যোগেনের এক মুহূর্তও বাঁচা চলে? শরৎ বোসের বাড়িতে গান্ধীজি কেমন কথা বলতে-বলতে তাদের কাছে এসে বসে পড়লেন। হাঁটু পর্যন্ত ধুতি। চাদরটা কাঁধের ওপরে। দেখেই বোঝা যায়, হাতে ধোয়া কাপড়। নিপুণ করে দাড়ি কামানো। হাসি কম। চোখটাও কোঁচকানো। কথার মধ্যে একটুও কিন্তু-কিন্তু নেই। সোজা বলে দিলেন, মন্দির খুলে দিলেই হরিজনদের সঙ্গে উঁচুজাতের সব বিপদ ঘুচে যাবে। এ-কথাটা যে বলে আর যে শোনে দুজনেরই হেসে ফেলার কথা কথাটা এত বানানো, ভুল ও শিশুবোধক যে সাবালক কানে কপটও ঠেকতে পারে। কিন্তু গান্ধীও কথাটা হেসে বলেননি। যোগেনরাও শুনে হাসেনি। গান্ধীজি না কী তাঁর প্রথম আন্দোলনের সময় বলেছিলেন, একবছরের মধ্যে স্বরাজ আসবে। সবাই সে-কথা মেনে নিয়ে স্কুলকলেজ ছেড়ে, অফিসকাছারি ছেড়ে, বাড়িঘর ছেড়ে পথে নেমে গেল। একবছর পরে যখন-স্বরাজ এল না, লেখাপড়া জানা উঁচুজাতের লোক গান্ধীর কত নিন্দে করল। গান্ধী একবারের জন্যও বললেন না—তাঁর ভুল হয়েছিল। বরং, যেন তিনি এমনটাই চেয়েছিলেন। কী সৎ, কী সাহস আর কী খাঁটি। কোনো চাষা কি ফাল্গুন-চৈত্রে ক্ষেত তৈরি করতে-করতে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ের জলের হিশেব কষে? যদি বৃষ্টি না-হয়, হল না। তার ক্ষেতটা তো তৈরি রাখতেই হবে বৃষ্টি হওয়াটাই স্বাভাবিক বলে নয়। বৃষ্টি না-হওয়াটা অস্বাভাবিক বলে নয়। বৃষ্টি হওয়াটাই নিয়ম বলে। তার শরীরের ভিতরে রক্ত স্রোতের মত, আকাশমাটি মিলিয়ে জলস্রোতটাই নিয়ম। যোগেন গান্ধীর আগে

আর-কাউকে এমন দেখেনি যে চিরকালের শূদ্রের মত জন্মের আগে থেকে নিজের শরীরে স্বাধীনতার অভাব বুঝেছে। শুদ্দুরনির গর্ভের রসে দাসত্ব থাকে। বামুনদেরও কি ছুঁৎ-ছুঁৎ করতে-করতে ছুচিবাই হয়ে যায়। বিশেষ করে বামনিদের। ন-বছর বয়সে বিয়ে হল। ঋতু শুরু হওয়ার আগেই বিধবা হয়ে ফিরে এল। তাকে যদি মৃত্যুর আগে পর্যন্ত আরো পঞ্চাশ-ষাট বছর বেঁচে থাকতে হয়, তাহলে তার নিজেকেই অশুচি মনে না হয়ে পারে? আর শুচি হতে সে কি সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রত্যেক প্রহরে স্নান না করে পারে? তাকে আগলি-পাগলি যে-বলে, তার জিভে সে-কথা থাকে, তার অশুচিবোধ তাতে কমে না, তার প্রায়শ্চিত্ত কিছু কমে না। শুদ্দুরের অশুচিবোধও কমে না, প্রায়শ্চিত্তও শেষ হয় না।

এতটা যোগেন বেশ গুছিয়েই ভেবে ফেলে ঐ শেষ রাত্রির শূন্য ডেকে, রাতের নদীর হাওয়ার মুখে খাড়া দাঁড়িয়ে, হাওয়ায় ডেকের চেয়ারের ক্যানভ্যাসগুলির ওঠাপড়ার ছায়াচ্ছন্ন বিবিধ আওয়াজে।

এমন গুছিয়ে ভাবতে পারে এতটাই যোগেন যে মাথায় বা মনে যেখানে ভাবনা আকার পায়, সেখানকার গড়নের আন্দাজও সে পেয়ে যায়। তাই—গান্ধী, হয় শুদ্দুর, না-হয় বালবিধবা বামনি—এমন একটা সিদ্ধান্তে যাতে পৌঁছে যেতে না হয়, যোগেন বাতাস ঠেলে বিপরীত দিকের রেলিঙে গিয়ে দাঁড়ায়।

একই রাতের যেন দৃশ্যান্তর ঘটে যায়—সিনেমার মত। এদিকটায় নদীর বিস্তার অথচ প্রথম নজরে জল চোখে পড়ে না। চোখটা সয়ে গেলে ঐ তরল অন্ধকার স্রোতের অসম কিছু বিন্দু অন্ধকারে মোষের চোখ, নাকের ফুটো আর মুখের ভেজা হাঁ-এর মত জ্বলে। অন্ধকার সেই তরল স্রোতের ওপর কুয়াশার জালি ছড়িয়ে আছে। দোতলার এই ডেকও যেন সেই কুয়াশাজালের ওপরে। যোগেনের মনে হয়, সে আড়াল থেকে দেখছে বলেই, কিছু লালবিন্দু, এক লাইনে জল বেয়ে তারই দিকে ছুটে আসে মনে হচ্ছে, কিন্তু সে ঘাড়টা উলটোদিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনতেই দেখে সেই এক-লাইন লাল বিন্দু আরো একটু বড় হয়ে, আরো একটু কাছে এসে গেছে। যোগেন তাকিয়ে থাকে ঐ লালবিন্দুগুলির গড়িয়ে আসা—যেন পাহাড়ের ঢাল বেয়ে—দেখতে। ওগুলো ছোট-মেছো নৌকোর ছোট ছইয়ের ওপরকাঠিতে জ্বালানোঝুলনো লণ্ঠনগুলি—যোগেনের কাছে কি এই নিচু-বাংলা, জলবাংলা, বিলবাংলা, মোহানা বাংলা, সসাগরা বাংলার কোনো অন্ধকার অচেনা থাকতে পারে? ওগুলো খাবারের নৌকো। শেষ রাতের স্টিমারে খাবার বেচতে আসছে। ভাতমাছের নৌকোও আছে, নিরিমিষ্যি নৌকোও আছে—বিধবা মা-ঠ্যায়ানদের জন্য। লুচির নৌকো আছে। নৌকোর ওপর তোলা উনুনে গরম ভেজে দিচ্ছে। ভাজা লুচির ঝুড়ি আছে আড়ালে সেখান থেকেই খদ্দেরদের দেয়। আর আছে, পানবিড়ির আর মিষ্টির নৌকা। এসব কলকাতার দিকের নামকরা মিষ্টি নয়, এই মিষ্টিগুলো এখানেই চলে বেশি—বাংলাসোই, পাতক্ষীর, পাটিসাপটা, তক্তি, নারকেল-চিড়ে, ভাজা চিড়ে, চিড়ে ভেজানোর জন্য পাতলা টক দৈ, লবঙ্গলতিকা, বাখরখনি।

সেই লালবিন্দুগুলি বড় হতে-হতে মিলিয়ে যায় লণ্ঠনের কমলা শিখায়। তারপর শোনা যায় নানা মানুষের কলকণ্ঠ, হাটের গোলমালের মত, তার কোনো শব্দই বোঝা যায় না। যে যার মাল হাঁকে।

সব নৌকো স্টিমারের খোল ঘিরে সারি দিয়ে ভিড়বার আগেই বেচাকেনা শুরু হয়ে যায়। কারো-কারো তো দরকার থাকেই। হঠাৎ-দরকার বা শখের ওপর তো এমন একটা ভাসাবাজার তৈরি হতে পারে না। বিশেষ করে রোজার মাস শুরু হলে তো কথাই নেই। ফজর নামাজের

আগেই নাস্তা করে নেয়। খুলনা বা বরিশাল থেকে যত দূর পাড়ির স্টিমার বা লঞ্চ ছাড়ে—খুলনা-সাতক্ষীরা, খুলনা-বোয়ালমারি, খুলনা-মাগুরা, খুলনা-কুমার মধুখালি, বিল-মাদারিপুর, বরিশাল—তার পাশা, খুলনা-বরিশাল রুটে হুলার হাট, খুলনা-বরিশাল রুটে ঝালকাঠি, বরিশাল-পটুয়াখালি, বরিশাল-চাঁদপুর-ঢাকা, বরিশাল-পটুয়াখালি, বরিশাল-চট্টগ্রাম—এইসব রুটই গড়ে বার-চৌদ্দ ঘণ্টার রুট। এক মেল-স্টিমারই একটু তাড়াতাড়ি যেতে পারে। সব রুটে তো আর মেল যায় না। এমন বার-চোদ্দ ঘণ্টার রুটে অনেক স্টিমার-স্টেশন। এক-একটা বড় জায়গায় জাহাজ প্রায় খালি হয়ে যায়। দুই-তিন স্টেশন পর আবার এক বড় জায়গায় জাহাজ ভর্তি হয়ে যায়। লোকজন তো দিন বাঁচাতে রাতটা নদীতে কাটাতে চায়। তাই রাতের ফেরিই বেশি। এই বার চোদ্দ ঘণ্টার রুটে মানুষজনের তো একটা খাওয়া দরকারই হয়। কোনো-কোনো বড় জাহাজে নিজেদের খাওয়ার সার্ভিস আছে। তাদের বাটলার শেফ, বয়ও থাকে। সব স্টিমারে বা লঞ্চেও কিছু দোকান থাকে—পানবিড়ির, চা-সিঙাড়ার। দু-একটা লঞ্চে ভাতের হোটেলও সন্ধ্যা আটটা-নটা পর্যন্ত খোলা থাকে। লোকজনের টান কিন্তু এই এক-এক জায়গার ভাসাবাজারের দিকেই। জলের ওপর থেকে দড়িতে ঝোলানো ছালার ব্যাগে অর্ডার-মতো খাবার উঠে আসে, সেই ছালার ভিতরেই দাম দিয়ে দেয়া হয়।

তাকিয়ে থাকতে-থাকতে যোগেনের প্রথমে ইচ্ছে হল—কিছু একটা টাটকা খাদ্যের স্বাদ নেয়ার। যোগেন খেতে ভালবাসে। কিন্তু তার মত বাড়ির ছেলের কি আর খাওয়ার সঙ্গে ভালবাসাবাসির সম্পর্ক তৈরি হয়—যেখানে অন্তত দু-বেলা পেটভরাটাই প্রায় স্থায়ী সমস্যা ছিল। খাওয়া পেলে খাওয়া তাই যোগেনের স্বভাবে ঢুকে গেছে।

ডেক থেকে ঝুঁকে যোগেন কী খাবে বাছছিল। আর, এমন বাছাবাছির যখনই দরকার হয়, যোগেন তখনই আবিষ্কার করে—বাছতে পারার মত খাওয়া তার জানাই নেই। সেই সিলেট-যাওয়ার সময় ট্রেনে খুব ভাল খাইয়েছিল। কী, মনে নেই। স্বাদ ছিল আলাদা।

হঠাৎ ভাসা-বাজার থেকে একটা সরু আওয়াজ উঠল—'পাতক্ষীর', 'পাতক্ষীর', 'ক্ষীরসন্দেশ'। যোগেনের মনে এল—তাদের ওদিকে, মানে গৌরনদীতে, এসব মিষ্টির নামও শোনা যায় না। এমন ভাবনাটা সত্যিই কি মিথ্যে তা যোগেন যাচাইও করে না। এমনকী, নেহাত বাস্তব এই প্রশ্নটাও সে এড়িয়ে যেতে পারে যে গৌরনদীতে না-হয় নেই, কলকাতাতে ক-দিন যোগেন মিষ্টির দোকানে ঢুকেছে? যোগেন রেলিং থেকে মাথা গলিয়ে ডাকে, 'এই পাতক্ষীর', লোকটা ওপরে তাকাতেই যোগেন একটা আঙুল তোলে। মানে, একটা পাতক্ষীর। নীচের লোকটা দুটো আঙুল তোলে—মানে দুটো নেয়ার আবেদন। খুচরো দুটো-একটা করে না বেচলে, মিষ্টির খদ্দের জুটবে না। দুটো পাতক্ষীরের দাম দু-আনা। লোকটিকে সম্মতি জানাতে গিয়ে যোগেন দুই হাতের পাতা নাড়িয়ে-নাড়িয়ে যা বোঝায় তার মানে দাঁড়ায়—দুই হাঁড়ি, একেকটিতে কুড়িটি আর আলগা দুটি। এত বড় অর্ডার—লোকটি আবার নিজের দুই হাতের পাতা ও আঙুল দিয়ে যাচিয়ে নেয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, দুই হাঁড়ি পাতক্ষীর, একেকটাতে এক কুড়ি করে, আর দুই হাঁড়ির জন্য দুটো ফাও—আলগা।

এটা কী করে সম্ভব হল? যোগেন খাওয়ার ইচ্ছেয় পাতক্ষীরওয়ালাকে একটা আঙুল তুলে একটা পাতক্ষীর চেয়েছিল, এক আনা দাম। পাতক্ষীরওয়ালা জল থেকে হাত নেড়ে দুটো নেয়ার অনুরোধ করে। দুটো মানে দু-আনা। জবাবে যোগেন চল্লিশটা পাতক্ষীর দুই হাঁড়িতে দিতে বলে দিল। এটা ঠিক করল কখন যোগেন যে সে সোজা খাগবাড়ি গিয়ে সেখান থেকে বৌ-ছেলেকে তুলে নৌকো নিয়ে মৈস্তারকান্দি উঠবে। হঠাৎ করে দেশে একপাক ঘুরে আসার ইচ্ছেটা শেষ

পর্যন্ত সক্রিয়ই থাকবে—এটাই সে আন্দাজ পায়নি।

খুলনা মেলে রাতভর ঘুমিয়ে সেসব আন্দাজি থেকে ছাড় নিয়েছে। কিন্তু জাহাজে উঠেও তো সে জানত না—কোথায় যাবে। শুধু পাতক্ষীরে ঠিক হয়ে গেল—শ্বশুর বাড়ি হয়ে বাপের বাড়ি? দুই বাড়ির জন্য দুই হাঁড়ি মিষ্টি নিয়ে? শ্বশুরবাড়ির লোকও ভাবে—যোগেনের ঠিক শ্বশুরবাড়ি নেই। পাক খেতে-খেতে মাঝে মধ্যে এসে পড়ে। বাপের বাড়ির লোকজনও তাকে হিশেবে ধরে না। তাহলে, যোগেন থাকে কার হিশেবে পাকাপাকি? গাঁয়ের, থানার, সদরজিলার না কী বাংলার? গান্ধী যেমন গাঁয়ের, থানার, সদরজিলার, বাংলার, ভারতবর্ষের আর পৃথিবীর? সবাই গান্ধী হতে পারে না। চাইলেও পারে না। কারো বুকের পাটা আছে এমন টলটলে কথা বলার, যে-কথায় সবাই নিজের চোখের প্রতিফলন দেখতে পায় আর শুনতে পায় স্বপ্নাদেশ। মা-মনসা বা চণ্ডী বা শিব বা ধর্মঠাকুরের আদেশ স্বপ্নে পেয়ে স্বপ্নোত্থিত সে-মানুষ কোনো পুকুরের গভীর পাঁক থেকে, বা কোনো হিজলগাছের গুঁড়ির একটা কোণ থেকে, বা যে-কাদায় ঘোড়া বা গরুর পা ডুবে গিয়ে আর উঠছে না, সেটা আরো খুঁড়ে, আরো আরো খুঁজে তার তলা থেকে গোটা বা কোন ভাঙা বিগ্রহ বা গোটা একটা মন্দিরই, পেয়ে যায়। তার মত করে সব সমস্তবৈয় সীমা পেরিয়ে গিয়ে সে তো স্বপ্নের অসম্ভবে স্বাধীন হয়। গান্ধী যাকে বলেন রামরাজ্য, সারা দেশের মানুষ তাকেই বলে গান্ধীরাজ। যা অসম্ভব গান্ধী শুধু সেটাকেই সম্ভব বলে ভাবাতে পারেন।

বিশাল নদীর প্রায় নিস্তব্ধ স্রোত ক্ষুরধার বেগে পাড়ের তলায় সুড়ঙ্গ খুঁড়ে মাটির ভারসাম্য ধ্বংস করে পাড় ভাঙে যেমন, আর মাটির ওপরের মানুষজন নিজেদের আবিষ্কার করে সেই ক্ষুরধার স্রোতের ভিতর শ্বাসরুদ্ধ হঠাৎ যেমন, তেমনি ভাঙনে ও তেমনি বাঁচনে যোগেন বোধ করে ফেলেছে সে গান্ধীর মত স্পষ্ট তাতেই অসম্ভব কথা বলবে—উঁচুজাতের হিন্দু আর শূদ্ররা এক ধর্মের লোক নয়। জীবনযাপনের ইতিহাস ও অভ্যাস শূদ্রদের সঙ্গে মুসলমানদের একটা মিলন ঘটিয়ে দিয়েছে। উঁচুজাতের হিন্দুদের আক্রমণ ও অপমান সেই মিলনকে সত্য করে তুলেছে। সে-সত্যকে অস্বীকার করা যায় না।

যোগেন যেখানে বসে, সেখানে যেন গাছের মত বসে, আর নড়বেচড়বে না। মাত্র তো দিন-তিন হল মৈস্তারকান্দিতে এসেছে। এর মধ্যেই মাটির ওপর তার ছেলের সঙ্গে হামা টানছে, ছোটকাকার সঙ্গে কোন এক মহাজনের কাছে গিয়ে একটা ছিপনৌকার বায়না এনেছে। বায়নাটা ঠকবে কী না কে জানে। যোগেনের নাম শুনে ও যোগেনকে দেখেই সাততাড়াতাড়ি তাকে গদি থেকে সরানোর জন্য বায়না দিয়ে দিয়েছে। ভেবেছে—মহাজনি সুদ ধরবে যোগেন। নিরস্ত করতে যোগেন বলে, 'আরে, আমারে বায়না দিচ্ছেন না, দিচ্ছেন আমার খুড়ারে।' মহাজন উলটে বলে, 'যার নৌকাই হোক, চড়বেন তো আপনি।' প্রতিদিনই যোগেন ভাইপোভাইঝিদের নিয়ে খালের জল তোলপাড় করেছে। ছেলেটাকেও চেয়েছিল একদিন, জল ছোঁয়াবে বলে, যোগামা এসে পাড় থেকে ধমক দিলে, যোগেন জলের ভিতর থেকে বলে, 'তালি ছাওয়ালের মা-রে পাঠাও—।' 'অ্যাহন তার জলকেলির টাইম নাই'—বলে ঝামটা দিয়ে যোগামা চলে গেলেও, বৌকে নিয়ে ছোটকাকিমা আসে, যেন কত গল্প আছে, পরে যোগেন শুনেছিল, ওটা ছিল ছল। সিঁড়ির শেষ ধাপের পরেও জলে এক না নেমে কী যেন ধুতে শুরু করে দু-জন আর ছোটকাকিমা হঠাৎ তার পেছনে একটা ধাক্কা দিয়ে বৌকে খালে ফেলে দেয়। কমলা আঁচল কোমরে গোঁজারও সময় পায়নি। দুই হাতে জল উথলিয়ে ডুবে গেল আর তার আঁচল উঠল

ভেসে। কেউই ভাবেনি যে কমলা বিপদে পড়েছে। তবু, তার মাথা চাড়া দিয়ে ভেসে ওঠার সময়টা যেন একটু লম্বা হচ্ছে মনে হয়। ভাইপোভাইঝিদের কেউ-কেউ সেই ভাসা আঁচলের কাছে ডুব দেয়। আঁচলটা স্রোতে ভাসতে-ভাসতে উলটো দিকে যায়। যোগেনও ভেসে কাছে এসেছিল—আঁচলটা ভেসে যেতে দেখে সে আর এগয় না—পালটাা ডর দিচ্ছে ডুবসাঁতারে। সাহস আছে তো। আচমকা ডুবজলে তো সাঁতারের বীরদেরও বুদ্ধিবিভ্রাট হয়, সাঁতার ভুলে যায় আর এ মেয়েটা জলে পড়ার চমক ভেঙে ডুবসাঁতার দেয়? যোগেন একবার ভাবে, আঁচলটা ধরে রাখে। কিন্তু তাতে যদি আবার পায়ে ফাঁস লেগে যায়? এখনো ভাসে না কেন? এতটা দম? ডুবজলে ভাসা শরীরের ভারসাম্য রাখতে রাখতে এতকিছু খুব পরপর গুছিয়ে ভাবা যায় না। যোগেন ডুব দিয়ে শাড়ির আঁচলটা যেদিকে কুঁচকে ভাসছিল, সেদিকে ভেসে যায়। কিন্তু কোনো রঙের আভাস পায় না। শাড়ির রঙের আভাস। আরে, হলটা কী? যোগেন ভুস করে জল ফুঁড়ে ওঠে। এদিকওদিক তাকিয়ে কমলাকে দেখে না। ভাইপোভাইঝিরা কী একটা চেঁচামেচি করে হাততালি দিচ্ছে। আরে? যোগেন কমলাকে খুঁজতে আবার ডোবে। ব্যস্ততায় সে দেখতে ভুলে যায়—শাড়ির আঁচলটা ভাসছিল কী না। যোগেন ডুব দিতেই কমলা ভেসে উঠে চিৎ হয়ে খানিক দম নেয়। জলের নীচে যোগেন এবার সত্যিই ভয় পায়—এতক্ষণ কি কেউ জলের ভিতরে থাকতে পারে? এরপর খোঁজাখুঁজির টাইমও তো পার হয়ে যাবে। যোগেন জলের ওপর ভেসে উঠে তার বড় ভাইপোকে ডাকে, 'এ বলাই—'।

কেউ একজন জবাব দেয়, 'দাদা তো নামে নাই'—

'তায় নামল কেডা—নিতাই—'

'কও কী'—

'আরে, তোর কাকি তো জলডোবা থিক্যা উইঠল না। তালাস কর, অনেকক্ষণ হইয়্যা গেল তো—'

'তো ডোবো কাহা, আমিও ডুবি', যে বলল সে ডুবল কী না তা বোঝা কঠিন, সবাইই তো ডুবছে-ভাসছে যোগেন নির্দেশমত ডুব দিয়ে বাড়ির ঘাটের দিকে ডুবসাঁতার দিল।

তখনই কমলা ভেসে উঠে, জল কেটে, ঘাটের কাছে এসে, ধাপে উঠে বসে পড়ে হাঁফায়। ভাইপোভাইঝিরা চেঁচামেচি শুরু করে, 'কাকি, লুকাও শিগগির জলে, কাহা ভাস্যা উইঠল বইল্যা—কাকি জলে লুকাও'।

কমলা আর জলে নামে না।

যোগেন ভু-উ-স করে জলের ওপর মাথা তুলে ডাকে, 'নিতাই, পাইলি?'

'পাব নে কোথায়? ঘাটের ধাপে বইস্যা হাইসবার লাগছে তো। খাড়াও, ঘর থিক্যা চশমা আইন্যা দেই। খালি চোখে কাকিরে খুঁইজব্যা ক্যামনে?'

যোগেন ততক্ষণে ঘাটের কাছে এসে দেখে, ধাপের ওপর কমলা বসে, তার চুলগুলো সারা মুখেগলায় লেপটে আছে, খালের জলে চোখদুটোও যেন ধোয়া। গলা বেয়ে জল গড়াচ্ছে বুকের আঁচল একটু শিথিল। কারণ, তার দুই হাতের দশটা আঙুল তখন ঘাটের শক্ত ভেজা মাটি খুঁটছিল। সে যোগেনকে দেখছিল কিছু কৌতুকে। যোগেন বলে ওঠে, 'আরে আমি জলের তলে তোলপাড়, তুমি কোথ্থিক্যা আইস্যা ঘাটে বইস্যা আছো—'

এ কথার উত্তর দিতে যেটুকু সময় লাগে, তার চাইতে একটু বেশি কাটিয়ে কমলা একঝটকায় উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে, 'আকাশ থিক্যা' বলে, পেছন ফিরে ধাপে ধাপে ঘাট ভাঙতে থাকে।

বুক পর্যন্ত জলের ভিতর দাঁড়িয়ে হাঁ করে যোগেন সেই ধাপ ভাঙা দেখে। দেখতে ভালও

লাগে যোগেনের। সেটা তো বোঝা যায়—ভাল লাগা! বুঝে কিন্তু মজা পেয়ে হেসেই ফেলে যোগেন—হাঁ-করা মুগ্ধতায় নয়, মজা পেয়ে হাঁ—করায়। উলটো পাক নিয়ে সাঁতার কাটতে-কাটতে যোগেন মনে-মনে অট্টহাসি হাসে—খুলনা—বরিশালে ভেজা মেয়ের পেছন দেখে রেতঃবৃদ্ধি করতে চাইলে ধ্বজভঙ্গ হয়ে যাবে। ভদ্রলোকরা মাসিকপত্রে হেমেন মজুমদারের সিক্তবসনা আর সাধনা বোসের টকি দেখতে ভালবাসে। সেগুলো সব সিক্তবসনা মেমশাহেব বলে?

পড়বে টেন্যান্সি আর নো কনফিডেন্সের মুখোমুখি। টেন্যান্সির ঘোর প্যাঁচ যোগেনের সরাসরি কিছু জানা নেই—কার গোয়ালের মশা কে তাড়ায়। আর দুধ কে দোয়ায়। একটু জেনে না নিলে তার তপ্‌শিলি-মুসলিম ঐক্যের কথার তো কোনো জোর থাকবে না। শুধু একটা ঘুরান দিলেই বরিশাল থেকেই যোগেন বাংলায় চালু সবরকম রাজস্বের রহস্য জানতে পারবে।

আন্দামান-ফেরতদের সঙ্গে যোগেন

৯৪

চারদিনের মাথায় নলিনীদা, ক্ষেত্রবাবু, এমনকি হকশাহেব, আর-এক অচেনা ভদ্রলোক একেবারে মৈস্তারকান্দিতে যোগেনদের ঘাটে এসে নৌকা ভেড়ান। যোগেনের ঘাটে এমন ভারী লোকজনের নৌকা একেবারে যে ভেড়ে না, তা নয়। যোগেনই সঙ্গে থাকে। এমনি দেখাশোনা কাজকর্ম এখানে যা, তা তো আগৈলঝরার হাটেই হয়। তাছাড়া, এতটা লম্বা সময় যোগেন কবে থাকে মৈস্তারকান্দি বা আগৈলঝরায়? সবকিছুই তো বরিশালে।

যোগেনের ছোটকাকা এসে বলে, 'দ্যাখ গিয়া ঘাটে। তর কাছে কারা আইছেন য্যান।'

যে আসে, সে তো বাড়ির ভিতরেই আসে। এমন ঘোষণা দেয়ার মত লোক কে? যোগেন ঘাটে এসে দেখে নৌকা লেগেছে—দুজন নেমেছে, দুজন নামার আয়োজন করছে। যোগেন ঘাটের ধাপগুলো দিয়ে যেন গড়িয়ে জলের কাছে যায়। নামতে-নামতেই সে চিৎকার শুরু করেছিল, নেমে হাতজোড় করে বলে 'আরে কয় কী? এমন চাইর যাত্রী নিয়্যাও নাও ডোবে নাই? নলিনীদা, ক্ষেত্রবাবু—এই অধমের প্রতি এই দয়া প্রদর্শনের সময় কি একবারও হাঁড়িকাঠস্থ ছাগশিশুর আর্তনাদ আপনাদের কানে প্রবেশ করে নাই? স্বয়ং ব্রিটিশ সম্রাট যাদের এত বড় ভারত সাম্রাজ্যের কোথাও স্থান দিতে পারেন নাই, তাদের বসানোর যোগ্য আসন আমি কোথায় পাই?'

নলিনীদা বাঁ হাত তুলে বলে, 'থামো তো, তুমি তো দেখছি আইনসভায় গিয়ে খুব যাত্রা-থিয়েটার শিখেছো?'

ক্ষেত্রবাবু তাঁর জুতোজোড়া হাতে করে নেমেছে। এখন ঠিক করতে পারছে না, এখানেই খালের জলে পা ধুয়ে জুতো পরে নেবে, নাকী পাড়ে উঠে পড়বে। কিন্তু পাড়ে তো জল পাওয়া যাবে না। পায়ে যেটুকু কাদা লেগেছে তা অবিশ্যি ফাল্গুনের এই বাতাসে ও রোদে দেখতে না-দেখতে শুকিয়ে যাবে। তখনো ঝেড়ে ফেলা যায়। নিজের সমস্যা লুকোতে ক্ষেত্রবাবু বলে, 'নলিনীদা কি যোগেন্দ্রবাবুর কেষ্টকীর্তনের খ্যাতি শুনেন নাই?'

'আমি তো ওর আরো কত খ্যাতিই শুনেছি। কেষ্টযাত্রার কথা আপনারা না-শোনালে কী

করে শুনব?

নলিনীদা আন্দামান থেকে আর ক্ষেত্রবাবু দেউলি থেকে ছাড়া পেয়েছেন। হকশাহেবকে একবার এ-জেল, একবার ও-জেল করিয়ে দিয়ে ক্ষেত্রবাবুই বলয়—'যোগেন্দ্রবাবু, এর সঙ্গে তোমার চেনাজানা হওয়ার সময় হয় নাই। গৌরনদী থানার নতুন লোন সেট্লমেন্ট অফিসার। অ্যাহন এই এলাকাতেই ক্যাম্প গাইড়ছে। কুমিল্ল্যার পোলা—'

'সবই কইলেন তো ক্ষেত্রবাবু, ডাকব কী বইল্যা, নাম তো একডা কিছু চাই। না-থাইকলে দিবার লাগে—ঠাকুরমশায় বা মৌলবিশাহেব তো শিডিউল-শুদ্দুর'।

'নাম নিয়্যা যে এত মুশকিল হয় তা তো আগে বুঝি নাই। মুসলমানগো নাম তো হয় তের হাত লম্বা। আমার ইস্কুলকলেজের নাম তো আমারই স্মরণ থাকে না—আবু বকর মালেক জাফরউদ্দিন। আমারে যদি জিগ্যান আমি কব্যার পারব না এই শব্দগুলার মইধ্যে সম্পর্কডা কী? যদি আমার নানার ইচ্ছা হইত বা জানা থাইকত—তাইলে আরো বাড়ানোও যাইত। এসব নিয়্যা তো কোনো কালে দুর্ঘটনা ঘটে নাই, যতদিন স্কুলকলেজে ছিল্যাম। ক্যান য্যান সবাং 'হাউর্য়া' কইয়্যা ডাইকত। সবাই। স্কুলকলেজের মাস্টারমশাইর‍্যাও। কলেজে এক প্রফেসর, তিনি নাকী কইছিলেন, এই নামটার মানে কী। আমি কইল্যাম—এই বইল্যা ডাইকলে আমি জব দেই, নামের আবার মানে কী, ডাকা আর জবাব ছাড়া? তো স্যার বইললেন, বাঙালিরা সব আরবী শব্দের উচ্চারণ—বানান বেবাক বিগড়াইয়া দিছে। তোর নাম নিশ্চয়ই 'উজাইর‍্যা'। আমি স্যারকে বলি, স্যার, উজাইর‍্যাও তো বাংলা। স্যার কইলেন—তোরটা আরবী, যা, উজাইর‍্যা, মানে হইল তোর কোনো ইনাম মিলব। চাকরি নিব্যার গিয়্যা দেহি—কেউ কয় মিস্টার আর বকর ; কেউ ডাকে—জনাব জাফরউদ্দিন। আমি কারো ডাকেই জব দেই না। আপনাগো কাছে এই বিত্তান্ত দেয়ার কারণ এই—আমারে হাউড়্যাও ডাইকবার পারেন, উজাইর‍্যাও ডাইকবার পারেন। কিন্তু আসল নামে ঢুইকবেন না। মিস্টার আর বকর শুইনলে মনে হয় হিন্দুগো মতন নাম আর পদবী। জাফরউদ্দিন শুইনলে, কেমন পাতি নেড়া ঠ্যাহে। তার থিকা আরবী 'উজাইর‍্যা' অনেক ভাল আর তার বিকার বাংলা 'হাউর্য়া' আরো ভাল।'

'কন কী? আপনে একডা অফিসার মানুষ আর আমরা আপনারে ডাইকব হাউর্য়া আর উজাইর‍্যা বইল্যা? কন কী? বাংলা বইল্যা কি কথার মানইজ্জত নাই?' যোগেন বলে। ওরা ততক্ষণে ভিতরের দুয়ারে পৌঁছেছে। একটু উত্তরে, যেখানে ওদের নৌকা বানাবার কাজ হয়, সেখানে একটা ছেঁড়া পাটি আর-একটা চাদর কেউ পেতে দিয়েছে। ওরা ঐখানেই বসে।

হকশাহেব বসতে-বসতে বলে, 'মানুষ যদি একডা থাকে, তার নামও একডা বাইর হইয়্যা যায়। গাছ আছে তার বোল আইসবে না? সবুর দরকার'।

যোগেন বলে, 'আমার বাড়িতে আপনারা পায়ের ধুল্যা দিছেন। আমি ক্যামনে কই—কেন দিছেন। কিন্তু কোনো কাজ কামের কথা থাইকলে কাকের মুখে এডডা ডাক পাঠাইলেই হইত। বান্দা হাজির হইত।'

'দেখো যোগেন, কাজ একটা আছে, কথাও তোমার সঙ্গে তাই নিয়ে। সময় বাঁচাতে আমরাই এলাম। কথাটাই বরং বলি। আমরা রাজবন্দীরা কিছু-কিছু তো ছাড়া পাচ্ছি। আমরা সকলেই তো রাষ্ট্রবিরোধী বিপ্লবী কাজের দায়ে জেলে ছিলাম। এতগুলো বছর তো মাথার কাজ বাদ দিয়ে জেলখাটা যায় না। যা হোক, কিছু-কিছু পড়াশোনা, আলাপ-আলোচনা, বাইরের রাজনীতি বিচার, আন্দোলনের আকারপ্রকার দেখে জেলের ভেতরে আমাদের মনে হতে থাকে একটা-দুটো শাহেব মেরে জেল খাটলেই দেশের স্বাধীনতা আসবে না। বিভিন্ন শ্রেণীকে, বিশেষ করে কৃষক

ও শ্রমিকের সচেতন না করলে, স্বাধীনতা আন্দোলনের শিকড় গজাবে না'।

'নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার আমাকে দুটো বই পড়তে দিছিলেন। সে কী বই! বইয়ের পাতা থিক্যা য্যান আগুন ঝরে। কিন্তু একটা কোথাও ফাঁক নাই—দেওয়ানি মামলার আরগুমেন্টে। কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো আর ক্লাস-স্ট্রাগল্ ইন ফ্রান্স। মার্ক্সের। তাতেই তো এ-কথাডা প্রথম জানি—শ্রেণী ছাড়া কোনো যুদ্ধ নাই। তারপর থিক্যা এডডা গোলমালের মইধ্যে আছি নলিনীদা—

'সেডা কীরকম? যে বই পইড়্যা আমাগো গোলমাল মিটল, সেই বইয়ে তুমি গোলমালে পইড়ল্যা?' ক্ষেত্রবাবু বলে।

'তা কেন বলছেন ক্ষেত্রবাবু। শুনেছি তো মার্ক্স আর লেনিনের লেখা সংখ্যায় আর বিষয়ে এত যে সেগুলি দিয়েই একটা লাইব্রেরি তৈরি করা যায়। তার মধ্যে দুটো-একটা লেখা গুপ্তপথে বা কোনো বিলেত ফেরতের সুটকেস থেকে আমাদের কাছে আসে। তাতে কারো নতুন গোলমাল বাঁধতেই পারে। মার্ক্সবাদের দুটো অক্ষর তো এটুকুই শিখিয়েছে গোলমালই পাকাতে হবে নিজের মাথায়—', নলিনীদা একটু হেসে থামে, সেটা যোগেনের ভাল লাগে, গোলমাল, চিন্তার, চেনাটাই তো কাজ।

'আমার গোলমালটা অত বড় কিছু না। আমিই পাকাইছি। সে ছাড়েন গিয়া। কাজের কথাডা শুনি'।

'সে-ও তো ঐ মাথারই গোলমাল। নলিনীবাবুর নেতৃত্বে আমরা একডা 'বরিশাল কৃষক সমিতি' খাড়া কইরছি—'হকশাহেব বলে।

'খাইছে-এ। কতগুল্যা কৃষকসমিতি হইব? হকশাহেবের প্রজা সমিতি, কংগ্রেসের কৃষক সমিতি, সহজানন্দ স্বামীর কৃষক সমিতি, মুসলিম লিগের কৃষক লিগ। এগুল্যা ছাড়াও তো জিলায়-মহকুমায় আপনাগো যেমন—'

'এতে কি ক্ষতি না লাভ? আমাদের পনের আনা মানুষ কৃষক। তারা তো আবার হাজার-হাজার উপায়ে কৃষির সঙ্গে বাঁধা। কৃষক বলতে একটা শ্রেণী বোঝায় ঠিকই। কিন্তু সেই শ্রেণীর সকলে তো। একরকম কৃষি করে না। নোনা জলের চাষ কি মিষ্টি জলে চলে? জলে চাষ আর বালিতে চাষ কি এক? তাহলে তো কৃষক সমিতি যত বাড়ে, ততই মঙ্গল—',

'এডা তো ঠিক কথাই নলিনীদা। কিন্তু এমন কইর‍্যা ক্যান ভাবি নাই?'

'ওটাই তো মাথায় গোলমাল পাকানো। আমরা চাই সবকিছু স্পষ্ট হোক, সিধে হোক। গোলমাল এড়ানোটাই যেন জীবনের আসল কথা। আসলে তো গোলমাল না-পাকালে কিছুই এগবে না'। শুনে যোগেন চুপ করে একটু ভাবে। তারপর বলে, 'এখন মনে হইতেছে, আমি নিজের মাথায় যে-গোলমাল পাকাইছি সেডার কারণও তো 'ক্লাশ স্ট্রাগ্ল্ ইন ফ্রান্স'-এ বলা আছে। সেই যেহানে কে কার ঘাড়ে চাপতেছে তাই নিয়ে মজা করা আছে। পেটি বুর্জোয়ারা বুর্জোয়াদের ঘাড়ে, বুর্জোয়ারা কৃষকদের ঘাড়ে, কৃষকরা সৈন্যদের ঘাড়ে আর সৈন্যরা তাগো বন্দুকের সঙ্গে লাগান্ সড়কি দিয়্যা চাষীগো পাছায় ঢুকাইয়্যা তাগো উলটা দিকে ফিকক্যা দিবার লাগছে,' যোগেনের বর্ণনায় সকলেই হেসে উঠলে যোগেন বলে, 'আমার তো ঐ সময়কার ফরাসি ইতিহাস পড়া নাই। অ্যাসেম্বলি লাইব্রেরিতে পড়তে গিয়্যা দেখি—মার্ক্স-এর বইয়ে যেসব ঘটনা আছে, সেগুলা কিছুই য্যান ঘটে নাই। আরে, হইলডা কী? তহন ইমপিরিয়্যাল লাইব্রেরিতে গিয়্যা দুই-তিনখান ম্যাপ আর বই মিল্যাইয়া দেখি—ইতিহাস পড়ার আগেই ঠাহর্ কইরতে লাগব কোন ইতিহাস পইড়ব্যা। এই পর্যন্ত বুইঝ্যা বইগুল্যা বাইছ্যা রাখছি, গিয়া পইড়ব। এর মইধ্যে

দ্যাহেন কপালের ফ্যাড়। লোন-অফিসার আইস্যা বলে, তেনার নাম না কী থুইছে, আসল আরবীতে 'উজাইর‍্যা'। কেডা থুইছে? এক প্রফেসর। যার নিজের একডা ধর্ম আছে। কী? না, ব্রাহ্ম। কিন্তু যার বংশ বা সমাজের কোনো ধর্ম—হিন্দু, খ্রিস্টান, ইসলাম—তার নিজের নয়। আর আন্দামানে সারা জীবন জেল খাইট্যা আইস্যা আপনি কইলেন, যোগেন, তোর মাথার ভিতরে মারামারি, কাটাকুটি, লেঙ্গিবাজি, ছেঁড়াছেঁড়ি নাই ক্যান রে? মাথাখানরে একখান পাকা বেলের লাগাল চকচইক্যা রাখছিস ক্যামনে? কন, কাজের কথা কন।'

হকশাহেব বলেন, 'সেডা খুব শান্তিপূর্ণ ও সহজ। আমাগো কৃষক সমিতির প্রথম বার্ষিক সম্মিলন হবে দুই দিন পর, সেইডাতে আপনারে সভাপতি হইতে হইব।'

'কোথায় হইব? সম্মিলন?'

'মাহিলাড়া খালের পারে', ক্ষেত্রবাবু বলে।

'মাহিলাড়া, মানে আমাগো এই মাহিলাডা?'

'আরে যোগেন্দ্রবাবু, মাহিলাড়া আবার কয়ডা?'

'মাহিলাড়ায় আপনারা আরম্ভ দিছেন, বরিশাল কৃষক সমিতি, আর সেডার বিবরণ আমারে শুইনতে হইল আপনাগ মুখ থিক্যা যারা ছিলেন জেলে, দ্বীপান্তরে—'

'এডা কি অভিযোগ না অনুতাপ?' ক্ষেত্রবাবু প্রশ্ন করেন।

'কী যে কন ক্ষেত্রবাবু! আমার কি অভিযোগের অধিকার আছে আপনাগো মতন মানুষগো সামনে? আর অনুতাপের লগে তো টোপ গেলা মাছের বড়শিকাটা দরকার। আমার আর টোপ কই, কেডাই বা গিলব! আপনাগো কাছে শুইন্যা আমি এই সিচুয়েশনে নিজেরে লোকেট কইরব্যার লাগছি।'

'এটাও কিন্তু কনট্রাডিকশন এড়ানো হল যোগেন। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের শ্রেণীচরিত্র নিয়ে কোনো বড় তর্ক না তুলেই বলা যায়—আমাদের আন্দোলন একজন নেতানির্ভর। সুরেন ব্যানার্জি, সি আর দাশ, গান্ধীজি। এটাই অভ্যাস। ফলে জিলাতে বা গ্রামে যদি কোনো আন্দোলন হয় তারও একজনই নেতা থাকে—পটুয়াখালি সত্যাগ্রহ মানে সতীন সেনের সত্যাগ্রহ। ফলে আন্দোলনের কাছে এটাই আমরা চাই। তাই আমাদের ছোট ছোট কাজের জায়গায় আমার অজ্ঞাতে যদি কিছু ঘটে, তাহলেই মনে হয়, সে কী আমি তো জানি না। এ তো সেই গোলমাল এড়ানো। তোমার জানার বাইরে যদি ঘটনা ঘটতে শুরু করে, নিরপেক্ষ, স্বাধীন, সব ঘটনা—সেটা তো ইতিহাসের প্রগতি। আমাদের কাজ তখন, তুমি যা বলেছ, সিচুয়েশনে লোকেট করা। বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলিকে মেলানো। আমাদের কাজের এই আমরাটা কারা? কোনো-না-কোনো কারণে যারা নেতা হয়েছে ; জনসাধারণের ওপর যাদের কর্তৃত্ব আছে বা যাদের ওপর জনসাধারণের কর্তৃত্ব আছে। ঘটনাটা ইনটারেসটিং—দেখবে সিচুয়েশনই তোমাকে লোকেট করে রেখেছে। হকশাহেবই বলুন না।'

'মাপ দিবেন হকশাহেব। মহিলাড়ার ঘটনা না-জানার গোস্তাকি মাপ দিবেন।'

'মাপ দিতে হইলে তো গোস্তাকি দরকার হয়। এমএলএ হইয়্যাও আপনি তো আমাগো কাজই করেন। নাইলে নলিনীবাবু ক্ষেত্রবাবু—এঁরা ছাড়া পাইতেন?'

'আপনি কি ভোটের আগেই রিলিজ অর্ডার পাইয়্যা গেছিলেন?' ক্ষেত্রবাবু একটু খোঁচা দেন।

'কী যে কন ক্ষেত্রবাবু? আপনাদের পাঠাইছে আন্দামান-দেউলিতে দ্বীপান্তরে-নির্বাসনে। আর, আমারে তো ঘুরাইছে দেশের মইধ্যে আলিপুর থিক্যা বহরমপুর, সেখানে থিক্যা রাজসাই। কথা হইল—ছাড়া পাওয়ার পর আমাদের রাজনীতি-সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের কথা পরে একসময়

কওয়া যাবে। বরিশালে কৃষক আন্দোলন তৈরি করা—এইডা স্থির হইছে আমার কারণে। মহিলাডাও আমার কারণে। মাহিলাড়ার পুবের আর পশ্চিমে বিলচাষিদের সঙ্গে আমার মেলামেশা বহুকালের। আপনার তো সমস্যাডা জানাই আছে। একডা মাইল দেড়েকের খাল কাইট্যা বিলের বাড়তি-জল লঞ্চ-স্টিমারের বড় খালে ফেলার ব্যবস্থা হইলে ফলনটা নিশ্চিত থাকে। নায় তো একটু বেশি বৃষ্টিতেই অর্ধেক ক্ষেতের ফসল ভাইস্যা যায়। এডাই আমাগো কর্মসূচি। খালটা কাটা। এই দাবিতে কৃষকদের এক করা সহজ হইল। খাল কাটার প্রধান আপত্তি মাহিলাড়ার হিন্দু ভদ্রলোকদের। বিলের সব চাষিই মুসলমান। ভদ্রলোক হিন্দুদের আপত্তির কারণ—নতুন খাল দিয়্যা বাড়তি জল যখন লাইনের খালে যাবে, তখন তো লাইনের খালও ভর্তি হইয়া থাকব। নতুন খালের জলে মহিলাড়ার প্রধান পল্লী ডুইব্যা থাইকব বছরে ছয়মাস। বিলের যে-পরিমাণ ফসল বাঁচাইবার লগে খাল কাটা হইব, খাল কাটা হইলে তার দ্বিগুণ পরিমাণ ফসল ধ্বংস হইব—এর একডা হিশাবনিকাশ ভদ্রলোকেরা বহু বচ্ছর ধইর‍্যা সরকারে ও কোর্টে এজাহার কইর‍্যা থুইছে। আমরা ভাবছি—কৃষক সমিতি দিয়্যাই খাল কাটাব। সরকারের বুড়ি ছুঁইয়্যা থাইকব। তাই কৃষক সমিতির বার্ষিক সম্মিলন। সভাপতি বঙ্কিম মুখার্জি। বঙ্কিম মুখার্জির নাম শুইন্যা সমিতির কৃষকরা আগুন। কয় যে স্যায় তো হিন্দু আর কংগ্রেসি।'

'বঙ্কিমদা কংগ্রেসি, তার উপর হিন্দু? শুইনলে তো বঙ্কিমদার সন্ন্যাস রোগে মৃত্যু হইতে পারে', যোগেনের এই কথায় নলিনীদা বলে, 'আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করেও কৃষকদের বোঝাতে পারিনি। তাদের একটাই কথা—মুখার্জি তো বড় বামুন। আর তিনি তো প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক। জিতছেন কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে। এর কোনোটারই তো কোনো উত্তর হয় না। আর, সবগুলো কথাই তো সত্য। আমাদেরও তো নতুন কোনো যুক্তি নেই। আবার, এতটা সাম্প্রদায়িকতা স্বীকার করতেও বাধছিল। ভাবছিলাম, সম্মিলনটাই বন্ধ করে দেব। তখন কৃষকদের ভিতর থেকেই আপনার কথা উঠল। উনি এখানকার এমএলএ। কংগ্রেসকে হারিয়েছেন। সুতরাং হিন্দু নন। ওঁর হাতের জল হিন্দুরা খায় না, আমাদের হাতের জলও খায় না। উনি আমাদের স্বজাত। আপনাকে অনুরোধ করতে এসেছি যে আপনি সভাপতিত্ব করতে রাজি হয়ে আমাদের সাহায্য করুন। সরকার যাতে স্থানীয় চাপে প্রভাবিত না হন সেই উদ্দেশে। লোন-অফিসার ঐ এলাকার ঋণ সালিশি বোর্ডের মিটিং ডেকেছেন, ঐ দিনই, উনি আমাদের খুবই সাহায্য করছেন।'

'আপনাগো সমিতি তো আমার লগে কোনো পালানোর পথ খোলা রাখে নাই। আমারে তাগো স্বজাত ভাই কছেন, আমারে হিন্দু বইল্যা স্বীকার যান নাই, আমাগো হাতের জল হিন্দুগো কাছে অচ্ছুৎ বইল্যা আমারে আত্মীয় ভাইবছেন। আমার তো আপত্তি করার কোনো ক্ষেত্র নাই।'

'দেখেন, যোগেন, আমার নিজের যেটা গোলমেলে লাগছিল সেটা হল—বঙ্কিমবাবু সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভুল ধারণার ভিত্তিতে তৈরি ধারণা থেকে সঠিক আন্দোলন কী করে তৈরি হবে? পরে দেখছি এই প্রক্রিয়াটা অদ্ভুতরকম সঠিক অথচ পুরোটাই ভুল। ভুলটা হয়েছে ব্যক্তিগত তথ্যের ব্যাপারে। বঙ্কিম মুখার্জি কংগ্রেস হলেও কংগ্রেস নয়, হিন্দু হলেও হিন্দু নয়—এটা আমাদের বড়-রাজনীতির অংশ হতে পারে। কিন্তু কোনো একটা ঘটনায় সেই বড়-রাজনীতি মহিলাড়া পর্যন্ত পৌঁছয়নি। যে-প্রক্রিয়াতে বঙ্কিম মুখার্জি এলে মুসলমানরা দাঙ্গা বাধিয়ে দিতে পারে, সেই প্রক্রিয়াতেই যোগেন মণ্ডলের অহিন্দু অ-কংগ্রেসি চরিত্রটাও কিন্তু উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এতদিন জেলখানায় শুয়ে বসে থেকে আমাদের চিন্তাশক্তিটাই শুধু বেড়েছে। তাই যে-কোনো ঘটনার দ্বন্দ্বটা বুঝতে চাই। আপনাদেরও বিরক্ত করি। কিন্তু সবসময়ই যে ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকি যে

আমার কোনো ব্যক্তিগত ধারণা বা ব্যাখ্যা দিয়ে একটা পরিস্থিতিকে বদলে নিচ্ছি কী না। আগে যখন শাহেব মারতাম—তখনো তো নিজের ব্যক্তিগত ধারণাকে চরম বলে জানতাম। পরিস্থিতি নিয়ে কিছু ভাবতামই না। এখন খানিকটা শুনে, কিছুটা পড়ে মার্ক্সবাদ অনুযায়ী সংগঠন করতে যাই, তখন মনে হয়, পরিস্থিতিটাকে বেশি দাম দিচ্ছি না তো?'

মাহিলাড়ার কৃষক সম্মিলন

৯৫

মাহিলাড়ার কৃষক সম্মিলনে এতটা জড়িয়ে পড়বে-যে, যোগেন সেটা মনে-মনেও ভাবেনি। ওঁরা কৃষকসমিতি করেছেন, আন্দামান-দেউলি-খাটা বিশ্বাসী নেতা আছেন, যোগেনকে প্রক্সি প্রেসিডেন্ট হয়ে একটা ভাষণ দিতে হবে—এইটুকু তো তার জন্য নির্ধারিত কাজ। যেটুকু কাজের জন্যই হোক, যোগেন তো নিজের সবকিছু সেই কাজে লেপটে না দিয়ে পারে না। এটা যোগেনের স্বভাব।

নিজের বাড়িতে বাপ, যোগামা, খুড়ারা, খুড়িমারা, ভাইবোনরা আর বৌ-ছেলেরা একসঙ্গে অজ্ঞাতবাস কাটাবে বলেই-না যোগেন মৈস্তারকান্দি এসেছে। অজ্ঞাতবাসের এমন টান উঠলে আর বসবাসে থাকা যায় না। অজ্ঞাতবাস থেকে মানুষটার বদলে আসারই কথা। তবে, সবসময় যে তেমন হয়, তা না।

অজ্ঞাতবাস, মানে কি টানা জীবন কাটাতে-কাটাতে হঠাৎ একটু জিরেন নেয়া? নইলে, গান্ধীজি ডাক দিতেই চাকরিবাকরি, অফিসকাছারি, স্কুলকলেজ ছেড়েছুড়ে দিয়ে সবাই আইন অমান্য করে জেলে যাওয়া শুরু করে? গান্ধীজির ডাকটা তাদের কাছে পৌঁছে ছিল সেই অজ্ঞাতবাসের ডাক হয়ে।

আবার গান্ধীজি মানুষটা যোগেনের কাছে পৌঁছেছিলেন, অজ্ঞাতবাস শেষ করার ডাক নিয়ে, মন্দিরে-মন্দিরে ঢোকার ডাক নিয়ে, হিন্দু হয়ে বসবাসের ডাক নিয়ে, অচ্ছুৎ-মন ঝেড়ে ফেলে স্বয়ংসম্পূর্ণ হিন্দু হওয়ার ডাক নিয়ে। সেটাও কারো কাছে অজ্ঞাতবাসের ডাক হতে পারে। যোগেন জানে—গান্ধীজির ডাকের মায়া আছে। সে তাই নিজের অজ্ঞাতবাসে চলে এসেছে মৈস্তারকান্দির বাড়িতে অথচ এই বাড়িটা থেকে বেরিয়ে যেতে তার চৌত্রিশ বছরের জীবন জুড়ে কত উলটো টানই-না উশকেছে যোগেন। সেটাও, সেই বাহিরটাও তো ছিল অজ্ঞাতবাস। এখন যোগেনকে তার বসবাসে ফিরতে হবে—অজ্ঞাতবাসে আয়ত্তে আসা বর, শাপ, অস্ত্র ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। বাসভূমি তৈরির সেই প্রকাশ্যতায় এই বাড়িই তার অজ্ঞাতবাস গৃহ।

সম্মেলনের প্রথম দিন বিকেলনাগাদ মঞ্চে বসে যোগেন বুঝতে পারেনি, এই সমাবেশের চেহারাচরিত্র। কিছু লোক বসে আছে, কিছু লোক যাতায়াত করছে, কিছু লোক জটলা পাকাচ্ছে। গ্রামে তো মানুষজনের দেখাসাক্ষাতের জায়গাও কম, সুযোগও কম। চব্বিশটা ঘণ্টা এমন জমাট যে কারো কোনো খামতি হলে ধরা সে পড়বেই। চুরি করতে বেরনোরও বাঁধা টাইম আছে। আর, মঙ্গলবারের হাট সেরে, হাটবাবু সন্ধ্যা নামতেই আগৈলঝরার পশ্চিমের হাওর পার হয় এক ডিঙিতে। সেখান থেকে এক নৌকো নিয়ে তেতুলিয়া নদী দিয়ে এই পাড়েই তার দ্বিতীয় সংসার করতে যান। সেই স্কুলের দিন থেকে যোগেনরা দেখে আসছে, হাটবাবুর চেহারার কোনো বদল নেই, ছাপা শাটিঙের হাফ শার্টে কোনো বদল নেই, মঙ্গলবারের সন্ধ্যার কোনো বদল

নেই, হাটবাবুর দ্বিতীয় সংসারের কোনো বদল নেই। এতখানি পথ, স্থলে জলে পেরিয়ে সৎ ব্রাহ্মণ হাটবাবু এক মুসলমানীর সঙ্গে ঘর করছেন যুগ-যুগ ধরে। তাদের সংসার হল মঙ্গলবার প্রথম রাত থেকে বৃহস্পতিবার দুপুর।

গ্রামের মানুষ এমনই নিয়মের কাজে বাঁধা, যে হাট, বাজার, মেলা, পরব ছাড়া দেখা হয় না তাদের। যেখানেই তাদের দেখা হোক, তারা ঠিক একটা মেলা বসিয়ে নেবে। মিটিঙের মত মিটিংও চলবে।

মাহিলাড়ার সম্মিলনটাকে এই চেনা ছকের বাইরে আর কী ভাবে দেখবে যোগেন, তার ওপর পশ্চিম থেকে সূর্যাস্তের আলো পড়ে আড়াল করে দিয়েছে মঞ্চ থেকে ডানদিকের অংশটা। ফলে, যোগেন কোনো আন্দাজই পায় না। পেল—অন্ধকার একটু ঘনিয়ে উঠলে। ঐ অন্ধকারের বিস্তারের ভিতরে দূরে-দূরে বুকের কাছে ধরে থাকা কিছু লালশিখার লণ্ঠন। কোথাও একটা কুপি জ্বলছে। আর অন্ধকার আলোর ধোঁয়া আর-একটা দিগন্ত হয়ে বয়ে যাচ্ছে। যোগেনকে মনে করিয়ে দেয়—খাল কেটে জমি বাঁচাতে চায় বিলের চাষিরা। সে তখন গলা সপ্তমে তুলে বলছে—'কেউ কি কোনোদিন শুইনছেন, কৃষক ছাড়া কৃষি হয়? তাইলে কৃষির জইন্য কৃষকের যা দরকার, যা কিছু কৃষকের মনে হবে তার দরকার, সেই সব কিছু করার পুরা অধিকার কৃষকের আছে।'

যোগেন একটু থামে। সে লক্ষ করে, তার মুখ থেকে স্বাভাবিক বেগে, 'পুরা অধিকার কৃষককে দিতে হবে', বেরল না। বেরল, 'অধিকার কৃষকের আছে'। যোগেন নিজেই আঁচ পায়নি যে ভিতরে-ভিতরে ল্যান্ড টেনান্সি অ্যাক্টের সংস্কার, কংগ্রেসি হিন্দু জমিদার আর মুসলিম জোতদার-তালুকদারের ভূমিসংস্কারে ঢোঁক চিপে কথা বলার ঐক্য, ভূমিসংস্কার আইন—এইসব মিলে তার ভিতরে জমি-জমির মালিক—জমির কৃষকের সম্পর্ক নিয়ে একটা বোধ তৈরি করে ফেলেছে। বলতে-বলতেই যোগেন নিজের কথাগুলো শুনে ভেবে ফেলে, সে তো বরং উলটোটাই ভাবছিল—জমিদার না-থাকলে গরিবের গরিব চাষিদের ভরসা কোথায়, ঋণ সালিশি বোর্ডের ধাক্কায় চাষে তো আর কেউ লাল পয়সাও ঠেকাবে না। যোগেন এখন কী ভাবছে সেটা তার নিজের গলাতেই সে শোনে ও বলার আগে বাক্যগুলি সাজানো থেকে বোঝে—'এক জমির কত মালিক গুনে শেষ করা যায় না। একজন মালিক হলেন জমিদার—সরকারি জামিন, তার জমিতে থাকার কোনো দায় নাই, শুধু সরকারের ঘরে কিস্তিবন্দী খাজনা দিলেই খালাশ। কিন্তু এত বড় জমিদারির ঘরে-ঘরে গিয়্যা খাজনা আদায় নেয়া যায়? যায় না। তাই আর-এক মালিক হইল তালুকদার। স্যায় তালুকের সাইজমত খাজনা জমিদারের কাছারিতে জমা দিলেই খালাশ। কিন্তু একবার তালুকদারি ধইরলে তো হাত সুড়সুড়ায়, পাও সুড়সুড়ায়। তহন আরো তালুক বায়না নেয়। এত ব্যস্ত-সমস্ত তালুকদারের পকেটে কি আর টাইম থাকে সব তালুকে টহল মারার? তাই আইল, নিম-তালুকদার। নিম-তালুকদার কি চিরজীবনই নিম থাইকব্যার চায়? স্যায়ও চায় কুলিন হবার। তাই স্যায়ও রাইয়তের হাতে জমি দেয়। আপাতত রাইয়তেই যদি থামি তাইলেও খাড়ায় এক জমিদারির চাইর-চাইরডা, এক গণ্ডা, মালিক। তারা সক্কলেই মালিক। কায়ও চাষা না। পাঁচ নম্বর মালিক হইলেন আধা-মালিক, আধা-চাষি। মুসলমান বা শুদ্দুর জাইতের রায়ত নিজেও চষে, ভাগে দিয়্যাও চষায়। ফসলের ভাগ নেয়। তাইলে, এই-যে পাঁচ-পাঁচ খান ধাপ, যেমন সুপুরিগাছের গোড়া কাইট্যা খালের ঘাট বানায়, তেমনি পাঁচ-পাঁচ খান ধাপের সঙ্গে জমির কোনো আবাদের সম্বন্ধন নাই, আছে শুধু খাজনার সম্বন্ধন। জমিদার, তালুকদার, নিম-তালুকদার, গেরস্ত রাইয়ত—এই পর্যন্ত কোনো ধানপাটের হিশাব নাই। আবাদ

শুধু চাষি-রাইয়ত আর ভাগচাষির ব্যাপার। আর, এই-যে এত—ধাপের খাজনা এডা কেডা দ্যায়? সেই চাষি-রাইয়ত আর ভাগচাষি। স্যায় তো আর জমি থিক্যা পলাবার পারে না। তাইলে সরকারি খাজনারও একমাত্র ওয়ারিশ হইল চাষি। আর ফলনেরও একমাত্র দায়িক হইল চাষি। কিন্তু স্যায় চাষির জমির উপর দখল নাই কুনো। নিজের জমিতে সুপারিগাছ থিক্যা একডা সুপুরি খাওয়ারও আইন নাই চাষির। এই যে-সরকার এখন দেশ শাসন করে তারা চাষিগোর কথা এডডু আধডু ভাবে। ক্যা ভাবে, তা আমি জানি না। ভাইবলে পরের ভোটে জিতব, এমন আশা হয়ত আছে। মেম্বারগো ভিতরে দুই-তিন গণ্ডা রায়ত বা চাষি থাইকবার পারে। তালুকদার নিম-তালুকদার তো আছেই। আবার, উকিল-ব্যারিস্টারও আছে। তাই সভার একডা-দুইডা আইন হইছে। মানে, আইন নিয়্যা কিছু কথা হইছে, কর্জ-ধানের সুদ কমানোর সালিশ বসানো হইছে, বাজে-আদায় হাটবাজারে বেআইন হইছে। চাষি যদি এই আইনের বদল নিজের চক্ষুতে না দেখে, তাইলে এইসব আইনেও কাজ কিছু হইব না। চাষিরে তাই শুধু চাষ কইরলেই হব না। চাষের জইন্যে যা-দরকার, চাষি তা-ই করব। এইডা চাষির দখল।'

যোগেন একটু থামে। কয়েক মাস ধরেই এই সমস্ত আইনকানুনের রহস্যের ভিতর ঘুরপাক খেতে-খেতে সে নিজেই একটা দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে আছে। তার কোনো পুরুষে কোনো জমি নেই। সে কী করে আন্দাজ করতে পারবে, কোন আইনে কার উপকার, কার হাতে কে তামাক খায়। জমিজমা নিয়ে খুনোখুনি, দাঙ্গাহাঙ্গামা এইসবে তার আপত্তিই আছে—মনে-মনে। এমন একটা ধারণাতেও সে বাঁধা, যে, এসব বেনিয়মি, দখলি, দাঙ্গা বেশির ভাগই লাগায় রাইয়ত আর চাষিরা। তালুকদার, নিম-তালুকদার, গৃহস্থ রায়ত—দাঙ্গা হাঙ্গামায় এদের তো লাভ নেই। তাছাড়াও জমিদার-তালুকদাররা যদি হাঙ্গামা বাধাতে চায়, তাহলে তাদের তো লেঠেল-পাইকের বাহিনী বানাতে হয়। উলটোদিকে চাষিমাঝিরা তো নিজেরাই লেঠেল-পাইক। মানুষের মনের ভাব তো আর যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে তৈরি হয় না, তৈরি হয় নিজের স্বার্থ ও লাভক্ষতি থেকে। জমিজমার ব্যাপারে সেই মনোভাবটাই যোগেনের তৈরি হয়নি। তাদের বাড়িঘরের দুঃখদুর্দশা, অভাব-অকুলান এতই প্রাচীন ও বংশানুক্রমিক যে সেসব তার চিন্তাভাবনার মধ্যে ঢোকেইনি। অথচ, বামুন-কায়েতদের সঙ্গে বর্ণভেদের যন্ত্রণায় সারা গায়ে তার যেন রাতদিন ভিমরুল কামড়ায়। যোগেনের কি এমন কোনো অনুভবও তৈরি হয়ে গেছে যে জমি থাকলে মালিকও থাকবে, আর নিজের যার কাজের জোর থাকে সে ঠিক দাঁড়িয়ে যায়, মালিক তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না? এই এমন অনুভব, যদি থাকেই যোগেনের, তার শিকড় কি তার একার জীবনের এই সাফল্য বোধের মধ্যে গেড়ে যাচ্ছে।

এই প্রথম যোগেনকে প্রকাশ্যে বলতে হল—ফজলুল হক-সরকারের জমি ও চাষি নীতি কী? আইনসভাতেও বলেনি। সে তো বিরোধীপক্ষে। তার ওপর কংগ্রেস তাদের ডেকেছে। আজ বাদে কাল হকশাহেবের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব তোলা হবে। শরৎ বোস হিশেবনিকেশ করছে। আর, যোগেন কী না মাহিলাড়া-র বিল্যা লোকজনদের এই মিটিঙে এসে এত চাষিকে একসঙ্গে জোট পাকাতে দেখে ও তাদের জ্বলন্ত চোখ দেখে, তাদের সম্বোধন করে, নিজের সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে?

হ্যাঁ। যোগেন নিজেই নিজের গলা শুনে জানতে পারে, যাচ্ছে। নিজেরই সঙ্গে কথা বলে, যাচ্ছে। যোগেন কি এক বারও আন্দাজ পায়নি যে কথাগুলি এমন বিস্ফোরক হয়ে আছে তার ভিতরে? বুকের ভিতরের আগুন কি আর বাইরে তাপ দেয়। বরং যোগেন আরো শুনতে চায় নিজের গলায় নিজের কথা।

যোগেন শোনে, সে বলছে, 'বাউন ছাড়া যহন পুরুত হইব্যার কেউ পারে না, তাইলে কোন পূজার কী নৈবেদ্য সে-বিচারে তো বামুনঠাকুরের বিধানই বেবাকের উপরে। তেমনি শুদ্দুর আর শ্যাখরা ছাড়া যদি কেউ চাষি হইব্যার না পারে, তাইলে কোন জমির কী ব্যবস্থা সে-বিচারে তো শ্যাখ-শুদ্দুরের বিধানই বেবাকের উপরে। কোন বিলের বাড়তি জল বাইর করার খাল কাইটতে হব আর কোন জমির ফলন বাঁচাইতে বাড়তি জল ঢুকাইব্যার লাগে, সেডা তো চাষিগোর ঘরের ব্যাপার। আগামি কাল প্রাতঃকালে যহন আপনাগো রোজকার নিদ্রাভঙ্গ হয়, কাইলও তাই হইব। সকালে উইঠবার লগে পুরা রাইতডা জাইগ্যা থাইকেন না। যহন আপনাগো জাগরণ, তহনই এই মাহিলাড়ার খাল খননের আরম্ভন হইব। আরম্ভন হইয়া গ্যালে শ্যাষের আগে শ্যাষ নাই। কতক্ষণ লাইগব তারও হিশাব নাই। যদি আপনাগো কোদাল-কুড়াইলের খাওয়ার মুখডা হয় দশাননের সাইজে আর তার ধার থাকে কুমিরের দাঁতের লাগাল, তাইলে একশ মাথার দুইশ হাতে এই মাইলদুই মাটি উগরাইতে আর কয়দিন কয়ঘণ্টা লাগে? যদি দুইশ হাতের একশ মাথায় খালের জমির মাটি পাড়ে ফেইলবার ঝুড়িগুলা থাহে নিদ্রাভঙ্গের পর কুম্ভকর্ণের খিদ্যার লাগাল খিদ্যা, তাইলে এই মাইল দুই মাটি কুপাইয়া জল তুইলতে আর কয়দিন-কয়ঘণ্টা লাইগব? আপনারা অ্যাহন সন্ধ্যার পূর্বে বাড়ি ফেরেন, কোদাল-কুড়াইল-ঝুড়ি পরীক্ষা মেরামতি সাইর‍্যা নিজের-নিজের হাতের ভাঁজে মাথা দিয়্যা রাইতের ঘুম দ্যান। আইজ আর মাথা থোয়ার লগে বিবি বৌ-রে হাতড়াইবেন না। কালি প্রাতে আরম্ভিবে মহারণ, আজিকার রাইত অবশ্যই সংযমন।'

অতবড় সমাবেশকে থতমত খাইয়ে ও নিজেও থতমত খেয়ে যোগেন বক্তৃতা শেষ করে দেয়। যারা শুনছিল, তারা তো আর রোজ বক্তৃতা শোনে না। তাই তারা বুঝতে পারে না—বক্তৃতা শেষ হয়ে গেছে। বুঝতে পেরেই পুরো সমাবেশ দাঁড়িয়ে উঠে ধ্বনি তোলে—'জয়ো জয়ো যোগেনো মণ্ডলো জয়ো, জয়ো জয়ো।'

নলিনী ছুটে এসে যোগেনকে ধরে বলে, 'আরে, তুমি তো বিরাট মাপের মাস-লিডার। বঙ্কিমবাবু নিশ্চয়ই তোমার চাইতে বড় লিডার, বড় স্পিকার। কিন্তু তুমি যেমন আন্দোলনটাকে কর্তব্য করে দিলে চাষিদের, এমনটা কি মাটির নেতা ছাড়া কেউ পারে?'

'কন কী নলিনীদা, আমি তো আকাইম্যা মানুষ। আমার নি ক্ষমতা ছিল এমন একডা মিটিং ডাকার? বিপ্লবী ছাড়া সেই ধৈর্য থাহে? পনের বছর দেউলি, সারা জীবন আন্দামান না খাইটলে এই ধৈর্য জন্মায়? আপনাগো কী কামে লাইগল্যাম, জানি না। কিন্তু আপনাগো মিটিং আমারে বড় বাঁচান বাঁচাইল আজ।'

'বাঁচামরার কথা আসে কোত্থেকে?'

'আমি তো শুদ্দুর হিশাবেও থার্ড ক্লাশ, চাষি হিশাবে তো অষ্টরম্ভা। জমিজমা জমিদার-চাষি ঋণ-সালিশি নিয়্যা নিজের কুনো মতামত তৈরি হয় নাই। কোত্থন হব—আমাগো তো এক চিমটা জমিও নাই। বংশের পর বংশ না-থাইকতে-থাইকতে মগজে গজাল ঢুইক্যা গিছে যে আমাগো জমি থাইকব্যার কুনো কথাই নাই। তাইলে জমিদারি-জোতদারি মহাজনি এইসব হাঙ্গাম বাঁধাইব্যার হেতু নাই। যা আছে, থাউক। কোন ব্যবস্থায় দুষ্ট ব্যক্তি থাকে না? আপনার এই মিটিঙে আইস্যা আমার অঙ্কডার ভুল বুইঝল্যাম। আমি কইষতেছিল্যাম ভুল সমীকরণ। শুদ্দুর বা শ্যাখ হওয়ার সুবাদে তো চাষি হয় না। মাহিলাড়ার গোটা বিশ-পঞ্চাশ ভদ্দরলোকদের স্বার্থ আর এই শয়ে-শয়ে বিল্যাচাষির স্বার্থ নিয়্যা যদি পক্ষ নিব্যার লাগে—আমি কী কইর‍্যা শুদ্দুর-শ্যাখগো পক্ষ ত্যাগ করি? আমার তো সেই চয়েসই নাই নলিনীদা। আমি কাইল উষাকালে আইয়্যা পড়ব নি।'

'তুমি এলে তো নাচতে-নাচতে খাল কাটা হবে। তাহলে একজন কাউকে বলি নৌকো নিয়ে

তোমাকে আনতে?'

'নলিনীদা, কন কী? মৈস্তারকান্দি থিক্যা মাহিলাড়া—এইটুকু আমি একা নাও বাইব্যার পারি না? কন কী? তাইলে তো শাহেবগো জেলখানাই নিরাপদ। চরিত্র নষ্ট হওয়ার ভয় নাই।' মাহিলাড়ার খাল কাটা হল শনিবার। বিঘে খানেক দূরত্ব বাকি ছিল, তার আগেই অন্ধকার হয়ে গেল। কথা উঠেছিল, মশাল জ্বেলে বাকিটা শেষ করে দেয়া। সেটা আর করা হল না—ঠিক হল রবিবারে ঐ টুকু খোঁড়া হবে আর বিল থেকে জলও ছাড়া হবে।

যোগেন অন্ধকার থাকতেই এক ছিপ নৌকো নিয়ে হাজির। যোগেনকে দেখে সত্যিই যেন কাজের গতি বেড়ে গেল। আলো ফুটতেই নিজের জামা খুলে রেখে, ধুতি মালকোঁচা মেরে এক কোদাল নিয়ে নেমে পড়ল খাল কাটতে। নইলে তো যোগেনকে মানতে হয়—সে এত বুড়ো যে কোদাল চালানো তার পক্ষে সম্ভব নয়, বা সে বামুন-কায়েত-বৈদ্যের মধ্যে বা মোল্লা-মৌলবীর মধ্যে পড়ে—এসব কাজ বেতরিবতের কাজ, বা সে উকিল-ব্যারিস্টার-জমিদারদের মত ঠিকা নেতা। খালকাটা বা ঝুড়িতে করে মাটি তুলে মাথায় নিয়ে পাড়ে ফেলা এইসব কাজ আর তার নিজের কাছে নিজের পরিচয় নিয়ে তেমন কিছু বিবাদ-বিসংবাদ ঘটেনি, যার সুরাহার জন্য যোগেন কোদাল নিল কাঁধে বা ঝুড়ি তুলল মাথায়। যেখানে গতর লাগে, সেখানে গতর না-খাটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা তার চোদ্দো পুরুষের পক্ষেও সম্ভব নয়। যা স্বাভাবিক ও তার বংশানুক্রমিক, যোগেন মাত্র সেইটুকুই করেছে। তা নিয়ে কোনো হৈহল্লাও তাই হয়নি।

লোন অফিসারও এসেছিল। তার সঙ্গে কথা বলে যোগেন আন্দাজ পায়, অফিসারের সঙ্গে আলাদা করে সে কিছু আন্দাজ পেতে পারে। সে অফিসারকে, পরদিন, রবিবার একটু আসতে বলে, হ্যাঁ, ঐ খালপাড়েই।

রবিবারে যোগেন আর খালের কাজে হাত লাগায়নি। কিছু কাগজ ও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। একটা গাছতলায় অফিসারকে নিয়ে বসে, সে কথা বলছিল আর মাঝেমধ্যে কাগজে লিখছিল। খালকাটার ব্যস্ততায় তাদের কোনো অসুবিধে হচ্ছিল না। তারাও কোনো অসুবিধে তৈরি করছিল না। কিন্তু দূর থেকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, তারা বেশ নিবিড় আলাপে মগ্ন আর আলাপটা চলতেই থাকবে।

সকালটা চৈত্রের রোদে তেতে উঠছিল। তারা যে-জায়গায় বসে কথা বলছিল সেটা কোনো গৃহস্থ বাড়ির খিড়কি। এক মহিলা সেই খিড়কির টিনের দরজা খুলে হেঁটে যোগেনের দিকে আসেন। আধময়লা শাড়ি, মাথায় একটু ঘোমটা, চোখে চশমা। যোগেন বোঝেইনি মহিলা তাদের দিকেই আসছেন। যখন বোঝে, তখন লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় ও মহিলা যোগেনকে নমস্কার করে ফেলেন, দুই হাত জড়ো করে। যোগেনকে একটা প্রতি-নমস্কার করে হাসতে হয়। ততক্ষণে মহিলা জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি তো যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল?

'আজ্ঞে—'

'আপনারা কিন্তু আমাদের বাড়িতে বসেও কথা বলতে পারেন—'

'না, না, সে তো, এই এখানডায় তো বেবাক মানুষ আছে—'

'হ্যাঁ, তাঁরা তো একটা কাজে ব্যস্ত আছেন—'

'আমরাও, আমরাও, ঐ কাজেই—'

'মনে হল আপনারা খুব বিশেষ কোনো আলাপে মগ্ন। রোদও তো চড়েছে আমাদের ঘরটায় বসলে আপনাদের কথাবার্তার সুবিধেই হবে আ—সুন। এটা প্রোফেসর সেনের বাড়ি।'

ততক্ষণে যোগেন ভদ্রমহিলাকে ও অফিসার যোগেনকে অনুসরণ করছে। যোগেন জিজ্ঞাসা

করে, 'প্রোফেসর সেন? মানে প্রোফেসর এস এন সেন? হিস্টরিয়ান?'

মহিলা ঘাড়টা ঘুরিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ'—

'খাইছে। বরিশালের এই একডা বিপদ। মাহিলাড়া, গৈলা, বাটাজোড়, বাকলা—যেহানেই যান, য্যান, দেশগৌরবদের মেলা বইস্যা গিছে। চন্দ্রদ্বীপের পণ্ডিতগণ আছেন। বরিশালে সত্যি একডা রত্নসমুদ্র'

ওরা ঢুকেছে বাড়ির পাছদুয়ার দিয়ে। বাঁয়ে গোয়াল। ডাইনে সুপুরিগাছের সারি। তারই মধ্যে একটা লাউমাচা। লাউমাচার নীচে কিছু লঙ্কাগাছ। বাঁয়ে রান্নাঘর—চেগার দেয়া, ওপরে টিন। রবারান্দার কোণে আরো একটা ছোট রান্নাঘর। যোগেন অনুমান করে, হবিষ্যি ঘর। বেশ বড় ঠনঠনে দুয়ার পার হয়ে টিনের একটা চার চালা ঘর। বেড়া চেগারের। তার ওপর আলকাতরা—সেই ঘরটার ভিতরে ঢোকার আগে যোগেন একটু দ্বিধা নিয়েই বলে, 'আমি তো নমশূদ্র, আর এও কিন্তু মুসলমান। আমাদের তো আপনাদের ঘরে ঢোকা নিষেধ।'

'আপনারা তো ঢোকেননি আমি ডেকে এনেছি। সেটা তো বারণ নয়। আসুন। আপনারা এই ঘরে বসে কথা বলুন।'

ওরা বসার জায়গা খুঁজে বের করার আগেই মহিলা চলে গেলেন। বোঝা যাচ্ছিল—এটা সদর ঘর। এর সামনেই বড় রাস্তা। সেনবাড়িতে তো একটা বারবাড়ি থাকার কথা—যোগেন সদর দরজার কাছে গিয়ে বারবাড়ি খুঁজে আসে। লোন অফিসার ততক্ষণে একটা কাঠের চেয়ারে বসে বলতে শুরু করেছে, 'স্যার, বসেন, নাইলে আমি কথার খেই হারায়্যা ফেইলব। সন্দ হয়, সালিশি বোর্ড অ্যাহন সাড়ে তিন হাজার, চাইর হাজার ছাইড়্যা গেল। সরকারের নীতিডা কী স্যার, সালিশি বোর্ড তৈরির? থানা পিছু একডা?'

'সেইডা হয় নাকি। ঋণের সঙ্গে থানার সম্পর্ক কী?'

'তাইলে স্যার—'

'ইউনিয়ন পিছু ধইরব্যার পারেন। ঋণ সালিশি বোর্ড তো কাম কইরতে পারে শুধু ইউনিয়ন বোর্ডের আন্ডারে।'

'সেইখানেই তো স্যার শোয়ার ঘরে সাপের গর্ত। কংগ্রেস-না অ্যান্টি ইউনিয়ন বোর্ড আন্দোলন লাগাইছিল—'

'সম্ভবত তোমার জন্মের পূর্বে। অ্যাহন তো কংগ্রেস পাইরলে এক মেম্বারের জায়গায় পাঁচ মেম্বার চায়—'

'এ তো স্যার মামার বাড়ির মোয়া না যে হাত ঘুর্যাইলেই মিলব।'

'তাও যদি মামি মামার দ্বিতীয় পক্ষ না-হয়।'

'প্রথমপক্ষেও হয় না স্যার। কংগ্রেস কইল ইউনিয়ন বোর্ডে যাওয়া নাই। নাই তো নাই। যাওয়ার লোকের তো অভাব নাই। মুসলমানরাই বেশির ভাগ ইউনিয়নের চেয়ার পাইল। আর, ঋণ সালিশির আইন তো স্যার দুই বছর আগে। তহন গবমেন্ট অর্ডার দিল, সালিশি বোর্ড চালাইব ইউনিয়ন বোর্ড। ব্যাস। লাইগ্যা গেল পার্মানেন্ট কাইজা হিন্দু-মুসলমানে। তহনো তো স্যার কংগ্রেস-লিগ-প্রজা পার্টি এইসব নাম হয় নাই।'

'এতডা কথা তোমার সংগ্রহ কী কামে?'

'কী যে কন স্যার। আমার নি সাইধ্য আছে?'

'লোক লাগাইয়া আনছ?'

'কী যে কন স্যার! আমার নি লোক লাগাইবার সাইধ্য আছে।'

'আরে, এডডা কিছু তো কবা রে মিয়া? সবই তোমার সাইধ্যের বাইরে কও আর ধানক্ষেতে টিয়ার ঝাঁকের নাগাল দাঁতের আওয়াজ তুইল্যা তো শুন্যাবার ধইরছ ইউনিয়ন বোর্ডের জন্মকথা। এইসব কানে শোনা কথা কইয়্যা ঘুইর‍্যা মরো, অফিসার, তোমার মরণ আসন্ন। যে-কথাই কও তার দায় তো নিবা লাগব? তহন কইবাডা কী?'

'আল্লা হো আকবর।'

যোগেন একটু হেসে বলে, 'ভাল কইছ। কিন্তু যে-পুলিশ ধইরব স্যায় তোমার আল্লারে চিনব তো?'

'সে কি কওয়া যায় কত্তা, বিশ্বাসের কথা কি কওয়া যায়। তবে আমারে আল্লাই কইছে—হেইডা তো মিছা কথা না। নাইলে আমি কি কোনো শাহেবের বুলি বুইঝব্যার পারি?'

'আল্লারে শাহেব ঠাউরাইছ? কুরান না আরবি লেখা? তুমি তো গ্র্যাজুয়েট আরবি জবান শিখল্যা কবে—'

'শিখার কামডা কী? শাহেব কী কইলেন, সেইডা আমার বোঝনের কাজ। ভাষা শিক্ষাডার কথা আসে ক্যামনে?'

'শাহেবরেই আল্লা ধইরল্যা?'

'উপায় কী সেটা কন।'

'তোমার উপায় করব আমি? আমি কি তোমার পির।'

'কী যে কই! আল্লাও সেই কথাই কলেন—এই মৌলবি আর পিরগোর কথা বিশ্বাস নাই। তেমন কথা কানে আইলে আর-এক কানে দেয়ার আগে সদরের অ্যাডিশন্যাল এস্‌ডিওরে সর্বাগ্রে তালাশ দিবা। ওনার কাছে তোমার নাম রাখা আছে।'

'আল্লা তোমারে রিটার্ন পোস্টও দিছে? তাইলে কও।' 'আমাগো নিয়োগপত্র দেয়ার পর চট্টগ্রাম ডিভিশনের কমিশনার শাহেব আমাদের এক ঘণ্টা ধইর‍্যা বুঝাইয়্যা, সেই বোঝানগুল্যা আবার চার পৃষ্ঠায় ছাপাইয়্যা আমাগো মইধ্যে বিলি কইরা কইলেন, যহনি কোনো কিছুতে সন্দ হব, তহনি এই চার পৃষ্ঠা গড়গড় কইর‍্যা পইড়্যা যাবে। দেখবা, উত্তর লিখা আছে।'

'চার পৃষ্ঠায় দুনিয়ার সব প্রশ্নের জবাব। কেউ যদি জিগায় এবার ডার্বির মাঠে যে-ঘোড়াডা ফার্স্ট হইব, সেইডার টিকিট নম্বরডা কী?'

'ডার্বি কী?'

'ছাড়ান দ্যাও। সে তো বুঝানের বাহিরের দ্রব্য—'

'সে কী করে হয়? শাহেব তো কইছেন, আমাগো লোন অফিসারের চাকরির লগে।'

'কও। তালি কও।'

'শাহেব কইছেন—তিন হাজার লোন অফিসার নিয়োগ একডা অভূতপূর্ব ঘটনা, এতগুলা চাকরি, একবারে দেয়া আর সে-ই সব চাকরি শুধু শ্যাখগো দেয়াও একডা অভাবিতপূর্ব ঘটনা। কেন?'

'এত পুরানকথার লগে শাহেব লাগে? সরকারি চাকরিতে কোনো শ্যাখও নাই, কোনো শুদ্দুরও নাই। শাহেব নি কইছে ঢাকা জিলার হিশাব?'

'কইতেও পারে, নাও কইতে পারে, আপনার কাছে শুইনব্যার তো নিষেধ নাই—'

'আমি-না তোমারে ডাইকল্যাম্ শুইনব বইল্যা। এক হিশাবে বার হইল, আমিই জিগাইছিল্যাম আইনসভায়, ভোটের আগে ঢাকায় ছিল স্থায়ী সরকারি চাকরি ৭ হিন্দুর পাছে ৩ শ্যাখ। আর অস্থায়ী চাকরি ১২ হিন্দুর পাছে ৭ শ্যাখ। ভোটের পরে মাত্র একজন হিন্দু স্থায়ী। অস্থায়ীপদে

কেউও নাই, হিন্দুও না, শ্যাখও না। প্রয়োজন নাই, তবু জাইন্যা রাখা ভাল—হিন্দুর মইধ্যে তপশিলি ধরা আছে। তুমি ঋণ-সালিশির কথা কও।'

'শাহেব যা কইছে?'

'তোমার তো কামই শুরু হয় নাই, শাহেবের কথাই কও।'

'শাহেব কইল—তোমাগো আমি অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ কইরতে কই। এই কথাডা ভুইলব্যা না যে তোমাদের ঘিরা্যা অগ্নিকুণ্ড।'

'থোও তোমার থিয়েটারি। শাহেব কইছে অগ্নিকুণ্ড?'

'ঠিক ঐ শব্দটাই যে কইছে তা না হইব্যারও পারে, তবে মানেটা তাই দাঁড়ায়। ধরেন, হিন্দুরা মানে কংগ্রেস তো ইউনিয়ন বোর্ডের নৌকায় ওঠে নাই। নৌকা তো ছাইড়্যা গিছে। মুসলমানরাই বেশি। সরকারের হাতে মোট মেম্বারের তিন ভাগের একভাগ নমিনেশন—বোর্ডগুল্যা ফেইলবার রাইটও সরকারের। ঋণ বোর্ড চালায় ইউনিয়ন বোর্ড। মহাজন তো বেবাকই হিন্দু। ইসলামে মহাজনি হারাম। তাইলে লোন বোর্ডে মহাজনরা দাবি দিল, শাহেব কাগজ দেইখ্যা কইছে, প্রায় চাইর কোটি। সালিশি বোর্ডে মারামারি কাটাকাটি কইর‍্যা হিন্দু মহাজনরা পাশ করাইয়্যা নিল, ধরেন, তিন কোটি—'

'কইল্যা তো শাহেব কাগজ দেইখ্যা কইছে। তালি আবার ধরাধরি ক্যান?'

'যে-হিশাব কইব্যার লগে শাহেবেরও কাগজ লাগে, সেইডা কি আমার মতন হাভাইত্যা না উজারত্যার মাথায় থাকতি পারে? কোটি টাকা কারে কয়, জানি না। আমারে শ-দিয়্যা বুইঝব্যার লাগে। ধরেন, সালিশি বোর্ড কয়েক শ টাকা মকুব দিল—তাই কইল্যাম তিনকোটি। মকুব দেয়ার পরও তো তিন কোটি, তিন কোটিই থাকে। সালিশি বোর্ডে হিন্দু মহাজনরা তো লোনটারে বাড়াইয়্যাই দেখাইছে। ইউনিয়ন বোর্ডে মুসলমান তালুকদার-জোতদার সেডা নামাইয়্যা আইনল প্রায় ১৮ লাখে। চার কোটি-তিন কোটি থিক্যা তো প্রায় ১৮ লক্ষ অনেকডাই কম। আটটা সংখ্যায় কোটি আর সাতটা সংখ্যায় লক্ষ। তাইলে তিন-চার কোটি আর সতের-আঠার লক্ষের মইধ্যে কতগুলা একশ গড়ায়্যা যায়। শাহেব কইয়া দিছে—এইডাই অগ্নি কুণ্ড।'

'অ্যাহনো তো ধোঁয়াও দেখাইলেন না, অগ্নিডা কোথায়?'

'স্যালিশি বোর্ড আর ইউনিয়ন বোর্ডের কাইজ্যা রাতারাতি হইয়্যা গেল হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। আইনশৃঙ্খলা। পুলিশ। পুলিশ শাহেব। ম্যাজিস্ট্রেট। পিটুনি কর। এত মিল্যাও কি আপনার আকাঙ্ক্ষামত আগুনের পরিমাণ খাড়াইল না? শাহেব কইছে, দাঙ্গা লাইগব্যার দিবা না। সালিশি বোর্ডের হিন্দু মহাজনগোর সাথে আলাদা-আলাদা কথা বলো। কয়ডা মহাজন কাগজে প্রমাণ দিব্যার পারব? কতডা বাড়াইছে নিজেই কহুক। এগো মইধ্যে ভেজাইল্যা লোক খুঁইজ্যা বার করো। তারে বেশি কথা কইতে দিবে না। ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বারগুলাকও বুঝাও—না-হয় হইল মহাজন, সুদ-খাওয়াডাই তো মানুষডার ব্যাবসা। তারে প্রাণে মারাডা, অধর্ম। লোকডার আসলডা অন্তত দ্যান। আর যদি দ্যাহেন, দুই বোর্ডের বজ্জাত গুইল্যার হাতেই হাল আর বৈঠার দখল, তহন আপনেও সরকার দেখাইবেন। শাসন দিয়্যা কইবেন, আমি সদরে রিপোর্ট দিবই, এই বোর্ড নিয়্যা কাম করা অসম্ভব। ইচ্ছা কইরলে সরকার দিবে বোর্ড ডিসমিশ কইর‍্যা। যশোরের মিউনিসিপ্যালিটির নাগাল। বোর্ড ডিসমিশের কথায় সব বোর্ডের সব মেম্বারই ডরায়—তাইলে বুঝি আমও গেল, ছালাও গেল। আর, যদি পরিস্থিতি অতডা খারাপই হয়, তালি হাটে বাজারে কথাডা পাবলিক কইর‍্যা দিবেন। কয়ডা লোক আর তালুকদার? কয়ডা লোক আর মহাজন। দাঙ্গা বাধাইতে কেউ চায়? লোন অফিসারের কাম—দাঙ্গা য্যান না বাঁধে।'

'অফিসার, দাঙ্গা না-হয় ঠেকাইলেন, চাকরি নিলেন অফিসারি, কাম হইব সেপাইগিরি। কিন্তু চাষের টাকা তো যাবে নে শুখাইয়্যা, মহাজন তো হাত মুঠা কইর‍্যা ফেলছে।'

'তহন তো আপনার মত লিডার আইস্যা নতুন খাল কাইট্যা নতুন জল বহাইয়্যা দিবেন। আমি স্বকর্ণে শুইনছি কাইল থিক্যা—সারদার বিলও ছিল বরাবর কাল, ফসল নষ্টও ছিল বরাবরকাল, অ্যাহন তো দেইখল্যাম বিলের ফসল বাঁচাইতে আর বাড়াইতে দুই সকালেই নতুন খাল কাটা যায়।'

'কথাডা তো ঠিকই, অফিসার। বলদ, কুকুর, শুয়ার, মোরগা, এই পশুগুলার তো খ্যামতা নাই। গায়ের জোর আছে, দাঁতও আছে, থাবাও আছে কিন্তু খ্যামতা নাই। নিজের বাঁইচ্যা থাকার উপুর কোনো হাত নাই, খ্যামতা নাই। মানুষের জোর আছে, হাতও আছে, খ্যামতাও আছে। দুই সকালে এক খাল। কিন্তু সারাডা কাল গেল 'সর্ সর্' 'ছুঁইস ন্যা', 'বাড়িতে ঢুকিস ন্যা', 'দুয়ারে বইস্যা খা', বামুন-কায়েত-বৈদ্যের তাড়া খাইয়্যা।'

যোগেন উডবার্ন পার্কের বাড়িতে সরাসরি গিয়ে বলল, 'সুভাষবাবুর সঙ্গে দেখা করব।' এ-বাড়ির দারোয়ানগোছের লোকজনের কাছে যোগেনের মুখটা চেনা হয়ে গেছে। আর, প্রবেশ-প্রস্থানের খুব একটা কড়াকড়িও এ-বাড়িতে নেই। কড়াকড়ির ব্যবস্থা আছে, দরকারমত সেটা কাজেও লাগানো হয়—তাও যোগেন দেখেছে। শরৎ বোসের চেম্বারের দিকটায় যোগেনের যাওয়া হয়নি—সেটা বাড়ির উত্তরাংশ, যে-লনে পার্টিটার্টি হয়, তারই পাশে, ওপরে। সেই তরফে ঢোকা বা বেরবার কড়াকড়ি আছে, গেটটাও আলাদা। সুভাষচন্দ্র যখন বিদেশে বা জেলে থাকেন, তখনও ব্যবস্থাটা কি এমনি থাকে—উত্তরের গেট ব্যারিস্টারির আর দক্ষিণের গেট পলিটিকসের। সেটা না-জানলেও যোগেন বোঝে, বাড়িটাতে খোলামেলা ভাব আছে।

সুভাষচন্দ্র পাঞ্জাবিধুতিতে নেমে এসেছিলেন। সেই যে-ঘরে যোগেন বসে সেই ঘরের দরজায় এসে দুই হাত বাতাসে তুলে হো-হো করে হেসে উঠলেন, তাঁর সবগুলি দাঁত, জিভ, মুখের ভিতর পর্যন্ত দেখিয়ে। যোগেন উঠে দাঁড়িয়েছিল, সুভাষচন্দ্রের এমন হাসি প্রথম দেখে প্রথমেই তার মনে হল, সুভাষবাবুকে হাসিতে খুব তাজা লাগে তো, যদিও একটু বয়স্কও লাগে। সাধারণত ওঁর মুখে একটা বিষাদ মাখানো থাকে।

'আপনার জন্য তো মেজদা পুলিশের লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ডে ডায়রি করছিলেন। বললেন, কোর্টেও নেই, অ্যাসেম্বলিতেও নেই, আপনার বাড়িতেও তো বোধহয় ফোন করিয়েছেন বা করাবেন বলছিলেন', সুভাষচন্দ্র যোগেনের ডানদিকের কৌচটাতেই বসেন, ডানহাঁটুর ওপর বাঁ পা চড়িয়ে।

যোগেন বলে, 'আমি তো আমার প্রফেশন্যাল ডিউটি করতে এসেছি। আপনি তো আমার পেশেন্ট। কেমন আছেন ঐ তেল মেখে?'

যেন মনে পড়ল, সুভাষচন্দ্র এমন ভঙ্গিতে ঘাড় ঘোরালেন, 'দেখে কী মনে হচ্ছে? বিধানবাবু নাকী একবার তাকিয়েই ডায়াগনসিস করেন?'

'আমি তো হাতুড়ে রোগীর হাতুড়ে ডাক্তার—'

'ডাক্তার না-হয় হাতুড়ে হতে পারে, রোগী কী করে হাতুড়ে হয়?'

'সেটা তো আরো সোজা। যার রোগ হাতুড়ি পিটাইয়্যা বানানো হয়, মানে পুলিশ বানায়, জেলের ভিতরে ও বাইরে।'

'আপনার ডায়াগনসিস বিধানবাবুর চাইতে অনেক ভাল, যেটুকু ডায়াগনসিস করা গেল না,

সেটা এমন চমৎকার কথা দিয়ে ঢেকে দেন। বিধানবাবু তো কথা বলতে পারেন না।'

'এর ওপর কথাও চান? বিধানবাবু তো আপনার থিক্যা বড়, না?'

'বলেন কী? মেজদা আমার চাইতে আট বছরের বড়, বিধানবাবু মেজদার চাইতেও নয় বছরের বড়। এক হকশাহেব আর নলিনীদাই বিধানবাবুকে নাম ধরে ডাকতে পারেন'

'মানে, এখন তো ওনার বয়স তাইলে বাইট ছুঁইছুঁই। দেখে বোঝার উপায় নাই।'

'জেলে যাননি তো কখনো। একবছর জেলে থাকলে দশবছর বয়স বাড়ে। আমাদের মত যারা দশবছরের বেশি খেটেছি—তাদের বয়স গোনা হয় না। আর যাঁরা, আন্দামান খেটেছেন, তাঁরা জ্যান্ত প্রাণী হিশেবে কনডেমড—'

'ওরা আপনাকে আন্দামানে পাঠায় নাই কেন?'

'মান্দালয় পর্যন্ত ঠেলেছে। আন্দামান বোধহয় আমার পক্ষে ওদের কাছে নিরাপদ ঠেকেছিল।'

'বরিশালে নলিনীদারে দেইখল্যাম। মাস ছয়-সাত বোধহয় আন্দামান থিক্যা আইসছেন। আইস্যাই বরিশালে এক কৃষক সমিতি খাড়া কইর‍্যা মাহিলাড়ার বিল থিক্যা দেড় -দুই মাইলের খাল কাটান ধইরছেন। কী ধাতু দিয়্যা যে মানুষগুল্যা তৈরি?'

'এইসব নিখাত সোনা যদি কংগ্রেসে জড়ো হন, তাহলে আর কিছুতেই ভারতের লেফ্‌টটার্ন ঠেকানো যাবে না। একেবারে সরাসরি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে।'

'আপনে রাষ্ট্রপতি হওয়ায় এই আশাডাই তো সগলের। দেখাও যায়। কংগ্রেস জনসংযোগ আন্দোলন তুইলল। বাপের জন্মে শুনি নাই কংগ্রেস আর হিন্দু আলাদা বা কংগ্রেস আর জমিদাররা আলাদা। চাষাফাসা নিয়্যা কংগ্রেসের কোনো কালেই দুর্ভাবনা ছিল না। গান্ধীজি তো কয়্যাই দিছেন জমিদাররা ট্রাস্টির কাজ কইরব। এই ভোটটা সেই উব্‌গারডা কইরল। বাংলার মত মুসলমানপ্রধান প্রদেশে কংগ্রেসের পায়ের তলার মাটি গেল সইর‍্যা আর 'সামাল সামাল' চিক্কার উইঠল। আবার যুক্ত প্রদেশের মত হিন্দুপ্রধান প্রদেশে এমন জেতা জিত্যা কংগ্রেসের চিক্কার উইঠল, মুসলমানরা ক্যান বাইরে থাকব?'

'হ্যাঁ-আ। ইউপিতে তো জওহরলাল নিজে লিড করছে, মাস-কনট্যাক্ট প্রোগ্রামে তাই কাজ দিচ্ছে। তবে ইউপির বিপদ আমাদের চাইতে অনেক বেশি। সেখানে হিন্দু কমিউন্যালিস্টরা কংগ্রেসের ভিতরেবাইরে এত বেশি অ্যাকটিভ লিডারশিপের সবগুলো টায়ারেই যে সেকিউলার পজিশন রাখাই মুশকিল। আমাদের এখানে অতটা সরাসরি কমিউন্যাল পজিশন, কংগ্রেসের ভিতর থেকে নেয়া অত সোজা নয়, বাইরে থেকেও নয়।। আসরাফউদ্দিনের লিডারশিপটার ধরনই আলাদা। কৃষক আন্দোলন তো ঠিক ভদ্রলোকদের আইনঅমান্য আন্দোলনের খাপে-খাপে হতে পারে না।। আবার, আমাদের এখানে হিন্দুভদ্রলোকরা তো মুসলিমবিরোধী হয়ে যাচ্ছেন—তাঁরা অত উঁচু তারে বাঁধা কৃষক আন্দোলন মানবেন না। রয়েসয়ে এগুতে হবে। এগনো হচ্ছেও। বর্ধমানে দাশরথি তা তো চাকদিঘি জমিদারদের জোর করে খাজনা আদায়ের বিরুদ্ধে কৃষক সমিতি তৈরি করেছেন। বাঁকুড়াতেও হয়েছে কৃষক সমিতি। নদীয়াতেও হয়েছে। ঢাকার চল্লিশজন বড় চাষি তো বেশ আড়ম্বর করে কংগ্রেসে এসেছিলেন। বীরভূম, মেদিনীপুর, কন্টাইয়ে ঈশ্বর মালের কৃষক সমিতি তো 'নো রেন্ট' আন্দোলনের দিকে যাচ্ছেন বলে পুলিশও বলছে, কংগ্রেসের কোনো-কোনো নেতাও বলছেন।'

'সে তো গিয়া আপনার মুসলমানগোর মধ্যে যারা বড় চাষি বা নবাব বা ছোট নবাব—তারাও তো কৃষকগো আন্দোলন চায় না। তারাও তো ডরে কাঁপে—শিয়ালরে ভাঙা বেড়া দেখাও কেন? কৃষকরে হিন্দু-মুসলমানে ভাগ করা যায় না—'

'একজ্যাক্টলি। বাংলায় এটাই কংগ্রেসের প্রচার করা দরকার—'কৃষক নিয়ে দলাদালি চলবে না।' কৃষককে দেখতে হবে নিরপেক্ষ উপাদান হিশেবে, কৃষক তো উৎপাদনের একটি শক্তি। তার আবার হিন্দু-মুসলমান কী?

'ঠিক জানি না—কৃষক-আন্দোলন নিয়্যা বীরভূমে, বাঁকুড়ায়, পাত্রসায়রে, দিনাজপুরেও, চাঁদপুরে আপনাগো পার্টির মইধ্যে তো নানা গোলমাল, অভয় আশ্রমের লগে, বেতুর আশ্রমের লগে। আসরাফউদ্দিন নাকী মোল্লারা জমায়েৎ থিক্যা বাইর কইর্য়া দিছে—কংগ্রেসে ঢুইকলে মুসলমানও কাফের হইয়া যায় বইল্যা, এম এন রায় প্রেসিডেন্ট হইব বইল্যা, সত্যাগ্রহের নিয়মকানুন মানা হয় নাই বইল্যা। কুমিল্ল্যায় আফসার উদ্দিনকে না কী সরকারের সাপোর্টাররা মিটিং কইরব্যার দেয় নাই—খাজনাবন্ধ আন্দোলন। ওই হকশাহেবের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে, শাহেবগো তাতে কী আসে যায়?

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। কংগ্রেসের মধ্যে তো আন্দোলন বলতে বোঝায় অহিংস অসহযোগ, আইনঅমান্য, বা, কখনোসখনো ধর্মঘট। কৃষক অসহযোগ করবে কী করে—তাদের সহযোগ তো চাষ বাসের সঙ্গে। কৃষকরা কোন আইন, অমান্য করবে—তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি তো লেগেই আছে। কৃষকরা তো আর ধর্মঘটও ডাকতে পারবে না। তাহলে তাদের হাতে থাকল দুটো অস্ত্র—খাজনা বন্ধ আর ভাগা বন্ধ। তার আগেই হয়েছে, হাট বন্ধ আর কর্জা ধানের সুদ বন্ধ। এর কোনোটাই তো সরকারের না। এইসব যদি কোথাও-কোথাও কার্যকর হয়, ক্ষতি তো এক হিন্দু ভদ্রলোকদের—যারা পুরুষানুক্রমে হাটের তোলা, কর্জার সুদ, খাজনার বাইরে আবোয়াব আর চক্রবৃদ্ধির হারে সুদ ভোগ করে আসছে।'

'এতগুলা ভাগাভাগি কি ভাগাভাগির বেড়াটা ভেঙে দেয় না?'

'দিলে তো ভালই হত'।

'হইত নি? ভাল? কোন বেড়াডা ভাইঙ্গলে হইত ভাল?'

'কৃষক কৃষক। যা কিছু তাকে আর কৃষক থাকতে দেয় না, সেগুলো ভেঙে দেয়াই তো ভাল?'

'এক কৃষকদের নিয়্যাই সমিতি কত, দ্যাহেন। মুসলমান কৃষক সমিতি, হিন্দু কৃষক সমিতি, জাতীয় কংগ্রেসের কৃষক সমিতি, প্রত্যেক জিলার নামে একটা কৃষক সমিতি, বরিশাল কৃষক সমিতি, নোয়াখালি কৃষক সমিতি, ত্রিপুরা কৃষক সমিতি, ক্ষত্রিয় কৃষক সমিতি, আরো কত। কোনোটাই তো কোনো ভাগাভাগি ভাঙে না। সবগুলাই তো বাড়ায়। নোয়াখালির গোলাম সারোয়ার। ভোটে জিতল। আজও মানুষ জানে না সে নিজের কোন পরিচয়ে জিতল—কৃষকপ্রজা, না লিগ, না কংগ্রেস। স্যায় তো খাজনা দিব্যারও না করে, হাটে যাইব্যারও না করে, লোন বোর্ডে মহাজনগো জায়গা দিতেও না করে।

'লোক্যাল ফ্যাক্টার তো থাকবেই এরকম—'

'আমার সন্দেহটাও তাই নিয়্যাই। আসলে লোক্যাল ফ্যাক্টারগুল্যার জগাখিচুড়ি দিয়্যাই কি আপনাগ কৃষকনীতি সাব্যস্ত হইছে, না কী কেন্দ্রীয় নীতি ফলো করতে গিয়্যাই লোক্যালগুলার ফেবরি বাড়াইছে—'

'ফেবরি মানে?'

'ব্র্যাঞ্চ আউট কইরছে—'

'এই প্রশ্নের উত্তর নেই। ভারতের ভূমিব্যবস্থা ও কৃষিব্যবস্থা এক না। ভারতের ভূস্বামী ও চাষিও এক না। এর কোনো কেন্দ্রীয় চরিত্র নেই। তাই ব্রিটিশ সরকারও সারা ভারতে একটিমাত্র

কেন্দ্রীয় নীতি দিয়ে ভূমি ও কৃষিকে বাঁধতে পারেনি। কংগ্রেসও তাই তেমন কোনো নীতি নেয় নি।'

যোগেন একটু হেসে ফেলে বলে, 'কংগ্রেস তো ব্রিটিশ শাসন থিক্যা মুক্তি চায়। তাইলে, কৃষি আর ভূমিতে শাহেবগ অনুসরণের যুক্তি চায় ক্যা?'

'এটা তো যুক্তি না। অবস্থাটাই এরকম। স্টেট অব অ্যাফেয়ার্স। শাহেবরা যদি পাহাড়কে পাহাড় বলে, আপনি শুধু সেই কারণে পাহাড়কে কি নদী বলবেন?'

'অতটা তফাতে হয় তো বলি না। শাহেবগ সঙ্গে মিল্যায়্যা কওয়াডা তো আমাগ জিভে মিশ্যা গিছে। যাগ মিশে নাই, তারা তো তাগ ভাষাতেই পাহাড়ের কথা কয়।'

'সে ভেরিয়েশন তো জমি আর চাষের ব্যাপারে শাহেবরা মেনে নিয়েছে, জোর করে কোনো কিছু বদলায়নি।'

'আমি কিন্তু কেন্দ্রীয় নীতি কইতে 'অ্যাক্ট' বা 'আইন' বুঝাই নাই। প্রিন্সিপ্‌ল কইব্যার পারেন। আইজকাইল পলিসিও শুনি। কংগ্রেসের কি তেমন কিছু কোনো দিন আছে যে বাংলার স্থায়ী বন্দোবস্ত বা মহারাষ্ট্রের রায়তওয়ারি ব্যবস্থা, জমির মালিক জমিদার আর চাষের দায় রায়তের—এমন ভাগাভাগি, পাঞ্জাবে তো চাষিই জমিদার মানে মালিক। শাহেবদের ঝোঁক কিন্তু সব জায়গাতেই ছিল জমিদার বানানোর দিকে। হয়ত শাহেবদের ভাবনায় ছিল ব্রিটিশ ফার্মার। কিন্তু এ-দেশে তা হয় নাই। জমিদার ফার্মার হইল না কিন্তু বেশি জমি আবাদে আনার সুবাদে, চাষিদের থিক্যা কেউ-কেউ হইল ফার্মার। যে-চাষির আবাদি জমি বেশি, খালের জলও জমির কাছে, শুধু খাদ্যফসল না, বিক্রির মত ফলনও ফলায়—তুলা, আখ, পাট, রেল স্টেশনও কাছাকাছি সে হয়্যা গেল ফার্মার। সুদেও টাকা খাটায়। গরুর গাড়ির চাকাও বদলায়—চওড়া আইলের চাকা আর ছোট আইলের চাকা। এডা যে প্রদেশ ধইর‍্যা-ধইর‍্যা হইছে, তা তো সম্ভব নয়। এক-এক প্রদেশে আবার কত রকম হইছে। আপনার কাছে থিক্যা যেইডা জাইনতে চাই সেডা হইল—এই যে চাষ আর জমির সঙ্গে জড়ানো মালিক আর চাষিগো এত-এত ভাগ এর মইধ্যে কোনো একডা ভাগের দিকে ঝোঁক দিয়্যা কি কোনো জায়গার কংগ্রেস কখনো তার নীতি মানে প্রিন্সিপ্‌ল্ ঠিক করছে?' যোগেনের কথা শুনতে-শুনতে সুভাষচন্দ্রের চোখের নীচে ভাঁজ পড়তে থাকে। যোগেনের কথা শেষ হলেও, ভ্রূঁজগুলো থাকে। সেসব মিলিয়ে যায়, সুভাষ যখন আওয়াজ না করে, শুধু ঠোঁট ছড়িয়ে নীরবে হাসেন ও হাসিমুখে থাকেন।

তারপর বলেন, 'যিনি এতটা জানেন, তিনি বাকিটা জানেন না, এটা আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন? আপনিই বলুন। আমাকে আর পড়া ধরবেন না।'

যোগেনও হেসে বলে, 'আমারে নিয়্যা এই ভুলবোঝাডা যে কী কইর‍্যা কাটাই? যেহানে আমারে অভিজ্ঞ নেতা বইল্যা ভাবে, সেহানে আমার লাভ থাইকলে তাগ ভাবনায় আপত্তি নাই। কিন্তু আপনার মত মানুষ তেমন ভাইবলে আমার যে কী ক্ষতি তা আন্দাজের উপায় আপনার কাছে নাই। আমি রাজনীতির কিছুই জানি না। ওকালতি পাশের আগে রাজনীতির ধারেকাছে ঘেঁষি নাই। উকিল হওয়ার পর তিরিশ বছর বয়সে সব উচ্চাশা দেখা দিল। তাও ইউনিয়ন বোর্ড আর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড। এই ভোটে খাড়াইবার পরেও রাজনীতি জানি নাই। আইনসভা শুরু হওয়ার পর, ধরেন, আমার রাজনীতির অভিজ্ঞতা সঠিক ষোল-সতের মাসের বেশি না। আর, আমি তো রাজনীতি করি জ্ঞানবুদ্ধি থিক্যা না, শুদ্দুর বইল্যা।

'আপনি যে একটুখানি বললেন সারা ভারতের ভূমি ও কৃষির পার্থক্য নিয়ে, ক-জন পারবে বা ক-জন জানে?'

'খা—ইছে। এগুলা তো ওকালতির কারণে জানা। আমাগ বরিশালে বামুন থিক্যা মুসলমান বেবাকই মামলাবাজ। আর সব মামলাই জমি নিয়্যা—'

'সব উকিল-মোক্তারই তো তাহলে এইসব জানত। আমি তো উকিল-ব্যারিস্টারের সংসারই করি।'

'তারা কেউ তো আর বরিশালের জজ কোর্টে মামলা লড়েন না। বরিশাল তো মেইনল্যান্ডের পার্ট না। মেইনল্যান্ডের ছিটমহল। সেই কারণেই যাগ জলপথে গমনাগমন তারা বেবাকই বরিশালে আছে। নদীর বুক থিক্যা এমন মাটি আইস্যা পড়ে যে বাতাসে বিছন উইড়্যা অ্যালেই ধানে খ্যাত ভইর‍্যা ওঠে। সর্বত্র থিক্যা বামুন-কায়েত-বৈদ্য-মুসলমান-চাষি-শুদ্দুর আইস্যা রাজত্ব গাইড়া বইসছে। আরে, যে-নদী জল আর মাটি দেয়, সে-নদী তো খায়ও জল আর মাটি। রাজত্ব ভাঙতে-ভাইসতে সময় বেশি লাগে না। বার ভুইয়্যাঁর ভুঁইয়্যারাও জলের তলে, ভুঁইয়্যাগ জামাইরাও জলের তলে। যদি নবাবগো আমল হইত তালি না-হয় তীরবিদ্ধ হইয়্যা মরণের আগে লম্বা একখান স্পিচ ঝাইরত। কিন্তু এ তো ইংরাজ রাজত্ব, আইনের রাজত্ব, মামলা ছাড়া স্পিচ নাই। তো আমারে যদি একডা নদীর চরের এক রায়তের মামলা কইরতে হয়, তালি তো যে-নদী অ্যাখন নাই কিন্তু দুই-তিন শ বছর আগে ছিল, সেই নদীডারে বহাইতে লাগে। আর, হাইকোর্টের মামলার নজির লাগে। আর, বরিশালের হিন্দু-ফৈরাজি মুসলমান-বৈষ্ণবগণ এইসব সম্প্রদায়ই মামলাবাজ ও প্রতিহিংসা পরায়ণ। মামলা জিত্যা না দিলে ওনারা উকিলের শ্বাসনালী কাইট্যা খালে ফেইল্যা দ্যায়। আর কাল কোট পরা উকিলবাবুর দেহখান বেশ কিছুদিন ভাঁটার টানে একবার নদীর দিকে খানিকটা যায় আবার জোয়ারের ঠেলায় ভিতরের দিকে পিছ্যায়া আসে। ফলে যে-দূরত্ব একটা জ্যান্ত মানুষ আধবেলারও আধবেলায় পাড়ি দেয়, সেইটুখানি দূরত্ব পাড়াইতে কালো কোট পরা মৃত উকিলবাবুর নেক্সট উইকলি হলিডে পর্যন্ত কাইট্যা যায়। সেই বেহুলাহীন লখাই-এর দশা থিক্যা বাঁচার জইন্যে অল-ইনডিয়া রিপোর্টার ঘাঁইট্যা এই খবরগুলি আমাকে জাইনতে হয়। জীবনধারণের অবলম্বনকে জ্ঞান বইল্যা ভাইব্যা আমারে আর পাপের ভাগী কইরবেন না। সত্যি আমি জানি না, কংগ্রেস বা মুসলিম লিগ কি কোনোদিন জমিদারি উচ্ছেদের কথা বইলছে। বেঙ্গল টেনান্সি অ্যাক্ট আইনসভায় আইস্যা গিছে। থার্ড বেল পইড়্যা গিছে। আমারে এখনই স্টেজে এন্ট্রান্স নিব্যার লাগব। আমারে এইটুকু প্রম্পট কইর‍্যা দেন—কংগ্রেস বা মুসলিম লিগ কি কোনোদিন জমিদারি উচ্ছেদ দাবি করছে? কোনোদিন?'

সুভাষচন্দ্র মাঝে-মাঝেই হাসছিলেন, শব্দ না করে। যখন থেকে আওয়াজ বেরতে শুরু করল, যোগেন থেমে থেকে তাঁকে হাসি শেষ করার সুযোগ দিচ্ছিল। কিন্তু যখন থেকে সুভাষচন্দ্র আর হাসি শেষ করার ফাঁকও পেলেন না, মাঝে-মাঝে চশমা খুলে চোখের জল মুছছেন, মাঝে-মাঝে দুই হাতে কোমর চেপে ধরে খাড়া হয়ে বসছেন, দু-একবার 'ও মাগো' বলে ডেকেও উঠেছেন, তখন থেকে যোগেন তার কথায় কোনো ছাড় দেয়নি। তার কথা শেষ হলে, সে চুপ করে তাকিয়েছিল হাসিতে কুঁকড়ে যাওয়া সুভাষচন্দ্রের হাত-পা ছোঁড়ার দিকে—যেন বলি-দেয়া পাঁঠা পা ছুঁড়ছে, পেট কাঁপাচ্ছে।

বেশ কয়েকবার হিক্কা তুলে সুভাষচন্দ্র ধীরে-ধীরে স্বাভাবিক হন।

'আপনি তো মশায় গুপ্তঘাতকের চাইতেও মারাত্মক। শুধু হাসিয়ে হাসিয়ে একটা লোককে খুন করে দিতে পারেন। উঃ। না। কোনোদিন কংগ্রেস বা লিগ জমিদারি উচ্ছেদ দাবি করেনি।'

'এবার বলেন, ঐ তেল মেখে কেমন আছেন?'

'সে তো সব গুলিয়ে গেল। এত ভাল আছি সেটা ঐ তেলের জন্য না এই হাসির জন্য,

তা কী করে জানব।'

জুলাই মাসের শেষ থেকে হুড়মুড়িয়ে এমন সব ঘটনা ঘটতে লাগল যেন জ্যৈষ্ঠ মাসে কালবৈশাখীর ঝড়ে রাস্তায় যোগেন গাছ চাপা পড়েও বেঁচে আছে বটে কিন্তু ডালপালা পাতালতার নীচে এমনই চেপটিয়ে যে বেরিয়ে আসার পথ তো পাচ্ছেই না, এমন কী বাইরের কিছু দেখতেও পাচ্ছে না। বেঙ্গল টেন্যান্সি বিল, তার মাঝখানে যশোরের দাঙ্গা, সেখান থেকে ফিরতে-না-ফিরতে অনাস্থা প্রস্তাব। আন্দামান বন্দীরা অনশনের হুমকি দিয়েছেন। সরকার ফেলে দেয়া হচ্ছে শুনে সরকারের সমর্থকরা রাস্তায় নেমেছে। এত মিছিলের কোনটা কীসের বোঝা যাচ্ছে না। ছাত্ররা আসছে রাজবন্দীদের দাবিতে, চটকলের মজুররাও আসছে প্রায়ই একটা দাবিপত্র নিয়ে। যোগেন তো একদিন সরকার—সমর্থকদের একটা মিছিলকে ভুল করে বন্দীমুক্তির মিছিল ভেবে, নিশ্চিন্ত মনে হাঁটছিল। হঠাৎ করে বুঝতে পেরে যোগেন পালানোর পথ পায় না। সরকার সমর্থকরা এমএলএদের ধরে-ধরে পেটাচ্ছে। যদি তাকে চিনে ফেলে!

আইনসভায় বেঙ্গল টেন্যান্সি অ্যাক্টের ওপর আলোচনা শুরু হয়েছে। যোগেন প্রত্যেকটি বক্তৃতা খুব মন দিয়ে শুনছিল, লাইব্রেরিতে গিয়ে কাউন্সিলে ২৮ সালের সংশোধনের বিতর্ক ও ভোটাভুটি, পড়ে নিয়েছে। তাতেই সে এমন চমকে যাওয়ার মত সব তথ্য পেয়ে যায় যে বিভিন্ন সংশোধনের প্রস্তাবের ওপর একেবারে লাইন বেঁধে ভোট হয়েছে। মুসলিম ও তাদের সমর্থিত ২১ জন লাইন বেঁধে ভোট দিয়েছে বর্গাদারের পক্ষে। ওঁদের আরো পাঁচজন সংশোধনের একটা অংশের পক্ষে ভোট দিয়েছে, তাদের মধ্যে খাজা নাজিমুদ্দিন, আবদুর রহিম আছেন। তিনজন হিন্দুও আছেন—দু-জন মনোনীত সভ্য আর বীরভূমের জিতেন ব্যানার্জি। আর, জমিদারদের পক্ষে স্বরাজিদের ৪২ জন ভোট দিয়েছে লাইন বেঁধে, তার ভিতর শরৎ বোস-সুভাষ বোস দুই ভাই আছেন। আর শশিকান্ত আচার্য চৌধুরী আধাআধি বিরোধিতা করেছেন। অফিসিয়াল ও ইয়োরোপিয়ান ব্লকের ৩৭ জনই মূল প্রস্তাব সমর্থন করেছেন। মুসলিম মেম্বাররা সাধারণ ভাবে বর্গাদারের পক্ষে ও প্রজার পক্ষে আর হিন্দু মেম্বাররা সাধারণভাবে জমিদার-স্বার্থে, বর্গাদার ও ইতর-রায়তের বিরুদ্ধে। কী নিয়ে ভোটাভুটি? এক জমিতে একই চাষি ১২ বছর টানা চাষ করলে তাকে উচ্ছেদ করা যাবে কী না? প্রজা-রায়তের কোনো অধিকার থাকবে কী না জমি হস্তান্তরের? জমিদারের সেলামি থাকবে কী না? ১৯২৮-এর কৃষকনিধন এই ৩৮-এ, দশ বছরে, কোথায় এসে দাঁড়াল? কোনো দল বা কোনো নেতার সাহস বা মুখ আছে বা কোমরে জোর আছে যে বলবে—জমিদারই জমির মালিক? চাষি সে ইজারাদারই হোক আর ক্ষেতচাষিই হোক, প্রকাশ্যে বলার মত পরিস্থিতি এখন যে সেই চাষিই কেবল জমিদারের অনুমতিপ্রাপ্ত একজন যে জমিটাতে ফসল ফলায়। তার ফসলের ওপরও চাষির অধিকার প্রথমে স্বীকৃত হয়নি। মালিকের খোলানে সব ফসল তোলাঝাড়ার পর চাষিদের সঙ্গে দেনাপাওনার হিশেব হত, সামনের বছরের দাদনেরও হিশেব হত। আর, ১৯৩৮-এ? অনেক জায়গায় তেভাগা চলছে, অনেক জায়গায় শস্যখাজনা হয়ে যাচ্ছে নগদ-খাজনা—চাষির দাবিতে। মালিকের খোলান এখন চাষির ইচ্ছা নির্ভর। তুলসী গোঁসাই তাঁর বক্তৃতায় বললেন, 'জমিদাররা যদি ভাবেন তাঁরা তাঁদের পূর্ব গৌরব ফিরে পাবেন, তাহলে আমি তাঁদের বলব—যা গেছে, তা গেছে। যা আছে—সেটুকু যাতে না যায়, তার ব্যবস্থা করুন। সময়ের ধর্ম-অনুযায়ী আমাদের মেনে নিতে হবে, যাদের নিজেদের একচিলতেও জমি নেই তেমন কৃষকও তার ফলনের মলিক, অন্তত নিছক মালিক। যদি কেউ মনে করেন, জমিদার শ্রেণীর প্রতিনিধি হিশেবে আইনসভায় অনন্তকাল ধরে নির্বাচিত হওয়ার অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারবে না, তা হলে শুধু বলব, তাঁদের এই ধারণার বশে

তাঁরা নিজেরও ক্ষতি করছেন, জমিদারশ্রেণিরও ক্ষতি করছেন, দেশেরও ক্ষতি করছেন।'

যোগেন বিস্মিত হয়—তুলসী গোঁসাইয়ের কথা যদি সত্য হয় তাহলে কংগ্রেসের সঙ্গে তো সরকারের এই বিলের কোনো মতপার্থক্য থাকতে পারে না। কৃষক-প্রজা পার্টি জমিদারি উচ্ছেদের দাবিতে ভোট করেছে। কংগ্রেস তা করেনি। কিন্তু ভোটের ষোল-সতের মাসের মধ্যেই যদি কংগ্রেস ভেবে থাকে জমিদারি উচ্ছেদের কথা, তাহলে এখন সেটা মন্ত্রিসভাকে বলছে না কেন?

রাজনীতির মারপ্যাঁচে যোগেন কংগ্রেসি বা লিগের লোকদের মত অভ্যস্ত নয়। নেতাদের মত তো নয়ই, এমন কী, মফস্বলের নেতাদের মতও নয়। কলকাতা বা মফস্বল যেখানেই হোক, কংগ্রেস বা লিগ কোনো পার্টিরই শরিকি হাঙ্গামা কিছু কম না। এমন কী বর্ধমানের মত জায়গাতে লিগের এক শরিকনেতা লিগের আর-এক শরিক নেতাকে মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যানশিপে ঠেকাতে গিয়ে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যাওয়া ন্যাশনালিস্ট পার্টির একজন-যে কমিশনার তাকে গিয়ে ধরে। এসব প্যাঁচঘোঁচ আয়ত্ত করতে আর কদিন লাগে? যখন দরকার তখন মারপ্যাঁচ ঠিক জানা হয়ে যায়। কিন্তু এখন কংগ্রেস-নেতাদের বক্তৃতা শুনে যোগেন কংগ্রেস আর লিগের ভিতরে যে-মতৈক্যের প্রমাণ পায়, কংগ্রেস কেন তা প্রকাশ্যে বলে না এই প্রশ্নের মীমাংসা যখন যোগেন আর খুঁজে পায় না, তখন তার ওকালতি বুদ্ধিতে যেন ঝিলিক দেয়। তাহলে কি অনাস্থা প্রস্তাব তোলা হচ্ছে এই কথাটাই জানাতে যে লিগ আর কংগ্রেসে মতের অমিল নেই।

হকশাহেবের প্রজাপার্টি আসলে তো পার্টি নয়, বরং নানারকম স্বার্থের খিচুড়ি। প্রজা পার্টি ভোটে জিতল যেন বজ্রপাতের বেগে, আর জিততে না জিততেই বিদ্যুতের আলোর মত গেল নিবে। প্রজা তাই জিততে না-জিততেই প্রজা পার্টি ভাঙতে শুরু করে। একটা মজার কথাই চালু আছে যে হকশাহেব মন্ত্রিসভার প্রধান অথচ তাঁর পার্টির তিনি ছাড়া আর-কোনো মন্ত্রী নেই। আর-একটা এমন রটা কথা—আইনসভা বসার পর থেকেই বিরোধীপক্ষে প্রজাপার্টির অন্তত ১৫ থেকে ২০ জনকে পাওয়া যাবেই। সেই ভরসাতেই শরৎ বোস অনাস্থা প্রস্তাবের দিনক্ষণ ঠিক করছেন।

যোগেনের মনে এই সব সন্দেহ উঠছিল ভাঙছিল আর সে বারবারই গা-ঝাড়া দিয়ে সন্দেহগুলি থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করছিল নিজের ঘাড়ে দোষ নিয়ে। যোগেন নমশূদ্র হলেও জমিজমার সঙ্গে তাদের কোনো স্বার্থই তৈরি হয়নি। রসিক কাকা, বিরাট কাকা, ধনঞ্জয় রায়, পিআর ঠাকুর, মুকুন্দ মল্লিক—এরা সকলেই জমি জানে। এরা কেউ বিএ পাশ, কেউ বিএল, কেউ ব্যারিস্টার বটে ও জাতেও শূদ্র বটে, তবু জানে কত ধানে কত চাল। যোগেনের বংশানুক্রমিক পেশা নৌকা বানানো। কিন্তু নৌকা নিয়েও যদি বিল আসত, যোগেন কি কিছু বলতে পারত? সে হয়ত একটা নৌকো এক হাতে বানিয়ে জলে ভাসাতে পারবে কিন্তু সে কি নৌকো বানানোর অর্থনীতি, কাঠসংগ্রহ, আলকাতরার দর, গাবগাছ কমে যাওয়া—এই নিয়ে কোনো একটা কথা তৈরি করতে পারবে। যোগেনের সন্দেহ যোগেনেরই অজ্ঞানতার ফল।

বঙ্কিম মুখার্জি বিতর্কের দ্বিতীয় দিনে তাঁর বক্তৃতায় যোগেনের সন্দেহটাকে যুক্তির ওপর খাড়া করে দেয়ায় যোগেন আবার ডুবজলে পড়ে। বঙ্কিম মুখার্জির কথাগুলিই যোগেন নানারকম করে ভাবছিল কিন্তু আকার দিতে পারছিল না।

'শরৎ বোস—তুলসী গোস্বামীর বক্তৃতা শুনে মনে হল—ওঁরা দশ বছর আগে এই নীতি ঘোষণা করলে তো চাষা ও চাষি নিয়ে এত উপদ্রব হত না।'

'আপনিও তো সেই দলেই', কিরণশঙ্কর ফুট কাটেন।

'হ্যাঁ কিরণশঙ্কর বাবু, আমি সেটা মনে রাখি কিন্তু আপনারা এটা মনে রাখেন না। মনে রাখেন না যে কংগ্রেসের লক্ষ লক্ষ সমর্থক ও কর্মীদের চিন্তা ও আবেগ কেমন অস্থির হয়ে থাকে। অস্থির হয়ে থাকে, শ্রমিক-কৃষক ও খেটেখাওয়া মানুষদের জীবনযাত্রার মান একটু উন্নত হোক, তাদের পেটে কিছু খাদ্য ও শরীরে কিছু রক্ত পড়ুক ও সঞ্চারিত হোক। সারা বাংলায় কংগ্রেস কর্মীরা দুর্গম গ্রামাঞ্চলে গিয়ে কৃষক সমিতি তৈরি করছেন, কোনো-কোনো জায়গায় কর দেয়ার বিরোধী আন্দোলন করছেন, জমিদারদের বাজে আদায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন, হাটের অতিরিক্ত তোলার বিরুদ্ধে দশের হাট বসাচ্ছেন অথচ প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্ব জমিদারে ঠাসা। তারা সকলেই খুব সুনামের অধিকারী নন। কিরণশঙ্কর বাবু একজন জমিদার, তুলসী গোস্বামীর কথা কে না জানে, দেবেন্দ্রলাল খান, আর কত নাম বলব?'

কংগ্রেসের দিক থেকে কেউ বলে ওঠে, 'সুভাষবাবুর জমিদারি নেই।'

'তাঁকে এত ঘন ঘন জেল খাটতে হয় যে জমিদারি করার টাইমই পেলেন না। কর্পোরেশন চালাবার অভিজ্ঞতা যাঁর আছে তিনি মনে-মনে জমিদারিবিরোধীও হতে পারেন। সুভাষবাবুর কথা তুলে ভাল করেছেন। সুভাষবাবু শেষবার ছাড়া পাওয়ার পর, তাঁকে ঘিরে বা তার ওপর ভরসা করে কংগ্রেসের ভিতরে নতুন-নতুন নেতা ও কর্মীর সমাবেশ হয়েছে। এম এন রায়ের মত নেতা কংগ্রেসে আছেন। আছেন অনুশীলন ও যুগান্তর দলের জেলখাটা বিপ্লবীরা। আছে সব যাঁরা জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন সেই রাজবন্দীরা। যাঁরা এখনো মুক্তি পাননি, তাঁরাও আন্দামানে-হিজলিতে মুক্তির দিন গুনছেন যাতে সুভাষবাবুর কাজে হাত লাগাতে পারেন।'

'আরে, কথা তো বন্দীমুক্তি নিয়ে নয়, জমিজমা নিয়ে' শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি দাঁড়িয়ে উঠে বেশ জোর দিয়ে বলেন। স্পিকার বঙ্কিমবাবুকে বলেন, 'বরং আলোচ্য বিল নিয়ে যা বলার বলুন।'

লম্বা শরীরে বেশ একটা ভঙ্গি করে বঙ্কিমবাবু স্পিকারকে 'ইয়েস স্যার' বলে শ্যামাপ্রসাদের দিকে ফিরে বলেন, 'আপনার উষ্মা ও আপত্তির কারণ আমি বুঝি ডক্টর মুখার্জি। কিন্তু আপনার কোনো বক্তব্যেরই যুক্তি কোনোদিন বুঝি না'। বঙ্কিমবাবু সহাস্য নীরবতায় সভ্যদের ওপর দিয়ে তাকান, তাঁদের হাততালির সুযোগ দিতে। সভ্যরা হাততালি দিলেন।

'কারে কয় থিয়েটার', যোগেন নড়েচড়ে বসে।

বঙ্কিমবাবুর গলাটা হঠাৎ নীচে নেমে যায়। খানিকটা স্বগতোক্তির ঢঙে কিন্তু স্পষ্ট উচ্চারণে তিনি বলেন, 'একই ভাষা যদি পরস্পরের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে যায়, তাহলে এমন কী স্বামী স্ত্রীর মধ্যেও কোনো কথাবার্তা হতে পারে না। ডক্টর মুখার্জি ও আমি নিশ্চয়ই স্বামী-স্ত্রী হতে পারি না। তবু আমরা পরস্পরের ভাষা বুঝতে পারি। যেমন উনি বুঝে নিয়েছেন রাজবন্দীদের মুক্তির কথা ও সুভাষ বোসের নেতৃত্বের কথা যখন আমি বলছি, তখন আমি জমিদারিপ্রথা সম্পর্কেই বলছি। এটা উনি চান না—এই তিনটাকে মেলাতে। নাই চাইতে পারেন। কিন্তু অন্য কেউ এটা বলবেন, এটাও তিনি হতে দেবেন না। এটা বোধহয় ওঁর ক্ষমতা প্রয়োগের সীমা অতিক্রম করা হল। ক্ষমতার এমন অপপ্রয়োগ তো আইনসভায় চলতে দেয়া যায় না।'

একেবারে নিশ্চুপ হলে বঙ্কিমবাবু শুধু তাঁর কথা বলার ঠাটে ও গলার খেলায় সবাইকে টেনে রেখেছেন তাঁর দিকে। যুক্তিটাকে কোন্‌দিকে বেঁকাবেন এই নিয়ে একটা উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়লে বঙ্কিমবাবু স্বরটাকে আবার ঘোরান। একটু যেন বাঁকা স্বরেই বলেন, 'জমিদারি শব্দটি ব্যবহারে-ব্যবহারে যে যোগরূঢ় শব্দ হয়ে গেছে, এখন আর ঐ শব্দ দিয়ে জমিজমার

স্বত্বাধিকারীকে বোঝায় না। বোঝায় মালিকানা। যেমন, কেউ যদি বলেন—বিশ্ববিদ্যালয় তো মুখার্জিবাড়ির জমিদারি, তাহলে কোনো মহামহোপাধ্যায়ও এই বাক্যটির শুদ্ধতা সম্পর্কে আপত্তি করতে পারেন না।' সতর্ক একটা সমবেত চাপা হাসি চাপা দিয়ে শ্যামাপ্রসাদের উঁচু গলা উঠল, 'স্যার, এমন ব্যক্তিগত আক্রমণ কি পার্লিয়ামেন্টারি ব্যবহারে চলতে দেবেন? এই কথাটি সভার বিবরণ থেকে বাদ দেয়ার দাবি জানাচ্ছি, আইনসভার সদস্যের অধিকার এতে অস্বীকার করা হচ্ছে'।

স্পিকার আজিজুল হক তখন গালে হাত দিয়ে বঙ্কিমবাবুর বক্তৃতা শুনছেন। শ্যামাপ্রসাদের এমন বাধায় তিনি বিরক্ত হয়েও হাতের ইশারায় বঙ্কিমবাবুকে চালিয়ে যেতে বলেন। মানে, শ্যামাপ্রসাদের আপত্তি উনি মানলেন না।

'স্যার, আমার কথাটা সম্পূর্ণ ও সুশৃঙ্খল। জমিদার-ইজারাদার-রায়ত-চাষি-দখলি চাষি—এই সব শব্দ কৃষি ও ভূমির মালিকানা ও ব্যবহার নিয়ে আজ আমরা যে-প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছি সেটা ১৮৪৩ সালেও উঠতে পারত। ঐ বছরের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় একটি লেখা বেরিয়েছিল, প্রজাদের ওপর জমিদারের অত্যাচার ও অন্যায্য আদায়ের তালিকা দিয়ে। সেদিন প্রতিবাদ ঐ টুকুই হতে পারত কারণ তখন নির্বাচিত সভ্যদের নিয়ে কোনো আইনসভা ছিল না, কৃষক সমিতিগুলিতে মুক্ত রাজবন্দীরা যুক্ত ছিলেন না ও সুভাষচন্দ্রের মত নেতা ছিলেন না।

যাকে আমি বলছি আমাদের জাতীয় আন্দোলনের নতুন শক্তিসমাবেশ, সেটাকেই কেউ ও অনেকে মনে করেন, আমাদের জাতীয় আন্দোলনে স্থায়ী ধর্ম থেকে বিচ্যুতি। বিচ্যুতির উদাহরণ হিশেবে তাঁরা বলেন—বাংলার রাজনীতি ও সংস্কৃতি থেকে হিন্দুরা বিচ্ছিন্ন, একটা মুসলিম সরকার দেশ চালাচ্ছে, সে-ই ১৯২৬ সাল থেকে বাংলার যেখানে-সেখানে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বাঁধছে, ঋণ-জমি-ফলন ভাগের আইনি বা প্রচলিত কোনো ব্যবস্থাই মানা হচ্ছে না, মুসলিমদের নানাভাবে উশকে দিচ্ছেন সরকার, গ্রামবাংলায় হিন্দু জমিদারদের নেতৃত্বের ভূমিকা অপসারিত হয়েছে, নিজের জমি বিক্রি হয়ে গেলেও তাঁকে জানানোর কোনো বাধ্যতা থাকছে না, বর্গাদার কাজ না করলেও তাকে উচ্ছেদ করা যায় না। সন্দেহ নেই, এই দুটো চূড়ান্ত অবস্থায় আমরা বিভক্ত। চোখের সামনে দেখছি, বাংলার মুসলিম সমাজের নবাব থেকে হাকিম, বেশিরভাগ মানুষ তথাকথিত মুসলমানী নবাবজাদা-শাহজাদাদের নেতৃত্ব থেকে বেরিয়ে এসে জনাব ফজলুল হকের নেতৃত্বে জমা হয়েছেন। ফজলুল হক শাহেরের কাছে ঢাকার নবাববাড়ির খাজা নাজিমুদ্দিনের পরাজয়ের মূল শিক্ষা এটাই। মুসলমান সমাজের মধ্যে গণতান্ত্রিক ধারণার বিস্তার।'

ঠিক এই জায়গায় যে-প্রশ্নটি অনেকের মনে এসেছিল, কেউ একজন নিজেকে লুকিয়ে রেখে সেটাই চিৎকার করে বলল 'হকশাহেব যে খাল কাটছিলেন, নিজেই তা বুইজ্যায়া দিছেন, হক শাহেব লিগ হইয়্যা গিছেন।'

'কিন্তু আপনি তার প্রতিবাদ করতে পারছেন। আবার একদিকে গোঁড়া, রক্ষণশীল, প্রধানত মুসলিম লিগের ও জমিদারদের এই সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব তোলা হবে এই গুজব সারা শহরে রটে গেছে ও বিভিন্ন জায়গায় ছোট-ছোট মিছিল-মিটিং করে অনাস্থা প্রস্তাব আনার চেষ্টার বিরোধিতা করা হচ্ছে। এ-বিরোধিতার একটা জনভিত্তি নিশ্চয়ই আছে। সেই জনভিত্তির প্রধান উপাদান মুসলিম জনসাধারণ, যাঁরা মুসলমানদের মধ্যে দলাদলি পছন্দ করেন না। কিন্তু সেই মুসলিম জনসাধারণের একটা অংশ ডক ও বন্দরের মজুররা। একটা গোটা ভোট হয়ে গেল এই দাবিতে—'জমিদারি উচ্ছেদ করতে হবে', 'চিরস্থায়ী ব্যবস্থা নিপাত যাক', 'বাজে আদায় বন্ধ করো', 'কর্জা ধানের সুদ নাই', 'হাট তোলা ও বাজে আদায় বন্ধ করো', 'লাঙল যার

জমি তার'। একটা গোটা ভোটে সাধারণ মুসলমানরা আইনসভায় এসেছেন মফস্বল থেকে, আমাদের মত যাঁরা চটকলে কয়লাখনিতে শ্রমিকদের ইউনিয়ন করছি, তাঁদেরও তিন-চারজন প্রতিনিধি আইন সভায় আসতে পেরেছেন। এর চাইতে সুবর্ণ লক্ষণ আর কী হতে পারে? এই সুবর্ণসুযোগে আমরা যদি পচা, গলা, দুর্গন্ধি, এই চিরস্থায়ী বন্দবস্ত বিসর্জন দিতে না পারি, কবে পারেন? এই বিলে বলা হয়েছে—যিনি দখলদার—চাষি তিনি জমি বিক্রি করতে পারবেন। জমিবিক্রির জন্য জমিদারবাবুর অনুমতি নিতে বাধ্য নন। জমি বিক্রি হবে যে দরে তার ২০ শতাংশ টাকা জমিদার সেলামি পেতেন। এখন থেকে আর পাবেন না। কোনো বর্গাদারকে তার জমি থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না—যদি তিনি ১২ বছর একটানা ঐ জমি চাষ করে থাকেন। এগুলো নিয়ে তর্কবিতর্কের জন্য কোনো ফাঁক খোলা নেই। কোনো জমিদারবাবু হয়ত ৫-১০ শতাংশ সেলামি দিতে বলতে পারেন। বর্গাদার উচ্ছেদের শর্তগুলি আরো ভাসা-ভাসা রাখতে চাইতে পারেন। কোনো জমিদার হয়তো 'কর দিব না' আন্দোলনের উপর নিষেধ চাইতে পারেন। এসব নিয়ে কথা হবে, কথা হোক। কিন্তু এ কথা ভুলবেন না—এর বেশিরভাগ দাবিই আন্দোলনের জোরে চাষিরা আদায় করেছে। আইন করার সুযোগ যখন পেয়েছেন, হাতছাড়া করবেন না।'

'সরকারি প্রস্তাবের বিরোধিতা আমি করছি না, আমার পার্টিও করছে না। কিন্তু একটা বিষয়ে আমি আইনসভার সদস্যদের সাবধান করে দিতে চাই। তাতে আইনসভার ভিতরের পার্টিশৃঙ্খলা হয়ত ভাঙা হবে তবে আইনসভার বাইরের বাংলার যে বৃহত্তর শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের আন্দোলনের শৃঙ্খলা নিশ্চয়ই আইনসভার চাইতে উচ্চতর শক্তি। সেই শক্তির প্রতি আনুগত্যবশত আমি আপনাদের এই কথা জানিয়ে দিতে চাই যে কংগ্রেস, মুসলিম লিগ ও কৃষকপ্রজা পার্টির ভিতরের মধ্যস্বত্বভোগীরা এই আইন পাশ করতে দেবে না। তারা বিচ্ছিন্নভাবে বিচ্ছিন্ন যুক্তিতে এই আইন ঠেকিয়ে রাখবে। তার বিরুদ্ধে এই তিন পার্টির ও স্বতন্ত্রদের যাঁরা চান জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ, জমিদারদের কোনো ক্ষতিপূরণ না দিতে ও লাঙল যার জমি তার কাছে ফিরিয়ে দিতে, তাঁদের নীতির ভিত্তিতে এক হতেই হবে।'

এমন একটা বক্তৃতার পর স্পিকারও যেন খুঁজে দেখেন পরের বক্তার নাম, কিন্তু সভ্যরা তা শুনতে পেলেন না। সকলেই প্রায় আসন থেকে উঠে লবির দিকে যাচ্ছেন।

বঙ্কিম মুখার্জি নিজের আসনে বসে পরের বক্তার ভাষণ শুনতে লাগলেন। রাজনীতির এই প্রক্রিয়াটাই নতুন ও অদৃশ্য। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা যত বাড়ছে, কংগ্রেস-লিগ-হকশাহেবের ভিতরকার কর্মসূচি তত মিলে যাচ্ছে। শ্রেণী মৈত্রী একেই বলে। এই কথাটি কি পরিষ্কার করা গেল? যাদের জন্য পরিষ্কার করা, তাদের মুখচোখ দেখে বোঝার উপায় নেই–তাদের কিছু অপরিষ্কার ছিল।

বাথরুমের দরজায় প্রবেশোদ্যত জে সি গুপ্তের সঙ্গে যোগেনের প্রায় ধাক্কা লেগে যায়।

জে সি গুপ্ত যোগেনকে বলেন, 'কংগ্রেসের এই কমিউনিস্ট ছেলেদের আর্গুমেন্টটা এত অরিজিন্যাল আর কনভিনসিং যে কংগ্রেস এদের কতদূর পর্যন্ত অ্যাকোমোডেট করতে পারবে, আমার সন্দেহ হচ্ছে। দেখুন, এর চাইতে বেটার কম্বিনেশন তো আর হতে পারে না। পুরনো জেলখাটা বিপ্লবীরা জেল থেকে কমিউনিস্ট হয়ে বেরচ্ছে, কংগ্রেসের মত ছাতা বা পাটাতন পাচ্ছে আর জমিদারদের মত শত্রু পাচ্ছে'—

মুসলিম লিগের সেক্রেটারি আবুল হাশেম ঢুকে এদের এই অবস্থায় দেখে বলেন, 'এত বড় আরামের হল, বারান্দা, লবি বানিয়ে দিয়েছে সরকার। কিন্তু কথা-বলতে আপনারা ঠেলাঠেলি করবেন পায়খানার দরজায়!'

যোগেন আর জে সি গুপ্ত বেরিয়ে এল। তারা বোধহয় আরো একটু থাকতে চায় লবিতে।

হেমন্ত সরকার এসে জে সি গুপ্তকে বললেন, 'টেনান্সি অ্যাক্টটা আমাদের একটা স্ক্যান্ডালই হয়ে গেল। স্ক্যান্ডালটা এতটা ওপন হওয়া কিন্তু ঠেকানো যেত। একটা ন্যাশন্যাল ক্যারেক্টার দেখেছেন মিস্টার গুপ্ত? আমাদের মনের সঙ্গে মতের কোনো মিল নেই অথচ সেই অমিলটাকে আমরা কনসিসটেন্সি বলে জাহির করি।'

'আপনার এই আমরাটা কে, বলুন তো? ট্রেজারি বেঞ্চ না অপোজিশন?' জে সি তাঁর সেই তোতলানো ভঙ্গিতে বলেন।

'ট্রেজারি আর অপজিশন কি আলাদা আর থাকল? এখন তো জমিদার আর চাষি ভাগ হয়ে গেল। আর এ-ভাগ হলেই সেটা হিন্দু-মুসলিম ভাগাভাগিতে গিয়ে ঠেকবেই। সেই মনসুর আমেদ-এর কথাটা তো প্রবাদ হয়ে গেছে—'স্বত্বভোগী বললেই হিন্দুর তিলক আর চাষি বললেই মুসলমানের সুন্নত বেরিয়ে পড়ে।"

'সেটা একবার হিশেব করে দেখলেই তো হয়,' জেসি বলেন।

'সেটাই তো স্যার বলেছিলাম তের বছর আগে। কমিটির নামও দিয়েছিলাম। তখন তো আমাকে বলশেভিক বলে গাল পেড়ে নাকঘষা দেয়া হল যে আমি নাকী চিরস্থায়ী বন্দবস্তের বৈধতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করছি।'

'আপনি কি স্পিকারস গ্যালারিতে বসেছেন?'

'আর কোথায় থাকব। এই বিলটা শোনার জন্যই এলাম।'

'আচ্ছা—আপনি যে কইলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বৈধতা সন্দেহ করায় আপনার সংশোধন প্রত্যাহার কইরবার লাগল—সেডা কী রকম। বৈধতা চ্যালেঞ্জ কইরলে বৈধতা প্রমাণ করতে হয়। কিন্তু সেটাকেই অপরাধ ধইর‍্যা শাস্তি দেয়া যায়?' যোগেন প্রশ্ন করে।

হেমন্ত সরকারের মুখ দেখে বোঝা যায় উনি যোগেনকে চেনেন না। জে সি পরিচয় করিয়ে দেন, 'যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। বরিশাল থেকে জেনারেল সিটে জিতে এসেছেন। হেমন্ত সরকার—কাউন্সিলে কংগ্রেসের স্বরাজ্য দলের চিফ হুইপ ছিলেন।'

তাঁর নিকেলের চশমার ফ্রেমের ওপর দিয়ে হেমন্ত সরকারের চোখদুটো যেন বেরিয়ে আসে। তিনি যোগেনকে বুকে টেনে বলেন, 'যোগেন মণ্ডল বরিশালের কেন হবে? ইন্ডিয়ার। ইন্ডিয়াতে এই একজন মাত্র মানুষ একই সঙ্গে দুটো কথা প্রমাণ করে দিলেন। এক নম্বর, রিজার্ভেশনটা সুযোগ নয়, সেটা প্রত্যাখ্যান করা যায়। দুই নম্বর, জেনারেল সিটটা সত্যিই জেনারেল।' হেমন্ত সরকার যোগেনকে বললেন, 'আপনি তো উকিল? কথাটা তাই আপনার মনে উঠেছে। কাউন্সিলেও তো বড়-বড় আইনজ্ঞ সব ছিলেন, তখন, নাইনটিন টুয়েন্টি ফাইভে। তাঁরাই ফ্যাকড়াটা ধরলেন—লেজেটিমেসি আর ইল্লেজেটিমেসির পার্থক্য ধরে। আসলে, ওসব কিছু নয়। মধ্যস্বত্বভোগীরা তুলতে দেবে না বলে তুলতে দিল না। ঐ বললাম-না, যা আমরা ভাবি আর যা আমরা বলি তার গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার এক নয়। অবিশ্যি আমার ওয়ার্ডিঙের জন্যই ফাঁকটা ওরা পেয়েছিল। মনে মুখে এক থাকব বলে প্রস্তাবে কিছু আর গোপন করিনি। এ কমিটি বি ফর্মড উইথ গভর্নমেন্ট রিপ্রেজেনটেটিভস অ্যান্ড মেম্বারস অব দি পাবলিক, টু ইনকোয়্যার ইনটু দি আইডিয়া অব ওনারশিপ অব ল্যান্ড, অ্যাজ ইন পার্মানেন্ট সেটলমেন্ট অ্যান্ড ইটস কনসিসটেন্সি উইথ অ্যানসেন্ট ট্র্যাডিশন অব ইনডিয়া, টু ডেটারমিন হু মে বি দি রিয়্যাল অ্যান্ড ন্যাচার‍্যাল প্রোপ্রাইটার অব ল্যান্ড। এটাতে তো শিকড় ধরেই টেনেছিলাম।'

'আপনি মিস্টার মণ্ডলের সঙ্গে শিকড় টানাটানি করুন, আমাকে তো ভিতরে যেতে হবে',

জে সি চলে গেলেন।

'আপনিও তো ভিতরে যাবেন—' হেমন্ত বলেন।

'হ্যাঁ, যাব, নীহারবাবুর বক্তৃতাডা শুইনব ইচ্ছা। আপনার কেমন লাইগল বঙ্কিমবাবুর ভাষণ?'

'বঙ্কিমবাবু তো আমাদের শ্রেষ্ঠ বক্তাদের একজন। ওঁর বক্তৃতা আর খারাপ হবে কী করে? শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে ঐ কথার মারপ্যাঁচে সময় গেল, অবিশ্যি সেটাকে উনি ঘুরিয়ে আনলেন নিজের বক্তব্যে। এটাই মাস্টারি অব অরেশন। কিন্তু—

'তাইলে আপনার একডা কিন্তু আছে? কন-না!'

'আমি যেন অপেক্ষায় ছিলাম, উনি হয়ত আমার সেই তের বছর আগের প্রস্তাবটার বিষয়ে ঢুকে পড়বেন। জানি না তো ওঁরা ঐ ভাবে ভাবেন কী না—'

'ভাবনাডা কী? ঐ লেজিটিমেসি—?'

'হ্যাঁ—আ, বলতে পারেন। পাবলিক ডিসকাশনের একটা অসুবিধা হচ্ছে টার্মগুলো কেমন যেন তার কোনা-কানছি, উঁচু-নিচু হারিয়ে ফেলে। ফলে ধারণাটা, কনসেপ্টটা ঠিক বোধহয় পৌঁছে দেয়া যায় না।'

যোগেন হেসে বলে, 'খাইছে। আমাগ পেশা তো ওকালতি। যা কব, তার মাত্র একটাই মানে হওয়ার লাগব।'

হেমন্ত সরকার হো-হো হেসে ওঠেন, 'একেবারে সত্য কথা এত সরাসরি বলবেন আর রাজনীতি করবেন—এটা কিন্তু মিলবে না যোগেন মণ্ডল। আপনাকে কষ্ট দেবে।'

'কী রকমের কষ্ট?'

'কথাবলার আর না-বলার কষ্ট—'

'না। আপনে বোধহয় কইছিলেন কথা বানাইতে না-পারার কষ্ট আর কথা শুইন্যা বুইঝতে না-পারার কষ্ট?'

হেমন্ত সরকার ঘাড় হেলিয়ে, ভুরু কুঁচকে, দুই ঠোঁটের ওপর একটা আঙুল চাপা দিয়ে, আর-একটা হাতের পাতা দু-একবার বাতাসে খেলিয়ে, যোগেনের মুখের দিকে তাকিয়ে কোনো কথা না-বলে হেসে ফেলেন, 'না, বুঝলাম না। লিঙ্ক হারিয়ে গেল। আবার, গোড়া থেকে শুরু করুন।'

যোগেন প্রাণ খুলে হাসে। 'এইসব কথার কি আগা থাকে না গোড়া থাকে? আবার ফিইর‍্যা কইতে গিয়্যা তো আগাগোড়া উলট্যায়া যাবে নে। আপনি কইলেন—না, লেজিটিমেসির ছুত্যা তুইল্যা তের বছর আগে আপনারে ল্যান্ড টেনিওর নিয়্যা এনকোয়ারি কমিটি করার প্রস্তাব তুইলব্যার দেয় নাই। আর, আমি বোধহয় কইল্যাম, ওকালতিতে তো একডা কথার একডাই মানে। আপনি পাবলিক ডিসকোর্সের অসুবিধার কথা কইলেন—পাবলিক ডিসকোর্সে কনসেপ্ট নিয়্যা কথা কওয়া যায় না।'

হেমন্ত সরকার তাঁর এলোমেলো চুল নিয়ে একদিকে ঘাড় হেলিয়ে চোখ বুঁজে যোগেনের কথা শুনছিলেন। যোগেনের কথা শেষ হওয়ার পর চোখ খুলে বললেন, 'আপনার রিক্যাপিচুলেশনে একটা ওভারস্টেপিং হল। বঙ্কিমবাবুর বক্তৃতার প্রসঙ্গে আমি পাবলিক ডিসকোর্স আর কনসেপ্টের আড়াআড়ির কথাটা তুলি। আপনি তখন ওকালতির যুক্তির একার্থকতা নিয়ে বললেন। আপনার এই স্টেপওভারটা রাজনীতিতে একটা কৌশল হিশেব ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন, ধরুন আপনি বলতে চান মানে আপনার বক্তব্য হল, বা উদ্দেশ্য হল জমিদারি রাখার পক্ষে। কিন্তু আপনি বললেন, 'আমি জমিদারি তোলার, বিপক্ষে নই কিন্তু

আন্ডাররায়তের পক্ষে।' দেখবেন, এই আন্ডাররায়ত নিয়ে বড়-বড় জমিদার তালুকদারদেরই সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা, মজাটা হচ্ছে, ১৯২৮-এর অ্যামেন্ডমেন্টের আগে আপনি কোথাও, রেজিস্ট্রি অফিসে, গবমেন্ট অর্ডারে, সেটলমেন্ট রিপোর্টে এই 'আন্ডাররায়ত' খুঁজে পাবেন না। 'আন্ডাররায়ত' হল সেই দখলি চাষি, যে ফলনের ভাগ দেয় মালিককে এবং পরিমাণটা নির্দিষ্ট, ফলনের ভালমন্দের ওপর নির্ভরশীল নয়। আন্ডাররায়ত বা কোর্ফা প্রজার ধারণাটাই এসেছে যাতে ভাগদেয়া প্রজা ভাগটাকেই খাজনা বলতে না পারে। আবার উলটে দেখুন—বর্গাদারদের কোনোরকম আইনি অধিকার দেয়া হচ্ছে এই ভয়ে তারা বহুসংখ্যক বর্গাচাষিকে উচ্ছেদ করল। এই উচ্ছেদকৃষকই হল আন্ডাররায়ত বা কোর্ফাপ্রজা। জমিদাররা যে কোর্ফাপ্রজাদের জন্য এত চোখের জল ফেলল—ধরুন, শ্রীশ নন্দী, হবিবুল্লা, বিজয় প্রসাদ সিংগি রায়, বর্ধমানের মহারাজা—তার একটাই কারণ কোর্ফা প্রজা জমিদারের অনুমতি ছাড়া ঐ জমিতে একটা চালাও তুলতে পারবে না আর তাকে জমিদারের কাছ থেকে বলদ-লাঙল-বিছন নিতে হবে। অর্থাৎ যে-বর্গায় চাষ করেও চাষি ছিল, সে বর্গা থেকে উচ্ছেদ হয়ে সার্ফ হয়ে গেল। দিনমজুর না—কারণ তাকে নগদে মজুরি দেয়া হয় না। আর দিনমজুরটা আলাদা একটা ভাগ। কোর্ফা প্রজার ছেড়ে দেয়া জমিকে জমিদার বলত নিজচাষের জমি। আইনত, মানে ফাঁকফোঁকর দিয়ে আইন যদি ঢুকে যায়, তাহলেও যেন প্রমাণ করা না যায়—ওটা দিনমজুরে চষা জমি। এখন দেশের হাওয়া বুঝে কোনো জমিদার যদি জমিদারিব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিছু না বলেও কৃষকপ্রজার কাছে প্রিয় থাকতে চায়, তাহলে কোর্ফা প্রজা বা আন্ডাররায়তের জন্য চোখের জল ফেলাটাই সবচেয়ে নিরাপদ। এটা এখন রাজনীতির কৌশল হয়ে গেছে। নিজের প্রত্যক্ষ স্বার্থের উলটো কথা বলো। কারণ, আপনাকে তো আর ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে না, জমির মালিকানা নিয়ে আপনার ধারণা কী। ফলে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নীতি নিয়ে প্রশ্ন তোলা যাবে না। ওটা দেশাচারের মর্যাদা পেয়ে গেছে।'

যোগেনের খুব ভাল লেগে যায়, হেমন্ত সরকারের ব্যাখ্যা। কৌশল নিয়ে তিনি যা বললেন, তাতে যোগেন যেন অনেক বিপরীতের ভিতরকার মিলের অদৃশ্য সেলাই দেখে ফেলতে পারবে যেন এই ধারণা দিয়ে। সুভাষ বোস কেন জমিদারির পক্ষে ছিলেন? কেন আবদুর রহিম কোর্ফা প্রজাদের জন্য সংশোধন আনেন, কেন তপশিলি এমএলএরা একটা বক্তব্যে মিলতে পারলেন না, কেন মুসলিম মেম্বাররাও ভিন্নমত হলেন নিজেদের মধ্যে—ত্রিপুরার জনাব আলি মজুমদার আর নদীয়ার সিরাজুল ইসলামের মধ্যে বিপরীত স্বার্থটা কোথায়? হেমন্তবাবু যে পদ্ধতির কথা বলেছেন, সেটা দিয়ে কি এত রকমের প্রশ্নের উত্তর খোঁজা যাবে?

যোগেন বলল, 'এরকম বিতর্কে আপনার নাগাল যোগ্য ব্যক্তির থাকা উচিত ছিল।'

'আমার উপস্থিতি তো আমার যোগ্যতা দিয়ে হবে না। আমি ত ৩৪ সালের সেন্ট্রাল কাউন্সিল ইলেকশনে দাঁড়িয়েছিলাম, কিন্তু হেরে যাই। তবে, আমার কলম আছে। লিখলে যুক্তিগুলি স্পষ্ট হয়। বক্তৃতায় তো নানা কৌশলে যুক্তিগুলিকে ঢাকা যায়। আমাদের নেতারা তাঁদের বক্তব্য, লিখে প্রকাশ করেন না কেন? একটাই কারণ। তাঁদের যুক্তির ফাঁক ধরা পড়ে যাবে। তাঁরা যতটা মুখে বলতে পারেন, ততটা লেখার মত শিক্ষিত নন।'

বেল বেজে উঠল, অ্যাসেম্বলির দরজাগুলো খুলে গেল, মেম্বাররা বেরতে লাগল। টি ব্রেক।

শাহেব মেম্বাররা দল বেঁধে কথা বলতে-বলতে অ্যাসেম্বলির রেস্তোরাঁর দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল আর তাদের উলটোদিক থেকে তমিজুদ্দিন আর সারওয়ারদি পাশাপাশি হেঁটে আসছেন।

নলিনী সরকার বিরক্ত মুখে তাঁর ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ হেমন্ত সরকারকে দেখে

থমকে গিয়ে বলেন, 'এই ঝিল্লিমিল্লি, আমার ঘরে চলো।'

বেঙ্গল টেন্যান্সি অ্যাক্ট সংশোধন নিয়ে আইনসভায় আলোচনা যখন চলছে, হঠাৎ যোগেনের কাছে রসিক কৃষ্ণ বিশ্বাসের টেলিগ্রাম—রায়ট সিচুয়েশন ভেরি ব্যাড মাস্ট কাম টু যশোর ইমেডিয়েটলি।

যশোরে একটা দাঙ্গা বেঁধেছে খবর পেয়ে রসিক বিশ্বাস চলে গিয়েছিলেন। যশোর-খুলনা-বাখরগঞ্জ-ফরিদপুরের ঐ সীমাটায় বার মাসই দাঙ্গা বাধে আবার থেমেও যায়। নিজে-নিজেই বাধে, নিজে-নিজেই থামে। খবর আসতে-আসতে ও এখান থেকে নেতারা কেউ যেতে-যেতেই বেশিরভাগ সময় দাঙ্গা থেমে যায়। রসিককাকার মতো বড় নেতা যাওয়ার দুইদিন পরও এইরকম টেলিগ্রাম আসা তো খুব খারাপ খবর।

যোগেন, খাজা নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে তাঁর আইনসভা অফিসে দেখা করে, টেলিগ্রামটা দেখান ও ব্যাপারটা জানতে চায়। নাজিমুদ্দিন বলেন, 'রসিকবাবু, আপনি, এঁরা থাকতে আমাকে কী জিজ্ঞাসা করেন? ও তো ট্র্যাডিশন্যাল ট্রাব্‌ল্ স্পট। প্রথম খবরে ছিল, হিন্দু-মুসলমানের ব্যাপার নয়, দুই গ্রামের ব্যাপার। জমির আল নিয়ে। প্রথম দিন হাঙ্গামার পর দুই দিন শান্ত ছিল। লোক্যাল অথরিটি ভাবে, আর-কিছু হবে না। থার্ডডে-তে এক দল পুরো রিঅর্গানাইজ করে আর-এক গ্রামকে ঘিরে ধরে ও বাড়ি-বাড়ি গিয়ে তাদের লোকজনকে মারপিট করে। মেয়েরা কেউ-কেউ হয়ত আঘাত পান কিন্তু তাঁদের আঘাত করা হয়েছে নাকী তাঁরা তাঁদের বাড়িঘরের পুরুষদের বাঁচানোর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ায় আঘাত পান—সে-বিষয়ে কোনো রিপোর্ট নেই। এই ইস্যু থেকেই দাঙ্গা হিন্দু-মুসলমানে টার্ন করে। একটা হাঙ্গামা ঐ এলাকায় যদি শুরু হয়ে দু-দিন পর নতুন করে আরম্ভ হয়, তাহলে তো হিন্দু-মুসলমান হবেই। রসিকবাবু কবে গেছেন, জানেন?'

'আজকার দিন বাদে দুই দিন আগে—'

'ডিএম তো আমাকে জানায় নি রসিকবাবুর কথা।'

'স্যায় নিজে জানে কী না সেইডা দ্যাহেন।'

'না, এ তো খুব প্রম্পট অফিসার'।

'অফিসার তো প্রম্পট কিন্তু আমাগো লিডার তো শ্লো। স্যায় হয়ত অফিসারগো জানায়ই নাই স্যায় আইসছে। ঐরকমই তো অব্যাস।'

নাজিমুদ্দিন একটু হাসে। যোগেনের মনে হয়, নাজিমুদ্দিন রসিক বিশ্বাসের রাজনীতি বা অভ্যাস নিয়ে একেবারেই কৌতূহলী নয়। রায়টটা নিয়েও নয়। তাহলে কি মুসলমানরা আপারহ্যান্ডে?

নাজিমুদ্দিন জিজ্ঞাসা করে, 'রসিকবাবু তো কংগ্রেসের। তাহলে নিজের পার্টিকে না-জানিয়ে আপনাকে টেলিগ্রাম?'

যোগেন একটু তেতো মুখে বলে, 'আপনে জাইনলেন কখন যে রসিককাকা তার পার্টিরে খবর দেয় নাই?'

'এখন। আপনি তো তাহলে বলতেন।'

'এটা কি আমার কাজ বইল্যা আপনার সন্দেহ হয়—কোন্ পার্টির কে কাকে কী জানাইল, সেডা আপনারে জানাইয়্যা যাওয়াডা পার্ট অব মাই ডিউটি? এই ডিউটি পালনের জইন্য তো আপনার পুলিশ বাহিনী, গুপ্তচর বাহিনী, স্পেশ্যাল ব্র্যাঞ্চ ইত্যাদি। আমি তো আপনরেই জিগ্যাইবার আসছি—রসিকলাল বিশ্বাসের মতো ইমপর্ট্যান্ট মেম্বারের খোঁজডা পর্যন্ত হোম

মিনিস্টার রাখার দরকার মনে করেন না কেন। ওয়েল, আই উইল র‍্যাদার আস্ক ইউ ইন দি অ্যাসেম্বলি টু লেট আদার মেম্বার্স নো।' যোগেন চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে ওঠার ভঙ্গি করলে নাজিমুদ্দিন বলে ওঠে, 'বসেন তো! আপনার সঙ্গে কি দুটো প্রাইভেট কথাও বলা যাবে না। দাঁড়ান, আমি কিরণশঙ্করকেও ডাকি, নৌসের আলি শাহেবকেও ডাকি।'

যোগেন গুম হয়ে বসে থাকে।

'আপনি তো আজই যাবেন?'

'দাঙ্গা লাইলগ সাত দিন আগে। দুইদিন গেল চুপচাপে। মানুষডা গেল তিন সকাল আগে। আর এই টেলিগ্রাম পাইয়্যাও কি আমি কাল-পরশুদিনের জইন্য অপেক্ষা কইরব?'

'তাহলে আমি সেক্রেটারিকে জানিয়ে দি। ওরাই সব ব্যবস্থা করুক। আপনি তো সিলেটের পর রায়ট স্পেশ্যলিস্ট হয়ে উঠেছেন হিজ এক্সেলেন্সির চোখে।'

কিরণশঙ্কর আর নৌসের আলি নাজিমুদ্দিনের ঘরে এসে বসার পর নৌসের আলি বলেন, 'হোম মিনিস্টারের এত জলদি তলব কেন। চারদিকেই তো সরকারের পক্ষে সুবাতাস। এমন একটা বিল টেন্যান্সি অ্যাক্টের নামে বাজারে ছাড়লেন যে শরৎ বোসও বলল, 'বর্গাদারদের স্বার্থ দেখছে যে বিল, তা কি আর শেষ পর্যন্ত অপোজ করা যায়,' আবার বঙ্কিম মুখুয্যেকেও বলতে হয়, 'এই আইনকে, পেছন থেকে ছুরি মারার লোকের অভাব নেই—সরকারেও না, বিরোধি পক্ষেও না' হা হা করে হেসে নৌসের আলি বলে ওঠেন, 'দেখেন, পার্লামেন্টারি হিস্টরিতে খুঁজে বের করেন তো দেখি আর-একটা এমন উদাহরণ যার বিরুদ্ধে অপজিশনের কথা শুনে মনে হয়, বিলটা যেন অপজিশনেরই। অপজিশন ইজ শেমলেসলি অ্যারোগ্যান্ট টু লিভ হার হাউস অ্যান্ড মিট হার লাভার কেষ্টা, হোয়াইল দি গভর্নমেন্ট ইমপোটেন্টলি রেডি টু সারেন্ডার হিজ রাইটস অ্যাজ হাজব্যান্ড।'

নাজিমুদ্দিন বলে ওঠে, 'হিন্দুদের যেন কী একজন দেব্‌তা আছেন স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ঘুরে শুধু একজনের সঙ্গে আর-একজনের ঝগড়া বাধিয়ে যায়—'

কিরণশঙ্কর বলে, 'নারদের কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ। আলিভাই হলেন বেঙ্গল পলিটিক্সের মিস্টার নারদ। এদিকে ট্রেজারির লোক, ক্যাবিনেট-মেম্বার, ক্যাবিনেটে মোস্ট রিল্যায়েব্‌ল অ্যাডভাইসার। অন্যদিকে ক্যাবিনেটের বেইজ্জতিতে প্রাণভরা খুশি। হি ইজ নেভার এ জেন্টলম্যান। সো হি ডাজ নট টেন্ডার হিজ রেজিগনেশন—'

'টু ফেসিলিটেট দি ট্রেজারি?' নৌসের আলি আবার একটা উঁচু হাসি মিশিয়ে বলেন, 'প্লে দি গেম অ্যাজ পার রুল অব দি গেম। ক্যাবিনেটে মত পার্থক্য হলে মন্ত্রী পদত্যাগ করেন—এটা একটা পার্লামেন্টারি ট্র্যাডিশন অ্যান্ড এ গুড ওয়ান। বাট দিস ট্রাডিশন হ্যাজ ডেভেলাপড ইন এ সিঙ্গল পার্টি রুল। যখন ক্যাবিনেট ইটসেলফ ইজ এ কোয়ালিশন অ্যান্ড দি মেমবার্স হ্যাভ দি প্রিভিলেজ অব হোলডিং পোলিটিক্যাল অ্যালেজিয়ান্স টু দেয়ার পার্টিস, দেন দি লেজিসলেচার শুড বি আস্কড ফর ইটস কনফিডেন্স ইন দি পার্টিকুলার মিনিস্টার।'

'আপাতত বিপদ তার চাইতে বেশি। যশোরে একটা রায়টের খবর পেয়ে রসিকলাল বিশ্বাস দুদিন আগে যশোরে যান। আজ এই এখন সেখান থেকে মিস্টার মণ্ডলকে এই টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন। আমাদের যে ইনফরমেশন এসেছে তাতে দুই গাঁয়ের গোলমাল। দু-দিন শান্তই ছিল। তারপর রি-গ্রুপিং করে এখন হয়ত ঘটনাটা কমিউন্যালই হয়ে যাচ্ছে। আপনাদের ডেকেছি আমাদের কী করা দরকার।' নাজিমুদ্দিন টেলিগ্রামটা নৌসের আলির দিকে এগিয়ে দেন। পড়ার

জন্য নৌসের আলি পকেট থেকে চশমা বের করেন।

'রসিকের এই-যে ডুব দিয়ে কাজ সারা—! এ তো বোঝাই যাচ্ছে পরিস্থিতি খারাপ। একটা তো খবর পাঠাবে গভর্নমেন্টকে বা ওর পার্টিকে। আপনাদের কি কিছু জানিয়েছে, রায়শাহেব।'

'না। উনি তো এমন জানাবার মানুষও নন। ওখানকার কাজ যিনি গেলে সাহায্য হবে তাঁকে যেতে বলেছেন, যোগেনবাবু নিশ্চয়ই রওনা হচ্ছেন।'

'হ্যাঁ। উনি তো প্রপারলি গবর্মেন্টকে ইনফর্ম করেছেন। সুতরাং উনি গবর্মেন্টের হয়েই যাবেন। আমরা এখনই যশোরের ডি এম ও এস পিকে টেলিগ্রাম করছি। যোগেনবাবু, কোন ট্রেনে যাবেন?'

যোগেন তাকায় নৌসের আলি-র দিকে। নৌসের আলি একটু চুপ করে থেকে বলে, 'আমিও তো তাই ভাবছি—যাবেনটা কোথায়। যশোরে নেমে খবর নিয়ে অকুস্থলে যাওয়া মানে তো একটা দিন লস।' নৌসের আলি ঘাড়টা নাজিমুদ্দিনের দিকে ঘুরিয়ে বলেন, 'যশোর-খুলনা-ফরিদপুর-বাখরগঞ্জ এই চার জেলার মিটিং পয়েন্টটাই এমন হঠাৎ রায়ট বাধার জায়গা। উত্তরে মাগুরা, পুবে মোল্লার হাট, নড়াইল থানা, লোহাগাড়া থানা, কুলিয়া-মাগুরা থানার, শালিখা—এই হচ্ছে এরিয়া। যাই হোক, যোগেনবাবুকে যশোর গিয়েই জানতে হবে। আপনাদের যদি ব্যবস্থা থাকে যে শেয়ালদা-যশোর লাইনে যশোরের আগের কোনো স্টেশনে যোগেনবাবুকে কেউ কনট্যাক্ট করতে পারে, তাহলে আরো ভাল হয় যদি ঝকরগাছাতেই কেউ মিট করে'

কিরণশঙ্কর বলেন, 'আলিশাহেব, এতে গোলমাল বাড়তে পারে। ধরুন, ঝিকড়গাছায় হয়ত একজন এসডিও ও ডিএসপি আছেন। তিনি এই রায়টের খবর জানতেও পারেন, নাও পারেন। কিন্তু হোম ডিপার্টমেন্টের টেলিগ্রাম পেলে সে তো আর বলতে পারবে না—জানি না। সে কিছু খবর জোগাড় করে ঝিকরগাছায় কিছু হাফ-ইনফর্মেশন দিল। তার চাইতে যশোরের ডিএম আর এসপিকে বলুন যে যোগেন মণ্ডল পৌঁছচ্ছেন রানিং রায়টের জন্য ও তাঁকে স্টেশনে রিসিভ করতে।'

নাজিমুদ্দিন বলে, 'হ্যাঁ, সেটাই ভাল, যশোরেই যান, তারপর বুঝেশুনে প্রোগ্রাম করবেন। ঝিকড়গাছা-টাছার দরকার নেই—পাড়া জাগিয়ে প্রসব বেদ্না।'

'সেটার আবার কী মানে?' কিরণশঙ্কর বলেন।

'এটা একটা বাংলা প্রোভার্ব, না?' নাজিমুদ্দিন মুচকি হেসে বেল টিপে কাউকে ডাকেন। 'কোথাও শুনেছেন? ঠিকঠাক মনে আছে?'

'নার্ভাস করে দেবেন না।' একজন বেয়ারা এলে নাজিমুদ্দিন, মোতাহারকে চায়, 'ভুল হয়েছে কিছু?'

'ভুল হয়নি, এটাই সন্দেহের। প্রসববেদনা উঠলে তো পাড়া জাগাতেই হয়। আপনি বোধহয় কে পোয়াতি আর কে পাড়া, এর মধ্যে গোলমাল করে ফেলেছেন। কথাটা বোধহয়—পোয়াতি না-জাগিয়ে পাড়াজাগানো। কিন্তু সেটাও এক্ষেত্রে কতটা খাটবে? হ্যাঁ, খানিকটা তো পারেই বটে।' নৌসের আলি কথাটা শেষ করেন মোতাহার ঢোকার পর।

নাজিমুদ্দিন, মোতাহারকে বলে, 'যোগেন মণ্ডল শাহেব আজই যশোর রওনা হচ্ছেন। সব ব্যবস্থা করবেন। আর একটা টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে।'

মোতাহার বেরিয়ে গেলে নাজিমুদ্দিন যোগেনকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আর কিছু দরকার মণ্ডল মশায়?'

'তা দরকার নাই। আমার কাম তো রসিক কাকার সামনে হাজির হওয়া- যোগেন বলে।

'সে কেন? দাঙ্গা থামাবে কে?'

খুলনা এক্সপ্রেস যশোরে পৌঁছয় একটু বেটাইমে, ভোর চারটেয়। ঘণ্টা খানেক-ঘণ্টা দেড়েক প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করে কাটিয়ে দেবে ভেবেছিল যেগেন। ট্রেন যশোরে থামতে-না-থামতে তাকে পুলিশরা এসে যেন পাঁজাকোলা করে কেরোসিনের পোস্ট-লাইটে কুয়াশা-মাখা স্টেশন দিয়ে বাইরে এক গাড়িতে নিয়ে ফেলল। কয়েকবার মিস্টার মণ্ডল, মিস্টার মণ্ডল শুনেও কোনো দিশা করতে পারে না যোগেন। বাইরের রাস্তায় দাঁড়করানো একটা উঁচু ও মোটা গাড়ির ভিতরে তাকে সেঁদিয়ে দেয়ার পর, যোগেন নিজের কাপড়চোপড় গুছিয়ে নিচ্ছে যখন, গাড়ির ভিতরের অন্ধকারের ভিতর থেকে কেউ যেন ঘুমের ঘোরে জিজ্ঞাসা করে, 'ক্যা রে, ঘুমাইয়া গেইছিলি নি, ট্রেন তো ছেইড়ে দিত।'

'অ, খ্যাড়েকুটে আগুন জ্বালাইয়্যা/পেত্নি বইসছেন আলগোছ হইয়্যা।'

'তোর লগেই তো ছ্যামড়া। এহানকার ডিএম আইস্যা কয়, খুইলনা এক্সপ্রেসে মিস্টার মণ্ডল আইসবেন, আমরা তো কেউ চিনি না তারে। আর এহন তো অন্ধকারও কাটব না। ক্যামনে খুঁজি। যত বলি—মিস্টার মণ্ডল তো আন্ধার মানিক। আন্ধারেই তারে চিনা সহজ। শ্যাষে, আমারে ধইর‍্যা নিয়্যা আইল।'

'কাহা, রায়টটা কোথায়?'

'ক্যা? তোর কি হাউশ হইছে এই শেষ রাত্তিরে রাস্তার উপর দুই দলে রায়টের নাইট শো দিব তোর লেইগ্যা।'

নাজিমুদ্দিন শাহেব আর নৌসের আলি শাহেব য্যান কী কইতেছিলেন, ঝিকরগাছিতে আমারে নামাইব।'

'বাঁইচ্যা গেলি রে ধন। কেউ তো তোরে নামায় নাই। ঝিকর গাছাতেই যদি নামতি, তাইলে যশোরে নাইম্‌ত কোন যোগেন মণ্ডল? তা তুই নিজে ক্যান ঝিকরগাছাতে নাইম্যা জিজ্ঞাসা কইরলি না, আমারে নামাইব্যার লগে কে আসছেন?'

'ঘুমায়্যা পড়ছিলাম। রাত্তিরের ট্রেন। একদিকে ঘুটঘুইটা আন্ধার। আর একদিকে বজরার দোলন। আর ঢাকের বাদ্যির নাগাল ছোটন। ঘুমডারে আটকাইয়্যা রাইখব ক্যামনে?'

যোগেন গাড়িটার গড়ন খুব বুঝতে পারছিল না। তাকে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে বাঁ দিক থেকে। তাই, রসিককাকা পইড়্যা গ্যাল, যোগেনের বাঁয়ে। তাইলে রসিককাকার ডাইনে কে আছে? যোগেন রাতের শেষে একটা গাড়িতে উঠেছে, তাতে রসিককাকা আছে, তাতে অন্যমানুষও কিছু আছে—যাদের গায়েগতরে লোহার সম্পর্ক আছে—জুতোর তলায়, বা আঙুলে, বা বন্দুকে, বা কাঁধের ব্যাজে লোহার আন্দাজ কী করে পায় যোগেন—গন্ধে, লোহার গন্ধে? নাকী আওয়াজে, কোনো সংঘর্ষে ওঠা ধাতুধ্বনির মত? তাদের পেছনে গাড়ির দরজা আটকে যায়—তার আওয়াজের সঙ্গে মিশে এই কথাগুলিও আসে, 'স্যার আমরা যাব তো?'

'হ্যাঁ। আসামি-গ্রেপ্তারের পর বিলম্বের কোনো হেতু তো দেখি না।' রসিক কাকার একথায় হ্যান্ডেল নিয়ে অন্ধকারে একজন গাড়ির সম্মুখে দাঁড়িয়ে কোমর ভেঙে নিচু হয় আর-একটা হাতির বিষমলাগার আওয়াজে গাড়িটা থরথরিয়ে ওঠে। আলো জ্বলে। তাতেই যোগেন দেখে—ড্রাইভার তার সামনের সারির কোণে। রসিককাকার ডাইনে কেউ বসে নেই। তাতে যোগেনের কাছে গাড়ির ভিতরটা খুব স্পষ্ট হল না, ক-জন বসেছে, কে কোথায় বসেছে।

এটা খুব বিশদে জানাবোঝা যে যোগেনের অভ্যাস—তা নয়। কিন্তু একটা ঘরে ঢুকলাম, সে-ঘরের কিছুই দেখা গেল না, মানুষজন কোন্-কোন্ জায়গায় বসে বা বসে-বসে দেখা গেল তা গেল না, একটা গাড়ির ভিতরে তার কোনো সহযাত্রীর মুখই সে দেখেনি—এতে যোগেন বিরক্ত হয়ে জেগে যায়, ঘুমের অবশেষ ঝেরে ফেলে। দুটো হাতের তেলোয় মুখটা একটু ঘষে নেয়, তার জাগরণ সম্পূর্ণ করতে।

'এখন যাওয়া কোথায়?' যোগেন জিজ্ঞাসা করে।

'আমি ক্যামনে কই, তোরে থানা-কাস্টডি দিবে নাকী কোর্ট-কাস্টডি দিবে?'

'আরে, তহন থিক্যা সিধ্যা কথার ট্যারা জব দ্যান ক্যা? আমি তো আইছি, আপনার টেলিগ্রাম পাইয়া—'

'কিন্তু যোগেন্দ্র, সরকার তো টেলিগ্রামে অর্ডার কইরছে যে জিলার কর্তারাই তোমাকে রিসিভ করবে। সেই কামেই তো আমারে আনল—যোগেন মণ্ডল কে, এইটা আইডেনটিটির লগে।'

এইসব টুকটাক কথাবার্তার মধ্যে একটা জায়গায় এসে দাঁড়াল গাড়িটা। অফিসার তার পেছনের আসন থেকে নেমে যোগেনের দরজাটা টান মেরে খুলে বলে, 'স্যার, আপনার জায়গা তো এসে গেল।'

অফিসার কাকে বললেন, বোঝা না গেলেও রসিকলাল জবাব দিয়ে জানালেন তাকে, 'এডা তো ডাকবাংলা। যোগেনরে কোথায় তুইলবেন?'

'সার্কিট হাউসে, স্যার। আপনি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান বলে এরা খুলে দিয়েছে। এখানে দুটোর বেশি ভাল ঘর নেই, স্যার।'

'বাংলো হইল আমার আর আপনার কাছে আমার শুইনবার লাগব ঘরবিত্তান্ত? দুইডা ঘরের একডায় তো আমি আছি, আর-একটা তো খালি আছে। সেইড্যা যোগেনরে দ্যান।'

'দুটো ঘরই নিয়ে নেব, স্যার? শেষে যদি ইমারজেন্সি অ্যাকোমোডেশন দরকার হয় হঠাৎ?'

রসিকলাল একটু চুপ থেকে আরো নিচু গলায় যোগেনকে ঠেলা দেয়, 'এই ছ্যামড়া, নাম।'

যোগেন একটে এলোমেলো পা ফেলে বাইরে গলে যায়। পেছন-পেছন রসিকলাল।'

'এটা তো স্যার পুরনো কাঠের বাংলো। সার্কিট হাউসটা স্যার, নতুন, মিস্টার মণ্ডলের কোনো অসুবিধা হবে না।'

রসিকলাল যোগেনকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোর লাগেজ ছিল?'

যোগেন বলে, 'একটা ব্যাগ তো ছিল।'

রসিকলাল অফিসারকে বলেন, 'শুনেন স্যার, ডাকবাংলোর মালিক তো ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড। আমি তো তার ভাইস-চেয়ারম্যান। প্রথমত, আমি পুরো বাংলোটা নিলেও কারো কিছু কওয়ার থাকে না। দ্বিতীয়ত, এক্ষেত্রে একমাত্র ইমারজেন্সি অ্যাকোমেডেশন চাইবার পারেন নৌসের আলি শাহেব। তিনিই যোগেনরে যশোরে পাঠাইবার ব্যাপারে খুব ব্যস্ত হইয়া পড়েন। তৃতীয়ত ও এইডাই আসল—রায়টের ব্যাপার নিয়্যা তো কথাবার্তা কইব্যার লাগব। কাইল তো সাতসকালে মাগুড়া যাইব্যার লাগব। আপনে আর এসপি শাহেবও এইহানে থাইক্যা গেলে পরামর্শের ও কার্যারম্ভের সুবিদা হইত।'

সবাই মিলে একটু হাসাহাসি হল, তাতেই জটটা খুলে গেল। হয়ত জট তেমন কিছু ছিলই না, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের ভয় ছিল রায়টের পরিস্থিতিতে কমিশনার যদি ডিআইজিকে নিয়ে এসে পড়েন। তবে, এলেও ওঁরা তো লঞ্চ নিয়েই আসবেন।

'স্যার, আমরা তাহলে চলি, কিছু দরকার হলে আমাদের নাজিরবাবুকে ঘুম থেকে তুলে

দিতে বলবেন। উনি কিন্তু ডিউটিতে স্যার, এখানে। দারোয়ানকে বললেই ডেকে দেবে—'

'আপনে দুশ্চিন্তা কইরবেন না। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সব টপশাহেবেরা হাজির হইলেও নাজিরের ঘুম ভাঙে না, শাহেবরাও নাজিরের ঘুম ভাঙান না। আর আমরা দুইজন এমএলএ বইল্যা কি এতই বোকা যে এই শ্যাষ রাইতে নাজিররে ডাইকব? নাজিরবাবু হয়ত অ্যাহনো জানেন না যে লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি বস্তুডা কী?'

'না স্যার, না। নাজিরবাবুই তো পুরো জিলার ইলেকশন-প্রোগ্রামিং করলেন', বলতে-বলতে ডিএম গাড়ির প্রথম দরজাটায় হাত দেন। আর, সেই লোকটা এসে গাড়ির মৌমাছির চাকের সামনে হ্যান্ডেল নিয়ে দাঁড়ায়, হাতির গলায় বিষম লাগলে হাতি যে আওয়াজ করে, সেই আওয়াজে গাড়িটা কেঁপে ওঠে ও হেডলাইটটা জ্বলে সেই হেডলাইটের আলোয় ছায়াটায়া নিয়ে রসিকলাল ও যোগেন্দ্রনাথ ডাক বাংলোর দেয়ালে বিশাল ছায়া ফেলে আলোকিত হয়ে থাকে। শেয়ালদা ছাড়ার পর আর এত আলো দেখতে পায়নি যোগেন। তাদের ওপর থেকে আলো সরিয়ে গাড়িটা পেছিয়ে সামনের রাস্তার ওপর উঠে, গাড়িটা আবার একটা আওয়াজ করে। ততক্ষণে হেডলাইটের আলো দুই এমএলএর বিশাল ছায়দুটিকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে।

রসিকলাল আর যোগেন্দ্র লম্বা কাঠের বারান্দায় ওঠে।

বারান্দায় উঠে রসিকলাল জিজ্ঞাসা করে, 'ক্যা রে, তোর কি খুব ঘুম পাইছে?'

'আমার ঘুম তো আমি ট্রেনে ঘুমায়্যা নিছি। কিন্তু আপনের তো দুই চোখের পাতা নামছে কী না সন্দ।'

'সন্দ ক্যা? সত্য। আমি তো মাগুড়ায় ছিল্যাম। সন্ধ্যার পর তোর সংবাদ দিয়্যা গাড়ি পাঠাইয়্যা আমারে আনছে। একবার ভাইবল্যাম, গাড়ি ফেরত পাঠাইয়্যা কইয়্যা দেই তোরে লইয়্যা য্যান মাগুড়া আসা হয়। পরে ভাইবল্যাম মাগুর্যায় বইসা কথা বুঝান যাইত ভাল, কিন্তু আরো অনেক বুঝানদার আয়্যা পইড়ব। তার থিক্যা যশোরেই সুবিদা—তোরে সব জানাইব্যার। এইহানে বসবি? ডেক চেয়ারে? সামনে অন্ধকার নিয়্যা? বড় মশা। তার উপর ঘুমাইয়া পড়ার ভয় আছে। ঘরেই চল। আলোতে মুখ দেইখ্যা কথা কওয়া যাবে।'

যেটাকে বলা যায়, রসিকলালের ঘর সেটা বিলিতি কেতায় সাজানো। কোট ঝুলনোর স্ট্যান্ড, একডা ড্রয়ার দিয়ে তৈরি আলমারি, তার ওপর একটা বাহারে বাতি, কেরোসিনের, শেড দেয়া। একটা একটু বেশি সরু খাট, ঘরের মাঝামাঝি। খাটের পাশে একটা ছোট টেবিল। তার ওপরও একটা বাতি, ছোট। বেশ রঙচঙে লাগে। একটা ছোট টেবিলের পাশে একটা বেতের চেয়ার-চেয়ারটা গভীর সবুজ রং করা। সেই চেয়ারটিকেই একটু এগিয়ে আনতে টানে যোগেন, কার্পেটে ঠেকে যায়, উঁচু করে চেয়ারটাকে টেবিলের সামনে নিয়ে আসে যোগেন। কাছাকাছি বসে কথা না বললে ঘটনা বোঝা যাবে না।

'কন্ কাহা, বরিশালের দাঙ্গার ইতিকথা—।'

'আরে, ইতিহাস যদি হইত তো কহাই য্যাত। অ্যাহন তো ইতিহাসের মধ্যম অঙ্কে।—ঘটনা উলটাইয়্যা গিছে গা। শেষাঙ্ক আঁইচবার পারি না। তাই তোরে ডাইকল্যাম। পরামর্শ দরকার—'

'কাহা, এই পরামর্শের জন্য কত যে সময় ব্যয় করেন তা হিশাব নিলে দেইখবেন পরামর্শের আগে যেহানে ছিলেন, পরেও সেহানেই।'

'যোগা শোন। এডডা জট পাকাইন্যা পাটের বাণ্ডিল সোজা কইরব্যার ধরছি। সগলেই তাই চায়। জটটা ছাড়াইব্যার চায়। কিন্তু সুতার আগা নিয়্যা তো মত মিলে না। আমি কই এইডা আগা। ম্যাজিস্ট্রেট আর পুলিশ কয় ঐডা আগা। মানুষজন কয়—সেইডা আগা। জিগাইলে

মুসলমানরা আগা দেহায় দশরকম, হিন্দুরা দশ-আনা তিন-গণ্ডা চাইর-ক্রান্তি রকম।'

'তয় না শুইনল্যাম এই দাঙ্গাডা দাঙ্গা হইলেও হিন্দু শ্যাখ হয় নাই—'

'তাও কওয়া যায়—'

'লোক মইরছে কডা?'

'দুইডা। দুইডাই শ্যাখ। হিন্দুরা রটাইছে তাগ তিনজন মারা গিছে। কিন্তু কেউ দ্যাহে নাই, কেউ একডা শাকিনিও কয় নাই—'

'তাইলে তো মৃত্যু নিশ্চিত। বেশাকিন যহন কুনো সন্দ নাই। ক-ন।'

আইনসভা তৈরি হওয়ায় তোগ চেঁচামেচি দৌড়াদৌড়িতে সরকার তো শিডিউলগো শিক্ষার ব্যাপারে টাকা বরাদ্দ করছে—' চাকরিবাকরিরও শতাংশ পাওয়ার কথা।'

'আমরা ক্যান? আপনে চিল্লান নাই?'

'দ্যাখ যোগেন! তোগ চিল্লান ছাড়া এতডা হইত না। আর শুধু চিল্লানিতেই হইত না। শিডিউলগো ভোটাধিকারও একডা বড় ব্যাপার। নাইলে বিদেশ যাওয়ার বৃত্তি, ১৯জন শিডিউলরে প্রতি বছর ডাক্তারি পড়ার বৃত্তি, আরো সব বৃত্তির লগে প্রতি বছর ৩০ হাজার টাকা, আরো ৫ লাখের বিশেষ ফাণ্ড, একজন স্পেশ্যাল অফিসার—'

'আর-বাড়াইবেন না। সব হয় নাই। কিছু মুখে হইছে। কিছু মাথায় আছে। কিছু কাগজে নামছে। কাজের ঘরে ট্যাঁড়া।'

'সে এখন তোমার জাতভাইরা পরীক্ষায় না পাইলে কী হব? গেল বছরের স্পেশ্যাল ক্লার্কশিপে কয়জন শিডিউল পাশ কইরল?'

'দুই জন।'

'বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে?'

'দুইজন।'

'হায়ার মেডিক্যাল সার্ভিসে?'

'আমারে কি চাকরি দিবেন? নাইলে ইন্টারভিউ ন্যান কেন?'

'আচ্ছা, ছাইড়্যা দে। তোর নি মনে আছে ৩০ সালের হিশাবডা নমশূদ্রদের চাকরির?'

'সে তো চাইরড্যা জিলায়—ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, যশোর আর খুলনা। জনসংখ্যার সিকিভাগ শুদ্দুর আর সরকারি চাকরি দুই শতাংশ তাগ। ষোল আনার ডবল পয়সা।'

'তোর তো স্মরণশক্তি গণেশের নাগাল। একবার দেইখলে বা শুইনলে আর ভুলা নাই।'

'কোন গণেশ?'

'গণেশ তো ত্রিভুবনে একডাই। মা দুর্গার পোলা। তুই যে হিশাবডা কইলি, তারই উপর ভর দিয়্যা সরকার একডা অর্ডার ঝাইড়ল-না তিরিশ সালে, 'কমিউন্যাল প্রোপরশন রেসিও' হইব তিনডা অমুসলমান চাকরি পিছে একডা নমশূদ্রের চাকরি, ঐ চার জিলায়।'

'অর্ডার তো অর্ডারেই শ্যাষ। ঐ অর্ডারে চাকরি পাইছিল কেউ এমন নিজের চক্ষে কুনোদিন দেইখচেন?'

'না, দেখি নাই। কিন্তু অর্ডারডা তো জারি আছে। সেডাতো আর ক্যানসেল হয় নাই।'

'কাহা, ঐ ক্যানসেল হওয়া না-হওয়ার দাম কী? চাকরি দিব তো বামুন-কায়েত-বৈদ্য। সরকারি গাড়ির ঘোড়া যদি মারা যায় আর সেইখানে যদি মানুষ অ্যাপয়েনটেড হয় তাইলে, ঘোড়ার ভ্যাকন্সিতে শুদুরগো চাকরি হইলেও হব্যার পারে। একডাই কারণ—ভ্যাকন্সিডা মুসলমানগ রিজার্ভেশনের বাইরে। বামুন-বৈদ্য তো আর ঘোড়া হইতে পাবর না। এক শুদ্দুররাই

পাইরতে পারে। ওরা একডা শুদ্দুররে চাকরি দিব্যার লাইগলে বরং তারে হত্যা করব। মানুষমারার আর বাধা কী?'

'বাধা ঐ মানুষডাই। স্যায় যদি মইরবার রাজি না হয়।'

যোগেন এই কথার জেরে কিছু বলে না। তার কারণ হতে পারে, হঠাৎ ঐ অন্ধকারে এক ঝাঁক কাকের পাখশাট আর কর্কশ এমন এস্ত ডাক। যে নৈশ নীরবতায় এই কথাবার্তা ঢিমে গতিতে ও চাপা স্বরে রাত্রির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল, সেটা ছিঁড়ে যায়। আবার, কারণটা অন্যরকমও হতে পারে। রসিকলাল সত্যিই রসিক। শস্তা নাটুকেপনা তাকে বিরক্ত করে। হাসতে ও হাসাতে পছন্দ করে। যোগেনের নাটুকে কিন্তু বাস্তব মন্তব্যের সুতো ধরে রসিক যখন শুদ্দুরদের মরণের একটা কারণ তাদের মরণবাসনা, তখন যোগেনকে সামলাতে হয়ই নিজের কথার ঝোঁক।

যোগেন আবার কথা তোলে—'তা কী হইল চাকরির বাদে'।

'এক নমশূদ্র মাগুরা থানায় যায় কনস্টেবলের চাকরির সুবাদে। সে-চাকরির নিয়ম হইল তিন মাস ট্রেনিঙের পর ঠিক হইব কনস্টেবল হওয়ার যোগ্যতা তোমার আছে কী না। তারে ট্রেনিঙের লগে বাছা হইল।'

'ক্যা? বাছাবাছিতে বাদ দেওয়াডাই তো সুবিধা—'

'ঐ। বোধহয় কাগজেকলমে কমিউন্যাল প্রপোরশনডা দেহানোর লগে। তিনডা খোলা, মানে, নন-মুসলিম অ্যাপয়েন্টমেন্টে একজন শিডিউল কাস্ট। এরে বাছছিল আরো তিন কায়েতরে নেয়ার পথ খুইলবার লগে। তাছাড়া পচ্চিমা বামুনরাও তো আছে—বংশের একজন পুলিশে ঢুইকলে তো পরের চতুর্দশ পুরুষ নিশ্চিন্ত।

'ট্রেনিং হইল?'

'অগ, পুলিশের, নিয়ম, থানা থিক্যা চালডাল দিব, নিজের রান্না নিজে কইর‍্যা ন্যাও। তার লগে খুপড়ি-খুপড়ি রান্নাঘর বরাত হয়। এই ছ্যামরারও হইছে। থাহার জায়গা আর রান্নার জায়গা। প্রথম দিন সকালে বোধহয় রাঁধছিল—বিকালেই বড়বাবু ডাইক্যা কয়—তোমারে নেয়া যাবে না, তুমি রান্না কইরলে পাশের উঁচুজাতের পুলিশগ অশৌচ লাইগব। তোমার জইন্য তো আর বেবাক সেপাইরে খারিজ করা যায় না। ছাওয়ালডা নাকী কইছিল আমি রান্নাঘরে রাঁইধব না, বাইরের মাঠে রাঁইধব। সেডা তো আইনে নাই। সুতরাং সেই একদিনকা পুলিশ ছ্যামরা বাড়ি বইল্যা রওনা দিল।'

'কতদিন আগে কাহা?'

'মনে হয় আর বছর—। ছ্যামরা তো মাগুর‍্যা থিক্যা ফিরত আসে কুল্লিয়া দিয়্যা। দারোগাবাবু যহন তাড়াইয়্যা দিল, স্যায় তহন আন্ধারের আগেই বাড়ি পৌছিবার চায়। কুল্লিয়া আইস্যা দ্যাহে দল বাইন্ধ্যা শ্যাখেরা লাঠিশোটা ধইর‍্যা ছুইট্যা চলে। কী ব্যাপার? না, এক আইল নিয়্যা ক্যাচাল হইছে এক শ্যাখের লগে এক ঘোষের। সেই ঘোষের বৌরে কয় শ্যাখ নাকী জবর-দস্তি কইরছে। এই ক্ষুদ্র খবর কী কইর‍্যা থানায় পৌছায় সেই দিনই, সেডা রহস্য। দুই সেপাই আইস্যা তিন শ্যাখরে বাইন্ধ্যা নিয়্যা গিছে। আর ঐ গ্রামের শ্যাখরা জোট হইয়্যা ছুইটতেছে—কাইজ্যা করার লগে। শুইন্যা, এই একবেলাকা পুলিশ ছ্যামরা শ্যাখগ লগে-লগে ছোটে তার গ্রামের দিকে। ওরে দেইখ্যা তো চিনছে শ্যাখেরা—পুলিশের চাকরি পাইছে। তাইলে এই ব্যাটাই খবর দিছে। শ্যাখেরা চাকরি বুইঝব কী? ছ্যামরার চাকরি পাওয়া, শুদ্দুরপোলার চাকরি পাওয়া তাগ কাছে তো গল্পকথা। তাই কথাডা রটছেও বেশি। শ্যাখেরা তারে পিটাইব্যার ধরে। কাইজ্যার পিটানি একবার শুরু হইলে কে কার কথা শুনে। আর সে-ছ্যামরা তো মাটিতে পইড়্যা গিছে অসাড়।

জখমও হইছে কম না। শ্যাখেরা ঠিক কইরল, আর কাইজ্যায় কাম নাই, এই ছ্যামড়ারে আটক কইর‍্যা রাখব। ও যহন তিনজনেরে ধর‍্যায়্যা দিছে, ও-ই তাইলে তাগ খালাস কইর‍্যা আনুক।'

'এমন কপাল আর শুদ্দুর ছাড়া কারো হব্যার পারে? বামুনরা ঠিকই কয় কাহা, চাঁড়ালরা পা রাইখলে মাটি পুইড়্যা যায়। চাঁড়াল বইল্যা চাকরি পাইল, চাঁড়াল বইল্যা চাকরি গেল, চাঁড়াল বইল্যা শ্যাখগো জাঙ্গালে পইড়ল, চাঁড়াল বইল্যা শ্যাখগ হাতে গুম হইল—'

'পরের ঘটনা থিক্যা মনে হয়, শ্যাখগ মাতব্বরদের সন্দ হইছিল—ছ্যামরা মইর‍্যা যাইবার পারে। তালি তো গাঁ শুইদ্ধা ফাটক, তাই আর না—আগাইয়্যা তারে তুল্য নিয়্যা গ্রামে ফির‍্যা যায়। যদি মরে, তাইলে পাচার কইর‍্যা দিবে কাছে খালের জলে। ছ্যামরাডারে লুকাইয়্যা না ফেইললে তো কিছুই করা যাবে না আর, পুলিশের হাতে ধরা না পাইড়্যা! তার উপর, এডা তো হইব পুলিশ-হত্যা, সরকারের লোক হত্যা।'

'ঘইটল কবে এতখান কাণ্ড?'

'অত ঠিক কইর‍্যা তো কওয়া যায় না। সব শুইন্যা মনে লাগে বৈশাখের মাঝামাঝি হইব। কথা তো আর চাপা থাহে না। সেদিন আবার ছিল কুল্লিয়ার উত্তরে ছিরিপুরের হাট। সেই হাটে গিয়্যা খরব পৌঁছায় যে কুল্লিয়ায় শ্যাখ-শুদ্দুরের দাঙ্গা বাইনধছে। এই সব খবর তো যত ছোটে তত বাড়ে। আগুন, খুন, এই সব একসঙ্গে বাড়ে। শুইন্যাই ছিরিপুরের হাট খালি। নমশূদ্ররা ছোটে দক্ষিণে আর মুসলমানরা ছোটে উত্তরে। এই ছিরিপুর হাটফেরত নমশূদ্রগ সঙ্গে কুইল্লার আগেই শ্যাখদের দঙ্গলের সাক্ষাৎ। এইডা বোধহয় শ্যাখদের হিশাবে ছিল না যে উলটা দিক থিক্যাও আক্রমণ ঘটাইব্যার পারে। তাদের আচমকা ভাব কাটার আগেই দ্যাহে—নমশূদ্ররা ঘির‍্যা ফেইলছে। শ্যাখেরা পিছাইয়্যা গেল, ছ্যামরাডারে মাটির উপর রাইখ্যা। তারে দেইখ্যাই তো চেনা গেল। স্যায় না পুলিশ হইছে! হাটফেরত নমশূদ্ররা জানেই না বিষয় কী। তারা ছ্যামরাডারে কান্ধে ফেইল্যা 'জয় জয়' দিয়্যা গ্রামের দিকে ছুটে। কার জয়, কীসের জয়, তা কেউ জাইনলও না।

দুইদিন গেল ঠান্ডা। তিন দিনের দিন—এক্কেরে নড়াইল, শালিখা, লোহারডাঙা থানার শ্যাখরা নিজের-নিজের এলাকার হিন্দু গ্রামের উপর ঝাঁপাইয়্যা পড়ে আর হিন্দুরা তাগ জ্ঞাতিসম্বন্ধী নিয়্যা পালটা ঝাঁপান দিল। পুলিশের হিশাবে সাত-আটশ মুসলমান এক-জমাট হইছিল। পুলিশ নাকী এক্কেবরে রাইট টাইমে আইস্যা পড়ছিল তাই কারো মৃত্যু হয় নাই, কোনোপক্ষেরই গ্রামঘর পুড়ে নাই, তেমন বড় হাঙ্গামও হয় নাই। কিন্তু ঘটনাডা পাক খাইল তার পরে।'

'কইতেছিলেন তো নমশূদ্রগ কথা, এহন আবার কন হিন্দু-হিন্দু—'

'হইল তো তাই, নাইলে তোরে ডাকি? হিন্দুগ ন্যাতারা আইস্যা ভাষণ দিব্যার ধইরছে মুসলমানগ বিরুদ্ধে। হিন্দু মিশন এক্কেরে মাথায় গামছা বাইন্ধ্যা নাইম্যা গিছে। মিছামিছি রটান ধইরছে—কোন্-কোন্ মন্দির ভাঙা হইছে, কোন্ কোন্ দেবদেবীর মূর্তি ভাঙা হইছে। শুদ্ধিযজ্ঞের ডাক দিব্যার ধইরছে। অ্যাহন আর কেউ জানে না, ক্যাচালটা কী, কাগ মইধ্যে, আইলের মামলা না মেয়েমানুষের ঝামেলা, আমি তোরে জোড় দিয়্যা-দিয়্যা ঘটনা কইল্যাম। এতডা গোটা কইর‍্যা আর কেউ জানেও নাই, ভাবেও নাই।'

'আর সেই একবেলার পুলিশ? উচ্চবর্ণের হিন্দু পুলিশ এক ব্যারাকে তার সঙ্গে রান্না কইরব না বইল্যা কমিউন্যাল রেশিওরে যে শকুন ঠুকরায়?'

'তার কথা কেউ কয় না—'

'তো কাহা, আপনে তো নেতা এহানে, বেবাকরে নাম ধইর‍্যা ডাকেন। আপনে তো এহানের

বাতাস শুইক্যা কবার পারেন কোথায় কী পচে, আপনি নি আন্দাজ পান এই আইলের কাইজ্যা তো রায়তগ লগে হইব্যার পারে যাগ জমি নিজের, চাষি নিজের। সে চাষি হিন্দুও হব্যার পারে, মুসলমানও হব্যার পারে। আইলের কাইজ্যা কবে থিক্যা হইল শুদ্দুর-শ্যাখের কাইজ্যা, আর শুদ্দুর-শ্যাখের কাইজ্যা কবে থিক্যা হইল হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা?'

'সেইডাই কথা বাপ। হিন্দু মিশন, কংগ্রেস, আর আমাগ নেতারা তো আমাগ হিন্দুগ জ্যেষ্ঠপুত্র বানাইয়্যা তুইলছে, আমরা, শূদ্ররা যদি না থাকি তাইলে হিন্দুধর্ম যে আর থাহে না।'

'যারে কয় কমিউন্যাল রায়ট, জাতিদাঙ্গা, তা তো এহানে কিছুই হয় নাই। কিন্তু এমন কইর‍্যা কমিউন্যালাইজেশন অব রায়টসও তো আগে কহনো হয় নাই।'

'ঠিক কইছিস বাপ, ঠিক সত্যডা কইছিস। অ্যাহন তো কোনো হাঙ্গাম নাই। আইজ তোরে ঘুরাই, দেখবি হাঙ্গামার টাইমের থিক্যাও সন্দেহ, দুশ্চিন্তা, হিংসা কত বেশি। হাটগুল্যা ভাগাভাগি হওয়ার মুখাখুখি। যা হইল একদিনে হয়্যা গেল। কিন্তু অষ্টপ্রহর হাঙ্গামের ভয় য্যান ভূতের ভয়। ভিতর থিক্যা কুইড়্যা খায়। হাঙ্গাম হওয়া ভাল। হাঙ্গাম যে কোনো সময় ঘইটতে পারে এই ভয়ডায় সর্বনাশ রে যোগা।

'আসল-হিন্দুরা কী কইরল—কাইজ্যার টাইমে আর ভয়ের টাইমে?'

'খাড়ায় তো এক আমার জাতভাইরা। বাবুরা তো আর লাঠি-রামদা নিয়্যা খাড়ায় না।'

'হিন্দুগ বাঁচাইতে শূদ্ররা ক্যান প্রাণ দিবে? ভয় পাবে? আমাগ সঙ্গে তো মুসলমানগ কোনো বিবাদ নাই। নমশূদ্ররা আর ভদ্রলোকগ লাঠিয়্যালি কইরব না। আমরা শূদ্র হইয়া আছি বইল্যাই তো কুলীন হিন্দুরা কুলীন থাইকবার পারে। কাহা—'

'ক বাবা?'

'যার কুল সে রাখুক। যার শুদ্দুর সে রাখুক।'

'তাই তো রাহে রে যোগা, হিন্দুর শুদ্দুর হিন্দুরে রাখে। নাইলে হিন্দু বইল্যা তো এত সমাদর কহনো পাই নাই।' 'কাহা, আপনার কথা ঘুরান। হিন্দুর শুদ্দুর কয় তাগো যারা পোয়াখান হিন্দু আর তিন পোয়া বর্বর—'

'ঠিকই কইছিস। কিন্তু শুদ্দুররা যদি হিন্দু না হয় তাইলে তো হিন্দুধর্মডাও একপোয়া কমই থাইক্যা যাবে নি।'

'সেই একপোয়ার লগে কি দুঃখ?'

ডাকবাংলোটা যে একটু উঁচু ডাঙায়, সেটা ধীরে ধীরে আবছায়ায় স্পষ্ট হতে থাকে—এদের অবয়ব দেখা গেলেও সামনে একটু তলার মাটি আঁধারে ঢাকা। 'সকাল হওয়া' কথাটির তো কোনো মানে নেই, 'সকাল হওয়া' মানে তো টাইম। জমিতে যাকে হাল দিতে হয় আর বাড়ির দুয়ারে যাকে ছিটে দিতে হয় তাদের সকাল আর মহাজনের সকালের টাইম আলাদা। জেলের সকালের টাইম আরো আলাদা। রসিকলাল আর যোগেন একই সঙ্গে বাংলোর সেই উঁচু ডাঙা থেকে সকাল হওয়ার এই পার্থক্য দেখছিল। তাদের কাছে এটা কোনো দৃশ্য ছিল না—প্রকৃতি থেকে যেটুকু সরে দাঁড়ালে প্রকৃতিকে দৃশ্যরূপ দেখা যায় তাদের মনে সেই দূরত্ববোধ ছিল না।

'কাহা, যদি এমন একটা ফেবড়িতে পড়েন যে হয় হিন্দু না-হয় শূদ্র হইব্যার লাগব, এক সঙ্গে দুইডা থাকা যাবে না, তাইলে আপনে কী থাইকবেন?'

'যোগা, আমি কী থাইকব সেডা তো আমার বিবেচনা, ছাইড়্যা দে। কিন্তু নমশূদ্ররা কি এই মীমাংসা সত্য মাইনবে, সেইডা ভাইব্যা দ্যাখ। বংশধারা বইল্যা কথাডা তো ফেলনা না বাপ। বাপঠাকুরের জিভ্যা থিকা যে মানুষডা শুইন্যা আইল, তারা বামুন না বটে, কিন্তু তারা হিন্দু,

এক-এক কালে পৈতাও পইড়ছে, বামুনগর নাগাল তাগও মা-বাপের মৃত্যুতে দশদিনের অশৌচ, এইসব মিলদেখোড়া তো তার হিন্দু পরিচয়ডারেই আকার দ্যায়, রাধাকেষ্ট, রামসীতারে দেবতা মানে, তারে যদি গিয়্যা কও—তুমি শুদু শুদ্দুর হইয়্যাও থাকবা, হিন্দু হইয়ো না, তাইলে স্যায় তোর কাথাড়া বিশ্বাস কইরবে? বিশ্বাস তো দূরের কথা—তোর কথাড়া বুইঝতে পারব? হিন্দুর উলটা তো তার কাছে মুসলমান—তার বুদ্ধিবিবেচনায় তো কথাড়া খাড়াইব—হিন্দুর শুদ্দুর না হইয়্যা তাক্ তুমি মুসলমানের শুদ্দুর হইবার কথা বুঝাও।'

'তাইলে থাকো গা। বামুন-কয়েতরে বাঁচাইতে মুসলমানের বলি হও গা। তোমার মরণ আর কে ঠেকায়, তুমি তো নিজেই নিজের মরণ। একডা তো যুক্তি কইব্যার লাগব, কাহা। সরকারের আর কংগ্রেসের সুবিদা মতন কাইজ্যারে কবে—শ্যাখ-শুদ্দুরগ দাঙ্গা, ঐডা তো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা না। আবার উলডাডাও কবে—আসলে তো হিন্দু-মুসলমানেরই দাঙ্গা আমাগর তো সেই সুবিদা নাই।'

'সুবিদা নাই? নাকী সাহস নাই?'

'এডা সুবিদা-সাহসের কথাই না। কথাড়া বিশ্বাসের। নমশূদ্রগ এই বিশ্বাস নাই যে তারা হিন্দু না। মুসলমানগ সঙ্গে দাঙ্গায়ই কোনো নমো বুইঝব্যার পারে, স্যাও একডা হিন্দু। সেই বোঝা তো বিশ্বাস। গান্ধীজি এইডা জানেন বইল্যাই অস্পৃশ্যগ মন্দিরে ঢোকার নিষেধ তোলার কথা কইছেন। শুদ্দুরগ আরো এডডু হিন্দু মনে হইব নিজেগ।'

'আরো এডডু হিন্দু হইলে কি দাঙ্গাদাঙ্গি থাইমব?'

'তাও তো মনে হয় না রে বাপ', রসিকলালের নীরবতা জুড়ে আলো উঁচু ডাঙা থেকে গড়িয়ে নীচের ক্ষেতে পড়ে ছড়িয়ে যায়। 'যোগা মারামারি যা হইছে, হইব স্যায় কথা বাদ থো। কিন্তু মানুষজন তো ডর খাইয়্যা গিছে, কী শেখ, কী বামুন, কী শূদ্র। বাঁশপাতার মতন কাঁপে রে বাপ—ডরে। কী হইব জানে না—কিন্তু ডরায়। এই যে এতডা বিলের পর বিল, জমির উপর জমি, খালের ভিতর খাল—কুথাও তুই দেখবি না, হেই মাগুরা, নরাইল, সালিখা, লোহারডাঙ্গা চার-চারড্যা থানার কুথাও দেখবি না যোগা, মানুষ একলা হাঁটে, একলা ভাসে। কাইজ্যা তো চিরকালই হয়—চাষির সঙ্গে চাষির, আল নিয়্যা, কী ভাগ নিয়া, কী গাই নিয়্যা। সে-কাইজ্যাও তো ধর্ম আছিল নারে বাপ। অ্যাহন তো হিন্দু-মুসলমান ছাড়া দাঙ্গা নাই। আমাগো এই বিল্যা দ্যাশে উথালপাতাল জমির কোথায় ধান, কোথায় পাট, কোথায় ডাইল, কোথায় সর্ষ্যার খ্যাত বাইছতেই দিন যায়, দিন আর কতটুক সকাল থিক্যা সন্ধ্যা, সেই টুক দিনের বেবাক সময় কি নিজেরে হিন্দু-হিন্দু বইল্যা ভাবা যায় নাকি শ্যাখ-শ্যাখ বইল্যা মনে রাখা যায়?'

রসিকলাল আগেই ঠিক করে রেখেছিল, যোগেনকে নিয়ে একটা ঘুরান দেবে। ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়িতে না, দারোগা-পুলিশের কথামত না, হেঁটে, বা নৌকায়। যতটা পারে ঘুরবে ও হাটেমাঠে তাদের কথা বলবে। ঐ চার থানার কোথায় আজ হাট বসে—সেটা জেনে নিয়ে সোজা সেই হাটেও যেতে পারত, সেখানে একটা মিটিংও ডাকাতে পারত। কিন্তু কী ভেবে রসিকলাল তাও বাদ দেয়, 'বাদ দে, ঘুরান দিব তাতে আর জিগানোর কী আছে? পথে হাট পইড়লে, পইড়ল। না-পাইড়ল তো না-পাইড়ল। নিজের ঘরের রাস্তা জাইনব্যার কি কোর্ট ইনিসপেক্টরের কাছে জিগ্যাবার লাগব। চ—ল্।'

যশোর তো রসিকলালের হাতের পানজা। নিশ্চয়ই আগে ভেবে রেখেছে—যোগেনকে নিয়ে কোথায় ঘুরবে। যোগেন যশোরে পৌঁছনোর পর তাদের সারারাতের কথাবার্তার ফলে রসিকলাল

যা ভেবে রেখেছিল, তার অদলবদলও কিছু হয়ে থাকতে পারে। রসিকলাল মুখ খোলেনি। এক জায়গায় খান তিন বাস দাঁড়িয়েছিল। একটা বাসের কাছে গিয়ে রসিকলাল বেশ উঁচু গলায় ডাকে, 'এই কাততিক, কাত—তিক্'। বাসটা ছিল রাস্তার দিকে পেছন ফেরা। ভিতরে কেউ ছিল না। সেই পেছনের রাস্তার দিক থেকে দাড়ি না-কাটা এক গুঁফো জোয়ান এসে হাজির—'আরে, চেয়ারম্যান সাহেব? কনে যাবেন?'

'কাত্তিক, এডডু ঝিকড়গাছা যাওয়া লাগে-যে। ঠিক ঝিকড়গাছা না, যাব লাউজানি।'

'আমার তো এড্ডা কাক প্যাসেনজারও নাই। আপনে এহানে খাড়াইয়্যা একখান হাঁক পাইড়ে কন, চলো সবাই কাত্তিকের বাসে, আমি বাস ছাইড়ে দেই।'

'এই বুদ্ধি না হইলে তুই আর কাত্তিক কেন রে? বেবাক মানুষরে বাসে তুইল্যা আমি কইরবনে কী?'

'আপনে ঝিকড়গাছা নাইমে যাবেন, আমি আবার অগ ফিরত নিয়্যা আইসব,'—কার্তিকের কথা শুনে যোগেন হেসে ওঠে, যোগেনের হাসি দেখে কার্তিকও হাসে।

'আপনে এইডডু ঐ দোকানে বইসেন, আমি দেহি, বিশ্বাসরে যদি পাই। এ নগা, নগা', কার্তিকের ডাক শুনে এক কমবয়েসি ছেলে এসে দাঁড়াতেই কার্তিক তাকে বলে, 'যা দৌউড়িয়া, বিশ্বাসের বাস ধইরে কবি, চেয়ারম্যান শাহেব খাইড়ে আছেন, ঝিকড়গাছা যাইবেন। ও য্যান অ্যাহনি বাসডা নিয়্যা আসে।' ছেলেটি সঙ্গে-সঙ্গেই দৌড়েছে, কার্তিক তাকে ধমকে ওঠে, 'এই শালো কুইত্তা চোদা, এই দিক দিয়্যা যা, যদি ছাইড়্যা দিয়্যা থাকে, রাস্তায় মুখামুখি হওয়ার পাইরবি। থামাইয়্যা কবি।'

কার্তিকের কথা শেষ হওয়ার আগেই নগা রাস্তার ওপর একটা পাক খেয়ে দৌড়তে শুরু করেছে। কার্তিক তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে থাকে, হাসতেই। তারপর মুখ ঘুরিয়ে বলে, 'আপনারা মালেক, এই দোকানডায় এইটটু পাছা ঠেকান।'

'ঠেকাচ্ছি। কিন্তু বাবা, চা খাইবার কইবা না—'

কার্তিক হো হো হেসে ডান দিকে ছোটে, চায়ের দোকানটা ঐ দিকেই আর রসিকলাল যোগেনকে নিয়ে বাঁ দিকে ঘুরে প্রথম দোকানটার সম্মুখে দাঁড়ায়। যোগেন বলে, 'বসবার লাগে তো আপনে বসেন, কাহা, আমি বইসলেই ঘুমায়্যা পড়ব।'

গোল একটা টিনের চেয়ারে রসিক বসে পড়ে বলে, 'তুই না কইলি ট্রেনে পুরা ঘুমাইছিস। তাইলে তুই শুলি না ক্যা?'

যোগেন তার স্বাস্থ্যল হাসিমুখে বলে, 'সাধে কয়—যোশুর‍্যা মহাজন! মাইগগে দ্যায় আগুন আর মুখে দ্যায় নেমন্তন। সারাডা রাইত কইরলেন বকবক আর অ্যাহন কন—ঘুমাইলি না ক্যান।'

দোকানটা কীসের বোঝা যাচ্ছিল না। এই কথাতে দোকানের মালিক খুব এক চোট হেসে বলে, 'এইডা তো আগে শুনি নাই। কী কইলেন? যশুর‍্যা মহাজন? মহাজন মানেডা কী?'

'বরিশাইল্যা বচন। মহাজনের কাছে টাকা ধাইরলেই মরণ, কিন্তু যশুর‍্যা মহাজন হইলে নিজের শ্রাদ্ধের নেমন্তনও নিব্যার লাগে।'

'সইত্য হোক, মিইথ্যা হোক, কথাডা কিন্তু ভালো। না, চেয়ারম্যান শাহেব?'

'যশোরের মানুষরে জিগ্যান—ঐ কথাই বলবেনে, নামডা শুধু বদলাইয়া কবে বরিশাল বা মানিকগঞ্জ।'

'তাইতেও তো, কথাডা তো সুন্দরই থাকে, বিশেষ কইরে পূর্ব চরণের লাইগ্যা, কী য্যান, কোথায় আগুন দ্যায় আর কোথায় নেমন্তন্ন দেয়।'

কার্তিক দুই হাতে দুই কাপ নিয়ে কোনোরকমে যেন ভয়ে-ভয়ে পা ফেলে আসছে। তার চোখ চায়ের কাপের ওপর। টিপ টিপিয়ে হাঁটার কারণে হাঁটুদুটো ভাঁজ হয়ে গেছে। ও যে এই দোকান পর্যন্ত কাপদুটো নিয়ে আসতে পারবে, নিজেই তা বিশ্বাস করতে পারছে না। যোগেন দেখে দু-পা এগিয়ে একটা কাপ নেয়—'আরে, তোমার চক্ষু তো দুইডা, তা এক-এক কাপের উপর এক-এক চোখে নজর রাইখবার পারো না? এবার দুই হাতে এক কাপ ধইর‍্যা তোমার চেয়ারম্যান পর্যন্ত যাও।' কার্তিক সেই দাঁত বের করা হাসিটা হাসে। 'এর সঙ্গে যদি তোমার হাসিডাও দ্যাও, তাইলে কার্তিক, তোমারে রক্ষা করার সাইধ্য আমার নাই।' কার্তিক দুই হাতে কাপটা ধরে থেকে দাঁড়িয়ে পড়ে, 'আপনি মালেক যদি আমার চুপ-থাকা হাসিডারে স্টার্ট দিয়্যা দ্যান এমন কইর‍্যা, তা ইলে আর কাপখান বাঁচাই ক্যামনে?' কার্তিক কোনোরকমে রসিকলালের হাতে কাপটা ধরিয়ে দিয়ে তার নীরব হাসির সঙ্গতিপূর্ণ হা হা আওয়াজে ফেটে পড়ে।

সেই হাসির সঙ্গে মিল রেখেই যেন লোকভর্তি বাসের টিন বাজাতে-বাজাতে আর তার সঙ্গে মিলিয়ে ড্রাইভারের হর্ন প্যাঁকপেকিয়ে নগা এসে হাজির।

কার্তিক আরো এক চোট হাসে, 'মালেক, মালেক, লাইন থিক্যা বাস তুইলে আনছি। উঠেন, উঠেন।' তারপর নগাকে বলে, 'দেখলিরে ভোদাই, যদি তোর রাস্তায় যাইতি, বিশ্বাসরে তো ধইরব্যার পাইরতি নে। পিছন দিয়া গেইলি বইলে না বাসডা ধরবার পেইলি। এড্ডু পিছনমারা শেখ রে ভোদাই। এই বিশ্বাস, চেয়ারম্যানশাহেব যাবে ঝিকরগাছা—'

ড্রাইভার তার সিটের পাশের সিটে যারা ছিল তাদের বলে, 'এই নাম্, নাম্'। তারা ধুপধাপ লাফিয়ে বেরিয়ে আসে। রাস্তায় যোগেনকে কার্তিক বলে, 'মালেক, উইঠে পড়েন, এই এইখেনে একডা পাও দ্যান।'

যোগেন এক ঝোঁকে উঠে ড্রাইভারের কেবিনে বাঁ পা ঢোকাতেই রসিকলাল চায়ের শেষ চুমুক গিলতে গিলতে চিৎকার করে ওঠে, 'উঁ উঁ উঁ, না না না, আরে নামাও তো যোগেনরে। ড্রাইভারের নিকটে বসাইও না সারা রাত্তির ঘুম নাই। ঝিমাইয়া পড়ব ড্রাইভারের গায়। অ্যাকসিডেন্ট হবই। নামাও, নামাও।'

কার্তিক যোগেনের কোমরের নীচে হাত দিয়েই ছিল, তাকে ড্রাইভারের কেবিনে ঢুকিয়ে ফেলার শেষ ধাক্কা দিতে। হাত না সরিয়ে সে এবার ঠেলাটাকে টানে বদলায়, 'মালেক, আগে ভিতরের পা ডা বাইরে করেন।' সেটা করতে গিয়ে যোগেন বোঝে, তার পুরো ওজনটা পড়ছে কার্তিকের ওপর, তার মানে তার ও কার্তিকের একসঙ্গে পতন। যোগেন তার ভিতরে ঢোকানো পায়ের ওপর জোর দিয়ে এক ঝাঁকিতে কার্তিকের হাত ছাড়িয়ে ভিতরে পড়ে।

'কর্তা, বইসবেন না নাইমবেন?' ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করে। রসিকলাল রাস্তা থেকে হাঁকে, 'যোগা, নাইম্যা আয়, নাইম্যা আয়।'

ড্রাইভারকে যোগেন বলে, 'ডাকে যে।'

'হ্যাঁ কর্তা, পিছনে ঘুমাইব্যার সিট আছে, সেইডাই ভালো। আপনার ঘুমও হইব, অ্যাকসিডেন্টও হইব না।'

কার্তিক ও নগা তখন বাসের ভিতর প্যাসেনজারদের সরিয়ে জায়গা খালি করছে। গেট দিয়ে ঢুকেই ডানহাতের সিটটা খালি করে কার্তিক ডাকে, 'চেয়ারম্যান শাহেব, এই হানে, এই সিটটা ঘুমাইবার সিট, সাইডের জানলায় মাথা হেলাইবেন। আর, দুইজনের মইধ্যে যে মাথা না-হেলাইয়্যা ঘুমাইবার পারে স্যায় পাশে বইসবে। ঘাড় যদি হেলাবারই লাগে তয় পাশের জনের কান্ধে হেলাইবার পারব। বসেন, মালেক, বসেন।'

রসিকলাল আর যোগেন পাশাপাশি বসে, কার্তিক মুখে আঙুল পুরে একটা সিটি দেয়, 'আরে, দ্যাহো, কেমন সাত জন্মের যোটক, কী ফিট কইরছে গ—এই বিশ্বাস, গাড়ি ছাড়, গাড়ি ছাড়।'

ড্রাইভার গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে নি, হ্যান্ডেলমারার পরিশ্রম বাঁচাতে। এবার সে গাড়িটাকে পেছন-ফেরানো বাসদুটোর পাশ দিয়ে নামিয়ে ঘোরাতে থাকে।

বাসটা যাচ্ছিল ঝিকরগাছা হয়ে পানিসারা হাটে। আবার, কাল যাবে ঝিকরগাছা হয়ে শিমুল্যা হাটে। আবার, তার পরদিন হয়ত আরাবপুর হাটে। যশোরের মাইল দশ পরিধির মধ্যে এই হাটবাসগুলো চলে। যশোর থেকে চাষিরা ও দোকানদাররা মালপত্র নিয়ে হাটে যায় আবার এই বাসেই ফিরে আসে। এই বাসগুলিই একদিককার খবর আর-একদিকে ছড়িয়ে দেয় সবচেয়ে আগে। বাসের প্যাসেঞ্জার তো থাকে যশোরের উত্তরের নানা জায়গার লোক—ইছালি, বুনোদ বিল, চোরামন কাঠি, নোহাপাড়া, লেবুতলা হইবটপুর। এরাই আবার কাল যাবে যশোরের পুব-দক্ষিণের কোনো হাটে। কোথাও যদি তেমন কোনো ঘটনা যদি ঘটে, তাহলে দুই-এক বেলায় সে-ঘটনা চারদিকে রটে যেতে পারে।

রসিকলাল ঝিকরগাছাতে নামবে কেন, তা যোগেন জানেও না, জিজ্ঞাসাও করেনি। সে যশোর ততটুকুই মাত্র চেনে, যাতে আন্দাজ করা যায় ঝিকরগাছার কাছাকাছি মাগুরা শিমুলিয়া—এই জায়গাগুলিকেই রসিকলাল বলছিল—বর্ডার এলাকা। বর্ডার এলাকা মানে যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জের বর্ডার যেখানে মিলেছে। পদ্মার দক্ষিণে, চাঁদপুরের পশ্চিমে, নদীয়ার পুবে আর সমুদ্রের উত্তরে এটা তো একটাই সমতলখণ্ড।

রাস্তাটায় কোনো রাস্তা নেই। খ্যাপা মেঘনার মত অসমতল। তফাত এই যে, নৌকো থেকে পড়ে গেলে মেঘনার জল গিলে খাবে, আর, বাস যদি গড়িয়ে পড়ে তাহলে মাটির ওপর কাত হয়েই থাকবে।

রসিকলালকে দেখে অনেকে পেন্নাম দিয়ে যাচ্ছে। অনেকেরই নাম জানে রসিকলাল, অনেকের নাম জানে না। এমন চেনা-অচেনা মানুষজনের সঙ্গে রসিকলাল যখন নানা বিনিময়ে ব্যস্ত, তখন যোগেন সিটের বাঁয়ে গেটের জানলায় ঘাড় হেলিয়ে গভীর ঘুমের ভিতর ঢলে গেছে। তার ঠোঁট একটু ফাঁক।

রসিকলাল একজনকে ডেকে বলে, 'এই, শুডা, এই শুডা।'

ডাক শুনে বাসের পাটাতনে যারা বসেছিল তাদের ভিতর থেকে একজন দাঁড়িয়ে উঠে দুই পা ফেলে রসিকলালের সামনে এসে দাঁড়ায়।

'তুমি শুড্যা তো?'

'হেঁ কত্তা—'

'গড়াইখোলার?'

'হ্যাঁ কত্তা—'

'তোমরা আবার এদিকের হাটে আসা শুরু কইরল্যা কবে?'

'না কত্তা—'

'কী? তুমি হাটে নাইমব্যা না?'

'নাইমব কত্তা।'

'তাইলে যে কইল্যা তোমরা এদিকের হাট করো না—'

'করি তো না কত্তা।'

'তাইলে, আইজ কি বেয়ানবাড়ি নেমন্তন্ন?'

'না কত্তা। আমার বেয়ান তো কেষ্টবলরামে যাহে'।

'আমি কী জিগ্যাই তুমি বোঝ নি?'

'হ্যাঁ কত্তা, বুঝি, এইডা আমার হাট কী না-হাট?'

'বাঃ। বুইঝল্যাই যদি জব নাই ক্যান?'

'জব তো দেইছি কত্তা। এডা আমার হাট না, আইজ যাই।'

'ক্যা? হাট বইদলিলেন ক্যান? সেইডা কন না ক্যা?'

'সেইডা তো কত্তা জিগ্যান নাই। অ্যাহন জিগাইছেন অ্যাহন কই। আমাগ তো হাটে আয় না কইরলে সনসার চলে না ওদিকের হাটের উপায় যদি বন্ধ হয়, তাইলে এদিককার হাট তো লাগে।'

'গড়াইখোলা-র দিকের হাটের উপায় বন্ধ হইল ক্যা?'

'বন্ধ হয় কি হয় নাই, জানা নাই কত্তা। অনিশ্চিত্‌ হয়। নমরা নাকী শ্যাখগো দোকান তুইল্যা দিব শুনি।'

'ও। তাইলি কথাডা গড়াইখালি তক গড়াইছে?'

'আরো গড়াইছে, কত্তা। নমরা নাকী শ্যাখগো ফিইর্যা শুদ্ধ কইর্যা হিন্দু বানাইব।'

'তুমি তো শ্যাখ না?'

'না কত্তা—'

'হিন্দু?'

'জানি না কত্তা। বাবুরা তো কুনোদিন হিন্দু বইল্যা ডাকে নাই। তেনারা মানে কী না মানে।'

'তুমি তো শুইড্যা?'

'তাই তো শুনি, কত্তা'

'তাইলে আবার বাবুগ মানা-না-মানার কী? তুমি যা তুমি তাই।'

'শুইড্যা কি হিন্দু কত্তা?'

'হ্যাঁ। হিন্দু। তুমি তো জানো তুমি শ্যাখ না!'

'তা তো জানি কত্তা। শ্যাখ হইলে তো ছুন্নত হইত। আমাগ বাপদাদার বাপদাদারও ছুন্নত হওয়ার কথা শুনি নাই। আমারো তো ছুন্নত হয় নাই। শুড্যাগ ছুন্নত হয় না। তাইলে আমরা শ্যাখ হব ক্যামনে?'

'তাইলে ভয়ডা কীসের?'

'যদি বাবুরা হিন্দু না-মাইন্যা শুদ্ধি কইর্যা আবার ফির্যা হিন্দু বানাইব্যার চায়! দুইবার কেমন কইর্যা হিন্দু হইব? তার থিক্যা হাট বদলান ভাল যতদিন কাইজ্যা থাহে।'

'তোমারগ ট্যারে তো কাইজ্যা হয় নাই?'

'কাইজ্যা তো কুথাও দেহি হবার না কত্তা। শুনি সর্বত্তর। কুথায় নাকী দুই হাজার শ্যাখ এক হইয়্যা নমগ বাড়িঘর পুড়াইয়া দিছে। কুথায় নাকী নমরা দুই হাজার হইয়্যা কুন মশজিদ ভাইঙ্গ্যা দিছে। কিন্তু কুথাও তো দেহি না কত্তা। গাঁওই পুড়াক আর মশজিদই পুড়াক, পুড়ানের তো চিহ্ন থাইকব কত্তা, ছাই উড়ব, বাঁশ আধপোড়া হইয়্যা থাকব, থাকব না? সে তো কুথাও দেহি না।'

'কেউই দ্যাহো নাই?'

লোকটি বাসের ভিতরের টলমল ভিড়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমরা নি কেউ দেখছ? নমগ গাঁ পুড়ান? মশজিদ পুড়ান? ঘরের মাইয়া লুট? তোমরা নি কেউ দেখছ?' কত্তায় জিগ্যায়।'

কয়েকজনের গলা শোনা যায়, 'দেহি নাই, শুনি।'

একটা গলা শোনা যায়, 'খাড়া রে ভাই। সামনের হাট ফিরৎ টাউন থিক্যা একজোড়া চশমা নিয়্যা খুইজব্যার বারাব। চশমা ছাড়া কি পুড়ান—ভাঙান—লুটপাট দেখন যায়?'

আর-একটা গলা চিৎকার করে, 'এত ঠাট্টাতামাশার কী আছে। না হইলে মিছামিছি রইটছে না কী? সেই ভয়ে তো হাট ছাইড়িছ। তাইলে আর অবিশ্বাসের হেতু কী?'

এই বাসটার ঝিকরগাছা যাওয়ার দরকার ছিল না, তার আগেই বাঁয়ে একটা কাঁচা রাস্তায় বাঁয়ে ঘুরে পানিসারা হাটে যাওয়াটাই এর রুট। যারা এই রুটের নিয়মিত প্যাসেঞ্জার তারা তেলিয়াগাছিরমোড় আসতে না-আসতেই নামার জন্য তৈরি হয়, এখনো দেরি আছে তেলিয়াগাছির মোড় আসতে। আর, তারও পরে তো পানিসারা। মানুষের ব্যস্ততার অভ্যাস হিশেব করে না। যারা এখন তেলিয়াগাছির মোড় এসে গেছে বলে দাঁড়িয়েছে, তারাই গাড়ি বাঁদিকে ঘুরে কাঁচা রাস্তায় পড়লে টলতে-টলতে বসে পড়বে।

কিন্তু বাসটা তেলিয়াগাছির মোড়টায় বাঁয়ে ঘুরল না। যারা দাঁড়িয়েছিল তারা অনেকে মিলে একসঙ্গে রে রে করে উঠল। বাস থামল না। একটা গলা উঠল, 'বিশ্বেসদাদা ঘুমাইয়ে পইড়িছে। আরো একটা গলা উঠল, 'বেরেক ধরে নাই, বেরেক ধরে নাই, গেট খুইলে লাইফ্যে পড়ে।' যে বলল তাকেও কিন্তু গেটের দিকে যেতে দেখা গেল না।। আরো একটা বেশ ভারী গলা উঁচু স্বরে ধমকে ওঠে, 'কী কাউতাল লাইগ্যাছেন গ! দ্যাহেন না কত্তা বইসে আছে, ঝিগরগাছা নাইমবে। কত্তাক কি তেলিয়াগাছির মোড় থিক্যা পানিসারা হাট পর্যন্ত কিল্যাইয়া কিল্যাইয়া নেইই যাবি? মাথায় কি এক ছটাক বুদ্ধি নাই—বুইঝে নিবার যে বাসডা ঝিকরগাছা হইয়্যা পানিসারা যাবে? এই বুদ্ধি নিইয়ে যে কী কইরে পোলাপানের বাপ হয়?'

এতটা তিরস্কারের পর একটু নীরবতা তো ঘটেই। তারই ফাঁকে নিম্নস্বরে কেউ ফোড়ন দেয়, 'পোলাপানের বাপ হওয়ার কামে কি বুদ্ধি লাগে খুব?'

বাসের মধ্যে এমন হাসি ফেটে পড়ে—রাস্তার উঁচুনিচুতে গাড়ির আওয়াজের সঙ্গে মিশে তাতে একটা কোলাহলই তৈরি হয়। সেই কোলাহলে যোগেনের খোলা হাসিও মেশে।

'যাউক! তোর নিদ্রা তালি ভাঙ্গিল—'

'নিদ্রাখান আইতে দিলেন কহন, কাহা। বাস ছাড়ার পরই কারে ডাইক্যা কাঠগড়ায় তুইললেন, স্যায় নিজেই জানে না সে হিন্দু কী না। জানে শুধু বংশে যহন ছুন্নত নাই, তাইল তারা শ্যাখ না। তারপর এহনকার বিষয় হইল—পোলাপানের বাপ হইতে বুদ্ধি লাগে কী লাগে না। কাহা, এমন কোশ্চেন কইরলে তো আমাগ মন্ত্রীগ দম আটকাইয়া মরণ হইব।'

ঝিকরগাছি থেকে লাউজানি আর কতটুকু? তাও তো বাসটা পানিসারার রাস্তা ধরে খানিকটা এগিয়েই দিল। এখান থেকে হাঁটা পায়ে যাওয়াটা দরকারও। কাল রাতে কথাটা সম্পূর্ণ হয়নি, এটুকু রাস্তাতেও সম্পূর্ণ হবে না। কিন্তু লাউজানি কেন, সে-কথাটা তো যোগেনের জানা দরকার। হাঁটতে-হাঁটতে রসিকলাল জিজ্ঞাসা করে, 'তুই লাউজানিতে আসছিস না আগে?'

'এমন কইরে জিগান যেন লাউজানি কোন গয়া-কাশী-বৃন্দাবন। আইস্যা যদি থাকিয়ো তা মনে কইর‍্যা রাখার কী? আর যদি নাও আইস্যা থাকি তাও-বা মনে কইরব্যার কী? লাউজানিতে নি তাজমহল আছে—কাহা?'

'ঠিকঠাক কইব্যার গেলে, তাজমহল নাই। তাজমহল তো শুধু আগ্রায় হয় নাই, আরো তো কিছু শর্তমর্ত ছিল—মোগল সম্রাট, সাম্রাজ্য, সে-সব তো আর লাউজানির নাই। তবে ছোড

একডা রাজা, তার রাজধানী, বাঁয়ে নদ কপোতাক্ষ, ডাইনে নদ হরিহর। দ্বিতীয়ডা মইজ্যা গিছে।'

'বরিশালে য্যামন ঢেলা মাইরলে জমিদারের গায় লাগে, যশোরে তেমনি প্রতাপাদিত্যের গায়ে লাগে। একডা রাজা—'

'একডা কী রে? বার ভুঁইয়্যার দ্যাশ—'

'এমনই তিন গণ্ডা ভুঁইয়্যা যে তাগ নামধামও ঠিক কইরব্যার পারেন নাই। আমাগ কৃষক-প্রজা পার্টির মতন। হকশাহেব একাই পার্টি হইয়া বইস্যা আছে আর বেবাকরে এক্সপেল করে।'

'নতুন-নতুন পার্টিতে অ্যামন হয়। লিডার লাগে রে, লিডার লাগে। হকশাহেবের নাগাল লিডার আর হয়? মন্ত্রিসভায় যহন সবাই মুসলিম লিগ হইয়া গেল, হকশাহেবও লিগ হইয়া গ্যালেন। খাজাগজারা তো পাইরলে গত কালই হকশাহেবরে ফেল্যাইয়া খাজারে প্রধান করে। লাটশাহেবেরও তাই ইচ্ছা। তোর শাহেব মেম্বারগও তাই ইচ্ছা। তর অফিসারফফিসারগও তাই ইচ্ছা। এতগুলা পক্ষের ক্ষমতা হয় হকশাহেবের সরানোর? কত বড় লিডার তাইলে ভাব। আরে, বাঘের তো আর সদর থাহে না যে খুইলনার বাঘ, বরিশালের বাঘ, বাখরগঞ্জের বাঘ। বাঘ, মানে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, বুইঝলি, এক-এক থাবায় যে বর্ডার ভাঙে। হকশাহেব।'

'কইতেছিলেন তো লাউজানি সাম্রাজ্যের কথা, সইর‍্যা গিয়্যা হক সাম্রাজ্যে পৌছাইলেন যে!'

'না। শ্যাষ কথাডা আগে কইয়্যা নেই। নাইলে ভুইল্যা যাইব। আর তুই ছ্যামড়া কথায়-কথায় এত কথা কাটিস যে কথার রাস্তা ঠিক রাখা মুশকিল। অ্যাহন আর আমার কথা কাটিস না বাপ। শ্যাষ কইরবার দে। তারপর যা বলার বলিস।'

রসিকলাল বলে যে এই দাঙ্গাগুলো রটানো দাঙ্গা। রটায় কলকাতার হিন্দু কাগজগুলিই বেশি, দেখাদেখি মুসলমান কাগজও পালটা রটায়। কিন্তু মুসলমানরা বাংলা-দৈনিকে দুর্বল, তাদের জোর ইংরাজি দৈনিকে। আর হিন্দুরা বাংলা-দৈনিকে সবল। ফলে রায়ট রটানোর সুযোগ হিন্দুদেরই বেশি। কিন্তু রটিয়ে লাভটা কী? লাভ হল—হিন্দুদের দলপাকানো ও হিন্দু মিশনের কাজ বাড়ানো। হিন্দু মিশন ছাড়াও আছে প্রণবানন্দের ভারত সেবাশ্রম সংঘ। ওরা ফরিদপুরে বেশি। মিশন আর সংঘ দুইই এখন 'শুদ্ধি আন্দোলন' করছে। তাদের বক্তব্য—এদেশে ইসলাম ধর্ম ছিল না। নবাব সুলতানদের সময় নমশূদ্রদের জোর করে মুসলমান বানানো হয়েছে। তখন যারা পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছে, তারাই এখনো নমশূদ্র। তাহলে হিন্দুশাস্ত্র মতে প্রায়শ্চিত্ত করলে মুসলমানরাও হিন্দু, মানে নমশূদ্র হয়ে যেতে পারে। 'হিন্দু মিশন' আর 'সংঘ' এই শুদ্ধিকরণ শুরু করেছে। এদিকে লাউজানি তার প্রধান ঘাঁটি।

এই পর্যন্ত বলে রসিকলাল প্রশ্ন করে, 'কিছু খটকা লাগে?'

'খটকা আর রাইখলেন কোথায়। এমন মুসলমান পাবে কুথায় যে হিন্দু হব্যার চায়।'

'পাব না ক্যান? গরিব মানুষের প্রাণে বাঁচার কোনো উপায় আছে আর? চাইরদিকে হিন্দু গ্রামে ঘেরা একডা মুসলমান পাড়া। সে পাড়াডারে ঘির‍্যা ধইর‍্যা ভয় দেখায়, প্রাচিত্তির কর, প্রাচিত্তির কর, সে মানুষগুলা না-কইরা কতদিন বাঁচব রে?'

'যারা এডা কয়, করে, তাগ কি হিশাব নাই কাহা, পূর্ব বঙ্গে মুসলমানগ ঘেরে হিন্দু পাড়াই বেশি। এমন হইলে তো তারাও বামুনগ ঘির‍্যা কইব, মুসলমান হও, সুন্নত করো, গরুর মাংস খাও, নামাজ পড়ো।'

'আমার আন্দাজ যদি ঠিক হয় যোগা, সেইডা শুরু হইল বইল্যা। শুরু হইলেই কুরুক্ষেত্র। শ্যাখরা যাতে এইডা শুরু করে, ঐ মিশন আর সংঘের মতলব তাই। শুদ্ধিকরণে তো উঁচা হিন্দুগ মত নাই। কয়-না—আর-সব ধর্ম গ্রহণ করা যায়, এক হিন্দুধর্মেই জন্ম নিতে হয়। তাই

মিশন আর সংঘ নতুন তত্ত্ব রটাইছে—এহানকার বেবাক মুসলমান হইল কনভার্টেড নমশূদ্র। তাগ যদি শুদ্ধ কইর‍্যা আবার নমশূদ্র করা যায়, তাইলে উচ্চ হিন্দুগ তো ক্ষতি নাই। ক্ষতি তো নাইই বরং লাভ আছে। দাঙ্গার সময় বামুনগ তো বাঁচায় শুদ্দুররা। সুতরাং শূদ্রের সংখ্যাবৃদ্ধিতে বামুন-কায়েত-বৈদ্যের মঙ্গল। সব হিন্দুরই মঙ্গল।'

'কাইল রাইতে এই কথাডা তুলছিল্যাম বইল্যা-না আমার গলায় পাঁড়া দিয়্যা খাড়াইলেন, কাহা? কইলেন, কস কী, শিডিউলরা মাইনবে এই কথা যে তারা হিন্দু না?'

'যোগা, খেয়াল রাখিস, তহন কথা হইছিল হিন্দু-মুসলমান-শিডিউল তিন জাতরে নিয়্যা। অ্যাহন কথা হইতেছে হিন্দু-মুসলমান নিয়্যা। কথা দুইডা আলাদা।'

'আপনে যত আলাদা ভাবেন, তত আলাদা না। তবে মুসলমানগ প্রাচিত্তির কইর‍্যা হিন্দু বানাইলে আদমশুমারিতে হিন্দুর সংখ্যা বাইড়ব। সেডা হিন্দুগ স্বার্থ। শুদ্দুরের সংখ্যা বাইড়ব। সেডা ধরেন মাঝারি হিন্দুর পর্যন্ত কাজে লাইগব—রায়টের সময়। অন্য সময় থাইকল শুদ্দুরের মতন। আর, প্রাচিত্তিরের বদলা যে সুন্নত সে তো ধনে চাকু না পইড়লে বামুনগ মাথায় ঢুকব না। কইলেন না—লাউজানি ক্যা?'

রসিকলাল লাউজানির ইতিহাস বলে। সে ইতিহাস যে বানানো, গল্প থেকেই তা স্পষ্ট হয়।

লাউজানির নাম আগে নাকী ছিল ব্রাহ্মণ নগর। রাজা মুকুট রায়ের রাজধানী। সিকান্দর শাহ ছিল বিরাটনগরের রাজা। সেই সিকান্দর শাহের ছেলে গাজি। গাজির চোখে পড়ে, মুকুট রায়ের মেয়ে চম্পাবতী। সে সুন্দরবনের বাঘদের নিয়ে একটা কাহিনি তৈরি করে লাউজানি আক্রমণ করে। মুকুট রায়ের সেনাপতি ছিল দক্ষিণ রায়। গাজির সঙ্গে তার প্রবল যুদ্ধে দক্ষিণ রায় হেরে যায় ও সুন্দরবনে পালিয়ে যায়। চম্পাবতীর সঙ্গে বিয়ের পর গাজি আর দক্ষিণ রায়ের মধ্যে সন্ধি হয়। দক্ষিণ রায় সুন্দরবনের এক অংশের রাজা ও রাজা থেকে দেবতা হয়ে যায়। সুন্দরবনের আর-এক অংশের রাজা ও দেবতা হয়ে যায় গাজি। পরাজিত রাজা মুকুট রায় সবংশে ও প্রজাদের নিয়ে মুসলমান হয়। তার এক ছেলে পালিয়ে গিয়ে গোবরডাঙার কাছে চারঘাটে আশ্রয় নেয়। পরে সে-ও মুসলমান হয় ও 'পীর ঠাকুরবর' নামে বিখ্যাত হয়। গাজি ও দক্ষিণ রায়কে হিন্দু-মুসলমান নিরপেক্ষে সকলেই সুন্দরবনে ও সমুদ্রে রক্ষাকর্তা দেবতা মনে করে ও যে-কোনো বিপদের আশঙ্কায় এদের নামে সিন্নি চড়ায়।

'এরপর আর কী প্রমাণ কবুলিয়ৎ দরকার হয় যে বাংলার মুসলমান মানেই কনভার্ট শূদ্র? সুতরাং হিন্দু মিশনের বা সংঘের তো অধিকারই আছে তাগ হিন্দুধর্মে রিকনভার্ট করার।। এই ইতিহাস কও ইতিহাস, রূপকথা কও রূপকথা, দেবদেব্‌তাদের জন্মকথা কও জন্মকথা, পীর-গাজি পূজার কারণ কও কারণ, লাউজানির মত হাতে গরম কি আর পাওয়া যায়? হাতে গরম মানে, লাউজানির কোনো পোয়াতির প্যাটের বাচ্চাডাও তো এই গল্প বিশ্বাস করে। এও বিশ্বাস করে যে এই কাহিনীতে অবিশ্বাসের মূল্য অবধারিত মৃত্যু। মরণ থিক্যা ধর্মান্তরণের কাজ কারো কাছে সহজও ঠেইকবার পারে। মরণের কারণের তো অভাব নাই।। মোহনা গাঙ আর সমুদ্দুরে যাইব্যার লাগে মাছের লাইগ্যা। বনের ভিতর ঢুইকতে হয় মধুর লাইগ্যা, কাঠের লাইগ্যা। সাপ আছে, বাঘ আছে, কুমির আছে, হাঙর আছে মরণের দূত। এগ কাছে এড্ডা মাইনষের প্রাণ আর কতটুকাইন্যা? এমন মরণ-তাড়নার মানুষের কাছে হিন্দুই-বা কী, মুসলমানই-বা কী। যাতে প্রাণ বাঁচে তাই ধর্ম। যোগা, মিশন আর সংঘ তাই লাউজানিরে হেড-অফিস বানাইছে। এই রায়টগুলা রটান-রায়ট। এই প্রাচিত্তিরের পক্ষে। কলকাতার কাগজে খবর তুলার পক্ষে।'

'এহানে লিগ হয় নাই?'

'হয় কি আর নাই? এত্দিনে?'

'তারা আপত্ত করে নাই?'

'এহানে যদি লিগ বানায় স্যায়ও তো দক্ষিণ রায় ও গাজির বিশ্বাসী ভক্ত। তারে দিয়্যা হিন্দু মারাইতে পার, কিন্তু গাজি-দক্ষিণ রায় থিক্যা সরাবার পাইরব্যা না।'

রাজা মুকুট রায়ের রাজবাড়ি বলে যে-একটা ধ্বংসস্তূপ ছিল সেটাকে একটা অংশে গেরুয়া নিশানে সাজিয়ে হিন্দু মিশনের কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। গেটে দু-জন দারোয়ান ছিল কিন্তু কোনো গেট বা দরজা ছিল না, থাকার কথাও নয়। রসিকলাল ও যোগেন মাঠ দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতেই রাজবাড়িতে ঢুকে পড়েছিল। কাল্পনিক গেটের দুই দারোয়ান তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় রসিকলাল বলে ওঠে, 'আপনাগ পরিচয় জাইনব্যার লগে তো সরকার আমাগ পাঠাইছে।' যোগেন হেসে ওঠে। দারোয়ানরা এই উত্তর ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। রসিকলাল ও যোগেনের চেহারা-পোশাক মিলিয়ে তারা যা বুঝে নিয়েছিল, তাতে ওদের দু-জনকে বাধা দেয়ার সাহস হয়নি। যোগেনই দেখায়, 'রাজবাড়িতে কি সাপখোপের সংসার নাই—নাকী তারাও হিন্দু হইয়্যা গিছে? দ্যাহেন কাহা, একটু-আধটু তো সারাইয়্যা নিছে।'

গেরুয়্যাপরা একজনকে দেখা যাচ্ছিল। সেই এগিয়ে আসবে নাকী এরাই এগিয়ে যাবে এই নিয়ে কিছুটা দ্বিধা ছিল। গেরুয়াই এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনারা কি মিশনে এসেছেন? না, নিজেদের কাজে কোথাও যাচ্ছেন?' লোকটি বেশ শক্তসমর্থ, লম্বাও বটে। কথা বলার মধ্যেও ভদ্রতা আছে।

যোগেন বলে, 'আপনারা কি হিন্দু মিশনের এমন অফিস আরো খুইলছেন, অন্য জিলাতেও?'

'হ্যাঁ, ঠিক জিলাভিত্তিতে নয়। আপনারা নিশ্চয়ই মিশনের ইতিহাস জানেন। এটা তো এখনকার কোনো প্রতিষ্ঠান নয়। এই শতাব্দীর প্রায় গোড়া থেকেই তো মিশন হিন্দুদের পুনর্গঠনের চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমাদের নীতি প্রথম থেকেই স্বামীজির দ্বারা নির্ধারিত। তিনি যে-হিন্দু জাগরণের কথা বলেছিলেন, আমরা সেই কর্মসূচিই পালন করছি।'

'স্বামীজি? কোন স্বামীজি?' যোগেন ভেবেছিল স্থানীয় কোনো গুরুদেবগোছের নাম শুনবে। সন্দেহও ছিল কারণ এই লোকটি কথা বলছিল খুব স্পষ্টস্বরে, সম্ভবত দৃঢ়তা দেখাতে।

'স্বামী বিবেকানন্দ।'

'স্বামী বিবেকানন্দের তো রামকৃষ্ণ মিশন, না কাহা?'

'জানি তো তাই। কিন্তু তাগ তো সিলমোহর একডা হাঁসেরে ঘিরা্যা একডা চক্কর। এহানে তো তা দেহি না। আপনারা কি রামকৃষ্ণ মিশনের?'

'আমরা সহযোগী প্রতিষ্ঠান। ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রচারে হিন্দুরা যাতে ধর্মান্তর গ্রহণ না করেন ও ধর্মান্তরিত হিন্দুরা যাতে পুনরায় হিন্দুধর্মে আসেন, সেই প্রচারই আমাদের প্রধান কাজ। ফলে, হিন্দুদের আচারসংস্কারের পরিবর্তন করাও, যেমন অস্পৃশ্যতা, জলাশৌচ, আমাদের কাজ।'

'গান্ধীজি যেমন কন?' যোগেন বলে।

'হ্যাঁ, হয়ত গান্ধীজির এখনকার কথার সঙ্গে আমাদের বক্তব্যের মিল আছে, কিন্তু ১৯১০-১১ সালে কলকাতা হাইকোর্টের জজ, সারদাচরণ মিত্র যখন এ আন্দোলন শুরু করেন, তখন গান্ধীজি এসব নিয়ে কিছু ভাবেননি। ১৯২৩ সালে সিরাজগঞ্জে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মিলনে যখন হিন্দুসভা গঠিত হয় ও অস্পৃশ্যতাবিরোধী কর্মসূচি নেয়া হয়, তখন গান্ধীজি প্রধাণত খিলাফৎ—আন্দোলনের নেতা। ১৯২৪-এ স্বামী অভেদানন্দ আমাদের সংগঠনকে নেতৃত্ব দেন। পরের বছর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ফরিদপুর সম্মিলনে শপথবাক্য, পাঠ করান—সেই মুহূর্ত থেকে

কেউ অস্পৃশ্যতাদোষে দোষী হবেন না।'

রসিকলাল বলে ওঠে, 'ফরিদপুর? ১৯২৫? গান্ধীজি ছিলেন তো? না?'

গেরুয়া একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলে, 'হতে পারে। আমি জানি না। কিন্তু হিন্দু মিশনের আন্দোলন, বড় আকার নেয় ১৯২৯-এ স্বামী সত্যানন্দের নেতৃত্বে।'

'আপনারা এইখানে একডা কেন্দ্র তৈরি করবেন ক্যা?' যোগেন সরাসরি জিজ্ঞাসা করে, 'এত জায়গা থাইকতে এইখানে লাউজানিতে ক্যা? এহানে তো হিন্দুর সংখ্যাও খুব বেশি না।'

'সবরকম সংবাদপত্রে তো প্রতিদিনই খবর বেরুচ্ছে যে এদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে হিন্দুরা বিপন্ন।'

'হিন্দুগ শক্তিবৃদ্ধির লগে?'

'আমরা আমাদের সমধর্মীদের বিপদে তাদের পাশে দাঁড়াতে চাই। এটা তো সব ধর্মের লোকই করে। হিন্দুরা করলে দোষ?'

'দোষগুণের কথা না। এখানকার হিন্দুগ বিপন্নতার কথা আপনারা কেমনে জাইনলেন এইডা এডডু জাইনবার চাই।' যোগেন বলে।

'সে তো কাগজপত্র দেখে বলতে হবে। সব তো আর মনে থাকে না।। তবে এটা খুবই বিপজ্জনক জায়গা। মানে, লাউজানি নয়। যশোর-খুলনা-ফরিদপুরের সন্নিহিত এলাকা। সব চেয়ে বড় বিপদ একটা দূর গ্রামেও মুসলমানরা অন্য জিলা থেকে লোক এনে হিন্দুদের ঘিরে রাখে।'

'জায়গাগুলার নাম একটু কন না। কাগজ দেইখ্যাই কন। কাগজ আছে তো এইখানে'—রসিকলালের কথায় লোকটি 'দাঁড়ান, দেখছি' বলে ভিতরে চলে যায় ও একটু পরেই মেনিফোল্ড পেপারে টাইপ করা একটা কাগজ নিয়ে আসে, 'এখানেও সব নেই।' বলে পড়তে থাকে। গোপালগঞ্জে তো লেগেই আছে, নড়াইল, ওদিকে টাঙ্গাইল, খুলনা, মাটি ডাঙা, বাগের হাট, মোল্লা হাট—কোথাকার নাম বলব আর কোন নাম বলব না। বলতে পারেন, সর্বত্রই পাটকাঠি শুকনো করে রাখা। একটা ফুলকি পড়লেই হল।'

যোগেন হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিল, তারপর খুব মন দিয়ে দেখতে লাগল। দেখতে-দেখতে জিগগেস করে, 'এ লিস্টি কি কাগজ দেইখ্যা বানানো, থানার সঙ্গে মিলান হইছে, মানে ভেরিফায়েড?'

'সেটা তো আমরা বলতে পারব না।। এটা আমাদের কলকাতা হেডঅফিস দিয়েছে। এর পরেও দিয়েছে। ভেরিফাই না করে কি দেবে?'

'এটা তো একটা ছোট লিস্ট। তাতেও কেমন গোলমাল দেখেন। বাগেরহাট আছে আবার মোল্লাহাটও আছে। দুইডাই এক। ধরেন, খুলনাও আছে, ডুমর‍্যাও আছে। এই সব লিস্টিতে অকুস্থল ও তার জিলা বা মহকুমার উল্লেখ একসঙ্গে থাকা দরকার? নইলে মনে হওয়ার পারে যে সারা জিলায় য্যান সর্বত্রই একই সঙ্গে দাঙ্গা চইলতেছে। ধরেন কথায় কথায় বিখ্যাত ঢাকা রায়ট তো আসলে ঢাকা সিটি রায়ট। এই খবরের ভিত্তিতে আপনাগ কাজ তো উলট্যা ফল দিবে। যেহানে রায়ট হয় নাই সেহানেও আপনারা গিয়্যা হিন্দুগ মনোবল এমন বাড়ান বাড়াইলেন যে সেইডা বাহুবলে বদল হইয়া গেল। হাউসের লগে বাধায়্যা দিল রায়ট।'

'এটা আপনি কী বলছেন? আমরা দাঙ্গা ঠেকাতে এসে দাঙ্গা বাধিয়ে দেব?'

'সেডা তো আপনাগ দাঙ্গা ঠেকানোর পদ্ধতির কারণে। আপনে তো বারেবারেই কন—হিন্দুগ মনের জোর বাড়ানডাই আপনাগ কাজ। দাঙ্গার অপরপক্ষের সঙ্গে আপনাগ কোনো সম্বন্ধ নাই।'

'সেটা কী করে থাকবে। আমাদের লক্ষ তো হিন্দুধর্মীয়দের শক্তি জোগানো ও প্রয়োজনীয় সাহায্যদান। মুসলমানদের এমন অনেক জাতিসংগঠন আছে। হিন্দুদের মধ্যে আমরা আছি আর প্রণবানন্দজি আছেন।'

'আপ্‌নারা বড়, তাই ছোটগ ধরেন না। আমিই কই, আপনে শোনেন, বন্ধু জগদ্বন্ধু সমাজ, সত্যসাধন সভা, গোরক্ষা সমিতি, হিন্দুরক্ষা সমিতি। এগুলা সবএই সব জিলায় আছে। বড়বাজারে গিয়্যা আরো অনেক সমিতি পাইবেন। মুসলমানগ সব সমিতিই বড় কোনো সমিতি অনুমোদিত, আঞ্জুমান, জামাত যাই হোক। আপনাগ উদ্দেশ্য যতই ভাল হোক, আপনাগ কাজকাম বিপজ্জনক। আপনারা দাঙ্গা থামাইব্যার মানুষ না, দাঙ্গা বাধাইব্যার মানুষ। আমাদের এই জায়গার বেবাক মানুষ ডর খাইছে—হিন্দুই বলেন, মুসলমানই বলেন। আপনারা এই জায়গা ছাইড়্যা চইল্যা যান।'

'চলে আমি যাব না। আপনাদের পরিচয়ও তো জানি না।'

'উনি যশোরের মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান ও এম-এল-এ। আমি বরিশাল থিক্যা। ঐ একই পরিচয়, আমার পরিচয় থিক্যা চেয়ারম্যানডা বাদ। অ্যাহন অ্যাসেম্বলি খোলা। সেহান থিক্যা আমরা গোলমালের খবর পাইয়্যা আসছি।'

'আপনারা কেন এসছেন সেটা আপনাদের ব্যাপার। আমি কেন আছি সেটা আমার ব্যাপার।'

রসিকলাল বলে ওঠে, 'একডাই বেমিল। আপনার ব্যাপারটাই আমাগ ব্যাপারটা বানাইছে। আপনারে আমাগ ব্যাপারে নাক গলাইতে নিষেধ করার জইন্যেই আমরা আসছি। আমাগ তো জানাইতে হইব পরিস্থিতিডা। জানানোর লগে আইনসভায় ভাষণ দিব্যার পারি। অথবা, হোম মিনিস্টার নাজিমুদ্দিনরে রিপোর্ট কইরব্যার পারি। অথবা, জিলা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে জানাইবার পারি। আপনার পক্ষে তিনডাই সমপরিমাণ বিপজ্জনক। আইনসভায় হিন্দু মিশন লইয়্যা কথা বলার লোক কম। আমাগ কথার উপরই সরকাররে কাম কইরতে হব। মানে, নাজিমুদ্দিনশাহেবেই যা করার কইরবেন। তিনি তার জাত ভাইগ কথাই আগে ভাববেন। আর লোক্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে জানাইলে তারা কুনো রিস্ক নিবে না। আপনাগ জিলা থিক্যা চইলে যাওয়ার অর্ডার দিবে। সবগুলাতেই বাঘের থাবা এবং আঠার ঘা। এক আমাগ কথা যদি মাইন্য করেন, তাইলেই আপনার কোনো ক্ষতি নাই। আমরাও কাউরে কিছু কব না। আপনেও কবেন না। কেউ জিগ্যালে কব, থাইম্যা গিছে।'

লোকটি গম্ভীর হয়ে কিছু ভাবে, ঠোঁট কুচকে ও ডানহাতের আঙুল ঠোঁটে বুলায়। 'আপনাদের আমি অনুরোধ করছি—আমার কথাটা ভাবুন। এই কাজটা মিশন আমাকে দিয়েছে। আমি যদি ফেইল করি, তাহলে তো আমার কাজটা যাবে। এখনকার দিনে কাজ কি ছাড়া যায়?'

যোগেন চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করে, 'এটা আপনার চাকরি? মানে, জীবিকা?'

'নইলে এই কাজে কেউ আসে? যশোরে এসে 'আনন্দমঠ'-এর 'ভবানী মন্দির' বানাতে', লোকটা তেতো হাসে।

'এসব কাজ তো বিশ্বাস থিকে হয়। মাইনায় কি একাজ হয়?'

'বিশ্বাস যে আমার একেবারেই নেই, তা নয়। তার সঙ্গে লোভও আছে। এতগুলো টাকা। আরো চাইলে আরো। কাউকে হিশেব দিতে হবে না। আর যদি একটা বড় ঝামেলা পাকাতে পারি, তাহলে তো কথাই নেই।'

'আপনার কথাবার্তা শুইন্যা তো মনে হয়, বড় কলেজে পড়াশোনা—'

'হ্যাঁ। নামটা বলব না। আমি ভাবিই নি আপনাদের লেভেল থেকে এমন রেজিস্টান্স ফেস করতে হবে।' একটু বিষণ্ণ হেসে যোগ করে, 'এটাই বোধহয় প্যাসিভ রেজিস্টান্স।'

ফেরার পথে যোগেন হেসে বলে, 'এইডা দ্যাহনের লাইগ্যাই টেলিগ্রাম?'

'কইব্যার পারিস। আমি তোর কাহা হইব্যার পারি, বয়স তো খুব বেশি না। তবে, ক্যান জানি দ্যাশের কথা ভাবা ধরছি কম বয়স থিক্যা। তোগ বেলায় তেমন হয় নাই। দ্যাশে কী হইতেছে, তার থিক্যা বেশি দরকার নিজেরে খাড়া করা। খাড়া হওয়ার পর দ্যাশট্যাশ বুইঝলেই চলব। ঐ উনতিরিশ সালের স্বামী সত্যানন্দের হিন্দু মিশনের কথা তোরও জানার কথা তহন কি তোর ওকালতি হইয়া গিছে?'

'না। আরো দুই-এক বছর পর।'

'তহন এই শুদ্ধি শুরু হইছিল। আরে, আমরা যদি হিন্দুই, তাইলে আবার সাবান ঘইষ্যা হিন্দু বানানের কামডা কী। স্যায় সব তারপর বন্ধ হইল। না, আমাগর কারণে না, শ্যাখগ কারণে। তাগও শুদ্ধ কইর‍্যা হিন্দু বানাইতে গিয়া দুই-একডার মাথা গিছে, দুই-একডার পাও গিছে। এইবার দাঙ্গার খবর পাইয়্যা আইস্যা দেখি, আবার সেই শুদ্ধি, আবার সেই মিশন। খবরের কাগজে রক্তগঙ্গার খবর পইড়্যা সেইখানে যাইয়্যা জিগ্যালে দেহি তারাই উলট্যা পোঁছে—কোথায় কী হইছে। তহনই মাথায় আইল—রটাইয়্যা দাঙ্গা বাধাইব্যার চায় কেডা? এহানকার মানুষ হবারই পারে না। কেউ তো আর নিজের গাঁয়ে কাইজ্যা বান্ধাইতে চায় না। তারপর কাগজের আরো খবরের তল্লাশে আরো ঘুরান দিয়্যা বুইঝল্যাম—অ্যাহন দাঙ্গা ছাড়া কাইজ্যা নাই। কাগজে। সে জমির আইল বা বাড়ির সীমানা বা রাস্তার গাছের ফলের ভাগ নিয়্যা নিত্তি চব্বিশঘণ্টার ঝগড়াও হয়, তালিও সেটা দাঙ্গাই হইব। তহন একদিন যাই এসপির লগে। তারে জিগাই, এই যে কাগজে ছাপায়, মোট হাজার মুসলমান জমা হইছিল, আবার ছাপায়, চার-পাঁচ গ্রামের নমশূদ্ররা মিল্যা হাজার মানুষ মিলছিল—আর সব জায়গাতেই পুলিশ যথাকালে পৌঁছায় বইল্যা মারামারিডা শুরু হইবার পারে নাই, তাই জখমও নাই, খুনও নাই—এতডা বিত্তান্ত কোথ্ থিক্যা পান? শাহেব চইট্যা গিয়্যা কয়—'এগুলা তো লোক্যাল থানার ঘটনা, আমারে জিগানোর মানে কী, আমি কি থানার দারোগা।' শাহেবের রাগ দেইখ্যা শান্তি পাইল্যাম। কইল্যাম—এই-যে লিখছে লোহারডাঙ্গায় পাঁচ শ সেপাই রুট মার্চ করায় হিন্দু-মুসলমান সবাই ভয় পাইয়্যা পল্যায়্যা যায়। আপনাগ লোহারডাঙ্গা থানায় সব মিলাইয়্যা পাঁচ শ সেপাই হব তো? আপনারা তো আবার বামুন ছাড়া সেপাইয়ের চাকরি দেন না। এক লোহারডাঙ্গায় পাঁচশ বামুন সেপাই পাইলেন কই? এই প্রশ্নডার জব তো আপনারাই দিতে হয়। আর যদি অপারগ হন তালি থাক, অ্যাসেম্বলিতে হোম মিনিস্টাররে জিগাই। উনি আপনারই জিগ্যাইয়া আমারে জব দিবেন। কথা শুইন্যা শাদা চামড়ার কানে জল। কয়, 'এসব খবর তো কাগজের রিপোর্টাররা জোগাড় করে পাঠাতে পারে। সে-দায়িত্ব আমরা কেন নেব?' আমি নমস্কার দিয়্যা উইঠ্যা কইল্যাম—আমিই তাইলে খবর নিয়্যা আপনারে জানাইয়্যা যাব। আপনে আপাতত মাগুরা থানায় সেপাইয়ের পোস্টে এক নমশূদ্র প্রার্থীরে কেন যোগ দিতে দেয়া হয় নাই, সেইডা জাইন্যা রাইখবেন। যেদিন আইব সেদিন আমাগ সংবাদ দেয়াথোয়া হবে।'

'কাহা, এই কামে আইনসভা থিক্যা ছুটি?'

'আরে, ঘটনা না জাইনলে কোন্ আইন বানাবি রে বাপ। কতডা মাথা লাগে বাপ, লোহার ডাঙ্গায় পাঁচশ সেপাই জড়ো কইরতে, আর হাজার মুসলমানের জমাৎ বানাইতে। খাজারে জিগ্যা, কবে জিলার ঘটনা। জিল্যারে জিগ্যা, কবে লোক্যাল। লোক্যালরে জিগ্যা কইব গ্রামের ঘটনা—এফআই আর নাই। তালাশ কইরতে-কইরতে মিশনেরে পাইল্যাম মরিচা নদীর ঘাটের হাটে।'

'সেডা কুথায়? শুইনছি বইল্যা তো মনে নেয় না।'

'শুইনলেও নিত না। ঐ হাটের মানুষগরই মনে নেয় ন্যায় না মইরচ্যা ঘাটের হাট। এডডা দেড় হাত-দুই হাত চর। শক্ত দড়ি দিয়্যা বাইন্ধ্যা বঁড়শিতে টান দিলে উইঠা আইসব। জনা বিশ মানুষ—পুরা হাটে। মাথা গুইনলে আরো কমব্যার পারে। তো জিগাইল্যাম—এই কয়ডা মানুষের একডা হাট কীসের লাইগ্যা। মাতবর জব দিল—আমাগ থিক্যা একজনরে প্রতি সাতদিনে কায়েম খাশে পাঠাই ধানচাল আইনব্যার লাইগ্যা। খাওয়ার জইন্য না। আকারগুলা মনে রাখার লাইগ্যা। না-হয় তো বাড়ি ফির্যা মরিচের রং ভুইল্যা বেগুনরে মরিচ ভাইব্যা বসব। তহন আমি জিগাই—এমন একডা পাণ্ডববর্জিত হাটে ঐ গেরুয়া ক্যা? মাতবর কয়—রিলিফ দিব্যার আইছে। কীসের রিলিফ। কাইজ্যায় যারা জখম হইছে তাগ লাইগ্যা। আপনাগ এই চরেও নি কাইজ্যা হইছে, হিন্দু-মুসলমানে? না, হয় নাই, কয় যে হব্যার পারে তো আগাম রিলিফ, শুধু হিন্দুগ লগে। উনারে কওয়া হইছে, তাইলে রিলিফ ফেরত নিয়্যা যান। আমাগ এই চরখান তো পৃথিবীর বাইরে। হিন্দু-মুসলমান তো হয় পৃথিবীতে। আমাগ মরিচের রং মনে রাইখতে সাতদিন পরপর একজনরে খাশে পাঠাইব্যার লাগে। রিলিফডা আপনে ফেরত নিয়্যা যান। আমরা যহন ফিরব তহন আবার না-হয় শ্যাখ-শুদ্দুর হইব। তহন নিব রিলিফ।'

যোগেন হো হো হেসে উঠে বলে, 'আপনে খুঁইজ্যা খুঁইজ্যা এই রবিনসন ক্রুশোর দ্বীপ পাইলেন ক্যামনে?'

জবাবে রসিকলালের গলার স্বর বদলে গেল, 'জিদে আর অপমানে। আমি যশোরের মানুষ। অ্যাহন যদি কেউ কোপ দ্যায়, তাইলেও গা থিক্যা যশোরের রক্তই পড়ব। আর আমার যশোররে আমারই অজানা কইরব্যার ধইরছে কারা। যদি জাইনব্যার পারি তালেই হইল। না-জানা নিয়্যা আমি বাঁইচি ক্যামনে রে। খবরের কাগজে পড়ি আর নাম ধইর‍্যা-ধইর‍্যা যাই। সেহানেই মইরচ্যা নদীর ঘাটের হাট দেহা খোঁজা শুরু করি। আর আইছিল্যাম বইল্যাই হিন্দু মিশনরে চিন্যা ফেলি। যোগেন, একবার ভাইব্যা দ্যাখ—কতডা নকশা, বুদ্ধি, মানুষ চিন্যা এতটা দূরের চর খুঁইজ্যা বাইর করা যায়। ভাইবল্যাম, তোগ এইডা দেখান্ দরকার, না-হয় তোরা বিশ্বাস যাবি না। তোর কথাই মনে আইল। টেলিগ্রাম ছাইড়ল্যাম। ততদিনে লাউজানির এ মিশনের খবর কানে আইছে।'

লাউজানি থেকে ঝিকরগাছা হয়ে, ওরা একটা মাল বওয়ার ছোট ট্রাকে মাগুরার দিকে কিছুটা এগিয়ে গেল। যোগেনকে নিয়ে রসিকলাল কোথায়-কোথায় যাবে কী কী দেখাতে, তা নিয়ে যোগেনও কিছু জিজ্ঞাসা করেনি, রসিকলালও কিছু বলেনি।

যোগেন কিছু জিজ্ঞাসা করেনি, কারণ সে জানে রসিকলাল কিছু বলবে না। রসিকলাল কিছু নতুন বিষয় আবিষ্কার করেছে। সেইসব বিষয়ের মধ্যে ফেলে রসিকলাল যোগেন কী ভাবে সেটা বুঝতে চায়। সেই ভাবনা, রসিকলালের সঙ্গে না মিললেও এখনই বোঝা যাবে না। রসিকলাল কোনো ইশারাও দেয় না, কোনো মতও দেয় না।

'কাহা, লোকে নিন্দা দিবে না? ভরা আইনসভায় বিরাট-বিরাট বিলের তর্ক চইলতেছে আর কাহা-ভাইপো ইশকুল পালাইয়া চিত্রা নদী-ভৈরব নদের ফাঁকফোকর দিয়্যা মাষকলাই আর বড়ই তুইল্যা খ্যাবার ধইরছে।'

'তুই শ্রাবণ মাসে মাষকলাই দেখিস! তোর মাথার অবস্থা তো খুব সুবিধার লাইগে না রে।'

'শ্রাবণ মাসে যা পাওয়া যায় স্যায় কি আপনে পাইতে দিবেন? বরিশালে তো বারমাইস্যা জল। এই যশোরের মত তো দুরবস্থা না যে বর্ষার উপর ভর কইর‍্যা ধানপুঁটির ঝাঁক আইব?'

ওরা একটা বড় আলে পাশাপাশি হাঁটতে পারছিল। এত নানা রঙের হলুদ ও সবুজ ধানে তারা এমনই ডুবে ছিল যেন সে-রংগুলি তাদের গায়েমুখেও লাগছিল। আকাশ যেহেতু বেশি দূর গোল থাকতে পারে না বা মানুষের চোখ যেহেতু কোনো একটা দিক ছাড়া চোখ মেলে রাখতে পারে না—তাই ওদের মাথার ওপর শ্রাবণের একটু জলছুট আকাশের সামান্য পাতলা কিছু ছাইরঙা মেঘ পাড়ের দিকে কাল হয়ে একটু পরে আবার বেরিয়ে আসছে। পৃথিবীজোড়া সেই সবুজ আর হলুদের নানারকম ধানের ক্ষেতের ওপর রোদ তাই এলোমেলো ছড়িয়ে পড়ছিল, মুছে যাচ্ছিল আবার মেঘের ছায়াগুলোও খুব বড় নদীর দূর স্রোতের মত বইছিল। ধান্যপ্রান্তরের ভিতর থেকে যেমন অদৃশ্য ও বিবিধ শ্রুতির ধ্বনি ওঠে, কখনো পুনরাবৃত্তিমান, কখনো মাত্র একবার, কখনো ক্রমনিকট, কখনো রণনহীন কেঠো, কখনোই প্রতিধ্বনি তৈরি হয় না, দুইদিকের ক্ষেতের জল কোথাও কুলকুল করে আর কোথাও চকিত রোদে ঝিলকায়।

ধানপুঁটির কথায় রসিকলাল একটু তিরস্কারের সুরে বলে, 'দেখ্ যোগা, অসইত্যা কথা কইস না। বারানোর টাইমে নিজেও ছাতা নিল্যাম না, তরেও দিল্যাম না। ভরা শ্রাবণ। এখন যদি বৃষ্টি নামে—তালগাছের নাগাল খাড়াইয়া-খাড়াইয়া ছাতাইর‍্যা পাখির লাগান ভিজব্যার লাগব। আর তুই কস ধানপুঁটির কথা। ধর্, ক্ষ্যাতে নাইমা এক আঁজল তুইল্যাই আইনল্যাম, এই দূরাদরশ্চক্রে কুথাও কি আগুন দেইখব্যার পাস? ভাজবি কীসে? পোড়াইবিই-বা ক্যামনে?'

'ক্যা? বাজ পড়ে না? কাঠি ধইরলে জ্বইলব না?'

'তা অয়তো জ্বইলব্যারও পারে কিন্তু শ্রাবইন্যা ক্ষ্যাতে কি শুকনা কাঠি পাবি রে বাপ! সব তো জলে ম্যাদামাইরা গিছে।'

কোনো এক সময় কোনো একটা দিগন্তের টুকরো ছিঁড়ে ওরা একটা খালে পৌঁছায়। ওদের ওপারে নিয়ে যেতেই একটা ছই ঢাকা ছোট নৌকো ছিল জলে, তাতে, একজন লোক গামছায় মাথা ঢেকে কাত হয়ে, দুটো হাঁটু গুটিয়ে শুয়েছিল। রসিকলাল বা যোগেন এমন পারাপারে এতই অভ্যস্ত যে এটাকে তাদের বানানো লাগল না। এমনকী—এই খাল, জল, খেয়া ও মাঝির দিকে তারা হয়ত চাইলই না। মাষকলাই আর ধানপুঁটির আজাইড়্যা কথার মতই আজাইড়্যা দেখা হল।

পৌঁছনোর পর বোঝা যায়—রসিকলাল শিমুইল্যা গ্রামেই আসছিল। এক মাত্‌বরের বাড়িতে বসে লোকজন ডাকা হল। রসিকলাল সেই লোকজনদের ও মাতবরকে বলে, 'শোনো, আমাগ দুপুরের খাওয়ার কুনো চেষ্টা দিয়ো না। যে-কথা জিগাইব, তার জব জানা থাইকলে বইল। না-জানা থাইকলে বইল না।'

'যা জিগ্যাব্যার জিগ্যান। এর মইদ্যে দুপরের খাওয়া-না-খাওয়ার কথা আসে কোথ্থিক্যা? আপনে বিস্মরণ গেলেন কত্তা, আমাগ দুই বিহানে খাওয়া?'

'আচ্ছা, তাইলে জিগানোর কথাডা জিগ্যায়ই ফেলি। এরে যে সঙ্গে আনছি, আমার লগে আইসছে বইল্যা স্যাক অগ্রদানী বামুন ভাইব না। তোমরা কি চেন কেউ?'

'চিনি বইল্যাই তো মন করছিল, আপনার কথায় তো সন্দ হইল, সত্যি চিনি তো?' একজন বলে।

এসব কথা ঠারেঠোরে চলে। যা বলা হয়, তার উলটো বোঝানো হয়। যশোরের এত ভিতরের দিকের গ্রামে যোগেনকে না চিনতেই পারে। উলটোদিকে আবার ফরিদপুর-বাখরগঞ্জ এমন এক নদীর খেপ যে ওপারটাকেই নিকটতর মনে হতে পারে।

রসিকলাল একটু রাগের ভাব দেখিয়ে বলে, 'চেনো তো চেনো, তা নিয়্যা এত কওয়ার

কী আছে? কথাডা হইল, তোমাগ এহানে কি কাইজ্যা হইছে?'

মাতবর বলে, 'এডা কি কইলেন কত্তা। অষ্টপ্রহর তো এক কাইজ্যাই হয়। কোন কাইজ্যার কথা কন? স্বামীস্তিরির? না ভাইভায়ের? না দুই ভাইয়ের দুই বৌয়ের? না জমির আইলের? বা আইলের গাছের?'

রসিকলাল এবার সত্যি একটু রেগে বলে, 'দ্যাহো মাত্‌বর, নড়াইলের ফাজিল সাইজো না—'

নড়াইল কাছেই, সেখানকার জমিদারকে রাজা ডাকে। কলেজ আছে। টাউনে আরো যা থাকে, আছে। চুলকাটার সেলুন হচ্ছে সবচেয়ে বড় আধুনিকতা। সেইসব মিলিয়ে 'নড়াইলের ফাজিল' বলে একটা কথা চালু আছে। অনেকে নাকী বরযাত্রী হিশেবেও সঙ্গে নিয়ে যায়।

রসিকলালের রাগ দেখে মাত্‌বর হেসে বলে, 'আচ্ছা, মণ্ডলমশায় কন তো! আমরা তো দুনিয়া দেখি নাই কিন্তু আমাগ এই চারপাঁচডা জিলা মিল্যাইয়া যে বিল্যাখাইল্যা জায়গা, এইহানে সব মানুষ তো সব সময়ই রাইগ্যা থাহে। বিশ্বাসমশাইয়ের মত ঠান্ডা মানুষ ক্যামনে বুঝেন যে এত রাইগ্যা এতগুলা মানুষ থাহেই-বা ক্যামনে, কামকাজই-বা করে ক্যামনে, সনসারই-বা করে ক্যামনে?'

'কাহা এডডু বিরক্ত আছে। আমারে কইলকাতা থিক্যা তার কইর‍্যা আনাইছে। নিজেও আইনসভা থিক্যা ডুব দিছে। ক্যা? না, উনার মনে হইছে—কাগজে ছাপাইয়্যা রট্যাইয়া যশোরে দাঙ্গা বান্ধানো ধরছে।'

'রায়টের কথা কন না কী?'

'হ্যাঁ। আপনাগ নাম বারাইছে কাগজে। আপনাগ এইহানে কি কোনো গোলমাল হইছে?'

'রায়ট? হিন্দু-মুসলমানে? এইডা তো আমরাও নতুন শিখব্যার ধইরছি। যারা শিখাবার আসছিল, তাগ কইল্যাম—কাইজ্যা তো হিন্দু-হিন্দুতেও, আমাগ মতন চাঁড়াল হিন্দুর সঙ্গে চাঁড়াল হিন্দুরও হয়, বাবুহিন্দুগ বাবুহিন্দুর লগে হয়—কইর‍্যা দিব্যার লাগে হয় আমাগ না-হয় শ্যাখগ, শ্যাখ-শুদ্দুরেও হয়। কিন্তু সেডা যে হিন্দু-মুসলমানের তা তো জানিনা। যারা আইছিলেন স্যায়রা শিখাইলেন সেইডা হইল রায়ট। বিশ্বাস-কত্তারে শুনাইতে চাইল্যাম, নতুন শিক্ষা, কত্তা গেলেন চইট্যা'।

রসিকলাল বলে, 'এড্ডু বিতং দিয়্যা কও। কারা আসছিল?'

'কইল তো হিন্দু মিশন। রায়টে যাগ ক্ষতি হইছে, জখম হইছে, বাড়ি পুড়ছে তাগ সহায় দিব্যার লগে। নগদ টাকায়, জিনিশপত্রে। আমরা যহন কইল্যাম—আমাগ তো রায়ট হয় নাই, তাইলে ক্ষতিও হয় নাই। যে-ক্ষতি হয় নাই, সেডা পূরণ নিব ক্যামনে। শুইন্যা তো মিশনের বাবুরা বেবাক কাগজ বাইর কইর‍্যা এপিঠ দেখে, ওপিঠ দেখে আর জিগ্যায় আপনাগ গ্রামের নাম কী? আমরা কই যে শিমুইল্যা। জিগ্যায় শিমুইল্যা না কী ঘ্যান কইল রে, আলিজান, আমার তো মুখে আসে না—'

'শিমুলিয়া'।

'তো আমরা কইল্যাম, বাপের জন্মে শুনি নাই। তহন জিগ্যায়, পোস্টোফিস কি? কইল্যাম—জানি না, বাপও জাইনত না। জিগায়—থানা কী? কইলাম—দ্যাহেন, আপনারা ভুল জায়গায় আইছেন। আমাগ নিয়্যা আর থানাপুলিশ কইরবেন না। তহন কইল—'আপনাগ এইগুল্যা পাঠাইছে। আপনাগ না দিলে হিশাব মিলব না। আপনারা ভবিষ্যতের কথা ভাইব্যা রাইখ্যা দেন।' শুইন্যা কইল্যাম 'এডার মানে তো খাড়ায় আপনারা জানেন আমগা এইহানে রায়ট বাধবই, তাই তার ব্যবস্থা মজুত দিচ্ছেন।' তারও পর যহন কয়—শুধু হিন্দুগ লাইগ্যা

সাহায্য, তহন তো বেবাক মানুষ হাইস্যা খুন। আপনারাই তাইলে রায়ট বাধাইবার মানুষ। আপনারা এ্যাহন বিদায় হন। আমরা আমাগ মইধ্যে কথাবার্তা কইয়া ঠিক করি—আমরা কে কে হিন্দু আর কে কে মুসলমান, তার বাদে আপনাগ খবর দিব।'

রসিকলাল জিজ্ঞাসা করে যোগেনকে, 'এইগুলা এডডু সনতারিখ বসাইয়্যা এজাহারের নাগাল লিখ্যা নিলে ভাল হইত না যোগেন?'

'খুবই ভাল হইত। আমি জায়গার নাম লিখছি। কিন্তু স্যায় তো হব সব আমাগ কথা। ইগো এজাহার হইলে এভিডেন্সের দর কত উঠত—'

'সে-কথাডা কবি তো?'

'কেমন কইর‍্যা কব কাকা? আপনি কহন আমারে কইছেন যে আপনে আমারে নিয়্যা কোথায় যাবেন না, আর কোথায় যাবেন।'

'অ্যাহন কী করা যায়?'

'কিছুই না। দরকার তো শাদা কাগজ। সেডা তো শ্রাবণ মাসের মাষকলাই থিক্যাও দুর্ভিক্ষ।'

'কয়্যা দেহি না!'

'তার থিক্যা আমার কথাডা শুনেন। আমি এগ নাম আর হালসাকিনডা নিয়্যা রাখি। আর আপনে এগ কইয়্যা দ্যান এজাহারের বিষয়ডা কী।'

'ঠিক কইছস, সেইডাই করি। আরে সাধে কি আর প্র্যাকটিস করি নাই। এত সব নিয়ম মনে রাখা যায়?' রসিকলাল বিএ বিএল হওয়ার পরও কোর্টে মাত্রই দুই-একদিন গিয়েছিলেন, তারপর সিআর দাশকে ধরে কর্পোরেশন স্কুলের মাস্টারি নেন। রসিকলাল বলে ওঠেন, 'শুনো' আমাগ খালি হাতের অতিথ্ পাইয়্যা তোমরা সবাই মিল্যা যে এই গল্পডা বানাইল্যা, সেইটা মণ্ডলমশায় লিখ্যা রাইখছে। অ্যাহন তোমাগ নামগুল্যা কও। এত্দিনে তো গনা হইছে নিশ্চয় যে তোমাগ কারা এক পোয়া হিন্দু আর কারা এক পোয়া মুসলমান। বাছাধনগণ, এইবার স্যায় নামগুল্যা কও দিনি।'

'এজাহারডা শুনান। মণ্ডলমশায় কী লিখছেন?' কেউ বলে ; 'তারপর তো নাম।'

'মণ্ডলমশায় তো ইংরাজিতে লিখছেন। সেইডা পইড়লে কি তোমার বুঝনের সুবিধা হব নে?'

'চারি পাকে শুইন্যা-শুইন্যা ইংরাজি আওয়াজ তো চিন্যা ফেলছি কত্তা। ইংরাজিতেই কন।'

'আরে লিখছেন তো মনে-মনে। বড়-বড় উকিল যারা, তারা বাংলা-আওয়াজ শুইনতে শুইনতে ইংরাজি কইর‍্যা নেয়। না অইলে তাগ কানেও ঢুকে না, মাথায়ও ঢুকে না। উকিলবাবুর কান আর মাথাডা তো তোমার ঘাড়ে ফিট করা যাব না। গেলে, দেইখতে পারতা, স্বচক্ষে, বাঁ কান দিয়া বাংলা কথাগুলা হুহু কইর‍্যা ঢুকত্যাছে আর ডাইন কান দিয়্যা ইংরাজি হইয়া উইঠতেছে। সে-যা দৃশ্য। অ্যাহন বাবা ত্যা তোমাগ নামগুলা বলো। আমরা লিখ্যা লই।'

ভিড়ের পেছনে একটি মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে হঠাৎ হাত তুলে বলে ওঠে, 'খাড়ান দি, খাড়ান দি। আমার কাছে নামগুলা আছে।' বলেই সে ভিতরদিকে ছুটল আর-একটা তক্তা কাগজ ফড়ফড়িয়ে ফিরে আসে। গত ভোটের একটা ভোটার লিস্টের একটা পাতা, কার্বন কপি করা। এ দিকের গ্রামের জন্য মেয়েটিকে দিয়ে করানো হয়েছিল, এই অনিবার্য কারণে যে এই এলাকায় সেই একমাত্র মেয়ে যে ক্লাশ ফাইভে পড়তে কাছাকাছি কোন-একটা জুনিয়ার হাইয়ে যায়।

রসিকলাল জ্বলজ্বলে মুখে কাগজটি হাতে নিয়ে তাকিয়ে থাকে। তারপর যোগেনের দিকে বাড়িয়ে ধরে। যোগেন দেখেই বলে ওঠে, 'কা হা, এডা তো আরো ভাল হইল। লিখ্যা

দিব—ভোটার লিস্টের এত নম্বর হইতে এত নম্বর ভোটার। এজাহারের মেরিট বাড়ব। নাম দিল্যামই না ধরেন।'

রসিকলাল হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বলে, 'নামগুল্যা যহন পাওয়াই গিছে তহন আর দেরি কইর‍্যা কাম নাই। আরে, আমাগ ভাত দিব্যার কও। যে শাকখান আখায় তুইলছে, সেডা না হইলেও হইব। আমাগ তাড়া আছে গ।'

'শাক তো দূরস্থান, খাড়ান, বিছন ছিটাই', বলে মাতবর বাড়ির ভিতর দিকেই ছুটল।

'ভুল হইয়্যা গেল নি?' রসিকলাল নিজের মনে বলে ওঠে অথচ কেউ যদি জবাব দেয় তেমন একটা আশাও আছে, 'চোরামনকাঠি হইয়্যা এইহানে আইলেই হইত। অ্যাহন কি দিয়ারা দিয়্যা যাওয়া চলে।'

'অ্যাহনও যদি দিয়ারা হাঁইট্যা যান, তাইলে দিয়ারায় পানি থাইকব কহন?'

রসিকলাল তখন যোগেনকে জিজ্ঞাসা করে, 'আমি তো তরে আমার সন্দেহডা প্রকাশ করি নাই। তর মনে কি সন্দেহ কিছু উইঠছে?'

'উইঠব্যার পারে। কিন্তু রুমালডা অ্যাহনো দেহি নাই। সেইডা দেহান।'

'আমারে ইয়াগো বানাবার চাস, বানা, কিন্তু রুমালডা পাইলে তো শেষ পর্যন্ত যাবি?'

'কাহা, শ্যাষ পর্যন্তডা কদ্দুর। আমার আঙুলের জোরই বা কত—এইসব তো মাপা হয় নাই। জানাডাও তো একডা কাম।'

'তাইলে চলেন, সেই আসা আসেন কিন্তু খবরডা ক্যান যে দ্যান না!' বলতে-বলতে মাতবর এসে দাঁড়ায়।

ভিতরে, ওরা বসেছিল ও কথা বলছিল একটা ঘরের পেছনে বসে, তার পাশ দিয়ে ঢুকলে দুয়ারটাকেই ভিতর বলা যায় যদি, 'একটা পিঁড়ি আর একটা ভাঙা মোড়া পাতা। পাশে একটা বড় ঘটিতে জল। যোগেন বসতে যাচ্ছিল মোড়াটায়, রসিকলাল বলে ওঠে, 'যোগা, তোর সাইজ আইটব না রে মোড়ায়, প্র্যাকটিশ লাগে, দেহিস না কোমরকাইত্যা।'

মাতবর দুটো মাটির সানকি এনে এদের সামনে দেয় আর-এক বৌ মাটির একটা বড় হাঁড়ি নিয়ে এসে এদের সামনে বসে উটকো হয়ে, হাঁড়ির ভিতর হাত ঢুকিয়ে মুঠো করে ভাত তোলে।

ভাতের সঙ্গেই কয়েকটা কাঁচালঙ্কা আর ছোট পেঁয়াজ পড়ে সানকিতে। এক মুঠো ভাত মুখে দিয়ে পেঁয়াজে কামড় দিয়ে রসিকলাল বলে, 'নুন দে রে।' মাতবর নিজেই দৌড়ে নুন নিয়ে আসে। যে ভাত দিয়েছিল সেই-ই একটা পাতিল নিয়ে এসে সেটা কাত করে দুজনের পাতে ডাল ঢেলে দেয়।

'মাতবর রে, তোগো কৃষক পার্টি তো জমিদারি তুইল্যা দিল। আইন আইনছে।'

'উইঠা গিছে? নাকী উইঠব-উইঠব করে? হাটে শুনছিলাম।'

'এইডা তো ভাল কইছেন মাতবর। উঠানের আগে তো জানা চাই আছেডা কনে? মইর‍্যা গিছে? তালি তো কাঁধে তুইলবারই লাগব—গোরেই দ্যাও আর চিতায় দ্যাও। আর যদি গর্তে কাদায় হাঁটু ভাইঙ্গ্যা পইড়্যা থাকে, তালি তো হিশাব কইরব্যার লাগব—উঠানের খরচা আর দফনের খরচা কোনটা কম?' যোগেন বলে।

'আছিল্যাম যে-আন্দাজে সেইডা যহন মিল্যাই গেল তহন কয়্যা যাই, চোখকান খোলা রাখিস, হিন্দু-মুসলমানের কাইজ্যা...'

বাধা দিয়ে মাতবর বলে, 'রায়ট।'

রসিকলাল হাসিমুখেই সংশোধন মেনে নেয়, 'হ্যাঁ, রায়ট বান্ধাইব্যার ষড়যন্ত্র চারি পাকে।

বরিশালের যোগেন মণ্ডল—৩৭

বাইরের লোকগ ঢুকব্যার দিস না। তগ নামডা উইঠল ক্যা?'

'কথাডা তো ভাবছিল্যাম হাসিঠাট্টার কথা। ভিতরে যে এতখান তা তো বুঝি নাই,' মাতবর বলে।

'বুইঝছিল্যা ঠিকই। নাইলে দানসামগগিরি ফিরত দ্যাও? আরে ভৈরব পারায়্যা নোয়াপাড়া যাই?'

'তাছাড়া যাবেন কোথ্ দিয়্যা। দিয়ারায় তো অ্যাহন সরোবর, মাস তো শ্রাবণ।'

'নাও নাই?'

মাতবর একটু ভেবে বলে, 'কাম কী? আমাগ তো ঐ দিকে চলন নাই। দিয়ারাও নাও আইটক্যালে। তার থিক্যা ঘুর্যাই যান।'

শিমুইল্যা থেকে উত্তরপুব ধরে হাঁটতে-হাঁটতে ভৈরব পার হতে হল দুই জায়গায়, আরাবপুর হয়ে ওরা নোয়াপাড়ায় পৌঁছায়। যোগেন তার ঘড়ি দেখে বলে, 'তিন ঘণ্টার উপর। মাইল দশবার, না কী? এইডাই তো যাতায়াত?'

'এই পথে তো দশ মাইলের উপর, পনের মাইলের নীচে। বর্ষা ছাড়া তো দিয়ারা শুখা। দিয়ারা দিয়্যা আর কয় মাইল—ধরো মাইল পাঁচ।'

'রায়টটা হইল কবে লিখছে?'

'তারিখ মনে নাই—জ্যৈষ্ঠের শ্যাষ বা আষাঢ়ের শুরু। তহন কি দিয়ারা দিয়্যা যাতায়াত চলে?'

'তা কওয়া যায় না। একটুআধটু বৃষ্টিতে, বা, পুরা বৃষ্টি শুরু হওয়ার পরও কয়েক দিন না গেলে দিয়ারা দিয়্যা যাতায়াত বন্ধ হয় না।'

'মাত্‌বর তো কইল—এদিকে অগ আসাযাওয়া কম। তাইলে তো নোয়াপাড়ার মানুষেরও আসাযাওয়া বাড়ার কুনো কারণ নাই। সদর যশোর তো বরাবর দক্ষিণে। তাইলে, কাহা, যদি রায়ট বাঁইন্ধ্যাই থাহে, তাইলে কি রায়ট করার লগে মানুষজন মাইল পনের দৌড়াইয়্যা শিমুইল্যা যাইব? ক্যা? লোক কয়ডা শিমুইল্যার—হাতগনতি তো। শিমুইল্যায় তো হিন্দুমিশন গিছিল রিলিফ নিয়্যা। অবিশ্যি অগরো ইনফরমেশন গ্যাপ ঘইটতে পারে।'

'এডা কিন্তু আলাদা আসন, রিজার্ভ না, কাস্ট হিন্দুগ, মানে খোলা। অ্যাহন তো গ্রামের দিকে যাওন যাইবে না। টাউনে আমাগ পার্টি অফিসে চল্।'

'আপনাগ পার্টি অফিস?'

'ক্যা? এ বোকা, আমি না এই ভোটে চাঁড়াল হইল্যাম শুদ্ধি কইর‍্যা। তার আগের থিক্যা আমি বরাবরের কংগ্রেস। তুই ক্যামনে ভুলিস।'

'ভুলি নাই, কাহা। মুহূর্তের বিভ্রম। চলেন আপনাগ অফিসেই। অগ খোলা মনে কথা কইব্যার দিবেন। ধমকাইয়া উইঠবেন না। আমার পরিচয়ও আড়াই হাতি কইরবেন না। আমি ঝগড়াঝাঁটি কইরলে উইঠ্যা পড়বেন।'

'থো তুই। উইঠব ক্যা? আমি তো জিলা কংগ্রেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট। অবিশ্যি সন্ধ্যা ঘন হইলে যশোর ফেরার ব্যবস্থা করা কঠিন হইব।'

নোয়াপাড়া বড় জায়গা, ঝিকরগাছার মত বড় না হলেও। আবার, লাউজানির মত রাজবাড়ির ভগ্নস্তূপও নেই। নতুন জায়গা, গঞ্জ টাউন। শেড দেয়া গুদামঘর আছে, আগে ছিল নীলের, এখন পাটের। 'কংগ্রেস ভবন' সেই পাটগোলার কোণে, কাঠের দোতলা, বাইরে দিয়ে সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে দোতলার কাঠের বারান্দা। সেখানে যে দু-তিনটে ঘর, সেটাই নিশ্চয় অফিস। অবিশ্যি

নীচেও হতে পারে অফিস। কংগ্রেসের তো আবার নানা শাখা আছে—খদ্দর, হরিজন সেবা, বন্দীমুক্তি, কৃষক সমিতি।

রসিকলাল যে-ঘরে ঢুকলেন সেখানে একটা ফরাশ পাতা। বেশ কয়েকজন ভদ্রলোক বসে আছেন। একজন বসেছিলেন এঁদের মুখোমুখি, একটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে। রসিকলালকে দেখেই তিনি 'আসুন রসিকদাদা, বসুন।' আরো দু-এক জন উঠে দাঁড়ালেন। একজন কাছে এসে বললেন, 'এইটা কী হইল দাদা। আমি তো সেই কবে থেইকে শুইনছি রসিকদা না কী যশোরে। আবারও শুইনছি রসিকদা নাকী যশোরে। ভেইবেছি এখন তো আইনসভা খোলা। কাজেকর্মে আসাযাওয়া।'

রসিকলাল লাজুক হাসিতে সেই ছেড়েদেয়া তাকিয়ার সামনে আধাআধি যায় ও বসে পড়ে। তারপর হেসে বলল, 'তাইলে তো আমারে শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে শাস্তি দিব্যার লাগে। শাস্তিডা তো আমিই ঘোষণা কইরব—অ্যাহুনি মুড়ি তেল ও কাঁচালঙ্কা সহযোগে আনা হৌক ও তার পরে চা আনা হৌক।' পকেট থেকে একটা দুই টাকার নোট বের করে একজনের দিকে বাড়িয়ে দিল।

যোগেন পেছনে বসে পড়েছিল।

রসিকলাল প্রথমেই কথাটা তুলে ফেলে, যেন এই অফিসটা, এই লোকজন—এটা তার নিজের জায়গা, নিজের বন্ধুবান্ধব। যোগেনের এটা মনে হয় ও সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে শুধরয়। যেখানে কাকা যায়, কোনোখানেই কি বাইরের লোক থাকে?

'রসিকলাল প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা, নোয়াপাড়ায় তো পেপার আসে?'

'এইডা একডা কথা হইল, দাদা?'

'না। পেপারে একের পর এক খবর পেস্তেক দিন, যে যশোরে নাকী দাঙ্গায় নরমুণ্ড গড়াগড়ি যাইছে। তোমাগ চোখে এই খবর আসে নাই।'

'হ্যাঁ। কেন আইসব না? ঠিক কথাই তো লিখছে।'

'মুকুন্দ, আমি ঠিক ভাইব্যাই তো নামের লিস্টি বানাইয়া ঘুইরতেছি। কুথাও তো দাঙ্গা দেইখল্যাম না। দাঙ্গা মানে কাইজ্যা নয়। দাঙ্গা মানে রায়ট। হিন্দু-মুসলমানগ।'

'সে যে-নামেই ডাকেন গোবর তো গোবরই।'

'আমি তো কই নাই মুকুন্দ, গোবর আসলে গোবর না। কেউ-কেউ অবশ্যই কয় গোবর মানে অ্যান্টিসেপটিক। এইডা বোধয় হিন্দুগ গো-ব্রাহ্মণ্য হিতায়।'

'আপনে কন নাই হয়ত। কিন্তু এমন লোকোই তো বেশি যে হইল একডা হিন্দু-মুসলমান কাইজ্যা, কইল আরে এডা প্রাইভেট।'

'এডা তুমি ঠিকোই কইছ। আমি ডর খাইছি—বেবাক প্রাইভেট কি পাবলিক হইয়া গেল? সাম্প্রদায়িক ছাড়া কাইজ্যা নাই?'

'সেইডাই তো রসিকদা হিন্দু মিশন ধরাইয়্যা দিল।'

'কও তো, ভাই। ধরাইলডা কী? আমাগ পুরুষক্রমে বসবাস। আমরা জাইনল্যাম না, আর তারা জাইন্যা গেল? কও তো মুকুন্দ, কী জানাইল?'

'দাদা, আমি তো ঠোঁটকাটা, মুখের কথা বার হবই। সেডা সবাইগ শুইনতে ভাল্ লাগবে না। ছড়ামারা আর কুইল্ল্যায় কী হয় নাই। হিন্দু মেয়েগো গায়ে হাত তুইলছে শ্যাখরা—'

'হয়। তোমার কথাডা কী মুকুন্দ? মাইয়াগ, মানে, অনাত্মীয় মাইয়াগ গায়ে হাত দিয়া খারাপ—সে হিন্দুই হোক আর শ্যাখই হোক। না কী হিন্দু ছাড়া আর-কেউ হিন্দু মাইয়াগ গায়ে হাত দেয়াডা খারাপ।'

সবাই এমন একসঙ্গে হেসে ওঠে যে কথাটার কোনো ওজন থাকে না।

হাসিটা শেষ হলে, আর-একটা গলায় শোনা যায়, 'মুকুন্দ্যা, গায়ে হাত দেয়ার আগে জাইত জিগায়্যা নিয়ো।'

ফলে আর-একটা হুল্লোড়। ইতিমধ্যে মুড়ি এসে গেছে। মনে হল, আড্ডার বিষয় বদলে যেতে পারে। কিন্তু মুড়ি খাওয়ার মধ্যেই রসিকলাল বলে, 'দ্যাহো, আমার মুখে তো ওকালতি শোভা পায় না। পাশ কইর‍্যা তিনদিন কোর্টে গেছি। কিন্তু যোগেন তো আছে, চেনো তো তোমরা, নাম কইরছে ওকালতিতে। ওরা ভাল কইব্যার পারব। ফৌজদারিতে একটা ঘটনার কনটিনিউইটিই কিন্তু আসল। ধরো, একজন কইল, তার নিজের চক্ষুতে দেখা কুইল্ল্যায় শ্যাখরা এক শুদ্দুরের ছাওয়ালরে পিট্যায়া অজ্ঞান কইর‍্যা ফেলছে, তারপর লাস গুম কইর‍্যা ফেলাইছে। সে দৌড় পাইড়া শুদ্দুর পাড়ায় গিয়্যা খবর দ্যায়। শুইন্যা কী হইব? তারাও ছুইট্যা আইসব। ধরো, এইডা তিনডা-চাইরডা আলাদা-আলাদা ঘটনাও হব্যার পারে। বিষয়ডা হইল—এই কনটিনুইটি প্রতিষ্ঠা করা। এই যোগা, হেল্প কর্, না কী শুইন্যা হাসতছস?'

'ভাইবতেছি, আমি আপনের উলটা পক্ষের উকিল হইলে আমার নির্ঘাত পরাজয়,' যোগেন বলে। একটু চুপচাপের পর একজন বয়স্ক গলায় বলে, 'হিন্দু মিশন কিন্তু ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রত্যেকটা লোককে জিজ্ঞাসা করে, তার কথা লিখে, তারপর সত্যমিথ্যা যাচাই করেছে। এখন কাগজে দেখে আমরা বলছি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। সেটা কিন্তু যাচাই না করে বলছি। কেউই ঘটনাস্থলে যাই নি। একটা কথা বোধ হয় স্বীকার করতেই হবে, হিন্দু মিশন এই এলাকায় আসার পর হিন্দুদের মনে জোর এসেছে। ভারত সেবাশ্রমও আছে।'

'এর সঙ্গে কি শুদ্ধিও করছে?' যোগেন জিজ্ঞাসা করে।

'ঠিক জানি না। আমি কাউকে দেখিনি যাকে শুদ্ধি করা হয়েছে। তবে শুদ্ধি তো শুনেছি অপশন্যাল। কেউ যদি ইচ্ছা করে, করতে পারে।' একটা খাঁকারি তুলে বয়স্ক গলাটি থামে।

তরুণ আর-একটা গলায় শোনা যায়, 'এ তো প্রত্যেকের নিজস্ব মত। তেমনি অন্য মতও তো আছে। হিন্দু মিশন একটা হিন্দু চেতনা তৈরি করছে। সেটা বোধহয় সাম্প্রদায়িকতাকেই সংগঠিত করবে।'

মুখটা বাড়িয়ে রসিকলাল বলে, 'কেডা কও ভাই, মুখখান দেখাও।'

লম্বা একটি ছেলে দাঁড়ায়, 'তোমারে তো ঠিক—' এই পর্যন্ত রসিকলাল বলতেই একজন বলে দেয়, 'গৌর। অবনী ডাক্তারের ভাইয়ের ব্যাটা। কলকাতায় এমএ পড়ে না ল? কী পড় গৌর? এমএন রায়ের চেলা।'

গৌর বলে, 'এমএ। কিন্তু পূর্ণ জ্যাঠা, আমার পরিচয়টা তো ঠিক হল না। এখন তো আমরা কথা বলছি সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক নিয়ে। এটাই আমাদের দেশের প্রধান বাধা করে দিয়েছে সাম্রাজ্যবাদ। সেই সঙ্কট মেটাতে সকলেই নিজের-নিজের মত চেষ্টা করছেন। গান্ধীজি অস্পৃশ্যতা দূর করে সব মন্দিরে হরিজনের প্রবেশাধিকার চেয়েছেন। মুনজে-সাভারকর এঁরা স্বীকারই করছেন না, হিন্দু ছাড়া কোনো জাত আছে ভারতে। মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁরা মনে করেন, মুসলমানদের উচিত নয়—ধর্মীয় পরিচয়কে জাতীয় পরিচয় করে তোলা। আবার অনেকে বলছেন—ভারতীয় জাতি বলে কিছু নেই, আমাদের দেশে দুটো মাত্র জাত আছে, হিন্দু আর মুসলমান। এমএন রায়ও একজন নেতা। তাঁর একটা রাজনৈতিক বিশ্বাস ও সংগঠন আছে। তিনিও এই জাতিপরিচয়ের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বলেছেন, এ সব বেদ-পুরাণ-মনুসংহিতায় লেখা নেই, কুরআন শরিফ বা শরিয়তেও লেখা নেই, এসবই সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র। পূর্ণ জ্যাঠার

কথায় মনে হল উনি আমাকে একটু ঠেস দিয়ে এমএন রায়ের চেলা বলে পরিচয় দিলেন।'

রসিকলাল ব্যগ্র হয়ে বলেন, 'তোমার কথাডা কও বাবা। কথাডা দরকারি। ঠেসঠুস খুব দরকারি নয়। আমাদের সমাজে আদর জানাইতেও ঠেস দেয়। পূর্ণ দা কি তোমারে ঠেস দিব্যার পারেন? কত গৌরব কইর‍্যা কইলেন—এমএ পড়ে, এমএন রায়ের চেলা। তুমি কথাডা কও, গৌর। মনে হইল, তুমি য্যান হিন্দু মিশন নিয়্যা একডা অন্য কথা ভাইবছ। সেইডা কও। ভুল আমাগও হব্যার পারে, তোমারও হব্যার পারে। কিন্তু কথাডা তো জানা দরকার। কও।'

গৌর তার হাঁটুদুটোতে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে বলে, 'আমিও তো কলকাতার কাগজে প্রত্যেক দিন এই রায়টের খবর পড়তে-পড়তে গোলমালে পড়ে গেলাম। তাই এই কদিন আগে এসে দেখি—এখানে রায়ট বা দাঙ্গার কোনো চিহ্নও নেই। লোক্যাল ঘটনা তো কিছু ঘটতেই পারে—পুব পাড়া আর পশ্চিম পাড়ায়, দক্ষিণ পাড়া আর বটতলায়। যেহেতু আমাদের জনসাধারণ চব্বিশ ঘণ্টা মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও পেট ভরে খেতে পায় না তাই নিজের ছোট-ছোট অধিকার সে আঁকড়ে ধরে ও একইরকম আরো কিছু মানুষ পেটে একইরকম খিদে নিয়ে সেই অধিকার বোধটাকেই ধরে নেয় তার অধিকারহীনতা। আল নিয়ে, গাছের ডাল নিয়ে, পুকুরের মাছের ভাগ নিয়ে আর এর গরু ওর খেতের ফসল নষ্ট করা নিয়ে সবচেয়ে বেশি হাঙ্গামা হয়। যদি আপনি চান, তাহলে এইসব হাঙ্গামাকেই রায়ট বলতে পারেন, কারণ, আমাদের জিলায় মানুষ বলতে এই দুই জাতের মানুষকেই বোঝায়। মুসলমানরা বেশি। হিন্দুরা কম। হিন্দু মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ এই বিভেদের সুযোগ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাঁরা একটা খুব প্রতিশোধকামী ও শক্তিমান হিন্দুর ধারণা গ্রামে-গ্রামে প্রচার করছেন। হিন্দুরা এতে স্বস্তি পেতে পারেন। আমার 'রায়ট'টা যদি আর-এক জন করে দেয়, তাহলে স্বস্তি তো হবেই। 'হিন্দু মিশন'ও 'সেবাশ্রম' ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। তাঁদের যদি একবার মেনে নেয়া হয়, তাহলে তাঁদের এই কথাও মানতে হবে যে আমাদের দেশটা হিন্দুদেশ। বংশানুক্রমে যে-মুসলমান প্রতিবেশীর সঙ্গে আমি পাশাপাশি আছি সে হয়ে যাবে বিধর্মী। আর, মিশন বা সংঘের গেরুয়া ঝান্ডা নিয়ে যে অজানা অচেনা একটা লোক আসবে সে হয়ে যাবে আমার স্বধর্মী? মিশন বা সংঘ বেছে-বেছে এইসব জিলাতেই আসছে কেন—যেখানে হিন্দু বসতির চাইতে মুসলিম বসতি অনেকগুণ বেশি। তাঁরা মধ্য ও উত্তর বঙ্গের হিন্দু প্রধান জিলাগুলিতে যাচ্ছে না কেন? মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, বীরভূম—এইসব জিলায় তো সিকিভাগও মুসলমান নেই। তাই সেখানে মিশনও নেই। এমন কী যেখানে আট আনি মুসলমান, সেখানেও নেই, মুর্শিদাবাদ-দিনাজপুরে। হিন্দু সাম্প্রদায়িক এই সংগঠনগুলি যে মুসলমান প্রধান পূর্ববঙ্গের জিলাগুলিতেই তাদের এই সব হিন্দু জাগরণ ও শুদ্ধির আন্দোলন করছে তার একমাত্র উদ্দেশ্য হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা প্রতিষ্ঠা।'

গৌরকে থামিয়ে দিয়েই প্রায়, বৈকুণ্ঠ বসুরায় বর্মণ চিৎকার করে ওঠে, 'এইসব কথাই কি এহন কংগ্রেসের কথা হবে রসিকলালবাবু। যে-হিন্দুরা কংগ্রেসরে তৈরি করছে, বঙ্গভঙ্গ উলটাইছে, আইনঅমান্য কইরে জেলখানা ভইরছে, সেই হিন্দুগ মুসলমানগর আক্রমণের মুখে ছাইড়ে দিতে হব। কংগ্রেসের কয়ডা মুসলমান নেতা বা কর্মী আছে? হিন্দু মিশন তো কংগ্রেসের সংগঠন না। তাইলে হিন্দু মিশনের কাজকর্মে কংগ্রেসের নাক গলানোর কী হইছে?'

রসিকলাল বারবারই হাত তুলে বৈকুণ্ঠবাবুকে থামানোর চেষ্টা করে। শেষে সে-চেষ্টা ছেড়ে দেয়। বৈকুণ্ঠবাবু থেমে গেলে রসিকলাল একটু সময় যেতে দেয়। তারপর স্বাভাবিক নিচু স্বরে বলে, 'বৈকুণ্ঠবাবু, কংগ্রেসের নীতি তো আমরা ঠিক করনের অধিকারী না। আমরা তো সৈনিক। আর নীতিনির্ণয় তো ওয়ার্কিং কমিটির বিষয়, প্রেসিডেন্টের বিষয় আর সবাইয়ের উপুরে

মহাত্মাজি। স্থানীয় ঘটনা নিয়্যা একডা কথা বিনিময়ে গৌর তার কথা কইলে এত রাগ কইরলে কী কইরে চলে। হ্যাঁ, এডা তো ঠিক কথা, হিন্দু মিশন বা সেবাশ্রম কংগ্রেসের সংগঠন না। তাগ ব্যাপার ঠিক করার অধিকার আমাগ নাই। কিন্তু তাদের কাজকামের ফল নিয়্যা তো কথা না কইলে চলে না—'

একজন রসিকলালের কথার মধ্যেই পেছন থেকে হাত তুললে রসিকলাল থেমে গিয়ে, 'ভোলাদা, কিছু কবেন বোধহয়।' ভোলাদা নামে চেনা এই মানুষটি আন্দামান খেটে সবে ছাড়া পেয়ে যশোরে এসে আছেন। কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করেন। সকলেই তাঁকে মেনে চলে যদিও তিনি কাউকেই কিছু উপদেশ বা আদেশ দেন না। রাজনীতির কথাও কম বলেন। চেনাজানা মানুষজনের বাড়ির লোকজনের খবর রাখেন ও খবর নেন।

'হ্যাঁ। গৌর আর বৈকুণ্ঠবাবুর মতপার্থক্য শুনে কথাটা মনে এল। বলে ফেললে হয়ত সোয়াস্তি পাব। না-হলে মনের মধ্যে ঘুরবে। গৌর আর বৈকুণ্ঠবাবুর দুইজনের কথাই সত্য। এটা বোধহয় আমাদের জাতীয় অবস্থারই সত্য। গান্ধীজির আন্দোলনের সবচেয়ে বড় অবদান—মুসলমানদের খিলাফৎ আন্দোলনের সঙ্গে অসহযোগকে মেলানো। তার পরিণতি ভাল হয়নি ও মাত্র দশ বছর পরে গত আইন-অমান্যে মুসলমানরা যোগ দেননি। সেই ব্যর্থতাগুলিকে প্রাধান্য দিয়ে অতীত আন্দোলনের গৌরব কমানো ঠিক নয়। বৈকুণ্ঠবাবু সেই ভুলটাই করছেন। কংগ্রেস আমাদের একমাত্র জাতীয়তাবাদী পার্টি। সেই পার্টির পক্ষে সরাসরি বা আড়াআড়ি হিন্দু বা মুসলমানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখালে আমাদের সর্বনাশ। তেমনি গৌর যে-কথা বলেছে, সেটা বইয়ে ছাপা সত্য। কোনো লোকের ভূতের ভয় তো যুক্তি দিয়ে তাড়ানো যায় না। হিন্দু বা মুসলমান যে-সমাজই হোক, পুরো সমাজটা যদি হিন্দু বা মুসলিম ভূতের ভয়ে নিশিদিন আতঙ্কে কাটায় তাহলে তাদের সঙ্গ দিতে হবে—ভয়টা তাড়ানোর জন্য। সেই সঙ্গ যদি কংগ্রেস দিতে না পারে, তাহলে হিন্দু মিশন বা সেবাশ্রম বা জামাত বা আনসার বাহিনী সেই সঙ্গটা দেবে। একমাত্র কংগ্রেসই সেটা পারে—ধর্মের আশ্রয় থেকে দুই সম্প্রদায়কে রাজনীতির আশ্রয়ে আনতে।'

রসিকলাল বলে ওঠে, 'ভোলাদা, আপনি আপনার যোগ্য কথাই কইলেন—কাজডা কী? আর করবে কেডা?'

কেউ একজন বলে, 'এখানে না-হয় হিন্দু-মুসলমান, লখনৌতে তো শিয়া-সুন্নি দাঙ্গা গবমেন্ট, গভর্নর, ভাইসরয়, ইউপি কংগ্রেস, মন্ত্রিসভা সব কিছুকে নাড়িয়ে দিয়েছে। মুসলিম লিগের মুখে তালা। মানে বলছি, একই ধর্মের দুই অংশের মধ্যে দাঙ্গা তো রাজনীতি দিয়ে মিটছে না। পাঞ্জাবে খালশা-আকালি ঝামেলা। সেখানে যেহেতু মুসলিম সরকার, তাই সরকারের মুখে তালা। ভোলাদার কথাটা বুঝতে চাই—বললেন-না ধর্মের আশ্রয় থেকে রাজনীতির আশ্রয়। সমাজটা যদি ধর্মটাকে রাজনীতির প্রধান বিষয় করে নেয়, এমন কী একই ধর্মের শাখাপ্রশাখা যদি উলটো রাজনীতিতে চলে যায়, তাহলে কী হবে ভোলাদা।'

'ভোলাদা বলেন, 'লখনৌয়ের শিয়া-সুন্নি কিন্তু রাজনীতি দিয়েই মিটল। এটা ওয়ার্কিং কমিটির বাহাদুরি।'

কেউ জিজ্ঞাসা করে, 'এখানে শিডিউল্ড কাস্টরা যদি কাস্ট হিন্দু থিকে বাইরে চইল্যা যায়, তাইলে বাংলায় কংগ্রেসের নীতি কী হইব?'

রসিকলাল একটু হেসে বলে, 'সেডা তো গান্ধীজি কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ডের সময় দিয়্যা থুছেন—হিন্দুদের মধ্যে বর্ণ-অবর্ণভেদ সৃষ্টি হলে আমি প্রাণ দিব। তার উপরই তো পুনা প্যাক্ট।

বর্ণ-অবর্ণভেদ স্বীকার ও হিন্দুগ মধ্যে উভয়ের স্থান নির্ধারণ।'

যোগেন পেছন থেকে দাঁড়িয়ে বলে ওঠে, 'কাহা, অ্যাহন না-বারালে যশোর পৌঁছবার দেরি হব না?'

রসিকলালও দাঁড়িয়ে পড়ে।

সবাই মিলে নীচে নামার পর কী করে যশোর ফেরা হবে তা নিয়ে নিয়ে কথা উঠতেই ভোলাদা বলেন, 'বাস আছে এখনো, চলেন-না।'

ওরা ভোলাদার সঙ্গে এগয়।

পেছন থেকে কেউ একজন বলে ওঠে, 'ভোলাদা অ্যাহন যশোরের টাইম টেবিল, বাসের, ট্রেনের, নৌকার। চক্কর মারেন তো মারেনই।'

ভোলাদা ডান হাত তুলে পেছনের রসিকতাটাকে অনুমোদন করেন। যোগেন জিজ্ঞাসা করে, 'কী খোঁজেন ভোলাদা।'

ভোলাদা একটু হেসে বলেন, 'খোঁজাখুঁজি আবার কী? বসে থাকলে তো হাতেপায়ে খিল ধরে যাবে।'

রসিকলাল বলে, 'কালাপানির জেলখানায় খিল খুইলতেন ক্যামনে?'

'সেখানে খিলধরার টাইম কোথায়। সারা দিনই তো ব্যস্ত। ব্যায়াম, পড়াশুনো, এ ওর পড়া নেয়া, ফুটবল খেলা—'

যোগেন বলে, 'ফুটবল?'

'হ্যাঁ। শিল্ড-লিগ দুটোই। কতগুলো টিম।'

ওরা বাসস্ট্যান্ডে এসে গিয়েছিল।

বাসটা স্টার্ট দিতেই ভোলাদা 'চলি' বলে নেমে গেলেন। ওদের দু-জনকে নিয়েই বাসটা সগর্জন চলতে শুরু করে। এটা বাসগুলোর জিরব্যার জায়গা, টাউনে একটা পাক দিয়ে প্যাসেঞ্জার তুলবে। তবে, বিকেলের ট্রিপে আপের প্যাসেঞ্জার কম। এখন সব ডাউনের প্যাসেঞ্জার। কতক্ষণই-বা লাগবে যশোর পৌঁছুতে।

সগর্জন বাসে পাশাপাশি বসে রাস্তার ধাক্কায় সারা শরীর দোলাতে দোলাতে ওরা যাচ্ছিল। যোগেন বলল, 'আপনের কাম তো হইল, যার লগে আমারে ডাকছিলেন?'

'হ্যাঁ। তা হইল। আরো একটু ঘুরান দিলে কাজডা আরো ভাল হয় কী না ভাবছি। তুই কী বলস?'

'আমার আর লাগব না। এইহানে পৌঁছ্যায়াও বুঝি নাই—কোন্ কামে আমারে ডাইকছেন। বুঝি প্রথম লাউজানিতে।'

যোগেনের কাঁধ বেড় দিয়ে হাতটা ছড়িয়ে রসিকলাল বলে, 'তুই বুঝবি না? তোর তো কুকুরের মত ঘ্রাণশক্তি, শিয়ালের মত প্রবেশশক্তি আর শুশুকের নাগাল শ্বাসধারণ শক্তি।'

'কাহা, আমি আইজ বরিশাল এক্সপ্রেস ধইর‍্যা কইলকাতা ফিরি। আপনে কি পারবেন, আইজ?'

'পাইরলেও তোর সঙ্গে যাব না। দুইজনে একসঙ্গে থাকলি সারা দিনের কথা উঠবই। তোরে ক্যা ডাইকল্যাম বইল্যা তুই বুঝলি—সেই কথাডা আমি শুইনতে চাই না। সেইড্যা বুইঝ্যা সারাদিন ধইর‍্যা তুই কী দেখলি সেডাও শুইনতে চাই না, আমি কী দেইখল্যাম সেডাও কইতে চাই না, প্রথম আইস্যা যে-ঘুরান দিচ্ছিলাম তখন কী দেইখল্যাম তাও কব্যার চাই না। শুইনবারও চাই না। তোরে একডা জাতকের গল্প কই। এক বোধিসত্ত্বরে এক কাউঠা, না রে, ভুল কইল্যাম,

এক কাউঠারে এক বোধিসত্ত্ব জিগাইলেন, কূর্মাবতারে, কচ্ছপ তো খুব দীর্ঘজীবী আর উজাইয়্যা গিয়া ডিম পাইড়্যা ভাটি সমুদ্রে ফির‍্যা আসে। জানিস তো?'

'গল্প জানে না কি কেউ?' প্রত্যেকবারের শোনা তো আলাদা।'

'বোধিসত্ত্ব জিগাইলেন, এত যে হাজার-হাজার বচ্ছর বাঁইচ্যা শয়ে শয়ে সন্তান দিলা, একডারেও তো ফুটব্যার দেখো নাই। সন্তানের কথা কহন মনে পড়ে? কূর্ম উত্তর দিল, কর্মের শেষে যহন আমার ডুবার জল, আমার ভাসার জল থিক্যা গভীর ঠেকে।'

যোগেন একা, জেগে। তার এই কুপেটাতে আলো জ্বালানো। দু-একবার কন্ডাকটর-গার্ড এসে দরজায় টোকা দিয়ে গেছে, যোগেন কোনো সাড়াশব্দ করেনি। নিজের এই বিনিদ্রতা, বা আরো ঠিক বললে অতন্দ্রতাকে কোনো কারণের সঙ্গে যুক্ত করতে কোনো বই বা কাগজ চোখের সম্মুখে মেলে রাখেনি যোগেন। যেন তার নিজের কাছেও প্রমাণের দরকার আছে—রাত দুটোর পর যশোর থেকে শিয়ালদা গামী বরিশাল এক্সপ্রেসে সে পাড়ি দিচ্ছে, দুই চোখ খোলা রেখেই। যেমন গল্প শুনেছে, ইঞ্জিনঘরে ড্রাইভার বা স্টোকারদের জন্য বসার জায়গা পর্যন্ত থাকে না, খাড়া দাঁড়িয়ে থেকে ট্রেন থেকে বিচ্ছুরিত তীক্ষ্ণ আলো অস্ত্রের মত ঢুকে যাচ্ছে কী করে এই প্রাকার তুল্য অন্ধকারে, তাদের দেখে যেতে হয়। বড় স্টিমারেও তাই। সবার ওপরে ক্যাপ্টেনের ঘর। সামনে মোটা লোহার চেন দিয়ে ঘেরা জনহীনতা, বাধাহীনতা। ক্যাপ্টেনের ঘরটা গোল কাচে ঘেরা। সব দিক খোলা থাকা চাই, ক্যাপ্টেনের চোখের সামনে যতগুলো দিক, যতটা অন্ধকার ও যতটা আকাশ—তার সবটা সম্পূর্ণ খোলা থাকা চাই। যোগেন না ঘুমিয়ে তার জেগে থাকাটাকে উদ্‌যাপন করতে চায় না।

যোগেন যে কিছু ভাবছিল, তাও নয়। সেদিক দিয়ে যোগেন খুব নির্ঝঞ্ঝাট লোক। গুরুভার কাজের মধ্যেও খিদে পেলে সে তার অভ্যাসমত পরিতৃপ্তি পেতেই খায়। গুরুভার চিন্তা, তার ওকালতির জন্য অভ্যাসমত পান চিবুতে-চিবুতে ভাবতে পারে বেশ এক, দুই করে। তাকে যদি একা-একা মাইল পনের-বিশ হাঁটতে হয় ও সেই হাঁটাপথে চর ডিঙতে হয় বা ছোট খাট খাল সাঁতরাতে হয়, সে এক ছন্দে হেঁটে চলে যায়। আজকাল অবিশ্যি সঙ্গী থাকে, তাও কোনো ব্যবস্থার ফলে না, ঐ চলল সঙ্গে অনেকটা, আবার চলল যোগেন একা, আবার দু-চারজন তার সঙ্গেই হাঁটতে লাগল। যোগেন যদি আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়, তাহলে আক্রমণের লক্ষের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে সে শার্দূলের মত, তার লেজটা খুব ধীর লয়ে ধুলো ওড়াতে থাকে। যোগেন, শাদূলের মতই, চায় না কোনো এমন ঝাঁপ দিতে, যাতে তার লক্ষ পর্যন্ত সরলরেখার চাইতে তার লম্ফনের ব্যাস কম পড়ে যাবে।

যোগেনের 'গীতা' মুখস্ত, যেমন সমতুল্য আরো কিছু হিন্দুশাস্ত্রীয় বইপত্র। এক সময় সেটাই ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদের নিষেধ প্রমাণ্য করার দুঃসাহস। সে-স্মৃতি যখনতখন কাজ দেয় এখনো। কিন্তু যোগেন সেসব উক্তি ব্যবহার করে সচেতন অস্ত্র হিশেবে। ব্যবহারের পুরো ফলটা সে কাজে লাগাতেই চায়। অথচ সেই সচেতন চাওয়া ও পাওয়া তো ঘটতে পারে অভ্যাস ও স্মৃতির জোরেই। অভ্যাস ও স্মৃতি তো সচেতনতার বাধ্য নয়। সেই অবাধ্যতায় যখন ঐ সব শাস্ত্রবচন তার ব্যক্তিগত দরকারেও মনে এসে যায়, তখন যোগেন নিজের ওপর রেগে ওঠে। এখনো উঠল। যোগেন বিরক্ত হল। যোগেন লোহার ক্রেংকারের সঙ্গে আত্মীয়তা পায়, নিশীথের লৌহক্রেংকারের অনিশ্চয়তা সে এখন গ্রহণ করতে চায়। যেন, এই ক্রেংকার ছুটে চলেছে এক অবাস্তব সর্বনাশের দিকে, প্রাকৃতিক ধ্বস-সাইক্লোনের মত। যেন এই ক্রেংকার দুটো শক্ত

সমান্তরাল লোহার রেল থেকে উঠছে না। যেন, যোগেন জানে এইসব নৈসর্গিক কমলেকামিনী দৃশ্য কোন নৈর্ব্যক্তিকে দেখতে হয় ও নিজেকে সেই দৃশ্য থেকে মুক্ত করতে হয়। যেন, যোগেন জানে, আমার দেখার ওপর প্রলয় নির্ভর করে না, ন প্রমাণে সিদ্ধ, আমার না-দেখার ওপরেও না, ন অপ্রমাণে, প্রলয় শুধু তার কাছেই সত্য, প্রলয় : তু সত্য, প্রলয়ের বিপরীতে দাঁড়ালে, বিরুদ্ধস্থাপনে। ন প্রমাণে সিদ্ধ ন অপ্রমাণে/প্রলয় : তু সত্য বিরুদ্ধস্থাপনে। যোগেন সেই বিরুদ্ধস্থাপনের দিকেই ছুটছে, অন্ধকারে জেগে, ক্রেংকার তুলে।

ট্রেন থেকে নেমে কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে প্যারী সরকারের বাড়িতে যখন ঢুকছে, তখনো যোগেনের চোখ জ্বলছে, জাগরণে, মুখটা থমথমে।

শুধু প্রত্যাশাপূরণের জন্য সে ডেকে সব, 'উদ্দুর, খুদ্দুর, উদ্দুর, খুদ্দুর, খুদ্দুর। সিঁড়ির দিকে ছুটে আসে, উদ্দুরকে ছাড়িয়ে। কিন্তু উদ্দুর তাকে ডিঙবার জন্য আর দৌড়য় না। ছেলেটা লম্বা হয়ে যাচ্ছে।

উদ্দুর মামার পাটিটা বিছিয়ে দেয়। যোগেন তার ওপর গিয়ে ধপ করে বসে। খুদদুর এক পাঁজা খবরের কাগজ এনে দেয় ও লাল রঙের একটা মোটা পেনসিল।

প্রথম কাগজটার ভাঁজ খুলে হেডিং দেখে যোগেন অবাক, 'হক-মন্ত্রিসভার পতন আসন্ন?' যোগেন আর-একটা কাগজ খোলে, তার হেডিং, 'তপশিলি মন্ত্রিবদল কি মৃতসঞ্জীবনী?' এটা পড়ে ফেলে যোগেন। শুধু গুজব। শুধু গুজব। আবার গুজবের যে কারণ নেই, তাও নয়। গভর্নর সম্পর্কে গুজব। কে কাকে কত টাকা দিয়েছে সে-সম্পর্কে প্রমাণহীন খবর তো বেরয়ই।

'ভাই, ঘুইর্‌্যা আইস্যা মনডা দুঃখী ক্যা?'

'আচ্ছা বুন, তোমারে একডা কথা জিগ্যাই। বড় হিন্দুই কও আর শুদ্দুরগ কথাই কও, মাইয়াগ তো বড় জোর বার বছর বাপের বাড়ি রাখে। তার পর বিয়া দিবই। সেই নতুন বাড়ি, নতুন মানুষ, স্বামী বইল্যা একডা নতুন জীব, বৌ হইয়্যা' কী করার লাগে আর কী করার লাগে না তার কিছুই না-জানা বিয়া যখন বইসতে হয় তহন, তহন তোমাগ ডর লাগে না?'

একটু চুপ থেকে বোন হেসে ফেলে। সে-হাসিটুকু হাসতে যে-সামান্য দেরি হয় তাতে মনে হতে পারত, বোন বোধ হয়, কোনো কথা চাপা দিল। কিন্তু বোনের চোখের সরলতা তেমন মনে-হওয়াটাকে অসম্ভব করে দেয়।

'ভাই। জম্মের পর থিক্যাই তো বিয়্যা-বিয়্যা শুনি। বিয়্যা হওয়াডাই এক কাম। ডর আইব কোথ্‌ থিক্যা?'

'বিয়্যা হইলেও তো ঐটুক মাইয়ার মনে কিছু বদল হয় না—তাই? না বোন?'

'ও কি ভাগ-ভাগ কইর‍্যা ভাবনা আসে? বাপজ্যাঠা যেমন, ভাইদাদা যেমন, স্বামীও তেমন একটা কিছু। বামুন-কায়েত, মাইয়ারা আলাদা কইর‍্যা ভাবব্যারও পারে। অগ তো এড্ডু বড় হইয়্যা বিয়্যা হয়, স্বামীর সঙ্গে বয়সের তফাৎও কম হয়। ভাবনা ঢোকার ফাঁক আছে। এই কথাডা কি তোমার আইনসভায় উঠব?'

'আইনসভায় কত মাথামুণ্ডু ওঠে। এডা কইলে তো একডা কাজের কথা হইত। এডডু চা হয় না বুন? ডাক্তার কই?'

'ডাক্তারের এক রোগীর নাকী অ্যাহন-তহন, দেইখব্যার গিছে,' বলে বোন ওঠে।

স্বভাববশত যোগেন বলে বসে পেছন থেকে, 'ডাক্তারের কাম যে অঙ্গ লইয়্যা, সেইড্যা একবার বারাইলে তো ফিরানো কঠিন বুন।'

বোন একটু এগিয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে ঘাড় ফিরিয়ে বলে, 'চাঁদসীর ডাক্তারগ তো এইডাই বাঁচান ভাই। কুনো এমন রোগী নাই যার আরো কয়ডা ব্যাধি না-আছে।' যোগেন হেসে ওঠে।

নিজেকে একটু স্বাভাবিকও লাগে, যেন কাল সারা রাত জ্বরে ভুগেছে, এখন জ্বরটা নেমে যাচ্ছে। যোগেন ডেকে ওঠে, 'খুদ্দুর কই রে?'

খুদ্দুর নতুন হাফশার্ট', ইংলিশ হাফপ্যান্টের ভিতর শার্ট গুঁজে পরেছে, জামার গলায় একটা টাই—একেবারে ছুপানো নীলে পায়ে চকচক করছে জুতো—ফিতে বাঁধা।

'সে কী রে! তোরে এমন সাজান্ কে সাজাইল রে খুদ্দুর। ডাইকল্যাম খুদ্দুররে, কোলে বসায়্যা চুমু দিব বইল্যা আর প্রবেশ করিল এক পুলিশ-সার্জেন। চুমাডা অ্যাহন দেই কারে',

'এখন তোমার কোলে বসলে আমার চুল নষ্ট হয়ে যাবে।'

'আমার চুমাডার একডা ব্যবস্থা কর্। ঝুলানা চুমা নিয়্যা কতক্ষণ খাড়্যায়া থাইকব? আমি তো ভুইল্যাই যাই যে তোর অ্যাহন মর্নিং স্কুল।'

'দাদাকে দাও তোমার চুমা।'

'একের চুমা কি আর-কারে দেয়া যায়? চুমা আইঠ্যা হইয়্যা যায় না?'

চায়ের কাপ নিয়ে এসে বোন জিজ্ঞাসা করে, 'বারান্ কহন?'

'সেইডাই তো ভাবন। একবার ভাবি চিৎ হইয়্যা ঘুমাই। আর-একবার ভাবি, অ্যাহনই বারাই। উদ্দুর রে—'

উদ্দুর একটা কোঁড়া ধুতি কোমরে বেঁধে আসে। তার মুখে একটা সামান্য আভাস—দাড়ির।

'ক্যা রে, তুই টাই পরিস নাই?'

'পরব। আমাদের তো ডে-ইসকুল। ফুলপ্যান্ট।'

'দেখো উদ্দুর, তোমরা দুই ভাই মিল্যা ফন্দি কইর্যা আমারে বাড়ির বাইরে ফেল্যাব্যার চাও? একঘরে থাকি, এক থালে খাই আর আমি তোমার ফুলপ্যান্ট আর খুদ্দুরের টাই দেখি নাই?'

'কেমন করে দেখবে? তুমি যখন রাতে ফেরো তখন কি আমি টাই পরে আর দাদা ফুলপ্যান্ট পরে ঘুমুব?'

'আর যে-রাইতে ফিরি না?'

'না-ফিরলে তো দেখবেই না। ফিরলেও দেখবে না।'

'ক্যা বাবা! ঘুমে স্বপনে?'

'ঘুমের সময় তো তুমি চশমা পরো না। স্বপ্ন দেখবে কী করে?' বলে খুদ্দুর মার ডাকে রান্নাঘরের দিকে চলে যায়। যোগেন উদ্দুরকে বলে, 'বাবা, দ্যাখ তো, গত মঙ্গলবারের আগের মঙ্গলবারে স্টেটসম্যানে ভিতরের দিকে একটা খবর বারাইছিল—'বলশেভিজম অ্যামং পেজাস', পাইস না কী?'

'দাগ দাওনি? কাটা হয়নি?'

'সেডা স্মরণ নাই। খবরডা যে মনে আছে, সেইডাই কি তোমার কাছে যথেষ্ট না?'

'যদি তারিখটা বলতে তো যথেষ্ট হত ; দেখছি—'

একটু পরেই খাতার বান্ডিলটা এনে বলে, 'দাগও দিয়েছ, খুদ্দুর কেটেওছে, সেঁটেওছে।'

'কস কী? অর মনে থাহে?'

খাতাটা নিয়ে সাঁটা খবরটা পড়ল যোগেন। তার মনে হচ্ছিল, খবরটা ফরিদপুর নিয়ে। এখন

দেখছে দিনাজপুর নিয়ে। ঠিক খবরও না, তেমন কিছু তথ্য নেই, বরং একটা মন্তব্য বলাই ভাল। দিনাজপুরের কৃষক সমিতি এত তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ছে ও জমিদার-চাষির ভিতরকার এত কিছু ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে যে কারো সন্দেহ হতে পারে—এগুলোর পেছনে বল্‌শেভিক সংগঠন আছে কী না। শহর থেকে মাইল পনের দূরের একটা গ্রামে গিয়ে শুনলাম, ওখানকার কৃষক আন্দোলনের নেতা, শহরের একজন বড়লোক মোক্তারের ছোট ভাই। এখানেই থাকেন। মাঝে-মাঝে টাউনে যান। এখানে এমন নেতা না কী দূরে-দূরে আরো আছেন। তাঁদের কেউ-কেউ কখনো-কখনো এখানে আসেন। পার্টির কথা জানতে চাইলে বোঝা গেল ওঁরা সেসব জানেন না। কেউ বললেন কংগ্রেস, কেউ বললেন লিগ, কেউ বললেন হিন্দু। ওঁদের পক্ষে এর বেশি জানা সম্ভব নয়—রয়িস্ট কী না, পেজ্যান্টস পার্টি কী না, এক্স-টেররিস্ট কী না, ওয়াহাবি বা ফৈরাজি কী না। হিন্দু কথাটা বলতে বোধহয় 'ভদ্রলোক' বুঝিয়েছিলেন। যা হোক, প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনে কৃষকদের দাম রাতারাতি বেড়ে গেছে। সব পার্টিরই কৃষক সমিতি আছে। এই ফাঁকে বলশেভিকদের অনুপ্রবেশ খুবই একটা সম্ভবপর ঘটনা। আরো কোনো-কোনো জায়গাতেও কৃষকদের সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের এমন খবর পাওয়া যাচ্ছে, যে-খবরগুলি প্রচলিত দখলদারি দাঙ্গা বা হিন্দু-মুসলমান বিরোধ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। এ-বিষয়ে সরকারের আলাদারকমের চিন্তাভাবনা দরকার। যেসব পার্টি বল্‌শেভিজমের বিরোধী, তাঁদেরও এ-বিষয়ে সরকারকে সাহায্য করা কর্তব্য। কারণ, বল্‌শেভিজম সকলের শত্রু। বল্‌শেভিজম নির্মূল করা দেশের প্রধানতম রাজনৈতিক কর্তব্য'।

যোগেন উঠে ফোনের কাছে গিয়ে রিসিভার তোলে। এক্সচেঞ্জের মেমশাহেবের 'নাম্বার প্লিজ' শুনে শরৎ বোসের নম্বরটা বলে। রিংগুলো শুনতে-শুনতে ভাবে এই শুনবে 'নো রিপ্লাই।' না কী কোর্টে বেরিয়ে গেলেন? ঠিক তখনই সাড়া এল, অন্য কেউ কথা বলছেন। যোগেন নিজের নাম করে বলল, শরৎবাবুর সঙ্গে কথা বলতে চায়। ফোন যিনি ধরেছিলেন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি মিস্টার মণ্ডল এমএলএ তো?' যোগেন 'হ্যাঁ' বলায় উনি একটু চেনার হাসি দিয়ে বললেন, 'উনি তো কোর্টে বেরবার জন্য তৈরি হচ্ছেন। আমি কি ওঁকে জানাব বেরবার আগে আপনাকে ফোন করতে একবার?' যোগেনও একটু হাসি মিশিয়ে বলে, 'কোর্টে যদি ফার্স্ট আওয়ারে ওঁর কোনো আরজেন্ট কাজ থাকে, তাইলে প্লিইজ বোলেন না। দেখা তো হবই অ্যাসেম্বলিতে'। 'তাহলে আমি আপনাকে জানিয়ে দেব।' 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই ভাল।'

যোগেন আজকের 'স্টার অব ইন্ডিয়া'র ভিতরের পাতা থেকে জানল, মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের বিরোধিতা করে, কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় ক-দিন ধরেই মিছিলমিটিং চলছে—আগামীকাল অ্যাসেম্বলির কাছে কেন্দ্রীয় সমাবেশ ডেকেছে, বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব লেবার। মানে, সারওয়ার্দি শাহেবের ইউনিয়নের শ্রমিকরা। এআইটিইউসি কিছু বলেছে কী না খুঁজল যোগেন, পেল না। কংগ্রেস হয়ত লিগের সঙ্গে কে কত লোক আনতে পারে—এমন ঝামেলায় যেতে চায় না। তা থেকে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধতে পারে, সে-ভয় তো সরকারেরও থাকতে পারে, আরো বেশি পারে। স্বীকার না-করে উপায় নেই যে প্রধানত এআইটিইউসি গতবছর কয়েক-সপ্তাহের চটকল ধর্মঘট চালিয়ে নিজের ক্ষমতা প্রমাণ করেছে, কিন্তু মাত্র বছর দেড়েকে সারওয়ারদি যতগুলো লেবার হাঙ্গামা ট্রাইবুন্যাল করে মিটিয়েছে, এমন আর-কেউ পারেনি। এ নিয়ে উলটো কথাও চালু আছে। সারবওয়ারদি শাহেবের আসল বন্ধু অবাঙালি ব্যবসায়ী ও মালিকরা। সারওয়ারদি শাহেবের ইউনিয়নের সঙ্গে ঝামেলা তারা তাড়াতাড়ি মিটিয়ে নেয় যাতে লাল-ইউনিয়নগুলোকে একঘরে করা যায়।

ফোন বেজে ওঠে।

'হ্যাঁ। এনি বিগ টক? একটা কাজ করলে হয় না? আপনি কোর্টে চলে আসুন-না। আমি বোধহয় বাই লাঞ্চ ফ্রি হয়ে যাব। নইলে আপনাকে না-হয় একটা মামলার নথি ধরিয়ে দেব'।

'হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি কোর্টে কিন্তু ব্ল্যাক কোটে না।'

'আরে যোগেনবাবু, ব্ল্যাক কোটই আমাদের লক্ষ্মী। আর ধুতিপাঞ্জাবি তো দাতা হরিশ্চন্দ্র।'

হাসাহাসির মধ্যে ফোনাফুনি শেষ হয়।

শরৎ বোসের এই নজররাখাটা অবাক করে দেয়—নানা পার্টির এমএলএদের মধ্যে প্রফেশন্যাল যাঁরা, তাঁরা যাতে কলকাতার কোর্টগুলোতে কিছু আয় করতে পারেন, নইলে তাঁরা কী করে চালাবেন? শেয়ালদা কোর্টে তো শুধু এফিডেভিট করিয়ে শ-শ উকিল হাজার-হাজার টাকা রোজগার করে। কিন্তু ওঁর চোখকান খোলা। সাহায্য যেন কারো মর্যাদা হানি না করে। যোগেনকে সিভিল কোর্টের পিটিশনের কাজেই বেশি লাগান।

যোগেন সামান্য একটু দেরি করেই কোর্টে পৌঁছয়।

শরৎ বোস তাকে দেখে নিজেই উঠে বাইরে আসেন। ব্যারিস্টারদের লাইব্রেরিতে ভিতরে বসে তারা কথা বলতে পারতেন, সেজায়গা আছে। কিন্তু এসব ব্যাপারে শরৎ বোস শাহেবেরও শাহেব। বার লাইব্রেরিকে তিনি কখনো তাঁর রাজনীতির কাজে ব্যবহার করেন না।

যোগেনকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কী? আমার অফিসে গিয়ে বসব?'

'না। আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে আসছি। যশোরের রায়ট নিয়ে রসিক কাকা তো বেশ কয়েকদিন আগেই যশোরে যাইয়্যা সেখানেই আছেন। পরশুদিন হোম মিনিস্টারকে টেলিগ্রাম পাঠাইয়্যা আমারে পাঠাইব্যার কন।'

'হ্যাঁ। কিরণশঙ্কর তো বলেছে আমাকে, নাজিমুদ্দিনের বাংলা প্রবাদ সহ।'

'কাইল সারাদিন রায়ট-এরিয়ায় একসঙ্গে ঘুইর‍্যা রাইতে ট্রেন ধইর‍্যা আইজ আসছি। আমি কি দেইখল্যাম তা আমি রসিককাকাকেও বলি নাই। উনিও শুইনব্যার চান নাই। আমি অ্যাসেম্বলিতে এই ব্যাপারে অ্যাডজোর্নমেন্ট মোশন মুভ করতে চাই। কংগ্রেস কি আমাকে সাপোর্ট দিবে?'

'আপনি যদি মনে করেন ব্যাপারটা এত ইমেডিয়েট—মানে একসঙ্গেই তো বেঙ্গল টেন্যান্সি, মানি-লেন্ডার্স বিল, রিলিজ রাজবন্দীদের এবং এনি ডে আমরা নো কনফিডেন্স মুভ করব। এর মধ্যে ইস্যুটা চাপা পড়ে যাবে না তো, যদি আপনি সেটাকে এতই ইমেডিয়েট অ্যান্ড আরজেন্ট মনে করেন। আমাদের সাপোর্ট আপনি নিশ্চয়ই পাবেন। নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে কথা বললে, ও-ও রাজি হবে, ও-ই তো আপনাকে পাঠিয়েছে। তমিজউদ্দিন-সামসুদ্দিন আপনার বিরোধিতা করবে না, যদি আনয়্যাভয়ডেবল পলিটিক্যাল কারণ না থাকে। ওদের সাপোর্টের ওপরই তো নো-কনফিডেন্সের ভরসা। সেটা আপনার ভাবনার বিষয় নয়। আমি ভাবছি আপনার পারপাজটা কীসে সবচেয়ে ভাল সার্ভড হবে। আপনি তো আর হঠাৎ-উত্তেজনায় কিছু ভাবার লোক নয়।'

যোগেন বলে, 'আমি ভাইবছিলাম—আজই ফির‍্যা আইজই অ্যাডজর্নমেন্ট চাওয়ার যে-সুবিধা সেটা মিস করব না কী। অ্যাহন এই বিষয়ে আমার যা ক্রেডিবিলিটি তা তো দুদিন পর নাও থাইকতে পারে। রসিককাকার উপস্থিতিডা দরকার, বিরাট মণ্ডলের উপস্থিতিডাও দরকার। পিআরও তো বাইরে।'

যোগেন এ নিয়ে আর-কারো সঙ্গে কোনো কথা বলে না। ইতিমধ্যে রসিকলাল বিশ্বাস তপশিলি এমএলএ-দের, সমস্ত দলের তপশিলি এমএলএদের কাছে একটা বিবৃতি বিলি করেছে।

এ-নিয়ে যোগেনের সঙ্গে তাঁর আগে কথা হয়নি। তাছাড়া প্রধানত গান্ধীজির ইচ্ছেতেই কংগ্রেসের ধনঞ্জয় দাশ, তপশিলি কংগ্রেস ও সেই সুবাদেই কংগ্রেসের ডেপুটি হুইপ ও পিআরঠাকুর—নমশূদ্রদের স্বীকৃত নেতা, যোগেনের মতই, কিন্তু নেতৃত্বে যোগেনের বংশগত অধিকার নেই, পিআর-এর তুলনীয়, ও যোগেন বিলেতফেরৎ নয় পিআরএর মত ; কংগ্রেস যেসব প্রদেশে সরকার চালাচ্ছে সেসব জায়গায় তপশিলিদের সম্পর্কে কেমন ব্যবস্থা নিয়েছে তা দেখে আসতে বেশ বিজ্ঞাপিত একটা ট্যুরে বেরিয়েছে, তারা যদিও ফেরেনি, তবু, কংগ্রেসি প্রদেশগুলি সম্পর্কে তাঁদের ভাল ধারণার কথা কাগজে বেরিয়ে গেছে। আইনসভার ভিতরে মুসলিম লিগের নেতারা কথা বলছেন কম। আবার, কেপিপি-র যাঁরা কেপিপি ছেড়ে আলাদা ব্লক করেছেন তাঁরা হক-মন্ত্রিসভা যে যে-কোনো দিন পড়ে যাবে, এই আশায় বেশ বাচাল হয়ে উঠেছে। এমন একটা অদলবদলের সময় রসিকলাল জানাল,

'রাজনীতি যারা করেন তাঁরা প্রায় সকলেই জানেন, তপশিলি এমএলএ-দের সামনে একটা বিরল সুযোগ এসেছে। তাঁরা ঐক্যবদ্ধ থাকলে ও ঘটনার ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারলে তাঁরাই হবেন শক্তিসাম্যের নিয়ামক ও বাংলার ভাগ্যনির্ণায়ক।...সিন্ধু প্রদেশে যেমন মুসলমান ও তপশিলিদের একটি মন্ত্রিসভাকে কংগ্রেস সক্রিয় রেখেছে, এখানেও সেইরকম একটি মন্ত্রিসভা গঠন করতে কংগ্রেস আগ্রহ দেখিয়েছে। মাত্র ২৫ জন তপশিলি এমএলএ যদি বিরোধী পক্ষে যোগ দেন তাহলেই বর্তমান সরকারের পতন ঘটবে ও নতুন সরকারে তপশিলিরা অন্তত পাঁচজন মন্ত্রী পাবেন।'

শরৎ বোসই ঠিক করেছিলেন, সরাসরি পুরো মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব না এনে, আলাদা-আলাদা মন্ত্রীদের বাজেটবরাদ্দ কমানোর জন্য কাট মোশন আনা হবে। সেই প্রস্তাব জিতলে সেই মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হবে। শরৎ বোস এটাও ঠিক করেছিলেন, সাম্প্রদায়িক গোলমাল যাতে না বাঁধে তাই তপশিলি মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কোনো তপশিলি এমএলএ ও মুসলিম মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কোনো মুসলিম এমএলএ প্রস্তাব তুলবেন। প্রায় পরপর দশটি কাট মোশন বা অনাস্থা প্রস্তাব যেন পুরো সরকারকে তছনছ করে দিচ্ছিল। ৮ আগস্ট প্রথম কাট মোশনটি তুললেন ঢাকার তপশিলি এমএলএ ধনঞ্জয় রায়, মহারাজা শ্রীশকুমার নন্দীর বিরুদ্ধে। মহারাজা ছিলেন তিলি জাতের—পেছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী।

ইতিমধ্যে মন্ত্রী, মুসলিম লিগের সম্পাদক ও খিলাফৎ কমিটির সম্পাদক সারওয়ারদি, শ্রমিক নেতা হিশেবে, মন্ত্রিসভার পক্ষে হরতাল ঘোষণা করিয়ে দিলেন ও অ্যাসেম্বলি ঘিরে ফেলে এমন বিশাল শ্রমিক সমাবেশ ঘটালেন যেমনটি এর আগে কখনো ঘটেনি। সেই শ্রমিক সমাবেশ ছিল সরকারের পক্ষে ও অনাস্থা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। মুসলিম লিগের সরকারকে যারা ফেলতে চাইছে তারা ইসলামের দুশমন। সমাবেশের ভিতরে আটকে গিয়ে লিগবিরোধী মুসলমান নেতারা মুসলমান শ্রমিকদের হাতে মার খান ও পালিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন। এই আক্রান্ত নেতাদের মধ্যে ছিলেন, হুমায়ুন কবির, আবুল মনসুর আহমদ ও আরো কয়েকজন। তাঁদের উদ্ধার করতে স্বয়ং ফজলুল হক, নবাব হবিবুল্লাহ ও নাজিমুদ্দিনকে আসতে হয়।

এ-সমাবেশ নিশ্চিতভাবেই ছিল শ্রমিক সমাবেশ, বেশির ভাগই গঙ্গার পুব পারের চটকলের। এ-সমাবেশ নিশ্চিতভাবেই সাম্প্রদায়িক। ইসলাম ও মুসলমান ছিল তাদের প্রধান বিষয়। এ-সমাবেশ অংশত হলেও নিশ্চিত ছিল প্রাদেশিক। অবাঙালি শ্রমিকরাই ছিল সংখ্যায় বেশি। আর এ-সমাবেশ ছিল হাসান সারওয়ার্দির গুপ্ত রাজনৈতিক ক্ষমতার ও কলকাতার আন্ডারওয়ার্ল্ডের ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণের প্রথম প্রকাশ।

আবার একই সঙ্গে এ-সমাবেশ ছিল প্রায় সব ধরণের মুসলমানের—শিক্ষক-অধ্যাপক, ছোট মালিক, বড় মালিক, ঠিকাদার, খুচরো দোকানদার, রেস্টুরেন্টের ও হোটেলের বাবুর্চি, বেয়ারা, পাইকার, পাটের দালাল, কসাই, ডাক্তার, স্বদেশীকরা নারী, সকলের, সকলের, শুভেচ্ছা ও সমর্থনে লালিত ও পুষ্ট। সেই লালন ও পুষ্টি সেদিন সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, গুপ্ত দলীয়তা, রাজনৈতিক হিংস্রতা ও সংগঠনকে আড়াল দিয়েছিল। সে-আড়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার মত বোধ—কোনো রাজনৈতিক দলেরই ছিল না। একমাত্র তাদেরই খানিকটা ছিল, সেদিনও ছিল, যারা কংগ্রেসের বহিরাবরণে কৃষক সমিতি গড়ছিল সারা বাংলায় সেই কিছু কমিউনিস্টের, শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ছিল বাংলার বড়-বড় শিল্পকারখানায় সেই কিছু কংগ্রেসি-সোস্যালিস্ট ও কমিউনিস্টদের। তারা সারওয়ার্দির নেতৃত্বের রাজনীতিবিরহিত হিংস্রতার নজির তাদের নিজের-নিজের জায়গায় ইতিমধ্যেই দেখে ফেলেছিল—কৃষককে মুসলমান করা হচ্ছে, শ্রমিককে মুসলমান করা হচ্ছে।

বোধহয় তারা টের পেয়েছিল যে সারওয়ার্দি তার ক্ষমতা দেখাবে, তাই আরো-কিছু মিছিল সেদিন অ্যাসেম্বলিতে এসেছিল তাদের আলাদা-আলাদা দাবি নিয়ে। সেই দাবিগুলির মধ্যে প্রধানতম ছিল—'রাজবন্দীদের মুক্তি চাই' 'আন্দামান বন্দীদের ফিরিয়ে আনো,' 'পাটের দর, বেঁধে দাও,' 'জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করো' ও 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'।

এই স্লোগানগুলি সেদিন এমন প্রধান হয়ে ওঠেনি যাতে শোনা যায়। কিন্তু খবরের কাগজের ওপর আলতা দিয়ে মোটা হরফে লেখা ও চাটাইয়ের ওপর সাঁটা সেই পোস্টারগুলি নতুন একটা দৃশ্য তৈরি করেছিল রাজনৈতিক সমাবেশের। সারওয়ার্দির সমাবেশের সঙ্গে এই সমাবেশগুলির কোনো সংঘাত হয়নি। তেমন কোনো অবস্থাই তৈরি হয়নি। কিন্তু কোনো সংহতির আভাসও ছড়ায়নি। সারওয়ার্দির সমাবেশ ধরেই নিয়েছিল ঐ সমাবেশগুলিও সরকারের পক্ষে। ঐ সমাবেশগুলিতে যারা এসেছিল তারা এটাই জানাতে চেয়েছিল, সরকার নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই।

১০ আগস্ট, ১৯৩৮-এ অবরুদ্ধ আইনসভায় দ্বিতীয়-অনাস্থা প্রস্তাব জানালেন পি.আর.ঠাকুর তপশিলি ও নমশূদ্র মন্ত্রী অধ্যাপক মুকুন্দবিহারী মল্লিকের বিরুদ্ধে।

মুকুন্দবিহারীর পরিবার ছিল নমশূদ্রদের একটা গর্বের বিষয়। তাঁরা সব ভাইই ছিলেন কৃতী। তাঁদের ডাকা হত মল্লিক ব্রাদার্স বলে। মুকুন্দবিহারীর বিরুদ্ধে অনাস্থা জানানোয় বিস্ময় ছিল—এটা কি ঘটতে পারে। পিআর এমন তথ্যপ্রমাণ হাজির করলেন যাতে মুকুন্দবিহারীর ব্যক্তিগত দোষ—আত্মীয়তোষণ, ক্ষমতার অপব্যবহার, সমবায় আন্দোলনকে নিজের স্বার্থে অকেজো রাখা—পুরো মন্ত্রিসভার দায় হয়ে উঠল।

পিআর-কে সমর্থন করে বলল, যোগেন মণ্ডল। পিআর সাধারণত স্বাভাবিক স্বরেই বক্তৃতা দেন। বাইরে থেকে সমাবেশের গোলমাল ঢুকে পড়ছিল আইনসভায়। কিন্তু আইনসভার ভিতরে একটুও আওয়াজ ছিল না, এক পিআর-এর গলা ছাড়া।

যোগেন বরাবরই একটু নাটুকে, তার শ্রোতাদের সঙ্গে খেলতে ভালবাসে। গলা যথেষ্ট তোলে। কিন্তু সেদিন ঘটল একেবারে উলটো। হতে পারে, যশোরের অনুভব তার বুকে চেপে বসে আছে। হতে পারে, সে এই আইনসভার কাছে তার বেদনা ও আশঙ্কাটুকু জানাতে চায়। এমনও হতে পারে, সে যেন সর্বনাশের আঁচ পাচ্ছে। যোগেনের বিদ্রূপ সকলে পছন্দ করে, অথচ, যোগেন কোনো বিদ্রূপ করছিলই না। যে, যোগেন তার গলা নীচে বেঁধে রেখেছিল। যেন বাইরের সমাবেশগুলির আওয়াজ ও গোলমাল সভাগৃহে বেশি করে ঢোকাতে চাইছিল.

যোগেন যেন ছেড়ে-ছেড়ে বলছে, যা বলছে তার অতিরিক্ত কোনো তাৎপর্যের ইশারা দিতে।

'মানুষের সামাজিক পরিবর্তনের ইতিহাস অবিরত শ্রেণীযুদ্ধের ইতিহাস। এই মন্ত্রিসভায় ছ-জন মন্ত্রী আছেন যাঁরা বাংলার শীর্ষ স্থানীয় নবাব ও রাজা। কারো-কারো নামের আগে সত্যি-সত্যি স্যার, নবাব, মহারাজ এসব পদবী আছে। আমি তো শূদ্র। আমার কী অধিকার আছে বামুনের পৈতে মাপার—কোন বামুনেরটা হাঁটু পর্যন্ত, কোন্ বামুনেরটায় বেশি গ্রন্থি। তেমনি আমার মত শূদ্রের জানার অধিকারই নাই ঐ স্যার, নবাব, মহারাজা, পণ্ডিত, মৌলবি—এই সব পদবীর কোনটা বাপঠাকুরদার কাছ থেকে পাওয়া, কোন্টা কোন্কালে কোন্ সুলতানের কাছে পাওয়া, কোন্টা কোন্ পরীক্ষায় পাশ করে পাওয়া, আর কোন্টা নিজেকে নিজেরই দেয়া। নিজেকে তো দেয়াই যায়—নামের আগে একটা নাম। তেমন স্বকৃত নামের ভারে এই রাজা-গজা-খাজা মন্ত্রিসভা এত ভারাক্রান্ত যে তাঁদের কেউ, এই বারজনের মন্ত্রিসভার একজনও বাইরের ঐ সর্বহারা শ্রেণীর মানুষের সমাবেশের সামনে গিয়ে, যদিও এই সমাবেশের একটা বড় অংশই জনাব হাসান সারওয়ার্দিকে বাঁচাতে এসেছে, যারা এসেছে তারা শ্রমিক, এই মন্ত্রিসভা মালিকদের, তাই কেউ তাদের সামনে, নিজেদের সমর্থকদের সামনে দাঁড়াতে পারবেন না। মুকুন্দবিহারী মল্লিকও জাত্যা শূদ্র, বৃত্ত্যা ব্রাহ্মণ, লোভেন বৈশ্য, আত্মীয়তোষনেন ক্ষত্রিয়।

'এই সরকার যেন গরিবের সরকার, হকশাহেব তাই ফকিরির জোব্বা? পরেছেন। প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক শাহেব ফকিরের ভেক ধরেছেন—যাতে তাঁকে ন্যায় ও সাধুতার অবতার ভাবা হয়। তাঁর ন্যায় ও সাধুতা শুধু কথায়, কাজে নয়। একটি ঘটনা বলি। একটা সরকারি নির্দেশ প্রচারিত হয়েছে প্রতি চারজন হিন্দু সরকারি কর্মচারির পিছনে একজন তপশিলি জাতির কর্মচারী নিযুক্ত হবেন। এই করে সাম্প্রদায়িক অনুপাত রক্ষা করা হবে। সেই সুবাদে যশোর জিলার মগুরা থানার কুইল্ল্যা গ্রামের এক শুদ্দুরের পোলা কনস্টেবলের শিক্ষানবিশির চাকরি পায়। পুলিশের নিয়ম রান্নার জন্য রেশন দেয়া হবে, রান্নার ঘরও দেয়া হবে কিন্তু রান্না করতে হবে স্বহস্তে। এই নমোর ছেলে তো দুপুরে ভাত রাঁধে ও খায়। বিকালবেলায় শোনে উচ্চবর্ণের হিন্দু পুলিশরা আপত্তি করে যে একই ছাদের নীচে রান্নার ফলে তাদের স্পর্শদোষ ঘটছে। এইটুকু কথা যখন আমি হোম মিনিস্টারকে জানাই—উনি এর শাস্ত্রীয়বিধান জানার জন্য সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের মত জানতে চান। জানা যায়, এক ছাদের নীচে বিভিন্ন জাতের রান্নায় কোনো স্পর্শদোষ ঘটে না। যদি রান্নার জায়গাগুলিকে দেয়াল দিয়ে পার্টিশন করা থাকে, তাহলে স্পর্শদোষের প্রশ্নই ওঠে না। আর, যদি রান্নাঘরগুলিতে একটা ফুটো করে দেয়া হয়, তাহলে স্পর্শদোষ বরং স্পর্শগুণ হয়ে যায়। এই বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দিয়েছেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সেই পরামর্শ আমাকে দেখিয়েছেন। কিন্তু যে-নমশূদ্র ছেলেটিকে একবেলার জন্য পুলিশের চাকরি দেয়া হয়েছিল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তাকে আর খুঁজে বের করতে পারলেন না। গান্ধীজি যখন কংগ্রেসশাসিত প্রদেশ গুলিতে অস্পৃশ্যতাবিরোধী আইন বানাতে বলছেন, তখন আমাদের বাংলায় এসে তিনি দেখে যেতে পারেন, হিন্দুদের অস্পৃশ্যতার শিকড় কত গভীরে। তার শেষ চৌকিদার এক ছোট থানার অশিক্ষিত হিন্দু কনস্টেবল। সে-ও পারে মহামান্য ব্রিটিশ সম্রাটের আদেশে নির্মিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের সরকারের আইনসভায় পাশ করা আইন উপেক্ষা করতে।

'যশোরের রায়ট নিয়ে আপনারা প্রতিদিন কলকাতার কাগজে নতুন-নতুন খবর পাচ্ছেন। আমাদের শ্রদ্ধেয় মেম্বার রসিকলাল বিশ্বাস প্রায় সপ্তাখানেক যশোরে ঘোরেন, দুদিন আগে আমাকেও ডেকে পাঠান। আমরা দু-জন মিলে খুঁজলাম কিন্তু যশোরে কোনো রায়ট পেলাম

না। কলকাতার কাগজদের হিশেব অনুযায়ী ফরিদপুরের গোপালগঞ্জের এই বছরের ফেব্রুয়ারি দাঙ্গায় নিহতের সংখ্যা মুসলমান ৫, হিন্দু ৯। মার্চের টাঙ্গাইল দাঙ্গায় কাগজের হিশেবে নিহতের সংখ্যা হিন্দু ৫। যশোরের এই এখনকার দাঙ্গায় এখন পর্যন্ত ৮ জন হিন্দুর মৃত্যুসংবাদ বেরিয়েছে। এই হিশাবপত্র বলা বাহুল্য হিন্দু কাগজগুলিতে বেরিয়েছে। আমরা এই প্রত্যেকটি জায়গায় গিয়েছি. কোনো একটি জায়গাতেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি। গত বছরে তুলনীয় সময়ে জমির আইল, পুকুরের ঘাট, আমগাছের শিকড়, গরুর অনুপ্রবেশ—এইসব ঘটনা যত ঘটেছিল ও ঘটে থাকে, আশ্চর্যের ব্যাপার, এবার তার একটিও ঘটেনি। অথচ যে-দাঙ্গার নামগন্ধও গতবার ছিল না, এবার পুলিশের খাতায় সেই দাঙ্গার ফলে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বেড়ে দাঁড়িয়েছে এই চারটি জিলায়—যশোর-খুলনা-ঢাকা-ফরিদপুরে ৩৭।

'হিন্দু কাগজগুলি হিন্দুহত্যা বাড়িয়ে দেখানোর কারণ হিন্দুদের মুসলমানবিরোধী দাঙ্গায় জড়ো করা। পুলিশের খাতায় যাবতীয় অপরাধ মুসলমান ও শূদ্রদের নামে এজাহার করা। পুরো পুলিশ সার্ভিসে একজনও মুসলমান আইপিএস নেই, বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে আছেন দু-জন, জুডিসিয়াল সার্ভিসে ছিলেন একজন, তিনিও রিট্যায়ার করেছেন। আর, তপশিলি? আমার মনে হয় এ প্রশ্ন মনে-মনে তোলাও ঠিক নয়। আমরা অসুস্থ হয়ে পড়তে পারি। এমন স্বর্গরাজ্য আর কোথায় মিলবে? যে-চৌকিদার গিয়ে চোর ধরছে, সে হিন্দু, জেনারেল। যে পুলিশচৌকিতে গিয়ে সে সোপর্দ করছে সেই সাব-ইনস্পেক্টার, গোঁড়া হিন্দু, সম্ভবত ইউপির। যে-ইনস্পেক্টর কোর্টে পাঠাবেন তিনিও হিন্দু-জেনারেল। যে-মুন্সেফের কাছে প্রথম মামলা উঠবে, সে-ও হিন্দু-জেনারেল, নবশাখও হতে পারে। তাহলে তো বাকি থাকল চোরটা আর জাতদুটো। একটা লোকের কি দুটো জাত হতে পারে? না, একেবারে, তা না। তবে ভদ্রলোকদের মধ্যে কম। চোরটাকে হয় শূদ্র না-হয় মুসলমান হতেই হয়।

'আমাদের এই অনাস্থা প্রস্তাবের ভবিষ্যৎ কী হবে, তা ঠিক হয়ে গেছে প্রথম প্রস্তাবের ভোটাভুটিতে। ১৩৫ জন ভোট দেবেন এই সরকারের পক্ষে। তার মধ্যে ২৩ জন ইয়োরোপিয়ান ব্লকের। বাংলায় ইয়োরোপিয়ান জনসংখ্যা ০-১ শতাংশ। আর তাঁদের এমএলএসিট মোট সিটের এক দশমাংশ, ২৫ জন। তাঁদের রাখাই হয়েছে গভর্নর শাহেবের রিজার্ভ ফোর্স হিশেবে। সেই ২৩টি ইয়োরোপিয়ান ভোট ও ২টি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ভোট বাদ দিলে দাঁড়ায় সরকারের পক্ষে আছেন ১০৫ জন নির্বাচিত সদস্য। আর সরকারের বিপক্ষে আমরা ১১১জন। ইয়োরোপিয়ান ব্লকের আশ্রয়ধন্য এই সরকার কতটা আত্মসম্মানজ্ঞানহীন যে ইয়োরোপিয়ান ব্লকের আশ্রিত পোষ্য হয়ে মন্ত্রী থাকতেও তাঁদের আপত্তি নেই।

'থাকবেই-বা কেন? প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য বাঁটা হয়েছে শাহেবদের কথা ভেবে। বেঙ্গল টেনান্সি অ্যাক্ট-এর সংশোধন হয়েই চলেছে শাহেবদের স্বার্থে। মহাজনি বন্ধের আইন বেরিয়ে গেছে শাহেবদের স্বার্থে। আর শাহেবদের স্বার্থ যাতে রক্ষিত হয় তার জন্য হক-মন্ত্রিসভা হুজুরে হাজির ও হিন্দুমিশন, হিন্দুসভা এইসব সাম্প্রদায়িক সংগঠন দূরদূরান্তে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করছে। একটা স্থায়ী দাঙ্গার পরিবেশে, শাহেবদের স্বার্থ সবচেয়ে নিরাপদ থাকে।

'কিন্তু আমরা দায়িত্ব সহ আইনসভায় আজ ঘোষণা করতে চাই—কোনো নমশূদ্র বা রাজবংশী, বা তপশিলি জনগোষ্ঠীর একজনও আর উঁচুজাতের হিন্দুদের জীবনমান রক্ষা করতে মুসলমানদের সঙ্গে দাঙ্গা করবে না। হিন্দু-ঐক্য একমাত্র তখন সরব হয় যখন বর্ণহিন্দুরা আক্রান্ত হন। আমরা হিন্দু না।'

হকের খপ্পরে মণ্ডল

দশদশটি কাট মোশনের একটিও পাশ না-হওয়ায় বিরোধী পক্ষের তো মানহানি হওয়ার কথা। তা তো হলই না উলটে সরকারপক্ষ বা মন্ত্রিসভা বা হকশাহেব ও তাঁর মন্ত্রীরা কারো দিকে

৯৬

চোখ তুলে তাকাতে পারে না। মন্ত্রিসভা টিকে গেছে, শুধু ইয়োরোপিয়ানদের ভোটে—এ লজ্জা আর ঢাকা যাবে কী সে, যদিও মাস পাঁচেক আগে, ৩৮ সালের মার্চেই স্বাস্থ্যমন্ত্রকের বাজেট বরাদ্দের ওপর এক কাট মোশনে মন্ত্রিসভা পেয়েছিল ১১২ ভোট, তার ২৩ জন ছিল শাহেব আর দুজন ছিল অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। এই ২৫ জনকে বাদ দিলে সরকার পক্ষে থাকে ৮৭ জন মেম্বার। আর, বিরোধী পক্ষে ছিল ৯৬ জন। সেই মার্চ থেকেই হকশাহেবের সরকার, সংখ্যালঘু সরকার বলে খাটো হয়ে গিয়েছিল। ৮ আগস্ট থেকে যে ১০টি কাট মোশন পর-পর উঠতেই লাগল তখন ভোটের ভাগাভাগি প্রায় স্থায়ী হয়ে গেল—সরকারের পক্ষে ১৩০ আর বিপক্ষে ১১১। সরকার পক্ষীয়দের থেকে ২৫ শাহেবকে বাদ দিলে থাকে ১০৫।

এটা একটা ঘটনা হলে, না-হয় লোকজন একটু ভুলে যেতে বা ভুলে থাকতে পারত। কিন্তু সতের মাসে যদি একটা সরকারকে ১৭ বার শাহেবদের সমর্থন নিয়ে বাঁচতে হয়, তাহলে বাঁচার প্রমাণ আর কী করে দেয়া যাবে?

অথচ এই সরকারের সমর্থনে তো এমন সমাবেশ হয়েছে যেমন এর আগে কখনো ঘটানো যায়নি। তারা প্রায় সবাই-ই শ্রমিক। কৃষক-প্রজা পার্টির লিগ বিরোধীরা সমাবেশের ভয়ে আইনসভার বাড়ি থেকে বেরতে পারেনি। রাতে তাদের খাওয়ার বন্দবস্ত হয়েছিল বিরিয়ানি বা ভাতের সঙ্গে দু-রকমের মাছ বা বড় বাজার থেকে আনা কেশর মোহনভোগ আর গাওয়া ঘিয়ে ভাজা চপচপে পরোটা। কম পড়ে গেল নিরামিষাশীদের খাবার। বিরিয়ানির খদ্দেররা বা মৎসসুখীরা, সহজেই হাত বাড়াতে পারে পরটা আর কেশর ভোগের দিকে। মাথাগনতিতে আইনসভায় নিরামিষাশীর সংখ্যা খুবই কম। চাহিদার অপ্রত্যাশিত চাপে তাদেরই বরাদ্দে টান পড়ে।

সরকারের পক্ষে সমাবেশ আর বিপক্ষে বিরিয়ানি সত্ত্বেও যে সরকার পড়ে গেল না, তার আরো কারণ আছে। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের মতন শ্রদ্ধেয় মনীষী সায়েন্স কলেজে তাঁর রবিবারের আড্ডায় সবাইকে শুনিয়ে দরজা গলায় বলেছেন—বহুদিন পরে বাংলায় একটা ভাল সরকার হয়েছে, হকশাহেবের সেই সরকারকে ফেলে দেয়া অনুচিত কাজ।

ব্যাপারটা এমনই গিঁঠি পাকাল যে এই আইনসভার আড়াইশ সদস্যের মধ্যে হেরো-সরকার, আইনসভার বাইরে রাস্তায় অগুনতি মানুষের মধ্যে জেতা সরকার—এমন একটা থিয়েটারি ভাগাভাগি যেন খুব অস্পষ্ট থাকছিল না। মুসলিম লিগের যারা প্রধান নেতা, বিশেষ করে নাজিমুদ্দিন ও সারওয়ারদি এমন একটা চাল নিলেন যে এটাও তাঁদের পরিকল্পনা মাফিক জিত। তাদের বকলমে একটা এমন কথাও চালু হয়ে গেল—যে-আইনে আমরা মেম্বার সেই আইনেই শাহেবরা মেম্বার। তাদের ভোটে জেতায় দোষ কীসের?

মুসলিম লিগের কোনো নেতারই এটাতে কিছু মনে হয়নি, অন্তত শীর্ষ নেতাদের। নবাব হবিবুল্লাহ বা সারওয়ারদি তো নিজেদের শাহেব ঘেঁষা মনে করতে আনন্দ পায়, বিশ্বাসও পায়। বাইরের সমাবেশটা মাত্রই একটা কৌশল। সারওয়ারদি মনে করে, তার নিজের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির পক্ষে এই সমাবেশের ক্ষমতা তাকে সার্ভিস দেয়। নাজিমুদ্দিন মনে করে সে যে সর্বপ্রধান নয় এটাই তো সবচেয়ে অন্যায়। শাহেবদের দৌলতে বেঁচে আছে, মন্ত্রী থাকতেই-বা লজ্জা কী? মুয়াজ্জামুদ্দিন হোসেন তো আইনসভায় বক্তৃতাই করল—'যদি দরকার হয়, তাহলে ভারতের বাইরে থেকে, ইজিপ্ট থেকে, বাংলার বাইরে থেকেও মুসলমানদের এনে চাকরি দিলে বাঙালি মুসলমানদের পক্ষে ভাল হয়।' এমন কী হকশাহেবও তো চাকরিতে মুসলমান কোটা ভরার দরকারে হোসেনের ঐ মন্তব্য ব্যাখ্যা করেন সমর্থনের সুর দিয়ে, 'যদি চাকরিতে বাংলা থেকে যোগ্য লোক পাওয়া না যায়, তাহলেই এক এমন বিকল্প ভাবা যেতে পারে'।

অথচ হকশাহেবের ভাবগতিকে কোনো বদল নেই। এমন কী, এটুকু আভাসও কেউ বানিয়ে দেখতে পায় না যে হকশাহেব ভিতরে-ভিতরে নাড়া খেয়েও বাইরে ভাব দেখাচ্ছেন যেন তাঁর কিছুই আসে যায় না, এমন কী মন্ত্রিসভা যদি পড়েও যেত তাহলেও যেন তাঁর কিছু আসত-যেত না। যেন, তাঁর একটা আশাও ছিল যে মন্ত্রিসভাটা ভেঙে যাক। সেটা বলেও ফেলে ছিলেন একদিন লবিতে, সিদ্দিকিশাহেবের এক কথার জবাবে, 'আচ্ছা হকশাহেব, আমার বড় জানতে ইচ্ছে করে আপনি কী করে এতটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন? কোনো কিছুতেই কোনো তাপ-উত্তাপ নেই। এদিকে সকলের তো ধারণা ফজলুল হকশাহেব মাথা-ঘাড়ে চলেন না, দিল্, হৃদয় নিয়ে চলেন'।

এমন করে হকশাহেবকে এক সিদ্দিকি শাহেবই বলতে পারেন। বিলেতে পড়াশুনো, অভিজাত বাড়ির ছেলে, মতামতে একেবারেই সাম্প্রদায়িক নন, সর্বভারতীয় মুসলিম লিগের কার্যকরী সমিতির সভ্য, পার্লামেন্টারি রীতি পদ্ধতিতে এমন ওয়াকেবহাল যে পয়েন্ট অব অর্ডার তুললেই স্পিকারের মুখ কাল, জিন্নার সঙ্গে মত পার্থক্য গোপন রাখেন না। সিদ্দিকি শাহেব এমন কথা, লবিতে, সকলের সামনে বলার মধ্যে তাঁর নিজের অস্বস্তিটাই ধরা পড়ল। ইংরেজের উচ্ছিষ্ট একটা সরকারকে তিনিও তো সমর্থন দিতে বাধ্য হচ্ছেন।

হকশাহেব ঠোঁটটা গোল করে সিদ্দিকি শাহেবের কথা শুনলেন, তারপর না হেসে, খুবই গাম্ভীর্য নিয়ে বললেন, 'মন্ত্রিসভা-ভাঙনের কথা কন সিদ্দিকি ভাই?'

'তা ছাড়া আর কী বলব? মন্ত্রিসভাটা তো আপনার। পড়লে তো পড়ত হক-মন্ত্রিসভা—'

'অপজিশন তো মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা জানানোর সাহস পায় নাই। এক-একজন মন্ত্রীর বাজেট বরাদ্দের উপর আলাদা কাট মোশন আনছে।'

'ফাইন্যান্স বিলে মন্ত্রী কাত হলে কি ক্যাপ্টেন বাঁচত?'

'না, না, তা হব ক্যামনে? জয়েন্ট রেসপনসিবিলিটি না? কার্টসি টু দি পার্লামেন্টারি কাস্টম মন্ত্রিসভাই তো রিজাইন কইরত্যাম।'

'তফাৎটা কী হল? যাই হোক না কেন, শাহেবদের ভোটের কারণেই তো অপজিশন হারল—'

'তাহলে আমার হৃদয়ের কী হইল?'

'তা হলে আমাদের কী হল?'

'কী হইল?'

'লজ্জা। লজ্জা। উথলে নয়নবারি।'

'আমার তো তেমন লজ্জার কোনো কারণ দেখি না, সিদ্দিক শাহেব। অ্যাহন, একডা ফজলুল হক ছাড়া কেউ সরকার খাড়া কইরতে পারব না। আইন সভায় তো ঐ নামের দ্বিতীয় কোনো মেম্বার নাই। রিজাইন কইরলে পরদিন আবার আমারেই ডাইকতে হইত লাটশাহেবরে নতুন মন্ত্রিসভা বানানোর লগে। আমি ছাড়া তো কারো মেজরিটি নাই। মন্ত্রিসভারে ফেইল্যা দিলে আমারেই যদি ফিইর‍্যা ডাইকবার লাগে, তাইলে তো আমারই গ্ল্যামার আর-এক পোঁছ বাইড়ত। শাহেবরা সেইডা বুইঝ্যাই আমারে গ্ল্যামারডা পাইতে দিল না।'

সিদ্দিকি শাহেবের সঙ্গে হকশাহেবের কথা হচ্ছে—আরো সব মেম্বাররা এসে ভিড় করবে না—তা কি হয়? লবির যাতায়াতই বন্ধ হয়ে যায়। যাতায়াত ঘটছিলও না, কে আর এই আসর ছেড়ে যাবে?

সিদ্দিকি শাহেব একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'এটা তো অস্বীকার করাও যায় না। এ যুক্তিটা। কিন্তু স্যার, একটা কথা বলুন—এই যুক্তিটা কি নো-কনফিডেন্সের আগেই আপনার মনে এসেছে। নাকী শাহেবদের ভোটে রক্ষা পাওয়ার পর মনে এসেছে?'

হকশাহেব হো হো রবে তাঁর স্বাভাবিক হাসিতে লবি ভরিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, 'আপনে তো বব্বের পোলা। আপনে জানবেন ক্যামনে পদ্মা-মেঘনা-কীর্তনখোলায় মাঝগাঙে যদি ঝড় আইস্যা ঝাঁপায়, তাইলে, হাঙরের নাগাল ঢেউগুল্যার কোনো আগে-পরে গোনা যায় না। যেইডা ভাঙলেন, সেইডাই ভাঙলেন। হয় পাড়ে পৌছান নাও নিয়্যা আর গল্প নিয়্যা, নয় গাঙে ডোবেন নিজেও আপনার গল্প নিয়্যা'।

'হকশাহেবের কথা শুনে মনে হয়, উনি নিজেই আস্থা ভোটে জিতলেন,' ভিড়ের পেছন থেকে নলিনাক্ষ সান্যাল টিপ্পনী কাটেন, 'দশদিন ধরে যেন ওঁর শান্তি-স্বস্ত্যয়ন হল—না?'

'নলিনাক্ষ, দ্যাহো, তোমরা তো প্রমাণ দিয়্যা ছাইড়ল্যা যে অনাস্থা প্রস্তাব তোলার লাইগ্যা আবশ্যক আশি-বিরাশিডা সইও তোমরা জুটাইতে না-পাইর‍্যা এক-এক মন্ত্রীরে কাটমোশনে কাইটব্যার ধইরল্যা। কার্টসি টু পার্লিয়ামেন্টারি কাস্টম, তাতেই তো প্রমান হইয়্যা গেল, ফজলুল হকরে নিয়্যা কুনো আপও নাই, কিন্তু তার মন্ত্রীগ কারো-কারো নিয়্যা আপত্ত আছে। এমন প্রশংসাবাক্য শুইনলে তো আমার অসন্তোষের কোনো কারণ দেহি না।'

সেই ভিড়ে যোগেনও ছিল আর তার দিকে হকশাহেবেরও নজর পড়েছিল। যোগেন কিছু বলেও নি, কারণ সে তো ছিল অনাস্থা জানানোর বড় আসামি। হকশাহেবই বলে উঠলেন, 'এই মণ্ডল, আইসো, নিয়ড়ে আইসো।' যোগেন ভিড়ের পেছন থেকে একটু লাজুক মুখে এগিয়ে আসে। হকশাহেব বলতে থাকেন, 'আরে, আইনল্যাম একডা নেয়াপাতি নারকেইল সেই গৌর নদী থিক্যা। কইলকাতায় পা দিয়্যাই হইয়্যা গেল স্বাধীন। সব্বাই মিল্যা ওর মাথা চিব্যাইয়া লিডার কইর‍্যা তুলছে। চলো দেহি, আজ আমার লগে—তোমারে কত্ডা আর বাঁচান্ যায়?'

যোগের কাঁধে ডান হাত রেখে হকশাহেব তাঁর চেম্বারের দিকে চললেন। যোগেন হকশাহেবের খপ্পর থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনের ভিড়কে দেখলও না একবার।

আইনসভা থেকে যোগেনকে নিয়েই হকশাহেব রাইটার্সে চলে এলেন। গাড়িতে ওঠার সময়

যোগেন বলে ওঠে, 'দ্যাহেন, শেখ শাহেব, সব কিছুর একটা আদবরীতি থাকে। আপনার পাশে আমারে বইসতে আপনে ডাকতি পারেন। কিন্তু সেই ডাকার জবাবে, আমি আপনার পাশে গিয়্যা বইসব্যার পারি না।'

'দ্যাহ, মণ্ডল, তুমি হিন্দুগ ছোঁয়াছুয়ি অ্যাসেম্বলিতে ঢুকাইও না। আমার সঙ্গে এক-সিটে বইসলে তোমার জাইত যায় ক্যামনে?' ততক্ষণে যোগেন সামনের দরজা খুলে বসে গেছে।

হক-মণ্ডল চোর-পুলিশ

রাইটার্সের পথে হকশাহেব জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার কি আইজ অপরাহ্নে কোনো কাঠিবাজি আছে?

৯৭

'তেমন কিসু নাই। ক্যা?'

'ক্যা? কাঠিবাজিতে তো কোনো হাফছুটি নাই। প্রত্যেকডা মিনিট ইমপোরট্যান্ট। তবে তোমরা তো বর্তমানে এড্ডু, যাকে বলে, ন্যাত্যায়া পড়ছ? না?'

যোগেন বলে ওঠে, 'ন্যাতাইয়া পড়নের কারণডা কী?'

'এই হার। মন্ত্রিসভা ভাইঙব্যার পারল্যা না?'

'বিরোধী পক্ষের যা করণীয় তা তো কইরব্যারই লাগে।'

'তুমি 'বিরোধী' পক্ষে পার্মানেন্ট?'

'যদি আপনার মন্ত্রিসভায় ঐ গজা খাজা আর ছোট জাইতের রাজা-নবাবগুল্যা আফিমখোরের মতন ডুল্যায়, তালি বিরোধী পক্ষেই ভাল।'

হকশাহেব একটু হেসে বললেন, 'মণ্ডল, আমার মনে হইছিল ক্যা জানো যে তোমার কিছু বুদ্ধিসুদ্ধি আছে! অবস্থার বৈগুণ্যে তুমি ঘোল খাইব্যার পারো, কিন্তু নিজের দুর্বুদ্ধিতে ঘোল গিলব্যা না। ক্যান যে মনে হইছিল?'

'আপনার মনের খবর কেউ কইব্যার পারে? শাহেবগুল্যা আপনারে দুই চক্ষে দেইখবার পারে না। কিন্তু জিয়াইয়্যা রাহে আপনারেই। আপনার কখন হিশাব ছিল যে আপনে আমারে শূলে দিব্যার চাইলেও আমি পলাব্যার পারব। তারপরে যহন দ্যাখলেন, আরে, ছ্যামড়াডা তো পলায় না, তহন, আমারে জিগ্যান—তোরে-না আমি আর এডডু চালাক ভাবছিল্যাম। বধ্যভূমিতেও তুমি এত নির্ভয় কেন যুবক? মাতৃভূমির জন্য মরিবার উৎসাহে। এ-মরণ তো চিরকালের মত বাঁচা।'

হকশাহেব একেবারে হো হো হাসিতে দুলে ওঠেন, 'এবার তোমার কোটেশন আমি ধইর‍্যা ফেলছি। 'মীরকাশিম'। না?

ধরা পড়েও যোগেন হাসে। ফজলুল হক্ ছাড়া আর-কেউ কি তার নিজের কথার মধ্যে নাটকের আলাপ ঢুকিয়ে দেয়ার মজাতে এমন সাড়া দিত? দিয়েছে কখনো? হকশাহেব এতটা হালকা রাখেন কী করে? নিজেকে?

রাইটার্সে লাল পাগড়ির পেখম মেলা দারোয়ান গাড়ি দাঁড়াতে না-দাঁড়াতেই দরজা খুলে ধরে। গাড়ি থেকে নামতে হকশাহেবের অসুবিধে হয়। গাড়ির সিট তো পেছনে হেলানো।

সেটাকে উল্টে সামনে নুইয়ে বাঁ পাটা, বের করতে সময় লাগে।

হকশাহেব গাড়ি থেকে নামার পরই মণ্ডলকে ঘাড় ঘুরিয়ে ধমকান, 'তোমারে নামাইতে কি অপ্সরাগণ চৌদোলা নিয়া আইসবে নাহি? নামো—আরে, নামো।' মন্ডল গাড়ির ভিতর থেকে বলে ওঠে, 'আপনে না অ্যাহনি বাইরাবেন কইলেন। তালি আর মিছামিছি আপনার লগে সিঁড়ি ভাঙি কেন?'

হকশাহেব দু-এক পা এগিয়ে গিয়েছিলেম। যোগেনের কথার জবাব দিতে তাঁকে দাঁড়াতে ও ঘুরতে হয়, পুলিশ বা দারোয়ান বুঝতে পারে না কী করবে। হকশাহেব, 'এই মণ্ডল এইখানে তোমারে বইয়্যা থাকতে দিব না। আইসো আমার লগে, ফাঁকাইন্যা কইরা না।'

মণ্ডলকে নামতেই হয়। সে হকশাহেবের সঙ্গে একটু দূরত্ব রেখে পেছন-পেছন যায়। কয়েক পা যেতেই ছোট্ট একটা লিফট। একেবারেই ছোট—শুধু প্রাইম মিনিস্টার আর চিফ সেক্রেটারির জন্য। যদিও অন্য সেক্রেটারিরা ও মন্ত্রীরাও ওঠানামা করে, সুযোগ বুঝে।

হকশাহেব লিফটের দিকে ঘুরতেই যোগেন দোতলার সিঁড়িতে পা দেয়। লিফ্‌ট উঠতে শুরু করেছে আর ভিতর থেকে হকশাহেবের চিৎকার ওঠে, 'আরে রে রে, মণ্ডল গেল কৈ?' একই স্বরে লিফটম্যানকে জিজ্ঞাসা করেন, 'মণ্ডলরে উঠ্যাইল্যা না।' তারপর কোল্যাপসিবল গেটের ফাঁক দিয়ে আরো গলা তুলে ডাকতে থাকেন, 'হেই, বরিশালের যোগেন মণ্ডল, গৌরনদীর যোগেন মণ্ডল, আরে গ্যালা কুথায় পলাইয়া? এই লিফ্‌ট নামাও। লিফ্‌ট নামাও। মণ্ডলরে আনো। তারে আইনল্যাম ডাইক্যা আর ফেললাম ফেইক্যা। এ কী কালা পুরুত আর তোতলা যজমানের কাণ্ড'!

হকশাহেবের হুকুমে লিফট আবার একতলায় নামে। হকশাহেবই বেরচ্ছিলেন যোগেনকে খুঁজতে কিন্তু পাখামেলা মোরগের মত পাগড়ি-মাথায় দারোয়ান, 'আমি যাই স্যার', বলে বেরিয়ে দোতলার সিঁড়ি কয়েক ধাপ লাফিয়ে উঠে যোগেনকে ধরে ফেলে বলে, 'স্যার, পি-এম খোঁজেন তো!'

লিফটের সামনে দাঁড়িয়ে হকশাহেব হেসে উঠে হাততালিও দেন প্রায়, 'আরে মণ্ডল, তুমি কিন্তু, উদ্যা-চালাক, দেখনদারিতে যত, কামদারিতে তত না।'

যোগেন বুঝে ফেলেছিল, হকশাহেব আরো বিপর্যয় ঘটাতে পারেন। সে সিঁড়ি ভেঙে নেমে দাঁড়ায়, হকশাহেব লিফটের ভিতরে ঢোকেন, তাঁর পেছনে যোগেন, শেষে দারোয়ান।

লিফট উঠতে শুরু করতেই—হকশাহেব যোগেনকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কি আমারে ভড়কি খাওয়াইল্যা, না কী পলাইল্যা?'

যোগেন কোনো জবাব না দেয়ায় লিফট দোতলায় ঠেকে ও ওরা সকলে বেরন। যোগেন বুঝতে পারে পি-এমের দারোয়ান এখন তার দিকে নজর রাখছে। ইতিমধ্যে যোগেন ঠিক করে ফেলেছে, যতক্ষণ হকশাহেব তাকে না-ছাড়েন, ততক্ষণ সে আর পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে না। যোগেন এসব কিছুকে পাত্তা না—দেয়ার মেজাজেই বরাবর থাকে। কিন্তু রাজনীতিডা অ্যাহন এতডাই প্যাঁচাইলা হইয়া গিছে যে কেউ ভাইববে হকশাহেব যোগেনরে টোপ দিচ্ছে, কেউ ভাইববে, যোগেনই হকশাহেবকে খেলাচ্ছে। হয়তো এমন মিশ্রণ একটা হকশাহেব ঘটালেন—সিদ্দিকির সঙ্গে তর্ক করতে-করতে যোগেনকে কাছে ডাকেন, তারপর পাকড়াও করেন। কিন্তু মতলবটা তো ঠাহর করতেই পারছে না যোগেন।

ওঁর ঘরের দরজাটা খুলে দিয়ে দারোয়ান দাঁড়িয়ে ছিল। হকশাহেব ঘরের ভিতরে ঢুকে যান—চকিতে একবার পেছনে তাকিয়ে। যোগেন সাজানো চেয়ার গুলির প্রথম সারির শেষ

চেয়ারটায় গিয়ে বসে। সেটা পড়ে হকশাহেবের ডাইনে কিন্তু হকশাহেবের চেয়ার থেকে দেখা যায় না—মাঝখানে রিভলবিং বুকশেলফ একটা আড়াল দিয়েছে।

হকশাহেবের সঙ্গেই দু-চারজন ঢুকেছিল, তাদের কেউ-কেউ দাঁড়িয়ে থাকল, একজনই শাদা চামড়া ছিল, সে প্রথম সারির মাঝের চেয়ারটায় বেশ আয়েশ করে বসল। আর দু-জন দ্বিতীয় সারির কোণের চেয়ারে বসল। শাহেবের বসার মধ্যে একটা ভাব ছিল, যেন ওর অনেক কথা আছে। অন্যদের কাজ সেরে চলে যাওয়ার অপেক্ষায় আছে। সেই অন্যদের একজন কয়েকটা ফাইল রাখল হকশাহেবের ডানহাতি ট্রেতে। আর একজন কী জিজ্ঞাসা করে বেরিয়ে গেল। হকশাহেব চশমা খুলে টেবিলে রেখে চেয়ারে হেলে শাদা চামড়ার দিকে তাকালেন। কিন্তু তাঁর ভঙ্গিতে এটা কোথাও বোঝা গেল না যে তিনি শাহেবকে তাঁর কথা-বলার জন্য আহ্বান করছেন। হকশাহেব এটা জানেন যে শাহেবরা তাঁকে একেবারে পছন্দ করে না, তারা পছন্দ করে খাজা নাজিমুদ্দিনকে। সুযোগ পেলেই হকশাহেব বুঝিয়ে দেন, তিনিও শাহেবদের পছন্দ করেন না। যোগেন মনে করে উঠতে পারে না—হকশাহেব কোনো আলোচনা বা তর্কে শাহেবের কথা, এমন কী লাটশাহেবের কথাও, 'হ্যাঁ' বলে মেনে নিয়েছেন কী না। বরং, হকশাহেব চুপ করে গিয়ে অন্য দিকে ঘাড় ঘোরান, তাতে বুঝে নিতে হয় তাঁর অগত্যা সম্মতি।

শাহেব যা বলার তা বলল, অমন হেলে থেকেই। হকশাহেবের গলা চাপা স্বরেও গমগমিয়ে ওঠে, 'বাট দি সাবজেক্ট অব এক্সপোর্ট ট্যাক্সিং শুড বি টেকেন আপ উইথ দি সেন্ট্রাল গবমেন্ট। দি স্টেটস ডু নট হ্যাভ এনি রাইট টু নিগোসিয়েট।'

শাহেব বলল, 'হ্যাঁ, তারা সেটা জানে। সেই কারণেই ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন থেকে কোনো গভর্নমেন্টের সঙ্গেই ফর্মালি মুভ করা হয়নি। কারণ, ট্যাক্স ইকুয়ালাইজেশনের ব্যাপার বিটউইন দি কর্নসার্নড স্টেটস অ্যামিকেবলই সেটল্‌ড হয়ে যায়। অ্যাজ প্রোডিউসার অ্যান্ড এক্সপোর্টার কেন দু-বার ট্যাক্স দেব?

শেখশাহেব একটা বাঁকা হাসির সঙ্গে বললেন, 'যদি তোমরা আমার রেললাইন ও গুডসশেড ব্যবহার করো আর বম্বে পোর্ট ব্যবহার করো, তা হলে দুটো ফেসিলিটির জন্য দু-বার পে-করাই তো প্রপার অ্যান্ড ফেয়ার।'

হকশাহেবের এই প্রশাসনের ক্ষমতাটা কেউ দেখতেই পায় না। যোগেনও যে খুব বেশি পেয়েছে, তা নয়। যা দেখেছে, কল্পনা করে নিতে পেরেছে তার চাইতে বেশি। হকশাহেবের প্রকাশ্য রাজনৈতিক কাজকর্ম, আচার-আচরণের কোনো মিল তো নেই-ই বরং বেমিল আছে। সবাই সহজেই ভেবে নিতে পারে, হকশাহেবের মনের বা মতের কোনো স্থিরতা নেই, নিজেরই তৈরি করা দল ভেঙে দেন, নিজেই নিজের মতের বিরোধিতা করেন, যখন যে-কৌশল সবচেয়ে কাজ দেবে তখন সবচেয়ে তাড়াতাড়ি সেই কৌশল নেবেন। ফলে, যে কেউ ভাবতে পারে, হকশাহেবের কাছ থেকে সে তার কাজ আদায় করতে পারবে। সমস্ত স্তরের লোকজনের এই ধারণার ওপরই তাঁর জনপ্রিয়তার নির্ভর। কিন্তু প্রশাসনের সবচেয়ে ওপরে যাঁরা তাঁরা জানেন—হকশাহেবের হাতে তামাক খাওয়া প্রায় অসম্ভব। খাজা নাজিমুদ্দিনও ভাল প্রশাসক, বিশেষ করে শাহেবসুবোরা জানে যে খাজার ব্যক্তিগত স্বার্থটা ধরিয়ে দিতে পারলে খাজা যে-কোনো অর্ডারে সই মেরে দেবে। খাজাও অবিশ্যি বোঝালেই বোঝে না। কিন্তু বিষয়টা যদি এমন ভাবে উপস্থিত করা যায়, কিছু-কিছু দরকারি ফাঁক রেখে-রেখে যে খাজা যখন একা-একা ঐ ফাঁকগুলো দিয়ে দেখবে, তখন সে দেখে ফেলতে পারবে যে কিছু দিন পর থেকেই এই অর্ডারটি তাকে সুদ দিতে থাকবে। খাজা তার শরীরের ভাঁজে-ভাঁজে, গাঁটে-গাঁটে,

এতটাই স্বার্থান্ধ যে সে নিজের চোখে দেখতে না পেলে, সে-স্বার্থটাকে সে স্বার্থ বলে স্বীকারই করবে না। হয়তো, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই, হকশাহেবও স্বার্থপর, টাকার জন্য তিনি করতে পারেন না এমন কোনো কাজ নেই। কিন্তু হকশাহেবের পদ্ধতিটায় অনিশ্চয়তা থাকে।

দুটো সুবিধের জন্য দুবার পয়সা দেবে না? হকশাহেবের এই কথায় শাহেব বলে উঠেছিল, 'একই রপ্তানির জন্য?'

হকশাহেব জিজ্ঞাসা করেন, 'রপ্তানি এক হল কী করে? যদি কলকাতা পোর্ট ব্যবহার করতেন, তা হলেও বলতে পারতেন—রপ্তানি একটাই। কিন্তু বাংলায় উৎপন্ন চা, বাংলার রেলপথ ব্যবহার করে রপ্তানির জন্য আপনাদের ব্যবসার খাতিরে বম্বে পোর্ট থেকে পাঠাবেন আর আমাকে পয়সা দেবেন না? আপনাদের তো এই দেশটার ওপর এটুকু দরদ থাকা উচিত। এই দেশটা তো আপনাদের খাওয়ায় পরায়।'

'শুধু ক্যালক্যাটাই আপনার দেশ হল? বম্বে আপনার দেশ না? ক্যালকাটা পোর্ট থেকে যদি পোল্যান্ডের ডাইরেক্ট শিপমেন্ট লাইন না থাকে, তা হলে বম্বে যাওয়া ছাড়া আমাদের উপায় কী?'

'আমিও তো তাই বলছি। আপনাদের ব্যবসা বাড়বে, পোল্যান্ডের লোককে চা খাওয়াবেন আর তাদের জন্য সরকারের পকেট কাটবেন? সরকারটাও তো আপনাদের?'

'তা মনে না করলে কি আমরা ইন টোটো ভোট দিয়ে আপনার গর্বমেন্টকে বাঁচাতাম? এখনো তো একমাসও পার হয়নি। আমরাও তো ইন রিটার্ন এটুকু এক্সপেক্ট করতে পারি।'

হকশাহেব মুখটা একটু থমথমে হয়ে গেল, তিনি তাঁর চেয়ারে সোজা হয়ে বসে টেবিলের ওপরের কোনো একটা জিনিস অপ্রয়োজনীয় সরালেন।

হকশাহেবের একটা অনভ্যস্ত গলায় বলে উঠলেন, 'আমার মনে হয়, ট্যাক্সরদের এইসব ব্যাপারের খুব দূরপ্রসারী ফল আছে। আপনি বরং আপনার সংগঠনের ফর্ম্যাল মেমোরান্ডাম নিয়ে ফাইন্যান্স মিনিস্টারের সঙ্গে কথা বলুন—আপনাদের অথরাইজড টিম নিয়ে। এ-ধরনের অনুরোধ ওয়ান-টু-ওয়ান, করা ও রক্ষা করা প্রশাসনে খুব খারাপ দৃষ্টান্ত হয়। আমার মত যথাসময়ে জানাব। আশা করি, ফাইলটা আমার কাছে আসা ও আমার দেখার অনেক আগেই আমাদের অনেকবার দেখা হবে,' শাহেবকে তো চলে যেতেই বলা হল। বলা হল বটে, তবে, যোগেনের মনে হয়, যে-মেজাজে হকশাহেব শুরু করেছিলেন, সে-মেজাজে শেষ করেননি। গোপনে একটা সন্ধি করে নিলেন কি?

'ম ন ড ল'

'হ্যাঁ, আছি, কন,'

'আন্ধারমানিক হইয়্যা আছো ক্যা? যাতে কেউ না দেখে?

'আপনার কাছে কাজকামে লোকজন আইব। আমারে ঢেঁকির নাগাল বসাইয়া রাইখলেন ক্যা?'

'তুমি তো বরিশাইল্যা। তাই প্রাইম-মিনিস্টার ডাইক্যা নিলেও তোমার কিছু যায়-আসে না। ডাকছি যহন, তহন কারণও আছে। তোমার লগে কথা আছে।'

'কথা? তা কন!'

'এই হানে? রাইটার্সে? এডা কি কোনো মনের কথা কওয়ার জায়গা? এডা তো দোকানদারির জায়গা। শুইনল্যা না শাহেবের কথা, ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান। কয়—আমাগ ভোটে গবর্মেন্ট বাঁইচল, আমাগো ডিউটি ছাড় দ্যান। শাহেব হইলে কি চোখের পাতা ভুরু

কিছুই থাহে না? এ-কথা কওয়ারও তো একডা আচরণ আছে।'

'আপনে তো অরে শ্যাষে কইলেন ফাইন্যান্স মিনিস্টারের লগে কথা কইব্যার—'

'তা কই নাই। আমি প্রপার চ্যানেলডা কইল্যাম।'

'কথাডাই যদি প্রপার না-হয়, চ্যানেল কী কইর‍্যা প্রপার থাহে?'

'মণ্ডল, ঐডা হইল কওয়া যে আপনে এবার আসেন। আর কথাডা তো অসত্য না। অগ ২৫ ভোটেই তো আমি প্রাইম মিনিস্টার। বাজেট সেশন শ্যাষ হয় নাই। তোমরা আবার কবে হঠাৎ কাট মোশন তুইল্যা বসো. ঠিক আছে কিছু?'

'ওদের উপর ভর দিয়্যা নাও চালাইবেন?'

'আমারে ওরা ফেইলবে না। ওরাই হাড়ে-হাড়ে জানে আমি হচ্ছি ইউনিফাইঙ ফ্যাক্টর। ওরা চায় খাজারে। কিন্তু অ্যাও জানে খাজার লগে কুনো মানুষ নাই। খাজা মানুষ হিশাবেই খারাপ—শাহেবগ তো স্বার্থের কাছে মা-বাপও পর। ইয়োরোপিয়ান বিজনেস কমিউনিটি খাজার মত আপাদমস্তক কনসিসটেন্ট লোক চায় না। চায় আমার নাগাল ইনকনসিসটেন্সি। জিত্যা আইস্যা নিজের দলরে নিজেই ভাইঙ্গ্যা দিল্যাম। শাহেবগ ভোটে টিক্যা থাইক্যা অ্যাহন আবার দলডারে গোছাইতে লাগব। সেই পরামর্শ তোমার সঙ্গে।'

৯৮

হক-মণ্ডল ইকুয়েশনের খেলা

'শাহজাদা, আপনাকে বিশ্বাস করা অকর্তব্য', যোগেন কোনো নাটকের উদ্ধৃতি বলে, 'ঐহানে দেইখ্যা আমারে ডাইকলেন, না-দেইখলে ডাইকতেনই না, অ্যাহন কন—পরামর্শ আছে। আমার লগে কী পরামর্শ। আমি তো আপনার পার্টির লোক না।'

'আমার পার্টি কুনডা?'

'কে-পি-পিরে জন্ম দিলেন, স্তন্য দিলেন, খাড়াইব্যার শিখাইলেন, তারপর তার কান্ধে চাইপ্যা প্রাইম মিনিস্টার হইলেন আর অ্যাহন জিগ্যান আপনার পার্টি কী?'

'আরে মণ্ডল, আমি তো মুসলিম লিগের অল ইনডিয়ার ভাইস আর বেঙ্গলের প্রেসিডেন্ট। কও কী তুমি?'

'অ তো বামুন-কায়েত-বদ্যিগ মাইয়াদের বিয়ার সময় গোত্রবদল।'

খুব একচোট হেসে ওঠেন হকশাহেব। যোগ করেন, 'মণ্ডল, আমাগ আর তোমাগ একডা বড় ফাঁক হইয়া গিছে এই পার্টি নিয়্যা। আমাগ টাইমে তো পার্টি একডাই—কংগ্রেস। তার মইধ্যেই নরম গরম, নো চেঞ্জার, প্রোচেঞ্জার, টেররিস্টগ নানা গ্রুপ, ভবানী মন্দির, আবার ধরো, সোস্যাল রিফর্মের নানা ছোটখাটো সংগঠন, হিন্দু সৎকার সমিতি, মুসলমান উন্নতি পরিষদ, নিরামিষ খাদ্য সমিতি, অবলা বান্ধব সমিতি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, মুসলিম সাহিত্য পরিষদ—যা ইচ্ছা তাই করো, পার্টি কিন্তু একডাই কংগ্রেস। দেখাদেখি ঐ বঙ্গভঙ্গের টাইমে ইন্ডিয়ান মুসলিম লিগ হইল কিন্তু পাইকল না তেমন। দ্যাহ, মতিলাল নেহরু, সি-আর দাশের মাপের ন্যাশন্যাল লিডাররাও স্বরাজ্য পার্টি বইল্যা আলাদা পার্টি কইরল—তাও কংগ্রেসে থাইক্যা, আর, তোমাগ টাইমে খাড়াইছে পার্টি য্যান বাপের নাম, মরণের পরেও বদলাইব্যার উপায় নাই। এমন পিছনদড়ি

নিয়্যা কুনো কাম করা যায়? কাম তো কইরব মানুষ। পার্টি হইল একডা কৌটা। সেই কৌটাডারে শালগ্রাম শিলা বানাইবার কাম কী? তোমার এই কৌটা পছন্দ না হইলে আর—একডা কৌডা ধরো।'

'কথাডা আপনার বেবাক ফেলনা না। পার্টিতে তো বাঁধাবাঁধি লাগবই। তাতে আবার বড় মানুষর ইচ্ছায় ব্যাঘাতও ঘগইটব্যার পারে। কিন্তু পার্টি না-থাইকলে পার্টি-লিডার হইব ক্যামনে?'

'ক্যা? যহন পার্টি ছিল না তহন লিডার বেশি ছিল, না অ্যাহন বেশি? আইসো, ফর্দ বানাই, দেহ। আর সেই সব লিডারগুল্যার সাইজ কী এক-একডা? তিন সেরি খাশি এক-একজনের গলা দিয়্যা নামে য্যান শরবতের লাগাল। আচ্ছা, আমার কথা বাদ দ্যাও। নিজের কথা কও। সইত্য কইর‍্যা কও। তোমার শিডিউলগ যদি একডা পার্টি থাইকত, তালি তোমার সুবিদা হইত, নাকী, অ্যাহন যেমন, শিডিউলগ পার্টি একডা থাইকব্যার পারে আর শিডিউল বইল্যা একডা আলাদা আড্ডাও থাইকব্যার পারে।'

'আমাগ বর্তমান অবস্থায় সুবিধা বেশি। পার্টিগুলার শিডিউল দরকার আর শিডিউলগ পার্টি দরকার। কিন্তু তাতে তো অসুবিধাও মেলা। ধরেন, আপনারা সাব্যস্ত কইরলেন দুই বা তিন শিডিউলরে মন্ত্রী বানাইবেন। তহন তো সব পার্টিরই মনে খেইলব—ঐ নন্দী, মল্লিক, রায়কতের কথা। এরাই তো পুরানা লিডার। শিডিউল লিখব কোন শ দিয়্যা, তাও জানে না। একডা পার্টি হইলে এইডা বন্ধ হইত।'

'ঘোড়ার আন্ডা হইত। এগ টাকা আছে। পার্টি খাড়া কইর‍্যা নিত।'

'যাগ টাহা নাই, পার্টিও নাই, সেই লোকগুল্যা তো কথা কইব্যার পাইরত।'

'পাইরত। তাতে আগাইতডা কী?'

'পার্টি, লিডার বানাইত। লিডার, পার্টি বানাইত না। আপনার নাগাল হইলে পৃথক কথা। পার্টি বানাইতে-বানাইতে লিডার নিজেরেও লিডার বানায়।'

হকশাহেব তাঁর চেয়ার থেকে একটু ঝুঁকে টেবিলে কনুই রেখে চিন্তিত কোনো ব্যক্তির মুখচ্ছবি তৈরি করেন। তিনি কিছু ভাবছেন—বোঝা যায়।

'একডা কথা মনে আসা-যাওয়া করে। তোমারে কইতে বাধো-বাধো ঠ্যাহে। তোমার তো এ-সব পড়া। তুমি তো জানই। তোমারে আর নতুন কইর‍্যা কওয়ার কী আছে?'

'হা আর্যপুত্র, এই বাধা কি তোমাকে মানায়?'

'এত মুখস্ত রাহ ক্যামনে? ভাইবতেছিল্যাম—এই যে অ্যাহন আমাগ এড়ডা অ্যাসেম্বলি হইছে, লেকচার দেয়ার জায়গা হইছে, লেকচার দেয়ার আইন হইছে, আইন পাশের খ্যামতা হইছে, ধরো, তর্কাতর্কির মইধ্যে না গিয়্যা যদি এইডারে হোমরুল কই কব্যার পারি, ডোমিনিয়ন কই কব্যার পারি, স্বরাজ কই কব্যার পারি। ঐ গুল্যার মানে জানি না। যে-সব ব্যবস্থা হইছে সে-সব আমার কামে লাইগলে আছি, নাই তো নাই। মন্ত্রী তো হইয়া আসতিছে, ধরো, বছর কুড়ি। আমিও তো ছিল্যাম এডুকেশন মিনিস্টার। স্যাও তো লিডার দেইখ্যা নমিনেশন। অ্যাহন আমি প্রাইম মিনিস্টার, আমি শিডিউল বইল্যা রায়কতরে বাছি। আবার তোমাগ ভাবসাব দেইখ্যা পছন্দ হয় প্রসন্নদেবরে আর বেশিদিন বাছা যাইব না। যোগেন মণ্ডল বা পি-আর ঠাকুররে খুঁইজতে হব। তুমি তাইলে আমারে একডা ইকুয়েশন বানাইয়্যা দ্যাও দেহি—অঙ্কের মত কইর‍্যাই দ্যাও—তুমি তো অঙ্কের ভাল ছাত্র, আমিও তো স্যার পি-সি রায়ের পেয়ারের ছাত্র—আইসো, ইকুয়েশন বানাই।'

'আমারে ছাইড়্যা দ্যান হকশাহেব। ঘাড় ধইর‍্যা ঘরে ঢুক্যাইয়া কন, ইকুয়েশনের খেলা খ্যাল্।

আমার কি আপনার মত আকামাইয়া থাইকলে দিন চলে? এক সঙ্গে দশডা পকেটে কাঁচি না-চাল্যাইব্যার পাইরলে কি আমার চলে?’

‘দ্যাহো মণ্ডল, এটুক্ খাতির আমারে কইরো যে দুই হাতে চাইরড্যা কাঁচি চালাইলেও তোমার খুব ভাল চলে না—এডা আন্দাজের খ্যামতা আমার আছে। অ্যাহন ইকুয়েশনডা বানাও, পাওয়ার সিরিজে, ধরো পাওয়াররে r-কে ধরো রিপ্রেজেন্টেশন, আর ম্যানিপুলেশনরে ধরো m। তাইলে এইডা তো আসে $p - r = m$।’

‘তাইলে তো এডাও আসে, $r = m - p$’।

‘আসেই তো। আনার লগেই তো দরজা খোলা। তাইলে তো এইডাও আসে $-m - r = -p$।’

‘হকশাহেব, উত্তর দেইখ্যা অঙ্ক কষেন? তাইলে তো এইডাও আসে $p = m + r$?’

‘আসেই তো মণি। আইলে তো আইসব্যার দিব্যার লাগব। দিলে দেখবা—ঐ আমাগ টাইমের লিডারি আর তোমাগ টাইমের ভোট-জিতা, পাওয়ারের একই কো-অর্ডিনেট। সুতরাং ব্রিটিশ এমপ্যায়ার আর ইনডিয়ার সম্পর্কের কোনো বদল নাই যদিও আমরা ৭৫ বছরের অধিক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। মানে, কিছুতেই কিছু আসে যায় না। রায়কতরে যদি বদলাই, তাইলে কী বদলাইব? যদি না বদলাই, তাইলেই-বা কী অবদল থাইকব? তাইলে আমি ক্যা আমার ভাঙা পার্টিরে এড্ডু গুছ্যাইয়্যা আনি-না? তাইলে তোমরা আচমকা কাটমোশন আইনলেও শাহেবগ ভোটে খাড়া থাকার ঐ কয়েকডা দুর্নাম তো কমবে।’

‘এই নিয়্যা পরামর্শ করার যোগ্য মানুষ আপনে আমারে বাইছলেন?’

‘শুধু এই নিয়্যাই না। একডা কথার লগে তো কত পাতা, ডাল এই সব লাইগ্যা থাকে। সেগুল্যাও হবে কথা।’

‘এইডা কী কইর্যা হয় হকশাহেব। আপনে লিডার আব দি হাউস, আমি অপোজিশনে। আমাগো মইধ্যে কী কথা হবে?’

‘সেডা যদি আমার সঙ্গে তুমি কথা কইতে চাইত্যা তাইলে আমি রিফিউজ কইরতে পাইরত্যাম যে আমাগ মইধ্যে বিনিময়যোগ্য কোনো কথা নাই। কিন্তু আমি ডাইকলে ‘না’-করার রাইট তোমার নাই। ম্যানিপুলেশন থিক্যা পাওয়াররে বাদ দিলে তোমার রিপ্রেজেন্টেশনও তো টেঁকে না। তুমি অ্যাহন আমার সঙ্গে বাইরাব্যা। তারপর আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে এই সব কথাবার্তা কব। অ্যাহন্, তুমি আমারে নীরবে অনুসরণ করো।’

হকশাহেব উঠে দাঁড়িয়েছেন।

সেই পেখমখোলা পাগড়ির পিয়ন এসে তাঁর পেছনে দাঁড়ায়। যোগেনের দিকে না তাকিয়ে হকশাহেব দরজার দিকে পা বাড়ালেন। সেই পিয়ন দাঁড়িয়ে থেকেই যোগেনকে হাতের আদেশে হকশাহেবের পেছনে দাঁড় করিয়ে হাঁটিয়ে দিল।

হক-মণ্ডল যাত্রা

রাইটার্স থেকে গাড়িতে ওঠার সময় পেছনের দরজাটা খুলে ধরেছিল দারোয়ান আর সেই ফাঁকে যোগেন সামনের দরজা নিজেই খুলে ঢুকে বসে পড়েছে।

৯৯

হকশাহেব দারোয়ানের হাত সরিয়ে নিজেই হ্যানডেলটা ধরে যোগেনকে ডাকেন, 'উঠো, তুমি আগে না উইঠলে আমি উইঠব না।' এক পুলিশ সার্জেন্ট তার মোটর সাইকেলে স্টার্ট দিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাচ্ছে। পি. এম. যাচ্ছেন বলে অনিবার্য ভিড় তো আছেই, কিছু ইউনিফর্মের, কিছু সাদা পোশাকের। একজনই ছিল স্যুট-পরা। হকশাহেবের কাণ্ডে এরা সকলেই মজা পেয়ে হাসছিল। তবে, সেই হাসিতে হকশাহেবের পক্ষে সবই সম্ভব, এমন একটা সমাদরও ছিল। সেই স্যুট-পরা ভদ্রলোক এগিয়ে এসে যোগেনের দরজাটা খুলে দিয়ে বলে ওঠেন, 'উনি যখন চাইছেন, আসুন স্যার।' এতটা অপরিচিত ভিড়ের দর্শনীয় হয়ে ওঠার অনভ্যাসে যোগেন নিরুপায় বোধ করে, সামনের আসন থেকে নেমে হকশাহেবের পেছনে দাঁড়িয়ে বলে, 'নেন, চলেন।' হকশাহেব তাঁর হাত না সরিয়েই বলেন, 'আপ আগারি যাইয়ে'। প্রচলিত এই রসিকতায় সকলেই আমোদ পায়—যোগেন আরো নিরুপায়তা থেকে হকশাহেবের ডান পাশ দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ে স্বস্তি পায়।

হকশাহেব দরজার হ্যান্ডেল ছেড়ে দিয়ে ভিতরে ঢুকে যান, দরজাটা বন্ধ করেন না। দারোয়ান এগিয়ে এসে আটকে দেয় দরজাটা। এ-গাড়িটা চলা শুরু করতেই, সামনের সেই বাইক-আরোহী সার্জেন্টও চলতে শুরু করে।

সার্জেন্ট সামান্য আওয়াজে হুটারটায় একটু বড় হর্নের ধ্বনি তুলে বৌবাজার স্ট্রিটে ঢুকে যায়, পেছনে গাড়িটাও। যোগেন গাড়িতে তো ওঠে না, তার ওপর পি-এম-এর গাড়ি। সে আরাম পেয়ে যায় আর এই গাড়িটা রাস্তা দিয়ে যেমন বাধাহীন এগিয়ে যায়, তাতে যোগেন মজাও পায়। ড্রাইভারও ডাইনে-বাঁয়ে তাকায় না। সে-কাজটা করে ঐ সার্জেন্ট। ফলে, গাড়ি-বাস দাঁড়িয়ে পড়ে, বাসট্রাকও রাস্তা ছেড়ে দেয়, ট্রামগুলোও হেঁচকি তুলে থামে।

যোগেন জিজ্ঞাসা করে, 'আপনাগ চাখারের বাড়িতে পোষা বিল্যাই কী কুত্তা ছিল কী ধরেন মুরগি-হাঁস?'

'এ সব গুল্যাই তো ছিল। একডাও তো পোষা ছিল বইল্যা মনে নাই। পুষব ক্যা? ওরা তো বাড়ির মানুষজনের মতই থাইকত! বাড়িতেই তো আছে। তাইলে আবার পুষার ঝামলা কইরব ক্যা?'

'আমি ভাবছিল্যাম বাল্যকালেই আপনি আপনার পোষা জীবদের শারীরিক যন্ত্রণা দিতেন—'

'ক্যা? যন্ত্রণা দিব ক্যা?'

'আপনার ভাল্ লাইগব বইল্যা?'

'আরে, আমার লগে বাড়ির গাইবলদের, মোরগা-মুরগির, বিল্যাই-কুত্তার সম্বন্ধটা কী। ইচ্ছা হইল তো কইল্যাম। দেইখলাম একটা বেশ নধর বাছুররে জবাই দিয়্যা মাংস হইল খাওয়ার সময়। আমি কি দেইখব্যার গিছি কোন বাছুরডারে জবাই দিল। আমার কাম তো ছিল রান্না মাংসডা খাওয়া।'

'তাইলে আপনের স্বভাবডা এমন হইল ক্যামনে? নিজের নিকট মানুষজনরে কষ্ট দ্যান ক্যান?'

'ক্যা? কারে কষ্ট দিচ্ছি? আবার কও আপনজন?'

'আপনে তো এই প্রদেশের প্রাইম মিনিস্টার। আপনারে একা ঘরের মইধ্যে যাই কই, প্রকাশ্যে তো তা কওয়া যায় না। কিন্তু আপনার তো সেই সব বালাই নাই। সব হাঁড়িই হাটে ভাইঙ্গবেন?

'ক্যা?' তোমার কী হাঁড়ি ভাইংছি?'

'আমি একডা সাধারণ মেম্বার। আপনি ডাইকছেন বইল্যা আমি আপনার লগে যাইতে বাইধ্য। তাই বল্যা, আপনার সঙ্গে এক সিটে আমার বসা চলে? দশজন ভাইবলডা কী আমারে?'

'ভাইব্ব আবার কী? ভাইব্‌ল, দ্যাহো, মানুষ কয় কারে। সবাই তো পি-এমের সঙ্গে গা ঘইসব্যার চায়। আর, মণ্ডল মেম্বাররে সাইধলেও যায় না। তোমার এমন সুখ্যাত রটাইল্যাম আর তুমি কও আমি পোষা জীবরে জবাই করি। এই—না দুই দিন আগে অ্যাসেম্বলিতে আমারে জবাই কইরল্যা। কে তোমারে আমার পোষ্য ভাবে? তুমি ভাবো?'

'কথাডা তো আমার ভাবা দিয়্যা না।'

'অন্যের ভাবার বিষয়ে তোমার না-ভাইবলেও চলে'।

বাইরে তাকিয়ে যোগেন দেখে, কলেজ স্ট্রিটের মোড় পার হয়ে গাড়ি কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট ধরে চলছে।

'এই দিকে আপনে যান কই? এ তো আমার বাড়ি—'

'তাইলে চলো, তোমার বাড়িতেই যাই।'

'আপনে গেলে তো প্যারী সরকার স্বর্গের সিঁড়ি পাবে কিন্তু আমারে তো হাইড্রান্টে নামবার লাগব।'

'ক্যা? কী হইব আমি গেলে? চলো।'

'আরে আমি তো এই জায়গায় সকলের চেনা। এইহান থিক্যাই তো ল করছি। গরিবের পোলা বইল্যা বেবাক মানুষ দয়াধর্ম করে। আপনে গেলে তো আমার সব গুডউইল হোগায় গেল।' গাড়ি হেদো পার হচ্ছিল। যোগেন বলে ওঠে, 'আরে সত্যি তো আইস্যা গেলেন। ঠিকানা জানেন না তো?'

'মণ্ডল, তুমি এড্ডু বেতমিজ আছো। আমি ভাইবত্যাম, ঐডা তোমার চালাকি। অ্যাহন বুঝি, না, ওডা খাঁটি বেতমিজই। আমি একডা প্রাইম মিনিস্টার। আমার রাস্তা ক্লিয়ার করার লগে সাড়ে দশ হাত আগে-আগে সার্জেন্টের মোটর বাইক যায়। ঠিকানা কি আমার জেবে রাইখব? আর মায়না পাইব ঐ সার্জেন্ট? তালি ওর জামা-প্যান্টে এতগুলা পকেট ক্যা?'

যোগেন দেখতে পায়, সার্জেন্ট ১৭৩/১ বাড়ির সামনে দাঁড়াল না। গেলে অবিশ্যি ভালই হত। ততক্ষণে গাড়ি এগিয়ে গেছে। হকশাহেব যদি এই রাস্তা দিয়েই ফেরেন, তা হলে না হয়, বলা যাবে। বললে তো হকশাহেব এখনই নামতেন।

'তুমি যে এই রকম একডা প্রাচীন বিখ্যাত জায়গায় থাকো, এহানের সব দ্রষ্টব্য তুমি দ্যাখছ?'

'খুঁইজ্যা খুঁইজ্যা দেহার টাইম পাই নাই। চোখে যা পইড়ছে দেখছি।'

'উমিচাঁদের দালান দেইখছ?'

'কে উমিচাঁদ?'

'পলাশির যুদ্ধডা ফাইন্যান্স কইরছিল।'

'ও। সেই মিরজাফরের ষড়যন্ত্র।'

'আচ্ছা মণ্ডল, তোমার তো পড়াশুনার অভ্যাস আছে—অন্তত আমার থিক্যা বেশি। যহন প্র্যাকটিস কইরত্যাম তহন তো বাধ্য হইয়্যা পড়ব্যার লাইগত—মক্কেল যদি টাহা না দেয়। কিন্তু

মিনিস্টার হওয়ার পর ক-অক্ষর হারাম। যাক্ গিয়্যা, যা কইতেছিল্যাম—পলাশির যুদ্ধের ষড়যন্ত্র কইরল পাঁচ-পাঁচডা হিন্দু, রানী ভবানী, রাজবল্লভ, জগৎ শেঠ, উমিচাঁদ, আর-একডা য্যান কেডা? মনে তোমার নাগাল হিন্দু না, সৎহিন্দু, আর নামডা হইল মির জাফরের। তুমি গিরিশ-নকুড়ের সন্দেশ খাইছ?'

'সিমলার সব মিষ্টিই ভাল। খায়্যা থাইকতে পারি'।

হকশাহেবের হাসিতে যেন গাড়িটা দুলে ওঠে, 'এইডা যা কইছ মণ্ডল, বরিশাইল্যা ছাড়া কেউ কব্যার পাইরব না। গিরিশ-নকুড়ের সন্দেশ, খায়্যা থাইকবার পারি? আরে, একবার যদি ঐ সন্দেশ তোমার বরিশাইল্যা জিভে ঠ্যাকত, তাইলে তোমার জিভডা ব্যাঙের জিভের নাগাল উল্টাইয়্যা টাকরায় বিঁধ্যা থাইকত। মল্লিকগ মার্বেল প্যালেস দেইখছ? নাকি হ্যায়ও তোমার, দেইখ্যা থাইকতে পার? শিশির ভাদুড়ীরে দেইখছ? থিয়েটার করে। নাকি হ্যায়ও তোমার কত থিয়েটারই তো দেহি?'

হাতিবাগানের মোড়টাতে ভিড় তো একটু থাকেই, এতগুলো সিনেমা থিয়েটার হল। সার্জেন্টকে তার বাইক থামিয়ে ঘন ঘন ভেঁপু বাজাতে হয় রাস্তা করে দিতে। একে সার্জেন্ট, তাতে ভেঁপু। লোকজন হাঁ হয়ে দেখে। বোঝেই নি, সার্জেন্ট নেহাতই খবরদার ওয়ান। তফাত এই যে খবরদারোয়ান থাকে ঘোড়ার গাড়ির পেছনে, আর সার্জেন্ট থাকে গাড়ির সামনে। লোকে খেয়াল করল তখন, সার্জেন্ট যখন ডাইনে শ্রীরঙ্গমের বাইরের মাঠটুকুতে ঢুকল আর তার পিছু-পিছু একটা বড় গাড়ি।

গাড়ি থামা মাত্র একটু ছুটোছুটি পড়ে গেল।

হকশাহেব বললেন, 'এবার নামো। আজ থিক্যা তোমার কইলকাতা দর্শন শুরু হোক। শিশির ভাদুড়ীর থিয়েটার দিয়্যা বোধন। খারাপ হইব না—'

যোগেন শুধু বলতে পেরেছিল, 'এহন আপনে থিয়েটার দেইখবেন?' হকশাহেবও শুধু বলতে পেরেছিলেন, 'তুমিও দেইখব্যা', হলের ম্যানেজার-ট্যানেজার এসে ততক্ষণে 'আসুন, আসুন' শুরু করেছে।

এমনিতেই থিয়েটারের ভিড়, তার ওপর আঙিনায় দুটো ঘোড়ার গাড়ি ও এই একটি মোটর গাড়ি। দেখতে-দেখতে হকশাহেবকে ঘিরে ভিড়টা জমে গেল। ম্যানেজার-গোছের কেউ হাতজোড় করে বলে, 'স্যার, আপনি কি গ্রিনরুমে আসবেন, স্যার। বড়বাবু মেক-আপ নিচ্ছেন। উনি বারবার বলে দিয়েছেন, আজ আপনি, আসবেন। কিন্তু এখানে আপনি দাঁড়িয়ে তো কষ্ট পাবেন, স্যার?'

হকশাহেব একটু হেসে বলেন, 'নাটকটা শুরু হবে কখন? আমার কষ্টের কথা ভাবেন কেন? এত মানুষ থিয়েটার দেখতে এসেছেন।'

'আমরা তো আপনার আসার জন্য অপেক্ষা করছি, স্যার। আপনি বসলেই শুরু হয়ে যাবে।'

'বললেন, যে বড়বাবুর মেক-আপ চইলছে।'

'স্যার, ওটা তো কথার কথা। যতক্ষণ স্টেজে নেই, ততক্ষণই তো মেক-আপ চলে। বলেছেন, আপনাকে বসিয়ে দিয়ে থার্ড বেল দিতে। দুটো বেল তো দিয়ে দিয়েছি, স্যার। আপনাকে বসিয়ে স্যার, বড়বাবুকে গিয়ে বলব আপনি বসেছেন, তারপর তিনি বললে থার্ড বেল দেব, স্যার।'

হকশাহেব বুঝে নিলেন—এটাই ব্যবস্থা, এখন, এখন আর গ্রিনরুমে গিয়ে শিশির বাবুর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা হবে না—থিয়েটার আরম্ভ হতে তা হলে দেরি হয়ে যাবে। ইন্টারভ্যালে

বা শেষে দেখা হবে। এখন, তিনি বসলেই ড্রপ উঠবে।

'তা হলে চলেন, কোথায় বইসব? আমার সঙ্গে একজন আছেন, এম. এল. এ।' তারপর গলাতুলে ডাকেন, 'মণ্ডল।'

যোগেন একটু আড়ালে পড়ে গিয়েছিল। সে সেখান থেকেই সাড়া দিল, 'হ্যাঁ, এই তো।'

'আইসো। বইসব্যার লাইগব তো।' প্রায় জনা পাঁচেক বাবু, ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। দুটো সারির মাঝখানে বেশ খানিকটা খোলা জায়গায় দুটো কাঠের চেয়ার পাশাপাশি রাখা। হক শাহেব মণ্ডলকে বলেন, 'বোসো'। যোগেন বসে পড়ল। হক শাহেব বলেন, 'আমি বইসলে তো পিছনের লোকের বাধা হবে।' ম্যানেজার আশ্বস্ত করে, 'সে স্যার যার হবে সে সরে বসবে'।

শিশির ভাদুড়ীর মেবার পতন

১০০

হঠাৎ ক্রি-ই-ং ক্রি-ই-ং করে একটা টানা বেল বাজতে লাগল। চারদিকে যেন হৈ-হৈ পড়ে গেল। বাইরে থেকে সবাই দৌড়ে, লাফিয়ে, ঝাঁপিয়ে হলে ঢুকে পড়ল। সেই ভিড় যে-রকম হৈ হৈ করে হলে ঢুকে বসে পড়ল, তাতে মনে হয় সিটগুলো তাদের চেনা। কিংবা এরা আগে থেকেই নিজের-নিজের আসন দেখে তার ওপর গামছা বা টুপি এই সব বা রুমাল এই সব দখলি চিহ্ন ছড়িয়ে রেখেছে। যোগেনরা বসেছিল হলের একেবারে মধ্যিখানে। তাদের বাঁদিকে অর্থাৎ যে-দিক দিয়ে তারা হলে ঢুকেছিল সেই দিকটা হিন্দু মেয়েদের জন্য আলাদা দুই সারির আসন। হিন্দু মেয়েরা বেশির ভাগই গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে ও মাথায় একটু ঘোমটা দিয়ে, সে-ঘোমটাটা মুখের দু-পাশেও ঝুলিয়ে বসেছে। এদের মধ্যে অনেকেই বিধবা—তাদের ছোঁয়াছুয়ি মেনে চলতে হয়। ঐ দুই সারির টিকিট কাটতে হলে বলতে হয়, "হিন্দু লেডিস"। যোগেন টেরই পায় না, অতটা হৈ-হল্লা কখন মিশে গেল ড্রপ সিন উঠে যাওয়ায় স্টেজ থেকে ছড়ানো আলোর সঙ্গে আর একদল মেয়ে তীব্র আলোতে স্টেজে পাক দিচ্ছিল একটা কোরাস গাইতে-গাইতে। এটা বুঝতেও কিছুটা সময় গেল। তারপর বোঝা গেল, গানটার সুর ও তাল—

> মেবার পাহাড়—উড়িছে যাহার রক্তপতাকা
> উচ্চশির—
> তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছ দর্প দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।

গানের তাল ও সুরের ঘাট বোঝাতে স্টেজের মেয়েরা ফিরে-ফিরে গাইতে লাগল।

> মেবার পাহাড় শিখরে তাহার রক্তপতাকা ওড়ে না আর,

গানের তাল রেখে একটি মেয়ে স্টেজের বাঁ-হাতি ফাঁকটা দিয়ে মাপা পায়ে ঢুকে পড়ে। তার হাতে ধরা খাড়া একটা কোষ মুক্ত তলোয়ার, ঝলকাচ্ছে। গানটা তখন হচ্ছে।

> মেবারের এই তরবারি চায় মুসলমানের রক্তপান,
> মেবারের মাঠে মরিতে আসিছে হাজার হাজার মুসলমান॥
> যবনরক্তে ধারালো হইবে এই তরবারি দীপ্যমান।

হিন্দুর এই তরবারি চায় মুসলমানের রক্তপান॥

খুব উঁচু গলায় গান হচ্ছিল। তালটা বুঝতে পারার পরই তালে-তালে হাততালিও শুরু হল। যেন আগে থাকতেই ঠিক ছিল, হাততালির ফলে উজ্জীবিত গান আরো কতক্ষণ চলবে। এর মধ্যে একজন পিঠ নুইয়ে এসে হকশাহেবের হাতে একটা শালপাতার ঠোঙা ধরিয়ে একই ভঙ্গিতে ফিরে যায়। হকশাহেব ঠোঙাটার গন্ধ শুঁকে আন্দাজের চেষ্টা পান ভিতরে কী। টেরা না পেয়ে তিনি ঠোঙার ওপরটা ছিঁড়ে আবার গন্ধ শুঁকলেন। পান। তিনি একটা খিলি দু-আঙুলে তুলে মুখে পড়ে চিবুতে লাগলেন, 'পান' বলে ঠোঙাটা মণ্ডলের দিকে বাড়িয়ে দেন। হকশাহেব জিজ্ঞাসা করেন, 'দ্যহ তো মণ্ডল, জর্দার গুলি পাও না কি দেহ তো'।

যোগেনের হাতে সেই পুরিয়াটা আগেই এসেছিল। সে সেটা হকশাহেবের হাতে দিয়ে, একটা ছোট পানের খিলি নিয়ে মুখে ঢোকান।

ইতিমধ্যে মঞ্চ থেকে নাচের মেয়েরা চলে গেছে ও প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই শাদা দাড়ি নিয়ে এক বুড়ো, জ্বলজ্বলে পোশাকে রাজা-রাজড়াই মনে হয়, ঢুকে পেছনের দেয়ালে একটা চকচকে ঢালের ওপর কোণাকুনি করে রাখা এক তরবারি স্পর্শ করলেন। যোগেন তো আগে দেখেনি, দেয়ালে তরবারি—ঠিক যখন নীলচে ফোকাস ঐ তরবারি ও বৃদ্ধের শীর্ণ করতলের ওপর পড়ল, তখনই যেন দেখল যোগেন, দেয়ালে তরবারি। তা হলে দেয়ালে ঝোলালো কখন? এই দ্বন্দ্বেই যোগেন হাঁ হয়ে যায়, যেন এটাই প্রধানতম দৃশ্য—দেয়ালে তরবারি ঝোলানো।

যোগেনের বিস্ময় যে কাটল তা নয় কিন্তু নতুনতর দৃশ্যে সেই বিস্ময় একটু চাপা পড়ে গেল। বৃদ্ধ তখন সেই খোলা তরবারি নিজের দুই করতলে ধরে, ঘাড়টা একটু পেছনে হেলিয়ে, তরবারিটিকে একটা দীর্ঘ চুম্বন দিয়ে হঠাৎ সোজা দাঁড়িয়ে তরবারিটি নিয়ে একটা খেলা করেন। নীল ফোকাস তার অনুসরণ করে। একা যুদ্ধের ভঙ্গিরত সেই বৃদ্ধ নাচের ছন্দেই মঞ্চের সামনে চলে এসে দাঁড়াল। নীল আলোর ঘেরে তিনি এবার আর একটি চুম্বন করেন তরবারিটিকে, এবারও দুই হাতে ধরে কিন্তু হাঁটু গেড়ে ও হাঁটুর ওপর ডানহাতটা রেখে। যোগেন তখন তার গায়ের রঙচঙে চামড়া, লাল ঠোঁট, কাল দুই ভুরু, উড়ন্ত শাদা দাড়ি ও তাঁর দাঁতের সারি জিহ্বার লালসহ—একবারে দেখতে পায় ও তাঁর গলা শুনতে পায়,

'প্রিয়তম আমার! তোমায় এতদিন ভুলে ছিলাম
বলে কি তুমি অভিমানে অনুজ্জ্বল? অভিমান ছেড়ে
একবার অভিসারে চলো, তরবারি। মেবার আক্রমণ
করেছে মোগল। তোমার রক্ততৃষ্ণা বাড়াও। সদ্যঃ
উষ্ণ মুসলমানি রক্তে তোমার সেই তৃষ্ণ মেটাব।'

এর পরই, এই কথাগুলি বলা শেষ হলে দূর থেকে একটি মেয়ে তীব্র কণ্ঠে ডেকে ওঠে, 'বাবা'। সেই বৃদ্ধ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেন। ততক্ষণে মেয়েটি তাঁর কাছে এসে গেছে। বলে,

'ও তরবারি রেখে দাও বাবা, রেখে দাও। আমার
ভয় করে। রেখে দাও, বাবা।'

সেই বুড়ো সেনাপতি তাঁর বাঁ হাত মেয়েটির মাথায় আশীর্বাদের মুদ্রায় বুলিয়ে বলেন,

'ভয় কেন রে কল্যানী, মা আমার। এ তো ভয়ঙ্কর
ও সুন্দর। এ কী চায় জানিস?'
'কী'?
'রক্ত।'

'কার রক্ত?'
'মুসলমানের।'
'কেন বাবা, মুসলমানের প্রতি তোমার এ আক্রোশ'?
'কেন? সে-কথা জিগগেস করো তোমার
জন্মভূমি এই মেবারকে। সপ্তদশ বর্ষ ধরে এই
স্বাধীন রাজ্যটুকু দখল করতে ঐ মুসলমানরা
ধেয়ে আসছে, আর বারবারই শৈলাপহত
সমুদ্রতরঙ্গের মত ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে। সে
তো এই তরবারিরই শক্তিতে। এই তরবারির। এই।'

এরপর একটি মেয়ে এসে আরো সব মেয়েদের নিয়ে মেবার নিয়ে স্বাদেশী গান গাইতে লাগল। মেয়েটির নাম যে সত্যবতী সেটুকুই মাত্র জানা গেল। কিন্তু জানার দরকারটা বোঝা গেল পরের দৃশ্যে—মেবারের রাণার রাজসভায়। সেখানে রাণার প্রশ্নের জবাবে মেবারের প্রবীণ সব সেনাপতি ও অমাত্য নিজেদের মত করে মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পক্ষে বললেন কিন্তু রাণা রাজি হলেন না। রাজি না-হওয়ার যে-কারণ বললেন রাণা সেটা খুবই শাদাসিধে ও মোক্ষম মনে হল, 'সামান্য একটা কর দিয়ে এই সুখশান্তিতে থাকা গেলে সেটাই তো ভাল। না কর না দিয়ে মরা ভাল?' প্রথমে যে বুড়ো সেনাপতি তলোয়ার নিয়ে নেচেছিলেন তিনি বেশ খানিকটা লম্বা বক্তৃতা করলেন যুদ্ধের পক্ষে। তাঁর বক্তৃতার বেশির ভাগই ছিল এই বর্তমান রাণার বাবা প্রতাপসিংহের স্বাধীনতা-যুদ্ধের স্মৃতি। এই বৃদ্ধ তখন তাঁর সঙ্গী ছিলেন।

এতটা স্মৃতিকথা বলতে সেই বৃদ্ধকে বেশ কিছুটা হাত-পা ছুড়তে হল, হাত দিয়ে চোখ ঢাকতে হল, কপালে চড়ও মারলেন কয়েকটা।

এত কিছুর পরও রাণা অমর সিংহ ঘোষণা করে দিলেন, তিনি যুদ্ধটুদ্ধতে নেই, মোগল সেনাপতির সঙ্গে সন্ধি করবেন। রাণা দৌবারিককে বললেন, 'মোগলদূতকে ডাকো।' দৌবারিক যেই ডাকতে গেল, গোবিন্দ সিংহ দু-পা এগিয়ে এসে আকাশের দিকে দুই হাত ও মুখ তুলে চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'রাণা প্রতাপ! রাণা প্রতাপ! তুমি স্বর্গ থেকে যেন এ-কথা শুনতে না পাও। বজ্র! তোমার ভৈরব স্বরে এ হীন উচ্চারণকে ঢেকে ফেল। মেবার! মোগলপ্রভুর দাসত্ব স্বীকার করার আগে একটা বিরাট ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে যাও।'

মোগলদূত আর সেই আগের সিনের সত্যবতী দু-দিক থেকে একসঙ্গে ঢুকে পড়ল—সত্যবতী একটা বড় জলচৌকির ওপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা করে দিল, 'আমি তোমাদের যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাব।' সকলে সম্মতি দিয়ে হৈ হৈ করে উঠল আর গোবিন্দ সিংহ একটা লোহার বল কুড়িয়ে ছুঁড়ে মারল এক আয়নায়। ঝনঝনিয়ে কাচ ভেঙে যাওয়ার আওয়াজ থেকে যুদ্ধের বাজনা বেজে উঠল ও বেশ খানিকক্ষণ চলল।

একটা বেশ চনমনে আবহাওয়ায় পরের ঠান্ডা সিনটাতে শুধু জানা গেল মহাবৎ খাঁ একজন মোগল সেনাপতি আবদুল্লা একজন মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ। সম্রাটের ভাগ্নে হেদায়েত খাঁকে মেবার যুদ্ধে সেনাপতি করা হয়েছে। হেদায়েত যুদ্ধের কিছু জানেন না। তিনি তাঁর স্ত্রীর ভাই এনায়েতকে সঙ্গে নিয়েছেন। সে যুদ্ধ জানে। আর, এই সিনের মহাবৎ খাঁর জন্মভূমি মেবার বলে তিনি মেবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যান না।

এর পরের সিনে নাটকটা দর্শকদের হাসিতে ও হাততালিতে দেখতে না-দেখতে জমে উঠল। সেই সেনাপতি হেদায়েত খাঁ একটা সিংহাসনের মত আসনে আধশোয়া হয়ে গুড়গুড়ি টানছিলেন

আর সেই বড় কক্ষে থেকে বেশ ঘন ধোঁয়া বেরচ্ছিল। যেন, সেই ধোঁয়া দেখানোর জন্যই হেদয়য়েত খাঁ আর তাঁর এক কর্মচারী কোনো কথা বলছিলেন না।

হকশাহেব যোগেনের কানের পাশে মুখ নিয়ে বলেন, 'বড়বাবু! হেদায়েতে নামছেন আজ?'

যোগেন ততক্ষণে মুগ্ধ হয়ে গেছে। স্টেজে কেউ নেই—ঐ হুঁকো-টানা হেদায়েত ও তাঁর মোশাহেব হুসেন ছাড়া। হেদায়েত যেন ঘুমিয়েই পড়েছেন। চোখ বন্ধ। আর, হুসেনকে ব্যস্তই দেখায়—এই ঢুকল একটা দড়ি নিয়ে, সেটা দিয়ে ঘরটার সিলিং থেকে মেঝেটা কতটা মাপতে গিয়ে আবিষ্কার করল—সিলিং পযর্ন্ত উঠবে কী করে? তখন, দড়িগাছা ফেলে রেখেই বাইরে বেরিয়ে গেল। ফিরে এল উল্টো দিকে থেকে। তার অনুপস্থিতিটা শুধুই কলকের গভীর ধোঁয়া উঠল আর মঞ্চে ভেসে বেড়াল। মই নিয়ে ঢুকে হুসেন দেখে, মইটা দাঁড় করানোর একমাত্র জায়গা, হেদায়েতের ডিভানের বাঁকানো মাথাটা। হুসেন খুব মন দিয়ে মইটা ফিট করতে লাগল—যাতে পিছলে না যায়, যাতে উল্টে না যায়, যাতে ভেঙে না পড়ে। তখনো ধোঁয়া ঘুরে বেড়চ্ছে। হুসেন বেশ আয়োজন করে সাবধানে মইয়ের ধাপ বেয়ে উঠছে। আর দাঁড়াচ্ছে। জোড়পায়ে মই ভেঙে যখন সে হেদায়েতের শোয়া শরীরের ওপরে উঠে গেছে আর শুধুই তার কোমরের নীচটুকু দেখা যাচ্ছে। গড়গড়ার ধোঁয়াটা একটু পাতলা হতেই শোনা গেল বেশ ভারী একটা গলার ছোট্ট একটা হাসির সঙ্গে এই নিজেকে বলা কথাগুলো, 'তুমি আমার বন্ধু বলেই তোমাকে বলছি, এই মেবার জয়টা-না একটা তুড়ির কাজ!' কথাটা খুব ভেবে-ভেবে থেমে-থেমে বলা। হুসেন মই বেয়ে কয়েক ধাপ নেমে এসে বলল, 'তা হলে তো একটা বড় তুড়ি দিতে হবে। সম্রাট আকবরের চাইতেও বড়। উনিও তো জিততে পারেননি মেবার।' বলে হুসেন কয়েক ধাপ উঠে যায়। হেদায়েত গড় গড়ার নলটা ফেলে দিয়ে ত্বরিত গতিতে ডিভানের ওপর উঠে বসেন, 'আকবরের কি আমার মত সেনাপতি ছিল?' বলে বুক চিতিয়ে কয়েক পা এগিয়ে যান। হুসেন আবার নেমে এসে বলে, 'কেন? মানসিংহ?'

হেদায়েত কথাটা গ্রাহ্য না-করার ভঙ্গিতে খুক করে একটু হাসেন? তারপর বেশ বড় গলায় বলে ওঠেন, 'এই জন্যই-না তোর কথা শুনতে এত ভালবাসি।' বলে সেই খুক হাসিটা আরো বড় করে হাসেন। 'যে-কোনো কথাকেই তুই মজার কথা বানিয়ে দিতে পারিস।' আবার হাসি। 'মানসিংহও নাকী সেনাপতি!' এবার হাসির বাকিটুকু হাসলেন ও বেরিয়ে যেতে যেতে হাঁকলেন, 'খানশামা খানা লাগাও। হুসেন কী হাসাই না হাসাল। খিদে পেয়ে গেছে'।

হল ভেঙে পড়ে হাততালিতে।

'দেখ্‌লা মণ্ডল! বড়বাবুর অ্যাকটিং। শুধু কল্ক্যার ধোঁয়া ছাইড়্যাই কেল্লা ফতে। তোমার ভাল্ লাগতেছে না?'

'এই দৃশ্য কি কারো ভাল লাগা না লাগার উপর নির্ভরশীল। অথচ দ্যাহেন একডুও তো বানান নাই'।

হকশাহেব আর যোগেন আবার থিয়েটারে ডুবে যান। থিয়েটারের গল্প আগে জানা না থাকলে অসুবিধা। যাত্রায় বেশির ভাগ গল্পই জানা—ডায়ালগ পর্যন্ত। কিন্তু আধুনিক এই শাহেবি নাটকে গল্পটা ধরতে-ধরতে, কে কার কী হয় বুঝতে-বুঝতেই সময় চলে যায়। তার ওপর ঐতিহাসিক নাটকে লেখক আবার নিজের বানানো চরিত্রও ঢুকিয়ে দেন।

ইন্টারভ্যালে গিরিশের সন্দেশ

ইন্টারভ্যালের আগেই সত্যবতী, মানসী, অজয় এদের কথা বোঝা গেছে। আবার রাণা প্রতাপের নিজের ভাই সগার সিংহ ও তাঁর নাতি অরুণ সিংহ, কল্যাণীর মুসলমান-ধর্মান্তরিত স্বামী,

১০১

কল্যাণীর পতিধর্ম আর তার বাবার দেশধর্মের বিরোধ—এগুলি গল্পের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

ইন্টারভ্যালে ম্যানেজার তাঁর লোকজন সহ কাপ ভর্তি চা, প্লেট ভর্তি সিঙারা, আর-একটা প্লেট ভর্তি সন্দেশ এনে দুজনের সামনে ধরে। হকশাহেব বা যোগেন কেউই খাদ্য প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না। হকশাহেব বললেন, 'এতই যদি ডিশ-পাইড়্যা খাওয়াইবেন, তালি কি আর দশমিনিটের হাফটাইমে চলে? তালি তো হাফটাইমের টাইম বাড়াইতে হয়,' বলতে-বলতেই হকশাহেব দুটো সন্দেশ একসঙ্গে মুখে পুরেছেন। অনায়াস দক্ষতায় সবচেয়ে কম সময়ে সে দুটোকে গিলে হকশাহেব বলে ওঠেন, 'এডা কি গিরিশের সন্দেশ।'

ম্যানেজার হাত জোড় করে বলল, 'হ্যাঁ, স্যার, আপনারা খান স্যার। আপনাদের খাওয়া শেষ না হলে ইন্টারভ্যাল শেষ হওয়ার বেল বাজবে না।'

ততক্ষণে হকশাহেব যোগেনের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন, 'মণ্ডল, এই—যে গিরিশ, আমি আর একডাও খাব না। তুমি অপরাধীর কইর‍্যা ফেলছিলা। তুমি বেবাক খাও। আমি সিঙারা খাই।' হকশাহেব একটা সিঙারা তুলে নিলেন। এক কামড়ে সিঙারার অর্ধেকটা মুখের ভিতরে নিয়ে হকশাহেব জড়িয়ে বলেন, 'বাঃ গরম তো, মণ্ডল, তুমি সিঙারা খাইয়ো না। তালি সন্দেশের টেস্ট নষ্ট হইয়া যাবে। জলও খাইব্যা না। চাও খাইব্যা না। মুখের আইঠ্যা ধুব্যা না। যতক্ষণ সেই স্বাদ মুখে লাইগ্যা থাকে, ততক্ষণই স্বর্গবাস। খাও, খাও।'

যোগেন অতিথির মত ধীরে-ধীরে খাচ্ছিল। আবার, তার খাওয়ার মধ্যে যাচাইয়ের ভাবও ছিল। সত্যি এ সন্দেশ সে আগে খায় নি। প্লেটটা তো চায়ের প্লেট, তাই সন্দেশ যেন অনেক মনে হয়েছিল। এখন তো মাত্র ছটা পড়ে আছে।

যোগেন তার খাওয়ার গতি তো বাড়ায়ই না, উল্টে, চোখ বুঁজে সন্দেশগুলো অর্ধেক করে-করে যত্ন করে মুখে দিতে লাগল, বাঁ হাতটা আলগা করে ধরে, যাতে সন্দেশের গুঁড়ো পড়ে না যায়। আর তার আস্বাদনের গভীরতা, তার ঠোঁটে একটা রেখা হয়ে ওঠে, তৃপ্তির রেখা।

হকশাহেব বলে ওঠেন, 'মণ্ডল, আইজ তুমি একডা ডার্বির টিকিট কিনলে পারতা। লাইগ্যা যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল ছিল। একই দিনে শিশির ভাদুড়ী ও গিরিশ-আস্বাদন তো ভাগ্য ছাড়া হয় না।'

দর্শকদের অনেকেই আন্দাজমত হলে ফিরে আসছিল। কেউ-কেউ নিজের আসনে বসে পড়ছিল। কেউ-কেউ আবার বেরিয়ে যাচ্ছিল, ইন্টারভেল শেষ হয়নি দেখে। দুটো-একটা এমন কথাও শোনা গেল, বেশ উঁচু গলায়, 'সিন তুলতে ভুলে গেচে রে'। বা, 'হাফটাইমেই যবনিকাপতন করে দিলে, দেকো হিশেব কষে, লাভ বেড়ে যায় দ্বিগুণ।' 'লাভের গুড় যেন কে খায়—যুদ্ধ-যুদ্ধ করে লেকচার শুনিয়ে হাফটাইমে ড্রপ ফেললে, যুদ্ধ দেকাবে কখন? কালই তো রাইভ্যাল কোম্পানি রটিয়ে দেবে—এ থেটারে যাস নে, পতন আচে—যবনিকাপতন—মেবার নেই। মানে, যুদ্ধ নেই। এ-বড় কঠিন কমপিটিশনের বাজার।'

এমন একটা সমাবেশে যোগেন তার সামনে ম্যানেজারের লোকের ধরে থাকা প্লেট থেকে আধখানা করে সন্দেশ মুখে পুরে চিবুচ্ছে। ম্যানেজার বাবুর আরো একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল জল আর চায়ের ট্রে ধরে। হলে নানা ধরণের এই কথাগুলোতে অস্বস্তি পেয়ে সে বলে, 'ও-সব কথায় কান দেবেন না স্যার। থিয়েটার তো একটা সংসার। সব দিন কি আর এক রকম চলে। এ কি রেলের স্টেশন যে গার্ড শাহের হুইসল দিলেই ট্রেন ছাড়বে? পর্দা একবার ফেললে আবার তোলার আগে সব ব্যবস্থা কমপ্লিট করতে হবে না?'

হঠাৎ ম্যানেজারবাবু এসে পড়ে হাতজোড় করে বলে—'স্যার, তা হলে অনুমতি দিন। ড্রপ তুলি?'

শেষ আধটুকু মুখে নিয়ে যোগেন বলে দেয়, 'হুঁ-হুঁ।'

ইন্টারভ্যালের পর

ম্যানেজারবাবু প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে যায়। জল ছিল যার হাতের ট্রেতে, সে, ট্রেটা এগিয়ে ধরে। হকশাহেব তাকে বলে দেন, 'না, না, জল খাইব না। টেস্ট ধুইয়্যা যাবে।'

১০২

হঠাৎ ক্রি-ই-ইং আওয়াজে বেল বেজে উঠল, পর পর এইটুকু বোঝাতে যে দুটো বেল একই সঙ্গে দিয়ে দেয়া হল। তারপরই লোকজনের তাড়াতাড়ি হলে ঢুকে বসে পড়ার নানারকম আওয়াজ ওঠে, বিড়ি-সিগারেটের গন্ধ ভাসে, হলের আলো নিবে যায় ও তৃতীয় বেল বেজে ওঠে। ড্রপ উঠলে দেখা যায়, পেছনে পাহাড়ের আর দুর্গের ছবি আঁকা মেবার, এটা আগেও ছিল, ইন্টারভ্যালের পর সেই আঁকা ছবির ভিতর থেকে ছলছলিয়ে ঝর্নার জল পড়ে, আর একটা ছোট সাঁকোর তলা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, দেখা যায়। একজন প্রধান মেয়ের নির্দেশ মত আরো ছ-সাতটি মেয়ে গাইতে-গাইতে নাচছে।

দৃশ্যটা দেখে যোগেনের মনে পড়ে যায়, ইন্টারভ্যালে পর্দাটা পড়েছিল—সাঁকো আর ঝর্না বাদে—এই দৃশ্যটির সামনে সত্যবতী তার হারানো ছেলে অরুণকে খুঁজে পায় আর অরুণ-সত্যবতীর ধিক্কারে তাদের দাদা মশায় ও বাবা, সগর সিংহ মোগলদের প্রতি তার আনুগত্যবোধ ত্যাগ করে মেবারের দিকে চলে আসে।

"জল খাইব্যার দিলেন না! মুখ শুকনা লাগে না?"

'জিভে জল নাই? জিভের জলে ভিজাও গলা।'

'জল না-খাইলে তো ঢেকুর ওঠে না। ঢেকুর না উইঠলে তো পেট ভরে না।'

'অ্যাহন ঢেকুর তোলার কাম নাই। ঢেকুর কি পাইছে না কি?'

'ঢেকুর কি পায় না কী? ঢেকুর তো উঠে—'

'তোমার ঢেকুর কি উইঠবার নিছে। তালে দ্যাও তুইল্যা। না-হইলে বায়ু ঊর্দ্ধগামী হইব গা। এডডু চাপাইয়্যা চুপাইয়্যা তুইল্যা দেও, বেশি আওয়াজ দিয়ো না। দুই-তিন বারে ভাইঙ্গা-ভাইঙ্গ্যা তোলো। প্র্যাকটিস নাই?'

'কীসের প্র্যাকটিস? ঢেকুর তোলার, না চাইপ্যা তোলার?'

'অ্যাহন দ্যাও তুইল্যা, জয়বন্ধু বইল্যা।'

হকশাহেব যেন সত্যবতীর অভিনন্দনের জবাবে অমর সিং-এর বাঁকা কথায় মগ্ন হয়ে গেলেন, 'যারা এ যুদ্ধ জিতেছে, তারা সব সমরক্ষেত্রে মৃত হয়ে পড়ে আছে। প্রকৃত যুদ্ধ জয় তারা করে না সত্যবতী, যারা নিশান উড়িয়ে ডঙ্কা বাজিয়ে জয়ধ্বনি করতে-করতে যুদ্ধ হতে ফেরে। আসল যুদ্ধ জয় করে তারা, যারা সেই যুদ্ধে মরে।' অমর সিংহের কথায় ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে হকশাহেব যোগেনকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কী উইঠছে নি ঢেকুর?'

কিন্তু মঞ্চে তখন নানা রকম অদলবদল ঘটে যাচ্ছে—শুধু মুখের কথায়। একটা কথা যদি শোনা না হয়, তা হলে ঘটনাটাই বোঝা যাবে না। তা ছাড়া কথা যারা বলছে, তারা তো কথাটাই শুধু বলছে না—কথার সঙ্গে মিল রেখে শরীরের নানারকম ভঙ্গি করছে। অমর সিং বেশ সাহসী ও স্পষ্টবক্তা হয়ে যায়, ফলে তার চলাফেরা কথাবলা ভাল লেগে যায়। মহাবৎ খাঁ তার স্ত্রীকে ফেলে এসেছে, নিজে মুসলমান হওয়ার সময়। সে সেই কারণে অনুতপ্ত হয়ে একা-একা সারাটা স্টেজে ঘুরে-ঘুরে সেই অনুতাপ জানায়—লম্বা চেহারার মানুষটির লম্বা-লম্বা পা ফেলায় মনে হয়, জায়গাটা তার পক্ষে ছোট হয়ে গেছে, যেমন তার দুঃখ বইবার পক্ষে তার শরীরটা যেন একটা খাঁচা হয়ে আছে—'কল্যাণীর পিতার প্রতি ক্রোধে তার উন্মুখ প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। যদি এখন তার ক্ষমা চাইবার সুযোগ থাকত।' মহবৎ খাঁ কিছুতেই মেবার যুদ্ধে সেনাপতি হতে রাজি নয় কারণ সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও মেবার তার জন্মভূমি। জন্মভূমি আর ধর্মের প্রতি কর্তব্যের নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই তার বাবা সগর সিংহ ঢুকে জানায়, 'এতদিন পরে স্নেহময়ী মায়ের ডাক শুনেছি, কী গভীর, কী করুণ, কী গদ্‌গদ। মহাবৎ, তুমি তা কল্পনাও করতে পারবে না। তুমি তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করো। তুমি ধর্ম পর্যন্ত ছেড়েছ। কোরান পড়েছ অবশ্য। সে অবশ্য অতি মহৎ ধর্ম। হিন্দু ধর্ম তাকে হিংসা করে না। তার সঙ্গে এর বিবাদ নেই। যে-ধর্মের মূলমন্ত্র প্রবৃত্তিকে দমন, আত্মজয় ; যে-ধর্মের চরম কথা সর্বভূতে দয়া, সামান্য পিপীলিকাটি বধ করতে যে ধর্ম নিষেধ করে।'

যোগেন বলে বসে, 'সগর সিং কি বামুন ছিল?'

হকশাহেব একটু বিরক্ত হয়েই যেন ঘাড় ঘুরিয়ে বলেন, 'সিং কি বামুন হয়? ক্ষত্রিয়। সেও তো উচ্চবর্ণ। কথাগুল্যা তো ভাল।' ইতিমধ্যে সগর সিংহ বলে ফেলেছে, তার মেয়ে ও মহবতের স্ত্রী, কল্যাণীকে সে নির্বাসন দিয়েছে কারণ কল্যাণী তার বিধর্মী স্বামীর পূজা করে।

সঙ্গে-সঙ্গে মহাবৎ খাঁ ঘোষণা করে, 'হ্যাঁ পিতা, আমি প্রায়শ্চিত্ত করব—কিন্তু তা মুসলমান হওয়ার জন্য নয়। একদিন যে হিন্দু ছিলাম, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব।'

মহাবৎ খাঁ এমন অভিনয় করল, হাততালিতে হল ফেটে পড়ে, মহাবৎ বোধহয় হাততালি যে পড়বে তা জানত। সে হাততালির সময়টা জুড়ে স্টেজে তার জায়গা বদলাতে থাকে।

'মহাবৎ কিন্তু দারুণ পার্ট করে'। হকশাহেব জানান, 'মেবার পতনে মহাবতই তো হিরো, বড়বাবু তো মহবৎ করেন। ক্যান যে আইজ কইরলেন না!'

মহাবৎ তখন স্টেজে তার জায়গা থেকে গম্ভীর উঁচু গলার কম্পনে কেটে কেটে বলে, 'আজ থেকে হিন্দুদের প্রতি অনুকম্পার শেষরেখা হৃদয় থেকে মুছে ফেলে দিলাম।' তারপর কয়েক পা এগিয়ে স্টেজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুই হাত ওপরে তুলে বলে, 'আজ থেকে প্রতি শিরায়, মজ্জায়, স্নায়ুতে আমি মুসলমান'। সেই বীরত্বের ভঙ্গি থেকে মহবৎ হঠাৎ নমাজের ভঙ্গিতে হাঁটু গেড়ে ঊর্ধ্ব মুখে দুই হাতের আঁজলা এক করে আল্লার দোয়া চাইল। সারা হল হাততালিতে উত্তাল হয়ে থাকে যতক্ষণ না আল্লার উদ্দেশ্যে মাটিতে ললাট ছুঁয়ে থাকার ভঙ্গি থেকে মহবৎ উঠে না দাঁড়ায়।

এর পরও যে মহবতের আরো কিছু বলার থাকতে পারে, তা মনে হয়নি। নমাজের আত্মমগ্নতা থেকে বেরিয়ে আসাটা শরীরের কিছু ভাঙচুরে আর হাঁটার গতিতে বুঝিয়ে দিয়ে মঞ্চের বাইরে চলে যাওয়ার সম্ভাবনায় থমকে দাঁড়িয়ে বলে, 'এত বিদ্বেষ, এত আক্রোশ! এই এঁদের উদার, অত্যুদার হিন্দুধর্ম, সনাতন হিন্দু ধর্ম। মুসলমান ধর্ম যে-কোনো বিধর্মীকে আপনার করে নিতে পারে। আর একজন বিধর্মী শত তপস্যাতেও হিন্দু হতে পারে না। হিন্দু হয়ে জন্মাতে হয়। এত গর্ব, এত অহঙ্কার?'

এরপরও কিছু কিছু হৃদয় বদল ঘটল ও মহবৎ খাঁ ও অমর সিং দুই ভাই ভয়ঙ্কর আয়োজনের এক যুদ্ধে উদ্যত হল। সেই দৃশ্যে আলোর রং বদলাতে থাকল পেছনের একটা শাদা পর্দার ওপর। দুই ধর্মে বিচ্ছিন্ন একই জন্মভূমির দুই ভাই চরম শত্রুতায় এ ওকে সম্পূর্ণ হত্যা করার জন্য অস্ত্র ধরতেই মানসী তার চারণীদের নিয়ে এসে গান গেয়ে সে যুদ্ধ থামিয়ে দেয়,

ধর্ম যেথা সেথায় থাক, ঈশ্বরেরে মাথায় রাখ্,
স্বজন দেশ ডুবিয়া যাক—আবার তোরা মানুষ হ।

সেই গানের মধ্যে আলাদা ধর্মের দুই ভাই ও এক কন্যা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে। ড্রপ সিন নামতে থাকে।

কেউ-কেউ হয়তো জানত, এখানেই নাটক শেষ, তারা ঠেলাঠেলি এড়াতেই হয়তো লাফিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে যাওয়া বা হলে ঢোকা দিয়ে অবিশ্যি বোঝার উপায় নেই—নাটকের আরম্ভ বা শেষ বা ইন্টারভ্যাল। দরজাগুলো সব সময় বন্ধও থাকে না। বাইরের মাঠের নানা ঘটনাও দেখা যায় হলের ভিতর বসে থেকেই।

গানটা শেষ হওয়ার আগেই দু-জন এসে হকশাহেব ও যোগেনের কাছে দাঁড়াল বটে কিন্তু কিছু বলল না। হকশাহেব নিজে দাঁড়িয়ে উঠে মণ্ডলকে বললেন, 'গাত্রোত্থান করা হোক। ঢেকুর কি উঠ্যাইতে পারছিলা শ্যাষ পর্যন্ত? তবে এত যুদ্ধবাদ্যের ভিতর কোনো আওয়াজ তো পাই নাই।'

যোগেনও দাঁড়িয়ে পড়েছিল, 'থিয়েটার দেইখতে-দেইখতে ঢেকুর ভুইল্যা গিছিলাম।'

হকশাহেব তাঁর অট্টহাসির মধ্যে পা বাড়ালে সেই দু-জনের একজন পথ দেখিয়ে বলে, 'আপনারা একটু ভিতরে চলেন স্যার। বড়বাবু অপেক্ষা করছেন।' দু-জন দু-দিক থেকে পথ দেখিয়ে তাঁদের সামনের দিকে নিয়ে চলল। আলো যথেষ্টই ছিল, তবু হকশাহেব পায়ের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে চলছিলেন। হলের ভিতরেই একটা ছোট সিঁড়ি। সেটাই ভিতরে যাওয়ার দরজা। একজন লাফিয়ে উঠে দরজাটা ঠেলে খুলে দিল।

শিশির সকাশে হক

১০৩

ভিতরটা প্রথমে অন্ধকার ঠেকে, আসলে হলের চাইতে আলো কম। এতক্ষণ যে স্টেজ ছিল সব আলোর লক্ষ, এখন সেটা প্রায় আবছায়া। ওপরে কোথাও মাত্র একটা আলো জ্বলছে। সেটাই শেষ সেটটাকে, উইংগুলোকে, ড্রপেরও তলার দিকটাতে আলো ও ছায়া দুই-ই ফেলছে। হকশাহেব আর যোগেন যে-জায়গাটা দিয়ে যাচ্ছেন সেটা স্টেজের মুখের বাঁ দিকের জায়গাটা। সেখানেও আলো নেই। কিন্তু কোথাও কোনো একটা আলোয় লম্বা-লম্বা ছায়ায় ছককাটা হয়ে আছে। সঙ্গে যে বা যারা ছিল, তাদের একজন হকশাহেবের হাত ধরেছে।

ওখান থেকে দুই ধাপ সিঁড়ি নামতেই গ্রিনরুমে আলোতে একটা ডেকচেয়ারে শিশিরবাবু বসেছিলেন, হেদায়েত-এর পোশাকেই, মুখে দাড়িটাও খোলেননি। আরো দু-একজন বসে ছিলেন, অনেকেই দাঁড়িয়ে ছিলেন।

হকশাহেবকে দেখেই শিশিরবাবু চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে জড়িয়ে ধরলেন, 'হকশাহেব, কী যে খুশি হয়েছি। কিছুদিন আগে কাগজে দেখি আপনার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছে। দেখে খুব ফূর্তি হল। যাক, এইবার হকশাহেব যেটা তাঁর নিজের জায়গা—হাইকোর্ট, থিয়েটার-সিনেমা, লাইব্রেরি—সেখানে একটু সময় দিতে পারবেন। বসুন, বসুন, বসুন।'

চেয়ারে যাঁরা বসেছিলেন তাঁরা আগেই উঠে গেছেন। কিন্তু হকশাহেব আর শিশির বাবুর হৈ হৈ হাসিতে পেছনের দরজাটায় লোকজনের ভিড়, তার মধ্যে কারো-কারো অভিনয়ের পোশাক আর মুখ, মেয়েরাও আছে।

বসে হকশাহেব বললেন, 'তাইলে আপনার সঙ্গে এনার পরিচয় করানো দরকার। ইনি যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল অব বরিশাল। উনিই সেই অনাস্থা প্রস্তাবের নেতা ছিলেন। কিন্তু আপনার আশা পূরণে ব্যর্থ হইছে। তাই কইল্যাম, মণ্ডল, চলো তোমার ডিফিট সেলিব্রেট করতে যাই বড়বাবুর থিয়েটারে। আমার দেশের ছেলে, যারে কয় আগুনের গোলা।'

যোগেন উঠে গিয়ে শিশিরবাবুকে প্রণাম করে। শিশিরবাবু তার মাথা ছুঁয়ে আশীর্বাদ করে বলেন, 'আপনার নাম কিন্তু আমি ভুলব না মণ্ডল অব বরিশাল'।

'সে তো আমার পরম সৌভাগ্য', যোগেন গিয়ে তার চেয়ারে বসে।

শিশিরবাবু তাঁর চিবুকটা এগিয়ে ইংরেজিতে বলে ওঠেন, 'বাট ফর ওয়াট্‌ রিজন? হকশাহেব আপনাকে ইনট্রোডিউজ করে বললেন, মণ্ডল অব বরিশাল। বলতে পারতেন, মণ্ডল ফ্রম বরিশাল। কিন্তু তা বলেননি, বিকজ হি হ্যাপন্‌স্‌ টুবি এ কে ফজলুল হক অ্যান্ড নোজ হিজ ইংলিশ।' হকশাহেব হেসে উঠতে গেলেন কিন্তু পারলেন না। শিশিরবাবু তাঁর কথা—বলার জাদুতে হকশাহেবের হাসি থামিয়ে দিলেন ও বলে চললেন, 'ফ্রম মে মিন দ্যাট ইউ হ্যাপন টু বি বিলংগিং টু বরিশাল। কিন্তু অব বরিশাল উইল মিন দ্যাট বরিশাল বিলংগস টু ইউ।'

হাসাহাসি শেষ হলে হকশাহেব বললেন, 'বাট বড়বাবু ইটস অনলি এ হাফট্রুথ।'

'দেন, হোয়াট ইজ দি আদার হাফ?'

যোগেন কথা বলে ভাল, কথা-বলার রকমারি জানে, কথা তার মুখে আসেও ভাল। কিন্তু এ একেবারে অন্য জিনিশ, মুখ খুললেই মণিমাণিক্য ঝরছে। কী সুন্দর মুখ। অথচ পরে আছেন একটা ক্লাউনের পোশাক।

'এইডা ট্রুথ যে যোগেন মণ্ডল অ্যাহন বরিশালের মালেক—'

শিশিরবাবু উদ্ভাসিত মুখে হাততালি দিয়ে উঠলেন, 'ব্রিলিয়্যান্ট। মা-লে-ক। নট, বাড়ির মালিক।'

'আর আনট্রু হইল আমি ফ্রম আর অব-এর পার্থক্য করার মতো ইংরাজি জানি না।'

'ইটস মোর দি রিজন দ্যাট ইউ বিলং টু ইংলিশ অ্যাজ এ নেটিভ অর ন্যাচরাল স্পিকার।'

'একেবারেই না বড়বাবু। ইংরাজিতে তো বরিশালি টান আসে না। তার লগে শাহেবগ ইংরাজির লাগান শোনায়।'

যোগেন চায়নি কথা বলতে, তার মুখ ফশকে বেরিয়ে যায়, 'তাইলে তো দাঁড়ায় বরিশাইল্যা ভাষা উইদাউট বরিশ্যাইলা টান মেকস দি কিংস ইংলিশ' বলেই যোগেন মনে-মনে অপ্রস্তুত হয়ে যায়, এ সে কী করল, কথাটা বললই-বা কেন আর ইংরেজিতেই-বা কেন। ওঁরা কেউই যখন হাসলেন না, তখন যোগেন নিজের মুখেই একটা হাসি ফুটিয়ে রাখল।

ততক্ষণে শিশিরবাবু ঘাড় নুইয়ে তাঁর ডানহাতের পাতাটা চোখের নীচে মেলে ধরে, বাঁ-তর্জনী দিয়ে পাতার ওপর ঠুকতে-ঠুকতে যেন মনে বলছেন, এমন নিম্নস্বরে বিড়বিড় করেন, 'তাহলে—মানে ফর্মুলাটা কী দাঁড় করালেন, বরিশালের ভাষা থেকে বরিশালের টান বাদ দিলেই সেটা কিংস ইংলিশ। এ তো ওয়ান্ডারফুল, ডিসকাভারি। সেই কারণেই বরিশালের লোকরা ভাল ইংরেজি লেখে।'

এইবার দু-জনের হাসি শুরু হয়। শিশিরবাবু যা বললেন তাতে যে যোগেন শ্বাস ফেলার স্বস্তি পেল, একেবারেই তা নয়। যে-স্বরে ও যে-মুদ্রায় শিশিরবাবু কথাটা বললেন, তাতে যোগেন এতই মুগ্ধ হয়ে যায়, যে, সে ভুলেই যায় নিজের বোকামো।

শিশিরবাবু বলে ওঠেন 'হকশাহেব, আপনার কাছে তো সব শো-এর চিঠিই যায়। আপনি যখনি আসবেন, প্লিজ মেক এ নোট অব ইট যে যোগেনবাবু অ্যাকম্প্যানিজ ইউ।'

'আমার তো সব সময়ই মন উড়ান দেয়, যাই একবার বড়বাবুরে স্টেজে দেইখ্যা আসি, নয়নারাম, আত্মারাম, শ্রবণারাম। অ্যাহন মণ্ডল তাগাদা দিলে আমি ওর লগে পালাইতে পারব।'

'সরি, যোগেনবাবু, আমাকে মার্জনা করবেন। আপনি কেন হকশাহেবের ওপর নির্ভরশীল থাকবেন। আপনি আপনার খুশিমত আসবেন। হকশাহেবও আপনার সঙ্গে আসবেন। আমার পক্ষে এটা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ হল—'ছী', শিশিরবাবু কাকে ডাকলেন, কেউ একজন এসে মাথা নিচু করলে শিশিরবাবু বললেন, 'এখন থেকে ওঁকে মনে করিয়ে দেবে প্রত্যেক শোয়ের আগে। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল, রাইটার্স বিল্ডিংস।'

'কিন্তু মন্ডলরে পাঠাইতে গিয়া আমারডা আবার বিস্ফরণ না হয়। আমি তো একা-একা থিয়েটার দেখব্যার পারি না, ডর লাগে।'

'সে আবার কী। থিয়েটার কি সার্কাস যে বাঘ-সিংহ দেখে ভয় পাবেন?'

'আমি আসলে গুল্যাইয়া ফেলি কোনটা থিয়েটার। মনে হয়, যা দেইখতেছি, আমি তার পার্ট। তাও না। মানে, সেডা আমারও অ্যাকশন।'

'মানে, চটি ছুঁড়ে মারেন? বিদ্যেসাগরের মত? থিয়েটারে গল্প আছে।'

'না। মনে হয়, তার থিক্যা বেশিই। সন্দেহজনক। বহুকাল থিক্যা তো থিয়েটার দেখতেছি। স্বভাব বদলাইল না। তবে আপনার আইজক্যার থিয়েটারের মত থিয়েটারে তেমন হয় না।'

'মানে, আজকের থিয়েটারটা আপনাকে খেপাতে পারেনি?'

'না। এডা তো নানা বিষয়ে আলোচনামূলক নাটক। হিন্দু কী, মুসলমান কী, আবার

হিন্দু-মুসলমান মিল্যা কী। আর কোনো তো কী হব, কী হব, এমন উদ্বেগও নাই। তবে, আপনের নতুন রূপ দেখা তো এক সৌভাগ্য।'

'এমন কী আর? আমি তো নিমে দত্ত করেছি।'

'এখন একবার করেন, বড়বাবু।'

'সেটা একা-একা দেখতে ভয় করে?'

'না-আঃ। হাসি আর কৌতুকডা তো কমন। সবাই হাসে, হাততালি দেয়। একবার হইল কী, নাইনটিন টুয়েলভে ঐ দিল্লির দরবার-টরবার হইল না। খাশ শাহেবগ একডা দল আসছিল শেক্সপিয়্যার নিয়্যা—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটা একটা দল ছিল না, একটা কম্বিনেশন দল ছিল। গ্রিফিথ ছিলেন। থর্নডাইক ছিলেন। ইয়াগো করেছিলেন এক ছোকড়া। হ্যানসেন। সে তো ভিলেইনের ধারণাই বদলে দিল। আমাদের প্রফেসররা, বিশেষ করে প্রফুল্ল ঘোষ তো রেগেই গেলেন। আমার তখন ফিফথ ইয়ার।'

'আমি তো তহন চাকরি ছাইড়্যা আশু মুখার্জির জুনিয়ার, হাইকোর্টে। ম্যাকবেথ দেইখতেছি। যেই ফার্স্ট অ্যাক্ট সিন সেভেনে ম্যাকবেথের সলিলকির পর এনটারস লেডি ম্যাকবেথ, আমি চিল্লায়্যা উঠছি, ম্যাকবেথ, বৌয়ের কথা শুইনো না, সর্বনাশ হইব। আমার চিক্কুর থামার আগে কাল ড্রপ গেল পইড়্যা, হলের লাইট সব গেল জ্বইল্যা, বিবির চোখ সরমে ঢাকা। দুই দুইডা গোরা পুলিশ অফিসার আমার রোয়ের দুই দিকে আইস্যা খাড়ায়। আমি ভাইবল্যাম, হইছে, সারা রাত্তির হাজতবাস। বিবিরে কইল্যাম—আমার লাইগ্যা ভাইব না, গাড়িডা খুঁইজ্যা বাড়ি চইল্যা যাঁইয়ো।

হকশাহেব, আপনিই পারেন, নিজেকে সারপাস করতে।' শিশিরবাবু নিজের বাঁ হাঁটু বাঁ হাত দিয়ে থাবড়ালেন, উচ্চ থিয়েটারি ভঙ্গিতে, তারপর হা হা হেসে উঠে বললেন, 'গডস ওন একটিং'। তারপর?

আমার তহন একটু-আধটু নামগাম হইছে, হাইকোর্টে। কিন্তু ঐ গোড়া পুলিশ আমারে যা পিটাইব। সময়ডা তো খারাপ—টেররিস্টগ ডরে শাহেবগ বিচি উইঠছে কপালে। যাই হোক—হাইকোর্টের এক জজশাহেব ছিলেন, তিনি উইঠা আইস্যা আমারে জিগান—তুমি কি ইনভলভড নাকি, এ-সব গোলমালে। তারে পাইয়্যা য্যান মহাদেবের দুইডা পাও একডা মুঠাতেই পাইল্যাম। জজশাহেবরে কইল্যাম,—আমি স্যার থিয়েটার ভুইল্যা থিয়েটারের মইধ্যে ঢুইক্যা গিয়া ম্যাকবেথরে কইছি—বৌয়ের কথা শুইন্যা ঐ কাম কইরো না ম্যাকবেথ। সে জজশাহেবও ছিল একটু থিয়েটার-পাগলা। আমার কথা শুইন্যা বলে, সত্যি এত ভাল অভিনয় করছে যে আমিও তোমার মতন চিল্লায়্যা উইঠবার পারতাম। জজশাহেব পুলিশ-টুলিশ সর্যাইয়া ঘটনা কইয়া দিলেন। মাইক্রোফোনে, আরে অরাই নিয়্যা আইসছিল বিলাত থিক্যা, এক মেমশাহেব খুব নরম গলায় কইলেন, আমাদের একজন দর্শক অভিনয় দেইখ্যা মেসমেরাইজড হইয়্যা ম্যাকবেথরে বাঁচাইব্যার লাইগ্যা কথা কয়্যা ফেইলছে। তারে ধইন্য ধইন্য দেই। আপনারা সিট লন। হলের আলো নিবব। ড্রপসিন উইঠব। তাই হৈল। তহন ঐ অন্ধকারে বিবি কয়, আমার গাও ঘুল্যায়, বাইরে চলো। কে কী শুইনল, কেডা জানে। একজন হাত বাড়াইয়্যা আমার বিবিরে লজেঞ্চুসের মত কিছু দিল। তারপর থিক্যা কোনো সাহায্যকারী না নিয়্যা আমি থিয়েটারে ঢুকি না। থিয়েটার দেখা না দেখা সেডা তো বিষয় না। নিজেরে বাঁচানোডা অবশ্য কর্তব্য। মণ্ডল লগে থাইকলে ভরসা পাই। বিকজ অব মাই এজ, বিকজ বোথ আব আস বিলং টু দি ডিস্ট্রিক্ট অব বরিশ্যাল এবং বরিশাইল্যারে বরিশাইল্যাই যদি না বাঁচাইব, তয় বাঁচাবে কেডা।'

যোগেন বলে, 'যারে কইবেন, স্যায়ই তো আপনার লগে আইসব। আমার তো সবডাই সৌভাগ্য।'

গল্পটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আবার একটা সবাই মিলে হাসাহাসি হল। সেই হাসিটার শেষে হকশাহেব হাত জোড় করে বলেন, 'বড়বাবু, যদি অনুমতি করেন, আইজ তাইলে ছুটি অনুমোদন করেন।' শিশিরবাবু ও হকশাহেব যে যার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন, পরে যোগেন। হকশাহেবের একটা ভঙ্গি থেকে বোঝা যায় উনি বেরবার পথটা খুঁজছেন। হেদায়েতের পোশাকে শিশিরবাবু ডান হাতটা দিয়ে পথ দেখিয়ে এগিয়ে যান 'ম্যাকবেথ' নিয়ে যে আড্ডা হচ্ছিল, সেই সূত্রটা ধরে, বিড়বিড় করতে-করতে।

ইফ ইট অয়্যার ডান, হোয়েন ইট ইজ ডান, দেন ইটয়্যার ওয়েল
ইট ওয়্যার ডান কুইকলি : ইফ দ অ্যাসাসিনেশন
কুড ট্র্যামেল আপ দি কনসিকুয়েন্স, অ্যান্ড ক্যাচ
উইথ হিজ সুরসিজ সাকসেস ; দ্যাট বাট দিস ব্লো
মাইট বি দি বি-অল অ্যান্ড এন্ড অল—হিয়ার

হেদায়েত খাঁ সাজা শিশিরবাবু কিছুটা আপন মনে, কিছুটা আপ্যায়নে, হকশাহেবের প্রতি মনোযোগে ম্যাকবেথের স্বগতোক্তি আবৃত্তি করতে-করতে চলেছেন বড় গ্রিনরুমের ভিতর দিয়ে। সে গ্রিনরুমে ততক্ষণে সকলেরই পোশাক খোলা ও রঙ তোলা হয়ে গেছে। তারা নিজেদের স্বাভাবিক পোশাকে ও চেহারায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল শহরের সান্ধ্য রাস্তায় যেন। একমাত্র শিশির ভাদুড়ীর শরীরে পোশাক, মুখে নুর ও রং, চোখে গভীর কাজল। যেন এটা নাটকই, 'ম্যাকবেথই, যেন মঞ্চেই, হেদায়েত খাঁ-র যে পোশাক থেকে হলে কৌতুক ও হাসি উথলে তুলেছিলেন ঘণ্টা খানেক আগে, সেই পোশাকের ভিতর থেকেই উঠে আসছে, আত্মমগ্ন ম্যাকবেথের শেষ যুক্তিশীল দ্বিধা। এই লোকজন, এই একটু চলাফেরা, এই একটু ভিড়ও যেন মঞ্চনির্দেশে আছে।

দিস ইভন-হ্যানডেড জাস্টিস

কম্ভেস দ ইনগ্রেডিয়েন্স অব আওয়ার পয়জেনড চ্যালিস—বলতে-বলতে শিশিরকুমার দাঁড়িয়ে পড়েন, হকশাহেবের কব্জি ধরে ঝাঁকান আর ঠোঁট-চিবুক মিলিয়ে বানরের মুখের মত একটা ভঙ্গি করেন।

বাইরের মাঠটাকে আলো করে দিয়ে হকশাহেবের গাড়ি আর সার্জেন্টের বাইক একই সঙ্গে আওয়াজ তুলল।

শিশিরবাবু যোগেনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'খুব ক্ল্যাশ শুনিয়েছে-না ঐ হিন্দু-মুসলমান নিয়ে ডায়ালগগুলো?'

হকশাহেব একটু আগ বাড়িয়েই জবাবটা দিলেন, যাতে যোগেন কিছু বলে না বসে, 'থিয়েটারে একটু-আধটু ক্ল্যাশ না-থাইগলে ভালও লাগে না। ও আপনে ভাববেন না বড়বাবু। মুসলমান দর্শকরাও তো ক্ল্যাপস লাগাইল।'

'এই কথাটাই তো বিপদের। আমরা স্টেজে একই সঙ্গে হিন্দু কমিউন্যালিজম আর মুসলিমস সেন্স অব হিউমারকে সুড়সুড়ি দিচ্ছি। ১৯০৭-এ লেখা নাটক। তখন তো স্বদেশীর জোয়ার। কী করব? দল রাখতে হয়। আমি তো মহবৎ করি। ক-দিন রিহার্সাল দিয়ে নিজের মুখে কথাগুলো বলতে খুব খারাপ লাগল। কাউকে কিছু বললাম না। এর মধ্যে আমার কানে এসেছে দলের ম্যানেজাররা কানাঘুষো করছে, এখন তো রোজই রায়ট হচ্ছে, নাটকটা বেশ লোক টানবে। গতকালই মাত্র বলেছি—আমি হেদায়েতে নামব। কী করুণ আত্মরক্ষা, ভাবুন। কাউকে কিছু

বলতে পারব না। আর, নিজে ভাবব, যাক বাবা, লোকে তো এটা বলতে পারবে না যে শিশির ভাদুড়ী এইসব বলল। এখন আবার নিজেই ভাবছি—হেদায়েতে নামার ডিসিশনটা ঠিক হয়েছে। লোকজন হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়াঝাঁটি ভুলে হয়তো হেদায়েতকে নিয়ে মজায় ব্যস্ত হয়ে পড়বে। তবে, আপনাকে আর মনের দুঃখ বলে লাভ কী? আপনাকে তো এই সব করেই গবমেন্ট চালাতে হয় আর নো-কনফিডেন্সের মুভারকে বডিগার্ড করে থিয়েটার দেখতে হয়—!' সিঁড়ির ওপরে চৌকাঠের ঘেরে শিশিরকুমার, সিঁড়ির মাঝখানে হকশাহেব। যোগেন মাঠে। শিশিরবাবু আর হকশাহেবের মিলিত সরব হাসিতে ঝমঝমিয়ে উঠল থিয়েটার পাড়া।

হকশাহেব নেমে হাত নেড়ে গাড়ির দিকে এগলেন।

যোগেনের কী একটা দুঃখ হল শিশিরকুমারের দিকে তাকিয়ে, বলে উঠল, 'এই সব বলা আর শোনা মানুষের অভ্যাসে ঢুক্যা গিছে। এগুলা কিছু বুঝায় না। কারোই ব্যক্তিগত দোষ নাই'।

থিয়েটার থেকে ফেরা থিয়েটারে

গাড়িতে হেদো পর্যন্ত কেউ কোনো কথা বললেন না। দু-জনই একটু সময় নিলেন—এত আলাদা ধরনের একজন বড় মানুষের সঙ্গের স্মৃতিটা জারিয়ে নিতে।

১০৪

কেশব সেন স্ট্রিট পার হতে-হতেই হকশাহেব বলে উঠলেন, 'এই যা, তোমার বাড়ি?'

'সে তো এহানে নামলেই হয়।'

'নাইমব্যা?'

'আপনার বডিগার্ড না লাইগলে নামা যায়।'

'তোমার বাড়িতে দেরিটেরির ব্যাপার নাই তো?'

'না। ঐ সব কি রাইখতে দেয়া যায়? তবে নাই।'

'তাইলে তুমি আমার লগে আমার বাড়িতে চলো। তোমারে আমি কয়েকডা কথা জিগ্যাইব।'

'যদি কথা থাকে তাইলে যাইব না তো বলি নাই। আচ্ছা, হকশাহেব, ভাদুড়ীমশয় য্যান কইলেন এই পালাডা ১৯০৭-এ লেখা?'

'হ্যা। এগুল্যা তো সব বঙ্গভঙ্গের হিন্দু প্রোডাক্ট।'

'এইডা আমারে এডডু কইবেন? এগুল্যারে তো স্বদেশী নাটকও কয়? আপনিও কন?'

'নামডারে এত মূল্য দিও না। এড্ডা নাম চালু আছে। সেই নামেই সবাই ডাকে।'

'তাইলে ১৯০৭-এ যারে কয় স্বদেশী নাটক, তারেই কয় হিন্দু প্রোডাক্ট।'

'তা কইব্যার পারো—রাফলি।'

'আপনাগ তাইতে আপত্তিও ছিল না?'

'সত্যি কথাডা হইল—অন্তত বেঙ্গলের ব্যাপারে ওডা, মানে হিন্দু আর স্বদেশীরে এক কইর‍্যা দেহাডা তহন ছিল পার্ট অব আওয়ার সেকুল্যার ট্র্যাডিশন। মানে, হইল, হিন্দুরা স্বদেশী করে, এডা হিন্দু-মুসলমান দুইয়েই মাইনত। অ্যাহন দেহি, মুসলমানদের মন নিয়্যা নানান লেখাপত্তরে লেখে—ইংরেজরা মুসলমানদের হাত থিক্যা নবাবি-সুলতানি দখল কইরছে বইল্যা না কী

মুসলমানরা ইংরাজি শেখে নাই। এডা আমার ঠিক লাগে না। আমাগ এইসব বানান কথা। আরে লেখাপড়া শিখে নাই—এডারে তো একডা ন্যাশন্যালিস্ট প্রোগ্রাম কওয়া যায় না।' হকশাহেব খুব একচোট হেসে উঠলেন। 'মুসলমানগ ভিতরে যে-সব বাড়ির লেখাপড়ার অভ্যাস ছিল তারা ঠিকই পইড়ছে। তাগ বাড়ির মেয়েরাও পইড়ছে। আমার কি উপায় ছিল না পইড়্যা? আমার পয়লা বিবির গল্প শুইনছ না?'

'কী য্যান, একডু-আধটু গোলমাইল্যা শুইনছি, তাও তো স্মরণ নাই।'

'তাইলে আমার মুখ থিক্যাই শোনো। অন্যেরা তো অন্যের মুখ থিক্যা শুইনছে। আমি তো এইটটিন এইট্টি নাইন থিক্যা এইটটিন নাইনটি ফাইভ পর্যন্ত লাগাও প্রেসিডেন্সি কলেজে। আরো তিনবছর ওকালতি কলেজে। তাইলে ধরো, টানা নয়-দশ বছর কইলকাতায়, প্রেসিডেন্সিতে, হস্টেলে, একই ঘরে, একই রুমমেট দুইজনের সঙ্গে। এই বাকি দুইজন রুমমেটই ছিল নবাব সৈয়দ মহম্মদ আজমা খাঁর বেটা। উচ্চ শিক্ষিত বাড়ি। বাড়ি থিক্যা নিয়মিত চিঠিপত্তর আসে। দুই বেটা আমারে ধইর‍্যা জব লিখবার কয়। আমাগ টাইমে, অ্যাহনো, পত্রলিখনডা অ্যাড্ডা জরুরি কাম ছিল। মামুলি চিঠি। দিত্যাম লিখ্যা। একজনের চিঠি আইসত বেশ ঘন ঘন, অগ বড় বহিন, আপা খুরশিদ। তার হাতের লিখা এক্কেবারে স্বর্ণাক্ষর। ভাষাও খুব ভাল। তহন সেই ধরো আজ থিক্যা প্রায় চল্লিশ বছর আগে একডা ধর্মপ্রাণ গোঁড়া মুসলমানবাড়ির মেয়েরা পর্যন্ত এতডা শিক্ষিত ছিলেন। আমার যহন শাদির কথাবার্তা উইঠল, আমি কইয়্যা দিল্যাম—খুরশিদ আলম ছাড়া কাউরে আমি শাদি কইরব না। কম কথা—আট-দশ বছর ধইর‍্যা আমাগ ছদ্মনামে পত্রালাপ। বোঝো, শুধু হস্তলিপি দেইখ্যা প্রেম। সে-শাদি ভাইঙ্গ্যা গেল কিন্তু আমার তো দুই-দুইডা বেটি হইল ঐ বিবি থিক্যা! তোমারে এই কথাডা কইল্যাম শুধু এইডা জানাইবার লগে যে ইংরাজি না-শিখাটা কোনো মুসলিম ন্যাশন্যালিজমের প্রোগ্রাম না। কত মুসলমান বাড়ির নাম কইরতে কও। ধরো, হুগলির আলি ফ্যামিলি—আরে অক্সফোর্ড-কেমব্রিজের নীচে কোনো কথা নাই, পাঁচনৌয়ের মির্জা ফ্যামিলি—তাঁরে তো কয় রামমোহনের আগে বিলাত ফেরৎ। টাঙ্গাইলের চাঁদ মিয়া, রেজা আলি ডাক্তার, আহমদ ফজলুর রহমান। কত কব? দুইডা ঘটনা গুল্যাইয়া 'মুসলিম ন্যাশন্যালিজম' নামে একখান নতুন জিনিশ খাড়া কইরছে য্যান, অশিক্ষিত থাকাটার মধ্যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ছিল। কই? হিন্দু ছোটলোকদের বেলায় তো ত্যামন কথা কওয়া হয় না। তোমাগ জাইতে কি খুব পড়াশুনার চল হইছে? হবারই পারে না। তোমাগ নাগাল মুসলমান—শূদ্ররাও তো পড়াশুনা শিখে নাই।'

'তাইলে, ধরেন ১৯০৭-এর সময় এইসব থিয়েটারে মুসলমানরা আপত্তি করে নাই? এহনো তো করে না?'

'ব্যাপারডা এডডু কঠিন কইর‍্যা ভাবব্যার লাগব, মণ্ডল। আপত্তিডা যে হয় নাই সেডা থিয়েটার বইল্যা, ডি-এল রায় বইল্যা, শিক্ষার প্রভাবেও—শেক্সপিয়ার যে মার্চেন্ট অব ভেনিসে সাইলক লিখছেন বা 'ওথেলো'রে যে কালা মুর বানাইছেন, তার কারণে কি তাঁরে ইহুদি বা কালা বিদ্বেষী বলা চলে? এই সবে আপত্তি করতে হইলে একডু বাইগটারি লাগে। তোমার ঢাকার নবাব আর তার ভাইয়ের বেটা বাংলা ভাষাডাই কয় না আর বাইগট হব? তোমার নো-কনফিডেন্সের বক্তৃতাডা আমার খুব ভালো লাগছিল। তুমি কইল্যা-না, যেহানে রায়টের নামও শুনে নাই, সেইহানে রিলিফ নিয়্যা গিছে। ক্যা? না রায়টের কথাডা শুনাইতে। হিন্দু কথাডা আলাদা কইর‍্যা শুনাইতে। তুমি য্যান কী কইল্যা? মোটিভেশন্যাল কমিউন্যাল ক্যাম্পেন বাই অ্যান ইয়েট আননোন কনসেপ্ট অব রায়ট।'

'আপনার মনে আছে?'

'মনে-রাখার মত কথা হইলে মনে থাকব না? তোমারে কইয়্যা দিচ্ছি—বেঙ্গলের এই লিগওয়ালারা এই রাজনীতি ভাইবব্যারও পারব না। আবার বাইগট হওয়ারও সাহস নাই। তয়? রায়ট বাধাইবে হিন্দুরা আর দোষে পড়ব মুসলমানরা। তুমি-যে সেদিন কয়্যা দিল্যা—নমশূদ্দুররা আর হিন্দু হইয়া মুসলমানগ লগে রায়ট কইরব না, সে-কথায় কংগ্রেস তো নাকে কাঠি দিয়্যাও হাঁচে নাই। হিন্দুসভা কী কয়?'

'হিন্দুসভা তো হুইনল্যাম নদীয়ায় একডা মিটিঙে আর ফুলবাড়ি হাটে একডা মিটিঙে কলকাতার লিডাররা যায়্যা কইছে—তপশিলভাইদের হিন্দু সমাজ থিক্যা আলাদা কইরব্যার ষড়যন্ত্র হইছে। আপনারা এই চক্রান্ত সম্বন্ধে সাবধান থাকবেন।'

ওঁরা হকশাহেবের নিউ পার্ক স্ট্রিটের বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিলেন। হকশাহেব যোগেনকে নিয়ে একতলার বসার-ঘরেই বসলেন, 'আশা করি, এত রাত্তিরে আমারে জরুরি কথা জানাইবার কর্তব্যবোধে কেউ আইসব না?' উনি উঁচু গলায় কাউকে ডাকলেন। সে দরজায় এলে বললেন, 'কাউরে আইসতে দিবি না, বাইরের প্যাসেজ দিয়্যা একতলা-দোতলাও করব্যার দিবি না।' সে চলে গেলে হকশাহেব যোগেনকে বলেন, 'বসো, মণ্ডল, গাও অ্যালাইয়্যা বসো।'

'আমি তো বইসছি। কিন্তু এই রাত্তিরে যদি কোনো অতিথ্ আপনার দর্শন মানসে আসে, ঐ দারোয়ান কি তারে ঠেকাইতে পারব? এডা তো সবাই জানে, হকশাহেবের কাছে আর্জি জানানোর দিনরাত নাই—'

'এইডা যে কে রটাইল? কথাডায় এডডু যে ঠেস দেয়ার ভাব আছে সেটাতে য্যান ব্যারিস্টারি হিন্দু গন্ধ। আর মুসলমানদের মইধ্যে এক পারে ইস্পাহানি। ও এডডু রগড় কইর‍্যা কথা কয় না?'

'আমার তো আর-একজনের কথা মনে আসে। সে-ই রটাইছে।'

'কেডা? তুমি ক্যামনে জাইনল্যা?'

'এ কে ফজলুল হক।'

হকশাহেব একটু থমকে গিয়ে হো হো হেসে উঠেই তাড়াতাড়ি মুখে হাতচাপা দেন। হাসিটা বন্ধ হওয়ার পর হাতটা নামিয়ে যোগেনকে বলেন, 'দুষ্ট। নড়াইলের ফাজিল হওয়ার চাও?'

দ্যাট ইট অয়্যার ডান কুইকলি

১০৫

হাসাহাসির পর হকশাহেবের মুখ দেখে যোগেন বোঝে, উনি যা বলতে চান, এবার সেটা বলবেন। যোগেনও তার মুখের পেশিতে একটু বদল ঘটিয়ে বোঝায় সে-ও শুনতে তৈরি।

হকশাহেব খুব নিম্নস্বরে বলেন, 'মণ্ডল, তুমি কি মন্ত্রী হইব্যার রাজি হইব্যা?' জবাবটা যোগেনের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, 'কেডা হইব না? রাজি? মন্ত্রী হইব্যার?' জবাবটা বেরিয়ে যাওয়ার পর আসল জবাবটা যোগেনের মাথায় আসে—সিদ্দিকি শাহেবের সঙ্গে আপনার আলাপনের ভিড়ের পিছনে আমারে খাড়ানো দেইখ্যাই কি আপনার সব একলপ্তে মনে আইল—মেবারপতন, বড়বাবু, মন্ত্রিসভা? কিন্তু মাথার জবাবটা

সে মুখে আনে না।

ততক্ষণে হকশাহেব ধমকে উঠেছেন, 'মণ্ডল, বরি-শ্যাইল্যা পান্টাজিগানো ছাড়ো। এডা কাজকামের কথা।

'মানে, আপনে ইয়োরোপিয়ান ব্লকের আশ্রিত প্রধানমন্ত্রিত্বের খেলাপ থিক্যা বাঁইচবার লগে কিছু সমর্থন চান, আমাগ? সিডিউলগ?'

'তুমি তো দেহি বরিশাইল্যা অব অল ভ্যারাইটিজ ইন ওয়ান। এহন কথা কও চন্দ্রদ্বীপের ন্যায়তীর্থগ লাগান। কথাডা এতই সরল যে বুইঝব্যার লগে কোনো বিরলপ্রতিভার দরকার পড়ে না। তোমারে তো অব্‌তার হইব্যার ডাকি নাই। মিনিস্টার হইব্যার ডাইকছি। হইব্যা মিনিস্টার, লগে কুনো এম. এল. এ আইনব্যা না—এডা কি কোনো সওদা হয়?'

'আমারে বাইছলেন ক্যা? আরো তো শিডিউল আছে।'

'আছে। কিন্তু তাগ সবার লগেই পার্টির একডা ল্যাজ আছে অথবা তারা নিজেরাই এত বড় হইয়া গিছে যে পার্টিটাও তাগ ল্যাজ হইয়া গিছে। তা দিয়া তো আমার চলে না। তুমি ছাড়া আর কোনও শিডিউল আছে ফ্রি? সুভাষবাবুর সঙ্গেও আছ, বঙ্কিম মুখার্জির সঙ্গেও আছ, সারওয়ার্দির লগে আছ। আবার, আবুল হাসেমের সঙ্গেও, আছ, কিন্তু কেও কইব্যার পারব না যে মণ্ডল আমার লোক।'

'তার লগে আমার পাছায় পোস্টাফিসের সিল মাইরতে চান যে মণ্ডল হকশাহেবের সম্পত্তি?'

এই সোজা কথাটার মধ্যে একটা দীর্ঘ অট্টহাস্য নিহিত ছিল। কিন্তু কেউ হাসে না।

'তোমার আক্কেলদাঁত উইঠছে? নাকি, সারা জীবন, ধইর‍্যাই উইঠতেছে? ওঠার আর শ্যাষ নাই কুনো দিন? তুমি যে একডা মৌলিক কথা শুনাইল্যা সেদিন অ্যাসেম্বলিতে কাট মোশনে। কইল্যা-না, নমশুদ্দুররা হিন্দু না, হিন্দুগ লাইঠ্যাল হইয়া নমশূদ্ররা আর মুসলমানগ মাইরব না। কইল্যা-না।

'হ্যাঁ। কইছি। আরো কব। এডাই তো কহার।'

'তোমার কথা শুইন্যা আমারও তাই মনে হইছে। এইডাই নতুন কথা, এইডাই কওয়ার কথা, দাঙ্গা বন্ধ করার ন্যায্য কথা। নমশূদ্রগ না-পাইলে হিন্দুরা দাঙ্গা কইরব্যার সাহস পাবে না। নাইলে তো, অ্যান্টি-জমিদারি সব গোলমালই তো দাঙ্গা হইয়া যায়।'

'তাইলে সিডিউলগ থিক্যা তিনচাইর জন মন্ত্রী নেন।'

'মণ্ডল। একে বাপ মরছে, তার উপর বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধের ফর্দ ধরাইয়ো না। রাতের কথা ছোট হয়। তোমার একার মন্ত্রী হওয়ার বিরুদ্ধে কারণটা কি জানা যায়?'

'হকশাহেব! একা একা মন্ত্রী হইয়্যা গেলে আমিও তো মুকুন্দ মল্লিক হয়্যা যাব। শিডিউল-স্বার্থডা আর কেউ আমার থিক্যা বুইঝতে চাইব না। সেডাই আমার কাজ। যোগেন মণ্ডল হইয়্যা মন্ত্রী চাই না। শিডিউল হইয়্যা আরো শিডিউল মন্ত্রীর একজন হইয়্যা মন্ত্রী চাই।'

'হ্যাঁ—আ। তা তো তুমি কইতেই পারো। তোমার কাম তো একডা পার্টি বানান্। কাগ পার্টি সেইডা তো ঠিকই আছে। আর, আমার কাম তো পার্টি ভাঙ্গা।'

'আপনে তো যাগ বিরুদ্ধে প্রজা পার্টি বানাইলেন, ইলেকশন জিতলেন, জিইত্যা আইস্যা সেই শত্রু পার্টি মুসলিম লিগে জয়েন দিলেন। আপনার ফলোয়ার যারা লিগরে চায় না, তারা করবটা কী?'

'যদি আমার ফলোয়ার হয় তাইলে আমার লগেই থাইকব। আমি তো আর ফলোয়ার না। আমি তো লিডার। আকাশ-লাথ্থ্যানো কথা কইয়া এক দলের মধ্যে দশ দল বানা—য়। নৌসের

আলি, সামসুদ্দিন। ফজলুল হক বিশ্বাসঘাতকতা কইরছে। আরে, আমারে ঢাকার নবাবের জ্ঞাতিগুষ্টি, জমিদার, ভাইগন্যা, ভাইয়ের ব্যাটা নিয়্যা, ভাইয়ের ব্যাটার বেগমরো নিয়্যা সরকার চালাইব্যার লাগে আর কৃষকের কাছে বন্ধক রাখা জবানের হেফাজতের জইন্য তো টাইম দিব্যার লাগে। হয়্যা তো গিছিল—শাহেবরা বাঁচাইল বইল্যা সরকার টিকঁল।'

'আপনারে বাঁচাইব কেডা? আমারে মন্ত্রী হইতে কন? যত উলটা-পালটা কাম। তমিজউদ্দিন শাহেব আর সামসুদ্দিনরে মন্ত্রী করেন—দলও থাইকব, আপনার আস্থা ভোটও থাকব।'

যোগেন বুঝে ফেলে, হকশাহেব হঠাৎ গুটিয়ে নিলেন নিজেকে। চলে যাওয়ার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ওঠার মুদ্রা মণ্ডলের, ঠেকে গেল হকশাহেবের প্রায়-স্বগতোক্তিতে। 'চাষির কাছে জবান? আইন দিলেও যে-সরকার নিজে খাড়াইতে পারে না, শাহেবগর ভোটে সরকার জিতলে যাগ মাথা হেঁট হয় না, মন্ত্রিসভার মিটিঙে যারা লাটশাহেবরে দিয়্যা ক্যাবিনেটে চেয়ার করায়, তাগ কোনো দ্যাশ আছে না আল্লা আছে? তাগ আছে শুধু শাহেব। আমারে এডড়ু গুছাইব্যার লাইগব। তার পরে মুসলিম লিগের এই গরাদটা ভাঙব। এক্কেরে জরাসন্ধ বধ কইর‍্যা ছাড়ব। আরে, আমি হইল্যাম ইনডিয়ার সবার থিক্যা বেশি পপুলেশনের মুসলিম লিডার! আর জিন্না হইব কায়েদ-ই-আজম? এমন সব আইন বানাব যে মুসলমানরা খোদার দোয়া চাইব্যানে দুনিয়ার সব সেরা মুসলমান ফজলুল হকের আয়ু বাড়াইতে।'

আরো কিছু রাতে পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে একটা উটকো বাসের দোতলার ঝড়ো বাতাসের শিহরে যোগেনের মনে হল—হকশাহেব কি বড়বাবুর মত করে সলিলকি দিচ্ছিলেন, 'ইফ ইট অয়্যার ডান, হোয়েন' টিস ডান, দেন ইট ওয়্যার ওয়েল্ ইট অয়্যার ডান কুইকলি'।

সুভাষ বোসের কাজে যোগেন

১০৬

১৯৩৭-এর মন্ত্রিসভা তৈরি হওয়ার পর থেকে তপশিলিদের রাজনীতিটা ক্রমেই টলমলে হতে লাগল, বাংলায়। ১৯৩২-এর গোলটেবিলে বি. আর. আম্বেদকারের নাম প্রথম শোনা গিয়েছিল। তার আগে গান্ধীজি অন্তত শোনেননি। গোলটেবিলে আম্বেদকার হিন্দু মনুবাদী ধর্মকে তুলোধোনা করেন—একেবারে ঢাকিসহ বিসর্জন। হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে মুসলিমদের কথায় এত মর্মদাহ থাকে না—বরং নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও হিন্দুদের অত্যাচার এই সব কথাই বেশি থাকে। শুনতে শুনতেই বোঝা যায়, অভিযোগগুলো সবটা সমান সত্য নয়, আর যেগুলো আংশিক সত্য, সেগুলোও অনেক সময়ই কংগ্রেস-রাজনীতির অন্তর্গত নয়। কিন্তু দুটো-একটা এমনও ঘটনার উল্লেখ থাকে, যেগুলো খবরের কাগজ মারফৎ ও জনসভার বক্তৃতা মারফৎ বেশ কিছুটা প্রচারিত—বিভিন্ন রকম জোর দিয়ে ও নীরবতাসহ। কিন্তু আম্বেদকারের গোলটেবিলের ভাষণে যেন কবরের ভিতর থেকে মধ্যরাত্রির হাওয়া উঠে এসে, জ্যান্ত মানুষদের হাড়ের ভিতরে মজ্জা পর্যন্ত বিঁধছিল। গান্ধীজি একবার, দ্বিতীয় দিনের সকালের বৈঠকে, তাঁর পার্শ্ববর্তী কোনো সহকর্মীকে জিজ্ঞাসাও করলেন, 'কে লোকটা?' গান্ধীজির ধারণা ছিল বর্ণহিন্দু কেউ তপশিলিদের নেতা সাজছে। তাঁর জিজ্ঞাসার জবাবে তখন এটুকুই মাত্র শুনেছিলেন, 'দলিত্। মহারাষ্ট্রের।' সেদিনই অবিশ্যি আম্বেদকারের জীবনীটা তাঁর জানা হয়ে যায়। আর, আম্বেদকারের বক্তব্য নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়ার ভাষাও বদলে যায়।

তপশিলিদের মধ্যে যারা শিক্ষিত ও সম্পন্ন, তাঁদের ব্রিটিশ সরকারও খাতির দিতেন। নমশূদ্রদের মধ্যে মল্লিকভাইরা, রাজবংশীদের মধ্যে প্রসন্নদেব রায়কত ও উপেন্দ্রনাথ বর্মণ। ১৯৩৭-এর ভোটের পর তপশিলদের এই খাতির ক্ষিদে একটু বাড়ল ও ছড়াল। তাঁদের অনেকেই কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকলেন। যদিও তখনো তাঁদের প্রাথমিক আনুগত্য নিজেদের জাত-সমাজের দিকেই।

যোগেন এ-বিষয়ে একটু স্পর্শকাতর দিল।

তার সঙ্গে সব দলের সব নেতারই ছিল বিশ্বাস ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক। কিন্তু তার কাছে প্রধানতম বিষয় ছিল নমশূদ্ররা।

যতই সময় যাচ্ছিল ও যোগেন কলকাতার নানা পার্টির নানা নেতার সঙ্গে নানা সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছিল, ততই বেশি করে সে ভাবছিল যে তপশিলিদের নিজস্ব পার্টি ছাড়া তাদের রাজনৈতিক ক্ষম[illegible] পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

রাজনৈতিক ক্ষমতা বলতে যোগেনের কাছে ভারতের স্বাধীনতা খুব একটা প্রত্যক্ষ বিষয় হয়ে ওঠেনি। বা, এমন কী যে স্বাধীনতার কথা সে শুনছে এখানে, সে স্বাধীনতায় তপশিলি জনগোষ্ঠীর বিশেষ উপকার কী হবে—তাও তার কাছে পরিষ্কার ছিল না। সামাজিক যে অসম্মানের মধ্যে তপশিলিদের জীবনযাপন করতে হয়, তার জন্য সবচেয়ে বেশি দরকার শিক্ষিত হয়ে ওঠা। যোগেন তপশিলি এলাকায় নতুন স্কুল তৈরির জন্য, কলকাতায় তাদের থাকার ছাত্রাবাস তৈরির জন্য, কোনো কোনো বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার বৃত্তির ব্যবস্থার জন্য, তপশিলি মেয়েদের অন্তত নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করতেই বেশি ব্যস্ত থাকে। আর এ-বিষয়ে যার কাছে কোনো সাহায্য চেয়েছে সরকারের বা সামাজিক-রাজনৈতিক নেতাদের, কেউ-ই কখনো তাকে ফেরায়নি বলে তার একটা সহজ সাফল্যবোধও এসে গিয়েছিল। সব ধর্মের সব পার্টির সবাই এই ধরণের যে সাহায্য দেয়,—তার কোনো কারণ সে খুঁজতে যায় না। বোধহয় এড়িয়েই চলে।

শরৎবোসের জন্যই বোসবাড়ির সঙ্গে তার একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে ও সেই সুবাদে সুভাষের সঙ্গে তার বন্ধুত্বের ও নির্ভরতার একটা নিবিড়তা তৈরি হয়েছে। কিছু কিছু ব্যাপারে সুভাষ যোগেনের ওপর ভরসা যে-রকম প্রকাশ করে ফেলেছে, তাতে যোগেন একটু অবাকই হয়।

সেটা অনেকগুণ বেড়ে একটা আকারই নিয়ে ফেলল—সুভাষ যখন ১৯৩৯-এ দ্বিতীয় বারের জন্য কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি হতে চাইলেন ও তাঁকে কিছুতেই হতে না-দেয়ার জন্য কংগ্রেসের প্রধান-প্রধান নেতারা, গান্ধীজিসহ, উঠে পড়ে লেগেছেন, এটা বোঝা গেল। সুভাষ যোগেনকে বললেন, 'কংগ্রেসের যারা জিলা-মহকুমার নেতা, বা বড়-বড় নেতাও গত বিশ বছর ধরে গান্ধীজির এই সব অহিংসা, আইন-অমান্য, মাদকবর্জন, চরকাকাটা আর রামধুন গানে ক্লান্ত ও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সারাটা দেশ ইংরেজের সঙ্গে একটা সরাসরি লড়াইয়ের জন্য তৈরি। তারা শুধু অপেক্ষা করছে একজন নেতার। ওয়ার্কিং কমিটির নেতারা সেটা কিছুতেই হতে দেবে না। তাই আমাকে রাষ্ট্রপতি হিশেবে কিছুতেই মানবে না। কারণ, গান্ধীজি এতটা ব্যক্তিগত করে কংগ্রেসের একজন নেতার বিরুদ্ধে কখনো কোনো পজিশন নিয়েছেন বলে জানি না। এটা তাঁর অহিংসা-টহিংসার চাইতে আরো গভীরের ব্যাপার। গান্ধীজির একটা হিশেব থাকে। যে-কারণেই হোক, আমি ওঁর সেই হিশেবের সঙ্গে মিলছি না। তা হলে আমার সামনে দুটো পথ খোলা থাকে। গান্ধীজির ইচ্ছে মেনে সরে দাঁড়ানো। তাতে আমার নিজের ভাল। জওহরলাল এটাই চায়। তাতে হয়তো দেশেরও ভাল। কারণ, কংগ্রেসকে অখণ্ড রাখাটা দেশের লাভ। আর একটা পথ হল গান্ধীজিকে ও হাইকম্যান্ডকে অমান্য করে রাষ্ট্রপতির পদে প্রার্থী হওয়া। প্রতিনিধিদের ভোট চাওয়া। হারলে হারলাম, জিতলে জিতলাম। এতে আমার নিজের খারাপ। হারলে ওরা আর পাত্তাই দেবে না। বাংলাতেও কোণঠাসা হব। জিতলে তো এই প্রথম প্রমাণিত হবে, গান্ধীজিই শুধু কংগ্রেস নন, গান্ধীজির চেলারাই শুধু কংগ্রেস নন, দেশে গান্ধীবাদের বিপরীত যে-শক্তিগুলি ছড়িয়ে আছে, তারা কংগ্রেসে একটা নতুন ক্ষমতা হয়ে উঠবে। ব্রিটিশ-বিরোধী রাজনীতি একেবারে বদলে যাবে। আমি তো নিজের শরীরে টের পাচ্ছি, যোগেনবাবু, ভারতের আপামর মানুষ একটা নতুন লড়াই চায়। আমি যদি সেটা আমার শরীরের ভিতরে এমন করে টের পাই, তা হলে কি তা মিথ্যা হতে পারে? সমস্ত ভারত আজ সমবেতা যুযুৎসবঃ। কিন্তু তাদের কিছুতেই এমন নেতা দেয়া হবে না যে নেতা যুদ্ধ জেতাতে পারে। রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হয়ে যদি আমি হারি, তাতে আমার নিজের ক্ষতি, যাঁরা আমাকে চান তাঁদের ক্ষতি। তখন কী করা যায়, সেটা

তখন ভাবতে হবে। কিন্তু কত বড় একটা সম্ভাবনা খুলে যাবে—বলুন। গান্ধীজিই কংগ্রেস নন। গান্ধীজিকেও অস্বীকার করা যায়। আমি হয়তো হারব। কিন্তু পরের বছর আর-একজনকে নিয়ে এ-লড়াই লড়া যাবে—নরেন্দ্র দেও, জয়প্রকাশ, অচ্যুত পট্টবর্ধন, পান্ধে। এ যুদ্ধ থেকে আমার পরিত্রাণ নেই। আপনার সাহায্য চাই—প্রতিদিন, প্রতিটি বিষয়ে। আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি—যুদ্ধটা হয়তো লম্বা, কিন্তু জয় নিশ্চিত। হয়তো আমার মৃত্যুর পর সে-জয় আসবে। কিন্তু এমন সেনাপতি আমি নই যে সেই মরণোত্তর জয়ধ্বনি না শুনে আমি যুদ্ধে ঝাঁপ দেব। শুনতে তো পাচ্ছি। আপনারা আমার পাশে থাকুন।'

এমন কথার বা ডাকের তো কোনো জবাব হয় না। সুভাষ যে কত বড় নেতা ও কত দূর পর্যন্ত দেখতে পারে—সে-বিষয়ে যোগেনের একটা গোপন ধারণা ছিল। শূদ্র হয়ে জন্মেছে সে, তার বাঁচার একমাত্র অবলম্বন তো এই সব গোপন ধারণাগুলি। সুভাষকে নিয়ে যোগেনের গোপন ধারণা যা তৈরি হয়েছিল, তাতে তার পক্ষে সুভাষকে এমন কী এ-কথা বলারও সুযোগ নেই যে আমি তো কংগ্রেস নই, আমি তো কংগ্রেসবিরোধী। এমন কী, এটুকুও জানানোর উপায় নেই যে সুভাষের রাজনীতিতে শূদ্রদের নিয়ে কোনো চিন্তাভাবনা নেই। যোগেন যে জেনে গেছে—এই রুগ্ন, অত্যাচারিত, দুর্বলদেহ মানুষটির ভিতরের আগুনটাই একে পোড়ায়। সে-আগুন থেকে মানুষটি নিজেই নিজেকে বাঁচাতে পারে না, যোগেন তাকে বাঁচাবে কী করে? যোগেন তার কী কাজেই বা আসবে? যোগেন একটা হেঁচকা টানে নিজেকে চোখ ভিজে ওঠার কিনারা থেকে সরিয়ে আনে—'এত বড় যুদ্ধের সেনাপতির তো আহারবৃদ্ধি দরকার, সুনিদ্রা দরকার।' যোগেনের চেষ্টা সত্ত্বেও কথাটায় যোগেনের মজা খেলল না।

সারা ভারতে কিন্তু ছবি এইটাই তৈরি হচ্ছিল যে কংগ্রেস সুভাষকে একঘরে করে দিল।

আরো একটা ছবি এখন তৈরি করে তোলা যায়, কিন্তু তখন তৈরি করে তোলা হয়নি। কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতিকেই একঘরে করে দিল ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা। ওয়ার্কিং কমিটি কিন্তু তৈরি হয়েছিল কংগ্রেসের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির মনোনয়নে। এখন ভাবা যায়—তা হলে তখন এমন একটা ছবিও তৈরি হতে পারত—সুভাষ রাষ্ট্রপতি হিশেবে থাকবেন কিন্তু তার নিজের ওয়ার্কিং কমিটি বাতিল করে নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গড়ছেন।

সুভাষ যে কংগ্রেসের নেতৃত্বে এতটা বিচ্ছিন্ন ও একা হয়েও রাষ্ট্রপতি পদে দাঁড়িয়েই থাকলেন—এই ঘটনাটি একজন মানুষের চারিত্রে প্রতিভা ও প্রতিপালনের স্তম্ভগুলির ভারবহনক্ষমতা ও সেই স্তম্ভগুলির চলমানতার মাপক হতে পারে।

কংগ্রেস এর আগে ও পরে বহুবার ভেঙেছে। কিন্তু কখনোই এমন হয়নি, এমন হওয়া কংগ্রেসের সংবিধানে সম্ভবই নয় যে বর্তমান রাষ্ট্রপতিকে সম্পূর্ণ, স ম পূ র্ণ, একা করতে পুরো ওয়ার্কিং কমিটির বাকি সকলে একজোট। কংগ্রেস অধিবেশনের সমস্ত প্রতিনিধিরা রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করেন। ওয়ার্কিং কমিটি নির্বাচিত হন রাষ্ট্রপতির মনোনয়নে।

সুতরাং যুদ্ধটা ছিল কংগ্রেসের মালিকানা নিয়ে। কংগ্রেসের মালিক কি কংগ্রেসের সদস্য কর্মী ও সমর্থকরা? না কী, কংগ্রেস গান্ধী শরিকদের সম্পত্তি?

এখান থেকে যুদ্ধের আরো একটা সম্প্রসারণ কল্পনা করা যায়। কংগ্রেস কি শুধুই গান্ধী-অনুশাসিত? নাকি ভারতীয় জনতা-আন্দোলিত মঞ্চ?

বম্বে, গুজরাট, কর্ণাটক, পাঞ্জাব, আসাম, ত্রিবাঙ্কুর, ওড়িশায় তাঁর পরিচিত, বন্ধু, অনুগামীদের কাছে সুভাষ চিঠি লিখে-লিখে সব জানাচ্ছিলেন। সেই কাজের জন্যই যোগেনকে কখনো দু-বেলাই আসতে হচ্ছিল। যোগেনই বুদ্ধি দিল, 'প্রত্যেককে একই কথা জানাইয়্যা চিঠি দিব্যার

লাইগলে তো ছাপায়্যা নিলেই হয়।'

সুভাষ বললেন, 'খবরের কাগজের মত?'

যোগেন বলে, 'ঐ যা কন! শুধু জানাইয়্যা আপনার পক্ষ টাইন্যা।'

সুভাষ একটু চুপ থেকে ম্লান হেসে বললেন, 'কিন্তু এঁরা তো সকলেই নিকটজন। আমার অবস্থা কাগজের ভাষায় জানতে ওঁদের কষ্ট হবে না?'

'তাইলে একডা কাম কইরলে হয়। একডা ছোট আকারে আপনাগ সমস্যার কথা ছাপা হোক আর আপনে যাদের চিঠি দিবেন, যারে যেমন, সেইডা আলাদা দ্যান, প্রথম লাইনেই লিখ্যা দিলেন, সি দি অ্যাটাচমেন্ট অ্যান্ড আফটার রিডিং কাম ব্যাক টু দিস লেটার।'

সুভাষের ম্লান হাসিতে একটু কষ্ট মিশে থাকে। কিন্তু কোনো কারণে উদ্ভাসন ঘটলে ঐ হাসিটাই যেন বদলে যায় কৈশোরকে।

'আচ্ছা যোগেনবাবু, এই সামান্য বুদ্ধিটা আমার মাথায় খেলল না কেন?'

'আপনে অসামান্য বইল্যা। মগজের সাইজ দিয়্যা তো বুদ্ধির ওজন—'

যোগেন এই কাজটাই প্রধানত করছে এখন। সুভাষের কাছ থেকে ডিকটেশন নিচ্ছে, টাইপ করছে, পোস্টাফিসে গিয়ে ফেলে আসছে, আবার টাইপ, আবার ডিকটেশন। অ্যাসেম্বলি লাইব্রেরি থেকে নানা ক্লিপিং, বিলেতি ম্যাগাজিনের কোনো আর্টিকল, এমন কী গভর্নর জেনারেলদের এক্সকিউটিভ কাউন্সেলারদের পুরনো মিটিংগুলোর মিনিটসও টুকে আনতে হত যোগেনকে। ঐ যে বছর-সাতেকের 'আসাম ও পূর্ববঙ্গ প্রদেশ', তার কিছু মিনিটস ও মোমো।

যোগেনের একটা মহাগুণ তো তার দরকারি খবর সাজিয়ে ফেলা ও সেই সাজানো থেকে নতুন দরকার খুঁচিয়ে তোলা। এটা তার পেশার পক্ষে খুব দরকারি। কিন্তু এটা করতে গেলে, যেখান থেকে তথ্যটা আনতে হবে, সেটা হাতের কাছে থাকা দরকার। শরৎ বোসই একদিন শেখালেন, একেবারে সিনিয়ারের মত শেখালেন—'যোগেনবাবু, টেক ইট প্রফেশন্যালি। ধরুন, এমন তো নয় যে একটা পার্টিকুলার ডকুমেন্টই দরকার, বরং বেশির ভাগই একটা পার্টিকুলার বিষয় দরকার। আপনি প্রথমে আমার চেম্বারের ছেলেটিকে রিকিউজিশন শ্লিপ দিয়ে একদিন পর টেবিলে যান। ডু দি সেম উইথ বার লাইব্রেরি অ্যান্ড অ্যাসেম্বলি লাইব্রেরি। কিন্তু তার আগে আপনার দরকারটা দাগিয়ে নিন। দরকারের চাইতে খবর যদি কম পান—সেটা পূরণ করে নিতে পারবেন। বেশির ভাগ সময় বাজে খবরের পাঁজায় চাপা পড়তে হয়।'

সুভাষবাবুর সমর্থক ও অনুরাগীদের খোঁজখবর নিতে, তাদের কাছে চিঠি পাঠাতে, সুভাষবাবুর কাছ থেকে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের পাঠানো চিঠির ডিকটেশন নিতে-নিতে যোগেন বুঝতে পারে, সুভাষবাবুর সঙ্গে এদের সম্পর্ক প্রধানত ব্যক্তিগত। হয়তো কারো সঙ্গে বার্লিনে ফ্রিডম লিগ করেছিলেন। অনেকেই তাঁর জেলসঙ্গী, তাদের প্রায় সবাই-ই সুভাষকে জেলের ভিতরে কোনো-না-কোনো অসুখে সেবা করেছে বা হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিয়েছে বা রান্না করে খাইয়েছে। সুভাষবাবু যে কারো জন্য কিছু করেছেন তার বিন্দুমাত্র উল্লেখ নেই। এঁরা সকলেই রাজনীতির ভিতেরই এখনো আছেন, কংগ্রেসের সম্মিলনের প্রতিনিধি। যোগেনের যেন মনে হল, এঁরা অনেকেই সুভাষের চাইতে বয়সে একটু-আধটু বড়। এঁদের অনেকের নিজস্ব সব রাজনীতি ছিল—কেউ হয়তো গারো পাহাড়ের হাজংদের নিয়ে টঙ্ক আন্দোলন করেছেন। কেউ হয়তো মালাবারের জেলেদের নিয়ে ট্যাক্স বিরোধী মোর্চা করেছেন। একজন ছিলেন কোলার সোনার খণির অ্যাসিস্ট্যান্ট ইনজিনিয়ার। এঁরা তো সাজা খাটছেন। তাঁদের ঐ আন্দোলন ইত্যাদি মানেই পুলিশ তাদের কংগ্রেস-টেররিস্ট বলত। কিন্তু যোগেন অনুমান করতে পারে—এঁদের সঙ্গে

গান্ধীজির কোথাও একটা বিচ্ছেদ ছিল, বা, এঁরা কোনোদিনই গান্ধী রাজনীতি করতেন না। বরং কেউ কেউ গান্ধীজির আইন অমান্য-টমান্য পছন্দ করতেন না। তাও আইন-অমান্য করে জেল খেটেছেন। গান্ধীর সঙ্গে মিল-অমিল কোনো বিষয় ছিল না তখন। রাজনীতি করা মানেই কংগ্রেস করা। কংগ্রেস করা মানেই গান্ধী করা। উত্তর প্রদেশের দু-তিনজন নেতা ছিলেন স্বরাজ্য দলে—দেশবন্ধু-মতিলালের সময়। সিন্ধু প্রদেশের এক নেতাকে সুভাষ তাঁর চিঠিতে লিখলেন, তুমি তো ওখানকার আইন সভায় একমাত্র কংগ্রেসি-মুসলমান, কংগ্রেসের রাজনীতিতে তোমার কথার গুরুত্ব থাকা দরকার। সুভাষ এঁকে আরো লিখলেন, কংগ্রেসি মুসলমানদের নিয়ে বিপদ হচ্ছে তাঁরা নিজেদের মুসলমান পরিচয়টাকে প্রকাশ্যে আনেন না। ফলে নিজের সর্বজাতীয় চরিত্রপ্রমাণের জন্য কংগ্রেস-হাইকম্যান্ডকে কিছু 'হোলি কাউ' রাখতে হয়েছে। অথচ, মুসলমানদের দাবিদাওয়া নিয়ে কংগ্রেস কোনো কথাই শুনতে চায় না।

যোগেনের তো রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস জানা নেই। সুভাষের সচিবতার সুযোগে যোগেন প্রথম বুঝতে পারে—গান্ধী বিরোধী একটা ধারা বহুকাল থেকেই কংগ্রেসের এক-একটি অংশে বেশ ভালই আছে। সুভাষের আন্দাজ ঠিক—তারা সুভাষকে ঘিরে দাঁড়াতে চাইছে, যেহেতু সুভাষ তার রাজনৈতিক অধিকার ব্যবহারের সাহস দেখিয়েছে।

যোগেন বুঝতে পারে—কিছু-কিছু সংগঠনও আছে যারা সুভাষের নেতৃত্ব মানে বা নেতৃত্বের ওপর ভরসা রাখে। কীসের সংগঠন সব-যে বুঝতে পারে যোগেন, তা নয়। খাকসারদের একটা ছুট-অংশ, গারো-জয়ন্তিয়া খ্রিস্টানদের একটা প্রতিষ্ঠান, তাকে তো সুভাষ লিখলেন, স্কটিশচার্চ কলেজে তুমি আমাকে যে-সব বুদ্ধি দিতে তার কিছু-কিছু এখন আমার দরকার, পরে যোগেন সুভাষের কাছেই শুনেছে—নিকোলাস রায় ওঁর চাইতে এক বছরের ওপরে পড়তেন স্কটিশে, প্রগ্রেসিভ যাদব সঙ্ঘ—ইউ-পি।

এ ছাড়া প্রতিদিনই তো কত নেতা আসছেন—যোগেনকে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে হত, সুভাষের সঙ্গে কথা বলাতে হত।

এম এন রায়

১০৭

এরকম একটা কাজে এমন জড়িয়ে পড়া—যোগেনের এই প্রথম—সে তো সবাইকে চিনতও না। সেই প্রথম সে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের রাজনীতির একেবারে ভিতরটার আঁচ পেল। না, আঁচ হয়তো কিছু পেয়েছে আগেও, বলা যায় ভিতরটা সে দেখে ফেলল। সে জড়িয়েও পড়ল, নিজেকে আটকাল না।

এম এন রায় ইংরেজিতে ছাড়া কথা বলেন না। তিনি চটকলের শ্রমিক ইউনিয়ন করেন। তা হলে সেখানে কী ভাষায় বলেন। যোগেনের এই এক স্বভাব—কোনো প্রশ্ন যদি মাথায় আসে, সেটার একটা কোনো মীমাংসা—আর কারো কাছ থেকে জেনে না-নেয়া পর্যন্ত তার শান্তি নেই। সে জব্বাবটা ঠিক কী বেঠিক এ নিয়ে তার কোনো মাথা ব্যথা থাকে না। সে নিজেই জানে না, সে কি প্রশ্নটাই বলতে চায়—প্রশ্নটা করার যোগ্য লোক খোঁজে, উত্তরের যোগ্য লোক সে খোঁজে না। এম এন রায় খুব লম্বা, সব সময়ই একটা পাইপ কামড়ান,

পরনে—শাহেবরা যাকে কমপ্লিট সুট বলে, তাই। জুতো এত চকচকে, যেন রাংতার মত, আলো ফিরিয়ে দিচ্ছে। হাতে একটা স্টিক। সেটলটাতে তে উনি জোর দিচ্ছিলেন, সেটা বেঁকেও যাচ্ছিল আর চৌকাধ থেকে সোফা পর্যন্ত আসতেও খোঁড়াচ্ছিলেন। যোগেন একটু কোণের দিকে একটা চেয়ারে বসে ছিল। এম এন রায় সোফাটায় বসে পড়ে আরামের একটা আওয়াজ করলেন—যোগেন তাড়াতাড়ি নিজের স্যান্ডেলসহ পা-দুটো তার চেয়ারের তলায় গুটিয়ে নিল।

সুভাষ জিগগেস করেন, 'পায়ে আবার কী বাধালেন'।

রায় পাইপটা চেপে রেখে মুখটা কুঁচকে বললেন, 'মে বি এ স্মল স্ট্রেইন। বাট দি সার্জন ইজ নট সিয়োর হোয়াট উড এক্সরে-প্লেট শো?'

'তাহলে তো অনেক কাণ্ডই হয়েছে। হলটা কী করে?' সুভাষ একটু হেসে শুধোন।

'বোস, ইউ প্লিজ ডোন্ট টক অব ইলনেস,' রায় এবার হাতটাও নাড়লেন।'

'আমি আবার কী করলাম?'

'ইউ ডোন্ট নিড টু ডু এনি থিং ইউ অনলি লেট ইভেন্টস হ্যাপেন, জাস্ট লাইক এ ফিলিস্তিন পাতিবুর্জোয়া'।

সুভাষ খুব হেসে উঠলেন। রায় সম্পর্কে কত গল্পই যে চলে। থাকেন দেরাদুনে, যুক্তপ্রদেশ কংগ্রেসের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বার, কাগজ বের করেন লখনৌ থেকে, আর ট্রেড ইউনিয়ন করেন কলকাতায়। ইয়োরোপের সবগুলো ভাষাই নাকি জানেন। সেই কারণেই একটা কোনো ভাষা বলতে-বলতে অন্য কোনো ভাষায় চলে যান। এই যেমন সুভাষবাবুকে বললেন। যোগেন ঠিক বুঝতেই পারল না কথাটা কী। কিন্তু সুভাষবাবু তো প্রাণ খুলে হাসছেন। একজন কেউ বুঝে নিলেই হল। শুনতে কিন্তু খুব ভাল লাগছে—গলাটা খাদে আর খাদে দানা আছে।

'দেখুন, একজনকে গালাগাল দেয়ার প্রধান আরাম কী, আপনার কাছে?'

'অঁহ্, ইউ সে কার্সিং হ্যাজ ভ্যারিড কমফোর্টস? জিজ্ঞাসা করে রায় পাইপটা নামালেন আর একটা ভুরু নাচালেন।

সুভাষ বললেন, 'আমার আরামটা অন্য লোককে শুনিয়ে। যাকে বকছি সে তো জানেই বকছি। অন্য লোক যেন বোঝে তাকে আমি বকছি।'

রায় পাইপহীন মুখে বেশ খোলা হাসলেন একটুও আওয়াজ না করে, 'অঁহ্, দেন ইয়োর কাইন্ড ইজ গ্র্যাটিফিকেশন বাই এক্সপোজিং ইয়োর প্রাইভেট পার্টস টু অ পাবলিক।'

'দেখুন, একেবারে খারাপ কথা বলবেন না। আপনি যে আমাকে ফিলিস্টাইন পেটিবুর্জোয়া বলে গাল পাড়লেন, সেটা সবাই বুঝলে আপনার ভাল লাগত না?'

'অঁহ্, মাই কাইন্ড অব কার্সিং ইজ মাস্টারবেশন। আই ক্যান কার্স অনলি মিসেলফ।'

'আবার!'

'অঁহ্। লাস্ট ইভনিং আই হ্যাড টু হিয়ার দোজ ইমব্রোগলিয়ো ইন জুট মিলস। দের ওজ নাথিং টু নো—দ্যাট ওল্ড মাঙ্কি ট্রিকস অব ওনার্স টু গ্র্যাব দি সারপ্লাস। আই টোল্ড দেম অব দি কামিং ওয়ার। অ্যাজ আই মুভড মাই লেগ টু গো আউট আফটার দি টক ওয়াজ ওভার, সামবডি ফ্রম মাই ব্যাক অ্যান্ড ফ্রম উইদইন দি ক্রাউড অ্যাবাউট দি কনগ্রেস। দ্যাটস অ্যান ইরেসিসটেবল কমবিনেশন ফর মি ইউ নো—জুট, ওয়ার, অ্যান্ড কংগ্রেস র‍্যাডিক্যালস। ইন মাই হেস্ট, আই টার্নড ফরগেটিং মাই অলরেডি ফরোয়ার্ডে ফুট টু দি একজিট। হোয়েন, ফাইন্যালি অল দি ব্যাটলস ওয়্যার উন, দি ক্লাও, শি অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ত অ্যান্ড দি ন্যাশনালিস্টস, আই ফাউন্ড মাই ফুট'স ইনসাবর্ডিনেশন।'

রায়ের হাসিতে এবার একটু আওয়াজ এল অথচ এত লম্বা গল্পে একবারও গলা তুললেন না। যোগেন একেবারে মুগ্ধ।

'এত কষ্ট করে এলেন কেন? আমাকে খবর দিলেই পারতেন—'

'ইফ অনলি আই ডিড নো ইয়োর প্রোগ্রাম। অ্যান্ড ইউ নো আই হ্যাভ টু ট্র্যাভেল স্টেট আফটার স্টেট আফটার টু রিচ ইউ ইন ব্রিটিশ ইনডিয়া। অল দি নিউজপেপার্স ওয়্যার অ্যাগগ উইথ রাজকোট অ্যান্ড জয়পুর অ্যান্ড গান্ধীজি দেয়র দ্যাট আই কুড নট মেক আউট ইফ ইউ হ্যাডবিন এক্সাইড ইন এনি অব দিজ স্টেটস। মোরওভার বোথ অব দেম, দি কম্যান্ডার অ্যান্ড দি জেনারেল, গান্ধীজি অ্যান্ড প্যাটেল ওয়্যার দেয়ার। আই ওয়াজ অ্যাফরেইড হু এলস বাট ইউ কুড বি দি অনলি হার্ডল টু গ্যাদার দেম।'

'মানে, আমার ওপর ভরসা নেই আপনার?'

'হোয়াই শুড আই হ্যাভ দ্যাট ফেইথ অন ইউ। আই মে সে ওপেনলি দ্যাট আই অ্যাম নো ন্যাশনালিস্ট। ক্যান ইউ? ইউ কানট। ইউ আর বন্ডেড টু ইট, দি নেশন স্টেটস'।

'আমি এটা সত্যিই বুঝতে পারি না। আমার রাজনীতির সীমা যদি আমার দেশ হয় তাহলে জাতীয়তাবাদী তো হতেই হবে আমাকে—'

'ইয়েস, ইফ ইউ লাইক টু বিলং টু দি প্যাক।'

'এটা তো পরিস্থিতি। আমি লেফটিস্ট, সোস্যালিস্ট, অ্যান্টি ইমপিরিয়ালিস্ট বলে আমার ন্যাশন্যালিজমকে আলাদা করছি।

'হোয়াই ডু ইউ ব্রিঙ ইন অ্যান এয়ার অব ডেফিনিশন। ডেফিনিশন কিলস ডায়ালেকটিকস। র‍্যাদার, ইউ মে আস্ক ইন সিনসিয়ার ডাউট হোয়াট ডাজ কাম ইন দি ওয়েজ অব কংগ্রেসমেন। লেবেলিং দেমসেলভস অ্যাজ লেফটিস্টস অর রাইটিস্টস অর সেন্টারিস্টস। দ্যাট 'ল স্টপ অ্যাটলিস্ট দি, রিউমার-মিল।'

'আপনি জওহরলালের লেখাটা কি দেখেননি?'

'অঁহ! দ্যাট অন দি লেফট অ্যান্ড রাইট অ্যান্ড ন্যাশন্যাল স্ট্রাগল?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওটাই।'

'ইয়েস, ইউ নো, নেহরু ইজ পোলিটিক্যালি কারেক্ট। বাট হিজ পলিটিকস ইজ বেরেফ্ট অব ফিলজফি। দিজ ওয়ার্ডস লেফট-রাইট হ্যাভ অ্যান অবভিয়াস পার্লামেন্টারি কনোটেশন।'

'শাহেবরাও তো পুরনো শব্দ বদলে দেয় আপনাকে বোঝাতে যে আপনি যা চাইছিলেন তাকে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসই বলে, না জেনে আপনারা হোমরুল বলেন—'

'দিজ থিঙ্গস ডু নট হ্যাপেন নাও। দেয়ার আর সো মেনি ইনডিয়ানস প্র্যাকটিসিং ল ইন দি প্রিভি কাউন্সিল অ্যান্ড ব্রেকিং দি 'ল ইন সিভিল ভিসওবেডিয়েন্স ইন ইনডিয়া, অব কোর্স ডিউরিং দি ভেকেশন। ইন এ ওয়ে, দি ইমপিরিয়ালিস্টস আর দি ব্রাহ্মিনস অব দি ক্যাপিটালিস্ট কাস্ট।'

'লেনিন "হায়েস্ট স্টেজ" বলেছিলেন না?'

'ইট মিনস দি সেম ইফ ইউ সে 'ব্রাহ্মিনস অব'। মোর ওভার হোয়াট ট্র্যানস্লেশন ডিড ইউ রিড।'

'সে তো মনে নেই। এই গেলবারই আমি প্যারি থেকে বেরিয়ে একটা রোড সাইড স্টেশন বুকশপে পেয়ে গেলাম, ট্রেনে তো মলাটের ওপর হাত চাপা দিয়ে চালিয়ে দিলাম। কিন্তু বার্লিনে করি কী?'

'অঁহ! দি জোক ইজ, দিস বুক বাই লেনিন ইজ নট দ্যাট মাচ অব এ ব্যানড বুক ইন ইয়োরোপ। ইট ইজ ইউজেবল বাই এ ক্যাপিট্যালিস্ট স্টেট অ্যাজ অ্যান এক্সকিউজ দ্যাট দে মে বি ক্যাপিট্যালিস্ট বাট নট অব দি ইমপিরিয়ালিস্ট কাইন্ড।' একসঙ্গে হেসে উঠলেন দুজন, হাসির শেষে রায় বললেন, 'ইট ওজ পাবলিশড ইন জ্যানুয়ারি নাইনটিন সিক্সটিন, মোর অ্যাজ এ পপুলার আউটলাইন। বাট ইট কনটেইনড দি মোস্ট অরিজিন্যাল ফিলজফিক্যাল ক্যাটিগরাইজেশন অব ক্যাপিটালিজম বাই লেনিন ওভার মার্ক্স। মার্ক্স নেভার এক্সপ্লেইনড ক্যাপিটালিজম ইন 'স্টেজেস'। সো ফার অ্যাজ আই ক্যান ট্রেস, লেনিন ওয়াজ ডেভেলাপিং দি কনসেপ্ট এভার সিন্স হিজ স্মল আর্টিকল 'দি আইডিয়াজ অব অ্যান অ্যাডভান্সড ক্যাপিটালিস্ট' ইন, জুলাই ১৯১৩, অ্যান্ড এগেইন ইন দি ফর্ম অব এ নোট ইন ১৯১৫, ইম্পিরিয়ালিজম অ্যান্ড সোসিয়ালিজম ইন ইটালি,' অ্যান্ড এগেইন ইন অক্টোবর নেক্সট ইয়ার 'ইমপিরিয়্যালিজম অ্যান্ড সোসিয়ালিজম,' অ্যান্ড দেন দিস বুক ইউ রেফার্ড। ইটস এ রেয়ারেন্ট অব রেয়ার অপরচুনিটি টু অবজার্ভ দি মার্ক্সিস্ট ওয়ে অব ডায়ালেকটিকস ডেভেলাপিং এ কনসেপ্ট।'

'হ্যাঁ—আ। কিন্তু কনসেপ্টের ইতিহাস তো রোজ কোনো কাজে আসে না। সেখানে তো সমাবেশের ক্ষমতাটাই সবচেয়ে বড় ব্যাপার। অর্গানাইজেশন। এ-ব্যাপারটা বোধ হয়, ফ্যাসিস্ট আর নাৎসিদের কাছ থেকে কিছু শিখতে পারি।'

অঁহ নো, উই কান্‌ট। উই ওন্ট, ইভন ইফ উই কুড। ফ্যাসিস্টস অ্যান্ড নাৎসিজ আর নট দি মডেল ফর এ কান্ট্রি লাইক আওয়ার্স, ইনভলবড ইন ন্যাশন্যাল লিবারেশন মুভমেন্ট। বোস, আই মাস্ট সে দ্যাট হিয়ার ইন ইনডিয়া দেয়ার ইজ কলোসাল ইগনোরান্সে আব্যাউট দিজ। অনলি জওহরলাল ইজ অ্যান একসেপশন।'

'কিন্তু সংগঠন, রাজনীতি, বিশ্বাস—এ-সব ব্যাপারে?'

'বোস, ইউ আর বিহেভিং চাইল্ডিস। ইউ ক্যানট রেইজ অ্যান অর্গানাইজেশন ফর পোলিটিক্যাল লিবারেশন অব এ কান্ট্রি লাইক আওয়ার্স ইন এ ফ্যাসিস্ট ওয়ে। ইয়োর রাইটিস্ট ফ্রেন্ডস ইন দ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি মে গিভ ইউ এ স্যাম্পল অব হোয়াট ইট ইজ রিয়্যালি।'

'সে করুক—না যা করবে। আমি ওদের সে সুযোগ দেব না।'

'বাট বি ওভার কেয়ারফুল অ্যাবাউট দেয়ার হিন্দু কমিউন্যাল অর্গানাইজেশন। দে আর নেভার সিন, বাট দে আর দেয়ার অলওয়েজ। ইউ ক্যান সি দেয়ার রেডিনেস ইন দ্য উয়িংস।'

যাদুগোপাল

১০৮

একদিন রাঁচি থেকে এলেন, যাদুগোপাল মুখুজ্যে—বিখ্যাত বিপ্লবী, কতবার যে জেল খেটেছেন। তিনি এখানেই উঠলেন ও এখানেই একরাত থাকলেন। তাঁর দেখাশোনা করার ভার ছিল যোগেনের ওপর। কিন্তু তিনি যোগেনকে খুব পাত্তা দিলেন না। যোগেন ভেবে নিয়েছিল, মণ্ডলের প্রতি মুখুজ্যে বামুনের যা ব্যবহার চলে আসছে, উনি তার বাইরে নন। কিন্তু উনি সময়ও পাচ্ছিলেন না—কত জন যে দেখা করতে এসেছে। আর, তারা প্রত্যেকেই বিপ্লবী—আন্দামান-খাটা বা লাইফার। একজন মাঝবয়েসি লোক এসে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন?' উনি জবাব দিলেন, 'চিনতে পারার কারণ না বললে চিনব কী করে?' তখন জানা গেল, কোথায় একটা বিপ্লবী অ্যাকশনে ওঁর পেটে একটা গুলি বিঁধে পেটেই আটকে ছিল। কে যেন ওঁকে রাঁচি যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল। উনি রাঁচি গিয়ে ডাক্তার যাদুগোপালের কাছে পৌঁছন। যাদুগোপাল তাঁকে এক গোপন ডেরায় নিয়ে যান ও অপারেশন করে গুলি থেকে মুক্তি দিয়ে ফেরার ব্যবস্থা করে দেন। যাদুগোপাল বললেন, 'তোমাকে চিনতে পেরেছি বললে মিথ্যে বলা হবে কিন্তু পেটে গুলি থাকার কথা বলায় মনে পড়েছে। আরো মনে পড়েছে তোমার একটা কথা।' যাদুগোপাল চুপ করে গেলেন। আগন্তুক জিজ্ঞাসা করল, 'কী কথা স্যার?' 'বলেছিলে, অ্যাকশনের আগে সবাই কত সাহস দিল, ধরা পড়লে কী করতে হবে সব একেবারে পাখি পড়ার মত করে পড়িয়ে দিল, কী করলে ধরা পড়ব না সে সব কত বুদ্ধি দিল, শুধু কেউ এই কথাটা বলে দিল না, গুলি খেলে যদি মরো তো বেঁচে গেলে কিন্তু গুলি যদি পেটে থাকে তা হলে যাবজ্জীবন নরক যন্ত্রণা।'

যাদুগোপাল সুভাষের সঙ্গে দু-বার কথা বলেছিলেন, সেই রাতে ও পরের সকালে। ঘরের সমস্ত দরজা-জানলা বন্ধ করে। সুভাষ একবার জিজ্ঞাসা করলেন, যোগেন ঘরে থাকতে পারে কী না। যাদুগোপাল জবাব দিলেন, 'উনি ঘরে থাকলে আমাদের কোনো উপকারে আসবেন।' সুভাষ বললেন, 'আরো একজন শুনে রাখলেন আপনার কথাগুলো। দরকারে মনে করিয়ে দিতে পারবেন। উনি আমাদের বন্ধু। বরিশাল থেকে ভোটে জিতে অ্যাসেম্বলিতে এসেছেন।' যাদুগোপাল বললেন, 'কিন্তু তুমি ওঁর বিশ্বাসযোগ্যতা কী করে জানলে? আর, এটাই-বা কেন ভাবলে যে আমি তোমাকে কিছু ইনফর্মেশন দেব যা ভুলে গেলে বা গুলিয়ে ফেললে ক্ষতি হবে।'

যোগেন একটু লজ্জা পেয়েই বলে, 'আমি বাইরে থাকছি দরকার হলে ডাকবেন।'

যাদগোপাল বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন, আমি যে-কাজে এসেছি তাতে লোক-লৌকিকতা করা যায় না। আপনি কিছু মনে করবেন না।'

সে রাতে ঘণ্টা দুয়েক, পরের সকালেও ঘণ্টা দুয়েক। সুভাষ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনাকে যোগেনবাবু তা হলে ট্রেনে ছেড়ে আসুন।'

'আমি যখন তোমার কাছে এসেছি কেউ কি আমায় পৌঁছে দিয়েছে। ফেরার সময়ই-বা কেউ সঙ্গে থাকবে কেন?'

সুভাষ হেসে বললেন, আপনার তো বাংলা প্রদেশে ঢোকা নিষেধ। সে-নিষেধ কি বলবৎ আছে?'

'হ্যাঁ। আর মাস তিনেক। কিন্তু যুদ্ধ বেধে গেলে অনির্দিষ্ট কাল।'

'তা হলে, যোগেনবাবু সঙ্গে থাকলে এটুকু অন্তত জানব যে হাওড়া পর্যন্ত ধরা পড়েননি।'

'সুভাষ, তোমার একার ওপরে আজ সারা দেশের দায়িত্ব। কে কোথায় ধরা পড়ল কী পড়ল না, এ-সব খুঁটিনাটিতে আটকে যেও না। ধরা না-পড়াটা তো আমার দায়িত্ব। সে ব্যবস্থা না-নিয়ে কি আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারি?'

তাঁর হাতে একটা চটের থলি ছিল। সেটা ঝুলিয়ে তিনি সিঁড়ি ভেঙে নেমে ছোট গেট দিয়ে বেরিয়ে গেলেন, একবারও পিছু ফিরে দেখলেন না।

দু-দিন কেটে গেল। তৃতীয় দিন সকালে একটু ফাঁকা ছিল। সুভাষ যোগেনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যোগেনবাবু সেদিন আপনি কিছু মনে করেন নি তো যাদুগোপালবাবুর ব্যবহারে?

'মনে করি নাই বললে মিথ্যা বলা হবে কিন্তু এখন সে-সব আর মনে নাই। উনি কোনো সময়ই আমার দিকে ভাল করে তাকানই নাই। তবে, এ-সব তো আমাদের জানা।'

'আমাদের, মানে কাদের কথা বলছেন?'

'আমাদের মানে পুরানো নাম শুদ্দুর, নতুন নাম সিডিউলড, নতুন আরো নাম হরিজন। উনি তো ব্রাহ্মণ।'

'হ্যাঁ, কিন্তু উনি তো বিপ্লবী। শুধু বিপ্লবী নন, বিপ্লব নিয়ে চিন্তা করেন। বাঘা যতীনের শিষ্য। উনি চান বিপ্লবী ও সশস্ত্র দলগুলিকে একটা ছাতার তলায় আনতে। ৩৫ সালে মেদিনীপুর জেলে তেমন একটা কর্মসূচি সইও হয়েছিল। কিন্তু তেমন কিছু এগয়নি। এখন কংগ্রেস-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এঁরা আমাকে সমর্থন করে একমত হতে চাইছেন। উনি কিন্তু অস্পৃশ্যতা দোষে দোষী হতেই পারেন না।'

'আপনি যখন বলছেন, তার উপরে তো কথা হয় না। তাইলে হয়তো আমার মনের সংস্কারেই ভাইব্যা নিছি। এমন সংস্কার আমাদের আছে তো।'

'এই সব সংস্কার এতটাই গভীরে থাকে, রক্তের, যে একসঙ্গে বসবাস না করলে আন্দাজও করা যায় না। আমার বোধহয় উচিত হল না, এত জোর দিয়ে বলা যে আপনার ধারণা ভুল। তবে, উনি যে আপনার সামনে কথা বলতে রাজি হননি কেন—সেটা আমি বুঝতে পেরেছি। সে-কথাটা সত্যিই আর-কারো সামনে বলা যায় না।'

'সেটা আগে বলে দিলেই তো হয়। তাইলে কাউকেই অপ্রস্তুত হতে লাগে না।'

'সেটা অবিশ্যি ঠিক। কিন্তু সেটাও হয়তো ওঁদের বিপ্লবী গুপ্ত দলের নিয়ম। আপনি যদি আগেই জানেন যে উনি একা কথা বলবেন, তা হলে আপনি হয়তো কোনো ব্যবস্থা করে ফেলবেন যাতে আমাদের কথা আপনি শুনতে পারেন।'

'মানে, আমি যে খারাপ লোক, পুলিশের গুপ্তচর, সেটা ওনার ধারণা না। সেডা ওনার বিশ্বাস।'

'এটা গুপ্ত দল মাত্রেরই বীজমন্ত্র—কাউকে বিশ্বাস করবে না, যতক্ষণ না সে নিজেকে বিশ্বাসী প্রমাণ করছে।'

যোগেন একটু চুপ করে থাকে। সুভাষ বোঝেন তার ভিতরে কোনো ভাবনা চলছে।

'কী হল? মনে হচ্ছে, কিছু ভাবছেন?'

'ঐ কথাটা শুইন্যা এডডু ডর ধইরছে।'

'আপনার ভয় পাওয়ার কী? গুপ্ত দলকে কত গোপনতা মেনে চলতে হয়। আমি কোনো দিন কোনো গুপ্ত দলে ছিলাম না। মনে হয়, এত গোপনতা রক্ষা করতে পারতাম না।' সুভাষচন্দ্র

একটু হাসেন। তাতে যোগেন কথাটা আর না-চালাতেও পারত। কিন্তু যোগেন বলে বসে, 'যতক্ষণ না একজন মানুষ নিজেকে বিশ্বাসী প্রমাণ করে, ততক্ষণ তাকে সন্দেহ করা—এটা কি আপনার ধাতে পোষাইত? এঁরা তো বিপ্লবী, দেশকে নিজের প্রাণের থিক্যা ভালবাসেন আবার একই সঙ্গে দেশের বেবাগ মানুষগ সন্দেহ করেন। এডা কি একডা সম্ভব কথা?'

'সম্ভবপর কাজের জন্য কেউ কি আর গুপ্ত বিপ্লবী দলে যায়? এঁদের মধ্যেও নানা মত আছে, নানা নেতা আছে। একটা অ্যাকশনের পর, বা, অ্যাকশনও দরকার নেই, অ্যাকশন নিয়ে প্রথম ভাবনার পরই দলেরই কেউ পুলিশকে জানিয়ে দেয়। অ্যাকশন হলে, রাজসাক্ষী পাওয়াটাও সহজ। মাথা গুনলে হয়তো যাবজ্জীবন বন্দী বা ফাঁসির শহিদদের তুলনায় রাজসাক্ষীর সংখ্যা বেশিই দাঁড়াবে। সেই কারণে তো আর বিপ্লবী দলগুলির বিশ্বাস খাটো হয়ে যায় না। তাঁরা মনে করেন, সারা দেশের বড় বড় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের পাশাপাশি যদি শাহেব খুনও না করা যায়, তা হলে শাহেবরা ভয় পাবে না। আর ভয় না পেলে শাহেবরা এ-দেশ ছেড়ে যাবে না।'

'তাইলে তো খাড়ায় সুভাষবাবু, শাহেবগ ডর দেখাইতে দ্যাশের বেবাক লোককে অবিশ্বাস করো।'

সুভাষ হেসে বলে ফেলেন, 'আপনি কি কোর্টে কোনো মামলায় হারেন? এ সব প্রশ্ন করতে পারে আর কেউ?'

যোগেন ছাদের দিকে আঙুল তোলে। বোঝায় শরৎ বোসকে।

সুভাষ বলেন, 'ঠিক আছে। আপনারা ওকালতি করুন। আমার কাছে সারা ভারত থেকেই নানা ধরনের মানুষ আসছেন। এতটা সমর্থন পাব—এটা প্রায় অবিশ্বাস্য। তাঁদের সবাইকে এক রকমের ভাববেন না। তাঁরা প্রত্যেকে আলাদা। প্রত্যেকে। আলাদা।'

সাতদিনের বিবৃতি যুদ্ধ

১০৯

যোগেন কংগ্রেসের সঙ্গে কখনোই কোনো রাজনীতি করেনি, সে তো ভাল করে জানতই না রাজনীতি-করা কাকে বলে। তার ধারণা ছিল, লোক্যাল বোর্ডে, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে বা বড়জোর মিউনিসিসপ্যালিটির বোর্ডে ঢোকাটাই রাজনীতি। যোগেনদের পক্ষে সেটা একটা জয়ও বটে। কারণ, এই সব বোর্ডেও তো উঁচু জাতের লোকরাই বসে। এমএলএর ভোটে দাঁড়িয়ে, ভোট করে, ভোটে জিতে কলকাতায় এসে যোগেন প্রথম বুঝেছে রাজনীতির সরল অর্থটা কী? এক নম্বর, সারা দেশের নানা ব্যাপারে তোমার নীতিটা কী? দুই নম্বর, সেই নীতির পক্ষে তুমি কত লোক জমাতে পারো ও কত কাগজে লেখালেখি করতে পারো? তিন নম্বর, তোমার একটা রাজনীতি নিরপেক্ষ পরিচয় থাকা দরকার—প্রাক্তন বিচারপতি, বিখ্যাত ডাক্তার বা উকিল, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী। এই তিনটির কোনোটিই যদি তোমার না থাকে তবে তোমার মত বা নীতি ধুয়ে তুমি একাই জল খাও আর ঢেকুর তোলে।

যোগেন যে সেই সিনগুলো পর পর গেথেঁ পালা তৈরি করতে পারছে তার কারণ অজস্র

অজস্র বড় নেতাদের মুখ থেকে অসংখ্যা গল্প তাকে শুনতে হয়েছে, সুভাষের প্রয়োজনে পুরনো কাগজপত্র পড়তে হয়েছে, সর্বোপরি শরৎ বোসের কাছে নির্লজ্জভাবে জিজ্ঞাসা করতে পেরেছে।

এটা আগেই ঠিক ছিল ২৯ জানুয়ারি (৩৯) তারিখে কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হবে। এরকম একটা দিন প্রত্যেকবারই থাকে, তা নিয়ে কারো কোনো মাথা ব্যথাও থাকে না, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গান্ধীজির কাছ থেকে জেনে নেয় কাকে রাষ্ট্রপতি করা ভাল হবে! তারপর তিনি রাষ্ট্রপতি হয়ে যান। সত্যি কথা হচ্ছে, ওয়ার্কিং কমিটি যে কমিটি হিশেবে খুব মাথা খাটায়, তাও নয়। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির আসল নেতা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। তিনি গান্ধীজির সঙ্গে কথা বলে সব ঠিকঠাক করে দেন, এমন কী ওয়ার্কিং কমিটি থেকে কারা অবসর নেবেন (কংগ্রেসের সংবিধান অনুযায়ী, ১৯৩৪), আর সেই সব ফাঁকা জায়গায় কারা আসবেন সেটাও ঠিক করেই রাখেন সর্দার। ১৯৩৮-এ সুভাষও এই পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

এবারও সেরকমই ছিল। আট-দশ দিন আগেও প্রকাশ্যেই আজাদ, সুভাষ ও সীতারামাইয়ার নাম ঘুরছিল। এঁদের দুজন আপত্তি করলে অবশিষ্ট জন রাষ্ট্রপতি হবেন—মিটে গেল। গান্ধীজি, সর্দার প্যাটেল ও কংগ্রেসের আরো কোনো-কোনো নেতা, রাজকোটে প্রজাদের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। দেশীয় রাজ্যগুলিতে কংগ্রেসের আন্দোলনের নতুন দিশা পাওয়া যাচ্ছিল।

এই সবের মধ্যে, মৌলানা আজাদ, যেহেতু তাঁর নাম রাষ্ট্রপতি হিশেবে প্রস্তাবিত হয়েছে আর ২৯ তারিখও এসে গেল, একটি বিবৃতি দিয়ে জানালেন (২২ জানুয়ারি ১৯৩৯), তাঁর শরীর খুব খারাপ, কাজের চাপও বেশি, তিনি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিতে পারবেন না, এবার পট্টভি সীতারামাইয়াকেই রাষ্ট্রপতি করা হোক। পরদিনই ২৩ জানুয়ারি, ১৯৩৯, সুভাষ বিবৃতি দিয়ে জানালেন, ১৯৩৯ সালটা দেশের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। যুদ্ধ লাগতে পারে। দেশের মানুষ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম চান। সুতরাং নতুন নেতৃত্ব দরকার। সেই কারণে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যদি ভোট করতে হয়, ভোট করা হবে। একজন প্রতিনিধিও তাঁকে সুভাষকে ভোট থেকে সরে দাঁড়াতে বলেন নি। বা রাষ্ট্রপতি হতে না করেননি।

কংগ্রেসের সংগঠনের যা অবস্থা, তাতে সুভাষবাবুর ভোটের কথায় বজ্রপাত হওয়ার দশা। গান্ধীজি কংগ্রেসের একমাত্র নেতা হওয়ার পর, তাঁর ইচ্ছার বাইরে কিছু ঘটতে পারে না। পরদিনই, ২৪ শে বরদৌলি থেকে ওয়ার্কিং কমিটির সাত সদস্য—সর্দার, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বাজাজ, দৌলতরাম, শঙ্কর রাও, ভুলাভাই আর কৃপালনী—একটা যুক্ত বিবৃতিতে সুভাষের সবগুলি যুক্তি খণ্ডন করে অনুরোধ জানালেন, সুভাষ ভোট তেকে সরে দাঁড়াক ও পট্টভি সর্বসম্মতিতে রাষ্ট্রপতি হন।

এর উত্তরে সুভাষ ও পরদিনই (২৫ জানুয়ারি ৩৯) একটা লম্বা বিবৃতিতে বললেন একজন প্রার্থীর পক্ষে ওয়ার্কিং কমিটির এতজন সদস্যের প্রচার করা অনুচিত, তিনি চান বর্তমান সংকটে একজন বামপন্থী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়া দরকার। আশ্চার্য নরেন্দ্রদেও এর মত সর্বজনমান্য ও সর্বসম্মত একজন বামপন্থীকে রাষ্ট্রপতি করলে সুভাষ ভোট থেকে সরে দাঁড়াতে পারেন ও রাষ্ট্রপতি—নির্বাচন তথাকথিত মতৈক্যের ভিত্তিতে হতে পারে, তাহলে।

এই বিবৃতিটির ব্যাপারে যোগেনের একটু হাত ছিল। যোগেন ডিকটেশন নিচ্ছিল। তাতে সুভাষ এ-কথাটার ওপরই কেবল, জোর দিয়েছিলেন যে মুখে মতৈক্যের কথা বলা আর এতজন এত বড় নেতা মিলে একজন প্রার্থীর পক্ষে প্রচার করা অনুচিত, অনৈতিক ও কংগ্রেস প্রতিনিধিদের

সঙ্গে ছলনা মাত্র।

টাইপ করতে-করতে যোগেনের একটু খটকা লাগে, সুভাষের বিবৃতিটা যেন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। ওঁদের মতলব ধরে ফেলা আর বলে দেয়া তো সুভাষের পক্ষে একমাত্র যুক্তি নয়। সে টাইপ করা কাগজটা সুভাষের হাতে ফেরৎ দিতে দিতে বলে, 'তেমন যুতসই ঠেকল না। ওঁরা তো কেউ নালায়েক নন। আপনিও কোর্ট অব ওয়ার্ডস নন। আপনার শর্ত একটা না-দিলে আদালতের বাইরে সেট্‌লমেন্টে আপনার আগ্রহ প্রমাণ হয় না।' কাগজটি হাতে নিয়ে সুভাষ ফেলফেল করে যোগেনের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। যোগেনের স্পষ্ট কথাই সুভাষের সঙ্গে তার সহকর্মিতার প্রধান ভিত, সুভাষের ভরসা ও যোগেনের শক্তি।

বিকেলের দিকে সুভাষ সেই টাইপ-করা কাগজটার ওপরে আরো কিছু লিখে যোগেনকে ফেরত দিয়ে বলেন, 'দেখুন তো এবার ঠিক হল কী না।'

যোগেন পড়ে বলল, 'নরেন্দ্র দেও ঠিক-কি-বেঠিক সে তো আমি বলতে পারব না। কিন্তু নতুন একটা নাম বলাতে আপনার যুক্তিটা শক্ত হল অনেকটা।'

'তাহলে এটাই ছেড়ে দিন', সুভাষ বলে দেন। যোগেনই তার পর বেরিয়ে নিউজ এজেন্সি ও পেপারগুলিতে স্টেটমেন্টটা ধরিয়ে এল।

ঐ দিনই বেশি রাতে বল্লভভাই বরদৌলি থেকে সুভাষের ২৫ জানুয়ারি বিবৃতির জবাব দিলেন। তাঁর সহকর্মীরা নিশ্চয়ই কাছাকাছি ছিলেন না, তিনি তাই নিজের নামেই বিবৃতি দিয়েছেন। 'কোনো একদিন নেহাৎই ঘটনাক্রমে আজাদ, নেহরু, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ভুলাভাই, কৃপালনী ও আমি কথা বলছিলাম। আজাদ যদি কোনো ক্রমেই রাজি না হন, তাহলে পট্টভি ছাড়া তো কোনো প্রার্থীই থাকে না। সুভাষকে যে পর-পর দু-বার রাষ্ট্রপতি করা যাবে না, সেটা তো আগেই ঠিক হয়ে গেছে'।

সুভাষ হেসে বললেন, 'আপনি তো ঠিকই ধরেছিলেন। নরেন্দ্র দেও-এর বদলে ওঁরা গান্ধীজিকে মাঠে নামিয়ে দিলেন। গান্ধীজি কী চান সেটা জানার পর কংগ্রেসের তো আর কিছু জানার দরকার নেই।'

যোগেন জিজ্ঞাসা করে, 'আমরা কি কিছু বলব, না কী চুপ করে থাকব?'

'থাকা যেত। কিন্তু গান্ধীজির নাম উঠে পড়েছে। প্রতিনিধিরা ভুল বুঝতে পারেন যদি চুপ করে থাকি।'

'পালটা বিবৃতি দিতে হলে তো বলতে হয়, গান্ধীজির কথার কথা মানি না।'

'তা কি বলা যায় গান্ধীজিকে নিয়ে? তাও সর্দার প্যাটেলকে?'

'একইরকম ভারী আর কী আছে?'

'তাহলে তো যা সত্য তাই বলতে হয়। ফেডারেশন। কিন্তু সেটা বললে ভোট অ্যাফেক্ট করতে পারে। অনেকে তো ফেডারেশন চায়, আপনি একটু মেজদার সঙ্গে কথা বলুন না। আমিও একটু কথা বলে নি—বঙ্কিমবাবু, নীহারেন্দুবাবুর সঙ্গে—ওঁর রাজি কি না।

রাত যে তখন কত সেটা যোগেন বোঝে যখন উডবার্ন পার্কের বাড়ির দিকে হাঁটছে, এলগিন রোড থেকে। শুধু শরৎ বোসের বাড়ির গেটের ৫/৬ টা ডোম আলো জ্বলছে। এত রাতে একটু লজ্জাই করে যোগেনের শরৎবাবুকে ঘুম থেকে তুলতে। ছোট গেটটা থেকে দেখতে পায় চেম্বারে আলো জ্বলছে। শরৎ বোস বললেন, 'ধরুন, রাইটিস্ট বা ফেডারেসনিস্টরা তো আপনাদের ভোট দেবে না। তাহলে, সুভাষ যদি ওর এই স্টেটমেন্টে ফেডারেশনের কথা ফাঁস করে দেয়, আপনারা নতুন করে কিছু হারাচ্ছেন না। উলটে, আপনাদের কোনো দুর্বল সাপোর্টার জোর

পেতে পারে। তা হলে বলাই উচিত। একই সঙ্গে আমার একটা স্টেটমেন্ট ছেড়ে দিন অ্যাজ এ মেম্বার অব দি ওয়ার্কিং কমিটি অ্যান্ড অ্যাজ লিডার অব দি অপজিশন, দ্যাট মিস্টার প্যাটেল শুড নট প্রিটেন্ড টু এনজয় এনি সাচ প্রিভিলেজ টু ক্রিয়েট এ মিয়াসমা অব অ্যান এগ্রিমেন্ট ইন দি ওয়ার্কিং কমিটি অন পট্টভি অ্যাজ ইটস এগরিড ক্যানডিডেট। দি ওয়ার্কিং কমিটি হ্যাড এক্সপ্রেসড নো চয়েস।'

যোগেন টুকছিল। শেষ হয়ে গেলে বলে, 'ওঁর টাও বলেন, স্যার।' শরৎ বোস একটু চুপ থেকে বলেন, 'আমি তো সানাইয়ের পোঁ। লেট এ পোঁ বিহেভ এ পোঁ। এটা সুভাষেরই বলা উচিত।'

যোগেন চেয়ার ছেড়ে ওঠার একটা ভঙ্গি করে কিন্তু ওঠে না। একটা ত্রিভঙ্গ টেবল-ল্যাম্প শরৎ বোসের টেবিলের ওপর রাখা বইটাতে আলো ফেলছিল। সেই আলোটাই উপছে এসে যোগেনকে স্পষ্ট করছিল। শরৎবোসের চোখের দৃষ্টি তখন মধ্যরাত পেরনো। সংকোচ করেও যোগেন না বলে পারে না, 'আমার স্যার এই ফেডারেশন নিয়ে কিছু জানা নাই। স্টেটমেন্ট তো এখনই ছাড়তে হবে। গ্রাউন্ডওআর্ক করব কখন। এত রাত্তিরে স্যার, কইতেও বাধে। হয় আপনে ডিকটেশন দ্যান, না হয় আমারে দুই কথায় বুঝাইয়্যা দ্যান হুইচেভার সিমস ইজিয়ার ফর ইউ। আই ফিয়ার দি ডিকটেশন।'

'আপনি তো থার্টি-ফাইভের অ্যাক্টেই ভোটে জিতে এসেছেন। তাহলে ফেডারেশনে এত হোঁচট কেন?'

'হোঁচটটা তো স্যার পায়ের দোষে। পথের দোষে নয়।'

শরৎ খুব পছন্দ করেন, এমন আলাপ, 'পায়ের আর দোষ কী? রাতদিন এত লোককে লেঙ্গি মারছেন—! সেকেন্ড রাউন্ড টেবলে গান্ধীকে আউটওয়ে করতে ব্রিটিশ গবর্মেন্ট নাকি যত ৪২০ আর ৪৩৪ কনভিক্ট ছিল জেলখানায় তাদের জাহাজের খোলে পুরে লন্ডনে নিয়ে যায়। যাকে বলে 'স্টেটস' তাদের রাজা-রাজড়া-বংশধররা তো এক্স-অফিসিয়ো কনভিক্ট আন্ডার দোজ টু অ্যাক্টস—', যোগেন এত হেসে ফেলে যে শরৎ বোসকে থামতে হয়। অত রাত বলেই ওঁরা নিচু স্বরে কথা বলছিলেন।

'আপনি তো গ্রাউন্ডওয়ার্ক চাইলেন। লাস্ট রাউন্ড টেবিলে গান্ধীজি নাকি শুরুতেই বলেছিলেন, ওঁর মারগুলো তো এত চাপা যে শুনে বোঝা যায় না, মরণকোপ। মরে বোঝা যায়।' যোগেন আবার হেসে ফেলে আর হেসে ফেললে যোগেন থামতে পারে না। অগত্যা সে বলে, 'আইজ কি সন্ধা থিক্যাই মশা তাড়াচ্ছেন? অ্যাহন শেষ রাইতে আমারে ধইরলেন!'

'আপনি তো গ্রাউন্ডওয়ার্ক চাইলেন। গান্ধীজির কথাটা শুনুন, গোলটেবিলে তাঁর ওপেনিং স্পিচ, ব্রিটিশ সরকারের আমন্ত্রণে আমরা এখানে এসেছি ভারতের স্বাধীনতা ও স্বাধীন ভারতের শাসনব্যবস্থা নিয়ে কথা বলতে। কাজটা যাতে ভালভাবে হয়, ব্রিটিশ গভর্মেন্ট অসম্ভব কষ্ট করে তাই এখানে একটা ভারত তৈরি করে রেখেছেন, ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে এঁদের স্বার্থ নাকী এমনই জড়িত যে এঁদের সবার মধ্যে মতের মিল হলেই তবে সিদ্ধান্ত হতে পারবে। কিন্তু আমার অসুবিধে হচ্ছে—আমি এঁদের বেশির ভাগকেই চিনি না, এঁরা কোনদিক দিয়ে ভারতের স্বাধীনতার দ্বারা প্রভাবিত তাও জানি না।'

এবার শরৎ বোসই হেসে উঠলেন।

'কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তো আর গান্ধীর চাইতে কম ধুরন্ধর নয়। তারা নিমন্ত্রণ কর্তা। নেমন্তন্নের লিস্ট তো তারারই বানাবে। শাহেবরা নেমন্তন্ন ডাকছে, অথচ সে-নেমন্তন্ন আমি পেলাম

না—আমাদের দেশের খয়ের খাঁদের তো কমপিটিশন লেগে গেল, যাতে এই নেমন্তন্ন পায়। তাদের শুধু এইটুকু জানাতে হবে যে ব্রিটিশ ভারতের কোন গোষ্ঠীর প্রতিনিধি তারা। জাতপাত কুলনি কাফ গাঁইগোত্র এই সব ভাগাভাগিতে শাহেবরা রঘুনন্দনকে হারিয়ে দেবে। ভারতে যে এত রাজত্ব আছে, নেটিভ স্টেটস, শাহেবরা বলতে পছন্দ করে স্টেটস, তা আমরা বাংলায় বসে ভাবতেও পারি না। আমাদের এখানে তো চিরস্থায়ী বন্দবস্ত। এখানে তো রাজা হওয়া যায় না। সারা বাংলায় একটা মাত্র দেশীয় রাজ্য—কোচবিহার। অন্যান্য প্রদেশে রাজার ছড়াছড়ি। কেন এত স্টেট ছড়িয়ে রেখেছে শাহেবরা তার কারণটা ঠিক আন্দাজ করা যেত না। সেকেন্ড রাউন্ড টেবলে বোঝা গেল। দে আর এসেনসিয়ালি এ পার্ট অব দি ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, কনস্টিটিউশন্যালি, লিগ্যালি, সোবরেনেটিক্যালি। তাদের প্রজাদের ওপর কর বসাবার একটা রাইট আছে আর ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টকে তাদের একটা বার্ষিক কর দিতে হয়। দে হ্যাভ দেয়ার ওন জুড়িসিয়ারি, সামটাইম দে কল ইট সুপ্রিম কোর্ট, সাম অব দেম হ্যাভ দেয়ার ওন কয়েনস, ওন ফ্ল্যাগস অ্যান্ড ওন প্যারাফার লেলিয়া। এখন সেকেন্ড রাউন্ড টেবলে এদের নিয়ে গিয়ে শাহেবরা বলালো—নতুন ভারত শাসন আইন প্রদেশগুলিকে যেমন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দিচ্ছে তেমনি কেন্দ্রে এই প্রদেশ ও অন্যান্য নানা স্বার্থের কথা ভেবে একটা 'ফেডারেশন' তৈরি হোক। একটা মাইনরিটি ফোরামও তৈরি হল—ইনডিয়ান ক্রিশ্চানস, ইয়োরোপিয়ানস, মুসলিমস অ্যান্ড সাচ আদার্স।

ভারতের পাবলিক ওপিনিয়নের বেশ একটা বড় অংশ—ফেডারেশন মেনে নেয়ার পক্ষে ছিল। দেশীয় রাজারা ভাবলেন, অন্তত কেন্দ্রে কংগ্রেসের দখলটা এড়ানো, মুসলিমরা ভাবলেন কেন্দ্রে হিন্দু দখলটা এড়ানো যাবে, সপ্রু-টর্পু যাদের কোনো ভিত নেই ভাবল অন্তত একটা সরকার তো পাওয়া যাবে কেন্দ্রীয় আইনসভার কাছে যাদের কৈফিয়ৎ দিতে হবে আর ব্রিটিশ নেতারা ভাবলেন, যা হোক, দেখতে তো একটা ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের মতই হল অথচ ব্রিটেনের স্বার্থ রক্ষা করা গেল।

'এ কথা সত্য যে প্রস্তাব বেরবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস বলে দিয়েছে, 'আমরা ফেডারেশনে নেই'। সে তো কংগ্রেস বলে দিয়েছে 'আমরা কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ডে নেই'। আমরা যখন ওয়ার্কিং কমিটিকে জানালাম, বিশেষ পরিস্থিতিতে বাংলাকে হকশাহেবের সঙ্গে কোয়ালিশন করতে দেয়া হোক, বাব্বা, সর্দার প্যাটেল যা লিখলেন আমাদের, তা কোনো জমিদার তার নায়েবকেও লিখতে পারে না। কংগ্রেসের গ্রহণ প্রত্যাখ্যান দিয়ে এটা বোঝা যায় না সত্যি-সত্যি গ্রহণ করল নাকি প্রত্যাখ্যান করল। ফেডারেশনের পক্ষে কংগ্রেসের বেশ বড় একটা অংশের সম্মতি ছিল ও আছে। অন্তত ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কথা-বলার বিষয় হিশেবে। আরে, ভুলাভাই দেশাই বা, ঐ সুভাষের সঙ্গে কে যেন দাঁড়িয়েছে, কংগ্রেসের...

'পট্টভি সীতারামাইয়া?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ভুলাভাই আর পট্টভি তো কংগ্রেসের বড় নেতা। তারা তো দেশবিদেশে বক্তৃতা দিয়ে বেরিয়েছে। কাগজে লিখেছে। এটা কংগ্রেসের চিরস্থায়ী নেতাদের পক্ষে যতই অস্বস্তিকর হোক, কংগ্রেস রাজনীতিতে ফেডারেশন অত্যন্ত জ্যান্ত ইস্যু। এটাকে আগেই আপনাদের ইস্যু করা উচিত ছিল।'

যোগেন উঠে পড়ে বলে, 'এটা স্যার আপনে বলে দিলেন না ক্যান?'

এলগিন রোডের দিকে আসতে-আসতে যোগেন ভাবতে পারে যে ফেডারেশনের কথাটা আগে তোলা ভাল হত না। যোগেন যা শুনল, ফেডারেশনের ব্যাপার, তাতে বামাল চোর

ধরা যাবে না। উলটে তখনকার নেতারা সই করে জানিয়ে দেবেন—বাজে কথা, ফেডারেশন প্রস্তাব সর্বসম্মতি ক্রমে প্রত্যাখ্যাত। কিন্তু এখন শেষ মুহূর্তে কথাটা যদি সুভাষভাবু আলগা ছেড়ে দেন, তাহলে যে—সন্দেহটা আছেই সেটাকে একটু উশকে দেয়া যাবে। নিশীথ কলকাতায় কয়েক পা হাঁটতে-হাঁটতে যোগেন সুভাষবাবুর বিবৃতিটার খশড়া করে। পরের পরদিন সেই বিবৃতিতে বলা হল—রাষ্ট্রপতি কে হবেন সে-বিষয়ে সম্মতি-অসম্মতির গভীর রাজনৈতিক কারণ থাকে। দেশের মানুষ নতুন সংগ্রামের জন্য এত উন্মুখ যে ফেডারেশন-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে যাঁরা মুখ খোলেন নি তেমন সন্দেহভাজন কারো বদলে তাঁরা চান প্রকাশ্য ও প্রমাণিত কোনো ফেডারেশন বিরোধীকে।

২৭ জানুয়ারি (৩৯) জওহরলাল একটা বিবৃতিতে দুই পক্ষকে মেলানোর চেষ্টা করেন। তিনি তিনটি বিষয়কে আলাদা করে নেন। এক, কংগ্রেসে কোনো দক্ষিণ-বাম নেই। দুই ফেডারেশন প্রস্তাব কংগ্রেস ফিরিয়ে দিয়েছে। সুতরাং ফেডারেশন কোনো বিষয়ই নয়। তিন নেহরু কংগ্রেস-রাষ্ট্রপতির ভূমিকা নিয়ে সুভাষকেই সমর্থন করলেন—কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি নিশ্চয়ই পার্লামেন্টের স্পিকার নন, কংগ্রেসে গৃহীত নীতিকে তিনি নিজের মত করে প্রয়োগ করতে পারেন।

পরদিন, ভোটের আগের দিন, ২৮ জানুয়ারি (৩৯) গান্ধীজি 'হরিজন'-এ লিখলেন, 'অন্তরের ক্ষয়'। ২৮ তারিখে যখন বেরিয়েছে, অনুমান করা যায়, অন্তত দু-একদিন আগে লেখা। গান্ধীজি লেখাটিতে জানালেন, তাঁর ও তাঁর সহকর্মীদের বেশির ভাগ সময় এখন চলে যাচ্ছে, কংগ্রেসিদের দুর্নীতি ও বিকৃতি সম্পর্কিত অভিযোগগুলির ভিতর দিয়ে হোঁচট খেতে-খেতে। অভিযোগগুলি কী নিয়ে তাও তিনি বলেন। মিথ্যে পরিচয়ে লোক-ঠকানো, কংগ্রেসের খাতাপত্র জাল করা, ভুয়ো মেম্বার দেখানো, ভোটাভুটি নিয়ে গোলমাল পাকানো, অনেকেই দায়িত্বহীন কথা বলেন, হিংসা ছড়ান, অনেকেই কোনো নির্দেশ মানেন না। কংগ্রেসের এই কুৎসিত মুখ দেখানোর জন্য কংগ্রেস কর্মীরা তাঁর ওপর যেন রাগ না করেন। এটা তাঁর পক্ষে দোষই হত যদি তিনি সত্য লুকোতেন। 'আমি তো বর্তমান অবস্থায় দেশের সামনে নৈরাজ্য আর রক্তিম ধ্বংসাবশেষ ছাড়া কিছু দেখতে পাচ্ছি না। ত্রিপুরীতে কি আমরা এই কঠিন সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারব?'

এর পরদিনই ছিল ভোট ও সুভাষচন্দ্র জিতলেন।

ভোটের মাত্র আট-দশদিন আগে থেকে প্রতিদিন বিবৃতি-পাল্টা বিবৃতি, কংগ্রেসের উচ্চতম নেতৃত্বের মধ্যে কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি ও তাঁর মন্ত্রিসভার মধ্যে, সকলেই প্রবল সক্রিয়। শত্রুতা কেউই গোপন করেন নি। গান্ধীজিও না। নেহরুই একমাত্র রাজনীতি-বোঝার তফাতটা ধরতে চাইছিলেন। গান্ধীজি কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রমাণ হিশেবে মিথ্যে সদস্য দেখানো আর জালিয়াতির কথাই তোলেন। সেখানে আজ কেউ এমন ইঙ্গিত পড়তে পারেন, যে সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্বাচন হয়েছে, গান্ধীজি সেই সংখ্যাই অস্বীকার করছেন। নইলে ত্রিপুরী কংগ্রেসে সত্যের মুখোমুখি আসার কথা কেন?

সুভাষের রাজনৈতিক প্রচারে, এই কটি কথাই, বারবার এসেছে। নতুন আন্দোলন—চরম মীমাংসার জন্য। নতুন নেতৃত্ব—সেই আন্দোলনের জন্য। ফেডারেশন-চুক্তি-রোয়েদাদ—কোনো মধ্যপন্থা নয়।

নতুন আন্দোলনের একটা ক্ষেত্র ছিল দেশীয় রাজ্য। ১৯৩৮-এর হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে প্রস্তাব নেয়া হয় যে দেশীয় রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীন বিষয়ে জাতীয় কংগ্রেস কিছু বলবে না। এমন প্রস্তাবের্ব কারণ, দেশীয় রাজ্যগুলির ভিতরে প্রজামণ্ডল ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলি সেই সব রাজ্যের বিশিষ্ট সমস্যাগুলির জন্য স্বতন্ত্র পদ্ধতি যাতে নিজেরাই

নিতে পারে। কিন্তু কংগ্রেস এই প্রস্তাব নেয়ার পরই দেশীয় রাজ্যগুলির অফিসাররা ও রেসিডেন্টরা এমন প্রকাশ্য অত্যাচার .শুরু করে যে মধ্যভারত, দক্ষিণ ভারত, রাজপুতানার জনসাধারণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করতে বাধ্য হন। মহীশূরে, ত্রিবাঙ্কুরে ও অন্যান্য দেশীয় রাজ্যে দেশীয় রাজন্যরা যে অত্যাচার শুরু করেছেন তাতে ছোট-ছোট রাজ্যগুলিও উৎসাহিত হয়ে ওঠে। রাজকোটে কংগ্রেস আন্দোলনে যোগ দেয়ায় ছোট রাজ্যগুলি আতঙ্কিত হয়ে কিছু সুবিধে-সুযোগের কথা ঘোষণা করে। কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যে নাক গলাবে না—এই নীতি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী সরকার রাজন্যদের সাহায্য করতে আসে। বেশির ভাগ প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব থাকায়, সরকারের সমর্থন রাজন্যরা পাচ্ছেন না। তাছাড়াও সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল, যমনলাল বাজাজ ও পরে, গান্ধীজি নিজে এই সব আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। কংগ্রেসের মধ্যে যে সোস্যালিস্ট, কমিউনিস্ট ও বিপ্লবীরা ছিলেন, তাঁরা প্রচার করছিলেন যে দেশীয় রাজ্যের এই আন্দোলনে ব্রিটিশ সৈন্যদের সমর্থনে ব্রিটিশ সরকার যদি কোনো একরকম সাফল্যও পায়, তাহলে তারা এই বর্বর পদ্ধতিতেই প্রস্তাবিত 'ফেডারেশন পরিকল্পনা' ভারতের ওপর চাপিয়ে দেবে।

সুভাষ তাঁর শেষ বিবৃতিতে ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনে প্রস্তাবিত ও প্রকাশ্যত কংগ্রেস কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা হিশেবে ফেডারেশন-এর ধারণার প্রতি দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতাদের ও তাঁদের সধর্মীদের মধ্যে সমর্থনের মনোভাবের অভিযোগ স্পষ্ট করে বলেছেন। সেই কারণেই তিনি চান একজন প্রমাণিত ফেডারেশন-বিরোধী ১৯৩৯-এর রাষ্ট্রপতি হন। অনেকেই এটাকে কষ্ট কল্পনা মনে করেন। কংগ্রেস একের পর এক প্রস্তাবে ফেডারেশন—সুপারিশ বাতিল করেছে। তৎসত্ত্বেও এখন যে-সব তথ্য নতুন করে পাওয়া যাচ্ছে তাতে এটা মনে হয়, তখন কংগ্রেসের ভিতরে ও কংগ্রেসের বলয়ে ফেডারেশনের পক্ষপাতী একটা হাওয়া ছিল। তাঁরা প্রধানত ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগী। এ-নিয়ে একটা গল্প-গুজবও চালু হয়েছিল। ভলাভাই দেশাই-এর কথার ভুল উদ্ধৃতি দিয়ে লর্ড লোথিয়ান ব্রিটিশ প্রেসকে জানান, বাপু ও কংগ্রেস ফেডারেশন-প্রস্তাবের পক্ষে। ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বরে চেকোশ্লোভাকিয়ায় হিটলার তাঁর দখল কায়েম করতে ইয়োরোপকে যুদ্ধ পর্যন্তই প্রায় ঠেলে নিয়ে গিয়েছিলে। সুভাষ তখন কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের আতঙ্কে ও সংকটে কংগ্রেস ইঙ্গিত পাঠিয়েছিল ভাইসরয়কে সেই ১৯৩৮-এই যদি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনকে সম্প্রসারিত করে কেন্দ্রে কোনো ব্যবস্থা হয়, তাহলে কংগ্রেস সেই ব্যবস্থায় যোগ দিতে পারে। সুভাষ বোস নিজে ঘোষণা করেছিলেন, কংগ্রেস দিল্লি দখলের প্রতিযোগিতায় সবার চাইতে এগিয়ে আছে। আজাদ, প্যাটেল ও রাজেন্দ্রপ্রসাদকে নিয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি একটা পার্লামেন্টারি সাব-কমিটিও বানিয়েছিল। আকাশপথে, জলপথে বা নৌপথে অকস্মাৎ কোনো আক্রমণ ঘটলে ওয়ার্কিং কমিটি ও এআইসিসি-র অধিকার এই উপসমিতির ওপর বর্তাবে ও তারা ভাইসরয়ের পাশে সমস্ত সাহায্য ও সমর্থন নিয়ে দাঁড়াবেন। এই উপসমিতির সভাপতি ভোটের হিশেব কষে বেরা করে ফেলল—ফেডারেশন প্রস্তাব যদি আপাতত শিকেয় তোলা যায়, আর সেন্ট্রাল লেজিসলেচারকে পুরনো আইনেই যদি নতুন নির্বাচনী মনোনয়নে সাজানো হয়, তাহলে, সেই নতুন সেন্ট্রাল লেজিসলেচারে নিশ্চিতই কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। এটাকে কার্যকর করতে হলে মধ্যবর্তী একটা ব্যবস্থা করা দরকার। ইংরেজদের কোনো কিছুতেই আপত্তি নেই। ফেডারেশন-প্রস্তাব শিকেয় তুলতে তারাও চাইছিল, কিন্তু সুযোগ পাচ্ছিল না। চেকোশ্লোভোকিয়া নিয়ে যুদ্ধ বাধলে সুযোগটা পাওয়া যেত। কংগ্রেসের দুর্ভাগ্যে, যুদ্ধটা তখন বাধেনি।

গান্ধীজির সচিব মহাদেব দেশাইকে ঘনশ্যামদাস বিড়লা ১৯৩৯-এ যুদ্ধের মুখে বেশ কিছু চিঠি লিখেছিলেন গান্ধীজিকে খবর জানাতে ও কোনো কোনো বিষয়ে পরামর্শ নিতে। একটি চিঠির সঙ্গে তিনি একটা খশড়া প্রস্তাবও পাঠিয়েছিলেন। ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইনডাসট্রিজ যুদ্ধ-সংক্রান্ত একটা আবেদন করতে চায়, যদি বাপু অনুমোদন করেন। সেই খশড়ায় খুব স্পষ্টই বলা ছিল—ভারতের পূর্ণ সহযোগিতার জন্য কেন্দ্রে প্রতিরক্ষা ও যুদ্ধ-সংক্রান্ত দপ্তর করা দরকার ও সেখানে ভারতীয়দের দায়িত্ব দেয়া দরকার। একমাত্র তা হলেই সেই সংগঠন তৈরি হবে যা যুদ্ধে গ্রেট ব্রিটেনের জয় নিশ্চিত করবে।

সুভাষের জয়-পরাজয়-নতুন রণাঙ্গন

১১০

এটা জানাই ছিল যে ২৯ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনের ফল জানা যাবে। বিপিসিসি দপ্তরে দুপুর থেকেই একে একে অনেকে আসতে শুরু করেন। সকলেই যে কংগ্রেসি তা নয়, কংগ্রেসের নেতাদের কেউ-কেউ ছিলেন, কেউ-কেউ জিলা থেকেও এসে গেছেন। আবার, এমন কী প্রজা পার্টি, মুসলিম লিগ ও মুসলিম চেম্বারেরও কেউ-কেউ এসেছেন। গলাবন্ধ আর গোল টুপিতে একজন ঢুকতেই কিরণ শঙ্কর রায় তাঁকে দু-হাত তুলে ডাকেন, 'আরে আসুন, আসুন মিস্টার তলোয়ারকর। আপনি কি এই খবর জানতেই এলেন না কী, সিন্ধ থেকে। তা হলে, এলাহাবাদে নেমে গেলেই তো সবার আগে খবর পেতেন।'

ততক্ষণে তলোয়ারকর কিরণশঙ্করের কাছাকাছি এসে গেছেন। কিরণশঙ্কর কাউকে নিচু গলায় বললেন, 'একটা চেয়ার দাও'। একজন উঠে চেয়ারটা ঠেলে সরিয়ে তলোয়ারকরকে আসন দিলেন। তলোয়ারকর নমস্কার করে সবার দিকে মুখটা ঘুরিয়ে করিণশঙ্করের মুখে ফিরে এসে বলেন, 'কিরণবাবু আমি একটা সিন্ধি মারচেন্ট আর আমাকে আপনি শেখাচ্ছেন দেহাতে গিয়ে মাল দেখতে। আমার বাবার সবচেয়ে বড়বোন, আর স্বামী, কী ডাকেন আপনারা—যেন?'

'পিসেমশায়—'

'হাঁ হাঁ পিসামশায়—আমরা ডাকি জেটা। আমাদের এই জেটা আমাদের সবাইকে ব্যবসার মুল নীতি শিখিয়েছিলেন।'

'তিনি কি আপনাদের বাড়িতেই থাকতেন? ঘরদামাদ?'

'হাতের একটা ভঙ্গিতে সেটা নাকচ করে তলোয়ারকর বলে ওঠেন, 'ছোড়েন তো। আরে কোনো সিন্ধি নিজের বাড়িতে কাউকে থাকতে দেয় না। সব সিন্ধি অন্যের ঘাড়ে বসে খায়-ঘুমোয়। না। উনি, ভাল বিজনেসম্যান তো—মার্কেট সেন্স ছিল চুম্বকের মত। বিপদে পড়লেই ওঁর বুদ্ধি নিতে ছুটতো হত। বুদ্ধি শেষপর্যন্ত দিতেন কিন্তু তার জন্য দর দিতে হত। এটাই ছিল ওঁর প্রথম শিক্ষা, সিন্ধি যদি হতে চাও, দাম ছাড়া হাঁচবেও না।'

'সে না-হয় বুঝলাম। কিন্তু আপনি শুধু হাঁচার জন্য এত দূর এলেন? খরচা হয়ে গেল পোষাবে তো?'

'সেটাই তো ছিল ওঁর পরের মন্ত্র। লাভের হিশেব কখনো লাভের জায়গায় না-দাঁড়িয়ে করবে না। আপনাদের জমিদারবাবুদের হিশেব আর তরিকা তো আলাদা। কেউ এসে বলল,

বাবু, কিছু সোনা চুরি করে এনেছি, আপনি নেবেন? আপনারা চোখ না খুলে জবাব দেবেন—বেটা, আমার ঘুম ভাঙালি, দুপুরের? বিকেলে আসিস। টাকা নিয়ে যাস। জানব সুভাষবাবুর ভোটের কী হল? তার জন্য কলকাতা না-এসে এলাহাবাদ নামব কেন? আমি তো সিন্ধি। বাঙালিবাবু না।'

'ভোটটা তো কংগ্রেসের। তো কংগ্রেসের হেড-অফিসে যাবেন না? এই শেখালেন, আপনার পিসেমশায়?'

তলোয়ারকর খুব হাসলেন। তারপর বললেন, 'সেটাই তো জেটা-র শেষ মন্ত্র। সওদা চিনতে ভুল করিস না। আমার সওদা তো সুভাষবাবু। আপনি দেখাচ্ছেন কংগ্রেস?'

হঠাৎ যোগেন, সামসুল আমেদ, মেদিনীপুরের যতীন, দু-তিনটি ছাপা কাগজ নিয়ে হৈ-হৈ করতে-করতে ঢুকল, বোঝা গেল কোথাও একটা জিত হয়েছে। তারপরই ওরা কেউ হাতের কাগজটা মেলে ধরেছে, বড়-বড় কালো অক্ষরে শুধু লেখা—'সুভাষ ইলেকটেড কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট, বাংলাতেও বেরিয়েছে একই টেলিগ্রাম, 'সুভাষ রাষ্ট্রপতি'।

ততক্ষণে ওরা টেবিলের কাছে পৌঁছে গেছে, ওদের হাত থেকে কাগজগুলোও চলে গেছে। 'স্টার অব ইন্ডিয়া' নতুন হেডিং করেছে, 'ওল্ড অর্ডার কনটিনিউজ ইন কংগ্রেস।'

কংগ্রেস আর ওল্ড বলতেই তো গান্ধীজিকে মনে হয়। সে কী? ভুলটা কার? তখন কেউ একজন জোরে-জোরে পড়ে—সুভাষই ছিলেন, সুভাষই থাকলেন, প্রেসিডেন্ট।

'সেটা সোজা লিখলেই হয়, এত ঘুরিয়ে লেখার কী হল?'

বাইরে একটা গাড়ি এসে দাঁড়ায়, বেশ জোরে ব্রেক কষে আর হর্ন দিয়ে। দুই হাত ভর্তি সন্দেশের প্যাকেট বুকের কাছে ধরে ছোট ইস্পাহানি হৈ-হৈ করে ঢোকে, 'মোহনবাগানকো তোড়কে মহামেডান স্পোর্টিং ছিন লিয়া ট্রিপল ক্রাউন', বলতে-বলতে সে সন্দেশের প্যাকেটগুলো টেবিলের ওপর রেখে খুলে দেয়। 'আরে, তুমি কি ভীম নাগ পুরোটা তুলে এনেছ?'

সন্দেশে তখন সবারই মুখ ভর্তি। অনেকে অনেকটা একসঙ্গে মুখে নিয়েছে, তাদের গাল ফোলা। দু-একজনের ঠোঁটের কোণ দিয়ে সন্দেশের ছানা বেরিয়ে এসেছে। সন্দেশের রকমও বিচিত্র। কেউ বাঁ-হাতে মুখেরটা ধরে রেখে ডান হাতে আর-এক রকম ধরে রেখেছে।

'এই দ্যাখো। ভীম নাগ দেখে সব শত্রুমিত্র ভুলে গেছে। সুভাষ বোস কংগ্রেস প্রেসিডেন্টে জিতলে ইস্পাহানি শিল্ড জিতবে কেন? ও না মুসলিম লিগের টেররিস্ট!'

ইস্পাহনি কোনো সন্দেশ নেয়নি। ও বাংলা বলতে পারে না, উর্দু-ইংরেজি-বাংলা মিশিয়ে বলে ওঠে, কংগ্রেস কংগ্রেসই থাকবে, লিগও লিগই থাকবে, ইস্পাহানিও ইস্পাহানি থাকবে, তাই বলে কলকাতার ছেলে বাঙালি সুভাষ বোস জিতলে ফুর্তি হবে না?

'এই ইস্পাহানি, তুমি কী করে কলকাতার হও আর বাঙালি হও। ব্যাটা আপকানট্রি—'

জেতার পর একটু কনসেশন দেন বেরাদররা। আমি তো ভাবলাম আমার হাতের ছোঁয়া আপনারা খাবেন কী না। ভীমনাগের দোকান ক্রস করতে গিয়ে মাথায় খেলে গেল—মিষ্টি, ফল আর লুচিতে নাকি জাতপাত লাগে না।—এই কথাটা ইস্পাহানি বেশ হাততালি দিয়ে বোঝাতে পারল।

উত্তরে কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'এতই যদি শাস্ত্র জানো, পুঁটিরামের কচুরি আনলে না কেন এক ঝুড়ি? শুধু মিষ্টিতে জিভ ধরে যায়—না?'

এমন কথায় কে-একজন সন্দেশভর্তি মুখে এমন দুর্দমনীয় হেসে ফেলল যে বাতাসে ছানা ছিটিয়ে যায়।

কলকাতায় যেমন, তেমনি লাহোরে, মাদ্রাজে, এলাহাবাদে, (ত্রিবাঙ্কুরে ও) মহীশূরেও কংগ্রেস-মহলে খুব ফুর্তি হয়েছিল, সুভাষ রাষ্ট্রপতি ভোটে জেতায়। বাংলা ও এই পাঁচটি প্রদেশকেন্দ্রে সুভাষ ভোট পেয়েছিলেন ১১৫১টি। তার মধ্যে, এক বাংলারই ছিল তো ৪০৪টি ভোট। আর পট্টভি সীতারামাইয়া তাঁর নিজের জায়গা অন্ধ্রেই পেয়েছিলেন ১৮১টি। বাংলার কংগ্রেসসদস্য ছিল বেশি। আবার তেমনি ভুলাভাই-মহাদেব ভাই-বল্লভ ভাইয়ের গুজরাটে সুভাষ পেয়েছিলেন ৫টি ভোট আর সীতারামাইয়া পেয়েছিলেন, ১০০ ভোট। বিহারেও সীতারামাইয়া আর সুভাষ পেয়েছিলেন, ১৯৭ আর ১০, যথাক্রমে। এক পাটনাতেই ভোটের প্রচারে গিয়ে সুভাষ সংগঠিত প্রতিবাদের মুখে পড়েন। তিনি তো তখনো কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি। সন্ধেবেলায় এক সিনেমা হলে জনসভা ডাকা ছিল। সেই সভাতে তাঁকে কালঝান্ডা দেখানো হয়, মঞ্চে জুতোটুতো ছোড়া হয় ও 'গান্ধীদুষমনি চলবে না' স্লোগান তোলা হয়। কে কোথায় কত ভোট পেয়েছেন, সেই সংখ্যার অনুপাত প্রদেশে কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যার ওপর নির্ভরশীল। তাতে বেশ পরিষ্কার দুটো বিপরীত গতি দেখা যায়। সেই সব প্রদেশেই কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা বেশি, যে প্রদেশগুলিতে কংগ্রেসের গান্ধী নেতৃত্বের ২১-২২ সালের সত্যাগ্রহ ও ৩১-৩২-এ দু-দফার অসহযোগ আন্দোলন ব্যাপকতর আকার নিয়েছে—বাংলা, মাদ্রাজ, গুজরাট, পাঞ্জাব, ত্রিবাঙ্কুর, হায়দরাবাদ, যুক্ত প্রদেশ। কংগ্রেসের যে-নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সুভাষ ভোটে দাঁড়ালেন, সেই নেতৃত্বের সংগঠিত এলাকায়ই সুভাষ বেশি ভোট পেয়েছেন। তারও ওপর পেয়েছেন কংগ্রেসের মধ্যে অন্যান্য যে-সব পার্টির লোকজন, কংগ্রেস র‍্যাডিক্যাল, সোস্যালিস্ট, কমিউনিস্ট বলে পরিচিত দলগুলি। যেমন, বাংলায়। সেখানে গান্ধী আন্দোলনের পক্ষে সমাবেশ, তুলনায় কম অথচ বিপ্লবী সশস্ত্র আন্দোলন বেশ বেশি। সেখানে সুভাষ বিপ্লবীদের ভোট পেয়েছেন বেশি। সীতারামাইয়া পেয়েছেন গান্ধীবাদী ও সংগঠন নেতৃত্বের ভোট। সুভাষ পেয়েছেন—গান্ধীবাদ-বিরোধী, সংগঠন-বিরোধী, অন্য রাজনীতিরও ভোট।

প্রদেশ কংগ্রেস অফিসে সন্দেশ খেয়ে যোগেন এলগিন রোডে যাবে বলে বেরতে গিয়ে কারো ডাক শুনে পেছন ফিরে দেখে, মনসুর আহমদ। যোগেনকে জিজ্ঞাসা করে, 'যাও কই?'

যোগেন জিজ্ঞাসা করে পালটা, 'তুমি আছো কই?'

মনসুরও পালটা বলে, 'তুমি ছিলা যেখানে।'

যোগেনও পালটা বলে, 'যাইব্যা লগে?'

'কোথায় যাবা কইলে যাই না।'

'কই নাই তো, আও তালি—'

মনসুর চেয়ার থেকে উঠে আসে। দু-জনে বড় দরজা দিয়ে বেরিয়ে রাস্তায় পড়ে। যোগেন জিজ্ঞাসা করে, 'ভাগের সন্দেশ খাইছ? পেট পুইর‍্যা?'

মনসুর বলে, সঙ্গে ঠোঁটের একটা ভঙ্গিও করে, 'খাইছি এক গণ্ডা—'

'মুখ দেইখ্যা তো মনে হয় পাচন গিলছ য্যান। সন্দেশ কি তিতা লাইগল?'

'সন্দেশ তো আর বিশল্যকরণী দিয়া বানায় নাই। তিতা খাওয়ার সাইধ হইলে ভ্যাড়েন্ডা পাতা খাও'।

'আমার যা খাওয়ার, তা খাব নে। খাইল্যা সন্দেশ, মুখডা বিজর‍্যাইয়া রাইখলা ক্যা? ইস্পাহানি আইনছে বইল্যা?'

'ধইরছ ঠিকোই, শালা চাঁড়ালের পো, বামুনের দিকে অষ্টপ্রহর চাইয়্যা থাকার অব্যাস তো। চোখ খুব একডা ভুল করে নাই।'

'আমারে চাঁড়াল বইললে তো গালি-দেয়া হয় না। হইয়া যায় সত্যকথন। কিন্তু আমারে গাইলের ছল কইর‍্যা নিজেরে বানাইল্যা বাউন? তার উপর তোমার মুখ আইঠ্যা হইয়া আছে ইস্পাহানির সন্দেশে—'

'দুধ মঙ্গলার দুহিয়াছে প্রসন্ন। আমার তো কোনো স্বত্ব নাই। সন্দেশ ভীমনাগের। আনিয়াছে ইস্পাহানি. তবে আমার মুখে যে-দুঃখভাব দ্যাখো সেইডার নিমিত্ত শুধু ইস্পাহানি না।'

'তাইলে তো তোমার দুঃখের বেশ বড় কেচ্ছা আছে। কও-না ক্যা?'

'শুনো মণ্ডল। তোমাগ থিক্যা নিকৃষ্ট জীব মনুষ্যসমাজে তো আর হয় না—'

'এত পচা পুরানা কথা কন যে তোমার লগে তো কথা কওয়াই মুশকিল। তা ছাড়া কইলকাতায় গুজব রটাইয়্যা থুইছ তুমি নাকী জ্ঞানীগুণী মানুষ। ঐ ফরিদপুরের পোলাডার নাকী বিলাতি ডিগ্রি। তারে দিয়্যা তামুক সাজাইয়্যা তো দৈনিক কাগজের সম্পাদকও হইছ। নতুন কথা কিছু শেখ নাই?'

'শিখছি। সেই শিক্ষাডাই তোমারে দিব্যার চাইছিল্যাম। কিন্তু তুমি নিল্যা না। জন্মের দোষ, কাটাইব্যা ক্যামনে?'

'শিক্ষাডা শুনি। নিব কি না-নিব বাদে ঠিক কইরব।'

'শিক্ষাডা হইল, যার সঙ্গে তোমার হাঁটা-যাওয়ার কথা ছিল না কিন্তু তোমার হাঁটাচলায় সে সঙ্গী হইয়্যা পইড়ছে, তার মুখে যদি দুঃখছাপ দ্যাহো, সে যদি তোমার আপনজনও হয়, জিগ্যাইও না। মাথায় গেল?'

'এ তো ভাবের কথা। এর আবার মাথার কাম কী?'

'মাথার কাম এই হানে যে তোমারে যদি অ্যাহন আমি কই—কইলকাতার এই ভীম নাগ-ভরত নাগের কতকগুল্যা ছানার দলা আমার জিভে রোচে না। তাও চার গণ্ডা খাইতে হইল ইস্পাহানি আইনছে বইল্যা। আমার এই দুইড্যা কারণের দুঃখের কথা যদি তোমারে কই, মানে, তোমার কথার জবে কই, তাইলে তো তোমারে জিগাইতে হয়—কেন আমি সন্দেশ আর ইস্পাহানি দুইডারেই একসঙ্গে অরুচি করি।'

'ও বোধ হয় সরল মনেই আইছে। সুভাষবাবুর জয়ে আনন্দ হইব্যার পারে না, ওর?'

'আরে, আনন্দের কি গুরুদশা? কেন? সুভাষবাবু কংগ্রেসের ভোটে জিতলে ওর ক্যান আনন্দ হইব?'

'এইডা কী কও? চেনাজানা মানুষ একজন নেতা হইলে আনন্দ হয় না?'

'আরে মুখ্যু। ও তো নেতা পোষে। খাওয়ায় দাওয়ায় হাতখরচা দ্যায়। জিন্নারে রাইখছে। নাজিমুদ্দিনরে রাইখছে। অ্যাহন, সুভাষবাবুরে যদি রাইখতে পারে, তালি আর বাকি থাকে কী?'

'হকশাহেব?'

'টাকার গন্ধ পাইলে তো হকশাহেব পা বাড়াইয়্যাই যাবে। চেষ্টা করছিল। পারছিলও খানিক। নাইলে কি এই সরকার হইত না চইলত? হকশাহেবরে তো লিগ বানাইয়্যা দিল? দিল না?'

'হকশাহেব এক পার্টির হইয়্যা জোহর আর ইশা-র নমাজ আদায় দেয় না। আর, দোষ হইল ইস্পাহানির?'

'হকশাহেবরে এত খাতিরদানের বিষয়ডা কী ইস্পাহানির?'

'দ্যাহো মনসুর! তোমার এই পোলাপানের নাগাল কথা বলা ছাড়ো যে-কথাডা তুমি জানো, সেইডা আর-এক জনের মুখে শোনা।'

'শুনাও-না, শুনাও। তাইলে আমিও হয়তো কিছুডা শুনাইব্যার পারি।'

'একডাও বাঙালি লিডার না পাইলে মুসলিম লিগ অল ইন্ডিয়া হয় ক্যামনে?'

'বাঃ। মণ্ডল, দেহি তোমারও তো বুদ্ধি খেলে। এইডা তালি মুসলিম লিগরা মানে? আর আমরা, বাঙালি মুসলমানরা, মানি না? না কী জানি না? তুমিও যা বুঝো মণ্ডল, হকশাহেব তা বুঝেন না, যে বাঙালিই তাঁর টেক্কা। ঐ টেক্কা ভাঙাইলে শের-ই-বাংলা হইয়্যা যাইবে বাঘের মাসি। মুসলিম লিগও জানে হকশাহেবের লিগ-হওয়ার কুনো স্থায়িত্ব নাই, হকশাহেবও জানে লিগেরও হকশাহেবরে নেতা মানার কুনো স্থায়িত্ব নাই।'

'খবরের কাগজে চাকরি করার এই এক বিপদ। প্রত্যেক দিন একই কথা নতুন কইর‍্যা লিখতে হয় আর প্রত্যেকদিন এডার সাক্ষী দিব্যার লাগে আইজক্যার খবরডাই সবথিক্যা নতুন।' ওরা একটা ট্রাম রাস্তায় পৌঁছে যাচ্ছিল। যোগেন হঠাৎ থেমে গিয়ে বলে, 'ঐ যে পানের দোকানডা, ওরে গিয়্যা জিগ্যান, ও-ও কইব, লিগ আর হকশাহেবের শাদি-তালাকের গল্প। ও তো কুনো কাগজের এডিটার না?'

'আল্লা। বেকুব কি এক বরিশালেই জন্মায়? ও যে এডিটার না, তা কবুল কইরতে ওরে এতডা খাটাখাটনি কইরতে হবে ক্যা? কপালে চক্ষু নাই? সেই চক্ষু-দুইডাতে দ্যাহা যায় না, ও পানই বানায়!' এইবার এডিটরি দ্যাহ। সামনে কর্পোরেশনের ভোট, নতুন আইনে, রিজার্ভ সিট নিয়্যা। সুভাষবাবুর মতো চেনা পুরানা মানুষ নেতা হইলে লিগের সঙ্গে তো সিটভাগ হইতেও পারে—মুখ খুইল্যা বা বুইজ্যা। অ্যাহন কি ইস্পাহানির সন্দেশ-রহস্য মাথায় গেল?'

ওরা একটা ট্রামস্টপেই দাঁড়িয়েছিল। ওখানে দাঁড়ালে পার্ক সার্কাস আর গড়িয়াহাটের ট্রাম পাওয়া যায়। শোনা যাচ্ছে ট্রাম নাকী বালিগঞ্জ স্টেশন পর্যন্ত বাড়ানো হবে।

জানুয়ারির শেষ। কলকাতার সবচেয়ে ঠান্ডা পড়ার সময়। সবচেয়ে বেশি ঠান্ডা পড়ে সাউথেই। যোগেন শুনেছে—আলিপুরেও নাকী খুব ঠান্ডা।

মনসুর বলে, 'খবর তো নতুন দিল্যাম, মণ্ডল, চুপ মাইর‍্যা গেলা ক্যান? কথা কও।'

'জানো মনসুর ভাই, তুমি ঠিকই বলছ, আমার মাথায় এই সব ঠিক ঢুকে না। কিন্তু সবাই যহন সবই জানে দেহি, তহন কখনো-কখনো মনে হয়, ঐ, তুমি যা কইল্যা, অত কথা বোঝার মত মাথা না। কিন্তু আমাগর এমন মানুষ আছে, জানো, যারা এইসব খুব ভালো বুঝে। ঐ যে আমাগ মন্ত্রী মল্লিক।' ট্রাম এসে যাওয়ায় যোগেন ওঠে, পেছনে মনসুর। সিটে বসে যোগেন যে-কথা বলছিল, সেটা শেষ করে, 'এই কংগ্রেসের ভোটাভুটি নিয়ে তো সুভাষবাবুর একটু-আধটু কাজ করল্যাম, তাতে তো দেখি, দেশের যারা আস্ত-আস্ত মাথা, সেগুল্যাও খুব পরিষ্কার মাথা না। তাইলে আমাগ লেভেলে তো এই হিশাব কাজ করতেই পারে কারো মাথায়, কর্পোরেশন ভোটে লিগের সুবিধা হব্যার পারে যদি কংগ্রেসের সঙ্গে ভাবসাব করা যায়, ভাবসাব রাখা যায়। কংগ্রেস যদি চায় তাইলে তো হকশাহেবের সঙ্গে সরকারই কইরব্যার পারে।'

'মণ্ডল, তুমি যেইডা ভাবছ, সবডা সেরকম সাজানো না। ধরো, নিজের কথাই কই। আমি মুসলিম লিগ অপছন্দ করি। ভিতর থিক্যা। কিন্তু আমি মুসলমান বইল্যা একডা গর্ব আছে। সেই জন্যই কৃষকপ্রজা। তার নেতা যদি কৃষক ভুইল্যা, প্রজা ভুইল্যা, নিজেই মুসলমান হইয়্যা যায়, তাইলে আমাগ জায়গাডা কই? সুভাষবাবু সম্পর্কে হিন্দুমুসলমান সব মানুষের একটা বেদ্না আছে। অ্যাহন, সুভাষবাবু যদি মুসলমানদের সঙ্গে এমন একডা ব্যবস্থা করেন যে মুসলমান মুসলমানই থাকবে, থাইক্যাও দেশের ব্যাপারে তাগ একমত হওয়ার বাধ্যতা নাই। অবস্থা যা খাড়াইতেছে আমার কেমন ভয় করে যোগেন, আমিই-না কোনদিন লিগ হইয়্যা যাই।'

যোগেন সুভাষবাবুর সঙ্গে চোখের দেখাটুকু সারতে এলগিন রোডে আসছিল, মনসুর সেটা

বুঝেই তার সঙ্গ নিয়েছে।

এলগিন রোডের বাড়িতে ভিড় থাকবে, সেটা যোগেনের আন্দাজই ছিল। বাড়ির লোকজন তো তাকে চেনেজানে। এটাও জানে, যোগেন যে এ-বাড়ি ও-বাড়িতে সব সময়ই আসা-যাওয়া করে, সেটা সুভাষ বাবুরই কাজে। এখন দেখে, ভিড় বাইরের গেট ছাড়িয়ে পথে। মনসুরকে নিয়ে এই ভিড় ঠেলবে কী করে? সুভাষের সঙ্গে তো মনসুরের 'তুমি'র সম্পর্ক, সুভাষ পর্যন্ত যাবে কী করে?

যা হোক, বাড়ির কাজের লোকদেরই কেউ যোগেনকে চিনতে পেরে কাছে এসে বলে, 'আপনি আমার সঙ্গে আসুন।' যোগেন বলে, 'উনি আছেন আমার সঙ্গে।' লোকটি বলে, 'হ্যাঁ, আসুন'।

লোকটি ভিড়টার মধ্যে ঠেলেঠুলে ঢুকে গিয়ে কম আলোর সরু একটা প্যাসেজ দিয়ে বাড়ির পেছনে একটা লোহার প্যাঁচানো সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়ায়। সিঁড়ির মাথায় আলো আছে। লোকটি বলে, 'এই সিঁড়ি দিয়ে উঠে যান, স্যার।'

মনসুর বলে, 'যদি চোর বলে মারে?'

লোকটি হেসে বলে, 'আমরা তো এই সিঁড়ি দিয়েই উঠছি-নামছি। কিছু হবে না।'

মনসুর বলে, 'যোগেন, এক্ষেত্রে সিংহের গহ্বর থিক্যা কোনো নিষ্ক্রমণের পদচিহ্ন নাই। সুতরাং তুমিই অগ্রে প্রবেশ করো।'

'অগ্র পশ্চাতে খুব একটা তফাত হব বইল্যা তো মনে নেয় না,' যোগেন বেশ পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে উঠে যায়। মনসুরও। আর, দেখে একটা দরজা খোলাই আছে। তারা নির্ভয়ে সেই দরজা দিয়ে ভিতরের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে যায়।

সেই ভিড়ের মধ্যেই পেছন থেকে মনসুর বলে, 'যোগেন, সুভাষবাবুর সঙ্গে চোখাচোখির চেষ্টাও কইরো না। সিধা সদর সিঁড়ি দিয়্যা রাস্তায় নাইম্যা যাও। উঠাইব্যার লোক মেলে, নামাইব্যার লোক মেলে না যোগেন।'

যোগেন আন্দাজ করে সামনে ডানদিকের দেয়াল শেষ হলেই যে-ঘর সেখানেই সুভাষবাবু আছেন।

যোগেনের আন্দাজ ভুল হওয়ার কথা নয়, ঐ ঘরেই সুভাষবাবু দরজার দিকে মুখ করে বসে। একটু এগতেই যোগেনকে তিনি দেখে হাত তোলেন। যোগেন বোঝে, আর কাছে যাওয়ার চেষ্টাও ঠিক হবে না। সে দাঁড়িয়ে পড়ে, পেছন থেকে মনসুরকে টেনে সামনে আনে। তখনো সুভাষের দৃষ্টি সরে যায়নি। যোগেন আঙুল দিয়ে মনসুরকে দেখায়। মনসুর আদাব জানিয়েছিল, সুভাষবাবু চোখ বড় করে বলে ওঠেন, 'ম-ন-সু-র'।

মনসুর সামনের লোকজনকে হাত-কনুই দিয়ে সরিয়ে এগিয়েই যায়। যোগেন এগয় না। যোগেন দেখে, মনসুর ঘরের ভিতরে ঢুকে গেল।

তার পরই দেখে, সুভাষবাবু মনসুরের হাত ধরে আছেন আর মনসুর তাঁর কানে-কানে কী বলছে। শুনে, সুভাষবাবু ভুরুতে দাগ তুলে একটা কিছু জিজ্ঞাসা করলেন। মনসুর আবার তার মুখ সুভাষবাবুর কানের কাছে নিয়ে কিছু বলতেই, সুভাষ তাঁর হাতে ধরা মনসুরের হাতটা ঝাঁকিয়ে ওঁর সেই উজ্জ্বল হাসিটা হেসে উঠলেন। মনসুর বেরিয়ে আসা শুরু করে।

বেরিয়ে আসার সময় খুব কিছু ঝামেলা হল না, সুভাষবাবুর এক ভাইঝি কিছুতেই মিষ্টি না খাইয়ে ছাড়ল না। ঐ ভিড়ের মধ্যে ডিশে দুটো রসগোল্লা, রস না-গড়িয়ে ও মেঝেতে না-ফেলে খাওয়ার ঝামেলা যোগেন মিটিয়ে ফেলে দুটো রসগোল্লাই একসঙ্গে মুখে পুরে গাল

ফুলিয়ে সিঁড়ির দিকে হাঁটা দিয়ে।

মনসুর অবাক হয়ে পেছন থেকে যোগেনকে দেখে বলে, 'ডিশটা নীচে রেখে যাব'। সে আধখানা রসগোল্লা চিবুতে-চিবুতে ও দেড়খানা রসগোল্লা ডিশের ওপর গড়াতে-গড়াতে সিঁড়ি বেয়ে তাড়াতাড়ি যোগেনকে ধরতে, প্রায় ছোটে।

ডিশটা মনসুর বেরবার সিঁড়ির পাশেই রাখে রাস্তায় নেমে দু-জনেই একসঙ্গে হেসে ওঠে, যেন খুব মজা হল।

মনসুর বলে, 'পারল্যাম না। কইয়্যা দিল্যাম। ছোট ইস্পাহানি প্রদেশ-কংগ্রেসে সন্দেশের পাক বসাইছে'।

'আপনার ব্যাখ্যাডাও কইলেন?'

'আমি কি তোর নাগাল বেকুফরে। সে-সব তো কওয়া যায় রাজনৈতিক ডিসকাশনের টাইমে।'

'সব কিছুর পরও সুভাষবাবু তো আর দেশের শত্রু নন'

১১১

৩১ জানুয়ারিও যোগেন উডবার্ন বা এলগিন মুখো হয়নি। ১ ফেব্রুয়ারি বেশ রয়েসয়ে এলগিনে গিয়ে কাউকে কোনো তাগাদা না দিয়ে ও সুভাষের সঙ্গে দেখা না করে টানা বারান্দার রেলিঙে লাগানো কাঠের চেয়ারটায় গা এলিয়ে পাশের গোল শ্বেত পাথরের টেবিল থেকে সেদিনের 'ফরোয়ার্ড' কাগজটা তুলে ভাঁজ খোলে। দেখে, নীচে, 'বঙ্গবাসী'ও আছে। যোগেনের দু-হাতে 'ফরোয়ার্ড' মেলা, অথচ তার ঘাড় ডানদিকে ঘোরানো, 'বঙ্গবাসী'র পৃষ্ঠায়। সেখানে তার চোখ আটকে থাকে—'ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে', এইরকম একটা এক-কলমি টানা লেখায়। যোগেন টেরও পায় না, কখন সে 'বঙ্গবাসী'র লেখাটাই পড়তে শুরু করেছে। নিখিল ভারত কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সুভাষ বোসের সঙ্গে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বিবাদে বাংলার মুসলিম লিগের হর্ষের কারণ কী—তা নিয়ে লেখকের দুশ্চিন্তা। যার যে-বিষয়ে ইচ্ছা, সে, সেই বিষয়ে কি দুশ্চিন্তা করতে পারে? কংগ্রেসকে সারা ভারতের কথা ভাবতে হয় আর লিগ বা পাঞ্জাব পার্টি বা সিন্ধু পার্টিকে কেবল নিজ-নিজ প্রদেশের ভাবনা ভাবলেই মুসলমানদের চলে ও গান্ধী-সুভাষ বিবাদ হলে মুসলমানরা উলুখাগড়ার মতো মারা পড়ার ভয় পায় না বরং তাহারা ঘোলা জলে মৎস্যশিকারের সম্ভাবনায় ঘুমের ঘোরে খোয়াব দেখিতে চায়।

যোগেন 'ফরোয়ার্ড'-এ ফিরে আসে। বাংলা কাগজে প্রতিদিন অন্তত চার-পাঁচটি মারামারি, কাটাকুটি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, আগুন লাগানো ও পাশবিক অত্যাচারের খবর ছাপা হয়। বাংলা কাগজের কোনো নিরপেক্ষতার দেখনদারি নেই। তারা অবশ্যই এক পক্ষের সমর্থক। ফলে, কেন মারামারি, কী মারামারি, হারজিৎ কী, সরকারের ভূমিকা এ-সব নিয়ে কোনো খবরই থাকে না। তারপর 'জনৈক আলি নামধেয় মুসলমান', বা 'বাংলা অক্ষরজ্ঞানহীন মাদ্রাসার মৌলবি'—এই সব বর্ণনায় অস্পষ্টতা আরো বাড়ে ও সেটাই অবশেষে নানা গুজবের কারণ হয়ে ওঠে।

যোগেন 'ফরোয়ার্ড'কে কাগজের মতো ভাঁজ করে চোখের ওপর মেলেই চমকে সোজা

হয়ে বসে। 'মহাত্মা আডমিটস ডিফিট ফ্রম সুভাষ।' এক পাতার খবর চার-পাতায় গেছে।

রাষ্ট্রপতি-নির্বাচন নিয়ে গান্ধীজির একটি বিবৃতিও ছাপা হয়েছে। কাগজ পড়ার একটা গতি আছে। সেই গতিতে অভ্যাসমত পড়তে গিয়ে যোগেন হোঁচট খায়, কাগজের লেখায় এমন শ্বাসরোধী হিংসা ও চিন্তাশীল খুব বেশি দেখা যায় না। যারা হিন্দুদের বা মুসলমানদের খেপাতে চায়, তারা কোনো সূক্ষ্মতার ধার ধারে না। সব একেবারে, 'গর্জিলা মোহনলাল, নিকটে শমন।' এটা গান্ধীজির লেখা?

'শ্রীসুভাষ বোস হ্যাজ অ্যাচিভড্ এ ডিসাইসিভ ভিক্টরি। আমাকে স্বীকার করতেই হবে, শুরু থেকেই আমি তাঁর পুনর্নির্বাচনের দ্বিধাহীন বিরোধী।...তিনি যে-সমস্ত তথ্য ও যুক্তি তাঁর প্রচারের জন্য ব্যবহার করেছেন, তার কোনোটার সঙ্গেই আমি একমত নই। আমি মনে করি তাঁর সহকর্মীদের সম্পর্কে তিনি যে-সব কথা বলেছেন, সে-সব অপ্রমাণিত ও বিশ্বাস-অযোগ্য। তবু আমি তাঁর জয়ে খুশি। যেহেতু আমি শ্রীযুক্ত পট্টভিকে নির্বাচন থেকে সরে আসতে নিষেধ করি, তাই, এ-পরাজয় যতটা তাঁর তার চাইতে বেশি আমার। ...এটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে, যে-সব নীতি ও মতের পক্ষে আমি দাঁড়াই, তার কোনোটাই কংগ্রেস-প্রতিনিধিরা স্বীকার করেননি।

'এই পরাজয়ে আমি খুব খুশি। যাঁদের তিনি দক্ষিণপন্থী বলেন, তাঁদের কষ্টকর সমর্থন নিয়ে সুভাষবাবুকে রাষ্ট্রপতি হতে হয়নি, তিনি একটি প্রত্যক্ষ নির্বাচনী দ্বন্দ্বে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। এর ফলে, কোনো দেরি না করে একটি সমস্বত্ব ওয়ার্কিং কমিটি তৈরি করে তিনি তাঁর কর্মসূচি পালন করতে পারবেন। ...সর্বোপরি, সুভাষবাবু তো দেশের শত্রু নন। তিনি দেশের জন্য কষ্ট ভোগ করেছেন। তাঁর মতে, তাঁর কর্মসূচি ও পরিকল্পনাই সবচেয়ে সাহসী ও অগ্রসর কর্মসূচি। যাঁরা সংখ্যালঘু হয়েছেন তাঁরা [সুভাষবাবুর] সুভাষবাবুর কোনো কাজে নিশ্চয়ই বাধা দেবেন না। সাহায্য যদি নাই করতে পারেন, তাঁরা অন্তত গরহাজির থাকতে পারেন।

'কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্টদের মধ্যে একটা দিকে মিল আছে। কংগ্রেস সংগঠনের অভ্যন্তরীণ শুদ্ধতা। 'হরিজন'-এ আমার লেখাগুলিতে দেখানো হয়েছে কংগ্রেস যেভাবে তাদের সদস্য তালিকা তৈরি করছে, পাতা ভর্তি করছে বোগাস সব সভ্যদের নাম লিখে। কয়েকমাস ধরেই আমি এই সদস্যতালিকা ঠিক করার কথা বলে আসছি। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে স্ক্রুটিনি করলে যারা বোগাস সভ্যদের ভোটে জিতেছেন, তারা তাঁদের পদ হারাবেন। অতটা আমি এখনই করতে বলছি না। খাতা থেকে বোগাস সভ্যদের নাম বাদ দিতে পারলেই যথেষ্ট, ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটতে না পারে।

যাঁরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছেন, তাঁদের হতাশ হওয়ার কিছু নেই। কংগ্রেসের বর্তমান কর্মসূচিতে যাঁদের আস্থা আছে, তাঁরা সংখ্যাগুরুই হন আর সংখ্যালঘুই হন, এমন কী, তাঁরা কংগ্রেসের ভিতরে থাকুন আর বাইরেই থাকুন—তাতে কংগ্রেসের কর্মসূচি অনুযায়ী কাজ করতে কোনো বাধা ঘটবে না।

'একমাত্র পার্লিয়ামেন্টারি কর্মসূচি সংগঠনের এই বদলা-বদলির কারণে ব্যাহত হতে পারে। এই সাংগঠনিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণিত হওয়ার আগেই কারা মন্ত্রী হবেন ও তাঁদের প্রধান কর্মসূচি কী হবে, তা পূর্ববর্তী সংখ্যাগরিষ্ঠরা স্থির করে দিয়েছেন। কিন্তু পার্লিয়ামেন্টারি কর্মসূচি আর কংগ্রেসের সামগ্রিক কর্মসূচির কতটুকু? কংগ্রেস-মন্ত্রীদেরও তো একদিনের পর আর-একদিন কাটাতে হবে। কংগ্রেসের নীতির সঙ্গে মতৈক্য সত্ত্বেও তাদের মন্ত্রিত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া হল বা কংগ্রেসের নীতির সঙ্গে মতানৈক্যের কারণে তাঁরাই পদত্যাগ করলেন—এতে খুব একটা

কিছু আসে যায় না।

'সব কিছুর পরও, সুভাষবাবু তো আর দেশের শত্রু নন। তিনি দেশের জন্য কষ্ট করেছেন। তিনি মনে করেন, তাঁর নীতি ও কর্মসূচিই সবচেয়ে অগ্রণী ও সাহসী। সংখ্যালঘুরা তাঁর সাফল্য কামনা করতেই শুধু পারে। তারা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের সঙ্গে একই বেগে চলতে না পারে, তাদের তাহলে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। যদি তাদের পক্ষে সম্ভব হয়, তা হলে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠের শক্তি বাড়াতে পারে।

'কিন্তু সংখ্যালঘুরা কোনো অবস্থাতেই যেন বাধা না দেয়। তারা সাহায্য করতে না-পারলে, সরে থাকবে। সমস্ত কংগ্রেসিকে আমি মনে করিয়ে দিতে চাই, কংগ্রেসের সবচেয়ে বড় প্রতিনিধি তারা যারা স্বেচ্ছায় কংগ্রেসের বাইরে থাকে। সুতরাং কংগ্রেসের ভিতরে যারা এখন থাকতে অস্বস্তিবোধ করবে, তারা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, কোনো অসদিচ্ছায় নয়, কংগ্রেসকে আরো ফলপ্রসূ ও সদিচ্ছুক সেবা করতে।'

পড়তে-পড়তে যোগেন ক্রমেই এতই অবিশ্বাস করছিল যে খবরটা শেষ করার পর তার মনে হল সে বোধহয় ঠিকঠাক পড়েনি। তার কেমন অবিশ্বাস্য লাগছিল। মহাত্মা গান্ধী—যাঁর নামে মুমূর্ষু বেঁচে ওঠে, স্পর্শে নিরাময় ঘটে, যিনি ভারতের প্রতীক, তিনি সুভাষকে বলছেন—মিথ্যাবাদী, বলছেন—তার নির্বাচন হাস্যকর, অমানুষিক শ্লেষে সুভাষের ব্যাজস্তুতি করেছেন, সুভাষের চাইতে নিকৃষ্ট সভাপতি হতে পারত এক দেশের কোনো শত্রু, সুভাষের জেলখাটাকে পর্যন্ত উপহাস করেছেন। যেন সুভাষ সকলেরই বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছেন—এমনভাবে তিনি প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলিকে ভয় দেখালেন। আর, নিজের ঘোঁটকে বুদ্ধি বাতলালেন, কী করতে হবে। সে আবার মাথা থেকে পড়তে শুরু করল, 'মহাত্মাস স্টেটমেন্ট অন বোসেজ ভিক্টরি।' তারপর প্রত্যেকটা বাক্য আলাদা-আলাদা, যেমন সূক্ষ্মতায় একটা জটিল সম্পত্তি মামলায় দুর্বল পক্ষের উকিল হয়ে সে কোনো পুরনো নথি পড়ে।

যতই এগচ্ছিল, ততই যে সে তার প্রথম পাঠের কোনো ভুল ধরতে পারছিল না, তাতেই তার মনখারাপ হয়ে যাচ্ছিল। সারা দেশের মানুষ যাঁকে অবতার মনে করে, যাঁর প্রত্যেকটি কথা দেশের কোটি-কোটি মানুষের কাছে ভগবানের নির্দেশ, যাঁকে নিয়ে সকলেই ভাবে ব্রিটিশরাজের পর গান্ধীরাজ, যিনি বারবার দেশের কোটি-কোটি মানুষকে শিখিয়েছেন—অহিংসা মানে শুদ্ধতম মনের পরম সাহস, তিনি এই বিবৃতি দিয়েছেন তাঁর পুত্রসমান এক কংগ্রেস-নেতা সভাপতির পদে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জিতেছেন বলে? সাংসারিক জীবনেও তো এ-ব্যবহার চলে না।

কিন্তু এই ব্যবহারের একটা সমতুল্যতা যোগেনের মাথায়, মনে, স্মৃতিতে, শ্রুতিতে কোথাও যেন আছে, কোথাও যেন আছে তার সেই জীবনে, যাকে অস্তিত্ব বলা যায়। নিজের অধিকার-অন্ধ কোনো দুই-হাত, দুই-পা, একটা মাথাওয়ালা কোনো মানুষ, যে তার নিজের মাথাটা দেখতে পায় না, তেমন দেখা শারীরিক সম্ভবের বাইরে বলে, কিন্তু তার নিজের কাছেই অদৃশ্য তার মাথা-ঘেরা একটা জ্যোতির্বলয়ের তাপ সে পেয়ে যায়, তেমন পাওয়া সামাজিক সম্ভবের বাইরে নয় বলে, আর সে নিজেকে বিশ্বাস করে ফেলে যে সে শুধুই শাস্ত্রের বিধান প্রয়োগ করছে, সে নিজেকে এতটাই বিশ্বাস করে ফেলে যে তার নিজের বাইরে কোথাও নৈতিকতা নেই, সে যে সেটা চায় তা নয়, কিন্তু ঈশ্বর তাকেই বেছেছেন। যোগেন টের পায় সমতুল্য যে-দৃষ্টান্তটা বিদ্যুতের মতো ঝলসে ওঠেনি, সেটাই অব্যর্থ ধীর সম্মুখগতিতে একটা আকার নিচ্ছে। নিচ্ছেই। নিচ্ছেই। যোগেন তার রক্তের পুরুষানুক্রমিক রাসায়নিক কণাগুলি বহন করে এনেছে লাঞ্ছনের

দণ্ড, পাপের প্রায়শ্চিত্ত, নির্বাসন-আদেশ, অস্পৃশ্যতার বিধান। গান্ধীজি সুভাষকে শূদ্রের জীবনে নিক্ষেপ করলেন। যোগেন সুভাষের জন্য মর্মান্তিক এক বেদনার উত্থান টের পায় নিজের মধ্যে।

যোগেন আত্মস্থ হওয়ার দরকার বোধ করে।

এ-বাড়িতে এই সদর বারান্দায় এতক্ষণ সে বসে আছে অথচ একজনও কেউ এল না, এটা তো অস্বাভাবিক। কতক্ষণ এসেছে যোগেন। চেয়ারের দুই হাতল ধরে সোজা হতেই যোগেনের ডানদিকের প্যাসেজ দিয়ে সুভাষ এসে দাঁড়ালেন, স্মিত হাসিতে।

'কী এমন পড়ছিলেন, যেন অর্জুনের লক্ষবেধ। দু-বার এলাম, ফিরে গেলাম। খবর দিলাম—কেউ যেন এদিকে না আসে—'

যোগেন উঠে দাঁড়িয়েছিল, একটু হাসির চেষ্টা করে বলল, 'তাই বলেন, আর আমি তো ঝিমাচ্ছিলাম, বারবার চায়ের কাপের দিকে আঙুল বাড়াইছিলাম'। যোগেনের নিজের স্বর তার নিজেরই কাছে এত মিথ্যা শোনায়। কিন্তু সুভাষ সে-মিথ্যা শুনলেন না। জিগগেস করেন, 'এখানে বসতে ভালো লাগছে না কী ঐ ঘরের যাবেন?'

'ও-ঘরে কী আছে?'

'আপনার জন্য ফাইল বানিয়ে রেখেছি। নানা জায়গা থেকে নানা রকম চিঠিপত্র আসছে, লোকজনের, নানা স্থানীয় সংগঠনের, এক-এক জায়গার এক-এক পেশার? দেখুন, যোগেনবাবু, এই চেতনাটা কিন্তু চর্চা ছাড়া আসে না। বিবেকানন্দ যেমন সারা দেশ পরিব্রাজক হয়ে ঘুরে বেরিয়েছিলেন, আমার খুব ইচ্ছে ছিল...'

'কেন? আপনার ঘোরাঘুরি কি একটু কম হচ্ছে?'

'এটা আবার ঘোরাঘুরি নাকী? এ তো ভ্রমণ, টুর—'

'আর মিটিংগুলার হিশাব নাই, আপনার মিটিঙে তো ভিড় হয় খুব।'

'তা হয়। বাংলার লোকজনের তো মিটিং শোনার অভ্যাস বহু পুরনো। বক্তৃতা করতে শেখাটা বোধহয় শাহেব হওয়ার পার্ট ছিল। তা ছাড়া বাঙালিরাই তো প্রথম উকিল হল, না?'

'এখন তো বাংলা-বাংলা করলে হবে না। এখন তো ভারত-ভারত করতে হবে।'

'সে কী? আমার আর কী বদলাল? পেনশন নেই নি, এই তো? যা বলছিলাম, পরিব্রাজক হওয়ার সাধ মেটালাম আমার আত্মজীবনীর নাম 'ইন্ডিয়ান পিলগ্রিম' দিয়ে।'

'তাতেই তো আপনার নেতারা এত রাইগ্যা গিছেন। আমরা সব বুড়া, খোঁড়া, অকম্মা, দক্ষিণপন্থী আর উনি আসছেন কল্কি অবতার।'

'আমার ও আমার সঙ্গে যাঁরা একমত তাঁদের, উদ্দেশ্য ছিল, একটা গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের সংবিধানে যদি নির্বাচনের কথা থাকে, সেটাকে সর্বসম্মতি মনে করা হবে কেন? একটা গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল তার কর্মসূচি ও আন্দোলনের জন্য কেন একজন মাত্র নেতার ওপর নির্ভর করবে? বিকল্প প্রস্তাবকে সমমর্যাদা দেয়া হবে না কেন? কেনই-বা একজন নেতার ব্যক্তিগত নীতিবোধ—অহিংসা, চরকাকাটা, খদ্দর পরা—একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্যের শর্ত হবে? ভোটের সুযোগে এই কথাগুলো তো ওঠানো গেল। কংগ্রেসে অবিশ্যি বরাবরই এমন তর্কাতর্কি দিয়েই মীমাংসা হয়ে থাকে। এবারও হবে।'

'এ নিয়্যা আমার তো কোনো মত দেয়া চলে না। এ-বিষয়ে আমার কোনো পড়াশুনাও তো নাই।'

'এ তো সকলের জানাই। ১৯০৫-এ স্বদেশী নিয়ে তর্ক। বিপ্লব নিয়ে তর্ক। সুরেন ব্যানার্জি। অরবিন্দ। তারপর, নরমপন্থী-চরমপন্থী। তারপর, কাউন্সিলের ভিতর-বাহির, তারপর

গান্ধী-দেশবন্ধু-স্বরাজ্য পার্টি, তারপর বিপ্লবী হিংসা ও অবিপ্লবী অহিংসা, এখন এই ভোট নিয়ে—'

'এটাকে কী বলা যাবে—গান্ধীবাদ বনাম সুভাষবাদ?'

'এটা কী রকম মুশকিল, বলুন। ভোটের কথা তো কংগ্রেসের সংবিধানে আছে। কেউ যদি দাঁড়ায়, তখন তাকে বলতে হবে গান্ধীবিরোধী। গান্ধীবিরোধী মানে কংগ্রেস বিরোধী? দেশের সামনে কতগুলো সমস্যায় কোনো নেতৃত্ব নেই? হিন্দু-মুসলমান। হিন্দু-তপশিলি—গান্ধীজি বললেন মন্দিরে ঢোকার অধিকার পেলেই শূদ্র আর শূদ্র থাকবে না। জমিদার-কৃষক—গান্ধীজি বললেন জমিদার কৃষকের ট্রাস্টি হিশেবে কাজ করবে। এগুলো নিয়ে সারা দেশে ঝড় তুলতে হবে, ঝড়। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিটা তৈরি হয়ে গেলেই প্রোগ্রামগুলো ভাবতে হবে।'

'ওয়ার্কিং কমিটি নিয়ে কোনো গোলমাল হবে না তো?'

'কংগ্রেসের সংবিধান এ-সব নিয়ে পরিষ্কার! গান্ধীজি দ্বিমত না হলেই হয়।'

'ভোটের সঙ্গেই তো তাঁর দ্বিমত!'

'চিঠি লিখি। তারপর যাব।'

সুভাষ বা যোগেন কেউ গান্ধীজির বিবৃতির কথা তুললেনই না।

সুভাষ গান্ধীর কাছে ও গান্ধীবাদীদের কাছে বিনীত চিঠিপত্র লিখতে লাগলেন—যাতে ভুল বোঝাবুঝি কেটে যায়।

কাটল না।

১৫ ফেব্রুয়ারি সুভাষ গেলেন গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতে। ঘণ্টা তিন তাঁরা একসঙ্গে ছিলেন। কিছুই মিটল না। এমন কী, তাঁর জয়ের পর গান্ধীজির বিবৃতি নিয়েও কোনো কথা হল না।

কলকাতায় ফিরতে-ফিরতেই সুভাষ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ২২ ফেব্রুয়ারি (৩৯) ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং ডাকা ছিল, ওয়ার্ধায়। সুভাষ বল্লভভাই প্যাটেলকে তাঁর অসুস্থতার কথা বলে জানালেন, তাঁর অনুপস্থিতিতে যেন কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া না হয়। সুভাষ ভয় পেলেন, তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে ওয়ার্কিং কমিটি আবার কিছু গোলমাল না পাকায়।

অপমান বোধ করলেন ওয়ার্কিং কমিটি। নেহরু ও শরৎ বোস ব্যতীত বাকি সকলে পদত্যাগ করলেন। নেহরুও করলেন, পরে, একটা আলাদা চিঠিতে।

ত্রিপুরীতে কংগ্রেস অধিবেশন হওয়া ঠিক ছিল ১০ মার্চ। সুভাষ তখন সবচেয়ে অসুস্থ। তাঁর অসুস্থতা সম্পর্কে সন্দেহ করে কংগ্রেস-নেতাদের নানা মন্তব্য ও তাঁদের অনুগামীদের বানানো সব গুজব। ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও সুভাষ ১০৪ ডিগ্রি জ্বর নিয়ে রওনা হলেন। দাদা শরৎ বোস ও ডাক্তার-দাদা সুনীল বোস ও তাঁর স্ত্রী তাঁর সঙ্গে গেলেন।

ত্রিপুরীতে গোবিন্দবল্লভ পন্থ একটা প্রস্তাবে বললেন, গান্ধীজি কংগ্রেসের নেতা ও তিনি আমাদের পরিচালনা করেছেন। তাঁর নেতৃত্ব ছাড়া কংগ্রেস কোনো পথ পাবে না। কংগ্রেস রাষ্ট্রপতিকে গান্ধীজির ইচ্ছা ও উপদেশ অনুযায়ী নতুন ওয়ার্কিং কমিটি তৈরি করতে হবে। বামপন্থীদের যে-ঐক্যের ফলে সুভাষ রাষ্ট্রপতি পদে জিতেছিলেন, মাত্র ৪১ দিনে সে-ঐক্য খানখান হয়ে গেল। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে কংগ্রেসের আপোশ হয়ে গেল। পন্থ-প্রস্তাবে কংগ্রেস সোস্যালিস্টরা নিরপেক্ষ থাকলেন। পন্থপ্রস্তাব পাশ হয়ে গেল।

ত্রিপুরী অধিবেশনের পর থেকে অসুস্থ শরীরেও সুভাষ গান্ধীজি ও নেহরুর সঙ্গে মার্চ-এপ্রিল দুই মাস চিঠিপত্র লেনদেন করতে লাগলেন। শরৎ বোসও গান্ধী ও নেহরুকে আলাদা চিঠি দিলেন। এই সব চিঠিই ছিল গান্ধীজির আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা আর সুভাষের পাশে পুরোপুরি না-দাঁড়ানোর অপরাধে নেহরুকে অভিযোগ।

কলকাতা এআইসিসি ৩৯

কিন্তু কিছুতেই কিছু বদলাল না।

অথচ এ-আই-সি-সি যথাসময়ে হচ্ছে।

১১২

বরং এই চিঠিপত্রের সুযোগে গান্ধীজি তাঁকে আরো তুচ্ছ করতে পারলেন। প্রায় প্রত্যেকটি চিঠিতেই গান্ধীজি লিখছিলেন—তোমার কাজ-করার টিম কোথায়, তুমি কী করতে চাও বলো, প্রমাণ দেখাও যে দেশ আমার চাইতে তোমার ওপর বেশি ভরসা করে। তোমার যদি টিম না থাকে, কী-করবে ঠিক না থাকে ও তোমার প্রতি সমর্থনও এমন খুচরো হলে পথ ছেড়ে দাও, আমার লোকদের আমার কাজ করতে দাও।

এআইসিসির অধিবেশন ডাকা ছিল ২৯ এপ্রিল, কলকাতায়। ডাকা তো ছিল, গেল বছর থেকেই, সুভাষের অভিষেক উপলক্ষে শরৎ বোসের দাওয়াতের জবাবে। তখন তো জানা ছিল না, অভিষেকের উৎসব অভিষেক আর বাড়াতে চায় না। অথচ নিমন্ত্রণ তো আর শরৎ বোস ফিরিয়ে নিতে পারেন না। কংগ্রেসও এই বিশেষ অবস্থায় বলতে পারে না—যাব না। আগে নেহরু ও সুভাষের কথা হয়, নেহরু গান্ধীকে পরিষ্কার জানালেন, 'অসংখ্য দোষ থাকলেও সুভাষ বন্ধুত্বের বশ। আমি জানি, আপনি চাইলেই সেটা হতে পারে। ...তাকে ঠেলে বাইরে ফেলে দেয়া আমার কাছে নিষ্ঠুর ও সম্পূর্ণ ভুল কাজ মনে হয়েছে।'

২৯ এপ্রিলের অধিবেশনের শুরুতেই সুভাষ জানান, ত্রিপুরীর প্রস্তাব-অনুযায়ী মহাত্মাজির পরামর্শ নিয়ে তিনি কোনো ওয়ার্কিং কমিটি তৈরি করতে পারেন নি। সেই কারণে তিনি পদত্যাগ করছেন।

নেহরু পদত্যাগের বিরোধিতা করেন ও বলেন, পুরনো ওয়ার্কিং কমিটি বহাল থাক, দু-জন সদস্য শিগগিরই শারীরিক কারণে পদত্যাগ করবেন, সেই দুটি পদে কংগ্রেস-রাষ্ট্রপতি তাঁর মনোনীত দু-জনকে আনুন, সুভাষ তাঁর পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করুন।

রফি আহম্মদ কিদোয়াই ও জয়প্রকাশ নারায়ণ নেহরুকে সমর্থন করলেন। সেদিনের মতো সভা শেষ হল বলা যায় না, ভণ্ডুল হল।

সভা থেকে বাইরে বেরবার এই একটিই পথ—বেশ সাজানো-গোছানো, উঁচু। দু-পাশে পাকা বাঁশ বেঁধে বেড়া, যাতে ভিড়ে নেতাদের যাতায়াতের পথে কোনো বাধা না পড়ে। বাইরের গেট সামলাচ্ছিলেন, বাইরে থেকে আনা লোকরাই, তাদের মাথায় টুপিও ছিল না, কাঁধে ব্যাজও ছিল না।

বড় গেট পার হওয়ার পর সব কংগ্রেস সেবাদলের ভলান্টিয়ার—শাদা ঢোলা হাফ্ প্যান্ট, শাদা মোটা হাফশার্ট, মাথায় গান্ধী ক্যাপ, কারো-কারো বগলে এক হাতি ছোট লাঠি, সেগুলোকে এখন নাকী নেহরু-ব্যাটন বলে। এদের টুপিও আছে, ব্যাজও আছে। যোগেন খুব আবছা মনে করতে পারে, যেন শুনেছিল, ১৯২৮-এর কংগ্রেস অধিবেশনে সুভাষ ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান, তাঁকে বলা হত 'জেনারেল অফিসার ইন কম্যান্ড'-এর সংক্ষেপনে 'গক' বলে। এতই আনমনে শোনা যোগেনের এই গল্প যে সে আজও জানে না। 'গক' কি ছিল কংগ্রেসের অফিসিয়াল নাম, নাকী, কাগজের বানানো নাম। ছড়াও বেরিয়েছিল অনেক। পরে শুনেছে যোগেন, মনে রাখেনি। গান্ধীজি নাকী ঠাট্টা করেছিলেন, 'সুভাষবাবুজ টিনড্রাম সোলজার্স'। একটু

অপছন্দই ছিল অহিংস কংগ্রেসের আধা-সামরিক ইউনিফর্ম। অন্যদিকে, সুভাষ বাবু নাকী সব সময়ই চাইতেন, কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকরা ইউনিফর্ম পরবে, লাইন দিয়ে হাঁটবে, মার্চ করবে—মানে, দল হিশেবে কংগ্রেসের সাংগঠনিক দৃঢ়তা, শৃঙ্খলা, তৎপরতা আলাদা করে যেন চোখে পড়ে। ইতালিতে মুসোলিনির 'ব্ল্যাক শার্ট'দের দেখেই নাকী সুভাষবাবুর এই শখ হয়েছিল—এও শুনেছে যোগেন।

অধিবেশন তো হচ্ছে উডবার্ন পার্কে, শরৎ বোসের বাড়ির মাঠে, যোগেনের অফিসঘরের জানলার সামনে। যদি চাইত তা হলে যোগেন তো তার চেয়ারে হেলে, টেবিলে পা তুলেই অধিবেশন দেখতে-শুনতে পারত। 'রিসেপশন কমিটি'র পক্ষ থেকে রান্নার লোকজন, মিস্ত্রিরা, ইলেকট্রিকের লোকরা, এমন কী, যে-মেয়েরা স্বেচ্ছাসেবিকার কাজ করবে, তারা, তাদের মধ্যে এই বাড়ির মেয়েরাও আছেন, শরৎবাবুর মেয়ে গীতাই তো ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বারদের দায়িত্বে—সকলকে তো যোগেনই ঢুকবার অনুমতি সূচক ব্যাজ দিয়েছে। 'অভ্যর্থনা সমিতি, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি, ১৯৩৯, কলিকাতা।'

যোগেন যে-অধিবেশনে থাকতে পারছে না, সেটা ধরা পড়ল প্রথম দিনই, উদ্বোধন হয়ে যাওয়ার পর, পতাকা উত্তোলনের পর। সিদ্দিকিশাহেব, তার সঙ্গে যোগেন ঢুকছে না দেখে বলেন, 'কী হল? আসেন।'

'আপনে বসেন গিয়্যা। আমার কাম আছে।'

'কাম আছে? এর চাইতে বড় কাজ? কংগ্রেসের এই অধিবেশন না-শুনলে রাজনীতি করবেন কী করে। দিস ইজ দি পিপলস পার্লামেন্ট।'

'খাড়ান। আমি কাইলই সারওয়ার্দিশাহেবকে জানাইব—আপনে কী বলছেন।'

'জানাবেনই যখন, ভিতরে চলেন, আরো অনেক কথা বলব। আপনার চার্জশিটটা তাহলে জমকালো হবে। তবে খাজাকে দিলে ভালো হয় না, চার্জশিটটা? চলেন তো। আমরা তো সব দর্শক-আসনে বসব। আপনাকে বাইরে রেখে কি ভিতরে যাওয়া যায়? চলেন।' সিদ্দিকিশাহেবের সঙ্গে যোগেন ঢুকল।

আজ ৩০ এপ্রিল (৩৯) যোগেনকে তো কংগ্রেস-অফিসের কাজে আসতেই হত। কিন্তু সে আজ প্যানডেলের ভিতরে ঢুকবে না। কাল যে-ভাবে মিটিং শেষ হল, তার ভালো লাগে নি। সুভাষবাবু নিজেই যে পদত্যাগ করতে পারেন, এ-কথা তার জানা ছিল না। গান্ধীজি মিটিঙে এলেন না, অথচ এই বাড়িতেই আছেন। কালী পুজোয় বলির লাইনের পাঁঠা যেমন ইতিপূর্বে বলি-দেয়া পাঁঠার রক্তের গন্ধে ভয়ে, ত্রাসে, নীরবে কেঁপে-কেঁপে ওঠে, যোগেন তেমনি কেঁপে-কেঁপে উঠছিল। গান্ধীজি নিজেই সাংবাদিক সম্মিলনে বলেছেন, দেশের স্বার্থের কথা ভেবেই তিনি বল্লভভাইকে অধিবেশনে আসতে নিষেধ করেছেন। অথচ তিনি ত্রিপুরীতে ছিলেন না। সেখানে পন্থ-প্রস্তাবে, জয়ী রাষ্ট্রপতি সুভাষকে শিকল পরানো হল যে গান্ধীজির ইচ্ছা ছাড়া নতুন ওয়ার্কিং কমিটি তৈরি করা যাবে না। এ-কথাও রটেছিল ত্রিপুরীতে যে পন্থ-প্রস্তাবে গান্ধীজির অনুমোদন আছে। সুভাষ বাবু ওঁদের খড়্গাঘাত ঠেকাতে, ওঁরা তাঁকে তাড়িয়ে দেয়ার আগে নিজেই নিজেকে তাড়ালেন। কেন? তাতে ওদের পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে পারে, এই আশায়? পাল্টা চাল? নাকী, দুদিন ধরে গান্ধীজির সঙ্গে কথা বলে বুঝলেন, তাঁর কোনো পরিত্রাণ নেই, এই হতাশায়? আত্মসমর্পণ? কাল অধিবেশন শেষ হওয়ার আগেই প্রতিনিধিদের মধ্যে গালাগালি হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। তখন অধিবেশন মুলতুবি ঘোষণা করে দেয়া হয়। প্রতিনিধিরা হুড়মুড়িয়ে পথ আটকে দেয়। রাজেন্দ্রপ্রসাদ যখন বেরচ্ছিলেন, পেছন থেকে কেউ তাঁকে ধাক্কা

মারে এত জোরে যে তিনি হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে যান যদিও দু-হাত মাটিতে ফেলে সামলান। নেহরুকে বাঁ-দিক থেকে একটা ভিড়ের তোড় এসে হঠাৎ ডানদিকে ঠেলে দেয়। নেহরু তাঁর আগে রাজেন্দ্রপ্রসাদের দুরবস্থা দেখে অনুমান করতে পারেন, তাঁকেও ওরকমই কিছু করা হবে। তিনি ওখানেই একা দাঁড়িয়ে থাকলেন। ততক্ষণে কংগ্রেস সেবাদলের স্বেচ্ছাসেবকরা লাইন বেঁধে হাতে হাত ধরে একটা প্যাসেজ তৈরি করে ফেলেছে।

কাল থেকে সুভাষের সঙ্গে যোগেনের দেখা হয়নি।

যোগেনের ভিতরে কি কোনো অনিশ্চয়তা আছে—আজ কী হবে? নইলে সে দেখতে-শুনতে চায় কেন? অথচ, সে কালকের মতো আজ ভিতরে যাবে না কেন? বাইরের যে-দিনমজুরদের ডিউটি দেয়া হয়েছে ও আরো কিছু অনাহুত-রবাহুতের ভিড়ের পেছনে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কেন? সেই মজুরদের ঠিকেদার যোগেনকে চিনতে পেরে টিনের একটা চেয়ার এনে দিলে, সেটাকে বেড়ার কাছে ঠেলে নিয়ে ভালো করে লুকতে পারে যোগেন।

৩০ এপ্রিল (৩৯) দ্বিতীয় অধিবেশনের শুরুতেই নেহরু বললেন—গতকাল আমার প্রস্তাব নিয়ে কোনো-কোনো বক্তার আলোচনা থেকে আমার মনে হয়েছে যে নেহরু বুঝি সুভাষের ওপর একটা ওয়ার্কিং কমিটি চাপিয়ে দিচ্ছেন। এটা একেবারেই সত্য নয়। তার ওপর, এখন তাঁর মনে হচ্ছে, সুভাষ বোস যদি এই প্রস্তাব মেনে না নেন, তা হলে কথা বলা নিরর্থক। নেহরু সুভাষকে অনুরোধ করেন—নেহরুর প্রস্তাব তিনি অনুমোদন করেন কি, আর, তিনি তাঁর পদত্যাগ প্রত্যাহার করতে রাজি কি।

উত্তরে সুভাষ বলেন, 'যে-প্রস্তাবটি নিয়ে এখানে আলোচনা চলছে, তার সঙ্গে আমার জীবন-মরণ জড়িত। এই প্রস্তাব নিয়ে আমি কী ভাবছি তা জানাতে পারলে এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার কিছু সুবিধে হতে পারে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আমাকে পদত্যাগ প্রত্যাহারের অনুরোধ করেছেন—এটা তো আমার ভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু আমি তো কোনো লঘুচিত্ততার ভঙ্গিতে পদত্যাগ করিনি, তাহলে কোনো চরম সিদ্ধান্ত জানাতে হলেও আমাকে গভীরতার সঙ্গে ভাবতে হবে।'

যোগেনের মনে খেলে যায়—সুভাষবাবু কি চাইছেন তাঁর সম্পর্কে সিদ্ধান্ত যেন এখুনি নেয়া না হয়। মনে হতেই তার ভয় হয়, সুভাষবাবু কি হেরে গেছেন?

'মহাত্মা গান্ধী ও পুরনো ওয়ার্কিং কমিটির কেউ-কেউ ব্যক্তিগত কথাবার্তায় যে-পরামর্শ তাঁকে ইতিপূর্বে দিয়েছেন, তার সঙ্গে এ প্রস্তাবের ফলত হুবহু মিল আছে।'

যোগেন এই যুক্তিটাতে খুশি হয়।

'মহাত্মা গান্ধী যখন দুর্ভাগ্যত ওয়ার্কিং কমিটি তৈরি করতে সাহায্য দিতে পারছেন না, তা হলে অগত্যা আমাদের কি উচিত নয় কংগ্রেস সংবিধান এ নিয়ে কী বলছে, সেটা একবার দেখা?'

সম্ভবত হাততালির অপেক্ষায় সুভাষবাবু একটু থেমেই বলে উঠলেন, 'এই প্রশ্নের উত্তর কী হতে পারে, সেটা বিবেচনার দায় আমি আপনাদের ওপর ছেড়ে দিলাম।'

এটা তো সবচেয়ে শক্ত যুক্তি—গান্ধীজি আর কংগ্রেস সংবিধান কি বিকল্প না পরিপূরক। যোগেনের সন্দেহ যে এতটা অভিযোগ তোলার জন্য কি সুভাষবাবু যথেষ্ট সময় নিয়েছিলেন?

এর পরেই সুভাষবাবু স্পষ্ট স্বরে বলে ফেললেন, 'ভারতের মতো বিশাল বৈচিত্র্যের দেশে কংগ্রেস কয়েকজন মাত্র ব্যক্তির গোপন সম্পত্তি হয়ে থাকতে পারে না।'

যোগেনের ভালো লাগে না যে এর পরই কী করে এই গোপন সম্পত্তি সকলের সম্পত্তি

হতে পারে, তার উদাহরণ দিতে সুভাষবাবু ব্রিটেন, ফ্রান্স আর অন্যান্য ইয়োরোপীয় দেশের তুলনা টানলেন? তুলনা শুধু টানলেনই না, তর্কটাকে বা উদাহরণটাকে আরো জোরদার করতে বলে বসলেন, 'আমরা কি ওদের চাইতে কম দেশপ্রেমিক। সে-কথা আমি মানি না। ভারতের সমস্ত জনমতের প্রতিনিধি কেন রাষ্ট্রপতির মন্ত্রিসভায় আসবে না?'

সুভাষবাবু আড়টুকুও রাখলেন না। সত্যি-সত্যি 'ক্যাবিনেট' বললেন? সত্যি-সত্যি বললেন, ওরা যদি জাতীয় বিপদের সময় পার্টি বিভেদ ভুলে একটা সরকার তৈরি করতে পারে, আমরা কেন পারব না?

সুভাষবাবু নিজেদের স্বাধীন দেশ ধরে নিয়ে কথা বলছেন? যাকে উনি বলছেন, বহুবিধ শক্তির সমাবেশ, কংগ্রেসে, তা থেকে কি বাদ থাকবে কংগ্রেস-ছাড়া অন্য সব দল? '১৯২১-এর পর কংগ্রেস অনেক বদলে গেছে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ভোটাভুটিটাও মনে রাখবেন।'

আঃ। আঃ। এটাই তো মোক্ষম কথা। এটাকে আরো ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে হবে। বলতে হবে—'আমি কংগ্রেসের সবচেয়ে বড় সংগঠনের নির্বাচিত সভাপতি। আমার বিরোধিতা যাঁরা করছেন তাঁরা কংগ্রেসের বিরোধিতা করছেন, তাঁরা কংগ্রেসকে ভাঙছেন।' কিন্তু সুভাষবাবু সে-দিকেই গেলেন না, তিনি যে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি, তাও বললেন না, আরো একবার। বরং বললেন 'এআইসিসি থাকতে বললে থাকবেন, যেতে বললে চলে যাবেন।'

সরোজিনী নাইড়ু বলে ওঠেন, 'আমাদের তো মিটিংটা চালাতে হবে। আমরা এখন আপনার পদত্যাগ নিয়ে কোন জায়গায় আছি। আমার অনুরোধ, নেহরুজির প্রস্তাব অনুযায়ী আপনি ওয়ার্কিং কমিটি তৈরি করে ফেলুন। এআইসিসি শুরু হয়েছে আপনার পদত্যাগ দিয়ে। এ-বিষয়ে আপনার শেষ কথাটা বলুন।'

ঠিকেদারের লোহার চেয়ারে বসে টিনের বেড়ায় হেলান দিয়ে ঘাড় না তুলে তার আত্মগোপনতায় শিউরে ওঠে, সুভাষবাবু এই ফাঁদে পা দিয়ে ফেলতে পারেন—হ্যাঁ, না, না।

নেহরুর গলা শোনা গেল—'আমি সবার সঙ্গে কথা বলেই প্রস্তাবটা দিয়েছি। কিন্তু সে-বিষয়ে যদি উৎসাহ না থাকে, তাহলে আমি প্রস্তাবটা ফিরিয়ে নেব। সুভাষ যদি হ্যাঁ-না কিছু একটা বলে তার চরম কথা জানিয়ে দেয়, তা হলে সুবিধে হয়'।

যোগেন সোজা হয়ে বসে, ওরা কি ভয় দেখিয়ে কবুল করাতে চায় সুভাষকে? সুভাষবাবুকে দেখলে কিন্তু সকলেরই প্রথমে মনে হতে পারে—সুভাষকে কবুল করানোটা খুব কিছু কঠিন নয়। যোগেনের ধারণা—গান্ধীজি ও সুভাষ আগেই সব দিক ভেবে দেখে নিজের কথা সাব্যস্ত করে আসেন। তাঁরা এমন কোনো শেষ মুহূর্তের নাটক করেন না। যোগেন একেবারেই জানে না, শোনেওনি কিছু এ-ব্যাপারে, এম-এন রায়কে দেখেওছে মাত্র দু-একবার, তবু বোধহয় 'ইনডিপেনডেন্ট ইনডিয়া'তে ওঁর লেখা থেকেই মনে হয়েছে—আসল কথায় মিল থাকলে ছোট কথায় আটকান না।

সুভাষবাবু কি যা বলেছেন, তার বেশি কিছু বলতে চান না? নাকী কোনো শলাপরামর্শ হচ্ছে। সুভাষবাবু যেন কিছু না বলেন, যখন ভেবেছে যোগেন, ঠিক তখনই সুভাষের গলা শোনা গেল, 'আমার যা বলার আমি বলেছি। সভানেত্রী আদেশ করেছেন, একখুনি আমাকে হ্যাঁ বা না বলে আমার পদত্যাগের ব্যাপারটি চুকিয়ে দিতে হবে। আমি এই টুকুই শুধু বলতে পারি, এআইসিসি কী রকম করে প্রস্তাব নেয়, তার ওপর আমার শেষকথা নির্ভর করে। যেহেতু এআইসিসি কী প্রস্তাব নেবে তার বিন্দুবিসর্গও আমার জানা নেই, সেটা না জেনে আমার পক্ষে কোনো শেষ কথা বলা সম্ভব নয়।'

সুভাষবাবু কি হঠাৎ থেমে গেলেন?

ভিতরে তো কোনো গুঞ্জন উঠল না? ওরা পেয়ে গেল নাকী সেই শেষ-কথা, যা ওরা চাইছিল? রাষ্ট্রপতি এআইসিসিকে কি জানিয়ে দিলেন, এআইসিসি যদি সমমনা ওয়ার্কিং কমিটি চায়, সুভাষ নেই, আর যদি বহুমনা ওয়ার্কিং কমিটি চায়—সুভাষ আছে। যোগেন স্থির থাকতে না-পেরে, দাঁড়িয়ে পড়ে টিনের একটা ফুটো খোঁজে। সেই ঠিকেদার দৌড়ে এসে যোগেনকে ডাকে, 'ইধার বাবুজি'। দু-পা বাঁয়ে সরিয়ে এনে ঠিকেদার তার বাবুজিকে টিনের একটা বড় ফুটোর সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। একচোখেই দেখতে হয়।

সরোজিনী নাইডু বারবার এর ওর দিকে তাকাচ্ছেন। যেন সুভাষের কথা বুঝতে পারলেন না। নেহরু তাঁর প্রস্তাব সম্পর্কে অধিবেশনের সাড়া খুব পরিষ্কার নয় বুঝে, তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাহার করলেন শোনা গেল। সভানেত্রী তখন প্রতিনিধিদের তাড়া দিলেন, হাত নেড়ে, নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য। নীহারেন্দু দত্ত-মজুমদার ও কে-এফ নরিম্যান পর পর উঠে আপত্তি করলেন। যোগেন বুঝতে পারে নাইডু তাঁদের আপত্তি নাকচ করে দিলেন। এআইসিসি বর্তমান রাষ্ট্রপতির বাকি কর্মকালের জন্য রাজেন্দ্রপ্রসাদকে নির্বাচন করলেন।

কী যে হল, তা বোঝার আগেই যা হওয়ার তা হয়ে গেল। যেন, কিছুই হয়নি। সুভাষবাবু পদত্যাগ করেছিলেন, তাই বাকি ক-মাসের জন্য রাজেন্দ্রপ্রসাদকে রাষ্ট্রপতি করা হল।

এঁদের ভিতর থেকেই এইসব প্রশ্ন উঠেছিল, কারো কাছে নয়, তাঁদের নিজেদেরই মনে উঠেছিল—সুভাষবাবু যে-উত্তর দিলেন তাতে তিনি বলেছেন বটে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করছি না। কিন্তু তিনি তো এও বলেছেন তিনি পদত্যাগ করতে চান না। হ্যাঁ, একটা শর্ত ছিল সমমনোভাবাপন্ন ওয়ার্কিং কমিটি। নেহরুর পদত্যাগবিরোধী প্রস্তাব উঠল আগের দিন অথচ সিদ্ধান্ত হল পরদিন। নেহরু-প্রস্তাবের ওপর ভোট হল না কেন? ভোট হলে পরিষ্কার হয়ে যেত—সুভাষ পদত্যাগ করতে চান কী চান না? সেটা পরিষ্কার হওয়ার আগেই সভানেত্রী নতুন রাষ্ট্রপতির নাম চাইলেন কেন? কোনো কি পূর্বব্যবস্থা ছিল—সুভাষকে সরানোর? সুভাষ পদত্যাগ করবেন, এটা কি সুভাষও জানতেন? পদত্যাগ করে তিনি কি প্রতিপক্ষকে অপ্রস্তুত করতে চেয়েছিলেন? ওরা অপ্রস্তুত হওয়ার বদলে সুযোগ নিলেন? কী হত যদি সুভাষ নিজের মতো একটা ওয়ার্কিং কমিটি ঘোষণা করে দিতেন? গান্ধীজি তাঁকে তেমনই করতে বলেছেন বলে? সুভাষই তা হলে শহিদ?

সেই ফুটো দিয়ে যোগেন সুভাষ বোসকে এক পলক দেখতে চেষ্টা করল। একবার মনে হল, দেখেওছে। কিন্তু সকলেরই ধুতি, পাঞ্জাবি, গান্ধীটুপি—সবাইকেই সবাই মনে হয়।

যোগেন এসে তার লোহার চেয়ারটাতে আবার নিচু হয়ে বসে, ঘাড়টা কুঁজো করে, অজ্ঞাতবাসে বসে। নিজেকে সে এটুকু পর্যন্ত বোঝাতে চায় যে কংগ্রেসের কী হল না হল, তা নিয়ে তার কোনো চিন্তাভাবনা থাকার কথাই না। সে যদি করতেও চায়, চিন্তাভাবনা, কেউ সে কথা জানতে চাওয়ার মত নেই।

সুভাষবাবুই তাকে তাঁর কাজে ডেকে নিয়েছিলেন।

সেই ডাকের সুতো ধরেই, যোগেন এই মানুষটিকে তাঁর রোজকার জীবনে দেখে। ফলে মানুষের জীবন নিয়েই একটা এমন ধারণায় সে পৌঁছয়—যেমন ধারণা তৈরি করার উপাদান তারই ভিতর আছে সে জানত না। এই লোকটি বড়লোকের ছেলে ও ভাই। বিলেতে গিয়েছিল, আইসিএস পড়তে। কেন? এই বাড়ির পক্ষে একটা আইসিএস খুব দরকার ছিল, ভারতে কুলীন হতে। বাবা কটকের বড় উকিল। কাউন্সিলার ছিলেন। এক ভাই ব্যারিস্টার। এক ভাই

এনজিনিয়ার। এক ভাই ডাক্তার। সকলেই বিলেত ফেরৎ। একটা বিলেত-ফেরতের ভ্যাকান্সি ছিল আইসিএস হয়ে আসার জন্য। সেটা হতেই সুভাষ গিয়েছিলেন। হয়েও ছিলেন। প্রবেশনে যাওয়ার পূর্বমুহূর্তে যেন তিনি সেই অনন্ত অসীম কাল গর্তটা দেখতে পান, যার ভিতর তিনি এক-পা দিয়ে ফেলেছেন। আর-এক পা এগুলেই ব্রিটিশ ব্যুরোক্রেসির গহ্বরে তিনি হারিয়ে যাবেন চিরকালের জন্য। প্রবেশনে না গিয়ে তিনি ছুটলেন, ভারতে। স্বদেশীয় লোকদের শাসন করতে ও শাস্তি দিতে যিনি বিশেষ করে বিদ্যে শিখতে এসেছিলেন, তিনি দেশে ফিরে নিজেই চলে গেলেন জেলে। প্রায় আট-দশ বছর জেলখাটার পর যখন তিনি কংগ্রেসকে নতুন নেতৃত্ব দিতে চাইলেন, তখন তাঁকে জানানো হল, নেতৃত্ব দেয়ার জন্য কংগ্রেস ও দেশে একজনই মানুষ আছেন। মহাত্মা গান্ধী।

যোগেনের কাছে ঐ মুহূর্তে এটাই প্রধান হয়ে উঠল—সুভাষকে একটা আইন দেখিয়ে বলা হল, এই আইন কংগ্রেসের আইন, দেশের আইন, সকলের পক্ষেই সমান প্রযোজ্য। সে-কথা সত্য মেনে সুভাষ ভোটে জিতে এলেন। তখন, তাঁকে বলা হল—জাল মেম্বারদের ভোটে জিতেছেন, আমরা আপনার মন্ত্রী হব না।

যোগেন সত্যিই আঁতকাল। বামুনরা বিধান পাল্টাচ্ছে। ওদের পাঁজি আছে পঞ্চাশ রকম। সে পাঁজিতে দোষ আছে হাজার রকম। প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে পঞ্চাশ হাজার রকম। সুভাষের যে পরিত্রাণ নেই, সেটা সুভাষবাবু কি জেনেছেন? সুভাষবাবুর কপালে পুরোহিত তেল-আলতা এঁকে দিয়েছেন। এবার তাঁকে হাঁড়ি কাঠে ফেলা হবে।

সুভাষবাবু ভোটে জেতার দু-দিন পর গান্ধীজির বিবৃতি পড়ার নিভৃতিতে যন্ত্রণায় এলগিন রোডের বারান্দায় যোগেনের ক্ষীণতর মনে এসেছিল—সুভাষবাবুকে গান্ধীজিরা শূদ্র করে দিলেন। এমন কথা মনে হয়েছিল বা এসে গিয়েছিল, কত হাজার বছরের শূদ্রস্মৃতি থেকে, যে-স্মৃতি মরে না, শুকোয় না।

আজ, টিনের ফুটো দিয়ে সুভাষবাবুর শাস্তি দেখে, যোগেন আবার সেই স্মৃতিতে ফিরে যায় কোনো প্রতিবর্তক্রিয়ায়। না। সে কেন সুভাষকে এক ঝলক দেখতে চাইছে? কী দেখবে? নাগরাজের 'বরে', পোড়ামুখ, বিকৃত অঙ্গ, পায়ে গোদ, চোখে পিচুটি, অসম নাসারন্ধ্র এক অধস্তন গোত্রের মানুষ হয়ে আরো পালাতে, আরো আরো পালাতে, আরো আরো আরো পালাতে, আরো আরো অপরিচয়ের দূরত্বে আত্মগোপন করতে না-চেনা পথ, বনজঙ্গল ও পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে একটা কোনো দেশের দিকে নলরাজার ছুটে যাওয়া যার নামটুকুমাত্র তার সেই নাগরাজের কাছেই প্রথম ও একবারই শোনা—নলরাজা সেই দূরত্বে লুপ্ত হয়ে যেতে চায়, এই পৃথিবীতে দময়ন্তীর কাছ থেকে যতটা দূরত্ব তৈরি করে তোলা যায় পচা, গলা, চিহ্নলুপ্ত আট-দশ দিনের এক বাসি মড়ার মত, শনাক্তের অতীত।

তার উপমাটা যে তাকে এতটাই মথিত ও উন্মার্গী করে দেবে, তার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না যোগেন। এমএলএ গিরি ও নেতাগিরি করতে-করতে যোগেন কি ভুলে গিয়েছিল, বা মাঝে-মাঝে তার এমন অপস্মার ঘটছিলই, যে তার চন্ডালসত্তা কতটাই স্বার্থপর, পলায়নপর ও আত্মরক্ষাপর হয়ে উঠতে পারে?

চন্ডাল শুধু শরীরটা নিয়ে বাঁচতে জানে। তার, যোগেনের তো কোনো চাওয়া থাকতে পারে না, তার শুধু থাকতে পারে বেঁচে যাওয়া। বাঁচতে না-পারলে মরে যাওয়া। সে সুভাষকে কেন দেখবে?

কী দেখবে? মাটির তলা থেকে উদ্ভিন্ন কোনো বিদ্যুদাঘাতে যোগেন কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

সে পালাতে চায়, এখনই, একবারও সুভাষবাবুকে সে দেখতে চায় না।

যোগেন বরিশালে যাবে, মৈস্তারকান্দিতে, কেরল ভৌগোলিক কারণেই যে-দুর্গমে রাজা বা বামুন কেউ পৌঁছুতে পারে না।

যোগেন শেয়ালদা স্টেশনের দিকে ছুটল।

সুভাষ কল্পনাও করতে পারেন নি, এ-রকম কিছু হতে পারে। সুভাষ একেবারেই চাননি কংগ্রেস ভাঙতে। তিনি মনে প্রাণে চাইছিলেন—কংগ্রেসের নেতৃত্বে গণ্য হতে। সেটা আন্দাজ করতে পেরেই কংগ্রেসের সর্বোচ্চ কর্তারা ৩৮-এ তাঁকে রাষ্ট্রপতি বলে মেনে নেন। সেই সর্বোচ্চ কর্তাদের কারো মনেও আসেনি, কংগ্রেসের নেতা হিশেবে এর চাইতে বড় কী স্বীকৃতি সুভাষ আশা করছিলেন? সুভাষ রাষ্ট্রপতি আবার হতে চাইবেন—এটা কারো হিশেবে ছিল না। আর, সুভাষের হিশেব ছিল ইংরেজকে একটা সময় ধরে আলটিমেটাম দেয়া। আর, সেই তারিখের মধ্যে ভারত স্বাধীন না-হলে, সারা দেশে আন্দোলনের প্রলয় তৈরি করা হবে। সে-আন্দোলন, নীতিগতভাবে অহিংসই হবে বটে কিন্তু অহিংসা সে-আন্দোলনের একমাত্র সীমা-নির্ণায়ক হবে না।

কলকাতা অধিবেশনের কয়েকদিন পর বৃন্দাবনে এক সভায় গান্ধীজি বলেছিলেন, এই আলটিমেটামের ভূত সুভাষের ঘাড়ে চেপেছে ১৯২৫-এ জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক সম্মিলন থেকে। সেখানেও সুভাষ আলটিমেটামের জিদ ধরেছিল। তার পরের চোদ্দ-পনের বছরে সুভাষের কাঁধ থেকে আলটিমেটামের ভূত নামেনি, সুভাষকেও বদলাতে দেয়নি। কাকে আলটিমেটাম? সেই শক্তিমান কি আমাদের ছেড়ে দেবে? আমাদের দেশের কোটি-কোটি মানুষকে কতবিধ অত্যাচারই না করা হবে। প্রস্তুত থাকলে এই মানুষই সে-সব অত্যাচার প্রতিহত করতে পারে। আমাদের দেশের মানুষকে কি অতটা প্রস্তুত আমরা রাখতে পেরেছি?

গান্ধীজি বৃন্দাবনের সভাতে ও কারো কাছে কোনো চিঠিপত্রেও যে-কথা উল্লেখ করেননি সম্ভবত সেটাই ছিল তাঁর সুভাষ সম্পর্কে অনড় অবস্থানের প্রধান কারণ। যে-কোনো দিন যুদ্ধ বাধতে পারে। জার্মানি, ইংল্যান্ড, ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইতালি—এই সব দেশের মধ্যে সুভাষের আনুগত্য কার প্রতি? এই সময়ই, বা হয়তো এর কিছুদিন আগে, কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতারা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন, ভারতের ভবিষ্যতের পক্ষে কোন দেশকে বা শক্তিকে সমর্থন করা উচিত। গান্ধীজি নিশ্চিত স্বরে জবাব দিয়েছিলেন, ইংরেজ শাসনের অধীনতার মধ্যেও বেঁচে থাকার যে সুবিধে আছে, তেমনটি অন্য কোনো দেশের অধীনতায় নেই।

ক্ষমতা দেখে যোগেনের আতঙ্ক

সারা বিকাল, সন্ধ্যা, রাত জুড়ে জল, শুধু জলস্রোত, শুধু জলের সঙ্গে জলের আঘাত-স্বর, যোগেন বুঝতে পারে, তার মন ও মাথা শূন্য হয়ে গেছে, বা শূন্য সে রেখে দিতে পেরেছে।

১১৩

তাহলে তার শরীরের স্বভাবে তার ঘুমিয়ে পড়া উচিত ছিল। যোগেন মনে বা শরীরে শূন্যতার লালন জানে না। বরং তার শূদ্রদেহে কখনো শ্রমের কোনো অভাব ঘটে না, বিশ্রামেরও কোনো অভাব ঘটে না।

ট্রেনে ওঠামাত্রই তার পালানো শেষ হয়ে যাবে—এমন একটা কোনো পরিত্রাণ কি তার মনে কোথাও আকাঙ্ক্ষিত ছিল? সে কোথা থেকে পালাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে, কেন ছুটছে—এমন কোনো কথা যে তার মন বা মাথার ত্রিসীমানায় নেই সেটা তো যোগেন বোঝে খুলনা এক্সপ্রেসের ফার্স্টক্লাশে একা বসে ও হাতভাঁজির ওপর মাথা রেখে, বেয়ারা চাদর-বালিশ নিয়ে এলে শুধু বালিশটা নিয়ে সে ঘাড়ের তলায় গুঁজে দেয়। এতই অভ্যস্ত ও নিশ্চিত ছিল যোগেন যে বুঝতে তার একটু সময়ই লাগে, অন্তত রানাঘাট পর্যন্ত যে ঘুমুতে পারছে না সে। কিন্তু একটা আচ্ছন্নতা ছিল—সে-আচ্ছন্নতায় চোখ খোলা যায় না, বন্ধও করা যায় না।

তারও কিছু পরে, সম্ভবত একটুকরো ঘুমের পরে যোগেন শুনতে পায় জলরব, বিকেল বা সন্ধের আবছায়ায় কোনো স্রোতময় বিস্তারের নিজস্ব অন্ধকারে ঢুকে পড়ার জলরব। সেই শুরু। তারপর, যে-জলধ্বনি আর তাকে ছাড়েনি।

যোগেন জানে, ছাড়বে না।

যোগেন জানে, জলপ্রাণীদের মতই জানে, জল কখন শরীরটাকে লেপটে নেয় একেবারে গতিবেগের সঙ্গে মিলিয়ে, গতি আর স্রোত যখন পৃথগর্থক নয়। জলপ্রাণীদের মতই জানে যোগেন, জল কখন শরীরটাকে লেপটে নেয় যে-সামান্য ঢেউ ওপরে উঠবার আগেই জলে ভেঙে যায় সেই ঢেউয়ের পরতে-পরতে। যোগেন জানে, জলপ্রাণীদের মতো নিশ্চয়তাতে জানে এই জল, এই জল তার দেশ, এই দেশে তার বাঁচা আর মরায় সময়ভেদ ঘটে না। যোগেন সেই জলবিলাসের মর্মরটুকু মাত্র শুনতে পায়, নিজের আসঙ্গের তৃপ্তির ঘনতায় জলপ্রাণীদের শরীরে যে-বিলাস ধ্বনিত হয়। যোগেন যে-জলে জেগে থাকতে পারে না। ঘুমিয়ে পড়তে পারে না। শুধু ভেসে যেতে পারে।

জলধ্বনি আর হাওয়াবেগে কখন-যে যোগেনের মনে এসেছে, সে তার আত্মরক্ষার দুর্গে ঢুকে গেছে। সে এমন কিছু মনে আনতে চায়নি। সে কিছু ভেবে উডবার্ন পার্ক থেকে শেয়ালদায় দৌড়ে আসেনি। কিন্তু, দৌড়েই এসেছে। কোনো কিছু তাড়া না-করলে বা তাড়া করেছে না-ভাবলে দৌড় আসবে কেন ভঙ্গিতে? যোগেন ভুলে গিয়ে থাকতে পারে, তাড়াটা কী ছিল। ভুলে গিয়ে থাকতে পারে, সেই পলায়নে কী ভাবছিল সে, কিছু কি ভাবছিল। যেন ধরে নেয়া হয়, জেগে থাকলে ভাবতেই হবে। যোগেন মনের বা মাথার অভ্যাসে কিছু ভাবছিল কী না, সেটাই তার মনে নেই। গলা শুকিয়ে কাঁটা-কাঁটা লাগছিল, পায়েও একটু টান লাগছিল বাঁ-পায়ের বাটিতে। সেগুলোকে তখনো তার ভাবনাসংক্রান্ত কিছু মনে হয়নি। এই ট্রেনটা ছাড়ার সময় জানা ছিল না তার যে ট্রেনটা ধরতেই সে ছুটছে। যদি ট্রেন নাই থাকত, নাই ধরতে পারত, যোগেন কি তাহলে যে-ট্রেন পেত তাতেই চড়ে বসত ও সেটা যেখানে তাকে নিয়ে যেত সেখানেই যেত? না। না। যাওয়ার জায়গা ছিল অপরিবর্তনীয়। আত্মহত্যা করতে আসা মানুষের

কি জায়গাবদল হয়? হয় যদি, তাহলে সেদিন তার আত্মহত্যা করা হয়ে ওঠে না। না। যোগেনের ছোটার মধ্যে কোনো আত্মহনন ছিল না। ছিল, যদি থেকে থাকে, বড়জোর হননের ভয় থেকে পলায়ন। কেন? যোগেনের দরকার পড়ছে পলায়নের কোনো কারণ? শুধু পালানোর জন্যই তো সে পালিয়ে থাকতে পারে। যোগেন তো দেশের এত বড় কোনো নেতা নয় যাকে তারই দলের লোকজন ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিলেও তাকে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে দাঁড়াতে হবে। বা, যাকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিলেও তাকে বেরবার নিরাপদ সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। পালানো ছাড়া যোগেনরা নিজেদের বাঁচাবে কী করে? ভয় থেকে পালাবে কী করে? যোগেনদের ভয় তো প্রমাণের অপেক্ষা করে না—এই কথা বা সত্য যোগেন কি ভুলে গিয়েছিল এই বছর-দেড়-দুই-এর এমএলএগিরিতে। উডবার্ন পার্কের কংগ্রেস মিটিঙের টিনের বেড়ার একটা ফুটোতে একটা চোখ রেখে যত ভয়ংকর ঘটনাই সে দেখে থাক ও ভয় পাক যোগেন যদি সেই ভয় থেকে সরে যেতে চায়, বা সেই দৃশ্যের গোপনদর্শীও না হতে চায়, তাহলে ফুটো থেকে চোখ সরিয়ে, ঘুরে দাঁড়িয়ে, দুই হাত টানটান মাথার ওপর তুলে আড় ভাঙতে-ভাঙতে একটা হাইতোলার জন্য হাঁ করে, হাঁ-বোজানোর আগেই, দুই পা ফেলে অপরিচয়ে হারিয়ে যেতে পারে। পালানোর জন্য বা নিজেকে হারানোর জন্য তাকে কীনা সেই উডবার্ন থেকে শেয়ালদা পর্যন্ত দৌড়তে হয়? তারপর দাঁড়িয়েথাকা ট্রেনের বেঞ্চির তলায় লুকোতে হয়?

এখন যোগেন যে আতঙ্ক থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছে, তা নয়।

কিন্তু অনেকটা সময় তো তার কেটে গেল এমন নিথরতায়, ট্রেনে ও জলে, যার দুই পাড়ই এত দূরে ও গতিমান যে আতঙ্ক থেকে নিষ্ক্রান্ত না-হয়েও, যোগেন, 'বেঁচে গেলাম', এমন একটা স্বস্তি বানাতে পারে।

সে কি পালাচ্ছিল? ভয়ে?, নাকী সে তার স্বদেশে পৌঁছুতে চাইছিল, যে-স্বদেশ ভারতের মত বিশাল নয়। নাকী সে তার নিজের হাওয়ায় শ্বাস টানতে চাইছিল যে-হাওয়া সমুদ্রের মতো অনন্ত থেকে বয়ে আসে? যোগেন অন্ধকারে জলকল্লোলের ওপর চোখ মেলে দেয়। কী আওয়াজ, জলের! কী বেগ, হাওয়ার! কী বিস্তার, স্রোতের।

যোগেনের কথাবলার যে-ভঙ্গি বিখ্যাত হয়ে যাচ্ছে, নিজেকে নিয়ে তার ঠাট্টার যে-সরলতা চেনা হয়ে যাচ্ছে অনেকের, পাঁকালমাছের মতো তার যে-পিচ্ছিলতা ক্রমেই রাজনীতির হিশেবের বাইরে চলে যাচ্ছে—সেটা তো যোগেনকেও প্রভাবিত করেছে। সেই প্রভাবেই কি যোগেন নিজেকে একটু ঠাট্টা করতে চায়, নিজেকে নিয়ে তার নিজের ভাবনার এই মেরুবদলে? পালানো হয় পৌঁছুনো, ভয় হয়ে যায় অনিয়ন্ত্রিত প্যাশন, মেঘনা-কীর্তনখোলা হয়ে যায় স্বদেশ?

যোগেনের আধুনিক অভ্যাসে মনে এসে গিয়েছিল—বাঃ, বেশ বামুনগ মতন ভাবা প্র্যাকটিস হইয়্যা গিছে কিন্তু সে কিছুতেই বাক্যটা শেষ করল না। সে তখনো তার ঘোরে। সে-ঘোরটা সে কাটাতে চায় না। শস্তা করে নিতেও চায় না। এইসব কুশলতা মিথ্যা। মিথ্যা। মিথ্যা। চতুর। কপট। নীতি। নীতি? নীতি!! ভোটে জিতলেই রাষ্ট্রপতি হওয়া যায়? তুমি কী করবে সেটা তুমিই ঠিক করবে? কোন্ সভায় আমি হাজির থাকব, কোন্ সভায় থাকব না আর কোন ঘোষিত সভায় তিন দিন আগে এসে বসে থাকব, যেমন এসেছি উডবার্ন পার্কে একবছরের পুরনো নেমন্তন্ন রাখতে কিন্তু মিটিঙে যাব না—সেটা তো আমারই সিদ্ধান্ত, এক আমারই, আমার প্রতিপক্ষ অনুযায়ী আমার নীতি বদলাই। আমি যা করি সেটাই নৈতিক আর যে আমার বিরোধিতা করে সে-ই-ই অনৈতিক—এই বিশ্বাস আমাকে তিল-তিল করে গড়ে তুলে, তিল-তিল করে

ছড়াতে হয়েছে একটা দেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে নৈতিকতম করে তুলতে। সে কি তোমার মতো একজন উটকো নেতাকে বিলিয়ে দিতে? তুমি তো জানই না, কখন তোমার কথা দুর্বোধ্য ঠেকবে এদের আর কখন তোমাকে শুধু 'হ্যাঁ' আর 'না'-টুকু বলার অধিকার দেয়া হবে। আমার করুণাকে, মূর্খ, তুমি ভাবো পারিবারিক? বারবার বলো, আমি তোমার পিতার মত। তুমি কি জানো, সত্যি করেই আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র আমাকে ত্যাগ করে, হারিয়ে গেছে? আমার বড় ছেলে—সে তো চাইতেই পারে একটু আলাদা আদর তার বাবার কাছ থেকে। ওকে আমি সে-গল্প বলিনি—বুদ্ধ তাঁর একমাত্র ছেলেকে বলেছিলেন 'রাহুল', বুদ্ধের শত্রু রাহু, বুদ্ধের অভিযানের বাধা। বলিনি—কারণ এই গল্পকে যুক্তি করে তোলা দুর্বলতা, আমার। হয়তো হরি নিজে সে-গল্প জানত। ও তো পড়াশুনো করত খুব। আর, আমার তো জীবন ছাড়া কোনো গ্রন্থ নেই। আমি কী করে আমার করুণার শক্তিকে ঘুষ হিশেবে আমার ছেলেকে দেব, বা, তার মাকে, বা, বাড়ির আর-কাউকে? যে-কুষ্ঠরোগীর ঘা আমি নিজের হাতে ধুয়ে দিচ্ছি তার নাম কেউ জানে? আমি জানি? সে-ছবির গল্প মানুষ কত শাস্ত্রে কত হাজার বছর ধরে পড়েছে কত ধর্মগ্রন্থে, কত শাস্ত্রে। কিন্তু কোনোদিন দেখেনি এই ছবি—তাদের চেনা একটা লোক এক কুষ্ঠরোগীর ঘা নিজের হাতে পরিষ্কার করে দিচ্ছে। আমাদের মহাজনরা কত উপদেশ দিয়ে গেছেন, একজনও ব্যবহার দেননি। আমি শুধু ব্যবহারটুকুই দেখাতে চাই। তুমি তো জানো, কতবার আমি অনশন করেছি। সবাইকে বলেকয়ে। যথেষ্ট সময় দিয়ে। একজন মানুষের না-খেয়ে নিজেকে মারার অধিকার আছে—এইটুকু প্রমাণ করতে। কিন্তু তুমি তো জানো না, পাঁচ-ছদিন পর যখন তোমার শরীরের ব্যবস্থাগুলি ধসে যেতে শুরু করে তখন মৃত্যু মোহন হয়ে ওঠে! কিন্তু আমি তো বাঁচার জন্য অনশন করছি। জীবনের জন্য। তখন আবার নিজেকে গুছিয়ে নিতে হয়। যোগেনের মনে পড়ে, ইফ ইট ওয়্যার ডা...ন।

শিবের নন্দীর মত

১১৪

যোগেন যখন খাগবাড়ির ঘাট থেকে উঠে এসে ভিতর-দুয়ারের ফাঁকাটায় দাঁড়ায়—একবেড়া শেষ আর দু-হাত ভিতরে আর-এক বেড়া শুরু ফাঁক, তখন পুব-দক্ষিণের আকাশ থেকে সব তারা অস্ত গেছে আর সেই তারাগুলোর দীপ্তিমণ্ডিত জায়গাটুকু যেন লেপে রাখা হয়েছে। যোগেনের এই আগমন পরে কমলার মায়ের মুখে-মুখে খালে-খালে হাটে-হাটে দশদিকে এতদিন ধরে এতই ছড়িয়ে পড়েছিল, সেখান থেকে আবার দিকে দিকে এত দিন ধরে এতই ছড়িয়ে পড়েছিল যে তা থেকে সব মানুষগুলো খসে গিয়েছিল,—যোগেন, যোগেনের বৌ, যোগেনের ছেলে, যোগেনের শ্বশুর-শাশুড়ি—সব এক পর্ণমোচী বৃক্ষের পত্রপল্লবরাজির মতো নিঃসাড়ে সম্পূর্ণ খসে গিয়েছিল, যেন এটা একটা ভবিতব্য পুরাণ, যে-কারো জীবনেই ঘটতে পারে, যেন এটা একটা সামাজিক বিধি—সন্ধেবেলা চুল এলো না রাখা, শোয়ার আগে হাত দিয়ে শোয়ার জায়গা—সে মাটিই হোক আর শতরঞ্জিই হোক বা কাঠই হোক—মুছে নেয়া সূর্য অস্তে গেলে কারো কথা আর মনে আনতে নেই, সে মৃতই হোক বা জীবিতই হোক, যেন বাড়ির আঙিনায় নেই তাকে মনে আনতে নেই, মনে এসে গেলেও কোনো দীর্ঘশ্বাসপতনের আগেই মন থেকে মুছে ফেলতে হয়। তুমি তো জানো না তোমার মনেপড়ার জোর। স্বর্গ-নরক বা জল-ডাঙা যেখানেই সে থাকুক, তোমার মনেপড়ার জোর টানে তাকে হয়ত কত উলটো জোয়ার ঠেকিয়ে, কোন্ সবে বালিপড়া চরের বালি খুঁড়ে, কোন্ রাত্রির ছায়ার ওপরের অবচ্ছায় আলো-ধোঁয়া পথ পেরিয়ে তোমার কাছে আসতে হল। অসময়ে মনে করতে নেই। নিজের বুকে নিজের থুতু তিনবার ছিটিয়ে মনেপড়াটা ঠেকিয়ে রাখতে হয়, দীর্ঘশ্বাসটা আটকে দিতে হয়। এমনিই তো নিষেধ আছে, ঘুমের মধ্যে তোমার নাম ধরে ডাক যদি-বা শোনো, পরপর তিনবার না শুনলে সাড়া দিয়ো না। তিনবার, পরপর তিনবার শোনার পর, তোমার নাম আর-একজনের মুখে তিনবার শোনার পর সাড়া দিয়ো, কিন্তু দুয়ার খুলো না। নিজের মনে হিশেব করো, আবার, সত্যি তো তিনশোনা হয়েছে ডাক? দুটো শোনার মাঝখানে কোনো ঝিমুনি এসে গোনাটা ভুলিয়ে দেয়নি তো? সন্দেহ থাকলে, দুয়ার না খুলেই একবার, দুবার, তিনবার একই কথা জিগগেস করো।

যোগেন তেমন কোনো আশ্চর্যের আগে-আগে আসেনি, তেমন কোনো আশ্চর্য যোগেনের পেছন-পেছন আসেনি। সে যে খাগবাড়িতেই আসবে তাও ঠিক ছিল না। স্টিমার থেকে নামার সময়ই যোগেন দেখে, তার পকেটে পয়সাকড়ি যা আছে তাতে কোনো ভরসা হয় না। একবারের জন্যও যোগেনের মনে হয়নি, প্রহ্লাদের ওখানে যাওয়ার কথা। সে ঘাটপারে এসে যে-নৌকোয় কিছু লোক ছিল, সেই নৌকোতে গিয়ে বসে। দশজনের সঙ্গে ফেরির পয়সা হয়ে যাবে। খাল বেয়ে বেশ খানিকটা যাওয়ার পর কোনো-এক-ভাবে তার কানে এল, ভুলও এসে থাকতে পারে, নৌকো খাগবাড়ি হয়ে যাবে। বা খাগবাড়ি পর্যন্তই যাবে। এসব নৌকোর হয়ে-যাওয়াও নেই, পর্যন্তও নেই, কয়েকটা বড় হাট ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যায়। হাটের লোকজন ঘাট এলে নেমে যায়।

হাটছাড়া মানুষ তার ঘাট এলে নেমে যায়—বললেই মাঝি নৌকো ভিড়িয়ে দেয়। যোগেন জিগগেস করে না, খাগবাড়ি ছেড়ে নৌকা কি আগৈলঝরা যাবে, আগৈলঝরার পরে নৌকো কি মাহিলারা যাবে। এমন কোনো জায়গায় যে যোগেনকে যেতে হবে, তা তো না। সে আত্মরক্ষার জায়গার দিকে ছুটছিল। এখন যোগেন ভাবতে পারে—যখনই সে জল ও বায়ুর বিশ্বে ঢুকেছিল তখনই সে তার আত্মরক্ষার বলয়ে ঢুকে পড়েছিল।

খাগবাড়িতে নৌকো লাগতেই দু-চারজন নেমে যায়, যোগেন দাঁড়ায় কিন্তু নামে না। যারা নেমে গেল তাদের পেছন-পেছন নামবে বলেই যোগেন দু-পা এগিয়ে চোখ বুলিয়েছে, ঘাটের ওপরের দিকে। মনে হল, অতটা অন্ধকারে চিনতে পারবে না। না-পারলে, না পারবে, তাতে তো নামার বাধা নেই। নেমেই যেত যোগেন, কিন্তু মাঝি নৌকো ঠেলে দিল, ভেবেছে, যোগেন হয়ত পরের ঘাটে নামবে। পরের ঘাট বলতে লগির ঠেলা তিনবার। নৌকো সেখানে ভিড়ল আর যোগেন দাঁড়িয়ে বলেই যোগেন নৌকো থেকে ঘটে নামে, পাড় বেয়ে পাড়ে ওঠে, পেছনে তাকিয়ে দেখে খালের জলে অন্ধকার এতই কঠিন যে নৌকোটাকে আর দেখা যায় না, ছপ ছপ শব্দ পাওয়া যায়, বৈঠার। যোগেন মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দু-পা এগিয়ে আবার থেমে যায়। নৌকোটাতে কি বৈঠা ছিল? তার মনে পড়ে না। নৌকোয় এতটা সময় ভেসে আসতে যে-বৈঠার আওয়াজ সে পায়নি, এখন এখানে পাড়ে নেমে গিয়ে অদৃশ্য নৌকোটির অলৌকিক বৈঠার আওয়াজ সে শুনতে পায়। ঘাড় ফিরিয়ে আরো দু-পা হাঁটতেই যোগেন অন্ধকারের ঘনতাভেদে, তলভেদে, আর দক্ষিণাকাশে মাটি-লেপা দুয়ারের মতো নিবিড়তরতা দেখে চিনে ফেলে, অভ্রান্ত, কমলাদের বাড়ি। তার স্ত্রী-পুত্র সম্ভবত এখানেই থাকে। তার ছেলের নাম কী দেয়া হয়েছে? তাকে ডাকে কী ডাকে? যোগেন জানে না সে-নাম। ততক্ষণে অন্ধকার যোগেনকে ছেয়ে ফেলেছে। পরিত্রাণ চাওয়ার মতো স্বরে যোগেন ডেকে ওঠে, 'কমলা, কমলা।'

'বাড়ির মইধ্যে আমার ঘুমই তো আগে ছোটে। শীত-গ্রীষ্মে তফাত নাই। মেঘ-রৌদ্রে তফাত নাই। ঘড়ি নাই, কোনো মুরগিও ডাকে না। বারো মাস তিরিশ দিন ঠিক একে সময়ে শরীর থিক্যা ঘুম ঝইর‍্যা যায়। কিন্তু ঝরনেরও তো আগাগোড়া আছে। কালে একডা ডুব দিয়্যা উঠ্যা আইলেও মাথার জলই তো শরীর বাইয়্যা ঝরে আগে। আর, পায়ের জল তো ঘর পর্যন্ত গেলেও শুকায় না, ঘরের মাটিতে জল-পা আঁকে। স্যায়, মাঘ মাসের ত্রয়োদশী। দুই দিন পরে আমাবস্যা। পাথরের মতন আন্ধার। ঘুম য্যান আর শরীর থিক্যা ঝরে না। তার মইধ্যে শুনি, শিবের নান্দীর মত গলার স্বরে কে য্যান ডাইক্যা উঠে, 'কমলা, কমলা'।

'বুকের ভিতর তো ঢেঁকির পাড়। গলার ভিতরডা য্যান বালির চড়া। জিভা শুকাইয়্যা কাঠ। যদি-বা খাড়া হইছি, খাড়া হইয়্যা তো থাকব্যার পারি না, কাঁইপ্যা পড়ি, ঝড়ের মুখে পাটখ্যাতের মত। একবার ভাবি—কমলার নাম ধইর‍্যা ডাকি। গলা দিয়্যা স্বর বারায় না। একবার ভাবি—আমাগ চাষের মানুষডারে ডাকি—ভাবাই সার, ডাকা হয় না। ন্যাক্কেরে শেষে ভাবি—কমলার বাপডারেই ডাকি। কুনোদিন তো এত আন্ধারে এত দূর থিক্যা ডাকি নাই। ডাক তো জানি না। শ্যাষে ভাবি—আমারই শোনার ভুল। তারপরই বুঝি, এ-শোনা ভুল হয় না। এ-শোনা ভুল হইব্যার পারে না। তারও পরে ভাবি, আমি শুইন্যা ফেলছি বইল্যা আমারেই উইঠতে হব ক্যা? আর-একবার তো ডাইকব? তাও তো ভাগে না। এ ভাগ তো দুইবার উঠে না। সেই কথা আছে না—দক্ষের কইন্যা সতীরে শিব কালো কইছিল বল্যা, সতী গিয়্যা হত্যা দিয়্যা কোন্ ঠাকুরের মন্দিরে কাইড়্যা আছে। শ্যাষে বৌ-ছাড়া মহাদেব নন্দীর পিঠে চইড়্যা আইস্যা হাজির সেই মন্দিরে। নন্দী ডাক দিয়্যা উঠে। য্যান, প্রলয় আমার আগের গর্জন, কমলা, কমলা।'

খাগবাড়ির শ্বশুরবাড়িতে যোগেনের যেন এমন করেই দিনকাটানোর কথা। কে কাকে কী কথা দিল সেটা কারো জানা নেই। এখানে যেদিন পৌছুল যোগেন সেই শেষরাত থেকে পরের দিন

১১৫

সাতসকাল পর্যন্ত যোগেন যেন তার সারা জীবনের অনিদ্রা ঘোচাতে ঘুমিয়েই যায়। কমলা দু-বার তার মায়ের কাছে এসে বলে, 'মা, তুমি দেইখ্যা য্যাও। এ কেমন মরণঘুম!' কমলা তো স্বামী-স্ত্রীর সেই জীবনে কোনোদিন ঢোকেই নাই যেখানে এইসব ঘুম-জাগরণের কারণ বোঝা যায়, অন্তত অনুমান করা যায়। কমলার মার দৃষ্টি একটু তির্যক কোণে থেমে যায়! সে কিছু আন্দাজ করতে পারছে। শাড়ির আঁচলটা দিয়ে ঠোঁট মুছতে গিয়ে আঁচলটা আর নামায় না। আঁচলের আড়াল থেকে ফ্যাঁসফেঁসে গলায় জিজ্ঞাসা করে, 'জামাই কাল তরে কিছু রাইখব্যার দিছে?'

'স্যায় শ্বশুরের ব্যাটা আইল-না তোমার দুয়ারে। তুমি-না আইনল্যা তারে। আর কিছু দিব্যার লাইগ্যা চাইব আমার হাত? কস কী মা? আমারে কি চিন্যাশুন্যা তাকাইছে একবারও? আর, তুমি কত্ত থুব্যার দিছে কিছু?'

'তোরে যা জিগ্যাই তার জবাব দে। অত কথা কস ক্যা? মোট তো একডা ছাওয়াল বিয়াইছিস, তাতেই দেহি মুখ দিয়্যা মা-বারুণীর স্রোত। যা জিগ্যাই তার জব দে। দিয়্যা এইহানে শুইয়া-বইস্যা থাক। যতক্ষণ না ফিরি।'

'যতক্ষণ না ফিরি? তুমি যাও কই মা?'

'যাই তোর সতাল (মামা) শাশুড়ির বাড়ি নায়র খাইতে। ক। কিছু রাইখব্যার দিছে, জামাই, তক, আইস্যা। লুকাইস না রে কম্‌লা। লুকাইলে তরতো স্বামীজ্যান্তে বিধবা। আর, আমার আর তোর বাপেরে তো ঘানি টানাইব।'

'ঘানি? কিয়ের লাইগ্যা?'

'যে-জামাইর‍্যা ঐ সময়ে আইস্যা পরিবারের নাম ধইর‍্যা ডাকে, তারপর দেড়রাত ধইর‍্যা ঘুমায় তার শাশুড়ি তার শ্বশুররে ঘানি ঘুরাইব্যার লাগে। শাহেবগ আইনে। আমিই যদি কিছু না জানি, তর বাপেরে কইব কী। জামাই তরে কিছু থুব্যার দিছে, গামছায় কি ত্যান্যায় পুটলি কইর‍্যা?'

'তোমরা ক্যা ঘানি ঘুরাইবা মা? বলদে ঘুরায় না?'

'তোমার মতো মাইয়্যার মাও হইলে মানুষগও ঘুরান লাগে কত?'

'আমারে গাইল পাড় ক্যা চুল ঝাইর‍্যা? এতখান বয়সে আমার একডামাত্তর ছাওয়াল! তগ দয়ামায়া নাই রে মা!'

'প্যাট বানাইছস একফসলি আর আবাদ তুইলব্যার চ্যাও গোবর্ধন গিরি? এই তো পাইছস এইবার, ধুইয়্যা মুইছ্যা বিছন নে কমলা। তাইলে তো কোলে পো কাঁখে পো হইব। কলি ন্যা, জামাই কি তর হাতে কিছু পোঁটলা বাইন্ধ্যা রাইখতে দিছিল?'

'কী রম মা-বাবা তোমরা? কুন বিয়াতী মাইয্যারে জিগান যায়, জামাই তরে কী দিছে, পোটলা বাইন্ধ্যা, প্রথম সাক্ষাতে? নিজের মাইয়্যার লজ্জা বুঝ না? না-দিলে কি কওয়া যায়, দেয় নাই। আমি কি নটী নি? দিলেও কি কওয়া যায়, দিছে। আমি কি নটী নি? পুরুষের উশুল দ্যাখাইব।'

'তাইলে আর আইস্যা কাইন্দ্যা পউড়ো না, মা, জামাই এত ঘুমায় ক্যা!'

কমলা একটু দাঁড়িয়ে থেকে বলে, 'খাড়ো মা, একবার খুঁইজ্যা দেইখ্যা আসি। তারপরে কই।'

'খুঁজবিনি কই? দিলে তো তোরেই দিছে। দিলে তো তর মনই থাকব। খুঁজবি কোথায়?'

'না রে মা। তোর জামাই খুঁখিতে রাইখছে না কী কাছায় বাইন্ধ্যা থুইছে না কী, সে তো দেহা হয় নাই। দেইখ্যা আসি। খাড়া'।

কমলার মা তার পেছন থেকে ছড়া কাটে, 'এই না কান্দলি, বয়স হইল এত আর ছাওয়াল হইল একডা মোটে? তর ছাওয়াল রি হাঁইট্যা হাঁইট্যা বাড়াইব তোর প্যাট থিক্যা? দুই রজনী ঘুমায় জামাই। খুঁখি-কাছা খোলা হয় নাই।'

কমলা দুয়োরটা দৌড়েই পার হয়। তার ঘরের ঝাঁপ তো সরানো হয় না—জামাইয়ের চোখে রোদ লাগবে। কমলা তার মায়ের ঘরের আধা-আলো থেকে তার নিজের ঘরের জলের মতো আঁধারে ডুব দেয়—মাঝখানে এই রোদের খরতা পেরিয়ে।

যোগেনের কোমর আর কাছাতে হাত দেয়ার আগে প্রথমত যোগেনকে ভালো করে দেখে নিতে হয় কমলাকে। দেখা হলে, সে শুধু আঙুল বুলিয়ে আন্দাজ পেয়ে যায়—খুঁখিতে কিছু আছে কীনা। যোগেন শুয়েছিল বাঁ কাতে, তাই ডান কোমরটা একবার হাত বুলিয়েই দেখে নেয়া যায়, এমন কী একটু ঝুঁকে বাঁ-কোমরেরও খানিকটা। না। কোথাও কোনো উঁচু-নিচু নেই। কাছা দেখতে যে কোনো বাধা ঘটতে পারে, কমলা এটা ভাবেইনি। ঐ দিকে পাশ ফিরে আছে। কমলার হাতের নাগালে কাছা। টান দিলেই খুলে যাবে। ফের গুঁজে দিতে অসুবিধে হলে, না-গুঁজেই বেরিয়ে যাবে। কিন্তু যোগেনের কাছ ধরে টানতেই কাছাটা খুলে এল, কমলার দেখাও হল কিছু আছে কী নেই, নেই, তারপর যে-ই আবার গুঁজে দিতে গেছে, যোগেন তার হাত ধরে ফেলে এক হেঁচকা টানে কমলাকে নিজের পাশে টেনে নেয়।

'তোমারে কাছাচুরি শেখ্যালো কেডা?'

কমলা অপ্রস্তুত হয়েছে এতটাই যে যোগেনের কথাটুকু ধরে সে পরিত্রাণ পেতে চায়।

'কত্ত! এমন পাকা আঙুলের চুরি শিখাইল কেডা?'

কমলা খুঁজছিল এমন কোনো কথা যা তাকে চুরির দায়মুক্ত করবে। কিন্তু অপ্রস্তুত যে এতটাই হয়েছিল যে কোনো কথাও খুঁজে পায় না।

যোগেন কমলাকে আরো টাইট করে ধরে রেখে বলে, 'তুমি নিশ্চয় বিদ্যাসুন্দর পড়ছ। না-হলে চুরির এত ভালো আঙুল পাইতা না।' এতক্ষণে কমলা বলতে পারে, 'আমি পড়তে শিখি নাই : কেউ আমারে শিখায় নাই।'

'তালি শুনছ গান কুনোদিন—'

'না। শুনি নাই। আমি চুরি করি নাই।'

'তয়? কোমরের কষি আর কাছা দেখো ক্যান?'

'মারে জিগাইল্যাম, এত ঘুমায় ক্যান, য্যান অজ্ঞান।

য্যান কত রাইত ঘুমায় না। মা কইল, সে যে আইল তর হাতে পোঁটলা বাইন্ধ্যা কিছু দিচ্ছিল। আমি কই, না তো। আমি কই, খাড়াও, দেইখ্যা আসি একবার, কিছু আনছে কিন্তু ভুল্য গিছে নি—'

যোগেনের হাত শিথিল হয়ে আসে। সে যেন একটা ফুটোতে তার একটা চোখ রেখে দেখতে পায়—সুভাষবাবুকে ঘিরে ফেলেছে তাঁর প্রতিপক্ষ, তাদের প্রত্যেকের হাতে অস্ত্র, সেগুলোর যে-কোনোটির একটি মাত্র আঘাতে সুভাষের মরণ। মরণ দেখলে তো বাঁচার জন্য পালাবেই যোগেন। যোগেনের হাত একেবারে আলগা হয়ে গেলে, কমলাকে তার মায়ের কাছে যেত

উঠতেই হয়। তার প্রস্থানে ঘরের আবছায়া একটু দোলে, যেন জল। সেই দোলনটা জুড়ে যোগেন বুঝে নেয়—কমলার মা ভাইবছে তার জামাই কোনো ডাকাতি সাইর‍্যা আইসছে, মেয়েরে তাই ডাকাতির পোঁটলা খুঁইজব্যার পাঠায়। বরিশালের মাইয়া তো। কত বামুন-কায়েতরে ডাকাইত দেখছে। সে তো যোগেন মাত্র।

ছেলেকে নিয়ে খেলা

১১৬

সেদিন থেকেই যোগেন তার শরীর থেকে ঘুম আর পলায়ণ ঝেড়ে ফেলে খাড়া হল আর নিজের ছেলেকে বুকেপিঠে তুলে আদর করতে লাগল। ছেলেটার শরীর ভালো হয়েছে। মনে হয়, হাড়গোড় শক্ত হবে। আর ছেলেও যেন বাপকে চিনে ফেলেছে, তাকে আর ছাড়তে চায় না। ছেলের হাসিতে, য্যান বিলের উপর বকের ঝাঁকের উড়ালের আওয়াজ। যোগেন তাকে কাঁধে তুলে, নিজের ঘাড়ের দু-দিক দিয়ে খোকার দুই পা নামিয়ে দেয়, তারপর দুয়ার জুড়ে দৌড়তে থাকে, ছোট-ছোট পায়ে। খোকা যোগেনের মাথার ঘন, কালো, কোঁকড়া বাবরি চুল দুই হাতে টানে। টানার পরে মুঠো আলগা হয়ে গেলে, আবার টানে। কিন্তু দুই পাক ঘুরতে-না- ঘুরতেই এ-খেলা খোকার ভাল লাগে না। সে নেমে আসার জন্য কান্না জুড়ে দেয়—একেবারে চিৎকার করে কান্না, যেন কেউ তাকে মেরেছে। যোগেন তাকে কাঁধ থেকে নামাতে-নামাতে বলে ওঠে, 'আরে, দেইখছ নি, ক্যামন মিছা চিক্কুর দিয়্যা আটাশ খায় বজ্জাত'। ছেলেকে বুকে নামাতেই সে বাপের নাকের ভিতর আঙুল ঢুকিয়ে হাসে। 'দেহো, দেহো, চক্ষে এক্কেরে জল আইন্যা ফেইলছে আবার ফোগলা মুখে বিশ্বরূপ দেখায়'।

এইসব হট্টরোলে বাড়ির হাওয়াটা বদলে যায়। শেষ রাতে জামাই যদি জল থিক্যা উইঠ্যা আস্যা দুই রাত্তির অজাগর ঘুমায়, তালি বাড়ি তো গুমট হইবই।

কী বৃত্তান্ত কেউ জানল না। জামাই খাওয়ার সময়ও যেন ঘুমায়। কমলার বাবা নিচু স্বরে বাড়ির সবাইকে শাসন করে দেন, যোগেন যে এসেছে তা কাউকে না বলতে। উনি হাটে কোন্ মাস্টারকে বলতে শুনেছেন কলকাতায় নাকী পার্টির গোলমাল হতে পারে। সেই গোলমালেই নাকী অন্য কোনো কারণে যোগেন এমন এসেছে কী না সেটা যোগেনের মুখ থেকে না-জেনে কাউকে বলার দরকার নাই। শুনলেই তো সব এসে ঘিরে ধরবে। আগে যোগেন পুরা ঘুম ঘুমাইয়্যা গা-হাত-পা ঝেড়ে উঠুক, তারপর ও যা বলে তাই হবে।

যোগেন আর তার ছেলে মিলে একসঙ্গে হেসে ও খেলে সবাইকে জানান দিল।

ছেলে-বৌ নিয়ে খাগবাড়ি থেকে যোগেন মৈস্তারকান্দি এল পরের সকালেই—শ্বশুরমশাইয়ের কাছে গোপনে ৩০ টাকা ধার চেয়ে। একটু অবাক হয়েই বলে প্রহ্লাদ, 'তোমার হইলডা কী? কোনো দুর্ঘটনা না তো?' প্রহ্লাদের প্রশ্নে যোগেন যে তার স্বাভাবিক হাসিতে মুখটা ভরে তুলল, তাতেই প্রহ্লাদ আশ্বস্ত হয়ে গেল—যোগেনকে মুখে কিছু বলতে হল না। প্রহ্লাদ তার ঘরের চৌকির পাটাতন থেকে ড্রয়ারের মত ছোট একটা বাক্স থেকে কিছু টাকা বের করে ঠোঁটে আঙুল ভিজিয়ে গুনতে শুরু করতেই 'বাইরের লোকের সামনে গুপ্তস্থান দেখাইয়্যা দিলেন। এরপর ডাকাইতি হইলে তো জামাইরে ধইর‍্যা সদরে চালান দিবে। পাবনা-ফরিদপুরে জামাইবাড়ি

ডাকাতি করার নিয়ম আছে না?'

'হ। এডা তো ঠিক কথাই। উচিত হয় নাই। তবে, পাবনা-ফরিদপুরের কথা তুলল্যা ক্যা? এই হনে তো জামাইয়ের ডাকাতি শ্বশুরবাড়িতে—আমাগ বরিশালি নিয়ম। তুমি ৫০ টাকাই রাখো। পকেট একেবারে খালি রাইখ্যা কইলকাতায় নামা ঠিক না।'

'শোধ দিব্যার টাইম কত?'

'ও। আসাযাওয়ায় পাঠ্যায়ো সুবিধামত—'

'তাও মুখ খুইল্যা কইব্যরে পাইরলেন না—ছি, ছি, এই কয়ডা টাহা কি জামাইয়ের কাছ থিক্যা উশুল নেয়া যায়?'

'তোমাগ বংশবৃত্তি তো নৌকা বানান্ আর নৌকা সারান্?'

'তাই জাইন্যাই তো মাইয়্যা দিছিলেন?'

'সে কথা থাউক। নৌকার গলুইয়ের কামের লগে একডা বেঁকা করাত, পুরাপুরি বেঁকা না, ধরো পূর্ণিমার চাঁদরে বঁটিতে আধাআধি করলে যেমন বেঁকা যাহে, তেমন—?'

'মতলব কী? নৌকা—সাপ্লাইয়ের বরাত পাইছেন নি? জামাইরে মিস্তিরি রাইখবেন?'

'জামাইয়ের একডা প্যাটের লাইগ্যা প্রহ্লাদ বারইবে্ নারকোইলের আধা-খোল হাতে হাটে ঘুরব্যার লাগব না। জামাই তো আমার। ন্যাতা তো দেশের? তোমার কথা ঐ গলুই করাতের নাগান, দুইদিকেই কাটে।'

'মোটে দুইদিক? আমি ভাইবল্যাম, আপনার বরাত বুঝি তিনদিক কাটার?'

'যদি কুনো গলুয়ের তিনডা দিক আছে, দেহ, তাইলে আমার লগে কাইট্যা আইনো বাপ। তুমি তো কইল্যা পাবনা-ফরিদপুরের বামুন-ডাকাইতগ কথা। ক্যা? না—ওনারা জামাইরে ডাকাইতি করত। সেই কথার ভাব তো আসলে ঢাকা-বরিশালের মুসলমান-শুদ্দুর ডাকাইতরা শ্বশুরবাড়িতে ডাকাতি করে।'

'দ্যাহেন বাবা, ডাকাইতির মতন উঁচা কাজ নিজেগ নিজেগ মইধ্যে হওয়াই তো নিরাপদ—ক্ষতি-লাভ দুইভাই নিজেগ মধ্যেই থাইকল। কারোরই লস হইল না কিছু।'

খাগবাড়ি থেকে মৈস্তারকান্দি যাওয়া কি কোনো খাওয়া না কী? মাঘ মাসের মাঝামাঝি। খেতে জল নেই, তাই তাও একটু যাওয়া (বানানো)—না-হলে তো এ-ঘাট থেকে ঠেলে দিলে ওঘাটে গিয়ে ঠেকে। খাগবাড়ির ঘাট থেকে খাল বেয়ে আগৈলঝরা হয়ে হেঁটে গেলেই-বা কতক্ষণ? কিন্তু খাল থাকতে হাঁটা কেন?

ছোট নৌকাটায় উঠতে-উঠতে যোগেন হঠাৎ মাঝ-পাড়ে পেছন ফিরে বলে ওঠে, 'আরে, এইডা শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা? কোনো বাদ্যি নাই, সানাই নাই, কান্দাকাটি নাই, টিনের বাক্স নাই।'

পাড় থেকে মেয়েগলায় কেউ আধা গেয়ে ওঠে, 'আয় লো বর ধরি গিয়া সে বড় লম্পট কপটিয়া'।

ছেলে ছিল কমলার কোলে। যোগেন নৌকায় উঠে দুই হাত বাড়ায়। খালের জলে উলটো ছায়া ফেলে ছেলে বাপের কোলে যায়। ঘাটের পাড় থেকে আবার সেই মেয়েগলা ওঠে, 'দেখো হেরায়, ছাওয়াল না গড়ায়।' ঘাটে লগি লাগিয়ে মাটি ঠেলা দিয়ে নৌকা সরায়। অতটা জলবিস্তারে অতটা আলোতে অতটা আকাশের তলে কমলা আর যোগেন সবকিছু ভুলে ছেলেকে দেখতেই থাকে, অপলকে। কমলা তার শাড়ির আঁচল দিয়ে রোদ আড়াল করে। একটু পরেই যোগেন বলে ওঠে, 'বাতাস আটকাও ক্যান? দ্যাহো দেহি গলা ঘামায়।'

'গলা ঘামায় তো হাত নাইড়্যা আরাম দ্যান, খালের বাতাসে ঠান্ডা লাইগব।'

'ও কি বিলাতে জন্মাইছে? এই জল-হাওয়ার ছাওয়াল আর এই বাতাসে ঠান্ডা লাইগব।'

'দ্যান, আপনারে নিব্যার লাগব না। আমারে দ্যান। ঠান্ডায় জ্বরজারি লাইগলে অর বাপরে পাব কই?'

যোগেন ছেলেকে কমলার কাছে দেয় না। ছেলেকে কোলে নিয়ে একটু নড়াচড়া করে নিজের কোঁচাটা টেনে বের করে খোলে। যোগেন একেবারে হে-হে করে ওঠে যখন হাওয়ায় তার খোলা কোঁচা উড়ে পালের মত হয়ে যায়। যোগেন 'আরে আরে' বলে ওঠে বটে কিন্তু ছেলে কোলে সে কিছু করতে পারে না আর কমলা হাততালি দিয়ে ওঠে, 'এ কেমন বাপ, ছেলেরে কোলে নিতেই কাপড় খুইল্যা যায়'। কমলা ওড়া ধুতি সামলে যোগেনের হাতে এনে দিলে যোগেন সেটাকে ছাতার মত ধরে। এক কোনা থাকে যোগেনের হাতে ; আর-এক কোনা দেয় কমলার হাতে। কমলা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আলগা করে ধরে থাকে।

যোগেন জিগগেস করে, 'কী য্যান কইল্যা, ছাওয়ালের জ্বরজারি হইলে বাপরে পাবা কুথায়? কইল্যা না?'

'এডা কি একডা কওয়ায় কথা? তাই বইল্যা কি আপনারে এইহানে থাকতে কইছি কাজকাম ছাইড়্যা? আপনার বাপ-খুড়া, আমার বাপ-খুড়ার মতো তো আপনার কাম না।'

'সে তো হইল। কিন্তু আশু স্যার তো আছেন?'

'হ্যাঁ তো। তেনার কথা ক্যান?'

'আশু স্যারের কাছে তো আমার কইলকাতার ঠিকানা আছে,' যোগেন বোঝে কমলা তার কথার ইঙ্গিত পাচ্ছে না, সে যোগ করল, 'ওর জন্ম সংবাদ দিয়্যা স্যার লাটশাহেবরে টেলিগ্রাম দিছিলেন না?'

কমলা বলে, 'তহন তো শুইনছিল্যাম। আপনে য্যান কোথায় ছিলেন। সেইখান থিক্যা লাটশাহেব আপনারে বাড়ি আইন্যা দিছিল। শুনছিলাম। বুঝি নাই। হইছিলডা কী?'

যোগেনকে একটু চুপ করে থাকতে হয় ঠিক করতে—কমলার প্রশ্নের জবাব দেবে আগে, না কী তার কথাটা বলে নেবে? সে বলে, 'না। কইতেছিল্যাম, জ্বরজারি হইলে আশুস্যাররে কইয়ো। লাটশাহেবরে টেলিগ্রাম কইর‍্যা দিবে।' যোগেন নিজেই হেসে ওঠে, 'তোমার ছাওয়াল তো লাটের লাট। জগতের সবব্যাইর উপরে। জগদীশ। যোগেনের ছাওয়াল জগদীশ।'

মাঘ মাসের খাল তো—মাঝি হয়তো কোথাও ডাইনে ঘুরতে বাঁয়ে ঘুরেছে—দেখে, খাল আর খাল নেই, বাঁধে গিয়ে ঠেকেছে। শীতকালে এদিকে একটা ছড়ান্—আমন চাষ হয়। জল না আটকালে তো বিছন ভেসে যাবে। তাই জল আটকে চাষ হয়। মাঝিটা কমবয়েসি। যদি কোনো আওয়াজ না-করে নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে নিত, তাহলে নৌকোর দুই প্যাসেঞ্জার টের নাও পেতে পারত—ছেলে নিয়ে তারা এতই মশগুল। সে একেবারে আলবাঁধে নৌকার মাথা ধাক্কা লাগানোর পর বলে ওঠে, 'দেখছ নি হোগামারার কাম!' খালের মুখ জুইড়্যা বান্ধ।'

যোগেন হো হো হেসে উঠতে পারে, 'আরে বড়ভাই, এইডা কী কইরলেন? মাঘ মাসের ডোঙ্গায় খাগবাড়ি থিক্যা পথ হারাইয়্যা ফ্যালেন মৈস্তারকান্দির? এ-কথা দুইকান হইলেও তো সারাডা গৌরনদীতে আপনার নামডাক ছড়াইয়্যা পইড়বে—রায়চৌধ্রিগ সতী হওয়ার নাগাল। লোকজন কইব্যার ধইরবে—দেহিস আবার জুড়ান শ্যাখের নাগাল জলাভোলায় য্যান না ধরে।' যোগেনের কথা থামে বটে কিন্তু সে আবার তার সেই শীতকালের বজ্রধ্বনির মত হাসিতে আকাশ-বাতাস ভরিয়ে দেয়, 'আ রে, জলাভোলা জুড়ান শ্যাখ, তুমি খাগবাড়ি থিক্যা মৈস্তারকান্দির খাল হারাইল্যা', যোগেনের হাসি যেন আর থামে না।

মাঝি, জুড়ানশ্যাখ, ততক্ষণে নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে ফেলেছে। সে যোগেনের হাসিতে বিরক্ত হয় আর কথা শুনে রেগেও যায়। 'মানষের জিভা তো লকলকায়। আগুনের মতন। এই কথাডা যদি হাটের মইধ্যে ফাটে তাইলি তো তারে নাম বদলাইব্যার লগেব বা মাঝিগিরি ছাইড়্যা অন্য কাজ কারবার ধরা লাগে। তাতেও তো মুশকিল। অ্যাহন তার নাম জানে বড়জোর দশজন। নাম বদলাইলে তো জানব একশ জন। সে যোগেনকে ধমকে ওঠে, 'দ্যাহো ভাইগন্যা, অত বন্দুকের আওয়াজ দিয়্যা হাইসোনা, দাঁত ছুইড্যা কপাল ফুইড্যা কইর‍্যা দিবে।'

জুড়ান ভয় পেয়েছে বুঝে যোগেন তাড়াতাড়ি বলে ওঠে। 'জুড়্যান শ্যাখরে সবাই তো জানে যোগেন মণ্ডলের মামা বইল্যা। ভাইগন্যার মুখে মামার গোপন কথা শুইন্যা বিশ্বাস কইরব কোন্ বলদায়? কিন্তু সেই ভয়ে কি আমি মামার কলঙ্ক রটনা দিব না?' যোগেন গুনগুনিয়ে গায়। 'তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিয়া সুখ—'।

জুড়ানশ্যাখ সুরটা শেষ করতে দিয়ে সেই, জলের একটু আওয়াজ ও বাতাসের সামান্য ধ্বনির স্কেলে নিজের গলা বেঁধে বলে, 'হার কার? কলঙ্কই-বা কার?'

এরমধ্যেই ওরা মৈস্তারকান্দির যে-খাত দিয়ে যোগেনদের ঘাটে লাগানো যায়, সেই খাতে ঢুকে পড়ে।

যোগেনের আসার খবর তো মৈস্তারকান্দিতে আসেনি। বৌ নিয়ে, ছেলে কোলে যোগেন চেঁচায়, 'যোগামা কই গেলা?' 'কেডারে?' বলল একজন। আর ঐটুকু বাড়ির তিন ভিটের তিন ঘর থেকে বেরল পাঁচ-ছয়জন। যোগেনের মেজকাকি দৌড়ে এসে যোগেনের কোল থেকে ছেলেকে নিজের কোলে নেয়, ছেলে কোনো কান্নাকাটি করে বা হাত-পা ছুঁড়ে কোনো আপত্তি জানায় না। ঘরের ভিতর থেকে কফে আটকানো গলায় যোগেনের বাবা চিৎকার করে, 'আরে, আইল কেডা? অ বৌমা, আইল কেডা'। তারপরই কাশতে শুরু করে এত জোরে-জোরে যে দুয়োরে দাঁড়িয়ে মনে হয়, এ-কাশি একেবারে দম টেনে থেমে যাবে। বাড়ির যারা তারা শুনতে-শুনতে আর শুনতে পায় না। যোগেন একটু জোর পায়ে বাপের ঘরের দিকে যায়, 'বাবা, আমি, আমি আইছি।'

যোগেনের বাবা জিজ্ঞাসা করে, 'কেডা আইছে? কেডা?'

যোগেন ততক্ষণে তার পাশে বসে তার বুক দলে দিতে-দিতে বলে, 'আমি যোগা আইছি—'

'কহন আইলি? আমারে তো কেউ কয় নাই—'

যোগেন বাবাকে আরাম দেয়ার চেষ্টা করতে-করতে বলে, 'আরে, এই তো আইল্যাম, কইব কেডা?'

যোগেনের বাবা জিগগেস করে, 'থাকবি তো?'

'ঐ যেমন থাকি, দুই-চারদিন। তোমার নাতিরে নিয়্যা আইল্যাম'।

'নাতি? নাতি তো এইহানেই?'

'তোমার তো বিশ্বজোড়া নাতি। সবডা কি এই বাড়িতে আঁটে। ওইডাই শ্যাষ কী না, তাও তো জানি না। অ যোগামা, বাবারে নাতি দেখাও'।

যার কোলে ছেলে ছিল, যোগেনের মাইঝ্যান কাকিই নিয়ে ঘরে ঢোকে। যোগেনের বাবা ভুরু কুঁচকে, চোখ নিশ্চল করে দেখার চেষ্টা করে। তারপর বলে, 'ওরা তোর লগে আইল ক্যামনে? এইহানেই ছিল?'

'না। ওরা তো ঐ বাড়িতেই আছে। আমি ঐ বাড়ি হইয়া অগ নিয়্যা অ্যালাম।'

'যোগা, আইস্যাই যহন পড়ছিস, কবর‍্যাজ মশাইয়ের লগে এডডু যাবি। যদি একডা বাসক

পাতার পাচন বানাইয়্যা দ্যান, তালি বুঝি কাশিটা উইঠ্যা আইসব। না?'

যোগেনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, 'বইল্যা কাম কী?' বাকিটা, 'কবর্যাজ মশাইরে নিয়্যা আসি ডাইক্যা' বলার আগেই তার বাবা বলে ওঠে, 'তাইলে বাদ দে। হয়। সরষ্যার ত্যাল ভাল কইর‍্যা মাইখলেই বিষব্যথা সাইর‍্যা যাইব। না?'

যোগেন তখন কথাটা ঘুরিয়ে বলতে পেরে বেঁচে যায়, যেন কথার কথা বলছে এমন ভাব করে বলে, 'যাই-ন্যা। দেখাটাও হবে নে। আর তেন-পাঁচন যাই দ্যান—'।

একটু চুপ করে থেকে যোগেনের বাবা অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বলে, 'দ্যাখ ভাইব্যা—'

যোগেন উঠে বাইরে যায়।

হঠাৎ করে বাবাকে দেখে যোগেনের মনে হয়ে গিয়েছে, বাবার কষ্ট হচ্ছে, হাসপাতালে চিকিৎসা করালে হয় তো! এটা একেবারে রোজকার অভ্যাসের কাজের মত, একটুও না-ভেবেচিন্তে করে ফেলেছে। বাপের জন্য এটুকু করা এখন যোগেনের ক্ষমতার মধ্যে পড়ে। কলকাতাতেও করতে হয়। কলকাতাতে যাদের জন্য করতে হয়, তারাই যোগেনের ক্ষমতাটা ব্যবহার করে। এখানে, মৈস্তারকান্দিতেও তো এমন কিছু কঠিন না। হাসপাতাল তো এক বরিশালে। যোগেন যদি সিবিল সার্জেনকে একটা চিঠি লিখে কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দেয় আর বাড়ির ঘাট থেকেই বাবাকে নিয়ে একটা নৌকায় রওনা দেয়, তাহলেই তো হয়। যাতায়াতটাই সমস্যা—খালের সুবাদে সেটা এখানে নেই। এক নৌকোতেই বরিশালে যাওয়া যায়।

যাওয়া গেলেই কি আর যাওয়া যায়? বাবাকে এ কথা বললেই বাবার শ্বাসকষ্ট হয়ে যাবে—হা স পা তা ল? ক্যানে আমারে শ্মশানে নিয়্যা যাওয়ার চাইরডা শুদ্দুরের কাঁধ কি পাওয়া যাবে না? আমারে মাইর‍্যা ফেইলতে চাস, বাড়িতেই মার্।

তারপর, বাড়িতে কাকা-কাকিদের আপত্তি উঠবে। সে-আপত্তির প্রধান প্রশ্নই হবে—যোগেন ক-দিন থাকবে?

যোগেন যদি বলতে পারত—আমি নিয়্যা যাচ্ছি, সারাইয়্যা ফিরত দিয়্যা যাব ; তাহলেও বাড়ির লোক রাজি হত না। রাজি না-হওয়ার কত কারণই যে আছে আর তার সবগুলো কারণই এত জোরালো যে একটা কারণেরও কাটান দেয়া যাবে না। না-জানা কারণ যে কত আছে।

মৈস্তারকান্দির কথা না-হয় বাদই দেয়া যায়, এই গৌরনদী থানায় কেউ কল্পনা করতে পারে যে মাঘ-ফাল্গুনের কাশি সারাতে এই বুড়োকে বরিশালের হাসপাতালে নেয়া হচ্ছে।

এমন চরম জায়গা থেকে শুরু করায় যোগেন উলটো কথাও ভেবে ফেলে। গৈলা, কিংবা মাহিলাড়ায়, কি বাটাজোড়ে শিক্ষিত জমিদারপ্রধান জায়গায় হয়ত অনেকেই পক্ষে দাঁড়াত কিন্তু তারা তো নিয়ে যেত কলকাতায়। তাও নিত কী না, সন্দেহ যোগেনের।

ঐ গৈলা-মাহিলাড়া-বাটাজোড়ের বাবুরা কিন্তু যোগেনের বাবাকে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে মত দিত না। বামুন-কায়েতরা নিচু জাতের বিরুদ্ধে কোনো ভাবনা চেপেচুপে রাখতে পারে না। তারা প্রকাশ্যেই বলে বেড়াত ছোটলোকদের কী বাড় বেড়েছে। আর যদি-বা দু-একজন চুপ করে থাকত, তারাও বিমূঢ় হয়ে ভাবত, যোগেন তার বাপের শ্লেষ্মা সারাতে বরিশাল শহরে নিয়ে যেতে পারে যে-ক্ষমতায়, সে-ক্ষমতা যদি কোথাও থাকেও, তা কী করে বামুন-কায়েত-বৈদ্যদের আয়ত্তে না-থাকতে পারে?

ফলে, সেখান থেকে এমন পালটা রাজনীতিও শুরু হতে পারে যে খোলা সিটে তপশিলি প্রার্থী দাঁড়ানো চলবে না। শেষ পর্যন্ত কিছু না-হলেও ওটাই তো যোগেনের সবচেয়ে জোরের জায়গা। সেখানে ঘোঁট বেঁধে যাবে।

ছোটকবরেজ

বিকেলে একটু বেলা থাকতেই যোগেন কবরেজমশায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য বেরয়, যদি তৈরি না থাকে তাহলে যাতে বাটা-ছেঁচার সময় থাকে। অন্ধকার তো ঝপ করে নামে।

১১৭

কবরেজমশায়ের কাছে যেতে আর নৌকো খুলল না, এখন তো শুকনোই থাকে। তাদের পাড়ার দক্ষিণ-উত্তরে মৈস্তারকান্দির খালের বাঁকের উপর দিয়ে এক বাঁশের সাঁকোটা দিয়ে পার হলে ওপারের রাস্তাটা দিয়ে, একটু ঘুরে কবরেজমশায়ের 'সঞ্জীবন'।

এই 'সঞ্জীবন'-এরও ইতিহাস আছে। কবরেজমশায়রা বৃত্তিতে বৈদ্য। ওঁর বাবাকে যোগেন দেখেছে বলেই মনে করে। বাল্যের সেই অস্পষ্ট স্মৃতির ভিড়ে কাকে যে সে কবরেজমশায়ের বাবা মনে করে রেখেছে। কথাবার্তা থেকে একটা আন্দাজের চেষ্টা করা যায়, যোগেন যখন জলিল মাস্টারমশায়ের পাঠশালা ছেড়েছে তখনো বুড়ো কবরেজেরই দাপট। বুড়ো কবরেজের কথা কোনোভাবেই যোগেনের জানা বা শোনার কথা না। তাদের অসুখবিসুখে কবরেজমশাইকে দেখানোর কথাই ওঠে না, অসুখবিসুখের কথাই ওঠে না, তার আবার কবরেজ। কবরেজমশায়ের বাড়ি যেমন মৈস্তারকান্দিতে, মৈস্তারকান্দিকেও তেমনি বলা হত কবর্যাজ গ্রাম। যোগেনদের বাড়ি যে জলের ভিতরে একটা ডাঙার টিলার ওপর, সেটাকে মৈস্তারকান্দি বলতে-বলতে মৈস্তারকান্দিই হয়ে গেছে। কিন্তু আসল মৈস্তারকান্দি হচ্ছে কবরেজমশায়দের বাড়িটাড়ি ঘিরে। এত খাল যে নাম দিয়ে কূল পাওয়া যায় না—এক নাম দিয়েই দশ খাল বোঝানো হয়ে যায়। মৈস্তারকান্দির খাল বলে ধনুকের বাতার যে বাঁকটা বোঝায়, তার এক সীমান্তে যোগেনদের জায়গা। আর ছিলাটা উঁচু জায়গা, রাস্তাঘাট আছে, ওটা হচ্ছে ভদ্দরলোকের মৈস্তারকান্দি। ফলে কার্যত ধনুকের বাতা দিয়ে যাদের গতায়াত, খালপথে, বা আজ যেমন যাচ্ছে যোগেন সাঁকো পার হয়ে এই রাস্তাটা দিয়ে, তাদের সঙ্গে ভদ্রলোকের মৈস্তারকান্দির কোনো সম্পর্ক তো কোনোকালে নেইই, এমন কী তাদের রাস্তাও আলাদা। বুড়ো কবরেজমশায়কে নিয়ে অনেক গল্প বোধহয় চালু ছিল। তারই কিছু হয়ত যোগেন শুনেছে যখন কলেজে পড়া হবে কী হবে না এই অনিশ্চয়তায় যোগেন চাঁদসীতে চিকিৎসাবিদ্যা শিখতে শুরু করে যখন, তখন চাঁদনীর মেজ-ডাক্তার পদ্মলোচন দাস খুব বলতেন বুড়া কবরেজের কথা। ওঁর কাছে কোনো রোগী যদি যেত, যার অসুখের চিকিৎসা চাঁদসী-পদ্ধতিতেই নিরাময় হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, তাকে তিনি চাঁদসিতেই পাঠাতেন। অনেক সময়ই রোগীরাই আপত্তি করত, জাতপাতের কথা তুলে, শূদ্রের দেখা ওষুধ খাবেনই-বা কী করে, অস্পৃশ্যের চিকিৎসাই-বা নেবেন কী করে। বুড়ো কবরেজ নিজেও ছিলেন খুব নিষ্ঠাবান বৈদ্যব্রাহ্মণ। তিনি জাতপাত জানতেন, অস্পৃশ্যতাও পালন করতেন। কিন্তু রোগের চিকিৎসা করতে শূদ্র-চিকিৎসকের কাছে যেতে কেউ জাতিগত কারণে আপত্তি করলে তিনি নাকী খুব চটে গিয়ে বলতেন, 'তাইলে তো আমার কাছেও তোমার চিকিৎসার জন্য আসা উচিত হয় না। আমি কোনোদিন কি কোনো রোগীর নামধাম জাতপাঁত জাইনতে চাই? না। আমি শুধু তার কষ্টের কথাটা শুধু জাইনতে চাই। তার সেই কষ্টটা দূর করা আমার ধর্ম। সেই ধর্মপালনকালে কোনো স্পর্শদোষ ঘইটতেই পারে না। তোমার যা ব্যাধি তার চিকিৎসা আমার কোনমতে চাঁদসিতে উত্তমোত্তম।'

মেজ-ডাক্তারের কাছেই যোগেন কিছু গল্পও শুনেছে। কবরেজবাড়ির একটা অংশ ভদ্রাসন, তাঁদের বসবাসের জায়গা। আর-একটা অংশ গাছপালা, বনবাদাড়, লতাপাতা, ডোবা-একটা

ইত্যাদিতে ভরা জংলা জায়গা। আর-একটা অংশে, তৃতীয় অংশে, কবরেজমশায়দের চিকিৎসার জায়গা। মাঝখানের এই দ্বিতীয় অংশটি আসলে কবরেজমশায়দের লতাপাতা, চিকিৎসার জন্য দরকারি শিকড়, ফল ইত্যাদি রোপণ ও পালনের জায়গা। এই তিনটি অংশের আলাদা-আলাদা নামও ছিল— ভদ্রাসন, গুল্মবন আর সঞ্জীবন। সে তো যোগেনদের সময়ও ওরা জানত, সময় মানে যোগেনরা যখন মাথাচাড়া দিয়েছে। লোকে এত মনে রাখতে পারত না। তারা সবটাকে মিলিয়ে এক নামে ডাকত, 'কুঞ্জবন'। এখনো তাই ডাকে নিশ্চয়। বদলাতে যাবে কেন? কিন্তু কেউ যদি ভুল করে ডাক্তারদের সামনে এ-কথা বলত, তবে তার ব্যাধির বিপদ থেকেও সমূহ হয়ে উঠত সম্মুখ বিপদ। বড় ডাক্তারজ্যাঠা খুব কিছু বলতেন না, কিন্তু ছোট বা মেজ সে-রোগীকে জীবস্মৃত করে ছাড়তেন, 'তোমার শারীরিক দুঃখের কথা পরে কইয়ো— আগে তোমার নাকের চিকিৎসা করি।' সে-মূর্খ যদি তখনো বুঝতে না পারত তার চুপ করে থাকাই ভাল, তাহলেই শুরু হত কবর‍্যাজ মশায়দের ক্ষুর শানানো। এক-একজন মানুষ বা এক-একডা জায়গা নিয়ে এতরকম গল্প তৈরি হতেই থাকে যার সাক্ষ্যপ্রমাণ দরকার হয় না। অথচ, এত নৌকায়, এত খালবিলনদীতে এত জোয়ার-ভাঁটায়, সেসব গল্প তো জলের ওপরের বা তলার দশবিশ দিকে ছাড়িয়ে যায়। যোগেন যখন চাঁদসী শিখতে যেত, তখন এমন অনেক গল্প শুনেছে মেজ-ডাক্তারের কাছে।

একদিন নাকী এক রোগী মাইঝ্যান-কবরেজের ধমকে বলে উঠেছিল, 'কন কী মাইঝ্যা নকত্তা! গু-রে যদি গু-ই কইতে পাইরত্যাম তাইলি তো ষোল আনা মানুষই হইয়া যাইতাম। তিন ডবল পয়সা কম বইল্যা বৌঠ্যারানের হাটে গামছায় ধরা পুঁটিমাছ বেইচত্যাম না।'

এটা খুব চালু গল্প। নানাভাবে চলে। কখনো রেগে উঠে, 'গু-রে যদি গু-ই কইতে পারেত্যাম' কখনো পীড়িত আত্মসম্মানে, 'ষোল-আনা থিক্যা তিন ডবল পয়সা কম মানুষ' কখনো একটু উলটানো অর্থে, 'আরে, আমার কথা ছাড়ান দ্যাও। আমি তো বৌঠাব্যানের পুকুর থিক্যা গামছায় পুঁটি মাছ ধইর‍্যা ঘাটের পাড়ের হাটে বেচি।'

কবর‍্যাজবাড়ি নিয়েই আর-একটা কথা চালু আছে। মনে আসতেই যোগেনের ঠোঁটে হাসি ফোটে। কে বলেছে, কী বলেছে, ঘটনা কী সেসব কোনো প্রসঙ্গ ছাড়াই সুযোগমত লোকে বলে দেয়—'পুরুতে মন্তর পড়ে, পাঁঠার অণ্ডকোষে শোনে।'

'ক-মাস আগে হলেও কবর‍্যাজবাড়ি যাওয়ার পথে এসব মনে পড়লে যোগেন, বলুক-না-বলুক, ভাবত ও বেশ অভিমান নিয়েই ভাবত, বৈদ্যবামুন কবর‍্যাজের সাধ হইছে তার জলাজংলা খোলা জায়গাটার নাম দিব 'গুল্মবন' আর অমনি সারা জায়গার শুদ্দুর মানুষ, মুসলমান আর চুনারি-ঘুনারির দল 'গুল্ম'—বলা শিখ্যা যাইব। তাও তো 'গুল্মবন' না-কইয়্যাই কুঞ্জবন কইছে। কথায় তো ভুল নাই।

কিন্তু এখন যোগেন অতটা রেগে উঠতে পারল না। এমন সব গল্পরটনার মধ্যে যেন একটা সকলের সমস্ত অধিকারেই স্বীকৃত্তিও আছে, নিত্যকার গণতন্ত্র। তেমন একটা সমান বিনিময়ের কারণেই গল্পগুলো মনে থেকে যায়, যেন এই রোজকার জীবনের এই সমান-সমান সত্যটাই সত্য। জাতিভেদ বা ফসলভাগ, এইসব নিয়ে সেই সময় অনুভব যখন মার খায়, তখনই সন্দেহ তৈরি হতে পারে বড়লোক আর ছোটলোকদের" মধ্যে। শুধু তাই নয়। সমান বড়লোকের মধ্যেও। সমান ছোটলোকেরও মধ্যে। গান্ধীজির মত বড় মানুষও তখন তাঁর পরিকল্পনার সবচেয়ে বড় বাধা মনে করেন সুভাষকে। আর সুভাষের মত বড় নেতাও মনে করেন গান্ধীজিই সবচেয়ে বড় বাধা। কিন্তু কেন মনে করেন— সেটা কখনোই সবটা খুলে বলেন না। যদি সত্যিই গান্ধীজি

মনে করতেন— তিনি ওয়ার্কিং কমিটির ভিতরের দুই দলের মধ্যে থাকবেন না, তাহলে তিনি পন্থপ্রস্তাবে রাজি হতেন না। তিনি পন্থপ্রস্তাবে বিরক্তি বা রাগ জানিয়েছেন অথচ সেই প্রস্তাবে তাঁকে যে-ক্ষমতা দেয়া হয়েছে সেই ক্ষমতা ব্যবহার করেছেন। সুভাষ বস্তুত গান্ধীনেতৃত্ব থেকে কংগ্রেস ও দেশকে সরাতে চাইছিলেন অথচ গান্ধীকে বলছিলেন গান্ধীই কংগ্রেসের ও ভারতের একমাত্র নেতা। গান্ধীজি বরং বলেছেন, 'তোমার-আমার কর্মসূচি আলাদা'। সুভাষ এই পর্যন্ত বলতে পারেননি, তিনি দোষী করেছেন 'দক্ষিণ পন্থীদের।' কোনো সময় এটা বলেননি, গান্ধীজি 'দক্ষিণপন্থী' কী না। নীহারেন্দুবাবু একদিন 'শ্রেণী' দিয়ে দু-জনের ভাগাভাগি বুঝিয়েছিলেন। যোগেন পালটা কিছু না-বললেও মনে করেছে—ওই শ্রেণী-ভাগাভাগি ঠিক না, আগেই ঠিক করা থাকছে কে বামুন, কে সৎশূদ্র, কে নবশাখ, কে শূদ্র, কে অতিশূদ্র। গান্ধীজি যে বলেন, বর্ণভেদ প্রত্যেকের সামাজিক কাজ বলে দেয়া আছে, সেটা খারাপ হবে কেন, উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ওটাকে ব্যবহারে খারাপ করেছেন, যোগেন চেষ্টা করেও বুঝে উঠতে পারেনি গান্ধীজি এটা কী করে বলেন। মানে—রাজপুতানায় ক্ষত্রিয়দের সামাজিক কর্তব্য আছে আর বাংলায় নেই? মানে—চারই হোক আর পাঁচই হোক—দুটি মাত্র বর্ণের সামাজিক কর্তব্য সারা দেশে এক। একটি বর্ণ—ব্রাহ্মণ। সমাজের সবকিছুর অনুমোদক। সমাজের সব বর্ণের সমস্ত রকম কাজের ঔচিত্য-নির্ধারক। আগে বলা হত, সমাজের আধ্যাত্মি সামল নে বামুন। সে কখনো আধ্যাত্মিক আর ঐহিক এমন স্পষ্ট ভাগে ছিল কী না, যোগেন জানে না।

ছোট-কবর‍্যাজ মশায় ছিলেন জলচৌকিতে বসে ডেস্কের সামনে। হাওয়াটা এত আচমকা উঠেছে আর প্রায় একই সঙ্গে যোগেন দৌড়ে এমন করে ঘরের ভিতর ঢুকেছে, ছোট-কবর‍্যাজ মশায় চমকে গিয়ে জোরেই বলে ওঠেন, 'কেডা রে?'

যোগেন ভেজেনি, বাতাসের একটা ঝাপটা খেয়েছে। সে চুলটায় হাত বুলিয়ে, ধুতিটা ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে ছোট-কবর‍্যাজ মশায়কে প্রণাম করে বলে, 'আমি, ছোটকর্তা, যোগেন,—'

'তুমি তো যোগেন, তোমার বাপ কেডা?'

'শ্রীরামদয়াল—'

'দয়াল কি পদবী?' তালি তো হওয়ার লাগে শ্রীরামচন্দ্র দয়াল। তুমি শ্রী কইল্যা, চন্দ্র তো কইল্যা না?'

ঘরে আরো দু-একজন ছিল, তাদেরই মধ্যে কেউ বলল, 'ছোড কত্তামশায় ইনি তো আমাগ মেম্বার।'

'তোমা গডা কারা আর মেম্বারই-বা কীসের?'

যোগেন হাসিমুখে বলে, 'আমি যোগেন। যোগেন মণ্ডল। উনি ভোটের কথা তুইলছেন, গেল ভোট।'

ছোট-কবর‍্যাজ মশায় ভুরু একটু কুঁচকে বলেন, 'ভোট—স্যায় তো আই নাভার ভোট?' যোগেন ঘাড় হেলিয়ে হাসে।

'আরে সেডা তো কইব্যার লাগে। আমি মেম্বার যোগেন। তা না কইয়্যা তুমি আইস্যাই বললা আমি যোগেন। দ্যাহ কাণ্ড। বসো, বসো। তুমি তো একডা মান্যগণ্য মানুষ। বসো। আমি অবিশ্যি তোমারে খুব বেশি দেখি নাই। খবর কী কও? তুমি হঠাৎ আজ আইল্যা ক্যান?

'কবর‍্যাজ মশায়, আমারে আপনে দেইখবেন ক্যামনে? আপনার তো এইখানে, জীবনদানের ফ্যাক্টরি আর আমাগ তো তার উলট্যা ফ্যাক্টরি—'

'ক্যা? তোমার তো তেমন নিন্দা শুনি নাই। কও। কী কামে আইছ?'

'কলকাতা থিক্যা আইস্যা দেহি— বাবার কাশি উঠে শ্বাসটানার মত আওয়াজ হয়, কইল, কবর‍্যাজ বাড়ি থিক্যা বাসক-পাঁচন আইন্যা দিলেই আরাম হইত।'

'তোমার বাপের কি কুনোদিন ইতিপূর্বে আমাগ ঘরের পাঁচন খাইয়্যা আরাম হইছিল—'

'আপনাগ ঘরের পাঁচনে আরাম পাইতে কি খাওন লাগে?'

'এত্‌দিন যদি স্মরণেই আরোগ্য হইয়্যা থাকে এবার ক্যান খাওনের দরকার পইড়্‌ল। বাপের শ্লেষ্মার রং দেখছ?'

'শ্লেষ্মা তোঁ দেইখলাম। রং তো বুঝি নাই।'

'তুমি কি দিনকানা?'

'না। ঘরে তো অত আলো ঢোকে না—'

'অ—। তাইলে তো মনে হয় হলদ্যা। শ্লেষ্মা পাকছে।'

'কী কইর‍্যা বুইঝলেন ছোড কত্তা'।

'শাদা কফ হইলে তো তুমি আবছা ঘরেও দেইখতে পাইত্যা। তুমি কয়দিন থাইকব্যা?'

'কয়দিন আর? দুই-এক দিন কী তারও কম।'

'দুই দিনে তোমার বাপের তো আরাম হইত না। বাসকের পাঁচন খাওয়া দরকার ছিল মাস দুই আগে। আমি একডা অন্য ঔষধ দেই। এইডা দুইবেলা খাইব দুই মুখটি কইর‍্যা। বাড়িতে কে আছে খবর দিব্যার?'

'আছে। আপনি কন। কবে খবর দিবে?'

'এইডা ভাল কইর‍্যা স্মরণে রাইখো। আজ হইল মাঘের কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়। রাত্রি নয়ডায় তৃতীয়া ধইরবে। তাইলে ধরো, অমাবস্যা পইডব বারদিন বাদে। বার। ভাল দিনে আইছ রে মণ্ডল—তিথিপক্ষ দুইই মিলল। অমাবস্যার পরে দুইডা সূর্যোদয় কাইটলে আমারে আইস্যা য্যান খবর দেয় শ্লেষ্মার রং বদলাইছে কী না আর শ্বাসটা না কমছে কী না। এতগুল্যা খবর দেয়ার মতন মানুষ আছে তো?'

'অত কইলে মনে রাইখবার পারব না। আমি কয়্যা যাই অমাবস্যার দিনডা বাদ দিয়্যা দুই রাইত কাইটার মাথায় আপনারে খবর দিবে। খবর দেয়ার আগে বাবারে শুধ্যায়া আইসবে কী কইব্যার লাগবে। যার শ্লেষ্মা আর যার শ্বাস, সে ছাড়া কেউ রং চিনবে না আওয়াজ চিনবে?'

'যোগেন মণ্ডল, তোমার তো দেহি বুদ্ধি এক্কেরে চৌখোপা। বাঃ। আমাগ তো বেশি সময়ডাই ব্যয় হয় রোগী কী কইব্যার চায় সেইডা আন্দাজ কইরতে। জি—তে—ন'—

জিতেন মানে যিনি ওষুধ দেবেন। তাঁকে বরং যোগেন একটু বেশি চেনে, হাটেবাজারে দেখেছে। জিতেন এসে যোগেনকে দেখে বলে, 'কবে আইল্যা'।

'ফিরত যাওয়ার আগের দিন', একটু হাসাহাসি হল।

'ওর বাবার শ্লেষ্মা বৃদ্ধি, শুইন্যা তো মনে নিল কাতর। নইলে ছাওয়ালরে কি আর কবর‍্যাজ বাড়ি পাঠায়। অ্যা সমাজে তো বৈদ্যং শূদ্রম্মন্যতে। যোগেন কইল্যাই বাপের কারণে এইবার আইসছে। ওরে আর বইলো না ওষুধ বান্যায়া রাখব, কাইল আইস্যা নিয়ে তোমার ভাণ্ডারে মুথা আছে তো নিশ্চয়ই। পুরানা তিন্তিরির পাতলা জলে মিশাইয়্যা এড্‌ডু না-হয় বর্বুরত্বকও দ্যাও। বয়স হইছে তো। এক পক্ষকালে মত দিয়ো।'

জিতেন, 'বও' বলে ভিতরে চলে যায়।

যোগেন বলে বসে, 'ছোড কত্তা, আপনাগ এইহানে তো আমাগ আসা হয় না—'

'আসায় তো কুনো নিষেধ নাই মণ্ডল। ঠিক কইর‍্যা কইলে কইতে হয়— বরং উৎসাহ আছে।

কিন্তু সেডা তো কওয়া ঠিক না।'

'ক্যান? বেঠিকডা কী? এ তো খোলাখুলি কাম—'

'জি তে ন' ছোটকর্তা জোরে ডাকেন ভিতরের দরজার দিকে মুখ করে, সেখানে জিতেন এসে দাঁড়ালে বলেন, 'পরিমাণের থিক্যা কম এড্ডু দ্রাক্ষামধু মিশান যায় না?' জিতেন চলে গেলে ছোট কর্তা পুরনো কথার খেই ধরেন, 'চিকিৎসার লগে মানুষজনার উৎসাহ দিলে তো এইডাও বুঝায় আমি আমার আয়বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই উৎসাহ দেই।'

'আমি সে-কথা ভাইব্যা কই নাই। আমাগ তো কুনো জায়গাতেই ঢোকার কোনো অধিকার বা অনুমতি নাই। শুদ্দুররাই তো ব্যাধির বাহক। না-যাইতে-যাইতে আমাগ কোথাও যাওয়ার ইচ্ছাডাই মইর্যা গিছে গা। আপনাগ এইখানে বইস্যা মনে হয় তীর্থে আইছি। কত যত্নে আপনারা মানুষরে খাড়া রাহেন।'

'যোগেন, আমরা তো বৃত্ত্যা বৈদ্যঃ। স্বইচ্ছায়। আমরা তো কাহারো দ্বারা নিযুক্ত নয়। বৃত্তি অর্থ তো স্বযুক্ত। যে-ব্যক্তি স্বযুক্ত হইয়া কোনো বৃত্তি দ্বারা জীবননির্বাহ করে, কোনো গ্রাহককে তো অন্য কোনো কারণে প্রত্যাখ্যাত করতে পারে না। কইরলে সে বৃত্তিধর্ম থিক্যা পতিত হয়। কোনো ব্রাহ্মণ যদি শূদ্র যজমানের কার্য গ্রহণ না করে তাইলে তো ব্রাহ্মণের বৃত্তিই লঙ্ঘন করা হয়। ব্রাহ্মণের বৃত্তি কী? যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা। যদি কোনো জাইল্যা আইস্যা কয়— বামুনগ মাছ বেইচব না সেডা যেমন অন্যায়, শুদ্দুরগ কাম কইরব না বলা ব্রাহ্মণের পক্ষে ততোধিক অধর্ম। চতুর্বর্ণের স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য বিভাজন কী কইর‍্যা বামুনঠাকুর বৃত্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করে? মণ্ডল, আমি হিন্দু, বৈদ্যবর্ণ, পরজন্ম মানি, পূর্বজন্ম মানি, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য মানি, ধর্মভেদ মানি। এগুলারে মান্য বইল্যাই মানি। কিন্তু এই সবগুলা মান্যেরে বাইন্ধ্যা রাইখছে কেডা? স্বধর্ম। স্বধর্ম, মানে, স্বযুক্ত বৃত্তি।'

'আপনার সবডা কথা মাথায় কইর‍্যা রাইখল্যাম। ললাটে আঘাতও কইরল্যাম— হায় রে, এমন সোজা কথাডা মাইনষে পালন করে না ক্যা? কিন্তু একডা দুষ্ট কথা কই। ক্ষমা দিবেন।'

'আরে, কও-না বাপ। আমি তো তোমারে কিছু কইব্যার দিল্যাম না। নিজেই বকবকাইয়া গেলাম। কী কথা, কও।'

জিতেন একটা বেশ বড় আকারের বোতল এনে যোগেনকে ধরিয়ে দেয়, 'সেবনবিধি, অজুপান, নিষেধ সব শোনা হইছে তো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে তো কব্যা দিছি, সকালে দুই মুখটি, রাইতে দুই মুখটি, শুক্লা তৃতীয়া পর্যন্ত।'

'মুখটি? আমি তো ছিপি সাঁইট্যা দিছি।'

'ক্যামনে দিল্যা?' মাপব কী দিয়া?'

'চামচ নাই? ছাওয়াল পাওয়ালগ দুধ-খাওয়ানোর ঝিনুক?'

'চামচ? ঝিনুক? মানুষ দ্যাহা ছাইড়্যা দিছ?' যে-পথ মাড়াইয়া হাঁটো সেইডায় কাদা না পাথর দ্যাহো না? আমার চৌদ্দ পুরুষের পুণ্যে আইজ এক শুদ্দুর আইছে আমার কাম আদায়ে। শুদ্দুরগ চোখে দেহো না? না? খাদ্য নাই, পরন নাই, বৃত্তি নাই। তাগ থাইকব চামচ আর ঝিনুক।'

'দ্যাহেন, কী উলটা কাম! আমি আবার ভাইবল্যাম ভোটে জিতা মেম্বার। কইলকাতার। মুখটির মাপ কইলে আবার অপমান ঠেকবার পারে,' জিতেন বোতলটা নিয়ে ভিতরে গিয়ে একটা বেশ বড় মুখটি বোতলের মুখে পেঁচাতে-পেঁচাতে ফিরে আসে। যোগেন দাঁড়িয়ে বোতলটা নিয়ে একটু চাপা স্বরে জিতেনকে জিজ্ঞাসা করে, 'কত দিব্যার লাইগব, কাহা—'

'একপয়সাও না', ছোটকর্তা জলচৌকি থেকে নেমে খড়মের ওপর দাঁড়ান, যোগেনের পকেটে

হাত, জিতেন চলে যায়, 'যোগেন, দক্ষিণা ছাড়া বৈদ্যের চিকিৎসায় ফল হয় না। ব্যতিক্রম, মুমূর্ষু, রাজকুল ও আগত বিদেশী।

বিনা দক্ষিণা বৈদ্যস্য চিকিৎসা ন ফলবতী।
ব্যতিক্রম মুমূর্ষু যথা বিদেশী চ রাজকুলাদি।।'

যোগেন পকেট থেকে হাত বের না করে বলে, 'আমারে এর কোন খোপে ফেইললেন ছোটকর্তা।'

'সেডা কওয়া লাগব। তুমি তো এতলোকের ভোটে রাজসভায় তাগো প্রতিনিধি।'

'আমি তো সেই পোস্টে আমি নাই। আমি তো আইছি বাপের ব্যাধির লাইগ্যা। আপনে দক্ষিণা না কেন, আমারে প্রণামীডা দিব্যার দ্যান।'

'বাবা, তুমি ভোট না কইরলে কি আর বাপের কষ্ট দেইখ্যাও বৈদ্যবাড়ি আসতা? আসতা না।'

'ছোটকত্তা, এরপর তো আমার আইসতে লজ্জা লাগব।'

'অতডা দুর নিজেরে নিয়্যা যাইয়ো না। আইসো'।

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

রাস্তায় নেমেও যোগেন বোঝেনি, আকাশ এতটা নীচে, আর বাতাস যেন নারকেলের ডাঁটি ছেঁড়া। অ্যাঁ? এমন তো কথা ছিল না। যোগেন ধুতিটা মালকোচা মেরে নেয়—ওষুধের বোতলটা পথেই একটু নামিয়ে। তারপর, বোতলের গলা চেপে ধরে প্রায় ছুট লাগায়। কথাডা দিছিল কেডা যে ঝড়বৃষ্টি হবে না?

দুর্যোগ শুরু

১১৮

বাড়ি পৌঁছুতে-পৌঁছুতে যোগেন বুঝে ফেলে ব্যাপারটা এই-একটু বাতাস উঠল গোছের চাইতে একটু অন্যরকম। বৃষ্টি থাকলে অন্যরকম হত না। শুধু হাওয়া—যা হোক রাত কাটলে হয়ত আন্দাজ পাবে। ধুতিটা মালকোঁচা দিয়ে নিয়েছিল বলে একহাতে বোতল নিয়েও বাঁশের সাঁকোটা পেরতে অসুবিধে হল না। বোতলটা কোনো দড়ি দিয়ে ঝোলানো হয়নি। সেটাকে একহাতে তো লেপটে রাখতে হয়। বৃষ্টি ছিল না বলে সাঁকোর বাঁশ বা ধরানি পিছল ছিল না। তাদের এই টিলাটায় এতগুলো বাড়ি যে কোনো সময়ই সম্পূর্ণ জনহীন হয় না। গভীর রাতেও না। অনেকে বাইরে শোয়।

এটা একটা সাপের প্যাচের পথ। দুই পা ফেললেই বাঁক। ডাইনে ঘর, বাঁয়ে ঘর। ঠিক সীমানাটা বাড়ি নয়। যোগেন এগতে-এগতে হাঁকে, 'কী রে রত্না, রাইতের মোতা সুইত্যা শুইছিসনি?' কোনো ঘরের দরজা খোলা নেই, কোথাও কোনো আলোও নেই। থাকার কথাও না। যোগেনের বাড়িতে ল্যাম্ফ জ্বলে, যোগেন এলে। নইলে, সন্ধের পর আলো দরকার হয় না।

যোগেন আর-একটা হাঁক দেয়, 'সাবি খুড়ি, খিচুড়িতে দুই কো রসুন দিয়ো।'

সাবি খুড়ি ঘরের ভিতর থেকে চৌকিদারি গলায় হেঁকে ওঠে, 'তুই তো সিঁদকাঠি নিয়্যা

বারালি, রসুন পালি না?' সাবি খুড়ি তার গলা চিনতে পারেনি। পারবেই-বা কেন। সাবি খুড়ি কি জানে যোগেন এসেছে। সাবি খুড়ির ঘর পার হয়ে গিয়েছিল যোগেন, যেতে-যেতেই ঘাড় ঘুরিয়ে জবাব দেয়, 'ওয় যে খুড়া কইল, থো তোর রসুন, সিঁদু কাইয্যা রসুন চুরি? চুরিরও তো মানমর্যাদা আছে।' সাবি খুড়ি কোনো জবাব দিল না। হয় শুনতে পায়নি, নয় চিনতে পেরেছে— কথার ধাঁচে। নারকেল গাছটাকে বাঁহাতে রেখে যোগেন ডানহাতে নিজেদের দুয়ারে ঢুকে ডাকে, 'যোগামা, অ যোগা মা, তোমরা কি নিশুত গেলা?'

তখন যদিও একটা ঝাঁপ ঠেলে যোগেন ঢুকে পড়তে পারে, একটা ঘরে, কিন্তু ঢুকেই বোঝে— বাতাসের কারণে সব একেবারে বিপর্যস্ত। তাকে বুঝে নিতে হয়, সে কাউকে জিজ্ঞাসা করে না। সন্ধ্যার মুখে, এই টাইমে রাত্রির ভাত নেমে যাওয়ার কথা। কিন্তু বাড়িতে কোথাও ভাতসেদ্ধর গন্ধ নেই। তখন তার মনে পড়ে, পাড়াতেও পায়নি। অথচ তখন খেয়াল হয়নি যে ভাতের গন্ধ পাচ্ছে না। এই বেলায় যদি এই হাওয়া ওঠে আর এতক্ষণ ধরে চলে, তাহলে আখা জ্বলবে কী করে? এমন অকাল হাওয়ার জন্য তো কেউ তৈরি ছিল না—ঘরের ভিতর একটা আখা খুঁড়ে রাখত। সেই আখাটাই এখন খোঁড়া হচ্ছে। ছোটখুড়্যা খোঁড়ে। কুপি জ্বালানো হয়নি। যোগেন হিশেবটা জানে—আখা খুঁড়ছে আগুনের জন্য, সে-আগুন তো আলোও দেবে, তাহলে এখন কেন কুপি জ্বেলে কেরসিন আর আলো দুটোই নষ্ট করবে?

যোগেন চাপা গলায় বলে, 'ছোড়খুড়্যা, আমারে দ্যাও'।

'হইয়া গিছে রে যোগা। তুই বরং বাইরে থিক্যা খটখটা নারকেলের পাতা-ডাল পাস কী না দ্যাখ।'

'সেসব তো গুছান্ আছে। ছাওয়ালডা আইল আইজ অরে না-খাটাইয়্যা তোমার শান্তি নাই', ছোট খুড়ির গলা। ঝাঁপটা ঠেলে যোগেন বেরিয়ে যায়। ছোট খুড়্যার ইশারা সে বুঝতে পেরেছে। দুয়ারের যে উত্তর মাথায় নৌকা-তৈরি-মেরামতির কাজ হয়, সেখানে শুকনো ডালপালা, কাঠছাঁটা, গোটা খড়িও পড়ে থাকতে পারে। বেশি খুড়ি দিয়ে আগুনটা বড় করে জ্বালালে ভাতটা তাড়াতাড়ি নামানো যাবে। কিন্তু কাঁচা আখা জ্বলবে তো?

বাইরের বা ঘরের ভিতরের অন্ধকারে যোগেনের আটকায়নি। কিন্তু এখন, শুকনো পাতা, কাঠের টুকরো কুড়োতে এসে সে উত্তর ভিটেয় ফাঁপরে পড়ে—খুঁজবে কী করে? যদিও প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই যোগেনের মনে আসে—ট্রেন থেকে নেমেই শিয়ালদা মার্কেট থেকে তিন ব্যাটারির একটা টর্চলাইট কিনবে, বরিশালে আসার সময় সঙ্গে রাখতে।

তবে এবার তো বটেই, এর আগেও, যেমন করে সে একটা ঘোরের মধ্যে বরিশালে আসে, তাতে আর টর্চটা আনা হবে কী করে? শ্বশুরের কাছে ধার করতে হল?

হাওয়ার বেগে ঠিক তখনই একটা মোচড়ানোর আওয়াজ উঠল।

পাশের বাড়ির নারকেলগাছের একটা ডাল ভেঙে পড়ছে। কিন্তু ভেঙে পড়ছে এমন ছ্যাঁচড়ানো আওয়াজটা পেল না। তাহলে হয় পড়েনি। না-হয় হাওয়ার বেগে খালে গিয়ে পড়েছে। এখানকার কোনো মেয়ে-পুরুষ কোনো সময়ই এ-আওয়াজ ভুল করবে না। এখন এই সান্ধ্য ঝড়ে তো কিছুতেই না। হতে পারে, পড়ার আওয়াজটা ওঠেনি বলে কেউ ছুটে আসেনি, নারকেলগাছের মালিকও না। যোগেন সেই সুযোগ নিতে খালের দিক থেকে গাছতলায় পৌঁছে যাওয়ার আগেই খালের ঢালে ডালটা পেয়ে গেল। ঢালে পড়েছে বলেই আওয়াজ ওঠেনি।

যোগেনকে হাত দিয়ে আন্দাজ করতে হয়—ডালের গোড়া কোন্দিকে। গোড়া ধরে টেনে নিয়ে যাওয়ার সুবিধে। কিন্তু গোড়াটা ঢালের আরো নীচের দিকে গড়িয়ে গেছে। ঢাল বেয়ে

এতটা নামতে ভরসা পেল না যোগেন। তাই সে আগার পাতাগুলো একসঙ্গে জাপটে ডালটা টেনে নিতে শুরু করে বাড়ির দুয়ারে। দুয়ার তো এটাও, যোগেন একেবারে ঐ ঘরের মধ্যে বা ঝাঁপের সামনে নিয়ে ফেলতে চায়। ডালটা বেশ সরসরিয়েই আসে। যোগেন ভাবছিল, গোড়াটা তো মোটা, সেটা মাটির কোনো বাধায়, এমন কী গর্তেও ঠেকে যেতে পারে।

ছোট খুড়্যা তাকে কাষ্ঠসন্ধানে পাঠালে যেগেনের তিলমাত্র বিশ্বাস ছিল না যে আখার পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণের কাঠ সেই অন্ধকারে সে খুঁজে পাবে। নিশ্চিত ব্যর্থতা সত্ত্বেও সে খুঁজছিল মন দিয়েই—যদি কাঠের চাঁই বা টুকরো পেয়ে যায়, এতগুলো মানুষের রান্না, অন্তত একহাঁড়ি ভাত তো সারা যাবে বা নামানো যাবে। হাওয়াটা এত আচমকা উঠল, অথচ আচমকা-হাওয়ার যতটুকু সঞ্চয়ের মধ্যে পড়ে যাওয়ার কথা তা পড়ল না, আর সন্ধ্যা পড়ে গেল যে মানুষজন তৈরি হওয়ার সময়ই পায়নি। এখন আর কেউ আশা করছে না, বাতাস কমবে কখন। এসব এখানকার সবারই জানা—হাওয়া-জলের মর্জি একটু আন্দাজ করা যায় মাত্র, সে-একটুও মর্জির সিকিভাগ না।

যোগেন আরো-একটা কারণে তাড়াতাড়ি করছিল। এ-ডালটা নারকেলগাছের মালিকের প্রাপ্য। আর-কেউ সুযোগমত সেটা নিয়ে নিলে, সেটা চুরি। যোগেনের তেমন চুরি করা মানায় না।

সেই নীতিজ্ঞান ও সমাজবিধির প্রতি মান্যতা বশত যোগেন মণ্ডল বিএ, বিএল, এমএলএ একটু তাড়াতাড়ি করতে পারে মাত্র কিন্তু সমুদ্রের ভিতরের একটা চরকে, বরিশাল জিলা, বাখরগঞ্জ জিলা, চন্দ্রদ্বীপ এইসব নাম দিলেই তো নয়দিকের সমুদ্র শুকিয়ে যায় না, জিলা-মহকুমা-থানা যেমন খটখটা থাকার কথা তেমন খটখটা হয় না, আর, সমুদ্রের দশম দিকে, জলের তলায় কুম্ভকর্ণের নাকডাকাও থামে না। একজনের কাত-ফেরায় যদি তার নাকের হাওয়ায় সন্ধ্যার ভাত নামানো না-হয়, তাইলে ঘরের মইধ্যের কাঁচা মাটিতে আখা খোঁড়া ছাড়া য্যাখন উপায় নাই কোনো, তেমনি নারকেলগাছের শুকনা ডাল হাতের নাগালে পাইলে চুরি-করা ছাড়া ব্যবস্থা নাই কুনো। আইনে যারে চুরি-ডাকাতি-খুন কয়, বরিশালে তারে তা কয় না।

নারকেলের একটা আস্ত শুকনো ডাল নিয়ে ঝাঁপ ঠেলে যোগেন ঢুকলে খুব যে বিস্ময়জ্ঞাপক আওয়াজ ওঠে, তা না, যোগেন গিয়ে ছোটখুড়োর ঘাড় ধইর‌্যা কয়, 'উঠো তো। আমারে করব্যার দ্যাও'। ছোট খুড়ো সরে যায়। যোগামা চাপা স্বরে বলে, 'পালি কই?' যোগেন বলে, 'যেহালে গাছের ডাল গজায়। চাইল হাঁড়িতে তো?' যোগামা বলে, 'সে তো গাছের মাথায়। তুই সেহানে উঠলি ক্যামনে?' 'ক্যা? নারকেলগাছের যেমন কইর‌্যা বাইয়্যা উঠে। দে। গোড়ার খানিকটা দে। পাতা ছিঁড়্যা কাঠি আলাদা কর্।' যোগেন যাদের বলছে, তারা আছে বলে ধরে নিয়েছে, ছেলেপিলেরা। একটা প্রযুক্তির সমস্যা মেটাচ্ছিল যোগেন। কাঁচা মাটি খুঁড়ে গর্ত করলেই তো আর সে-মাটির ওপরে আগুন জ্বালানো যাবে না। কিন্তু ডালের মোটা গোড়া আর গোড়ার মোটা পাতা বিছিয়ে দিলে আগুন জ্বলে উঠতে পারে। যোগেন তেমন একটা ব্যবস্থা করছিল।

আঁচটা যোগামা-রাই ভাল দিতে পারবে।

যোগেন দাঁড়িয়ে উঠে বলে, 'যোগামা, আঁচ দ্যাও। ভগুর থিক্যা। যোগামা আমার একডা বৌ নিয়্যা অ্যাসছিল্যাম, শ্যায় আছে না গিছে'।

'ক্যা? ছিল্যাম তো নারকেলগাছডায় পা ঝুল্যাইয়্যা। নাইলে ডাল পাইতেন ক্যামনে?' কমলা খুব চাপা স্বরে বলে।

কখন একসময় বোঝা গেল, হাওয়াটা অন্যরকম?

যেন, প্রথম থেকে হাওয়াটার চেহারা-তরিবৎ সকলেরই চেনাজেনা ছিল, একসময় তারা তাদের জানাটা ঠিক না এটা বুঝে গেল। মানে, সেই আগের আন্দাজটা ভুল ছিল, এখন আবার নতুন আন্দাজ তৈরি হবে—হাওয়াটা যখন রাত পেরয়।

থাকবে বরিশালে, আর জল-হাওয়া থাকবে চেনাজানা, কলকাতার ট্রামগাড়ির মত—এটা কি সম্ভব?

এই হাওয়ার মুখে রাতে তো আর কেউ দুয়ারে শুতে পারে না। বৃষ্টি হলে না-হয় ভেজার ভয় থাকে, হাওয়ায় অসুবিধে কী?

হাওয়ার অসুবিধেটা একটু বিপদের। এমন হাওয়া কখন-যে ডবল বেড়ে যায়, ঘুমের মধ্যে কেউ বুঝতে পারে? জেগে হাওয়ার মধ্যে বসে থাকলেও বোঝা যায় না, তার ওপর ঘুমের মধ্যে? সেই হাওয়ায় বাড়ির কোনো ঘর ভেঙে গিয়ে তোমাকে কবর দিতে পারে। সেই হাওয়ায় কোনো জায়গা থেকে একটা কাটা টিন উড়ে এসে সুদর্শন চক্রের মত তোমার গলাটা কেটে তুলে নিয়ে যেতে পারে। সেই হাওয়া তার সবটা জোর দিয়ে তোমার দম আটকে মেরে ফেলতে পারে। মরাটাকে ভয় পেয়ে তো বাঁচা যায় না। কিন্তু বাঁচতে হলে মরণ যতটা এড়ানো যায়।

কমলা আর তার ছেলেকে কোনো একটা নিরাপদ জায়গায় যোগামা ঠেসে দিয়েছে। যোগেন, ছোটখুড়ো, গোটা কয়েক ছাওয়াল-পাওয়াল আর যোগেনের খুড়ার বেটাভাইদের মধ্যে যে-বড়—তারা ছিল সব এই ঘরে।

শুয়েই যোগেন নাক ডাকতে শুরু করে।

ছোটখুড়ো রাতের অন্ধকারকে বলে, 'এরে কয় সিদ্ধ পুরুষ। ঘুমের জইন্য শোয়াও দরকার নাই'।

কিন্তু রাতের কোনো একটা সময় খুড়ার বেটা ডেকে ওঠে, 'যোগাদাদা, আওয়াজ কীসের? তোমার? না, হাওয়ার?'

যোগেন তড়াক করে উঠে বসে বলে, 'আওয়াজ কীসের রে? হাওয়ার না কী?'

যোগেন ঝাঁপ খুলে বাইরে যায়।

কাঁচা একটা মানুষ পেয়ে হাওয়া যেন উপোসী বাঘের মত কিড়মিড় করে উঠে যোগেনকে কামড়াতে আসে। যোগেন যেন হাওয়াটাকেই জিজ্ঞাসা করে, 'আরে, সাইকোলন না কী রে?'

ভিতর থেকে খুড়ার বেটা জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার কী যে সুবিধা সেডা আগে ঠিক করো। তারপর জিগ্যাও কলোন, নাকী হাউড্যা, না কী, টারমল, নাকী ডিপেরেশন, নাকী উইন্ডফোর্স?' এসব হল স্টিমার আর লঞ্চের। খালাশিদের কাছে শেখা—কোন্ হাওয়াকে কী বলে, সাইক্লোন, টারময়েল, ডিপ্রেশন, হাই উইন্ড নাকী উইন্ডফোর্স। কোম্পানিগুলি কিছুতেই স্টর্ম বলতে চায় না। স্টর্ম বললে ও তারপর স্টিমার-লঞ্চ ডুবলে কোম্পানিকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। খুলনা-নোয়াখালি-চট্টগ্রামের জোড় লাগানো যে-সমুদ্র, সেই পুরোটা জুড়ে উথালপাথাল না হলে স্টর্ম হয় না।

যোগেন হাওয়াটাকে মুখোমুখি নিতে পারে না। সে ঘরের বেড়ায় বুক দিয়ে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে বলে, 'উইঠ্যা আয় তো—দ্যাখ তো ঘর মচমচায় না কী!'

'কও কী দাদা, এতক্ষণ তো ভাইবছি তোমার নাকডাকে না ঘর মচমাচায়, ঝাঁপ ঠেলে খুড়ার বেটা দুয়ারে নেমেই হুমড়ি খায়, যেন ঠোকর খেল। যত ফুটো বেড়াই হোক, তবু তো বেড়াই—হাওয়ার আওয়াজে সে বুঝেছিল হাওয়াটা যেন উঠছে আরো। কিন্তু হাওয়ার বেগ আর ধাক্কাটা তো সে আন্দাজ করতে পারেনি। ঘরের বাইরে পা দিতেই সে হাওয়ার ধাক্কায় হুমড়ি খেল।

যোগেন যেমন বুক সেঁটে ছিল বেড়ায়, সেই ভঙ্গিতে বসে পড়ে সে দুয়োরের দিকে ঘুরে এক দৌড়ে সামনের ঘরটায় বেড়া ধরে দাঁড়ায়। এখানে হাওয়ার ধাক্কা যেন একটু কম। আবার সেই মড়মড় আওয়াজ ওঠে।

যোগেন তার ভাইকে জিজ্ঞাসা করে, 'শুনলিনি?'

হাওয়ার বেগে আর আওয়াজে কথা উড়ে যায় এই আট দশ হাত দূরত্বে। ভাই চিৎকার করে, 'কী কও?'

যোগেন আবার চেঁচায়, 'শুনলিনি মড়মড়ানি?'

'হ্যাঁ। শুইনল্যাম তো!'

'ডালের না চালের?'

এই হাওয়ার ধাক্কায় কোনো বড় গাছের ডাল মোচড়াচ্ছে ভেঙে পড়ার আগে, নাকি মোচড়ানোর জায়গা আছে তাই মোচড়ায়—ভাঙার মোচড় না, নাকি কোনো ঘরের কোনো আড়াচালের দড়ি ছেঁড়ার আগে মোচড়ায়।

এই বেগের হাওয়ায় ও এই আওয়াজে এমন দিগভ্রম ঘটেছে যে আওয়াজ শুনে আওয়াজের অর্থ নির্ণয় প্রায় অসম্ভব। অথচ, যদি ঘরের চালের আড়ার দড়ির আওয়াজ হয়, তাহলে তো সেই ঘরে যারা আছে, তাদের এখনই বের করে আনতে হবে—না-জেনেই যে বের করে এনে কোথায় তারা নিরাপদ হবে। অথচ, এত না-জানার কারণে তো একঘর মানুষের ঘর চাপা দেখা চলে না।

ভাইয়ের গলা শোনা যায়—'চুপ কইর‍্যা যাহো, আর-একবার শুনি, কান খাড়া রাইখো।'

ঠিক তখনই দক্ষিণের ঘরের ঝাঁপ খুলে বেরয় যোগেনের ছোট খুড়ি। সে বোধহয় ঠোঁটের আগায় কোনো কথা নিয়েই বেরিয়েছিল। হাওয়ার ধাক্কায় পড়ে যায় ঘরের বাইরের দাওয়ায়। বাইরে যে যোগেন আর তার ভাই আছে সেটা সে দেখে থাকবে হয়ত। চিনের মত চিৎকার করে ওঠে, 'ঘরের চালা তো মড়মড়ায়—' চিৎকারের স্বরে সে কেঁদেও ওঠে।

'আরে, কাইন্দো পরে, মানুষগুলকে তো বাইর করবা?'

যোগেনের ভাই মাটি ঘেষে নিচু হয়ে সেই ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে। তার গায়ে-গায়ে যোগেনও। 'এই উইঠ্যা পড়, উইঠ্যা পড়। বাতাসে যে-ঘর ভাঙে।'

মুহূর্তে সেই অন্ধকারে ও সেই গর্জনের মধ্যে মানুষের নানা স্বরের চিৎকার আর ভঙ্গি যেন কুম্ভীপাক হয়ে ওঠে। কোলে-কাঁখে-পিঠে বাচ্চাদের নিয়ে যোগেন আর তার ভাই বেরিয়ে, যে-ঘর থেকে যোগেনরা বেরল, সেই ঘরের ঝাঁপ ঠেলে, বাচ্চাদেরও অন্ধকারে গুঁজে দিয়ে আবার সেই ঘরের দিকে দৌড়য়। ঐ ঘরে আর যারা বড় ছিল, তারা বাচ্চাদের নিয়ে এই ঘরটার দিকেই ছুটে আসে। অন্ধকারে তাদের এই আন্দাজটুকু মাত্র ছিল যে কয়েক পা ছুটে যেতে হবে। এটা তাদের সে-আন্দাজে ছিল না যে উলটোদিক থেকে কোনো ধাক্কা আসতে পারে। যোগেন আর তার ভাইয়ের ধাক্কায় কেউ-কেউ মাটিতে পড়ে গিয়ে চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে। কেউ তাদের কান্না যেন শুনলই না। তখন তারা বুঝতে পারে—তারা এই হাওয়ার সঙ্গে জড়ানো কোনো অপ্রাকৃতের—প্লাবন বা ভৌতিক—ধাক্কা খায়নি। তারা কান্না থামিয়ে ঘরের দিকে ছোটে।

ততক্ষণে বাড়ির সমর্থ লোকজন ছাড়া ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়িয়ে চালের দিকে তাকিয়ে থাকে। একফোঁটা আলো নেই, সেই হাওয়ার তীব্রতর হয়ে ওঠারও কোনো বিরাম নেই। সেই আওয়াজটা আর শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু শোনাটা এত জরুরি বলেই সবাই এই ঘরে এসে পড়েছে। এখনই যদি কোন্ আড়াদড়িটা মড়মড় করছে ঠিক করতে পারলে হয়তো সকাল পর্যন্ত ঘরটাকে

খাড়া রাখা যাবে। আর এই হাওয়ায় ঘর যদি একবার ভেঙে পড়ে, তাহলে আবার ঘর তোলার খরচা জোগাড় হবে কোত্থেকে, নিজেরা খেটে তুললেও।

খুব ঠান্ডা গলায় মাইঝ্যান দাদা প্রেমানন্দ বলে, 'ঠিক শুনছিলি তো তোরা?'

যোগেনের খুড়ার ব্যাটা বলে ওঠে, 'আমি আর ছোড়দাদা না-হয় ভুলই শুনল্যাম, মা যে এই ঘর থিক্যা ঐ আওয়াজ শুইন্যা ভয় পাইয়া ঘর থিক্যা বারাল?'

এ-কথাটার কোনো উত্তর কেউ দিল না। প্রত্যেকেই নিজেদের সারা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এই গর্জমান হাওয়াতে শ্রুত মড়মড়-আওয়াজের কোনো সংক্ষিপ্ত অথচ নির্ভুল ইঙ্গিত পাওয়ার চেষ্টায় ছিল।

যোগেনের মাইঝ্যান দাদা প্রেমানন্দ খুব ঠান্ডা মাথার লোক বলে খাতির আছে—বাড়িতে, পাড়ায়, গ্রামেও একটু কিন্তু সেই খাতিরের কারণটা খুব পরিষ্কার নয়। খ্যাতিটা সে-ও অনেক কাল হল জানে ও তার যোগ্য থাকার চেষ্টাতেই সে চোখ নামিয়ে শোনে আর শ্রোতার কানের দিকে তাকিয়ে কথা বলে। ঘরটাতে একচিলতে আলোও ছিল না। তার সেই ব্যক্তিত্ব দেখাও যাচ্ছিল না।

কিন্তু সে এই অন্ধকারে তার ব্যক্তিত্ব হারাল না। নিম্নস্বরেই সে বলে, 'কানাই, আন্দাজমত পারবি বেড়া ধইড়্যা আড়ে উইঠব্যার?' কানাই মানে যোগেনের সেই খুড়োর বেটা—বাড়ির সমর্থ মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। আড়ে উঠতে হলে তাকেই উঠতে হবে। কিন্তু মাইঝ্যান দাদার ওপর তার খুব একটা বিশ্বাস ছিল না। সেই বিশ্বাস-অবিশ্বাস অস্থায়ী এখন ইতিকর্তব্য স্থির করা যায় না।

'তুমি কোন্ আড়ে আন্দাজ পাইল্যা?'

'য্যান মনে হইল দক্ষিণপশ্চিমে।'

এই উত্তরটাতেই কানাই নিশ্চিত হয় যে মাইঝ্যানদাদা কোনো আন্দাজ পায়নি, মিছিমিছি তাকে আড়ে ওঠাচ্ছে। কানাই বলে, 'দক্ষিণ পচ্চিম? সেটা আবার কোন্ দিক?'

কানাইয়ের বাবা, যোগেনের ছোট খুড়া বলে, 'ঐ বেণুগ ঘরের দিকে কোণটা?'

'তুমিও শুনছ?' কানাই জিজ্ঞাসা করে।

'না। আমি শুনি নাই। দিকটা জিগাইলি। তাই কইল্যাম।'

তখনই চালটা মড়মড়িয়ে উঠল। আর মনে হল যে বেণুগ ঘরের দিকের কোণটাই। কেউ সেটা বলে না আর এই অন্ধকারে বাঁশের বেড়ার গাঁটগুলো পায়ের আঙুল দিয়ে খুঁজে খুঁজে আড়কাঠে না-ওঠার পক্ষে কোনো যুক্তিই থাকে না। সে উঠতে ভয় পাচ্ছিল। যেন এর চাইতে সহজতর কোনো উপায় আছে, ঘরটা বাঁচানোর, সেটা জানার মত লায়েক সে হয়নি। কিন্তু তার তখন মনে এসে গেছে, সে-ও উঠল আর চালটাও উড়ল, তাহলে ঐ উঁচুতে হাওয়া তো এক তাকেই পাবে, তখন তাকেই হয়ত উড়িয়ে নেবে। তারপক্ষে আপত্তি করা সম্ভব না—জীবনমৃত্যুর মাঝখানে খুব সরু ও কোথাও-বা অস্পষ্টও, যে-আলপথ দিয়ে কোনো কৌমকে বংশানুক্রমিক জীবন চালাতে হয় তারা হয়ত এমন চরম অবস্থায় ভয় পেতে-পেতেই প্রত্যুৎপন্ন হয়ে ওঠে বা মরে যায়। কানাই বলে, 'দড়িগাছডা আছে তো। ধর্যাইয়্যা দিয়ো।'

কিন্তু তার কথা শেষ না-হতেই তার বাপ 'তুই দড়িগাছডা নিয়্যা আয়' বলে এক লাফে ঘরের একটা আড় ধরে, নিজের শরীরটা দুলিয়ে দুই হাতের ওপর জোর দিয়ে এক পা চড়িয়ে দিতে যায় আড়কাঠে, ও পড়ে যায়। কেউ তাকে ধরতেও যায় না, কিছু জিজ্ঞেসাও করে না। সে আবার উঠে আড়কাঠের দিকে দুই হাত উঁচু করতেই, যোগেনের মাইঝ্যান বৌদিদি বলে

ওঠে, 'ছোট খুড়্যা, এড্ডু ঝাঁকাইয়া দ্যাহেন, শক্ত তো, না, ভাইঙ্গ্যা পইড়বে'।

অভিজ্ঞতা কোনো সিন্দুকে রাখা টাকাপয়সা নয়, দরকারে যা কাজে আসে। দরকার আসার আগেই ডাকাত পড়ে। প্রত্যেকটা দিনের বেঁচেথাকার জন্য প্রতি মুহূর্তে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় বের করার সামর্থ্যই অভিজ্ঞতা।

রাজকৃষ্ণ মাইক্যান বৌমার কথাটা শোনে। একবার দোল খেয়ে বলে, 'ঠিক আছে'। এবার সে পারে তার ডান পা আড়ার ওপর শুইয়ে নিজের শরীরটাকে ছেঁচড়ে কানছিতে নিয়ে গিয়ে পা ঝুলিয়ে বসতে। তার ছেলে, কানাই লাফিয়ে দড়ির গাছা তার পায়ে জড়িয়ে দেয়। রাজকৃষ্ণ তখন হাতটা দিয়ে খোঁজে কানছিতে আড়ের দড়ির বাঁধনটা।

'বা ব্বা, হাওয়া য্যান হাতের পাঞ্জাখান কাইট্যা ন্যায়', বলতে-বলতে সে পায়ে জড়ানো দড়িগাছি থেকে একটা গাছি বের করে নিয়ে আড়ার সঙ্গে কানছির পুরনো বাঁধনের ওপরই বাঁধন দেয়। দিয়েই সে দুই হাত বাড়িয়ে বেনুদের বাড়ির দিকের আড়টা ধরে, সেই আড়ের ওপরে উঠে পায়ে জড়ানো দড়িগাছ থেকে একটা গুছি বের করে। দড়িগাছটা সে পায়ে আরো এক পাক জড়িয়ে নিয়েছিল, নইলে এ-আড়া ও-আড়া করতে গিয়ে দড়িগাছ পড়ে যেত। কিন্তু সেই দুইপ্যাঁচি দড়িগাছ খুলে একগুছি বের করে, আবার দড়িগাছটা দুই পায়ে জড়াতে সামান্য সময় লাগল। সময়ের এমন কৃপণ ব্যবহার সম্ভব এমন চরম অবস্থাতেও নিকষ অন্ধকারে হাওয়ার গর্জন ডুবিয়ে দিচ্ছে যখন, আর নিজের ঘরটা বাঁচাতে এতগুলো মানুষ তাদের বুদ্ধি ও শ্রম মেলাচ্ছে সংক্ষিপ্ততম যে সময়ে।

অভিজ্ঞতা কোনো কায়দাকৌশল নয়। অভিজ্ঞতা হল মরে না গিয়ে বেঁচেথাকার প্রত্যুৎপন্ন ক্রিয়া।

দুর্যোগের রাত

১১৯

হাওয়ার এমন নিরবচ্ছিন্ন হুংকার বরিশালের মানুষজনের কাছে নতুন নয়। যেমন নতুন নয়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস। যেমন নতুন নয়, অজস্র খালদোনা দিয়ে প্রত্যন্তের জলও নোনা হয়ে যাওয়া। আলাদা করে এই পাথরের মত অন্ধকারও কিছু নতুন নয়। যারা সত্যি-সত্যি একটা ধারালো সুতোর ওপর কাটিয়ে দেয় এক-একটা জীবন, তাদের কাছে অনভিজ্ঞপূর্ব বলে ধারণা কোনো সময়ই সত্য হয়ে ওঠার ফাঁক পায় না। যদি কেউ সেই সুতোর ওপর থেকে ছিটকে যায়, সে-ছিটকে যাওয়াটা মৃত্যুই মাত্র, কিন্তু অনভিজ্ঞপূর্ব নয়। কারণ, তাদের বাঁচার কারণ তাদের কাছে পূর্বনির্দিষ্ট নয় আর তাদের মরণের একটা মাত্র কারণই তাদের জানা—আর-বাঁচতে না-পারার ব্যর্থতা।

হাওয়া, এই বেশামাল হাওয়া, এখনো চেনা যায়নি যে-হাওয়া সেই হাওয়া, একটা গোটা রাত পুইয়ে যে-হাওয়া চিনে নেয়া, এখন আর ঠেকানো যাচ্ছে না, যদি এই নিকষ আঁধার না-থাকত, যদি দিনমান হত, যদি রাতের আকাশ থেকে মেঘচাপা একটা দীপ্তি ভুলবশত স্থির হয়ে আছে, মনে হত, যদি মেঘ না থাকত, যদি আবার আলো থাকত এই হাওয়ার অনেক ওপরে, তাহলেও তার আভা বিদ্ধ করত হাওয়ার তলার এই অন্ধকার, যে-আলো সেই

আকাশ-হারানো দীপন নিয়ে মাটি জল থেকেও দৃশ্যমান হয়, সেই আলো এদের চোখে প্রতিফলিত হয়ে অন্ধকারে সহস্রচক্ষু হয়ে উঠত।

কিন্তু হাওয়া সেই শেষ বিকেল থেকে উঠেছে ধীরগতিতে, কোনো ছেদ না দিয়ে অথচ ধীরগতিতে। আঁধারও নেমেছে অচ্ছেদ্য ও অবিরত ও নিশ্চিত। এই দুইয়ের কোনো আচমকা নৈকট্য যে সংগঠিত হয়ে যেতে পারে রাতের গভীরতর কোনো প্রহরে—তার কোনো আভাসও কেউ পায়নি। পেলে তো একটা কোনো ব্যবস্থা করা যেত। কারো তো অজানা নেই কোণ্ ঘরের চালা কোণ্ আড়ে ঢিলা বা কোণ্ ঘরের হোগল এমন হাওয়ায় ভেসে যাবে। তেমন কোনো জানা খবরও কাজে লাগানো গেল না। রাত্রি যখন অনন্ত হয়ে গেছে তখন, নিজের নাকড়াকার আওয়াজে নিজেই চমকে জেগে 'আওয়াজ কীসের' জিজ্ঞাসায় বায়ুসমুদ্রে ঝাঁপ দেয় যোগেন, বা আঁধারসমুদ্রে, তখন, তখনই তারা দেখার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল। কিছুই দেখা যায় না, নিজের হাত-পাও না। মাঝদরিয়ায় বহর ভাঙলে কাঠ না মানুষ না ফেনা কি আলাদা করা যায়?

যায় না। দেখা যায় না।

কিন্তু বহর যদি ভেঙে না গিয়ে ঠেকে যায় লুকনো পাহাড়ে, আর বাইরের সেই জলরাশির স্রোত থেকে প্রায় অদৃশ্য একটা ধারা যদি বহরের তলার ফাটল দিয়ে ভিতরে চুঁইয়ে ওঠে—তাহলে এক বহরের মানুষের অত জোড়া চোখ, ইঁদুর, পোকা-মাকড়-বিড়াল এইসব জীবজন্তুর সমবেত দৃষ্টি হয়ে ওঠে। তখন বহরের খোলের অন্ধকার আর আকাশের খোলের অন্ধকার চিনতে পারে সেই অলৌকিক দৃষ্টির সমবায়। চিনতে পারা যায়—রাজকৃষ্ণকে, সে একলাফে আড়কাঠে পা তুলতে না পেরে পড়ে যায়, দ্বিতীয়বার পারে, তারপর আড়ে-আড়ে বটামে-বটামে উড়ে যায়, ভেসে যায়, সাঁতরে যায়, হেঁটে যায়, নুয়ে যায়, চিতিয়ে যায় আর যতটা পারে বেঁধে যায় কানছি আর আড়ার বাঁধন।

রাজকৃষ্ণ নেমে আসে।

ঘরটার অন্ধকার আয়তন ভরে যত মানুষ ছিল, তারা কান খাড়া রেখে অন্ধকারে হাওয়ার আওয়াজ শোনে। আর কি শোনা যায় সেই মৃদু অথচ ভবিতব্য সেই মড়মড় আওয়াজ। যে-আওয়াজ সবাই শোনেনি, সেটা কোথা থেকে উঠেছে তেমন আন্দাজ তো দূরের কথা, সকলেরই ভয় ছিল এই হাওয়ায় ঘরটা যদি ভেঙে পড়ে, তাই, সেই আঁধারে সেই প্রথম তারা পরের সর্বনাশ আগে রুখল।

আর আওয়াজ হচ্ছে না দেখে কানাই চিৎকার করে "মাইঝ্যান দাদা, আর কি আওয়াজ উঠব?' কানাইয়ের স্বরে ঠাট্টাটা ছিল অনাবৃত। ফলে, সকলে হেসে উঠে জানায়, ঠাট্টাটা তাদেরও। প্রেমানন্দ বোঝে না। সে তার স্বরের মান্যগণ্যতা রক্ষা করে বলে ওঠে, 'পছন্দ হয়, না। ফলে, সকলে আবার হেসে উঠে জানায়, জবাবটা তাদের নয়।

একটা গোটা রাতের এই হাওয়ার জিঘাংসু হাহা রব আর অন্ধকারের এই নীরব স্থবিরতাকে মনে হয়েছিল—এর যেন শেষ নেই। ঠিক তেমনই যে মনে হয়েছিল, তা নয়। মনে-হওয়া বলতে যদি মনে-হওয়াই বোঝায়, তাহলে সেই সক্রিয় 'মনে-হওয়া'টা ঘটে কিছুটা মাথা খাটিয়েও বটে। এই যে-মানুষগুলি, যে-কৌমের মানুষগুলি, এই বাতাসে, আঁধারে, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে, তারা কোনো আত্মিকতায় ভোগে না, চারপাশ থেকে বিচ্ছিন্ন তাদেরই কিছু আত্মিকতায়। আত্মিকতা ছাড়া নিজস্ব সেই সময়বোধ তৈরি হয় না যার মাপে তারা তুলনা করতে পারে কোন্ সময়টা বড়—সেই পাছ-বিকেল থেকে রাজকৃষ্ণের আড়েওঠার সময়টুকু, না কী,

রাজকৃষ্ণের আড় ছেড়ে নামা থেকে, এই যে-সময়টা এখন চলছে সেইটি। 'মনে-হওয়া' এই বাচ্যটিকে বরং এক-শব্দ কমিয়ে 'ঠেকছিল' বললে ঠিক হয়। তাহলে সংশোধিত বাক্যটি দাঁড়াবে, '...হাহা রব আর...স্থবিরতাকে ঠেকছিল যেন...'।

তাতে এই মানুষজন ও এই কৌম, ক্রিয়ার কর্তৃত্ব থেকে সরে আসে ও হাহারবসহ অন্ধকারও স্বাভাবিক থাকে। বা, আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের কাগুজে নাটক থেকে জীবনের স্বাভাবিকেই থাকে। অন্ধকার এমনই অন্ধকার থাকে, এতটা রাক্ষ জুড়ে, যে-রাত অন্ধকার। হাওয়াও তো এমনই ভীষণ থাকে, যে-দিনরাত হাওয়া-উথাল। এই রকমই, কোনোকিছুই ব্যতিক্রম নয়—এমন আজন্ম অভ্যাস ছাড়া কোনো রাতও ভোর হয় না, কোনো সাঁঝও রাত হয় না।

অন্ধকারে এতটা লেপটে থাকলেও, অন্ধকার চিরে যেতে কি এরা একসঙ্গেই দেখে? না। সেটা একেবারে যার-যার, তার-তার মত। ঘুমের শরীর যেমন। ছায়া-অরুণ, সাত ঘোড়ার রথ, রামধনু অথচ পলকে-পলকে বদলায় এমন কোনো প্রাচীন, বিখ্যাত কাব্যময়, নাট্যময়, উদ্ভাসন নয়। এমনকী, সূর্যোদয়ই নয়। একটা কোনো লহমায় নিকষ অন্ধকারে একটু যেন তরুলতা আসে। আকাশ বলেই মনে হয় আলোভাসিত অনচ্ছ কোনো অবয়বকে। গাছের পাতাগুলো তাদের বিশ্বস্ততাতেও যেন ছায়া থাকে।

হাওয়া কমেনি এক ফুঁ-ও। অন্ধকারও কাটেনি আলোয় আলোকময় হয়ে। তবে? অন্ধকারে তো ছায়া পড়ে না। গাছের খুব উঁচু ডালের পাতাগুলো হাওয়ায় মাথা কুটতে-কুটতে নিজেরাই নিজেদের ছায়াছবি হয়ে গেল। হাওয়া যত আছড়ে পড়ে, গাছের পাতা-পল্লব ততই মাথা তুলে ছায়াছবিটাকে খাড়া করে। হাওয়ার এই দাপটে কি আর বোঝা যায়—সেই ছায়া নীচে নামছে, নীচের ডালের পাতাগুলোও ছায়া হয়ে ছায়া ঝরাচ্ছে গাছপালা, আকাশমাটি, ঘরদুয়োর, এতক্ষণ অন্ধকারে লেপটে ছিল। হঠাৎ করে আকাশের ধূসর, বিরোধাভাসে গাছপালার কলঙ্করেখাকে স্পষ্টতা দেয়।

তখন এরাও দেখতে পায়—আর-একজনের শরীর। কারো একচোখের পাতা, কারো নাকের ডগা, কারো ছড়ানো পায়ের খাড়া আঙুল।

যোগেন এক দাওয়ায় হেলান দিয়ে দুই ঠ্যাং ছড়িয়ে ঝিমচ্ছিল। ঘুমুচ্ছিল বলাই সংগত কিন্তু একজন মানুষের ঘুমের ভঙ্গি হিসেবে এটা গ্রাহ্য হবে না। হঠাৎ একবার জেগে উঠে, ওর হিশেব মত যেখানে আকাশ থাকার কথা, সেদিকে তাকিয়ে কী দেখে নিয়ে আবার নিজেরই বুকে নিজের মাথা ঝুলিয়ে দিয়েছিল। ছোট একটা নৌকোর ভিতরে একজনই মাত্র নিশ্চিত মানুষ—সে একাই যাত্রী, মাঝি ও জেলে, ঐ বারদরিয়ায় ঐ ডিঙি আর ঐ মানুষের ঢোকা ও ফিরে আসা অসম্ভব, তবু সে যেমন দরিয়ার বুক থেকে হঠাৎ চোখ তুলে তার মধ্যরাতের দিক ঠিক রাখার তারাটা একপলক দেখে নিয়েই ঘাড়টা আবার ঝুলিয়ে দেয় কালো রাত্রির প্রবল তরলে—যোগেনের ভঙ্গিটা সেরকমই ছিল। যেন ঝিমুনোর দিক ঠিক করে নিল।

সকাল যখন আরো একটু সকাল হল, যোগেন হঠাৎ জেগে লাফিয়ে উঠে, 'খালপাড় ঘুইর‍্যা আসি' বলে বাইরের দিকে বেরিয়ে গেল।

তাই তো, খালপাড়ে না গেলে তো জানা যাইত না, দুনিয়া দুনিয়াতেই আছে তো? কানাই যোগেনের পেছনে দৌড়ল। এ-বিষয়ে আর-কারো কোনো কৌতূহল ছিল না।

দুর্যোগসহ সকাল

১২০

খালপাড়ে পৌঁছুতে-পৌঁছুতেই যোগেনের কানে যা খবর আসে তাতেই সে বুঝে যায়, সারা রাতের হাওয়া এমনি হয়নি, কিছু একটা ঘটেছে। কিন্তু খালে নামতে-নামতেও আন্দাজ পায় না—কী হল, কদ্দুর হল। এটা জানাই সবচেয়ে দরকারি। বরিশালের দুর্যোগ কখনো ডোবার জলে কুমির ভেসে-আসা কখনো এই ভূখণ্ডটারই একটু গড়ানো বা এগনো বা পেছনো।

কোনো বড় গাছ পড়ে রাস্তা বা খাল আটকে দিয়েছে বা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে কয়েকটা ঘর—এমন চোখে না পড়ায় যোগেনের সন্দেহ হয়, তাহলে ওপর দিয়েই যাচ্ছে হাওয়া, মাটিতে নামেনি? কিন্তু হাওয়ার পরিমাণ কত যে সারা রাতেও শেষ হয়নি, এখনো চলছে তো বটেই বরং বেশি জোরেই চলছে, কিন্তু দিনের আলো, মানুষজনের গলার স্বর আর কখনো-সখনো বাজকুড়ুল পাখির ডাকে হাওয়াটা খেয়ালে থাকছে না।

কীর্তনখোলা বেয়ে অর্ধেকটা ধান পাঁজা আর বাকি অর্ধেকটায় মানুষ পাঁজা হয়ে গোল নৌকাটাকে দেখেই ঘাটের মানুষজন একেবারে চুপ করে যায়। এতটা হাওয়া সত্ত্বেও এইসব মানুষের শ্বাসগ্রহণের আওয়াজ পাওয়া যেতে পারত। যতক্ষণ পেরেছে পাকা-আধপাকা-কাঁচা ধানগুলি কেটে নৌকায় পাঁজা করেই নৌকা ছেড়েছে। এতটা ধান একদিনে কাটা যায় না। মানে, ধানকাটা শুরু হয়েছিল, শেষ হল না। পাকা টসটসা ধান—কাটা গেল না। এর চাইতে কোনো সর্বনাশই বড় না। একজন ডুকরে কেঁদে ওঠে। কে, কেউ ঘাড় ঘুরিয়েও দেখে না, কে। এই সমষ্টির ভিতরেও গভীর এক ঈর্ষা বা আশা বাতাসের ধাক্কায় এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল—ঐ নৌকোটা তো এল নাজিবপুরের দিক থেকে, মানে, হতেও তো পারে যে হাওয়া-বানা যাই এসে থাক, এসেছে নাজিবপুরের মাথার বাঁধ ভেঙে। তাতে কারো কোনো বিশেষ সান্ত্বনা জোটার কথা নয়, এক এই অতি ক্ষণস্থায়ী সান্ত্বনা ছাড়া যে তার নাজিবপুরের পশ্চিম চরের জমির ধান রক্ষা পেয়ে গেছে। কিন্তু এ নৌকোটা মৈস্তারকান্দির দিকে ঘোরেই না—সোজা আরো উত্তরে চলে যায়। খালের ভিড় থেকে কেউ চেঁচান, 'অ্যালেইন কোথথিক্যা?' উত্তর এল, 'আড়্যাল খার নগদ দিয়্যা—'

'মাঝি হইছে, দিশ্যা দিব্যার শিখে নাই? নগদ দিয়্যা?'

'অয় কি তোমার পোলার লগে মাইয়্যার সম্বন্ধ চায়? কথা জিগ্যাবার পার না নিজে। দোষ দ্যাও মাঝির। এ—ই যে মাঝিভাই, খাওয়ার মুখ কমে নাই তো? নয়া ভাঙ্গির হাটতল থিক্যা আইলেন তো?'

সেই নৌকো থেকে নতুন কোনো গলায় কেউ বলে ওঠে, 'প্রাণহানি নাই। শস্যহানি। বেবাক। হয়, হাটতলের বাঁধ ভাইঙ্গ্যা নদী ঢুকছে।'

পাড়ের ভিড় থেকে কেউ নিজেদের মধ্যে বলে ওঠে, 'হৈল তো জ্ঞাতিগুষ্ঠি হালসাকিন ঠিকঠিকানা! এইবার সম্বন্ধ করো।'

কিন্তু পাড়ের ভিড়ে তখন অন্য উদ্বেগ এসে গেছে, 'হাওয়ায় কি বাঁধ ভাঙ্গে?'

'অরা হাওয়ার কথা তো কয় নাই। কইছে, বাঁধ-ভাইঙ্গ্যা হাটতলে নদী ঢুইকছে। এর মইধ্যে হাওয়া প্যালি কই?'

'আমরা তো কাইল থিক্যা হাওয়ায় কাইত। অগ ওহানে হাওয়া ঢুকে নাই?'

'চুপ যা আহাম্মক। শুধু শুধু ঢোকাঢুকি, ঢোকাঢুকি। ওর যা খ্যামতা তাই ঢুক্যা—হাওয়া বা জল। তার বেশি তো আর মুরদ নাই—'

এইসব কথাবার্তার থেকে যোগেনের যা বোঝার বুঝে নেয়। এখানকার ভিড়টা শুধু জানতে চায় কাল সন্ধের মুখ থেকে যে-হাওয়া ক্রমেই উঠছে, তার সীমা কদ্দুর। কোথাও কি মানুষজন মারা গেছে! আরো কোনো বড় বিপর্যয়ের মুখে নাকি তারা, নাকি ল্যাজে? এটুকু আন্দাজ করলেই এদের চলে যাবে।

কিন্তু এখনো তো ঘটনাটিই জানা গেল না। এরপর আরো জানা যাবে না। হাওয়ার যা ধরণ, তাতে তো এ-বেলা কমবে মনে হচ্ছে না। যে-হাওয়ার সঙ্গে সমুদ্রের সম্বন্ধ, সে-হাওয়া তো সন্ধ্যার দিকে বাড়ে। এক, এখনি যদি বেরিয়ে যাওয়া যায় খালপথে। পৌঁছুনো নাও হতে পারে কিন্তু এগিয়ে গেলেই খবর জানা যাবে। বরিশালের প্রাকৃতিক দুর্যোগ পশ্চিমে দক্ষিণে শুরু হয় না, বিপদ আসে দক্ষিণ আর পুব থেকে।

মৈস্তারকান্দির ঘাটে বসে-বসে লোকজনের কথাবার্তা থেকে, সামনের খালের জল থেকে ও হাওয়ার শিস শুনে শুনে, যোগেনের একটু ঝিমও ধরে, সারারাতই তো জেগে কেটেছে।

সেই ঝিমের মধ্যে যোগেন একবার ভাবতে পারে—ঘরে গিয়্যা ঘুমাই।

সেই ঝিমের মধ্যে যোগেন যেন দেখতে পায়—তাদের কোনো ভিটেতে কোনো ঘর নেই, হাওয়ায় সব উড়ে গেছে। তবে যে কাল পুরোটা রাত জেগে দক্ষিণভিটার আড়কানছির দড়ি বদলাইল। ছোট খুড়্যার দেহে এখনো ডাকাইতের শক্তি।

যোগেনের ঝিমুনি কেটে যায়। সে আবার চারদিকের মানুষজনের গলা, হাওয়ার শিস শুনতে পায় ও খালের জল দেখতে পায়।

কিন্তু আবার ঝিমিয়ে পড়ে।

যদি মৈস্তারকান্দিতে থাইক্যাই যায়, এই দুর্যোগটা, বা, না-হয় আইজ রাইতটা, তাইলেও তো শুয়াবসার কোনো জায়গা মিলব না, যদি ঠিক অ্যাহনকার অবস্থা থাকে, তাও মিলব না, যদি বৃষ্টি ঝইরব্যার ধরে তাইলে গাছতলা-দুয়ার তো গেল, যদি ঘরের চাল উইড়্যা যায় বা মুখ থুবড়্যা পড়ে, তাইলে তো এই দুর্যোগে খসা বটপাতার মতন হাওয়ায় আর জলে পাক খাইতে হইব। আর, কুথাকারও কুনো খবর পাওয়া নাই। দ্বীপান্তর।

যোগেন আবার ঝিমুনি কাটিয়ে মাথা সোজা করে। মাথা খাড়া রেখেই সে ঝিমুনির সময় যা ভাবছিল, তার খেই ধরেই ভাবনা চলে যেন ভিতরের মাথার ঝিমুনি এখনো কাটেনি।

বাড়ির লোকগুল্যার তো সেই দুরবস্থাই হইব।

হইলে, অগর যা ব্যবস্থা অরাই কইরব। পাড়ায় যে দুডা-একডা ঘর খাড়া, সেইখানেই হয়ত সিদ্ধাবে। এদিক'ওদিকের শক্ত, পাকাঘরে যাইতে পারে। রায়মশায়ের একতলাখনে খুইল্যা দিব্যার পারে। যোগেনের থাকা-না-থাকায় সে-ব্যবস্থার কোনো উনিশ-বিশ ঘইটব না। কিন্তু যোগেনের তো নির্বাসন হইয়্যা যাইব গ্যা। কেউ জানেই না, সে কোথায়। সেও জানে না দ্যাশের হাল কী। এহানে বাড়ির মগলের লগে ভাগাভাগি কইরব্যার মত তো গোটা কিছুই নাই। বারাইতে হইলে তো অ্যাহনই বারাইবার লাগে।

আবারও যোগেন গা-ঝাড়া দিয়ে বসে। ঘাড়টা তার এতই নুয়ে গিয়েছিল, তার বুকের ওপর যে তারপরে গায়ে ঝাড়া একটা ওঠারই কথা। মাথার ঝিমুনি খোলসা হয় না। যোগেন যেন সামনের দিনগুলো দেখতে পায়—মৈস্তারকান্দিতে সব ঠিকঠাক, কুনো দুর্যোগও নাই, সুযোগও নাই, রৌদ্রও নাই, মেঘও নাই, বৃষ্টিও নাই। শুধু আছে—মৈস্তারকান্দির আকাশ দিয়্যা এক আলগা

বাওয়ের স্রোত, ঢেউ তুলে, ঢেউ ভেঙে, আর বায়ুর মিনার গড়ে তুলে, সেটাকে ঝিরঝিরিয়ে মুছে দেয়া। কতকগুলি পাড়ার কতকগুলি বাড়িতে কোনো চালা বা বেড়া নেই। তাদের ঘর ও বাহিরের তাবত তফাত ভেঙে গেছে। গ্রামের রাস্তায়-রাস্তায় এগ দেখা যায়—কোলকাঁখে ছেলেপুলে লৈয়া ঘুইর‍্যা বেড়ায়।

গা-ঝাড়া দিয়ে যোগেন দাঁড়ায়। যোগেন মৈস্তারকান্দি ছাইড়ব। অ্যাহনই ছাইড়ব। এরপর আর সময় পাওয়া যাবেনি। কিন্তু তার আগে তো মৈস্তারকান্দির একডা বেত্তস্থা কইরতে যোয়।

যোগেন মৈস্তারকান্দির ঘাট থেকে, খালি গায়ে-খালি পায়ে মৈস্তারকান্দির ভদ্দরলোকের পাড়ার দিকে হাঁটা দেয়। পথের দুই ধারে ভক্তজনদের অনেক বাড়িঘর আছে, ইট দেয়ালের বাড়ি, বড়সড় বারান্দা। ছাদের বাড়ি, টিনের উঁচু চালার বাড়ি—কোনো বাড়ি ফাঁকা, লোক থাকে দুই-চারজন, কোনোবাড়িতে দেবদেবতা আছে। সকাল সন্ধে পুরুতের ঘণ্টা বাজে। বড়সড় বারান্দা—তাদের পুজো গাঁয়ের লোক এঁটে যাবে। এখানে মাথার ওপর ছাদ আর তারা পড়ে থাকবে খোলা। যোগেনের একবার মনে হয়েছিল, লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকিয়ে দিলেই হত। কিন্তু তেমন করতে তার মন চায় না। একবার ভাবে শেখশাহেবের মনদিলে যায়। উনি আপত্তি করবেন না। কিন্তু ওদের আবার পর্দাপর্দি মেলা। যে-কোনো বারান্দাতেই তাদের গ্রামের লোকজন এঁটে যায়। যোগেন এদের কথা ভেবে পথে নামে। সে সোজা ডাইনে মোড় নিয়ে জোলা পার হয়ে প্রায় দৌড়তে-দৌড়তেই রায়বাড়ির দিকে ছোটে আর পাশের সেই খিড়কি দিয়ে 'সন্নমামি', 'সন্নমামি', বলে এগিয়ে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়ে।

ওপর থেকে সন্নমামির পাতলা, উঁচু, মিষ্টিগলা শোনা যায়, 'কার গলা রে? আসি, খাড়াও নিমাই।'

সন্নমামি রেলিং দিয়ে তাকিয়ে বলে ওঠে, 'যোগা আইছ, খাড়া'—

যোগেন তার একহাত তুলে বলে, 'খাড়ব না। তুমিও নাইম না। চারিদিকে ভীষণ। আমাগ পাড়ার বোবক ঘরের চাল উইড়্যা গিছে। সন্ধ্যার আগে বিপদ না কইমলে, তোমাগ বাইরের দাওয়ায় রাতডা কাডাইতে আইসব। আড়য়্যা দিয়ো না। শুধু বারান্দায়—'

স্বপ্ন, সবটা কথা মন দিয়ে শুনে, 'বাবা যোগা, এডডু খাড়া', বলে বেলিং সরে গেল। মানে, সন্নমামি তার মুখে কিছু না ঢুকিয়ে ছাড়বে না, বা, পাড়ার খবর আরো খানিকটা শুনবে। যোগেন আবার চেঁচিয়ে ওঠে, 'মামি—'। আর সিঁড়ির জালির ফাঁক দিয়ে দেখে সুন্দর একটা নক্সা গড়িয়ে নামছে।

নামল, বারান্দায়, হাতে কী সব পাঁজা করা। বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে সন্নমামি যোগেনের সামনে এসে গামছা মত কিছু দিয়ে যোগার মাথা-গা মুছিয়ে দেয়।

'আরে, আবার তো ভিজব, মুছ্যাও ক্যা?'

'এগ বাড়ি আইলে জামা পইর‍্যা চুল আঁইচার‍্যায় বাবু সাজা আইসো যোগা। তুমি আমাগ একডা যোগা। তোর সম্মানে তো আমরা মান পাই', বলতে-বলতে সনু একটু নতুন জামার গলা খুলে যোগার গলায় গলিয়ে দেয়, তারপর, যোগার হাতদুটো দুই হাতে ঢুকিয়ে দিয়ে ঝুলটা সামনেটা টেনেটুনে দিয়ে হেসে উঠে, 'দ্যাহ তো আমার যোগারে কেমন জজ-ম্যাজিস্টেটের মত লাগে। সন্ন আবার সেই সুন্দর হাসি হাসে। 'তাও তো পুরানা। বড় খোকার আলমারিতে ছিল। আর, বড় খোকাও তো কইল, গাঁয়ের মানুষ জলে ভাইসর আর তোমাগ বড় বড় এই সব ঘরে কি ঢপের কেওন হব? সবাইরে আইসতে কও। খাওয়াইতে তো পারবা না। রাঁধত কেডা। তো কইল্যাম—অরা নিজেরাই কইরব। অত কইব্য ভাবব্যার কাম নাই বড়খোকা। গ্রামের

মানুষ। বিপদে পইড়্যা আশ্রয় নিছে—এর বেশি কিছু করার দরকার নাই। কত্তা তো নাই। বুঝলি তো কথাডা। তুই জান্যাইয়া দিস যোগা।'

যোগেন সামান্য একটু দাঁড়িয়ে একটু বুঝে নিয়ে বলে, 'শুনো, সন্নমামি, আমারে তো পাবা না। আমি আজই চইল্যা যামু। আমি দুই-একজন অতিবিশ্বাসীদের কয়্যা যাব—বিপদ যদি বুঝো বাঁচার অতীত, তয়, বেবাক নিয়া রায়বাড়ির বারান্দায় উঠো চুপেচাপে। রাইতে তুমিও য্যান স্বজনবন্দনা ধইরো না। সগালে অবস্থা বুঝ্যা যা করার কইরো। বড় খোকাবাবুরে দিয়্যা কর‍্যাইয়া নিয়ো। কর্তা থাইকলে তুমিই যথেষ্ট। মালকিন। সন্নামা ভুল কইরো না—মালকিনের চাকরি কদ্দিন। মালিক রাখে যতদিন। তোমারে নিয়্যাও তো আমাগ গর্ব একডা। সেইড্যা য্যান ভাঙ্গা মাটির ভাঁড় না হয়।' যত বড় বামনই হও, শুদ্দুরনির চরণামৃতও লাগে, উদ্ধারের জন্য।'

'ছি ছি রে বাপ, আমি তো শুদ্দুরেরও শুদ্দুর। আমার পাপ য্যান আমার জাইতের গায়ে না লাগে। আমারে ছোঁয়ার পাপও যেন কর্তার গায়ে না লাগে।

রায়বাড়ি থেকে বেরতে-বেরতেই যেন স্থির হয়ে যায়—যোগেন বরিশালের দিকে এখনই বেরবে, যদ্দুর যাওয়া যায়, কিন্তু মৈস্তারকান্দিতে আটকে পড়ে যাওয়া ভুল হবে।

গ্রামের লোক, দরকারে, রায়বাড়ির বারবাড়ি। ব্যবস্থা হয়ে আছে। কথাটা বলে যাবে যোগামাকে, আর সাইফুলকে। কানাইকেও। ওকে একটু পরীক্ষাও করতে হয়। হঠাৎ যোগেনের মাথায় খেলে তার ছোট বোন শাদির কথা। শাদিদের এখনই কোনো বেশি বিপদ না হওয়ার কথা। কোথা দিয়ে যে কী হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না তো। যোগেন ঘুরে গিয়ে উলটোপথে হাঁটতে থাকে। ভাল কথা মনে পড়েছে। শদি আর জামাইকে দায়দায়িত্ব দিলে সবদিক ঠিক থাকব। সন্নমামির দিকটাই। বাবাকেও দেখতে পারবে।

ঝামেলা বাড়িয়ে কাজ কী। বিপৎকালে? সে যখন এখনই বেরুচ্ছে—তার সঙ্গে নিয়ে বৌ-ছেলেকে শ্বশুরবাড়িতে জমা করে যাবে। বাবাকেও বাবার যে একটু দেখাশোনা, তা ধৌই করতে পারবে। তাহলে এদিককার ঝামেলাও হালকা হবে।

শারদি তো দাদাকে দেখে এমন নেচে ওঠে যেন বাড়িতে উৎসব লাগল। শারদি দাদার জামায় হাত দিয়ে বলে, 'দাদার দর কতটা বাইরছে?'

যোগেন দাওয়াতেই বসে পড়ে বলল, 'সন্নমামি পর‍্যায়্যা দিল।'

'সন্নমামির কাছে এই বিপদে, সাতকালে?'

'তোর তো দেইখ্যা ঠাহর হয়, আর-একবার বিয়্যা বইসব্যার নাচন ধরছিস। শুন। সন্নমামির কাছে গিছিলাম এই ব্যবস্থার লগে আইজ সন্ধ্যার মুখে যদি বিপদ আরো বাড়ে, গাছ পড়ে, বন্যা আসে, ঘরের চাল উইড়্যা-পইড়্যা যায়—তাইলে গ্রামের লোক গিয়্যা রায়বাড়ির বারবাড়িতে উইঠব। সন্নমামি বড়খোকাবাবুর অনুমতি নিয়া কইছে, হ্যাঁ।'

শারদি প্রশ্ন করে, 'ক্যা?' কত্তা কই?'

'কত্তা এহন এই হানে নাই। তাই বড়খোকাবাবুর লগে মামি জিগ্যাইয়া রাইখল—'

শারদি ঠোঁট মুচড়ে বলে, 'গোবধে খুড়া কত্তা।'

যোগেন রেগে ওঠে, 'এইডা তোর খারাপ স্বভাব বড় শারদি কবে কার কী কথা। তহন অ্যামন হইত। আমাগ জাইতের একডা মাইয়া অত বড় ঘরের একডা বাঘা বামুনের ঘর যে জিইত্য লইল, তাতে তোর গর্ব হয় না। রায়কর্তার পোলারা তো সন্নমামিরে সন্নমা ডাকে।'

'ডাউক গ্যা। শুনুক গ্যা। দাদা, অসতীরে কুনো মাইয়া মানুষ কুনোদিন ক্ষমা দিব্যার পারে না।'

যোগেন একটু চুপ করে থেকে বলে, 'তরে আজ একডা দায়িত্বর কাম দিব্যার আসছি। কথার ভাবে বুঝি, ঘট্‌নাডা যদি অ্যামন হয় যে সইন্ধ্যা কিংবা রাইতে বাড়িঘর উড়্যা যায়, গাছপালায় রাস্তা আটকা দেইখ্যা যদি নিজেগ থিক্যা গিয়া রায়বাড়ির বারান্দায় গিয়া ওঠে, তাইলে হয়ত বড়খোকাবাবু কী মামির সুবিদা। লোকে আইস্যা উঠছে—এক কথা। আমি কইছি উইঠব্যার—এ আর-এক কথা। আর আমাগ দুর্দশা তো জানিস। অ্যাহন যদি কই, তেমন বিপদে রায়বাড়ির বারান্দায় উইঠো, তালি তো অ্যাহন থিক্যা চট বিছাইয়া জায়গা দখল শুরু হবে নে।'

'তুমি থাইকব্যা না? আইল্যা কবে? আজ যাবা ক্যামনে?'

'তোর তো দেহি শারদি, ভাল বামনাই ধইরছে। অম্বুবাচীর সময় চার-কুড়ি সধবা বুড়ির দুঃখ উথল্যায়া ওঠে—আমি কেন বিধ্বা হইল্যাম না, তালি কত আম-কাঁঠাল খাইব্যার পারত্যাম। কথা তুলছি কামের। অ্যাহন কাইন্দব্যার ধরছিস, দাদা আইজ যাবা ক্যামনে? কামের কথা শোন্। পারবি কী না ক। তুই আইজ দুপ্‌পরের পর মাস্তারকাইন্দ্যা চইল্যা যা, জামাইডারে নিয়্যা। গিয়্যা এগ কী দুর্দশা সেডা ক। কয়্যা থাক। বইস্যা থাক। জামাই এডডু বাইরে ঘুর্‌য়াফির্‌য়া আরো কী সব শুইনল সেই কথা বিস্তারে বইলল। তুই এই কথাডা প্রথম ক—ঘরে থাইক্যা তো মইরব্যার পারি না, মাথার আগড় আর গায়ের বেড়া তো লাগে। প্রথমে কইস না কোথায় যাবি। পরে কইস। গিয়া রায়কর্তার বারান্দায় বস। তোর কথা বেবাক শুনব। মানব। সন্নমানি তোরে খুব ভালবাসে। স্যায় যদি রাত্তিরে নামে, কী সকালে নামে, তোরে পাইলে খোলামেলা হইবার পারব। খাওয়ানোর কথাও তুলছিল, যদি মাইয়্যারা রান্না কইর‍্যা নেয়। আমি ঐ সব কইরব্যার না করছি। তুই এইডা পাড়ি দে দিদি— জামাইয়ের বুদ্ধি নিস।'

সারদি সব কথা বুঝল, মেনে নিল ও দাদাকে আশ্বস্ত করল যে কাজটুকু সে যোগেনের ইচ্ছেমতই করতে পারবে। তবে, দুর্যোগ কী আকার নেয়, কী ব্যবস্থা নিতে হয়—এগুলো তো এখন থেকে ঠিক করে রাখা যায় না। দাদাকে নির্ভয় দিয়ে শারদি বলে, 'তোমার মামিরে কুনো দায় চাপাইব না। নিজের সংসারের দায় যে নেয় না, তারে আর অ্যাহন শুদ্দুর-সংসারের দায় নিব্যার লাগব না। অন্য জায়গাতেও মাথার চাল জুইটবে। তুমি দাদা যাওয়ার সময় দেইখ্যা য্যাও, টুনি আছেনি। যদি থাহে তারে আমার লগে আইসতে কইরো।'

'টুনি? এডা তো তুই জবর ভাবছিই। কিন্তু টুনির অ্যাহন এহানে থাহার তো কোনো সম্ভাবনা আছে বইল্যা পছন্দ হয় না। তুই এক কাজ কর। টুনির মতন আর-একজনের কথা ভাব্, ভাব্ দেখবি প্যায়্যা যাবি নি। আমি যাই। আমারে তো রওনা দিব্যার লাইগব। অ্যাহন তাও কুনো মামি রাজি হইব্যারও পারে। এরপরে নাও পাব তো মাঝি পাব না—'

যোগেন উঠে দাঁড়ায় আর শারদি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে, চোখের জলও মোছে না, ঠোঁটও সোজা করে না। আবার ডুকারিয়েও ওঠে। যোগেন বলে ওঠে, 'আরে, এতক্ষণ—না গিন্নিমার মত পা-ছড়াইয়া উপদেশ করলি আর অ্যাহন কাঁইদব্যার ধরলি?' হইল-ডা কী তোর?'

ফোঁপানির মধ্যে শারদি তার কান্নার কারণ জানায়। 'এই দুরুযোগ। আকাশও জানে না কহন কী হব। রাস্তাঘাট বেবাক বন্ধ। নৌকা-লঞ্চ বন্ধ। একডা পাখি উড়ে না, কুত্তা-বিড়ালও পথে বাহির হয় না আর দাদা বাইর‍্যায় ক্যা? বাইর‍্যাবার আগে সারা দুনিয়ার মানষির বিপদের ব্যবস্থা কইর‍্যা যায়। দাদা কি নিমাই সন্ন্যাস নিছে?

যোগেন ফাঁপরেই পড়ে। কী বোঝাবে শারাদিকে? সে কি বোঝার মন নিয়ে আছে? কিন্তু 'নিমাই-সন্ন্যাস' বলেই শিয়ালকে শারদি ভাঙা বেড়া দেখিয়ে ফেলল। যোগেন রাগ দেখায়, 'তোর কাছে আসাডাই তো ভুল হইছে।' দেখানো-রাগ থেকে যোগেন নিমাই-সন্ন্যাসের একটা গান

ধরে, 'আগে যদি জাইনত্যাম নিমাই—'।

শেষে আপোশ হয় যে যোগেন এখান থেকে খেয়ে যাবে।

যোগেন দুর্যোগে যায়

শাদির বাড়ি থেকে নাকেমুখে গুঁজে ছুটতে-ছুটতে যোগেন মৈস্তারকান্দির ঘাটে উঠে কানাইকে ডাকে। বলে, 'দ্যাখ তো কেউ যাবেনি?'

১২১

'যাবা কুথায়?'

'যাব তো বরিশাল। কিন্তু স্যায় কইলে তো কেউই আগাম যাব না। সত্যি কথাডা কইস—যাবে তো বরিশাল, আপনে যদ্দুর পারেন, তদ্দুর যাইয়্যা নামাইয়্যা দিবেন—উজিরপুর, কী মুলাদি কী বাবুগঞ্জ। আর যদি দেহি লঞ্চ-স্টিমার লাইন বন্ধ হয় নাই, তাইলে ফির‍্যাও আইসব হয়ত।'

'আমার মুখ থিক্যা এত কথা কেউ শুনব মাঝিরা?' আমি ডাইক্যা দেই, তুমিও কও।' যোগেন দাঁড়িয়ে থেকে বলে,—

'দে। কিছুডা কথ্যা নিস। বাকিডা আমি কব নে।'

কিন্তু কানাইয়ের নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে দ্বিধাই কাজে লাগল। সে প্রথমে যাকে বলল, সে-ই রাজি হল। রাজি হল, শুধু তাই নয়, সে বলল, 'ক্যা? যামু না ক্যা?'

একজন রসিকতাও করে, 'অ না-যায় তো আমি যাব।' প্রথম যে রাজি হয়েছিল সে নাকী সেই ছোটমাঝি যে বছর তিন আগে, ইলেকশন জেতার দুই না এক রাত্তির পর, যোগেনকে মৈস্তারকান্দি নিয়ে এসেছিল। রাত্তিরবেলা। সে এখন পুরো মাঝি। যোগেন বলে, 'শুনো বাপধন, যতটুকু যাইতে তোমার সাধ ঠিক ততটুকু যাইব্যা। আমি নাইম্যা যাইব।'

'সে হবে ক্যামনে? আপনারে কোনো ভাল-মানুষের কাছে গস্ত না কইর‍্যা ফিরলে তো আমারে পাবলিকও পিটাইবে পুলিশও পিটাবে। চলেন-না। এতডা ভাবার কিছু নাই।'

'আর-এডডা কথা ছোটমাঝি। আমার ত্রিকট টাকা বেশি নাই। তোমার পুরা মঞ্জুরি হব্যারও পারে, নাও পারে। যদি নাই হয় তালি তোমারে আমি পাঠাইয়্যা দিব—'

'অত ভাবনের কিছু নাই। পাঠাইবেন ক্যামনে? আমার নামও নাই, ঠিকানাও নাই। যহন আইসবেন, নিয়্যা অ্যালেও হবে—'

নৌকা ঠিক হয়ে যাওয়ার পর যোগেন কানাইকে বলে, এতই যদি সেবা দিলি, নাওডারে এড্ডু ঠেইলা দে—'

'কত্ত, কী দিয়া ঠেলা লাইগব? কদ্দুর ঠেলা লাইগব?'

'নোর পার‍্যা বাড়ি যা—'

'গিছি, ধরো—'

'ঢুইকতে-ঢুইকতে চিক্কুর দে—'

'ঢুইকছি তো—চিক্কুর কী দিব?'

'ছোডাদাদা এতক্ষণ বরিশাল রওনা দিয়্যা সাইরছে—'

'দিছি চিক্কুর। তা চিক্কুর ক্যান?'

'সবাই যাতে একসঙ্গে শুনে, বারে বারে কইব্যার লাগে না।'

'হয়। এক চিক্করেই বেবাক শুইনল'।

'আমার বাপ যেহানে শুইয়্যা তার পায়ের কাছে এক বেতন পাবি!'

'পাইল্যাম—পাচনের না কেরাসিনের?'

'পাচন। তার বাদে আমার বাবারে পাঁজাকোলা কইর‍্যা তুইল্যা আনবি—'

'বোতল?'

'সে এড্ডা কুথাও ঝুলাইয়্যা নিস—'

'নিল্যাম, জ্যাঠা আর বোতল। ঘাটে পৌছিব?'

'না রে। ঘাটে অ্যাসার যাত্রা দে।'

'দিল্যাম তো—'

'যাত্রাকালে যোগামার কাছ থিক্যা আমার পাঞ্জাবিটা নিয়্যা আইসবি কান্ধে ফেলাইয়া—'

'কাঁধে যদি জ্যাঠা না ঝুল্যা থাহে—'

'থাইগলে জ্যাঠার উপর ফেল্যায়্যা দিবি'।

'দিল্যাম। এইবার যাত্রা করি।'

'কর্ যাত্রা। বারাব্যার কালে তোর বৌদিরে আর ভাইয়ের ব্যাটারে টান দিয়্যা আন। ঐ তিনগ খাড়বাড়ি নামাইয়া দিব।'

'সে তো আমি না। তুমি দিব্যা?'

'তুই নাওয়ে ধাক্কা না দিলে আমি নামাইব কী?'

'তাইলে আমি যাইগা, ওয়ান-টু-থ্রি, নোর দিল্যাম কিন্তু। পাছু ডাইকো না য্যান!'

ছোটমাঝি একজনকে সঙ্গে নিয়েছে, তারই বয়েসি।

যোগেন কোন নদী-খাল-দোন দিয়ে যাবে, একটু ভেবে নিতে চায়। মাঝি বুড়ো হলে এই সুবিধে, পথ তার জানা থাকে, আপদের পথ ও বিপদের পথ দুইই। ছোটমাঝির তো না-জানলেও স্বীকারে লজ্জা। আর, যোগেন তো এখনো কোনো আন্দাজ পায় না—ঘরের চালার ওপর দিয়ে বওয়া এই এক রাত্রি পুরনো ঝড়ের।

যোগেনের বাবা তো টানটান হয়ে হেঁটেই আসছে। কাল না শ্বাস উঠছিল। পেছনে কমলা। যোগেনের পাঞ্জাবিটা কানাই পরে নিয়েছে আর জগদীশকে তুলেছে কাঁধে। পাচনের বোতল কয়লার হাতে। ওরা নৌকোয় বসার পর যোগেনের পাঞ্জাবিটা খুলতে-খুলতে কানাই বলে, 'গায়ে তো একডা শাহেবগ নাগাল শার্ট, পিরানডা রাইখ্যা গেলেই হইত।'

নৌকো থেকে নামতে কানাই একটা ঝাঁকি দেয়, তাতেই নৌকা ঘাট ছাড়ে।

যোগেনের বাবা জিজ্ঞাসা করে, 'আমাগ নিয়্যা বরিশাল ক্যান রে?'

'তোমাগ তো খাগবাড়ি নামাইয়া যাব। মৈস্তারকান্দিতে কে কারে দেখব। শ্বশুরমশায়ের বাড়ি নিরাপদ তো বেশি।' তারপর কমলাকে বলে, 'কবর‍্যাজমশায়ের ওষুধডা সকালে দুই মুখটি আর রাত্তিরে দুই মুখটি খাওয়াবার লাগব। শ্বশুরমশায় রে কইয়ো ওষুধ শ্যাষ হইলে—ছোট-কবর‍্যাজ মশায়ের নগদে দেখা কইর‍্যা অবস্থা জানাইব্যার। টান কমছে, কাশি কমছে, কী না। শ্লেষ্মা শাদা না হলুদ। দুর্যোগ কাইট্যা রোদ্দুর উইঠলে বাবারে এডডু রোদদুরে বসাইয়া রাইখো।'

এইসব বলাবলিতেই খাগবাড়ির ঘাট। যোগেন জগদীশকে বুকে নিয়ে নামে। যোগেনের বাবাকে ছোটমাঝির সঙ্গী একেবারে পাঁজাকোলে পাড়ে তুলে দিয়ে আসে। কমলা পাঁচনের

বোতল ঝুলিয়ে নামে। মাঝি আবার নৌকায় ফিরে আসে। যোগেন জগদীশকে পাড়ের ওপরে কমলার কোলে দিয়ে ঘাটে নেমে নৌকোয় ওঠে। এই নৌকা, পাড়, ঘাট ওঠানামায় কমলা একবার জিজ্ঞাসা করে, 'আপনা যান কৈ?' যোগেনের উত্তর শুনতে পায় না।

নৌকোটা ঘাট ছাড়ল দেখে কমলা ভাবে, জবাবটা কি তারই শোনা হল না। না কী জব দেন নাই। নাকী কমলাই জিগ্যায় নাই, ভাবছিল জিগ্যাইবে।

যোগেন দাঁড়িয়েই ছিল গলুইয়ে। দু-চোখ জ্বলছে—সারারাত জাগা। কবে যেন এল মৈস্তারকান্দি? কাল সকালেই তো? আজ বারটা কী? কলকাতা-ছাড়া ক-দিন?

এসব কথা তার মনে উঠছিল বটে কিন্তু কোনোটারই উত্তর সে খুঁজছিল না। সেই কথাটাও মনে এল, যেটার কথা এখনই তাকেও জানতে হবে, মাঝিদেরও জানাতে হবে। যাচ্ছে কোথায়? বরিশাল তো একটা কথার কথা। খুলনাও বলতে পারত। মানে, যেসব জায়গায় মানুষের যাতায়াত আছে। যোগেন তো জানেই না—কোন্ পথ খোলা, কোন্ পথ আটকা, মাঝিদের শুধু বলে, 'খালে পইড়্যা, নামতে থাকো তো, যেহানে ঠ্যাকরা সেহানে থামবা। কুনো তাড়া নাই। কুনো মাঝিগিরি দেখাইব্যা না।'

সদর খাল দিয়ে খানিকটা নামলেই কাণ্ডকারখানা কী বোঝা যাবে। নিজেকে একটু কম-চালাক না-ভাবতে যোগেন যেন কৈফিয়তের মত করে ভাবে—এগতে না-পারলে ফেরত আসার পথ তো খোলাই—এই কথা মনে নিয়ে বেরনো ঠিক না। ফেরথপথ তখন খোলা থাকতে নাও পারে। যেখানে ঠেকবে, সেখানে তো মানুষজন থাকবে। তাদের কাছেই ঘটনা জানা যাবে। এই সবই তো যোগেনের আইনসভার ভোটের জায়গা।

যোগেন দাঁড়িয়েই থাকে। আকাশের দিকে মুখ তুলে দেখে দুই মানুষের খাড়ার ওপর দিয়ে ছাইরঙা আকাশের নীচে সমুদ্রের ঝড় বয়েই চলেছে, যেন রোজই এমন বয়। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা সহ্য করতে মানুষের কতক্ষণ লাগে? তিন ডুব দিলেই ডুবে মরে। একটু বেখেয়াল হয়ে নদীর গর্তে হাত ঢুকিয়ে মাছ ধরতে গেলে কুমিরের এক টানে পাতাল। হাঙর তো টানেও না, ঘুপটি মেরেও থাকে না, স্রোতের যতটুকু ভিতর পর্যন্ত তোমার চোখ যায়, ঠিক তার নীচের জল দিয়ে তীরের মত আসে। এমনিতে হেঁটে যাচ্ছ, যেমন যাও, মাঠ ভেঙে আল ভেঙে, একটা কিছু পায়ে দংশন করল। পায়ের দংশন কি বোঝা যায়? পরের নদীর পাড়ে পৌঁছুতে-পৌঁছুতে পেল ঘুম। অত চেনা নদীর পাড়ে শুয়ে পড়লে ঘুমাতে। শকুল দেখতে পায় সেই ঘুম যা আর ভাঙে না। ভাম গন্ধ পায় মাংসের যার ভিতরে রক্ত আর বয় না। পৃথিবীর কেউ জানতেও পারল না, তুমি আর বেঁচে নেই। আর দুদিন বললেই তো মনে হবে—এ হাওয়া যেন রোজই বয়।

যোগেনের কি এই সাতসকালেই মৈস্তারকান্দি ছাড়া দরকার ছিল? তেমন দরকার কিছু ছিল না। থাকার দরকারও ছিল না। মাথা-বাঁচানোর উপায় তো সে করে এসেছে। হ্যাঁ। তার বাড়িতে তো সেই থাকতে পারত না। কোথায় থাকত? এই বিপদের মুখে সে কি বাপ-ছেলে-বৌ নিয়ে মৈস্তারকান্দি ছেড়ে শ্বশুরবাড়িতে থাকত? এটা তো যোগেনের নির্বাচনক্ষেত্র। এখনো পর্যন্ত কোথাও কোনো দুর্যোগের খবর যদিও আসেনি, তবু, যোগেনকে তো সরাসরি জানতে হবে ঘটনা কি কিছু ঘটেছে। জানতে হবে—তার নিজের লোকজনের কাছ থেকে ও জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে। যদি তেমন কিছু কোথাও না হয়ে থাকে তাহলে ভাল তেমন কিছু না ঘটলে বরিশালে যাওয়ার তো কোনো বাধা নেই। কংগ্রেস অধিবেশনে আর কী হল সে-খবরও জানা যাবে, পড়া যাবে। প্রাণ-বাঁচাতে মৈস্তারকান্দি আর আটক থেকে ছাড় পেতে বরিশাল

কলকাতা—এই নিয়ে নিজের ভিতরে সন্দেহের একটা পাকও দিয়ে তুলেছিল যোগেন।

হাওয়া তো খালে বা নদীতে বাড়বেই। যোগেনের অনুমানে দুর্যোগের কথাটা এল কেন?

আসবে না কেন? বরিশালের আকাশ, সমুদ্র, নদী, নালা, খালবিলের কোনো পাঁজিপুঁথি আছে না কী? বার ঘণ্টার ওপর এই এক হাওয়া চলছে। চলছে তো চলছেই। খাল, নদী, বিলের আকাশে এত বড়-বড় ফাঁক যেখান দিয়ে যখন যার ইচ্ছা সে-ই সমুদ্রের মাঝখান থেকে একেবারে শরিয়তপুরের মাথায় উঠতে পারে—কুমির, হাঙর, সাইকোলন, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস—কী না। আবার এও সম্ভব যে এটা একটা খামকা বাতাস। আবার আজ সন্ধ্যাতেই নেমে যাবে। তাও পশ্চিম বরিশাল হলে একটা কথা ছিল। ঐ দিকটায় সমুদ্রের খাঁড়িখুঁড়ি কম, ডাঙা থেকে নদী বা খাল সমুদ্রে গিয়ে পড়েনি। তাও আছে বিষখালি-বুড়ীশ্বর। সমুদ্রের ভিতর থেকে মহীরুহের মত খাড়া উঠে গেছে—ঝালকাঠি-বাকেরগঞ্জ। কিন্তু দক্ষিণ-পুব বরিশালকে বিশ্বাস কী? ভোলার চরে যদি বসতি না বসত, তাহলে সে তো সমুদ্রই। সেই পুবসমুদ্রের জোয়ারভাটা তো সব নদীখাল দিয়ে চাঁদপুরের পাড় ছোঁয়। ভোলা তো যোগেনের ভোটের জায়গা।

ছোটমাঝির সঙ্গীকে যোগেন বলে, 'মণি, এই তক্তাটা লম্বালম্বি পাইত্যা দ্যাও না। একডু শুই।' ছোটমাঝিকে বলে, 'নিজের বুদ্ধি খাটাইব্যা না। বিপরীত কিছু দেখলেই নৌকা ভিড়াইয়া আমারে ডাকবা।' যোগেন সেই লম্বা করে পাতা তক্তাটায় নিজের কোঁচায় মাথা ঢেকে শুয়ে পড়ে।

ছোটমাঝি যোগেনকে ডাকছিল, 'কত্তা, কত্তা'। যোগেন ওঠে না দেখে আবার ডাকে, 'মেম্বারশাহেব, মেম্বারশাহেব।' তাতেও যখন যোগেন ওঠে না, তখন সে তার সঙ্গীকে ইঙ্গিত করে, যোগেনের পায়ে ধাক্কা দিতে। সঙ্গী রাজি হয় না। তাতে দুই মাঝি মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসে। এতটা হাওয়া সত্ত্বেও তাদের শরীর ঘামে শপ শপ করছে। কোথাও-কোথাও তাদের হাওয়ার মুখোমুখি চালাতে হয়েছে। এতটা পরিশ্রমেও যোগেনের ঘুম ভাঙানোর খেলায় তারা মজা পায়। নৌকোটা পাড়ে লাগিয়েছে। ছোটমাঝির সঙ্গী একটা কাঠি তুলে নিজের নাকে ঢোকায়। দেখে, ছোটমাঝি পেটে হাত দিয়ে তার হাসি চাপা দেয়ার চেষ্টা করে। সেই ছ্যামড়া কাঠির খোঁচায় হাঁচল বটে কিন্তু আওয়াজ তেমন হল না। মাথা থেকে কাপড় সরিয়ে যোগেন জিজ্ঞাসা করে, 'কী হইছে রে?'

'মুলাদি আইল তো। নাও ভিড়াইছি। লঞ্চ লাইন বন্ধ। লাল নিশান তুইল্যা দিছে। খবর নিব্যার চা—ন তো—'

'খাড়া, খাড়া,' বলে যোগেন গলুইয়ের দিকে যায় 'মুল্যাদি?' বলে জুতোজোড়া পরে প্রথমে এই পাড়, তারপর উলটো পাড় দেখে। ওদিকে দুটো লঞ্চ নোঙর করা আর-একটা নিশান গোঁজা একটার মাথায়। গোলনৌকো দুটি আর কয়েকটা ছিপনৌকো পাড়ে বাঁধা। যোগেন আচমকা ঘুম থেকে উঠেছে বলেই তার যেন বিহ্বল লাগে। জলের দিকে তাকিয়েও জিজ্ঞাসা করে, 'আড়িয়াল খাঁতে পড়ছি নাকি?'

ছোটমাঝি বলল, 'সামনে, পড়ব, তাই তো আপনারে জিগাইব্যার লগে ডাইকলাম। ঢুকব কি ঢুকব না?'

যোগেন নীচে ঘাটে নামতে গিয়ে দেখে, নামার জায়গাটা পাড়ের তলা, থিকথিকে কাদা। সে বলে, 'বাপ নৌকাডা এড্ডু ডাঙার দিকে ঠেল, নয় তো নামি ক্যামনে?'

বলা মাত্র সেই ছ্যামড়া মাটি জলে নেমে গেল, তার কোমরের কাছাকাছি জল। নৌকোটা

ঠেলে একটু ঘোরাতেই গলুইটা ঘোরে। পাড়ের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে হাত তুলে যোগেন পেছনের ছেলেটিকে 'খাড়া, খাড়া' বলে লাফিয়ে পাড়ে পড়ে।

মুলাদি

মুলাদি হল একটা বন্দর জায়গা। সব রুটের লঞ্চই মুলাদি ছুঁয়ে যায়। পুবে—ধর্মগঞ্জ নদী দিয়ে চাঁদপুরের লম্বা লঞ্চ লাইন। আবার, দক্ষিণে বরিশাল পর্যন্ত তো আছেই তারও দক্ষিণে বাখের

১২২

গঞ্জ পটুয়াখালি। মুলাদি থেকে একটু গড়িয়ে রাজগুরু নদীতে ঢুকলে সে-ই পশ্চিমে সাতলায় গিয়ে ঠেকবে।

মুলাদিতেই জানা যাবে রহস্যা কী?

লঞ্চ-লাইন সবগুলোই বন্ধ। সে তো দেখাই যাচ্ছে। কিন্তু সকালের দিকে কি আপ লঞ্চ একটাও আসেনি। বা, খানিক দূর এসে প্যাসেঞ্জারদের নামিয়ে দিয়ে বলেছে, আর যাবে না। তেমন প্যাসেঞ্জারও কি আসেনি সকাল থেকে? পাড়ের প্রায় সব দোকান বন্ধ। একটা দোকান দেখা যায়, যেন চায়ের। ও বোধহয় ঐ দোকানেই শোয়। ঐ দোকানের সামনেই তাও একটা ভিড় আছে। যোগেন সেই দিকেই হাঁটে। হাঁটতে-হাঁটতে ভাবার চেষ্টা করবে, রহস্যাটা কী? জিজ্ঞাসা করবে কী? হাওয়া ক্যান এমন? সে হাওয়ারে জিগান। বরিশালের দিকে যাওয়া যাবে না? এ তো এতখানি চওড়া একডা দুইডা নদী বুক চিতাইয়া রাইখছে—গেলেই যাওন যায়। এই ভিড়ের মধ্যে কি এমন দু-একজন নেই যারা যোগেনকে চেনে ও যোগেনকে প্রশ্ন তৈরির কষ্ট না দিয়ে সব বলে দেবে। কিন্তু এখানে সেই হাওয়া নেই কেন?

যোগেন একটু দাঁড়িয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। বাঁধল কোথায় নৌকাটা—তাই ঠাহর পায় না যোগেন। মুলাদির মত একটা বন্দর জায়গা যদি এমন ফাঁকা থাকে তাহলে ঠাহর পাবে কী করে? কিন্তু যোগেন মাথা ঘুরিয়ে নজর করেও ঠিকঠাক চিনতে পারে না জায়গাটা। ভাবল, একবার নৌকোয় ফিরে গিয়ে জেনে আসে, কোথায় বেঁধেছে নৌকোটা।

অবশেষে যোগেন এই পর্যন্ত বুঝতে পারে, না, এটা মুলাদিঘাট না। সে-ঘাটের ভাটির বা উজানের কোনো জায়গা হতে পারে কিন্তু মুলাদিঘাট না। আড়িয়াল খাঁ না-পেরিয়ে মুলাদি? আর, যোগেনকে জিজ্ঞাসা না করে আড়িয়াল খাঁয়ে ঢোকার দম আছে ঐ দুই ছাওয়ালের? কিন্তু নৌকো বাঁইন্ধল কোথায়? সেই হাওয়া নেই কেন? যোগেন আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখে। বোঝে না।

সেই দোকানটার কাছাকাছি হতেই যোগেনকে দেখতে পেয়ে ভিড়টা ভেঙে যোগেনের দিকেই আসে, তারপর যোগেনকে ঘিরেই দোকানটায় ফিরে যায়। ছাই মিয়া হেসে উঠে বলে, 'কাম দেইখছনি মেম্বারের, দরিয়ার উজান ঝড়ের উপর দিয়া চইল্যা আইসছে উইড়্যা? আপনার কাছে এ-সংবাদ যায় ক্যামনে।'

'কোন্ সংবাদ—সেডা তো অ্যাহনো কইল্যা না?'

ছই মিয়াও পাটের পাইকার, বলে, 'সংবাদ বাদ দ্যান, আপনে এই সকালে মুলাদি আইলেন ক্যা?'

'আইছি তো? সাক্ষী দিবা তো? সব থিক্যা আগে আইছে মণ্ডল—'

'সে তো দিবই। কিন্তু মামলাডা জাইনলে তো সাক্ষী। মামলাডা কী?'

'আরে, মক্কেল শুধ্যায় মোক্তাররে আমার মামলাডা কী? মোক্তার জাইনব ক্যামনে? মোক্তার তো জানে কোন ধারার মামলা—৩০২ না ৩০৪ না ৩০৭—জামিন পাবি কীসে। মোক্তার জাইনব ক্যামনে তুই তোর বৌরে কাটছিস না কলাবৌরে কাটছিস?'

'সে-কথা তো আছেই। আমি জিগ্যাই এই ভোলার মামলা কি হইতে-না-হইতেই হাইকোর্টে উইঠল? নাইলে আপনে জাইলেন ক্যামনে। একেবারে পক্ষীর নাগাল, যাও পক্ষী তার লগে—'

শুনা শেখ হঠাৎ রেগে ওঠে। হঠাৎও নয়, রাগও নয়, এটাই তার কথা—বলার স্বাভাবিক স্বর। বা, সে রাগ না করলে কথা বেরয় না ও হঠাৎ ছাড়া তার রাগ হয় না।

'তোর পুঙ্গির ভাইয়ের কথা থামাবি ছাই মিয়া। আরে, এই বিপদের মইধ্যে এত বড় মানুষডা নিজে হাঁইট্যা-হাঁইট্যা আয়্যা পাশে খাড়াইছে আর তার লগে দ্যানমৌরের দরাদরি করিস য্যান পাচতালাকের বিধিরে ঘরে তুইলব্যার মামলা ধইরছিস—'

যোগেন তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, 'বিপদডা কী, তা কি কইব্যা কেউ? না কী, কুনো বিপদ নাই, ও নিজেই আপনারে গিল্যা নিব, আপনারে কুনো চেষ্টা কইরব্যারই লাইগব না, পিছল্যাইয়্যা যাইবেন বইল্যা আমারে কুমিরের হাঁয়ে, ঢুকাইয়্যা দিব্যা। কাইল শেষব্যালা থিক্যা আইজ এই ঘড়ি পর্যন্ত প্রথম ব্যালা কাইট্যা গেল, জিগায়্যা গলাখান দুই চিত্তির বাড়ির ঘরের চাল শ্যাষ রাইত থিক্যা প্রসব বেদনার হিক্কা তুল্যা আর এইহানে নদীতীরে বইস্যা-বইস্যা য্যান কুলীন-বাউনের পাঠান্ নাপিত, বামুনের শ্বশুরবাড়ি আইস্যা কুলীনের বিয়াতী মাইয়ার একদিনের বার সাইজ্যা পাছার দাদ চুলকাই— ব্যার ধরছে। একডাও উদ্যা কথা কইবা না। কও। ব্যাপারডা কী?'

নজর আলি একটু আড়ালে ছিল। হয়ত এই ব্যাপার বলার কাজটা তার ওপরই চাপাল সবাই—চোখের ঠারেঠুরে, আঙুলের খোঁচায়।

'আপনে কি কিছু শুইন্যা আইছেন? আইস্যা কিছু শুইনছেন?' শান্ত গলায় নজর আলি জিজ্ঞাসা করে।'

'মনে নেন কি আমার কান ছিল না, শুনি নাই। চোখ ছিল না, দেখি নাই।'

কেউ একজন টিপ্পনী কাটে, 'আতুড় কাইটছে তো?'

নজর আলি বলে, 'না-শুইন্যা কওয়া যায়, চার-পাঁচ রাত্তির আগের থিক্যা এই বাও দিছে। য্যান এইডার কুনো নামানও নাই, থামানও নাই। না-শুইন্যা কওয়া যায়, তিন-চার ফজিরের আগের ফজিরে শুনা গেল, দক্ষিণ সাহাবাজ পুর আর তেঁতুলিয়া নদী, পুব আর পশ্চিম থিক্যা নদীর তলা দিয়্যা সিঙ্গ কাইট্যা উত্তর-ভোলাবে নদীবক্ষ হইতে বেবাক উখরাইয়া ফেল্যাইয়া দিছে—'

'ফ্যালাইল কুথায়। নদী-বাড়ি-গাছপালা-খাল-বিল লইয়্যা উত্তর-ভোলা তো জায়গা কম না। নদী নিজে খাইলে খাইত। কিন্তু উখরাইলে উখরাইল কোন্ পাকে? উখরান—ভোলার দক্ষিণ সীমা কী?'

'দৌলতখানের নাম শুনা গিছে প্রথম-প্রথম, এখন আর যায় না—'

'অ্যাহন কি নতুন নাম শুনা যায়?'

'চাঁদপুর-রাজাপুর।'

'কোন্ চাঁদপুর?'

'গণেশপুরা দোনের উত্তরে।'

'মানুষজন সব ভাইস্যা গিছে না সবব্যার পারছে?'

'মনে হয় না কেউ বাঁচা আছে। এখানে তো একজনেরও দেখি নাই।' ঠাট্টা করে উঠল ছাই মিয়া, 'দ্যাহন তো ক্যামন কথা। মানুষ ভাসে উত্তর ভোলায় আর মুল্যাদির মাতবর্ পা নাচাইয়্যা কয়, এদিগে তো আসে নাই। আইসব কেমন কইর‍্যা? সাগর যেহানে ভাসাইয়া লিব সেইহানে তো যাইব। মুল্যাদিতে যে আসে নাই, তাতে এইটুকু তো বোঝা যাইবার পারে, হয়ত মেহদিগঞ্জ ডোবে নাই।'

যোগেন ছাই মিয়াকে সমর্থন করে, 'সেডা তো ঠিকই। এইডা তো মুল্যাদি না।'

'মুল্যাদিই, এডডু উত্তরে। আপনে তো নৌকায় আইছেন'।

'হ্যাঁ। সে তো দুই ছ্যামড়া টানে।'

'ছ্যামড়াগ বুদ্ধিজ্ঞান তো বুড়া মাঝি থিক্যা পাকা। এই হানে নৌকা বাঁইনধছে।'

'আমি তো ঘুমায়্যাছিল্যাম। ওরা কী করছে, জানি না।'

'শুনেন। এইডা চাইর পাকে আড়িয়াল খাঁয়ে বাঁধা। আপনার মাঝি আড়িয়াল খাঁরে এড়াইয়া-এড়াইয়া এই খাঁড়িডাতে নৌকা ভিড়াইয়্যা আপনারে ডাইকছে। অ্যাহন তো আর এড়াইনা যাবে না। তালি করবডা কী?'

'তাইলে আমার কর্তব্যডা কী? এইটুকু জাইনল্যাম উত্তরভোলা ডুবছে। এইটুকুও বুইঝল্যাম—মানুষজনের কী হইছে সে-বিষয়ে তোমাগ কোনো খবর নাই। এইবার কও আমারে নিয়্যা তোয়াগ পরামর্শ কী? এতক্ষণ তো ঘুমাইয়্যা আসছি। অ্যাহনো ঘুমাইয়্যা ভাইসব যদ্দুর যাওয়া যায় ভোলার দিকে? যদি আগাইব্যার না পারি, পিছায়্যা আইসব।'

'যাইব্যার তো একডাই পথ আড়িয়াল খাঁ ধইর‍্যা। এই বাতাস। জলে তো পিছ্যা কইলেই পিছান যায় না। আপনার তো কইলেন দুই ছ্যামড়া মাঝি। এই বাতাসখ্যাপা নদী। কুনো মানুষরে কওয়া যায়—তুই যা, এরই মইধ্যে যা?' নজর আলি একটু আড়ালে চলে যায়, সে এই সিদ্ধান্তের ভাগিদার হতে চায় না।'

শুনা শেখ আবার রেগে ওঠে, 'দ্যাহেন, দ্যাহেন মেম্বারসাহেব আপনার মানুষজন ক্যামন বামুনগ নাগাল কথা কয়। য্যাগ আপনে কালীবাড়ির পুরুতঠাকুররে স্যাবা দিয়্যা জিগ্যাব্যার ধইরছেন, ঠাউরমশায়, ঐ চতুমারানির আমি চুত মাইরতে চাই, সেইডা ঠিক হইব না ভুল হইব?' এমন আচমকা বলে শুনা শেখ যে সকলেই হেসে ওঠে। শুনা শেখের কথা তখনো শেষ হয়নি, 'পয়লা কথা এই যে আমরা এতগুল্যা হোগামারানি এইখানে, জলেই যাগ বসবাস, ত্যাগ মইদ্যে একজনও হোগামারানি আছে যে কইব এমন দুর্যোগে নদী পার হওয়া অসম্ভব?'

'এই শুনা শেখ, কইব্যার চাও কী, নদীপারান যায়ই?—' নজর আলি গলা তুলে বলে, কইল্যাম তো অসম্ভব, কথা বুঝো না সব পিরশাহেব?'

'অসম্ভবডা কী? নদীপারান নাকি নাপারান', ছবি মিয়ার প্রশ্ন শুনেই যোগেন হেসে ফেলে বলে, 'শুনা। সম্ভবডা কী, সেইডা বলো। চারদিক, দশদিক ভাইব্যা বলো।'

'ভাবব কী দিয়্যা? যাহার মইধ্যে তো দুইখান অঙ্গ, চ্যাট আর প্যাট। আর ভাইবব্যার কন চাইরদিক আর দশদিক। সেই দুইডা দিয়্যা তো পারান যায়। ভাবান যায় না।'

'এই না—কইলি নদী পারান অসম্ভব?' ছবি আঙুল তোলে।

'কইল্যাম—এই এতগুলা হোগামারানির মইধ্যে কেউ কি আছে যে কইছে নদী পারান যাবে না। যাবে কি যাবে না, নদীতে না-ভাইস্যা সেটা কওয়া যায়? তুই য্যান আবার নামাজ পড়ব্যার

যাইস না রে ছবি—মৌলবির সব জোবান গুল্যাইয়্যা যাব।'

'শুনেন। ভোলা তো আমার ভোটের এলাকার মইধ্যে। তাই এইডা আমার কাজ—বিপদের সময় গিয়া দাঁড়ান। তাছাড়া, আমি এডডু চক্ষে দেইখলে তো আইনসভায়, মন্ত্রীগ, লাটশাহেবকে, নেতাগ কইব্যার পারব, বরিশালের জিলা ম্যাজিস্ট্রেটরে কইব্যার পারব—ক্ষতি কতডা, কষ্ট কতডা। নিজের চক্ষে দেখার তো দাম আলাদা। তার উপর ভোলার মানুষ যহন শুইনব আমি মুল্যাদি পর্যন্ত আইসছি, ভোলা পর্যন্ত যাই নাই—তাইলে তারা তো চইট্যা যাইবে গা। আমি মৈস্তারকান্দির বাড়ি থিক্যা খালপাড়ে আইস্যা আর বাড়ি ফিরি নাই। নৌকা নিয়া বাইর‍্যাছি। বাইর‍্যাছি যহন, আমার না-যাওয়ার কুনো উপায় নাই। আগাইয়া দেহি। আগাইতে না পাইরলে ফির‍্যা আইসব।'

'তার আগে তো আপনার নাওডারে দেখা লাগে, ওরা সকলে মিলে নৌকোর দিকে এগয়।

যোগেন জিগগেস করে, 'তোমরা এই পর্যন্ত শুইনছ যে তেঁতুলিয়া আর দক্ষিণ শাহবাজপুর মিল্যা উত্তর ভোলারে ডুবাইছে, দৌলতখান পর্যন্ত—'

'এত ঠিকঠাক ধইরবেন না। আমরা শুনেছি দক্ষিণ শাহাবাজপুর আর তেঁতুলিয়ার কথা, দৌলতখানের কথাও শুইনছি, কিন্তু দুই-একবার। এর বেশি কিছু দেখিও নাই, শুনিও নাই।'

'তেঁতুলিয়া আর মেঘনা—'

'মেঘনা না। দক্ষিণ শাহাবাজপুর।'

'তোর যহন লোম উঠে নাই তহন ছিল আলাদা থানা—শাহাবাজপুর, নদীও শাহাবাজপুর। তারপর জিলা যখন ফারাক, হইল তহন নামডা থাইক্যা গেল দক্ষিণ শাহাবাজপুর বইল্যা। মেঘনাটা?

যোগেনের নৌকো ও মাঝি দেখে এতক্ষণ এত কথার পর যোগেনই নিরুৎসাহ হয়ে যায়। এই ফাঁকটায় যে হাওয়াটা নেই, তার ফলে নানারকম সহজ সমাধান সম্ভব মনে হয়। নজর আলি বলে, 'ছোট ছিপের একডা সুবিধা ডুইব্যা গেলে সোজা কইর‍্যা নেয়া যায়। কিন্তু হাল তো লাগে একডা। নাইলে তো এই হাওয়ায় নাও সোজা রাখা যাবে নে না।'

নজর আলির কথার ওপরে এ নিয়ে আর কথা চলে না। ফলে নৌকো দেখে হাসাহাসিটা বন্ধ হয়ে গেল। ছোট মাঝি পায়ে-পায়ে উঠে এসে যোগেনকে বলে, 'আপনে কি অন্য নৌকা নিবেন? নিবেন না। আমরা পারব।'

এর মধ্যে কাউকে পাঠানো হয়েছিল, সে এই ছিপনৌকার মাপের এক হাল কোথাও থেকে নিয়ে এল।

চলো তো। তুমি তো পারবা, তোমার নৌকা নি পারবে? চলো, দেহি,' যোগেন পাড়ের ঢাল বেয়ে এগায়। ছোটমাসি আর ছ্যামড়া মাঝি খালের জলে নেমে নৌকোটাকে ওদিক থেকে ঠেলে আর পাড়ের দিকে টানে। নৌকো দেখার মানে যে এরা জানে—এটাই যোগেনকে আশ্বস্ত করে দেয়। কিন্তু জানা দিয়ে তো আর বাঁচা যায় না।

খানিকটা ডাঙায় টানা নৌকোটার ওপর ওঠে যোগেন—পেছনে নজর আলি।

মায়ের পেট থেকে পড়েই যাদের বাপের কামের দিকে হাত বাড়াতে হয়—সে লাঙলই হোক আর বৈঠাই হোক, জালই হোক আর শুকনা লবণ বানানোই হোক—তারা জন্মকাল থেকেই সেই কামের বা পেশার দড় বুঝে যায়। মৈস্তারকান্দির মণ্ডলবাড়ির ছেলে আর দউদাখানের নজর আলি যখন নৌকা দেখতে নামে—তুফান পাড়ি দেয়ার আগে—তখন তাগ সাহায্য করার কুনো উপায় নাই —চেঁচামেচি কমান্ ছাড়া। ভিড়টাই একটু সরে যায়, যদিও ওরা ঘাটে নামেইনি।

কী দেখে যে এই নৌকোর সঙ্গে আড়িয়াল খাঁর তুফানের বিচার করে দুজন?

যোগেন মণ্ডল নিচু হয়ে দেখে পেটে জল জমে আছে কতটা—এই চার-পাঁচ ঘণ্টায় জল খাল থেকে ভেতরে এসেছে কতটা—সেটা সামান্যই, যদি-না দুই ছ্যামড়া এর মধ্যে ছিঁচ্যায়্যা থাকে। জল ছিঁচিয়েছে কী না দেখতে একবার নৌকার ভিতর-গা, পাটাতন আর কিনারে চোখ বোলালেই জানা হয়ে যায়। না। নৌকার তলা শক্ত। সেদিক থেকে কোনো বিপদ-আপদ নেই।

নজর আলি গলুইয়ের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে মাথা ঝুঁলিয়ে দেখতে চায়—গলুইটা যে তলার কাঠ হয়ে নেমে গেছে তাতে আঙুল বুলালে, আঙুলে লাগে কী না। নজর আলির কড়া-পড়া আঙুলে সেটুকু খোঁচাখুঁচি বোঝা যায় না। তুফানের মধ্যে দুই গলুইয়ের ওপর এতটা বেশি চাপা পড়ে—সঙ্গে-সঙ্গে অবিশ্যি সরেও যায়—যে জোড় কাবু হইলে নৌকা ফাঁক হইয়্যা যাবে নে—য্যান কুড়াল দিয়্যা ফাড়া হইল নৌকাখান। এদিকে নজর থাকে কম।

নজর আলি নৌকোর গলুই জড়িয়ে নীচে নেমে, নৌকোর তলার দিকে যায়। অতটা ওপরে তো জলের থাবড়া পড়ে, দাঁত তো পড়ে এইখানে, কুমিরের দাঁত, দুই সারিতে একশডা পাটির দরোজা, পাতালের। সেই রাবণের দরজায় যদি খিল শক্ত থাকে, তাহলে নৌকো থেকে কোনো ভয় নেই।

নাজির আলি হালটা চায়।

হালটা নৌকোর সঙ্গে কোণ মিলিয়ে একটু দেখে।

তারপর, 'এই শুনা', ডাকে।

শুনা লাফিয়ে কাছে আসে। নাজির আলি নৌকোর তলা থেকে খুব ঠান্ডা গলায় বলে, 'হালডা বাইন্ধ। ধইর‍্যা যাহি—'

শুনাকে লাফ দিয়ে আবার উঠে নারকেলদড়ির খোঁজ করতে হয়। কাউকে বলেও হয়ত, কেউ কিছু হদিশও দেয় হয়ত, বা, শুনার নিজেরই জানা আছে। শূন্য পথের ওপর দিয়ে সে ছুটে যায়। ফিরেও আসে প্রায় ছুটেই, কিন্তু কাঁধে নারকেলদড়ির পাহাড়ে, তাই পুরো ছুটে নয়।

নাজির আলি হালের কোণটা মাপমত ধরে বসেই ছিল, ছেড়ে দিলে পাচ্ছে কোণের মাপটা ভুলে যায়, বা বেঠিক হয়ে যায়। সে শুনাকে বলে, 'আলগা দিস ন্যা, শক্ত কইর‍্যা দিস, য্যান, বাঁয়ে-ডানে একবিঘৎ-একবিঘৎ কইর‍্যা ঘুইরব্যার পারে। তার বেশি না।'

কাঁধে নারকেলদড়ির বান্ডিল, দুই হাতেও গুছি, শুনা শেখ কেমন উদাস হয়ে খালের উজানে তাকিয়ে থাকে, যেন কিছু মনে করতে, বা, যেন কোনো জানা কথা ভুলে যেতে।

'কী রে বান্ধ্যা ধরছিস?' নাজির আলি বলে।

'না। এইডারে তো ভাসাইবেন তুফানে?'

'চা লা ই ল্যা ম—'

'এইডার হাল নাই ক্যা?'

'চালায় তো লগি ঠেইল্যা, খালে। হালের কামডা কী? মিছামিছি হাল বাইন্ধ্যা ঘুইরব ক্যা?'

'বড় ভাসানে তো লাইগব্যার পারে।'

'পারে। তহন বাইন্ধব। বাইন্ধতেছি অ্যাহন।'

'বাইন্ধেন ক্যা? না। তুফানের জল য্যান পথ থিক্যা সরাইব্যার না পারে।' বলতে-বলতে ভাবছিল শুনা শেখ, 'ধরেন, কোষা নৌকা কি ভারী নৌকা, ভারী হালের নৌকার তো নিজের ওজন আছে। জলের ধাক্কায় সেডারে আর কদ্দুর ঘুরাবে। আর যদি ঘুরাব্যার পারে জল, তাইলে তো নৌকা উলট্যায়্যা যাবে নে। সেডা তো হাল ঠেকোবার পাইরব না। তাই হালডারে এডডু

শক্ত কইর‍্যা দিলেন। কিন্তু এই ছিপের কাম দিশা ঠিক রাহা। এমন একডা কলার মোচারে নিয়্যা তো বাতাসে-জলে লোফালুফি চইলব। ওর হাল শক্ত বাইন্ধলে অয় পালাইব কোথ্ দিয়্যা?'

শুনা শেখ গলুইয়ের ওপরে আকাশে দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে। নজর আলি গলুইয়ের নীচে হালের কোণ ধরে ভেজা মাটির দিকে তাকিয়ে, যেন বরশির চার বের করছে মাটি খুঁড়ে। আলাপটা চলছে—এমন স্বরে যে নিজেরাও নিজেদের কথা শুনতে পায় না বটে, কিন্তু একে অন্যের কথার ছাড়া-ধরা মিলিয়ে সবটা শুনতে পায়।

দুইজনের কথায় কোনো মিল নেই।

কোথাও একটা মিল ঘটাতে না পারলে হাল বাঁধা হবে না। দুইজনেই এখন এইরকম নৌকায় একা-একা আড়িয়াল খাঁ বা তেঁতুলিয়া পাড়ি দিচ্ছে, আর পরের বাধার মুখোমুখি হচ্ছে।

'হাল ঘুর‍্যাইয়া যে নাওরে পলাইতে হয়, সে-নাও তো পলাইবার লগেই ঘুইরব, তার তো আর যাওন নাই,' নাজিব আলি খুক করে হাসে।

শানু শেখ খুক করে হাসতে পারে না। সে যেন পাখি তাড়াচ্ছে, এমন একটা আওয়াজ দিয়ে বলে, 'হাল ঘুরাইয়্যাও যে নাওয়ের পলানো নাই, তার তো মরণ ছাড়া যাওনও-নাই। খুইল্যা রাইখ্যা মরণ, না, বাইন্ধ্যা রাইখ্যা মরণ?'

অনেকক্ষণ কোনো কথা হয় না।

ঢালের মাঝামাঝি যোগেন তার দুই ছ্যামড়্যা মাঝির সঙ্গে। ঢালের ওপরে সেই ভিড়টাও আলগা-গিঁটের পাটের গোছার মত। দুই-একজন এদিকওদিক বিড়ি টানছে। গলুইয়ে খাড়া শানু, কাঁধে দড়ির পাঁজা। গলুইয়ের নীচে নজর আলি—নৌকোর ফুটোফাটা সামলাতে যেন হাতে ডলে গাব পাকাচ্ছে।

'এডা তো চলা-নৌকায় বজ্রপাত না, য্যান বাঁচার কোনো উপায় নাই। বারাইছিল্যাম খটখটা রোদ্দুরে, দেওয়া নাই, দায়ি নাই, কোথাথিক্যা আয়্যা পইড়্ল ম্যাম ভিতরে নিয়্যা আগুন। বজ্রপাত আর বৃষ্টি—একই সঙ্গে। এমন কাণ্ডও তো ঘটে, সমুদ্রের জলে আগুনে পুইড়্যা গেল নৌকা। এক হাতে জল ছিটাইলেও সে-আগুন নিব্যা যায়। নৌকা ডুবাইয়্যা দিলেও সে-আগুন নিব্যা যায়। সে আগুন থিক্যা কুনো মাঝিরই বাঁচা নাই। কিন্তু এইডা তো তেমন যাত্রাই না। যা বিপদ আছে, তার একশগুণ বিপদ বাড়ানো হইছে। কত জায়গা মুখের কথায় ভাইস্যা গিছে। আলগা দুই-একটা নাম শোনা গিছে। শ-মাইনষের মুহে মুহে দুইডা নাম হইয়া গিছে পাঁচশ নাম। ভোলা নাই। দক্ষিণ সাহাবাজপুর নাই। দৌলত খাঁ নাই। এতখান 'না'-য়ের আগে জাইন্যা যে-যাত্রার শুরু সেডার সরহদ্দ তো জানা। গণেশপুরা দোনা, মাছকাটা নদী, লতা নদী, নয়াভাং গিনিয়া নদী—এই পথে যত্ডা যাইব্যার পারব, যাইব। যত্ডা পাইব্র না, ফিব্যা আইসব। হাল ঢিল্যা না দিলে তো মাঝিগ ঘাম হালেই খাব।'

শনু শেখ মনে-মনে একবার এই পথটা দেখে নেয়।

মনেমনেই তাকে স্বীকার করতে হয়, ভাইবছে ভাল।

এখন আর এই পথটাকে বাঁধভাঙা আড়িয়াল খাঁ কী মেঘনা মনে হয় না।

'লতা নদীতে ঢুইকব কোথায়?'

'এহান থিক্যা নয়া ভাঙ্গানি দিয়্যা, ভাসানচরের তল্যা দিয়্যা যাউক। তারপরে অবস্থা বুইঝ্যা ব্যবস্থা। লতা দিয়্যা উজানে উইঠ্যা মাছকাটা দিয়্যা রাইবতে পারে। তবু, অদ্দূর যাইব্যার ভরসা নাই। যেটুক গ্যাল, সেটুকই লাভ।'

'তাইলে হাল ব্যক্তি?'

'বাইন্ধতেই তো কই?'

'দুই দিক মিল্যা একহাত কোণ?'

'আলাদা কইর‍্যা মাপো। একবিঘৎ-একবিঘৎ। বান্ধার পর একবার ঘুরাইয়া দ্যাখব্যার লাগবো পাখনাও একবিঘৎ কইর‍্যা কোণ মারে না কী? তুই যাবি তো লগে?'

শানু শেখ বাঁধতে-বাঁধতে জিজ্ঞাসা করে, 'আর কেডা'

'কেউ না। আমরা পারব। না-হয় তো নৌকা নিয়্যা ফিরত যাব। আপনারা নতুন নৌকা, নতুন মাঝি দিয়্যা মেম্বারের নতুন নদী পারাইয়্যা দ্যান।'

প্রায় চমকেই তাকায় শানু শেখ আর নজর আলি। তাদের ধারণাতেই ছিল না—তারা ছাড়া আর মণ্ডল ছাড়া আর কেউ আছে। ছোটমাঝি তার কথাটা বলে বাঁ হাতে গামছা দিয়ে ওপরের ঠোঁটের ঘাম মোছে। তার সঙ্গী দুই হাত দূরে দাঁড়িয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে পায়ের আঙুল দিয়ে মাটি খোঁড়ে।

নজর আলি বলে, 'বাবা, তোমরা নিচ্চয়ই পারবা। এতখানি আইছ এত বুদ্ধি খাটাইয়া নতুন-নতুন পথ দিয়্যা। কিন্তু এ তো বাবা সমুদ্রযাত্রা। এ তো শিক্ষা লাগে। তোমরা লগে যাহ, শিখো, এই হান থিক্যা দুই মাঝি যাউক।'

যোগেন ব্যাপারটা বোধহয় আঁচ করতে পেরেছিল—নিজের দিক থেকেই। এরা সব ওস্তাদ মাঝির দল এত আয়োজন, বাঁধাবাঁধি করছে দেখে তার অনেক আগেই মনে হয়েছে—এই নৌকো নিয়ে প্রলয়ের নদী পাড়ি দেয়া কি সম্ভব? সম্ভব হলেও কি ঠিক? কিন্তু এরা তো কেউ একবারও বলল না—যাবেন না। একথাও বলল না—এই ছ্যামড়াগুল্যার কাম না। নতুন কোনো নৌকো নিয়ে এসেও বলল না—চলেন, আপনারে নামাইয়্যা আসি। যোগেন ঠিক করার আগেই যেন এরা যোগেনকে নৌকোয় তুলে দিচ্ছে—ঠিক এতটাই ভাবেনি যোগেন, কাছাকাছি পর্যন্ত ভেবেছে। নজর আলি আর শানু শেখের সঙ্গে তার মাঝিদের কথা হচ্ছে দেখে সে এগিয়ে আসে।

গলুইয়ের মাথায় হালটাকে নারকেলদড়ির প্যাঁচে শরীরের সব জোর দিয়ে বাঁধতে শানু শেখের মুখ মুখটা বেঁকে গিয়েছিল। যোগেনকে সে বলে, 'এই-যে দ্যাহেন কত্তা, কয় যে আমরাই যাব, না-হয় তো আমাগ নৌকা ফিরাইয়্যা দ্যান!'

নজর আলিকে শুধু তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে যোগেন, ব্যাপার কী?

নজর আলি বলে, 'অগ কথাডা তো ফেলনা না। মাঝি হইয়্যা কী কইব্যা মাঝির বেটারে কওয়া যায়—এমন খারাপ নদীতে যাইস না বাপ। অ যদি ডর না পায়, আমি ক্যান অক ডরাইতে চাই। ওরও তো মাঝি হিশাবে চেনা হব্যার লাগব। এর থিক্যা বড় সুযোগ ওর কী আর আইসব? আপনার মত প্যাসেঞ্জার নিয়্যা মেড়েজলে উখরান্ উত্তর ভোলাতে পৌছিবার প্রথম মাঝি। অর যদি দরিয়ার মাঝি হওয়ার দম আর হিম্মৎ থাহে, তাইলে আমি কেডা অরে আটকাইব্যার?' নজর আলি ধীরে-ধীরে কথাগুলোতে জোর দিচ্ছিল। জোরটা তার ভিতর থেকে উঠে আসছিল। কিন্তু সে যে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার মধ্যে থাকছে না, এটা বোঝাতে সে নৌকোর কাছ থেকে সরে যায় বলতে-বলতে, 'স্যা আপনে নিজে যদি বাদ দ্যান না, অ্যাহন যাওয়াডা। নীরাপদ না, তাইলে, আলাদা কথা। মাঝির কাছে আবার নদীর ভালমন্দ কী? নদী সবসময়ই তো ভাল।'

যোগেন হঠাৎ একটু একলা হয়ে যায়।

তার একটু একটু মনেও এসেছে—এমন অবস্থায় এমন বিপদের নদীতে যাওয়া উচিত হচ্ছে না। এও তার মনে এসেছে—সে বললেই তো হল, 'আইজ বাদ দেই।'

নজর আলি তার শেষ কথায় যোগেনকে যেন উদোম করে দিল—যোগেনের ডর করে কী না সেডা ন্যায্য কথা, কিন্তু মাঝিরে ডর-খাওয়ান ন্যায্য না।

এমন উদোম যে তাকে হতেই হবে সেটা জানতে-জানতে ও এড়াতে-এড়াতে পাঁচ দিন আগে তিরিশে এপ্রিলের সকালে উডবার্ন পার্কের কংগ্রেস থেকে সে আজ এখানে—আড়িয়াল খাঁর অজস্র বাঁকের এক খুপচিতে, দুই বালক মাঝির খুঁজে বের করা মুল্যাদির এই জায়গাটিতে, সামুদ্রিক হাওয়া ও জল থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে, দাঁড়িয়ে। সামুদ্রিক বাত্যা আর জল ভূসংস্থান বদলে দিচ্ছে যে ভোলা-দৌলতখান দ্বীপের সেই প্রলয়পয়োধি থেকে যোগেন এখনো মাইল চল্লিশ দূরে। যোগেন ভয় পাচ্ছে। দুই বালক মাঝি প্রস্তুত।

সুভাষবাবু কেন নিজের ওয়ার্কিং কমিটি তৈরি করলেন না? গান্ধীজি তো বলেছিলেন সুপরামর্শের ছলে। এম এন রায়রাও চাইছিলেন। সুভাষবাবু অভিমানী গলায় বলে উঠলেন, পদত্যাগ নিয়ে আমি কী বলব, আপনারা বলুন। অমনি কাড়া-নাকড়া বাজিয়ে 'পদত্যাগ' 'পদত্যাগ' চিৎকারে নতুন রাষ্ট্রপতির নাম ঘোষণা। এত মিথ্যা ও অন্যায় এক দেবতারা আর নিজেকে দেবতা সবে, এমন মানুষরা করতে পারে।

যোগেন ছোটমাঝির কাছে গিয়ে বলে, 'কী মাঝি, নাও ছাড়ো, দরিয়ায় চলো।'

দুর্যোগের মাঝবন্দর ভাসানচর

যোগেনরা বরিশাল সদরে ফিরে এল এক রাত পরে। ওরা ভোলায় যেতে পারেনি, যাওয়া অসম্ভব বলে। হালে ছিল শানু শেখ। দাঁড়ে ছিল ছোটমাঝি আর তার সঙ্গী।

১২৩

যে-ঘুপচিটাতে ওরা নৌকো ভিড়িয়েছিল সেখান থেকে বেরনোর কোনো পথ নেই, তিন দিকেই আড়িয়াল খাঁর পাক। কিন্তু সে-আড়িয়াল খাঁয় বাতাস থাকলেও জলস্রোতের আলোড়ন কিছু ছিল না। এ পর্যন্ত কেউ বলেনি, জানেও না এখনো, তেঁতুলিয়া আর শাহাবাজপুর মিল কোথায়। আড়িয়াল খাঁ যদি পেরতেই হয়, পেরনো ছাড়া কোনো গতি নেই, তাহলে, ওরা যে-ঘুপচিটাতে ছিল, সেটা দিয়ে সোজা পুবে পার হওয়াই সুবিধের। শানু শেখ হুকুমের সুরে বলে, 'আড়িয়াল খাঁর পেঁচাপেঁচিতে ঐ খানডা মাজার নাগাল সরু আর তার তলাতেই পাছার মত চ্যাবরা। কোমর দিয়্যা পার হও। এই ছোটমাঝিরা, হাতে বৈঠা থাইকলেই বাইতে লাগে? বৈঠা উঠ্যাও—সোত দেখো না।'

শানুর এই কথাতে যোগেন জলের স্রোতের দিকে তাকিয়ে দেখে শানু যেটাকে আড়িয়াল খাঁর মাজা বলল, তাতে তো কোনো বন্যা নাই, জোয়ারের। এটা কী করে হয়। বাতাসে সমুদ্রের জল যদি দোনা দিয়ে ঢোকে, তাহলে মাজা সরু থাকে কেমন করে। দেখে তো মনে হয়, দিন -তিনেকের মধ্যে জোয়ারের জল অন্তত মাজায় ঢোকেনি। তাহলে তলা থেকে বান আসেনি।

কেউই তো জানে না। বান এলেই সমুদ্রের বান। আর দৌলতখান-ভোলা শুনলেই, যেহেতু দৌলতখান, ভোলার দক্ষিণে, তাহলে, বানের পক্ষে সোজা রাস্তা তো দৌলতখান দিয়ে ঢুকে ভোলা দিয়ে বেরনো। শাহাবাজপুর নদী দিয়ে নোয়াখালির স্টিমার লঞ্চের বড় লাইন বলে—একটা ধারণা তৈরি হয়ে গেছে বড় নদীকে যদি বানের জল নিয়ে ঢুকতে হয় তাহলে

ছোট নদী, দোনা আর খাল চাই।

যোগেন জিগগেস করে, 'এই শানু শেখ, মাজা দিয়্যা বারায়্যা ঢুকব্যানে কুথায়। আড়িয়াল খাঁ কিন্তু প্যাঁচাল নদী। তুমি ভাবল্যা পার হইছি, শ্যাষে দেইখলা যেহান থিক্যা শুরু করছিল্যা সেহানেই আস্যা শ্যাষ। বারাব্যা কোথা দিয়্যা হে?'

'মাজা ভাইঙ্গ্যা তো একটাই যাওয়ার বন্দর। চিরির বন্দর। আল্লার কী যাদু, দুই খ্যান ঠ্যাঙের মইধ্যে দিয়্যা রাইখছ এড্ডা ফোটা মধু—।'

শানু যখন রওনা দেয়, তখন তো তার সবটাই অচেনা ও আজানা। লঞ্চ সার্ভিস বন্ধ মানেই তো বড় বিপদ। তার ওপর এই হাওয়া। নৌকা ছাড়ার পর আড়িয়াল খাঁকে যখন শানু দেখল স্বাভাবিক আর হাওয়াও নেই আর জলের স্রোতও সিধা, নৌকা একেবারে ময়ূরপঙ্খী, সে বেশ স্বস্তি পায়। তাছাড়া, যোগেন তাকে বলে দিয়েছে, যেখানে তার মনে হবে, ব্যাপার কুবিধা, সঙ্গে-সঙ্গে নৌকো ভিড়িয়ে দেবে। তেমনটা করা যায় যদি এক পাড় ধইর্যা খাড়াখাড়ি যাওয়া যায়। কিন্তু নদী যেখানে আড়া পেরতে হয় না। সেহানে ভিড়াইবে কনে, জলে গিঁঠ দিবে? যোগেন ঠিক আন্দাজ করতে পারে না, আড়িয়াল খাঁর বেড কী করে ভাঙবে? নাকি ভাঙবে না? নাকি ওর জানা নেই?

'ছোটমাঝি, তোমার তো গোসা হইল। তোমার গোসারই জয় হইল। কিন্তু তুমি কি এই নদীর পথ চিনত্যা?' যোগেন জিজ্ঞাসা করে।

'কুনোদিন না আইলে তো কুনোদিনই চিনব না—'

'ভাল কইর্যা চিনো। পরের বার কিন্তু শানু আইব না।'

যোগেন একটু চিন্তায় পড়ে। কাল রাতের হাওয়া তো সারা রাত ধরেই খেয়েছে। ঐ হাওয়া সমুদ্রের ধাক্কা ছাড়া হতে পারে না। যখন মৈস্তারকান্দি থেকে রওনা দিল তখনো হাওয়া বাড়ছিলই তো। কিন্তু পুরো আড়িয়াল খাঁ পার হল, মনে হল, অন্যদিনের চাইতে কম হাওয়া। সেটা ভুলও হতে পারে। সারা রাত সারা সকাল অত হাওয়ার মধ্যে থেকে শরীরের ভুল হতেও পারে। সারা রাত সারাসকাল অত হাওয়ার মধ্যে থেকে শরীরের ভুলও হতে পারে। বানার হাওয়া কি [illegible] গেছে? যেতে পারে। এমন শুশুকের ঘাই দেয়ার মতন করে কি ঐ হাওয়া পড়তে পারে? যোগেন নিজের মনে না-হেসে পারে না।

'গিছিল্যা কই?'

'দরিয়ায়'।

'দেইখল্যা কী'?

'দেইখবডা কী? আমি তো হোগা ঘুরাইয়া জলশৌচ করব্যার গিছিল্যাম।'

হাওয়াটার কারণ বুঝতে না-পেরে স্বস্তি পাচ্ছে না যোগেন। কী হয়েছে, কোথায় হয়েছে, কেন হয়েছে সে-সম্পর্কে কাটছাঁট করার মত একটা গুজবও না শুনে কী করে এগনো যায়। যোগেনের কি বুদ্ধিবিভ্রাট হল। সে এই দুই ঢ্যাংড়া-মাঝির কথায় কী করে রাজি হল যে ওরাই পারবে এমন প্রলয়কাণ্ড সামলাতে? যোগেনের স্বাভাবিক বিবেচনা কি এখন জব্দ থাকল?

নিজেকেই ধমকে ওঠে যোগেন, 'হে—ই শানু, না-জাইন্যা নাও ভাইসাস না। না-চিনলে নৌকা ভিড়্যা। যেহানে হয় সেহানে।'

'তাই যদি হয় ভিড়ানের কাম নাওই কয়েক। একডা ছোড বাদাম আনার কাম ছিল। টাঙ্গাইলে দেইখতেন দুইদিনের পথ একদিনে পাড়াইতেন। এমন স্রোত আর এমন হাওয়া।'

'তুই যাবি কোন্ দিয়্যা সেইডা ভাইঙ্গ্যা বল্।'

'গোটা থাইকলে তো ভাইঙ্গব। পুরানা নদীগুল্যান তো নতুন হইয়্যা গেল গা? লঞ্চ কোম্পানির রুটের নাম বদলাইব্যার লাগব। পুরানা রুট নাই।'

যোগেন হঠাৎ ভেবে বসে, জলখ্যাপা খেইপ্‌ল নাকি শানু। এত বিপরীত জল দেখতে-দেখতে ভুল দেখতে শুরু করেছে—পুরনো নদীপথটাই ভুলে যাচ্ছে? তারা তো আড়িয়াল খাঁ এখনো পেরয়নি। এখনো তো বাঁ-পাড় ঘেঁষে যাচ্ছে। এখনো তো নৌকা বাঁ-পাড়ে ভিড়ানো যায়। যোগেন ধমকেই ওঠে, 'শা—নু, আগে চক্ষু মুইদ্যা থাক, শানু, চক্ষু মুইদ্যা থাক।'

'হাল ধইর‍্যা না ছাইড়্যা?'

'হাল দে ছোটমাঝিরে'—ছোটমাঝি লাফিয়ে গলুইয়ে যায়। যোগেনের বগল থেকে হালটা নিজের বগলে টানে। দেখে, হালের হাতা তার মাথার ওপর। সে হাতটা নামিয়ে টেনে বগলে ভরে। দেখে, সামনে স্রোতের বিস্তার, জলের রং ছাই-ছাই, জলের ওপরে কোনো ছাদ নাই, জলের পাড়ে কোনো গাছপালা নাই। শুধু জল আর স্রোত আর ছোটমাঝি আর হাল। ছোটমাঝি নিজেকে আবিষ্কার করে—সেযেন জলের ঠাকুর, যেন জল তাকে পথ করে দিচ্ছে, কোথাও একটু উঁচুনিচু নেই।

শানু দু-পা এগিয়ে এসে চেঁচায়, 'মালেক, আমি কি এইহানে চক্ষু মুইদ্যা খাড়াইয়্যা থাকুম?'

'বইস্যা পড়। চক্ষু য্যান মুইদ্যান থাকে। শানু ধপ করে বসে পড়ে এমন যেন হোঁচট খেল।

'শানু, চক্ষু মুইদ্যা এইবার ক তুই অ্যাহন নাও চালাস কোন্ জলে?'

গলুইয়ের তক্তা থেকে শানু চিৎকার করে, 'আড়াইল খাঁর প্রথম ঘেরই তো প্যারাই নাই।' চোখ বন্ধ করে কথা বলতে হচ্ছে বলে শানুর গলা চড়ে গেছে যেন চোখের অভাব সে গলা দিয়ে মেটাচ্ছে। শানু আর যোগেন বসে আছে একই দিকে মুখ করে—স্রোতের দিকে। তাদের কথা তাই একমুখেই ছোটে—স্রোতের মুখে। যোগেন চিৎকার করে উঠে, 'আড়িয়াল খাঁত পইড়্যা কি পার দিব্যা মুল্যাদি সদরে?'

'না—আ। আড়িয়ালের এই পাড় ধইর‍্যা উজানে যাইব কিনার ধইর‍্যা—ধইর‍্যা।'

'ঐ হানে বাও বেশি নাই, জল বেশি নাই, ঢেউ বেশি নাই—জাইনল্যা কহন?'

'জানি না। নদী উথাল থাইকলে কিনারায় নৌকা ভিড়াইয়া রাইখব।'

'রাইখলে কি তোমার নাওয়ে পাখা গজাইব?'

'এইহানে ভাইস্যা ঐ নদীর কথা কহা যায়?'

'সে তো যাইয়্যা যদি রসাতল দেহো, তো রসাতলেই যাইবা?'

'নাও কয় কারে?'

'ভাসান দিবার পারে।'

'ভাসান দ্যায় কনে?'

'জলে, জলে।'

'জল যদি যায় রসাতল?'

'ভাসানও যায় রসাতল?'

'আর যদি দ্যাহো—হুলুস্থুল প্রলয়—'

'তালি ছোটমাঝিক জিগ্যাব—যাবি কি যাবি না?'

'ছোটমাঝি চাহে তো যাবা?'

'তাইলে তো না-যাওয়ার উপায় নাই শানু শেখের।'

'বে-শ। আড়িয়াল খাঁ উজানে পার হইল্যা, তারপর?'

'ঐ হানে তো একডা এক-পাইক্যা দাঁড়ির নাগাল জোলা ছিল'।

'সে জোলা অ্যাহনো থাকব, তার বিশ্বাস কী?'

'জোলা না-হয় খালো হবে, শুখা তো হবে না।'

'তার বাদে নয়াভাংগানি দিয়্যা নাইমব্যা?'

'নয়াভাংগানি পুরানা থাইকলে নাইমব। নয়াভাংগানি আরো নয়া হইলে নাইমব না।'

'নাইমবা না তো য্যাবা কই?'

'অতডা যাইয়্যাও কি আপনার পাড়ে নামা লাইগব না? ঐটুকখান চলেন তো।'

'চ—লো।'

'তাইলে কি অ্যাহন খাড়াইব্যার পারি?'

'খাড়াও।'

শানু শেখ দাঁড়ায়।

'তাইলে কি চক্ষুডা খুইলব্যার পারি?'

'খুলো।'

'তাইলে কি হালডা বগলে পুরব্যার পারি?'

'পোরো।'

যে-রুট এই কথোপকথন থেকে তৈরি হল, সেই রুটেই নৌকা চলল। খুব শান্ত জলের নদীতে ছোটমাঝিরা হাল ধরেছে, বৈঠাও টেনেছে। যোগেন কোথাও ঘুমিয়েছে, কোথাও বসে থেকেছে। যোগেন আর শানু শেখ দু-জনই একটা কৌশলই খাটাচ্ছিল মনে-মনে। এই প্রলয়ের ফলে কী কী বদল ঘটতে পারে, তার আন্দাজি হিশেব তারা কষেনি। পুরনো চেনা নদীপথ দিয়ে তারা দক্ষিণপুর দিয়ে নামাছিল। সেই নামার পথে একটু ঘুরান পড়লেও তারা এড়াচ্ছিল আড়িয়াল খাঁ ও লতানদীর মত বড় ও প্যাঁচ খাওয়া নদীপথ। বরিশালের নদী অন্যসব নদী থেকে আলাদা। গবর্মেন্টের এক মিটিঙের সুবাদে যোগেন দার্জিলিঙে যাওয়ার পথে আবিষ্কার করেছিল, পাহাড়ের ঝর্ণানদীগুলো বরিশালের নদীর মত, কে কার সঙ্গে মিলছে আর কার সঙ্গে ছুটছে তার কোনো হিশেব রাখা যায় না। বরিশালের কোন্ নদীর জল কোন্ নদী দিয়ে ঢুকছে তার কোনো মেইল লাইন নেই।

ঠিক কদ্দুর ও কোথায় যোগেন যেতে চাইছে, তাও তো তার কাছে পরিষ্কার ছিল না। কিছু শব্দ বাতাসে শোনা ছাড়া। দক্ষিণ শাহাবাজপুর তার তেঁতুলিয়া যদি দৌলতখানি আর ভোলার ওপর দিয়ে বয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে মেহেন্দিগঞ্জের কাছাকাছি যেতে পারলেই হত। কিন্তু গয়াভাংগানি নদী পেরিয়ে লতানদীতে তারা ঢোকার সাহসই পেল না। যোগেন বলে, 'শানু শেখ, এতডা রাস্তা যখন ভগবানের দোয়ায় পার হওয়্যা গেল, কোনো বিপদ যহন ঘটে নাই, তহন আর আগাই না। লতা পার হইয়ো না। তুমি ভাসানচরে নৌকা ভিড়্যাও।

আর এতেই যোগেনের চোখের সামনে আক্রান্ত জায়গাটির ছবি ভেসে উঠল। পুবে দক্ষিণ শাহাবাদপুর আর পশ্চিমে তেঁতুলিয়া নদী থেকে কিছু দোনা, কিছু নদী বা খাল দুদিকেই ছড়ানো ভোলার উত্তরে মেহেন্দিগঞ্জ। মেহেন্দিগঞ্জের গা ঘেঁষে গণেপুরা দোং। গণেশপুরা মেহেন্দিগঞ্জের আকাশ থেকে এই হাওয়া নীচে নেমে উত্তর-ভোলা থেকে দৌলত খাঁ উখড়িয়ে দিয়েছে, এবং সম্ভবত মেহেন্দিগঞ্জও খানিকটা খেয়েছে।

যোগেন যে সেই জায়গা পর্যন্ত পৌছুতে পেরেছে যে-জায়গা থেকে ঠিকঠাক আন্দাজটা অন্তত করা যায় এটাকে আজকের পক্ষে যথেষ্ট ধরা উচিত। এখন আর না-জেনে এগনো

উচিত নয়।

ভাসানচর বড় জায়গা না। একটা বড় হাট বসে। সুপুরি হাট। থানা বা আউট পোস্টও একটা থাকার কথা। আবছা মনে পড়ছে—একটা যেন ডাকবাংলোও থাকার কথা। সে থাক-বা-না-থাক, নদী দিয়ে ঘেরা, প্রায় সব নদী দিয়েই লঞ্চ সার্ভিস আছে। ভাসানচরে এক রাত্রি মাথাগোঁজার জায়গা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। কিন্তু পুরো ঘটনার একটা প্রামাণিক বিবরণ তৈরি করা যাবে।

ভাসানচরের লঞ্চঘাটাতে নৌকো ভেড়ানো হল।

লঞ্চঘাটের টিকিটঘরের পাশে লম্বা একটা বাঁধানো জায়গায় দু-একজন জলের দিকে তাকিয়ে বসেছিল। সম্ভবত ওখানে এই হাওয়া থেকে একটু আড়াল পাওয়া যাচ্ছিল। সুপুরি চাষ ও সুপুরি ব্যবসার খুব রমরমা। তাই লঞ্চ সার্ভিস বেশি আর অনেক জায়গাতেই লঞ্চঘাটায় বাঁধানো ও ঢাকা এমন একটা ফালি থাকে, যাতে আচমকা বৃষ্টিতে সুপুরি নষ্ট না-হয়। পরের লঞ্চে যা চালান যাবে—ঢাকা, নোয়াখালি, সিরাজগঞ্জ, খুলনা সবদিকেই—সবদিকেই সেগুলোই এই শেডে থাকে। যারা ঘাটে বসেছিল তাদের মধ্যে দু-জন যোগেনকে নৌকো থেকে নামতে দেখে এগিয়ে গিয়ে আদাব করে দাঁড়ায়। যোগেন মাঝিদের দেখিয়ে দেয়—ওদের জন্য কোনো ব্যবস্থার অনুরোধ করে।

পাড়ে উঠে যোগেন এদিকওদিক তাকায়। চেনাজানা কাউকে খোঁজে। এদিককার সুপুরির বড় ব্যবসায়ীর নাম দুদু মিঞা। ভোটে যোগেনের পক্ষে খুব খেটেছিলেন বলে শুনেছে যোগেন। টাকাও খরচ করেছেন। যোগেন কিছুতেই মনে করতে পারে না, তাঁর বাড়ি ভাসানচরে নাকী চাঁদপুরে। চাঁদপুরেই যদি হয়, তাহলে এখন আর কিছু করার নেই। চাঁদপুর তো মেহেন্দিগঞ্জে, গণেশপুরা দোনের ওপরে। আছে না ভেসেছে কে জানে। কিন্তু ভাসানচরই-বা কয় বিঘে জায়গা যে যোগেন এসেছে দেখেও একজনও মাতবর এগিয়ে আসে না। কাউকে দেখাও তো যাচ্ছে না।

যে-লোকটিকে যোগেন ওদের তিনজনের ব্যবস্থা করতে বলল, সে তখনো বেশিদূর যায়নি। তাকে ডাকার জন্য মুখ খুলতেই দেখে শানু শেখ উঠে এল, 'এ—ই শানু, শুন্।'

শানু দৌড়ে আসে।

'ভাসানচরে দুদু মিয়ার বাড়ি না?'

'কাছা-দেয়া, দাড়িমোচ কামান? সুপুরির বড় ব্যাপারী বাবু?'

'কইল্যাম মিয়া আর কস বাবু!'

'হ। মিয়াই তো। বাবুগ নাগান সাজে তো। ধুতি পরে। জবাকুসুম তৈল মাখে। পাতলা পাঞ্জাবি পরে। এদিকে নামাজ আদায়ের টাইম হইলে লঞ্চের সিঁড়ির মাঝখানে কাছা খুইল্যা হাঁটু গাইড়া পচ্চিম দিগ খোঁজে। আরে ত বাবুই ডাকে সবাই।'

'তার তো এডডু তালাশ লাগাইতে হয়। সে কি এহানে থাহে না চাঁদপুরে?'

'কী যে কন? আপনার নাগান বড় মানুষরা কি এক জায়গায় থাহে? আইজ একডা দিনের মইধ্যে আপনে কতগুল্যা জায়গায় থাগলেন? দুদু মিয়ারে পাওয়া যাব না? খাড়ান—'

শানু শেখ যোগেনকে একা করে দিয়ে টিকিটঘরের আড়ালের দিকে ছুটে যায়। ওদিকেই তাহলে বসতি, এদিকটা কী? শানু একেবারে দুদু মিয়াকে পেছন থেকে যেন ঠেলতে-ঠেলতে নিয়ে আসে। দুদু মিয়ার পরনে লুঙ্গি আর ফতুয়া। দূর থেকেই আদাব করতে-করতে দুদু মিয়া খোলা হাসি হেসে বলে, 'বহিনপতি কি দাওয়াত রাখার টাইম পাইলেন না—এই দুর্যোগ ছাড়া?'

'আপনারা হাসি শুইন্যা তো মনে লয় না দুর্যোগ—'

'হয় নাই তো দুর্যোগ। দুর্যোগ তো দেহা যায়। সেইসব কারবার নাই। এক্কেরে ধুয়ামুছ্যা দিছে বেবাক। খুঁইজ্যা যে কইবেন, এই হানে না মেহেন্দিগঞ্জ ছিল? যা ছিল, তার আর কিছু নাই। দৌলত খাঁর দক্ষিণে বোরহানউদ্দিন থিক্যা চরফ্যাসান পর্যন্ত কী ছিল আর কী ছিল না—কোনো সাবুদ নাই। আপনে এই বিপদের মইধ্যে কোথ্থিক্যা?'

'তাইলে আসি অ্যাহন। হাওয়া তো আমার গ্রামেরও চাল উড়াইছে। সেই হাওয়ার মুখেই শুইনলাম ভোলাদৌলতখান-দক্ষিণ সাহাবাজপুর—তেঁতুলিয়ার কথা। এডা তো আমার ভোটের আসনের মইধ্যে। এডা তো আমার কর্তব্য। দেইখল্যাম তো আপনাগ কুশল। তাইলে যাই—'

দুদু মিয়া জড়িয়ে ধরে যোগেনকে, একেবারে জড়িয়ে ধরে। দুদু মিয়া যোগেনের চাইতে মাথায় উঁচু—তাকে ঘাড় নোয়াতে হয়, যোগেনের ডান কাঁধের গর্তে নিজের মুখ ডোবাতে। যোগেনের ঠোঁট থেকে হাসি মুছে যায়। সে দুদু মিয়ার পিঠে হাত দিয়ে বলে, 'মাতবর, এই বিপদের কালে আপনার চোখের জল দেইখলে অন্য মাজুক্ষগ বুকের বল কইম্যা যায়।'

দুদু মিয়া তার চোখের জলে ভেজা মুখ তুলে আরো কেঁদে ওঠে, জোরে, কান্নার বেগে তার গলা আরো চড়ে যায়। যারা জুটেছিল তাদের ঘিরে, তারাও একসঙ্গে কেঁদে ওঠে। এই দুর্যোগের হাওয়ার আওয়াজ আর স্রোতের ধ্বনির বিপরীতে মানুষের সমবেত কান্না ছড়িয়ে পড়ল।

দুদু মিয়া বুক চাপড়ে বলছিল—'কান্দি নাই তো মোড়ল, তিনদিন ধইর‍্যা কাঁদি নাই। তহন তো মাতবরি কইর‍্যা যে-কয়ডা মানুষরে আর বলদরে বাঁচান যায় তাই করছি। কিন্তু অ্যাহন তো আপনে আমার মণ্ডল আইস্যা খাড়াইলেন! এই দুর্যোগ মাথায় কইর‍্যা এই ছাওয়াল-পাওয়াল-মাঝিগ নিয়্যা এই সমুদ্দুর পাড়ি দিয়্যা আমাগ পাশে খাড়াইব্যার জন্য আইলেন। এও হয়? আপনার মত মানুষ আমাগ নেতা—কত জন্মের ভাগ্য আমাগ, কত জন্মের ভাগ্য।'

ভোলার সাইক্লোন

১২৪

ভোলার সাইক্লোন নিয়ে শেষ পর্যন্ত যোগেনই হয়ে উঠেছিল ভোলা সাইক্লোনের একমাত্র নেতা, যোগেনকে ছাড়া কেউই কোনো সিদ্ধান্ত পাকা করতে ভরসা পায়নি। এসডিও-কে খুঁজে বের করেছিল যোগেনই, দুদু মিয়ার সাহায্যে। যোগেন যখন বলল, 'আরে এসডিও-টা কই? তারে তো লাগবই, সরকার', তখন দুদু মিয়া বলে উঠেছিল, 'এইডা লিখ্যা নেন সাইকোলনে হারাইয়্যা গেছে। হাজার-হাজার মানুষ ভাইস্যা গেল আর আপনার এসডিও ভাইসব্যার পারে না? একটা--না প্রস্তাব সবাই কয়। কুন বছরের বন্যায় চন্দ্রদ্বীপের কোন্ রাজা নাকি তালগাছে চইন্যা বাঁচছিল। আর কুন শাহেব তার অফিস টফিস নিয়্যা ভাইস্যা গিছিল। তারপর থিক্যা না সেরেস্তা আইল দৌলত কাজি। এবার দৌলত কাজিও রেয়াদ। রাজা ওঠে তালগাছে, শাহেব যায় ভাইস্যা, আর আপনার এস ডি ও তার একডাও পারে না?' যোগেন একটু হেসে দুদু মিয়াকে বুঝিয়েছিল 'পারব, পারব না ক্যা, অফিসার ও

তো নিয়তির বশ, আবার তাগ চাকরিরও বশ, ভাইস্যা যাইব্যার আগে এসডিও-রে তো কোনো অফিসারকে চার্জ দিব্যার লাইগবে। না তো সাইকোলোনও আইন মোতাবেক হবার পারবে না, হাজার-হাজার মানুষজনের মরণ-ভাসানও আইনমাফিক হবে না। এস ডি তো সত্যি ভাইস্যা যায় নাই—'

'ক্যা, মোড়ল, এর মইধ্যে সত্যি ভাসা আর মিথ্যা ভাসা দুই আলাদা ভাইসান আছে?'

'শুনেন মিয়াভাই,' কথা হচ্ছিল ভাষানচর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে পরদিন সকালে। নদী আর ভাষানচরের মাঝখানের মাঠটার একেবারে উলটোদিকে, লঞ্চঘাট থেকে সেখানে যেতে হয়, পুরো গ্রামটি পেরিয়ে। সেইখানে, ইউনিয়ন অফিস আর থানার মাঠে—সাইক্লোন থেকে যারা বেঁচে আসতে পেরেছিল, তারা থাকছে। থাকছে মানে মাঠেঘাটে পড়ে আছে। খাওয়াচ্ছে দুদু মিয়া। আরো বেশি উঠেছে, মেহেন্দিগঞ্জ ও রাজপুরের দিকে—শোনা যায় সে রকম, পাকাপাকি তো জানা হয়নি, সাইকোলন তো এখনো থামেনি।

সারারাত ধরে যোগেন আর দুদুমিয়া ঘুরে-ঘুরে একটা লিস্টি বানানোর চেষ্টা করেছে। এখনো করছে। কী করে যেন, একটা ব্যবস্থাও হল। ইউনিয়ন বোর্ড অফিসের বারান্দায় একটা লণ্ঠন জ্বালানো হল আর সকলে এসে, একের-পর-এক, নিজের নাম, সাকিল, পরিবারের লোকসংখ্যা, এখানে ক-জন আসছে, গাই-বলদ ছিল কটা, কটা বেঁচেছে এসব বলে যেতে লাগল। লাইনই একটা হয়ে গেল—যদিও এরা জানে না কাকে লাইন দেয়া বলে। এরা মুখে বলে, মিশিল বইন্ধ্যা।

চৌকিদারি ট্যাক্সের হ্রাসবৃদ্ধির সুবাদে, ডাকাতির সন্দেহে গ্রেপ্তারের সুবাদে, হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার সুবাদে, ভোটার লিস্টের সুবাদে, ঋণসালিশি বোর্ডের সুবাদে, সুপুরি চালানের ওপর ট্যাক্সের সুবাদে—সরকারি লিস্টিটা লোকজনের জানা ছিল। জানা থাকলেও, সেটা ভাল কি খারাপ এ-বিষয়ে কোনো মতৈক্য ছিল না। কেউ ভাবত, নিজেকে যতটা গরিব বলা যাবে, সরকার ততই সাহায্য করবে। কেউ ভাবত, নিজেকে যতটা বড় চাষি বলা যাবে, সরকার ততই ক্ষতিপূরণ দিবে।

যারা এই সাইক্লোন থেকে প্রাণে বেঁচেছে, তারা সবাই এখনো মরার আতঙ্ক কাটিয়ে উঠতে পারেনি। দু-একজন বুড়ো তো মরোমরোই হয়ে আছে। দুদু মিয়ার আশ্রয় পেয়ে ও এখন যোগেন মণ্ডলও এসে যাওয়ায়, তার ওপর লণ্ঠন জ্বালানোর ফলে এদের মধ্যে ধীরে-ধীরে একটা আশা বইছে যে সাইক্লোন আর মানুষ, পক্ষ এই দুটোই নয়, তাদের কী গেছে তা তারা নিজেরাই জানে না। এখন সরকারি লিস্টি যখন যোগেন মণ্ডল বানাচ্ছে, তখন, একটু ভরসা করেই ক্ষতি বাড়িয়ে বলা আর কমিয়ে বলা নিয়ে এদের ভিতরকার দু-রকম ভাবই বেরিয়ে আসতে শুরু করেছিল বটে, কিন্তু বেশিদূর এগয়নি।

একজন তার সাকিন বলল, ইউনিয়নের নম্বর ও নামও বলল, বাড়িতে তারা মরদ আর দুই বৌ এই তিনজন, তাদের কোনো ক্ষতি হয়নি—বাড়িঘর জমিজিরেত ছাড়া। দুদু মিয়া তাকে বলে, 'দুই-দুইডা শাদি, ছাওয়াল-পাওয়াল হইল না কোনো বিবিরই।'

'হ্যাঁ। হইছে। ছোডবিবির একডা ছেলে—'

'সে কোথায়?'

'জানি না। ভাইস্যাই গেল নাকি সাঁতরাইয়া উইঠল?'

'মাইয়্যার কি শাদি দিছিলেন?' দুদু মিয়া বলে।

'হ্যাঁ'।

'গ্রামেই?'

'হ্যাঁ।'

'তাগ খবরাখবরও তো জানা নাই।'

'দুইডা শাদি কইরতে তো দ্যানমোহর কম লাগে নাই?'

'প্রথম শাদির কম ছিল। ছোডবিবির বেলা বেশি হইছিল।'

'দ্যানমোহর আইল কোত্থিক্যা? বলদ বেইচ্যা'।

'হ্যাঁ। বলদ বেইচ্যা।'

'অ্যাহন ছিল কয়ডা?'

'তিনডা বলদ আর দুইডা গাই'।

'সেগুল্যার কী হইল?'

'জানি না। ভাইস্যা গিছে—'

যোগেন বলে, 'আপনেই জেরা করেন। আমি লেইখ্যা নেই। কথা বলার সুবিধা হয় যদি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দুদু মিয়া বলে, 'মণ্ডলমশায়, এমন কইর‍্যা হবে না। সে সঙ্গে নাই, তারে নাই কইতে মনে বাজে। নিজে যার মরা দেহে নাই, সে ব্যাটাই হোক আর বলদই হোক, তারে ক্ষতি দেহাইতে নাই।'

'কড়ু ঘুরাইয়্যা কন। বাড়িতে কয়জন ছিলেন, এহানে কয়জন আছেন। আর সম্পত্তিডা আপনে আন্দাজ কইর‍্যা নন। এই দুইডা যদি না দেয়া যায়—মৃতের সংখ্যা বা নিরুদ্দেশের সংখ্যা আর সম্পত্তির পরিমাণ—তাইলে ক্ষতির হিশাব বাইর হইব না।'

আবার, এর উলটোও হচ্ছে।

এক কমবয়েসি জোয়ান তার বিবিকে সঙ্গে নিয়ে বলে, তাদের বাড়ি ছিল চরকিলকিতে। 'বাপ-বড় বাপ-মা-বড় আপা সব ভাইসা গিছে। বাড়ির জমির হিশাব তাগ জানা নাই। পুরা চরখানই আমাগ। তার উপর আইল ধইর‍্যা সুপুরিগাছ—'

দুদু মিয়া জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার বাপের নামডা কইব্যা?'

'সরকারি নামডা তো কইব্যার পারব না। সবাই তো শুগুর মিয়াই কইত।'

'তুমি আমারে চিনো?'

'না। আমি তো নালায়েক। কাজকামে হাত দেই নাই অ্যাহনো। আপনার মতন বড় মানুষরে চিনি ক্যামনে?'

'তোমাগ সাকিনডা য্যান কী কইলা?'

'চর কিলকি-ই তো কয়'—

'নদীডা কী?'

'তেঁতুলিয়া আর আড়িয়াল খাঁ—'

'এ—ই, তোমরা কেউ চরকিলকি চেনো নি? শুগুর মিয়া—বড় মানুষ। সুপুরি ক্ষেতি। আমি তো চিনি না। তোমার দ্যাহো'।

পেছন থেকে অনেকেই এসে ছেলেটি ও মেয়েটিকে একঝলক দেখে যায়। দেখার ভঙ্গিতে সন্দেহ। দেখার পরেও সে-সন্দেহ কাটে না। এরমধ্যেই দুদু মিয়া জিজ্ঞাসা করে, 'শ্বশুরবাড়ি কনে?'

মেয়েটি হঠাৎ বলে ওঠে, 'আপনাগ যহন এত সন্দ, তহন ছাড়ান দ্যান,' বলেই সে আলো থেকে সরে যেতে পা ফেলে, ছেলেটির দিকে না তাকিয়েই। ছেলেটিও সরে যেতে পা বাড়ায়। ঠিক তখনই কেউ বলে ওঠে, 'আলিমাবাদ থিক্যা পশ্চিমে আর চন্দ্রমোহনের পুবে শক্কুর

মিয়াশাহেবের জঙ্গলের কথা কয় না কী? তেনার ইন্তেকাম হইছে মাস দুই।'

'শুক্কুর ভাই। শুক্কুর ভাইরে বাপ বানাইছে। আমারই লগে। ছ্যামরাডা কেডা? আবার বিবিও ধইরছে। দ্যাহো, তোমরা কেউ য্যান আমারে জালি কইরো না।'

দুদু মিয়ার কথা শেষ হওয়ার আগেই, 'ধর্ ধর্' আওয়াজ করে অনেকে ছুটে যায় ছেলেটি আর মেয়েটিকে ধরতে। দুদু মিয়া সেদিকে কানও দেয় না, চোখও দেয় না। যোগেন চিৎকার করে বলে, 'আরে, ওরা তো আর সাইক্লোনডা জালি করে নাই।'

এখান থেকে শোনা যাচ্ছিল—'ধর্ ধর্' আওয়াজটা বাড়ছেও, দূরেও চলে যাচ্ছে। দুদু মিয়া শুনতে পাচ্ছে না দেখে, যোগেন ডাকে—'এর পরে [illegible]?'

পরের সকলেও সেই উপর হাওয়ার বেগ কিছু কমে না। যোগেন বলেছে, নতুন কোনো জায়গা ভাসার কথা যখন শোনা যায়নি, তখন বাতাসের জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই। সে দুদু মিয়াকে বলেন, 'চলেন তো—আমার লগে, বরিশাল যাব, জিলা ম্যাজিস্টেটের সঙ্গে দেখা কইর‍্যা কইব কী হইছে আর সরকার কী কইরব। চলেন। চলেন। আপনেরে যাতে বেলা পড়ার আগেই ফিরত দেয়া যায়। আপনার ধুতির কাছা দেয়া শ্যাষ হইলেই আমরা রওনা দিমু।'

দুদু মিয়া আপত্তি করে, 'আপনে তো সব বুইঝ্যা নিলেন, আবার লিখিতংও তো রাইখলেন, আবার আমারে ক্যা, ঐ শাহেব-শুবাগা মইদ্যে? মোড়লদাদা, আমারে কবেন না।'

'আরে, আমি যে সত্যি এইহানে আইস্যা পড়ছি আর যা কব তা নিজের চক্ষুতে দেইখ্যাই কতেছি সেডার তো একটা সাক্ষ্য চাই। দুদু মিয়ার থিক্যা বড় সাক্ষী আর কেডা? আরে বেলাবেলি ফিরত।'

দুদু মিয়া কাছা দিয়ে ধুতি পরতে, চিকনের কাজের পাঞ্জাবি পরতে আর চোখে সুরমা লাগাতে সত্যি দেরি করে না। ঘাটে এসে সে নৌকো আর তার মাঝিদের দেখে সাইক্লোনের থেকেও জোরে হেসে উঠে বলে, 'এই নাওয়ে এই মাঝিরা আমাগ সদরে নিয়া যাবে?' তারপর কাউকে ডাকে। যোগেন প্রায় তার মত করেই বলে ওঠে, 'আপনে কি ম্যাজিস্টেটকে বন্যার দুর্দশা দেখাবেন বইল্যা সদর যাচ্ছেন, নাকি চার নম্বর নিক্যা বসার কামে? আপনারে দেহাইয়া কাউরে বুঝান্ যায়, ভোলায় কী সর্বনাশই যে হইল!

কিন্তু নৌকো নিয়ে বিবাদ তাতে মিটল না। দুদু মিয়া কিছুতে ছোটমাঝির নৌকোয় উঠবে না।

'এডা কী কন? নৌকা ভাড়া লইয়্যা আসছি আর মাঝখানে তারে ছাইড়্যা দিব—এডা কোনো বয়স্ক মানুষ কইব্যার পারে? তার থিক্যা আপনার নৌকারে পিছন-পিছন আইস্যা বরিশালের ঘাটে ভিড়ায়্যা রাখুক। শাহেব যদি আমারে রাইতডা থাইক্যা যাইব্যার কয়, আপনি তালি আপনার নৌকা নিয়্যা পাড়ি দিবেন। আমি আমার নৌকা নিয়্যা যেহানে হয় যামুনে।'

এই কথাটার মধ্যে সত্য ছিল। সেই সত্যের জোরেই দুদু মিয়া নৌকায় বসে। আর নৌকা ছেড়ে দেয়।

দুদু মিয়া বলে ওঠে, 'এই নৌকায় পাড়ি দিতে আপনের ডর লাইগ্‌ল না। আমার তো দাঁতের খটখটি শুরু হইয়া গেল। দেখ বাবা, যদি ডুবাইসি, তাইলি এমন জায়গায় ডুবাইস, যেহানে ডুবলে পায়ে মাটি পাওয়া যায়। না-হয় তো শ্যাষে নদীর তলার কর্দমে এমন গাঁইথ্যাই গাঁইথ্যা গেলাম যে আমারে বাকিডা জীবন কাদামাটির জিন হইয়্যাই জীবন কাটাব্যার লাগব।'

দুদু মিয়া গান ধরে, 'আমরা আছি পোলাপান/গাজি আছে লিখাবান/গিয়াসুদ্দিন

শামসুদ্দিন/কালু মিয়া গাজউদ্দিন/সেকেন্দার উদ্দিন/শিরে গঙ্গা দরিয়া/পঞ্চ পির মা গঙ্গা বদর-বদর।

বদর-বদরে নৌকোর সবাই গলা মেলায়—এটা জলাচার, জলে ভাসলে বদর-বদর শুনলে বলতে হয়।

চরভাসান থেকে বরিশাল নদীর নৈরাজ্য

১২৫

গতকাল মুলাদি থেকে নামার পথে, নদী ও হাওয়াকে ফাঁকি দিতে শানু আড়িয়াল খাঁর একটা সোঁতা দিয়ে নয়াভাংগানিয়া নদীতে ঢুকেছিল। লতা নদী পর্যন্ত যায়নি। আর যোগেনও আর না-এগিয়ে ভাষানচরেই নোঙর করতে বলেছিল। সব মিলিয়ে নিজেদের সাহস আর নিজেদের বুদ্ধির ওপর ভরসাও একটু অসাবধানে বেড়ে গিয়েছিল—মাঝি কোনো বড় বিপদ কাটানোর বাহাদুরি মনে জমতে দেয় না। মনে তেমন জমতে দেয়া নিষেধ। ওদের মনে রোজকার ভাবটাই ফিরে এসেছিল—যেন দুর্যোগ আর হাওয়া নেই। চিরভাষান থেকে বরিশাল আর কতটুকু। নদীর যে বেগ তাতে নৌকো ছাড়া আগেই পৌঁছে যাবে। ফেরার সময় জোয়ারের বেগ ধরতে পারলেও এই একই সুবিধে। ভাসানচর থেকে পাড়ি দিতে হবে আড়াআড়ি—শায়েস্তাবাদ। তারপর পাড় ঘেঁষে ঘেঁষে সাবধানে শায়েস্তাবাদের তলার রাজাগুরু-আড়িয়াল খাঁ-কীর্তনখোলার তেমোহনটা গড়িয়ে গেলেই কীর্তনখোলায় পড়বে। কীর্তনখোলা মানে তো বরিশাল। এই হিশেব থেকে ঠিক তেমোহনার আগে শানু শায়েস্তাবাদের পুবসীমায় চরজংলার ধারে নৌকোটাকে নিয়ে যেতে পরল। ওখানে একটা ছোট তেমোহনা আছে কীর্তনখোলা-শায়েস্তাবাদ-খাঁড়ি আড়িয়াল। এবার ওরা কীর্তনখোলা দিয়ে ভেসে নামবে—বরিশাল তো এসে গেল। শানু শেখ চিৎকার করে ওঠে নদী-হাওয়ার সব আওয়াজ ছাপিয়ে, 'দ্যাখরে ছ্যামড়া মাঝি, বৈঠা জলে না ফেলাইয়া কেমন ভাসা যায়।' এই ছোট তেমোহনাটা শাহুর হিশেবে ছিল না, ছোট তেমোহনা যে বড়টার সঙ্গে মিশে গিয়ে থাকতে পারে—এটাও শাহুর মাথায় খেলেনি। ওরা সেই ছোট তেমোহনা পার হয়েই গেছে প্রায়। ওটা আসলে তিনমোহনা না, চারমোহনা। বরিশালের নদীর মোহনা গুনতে গেলে সংখ্যা শেষ হয়ে যাবে। এটা চারমোহনা হওয়ার সুবাদ—তেমোহনার ঠিক আগেই একটু ওপরে, শায়েস্তাবাদ থেকেই সরু একটা নদী বেরিয়ে একটা ছোট পাক দিয়ে তেমোহনার ঠিক পরে শায়েস্তাবাদেই মিশেছে। এমন এক-পাকের নদী, ভুলে যাওয়া নদী, গিঁঠ-না-খোলা নদী, ফাড়া নদী, খিটকেলে নদী, বরিশালে আর নোয়াখালির তলায় বাঁশবনের মত অজস্র, তার শুরু নেই, শেষ নেই আর রাতদিন দিনরাত বাঁশবনের মধ্যে পথ হারানো হাওয়াদের পথখোঁজার আওয়াজ।

বড় তেমোহনা পার হওয়ার পর শানুর জয়ধ্বনির পর, প্রায় গায়ে গায়েই, নৌকাটা যেন জলের স্রোতের ধাক্কায় বাঁয়ে একটু বেশি কাত হয়। শানুর লাফালাফিই এর কারণ—এমন মনে হতে-না-হতেই নৌকো একটা কোন্ উল্টো টানে একই নদীর অন্য—একটা স্রোতে ঢুকে যায়। এমন পাক বড় নৌকোয় ঠেকানো যায় না—নৌকো ডুবে যায়। ডুবে যাওয়ার পর, বাঁচামরা ভেসে যাওয়া ঘটে যাবার পর, পুরনো মাঝিরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে বুঝতে চায়—কিছু

করে কি ডুবি ঠেকানো যেত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেসব বোঝাবুঝির কোনো মানে থাকে না। কারণ নদীর স্রোতটাই তো বদলে যায়, ঠিক ডোবার সময়ের নদীটাকে তো আর পাওয়া যায় না। সবাই-ই জানে—এই ডোবার কোনো ঠেকনা নাই। তাই এমন মরণডোবা সংক্রান্ত অনেক প্রবাদ-নিষেধ চালু আছে। কোনো-কোনো মাঝি আছে যারা সারা জীবন বহরের নৌকো নিয়ে সমুদ্রের ভিতরের নদী পথ দিয়ে যাতায়াত করে, তাদেরও মধ্যে দু-একজনরেই মাত্র জলের দিকে তাকানো দৃষ্টি জলের ভিতরে অনেকটা যায় আর ঐরকম দু-একজনই নদী-সমুদ্রের আকাশের পথ চেনে পেঁচার মত। তবে, সেসবও গল্পকথায় গীতে-গানেই শোনা যায় বেশি। যে-বিদ্যা দেখা যায় না, শোনা যায় না, তার ওপর মানষের শরীরের ভালমন্দ আছে, চোখের দৃষ্টির কমাবাড়া আছে, নিদ্-জাগরণের প্রভাব আছে, তবু, লোকের মুখে মুখে এসব প্রবাদ-নিষেধ ছড়িয়েই থাকে—বাওজল চেনা নাই, সে-জলেরে বিশ্বাস নাই ; হাইল ধরো যান সামনে কুম্ভীপাক ; ডোবার কালে কারণ খুঁইজো না ; দুই ঘাটের মাঝখানে শুধু মরণ যাহে ; ডুইবব বুঝলে উলট্যা ঝাঁপ (নৌকো যেদিকে হেলে সেদিকেই ডোবে, মাঝিই সবচেয়ে আগে টের পায় ডুবছেই, তখন আর নৌকো বাঁচানোর চেষ্টা না করে, যেদিকে নৌকো হেলছে তার উলটোদিকে ঝাঁপ দিয়ে জলে পড়ে নিজের প্রাণ বাঁচাও, আপনে বাঁচলে বাপের নাম, হেলাদিকে ঝাঁপ দিলে মাঝি নিজের নৌকোতেই চাপা পড়তে পারে) ; যে নদী ছাড়াইল্যা সে নদীর দিকে চাইও না ; সব নদীই নতুন, সব জলই নয়া জল।

কখনো সখনো বা, বেশিরভাগ সময়ই, এক-একটা নৌকোডুবি বা লঞ্চডুবি বা স্টিমারডুবির বড় ঘটনা ঘটে গেলে লোকের মুখে-মুখে কারণও ছড়িয়ে পড়ে। যমুনায় একটা জাহাজ ডুবি ঘটেছিল দিনেরবেলা, ১৯৩০ সালে, কন্ডোর-জাহাজ নগরবাড়ি ঘাটের কাছে। সব লোকই মারা গিয়েছিল। সারদা অ্যাক্ট পাশ হয়ে গেলে মেয়েদের আর বিয়ে দেয়া যাবে না—এই গুজবে জাহাজভর্তি বর-বৌ ছিল, ছোট ছোট, বেশির ভাগই মুসলমান। সে নিয়ে অনেক গান হয়েছে—সব গানেই সারেংকে বাঁচিয়ে আর শাহেবকে দুষে। দোষগুণের সাক্ষী কেউ ছিল না।

এক-পা-র আর-এক পা যেখানে পড়ার, সেখানে পড়ল না, হিশেব তো এইটুকু, বাঁয়ে-হেলাটা সামলে নৌকো ডাইনের স্রোতে গেল না—দুদু মিয়া এক লাফে গিয়ে হাল ধরে নৌকো যাতে বাঁয়ে আর না-হেলে। দুই চ্যাংড়া মাঝি নৌকোর আড়কাঠে শুয়ে আর উঠে, শুয়ে আর উঠে বৈঠা মারছিল। দুদু মিয়া হাল ধরতেই শানু লগি তুলে নিয়ে জলে ডোবায়। ডোবানোর আগেই লগি যেন বাতাসে বা স্রোতে ভেসে যায়। শানু দ্বিতীয়বার লগি ফেলে, নৌকো গিয়ে লগির গায়ে লাগে, থরথরিয়ে ওঠে লগির ঐ সোনালি দণ্ড, যেন মনে হয়, লগিটা যে-কোনো মুহূর্তে দু-টুকরো হয়ে যাবে, অথবা শানুকে নৌকো থেকে তুলে নেবে। বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়ার দুই মেরু কতটুকু লম্বা, অন্তত তখন, খুব বেশি ধরলেও বুকের ভিতরে পাঁচ-ছ বারের বেশি ধুকপুক হয়নি। পেছন থেকে একটা বড় স্রোত এই নৌকো ভাসিয়ে ভেঙে পথ করে নিতে বড় ধাক্কাই দেয়। জলে ডোবানো লগিটা শানুর এমন থরথর করে ওঠে, যেন লগি ভেঙে ফেলে নৌকো সেই বাঁয়েই পাক নিল গো-ও-ও, মরণ পাক। নিল তো—'।

নি...ল। কিন্তু গলুইটা যেন বাঁয়ে ঘুরল না। নতুন স্রোতটা নৌকোর তলা দিয়ে একটু ডান বাঁকে নৌকোর মুখটাকে ঘুরিয়ে দিল। বা পেছনের স্রোত এগিয়ে পেছনের নৌকোটার মুখ টেনে দিল। ঘুরিয়েই দিয়ে থাক আর টেনেই নিয়ে যাক, নৌকোটা যে ডুবতে-ডুবতেও ডুবল না, সেটুকু বুঝে নিতে বুকটাকে অন্তত দশবার-বার ধুকপুক করতে দিতে হয়।

নিশ্চিত মৃত্যু থেকে এমন বাঁচা বেঁচেও কাউকে ধন্যবাদের কিছু নেই, নিজেদেরও কোনো

পরিত্রাণবোধ নেই।

শানু লগি তুলে নৌকোর ভিতরে ফেলে গলুইয়ে এসে দাঁড়াতেই দুদু মিয়া হালটা তার হাতে দিয়ে আবার তার পুরনো জায়গায় বসে পড়ে।

নৌকো স্রোতের ওপর এত বেগে, ক্রমেই বেশি বেগে, গড়াচ্ছে যে আবার হালের পাশে লগিটা ফেলে গতি কমাতে হতে পারে। তবে, তার দরকার হল না, তার আগেই বরিশালের পাড়ঘাটা এসে গেল। সংখ্যায় কম হলেও জলপথ খোলা। ওপরের সেই হাওয়াটাও নেই। ঐ বিপদের কারণে কারো খেয়ালে আসে নি—ওপরের হাওয়াটা কোত্থেকে নেই। যোগেন সেই ভুলটা সংশোধন করতে যে খাল পথটা তারা পেরিয়ে এল, দু-সারিতে সবুজ দাগকাটা সেই আকাশখাত একবার দেখে নিল।

দুদু মিয়া পাড়ে নেমে দাঁড়িয়েছিল।

তার নৌকোটা এখনো আসেনি।

তারা আবার কোন্ নদী, কোন্ খাল ধরেছে।

যোগেন জুতোজোড়া পায়ে গলাতে গলাতে চেঁচিয়ে দুদু মিয়াকে বলে, 'ঐ দেখা যায়, আইল বইল্যা'।

বরিশালে মণ্ডল-মিয়া তর্ক

১২৬

প্রথমে যোগেনের মাথায় ছিল যে শিবু সরকারের মারফত হাতচিঠি পাঠিয়ে সার্কিট হাউসে একটা অল পার্টি আর একটা অল অফিসার্স মিটিং ডাকবে। একসঙ্গে কিন্তু পৌঁছুতে-পৌঁছুতেই তার মনে আসে—তার মানে, আজ সারাদিনও তো কোনো কাজ হবে না। কাজ মানে, কী কী করতে হবে তার কোনো ফর্দও তো তৈরি হবে না। স্কুলের উঁচু ক্লাশে পড়ে যখন, তখন অশ্বিনীকুমার শিখিয়েছিলেন—এমন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রথম কাজ যারা বেঁচে গেছে, তাদের বাঁচিয়ে রাখতে মাথার ছাউনি আর পেটের খাওয়া। দ্বিতীয় কাজ, যারা বেঁচে থাকল, তাদের নিরাপত্তার জন্য কলেরা-টাইফয়েডের ইনজেকশন। যোগেন তো সে-ই প্রথম ইনজেকশন দেয়া শিখেছিল। আরো একটি জরুরি শিক্ষা পেয়েছিল যোগেন, বাস্তব ছাড়া যে-শিক্ষা পাওয়া যায় না, বিপর্যস্ত এলাকার সবচেয়ে দূরের জায়গা থেকে কাজ শুরু করতে হয়। সেটার হদিশ না থাকলে জানা—এলাকারই দূরতম জায়গা থেকে।

যোগেন ঠিক করল, একটা দুপুর, বিকেল, রাত তো কম সময় নয়। একটু হলেও তো কাজটা এগিয়ে রাখা যায়। তাই ঘাটে নামতেই সে 'খাড়াও' বলে সবাইকে দাঁড় করিয়ে রেখে উধাও হয়ে গেল ও মিনিট—পাঁচ-সাত পরেই আবার যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে দাঁড়ায়।

'মিয়াভাই, ডি এম শাহেবের সঙ্গে সরাসরি কথা হৈল। উনি তো বিশ্বাস করব্যারই চান না যে আপরে নিয়্যা আসছি। কয়, এখনই আসেন। তো চলেন, একডা টমটম ধইর‍্যা...। ওরা এই হানে থাউক। শহর দেহুক। টকি দেহুক।'

দুদু মিয়া সবে বলতে শুরু করেছে, 'মণ্ডলমশায় এ তো শাদা ডি এম?'

'ডি এমরা তো শাদাই হয় সাধারণত—'

'তা তো হবেনই। কিন্তু আমি য্যান অসাধারণ হইয়্যা যাই। ইংরাজি তো?'

একটা টমটমকে হাত তুলে দাঁড়াতে বলে যোগেন দুদু মিয়াকে ডাকে, 'উঠেন তো। নমাজ পইড়তে মিসিলে খাড়াইয়্যা কন, কাছা খুইলব না। চলেন দেহি। আপনার যা কওয়ার আমারে কইবেন হইল তো!' যেন তাঁকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে—এমন ভঙ্গিতে দুদু মিঞা পেছনের আসনে বসে।

জিলা ম্যাজিস্ট্রেট রেঞ্জশাহেব নিজেই বেরিয়ে এসে ওদের দু-জনকে তাঁর ঘরে নিয়ে এলেন, বলতে-বলতে, 'সারা দুনিয়া তো জেনে গেছে ভোলা-দৌলতকাজি উপে গেছে, তখন আপনারা এসে জানালে, আমরা ভোলা-দৌলতকাজির লোক। আমি তো ভাবছিলাম, ভূতরা কি এখন ফোনও করে? বসুন। বসুন। এটা সত্যি চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর মত কাজ, রিপ্রেজেনটেটিভ গবর্মেন্ট, ব্যাপারটি কী আর পিপলস রিপ্রেজেনটেটিভ বলতে কী বোঝায়। মিস্টার মণ্ডল, আপনার মত পিপলস রিপ্রেজেনটেটিভ পাওয়া গবর্মেন্টেও ভাগ্য, পিপলেরও ভাগ্য। ওঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল—'

রেঞ্জশাহেব বুঝতে পারেন, যোগেন সব কথা তার সঙ্গীকে বাংলা করে শোনাচ্ছে। বোঝার পর থেকে উনি কথা বলার গতি কমিয়ে দিলেন, যাতে যোগেন বাংলা করার সময় পায়। যোগেন দুদু মিয়ার পরিচয় দিচ্ছিল—ঐ দিককার, ঐ ভোলা সাইডের খুব বিখ্যাত বংশানুক্রমিক এক্সপোর্টার, সুপুরির, এক্সপোর্টার মানে বেয়ন্ড ইন্ডিয়া, বাই শিপ টু ইতালি অ্যান্ড মেডিটেরেনিয়ান কান্ট্রিজ—।

শাহেব যথাযথ বিস্ময় জানালেন। ওঁর নাম শুনে শাহেব জিজ্ঞাসু হলেন, 'ডুডু মিয়া। ইজ ইট নট এ হিন্দু নেম?'

'না স্যার। উনি খুব নিষ্ঠাবান মুসলিম—'

'এ মুসলিম?'

হ্যাঁ স্যার। খুব নাম করা মানুষ।

'এ মুসলিম ইন ধোতি?'

'হ্যা স্যার। দেখেন না। দাঁড়ি গোঁফও নেই, টুপিও নেই।'

'ইট ইজ এ রেয়ার সাইট ইন বেঙ্গল—'

দুদু মিয়াকে শাহেব কী বললেন, সেটা বলে দেয়ার পর শাহেব তাঁদের স্টোরি ইন এভরি ডিটেইল শুনতে চাইলেন। আর সেটা এঁরা দু-জন একসঙ্গে বলতে-বলতে নিজেরাই বুঝছিস, সত্যিই, এতটা ঘটেছে। শাহেব মাঝে-মাঝে তাঁর ভ্রূর ওপর হাত রাখছিলেন, বিস্ময়ে, হতাশায়।

শেষে ঠিক হল—যা যা এক্ষুনি দরকার বলে যোগেন ও দুদু মনে করে তার একটা ফর্দা শাহেবের অফিসের সঙ্গে বসে ওরা করে দিয়ে যাবে। আগামীকাল সকাল নটায় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড অফিসে শাহেব অল পার্টি মিটিং ডাকছেন, মণ্ডল ও মিয়ারই জন্য।

রাতে কোথায় থাকা এই নিয়ে মণ্ডল আর দুদু মিয়ার নতুন বিবাদ শুরু হল ফেরার পথে। দুদু মিয়া এটা বুঝেছে যে জিলা ম্যাজিস্ট্রেট তাদের যথেষ্ট সম্মান দিয়েছেন। এটাও বুঝেছে যে তারাই প্রথম, যোগেন আর দুদু মিয়াই প্রথম, বাইরের সবাইকে খবর দিচ্ছে, সুতরাং দায় দায়িত্ব আছে। দুদু মিয়া মনে-মনে জানে, সবটাই যোগেন মণ্ডলের কাজ। মণ্ডল যদি নিজে এসে না পড়ে তাহলে দুদু মিয়া ওখানকার আরো দশের সঙ্গে নিজের দুর্ভাগ্য ভাগ করতে থাকত, তার মাথাতেও খেলত না সদর ম্যাজিস্ট্রেট দৌড়াদৌড়ি করা। সদর-ম্যাজিস্ট্রেট যদি তার কাছে যেত তাহলে কাজের বিলিবণ্টন ঠিকভাবে করার জন্য দুদু মিয়া তার করণীয় করত'

যা হোক, এসে যখন পড়েছে কালকের মিটিংটা না করে আর ফেরার উপায় নেই।

যোগেন যতই বলে, প্রহ্লাদার বাড়িতে চলুক দুদু মিয়া, দুদু মিয়া ততই বলে, সে তো বলতে পারে না তার আড়তদারের ওখানে থাকতে মণ্ডলমশায়কে, মণ্ডলমশায়ের অসুবিধে লাগতে পারে, ছোঁচ লাগতে পারে যবনের বাড়িতে, তাই তাকে ছেড়ে দিক মণ্ডল, মণ্ডল যাক প্রহ্লাদের বাড়িতে।

তার হিন্দুত্ব নিয়ে দুদু মিয়ার হিশেব শুনে যে হাসাহাসি শুরু করল মণ্ডল, তাতে দুদু মিয়া প্রথমে ভড়কি খেয়ে পরে মজা পেল। যোগেন তাকে এই কথাটা কিছুতেই বোঝাতে পারে না যে হিন্দুধর্মের বিধান অনুযায়ী যোগেনের হাতে বা যোগেনের ছোঁয়া কোনো জল বা ফল পর্যন্ত খেলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। দুদু মিয়া এই কথায় বারবারই জিজ্ঞাসা করে, 'আপনারাও তো হিন্দু। গরিব। কিন্তু হিন্দু।' আবার যোগেন এই কথাটার জবাবে বলে না বা বলতে পারে না, না, আমরা হিন্দু না। বা, এ রকম করেও বলতে পারে না, হিন্দু কি একরকমের? উলটে সে দুদু মিয়ার কাছে বিষয়টা আরো রহস্যময় ও দুর্ভেদ্য করে তোলে, এই কথা বলে যে, ভগবানের দয়ায় তারপরে আর ছোঁয়াছুঁয়ি নেই। দুদু মিয়া বোঝে না, 'তারপরে' মানে 'কার পরে'? তারপরে মানে 'আমার' পরে। মানে, যোগেন মণ্ডলের পরে। তাতেও দুদু মিয়ার প্রশ্নের নিরসন হয় না, যোগেনের পরে না মণ্ডলের পরে? যোগেনকেই হার মানতে হয়, 'এরে কয় ব্যাপারীর বুদ্ধি। নাই, নাই, কিন্তু ছটাকে শেয়ানা। আরে আমি, এমন একডা বড় ব্যাপারী, বাপও যার বড় ব্যাপারী, যার গাছের সুপুরির লগে মহারানী ভিক্টোরিয়ার দন্ত শুল্যায়, স্যায় কী কইর‍্যা না জাইনতে পারে হিন্দুগ জাতপাতের কথা?' দুদু মিয়া এর যা ব্যাখ্যা করল, তেমন ব্যাখ্যা যোগেন তো কোনোদিন শোনেইনি, পণ্ডিতমশায়রা শুনলে যজ্ঞের আগুনে নিজেদের চিতা জ্বালাবে। দুদু মিয়া বলে, 'আরে আমরা সারা জীবনে হিন্দুদেহি কয়ডা? একডা না দুইডা। তাও তো চেনা বামুন বাড়ি। সারা ভোলা-দৌলত খান-তজুমুদ্দিন-চরফ্যাসান এই সারা জায়গা খুঁইজ্যা একডা হিন্দু বাইর কইরব্যার পাইরবেন। আমরা শুধু শিখ্যা রাইখছি হিন্দুরা মুসলমানগ ছোঁয়ও না, ছোঁয়া খায়ও না। হিন্দুরা যে হিন্দুগ ছোঁয়াও খায় না—এমন আজব জীব খোদাতালা বানাইছিল ক্যা। আপনে আসন কথাডা প্রকাশ দিলেন না, আপনারা হিন্দু তো?'

সেই প্রশ্নের উত্তরে আগে যোগেন দুদু মিয়াকে জিজ্ঞাসা করে, 'হিন্দু-মুসলমান ছাড়েন। আইজ রাইতডা আমার আপনার একজায়গায় থাকাডাই উচিত তো?'

'চিরজীবনই থাকা উচিত। আইজ রাইতডা ক্যা শুদু?'

'সে তো চিরজীবনের টাইমে ভাবা যাইব। সব চিরজীবনের পরের সকালে কাকাডাকার আগে তো মিটিং যাইব্যার লাগব না।'

'তা লাইগব না।'

'আমাগ দুইজনরে তো একসঙ্গে মিটিঙে হাজির হওয়া লাগব?'

'অসুবিধাডা কোথায়?'

'কাইল মিটিংডার লগে যদি একডা একথা মনে খেলে, সেডা আপনারে কইব ক্যামনে যদি আপনে থাহেন আড়তে আর আমি থাহি প্রহ্লাদে'।

'এ তো আমারে আপনে খুনের আসামি বানাইয়্যা দিলেন মণ্ডলমশায়। আপনে নিশ্চয় হিন্দু। হিন্দু ছাড়া উকিল হয় না তো। সেই খুনের আসামি রে একের-পর-এক কথা জিগ্যাইব্যার ধরছে উকিলবাবু। অয় সারা জীবনেও মোট এতগল্যা কথা শুনে নাই। কথায়-কথায় জ্যারবার হইয়্যা শ্যাষে কাঁইন্দতে-কাইন্দতে উকিলবাবু রে কয়—বাবু, খুনড্যাও কইরব আমি আর কথাডাও কব

আমি। আগে কইবেন তো! কোন বলদ তাইলে নিজের শাশুড়িরে খুন করার মত হারামের কাম করে? তাও যদি শাশুড়ির মাইয়্যা বাঁইচ্যা থাইকত—'

'আমি কি কইল্যাম মিয়াভাই যে নিজেরে ফাসির আসামি ভাবেন?'

'কইলেন না মইধ্যা রাইতে যদি কাইলক্যার মিটিঙের কথা স্মরণে আসে, কইবেন ক্যামনে?'

'সে কথাডা অন্যায্য ঠেকে ক্যা?'

'হায় আল্লা—মইধ্যরাইতেও যদি স্মরণ হয়, তালি মধ্যরাইতডা হইব কহন? না। আপনে আপনার পেছ্লাদে যান, আমি আমার আড়তে যাই—'

'না, মিয়াভাই, পাড়ে আইস্যা নৌকা ডুবাইবেন না।'

'নাও যদি ডুবাইব্যার লাগে তাইলে পাড়ে ডুবান্টাই তো পছন্দ ঠেহে। মরার ভয় কম—'

'না, মিয়াভাই, এডা অযুক্তির কথা। দ্যাহেন, আপনে ছিলেন আপনার ঝড়ি-হাঙ্গামে। আমি আইস্যা ইতিউতি চাইয়্যা নাইমলাম। দুই ভাই মিল্যা সব বুদ্ধি কইরল্যাম। ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে কথা হইয়া গেল। স্যায় মিটিং ডাইকলেন। এতডা কাজ আগাইয়্যা আইজ রাইতে দুইজন দুইজায়গায় ঘুমাইয়্যা কাইলক্যার মিটিংডারে খয়রাত কইরব। না, মিয়াভাই, চলেন, আপনার আড়তেই থাহি। আমার পরে তো কুনো ছোঁয়া নাই।'

'কিন্তু মধ্যরাইতডা মধ্যরাইতেই হবার দিবেন তো?'

'দিব। দিব। এই কাগজগুল্যা আছে, এই ফাউন্টেন কলম আছে। মধ্যরাইতে কোনো নতুন কথা স্মরণ হইলে কাগজডায় লিখ্যা রাখব, সকালে কথা কব?'

'হায় আল্লা, আমারে তুমি এডা কী ফিকিরে ফেলাইলা আল্লা? ছিল শুদু কথা। অ্যাহন যোগ হইল কলম। আমার মরণের কী আর বাকি রাইখল্যা, 'আল্লা', তারপর যোগেনকে বলে, 'চলেন মণ্ডলমশায়। মালেক আইছে তার গুরুঠাউররে নিয়্যা। আড়তদার মুরগি খাওয়াইব নিশ্চিত। আর আপনার নীচে তো কুনো ছোঁয়ার দোষ থাকে না'।

দুর্যোগ নিয়ে মিটিং ও মিটিঙে দুর্যোগ

১২৭

পরদিন সকালে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সভা যে এত বড় হবে—কেউ ভাবতেই পারেনি। জিলা ম্যাজিস্ট্রেট অল পার্টি বলতে হয়ত বুঝিয়েছিলেন সকলকে ডাকা, এমন বিপদে কোনো বাছবিচার না করা। ফলে, বলতে গেলে বরিশালের সবাই এসেছেন। পুরনো মানুষজন এসেছেন—যে দুর্যোগ চার পাঁচদিন ধরে চলছে সে—সম্পর্কে কৌতূহল নিয়ে। বরিশালের কথা তো! কিছু বলা যায় না। সমুদ্রের এতই ভিতরে যে এখানে বাড়ির পুকুরেও জোয়ারের জল আসে। পুরনো মানুষ যাঁরা, তাঁরা আন্দাজ করতে পারবেন—এত দুর্যোগ কি স্থায়ী হয়ে গেল, নাকি ভোলার নাম। যে একটু রটেছে তার মানে ভোলা চিরকালের মত চলে গেল বা যাচ্ছে।

রাজনীতি, ক্লাব, ব্যায়াম সমিতি, সেবাসংঘ ইত্যাদি করে যারা সেই মাঝবয়েসি নেতারা এসেছেন—কী করে ত্রাণ ও সেবায় সরকার বা পাবলিককে সংগঠিত করা যায়, তার একটা আন্দাজ নিতে। বরিশালের সেবা ও ব্যায়াম সমিতি বহু কালের। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী

পুরুষোত্তমানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, এঁদের শিষ্য ও ভক্তদের মধ্যে আধ্যাত্মিক সাধনা ও স্বদেশপ্রীতি একাকার হয়েছিল। এঁদের সঙ্গে সশস্ত্র বিপ্লবী কর্মসূচিরও সংযোগ ছিল। 'অনুশীলন সমিতি', 'আত্মোন্নতি সমিতি', 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি, যশোহরে বিজয় রায়ের দল, এরকম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এক-একটি জায়গার নাম জড়িত থাকলেও জিলা ও জিলার বাইরেও তাঁরা সক্রিয় ছিলেন। মাত্র একরাত্রির ভিতর এমন একটি বড় সভা সংগঠন করা কারো পক্ষেই সম্ভব হত না যদি এই দুর্যোগ নিয়ে উদ্বেগ-আশঙ্কা জড়িয়ে না থাকত আর বরিশালের মানুষজনের ত্রাণ ও সাহায্যের কাজে যুক্ত থাকার অভ্যেস না থাকত।

জিলা ম্যাজিস্ট্রেট খুব কম কথায় বললেন, 'কাল বিকেলে প্রথমে ফোনে ও পরে মুখোমুখি বরিশালের এম এল এ মিস্টার জে এন মণ্ডল আমাকে জানান যে প্রাকৃতিক দুর্যোগে আমরা সকলে প্রায় চার পাঁচদিন হল হতবুদ্ধি ও হতাশ হয়ে বসে আছি উনি সেই দুর্যোগের কেন্দ্র ভোলা-তে ছিলেন। তিনি, তাঁর এক বন্ধু, দুদু মিয়া, ওখানকার একজন প্রধান উৎপাদক ও ব্যবসায়ী, তাঁকে নিয়ে এসেছেন। তাঁরাই এ-বিষয়ে প্রথম খবরগুলি জানিয়ে দেবেন।'

চেনাজানা মানুষজনদের সঙ্গে যোগেনের দেখা হল কোথায়? সে জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের পাশে বসে, কাউকে নমস্কার করে, কাউকে হাত তুলে, কাউকে হেসে সম্ভাষণ জানাচ্ছিল কিন্তু দুর্গামোহন সেনকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। দুর্গামোহন চেয়ারে বসার পর, যোগেনের দিকে সম্মতি জানিয়ে হাত তুললে, যোগেন চেয়ারে বসে, কিন্তু ততক্ষণে জিলা ম্যাজিস্ট্রেট আবার 'মিস্টার মণ্ডল' বলা মাত্র উঠে দাঁড়ায়।

যোগেন প্রথমেই বলে, 'আপনাগ মনের প্রথম প্রশ্নডার জব আগে দিয়্যা দেই। তাইলে পরে অনেক হাঙ্গাম কমব। আমি কেমন কইর‍্যা ঝড় পাইল্যাম বা ঝড়ই-বা আমাকে পাইল ক্যামনে।' না। আমি এই ঝড়ডারে পিছনে বাইন্ধ্যা আনি নাই। ঝড়ডাও আমারে কলিকাতার থিক্যা উড়াইয়্যা আনে নাই।'

যোগেন সামান্য হাসি আশা করেছিল, পেল না।

লোকজন ঘটনাটা শুনতে চায়। যোগেন বুঝে নিল।

'আমি তিন চারদিন আমার অন্য একটি কর্মের ব্যপদেশে কইলকাতা থিক্যা খাগাবাড়ি যাই কাইল দুফরেই তো? বাবা অসুস্থ। সেইহেতু ছোট কবর‍্যাজমশায়ের নিকট যাই, মৈস্তারকান্দির। সেই বাড়ি হইতে বাহিরে হওয়ার সময় এই বাতাসডা ঠাহর করি। না। কথা ভুল হইল। এই বাওয়ের প্রথম ঠেলা পাই ছোট কবর‍্যাজমশায়ের ঘরে ঢোকার পিছ পায়ে। তারপর তো সারা রাইতই সবাই মিল্যা যমে মানুষে টানাটানি—'

'কুথায়?'

'আমি তো মৈস্তারক্যান্দিতে ছিলাম। যম নি আমারে তারপাশায় টাইনব?' যিনি প্রশ্ন করেছিলেন তিনি তারপাশার। তিনি বলে উঠলেন, 'যম প্রবেশ কইরল কহন? কোথায়? সেসব না কইয়্যাই এককেবারে তার লগে টানাটানিটা শুরু করল্যা?'

'আমাগ বাড়ি তো কত্তা, বাবুইয়ের বাসা। দ্যাখতে ময়ুর পংখি, আর বাও উইঠলেই হোগা পুঙ্গি। চাল উইডায়্যা নিব্যার চায়। আমরা আছি, ধরেন, তিন-চার পুরুষ। সবাই মিল্যা একডা চাল ধইর‍্যা রাইখতে পারি না? যাক গিয়া, আমার ম্যাজদায় শ্যাষে সাহস কইর‍্যা উইঠল আড়কাঠে। সকালে, আজই তো?' সকলে মিলে 'কাল, কাল' বলে উঠলে যোগেন 'কাল হলেই-বা আগায় কী, আইজ হইলেই-বা অসুবিধা কী' বলে নিয়ে বলে, 'ঘাট থিক্যা নৌকা নিয়্যা বাড়াই। দেইখব্যার চাই, বিষয়ডা কী। শ্যায়না মাঝি কেউ রাজি গেল না। দুই চ্যাংরা

রাজি হইল। সার রাত্রি জাগা গিছে। শরীর দিল প্রভাতবায়ুতে ছাইড়্যা?'

'ঐ দুর্যোগে? নদীতে?'

'নদী তো দুর্যোগেও নদীই যাহে। আমি আমার কোঁচা দিয়্যা মাথা ঢাইক্যা ঘুমাইয়্যা পইড়ল্যাম। এইডা আমি বরাবর দেইখছি ঠাকুরমশায়রা, ঘুম আর ক্ষিধ্যার কুনো ভদ্রতাজ্ঞান নাই। নাইলে ঐ সময় কি আমার ঘুমাইয়্যা পড়াডা উচিত ছিল? চ্যাংরা মাঝিরা যহন আমারে ডাইক্যা তোলে, আমি জাইগ্যা দেহি মুলাদি। দেহি না, শুনি। ওরাই কইল, মুলাদি। মুলাদি, তো ঝড় নাই কেন, লঞ্চ নাই কেন, মহাজনি নৌকা নাই কেন। তহন দেহি—লাইনবান্ধা লঞ্চ সব শিকল দিয়্যা অ্যাংকর, দেশী নৌকা ডাঙার উপর টানা আর মাঝিমাল্লাগ জমাৎ। কিন্তু দুর্যোগ নাই ক্যা? মুলাদি তো মেইনলাইন। মেইনলাইনে দুযোর্গ নাই, মানেডা কী, মানে কি এই যে-দুর্যোগ দেইখব্যার আইছি, সেডা তাইলে মেইনলাইনে দুর্যোগ না। যদি দুর্যোগ নাই হইব, তালি লঞ্চ কোম্পানি সব লঞ্চ বন্ধ জারি কইরছে ক্যা, নদী নৌকাশূন্য ক্যা, ছোটনৌকা ডাঙায় তোলা ক্যা। তহন শুনি, ঐ মাঝিমাল্লাগ সঙ্গে কথা কইয়্যা জানি—সবই ঠিকঠাক আছে, মেইনলাইন মেইনলাইনেই আছে, ঝড় ঝড়েই আছে, মুলাদি মুলাদিতেই আছে। আমার নিদ্রাভঙ্গ যাতে না হয়, সেই উদ্দেশ্যে আমার নাওডারে একটা ঘুপচির মইধ্যে ঢুকাইয়্যা রাইখছে। তাই দুর্যোগ গায়ে লাগে না। তহন আরো জানি, অত যে মাঝিমাল্লা, অত যে মহাজনি ডিঙা, অত যে লঞ্চ আর গাদাবোধ, তাগ একজনও ভাটি মাইর্যা দুই রশি আগাইয়া তহনো দ্যাহে নাই, তহনো জানে না, দুর্যোগডা কি ভাঁটিতে না উজানে। আমি তাগ দশকথা শুন্যাইল্যাম, কলঙ্ক বইল্যা। তারা লজ্জা পাইয়্যা কোথথিক্যা এক সাইজ মত হাল আইন্যা দিল ছোট মাঝির নৌকায় বাইন্ধ্যা। তারপর শানু বইল্যা এক পাগলরে হালে বসাইয়্যা নৌকা দিল ঠেইল্যা।'

যারা শুনতে এসেছিল তাদের কেউ-কেউ ঐ জনপথ ও জলপদগুলি চেনে। তারা একটু বেশি বুঝতে পারছিল।

এমন কথাও কেউ বলল, 'কইল্যা যে এক পাগলারে হালে বসাইয়্যা নৌকা দিছে ঠেইল্যা। কত বড় ওস্তাদ মাঝি হইলে আড়িয়াল খাঁর জল না ছুঁইয়্যা আড়িয়াল খাঁ পার হয়। যেমন বইরশালের মানুষ-খাওয়া নদী, তেমনি নদীর পেট চিইড়্যা নদীগেলা মানুষরে বাইর করে বইরশালের মাঝি।'

যোগেন চরভাসানের দুদু মিয়ার পরিচয় ও এই দুর্যোগে মানুষকে বাঁচাচ্ছেন কী করে তার বিবরণ দিয়ে অনুরোধ করে, দুদু মিয়া যেন তাঁর আন্দাজটা দেন, কতটা ক্ষতি, জানপ্রাণ, গাইবলদের ক্ষতি কত, ফসল সম্পত্তির ক্ষতি কত।'

একা কথা বলছে আর ঘরভর্তি মানুষ শুনছে—এমন ঘটনা দুদু মিয়ার কত দেখা। সে তো মোল্লা-মৌলবি-পিরদের কাজ। নিজের অনেক পাপের জন্য কেয়ামতের দিন সে যে সবচেয়ে বেশি শাস্তি পাবে, এ নিয়ে তার কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তাকে যে এই জীবনেই পির হয়ে কথা বলতে হবে, এতগুলো মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে, সেটা তার কাছে কেয়ামতের দিনের শাস্তির চাইতেও অনেক কঠিন লাগল।

সে দাঁড়িয়ে হঠাৎ বলে বসে, 'আমি তো জানিই না, কীসের মইদ্যে কী হইছে? চরভাসানে আমার একখান দলিজ আছে কিন্তু আমার বাড়ি তো মেহেন্দিগঞ্জের দক্ষিণে। গণেশপুরা জেনের নীচে। দুপুরে ঘুইরতে-ঘুইরতে আইস্যা পড়ি চরভাসানে। বেলাবেলি আর ফিরব্যার পারি না, এমন উলট্যা বাও আসা শুরু করে দক্ষিণ থিক্যা। স্যায় মনে হয় চক্ষু দুইড্যা খুইল্যা যাবে। তাও মনে নেয়, কী, আরে এই বাওয়ে যদি ভাসানচর থিক্যা ভোলা যাইব্যার না পারি তাইলে

তো গোরে যাওয়াই ভাল। যতবার নৌকাডা ছাড়র বইল্যা আগাই, ততবার পিছাই। ক্যামন য়্যান ঐ বাওয়ে কাঠপুড়ানোর গন্ধ নাকে লাগে। মনে হইল, ডর খাইছি। মনে হইল, আমার নানি সেই কবে কইছিল—ডর যদি খাসই, ডরটা তালি স্বীকার দিয়্যাই খাস। ডর-খাওয়ায় লজ্জা নাই মণি। লজ্জা ডর খাই নাই বলার বুজরুকিতে। নৌকা না ছাইড়্যা ভাষানচরে থাইক্যা গেলাম। আর রাতদুফুরের আগে থিক্যা মানুষ তুইলব্যার শুরু। আন্ধারে তো কিছু বোঝাও যায় না। মনে হয় সারা নদীতেই মানুষ। শ্যাষে বড়-বড় জাইল ফেইল্যা মানুষ তুইলতে লাগল্যাম। কে কী কয় জানি নাই, শুনি নাই। পরেরদিনও নদীভর্তি মানুষ। তহন তো মানুষের থিক্যা বেশি গরুমেষ। ভাইস্যা যায়—বোঝার উপায় নাই জ্যান্ত না মরা। দ্বিতীয় দিন, তাও বেলা গেলে আমার মনে পইড়ল—তাইলে তো আমার বাড়িও ভাইসছে। এত বড় উঁচা বানা ঠেহাবার ঘর আমার একডাই। যেমন মৈষ ভাসে, তেমন কি আর খুঁটি না ভাইঙ্গ্যা পারে। আপনাগ কবডা কী? আমার বাড়ির খবর না-জাইন্যাই আপনাগ কাছে কইব্যার আসছি। এডা সত্যি কথা, খোদার কিড়্যা কাইট্যা কই সত্য কথা। দুদু মিয়াও তার বাড়ির খবর নিব্যার পারে নাই। সত্যি তো পারি নাই। এডা তো সর্বনাশের একডা মাপ—কতডা সাইকোলন হইছে, না, দুদু মিয়াও তার বাড়ির খবর নিব্যার পারে নাই। দুদু মিয়া তো একটা মানুষ না। একটা মাপ। সেই মাপডা ভাইস্যা আইসছে। যুদ্ধে আর এমন সর্বনাশের একডাই গুণ—কোনো সংবাদই আর দুঃসংবাদ হয় না—'

বোঝা গেল, দুদু মিয়া ভেঙে পড়ছে, আর বলতে না-পেরে বসে পড়ে। সারা ঘর স্তব্ধ হয়ে থাকে। এবার যোগেন নিচু স্বরে চেয়ারে বসে থেকেই বলে, 'কাইল থিক্যা মিয়া ভাইয়ের সঙ্গে বইস্যা একডা কোনো আন্দাজ কি পাওয়া যায় দেখছি। আমি সেইডা কই। চরভাষান কিন্তু সব থিক্যা ডাইনের জায়গা। এইখানে সব থিক্যা কম লোক আসব্যার পারছে। স্বামী-স্ত্রী-পরিবার না-ধইর‍্যা মাথাগুনলেও ৮ হাজার ৩ শ ২৫ জন মানুষ। এইডা থিক্যা একডা হিশাব বাইর করছি—অ্যাহনো দুর্যোগ শ্যাষ হয় নাই। সমুদ্রের দুর্যোগের পাঁজিপুথি নাই। দুর্যোগ বাইরব্যারও পারে। আমরা সরকাররে কই যে সরকার আগাইয়্যা নাইলে এ দুর্যোগ পাড়ি দিব্যার খ্যামতা আমাগ নাই। আমি কই কী—আমরা যে আজ আইস্যা পইড়ল্যাম, তাতে তো এইডা সাবুদ হইল আসা যায়।'

দুদু মিয়া মাথা ঝাঁকিয়ে অবিশ্বাস জানিয়ে বলে, 'না, মণ্ডলমশায়, না, আমরা যে আইসছি তাতে এইডাই জাইন্যা আসছি যে আসা যায় না। আমাদের কাইল বরিশাল আসার থিক্যা ভাইস্যা যাওয়ার কথাই বেশি ছিল। আজও আমরা ঐ জল দিয়্যাই পার হব। আইজও আমাদের নৌকা পাড়ে নাও যাবার পারে। যাওয়া যায় এই হিশাব থিক্যা কোনো কাম ঠিক কইরবেন না।'

আলোচনা গুটিয়ে আনতে জিলা ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, 'আমরা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারি যে মিস্টার দুদু মিয়ার মত মানুষ এখনো জানতে পারেননি, তাঁর বাড়িঘর-নিকটজনদের খবর। এ-থেকেই আমরা অবস্থা যে কত খারাপ তার আন্দাজ পেতে পারি। আমি আজ এই মিটিঙের সব খবর গবর্মেন্টকে পাঠাচ্ছি—হাঁটাপথেও ও টেলিগ্রামেও। আমাদের এই মুহূর্তের দরকার রাফেস্ট পসিব্‌ল্ সি-তে নেভিগেট করতে পারে এমন কোনো ফ্লোটিলা। কিন্তু আমার দিক থেকে যা করার তা কাল থেকেই করা শুরু হয়েছে। আমি চাই এত কঠিন একটা দুর্যোগের মোকাবিলায় সরকার ও পাবলিকের মধ্যে সহযোগিতার একটা পরিবেশ তৈরি করতে। আমার অনুরোধ আপনারা এই সভা থেকে একটা কমিটি তৈরি করে দিন—'বরিশাল ডিজাস্টার রিলিফ কমিটি!' আমাকে পদাধিকার বলে মাথায় রাখুন। আপনাদের মধ্যে থেকে কেউ সেক্রেটারি হন।

আজ সভায় যাঁরা আছেন, তাঁদের সবাই সেই কমিটির সভ্য।'

'রশিদ বইটই তো ছাপতে হবে।'

'আমি কিন্তু ভাবছি—এটা এমন একটা আকারের ডিজাস্টার যা নরম্যাল ফ্লাড রিলিফ কমিটি বা গবর্মেন্টের রিলিফ ডিপার্টমেন্ট এঁদের একার পক্ষে করা সম্ভব নয়। আমি গবর্মেন্টের সঙ্গে কথা বলব। সমস্ত খরচ গবর্মেন্টের। খরচ ট্রেজারি থেকে হবে। পাবলিক ডোনেশন যদি নেয়া ঠিক হয়, তার পদ্ধতি পরে ভাবা যাবে। সেটা কোনো সমস্যা হবে না।'

এতদূর পর্যন্ত খুবই ভালভাবে চলা সভা শেষ হল আচমকা ও খুব খারাপভাবে।

সভাতে অনেকেই এসেছেন, বরিশালের সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা সতীন সেনও ছিলেন। এমন একটা কমিটির সাধারণ সম্পাদক হিশেবে সতীন সেন যে যোগ্যতম সে বিষয়ে কারো কোনো সন্দেহ নেই। এতটা বিশ্বাস আর কোনো নেতার ওপর নেই। সংগঠন শক্তি ও কর্মী সমাবেশের ক্ষমতাই-বা সতীন সেনের তুল্য আর কার আছে? কেউ একজন খুব সহজ ভঙ্গিতে ও স্বাভাবিক স্বরে বলল, 'ঐ একটা পোস্ট তো! তাহলে সতীনদাই থাক।'

হঠাৎ, একেবারেই হঠাৎ, দুদু মিয়া বলে উঠল, 'আপনারা মাফ দিবেন। আপনারা কি সতীন সেন মশায়ের নাম বইললেন—।'

দুদু মিয়া চুপ করে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন দেখে জিলা ম্যাজিস্ট্রেট মাথা হেলিয়ে বললেন, 'ইয়েস'।

দুদু মিয়া বলে ফেলে, 'আমার সঙ্গে তো উনার কোনো সাক্ষাতের কথাই না। উনি কত জেল খাইটছেন, কত দেশের সেবা কইরছেন সে তো দুধের ছাওয়ালও জানে। কিন্তু মুসলমানরা ওনাকে আপন মানুষ ভাবে না, বরং উলট্যা শত্রুই ভাবে। পটুয়াখালিতে মশজিদের সামনে ঢাকপিটানো পাশ করা জন্য হিন্দুরা যেমন ওকে সেলাম করে, মুসলমানরা তেমনি ওনাকে বেয়াদপ করে। তারপর কলেজের সরস্বতী পূজা নিয়্যা রায়ট। তারপর পোনাবালিয়ার ১৯ জন মুসলমান পুলিশের গুলিতে মরে। সেখানেও উনিই ছিলেন লিডার। ভোলা মহকুমায় হিন্দু মানুষজন কিন্তু নাই বললেই চলে। মাইল পাঁচ-সাতে একঘর কী দুইঘর। ছোট জাতের হিন্দুও নাই। সতীনবাবুর কমিটির উপর ভোলার কোনো মুসলমান কিন্তু কোনো বিশ্বাস রাইখতে পারবে না। আমি কুনোদিন এত মোড়ল-মাতবর-ম্যাজিস্ট্রেটের লগে মিটিং করি নাই। ভোলার এই বিপদে আপনারা আমার সব কথা বিশ্বাসে নিয়্যা এত বড় দায় নিলেন। আমি যদি সব কথা আপনাগ না জানাই, তালি তো আমার গোস্তাকি হয়।

হঠাৎ করে সভাটা চুপ হয়ে গেল। চুপ তো হয়েই যেতে পারে কোনো সভা। তেমন যে হতে পারে, এতক্ষণ তার কোনো ইশারাই ওঠেনি, যেন জলের আওয়াজ চাপা দিয়ে ইঞ্জিনের আওয়াজে নদীর দিগন্ত ভেঙে একটা মিস্টার বেশ গতি নিয়েই এগচ্ছিল, হঠাৎ করে চরে আটকে গেল, তখনো ইঞ্জিন চলছিল, স্টিমার উঠল না, ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল—তার পরের আকাশ-বাতাসের চুপ হয়ে যাওয়ার মত সভা চুপ হয়ে থাকল। স্রোতের বাতাসেরও আরো সব আনুষঙ্গিক আওয়াজের পুনরশ্রুতি তখনো ফিরে আসেনি। সতীন সেন কোথাও আছেন—অথচ তাঁকে দেখা যাচ্ছে না, এ তো হতেই পারে না, তাঁর শারীরিক কারণে—তিনি এতটাই লম্বা ও এতটাই প্রধান। এই সভায় এখন তাঁর দিকে লুকিয়ে চাইবার একটা চলৎ চাউনি তৈরি হতে পারত কিন্তু এ-সভায় তেমন কেউ ছিলই না যাঁকে চাউনি লুকোতে হবে। অথচ সভার একটা ভঙ্গি কিন্তু সেই নীরবতার কারণেই ক্রমে স্পষ্ট হচ্ছিল। দুদু মিয়াকে এ-সভার কেউ চেনেই না প্রায়। সতীন সেন এক সভার প্রায় সকলেরই নেতা। কিন্তু এটা বোঝা গেল,

সভা মনে করছে, দুদু মিয়াই এখানে প্রধানতম মানুষ, তিনি এখনো দুর্যোগের মধ্যে আছেন, নিজের বাড়িঘরের খবরও জানেন না, আবার সেই দুর্যোগের পথ বেয়েই দুর্যোগের ভিতরে যাবেন। তাঁর কথার কোনো অমর্যদা করা যায় না।

হাসেম আলি এমন মানুষ যিনি শেষপর্যন্তও অপেক্ষা করে থাকেন, নিজের নীরবতা রক্ষা করতে। সব সভাসমিতিতে থাকেন, যদি সেসব সাম্প্রদায়িক কিছু না হয়। কিন্তু তাঁর ভঙ্গিটাই এমন যে ভঙ্গিটা শুধু তাঁরই। ধার হিশেবেও সেটা তিনি কাউকে দেবেন না। আর তাঁর সেই ভঙ্গি এতই স্বনির্ভর যে কোনো লাঠি বা কারো ঘাড়ে তিনি কোনো ভর দিতে চান না।

তিনি তাঁর চেয়ার থেকেই বললেন, 'আমার তো মনে হয় শ্রীযুক্ত দুদু মিয়ার কথাডা বাস্তবসম্মত। বিপন্ন মানুষজন কাকে ভরসা করবেন, সেটা তো ভাবনা করতেই লাগে। এডা তো শ্রীযুক্ত সতীন মশায়ের সম্পর্কে কোনো বিচার না। আরো কত যোগ্য মানুষও তো আছেন।'

সভা আরো চুপ হয়ে গেল।

সেই চুপের স্বর মেনেই সতীন সেন তাঁর চেয়ার থেকে বললেন, 'হাসেম আলি শাহেব তো আসল কথাডা কয়্যা দিলেন। আমারে আপনারা যে-দায়িত্ব দিচ্ছেন আমার তাতে 'না'—বলার অধিকারই নাই। তাই চুপ কইর‍্যা ছিল্যাম। কথাডা তো বিপন্ন মানুষগুলাক বাঁচান্। বাঁচান শুদু না। বাঁচাই য্যা রাখা। আমার কাজকর্ম নিয়া মুসলমান, সম্প্রদায়ের এই ধারণা যে আমি হিন্দুদের পক্ষে সেডা আমার জানা। এই ভোলা-র কাজে মনপ্রাণ দিয়্যা আমারে প্রমাণ কইরব্যার লাগব সে ধারণাডা ঠিক কি ব্যাঠিক। আপনারা আমারে কর্মী থিক্যা বাদ দিবে না। আর-কাউরে সম্পাদক করেন। আমারে কর্মী বইল্যা হিশাবে রাইখবেন।'

জিলা ম্যাজিস্ট্রেট বলে ওঠেন, 'আমি একজন বিশ্বাসী খ্রিস্টান ও ধর্মাচরণ পালন করি। সেই হিশেবে বলছি, এমন একটা সভায় হাজির থাকতে পারাটা ভগবানের আশীর্বাদ। এ মিটিঙে মানুষই প্রধান। সত্য আর মহত্ত্ব এখানে শিশুর মত খেলা করছে। আপনারা দয়া করে একটা নাম বলুন।'

সভায় একটু-আধটু কথাবার্তা হয়।

একটু নবীনতর কেউ বলে ওঠে, 'এখানে তো জিলা ম্যাজিস্ট্রেট নিজে আছেন। উনি যদি কথা দেন যে গোপালজ্যাঠাকে এর মধ্যে আর অ্যারেস্ট করবেন না, তাহলে গোপাল মুখোপাধ্যায় সাধারণ সম্পাদক হতে পারেন।'

প্রস্তাবটি সত্যও হতে পারত কিন্তু একটু রসিকতাও ছিল। গোপাল মুখুজ্যে বরিশালের ছেলে। অনুশীলন সমিতির নেতা। সেই হিশেবে ২১/২২ বছর বয়স থেকে শুধু জেলই খেটেছেন। মাত্র বছর খানেক হল তিনি সিরাজগঞ্জের জাতৈল থানা থেকে মুক্তি পেয়ে আট-দশ বছর পর বরিশালে ফিরে এসেছেন।

বরিশালে এমন মানুষ কম ছিলেন না।

'অকারণে আর নাম বলাবলি করে কী হবে', সতীশ পাকড়াশি বলে উঠলেন, 'দুদু মিয়াকে জিগগেস করে যোগেনবাবুকে সাধারণ সম্পাদক করে দিন।'

'সেটা তো অতক্ষণ কারো মনে উদয় হয় নাই', পণ্ডিতমশায় বলে উঠলেন, 'যে-লোকডা সাঁতরাইয়া আইল, তারে মাথা মোছারগামছা আগুইয়্যা না-দিয়্যা সিংহ-প্যাঁচার গাও মুছান!'

যোগেন দাঁড়িয়ে উঠে বলে, 'এইডা কি আমার সাজে? এইহানে বরিশালের বেবাক মানুষজন খাড়াইয়্যা আছেন, যাগ পায়ের ধুলার আমি যোগ্য না। আমারে আপনারা এই শাস্তি দিবেন না। আমি কই কী, বরিশাইলের বাইর থিক্যা কাউরে কইরলে হয় না—আচার্য পি সি রায়,

সুভাষচন্দ্র বসু, বিধান রায়, সৈয়দ বদরুদ্দোজা, বা এমন কাউরে?'

সভার ভিতর থেকে গলা ওঠে, 'শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি।'

যোগেন হ্যাঁ-না কিছু না বললেও তার সমস্ত শরীর সকলের সামনে পরিষ্কার করে দিল, সে এটা মানবে না।

সতীন সেন হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর গভীর স্বরে বলে উঠলেন, 'মিস্টার চেয়ারম্যান, আই হ্যাভ টোল্ড ইউ দ্যাট আই'ড বি ওয়ার্কিং ইন দি কমিটি আন্ডার এনিবডি, অ্যাজ এ ভলান্টিয়ার। নাও, দেয়ার ইজ নো মোর নেসেসিটি ফর দি মিটিং টু কনটিনিউ। আই'ম লিভিং।' সতীন সেন বেরিয়ে গেলেন, তাঁর সঙ্গে আরো কয়েকজন।

মিটিংও তারপরপরই শেষ হয়ে গেল। ডিস্টিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, 'যেহেতু এটা একশ শতাংশ সরকারি কমিটি, সরকারের সঙ্গে কথা বলা দরকার। আমাকে একটু জেনে নিতে দিন, গবর্মেন্ট কী বা কাকে চান। সেটাই যে মানা হবে, এইটুকু আপনারা বলে যান।'

শাহেবরা ও প্রধান ব্যক্তিরা চলে গেলে, যারা উপস্থিত ছিল, তাদের মধ্যে এমন ঝগড়া বেধে গেল যেন হাতাহাতিও হতে পারে।

হিন্দুমহাসভার নতুন নেতা কালীশ বিশ্বাস এসে যোগেনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রায়, 'আপনারা ভাবছেন আমরা কিছু বুঝি না? কোথথিক্যা এক মোল্লারে ধইর‍্যা আইন্যা তারে দিয়্যা সতীন সেনের বেইজ্জতি? আনেন-না, আপনার দুধু মিয়্যা নাকি চুদু মিয়্যাকে আর সতীন সেনরে এই রাস্তার মোরে খাড়াইতে। কয়ডা মানুষ সতীনদারে চেনে আর কয়টা আপনার খুদু মিয়াকে চেনে তা গুইন্যা দ্যাহেন। এই শিডিউল গুল্যাই মোছলাগুলার সঙ্গে মিল্যা মোছলাগ ত্যাজ বাড়াইয়্যা দিছে।'

কালীশ বিশ্বাসের কথাগুলি যে তাকেই বলা যোগেন বুঝতেই পারেনি। এত বড় দুর্যোগ যে এত তাড়াতাড়ি ত্রাণের এমন ব্যবস্থা করা গেল—তাতে যোগেন এতটাই বুঁদ ছিল, যে, সে দাঁড়িয়েছিল অভিনন্দিত হওয়ার জন্যই।

তাছাড়াও কালীশ বিশ্বাস তার কিছু চেনাও না যে তাকে কথা বলতে দেখে যোগেনের মনে হবে, তাকেই বলছে। ফলে লোকটির এমন আক্রমণের জবাবে যে পালটা আক্রমণ যোগেনের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল, সেটা ঘটল না আর যোগেন খুব নিচু গলায় জিজ্ঞেস করে বসল, 'আপনে সতীনদারে কত্‌দিন চেনেন?'

কালীশ তার মেজাজ একটুও না-নামিয়ে বলে, 'সেডার হিশাব কি আপনার কাছে দিব?'

যোগেনের গলা দিয়ে যে-নিম্নস্বরের প্রশ্নটা বেরিয়েছিল, সেটা তার নিজের কানে যুতসই ঠেকায়, সে ঐ স্বরেই কথা বলবে ঠিক করে সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়েও ছিল। কালীশের পালটা প্রশ্নের আচমকা ধাক্কায় সেসব ঠিক-করা কথা ও ভঙ্গি, মুহূর্তে উড়ে গেল। ভোলার উপর-হাওয়ার দুর্বোধ্য তাণ্ডবে দুই রাত্রির আগের অন্ধকারে মৈস্তারকান্দির বাড়িঘরের চাল উড়ে যাওয়া ঠেকাতে বাড়ির অত মানুষ একফোঁটা আলো ছাড়া পালটা পাহাড় তুলে যেমন হাওয়া ঠেকিয়েছিল, বা ভাষানচরের রাত্রিতে লণ্ঠনের আলোয় মানুষজনের নামসাকিন লিখে লিখে এমন বেঠিক দুর্যোগকে যেমন একটা ঠিকানা দেয়ার চেষ্টা করছিল সে আর দুদু মিয়া আর, যে-ঘটনা এখনো পর্যন্ত তারা নিজেরাও একবারের জন্য বলাবলি করেনি, কাল সকালে বরিশাল-আসার সময় তুফানের দরিয়া পাড়ি দিতে একটা সুতোর মাপের বাঁকে তাদের বেঁচে যাওয়ার বিস্ময় যেন ফেটে পড়ল যোগেনের গলায়, 'নিশ্চয়ই দিবেন। আমার কাছেই দিবেন। দিতে হইব। হিশাব না দিলে জিভ টাইন্যা বাইর কইর‍্যা হিশাব নিব।'

সেই যে সে টিনের ফুটো দিয়ে, কলকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনের সকালে, সুভাষ বোসকে কথার পাকে জড়িয়ে, পেঁচিয়ে, বেঁধে ভাগাড়ে ফেলে দেয়ার দৃশ্য দেখে আঁতকে উঠে দম আটকে পালিয়ে এসেছিল শেয়ালদা হয়ে বরিশাল হয়ে খাগবাড়ি হয়ে মৈস্তারকান্দি হয়ে চরভাসান হয়ে বরিশাল—সেই ভয় ও ত্রাসের বিরুদ্ধে যোগেন তার শূদ্র-প্রতিক্রিয়ায় গর্জন করে উঠতে পারল, একই হিন্দু-রাজনীতির বিরুদ্ধে, 'হিশাব না দিলে জিভ টাইন্যা বাইর কইর‍্যা হিশাব নিব।' বারান্দায় যারা ছিল তারা সকলে থমকে গেল যোগেনের এই আক্রমণে।

ঐ কালীশ বলে লোকটিও।

সেই ফাঁকে সিরাজুল চৌধুরী দৌড়ে এসে যোগেনকে জড়িয়ে ধরে, 'যোগেনদা, যোগেনদা, ঠান্ডা হোন, ঠান্ডা হোন' বলে সিঁড়ির ওপর বসায়। পায়ে-পায়ে এগিয়ে আসেন নলিনী বোস। তাঁর বাবা ছিলেন বি এম কলেজের অধ্যাপক, একনিষ্ঠ কংগ্রেসি। তিনি এসে যোগেনের পাশে বসেন।

একটু ঠান্ডা হয়ে সিরাজুল ও নলিনী বোস দু-জনকেই জিজ্ঞাসা করে, 'এগো এতডা বাইড্ বাইড্ল কবে?'

'তুমি যা মনে ভাবছ তা না। তোমারে পাইয়া, সতীনের ঘটনা লইয়্যা মিয়াভাইয়ের কথায় সুযোগ বুইঝ্যা এডডু খ্যামতা দেখাইল—'

'এডা তো সাতপুরানা কথা। সতীনদারে তো বরিশালের মানুষ মাথায় রাখে। স্যা মানুষের মইধ্যে তো মুসলমান নাই। ক্যামনে থাকব। মুসলমান দাঙ্গাবাজদের ঠ্যাকাইতে গিয়্যা সতীনদাকে হওয়ার লাগল হিন্দু—অযোধ্যার প্রজারা য্যামন সীতারে কইল কুলটা। আর এই ছ্যামরারা ক্যামন পাটের পাইকারগ মত সতীনদা-শিডিউল-মুসলমান লইয়্যা ঘোট পাকাইল। নলিনী দা—এ রাজনীতি ঐ ছ্যামরার মাথা থিক্যা বাইরে হওয়া সম্ভব না। খবর নেন—আরো বড় মাথা কেডা। আমি আইজ কইলকাতা যাইয়্যা একডু কথা কইয়া দুই-চারিদিনের মইধ্যেই ফির‍্যা আইস্যা দেখা করব।'

দুদু মিয়াকে যোগেন ঘাট পর্যন্ত এগিয়ে দিল। তার জেদাজেদিতেই দুদু মিয়া নিজের নৌকোয় ভাসানচর রওনা দিলেন। সময়টা ভাল। জোয়ার সবে ঢুকছে। আসন্ন জোয়ারে উজান্ত যাত্রা শুভ।

ঘাট থেকে সরে যাওয়া নৌকোর দিকে হাত তুলে যোগেন চেঁচায়, 'এইবার বাড়ির লোকজনের খবর করেন।'

ছোটমাঝি আর তার সঙ্গীকে নিয়ে যোগেন প্রহ্লাদের বাড়ির দিকে চলে। পকেট তো ঢুঢু। এদের টাকা দিতে হবে। শ্বশুরমশায়ের ধারের টাকাও এদের হাত দিয়ে পাঠাবে। সে-ও আজই চায় কলকাতা রওনা হতে। প্রহ্লাদ দাদা ছাড়া যোগেন্দ্রের এত দায় মিটাইব কেডা?

কলকাতা ফেরার পর যোগেন জানল সেদিন তারিখ ৬ মে, ১৯৩৯। সে আগে আইনসভায় যাবে, সেখানে একটা মুলতুবি তোলার চেষ্টা করবে ভোলার সাইক্লোন নিয়ে। বোধহয়, আজ তোলা যাবে না। বরং আজ শরৎবোসের ঘরে বসে এম এল এদের জানানো যায়। না, শুধু বিরোধী পক্ষের এম এল এদের জানালে কী করে চলবে? তার তখন যোগেনের মনে হয়—মুলতুবি প্রস্তাবটা সর্বসম্মত হতে পারে।

আইনসভায় যোগেন একটু আগে-আগে যায়। এই কদিনের খবরা তো সে কিছু জানে না। অন্তত বড় খবরগুলি তো জেনে নেয়া দরকার। সে শুরু করে আজকের কাগজ দিয়ে।

নো বরিশাল সাইক্লোন—

আরে, সাইক্লোন না থামলে খবর আসবে কী করে?

সুভাষবাবু ৩ মে তারিখেই কংগ্রেসের ভিতরে একটা রাজনৈতিক গ্রুপ হিশেবে, দেশবন্ধু-মতিলালের স্বরাজ্য দলের মত, ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করে ফেলেছেন। এটা কি আগেই ঠিক করা ছিল? যোগেন জানে না। তাহলে ওঁরা কি ভেবেছিলেন যে সুভাষবাবুকে না তাড়িয়ে ওরা ছাড়বে না?

যোগেন পালটা যুক্তি পায়—তা কেন হবে। এটাই তে স্বাভাবিক। ভোটে জেতা রাষ্ট্রপতিকে তাড়ালে সুভাষবাবুর তো উচিত—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই জয়টাকে ধরে রাখা। তাতেই যোগেন জানল, সামনের বছর ১৯ মার্চ রামগড়ে কংগ্রেস অধিবেশনের সময়ই সুভাষবাবু একটা পালটা সম্মিলন ডেকেছেন—'আপোশবিরোধী সম্মিলন'।

আরো একটা খবরে যোগেনের চোখ গেল। সামনের বছরের মার্চে কর্পোরেশন নির্বাচন, তার আগেই কর্পোরেশন আইন (সংশোধন) পাশ করা হবে—মুসলমানদের ও তপশিলদের জন্য সংরক্ষিত আসন বাড়িয়ে। নতুন ভোট নতুন আইনে হবে।

সুভাষবাবু একটা বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন—বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি তিনিই আছেন ও থাকবেন। কোনোভাবেই তিনি বাংলার স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে কংগ্রেসের ভিন্নতর কোনো নেতৃত্বকে কোনো সুযোগ দেবেন না।

মুসলমান আপকানট্রি ও ডাউনকানট্রি

কেউ নিশ্চয়ই রহমানশাহেবকে যোগেনের কথা গিয়ে বলেছে—যোগেনকে চিনে নয়, তার পরনের ধুতি দেখে তাকে বিশিষ্ট অর্থাৎ হিন্দু মনে হয়েছে বলে। নইলে রহমানশাহেব তাকে দেখতে না পেলেও কি চেঁচিয়ে ডাকতে পারেন—'যোগেনবাবু, এখানে আসুন, এখানে।' যোগেন দেখে ওখানে একটা চেয়ারও আছে আর তাতে একজন বসেও ছিল, সে উঠে দাঁড়িয়ে যোগেনকে বসতে দেয়। ডাক্তারবাবু একটি দাঁড়ানো মেয়ের পেট টিপছিলেন, আর পেটের কাছে কান পেতে যেন কিছু শুনতে চেষ্টা করছিলেন। ওঁর ভুরুতে লাইন পড়েছে শোনার চেষ্টায়। তারপর হঠাৎই মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে, কাগজছেঁড়া ছোট-ছোট স্লিপের একটা কাগজে কিছু লিখে, মেয়েটিকে দিয়ে বললেন, 'এই দুটো পিল খেয়ে নেবেন, কাল ফজিরে। দাস্ত হবে। দাস্ত হয়ে গেলে আসবেন। কাল হলে কালই। না-হয় তো পরশু। তাড়াহুড়ো করবেন না। দাস্ত পরিষ্কার না-হলে দুদিন পর আবার এই দুটো পিল খাবেন।'

স্লিপ-কাগজটা মেয়েটির হাতে ধরিয়ে রহমানশাহেব ঘরভরতি রোগীদের বললেন, 'আজ আর ডাক্তারি হবে না। আমার বহুত ইমানদার দোস্ত, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, বিএ, বিএল, এমএলএ। ওঁর সঙ্গে আমার কথা আছে। তোমরা কাল সকালে এসো।'

রোগীরা একে-একে বেরিয়ে যেতে শুরু করে।

যোগেন রহমানশাহেবকে বলে, 'এঃ, আপনি আমাকে অন্য সময়ও তো দিব্যার পারতেন। খারাপ লাগছে। আমার জন্য ওদের চিকিৎসা আটকাইয়্যা গেল!'

রহমানশাহেব বলেন, 'দোষটা তো তাহলে, আমার হয়েছে। কর্পোরেশনের কাউন্সিলার হবেন আবার ডাক্তারিও করবেন—এমন হলে তো এইরকমই হবে। আমি ডাক্তারি ছেড়েই দিয়েছিলাম। আমার রোগীরা একেবারে হত্যে দিয়ে বসল—কাউন্সেলের ভোটই হোক, আর যাইহোক, আপনি না-দেখলে আমরা মরে যাব। তাই এই ব্যবস্থা—হপ্তায় তিনদিন।'

'আপনি যে ওদের কাল আসতে বললেন?'

'সেটা তো কমপেনসেটারি, আজ সবাইকে দেখলাম না বলে। আপনি বলুন তো, ঘটনাটা কী? ফোনে আমি বুঝতে পারি না ভালো। আপনাকে তো সুভাষবাবু তিন-নম্বর ওয়ার্ডের রিজার্ভড সিটের ক্যানডিডেট করলেন, তারপরে, আবার গোলমাল কীসের?'

সব শুনে রহমানশাহেব খুব একচোট হাসেন, আওয়াজ না করে, তাঁর লম্বা ধড়টা কাঁপছিল হাসির দমকে। তারপর একটু থেমে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি তো কোনো কালে কংগ্রেস না।'

যোগেন মাথা নাড়ে।

'আপনার বাপদাদারা কেউ?'

যোগেন মাথা নাড়ে।

'আপনি এমএলএ হলেন তো অন্যপার্টির?'

যোগেন ঘাড় কিলায়।

'ও! আপনি তো কংগ্রেসপ্রার্থীকে হারালেন?'

যোগেন ঘাড় হেলায়।

'বড়তলায় কংগ্রেসের হয়ে দাঁড়ালেন কেন? সুভাষবাবুর কথায়?'

'হ্যাঁ। সেটাই প্রধান। তবে আমরাও নিজেদের মধ্যে কথা বলে ঠিক করছি। কংগ্রেসটা বড়ো কথা না। বড়ো কথা রিজার্ভড সিট। জিততে পারলে কলকাতায় আমাদের একটা ঘাঁটি হয়।'

'আপনাদের? মানে, শিডিউল্ড কাস্টদের?'

'হ্যাঁ। কলকাতায় থাকলে তো মনেই আসে না, দেশে সিডিউল কাস্ট বইল্যা কিছু আছে।'

'কিন্তু কলকাতায় শিডিউল কাস্ট আছে বলেই তো আইন বদলে চারটি সিট রিজার্ভ করা হল। এটা একটা খুব ভালো আইন হয়েছে। কিন্তু লিগ গভর্মেন্ট বা হকশাহেবের মন তো শাদা কাগজ না। তাহলে, ওদের নিশ্চয় ভাবা ছিল, ঐ চারটি সিটে কাদের জিতিয়ে আনলে লিগের প্রেস্টিজ বাড়বে। না হলে রিজার্ভেশনের কথা ওদের মাথায় এল কেন?'

'কংগ্রেস আর লিগে তো বোঝাবুঝি হয়েছে। কংগ্রেস আর লিগে!'

'সেটা তো পরের ডেভেলাপমেন্ট। লিগও চায় জাতীয় কংগ্রেসকে ভাঙতে। সুভাষবাবু চান বাংলায় জাতীয় কংগ্রেসকে জমি না-ছাড়তে। তাই বোঝাবুঝি হল। কিন্তু আইন সংশোধনের সময় লিগের বা হকশাহেবের বা নাজিমুদ্দিনের বা সারওয়ারদির তো মাথায় ছিল কেউ। সেটা কে জানেন?'

যোগেন চুপ করে গেল। সে রহমানশাহেবের কথামত ভাবতে লাগল এই অনুতাপটুকুসহ যে এই কথা তার মনে আসেনি কেন? শিডিউলদের কোনো-কোনো নেতার দেশের সঙ্গে সম্পর্ক নামে মাত্র। তাদের কাজকর্ম কলকাতাতেই। যেমন বিরাট জ্যাঠা। কৃষকপ্রজার ভাইস-প্রেসিডেন্ট। তাঁকে যদি কর্পোরেশনে পায়, তাহলে লিগ ও হকের দুয়েরই লাভ। আর কে?

যোগেন মন দিয়ে ভাবছিল। রহমানশাহেব তাকে মন দিয়ে ভাবতেই সময় দিচ্ছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ কাটার পর যোগেন বলে, 'না, রহমানশাহেব, আমাকে আপনে যত সময়ই দ্যান, আমি ঘুর্‌যাফির্‌যা সে-ই বরিশাল। আমি কলকাতার পলিটিক্স তো জানিই না কিছু।'

'যোগেনবাবু, কলকাতার পলিটিক্সের এটাই তো মজা। আপনি কিছুই জানতে পারবেন না, সে মাথা খাটান বা খুড়ুন। আবার, আপনি ভাত মাছ খেয়ে দুপুরে ঘুমোচ্ছেন, দেখলেন, সেই ঘুমের মধ্যেই আপনার যতটুকু জানা দরকার, ততটুকু জেনে গেলেন।'

'স্বপ্নে নাকী?'

'সে তো জানি না। স্বপ্ন তো হতেই পারে। আবার চোখ-কান বুজে যে পড়ে আছেন তার ফলও হতে পারে। কলকাতার পলিটিক্স, সব পার্টিরই, বড়লোকদের হাতে। সে হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, খ্রিস্টান হোক, এখন শিডিউলই হোক, পয়সার মদত না থাকলে কলকাতায় নেতা হয় না।'

যোগেন একটু চুপ করে থাকে। তাতে মনে হতে পারে, রহমানশাহেবের কথাটা তার পছন্দ নয়। সে সেটা বলেও ফেলে, 'না, রহমানশাহেব। কলকাতা আইস্যাই না প্রথম দেইখল্যাম পলিটিক্স কত বড় ব্যাপার। ধরেন, এক, এই-যে শ্রমিকদের নিয়্যা দাবিদাওয়া তৈরি করা, আদায় করা—এই পলিটিক্স কি বরিশালে আছে? সেখানে তো মাঝিমাল্লালস্কর কিছু কম নাই। স্টিমার আর লঞ্চ কোম্পানিও তো আছে। ধরেন, দুই, ছাত্ররা যে এত কাণ্ড কইরব্যার পারে সেডা কি কইলকাতা ছাড়া জানা যায়, আইনসভায় তো রোজই একটা কইর‍্যা মিছিল আসে।'

'আপনার দুই নম্বরটা ভুল হল। সেই ১৯০৫ সাল থেকেই তো ছাত্ররা রাস্তায় নামে। আমি

তো ডাক্তারির ফাইন্যাল পরীক্ষা না দিয়ে 'বঙ্গভঙ্গ চলবে না, বন্দেমাতরম্ বলে জেলে চলে গেলাম।'

'তবে যে শুনি, পড়ছিও, মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ছিল।'

'সেটাও ভুল শোনেন নাই বা পড়েন নাই। জেল থেকে বেরিয়ে দেখি আমার জাতভাইরা আমার ওপর এত চটে আছে যেন আমি তাদের মুখ থেকে খাবার কেড়ে নিয়েছি। হচ্ছিল মুসলমানদের একটা আলাদা প্রভিন্স, তুমি তার উলটো কথা বললে কেন। বছর পাঁচ-সাত পরে যখন 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ' তুলে দেয়া হল, তখন আমার জাতভাইদের গিয়ে বললাম, চলো, আমরা আন্দোলন করি—'নতুন প্রদেশ তুলে দেয়া চলবে না'—'

'আপনেই উলট্যা কথা কইলেন?'

'কাজ যদি উলটো হয়, কথাও তো উলটোবে, না কী? বঙ্গভঙ্গ চলবে না বলে জেলে গেছি। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ তো হয়ে গেল। পাঁচ-সাত বছর না কাটতেই আবার সেটা উলটে দেয়া হল। আমরা কি-একবার আলুর বস্তার আলু হব, আর একবার পাটের গাঁটের পাট হব? কিন্তু আমার জাতভাইরাই রাজি হল না। তারা তখন আপকানট্রি মুসলমান হতে চায়, বাঙালি মুসলমান হয়ে থাকতে চায় না।'

'তাইলে আপনে টাকার কথা কইলেন য্যা? এগুলা তো জাতের সকলের ইচ্ছা-অনিচ্ছা ছাড়া হয় না। কইলকাতা ছাড়াও হয় না।'

'সেই কারণেই তো টাকার সাপোর্ট লাগে। তার সঙ্গে বংশমর্যাদা ও বামুন-কায়েত জমিদারের ছেলে হতে হয়। না-তো আপকানট্রি মুসলমান হতে হয়। না-হলে দাঁড়ানো যায় না।'

'রহমানশাহেব—আমার তো সবই বইপড়া অবিদ্যা। শুদ্দুরগ বাড়িতে তো বাপখুড়ার কাছ থিক্যা কিছু জানা যায় না। তাদের কিছু জানা থাইকলে তো কইব। বামুন-কায়েতদের বাড়িতেই তো এইসব ঘটত। তারা শুদ্দুরগ সে-কথা বলতে আসব ক্যা? আপনে মুসলমান, শুনছি আপকানট্রি, কংগ্রেস হইলেন ক্যামনে? আর যদি হইলেনই তো গান্ধীর চেলা হইলেন না ক্যা?'

'গান্ধীজির চেলা হওয়ার আগেই তো আমি স্বদেশীর চেলা হয়ে জেল খেটে এসেছি।'

'আপনে তাইলে স্বদেশী-কংগ্রেস। গান্ধী-কংগ্রেস না।' যোগেন হেসে বলে, রহমানশাহেব হো-হো করে হাসতে থাকেন, যোগেন বলে যেতে থাকে, 'শুনছি খিলাফৎ আন্দোলনেই হিন্দু-মুসলমান প্রথম মিলছিল।'

'মিলছিল একরকম। আমার পছন্দ ছিল না?'

'খিলাফতে ছিলেন না আপনি?'

'না। খিলাফৎ আমার তখনো পছন্দ ছিল না, এখনো পছন্দ না। গান্ধীজি তো বাঙালি বা মুসলমানকে আলাদা জাত ভাবতেন না। তিনি একটা দাবি খুঁজছিলেন যে দাবি ভারতের সব মুসলমানের দাবি। খিলাফৎ সেই সুযোগটা দিল তাঁকে।'

'গান্ধীজি না করলে আর-কেউ করত না?'

'অন্যেরা করেছে বলেই গান্ধীও করলেন? তাইলে তাঁর আর গান্ধী-হওয়ার দরকার কী ছিল? আমি খিলাফতে যাইনি, ৩২ সালের আইন-অমান্যে আবার জেল খেটে এলাম।'

'তাতে তফাতটা কোথায় হৈল?'

'এক খিলাফতে তো মুসলমানদের নাম-পোশাক-ধর্ম সব বদলে দিল। যে-ছিল দুধু মিয়া সে আর বাংলা নাম রাখতে চাইল না, হল এনতায়েজ মাহমুদ হাসিম মুখতাসিন শেখ'—

'তাতে তার লাভ হৈল কী?'

'রাজহংসের ডিম। সে নাকী তাতে খাঁটি মুসলমান হল। সে তো মনে রাখতে পারে না। সরকারি কোনো কাজে যদি নামের দরকার হয় তাহলে সরকারিবাবুকে নিয়ে মৌলবির কাছে গিয়ে বলে, 'আমার নামটা বলে দেন, একটু, মৌলবিশাহেব।'

'সে আর কী করবে? তারে নাম দিছে মৌলবি। আর মৌলিবি তো যত আপকানট্রি তত বড় মৌলবি। রহমানশাহেব ঐ দুধু মিয়া তো আর মৌলবি বানায় নাই। আপনারা মৌলবি আইন্যা মশজিদে বইস্যা অগ কইলেন, যা, আপকানট্রি হ। দুধু মিয়া আপকানট্রি হইল। তবে, আমি শুইনছি—বাংলার মুসলমানদের মধ্যে না কী দুই ভাগ—আপকানট্রি থিক্যা দেশী মুসলমান হইছে আর অন্য ভাগ দেশি থিক্যা আপকানট্রি হইছে। আপনেও তে আপকানট্রি? না?

'আপনার কি মনে হচ্ছে, আমি বাঙালি না?'

'সে তো কারোই মনে হবে না। তবু শুনা যায়।'

'সে তো শোনা যায়—মানুষ একদিন বাঁদর ছিল।' সেই শোনার সুবাদে কি একজনকে বলা যায়, আপনি তো বাঁদর।'

যোগেন মাত্র সেইটুকু হাসে, যাতে বোঝা যায়, তার প্রশ্নের পালটা প্রশ্নটায় কোনো যুক্তি নেই। রহমানশাহেব তখন বলেন, 'আমি বাঙালি, আমার বাবা বাঙালি, আমার শ্বশুরমশায় বাঙালি, আমার মা বাঙালি, আমার শাশুড়ি বাঙালি, আমার বেটাবেটি জামাইবউরা বাঙালি। তাদের বাপের বাড়ি বাঙালি, তাহলে আমি কী করে আপকানট্রি মুসলিম হই?'

'তাহলে এ কথাটা সবাই কী কইর‍্যা এমন জাইনল?'

'একই ভুল কথা সকলেই জানে বলে—কথাটা জানে, অথচ ভুলটা কেউ যাচাই করেনি। তাই কোনো মতভেদ নেই যে আমি আপকানট্রি।'

যোগেন একটু হেসে যোগ করে, 'এক আপনে ছাড়া।'

'আমি কী জানি তা কি আপনি জানতে চান? তাহলে জানুন। বলছি। কলকাতার মুসলমান ও হিন্দু জনসংখ্যা সম্বন্ধে আপনার ধারণাটা স্পষ্ট হবে। তাতে আপনার আসনটার রহস্য আপনি বুঝতে পারবেন। মানে আপনার ভোটারদের কমপোজিশনটা। আমরা বংশগতভাবে বেশ গোঁড়া আপকানট্রি হিন্দু—'

'ও? মানে, হিন্দু হাইকান্ট নিশ্চয়ই,' যোগেন তেমন কিছু অবাক হল না।

'মনে হয়, আমার মতন প্রাক্তন হিন্দু বর্তমানে মুসলমানদের সঙ্গে আপনার রোজই নাস্তা হয়।

রহমানের ঠাকুরদাদার মুসলমানি

যোগেন বলে, 'নাস্তা তো না-হয় করা যায়। কিন্তু জানব ক্যামনে কে আপকানট্রি, কে ডাউনকানট্রি—'

১২৯

'আপনাদের তো পূজাআর্চায় চোদ্দ পুরুষের নাম লাগে। আমি তো বোধহয় চারের বেশি পুরুষের নাম বলেছি। কয়জন পারবে?'

'অন্তত আমার মতন শুদ্দুররা যে পারবে না, তা নিশ্চিত। আমরা শুদ্দুররা নিজের বাপের নামই জানি না, তার ওপর আবার চোদ্দপুরুষ?'

'আমার ঠাকুরদাদার বাবা ছিলেন পুরা হিন্দু আর পুরা আপকানট্রি। ঠাকুরদাদা ছিলেন বিশ-পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত আপকানট্রি হিন্দু, বাকি জীবন বাঙালি মুসলমান। বিহার ছাড়িয়ে বেথিয়া বলে কোথাও আমরা থাকতাম বেথিয়াবাজের রাজ্যে। কী রাজ্য, কেমন রাজ্য, কার রাজ্য—সেসব জানি না। ঘোড়ায় চড়া সৈন্যরা এসে মাঝেমধ্যেই চড়াও হত। গাঁও পুড়িয়ে দিত। লোকজনকে বেঁধে নিয়ে যেত। কখনো শোনা যেত এরা সব রাজার লোক, কখনো শোনা যেত রাজের লোক। কিন্তু যার লোকই হোক—তারা হিন্দুমুসলমান ভেদ করত না, সব বাড়িই পোড়াত, সবাইকেই মারত বা বেঁধে নিয়ে যেত। যাদের বেঁধে নিয়ে যেত তারা কেউ ফিরে আসত, কেউ ফিরে আসত না। কোলের বাচ্চাদের ছিঁড়ে নিয়ে যেত—কেউ বলত, রাজের লোকজন যাতে ফলন বাড়াতে তাদের বলি দেয়া না হয়। কেউ বলত, রাজার লোকজন, চাষের আগে মাঠে বলি দিতে। আমাদের ওখানে মেয়েদের বড় হওয়া হত না। মা-বাবাই তাদের জলে ডুবিয়ে মারত। কেউ বলত, রাজের লোকজন বাচ্চাগুলিকে বাঁচিয়ে দিত। কেউ বলে, রাজার লোকজন শিশুবলি দিত। সবসময় হাঙ্গামা-হুজ্জতি, ধরাপড়া ও পালানোর মধ্যে ছুটোছুটি করতে হত বলে আমাদের গ্রামে হিন্দু-মুসলমান ভাগ ছিল না, খুব একটা। হিন্দুঘরের পাশে বা সামনেই হয়তো মুসলমান ঘর। আর বাচ্চারা পুরো গাঁয়েরই সম্পত্তি। যে পারে সে-ই বাঁচাত বাচ্চাদের। পুরুষ-বাচ্চাদের তো বটেই—মেয়ে-বাচ্চাদেরও তাদের মা-বাবার হাত থেকে বাঁচাতে কেউ হয়তো লুকিয়ে রাখত। তারা বেশিরভাগই মুসলমান মেয়ে, যারা হিন্দু নবজাতদের রক্ষা করত। আমাদের গ্রামে এমন ডাকাডাকি খুবই ছিল—সীতাপ্যারি লেড়কি, আয়েশা কী লেড়কীকো যশোদা মাইই। আর, আমাদের গ্রামে সবসময়ই ছিল একটা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। আর, আমাদের গ্রামে সবসময়ই ছিল একটা ভয়—এই বুঝি এল ডাকুয়ারা, রাজের বা রাজার। আমাদের হিন্দু মেয়েদের স্বামীর চিতায় বেঁধে মারা হত। ফলে মেয়েরাও পালাত, বুড়ি মেয়েরাও, যাদের স্বামীদের টান উঠেছে। বা, রাতারাতি মুসলমান হয়ে কোনো মুসলমান ঘরে লুকোত। এমনই একটা লুটপাট লুকানো-পালানোর সময় আমার ঠাকুরদাদার বাবা প্রাণ বাঁচাতে সারারাত ধরে পালিয়ে এক রেলস্টেশন থেকে হাওড়ার ট্রেনে চেপে, এই, এইখানে, এই বাড়িটাতে চলে আসে। কেন? তাদের, মানে আমার ঠাকুরদাদার বাবাদের ঘরের সামনে, থাকত, আর-একটা ঘরে ফতেমা আর বুলবুল—আমার ঠাকুরদাদার বাবা তাদের ঘরেই থাকত—গাঁয়ের লোকরা কেউ-কেউ ফতেমাকে ও বুলবুলকে আমার ঠাকুরদার বাবার সম্বন্ধে গোবর্ধন কো মাই আর বলরামকো বাপ ডাকতে শুরু করেছিল, যখন তারা গাঁও পালিয়ে খিদিরপুরে চলে আসে। খিদিরপুরে তখন ডক তৈরি হচ্ছে, দেশবিদেশের জাহাজ ভাসছে, কামাইয়ের শেষ নেই। খিদিরপুর, কলকাতা, হাওড়া—এইসব নাম শোনা ছিল বলেই আমার ঠাকুরদাদার বাবা দশ বছর বয়সে গোবর্ধন

কা মায়ীর কাছে পৌঁছে গেল, আরো বছর দশ কাটিয়ে দিল। গোবর্ধনের মা ফতেমা তার ছেলেকে বলল, 'বিয়ে কর' আর গোবর্ধন বলল, 'মেয়ে দেখ'। সাততাড়াতাড়ি যে মেয়েটিকে পাওয়া গেল, তার কথা শুনে গোবর্ধন বলল, 'ও তো হিন্দু'। ফতেমা বলল, 'তুইও তো হিন্দু।' গোবর্ধন বলল, 'মুসলমান মায়ের হিন্দু ছেলে হয়? আমাকে মুসলমান করে নে।' আমার ঠাকুরদার বাবার মুসলমানি হল, তার, গোবর্ধনের একুশ-বাইশ বছর বয়সে। হাজামের ক্ষুর একপাক ঘুরতে-না-ঘুরতেই কোরবানির মোষের গলায় গোবর্ধন নাকী কেঁদে উঠেছিল, 'আমাকে হিন্দু করে দে মা' আর গোবর্ধনের মা তার মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে কাঁদতে-কাঁদতে বলেছিল, 'কত বললাম, তোর মুসলমান হওয়ার কাম নেই।'

খুব একটা হাসাহাসির মধ্যে রহমানশাহেব বলেন, 'আমার সেই ঠাকুরদাদাকে নিয়ে অনেক গল্প চাউড় আছে। ঠাকুরদাদা তো মুসলমান হয়ে মুসলমান লেড়কি বিয়ে করলেন কিন্তু বেশ কয়েকদিন পর বোঝা গেল—ঠাকুরদাদা নানা ছুতো দেখিয়ে বৌয়ের সঙ্গে ঘুমনোটা এড়িয়ে যাচ্ছেন। এটা সবার বুঝতে সময় লাগল কারণ দাদির ফুর্তি এত বেড়ে গেল যে সবাই বুঝেই ফেলল, সাদির পানি না, সাদির ফ্লাড ঢুকেছে দাদির শরীরে! মাস ছয় নাকী লেগেছিল আমার ঠাকুরদাদার মায়ের এটা বুঝতে যে ছেলে আর ছেলেবৌয়ের কোনো সুহাগ রাত হয়নি। কেন হয়নি—সেটা আন্দাজ করাই কঠিন, জানা তো অসম্ভবই। দোষ আছে মেয়ের? বা বেটার? চেষ্টা করেও হয়নি। আমার ঠাকুরদাদার মা, ঠাকুরদাদাকেই প্রথম ধরলেন। কী রে কী ব্যাপার? আমার ওসব ভাল্ লাগে না। ভাল্ লাগাতে চেয়েছিস? সবই তো ভাল আছে—আবার ওসব কী? আরে উল্লু, ঐটাই তো বিয়ের আসল কাজ। ঐ কাজটা যদি পণ্ড হয়, তাহলে সবই পণ্ড। তোমার বেটার বৌকে দেখে কি তাই মনে হয় যে ওর সব পণ্ড? চুপ কর তো! ঐ মেয়েটার তো এখনো জোয়ানিই আসেনি। ও তো তোর কাছ থেকেই জোয়ানি শিখবে। এতদিন খালাত-ফুফাত দিদিদের কাছে তো শুধু শুনে এসেছে—মরদরা রাত্রে কেমন দুষমন হয়ে ওঠে। তেমন কিছু যে ওর ঘটে না তাতেই ওর ফুর্তি। তাহলে, আমার ফুর্তিতে তোমার নারাজ কেন? নারাজ হব না? মরদ যদি মরদ না হয় আর জেনানা যদি জেনানা না হয় তবে নারাজ হব না? তোর কেন ইচ্ছে হয় না বৌয়ের পাশে শুতে? ইচ্ছে কি আর হয় না, মা? কিন্তু ইচ্ছে হলেই যে ভয়ে কুঁচকে যাই। কেন, তোর ভয়ের কারণটা কী? সেই মুসলমানির দিনের কথা মনে আসে। যেন, ঐ জায়গাটায় হাত দিলেই বা ঐ জায়গায় কিছু করতে গেলেই সেদিনের মতো, সেই মুসলমানির দিনের মতো, মাথা থেকে পা কেটে ফালা হয়ে যাবে। আর হাজাম ঠাকুরের হাতে ধরা ক্ষুর থেকে ঝুলছে আমার মাংসের আগা।

'মজার গল্প তো আর কোথাও শেষ হয় না। যে যার মতো মজা বাড়াতেই থাকে। তারপর আমার ঠাকুরদাদার মা ওখানকার বড় হেকিমজিকে ডেকে তাঁর ছেলের ভয়ের কথা কোনোরকমে জানান। কী করে জানালেন, সেটা একটা মজা। তারপর বড় হেকিমজি আমার ঠাকুরদাদার সঙ্গে ঠাকুরদাদার হোটেলে বসে গল্প করতে বসতেন। এতদিন ধরে এত গল্প করলেন যে ততদিনে আমার ঠাকুরদাদার বৌয়ের অন্তত তিন-তিন বাচ্চা পয়দা হওয়ার কথা। কোথায় কী? কথায় কি আর বাচ্চা হয়? সেই ঠাকুরদাদার সঙ্গে বড় হেকিমজির এতদিন কার, প্রায় পৌনে তিন বছরের কথাবার্তা তো আর-এক আলেফ-লায়লার গল্পের মজা। তারপর, কী করে আমার বাবা জন্মালেন সে-ও তো আর-এক মজা।

'আমাদের বংশ আপকান্ট্রি হিন্দু থেকে বাঙালি মুসলমান হয়ে যাওয়ার এই গল্প শুনেই তো আপনি বুঝতে পারছেন—হিন্দুদের স্বদেশী করার রাইট আমার আছে, তেমনি আছে 'বঙ্গভঙ্গ

বাতিল করা চলবে না' এই মুসলমানি স্লোগ্যান তোলার রাইটও আমার আছে। আবার, খিলাফতের জন্য কোনো শোকদুঃখ আমার না-থাকতে পারে। কিন্তু সে-কারণে ৩২-এর আইন অমান্যে জেলখাটা আটকায় না। আবার মুসলিম লিগের নতুন আইনে রিজার্ভড সিটের বাইরে কাউন্সিলর ভোটে দাঁড়ানোও আটকায় না। আপনাদের, শিডিউলদের, এমন কোনো মজার গল্প নেই—তপশিলি হওয়ার? বরিশালের তপশিলি কেন কলকাতারও তপশিলি—সেসব নিয়ে মজার গল্প নেই কোনো?'

'সেখানেই তো আমার গেরো রহমানজি। বরিশালে তো আমি তপশিলি সিটে দাঁড়াই নাই। খোলা সিটে খাড়ায়্যা জিতছি। তাই তো উলট্যা রটানো ধইরছে, শিডিউল হইলে কেউ জেনারেল সিটে যায়?'

'তাই তো মজার গল্পের কথা বললাম—'!

'আপনে তো কইলেন আপনার ঠাকুরদাদার গল্প, বড়জোর শ-খানেক বছরের গল্প, হাওড়া-কইলকাত্তার গল্প, চটকল আর খিদিরপুরের ডকের গল্প, যে-বাড়িতে গল্পগুল্যা ঘটছে সেই গল্প সেই বাড়িতে বইস্যা-বইস্যা শোনাইলেন। হিন্দুগ জাইতে ঠাকুরদাদা হয় না, আপকানট্রি হয় না, বাঙালিও হয় না। শুধু স্বর্গ হয়। আর সেই স্বর্গে থাকে ব্রহ্মাঠাকুর, বিষ্ণুঠাকুর ও শিবঠাকুর। এই দেব্‌তাগ কারো মুখ থিক্যা, কারো পা থিক্যা, কারো পাছা থিক্যা এককেকডা জাইত বারাইছে। আমি ক্যামনে ঠাকুরদাদার গল্প কইয়্যা আপনার নাগার নেতা হইব? সেইডা হয় না। আমি আপনার আন্দাজডা শুইনব্যার লাইগ্যা আসছি—কাউরে কিছু না কয়্যা। এডার রহস্য কী, সেইডার একডু ইশারা যদি ভাইঙ্‌গতেন, রহমান সা'ব।'

'আমার তো শুনেই মনে হল—কংগ্রেসের ভিতরের কেউ যোগেনবাবুকে তাদের উন্নতির পথে কাঁটা ভাবছে। তারা নিজেরা দাঁড়াতে চায়। দেশ তো স্বাধীন হয়েই গেল—দেশী মন্ত্রী, দেশী অ্যাসেম্বলি, দেশী আইন—স্বাধীনতার আর বাকি থাকল কী? এখন যে যার ঘর না-গুছিয়ে নিলে সত্যি যখন ইংরেজরা চলে যাবে, তখন, আমাদের হাতে থাকবে কী? দেখেন না, এত যুদ্ধটুদ্ধ চলছে, কিছু বোঝা যায়? যেন ওসব অন্যদের কাজ, আমাদের কাজ শুধু স্বাধীন হওয়া।'

'তাহলে আমি করবডা কী? মারামারি?'

'এক সন্ধ্যার মারামারিতে যদি মিটত তাহলে তাই করতে বলতাম। কিন্তু ভোটের তারিখ তো এসে গেল। এখন পালটা-মারামারিতে আপনাকে ফাঁসিয়ে দিতে পারে। তার চাইতে ট্রেড ইউনিয়নের নেতাদের ধরে খুব বড় সাইজের একটা মিছিল লাগান। একটু জঙ্গি। একটু জঙ্গি মিছিল। ওঁদের, নীহারেন্দু বাবু-ভূপেন বাবু-বঙ্কিমবাবু-শিবদাস বাবু, ওঁদের ধরুন। মিছিল একটা হলে মাপ একটা পাওয়া যায়। মানে, আপনারা ওসব খেয়াল না করে ভোটের হাওয়া তুলুন।'

'হাওয়া তো ওরাই তুলল—'

'ওটা তো কানাকানি হাওয়া। আপনারা তুলুন ঝড়ের আওয়াজ, তাতে কি আর কানাকানি শোনা যায়?'

'ঝড়ের হাওয়া?' সেটা কী বুঝতে যোগেন হঠাৎ হাঁ করে। আর, হাঁ করেই থাকে।

বেশ অনেকক্ষণ সেই হাঁয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে রহমানশাহেবকে বুঝতে হয়, হাঁ-টা নিজেনিজেই খুলেছে বটে, কিন্তু নিজে-নিজে বন্ধ হবে না। বন্ধ করিয়ে দিতে হবে।

রহমানশাহেব জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনার কি আমাদের ঘরের মিষ্টি চলবে? এতক্ষণ তো জলও দিতে পারিনি সাহস করে?'

যোগেনের হাঁ বন্ধ হয়ে যায়, চোখদুটো পাকিয়ে ওঠে। যেন তাতেই তার মুখের ভাষা শুনতে

পাওয়া উচিত, এমন একটা সময় পেরিয়ে যোগেন বলতে পারে, 'আপনি কি আমারে জিগান, জলমিষ্টির কথা?'

'কাকে আর বলব। আপনি এতক্ষণ এসেছেন, কিন্তু চা বা জল কিছুই দিতে পারিনি। হিন্দুদের ব্যাপার তো—আপনি খাবেন কি খাবেন না?'

'আমি? খাব কি খাব না? আপনার ছোঁয়া? জল মিষ্টি? আমি তো শুদ্দুর রহমান সাব। কারো উচ্ছিষ্টও আমার 'না' করা নিষেধ। আর, আমার ছোঁয়া কারো খাওয়া নিষেধ। ছোঁয়াছুঁয়ি তো জাতের উচানিচার ব্যাপার। আমার থিক্যা তো নিচা নাই কেউ।'

'সে তো আপনাদের হিন্দুসমাজের ব্যাপার—'

'না, রহমান সাব, মানবজাতের ব্যাপার। মানবজাতের কোথাওই, কুথথাও, শূদ্র-চাঁড়ালের নীচে কোনো তাক নেই। ছোঁয়া? উচ্ছিষ্ট নয় এমন কিছু তার খাওয়াই নিষেধ।'

রহমানশাহেব স্বীকারোক্তির ধরণে এমন কথায় একটু বিচলিতই হয়ে পড়েন, যেন এমন কথা এর আগে কখনো তাঁকে শুনতে হয়নি। তিনি দাঁড়িয়ে উঠে বলেন, 'তাহলে আপনি দুটো ভাত খান—'

'খাইতে পারি, দুইডা না, চাইরডা যদি দেন'।

রহমানশাহেব লাফ দিয়ে বাড়ির ভিতরে যান, প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বেরিয়ে আসেন, পেছনে একটা ছোট ছেলে—কলাই-করা বগি থালা হাতে ছুটে তাঁকে ডিঙিয়ে চলে যায়। যোগেন আন্দাজ করে, মাছ বা মাংস আনতে।

কর্পোরেশন ভোটে যোগেনের স্ট্র্যাটেজি

১৩০

সেদিন শেষ পর্যন্ত এটাই ঠিক হয়েছিল যে কে কাছা ধরে টানছে আর কে কোঁচা খুলে দিচ্ছে—এসব খোঁজা এখন যোগেনের কাজ নয়। যোগেন যেমন বোঝে তেমন ভোট করে যাবে। রহমানশাহেব আর দিন পাঁচেক পরে রাজাবাজারের উত্তরে, বড়তলায় তাঁর এক ভাই বেটার বাড়িতে গিয়ে উঠবেন, ভোট শেষ হওয়া পর্যন্ত থাকবেন আর যোগেনের পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করবেন। যোগেন উত্তর কলিকাতা জিলা কমিটির সঙ্গে ও তার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে প্রোগ্রাম করে যাবেন। যোগেন একবার বলেছিল, 'কিন্তু আপনারও তো ভোট।' তাতে রহমানশাহেব বলেছিলেন, 'আরে, আমি তো চার জেনারেশনের বাঙালি মুসলমান আর আপনি তো মনুসংহিতা থেকে বাঙালি শূদ্র। আমার ভোট দেখাশোনার লোক আছে। আমরা না-দেখলে আপনার তো লোক নেই। আবার, আপনার পেছনে লাগার লোকও তো জুটিয়েছেন।'

রহমানশাহেব যোগেনের পক্ষে কাজটা অনেক গুছিয়ে দিলেন। তাঁর সঙ্গে যোগেনের যে রোজই দেখা হত, তা নয়। আবার, জিলা অফিসে রাত নটা নাগাদ দেখা হয়েও যেত। জিলা অফিসের একজন, অর্ধেন্দুদা, ছিলেন যোগেনের দায়িত্বে। তিনিই ঠিক করে দিতেন—কোন্ পাড়ায় বা বস্তিতে যেতে হবে, সেখানকার প্রধান সমস্যাও বলে দিতেন—বৃষ্টি হলে হাইড্রান্টের জল ওপরে উঠে আসে, বা ট্রামের একটা স্টপ দরকার, বা শ্রীমানী মার্কেটে রাতে মাছের ট্রাক

থেকে যে-দুর্গন্ধ বেরয়, তাতে রাত আড়াইটে-তিনটের পর ঘুময় কার সাধ্যি বা শ্যামপুকুরের খাটালটার জন্য কি শেষে নর্থ ক্যালক্যাটায় মশারি টাঙিয়ে শুতে হবে? কোন্ কথার কী জবাব দিতে হবে, তাও অর্ধেন্দুদা বলে দিয়েছিলেন, 'হাইড্রান্টের জল যদি মাটির নীচে না গিয়ে ওপরে উঠে আসে বা শ্রীমানী মার্কেটের আঁশটে গন্ধ যদি শেষ রাতে ছড়ায় তার আপনি কী করবেন? আপনার মোক্ষম অস্ত্র হবে—'আমি তো নতুন। আপনারা আমাকে যেমন চালাবেন, তেমন চলব। আপনার সঙ্গে সবসময়ই রাজীব থাকবে তাছাড়া, পাড়ার ছেলেরাও থাকবে, ওরাই ক্ষেত্রে কর্ম বিধীয়তে করে দেবে। আর-একটা কথা—আপনার ওয়ার্ড কিন্তু সাবেক কলকাতা, সেই সাবেককালে ওড়িশ্যা, বিহার সব জায়গা থেকে আর গঙ্গার দুই পার থেকে নানা জাতের লোক এসে এখানে বিরাট-বিরাট বাড়ি তৈরি করে নতুন সব কুলপঞ্জিকা বানিয়ে কায়েত হয়েছে। তিলিরাই বেশি। দেবরাও কম না। এসব নিয়ে একেবারে মাথা ঘামাবেন না। এদের সব বাড়িতেই বাইরে বা ভেতরে মন্দির আছে। আপনি ভেতরে ঢুকতে যাবেন না, এদের আবার শুচিবায়ু খুব। ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারও বেশি। আপনি বাইরের দেয়ালে মাথা লাগিয়ে প্রণাম সেরে দেবেন।

অর্ধেন্দুর পরামর্শ যোগেন অক্ষরে-অক্ষরে মেনেছে, বরং বলা উচিত, অর্ধেন্দুর পরামর্শ আর রাজীবের নেতৃত্ব। সামনের একটা বাড়ির সঙ্গে ডাইনে-বাঁয়ে লাগিয়েবাড়িয়ে কতগুলি যে বাড়ি বা ফ্ল্যাট তৈরি হয়েছে, কত বাড়ির সিলিঙের নীচে ফলস্ সিলিং ফিট করে ছোট-ছোট সব গোডাউন আছে, এইসব চাক্ষুষ করা গেল। কিন্তু তার চাইতে অনেক বেশি দেখা ও জানা হল—বিশাল-বিশাল বস্তি। এইসব বস্তির মালিকরা খুব নামডাকওয়ালা লোকজন—সব জাতের, সব প্রদেশের। বেশিরভাগই যে নানা পেশার লোকজনদের মধ্যে ভাগ করা সেটা যোগেনকে বুঝতে হল বেশ দু-একটি দেখে। যোগেন জানেই না, শহরে বা কলকাতায় পেশা এত। এই বস্তিগুলি দেখেও যে তার মনে থাকল, তাও নয়। কিছু মনে থেকে গেল, আলাদা-আলাদা কারণে। ঝালাই বস্তির ভিতরে আবার রংঝালাই, রাংঝালাই, লোহাঝালাই, পিতলঝালাই, তামাঝালাই, এমন কী, সোনাঝালাই-রুপোঝালাইয়ের—দোকান না, মিস্তিরিরা এখানে থাকে। আর-একটা ছোট বস্তিতে শুধুই কশাইরা থাকে, তাদের বেশিরভাগই অবাঙালি মুসলমান। কথাটা কাউকে জিজ্ঞাসা করেনি যোগেন কিন্তু কথাটা তার মগজ থেকে বেরিয়েও যায়নি—কশাইবাগানের এত কশাইয়ের ও তাদের বাড়িঘরের মানুষদের ক্ষিদে মেটাতে যে মাথার দরকার, তা আসে কোত্থেকে?

সবচেয়ে বেশি বোধহয় মিস্তিরি বস্তি—কতরকম যে মিস্তিরি, গুনে শেষ করা যায় না। ইট বসানোর মিস্ত্রি, জোগানি মিস্ত্রি, তাদের মধ্যে কেউ-কেউ আবার ছোটখাটো কাজও করে, জলের মিস্ত্রি, কলের মিস্ত্রি, জল মানে গঙ্গাজলের পাইপ আর কল মানে টালার জল, ফেরুল মিস্ত্রি, সেলাইকল মিস্ত্রি, সাইকেল মিস্ত্রি, টায়ার মিস্ত্রি—রিসোলিং, দরজা মিস্ত্রি—ছুতোর নয়, তৈরি ও বসানো দরজার, তালা মিস্ত্রি, চাবি মিস্ত্রি, কাচ মিস্ত্রি, জানলা মিস্ত্রি—চিকের জানলা মেরামতির—যোগেনের এই মনে আছে। মনে আছে আরো এমন সব মিস্ত্রিগিরি যার মানেই সে জানে না, প্রয়োগ তো জানেই না, দু-একবার জিগগেস করেছে—তারপর নিজেই চুপ করে গেছে, এর আর শেষ নেই বুঝে। কাঁকড়া, বাবড়ি, হোগলা, গির্জা, পাথথর, শাবল, খন্তা, জরদা, মশলা, গুণ্ডি, হাতকো, হেরিকেন, সুচ, গেঁড়ি, শামুক, পাখি, দাঁড়া, পাখা, ডেনটিস, প্যানটি—আরো যে কত। এর কিছু-কিছু মজার ব্যাপার মজার বলেই যোগেনের মনে থেকে গিয়েছে। চিনে ডাক্তাররা দাঁত বাঁধায় কিন্তু সে-দাঁত অনেক সময়ই মাঝামাঝি ভেঙে যায়। হয়তো হাত থেকে পড়ে বা মুখ থেকেও পড়ে। আর-একবার দাঁত করানোর তো খরচা অনেক।

'ডেনটিস'রা ভাঙা পুরনো দাঁত জোড়া লাগায়। শাবল মিস্ত্রিরা কিছু খোঁড়ে না। খন্তা মিস্ত্রিরা খোঁড়ে—কুয়োও। আজকাল কেন, অনেককাল হলই গম্বুজবাড়ি ওঠে খুব—বরং আজকাল কমে এসেছে। খরচা বেশি, মেরামতি খরচা বেশি। গম্বুজ যত তাক ছাড়া হয়, ও যত লম্বা হয়, তত বাহাদুরি। এক গিরজা-মিস্তিরিরাই পারে সেই গম্বুজগুলির ওপর ছোটখাটো সব মেরামতি করতে বা গম্বুজের গায়ে গজানো অশথ বা বটের, পাতাগজানো চারা উপড়ে, সেখানে অ্যাসিড ঢালতে বা গম্বুজের ঐ চোখা অংশটি রং করতে। কাঁকড়া মিস্ত্রিদের কাজ শুনে একেবারে হাঁ হয়ে গিয়েছিল যোগেন। এরা, একমাত্র এরাই, জাহাজ ও বড়-বড় চটকলের চিমনি রং করে। এরা প্রায় সকলেই বালাসোয়ের লোক—বংশানুক্রমে এই কাজই করে যাচ্ছে। বড়-বড় জাহাজের পাহাড়ের মতো উঁচু গা বেয়ে ও আকাশফোঁড়া চিমনির গা বেয়ে এরা কাঁকড়ার মত ওঠানামা করে—সেই জন্যেই এদের নাম কাঁকড়া। দড়ির গিঁঠে-গিঁঠে তারা কী করে সেই ভাঁজহীন উচ্চতায় চলাফেরা করে তা যোগেন বুঝে উঠতেই পারেনি। কাঁকড়া নামটা থেকে ছবিটা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল।

জিলা কংগ্রেসের যারা যোগেনকে নিয়ে ভদ্রলোকদের পাড়ায় ঘোরে তারা কিন্তু যোগেনকে নিয়ে বস্তিগুলোতে ঘোরে না। বস্তির নেতারা আলাদা। দু-দিনেই যোগেন বুঝে ফেলে, বস্তিরনেতা বলে কোনো একটা দল নেই। প্রত্যেকটা বস্তির আলাদা নেতা বা নেতৃদল আছে। তারা সকলেই হয়তো কংগ্রেসি, এখন কংগ্রেসে যখন ভাঙাভাঙি চলছে তখন কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের বানানো অ্যাড হক কমিটিও চেষ্টা করছে বস্তির নেতাদের ধরে বস্তির দখল নেয়ার। বা, হয়তো কলকাতার বস্তিগুলোতে সুভাষ বোসের একচেটিয়া দখল, তবু, কংগ্রেস দু-টুকরো হওয়ায় বস্তির নেতাদের কাছেও একটা বিকল্প এসে গেল। ব্যক্তিগত হিংসে-হিংসি থেকে কেউ-কেউ হয়তো অ্যাডহক বা হিন্দুমহাসভা হওয়ার ভয় দেখাত। বড় নেতারা বস্তির লোকদের দলে রাখতে দরকারে বস্তিনেতাদের অনেক দোষ ইচ্ছে করে দেখে না। এতটা একজায়গায় এই হাজার মানুষ আর কোথায় পাওয়া যাবে? তাতে যদি একজন আর-একজনের ঘর দখল করে নেয় বা বৌ লুঠ করে—তাহলে বড় নেতারা সহজে সেসব ঝামেলায় জড়াতে চান না। সেইসব বিষয়ই আসলে বস্তির নিজেদের নেতাদের হাতের মুঠোয়। আর একই বস্তিতে একাধিক লাইননেতা এক-একটা উপলক্ষে তৈরি হয়ে যায়।

একদিক থেকে যোগেন তো কলকাতারই ছেলে—সেই ১৯২৮ নাগাদ ল-কলেজের সুবাদে আর থাকেও সে বরাবরই প্যারি সরকারের বাড়িতে। সে টিউশন বা প্রুফ দেখার বাড়তি কাজও জুটিয়ে নিত এই পাড়ারই মধ্যে, অথচ এই বড়তলাটা তার দশ বছরে দেখা হয়নি—একটুও না। তার রোজকার যাতায়াতের বিঘৎখানেকের মধ্যে যে এই এত কিছু, তা কারো কাছে শোনেনি পর্যন্ত, দেখা তো দূরস্থান। কোনো কারণ খুঁজে পায় না যোগেন, খোঁজার মতো কোনো কারণ নেইও। কলকাতাতেও তো যোগেন, তার নিজেরই জীবনের দরকারে এসেছিল। সে-দরকার কলকাতাই এক মেটাতে পারে। তাই যদি হয়, তাহলে, যোগেন তো কলকাতাতে ঢুকেছে বাইরে থেকে—অথচ সে কলকাতাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করল না। এই যেসব বস্তিতে যারা থাকে, তাদের ছাড়া তো কলকাতা একটা দিনও চলবে না। তাও যে এসবের ঠিকঠিকানা কখনো জেনে উঠতে হয়নি, সে কী শুধু এই কারণে যে—যোগেনের তেমন কোনো দরকারই ঘটত না আর কলকাতারও তাকে তেমন দরকার হত না। যোগেন কলকাতায় সুযোগসন্ধান আগন্তুকমাত্র।

মনের এমন একটা দশায় যোগেন এই বস্তিগুলিতে ঘোরে। সেই ঘোরাঘুরিতে তার কাছে কলকাতার একটা জলছবি যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভোটের কথা যোগেনের মনেও থাকে না—সে

তো নেতারা সামলায়। বা, সামলাতে পারে না। যোগেন শুধু পাক খায় বস্তি থেকে বস্তি, বস্তি থেকে বস্তি। পালকি লাগে এখনো বিয়েশাদিতে, সেই পালকি-বেহারাদের ঘর থেকে পশ্চিমা বামুনদের কয়েক ঘরের টানা লাইন পর্যন্ত। শোনে এদের কথা—নিজে বুঝে নিতে চায় কলকাতার সঙ্গে এদের পারস্পরিক নির্ভরতা। কলকাতায় যে-হিন্দুরা এসে বড়লোক হয়েছে, তাদের কলকাতা-বাসটা হয়ে উঠেছে তাদের সদ্য অর্জিত বর্ণ-উচ্চতা ও টাকাপয়সার সঙ্গে বাঁধা। সুতরাং দেশে থাকলে বিয়ের যে-কনে হেঁটে বা গরুর গাড়িতে পতিগৃহে যেত, সে এখন সাজানো পালকি চাইতেই পারে আর তেমন বড় ব্যাপারে টাউনজোড়া নারদের নেমন্তন্নে রান্না, পরিবেশন, এঁটো পরিষ্কার ইত্যাদির জন্য পচ্চিমা বামুনদের ওপর নির্ভর ছাড়া অন্য কোনো উপায়ই নেই। ঠিক কনট্যাক্ট দেয়া নয় আবার নয়ই-বা কেন? ক্ষত্রিয়দের মধ্যে নাকী কোনো-কোনো গোত্রের লোক হাতির পিঠে না-এলে বরকে বরণ করাই হয় না। কলাবাগান বস্তিতে শুধু এই কাজের জন্যই নাকী একজন একটা 'হাতি' পোষে। সারা বছরে সে যে-বায়না পায় তাতে এর দুই সংসারের, একটি ওড়িশার গোপালপুরে, আর-একটা কলকাতার এই কলাবাগানে, দিব্যি চলে যায়, তার ছোট মুণ্ডুতে একটা জরির পাগড়ি বাঁধার খরচা সমেত। 'হাতি'র বদলে ঘোড়া চরে বর-আসাটা নাকী বেশি চালু। কিন্তু ঘোড়া বস্তিতে পাওয়া যায় না, ঘোড়ার খিদ্‌মদ্‌গারও না। রেসের মাঠের লম্বাচওড়া বাতিল ঘোড়া থেকে বরযাত্রীর ঘোড়া জোগাড় হয়। রেসের মাঠের আস্তাবলের মাস্টাররা এ কারবার করে।

কর্পোরেশনের ভোটে দাঁড়াতে বাধ্য না হলে যোগেন এমন একটা কলকাতার কথা জানতেই পারত না, দেখা তো অনেক দূরের ব্যাপার।

আসনটা যে-কেন তপশিলিদের জন্য রিজার্ভ রাখা হল, সেটা নিয়ে যোগেন ভাবেনি। সেনসাস রিপোর্ট, বিভিন্ন ধরনের অধিবাসীর আনুপাতিক সংখ্যা এই সব নানা প্রমাণ দিয়ে এসব হয়। যদি ভুল হত, সেটা নিয়ে চেঁচামেচির লোক কম নেই। বস্তিগুলিতে ঘুরতে-ঘুরতে তার মনে হয়েছে, পরে সে চিনে নিতেও পেরেছে, যদিও সেখানে সব মানুষ দলা পাকিয়ে আছে, তারমধ্যেই বর্ণভেদ বেশ স্পষ্ট অন্তত তার কাছে যে এই ভেদচিহ্নগুলি চেনে। হঠাৎ একটা খাটো দরজার মাথায় লালরঙে লেখা : ওঁ গুরবে নমঃ। ওঁ কথাটি বেশ পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে বড় করে লেখা। ঐ ওঁ আর সংস্কৃত জানিয়ে দেয় এটা একটা বামুন বাড়ি। ওঁ যতটা, সংস্কৃত ততটা নয়।

এইভাবেই একদিন বেশ সাতসকালে যোগেনকে নিয়ে যাওয়া হল কেশব সেনের বাড়ির পেছনের এক চামার বস্তিতে। বেশ একটা লম্বা পেঁচালো গলি দিয়ে যেতে হল। গলিটা চাপাও বটে। উলটোদিক থেকে সাইকেলে কেউ এলে বিপরীতমুখী লোকদের কারণে এগতে পারবে না, নামতে হবে। নামার পরও যে সাইকেল যাওয়ার মতো ফাঁক পাবে, তা নয়। সম্ভবত এ-গলি দিয়ে চেনাজানা লোকরাই যাতায়াত করে। সাইকেলওয়ালা সাইকেলটা ছেড়ে দিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ডান হাত বাড়িয়ে সাইকেলের হ্যানডেলের মাঝখানটা ধরে নিজের পাশে নিয়ে এসে সাইকেলে উঠে বসে। যেখানে আটকেছিল সেখানে বিপরীতমুখী যাত্রীদের কেউ সাইকেলটা ধরে দাঁড়িয়েছিল।

গলিটা শেষ হয় বেশ লম্বা ও গভীর একটা বানানো চৌবাচ্চায়—প্রথমে মনে হয় একটা, পরে, যখন সেই চৌবাচ্চাটা পেরতে হয় বাঁয়ে কেতরে, তখন দিনের আলোতে দেখা যায়—চৌবাচ্চা একটা নয়, দুটো আর দুটো চৌবাচ্চা থেকে চামড়া পচানো দুর্গন্ধ বাতাস ভারী করছে। দুর্গন্ধ এতটাই ব্যাপক, যেন কোনো মৃতদেহ পচেই যাচ্ছে এক ঋতুকাল ধরে।

যোগেন গলির শেষ-হওয়ার মুখটায় একটু সাবধান হয়েই বাঁয়ে কেতরে বেরতে-বেরতে বলে, 'রাত্তিরবেলায় তো অচেনা লোক গলি দিয়ে ঢুকে অবধারিত চৌবাচ্চায় পড়বে। আলোও তো নাই!'

'রাত্তিরবেলা গলিটা কেউ চিনতে পারে না, অচেনা কোনো লোক। কোনো অচেনা লোক রাত্রিবেলা চিনতে পারে না। ফলে, অন্যরকম বিপদ হয় অবিশ্যি।'

'বিপদের আবার রকমফের! কীরকম?'

'পুরনো চোর ট্রামরাস্তা থেকে বড়সড় একটা দাঁও মেরে দৌড়ে এই গলিটা দিয়ে পালায়। আর নতুন যারা তাদের ধাওয়া করে তারা চোর-ধরা দৌড়ে গলিটা পেরিয়ে ধপাস-ধপাস করে চৌবাচ্চাগুলিতে পড়তে থাকে। চৌবাচ্চার গায়ে লেগে হাঁটু ভেঙে যায় অনেকেরই, তারপর কোথায় পড়ল—জল না কী যা দুর্গন্ধ, তার ওপর বড়-বড় চামড়ার শিটগুলো গায়ের ওপর উঠে এলে মনে হয়—জলে জ্যান্ত পশ হাঙরটাঙর বুঝি—'

'এমন একটা বিপদ রাখার হেতু কী?'

'হেতু বোধহয়—এমন একটা চৌবাচ্চা থাকলে পাড়ায় বিপদের ভয় কমে—'

'বিপদ দিয়ে বিপদ ঠেকানো। বিপদডা কী?'

'অচেনা কোনো উৎপাত পাড়ায় ঢুকতে পারবে না।'

'বাঃ! বললেন যে, চোরদের পালানোর রাস্তা।'

'সে তো চেনাচোরদের—'

যোগেন খুব একচোট হেসে উঠে বলে, 'বাঃ, এটা কিন্তু শেয়ানা বুদ্ধি! চেনা বিপদ দিয়ে অচেনা বিপদ ঠেকানো! আপনারা ঐ মুখে একটা নোটিশ লাগাইতে পারেন তো—'শুধুমাত্র নিরাপদদের জন্য'?'

'নিরাপদরা তো জানেই বিপদটা। বরং নোটিশ দেন,

'বিপদদের বিপদ।' মানে, যাদের বিপদে পড়ার অভ্যেস...

তার চাইতে লেখা ভাল, 'নিজ দায়িত্বে নিজের বিপদ-সাপন সামলান। কোং দায়ি নহে'।

চৌবাচ্চাগুলো পেরিয়ে এলে জায়গাটা বেশ ভালোই লাগে। যোগেনরা যেদিকে হাঁটছে তার বাঁয়ে বেশ প্রাসাদের মতো বাড়িঘর, সামনে গাছাপালায় সবুজ একটা পার্ক—এখন তো ফাল্গুনের শেষ, কিছু গাছে বেশ রঙিন ফুল ফুটেছে। কলকাতায় এসে যোগেনের গাছ-ভালবাসা তৈরি হয়েছে, মাঠ-ভালবাসাও। আইনসভার বারান্দা থেকে সেই প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতাল পর্যন্ত খোলা ময়দান দেখা।

'ব্যাপার কী? এইরকম অট্টালিকায় আসার পথ এইরকম গলিপথে চৌবাচ্চায় ডুব দিয়্যা?' যোগেনের বিস্ময়ের জবাবে কেউ বলেন, 'সময় বাঁচাতে গেলে রাস্তা তো খারাপ হবেই। এটা তো খিড়কিদুয়ার। সিংহদ্বার দিয়ে আনলে তো আপনাকে তো সার্কুলার রোড দিয়ে মাইল তিন ঘুরে আসতে হবে।'

'তাই বলেন, ঐ গলি আর চৌবাচ্চা হইল এই এলাকার শেষ?'

'শেষ বা শুরু যাই বলেন। যে-রাস্তা দিয়ে ঐ গলিতে ঢুকলেন বা ঐ গলিটা কিন্তু আপনার তিন নম্বর ওয়ার্ডে পড়ে না। এখান থেকে আপনার ওয়ার্ড, এটা চামারবস্তি', যোগেন শোনে।

মনে-মনে ছকে নিয়ে যোগেন বলে, 'গলিপথ তো উভয়দিকেই ঘন ও উচ্চ প্রাকারে ঘেরা। ওয়ার্ডে তো মনুষ্যবসতি দরকার, মানে, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মশায় আমার ভোটার নন—' একটু হেসে সকলে মজাটায় সায় দিল। তারপরেই বাঁ-হাতি একটা অট্টালিকার দিকে ঘুরল।

'তবে-যে বললেন, চামারবস্তি?'

'হ্যাঁ, আপনাকে বলে দেয়া হয়নি। এই বিশাল-বিশাল বাড়িগুলি কিন্তু কলকাতার আদিকালের, অন্তত শ-দেড়েক বছরের তো বটেই—'

'শ-দেড়েক তো দাঁড়াইবে গিয়্যা, ধরেন, এইটিনথ সেনচুরি, মানে সেভেনটি নাইনটি—'

'হ্যাঁ, ঐরকমই হবে। এক মুসলমান মহাজন এসে এখানে একটা বিশাল চামড়া-ফ্যাক্টরি খোলেন। তারপর, নাকী সেই চামড়া দিয়ে তৈরি নানারকমের জিনিসও বানাতে লাগলেন। সব জাহাজ ভরে বিদেশে পাঠাতেন। সেই কাজে শয়ে-শয়ে চামার আনতে লাগলেন, কোত্থেকে কে জানে, একেবারে ফ্যামিলি শুদ্ধু। সে একটা চামারকলোনিই হয়ে গেল। তখন তো আর এদিকে বাড়িঘর ছিল না। মনের সুখে যে পারে সে যত পারে তত বাড়ি বানাত। কিন্তু ঠনঠনের কালীবাড়ি তো পাড়ার মধ্যে। প্রথম-প্রথম কোনো গোলমাল হয়নি। পরে যখন চামাররাই, শয়ে-শয়ে চামারই এখানকার বেশিরভাগ লোক হয়ে গেল, তখন নাকী এ-পাড়ার বসাক-তিলি এই নতুন বড়লোকরা এই নিয়ে খুব গোলমাল শুরু করে। তারা বলে—চামাররা তো অচ্ছুত আর এই চামারদের গায়ে গা না লাগিয়ে তো রাস্তাঘাটে চলাফেরা করা যাচ্ছে না, কে চামার, কে চামার না তা চেনাও যায় না, হিন্দুধর্মের সর্বনাশ হল, সুতরাং চামড়া কারখানা সরাও, যদি সরাতে না পার, তাহলে চামারদের অন্য কোথাও কলোনি বাজিয়ে দাও। মালিক নাকী রাজি হয়েছিলেন। বলেছিলেন, তিনি কয়েকদিনের জন্য পশ্চিমে যাচ্ছেন, ফিরে এসে সকলে যা বলছে, সেই অনুযায়ী চামারদের বাইরে কলোনি করে দেবেন আর কারখানাটা এখানে থাকবে। সেই-যে তিনি কয়েকদিনের জন্য পশ্চিমে গেলেন, আর ফিরলেন না। ফিরলেন না তো ফিরলেনই না। একেবারেই ফিরলেন না। তখন সবাই অপেক্ষা করতে লাগল—এত বড় ব্যবসায়ীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তো কেউ আসবেই। আসবে, আসবে, আসবে। তখনই নাকী জানা যায়, কারখানার মালিক ছিলেন 'বোনার' বংশের পাঠান, রাজপুতানার টঙ্ক রাজ্যের কেউ, ঐ টঙ্ক-রাজ্যের বোনার-পাঠান আমির শাহ বলে একজন পিণ্ডারিদের সঙ্গে নিয়ে শাহেবদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। তখন শাহেবরা টঙ্ক-জায়গাটিকে একটা রাজ্য করে দিয়ে ঐ আমির শাহকে তার নবাব বানিয়ে তাকে ঠান্ডা করে। এই চামড়া-ব্যবসাচী বা মালিকের নাম তখনই জানা গেল, তাল খাঁ। আরো অনেক কথাই রটনা আছে। আমার সবই শোনা কথা। আমি কিছুই জানি না। আপনি যদি আরো জানতে চান তাহলে আপনাকে আমি রাধাকান্ত দেবের ফ্যামিলির একজনের কাছে নিয়ে যেতে পারি। তিনি এই অঞ্চলের প্রাচীন কলকাতার অনেক খবর জোগাড় করেছেন।'

'রাধাকান্ত দেব কে?'

'রাজা নবকৃষ্ণ দেবের ফ্যামিলির—'

'রাজা? তিনি কে?'

'উনি তো খুব নামজাদা লোক ছিলেন।'

'এই বললেন রাজা আর এই বললেন লোক?'

'ঐ হল আর কী! রাজাও তো লোক। উনি তো শাহেবদের খুব সাহায্য করেছিলেন নাকী। সেইজন্য শাহেবরা তাঁকে রাজা-টায়টেল দেন। ওঁদের প্যালেস তো ট্রামরাস্তার ওপর, এখনো, আপনি যাবেন?'

'উনি রাজা ছিলেন, মানে রাজা টাইটেল পাইছিলেন কবে?'

'আমি তো হিস্ট্রি জানি না। কিন্তু অনেকদিন আগে, ঐ পলাশির যুদ্ধটুদ্ধের সময় হবে হয়ত।'

'আর ঐ চামারদের কী হল? এইটিনথ সেঞ্চুরির শেষে তো বললেন চামড়া-কারখানা! সেই চামারদের?'

'তারাই তো বংশানুক্রমে আপনার ভোটার হয়ে গেল। আর তাদের সুবাদেই তো এই সিটটা আপনাদের জন্য রিজার্ভ হয়ে গেল। আপনি তাদের সঙ্গেই কথা বলতে যাচ্ছেন—'

'বা বা—এই শ-দেড়েক বছর ধরে চামারদের এখানে থাকতে দিল হিন্দুরা?'

'কেন? চামাররা হিন্দু না?'

'আপনিই তো বললেন, বসাক-তিলি-শুঁড়ি, সব গোঁড়া হিন্দুরা ওদের উচ্ছেদ কইরতে চাইছিল অগ—'

'হ্যাঁ-আ। সেটা তো হিন্দুধর্মের ভিতরের ব্যাপার।'

'এখন তো সাহা-শুঁড়িরাও চামারদের সঙ্গে এক লিস্টে তপশিলি।'

'তখন তো তপশিলি ছিল না। চামাররা তো অচ্ছুত।

'তারা এখানেই শিকড় গেড়ে ফেলেছে। মালিক আজ আসবে কাল আসবে ছেলে বা নাতি কেউ আসবে বলে কাটল আরো বছর তিরিশ। তাতেই তো বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয়ে গেল, হিন্দুরা ব্রাহ্ম হয়ে আবার হিন্দু হয়ে গেল আর চামারদের দেশ থেকে আরো গ্রামকে গ্রাম উঠে এল এখানে, এখন যা সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি তাতে এরাই তো হিন্দুপাড়ার বলভরসা, প্রোটেকশন।'

যোগেন ঠিক আন্দাজ পায় না, এখানকার কংগ্রেসের যে-ভদ্রলোক কথা বলছেন তিনি যোগেনকে খোঁচাতে চাইছেন, নাকী, যোগেনই তাঁকে খুঁচিয়ে ফেলেছে। যাই হোক, কথাটা বদলানো দরকার। যোগেন খুব একটু হেসে বলে, 'আপনে তো আমারে সেঞ্চুরিবন্দি কইর‍্যা ফেললেন। এইটিনথ সেঞ্চুরির শেষ চামারবস্তি, এইটিনথ সেনচুরির মধ্যিখানে নবকেষ্ট, নাইনটিনথ পার হইয়্যা নাইনটিন থার্টি ফাইভের কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ড মোতাবেক ১৯৪০-এর মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট, ব্র্যাকেটে অ্যামেন্ডমেন্ট আইনের প্রথম কর্পোরেশন ইলেকশনের শিডিউল ক্যানডিডেটকে নিয়্যা যাইতেছেন তার দেড়শ বছরের পূর্বপুরুষ ভোটারের কাছে।'

ভোটে গোঁজ

১৩১

ভোটের আর দিন পনের বাকি। যোগেনকে জিলা কংগ্রেসের অফিসে ডেকে পাঠালেন, হেমন্ত বোস। সন্ধ্যায় সেই অফিসে গিয়ে দেখে, রহমানশাহেবও বসে আছেন। যোগেন বসতে-বসতে বলে, 'এ তো দেখি অস্ত্র বজ্র সম্মিলন। ডাক্তারশাহেব আর আমাকে অপরাধী করবেন না। এদিকে যা হওয়ার হবে। আপনে একটু নিজের ওয়ার্ডে বসেন। দরকার না-থাকলেও বসেন। না হলে তো আমারে দোষী করব লোকে। হেমন্তদা—'

'উনি পুরনো মেম্বার। আপনি নতুন। আমরা সাহায্য না করলে কী করে হবে? এদিকে আপনার বন্ধু রাধানাথ দাস কী রটিয়ে বেড়াচ্ছে আপনার নামে, দেখুন। না কী আপনি ইতিমধ্যে দেখেছেন?'

হেমন্তবাবু একটা ছাপানো কাগজ এগিয়ে দিলেন।

যোগেন পড়তে থাকে—'তিন নং ওয়ার্ডের করদাতাগণ জানেন কি?' তারপর কিছু

তথ্য-উৎস উল্লেখ করে জানানো হয়েছে যে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ৩৭ সালে এমএলএ হওয়ার পর বরাবরই হক মন্ত্রিসভার সমর্থক। কোনো সময়ই তিনি কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিরোধীপক্ষে বসেননি। তারপর একটা লিস্টি দেয়া আছে—কোন্ কোন্ বিষয়ে ও বিলে যোগেন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে হক মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করেছেন।

পড়া শেষ করে যোগেন কাগজটি রেখে বলে, 'রাধানাথ দা তো ভালোমানুষ। চিরদিন কংগ্রেস করেন। এখনো করেন।'

'ওঁর কাছে তো কংগ্রেস মানেই ওয়ার্কিং কমিটি,' হেমন্তবাবু বলেন, 'উনি তো অ্যাড হকের শিডিউল। সুভাষবাবুকে ভোটটা পর্যন্ত দেননি।'

'শিডিউলদের আর অ্যাড হকই-বা কী আর প্রদেশ কংগ্রেসই-বা কী? গান্ধীজির কথায় পি আর ঠাকুরের সঙ্গে ওঁকেই তো কংগ্রেস পাঠিয়েছিল—কংগ্রেসশাসিত প্রদেশগুলিতে তপশিলিরা কেন আছে দেখে আসতে', যোগেন মনে করিয়ে দেয়ার ভঙ্গিতে বলে, 'কংগ্রেস ওঁকে ডেপুটি হুইপ বানাইয়া প্রথম শিডিউলগ মান দিছে'।

'সে তো সব ত্রিপুরীর আগে। ত্রিপুরীর পর তো আর সে-কংগ্রেস নেই। একই কংগ্রেসের তো আর দু-জন প্রার্থী হতে পারেন না। রাধানাথ দাস আপনার ঘনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও এরকম একটা ইস্তাহার বের করলেন?' রহমানশাহেব জিজ্ঞাসা করেন।'

'বের তো করছে ত্রিগুণা গুপ্ত বলে কে, ডায়মন্ড প্রিন্টিং হাউস, ২৬ নং ফড়িয়াপুকুর স্ট্রিট', যোগেন কাগজটি দেখে বলে।

'ওসব খবর নেয়া হয়ে গেছে। এর মধ্যে একটা কথাই সত্য। ডায়মন্ট প্রিন্টিং হাউস বলে একটা প্রেস ওখানে আছে। কিন্তু তারা এই লিফলেট ছাপায়নি। ফড়েপুকুরের ২৬ নম্বরে ত্রিগুণা গুপ্ত বলে কেউ থাকে না। এটা তো জালিয়াতি কেস, আমরা কোর্টে মামলা করতে পারি, ডায়মন্ড মামলা করতে পারে, ২৬ নম্বর মামলা করতে পারে, আপনি মামলা করতে পারেন। সেটা জেনেশুনেই রাধানাথবাবু নিজের নাম দেননি যাতে কোর্টে বলতে পারেন যে তিনি এ-ব্যাপারের কিছুই জানেন না।' হেমন্ত বোস বলেন।

রহমানশাহেবও যোগ করেন, 'আপনাকে প্রার্থী করার বিরোধিতার ঘটনাটাও জানা গেছে। আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি বলে জানানো হয়নি। হেমন্তদাকে জানিয়ে গেছি।'

'কী জানিয়েছেন? আমাকে?'

'ঐ যে কারা গিয়ে সাহা-বসাকদের দিয়ে যোগেনবাবুর প্রার্থীপদে আপত্তি করিয়েছিলেন। রাধানাথবাবু নিজেই তো গিয়েছিলেন। সাহাদের এক ফ্যামিলিতেই ১২৩টা ভোট। এক ভাই নাকী বলেছিল, কথায় কথায় বলেছিল, 'আমরা থাকতে আবার বড়তলায় নতুন তপশিলি কে?' সেই কথাই বহরে বাড়িয়ে ওঁদের সমবেত মত বলে রটানো হয়েছে। হেমন্তদা নিজে গিয়ে ভাইদের সঙ্গে কথা বলে এসেছন,' রহমানশাহেব জানান।

'হেমন্তদা তো আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাননি।'

'আপনাকে সঙ্গে নেব কেন? আমাদের প্রার্থীর সম্মান নেই না কী? আপনি তো আর নিজে-নিজেকে প্রার্থী করেননি। আপনি কংগ্রেসের প্রার্থী। তাহলে কংগ্রেসেরই দায়িত্ব আপনার সম্মানরক্ষা করা। আপনি এর মধ্যে প্রচারে যে-বেগ এনেছেন, তাতে ওসব ভেসে গেছে। চামারবস্তির একজায়গায় ৩০০ ভোট, মেয়েদেরও ভোট আছে ওদের। আপনি ওদের কী বলেছেন জানি না। ওরা বলছে, আমাদের জাতভাই থাকতে আমরা কেন অচেনাদের ভোট দিতে যাব? সাহারাও বলল, সুভাষবাবু ছাড়া আমরা কোনো কংগ্রেস মানি না।'

'এসবই তো সুসংবাদ। তাহলে আমাকে তলব কেন?'

'লিফলেটটা আজও বিলি করেনি। মানে, ওরা ভয় পেয়ে থাকতে পারে এতটা জালিয়াতি করতে। মামলার ভয়ও পেয়ে থাকতে পারে। কালকের দিনটা দেখা যাক। তারপরে বিলি করুক চাই না-করুক জিলা কংগ্রেস থেকে সুরেশবাবু আর হেমন্তদার নামে একটা পালটা লিফলেট ছাড়া হোক। আর, আপনি যদি মনে করেন, মামলার মেরিট আছে—তাহলে আপনি মামলা দায়ের করুন।'

'দিন পনের পরে ভোট। মামলার তো ডেটই পাবেন না। যদি হাইর‍্যা যাই তাইলে তখন ভাবা যাবে।'

'তাহলে হেমন্তদা—লিফলেটের ব্যাপারটা আপনি দেখুন। যোগেনবাবু যেরকম জনপ্রিয় হয়ে উঠছেন তাতে উনি তো ওঁর রাশিয়ান বন্ধুদের দিয়ে একটা মিছিল ওয়ার্ডে ঘোরাতে পারেন। এখানকার লোকজনও থাকল। আর, যোগেনবাবুর চামারবস্তিও থাকল, সাহারাও থাকল।'

হেমন্তবাবু নীরবে কিন্তু মুখটা পুরো খুলে হাসতেই থাকলেন। ওঁর নিকেলের চশমার কাচদুটোতে যেন কুয়াশার ছোপ লেগে আছে। হাসিটা শেষ হলে বললেন, 'সাহারা আসবে মিছিলে? এ-সাহা সে-সাহা না। জব চার্নকের আমলের সাহা। তবে যদি চেপে ধরা যায়, তাহলে ওদের ঠাকুরচাকরদের পাঠিয়ে দেবে। হ্যাঁ। মিছিলটা কিন্তু করা দরকার। লিফলেটের ব্যাপারটা আমার ওপর থাকল।'

'তাহলে হেমন্তদা আমি কি আমার জিলা কমিটিতে হাজিরা দিতে পারি?' রহমানশাহেব আর যোগেন একসঙ্গেই চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ান। হেমন্তদা রহমানশাহেবকে বলেন, 'দেখুন, যদি তারা নেয়। না নিলে চলে আসবেন।'

ভোটের দিনসাতেক বাকি থাকতে তিন নম্বরে যেন মিছিল, মিটিঙ, লিফলেট, পোস্টারের বান ডাকল।

যোগেনের একটা আবেদন বাড়ি-বাড়ি দেয়া হল।

৩ নং পল্লীবাসীর প্রতি সবিনয় নিবেদন

শ্রদ্ধেয় করদাতৃবৃন্দ,

আপনারা অবগত আছেন যে আগামী ২৮ মার্চ কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নির্বাচন হইবে। ৩ নং ওয়ার্ড হইতে একজন বর্ণহিন্দু এবং একজন তপশিলভুক্ত শ্রেণীর সভ্য নির্বাচিত হইবেন। তপশিল শ্রেণির জন্য সংরক্ষিত আসনে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীরূপে আমি আপনাদের সহানুভূতি কামনা করি।

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে একজন সৈনিকরূপে আমি সাধ্যানুসারে দেশের ও দশের সেবা করিয়া আসিতেছি। জনসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণে যে-কোনো ত্যাগ স্বীকার করিতে কষ্ট ও কুণ্ঠা বোধ করি নাই। বর্ণহিন্দু ও তপশিল হিন্দুর মধ্যে ভেদবৈষম্য দূর করত : শক্তিশালী অখণ্ড হিন্দুসমাজ গঠনে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছি বরং ইহাই আমার জীবনের অন্যতম সাধনা।

আমারই ঐকান্তিক চেষ্টায় বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে 'স্বতন্ত্র তপশিলি দল' গঠিত হইয়াছে। উক্ত দল দেশের ও দশের স্বার্থ রক্ষার্থে পরিষদের বিরোধী দলের সহিত একযোগে কার্য করিতেছে। হক্ মন্ত্রীমণ্ডলীর উপর অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনকারীদের মধ্যে আমি অন্যতম। বর্তমান মিউনিসিপ্যাল সংশোধন বিলে হিন্দু ও মুসলমানের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা প্রবর্তনের আমি ঘোর বিরোধী ছিলাম। তপশিল জাতির জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন

প্রবর্তনের চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু আমার তীব্র প্রতিবাদ ও বিরোধিতার ফলে উহা পরিত্যক্ত হইয়া, বর্ণহিন্দু ও তপশিল হিন্দুর জন্য যুক্ত নির্বাচন প্রবর্তিত হইয়াছে।

বর্ণহিন্দু হইতে অনুন্নত হিন্দুকে (তপশিলভুক্ত সম্প্রদায়) পৃথক করার যেসব প্রচেষ্টা ব্যবস্থা পরিষদে যখনই হইয়াছে, আমি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছি।

আমি আপনাদের ওয়ার্ডেরই স্থায়ী অধিবাসী। সুতরাং আমার পক্ষে আপনাদের সেবায় সর্বদা আত্মনিয়োগ করিবার বিশেষ সুযোগসুবিধা হইবে। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আপনাদের অনুগ্রহে আমি কাউন্সিলার নির্বাচিত হইতে পারিলে ৩ নং ওয়ার্ডের শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সর্বপ্রকার জনহিতকর কার্যের উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিব। পল্লীবাসীদের সর্ববিধ সুখসুবিধার প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখিব। পল্লীর প্রত্যেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের উন্নতিসাধনে যত্নবান থাকিব।

পরিশেষে, করদাতৃবৃন্দের প্রতি সবিনয় নিবেদন এই, আগামী নির্বাচনে অনুগ্রহপূর্বক আমাকে সমর্থন করিয়া আমাকে আপনাদের সেবা করিবার সুযোগপ্রদান করিয়া বাধিত করিবেন।

আপনাদের অনুগ্রহপ্রার্থী বিনীত সেবক—
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, বিএল ; এমএলএ।
কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী।

এই লিফলেট যোগেনের হাতে এল দেরিতে। জিলা অফিস যাকে দিয়ে শ-খানেক লিফলেট যোগেনকে পাঠিয়েছিল, সে সেইগুলি নিয়েই নাকী বাগেরহাট গিয়েছিল। সেখান থেকে ফিরে সে যোগেনের কাছে গিয়ে প্যাকেটটা দেয়। যোগেন ইস্তাহারটা পড়ে একটু অবাক হয়। সে এটার বিন্দুবিসর্গও জানে না। প্যাকেট বাঁধা হয়ে গেছে যখন-তখন নিশ্চিয়ই প্রুফ দেখতে পাঠায়নি—ছাপা হয়ে বেরিয়ে গেছে। বেরিয়ে গেলেও যোগেনের হাতে বা চোখে পড়েনি, সেটাই আশ্চর্যের। যোগেন জিজ্ঞাসা করে, 'এগুল্যা আপনাকে কে দিল?'

'দিল কংগ্রেসের সুধন্যদা। বলল, এগুলো আপনার এখানে দিয়ে যেতে—।'

'মানে, এগুলো সুধন্যরই দেয়ার কথা ছিল?'

'সে আমি জানি না। কিন্তু হওয়াটাই স্বাভাবিক।'

'কেন? স্বাভাবিক কেন?'

'আমাকে যে পাবেন, তা তো সুধন্যদার জানা ছিল না।'

'আপনাকে পেয়ে আপনার হাতে গছিয়ে দিল?'

'গছিয়ে বলাটা ঠিক হবে না। আমাকে পেলেন, আমাকে দিলেন। আমাকে না পেলে আর-কাউকে দিতেন। ওঁকে হয়তো কাউকে দিয়ে পাঠানোর কথাই বলা হয়েছিল।'

'কে বলেছিল?'

'যারা বলে, তারা কেউ।'

'আপনার কি জিলা অফিসে কাজ ছিল?'

'জিলা অফিসে না। সুধন্যদার কাছে। ভাবলাম—সুধন্যদাকে বলে যাই—'

'কোথায় যাবেন? যাচ্ছিলেন?'

'বাগেরহাট। সেটা তো প্রথমেই বলেছি। তার ওপর যখন প্যাকেটটা দিলেন, তখনো বললাম, আমি তো বাগেরহাট যাচ্ছি। সুধন্যদা রেগে বললেন, বাগেরহাটে যেতে-যেতে এগুলো কি যোগেনবাবুকে দিয়ে যাওয়া যায় না?'

'এ প্রশ্নের তো হ্যাঁ-বিনা কোনো উত্তর হয় না। আমিও বললাম হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাগেরহাট থেকে ফিরতে-ফিরতেও দেয়া যায়। সুধন্যদাও বললেন, 'তাই দিয়ো, ফিরতে-ফিরতে? এখন আমার মনে হচ্ছে—সুধন্যদার কথাতে কি ঠাট্টা ছিল!' আসলে হয়তো উনি চাইছিলেন, তখনই ওটা পৌঁছে দি। আমি ওঁর চাওয়াটা আন্দাজ করিনি কিন্তু আমার পারাটা আন্দাজ করলাম শুধু নিজের কথা ভেবে। সেটা খুবই অন্যায় হয়ে গেল। না?'

'মানে, ভোটের মুখোমুখি দিন-দুই-তিনে তো বুঝতে হয় কে কোথায় দাঁড়ায়। আমারই লিফলেট, আমিই জানি না। ছাপার আগেও না। পরেও না।'

'ছাপার আগেও কি সুধন্যদা—?'

যোগেন একটু হেসে বলে, 'ছাপার আগেও কি বাগেরহাট?'

যোগেন লিফলেটটা নিয়ে স্বস্তি পাচ্ছিল না। চেষ্টা করছিল—একটু আনমনা হয়ে যেতে। কিন্তু অস্বস্তিটা যাচ্ছিল না। শেষে সে এলগিন রোডেই গেল, সকালে। সুভাষবাবু ওপরে ছিলেন, তাঁকে নীচে নামতে বলল না, যোগেনকেই ওপরে যেতে বলল—এ-বাড়ির বা এই দুই বাড়ির সকলেই যোগেনকে চেনে জানে।

সুভাষবাবু বসেছিলেন, সিঁড়ির বাঁ-হাতি ঘরে। এ-বাড়িতে ওখানেই বসেন। যোগেনকে হেসে বললেন, 'ভোটের আগেই ভোটে জিতে এলেন না কী। সবাই তো বলছে তাই'।

লিফলেটের কথা যোগেন খুব সাবধানে তোলে। সুভাষবাবু না ভেবে বসেন, সে নালিশ জানাচ্ছে। সুভাষবাবু সেই ভুলটাই করলেন, 'আরে, যে-পুজোয় যে-মন্ত্র লাগে। ভোটের সময় প্রার্থীর একটা আবেদন ছড়ানো হয়। কারো হয়তো খেয়াল হয়েছে—আপনারটা করা হয়নি। করে দিয়েছে। ভালোই তো করেছে, ড্র্যাফট, কাউকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছে। ভালোই—'

যোগেন হেসে ফেলে বলে, 'একটু বেশি ভাল না? আমার পক্ষে? মানায় না য্যান—'

'যোগেনবাবু, এর মধ্যে মানানো-অমানানোর কী আছে? এগুলোকে এত সিরিয়াসলি নেবেন না। আপনার আপত্তি আছে কোনো কথা? নাকী কোনো কথা দেয়া হয়নি। সেসব ঠিক করে আর-এক লট ছেপে নিলেই হয়।'

'আর-এক লট ছেপে নিলেই যদি ভ্রম-সংশোধন হইত তাইলে তো সেই সামান্য ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা কইব্যার আইসত্যাম না। আমি তো রাজনীতিই করি। আপনারে যে নেতা মান্য করি সেও তো আপনে সাবেক কংগ্রেসি থাকেন নাই বইল্যা। শিডিউল কাস্ট মুভমেন্টে তো একটা আলাদা কথা আছে—পুরনোদের থিকেও আর নতুনদের থিকেও আলাদা। এখনো হয়ত সবাই খেয়াল করে নাই। কিন্তু সকলের খেয়ালে আনার জন্য আমিও তো তৈরি হচ্ছি। এই লিফলেটটায় আমার সেই আলাদা ধারণাটা লেখা হয় নাই। সেটা লেখা সম্ভবও নয়। কিছু না লিখলেই হত। অখণ্ড হিন্দুসমাজ তো বিষয় না। ফলে, আমার বিরোধী ধারণাটাই লেখা হয়েছে।'

সুভাষ হেসে ফেললেন, 'এখানে কি আপনি পলিটিক্যাল কনসেপ্ট খুঁজছেন? যাকে দিয়ে লেখানো, সে কি আপনার কনসেপ্ট জানে? যা বললে ভালো শোনায়, তাই বলেছে'।

'আমাকে একবার দেখ্যায়া নিলেই হত।'

'ক্যানডিডেটকে স্পেয়ার করতে চেয়েছে। আচ্ছা, আমাকে বলবেন আপনার কোন্ কনসেপ্টগুলি নিয়ে খুঁতখুঁত লাগছে? আমারও তো খুব স্পষ্ট করে জানা নেই। আমরা তো একটা লিফলেট দেব। তখন যদি কিছু করা যায়,' সুভাষ হাত বাড়িয়ে একটা পেন্সিল নিয়ে লিফলেটটার ওপর রাখলেন।

'যোগেনও লিফলেটটা পড়তে-পড়তে বলে, 'মুখে বলতে গেলে এত পেটি শুনায়! তবু, ধরেন 'দেশের স্বাধীনতা'র জন্য 'দেশের ও দশের সেবা' করার কোনো 'সাধ্য'ই আমার 'সাধ্যানুসারে' নয়। আমার কোনো 'ত্যাগস্বীকার'ও নাই। আমার আছেটা কী যে ত্যাগ করব?'

'যোগেনবাবু, আপনি যে-সমাজ থেকে নিজের চেষ্টায় উঠে এসে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সেটা কি দেশের কাজ না?'

'ও তো আপনি সাজায়্যা বলছেন। যাক, ছাড়্যা দেন। কিন্তু আমি তো কখনো 'শক্তিশালী অখণ্ড হিন্দুসমাজ' গঠনের চেষ্টা করি নাই। আমি তো অখণ্ড কংগ্রেসকেও হিন্দু-কমিউন্যাল সংগঠন মনে করি। ঐ বাড়িতে বছর দুই আগে গান্ধীজির সঙ্গে আমাদের মিটিঙে আমি তো গান্ধীজিকেই বলছিলাম। আমি তো মনে করি, তপশলিদেরে নিজেদের পার্টি তৈরি করতে হবে যা কংগ্রেস থিকে আলাদা তপশিলিদের নিজেদের ধর্ম তৈরি করতে হবে, যা হিন্দুধর্ম' থিকে আলাদা। আবার বলা হয়েছে, 'বর্ণহিন্দু হইতে অনুন্নত হিন্দুকে (তপশিলভুক্ত সম্প্রদায়) পৃথক করার যেসব প্রচেষ্টা ব্যবস্থা-পরিষদে যখনই হইয়াছে, আমি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছি'—বরং উলটাটা ঠিক, 'এক করার যেসব প্রচেষ্টা হইয়াছে, আমি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছি'। অ্যাসেম্বলি রেকর্ডসে তো সেসব আছে। প্রতিপক্ষ যদি সেসব তুল্যা লিফলেট ছাড়ে—'

সুভাষ চুপ করে থেকে তাঁর পেন্সিলটা ঠোঁটের ওপর বোলাল। একটু চুপচাপের পর সুভাষ যোগেনের দিকে না তাকিয়ে, বাঁ-চোখটা একটু কোনাকুনি ফেলে বলেন, 'আপনার এই রাজনৈতিক মত কি কোথাও প্রকাশ করেছেন?'

'একেবারে এই পয়েন্টটাই অ্যাডড্রেস করি নাই হয়ত। কিন্তু এইডা তো আমার নিজের অভিজ্ঞতায় অর্জিত বিশ্বাস—'

'নিজের অভিজ্ঞতায়, মানে বিয়িং এ শূদ্র?'

'তাছাড়া আমার অভিজ্ঞতা কী হবে?'

'তা হবে না কেন? ধরুন, একজন মানুষ হিন্দুও নন, মুসলিমও নন—কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা নিয়ে তাঁর তো একটা নিরপেক্ষ ভাবনা থাকতে পারে। বর্ণহিন্দু বা শূদ্রহিন্দু না হয়েও তো এদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে কারো একটা মত থাকতে পারে। বেশিরভাগ অ্যাকাডেমিশিয়ানেরই মত সেই নিউট্রালিটি থেকে তৈরি।'

'বা, অনেকেই সেই নিউট্রালিটির আড়ালে নিজের মতটাই প্রতিষ্ঠা করেন। আমাদের স্বজাতের মধ্যেই বেশি।'

'কিন্তু আপনার মতটায়, আপনি বলছেন, আপনি পৌঁছেছেন থ্রু ইয়োর বিলংগিং টু দিজ ইয়ারমার্কড আনটাচেব্‌ল কাস্টম। এটা কোনো মত নাও হতে পারে। এটা শুধু একটা অনুভূতিও হতে পারে। অনুভূতি থেকে ধারণা তৈরি হতেও পারে, নাও পারে। ধারণা থেকে মত তৈরি হতেও পারে, নাও পারে। মত থেকে অ্যাকশন তৈরি হতেও পারে, নাও পারে। কিন্তু আপনি যে বিলংগিং টু দ্যাট কাস্টকেই রাইট টু অ্যাক্ট বলে জাহির করেননি, সেটাই আমার কাছে দরকারি। আর সেটা এটাও প্রমাণ করে আপনি হঠকারিতা করতে চান না। এটা আমার কাছে খুব বড় কথা। যাতে, যখন অ্যাক্ট করার সময়, তখন দ্বিধা না আসে। আমার তো মনে হয় আম্বেদকার অ্যাক্ট করছে উইদাউট এক্সপিরিয়েন্সিং, ফিলিং, কনসিভিং, পলিটিক্যালাইজিং। এসব ছাড়াই অ্যাকশনে নেমে পড়েছে। ফলে, ওকে সবসময়ই সাহায্যের হাতের জন্য নিজের হাত বাড়িয়ে রাখতে হয়। সে ইংরেজের হাতই হোক আর কমিউন্যাল হিন্দু-মুসলিম লিডারদের হাতই হোক।'

'মনে হয়, আপনি ঠিকই বলছেন. তবু, যেহেতু কথাটা মনে চইড়্যা ফেরে, তাই কোথাও

এইডা কয়্যা থাকতেই পারি। বিশেষ কইর‍্যা যশোর দাঙ্গার উপর অ্যাসেম্বলিতে।'

সুভাষ একটু হেসে বলেন, 'এটা আমাকে বিশ্বাস করতে বলবেন না। মেজদার কাছে তো আপনার আর্গুমেন্টের কথা শুনেছি। আপনি যা বলতে চান না, সেটাই বলে ফেললেন, এটা হতে পারে না।'

'তখন মন-মাথা দুইটাই বিগড়াইছিল। আমি বলছিল্যাম, রায়ট যশোরে হচ্ছে না, হচ্ছে কলকাতার খবরের কাগজে। তপশিলিরা আর উচ্চবর্ণের হিন্দুদের জীবনরক্ষার দায়িত্ব নেবে না।'

'এর মানে তো এও হতে পারে যে আপনি উচ্চবর্ণ হিন্দুদের স্বাবলম্বী হতে বলছেন। সে তো বলতেই পারেন। আপনি আপনার পোলিটিক্যাল লাইনটা স্পষ্ট করেননি কেন? আপনার কমিউনিটির কাছেই।'

'করি নাই যে তার প্রধান কারণ আমার পক্ষে সুবিধার সময় পাই নাই। দ্বিতীয় কারণ, আগে তো আমার কমিউনিটির বিশ্বাস তৈরি করতে হবে। এখনো তো নমশূদ্র নেতা বলতে মল্লিক ব্রাদার্স, রায়চৌধুরীরা, ঢাকার মোহিনী দাশ, বিরাট মণ্ডল, রসিকলাল! পি আর ঠাকুরকে মানা শুরু হইছে—সে তো হরিচাঁদ-গুরুচাঁদের বংশের লোক, তদুপরি বিলেতফেরতা। আমি যে কর্পোরেশনে খাড়াইতে রাজি হইল্যাম, সেটা আপনার ও প্রোফেসরসাহার কথাতেই নিশ্চয়, তবে, আমার একটু যাচাই করার ছিল যে আমার নামটাই অটোমেটিক্যালি উঠে আসে কী না—'

'তাই তো হল। একজনও তো অন্য কোনো নাম বলেননি সেদিন। যাকে বলে সর্বসম্মত।'

'আপনারাই তো আমার নাম কইর‍্যা দিলেন। আপনারা কইলে কেউ 'না' কইতে পারে?'

'তাহলে এটুকু তো প্রমাণ হল যে কেউ বলে দিলে আপনার নামে কেউ আপত্তি করবে না।'

'সে ভবিষ্যতে দেখা যাবে। কিন্তু এখন আমার লক্ষ, কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ভোটে জেতা আমাদের সমাজে আমার বরিশাল-জেতার থিক্যা উচ্চতর জেতা মনে হবে। আমার পলিটিক্যাল লাইন প্রতিষ্ঠার দিকে আমি আর-এক ধাপ আগাব। কিন্তু যার জন্য এত, সেই পলিটিক্যাল লাইনটাই তো এই লিফলেট উলট্যাইয়া দিল। তখন তো লোকে বলবে, তুমিই-না বলেছিলে অখণ্ড হিন্দুত্বের কথা।'

'হ্যাঁ। বলেছিলাম। হিন্দুরা যদি অখণ্ড না থাকতে চায়, আপনি কী করে অখণ্ড রাখবেন? তখন কত অখণ্ড স্টেজে আসবে। সিচুয়েশন কত দ্রুত বদলায়, দেখছেন তো? এখনকার অবস্থায় যদি এই ইলেকশনে তপশিলিরা হিন্দুদের থেকে আলাদা বলতেন, তাহলে কাস্ট হিন্দু ভোট পেতেন? তবে, নিশ্চয়ই না-দিলেও চলত হয়ত।'

যোগেন চুপ করে গেল। ওর যেমন অভ্যেস, একটু হাসি ঠোঁটে লাগিয়ে রেখে হাঁটু দোলাতে লাগল। তারপর হঠাৎ একটু জোরেই বলল, 'এ-বাড়িতে কি শুধুই পলিটিকস হয়? অতিথ-আপ্যায়ন কি উইঠ্যা গেল? তাইলে ঐ বাড়িতেই যাই।'

সুভাষ তাড়াতাড়ি চেয়ার থেকে উঠতে গেলেন, 'সে কী? সত্যিই তো!'

কিন্তু যোগেন তাঁকে উঠতে বাধা দিয়ে বলল, 'এর মধ্যে আপনার তো কোনো পার্ট নাই। কেউ কি জানে যে আমি আসছি।' এ-বাড়ি তো দুর্গের মতন। দ্যাখেন, ঠিকই আহার্য আইস্যা যাবে।'

সুভাষের এক ভাইঝি, গীতা, সে ছুটে এসে যোগেনকে দেখে জিভ কেটে উলটো দৌড় দেয়। দৌড়তে-দৌড়তেই চেঁচায়, 'চা দিচ্ছি'।

যোগেন তার সেই নিজস্ব হাস্যরেখার সঙ্গে নিজেরই পায়ের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আপনে একবার বরিশাল চলেন। কাউকে খবর না দিয়ে গেলে আরো ভাল। তবে আপনার চেহারা তো! বেশিক্ষণ লুকায়্যা রাখা যাবে না। তবু যদি একটু পারা যায়।'

'কেন? লুকিয়ে যেতে হবে কেন?'

'শুধু এইটুক চোখে দেইখতে যে আমাগ দ্যাশের মানুষ কতটা কষ্ট মুখ বুজে কাটায়। তার উপর এই উচ্চবর্ণের অত্যাচার। মানুষজন কী কইর‍্যা বাঁইচ্যা থাকে—এটাই যেন রহস্য'।

'দেশ বলতে কি আপনি বরিশালই বোঝাচ্ছেন'।

'বলছি যখন, তখন হয়ত মনের অভ্যাসে তাই ভাবছিল্যাম কিন্তু বলতে-বলতে মাথার নতুন অভ্যাসে ভাইব্যা ফেললাম—আমাগ পুরা দ্যাশটার কথাই। এডা আপনার সঙ্গগুণ। সব জায়গাতেই তো এক কষ্ট। বরিশালই-বা কী আর আম্বাবাদই-বা কী?'

ইস্তাহারে যোগেনপক্ষ

১৩২

দু-দিনের মধ্যে উত্তর কলিকাতা জিলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সুরেশ মজুমদার ও সম্পাদক হেমন্ত বসুর নামে একটা লিফলেট বেরল। যোগেনের প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দুসভার রাধানাথ দাসের বিরুদ্ধে আক্রমণ। প্রসঙ্গ সেই পুরনো ইস্তাহার—ডায়মন্ড প্রিন্টিং হাউস ও ত্রিগুণা গুপ্ত। যোগেনের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের যে-ইস্তাহারটিকে আগে মূল্য দেয়া হয়নি। তাতে রাধানাথবাবুর কথাটাই প্রধান হয়ে উঠল। 'নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যখন রাধানাথবাবু বুঝিতে পারিলেন যে তাহার জয়লাভের বিন্দুমাত্র আশাও নাই, তখনই তিনি যোগেন্দ্রবাবুর বিরুদ্ধে হীন ও কাপুরুষোচিত মিথ্যা প্রচার কার্য আরম্ভ করিলেন।' আরো লেখা হল, 'রাধানাথবাবু ত্রিপুরী কংগ্রেসে সভাপতি নির্বাচনে দেশগৌরব বাংলার প্রাণ শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়কে ভোটপ্রদান না করিয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী সুদূর মাদ্রাজ প্রদেশের অধিবাসী ড. পট্টভি সীতারামাইয়াকে ভোট দিয়াছিলেন।'

এর পরদিনই ছাড়া হল সুভাষের ছবি সহ তাঁর আবেদন।

আগামী মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে
৩ নং ওয়ার্ডের করদাতাগণের নিকট
দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের আবেদন—

আগামী কর্পোরেশন কাউন্সিলার নির্বাচনে ৩ নং ওয়ার্ড হইতে শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী (বর্ণহিন্দু) ও শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল (তপশিলভুক্ত সম্প্রদায়) কংগ্রেসের পক্ষ হইতে প্রার্থী-মনোনীত হইয়াছেন। এ বৎসর ৩ নং ওয়ার্ড হইতে একজন বর্ণহিন্দু ও একজন তপশিলভুক্ত নির্বাচিত হইবেন। শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী ৩ নং ওয়ার্ডে সুপরিচিত। তিনি বর্তমানে কর্পোরেশন কংগ্রেস দলের একজন বিশিষ্ট সভ্য। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ওয়ার্ডের করদাতাগণের নিকট প্রত্যক্ষভাবে সুধীরবাবুর ন্যায় পরিচিত না হইলেও ইঁহার নাম করদাতা গণের নিকট অপরিচিত নয়। বর্তমান বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে তিনি প্রথম হইতেই সংশ্লিষ্ট আছেন এবং তাঁহার কার্যদ্বারা পরিষদে কংগ্রেসের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন। গত বৎসর বহু

প্রলোভন সত্ত্বেও তিনি বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করিয়া বিশেষ নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছেন। বর্তমানে বাংলার প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রিমণ্ডলী ও ইংরেজ ব্যবসায়িগণ কলিকাতা কর্পোরেশনে কংগ্রেসের ও জাতীয়তার প্রভাব নষ্ট করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। গত বৎসর ব্যবস্থা পরিষদে যখন কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল সংশোধিত আইন পাশ হয় তখন তাঁহাদের এই মনোভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। আমি আশা ও প্রার্থনা করি ৩ নং ওয়ার্ডের করদাতাগণ ও যুবকসম্প্রদায়—যাঁহারা এ যাবৎকাল কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছেন—তাঁহারা আজ কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হইয়া কংগ্রেস প্রার্থীদের জয়যুক্ত করিয়া জাতীয় আদর্শের সম্মানরক্ষা করিবেন।

বন্দেমাতরম

৩৮/২ এলগিন রোড (স্বা:) শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু
কলিকাতা

যোগেন এই ইস্তাহারটি পড়ে খুশি হল ও মনে-মনে হাসল। সুভাষবাবুর স্বাক্ষরিত ইস্তাহার অথচ কোথাও তিনি 'তপশিলি সংরক্ষিত' বা 'তপশিলি হিন্দু' শব্দটি ব্যবহার করেননি। বরং একটু ভুলভাবেই 'বর্ণহিন্দু' কথাটি সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী-র আসনজ্ঞাপক শব্দ হিশেবে ব্যবহার করেছেন ও যোগেনকে বলেছেন '(তপশিলভুক্ত সম্প্রদায়)', যেন শব্দটি যোগেনের পরিচয়জ্ঞাপক।

পরেরদিনই ৩ নং ওয়ার্ডে মিছিল বেরবার কথা। বঙ্কিমবাবু, নীহারেন্দুবাবু, আবদুল হালিম তাঁদের মিছিল নিয়ে এসে হেদোতে দাঁড়াবেন আর ওয়ার্ডের মিছিলগুলি এসে তাদের নিয়ে ওয়ার্ড ঘুরবে।

যোগেনের কিছুই করার ছিল না। সে তো আর কোথাও থেকে মিছিল আনতে পারবে না—মিছিলের শেষে হয়ত কেউ ডেকে কিছু বলতে বলবে। মিছিলটিছিল যারা সাজাচ্ছে, তাদের চলাফেরা দৌড়ঝাঁপ দেখেই বোঝা যায় তাদের দক্ষতাও আছে, অভিজ্ঞতাও আছে। তার পার্কের মালিকে বুঝিয়েসুঝিয়ে মেইন গেটটা খুলিয়ে সেখানে একজন স্বেচ্ছাসেবক দাঁড় করাল যাতে গেট ফাঁকা পেয়ে গরুছাগল ঢুকে না পড়ে। বাইরে থেকে যে-মিছিলগুলি আসবে সেগুলি ঠেলাগেট ঠেলে ঢুকতে গেলে মিছিল ভেঙে যাবে। বা, তাদের রাস্তায় দাঁড় করিয়ে পার্কের ভিতরের মিছিল বাইরে এনে মেশাতে গেলেও ঠেলাগেটে ঠেকে ভেঙে যাবে। যোগেন তো কখনো মিছিল সাজায়নি—সে এই তৎপর কল্পনাশক্তি দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল।

শাদা কাপড়ের ওপর বড় করে লেখা সুধীরবাবুর নাম, যোগেনের নাম, কংগ্রেসের নাম, বাঁদিকে সুভাষের একটা ছবি আঁকা, নীচে বড়-বড় করে 'ভোট দিন।'

এক ভদ্রলোক এসে যোগেনের হাতে বেশ বড় একটা প্যাকেট ধরিয়ে দিয়ে, 'মিছিলে যাবে', বলে চলে গেল—মুখচেনা যোগেনের। যোগেন দেখে সেটা একটা নতুন ইস্তাহার, (স্বা) সুভাষচন্দ্র বসু।

দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের বিবৃতি
কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী

৩ নং ওয়ার্ডের হিন্দুসভার সম্পাদকমহাশয়ের ইস্তাহারে একথা লিখিত হইয়াছে যে, ''কংগ্রেস এবার কর্পোরেশন নির্বাচনে বিরত হইয়াছে।" এ কথায় আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি। জানি না সম্পাদকমহাশয় শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী ঘোষ এমএ (ক্যানট্যাব) কোথা হইতে এ সংবাদ পাইলেন। হিন্দুসভার মনোনীত পদপ্রার্থীরা (অর্থাৎ ডা. গিরীশচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত রাধানাথ

দাস) বঙ্গীয়-প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির নিকট মনোনয়নের জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন। কংগ্রেস কর্তৃক মনোনীত না হওয়াতে তাঁহারা হিন্দুসভার মনোনয়ন প্রার্থী হন এবং এখন হিন্দু মহাসভা কর্তৃক মনোনীত হইয়াছেন। তাঁহাদের দিক দিয়া এইরূপ ইস্তাহার কেন জারি হইয়াছে যে, "কংগ্রেস এবার কর্পোরেশন নির্বাচনে বিরত" হইয়াছে তাহা আমাদের ধারণার অতীত। যাহা হউক, সমগ্র কলিকাতাবাসী এ কথা জানেন যে, বাঙ্গলার কংগ্রেস এই নির্বাচনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং তার জন্য সমস্ত আয়োজন চলিতেছে। কলিকাতাবাসী এ কথাও জানেন যে 'ওয়ার্কিং কমিটি' কর্তৃক নিযুক্ত 'এড হক কমিটি' বাঙ্গালীর এবং বাঙ্গলার অনুমোদিত কংগ্রেস নয়। সুতরাং 'এক হক কমিটি' বা 'এড হক কমিটি'র সমর্থকদের কোনো ইস্তাহার কংগ্রেসের ইস্তাহার নয়। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে 'এড হক কমিটি'র সমর্থকেরা এখন হিন্দু মহাসভায় আশ্রয় পাইয়াছেন। আমি আশা করি, ৩ নং ওয়ার্ডের ভোটারগণ কংগ্রেস মনোনীত পদপ্রার্থীদিগকে ভোট দিয়া জয়যুক্ত করিবেন। কংগ্রেসের জয় মানে জনসাধারণেরই জয়।

(স্বা:) শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু
১২/৩/৪০

তারিখ দেখে, যোগেন ভাবে, এটা কি আগেই বেরিয়েছে? সে তো পায়নি। কে জানে? এটাও হয়ত ভায়া বাগেরহাট এসেছে! তবে, সুভাষবাবু হয়ত সই করার তারিখ দিয়েছেন, প্রেস আর বদলায়নি।

১৩৩

যোগেনকে নিয়ে মিছিল

দেখতে-দেখতে হেদুয়া পার্ক ভরে গেল মিছিলের মানুষে আর মিছিলের রঙে। কংগ্রেসের জাতীয় পতাকাই বেশি—লালঝাণ্ডাও ছড়িয়েছিটিয়ে আছে। সেগুলিতে শাদা ফেস্টুনে কারখানার নাম লেখা। স্লোগান উঠছে টানা সুরে—'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস—জিন্দাবাদ,' 'কংগ্রেস-সভাপতি সুভাষচন্দ্র—জিন্দাবাদ'। জিন্দাবাদ এসে গেছে। 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'। 'বন্দেমাতরম'। 'বাংলাদেশে অ্যাড হক লাই। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস—জিন্দাবাদ।'

এর মধ্যে কখন যে লাইন সাজানো হচ্ছে, যোগেন খেয়ালই করেনি। হঠাৎ কে এসে হাত ধরে টেনে দৌড়ে-দৌড়ে তাকে মিছিলের মাথায় দাঁড় করিয়ে দেয়। সামনে-পেছনে-দু-পাশে তাকিয়ে যোগেন দেখে—হেমন্ত বোস, সুধীরবাবু, নৃপতিবাবু, আর-একজন গলায় মালায়, ডাক্তার রহমান, দু-জন মহিলা, আরো একটু দেখতে যোগেন পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে খাড়া হলে দেখে—শরৎ বোস, মাথায় গান্ধীটুপি।

যোগেন কখনো এমন মিছিল সাজায়নি বা এমন মিছিলে হাঁটেনি। মিটিং করেছে—ছোটবড়। হাটে-হাটে ঘুরে অপ্রস্তুত মিটিং করেছে। গ্রামে-গ্রামে ঘুরেছে কোনো একটা ঘটনা আটকাতে বা বাধাতে বা কোনো একটা রটনা যাচাই করতে বা লোকজনকে কোনো একটা কাজে জড়ো করতে। মিটিঙে তার বক্তৃতার খুব নামডাকও আছে। তার গলার জোরের জন্য বা তার রসিকতার জন্য বা সে হঠাৎ-হঠাৎ গান গেয়ে ফেলার জন্য। সেসব তো তার একার দোষ বা গুণ। যোগেন

এমন করে কোনো মিছিল কখনো তোলেনি যে-মিছিলে শরৎ বোসের মত বড় নেতা আর চামারবস্তির অচ্ছুৎরা একইসঙ্গে হাঁটছে একটাই উদ্দেশ্যে। কর্পোরেশনের ভোটে সুভাষ বোসের প্রার্থীরা জিতে যেন কর্পোরেশনের দখল নিতে পারে। পারলে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে যোগ্য শাস্তি দেয়া হবে। পারলে, বিপিসিসি হয়ে দাঁড়াবে এআইসিসির বিকল্প। পারলে, কংগ্রেস হাইকম্যান্ড কর্তৃক নিযুক্ত অ্যাড হক কমিটি উপে যাবে। এগুলি তো এমন স্পষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যার সঙ্গে যোগেনের কোনো সম্পর্কই নেই। সে কংগ্রেস করে না। কংগ্রেস কর্পোরেশন দখল করল কী করল না তাতে তার কিছুই যায়-আসে না। সে যা চায়—তপশিলি জাতগুলির স্বাতন্ত্র্য ও সম্মান—এই মিছিল তা তাকে দিতে পারবে না।

কিন্তু মিছিলটায় যখন তাকে ভোট দেয়ার জন্য সকলে মিলে ছন্দে-ছন্দে গানের মত করে সুর তুলছে, তাকে ভোট দিয়ে জেতাতে বলছে, যখন মিছিলের সামনে তাকে রাখা হয়েছে যাতে চেনা যায় সে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল এই মিছিলের একজন চালক, রাস্তার দু-পাশের বাড়িগুলির তিনতলা ও তার চাইতেও উঁচু বারান্দায় জড়ো মানুষজন তাদের দিকে হাত নাড়াচ্ছে, যখন এই বাসরাস্তা ট্রামরাস্তার পুরো দখল নিয়ে মিছিল চলছে, যেন রাস্তাটা খাড়া হয়ে আকাশের দিকে উঠে গেছে, যখন এই মিছিলের এই মাথা থেকে যে-রাস্তা সে প্রতিদিন পেরয় সেই রাস্তাটার শেষপর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, যেন সেটাই তাদের যাওয়ার জায়গা, সিঁড়ি বেয়ে আকাশে ওঠার জায়গা, রামধনু ওঠার জায়গা, রামধনু বেয়ে আকাশে ওঠার জায়গা, বরিশালের জোয়ার-ভাঁটা খেলা খালগুলোর ওপর দিয়ে যে-রামধনু ছড়িয়ে পড়ছে, কীর্তনখোলার ঢেউগুলির ওপর দিয়ে নেচে-নেচে ভেসে যায়,

বিলের জলেমাটিতে
কোমর পর্যন্ত ডোবা
শূদ্র মানুষ
দুই হাতের মুঠোয়
অন্নপূর্ণার ধান নিয়ে
হাসে,
আর
পাছে তার ছোঁয়া লাগে
ভয়ে
শাস্ত্রগুলো
শুধু
পেছন দিকে গোড়ালি ঘুরিয়ে
দৌড়য়
তাদের খাঁচার দিকে,
আর এই মিছিল এই মিছিল
জেগে উঠেছে
শীতঘুম-ভাঙা
রাস্তার মত,
আমাদের কোনো মালিক নেই,
কারণ, আমাদের কোনো জমি নেই,

কারণ, আমরা শূদ্র,
কারণ যার জমি থাকে
সে শূদ্র নয়,
কারণ যে শূদ্র
তার কোনো জমি থাকে না
যা কাঠা বা বিঘা বা হাল দিয়ে
মাপা যায়, কারণ
শূদ্রের থাকে শুধু দেশ
তার মাটির ঘাস থেকে
শূদ্ররা ছড়িয়ে পড়ে

মিছিলটা শুধু ৩ নম্বর ওয়ার্ডটাই ঘুরল। এত বড় একটা মিছিলের পক্ষে ৩ নম্বর ওয়ার্ড আর কতটুকু, ভিতরের রাস্তাগুলিত যদি ধরা যায়। কর্পোরেশন ভোটে এত বড় ও রংচঙে মিছিল হয় না। হল—যোগেনের জন্য। আইনসভায় তার বন্ধু—বঙ্কিমদা, নীহারেন্দুবাবু, শিবনাথবাবু, আইনসভার বাইরেও ভুপেশবাবু, এঁরা যোগেনের জন্য মিছিল তুলে এসেছেন। তারা ৩ নং ওয়ার্ডের ভোটার নয়। অথচ তারাই সত্যি-সত্যি বলে গেল—যোগেন শুধু ৩ নং ওয়ার্ড নয়। তাহলে যোগেন কী? যোগেন মণ্ডল?

যোগেন জানে—সবকিছুরই কারণ আছে। সে সত্যিই নিমিত্তমাত্র। কিন্তু কোনো-কোনো মুহূর্ত তো এমন আসে যে নিমিত্ত ভাবতে চায় সে-ই কারণ, সে-ই নিয়তি। তখন তো তার কারণ খুঁজতে ইচ্ছে করে না, বোধহয় পারেও না কারণ খুঁজতে। যোগেন মণ্ডল এখন নিজের এই উপলব্ধিতে মাখামাখি হতে চায়—সে, যোগেন মণ্ডল, সেই বেদের আমল থেকে শূদ্র, চণ্ডাল, চতুর্বর্ণের মধ্যে তাকে রাখা হয়েছে তারপর তলিয়ে দেয়া হয়েছে অতল অস্পৃশ্যতায়, সে, যোগেন মণ্ডল, নমশূদ্র, সে-ই এই মিছিলের নায়ক ও মিছিলের অনুগামী। মিছিল টলিয়ে দেবে চতুর্বর্ণের ভারসাম্য, যদি চতুর্থ থেকে অনুগত বর্ণগুলি বেরিয়ে আসে ভারসাম্যের সেই নির্মাণ থেকে।

যোগেন এক আবৈদিক চণ্ডাল, আত্মরক্ষা করতে-করতে হাজার-হাজার বছর ধরে তার অনুভব আর অনুমানের ক্ষমতা হয়ে উঠেছে মানব-বিবর্তনের বিপরীত। তার মানুষের মতই মাথা আছে। সেই মাথা দিয়ে সে ভাবতেও পারে বটে। কিন্তু সে বেঁচে থাকে পশুর মত অনুভব ও অনুমানের ক্ষমতায়। চণ্ডাল জানে, কত আপদ মিশে একটা ঘটনা হয়। চণ্ডাল জানে, ঘটনাটা ঘটে গেলে আর কতকগুলি হঠাৎ-যোগাযোগের ফল মাত্র থাকে না সেই ঘটনা। ঘটনাটা তখন স্বাধীন হয়ে যায়। চণ্ডাল জানে, তখনই, ঠিক তখনই, তাকে যুক্তিশাস্ত্র শেখানো হবে। শেখানো হবে আপতিক আর নিত্যের দ্বন্দ্ব ও তফাত। চণ্ডাল জানে, সে যদি গুরুদক্ষিণা দিতে অস্বীকার করে, মাত্র একবার, সে যদি হরিজনের মিথ্যা পদবী ফেলে দিতে পারে, মাত্র একবার, সে যদি মন্দিরে প্রবেশাধিকার ফিরিয়ে দেয়, মাত্র একবার তাহলেই সে মুক্ত ও স্বাধীন। যোগেন তার ভিতরে মুক্তির পাখসাটের হাওয়া আর স্বাধীনতার আঁচ পায়। সে অস্থির হয়ে ওঠে। দুদিন পরের ভোট, ভেটের একদিন পরে গোনা হয়। যোগেন জিতেছে। ভোট পাওয়ার হিশেবে ওপর থেকে চার নম্বর।

সুভাষসহ বরিশালে

১৩৪

যোগেনের জেতায় সুভাষবাবু বিশেষরকম খুশি হলেন কী না, সেটা বোঝার কোনো উপায় ছিল না। তাঁকে তো কর্পোরেশনের সবগুলি আসনই নজরে রাখতে হচ্ছিল। অলডারম্যানদের ইলেকশন আছে। তা নিয়ে দল পাকানো চলছে। তার ওপর কংগ্রেসের হেডঅফিসের সঙ্গে প্রতিদিনের যুদ্ধ এটা প্রমাণ করতে যে বাংলায় সুভাষছাড়া কোনো কংগ্রেস নেই ও হবে না। জেতার পর যোগেনের সঙ্গে প্রথম দেখাতে সুভাষবাবু একগাল হেসে বললেন, 'থাক, আপনাকে বরিশালছাড়া করা গেল।'

'কন কী? এইডা কি নেতার কাম? আমার ভিটামাটি উচ্ছেদ করার বুদ্ধিতে আমারে কইলকাতায় আইন্যা ফেলাইলেন? এহানে তো নিজের বলতে আমার একখান আস্ত ইটও নাই যে শিয়রে দিয়্যা শুব!'

'আপনাকে বরিশাল থেকে না-তুললে বরিশালে আমি ঢুকব কী করে? বরিশাল পুরোটা তো ভাগ করে নিয়েছেন হকশাহেব, সতীন সেন আর আপনি। যোগেনবাবু, চলুন-না বরিশালটায় দু-চারদিনের জন্য ঘুরে আসি।'

'সে তো আমাগ ভাগ্যি। কিন্তু এহন তো ভোলা হইয়্যা যাইতে হইব—'

'সে যেতে হলে তো অন্তত কিছু রিলিফ নিয়ে যেতে হয়। আপনাদের সেই হাঙ্গামা তো মিটে গেছে। সতীনবাবুকে নিয়ে। রিলিফ কমিটিতে।'

'সে আর হাঙ্গামা কী? আমি কলকাতায় ফির‍্যাই তো বরিশালের সুসন্তানের সন্ধানে বাইর হইল্যাম। আপনাগ আশীর্বাদে ও ঘরজামাইরাখা সম্মানের ঘটনা হওয়ায় বরিশালে এই অভাবডা একেবারেই নাই। বরিশাল যেমন বাংলার অন্নভাণ্ডার তেমনি সর্বাধিকসংখ্যক স্বর্ণগর্ভারও ভাণ্ডার। কিন্তু আমার বিপদ হল এমন সুসন্তান জোগাড় করা যাকে বর্তমান কুসন্তানগণের কেউ হোগায় কাঠি দিতে পাইরবে না।'

'সে আবার কী? বেশ তো বংশপরিচয় চলছিল, এর মধ্যে আবার কুসন্তান কেন?'

'কারণ, হিন্দুমহাসভা বরিশালে শিকড় গাইড়ছে।'

তারা য্যান সতীনদার মাসিপিসি। সতীনদারে রক্ষার দায়দায়িত্ব সবই তাগ। সতীনদা তো সন্ন্যাসী মানুষ, পিছন দিকে চোখ না মেইল্যা চলেন। ঐ হিন্দুমহাসভাগুলান যদি সতীনদার চেলা বইল্যা নিজেগ প্রচার করে, তাইলে তো সর্বনাশ। সুতরাং আমার এমন একজন বরিশাইল্যা সুসন্তান দরকার যে সতীন সেনরেও জানে, বরিশালরেও জানে, পটুয়াখালি-পোনাবালিয়া জানে, লাউকাঠিও জনে। ব্যস, কইলকাতায় আইস্যাই হাসেম আলি শাহেবকে সমস্ত বৃত্তান্ত কইয়্যা উদ্ধার চাইল্যাম। উনি তো মন্ত্রী। সেডাও বাধা হইব্যার পারে। তো হাসেম আলি শাহেব হাসেম আমি শাহেবের মতই জব দিলেন, আমারে কি সেক্রেটারি বানাইবার চান? আমি কইল্যম, হ্যাঁ, যদি না মন্ত্রী হওয়ায় কোনো অসুবিধা না ঘটে। উনি কইলেন—মন্ত্রী হওয়ার লোকের তো অভাব নাই। কেউ হইব, [illegible] আর আমি ভোলায় যাওয়ার পারব না—এ কী

হয়? তুমি জানাইয়্যা দ্যাও। আমি দুই-একদিনের মইধ্যে বরিশাল গিয়া সতীনদারে নিয়্যা ভোলায় যাব। আমি কইল্যাম, এতডা দয়াই যদি কইরলেন, আপনার লগে আমারেও নিয়্যা চলেন। আপনারে ভোলায় গস্ত করাইয়্যা আমিও অ্যাহন ভোলা ভুলি। কইব কী, সুভাষবাবু, পরের দিন সাতসকালে ফোন কইর্য়া কয়, আও, আইজ বরিশাল মেলে।'

'বাব্‌বা আপনিও তো কম কিছু নন। এর মধ্যে বরিশালে করছেন? তাহলে তো আমাকে যেতেই হয়। এত যদি হিন্দুমহাসভা হয়ে থাকে। কবে যাবেন? দু-চারদিনের মধ্যে চলুন। না-হলে আমি আবার আটকে যাব।'

১৯৪০-এর জুনে সুভাষকে নিয়ে যোগেন রওনা হল বরিশালে পৌঁছুতে। সুভাষের সঙ্গে আরো কয়েকজন ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন অবাঙালি। তাঁর সঙ্গে সুভাষ হিন্দিতেই কথা বলছিলেন। সুভাষচন্দ্র যে বরিশাল যাচ্ছেন এ-খবর কাগজে বেরিয়েছিল। সুভাষ তখন বাংলার বীর নেতা। রানাঘাট স্টেশনে যুবকরা ভিড় করেছিল—ট্রেন ঢুকতেই তারা স্লোগান দিতে শুরু করে—'বাংলার নেতা সুভাষচন্দ্র জিন্দাবাদ', 'বন্দেমাতরম', 'জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ'। কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলনের দৌলতে 'জিন্দাবাদ' তখন আন্দোলনের ধ্বনি হয়ে উঠেছে।

ট্রেন দাঁড়ালে দরজা খুলে যোগেনই সম্মুখে দাঁড়ালেন। তাকে দেখে আবার 'ভারতমাতা কী জয়', 'সুভাষচন্দ্র বোস জিন্দাবাদ'।

সুভাষ এসে যোগেনের পেছনে দাঁড়াতেই যোগেন নীচে নেমে যায়। এত মালা সুভাষের দিকে আসতে থাকে যে সুভাষকে অগত্যা ট্রেন থেকে নামতেই হয়। দেখতে-না-দেখতে গলার মালা তাঁর গলা ঢেকে দেয়। তাছাড়াও, অনেকেই হাতে ফুলের তোড়া দিচ্ছিল। স্টেশন মাস্টার তাঁর ইউনিফর্মে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে, আরো দু-জন গ্যাংম্যান, তাঁর সঙ্গে, তাদের পরনে নীল হাফহাতা জামা ও খাকি প্যান্ট এসে সুভাষের সামনে স্যালুট করে দাঁড়ান ও তারপরে নিচু হয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন। একজন গ্যাংম্যান একটা বিরাট হাঁড়ি গাড়ির ভিতরে তুলে দেন। সুভাষচন্দ্র হেসে বললেন, 'এত বড় হাঁড়ি—রেলকোম্পানি তো ভাড়া চাইবে। রানাঘাট কি হাঁড়ির জন্য বিখ্যাত?'

'না স্যার, এখানকার পান্তুয়া খেতে সবাই ভালবাসে।'

'ভালবাসে বলে এই একটা সিন্দুক ভর্তি—?'

ইতিমধ্যে ট্রেনছাড়ার ঘণ্টা পড়ল। প্রথম ঘণ্টাটির পর, অনেকগুলি ঘণ্টা বেজে ওঠার আগে যে একটা বিরতি থাকে সেটা যেন একটু বড়ই হল, তারপর ঢং-ঢং-ঢং-ঢং করে বেজে উঠল। কিন্তু ছাড়ার বাঁশি দিল ট্রেন সুভাষবাবু কামরায় ফিরে আবার সমবেত মানুষজনের হাত নাড়াবার পর। যোগেন তার আগেই কামরায় উঠে পড়েছিল—ওঠার সময় সুভাষবাবুর যাতে কোনো অসুবিধে না হয়।

তাঁর আসনে বসে সুভাষবাবু বললেন, 'যোগেনবাবু এমন হাঁড়ির ব্যবস্থা আর ক-জায়গায় করে রেখেছেন?'

অবাঙালি সেই সঙ্গী এবার ইংরেজিতে যোগেনকে জিজ্ঞাসা করেন, 'সারা বাংলার কি উনি এমনই ভালবাসার মানুষ। ওঁর সঙ্গে ঘোরাটা তো একটা অভিজ্ঞতা। এমন নেতাকে কংগ্রেস কী করে সরিয়ে দিতে পারে? উনি নিজেই তো একটা জাতীয় আন্দোলন।' তিনি তাঁর পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে যোগেনকে জিজ্ঞাসা করেন, এই জায়গাটার বানান কী?'

যোগেন একটু ঠাট্টা মিশিয়ে বলে, 'আপনার তো আরো অনেক বানান দরকার হবে। যাত্রা শেষে একসঙ্গে সবগুলো করে দেব।'

'উনি দক্ষিণ ইতালির একজন সাংবাদিক—এখানে ঘুরছেন ইতালির রাজনীতি বুঝছেন', সুভাষ ইংরেজিতেই বলছিলেন, 'আমাকে যা বলেছেন, তাতে তো উনি খুলনা পর্যন্ত যাবেন, সেখান থেকে ফিরে আসবেন। ওঁর যদি কিছু জানার থাকে, এখন জানিয়ে দেয়াই ভাল।'

যোগেন দেখে শাহেব হাতের বিঘৎ দিয়ে হাঁড়ির ব্যাস মাপছেন। যোগেন হেসে বলে, 'দেয়ার'জ অ্যান ইজিয়ার ওয়ে টু মেজার'।

শাহেব 'ইনক্রেডিবল' বলে কাঁধ ঝাঁকিয়ে 'হাও' জিজ্ঞাসা করেন ও কোমর ভেঙে খুব মন দিয়ে দেখেন, যোগেন কী করে হাতের এক-এক টানে কলাপাতার ঢাকনা, তার নীচে লাল সালুর ঢাকনা, তার নীচে শালপাতার ঢাকনা—খুলে ফেলছে। শাহেব বেশ ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'প্লী-ই-জ হাউ মেনি লেয়ারস ওয়্যার দেয়ার?'

'থ্রি। টু অব লিভস অ্যান্ড ওয়ান অব পেপার।'

'ইজ ইট ওপেন বাই নাও? দি ইনসাইড?'

'ইয়েস, বাট ফর ইউ ইর্টল বি এ হার্ড ওয়ে, লেট মি সি', যোগেন দরজা খুলে অ্যাটেনড্যান্টদের কাউকে ডাকে। চোগা-চাপকান-পাগড়িতে বেয়ারা এসে দাঁড়ায়। তাকে যোগেন বরিশাইল্যা ভাষায় বলে, 'অ্যাডডা চামচ পাওয়া যায় কত্তা?' লোকটি বেরিয়ে যেতে নিলে যোগেন তাকে পেছন থেকে ডাকে, 'আরে, খাড়ো, খাড়ো, কত্তা না মিয়া?'

লোকটি যোগেনের প্রশ্নের নিহিতার্থ ধরে ফেলে হাসে, একটু অপ্রস্তুত আত্মীয়তার হাসি, 'মিয়া, কত্তা, শাহেব এই সব তো বাবুরা হয়। আমরা তো দাস। তাগ সেবার।'

যোগেন হেসে ফেলে, 'এতখান বুদ্ধি নিয়্যা বাবা তুমি বাবুর্চি হইয়্যা থাইকব্যা আর কতদিন। শাহেবরে পান্তুয়া খাওয়াব। একটা লম্বাগোছের হাতা আর একটা বৌল চাই। ছেলেটি ফিরে আসে মাত্রই মিনিট-তিন-চারে। এসে সেই হাঁড়ির সামনে উটকো বসে, হাতাটা দিয়ে ভিতর থেকে একটা পানতোয়া বের করে বৌলে রাখে। বৌলটি প্রায় ভরে যায়।

'এ দো একডায়ই দশডা। কডা তুলি বাবু?' সে জিজ্ঞাসা করে যোগেনকে। যোগেন শাহেবকে প্রশ্ন করে, 'দিস ইজ দি হার্ডার ওয়ে টু রিচ ইট। দিস ইজ সুইট। হাউ মেনি ডু ইউ লাইক টু টেক?'

'অল্ দেয়ার অব দি সেম সাইজ?'

'জেনারেলি সো। বাট এ ফিউ মে বি বিগার?'

'অ্যান্ড ইউ আর আসকিং হাউ মেনি আই মে টেক। ইট'স মইনাস-ওয়ান।'

'দেন, প্লিইজ টেক ইয়োর ডিশ অ্যান্ড হেল্প ইয়োর সেলফ উইথ ইয়োর আইস আন আস টু সি দি কুইকার ইনডিজিনাস ওয়ে?', বলে যোগেন বাকি সকলকে ডাকে, 'আসেন, শাহেবরে পান্তুয়া ভক্ষণ দেখাব্যার লাগব।' তারপর হাঁড়ির ভিতর হাত ঢুকিয়ে পাকা মর্তমান কলা সাইজের পান্তুয়া বের করে মুখের ভিতরে একবারে ফেলে দিল, পুরোটা এক গ্রাসে। শাহেবের হাতে সেই বৌল, হাতে একটা কাঁটা, এখনো ব্যবহৃত হয়নি। সে হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

পরে সুভাষ বললেন, শাহেব দক্ষিণ ইতালির একটি রাজনৈতিক দৈনিকের সঙ্গে যুক্ত। মুসোলিনির বিরুদ্ধে। ইতালিতে ফ্যাসিস্টদের যারা বিরোধী তারাও এক হতে পারছে না। তাদের বিরোধিতার কারণগুলো কিছুতেই এক হচ্ছে না। এই নানা কারণের মধ্যে কোনো-কোনো দল বা গোষ্ঠী মনে করে গণ-আন্দোলন কখনো ক্যারিসম্যাটিক নেতা ছাড়া তৈরি হয় না সুতরাং মুসোলিনির পালটা কোনো ক্যারিসমা চাই। এই রাজনৈতিক প্রশ্নের জবাব খুঁজতে উনি নিজের চোখে দেখতে এসেছেন—ভারতের মত একটা বিশাল মহাদেশে গান্ধীজির ক্যারিসমা কীভাবে

কাজ করে যে তিনি দরকারে কংগ্রেসদলের নির্বাচিত সভাপতি, তাঁর ক্যারিসমাও কিছু কম নয়, তাঁকে পদত্যাগে বাধ্য করতে পারেন। এখন শাহেবেরও তো রাজনীতি আছে। উনি মনে করেন ক্যারিসমা একটি সম্পূর্ণ বানানো জিনিস। সবসময়ই এটা রাজনৈতিক কৌশলের অংশ। শাহেব লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সের ছাত্র ছিলেন। সেই সুবাদে ফেবিয়ান সোস্যালিস্ট। ভারতে এসে ওঁর দিব্যজ্ঞান হয়েছে। উনি গ্রামে মফস্বলেও গেছেন। তাতে ওঁর ধারণা হয়েছিল যে ভারতের লোকজনের ক্যারিসমা না-হলে চলে না। অবতারের দেশ। কিন্তু যেটা ওঁর ইয়োরোপীয় অভিজ্ঞতাকে শিকড় শুদ্ধ নাড়িয়ে দিয়েছে, ভারতে এই ক্যারিসমা প্রাথমিকভাবে নেতাদের নিজেদের তৈরি নয়। মুসোলিনির ক্যারিসমা যেমন সুসংগঠিত। গান্ধী, গফফর খাঁ, নরেন্দ্র দেও, এঁদের দেখে উনি বুঝেছেন, এঁরা কেউ ক্যারিসমার ধারেকাছে নেই। জওহরলালকে ওঁর মনে হয়েছে, ওঁর সমর্থকদের সংগঠিত করার দিকে তাঁর যত্ন ও নজর আছে। সুভাষ সম্পর্কেও তেমন কিছু শুনেছিলেন। বড়লোক, গ্রামে-কলকাতায়-কটকে ভূসম্পত্তি আছে, শাহেবপাড়ায় প্রাসাদের মত বাড়ি, আইসিএস ছেড়ে দেশের কাজে এসেছে, চিরকুমার, খুব সুন্দর দেখতে—সুতরাং এ তো অনেকটা ক্যারিসমা নিয়েই বড় হয়েছে, সর্বভারতীয় নেতা হতে তাঁর আরো কিছু জঙ্গি ক্যারিসমা দরকার হতে পারে। কিন্তু বেশ কয়েকদিন নানা পরিস্থিতিতে সুভাষকে দেখে—নিজের রাজনৈতিক দল করার অভ্যেস থেকে উনি টের পেয়েছেন—সুভাষ প্রধানত একজন ফ্যাকশন লিডার, অপারেটার, নিজেকে আড়ালে রেখে কাজটা সম্পন্ন করার মত গোপন মানুষ, ক্যারিসম্যাটিক নেতার ঠিক উলটো। এটা নিশ্চয়ই গান্ধীর মত কিছু নয়। কিন্তু নিশ্চয় গান্ধীর বিকল্প কিছু হতেও পারে, কোনো সংযোগের ফলে, বা সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে।

সুভাষ শাহেব সম্পর্কে এই কথাগুলো ইংরেজিতেই বললেন। বলা শেষ হলে, শাহেব দুই হাত ওপরে তুলে বিস্ময় জানিয়ে বললেন, 'এটা তো আমার টিউটোরিয়্যাল ক্লাশ হয়ে গেল, আমি জানতে পারলাম, ফ্রম বোসেজ সামারি, হোয়াট আই অ্যাম হান্টিং ফর—।'

যোগেন বলে—তাহলে আর খুলনা থেকে ফিরবে কেন। আমাদের সঙ্গে চল বরিশাল বাই এ স্টিম বোট ফুল অব পিপল অব অল ভ্যারাইটিজ, ওখানকার মিটিং দেখে আমাদের সঙ্গেই ফিরবেন।

শাহেব আবার নিজের মনেই কী যেন বলল, মুখটুখ বেঁকিয়ে। বোঝা গেল, শাহেবকে হাওয়া দিয়ে ফোলানো যাবে না। ওর নিজের কাজই ওর একমাত্র বিবেচ্য।

পথে আরো দুটি-একটি স্টেশনে কিছু-কিছু 'বাংলার নেতা সুভাষচন্দ্র জয় হোক, জয় হোক' ও 'ভারতমাতাকী জয়' হয়েছে। রাত সাড়ে এগারটায় এক স্টেশনে সুভাষকে দরজা খুলে দাঁড়াতেও হল কিন্তু সে-স্টেশনে আলো এত কম যে সুভাষকে অভ্যর্থনাকারীরা খুঁজে পাওয়ার আগেই ট্রেন ছেড়ে দিল। সুভাষ অবিশ্যি দরজায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়াচ্ছিলেন ও শোভাযাত্রাকারীদের দলটাকে একঝলক দেখতে পেলেন, তাদের জয়কার শুনে মনে হল, তারাও সুভাষকে দেখতে পেয়েছে।

খুলনা স্টেশনে গাড়ি থামার পর, মনে হল, সমবেত মানুষজন যেন সুভাষকে লুট করে নিয়ে যাবে। এমনিই তো খুলনা স্টেশনে লোকের ভিড় বেশি হয়, রাতে। খুলনা থেকেই দূরের মেল বা এক্সপ্রেস স্টিমারগুলি ছাড়তে থাকে। নামেই খুলনা—সাতক্ষীরা, আসলে খুলনা-চাঁদখানি, খুলনা-মাদারিপুর লাইন, তার পাশা লাইন, খুলনা—বরিশাল লাইনে পাটগাড়িতে নেমে নৌকোয় ফরিদপুরের কোটালিপাড়ায় যাওয়ার লাইন, খুলনা—বরিশাল লাইনে হুলার হাট, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, কচুয়া—পটুয়াখালি লাইনে বাগাবন্দরের ১০ মাইল পুবে বৌফল থানা, উলটো পাড়ে

কচুয়া। এই তেঁতুলিয়া নদী ভোলাকে দ্বীপ করে রেখেছে বরিশাল-সন্দ্বীপ-চট্টগ্রাম। এর ওপর আছে খুলনা থেকে লাইন ধরে এক স্টেশনে নেমে অন্য নানা দিকে যাওয়ার সব ছোটখাটো লঞ্চের লাইন। খুলনা মানে রেলপথ শেষ। আর স্টিমারে যদি যেতে হয়, তাহলে তো রাত্রির স্টিমারই সবচেয়ে ভাল। রাতে ঘুম হবে ভাল, নদীর ওপরের হাওয়ায়, বাড়ি থেকে খেয়ে না-এলে স্টিমারের রান্নার তারই আলাদা। একটু আগে বাড়ির ছেলেপুলেদের কাউকে বালিশ আর শতরঞ্চি পাঠালেই হল। ওরা সবচেয়ে ভাল জায়গায় বিছানা পেতে জায়গার দখল রেখে আসে।

এরপর আবার শেয়ালদা থেকে ট্রেন আসে—একের-পর-এক। শেয়ালদার দিকে ট্রেনও যায়—একের-পর-এক। ফলে, গরমের সময় বিকেল শুরু হতে-না-হতে বা শীতকালে বিকেল শেষ হতে-না-হতে খুলনা রেল ও স্টিমার স্টেশন তল্লাটটা, পেছনের বাজার সমেত, আলো আর মানুষে ঝলমলে গমগমে হয়ে থাকে। খুলনার এক রসনাম তাই খলনা। শেষে একটা খুব ছোট জ আছে। সেটা গিলে নেয়। খল্‌না মানে উলুঘাসের ছাওয়া ঘর। খুলনা তো রাতের শহর, সবাই জেগে থাকে। তোমার সাথি জুটবেই। সাথিকে নিয়ে নদীপাড়ে একটা উলুঘাসের ঘর তুলে কয়েক প্রহর কাটাও। কোঁক পাখি প্রহর ডেকে দিলে আর থেকো না। দুজন বেরিয়ে দু-পথে চলে যেত। উলুঘাসের ঘর একপ্রহরের বেশি বাঁচে না, বাতাসে মিশে যায় তুলোর মত।

তবে খুলনা নামের এত রসিক ডাক জানতে হলে তো রসিক হতে হয়। ক-জন আর রসিক হয়? তারা জানে, খুলনা নাকী কোন্‌ ব্যাপারীর দুয়োরানী।

মধ্যরাতে খুলনায় স্টেশন থেকে স্টিমারঘাটায় যেতে সুভাষকে নিয়ে এগনে যাচ্ছিল না। ফুলের মালা আর তোড়া নিয়ে যারা এসেছিল এদের নিয়ে তেমন হাঙ্গামা কিছু হল না—তাঁরা অনেকেই প্রবীণ, জিলা কংগ্রেসের সভাপতি, মহকুমা কংগ্রেসের সভাপতি, কংগ্রেস সংখ্যালঘু কমিটির সভাপতিও ছিলেন কেউ-কেউ। অনেকে সঙ্গে মাটির হাঁড়িতে যশোরের বিখ্যাত রসকদম্ব নিয়ে এসেছেন। সুভাষ হাতে করে গ্রহণ করলেন, কেউ তাঁর পাশ থেকে হাত বাড়িয়ে নিল। মেয়েদের একটা দল এসেছিল। তাঁদের মধ্যে দু-চারজন ছিলেন ছাত্রী, বাকি সকলেই বাড়ির মেয়েরা? রাত্রির খুলনা স্টেশনের আলোও তাঁদের প্রতিদিনের প্রাণান্ত শ্রমের চিহ্ন তাঁদের মুখ থেকে নিঃশেষ মুছে নিতে পারেনি। কিন্তু সুভাষ যখন তাঁদের সম্মুখে করজোড়ে মাথা নিচু করে দাঁড়ালেন আর তাঁদের কেউ-বা সুভাষের কপাল লেপে দিল রক্তচন্দনে, তাঁর পায়ের দুই পাতার ওপরে এঁকে দিলেন বরণচিহ্ন, সুভাষের গলায় ঝুলিয়ে দিলেন বাটিকের এক উত্তরীয়, তার মাঝখানে দুলছে মহাত্মাজির একটা ছোট্ট রঙিন ছবি, অনেক সময় ঢাকা, মোহিনী মিলস ইত্যাদি স্থানীয় মিলের কাপড়ের বান্ডিলে এই ছবি থাকে। মেয়েরা তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গান ধরলেন,

সুজলাং সুফলাং, মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাং—

এই গানের সমবেত উচ্চারণে ও স্বরের ঐক্যে পুরো স্টেশনের ওপর একটা স্তব্ধতা নেমে এল, যে যেখানে ছিল সে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল, প্রত্যেকেরই হাত জোড়া। যে-আলো এতক্ষণ মনে হচ্ছিল প্রকট সে-আলো ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল। মনে হল অকালে সকাল যেন ছড়িয়ে পড়ল আর সকলেই যেন নমস্কার করছে নিজেকে—সামনে আদিগন্ত সমুদ্রের ভিতর থেকে উদীয়মান সূর্যের কিরণরেখায় যেন এই মানুষজন তাদের স্বদেশকে দেখছে ও নিজেদের সেই উদয়কিরণের দীপ্তিতে উজ্জ্বল করে নিচ্ছে। সুভাষ মাথা নুইয়ে গাইছিলেন,

ত্রিংশ কোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদ করালে
দ্বিত্রিংশ কোটি ভুজৈ্য ধৃত খরকরবালে
অবলা কেন মা এত বলে—

গানের শেষে সুভাষ যখন তাঁর ভেজা দুই চোখ মেলে মায়াবী এক স্বদেশ ও প্রভাতের দিকে তাকালেন—তখন মনে হল সত্যি ত্রিশ কোটি মানুষের ষাট কোটি হাত তার ললাটে রক্তচন্দন এঁকে দিয়েছে আর একইসঙ্গে সুভাষ তাঁর প্রসারিত দুই হাতে সেই স্বদেশকে গ্রহণ করছেন।

এত মানুষ, প্রহর মধ্যরাত, সামনে কিছুদূর পর আলো আর নদীকে স্পষ্ট করছে না, স্টিমারের দোতলায় রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে সুভাষ, যোগেন, সেই শাহেব ও অন্যান্য সঙ্গীরা। মেয়েরা কেউ-কেউ তখনো গাইছিলেন।

পরিবেশটা খুব গভীরে বদলে গেল।

কলকাতা থেকে ট্রেনটা যখন এল, তখনো ছিল অভ্যর্থনা। এখন খুলনা থেকে স্টিমারটা যখন ছাড়ল, তখন এটা হয়ে যায় যেন, আমার শ্রেষ্ঠ বীরকে যুদ্ধযাত্রায় এগিয়ে দেয়া। সেই যুদ্ধে ও প্রবাসেও যে এই বিজয় আনতে বিদায়সুর শোনা যাবে সেই সংকেত তৈরি হচ্ছিল—পাড় যখন দেখা যাচ্ছে না, তখনো। সুভাষ রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিলেন।

পরিস্থিতিটা একটু হালকা করতে যোগেন সেই শাহেবকে জিজ্ঞাসা করে, 'কী হল শাহেব, তুমি-না খুলনা থেকে ফিরে যাবে? তুমি জানো তো—খুলনা কিন্তু ফেলে যাচ্ছ'।

শাহেব ফিসফিসিয়ে বলল, 'আমি কী করব। আমার পাশ্চাত্য শিক্ষায় ও অভিজ্ঞতায় আমি একটা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া দেখতে এসেছিলাম। খুলনায় দেখলাম, তোমরা এটাকে আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া করে ফেলেছ। এটা তো আমার নতুন হোমওয়ার্ক হয়ে গেল।

এটা তো স্টিমারঘাটা—আর মধ্যরাতের কাছাকাছিই দূরের লাইনের স্টিমার-লঞ্চ ছাড়ে। যাত্রীছাড়া শুধু মালবাহী গাদাবোটও ছাড়ে—তাদের রুটের যাত্রীলঞ্চ ও স্টিমারের সঙ্গ নিতে। নইলে ডাকাতির ভয় থাকে। তবে, গাদাবোট তো খুব ধীরে-ধীরে এগোয় আর তার থামার জায়গাও বেশি। সঙ্গ দরকার তো ঘণ্টা তিন-চার, রাত ১২টা থেকে একপ্রহরের একটু বেশি। নদীর সকাল সবচেয়ে আগে ফোটে। সেই প্রথম ভোরে ডাকাতদের মুখ চিনে ফেলতে পারে নৌকার মাঝিরা। তাছাড়াও রাত চারটার সময় বা গায়ে-গায়ে এমন জলডাকাত পড়লে ধরে নেয়া হয় পাশাপাশি গ্রামের কোনো দলই করেছে, ডাকাতি সেরে ঘরে ফিরে আসতে যাদের সময় লাগতে পারে, বড়জোর আধা ঘণ্টা। ফিরতি-ডাকাতি—একজায়গায় ডাকাতি সেরে ফেরার পথে এক গাদাবোট হাতে পেয়ে লুটে নিল। আর-এক হয়, মিয়াবিবি ডাকাতি। পুলিশ মাঝে-মাঝে জলে চৌকিদারি করে, ডাকাতি ঠেকাতে। অনেক সময় অনেক নদীতে ডাকাতরা একটা আলাদা নৌকোয় চলে পুলিশের লঞ্চের সঙ্গেই। সে-ডাকাতি দিনদুপুরে হলেই-বা ঠেকায় কে?

ছাড়ার সময়টা রহস্যময়, স্টিমার ছাড়ার সময়ের রহস্য। নানা লঞ্চ, স্টিমার, বড় নৌকো ছাড়ে। মাঝেমধ্যে এক-একটা লঞ্চ বা স্টিমারের সিটি বেজে উঠেই থেমে যায়। এ-সব হচ্ছে জানান-হুইস্‌ল্। নিয়মিত যাত্রীরা টের পেয়ে যায়—তাদের রুটের নৌকো মজুত আছে। কখন যে ছাড়া হয় টের পাওয়া যায় না। একটু অবাক করে জলের তরল স্রোত জায়গা বদলায়, তারই ফলে জলটা গতিময় হয়ে যায়।

সুভাষবাবুকে নিয়ে যোগেন, শাহেব, বরিশাল জিলা কংগ্রেসের সভাপতি, সম্পাদক আর আরো কয়েকজন জাহাজের উলটোদিকের রেলিঙের গলিটাতে দাঁড়িয়ে। তাদের সামনে একটা কাঠের দেয়াল। তার ওদিকে স্টিমারের রেস্টুরেন্ট।

যোগেনই এখানে এনে দাঁড় করিয়েছে। খুলনা স্টেশনের কাণ্ড দেখে যোগেন সাবধান হয়েছে। সারা রাস্তা তো সব ঘাটায় সারা রাত ধরে সংবর্ধনা চলতেই থাকবে। তাদের গ্রাম দিয়ে এত বড় একজন মানুষ পাস করলেন অথচ তাঁকে একটা জয়জোকার দেয়া হল না, বা, তাঁর গলায় একটা মালা পরানো গেল না—এটা তো পুরোগ্রামের অসম্মান।

একটা পরিত্রাণের পথ পেয়ে গিয়েছিল যোগেন। এটাই রটনা ও খবর ছিল যে সুভাষচন্দ্র পূর্ববঙ্গে সফরে বেরচ্ছেন শিডিউল্ড কাস্ট নেতা ও এমএলএ যোগেন মণ্ডলকে সঙ্গে নিয়ে। যোগেন যখন টিকিট ইত্যাদি সব ব্যবস্থার কথা রেল-স্টিমার কর্তৃপক্ষকে জানায় তখন সে রিকিউজেশন করেছিল গন্তব্যের জায়গায় ব্র্যাকেট ভায়া ভোলা লিখে—বরিশাল (ভায়া ভোলা)। দিনে অন্তত একটা লঞ্চ ভোলা ছুঁয়ে বরিশাল যায়। বাকি সব যায় বরিশাল হয়ে ভোলা। ভোলায় এই সাইক্লোনের পর সুভাষবাবু ভোলা ছুঁয়ে না-গেলে, তকে সবাই খারাপ কথা বলবে। আগেই যোগেন খবর দিয়ে রেখেছে। দুদু মিয়া লোকজন নিয়ে স্টিমারঘাটায় অপেক্ষা করবে। সেখানেই মিটিং হবে। তারপর আবার জাহাজ ছাড়বে। বরিশাল রুটে যারা সারারাত বিভিন্ন স্টেশনে অপেক্ষা করবে, তারা ভোলা-রুটের স্টিমারে তো আর সুভাষবাবুকে খুঁজবে না।

সুভাষবাবু বললেন, 'সবকিছুই কলকাতাকেন্দ্রিক হয়ে যাওয়ায় বাঙালির সংস্কৃতিতে কিন্তু খুব ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। কলকাতায় কত জন মানুষ আছেন, যাঁরা জানেন, বাংলা একটা নদী-বদ্বীপ। অথচ হিশেব যদি করেন, দেখবেন পূর্ববঙ্গের জনসংখ্যা অনেকটাই বিচিত্র ও বেশি।'

'ঢাকার একটা প্রাধান্য কি নেই?' যোগেন জিজ্ঞাসা করে।

'হ্যাঁ, আছে, বা আলাদা প্রাধান্য একটা হচ্ছিলই। নতুন প্রদেশ হল। সেটা আবার তুলে নেয়া হল। কোনোটাতেই দেশবাসীর মতামত নেয়াই হল না।'

'একে বলে হাঙড়ের কামড়। কামড় যদি বসাতে পারে একবার, তাহলে নিজের হাজার চেষ্টাতেও আর খুলতি পারব না—', খুলনা থেকে কংগ্রেসের যে নেতা সুভাষের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তিনি বললেন। সুভাষবাবু বললেন, 'আমার অবিশ্যি কোনো কামড় সম্পর্কেই কোনো অভিজ্ঞতা নেই তবু ছোটবেলা থেকে তো শুনেছি, কচ্ছপ কামড়ালে মেঘ না-ডাকলে ছাড়ে না। ছোটবেলা থেকে আজও এই কথাটা বুঝে উঠতে পারলাম না—কচ্ছপ আর মেঘডাকার সম্পর্কটা কী?'

স্টিমার খোলা নদীতে এসে পড়েছিল। হাওয়া বেশি-বেশি করে ভিজে উঠছিল ও তার জোরও বাড়ছিল। এতটাই যে এত কাছাকাছি দাঁড়িয়েও এঁরা পরস্পর কথা বলতে পারছিলেন না। প্রত্যেককেই নিজের ধুতি-পাঞ্জাবি সামলাতে ব্যস্ত হতে হয়। যোগেন বলে সুভাষকে, 'আপনার পক্ষে কিন্তু এতটা হাওয়া নেয়া ভাল না। চলেন, যে যার কেবিনে যাই।'

'এ হাওয়ায় কি ঠান্ডা লাগে? এত মানুষ খোলা ডেকে যান। তাছাড়া, আমার কিন্তু সি-সিকনেস নেই। সি-সিকনেস সম্পর্কে শুনেছি ওটা নাকি ঢেউয়ের দুলুনির জন্য হয়, যেমন অনেকের এমনকি ট্রেনে চড়লেও হয় বা পাহাড়ে চড়তে বা পাহাড় থেকে নামতেও হয়। এমন হাওয়ায় না কি সেরে যায়।'

'আপনার তো হয় নাই আর হয়ও না। তাইলে সারানোর জইন্যে এই হাওয়া গাওয়ার চিকিৎসারও কাম নাই। চলেন, ক্যাবিনে যাই।'

কার কোন্ ক্যাবিন সেসব কাগজপত্র যোগেন তার পকেট থেকে বের করল—ডানদিকের বাঁকটা ঘুরে। সেখানে হাওয়া ঠেকে যাচ্ছে একটা আগাগোড়া লোহার বেড়ায়। কিন্তু যোগেন দেখে, ক্যাবিনের চাইতে লোক বেশি। খুলনা থেকে যাঁরা উঠেছেন, তাঁদের স্লিপ যোগেনের

কাছে নেই। সমস্যাটা সুভাষবাবুকে টের পেতে না দিয়ে যোগেন শুধু তাঁর স্লিপটা হাতে রেখে, বাকিগুলো একসঙ্গে পাশের জনকে দিয়ে বলল, 'আপনারা খুঁইজ্যা ঢুক্যা পড়েন। আমি ওঁকে পৌছায়া আসতেছি।'

সুভাষের জন্য নির্দিষ্ট ক্যাবিনটা ঐ সারির একেবারে শেষে। দরজা খুলে যোগেন আলো জ্বালালে সুভাষ ঢুকে দেখে বলেন, 'সত্যিকারের লাইনারগুলোর দুটো ফার্স্টক্লাশ ক্যাবিন জোড়া লাগালেও তো এত বড় হবে না।'

যোগেন সুভাষের বিছানার চাদরটা টানটান করতে-করতে বলে, 'শাহেবরা তো বড়লোকি করব্যার লগেই এত বড় দেশখান দখল কইরছে। অগ দ্যাশেই যদি এই বড়লোকি পাইত তাইলে সাতসমুদ্দুর উজাইয়্যা খুলনা-বরিশালে আইসব ক্যা?'

সুভাষ অন্য কোনো কথা বলার ভঙ্গিতে তার বিছানায় বসে কিন্তু যোগেনের শেষ কথায় তাঁর স্থির করা কথাটা গুলিয়ে যায়, তিনি সেই সরল হাসি হেসে বলেন, 'এর চাইতে সোজাসুজি ইমপিরিয়্যালইজমের ডেফিনিশন কেউ দিতে পারত না। বার্নার্ড শ-র একটা বই আছে, 'অ্যান ইনটেলিজেন্ট উইম্যান'স গাইড টু ক্যাপিট্যালিজম অ্যান্ড সোস্যালিজম।' আপনারও একটা বই লেখা উচিত, 'এ লেম্যানস গাইড'।'

'আমি লিখলে তো ইন্ডিয়ান লইয়ারস ইংলিশ হইব। ইংল্যান্ডেও নিশ্চয়ই বরিশ্যাল আছে। কিন্তু আমি তো বরিশাইল্যা ইংলিশ জানি না।'

সুভাষ আরো একচোট হেসে বলেন, 'বাইরের সি-উইন্ড থেকেও আপনার কথায় অক্সিজেন বেশি। আমি কি আপনাকে ইংরেজিতে লিখতে বলেছি? যেমন করে আপনি কথা বলেন, অবিকল তেমন ভাষাতে লিখবেন। নইলে মজাটা কীসের?'

যোগেন সোফার মত একটা আসনে বসে পড়ে, 'বইয়ের নামডা তো মাথায় খেইল্যা গিছে, 'অগাগ ডিকসনারি।'

সুভাষ এতটাই হাসতে থাকে যে দুইহাত পেছনে দিয়ে হেলে তাকে হাসি সামলাতে হয়। 'ওঃ যোগেনবাবু, আপনি একটা লোককে হাসিয়ে মেরে ফেলতে পারেন।'

'আপনার মরণে আমার কোনো হাউস নাই। আপনে অ্যাহন নিদ্রা যান। আমি যাই,' যোগেন সোফা থেকে উঠে পড়ার ভঙ্গি করতেই সুভাষ বলে ওঠেন, 'নিদ্রা আসবে কোথ্ থিক্যা। আলো নিবিয়ে চোখ বুজে শুয়ে পড়লেই তো আপনার কথাগুলি মনে পড়বে আর আরো হাসব। একা-একা হাসা কি স্বাস্থ্যকর?'

যোগেন চুপ করে থাকে। স্টিমারের চাকার জল কাটার আওয়াজ উঠে এসে রাত্রিটাকে গভীর করে দেয়, হঠাৎ।

'আপনারে তো এতডা খালি পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। আবার, আপনে চাইরপাশের মানুষ হারাইয়া একলা হইয়া আছেন, সেডাও তো আমার কাছে কোনো শুভদৃশ্য না। আপনে যদি রাজি থাহেন, তাইলে, আমাগ একডা সমস্যা নিয়্যা একড়ু কথা কবেন?'

'সে কী? আপনার কী এমন সমস্যা হতে পারে যার জন্য এত বড় নদী, এত বেশি রাত্রি ও এতটা নির্জনতা দরকার?'

'কথাডা এড্ডু আকস্মিক ঠেকব্যার পারে। আপনে যদি সে-বিষয়ে কিছু ভাইব্যা না থাকেন, আপনে সেডা কয়্যা দিবেন—ভাবি নাই কিছু। যা জানি তেমন কথা আবার শোনার লগে কথাডা আমি তুইলতেছি না।'

'আপনি কী জিজ্ঞাসা করবেন জানি না। তবে এটুকু বলতে পারি, এখন কিছু বলব না যা

আগে ভাবিনি বা ভাবতে হয়নি। কিছু যদি না-ভেবে থাকি, না বলতে পারি তবু বিষয়টা শুনতে চাই। আমারও তো কিছু প্রশ্ন থাকতে পারে।'

'আমি কইতেছিল্যাম, আমাদের, যাগ শিডিউল্ড কাস্ট বইল্যা নতুন নাম হইছে, গান্ধীজি যাগ বলেন হরিজন, মহারাষ্ট্রে কেউ-কেউ বলেন দলিত, জন্ম থিক্যা শুইনতে-শুইনতে আমি 'চাঁড়াল' ছাড়া কিছু কইব্যার পারি না, মনে হয়, 'শূদ্র' কথাডাই ঠিক।'

'শূদ্রটাই ঠিক মনে হয় কেন আপনার?'

'কারণ, হিন্দুগ যে সমাজবিন্যাস তাতে 'শূদ্র' চারবর্ণের এক বর্ণ। চতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টম। শূদ্রেরও নানা ভাগ-উপভাগ আছে। সৎশূদ্র, অতিশূদ্র, পঞ্চম বর্ণও আছে। হিন্দু উত্তরাধিকারের যে স্বীকৃত বিধি ও বিধান তাতেও শূদ্র একটা ক্যাটিগরি হিশাবে গৃহীত। বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু চিন্তা থেকে যে-সমাজশাসিত তাতে ব্রাহ্মণ এই ক্যাটিগরির কোনো বদল হয় না। শূদ্র ক্যাটিগরিরই সব থিক্যা বেশি বদল হয়। সেই বদল ঘটাতে পারেন একমাত্র ব্রাহ্মণরা। টাকাপয়সার জোরে, গায়ের জোরে, ক্ষমতার জোরে শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণের মধ্যে যে আরো দুই বর্ণ আছে—বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়—সেই মধ্যবর্ণগুলিতে প্রমোশন আদায় করা হইছে। অ্যাহনো হয়। ফলে, কার্যত হিন্দুসমাজের ক্যাটিগরি মাত্র দুইটা—ব্রাহ্মণ আর শূদ্র। আমি শূদ্র কইতেই পছন্দ করি কারণ, এটা একটা স্বীকৃত স্তর। খুব উদারমনা সংস্কারকরা এই পদটিই ব্যবহার কইরছেন। অন্য নামগুলি হয় প্রায়শ্চিত্তসূচক অথবা আইনি—হরিজন, দলিত, শিডিউল্ড কাস্ট। ভারতের মাত্র ১৭ শতাংশ মানুষ উচ্চবর্ণ হিন্দু আর ৭৭ শতাংশ শূদ্র। শূদ্রদের বিভাজন করব্যার লগেই শিডিউল্ড কাস্ট বানান হইছে। তাইলে শিডিউলগ নামাইয়্যা আনা যায় ২২ শতাংশে আর কুলীন শূদ্র বা উচ্চবর্ণ শূদ্রগ ধরা যায় ৫৩ শতাংশ। আমি কব্যার চাই—শূদ্রদের ভাগ করা চলে না, শূদ্র শূদ্রই থাকে।'

'হ্যাঁ। এটা তো বোঝা গেল—নামে যথেষ্ট এসে যায়। এটাও বোঝা গেল যে, যে-নামেই ডাকুক, তার সেই ডাকের পেছনে একই সঙ্গে উদ্দেশ্যও আছে, রাজনীতিও আছে। আমি যদি আপনার নামটিই পছন্দ করি, তাহলে, ব্রাহ্মণবর্ণ ও মধ্যবর্ণের বাইরের চতুর্থ বর্ণ কি শূদ্র বলে পরিচয় দিতে রাজি হবে? থার্টি ওয়ানের সেনসাসে তো হয়নি। ফর্টি ওয়ানেও তো গোলমাল। এমন কোনো আন্দোলন তো কখনো হয়নি যে শূদ্রদের কোনো নতুন ভাগাভাগি করা চলবে না। এমন কি স্থানীয় কোনো আন্দোলনও তো কোথায় হয়েছে বলে জানি না। আপনি অবিশ্যি খবরের কাগজের পোকা। কোথাও দেখেছেন?'

'না। তা হইতেও পারে না। ক্যান? না, সেডা তো কইব্যার পারে এক সেই শূদ্র যার নীচে আর শুদ্দুর নাই। শূদ্রগ একটা লিস্টি টাঙাইয়া দেয়ার পরে যে শুদ্দুরের জাতনাম ঐ লিস্টে নাই কিন্তু তার টাকাপয়সা নামগাম আছে স্যায় তো নিজেরে অশূদ্র বা নন-শিডুইল্ড বা সৎচাষী বা নবশাখ এমন সব নতুন জাত বানাইবার পারে। যদি তার নীচে একডা শূদ্রজাত না থাহে, তাইলে একজন উচ্চ জাইত হয় কী কইর‍্যা?'

'আপনি বোধহয় একটা ডায়ালেকটিকসের ইনার ভিতরের ডায়ালেকটিকসের কাছে চলে যাচ্ছেন। পোলিটিক্যাল ইকনমিতে ক্যাপিট্যাল তৈরি করে তার জন্য প্রয়োজনীয় ওয়ার্কিং ক্লাস। সোস্যাল হিস্ট্রিতে দাস তৈরি করে তার প্রভু, নিচু জাত তৈরি করে উঁচু জাত। তাই তো আপনি বললেন, না কী?'

'আমি ডায়ালেকটিকস জানি না।'

'আমিও কি জানি না কী? কিন্তু আমার ভিতরে যদি প্রশ্ন থাকে, তাহলে অ্যাপলিকেশনটা পড়ে নেয়া যায়। জেলে থাকলে বা বিদেশে থাকলে সুবিধে। তবে ওকালতি আর এমএলএ

গিরি করেও কলকাতা শহরেও একা-একা পড়া যায়।'

'আপনে আমার একডা পোস্ট বাদ দিলেন, কাউন্সেলার, ক্যালক্যাটা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন।'

'দুঃখিত', সুভাষ বললেন হেসে কিন্তু যোগ করলেন, 'ভাল কথা মনে করেছেন। কর্পোরেশনের ধাঙড়-মেথররা স্ট্রাইক নোটিশ দিয়েছে। তাদের লিডার এক অদ্ভুত মহিলা। নাম—সাকিনা ফারুক সুলতানা মোয়াজ্জেদা। জন্ম শুনেছি পারস্যে। তাঁর বাবা ছিলেন বিপ্লবী, পারস্যের। ১৯০৫-এ রাশিয়ার প্রথম বিপ্লব ব্যর্থ হল, পারস্যেরও গণতান্ত্রিক বিপ্লব ব্যর্থ হল। অবধারিত মৃত্যুদণ্ড এড়াতে উনি ঐ একমাত্র মেয়েকে নিয়ে দেশ থেকে পালালেন। পালিয়ে কলকাতায় এলেন। এখান থেকে উর্দু সাপ্তাহিক বের করতেন, 'হাবুল-এ-মতিন'। বের করতেন কলকাতায় কিন্তু পারস্যের জন্য। প্রতি সপ্তাহে গোপনে সেই পত্রিকা পারস্যে পাঠাতেন। সাকিনা কলকাতাতেই বড় হয়ে উঠতে থাকে। খুব উঁচু পদের এক অফিসারের সঙ্গে বিয়ে হয়। একটা মেয়েও হয়। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে থাকতে পারলেন না। সাংসারিক জীবন থেকে বেরিয়ে পড়লেন। কলকাতার ল কলেজ থেকে পাশ করে ক্যালক্যাটা হাইকোর্টের প্রথম মহিলা অ্যাডভোকেট হন। এর আগের কর্পোরেশন ভোটে মুসলমান মেয়েদের রিজার্ভ সিটে ইনডিপেনডেন্ট প্রার্থী হিশেবে জিতে কাউন্সিলার হন। ধীরে-ধীরে ধাঙড়-মেথরদের মধ্যে কাজ শুরু করেন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন শিবনাথবাবু, মহম্মদ ইসমাইল এঁরা। ফলে পুলিশ তাকে কমিউনিস্টই ভাবত। হতেও পারেন। কিন্তু তিনি লিগ বা কংগ্রেসে ছিলেন না। এই ধাঙড়-মেথর ইউনিয়নের অফিস তাঁর বাড়িতে, মৌললিতে, মিড্ল্ রোডে। বিশাল বাড়িতে ধাঙড়-মেথররাই থাকে। ওকে মাতাজি বলে ডাকে। আপনি নিশ্চয়ই ওঁর সঙ্গে দেখা করবেন, কথা বলবেন ও চেষ্টা করবেন এই আন্দোলনটা যে শিডিউল্ড ক্লাসের আন্দোলন, সেটা প্রচার করতে, মাতাজিকেও বোঝাতে, বোধহয় শিবনাথবাবুদের সঙ্গেও একটু কথা বলতে হবে। ওঁদের একটা মত আছে—কাস্ট পলিটিকস ক্লাস-মুভমেন্টের পক্ষে ক্ষতিকর।'

যোগেন চুপ করে থেকে হেসে বলে, 'যাক, মনের মত একটা কাজ জুটল।'

'কেন? মনের মত কেন?'

'আমি তো আমার প্রশ্নডা অ্যাহনো কইই নাই কিন্তু আপনে তার জব দিয়া দিলেন।'

'তাহলে প্রশ্নটা বলুন। কোন্ প্রশ্নের জবাব দিলাম, সেটা জানব না?'

'সুভাষবাবু, আপনে যথার্থই বুঝছেন, আমার প্রশ্নটা ছিল শিডিউল্ড ক্লাস মুভমেন্ট নিয়ে। আমাদের মধ্যে কিছু এমএ, বিএ পাশ তো আছেন। আমাদের মানে নমশূদ্রদের মধ্যে। উঁচুস্তরের কারো যদি নমশূদ্রদের খুশি করার দরকার হয় ঐ এমএ, বিএরা হাতের কাছেই থাহেন। জিলা বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটিতে তারাই থাকেন। এই সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ হঠাৎ নমশূদ্র-পরিচয়টাকে দামী কইর‍্যা তুইলল। একডা আইনসভায় তিরিশডা মেম্বার তো কম না, তার মইধ্যে তেরজন আমার জাতভাই। কিন্তু এমন একডা রাজনীতিরে আমাগ জাতের স্বার্থে নিয়া আসার কোনো চিন্তা কী কাম এসব আমাগর অভ্যাসেই নাই। কী করা যায় সেডাই ছিল আমার জিগ্যাইবার।'

'কিন্তু, এ-জবাবটা তো আপনিই তৈরি করলেন আমার কথা থেকে। সে তো করতেই পারেন। তবে আপনার আসল প্রশ্নটি এমন আড়াল করবেন না। ভারতবর্ষের বার-আনি মানুষের মুক্তির সঙ্গে আপনাদের আন্দোলন-সংগঠিত জড়িত। গান্ধীজি ভাবতে পারেন ঐ ৭০ কোটি মত মানুষকে হরিজন বলে হিন্দুমন্দিরে ঢুকতে দিলেই বর্ণভেদজনিত সমস্যা মিটে যাবে। গান্ধীজির মত নেতা এ খবর রাখেন যে তাঁর প্রধান চেলারা কতটাই জাতবাদী। কিন্তু তাঁর মত নেতাও

কি এ-খবর রাখতে পারেন—উনি হরিজন বলে ডাকলে, ওঁর প্রধানতম সেনাপতিরা প্রত্যুত্তরে অস্ত্রত্যাগ করতে পারেন?'

'সেই সেনাপতিগরই কাছে গিয়া যদি আমাগ নাম লিখাইতে হয়, নাইলে যদি শুদ্দুরের কোনো সম্মান না জোটে, তাহালি আর সে-সেনাপতির দোষ কী? তার তো নাম লেখানোর দরকার নাই। দরকার তো আপনাগ—নিম্ন জাতির দুই-চারজনের নাম না দিলে, পার্টিটা য্যান ক্যামন ছোড় দ্যাহায়। এইডাই আমার জিজ্ঞাসা—কোন্ হিশাবে আমরা হিন্দু? আমরা উচ্চবর্ণ হিন্দুরই আপনজন? গ্রামে কোথায় কোন্ জাতের লোকজন বাস করে একসঙ্গে, খায়দায় একসঙ্গে, মহোচ্ছবও করে একইসঙ্গে, অষ্টপ্রহর বাড়িতে, দলিজে, হরিলুটে, কীর্তনে? ক—ন্।' যোগেন কথা বলতে-বলতে নিশ্চিত বোঝে সুভাষবাবু অস্বস্তিতে পড়ছেন। আরো কিছু রাত্রির জল থেকে আওয়াজ উটী আসে ইঞ্জিনের, এই ঘরটায়। সুভাষ বলে বসেন, 'আপনাদের ন্যাচার‍্যাল অ্যালির কথা জিগগেস করবেন তো?

যোগেন একটু হেসে বলে, 'কথাডা আপনে ঘুর‍্যায়্যা নিলেও তো আমার আপও থাইকবার পারে যে যারে আপনে বা গান্ধীজি ন্যাচার‍্যাল কন, সেডা আমরা ন্যাচারেল তো মানিই না, অ্যালি বইল্যাও মানি না।'

'সেটা তো না-মানতেই পারেন। কিন্তু আপনাদের সমাজের মানুষরা মুসলমানদের ন্যাচালে অ্যালি ভেবে নেবে সবাই? মুসলমানের ছোঁয়া খাবে?'

'গান্ধীজি যহন প্রথম কইছিলেন, অহিংস প্রতিবাদ, আইন অমান্য তখন কেউ বিশ্বাস কইরছিল কংগ্রেসের কেউ?'

সুভাষ হেসে বলেন, 'কেউ না। এখনো কেউ না। বিপিন পাল প্যাসিভ রেজিস্টান্সের প্রতিবাদ করে বেশ জ্বালাময়ী বক্তৃতা করতেন। আমার মনে আছে, একটা বক্তৃতায় বলেছিলেন—অহিংস প্রতিরোধ? ননভায়েলেন্ট ননকোঅপারেশন? অহিংস অসহযোগ? এটার মানে কী? নপুংসকের ব্রহ্মাচর্য? না কী ভীষ্মকে নিরস্ত্র করতে তাঁর সামনে গিয়ে শিখণ্ডী নৃত্য?'

বলতে-বলতে সুভাষ একটু নকল করে ফেলছিলেন, বিপিন পালের বক্তৃতার ঢং।

'এই ছিল গান্ধীজির পার্টি?'

'যদি আপনি সিক্রেট ব্যালট নিতেন তাহলে দেখতেন যে কংগ্রেসের বেশির ভাগ নেতা ও কর্মী মনে করে, অহিংস থাকার তো খরচা নেই কিছু। খরচা তো সরকারের। তাহলে একটু অহিংসা করলে ক্ষতি কী? মানে, এটা একটা কৌশল তো হতেই পারে। সত্যের খাতিরে এটা বলা উচিত সংখ্যায় কম হলেও শক্তিতে ভক্তিতে গান্ধীজিকে যাঁরা অবতার ভাবেন বা তাঁকে অদ্বিতীয় মনে করেন, তাঁদের কোয়ালিটি কিন্তু অন্য ধাতুর। যেমন, ধরুন, বিনোবা ভাবে, বল্লভভাই, বাদশাহ খান, জওহরলাল, গোবিন্দ বল্লভ পন্থ, মৌলানা আজাদ, রাজেন্দ্র প্রসাদ।'

'গান্ধীজির মত নেতা না-পাইলেও এঁরা নিজেগ চিন্তায় শক্তিতে এত বড় নেতা হতেন?'

'সেটা বলা খুব কঠিন। সি আর দাশ তেমন নেতা ছিলেন। মতিলাল নেহরু ছিলেন। তাঁরা পেরেছিলেন দেশের স্বরাজের বড় ও বহু ডালপাতার বটগাছের নীচে কংগ্রেস ও গান্ধী ও বিপ্লববাদীদের জন্য জায়গা দিতে। এই নেতাদের কারো-কারো তেমন ভাবার ও করার ক্ষমতা আছে। কিন্তু এখন তো বটগাছটাই হয়ে গেছে গান্ধী, তার নীচে কিছু-কিছু জায়গা। রাজনৈতিক ইতিহাস যদি কখনো লেখা হয়, তাহলে হয়তো ঘটনাক্রমের এমন ক্রনিকলও তৈরি হতে পারে যে গান্ধীজি এই স্ট্যাটাসটা পেয়েছিলেন ইংরেজদের কাছ থেকে, তাদেরই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। ১৯২০ থেকে ৩০—গান্ধীজির এই স্বীকৃতি তৈরি হয়েছে—ইংরেজরা তাঁকেই পেয়েছে এমন

একজন নেতা যিনি আন্দোলন তৈরি করতে পারেন যেমন অসংখ্য লোককে নিয়ে, তেমনি আন্দোলন সংবরণও করতে পারেন।'

'তাইলে তো খাড়ায় সেই তত্ত্ব যে সুপারম্যান না হইলে কেউ মানুষরে চালনা কইরব্যার পারে না আর-এক সুপারম্যানই পারে মানসের ইচ্ছাডা কী, চায়ডা কী। সবাই তো এক জিনিস চায় না। সুপারম্যান যেডা দ্যায় সেডাকে বেবাকই ভাবে, সে যেডা চাইছিল সেডাই পাইছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই সেঞ্চুরিতেই তো এইটা প্রমাণ হচ্ছে। রাশিয়ার লেনিন, ইতালির মুসোলিনি, জার্মানির হিটলার, আমেরিকার আব্রাহাম লিঙ্কন ; আয়ার্ল্যান্ডের ডিভ্যালেরা—সবাই জনসমাবেশ করিয়েছেন, জননেতা, এঁরা কেউ কিন্তু সামরিক নেতা নন।'

'আমি শিডিউল ক্লাস শব্দডা কইতে চাই না। ধরেন, শূদ্র বা নন-ব্রাহ্মণ মাসেস—তারা তো এই কথাডা কইব্যার পারে উইথ ফুল রাইট তে আমরা হিন্দু না—'

'তাহলে তো বলতে হবে তোমরা কী?'

'এইডা কী কন সুভাষবাবু। খুনের আসামী যদি কয় আমি খুন করি নাই, তাইলে খুনডা কইরল কেডা সেডাও তাইরেই কইতে হব?'

সুভাষ একটু হেসে বলেন, 'সেটা তো ঠিকই। কিন্তু ভারতবর্ষ তো ধর্মপ্রধান রাষ্ট্র আপনি বলতে পারেন, আমি হিন্দু না, যদি আপনার সমাবেশ লম্বাচওড়ায় এমন একটা স্টেটমেন্টকে ধারণ করতে পারে।'

'সেইডাই আসল কথা। কতডা ছড়ানো জায়গা থিক্যা কত মানুষ কথাডা কয়। নাইলে এই সুযোগে তো সব জায়গায় গুরুদেব আশ্রম তৈরি হবে—যারা কবে আমরা হিন্দু না, আমাগ যাহোক একডা ধর্ম আছে,' বলে যোগেন একটু বেশি হাসে, 'সেই কারণেই তো কইল্যাম—শূদ্রগ স্বাভাবিক মিল মুসলমানগ সঙ্গেই বেশি।'

'সে তো আপনার মত। এটার কার্যকর চেহারাটা কী?'

'মতটা তো আমি আইনসভায় কয়্যা দিছি ঐ যশোর রায়টের উপর একটা মুলতুবি তুলতে গিয়া। তার মইধ্যে কাজের পার্টও একটু ছিল। ভবিষ্যতে কোনো দাঙ্গায় শুদ্দুররা আর হিন্দু উচ্চবর্ণের হইয়া মুসলমানগ লগে রায়ট কইরবে না।'

সুভাষ একটু গম্ভীর হয়ে যান।

যোগেন জিজ্ঞাসা করে, 'আপনে য্যান কী ভাবেন?'

'হ্যাঁ, ভাবছিলাম, কথাটার মধ্যে সামাজিক ঔচিত্যের দায়টা এড়ানোর পথ খোলা থাকছে না? মুসলমানরা যদি একটা দাঙ্গা বাধায় সেটা ঠেকানো তো সবারই কাজ। মুসলমানদেরও কাজ। তাহলে শূদ্ররা কেন বলবে—আমরা হিন্দু হয়ে রায়ট করব না। দুটো তো আলাদা কাজ। আমরা হিন্দু না। যেমন আমরা বলছি আমরা পরাধীন না। আর-একটা হচ্ছে অ্যাকশনের পার্ট। আমরা দাঙ্গা করব না। হিন্দু থেকে। এটা কি কোনো অ্যাকশন প্রোগ্রাম হতে পারে? আপনারা বলতে পারেন—আমরা কোনো দাঙ্গা বাধাব না। আমরা, শূদ্ররা দাঙ্গা ঠেকাব। তাহলে এটা স্লোগানটা পজিটিভ হয়। সারা ভারতের আন্দোলন না হলে, কথাটায় কিন্তু হরাইজেন্টাল জোর আসছে না। একটামাত্র জায়গায় যত গভীর আন্দোলনই হোক্, সেটা দেখাবে লোক্যাল। ধরুন, শিখদের মধ্যেও তো শূদ্র আছে। মারাঠিদের মধ্যেও আছে।

সুভাষ একটু অন্যরকম হাসেন, একটু দুষ্টুমির হাসি। 'স্লোগানটায় কিন্তু খুব প্যাঁচ আছে। অল ইনডিয়া মবিলাইজেশনের মেটেরিয়্যাল আছে। তার ওপর গান্ধীজির পজিশন থেকে এটা এত আলাদা কংগ্রেস বা গান্ধীজি এর পালটা কী বলবেন? না, শূদ্রদের রায়ট করতে হবে?

এটা মানতেই হবে, এটা খুব ভাল প্যাঁচ, এ ভেরি ক্লেভার মুভ। আপনারা অল ইনিডিয়ায় একটা গোষ্ঠীর স্বীকৃতি পেয়ে যেতে পারেন, যদি সারা দেশের প্রধান জায়গাগুলোতে একই সঙ্গে কথাগুলো তোলা যায়। বিভিন্ন কাস্ট-সংগঠনই তুলল বটে কিন্তু কথা একটাই।'

'বিপদডা তো সেই হানেই। ভারতের স্বাধীনতা লাভে আমি কি শূদ্রের জায়গা চাই, না, আমার নিজের জায়গা চাই? যদি আমার জায়গাই চাই, তাইলে কংগ্রেস হইতেও আপত্ত নাই, হিন্দুমহাসভা হইতেও আপত্ত নাই। মুখে তো কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ডের বিরোধিতা। সেই সুযোগে সব দলই তো নিজেগ দরজা হাট কইর‍্যা রাখছে, শিডিউলগ লাইগ্যা।'

'যোগেনবাবু, সেই কারণেই তো আমাকে সভাপতিপদ থেকে তাড়ানো। আমি কেন বলছি যে সারা দেশ একটা চরম সংগ্রামের জন্য ছটফট করছে। আমি কে সে-কথা বলার? সে-কথা বলতে পারেন একমাত্র গান্ধীজি।'

সুভাষের সভায় সভাপতি যোগেন

১৩৫

ভোলায় ঠিক সভা ডাকা হয়নি। কারণ, এই স্টিমারই বরিশাল যাবে। ভোলায় আধঘণ্টা থাকে। কিন্তু স্টেশন মাস্টারকে একঘণ্টা স্টিমার-ভোলায় রাখতে অনুরোধ করার জন্য যোগেন আগেই মোড়লমাতব্বরদের জানিয়ে রেখেছিল। বিশেষ করে দুদু মিয়াকে। স্টিমারঘাটেই সকলে জড়ো হয়েছিল। এর আগে কোনো পার্টির এত বড় নেতা কোনোদিন ভোলায় আসেননি। সাইক্লোনের দুর্যোগে ধ্বংসস্তূপ চারদিকে। সেই বাধা কাটিয়েও শ দুই-তিন মানুষ ঘাটে দাঁড়িয়েছিল। সুভাষচন্দ্র স্টিমারের সিঁড়ি দিয়ে নামার আগেই মাতব্বররা সিঁড়ি বেয়ে সুভাষের কাছে এসে তাঁকে মালা পরায় আর জয়কার দিয়ে ওঠে, 'সুভাষচন্দ্র বসু—জয় জয়', 'বন্দেমাতরম', 'আল্লা হো আকবর'।

সর্বাগ্রে দুদু মিয়া—কাছা দিয়ে ধুতি ও পাঞ্জাবি পরা। ঘাটের মাঠে সুভাষ গিয়ে দাঁড়াতেই একজন ছুটে গিয়ে ঘাটমাস্টারের টেবিলটা তুলে নিতে গেলে ঘাটমাস্টার চেঁচিয়ে ওঠে, 'আরে আরে, করস কী, ড্রয়ারে আমার ক্যাশ আছে, ক্যাশলুটের মামলায় পড়বি।'

টেবিল আনতে গিয়েছিল যে, সে এক হ্যাঁচকা টানে টেবিলটা মাথার ওপর তুলে বলে, 'এত বড় মানুষ কুনোদিন দেইখছেন? স্বচক্ষে? ক্যাশলুটের জইন্য ফাটক খাইট্যা আইসবনে। আপনার ক্যাশের উপর পাওনা দিয়্যা দিব। তাই বইল্যা, দেশের সামনে ভোলার নাম খারাপ কইরতে পারব না।'

টেবিলটা সে উলটো করে মাথার ওপরে তুলেছিল বলে ড্রয়ার থেকে কিছু খুচরো পয়সা পড়ে যাচ্ছিল। কয়েকটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে সেই পয়সা কুড়ুতে ও আরো পয়সার লোভে লোকটার পেছন-পেছন। লোকটি গিয়ে টেবিলটা আবার সোজা করে সুভাষের সামনে রাখে। তখনো কিছু খুচরো পড়ে যায়। দুদু মিয়া সুভাষকে আগলে রেখে লোকটিকে ধমকে ওঠে, 'আ রে বলদের বাচ্চা, টেবিল আনছিস, চেয়ার আইনব কি তোর বোনাই?'

সে লোকটিও একইরকম চিৎকার করে ওঠে, 'টেবিল আনছি কি হোগা বিছায়্যা বসার লগে। টেবিল আনছি উনি যাতে টেবিলে খাড়াইয়া ভাষণ দেন। নাইলে এই সমুদ্দুরের লাগান মিলাদের

মানুষ ওঁয়ার বচন শুইনব ক্যামনে?'

দুদু মিয়া এটা ভাবেনি ও ভাবনাটা তার ভাল লাগায় সে চুপ করে গেল আর সেই লোকটি খুব শক্ত করে টেবিলটা চেপে ধরে রেখে সুভাষবাবুকে বলে, 'উঠেন, উঠেন কত্তা—'

সেই লোকটির দেখাদেখি আরো দু-জন এসে টেবিলটা চেপে ধরে, 'উঠেন, কত্তা, উঠেন—'

টেবিলটায় ওঠা একটু মুশকিল, এত তো শক্ত নয় যে সোজা উঠে ধরে পা তুলে দিয়ে উঠবে। একটা টুল থাকলে হত। সেটা বুঝে ফেলতে উদ্যোগীদের এক মুহূর্ত লাগে। একজন টেবিলের সামনে হামা দিয়ে বসে, যেন টুল। ওর পিঠের ওপর পা দিয়ে সুভাষ মঞ্চে উঠবেন। কিন্তু সুভাষ বললেন, না, তিনি ওরকম করে উঠবেন না।'

'ক্যা কত্তা, ওর জীবন তো ধইন্য হইয়া যাবে নে, আপনার পায়ের ধূলায়—সুভাষচন্দ্র বসু জয় জয়—আল্লা হো আকবর।' এমন একটা জয়কার উঠতেই কয়েকজন সুভাষকে পেছন থেকে হাতবগল ধরে মাটি থেকে টেবিলের ওপর তুলে দিতে-না-দিতেই কেউ কোমর ধরে, কেউ পা ধরে, সুভাষকে খাড়া করে দেয়। সুভাষ খাড়া হয়েও যান। তিনি হাসিমুখে সবার দিকে ঘুরে নমস্কার দিতে শুরু করতেই আবার জয়কার ওঠে, 'সুভাষচন্দ্র বসু জয় জয়,' 'আল্লা হো আকবর'। সুভাষ চিৎকার করে বলেন, 'আমি আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি এইমাত্র। আপনারা সাইক্লোনের যে-বিপদের মধ্যে পড়েছিলেন, তখন আপনাদের পাশে এসে দাঁড়ানোর কোনো উপায় অন্তত আমার ছিল না। কিন্তু বাংলার কৃষক প্রাকৃতিক এমন দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করেই চিরকাল বেঁচেছে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর খরায় জলের অভাবে মানুষ বিপদে পড়ে আবার নিম্ন বঙ্গে এমন ঝড়জলে মানুষ বিপন্ন হয়। আপনারা কী ভাবে একে অপরকে সাহায্য করে সেই সময় বেঁচেছেন, সে-সব কথা, আমি আমাদের বন্ধু শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল মশায়ের কাছে শুনেছি। আপনাদের এই দুর্দশায় সাহায্য সংগ্রহের জন্য শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল এমএলএ মহাশয়ের উদ্যোগে ও এই জিলার ম্যাজিস্ট্রেটদের সাহায্যে একটা ত্রাণ কমিটি তৈরি হয়েছে। তাঁরা একটা ভাল নিয়ম করেছেন যে ব্যক্তিগত ও সংগঠনগত সমস্ত দানই এই কমিটি মারফৎ দেয়া হবে। আমরা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস থেকে সামান্য কিছু সাহায্য ঐ কমিটিতে জমা দিয়েছি। আরো দেব। কিন্তু দেশের বর্তমান অবস্থায় খুব কিছু একটা করে ওঠা খুব কঠিন। তবে, যত কঠিনই হোক, আপনাদের যে-কোনো ধরনের অসুবিধা নিয়ে যদি বিপদে পড়েন, তাহলে, যোগেনবাবু মারফৎ বা যে-কারো মারফৎ বা কেউ এখান থেকে গিয়ে সরাসরি আমার সঙ্গে দেখা করে জানাবেন। সাইক্লোনের পর জ্বরের ও পেটের অসুখের মহামারী শুরু হয়। যদি সরকার থেকে কোনো ইনজেকশন-টিকা দিতে আসে, আপনারা ইনজেকশন-টিকা নেবেন ও তাদের সাহায্য করবেন। আমি বিশেষ করে এতদঞ্চলের মুরুব্বি-মুখতার-মৌলবি-মোড়লগণকে অনুরোধ করছি—তাঁরা নিজেরা সর্বাগ্রে ইনজেকশন ও টিকা নিয়ে সাধারণ মানুষকে যেন উদ্ধার করেন, বিশেষ করে বাড়ির মেয়েদের ও বাচ্চাদের। আবারও বলছি, টিকা বা ইনজেকশনের বদলে ধুলোপড়া, জলপড়া, নিমছাল, এগুলোতে কোনো কাজ হবে না। আপনারা ভারতমাতার সৈনিক, আপনারাই যদি অসুখে মহামারীতে অকেজো হয়ে পড়েন, তাহলে স্বাধীনতালাভের জন্য ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে আপনারা টক্কর নেবেন কী করে। আমি এইটুকু বলে আমার বক্তৃতা শেষ করছি। আপনাদের জয় হোক, প্রদেশ কংগ্রেস জয় জয়, ভারতমাতা কী জয়—জয় জয়। বন্দেমাতরম্ আল্লা হো আকবর। নমস্কার। সেলাম। মা-বোনদের দোয়া চাই। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। কৃষক-মজুর এক হোক, এক হোক।'

সুভাষ ঘুরে-ঘুরে আবার নমস্কার দিতে থাতেন। কয়েকজন মিলে ঘূর্ণ্যমান তাঁকে পা ধরে,

হাত ধরে, কোমর ধরে, নীচে নামায়।

স্টিমারের ভোঁ তখনই বেজে ওঠে বেশ লম্বা করে। মিটিং হয়ে গেছে বুঝেই হয়তো ইচ্ছে করে বাজিয়ে দিয়েছে। বা, মিটিং ভাঙার সংকেত দিয়ে।

বরিশালে এমন কোনো অপ্রস্তুতভাবে ছিল না। সেখানে বঙ্গভঙ্গের সময় ১৯০৬-এ বিখ্যাত প্রাদেশিক সম্মিলন হয়েছে—সুরেন ব্যানার্জি, বিপিন পালদের নিয়ে ১৯২১-এ আবার প্রাদেশিক সম্মিলন রয়েছে। সালের পর প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মিলন হয়েছে, আগৈলঝরাতে রাজনৈতিক সম্মিলন হয়েছে—সেখানে মদন মোহন মালব্যের মত নেতা এসেছিলেন। তাছাড়া অনেক গোপন বিপ্লবীদলের অঘোষিত বহু ছোটখাটো সম্মিলন অনবরত হয়েছে। স্বামী প্রভশনানন্দ, পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত, ভোলানন্দ গিরি, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, প্রভু জগদ্বন্ধু—এই সন্ন্যাসী নেতারা ছিলেন বরিশালের সামাজিক জীবনের সঙ্গে মিশে। সেই সন্ন্যাসের আবার একটা ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী জনপ্রিয় দেশপ্রেমের ধারা বইত মুকুন্দদাস থেকে।

বরিশাল অভ্যর্থনা ও আয়োজনে অনভিজ্ঞ তো ছিলই না, বরং বহু অভিজ্ঞ। তাদের নেতাদের অনেকেই ছিলেন সারা বাংলার নেতা। তাদের কর্মীরাও ছিলেন সারা বাংলায় কর্মী হিশেবেই পরিচিত। বরিশালের বিভিন্ন আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল নেতারাই ছিলেন, প্রধান কর্মী। অশ্বিনী দত্তের বরিশাল, সতীন সেনের বরিশাল, ভেগাই হালদারের বরিশাল, বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার দেবেন সেনের বরিশাল, সুভাষকে তাঁর যোগ্য মর্যাদায় অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত ছিল। তার ওপর, বরিশালের রাজনীতির বা সমাজের অনেক নেতাই ছিলেন সুভাষের বন্ধুতুল্য। সুভাষ এর আগেও বরিশালে এসেছেন—যতীন সেনকে অনশন ত্যাগের অনুরোধ জানাতে। ভোটে এআইসিসি থেকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও সুভাষকে কংগ্রেসের সভাপতি হতে দেয়া হল না।—এতে সারা ভারতের কংগ্রেস নেতাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও অভিমান ছিল বরিশালের সব দলেরই নেতাদের মনে। আবার, বরিশালের অনেক নেতার সঙ্গেই ভারতের অন্যান্য নেতাদের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল—ডক্টর মুঞ্জে, শ্যামাপ্রসাদ, সাভারকর, গান্ধী, সি আর দাশ, অনুগ্রহ নারায়ণ সিং, মুজাফফর আমেদ, পি সি যোশী প্রমুখ। তাঁদের সকলেরই এই টুকু সহবৎ ছিল, যেন সুভাষচন্দ্রের অভ্যর্থনার ফলে কোনো রাজনৈতিক পক্ষপাত প্রাধান্য না পায়। বাংলার গৌরব ও ভারতের নেতাকে বরিশাল যেন তাঁর যোগ্য অভ্যর্থনা জানাতে পারে।

ব্যবস্থা সব আগে থাকতেই করা ছিল। একটা ফিটন গাড়ি নদীর সমান্তরাল পাকা রাস্তার ওপরে একই মুখে দাঁড়করানো ছিল। স্বাভাবিক ছিল—নদীতে পেছনে রেখে দাঁড়করানো। বহু বছর আগে সে-তর্কের মীমাংসা ঘটে গেছে। ১৯০৫-এর প্রাদেশিক সম্মিলনে সুরেন ব্যানার্জি ও বিপিন পালের জন্য ফিটন ছিল। ওঁদের সঙ্গে কালীপ্রসন্ন বিদ্যাবিশারদও ছিলেন, খালি গায়ে, উত্তরীয়ে ঢাকা কিন্তু পৈতে দেখা যাচ্ছে। তিনজন তো এক ফিটনে এঁটেই যাবেন। কিন্তু বিদ্যাবিশারদ বললেন, পেছন থেকে ঘোড়ায় ওঠা শাস্ত্রে নিষেধ, এটা শাহেবদের আমদানি, সুতরাং বিদেশী বর্জনের আওতায় পড়ে। সুরেন ব্যানার্জি না শোনার ভান করলেন, আর, বিপিন পাল মশায়ের সবচেয়ে স্বাভাবিক মুখাবয়বই যেন প্রত্যক্ষ নিষেধ—কোঁচকানো ভ্রূ, চোখের পাতা অর্ধেক নামানো, নীচের ঠোঁট ওপরের ঠোঁট থেকে এগিয়ে, খাড়া নাক—সুতরাং বিদ্যাবিশারদের নিষেধে তাঁর কিছু যায় আসে না। কিন্তু নিষেধতো নিষেধই—নৈব অশ্বারোহণ পশ্চাদাৎ। যা হোক ফিটন চলে গেল, বিদ্যাবিশারদের জন্য অন্য ব্যবস্থা করতে হল। কিন্তু বরিশালের নেতা ও সংগঠকরা বংশানুক্রমে এ-নিষেধ ভোলেননি, নৈব অশ্বারোহণ পশ্চাদাৎ। তখন থেকে ফিটনযোগ্য অতিথির জন্য ঘাটে ফিটন নদীর দিকে পেছন ফিরে থাকে না, নদীর সমান্তরালে

থাকে।

'ভারতমাতা কি জয়', 'সুভাষচন্দ্র জয় জয়', 'প্রদেশ কংগ্রেস জয় জয়', 'বন্দেমাতরম্'—এইসব জয়কারের মধ্যে সমবেত বিশিষ্টগণ সুভাষকে ঘাট থেকে রাস্তায় তুললেন, ইতিমধ্যে অনেকেই সুভাষকে মালা দিলেন, ফিটনে চড়বার মুখে এক বৃদ্ধা তাঁর কাঁপা আঙুলে সুভাষের কপালে রক্তচন্দন লেপে দিলেন। সুভাষ তাঁকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম সেরে যখন সোজা হলেন, দেখেন, চন্দনচূর্ণ তাঁর চশমার ডান কাচে পড়েছে। সুভাষ ফিটনে ওঠার পর বরিশাল জিলা ফরোয়ার্ড ব্লকের সভাপতি পি এল রায় মশায় উঠলেন। সুভাষ তাঁকেই বললেন, 'যোগেনবাবু তো আমাদের সঙ্গে এলেন। উনি যাবেন না?' এটা ছিল ফরোয়ার্ড ব্লকের আয়োজিত জনসভা ও কর্মিসম্মিলন। রায়মশায় চট করে বুঝতে পারেননি যোগেন বলতে কাকে বোঝাচ্ছেন সুভাষ। তিনি বলে ফেললেন, 'কে যোগেন?' সুভাষবাবু তখন আসন থেকে পেছনের শোভাযাত্রার দিকে তাকাচ্ছেন, ঘাড় না ঘুরিয়েই তিনি বললেন, 'যোগেন মণ্ডল, আপনাদের এমএলএ।' সুভাষের গলা অনেকেই শুনতে পেল ও বোঝা গেল যে-শোভাযাত্রা তৈরি হচেছ সেখানে যোগেন মণ্ডল, যোগেন মণ্ডল, রব উঠল। সুভাষ সোজা হয়ে বসতেই যোগেনবাবুকে ধরে দু-তিনজন এলেন। একজন রসিকতাও করলেন, 'আসামী হাজির।' যোগেন সুভাষকে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনে নাকি ডাকছেন?'

'ডাকব না? একেই বলে গাছে তুলে দিয়ে...। উঠে আসুন—'

যোগেন জিভ কেটে দুই কান ধরে বলে ওঠে, 'সে কী কথা! এডা তো বরিশাল। আপনার লগে ফিটন চইড়্যা নগরকীর্তন আমার করা সাজে?'

ততক্ষণে অনেকেই যোগেনকে ঠেলে প্রায় তুলেই দিয়েছে। এমন কথাও কেউ চাপা স্বরে বলে ওঠে, 'কী কর যোগেন, উনি ডাইকতেছেন, যদি কুনো অসুবিদা বোধ করেন। উঠো।'

কথাটার মধ্যে আদেশ ছিল, যোগেনকে উঠতেই হল। তাঁর পাশের জায়গাটি থেকে ফুল-পাতা ঝেড়ে রায়মশায় বলেন, 'তুমি বরং এইখানে বইস্যা সর্বজনের সমক্ষে তোমার শাস্তি প্রদর্শন করো। যোগেন যে ফরোয়ার্ড ব্লকে যোগদান করছে, সে-সংবাদ আমার নিকট পৌঁছায় নাই। তাই আমি বুইঝতে পারি নাই, কোন্ যোগেন?'

সুভাষ একটু হাসি মিশিয়ে বললেন, 'না, না, উনি ব্লকের কর্মী নন। ব্লক তো কংগ্রেসেরই ভেতর। উনি কংগ্রেসের ধারেকাছে থাকেন না। উনি তো আইনসভায় বিরোধীপক্ষের বড় নেতা। বন্ধু হিশেবে কখনো-সখনো আমার অভিভাবক।'

রায়মশায় তাতেও ঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করে বসেন, 'তয়?'

সুভাষ তাঁর চশমাটা খুলে ধুতির খুঁটে মুছতে থাকেন। চন্দনটা ভেজা ছিল, কাচে আটকে গেছে, সুভাষ পকেট থেকে রুমাল বের করেন।

যোগেন ঠিক বুঝে উঠতেই পারছিল না, সুভাষ তাঁর কাছে কী চাইছেন। কর্মসূচি অনুযায়ী সুভাষকে নিয়ে এই মিছিল নগর পরিক্রমা করছে। মিছিলের কোথাও গান, কোথাও জয়কার। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে অনেকে ফুল ছিটচ্ছে। দুটি-একটি মোড়ে ফিটন থামাতে হল, সুভাষকে কোনো প্রতিষ্ঠান বা বিদ্যালয় থেকে সংবর্ধন করা হল।

শহরের একটু পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন অংশ দিয়েই শোভাযাত্রা শেষ হল পি এল রায় মশায়ের দোতলা বাড়ির সামনে। বেলা দুটোয় বাণীপীঠ স্কুলের মাঠে জনসভা। শোভাযাত্রার মানুষজন যে যার পথে পা বাড়ায়। সুভাষকে নিয়ে রায়মশায় দোতলায় ওঠেন। সেখানেই সুভাষের থাকার ব্যবস্থা। সুভাষ সেই ঘরে বসলে, যোগেন তাঁর কাছে গিয়ে বলে, 'আমি আমার বাড়িতে যাচ্ছি। মিটিঙে যাব। কিন্তু সেখানে সাক্ষাৎ-হওনের সম্ভাবনা কম। আমি রাইতে ফিরার পথে একটা

ঘুরান দিয়া যাব।'

'সে কী? আপনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন না? খাবেনও না? আপনি যাচ্ছেন কোথায়?'

'বরিশালে আমার বাড়িঘর নাই না কী। এইডাই তো আমার কর্মক্ষেত্র।'

'কিন্তু আপনি তো বলেছিলেন এখানে আপনার কোনো বাসাবাড়িও করেননি। এক বন্ধুর সঙ্গে থাকেন।'

'সে-ও তো আমারই বাড়ি। বাড়ি আইল্যাম অথচ বাড়িতেই গেলাম না, এডা কেমন হইব? লোক কী কবে?'

'লোক তো এও বলতে পারে যে সুভাষবাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে যোগেনবাবু কোথায় যে গা-ঢাকা দিলেন।

'য্যান আপনার পাশে থাইকলে আমার মুখোজ্জ্বল হইব! রামচন্দ্রের পাশে হনুমানের পোড়া মুখ।'

'আমি তো গৃহকর্তার অতিথি। অতিথি দেবো ভবেৎ। আমার সেই অধিকারে আপনাকে নিমন্ত্রণ করছি—আমাদের সঙ্গে আহার করবেন। আর, একটু প্রস্তুত হয়ে নেবেন। আজকের জনসভায় আপনি সভাপতিত্ব করবেন।'

'সুভাষবাবু, আপনার কথামত এই বাড়িতে আমি দিনে আটবার খাব।'

'না, না, ভয় দেখাবেন না গৃহকর্তাকে। শেষে আপনিই জব্দ হবেন', সুভাষ বলেন।

'আটবার খাব মানে অষ্টপ্রহর খাব। শিয়াল-মোরগার নাগান। কিন্তু বরিশালের জনসভায়, মানে বরিশালে আপনার জনসভা বরিশালের ইতিহাসে যে কত বড় ঘটনা, সেডা আপনে কল্পনাও কইরতে পারবেন না। আমি এখানকার বারের নেহাৎই জুনিয়ার এক উকিল। আপনার লগে পরিচয়ের সূত্র এমন এক দিগ্বিজয়ী ব্যারিস্টার মারফৎ আর আইনসভার খেজুর‍্যা রাজনীতির মইধ্যে যে আপনে আমার সাইজ মাপতে পারেন নাই। কিন্তু বরিশালের পোলাপানরাও তো আমার সাইজ জানে। আপনার সভায় সভাপতি হওয়ার ভাগ্যে আইজ আমারে কেউ কিছু কবে না। কাল থিক্যা তো আপনে নাই। তহন এই পোলাপহনগুল্যা তো আমারে ঢিল্যাব। আর পিছন থিক্যা লুক্যাইয়া ডাকব 'যোগেন পাগলা'।'

'আচ্ছা। তাহলে আমার বক্তৃতার ওপর তো আপনি সেন্সর করতে পারেন না। আমি আজ বরিশালবাসীদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাব। সেটাই আমার বিষয়। দেশ প্রতিটি দিন স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য নতুন হয়ে উঠছে অথচ আমাদের নেতৃত্ব এত পুরনো যে ঝুড়ি নেমে গেছে। বরিশাল দেশকে দেখিয়েছে—যোগেন মণ্ডলের মত সৎ, পরিশ্রমী, জ্ঞানী, নিঃস্বার্থ নেতাকে কী করে প্রদেশ ও দেশের রাজনীতির সর্বোচ্চ শিখরে তোলা যায়...'

'আপনে ছাড়ান দ্যান, ছাড়ান দ্যান। আপনে তো আমারে ডর খাওয়াইয়া কর্মসম্পন্ন করতিছেন। আমি আপনার তুলনায় এতই তুচ্ছ যে আমি ডরাইয়্যাই থাকি। তার জইন্য আপনার এতডা শক্তি ব্যয় শোভা পায় না।'

'আমি একটু অসাবধানে এমন করে বলেছি যেন এগুলো বানানো। আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনার সম্পর্কে এটাই আমার ধারণা। আমি ও আপনি ছাড়া তৃতীয় কোনো ব্যক্তি নেই যে জানে নেতৃত্বের ভয়, জড়তা ও অক্ষমতা এই মুহূর্তে নতুন নেতাদের উঠে আসা কেমন ঠেকিয়ে দিচ্ছে। আসার পথে স্টিমারে আপনার সঙ্গে সারারাত তো এই কথাই হল। আমাদের সমাজ যাদের নিম্নবর্ণ করে রেখেছে, আবার একই সঙ্গে, উচ্চবর্ণের স্বার্থে যাদের বর্ণব্যবস্থার অন্তর্গত করে রেখেছে—তাঁদের সেই নিম্নবর্ণের আন্দোলনের জন্য সারা ভারতের পরিপ্রেক্ষিত

তৈরির কথা হল। এখন আপনাকে উদ্দেশ্যহীন হয়ে কোনো একটি কাজের কথাও বলছি না।'

'আমারে অপরাধী কইরবেন না। আপনার মত মানুষের কোনো কাজে লাগা তো আমাগ মত তুচ্ছ মানষের ভাগ্যের কথা।'

'যোগেনবাবু, আপনার মুখে কিন্তু এ-বিনয় মানায় না। আপনার আক্রমণমুখী বিখ্যাত হিউমার কোথায় গেল?'

'আমার কি এটুক বোঝনেরও খ্যামতা আছে যে আপনে শুইনলেন কাল রাইতে আর আজ সকালেই কাজ আরম্ভ কইর‌্যা দিচ্ছেন?'

'এটা বাড়াবাড়ি করছেন। কাজটা তো আমার নয়, হয়তো ওরা জোর করে না তাড়ালে কাজটা নিয়ে এগনো যেত। কংগ্রেসের ছাতাটা তো বিশাল। তবে, মনে হয় না, কংগ্রেসের ঐ সব নেতাদের রাজি করানো যেত। তবু, কংগ্রেস বা গান্ধীজি যদি শূদ্র-অধিকারের এতটা সম্প্রসারণে রাজি না হতেন, তাহলেও কংগ্রেসের তর্কবিতর্ক তো? এটা একটা ন্যাশন্যাল ইসু হয়ে যেত।'

'দ্যাহেন, সুভাষবাবু, আপনি তো সারা দ্যাশের নেতা, শুধু শুদ্দরগ নেতা না। কিন্তু কংগ্রেসে তো আমাগ সমাজের বড় মানুষরা তো ছিলেন, আছেন। তারা তো অন্তত কথাটা, মানে তর্কটা তুলব্যার পারতেন। তাইলেও তো ইস্যুডা লোকের চক্ষুর সামনে থাইকত।'

'তেমন ইফেকটিভ বড় নেতা কংগ্রেসে কোথায়, যিনি নিজের ক্ষমতায় একটা অঞ্চলের বা প্রদেশের নেতা, আবার নিজের সম্প্রদায়েরও নেতা, আবার ডিপ্রেশড জাতগুলোরও নেতা। এক আপনি যদি আসতেন কংগ্রেসে, বা মহারাষ্ট্রের আম্বেদকর, বা মাদ্রাজের রাজা। জগজীবন রাম বলে বিহারের এক নেতার কথা, শুনছি যিনি জাতিতে শূদ্র। তাঁকে হয়তো কংগ্রেস তুলবে এখন।'

'বিহারে কি গান্ধীজির আন্দোলনের সঙ্গে মানে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জাতের পার্টিগুল্যার কুনো আকছা-আকছি নাই?'

'তা নিশ্চয়ই আছে। ওদের ভাঙিয়ে তো উঁচুবর্ণের নেতারা করেকম্মে খান। তাই কংগ্রেসের ভিতরে অন্তত কারো-কারো তেমন দলিতনেতাকে মেনে নেয়া হয়। এখানকার উলটো। এখানে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনগুলিতে কোনো নিম্নবর্ণের নেতার নাম পাবেন না। বিহারে প্রচুর। জগজীবন রামের কথা বললাম। আরো কয়েকজনের নাম শুনছি, যাঁরা আগামী কোনো আন্দোলনের নেতা হয়ে উঠবে—প্রসাদ মণ্ডল বলে একজন। বিহারে তো প্রদেশের নেতৃত্ব ঠিক করে উচ্চবর্ণও না, নিম্নবর্ণও না। মধ্যবর্ণ যাদব, ভুঁইহার, কুরমি এইসব মধ্যবর্ণ।'

'বিহারের নিম্নবর্ণ নেতারা কি তাদের শ্রেণী বা জাতের দাবি সবার সামনে হাজির করব্যার পারছে?'

'সেখানে সমস্যাটা আলাদা। আমাদের এখানে যেমন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুযোগে হিন্দু উচ্চবর্ণের একচেটিয়া জমিদারি, বিহারে সেরকমই একচেটিয়া দখল নিম্নবর্ণের উচ্চবিত্তের। তারা চেষ্টা করছে বর্ণেও উচ্চ হওয়ার। কিন্তু আমাদের এখানে ব্রাহ্মণ আর শূদ্রের মাঝখানে মধ্যবর্তী বর্ণের আর্থিক দাপট খুব বেশি নয় হয়ত, ইংরেজ আমলের শুরু থেকেই তারা সব কায়স্থ হয়ে গেছে, সেনসাস শুরু হওয়ার পর তো রেকর্ডও হয়ে আছে, বিহারে ঠিক সেরকম নয়। সে-কারণেই উনিশ শ বত্রিশের গোলটেবিলে অনেক ঐতিহাসিক মত দিয়েছিলেন যে বাংলায়, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে, অস্পৃশ্যতা, প্রধান সমস্যা নয়। তারপর তাঁরা আবার ব্যাখ্যা করেছিলেন—দাক্ষিণাত্যের তুলনায় তাঁরা কথাটি বলেছেন। তেমন বলার কারণ ছিল, এখনো

আছে ও ইংরেজদের সঙ্গে ক্ষমতা হস্তান্তরে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেলে আবারও উঠবে, বাংলা নিয়েই। কেন আমি এটা বলে রাখছি, তা আর বিশদ করছি না। এই ঐতিহাসিক সূত্র যদি মানিয়ে নেয়া যায় যে বাংলায় অস্পৃশ্যতা হিন্দুদের প্রধান সমস্যা নয় ও বাঙালি মুসলমানরা সব নিম্নবর্ণের ধর্মান্তরিত হিন্দু—তাহলে লাভ কাদের সেটা আপনারা ভালই জানেন।

'আপনের পাশে বইস্যা ফিটনে চইড়্যা নগরপরিভ্রমে বা মধ্যাহ্ন আহারে বা সভায় সভাপতিত্বে রাজি না-হওয়ায় আপনার গোসা যে এমন আশীর্বাদ হইব, ভাবি নাই। আপনে যে রাজনীতির ফিলজফিটা এমন সাজাইয়্যা দিলেন, সেডা নিজে বুঝার সাধ্য আমার ছিল না, সুভাষবাবু। এইডা যে আমাগ কত বড় নির্দেশ হইয়া গেল, সেডা আপনার পক্ষে ধারণায় আনা সম্ভব না। তার উপর একটা বড় বাধা যে উঁচা হিন্দুগ লগে আমাদের শুদ্দুরদের খটাখটি, মান-অপমান, পরিবারগ রক্ষা, চাষ রক্ষা এমন একডা বারমাস চব্বিশঘণ্টার ঝামেলা যে, নিরপেক্ষ বিচারের জন্য নাকের ডগা থিক্যা একটু বেশি দূরের দৃষ্টি আমাগ আসে না।'

'এই কথাগুলো আপনাকে বলতে চাই। কলকাতায় তো সম্ভবই নয়। কথা বলতে আপনার সঙ্গে আপনার জিলায় আপনার শহরে এলাম আর আপনি পালিয়ে যাচ্ছেন', সুভাষ একটু হেসে বললেন, 'আমি তো বাংলার অস্পৃশ্যতা বুঝতে পারলাম আপনার ব্যবহারে। আপনি আমার সঙ্গে একাসনে বসতে রাজি নন, দুই আসনে খেতে রাজি নন, এক সভায় বক্তা হতেও রাজি নন। অস্পৃশ্যতার আর বাকি থাকে কী?' সুভাষই হেসে উঠলেন জোরে, যোগেন জিভ কেটে শুধুই মাথা নাড়তে লাগল। ঘরে লোকজন আর-কেউ ছিল না। সুভাষ তাঁর কথাগুলো বারবার যোগেনকেই বলতে চাইছিলেন যে সেখানে উপস্থিত থেকে শোনাটা অনেকের কাছে মনে হল—এটা লুকিয়ে কান পেতে শোনার মত আত্মমর্যাদা-নষ্ট করার মত কিছু হয়ে যাচ্ছে। আরো কেউ-কেউ সুভাষ-যোগেনের আলাপের বিষয়টাতে কৌতূহলী হয়ে উঠতে পারছিল না। ফলে, সুভাষ আর যোগেনই ছিল বক্তা ও শ্রোতা, দুই-ই।

'আর-একটা খুব দরকারি কাজের কথা আপনাকে বলেনি। এরকম ফাঁকা আর পাব কী না কে জানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনারা সারা ভারতের ডিপ্রেসড কাস্টদের একটা কমন কজ পাবলিক করুন। সে যাই হোক। এমন কী, আপনি যেটা বলছিলেন, 'আমরা হিন্দু না', বা, 'আমরা হিন্দুদের হয়ে রায়ট করব না কিন্তু আমাদের শক্তিতে রায়ট ঠেকাব।'

'মনে হচ্ছে, আপনারে কাইল রাত্তির থিক্যা এডডু ভাবাইয়্যা তুলছি।'

'এটাই তো মুশকিল এত টানা জেল খাটার। আপনি শুধু সমস্যাটাকে ভাবতে পারেন ও আপনার রাজনীতি অনুযায়ী সমস্যাটাকে ব্যবহারের উপায় ভাবতে পারেন, চার দেয়ালের মধ্যে আটকে, তার একটা লোহার শিকের। কিন্তু সেটা তো আপনার ভবিষ্যৎ শক্তিরও সঞ্চয়।'

'সে তো যে-মানুষ তার বর্তমানটাকে তার ভবিষ্যতের থিক্যা বেশি দেখে তাগ পক্ষে—'

'আমি তো গান্ধীজির কাছ থেকে রাজনীতিতে আসিনি। সি আর দাশের কাছ থেকে এসেছি। কিন্তু, জানেন, গান্ধীজির কাছ থেকেই রাজনীতির কর্মসূচি কী করে তৈরি করতে হয় সেটা শিখেছি—ঐ কম বয়সেই, জেলে যাতায়াত শুরু করার আগেই। গান্ধীজি ভারতে আসার পর নতুনরকমের আন্দোলন যখন শুরু করলেন, ১৯১৭, তখনই চমকে উঠেছিলাম। দেখছিলাম ওঁর কাছে কোনো একটি বিষয়ও স্থানীয় নয় ও তুচ্ছ নয়, প্রত্যেকটা ইসুই জাতীয় বিষয় ; প্রত্যেকটা বিষয়েই চরম, মানে, আলটিমেট বিষয়। গুজরাতের ওয়াধোয়ান বলে একটা রেলস্টেশনে ঐ আবগারি অফিসাররা খুব সার্চটার্চ করতেন। প্ল্যাটফর্মে এক যুবক এসে তাঁকে এর প্রতিকার করতে বলল। গান্ধীজি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—এটার প্রতিকারের জন্য কি সে

জেলে যেতে রাজি আছে। ছেলেটি বলল, হ্যাঁ। শুরু হল আন্দোলন। গোখলের মৃত্যুসংবাদ জেনে বর্ধমান থেকে পুনে যাচ্ছিলেন। থার্ড ক্লাসে উঠতে না পেরে ইনটারক্লাসে উঠেছিলেন। মুঘলসরাইয়ে এসে আবার থার্ড ক্লাসে উঠলেন। রেল কোম্পানির সঙ্গে চলল আন্দোলন ও রেল কোম্পানি তাঁকে মুঘলসরাই-পুনে এই অংশের টারা ফেরত দিলেন। রেঙ্গুনে গেলেন ডেকে। ডেকের যাত্রীদের নোংরামির বিরুদ্ধে চলল আন্দোলন। কোনো একটি বিষয়ও স্থানীয় নয়। কোনো একটি বিষয়ও ব্যক্তিগত নয়। আমি চাই আপনি মহারাষ্ট্রের আম্বেদকার ও মাদ্রাজের রাজা-র সঙ্গে বসে একটা কমন কজ করুন।'

যোগেনকে সবই করতে হল।

সুভাষবাবুর পাশে বসে খেতে হল।

খাওয়ার পরে সুভাষবাবুই তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে রাজনীতির কথা তুললেন।

'বাণীপীঠ' স্কুলের মাঠে জনসমাগম ঘটেছিল এতই অভূতপূর্ব যে সংগঠক ও প্রত্যক্ষদর্শীদের ৩০-৪০ বছর পরে চারিত স্মৃতিতে তা বিশ হাজার থেকে দু-লাখের মধ্যে ওঠানামা করত। হাটের মত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, কেউ কারো কথা শুনতে পায় না, শুধু আওয়াজ, শুধু আওয়াজ। তখনো বরিশালে মাইক আসেনি। জানা থাকলে কলকাতা থেকে সঙ্গে আনা যেত।

দুই ডজন মত মানপত্র পড়া হবে ও সুভাষবাবুকে দেয়া হবে, ঠিক ছিল। অন্ধকার হওয়ার আগেই শেষ করতে হবে বলে মিটিং ডাকা হয়েছিল দুপুরে। শেষে, যোগেনই সুভাষের প্রতিনিধি হয়ে একে-একে মানপত্রগুলি নিল ও নামগুলি বলল। পড়া হল শুধু নাগরিক কমিটির মানপত্র। সুভাষ বেশ কিছুক্ষণ দেশের পরিস্থিতি নিয়ে বললেন—যুদ্ধ লাগল বলে, এই যুদ্ধে এমন কোনো কারণ কী আছে যাতে আমরা ব্রিটেনকে সমর্থন করতে পারি, নাকী, যাই হোক না কেন, কোনো এমন কারণ কি ঘটতে পারে যে আমরা ব্রিটেনকে বিপন্ন বন্ধু ভাবতে পারি ও এই সময় ব্রিটেনকে যুদ্ধে বিরক্ত করা থেকে বিরত থাকতে পারি? নাকী, ব্রিটেনের এই বিপদের সময় আমরা সবথেকে বড় আন্দোলন তৈরি করে, ব্রিটেনকে ভারত ছেড়ে যেতে বাধ্য করতে পারি?

বলার পর সুভাষবাবুর মনে হল, এই মূল কথাটি বোধহয় পরিষ্কার হল না। তিনি যোগেনকে অনুরোধ করলেন, কথাটাকে সরল করে বলে দিতে। যোগেন বলতে গিয়ে বেশি বলল। 'ধরেন একডা বড় হাটের মইধ্যে এক বুড়া ধর্মের ষাঁড় ঘুরে বেড়ায়। সে আপনার দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। আপনি কি সেই বলদকে একটা বাঁশের ঝুড়িতে একটা লাউ, বাঁধাকপি, একটা বড় বেগুন, একপাল্লা শসা ভুজ্যি দিবেন, জিভের একটা ছোটমত গ্রাসেই তিনি পেটে ঢোকাবেন? লাঠি মেরে তাকে তাড়াবেন? অথবা, আহারের অভাবে শীর্ণ সেই বলদ-নন্দনটিকে আপনার প্রতিবেশীর জমিতে খুঁটিতে বেঁধে রেখে আসবেন যাতে আপনার প্রতিবেশীর ক্ষতি হয়, বলদের লাভ হয় ও সেই সুবাদে আপনেও লাভের দু-আনি চার-আনি ভাগ পাবেন? নাকী, একটা লাঠি ধইর্‌য্যা সেই বলদডারে হাট থিক্যা বাইর কইর্‌য্যা দিবেন? সুভাষবাবু এই কথাডাই আপনাগ নিকট বলব্যার চান—ধর্মের ষাঁড়, মানে শাহেবদের ধর্ম। ধর্মের ষাঁড়ের ধর্ম। সেই ধর্মপালনের দায় দোকানদারের ওপর চালানো কেন। দোকানদারের ধর্ম দোকানদারের ধর্ম। যে সেই ধর্মপালনের দায় প্রতিবেশীর ওপর চাপাল কেন? একমাত্র সেই মানুষডাই নিজের ধর্ম নিজে পালন করল যে একখান লাঠি পাকাইয়া ধর্মের ষাঁড়কে সীমানা পার কইর্‌য্যা দিল। সুভাষবাবু এই কথাডাই বলতেছেন যে যুদ্ধডা একডা সুযোগ—আমরা সে-সুযোগ নিব কি নিব না?'

যোগেনের সারসংক্ষেপে খুব হাততালি পড়ল।

পরদিন রাতের স্টিমারে ওঁরা বরিশাল ছাড়লেন। যোগেন সুভাষবাবুকে তাঁর ক্যাবিনে ঢুকিয়ে

দিয়ে বেরিয়ে এল। এই দিনটাতে সুভাষবাবু সারাদিন ব্যস্ত ছিলেন ফরোয়ার্ড ব্লকের জিলা সংগঠন তৈরিতে। একটু বোধহয় বাইরেও যেতে হয়েছিল। সুভাষবাবুর সঙ্গে সেদিন যোগেনের দেখা হল শেষ বিকেলে। কলকাতা ফেরার জন্য। সারাদিনই দুজন-দুজনের নিজের কাজে ঘুরেছেন।

যোগেন দেখতে পাচ্ছিল—কোনো একটা সময়াভাবের অভ্যন্তরীণ তাড়ায় সুভাষ নিজের বইবার ক্ষমতার অতিরিক্ত চাপ নিচ্ছেন, এবার শরীর তার শোধ নেবে। সেই কথা ভেবেই যোগেন সুভাষবাবুকে ক্যাবিনে ঢুকিয়ে বেরিয়ে এসে রেলিঙের পাশে সাজানো দুটো চেয়ারের একটাতে বসে থাকল। একরাত্রির টানা ঘুম হলে শরীর সামলে যাবে। ক্যাবিনে একা-একা না-ঘুমিয়েও উপায় নেই। ফেরার সময় লোকসংখ্যা কম, এক শাহেব-ছাড়া। কিন্তু শাহেব তো স্বাধীন। কোনোভাবেই সুভাষবাবুর দলের নন। সে তার নিজের কাজ করছে, নিজের প্রশ্নের জবাব খুঁজছে, একটা প্রশ্ন থেকে আর-একটা প্রশ্নে যাচ্ছে।

গম্ভীর লম্বা সিটি বাজিয়ে লঞ্চ ছাড়ল।

গুমোট লাগছিল। একটু পিছিয়ে গিয়ে বাহিরজলে পড়ার জায়গাটায় বা লেনে ঢুকে পড়ল। তারপরই জল আর হাওয়া আর বন্দরের আলো ছোট হতে থাকা ও ভুলে যাওয়া।

যোগেন ঝিমুতে ভালবাসে। কিন্তু ঝিমুচ্ছিল না।

যোগেনের কাছে তো এই বিপুল জলস্রোত, এই স্রোতস্বী অন্ধকার, অন্ধকারের এমন প্রবল আলোড়ন আকাশজুড়ে—মাতৃগর্ভের মত রক্ষণশীল ও নিয়ত শুশ্রূষাময়। যোগেন নিজে সেটা জানে না—যেমন গর্ভের কোনো ভ্রূণই জানে না।

তেমন না-জেনেই তো জীবন চলে যায়। চলে যাচ্ছিল। তাদের কেমন উলটো জানা। যে-বিষয় আমারই নয়, যে-বিষয় আমার জাতেরও নয়, পাতেরও নয়, যত পেঁচিয়েই হোক যে-বিষয় থেকে কোনো একটি স্বার্থ আমি ছুঁড়ে আনতে পারছি না, যে-বিষয় থেকে আমার কোনো লাভই গড়ায় না সেটা আমার স্বার্থ নয়। কোনোকালে এমন করে ভাবতে শেখেইনি যোগেন। কোনোকালেই না। বাড়িতেও না, স্কুলে না, কলেজে না, ল-কলেজে না, বারে না, কোর্টে না।

সে না-হয় হল।

কিন্তু যোগেনরা তো এটাও জানেনি, তাদের স্বার্থটা কী। স্বার্থ নিশ্চয়ই সমতা নয়। উচ্চবর্ণের সমতা কি স্বার্থ? নাকি সম্মান?

রাত্রির সংকীর্ণ দিগন্তগুলি থেকে স্রোতোধ্বনির প্রত্যাঘাতে আর ক্রমেই নিবিড় ও উত্তরঙ্গ সামুদ্রিক হাওয়ায় যোগেন জেনে যায়—কোনো বিষয়ই স্থানীয় নয়, কোনো বিরোধই রায়ট নয় শুধু, প্রত্যেকটা বিষয়ই জাতীয়, প্রত্যেকটা বিষয়েই আমার স্বার্থ।

যোগেন আরো একটু টের পায়।

তার ঠাকুরদা, বাবা, কাকা, এত গরিব যে তাদের এমন কী কোনো স্বার্থের মালিকানাও নেই। এমন স্বার্থনির্বাসিত না-হলে যোগেন এই কথাটার অর্থ কি ধরতে পারত—কোনো বিষয়ই সংকীর্ণ নয়, সব বিষয়ই আমার বেঁচে থাকা নিয়ে।

ধাঙড় ধর্মঘট

১৩৬

বরিশাল থেকে ফিরেই সুভাষকে যেতে হয় নাগপুর 'আপোশ-বিরোধী' দ্বিতীয় সম্মিলন করতে। সুভাষ ভেবেছিলেন লেফট কনসোলিডেশনের নামে ডাকা এই সম্মিলনগুলিতে কংগ্রেসের সেই নেতা ও কর্মীরাও যোগ দিতে পারবেন, যাঁরা কংগ্রেসের ওপর দক্ষিণপন্থী নেতাদের একচেটিয়া দখল স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকর ভাবছেন। এঁদেরকে গান্ধীবিরোধী বলা যাবে না। বরং, এঁরা প্যাটেলবিরোধী। প্যাটেল সাংগঠনিক ব্যাপারে গান্ধীজিকে না-জানিয়েই অনেক কিছু করছেন। বম্বে ও সেন্ট্রাল প্রভিন্সে প্রাদেশিক কমিটির যেহেতু প্যাটেলের মনোনীত প্রার্থীরা প্রার্থী হতে পারেনি, সেই কারণে প্রাদেশিক কমিটির ওপর খাপ্পা হয়ে এই দুটি প্রদেশেরই কংগ্রেস-নেতাদের শাস্তি দিয়েছেন প্যাটেল। প্রদেশ-সভাপতির পদে যথাক্রমে নরিম্যান ও এন বি খারে-কে বাতিল করে তাঁর নিজের লোক মি. জি খারে ও আর এস শুক্লাকে বসিয়ে দিলেন। নাগপুরের সম্মিলনে তাই সুভাষের আশা আঞ্চলিক নেতারা আসতে পারেন। যদি তাঁরা আসেন, তাহলে স্বাভাবিক জীবনে কংগ্রেস কোনো প্রভাব ফেলছে কী না, যদি ফেলেও থাকে, তাতে যদি সুভাষের লাভও হয়, তাতেও সুভাষের বর্তমান ক্ষতি উশুল হবে না কারণ কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির পুরনো শরিকদের সন্দেহ তৈরি হয়েছে যে 'লেফ্‌ট', 'কনসোলিডেশন' আসলে কমিউনিস্টরাই। রামমনোহর লোহিয়া নামে এক নেতার নামে একটা কাগজে চিঠিও বেরিয়েছে। ওঁদের স্বাদেশিকতাতে লাগছে। সুভাষ যদি একদিন আগেও নাগপুর পৌঁছয় তাহলে কথাবার্তার সুযোগ পাওয়া যাবে।

যোগেনকে সুভাষ কলকাতায় নেমেই বলেছিলেন—'আমি নাগপুর থেকে ফিরলে কথা হবে।'

'নাগপুর আবার কবে সাব্যস্ত হইল!'

'ওখানে তো অ্যান্টি সারেনডারের সেকেন্ড সম্মিলন।'

'সেই হানে তো বরিশালের আমাগ সমস্যা আপনার মাথায় থাকব না?'

'থাকবে কী করে। এখানে কি নাগপুরের কথাও কিছু বলেছি?'

'এই বিদ্যাডা আপনার নিকট বা আপনাগ নাগাল উচ্চবর্ণের সর্বভারতীয় নেতাগর নিকট শিক্ষা নিব্যার লাগব—মাথার খুলির এই খোপগুল্যা ক্যামনে বানাইলেন। নাগপুর, বরিশাল, ধাঙড় স্ট্রাইক, ব্রিটিশ সরকার। অপারেশন কইরব্যার লাগব? নাকী বামুন হইবার লাগব? কিন্তু আপনে বা গান্ধীজি একজনও তো বামুন না? তয়?'

'আর আপনি যে জয় বরিশাল করে আজ কর্পোরেশনে স্ক্যাভেঞ্জার স্টাইক করবেন? তাহলে আপনি আপনার মেথড়ে আমাদের সর্বভারতীয় বলে শিডিউল টাঙাবেন কেন? আর আমাদেরই বা কুলীনের লিস্টে ঢোকাবেন কেন?'

'কী যে কন, সুভাষবাবু, ভাগ্যি কাছাকাছি গাছপালা নাই, তাই হাইসল না। কইতেছি গান্ধী-সুভাষের কথা, কোথিক্যা আইনলেন যোগেন মণ্ডলের কথা!'

'আপনি কিন্তু সাকিনার সঙ্গে আজই দেখা করবেন, ঐ যে কর্পোরেশনের স্ট্রাইক।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার মনে আছে, কিন্তু সাক্ষাৎ কইরতে হইব কী? আমার কথাবার্তা বুইঝব্যার পারব তো? না কী দোভাষী নিয়া যাব?'

'বরিশালে আপনি যেমন ছিলেন—। আমার নাম বলবেন কেন? আপনাদের সংগঠনের

নাম বলবেন। তাছাড়া, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। আপনি যে কত বিখ্যাত, সবাই যে আপনাকে কত চেনে, আপনি তা নিজে জানেন?'

কর্পোরেশনে যোগেন খুব বেশি আসেনি। এত প্রকাণ্ড দুই লালবাড়িতে কর্পোরেশন ইলেকশনের পর একদিন এসেছিল বোর্ড মিটিং করতে—সেদিন কিছুই হল না, শুধু গালাগালি-মারামারি ছাড়া। কর্পোরেশনের মিটিঙের মারামারিটা যোগেনের খুব ভাল লাগে। একজন মেম্বার উঠে বেশ কয়েকটা লাইন পেরিয়ে গিয়ে আর-এক মেম্বার, যিনি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছিলেন, পেছন থেকে তাঁর ঘেঁটি ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে আবার অতটা হেঁটে নিজের আসনে এসে বসলেন। ওঁরা দু-জনই হিন্দু মহাসভার। যিনি হেঁটে গিয়ে ঘেঁটি ধরে আর-এক মেম্বারকে বসিয়ে দিলেন, তিনি কর্পোরেশনে হিন্দু মহাসভা দলের হুইপ। হুইপ দেয়ার এমন কার্যকর ব্যবস্থায় যোগেন আরো আনন্দ পেল।

আইনসভার হাওয়াটাই খুব কড়া। মেম্বারদের ওপর কড়া, তা নয়। মেম্বাররা যাতে কাজ করতে পারেন ও কাজে কোনো বাধা না ঘটে, সেই ব্যবস্থাটা কড়া। অনেকটা হাইকোর্টের কোর্টগুলির মত। তার একটা কারণ বোধহয়, যোগেনের মনে তখনই এসেছিল, আইনসভাতে স্পিকার আছেন ও কোর্টে জজশাহেব আছেন। এখানেও তো মেয়র আছেন। তাঁর ক্ষমতা তো আরো বেশি। যোগেন তার কর্পোরেশন-অভিজ্ঞতাকে একটু সাজিয়ে নিতে এরপরও ভেবে নিয়েছিল, সেখানেই বোধহয় গোলমাল। আইনসভার আইন যদি হত, প্রধানমন্ত্রীই স্পিকার হবেন, মানে হকশাহেব, তাহলে তো নরক গুলজার।

প্রথম দিনের মিটিঙে কোনো কাজ হল না বলে যোগেন দ্বিতীয় দিনের মিটিং করতে যায়। সেদিন সকলে বেশ শান্তভাবেই মিটিংটা করলেন। মিটিঙের বিষয়গুলি নিয়ে আগেই কংগ্রেস-লিগ-মহাসভার নেতাদের বোঝাবুঝি হয়েছিল। তাহলে আর গোলমাল হবে কোত্থেকে?

সে দুদিনই তো যোগেন এসেছে কাউনসিলার হিশেবে। ফলে তাকে কিছু খুঁজতে হয়নি। দরজাতেই লোকজন হাজির ছিল। তেমনি কর্পোরেশনের বাড়িঘর কিছু দেখাই হয়নি, চেনা তো দূরস্থান। যোগেনের এমএলএ আর কাউন্সিলার হওয়ার মাঝখানে বছর তিনেকের ফারাক। কর্পোরেশনে যাঁরা নির্বাচিত হয়ে আসেন তাঁদের একটা আলাদা সম্মান থাকে মানুষের মধ্যে। যাঁরাই বাংলার নামজাদা লোক, তাঁরাই কর্পোরেশনের সঙ্গে যুক্ত। সি আর দাশ, জে এম সেনগুপ্ত, বিধান রায়, নলিনী সরকার, ফজলুল হক, ইস্পাহানি ছোট, জে সি গুপ্ত, শরৎ বোস, সিদ্দিকি, সারওয়ারদি, সুভাষ—কে না? এমন একটি সংস্থায় নির্বাচিত হওয়ায় যোগেন নিশ্চয়ই খুশি। কিন্তু সে এখনো বুঝে উঠতে পারেনি, নমশূদ্রদের জন্য এখানে কী কাজ সে করতে পারে। যোগেন মনে-মনে নমশূদ্রই ভাবে, ভেবে ফেলে নিজেকে শুধরোয়, 'তপশিলি জাতি'।

আজ তো যোগেন এসেছে ধর্মঘটী ধাঙড়দের দেখতে ও তাদের নেত্রী সাকিনা বেগম-কে দেখা দিতে। আজ তো কেউ তাকে 'রিসিভ' করতে দরজা দেখিয়ে দেবে না। তাকেই খুঁজে বের করতে হবে।

এমন খোঁজাখুঁজি যেমন ধীরেসুস্থে হয়, যোগেনও সেরকমই এগচ্ছিল। হঠাৎ যেন তার কানে আসে—খুব চড়া গলায় কেউ কিছু বলছে। যে-কেউ চড়া গলায় কিছু বললেই তো গলাটা সরু হয়ে যায়। তবে, এ গলাটা কোনো মেয়েরও হতে পারে। কিন্তু এত স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল না, যাতে শনাক্ত করা যায়। হাততালির একটা ঝোড়ো আওয়াজ উঠতেই যোগেন প্রায় দৌড়ে তালতলা রোডের ওয়াই-এম-সি-এর উলটো ফুটে গিয়ে সামনে তাকায়—হাজার-হাজার মানুষ

বসে আছে মাটির ওপর, মাথাটা একটু উঁচু করে সামনের কিছু দেখতে। দুই লালবাড়ির মাঝখানে জায়গাটিতে। যোগেন দেখছে সমাবেশটাকে পেছন থেকে। তাই সে বুঝতে পারে—সমাবেশের পেছনে যারা তারাই ঘাড় উঁচিয়ে আছে। কারো-কারো মাথায় ফেট্টি বাঁধা, সকলের না। যদ্দূর দেখা যায়—প্রায় পুরো সমাবেশটারই খালি ঊর্ধ্বাঙ্গ প্রায় নেংটিমত কিছু পরা। ফলে, এতগুলো উদোম উদ্দাম মানুষের ঘাড়-পিঠ-হাঁটু-উরু মিলে যেন একটা নদী বয়ে যাচ্ছে।

যোগেনের চমৎকৃত মনে নদী ছাড়া উপমা জুটবে কোত্থেকে? আবার নদী ছাড়া সে-উপমা সংশোধনই-বা হবে কী করে? যেন একটা নদী বয়ে যাচ্ছে—ভাবনা শেষ না-হতেই তার মনে এসে যায়—পাথরের নদী। নদী পাথরের হয়ে গেল—অদৃষ্টপূর্বতার ধাক্কায়? নাকী কোনো বিস্মৃত উপমার টানে?

যোগেন সেই উপবিষ্ট সমাবেশে পেছন থেকে ঢোকে ও একটু-একটু করে এগতে থাকে, কোথাও এগনোর পথ বেশ খোলাই। কোথাও কারো কাঁধে হাত দিতে হয়। কোথাও নিচু স্বরে 'ভাই' ডাকতে হয়। এমনকী দু-একটা ঘন ভিড়ে 'সুভাষ বোস'ও তাকে বলতে হয়েছে, কোনো বাধা পেরতে নয়, পথ-পাওয়ার সুযোগ বানাতে। একটু অবাক যে সে হচ্ছে না। এতটা ঘন, চাপা, বসা ভিড়ে এতটা দূর সে একা শুধু হেঁটে এল অথচ একটাও চেনা গলার ডাক শুনল না। পেটগরমের অনিদ্রার স্বপ্ন ছাড়া কোথাও কি নিজেকে এত নিঃসঙ্গ লাগে? যোগেন একটু হোঁচট খেয়ে দেখে, ঐ সমবেশটাকে আড়াআড়ি চিরে একটা বাঁধানো রাস্তা দুই লালবাড়ির ভিতরে ঢুকে গেছে। তখন সে-রাস্তাটা তার কাছে প্রাসঙ্গিক ছিল না। সে শুধু একবার মাথা ঘুরিয়ে দেখল, ও আধাআধি কি পৌঁছেছে? বুঝতে পারল না। তাহলে হতে পারে, সে উলটো দিক থেকে ঢুকছে। উলটো দিক থেকেই তো। তাহলে সম্মুখ কোথায়? যে বক্তৃতা করছে, এত বড় সমাবেশে সে একাই কথা বলছে। এই সমাবেশ সেই কথাগুলি সারা শরীর দিয়ে শুনছে সেটা, যোগেন সেই পাথরের নদী উজোতে-উজোতে টের পায় কখনো হাসির আওয়াজে, কখনো হাততালিতে।

যোগেন আচমকা চোট খেয়ে বসে পড়ল। আচমকাই হঠাৎ তার মনে এল—সে এত মানুষের এমন শান্ত সমাবেশ উজিয়ে সামনে যাচ্ছে কেন? মনে আসতেই সে আচমকাই, বসে পড়ল। তার পাশের মানুষটি সরে গিয়ে তাকে জায়গা দিল, মুখ না-ফিরিয়েই। যোগেন বসে পড়ার পর দেখতে পায় অনেক দূরে একজন কেউ বলছে, তার হাতটা, একটা হাত, তুলে। মাঝে-মাঝে সেই হাতটার একটা আঙুল দিয়ে যেন কিছু দেখাচ্ছে। কোনো মাইক নেই। যে বলছে, তার গলার আওয়াজটাই শুনতে হচ্ছে। সমাবেশে তাই অন্য কোনো ধ্বনি তৈরি হতে দেয়া হচ্ছে না। যোগেন তার শরীরটাকে এই সমাবেশের অন্য শরীরগুলির মত টানটান ও সোজা করে ফেলেছে—যা সে শুনছে, সেটা শুনতে।

সে এগুলো জানে না।

কলকাতা কর্পোরেশনে যে ধাঙড়-মেথরই আছে বিশ হাজার যোগেন জানত না। এই বিশ হাজার ধাঙড়-মেথরই ধর্মঘট করছে। মালিক চেষ্টা করেছিল, ভাঙতে, ভাগাতে। একজনকেও পায়নি। এক আদমিও সরেনি। উলটে, কর্পোরেশনের বাবুরা আজ নোটিশ দিয়েছেন, কাল থেকে তাঁরাও ধর্মঘট করছেন। যোগেন জানত না।

তার মানে বিশ হাজার ধাঙড়-মেথরের সঙ্গে দশ হাজার বাবু সামিল হলেন, তা নয়। ভাগ্যি, ধাঙড়-মেথররা গুনতে জানে না। যদি জানত তাহলে ঐ বিশ-দশ যোগ করে ভাবত, তারা তাহলে তিরিশ হাজারি হরতাল করছে। এ হিশাব বিলকুল ভুল। এখন লড়াই শুরু হয়ে গেছে।

লড়াই শুরু হয়ে যাওয়ার পর নিজের ক্ষমতা বাড়িয়ে ভাবা ঠিক না। তাহলে ক্ষতি হয়ে যাবে। কেন?

যোগেন জানে না।

বাবুদের হরতাল বাবুদেরই হরতাল। বাবুদের জোর আর দিমাক, আমাদের জোর আর দিমাক আলাদা। আমরা আমাদের জোর আর দিমাক দিয়ে হরতাল শুরু করেছি। সেই হিশাব নিয়েই শেষ করব। বাবুদেরও সেই আজাদি থাকবে। শুনছি কর্পোরেশন স্কুলগুলিতে যত মাস্টারলোক আছে, তারাও হরতালে নামবে। সেখানেও হাজার দশ। আপনারা সেটা যোগ করে ভাববেন না, আমরা তাহলে ৪০ হাজারের তাকত নিয়ে লড়ছি। বিলকুল ভুল হিশাব। গদ্দর। এটাই তো আমাদের তাকতের সাবুদ যে আমরা ধর্মঘট জারি করাতেই বাবুরা, মাস্টারসাবরা, টাইমটা মেলাতে পারলেন, যাতে কর্পোরেশনের ওপর ৪০ হাজারেরই শ্বাস পড়ে। আপনারা এটা খেয়াল রাখবেন পুরা, এখন তো কাজে যাচ্ছি না, তাহলে একটু আরাম করি, আরামটা একটু বাড়াই। আপনারাই ভাল জানেন, আরাম কী করে বাড়াতে হয়। লেকিন খেয়াল রাখবেন, চাকরির শিফটে টাইম বাঁধা, লেকিন হরতালের শিফট বগেড়া চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি। চব্বিশ ঘণ্টা ইউনিয়ন অফিসের কাছাকাছি থাকবেন। না-হয় তো কর্পোরেশনের আশপাশে থাকবেন। না-হয় তো মাতাজির কোঠির কাছাকাছি থাকবেন। কেন? আজ হরতালের তিন রাত পোহাবে। আপনারা যে-কাজ করেন, সে-কাজ বন্ধ হলে মহামারী হবে। তাই মালেকলোগ আপনাদের তিন রাত কিছু বলে নাই। কিন্তু এবার তো তারা বলবে। তাদের পুলিশকে দিয়ে বলাবে, মিলিটারিকে দিয়ে বলাবে। তার ওপর এখন যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধের সময় হরতাল-জুলুশ বেআইনি করা যায়। মালেকরা এবার করবে। তাই, যখনই মালেকরা জুলুম করে হরতাল ভাঙতে আসবে, তখনই একটা হুইসল শুনলে, বা একটা বাচ্চার মুখে খবর পেলে চোখের পাতা দশবার পড়ার আগেই এই আজ যেমন জমায়েত, তেমন জমায়েত তৈরি হয়ে যায়। সে দুপুর দেড়টায় হোক বা রাত দেড়টায় হোক বা সকাল দেড়টায় হোক বা বিকেল দেড়টায় হোক। খবর পাওয়ার পর দশবার আঁখের পাত বন্ধ হওয়ার আগেই জমায়েত হতে হবে। মালেকরা যাদের পাঠাবে, তারা এসে দেখবে, সব ফাঁকা। তারা আনন্দে ভাববে তাদের দালালির তাকত কত! তারা আসছে শুনেই হরতাল ভেঙে গেছে। তারপরই চোখের পাতা দশবার বন্ধ হওয়ার আগেই তারা বুঝবে, তাদের বিলকুল ভুল হয়েছিল। চাঁদের রাতে বা রোদের দুপুরে মানুষ ভিড়মি খায়, ভুল দেখে। তারপর চোট পেয়ে বোঝে ভুল দেখেছিল। মালেকরা ফাঁকা জমি দেখে ভেবেছিল হরতাল তুড়ে গেছে, এ তো নদীর মত ফাঁকা, শুধু জল আর হাওয়া আর ঢেউ। চোখের পাতা দশবার বন্ধ হওয়ার আগেই মালেকরা দেখবে, হাঁ, ঠিকই নদী, কিন্তু পাথ্থরের নদী। পাথ্থরের নদী কী করে হবে যদি আপনারা চব্বিশ ঘণ্টা হাজির না থাকেন। চব্বিশ ঘণ্টা। হয় এই অফিসের আশপাশে, নয় মাতাজির কোঠিতে, নয় কর্পোরেশনের ফুটপাথে। পাথ্থরের নদী। সে নদীতে জল নেই, স্রোত নেই, হাওয়া নেই। লেকিন নদীর মাফিক গতি আছে, ইস্পিড, আর আগুন জ্বালাবার চকমকি আছে, আর আগুন আছে। আজকের এই জমায়েত আপনারা করলেন কেন? যেহেতু কাল থেকে মালেক জাগবে। তাই আজকের এই জমায়েত থেকে বুঝে নিতে হবে—আজ রাত থেকে এমন কোনো ঘুম ঘুমানো চলবে না, যেটা থেকে জাগতে দশের বেশি বার চোখের পাতা বন্ধ করতে হয়। আজ রাত থেকে এমন দূরে যাওয়া চলবে না, একটা বাচ্চার আওয়াজ যে-দূর ডিঙাতে পারে না। আজ রাত থেকে এমন নদী খোয়াবেও দেখা চলবে না, যে-নদী পাথরের নদী হয়ে খোয়াব ভাঙাতে পারে না। আমি আপনাদের মত হরতালি না। আমাকে

মালেক হরতাল দিয়ে দিয়েছে জীবনভর। আমিও বলেছি, 'ঠিক আছে। এটাই আমার নিজের চাকরি। যে-মজুর লড়াইয়ে নেমে গেছে, তাকে পায়ে-পায়ে বাঁচানো।'

শাকিনা-যোগেন সাক্ষাৎ

এই সমাবেশের ভাষণগুলি থেকেই যোগেন ধীরে ধীরে বিষয়টি জানতে পারে, বুঝতে পারে। যদি সুভাষবাবু বারবার না বলে দিতেন তাহলে হয়ত আসত না। যোগেনের রাজনৈতিক উৎসাহ

১৩৭

খুবই ছোট-ছোট বৃত্তে ভাগ করা। বৃত্তের বাইরে হয়ত বড় বৃত্ত আছে কিন্তু তেমন ছোট বৃত্ত আর বড় বৃত্ত কোনোটাই যোগেনের তৈরি করা নয়। রাজনীতি, এই প্রদেশের, তেমনি সারা দেশেরই, পাক খায় কয়েকটি মাত্র বিষয় ঘিরে। সেই কয়েকটি বিষয়ের বাইরে স্থানীয় ঘটনাও আসে কিন্তু সাধারণত সেইসব ঘটনা রাজনৈতিক হয়ে ওঠে না। বরিশালের সাতলাবিলের জল বের করতে খাল কাটার দরকার—এটা কে না জানে? কবে না জানে? এর মীমাংসাও তো ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডেই হয়ে যেতে পারত—অনেক বছর আগেই হতে পারত, আইনসভা না-হলেও হতে পারত, চাইলে টাকাও জোগাড় হত। কিন্তু সাতলার খাল কাটা হলে লাভ সেখানকার চাষীদের। কাটা না-হওয়ায় ক্ষতি যা হওয়ার তাও সাতলারই কৃষকদের। কিন্তু তারা ক-জন? বড়জোর ৫০ ঘর। এই ৫০ ঘরের সবগুলো মানুষ মিলে অষ্টপ্রহর খাটলে সোনা ফলে। তারা কী করে জানবে কাকে মুরুব্বি ধরে কাকে বলতে হবে। সে যদি কেউ এটা মাথায় নেয়, তাহলে হতে পারে কিন্তু সকলের মাথা তো আর জগা পাগলার মত খারাপ হয়নি যে হাটে-হাটে সাতলাবিলের দুঃখের গান গেয়ে বেড়াবে, সাতলাওলারা বরং এত প্রচার চায় না। এমনিতেই সাতলার বিলের ধানের দর বেশি। দুনিয়ার সব মানুষ জানে, সেই চালের গুণ আর সেই দরের গুণ। যা রটেছে, তা রটুক। আরো রটনার কাজ নেই। শিয়ালকে ভাঙা বেড়া দেখাতে নাই।

সব স্থানীয় সমস্যা তো এইরকমই—এগুলো থেকে রাজনীতির ফ্যাকড়া আর কী বেরবে। আর আছে—হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। আর আছে—সুভাষ বোস। আর আছে সরকার চালানো। এর বেশি রাজনীতি যোগেন শুনবে-জানবে কোথায়? যে-খবর কাগজে বেরয় না, আইনসভাতেও শোনা যায় না, যেমন এই ধাঙড় ধর্মঘটের খবর।

কিন্তু সমাবেশ থেকে ফিরে, সমাবেশে বসে-বসেই তার মনে হচ্ছিল—এখানে তো তার অনেক আগে আসা দরকার ছিল। এ সমাবেশটাই ছিল তার জাতের মানুষদের, শুদ্দুরদের। সেই শুদ্দুর, যারা হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী শূদ্রের কাজ করছে এই শাহেবদের রাজধানীতে। শাহেবদের ধর্মে শূদ্র নেই। শূদ্রদের ধর্মে শাহেব নেই। কিন্তু শাহেবদের এই এত বড় রাজধানী চলবে না, যদি ঐ ২০-৩০ হাজার শূদ্র না থাকে। শূদ্রকাজে নিযুক্ত শূদ্র, না থাকে। তারা যখন শূদ্রকাজে অধিকারী ও বংশানুক্রমে পারদর্শী, তখন সেই শূদ্রকাজের, সরকারি শূদ্রকাজের, দখল নেয়া তো তাদের হকের ব্যাপার। যোগেন তার চোখের চশমার পাওয়ার বাড়িয়ে ফেলল শুধু হিশেব কষতে যে সরকারি কাজে সাম্প্রদায়িক অনুপাত রক্ষা করা হচ্ছে কী না, অন্ততপক্ষে ১৫ শতাংশ সরকারি নিয়োগ শিডিউল জাতগুলো থেকেই ঘটছে কী না ও বিভিন্ন বিভাগে বড়কর্তাদের

উচ্চবর্ণ সংস্কারে শূদ্রনিয়োগ কার্যত হয়ই না।

তার পাশাপাশি এদের কথা তো কোনোদিন ওঠেনি, এই বিশ-তিরিশ হাজার ধাঙড়দের কথা, যারা স্বাধিকারেই বলতে পারত আমাদের এই ডিপার্টমেন্টে শূদ্র ছাড়া কাউকে রাখা চলবে না। তেমন কথা এরা কোনোদিন বলেনি।

কথা হচ্ছিল শাকিনা বেগমের প্রাসাদের একতলা হলঘরে বসে পরদিন সকালে। শাকিনা হাসিতে ভেঙে পড়ল, যখন শুনল, আগের দিনের সমাবেশে মণ্ডল শ্রমিকদের সঙ্গে বসেছিল। যোগেন তাঁর 'কেন?' প্রশ্নের জবাব জানে না, 'আমাদের ওপর এত্ত গুসসা কেন', প্রশ্নেরও কোনো জবাব জুটল না জিভে।

যোগেন বলে বসল, আমি যদিও কর্পোরেশনে চাকরি করি না, তবু এই সত্যটা আর আমি লুকাব কেন যে আমি নমশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত চাঁড়াল ও শাস্ত্রে আমাদের মেথরই বলা হয়ে আসছে। তাহলে আমি তো হরতালি, তাহলে আমি আমার জাতভাই-কামদারির সঙ্গে বসব না কেন। হিন্দুশাস্ত্র আর ব্রিটিশ গবর্মেন্টি একমত হয়ে আমাকে আমার জায়গায় বসিয়ে দিয়েছেন। আমি বসে পড়েছি।

'সে ভালই করেছেন। আমাদের একটু বলে গেলে পারতেন। তাহলে আমাদের আর দশদিকে লোক পাঠাতে হত না—আপনার খোঁজে। ১৫ নম্বরেও গিয়েছিল।'

'সেডা আমি বুঝব্যার পারব ক্যা? আমারে তো কেউ জানানই নাই। আমি তো বাদাম খুইলতে-খুইলতে নিজ চক্ষুতে ঐ জমায়েত আবিষ্কার কইরল্যাম। আমি আমার জাতভাইগ পাইয়্যা ঐ হানেই বইস্যা পইড়ল্যাম। আপনারা আমারে খুঁইজ্যা পাইলেন না কারণ আমি আপনাগ জাতভাই না।'

শাকিনা তার বড় পাঞ্জা সহ বড় বড় আঙুল নাচিয়ে বলে, 'আজ তো আমরা একটা অফেনসিভ ফেস করব বলে মনে হচ্ছে—'

'খবর কিছু আইসছে?'

'মাতাজি, আপনি কি এর আগে কোনো বরিশাইল্যার সঙ্গে কথা বলেছেন, না হলে ওটা তো আবার অনুবাদ করে দিতে হবে।'

'আপনি কি আমাকে মণ্ডলজিকে চেনাবেন? আমরা কর্পোরেশনে কলিগ। উনি কি আমাকে ভুলে যাবেন? দুজনে জিতেছিও রিজার্ভ সিটে। আমরা জানি 'আমরা এক গোয়ালের গরু'। আপনি কী বললেন, মণ্ডলজির কি ভাষা কি জায়গা নিয়ে? বরি..., বরি...'

'ওটা একটা মজার কথা হচ্ছিল। আপনাদের মধ্যে কথা হওয়াটা খুব দরকার'। নীহারেন্দু বলেন।

'সে-কথা কি বাসি হয়ে যাবে? আমিও আছি। মণ্ডলজিও আছেন। কথাও আছে। কিন্তু আপনি কী বললেন, নীহারজি, আমি বি বাংলা বুঝি না, কিছু গড়বড় করেছি?'

'আরে না। ওটা একটা ঠাট্টা। মণ্ডলের দেশ বরিশাল। ওদের একটা নিজস্ব ভাষা আছে। সেই ভাষা কেউ বোঝে না। কিন্তু বরিশালের লোক বরিশালি ছাড়া কোনো ভাষায় কথা বলে না। তাই মণ্ডলের পেছনে লাগছিলাম—আপনি বরিশাইল্যাতে এক্সপোজড় কী না জানতে।'

'এত অসুবিধা হবে? তাহলে উনি যে অ্যাসেম্বলিতে আছেন?'

'হ্যাঁ। তাতে অসুবিধে কী?'

'সেখানে কথা বলতে হয়, বুঝতে হয় তো! তাঁরা কী ভাষায় শোনেন, মণ্ডলজি কী ভাষায় বলেন?'

'আরে, আইনসভায় সব লোকই তো বরিশাইল্যা। ওদের-ওদের মধ্যে কথা হয়ে যায়। হকশাহেবও বরিশাইল্যা। হোম মিনিস্টার নাজিমুদ্দিনও হাফ্ বরিশাইল্যা, হাসেম আলি শাহেবও বরিশাইল্যা। সুতরাং অসুবিধা নেই। আমি আছি। আপনারা কথা শুরু করুন।'

যোগেন বলে, 'হ। এরা তো বিলাত থিক্যা উকিল হইয়া আসছে। দ্যাহেন না হাইকোর্টের বার লাইব্রেরিতে আলাদা গোয়াল—শুধু দুষ্ট বলদদের লাইগ্যা, যারা বিলাত থিক্যা আইন পাশ। আপনে আর আমি দুইজনেই তো আইনশিক্ষার কাশীধাম ক্যালকাটা ল-কলেজের পাশ উকিল। তাই হিংসা—'

শাকিনা হাততালি দিয়ে উঠল, 'এটা তো আমার জানা ছিল না যে আপনিও অ্যাডভোকেট। ঠিক বলেছেন। নীহারজির হিংসা হিংসা। আপনি তো বরিশাইল্যাতেই বললেন। আমি তো প্রত্যেকটা কথা বুঝলাম। তবে? আপনি বলুন।'

'আমাকে সুভাষচন্দ্র বোস বলছিলেন আপনার লগে দেখা কইর‍্যা এই স্ট্রাইকটাতে নাক গলাইব্যার।'

'নাক গলাইব্যার? মানেটা কী হল। যতটা জানি সুভাষজি তো আমাদের স্ট্রাইক পছন্দ করছেন। তবে সেটা অনেক আগের কথা। এর আগেও একবার আমরা প্রায় স্ট্রাইকে যাচ্ছিলাম। সুভাষবাবুই একটা মিটমাট করে দিলেন। কিন্তু ওরা, মানে, কর্পোরেশন কোনো কাজই করল না। এখন সুভাষবাবু কি স্ট্রাইকের পক্ষে আছেন, না বিপক্ষে তা আমি জানি না। এর মধ্যে তো ওঁদের পলিটিক্স অনেক বদলে গেল। আপনাকে যে সুভাষবাবু আমার কাছে পাঠালেন তার মানে কি এই যে তিনি আমাদের পক্ষে দাঁড়াতে চান নাকী আমাদের এই স্ট্রাইকে কোনো মিটমাট চান নাকী উনি এটা অপোজ করতে চান? আপনাকে যে উনি পাঠালেন আমার কাছে—সেটার কারণটা কী?'

যোগেন তৈরি ছিল না—শাকিনা এত গোপন কথা এত সোজা বলবে। কলকাতার ট্রেড ইউনিয়নেই তো যোগেনের একটু-আধটু আড্ডা, আর আইনসভায়। সেখানে তো যে-কথাটা বলা হল তার ভিতর খোঁড়া চলে, কোন্ কথাটা বলা হল না। যোগেন মনে-মনে তৈরি হয়েই বলল, 'আপনার এই কথাডার জবাব দেয়ার ক্ষ্যামতা আমার নাই। জ্ঞানের দিক দিয়া তো নাইই। সুবিধার দিক দিয়াও নাই। সুভাষবাবু এত বড় নেতা যে তিনি আমাকে দিয়্যা তাঁর কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ কইরবেন, তার আন্দাজ আমি পাব। আমি ওঁর পার্টির লোক না। আমি কংগ্রেসের লোক না। মনে হয় না যে ওঁর কোনো রাজনীতির উদ্দেশ্যে উনি আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা কইরতে পাঠাইছেন। আমি জাতিতে নমশূদ্র, যাদের মুখের কথায় চাঁড়াল ডাকা হয়। এখন শিডিউল হয়ে যাওয়ার পর নিম্নবর্ণদের মধ্যে যে কত ভাগ আছে, তা বোঝা যায় না। আমার যা কিছু পলিটিক্স সবই নমশূদ্রগর নিয়্যা, বলতে পারেন শিডিউলদের নিয়্যা। আর প্রধানত হিন্দুগ বিরুদ্ধে। মুসলমানদের বিপক্ষে বা শাহেবদের বিরুদ্ধে আমি কখনো কিছু বলি নাই। সেটাকে যদি আমার রাজনীতির মধ্যে ধরব্যার চান ধরতে পারেন। সুভাষবাবুর সঙ্গে এ নিয়ে কথা হইছে কিন্তু ওনারে জানাইব্যাব উদ্দেশ্যে যে আমারে কিছু ভুল না ভাবেন। তবে সে কথা হইছে হিন্দু-মুসলমান নিয়্যা। শাহেবগ নিয়্যা না। কথা হইতে কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু যে-মানুষডা শাহেবগ জেলখানার ভাত খাইয়্যা আর মার খাইয়্যা এতগুলা বছর বাঁইচ্যা আছে, তার লগে এমন কথা তুইলতে ক্যামন লজ্জা করল। তবে কব একদিন। আপনারে আজই কই। তাও শাহেবসুবা আছে বইল্যা আমরা শুদ্দুররা নিম্নশ্রেণীর মানুষরা একটু-আধটু নালিশ জানাইবার জায়গা পাই, বিচারও পাই কুনো-কুনো সময়। তাই আমি স্বাধীনতা-টাধিনতার কথাবার্তায় যাই না। আমার একমাত্র

কাজ শূদ্রগ লগে সুবিধা আদায়। যাতে চাকরি পায়। যাতে লেখাপড়া শিখ্যা সমাজের নীচ অবস্থাটা বদলাইতে পারে। আর-একডা কথা। ধরেন, সত্তর-আশি বছর আগে আমাগ বলা হইত ধাঙড়-মেথর। গাইল হিশাবে না। কাম হিশাবে। তাই আমার এড্ডা ভাই-ভাই ভাব হইল আপনাগ জমায়েৎ দেইখ্যা। আমি হরতালি হইয়্যা বইস্যা গল্যাম। থাউক, আপনার তো এতডা কর্মাভাব নাই যে আমার জীবনীও আমার জাইতের জীবনী আপনারে শুইনতে হব। এসবই কইল্যাম টু জাস্টিফাই মিসেল্ফ অ্যান্ড দি পার্সন হু সেন্ট মি হিয়ার।'

শাকিনা আর দত্তমজুমদার দুজনেই খুব মন দিয়ে যোগেনের কথাগুলি শুনছিল। যোগেনের কথার মধ্যেই একজন এসে বসল—সে-ও শুনছিল, সে-ও কোনো কথা বলেনি। তাতে অবিশ্যি খুব নৈঃশব্দ্য এই বাড়িটাতে তৈরি হয়েছিল তা না। মাঝেমধ্যে এক-একটা ছোটখাটো দল ঢুকছিল। ওঁরা যেখানে বসেছিলেন, তার মাথার ওপর দিয়েই দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। যারা আসছিল তারা ওঁদের দিকে একপলকও না তাকিয়ে সোজা ওপরে উঠে যাচ্ছিল। কালকের জমায়েত দেখা বলে যোগেন বুঝতে পারছিল এরা সকলেই হরতালি ধাঙড়-মেথর। একটি মেয়ে দরজা দিয়ে ঢুকে চোখ নামিয়ে ধীর পায়ে ওপরের সিঁড়ির দিকে বেঁকল। একটা শাদা শাড়ির ওপর জরির কাজের রং, মেয়েটির শাড়িটি সামনে আঁচল দিয়ে পরা। যোগেনের মনে হল, ছবিতেই এক এত সুন্দর কাউকে দেখা যায়। ওর ওঠার সময়টুকু সিঁড়িতে কেউ ছিল না। শাকিনা বেশ মুগ্ধ হয়ে বলল, 'বাঃ, আপনি তো আমাদের লোক। নীহারজি কী বলছিলেন বরি...। সুভাষবাবুর নামের দরকার ছিল না, আপনি তো নিজের নামেই আসতে পারতেন। আমি বুঝেছি, সুভাষবাবু আপনাকেই কেন পাঠিয়েছেন। এমন কাউকে পাঠাতে চাননি যেখান থেকে রাজনীতির জাল বেরবে। আমরা আজ সকাল থেকে অপেক্ষায় আছি—কখন কমিশনারের নোটিশ আসবে যে এটা ইমারজেন্সি সার্ভিস, এখানে স্ট্রাইক করা চলবে না, এখনই যে যার কাজে জয়েন করো।'

'কেন? সেরকম কোনো সংকেত কি পান?'

'কী যে বলেন মণ্ডলজি। একনম্বর কর্পোরেশনই জানে না মোট ধাঙড়-মেথর তাদের কত। আমরাও ঠিক জানি না। আমরা অনেক দিন খোঁজখবর লাগিয়ে ২০,০০০ পর্যন্ত পেয়েছি। সেই খোঁজখবরের কোনো অসুবিধে নেই। সবাইই তো কর্পোরেশনের বস্তিতে থাকে। সুতরাং বাড়ি-বাড়ি ঘুরে সেনসাস করলেই তো মোট কত তা বেরিয়ে আসবে।'

'সেটা আপনাগ আগে কেউ করে নাই?'

'কেন করবে? কার দায়? এরা তো সব পার্মানেন্ট কনট্রাকচুয়্যাল লেবার। স্থায়ী মানে কিন্তু একটা লোকের চাকরি স্থায়ী তা নয়। কনট্রাক্টটা স্থায়ী। মানে কর্পোরেশন এই কাজটা এভাবেই করবে। কনট্রাকটারও স্থায়ী নয়। পদ্ধতিটা স্থায়ী।'

'কর্পোরেশনের কোনো দায় নেই এই এত লোকের ব্যাপারে?'

'আছে। অ্যাকোমোডেশন, ওয়াটার সাপ্লাই, লাইট, ইউনিফর্ম আর দরকারি ব্লিচিং পাউডার, তেমন কাজের জন্য গ্লাভস আর হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা সু, গ্যাস মাস্ক আরো এ-রকম কিছু ননসেন্স। এর মধ্যে প্রথম তিনটি হয়। হয় মানে আছে, তাই আছে। ধাঙড় বস্তি, মেথর বস্তি, ডোম বস্তি আছে, আলাদা-আলাদা। সেটা এদের নিজেদের সাবকাস্ট পার্থক্যের জন্য।'

'এটা আমারে আর বুঝ্যায়্যা বলার চেষ্টায় যাবেন না। আমাগ নমশুদ্দুরগ সবাই নমশুদ্দুরই জানে। কিন্তু মোট মানুষের সংখ্যাডা কত? ব্রিটিশ ভারতের পূর্বাঞ্চলে সব থিক্যা সেকেন্ড বড় জাইত। ফার্স্ট হইল রাজবংশী। এডা তো যে-কোনো লোকেই বুঝে যে এমন কোটি-কোটি মানুষের একটাই পেশা হওয়া সম্ভব না। পেশা যদি এক কইরতে হয় তাইলে জাতটারে ছোট

রাখার লাগে। বামুনরা যেমন রাখছে।'

'এটা তো আমার বোঝা হল না—

'কী? কোন্‌টা', নীহারেন্দু জিজ্ঞাসা করেন।

'ঐ বামুন ছোট শূদ্র বড়—বললেন মণ্ডলজি?'

'শাকিনা, ওটা তোমার এখনই না বুঝলেও চলবে।' নীহারেন্দু যোগেনকে বলেন, 'নিন, বোঝান, হিন্দু জাতিভেদ, এদিকে শিয়রে শমন।'

যোগেন অপ্রস্তুত হয়ে বলে, 'এমন কিছু না। ধরেন, আমরা শূদ্র পপুলেশন ভারতে, যদি একটু ব্রডলি, অ্যান্ড স্ট্রিক্টলি ধরেন তাহলে কিন্তু প্রায় ১০ কোটি হব। এখন কোনো উচ্চবর্ণের হিন্দুকে যদি জিগান, তাইলে উনি কবেন, কী আবার করবে, ধাঙড়-মেথর-ডোম-কসাই-চামার কাজের কি আর অভাব আছে না কী। কিন্তু আপনি তো নিজেই বোঝেন ১০ কোটি ধাঙড়-মেথর যদি লাগে তাইলে তাগ সেবা নিব্যার সংখ্যা তো হতে হয় ৬০ কোটি-৭০ কোটি।'

'হাউ কাম, মণ্ডলজি?'

'আমি কইতেছিলাম সিস্টেমটাই এমন যে, ধরেন, আপনে তো কইলেন কর্পোরেশনের ধাঙড় ২০,০০০-এর বেশির থিক্যা কম হব না। কিন্তু যদি আপনে জিগান—ধাঙড়দের কামডা কী, তহন শুইনবেন, স্ক্যাভেনজিং, তারপরেও যদি জিগ্যান, স্ক্যাভেঞ্জিং বলতে কী কাম বোঝায়, তালি শুইনবেন—ধাঙড়-মেথরগ যা কাজ। তেমনি আমাগ বেলাতেও, শুইনবেন, শুদ্দুর। জিগান, শুদ্দুরগ কামডা কী? তহন শুইনবেন লোয়ার কাস্ট। তারও পরে যদি জিগ্যান লোয়ার মানে তো একডা কিছু হায়ার আছে, তার তুলনায়, সেডা কী? তহন শুইনবেন—হায়ার কাস্ট। তহন যদি জিগান এগ মইধ্যে মিলডা কী যে তুলনা হইব? কাস্ট মানেডা কি জাত? তহন কইব যে যেহানে জন্মায়। আরে, জন্মাইল তো একবার, তারপর যে যে-কাজই করুক সে শুদ্দুরই থাইকব। ধরেন, আমাগ মইধ্যে একডা বড় অংশ বিলে চাষ করে, পূর্ববঙ্গের বিলে। হাজার-হাজার। ঐ জমিতে যে চাষ হব্যার পারে সে কথাডাও তো কেউ ভাবে নাই। ধরেন, আমাগ মইধ্যে বিরাট একডা পপুলেশন কৈবর্ত, মানে মাছ ধরে, সারা বছছর, হাজারে-হাজারে। আর-একডা বড় পপুলেশন চাষের কাম করে হাজারে-হাজারে। ঐ টেনান্সি বিলের সুবাদে টেনান্ট, রাইয়ত, আন্ডার রাইয়ত এইসব শব্দ তৈরি হইছে। কেউ ভূমিদাস, কারো দু-এক ছটাক জমি আছে কী নাই। মানে, কইতেছিল্যাম, একডা প্যারাসাইট সিস্টেম এমন প্যারাসাইট যে কী খাইয়্যা যে প্যারাসাইট হইয়্যা আছে, তাও জানে না। তহন কয়, কালচার‍্যাল সুপিরিয়রিটি অব দি কাস্ট হিন্দুস। সেডা বস্তুডা কী? ভাজে না খায়?'

যোগেন থামার পর শাকিনা তার বাঁ হাতটার কনুই হাঁটুর ওপর রেখে আঙুলগুলো কপালে ছোঁয়ায়। যোগেন সেই ভঙ্গিটা দেখে এত মুগ্ধ হয়ে যায় যে থেমে যায়। তার দৈনিক জীবনে তো হামেশা এই ভঙ্গি তৈরি হয় না। যোগেন বলছিল তাদের জীবনের কথা, বেঁচে থাকার কথা, একটা পরগাছা ব্যবস্থার কথা; তাদের জীবনের এক বংশানুক্রমিক দাসত্বের কথা। এ-কথাগুলোর মধ্যে যোগেনদের সারাটা জীবন ছড়ানো। এ-কথাগুলো এত বেশি করে যোগেনদের যে সেখানে কোনো অজানিতের চমক ঘটে না। অনেক সময় যে শোনে, সে কোনো একটা কিছুতে অজানিত পেয়ে যেতে পারে, যদি তার এই জীবনের কিছুই দেখা না থাকে। কিন্তু এই যে একটি খাড়া মেয়ে বসে তার হাঁটুর ওপর কনুই রেখে, আঙুলগুলো নিজেরই কপালে বুলচ্ছে—এটা যোগেনের জীবনের কোনো টুকরো তো নয়—নিরবধি জীবনেরও নয়, জীবনের একটা দিনেরও নয়। এমন অজানিতের সামনে পড়ে যোগেনের কথা গুলিয়ে গেল

ও সে আচমকা থেমে গেল। নীহারেন্দুবাবু বা শাকিনাও বোঝেনি, সে থেমে গেছে।

'মণ্ডলজি, আপনি তো ঐ সমাজের মানুষ। এই কষ্টটার মধ্যে তো আপনি বড় হয়েছেন। আমার তো তা না। আমি তো ইনডিয়ানই না। বাই বার্থ ইরানিয়ান। বাবার অবস্থা ভাল ছিল অ্যান্ড হি ওয়াজ ট্রুলি এ রেভেলিউশনারি ফর দি কজ অব ডেমোক্রেসি ইন ইরান। হি ওয়াজ কমপেল্ড টু লিভ ইরান। এই কলকাতা থেকে প্রত্যেক সপ্তাহে কাগজ ছেপে ইরানে পাঠাতেন। আমি বাবাকে দেখে ভাবতাম, বাবার কতটা ভালবাসা ইরানের জন্য। নো, ইট ওয়াজ নট হোমসিকনেস। সামথিং নব্‌লার। ইরানের মানুষ নিজেকে ফ্রি ভাববে, স্বাধীন ভাববে, নিজের মত ভাবতে পারবে, নিজের মত কাজ করতে পারবে—এগুলা আমার বাবার কাছে জ্যান্ত ছিল। আমার তো তা নয়। আমি তো ঐ দুনিয়ায় জন্মাইনি। আমার খুব ভাল শাদি হল। সেরকমই তো হবে। অন্যরকম আর কী হবে? কিন্তু যেদিন আমি বুঝলাম শাদি আমাকে আমার মত ভাবতে দেয় না, আমার মত কাজ করতে দেয় না, নিজেকে ফ্রি ভাবতে দেয় না—আমার বাবার মতই আমি দেশ ছেড়ে দিলাম। শাদি তো একটা দেশ। শাদি ছেড়ে দিলাম। কিন্তু এই পর্যন্ত আর এরপরও এটা তো আমার নিজের কথা। আমি জানতাম না মণ্ডলজি, আমার বাবার মধ্যে যে ইরানের মানুষের গণতন্ত্রের দরকারটা তাঁর নিজের ক্ষিদে কী ঘুম পাওয়ার মত শারীরিক ব্যাপার ছিল, আমার শরীরের ভিতরে সেই কষ্টটাই আমি পেতাম। কিন্তু আমার তো বাবার মত জন্মসূত্রে পাওয়া কোনো ভালবাসার টান ছিল না। ভালবাসার টান যেন শরীরের টান। কিন্তু অন্য একটা মানুষের জন্য না। সেই কষ্ট থেকে আমি ধাঙড়দের কাছে পৌঁছে গেলাম। আমি এইসব ইউনিয়ন করব, কখনো ভাবিনি। কত বছর ধরে বেশি রাতে, বেশি সকালে আমি ধাঙড়দের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের কাজ দেখতাম। ওরা কিছু মনে করত না। ওরা নিজেরা মনের দিকে এত স্বাধীন, বরং, সম্পূর্ণ, যে কাউকে কোনো কারণে সন্দেহ করার কোনো দরকারই হত না। আমার মনে হত—ওরা সকলেই এক-একজন সন্ত্‌। ওরা সন্তের কাজটুকুই করছে। আপনি কিন্তু ভাববেন না, এটা কোনো ধর্মের ভাব থেকে এসেছিল। কিন্তু যদি আমি সত্য কথা বলি, তাহলে বলব, আমি তো ইরানের, ইরানে সুফিদের একটা পুরনো ধারা ছিল। বাবা, তাঁর বেআইনি কাগজে আঠা লাগাতে-লাগাতে, ঐরকম একটা কঠিন রাজনীতির মধ্যে, বিপদের মধ্যে যে-গানটা গুনগুন করতেন, তার সুরটা তো আমার কানের ভিতরে পোঁতা ছিল। পরে বড় হয়ে দেখি ওটা সুফিদের গান। আমি যে ওদের রাতদিনের কাজের সময় ওদের কাছে থাকতাম আর ওদের সন্ত্‌ ভাবতাম, তার ভিতর সুফি টানও থাকতে পারে একটা, কিন্তু ধর্মের কোনো ব্যাপার ছিল না। তারপর যা ঘটার ঘটল সব। কিন্তু আপনাকে যে এই গল্পটা বললাম তারও একটা কারণ আমি বুঝতে পারছি। যখন আমি ধাঙড়দের আবিষ্কার করলাম আমার দেশ বলে আর ওদের সঙ্গে জুড়ে গেলাম, তখন রাতদিন আমার বাবাকে বলতাম, মনে মনে, বাবা তো তার অনেক আগেই চলে গেছেন, বলতাম, বাবা, তুমি তো একটা দেশ পেয়েছিলে জন্মসূত্রে, আমি আমার দেশ আবিষ্কার করেছি। আপনি একজন মানুষ এলেন, যিনি ঐ শূদ্র সমাজেরই মানুষ। আপনি জন্মে শূদ্র। তারপর আপনি খুব কষ্ট করেই হয়ত লেখাপড়া শিখেছেন। তারপরও আপনি শূদ্রই থেকেছেন, আপনার নিজের ইচ্ছেতে, আপনি শূদ্রদের আবিষ্কার করে যাচ্ছেন, আবিষ্কার করতে চান, নিজেকে তাদের প্রতিনিধি সাজাননি, তাদেরকে আপনার প্রতিনিধিত্ব দিয়েছেন। তারা নিজেরাই নিজেদের মুখতিয়ার'।

নীহারেন্দুবাবু বলে উঠলেন, 'আমার যে এমন ভাগ্য হবে তা ভাবতেই পারি না। শাকিনার কথা তো সবাই জানি কিন্তু ও যেভাবে বলল, সেভাবে তো কখনো ভাবিনি। যোগেনবাবু তো

বন্ধু মানুষ। বন্ধু হলে তো বন্ধুকে মানুষ বেশি চেনে। আমাদের বেলায়—বন্ধু হয়ে গেলেই তাকে আর চেনা দরকার নেই। সে তো আমারই মত। আপনাদের কথা থেকে কিন্তু আমার চোখ খুলল। জানি না, আমাদের সমাজসংসার সে চোখ এমন করে খোলা রাখতে দেবে কী না। সম্ভবত দেবে না। কিন্তু আমি তো আপনাদের দুজনের এই আলাপটা ভুলতে পারব না। চোখ বন্ধ হয়ে গেলেও ভাবতে পারব না, চোখ খোলা আছে।'

যোগেন বলে ওঠে, 'আপনাদের দুজনের কারো কথাই যে আমি বুঝতে পারলাম, তা না। এসব কথা তো, ঐ যে কইলেন না, সুফি গানের সুর, সেই সুরের লাগান। অনেক পরে বোঝা যায় সুরটা কানে রোয়া আছে। কিন্তু এডা আমি বুঝি—আমি শুদ্দুরগ নেতাও না, গুরুও না। আমার সেই বড় গুণ নাই। আমি বড় ছোট-ছোট কাজে ফাঁইস্যা থাইকতে পছন্দ করি। ধরেন, চাকরি বাড়ানো। আমাগ ছেলেরা তো আর কথায়-কথায় জজ-ম্যাজিস্টেট হব না। কিন্তু খালাসি তো হইতে পারে, রেলের গ্যাংম্যান তো হইতে পারে। আমি শুধু এইটুক চাই, যে চাকরিডা তার প্রাপ্য সেইডা য্যান সে পায়। লাঠিঅলা সেপাইয়ের কামে জয়েন কইরতে গেল, বিহারী বন্দুকওয়ালা বামুন সেপাইরা তাকে তাড়াইয়্যা দ্যায়। ক্যান? না, ঐ পুলিশ লাইনের রান্নাঘরের খুপরি আছে তো লাইনবাঁধা। সেইখানে তো ঐ শূদ্রকেও রান্না করতে হব। তাইলে বামুনগ জাইত মারা যাইব। অ্যাসেমব্লিতে সেই কথা নিয়্যা চেঁচামেচি। শ্যাষে রেফার করা হইল সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যালরে। তিনি কইয়্যা দিলেন দেয়াল থাইকলে জাত যায় না আর বাইরের দিকে একডা ফুটা কইর‍্যা দিলে তো কথাই নাই। প্রাইমারি স্কুল যদি একডা-দুডা কইর‍্যা বাড়ানো যায়। দুডা-একডা প্রাইমারি স্কুলরে যদি মডেল স্কুল করা যায়। কইলকাতায় যারা পইড়তে আসব তাগ একডা হস্টেল চাই। দ্যাহেন, কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ড শুদ্দুরগ একডা ভিজিবিলিটি দিছে, অ্যাহন এদিক-ওদিক চাওয়াচাওয়ি কইরলে দুডা-একডা চাঁড়াল দেখা যায়—এই ইউনিয়ন বোর্ডে, এই ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে, এই ঋণ সালিশি বোর্ডে, এই মিউনিসিপ্যালিটিতে। সেই সুযোগডা নিয়্যা নিজেরে দেখাইব্যার চাই, এই যে স্যার, আমরাও আছি।'

শাকিনা হঠাৎ বেশ জোরেই বলে ওঠে, 'একেবারে ঠিক। ইউনিয়ন তো হল সেখান থেকেই। আমি যখন বললাম, ইউনিয়ন কর, এই নীহারজি, বঙ্কিমদা এরাই সব বুদ্ধি দিলেন। ওদের বলতেই ওরা বলে, 'বানাও'। ব্যস, তারপর দুই হাত মাথার ওপর তুলে চলে গেল। নেশার তো আর শেষ নেই। রাতদিনই নেশা। চুল্লু। শিসা মেশানো। আমি একদিন আইন জারি করলাম—যখন কাজের কথা হবে তখন নারাজদের হাজির থাকতে হবে, যারা সবকিছুতেই নারাজ। একদিন আমি বলে ফেললাম, 'আচ্ছা, ধরো তুমি অন্ধকার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছ, অন্ধকারে তোমাকে দেখা যাচ্ছে না। এমন সময় একটা লোক বড় একটা করাত কাঁধে তোমার উলটোদিক থেকে তোমার দিকে আসছে। সে-ও তোমাকে দেখতে পাচ্ছে না, তুমিও তাকে দেখতে পাচ্ছ না। লাগল দুজনের মুখোমুখি ধাক্কা। ঐ লোকটার হাতে তো করাত ছিল। ওর করাতটা তোমাকে দু-ফালা করে রাস্তায় ফেলে রেখে চলে গেল। তখন 'তুমি কী করবে?' একজন বলল, কী আর করব, ও তো দেখতে পায়নি, বেচারা। দুফালি হয়ে পড়ে থাকব—সকালে সাফাইয়ের গাড়ি না-আসা পর্যন্ত। তারপর ডাম্প হয়ে যাব।' আর-একজন বলল, 'এত তকলিফ কীসের? ফালিদুটো জোড়া লাগিয়ে আবার হাঁটব।' আমি বললাম, 'তার চাইতে নিজেকে যদি দেখাতে পারতে, তাহলে তো লোকটার সঙ্গে তোমার ধাক্কাই লাগত না।' একজন জিগগেস করল, 'কী, হর্ন লাগবে, সাফাই গাড়ির মত, প্যাঁক প্যাঁক। তাহলে তো কুকুরগুলো আবার তাড়া করবে। নাঃ, হর্ন বাতিল।' এরপরও একজন বলল, 'ঐ যে হাইড্রান্টে নামার সময় ডেনজার দেয়া লাল লণ্ঠন থাকার কথা,

সেটা তো থাকে না'। কেন থাকে না? জিগগেস করায় একজন বলল, 'ডেনজার না হলে, বেকার কেন লণ্ঠন জ্বলবে?' আর-একজন বলল, 'আরে, ওর কেরাসিন তো ঠিকদার বেচে দেয়'। তখন আমার রাগ উঠেছে খুব। আমি খুব ঠান্ডা গলায় বললাম, 'তোমরা কেউ সবচেয়ে সহজ উপায়টাই বললে না, কেরাসিনও লাগবে না, হর্নও লাগবে না, কুকুরও আসবে না, করাতও আসবে না।' তার প্রতিক্রিয়া হল, এরকম আজব চিজ কী হতে পারে? একটু গুঞ্জনও উঠল, আলোচনার। শেষে আমি আর ধৈর্য রাখতে না পেরে বলে উঠলাম, 'নিজেদের ভূত বানাও।' সঙ্গে-সঙ্গে সবাই একমত হয়ে গেল, জরুর, ভূত বনে যাওয়া তো খুবই সোজা, ভূত হওয়ার আগে শুধু একটু মরে নিতে হবে। ব্যস, মর গ্যয়া? আব বন যাও ভূত।' কিন্তু যাদের সঙ্গে ডেনজার হতে পারে তাদের কী করে দেখানো যাবে সে আদমি না, সে ভূত? জবাবটা আমি দিলাম, 'ভূত কাউকে দেখতে পায় না। কিন্তু ভূতকে সবাই দেখতে পায়।' ব্যস হয়ে গেল ইউনিয়ন।

নীহারেন্দুবাবু বললেন, 'এটাও কিন্তু আমার প্রথম শোনা মানে এত গল্প করে শোনা। আপনি যে একটা অলৌকিক কাজ করছেন, এটা তো তখনো রটেছিল, এখন তো সবাই দেখছে।'

'কী দেখছে নীহারজি? বিশ হাজার ভুত?'

'ভূত যদি বিশ হাজার হয় আর এককাট্টা হয় না-দেখে উপায়?'

'মণ্ডলজি যখন এসেই গেছেন, উনি বোধহয় সাহায্য করতে পারবেন। সুভাষবাবুকে বলে একটা বুদ্ধিও বের করতে পারবেন। আমরা সরাসরি যুক্ত থাকলাম না।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। যোগেনবাবুকে বলা যাবে না কেন? আর উনি তো কর্পোরেশনে চেনা ভূত না, সুতরাং কাজেও লাগতে পারেন। বলুন।'

'আপনি বলুন। আমি বললে এলোমেলো হবে।'

'শুনুন যোগেনবাবু। আপনি তো ডিম্যান্ডগুলো দেখেছেন—'

'হ্যাঁ। ঐ তো চাকরি পার্মানেন্ট, বোনাস, ইউনিফর্ম, সেফটি—'

'হ্যাঁ। কিন্তু কর্পোরেশন যদি রাজি হয়ে যায়, সব ডিম্যান্ডই মানছি, তাহলে আমাদের মুশকিল। কনট্রাকটারের কাছে যে লিস্টি আছে তাতে এদের ঠাকুরদাদের নাম আছে। সেদিক থেকে আমাদের কোনো লিগ্যাল স্ট্যাটাস নেই। কিন্তু এটা তো কর্পোরেশন কনট্রাকটারদের বলতেই পারে, তাদের একটা আপডেটেড লিস্ট দিতে হবে, ওয়ার্কারের নাম-ঠিকানাসহ। এই দাবিটুকু মানতে কর্পোরেশনের কোনো খরচ নেই। ওয়ার্কাররাও এতে মাথা ঘামাবে না। কিন্তু আমার মতে এটাই ভবিষ্যতে সবচেয়ে কাজে লাগবে। অন্তত এনলিস্টমেন্টটা থাকল।'

'আমি আপনার সঙ্গে একমত'।

'বোনাসের কথাটায় পরে আসছি। ইউনিফর্ম, গ্লাভস, গামবুট এগুলোতে আমাদের অসুবিধে হচ্ছে—হয়ত কখনো কাউকে দিয়েছে কিন্তু তারা তো সঙ্গে-সঙ্গে বেচে দিয়েছে। আরো অনেকে হয়ত পেয়েছে বলে টিপসই দিয়ে দিয়েছে কনট্রাক্টারকে, বদলে, টোট্যাল প্রাইসের ওয়ান ফোর্থ নগদ নিয়েছে। ইউনিফর্মের ব্যাপারে গড়বড় আছে। কর্পোরেশনে নাকী সিদ্ধান্ত হয়েছে—খদ্দরের ইউনিফর্ম দেয়া হবে। এটা তো কর্পোরেশনের খরচা। অর্ডার দেয়া হয়েছে খুব নামকরা নেতার দোকানে, ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট অ্যাডভান্স। কনট্রাক্টার বলছে, সে যখনই খোঁজ করতে যায়, দোকানের লোকজন সেই খাদির দোকানের ম্যানেজার-নেতাকে বলতে বলে। বাবুকে বলার সাধ্য এই কনট্রাক্টারের নেই। তাছাড়া, দোকানটা তো ট্রাস্টি বোর্ডের। কিন্তু উনি এটাকে প্রাইভেট অর্গানাইজেশনই করে রেখেছেন। আমার মনে হয় না, এখন যে অবস্থা তাতে ওঁকে কেউ ঘাঁটাতে

চাইবে। এখন তো সোনায় সোহাগা। বিপিসিসি কিছু বললে সে বলবে আমি এআইসিসি, এআইসিসি কিছু বললে বলবে, আমি বিপিসিসি। তাছাড়া, এআইসিসি অডিটটডিট নিয়ে ঝামেলা পাকাচ্ছে। এইবার আসল কথাটা বলছি যেটা চার্টার অব ডিম্যান্ডে নেই। সেটা হচ্ছে গ্র্যাফট। কর্পোরেশনের ধাঙড়দের কাছ থেকে তোলা আদায়। ক্যাশ পেমেন্ট। কনট্রাকটার যখন পেমেন্ট করে তখন সে বলে—বিলিং সেকশন থেকে শুরু করে ক্যাশ সেকশন পর্যন্ত প্রতি টেবিলে পার ওয়ার্কার যদি পাঁচ টাকা করে না দেয়া যায়, তাহলে কোনো বিল পাশও হবে না, পেমেন্টও হবে না। ওয়ার্কাররা জানেই না তাদের মাইনে কত, আরো সব পাওনা কী। সেটা বুঝতে পারে যখন দেখে মাস চলে না। তখন বললে, জিনিশপত্রের দামের কথা বলা হয়। সেটাও তো ঠিক। ইউনিয়ন হওয়ার পর শাকিনা এটাকেই প্রধান বিষয় করে তুলেছে। ওয়ার্কাররা এটা বুঝেছে। সেটাই ২০,০০০ শ্রমিকের এক হতে পারার প্রধান কারণ। এটা একেবারে বন্ধ হলে তো কর্পোরেশনই উঠে যাবে। কিন্তু একটা ব্যবস্থা যদি করা যায় যে কনট্রাকটারের সঙ্গে অ্যাকাউনট্যান্ট বসে মোট বিলের অ্যামাউন্টের ওপর একটা তোলা ফান্ড তৈরি করুক। ওয়ার্কার ও অফিলাররা নিজেদের টাকা ভাগ করে নেবে।

যোগেন বলে, 'এ তো ছোটকাল থিক্যা শুইন্যা আসছি, ধান কাটা তোলা ঝাড়াই বাছাইয়ের পর চাষা খালি ধামা নিয়্যা বাড়ি ফেরে। বাজে আদায় আর আবওয়াবেই যায় সব। জমিদারের মাইয়্যার বিয়্যা আর মায়ের শ্রাদ্ধে তো কথাই নাই, গোবর যদি পাতলা হয়, তারজন্যও আবওয়াব দিতে হয়। আমার নিকট শোষণের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত এইডাই। আর শাসনের চূড়ান্ত উদাহরণ বামুনদের বা কায়েত-বৈদ্যদের ব্যবহার শুদ্দুরদের সঙ্গে। আইজ আবার নতুন দিগদর্শন হইল—ধাঙড়ের মায়নার টাকার ভাগও বামুন-কায়েত খায়। কইলকাতায় আইস্যা একডা নতুন গালি শিখছিলাম—বেশ্যার অন্নভুক। সেইডাও তো যা শুনাইলেন তার থিক্যা ভাল।'

শাকিনা ও ধাঙড় স্ট্রাইক নিয়ে যোগেনের নতুন ধরনের কষ্ট

যোগেনের ঘুম যখন ভাঙল, তখন খুদ্দুর স্কুলে যাওয়ার জন্য একেবারে তৈরি—পিঠে ব্যাগ, গলায় টাই।

১৩৮

যোগেন চিৎকার করে ওঠে, 'আ-রে তোরা কেউ ডাকস নাই আমারে। আমি কি রাত্তিরে সিঁধ কাইটতে বারাইছিলাম।'

'আমি তোমাকে ডাকতে গিয়েছিলাম, মা বলল, ডাকিস না, উঠলেই তো সারাদিনের মত বের হয়ে যাবে।'

'এই মাতৃআদেশ তো খুব মাইন্যা চলো। তোমার তো মামার প্রতিও কিছু কর্তব্য আছে।'

খুদ্দুর রুটিন মিলিয়ে খাতা ভরছিল। ব্যাগটা আটকে দিতে দিতে বলে, 'সেই কর্তব্য পালন করে তোমাকে আবার ঘুমুতে বলছি—' বলেই খুদ্দুর নটি বয় সু-র খটখট আওয়াজ তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নামে। যোগেন চিৎকার করে তার পেছনে—'ছাওয়ালগুল্যা কি ফাল পাইড়্যা বড় হওয়া ধইরল? অ্যাহন কি ল-কলেজও মর্নিং স্কুল?'

উদ্দুর পাশের ঘর থেকে আসে, 'এখন তো বাত্রি না, তা-হলে লাস্ট বাসের মত গিয়ার

বদলাচ্ছ কেন?'

উদ্দুর ল-কলেজে ঢুকেছে। লম্বা, পাতলা চেহারায় যেন ওর চোখ-নাক-ঠোঁট কুঁদে বেরচ্ছে। কাঁধদুটো চওড়া হচ্ছে। বরাবরই তো ঠান্ডা আর বুদ্ধিমান। যোগেন তার দিকে তাকিয়ে হেসে বলে, 'তোরা তো আইনসভার গল্পও শুনতে চাস না, কর্পোরেশনের গল্পও শুনতে চাস না, এদিকে আমার প্যাট ফাঁফাইয়্যা ওঠে।'

উদ্দুরের মা বলতে বলতে ঢোকে, 'প্যাট যদি ফাঁফে চুনের জল খাও। মাথায় মা-গঙ্গা ঢাইল্যা দুই গা মুখে দিলা কি দিলা না, কাছা খুইল্যা দৌড়। আমি ডাক্তাররে জিগাইল্যাম, ভাই ভোটে জিত্যার আগে দ্যাশ চইলত কী কইর‍্যা? ডাক্তার উলটা আমারে ঠাসে, আরে, আগে তো আইনসভাও ছিল না, কর্পোরেশনও ছিল না। মণ্ডল আইস্যা খুইলল তো সব। বাড়ি বইস্যা কি গাব পাকাবে? আর, কী যে কইল্যা খুদদুররে, মিটিঙে কে কার ঘাড় ধইর‍্যা বসাইয়্যা দিছে, সে তো সারাদিন সেই এক গল্পই করে আর হাসে।'

কর্পোরেশন ভোটের সময় যোগেন একেবারে কাছেই একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল। ভাড়া বললে বেশি বলা হয়। কংগ্রেসের এক নেতার এক গলি ভরা নানা সাইজের বাড়ি আছে। তারই একটা কোনো একতলায় একটা ঘরে ভদ্রলোক জোর করে যোগেনকে বসালেন। 'আরে, আপনার তো নিজের একটা আপিস চাই নয় তো পোস্টার মোস্টার মই লেই বিবেকানন্দ সুভাষচন্দ্র থাকবে কোতায়? ডাক্তারবাবুর ঐ টুকুনি ফ্ল্যাটের ওপর কত আর চাপাবেন? তা ছাড়াও বাপপিতামর শুভ নজর তো একটা দরকার? দরকার কী না?' রাজি হয়ে যাওয়া ছাড়া যোগেনের কোনো উপায় ছিল না। ঘরটার সঙ্গে রান্নার একটা জায়গাও আছে। আর পায়খানার দরজাটা বাইরের দিকে, ঘর থেকে বেরিয়ে দুপা এগিয়ে। সামনে গলিটা যেখানে মোড় নিল সেখানে গঙ্গাজলের একটা কল আছে কিন্তু ফুটপাথ নেই। তবে, বেশ আধা গোল করে ইট পাতা, জলধোয়ার ফলে পোড়ামাটির রঙের বাহার ঝলক দেয়। তখন বোঝা যায়, এক মাটিরই কত রং। ভদ্রলোকের পরনে ঢোলা হাতা খাটো পাঞ্জাবি আর ধুতির ঝুলটা গোড়ালির ইঞ্চি তিনেক ওপরে। গলিটার নাম অনিত্যশিখর বসাক লেন। তিনি ছিলেন কর্পোরেশনের অ্যাসেসার। সেই সূত্রেই এই এক গলি-ভরা বাড়িগুলো কিনে নিতে পেরেছিলেন। সি-আর দাশের সময়। তিনি মারা গেলে, কর্পোরেশন তাঁর এই ছেলে নিত্যশিখর বসাকের তৎপরতায়, এই নামকরণ দুই প্রান্তেই করে। বেশ লম্বা গলি। কী করে-কী করে যেন কর্নওয়ালিস স্ট্রিট বা উত্তরের ট্রাম লাইনের দিকে রাস্তাটার নাম হয়ে থাকল নিত্য বসাক লেন আর ফড়েপুকুরের দিকে নাম হয়ে গিয়েছিল অনিত্য বসাক লেন। তাতেও কোনো অসুবিধে হয়নি বাবুদের বা, একটা ছোট আর একটা বড় বস্তির লোকদের। নিত্য বসাক পিতৃসূত্রে যেমন জীবিতাবস্থায় রাস্তার শিরোনাম হয়েছেন, এই বিপুল ভুসম্পত্তির মালিক হয়েছেন, তেমনি, অবসর নেয়ার আগেই মৃত্যু তাঁর বাবাকে অবসার দিয়েছে বিধায় বাবার কর্পোরেশনের অ্যাসেসরের চাকরিটিও মানবিক সহানুভূতির কারণে, নিত্য বসাকের ওপর বর্তায়। এমন সব প্রকাশ্য কারণে, কর্পোরেশনে তাঁর নিজের একজন কাউন্সিলার দরকার। যেই দাঁড়াক, জয়ী যিনি, তাঁকে নিত্য বসাক লেনে অফিস খুলতে হবে। সেটা এখন দাঁড়িয়ে গেছে, যিনি খুলবেন, তিনিই জিতবেন।

ফলে কিছুদিনের জন্য প্যারী সরকারের বাড়ির সঙ্গে যোগেনের সম্বন্ধ একটু আলগা ছিল। প্রথমদিকে দুই বেলাই খেতে আসত, তারপর একবেলা, তারপর একবেলাও না। যেখানে হোক খেয়ে নিত। উদ্দুর অবিশ্যি যোগেনের ভোটে খুব খেটেছিল আর ঐ অফিসেই পড়ে থাকত।

ভোট টোট চুকে যাওয়ার পর যোগেন আবার সরকার-বাড়ির দোতলার মাদুরে ফিরে

এসেছে। কিন্তু তার কাজের ধরণও বদলে গেছে আর উদ্‌দুর-খুদ্‌দুরও যেন বর্ষার পাটগাছের মত ফনফনিয়ে বড় হচ্ছে।

যোগেন উদ্‌দুরের মা-কে জিজ্ঞাসা করে, 'বুন, একডা বুদ্ধি দ্যাও তো কী করি?'

'তোমারে বুদ্ধি দিব আমি? তুমি-না বুদ্ধি দিয়্যা সরকার চালাও। হইলডা কী?'

'উদ্‌দুর, তুইও শোন্‌। কর্পোরেশনের ধাঙড়-মেথররা স্ট্রাইক করছে—'

'কী করছে কইল্যা?'

'স্ট্রাইক। কামকামাই।'

'তাতে তোমার কী ভাই! ঐ ধাঙড়-মেথরগ দলে যাইও না। তোমারে দেখাইয়্যা আমাগ একডা সম্মান জোটে। সেইডা বাড়াও। তা না, কোথাকার ধাঙড়-মেথর-ডোম—ছিঃ।'

যোগেন দুলে-দুলে হেসে ওঠে।

উদ্‌দুর ভুরু কুঁচকে চাপা গলায় বলে ওঠে, 'একী মা? আমরা নীচজাত না? মামা তো নীচজাতের প্রার্থী হয়েই জিতল!'

'তুই কি আগ বাড়াইয়্যা সবাক কইব্যার গিছিস যে আমরা নীচজাত? কইলকাতায় জাইতের উঁচুনিচু নাই। কাম নাই কিছু? যে গু-মুতের কথা কব্যার লাগব?' উদ্‌দুরের মা ঝামটা দিয়েই উঠে গেলেন। আরো একবার হেসে যোগেন উদ্‌দুরকে বলে, 'ক্যারে? করি কী?'

'ইনভলভ্‌ড কত ওয়ার্কার?'

'সে কেউ জানে না। বিশ হাজার তো বটেই—'

'বলো কি মামা? এত বড় একটা ওয়ার্কিং ফোর্সের বাইরে থাকবে? মুভমেন্ট থেকে ঢিলে দিয়ো না।'

যোগেন ঠিক বুদ্ধি বের করতে পারছিল না কাকে কী বলবে, বলে কিছু লাভ হবে, খদ্দরের আশ্রম-টাসরমের ট্রাস্টিবোর্ড, কার সঙ্গে তার যোগ কী সেটা বাইরে থেকে আন্দাজ করাও মুশকিল। শেষে দেখা যাবে ওয়ার্কারদের কাছ থেকে যে-টাকা তোলা হয়, তার ভাগ আসে মুরুব্বি নেতার কাছেও। ব্যস, যোগেনের আমও গেল, ছালাও গেল। ধর্মঘট মেটা তো দূরস্থান—তাদের ওপর লেঠেল লাগানো হল। ধর্মঘট ভেঙে দিতে।

সবচেয়ে নিরাপদ, যোগেনের পক্ষে এ থেকে দূরে থাকা। তার তো সত্যি এরকম আন্দোলনের অভিজ্ঞতাও নেই, চেনাজানাও নেই। তার ভরসা তো নীহারেন্দুবাবু, বঙ্কিমবাবু এঁরাই। এঁরাই তো আছেন শাকিনার পাশে। যোগেনকে কোনো দরকার আছে?

দরকার যে নেই সেটা নিয়ে কোনো সন্দেহও থাকত না, যদি কথাগুলো নীহারেন্দুবাবু না-বলে শাকিনা বলত। নীহারেন্দুবাবুই যে ব্রিফিং করবেন সেটা আগে থাকতে স্থির রাখতে হলে তো তাঁদের জানতে হয় যে সুভাষ যোগেনকে পাঠাচ্ছেন এই দায়িত্ব দিয়েই। সুভাষ এখন নাগপুরে, নইলে সুভাষকেই জিজ্ঞাসা করা যেত। স্টাইকটা এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে অপেক্ষা করার সময় নেই।

যোগেন বুঝে উঠতে পারে না, সুভাষের ফিরে আসা পর্যন্তও অপেক্ষা করা সংগত নয়, এমন একটা যুক্তি তার নিজের কাছে এত দরকারি হয়ে পড়ল কেন? বা, সুভাষ ছাড়া তারই উদ্যোগে একটি মীমাংসার রাস্তা খুঁজতে তারই-বা এত আগ্রহ কেন?

ধাঙড়রা এমন একটা আন্দোলনে এতদূর এসেছে, এটাই যোগেনের কাছে খুব বড় ব্যাপার নিশ্চয়ই। শাকিনার নেতৃত্বের গুণ প্রায় অবিশ্বাস্য। যদিও এই ওয়ার্কাররা একই জায়গায় থাকে

ও একই কাজ করে এই দুটো ঘটনার ফলেই সবাইকে এতটা জড়ো করা সম্ভব হয়েছে। যোগেনরা যদি ভাবে, নমশূদ্ররা তাদের অভিযোগ জানাতে এমন সবাই মিলে স্ট্রাইক বা জমায়েত করলেও কাজ হত, সেটা আকাশকুসুম। কেন? নমশূদ্র কৃষকদের একজায়গায় থাকা মানে তো তিন নদী ছয় বিলের কাটাকুটি। তাছাড়া, তাদের একেক জনের সমস্যা তো এক-এক-রকম, তাদের চাষও তো আলাদা-আলাদা। এই মুশকিলটা এমন করে যোগেন এর আগে কখনো বোঝেনি।

নমশূদ্ররা এক হলেও এক শূদ্র না।

সে তাহলে কেন সিদ্দিকি শাহেবকে সরাসরি জানাবে না? সিদ্দিকিশাহেবই তো মেয়র। তাহলে, এটা তো ওঁরই ব্যাপার। তার ওপর মেয়র হয়েই এত বড় একটা হরতাল মেটাতে পারলে, সিদ্দিকিশাহেবের নাম ফাটবে। তারও ওপর সিদ্দিকিশাহেবের সঙ্গে যোগেনের ঘনিষ্ঠতাই আছে, আইনসভার কাজে। সিদ্দিকিশাহেব যদি আঙুল তুলে পয়েন্ট অব অর্ডার তোলেন, সকলেই বোঝে কিছু গোলমাল হয়েছে। অনেক মেম্বারই তখন বাইরে একপাক ঘুরে আসতে যান। সিদ্দিকিশাহেব ছাড়ার পাত্র না। আর তখন হালকা সভায় যোগেন সিদ্দিকিশাহেবের সঙ্গে একটা হাসি লেনদেন করে। দুই উকিলের পেশাদারির স্বীকৃতি। মিটিঙের বাইরে সিদ্দিকিশাহেব যোগেনের কোনো-কোনো পয়েন্ট নিয়ে বাহাদুরি দেন, আলোচনা করেন, খাতির দেখান। সিদ্দিকিশাহেবের মেজাজে সমস্যাটা বুঝতে আর মেনে নিতে কোনো অসুবিধে হওয়ার কথা না। কংগ্রেসের বা লিগের বড় নেতাদের কেউ হলে তো এরকম তোলা তোলার ঘটনাই মানত না, বলত অসম্ভব। যোগেনের বুদ্ধি সেটুকু পেকেছে যে বোঝে, যে যত জোরে অস্বীকার করে তার তত বেশি মাছের মা-র চোখের জল। সে-জল মোছাতে কে পারে? তাই তো, সিদ্দিকিশাহেবের মত মেয়র, তাঁকে এমন রগড়ের কথার রসই আলাদা।

যোগেন ঘরে ঢুকতেই সিদ্দিকিশাহেব বললেন, 'যোগেনবাবু, যদি আপনার এমন কোনো ইমার্জেন্সি থাকে যে আপনি আমাকে বলেই সেখানে না গেলে কেউ মারা যাবে, তাহলে আপনি আর ঝুটমুট কুরসিতে বসবেন না। যা জানাতে এসেছেন, জানিয়ে তুড়ন্ত চলে যান।'

'তবে যে শুনি লখ্‌নউ খানদানির সব রসের গল্প, মোকান পুড়তেছে তো পুড়ুক, তাই বল্যা কি বাপঠাকুরদার চলন বদলাইব?

খুব হেসে উঠে সিদ্দিকি বলেন, 'আপনার দুটা ভুল। তবে আমি কিছু দোষ ধরছি না। ওয়ান, আমার শহর দুটো—এক, বম্বে, জন্মসূত্রে, দুই, কলকাতা, আর সব সূত্রে। যোগেনবাবু, লখনৌভি বললে আমাদের জাতে একটু লাগে। থাবড়া মেরে আমার রাজ্য কেড়ে নিয়ে কলকাতায় জেলখানায় রেখে মস্‌জিদ আর কবরস্থানের নাম নবাবের নামে দেয়া! ধুস, সব বেফিগারি নওয়ার। আমাদের ঘরানা হচ্ছে মুম্বইয়ের বিজনেস কমিউনিটির। পারসিদের সঙ্গে টক্কর দিয়ে ব্যবসা করি, এখন শাহেবদের টক্কর নিচ্ছি। দেখুন, কলকাতা ছাড়া আর-কোথাও আমরা ওয়েস্টার্ন মুসলিম বলে খাতির পাই না। আর আপনি কি কখনো পারসি ব্যবসায়ীর পার্টনার হয়েছেন?'

'আপনার সঙ্গে কথা বলার এটাই বিপদ। আরে, আমরা বাঙালি হিন্দুদের চাঁড়াল। ব্যাবসা? কী যে কন!'

'কিন্তু আপনাকে এইটুকু অ্যাডভাইস করি, আপনাদের সামনে তো গোটা জীবন পড়ে আছে। যদি কখনো সুযোগ পান, এই এক্সপিরিয়েন্সটা করে নেবেন। ধরুন, পার্সি পার্টনারের সঙ্গে আপনার এত দোস্তি যে রাতে একসঙ্গে শুয়ে আছেন। সকালে উঠে দেখলেন, আপনার গায়ের পুরা চামড়াটা চেঁছে খুলে নিয়ে পাশে মুচির দোকানে বেচে দিয়ে আবার আপনার পাশে শুয়ে বাকি ঘুমটা সেরে নিচ্ছে। আমরা ওদের কাছ থেকে বিজনেস টিপস নিয়েছি। দেখছেন-না,

মুম্বই ঘরানার এক মুসলিম, কংগ্রেসি গুজরাতি বানিয়াকে কী ঘোল খাওয়াচ্ছে! নাউ, উই মে টক শপ। যদি আপনার কোনো টক থাকে। না-থাকলে, যেমন চলছে চলুক আড্ডা।'

'আপনার এই বুদ্ধিডা সবাই ধইর‍্যা ফেলাইছে। এমন আড্ডা দিবেন যে কেউ আর কামের কথা তুইল্যাবার পারব না।'

'না, না। এটা আমার বদনাম। আমি কখনো আড্ডার পিওরিটি, বিজনেস মিশিয়ে নষ্ট করি না। এটা খুব বড়দস্তুর আপনাদের, বাঙালি ভদ্রলোকদের। সেজেগুজে আসে আড্ডা মারতে, কিন্তু এসেই ভাব দেখাবে খুব আর্জেন্ট কাজ আছে।'

'এইডা আবার কী কন। চারিদিকে তো বাঙালির সুনামে কান বন্ধ—এমন আড্ডাবাজ লোক নাকী দুনিয়ায় নাই। আবার, একই দুর্নামে রাস্তায় চলা যায় না। বাঙালির নিন্দায়—এমন আইলস্যা জাইত দুনিয়ার বার।'

'কী বললেন কথাটা? আইলস্যা? আমি জানি না কথাটা আমি জানি কী না। আ ইল স্যা। মতলব কী?'

'আরে কী যে কন, আইলস্যা মিনস আইলস্যা। মিনস আয়ডল, লেজি। আইলস্যা—'

সিদ্দিকিশাহেব ঘর ফাটিয়ে হাসতে-হাসতে মাঝখানে বলে নেন, 'সরি, সরি, আলসে! আরে আমি তো ভুলে গেছি আপনারা বাঙাল। আমরা তো আবার কলকাতার ঘটি। কী বললেন, আলইস্যা? না। হল না। আলসে।'

সিদ্দিকিশাহেবের হাসি থামলে যোগেন হাতজোড় করে বলে, 'এবারে কি আমারে মুখখোলার এড্ডু সুযোগ দিবেন? কেন আইছি?'

'আপনার বেলায় সেটা আমি পারব না। আমার ঘরানায় বাধবে। আমার বন্ধুরা কি আমার কাছে কোনো কাজ নিয়েই আসেন? আপনার খেয়ালে আসেন না! যদি কিছু জানানোর থাকে জানাবেন। আপনার যদি কিছু বলার থাকে, বলুন। আর, যদি না থাকে, আপনার দুশ্চিন্তার কারণ নেই—আমি একাই দুজনের সমান কথা বলে দেব।'

যোগেন কী বলবে, কতটা বলবে, কোন্‌টার পর কোন্‌টা বলবে—সে সব ভেবে এসেছিল, তেমন ভেবে আসাটা তার অভ্যাসে ঢুকে গেছে। সিদ্দিকিশাহেব যে দুটো-একটা কথা জিগগেস করলেন ও যোগেন সেসবের যেটুকু জানে সেটুকু উত্তরে মোটামুটি কেসটা যাকে বলে হাজির করা হল। যোগেন বুঝে নিল, 'সিদ্দিকিশাহেবের নিজের সূত্রে জানা খবরও আছে। যোগেন যখন তার কেসটা হাজির-করা শেষ করল, তখন সিদ্দিকিশাহেব পাশে-রাখা একটা ঢাকনা নামিয়ে কাচের গ্লাশ থেকে একচুমুক জল খাওয়ায় যোগেন বুঝে যায়, এবার সিদ্দিকিশাহেব কথা বলবেন।

'ওদের তো ইউনিয়ন বা স্ট্রাইক কমিটি আছে, তারা কেউ না-এসে আপনি এলেন-যে!'

'এডা আপনাকে কি জব শুইন্যা বুইঝতে হব। হরতাল চূড়ায় উঠছে। অ্যাহনি একডা সমাধান না পাইলে গড়াইয়া পড়ব। নেতারা কেউ আইলে খবর রটবে—মেয়রের কাছে গিছে মেথরেরা। আপনে ডাইকলে আইসবে। আপনে যে ডাকছেন সেটা বেবাকরে জানাইয়া তারপর আইসব। আর, আমারে ক্যান? না। সকলের সব সন্দেহের বাইরে। বরিশালের লোক আর কী কইরবে কর্পোরেশনে?'

'বরিশালের লোক যদি কলকাতার বুকে খাড়াইয়া কর্পোরেশনের ভোটে জেতে, তাহলে সে সন্দেহের ভিতরে ঢুকে পড়তে পারে না? আমি এই স্ট্রাইক সাপোর্ট করি। ২০,০০০ ধাঙড়কে এক করা কি চাট্টিখানি কাজ? শাকিনা অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। কিন্তু আমার ধারণা, কেউ ওদের দিকে ফিরেও তাকাবে না। ২০,০০০ ধাঙড়, লেড বাই আ উওম্যান—এটার কি কোনো

দর আছে আমাদের রাজনীতিতে, মানে, পাবলিক রাজনীতিতে? তার ওপর আপনার মত নন-আপকানট্রি মুসলিম এমএলএ হচ্ছেন, প্রধান নিগোসিয়েটার।'

'সেডা না-হয় হইল। কিন্তু আমি কী কইর‍্যা নন-আপকান্ট্রি মুসলমান হইল্যাম, সেইডা তো বুইঝল্যাম না।'

'সেটা বোঝা না-গেলেও তো ঠিক। আপনি নন-আপকান্ট্রি এটা তো ঠিক, মানে, ডাউনকানট্রি বললেও কম বলা হয়, কাঠ-বাঙাল। আপনি মেইনস্ট্রিম পলিটিক্সের বাইরে, মানে হকশাহেবের প্রি-ইলেকশন প্রজাপার্টির হলেও হতে পারেন কিন্তু তার শেপ এখন যা তাতে তো সুপার-মেইন-স্ট্রিম। আপনি মহাসভা না, লিগ না, কংগ্রেস না—তাইলে তো বাকি থাকে দেশি, বাঙালি, মুসলমান। আপনে সেই স্ট্যাটাসই ভোগ করেন, আমাদের বডি-পলিটিতে। নাম যাই নেন। যেটা বলার তা হল, এই ধাঙড়-মেথর ধর্মঘট আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ঘটনার সমমর্যাদার ঘটনা। কিন্তু সে মর্যাদা দেয়া হবে না। এবার বলুন—কোনটুকু অন্তত করতেই হয়, টু মেক ইট এ সাকসেস।'

যোগেন বলে, 'তাইলে আমি অগ বলি গিয়া যার যার পাঁঠা, স্যায় স্যায় কাটো।'

'সেটা সম্ভব হলে ওরা আপনাকে পাঠাত না। আমি বলি যেটা রিয়্যাল ডিম্যান্ড অর্থাৎ ধাঙড়দের প্রাপ্য মাইনে থেকে বেআইনি তোলা—এর কিছু করা যাবে কী না, জানি না। অন্তত কারা সেটার খাতক সেটা না জেনে। কিন্তু এটা নিশ্চয়ই আমি বলতে পারি যে আমার কাছে অনেক নালিশ এসেছে—মজুরদের প্রাপ্য টাকা দেয়া হয় না, মাইনের টাকাও পুরোটা দেয়া হয় না, অন্য যেসব উপকার ওদের পাওয়ার কথা সেসব দেয়া হয় না। এইসব বিষয়টি এনকোয়্যারি করার জন্য আমি একটা কমিটি করব ও তাঁদের অনুরোধ করব একমাসের মধ্যে রিপোর্ট দিতে। তারপর দেখব কী কতটুকু করা যায়। আমি আপনাদের আজ এইটুকুই বলতে পারি—মজুরদের টাকা-খাওয়া ধর্মে মহাদোষ, প্রায়শ্চিত্য করতে হয়, খোদার দরবারে গুনাহ্।'

'ওপেন ডিম্যান্ডগুলো?'

'সেটা তো ওরাও জানে না, আপনিও জানেন না, আমিও জানি না। যাহোক, সে একটা কিছু হবে। ধরুন, হেল্‌থ্ ডিপার্টমেন্টকে যদি বলা যায়, কোনো কাজ হ্যাজার্ডাস কী না সেটা জানিয়ে দিতে—সেই-বা কী করে সম্ভব। যাই করা যাক, তার যদি কোনো লেখাপড়া-জানা লোকের দরকার হয় বা যদি কারো সার্টিফিকেট দরকার হয়, তাহলে তোলা থাকবেই। এ এক অদ্ভুত প্যাঁচ। আপনি যদি ঠিক করেন, গামবুট আর গ্লাভস ওয়াকাররা নিজেরাই কিনবে, তাহলে ওয়াকাররা কুপন বিক্রি করে ক্যাশ নেবে। আপনি যদি ঠিক করেন, ঠিকেদার বা বাবু কিনে দেবে, তাহলে বাবু-ঠিকেদার ঐক্যে অদৃশ্য সব ক্রয়বিক্রয় ঘটবেই। সিস্টেম একটা শাহেবরা বানিয়েছে বটে, যাই করুন, পিকপকেট হবেই। যদি পকেটমার না-পাওয়া যায়, তাহলে নিজেই নিজের পকেট কাটবে।'

'এইডার জইন্যে শাহেবগ ক্রেডিট দেয়াডা কি ঠিক হইল? তারা কি এত জাইন্যাবুইঝ্যা সব করছে? যেখানে বুঝছে, ডুবজল, সেহান থিহেই পলায়ন। শাহেবরা কী কইর‍্যা জাইনব কন, এই কামডা ধাঙড় ছাড়া হয় না আর সেই কারণেই তাগ থাইকতে হব গুয়ারের খোঁয়াড়ে।'

'আপনে ভাল কথা বলছেন। হাইলি স্পেশ্যালাইজড জব মে বি ডান অনলি বাই এ গ্রুপ অব স্কিলড পিপল হু হ্যাব লার্নন্ট ফ্রম দেয়ার অ্যানচেস্টার্স দি নেসেসারি স্কিল। আর সেই কারণেই দে আর ক্যাপটিভ টু দেয়ার স্কিল। যা হোক, সেই ক্যাপটিভিটিকেও তো লজিক্যাল হতে হবে। ঐ স্কিলের সঙ্গে যা জড়িয়ে আছে, তার ব্যবস্থা করুন। যে-কাজ ধাঙড়রা করেন,

সে-কাজ মদ না-খেলে করা যায় না। তাহলে ওদের মদের ব্যাপারে সাবসিডি দিন। দি—ন। সঙ্গে-সঙ্গে গান্ধীজির চেলারা এসে রাস্তা আটকে মাদকবর্জন।'

'কিন্তু, এডা কিন্তু সহজেই করা যায়। কর্পোরেশনের কার্ড দেখালে এক পাঁইট বোতলে এত পার্সেন্ট রিবেট পাবে। এ নিয়ে তো আপত্তির অভাব হবে না। সেইজন্য এক পাঁইটের ওপর রিবেট দেয়া হবে অন দি স্পেসিফিক মেডিক্যাল নেসেসিটি। আচ্ছা, তাহলে ঐ ঠিক থাকল। আপনি আমারে চার-সাড়ে-চারটায় ওদের সঙ্গে কথা বলে অলক্লিয়ার দিলে, আমি বাই-সাড়ে-পাঁচ কর্পোরেশনে পৌঁছে যাব। আমিই ঘোষণা করব।'

একদিনের জন্য প্রোগ্রাম স্থগিত

সিদ্দিকিশাহেবের বাড়ি থেকে শাকিনার বাড়ি আসা তো ট্রামে কটা স্টপ, বসার জায়গা থাকলেও বসার দরকার হয় না। মৌলালিতে নেমে মিড্‌ল্‌ রোড পর্যন্ত হাঁটা।

১৩৯

কিন্তু ঐ টুকু দুরত্বেই যোগেন একটু বুঝে নিতে চাইল—ঘটনাটার সঙ্গে তার লিপ্ততা কতটা? ধাঙড়দের হরতালে সুভাষবাবু তাকে যেতে বলেছিলেন, সে গেছে। সে খবর রাখত না, তেমন। ঐ একদিন গিয়ে যা বুঝেছে, তাতেই তার মনে হল, এত বড় একটা ঐতিহাসিক ঘটনা, না, 'ঐতিহাসিক' কথাটা সে ব্যবহার করতে চায়নি, অভ্যাসে এসে গেছে, কিন্তু, এত পেছিয়ে থাকা মানুষের এক হওয়াটার মত বড় ব্যাপার, এটা অবিশ্যি এই কমিউনিস্টমার্কা কংগ্রেসিদের সঙ্গগুণ। না-হলে যোগেন মানুষের সমাবেশের ছোটবড় দোষগুণ এ-নিয়ে খুব মাথা ঘামাত না, জানতও না কিছু। এখন, যোগেনের মনে হচ্ছে, কংগ্রেসের গান্ধীজির সত্যাগ্রহে কয়েকজন ধুতিপাঞ্জাবি পরা ভদ্রলোক 'অহিংস অসহযোগিতা'র 'সত্যাগ্রহ'তে অসহযোগিতাও বোঝা যায় না, অহিংসা বোঝানোর মত কোনো ভঙ্গি তো আর নেই, কিন্তু এই ধরনের জমায়েতের জোর আলাদা।

যোগেন কি একটু আগ বাড়িয়ে ভাবছে। একদিনের আলাপে ওরা বলল, একটা ব্যবস্থার চেষ্টা করতে আর সে আজ সকালেই সিদ্দিকিশাহেবের সঙ্গে দেখা করে, কথা বলে সব ঠিক করে ফেলল। সিদ্দিকিশাহেব নিজেই আসবেন ওয়ার্কারদের কাছে বলতে, কী কী ব্যবস্থা তিনি নিতে পারবেন?

এতটা আত্মবিশ্বাস যোগেনের জমবে কোথ্‌ থেকে যে তার উদ্যোগেই সব হল এমন ভাববে? বরং, তার বংশগত ও জাতগত স্বভাবে সে একটু সন্দিহানই হয়ে পড়ে, কারো প্যাঁচে পড়ল না কী! এ পর্যন্তও সে মনে-মনে ভেবে নিতে পারে যে শাকিনা বেগমের মত নেত্রী ও নারী তার ইতিপূর্বে দেখা নেই, এত কাছে থেকেও দেখা নেই। সেখানেই কি তার এই তৎপরতার শিকড়? তার রাজনীতির এই এক অন্য শিকড়ের আন্দাজ থেকে বা হয়ত ইচ্ছে থেকেই, যোগেন তার চেনাজানা ও অভ্যস্ত শিকড়টাকে স্পষ্টভাষায় চিনে নিতে পারে। আগেও এটা শুনেছে, নিজেও বুঝেছে কিন্তু ধারণাটাকে স্পষ্ট করতে চায়নি যে তার সবসময়ই এক অদৃশ্য প্রতিযোগী থাকে, বর্ণহিন্দু। সে প্রতিযোগী কোনো একটা লোক নয়, সেটা বর্ণহিন্দুত্ব, বর্ণহিন্দু কালচার। যোগেন কুকুরের মত ঘ্রাণশক্তিতে বুঝতে পারে, তার কোন্‌ কাজটায় এই বিস্ময় চমকে ওঠে

ভদ্রলোকদের চোখে—বাঃ, এতটা ভেবেছে, বা, সত্যি, ওর মত কত শক্তিমান লোকজন অন্ত্যজ বা তপশিলি সমাজে ছড়িয়ে আছে। মল্লিক ভাইরা বা উপেন বর্মণ বা প্রেমাহরি বর্মণ এমন চমকে দিতে পারে না। ওঁরা চেহারায়, শিক্ষাদীক্ষায়, সব দিক থেকেই, উচ্চবর্ণ হিন্দু, শুধু জন্মসূত্রে শূদ্র। হেম নস্কর মশাইও তাই। তাঁর আভিজাত্য, ভদ্রতা ও আপ্যায়নের ভিতর থেকে বামুন জমিদারের মত ব্যবহার যেন উপচে পড়ছে। গায়ের রং টকটকে ফরসা নয়, কিন্তু এমন যে দেখলেই বোঝা যায়, রোদজল-খাওয়া চামড়া না আর-এক পুরুষেরও না। ফিনলে মিলের একেবারে ভেজা কাপড়ের মত বুনটের ধুতি আর গলাখোলা নেটের গেঞ্জি। যোগেনের চেহারাতেও সেসব আছে—যে কেউ দেখলেই বোঝে জন্মত শূদ্র কেবল নয়, যোগেন কালচারে শূদ্র। যোগেনের সচেতন প্রতিটি মুহূর্তই এই কালচারের দ্বন্দ্বে আতত হয়ে আছে। সে তাই কলকাতার ভাষায় কথা বলে না। সে তাই বরিশালি ভাষায় ইংরেজি বলে না আবার শাহেবদের নকল করেও না। সে আশু স্যারের মত করে ইংরেজি বলে—তাকে বোঝানো ও শেখানোর জন্য আশু স্যার শব্দের সিলেবল জোর দিয়ে যেমন ভাঙতেন আর যতিচিহ্নগুলো যেমন অতিকৃত করতেন প্রশ্ন, বিস্ময় এসব নির্ভুল জানাতে—সেই দুটো, যোগেন খুব খেয়াল করে বাদ দিয়েছে। সে বর্ণহিন্দুর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তো বর্ণহিন্দুকে হারিয়ে বর্ণহিন্দুরও নেতা হতে চায়। সেখানেই তার রাজনীতির শিকড়। সে আজও মুগ্ধ হয়ে স্মরণ করে 'মেবারপতন' অভিনয়ের পর গ্রিনরুমের ভিতর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে নিম্নস্বরে শিশিরবাবুর গলায় ম্যাকবেথ ইফ ইট অয়্যার ডান ইট ওয়্যার বেস্ট দ্যাট...

যোগেন আজও শিশিরভাদুড়ির গলা মনে করল কিন্তু শাকিনার প্রাসাদে ঢোকার আগে সে বুঝে ফেলতে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে, এই কি তাহলে তার রাজনীতির নতুন শিকড়? সে-শিকড় শোনায় মাটির তলের জলে ডোবা মেয়ের স্বর, সে-শিকড় লতিয়ে দেয় শাকিনার খাড়া কনুই থেকে তার কপালের আঙুল পর্যন্ত ওঠার গতি। হ্যাঁ, সেই অদৃশ্য প্রতিযোগীর শেষ পরাজয় ঘটিয়ে যোগেন স্বাধিকারে, স্বনির্বাচনে, স্বেচ্ছায় তার দ্বিতীয় শিকড়ে স্ফুট ও নন্দিত হতে চায়।

যেখানে বসে শাকিনা সেখানেই বসেছিল। অনেক হরতালি তাকে ঘিরে বসেছিল, ঠিক ঘিরে নয়, একটু সরে দুই ধাপ সিঁড়িতে বসেছিল কয়েকজন, দোতলায় ওঠার সিঁড়িতেও।

যোগেনকে ঢুকতে দেখে এরা কেউ সরে গেল না, একটুও না। যোগেনকে জায়গা করে নিতে হল পা ফেলে ভিতরের সেই আধা চৌকিতে গিয়ে বসার। শাকিনা যোগেনকে তার বসার জায়গা থেকে আদাব দিল। যোগেন নমস্কার করল। যোগেন যেন ভেবেছিল নীহারেন্দু বা ওরকম কেউও থাকবে। এদের মধ্যে যে-কথা হচ্ছিল, সে-কথাই চলছিল। যোগেন বোঝার মত করে শোনেওনি। মনে হচ্ছিল, ওরা সবাই দরকারি কথা বলছে। আবার, এও মনে হচ্ছিল, তেমন দরকারি নয়ও হয়ত। হলে কি আর চুল বাছাবাছি হত বা পুরুষদের একজন মেঝের ওপর দেয়াল ঘেঁষে অমন ঘুমুত। নিশ্চয়ই মদ খায়নি। খেলেই বা কী? ওরা হরতাল করছে, পুজো তো করছে না।

কাদির শেখ ঢুকে দরজা থেকেই চেঁচিয়ে বলে, 'শাকিনা, তোমার এত বড় হরতালে সব পার্টিকে জমা করেছ, শুধু তোমার নিজের পার্টিটাকে ভুলে থাকলে?'

'কাদিরভাই, বসুন। কিন্তু আমার পার্টি কোন্‌টা?'

কাদিরভাই রাজনীতিতে চেনা মানুষ। যোগেনকে একটা ছোট আদাব দিয়ে সে যোগেনের পাশেই বসে। এই সময়টা জুড়ে শাকিনা তার নিজের জিজ্ঞাসার, আমার পার্টি কোন্‌টা, আনুষঙ্গিক ভঙ্গি করছিল ভিড়ের মানুষজনদের দিকে আলাদা-আলাদা করে তাকিয়ে আর নিজের হাতের

পাতাদুটো ঘোরাতে-ঘোরাতে। একটা মেয়ে গলায় কোনো প্রশ্ন ছিল, শুনে সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল, যোগেন বোঝে প্রশ্নটা ছিল—মাতাজির কী হারাল, এত তালাস!

কাদিরভাই যেন এতক্ষণে যোগেনকে দেখতে পায়, 'এই তো, আর-একজনও হাজির। সব আসামি এক হাজতে? নিজের পার্টিটাকে ভুলে থাকলেন?' এইসব কথাই যোগেনকে বলা। যোগেনও হাসল। তারপর যোগ করল, 'আপনেই তো দেহি এক বেবাগের মনেরও হিশাব রাখেন, আইন-অমান্যেরও হিশাব রাখেন। একটু কয়্যা দ্যান—'

'এই-যে আপনারা দুইজনই রিজার্ভ সিটে জিতে কর্পোরেশনে এলেন, সেইডা কীসের রিজার্ভ?'

'খাইছে। আপনে কি ইমপস্টারের মামলা আনবেন না কী?'

'এইটা কি কোনো প্রশ্ন হল কাদিরভাই। আমি যার রিজার্ভ হতে পারি আইন-মুতাবেক, তার রিজার্ভ। কেউ যদি অন্যকিছুর রিজার্ভ মনে করে ভোট দিয়ে থাকে, সেটা তো আমার ওপর বর্তাবে?'

'সেসব কথা না। কিন্তু আইন তো আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে, আপনি যে শিডিউল্ড কাস্ট বা মুসলিম বলে এতসব সুযোগসুবিধে পাচ্ছেন, তাহলে আপনে যে শিডিউল্ড বা মুসলমান তার প্রমাণ কী?'

'কোর্টের তো যা খুশি প্রশ্নের অধিকার আছে। আসামির কি যে-কোনো জবাবের প্রভিশন নেই?'

'আমি তো উকিল না—আমি কী করে বলব?'

'আসামির আছে—কোন প্রশ্নের জবাব না দেয়ার অধিকার'—যোগেন বলে আবার যোগ করে—'আগে তো বামুনগ বার্থ-সার্টিফিকেট দেখতে হবে। তার কত পরে আমরা শূদ্ররা মুসলমানরা। কোনো বামুন কি প্রমাণ দিচ্ছে—সে যে বামুন তার প্রমাণ?' বলে যোগেন কাদিরভাইয়ের দিকে তাকায়, নিজের যুক্তি বিষয়ে নিশ্চিত।

কাদিরভাই হেসে আপাতত পরাজয় মেনে নেয় যেন। সেটা সবাইই মেনে নিল এমন একটা হাওয়া তৈরি হতে-না-হতেই কাদিরভাই বলে,

'বামুনরা কি বাউন হওয়ার ফলে কোনো অ্যাডভানটেজ পায়? ধরেন, কোটার সিট, ইলেকশনের বা কলেজে ভর্তির বা চাকরির। তো আপনি একটা অ্যাডভানটেজ নেবেন। আপনাকে তো জানান দিতে হবে যে আপনার অ্যাডভানটেজ পাওয়ার রাইট আছে কী না আছে।'

'এটা তো উলটেও দেয়া যায় কাদিরভাই। বামুনরা যেসব প্রিভিলেজ এতদিন প্রমাণ না দিয়্যা পায়েছে সেইগুলো কাইড্যা বিলি করা হচ্ছে যাদের মধ্যে, তাদের কী দায় পড়েছে প্রমাণ দেয়ার। ধরেন, কোনো জমিদার, বড় মানুষ, বড় জাত তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণভোজন করাচ্ছেন, ঢাকঢোল সহরৎ সেটা প্রচার করা হইছে, তা এ কথা তো সকলেই জানে বামুনদের পেট শুরু হয় বুকের উপুর থিক্যা। সুতরাং এমন নিমন্ত্রণে লোকাভাবের কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু তাদের কাছে কি প্রমাণ চাওয়া হয়? প্রমাণ চাওয়া কি সম্ভব? সুতরাং ব্রাহ্মণদের ভিড়ে কিছু-কিছু অব্রাহ্মণ তো মিশে থাকতেই পারে। উলটাটা ধরেন, কাদিরভাই। ঐরকমই আর-এক বামুন ঐ মাতৃশ্রাদ্ধেই, না' না এরা দুইজন এক মায়ের পোলা না, যে যার মায়ের পোলা, এই দুই নম্বর পোলা সাব্যস্ত কইরল যে মাতৃশ্রাদ্ধে স্যায় কাঙালি ভোজন করাইব। সেহানেও লোকাভাবের কোনো কারণ নাই। বামুন আর কাঙালদের মইধ্যে খুব একটা রূপের কমব্যাশ নাই। অ্যাহন, সেই কাঙালগ ভিড়ে দুই-চারজন বামুন মিশ্যা যাবার পারে। তারা যে বামুনও বটে, শুধুই কাঙাল

নয়, এটা প্রমাণের দায় কি বামুনদের? আগের ব্রাহ্মণ ভোজনের কেসে ব্রাহ্মণস ওয়্যার ইনভাইটেড। বাট ইট ডাজ নট এক্সক্লুড দি নন ব্রাহ্মিণস। সিমিলারলি ইন দি কেস কাঙালি ভোজন, ব্রাহ্মিণস হু আর কাংগাল টুউউ, আর নট এক্সক্লুডেড। সুতরাং আপনি যে-অভিযোগই করেন, তার দ্বারা আমরা অ্যাফেকটেড না।'

কাদিরভাই বলেন—'উকিলের কথা, হাতির গোবর আর গঙ্গাজলের কল একবার খুললে আর বন্ধ হয় না। বলছিলাম—ভোটে দাঁড়ালেন না-হয় মুসলিম লেডিজ আরবান বলে। কিন্তু জিতে কোন্ পার্টি হলেন?'

'যে পার্টি ছিলাম! মুসলিম লেডিজ আরবান।'

'আরে, এডা তো শাকিন সিটটার নাম। এরপর তোমার পার্টির নামটা তো চাই। সেটা কী?'

'সে একটা কিছু বের করে দেন। আমি রাজি।'

'লেখাই আছে, দিদি, এখানে, কমিউনিস্ট পার্টি অব ইনডিয়া'।

'ও-কে।'

'আপনি যদি সিপিআই হন, তাহলে আপনার ইউনিয়নের দায়দায়িত্বও তো সিপিআইয়ের। অথচ, আপনি তো সিপিআইকে ডাকেনওনি, কী করা হবে সেসব নিয়ে সিপিআয়ের সঙ্গে কথাও বলেন না।'

'কাদিরভাই, আপনে তো সিপিআই?'

'হ্যাঁ, তা ধরতে পারেন—'

'কাল আপনে সামের জুলুশে আসেননি?'

'না। কাল তো আসিনি।'

'ইসমাইলভাই-এর বক্তৃতায় তো পুরা জুলুশের আঁখ ভিজে গেল। কী বললেন ইসমাইল ভাই? বললেন, এই জুলুশ দরিয়ার মত, কিন্তু সে-দরিয়ায় জল নেই। শুধুই পথথর্। পথথরকে দরিয়া। ওঃ। ইট ওয়াজ সো নোবল। আমি বাড়িতে ফিরে মনে আনার চেষ্টা করলাম। ফলে, ঘুমের বারোটা বাজল। কাদিরভাই—ইসমাইলভাই তো কমিউনিস্ট। তা, বলছেন কেন, আমি কমিউনিস্টদের ডাক করছি না। কিন্তু আমিই তো বুঝতে পারছি না, আমি কেন, কমিউনিস্ট, মণ্ডলজিরও কি এক কেস।'

'কেস একই—তবে উনি তো কংগ্রেসসমর্থিত নির্দল। এদিকে বিপিসিসি তো কিছুই জানে না। জানতে চায়।'

যোগেন ঠিক করতে পারে না, সকালে সিদ্দিকিশাহেবের সঙ্গে যে-কথা হয়েছে তা কাদিরভাইয়ের সামনেই শাকিনাকে জানিয়ে দেবে কী না। শাকিনার এখানে গোপনতা কিছু আছে বলে তো ঠাহর করতে পারেনি যোগেন। সব কথাই সবার সামনে হয়, সবাইই সব কথায় একই অধিকারে কথা বলে। কথা বলতে-বলতে উঠেও যায় আবার আগের কথার কিছু না জেনেও এসে কথায় বসে যায়। যোগেনও হয়ত এসেই বলে দিত, যদি সে নিজে যুক্ত না হত ব্যাপারটির সঙ্গে। কাদিরভাইয়ের কথাতে অবিশ্যি বোঝা যাচ্ছে—কিছু ঘোঁট ও গোপনতা কোথাও-না-কোথাও আছে। আবার, এটাও বোঝা যাচ্ছে, তেমন একটা কিছু কোথাও আছে এমন মানতে চায় না শাকিনা, এমন প্রশ্রয়ও দিতে চায় না। যোগেন ঠিক করে ফেলে, সেই কথাটা বলবে, সিদ্দিকির কথা।

ফোনটা বেজে উঠল, স্কুলের ছুটির বেলের মত। একজন ধরেছিল। সে কী বলে দেয় শাকিনাকে। শাকিনা একটা আধবলা কথা আধখানা রেখেই বাঁ হাতের মুঠোয় ফোনটা চেপে

ধরে বলে, 'শাকিনা বলছি'।

একটু চুপ করে শুনে, সেই শূন্যতাটা তার ব্যক্তিগত হাসিতে ভরে দিয়ে, শাকিনা কপালে ভাঁজ ফেলে বলে ওঠে, 'হায় রাম, এ তো খুদ শোভানাল্লা কী আওয়াজ!' বলে সে হাসিটা ধরেই থাকল রিসিভারের কালো ছোট শূন্যতায়, যেন, সে জলে তার মুখের ছায়া দেখছে। এই মুহূর্তটি ও এই দৃশ্য যোগেনের চোখে ও মনে সেঁটে যায়, সে এতটাই নিষ্ক্রিয় ওতপ্রোত দর্শক। শাকিনা মাথা নাড়াচ্ছিল আর ছোট-ছোট আওয়াজ তুলছিল 'জি জি জি' বলে, ভুরু দুটোতে ও ভুরু দুটো যেখানে মিলেছে সেই বিন্দুটাতে ও কপালেও কিছু কিছু রেখা ফুটছিল আর ভাঙছিল আর ফুটছিল। শাকিনা ফোনটা ডানমুঠোতে নেয়ায় পূর্ব ভঙ্গিটা স্মৃতি হয়ে গেল। যোগেন আন্দাজের চেষ্টাই করেনি কে ফোন করেছে বা সিদ্দিকিশাহেবের ফোন কী না। তেমন কোনো আন্দাজের জন্য দরকার জ্ঞানই তার নেই এদের সম্পর্কে। তেমনি যোগেনের হয়ত পেশাগত আপত্তিই তৈরি হয়েছে, অন্যের কথা শুনে ফেলার বা চিঠি দেখে ফেলার।

ফোনটা হাতে নিয়েই শাকিনা উঠে দাঁড়ানোয় মালুম হয়, সে কতটাই লম্বা আর তার খুবই লম্বা চুল বেণী বাঁধা। সেই বেণীটাও স্বাভাবিকতই অতটা লম্বা। সে দাঁড়িয়ে ফোনটা কোনো একদিকে বাড়িয়ে ধরায় তারে টান পড়ে, তখন, শাকিনা আবার তার পুরনো জায়গায় প্রথমে দাঁড়িয়ে, পরে বসে পড়ে বলে, 'হাঁ, হাঁ, হিয়াঁই হ্যায়, লেকিন পারফেক্ট জেন্টলম্যান হ্যায়-না, কই আদমিকো ওভারটেক করনেবালা নাহি।' শাকিনা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাসে, গৌরনদীর খালের ধারে জোয়ারের ধাক্কায় থরথরানো এক ফুলন্ত বকুলের মত, এতটা কাঁপলে দুটো-চারটি শাদা ফুল তো জোয়ারের স্রোতের ওপরে ঝরে পড়তেই পারে, দেখতে মনে হতেও পারে—জোয়ারস্রোত থেকে ফেনা উলটো গতিতে বকুলগাছটার পাতায় গিয়ে পড়ছে।

শাকিনা ফোনটা যোগেনকেই দিতে চাইছে, সেটা যোগেন বুঝতে পারেনি, শাকিনাও তার কম পড়ে যাওয়ায় বিব্রত হয়ে, তারপর দাঁড়িয়ে থেকেই বলে, 'মণ্ডলজি, আপনার ফোন, সিদ্দিকিজি করেছেন, এখানে এসে কথা বলুন।' যোগেন উঠে শাকিনার আসনের দিকে যায়, শাকিনা নেমে এসে ফোনটা তার হাতে দিয়ে সামনে বসে, ফোনের কথা শুনতে।

'যোগেনবাবু, শাকিনাকে তো এখনো বলতেই পারেননি, বুঝলাম। ভালই হয়েছে। পরে, ব্যাপারটা নিয়ে একটু এগতেই বুঝলাম—ঐ গ্র্যাফটের ব্যাপারে, তোলার ব্যাপারে একেবারে ন্যাশন্যাল ইউনিটি। সব রাজনীতির, সব দলের, সব মতের বাবুরা একমত, নানা ভাষায়, যে ধাঙড়রা কনট্রাকটারের লোক, কর্পোরেশন সেধে কেন তাদের দায়িত্ব ঘাড়ে নেবে। কথাটার মধ্যে তো অ্যাপারেন্ট একটা যুক্তি আছে। কারণ এর পালটা কথাটা ধাঙড়রাই বলেনি, আমরা তো কোন্ ছার। আমার মনে হচ্ছে—একটু পজিশন পলিটিক্যালি স্ট্রেংদেন করে প্রসিড করব। আজ না করে, কাল করুন। খুব অসুবিধে হবে না তো। শাকিনাকে জিজ্ঞাসা করে নিন।

রিসিভারটা মুখ থেকে সরিয়ে কানে চেপে রেখে যোগেন শাকিনাকে বলে, 'সকালে ঠিক হইছিল, আইজ সন্ধ্যায়ই সিদ্দিকিশাহেব নিজেই ঘোষণা কর‍্যা দিবেন হরতাল মিটানোর শর্তগুল্যা। এহন উনি জিগান, সেই ঘোষণা আজ না কইর‍্যা কাল কইরলে আপনার কোনো অসুবিধা হবে কী না। আপনিই কথা বলেন,' যোগেন উলটোদিকে ফোনটা বাড়িয়ে ধরে। শাকিনা ফোনটা নিয়েই বলতে শুরু করে, 'নরম্যালি কোনো অসুবিধের আভাসও নেই। কিন্তু চারদিন হয়ে গেল তো। ওদের টাকাপয়সার যা অবস্থা, তাতে সংসার চালাবে কী করে? তখন দু-একজন হয়ত লুকিয়ে কাজও করবে, স্ট্রাইকও চালাবে। আর, ঐরকম শুরু হলেই তো ব্লাডসাকাররা চারপাশে এসে চেপে ধরবে। এছাড়া কিছু না। আমার ভয়টার কোনো মানে নেই। কিন্তু এরা যে এক

হয়েছে, সেই একাইটায় কোনো আঁচড় কাটতে না দিয়ে যদি হরতালটাকে বাঁচাতে পারি নাথিং লাইক ইট। কাল বিকেলে আপনার সুবিধে হলে কালই ভাল। আমরা একটু ক্যাম্পেনও করতে পারব যে আপনি কাল আসবেন।'

'ঐ গ্র্যাফ্‌ট-তোলা এসব শুনলে মাথা ঠিক থাকে না। এরা তো আপনার-আমার ঘরেরই ছেলে। কাজও করে কর্পোরেশনে। একটা তো অবলিগেশন থাকবে। ঠিক আছে। কালই হবে। আমি সাড়ে পাঁচটায় পৌঁছে যাব। একটু যোগেনবাবুকে দেবেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নমস্তেজি—'

যোগেন সাড়া দিতেই সিদ্দিকি বলেন, 'যেটা করতে হবে সেটা দেখুন। অ্যাসেম্বলির পার্টিগুলোর কাছ থেকে দুটো-চারটে প্রস্তাব বা তাদের সেক্রেটারি-প্রেসিডেন্টদের চিঠি পেলেই হল যে এরকম একটা এমার্জেন্সি কাজ এমন আটকে আছে, কদিন হল স্ট্রাইক চলছে, শেষে তো ল অ্যান অর্ডার প্রবলেম হতে পারে। চাইলে ওয়ার ইফোর্টসের কথাও লিখতে পারে। ব্যস। এনাফ। কারো কিছু বলার থাকবে না। তাই তো?'

'হ্যাঁ। সে তো ভালই। ধরেন অ্যাহন তো অ্যাসেম্বলির কংগ্রেসের দুই নেতা। শরৎবাবুকে বলতে আর অসুবিদা কী? ওনারডা পাইলেন। কেএস রায় একা-একা কি কিছু করব? তার তো আবার পাঁচকান করা লাগবে। বিদ্রোহী কৃষকপ্রজা পাবেন। মুসলিম লিগডা পাওন জরুরি। সারওয়ারদি আপনারে একডা চিঠি দিলে তো একটিলে তিন পক্ষী নিহত—গবর্মেন্ট, লিগ আর ট্রেড ইউনিয়ন—'

'সারওয়ারদি না কী এই স্ট্রাইকটা নিয়ে গা-ছাড়া?'

'তার গায়ের খবর আমি পাব কই? আপনারও তো তারে বলার সুবিধা নাই। এইসব মালিকের লোক নেতা হইলে তাগ সঙ্গে কাজ করা যায় না। তাগ মালিক কী সে সুবিধা পাবে—সেডা আগে জাইনবার চায়। আমি একডা কাম করতে পারি। নীহারেন্দুবাবুকে বলতে পারি। সারওয়ারদি এমন একটা ব্যাপারে নীহারেন্দুবাবুকে না করতে পারব না। আর-এক হয়—লিগরে বাদ দেন—সরকারও না, পার্টিও না। ইস্পাহানিকে বলা যায়, ওর তো একটা পাবলিক ফেস আছে, তাছাড়া লিগের সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভে আছে তো!'

'আর, আপনাদের শিডিউল্ড ক্লাশের কিছু হবে না? আমার তো ওটাই প্রধান কথা। শিডিউল্ড ক্লাসের মত ডিপ্রেসড পিপ্‌ল পাঁচদিন স্ট্রাইক করে আছে। আমার পক্ষে ইনডিফারেন্ট থাকা সম্ভব নয়।'

'সে একডা কিছু হবে নে। সবই তো চাই কাইল বিকালে?'

ধাঙড় স্ট্রাইকের সমর্থন-বিতর্ক

শাকিনা বলে ওঠে, 'আপনার কাছে বসে অর্গানাইজেশন করা কাকে বলে শেখা যেত যদি!'

'কী যে কন। আপনারে দেইখ্যা তো চমকাইয়া উঠি। তাও তো যাগ নিয়্যা আপনার কাম,

১৪০

তাগ সঙ্গে আপনার কথাবার্তা কাজকর্ম তো কিছু জানিই না। আমাগ এই কাজটারে সংগঠন কইবেন না। বড়-বড় মানুষের সঙ্গে তাগ দয়াতে চেনাজানা হইলে সেডারে রক্ষা করা আর বিপদে-আপদে একডু সাহায্য চাওয়া। তাও, যদি একডাও নিজের জইন্য না হয় তাইলে বড় মানুষরাও নির্ভয় থাকে—না, এ-লোকডার নিজের কুনো মতলব নাই। তখন এডডু-আধডু মানসম্মান দেয়। তাইলে আমি বারাই।'

যোগেন দাঁড়িয়ে উঠলে শাকিনা বলে, 'আপনি কি কোথাও-কোথাও যাবেন? না কি প্রথমে ফোন করবেন?'

'রুটটা ঠিক করি নাই। রাস্তায় না-বারালে আমার বুদ্ধি খোলে না। তবে ফোন তো কইরব্যার লাইগবই।'

'ফোন কোথা থেকে করবেন?'

'আরে, কলকাতা শহরে কি ফোনের অভাব? কী করব সেডা ঠিক কইরতে পাইরলে ফোন কি একডা জুটব না?'

'আমি একটা অনুরোধ করব? আপনি এখান থেকে বেরিয়ে মৌলালির দিকে না ঘুরে, ডাইনে দুই নম্বর ব্রিজের দিকে ঘুরবেন। দুই নম্বর ব্রিজটাকে বাঁ-হাতে রেখে ডাইনে ঘুরবেন। ডানদিকের ফুট ধরে মৌলালির দিকে হাঁটবেন। কয়েক পা এগলেই ডানদিকে একটা রাস্তা পাবেন। সেই রাস্তা ধরে এগলেই একটা তেমাথা পাবেন। তেমাথায় দাঁড়িয়ে ডানদিকে তাকালেই এই বাড়ির গেটটা পাবেন। সেই গেটটা দিয়ে ঢুকলেই এই দরজাটা পাবেন। সেই দরজার ভেতরে ঢুকলেই এই ঘরটা পাবেন। এত লোকজন থাকবে না। আপনার হাঁটা হবে, মাথায় বুদ্ধি খুলবে। এখানে বসে বসে যতগুলো দরকার ফোন করবেন। আপনার কাজের সাহায্যের জন্য একটি মেয়ে থাকবে—বাচ্চা মেয়ে, পনের-ষোল বছর বয়স। এর মধ্যেই দুই ছেলেমেয়ের মা। বিয়ে দিয়েছিল যখন, ওর বয়স সাত-আট হবে। কিন্তু ওর শ্বশুরের কী জিদ চাপল—আমার বহু ইশকুলে পড়বে। কর্পোরেশনের স্কুলে ভর্তি হল, ক্লাশ টুতে স্কলারশিপ পেল। ওর শ্বশুর সেটা সেলিব্রেট করল, বারদুয়ারি থেকে দু-পাঁইট ফরেন দিয়ে। শ্বশুর দিনরাত পাহারা দিত যাতে তার ছেলের সঙ্গে না মেশে। ক্লাশ ফোরে পাশ করে আবার স্কলারশিপ। এখানকার স্কুল ঐ পর্যন্ত ছিল। ওর শ্বশুর সারাবস্তির সঙ্গে ঝগড়া করে আর্মেনিয়ান রোডের মিশনারি স্কুল 'অনলি ফর দি গার্লস অব ডিসট্রেসড কাস্টস' সেখানে ভর্তি করে দিল। যাওয়ার সময় একাই যেত, ফেরার সময় শ্বশুর গিয়ে নিয়ে আসত। সেখানে সিক্সে বৃত্তি পেল, ওর বয়সও তের হল, ওর বরের সঙ্গে ও লুকিয়ে দেখাশোনা করতে লাগল। তার যা ফল তাই হল, পেটে বাচ্চা এল। আর তো পড়ার কথাই ওঠে না। কিন্তু স্কুলের দিদিমণিরা ছাড়বেন না। বাচ্চা হয়েছে, ভাল হয়েছে, স্কুলে আনবে, স্কুলের দাইদিদির কাছে থাকবে। তুমি ক্লাশের ফাঁকে এসে দুধ দিয়ে যাবে। বৃত্তি-পাওয়া মেয়ে। স্কুলের খুব আশা ক্লাশ টেনের পরীক্ষায়, বোধহয় ক্যামব্রিজ, ও বৃত্তি পেয়ে স্কুলের নাম বাড়াবে। নাইন পাশ করে টেনেও উঠল। পড়ছিল। কিন্তু এর মধ্যে মেয়েটির পেটে আবার বাচ্চা এল। সেই খবর শুনে তার শ্বশুর স্ক্যাভেনজিং ব্রাশের লাঠি দিয়ে ছেলেকে এমন পেটাল যে তাকে হাসপাতালে দেয়া হল। হাসপাতাল থেকে ছেলে গেল পালিয়ে। তখন তো মেয়ের

বয়স আঠার-উনিশ বড়জোর। তার তো স্বামীর জন্য মনখারাপ হবেই। পেটে বাচ্চা, স্বামী নিরুদ্দেশ—সে মেয়ে আর স্কুলে যায়। কিন্তু ও এই পপুলেশনের সবচেয়ে শিক্ষিত। ঐ স্কুলের অফিসে চাকরি দিয়েছে। খুব নির্ভুল ইংরেজি লেখে ও বলে। খুব ভাল টাইপ করে। কলকাতার সব জায়গা চেনে। ওকে যদি আপনি চিঠি দিয়ে কারো কাছে পাঠান আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। ওর নাম মতিয়া?

'আর, ওর স্বামী?'

'কদিন পরেই ফিরে এসেছে। তারপর ওদের আর কোনো ছেলেপুলে হয়নি,' শাকিনা আর যোগেন দুজনেই উঁচু গলায় হাসতে লাগল।

'ওর শ্বশুর?'

'আছে। তার শেষ ইচ্ছে, সে মরার পরে মুখে আগুন ছুঁইয়ে নদীতে ভাসিয়ে দেয়ার সময় তার 'বহু' যেন ইংরেজিতে কাঁদে।'

শাকিনা হঠাৎ করেই চেঁচিয়ে যা বলে, যোগেন বোঝে, মতিয়াকে কাজের জন্য প্রস্তুত হয়ে হাজির হতে বলছে। তারপর যোগেনকে 'আপনি বেরন, মাথায় রোদ লাগিয়ে রাস্তায় হেঁটে আসুন,' বলে সে নিজেই দরজার দিকে দু-পা এগিয়ে যায়।

যোগেন সত্যি-সত্যি শাকিনার বলে দেয়া রুটেই হাঁটে, দুই নম্বর ব্রিজের নীচ দিয়ে যে পায়ে হাঁটা রাস্তা ট্যাংরার দিকে গিয়েছে, তার মাথায় একটা চটের ছাউনির তলার চায়ের দোকানে যোগেন বেঞ্চির ওপর বসে—বেঞ্চিটা তৈরি হয়েছে, দু-দিকে ইট দিয়ে সমান মাপের দুটো স্তূপের ওপর একটা পাটা ফেলে। চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিতে দিতে যোগেন মনে মনে হিশেব কষে বোঝে—এমন কিছু বেশি কাজ নয়, বিশেষ করে সাহায্য যখন পাওয়া যাবে। সে ঠিক করে ফেলল, শাকিনার ওখানে ফিরেই নীহারেন্দুবাবুকে একটা চিঠি পাঠাবে। ঠিক করার পর তার মনে হয়, নীহারেন্দুবাবুর সঙ্গে ফোনেই কথা বলতে হবে—সারওয়ারদি-ইস্পাহানি- কিরণশঙ্কর মুখে না বললে হয় না কী? ওঁর অন্য পরামর্শও থাকতে পরে। সামসুদ্দিনের কাছে যেতে হবে, ফোনে হবে না। তার আগে তার পার্টির একটা বর্ধিত জরুরি সভা ডাকা দরকার। সবাইকেই তো ফোনে পাওয়া যাবে। বাইরের কজনকে ডাকতে হবে, বিশেষ করে কমবয়েসিদের। যোগেন ঠিক করে ফেলে—নোটিশ লিখে ঐ মেয়েটিকে দিয়ে ১৫ নম্বরের নোটিশ বোর্ডে মেরে দিয়ে আসতে বলবে। এখান থেকে ১৫ নম্বরে গিয়ে ফিরে আসতে আর কতটুকু সময় লাগবে? উপেন বর্মণকে পাওয়া গেলে খুব ভাল হয়। যোগেনের মনে হল—আলোচ্য তো ধাঙড়দের ধর্মঘটকে সমর্থন জানানো ও তার অত্যন্ত দ্রুত নিষ্পত্তি দাবি, তাহলে, সত্যেন দাসকে ডাকা উচিত—শিক্ষিত লোক ; শিডিউল্ড কাস্টস্ ওয়াকার্স ইউনিয়নে এখন যারা নেতা, তাদেরও ডাকবে। এটা যখন তৈরি হয়েছিল তখন যোগেনই ছিল সভাপতি। পরে, রসিক কাকাকেই এই দায়িত্বটা দেয়া হয়—সমস্তরকম তপশিলি সংগঠনের একটি একত্রিত মঞ্চ তৈরি করা।

শাকিনার বাড়িতে ফিরে দেখে, কমবয়েসি একটি ঝকঝকে মেয়ে তাকে সাহায্য করতে দাঁড়িয়ে। বাড়িতে আর-কোনো আওয়াজ নেই। যোগেন হেসে জিজ্ঞাসা করে, 'মতিয়া?'

পনের নম্বরের সভা

১৪১

যোগেন ভেবেছিল এত কম সময় দিয়ে ডাকা সভায় আর ক-জন আসবে। কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপার তো নেই, একটা স্ট্রাইককে সমর্থন জানাতে আর আপত্তি কী, যদি তারা আমাদের সমর্থন চায়। কিন্তু যোগেনেরই পৌঁছুতে আধঘণ্টাটেক দেরি হয়ে যায়—ট্রামের তার ছিঁড়ে গিয়েছিল মানিকতলায়। নেমে দেখে লাইন বেঁধে ট্রাম দাঁড়িয়ে। কোথায় ছিঁড়েছে, কখন সারবে এসব খোঁজখবরের মধ্যে না গিয়ে যোগেন তার চেনা অলিগলি দিয়ে হাঁটা দিল। পটুয়াটোলা দিয়ে এসেও দেরি হয়ে গেল। অনেকেই এসে গেছে—যারা না এলে মিটিং শুরু করা যায় না। রসিক কাকা, বিরাট মণ্ডল, সুরেন বিশ্বাস আর সুনীল বিশ্বাস দুজনেই, পি আর এখনো আসেননি, বললেন তো আসবেন, সত্যেনবাবু এসে গেছে।

যোগেনের দেখে নেয়া শেষ হলে রসিকলাল তাঁর সেই অনুচ্চ স্বরে বললেন, 'আমারে তো প্রোফেসর ফোন কইর‍্যা বললেন, উনি আইসবেন, সঙ্গে বরিশালের অগ্নি মণ্ডলও আইসবে। ওরা আসুক।'

'আসুক', যোগেন সুরেন বিশ্বাস আর সুনীল বিশ্বাসের দিকে চোখ নাচিয়ে জিগগেস করে, 'কেডা কারে ধইর‍্যা আইনলেন?'

'দুইজনেই দুইজনারে—'

ধনঞ্জয় রায়ের দিকে তাকিয়ে যোগেন নমস্কার দিল। পি আর ও মুকুন্দবিহারী একসঙ্গেই ঢুকল, বরিশালের পিরোজপুরের অগ্নি মণ্ডল। মুকুন্দবিহারীকে দেখে কয়েকজন দাঁড়ালেন, আরো কেউ-কেউ নমস্কার করলেন। তিনি সবার দিকে সহাস্যে জোড়হাতে নমস্কার জানিয়ে, চেয়ার খুঁজছিলেন। রসিকলাল বলে, 'মিছামিছি আর বসাউঠা কইরবেন ক্যা। আপনার সিটেই বসেন।' পি আর একটু হেসে মুকুন্দবিহারীকে সভাপতির চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করে।

রসিকলাল বলে ওঠেন, 'আরে প্রস্তাব-সমর্থন-টমর্থন কি তুইল্যা দিল্যা? যে-পূজার যে-মন্ত্র। এ কি কুলীন পাত্র নাকী, মাইয়্যা দেইখলেই বিয়্যার টোপর মাথায় খাড়াইয়্যা পড়ব?'

যোগেন লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে বলে, 'আমি প্রস্তাব করি', এই পর্যন্ত বলে দাঁত বের করে হাসে ও হাসিটা দেখায়, তারপর বলে, 'কী প্রস্তাব তাতো আপনাগ সবারই জানা—।' সে এবার মুকুন্দবিহারীকে হাত দেখায় চেয়ারে বসতে। পি আর বলে দেয়, 'আমি সমর্থন করি—। কী সমর্থন করি সে তো আপনাদের সকলের জানা।' মুকুন্দবিহারী গিয়ে সভাপতির চেয়ারে বসেন। আবার নমস্কার করে বলেন, 'সাগত হি সাগতনাম। যারা এখানে নিজেরাই এসেছেন, তাঁদের স্বাগত জানাই।' উনি এরকম কোনো কথা সংস্কৃতে বলে সভা শুরু করেন, যে সভার তিনি পতি। তাঁর শ্রোতারা সংস্কৃত বলেই জানে বটে, কিন্তু উনি এই সদুক্তিগুলি বলেন, পালিভাষায়। ওঁর শ্রোতাদের মধ্যে হয়ত কেউই পালি জানেন না, হয়ত বেশির ভাগই জানেন না—পালি নামে একটা ভাষা আছে। সেজন্য তিনি বাংলাটা সঙ্গেসঙ্গে বলে দেন।

সভাপতি বলেন, 'তাহলে সভা আরম্ভ হোক। যোগেনবাবু উত্থাপন করুন।'

যোগেন তার চেয়ারের সামনে দাঁড়িয়েই পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে মেলে ধরে বলে, 'এমন কিছু কওয়ার নাই, প্রস্তাবডা পইড়্যা দিলেই হইত। কিন্তু সকলের জানা নাও থাইকতে পারে বইল্যা ব্যাকগ্রাউন্ডটা বইল্যা নেই। আমরা অনেকে যেমন কলকাতায় কিছু কিছু খবর রাখি, অনেকেই তেমনি আমাদের নিজনিজ দেশে থাকি বইল্যা, কলকাতার সব খবরের বা ঘটনার

মূল বা বদল জানি না।

'কলকাতায় জমাদার, ঝাড়ুদার, ধাঙড়, মেথর প্রমুখ কর্মরত জনসংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ে। কলকাতা কর্পোরেশনেই সব থিক্যা বেশি কর্মী—কত তার হিশাব নাই, গুইন্যা-টুইন্যা ঠাহর হয় তিরিশ হাজার হইবই। হিশাব নাই কেন? কারণ, এরা কর্পোরেশনের লোক নন। এঁরা কনট্রাকটারের লোক। কিন্তু এগ মাইনা ও বাসস্থান ইত্যাদি কর্পোরেশনই দিয়া থাকে। আমি খুব বেশি জানি না। তবে শুনছি, বরাবরই এই চাকরির ব্যবস্থা এইরকম। এই ব্যবস্থা আইনসঙ্গত। কর্পোরেশনের আইন অনুযায়ী এই ব্যবস্থার নাম স্থায়ী কনট্র্যাকট। মানে এই কাজটার লোক কনট্রাকটার মারফৎই সংগ্রহ করা হবে। হয়ত এমন ব্যবস্থার একটা যুক্তি—এই কাজগুলি বিশেষ-বিশেষ সম্প্রদায় করে থাকে ও সেই সম্প্রদায়ের লোকজন বংশানুক্রমে পারিবারিকভাবে এই কাজ করে থাকেন। যে-কাজ তাঁরা করেন তাতে বিশেষ ধরনের দক্ষতা বা স্কিল দরকার। এরকম কর্মী-সংগ্রহ কর্পোরেশনের পক্ষে সম্ভব নয়।

'কিন্তু এই লোকজনের জন্য বেশ বড় জায়গা জুইড়্যা বড় বড় বস্তি আছে। সেখানে আলো ও জল দেয়া কর্পোরেশনের দায়িত্ব। যাই হোক—কলকাতা কর্পোরেশন ছাড়াও অনেক প্রাইভেট জায়গাতেও এই কাজের লোক নিয়োগ করা হয়। সম্প্রদায়গতভাবে এঁরাও ধাঙড় শ্রেণির।

'যেহেতু এঁরা নির্দিষ্ট জায়গাতে বসবাস করেন ও নির্দিষ্ট কাজ করেন, সেই কারণে এগ সংগঠিত করা সহজ মনে কইর‍্যা নানারকম রাজনৈতিক পার্টি এগ মতামত তৈরি করার কাজ করতেছেন অনেকদিন হয়। আমি যা শুইনছি ১৯২০ সালেই এগ একডা ধর্মঘট হয়। এইডা বুঝি নাই—ধর্মঘটটা এগ ছিল না কনট্রাকটারের ছিল। ১৯২৮ সালেও নাকী দুইবার হইছে। এবারও কর্পোরেশনের ভোটের আগে একটা ধর্মঘট শুরু হইয়্যা থাইম্যা যায়। নতুন কর্পোরেশনের কাছেই দাবি আদায় করা হইব বিবেচনাবশত। নতুন কর্পোরেশন হইছে। এরাও থামানো ধর্মঘট চালু কইরছেন। আজ দিয়্যা চারদিন না ছয়দিন হইল। কলকাতার ভিতর দিয়্যা আসা-যাওয়ার কালে দুর্গন্ধে শ্বাস টানা যায় না এহন। কলকাতা কর্পোরেশন এলাকায় খাটা পায়খানার সংখ্যা ১০ হাজারের উপর। এইগুলি প্রত্যহ পরিষ্কার না কইরলে মহামারীর ভয় থাকে। তার উপর নাকী হাজার পাঁচ-সাত লাইসেন্স-ছাড়া খাটা পায়খানা আছে। যেসব মানুষের কলকাতায় কোনো বাসস্থান নাই, কর্পোরেশন অনুমোদিত বাসস্থান নাই, সেইসব মানুষজন বিশেষত কলকাতার খালগুল্যার ধারে বসবাসের একডা চালা খাড়া কইর‍্যা থাকে ও তাগ পরিবারের নারীগ জন্য অন্তত খানিক আড়াল দিয়্যা পায়খানার ব্যবস্থা কইরতে হয়। এইগুলি খাটা পায়খানাও নয় ও প্রতিদিন পরিষ্কার কইরব্যার উপায় নাই ও কর্পোরেশনের কোনো বাধ্যবাধকতাও নাই। তবু জনস্বাস্থ্যের কারণে এই পায়খানাগুলিতে কাজ কইরতে হয়। তার উপর কলকাতায় প্রতিদিন অশনাক্ত ও স্বীকারহীন মৃতদেহের সংখ্যা পাঁচ শতাধিক। এইগুলির যথাযথ সৎকার এই কর্মীদের কাজ। প্রতিদিন সকালে রাস্তা ধোয়া একডা বড় কাজ। সুতরাং এই ধর্মঘট তাড়াতাড়ি মিটানো দরকার। কর্পোরেশন এখনো হাঁচে নাই। নাকে কাঠি দিছে কীনা জানি না। তাই কর্পোরেশনের ধাঙড়দের স্ট্রাইক কমিটি সব রাজনৈতিক দল ও আইনসভার দলকে অনুরোধ কইরছে, যে, তারা এই ধর্মঘট যথাশীঘ্র মিটাইব্যার জন্য সরকারের কাছে কথা তুলুক। এই কারণে, আমাগ একডা প্রস্তাব নিব্যার লাইগব। সেই উদ্দেশ্যেই মিটিং।

'আমি প্রস্তাবডা লিখ্যা আনছি। পড়তেছি। আগে পইড়্যা দিলেই হইত। একডা ভাষণ দিব্যার কাম কী ছিল?

যহন প্রথম এইসব শুইনল্যাম ও জাইনল্যাম তহন আমি মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝি নাই। আমি

ধইর‍্যা নিল্যাম—আমাগ মইধ্যে প্রতিভাধরগ বাদ দিলে গড়-মেম্বারগ বুদ্ধি আমার খুলির মাপেই হওয়ার কথা। তাই যেটুক্ না-জাইনলে পরেরটুক্ বোঝা যাব না, আমি সেই টুকখানি শুধু আপনাগ কইল্যাম। সবই ভুল হওয়ার ভয় আছে। আমার এত তাড়া কইরব্যার কারণ এই ধাঙড়-মেথর-ডোমরা আমাগ মতই শিডিউল্ড কাস্ট সমাজের মানুষ। তারা সগলে মিল্যা একডা আন্দোলন কইরব্যার লাগছেন। এমনিই তো আমাগ কর্তব্য অগ পাশে গিয়া খাড়ানো। অনেকে খাড়াইছেনও। কিন্তু অ্যাহন তো একডা রাজনীতির চাপ দিতে হয়। সেই কারণেই এই সভা অ্যাসেম্বলি পার্টির নামে ডাকা। কিন্তু বর্ধিত। সবাইরেই ডাকছি, যদ্দুর কুল্যাইছে। কেউ কেউ তো শুইন্যাই আসছেন। যেমন, পিরোজপুরের নেতা অগ্নিকুমার মণ্ডল।

'আমি নির্ভয়ে লিখ্যা আনছি এই ভাইব্যা যে মিটিঙে এমন সব পণ্ডিত-বিদ্বান থাইকবেন যাগ চক্ষুকর্ণ এড়াইয়া সটকান যাবে না।

শাকিনা বেগম ঘরে ঢোকেন মতিয়াকে সঙ্গে নিয়ে। যোগেন বলেছিল, 'যদি পারেন এক পাক ঘুরান দিয়্যা যাইবেন।' সেই কথা রাখতেই শাকিনা এসেছেন। যোগেন কথা থামিয়ে ডান হাত ঘুরিয়ে তাঁকে বসতে বলে। পেছন দিকে অনেক চেয়ার খালি ছিল। তারই একটা করে তুলে নিল, শাকিনা আর মতিয়া। সে দুটো চেয়ার আলতো করে বসিয়ে, তারা বসে। চেয়ার টানার যে-আওয়াজের সঙ্গে তাদের এত চেনা—তেমন কিছুই ঘটল না দেখে শাকিনাকে এক চোখ দেখেও নিল কেউ-কেউ। যোগেন তখন পড়ছে—ইংরেজিতেই।

কলকাতা কর্পোরেশন সীমানার মধ্যে গত চার-পাঁচ দিন যে অস্বাভাবিক ও আতঙ্ককর অবস্থা চলিতেছে তাহাতে ইনডিপেনডেন্ট শিডিউল্ড কাস্ট পার্টির কর্মসমিতির এই বর্ধিত সভা উদ্বেগ বোধ না-করিয়া পারে না। কর্পোরেশনের ধাঙড়-মেথররা তাঁহাদের নির্বাচিত স্ট্রাইক কমিটির নেতৃত্বে চারদিন হইল ধর্মঘট করিয়াছেন। ফলে, রাস্তা ধোয়ামোছা হইতে শুরু করিয়া বাড়ির ময়লা সাফ পর্যন্ত সমস্ত রকম কাজ বন্ধ আছে। এর ফলে, বাড়ির ভিতরে, রান্নাঘরে, ও বাথরুমে আর বাড়ির বাইরে ফুটপাতের ময়লা ফেলার ড্রামে বিভিন্ন মহামারীর সংক্রমযোগ্য বীজ প্রতিদিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। কলিকাতা শহরে কোনো অঞ্চলে দু-চারজনও যদি এই সকল মহামারীর কোনো একটিতেও আক্রান্ত হন, তাহা হইলে কলকাতা শহরের বর্তমান অবস্থায় তাহা স্বাভাবিকের অপেক্ষা শতগুণ বেগে একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্তে ছড়াইয়া পড়িবে। সেই মহামারীগুলিরও শিকার হইবেন প্রধানত গরিব মানুষজনই, যাঁহাদের কোনো নির্দোষ পানীয় জল জোটে না। শুধু পেয় জলের অভাবে কলকাতা শহরে প্রতি বৎসর ওলাউঠা মহামারী ঘটিয়া থাকে। এই ধাঙড় ও মেথর ধর্মঘট সেই নিয়মিত মহামারীর উপর এই বিশেষ মহামারীকে সম্ভাব্য করিয়া তুলিয়াছে। স্বতন্ত্র শিডিউল্ড কাস্ট পার্টির বর্ধিত কর্মসমিতির এই মিটিং কলকাতা শহরকে অবিলম্বে মহামারীর আতঙ্ক হইতে রক্ষা করিবার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন ও অনুরোধ করিতেছে।

আমাদের এই আবেদন ও অনুরোধ কর্পোরেশনের ধর্মঘটী ধাঙড় ও মেথরদের দাবিদাওয়ার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাইতেছে। ধর্মঘটী শ্রমিকদের দোষে আজ কলকাতা, মহামারীর আক্রমণের আশঙ্কায় বিপন্ন নহে, এই মহামারীর আশঙ্কা তৈরি হইয়াছে ধাঙড় ও মেথরদের দাবিদাওয়ার প্রতি কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষের অনমনীয় মনোভাবে। এই কর্মিগণ এখনো বেতন পান মাসিক মাত্র ১২ টাকা। ইহাদের চাকরির কোনো নিয়োগপত্র নাই। সারাজীবন কাজ করিয়া অবসর গ্রহণকালে ইহাদের কোনো পেনশন বা রিট্যায়ারমেন্টের জন্য আর্থিক সাহায্য নাই। পরন্তু কর্পোরেশন চুক্তির জোরে ইহাদিগকে সপরিবার চাকরি করিতে বাধ্য করেন। অথচ সেই চুক্তির

ধারা অনুযায়ী এক পরিবারকে একাধিক পরিবারের একাধিক সদস্যের জন্য একাধিক কাল মঞ্জুর করেন না। তদুপরি, কর্পোরেশন হইতে এই ধাঙর ও মেথরদের যে-সামান্য টাকা মাস মাহিনা হিশাবে কোনোরূপ বৃদ্ধি ছাড়া দেয়া হয়, সেই টাকা হইতেও দালাল শ্রেণির কিছু অসৎ লোক আংশিক টাকা কাটিয়া লন। আমরা এই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি এবং অতি সত্বর এই অসাধু অব্যবস্থা না-বদলাইলে আরো আগুন জ্বলিয়া উঠিবে বলিয়া কর্তৃপক্ষকে জানাইতে চাহি।

ইনডিপেনডেন্ট শিডিউল্ড কাস্ট পার্টির কর্মসমিতির এই সভা মনে করিতেছে যে পশ্চাৎপদতার কারণে শিডিউল্ড কাস্টদের মধ্যে শিক্ষিতের হার খুবই কম। সেই সুযোগে কেরানি ও অফিসার শ্রেণির উচ্চতর জাতির লোকজন শিডিউল্ড কাস্টদের প্রাপ্য আয়ের উপরও ভাগ বসান। একদিকে বর্ণহিন্দুগণ আমাদের উপর অস্পৃশ্যতা, অশিক্ষা ও অবিচার চাপাইয়া দিয়াছেন, অন্যদিকে বর্ণহিন্দু জমিদারগণ নিম্নবর্ণ প্রজাদের উপর করের বোঝা চাপাইয়া দিতেছেন, এখন আরো অন্যদিকে তপশিলি গোষ্ঠিভুক্ত আমরা কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরি করিলে, আমাদের, তপশিলি গোষ্ঠিভুক্ত কর্মীদের, প্রাপ্য অতিসামান্য বেতন হইতেও ভাগ বসাইতেছেন। বর্ণহিন্দুদের শাস্ত্রীয় শাসন, সামাজিক শাসন ও আর্থিক শাসনের সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক শাসন ও শোষণ যুক্ত হইয়া আমাদের, শিডিউল্ড কাস্টদের, জীবনধারণই প্রায় অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন। ইনডিপেনডেন্ট শিডিউল্ড কাস্ট পার্টির এই বর্ধিত সভা, আইনসভার অন্তর্গত একটি পার্টি হিশাবে তো বটেই, তদুপরি, বাংলার তপশিলি জাতিসমূহের একটি সমবেত প্রতিষ্ঠান হিশেবে কর্পোরেশনের ধাঙড় ও মেথরদের বর্তমান ধর্মঘটের সকল দাবি সমর্থন করিতেছে, অবিলম্বে এই ধর্মঘটের মীমাংসার দাবি ও অনুরোধ জানাইতেছে। আমরা বর্তমানে অনতিবিলম্বিত মহামারী আর উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে দাঙ্গার আশঙ্কা—এই দুই আতঙ্ক হইতে উদ্ধার চাহিতেছি।

বিনীত

স্বাধীন শিডিউল্ড কাস্ট পার্টি, কলকাতা।

যোগেন 'বিনীত' বলায় ও পার্টির নাম বলায় ও হাতের কাগজটি ভাঁজ করতে-করতে বসে পড়ায় সবাই বুঝে নিল প্রস্তাব পড়া শেষ হল।

একটু পর মুকুন্দবিহারী বলেন, 'এত সুলিখিত ও সুসম্পাদিত একটি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার ইচ্ছা থাকে না। গ্রহণের ইচ্ছাই প্রধান হয়। তবুও আমাদের যার যা বক্তব্য তাতো শুনতেই হবে। কিন্তু তারও আগে একটা আনুষ্ঠানিক সমর্থন তো কেউ করবেন নিশ্চয়ই।' মুকুন্দবিহারী একেবারে পেছন থেকে তাঁর চোখ দুটো নিজের পাশে নিয়ে এলেন। তারপর তাঁর বাঁ-দিকে তাকালেন। সেখান থেকেই একজন বলে ওঠেন, 'খুঁজেন কী, সভাপতি? প্রস্তাবের সমর্থক? আমি সমর্থন দিচ্ছি।'

'এটা তো আপনাকে সভাকে বলতে হবে। সভাই একমাত্র কর্তা। এক সভাই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, সমর্থক হিশেবে আপনাকে স্বীকার করা হবে কী না।'

পেছনের ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে বলেন, 'সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি অনুযায়ী আমি যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি অন্তরের সঙ্গে সমর্থন করি।'

সভাপতি এবার সভার ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে বলেন, 'আপনারা কে কে বলতে চান, তাঁদের নাম দিন।' হয়ত নামলেখার সময় দিতেই সভাপতি গল্প বলার মত করে বললেন, 'জাতক-এ একটা মজার গল্প আছে। বোধিসত্ত্ব তখন এক উপনগরে বাস করেন। এক ধনাঢ্য বৈশ্যের বাড়িতে নেমন্তন ছিল—আর-সকলের সঙ্গে এই নাপিতটিরও। এই নাপিত ছিলেন

বোধিসত্ত্ব। তিনিও গিয়েছেন ও তাঁর জন্য নির্ধারিত পংক্তিতে বসে, আহার করে, প্রস্থান করেন। কারো সঙ্গেই তাঁর কোনো বাক্যবিনিময় হয় না। সে যখন বাড়ি পৌঁছেছে, তখনই একজন দাসী এসে বলে, 'একজন দর্শনপ্রার্থী আছে।' নাপিত বলল, 'জিগগেস করো সে ক্ষৌরপ্রার্থী না দর্শনার্থী। দর্শনার্থী হলে নিয়ে এসো।' এল দর্শনার্থী, 'হে ক্ষৌরকার, আমাকে তো গৃহকর্তা শ্রেষ্ঠী পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন, 'আপনি আহারের আগেও কথা বলেননি। পরেও কথা বলেননি। ফলে তিনি খুব দ্বিধায় আছেন।'

'তিনি তোমাকে কী আদেশ দিয়েছেন। আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে? না, তাঁর কাছে আমার উত্তর নিয়ে যেতে।'

'আপনি গেলেই তো ভাল হয়। মুখে-মুখে বললে অনেক বড়-বড় কথাও সোজা হয়ে যায়। তৃতীয় ব্যক্তির দৌত্যে কথা বললে অনেক ছোট-ছোট কথাও বড় হয়ে যায়।'

'আমি ওঁর নিমন্ত্রণ পেয়ে বাধিত হয়েছি। আমি ওঁর অন্নাদিতে সম্পূর্ণ তৃপ্ত হয়েছি। আমি যে এ-বিষয়ে ওঁকে কিছু না-বলে চলে এসেছি তার কারণ উনি তো আমার আহার দেখেছেন, আমার তৃপ্তি দেখেছেন ও আমার প্রত্যাবর্তনও দেখেছেন। সেই ভাষাতেই তো সব বলা হয়েছে। মুখোমুখি কথাতে সামাজিকতাবশত কিছু সমালোচনার কথাও বলতে হয়। সেটা আমি করতে চাইনি।'

এমন গল্প বলা মুকুন্দবিহারীর অভ্যেস। তিনি নিজেই হাসলেন। সুতরাং আরো কেউ-কেউ সামাজিকতাবশত হাসলেন। ওঁর হাতে ইতিমধ্যে চারটি স্লিপ জমা পড়েছিল। মুকুন্দবিহারী বললেন, 'শ্রী যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের প্রস্তাব আপনারা যে-রকম ভঙ্গিতে শুনেছেন, তাতেই বোঝা গেছে মুখোমুখি কথার কোনো প্রয়োজন নেই। এই চারজনকে আমি পরপর ডাকছি।' তিনি সত্যেন্দ্র রায়কে ডাকলেন।

যোগেন একটু সতর্ক হল।

মুকুন্দবিহারী আসার পর থেকেই এই প্রস্তাবের ও এই উদ্যোগের এত প্রশংসা করছেন যে সম্ভবত একটা গোলমাল হবে। পিরোজপুরের অশ্বিনী মণ্ডলকে তো প্রায়ই কলকাতায় আসতে হয়। সেই সুবাদে এসেই মিটিং শুনে হাজিরা দিয়ে গেলেন।—এমনই ভেবেছিল যোগেন। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে—ঘটনাটা অত সিধে নয়।

সত্যেন রায় বললেন, 'যোগেনবাবুর ভাষণ ও প্রস্তাবটা আমিই আলাদা করে শুনিনি। তাঁর ভাষণের কথাগুলোকেও আমি প্রস্তাবের অংশ ভেবেছি। এসব খবর আমার জানা ছিল না। জানার ফলে প্রস্তাবটির প্রতি আমার সমর্থন আরো জোর পেল। আমার মত লোকই তো বেশি। এরকম এক-একটা ঘটনায় আমাদের জানা হয়ে যায়। সেই জন্যে আমার মনে হচ্ছে—ওই ইতিহাসের অংশটা, ধাঙড়-মেথরদের সঙ্গে কর্পোরেশনের সম্পর্কের ইতিহাসটা ছোট করে মূল প্রস্তাবে থাকলে ভাল হয়।'

এরপর বললেন প্রেমহরি বর্মণ, 'আমরা তো একটা আন্দোলনকে সমর্থন করছি। কারণ, তাঁরা যে-দাবিগুলি করছেন সেগুলিকে আমাদের ন্যায়সংগত মনে হয়েছে। জিনিশটা তো খুব ভাল নয়। ধাঙড়-মেথর ছাড়া স্বর্গও স্বর্গ থাকে না। কিন্তু তাদের এক-একটা জায়গায় ঘিরে রেখে তাদের দিয়ে কাজ করানো, মাইনে না-বাড়ানো, জিনিশপত্রের দাম এত বেড়েছে সেই কারণে তাদের কোনো বিশেষ অ্যালাওয়েন্স না-দেয়া, তাদের সম্পর্কে সব দায় কনট্রাকটারের ঘাড়ে ফেলা—এসবই তো লজ্জাজনক শোষণ। বিশেষ করে এতগুলো লোক জড়িয়ে আছে। সেটাই তো আসল কথা। ইতিহাসের কথা তুলতে গেলে তো নানা কথা উঠে পড়বে। ধরেন,

ওঁরা সেই বিশ সাল থেকে আন্দোলন করছেন। তখন শিডিউল্ড কাস্ট বলে কিছু ছিল না। আমাদের এরকম পার্টিও ছিল না। তার পর ধরুন ১৯২৮ সালের স্ট্রাইক নিয়ে তো উলটো কথাও আছে। ওয়ার্কার্স পার্টি ও কমিউনিস্টরা ধাঙরদের দিয়ে এই সব স্ট্রাইক করিয়েছে। করিয়েছে তো ভালই করেছে। কিন্তু তখন তো আমরা শিডিউল্ড ক্লাস হইনি। তাহলে, ওসব গণ্ডগোলে আমাদের যাওয়ার দরকার নেই। আমরা এই আন্দোলন নিয়ে সোজা ভাষায় ও দু-এক কথায় আমাদের সমর্থনটা জানিয়ে দেই। কথা এত বেশি বললে, মনে হয়, যেন আমাদেরই আন্দোলন, তা তো নয়। তাহলে পাবলিককে এত কথা বলার দরকার কী?'

প্রেমহরি তাঁর কথা শেষ করে ফিরে যাওয়ার আগেই একজন বলে ওঠেন, 'আপনাগ এই কায়দাডা আমরা বুঝি না। আরে, আমাগ দেখেই-বা কেডা, পৌঁছেই-বা কেডা? অষ্টপ্রহর য্যান্ ভূতের ভয়—এই অত চিল্লাস না, কত্তায় শুনব, এই কথা বেশি কস ক্যান, কত্তায় শুনব, অত মুখ বাড়াইস না, কত্তায় দেখব, অত কাঁধ ঝাঁকাইয়্যা হাঁটিস না, কত্তার পালকি নড়ব। এইডা তো সারাজীবন শুইন্যা অ্যালাম। অ্যাহন তো মনে হয়—জীবনডা সাইর‍্যা আনছি। একডা জীবনও তো কম-জীবন না। কিন্তু কত্তাডা যে কেডা সেইডা দেখব্যার তো পাল্যামই না, শুইনবারও পাল্যাম না। দ্যাখব ক্যামনে? আমরা নিজেরাই তো নিজেগ দেখি না তাইলে কত্তারে দেইখব ক্যামনে। তহন তো আমরা শিডিউল ছিলাম না। শিডিউলই ছিল না—তাতে আমরা থাকি কী প্রকারে? শিডিউল না হই, নমশূদ্র ছিল্যাম তো? ধাঙড়-মেথর ছিলাম তো? সাহা-শুঁড়ি ছিল্যাম তো। না কী-শিডিউল হইলে আর নমশূদ্র থাইকব্যার চলে না। আমাদের এত কিছু বলার কাম কী য্যান আমরা সব জানি। ভ গ বা ন। কুনোদিন শুইনছেন কোনো ভদ্রলোক কী বামুনের বেটা কইছে—নমরা এগুলা জানে। ক্যা বলে নাই। আমরাই বলি নাই, আমরা কিছু জানি। অ্যাহন তো আমাগ উচিত, যা জানি তার থিক্যা বাড়াইয়া বলা। যোগেন মণ্ডলের ওই টুক কথায় মাথায় এক্কেরে আকাশ ভাইঙ্গা পড়ে। থাউক, যোগেনবাবু যা লিখছেন সবটাই থাউক। একডু তর্জন-গর্জন হউক।'

সে থেমে গেলে, সভাপতি বললেন, 'আমার কাছে এখন তো একটা নামই আছে। শ্রীঅগ্নিকুমার রায়, পিরোজপুরখ্যাত অগ্নিকুমার রায়। অগ্নিবাবু বলার পর যোগেনবাবু তাঁর উত্তর দিবেন। শ্রীঅগ্নিকুমার রায়।'

অগ্নিবাবু উঠলেন, সভার মুখোমুখি দাঁড়ালেন, কাঁধের ভাঁজ করা চাদরটা একটু টানলেন, তারপর বললেন, 'আমি পিরোজপুরে যত বিখ্যাতই হই, কলকাতায় এমন কী অজ্ঞাতও না। কিন্তু এই বিষয়ে কথাবার্তা হইব শুইন্যা লোভ সংবরণ হয় নাই। একবার ভাবল্যাম, কাম নাই। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস মহাশয়দ্বয় তাগ নিজ-নিজ পত্রে সমস্ত মতামতই নিয়মিত প্রকাশ করিতেছেন, রসসিক্ত ও জ্ঞানসিদ্ধ কইর‍্যা'।

অগ্নিবাবু তাঁর জিভটা বের করে আবার মুখের ভিতর গুটিয়ে নিয়ে, 'রসসিক্ত' বললেন, আবার নিজের দুই হাত বুকের উপর আড়াআড়ি রেখে বললেন, 'জ্ঞানসিদ্ধ'।

সভায় বেশ একটা বোধগম্য উৎসাহ এল। এর আগে অনেকেই অগ্নিবাবুর বক্তৃতা দেখেননি। তাঁর হাত-পা-মুখ এইসব ভঙ্গি বেশ নতুন লাগল।

তাঁর ভাষণের ধরতাই শুনে মনে হল অনেকক্ষণ বলবেন। যেমন মনে হয়, তিনি অনেকটাই যা মনে আছে তাই বলে দেয়ার মত বক্তা একটু পরেই বোঝা যায় একেবারেই তা নয়। তবে, বক্তা হিশেবে তাঁর আত্মবিশ্বাসটা দু-একজনের কাছে একটু বিপজ্জনক ঠেকে—এমন চুপচাপ শ্রোতা পেলে তাঁর উৎসাহ বাড়তে পারে।

ধীরে ধীরে অগ্নিকুমার তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করেন এই যুক্তির ভিতের ওপর যে শিডিউল্ড কাস্ট একটি সরকারি কাগজের নাম। সেই কাগজ কি পরাশর সংহিতা বা মনুসংহিতার সমতুল্য স্মৃতিশাস্ত্র যে তার দ্বারা কারো ধর্ম নিরূপিত হবে? মুসলমানদের শিয়া-সুন্নিভাগের একটা ইতিহাস-নির্ভরতা আছে। শিডিউল্ড কাস্ট আর অশিডিউলড কাস্ট তেমন ইতিহাসনির্ভর ভাগ নয়—এই ভাগ হিন্দুসমাজের বিধিবিধানের উপর ইংরেজদের শাসনের ব্যবহারিক প্রয়োগ। ইংরেজ রাজপুরুষগণ হিন্দুদের উন্নতি চান। তাই তাঁরা একটা তালিকা তৈরি করেছেন— হিন্দুসমাজের ভিতরে কোন্-কোন্ জাত অনুন্নত। এই জাতগুলি কখনো বৃত্তিনির্দেশ—অর্থাৎ কার কী কাজ। কখনো স্থানজ্ঞাপক—অর্থাৎ হিন্দু সমাজের ভিতর কোন্ স্থানে তারা আছে।

এই যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে, তার দুটি ভাগ। একটি উপলক্ষ ভাগ, আর-একটি যুক্তিভাগ। উপলক্ষভাগ সম্পর্কে কোনো আপত্তি নেই, থাকার কথাও নয়, কারণ কবি বলেছেন,

'যারে তুমি নীচে ফেলো সে তোমারে বাঁধিবে
যে নীচে
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে

কর্পোরেশনের ধাঙড় ও মেথররা যখন দুর্দশায়, তখন আমাদের হাত বাড়িয়ে তাদের তুলতে হবে। এটা আমাদের কর্তব্য, ধাঙড়-মেথরদের অপেক্ষা আমরা উচ্চতর বলে। আমরা এক বিপুল হিন্দুজাতির অংশ। সেই হিন্দুধর্ম বেদ, ধর্মশাস্ত্র, মহাভারত পুরাণ, লোকসংগ্রহ দ্বারা দৃঢ়ভাবে বাঁধা।

এই বাঁধা কথাটি অগ্নিকুমার বলার পর অভিনয় করে দেখান—কাল্পনিক কোনো দড়িতে কীভাবে বজ্র আঁটুনি দেয়া হয়। তাঁর দুটি হাঁটুই একটু ভাঙে আর তাঁর মুখচোখে শরীরের শক্তিপ্রয়োগের লক্ষণ ফুটে ওঠে কপালের দুই পাশের ধমনীর স্ফীতি, দাঁতের চাপে দুদিকের চোয়ালের হাড়ের দৃঢ়তা, নাসারন্ধ্রের ব্যাপ্তি ও কণ্ঠদেশের শিরা-উপশিরার স্পষ্টতা। তার পর তাঁর দুই হাত এক করে একবার তালি বাজান ও তাঁর হাস্যসহ তাঁর মুখখানি স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। এই দৃঢ় বন্ধনের কোনো বন্ধন ঢিল হইবার উপায় নাই।' 'মহাভারত'-এর অনুশাসন পর্বে আছে—

ধর্মং জিজ্ঞাস মানানং প্রমাণং পরম শ্রুতি।
দ্বিতীয়ং ধর্মশাস্ত্রতু তৃতীয়ং লোকসংগ্রহণ।

অর্থ-ধর্মজিজ্ঞাসুদের প্রথম শাস্ত্র শ্রুতি বা বেদ, দ্বিতীয় শাস্ত্র ধর্মশাস্ত্র ও তৃতীয় শাস্ত্র লোকাচার। এই কোনো প্রমাণের জোরেই প্রমাণ হয় না যে ধাঙড়-মেথর ও নমশূদ্রগণ একই জাতিত্বের অন্তর্গত। সুতরাং এই ভুল কথা বলে যেন আমাদের সঠিক প্রস্তাব ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। আমি বলছি না, প্রস্তাবটি এই ভাষায় সংশোধিত হোক যে, যদিও আমাদের ও ধাঙড়-মেথরদের মধ্যে কোনো জাতিগত ঐক্য নাই, তবু, তাদের দাবি ন্যায্যতাবশত সমর্থন করছি। তেমনি, আমি বলছি যে এই কথাখানিও বলা অপরিহার্য নয় যে একই শিডিউলের অন্তর্গত বলিয়া আমরা এক-শিডিউল, আর-এক শিডিউলের দাবি সমর্থন করছি। এই যুক্তিটি কেটে দেয়া হোক। অগ্নিকুমার এক হাতের ওপর আর-এক হাত বসিয়ে ছেদন বোঝান এইটুক্ বদল করে প্রস্তাবটিকে সুন্দর, শোভন ও যথার্থ করা হোক। শাস্ত্রে বলেছে, কোনো কারণেই কোনো বাচ্যকে অকারণহেতুক, অযুক্তি নির্ভর ও তুলনা ভিত্তিক করবে না। করলে তুমি ক্রমেই তোমার বক্তব্য থেকে দূরে চলে যাবে, যেমন, কাকদের হয়, জ্যোৎস্নার তীব্র আলোকে দিন ভেবে।

অগ্নিকুমারের বক্তৃতা যে শেষের দিকে এসেছে, সেটা তাঁর স্বরক্ষেপ থেকে বোঝা যাচ্ছিল।

নমশূদ্র আন্দোলনের নেতা যাঁরা তাঁরা অগ্নিকুমারের রাজনৈতিক দর্শনও জানতেন। অগ্নিকুমার শিডিউল কাস্ট করা বা সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের বিরোধী। সে রোয়েদাদ যখন ঘটলই তখন তিনি নমশূদ্রদের সেই শিডিউলের অন্তর্গত করে নেয়ারও বিরোধী। তিনি গান্ধীজির যুক্তিই সঠিক মনে করতেন—এই রোয়েদাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হিন্দু ভোট ভাগ করা। তা করতে দেয়া উচিত নয়। তাঁর অনেক যুক্তিই গান্ধীজির যুক্তির সঙ্গে মিলত। তিনি এমন একটি অবস্থাকে বলতেন—'আমি মুসলমান-বিরোধী না হয়েও কি নিষ্ঠাবান হিন্দু হতে পারব না?' এই মতের সমর্থক তখন কম ছিল না। বিশেষ করে অগ্নিকুমারের এই যুক্তিটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল, নানারকমে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, 'যবন না মাইর‍্যা বামুন হওয়া যায় না', 'হিন্দু হইবার লগে আগে মুসলমান হইব্যার লাগব?'

এসব কথা তিরিশ সাল নাগাদই খোলাখুলি বলা হতে থাকে, যোগেনরা তখনো ওকালতি থেকে বেরই হয়নি। নমশূদ্র আন্দোলনেও খুব একটা জোর নেই তখন। গুরুচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশে সমস্ত স্বদেশি কাজকর্ম থেকে নমশূদ্ররা দূরে থাকে। আবার, সাম্প্রদায়িক ভাগাভাগি তখন এসে গেছে। এদেশে যত, তার চাইতে বেশি বিলেতে। গান্ধীজির একটা কথা তখন খুব রটেছিল যে গান্ধীজি তখন বলেছিলেন, 'কিছু লোক আমাকে হিন্দু বলে মানতেও নারাজ কারণ আমি অহিংসায় বিশ্বাস করি। কিছু লোক আমাকে মুসলমান বলে মানতেও নারাজ কারণ আমি খিলাফতে বিশ্বাস করি। তারা এখন একটা মতে এক হয়েছে যে আমি ক্রিস্তান। এ তো মনে হয়, সবচেয়ে বড় লটারির চাইতে বেশি পাওয়া—একসঙ্গে তিন-তিনটি ধর্ম পেয়ে যাওয়া।'

গান্ধীজির এইসব কথা অগ্নিকুমারকে খুব প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু তিনি গান্ধীজিকে দেখেনওনি শোনেনওনি, কাগজপত্রও তাঁর কাছে আসেনি। তাঁর প্রধানতম কাজ হিশেবে তিনি বিধবাবিবাহকেই বেছে নেন।

বিধবাবিবাহের পক্ষে তাঁর একটি ছোট ইস্তাহার পুস্তক বেরয়। বিধবাবিবাহ যে হিন্দুধর্ম সংগত তা পাণ্ডিত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে পারলেও এই বইটিতে তাঁর সততা সেই সময়ে অনেকের চোখে পড়েছিল। গান্ধীজি যেমন সরল পদ্ধতিতে তাঁর সত্য বলতেন, অগ্নিকুমারও তেমনি সরলতায় বিধবা-বিবাহের সমর্থনে বলেছিলেন, নিম্নবর্ণ হিন্দুসমাজে বিধবা-বিবাহ বেশি করে প্রচলিত হওয়া প্রয়োজন। 'অনেক বিধবা অসৎচরিত্র পুরুষের ভোগের সামগ্রী হইয়া পড়ে। অনেক নিরাশ্রয়া মহিলা দুর্বৃত্ত কর্তৃক অপহৃতা, ধর্ষিতা ও নির্যাতিতা হইয়া থাকে। কত বিধবা দুষ্টলোকের প্রলোভনে পড়িয়া প্রথমে সতীত্ব এবং পরে জমিজমা যথাসম্পত্তি খুয়াইয়া একেবারে পথের ভিখারিণী হইয়া বসে। কত বিধবা হিন্দুসমাজে বিবাহের সুবিধা না পাইয়া, হিন্দুধর্মের মতকে মাথায় পদাঘাত করিয়া অন্য ধর্মাবলম্বী পুরুষের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধা হন। কোন বিধবা লম্পট পুরুষের প্রলোভনে পড়িয়া উভয়ই জাত্যন্তর গ্রহণ করিয়া পরস্পর বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়, অন্য ধর্ম গ্রহণ করিবার পরই উহারা এক-একটি কালাপাহাড় হইয়া যায়।... যাহারা ভক্তি সহকারে গরুর সেবা করিয়া ধন্য হইত, তাহারাই আবার গরুর তাজা রক্তে স্নান করিয়া তৃপ্ত হয়।'

নমশূদ্র আন্দোলনে তাঁর এইমত ও সেইমত অনুযায়ী সমাজ সংস্কার, বিশেষ করে বিধবাবিবাহ, সমাজের ভিতরের ব্যাধি আবিষ্কার ও তার বাস্তব নিরাময়ের এক বিকল্প উপায় সম্ভব করে তুলেছিল। তিনি প্রায় দুই হাজার নমশূদ্র বিধবার বিবাহ দেন। পরে, রাজনীতি, ধর্মভেদ ও জাতিভেদ যখন একাকার হয়ে গেল তখন জঙ্গি হিন্দুত্ববাদের সংগঠন, হিন্দু মহাসভা ও ভারত সেবাশ্রম সংঘ তাঁর এই মত ও কর্মসূচিকে গ্রাস করে নিয়েছিল বটে, তবু, অগ্নিকুমার নমশূদ্র

সমাজের একটি অংশের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন।

অপছন্দ হলেও অশ্বিকুমারের মত অবহেলা করা যায় না। তাঁর বক্তৃতার শেষে সভায় একটা অস্বস্তি ছড়িয়ে পড়তে-না-পড়তেই সিঁড়ির দিকের আসনগুলি থেকে একটা তরুণ গলা বলে উঠল, 'সভাপতি মশায়। কিছু বলতে চাই।'

মুকুন্দবিহারী ঠিক বুঝতে পারেননি, কে, তিনি ঘাড়টা ঘুরিয়েছেন মাত্র, সেই তরুণ ততক্ষণে বলতে শুরু করেছে, 'আমরা প্রস্তাবটি শুনেছি ও সেই প্রস্তাবের ওপর তিনজন-চারজনের বক্তৃতাও শুনেছি। মনে হল, প্রত্যেকেই প্রস্তাবটিকে সমর্থন করেছেন ও কেউ কেউ দুটি-একটি সংশোধন প্রস্তাব করেছেন। মোটামুটি ধরে নেয়া যায় প্রস্তাবটি সর্বসম্মত হয়েছে ও গৃহীত হয়েছে। তবু এই সুযোগ নিয়ে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। তুলতেই চাই মাত্র। কোনো তর্ক বা আলোচনা এখনই দরকার নেই। আপনারা ব্যবস্থা করলে অন্য একদিন হতে পারে। আমি পূর্ববর্তী বক্তার বক্তব্য নিয়েই বলছি। এই ধরনের জাতি আন্দোলনের একটা প্রধান বাধা হচ্ছে—সময়ের সঙ্গে তাল রেখে জাতি-আন্দোলনগুলি তাদের কর্মসূচি বা লক্ষ বদলাতে পারে না। যেন ৮০ বছর আগে যে পৈতে পড়ার আন্দোলন হয়েছিল, এখন সেটার কোনো দাম আছে। এখন তো উলটো কর্মসূচির সময় পার হয়ে যাচ্ছে—আমরা পৈতে পরব না, আমরা শূদ্র, আমরা দলিত, আমরা মনুবাদী না। মহারাষ্ট্রে আম্বেদকরজি এই আন্দোলন জোরদার করে তুলেছেন। এখন কি আমরা হিন্দু হয়েও ধাঙড়-মেথরদের ধর্মঘট সমর্থন করছি, বলার সময়, নাকী, আরো জোর দিয়ে বলার সময় যে, শিডিউল্ড কাস্ট বলে কথিত জাতগুলোর ভিতরে যে-ঐক্যবোধ তৈরি হয়েছে, সেটা ইংরেজের দান নয়। ইংরেজ তার নিজের স্বার্থরক্ষার মতলবে হিন্দুভোট ভাগ করতে চেয়েছে। গান্ধীজি 'হরিজন' বলে সেই ভাগ জুড়তে চেয়েছেন—কিন্তু মন্দিরে ঢুকে উচ্চবর্ণ হতে চাওয়ার মত বোকা শিডিউল্ড কাস্টের মধ্যেও পাওয়া কঠিন। আমরা, শিডিউল কাস্টরা এক হয়ে বিপরীত ঐক্য তৈরি করে একই সঙ্গে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ও হিন্দু-উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার সুযোগ পাচ্ছি। এই সুযোগটা আমাদের খোলা মনে ব্যবহার করতে হবে। আমরা কতটা হিন্দু ও কতটা শিডিউল্ড তা মাপার সময় এখন নয়। আমাদের সোজা কথা—আমাদের আলাদা জাত বলে নোটিশ ঝোলাবে আর পুরনো হিন্দু বলে টিকি রাখাবে—এ চলবে না। আমরা আলাদা তো আলাদা। আমরা কংগ্রেস বা হিন্দুসভার কেনা সম্পত্তি না। মুসলমানদের সঙ্গে আমাদের কোনো স্থায়ী বিরোধ নেই। কোনো বিরোধকে আমরা স্থায়ী হতে দেব না।'

হঠাৎ সবাই মিলে হাততালি দিয়ে উঠল আবেগ থেকে। যোগেন অনেকক্ষণ ধরে ঘাড় ঘোরানোর চেষ্টা করছিল, দেখতে, কে বলছে কিন্তু কিছুতেই পুরোটা ঘোরাতে পারছিল না। হাততালিসহ ছেলেটির ভাষণ শেষ হলে আর না-পেরে যোগেন রসিকলালকে জিগগেস করে, 'কাকা, এ কেডা?' রসিকলালও স্বর না তুলে জানান, 'আরে, যশোরের কংগ্রেস অফিসে তোর লগে কথা হইল না। এহানে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। রায়িস্ট।'

ছেলেটি এত সুন্দর বলেছে যে মিটিং ভেঙে গেল। মুকুন্দবিহারী দাঁড়ালেন ও গলায় জোর এনে বললেন, 'আপনারা আমার কাজটি সম্পন্ন করতে দিন। প্রস্তাবটি সম্পর্কে আপনাদের সিদ্ধান্ত কী।' কেউ কথা বলল না, আবার একটা হাততালি। মুকুন্দবিহারী বললেন, 'এই করতালিধ্বনি কি গ্রহণসূচক না বর্জনসূচক?' এ-কথার উত্তরেও একটা হাততালি উঠল। এবার মুকুন্দবিহারী আরো জোরে বললেন, 'আপনারা কিন্তু সভা মুলতুবি রেখে যাচ্ছেন। কোনো প্রস্তাব গৃহীত হল না। আমার শেষ অনুরোধ, আপনারা যারা এই প্রস্তাবের বিরোধী, তেমন কেউ থাকলে,

হাত তুলুন'। এবার সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছিল আর মুকুন্দবিহারীর নির্দেশ মত জনা দশ-বার হাত তুলে দিল। মুকুন্দবিহারী তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'আপনারা কি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছেন?' সঙ্গে সঙ্গে সমবেত 'না না' আওয়াজের সঙ্গে হাতগুলো লুকিয়ে ফেলা হল। মুকুন্দবিহারী বলে উঠলেন, 'তাহলে আমি কি এই বর্ণনা করতে পারি যে সভ্যগণ কেহই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন নাই'। আবার এক সমবেত 'হ্যাঁ' ও হাততালি।

ঘরটা একটু ফাঁকা হতেই পি আর সভাপতির দিকে এগিয়ে আসে, মুকুন্দবিহারী তখনো সভাপতির চেয়ারেই বসে। পি আর বলে, 'সকলে এত রগচটা হয়ে আছে কেন? একটা সাপোর্টিং প্রস্তাব। আমি তো ভেবেছি লোকই হবে না। আমি তো কোরাম রাখতে এলাম। আমি তো বুঝতেই পারলাম না। অথচ বোঝা তো গেল যে দুটো পক্ষ আছে, দুটো পক্ষ সংগঠিত।'

'আম অতটা বুঝিনি, রসিকলালবাবু, পক্ষাপক্ষি কি বুঝতে পারলেন?'

'আমার তো মনে হয় সুভাষকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া। আইস্যা দেখে—কোনো প্রতিপক্ষ নাই। আর বোধহয় বামপন্থীগ প্রভাব।'

যোগেন প্রস্তাবের কাগজটা মুকুন্দবিহারীকে সই করিয়ে নিয়ে শাকিনার কাছে আসে। আরো দু-একজন ছিলেন। তাঁদের কী কথা হচ্ছিল না শুনেই যোগেন শাকিনাকে বলে, 'পাঁচ মিনিট একটু খাড়াইবেন, তাইলে রিজোলিউশনের টাইপড কপিডা আপনে হাতে গরম নিয়্যা য্যান, পাঁচ-সাত মিনিটে বেশি লাইগব না।'

'মিনিট কো সওয়াল নেহি। হাম পাঁচ ঘণ্টাভি খাড়ি রোহেগী। কিন্তু মতলব কী? এটা তো মিস্টার সিদ্দিকের দরকার, সে তো আপনিই নিয়ে যাবেন। না? তা হলে এখনি কপি নিয়ে আমি কী করব?'

মতিয়া কিছু-একটা ইঙ্গিত করে। শাকিনা নিচু হয়ে তার কথাটা শুনে নিয়ে খাড়া হয়ে বলে, মতিয়া বলছে আমাকে চলে যেতে। ও কপিটা নিয়ে পিছে-পিছে চলে আসবে।' যোগেন ততক্ষণে সিঁড়ির এক ধাপ নেমে গেছে। 'আপনারা ঠিক করুন, টাইপডা সাইড়্যা রাখি। যেই আপনেগ টাইম হইব, সিড়ি দিয়্যা নামেন এক্কেরে গোড়ায়। গোড়ায় বাঁয়ে'—যোগেন নেমে যায়।

যারা তার সঙ্গে কথা বলছিল তাদের মধ্যে লাইব্রেরিয়ান সত্যেন আর সেই এম-এ পড়া ছেলেটিও ছিল। তাদের কারো দিকে না তাকিয়ে অথচ যেন তাদের দু-জনের দিকেই তাকিয়ে একটু হাসিমাখিয়ে শাকিনা বলে, 'হি হ্যাজ হিজ ওন স্টাইল টু ডু থিংস।

সকালবেলায় এই মিটিংটা অর্গানাইজ করার যখন কথা হল, উনি ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি বললাম, আপনার তো এখন ফোনাফুনির কাজ চলবে। তো আপনি কেন বাইরে যাচ্ছেন। আপনি ইউনিয়ন—অফিসে বসে যোগাযোগগুলো করুন। এই মতিয়া মজুত থাকল। যা দরকার, বলবেন, ও করে দেবে। তখন বলছেন, না, আমি রাস্তায় হেঁটে মাথায় রোদ না লাগালে আমার বুদ্ধি খোলে না। ব্যস, উনি রাস্তায় বেরিয়ে মাথা গরম করতে গেলেন, আমরাও ঘর ফাঁকা করে সরে পড়লাম।

শাকিনার একটা কোনো ভঙ্গিতে ওঁকে যারা ঘিরে ছিল, তাদের কেউ একজন সরে তাঁকে পথ দেয়, তারপর পর পর সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে। পেছন থেকে এম-এ পড়া ছেলেটি বলে, 'যে-লেফ্‌ট কনসিলিডেশনের জন্য জেলে এতকিছু, এখানে সেটা আপনার স্ট্রাইকের সুবাদে জেলের বাইরে কেমন অনায়াসে হয়ে গেল।'

'তা হলে এই গভমেন্ট সব পলিটিক্যাল প্রিজনারদের ছেড়ে দিচ্ছে না কেন! আন্দামানে

আবার তো হাঙ্গার স্ট্রাইক করবেন প্রিজনাররা। তো এই গবমেন্টটাও বুরবক। তোদের তো এখন লেফট-কনসোলিডেশনই দরকার। তাহলে রাজবন্দীদের ছাড় দিচ্ছে না কেন।'

'আপনার যুক্তিটা খুব মৌলিক। আর, জজশাহেবরা যে—প্রশ্নগুলির উত্তর জানে না, সেগুলোতে বলে দেন, অবজেকশন ওভার রুলড।'

শাকিনাই নামছিল আগে। সে কথাটাকে তারিফ দিতে একটা ধাপে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে বলল, 'খুব ভাল পয়েন্ট। নীহারেন্দুদাদের বলুন-না কোর্টে তুলতে।'

ওরা সিঁড়ি থেকে নামতেই যোগেন পাশের গলিটাতে হলুদের মধ্যে বড়-বড় হরফে ইংরেজিতে 'টাইপ' লেখা। যোগেন হাত তুলে কিছু বলে, শোনা যায় না। তারপর বাকি আঙুলগুলি তালুতে ডুবিয়ে শুধু তর্জনী তুলে 'এক মিনিট' বোঝায়।

সত্যেন বলে, 'এখানে তো দৌড়কে বলে স্লো হাঁটা। কার ধাক্কা লেগে পড়ে যাব। চলুন, আমরা একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াই।'

বাইরে মানে হ্যারিসন রোডে।

ইউনিভার্সিটির ছেলেটি বলে, 'এখন তো অ্যাকশন শুরু হয়ে গেছে, মানে, আপনাদের স্ট্রাইকের কথা বলছি, এখন তো টস্ করে দেয়া হয়েছে,' ছেলেটি তার বাঁ হাতের আঙুলগুলো দিয়ে টস করার একটা ভঙ্গি করে। তারপর সেই হাতেরই একটা আঙুল আকাশের দিকে তুলে বলে, 'দি কয়েন কি আপ দি এয়ার,' তারপর হেসে বলে, 'ইট মাস্ট কাম ডাউন উইদাউট এ থার্ড চয়েস। ইদার দি হেড অর দি টেইল। হয় আপনারা জিতবেন, নয় তো কর্পোরেশন জিতবে। কিন্তু যখন ওয়ার্কারদের এটা বোঝাতে হচ্ছিল, যখন তাদের ভয় কাটাতে হচ্ছিল, যখন তাদের বুঝতে হচ্ছিল—তার নিজের ক্ষতি হবে কত, যখন একদিন যা ঠিক হল পরদিন তা ওয়ার্কাররাই ভেঙে দিল—তখন নিশ্চয়ই খুব টেনশন, আনসার্টেইনটি, ক্লাশ এলায়েন্সের চাইতে মাস্টার-সার্ভেন্ট অ্যালায়েন্সটাই বড়, আমি তো পড়েছি টেন ডেজ দ্যাট শুক দি ওয়ার্ল্ড'—

'কী করে পড়লেন। ওটা তো ব্যানড। না।'

'ঐ যেমন আসে, পেয়ে গেলাম এক কপি। তখন আপনাদের সঙ্গে চেনা থাকলে কাজ করতাম। এই স্টাডি সার্কল, ক্লাশ নেয়া...

'তখন আর আমাদের চেনা হবে কী করে—আমি তো রাশিয়ার বিপ্লবে ছিলাম না—'

গলার স্বরে ধরা পড়ে গেল, শাকিনা ছেলেটির পেছনে লেগেছে। ছেলেটি বলল, 'আরে রাশিয়ায় নয়, আপনাদের ইউনিয়নে, ঐ স্ট্রাইকটাকে অরগ্যানাইজ করতে—'

'ও। আপনি যে-রকম করে বলছেন, আমি কী করে ভাবব যে আপনি কর্পোরেশনের স্ক্যাভেঞ্জার স্ট্রাইকের কথা বলছেন? তো, এখন তো স্ট্রাইক চলছে। 'স্ট্রাইক' শেষ হলেই কি ইউনিয়নের কাজ শেষ? এখন তো আরো কঠিন কাজ। চ—লে আ—সু—ন।'

যোগেন এসে একটা টাইপ-করা কাগজ মতিয়াকে বাড়িয়ে দেয়। মতিয়া খুব মন দিয়ে পড়ে।

যোগেন বলে, 'যুদ্ধে যে কী লাগে আর কী লাগে না? কার্বন পেপার নেই। কিন্তু টাইপের দরকার তো আর কমে নাই। টাইপিস্টের রোজগারের দরকারও কমে নাই। সুতরাং একপাতা টাইপের পয়সা দিলেই ডুপ্লিকেটটাও টাইপ করে দিচ্ছে। শুধু একটা জিনিশই তো বেচারা কমাতে পারে—ওর খাটুনির দাম।'

মতিয়া খুব সঙ্কোচে বলে স্পষ্ট স্বরে—'একজন একটা অ্যামেন্ডমেন্ট বলছিলেন না—আপনার ইনট্রোডাকশনটাকে ম্যাটার অব কনটেস্ট করে দিতে?'

'ঐ প্রথম তিন লাইনে তো করা আছে। এর বেশি করতে গেলে তো রিরাইট কইরব্যার

লাগে। ঐডা বরং তুমি কাভারিং লেটারে দিয়্যা দ্যাও।'

যোগেন শাকিনাকে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনারা কি বাস ট্রাম কিছু ধইরবেন? তাইলে তো রাস্তা পার হওয়ার লাগে।'

'এখান থেকে মৌলালি যাব—তার বাস ট্রাম। আমরা হেঁটে চলে যাব। আর, এটার কপি তো আমরা পেলাম। আমাদের কি এটা কোথাও পাঠাতে হবে?'

'সেডা তো আমাগরই দায়। আপনাদের সাপোর্ট দিল্যাম—সেটুক তো আমাগ জানাইব্যার লাগব আপনাদের। আপনারা যদি কন তোমাগ সাপোর্ট আমাগ লাগে না', সবাই মিলে হাসিটা শেষ করার পর যোগেন বলে, 'কী সত্যেন, তাই তো ঠিক হব। আমরা পাঠাইল্যাম কর্পোরেশনকে। আরো যার-যার কাছ থেকে ওঁরা এমন সাপোর্ট পাবেন—সেইগুল্যা মিলাইয়্যা ওঁরা যদি কর্পোরেশনরে কিছু জানাইব্যার চান, সে তো ওঁরাই ঠিকঠাক করবেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ-ছাড়া আবার কী হবে? তবে কর্পোরেশনে যেটা দেবেন সেটাতে প্রেসিডেন্টের সই থাকলে ভাল হয়?'

'খাইছে! প্রেসিডেন্টের মানে প্রফেসারের? তারে অ্যাহন পাই কোথায়?'

'বললেই তো থাকতেন?'

'কী যে কন? আমি কব প্রফেসররে একডু খাড়াইয়া যান?' যোগেন চুপ করে অন্যদিকে তাকিয়ে একটুখানি ভেবে নিয়ে মুখ ঘুরিয়ে বলে, 'চলেন, আপনাগ এডডু আগাইয়া দেই—'

'সে তো ভালই। কিন্তু আমাদের তেমন দরকার নেই।'।

'তাইলে বেদরকারেই চলেন', এক পা এগিয়ে সত্যেনের দিকে তাকিয়ে যোগেন বলে, 'ওদিকে কি যাওয়া হবে?'

সত্যেন বলে, 'আমি উল্টোপথে যাব কেন। সে যদি আপনার ফেরার সময় সঙ্গী লাগে—'

যোগেন বলে, 'আরে, আমি তো কাজ সাইরব্যার যাই। মৌলালি থিক্যা যাব সিদ্দিক শাহেবের কাছে। সেখানে হাতে হাতে চিঠিপ্রস্তাব দিব। এ-চিঠিডা তো লিখত্যাছি আমি, আমার সই থাকতিছে। প্রফেসরের সই তো এস-ডি কইর‍্যা যাইব। তাই তো?'

সেই ছেলেটি শাকিনাকে বলে, 'আমি যাচ্ছি তাহলে?'

শাকিনা হেসে মাথা হেলায়।

সত্যেন বলে, 'নিজেরই তো সব জানা। আমারে মিছামিছি নিমিত্ত করা কেন?' ওরা দুমুখে আলাদা হয়। হ্যারিসন রোডের মাথা থেকে ওরা সার্কুলার রোডে পা দেয়।

ফুটপাতে খুব বেশি লোকজন নেই। এখন তো সিভিল ডিফেন্সের নির্দেশে সব আলোই ঢেকে রাখতে হয়। যোগেন কোনোদিন ব্ল্যাক-আউট দেখেনি, বা, ব্ল্যাক-আউট ছাড়া দেখেনি। অন্ধকারে জল-মাঠ-খাল-গর্ত আরো ভাল দেখা যায়। পরে, কানখাড়া রেখে জেনেছে—আলো জ্বলা শহর নাকী বোমারু বিমানগুলি দেখতে পায় ও দেখতে পেলে বোমা ফেলে। এখনো পুরো ব্ল্যাক-আউট হচ্ছে না। আলোগুলোকে ঠোঙা পরানো হচ্ছে যাতে আলোর রোশনি না-ছড়ায়। বোমারুগুলি নাকী খুব নিচু দিয়ে ওড়ে। যোগেন কোনোদিন প্লেনে ওড়া দূরের কথা, এই যুদ্ধের সুবাদে মাঝে মধ্যে উড়ন্ত প্লেন দেখেছে ও দেখলে তাকিয়ে থাকে, এখনো। ট্রামে বাসে, পাড়ায়, কোর্টে সর্বত্র সর্বত্র এতলোক কী করে প্লেন, বোমারু বিমান এ-সব এত জানে কী করে। এরা সবাই কি প্লেনে চড়েছে। এমন কী, ব্ল্যাক-আউট কত রকম হয় তার পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর রাখে। যোগেনকে যেহেতু কান পেতে-পেতে নিজের অজ্ঞানতা গোপনে দূর করতে হয়, সে কোনো বিষয়ে কোনো খবর সন্দেহ করত না। উলটে সে তার নিজের খবর নেয়ার উৎস

বের করে ফেলেছিল। স্টেটসম্যান কাগজ, নিউ স্টেটসম্যান সাপ্তাহিকে কিংসলি মার্টিনের লন্ডন ডায়েরি আর-একটা বুলেটিন—'ব্যাকগ্রাউন্ডার' নামে, আরো একটা ঐ বুলেটিন-মতই—কিংস আর্কাইভস। 'ব্যাকগ্রাউন্ডার'-এ থাকে যে-সব জায়গায় বা সমুদ্রে তখন যুদ্ধ চলছিল তার ইতিহাস-ভূগোল। আর, 'আর্কাইভস'-এ থাকে প্রায় গতকালের যুদ্ধের টাটকা খবর। আইনসভা লাইব্রেরিতে ম্যাপের অভাব নেই। আর, এই সব কাগজই তো সেখানেই খুঁজে বের করেছে। ফলে, ইয়োরোপের যুদ্ধ নিয়ে সে ছবি এঁকে-এঁকে বলে দিতে পারে—কোথায় কী যুদ্ধ হচ্ছে। অথচ লোকের মুখে-মুখে শুধু কলকাতার যুদ্ধের খবর। মনে হয়, ময়দানে মহামেডান স্পোর্টিং আর মোহনবাগানের শিল্ড-ফাইন্যাল খেলা হচ্ছে, বা, হাওড়া-আমতা লাইট রেলওয়ের কামরায় বসলে ট্রেনের জানলা দিয়ে যুদ্ধ দেখা যেতে পারে। এমনও অনেকবার হচ্ছে যে নিজের কান খাড়া রাখতে-রাখতে হঠাৎ অনেকক্ষণ পর আবিষ্কার করে যে সে ইংল্যান্ডের দুটো বড় রেসের মাঠের ঘোড়াদের নাম শুনছে—ডার্বি আর রেনজার্স-এর রেসের লটারি টিকিটের দুই খদ্দেরের মধ্যে কথা হচ্ছে ঘোড়াদের নিয়ে। অত ইংরেজি নাম শুনে যোগেন ভাবছিল যুদ্ধের জায়গাগুলোর বা কামান-বন্দুকের নাম। প্রায় দশ মাস চলছে, কিন্তু যুদ্ধটা কোথায়, দেখাই যাচ্ছে না। এ তো পদ্মবিলের কাইজ্যা।

১৫-নম্বরে মিটিং সেরে সিদ্দিক শাহেবকে প্রস্তাবটি দিয়ে আসতে ও আর কাদের প্রস্তাব এল জানতে, শাকিনা আর মতিয়াকে মৌলালি পর্যন্ত অকারণ এগিয়ে দিতে-দিতে যোগেন যে যুদ্ধের কথা ভাবছিল—একেবারেই তা নয়। কিন্তু, সন্ধ্যা হয়ে গেছে বলেই শেয়ালদা কোলে মার্কেটের ফুটপাতটার আলোর অল্পতা, একটু কম লোকজন, কিছু-কিছু বন্ধ দোকানপাট আর লোকজনের চলমান ছায়াগুলো চকিতে লম্বা হয়ে চকিতে মিলিয়ে যাওয়ায় যুদ্ধ ছিল এত ওতপ্রোত যে যুদ্ধ ও যোগেনের সম্পর্কের প্রত্নতত্ত্ব ছাড়া ও-রকম সন্ধ্যা সত্য হত না।

সত্য না হলে আর মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে যোগেন যুদ্ধ সংক্রান্ত ঘটনায় প্রথম এমন জড়িয়ে পড়ত না। বা, যোগেনের প্রথম যুদ্ধদৃশ্য দেখা ঘটে উঠত না।

শাকিনা আর মতিয়া পাশাপাশি যাচ্ছিল কথা বলতে-বলতে। ফুটপাত দিয়ে পাশাপাশি তিনজন হাঁটা যায় না। কিন্তু যোগেনের সঙ্গে তাদের দূরত্বটা ছিল তেমন ভাঙা—পাশাপাশি থেকে বেশি। খুব ভিড়েও বোঝা যায় কারা-কারা পাশাপাশি। সেটা বোঝা যাচ্ছিল না।

প্রথমে খানিকটা তো ওরা পাশাপাশিই এগচ্ছিল। শাকিনাই বলছিল—যোগেনদের মিটিং নিয়ে। যোগেন শুনছিল, হুঁ-হাঁও করছিল। কিন্তু তার চোখ ছিল দোকানগুলিতে, যেন কিছু খুঁজছে। তাতেই ওদের সঙ্গটা ভেঙে গেছে। কিন্তু পেছন থেকে সকলের মাথার ওপর শাকিনার বেণী বাঁধা মাথা এমন ভেসে যাচ্ছিল যে যোগেন তাড়াতাড়ি হেঁটে দূরত্বটা পেরতে চাইছিল। কিন্তু সে যে-দোকান খুঁজছিল সেই খোঁজা থেকেও সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হতে পারছিল না। বৌবাজারের রাস্তা পেরবার আগেই যোগেন দোকানটা পেয়ে যায়। সঙ্গে-সঙ্গে সে প্রায় দৌড়েই 'মতিয়া-মতিয়া' ডাকতে-ডাকতে ওদের দিকে ছোটে। শুনে, ওরা দাঁড়িয়ে ঘুরে তাকায়। যোগেন হাত উঁচু করে তাদের দাঁড়াতে বলে। যোগেনের সংকেত ওরা বুঝতে পেরেছে বুঝে যোগেন নিশ্চিন্ত মনে দোকানটায় দাঁড়িয়ে একটা খাম চায়।

দোকানি প্রশ্ন করে, তার হাতদুটো দিয়েও আবার বোঝাতে, 'খাম চান? মানে খাম?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। পোস্টাপিসের না। এমনি অফিসের খাম', যোগেনকেও বোঝাতে তার দুই হাত ব্যবহার করতে হয়, 'অফিসের খাম। ব্রাউন পেপারের। হয় না? যে-রং আছে, তাই দ্যান—?

যোগেনের ভাষা ও উচ্চারণ তাকে এতটাই অকৃত্রিম বাঙাল বলে চিনিয়ে দেয় যে এ নিয়ে

যার সঙ্গে কথা হচ্ছে সে আর কিছু জিজ্ঞাসা করে না। কিন্তু এই লোকটি করল, ‘কী? একুনি নাবলেন ট্রেন থেকে?’

যোগেন কিছু বুঝে উঠতে পারে না, ‘ক্যা? কী হইল? খাম—’

শাকিনা আর মতিয়া ফিরে যোগেনের পাশে দাঁড়িয়েছে। লোকটি তখন যোগেনকে বলছে, ‘এই সন্দেয় তো বাঙালদের ট্রেনগুলো আসে। আর পিলপিল করে সব কাল-কাল’ নোক নারকেল দড়ি দিয়ে বাঁধা শতরঞ্চির বেডিং মাথায় দৌড়ুতে-দৌড়ুতে নিজেদের জায়গার মেসগুলোতে ঢোকে বৌবাজারে—ঢাকা মেস, চিটাগাং মেস, সবচে বেশি সিলেট মেস, বরিশাল মেস, নোয়াখালি মেস আপনাদের ওদিকে তো যুদ্ধুটুদ্ধু নেই।’

শাকিনার ‘কী হল যোগেনবাবু’, আর যোগেনের ‘সিদ্দিক, শাহেবের চিঠিটার জন্য একটা খাম খুঁজছিলাম, আফটার অল মেয়র বলে কথা’, এই প্রশ্নোত্তর চলে লোকটির কথা-বলাটুকু জুড়ে। লোকটি স্বগতোক্তির মতই বলে যায়। দোকানের ঠোঙা-ঢাকা আলোয় কেউই কারো মুখ দেখতে পায় না।

‘তো পেলেন?’ শাকিনা তার বড় পাঞ্জা ও চওড়া কবজির হাতটা রাখে কাউন্টারের ওপর। ঠোঙা ঢাকা আলোর সবটুকু উজ্জ্বলতা, যদিও সেটাও খুব বেশি নয়, ঐ হাতটুকুর ওপর পড়ে দোকানি ও যোগেন দুজনকেই জড়োসড়ো করে দেয়।

‘হ্যাঁ, বলছি তো? বলল্যাম-না, একডা অফিসখাম দ্যান।’

লোকটি ‘মেয়র’ শব্দটি, ‘আফটার অল’ কথাটি ও শাকিনার একটা হাত প্রায় একসঙ্গেই শুনে ও দেখে ফেলে গুটিয়ে গিয়ে ভাবে সে কি কিছু ভুল করল, লোকটা তো ‘দ্যান’ই বলল, যতটুকু দেখা গেল তাতে কালই তো দেখাল। তাহলে এমন দশাসই মেচ্ছেলে এল কোতথেকে? সে সেয়ানা বুদ্ধিতে আর-কোনো আওয়াজ করল না, শুধু বলল, ‘নেই।’

‘নাই? সে কী কথা?’

লোকটি হয় বাচাল, না-হয় অতিচালাক। বলে ফেলে, ‘যুদ্দ নেগেচে তো? খাতা-কাগজ-কালি এ-সব আর পাওয়া যাচ্চে না।’

যোগেনের যেন কিছু বলার ছিল। শাকিনা বলে, ‘ওঁর কাছে তো নেই। চলুন।’

ওরা দোকান ছেড়ে চলে গেলেও আলোর রশ্মির কোনো হেরফের ঘটল না। আলো যাতে ঠিকরে না বাইরে যায়, সেই কারণেই ঠোঙা। যখন ওরা ছিল, তখনো ও ওদের দেখা যাচ্ছিল না। যুদ্ধ।

যুদ্ধের টাইমে সবাইকে আবছা দেখায়—লোকটি ভাবল।

ভেবেই মনে পড়ল শাকিনার বড় পাঞ্জা, চওড়া কবজি। যুদ্ধ।

যুদ্ধে কি মেচ্ছেলেদের পাঞ্জা বড় হয়ে যায়?

লোকটি ভয় পেয়ে গেছে। ভয় তাড়াতে রসিকতা ভাবছে।

তার ও ফুটের মাঝখানে সেই ঠোঙাপরা আলোটা ঝুলে।

লোকটা সেই আলোর কুয়াশা ভেদ করে ওদিকটা দেখতে চায়। দেখা যায় না। লোকটির দুই ভুরুর মাঝখানে খাড়া ভাঁজ পড়ে। চোখের মণিদুটো স্থির। আলোর সে-কুয়াশা ভেদ করতে পারছে না। লোকটা ঐ একভাবে বসে ও তাকিয়ে থেকে ভয়টাকে আর ঠেকাতে পারল না। ভয়টা তাকে এখন জাপটাল যে সে আর নিজের বসা বা তাকানো একটুও বদলাতে পারে না। যুদ্ধ।

কিছু বেফাঁস বলিচি? দেকলুম, মানে, আবছা দেকলেও কি বাঙাল চিনতে ভুল করব?

ব্ল্যাকআউটের একটা বিভ্রাট—বাঙালগুলো অন্ধকারে মিশে যায়। ওরা নিজেদের মেসবাড়ি ছাড়া ওটে না। কেন? ভদ্দরনোকের হোটেলের চাকর-ঠাকুররা ওদের কতা বুঝতে পারে না। তার ওপর নেড়া-শুদ্দুর কী সব ছোট জাত! কিন্তু অমন একটা খাড়া মেচ্ছেলে পেল কোত্থেকে বাঙালটা? হাতের পাঞ্জাই যেন চিড়িতন। চিড়িতন ভাবতেই লোকটি হাসে। মেচ্ছেলেকে নতুন নামে ডাকতে কী যে ওম, উস।

লোকটি হেসেই থাকে, ঠোঁটটা বন্ধ করতে পারে না, চোখদুটো বড় ও গোল হয়ে যায়। আতঙ্কে। সন্ধ্যায় বৌবাজারের মোড়ে, আতঙ্কে। হাতের পাঞ্জাটা চিড়িতন যেমন তেমনি ত্রিশূলও তো।

কেন যে এত কতা বলি। এত! সাধে কি বৌ বলে, টানাটানি করো না, তোমার লিঙ্গ তো জিবে। নাড়াও, জিবে গাজা নাড়াও। তাতেই তোমার হয়ে যাবে খন।

লোকটা এত ভয় পায় যেন দোকানটা খোলা রেখেই সে পালিয়ে যাবে। এত তাড়া করে সে কাঠের ভাঁজ-দরজা টেনে দিয়ে আলো নিবিয়ে বেরতে গিয়ে দেখে—সে তো নিজেই টেনে দিল দরজা, এখন বেরবে কী করে। যুদ্ধের টাইমে। কেন যে কতা বলি? বেফাঁস কিছু বলেচি?

যোগেনের কানে ভারত আহ্বান

১৪২

সিদ্দিকিশাহেব পরদিনই কর্পোরেশনে, জনসমাবেশে ধাঙড়-মেথর হরতালের দাবিপত্র অনুযায়ী ও দাবিপত্রের বাইরেও কিছু সুবিধে দেয়ার কথা জানালেন। তাঁর জন্য মঞ্চ বানানো হয়েছিল সেই বিখ্যাত করিডরের দক্ষিণ সীমায় যাতে তাঁকে ওদিককার রাস্তায় জমায়েতও দেখতে পায়। শাকিনা তারপরে জানাল যে কাল সকাল থেকে ওয়ার্কাররা কাজে ফিরবে—এটা নিশ্চিতই বলা যায়। কিন্তু এই জমায়েতের পর স্ট্রাইক কমিটি বসে এই সিদ্ধান্ত নেবে। আরো একটা কথা শাকিনা জানায়—ওয়ার্কারদের স্ট্রাইকের সময় যে-ময়লা শহরে জমা হয়ে আছে, সেইসব ময়লা ওয়ার্কাররাই সাফাই করে দেবে। তার জন্য কর্পোরেশনের কাছ থেকে কোনো ওয়ার্কার একটা লাল পয়সাও মজুরি নেবে না।

মঞ্চটা ছোট কিন্তু উঁচু। একজন নেমে এলে আর-একজন উঠতে পারে। যোগেন আর-সব নেতাদের সঙ্গে সেই মঞ্চটাকে ঘিরে যে চৌকি পাতা ছিল তার উপর বসেছিল। সেই সমাবেশ দেখে যোগেন একেবারে অভিভূত হয়ে যাচ্ছিল যখনই তার মনে হচ্ছিল, এই সমাবেশের সে-ও একটা অংশ। সেই ঠান্ডা, স্তব্ধ, মানুষের ব্যগ্রতা দিয়ে ঘেরা নিরালায় যোগেনের একবারও মনে আসেনি—এই সমাবেশের নেতৃত্বেরও সে অংশ। জন্মের আগে থেকেই যোগেন তো এক ঘৃণিত সমাজের সন্তান। সে আলাদা কোনো মানুষ নয়। সে আরো একজন নমশূদ্র—এতদিন পর্যন্ত যোগেনের জীবনটা কেটেছে নিজের জন্য একটা আলাদা পরিচয় তৈরি করার যুদ্ধে। অথচ কখনো তার ব্যক্তিত্ব তার জন্মের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো আত্মতায় সংলগ্ন হয়নি। কেন হয়নি, সেই উত্তর খোঁজার মধ্যেও একটা অস্বীকৃতি আছে, যেন যোগেন চাইতে পারত কিন্তু চায়নি। যোগেন তেমন কোনো চাওয়ার কোনো অঙ্কুরও দেখেনি নিজের মধ্যে। বরং তার আত্মতা গড়েই ওঠেনি বলে, যদি তার কোনো সামান্য কাজও সাফল্য স্বীকৃতি পায়, তাহলেও সে ভেবে ফেলে. 'তাইলে শুদ্দুররাও পারে। চাঁড়ালরাও পারে।'

এতটা সংলগ্নতা, সমাজ বলে এক বিমূর্তনের এতটা সংলগ্নতা, হয়ত বাধা হয়ে দাঁড়ায় নেতা

হিশেবে তার স্বতন্ত্র বিকাশে। দাঁড়িয়েছেও হয়ত। যোগেনের যে দাঁড়ায়নি, তার একটা আপাতকারণ বলে মনে হতে পারে, যোগেনের সমাজ তো বিমূর্তণ নয়। যোগেনের সমাজ তো জ্যান্ত। সে-সমাজের বুক ধুকপুক করে। সে-সমাজের শরীর থেকে সবসময়ই রক্ত ঝরে। ঘৃণা, ঘৃণা আর ঘৃণায় তার সমাজ নির্বাসিত হয়ে আছে সমুদ্রের মুখে মিষ্টি জলে ভেজা শেষ মাটিতে। বিলে হাওরে। জলের ভিতর থেকে ধান তুলে আনার ঐশ্বরিক কাজে। তেমন এক সমাজ থেকে যোগেন চাইলেও নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। পারবে না মানে, কোনো প্রতিশ্রুতির প্রতি আনুগত্যে নয়। পারবে না, শারীরিক কারণে। পারবে না, কারণ তার এখনো নাড়ি কাটা হয়নি। কারণ, সে এখনো শ্বাস টানছে তার মায়ের ফুসফুস দিয়ে। কারণ, মাতৃগর্ভ থেকে বেরনোর পর তার গায়ে পৃথিবীর রোদ-হাওয়া লাগছে কিন্তু সেই স্পর্শ সে নিজের শরীরে টেনে নিতে পারছে না। ওই বাতাস ও তাপ উচ্চবর্ণের আকাশ থেকে আসছে। সে, যোগেন, চাঁড়াল। সে জন্মেছে কিন্তু তার জন্মের প্রথম কান্না এখনো কেঁদে উঠতে পারেনি। কান্না তো মানুষের একার।

শাকিনা তখন তার স্বরের উঁচু গ্রামে খুব ধীরে, প্রায় চিবিয়ে, বলছিল—'আমি আর-কিছু বলব না। লেকিন, একটা কথা আমাকে বলতেই হবে। কাকে বলছি না-জেনেই বলতে হবে। আমার মজদুর-সহকর্মীদের বলছি, হতে পারে। মজদুর কমরেডরা ছাড়াও যারা আছে, তাদের বলছি, তাও হতে পারে। যে মানুষরা এখানে হাজির নেই, তাদেরও বলতে পারি। আমার দুটো দেশ। ইরান আর বাংলা। আমার একটা দেশ দুই হাজার না তিন হাজার বছরের বাতিল, মুর্দা, পচা একটা শাহ্ বা সম্রাটের হাতে বন্দি। সেই দুনিয়ার প্রাচীনতম সাম্রাজ্য থেকে আমি এসেছি বাংলায়। সে-বাংলাও একটা বাতিল, মুর্দা, পচা একটা সাম্রাজ্যের বন্দি। এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে নাকী সূর্যের কোনো অস্ত হয় না। দুনিয়ার সবসে বড়া, সবসে চওড়া সাম্রাজ্য। যেমন আমার দেশ ইরানের সাম্রাজ্য সবসে পুরানা। কিন্তু এইসব পুরানা আর চওড়া আর শক্ত সাম্রাজসে ভি ঔর পুরানা ঔর পুরানা ঔর শক্ত ঔর পাকা এক চিজ আছে। সেটা মানুষ। মজদুরির মানুষ। যে যত কঠিন কাজ করে সে তত বড় মানুষ। আমরা ধাঙড়-মেথররা সেই সবসে কঠিন কাজটা করি, যেটা ছাড়া দুনিয়ার সবসে পুরানা আর সবসে বড়া কোনো সাম্রাজ্য একদিনও পুরা বাঁচে না। আমরা তো ছ-দিনের হরতাল চালালাম। তাতেই তো লন্ডনকা যমজ বহিন কলকাতা নিজের শরীরের দুর্গন্ধে আর নিজের মুর্দা থেকে তৈরি অসুখ নিয়ে মরতে বসেছিল। কিন্তু এ-লড়াইটা তো আরো বহুত বড়া, বহুত কঠিন আজাদির লড়াইয়ের টুকরো। আমাদেরও তো একটা ভারত আছে—আমাদের মানে ছোটলোকদের, এই অচ্ছুৎদের, এই শুদ্দুরদের। আমরা সেই আমাদের আজাদি ভারতটা বানাব—আমরা, এই ধাঙড়-মেথর-শুদ্দুররা। কংগ্রেস আর মুসলিম লিগের নিজের নিজের ভারত আছে। ওদের পেছনে আমরা লাইন দিব না। আমাদের নিজের ভারত কায়েম করব। কোই ছোটাভি লড়াই 'ওই আজাদির লড়াই থেকে আলাদা না—'

যোগেন টের পায়, তার গলায় একটা দলা পাকিয়ে উঠছে। যেন ঢোক গিলতে পারছে না। হ্যাঁ, শাকিনার এই কথাগুলো থেকেই দলাটা পাকাচ্ছে। কাল পনের-নম্বরের মিটিঙে মতিয়াকে নিয়ে শাকিনা ছিল। পুরো তর্কটা শুনেছে। সভা শেষে কাউকে না বলে বেরিয়ে গেছে। আজ কি তার জবাব দিল? সে জবাবই যোগেনের কর্মসূচি হয়ে তার দম আটকে দিচ্ছে? আজাদির লড়াই, শূদ্রের ভারত, সুভাষবাবু মেঘনার বুকের নিঃসীম জলের ওপর দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—না—কোনো কিছু স্থানীয় না, কোনো একটি ঘটনাও বিচ্ছিন্ন নয়। নীহারেন্দুবাবু, বঙ্কিমবাবুরা তো আরো এক পা এগিয়ে—কোনো ঘটনা এমন কি দেশীয়ও নয়।

যোগেন নিজের ভিতরের বাসনা-ভাবনা নিয়ে ভাবতে পারে না। কোনো শূদ্রই পারে না। বর্ণহিন্দু তার স্বভাবনা নিষিদ্ধ করে রেখেছে। যোগেনের তো কেবল বাঁচা আর বেঁচে থাকা। ভেবে-ভেবে তো আর বাঁচা যায় না। যোগেন তারজন্য নির্দিষ্ট বাঁচা থেকে বেরিয়ে আসতে চায়।

নাগপুর থেকে ভারত আহ্বান

সিদ্দিকিশাহেবের মিটিঙের পরের দিন সকালে সুভাষ ফিরলেন নাগপুর থেকে। যোগেন ওঁর প্রোগাম জানত। তবে এখন যা ব্যস্ততা, সেটার অদলবদল হওয়া স্বাভাবিক। এদিকে যদি কোনো

১৪৩

প্রোগ্রাম করা থাকত, তাহলে অদলবদল হত না, বিশেষ করে পাবলিক প্রোগ্রামে। ফোনে যোগেন জেনে নিল, ফিরেছেন কীনা, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেল বিকেলে।

'কেমন হইল নাগপুর?'

'আপনি কি নাগপুরে গেছেন?'

'নাগপুর যদি মেঘনার পারে হয়, তাইলে বলি গিছি।'

'ও আপনার তো বরিশালের বাইরে পৃথিবী নেই, নমশূদ্র ছাড়া জাত নেই—'

'আর সুভাষ বোস ছাড়া নেতা নেই কিন্তু, সুভাষের কুনো পার্টিতেও আপনি নাই।'

যোগেন হেসে ফেলে—'এগুলা ভাবেন কখন, বানান কখন। আপনে তো নাকী সদ্‌গুরু সন্ধানী। ওই, আমাগ চাইর জিলায়—বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকা, নোয়াখালি এই চার জিলায় গুরুগ মাহাত্ম্য তাতেই এই কথাডা শুনছি—গুরু তালাশি। মানে, যারা চিরজীবন গুরু খুঁজে বেড়ায়। অগ নামে লোকে আবাদ দেয়, অরা কহনো গুরুর ঠেক কাউরে জানায় না, সেডা না কী ধর্মে নিষেধ। লোকজন অগ পিছনে বলে, 'অরা গুরু গরাসি। গুরুরে ধাইট্যা খাইয়্যা গরাস কইর‍্যা নেয়। আপনে কি আমারে সেই আবাদ দেন—যে আমি গুরুগরাসি, নাইলে আপনার কোনো পার্টিতে চুক্তি কেন? সেডা তো আপনে কন নাই।'

'যেমন আছেন, তেমনি থাকেন—আপনার মতন মানুষ সব পার্টিরই দরকার।'

'সে তো হইল। নাগপুরডা একটু কন। হইলডা কী?

'হওয়ার তো আর দু-রকম নেই। যাঁরা এই সম্মিলনে যোগ দেবেন তাঁরা তো নিজেদের এআইসিসি রাজনীতির বিরোধী মঞ্চেই দেখাতে চান। কম বয়েসিদের খুব ভিড় হচ্ছে, সব জায়গাতেই যেমন। তারা মনে করে—গান্ধীজি ও তাঁর প্রধান চেলারা সব বুড়ো, সত্যাগ্রহ-অসহযোগ তারা বুঝে উঠতে পারে না, চায়ও না, আবার দেশব্যাপী আন্দোলনে কংগ্রেসের মত একটা ছাতা না পেলে তারা ভরসা পায় না। ফরোয়ার্ড ব্লককে এখনো কংগ্রেসের বিকল্প বলে গ্রহণ করছে না, কংগ্রেসের মধ্যেই 'বোসজিকা কংগ্রেস' ভাবছে। পুরনো চেনা কংগ্রেসি নেতারা ক-জন এলেন, সেটা তো একটা ভাল করে দেখার বিষয়। নাগপুরে তো মনে হল সেটা বেশ ভাল। জিলা কংগ্রেসের নেতা এসেছিলেন পাঁচ-সাতজন। দু-জন এসেছিলেন দেশীয় রাজ্য থেকে গাড়োয়ালদের খুব নামডাকওয়ালা নেতা একজন এসেছিলেন। তবে, তিনি

আমার সঙ্গে ভদ্রতা-সৌজন্য করতে এসেছিলেন না রাজনীতির সমর্থন জানাতে তা বোঝা গেল না। রাজনীতি নিয়ে কোনো কথাই তুললেন না।'

'আপনাদের কংগ্রেসে রাজনীতির কথা তোলার অর্থ তো গান্ধীজির বিরুদ্ধে কথা বলা। কংগ্রেসিদের পক্ষে সেটা কি সম্ভব? তাও, দরজা-জানলা আটকানো ঘরে যদি-বা সম্ভব, প্রকাশ্যে মিটিঙের মধ্যে সম্ভব? জয়প্রকাশ নারায়ণ পারে? বরং নতুন যুবকগ আসাডা শুভ লক্ষণ। এগ তো কোনো পিছুটান নেই।'

'পরিণতিতে নিশ্চয়ই। শুরুতে পুরনোদের দরকার। আমি মুসলমানদের সম্পর্কে রাজনৈতিক মৈত্রীর কথা বলায়, সিরাজদৌল্লা দিবসের কথা বলায়, আমি কলকাতায় ফিরেই হলওয়েল মনুমেন্ট, অন্ধকূপ হত্যার মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ শুরু করব শুনে ওঁরা, মুসলমান নেতারা খুব খুশি হলেন। জানেন, আমি বক্তৃতা করতে-করতেই বুঝতে পারলাম, যেদিন জনসভা ছিল, শ্রোতাদের মধ্যে বেশ বড় একটা অংশ কীরকম হাঁ করে আছে। তারা কোনোদিন শোনেইনি বাংলার মুসলমানদের দেশপ্রেমের কথা। শোনেইনি অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মশায়ের বইয়ের কথা। শোনেইনি হলওয়েলের গাঁজাখুরি অন্ধকূপ সত্যি ঘটেনি। সেটা আমি বোঝবার পর ওই বিষয়টি নিয়েই আরো খানিকটা বললাম। মুসলমানদের কেন চিরকালের জন্য দোষী থাকতে হবে যেন তাঁরাই দেশটাকে শাহেবদের কাছে বিলিয়ে দিয়েছেন? যে হিন্দু রাজারা শাহেবদের ডেকে নিয়ে এসেছেন, নিজেদের জ্ঞাতিবিরোধে দেশের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করেছেন তাঁদের চাইতে মুসলিম নবাব-সুলতানরা নিশ্চয়ই বেশি অপরাধী নন—এসব শুনে ওঁরা চমকে উঠেছেন। এসব কথা কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে ওঁরা কোনোদিন শোনেননি। শুনবে কোত্থেকে? জাতীয় নেতারা তো প্রায় সবাই অ্যান্টি মুসলিম। সুতরাং মুসলমানের প্রশংসা তাঁদের মুখ থেকে বেরবে না। বাকি রইলেন গান্ধীজি আর জওহর। গান্ধীজি যে-ভাষায় মুসলমানদের প্রশস্তি করেন, সেই ভাষাটাই তো হিন্দুভাষা। আর, হিন্দু-মুসলমান বিরোধ সম্পর্কে কিছু বলতে জওহরের আভিজাত্যে লাগে। তাহলে বুঝুন—'

'আচ্ছা সুভাষবাবু, আপনে কি সত্যি-সত্যি উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ ভাগাভাগি আপনাদের আন্দোলনে তেমন দরকারি মনে করেন না? নাইলে, এত বড় একডা সম্মিলনে আমাগ কথা একবার উঠে না? আপনেও তোলেন না?'

'যোগেনবাবু, আপনি এটা ভুল বুঝছেন। আমার ব্যক্তিগত মত কী, আপনি জানেন না? আমি নাগপুর রওনা হওয়ার আগে আপনাকে বিশেষ করে ধাঙড়-মেথর ধর্মঘটের খোঁজখবর নিতে বলিনি? শাকিনার সঙ্গে দেখা করতে বলিনি? আপনি ভেবে দেখুন—আমি তো কংগ্রেসের নেতাদেরও কাউকে এই কাজটার কথা বলতে পারতাম। তা না বলে আপনাকে বলেছি কেন। কংগ্রেস মানেই এদের কাছে, এই ধাঙড়-মেথরদের কাছে হিন্দুবাবু। এই বাধাটা কোনো পক্ষই ডিঙতে পারত না। আপনার বেলায় এসব ওদের মাথাতেই আসবে না। আর আমি চাইও যে ডিপ্রেসড কাস্টরা যত ঐক্যবদ্ধ হয়, ততই ভাল।'

যোগেন হেসে ফেলে।

'হাসছেন কী মনে করে, না আমার কথায়?'

'দুইয়েই। আপনে কলেন না কংগ্রেসের লোক হলেই আমরা ভাইব্যা নেই হিন্দুবাবু। কথাডা চট কইর্যা শুইনলে মনে হয়, ঠিকই তো। তারপরই ভাইব্যা দেখি—এই ধাঙড় আন্দোলনের বেবাক নেতাই তো কুলীন বামুন—বঙ্কিম মুখার্জি—কুলীন, শিবনাথ ব্যানার্জি—কুলীন, সুরেশ ব্যানার্জি—কুলীন, নীহারেন্দু দত্ত-মজুমদার—কায়েত বা বৈদ্য। এদের তো ওরা কংগ্রেস-নেতা

বইল্যাই জানে। তাইলে এগ ক্যান হিন্দুবাবু ভাবে না?'

'হ্যাঁ, ঠিকই, তবু একটা কোথায় যেন একটু বাছাবাছি আছে। পাবলিক ঠিক বোঝে। ধরেন, আপনি যাদের নাম বললেন, তাঁদের কিন্তু কেউ 'স্বদেশী' বাবুও বলে না। কংগ্রেসিদের বলে, স্বদেশিবাবু, হিন্দুবাবু, কংগ্রেসবাবু। আমাকে এসব ডাকে বলে তো শুনিনি। জওহর একবার বলছিল—এলাহাবাদের আনলাই-সেপ্সড ছোট-ছোট সব ফ্যাক্টরির ওয়ার্কাররা তাকে নাকী ডাকত, 'বেটাবাবু', এরকম ডাকতে নাকি শিখিয়ে দিয়েছিলেন ওদের মালিকরা মতিলালজির কথা মনে রেখে। এখন সেটাই তাঁর নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'আপনি রুব্যার চান—রাজনীতি সবসময় কমিউন্যাল ইস্যু হয়ে থাকে না আর যেখানে হিন্দুগ নিজেগ ঝগড়া সেস্থানে তো রাজনীতিতে এটা আনা হয় না, মুসলমানদেরও তো ভাই। কার না কী?'

সুভাষ হাসি মিশিয়ে বলেন, 'এ উক্তি তোমার মুখে না হি সাজে, হে যুবক—'

'খাইছে। আপনে পাট মুখস্থ করব্যার গিছেন নাকী? ও কামের কাছাকাছি থাকবেন না।'

'কাছাকাছি না-থাকলে আমাদের কী হবে, আমাদেরও তো পার্টি করতে হবে। আমরা তো আমাদের হিন্দু সমর্থকদের ভুলতে দিতে পারি না যে আমরা তাঁদের পাশে থাকব। সময়টা ভাবুন, আমাদের ওপর রাগ হলেই এআইসিসির খাতা খোলা, তাতে নাম লেখাবে। আপনাকে আগেই বলে রাখছি, এই স্ট্রাইকের সেট্‌লমেন্ট নিয়ে যদি আমি একটু ক্রিটিক্যালও হই, আপনারা ভুল বুঝবেন না।'

'আমি না-হয় ঠিক বুঝল্যাম। কিন্তু আর-সবাই তো আমার কাছ থিক্যা বুদ্ধি ধারে নাই। তারা ক্যান মাইনব? এডা আপনার পক্ষে খারাপ হইব তো!'

'আমি চেষ্টা করব কিছু না বলতে। কিন্তু একটা আপত্তি তৈরি হয়েছে বলে শুনেছি। সিদ্দিকিশাহেব আর শাকিনা দু-জনেই নাকী সরাসরি বলেছেন—বাবুরা তোলা নেয়া বন্ধ করুন'।

'হ্যাঁ, কইছে তো। দুইজনেই।'

'হ্যাঁ, একটা আপত্তি হয়েছে—সবাই তো আর তোলা নেয় না। সেই ভাগাভাগি করা হল না কেন? আর, আপনি জানেন তো কর্পোরেশনে এমন অনেকে বাবুর বা মাস্টারির কাজ করেন, যাঁরা বহু বছর জেল খেটে এসেছেন।' 'তাঁদের তো মনে হতে পারে যে সারাটা জীবন জেলে কাটিয়ে ঘুষখোর বদনাম জুটল।'

'তাগই তো তাইলে আপত্তি কর্তব্য।'

'যাই অফিসে, বেশি হাঙ্গামা না হলে কিছু বলব না। অনেক সময় দেখা যায়—দু-একজন বদবুদ্ধি করে এসব কথা চালিয়ে দেয়। খোঁজ নিতে গেলে কেউই স্বীকার করে না।'

'হ্যাঁ, আমার কিন্তু মনে হয়—কর্পোরেশনে যে এইডা এত ভাল কইর‍্যা সেটেলড হইল, এর সবডাই আপনার জইন্যে। আপনেই সিদ্দিকিশাহেবরে কয়্যা গিছেন। শাকিনারা তো এমনও ভাবছে—আমিই আপনার ম্যাসেনজারের কাম করছি। শিডিউল্ড কাস্টগ সঙ্গে আপনার এই সম্পর্কটারে রক্ষা করার লাগে। যেন ভুল না-বুঝে কেউ।'

সুভাষ বলে উঠলেন, 'একজ্যাক্টলি সো। পুরনো কায়দায় যে চলে না আর নতুন-নতুন মৈত্রী করাটা যে আমাদেরই দায় এটা মানুষজনকে সাহস করে দেখাতে হবে। দেখালে তারা নিজেরাই বুঝে নেবে আপোশ আর সংগ্রামের পার্থক্য। ইট হ্যাজ টু বি প্রুভড দ্যাট এ স্ট্রাগল ক্যান বি ওন। আমি নাগপুরেই ঠিক করেছি—এবার আমার উচিত কিছু ক্যালকুলেটেড রিস্ক নেয়া। আমি মনে-মনে ঠিক করে ফেলেছি।'

সুভাষবাবু, আমারে মাফ দিবেন। আপনে যতগুল্যা কথা কইলেন—মানুষরে চমকান্, মানুষরে দেখাইয়্যা দেয়া, ক্যালকুলেশন, রিস্ক—এই সব কথায় আমার পিল্যা চমকায়। নেড়ার কোনো পলিটিক্যাল বা ফিলজফিক্যাল কারণ নাই। আমরা, হিশাব কইর‍্যা দুই-শতাংশ পাঁচ-শতাংশ বাদ দেয়ার কাম নাই। আমরা, শুদ্দুররা, গ্রামের, অ্যাহন শহরেরও, এমন দুঃখী মানুষ যে আমাদের সমাজেও তো বুড়াবুড়ি আছে, আবার, নতুন কথা শিখতেছে এমন দশ মাস-একবছরের শিশুও আছে, তাগ কেউ কুনোদিন গল্পও শোনে নাই যে মানুষে দুই বেলা খায়। সে কষ্ট-অনাহার কোনো দুঃখও দেয় না—খিদার জায়গাটাক অসাড় কইর‍্যা দ্যায়। অ্যাহন, এত মানুষের মধ্যে, এত সব ঠাকুরদার ঠাকুরদার ঠাকুরদার, দশডা ঠাকুরদাদার টাইমে, আর কখনো সমুদ্রের তলায়, কখনো কচ্ছপের পিঠের নাগাল, ডোবে আর ভাসে যে-জায়গাগুল্যান, কোনো একদিন কোনো একজন মানুষের তো মাথা চাইগ্যা উঠতে পারে যে আর সহ্য হয় না, একটা এসপার-ওসপার হইয়্যা থাক। ওই ক্যালকুলেশন শুরু হয়। আর প্রত্যেকবারই ক্যালকুলেশনটা ভুল প্রমাণিত হয় সর্বনাশ হইয়্যা যাওয়ার পর। এডা হচ্ছে বাঁচার ডর। হাজার-হাজার বছরের না-খাওয়ার ডর। আপনে কন। আমার এই কথাডারে কোনো পাত্তা দিবেন না। আপনে কন।'

সুভাষ একটু চুপ থেকে বললেন, 'আমি বলেছি পিয়োরলি আন্দোলনের কথা। লন্ডনের, দিল্লির, কলকাতার সব গভর্নমেন্টই চায় আমাকে ডিওআই রুলে অ্যারেস্ট করে জেলে পচাতে কিন্তু এখানকার মন্ত্রীরা সাহস পাচ্ছে না। বিশেষ করে ফজলুল হক। গভর্নরের নাকী খুব পছন্দ—আমাকে আটকে রাখলে অন্তত একটা দিকে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে। বরং ভাইসরয়ের নাকী দ্বিধা আছে। কারণ ফজলুল হক সবার চাপে পড়ে নাকী বলেছেন—যুদ্ধটুদ্ধ তো দিল্লির ব্যাপার, দিল্লি যা করার করুক, এর মধ্যে আমাদের জড়ায় কেন? এটা জেনেই আমি ঠিক করেছি গবর্মেন্টকে এক্সপোজ করার সুযোগটা ছাড়ব না। ইয়োরোপিয়ান গ্রুপ নাকী বলে দিয়েছে আমাকে অ্যারেস্ট না করলে হক-মন্ত্রীসভাকে তারা ফেলে দেবে। সুতরাং আমি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দোসরা জুলাই হলওয়েল মনুমেন্ট ভাঙার জন্য সত্যাগ্রহ করব। এদিকে গবর্মেন্টের পক্ষে হলওয়েল মনুমেন্ট যে জায়গায় সেখানে প্রাইভেট প্রপার্টিতে পুলিশ লাগিয়ে মনুমেন্ট রক্ষা করাও সম্ভব না, ভাঙাও সম্ভব না। কিন্তু আমার তো কোনো আইনের বাধা নেই। আমি তো বলেকয়েই যাচ্ছি। সাহস থাকে আটকাও। নয় তো প্রকাশ্যে বেইজ্জত হও। আর লাটশাহেব সহ ইয়োরোপিয়ান গ্রুপ হকশাহেবের গবর্মেন্টকে যদি ফেলতে পারে, ওয়েল, আ'ল ইনভাইট দি কোল্যাপ্স অ্যান্ড ক্যাওস। রিস্কটা এই জায়গায় যে যদি আমাকে অ্যারেস্ট করে ফেলে, তাহলে তো আমার সব কাজকর্ম মাথায় উঠবে। অ্যারেস্ট হয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না। আমি চাইছি টু প্লে অন দি মারজিন। আপনার কী মনে হয়। কিছু শুনেছেন নাকী?'

যোগেন একটু চুপ করে থাকে তার ঠোঁটের কোণে একটুখানি চাপা হাসি নিয়ে। এটাই তার চিন্তার মুদ্রা। বা, হয়ত জবাব তার জানা আছে। সেই জবাবটা খুব সরল নয়। তাই নিজেকে তৈরি করে নিচ্ছে। যোগেন হঠাৎ ঘাড় তুলে জিগগেস করে, 'আপনার শরীরের যন্ত্রপাতি চালু আছে তো?'

সুভাষ একটু অপ্রস্তুত স্বরে বলে, 'ঠিক খেয়াল করিনি, তবে ভালই আছি তো, কাজ থাকলেই আমি ভাল থাকি।'

'খাওয়া আর ঘুমের পরিমাণ ঠিক আছে তো?'

সুভাষ একটু হেসে বলেন, 'আপনি জিগেস করায় আবার নার্ভাস লাগছে। না, ঠিকই আছে। ঠিকই আছে।'

'মানে ঠিক-ঠিক সময়ে খাওয়া পাইলে ক্ষুধা পায় না এই তো?'

'সেটা হতে পারে। খেয়াল করিনি।'

'আর রাত্তিরে যখন শোয়া হয়, তখন ঘুমানো ছাড়া গতি নাই।'

'সেটা হয়ত ঠিক। তবে আমি তো ইনসোমনিয়ায় অনেকদিন ভুগেছি। এটা ইনসোমনিয়া না—সেটা বুঝি।'

'আপনে যে ক্যালকুলেটেড রিস্কের কথা কইলেন, সেডা তো শুধু পলিটিক্স ভাইব্যা?'

'তাছাড়া কী ভাবব। তবে পলিটিক্সটা তো আমার জটিল হয়ে গেছে। একইসঙ্গে এআইসিসিকে বাংলায় ঢুকতে না দেয়া, বিপিসিসিকে শক্ত করা, বাংলার বাইরে ফরোয়ার্ড ব্লককে অলটারনেটিভ পলিটিক্স হিশেবে তৈরি করা আর তার সঙ্গেই অ্যান্টি ব্রিটিশ মোবিলাইজেশন ও অ্যাকশন প্ল্যান করা। লেফট কনসোলিডেশনে কমিউনিস্টরা খুবই সাহায্য করছে। ওদের কৃষক সমিতিগুলিতে 'না এক পাই, না এক ভাই' স্লোগানটা খুব ধরেছে। একই সঙ্গে অ্যান্টি ওয়ার ও নো রেন্ট। মুসলিমদের সঙ্গে আমার যে বোঝাপড়া তৈরি হয়েছে সেটা কাজে লাগাতে চাই। হলওয়েল সেদিক থেকে বড় সুযোগ। এমন সুযোগ আর নাও আসতে পারে। এই মুহূর্তে একটা অ্যাকশন খুব দরকার। রিস্কটা এই জায়গায় ওই অ্যাকশনের ফলে অনিশ্চিত ইনঅ্যাকশন, যদি অ্যারেস্ট করে। তাহলে তো ফার্দার অ্যাকশন শিকেয় উঠবে। এইটা আমার প্ল্যানে এখনো ঢোকাতে পারছি না—অ্যারেস্ট করলেও, আমাকে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য জেলে আটকে রাখলেও, এমন কী আমাকে বাইরে কোথাও একজাইলে আটকে রাখলেও ফার্দার, গ্রেটার ও ম্যাসিভ স্ট্রাগল শুরু হতে পারে, ছড়িয়ে পড়তে পারে।'

'আমি তো ক্যালকুলেটেড রিস্ক বলতে শুধু আপনার শরীর বুঝি। আপনার শরীর কোনো অতিরিক্ত কষ্ট বওয়ার অনুপযুক্ত। জেলে তো অত্যাচার হইতে পারে, খিদা আর ঘুম যাইবে কইম্যা, রক্তপাত ঘটতে পারে শরীর থিক্যা। রিস্কডা বেশি হয়্যা যাচ্ছে না?

সুভাষ-যোগেন শেষ দেখাশোনা

সুভাষের সঙ্গে যোগেনের এই কথা হয় ২৫ জুন, ১৯৪০, এলগিন রোডের বাড়িতে। এরপর আর তিনদিন মাত্র তার সুভাষের সঙ্গে দেখা হয়েছে।

১৪৪

২৯ জুন কাগজে একটা আবেদন বেরল সুভাষচন্দ্রের নামে—

হলওয়েল মনুমেন্ট নিয়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের সিদ্ধান্ত এখনই কার্যকর করতে হবে। বাংলার শেষ স্বাধীন রাজার স্মৃতিতে ৩ জুলাইকে সিরাজদৌল্লা দিবস হিশেবে পালন করা হবে। হলওয়েল মনুমেন্ট শুধু যে নবাবের স্মৃতিকে কলুষিত করছে, তা নয়। প্রায় দেড়শ বা তার বেশি কিছু বছর ধরে আমাদের দাসত্ব ও অপমানের চিহ্ন হয়ে শহরের মাঝখানে খাড়া আছে। এই মনুমেন্টকে অপসারিত করতে হবে।... আগামী ৩ জুলাই এই অভিযান শুরু হবে। এই লেখক স্বেচ্ছাসেবকদের প্রথম দলের নেতৃত্ব দেবেন।

সুভাষচন্দ্র বসু

এই আবেদনটি সুভাষ ডেকে যোগেনকে দিলেন কাগজগুলিতে বের করতে। সেটা ২৭ জুন। ইংরেজিতে লেখা আবেদনটি যোগেনই টাইপে অনেকগুলো কপি করে বিলি করতে বেরল। 'ফরোয়ার্ড' আর 'হিন্দুস্থান স্ট্যাডার্ড'-এ বেরল ২৮ তারিখে। বাংলা কাগজগুলিতে পরদিন, ২৯ তারিখে। 'দি স্টার অব ইনডিয়া', আর 'আজাদ'—লিগের কাগজগুলিতে প্রথম পৃষ্ঠাতে খবর হিশেবেই বেরল। ২৯ তারিখ বিকেলে শরৎ বোসের সঙ্গেই যোগেন বোসবাড়িতে ফিরল। সুভাষ বাড়িতেই ছিলেন। বললেন, 'ফরোয়ার্ড ব্লক অফিস থেকে ফোন করেছিল। স্বেচ্ছাসেবকরা নাম লেখাতে আসছে। অফিস থেকে বলেছে, যেদিন যাবেন, সেদিন যাবেন, নাম লেখাতে হবে না। কিন্তু আরো লোকজন আসায় আমাকে জিজ্ঞাসা করল। আমি বললাম, যাঁরা নাম লেখাতে আসছেন, তাঁদের নাম-ঠিকানা লিখে নিন। তাঁদের নিরুৎসাহ করবেন না। বেশির ভাগই কলেজের ছাত্র, মুসলিম।'

যোগেন বলল, 'আপনি কি আশা করছিলেন যে হিন্দু মহাসভা স্বেচ্ছাসেবক পাঠাবে?'

'কংগ্রেসের ছেলেরা? তারা তো আমাকেই নেতা মানে। আপনাদের লোকজন?'

'কংগ্রেসের ছেলে মানে তো হিন্দু ছেলে। তারা ঠিক তাগ রাজনীতির সঙ্গে সিরাজদৌল্লাকে ম্যালানো শিখে নাই। এটা তো জাইনতে হয়। কংগ্রেস তো কোনোদিন সিরাজদৌল্লারে নিয়া কিছু করে নাই। আর আমাগ জাতের ছাওয়ালরা এইসবে কোনোদিনই নাই। আমরাও তো ছিলাম না। আমাগ তো নিষেধ ছিল। অ্যাহন যদি তাগ এই মিছিলে-জমায়েতে ডাইকতে হয়, তার আগে তাগ একড়ু শিখাইতে-পড়াইতে হব।'

যোগেন পরদিন আর আসেনি। ১ জুলাইও দুপুরে একটা ফোন করে সুভাষের কাছে জেনে নিয়েছে, তার কিছু করণীয় আছে কী না। সুভাষ একটু হেসে বলেছেন, 'হ্যাঁ। ৩ তারিখে সত্যাগ্রহই বলুন আর হলওয়েল মনুমেন্ট অভিযানই বলুন, আপনি যেন স্বেচ্ছাসেবক হয়ে বসবেন না। এটা কিন্তু খুব দরকারি কথা। পার্ট অব মাই প্রোগ্রাম। কেউ আপনাকে বললেও আপনি যাবেন না। আমি যে আপনাকে নিষেধ করেছি, সেটাও বলবেন না। বড়জোর যেখানে সবাই জড়ো হবে, সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন।'

'আমার তো অভ্যাসও নাই স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার। আমি তো শূদ্র, বাই বার্থ পরেচ্ছাসেবক।'

২ জুলাই ভোরে মানে বাংলা অভ্যাসে ১ জুলাই রাত ১২টার পর, পুলিশ এল স্পেশ্যাল ব্র্যাঞ্চ থেকে ও সুভাষকে ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া আইনেই প্রতিরোধ-সূচক, প্রিভ্রমটিভ, গ্রেপ্তার করে প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে গেল।

নানা কিছুর মধ্য দিয়ে, নোটিশ দিয়ে হাঙ্গার স্ট্রাইক করে ভগ্নস্বাস্থ্য ও অসুস্থ সুভাষ ছাড়া পেল শয্যাশায়ী হয়ে—৫ ডিসেম্বর, ১৯৪০। এই মুক্তিকে সরকারি নথিপত্রে এক-এক জায়গায় এক-একরকম বলা হয়েছে—'জামিন', 'বেকসুর খালাশ', 'প্যারোল', 'নজরবন্দী', 'গৃহবন্দী', 'অন্তরীণ', 'নিয়ন্ত্রিত চলাফেরা', 'কোনো সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়ে মত দেয়ার বা আন্দোলন করার ওপর বা সংবাদপত্রে বিবৃতি ও সাক্ষাৎকারের ওপর নিষেধাজ্ঞা', 'মুক্ত সুভাষের সঙ্গে যাঁরা দেখা করতে আসবেন, তাদের পুলিশের অনুমতি নিতে হবে।'

সুভাষের ঘোষিত সত্যাগ্রহের আগেই সরকার একটি অর্ডিন্যান্স করে হলওয়েল মনুমেন্ট ও সুভাষ সংক্রান্ত সব সংবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। ফলে, সুভাষের গ্রেপ্তারের খবরও কাগজে বেরয়নি, তার মুক্তির খবরও না। জুলাই থেকে ডিসেম্বর তার জেলখাটার কোনো খবরও কাগজে বেরয়নি। যা একটু-আধটু বেরিয়েছে সেটা আইনসভায় সুভাষ প্রসঙ্গ নিয়ে।

ডিসেম্বর (৪০)-এর শুরুতেই যোগেনকে আইনসভাতেই শরৎ বোস বললেন, 'সুভাষকে

তো পরশু ছেড়ে দিয়েছে।'

যোগেন উদ্দীপ্ত হয়ে বলে উঠল, 'প র শু উ দিন? আর আপনে আমারে আজ কইলেন? অ্যাসেম্বলিতে সরকার স্টেটমেন্ট করে নাই ক্যান?'

'সরকার কি স্টেটমেন্ট করেছে যে ওকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে?'

ওঁরা কথা বলছিলেন আইনসভার ফ্লোরে দাঁড়িয়ে। ওঁদের কথা বলতে দেখে কিরণশঙ্কর রায় চেয়ার থেকে উঠে এসে, দাঁড়ান। এঁরা দু-জন কিরণশঙ্করের দিকে তাকালে কিরণশঙ্কর শরৎ বোসের কোটের কনুইটা টানলেন একটু সরিয়ে নিতে। শরৎ বোস সরলেন না। তিনি কিরণশঙ্করের দিকে তাকালেন। কিরণশঙ্কর যতটা সম্ভব, তাঁর কানে-কানেই কিছু বললেন। শরৎ বোস সেই গোপনতা ভেঙে দিয়ে স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'হ্যাঁ। ঠিকই শুনেছেন, ছেড়েছে সুভাষকে, তার মৃত্যুর দায় কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলতে।'

শরৎ বোস থেমে যান। কিরণশঙ্কর সরে গিয়ে তাঁর চেয়ারে বসেন।

শরৎ বোস আবার যোগেনকে বলতে থাকেন, 'তার ওপর যা কনডিশনের বহর, তাতে মনে হয়, সরকার চায়, সে তার নিজের বাড়িতেই মারা যাক। কারোর সঙ্গে দেখা করতে পারবে না, কথা বলতে পারবে না। আর যা হাল দাঁড়িয়েছে তাতে ওই নিষেধাজ্ঞা না-থাকলেও সুভাষ কিছু করতে পারত না। ফ্যামিলি মেম্বারদের লিস্ট চেয়েছে, ওর চিকিৎসা ও যত্নআত্তির ব্যাপারে ১২ জনের লিস্ট। সেটা আমরা এখন তৈরি করছি। প্রথম লিস্টটা ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। জিগগেস করছে—সুভাষ বোসের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আমার সুভাষের সঙ্গে সবসময় কথা বলার দরকার কী? আমি চেষ্টা করব—একটা কোনো ফন্দি করে আপনার দেখার ব্যবস্থা করার। আপনাকে দেখে হঠাৎ মনে এল—আপনি তো সুভাষকে চিকিৎসা করেছিলেন, আপনাদের শাস্ত্র-অনুযায়ী একটা তেল বানিয়ে কয়েকবার দিয়েছিলেন। তাতে সুভাষের উন্নতি হয়েছিল। ত্রিপুরী থেকে ফেরার পর সুভাষকে নিয়ে যখন আমরা জামরিগেরিতে ছিলাম ওকে বিশ্রাম দিতে, তখন সুভাষের ইচ্ছেতেই আপনাকে খবর পাঠানো হয়েছিল ও আপনি সেখানে গিয়ে সুভাষকে পরীক্ষা করে কিছু ওষুধ দেন। তাহলে কনসালট্যান্টদের নামের লিস্টে আপনাকে ঢুকিয়ে দি'।

'ওরা সেডায় রাজি হব কেন?'

'নাহলে অরাজি হবে। স্ট্যাটাস কুয়ো অ্যানটি। আপনার কোনো অসুবিধে নেই তো?'

'ওরা জানে না নাকি যে আমি এমএলএ। আর আমার ডাক্তারি করার লাইসেন্সই তো নাই। পুলিশ কি চাঁদসি গ্রাহ্য করে?'

'সেটা নিয়ে আপনি ভাবছেন কেন? নাম-ঠিকানা দিয়ে দেব এই চিকিৎসা যাঁরা করে থাকেন, বংশপরম্পরায়।'

'তা তো দেয়াই যায়—'

'আপনি যাঁদের কাছে শিখেছেন—'

'হ্যাঁ। তাও দেয়া যায়।'

'তাঁরা আবার কেউ অস্বীকার করে বসবেন না তো?'

'ওনাদের অস্বীকারের সুযোগ কোথায়? বড়জোর কইবেন, হ্যাঁ, শিখছিল তো কিছুদিন, তারপরে তো ও লাইন চেঞ্জ করছে। সেডাও কেউ কইব বল্যা তো মনে হয় না। এটা তো আমাগ সমাজের একটা গর্বের ব্যাপার।'

'আপনি তাহলে আমাকে তিনটি নোট লিখে দিন। ডিটেইলস অ্যাভয়েড করবেন। যদি

কোনো বিশ্বাস বা ধারণা থেকে পদ্ধতিটা তৈরি হয়ে থাকে, সেটা দেবেন, অ্যালপ্যাথি টার্ম ব্যবহার না করে, বরং একটু মিস্টিফাই করে। এটা প্রথম। দ্বিতীয়টা সুভাষের অসুখ নিয়ে আপনার মত। আর তৃতীয়টা ওই নামের লিস্টি। আজই। বিফোর আই লিভ।'

'এডডু তো ভাবার টাইম দিবেন?'

'লাইব্রেরিতে চলে যান, এখানে হবে না।'

যোগেন লাইব্রেরিতে পৌঁছুতে-পৌঁছুতে শরৎ বোস কী বলতে চাইলেন সেটা নিজের কাছে পরিষ্কার করে নিতে পারল। মনে-মনে শরৎ বোসের ওকালতির ক্ষমতায় আরো একবার অভিভূত হল। দুটি-তিনটি শব্দে কীভাবে উনি কী চাইছেন তা জানিয়ে দিতে পারলেন। এই লোকের সঙ্গে এই সব লাটশাহেব আর সেক্রেটারিরা পারে না কী। যোগেনের নোট যদি ঠিকঠাক হয় তাহলে হোম ডিপার্টমেন্ট নাড়া খাবে। ভারতীয় চিকিৎসা বিদ্যাকে অস্বীকার করার কৈফিয়ত দিতে হবে সরকারকে, হয়ত আইনসভায়। কিন্তু নোটটা হতে হবে খুব শাদাসিধে ও ভারী।

লাইব্রেরিতে যোগেন সোজা গিয়ে টাইপরাইটারে বসল। প্রথমেই ঠিক করে নিল। যতটা পারে নির্দিষ্ট কথা বলবে, হাওয়ায় ওড়ানো কথা নয়—শক্ত কথা। প্রথম লাইনটা যোগেন টাইপ করে ফেলে, একবার পড়ে, টাইপরাইটার আর থামায় না। তার যুক্তির ধরনটা হল যে অসুখ-বিসুখ, অস্বাভাবিকতা থেকে মুক্তি পেতে সব দেশের মানুষই তার অভিজ্ঞতা ও পূর্বপুরুষের কাছ থেকে পাওয়া জ্ঞান ব্যবহার করে আসছে, সেটাকে হাতুড়ে বলা ভুল ও তার পেছনে যথাযথ গবেষণা নেই বলা আরো বড় ভুল। ইন্ডিয়ান ফারমোকোপাইয়া সংকলিত না হলে চিকিৎসার এই পুরাতন বিজ্ঞানের রহস্য আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হবে না।

চাঁদসি চিকিৎসা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ভিতর থেকে একটি বিশেষ অঞ্চলে কতকগুলি বিশেষ ব্যাধির নিরাময়ের জন্য আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত হয় ও এখন ভারতের নানা জায়গায় এই চিকিৎসা ছড়িয়ে পড়েছে। অর্শ, ভগন্দর, ফিশ্চুলা, মলদ্বার-ব্রণ, মলদ্বারে স্থায়ী বিস্ফোটক, নালী ঘা, নাক দিয়ে রক্তপাত, গলা দিয়ে রক্তপাত, বমি—এই রোগগুলিকেই এই চিকিৎসার লক্ষবিন্দু বলা যায়। শরীরের ভিতরের অদৃশ্য কোনো একটি ক্ষত যদি তার পরিণতি নিয়ে শরীরের বাইরে চলে আসে, তাহলে সেই বহিরাংশটিতে রক্তসংবহন বন্ধ করে রেখে শুকিয়ে দেয়া হয়। সেই রক্তাভাবে শুষ্ক বহিরঙ্গ আর ভিতরের অদৃশ্য ক্ষতের পয়ঃনালী হিশাবে কাজ করতে না-পারায়, ভিতরের মূল ক্ষত আর কার্যকর থাকতে পারে না। চামড়ার ওপরের কোনো ক্ষতে এ চিকিৎসা ফল দেয় না। যদিও এটা শরীরের বিকৃত অঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করে তবু এ-চিকিৎসাকে অশল্যবিদ্যা বলা হয়। শল্যচিকিৎসা নয়—এটাই এ চিকিৎসার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। আবার, ঔষধসেবন অপরিহার্য নয়—এটাই এ চিকিৎসার তুলনায় আর-একটি বৈশিষ্ট্য। যদিও আধুনিককালে এমন একটা মতও স্বীকৃতি হচ্ছে—স্পর্শ, অঙ্গুলি ও হাত দিয়ে সম্পন্ন এ চিকিৎসাকে নিরস্ত্র সার্জারি বলাই উচিত।

যোগেন নিজের খশড়া পড়ে নিজেই অবাক হয়ে যায়। সে চাঁদসিতে শিক্ষানবিশ করেছে, কখনো-সখনো প্র্যাকটিসও করেছে, কলকাতায় পড়ার সময় চাঁদসি করে-করে আয় করতে হয়েছে ও এখনো কখনো-সখনো প্যারী সরকারের মত আপনজন ডাক্তার কোনো রোগীর বিশেষ সমস্যা নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলেন—এই সমস্তটাই এমন একটা ধারণা তৈরি করে তুলেছে তার মনে ও মাথায় তা সে নিজেই জানত না। জানার দরকারও পড়ত না যদি সুভাষ বোসের সঙ্গে দেখা করার একটি প্রক্রিয়া হিশেবে শরৎ বোস এই নোটটা তৈরি করতে না বলতেন।

পুলিশের কাছ থেকে যোগেনের ছাড়পত্র এল বেশ তাড়াতাড়ি। যোগেন ব্যাখ্যা দিল, 'ওই

অফিসারের নিশ্চয়ই এই অসুখগুলার একডা আছে। অথবা, সুভাষবাবুর চিকিৎসায় মাথা ঠিক রাখা ও স্বস্তি ফিরিয়ে আনার তেলডা চাই ওই অফিসারের বা অফিসারের বউয়ের।

সুভাষবাবুর সঙ্গে যোগেনের শেষ দেখা ৫ জানুয়ারি, ১৯৪১। যোগেন জানত না, সেটাই শেষ দেখা। সুভাষবাবু জানতেন কীনা তা কে বলবে। সুভাষবাবু তাঁর বাবার খাটে শুয়ে আছেন, সেই তাঁর ধুতি-পাঞ্জাবিতে। মুখে দাড়ি। বেশ কিছুদিন কাটেননি। সুভাষবাবুকে বড় বেশি রোগা দেখাচ্ছে কিন্তু আরো সুন্দরও লাগছে। সুভাষবাবুর সঙ্গ থেকে যে-স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে পড়ে, সেটা যোগেন পাচ্ছিল না আর তার জন্য নিজেকেই দোষী করছিল—কেন সে এঘরে ঢুকেই এমন ভেবাচেকা খেয়ে গেল। যোগেন তাড়াতাড়ি অবস্থাটা পালটাতে চেয়ে বলল—'এতদিনে আমার জ্ঞান হইল, সুভাষবাবু, ক্যান আমি ন্যাশনাল লিডার কোনোদিনই হবার পারব না। যদিও একটু বিলম্ব হইল নিজের বোধোদয়ে, তবু আরো সর্বনাশের আগেই যে হইল সেডা অন্তত রক্ষা।'

সুভাষবাবুর পুরো মুখটা হাসিতে ভরে গেল। যোগেন খুশি হল। সুভাষবাবু বললেন, 'আপনি তো অলরেডি ন্যাশনাল লিডার। হবেন আবার কী? ক-জন আমাদের ন্যাশন্যাল নেতার আপনার মত মাটিতে পা গাঁথা আছে? চোখের সামনে নিজের কাজ দেখতে পায় ক-জন? কিন্তু আপনি কী কারণ খুঁজে পেলেন, সেটা তো জানতেই হবে।'

সুভাষের প্রত্যাশাভরা শায়িত মুখটার দিকে তাকিয়ে যোগেন বলে, 'একটু জটিল হবে না, এতডা শোনা, একডা আহাম্মকের বোধোদয়ের গল্প? আচ্ছা, আমি সংক্ষেপেই কই। কওয়াও দরকার। পুলিশ আপনার লগে যে ব্যবস্থা কইরছে, তাতে আপনারে তো অ্যাহন অহর্নিশ ভাবব্যার লাগব। আমার সমাধানডা নিয়্যাও এডডু ভাবলেন না-হয়।'

'বলছেন কোথায়? ওরা জানে তো আপনি এসছেন। চা দিচ্ছে না তো।'

'সেটা আমি প্রথমে জাইন্যা নিয়্যা আপনার ঘরে ঢুকছি। পুলিশের নিয়ম হইছে, আপনার ঘরে কোনো তরল পদার্থ ঢোকার পূর্বে পুলিশকে ডিশে কইর‍্যা তার স্বাদ বুঝাইতে হব। তাই চা আইসতে এডডু দেরি হবে।'

'সত্যি? না, না। এটা আপনি বানালেন।'

'সে আপনে পরে চেক কইর‍্যা নিবেন। আমাদের মূল কথায় ফিরি। প্রথম কারণ—আমি নমশূদ্র লিডার। ভারতে সর্বত্র তো নমশূদ্র নাই। তাইলে?'

'আপনাকে বরিশালে বললাম-না, নমশূদ্র না থাকতে পারে। শূদ্র তো আছে। আপনাদের সারা ভারতের রাজনীতির সঙ্গে থাকতে হবে।'

'আপনে তো বইল্যা খালাশ। নমশূদ্রই থাইকব্যার পারি না, তা আবার অল ইন্ডিয়া শুদ্দুর হইব? যত নমশূদ্রগ স্কুল বানাই, কইলকাতায় হস্টেল বানাই, সব ট্যার পাওয়ার আগেই কায়েত হইয়্যা যায়। সেনসাসে দ্যাখবেন।'

'এটা তো পরিস্থিতি। আপনার কারণ কেন হবে?'

'শুধু আমারই বেলা পরিস্থিতি। আচ্ছা জেনারেল সিটে শিডিউল প্রার্থী—সারা ভারতে একমাত্র আদি ও অকৃত্রিম যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। এডা তো পরিস্থিতি। তাইলে কী হওয়া উচিত ছিল। আমি বিনয় দেখাইয়া কইব, 'কী যে কন। আমি শুদ্দুর। ভোটে জিত্যাও শুদ্দুর' আর বাবুরা কইবেন, 'তুমি তো আমাগ প্রতিনিধি। শুদ্দুর হইব্যা ক্যা?' তা না কইয়া বাবুরা বাহবা দিয়া কইল, 'সেডা তো ঠিক কথাই, তুই শুদ্দুর তো বটেই। তাই তোর জিতাডা য্যান ভূমিকম্প।'

সুভাষ খিলখিলিয়ে হেসে ওঠেন।

'কিন্তু এহো বাহ্য, আগে কহ আর। সব্বার থিক্যা বড় ও শক্ত কারণ হইতেছে, ন্যাশন্যাল লিডার হইতে গেলে হাঙ্গার স্ট্রাইক করা প্র্যাকটিস লাগবই, এমনকী সুভাষ বোসকেও। ওই ডা আমার পক্ষে সম্ভব না। আমি না-খাইয়্যা থাইকতে পারব না। কী কইর‍্যা পারব হাঙ্গার স্ট্রাইক। আমাগ তো চৌদ্দ পুরুষের ক্ষুধা। খাইল্যাম কবে যে না-খায়্যা থাকব?'

সুভাষ হাসতে-হাসতে উঠে বসলেন। হাসি আর থামে না। একবার বুকে হাত দেন, একবার পেটে হাত দেন। তারপর একটু জিরিয়ে বলেন, 'আমি তো হাঙ্গার স্ট্রাইক করিনি। আমি তো গবর্মেন্টকে লিখেছিলাম, আমার নিজের মৃত্যু ঘটানোর অধিকার আমার নিশ্চয় আছে ; আমি সেই অধিকার প্রয়োগ করব। জেলের মধ্যে আর কী করে মরব? না খেয়ে। আপনার তো মরার কোনো সমস্যা নেই, শূদ্র হিশেবে আপনার সমস্যা তো বাঁচা। তাহলে আপনি হাঙ্গার স্ট্রাইক করবেন কেন?'

এটা ৫ জানুয়ারি ৪১-এর ঘটনা। এরপর যোগেন আর সুভাষের সঙ্গে দেখা করার ও কথা বলার সুযোগ পায়নি।

২৩ জানুয়ারি পুলিশ তাঁর ঘরে ঢুকে দেখে, সুভাষ নেই। সুভাষের এক ভাইপো সুভাষের হাতে লেখা চিঠিটা পড়ে পুলিশকে শোনালেন, 'মহত্তর জীবনের সন্ধান করতে আমি গৃহত্যাগ করছি।' উনি কয়েকদিন তাঁর ঘরে কাউকেই ঢুকতে দিতে নিষেধ করেছিল। রান্নার ঠাকুরকেও না। সে খাবার দিত দরজার তলা দিয়ে। পরিবারের সবার ধারণা তিনি সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন। এ-খবরটা ছোট করে বেরিয়েছিল। যোগেন সেটা পড়েই জানল।

সুভাষ প্রহেলিকা

সুভাষ জেলের বাইরে থেকে একের পর এক প্রহেলিকা তৈরি করছিল। সকলের পক্ষেই নানা অপ্রস্তুত।

১৪৫

১. ৩৭-এর ভোটের পর জওহরলাল বেশ চড়া গলায় বলেছিলেন—ভোটে প্রমাণ হয়ে গেছে যে ভারতের রাজনীতিতে মাত্র দুটি পক্ষই আছে—কংগ্রেস আর ব্রিটেন। কোনো তৃতীয় পক্ষ নেই।

এর চাইতে বেশি ক্ষতি ভারতের আর-কোনো নেতার কোনো মন্তব্যে হয়নি—পাকিস্তান থেকে খালিস্তান পর্যন্ত নানারকম উগ্র বিচ্ছিন্নতার আন্দোলনের কোনো নেতার গ্রাম্য মন্তব্যেও নয়। জওহরলাল দেশ ও দলকে এক করে ফেলার যে-ইতিহাসসূত্রকে রাজনীতিতে ব্যবহার করলেন, সেই একই ইতিহাসসূত্র নানা সমীকরণে পাকিস্তানে বিভিন্ন প্রাদেশিকতাকে, ভারতে বিভিন্ন আঞ্চলিকতাকে ও বাংলাদেশে ইসলামি ও অনিসলামি বিভিন্ন রাজনীতিকে আজ পর্যন্ত মর্যাদা দিয়ে চলেছে।

২. সুভাষের ঘটনায় প্রমাণ হয়ে গেল—কংগ্রেস জাতীয় মঞ্চ হওয়া দূরের কথা, একটা

রাজনৈতিক পার্টিই নয়। সেটা একটা চক্র বা অলিগার্কি। প্রকাশ্য ভোটে জয়ী প্রার্থীকে সে-অলিগার্কি বা চক্র দল থেকে বের করে দেয়। সুভাষ এই চক্র বা অলিগার্কির একটা নামও দিয়েছিলেন, 'দক্ষিণপন্থী'।

৩. সুভাষের বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপন করতেই দেয়া হল না সেই কংগ্রেসে, যে-কংগ্রেস ও ভারত নাকি সমার্থক। কোনোদিনই কি ছিল, আগে কিংবা পরে? ১৮৮০ সালের পর শাহেবরা হিশেব করে দেখল, মেকলের সন্ততিরা সারা ভারতে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বংশবিস্তার করেছে। ইংরেজি শিক্ষার পর এবার ভারতীয়দের একটা পরামর্শ সভার অভিজ্ঞতা দরকার, ইংরেজি শিক্ষার গুণে সেই আকাঙ্ক্ষাও তৈরি হয়েছে। হল কংগ্রেস। কিন্তু বছর পনেরোর মধ্যেই সে-সম্মিলন নিজের যোগ্যতা ও স্বাতন্ত্র্য প্রমাণ করল, বিশ বছরের মধ্যে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সেই সম্মিলন 'স্বদেশী' হয়ে উঠল, সমাবেশ ও আন্দোলনের নানা আকার রপ্ত করে ফেলল—একই সঙ্গে বয়কট ও রাখিবন্ধন, বয়কট কার্যকর করতে 'স্বদেশী ডাকাতি'ও কর্মসূচিতে এসে গেল ও তা থেকে ব্যক্তিগত বা যৌথ সশস্ত্র বিপ্লবী সক্রিয়তা ১৯৩৭ পর্যন্ত ধারাবাহিক থাকল। কিন্তু কলোনিস্থাপকদের শিক্ষায় যে-সম্মিলন রাজনীতি করতে শুরু করল, সে-সম্মিলন তো তাদের কাছেই শিখবে—তাই অকল্পনীয়, দীর্ঘ, ব্যাপ্ত, স্বাধীনতা আন্দোলন সত্ত্বেও ভারতের কোনো মৌলিক দ্বন্দ্বের মীমাংসা হল না—হিন্দুসমাজের ভিতরের, বাইরের সঙ্গে হিন্দুসমাজের শিখ বা সমতুল্য আঞ্চলিক ধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের, ইসলামের সঙ্গে হিন্দুধর্মের—অসংখ্য দ্বন্দ্ব সংঘাতের কোনো সমাধান সংকেতিতও হল না গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে আসার পরও প্রায় দেড় দশক। গান্ধীজির সমাবেশ ক্ষমতা ও ভারতীয়তা যখন স্বীকৃত হল, ঠিক তখনই এল সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ও তার পরই পেল ক্ষমতার প্রথম স্বাদ—কংগ্রেসই প্রধানত আর চারটি প্রদেশে প্রধানত মুসলিমদের পার্টি। কিন্তু লিগ নয়। জওহরলাল যখন বলেন, ভারতের ব্যাপারে দুটিই মাত্র পক্ষ, কংগ্রেস আর ব্রিটেন, তৃতীয় কোনো পক্ষ নেই, তখন ভারতীয় মুসলমানদের মনে কংগ্রেসের নিহিত হিন্দুয়ানি ও মুসলিম বিদ্বেষ আরো সংগঠিত ও কেলাসিত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায় না?

৪. প্রাদেশিক ক্ষমতায় এসে কংগ্রেসকে বম্বের শিল্পশ্রমিকদের বিরুদ্ধে আইন পাশ করতে হল আর সুভাষ ও কমিউনিস্টদের সামলাতে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি নিষিদ্ধ করে দিল—কোনো রাজনৈতিক গোষ্ঠী বা কোনো শ্রমিক-সংগঠন তৈরি করা, অনুমতি ছাড়া কোনো আন্দোলন করা, সত্যাগ্রহ করা, কৃষক সমিতি করা।

৫. এত কঠিন নিষেধাজ্ঞা নিয়ে কংগ্রেসে কোনো তর্কই হয়নি। এই নিষেধাজ্ঞার জোরেই সুভাষের আন্দোলন ও মতের দায় কংগ্রেসের ওপর বর্তাল না। সুভাষ নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়ে কংগ্রেসকে জাতীয় মঞ্চের পালটা দাবিদারের ঝামেলা থেকে রেহাই দিল। বরং ; সুভাষ নিজেকে বধ্যভূমিতে একলা করে নিল তার সমবেত হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে। বরং রাষ্ট্রপতি ভোটে তাঁর প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়া হেরে যাওয়ায় গান্ধীজির বিকৃত ব্যাখ্যা, 'আরে সুভাষবাবু তো আর দেশের শত্রু নন', আরো এক স্বস্তিকর বিকার হয়ে উঠল, সুভাষের অন্তর্ধানের কিছু পরে, 'আরে, সুভাষবাবু তো আর স্বদেশপ্রেমিক নন'। তাহলে সুভাষবাবু গান্ধীজিকেও তাঁর দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি দিলেন।

৬. মুসলিম লিগের সঙ্গে সুভাষের সম্পর্কটা ছিল—খোলামেলা ও বন্ধুত্বের। বাংলায় তাঁদের কোনো নেতার পক্ষেই সুভাষের ব্যক্তিগত শত্রুতা করা সম্ভব নয়। সেই সুভাষ যখন কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত, তিনি জিন্নার সঙ্গে দেখা করেছিলেন লিগের সঙ্গে নতুন একটা বোঝাপড়ার

উদ্দেশ্যে। অনেক গুজব রটল এই নিয়ে। পরে জানা গিয়েছিল—সুভাষের সঙ্গে জিন্না দেখাই করেননি, সুভাষ 'কংগ্রেসের নির্বাচিত প্রতিনিধি নন', এই কারণে। অন্যদিকে আবার ফজলুল হকের সঙ্গে সিট-ভাগাভাগি করে সুভাষ, কংগ্রেস-রাষ্ট্রপতিপদ ছেড়ে দেয়ার এক বছরের মধ্যে, কর্পোরেশন দখল করলেন। এআইসিসি কোনো প্রার্থীই দেয়নি। তখন, জিন্নার সামনে কোনো পথ নেই। একটিমাত্র পথ খোলা—তিনটি লিগশাসিত প্রদেশের ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণক্ষমতা সম্পূর্ণত ও নিশ্চিত জিন্নারই হাতে, এটা প্রমাণ করতেই হবে ভাইসরয়ের কাছে। ভাইসরয় লিনলিথগো যুদ্ধ বাধার সঙ্গে-সঙ্গেই জিন্নাকে এটা আশ্বস্ত করেছিলেন একেবারে সরাসরি। এই গল্পটা বা প্রমাণপত্র নতুন পাওয়া গেল। সে-গল্পের জন্য আলাদা জায়গা দরকার।

৭. জিন্না যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্রিটেনকে লিগের সবরকম সমর্থন জানিয়েছেন আর এদিকে ৪০-এরই ১৫ জুন লিগকে দিয়ে একটা সার্কুলার জারি করলেন—কোনো মুসলিম কোনো ওয়ার-কমিটিতে যোগ দিতে রাজি হবে না। সেই মিটিঙেই এর পরে আর-একটি নীতি ঠিক করা হয় যে প্রেসিডেন্টের [জিন্নার] মত ছাড়া কোনো ওয়ার্কিং কমিটি মেম্বার কংগ্রেস বা অন্য কোনো দলের সঙ্গে এমন কোনো বিনিময়জ্ঞাপক কথা বলবেন না, যার ফলে কংগ্রেস ও লিগকে কোনো বোঝাবুঝির মধ্যে যেতে হয়।

এই দুটি ব্যাপারে জিন্নার সিদ্ধান্ত নিয়ে লিগের অনেক নেতাই আপত্তি করেছিলেন। একটি হল—কংগ্রেস সমস্ত প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাকে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিতে বলেছে। জিন্না এই নির্দেশকে সমাদর করে মুসলিমদের বলেন, 'কংগ্রেসের অত্যাচার' থেকে মুক্ত হওয়ার সুবাদে মুসলিম লিগ এই দিনটিকে 'মুক্তি দিবস' বলে পালন করবে। জিন্নার এই নির্দেশে লিগ ওয়ার্কিং কমিটি'র সদস্য, কলকাতার মেয়র, বাংলার এমএলএ এ আর সিদ্দিকি এই নির্দেশকে স্বাদেশিকতা-ও গণতন্ত্রবিরোধী মনে করে লিগ ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন।

দ্বিতীয় ব্যাপারটি হল—যুদ্ধ সংক্রান্ত কোনো কমিটিতে মুসলিম-প্রধান কোনো প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী বা অন্য কেউ সভ্য হতে পারবেন না—প্রেসিডেন্টের অনুমতি ছাড়া। সারা ভারত থেকে মুসলিম নেতা ও বুদ্ধিজীবীরা জিন্নাকে অনুরোধ করেছিলেন অন্তত ওই তিনটি প্রদেশকে—বাংলা, পাঞ্জাব ও আসাম—রেয়াত করতে। জিন্না তা করেননি। ফলে, জিন্না এমন একটি অবাস্তব ও স্ববিরোধী নীতি তৈরি করে ও সেই নীতি খাটিয়ে প্রাদেশিক লিগ সরকারের ওপর তাঁর ব্যক্তিগত দখল কায়েম করলেন। জিন্না একমুখে এই উলটো কথা বললেন—যুদ্ধে লিগ ব্রিটিশ সরকারকে সম্পূর্ণ সমর্থন করবে। যুদ্ধের জন্য তৈরি কোনো কমিটিতে লিগের কোনো প্রধানমন্ত্রী থাকবে না। এটা কী ধরনের সমর্থন বা এটা কী ধরনের অসহযোগিতা? এটা কী আর লেখা বা বলা যায় না—দুই প্রধানমন্ত্রী ও এই দুই প্রদেশের রাজনীতির ওপর জিন্নার দখল নেই—পাঞ্জাবের সিকান্দার হায়াৎ খান আর বাংলার ফজলুল হক। সে-দখল না-প্রমাণিত হলে তিনি কী করে প্রমাণিত হবেন লিগের একমাত্র মুখপাত্র বলে? এমন একমাত্র, যাঁর করজায় কোনো মুসলিম প্রধান প্রদেশ নেই। সুতরাং ফজলুল হককে সরতেই হবে—মাঝখানে এমন একটা ভাব আসা সত্ত্বেও যে আর-কোনো গোলমাল নেই।

৮. বাংলার ছোটলাট জে এ হার্বার্ট জুন ১৯৪০-এর প্রথম ১৫ দিনের রাজনৈতিক অবস্থা ভাইসরয়কে জানাচ্ছেন গোপন চিঠিতে। চিঠিটি লেখা হয়েছে ২৪ জুন। মানে, সুভাষকে গ্রেপ্তারের সপ্তাহখানেক আগে। এর আগের চিঠিতে আছে মে-মাসের শেষের পনের দিনের খবর। সেই চিঠিতে ছোটলাট লিখেছিলেন, 'নাজিমুদ্দিন (বাংলার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ১৯৪০), খুব জোর দিয়ে বলল লিগ যুদ্ধে পূর্ণ সমর্থন করবে অথচ ওয়ার কমিটিতে না-যাওয়া নিয়ে গোলমাল

পাকিয়েছে, সেটা মিটিয়ে দিতে পারলেই সে সুভাষকে জেলে পুরবে ও সুভাষকে রাজনীতি থেকে মুছে দেবে।' আমার কিন্তু ধারণা পার্টির (লিগের) ভিতরের চক্রের একটা লোভ আছে—সুভাষকে ছেড়ে রাখার। ভবিষ্যতে তাকে কাজে লাগতে পারে— পাটসংক্রান্ত তাদের নীতির কারণে বামপন্থী কংগ্রেসি ও বামপন্থী প্রজামেম্বরদের ওপর ইউরোপিয়ান ব্লক এমন চটে আছে যে দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসিদের সঙ্গে নিয়ে সামনের অধিবেশনে তারা সরকার ফেলে দিতে পারে। সেটা হলে বামপন্থীদের এই সরকারের পক্ষে জড়ো করতে সুভাষকে কাজে লাগবে।'

পরের চিঠিতে এর পরের ১৫ দিনের কথা—

'প্রধানমন্ত্রী লিগের ওই হুকুমকে কোনো পাত্তাই দিচ্ছেন না। লিগের সঙ্গে গোলমাল বাধলে বিপরীত কোন্ জোটের দিকে তাঁর নজর, তা একমাত্র তিনিই জানেন, বা তিনিও জানেন না। ইতিমধ্যে উনি একটা রগরগে বিবৃতি দিয়েছেন যে তার সঙ্গে সুভাষের একটা রাজনৈতিক চুক্তি হয়েছে। আসলে হয়ত এমন কোনো চুক্তির অস্তিত্বই নেই। নাজিমুদ্দিন বলেছে—পাটের ব্যাপারটা যদি মিটে যেত তাহলে সুভাষকে পুরো যুদ্ধটা ফাটক খাটাত। সারওয়ারদিরও একই মত।'

এরপর, সুভাষকে গ্রেপ্তারের পরের খবর—জুলাইয়ের প্রথম ১৫ দিনের রিপোর্টে।

'সুভাষের গ্রেপ্তার নিয়ে একটা মুলতুবি প্রস্তাব ১৫ তারিখে ১১৯ ও ৭৮ ভোট বেশ আরামসে হেরে গেছে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় হঠাৎ একটা মন্তব্য করায় কিছু কিচিরমিচির হয়েছে। বলেছিলেন, 'সুভাষকে জেলের বাইরে দেখলে ও দেশের রাজনীতিতে তার যোগ্য জায়গা নিতে দেখলে আমার অতুলনীয় আনন্দ হবে।' এমনও দুশ্চিন্তা ছিল যে মন্ত্রিসভা সুভাষের বিরুদ্ধে কোনো মামলা করবে না। করলেও তুলে নেবে।... পুলিশ কমিশনার সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স অফিসারকে বলেছেন, দিল্লি থেকে একটা ওয়ারেন্ট আনিয়ে রাখতে। মন্ত্রীসভা ছেড়ে দিলেও সুভাষকে যাতে গেটেই আবার গ্রেপ্তার করা যায়।...আপনি তো জানেন, সম্পূর্ণ বিপরীত কারণে ফজলুল হক ও নিজামুদ্দিন সুভাষের সমর্থন চায়।'
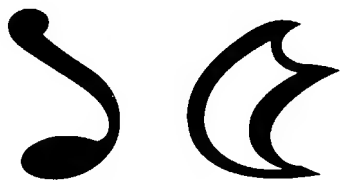
আবার মন্ত্রিসভা, আবার হকশাহেব এবার প্রোগ্রেসিভ

৫ ডিসেম্বর ১৯৪০ বাংলার ছোটলাট হার্বার্ট ভারতের ভাইসরয়কে তাড়াতাড়ি একটা চিঠি লিখে জানান কলকাতায় প্রদেশ সরকার নিয়ে কী কী গুজব রটেছে।

১৪৬

নলিনী সরকার দিল্লি থেকে ফিরে এলে দেখা হয়েছিল এক মুসলিম নেতার সঙ্গে। সেই নেতাটি এসে খবরগুলো ছোটলাটকে জানিয়ে দিয়ে যান। সেই নলিনী নেতা সরকারকে বলেন, হক আর নামিমুদ্দিন দুজনেই এখন সুভাষ ভজনায় ব্যস্ত। সুভাষ যাকে সমর্থন করবে, সে-ই হবে বাংলার প্রধানমন্ত্রি, শুনে সরকার বলেন, সুভাষ দেবে নাজিমুদ্দিনকে সমর্থন? এই বুদ্ধি নিয়ে ওরা কি মূর্খের স্বর্গে বাস করছে?

এ রকমই আর একজন জানালেন—হকশাহেব নাকি নতুন একটা পার্টি বাজারে ছেড়েছেন, প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি, ও সেই পার্টি আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে ও হক প্রধানমন্ত্রি থাকবেন।

শুনে ছোটলাট সাত তাড়াতাড়ি হককে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপারটা কী? হক মুখ মুছে বললেন, 'একেবারে বাজে কথা। তবে প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি নামে একটা পার্টি তৈরি হয়েছে। তারা সারওয়ারদির বিরুদ্ধে আজই অনাস্থা প্রস্তাব তুলবে। ছোটলাট সেদিনই, ২৯ নভেম্বর ক্যাবিনেট ডাকেন। ক্যাবিনেটে হক বলেন যে সারওয়ারদির বিরুদ্ধে তাঁর কোনো নালিশ নেই। সেই ক্যাবিনেট মিটিং থেকেই হক এক বিবৃতি দিয়ে জানান—প্রধানমন্ত্রি হয়ে তিনি তাঁর এক সহমন্ত্রির বিরুদ্ধে অনাস্থা আনবেন কী করে?

গুজব অনুযায়ী ৪০-এর ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের শেষ অবস্থা—হক ও নাজিমুদ্দিন এই দুজনের মধ্যে যাকেই ছোটলাট ডাকবেন, সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যাবে, কারণ মেম্বাররা নিজেদের বাজারের লাইনে দাঁড় করাবে। যে মন্ত্রি করবে, তাকে ভোট দেবে।

সবচেয়ে নিশ্চিত উপায় এম এল এ দের সমর্থনপিছু টাকা দেয়া। আর এক কাণ্ড ঘটে বসে আছে। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী হবেন এ সব গণতন্ত্র 'হোমে' চলে কলোনিতে চলে না। এখানে যে নিজেকে প্রধানমন্ত্রি হিসাবে পাকা প্রার্থী প্রমাণ করতে পারবে সে-ই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে যাবে। পাকা প্রার্থীর প্রমাণ কী? সে অনেক রকম। লাট শাহেবের ডাক। গুজব রটিয়ে দেয়া যে কোনো বড় পার্টি ভেঙে গেছে। স্বতন্ত্র প্রার্থীদের দু-একজন নেতাকে দিয়ে বিবৃতি দেয়ানো যে তাঁরা এঁকে সমর্থন করবেন।

লিগ-হকশাহের মন্ত্রিসভা ভাঙাভাঙির পর লিগ নাকি ঠিক করেছিল, তারা নতুন মন্ত্রিসভা

তৈরির দাবি জানাবে ও নবাবশাহেব হবেন সেই নতুন মন্ত্রিসভার প্রধানমন্ত্রি। ফলে, আবার হবিবুল্লাহ উৎসাহের সঙ্গে এমএলএ জোগাড়ে নেমে পড়েন। এমএলএদের পারহেড দর কত যাচ্ছে—এই কথা ইসপাহানিকে জিজ্ঞাসার পর ভাবলেন—পারহেড হাজার টাকা কি এই হেডগুলার ওপর খরচা করা যায়? কেউ বলেন এক, কেউ বলেন দেড় গন্ডা এমএলএ-কে টাকা দেয়ার পর নবাবশাহেব জানতে পারেন লাটশাহেব নাকি নাজিমুদ্দিনকে মন্ত্রিসভা গড়তে ডাকবেন। হবিবুল্লাহ এত চটে যান যে তিনি লিগ থেকে পদত্যাগ করে হকশাহেবের নতুন পার্টি প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশনে যোগ দেন। নবাবশাহেবকে নাজিমুদ্দিনের বিরুদ্ধে লিগের মিটিঙে ব্যালটে লড়তে হয় ও হারতে হয়। নবাবশাহেবের পদত্যাগ লিগ কর্তৃপক্ষ মানেনি। তারা তাঁকে বরখাস্ত করেছে। সেই খবর পেয়েই নাকি লাটশাহেব জন হার্বার্ট নবাবশাহেবকে শপথ নিতে নিষেধ করেন। কারণ, স্পিকারের কাজ থেকে তাঁর 'স্টেটাস রিপোর্ট' আসেনি।

হক লিগ মন্ত্রিসভা ভেঙে যায় ১ ডিসেম্বর। ৪ ডিসেম্বর হকশাহেব প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির নেতা হিশেবে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের দাবি জানান। তাঁর পক্ষে ছিলেন ওই দলের ৪২ জন, বোস-কংগ্রেসের ২৮ জন, কৃষক-প্রজার ১৯ জন, হিন্দু মহাসভার ১৫ জন, তপশিলি ইনডিপেনডেন্ট ১২ জন, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ২ জন, শ্রমিক প্রতিনিধি ১ জন। এ ছাড়াও সরকারি কংগ্রেস ও ন্যাশন্যালিস্ট পার্টির ২৭ জন হকশাহেবকে সমর্থন করবে।

লিগ নিশ্চিত ছিল—লাটশাহেব নাজিমুদ্দিনকে ডাকবেনই। লাটশাহেব, সরকারি শাহেবরা আর ব্যবসায়ী শাহেবরা সকলেই নাজিমুদ্দিনকেই চান। অনেকদিন ধরেই চান। নাজিমুদ্দিন সেটা জানেন বলেই হাবেভাবে হকশাহেবকে ট্যাঁকে গুজে রাখেন। ঢাকার পুলিশ প্যাকা। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন তো নাজিমুদ্দিনকেই জোগাড় করতে হবে। তাকে সেই জোগাড়ের সময় দিতেই হকশাহেবের চিঠি পাওয়া সত্ত্বেও এখনো লাটশাহেব ডাকাডাকি শুরুই করেননি। নামিমুদ্দিনকে নিজের মেজরিটি তৈরি করলেই তো হবে না। লাটশাহেবকে সাংবিধানিক অ্যালিবাইও জোগাতে হবে। লাটশাহেব প্রকারান্তরেও কোনো পক্ষপাতিত্বের দায় নিতে পারবেন না, কারণ, তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে যুদ্ধনীতি, ভাইসরয়ের সঙ্গে কংগ্রেস-লিগ-লন্ডনের সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইনডিয়া—ওয়ার ক্যাবিনেট ও ব্রিটিশ পার্লামেন্ট।

সারওয়ারদি-নাজিমুদ্দিনরা চারদিক দেখেই ছক সাজিয়েছিলেন।

ছকটা সাজিয়েছিলেন বাংলার এই মুসলিম নেতারাই, কিন্তু ছকটা এঁকে দিয়েছিলেন, লিগের সর্ব ভারতীয় সভাপতি জিন্না। হকশাহেবের সঙ্গে জিন্নার রাজনৈতিক বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এতদূর পর্যন্ত সম্পূর্ণ যে সেই ক্ষতস্থান থেকে কোনো রক্তপাতও আর ঘটছিল না ১৯৪১-এর ২৯ নভেম্বর, লিগ-হক মন্ত্রিসভা যেদিন ভেঙে গেল।

বাইরের ঘটনাগুলি থেকে জিন্না-হক বিচ্ছেদের অনেকগুলি স্থান-বিন্দু চিহ্নিত করা যায়। করা যে যায় সেটা বুঝেসুঝেই জিন্না-হক পত্রবিনিময় জিন্নার পক্ষ থেকে একতরফা কাগজে বের করে দেয়া হয়। হক-লিগ ছাড়াছাড়ির কোনো জায়গায় কোনো নীতির বালাই ছিল না। বাংলার মুসলিম লিগ সম্পূর্ণতই ছিল অবাঙালি মুসলমানদের দখলে। তারা আজ হোক, কাল হোক হকশাহেবকে সরিয়ে দিতেন। ভাইসরয়ের তৈরি প্রতিরক্ষা পরিষদে জিন্নার অনুমতি ছাড়া সদস্য হতে রাজি হওয়ার সুবাদে ভারতের মুসলিম রাজনীতিতে যে ফাঁক তৈরি হল, সেই ফাঁকটাকেই মুসলিম লিগ ব্যবহার করল। হকশাহেব এটাও জানতেন, খুব ভালোভাবেই জানতেন, মুসলমান প্রধান চারটি প্রদেশ—বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত—বিশেষ করে প্রথম দুটিতে নিজের নেতৃত্ব ষোল আনা কায়েম করতে না পারলে মুসলমান সমাজের একমাত্র

নেতা হিশেবে জিন্নার দাবি ও মুসলমানদের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিনিধি হিশেবে মুসলিম লিগের দাবির এক কড়া দামও নেই। সঙ্গে সঙ্গে জিন্না ও হকশাহেব জানতেন যে বাংলায় হকশাহেবকে বাদ দিয়ে কোনো মুসলিম আধিপত্যকে বিশ্বাস্য করে তোলা যাবে না।

১৯৪০-এর ২৪ মার্চ লাহোরে হকশাহেবকে দিয়ে জিন্না পাকিস্তান-প্রস্তাব তোলালেন। এই প্রস্তাব যুক্ত প্রদেশের মুসলিম নেতা খালিকুজ্জমান প্রথম খশড়া করেন। সেই খশড়া অংশত সংশোধন ও সম্পাদনা করেন পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী সিকান্দার হায়াৎ খান। সেই খশড়া জিন্না কখন দেখেছেন ও কী সংশোধন করেছেন, সেটা বলা যায় না। সম্মিলনের সভাপতি হিশেবে জিন্নাই একমাত্র পারেন—কাকে দিয়ে প্রস্তাবটি তোলা হবে তা স্থির করতে। ও তিনি ফজলুল হককে এই দায়িত্ব দেন। হকশাহেব আবার সেই খশড়াতে কিছু কাটেন ও কিছু যোগ করেন ও তারপর হকশাহেব সেটা উত্থাপন করেন।

পাকিস্তান প্রস্তাব নিয়ে প্রায় সত্তর বছর ধরে অনেক সুতো ছেঁড়া হয়েছে। পাকিস্তানের যখনই অন্য কোনো জাতীয়তাবাদ প্রধান হয়ে উঠেছে, তখনই লাহোরে প্রস্তাবের নতুন ব্যাখ্যা হয়েছে। পাকিস্তান বা মুসলিম লিগ আন্দোলনের একজন নেতাও স্বীকার করেননি যে তিনি কোনোভাবে এই প্রস্তাবটির সঙ্গে জড়িত। হকশাহেবকে এই প্রস্তাব থেকে মুক্ত করার চেষ্টা এখনো করা হয়। এই প্রস্তাব যদি প্রতিটি শব্দ ধরে আজও পড়া যায়, তাহলে যিনি রাজনীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ অথচ একটি রচনার অন্তর্বর্তী গভীর সংগঠন উদ্ধারে বিশেষজ্ঞ পাঠক—তিনি প্রায় রেখা গণিতে ছকে দিতে পারেন যে একই সঙ্গে কতগুলি ধারণা ও অভিমতকে আঁটাবার জায়গা তৈরি করে দিতে এই প্রস্তাবে চেষ্টা করছে ও চেষ্টা করছে বেশ অনেক দিন ধরে। প্রস্তাবটির বাক্যবন্ধে প্রকাশভঙ্গিতে ও বিন্যাসে সেই অনেক রকম চিন্তার চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। যেমন, অনেকটা সময় অতিবাহনের পলিচিহ্নও চোখে পড়ে, খোঁজাখুঁজি না করেও। এখন নতুন করে আবিষ্কৃত নথিপত্র ও দলিলপত্রের সাহায্যে একটা পরম্পরা তৈরি করা যায়—এই প্রস্তাবটিতে লিগ ও জিন্না কী করে পৌঁছুল। সেই পরম্পরা-রচনা খুব দরকার—আমাদের 'জাতীয়' বা 'দেশীয়', বা 'স্বদেশী' চেতনার যথাযথ লক্ষণগুলি উদ্ধারের প্রয়োজনে।

১৯৪০-এর ২৪ মার্চ লাহোরে মুসলিম লিগ সম্মিলনের মাস ছয় আগে, বড়লাট লিনলিথগো সেপ্টেম্বর ১৯৩৯, ব্রিটেন-জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে ও ভারত সেই যুদ্ধের অংশীদার, এই ঘোষণার পরের সকালে গান্ধীজি ও জিন্নাকে জানান—যুদ্ধ যতদিন চলবে ততদিন ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা নিয়ে কোনো আলাপ-আলোচনা হবে না। যুদ্ধ শুরু হওয়ারও ছ-মাস আগে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনে একটা নতুন ধারা যোগ করে ১৯৩৫-এর প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনকে কার্যত বাতিল করে। যুদ্ধ বা যুদ্ধের আশঙ্কাতে ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারগুলিকে প্রশাসনিক নির্দেশ দিতে পারবে, প্রদেশগুলির জন্য কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ নতুন আইন তৈরি করতে পারবে ও কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণ প্রশাসনিক অধিগ্রহণ করতে পারবে। ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন কার্যত নাকচ হয়ে যায়।

কংগ্রেস ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯, যুদ্ধের বিশেষ অবস্থায় ভাইসরয়কে জানায় পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ও তা সম্ভব করার জন্য অবিলম্বে সংবিধান রচনার পরিষদ তৈরি করার দাবি।

চারদিন পর ১৮সেপ্টেম্বর লিগ জানায়—যুদ্ধ শেষ না-হওয়া পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা স্থগিত থাক ও লিগের সম্মতি ব্যতীত কোনো শাসনতান্ত্রিক সংস্কার যেন করা না হয়।

ঐ দিনই বড়লাট লিনলিথগো লিগকে জানান, 'এটা তো ভাবাই যায় না যে যাঁরা এতদিন

হিজ মেজেস্টিজ গর্ভনমেন্ট ও পার্লামেন্টকে এই রকম সংস্কার পরিকল্পনা তৈরিতে সাহায্য করেছেন, তাঁদের সঙ্গে আবার পরামর্শ না করে আমরা নতুন কোনো পরিকল্পনা করব বা ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধানের কোনো ব্যবস্থা সংস্কার প্রস্তাব করব।'

এর মাত্র মাসখানেক পরে, ৪০ সালের ১৬ জানুয়ারি পরিষ্কার জানিয়ে দেন, জিন্নার সঙ্গে আলাপের সময় তাঁকে সম্ভবপর কনস্ট্রাকটিভ কোনো কর্মসূচি গ্রহণ ও প্রচারের পক্ষে পরিচিত সব যুক্তিগুলো আবার বলি ও তিনি (জিন্না) তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন। তিনি (জিন্না) ও তাঁর বন্ধুরাও মনে করেন 'তেমন একটা কিছু যথাসময়ে প্রকাশ করা যাবে, অন্তত আভাস দেখা যাবে।' সেই চিঠিতে লিনলিথগো আর একটি জরুরি খবর ভারত সচিবকে জানিয়ে রাখলেন। এমন খবর লিখিতভাবে এই প্রথম নথিভুক্ত হল।

খবর দেয়ার ভঙ্গিতে বেশ সাদাসিধে ভাব আছে।

ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থা কী হবে, তা নিয়ে তো কথাবার্তা চলছে বছর বিশ। গোলটেবিল বৈঠকগুলোও হয়েছে, প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ভাবার উদ্দেশ্যে। তাতে অন্তত এই ধারণাটা পরিষ্কার হয়েছে যে ভারতীয়দের মধ্যেই এ নিয়ে কোনো মতৈক্য নেই। এমন কী সবচেয়ে বড় দল কংগ্রেসও জানে না, স্বাধীনতা, স্বরাজ, সংবিধান বলতে তারা ঠিকঠাক কী বোঝাচ্ছে। ১৯৩০-এ কংগ্রেস প্রথম পূর্ণ স্বরাজের কথা বলে ও ১৯৩৮-এ সংবিধান ও উন্নয়ন-পরিকল্পনা নিয়ে দলিল তৈরি করেছে।

আবার, এই একই সময়ে ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন পাশ করে ও কার্যকর করে সম্রাটের সরকার ভারতে নির্বাচন, প্রতিনিধিত্বভিত্তিক সরকার, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, আইন তৈরির ক্ষমতা ও প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা চালু করার ব্যাপারে আন্তরিকভাবে আগ্রহী ও সৎ। বিভিন্ন প্রদেশের বহুরকম স্বার্থের প্রতিনিধিরাও এ-বিষয়ে আশ্বস্ত হয়েছে যে ব্রিটিশ সরকার তাদের স্বার্থ রক্ষা করবে। কংগ্রেসে ফেডারেশনের পক্ষে মত সংগঠিত হচ্ছিল। সেটা একটি পরিণতির দিকে যেত যদি সুভাষ বোস কংগ্রেসের ভিতরকার কমিউনিস্টদের ও টেররিস্টদের এক করে একটা বিদ্রোহ না ঘটাত।

এর ভিতর যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় পরিস্থিতি বদলে যাচ্ছে।

মুসলমান প্রধান প্রদেশগুলিতে মুসলিম লিগই একমাত্র দল নয়। জিন্নাও মুসলমানদের একমাত্র নেতা নয়। অনেক মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও সমাজনেতা, ফেডারেশন-কনফেডারেশনের ধারণার মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছিলেন। জাফরুল্লা খান বেশ একটি বিস্তৃত প্রস্তাব লিনলিথগোর অনুরোধেই তৈরি করে গোপনে দিয়ে গেছেন।

লিনলিথগোর ব্যক্তিগত কাগজপত্র সবে মাত্র গবেষকদের জন্য খুলে দেয়া হয়েছে। সেখানেই এ-চিঠিটি প্রথম পড়া গেল ও জানা গেল মুসলিম লিগের পাকিস্তান প্রস্তাবের পেছনে ব্রিটিশ-শাসকদের সরাসরি হাত কতটাই ছিল।

এতটাই ছিল যে বাংলায় জিন্নার কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর, নাজিমুদ্দিন-সারওয়ারদি-ইস্পাহানি, ছোটলাট হার্বার্টকে বোঝাতে পেরেছিলেন যে লিগ মন্ত্রিসভা ভেঙে দেয়ার পর, প্রোগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স পার্টির নেতা হিশেবে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবি সত্ত্বেও ফজলুল হককে তাড়াতাড়ি ডাকার দরকার নেই। কারণ, একটু সময় দিলে নাজিমুদ্দিনই সংখ্যাগরিষ্ঠ হবেন। জিন্নার অনুমতি নিয়ে নাজিমুদ্দিন কংগ্রেস-নেতা কিরণশঙ্কর রায়ের সঙ্গে পর্যন্ত দেখা করেন। গভর্নরের, সরকারের, ইয়োরোপিয়ান গ্রুপের ও ইংরেজ হৌসগুলির পূর্ণ সমর্থন ছিল হকশাহেবের বিরুদ্ধে ও নাজিমুদ্দিনের পক্ষে। ফজলল হককে সরিয়ে দিতে পারলে মুসলিম

প্রধান একটি প্রদেশের জিন্নাবিরোধী নেতাকে সরিয়ে দেয়া হবে। গভর্নর হার্বার্ট তাই নাজিমুদ্দিনকে সময় দিচ্ছিলেন। জিন্নার জন্য রাজনৈতিক মঞ্চ বাংলায় তৈরি করা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে তখন সবচেয়ে বেশি দরকার। লিগ মুসলমানদের একমাত্র সংগঠন ও জিন্না লিগের একমাত্র মুখপাত্র—এই রাজনীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে।

জাপান আমেরিকার বন্দর ও সেনাবাস পার্ল হারবার আক্রমণ করে বসল ৭ ডিসেম্বর। ৮ ডিসেম্বর জাপান মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। ১০ ডিসেম্বর সিঙ্গাপুরে কংগ্রেসের তিনরঙা পতাকা উড়ল। ১১ ডিসেম্বর যুদ্ধবন্দী মোহন সিং আরো সব সহবন্দীদের নিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যাল আর্মি তৈরি করে জাপানের সঙ্গে যোগ দিলেন। দিল্লি থেকে ভাইসরয়ের আদেশ এল সেই দিনই বাংলার গভর্নর হার্বার্টের কাছে—এই মুহূর্তে ফজলুল হককে ডেকে মন্ত্রিসভা তৈরি করো। ব্রহ্মদেশ ও সিঙ্গাপুর থেকে যুদ্ধ-উদ্বাস্তুদের দায়িত্ব ও পোড়ামাটি নীতি কার্যকর করার দায়িত্ব মন্ত্রিসভার ওপর ছেড়ে দাও।

হার্বার্ট হকশাহেবের কাছে গাড়ি পাঠালেন।

হকশাহেব এলে বললেন, 'মন্ত্রি কারা, ডাকুন, এখনই শপথ নিতে হবে।' হকশাহেব শরৎ বোস ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নাম লিখে দিলেন। হার্বার্ট বলে উঠলেন, 'শরৎ বোস জাপানের গুপ্তচর। তাকে অ্যারেস্ট করার জন্যই এত তাড়া। আপনি একাই শপথ নিয়ে শরৎ বোসকে অ্যারেস্ট করার অর্ডার দিন।'

হকশাহেব সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, 'আপনে দিল্লি থিক্যা ওয়ারেন্ট আনাইয়া অ্যারেস্টের কামটুক্ সাইর‍্যা আমাকে খবর কইরবেন।'

হার্বার্ট চটে উঠে বলেন, 'এটা আপনি অস্বীকার করতে পারেন না। আপনি যুদ্ধের মধ্যে প্রধানমন্ত্রি হবেন অথচ যুদ্ধকালীন দায়িত্ব নেবেন না এটা তো হিজ মেজেস্টিজ গভর্নমেন্ট মেনে নিতে পারে না।

হকশাহেব চেয়ারে আর ফিরে বসেননি, বলেন, 'হিজ মেজেস্টিজ গভর্নমেন্ট কী পারে আর কী পারে না, বিশেষ করে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সেটা তো আপনার সাংবিধানিক চালচলন থেকেই আমরা শিখতে পারছি। পূর্বতন মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র ও নতুন সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবিপত্র একই দিনে আপনার কাছে পৌঁছেছে। আপনি দশ দিন ধরে প্রদেশে একটা অনিশ্চিত পরিবেশ তৈরি করেছেন। আইনসভা খোলা, গভর্নর্স রুল হয়নি অথচ প্রদেশে কোনো সরকার নেই। আজ শরৎ বোসকে অ্যারেস্ট করার জন্য আপনার হঠাৎ মন্ত্রিসভার কথা মনে পড়ল। আমি আপনার অনুমতি নিয়েই এখন চলে যাচ্ছি। আপনি যখনই ডাকবেন, আমি তখনই আসব।'

হকশাহেব আর লাটশাহেব দু-জনই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। লাটশাহেবই নাকি প্রথম চোখ নামান, 'ওয়েল' বলে। হকশাহেব লাটশাহেবের দিকে পেছন ফিরে দরজার দিকে দু-পা এগতেই হার্বার্ট তাঁর পেছন থেকে হিসিয়ে ওঠেন, 'আপনাকে কড়ায়গণ্ডায় এই অবাধ্যতার দাম দিতে হবে ও অচিরেই।'

হকশাহেব পেছন ফিরে তাকাননি। কথাগুলো তিনি শুনলেন কী না, বোঝা যায় না।

হকশাহেব তাঁর নিউ পার্ক স্ট্রিটের বাড়িতে ফিরলেন। বাইরে লোকজন কিছু দাঁড়িয়ে—সবাই হয়তো মন্ত্রি-সংবর্ধনার জন্য তৈরি ছিল। ফুলও দেখা গেল, প্রধান দরজার পাশে। গাড়িতে কোনো ফুল নেই দেখে কেউ দ্রুত সরিয়ে নিল। কারো সঙ্গে একটি কথাও না বলে হকশাহেব দোতলায় তাঁর শোয়ার ঘরে ঢুকে বিছানায় গড়িয়ে পড়লেন। তাঁর মাথা থেকে লম্বা সারসি টুপি খুলে পড়ে থাকল বালিশের পাশে, কাত হয়ে। হকশাহেব গভীর ঘুমিয়ে পড়লেন তাঁর

নাকডাকার গুরগুর আওয়াজও শোনা গেল।

কাউকে ফোন করলেন না। শরৎ বোসকেও না।

শরৎ বোসের অ্যারেস্টের পর

১৪৭

আজ প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির নেতা হিশেবে হকশাহেব শপথ নিলেন, সে তো শরৎ বোসেরই হাতে তৈরি। শরৎ বোসের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আর উপ-প্রধানমন্ত্রি হওয়ার কথা।

'যার জন্য সিংহাসন সাজানো, তার হাতে পড়ল হাতকড়া' বাসটায় উঠতে উঠতে মনিরুজ্জমান বলে।

ওরা দোতলায় উঠতেই বাস দিল ছেড়ে, ডিসেম্বর ঠান্ডা হাওয়া ঝাঁপিয়ে পড়ল—আড়াল নেই কোনো। যোগেনের নেড়া মাথা। বাবা মারা গেছেন মাখখানেক হল, নভেম্বর। বাবার পারলৌকিক কাজ করতে যোগেন মৈস্তারকান্দি যায়। নমশূদ্রদের অশৌচ দশ দিনের। দশ দিনের দিন কামান। পরের দিন আদ্যশ্রাদ্ধ। তার পরের দিন নিয়মভঙ্গ। নমশূদ্রদের অশৌচ যে ব্রাহ্মণদের সমান, সেটা ঐ সমাজের একটা গৌরব। নিয়মভঙ্গের মেবার পতনের দিন, একদিনে দুটো টেলিগ্রাম এল কলকাতায় থেকে। এসেছে বরিশালে আগের দিন। লোক দিয়ে পরের দিন বাড়িতে দিয়ে গেছে।

একটা করেছেন শরৎ বোস—'সিচুয়েশন ডিম্যান্ডস প্রেজেন্স।' আর—একটা করেছেন—তার প্রেসিডেন্ট, ইনডিপেনডেন্ট শিডিউল কাস্ট অ্যাসেম্বলি পার্টি।

নিয়মভঙ্গ না করেই যোগেন কলকাতায় ফেরার জন্য রওনা দেয়।

এসে দেখে—হকশাহেব নিজেই মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়েছেন ও আবার মন্ত্রিসভা গড়তে চাইছেন প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পাটির নেতা হিশেবে।

বাতাসের কারণে অথবা সেই শিহরনে যোগেনের মনে পড়ে যায়, শিশির ভাদুড়ির গলায় ম্যাকবেথের শেষ সুস্থ স্বগতোক্তি—'ইফ ইট ওয়্যার ডান, হোয়েনটিস, ডান, দেন ইট ওয়্যার ওয়েল ইট ওয়্যার ডান কুইকলি।'

যোগেন জানে না, এখনো জানে না, সেই রাতে হকশাহেব মুসলিম লিগ নিয়ে যা বলেছিলেন, তা শুনতে শুনতে যোগেনের কেন মনে এসেছিল—মাত্র ঘণ্টা দেড়েক আগে শোনা শিশির ভাদুড়ীর ম্যাকবেথ। যোগেন এটা জানতেও চায় না। সে জানে—গানের একটা স্বর শুনলে বা কারো গলায় নতুন একটা আওয়াজ শুনলেও অকারণে চোখ ভিজে যায় বা গলায় যেন কিছু আটকে যায়। এরকম হয়, হয় এরকম।

'মাইঝ্যান দাদা জাইনতেন তো যে-কোনো সময় অ্যারেস্ট হইতে পারেন?'

'এ-কথা তো আর ওঁকে জিজ্ঞাসা করে জানা যায় না। আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি এর মধ্যে?' মনিরুজ্জমান জিজ্ঞাসা করে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হইছে তো। ফরোয়ার্ড ব্লকের কথা হইল। আমি কিছু কইব্যার আগেই উনি কইলেন, আপনি আবার ফরোয়ার্ড ব্লকে চলে আসবেন না যেন। আপনার তো আলাদা পার্টি আছে। তার তো আলাদা ধরনের কাজকম্ম আছে। সুভাষের অনুপস্থিতির কারণে আপনারা ক্ষতিপূরণ

করতে যাবেন না। ব্লকের সব নেতাকে তো আপনি চেনেনও না।

যোগেনের কথায় মনিরুজ্জমান বলে, একটু হাসি মিশিয়ে, 'আমাকে অবিশ্যি এর উলটোকথা বলেছিলেন শরৎবাবু। বললেন, 'ফরোয়ার্ড ব্লকের মুসলিম নেতা খুব দরকার, আপনি চেষ্টা করুন যাতে এই জায়গায় পৌঁছনো যায়, আমি আপনাকে, সাপোর্ট দেব। আমি অবিশ্যি পুরনো বা আদি ফরোয়ার্ড ব্লক।'

যোগেন হেসে বলে, 'আর, আমি তো কোনো কালেই কোনো ব্লক না। সেইডা বিশ্বাস করানো তো খাড়া—ইচ্ছে মহাসংকট। যতই কই আরে আমার তো একডা অ্যাসেম্বলি শিডিউল কাস্ট পার্টি আছে, ততই সন্দেহ বাড়ে, আরে শিডিউল তো বামুনের টিকি—সেহানে তো গোত্র নাই। তোমার গোত্রডা কী—তেওড়া না ওয়েলিংডন না সোদপুর না পটুয়াখালি? যত বলি আমার গোত্তর নাই, আমি নিগোত্রিয়্যা শুদ্দুর, আমারে গোতে নিব কেডা, তত সবাই ভাবে, আমি আসলে গুপ্তগোত্র। সেডা আবার কে য্যান শুধরাইয়্যা দিল পঞ্চম গোত্র।'

'সে তো ওদের দুর্ভাবনা। আপনার তো এ নিয়ে কোনো ভাবনা নেই?'

'ওদের, মানে, কাদের?'

'যারা আপনাকে এখনো নিজেদের গোত্রে টানতে পারেনি, শিডিউল হলেও তো গোত্র থাকে। কেউ শিডিউল কংগ্রেসি, কেউ আবার শিডিউল কংগ্রেসি গান্ধীবাদী, কেউ আবার শিডিউল কংগ্রেসি সুভাষপন্থী, কেউ আবার শিডিউল লিগপন্থী—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমাদের বড় নেতাদের তো সব পুরানা পার্টি একডা কইর‍্যা আছে, সেই যহন শিডিউল ছিল না, তহন থিক্যা। আমি তো তাইলে দাঁড়াই শিডিউলের শিডিউল।'

'শিডিউল শিডিউলই এখন বাড়বে মনে হয়, সুভাষবাবু থাকলে তো বাড়তই। লোকটাকে কাজ করতেই দিল না। যদি ধরেন, বিশ বছরের পাবলিক কেরিয়ারের আট-নয় বছরই জেলে। থাকলে তিনি শিডিউল ও মুসলমানদের নিয়ে ফ্রন্ট করতেন।

একটু চুপ করে থেকে যোগেন বলে, 'মনিভাই, কোলের সন্তান মারা যাওয়ার তিরিশ-চল্লিশ বছর পর পরশু মায়ে ভাবে, যদি পোলাডা থাইকত, তাইলে তার আর অভাব কিছু রাইখত না—'

মনিরুজ্জুমান সঙ্গে-সঙ্গে বলে, 'কয়বেটা কী মা? তার বেঁচে থাকা ছেলেদের তো আর বলতে পারে না। তাই বাধ্য হয়ে তাকে মরা ছেলের কথাই ভাবতে হয়।'

'সেডা তো বুঝি। মরা ছেলে ছাড়া মায়ের ভরসা নাই। কিন্তু আপনে-আমি তো মরা ছেলের মা না। ঐ আইনসভায় থাইক্যা দশের কাজ যেটুকু করা যায়। খুব যে দানধ্যান কইর‍্যা নেতা হইছি তাও তো না। কাজটা কী করি তাও তো বোঝনে, আসে না। এর থিক্যা বরিশালে ওকালতি করাই কি ভালো ছিল?'

'করুন। আপনাকে না-করেছে কে? এই যে এত মেম্বার তাদের একজনও কি নিজের জমিজমা চাষ-আবাদ, উকিল-মোক্তারি ছেড়ে এসে মেম্বারগিরি করে? একজনও না।'

'সে তো আমিও করি এহানে। ইনকামের দিক থিক্যা বরিশালের চায়্যা বেশিই হয়তো। শরৎবাবুর নজর তো সব দিকে।'

'আমার একটু অদ্ভুতই লাগে, জানেন। উনি তো সুভাষবাবুর বড় ভাই। কিন্তু সব সময় সুভাষবাবুকেই উঁচু করে রাখেন। যেই সুভাষবাবু অনুপস্থিত, অমনি এখানে সুভাষবাবুর সব কাজ ঘাড়ে তুলে নেন। উনি তো নিজের জোরেও কম বড় নেতা নন।'

'সেডা কি আর বলার কথা? কারো-কারো কাছে তো শুনি মাস মিটিঙে দাদা নাকি ভাইয়ের

থিক্যাও ভাল বক্তা।'

'আপনি, শোনেননি দু-জনকে, বড় সভায়?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনছি। সুভাষবাবু, একটু ঠান্ডা। শরৎ বোস গরম। কিন্তু আমার য্যান মনে হয় সুভাষবাবু বেশি কনভিনসিং। সুভাষবাবুর শরীর তো কোনো সময়েই ঠিক থাকে না। বড় দুর্বল। ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর তো রানিগঞ্জের কাছে জামুগেড়িতে ছিলেন শরীর সারাতে। বাড়ির অনেকেই তো ছিল। আমারে খবর পাঠাইছিলেন। গিয়্যা দেহি, তান্ত্রিক চিকিৎসা শুরু হইছে। কোন তান্ত্রিক নাকি বিচার কইর‍্যা কইছে যে এই দেশের কোনো একটা জায়গা থিক্যা নাকি সুভাষবাবুরে বাণ ছোঁড়া হইছে। পালটা বাণ না ছুড়লে ওঁর শরীর ভাল হবে না। বাড়ির সবাই এক তান্ত্রিক নিয়্যা আইস্যা ঐ জামগেড়িয়ার বাড়িতে [illegible] কইর‍্যা ওনাকে দুইডা আংটি আর দুইডা কবচ পর্যাইয়া দিল। আমি গিয়্যা পইড়ল্যাম এর মইধ্যে। সুভাষবাবু আমারে জিগান, যোগেনবাবু, আপনে এই সব বিশ্বাস করেন? আমি কইল্যাম—সুভাষবাবু, অবিশ্বাস করার ক্ষমতা আমার নাই বইললেও চলে, আপনারও অবিশ্বাস করার কাম নাই, দুইডা আংডি আর দুইডা কবচ নিয়্যা অত বিশ্বাস-অবিশ্বাস জুইড়বার কাম কী?'

দু-জনেই একটু হাসলেন। মনিরুজ্জমান বললেন, 'আমাদের ধর্মে আংটি-পাথর নেই কিন্তু পিরদের কবচ, দড়গার ধুলো, মশজিদের কোনো গাছের পাতা, কোন্ পুকুরের জল—এসব ছাড়া নিজেরই তো বিশ্বাস হয় না বেঁচে আছি। বেঁচে থাকার জন্য কিছু বিশ্বাস তো লাগেই।'

যোগেন খেয়াল করে ও খেয়াল করে তার ভাল লাগে যে ত্রিপুরীর পর জামগেড়িয়াতে সুভাষবাবু কিছুদিন ছিলেন শরীর সারাতে—এই খবরটা সকলে জানে না। মনিরুজ্জমান জানতেও পারেন—উনি এদের এতই আপন মানুষ। আবার, আপন মানুষ হলেও না-জানতে পারেন। তিনি সে বিষয়ে একটি ইঙ্গিতও দিলেন না। এমনকী, সবচেয়ে স্বাভাবিক প্রশ্নটাও করলেন না—যোগেনকে কেন ডেকেছিলেন সুভাষ জামগেড়িয়ায়। মানুষ শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠে কত ছোট-ছোট অভ্যাস তৈরি করে। যোগেন, তার শ্রদ্ধাটুকু জানাতে চাইল। ঘাড়টা ফিরিয়ে খুব চাপাগলায় বলে, 'আমাদের ওদিকে, বরিশালে, চাঁদসির টোটকায় খুব কাজ হয় তো। ওঁকে একটা তেল কইর‍্যা দিচ্ছিল্যাম। ওঁর নাকি উপকার দিচ্ছিল। তাই খবর পাঠাইছিলেন।'

উডবার্নের বাড়িতে

ওরা এলগিন রোডের মোড়ে নেমে, আবার একটু পেছিয়ে উডবার্নের রাস্তা ধরল। ঐ রাস্তাটা সোজা গিয়ে উডবার্ন পার্কে শরৎ বোসের বাড়ির গেটে ধাক্কা খেয়েছে।

১৪৮

মনিরুজ্জমান জিজ্ঞাসা করে, 'বাড়ির সবাই হয় তো এই বাড়িতেই আছে।'

'নাও থাইকতে পারে। এতদিন তো অপেক্ষায় ছিল কবে পুলিশ আইস্যা শরৎ বোসকে ধরব। পুলিশও আইসছে ধইরছেও ওকে-তাকে। এলগিন রোডের ঠাকুরটাকে নাকি খুব পিটাইছে। কিন্তু শরৎ বোসরে ধরে নাই। সেটা চুইক্যা গিছে। অ্যাহন তো যে যার বাড়ি ফেরার কোনো বাধা থাইকল না।'

লোহার ছোট গেটটা খোলা ছিল, ওরা ঢুকতে দেখেন দারোয়ানও টুলের ওপর বসে। ওদের

দেখেই সে ভিতরে ছুটল কাউকে খবর দিতে। মনিরুজ্জমান ও যোগেন, বাড়ির সকলেরই চেনা। দারোগা-মতন একটা লোক বারান্দায় একটা কাঠের চেয়ারে বসেছিল। সে যোগেনদের বলল, 'আপনাদের নাম-ঠিকানাটা লিখে যাবেন।' বলে, যুদ্ধের সময়কার একটা ছাই-ছাই রঙের বালিকাগজের সুতো দিয়ে সেলাই-করা খাতা এগিয়ে দিল। কিন্তু চেয়ার ছেড়ে উঠল না। মনিরুজ্জমান খাতাটা নিয়েছিল, 'দু-জনেরটাই লিখব?'

'না। যে যারটা লিখবেন।'

'আপনি কি স্পেশ্যাল ব্র্যাঞ্চ থিক্যা? যোগেনের প্রশ্নের জবাব দারোগা দিল না। ইচ্ছে করেই যে দেয়নি, সেটা বোঝাতে ঘাড়টা বাঁ-দিকে ঘুরিয়ে তাকিয়ে থাকে। মনিরুজ্জমান বলে, 'পারপাজ অব ভিজিটও লিখতে হবে আবার, টু মিট হুমও লিখতে হবে। কি লিখব?'

দারোগা ঘাড় ঘোরায় না। যোগেন বলল, 'টু ডিসকাস পলিটিকস উইথ শরৎ বোস, আর শরৎ বোস—লিখে দ্যান না। যেমন প্রশ্ন, তেমন জবাব।'

মনিরুজ্জমান একটু হেসে খাতা-কলম রেখে দিয়ে বলল, 'ও আপনি লিখে দেন, আমি পারব না।'

যোগেন খাতাটা নিয়ে খসখস করে লিখতে শুরু করে। দারোগা তখনো ঘাড় ফেরায়নি।

যোগেনের লেখা শেষ হওয়ার আগেই ভিতর থেকে শরৎ বোসের সেজোছেলে অমিয় বেরিয়ে এসে ডাকে, 'আপনারা আসুন। দে আর পার্ট অব আওয়ার ফ্যামিলি।' যোগেন লেখাটা শেষ না করেই খাতাটা ফেলে রাখার ভঙ্গিতে পেনটা বন্ধ করে পকেটে গোঁজে।

'ব্রজ খবর দিতেই মা বললেন, ওপরে নিয়ে যেতে। কিন্তু আমি দৌড়ে নেমেও তো পুলিশের অসভ্যতা থেকে আপনাদের বাঁচাতে পারলাম না।'

ভিতরে যেতে-যেতে যোগেন বলে ওঠে, 'চলেন, চলেন। আমাগ কী করব ও? ওর খাতা আছে, আমাগ কলম নাই?' যোগেন যে ঘরটিতে সুভাষের সঙ্গে কথাবার্তা বলত, সেই ঘরটির মধ্য দিয়ে ভিতরে ঢুকে বাঁ দিকে দোতলায় ওঠার চওড়া সিঁড়িতে পা রাখে।

মনিরুজ্জমান একটু হাসি মিলিয়ে অমিয়কে বলে, 'যোগেনবাবু ওরা খাতায় যা লিখে দিয়ে এসছেন, তা যদি বুঝতে পারে, তাহলে তো এতক্ষণে তের নম্বরে ফোন করেছে।'

'কী, কী লিখেছেন, যোগেনকাকু?' অমিয় যেন একটু মজার আন্দাজ পায়।'

'পারপাজ অব ভিজিট লিখেছে—শরৎ বোসের সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে। আর কার সঙ্গে দেখা করতে চাওয়ের জবাবে লিখেছে, শরৎ বোস।'

অমিয় খুব মজা পেয়ে ঝন ঝনিয়ে হেসে ওঠে, 'বেশ হয়েছে, জব্দ হয়েছে, ঠিক হয়েছে।' অমিয় লাফিয়ে-লাফিয়ে দুটো সিঁড়ি একসঙ্গে ভেঙে উঠে যায়, সম্ভবত মা-কে এই মজার খবরটা আগে জানাতে।

যোগেনরা ভিতরে ঢুকতেই বিভাবতী উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বলেন, 'কী? কতক্ষণ বসিয়ে রেখেছিল পুলিশ, আপনাদের? নীচে?'

ওরা নিজের-নিজের আসনে বলতে-বসতে, যোগেন বলে, 'বসাইবে কোথায়। কী একডা লিখতে খাতা আগাইল, সে-কাগজে তো কালি শুকায় না, শোষে। মনিভাই কী য্যান লিখছিলেন। ব্যাস, স্যালুট কইর‍্যা ছাইড়্যা দিল।'

অমিয় একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে বলে, 'আপনি যে লিখেছেন, টু টেক পলিটিক্স উইথ শরৎচন্দ্র বসু—'

'সরকারের খাতায় কি মিথ্যা কথা লেখা যায়? তাইলে তো 'অবস্ট্রাকশন অব গভর্নমেন্ট অ্যাকটিভিটিজের মামলা দিবে। আর অ্যাহন তো যুদ্ধের টাইম, তাইলে তো যা করব্যা সবই অবস্ট্রাকশন টু ওয়ার ইফর্টসে দিবে দশ বছর ঠুইক্যা। নো জামিন নো কোর্ট। তাই সত্য ছাড়িয়ে মিথ্যা কই নাই—।' যোগেনের কথায় ঘরের সবাই হেসে ওঠেন।

বিভাবতী বলেন, 'উনি সব সময় বলতেন, যোগেনের মতো গল্প বলার পাওয়ার দুর্লভ। আর সুভাষকে একদিন কী গল্প বলেছিলেন, হাসতে-হাসতে সুভাষের কলিক পেন শুরু হয়ে গেল,' বিভাবতী হাসি-হাসি মুখেই বলেন।

'আপনারা তো স্যাটকেস-হোল্ড অল অব বাইন্ধ্যা-বুইন্ধ্যা রেডি হইয়াই প্ল্যাটফর্মে বইস্যাছিলেন—না?

'সে আর বলবেন না। সুভাষ চলে গেছে ও আর ফিরবে কী না বোঝাই যাচ্ছে না। উনি আমাকে বললেন, স্যুটকেস-বেডিং গুছিয়ে রাখতে। আমি আবার বোকার মতো জানতে চাইলাম—তোমার কি কোথাও যাওয়ার কথা আছে?' বিভা আঁচল চাপা দিয়ে হাসলেন। 'উনি বললেন—বাঃ, আমার ভাই গেল নিরুদ্দেশে, তো ব্রিটিশ সরকার আমাকে ঘানি ঘোরাতে পোষ্যপুত্র রাখবে না? যে-কোনো দিন, পুলিশ আসবে। জানুয়ারি মাস তো—কোথায় না কোথায় রাখবে, আমি আবার একটা বিলেতি রাগ নিয়ে এলাম ডাক্তার দাদার কাছ থেকে। উনি তো কোর্টে বেরচ্ছেন, চেম্বার করছেন, অ্যাসেম্বলিতে যাচ্ছেন, বাড়িতে অন্য পার্টির নেতারাও আসছেন। দিনের পর দিন কাটছে। মাসও কাটে। পুলিশও আসে না। ওঁর ভাবসাব দেখে মনে হল, জেলে যাবার কথা ওঁর আর মনে নেই।' বিভা আবার আঁচলে হাসি চাপা দিলেন। 'আমিই-বা সেধে মনে করাতে যাই কেন। শুধু স্যুটকেসটা আবার নতুন করে সাজালাম—গরমের সময়ের জামাকাপড় দিয়ে। পুজো এল গেল। এবার কোথাও যাবার কথা কেউ মুখেও আনল না। আবার শীত পড়তে চলল। আবার স্যুটকেস গোছানোর কথা ভাবছি। দিন দশ-বার আগে একদিন বললেন, 'যাক, বাংলাটাকে তো এআইসিসি গোবিন্দায় নমঃ করে দিয়েছে। একটু বোধহয় বাঁচানোর চেষ্টা করা যাবে। নতুন পার্টি হল। প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি। একটা ন্যাশন্যাল গবমেন্টের মতো—লিগ টু মহাসভা। হকশাহেবই লিডার হবেন। আমাকে ডেপুটি হতে হবে আর হোম মিনিস্টার। এই গভর্নর-ছোকরার আবার কী বুদ্ধি আছে, কে জানে। প্রায় ১০ দিন কেটে গেল। কিছুতেই ডাকছে না, হকশাহেবকে। অবশেষে বেস্পতিবার সকালে পুলিশ এল।

যোগেন বলে, 'মানে কাল সকালে?'

বিভা একটু থমকে গেলেন, 'কালই বেস্পতিবার ছিল?'

'না, না, আজ সকালে আজই তো বেস্পতিবার'—মনিরুজ্জমান শুধরে দেন।

বেস্পতিবার, তো ১১-ই ছিল। ওঁকে নিয়ে গেল—ইন্ডিয়া গবমেন্টের হুকুমে, এখানকার গবমেন্টের কিছু করার ছিল না। প্রেসিডেন্সি জেলে রেখেছে। একটু আগে ফোন করেছিলেন। আজ তো শপথ ছিল, মন্ত্রিসভার, নতুন মন্ত্রিসভার। উনি বললেন, নতুন মন্ত্রিরা সবাই জেলে গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করে এসেছেন।'

বিভা যে ঘটনা বললেন, শহরের গুজব তার চাইতে আলাদা কিন্তু সে-গুজবগুলোর মধ্যে মিল নেই। শরৎবাবু অপেক্ষা করছিলেন কি পুলিশের লাইগ্যা না গভর্নরের লাইগ্যা? যোগেন একটু মজা করতে বলে, 'দেখুন, দেখুন পুলিশ কেন আসছে না। গভর্নর কেন ডাকছে না—সেই সময়ে যেন ঘুম নেই। যোগেন ও মনিরুজ্জমান এটুকু দেখে আশ্বস্ত হল যে শরৎ বোসের গ্রেপ্তারের ফলে অন্তত তাঁর বাড়িতে কারো মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েনি। সেই জানুয়ারির

মাঝামাঝি থেকে প্রায় এই এক বছর ধরে বাড়িতে একটা প্রস্তুতি তৈরি হয়েছে। সেই প্রস্তুতির ফলেই দারোগার খাতায় যোগেন কী লিখেছে—সেটাই এতটা প্রধান কৌতূহল হতে পারে।

ওঠার পরে দু-জন আলাদা করেই বিভাকে অনুরোধ করল, ছোট বড় যে-কোনো দরকারে বিভা যেন তাদের খবর দেন।

বিভা উলটে বললেন, 'আপনারা নিয়মিত খবর নেবেন। আমি কোনো খবর না দিলেও ফোন করবেন।'

মুসলিম ঐক্য নানা রকম

১৪৯

১৯৩৭-এর ১ এপ্রিল প্রজা-লিগ জোট মন্ত্রিসভা তৈরির পর থেকে শুধু মন্ত্রিসভা ও হকশাহেবকে নিয়ে গুজব থামেনি। গুজবের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—তা প্রমাণ-অপ্রমাণের উপর নির্ভর করে না। প্রত্যেকটা গুজবই আলাদা। যেমন চৈত্র মাসে ঘরের চালের আগুন পাশের চালে আগুন ধরিয়ে দেয় গুজবের ছড়িয়ে পড়া তেমন নয়। সকাম গুজবের নানা রকম উদ্দেশ্য থাকে না।

কংগ্রেস আর প্রজা পার্টি মিলে নতুন মন্ত্রিসভা হবে এটা নৌকায়-লঞ্চে, হাটেবাজারে ও নদীর সংলাপযোগ্য দুই পাড়ে—এটাই ছিল প্রধান মনোবিলাস—কী হবে হকশাহেবের মন্ত্রিসভা, কে কী মন্ত্রি হবেন—কংগ্রেসের ও প্রজার।

কিন্তু কংগ্রেস হাইকম্যান্ড অন্য কোনো পার্টির সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা তৈরি নিষিদ্ধ করে দেয়ার ফলে ঐ হালকা মনোবিলাসী খেলা বন্ধ হয়ে গেল। রাতারাতি প্রজালিগ মন্ত্রিসভা হয়ে যাওয়ায় গুজব ক্রমেই ভৌতিক হয়ে উঠল। 'হকশাহেবকে জানো না? দেবে একদিন সারওয়ারদিকে কুপোকাত করে।' 'নির্লজ্জডা কেডা? হকশাহেব না খাজা? পটুয়াখালি থিক্যা খাজারে ডুবাইয়া যে-পোশাকে তারে ছাড়া হইল—তাতে তার সঙ্গেই আবার ঘর করা?' 'হকশাহেব এই মন্ত্রীসভা ভেঙে দিয়ে নতুন মন্ত্রিসভা বানাবেন বলে কংগ্রেস, মহাসভা, ন্যাশন্যালিস্ট ও নির্দল সব হিন্দু নেতাদের সঙ্গে শলা পরামর্শ করছেন। যতবারই যোগেন শোনে প্রত্যেকবারই যেন প্রথম শোনে।

জে. সি গুপ্তের বাড়িতে হকশাহেবের সঙ্গে লিগবিরোধী পার্টিগুলির নেতাদের বৈঠকের মেনু পর্যন্ত যোগেন শুনেছে।

এও না-হয় বোঝা যায়। হকশাহেব যে গুজবটা ছড়াতে বলেছিলেন যোগেনকে, সেই কাজে তিনি নিশ্চয়ই আরো অনেককে লাগিয়েছেন। সবাইকে নিশ্চয়ই এক কায়দায় বলেননি। কিন্তু কথাটার আন্দাজ যাতে শ্রোতার কাছে নির্ভুল পৌছয় সেটা নিশ্চিত তিনি খেয়ালে রেখেছেন। আবার এই একই সময় জুড়ে হকশাহেব এমন সব আইন পাশ করিয়ে নিচ্ছেন আইনসভায়, প্রথম ধাক্কায় যে-সব আইন নির্লজ্জ মুসলমান-পক্ষপাতী বলে মনে হতে পারে। এমন কী একজন গোঁড়া মুসলমানেরও তেমন মনে হতে পারে।

ক্যালক্যাটা মিউনিসিপ্যাল (সংশোধন) আইন, মধ্যশিক্ষা সংস্কার আইন, সব জিলায়

ঋণ-সালিশি বোর্ড গঠন, কৃষক ঋণ (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, মহাজানি আইন, বন্ধকি ও অবন্ধকি ঋণের সর্বোচ্চ সুদ আইন, মুসলিম অধ্যুষিত পার্ক সার্কাসে ১০০ শতাংশ সরকারি খরচে মুসলিম মেয়েদের জন্য লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ প্রতিষ্ঠা, সংস্কৃত কলেজ-টোল-বৌদ্ধ বিদ্যালয়ের গ্র্যান্ট বন্ধ করা, কলাকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যান্টও অংশত কাটা, গ্রাম-উন্নয়ন প্রকল্পের তহবিল বাড়ানো, ২৭ জন জিলা গ্রামীণ উন্নয়ন অফিসার নিয়োগ, ২৬ জন প্রচার-অফিসার নিয়োগ, থানা-ওয়ারি ২৫০ সংগঠক নিয়োগ, সংগঠকের সংখ্যা বাড়িয়ে ৬০০ করা হবে, নির্দিষ্ট খাত থেকে উন্নয়ন প্রকল্পের খরচ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে পাঠানো বন্ধ, গ্রামীণ প্রকল্পগুলির জন্য অনেক অফিসার নিয়োগ, 'আইন ও প্রশাসনের সাহায্যে শ্রমিককল্যাণের কাজ ও সালিশি মারফৎ শিল্পগত সমস্যা মেটানোর' ঘোষিত শিল্পনীতি, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ট্রাইবুন্যালকে কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ব্যবহার, লোক্যাল বোর্ডগুলির ওপর লিগের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও সাংগঠনিকভাবে মুসলিম লিগের সভ্য ও শাখা বাড়ানো আর সাংস্কৃতিক দিক থেকে ইসলামের বিপন্নতা ও শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বাস প্রচার ও সেই উদ্দেশ্যে মোল্লা-মশজিদের ওপর নির্ভরতা বাড়ানো।

তিন বছর আগে যোগেনকে যে এই কথা বলেছিলেন, তার মানে তো এই না যে ১৯৩৮-এর পুজোর আগের সেই রাতে সেই প্রথম হকশাহেব তাঁর কর্মসূচি তৈরি করলেন। হকশাহেব সম্পর্কে সবচেয়ে প্রচলিত ভুলধারণা হল—তিনি অস্থিরমতি, কখন কী করে বসবেন ঠিক নেই, তাঁর ওপর নির্ভর করা যায় না। এই ভুলধারণা অন্য এক ভাষাতেও প্রচলিত—তিনি স্বার্থপর, সুযোগসন্ধানী ও বিশ্বাসঘাতক।

এই ধারণা প্রচলের একটা ইতিহাস ও তখনকার রাজনীতিতে অভ্যস্ত অনেকগুলি আদবকায়দার ব্যতিক্রমণ আছে। বিশের দশকের গোড়ায় চিত্তরঞ্জন দাশের 'স্বরাজ্য দল' প্রতিষ্ঠা ও কাউন্সিল—ভোটে দাঁড়ানো থেকেই রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে উপদল, উপদলের মধ্যে আরো উপদল, উপদলের নেতার জাতীয় নেতা হয়ে ওঠার জন্য নানা বোঝাপড়া—এই সব অভ্যাস তৈরি হয়েছিল, এটাই রাজনীতির প্রধান ও একমাত্র উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সবচেয়ে পুরনো ও বড় রাজনৈতিক দল হিশেবে কংগ্রেসেই এটা সবচেয়ে বেশি ঘটেছিল। হকশাহেবকে নিয়ে কোনো উপদলের উপদল তৈরি করা যেত না। হকশাহেব কখনো উপদল-তৈরির মধ্যে যেতেন না যদি সেই উপদলের উদ্দেশ্য ও তাঁর উদ্দেশ্য এক না হত। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে গেলে তিনি আর সে উপদলের থাকতেন না।

হকশাহেব প্রধানত কলকাতার লোক ছিলেন না।

কলকাতার প্রধানত অবাঙালি ও কিছুটা বাঙালি মুসলমান সমাজের মধ্যে খেয়োখেয়িটাই ছিল একমাত্র কাজ। দ্বিতীয় গোলটেবিলের পর মহম্মদ আলি জিন্না আর ভারতে ফেরেননি। লন্ডনে প্র্যাকটিস করছিলেন ও ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ঢোকার একটা আসন খুঁজছিলেন। ১৯৩২-এর নভেম্বরে সাম্প্রদায়িক রোয়দাঁদ ঘোষণার পর কলকাতার কয়েকজন শিক্ষিত, উদ্যোগী ও সম্মানিত মুসলমান নিউ মুসলিম মজলিশ নামে একটি প্রতিষ্ঠান পত্তন করেন। কলকাতায় 'নিউ মুসলিম মজলিশ'-এর নেতা ছিলেন—খাজা নুরুদ্দিন সিদ্দিকিমুজিবর রহমান ও ইস্পাহানিদের ছোট ভাই। এই চারজনের উদ্দেশ্য ছিল, কংগ্রেসের ক্রমহিংস মুসলিম-বিদ্বেষ ও সারওয়ার্দি, নাজিমুদ্দিন, গজনভিদের সংকীর্ণ মতলববাদি থেকে কলকাতার মুসলিম সমাজকে দায়িত্বশীল, নিঃস্বার্থ, দাঙ্গাবাজিমুক্ত ও রাজনৈতিক বিকল্পের পক্ষে জড়ো করা। আসন্ন পৌরনির্বাচন তাঁদের সুযোগ করে দিল। প্রত্যেক ওয়ার্ডে একজন সম্ভাব্য প্রার্থীকে নিয়ে সংগঠন তৈরি হল। এরা একটা মুসলিম চেম্বার অব কর্মাস তৈরির চেষ্টাও শুরু করল।

হকশাহেব ১৯৩২-এর জুলাইয়ে মুসলিম জমিদার, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও কাউনসেলারদের নিয়ে 'নিখিল বঙ্গ মুসলিম সম্মিলন' করলেন ও ঐ বছরের শেষ ছ-মাস জুড়ে কলকাতার নানা শ্রেণির নানাবৃত্তির মুসলমানদের সঙ্গে একাধিক মিটিং করতে লাগলেন—জাহাজে লশকর, খলিফা-দর্জি, কসাই, ছোট দোকানদার, বড়বাজারের পাইকার, কলকাতার একটু বাইরের জেলা। হকশাহেব এই নতুন সমারেশের প্রধানতম নেতা হয়ে উঠলেন। ১৯৩৩-এর ১২ অক্টোবর 'স্টেটসম্যান' কাগজে হকশাহেবের একটা চিঠি বেরল, 'যে কোনো বিচারকের সামনে যদি আমি প্রমাণ করতে না-পারি যে বাঙালি হিন্দুরা হল মূর্তিমান সাম্প্রদায়িকতা আর তার ভিত হল এই হিন্দুদের চূড়ান্ত স্বার্থপরতা—তা হলে, আমি ফাঁসি যেতে রাজি আছি।' হকশাহেবই বাঙালি মুসলমানদের প্রথম জানালেন, এই প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিশেবে প্রাপ্য মান মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা আদায়ের সময় এসে গেছে। তার জন্য যতটা এক হওয়া সম্ভব হতে হবে। এখন আর দেরি নয়। এখন মুসলমানদের নিজেদের জানারও জানানোর সময়।

তখন কোথায় জিন্না?

সত্যি করেই তো হকশাহেব এই মুসলিম ঐক্য তৈরি করেছিলেন। তিনিই তো খিদিরপুর ডকের বাঙালি লশকরদের ইউনিয়ন করার পথ খুলে দিয়েছিলেন সারওয়ারদিকে। হকশাহেবের চেলা দাউদ ছিল ওখানকার সব ইউনিয়নের বড় পান্ডা। দাউদকে বলে দিয়েছিলেন, সারওয়ারদিকে জায়গা করে দিতে।

মাত্র দু-তিন বছর পরে লন্ডন থেকে ফিরে জিন্না এসে মুসলিম লিগ পার্লামেন্টারি বোর্ড আর ইউনাইটেড মুসলিম লিগের খাঁচায় হকশাহেবকে পুরতে চাইলেন, হকশাহেব ঝিমুতে-ঝিমুতে সে খাঁচায় ঢুকলেন। মুসলিম ঐক্যের জন্য সারা ভারতে একটা আকঙ্ক্ষা তৈরি হচ্ছে। হকশাহেব আলাদা থাকতে চান না।

লাহোর প্রস্তাব ৫ মার্চ ১৯৪০

মুসলিম লিগের লাহোর সম্মেলনে হকশাহেব, জিন্না ও আরো সব মুসলিম নেতারা পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করে সেই আকাঙ্ক্ষিত ঐক্য আকার দিলেন। প্রস্তাব উদ্ঘাটন করলেন ফজলুল হক।

১৫০

সারা প্যান্ডেলের হাজার হাজার ডেলিগেট সমুদ্রের আওয়াজ তুলে সেই প্রস্তাবটিকে প্রায় স্বর্গীয় নির্দেশ মনে করে শুনল। আবেগে কারো-কারো চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। কেউ-কেউ মাটিতে মাদুর বিছিয়ে হাঁটু ভাঁজ করে পদতল মুড়ে দিয়ে আল্লার দোয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জানালেন, দুই হাতের তেলো জড়ো করে। অত বড় সম্মিলনে সকলেই যে এমন আচরণ করছিলেন, তা নয়। কিন্তু হকশাহেব যখন প্রস্তাবটি পড়ছিলেন, তখন সেই সমাবেশ থেকে এইরকম আচরণ ও ব্যবহারই দেখতে পান। যাঁরা অতটা আবেগপ্লুত হননি, তাঁরাও নিজেদের জায়গায় বসে হাসি-হাসি মুখেই শুনছিলেন। জনসভার বক্তা হিশেবে হকশাহেবের সমতুল্য পাওয়া মুশকিল। তিনি টের পেয়ে যেতেন, তাঁর কথা যারা শুনছে, তারা তাঁর কথার কী মানে করছে। লাহোরে হকশাহেব এই প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া দেখে, মাঝেমধ্যে হঠাৎ প্রস্তাব থেকে চোখ তুলে তাকাচ্ছিলেন। সমাবেশের হাততালি উচ্চতর হত।

কখনো-বা হকশাহেব 'আই রিপিট' বলে একটি বাক্য আবার পড়ছিলেন।

১. হোয়াইল অ্যাপ্রুভিং অ্যান্ড এনডর্সিং দি অ্যাকশন টেকন বাই দি কাউন্সিল অ্যান্ড দি ওয়ার্কিং কমিটি অব দি অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগ, অ্যাজ ইনডিকেটেড ইন দেয়ার রেজোলিউশন ডেটেড দি 27থ্ অব অগাস্ট, 17থ্ অ্যান্ড 18থ্ অব সেপ্টেমবার অ্যান্ড 22ন্ড অব অক্টোবর 1939, অ্যান্ড অব ফেব্রুয়ারি 1940 অন দি কনস্টিটিউশন্যাল ইস্যু, দিস সেসন অব দি অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগ এমফেটিক্যালি রিইট্যারেটস দ্যাট দি স্কিম অব ফেডারেশন এমবডিড ইন দি গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, 1935 ইজ টোট্যালি আনস্যুটেড টু অ্যান্ড আনওয়ার্কেবল ইন দি পিকিউলিয়ার কনডিশনস অব দিস কানট্রি অ্যান্ড ইজ অল টুগেদার আনঅ্যাকসেপ্টবল টু মুসলিম ইন্ডিয়া।

২. ইট ফার্দার রেকর্ডস ইটস এমফ্যাটিক ভিউ দ্যাট হোয়াইল দি ডিক্লেয়্যাশন ডেটেড দি 18থ্ অব অক্টোবর, 1939 মেড বাই দি ভাইসরয় অন বিহাফ অব হিজ মেজেস্টিস গভর্নমেন্ট, ইজ রিঅ্যাসিয়োরিং ইন সো ফার অ্যাজ ইট ডিক্লেয়ারস দ্যাট দি পলিসি অ্যান্ড দি প্ল্যান অন হুইচ দি গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1935 ইজ বেসড উইল বি রিকনসিডার্ড ইন কনসালটেশন হুইথ ভেরিয়াস পার্টিজ, ইনটারেস্ট অ্যান্ড কমিউনিটিজ ইন ইন্ডিয়া, মুসলিম ইন্ডিয়া উইল নট বি স্যাটিসফায়েড আনলেস দি হোল কনস্টিটিউশন্যাল প্ল্যান ইজ রিকনসিডার্ড ডি নোভো, অ্যান্ড দ্যাট নো রিভাইজড প্ল্যান উড বি অ্যাকসেপটেবল টু দি মুসলিম আনলেস ফ্রেমড উইথ দেয়ার আপ্রুভ্যাল অ্যান্ড কনসেন্ট।

৩. রিজলভ্ড্ দ্যাট ইট ইজ দি কনসিডার্ড ভিউ অব দিস সেশন অব দি অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগ দ্যাট নো কনস্টিটিউশন্যাল প্ল্যান উড বি ওয়ার্কেবল ইন দিস কান্ট্রি অর অ্যাকসেপটেবল টু দি মুসলিম আনলেস ইট ইজ ডিজাইন্ড অন দি ফলোয়িং বেসিস, দ্যাট জিয়োগ্রাফিক্যালি কনটিগুয়াস ইউনিটস আর ডিমার্কেটেড ইনটু রিজিয়নস হুইচ সুড বি সো কনস্টিটিউটেড উইথ সাচ টেরিটোরিয়াল রিঅ্যাডজাস্টমেন্টস অ্যাজ মে বি নেসেসারি দ্যাট দি এরিয়াজ ইন হুইচ দি মুসলিম আর নিউম্যারোটিকালি ইন এ মেজরিটি, অ্যাজ ইন দি নর্থ-ওয়েস্টার্ন অ্যান্ড ইস্টার্ন জোনস ইন ইন্ডিয়া, সুড বি গ্রুপড টু কনস্টিটিউট 'ইনডিপেনডেন্ট স্টেটস', ইন হুয়িচ দি কনস্টিটুয়েন্ট ইউনিটস স্যাল বি অটোনমাস অ্যান্ড সোভরেন : দ্যাট অ্যাডিকোয়েট, ইফেক্ট অ্যান্ড ম্যানডাটেরি সেফগার্ডস সুড বি স্পেসিফিক্যালি প্রোভাইডেড ইন দি কনস্টিটিউশন ফর দি মাইনরিটিজ ইন দি ইউনিটস অ্যান্ড দি রিজিয়নস ফর দি প্রোটেকশন অব দেয়ার রিলিজিয়াস, কালচারাল, ইকনমিক, পলিটিক্যাল, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যান্ড আদার রাইটস অ্যান্ড ইনটারেস্টস ইন কনসাল্টেশন উইথ দেম।

দিস সেশন ফারদার অথরাইজেস দি ওয়ার্কিং কমিটি টু ফ্রেম এ স্কিম অব কনস্টিটিউশন ইন অ্যাকর্ড্যান্স উইথ দিজ বেসিক প্রিন্সিপলস, প্রোভাইডিং ফর দি অ্যাজামশন ফাইন্যালি বাই দি রেসপেকটিভ রিজিয়নস অব অল পাওয়ার্স সাচ অ্যাজ ডিফেন্স, এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স, কমিউনিকেশন, কাস্টমস অ্যান্ড সাচ আদার ম্যাটারস অ্যাজ মে বি নেসেসারি।

কংগ্রেস ও পাকিস্তান প্রস্তাবের পর হক ও সুভাষের কর্পোরেশন দখল

হকশাহেব সংশোধিত আইনে ১৯৪০-এর ২৮ মার্চ কর্পোরেশনের ভোট হল। কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত সুভাষচন্দ্র বাংলার 'সাসপেন্ডেড' কংগ্রেসের সঙ্গে হিন্দু মহাসভার এক চুক্তি করার

১৫১

চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সুভাষচন্দ্র ও শ্যামাপ্রসাদ একসঙ্গে কাজকর্ম শুরু করলেন, তিল-তিল করে ছ-জনের কমিটিও হল। কিন্তু ভোটের আগে সব ভেস্তে গেল। সরকারি প্রদেশ কংগ্রেস বা অ্যাড হকরা হিন্দু মহাসভার সঙ্গে ভোটচুক্তি করায় সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে একই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক কংগ্রেস বিরোধী ও দুর্নীতিপরায়ণ বলে ছাপার অক্ষরে ও মুখের কথায় অকথ্য নিন্দে করতে লাগল। শেষ মুহূর্তে ভেস্তে যাওয়ায় তারা এই বোঝাবুঝির চেষ্টাকে 'ন-দিনের খেল' বলতে শুরু করল। কলকাতার মাঠঘাটে পার্কপথে দুই কংগ্রেসের দাঙ্গা হাঙ্গামা প্রায় নিত্যকার ব্যাপার হয়ে উঠল। শহরের হিন্দুরা পড়ল জাঁতাকলে—দুই হিন্দু দলের মারামারিতে। যা-হোক, হিন্দু মহাসভার সঙ্গে ভোটের জোট ফেঁসে যাওয়ায় সুভাষচন্দ্র প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মুসলিম লিগের সঙ্গে জোট করে ফেললেন। তিনি সর্বত্র বক্তৃতা দিতে লাগলেন যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বিখ্যাত 'বাংলা প্যাক্টের' (১৯২৪) মতই, 'বোস-লিগ প্যাক্ট বাংলার সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে নতুন চেহারা দেবে।' 'এই প্যাক্ট সারা ভারতের হিন্দু-মুসলমানের সংঘাতের অবসান ঘটাবে।' 'দুই সম্প্রদায় একসঙ্গে কাজ করার একটি মঞ্চ পেল, ঠিক যখন কংগ্রেস আর সেই মিলনমঞ্চ হিশেবে বাতিল হয়ে গেছে।'

হিন্দু মহাসভার সঙ্গে ভোটের চুক্তিটা হয়ে গেলে সুভাষচন্দ্র কী ব্যাখ্যা দিতেন? সেটাও কি হত বোস-মহাসভা প্যাক্ট? সেটাও কি হত হিন্দুদের মধ্যে দ্বন্দ্বসংঘাতের অবসান ঘটানোর জন্য ওই বেঙ্গল প্যাক্টেরই সমতুল্য?

হকশাহেব সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে একটা সর্বদলীয় সম্মিলন ডাকলেন। সম্মিলন শুরু হতেই হিন্দু মহাসভা থেকে আপত্তি করা হল—এ সম্মিলনে কংগ্রেসকে কেন ডাকা হল?

এই সব আইনে হিন্দু-মুসলমান সব গরিব বা আধা-গরিব গ্রামীণ মানুষের উপকার। জমিদার-মহাজনদের লুটপাটে বাংলার কৃষি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। সেখানে মহাজনি নিয়ন্ত্রণে, মজা খাল খননে, ইউনিয়ন বোর্ডের ডিসপেনসারি বাড়ানোয় গ্রামের সব মানুষেরই উপকার। বাংলায় মুসলমান কৃষক বেশি বলে, মুসলিমদের সংখ্যাগত উপকার বেশি। নতুন-নতুন পদ তৈরি করে সাম্প্রদায়িক অনুপাত রক্ষা করে আধা-শহুরে মুসলিম ম্যাট্রিকুলেট, আন্ডার ম্যাট্রিক, গ্র্যাজুয়েট ও আন্ডার গ্র্যাজুয়েটদের চাকরির সংস্থান—এ-সবও তো পুরনো অবিচারের সংশোধন। এমন একটা মুসলিম জাগরণ তো সাংস্কৃতিক আকাঙ্ক্ষার জন্ম দেয় খুব স্বাভাবিক গতিতে। ইসলাম ধর্মের আচার-আচরণ সংখ্যায় অনেক বেশি ও দৈনন্দিন। সেগুলি ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে পালনও করা যায়। যেখানে কিছু মুসলিম-বসতি আছে সেখানেই, মাটির হলেও, একটা মসজিদ থাকে—নইলে সুন্নত, শাদি, দাফন কী করে হবে? মসজিদ আছে, মুসলিম-বসতি আছে, মোল্লা-কাজি আছে, ইসলামি সরকার আছে, মুসলমান অফিসারও আছে, ক্ষমতা একা জমিদারবাবুর না। এমন একটা অবস্থায় পিররাও এসে জোটে, কিছু ইসলামি কাণ্ডকারখানা দেখায়, কিছু দিজহরি তাড়ায়, কোরাণ নাম করে কিছু বলে। হিন্দুদের গুরুর শেষ নেই, ইসলামের পিরের শেষ নেই।

এমন একটা ইসলামি প্রদেশ তো তৈরি হচ্ছিল ৩৭ সাল থেকে ৪১ সালের মধ্যেই, ফজলুল হকশাহেবের প্রধানমন্ত্রিত্বে ও নেতৃত্বে। মুসলিম লিগের বাংলা শাখার সভাপতিও হকশাহেব।

কিন্তু এই পুরো সময়টা জুড়ে হকশাহেব এমন ইসলামি বন্যা তৈরি করতে-করতেই ইসলাম-দ্বেষী হিন্দু মহাসভা, এক-এক প্রদেশে এক-এক রকমের সাম্প্রদায়িকতার ধ্বজাধারী কংগ্রেস, ন্যাশন্যালিস্ট নামের গোঁড়া হিন্দু সংগঠন, গান্ধী সেবাসমিতির মত প্রতিষ্ঠান—এঁদের সঙ্গে গোপন সমঝোতা কী উপায়ে তৈরি করতেন ও তাঁরাই-বা হকশাহেবকে ভরসা করতেন কী করে? কেনই-বা করতেন বিশ্বাস? হকশাহেব তো কথা না-রাখার জন্য বিখ্যাত ও কুখ্যাত।

হয়তো-বা সেই কাররেই হিন্দু বাঙালিরা হকশাহেবকে ভরসা করতেন। একরকমের শেষ ভরসা। এই হিন্দু বাঙালিদের 'ভদ্রলোক' বা 'বাবু' বলা হয়ে থাকে। হকশাহেবের ওপর নির্ভরতার শিকড় ছিল আরো গভীরে, মাটির অন্তত কিছুটা ভিতরে, গ্রাম-গ্রামান্তরে চাষিদের মধ্যেও, যারা আচম্বিতে জেনে ফেলছে তাদের হিন্দু-পরিচয়ের প্রাধান্য ও সংকট।

ধর্মান্ধগত্য থেকে জাতিবোধ, জাতিরক্ষণ আর আত্মরক্ষা একার্থক হয়ে যাওয়া, আত্মরক্ষার বাধ্যতা থেকে চণ্ড রিরংসা তৈরি করে তোলা, সেই রিরংসার তৃপ্তি এক তীব্র তুঙ্গ শকুন ক্ষমতায় পৌঁছে। একমাত্র তেমন ক্ষমতার বসেই বিধর্মী পরিচয়ের কাউকে খুন করে ফেলাটাও নৈতিক মর্যাদা পেয়ে যায়। এটা নিশ্চয়ই দঙ্গল পাকিয়ে একটা স্বপরিচয় লাভের জটিল, গভীর, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলেই ঘটে।

কিন্তু মানুষের চেতনার গভীরতা তো সুইমিং পুলের স্বচ্ছ জলরাশির মত মাপা নয়, তেমন দৃশ্যও নয়। বরং সে গভীরতা স্তরে-স্তরে আলাদা, ক্ষণে-ক্ষণে ডুবে যেতে হয়, ভেসে থাকতে হয়, জলের অদৃশ্য তলদেশ হয়ে ওঠে পাহাড়ের খাড়াই।

গভীরতার গভীরতা থেকে চেতনা ও বিশ্বাসের উত্থান ওই রিরংসার নেশার মতই উঠে আসে। হকশাহেবকে নির্ভর করা যায় না—এই রটনাই তাঁকে হিন্দুদের কাছেও গ্রহণযোগ্য রেখেছে। হকশাহেবের পার্টিও একটা নয়। লিগও তাঁর, কেপিপিও তাঁর, কংগ্রেসের দরজা তো তাঁর জন্য হাট করে রাখা, এমনকী হিন্দু মহাসভার ওপরও তাঁর দখল। দরকার বুঝলে, তিনি দুপুরের ঘুম দিয়ে উঠেই একটা নতুন পার্টি খাড়া করতে পারেন। তাহলে হিন্দুদের ভরসা তিনি হবেন না কেন—হিন্দু বাঙালি ভদ্রলোকের বা চাষির?

এমন ভরসার অর্থনীতিও আছে একটা

হকশাহেব ভোটে জিতলেন—বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদ ও চাষির ভাত ডালের ব্যবস্থার কথা তুলে। এটা দুটো কথা না। এটা একটাই কথা—জমিদারি যদি না থাকে, তাহলে চাষির ডালভাতের অভাব হবে কেন। চাষি যে বেঁচে আছে সেটা ধরে নিতে হয়। জমির বন্দবস্ত থেকে জমিদারকে যদি বাদ দেয়া হয়, তাহলেই চাষি মৃতসঞ্জীবনীর স্বাদ পাবে। ঋণের বোঝা নেই, ভাগের দায় নেই, আবোয়াবের অনিশ্চয়তা নেই, মালিক নেই—এর বাইরে কোথাও চাষির মুক্তি নেই। সেই মুক্তি দিতেই ফজলুল হক-এর হেফাজতি।

এর পাশাপাশি লিগের ইসলামি দায়িত্ববোধের স্লোগ্যান, কথায়-কথায় নবী আর কোরানের কথা, হিন্দুদের জাত তুলে গাল দেয়া—ভেসে গেল। লিগ ভয় দেখাচ্ছিল কেয়ামতের দিনের কথা বলে। কেয়ামত তো অনেক অনেক কাল পরের ব্যাপার, খেতির মালিকানা তো দিন কয়েক বা মাসখানেকের ব্যাপার। মাসখানেক পরে কেয়ামতের কথা ভাবলে কী আর এমন দেরি হবে?

আইনসভা শুরু তো হয়েছিল একশটা জয়ঢাকের আওয়াজে। মাত্র ৮-৯ বছর আগে বেঙ্গল টেনান্সি অ্যাক্টের যে সংশোধন কংগ্রেস-লিগ মেম্বাররা তুলে নিতে বাধ্য করেছিল, সেই

সংশোধনে এখন কংগ্রেস-লিগ বারদশেক ঢোঁক গিলে, আর, বারবিশেক বিষম খেয়ে, হেঁচকি তুলতে-তুলতে রাজি হল। রাজি না-হয়ে উপায় ছিল না। কারণ, কৃষক প্রজা পার্টির সমাবেশগুলো ক্রমেই বড় হচ্ছিল আর ফজলুল হকশাহেব চাষি-জনতার নামে নবাব-জমিদার নাজিমুদ্দিনকে কীর্তনখোলার অঢেল গভীরে পুঁতে দিয়েছেন।

নিষ্পত্তি হয়েই গেছে, এখন শুধু সার্টিফিকেটটুকু চাই। কাউন্সিল থেকে সংশোধন এল আইনসভায়। সে-সংশোধনে কিছু তো আর বাকি থাকল না—রায়তি জমি রায়ত বিক্রি করতেও পারবে। কারো অনুমতি দরকার নেই, জমিদারেরও না। কেনাবেচার জন্য জমিদার কোনো সেলামি পাবে না। দখলি চাষির জমি দখলি চাষিরই থাকবে। সকলেই বলে হ্যাঁ, কিন্তু আইন আর পাশ হয় না। কেন যে হয় না, তাও কেউ জানেও না, বলেও না। একটা আইন নিয়ে যদি এত দিন ধরে এত কথা হয়, তাহলে কথার আঁকশি তো বেরবেই। কোনো মেম্বার বললেন, এই-যে জমিদার-জোতদার-রায়ত-দখলি রায়ত-আন্ডার রায়ত ভাগাভাগি এটা বাংলা প্রদেশের সর্বত্র এক নয়। বরিন্দ্ থেকে দিনাজপুর—পুব রংপুর-ডুয়ার্সে খাশজমি চুকানিদার নিয়েছে সরকার থেকে। সেখানে দর চুকানিদার-নিম চুকানিদার হয়ে জমিচাষ করে আধিয়ার। সে-আধিয়ারকে কি দখলি চাষি বলা যায়? না, বলা যায় না। কারণ আজ সে যে-জমিতে হাল দিয়েছে, চার মাস পরে জোতদার তাকে আর-এক জমিতে পাঠাবে।

তাহলে একটা সংশোধন হোক—একদাগে বার বছর চাষ দিলে তাকে দখলি চাষি ধরা হবে।

তার চাইতে এই সংশোধনটা ভাল হত না—বার বছরের কম মেয়াদে কোনো জমিতে আধিয়ার লাগানো চলবে না?

এ কি একটা সংশোধন? চাষ করা কি সরকারি চাকরি—প্রথমে টেম্পরারি ১২ বছর, ১২ বছর পর পার্মানেন্ট, পার্মানেন্টের পর পেনশন। এসব গোলমালে যাওয়ার দরকার কী? দেড়শ বছরের একটা ব্যবস্থা বদলাতে হলে, সব দিক দেখেশুনে ভেবেচিন্তে করতে হবে। দাও বিল পাঠিয়ে সিলেক্ট কমিটিতে।

হল সিলেক্ট কমিটি। তারা তাদের সময় নিয়ে রিপোর্ট দিল যে এ-ব্যাপারে একটা কমিশন বসানো দরকার। কমিশন নিয়োগ করতে লাটশাহেবের অনুমতি দরকার। ফাইল গেল লাটশাহেবের কাছে। গেল তো গেলই—স্রোতে যেমন ভেসে যায়। ফেরৎ আর আসে না। সমুদ্র যেমন ফিরিয়ে দেয়। শেষে কোনো একসময় হকশাহেব একজন প্রাক্তন বিচারপতি চাইলেন হাইকোর্টের কাছে। যাকে চেয়েছিলেন তাকে পাওয়া গেল না। তখন আর-একজনকে চাইলেন। তাকেও পাওয়া গেল না। চাওয়া—না-পাওয়া—আবার চাওয়া—আবার না-পাওয়া, আবার...এই সব হতে-হতে কয়েকমাস কেটে যায়। দু-একজনের খেয়াল থাকে, বেশির ভাগেরই থাকে না। শেষে এক শাহেব পাওয়া গেল—ফ্লাউড কমিশন। সেই শাহেব খুব খাটাখাটনি করে রিপোর্ট দাখিল করলেন পাঁচ খণ্ডে। তাঁর কাছে যত লোক ও দল তাদের মত জানিয়েছেন সে সব থাকল রিপোর্টে। সঙ্গে তাঁর অনেক সুপারিশ। বাংলার ভূমিব্যবস্থা নিয়ে এই প্রথম বিশাল কাজ আইনসভায় পেশ করাও গেল না।

বেঙ্গল টেনান্সি বিল হারিয়ে গেল

ইতিমধ্যে ৩৯ সালের ২ সেপ্টেম্বর বড়লাট লর্ড লিনলিথগো ফিসফিসিয়ে রেডিয়োতে জানিয়েছেন—ভারত যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন। জার্মানির বিরুদ্ধে।

১৫২

যুদ্ধ কাকে বলে সেটা ভারতের লোকজন একেবারে জানত না, তা নয়। প্রথম মহাযুদ্ধে তো বেশ বড় একটা পল্টনই যুদ্ধ করেছিল পশ্চিম এশিয়ায়। কিন্তু যুদ্ধ নিজের দুয়োরে ঘটলে কী হয় তা বাঙালিরা জানল—সিঙ্গাপুর জাপানের দখলে চলে যাওয়ার পর তামিল ও সিঙ্গাপুর আর ব্রহ্মদেশে আর মালয়ে যারা ছিল বাঙালি, ভারতীয়, তারা বার্মা রোড ধরে পায়ে হেঁটে বাঁচতে ছুটল নাগা পাহাড়ের দিকে। এদিকে সিঙ্গাপুরেই 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি', 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' তৈরি হয়ে গেছে ও তার সর্বাধিনায়ক সুভাষ তখন নেতাজি, কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত সুভাষ, দেশ থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসিত সুভাষ, কলকাতার সুভাষের গলা শোনা গেছে রেড়িয়োতে। আজাদ হিন্দ ফৌজ পৌঁছে গেছে কোহিমায়। ভারত সরকারের যুদ্ধবিভাগ ঘোষণা করে দিয়েছে পোড়ামাটি নীতি। নৌকো ভেঙে দাও, সাঁকো ভেঙে দাও, বাঁশবন পুড়িয়ে দাও, ধানের গোলা ও মাঠের ধান জ্বালিয়ে দাও। শত্রু যদি বাংলায় ঢোকে, তাহলে সে যেন কোনো খাবার বা যানবাহন না পায়। সারা প্রদেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ। কৃষক জমিজমা ফেলে চলেছে শহরে, কলকাতায়, ভিক্ষা মাঙতে। তখন ফ্লাউডই-বা কে, তাঁর কমিশনই-বা কী, তাঁর পাঁচ খণ্ডের প্রমাণপত্র ও সুপারিশই বা কে। যে-কৃষক সপরিবার হারিয়ে যেতে টাউনে আসছে—টাউনে কত গলিঘুঁজি, কত আলো-অন্ধকার, কত ভদ্দরলোক, কত নদী, নদীর ওপর ব্রিজ, রাস্তার ওপর পুলিশ হাত ছড়িয়ে যেখানে রাস্তার গাড়িঘোড়া সামলায়, সেখানে, সেই টাউনে ঢুকছে কৃষক। তখন ভূমি সংস্কার? তখন বাংলা প্রদেশে কত রকমের সংজ্ঞাসন্ধান—জমি বলে কাকে, জমির মালিক যে, সে কি অনিবার্যভাবেই ফলনেরও মালিক? যুদ্ধ, পোড়ামাটি, মুসলমানদের স্বার্থে চাকরির বরাদ্দ ঠিক হতে পারে—কিন্তু তাই বলে কি জমির বরাদ্দও ঠিক হতে পারে? কংগ্রেস, মুসলিম লিগ, প্রজাপার্টি, দলহীন স্বতন্ত্র যারা, তাদের মধ্যে জমির মালিক যারা, জমির রায়ত যারা তারা বারবার 'বেঙ্গল টেনান্সি বোর্ড' নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখে। শুধু বাংলা কৃষক এমএলএরা আইনসভায় মাঝেমধ্যেই কথাটা তুলে রাখে।

১৯২৮-সালে 'বেঙ্গল টেনান্সি অ্যাক্ট সংশোধন' বিলটি জমিদার-হিন্দু ও কৃষক মুসলমানের স্বার্থে দু-টুকরো হয়ে যায়। একটিও সংশোধন বর্গাদারের পক্ষে আসেনি। স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন ও স্যার আরদুর রহিম দু-চারটি সংশোধনে বর্গাদারদের সমর্থন করেছিলেন বটে তবে সে-সমর্থনের উদ্দেশ্য ছিল কাউন্সিলের সদস্যদের হিন্দু-মুসলমান ভাগাভাগি কায়েম করা। তাঁরা এটা নিশ্চিতই জানতেন যে ওই সব সংশোধন গৃহীত হবে না, তাই, সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে আরো একটু শক্তপোক্ত করতে চেয়েছিলেন তাঁরা।

১৯২৮-এর 'বেঙ্গল টেনান্সি অ্যাক্ট (সংশোধন)' বিলটি প্রত্যাহৃত হওয়ায় প্রায় দশ বছর ধরে বাংলার কৃষকরা নানা ধরনের আন্দোলন করে হিন্দু-মুসলমান ভাগকে সত্য করে তুলেছিলেন ও ১৯৩৭-এর ভোটে ফজলুল হকশাহেব প্রজাপার্টির নির্বাচনী চোদ্দ দফাতে এক নম্বরে রাখলেন বেঙ্গল টেনান্সি অ্যাক্টের নতুন সংশোধন। ভোটে জিতলেনও। কিন্তু তাঁর প্রধান মন্ত্রিত্বের সাত বছরেও বিলটি আইনসভায় আনতে পারলেন না। কিন্তু হকশাহেবই হন আর

খাজাই হন আর সারওয়ার্দিই হন—পরাধীন বাংলায় ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টটা একবারও উঠল না। শুধু একটা স্তোক দিতে ৪০ সালে একটি সংশোধনে খাজনা বৃদ্ধির মেয়াদ করা হয় ১৫ বছর আর বৃদ্ধির হার ধরা হয় ষোল আনায় অনধিক দু আনা বা ১২.৫ শতাংশ। সারওয়ার্দির প্রধানমন্ত্রিত্ব কালে তেভাগা আন্দোলনের ফলে বর্গাদার সাময়িক নিয়ন্ত্রণ বিল (১৯৪৭)-এর একটি খসড়া গেজেটে ছাপা হয় কিন্তু আইনসভায় আসার আগেই দেশ স্বাধীন হয়ে যায়। ১৯৪৭ সালের ২১ এপ্রিল জমিদারি ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব বিল (১৯৪৭) বিধানসভা থেকে সিলেক্ট কমিটিতে যায়। সেটা ফেরৎ আসার আগেই দেশ স্বাধীন হয়ে যায়।

বাংলার ভূমি সমস্যা সমাধানের এই সব চেষ্টা খুব বেশি দুর্গম না হলেও, এসব নিয়ে তত্ত্বতালাশ ও খোঁজখবর বিশ শতকের ষাটের দশকের মাঝামাঝির আগে শুরুই হয়নি। শুরু হওয়ার আর শেষ নেই। তাঁরাই মুখ্যত আলোচক যাঁদের জন্ম স্বাধীনতার পর অথবা স্বাধীনতার সময় যাদের বয়স ১০ কিংবা ১২। স্বাধীনতার আগের দশকে বাংলার জোতজমি, সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের পর রাজনৈতিক পার্টি আর নেতাদের নিজেদের স্বার্থ—এসব নিয়ে খোঁজখবর কিছু হয়নি।

হকশাহেব যে আইনগুলি পাশ করেছেন, সেগুলো ইংরেজ সরকারও করতে পারতেন। তাতে হিন্দু-মুসলমান-গরিব-গেরস্ত সকলেরই উপকার। জমিদারির আবোয়ার, চক্রবৃদ্ধিহারে মহাজনি, সেই রেটে বর্গাদারদের ভাগ কাটা, বন্ধকী কারবার—এগুলো তো কোনো ব্যবস্থা নয়, এগুলো সবই অব্যবস্থা, হকশাহেব সেই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে আইন করেছেন। কিন্তু কোনো সম্পত্তিওয়ালার ওপর, কোনো মালিকশ্রেণির ওপর কোনো আইন চাপাননি। হকশাহেব জমিদারদের, শিল্পপতিদের, ও যুদ্ধের বাজারের ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার ও মজুতদারদের কারো ওপরে কোনো আইন বসাননি, এদের কাউকে কোনো কেসে অপরাধী করেননি। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে তিনি কোনো প্রভেদ করেননি।

৪০ সালের ২৪ মার্চ ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্পর্কে মুসলিম লিগের সম্মিলনে প্রস্তাব দিলেন হকশাহেব আর ২৮ মার্চ তাঁরই সরকারের তৈরি কলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন (সংশোধন)-এর আওতায় কর্পোরেশনের ভোট হল! বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সঙ্গে লিগের সমঝোতা হল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের নেতা তখন সুভাষ—কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত। ঐ ২৪ মার্চ থেকে ২৭ নভেম্বর ১৯৪১ পর্যন্ত ২০ মাস—হকশাহেব আর জিন্নাশাহেব পরস্পর থেকে কেবলই দূরে সরে যাচ্ছিলেন।

পাটও কী করে হারানো যায় তার শলা

১৫৩

শেষ পর্যন্ত কৃষিমন্ত্রী তামিজউদ্দিনের ডাকা পাট সম্মিলন বসল শনিবার ৪মে। তমিজউদ্দিন শাহেবের কাজের কোনো দোষ ধরা মুশকিল্। কথা ছিল, পাশাপাশি আরো যে-সব প্রদেশে পাট চাষ হয়, তাদের কৃষিমন্ত্রী বা সমস্যাটা জানেন, এমন কোনো সিনিয়ার অফিসারদের নিয়ে একটা সম্মিলন করা হবে একটা বিষয়েই কথা বলার জন্য পাটের একটা ন্যূনতম দর এই সবগুলো প্রদেশে একসঙ্গে, বেঁধে দেয়া যায় কী না।

এ-সম্মিলনে সব এমএলএকে নেমন্তন্ন দেয়ার কোনো মানে হয় না, এত বেশি সন্নেসিতে গাজন আর বাঁচানো যাবে না। প্রত্যেকেই তো কথা বলবে—পরের দিনের কাগজে তার কথা কী বেরবে, সেটা ভেবে। জনসভায় যদি সরকারি আইনকানুন ঠিক হয়, তাহলে বক্তৃতায় গেরস্তদের চোখের জলের বন্যাকে কতটা বওয়াতে পারবে—সেটাই হবে প্রধান উদ্দেশ্য। পাঠের দর বাঁধলে এমএলএদের ক্ষতি নেই, বরং, লাভই আছে। কিন্তু তাদের মেম্বাররা বেঁধে দিতে চাইছেন—এটা রটিয়ে দিলে অন্তত ভোটটা বাড়বে।

তমিজউদ্দিনশাহেব এই সব এমএলএকে বা এমএলসি-কে ডাকেননি। ডেকেছেন, শুধু জুট গ্রোয়িং এরিয়ার এমএলএদের। যাঁদের ডাকেননি তাঁদের উনি আলাদা চিঠিতে বলেছেন, ইচ্ছে করলে তাঁরাও আসতে পারেন বা তাঁদের পরামর্শ জানাতে পারেন। যোগেনকে ডেকে পাঠিয়ে তিনি বলেছেন, 'আপনে কিন্তু ডুবায়েন না। যা ভাবেন, তা লিইখে আনবেন। এতগুলা শাহেব তো, জুটমিলের আর গভর্নমেন্টের, পেটে-পেটে সবগুল্যার তো নিজের কোলে ঝোলটানা। তাগ একডু ধমকাইয়্যা রাইখতে লাগব না?'

'ধমকের মানুষ যেমন বাইছছেন, তাতে তো আপনার জিতার কোনো আশা দেখি না।'

'দ্যাহেন মণ্ডলমশায়, আমারে ডর খাওয়াবেন না। আপনি কিন্তু অ্যাবসেন্ট করবেন না। তাছাড়া আপনার কথার একটা আলাদা ক্রেডিবিলিটি আছে।'

'ক্রেডিবিলিটি? তাইলে তমিজ ভাই কন, উন্নতির আশা আছে। ক্রেডিবিলিটা কি শুনা যায়?'

'ক্যান শুনা যাবে না? আপনের উপরের চৌদ্দ পুরুষে বা তলার চৌদ্দ পুরুষের কেউ পাটিদারি করে নাই। কেউল পাটের চাষিও না, চাষিও না। পাটের শেয়ার নাই। পাটার বর্গাদারিও নাই। আপনে অফিসারও না। পাইকারও না। তাইলে আপনে যেইডা কইবেন সেইডার ওজন আলাদা হয় না?'

'তমিজ ভাই, এই কথাটা ঠিক না। ক্রেডিবিলিটির একটা আইনি মানে আছে। এই ঘটনায় তোমার স্বার্থ কী?'

'এটা তো গভর্নর জেনারেলও বলাকওয়ার সাহস পাবে না। বাংলার কৃষকদের ভাল হলে সেটা আমার ভাল না? খারাপ হইলে আমার খারাপ না? একটু ভাইব্যা আইসবেন। কারো মাথা থিক্যা তো কোনো নতুন বুদ্ধি বারায় না, যাতে সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে।'

'কে সাপ আর কে লাঠি—এইডা সাবুদ তো?'

তমিজউদ্দিন হো হো হেসে বলে—'সেইটা কখনো হয়? এই আপনার বরিশাইল্যা বুদ্ধি? বরং উলটায়্যা লন কথাডা—একডা সাপের গায়েও য্যান আঘাত না-লাগে কিন্তু লাঠি ঘুরানোর বোঁও বোঁও আওয়াজ য্যান না নামে। জুটমিলের শাহেবরা এক সাপ, তাগ বিলাতস্থিত মহাজনগণ অদৃশ্য সাপ। তাগ এতদ্দেশীয়, এজেন্ট-পাইকার-আড়তদার-পাইকার-ফাটকার-দালাল, এগুলা

খুবই সুদৃশ্য সাপ। জোতদার বা জমিদার বা ইনামদাররা হতেছে সেই সাপ যারে যে-দেখে সেই একডা ঢিল মারে। সুলভ সাপ। জুটমিলের বিলাইতি মহাজন যেমন অদৃশ্য, এপারেও তেমন একডা অদৃশ্য আছে। সেডারে কেউ কোনো কালে দ্যাখে নাই, কিন্তু সবাইই তার নামে ফুল ছিটায়। আপনাগ গণেশ ঠাকুরের মত। পাটচাষি। চাষিডা যে কে তা ঠাহর নাই কিন্তু তারে বাঁচাইতেই এক কাণ্ড।'

শনিবার সকালে কাউন্সিল হাউসের হলে এসে যোগেন দেখে শাহেবে-শাহেবে ছয়লাপ, এত শাহেব যে তাকেও কেউ 'শাহেব' দেখতে পারে। সারওয়ারদি পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হাতটা একটু তোলে। যোগেন তাকে বলে—'আমাগ বাখরগঞ্জের চাষিগ আইন্যা, এই মেলাডা দেখাইলেন না শাহেব, বুইঝত কারে কয় পাট।' সারওয়ারদি কলকাতার বাইরের বাংলাটাকে ম্যাপ হিশেবে চেনে—পূর্ববঙ্গ তো দূরস্থান, কলকাতার বাইরে কোনো বঙ্গই তার কাছে বিলেতের চেয়ে কাছে নয়। ওদের বাড়ি তো না কী মেদিনীপুরে। বাংলা বলতে তো পারেই না, বুঝতেও পারে না। সারওয়ারদিকে পেয়ে তাকেই কথাটা বলে ফেলল—বৃথা গেল। সারওয়ারদি দু-পা দূর থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে দাঁত দেখিয়ে হাসল। দু'পা এগিয়ে না গেলে দাঁত দেখাত না—শুধু ঠোঁটেই সারত। সারওয়ারদিকে দেখা যাচ্ছে—শাহেবদের সঙ্গে কেমন সহজে কথা বলছে, হাত তুলে কিছু বলছে, কোমর ভেঙে জোরে-জোরে হাসছে। যোগেন একটু নরমই হয়, একা-একাই—আচ্ছা, ওর ভাষা যদি হয় ইংরেজি, ওঁ তো ইংরেজিতেই সহজ হবে, ইংরেজি দিয়ে মেলামেশায় ওর ভাল লাগবে, ও যে বাংলা জানে না সেটা তো আর ওর দোষ না। এতটা ভেবে ফেলেও যোগেনের মন থেকে কাঁটাটা যায় না—যেন সারওয়াদির কিছু একটা দোষ আছে। যোগেন নিজের ভুল শুধরে ভাবে—সারওয়ারদি শাহেব তো সবরকম মানুষের সঙ্গেই মিশতে পারে অনায়াসে। সে নিজেই দেখেছে, খিদিরপুরের ডকের লসকরদের সঙ্গে আবার তেলেনিপাড়ার চটকলের মজুরদের সঙ্গেও।

কিন্তু আর কাউকে তো দেখছে না, মেম্বার বা মন্ত্রী। নিশ্চয়ই আরো কোথাও হয়তো ভিতরে ঢুকে গেছে। যোগেন এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেই সকলেই যেন হলে ঢুকতে শুরু করে—নিশ্চয়ই ভিতরে ডাকা হয়েছে। গভর্নর ওপেন করবেন, সুতরাং আধঘণ্টা আগে তো চেয়ারে বসতেই হবে। তারা আইনসভায় আসার পর কোনো গভর্নরই যেন টেকে না। অ্যাডারসন শাহেব ছিলেন মোট পাঁচ বছর, যোগেনরা আসার পর বছর খানেক। ব্রেবোর্ন শাহেব তো মরেই গেলেন। তারপর অ্যাকটিভ হলেন রেইড শাহেব। তারপর আবার এক অ্যাকটিভ—তাকে যোগেন দেখেইনি। এখন এসেছে হাবার্ট—এর তো কী এক অপারেশনের সময়ও হোমে গেল না, এখানেই করালো, তার ওপর যুদ্ধটুদ্ধ বেঁধে গেছে, মনে হচ্ছে এ কিছুদিন থাকবে।

হলে ঢুকে যোগেন একটু চোখ ঘুরিয়ে দেখে চেনাজানা কে কে এসেছে। নলিনী সরকার। কিরণশঙ্করবাবু। নিশীথ কুণ্ডু। পুষ্পজিৎ বর্মা। চারু রায়—মৈমন সিং-এর মুখতার শাহেব। জনাব আলি মজুমদার। মন্ত্রীরা সবাই নেই।

যোগেন একটা ফাঁক পেয়ে চেয়ারে বসে পড়ল। হলটা অনেক বড়। তুলনায় লোক কম। যোগেন যেন বসার সঙ্গী খুঁজছিল। আর না-খুঁজে বসে পড়ল।

সবার বসা হয়ে গেলে দেখে মনে হল মাত্র এই কজনকে ডেকেছে—পাট নিয়ে সরকারি নীতি ঠিক করতে? অবিশ্যি একটা কিছু শুরুর পক্ষে এমন ছোট মিটিংই ভাল—তারপর, যাই ঠিক হোক, আইনসভা ও কাউন্সিলে তো যাবেই। রাস্তাঘাটেও মিটিং হবে। তখন তো আর এই শাহেবদের পাওয়া যাবে না—যারা পাটের বাজারের মালিক।

এক মার্শাল এসে টাইপ-করা একটা কাগজ দিয়ে গেল। পার্টি সিপ্যাস্ট্রস। শাহেব এমএলএদের সবাইকে ডাকেনি। বর্ধমানের আর্মস্ট্রং শাহেব নেই। দার্জিলিঙের প্যাটন শাহেবও নেই। হুগলি-হাওড়ার ওয়াকার শাহেব আছেন—জুটমিলের নেতা। বেঙ্গল চেম্বারের স্টাড শাহেব, আইজেএমএ-র কেনেডি, ন্যাশন্যাল চেম্বারের নলিনীবাবুর সঙ্গে স্যার হরিশংকর, ইন্ডিয়ান চেম্বারের খৈতান, মারোয়াড়ি অ্যাসোসিয়েশনের রায়বাহাদুর, মুসলিম চেম্বারের সিদ্দিকি শাহেব, ট্রেডস অ্যাসোসিয়েশনের দুজন হ্যামিলটন আর নর্টন শাহেব, নুরুদ্দিন, ইস্পাহানি, আদমজি।

এসব মিটিঙে যা হয়—জোরে কেউ কথা বলছিল না। কিন্তু কথা বলার একটা গুঞ্জন ছিল।

গুঞ্জন হঠাৎ থেমে গেল, দরজা খুলে গেল, একটা লম্বা দণ্ডের মাথায় একটা ইউনিয়ন জ্যাক ঝুলিয়ে উঁচু একটা লাল পাগড়ি মাথায় এক বরকন্দাজ ঢুকতে-না-ঢুকতেই সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে। যোগেনও, যথারীতি একটু পরে।

যোগেন অনেক চেষ্টা করেছে, দরজা খোলার আগেই কী করে সবাই টের পেয়ে যায়, দরজাটা এবার খুলবে। আর টের পেয়েই সবাই দাঁড়িয়ে পড়ে। বুঝেও দেখে যোগেন যখন দাঁড়াতে যায়, তখন হয় সে স্যান্ডেলের এক পা-টি পায়ে খুঁজে পায় না, নয়তো পাঞ্জাবির পকেট হাতলে আটকে যায়, নয় তো হাতে ধরা কাগজগুলি মেঝেতে পড়ে যায়। যোগেন এটাকে শারীরিক ব্যাপার ধরে নিয়ে শোধরাবার চেষ্টা করে বুঝেছে, এটা কোনো শারীরিক ব্যাপার নয়। কই, কোর্টে তো হয় না? জজশাহেব ঢোকার আগেই যোগেন স্বয়ংক্রিয়তায় দাঁড়িয়ে পড়ে। কী করে বোঝে? কোর্ট বেশি চেনা বলে? বেশি চেনা আবার কী? যোগেন তারও পর ভেবেছে, দরজা থাকলেই, মানে দরজা বন্ধ থাকলে ও যিনি ঢুকলে দাঁড়াতে হবে তাঁর ঢোকার জন্য দরজাটা বিশেষ করে খুললেই এই গোলমালটা তার হয়। দরজা যখন খোলা তখনই তো সে ঢোকে। তার মানে কী? দরজাটা তার মাথায় থাকে না? তা কেন থাকবে না? সে কি বন্ধ দরজা ঠেলেও ঢোকে না? ঢোকে বৈ কী? তার কি এটা মনে থাকে না যে সে ঢুকে চেয়ারে বসলেই তার মিটিঙে ঢোকাটা শেষ হয়ে যায় না? বরং, ঠিকভাবে ধরলে, তখনই তার মিটিঙে ঢোকা শুরু হল ও মিটিঙের প্রধান হলে ঢোকার পর যোগেনের মিটিঙে প্রবেশ শেষ হয়। তাও বোধ হয় না। শেষ কি এত আগে হয়? যাই হোক, যোগেনকে এটা নিজের কাছে স্বীকার করে নিতে হয়েছে, কোনো শারীরিক কারণে বা স্বভাবগত বেঠিকপনায় তার এই আচরণের ত্রুটি ঘটে না। এটা তার ত্রুটিই। কারণটা নিশ্চিত না জানলে সে নিজেকে সারাবে কী করে? এই হলে, এখনই, সবাই যখন দাঁড়াল, তখন তো দরজাই খোলেনি। তারা দাঁড়ানোর পর, বা যোগেন দাঁড়াবার পর, দরজা খুলল ও বরকন্দাজ ঢুকল। যারা ঢুকল তাদের সবারই পা-ফেলা একটা অশ্রুত তালে ঘটে, লাটশাহেব ছাড়া।

লাটশাহেব বসার পর সবাই বসে। লাটশাহেব তখন দাঁড়ান ও তাঁর এডিকা পেছন থেকে, মনে হয় রুপোর, একটা ট্রে এগিয়ে দেয়। তার ওপর একটা কাগজ ছিল। লাটশাহেব সেটা তুলে পড়তে শুরু করেন, 'লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন। আমার সরকারের কৃষিমন্ত্রী ও বাণিজ্যমন্ত্রী মিলে বাংলার অর্থনীতিতে পাট সমস্যা নিয়ে এই যে সম্মিলন ডেকেছেন, তাতে আমি আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমার মন্ত্রীরা আমাকে জানিয়েছেন, পাট উৎপাদন ও পাট বিক্রির সঙ্গে কোনো-না-কোনো ভাবে জড়িত ৪২টি সংগঠনের প্রতিনিধিদের তাঁরা ডেকেছেন। তাঁরা এও জানিয়েছেন যে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে, খুব কম সংখ্যায় হলেও, কেউ কেউ আছেন, যাঁরা কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত নন কিন্তু ব্যক্তিগত স্তরে এই সমস্যাটি নিয়ে চিন্তিত। আমি তাঁদেরও

স্বাগত জানাচ্ছি। আমার ও আমার সরকারের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের আশ্বস্ত করছি যে পাটের সর্বনিম্ন দর ও সর্বোচ্চদর নিয়ন্ত্রণ, পাট রপ্তানি, হেশিয়ান উৎপাদন ও পাটচাষের বিস্তার নিয়ে যে-সমস্যা দেখা দিয়েছে সে-বিষয়ে আপনারা আমাদের কর্তব্য সম্পর্কে খোলা মনে পরামর্শ দেবেন ও আমরা সেই পরামর্শগুলিকে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের অধিকারভুক্ত ব্যবস্থায় পরিণত করব। এই প্রসঙ্গে এইটুকু আপনাদের মনে রাখতে অনুরোধ করি যে বাংলার পাটের মত নগদ ফসল নিয়ে আমাদের পূর্ববর্গ প্রশাসক ও অনেক চিন্তাভাবনা করেছেন। তাঁরা বাংলার পাটচাষিদের মঙ্গল চেয়েছেন, পাট-ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন পেশার মানুষজনের আর্থিক নিরাপত্তা চেয়েছেন, যাঁরা পাট থেকে চট বানান তাঁদের আয় বৃদ্ধি চেয়েছেন ও রপ্তানি ব্যবসায় যাতে বাড়ে তার জন্যও চিন্তা করেছেন। তাঁদের এই চিন্তার সঙ্গে আমাদের বর্তমান কালের একটা বিশেষ তফাৎ আছে। তফাৎ এইখানে যে বাংলায় এখন ক্ষমতায় আছে এক নির্বাচিত সরকার আর সেই নির্বাচনে এই সরকার তৈরি হয়েছে প্রধানত কৃষকদের ভোটে। বাংলার কোনো সরকার এটাকে শুধুই একটা তাত্ত্বিক সমস্যা বলে দেখতে পারে না। আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন যাঁরা এই ভোটে সরাসরি নির্বাচিত। আরো কেউ কেউ আছেন যাঁরা এই ভোটে পরোক্ষত নির্বাচিত। এমনও অনেকে আছেন, যাঁরা পাট উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত না হলেও, পাটবিক্রির রপ্তানিসহ, সঙ্গে জড়িত। আরো এমন কেউ কেউ আছেন, যাঁরা পাট থেকে চট বানাবার শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। আমরা সকলেই কিন্তু নামহারা সেই কৃষকদের কাছে বাধ্য যে এই বাংলার শস্য-শ্যামল প্রান্তরের আনাচে কানাচে বাড়ির লোকজনের খাটনিতে এই পাট চাষ করছে। পাট বাংলার একমাত্র নগদ ফসল। পাট বিক্রি করেই কৃষক তার জীবনযাপনের নগদের প্রয়োজন মেটায়—সেটা মেয়ের বিয়েই হোক, বৌয়ের শাড়িই হোক আর বুড়ো বাবার চিকিৎসাই হোক। পাটের ন্যূনতম ও উচ্চতম দর বেঁধে দিলে আবার চটকলগুলির ক্ষতি হবে। আমরা তো শিল্পের বিনিময়ে কৃষি চাই না, কারণ পাটের ন্যূনতম দরে পাটচাষি বাঁচলেও, চটকলগুলির ক্ষতিপূরণ হবে না। আমরা নিশ্চয়ই কৃষির বিনিময়ে শিল্প চাই না, কারণ হেশিয়ানের বিক্রি ও দর বাড়ালেও সেই বৃদ্ধি তো কৃষককে কোনোভাবেই সাহায্য করবে না। তার ওপর পাটের একটা 'দাদনি বাজার', ফিউচার মার্কেট তৈরি হয়েছে বা অনেক দিন থেকেই নামে-বেনামে আছে। সবচেয়ে কঠিন সময়ে কৃষকের জমির আগামী পাট বিক্রি হয়ে থাকে। সেই দাদনি বাজার চড়া কী ঠান্ডা, তার ওপর নির্ভর করে পাটের ওপর নির্ভরশীল কোম্পানিগুলির শেয়ারের দর। অনেক এমন কোম্পানির হেড অফিস এখন লন্ডন। তাঁরা পাটশিল্প বা পাটচাষের কিছুই জানেন না বা বোঝেন না, শুধু শেয়ারের লভ্যাংশ চান। ডিভিডেন্ড না পেলে তাঁদের দিনকাটানো বা মাসকাটানো সম্ভব নয়। তেমন ক্রেতা এদেশের আছে। এটাও কিন্তু ভাবার মত কথা—পাট কোম্পানি বা চা কোম্পানির লভ্যাংশের ওপর ভদ্রশ্রেণীর অনেক পরিবারের অসহায় অকাল-বিধবা ও কুলিন-কুমারীদের জীবনযাপনের সম্মান রক্ষিত হয়। আপনারা কী বিচার করবেন ও সরকারকে কী সুপারিশ করবেন, সে-বিষয়ে আমি কোনোভাবেই আপনাদের প্রভাবিত করতে চাই না। আমি শুধু চাই, আপনারা আপনাদের মত করেই ভাবুন। কিন্তু ভাবুন। এটা তো একটা মজার ব্যাপার যে মাত্র সত্তর-পঁচাত্তর বছর আগে যে-পাট চাষ বাংলার কৃষকদের আওতায় এসেছিল— এইটুকু সময়ের মধ্যেই সেই পাট হয়ে উঠেছে সেই হাঁস যে রোজ একটা করে সোনার ডিম পাড়ে। এইটুকু সময়ের মধ্যেই সেই একটি সোনার ডিমের এত প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ভাগীদার জুটেছে যে তাদের মধ্যে এমন কেউ এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়ে পড়তে পারে যে তার পেটের সবগুলো সোনার ডিম অন্যদের ঠকিয়ে হাতড়াতে গিয়ে সে শেষ পর্যন্ত হাঁসটাকে

মেরেই ফেলল। আমি জানি, আপনারা এ-বিষয়ে খুবই সচেতন যে হাঁস কিন্তু একটাই ও তার ডিমপাড়ার রেশনও কিন্তু বাঁধা—দিনে একটা, ও তার সেই ডিমের মর্যাদাও কিন্তু একই থাকতে হবে—সোনার ডিম। আপনাদের ধন্যবাদ।

চাপা একটা হাততালি অনেকক্ষণ ধরে চলে। এটা শাহেবদের হাততালি। যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা প্রত্যেকের মর্মে পৌঁছয় যে হাততালিটা সম্মতি বা আপত্তিসূচক কিছু নয়। হাততালিটা একটা প্রথা, পদ-অনুযায়ী সেই প্রথাপালনের রীতি জেনে নিতে হয়। হিজ এক্সেলেন্সির জন্য দীর্ঘ করতালি। এক ভাইসরয়কে তার চাইতে বেশি সময় দেয়া যায়। গ্রেট ব্রিটেনের কোনো মন্ত্রী এলে পাবে ভাইসরয়ের সমান সময়। রাজা বা রাজপরিবারের কারো জন্য সময় ধরা নেই, দিয়ে যেতেই হবে।

তমিজউদ্দিন শাহেব দাঁড়িয়ে লাটশাহেবকে ধন্যবাদ দিলেন, তিনি তাঁর অনেক দরকারি কাজ সত্ত্বেও এই সম্মিলনকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন ও তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়েছেন। এখন আমরা নিশ্চয়ই তাঁর কথা অনুযায়ী কাজ করতে পারব।

কোনো শাহেবের গলায় শোনা গেল, 'অ্যাডভাইস অর কশন?' সঙ্গে-সঙ্গেই লাটশাহেব উঠে দাঁড়ালেন ও বরকন্দাজের নেতৃত্বে মিছিল শুরু করলেন। মিছিলের আর সবাই মেপেঝেঁপে পা ফেলেন। এক লাটশাহেবেরই তালছাড়া।

লাটশাহেবের প্রস্থানের পর চা-পানের সময়ও বোঝা যায়নি। কনফারেন্স শুরু হতেই তমিজুদ্দিনের প্রস্তাবে সারওয়ারদি সভামুখ্য হয়ে এত তাড়াতাড়ি ক্যালক্যাটা ট্রেডস অ্যাসোসিয়েশনের নর্টন শাহেবকে ডাকলেন, যেন মনে হল, আগে থাকতেই ঠিক ছিল। শাহেবরা আন্দাজ দিতে চাইছে, সরকার কি কিছু ঠিক করে রেখে তাদের গেলাতে চাইছে। নইলে নর্টন কেন? নর্টনের কথা সবচেয়ে বেশি লোক জানে—সে ফাটকা খেলে পাট নিয়ে সুতরাং সে চায় সরকার এই মুহূর্তে 'দৃঢ় হস্তে' বাজারে হস্তক্ষেপ করে মার্কেট ফোর্সকে স্বাভাবিক করে দিক, যাতে সেই বাজার দেশী-বিদেশী চেম্বারগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয় ও যাতে বাজার নিয়ে যাদের কারবার সেই ব্যবসায়ীরা খোলা মনে ও খোলা হাতে বাজারে খেলতে পারে। নর্টন শেষ করে বেশ রেগে গিয়ে—'চেম্বারগুলো নাক গলায় কেন পাটের বাজারে? কত কীই তো বাজারে ওঠে। সে-সব কি কোনো চেম্বারের অধীনস্থ?'

সারওয়ারদি ডাকলেন, ইন্ডিয়ান চেম্বারের খৈতানকে। যোগেন সারওয়ারদির মিটিং-চালানোর দক্ষতা জানে। শাহেবদের অনেকেও হয়তো জানে। গবর্মেন্ট কী চায়, সেটা সবাই জানতে বা আন্দাজ করতে চায় বলেই সারওয়ার্দি প্রথমে নর্টন শাহেবকে ও তারপর খৈতানশাহেবকে ডেকেছে। যার যা তাস, টেবিলে ফেলো।

ইন্ডিয়ান চেম্বার মোটেই চায় না যে সরকার পাটের বাজারে নামুক। নামলে কত দরের কমে পাট আর কেনা যাবে না সেটা চেম্বাররা ঠিক করতে পারবে না, করবে গবর্মেন্ট অফিসাররা। কিন্তু খৈতানশাহেব খেললেন, উলটো দান। ঠোঁটটোট বেঁকিয়ে, গলা উঁচুনিচুতে খেলিয়ে বিরক্তি জানিয়ে বললেন, 'সরকার কোথায় নাক গলাবেন আর কোথায় গলাবেন না—সেটা ঠিক করে দেয়ার আমরা কে? সেটা সরকারকেই করতে হবে। সরকারের এতরকম ডাক্তার আছে, বৈদ্য আছে, সার্জেন আছে, তারা বলে দিক কতটা ঢোকালে নাকে ফোস্কা পড়বে আর কতটা ঢোকালে পড়বে না।'

একটু হাসি উঠল। খৈতানশাহেবও হাসলেন। তারপর হিন্দিতে বলে উঠলেন, কেন কে জানে, 'আরে ভাই, নাক এক আদমির, আগ ঔর এক আদমির ঔর দাওয়াই ঔর ঔর এক

আদমির—তো হাম কেইসেঁ বলোঁ, নাককো কেতনা তক নাশক হোগা।'

হাসি ও হাততালির মধ্যে খৈতান বসে পড়েন।

সারওয়ারদি বেশ আত্মবিশ্বাস নিয়ে ডাকে, 'মিস্টার সিদ্দিকি, মুসলিম চেম্বার অব কমার্স।'

সিদ্দিকি দাঁড়াবার আগেই বেঙ্গল চেম্বারের স্টাড শাহেব দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় বলেন, 'আমার এতে খুব আপত্তি আছে। মুসলিম চেম্বার বলে একটা প্রতিষ্ঠান ঠিক ভোটের মুখে-মুখে তৈরি হয়। কারা এটা তৈরি করেছেন ও তাদের উদ্দেশ্য কী সেটাও আমাদের সকলের জানা। সরকার ও সরকারের প্রধানদলের সঙ্গে এঁদের সুসম্পর্কও সকলের জানা। ভোটের মুখে এই সংগঠনকে মর্যাদা দিয়ে তাদের জন্য আইনসভায় একটা আসন বরাদ্দ করায় নানা দিক থেকে আপত্তিও করা হয়েছিল। এমনকী, ব্যবসা-বাণিজ্যের চেম্বারকে 'মুসলিম' এই সাম্প্রদায়িক নাম দেয়াতেও আপত্তি ছিল। আজকে পাটসংক্রান্ত এই অত্যন্ত বাছাই করা লোকদের মিটিঙে 'মুসলিম চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধি বলে কাউকে ডাকা ও কথা বলার সুযোগ দেওয়া ঠিক কাজ নয়।'

সারওয়ারদি ঘাড় ঘুরিয়ে সব দিক দেখে, কেউ দাঁড়ায়নি, হাতও তোলেনি। সারওয়াদি ভেবেছিল, কেউ নিশ্চয়ই পাল্টা কথা বলবে। কিন্তু স্টাড শাহেব যা বলেন তা না ভেবে বলেন না আর বেশ কড়া ধাঁচের মানুষ, এমন একটা ধারণা চালু আছে। আবার সিদ্দিকি শাহেবের আধুনিকতা, আইনসভা ও অভিজ্ঞতা নিয়েও একটা মান্য ধারণা প্রচলিত। এ নিয়ে কারো পক্ষে কথা বলা মুশকিল।

স্টাড শাহেবের মুসলিম চেম্বারের ওপর এত রেগে থাকার কারণ ওরা বেঙ্গল চেম্বারের ব্যবসা খাচ্ছে। কিন্তু সেই কারণে ইয়োরোপিয়ান গ্রুপের সঙ্গে সরকারের বন্ধুত্ব নিয়ে সন্দেহ তৈরি করা যায়?

এটা সত্যি-সত্যি সারওয়ারদির পক্ষেও বেশ কঠিন ব্যাপার। স্টাড শাহেবের আপত্তি মেনে সিদ্দিকি শাহেবকে বলতে না-দেয়ার কোনো প্রশ্নই নেই। কিন্তু স্টাড শাহেবও কম জানেন না যে তাঁর এই আপত্তি ও মুসলিম চেম্বারের বিরোধিতার প্রতিক্রিয়া অনেক দূর ছড়াতে পারে। হয়তো স্টাডের আপত্তিতে তেমন একটা ইঙ্গিতও ছিল। ইয়োরোপিয়ান গ্রুপের পঁচিশটা ভোট এই গবর্মেন্টকে টিকিয়ে রেখেছে। কিন্তু সেটা নিশ্চয়ই তাদের ব্যবসার ক্ষতি করে নয়। সুতরাং ইয়োরোপিয়ান গ্রুপের সমর্থন চিরকালই থাকবে এমন ধরে নেওয়ারও কোনো কারণ নেই।

যোগেন মুগ্ধ হয়ে যায় সারওয়ারদি শাহেবের উপস্থিত বুদ্ধিতে। উনি স্টাড শাহেবকে সম্বোধন করে বলে ওঠেন, 'ওয়েল, মিস্টার স্টাড, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না আপনার আপত্তিটা কার সম্পর্কে? মুসলিম চেম্বার, পাট ব্যবসা নাকি মিস্টার সিদ্দিকি? আপনি নিশ্চয়ই মিস্টার সিদ্দিকি-র অতুলনীয় বিশ্লেষণ থেকে নিজেকে ও আমাদের বঞ্চিত করতে চান না। তাহলে বাকি থাকে মুসলিম চেম্বার আর পাট-ব্যবসা।'

স্টাড শাহেব দাঁড়িয়ে উঠে বলেন, 'কিন্তু আপনিই তো মিস্টার সিদ্দিকিকে ডেকে বললেন, মুসলিম চেম্বার অব কমার্স। আমি তো বলিনি।'

সারওয়ারদি তাঁর সামনে রাখা কাগজটায় চোখ বুলিয়ে বললেন, 'তাই নাকি। আমিই তাহলে দোষী? ওয়েল, ডোন্ট মাইন্ড। মিস্টার সিদ্দিকি, দি ওয়ান অ্যান্ড দি ওরিজিন্যাল প্লিইজ'।

তাঁকে নিয়ে যখন এত কথাবার্তা চলছে, সিদ্দিকি শাহেব তখন একটাও কথা বলেননি। এখন দাঁড়িয়ে উঠে একটু খেঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ মিস্টার প্রেসিডেন্ট, অ্যাট লাস্ট ইউ হ্যাভ মেটেরিয়াইজড মি।' যোগেন উচ্ছ্বাসে টেবিল চাপড়ে বসে। তার দেখাদেখি আরো অনেকে। যেন জানাই ছিল হাততালির জন্য তাঁকে একটু থামতে হবে।

একটু থেমে সিদ্দিকি শাহেব বলেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ ফ্রেন্ডস। এতক্ষণ আবার নিজেকে 'হ্যামলেট'-নাটকের প্রথম দৃশ্যে হ্যামলেটের বাবার ভূত মনে হচ্ছিল, দ্যাট বোডস সাম স্ট্রেঞ্জ ইরাপসন টু আওয়ার স্টেট।' যোগেন আবার টেবিল চাপড়ায়। কিন্তু একবার চাপড়েই থেমে যায়। সে যে বুঝেছে, সেটা জাহির করা হয়ে যাবে। সিদ্দিকি শাহেবের গলায় তখন গাম্ভীর্য এসে গেছে, 'আমি যেমন মুসলমান বলে কোনো অতিরিক্ত সুযোগ নিতে ঘৃণা বোধ করি, সেই একই পরিমাণ ঘৃণা আমি বোধ করি, যদি কেউ হিন্দু বলে বা খ্রিস্টান বলে কোনো অতিরিক্ত সুযোগ নিতে চায়। কিন্তু আমার ঘৃণার পরিমাণটা লাফিয়ে-লাফিয়ে বেড়ে যায়—যদি মুসলিম বলেই কেউ আমাকে কোনো অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চায়। আমার বাড়ির লোকজন ও বন্ধুবান্ধব সকলেই জানেন, খাঁটি মুসলমানের যে-সব লক্ষণ আছে, সেগুলো দিয়ে বিচার করলে আমাকে খুব খাঁটি মুসলমান বলে মার্কা দেয়া বেশ কঠিন। মুসলিমরা কোনো ব্যবসায় যদি যুক্ত থাকে ও মুসলিম বলেই যদি সেই ব্যবসায় তারা বিশেষ এক ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে তাদের নিশ্চয়ই আইনি অধিকার আছে। কোনো একটা সমিতি গঠন করার। যদি কেউ সে অধিকার দিতে না চায় বা যদি কেউ সেই কারণে আমাকে বা আমাদের দোষ ধরে, তাহলে, আমি নিজেকে প্রকাশ্যত চিৎকার করে একজন গোঁড়া ও খাঁটি মুসলমান বলে ঘোষণা করব। এ কথাটা এত কর্কশ সুরে আলোচনার প্রথমেই বলতে আমার শিক্ষা, রুচি ও বিশ্বাসে লাগছে। শুনতে, আশা করি, আপনাদেরও খারাপ লাগছে। তবু যে আমি কথাটা আপনাদের জানাতে দরকার মনে করলাম, তার কারণ, আপনারা যদি আমার মত ধর্মসংস্কারমুক্ত মানুষকেও সাম্প্রদায়িকতার দিকে ঠেলে দেন, তাহলে, আপনাদের ধর্মনিরপেক্ষতা পালনের জন্য কোনো মুসলমানকেই পাবেন না। আরো একটা কথা আমি দেগে দিতে চাই যে মুসলমান-বিদ্বেষী বলতে শুধু হিন্দুদেরই বোঝায় না। ইসলামি সভ্যতার বিরুদ্ধে কয়েকশ বছর ধরে যারা সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করেছে আর সেই যুদ্ধকে পবিত্র ধর্মীয় কর্তব্য বলে প্রমাণ করেছে তারাও কেউ হিন্দু নয়। আমাদের আজকের এই আলোচনা সভার বিষয় পাট। সেই পাট উৎপাদন, ব্যবসা ও চটকলের এক মেরুতে আই জে এম এ, ডুফুস, স্টিল, ল্যানডেল অ্যান্ড ক্লার্ক, র‍্যালি ব্রাদার্স, সারকিজ অ্যান্ড কোম্পানি, ডেভিড অ্যান্ড কোম্পানি, আর-এক মেরুতে বাংলার মুসলমান পাটচাষি।'

সিদ্দিকিশাহেব একটু থেমে আবার শুরু করেন, শুরু করেও থেমে যান, তারপর একটু হেসে বলেন, 'আমাদের দেশে একটা কথা আছে, মেয়েদের মধ্যে, যা আছে তা তো পেটেই আছে, বলার দরকার কী? আমি মেয়ে নই বলেই অসাবধানতায় আমার পেটের কথাটা মুখে বলে ফেলেছি। কিন্তু বলা কথা আর ছোঁড়া ঢিলের তো আর কোনো ফেরৎ হয় না। বাংলার পাটচাষিরা যে প্রধানত মুসলমান এ নিয়ে তো কারো কোনো আপত্তি নেই। আপত্তি থাকলেও তা টিকবে না। ছ-ছটা সেনসাসের হিশেবে সেটা প্রমাণ হয়ে আছে, সাত নম্বর সেনসাসের হিশেবও তো তাই বলবে। যে ব্যবস্থাই নেয়া হোক না কেন, এই মুসলিম পাটচাষির রোজকার খাওয়া ও বেঁচে থাকা তার ওপর নির্ভর করবে। শাহেবদের একটা মুশকিল এই যে তাদের আর পাটচাষিদের মাঝখানে কোনো হিন্দু মহাজন পাওয়া যাচ্ছে না, ধান-চালের বেলায় যেমন পাওয়া গিয়েছিল—জমিদার হিন্দু আর রায়ত মুসলমান। চাষি কোথাও নেই। সুতরাং জমিজিরেত নিয়ে গোলমাল মানেই হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা। ভোটের আগে তাই দাবি উঠেছিল—জমিদারিপ্রথার উচ্ছেদ চাই, মহাজনি শাসন বন্ধ করো। সেই দাবির ভিত্তিতেই এই সরকার ক্ষমতায় আছে ও তারা অস্বাভাবিক দ্রুতবেগে ভূমি ব্যবস্থা সংক্রান্ত আইন বদলের জন্য এক

কমিশন বানিয়েছেন, মহাজনি লাইসেন্স চালু করেছেন, সুদের হার বেঁধে দিয়েছেন, সরকারি চাকরিতে মুসলমানদের জন্য আরো দশ শতাংশ, মানে মোট পঞ্চাশ শতাংশ কেটে রাখার আইন করেছেন। এমন আরো কিছু সংস্কার করেছেন। এই সরকার কোন বিষয়ে আইন আনবেন ও কোন বিষয়ে আনবেন না—তার একটা থিয়রি অব প্রব্যাবিলিটি খুঁজে পেয়েছি। যে-সংস্কারে মুসলমানদের ক্ষতি, সে-সংস্কার হবে না। যে-সংস্কারে মুসলমানের লাভ, সে-সংস্কার হবে। যে-সংস্কারে মুসলমানের লাভ না থাকলেও, তেমন ক্ষতিও কিছু নেই, সে-সংস্কারও হবে। যে-সংস্কারে মুসলমানের ক্ষতি সে-সংস্কার কিছুতেই হবে না। যে-সংস্কারের হিন্দুর লাভ কিন্তু মুসলমানের ক্ষতি তেমন নেই, সে-সংস্কারও হবে। আমার এই 'থিয়ারি অব প্রব্যাবিলিটি'তে পাটটা ঢোকানো যাচ্ছে না। কারণ পাটে হিন্দু স্বার্থের চাইতে মুসলিম স্বার্থ বেশি আর এখানে স্বার্থগুলো একটু বেশি স্পষ্ট ভাগ করা। পাট চাষ করে পাটচাষি, তারা বেশিরভাগই মুসলমান, পাটের ব্যবসা করে আড়তদার—তার মধ্যে অবাঙালিরা বেশি, পাট থেকে হেশিয়ান বানায় বেশির ভাগ শাহেবদের চটকল আর পাট বিদেশে চালান দেয় শাহেব কোম্পানিগুলি। এই চারভাগের মধ্যে একভাগেও হিন্দুদের প্রাধান্য নেই। তাদের জায়গা চাকুরে হিশেবে বিভিন্ন পাট-কোম্পানির অফিসে, পাটগোলায়, বড়বাবু-ছোটবাবুর পোস্টে কলকাতায় ও মফস্বলে। তাহলে পাটের বেলায় স্বার্থটা শাহেবদের আর মুসলমানদের। সেখানেই এই সরকারের বিপদ। শ্যাম রাখি না কুল রাখি। যদি সরকার পাটের নিম্নতম দর বেঁধে দেয়, তাহলে কোনো শাহেবই পাট কিনবে না—আই জে এম এও না, এজেন্ট-এক্সপোর্টারও না, আড়তদাররাও না। আমি যে খুব সংসারী মানুষ, তা না। সেই আমিও জানি, খদ্দের যদি একবার শস্তার স্বাদ পায়, তাহলে সে আর দর বাড়তে দেয় না। পাট না পাটরানী, পাট বা সোনার সুতো—এই সব প্রবাদ ১৯১৪-১৮-র যুদ্ধের আগের সময় নিয়ে। সেই যুদ্ধের পর পাট কিন্তু কোনোদিনই আর আগের দর পায়নি। ২৫ সালে একটু উঠল, তারপরেই তো ৩৪-৩৫ সালে নেমে গেল ২৫ সালের দরের ১০ আনি থেকে ১২ আনিতে। এখন আবার একটু নাড়াচাড়া পড়ছে। কিন্তু পাটের পাটরানীগিরি শেষ। তুলো পাটের চাইতে বেশি দর পায়। তার প্রধান কারণ বাংলার কৃষির বিরুদ্ধে বাজারি ও প্রশাসনিক মনোভাব। যুদ্ধের পর দর যা-একটু বাড়ল, তাও তো পাটচাষির কাছে পৌঁছল না। চলে গেল চাষি আর শেষ-খদ্দেরের মাঝখানে গজিয়ে ওঠা—সব হাতবদলি দালালদের হাতে। চাষির বাড়ি থেকে পাট কিনে নিয়ে যায় পাইকার বা ফড়ে। সে দেয় বেপারির হাতে। বেপারিরা তুলে দেয় এজেন্টের গুদামে বা খোদ কোম্পানির কাছে। নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, সিরাজগঞ্জ, সরিষাবাড়ি, চাঁদপুর এই সব স্টিমারঘাটায় কোম্পানি তো নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মাল কেনে। পাটের জন্য উত্তরবঙ্গে কতগুলি নতুন স্টেশন বসল। এর মধ্যে কোথাও একই লোক বেপারিও বটে আড়তদারও বটে। আবার কোথাও ফড়েই বেপারি হয়ে ওঠে। বেপারির একটা সামাজিক সম্মান থাকা দরকার। আজ ১৯৪০ সালে কথটা তুলছি এই কারণে যে ১৯২০-র আগে পাটের বাজারে পাইকার বা ফড়ে, বেপারি বা ডিলার, মহাজন বা আড়তদার, দালাল বা এজেন্ট—এই ভাগাভাগিগুলি ছিল না। ১৪-১৮-র যুদ্ধ পরিস্থিতিতে এই সব ভাগ কায়েম হয়ে গেছে। মাত্র ২০ বছরে, ১৯৪০-এ আমরা পাটের দর বুঝতে বেবাক ভুলে বসে আছি যে প্রথম রয়্যাল কমিশন অব এগ্রিকালচারের সামনে বাংলার কৃষি ডিরেক্টর ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর মিস্টার ফিনলো ও মিস্টার ম্যাকক্লিন সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে পাটের দরের বিশ শতাংশ যায় এই কেনাবেচার দালালদের হাতে। ঐ কমিশন সেই হাতখরচার হিশেব কষে বলেছিল ২০ শতাংশের নীচে নয়, ২৫ শতাংশের ওপরে নয়। পাটের দরে যুদ্ধের আগে, ঐ ১৪-১৮-র

যুদ্ধের আগে এই কমিশনটা যেত মিলের হিশেব থেকে, এখন যাচ্ছে চাষির হিশেব থেকে। যদি টাকা দেয়ার আগেই তা থেকে ভাগ কাটা হয়, তাহলে যতই টাকা বাড়াবেন, ভাগও তো ততই বাড়বে। যতই বাড়ুক সেটা কাটা হবে চাষির প্রাপ্য থেকে। খাদ্য ফসলের বেলাতে মালিকের বাজে আদায়ের তো শেষ নেই। পাট খাদ্য ফসল নয় বলেই তাতে বর্গা নেই, ভাগচাষ নেই, অধিকার নেই। সেই না থাকাটা এতদিনে পুষিয়ে নেয়া হচ্ছে। জমিদার কে পাটের? আই জে এম এ, এক্সপোর্টার আর আড়তদার। একমাত্র যারা বাজারে কিনছে তারা নয়, ফিউচার মার্কেট বলে যে ব্যবস্থা বাজারের নিজের নিয়মে তৈরি হয়ে উঠেছে, আর যে ফিউচার মার্কেটের ব্যাপারে উৎসাহী বলে মুসলিম চেম্বারকে পাটব্যবাসার পুরনো অভিজাতরা দোষ দিচ্ছে, সেই ফিউচার মার্কেটের প্রসারে সরকার যদি কোনো ব্যবস্থার কথা ভাবেন, আমরা নিশ্চয়ই সব রকম সাহায্য করব।'

সিদ্দিকিশাহেব এই কথা বলা মাত্র যেন কাউতাল শুরু হয়ে গেল। কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে, ইংরেজিতে ও বাংলায় চিৎকার করতে লাগল, বেশ খানিকটা চিৎকারের পর বোঝা গেল শুধু সিদ্দিকিশাহেবের বিরুদ্ধে নয়, সারওয়ারদির বিরুদ্ধেও সরাই রাগে ফেটে পড়ছে।

'মুসলিম চেম্বারের সঙ্গে সরকারের বোঝাপড়া স্যাংশন করাতেই কি আমাদের ডাকা হয়েছে?'

'এমন কনফারেন্স এত ঢাকঢোল বাজিয়ে লাটশাহেবকে দিয়ে ওপেন করার ছিলটা কী?'

'লাটশাহেবকে এই সব আন্ডারহ্যান্ড ডিলের পার্টি করার পেছনে কংগ্রেসি মাথা আছে।'

'একই সঙ্গে দুটো বাজার? একটা টেবিলের ওপরে, একটা নীচে?'

'ব্ল্যাকমার্কেট আর ফিউচার মার্কেটের তফাৎ কী?'

'মন্ত্রীরা কেন হাজির নেই? ইস্পাহানির বখরা খায় যে মন্ত্রীরা তারা কোথায়?'

'যার প্রমাণ নেই, তেমন কথা আর-একবার বললে, কোর্টে দেখা হবে।'

'অত কোর্ট দেখাচ্ছেন কাকে? নলিনী সরকার চুপ করে আছেন কেন? উনি ইস্পাহানিদের লাইসেন্স গোপনে পাশ করে দেননি? কেন ওপেন টেন্ডার ডাকা হয়নি?'

'সারওয়ারদিশাহেবের লেবার ইউনিয়ন আমাদের টাকা খায় না? আর, ফিউচার মার্কেট? আমরা এ মিটিঙে নেই। আমরা ওয়াক-আউট করছি।'

সারওয়ারদি আর তমিজুদ্দিন দুই হাত মাথার ওপর তুলে সবাইকে থামতে বলেই যাচ্ছেন, তমিজুদ্দিন তো ওয়েলের মধ্যে হাত জোড় করে দৌড়োদৌড়ি করছেন।

মনে হয়, মিটিংটা ভেঙে যাবেই।

এমন সময় মিস্টার স্টাড দাঁড়িয়ে উঠে দুই হাত তুললেন আর গোলমালটা যেন আচমকা নেমে গেল। সেটা মিস্টার স্টাড-এর প্রতিষ্ঠার জন্যও হতে পারে আবার চেঁচামেচির প্রথম পর্যায় শেষ হয়েছে বলেও হতে পারে।

মিস্টার স্টাড গোলমালের সেই অনিশ্চয়তাটা ব্যবহার করে প্রথমে সকলকে বললেন, 'আমাকে একটু কথা বলতে দিন। আমার কথা শেষ হলে যাঁরা আমার কথা সমর্থন করেন, তাঁরা সেই অনুযায়ী করণীয় করবেন। আর, যাঁরা তা করেন না, তাঁরা তাঁদের মতানুযায়ী যা করণীয় তা করবেন।' এই পর্যন্ত বলেই তিনি সারওয়ারদিকে সম্বোধন করে বললেন, 'মিস্টার মিনিস্টার, আমার কথা খুব সংক্ষেপে বলছি। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আমরা যারা এই সভায় আপনাদের আহ্বানে এসেছি তারা মনে করতে পারছি না এটা একটা যথাযথ সভা। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি—এটাকে সভা বলে কোনো স্বীকৃতি দেবেন না ও আমাকে সেখানে উপস্থিত বলে দেখাবেন না। থ্যাঙ্ক ইউ'।

মিস্টার স্টাড তাঁর আসন থেকে ওয়েলে বেরিয়ে দরজার দিকে হাঁটা দিলেন। এটা এতটাই অপ্রত্যাশিত যে সারা ঘর থমথমে নীরবতায় ছেয়ে গেল ও যেন মিস্টার স্টাডের প্রতি স্বীকৃতিতে একে-একে সকলেই বসে পড়লেন।

তমিজুদ্দিন দৌড়ে দরজার কাছে চলে গিয়ে, দরজার পিঠ দিয়ে দুই হাত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঐ নীরবতার যোগ্য স্বরে বললেন, 'এটা করা যায় না, মিস্টার স্টাড। আপনি কোনো অবস্থাতেই আনজেন্টলম্যানলি ব্যবহার করতে পারেন না'।

হলের আরো নীরব হওয়ার মত কোনো পরিসর ছিল না। মিস্টার স্টাড থমকে তমিজুদ্দিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একটা সভা থেকে ওয়াক আউট করার অধিকার আমার নিশ্চয় আছে।'

'নিশ্চয়। কিন্তু এটাকে আপনি সভা বলেই মানেননি। এখন ওয়াকআউটের একটাই অর্থ—ব্যাড ম্যানার্স। আপনি আমাদের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ করে বেরিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের জবাব না শুনে। আপনি কোনো কোম্পানিকেই এমন অসম্মান করতে পারেন না। ইটস এগেইনস্ট ইয়োর কালচার।' মিস্টার স্টাড তমিজুদ্দিনের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে, 'সরি' বলে, নিজের চেয়ারে ফিরে এলেন।

তমিজুদ্দিন তাঁর আসনের দিকে পা বাড়াতেই সারওয়ারদি বললেন, 'এবার কি আপনি বলবেন, মিস্টার তমিজুদ্দিন?'

তমিজুদ্দিন কোনো জবাব না দিয়ে নিজের আসনে বসে, তারপর দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমার কাছে এটা একটা বিধিসম্মত মিটিং এবং আমি তার যুগ্ম আহ্বায়কদের একজন। এই ধরনের মিটিঙের প্রথা অনুযায়ী আপনি আমার সিনিয়ার বলেই চেয়ার নিয়েছেন। সরকারের পক্ষ থেকে আপনারই বলার অগ্রাধিকার। কোনো কারণেই আমাদের অর্ডার ভাঙা উচিত নয়।'

সারওয়ারদি দাঁড়িয়েই বলতে শুরু করলেন, যদিও সভামুখ্য হিশেবে তিনি বসে বসেই বলতে পারতেন।

'প্রথমত, আমি মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে এ কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে চাই যে আমরা কোনো পক্ষের সঙ্গে কোনো বোঝাপড়াকে আইনানুগ করার জন্য এই সভা ডাকিনি। এমন একটি সভা ডাকার কথা হিজ এক্সেলেন্সি আমাদের ফুল ক্যাবিনেটে বলেন এবং এটাও বলেন যে হিজ মেজেস্টি ভাইসরয়ও এটা চান। তৎসত্ত্বেও যদি আমার অজ্ঞাতে কোনো বোঝাপড়া হয়ে থাকে, আমি তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে বলছি—মন্ত্রী হিশেবে আপনাদের কাছে অসত্য তথ্য দেয়ার অপরাধে তাহলে আমার মন্ত্রী থাকা চলবে না। কিন্তু বোঝাপড়া প্রমাণিত হতে হবে, প্রমাণিত বলতে আইনে যা বোঝায়, সেই অনুযায়ী প্রমাণিত।

'ফ্রেন্ডস, এখানে উত্তেজনার মধ্যে কিছু ধরনের অভিযোগ উঠেছে, যেমন মন্ত্রীদের মধ্যে কেউ-কেউ পাট ব্যবসায়ীদের সুযোগ করে দেওয়ার বিনিময়ে ব্যক্তিগতভাবে টাকা নিয়েছেন। দু-একবার দু-একজনের নামও উঠেছে, যেমন মিস্টার সরকার। আমি পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে গভীর বিশ্বাসী। সেই কারণেই আমি মনে করি—ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে এই ধরনের অভিযোগ পার্লামেন্টারি রীতিসম্মত নয়। যিনি বা যাঁরা এটা করেছেন তাঁরা আইনসভার এই পবিত্র হলের অমর্যাদা করে এখানে হাটবাজারের চালচলন ও বুলি আমদানি করেছেন।

যোগেন টের পায়—সারওয়ারদি মিটিংটা ধরে ফেলেছে। তার কথা সবাই বিশ্বাস করছে তা নয় কিন্তু ছোটখাটো মানুষটির কথাগুলো থেকে একই সঙ্গে এমন একটা সংযোগ তৈরি হয়ে যাচ্ছিল সবার সঙ্গে যে মোটামুটি সকলেই বুঝছে যে মিটিংটা ভেঙে দেয়া যায় না। বা, যোগেন আর একটু—কুটিল কারণে ভেবে নেয়—মিটিংটা এভাবে ভেঙে দিলেই প্রমাণ হবে

না যে গবর্মেন্ট আগেই মুসলিম চেম্বারের সঙ্গে কী হবে সেটা ঠিক করে রেখেছে। কিন্তু মিস্টার স্টেইড অতটা গেলেন কেন? আর, গেলেনই যদি ফিরলেন কেন? তমিজুদ্দিনের কথায়? তমিজুদ্দিন ঐ ভঙ্গিতে ও ভাষায় বাধা দেয়ায় মিস্টার স্টেইড হয়তো সংবিৎ পেলেন। কিন্তু হাজার-হাজার, হাজার-হাজার বছর ধরে লুপ্ত বংশানুক্রম জুড়ে উচ্চবর্ণের মতলব ঠাহর করতে পারার শূদ্র-অভ্যাসে যোগেন নিজের শরীরের গভীরে বোঝে—শূদ্র যেমন উচ্চবর্ণের সম্মুখে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে নিজের ছায়া মুছে দিতে চায়—যাতে বর্ণহিন্দুকে সে-ছায়া স্পর্শ না করে ও তার সর্বত্র দুই চোখের রক্তিমের সঙ্গে যাতে বর্ণহিন্দুদের দৃষ্টি বিনিময় না হয়, তেমনি যোগেন মিস্টার স্টাডকে একটা সাফাই দিচ্ছে—এটা যোগেন নিজের মনে বুঝে ফেলে। মিস্টার স্টাডস সংবিৎ হারিয়ে থাকতে পারেন—কিন্তু সেটা শাদা চামড়ার সংবিৎ। তার গ্রুপের ২৫টি ভোট পেয়ে, যে-মন্ত্রিসভা টিকে থাকে তার মন্ত্রীদের সাহস হয় কী করে যে মুখের ওপর কথা বলে? মুসলিম চেম্বার দেখায়? মন্ত্রিসভা ফেলে দিতে তো মিস্টার স্টাড-এর গভর্নরকে দু-লাইনের চিঠি দিয়ে অফিসের বেয়ারাকে রাইটার্সে পাঠিয়ে দেয়াটাই যথেষ্ট। তমিজুদ্দিনের বাধাটুকু মিস্টার স্টাডসকে বড়জোর মনে করার ফাঁক দিল যে এমন একটা যুদ্ধের বিপাকে ব্রিটেন যখন বিপন্ন, তখন ভারতে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করা তাঁর মত প্রবীণ ব্রিটিশের মানায় না। এমন কী, তাঁর সমর্থনের ভিক্ষে দিয়ে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের এক প্রাদেশিক সরকারকে টিকিয়ে রাখার মধ্যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি ব্রিটিশের সশ্রদ্ধ পক্ষপাত যেমন প্রমাণিত সেই প্রমাণটি অনেক বেশি দরকার। অনেক বেশি দরকার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্য।

যোগেন হঠাৎ শোনে সারওয়ারদি বলছেন, 'দেখুন, এই সম্মিলন ডাকার প্রশ্নই উঠত না যদি এই যুদ্ধের ফলে বিশেষ করে জার্মানি ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গারিতে আমাদের ট্র্যাডিশন্যাল পাট-রপ্তানির বাজার আমাদের পক্ষে একেবারে নিষিদ্ধ হয়ে না যেত। আমরা, বেঙ্গল, বাংলা, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পাট উৎপাদক, গুণে শ্রেষ্ঠ ও বিস্তারে, বৃহত্তম, হ্যাঁ এই বেঙ্গল, বাংলা, তাই এই যুদ্ধে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠিত পুরনো ব্যবস্থা যখন ধসে গেছে, তখন সেই বাংলায় সেই পাটের ব্যবসা নিয়ে যে সামান্য অনিশ্চয়তা দেখা গেছে তাকে তো অতিশয় সামান্য বলাই যায়। কিন্তু আমরা তো চাই সেই অনিশ্চয়তায় জড়িয়ে পড়েছে যারা, তাদের সব পক্ষের কাছে এই সমাধান গ্রহণীয় হোক—মিল-মালিকদের কাছে, চেম্বারগুলোর কাছে, নতুন স্থানীয় পেশাদারদের কাছে ও 'লাস্ট বাট নট দি লিস্ট, পাটচাষিদের কাছে। এবার আমি তমিজুদ্দিন ভাইকে অনুরোধ করছি আপনাদের সবার সঙ্গে কথা বলে এই মিটিঙের পরবর্তী বৈঠকের ব্যবস্থা কী হয়েছে তা আমাদের জানাতে। কাল তো রোববার। তাহলে কালই আমরা বসি না-কেন। বিফোর লাঞ্চ আমরা নিশ্চয়ই মিটিং শেষ করতে পারব।' তমিজুদ্দিন শাহেব তখন নানা জনের সঙ্গে নানা রকম কথা বলছেন, যোগেনের মনে হল—কালই হচ্ছে তাহলে মিটিংটা, সময়টা জেনে নেয়ার জন্য সে তমিজুদ্দিনকে ঘিরে থাকা ভিড়টার পেছনে দাঁড়ায়। শুনে নিলেই হল বা কাউকে ফোন করে নিলেও হত।

তমিজুদ্দিনই ডেকে ওঠে, 'যোগেনদা, কাল সকাল নটা। গাড়ি পাঠাব না কী?'

যোগেন তার ডান হাত তুলে আঙুলগুলো খেলিয়ে ও একটু হেসে জানিয়ে দেয়, গাড়ি লাগবে না।

হল থেকে বেরিয়ে যোগেন দেখে—বেলা শেষ কিন্তু আলো জ্বলেনি। যেন আলো জ্বলা উচিত ছিল—এই রকম ভঙ্গিতে আরো একবার তাকাতেই যোগেনের মনে পড়ে যায়—যুদ্ধের জন্য ডেলাইট সেভিং চলছে।

সময় আছে বলে যোগেন নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাড়িতে যাবে ঠিক করল।

যোগেনের ইচ্ছে করছিল পাটের ব্যাপারটা নিয়ে ওঁর সঙ্গে একটু কথা বলতে। সুভাষের কাছে যাওয়ার কথা স্বাভাবিকভাবেই মনে এসেছিল। সেই মনে আসা সত্ত্বেও যোগেন যে সুভাষকে ছেড়ে নীহারেন্দুর কাছে যাচ্ছে, তা নয়। যেন, সুভাষের কথা মনে এসেছিল, তারপর নীহারেন্দুর কথা মনে এল, তাই নীহারেন্দুর কাছেই যাবে ঠিক করল। সুভাষবাবুর ওখানে না-জানিয়ে গেলে, কাজ নাও হতে পারে। কথায়-কথায় বা খাওয়ায়-খাওয়ায় এত দেরি হয়ে যায় যে ১৫ নম্বরে ঢুঁ মারার সময় আর হাতে থাকে না। কংগ্রেসের ভাঙাভাঙি নিয়ে সুভাষবাবুর ওখানে প্রায় রোজই যেতে হচ্ছিল।

ঠিক যে হিশেবনিকেশ করে যোগেন সুভাষের কাছে না-গিয়ে নীহারেন্দুর কাছে যাচ্ছে—তা না হলেও, একটু হিশেব-নিকেশ যে মনের আড়ালে ঘটেনি, তাও নয়। এসব নিয়ে সুভাষের মত যোগেন শুনেছে—একদিন ওর সঙ্গেই কথা হচ্ছিল, আর-এক দিন পাঞ্জাব থেকে একজন এসেছিলেন, যোগেন পরে জেনেছিল তিনি পাঞ্জাব সরকারের কৃষিমন্ত্রী, তিনি জানতে চাওয়ায় সুভাষ একটু ছড়িয়ে বলছিলেন। কারণ, পাঞ্জাবের কৃষিমন্ত্রী পাটচাষ, পাট ব্যবসা, পাটের দাম ব্যাপারটা প্রায় বুঝতেই পারছিলেন না। তাঁদের কাথাবার্তা শুনতে-শুনতে যোগেন জেনে ফেলে, মন্ত্রী মনে করছেন—পাঞ্জাবের আখচাষের সঙ্গে বাংলার পাটচাষ তুলনীয়। উনি ওঁদের অসুবিধের কথাও বলছিলেন—আখের দর বেঁধে দেয়া, কৃষকদের ক্ষতি ইত্যাদি। এই দু-দিনের কথাবার্তা থেকে যোগেন বুঝে নিয়েছে—সুভাষবাবু পাটের ব্যাপারে তাঁর পুরনো ধারণাই আঁকড়ে আছেন যে, পদ্ধতি যাই হোক না কেন, পাটের চাষের একরোজ যদি কমানো না যায়, তাহলে খোলা বাজারের নিয়মে পাটচাষি কোনো সময়ই ন্যায্য দাম পেতে পারে না, কারণ, বাজারের নিয়ম অনুযায়ী খদ্দের যত পারে তত কম দাম দেবে আর চাষি, যদি এবার দর পাওয়া যায় ভেবে চাষ বাড়িয়ে বাজারের চাহিদার চাইতে অনেক বেশি পাট বাজারে আনবে। পাঞ্জাবের কৃষিমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপে সুভাষবাবু বেশ জোর দিয়ে বলেছিলেন—এটা তো একটা ইম্পসিব্‌ল্‌ সিচুয়েশন। ক্যাশক্রপ মানে যে ক্রপ বেচে ক্যাশ পাওয়া যায়। মানে, সেখানে মার্কেট রিলেশনস অপারেট করবে। তাহলে তো আপনাকে প্রাইস ভেরিয়েশনের রিস্কও নিতে হবে। একমাত্র প্রোডাকশন লিমিটেশন ছাড়া তো বাজারের ওপর চাষি কোনো চাপ তৈরি করতে পারবে না। একারেজ লিমিটে বাধ্য করা। দরকার হলে পুলিশ দিয়ে, প্যারা-মিলিটারি ফোর্স দিয়ে, আইন দিয়ে পাট উৎপাদন কমালে চাষিকে খদ্দের একটা দর দিতে বাধ্য হবে। পাঞ্জাবের মন্ত্রী একবার কথাটা তুলেছিলেন যে এই উৎপাদন-নিয়ন্ত্রণে কিষান সমিতি বা এমনকী কমিউনিটি প্রেসারকে কাজে লাগানো যায় কী না কারণ পাঞ্জাবে শিখ আর মুসলমান এই দুই ধর্মের মানুষই সংগঠিত ধর্মাচরণ করে। সেখানে গুরুদ্বার থেকে বা মসজিদ থেকে কোনো ফরমান জারি কি সাহায্য করতে পারে বা কাজটাকে গবর্মেন্টিটেন্ট থেকে সরিয়ে সমাজের একটা কাজের অংশ করে দেয়ার চেষ্টা কি করা যায়?

সুভাষবাবু এই প্রশ্নটির কোনো সরাসরি জবাব দিলেন না—বরং তিনি বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠলেন যে পাঞ্জাবে সব ধর্মাচরণের একটা সংগঠিত চেহারা আছে। তিনি আরো জানতে চাইলেন—এই সংগঠনগুলি কীভাবে কাজ করে। কৃষিমন্ত্রী খানিকটা বলতেই বোঝা গেল—বিষয়টি সুভাষবাবু জানেন কিন্তু কৃষিমন্ত্রী আখ বা পাটের বাজার নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে বলেছেন বলে তিনি বুঝে উঠতে পারেননি। সুভাষবাবু বললেন, 'কিষান সমিতির ধারণাটি ভাল কিন্তু আমাদের এই

আইন-অমান্যই বলুন আর জাঠা-মিছিলই বলুন, সব কিছুই যেন বিশৃঙ্খল ভিড়ের ব্যাপার। এদিয়ে কি এই ধরনের কঠিন কাজ করা যায়? গান্ধীজি আমাদের স্বভাবই নষ্ট করে দিয়েছেন তো! ধরুন, কিষান সমিতিগুলি যদি একটা সংগঠিত বাহিনীর মত, ইউনিফর্ম পরে, অধিকার নিয়ে উৎপাদন কমাতে বাধ্য করে—তাহলে কৃষকরাও ভরসা পাবে, তাদের কথা শুনবে। সেটা হতে পারত।

সুভাষবাবুর এই মতটা যোগেনের জানা আছে বলেও হয়তো সে নীহারেন্দুবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেল। হয়তো সেখানে সে সুভাষবাবুর কথাটাও যাচাই করতে পারে। হয়তো, পাট নিয়ে সুভাষবাবু যে-যুক্তি দিচ্ছেন যুক্তি হিশেবে সেটাই ঠিক কিন্তু সেই যুক্তির পরিসরে যেন পাট সমস্যাটি কোনাকানছি-সহ ঠিক আঁটছে না। যুক্তির বাইরে যে-অংশগুলি ছড়িয়ে থাকছে তার বহর কিছু কম না। পাট নিয়ে যোগেনের কোনো পারিবারিক অভিজ্ঞতা নেই—তাদের তো কোনো জমিই নেই পাট বা ধান কোনো কিছুরই কোনো টুকরো জমিও নেই। আর পাটের সঙ্গে চটকল একেবারে গাটছড়া বাঁধা। চটকলের বিষয়টা নীহারেন্দুবাবুর কাছে বিস্তারিত জানা যাবে।

কিন্তু নীহারেন্দুবাবুর বাড়ি গিয়ে শুনল, উনি বাড়ি নেই। এমনটা হতে পারে, জানাই ছিল। বাড়ির লোকজন ভিতরে বসতে অনুরোধ করল কিন্তু যোগেন না বসে বেরিয়ে আসছে, এমন সময় একটি ফুটফুটে মেয়ে, শাদা ফ্রকে, ছুটতে-ছুটতে এসে বলে, জেঠু ভারতসভা হলে মিটিঙে আছেন।

যোগেন হেসে ফেলল দেখে মেয়েটিও হেসে ঠোঁটে হাত চাপা দিল।

'আরে তাই তো! দ্যাখো তো মা, সে-মিটিঙে তো আমারও যাওয়ার কথা। কিন্তু আমার আর—একটা মিটিং ছিল বলে আমি ঐ মিটিংটার কথা ভুলে গিসলাম।'

'তুমি কি পরের খবরটা পেলে আগের খবরটা ভুলে যাও?'

'তাহলে তো মা, তোমাকে অনেক কথা বলতে হয়'।

'বলো, আমি শুনব। তুমি তো ভুলেই যাও, তাহলে গল্প বলবে কী করে?'

'মা রে, তুমি তো আটকাইয়া দিল্যা!'

'কী বললে? আট—, কী।'

'মাজননী, তোমার ডাক শুইন্যা প্যাট থিক্যা মাতৃভাষা বাইরিয়্যা পইড়ছে মা। আমার দ্যাশে সব মানুষই এই রকম কথা বলে।'

'তাহলে তো তোমার দেশে আমার যাওয়া হবে না।'

'কেন মা, তুমি যদি যাইব্যার না পারো তাইলে আমার দ্যাশ যাওনের কামডা কী? যাউকগা ভাইস্যা সমুদ্দুরে।' শুনে মেয়েটি ফুরফুরিয়ে হাসে। কোন কথাটাতে সে মজা পেয়েছে তা বুঝতে না পেরে যোগেন আবার বলে, 'কাম কী আমার তেমন দ্যাশে—?'

মেয়েটি আবার হেসে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমাদের দেশে কি সব ভাসে?'

'যোগেন একটু চিন্তিত মুখে বলে, 'না-ভেসে করব কী' দশ পাকে তো জল। জলে তো আর হাঁটা যায় না, মা, ভাসতেই হয়—'

'তোমরা কি হাঁসের মত ভাসো, না, সিন্ধুঘোটকের মত, নাকি, সিলমৎস্যের মত?'

'তুমি এ সব দেখলা কোথায় মা? সিন্ধুঘোটক, সিলমৎস্য, এগুলা কি সত্যি-সত্যি আছে?'

'হ্যাঁ আছে। আমি দেখেছি। চিড়িয়াখানায়। সিন্ধুঘোটক তো পুরোটা একবারে ভাসতে পারে না, মানে, ও তো খুব মোটা,' মেয়েটি দু-হাত ছড়িয়ে সিন্ধুঘোটকের বিশালতা বোঝায়, 'একদিকটা

ভাসালে, আর—একটা দিক ডুবে যায়। আবার অনেকক্ষণ পর, সে সেই আর—একটা দিক ভাসায়—'

মেয়েটি হাসে, যোগেনকেও হাসায়। যোগেন বলে, 'তাহলে খুব মজা হয়েছে চিড়িয়াখানায়?'

'মজা হবে কেন। চিড়িয়াখানায় ভাসা দেখা গেল বলে? সেটা মজা ছিল? ভাসাটা?'

'বাঃ, মজা না? একটা সিন্ধুঘোটককে তুমি কতবার ভাসতে দেখলে, সেটা মজা না?'

মেয়েটি একটু টেরিয়ে যোগেনের কথাটা বুঝতে চায়, 'কোনটা মজা বলছ? সিন্ধুঘোটক একটা বলে, না, ভাসাটা অনেক বলে?'

'আমি তো চিড়িয়াখানায় যাই নাই। তাই আমি বলতে পারব না। তুমি তো গিছ। তুমিই কও।'

মেয়েটি আবার চিন্তা করার পুরনো ভঙ্গিটা তৈরি করল, হয়তো ভঙ্গিটা নতুন শিখেছে—গালে আঙুল, ঘাড় হেলানো চোখ টেড়ানো।

'সিন্ধুঘোটক একটাই ভাল। দুটো হলে দেখা যাবে না, ভিড় হয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ, এডা ঠিক। দুই-দুইডা সিন্ধুঘোটকে যদি ভিড় না হয়, তাহলে সেগুলো সিন্ধুঘোটক কী না সে-বিষয়ে সন্দেহ হবে।'

মেয়েটি সম্মতি জানিয়ে হেসেই তাড়াতাড়ি হাসিটা মুছে নেয়, 'কেন হবে? সিন্ধুঘোটকদের কি ছোটবেলা নেই। তেমন ছোটবেলার দুটো সিন্ধুঘোটক এঁটে যেতে পারে। বুম্বা আর আমি তো এক খাটে এঁটে যাই কিন্তু জেঠু আর বাবা শুলেই ভিড় হয়ে যাবে। তবু, একটাই থাক।'

'নিশ্চয়ই একটাই থাক। দুটোর দরকার কী?'

'ঐ তুমি যেটা বললে একটাই থাক, সেটাই।'

'সেটার নাম কী?'

নাম দিয়ে কী হবে মা, এই যে তুমি আর আমি এতক্ষণ কত কথা বলছি, তুমি কি আমার নাম জানো, না, আমি তোমার নাম জানি?'

'আমি তো ছোট। তুমি যে-নামে ডাকবে, সেটাই আমার নাম হয়ে যাবে। কিন্তু তুমি তো বুড়ো হয়েছ। তোমার নাম তো তোমার সঙ্গে সেঁটে গেছে। নতুন নামের জায়গা নেই। তোমার নামটা বলবে?'

'তুমিই দিয়ে দাও না মা। সবার জানার দরকার নেই। শুধু তুমি জানবে আর আমি জানব। কী মজাটাই হবে—বলো।'

'ঠিক চিড়িয়াখানার ঐ সিলমৎস্যটার মত। জানো, সিলমৎস্যের ইয়া বড়-বড় গোঁফ আছে, বিড়ালের মত আলগা, সীতানাথের মত ঝাপড়া নয়। সিলমৎস্যটা জলের ভিতর একটু সরু আর শুকনো পাথরের মাথায় বসেছিল। সবাই বলছিল, সিলমৎস্যটা যখন ঘুমিয়ে পড়বে, তখন ওর গোঁফগুলো নড়ে উঠবে। অনেকেই দেখল, আমার দেখা হল না। আমি এতটাই দেখছিলাম, যে আমার চোখে জল এসে গেল। কিন্তু সিলমৎস্যটির একটা গোঁফও নড়ল না। ও তো মিছিমিছি ঘুমও ঘুমুতে পারত একটু'।

'ওটা ঘুমাতে জানলে তো ঘুমাবে? আমি খবর কইর‍্যা আসি কোন সিলমৎস্য ঘুমাতে জানে! কিন্তু তোমার কি সিলমৎস্যই লাগবে মা? অন্য মৎস্যে হবে না?'

'কেন? অন্য মৎস্য কি তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়বে?'

'ঘুমিয়ে পড়লেই তো চলে না। তারে তো আবার ঘুমের মধ্যে গোঁফও নাচানার লাগব। তাও একবারে এক গোছা গোঁফ নাচাইলেও তো হব না। একটা একটা কইর‍্যা গোঁফ নাচাইতে

হইব। এ বড় কঠিন কাজ মা। তুমি কি সিলমৎস্য ছাড়া অন্য কোনো মৎস্য দেইখছ কুনোদিন?'

'মৎস্য? দেখেছি? না। মৎস্য তো সিলমৎস্য'।

'তাহলে তুমি ভাতের সঙ্গে মাছ খাও না?'

'হ্যাঁ। খাই তো।'

'আচ্ছা। সেগুলা তাইলে তুচ্ছ মাছ? সিলমৎস্য না?'

'তুচ্ছ মৎস্য দেখেছ?'

'আমি দেখলে তো তোমার চলবে না, মা। তোমার তো সিলমৎস্যই চাই।'

'না-হলে গোঁফ থাকবে?'

'গোঁফ না থাকলে নাড়াবে কী?'

'না। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে নাড়াবে।'

'সে তো বটেই। জাইগ্যা-জাইগ্যা গোঁফ নাড়াইলে তো আর সিলমৎস্য হয় না।'

'তাই তো। দেখো আমার ঠিকঠাক মনে আছে কী না। সিলমৎস্য—পাথর থিক্যা নামা ঝরনার মত লেজ, এক দিকে মূল কইর‍্যা বসে থাকে। ঘুমাতে বললেও, ঘুমায় না।'

'লেজ কি ঝরনার মত হয়?'

'কোনো একটা কিছুর মত তো হতেই লাগে?'

'লেজটা তো লেজের মত—'

'লেজের তো ছোটবড় হয়। তুমি ছাগলের লেজ দেখছ, মা?'

'ছাগল কী?'

'মাগ, সিন্ধুঘোটক, তিমিমৎস্য পর্যন্ত পাড়ি দিল্যাম। এখন ছাগলে আইস্যা গর্তে পড়ি?'

'ছাগল চিড়িয়াখানায় থাকে?'

বাড়ির ভিতর থেকে চাপা একটা গলা এল। মেয়েটি সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরে বাড়ির দরজার দিকে ছুটতে-ছুটতে বলে যায়, 'পিসিমণি ডাকছে। তুমি কিন্তু সিলমৎস্য ভুলো না।' মেয়েটিকে আর দেখা গেল না কিন্তু যোগেন হাতটা নাড়িয়ে ফেলল। গেট দিয়ে বেরতে-বেরতে যোগেন ঠোঁটের একটু হাসি মিশিয়ে নিজেকে বলে, 'ভাগ্যি, নীহারেন্দুবাবুদের মিটিং থাকে—'।

নীহারেন্দুবাবুদের বাড়ি থেকে 'ভারতসভা' হলে পৌঁছুতে বাসে মিনিট বিশের বেশি লাগত না। মেয়েটির সঙ্গে কথা বলা তাকে এমন ফুরফুরিয়ে দিয়েছে যে সে বাস ধরার জরুরি ব্যবস্থাটা ভুলে গেল ও খানিকটা হেঁটে ট্রামের সেকেন্ড ক্লাসে উঠল। এখন যোগেনের যাতায়াত-ব্যবস্থা এটাই। ট্রাম কোম্পানির একটা অলরুট মান্থলি করে নিয়েছে। অতিরিক্ত তাড়া না থাকলে বা গন্তব্যের কাছাকাছি ট্রাম না থাকলে অগত্যা বাস। কতদূর পর্যন্ত ট্রামে গেলে বাসভাড়া কম লাগবে সেটা ঠিক করতে বাসের স্টেজ জানতে হয়েছে যোগেনকে। নীহারেন্দুবাবুদের বাড়ি থেকে বেরতে বেরতে ভেবেছিল, বাস ধরে হুস করে 'ভারতসভা'য় পৌঁছে যাবে। কিন্তু আপন মনে হাঁটতে হাঁটতে সেই ট্রামেই উঠল।

'ভারতসভা' হলের দোতলায় ওঠার সিঁড়ির প্রথম বাঁক থেকেই উঁচু গলার বক্তৃতা শুনে যোগেন আশ্বস্ত হয় যে মিটিং চলছে।

ভিতরে ঢুকে পেছনের একটা চেয়ারে বসে পড়ে যোগেন। এই মিটিংটার কথা নীহারেন্দুবাবু অনেকবার বলেছিলেন। চটকলের নানা ইউনিয়ন মিলে করছে, 'শহরের লোকজনকে সচেতন' করতে। এই পেছন থেকে যে রকম মাথা আর জামা দেখছে, যোগেন তাতে তো মনে হয় না—টাউনের লোক খুব একটা এসেছে।

গভর্নমেন্ট যে তাকে কনফারেন্সে ডাকবে—যোগেন তার কোনো আভাস পায়নি, কোনো কারণও বোঝেনি।

কিন্তু নীহারেন্দুবাবুকে কনফারেন্সের কথাটা জানাতেই পারেনি। নিজের দোষী-দোষী ভাবটা কেটে গেল।

সারাদিন ধরে পাটের আর গবর্মেন্টের শাহেবদের আর মন্ত্রীদের পাট নিয়ে ঝগড়াঝাটি শুনতে-শুনতে ও দেখতে-দেখতে পাটটাকে যোগেন তার নিজের মত করে বোঝার একটা জায়গায় এসেছে। সেটা একেবারে তার নিজের পদ্ধতি। কার সঙ্গে কার কী মতলবে কোন বিবাদ সেটা আন্দাজ করে ফেলার শুদ্দুরি ক্ষমতা না থাকলে কি কোনো শুদ্দুরই বাঁচতে পারে? কনফারেন্সের সব ঘটনা বিশদে এই ইউনিয়ন-নেতাদের না-জানালে তার চলবে না। সেটা জানতে-জানতে তাদের প্রতিক্রিয়া থেকে যোগেনকে আবার নিজের একটা বোঝাপড়া বানিয়ে ফেলতে হবে, কাল সকালের আগেই, যাতে নটাতেই কাউন্সিল হলে পৌঁছুতে পারে।

মঞ্চ মত জায়গাটিতে সুরেশ ব্যানার্জি, মৃণাল বোস, নীহারেন্দুবাবু, শিবনাথবাবু, বঙ্কিমবাবু বসেছিলেন। সুরেশ ব্যানার্জি ঘোর গান্ধীবাদী কিন্তু ইউনিয়নের বক্তৃতা করেন যেন চটকলের চালে আগুন লাগাচ্ছেন। ওঁকে নাকি দেশী মালিকরা সাহায্য করেন যাতে শাহেব চটকলগুলোতে উনি গোলমাল বাঁধাতে পারেন। সুরেশ ব্যানার্জির বক্তৃতার পর এমন কী বঙ্কিম মুখার্জির বক্তৃতা শুনলে মনে হয় শুদ্ধ খাদি। নানারকম ইউনিয়নের কথা শুনেছে বটে যোগেন, কিন্তু তার মনে থেকে গেছে এ আইটিইউসি, বিপিটিইউসি, এনটিইউএফ, বিএলএ, বিএলপি, এই নামগুলিই। কমিউনিস্ট, সোস্যালিস্ট আর ওয়ার্কার্স পার্টি কংগ্রেসের ভিতর থেকেই নিজেদের ইউনিয়ন করে। বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল মুসলিম লিগ ইউনিয়ন চালায় সারওয়ারদি। তাদের প্রধান কাজ নাকি অন্য মিলের হিন্দু শ্রমিকদের ওপর দাঙ্গা করা। যুদ্ধের আগে চটকলে নাকি গোলমাল লেগেই থাকত—হয় স্ট্রাইক নয় দাঙ্গা। কিন্তু যুদ্ধ লাগতে-না-লাগতে চট আর হেসিয়ানের চাহিদা বাইরে এত বেড়ে গেছে যে কাজের সময় নষ্ট না করে শ্রমিকদের টাকাপয়সা দেয়াটাও লাভজনক ছিল।

শ্রমিকরা ওভারটাইম ও ওয়ারবোনাসের দাবি তুলতেই আইজেএম-এ খেপে উঠেছে।

'মিল মালিকরা তাদের সঙ্গে মজুরদের লড়াইটা বদলে দিতে উঠে পড়ে লেগেছে। যেন, মালিকদের সঙ্গে মজুরদের কোনো খিটিমিটি নেই। সব খিটিমিটি হচ্ছে পাটচাষিদের জন্য। পাটচাষিরা পাটের দর বাড়াতে চায় যাতে তাদের হাতে নগদ আসে। এত চাষ করলে পাটের কোয়ালিটি থাকবে কী করে। এই সব কথার মাথাও নেই, লেজও নাই। মালিকের কথা শুনে আমরা পাটচাষি ভাইদের ওপর চড়াও হওয়ার মত বেকুফ না। যে চাষ করছে, সে পাটই হোক আর চাল-ডালই হোক—সে তো তার ন্যায্য দাম আদায় করবেই। আমরা চটকলের মজুররা আমাদের মেহনতের দর চাই। চাষিভাইরা তাদের মেহনতের দর চায়। আমাদের মধ্যে কোনো ঝগড়া নাই। ঝগড়া হবে না। এ কি রথেরমেলায় দানধ্যান করা নাকি। মালিক দশটাকার খুচরা করে বলে—আমার এই দশটাকার দান। তোমরা ঠিক করে দাও—কারা দান পাবে, যাদের কুঠ হয়েছে তারা, নাকি যারা আন্ধা হয়েছে তারা? তোমরা যা বলবে, আমরা তাদেরই দান দেব। এই যে আমরা খুচরা নিয়ে তৈরি।'

বক্তা একটু থামল। এত সুন্দর গল্পের মত বলছিল যে কেউ টেরই পায়নি, তারা কখন গল্পটার সঙ্গে এতটা লেপ্টে গেছে। বক্তা বোধহয় একটু বেশিক্ষণই চুপ করেছিল। হল থেকে কেউ চিৎকার করে উঠল, 'আরে হুয়া কিয়া, বাতলাও।'

বক্তা সারা মুখ ভরিয়ে হাসল আর হাসিটা লেগে থাকল ঝকঝকে শাদা দাঁতে। সবাই ভেবেছিল—এবার বিস্ফোরণ ঘটবে। তার বদলে বক্তা শান্তিজল ছিটিয়ে হাসিমাখা গলায়নিচু স্বরে বলে ওঠে, 'আরে উজবুক। এই বুদ্ধি না হলে কি মালিক হয়? তোর কিস্মত যদি দশটাকার খুচরা হয়, তাহলে তোর দান নেওয়ার জন্য দুনিয়ার সারে আদমি দোভাগে ভাগ হবে—হয় কুঠ, নয় আন্ধা।'

কথাটা এমন স্বরে, এমন হাসিতে, এমন থেমে থেমে বলা যে পুরো হল ও বক্তাও হেসে উঠল ও হাততালি দিল। যোগেন খুব একচোট হাসল। দারুণ বলেছে। তোর দানের কিস্মত জেনে কি কুঠ আর আন্ধা ভাগ হবে? সত্যি, দারুণ বলেছে। সবার হাসি শেষ হওয়ার পর যোগেন আবার একচোট হাসে, একা। যেন, সে সারাদিনের কনফারেন্সের জবাব শুনল—পাটের চাষ কমাও, তাহলেই ন্যায্য দর পাবে। আরে, বেশি বেঁচে থেকো না, তাহলেই বেশিদিন অনাহারে থাকতে হবে না।

যোগেন আবার একা-একা হেসে ফেলল, দারুণ বলেছে, হাঁটতে গেলে ব্যথা লাগছে, পা-টা কেটে বাদ দাও তাহলে ব্যথা থাকবে না।

এরকম আরো অনেক তুলনা মনে আসতেই লাগল আর যোগেন ফুকফুক করে হাসতেই লাগল।

হঠাৎ বঙ্কিমবাবু মঞ্চ থেকে যোগেনকে ডাকেন, এম এল এর ওপর জোর দিয়ে, শিডিউল কাস্টের ওপর জোর দিয়ে ও সাধারণ আসনের ওপর জোর দিয়ে। বঙ্কিমবাবুর গলার জোরে ও কথা বলার কায়দায়, সবার মনে হল, যোগেন তাহলে খুব লড়াকু মানুষ, নদীনালা-সমুদ্রের দেশ থেকে সাঁতরাতে সাঁতরাতে কলকাতায় এসেছে। সবাই এমন হাতাতালি দিয়ে উঠল যে যোগেনের আর না-উঠে উপায় থাকল না।

যোগেন খুব নিচু স্বরে বলল, 'আমি বঙ্কিমদার আদেশে এইখানে দাঁড়াইছি। কিন্তু আমি পাট নিয়েও কিছু জানি না, চট নিয়েও কিছু জানি না। আমার বাড়ি বরিশালে। সারা বাংলায় যেসব জায়গায় সবথিকা বেশি আর সবথিকা ভাল পাট হয়, তার মধ্যে বরিশাল ফার্স্ট।'

হঠাৎ হাততালি পড়ল। যেন, বরিশালের এই শ্রেষ্ঠত্ব এই মিটিঙেরও কৃতিত্ব। যোগেন কিন্তু ধরতে পারেনি, কেন হাততালি। সে বলতে লাগল।

'বরিশালের মানুষ হওয়ার কিছু স্থায়ী অসুবিধা আছে। লোকে ভাবে, বরিশালের মানুষ মানেই বড়-বড় ডাকাত। অ্যাহন ধরেন, জোয়ান ছেলের বিয়া হইল। ফুলশয্যাও হইল। ফিরত ঘোরানোও হইল। বাপের বাড়ি গিয়ে মাইয়া তো মায়ের কাছে কাইন্দ্যা একসা। মা, মাস কাইটতে গেল, মানুষ তো বাড়ির বাইর হয় না। শুদু আমার লগে-লগে থাকে।'

মায়েও তো বরিশালের। সে মুখ ঝাপটায়, 'জামাই যদি তোর হোগায় হোগায় না থাইকত তাইলে তো আইস্যা কাঁইদবার ধরতি। বিয়্যার পরের মাসিক হইছে?'

'ঐ সব কথা না। তুমি না কইছিলা বড় বড় ডাকাতি করে। তাতেই সম্পদ। কইছিল্যা—ট্যার প্যালেও ভাঁজ দিবি না। কইছিল্যা-না—বৌয়ের ভাইগ্যে ডাকাইতি উশুল।'

'আরে, সবে তো বিয়া বইসছে। এর মইধ্যে কারো ইচ্ছা হয়—বন্দুক-শড়কি-বল্লম নিয়্যা মাইল মাইল জল উথলাইতে? সাবধান, জামাই য্যান তোর মনের এই দুঃখের দিশা না পায়। যহন ডাকাতি টাইম আইবে, তহন কইরবে।'

সারা হল তখন হাসিতে হাততালিতে চিৎকারে যোগেনের কথায় ফুর্তি জানাচ্ছে।

'এই রকম আরো কিছু স্থায়ী অসুবিধা আছে বরিশাইল্যাগ। এই—যে বঙ্কিমদাদা আমারে

মঞ্চে ডাক দিলেন, তার কারণ কী? বরিশাইল্যা মানুষ যখন যোগেন, ও কী কইর‍্যা পাট না-জানে? কিন্তু সত্য কথাডা হইল, আমি আমার বাপের নামডাও জানি না। ক্যান? সরকারি কাগজপত্রে তো নিজের পরিচয় আইন-মোতাবেক কইরতে বাপের নাম দিতে হয়। আমাগ পরিবারের-মোতাবেক কইরতে বাপের নাম দিতে হয়। আমাগ পরিবারের কারো কুনোদিন দলিল হয় নাই। দলিলই যদি না-হয়, তাইলে বাপের নামের প্রয়োজন কী? আমাগ বংশের বা বাড়ির গুষ্ঠির কোনো একডা শিমূল গাছের ছায়ার মাপেরও জমি নাই।

'তাইলে পাটের দর দিয়্যা আমার কী লাভ? লাভডা খুউব সত্য ও খুউব গোপন। যে পরিমাণ পাট প্রথম ধাক্কায় বাজারে আসে, সেগুলা ভাল পাট না। কিন্তু সারা বছরের মোট পাটের আট আনি বা দশ আনি। কিন্তু সে-পাট না-বেচলে ঘরে তো হাঁড়ি চড়বে না। তাই খানিকটা পাট কম দরে বেইচ্যা চাষাগ তো নিজের প্যাটে আর ছাওয়াল-পাওয়ালগ প্যাটে কিছু ধানের বিচি ভইর‍্যা কৃষ্ণ বা শুক্ল কোনো একডা পক্ষ কাটাইতে হয়। আশা এই লটের পাট-টা সরেস হবে। কিন্তু আঁতুড়ঘরে যে শিশু কান্দে না, সে আর কোনোদিনই কান্দে না। পাট সরেস না নিরেশ সেইডা ঠিক করে কে? পাটের চাষি না—যে পচা জলের তলায় পাটের ভাঁটা টার মাপ আঙুলে মাইপ্যা জানে কোন পাট সরেস আর কোন পাট নিরেশ। সেডা তো হুকুম দিবে হাকিম—ফইড়্যা, পাইকার, আড়তদার।

'তাইলে আমাগ স্বার্থডা কী? যাগ বাপের নামটাও জানা নাই? এইডা খুব গোপন কথা, নিজের কাছেও কওয়া যায় না। পাটের দামটায় অন্তত কয়েকমাস ধান কেনার টাকাডা যদি পাওয়া যায়, তাইলে আমাগ খালেবিলে, হাওয়ায়, হাটে, নৌকায় সিদ্ধ চালের বাস পাওয়া যায়। ভাতের গন্ধেই তো খিদার অর্ধেক পূরণ।

'এইডা ছাড়া আমাগ আর স্বার্থ কী?'

যোগেন মঞ্চ থেকে নেমে আসে। সে নেমে এসেছে বোঝার পর হলের লোকজন একটু বিলম্বিত হাততালি দিয়ে ওঠে। বক্তৃতার শুরুতে যোগেন যে বাহবা পেয়েছিল, শেষে সেই বাহবা পেল না। যারা শুনছিল, তাদের ভাল লাগেনি বলে তারা বাহবা দিল না—তা নয়। যোগেন যেখানে এসে শেষ করল—সেটাই যে শেষকথা তা অন্তত এই মিটিঙে সবাই জানে। জানলেও, কথাটা অপ্রত্যাশিত। কথাটা তো দাঁড়াল, পাটের দর পেলে, বাতাসে ভাতের গন্ধ পাওয়া যায়।

সারাদিন ধরে কাউন্সিল হলে, প্রধানত ইংরেজিতে, চেম্বারগুলোর রেষারেষি পাটটাকে যেন আকাশের গ্রহ-তারার মত অলৌকিক করে দিয়েছে। পাট মানে কোনো ফলন নয়। পাট মানে একটা বাজার। দুনিয়া জোড়া বাজার। সে-বাজারে, যেমন আজ কাউন্সিল হলের মিটিঙে, পাটের কোনো চাষি নেই। শুধু নানা নামে কিছু খদ্দের আছে।

সেখানে পাট থেকে ভাতের গন্ধ পাওয়া যায়?

ঢাকায় সেনসাসের দাঙ্গা

মার্চ (৪১) থেকেই খবর আসছিল লোকের মুখে-মুখে যে ঢাকার এক-এক জায়গায় দাঙ্গা বাঁধছে। কাগজ পড়ে তো বোঝার উপায় নেই। হিন্দু কাগজ পড়লে মনে হয়, কোথাও-ই কোনো হিন্দুকে আর বেঁচে থাকতে দিচ্ছে না মুসলমানরা। আর মুসলিম কাগজ পড়লে মনে হয় হিন্দুরা মুসলমান মেরেই বাংলায় সংখ্যাগুরু হবে।

১৫৪

ঢাকা শহর যোগেনের চেনা, বরিশালের মতই। ওই যারা ঢাকা থেকে আসছে তাদের কাছ থেকে শুনে-শুনে আর হিন্দু-মুসলমান কাগজ পড়ে-পড়ে যোগেন একটা ধারণা করে নিয়েছিল—চকবাজার আর দক্ষিণ মৈসুন্দি এলাকায় তো দাঙ্গা লেগেই থাকে, নবাবপুর রোড আর জনসন রোডের মধ্যে পুব-পশ্চিমের রাস্তা ও অলিগলিতে হিন্দু-মুসলিম দুই জাতেরই বাস। সেই পাড়াগুলিতেই দাঙ্গাহাঙ্গামা হচ্ছে। ওই জায়গাগুলিকে বলা যায় দাঙ্গাএলাকা, যেমন শহরের কোনো-কোনো জায়গায় বলে ভাসাএলাকা। এমন দিন কমই কাটে যেদিন ২৪ ঘণ্টায় একটাও মারামারি হয়নি। যে-কোনো মারামারিই তো এখন দাঙ্গা হয়ে যায়। আর, দাঙ্গা মানেই হিন্দু-মুসলমান।

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ঢাকা থেকে মঞ্জু মাস্টার এসে ১৫ নম্বরে একেবারে ম্যাপ এঁকে বোঝাল, নারানগঞ্জের রায়পুর-শিবপুর-নরসিংদিতে হিন্দুদের দোকানপাট লুট হচ্ছে। রায়পুর থানার আদিয়াবাজবাজার থেকেই লুটপাট শুরু। দাঙ্গা আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ছে গ্রামের দিকে।

মঞ্জু মাস্টারের কাছেই প্রথম শোনা গেল যে এ-দাঙ্গা সেনসাস-ঘটিত। ১৯৪২ সালে আইনসভার ভোট। সে ভোটারলিস্ট তৈরি হবে এই ৪১-এর লোকগণনা দিয়ে। সংরক্ষিত আসনও ধার্য হবে কোন জাতের লোক কোথায় কত বেশি সেই পার্থক্য দেখে। সব জাতের লোকই চায় নিজেদের সংখ্যা বাড়াতে। কংগ্রেস তো বরাবরই বলে আসছে ৩১-এর লোকগনতিতে সাম্প্রদায়িক অনুপাতের ইচ্ছাকৃত গণ্ডগোলের ফলেই হিন্দু প্রার্থীরা এত বেশি হেরেছে। এবার তারা ছেড়ে কথা বলবে না। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক জনসভায় ও পাড়ায় পাড়ায় সভায় বক্তৃতা করেছেন—হিন্দুরা তো মিথ্যে কথা রটিয়ে চেঁচাচ্ছে যে তাদের জনসংখ্যা বেশি। উকিল, ইঞ্জিনিয়ার, মাস্টার, প্রফেসর, ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ আর হিন্দুদের কোটি-কোটি জাতের আরো কোটি-কোটি সব ভাগাভাগির মানুষজন সবাই মিলে মিথ্যা রটাচ্ছে যে হিন্দুদের সংখ্যা বেশি। সারাজীবন শিক্ষকতা করে যে-লোক ছাত্রছাত্রীদের মানুষ করেছেন, সেই লোক জালিয়াতি, মিথ্যাসাক্ষী, নকলপ্রমাণ নিয়ে একটা ডবপোকের মত মুসলমানদের সংখ্যা

কমাতে চাইছে। অতীতেও বাংলায় এমন অসৎকর্ম করে হিন্দুরা জিতেছে। এবারও যদি জেতে আর তাদের জেতার কারণ হিশেবে যদি এই লোকগণনার জালি হিশেব পেশ করা হয়, তাহলে আমি নিশ্চিত পাকিস্তানের পক্ষে। তখন আমার বন্ধুরা দেখবেন, আমি জিতি না হারি।

মঞ্জু মাস্টার হকশাহেবের নকল করে বসে-বসেই বক্তৃতাটি বলল। কংগ্রেস থেকে সঙ্গে-সঙ্গে পালটা প্রচার শুরু হয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী সেনসাসের কাজে বাধা দিয়ে আইন অমান্য করেছেন।

আসল কারণটা হচ্ছে—৩৫ সালের আইনেই ভোটে মুসলমানরা প্রথম ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছে। হিন্দুরা তাও কোনোরকমে সামলেছিল—রাজনীতিতে বা আইনসভায় যাই হোক, নিজেদের গ্রামে বা শহরে তো হিন্দু ভদ্রলোকদের কদর কিছু কমছে না। কিন্তু লিগ সরকার যখন আইন করে সরকারি চাকরিতে মুসলিম আর তপশিলিদের সংখ্যা বাড়াতে শুরু করল, তখন, জেলা ও মহকুমার হিন্দুরা ভয় পেল। হিন্দুদের খবরের কাগজ আর হিন্দু নেতারা, রটাতে লাগল, হিন্দু-অফিসারদের বদলি করা হচ্ছে আর মুসলমান ছাড়া কোনো নতুন অফিসার হচ্ছে না। সেই নতুন অফিসাররা আবার ভাবছে—তাদের এই নতুন চাকরি দেয়াই হচ্ছে হিন্দুদের শায়েস্তা করতে। তারা যদি বে-আইনি কাজও করে, তাতে কোনো শাস্তি হবে না। আইনের মতলব নিয়ে সরকারের মতলব নিয়ে, হিন্দু আর মুসলমানদের মতলব নিয়ে গোলমালের আর শেষ, নেই। এসডিও বা ডিএম শাহেব হল তার সিদ্ধান্তই শেষ সিদ্ধান্ত।

যোগেন একটু হেসে, মাথাটা একটু নিচু করে বলে ওঠে, মনে-মনে কথা-বলার স্বরে—'সত্যি, কত জন্ম কাটাইলাম কিন্তু এই বামুন-বইদ্য-কায়েতের বদবুদ্ধির কোনো কূল পাইল্যাম না। আইন না-হয় পাশ হইছে ওই তপশিলি-কোটার। কোথাও তাগ চাকরি দ্যায়? মুসলমানগ চাকরি দ্যায়? একডা ইস্কুল মাস্টারির হকদার মুসলমানকে, কমিটির রায়বাহাদুররা ঠেকাব্যার আর-কোনো উপায় না পাইয়া কয়—চাকরি তো দেয়াই যায় তবে হস্টেল তো দেয়া যায় না, হস্টেল তো হিন্দু হস্টেল! খুলনায় হইছে। জানি বইল্যা কইল্যাম। আর নমশূদ্রগ কোটা? সেডা তো কইব্যারও লজ্জা করে। এদিকে কয়, শূদ্ররা তো হিন্দু। হিন্দুই যদি হইব, তাইলে তোর জাতভাই লাগে তো। তার একডা চাকরি হইলে তো একডা হিন্দুরই চাকরি হইল। না। তার বেলায় শূদ্ররা হিন্দু না। কব কী? কওয়ার ভাষা নাই।'

'যোগেন, একটু থাম বাবা। তোর এই অশোকবনে সীতা তো রোজই শুইনতে হয়। মঞ্জুর কাছে আর-এডডু শুইনব্যার দে। ও তো দাঙ্গার খবর নিয়্যা আইসছে। ওর কী দরকার, জিগ্যা, ব্যাবস্থা কর, কও মঞ্জু, তার পর?'

'আমাগ বড় নেতা কারো যাওয়া দরকার। অ্যাহন যা অবস্থা তাতে মুসলমানরাও আমাগ হিন্দু বইল্যা গ্রাম থিক্যা তাড়ায়্যা দিচ্ছে। একেবারে মিলিটারির মত দল পাকাইয়া আসে, হাতে লিস্টি, তারপর বাড়ির মালিককে বলে, গ্রাম ছাইড়্যা চইল্যা যাও। চইল্যা গেলে আমরা বাড়িডা পুড়াব, যাতে ফিরৎ আইসতে না পারো। শুমারিতে তো নিজেরে হিন্দু কইবেন। সে হয়তো কইল, হিন্দুবাবুরা তো আমারে হিন্দু মানে না, তাইলে আমি হিন্দু হইল্যাম কার লগে। অমনি দঙ্গল থিক্যা কেউ ড্যাগার নিয়্যা আগাইয়া আসে ; 'পুরা হিন্দু না বইল্যাই এহনো প্যাট ফাঁসাই নাই। এইবার ফাঁসাইব।'

'আক্রোশডা আমাগ দিকে আইল কি প্রথম থিক্যাই?' জিগগেস করলেন অমূল্য রায়।

'অত হিশাবপত্তর কি করা হইছে? লিগের নেতারা, মন্ত্রীরা গিয়্যা মিটিং কইর‍্যা কইছে, মুসলমান ছাড়া কুনো জাতের নাম লিখানো চইলবে না। ভৈরব বাজারের মিটিঙে নাজিমুদ্দিন-সারওয়ারদি জোড়ায় আইস্যা কইল, যেহানে মুসলমান বেশি, সেহানে তো

পাকিস্তানই হব। হিন্দুরা তাগ জায়গা বাইছ্যা নিক। আবার শ্যামাপ্রসাদ মিটিং কইরল দাঙ্গাবাঁধার মাসটেক আগে। সভায় কয়, ভারতে না থাইক্যা যদি মিয়াগ পাকিস্তানে হাউস হইয়্যা যাহে, তো যাউক না সব বাক্সপ্যাঁটরা বাইন্ধ্যা যেহানে হয় সেখানে। বেবাক তো কয় শ্যামাপ্রসাদই দাঙ্গা বাধাইছে। কথা তো মিথ্যা না। ১১ই মাঘ ছিল শ্যামাপ্রসাদের ভাষণ আর দোল পইড়ল গিয়্যা ১৪ই ফাল্গুন। সেদিনই তো শুরু।'

'তুমি আইল্যা ক্যা? না? তোমারে পাঠাইল?' যোগেন জিগগেস করে।

'ঐ রকম আগুন আর খুনের মইধ্যে পালাইবার সুযোগ থাইকলে কেউ ছাইড়ে? ধর‍্যা ন্যান, আমিই আমারে পাঠাইছি আবার উহানকার মানুষ, মানে জাতের মানুষরাও পাঠাইছে, কইছে, অ্যাহন তত্ত্বের কাইজ্যা লাইগছে, অ্যাহন আমাগ বুদ্ধিতে কুলাইব না। কইলকাতায় যাও, যোগেন মণ্ডলরে ল্যাও। না তো যাও শ্রীধাম খেজুরতলা, সেহান থিক্যা পাগলচাঁদরে নিয়্যা আইসো। অ্যাহন আপনারা কেউ না গেলে আমরা বিপদে—আমরা হিন্দু কি মুসলমান সেইডা কেডা সাব্যস্ত কইরবে?'

'মঞ্জু, তোমরা কি আন্দাজ পাইছ, আমাগ সমাজের কেউ মারা গিছে, মইরলে কয় জন, মরছে?' রসিকলাল জিজ্ঞাসা করেন।

একটু ভেবে মঞ্জু মাস্টার বলে, 'এ হিশাবডা আমার কওয়া ঠিক না। কোনোডাই তো কেউ মাপামাপি করে নাই। যে যা শুনে তাই কয়। কেউই নিজের জাইতের মরা কিছু কম দেহে না। তবে, মফস্বলেরডা কইব্যার পারি। সেহানে আমাগ জাইতের উপর বামুন-কায়েত গুলার ভরসা। আবার মফস্বলে আমাগ জাইতের উপর মুসলমানগ রাগ বেশি—তারা আমাগ তাড়াইবারই চায়। সেইডা ঠেকানোর খ্যামতা আমাগ উপর নাই। আপনাগ যাব্যার লাইগব।'

'মিটিং কি ডাকা আছে না এহান থিক্যা গিয়্যা ডাইকব্যা'? যোগেন বলে মঞ্জুকে।

'পারেন বটে। কার সঙ্গে কার বিয়্যা তার পাটিপত্তর না জাইন্যা কন্যাদানের শুভক্ষণ ঠিক করব? চলেন আপনারা, দেহেন, তারপর ঠিক করেন।'

পরদিন সকালেই ঢাকা মেলে মঞ্জু, রসিকলাল ও যোগেন রওনা হয়। আগের সন্ধ্যায় কথা হচ্ছিল পি. আর আর যোগেন দুজনে আসবে। কিন্তু কলকাতায় তো একজনকে থাকতে হয়, নাহলে মন্ত্রীদের ঘরে ছোটাছুটি কে করবে? তখন রসিকলালই সমাধান দেন, মণ্ডলরে একা পাঠান্ ঠিক না, অর উপর হিন্দুগ রাগ দিনে-দিনে বাইড়ব্যার ধইরছে। আর, তোমাগ একজনের তো এহানে অবস্থান লাগে। তোমাগ আপত্ত না থাইকলে আমি মণ্ডলের লগে যাই।'

মঞ্জু মাস্টার তার এক আত্মীয়-বাড়িতে যেতে চাওয়ায় রসিকলাল বলেন, 'এহন আর কুটুম্বিতায় কাম নাই, তুমি বরং আমার ওহানেই রাইতটা কাটাও। মণ্ডল সকালে আইস্যা ডাক পাড়লেই দুইজনে আইস্যা ট্রেনে উঠব।'

গোয়ালন্দে পৌঁছুতে দুপুর দেড়টা হয়ে গেল। গোয়ালন্দের ঘাট দেখে রসিকলাল বলেন, 'তোরা পাটনায় গেছিস কেউ?' যোগেন-মঞ্জু দুজনের কেউই যায়নি। 'পাটনায় আমারে অগ একডা বিখ্যাত দালান দেইখবার নিয়্যা গেল, গিয়্যা দেহি একডা গোলবাড়ি, গুদামের নাগাল। পরে শুনল্যাম, সত্যিই গুদাম। আমি কইল্যাম, আরে আমি তো বাংলা থিক্যা আইছি, আমারে দালান দেখাইব্যার আনছ মাঠে? আর আমি তহন থিক্যা ভাইবতেছি, ভগবান বুদ্ধের থান, সম্রাট অশোকের রাজধানী, তাইলে বোধহয় বৌদ্ধ চৈত্য বা স্তূপমুপ কিছু একডা হইব। পাটনায় এমন একডা স্তূপগোছের আছে, তা জানি না বইল্যা লজ্জাও হইছে একডু।'

'তার সঙ্গে গোয়ালন্দের মিল পাইলেন কোথায়। গোল, চ্যাপটা, চাইল, বেঁকা-সিধা কোনো একডা দালানও তো নাই।'

'এইডা ভাল একটা বচন কইছিস যোগেন। বাঙালরে হাইকোর্ট দেখাও—না কইয়্যা অ্যাহন থিক্যা এডাও কওয়া চলে, গোয়ালন্দে গোলঘর দেখাও?' রসিকলাল হাঁটতে-হাঁটতেই হাসেন। যোগেনও হাসে।

মঞ্জু হঠাৎ বলে, 'কী কইর‍্যা কবেন? যারে কবেন স্যায় যদি গোয়ালন্দ আর গোলঘর কিছুই না জানে?'

যোগেন খুব একচোট হেসে বলে, 'মঞ্জুর বুদ্ধি বেশ পাইক্যা উইঠছে না কাহা?'

'হ্যাঁ। এডড়ু-আধড়ু গন্ধ যা পাই, তাতে পছন্দ দেয় নাই—কাঁঠাল কী না। বামুনগ গুঁতা খাইয়্যা না মিয়াগ গুঁতা খাইয়া অকালে এমন পাকলি রে মঞ্জু?'

'মঞ্জু, তুমি কইলকাতার হাইকোর্ট দেখছ নি?'

'দেহি নাই, তবে শুনছি যে আছে।'

'তাইলে বাঙালরে হাইকোর্ট দেখান বচনডা বোঝো?'

'বুঝব না ক্যা? বাঙালডা চিনি তো!'

'সেডা অবিশ্যি ঠিক। ঢাকার পোলা আর বাঙাল না চিন্যা থাহে কী প্রকারে?'

'কাহা, মঞ্জু তো বচনরেও ছাড়ায়্যা গেল!'

'ক্যা? অর কথায় ভুলডা কোথায়? ও বাঙাল। হাইকোর্টও দ্যাখে নাই। ন্যায্য সাক্ষী।'

'সাক্ষী তো ন্যায্য। উত্তরডা শুনেন নাই? কইল হাইকোর্ট দ্যাখে নাই কিন্তু শুইনছে। মঞ্জু, হাইকোর্টরে শুনা যায় কী প্রকারে, মঞ্জু।'

'যোগেনদাদা, তোমার নাগাল নামডাকের উকিল সাক্ষী শুইনতে এমন ভুল কইরল্যা? তুমি জিগাইল্যা, দেখছ। আমি কইছি, শুনছি, দেহি নাই। বচনডার মইধ্যে তো এই কথাডাও লুকান্ আছে—আমারে হাইকোর্ট দেখায়ো না।'

যোগেন আর রসিকলাল দু-জনেই খুব বাহবার হাসি হাসে।

'কিন্তু তোরা আমারে কইতে দিলি না যে গোয়ালন্দে আইস্যা ক্যান পাটনার গোলঘরের কথা মনে উদয় হইল?

'আপনে যদি না কন, আমরা ক্যামনে কওয়াব?' যোগেন বলে।

'শোন্। তোরা ভুইল্যা গেলেও আমি তো জেলখাটা কংগ্রেস। তহন সি. আর. দাশের মৃত্যুহীন প্রাণের মরা সাঙ্গ। সুভাষ জেলে। সেনগুপ্ত শাহেবই নেতা। আমি কর্পোরেশন স্কুলের মাস্টার। হঠাৎ একদিন আমার স্কুলে এক শাহেব আইস্যা হাজির। শাহেব তো কখনো কোনো সৎকর্মে আইসতে পারে না। তাই প্রবেশমাত্র সারা স্কুল তটস্থ। করবটা কী? শাহেব আইস্যা, আমারে হাত বাড়াইয়া দিল। আমি হাত বাড়াইল্যাম না। সেও গুটাইয়্যা নিয়্যা জিগাইল, আমি কি মিস্টার রসিকলাল বিশ্বাসের সঙ্গে কথা কওয়ার সৌভাগ্যে আছি?'

মঞ্জু বলে, 'মানে বোঝার মত কইর‍্যাই কইল? শাহেবরা তো তেমন কয়না।'

'আরে, আমি স্কটিশ চার্চের ছাত্র। আমারে শাহেব দেখাস না। ইংরাজগ চিটাগডিও আমার কাছে নস্যি। শাহেবরে বইসতে বইল্যা আমি কইল্যাম, তোমার কী কামে আমি লাইগব্যার পারি, বাপ!' শাহেব তহন তার পকেট থিক্যা এডডা খাম বাইর কইরে আমারে দেয়। আমি দেহি, কর্পোরেশনের খাম। উপরে আমারই নাম লেখা। ছিঁড়্যা দেহি, সেনগুপ্তের চিঠি, সেডাও ইংরাজিতে, আমারে লিখছেন—এই ছেলেটির বাবা বিলাতে আমার নিকট বন্ধু ছিলেন। আমাকে

তাদের বাড়িতেও কিছুদিন থাকতে হয়েছিল। এ এখন গবেষণার কাজ করছে—হল্যান্ডের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক নিয়ে। আপনে যদি এরে সাহায্য কইরতে পারেন, আমি বিশেষ বাধিত হব। চিঠি পইড়্যা আমার চক্ষু তো চড়কগাছ। কিন্তু নমশূদ্র হওয়ার এইডাই তো সুবিদা! আত্মরক্ষার। উচ্চবর্ণের সম্মুখে চক্ষু চড়কগাছের মত কপালে উঠব্যার চাইলেও উঠব্যার দিবা না। শুধু মা বসুমতীর কন্যা সীতারে স্মরণ কইর‍্যা মাটির দিকে তাকাইয়্যা থাকবা। শাহেব যদিও বামুন না, তবু প্রভু তো বটেই। কিন্তু মা সীতারে স্মরণ কইর‍্যাও আমি তো কিনারা পাই না—সেনগুপ্ত, হল্যান্ড ও আমার মধ্যে কোনো সম্বন্ধ পাই না। নিষ্ক্রমণের কোনো বুদ্ধিও মাথায় খেলে না। স্কুলের ছেলেরা ও অন্য মাস্টারমশায়রা দরজা ও জানলায় পাক দিয়ে যাচ্ছেন আমার শাহেব-মোলাকাত দেইখতে। শেষে চোখ তুইল্যা কইয়্যা ফেললাম, আপনে কি প্রশ্নপত্র বানাইছেন? সে সঙ্গে-সঙ্গে খাড়াইয়্যা তার গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ খুইল্যা একডা চিড় বাইর কইরে দিল। আমি সেইডা হাতে নিয়া ভাঁজ কইরে পকেটে ফেললাম একবারও না দেইখ্যা। কারণ, দেখা-না-দেখা আমার কাছে তখন একই কথা। আমি খাড়ায়্যা উইঠ্যা শাহেবরে কইল্যাম, আমার এখন ক্লাশ আছে, আপনে কাল আইসবেন।'

'তার পরদিন কামাই দিলেন?' যোগেন হেসে বলে।

'তোরে আবারও কই যোগা আমি, পুরানা গান্ধীবাদী কংগ্রেস। বিবেকডা আমার কাছে সব থিক্যা বড়। শাহেব তো আমার সমস্যা না। কইলেই হইল কোথাও এডডা ভুল হইছে, আমি এডা নিয়্যা কিছু জানি না। আমার সমস্যা সেনগুপ্ত শাহেবরে নিয়্যা। বিকালে প্রদেশে গিয়্যা তারে ধইর‍্যা চিঠি দেখাইয়া কইল্যাম, আপনে কি আর-কারো সঙ্গে আমারে গুল্যাইয়া ফেলছেন? সেনগুপ্ত শাহেব বললেন, সে কী, আমাকে তো নেলি নিজের মুখে কইছে, রসিকলাল বাবু লোক্যাল হিস্ট্রি এত ভাল জানেন যা সচরাচর দেখা যায় না। আমি কইল্যাম, লোক্যাল হিস্ট্রি? সেনগুপ্ত বললেন, হ্যাঁ। আপনে নেলিকে চিটাগং সম্পর্কে কত কথা বলেছেন, আমার জন্মস্থান হওয়া সত্ত্বেও আমি যার অনেকটাই জানি না। স্যরি। আপনার কোনো অসুবিধে থাকলে ওকে কারো কাছে পাঠান যে জানে। আমার তহন মনে পইড়তে শুরু কইরছে, বছরখানেক কি বছর দুই আগে একডা মিটিঙের সুবাদে সেনগুপ্ত মশায়ের বাড়ি গেছিলাম। গিয়্যা দেখি আমি ছাড়া কেউ নাই। তাঁর স্ত্রী আমারে কইলেন, মিটিংডা দুই ঘণ্টা পিছাইছে। আমি কইল্যাম, আমি তাইলে ঘুইর‍্যা আসি। উনি কইলেন, আপনে তো মিটিং কইরব্যারই আসছিলেন, তাইলে অ্যাহন আর কোথায় ঘুর‍্যা বেড়াবেন? এই হানেই বসেন। বইসল্যাম। কী কথা কই? আমি জিগাইল্যাম, আপনে তো নিশ্চয়ই চট্টগ্রামের সব জায়গা দেইখছেন? এত সুন্দর জায়গা! উনি তখন বললেন, জানেন, চিটাগঙ আমাকে হোমসিক হইতে দ্যায় না, এতই আমাদের দ্যাশের মতন। তহন আমি কইল্যাম—জানেন তো পির বদরের গল্প। এই পির শাহেব রাজার কাছে এক চাটি জায়গা চান। চাটি বইলতে বুঝায়, একডামাত্র প্রদীপের আলোতে যতটুক্ আলো হয় ততটুক্ জায়গা। রাজা মঞ্জুর কইরলে তিনি একডা পাহাড়ের মাথায় ওই প্রদীপডা বসান। তাতে যদ্দূর আলো হইল সেই জায়গার নাম হইল চাটিগাঁ। উনি কইলেন, আমি তো চেরাগি পাহাড়ে গিছি কিন্তু আমারে এই সুন্দর গল্পডা তো কেউ কয় নাই। তহন আমি কইল্যাম, আর-একডা সুন্দর গল্প আছে। আরাকানের বৌদ্ধ রাজা চট্টগ্রামের যুদ্ধে নবাবের হাত থিক্যা জায়গাডা [illegible] কইর‍্যা আরাকানি ভাষায় বইল্যা ওঠেন—চিৎ-তা-গঙ। তার মানে—যুদ্ধ করা অন্যায়। সেই থি[illegible] ওই জায়গাডার ওই নাম হইল। চিটাগঙ। সেই আমার কাল হইল। বউয়ের মুখে এই [illegible] সেনগুপ্ত শাহেব আমারে লোক্যাল হিস্টরির স্পেশ্যালিস্ট ভাইব্যা শাহেব [illegible] ইছেন।

'এত বড় একডা কথা বুনলেন, তার মইদ্যে তো গোলঘর বা গোয়ালন্দ কিছুই নাই। শাহেবের কী হইল?'

'শাহেবের কাছে তো ঘাড় হেঁট করা যায় না। কয়দিন ইমপিরিয়্যাল লাইব্রেরিতে গিয়্যা বাইর কইরল্যাম আমাগ ভাষার মইধ্যে ওলন্দাজ শব্দ কী কী। হল্যান্ডকে তো তহন বাংলায় ওলন্দাজই কইত।'

'কন কী কাহা? গোয়ালন্দ তাইলে আমাগ গোয়ালন্দ হোটেল না, এককেবারে ওলন্দাজ। সোজা কথা?' যোগেন বলে।

'আমরা দুপুরের ভাত কনে খাব?' মঞ্জু জিজ্ঞাসা করে।

'সেডা কি একটা জিগগাসার কথা। যেহানে খিদ্যা, সেহানে ভাত—' যোগেন জবাব দেয়।

'না–কইতেছিল্যাম, পাড়ের হোটেলে না জাহাজে? মঞ্জু জিজ্ঞাসা করে।

'তফাৎডা কী? তোগো দ্যাশ, তোরাই ক—'

'ক্যান? আপনার না ক্যান?' মঞ্জু জানতে চায়।

'আরে, আমি তো পদ্মাপারের না। আমি তো যশুর‍্যা।'

'মঞ্জু হঠাৎ স্টিমারে খাওয়ার কথা কইল ক্যান। ইস্টিমারে ফাউলকারির লগে?' যোগেন মঞ্জুকেই জিজ্ঞাসা করে।

'ঠিক ধইরছ যোগেনদাদা। ঐডার সাধ আলাদা। খাইবা? এইডাই তো সুযোগ। কেডাই-বা দ্যাখতেছে?'

'আরে ফাউল কারির ফাউল কি কারো বউ না কী? তারে বোরখা পরায়্যা নিয়্যা ভাগতেছি না কী। চ-ল্, ফাউলই খাব। কিন্তু মাছভাজা নিস একখান কইর‍্যা। খাওয়ার পর মাছের ঢেকুর না উইঠলে ক্যামন নিরামিষ খাইছি পছন্দ হয়।'

'শোনো মঞ্জু, আমি যে কই, আমরা, শূদ্ররা, হিন্দু না হিন্দু তো নাই-ই, এমন কি গুপ্ত হিন্দুও না। কেন? না, বামুনের সব থিক্যা বড় জোর কীসে?' যোগেন প্রশ্ন করে আর রসিকলাল সঙ্গে-সঙ্গে বলে, 'প্রাচিত্তির করানো'।

'কিন্তু নমশূদ্র হওয়ার সুবিধা যে আমাগ অভিশাপ দিলেও সেটা অফলা। ক্যা? না, আমাগ তো পতন নাই যে শাপ দিয়া পতিত্ কইরবে! আমরা তো পতিত্'!' যোগেন ব্যাখ্যা দেয়।

ওরা তিনজন আস্তে-আস্তেই হাঁটছিল। প্ল্যাটফর্ম শেষ হওয়ার পর রেললাইন আর লোহার বেড়ার মাঝখানে নানা মনোহারী জিনিশের মেলা। ঝোলানো আছে শাড়ি আর বোরখা। বোরখার তো আর কাল ছাড়া রং হয় না। একটা দোকানে 'জাপানি কল, জাপানি কল' বলে চেঁচাচ্ছে। খেলনা একটা—টিনের। ওপর দিয়ে দুটি শাদা ছোট বল ফেললে, সেটা আর-একটা মুখ দিয়ে তিনটে হয়ে বেরয়।

এই দোকানগুলো শেষ হতেই প্যাসেঞ্জারদের লাইনের ওপর দিয়ে, উলটো দিকের লাইনও পার হতে হয়—তারপরই যে-আওয়াজটাকে এখন পর্যন্ত হাওয়ার বা নদীর মনে হচ্ছিল, সেটার মনুষ্যরূপ দেখা যায়। কিছু-কিছু টিনের সাইনবোর্ড একটু কেতরে 'পবিত্র হিন্দু হোটেল', 'শুদ্ধ হিন্দু হোটেল,' 'হাজির হোটেল,' 'নারায়ণগঞ্জ হোটেল,' 'খাওয়ার শেষে মিষ্টান্নর ব্যবস্থা আছে,' 'শুধুমাত্র হিন্দু বিধবা ও ব্রাহ্মণদের ষোল আনা নিরামিষ ভোজনালয়—জাত ভাঁড়াইবার চেষ্টা করিবেন না,' 'সিলেট হোটেল'। সাইনবোর্ড ছাড়াও আছে অনেক হোটেল। দুটি-একটি মুসলমান হোটেলে হাই বেঞ্চ ও বসার বেঞ্চ আছে। অন্যসব হোটেলেই মাটিতে বসে খাওয়ার ব্যবস্থা। মাটিতে মাটি সর্বত্র আছে, এমন নয়। শুধুই বালি এমনও আছে। বালির মধ্যে বসে

বালির ওপর কলাপাতা পেতে খেতে হয়। সেজন্য এই হোটেলগুলির দর প্রায় অর্ধেক। পদ্মার বিপুল ও তীব্র হাওয়া সত্ত্বেও ইলিশ মাছের গন্ধে ও মশলার ঝাঁঝে নাক জ্বালা করে।

যত প্যাসেঞ্জার নামছে ও হাঁটছে, তাদের অন্তত দ্বিগুণ লোক একসঙ্গে চেঁচাচ্ছে নিজেদের হোটেলের নাম বলে। কোনো-কোনো অল্পবয়েসি আবার দোকান ছেড়ে ভিড় ঠেলে এসে কোনো যাত্রীকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যায়। সেই আক্রমী খাদ্যভিড় ছাড়িয়ে ওরা তিনজন ফাউল কারি খাওয়ার লোভে স্টিমারে উঠছে। হোটেলগুলোতে, পাড়ে, যে-দামে খাওয়া যেত, স্টিমারের রেস্তোরান্টে দাম তার পাঁচ গুণ। তবু ফাউলকারি তো! সত্যিকারের ফাউলকারি।

হিন্দু ও মুসলিম দাঙ্গায় তপশিলিরা কোথায়?

ফাল্গুনের বেলা লম্বা। ঘাটপাড়ে নেমে যখন ওরা রিক্সা করবে কি ঘোড়ার গাড়ি করবে, তা নিয়ে ভাবতে-ভাবতে এগচ্ছে, তখনো সন্ধ্যার আলো জ্বলেনি, রাস্তাঘাটে কিংবা দোকানপাটে।

১৫৫

ঘোড়ার গাড়িগুলো এমন চালাকি করে সাজিয়ে রাখা যে গাড়ির ভিতরে না ঢুকে রাস্তা পেরবার উপায় নেই। ঘোড়ার মলমূত্রের গন্ধে বাতাস ভারী।

মঞ্জু বলে, 'পা চালাইয়্যা চলেন। ওরা য্যান বুইঝবার না পারে আপনেরা ঢাকার লোক না। তাইলে গাড়ি ছাড়া যাইবার দিব না।'

'এত হাঙ্গামার কাম কী? নিলেই হয় গাড়ি?' যোগেন একটু দ্রুত হাঁটতে-হাঁটতেই পরামর্শ দেয়।

'কী যে কও যোগেনদাদা, তিনজন গাড়ি নিলে খরচা পোষায়? তিনজন গাড়ি নিলেই ওরা টের পায় যে নতুন লোক। তারপর যেহানে যাইব্যার সেহানে গিয়্যা জামাকাপড় খুইল্যা নিবে তোমার।'

'তাতে আর অসুবিদা কিছু নাই। শিব সাইজ্যা মোহিনী ডাক্তারের সামনে দাঁড়াইব। কইব, আমাগ শুদ্দুর চিন্যা কুট্টিয়া কাপড়চোপড় খুইল্যা নিয়্যা কইল, যান, পরানডা তো থাইকল, ঐডা নিয়্যাই যান—'

ওরা বেশ খানিকটা রাস্তা পেছনে ফেলে এগিয়ে এলে, টমটমের আড্ডা—ওই যেমন থাকে, সামনে-পিছনে চাইরডা সিট। তিনজন গেলে এখনই ছাড়বে। রাস্তায় এক প্যাসেঞ্জার তুলবে। এই টমটমের আড্ডারও শেষে গোটা কয়েক সাইকেল রিক্সা যেন দেখা যায়। একেবারেই গোটা কয়েক। টিনের পাতগুলো ঝকঝক করছে। এই কটা সাইকেল রিক্সা নিয়ে গাড়োয়ানদের এত দুশ্চিন্তা কীসের যে তাদের ঘাটপাড়ে ঢুকতে দেয় না?

'ওরাও যে খুব এড্ডা ঢুইকব্যার চায়, তা না। সাইকেল রিক্সা এত কম বইল্যাই সারাদিনে দুই-চাইরডা ভাড়া জুটবই। সেটাই তো গাড়ি পিছু আয়ের থিক্যা বেশি। যারা জানে, তারা এতডা হাঁইডা আইস্যাই রিক্সা চাপে। বাঁধা কিছু বড় প্যাসেঞ্জার এইভাবে গাড়ি ছাইড়্যা চাকায় ওঠায় গাড়োয়ানরা জোট পাকাইছে।'

'জোট পাকাইয়্যা কি চাকার লগে পারা যায় ঘোড়ার গাড়ির? কোথাও ঘটছে এমন? ওইনছ কোথায়।'

দেখাই যাচ্ছিল—রাস্তার মোড়ে বেশ নানা রঙিন কাগজে সাজানো রিক্সার লাইন। ঢাকায়

বছর দুই তো হল। উঠে তো যায়নি।

মঞ্জু রাস্তার এক টমটমকে ইশারা করে তারা যে তিনজন এটা বোঝাতেই টমটমটি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে পড়ে। ওরা উঠে পড়লে মঞ্জু বলে, 'নবাব পুর'।

ওরা মোহিনী ডাক্তারের বাড়িতে যাচ্ছে। তাদের কাছে মোহিনী ডাক্তারই ঢাকার একমাত্র নেতা। অন্যদের কাছেও। তবে একমাত্র না। নমশূদ্র সমাজে ডাক্তারের গল্প খুব চলে, কীভাবে নিজেকে দাঁড় করিয়েছেন। ওঁর বাড়ি মেলামোচ্ছবের মত। সব সময়ই দরজা খোলা। দরজা সবার জন্য খোলা থাকলেও আসে তো নমশূদ্ররাই এক। নমশূদ্রগ কোনো হোটেল নাই। আছে হিন্দুদের আর মুসলমানদের। বরাবরই মুসলিম হোটেলে যার ইচ্ছে সে-ই খেতে পারে। কিন্তু ভুল করে হিন্দু হোটেল ঢুকে পড়লে শুদ্দুরগ আর উদ্ধার নাই—এমন মার খেতে হয়। তার চেয়ে মোহিনী ডাক্তারের বাড়িই ভাল। পাঁজা থেকে দুটো কলাপাতার নীচে হাত দিয়ে তুলে ঠাকুরের সামনে ধরলেই, এক হাতা ভাত, এক হাতা ডাল, এক হাতা মাছের ঝোল। সবগুলো হাতারই গর্ত এক-বিধবার কড়াইয়ের মত। একবার ভাত নিলেই হয়ে যায়। খাওয়া কলাপাতা তুলে ঠাকুরের কাছে দাঁড়ানোর অনেক অসুবিধে। তাই যারা নিজেদের পেটের আন্দাজ জানে, তারা হয়তো, এক হাতার পর, আরো এক হাতা ভাত নিয়ে নেয়। বিশাল পাক দেয়া বারান্দা। সেইখানে নিজের বিছানা বিস্তারিয়াই গা আলগা দ্যাও। দেইখতে-দেইখতে তোমার চক্ষু মুইদ্যা আসব। ঢাকার নমশূদ্ররা রটিয়ে দিয়েছে, মোহিনী ডাক্তারের বাড়ির বারান্দায় দুপুরের ঘুম সাইরতে না কী বামুনরাও আসে। ঘুমের ঘোরে তাদের কাছা খুলে গেলে কোমরে পেঁচানো লুকনো পৈতে বেরিয়ে পড়ে। অথবা বাহ্য-পেচ্ছাব করতে গেলে বামুন হঠাৎ লুকানো পৈতা বের করে কানে গোঁজে। মজা হচ্ছে, বামুনদের নিয়ে এই মজার গল্প কিন্তু কখনো মুসলমানদের নিয়ে হয় না।

ডাক্তার মোহিনীমোহন দাস ছিলেন বরিশালের চাঁদশীর বিখ্যাত ক্ষত-চিকিৎসক বাড়ির ছেলে। বাড়ির সব বড়দের কাছ থেকে ক্ষত-চেনার পদ্ধতি শিখেছেন—ক্ষতের আকার, গভীরতা ও বিস্তার কী করে মাপতে হয়, কী করে হদিশ করা যায় ক্ষতের গোপন পথ, কেমন করে ক্ষতের বর্গ নির্ণয় সম্ভব, পেশাগত ও বয়সের কারণে কোন-কোন বিশিষ্ট ক্ষত তৈরি হয়, ক্ষত থেকে অপর কোনো লক্ষণ, জ্বর-শ্লেষ্মা-অগ্নিমান্দ্য, স্পষ্ট হয়ে উঠছে কী না, যে-কোনো মানুষেরই যে-কোনো ক্ষত হতে পারে—রোগীর সামাজিক প্রতিষ্ঠা দিয়ে রোগ নির্ণয় নিষিদ্ধ, চিকিৎসা ভিন্ন চিকিৎসার অন্য কোনো নীতি নেই, চিকিৎসা ও রোগীর মধ্যে ধর্মীয়-সামাজিক-আত্মীয়বিবাদ-আর্থিক অবিশ্বাস ইত্যাদির কোনো অনুপ্রবেশ বা প্রভাব কখনোই ঘটবে না—এই অভ্যাস ও নীতিনির্দেশ আয়ত্ত করে তিনি আর-জি-কর মেডিক্যাল স্কুলে তিন বছরের ডাক্তারি কোর্স (সম্ভবত এলএমএফ) পড়েন ও ১৯০৬ সালে স্থায়ীভাবে ঢাকায় এসে পেশা শুরু করেন। ১৯২৪ ও ১৯৩০ দুবারই তিনি দক্ষিণ ফরিদপুর কেন্দ্র থেকে কাউন্সিলের ভোটে জেতেন। ১৯৩৫-এর আইনে আইনসভার ভোটে তিনি হেরে যান। ঢাকায় নমশূদ্র ছাত্রদের জন্য দুটি হস্টেল, নমশূদ্রদের অবস্থা জানিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকা প্রকাশ ও বই-লেখা তাঁর প্রধান কাজ, পেশার বাইরে।

মোহিনীমোহনের নাম ছড়িয়ে পড়ে কালীবাড়িতে প্রবেশাধিকারের দাবিতে মুন্সিগঞ্জের নমশূদ্রদের সত্যাগ্রহে। কালীবাড়ির কর্তা ছিল স্থানীয় বার লাইব্রেরি। আর মুন্সিগঞ্জের এসডিও ছিলেন বর্ণভেদে বিশ্বাসী এক কায়স্থ। বামুন-কায়েত উকিলরা হিন্দুধর্ম রক্ষায় শূদ্রদের প্রবেশাধিকার-দাবি অস্বীকার করলেন ও উচ্চবর্ণীয় কায়স্থ এসডিও সরকারের পক্ষ থেকে এই

নিষেধ বলবৎ রাখতে পুলিশ রাখলেন। উচ্চবর্ণের এই সংহতি দেখে কোনো পার্টিরই প্রাদেশিক নেতা মিটিঙে বক্তৃতার বেশি কিছু বললেন না।

বড় রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মুন্সিগঞ্জ আন্দোলন নিয়ে মোহিনীমোহন খুব একলা হয়ে যান। তাঁর স্ত্রী তাঁর পাশে ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছেন, শুধু নমশূদ্র মেয়েদের নিয়ে একটা মিছিল ও তৈরি করেছিলেন। মন্দিরে শূদ্রের প্রবেশাধিকার-দাবির সমর্থনে মুন্সিগঞ্জের ছ-জন ব্রাহ্মণ গান্ধীবাদীও বটে, বিপ্লবীও, ব্রাহ্মণপুত্র অনশন শুরু করার ফলে সর্বদলমতের এক বিশাল মিছিল পুলিশ ও প্রতিরক্ষা ভেঙে মন্দিরে প্রবেশ করে। সেই মিছিলেরও মাথায় ছিলেন মোহিনীমোহনের স্ত্রী।

নিজে কি জানতেন মোহিনীমোহন, তিনি ভারতের রাজনৈতিক ব্যবহারের দুরূহতম সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছেন সারাটা জীবন? মোহিনীমোহন ছিলেন ঢাকার কংগ্রেস নেতা, গান্ধীবাদী নেতা ও নমশূদ্র নেতা। এই তিন রকমের আনুগত্যগুলির ভিতরে তাঁর কি কখনো কোনো সংঘাত হয়নি? এই আনুগত্যগুলি কি অবিভাজিত রাখা যায়? যেমন একসময় কামরাজ নাদারের মত বক্তৃতাহীন নিরলস কর্মী, দ্রাবিড় আন্দোলনের মুখে একটা নিরপেক্ষতার ভঙ্গি নিয়েছিলেন? যেমন খালিস্তান আন্দোলনের সময় পাঞ্জাব কংগ্রেসের সভাপতি, শিখধর্মের প্রধানতম কর্মী ও স্বর্ণমন্দিরের রক্ষক হিশেবে বিভাজিত আনুগত্যে দীর্ণ হয়েছিলেন? মোহিনীমোহন খুব বড় নেতা নন, সর্বক্ষণের নেতা নন। তিনি অনুশীলন সমিতিরও সদস্য ছিলেন। অথচ, কী আশ্চর্য, মোহিনীমোহন পেরে গেলেন সারাজীবন কংগ্রেসি, নমশূদ্র ও বিপ্লবী থাকতে। কী করে পারলেন? এটার উত্তর খোঁজার চেষ্টা আমাদের 'জাতীয়' ইতিহাসের বিষয় হবে কবে?

পেরেছিলেন যদি মেনে নেয়া যায় তবে তাঁর জীবনের শৃঙ্খলায় হয়তো একটা ব্যাখ্যার আভাস পাওয়া যায়। এন্ট্রান্স পাশ করার পর তিনি ডাক্তারির, আধুনিক ডাক্তারির, নিম্নতম শিক্ষা নেন যোগ্য প্রতিষ্ঠানে। ওই একই সময়, দু-তিন বছর ধরে শিক্ষা নেন বংশগত চিকিৎসাবিদ্যায়। দুটো শিক্ষা মিলে তিনি তখনকার মান-অনুযায়ী বিশেষজ্ঞের মর্যাদা আয়ত্ত করেন। সেই বিশেষজ্ঞতার প্রয়োগক্ষেত্র হিশেবে বেছে নেন বড় একটি শহরকে। কংগ্রেস, নমশূদ্র ও বিপ্লবী—এই বিশ্বাসগুলির মধ্যে বৈপরীত্য আছে। সেই বৈপরীত্যগুলির সমাধান অনেক বড় নেতারা করেছিলেন ক্ষমতার প্রচ্ছদে, মোহিনীমোহন করেছিলেন তাঁর ব্যক্তিত্বকে ধারণের যোগ্য করে তুলতে। তাঁর সমাজ ও রাজনীতিকে তিনি তাঁর অনুকূলে আনতে পেরেছিলেন। নমশূদ্রসমাজ তখন বৃহত্তর একটা পরিচয়ের ভিতর ঢুকতে চাইছিল। ১৯৪০-এর পর-পরই নিম্নবর্ণ এক-একটি গোষ্ঠী বা কৌম বা সম্প্রদায়ের কাছে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ভোটাধিকারের সুবাদে কংগ্রেস, ফরোয়ার্ড ব্লক বা হিন্দু মহাসভার সঙ্গে মিশে যাওয়ার সুযোগ এসেছিল। তিনটি রাজনৈতিক দলই প্রধানত হিন্দুত্ব নিয়ন্ত্রিত।

যোগেন মণ্ডল হয়ে উঠেছিলেন আধুনিকতর এক শূদ্র নেতা যিনি এই হিন্দুনিয়ন্ত্রণকেও অস্বীকার করতে পেরেছিলেন। যোগেন মণ্ডল অদ্বিতীয়। তিনি নেতা ছিলেন তাঁর সমাবেশ তৈরির ক্ষমতায়। তাঁর সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ মানুষ তাঁকে বিশ্বাস করতেন। সে-বিশ্বাস তিনি তৈরি করেছিলেন সম্প্রদায়ের পরিচয়কে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিত ও স্বাধীন চলনশক্তি দেয়ার উদ্যোগ নিয়ে। কোনো হাওয়ার বা প্রচলনের সুবিধা তিনি নেননি। রাজনৈতিক যে-বিকল্পগুলি হিন্দুত্বের সম্পর্কিত থেকে তখন নিম্নবর্ণের সামনে খুলে গিয়েছিল—কংগ্রেস, ফরোয়ার্ড ব্লক ও হিন্দু মহাসভা—তার যে-কোনোটিতেই তিনি উচ্চতম স্তরে আমন্ত্রিত ছিলেন। সে-আমন্ত্রণ তিনি

নেননি। কারণ, তিনি জানতেন ওইসব বিকল্পেই তাঁকে তাঁর শূদ্রপরিচয় কার্যত ছাড়তে হবে। কখনো-সখনো সেই পরিচয় দেখিয়ে কিছু লাভ করার সুযোগ তিনি একলা হয়তো পাবেন। কিন্তু সে-লাভে তাঁর সম্প্রদায়ের কিছু যাবে-আসবে না। বড়জোর তাঁর সম্প্রদায়ও তাঁকে প্রদর্শনীয় হিশেবে ব্যবহার করবে।

এ এক বিরল সাহস যা এক বিরল মানুষেরই থাকতে পারে। শেষ পর্যন্তও যে তিনি শূদ্র-মানুষ থেকে গেছেন—এই তাঁর মহত্ত্ব। হিন্দুত্বের সংকীর্ণ বা প্রগতিমান সিলমোহর চিহ্নিত কোনো শূদ্র নন। হিন্দুত্ব ও তার সংলগ্ন রাজনীতি থেকে স্বাধীন শূদ্র। সে শূদ্র তার প্রাণটুকু বাঁচিয়ে রাখার শ্রম, ও সেই বাঁচার চাইতে একটু বেশি বাঁচার অতিরিক্ত শ্রম, হিন্দু সমাজকে লুণ্ঠনের অধিকার দিয়ে আধ্যাত্মিক খতবন্দী শূদ্র নয়। এমন একটা রাষ্ট্রব্যবস্থা পাকিস্তানকে যোগেন নিজের রাষ্ট্র বলে বেছে নিয়েছিল, যে-ব্যবস্থায় শূদ্রত্ব কোনো ধারণাই নয়। যোগেন ছাড়া আর-কেউ ভারতের হিন্দুতা এমন আমূল আশীষ প্রত্যাখ্যান করেনি।

মোহিনীমোহন বললেন, 'এ তো খাড়াইছে আমরা হইল্যাম ছাগলের মধ্যমপুত্র। কংগ্রেস মায়ের বাঁট পায়, লিগও পায় আর শিডিউল কাস্টরা কোনো বাঁটই পায় না। মুসলমানরা শাসায় হিন্দু বইল্যা আর হিন্দুরা শাসায় লোয়ার ক্লাশ বইল্যা।'

'জ্যাঠা, ঢাকার এবারের রায়ট তো বাসি হওয়া ধইরল। আপনারা ঢাকায় তো তেমন সাড়াশব্দ কিছু তুললেন না–' রসিকলাল বলেন।

'ঢাকা টাউনে তো রায়ট ছিল হিন্দু-মুসলমান, ওই যা-হয়, এক রায়টের সতের গল্প। শাঁখারিরাই আগে লাগাইছে। তারপর মুসলমানরাও পালটা দিছে। তহন তো শিডিউলগ কেউই আলাদা করে নাই। সাহাগ তো আর কেউ শিডিউল ধরে না। তারা তো হিন্দুগরও চাঁই। ঢাকা থিক্যা রায়ট যখন নারানগঞ্জে গিছে, তারপর আবার ওই দুই-তিনডা থানায়, সেই হানেই ঘটনাগুলা ঘটছে। তবে, এ-সব কথা তো রটেও বেশি।'

'আপনাগ কাছে কোনো খবর আসে নাই?' যোগেন জানতে চায়।

'হ্যাঁ, আইসব্যার লাগছে তো। ঢাকায় গুজব রটাইয়্যা দিল ফজলুল হকরে হিন্দুরা খুন কইরছে। অ্যাহন, ঢাকাই কও আর নারানগঞ্জই কও, মুসলমানরা হিন্দু চিনব ক্যামনে, হিন্দুরাই-বা মুসলমান চিনব ক্যামনে? তার মইধ্যে আবার মিয়াগ তো চিনব্যার লাইগব—শিডিউল। এডা কি সম্ভব নাকী? তাইলে চেনা লোক ছাড়া খুন কইরব? চেনা দোকান ছাড়াই-বা কুন দোকান লুট করব? আমার লগে তো ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট জর্জ শাহেবের কথা হইল। আমিই গেছিল্যাম কয়জনারে সঙ্গে লইয়্যা।'

'আপনাগ কথা কিছু কওয়া গেল, না শাহেব শুদু নিজের কথা শুনাইল?' রসিক বলেন

'আমাগ তো কুনো নতুন খবর নাই। কংগ্রেসের আমরা দুইজন, আমাগ গবমেন্ট প্লিডার, ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলর। হিন্দু-মুসলমান মিল্যাইয়া একডা ডেপুটেশন। আমরা কইল্যাম—আমরা শুধু কইব্যার আসছি সরকার শক্ত হাতে খুনাখুনিডা বন্ধ করেন।'

'খুনাখুনিটা শুরু হইছিল ক্যান সেইডা নিয়্যা ডি-এম কিছু কইল?' মঞ্জু জানতে চায়।

'সেইডা নিয়্যা কি আর অ্যাহন কথা হয়, বাপ? এ তো সত্যি-সত্যি পথের গোড়া খুঁইজতে-খুঁইজতে পথ হারাইবার বুদ্ধি। কে দোলের রং-ছড়াছড়িতে মুসলমান মাইয়্যার গায়ে রং ছিটাইছে, কে আগে দল পাকাইয়া মুসলমান পাড়ায় আগুন দিছে, সাহাগ দোকান লুট কইরল যারা তারা মুসলমান আর আজিজ স্টোর্স ভাঙল যারা তারা হিন্দু। ক্যান? যেহেতু সাহারা হিন্দু

আর আজিজ স্টোর্স মুসলমান। বে—শ। কিন্তু এডা কি আইনত শুদ্ধ? যোগেন কইব্যার পারে—'

যোগেন হেসে বলে, 'আন্দাজ নিয়্যা তো প্রমাণ হয় না, বড় জ্যাঠা। বড়জোর কওয়া যায়—যুক্তির জোর আছে কোন আন্দাজে। কিন্তু আরো বড় যুক্তি আইসলে এই আন্দাজ আর টেঁকে না।'

'সেইডা কে মাপব, আন্দাজের পক্ষে যুক্তির ওজনডা? লোহার কামার না সোনার কামার? রতি দিয়্যা না হন্দর দিয়্যা?'

'ওডা কি দাঁড়িপাল্লায় মাপা যায় কাহা', রসিকলালের এই কথায় মোহিনীমোহন নীরবে মুখভরা একটা হাসি হাসলেন, তাঁর নাকের দুদিক থেকে দুটো মোটা ভাঁজ ঠোঁট পর্যন্ত নেমে স্থির থাকল তাঁর অরব হাসির সময় জুড়ে, 'তাই তো কই তোমাগ। সাহার দোকানের জিনিশের উপর তো আমারও লোভ আছে, পয়সা নাই, কিনব্যার পারি না, লুট হইছে, লুট কইরব্যার পারি। সেই রম ধরো, ঢাকার নবাব শাহেবেরও তো চোখ থাইকতে পারে, আজিজ স্টোর্সে রাখা একডা মোটরগাড়ির দিকে। এত্দিন কেনেন নাই। বা, বলা ভাল, কেনার সুবিধা ছিল না। বা, ধরো ইচ্ছা হয় নাই। অ্যাহন, আজিজ স্টোর্স লুট হইতেছে শুইন্যা তার নিজের এক লোককে ডাইক্যা কন—আজিজ স্টোর্স লুট হইতেছে, শুইনল্যাম। তুমি একা গিয়্যা ওগ দোকানে একডা ছোট মত নীল রঙের মরিস-মাইনর গাড়ি আছে, সেইডা চালাইয়্যা বাইর কইর্যা বড়-কাঠরার কুঠির গ্যারাজে ঢুকাইয়্যা চইল্যা আইসব্যা।'

সবাই চুপ করে থাকল। মোহিনীমোহনও। চারজনই বুঝতে চাইছে মোহিনীমোহনের উত্থাপিত সমস্যা। খুবই সহজ একটা গিঁঠ—রায়ট হচ্ছে মানেই দলবেঁধে আগুন, লুট, মেয়েদের অপমান, খুন। দুটো উলটো দল ছাড়া রায়ট হয় না। একা লোক রায়ট করতে পারে না। কিন্তু একা-একা এই সবগুলো অপরাধই করতে পারে—আগুন লাগানো, চুরি, মেয়েদের অপমান, খুন। যে-কোনো একটা অপরাধে ধরা পড়লে তার বিচার হবে। বিচার হবে ফৌজদারি আইনের একটি, দুটি বা পাঁচটি ধারায়। শাস্তি হবে। সেই সব ধারায় নির্দিষ্ট শাস্তি। রায় হবে, সবগুলি শাস্তি একসঙ্গে চলবে।

রায়টে যদি এই ঘটনাগুলিই ঘটে তাহলে সেটা কোনো ফৌজদারি আইনে পড়ে না। এমন কী রায়টের সময়ও, খুন করা হচ্ছে যখন, তখনই পুলিশ ধরলেও তাকে অপরাধী বলে আলাদা করা যায় না, একটা লোক হিশেবে তার কোনো অপরাধ নেই। একটা দল হিশেবে অপরাধ থাকতে পারত—যদি কেবল সেই দলের লোকরাই কোনো চুরি বা লুট করে থাকে। যে-অপরাধ দল না-বেঁধে করা যায় না, সে-অপরাধের জন্যও শাস্তি হতে পারে কিন্তু প্রত্যেকটা শাস্তিই হবে এক-একজনকে আলাদা করে। এমন একটা দলবদ্ধ অপরাধ যদি কেউ রায়টের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারে, তাহলেও সেটা আর ফৌজদারি-মামলা থাকে না। হয়ে যায়, রায়ট। সেটা ঠেকানো পুলিশের কাজ। রায়টের ফলে শান্তি নষ্ট হবে, রাস্তাঘাটে গাড়ি ঘোড়া থাকবে না, মানুষজনের যাতায়াতে অসুবিধে হবে, দৈনিক কাজকর্মে বেরতে পারবে না কেউ, ফলে, একটা অস্বাভাবিক অবস্থা তৈরি হবে। ঠেকানোর জন্য অ্যারেস্টও করতে পারে পুলিশ, কিন্তু তার বেশি কিছু না। আইন কেবল সেই অপরাধ নির্ণয় করতে পারে, যে অপরাধের একজন অপরাধী আছে। সমষ্টির বা সমাজের সম্প্রদায়ের বা কৌমের বা জাতির বা জাতের কোনো অপরাধ পেনালকোডে নেই।

এই নকশার মধ্যেই গৃহযুদ্ধ বা বহির্যুদ্ধকেও ধরা হবে। সেটাও দলবেঁধে হচ্ছে। এবার দলের নাম : একটা দেশ। বা সেই দেশে সক্রিয় দুটি পার্টি। তাই, যুদ্ধে হাজার-হাজার লোক ধরলেও একজনকেও অপরাধী হিশেবে ধরা যায় না। আর, রসিকলাল-যোগেনরা কী খোঁজ করতে

এসেছেন? মুসলমানরা নমশূদ্রদের হিন্দু বলে তাড়িয়ে দিচ্ছে—তার প্রতিবাদ চান, প্রতিকার চান। সেটা কী করে ঠিক হবে, কে মুসলমান, কে হিন্দু বা কে শূদ্র?

সেটাও তো যোগেন বেশ স্পষ্ট করেই বলল, 'এই কথাডা তো সব পক্ষরেই জানাইতে হইব যে শিডিউল কাস্টগ তাড়ানো হইতেছে, যেহেতু হিন্দু মহাসভা চারিদিকে রটনা কইরব্যার আছে যে শিডিউলগ বাধ্য করতে হব সেনসাসে নিজেগ হিন্দু বইল্যা ঘোষণা কইরতে হব। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি তো দিনে সাতডা মিটিং করে। যেহানেই মিটিং করে পরের দিন সেহানেই দাঙ্গা বাঁধে। হিন্দুরা বাঁধায়। তারপর মুসলমানরা চালায়। এ তো এক বজ্জাতি। ষড়যন্ত্র কইর‍্যা বজ্জাতি। আর, বজ্জাতির তো কোনো অসুবিধা নাই, মাঝখানে তো চাঁড়াল-শুদ্দুর-শিডিউলরা আছে, মরলে অরাই মরব, পুড়লে অরাই পুড়ব। আমরা এই কথাডা ক্যান কইব্যার পারব না—হিন্দু-মুসলমানের এই দাঙ্গায় আমরা নাই। কাউরে তো আর দাঙ্গায় না-থাকার জন্যে কয়েদ করা যায় না।'

মোহিনীমোহন বলে, 'এডা তো কওয়াই যায়। ভাল কথা। সোজা কথা। বইলব্যা কারে?'

'সেডা তো আপনে ঠিক কইরবেন।' রসিকলাল বলেন।

'এ-কথাডা তো প্রথম বলা দরকার আমাগ স্বজাতদের। সাহাগ, গোয়ালাগ আর শাঁখারিগ। অগ যদি বুঝান্ যায় তালি অন্তত অর্ধেকের বেশি কাম হইয়্যা যাব।'

'জনসভা কইর‍্যা?' মঞ্জু জিজ্ঞাসা করে।

'হ। করা যায়। কিন্তু তোমাগ জন কেডা যারা সভায় আসব?' যোগেন জিজ্ঞাসা করে।

'ক্যা? যাগ কথা বললা। সাহারা, গোয়ালারা আর শাঁখারিরা', বেশ সহজ সুরেই বলে মঞ্জু।

'তারা তোমাগ কথা শুইনতে আসব ক্যা? তাগ মইধ্যে কি শিডিউলগ কোনো সমিতি-কমিটি আছে? যদি কিছুও থাকে, তালেও অইব। আছে? মঞ্জু—?'

'আছেও আবার নাইও। ধরেন, সাহারা কবে কোন্ সমিতি-কমিটিতে থাহে? তবে তাগ নেতাগোছের মুরুব্বি বাইছ্যা কথা বলা যায়। অরা তো একটা অব্রাহ্মণ সমিতির দুর্গা পূজা করছিল।' মঞ্জু বলে।

'হ হ করছিল একবার। স্যায় তো ওই মহাদেব সাহার ছোট পোলার কাণ্ড। সে পইড়তে-পইড়তে সাহাগ পক্ষে একটু বেশিই পইড়্যা ফেলছে। সে কইল, আমরা ক্যান দুর্গাপূজার লগে বামুনগ চাঁদা দিব? না-পারব মণ্ডপে উঠতে, না পারব অঞ্জলি দিতে। পূজা করো, নিজেগ পূজা। ওর বাপ-কাকারা তার মুখের উপর কথা কইব্যার পারে না। বংশের প্রথম বিদ্বান ছাওয়াল। কী কইতে কী কইয়্যা বলদামি কইর‍্যা ফেলার ভয়ে। কিন্তু নিজেগ পূজা কথাটা তাদের কারো কাছেই খুব একটা স্পষ্ট হয় নাই। অর বাবাই তহন জিগ্যায়, নিজেগ পূজা? ছাওয়ালও জবাব দেয়, হ্যাঁ, আমাগ পূজা। বাপ হইয়া ছেলেরে জিগায়, নিজেরা আমরা কেডা? ছেলে বলে, যা বইল্যা দুনিয়া আমাগ ডাকে, সাহা। সাহাগ পূজা। ধুত, বাড়ির পূজা করা যায়, তুই তো কস সর্বজনীন? হ্যাঁ, ঘরের মইধ্যে কে আইস্যা দ্যাহে কার পূজা। সর্বজনীন। সাহাগ সর্বজনীন পূজা। ধুত, শুনায় না ভাল, তরিবত থাহে না, মাথা হেঁট হয়। শেষে আমাগ শশীবাবু, কংগ্রেসের কমিউনিস্ট, জেলখাটা, ইউনিভার্সিটির, পণ্ডিত বইল্যা নামডাক আছে, নিজে বামুন নাস্তিক। তিনিই কইয়্যা দিলেন, অব্রাহ্মণ দুর্গা পূজা। কইয়্যা দিলেন, এতে তো কারো আপত্তরের কারণ নাই। হিন্দুগ যারা বর্ণহিন্দু তাগ কইয়্যা দেয়া থাইকল—যাতে তারা ভুল না করেন।'

'এত্ত বড় খবরখান কাগজে বারাল না ক্যান?' যোগেন, মঞ্জুকেই।

মঞ্জু বলল, 'বারাইছে তো ফটো দিয়্যা।

'বারাইছিল? তাই তো! ভাবছিল্যাম, লোকজন জাইনলে তো জিগ্যাইত—'

'ইংরাজিতে। বাংলায় ছাপে নাই।' মঞ্জু আশ্বাস দিয়ে যোগ করে 'কইতে ছিলাম—এটা কিন্তু কামের কাম হইব্যারও পারে। শিডিউল মাইন্যা তো নিজেরে শিডিউল কওয়া। শিডিউল বইল্যা যদি সরকারি নোটিশ বাইর হয়, তাইলে তুমি তো আর শিডিউল থিক্যা বারাবার পারবা না। তালে তোমাগ শিডিউলের নেতাগ কথা শুইনব্যার লাগে'।

'তাইলে বড়-জ্যাঠা একডা কিছু সাব্যস্ত করেন। আমি যেটুক্ বুইঝল্যাম রায়টটা টাউনে খেপে-খেপে হইছে। কওয়া যাক্, অ্যাহনো চইলতেছে। তবে পাড়াগুলাতে। সারা টাউনে না। আর বুইঝল্যাম, রায়ট শহর থিক্যা গ্রামে গিছে। গ্রামে মুসলমানরা শিডিউলগ গ্রাম থিক্যা খ্যাদাচ্ছে। তাগ ন্যায্য ভয়, ওই শিডিউলরা নিজেগ হিন্দু বইল্যা পরিচয় দিবে সেন্‌সাসে। আরো বুইঝল্যাম, সেডা বুইঝ্যাই আসছি কইলকাতা থিক্যা। কিন্তু কইলকাতার জ্ঞান আর অকুস্থলের জ্ঞান পৃথক। যশোর-খুলনা-মোল্লাহাট থিক্যা হিন্দু মহাসভা নেতাগ আইন্যা মিটিং কইরতেছে কইলকাতার হলে-হলে। প্রচার কইর্‌যা লোক আনত্যাছে সব হিন্দু পাড়া থিক্যা। এক্কারে উছ্‌লাইয়া পড়ছে সব মিটিং। তাতে এই নেতারা মুসলিম লিগ সহ মুসলমানদের আদ্যশ্রাদ্ধ কইরতেছে। বিশেষ কইর্‌যা, সেনসাসে হিন্দুগ ভিতরে আরো পার্থক্য ঘটাইবার বুদ্ধিতে শিডিউল কাস্টের এনট্রি কি হিন্দু হইব, না শূদ্র হইব, এই নিয়্যা ক্যাচাল বাধাইতে চায় হিন্দুসভা। কংগ্রেস হাল ছাইড়্যা দিছে। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি অ্যাহন জাতীয় নেতা, হিন্দু নেতা, বাংলার নেতা। সব মিটিঙের সার কথা হক মন্ত্রিসভার পদত্যাগ। এই তিনডা অবিদ্যার জ্ঞানের মইধ্যে ঢাকায় কোনডা দিয়া কী কইরব। বড়জ্যাঠা, প্রতিপক্ষডা ভাইব্যা নিবেন। কংগ্রেসও না, লিগও না, ফজলুল হকও না, সুভাষ বোসও না। প্রতিপক্ষ, তাবৎ হিন্দুসমাজ। দাবি, হিন্দুগ আধিপত্য-রক্ষা। উপায়, বাংলায় হিন্দুদের জনসংখ্যা মুসলমানগ থিক্যা কম এই গোনাগনতির হিশাবডারে নাকচ কইরব্যার লগে এই যুক্তি প্রচার—সংখ্যায় কম বইল্যাই হিন্দুরা স্বাভাবিক-শাসক। বা, উলটাডাও হইবার পারে। বলেন, কী করার লাগব? কোনটা আগে আর কোনটা পরে। বড়জ্যাঠা, যুধিষ্ঠিরের বড় বাহাদুরি যে ভারত সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারের নিষ্পত্তির জন্য যে-কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, তারে তিনি বানায়্যা দিলেন পাঁচটা গ্রামের দখল আদায়ের লগে যুদ্ধ। হিন্দুগ তো এক ঘাড়ে দুই যুধিষ্ঠির। তারাও বুদ্ধি কইরছে—এটা ধর্মরক্ষার যুদ্ধ। হিন্দুধর্ম রক্ষার ধর্ম। হিন্দুধর্ম রক্ষার যুদ্ধ হইলে তো সেডা জাতীয় যুদ্ধ আর স্বাধীনতার যুদ্ধ হইবই, অটোম্যাটিক। আর হিন্দু মানেই তো বামুন-বৈদ্য-কায়েত। তাইলে খাড়াইল তো এইডা যে বর্ণহিন্দুর বিরোধী হইলেই স্যায় দেশদ্রোহী, জাতিদ্রোহী, ধর্মদ্রোহী, আরো যা যা দ্রোহী হওয়া যায়—সব। এই কথা যারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, রক্তের মইধ্যে যাগ এই বিষ, তাগ মইধ্যে কিন্তু বাংলার সব প্রাতঃস্মরণীয় ঋষিরাও আছেন—বঙ্কিমচন্দ্র, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, বিবেকানন্দ—কেডা নাই? তারা একজনও কি একটা কথাও লিখছে যে উচ্চ-হিন্দুগ কালচারের শ্রেষ্ঠতা মিথ্যা কথা। তাইলে তো আমাগ খোলা গলায় কইব্যার লাইগব—কর্তাগণ, আমরা বেবাক অপর জাত আপনাগ গলকম্বল হইয়্যা থাইকব্যার চাই না। আমরা হিন্দু না। এইডাই লিখব সেনসাসে। তাতে কার বংশবৃদ্ধি আর কার বংশহ্রাস, তা আমরা জানিও না, দেখবও না।'

সবাই একটু চুপ করে থাকে। রসিকলাল বোঝার চেষ্টা করেন, যোগেন এতটা খেপে গেল কেন। ওর তো সব থেকে বড়গুণ মাথা ঠান্ডা রাখা। তারা তো অনেকটাই জেনেশুনে এসেছে। শিডিউলদের গাঁও থেকে বের করে দিচ্ছে শুনেই তারা সেটা ঠেকাতে এল। তাদের তো তাহলে এই দাঙ্গার মধ্যে তিনটি কথা বললেই সব কথা আপাতত সারা হয়। এক নম্বর কথা—দাঙ্গাটা

বন্ধ হোক। দুই নম্বর কথা—শিডিউলদের সেনসাসে নিজের পরিচয়ের স্বাধীনতা মানতে হবে।

এইবারেই সেনসাসেই 'ধর্ম' আর 'সম্প্রদায়' বলে দুটি ঘর আছে। নতুন-নতুন ঘর হিন্দু সংখ্যা বাড়ানোর বুদ্ধিতে? তপশিলিরা তাহলে ধর্মের ঘরে কিছু বলবে না। সম্প্রদায়ের ঘরে বলবে, শিডিউল বা তপশিলি। তিন নম্বর কথা—মুসলমানদের বলতে হবে যে তপশিলিদের আক্রমণ করা চলবে না, তপশিলিরা আর এই গোয়ালা-সাহা-শাঁখারিরাও মুসলমানদের আক্রমণ করবে না। রসিকলাল ভাবছিলেন—বাংলায় এখন যে-রাজনীতি তাতে এই তিনটি কথা আঁটবে কী না। রসিকলাল ঠেকে যাচ্ছেন তিন নম্বর কথাটায়। তপশিলিরা আর মুসলমানরা পরস্পরকে আক্রমণ করবে না—এই কথাটা এখনই বলে দিলে কি শিডিউলরা ভরসা পাবে, না, ভয় পাবে? কলকাতা আর জিলা সদর কি মহকুমার হিন্দুবাবুরা তো একসঙ্গে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে? এখনই তো কংগ্রেস ছেড়ে হিন্দু মহাসভায় যাওয়ার ধুম লেগেছে। তাদের এই প্রচারে হিন্দুমহাসভার কোনো উপকার করে বসা হবে না তো? অন্য একটা ভাষা খুঁজছিলেন রসিকলাল।

চুপচাপটা ভাঙলেন মোহিনীমোহন, 'যোগেন, একডা গল্প মনে পইড়ল। তোমারও জানা হয়তো। এক বামনি স্নানে যাওয়ার আগে বামুনরে কইয়্যা গেল—আমি এডড়ু ঘাটে যাই, আখায় ভাত চড়ান আছে, এডড়ু চোখ রাইখো। বামুন চোখ রাইখতে-রাইখতে দ্যাহে, ড্যাকের ঢাকনিখান নড়ব্যার লাগছে। তারপর দ্যাহে, নড়া তো থামেই না, উল্ট্যা বাড়ে আর ধোঁয়াও উঠে। বামুন তখনই গায়ত্রীমন্ত্র পড়া শুরু কইরছে। বামনি ক্যান আসে না। ড্যাকের ঢাকনা আরো নড়ে, ধোঁয়ার সঙ্গে ফেনও উথলায়। বামুনের তখন বুদ্ধিনাশ। আগুন নিবানোর মন্ত্র আর মনে পড়ে না। তহন বুড়া আঙুলে পৈতা পেঁচাইয়া ঢাকনার ধোঁয়ার মাথায় যজ্ঞের আগুন নিবানোর মন্ত্র জোরে-জোরে পড়ে য্যান তারডা শুইন্যা যজমান কইব—'অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ, ওঁ পৃথ্বী ত্বং শীতলা ভব।'

বামনি তহন আইস্যা গিছেন। বাইর থিক্যা কন—'একা-একা মন্ত্র চিল্লাও কীয়ের লাইগ্যা?'

'আরে, এ ড্যাকের ঢাকনা তো মন্ত্রও মানে না—'

বামনি তহন রান্নাঘারে ঢুইক্যা ব্যাপার দেইখ্যা ড্যাকডা আখার উপুর থিক্যা নামাইতেই ঢাকনা ঠান্ডা। বামনি তহন মুখ নাড়াইয়্যা কয়, 'মা কালীরে যে পাঁঠা বলি দ্যাও, সেই মন্তরডা কি পাঁঠাব কান শোনে না অণ্ডকোষ শোনে? অকাল কুষ্মাণ্ড! বাইরে গিয়্যা মন্তর চেঁচাও। তাও দুইডা কাক তাড়ান্ হব। আমারে আইঠ্যা ছোঁয়াইলা-আর-একডা ডুব দিয়্যা আসি।'

'বড়জেঠা, এই গল্পডা আমার শোনা নাই। এত ভাল একডা কথা। শুইনতে এত ভাল যে মর্মার্থ বুঝি নাই।'

'মর্মার্থ কিছু থাইকলে তো বুঝবা? স—ব ওই পুরুতের ড্যাক-পড়া মন্তর। তুমি যেসব কথা কইল্যা বাবা, সেগুলা তো আমিই সব জানি না। জাইনব্যার লাগব। কিন্তু অ্যাহন তো ড্যাক উথলায়। অ্যাহন তো মন্ত্র দিয়্যা আগুন নিব্ব না। প্রথম কামডা তো খুনাখুনিটা থামানো। খুনাখুনির তো হিন্দু-মুসলমান-তপশিল নাই। যে মরে, সে-ই মরে।'

মোহিনীমোহন থামলে রসিকলাল বলেন, 'সেডা তো ঠিক কথা—ওই কথা প্রচারের সময় কি এ—ই? এই কথাডা পর্যন্ত কওয়া যায় যে খুনাখুনিডা বন্ধ হইক। এডাও কওয়া যায় যে সেনসাস নিয়্যা পাকানো দাঙ্গা—হিন্দু মহাসভার আর লিগের। এডাও কওয়া যায়, তপশিলগ জাত-পাত-ধর্ম-সম্প্রদায় তো তপশিলরাই জানে। তালি তাগ 'হিন্দু' লেখানোর জন্য মারামারি ক্যান। আর হিন্দু না-লেখানোর লগে খেদাখেদি ক্যান। কিন্তু এই কথাটা কওয়া যায় না শিডিউলরা হিন্দু না।'

'সেনসাস নিয়্যা বিবাদ। অ্যাহন কওয়া যাইব না তো কবে কওয়া যাইব? হিন্দু মহাসভার

উদ্দেশ্য তো সামনের বছরের ভোটে সংরক্ষণ কমানো।'

'তহন কব। কথাডা উঠুক আগে। বাবুরাই তুলব—কংগ্রেসের বা মহাসভার। তহন কব।'

'ক্যাঁ? কাহা? সব কথাই বাবুরা যাতে কয় তার লগে ছাইড়্যা রাইখব ক্যা? দুটা-একডা আসল কথা তো ড্যাকের ঢাকনাডার লাগান আমাগও কইব্যার লাইগব।' যোগেন একটু হেসেই বলে বোঝাতে যে কথাগুলির পেছনে কোনো রাগ নেই, চিন্তিত আছে।

সেটা বুঝেই মোহিনীমোহন বলেন, 'আমি কই কি, সইন্ধ্যা তো লাইগা গেল। মঞ্জু অ্যাহন গোয়ালাপাড়া, শাঁখাটুলি, শাঁখারিপট্টিতে ঘুরান দিক। কাইল সকাল থিক্যা যাতে তোমরা পাড়াগুলাতে ঘুরব্যার পারো, সভা ঠিক না, ওই দল পাকাইয়্যা কথা কওয়া। আর আমরা তিনজন চলো যাই ইউনিভার্সিটিতে আমাগ বামুন-নাস্তিক, কংগ্রেসি কমিউনিস্ট আর জেলফেরৎ প্রফেসরের সঙ্গে এডডু কথা-পরামর্শ কইর‍্যা আসি।'

যেমন ঠিক হয়েছিল, পরদিন সকাল ১১টা নাগাদ মোহিনীমোহন, যোগেন আর রসিকলাল, মোহিনীমোহনের গাড়িতেই গোয়ালাটুলি গেলেন। ওদের সারাদিনের কাজ আজ গোয়ালটুলি আর শাঁখারিপাড়া ঘোরা। তারপর যদি সাহাদের দু-একজনের সঙ্গে দেখা করা যায়, দেখা করবে। গোয়ালাটুলি-শাঁখারিপাড়া একদিনে শেষ হবে না। একবার কথা উঠেছিল যে সাহাদের সঙ্গেই আগে কথা বলে, যদি সাহাদের কাউকে সঙ্গে পাওয়া যায়, তা হলে সঙ্গে নিয়ে গোয়ালাটুলি ও শাঁখারিপাড়া ঘোরা। তার প্রধান অসুবিধে যে সকালে সাহাদের বাড়িতে পাওয়া যাবে না। তারা গদিতে-গুদামে চলে যাবে। আবার বেলা এগারটা-বারটা পর্যন্ত ঘোষদের ব্যস্ততা এত বেশি যে শ্বাস-ফেলার সময় থাকে না তাদের। অগত্যা এটাই ঠিক হল যে দশটা-এগারটা থেকে তারা ঘুরানটা অন্তত শুরু করুক।

গাড়ি দাঁড়াল নবাবপুরের মোড়ে, গাড়ি নিয়ে গোয়ালাটুলির ভিতরে ঢোকাও যায় না, কয়েকটা রাস্তায় যদি যায়ও কথা বলবে কী করে?

মঞ্জু মোড়ে দাঁড়িয়েছিল, কয়েকজনকে নিয়ে, রাস্তার উলটোদিকে। এঁদের দেখে তারা সবাই এদিকে চলে আসে। 'এরা তো কয়, জনসভা হইলেই ভাল, মনে একটা জোর আসে'।

যোগেন বলে, 'জনসভা ডাকো। জনসভা হব। অ্যাহন এডডু পদসভা কইর‍্যা নেই। চলো গিয়া? আগাও।'

তিন-চারজন ভার-ভারিক্কি বাবু নবাবপুরের গলি দিয়ে যাচ্ছে—এটা খুব একটা রোজকার দৃশ্য নয়, এখন তো আরো না। দু-একজন তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখে বোঝাও যে আরো আছে এদের সঙ্গে, তাদের মুখগুলো খুব অচেনা না।

যোগেন এটা খেয়াল করেছিল। মোহিনীমোহন মাঝে-মাঝে হাত তুলছিলেন, দু-একবার নমস্কারও করলেন। যোগেন আন্দাজ করে, লোকজনের চোখ পড়ছে, মোহিনীমোহনের কারণেই। মিনিট পাঁচ-সাত হাঁটতে-হাঁটতেই দলটা তিন টুকরো হল। মঞ্জু কয়েকজনকে নিয়ে এগিয়ে গেল, বোধহয় কোথায় দাঁড়িয়ে বা বসে কথাবার্তা হবে সেটা ঠিক করতে।

মাঝখানে ডাক্তারের সঙ্গে যোগেন আর রসিকলাল। ডাক্তার রসিকলালকে বলে, 'শুঁকছ? বাতাসে কেমন পবিত্তর গন্ধ। ঘুমের মইধ্যে নাকে লাগলে গোয়ালাটুলি চেনা যায়।'

'কোনডা পবিত্তর ঠেকে বড়জ্যাঠা? কাঁচাদুধের গন্ধ না গোবরের?' যোগেন জিজ্ঞাসা করে বটে কিন্তু বোঝা যায় না একটু ঠাট্টা মেশাল কী না!'

'তা যদি কও, তালি চোনা ক্যান বাদ দিব? চোনাও তো পূজায় লাগে। পবিত্তর। গন্ধডাও

ঝাঁঝাল,' রসিকলাল বলেন, 'অ্যাড্ডা সত্যিকথা যোগেন, আমরা তো টাউনের মানুষ হইয়্যা গিছি। কইলকাতা। আর যশোর। তোর অবিশ্যি তা না। তোক তো মৈস্তারকান্দি-আগৈলঝরা যাইতে হয়। ডাক্তারবাবু তো ঢাকা-কইলকাতা—'

ডাক্তার বলেন, 'আরে আমাগ তো টাউন গজাব্যার ধইরছে কচুবনের নাগাল। কইলকাত্তা আর যাওয়া হয় না। নারানগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, বিক্রমপুর তো ফনফনাইয়া বাড়ত্যাছে।'

রসিকলাল বলেন, 'তা তো বাড়ত্যাছেই, যুদ্ধের টাইমে য্যান বেশি। দ্যাশের বাসডা নাক থিক্যা সইর‍্যা যায় না? এই-যে অ্যাহন মনে হইল, এই মিশাল-বাসডা—দুধ-গোবর-চোনার বাসডা নাকে লাগতেই মনে আইল ক্যা বাসডা ভুল্যা গিছিল্যাম।'

'কাহা, এডা ক্যাম অন্যায্য কথা। বউবাজারের মোড়ে ছানাপট্টির পচা ছানার গন্ধে তো নাকে কাপড় দেয়ার লাগে—'

'কই কাঁচা দুধ, গোবর আর চোনার কথা! আর তুই কস ছানার কথা? বউবাজারের ছানাপট্টির গরুগুল্যা কি দুধরে একেবারে ছানা বানাইয়্যা দ্যায়?' রসিকলাল বলেন।

'না, তাই কই, আপনে য্যান ক্যামন ঘটিগ নাগাল কইলেন গন্ধের কথাডা, তাই কই—'

'আমি তো ঘটিই রে, যশোর না?'

'হ্যাঁ, হ্যা, আমার আর যোগেনের গৌরনদীর তুলনায় যশোররে বিলাত কইতেই-বা কী?' ডাক্তার নিজেই হাসেন, রসিকলালও হাসেন।

দু-তিনজন লোক একজনের ফতুয়া গায়ে, বাকিদের খালি গা, একটু দূর থেকেই নমস্কার করতে থাকে, 'আরে, কাম দেখছ নি, ডাক্তারবাবু সদলবলে প্রাতঃকালে। খবর দ্যায় নাই তো ছ্যামরাগুল্যা।' পৌঁছে, ওরা সকলেই এই তিনজনকে ভক্তি দেয়।

ডাক্তার বলেন, 'খবর কী দিবে? তোমরাই তো সব খবরের মাথায়। রাইত-দিন শুদু দাঙ্গা বাধাও।'

'কন কী ডাক্তারবাবু? আমাগ লগে দাঙ্গা কইরব কেডা? আপনারা চলেন দুই পা আগাইয়্যা এডডু বসেন—'

ডাক্তার কথাটা ছাড়েন না, 'তোমরাই তো আগ বাড়াইয়্যা পায়ে পা লাগাইয়্যা কাইজ্যা বানাও। আর তার ঠেলা গিয়া ধাক্কা দ্যায় মফস্বলে। সেহানে তো তোমরা নাই। এহানে যাগ মার, তারা গিয়্যা সেহানে তোমার স্বজাতগ মারে, গাঁও থিক্যা খ্যাদায়, কয় যে তোমরা গিয়্যা নিজেগ হিন্দু লিখাইবা আর আমাগ ভোটে হারাইবা।'

এদের যেখানে নিয়ে যেতে চাইছিল, সেই একটু ফাঁকা জায়গা এসে পড়ে। তিনদিকে গোয়াল আর-একদিকে রাস্তা-ঘেরা ফাঁকা জায়গা। কোথা থেকে দু-তিনটি পিঠসোজা প্যাঁচানো লোহার চেয়ার এনেছিল। এঁরা সেটাতে বসলেন। ভিড়টা একটু ঘন হল। সেই একটুখানি চুপের মধ্যে পরপর অনেকগুলো গরু একের পর এক হা—ম্বা ডাকতে লাগল। ভিড়ের ভিতর থেকে একজন ধমকে ওঠে, 'পাইছে মাইনষের গন্দ, অমনি জুড়ছে হাম্বা। এগ লাইগ্যা তো মানুষজনের লগে কথা কওয়া যায় না।' ধমকটাকে আরো চড়িয়ে সে হেঁকে ওঠে, 'চুপ যা হগগলে।'

ডাক্তার তখন বলছেন, 'দোলখেলার দিন তো আগে-আগে দোলমঞ্চ বানাইয়্যা বেবাক মানুষরে মিষ্টি বিতরণ কইরত্যা। অ্যাহন সেইসব ইষ্ট কর্ম বাদ দিয়া বাইছ্যা-বাইছা মুসলমান মাইয়াগ রং দিয়্যা দেশজুড়্যা একডা হাঙ্গাম বাধাও? এই যে দুইজনই আমাগ স্বজাতের নেতা, আইনসভার মেম্বার, তোমাগ শায়েস্তা কইরব্যার আইসছেন।'

পেছন থেকে টাকমাথা বাবড়ি চুলের এক বুড়ো মত মানুষ তাঁর দাঁড়ানোর জায়গা থেকে

হাত জোড় করে বলেন, 'পেনাম ডাক্তারবাবু আর মেম্বারবাবু, আপনারা তো হগলেই জানেন ঘোষেগ যে-বয়সে বুদ্ধি হওয়ার কথা সে-বয়স পর্যন্ত ঘোষরা সবাই বাঁচে না। আমাগ মইধ্যে নির্বুদ্ধিয়াই বেশি। আপনারা আইজ যা বুঝাবেন সেডা বুইঝতেও টাইম লাগব। তাই কই, দুপুরের আহারের ব্যবস্থাডা এই হানে হোক। এগ যা বকাঝকা কইর‍্যা আপনারা ঘুরানে বাড়ান। ফিরুয়া দুপুরের সেব্যা নিয়্যা আবার ওই একই রাস্তায় ঘুরান দিয়্যা দ্যাহেন যে শিক্ষা সকালে দিলেন, সেডা বিকালে কয়জনের মনে আছে?'

'স্যায় তো ভাল প্রস্তাব। তালি কয়জনরে আগুরি পাঠান পরের বসার জায়গা ঠিক কইরব্যার লাইগ্যা। আপনাগ সঙ্গে দুইগা কথা কইয়্যা আমরা অগ পাছ নিব।' যোগেন বলে।

'আপনাগ কেউ উঁচা হিন্দু নাই তো? আমাগ হাতে খান তো?' সেই বৃদ্ধই জিজ্ঞাসা করেন।

'কইল্যাম না? আমাগ স্বজাত মেম্বার। এনার নাম রসিকলাল বিশ্বাস, এমএলএ, তার থিক্যাও পুরানা ভাইস-চেয়ারম্যান যশোর মিউনিসিপ্যালিটির। পুনাচুক্তির সইদার। আর এনার নাম যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। জেনারেল সিটে বরিশালে কংগ্রেসরে হারাইয়া সারা দেশে, ভারতে একমাত্র, শিডিউল প্রার্থী যে জিতছে।' হৈ হৈ করে হাততালি পড়ল। ডাক্তারবাবু বলে চললেন, 'আমার তো উভয়সংকট। আমার পার্টি কংগ্রেস হাইরছে তার লাইগ্যা দুঃখ। নিজে হারছি তার লাইগ্যা দুঃখ। কিন্তু যোগেন এমন জিতা জিতছে যে খুশি না-হইয়্যা পারি না।'

আবার একটা জয়ধ্বনি উঠল। রসিকলাল যোগেনকে বলেন, নিম্নস্বরে, 'তুই ক। দাঙ্গা থামাইতে ক—আমাগ কী কী ক্ষতি হইব দাঙ্গায়—ক। আর হিন্দু মহাসভার কথা ক। আমরা হিন্দু না কইস না। ভাব দেইখ্যা নেই। হিন্দু মহাসভার উপ্‌কারে লাগে এমন কাম কইরতে না ক।'

নতুন দাঙ্গা?

১৫৬

ডাক্তারবাবুর গাড়িতে পেছনের সিটে যোগেনকে শুইয়ে দিয়ে রসিকলাল যোগেনের মাথার কাছে আর মোহিনীমোহন ড্রাইভারের পাশে বসার পর গাড়িটা ঘোরানো শুরু হলে গোয়ালাটুলির গলি থেকে লাঠি শোঁটা শরকি বর্শা নিয়ে 'রে-রে' করতে-করতে একটা দঙ্গল ছুটে রাস্তা পেরিয়ে উলটো দিকের রাস্তার ভিতর ঢুকে গেল। যারা ধরাধরি করে যোগেনকে এনে গাড়িতে তুলে দিল তারা তখন গাড়ির সামনে আর তাদের সামনে সেই ছুটন্ত দঙ্গল। তারা যেন থমকে দাঁড়াল, তারপর দৌড়ে সেই দঙ্গলে মিশে ছুটে গেল। তাদেরই একজন চিৎকার করে উঠল, 'বামুন-কায়েত মানি না', 'শ্যামাপ্রসাদ ধ্বংস হোক', 'বামুনগ টিকি কাটো, পৈতা ছিঁড়ো', 'যোগেন মণ্ডল জয় জয়।' ড্রাইভার স্টার্ট দিয়ে রেখেছিল। সে-আওয়াজে কথাগুলো বোঝা যাচ্ছিল না। এক ডাক্তারবাবুর কিছুটা জানা বলে তিনি প্রথম দুটো শুনে ফেলে বাকিগুলোও বুঝে নিতে পারলেন। রসিকলাল ওই দঙ্গলের ধেয়ে যাওয়াটা দেখেনইনি, যোগেনের মুখের ওপর এমন ঝুঁকে ছিলেন।

গাড়ি ঘুরিয়েই ড্রাইভার বাঁয়ের এক গলিতে ঢুকে গাড়ির গতি দিল বাড়িয়ে। তারপর এ-বাঁক, ও-বাঁক করতে-করতে যেখানে এসে বেশ আওয়াজ তুলে ব্রেক কষে, রসিকলাল বোঝেননি, সেটাই হাসপাতাল। ড্রাইভার লাফিয়ে নেমে একটা খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকেই বেরিয়ে আসে, এক হাতে স্ট্রেচারের এক-মাথা ধরে, আর-এক মাথা খালি গায়ের এক ছোকরাকে ধরিয়ে।

রসিকলাল নেমে দাঁড়িয়েছিলেন।

গাড়ি থেকে ডাক্তারের নামতে একটু সময় লাগে। নেমেই এমার্জেন্সির সেই দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেলেন।

ততক্ষণে যোগেনকে ধরে ওরা স্ট্রেচারে শুইয়ে দিয়েছে। স্ট্রেচারটা ওরা তোলার আগে যোগেনের একটু যেন গোঙানি শোনা গেল। বা, রসিকলাল বাজিয়ে শুনলেন। তিনি ভিতরে ঢোকার সাহস করলেন না।

রসিকলাল বাইরে পায়চারি করছিলেন। ভাবার চেষ্টা করছেন—ঘটনাটা কী হল? সেটা কি ভাবছেন, যোগেন এমন মার খেল বলে? দাঙ্গা মানেই তো মারার স্বাধীনতা। যখন বাঁচার স্বাধীনতা থাকে না আর আর-একজনকে মারার স্বাধীনতাই মাত্র থাকে—তখনই সেই অবস্থাকে দাঙ্গা বলে। আমাদের দেশে হিন্দু আর মুসলমান এই দুই প্রতিপক্ষ হয়ে গেছে। রসিকলাল একটা এমন ফাঁপরে পড়ে যান, যেখানে তিনি পড়তে চাইছিলেন না। হিন্দুরা কোনোক্রমেই এটা মেনে নিতে পারছে না যে তাদের মুসলমানদের শাসনে থাকতে হবে। যশোরে সে আর যোগেন দু-জনে ঘুরে-ঘুরে তো দেখেছে, সেই প্রথম দেখা—হিন্দুদের মধ্যে যারা চায় মুসলমানদের শাসন শেষ করতে, তারা কত রকম প্রতিষ্ঠানে-মিশনে-পার্টিতে কাজ করছে। হিন্দু সেবাশ্রম, হিন্দু মিশন, হিন্দু মহাসভা, স্থানীয় সব সেবা মিশন, দাতব্য হোমিয়োপ্যাথি সেবাসমিতি, ব্যায়ামসমিতি—এইসব সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি বাইরে যাই বলুক, ভিতরে একেবারে আপাদ শির মুসলিম বিরোধী। এরা হিন্দুধর্মের সবকিছু হয়তো বিশ্বাসই করে না। এমন অনেকেও আছেন, যাঁরা ধর্মই মানেন না। কিন্তু মুসলমানদের বিশ্বাস করেন না। বরং উলটে একেবারে চরম মনে করেন যে মনুষ্যজন্মের এমন কোনো পাপ নেই যা মুসলমানরা করতে পারে না। মুসলমানদের নিয়ে যে-সব গুলগল্প হিন্দুদের মধ্যে চালু আছে, তাঁরা সেগুলো বিশ্বাস করেন ও যে-কোনো জায়গাতেই তাঁরা সেই গল্প বিস্তৃত করে বলেন। হিন্দুদের সামাজিক সংগঠনগুলো ও মুসলমানদের রাজনৈতিক পার্টি ছাড়া কোনো দাঙ্গা হতেই পারে না। প্রত্যক্ষ না হলেও, অনতিদূর ভবিষ্যতে হিন্দুদের সঙ্গে হিন্দুদেরই দাঙ্গা বাঁধবে। সেটাই কি আজ শুরু হল আর-এক নয়া দাঙ্গায় সেখানে যোগেন মার খেল হিন্দুদেরই হাতে, যেখানে কংগ্রেস আর হিন্দু মহাসভা একসঙ্গে মুসলমানদের বিরোধিতা করছে।

রসিকলাল কী চান?

চান—দাঙ্গা-হাঙ্গামার শেষ। চান—হিন্দুদের বহু ধরনের ব্যভিচারী ধারণার ধ্বংস। চান—হিন্দু-তপশিলীদের সম্মান। চান—মুসলমান-তপশিলিদের একটা তালিকা। চান—তপশিলি সমাজের বড়-বড় মানুষের হিন্দু হিশেবেই সংবর্ধনা ও অধিষ্ঠান। তাঁর এই চাওয়া, তাঁদের অনেকের এমন চাওয়ার জবাবেই, আজ যোগেনকে মেরে অজ্ঞান করে মাটিতে ফেলে দেয়া হল। হিন্দু বড়জাতের কাছে তপশিলি বা শূদ্র আর মুসলমানরা পৃথক কোনো জনসত্তা নয়। চাঁড়াল আর নেড়া—দুইয়ে মিলে একটাই ছোটলোক।

রসিকলাল এতটা যে এখনই গুছিয়ে ভেবে ফেলেন তা নয়। তিনি বুঝতে চাইছেন তাঁর সঙ্গে যোগেনের কোথাও তো কোনো অমিল নেই, মতের তফাৎ নেই, তবু কোথাও একটা সুতোর মত ব্যবধান তৈরি হচ্ছে কি? আর, সে-ব্যবধানের কারণ কি এই, যোগেন যে-তীব্রতায় বলতে চায়, আমরা হিন্দু না, রসিকলাল তা পারছেন না। পারছেন না যে কোনো যুক্তির কারণে, তা নয়। পারছেন না যে শিকড়ের টানে, সেটা রসিকলাল বুঝে ফেলেছেন। বুঝে ফেলার পর তিনি নিজের ওপর বিরক্ত হয়েছেন। হিন্দু সমাজ ও ব্যবস্থাকে অমান্য করেই তো তিনি এতদিন চলেছেন। বিধবা বিবাহ করে হিন্দু উঁচু সমাজের শুদ্ধতা-সংস্কারকে আঘাত করেছেন। গান্ধীজির

অনশনে পুনে চুক্তি নিষ্পন্ন করতে মালব্যজি আর আম্বেদকারকে মিলিয়েছেন। মালব্যজিকে রসিকলাল বলেছিলেন পণ্ডিতজি, আপনারা কিন্তু কিছুতেই এই উচ্চবর্ণের অহংকার ছাড়ছেন না যে আপনারা যেন দয়াবশত আমাদের মত নিম্নবর্ণদের জন্য জায়গা করে দিচ্ছেন। ব্যাপারটা কিন্তু একেবারে উলটো। গান্ধীজির অনশনের অছিলায় আপনাদের শুদ্ধ হিন্দুত্বের যত বেশি অংশ আপনারা দখলে রাখতে পারেন, তার জন্য আপনারা উঠেপড়ে লেগেছেন। আমরা কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের একটা রোয়েদাদের জোরেই এই সংরক্ষণ পাচ্ছি. গান্ধীজির জীবনের মূল্য নিশ্চয়ই সংরক্ষণের চাইতে মূল্যবান। সে-মূল্যটাকে আপনারা বাজারের দরকষাকষিতে নামিয়ে আনবেন না, পণ্ডিতজি।

রসিকলালের কথাগুলিতে মালব্যজি খুশি হননি। তাঁর অখুশি তিনি বুঝিয়েও দিয়েছিলেন।

'হাঁ হাঁ, ব্রহ্মবাক্য তো এখনো আছে। কিন্তু উহে বাক্য কো বক্তা উলট গিয়া। আভি বামুনলোগ তো আর হিন্দু কো গুরু নাহি। আভি তো নয়া গুরু সব আ গয়া', মালব্যজি তাঁর হাতটা ঘুরিয়েছিলে আম্বেদকার ও রসিকলালকে দেখাতে।

আম্বেদকারকেও রসিকলাল বলেছিলেন, এটা কিছু ভুলে থাকা ঠিক হবে না, যে সাম্প্রদায়িক আসন সবচেয়ে বেশি হবে বাংলায় আর বাংলার কাজ থেকে সে-দামও উচ্চবর্ণরা আদায় করে নেবেন। আমাদের ভবিষ্যৎ একটু মনে রাখবেন।

কিন্তু যোগেন যখন বলল, তপশিলিরা হিন্দু না, তখন এতটা স্পষ্ট বিচ্ছেদ রসিকলাল মেনে নিতে পারছেন না। মেনে নিতে হয়তো পারবেন বা মানা-না-মানা পর্যন্ত কথাটাকে গড়াতেই দেবেন না—তবু অস্বস্তিটা তো মিথ্যা নয়। অজ্ঞান যোগেনের আঘাতের কোনো খবর না পেয়ে রসিকলাল নিজেকেই আঘাত করছিলেন।

মোহিনীমোহন বেরিয়ে এসে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলেন। রসিকলাল তাঁর দিকে এগিয়ে যান।

ডাক্তার বলেন, 'না, ভয়ের কিছু নাই। আমি একডু ভয় খাইছিল্যাম যদি লোহার রড দিয়্যা মাইর‍্যা থাহে, তা লি তো বাঁচামরা অনিশ্চিত। লোহা দিয়্যা মারে নাই। পাথর দিয়্যাও না। ইট দিয়্যা মারছে। তাতেই মনে হয়, হয়তো আগের থিক্যা ভাইব্যা মারে নাই। হঠাৎ মাথা গরম কইর‍্যা মাইর‍্যা বইসছে। এরা তো কইল বাড়ি নিয়্যা যাইতে। কয়, আমাদের ভরসায় সারা রাইত না-থাইক্যা, আপনার ভরসায় আপনার বাড়িতে থাকা বেশি নিরাপদ। আমি কইল্যাম, না, আঘাতের থিক্যা ট্রম্যাডা বেশি। তবে সামলাইয়্যা নিবে। সারা রাইত স্যালাইন দিলে সকালে ঝরঝরা হইয়্যা যাবে। আমার সঙ্গে তো কথা কইল, আপনে কথা কবেন? আসেন—না।'

'না, না, আমি অ্যাহন দেইখব্যার চাই না। যহন বাড়ি নিয়া যাইবেন, তহনই দেখব।'

'তাইলে চলেন। একবার গোয়ালাটুলি ঘুর‍্যান দিয়্যা যাই। সেহানে আবার কী যুদ্ধ বাইধল!'

অনুমান তো একটা ছিলই। কারা এই আক্রমণটা করে থাকতে পারে? স্বভাবতই মুসলমানদের কথা মনে আসে—কারণ দাঙ্গাটা তো চলছিলই। কিন্তু ঘটনার সঙ্গে-সঙ্গে ঘোষদের ছেলেছোকরারা যোগেনের দিকে ফিরে না তাকিয়ে এমন দৌড়েছিল আততায়ীর পেছনে টিনের চাল দিয়ে, ছাদের কার্নিস থেকে লাফিয়ে বাড়ির মাঝখান দিয়ে যে ছেলের দলের ফনফনানো দৌড়ের সঙ্গে অতটা লম্বা-চওড়া সেই পশ্চিমা-বামুন দৌড়ে পারেনি।

পশ্চিমা-বামুন তো পেছন থেকে চিনলেও চেনা যায়, খাড়া, লম্বা, বড় টিকি, টিকির আগায় কারো-কারো ফুল, পাথরের মত পিঠ, ছোট লাল পেড়ে ধুতি, পায়ের সাইজ বড়-বড় জুতোর দোকানের বাইরে যে জুতোটা টাঙানো থাকে, সেটার মত।

এদের নিয়ে নানা মজার গল্প হয়। কবে নাকী বামুনদের শুদ্ধি করানোর জন্য বামুনদের

আদিবাস কান্যকুব্জ থেকে এদের আনা হয়েছিল গৌড়ের রাজার হুকুমে। কিন্তু বাঙালি বামুনই-বা অন্য জাতের বামুনকে নিজেদের দলে ঢুকতে দেবে কেন? সুতরাং বাংলায় এসে এরা হয়ে গেল বামুনদের দঙ্গল।

গোয়ালাটুলিতে এসে জানা গেল, লোকটি কে এরা ধরে ফেলেছে। সে নাকী এক পশ্চিমা বামুন।

গায়ের জোর আছে। কয়েকঘর পশ্চিমা বামুন মুর্শিদাবাদ থেকে বিক্রমপুর এসেছিল কতদিন আগে। তারা বামুন হিশেবে সামাজিক কোনো খাতির পেত না মুর্শিদাবাদের তলার দিকে, এমন কী অগ্রদানী হিশেবেও শ্রাদ্ধকর্মে তাদের ডাকা হত না। বিক্রমপুরের দিকে বামুন কম, সুতরাং সেখানে বামুন হিশেবে তাদের কিছুটা খাতির জুটতেও পারে। সে নিশ্চয়ই শ-শ বছর আগের ব্যাপার। তাদের অবস্থার খুব যে একটা পুরুষানুক্রমিক বদল ঘটেছিল, তা নয়, তবে পূর্ব বাংলার নিম্নবর্ণ প্রধান অঞ্চলের কোনো-কোনো জায়গায় তাদের বামুনের কাজকর্ম কিছু-কিছু জুটেছিল।

এই হিন্দু-মুসলমান মারামারির সময় তাদের একটা সামাজিক জায়গাই তৈরি হয়েছে। তারা রায়টের সময় হিন্দুদের আগুয়ান বাহিনী হিশাবে কাজ করত। অনেক রায়ট-প্রবণ টাউনে বড়লোকরা এ-রকম এক-একটা দলকে পুষত, বিশেষ করে সেইসব এলাকায় যেখানে থেকে-থেকেই নমশূদ্ররা এমন আওয়াজ তুলত যে তারা বামুন-বৈদ্য-কায়স্থদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য আর ঢাল হিশাবে কাজ করবে না।

এরা, এই পশ্চিমা বামুনরা দাঙ্গা চাইত পেশাগত কারণে। তারা শান্তিটান্তির খুব বিরোধী ছিল। কোনো-কোনো পাড়া বা মহল্লা থেকে তাদের রুটিরুজি পেত। তাছাড়াও দাঙ্গার সময় বিশেষ বোনাস ছিল, দোকানপাট লুটতরাজ। সেই কারণেই এদের একটা ভিড় ছিল ঢাকায়।

যোগেন তার বক্তৃতায় যতই বর্ণহিন্দুদের নিন্দা করছিল ও শূদ্র মানুষজনের এক হওয়ায় লাভ বোঝাচ্ছিল, এই লোকটি ততই বুঝে ফেলে যে যোগেন তাকে বেকার করে দিচ্ছে। সে আর সহ্য করতে পারেনি। উঠে যোগেনের পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়।

মোহিনীমোহন এতক্ষণে একটু হাঁফ ছেড়ে বলেন, 'যাগ্, এইডা অন্তত বাঁচা গেল যে, যে-লোকডা মারছে সে নিজে বোধয় মহাসভাটভাও জানে না।' অর্থাৎ, দাঙ্গা সম্পর্কে নতুন কোনো কথা রটবে না।

পরের দিনের সকালের কাগজগুলিতে প্রথম পৃষ্ঠায় বড়-বড় হরফে ইংরেজি-বাংলা-উর্দুতে নানারকম খবরের কাগজে, বেরল। 'বিশিষ্ট এমএলএ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল গোয়ালাটুলিতে আনল। 'ঢাকা-দাঙ্গার নতুন মোড়', 'এসসিজ (sc) অ্যাফার্ম হিন্দুয়িজম', 'সেনসাসে সম্প্রদায়-পরিচয় থেকে গোলমাল।'

যোগেনকে হাসপাতাল থেকে মোহিনীমোহনের বাড়িতে নিয়ে এসেছে মঞ্জু মাস্টার আর ড্রাইভার। বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে যোগেন কাগজগুলি পড়ছিল। সবগুলো কাগজ দেখা হয়ে গেলে, সে আস্তে করে উঠে বসল আর তার দুটো পা নামাল। ধরে-ধরে খাট থেকে নেমে ধীরে-ধীরে সে রসিকলালের থাকার সম্ভাব্য জায়গাগুলির দিকে যায়। ঘর থেকে কয়েক পা দূরেই একটা বেতের চেয়ারে বসেছিলেন রসিকলাল। পেছন থেকেই বলে ওঠে যোগেন—'কাহা কী উবগারডা যে কইরল কুলীন পচ্চিমা। অ্যাদ্দিন তো চিল্লয়্যা গলা ভাঙছি। আপনারাই ভাল কইর‍্যা কান পাতেন নাই। ডর খাইছেন। পচ্চিমা বামুনডা তো আমারে উদ্ধার দিল, কাহা। দেখাইয়্যা দিল যে, তপশিলিগ হিন্দু বইল্যা হিন্দুরাই মানে না। নারানগঞ্জ, মুন্সি গঞ্জ, বিক্রমপুর কিন্তু বাদ দিবেন না। আমি যাব।'

'সেডা তো যোগেন, ডাক্তারবাবুর ব্যাপার। উনি যদি 'হ্যাঁ' বলেন তো 'হ্যাঁ', 'না' বলেন তো 'না'।

'না, না। বড়জ্যাঠার কথা মাড়াব না। কিন্তু আপনে য্যান কোনো বাগড়া দিবেন না। কাহা, ঘটনার যা গতি, তাতে আমাগ কিন্তু এই সুবিদা আর একবার নাও আইসব্যারও পারে'।

'আরে, তার লগে লগে প্রাণেও বাঁইচব্যার লাইগব তো। মঞ্জু বইস্যা আছে, নীচে, ডাকব?'

মঞ্জু গলা নামাইয়া সাপের মন্ত্র পড়ে ক্যা? ডাকেন উপরে। একটা ইস্তাহার ঝাড়ুক আজই—গ্রামে।'

মঞ্জু মাস্টারকে রসিকলাল সিঁড়ির মাথা থেকেই ডাকেন। মঞ্জু হয়তো সিঁড়ির গোড়াতেই বসেছিল। ডাকের জবাব না দিয়ে দৌড়ে উঠে এল, 'যোগেন-না ডাকে তোমারে।'

মঞ্জুকে যোগেন জিজ্ঞাসা করে, 'আমারে শহিদ বানাইয়্যা তোমার কী সুবিধা হইল? হিন্দু মহাসভা, ভারত সেবাশ্রম, আর্যসমাজ, কারেও কি নড়াইব্যার পাইরল্যা গোয়ালাটুলি-শাঁখারিপাড়া থিক্যা?'

'এডা কি আর সরাসরি হয় দাদা? তবে শাঁখারি-পচ্চিমা ভাবটায় ছানা কাটছে পছন্দ হয়। গোয়ালাটুলির কথা এহনো ঠিক কওয়া যায় না—জায়গাও বড়, লোকও বেশি, মাতবরও অনেক। আর-এক মাতবরের মন না জাইন্যা এ মাতবর কোনো কইব না।'

'আমি কই কী খবরডা গরম থাইকতে-থাইকতে উশুল নেয়া কাম। একডা ছোড লিফলেট কয়েক হাজার ছাপাইয়্যা শহরে-গ্রামে বিলি কর। বড় জ্যাঠারে দেখাইয়া যা করার করব্যা। আর কাইলের মইধ্যে যদি শরীরে জুত দেয়, তালি কাইলকা বিকালে একডা জনসভা ডাইকব্যার পার, যেহানে সেদিনের মিটিংডা ডাকা হইছিল। বড়জ্যাঠা আর রসিকবাবুর আপত্ত থাইকলে সেই কাজ কইরো না। লেখো।'

মঞ্জু দৌড়ে গিয়ে একটা শাদা লম্বা কাগজ আর একটা পেন নিয়ে আসে। তৈরি হয়ে সে জিজ্ঞাসা করে, 'বন্ধুগণ দিয়্যা তো। হইয়া গেল তো লেখা, কন।'

যোগেন একটু ভাবছিল। তারপর বলে, 'না, এইডা বরং এডডু অন্যরকম কইর‍্যা লেখো যাতে ঢাকার যারা নামডাকওলা তাগ অনেকের নাম দেয়া যায়। ধরো—সাম্প্রদায়িক হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় ঢাকা শহরের সম্পর্কে নানারকম সত্যমিথ্যা ঘটনা দেশের সব মানুষই জানে। ইহা ঢাকাবাসিবৃন্দের পক্ষে খুবই লজ্জার কথা। দুই-চারদিনের মধ্যে এমন একটা ঘটনা ঘটিয়াছে যাহাতে আমাদের লজ্জা শতগুণ হইয়া উঠিয়াছে। সেনসাস সম্পর্কিত কিন্তু জাতি-বিষয়ক হাঙ্গামার সংবাদ পাইয়া আইনসভার দুই মাননীয় সদস্য শ্রীযুক্ত রসিকলাল বিশ্বাস বিএ, বিএল ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল সরেজমিনে দেখিবার জন্য ঢাকা আসিয়াছিলেন',

'তারিখডা দিয়া দিয়ো। তাহারা পরদিন সকাল হইতেই ঢাকার সর্বজনশ্রদ্ধেয় জননেতা ও আইন পরিষদের প্রাক্তন সদস্য ডাক্তার মোহিনীমোহন বিশ্বাসকে সঙ্গে লইয়া প্রথমে গোয়ালাটুলি সফর করেন। গোয়ালাটুলিতে তাঁহারা জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলের দ্বারা সংবর্ধিত হন ও পর পর তিনটি জনসভায় বক্তৃতা করেন। এই তৃতীয় জনসভাটি হয় খালপুলের নিকট ও তাহা একটি মহতী জনসভায় পরিণত হইতেছিল। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল যখন হিন্দু বর্ণভেদ প্রথার ফলে নিম্নবর্ণ হিন্দু জনসাধারণের দুরবস্থার কথা বলিতেছিলেন তখন এক ব্যক্তি তাঁহার মাথার উপরে একটি অখণ্ড ইট দ্বারা এমন আঘাত করে যে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথবাবু মহাশয় অজ্ঞান হইয়া ভূমিতল আশ্রয় করেন। পরে আততায়ীকে ধরা হয় ও জানা যায় সে পশ্চিমা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত, তাহাদের লম্বা-চৌড়া স্বাস্থ্য ও দীর্ঘদেহবিধায় উচ্চবর্ণহিন্দুগণ কর্তৃক দাঙ্গা কার্যে

রক্ষিত ও পোষিত হয়। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা না হইলে ইঁহারা রোজগার হইতে বঞ্চিত হইবেন। দাঙ্গা বাড়িলে ও ছড়াইয়া পড়িলে ইঁহাদের আয় বাড়িবে, অবস্থাও ভাল হইবে।

সেই কারণেই উচ্চবর্ণ হিন্দুগণ ইঁহাদের কাজে লাগাইতেছেন, যাহাতে তপশিল জাতিভুক্ত সকলেই নিজের ধর্মপরিচয়ে 'হিন্দু' বলে। তাহা হইলে হিন্দুর সংখ্যা বেশি দেখাইবে ও অন্য ধর্মীয়দের সংখ্যা কম দেখাইবে। সেই কারণেই হিন্দুদের নিজেদের মধ্যে এইপ্রকার দাঙ্গা, ও সেনসাসের কাছে ধর্মপরিচয়ে সবাইকেই হিন্দু বলিয়া লিখিবার দাবি জগৎসভায় আমাদের মাথা হেঁট করিয়া দিবে। উচ্চবর্ণ হিন্দুদের এইরূপ কৌশলের বলে ও নিম্নবর্ণের মানুষদের কেবল হিন্দু—পরিচয় রেকর্ডভুক্ত হইলে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাধিক্য গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করিতেছি, আপরাধীদের যথাআইন শাস্তি দাবি করিতেছি ও নানাপ্রকার সাম্প্রদায়িক সুবিধা আদায় করিবার অসদুদ্দেশ্যে দাঙ্গায় অংশগ্রহণকারী সম্প্রদায়গুলির সংখ্যাবৃদ্ধিতে আমরা আশঙ্কা বোধ করিতেছি।'

এই বিবৃতিতে সই জোগাড় করতে মঞ্জু মাস্টার তার দলবল নিয়ে ঢাকায় বেরিয়ে পড়ল। মোহিনীমোহন ও রসিকলালের সই থাকায়, চারুচন্দ্র দাস, যিনি নমশূদ্র না হলেও একবার কাউন্সিলে ডিপ্রেসড ক্লাসের প্রতিনিধি মনোনীত হয়েছিলেন, রেবতীমোহন সরকার, ইনিও প্রাক্তন মনোনীত কাউন্সিলার, ও আরো অনেকে সই করলেন। এতে লিফটেটটির মর্যাদা বেড়ে গেল।

মঞ্জু মাস্টার নারানগঞ্জেও এই লিফলেট পাঠিয়ে দিল, বিশেষ করে যে তিনটি থানায় মুসলমানরা নমশূদ্রদের বাড়ি থেকে উৎখাত করছে।

মোহিনীমোহনকে নিয়ে রসিকলাল আর যোগেন ঢাকা থেকে নারানগঞ্জে পৌঁছুলেন, যোগেনের মাথার ব্যান্ডেজ খোলার পর। যে-জায়গা ফেটে গিয়েছিল সেখানকার চুল কেটে দেয়া হয়েছিল। এখন, সেখানে তুলোর একটা ড্রেসিং যোগেনের কাল বাবরি চুলের মধ্যে অদ্ভুত লাগছিল। রসিকলাল বললেন, 'তুই একটা গান্ধীটুপি দিয়া মাথাখ্যান ঢাইক্যা নে।' যোগেনের খুব আপত্তি ছিল না, মোহিনীমোহনের বাড়িতে টুপিও পাওয়া গেল। সেটা পরে বেরবার আগে যোগেন আয়নায় নিজেকে দেখে, ওঁদের সঙ্গে লঞ্চঘাটায় পৌঁছুনোর জন্য গাড়িতে ওঠার সময় টুপিটা খুলে পকেটে রেখে দিল। ডাক্তার সময় দেখেই বেরিয়েছিলেন, খবরও পাঠানো ছিল। ওঁরা ওপরের ডেকে উঠে বসতে না-বসতেই লঞ্চ ছেড়ে দিল আর নদী থেকে হাওয়া এসে যেন সব তছনছ করে দিল।

মোহিনীমোহন যোগেনকে বললেন, 'তোমার যদি শুয়্যা থাইকলে আরাম হয়, শোও গা যাইয়া।'

এই কথার সঙ্গেই রসিকলালও তাকান যোগেনের দিকে আর বলে উঠলেন, 'ক্যা রে, তোর মাথার টুপি কি বাতাসে উইড়্যা গেল না কী?'

মোহিনীমোহনও তখন দেখে বলে ওঠেন, 'তাই তো, তুমি না টুপি পইরল্যা?'

যোগেন হেসে বলে, 'পকেটে রাখছি।'

ডাক্তার বলেন, 'পইর‍্যা থাকাই তো ভাল ছিল, খোঁচাখাঁচি না লাগে।'

যোগেন আরো হেসে বলে, 'পইর‍্যা একবার দেইখ্‌ল্যাম তো আয়নায়। ক্যামন পচ্চিমা বামুনের মত লাগে।'

'তাইলে এগডা নমাজি টুপি পরো খুঁইজ্যা পাই নাকি দেহি—' রসিকলাল চেয়ার ছাড়ার উদ্যোগ নিতেই মোহিনীমোহন তাঁকে হাত দিয়ে নিষেধ করে বলেন, 'ক্যাঁ? নামাজি টুপির বুঝি ধর্ম নাই?'

রসিকলাল চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বলেন, 'সেডা অবিশ্যি ঠিক। কিন্তু যোগেনের তো পরনে ধুতি। নামাজি টুপির মাহাত্ম্য তো তাতে ঢাকব।'

'তাইলে তো পুলিশের হ্যাট লাগে। সব মাহাত্ম্য দাঁড়াইব টুপির,' ডাক্তার বলেন।

একটু চুপ করে থেকে রসিকলাল বলেন, 'যোগেন, তোর অ্যাহন যে মতবাদ, তার আগে তো তোর এগডা টুপি ভাবব্যার লাগে, বাবা, ধর্, গান্ধীটুপি হিন্দুগ, নামাজিটুপি শ্যাখগ, তপশিল্ টুপি তো একডা লাগে। না?'

শীতলক্ষ্যার স্রোতের আওয়াজে ওদের হাসি চাপা পড়ে যায়। জলে এমন হয়। এক-একটা জায়গায় স্রোত হঠাৎ ফুঁসে ওঠে।

সেই জায়গাটা পেরিয়ে গেলে যোগেন বলে, 'কাকা, আমারে হ্যাই গল্পের সন্ন্যাসীঠাকুর বানায়েন না য্যান। একলেঙটির লাইগ্যা যারে সংসার পাতব্যার লাইগ্‌ল। আমার তো লেঙটিও নাই, কাকা। আমি কইব্যার চাই—আমারে হিন্দুও বানান না, শ্যাখও বানান না, আমি শুদ্দুর, আমারে শুদ্দুর থাইকব্যার দ্যান। তাও দিব না। কয় যে তুই হিন্দু না-হইলে তো আমার মেম্বার হওয়া হব না। ক, ক তুই হিন্দু। ল্যাখ, ল্যাখ তুই হিন্দু। লিখব কেডা? লিখব্যার জানে তো এক বামুন-কায়েত-বৈদ্য। আমি যাই কই, সে আমার নামের পাশে তো লিখবই হিন্দু।'

আগেই ঠিক করা ছিল ওঁরা নারানগঞ্জে এক রাতের বেশি থাকবেন না। লঞ্চঘাটে মঞ্জু মাস্টার থাকবে। তার সঙ্গে কোথায়-কোথায় যেতে হবে জেনে আগে সার্কেল ইনস্পেক্টরের সঙ্গে দেখা করতে যায় সরকারি খবরটা নিতে। সরকারি খবর যে ঠিক হয়, তা না। সেটাও তো হয় রাজনীতি অনুসারে। কিন্তু সরকারি হিশাবটা জানা না থাকলে সরাসরি লোকজনের কাছ থেকে এতরকম উলটো-পালটা খবর পাওয়া যায় যে, সত্যিকথার আন্দাজ মেলে না। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি তো এই কায়দাতেই হিন্দু খেপিয়ে বেড়াচ্ছে।

সার্কেল ইনস্পেক্টর রোগা মানুষ, সিরাজগঞ্জের ছেলে, এডোয়ার্ড কলেজ থেকে বিএ পাশ করেছে। তার বাড়িতেই যেতে হল। তার বাড়িতে একসঙ্গে এমন চারজন গণ্যমান্যকে বসতে দেয়ার জায়গাই নেই। যদি-বা ভিতর থেকে একটা টুল আনল, সেটাতে মঞ্জু বসতে পারল, সে দাঁড়িয়েই থাকল। টানাটানি করে ওই টুলের অর্ধেকটায় মঞ্জু ওকে বসতে বাধ্য করল। সে তার কথা আগেই শুরু করেছিল, 'আমি আপনাদের মত মানুষের কাছে কী কব? দাঙ্গা যদি শুরু হয়, তাইলে যাগ সংখ্যা কম তারাই মরে বেশি। রায়পুরায় মুসলমানগ সংখ্যা হিন্দুগর দশগুণ,' একটু চুপ করে থেকে বলল, 'না, দশগুণ না। আটগুণ। আর শিবপুরে সাড়ে পাঁচগুণ। তেমন জায়গায় যদি দাঙ্গা বাঁধে আমি খবর পাওয়ার আগেই তো সমস্ত দুষ্কর্ম হাসিল ও সাক্ষ্য লোপ। নারানগঞ্জ সদরে কোনো গোলমাল নেই। রায়পুরা আর শিবপুরায় এত মাতবর জুইটল কোয় থিক্যা যে শ-খানেক গ্রাম পুড়াইল, আড়াই হাজার বাড়ি পুড়াইল, সোয়া পনের হাজার মানুষ খুন কইরল?'

'এ সংখ্যাগুল্যা কি অফিসিয়্যাল?' ডাক্তার জিজ্ঞাসা করেন।

'ওহানে অফিস থাইকলে তো অফিসিয়্যাল হইব? একমাত্র অফিসার বড়হাটের ডাকনদার। আমারে নেতারা কইয়্যা গেলেন। আমি শুইনল্যাম।'

'নেতারা? কেডা? কইলকাতার?'

'নাঃ। অ্যাহনো অদ্দূর যায় নাই। সব লোক্যাল, মহাসভা আর কংগ্রেস মিল্যাইয়া মিশাইয়া।'

'আমরাও তো ওই সংখ্যাই পাইছি', ডাক্তার বলেন।

'তাই পাবেন। ওই সংখ্যাডায় হয়তো একমত হইছে'।

'আপনি কি যাব্যার পারছেন?'

'আমার তো গাড়ি নাই। যাওয়ার উপায় একমাত্র সাইকেল। রাস্তা এদ্দুর খারাপ যে মরার জইন্য দাঙ্গা লাগব না। গাড়ি চাইব্যার লাইগব এসডিও শাহেবের কাছে। তিনি কোনো জবাবি দ্যান নাই। আমি ওই নেতাগ কথা শুইন্যা এখানকার লিগের সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা কইর্যা কইল্যাম—আমারে তো ফাইল ঠিক রাখব্যার লাগব। আপনার হিশাবডা কন। তাতে উনি খেইপ্যা উইঠ্যা কইলেন, আপনে নিজে মুসলমান হইয়্যা যদি মুসলমানগ ক্ষতির হিশাব না রাখেন, তাইলে আপনার মুসলমান হইব্যার কামডা কী ছিল। ওই হিন্দুরা যা ফিগার দিছে, তার উপুর লাখ-হাজার যেহানে যা বাড়াইব্যার বাড়াইয়্যা মুসলমানগ ক্ষতি দেখান। তো আমি কইল্যাম, তাইলে তো জনসংখ্যার সঙ্গে মিলব না। উনি চিল্লায়া কলেন, তাইলে, মিল্যাইব্যার যদি না পারেন, অফিসার হওয়ার হাউস ক্যা? যাউক, আমার অনুরোধে আর আমি মুসলমান বইল্যাও হয়তো, উনি ওঁর লিগের একডা প্যাডের কাগজ দিলেন। আমি তাতে উনি যা কইছেন তাই লিখ্যা ওনাকে সই করতে দিল্যাম। উনি একবার তাকাইয়্যা দেখলেনও না কী লিখছি? কারে ডাইক্যা কলেন, অ্যাড়ডা সিল লাগাইয়্যা দে। লোকটা সিল দিয়্যা খামে পুর্যা দিল। আমি সেডা ফাইলে রাইখ্যা দিছি। নিজেও দেখি নাই।'

'আমরাও তো পার্টির লোক। আপনে এই সব কথা কতেছেন, আমরা যদি বাইরে গিয়্যা কয়্যা দি।'

'আমিও তো চাই, আপনারা কয়্যা দ্যান। তাইলে আমি সব থিক্যা নীচের তলার অফিসার হিশাবে অন্তত কব্যার পারি, যেরকম প্ল্যান কইর্যা এত বড় সব দাঙ্গার ঘটনা ঘটতেছে, সেডার ঝামেলা ঠেহানোর খ্যামোতা সরকারের নাই। মানে আমার নাই, কইলে তো কথাডার জোর কইম্যা যায়। তাই কইল্যাম—সরকারের নাই। মানে, আমারও নাই।'

'বাঃ। আপনের মত ভাইব্যা-চিন্তিয়া কথা বলে নাকী নারানগঞ্জের অফিসাররা', যোগেনের কথার লক্ষ বোঝা যায় না।

'এর পিছনে ভাবনা খোঁজনের তো কিছু নাই। ভাবনা একডাই। বাপের জম্মে অফিসার হইব ভাবি নাই। অ্যাহন কোটার জোরে যহন পাইছি তহন য্যান বুদ্ধির দোষে হারাইয়্যা না বসি। আমি ওই দুই থানার সব থিক্যা বড় দুই হাটে গিছিল্যাম একদিন-একদিন কইর্যা। কী কইর্যা গেলাম সেডা আর কই না। ফির্যার সময় কুনো হাঙ্গাম হয় নাই। ওরাই পৌছাইয়া দিছে।'

'তাইলে তো একমাত্র আপনারই ফার্স্ট হ্যান্ড নলেজ।'

'বাড়াইয়্যা ভাইববেন না। আমি আমার সার্ভিস-ফাইল যাতে ঠিক থাকে তার লগে গিছিল্যাম। গিয়্যা ওহানকার মুসলমান মাতবরের সঙ্গে দেখা করি। আমি মুসলমান বইল্যা ওনারা যথেষ্ট খাতিরজমা কইর্যা জাইনব্যার চাইলেন যে ঢাকার নবাব শাহেবরে নবাব কইর্যা আর হকশাহেবরে উজির কইর্যা পাকিস্তান কবুলের আইনে আর কী কী আছে। ওনারা কী কী আছে বইল্যা খবর পাইছেন জিগ্যালে জাইনল্যাম—বিলাত থিক্যা হুকুম আইসছে সাতদিনের লগে মুসলমানগ আজাদ দিয়া হইছে, হিন্দুগ পুড়াইলে মাইরলে উচ্ছেদ দিলে মুসলমানগ বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি করা চইলব না। তহন আমি জিগাইল্যাম—অ, সেই হুকুম মাইন্যাই রায়ট বান্ধাইছেন? উনারা বইললেন, হিস্যা না জাইন্যা দাঙ্গা বাধাব আমারে কি তেমন বুরবাক পাইছেন? এরপর আমার অনুরোধে ওনারা হিন্দুগ বড় মোড়ল দুইজনরে ডাইকলেন। তারপর আমার অনুরোধে দুইজন একডা কাগজে স্টেটমেন্ট দিলেন, কী কী ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে ও হয় নাই। দুই জায়গায়ই। তারপর অগ অনুরোধে আমি গরম-গরম মুরগির মাংস দিয়্যা ভাত খাইল্যাম। দুই জায়গায়ই। আমি শহরে

ফিরৎ আসার মিনিটখানেক আগে কইল্যাম—অ্যাহন আমি অফিসার হিশাবে আপনাগ জিগাই—আমি ফিরান যাওয়ার আগে এহানের সব দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও সেই নিয়্যা গুজব পুরাপুরি ষোলআনা বন্ধ হইব কি? নাকি আমারে ৩৬ ঘণ্টা পরে বন্দুকপুলিশ আর মিলিটারি নিয়্যা আইস্যা এহানে পিটানি-থানা (পিউনিটিভ পুলিশ) বসাইতে হইব? উনারা মক্কামুখ্যা হইয়া কশম কাইটছেন। তারপর থিক্যা একদিন বাদে একদিন লোকমুখে আমারে খবর দিছেন। সব স্টেটমেন্টেই অগ টিপসই। সবই আমি ফাইলে রাইখ্যা দিছি। এর মইধ্যে দুইডা আকস্মিক ঘটনা ঘইটতে পারে, যা আমার ফাইলের বাইরের ব্যাপার। যদি মন্ত্রীরা আইস্যা মিটিং করেন, বা, আপনাদের মত লিডাররা আইস্যা মিটিং করেন, তার দায়িত্ব আমার না। সেডা তো এস-ডি-ও শাহেবের এক্তিয়ারে। আপনাদের যদি আরো কিছু জিগ্যাবার থাকে, জিগ্যান।'

ঘটনা, রটনা ও গুজব

বছরে রোজদিন তো গুজব-ছড়ানোর মত রটনা-ঘটনা থাকে না। কেউ ঢাকা ঘুরে এলে সেই গল্প দুই-চার হাট ধরে চলে। আর, কলকাতা ঘুরে এলে অন্তত দশ-বার হাট। বছর কয়েক

১৫৭

হল—ভোটাভুটি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, নেতাগ আসা-যাওয়ায় একটু-আধটু খবরাখবর হচ্ছে। গান্ধী-জিন্নাও একটা খবর, বিশেষ করে, সিরাজগঞ্জে জিন্নাশাহেবের মিটিঙের পর।

যুদ্ধ তো কখনো কেউ দেখেই নি। যুদ্ধ যেন নতুন জলের ব্যাঙ। ডাক আর থামে না। যুদ্ধের সময় যে-কোনো ঘটনা ঘটতে পারে, কোনো ঘটনা না ঘটলেও ঘটেছে বা ঘটেনি বলে রটনা হতে পারে, কোনো ঘটনা বা রটনার সঙ্গে বাঁধা না-হলেও গুজব ছড়ানো হতে পারে। আমাদের দেশের মত আড়েবহরে এমন ঐরাবতের মত দেশ আর ভালুকের লোমের মত গিজগিজে মানুষ যদি স্বাধীনতা চেয়ে রাস্তায় নামে—সে-ও যুদ্ধের মতই ব্যাপার।

ঘটনা শোনার লোক তো সবাই। কিন্তু হাটপিছু দু-একজন লোক না-থাকলে কি চলে? তারা সব নতুন-নতুন খবর জানে। তারা সেটা বলতেও ভালবাসে।

যুদ্ধ যেন এই কথোয়ালদের একেবারে মাঘের শেষে বৃষ্টির মত। চারা গাঁড়ার আগেই ধান বেরয় যেন।

কিন্তু যুদ্ধ তখন সত্যি-সত্যিই এত জটিল ও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে যে টাউনের কিছু শিক্ষিত মানুষ, যারা পড়তে পারে, তারা ছাড়া কেউ বুঝতেই পারছে না, কী হচ্ছে।

১৯৪২-এর অক্টোবর-নভেম্বর মাস এমন ঘটনা ঘটানোর, এমন রটনা রটানোর ও এমন গুজব ছড়ানোর মাহেন্দ্রক্ষণ পড়েছিল। ইয়োরোপের সাম্রাজ্য দেশগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। আমেরিকা ও জাপানও সে-যুদ্ধে জুটেছে। ভারতের স্বাধীনতা প্রাদেশিক স্বাধীনতা পর্যন্ত পৌঁছেছে বলে ধরা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার একটা সরকার হবে না কী একটা সম্মিলনী হবে—এই নিয়ে, আর প্রতিরক্ষার কী হবে নিয়ে নেতাদের, পার্টিগুলোর, এক-এক প্রদেশের সংখ্যাপ্রধান লোকজনদের মতামত, ছুপাছুপি, সন্দেহ, চোরধরা এ-সব তো লেগে আছে সেই ৩৫-এর আইন পাশ থেকেই। দেশীয় রাজ্যগুলোরও একটা চাহিদা আছে। সুভাষচন্দ্র, শেষপর্যন্ত জাপানে পৌঁছে এক আজাদ হিন্দ্ সরকার ও এক আজাদ্ হিন্দ ফৌজ গঠন করেছেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর কংগ্রেস ও লিগ যুদ্ধে ব্রিটেনকে সমর্থন করেছে কিন্তু সে-সমর্থন শর্তমুক্ত নয়। ব্রিটেন যুদ্ধে

তখন হারছে। ভারত সেই যুদ্ধ চালনার প্রধান কেন্দ্র।

সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মদেশে জাপানিদের কাছে ব্রিটিশ সৈন্য গো-হারান হেরে গেছে। পুরো পুব-দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে জাপান তার দখল কায়েম করেছে। ১০০ দিনে ১০০ যুদ্ধ জিতেছে জাপান। বাংলায় দক্ষিণ-পুব এশিয়া থেকে উদ্বাস্তুরা আসতে শুরু করেছে। আজাদ হিন্দ ফৌজ কোহিমা-পর্যন্ত এসে আবার ফিরে গিয়ে, জাপানের রণকৌশল অনুযায়ী বাঁ দিকের একটা নতুন জঙ্গল ধরে আবার কোহিমার দিকেই এগচ্ছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে তাদের সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র আছেন। একেবারে সাধারণ সৈনিকদের মতই তিনি সেনাবাহিনীর সঙ্গে চলেছেন। তাঁর বক্তৃতা তখন প্রতিদিন প্রচারিত হচ্ছে। ভারতবাসীকে বলছেন, 'আমি সুভাষ বলছি। আমরা বাইরে থেকে মুখোমুখি যুদ্ধে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে হারিয়ে বার্মা রোড ও তার আশপাশের জঙ্গল ও পাহাড় দিয়ে ভারতের দিকে এগচ্ছি। ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি এখন ভারতের পক্ষে কয়েকদিনের বা বড়জোর দু-এক মাসের ব্যাপার যদি আমাদের, আজাদ হিন্দ ফৌজের, এই আক্রমণের সঙ্গে-সঙ্গে ভারতের মধ্যে ব্রিটিশবিরোধী বিদ্রোহ ঘটানো যায়। ভারতের স্থানগত ও মানবিক সাহায্য তার পক্ষে অপরিহার্য। তাই ঠিক এখনই তারা ক্রিপসকে ভারতে পাঠাল—যাতে ভবিষ্যৎ কোনো মতৈক্যের বিনিময়ে এখন সমর্থন পাওয়া যায়।'

ইতিমধ্যে যুদ্ধে পক্ষ বদল ঘটে গেছে। জার্মানি আক্রমণ করেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন আর জাপান আক্রমণ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। গুজব, ঘটনা, অঘটনা, রটনার এত উর্বর ক্ষেত্র ক্বচিৎ মেলে। এই দুই যুদ্ধ যদি মিলে যায়, তাহলে ব্রিটিশ শাসন থেকে আজাদি আমাদের মুঠোয় এসে যাবেই। 'সমস্ত দেশপ্রেমিক ভারতবাসী ব্রিটিশবিরোধী বিদ্রোহ গড়ে তুলুন।'

যুদ্ধের এমন পরিস্থিতিতে বাংলা ছেড়ে আরো পশ্চিমে পেছিয়ে যাওয়ার, পশ্চাদপসরণের সিদ্ধান্ত নেয়া হতে পারে, ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে। এখন পর্যন্ত যে-সব কাগজপত্র পাওয়া, গেছে তার মধ্যে ব্রিটিশ সামরিক কোনো দলিল নেই (২০১০)।

কিন্তু ব্রিটেনের যুদ্ধ-পরিচালনার পদ্ধতি, সংগঠন ও সিদ্ধান্ত-নেয়ার ক্ষমতা সম্পর্কে কোনো অনিশ্চয়তা ছিল না। ভোটে নির্বাচিত সরকারই একমাত্র সে-ক্ষমতার অধিকারী। যুদ্ধ যখন চলছে, তখন সমস্ত সামরিক সিদ্ধান্ত তো মন্ত্রিসভা ও পার্লামেন্টে প্রতিদিন আলোচনা করা যায় না ও হয় না। সেই কারণেই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীই পার্লামেন্ট ও মন্ত্রিসভার পক্ষে সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে খবর নেন ও তাঁদের খবর দেন। চার্চিলের সমস্ত কাগজপত্র এখনো (২০১০) তালিকা করে ওঠা যায়নি। এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে তাঁর কাগজপত্রে এমন কোনো দলিল আছে যাতে জানা যাবে বাংলা থেকে প্রয়োজনে পশ্চাদপসরণের সিদ্ধান্ত ভাবা হয়েছিল। যে-সব কাগজপত্র বেরিয়েছে ও বেরচ্ছে (২০১০) তাতে এমন একটা আন্দাজ তৈরি করা যায়। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর পূর্ব রণাঙ্গণের সেনাপতি তখন (১৯৪২) জানিয়ে দিয়েছিলেন যে 'স্থিরীকৃত কর্মসূচি সেই পর্যায়ে এসে গেছে যখন উপকূল থেকে ২০ মাইলের মধ্যে সমস্ত নৌকো নষ্ট করতে হবে।' এ দেশ থেকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের পাঠানো বার্তায় এই শব্দগুলি পাওয়া যাচ্ছে এপ্রিল মাস থেকেই—কলকাতা থেকে অপ্রয়োজনীয় লোক সরানো ('অ্যাকসিলারেটিং দি ইভ্যাকুয়েশন অব ইনএফেকটিভস ফ্রম ক্যালকাটা'), নট নড়নচড়ন নীতি ('স্টে পুট পলিসি'), সরকারি ব্যবস্থাদি একেবারে সম্ভাব্য শেষমুহূর্ত পর্যন্ত চালু রাখা, ('টু মেইনটেইন দি সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আনটিল দি লাস্ট পসিব্‌ল্ মোমেন্ট'), গভর্নর (বাংলা) সামরিক অভিযানে নাক গলাচ্ছেন ('...ডিজায়ার্ড টু ইনটারফেয়ার ইন অপারেশন্যাল ম্যাটার্স')।

আর-একটু এগিয়ে, এই ব্যবহৃত শব্দগুলিকে যদি কালানুক্রমিক সাজানো যায় তাহলে এমন

আভাসও পাওয়া যেতে পারে যে পূর্ব রণাঙ্গণে স্থলপথে ও আকাশপথে জাপান যতই এগচ্ছে, ততই ব্রিটিশ ভারতের সর্বোচ্চস্তরে মতান্তর ঘটছে, ভয় ঢুকছে ও রোজকার সরকারি কাজ শাহেবদের কাছ থেকে সরিয়ে বেসরকারি স্তরের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে।

ঘটনা ঘটানো, না-ঘটানো, রটনা আর গুজবের সর্বোত্তম উপলক্ষ ও সময় যুদ্ধ। যুদ্ধে অকল্পনীয় ঘটনাও তো অনবরত ঘটে। তাই ঘটনা ঘটানোর এমন স্বাধীনতা আর-কোনো সময় পাওয়া যায় না। জননেপথ্যে অভ্যাসে-অভ্যাসে শৃঙ্খলিত কিছু মানুষকে নরহত্যার নানা অস্ত্রের অঙ্গাঙ্গী করে তোলা হয়। সেই মানুষটিকে নিজের বাহক করে অস্ত্র যুদ্ধে ঢোকে।

শুধু রটিয়ে দিয়েই যুদ্ধে জেতা যায় ও হারা যায়। অশ্বত্থামার মারা যাওয়া এক গুজব—দ্রোণকে যুদ্ধ ছাড়াতে। শিখণ্ডীর হিজরেপনা এক গুজব—ভীষ্মকে যুদ্ধ ছাড়াতে।

গোয়েব্‌লস্ দ্বিতীয় যুদ্ধে গুজব-রটানোটাকে যুদ্ধের একটা আলাদা বাহিনীর সমতুল্য করে তোলে। তা সম্ভব হয়েছিল নতুন যন্ত্র, রেডিও ও রেডিওগ্রাম ব্যবহারের ফলে। আর জার্মান-সৈন্যদের যুদ্ধের স্টাইল সম্পর্কে চমক লাগানো খবর রটানো হচ্ছিল আরো নতুন এক যন্ত্র দিয়ে—মুভি ক্যামেরা। ব্লিৎসক্রিগ শব্দটা এত শুনিয়ে-চিনিয়ে দেয়া হল যে 'ব্লিৎসক্রিগ' শব্দটা শুনলেই একটা ছবি চলে আসত মনে। বোমারু বিমানের সারি আকাশপথে। তারা বোমা ফেলতে ফেলতে এগিয়ে যাচ্ছে। নীচে, গ্রাম-শহরকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে আর বোমাবর্ষণের ছবির পরই আসত স্বস্তিকা-আঁকা সৈন্যদের অস্ত্র কাঁধে দখল নিতে নিতে এগনো। মধ্য ইয়োরোপের সব দেশ জার্মানরা এসে-পড়ার আগেই তাদের সংবর্ধনা করছিল। এর আগে হলিউডে যেমন আফ্রিকানদের দেখাত, এইসব বিখ্যাত দেশগুলিকেও দেখাত তেমনই। নাৎসিদের কাছে ইয়োরোপের (বাদে গ্রেট ব্রিটেন) এই আত্মসমর্পণগুলো থেকেই ওয়াল্ট ডিজনির কমিক স্ট্রিপে নেংটি ইঁদুর ও কাবলি বিড়াল এসে গেল।

আরাকানের আকিয়াবে দাঙ্গা বেঁধে গিয়েছিল—বাঙালি মুসলমানদের সঙ্গে মগ ও আরাকানিদের। মগ ও আরাকানিরা বহুকাল ধরে বাঙালি মুসলমানদের ওপর অত্যাচার করে আসছে। ওখানকার স্থানীয় ডেপুটি কমিশনারকে তার নিজের লোকরাই, আরাকানি, খুন করে। বাঙালি মুসলমানরা তখন একজোট হয়ে তাদের ধাওয়া করে, খুনটুনও হয়, লুটপাটও হয়। ওদের কক্সেস বাজার পর্যন্ত ধাওয়া করে বাঙালি মুসলমানরা ফিরে আসে। তারপর মিলিটারির একটা দল যায় ব্রহ্ম-সীমান্ত পর্যন্ত। তারা যুদ্ধপলাতক ১৩ জন রাজপুত ও জাঠ ব্রিটিশ সৈন্যকে ধরে। পলাতকরা কোনো আপত্তি না করেই আত্মসমর্পণ করে। এদিকে কক্সেস বাজারের এসডিও গ্রেপ্তার করে ফেলে মাউঙ্গদাও থেকে আসা ১৩ জন মগকে।

এই দুই তেরতে মিলে গিয়ে চট্টগ্রামের সদরে যখন খবর পৌঁছল তখন কমিশনার আর কোনো ঝুঁকি না নিয়ে, সেনাকর্তাদের জানিয়ে দেন—উপকূল ও উপকূল-সংলগ্ন পাহাড়ে সশস্ত্র এই মগরা শত্রুপক্ষের আগাম চর হওয়ার আশঙ্কা আছে। মগদস্যুদের সমুদ্রপথ ও নদীপথ ব্যবহারের জ্ঞাত ইতিহাস অনুযায়ী এটা খুব সম্ভাব্য।

বিভাগীয় কমিশনারের বার্তা তো আর হাটে-বাজারে রটার কথা নয়। কিন্তু কক্সেস বাজার থেকে যা রটল আর মিলিটারিরা যা বার্তা থেকে পড়ল তার মধ্যে অদ্ভুত মিল। মগ জাতের লোকজনরা জাপানিদের পক্ষে যোগ দিয়েছে। বা, মগদের ভিতর থেকে জাপানিরা চর জোগাড় করছে। বা, সে-চররা ইতিমধ্যেই অনেক ভিতরে চলে এসেছে। জাপানিদের জানা নেই উপকূলের পেছনের দেশটা কেমন। কোথায় বড় নদী বা দিঘি আছে। ফরেস্ট বা বড়গাছের জটলা কত বড় ও কত ঘন।

একটা দেশের সঙ্গে আর-একটা দেশের যুদ্ধে—নানা মজা হতে পারে, ইয়োরোপে দেশগুলি তো ছোট-ছোট। লোকজনও কম। আর ওইটুকু সাইজে কত মজাই-বা ঘটতে পারে? সবই হয়তো হল—কিন্তু সবই স্যাম্পল।

ভারত সমুদ্রে পড়তে না পড়তেই যুদ্ধের মজা শুরু।

এই ১৯৪২-এ কলকাতায়, বাংলায়, যুদ্ধটা কেমন জমজমাট হয়ে উঠল শুধু যুদ্ধক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্যে?

সিঙ্গাপুর—ব্রিটিশরাই যে সমুদ্রের শাসক তার দুর্গ। জাপানিরা এল উত্তর দিক দিয়ে লাব্রাডর-উপকূলে। এটা ব্রিটেনের হিশেবের মধ্যে ছিল না। কিন্তু ব্রিটিশ বাহিনী তো প্রস্তুতই ছিল। ল্যাব্রাডর উপকূল না বলে বিচ বা সৈকত বলাই ভাল। বেশ ভাল বিচ। সেই বিচকে ঘিরে রেখেছে জঙ্গল। সেই জঙ্গলের জটলায় লুকিয়ে আছে পর্বতশ্রেণী—ঠিক হিমালয় গোত্রের নয়, মোটামুটি দাক্ষিণাত্যের ঘাট সাইজের। পাহাড়, টানা, জঙ্গল, টানা, সৈকত, টানা, সমুদ্র, টানা। তখন যে নতুন কামান চালু হয়েছিল সেগুলো ঘোরানো যেত। সেই জন্যই তো নাম হয়েছিল এম. জি বা মেশিন গান। ল্যাব্র্যাডরের পাহাড়গুলোর মাথায় সারি দিয়ে বসানো হল মেশিন গান। এখনো (২০১০) দুটো-চারটে আছে—পর্যটন ব্যবসায়ের কারণেই সযত্নে। কল্পনা করে নেয়া খুব সহজ, কল্পনার দরকারও নেই, চোখে প্রায় দেখাই যায় ছবি। এই শৈলশিরার ওপর লাইন বেঁধে আধুনিকতম মেশিন গান, যা একই জায়গায় স্থির থেকে ঘুরবে আর গুলি ছুঁড়বে, রোটেট অ্যান্ড ফায়ার। ওই শিরা থেকে তো দেখাই যাচ্ছে সৈকত ও সমুদ্র। ধরা যাক, সমুদ্র পথে জাপানিরা এল যুদ্ধজাহাজে। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নামল, যুদ্ধ করতে, সাবেকি পুরনো কায়দায়, মহাকাব্যের স্টাইলে। এত বড় সৈকত। দুইদিকে দুই দল দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবে। জাপানিরা তো জানে না, পাহাড়ে লুকিয়ে দাঁড়ানো 'রোটেট অ্যান্ড ফায়ার'। ব্যস। সিঙ্গাপুরের প্রতিরক্ষা দুর্ভেদ্য। ব্রিটেনের নৌদুর্গ। কিন্তু জাপানিরা যুদ্ধ প্রথা ভেঙে যুদ্ধজাহাজে এল না, এল ডিঙি নৌকোয়, এই সমুদ্র পেরিয়ে। কত ডিঙি ডুবেছে, কত সৈন্য মরেছে—এসব হিশেবনিকেশ নেই। যুদ্ধের আগে ছিল, পরে নেই। কারণ, নৌযুদ্ধের সমস্ত এপিককে কলঙ্কিত করে জাপানিরা এল দক্ষিণ-এশিয়ায় সামুদ্রিক গ্রামে-গ্রামে প্রচলিত ডিঙিতে। এই ডিঙিগুলো লোকজনের রোজকার কাজে লাগে—বাজার করতে, বাজার দিতে, খবর দিতে, খবর নিতে। বরিশালের মত—এক ডিঙা দশ পা। দশ পায়ের সমান-গতিতে। পাঁচ মানুষের সমান-জোরে। সেই ডিঙিতে একটা গোটা সৈন্যবাহিনী আসতে পারে? এল তো! হয়তো রাতে-রাতে এসে অনেক রাত ধরে উত্তরের ওই জঙ্গলে পাহাড়ে লুকিয়ে থাকত। আর, উত্তরের ওই পাহাড় তো কোনো হিশেবের মধ্যেই নেই। যখন হিশেবের মধ্যে আনতে হল ও 'রোটেট অ্যান্ড ফায়ার' এম-জি যখন ছুঁড়ল গুলি, তখন মালুম হল এম-জিগুলি ৬-ইঞ্চির বেশি রোটেট করে না। একটা অক্ষরেখার বাঁয়ে ৬ ইঞ্চি আর ডাইনে ছয় ইঞ্চি রোটেট করে ল্যাব্রাডরের শান্ত বিচে ব্রিটিশ গোলন্দাজবাহিনী শুধু সমুদ্রকে তাক করে গুলি ছুঁড়তে লাগল আর জাপানি বাহিনী উত্তরের শৈলশিরা ধরে, পুরনো কলকাতার বেরা ভাসানোর স্টাইলে শিস দিতে-দিতে, সং করতে-করতে, এসে, এমন বিশ্ববন্দিত গোলন্দাজ বাহিনীকে পেছন থেকে ঘিরে ফেলল।

১০০ দিনের চমৎকারী যুদ্ধে জাপান তো বার্মা সীমান্তে এসে গেল, তারপর একবার ফিরেও গেল। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়া থেকে যুদ্ধ-শরণার্থীরা বাংলায় আসতে শুরু করে দিয়েছে, কলকাতায় ট্রেঞ্চ কাটা চলছে, কলকাতা থেকে জেলখানা, চিড়িয়াখানা খুলে দেয়ার ও সরিয়ে নেয়ার কথাও উঠছে। সকলেই ধরে নিয়েছে, জাপানি আক্রমণের নিশানা কলকাতা ও বাংলা। ৮মে বিকেলে

ও ৯ মে সকালে চিটাগঙে বোমা পড়ল, সৌভাগ্যত, শহরের ৯ মাইল দূরে এয়ারপোর্টে। এয়ারপোর্টে তখন রাস্তা মেরামতির কাজ করছিল ৩০০-মত মজুর। বোমার সময় এরা এয়ারপোর্টে ছিল না। মৃতের আনুমানিক সংখ্যা ১০০ আর আহতের সংখ্যা ৭০ মত। এমন বোমা-আক্রমণের সময়ের পুরো ধাক্কা সামলাতে যে-ব্যবস্থা করা হয়েছিল, শাস্ত্র অনুযায়ী, সিভিক গার্ড, এ-আর-পি, স্থানীয় যুদ্ধ কমিটি—এসব কোনো কাজেই আসেনি। সকলেই চিটাগঙ ছেড়ে পালিয়েছে। যারা পালায়নি, তারা পারেনি বলেই পালায়নি।

বাংলা ছেড়ে লোক-পালানোর কথা এতই রটেছে যে জওহরলাল নেহরু কলকাতায় এসে বুঝতে চাইলেন, লোকজন কি ফ্যাসিস্তদের মেনে নিয়েছে? মুখে বললেন পার্টির কাজে। পার্টির কাজ তো থাকতেই পারে।

আসল কারণ ছিল—সারা ভারতের কোনো রাজ্য থেকে এক ফোঁটা সাহায্য আসেনি বাংলায়। এমন কী, জেলখানাগুলোও রাজি হয়নি কলকাতার বন্দীদের নিতে। এটা ভারতের যুদ্ধ নিশ্চয়ই। এ যুদ্ধে ভারতে কি এমন আক্রমণ ঘটত, যদি ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত না হত, বাংলা তো সেই ভারতেরই অংশ। কিন্তু জাপানি আক্রমণের ঠেলা সামলাতে হবে এক বাংলাকেই? ভারতের আর-কোনো প্রদেশে বোমা পড়বে না, আর কোনো প্রদেশে পঞ্চম বাহিনী ঢুকবে না, আর কোনো প্রদেশে একই সঙ্গে যুদ্ধ, মন্ত্রিসভা, ভারতরক্ষা আইন চালাতে হয় না, আর কোনো প্রদেশে পাট চাষ হয় না, আর কোনো প্রদেশ এমন অনিশ্চিত ভবিষ্যতে ওলোটপালোট নয়, আর কোনো প্রদেশে বর্ণহিন্দুদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি এতটা নয়। বাংলায় ভৌগোলিক কারণে ঘটছে ভারতের লড়াই। ভারত তাই সর্বার্থে বাংলাকে একঘরে করে দিয়েছে। কংগ্রেস নেতা জওহরলাল নেহরু এসেছিলেন, এই খবর পেয়ে যে বাঙালিরা এত হতাশ হয়ে পড়েছে যে তাদের পক্ষে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী যুদ্ধটুদ্ধে কিছু করা সম্ভবই নয়। জওহরলাল হয়তো বাঙালিকে জাগাতেই এসেছিলেন। কিন্তু ১৯৪২-এর জুনে পুব বাংলার গ্রামে-গ্রামে তখন কারো আর কোনো আয়ের উপায় নেই। নৌকো পোড়ানো হয়েছে—এক বাখরগঞ্জেই ১২০০০। ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ তৈরি হচ্ছে—ওই জুন মাসতক ১১১/৪ লক্ষ মণ চাল কিনে সরানো হয়ে গেছে। 'যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বাড়তি চাল' কেনার কন্ট্রাক্ট নিয়েও মন্ত্রিসভায় মারামারি, অর্ধ-শারীরিক অর্থে।

শ্যামাপ্রসাদের রণনীতি ও গান্ধীজির আখেরি লড়াই

এপ্রিলের শেষদিকে বাড়তি চাল কেনার ব্যবস্থার জন্য শাহেবরা ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠল।

চাল 'বাড়তি' কী না কী করে মাপা হবে? বাড়ির খাওয়ার চালটুকু রেখে বাকি চালকে

১৫৮

'বাড়তি' ধরা হবে। বাড়ির খাওয়ার মাপ হবে কী দিয়ে? বাড়ির লোক বলে চাষী যদি পাড়ার লোককে জুটিয়ে আনে, তবে, তাদের চিনবে কেমন করে কনট্রাকটারের লোক?

কিন্তু শত্রু যদি এসে পড়ে, তাহলে তাকে ফিরে যেতে বাধ্য করার প্রধানতম ব্যবস্থা হচ্ছে—যেখান দিয়ে শত্রুসৈন্যের আক্রমণ ঘটবে বলে আন্দাজ, সেই পথে বা জায়গায় শত্রুসৈন্য যেন এক দানা খাবারও না পায় ; একফোঁটা জলও না পায়। জল বিষিয়ে দিতে বিষের প্যাকেট এখনই গ্রামের একটু মুরুব্বি লোকের হাতে দিয়ে আসা হচ্ছে, চাল প্রকিওরমেন্টের সঙ্গে-সঙ্গে।

'বাড়তি' চাল মানে বাড়ির সব চাল। কবে শত্রু আসবে তার জন্য অপেক্ষার কাল জুড়ে 'বাড়ির লোকদের' খাওয়ার নামে চাল মজুত রাখা হবে না কী?

মন্ত্রীদের মধ্যে আবার এ-নিয়ে বোঝাবুঝির গোলমাল। এমন কী অর্থমন্ত্রী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ছোটলাট হার্বার্টের সঙ্গে দেখা করে বলেন, 'আপনাদের এই ডিনায়্যাল পলিসিতে গ্রামের মানুষের কষ্ট বেশি হচ্ছে। তার মধ্যে হিন্দুদের কষ্ট আরো বেশি। হিন্দুদের ব্রাহ্মণ ও বিধবাদের আতপ চাল খেতে হয়। যাদের ঘরে ইষ্টদেবতা আছেন, তাদের নিত্যভোগ দিতে হয়। এঁটোকাঁটার খুঁতখুঁত হিন্দু বামুন বাড়িতে এত বেশি ও এত কঠোর যে শুধু এঁটোর কারণে একজন বিধবা দশবার স্নান করে। এখন বামুনদের দেখাদেখি কায়েত-বৈদ্যদের মধ্যেও এঁটোকাঁটার কড়াকড়ি শুরু হয়েছে। তাতে দেশ গাঁয়ে সুনাম হয় আর বাড়ির পরিবেশেও গোবরের গন্ধের সঙ্গে আতপ চালের গন্ধ মিশে একটা উঁচু জাতের হাওয়া বয়। এই সব সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারে সরকারের হাত দেয়া উচিত নয়। আমার মনে হয় ডিনায়াল পলিসির চাইতে স্কচড আর্থ পলিসি অনেক ভাল হত। গ্রাম-ছাড়ার আগে পুড়িয়ে দিত।'

লাটশাহেব শ্যামাপ্রসাদকে কী করে বলবেন, দুটোরই অর্থ এক। 'স্কর্চড আর্থ' কথাটা শত্রুরা ব্যবহার করে, নিজেরা তো 'ডিনায়্যাল'ই বলে। বড়লাটকে তাঁদের গোপনতম পত্র বিনিময়ে ছোটলাট এটা জানান, যদি তাঁর কোনো পরামর্শ থাকে। সে-পরামর্শ এলেও কাজে লাগত না। বাংলা পত্র-পত্রিকা ভাল একটা বাংলা চালু করেছে, পোড়ামাটি নীতি। শ্যামাপ্রসাদ লাটশাহেবকে যুদ্ধ সম্পর্কে আরো কিছু-কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। ১. বাঙালি রেজিমেন্ট চাই। ২. বাঙালি ভদ্রলোকদের নিয়ে একটা ব্যাটালিয়ন চাই। 'ভদ্রলোক' মানে হিন্দুবাবুরা। এই ব্যাটালিয়নের যাবতীয় খরচ ভদ্রলোকরাই দেবেন। ৩. হিন্দুদের নিয়ে একটা 'ন্যাশনাল গার্ড' বাহিনী তৈরি করা হোক। শুধু হিন্দুদের জন্য বাহিনী গড়লে সেটা 'ন্যাশনাল' হবে কী করে, লাটশাহেব জানতে চাইলে শ্যামাপ্রসাদ ব্যাখ্যা দেন, 'ন্যাশন্যালটা বলতেই হবে এটা সরকারের ব্যাপার বোঝাতে। আর 'হিন্দু'টাও বলতে হবে মুসলমানদের বাইরে রাখতে। ৪. শ্যামাপ্রসাদ বলেন যে সরকার থেকে এখন গেরিলা যুদ্ধ চালু করা দরকার, অবিলম্বে। শ্যামাপ্রসাদ ছোটলাটকে যুদ্ধনীতি বাৎলেই থামেননি, তাঁর লেখা একটি প্রস্তাবই 'কাউন্সিল অব মিনিস্টার্স' থেকে একটা মেমোরান্ডাম হিশেবে পাঠিয়েছেন। সেখানে ন্যাশন্যাল আর্মির কথাটা আরো বিস্তারে বলা হয়েছে। সামরিক কর্তৃপক্ষকে রাজি হতে হবে যে এই 'ন্যাশনাল আর্মি' মিলিটারি দ্বারা চালিত হবে না, এটা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের অধীনে কাজ করবে। এই বাহিনী আইনশৃঙ্খলা বিভাগের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণেও থাকবে না। পরন্তু, চিন্তাভাবনার কোনো গোলমালে ভারত সরকার যে 'ডিনায়্যাল পলিসি' ঘোষণা করেছেন সেটা অবিলম্বে বদলানো দরকার। মিলিটারি 'পোড়ামাটি নীতি' চায়।

ডিন্যায়াল পলিসির সুবাদে চারটি উপকূলবর্তী জিলার সব চাল কিনে ফেলার কাজ দেয়া হয় ইস্পাহানিকে। সরবরাহ মন্ত্রীর সঙ্গে ছোটলাটের কথা হওয়ার পরই একটা কনট্রাক্ট দেয়া হয়। ভারত সরকার এই বাবদ দেড় কোটি টাকা আগাম দিচ্ছেন জানার পর হকশাহেব মন্ত্রিসভায় রাগে একেবারে ফেটে পড়েন, 'ও আমরা মরব খাইট্যা আর লাভের গুড় খাইব ইস্পাহানি? এত বড় অর্ডার—আমি কিছু জানল্যাম না, কেবিনেট কিছু জাইনল না, শুধু এক ডিপার্টমেন্টের কেরানির সইয়েই অর্ডার পাস? ক্যানসেল করো অর্ডার।' হকশাহেবের কথায় আর-সব মন্ত্রীরাও সায় দেয়ায় শেষপর্যন্ত লাটশাহেবের কাছে গেল মামলা। হকশাহেব বলতে শুরু করেছেন, গজনবিরে অর্ডার দ্যান। তারপর দেখা গেল প্রত্যেক মন্ত্রীরই একজন করে গজনবি আছেন। সেই গজনবিরা মন্ত্রিসভাকে টাকার বন্যায় ডুবিয়ে রাখল আর লাটশাহেব চারজিলার দুই জিলায়

রাখলেন ইস্পাহানিকেই, আর দুই জিলা ভাগ করে দিলেন চারজনের মধ্যে। ১৯৪২-এর মাঝামাঝি ছাড়া এ-ঘটনা ঘটতে পারত?

১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। হকসাহেবের মন্ত্রিসভা সবচেয়ে স্বীকৃত মন্ত্রিসভা। মন্ত্রিসভায় হকশাহেব, শ্যামাপ্রসাদ, ফরোয়ার্ড ব্লক আছে, সরকারি কংগ্রেসও একরকম করে আছে। বিরোধী পক্ষ শধু মুসলিম লিগ, বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান সে-মন্ত্রিসভাকে মেনে নিয়েছে। সেই মন্ত্রিসভার মন্ত্রীরা প্রকাশ্যে ঘুষ খেয়ে মিলিটারি অর্ডারের কনট্রাক্ট বিলি করতে লাগল। কোনো বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী প্রতিবাদও করল না? ফ্যাসিস্তবিরোধী যুদ্ধের ভিতর ঘুষ-খাওয়ার অগ্রাধিকার যে কে ঠিক করল? এমন কী গভর্নর সব জেনেবুঝেও কিছু করলেন না। ইচ্ছে করেই করলেন না। ভাইসরয়ও না। তাঁদের তখন একমাত্র দায় যুদ্ধের জন্য সিভিল সাপ্লাই লাইন চালু রাখা। যখন কোনো সরকার যুদ্ধে, নিশ্চিত পরাজয়ে ধ্বংস-হওয়া থেকে দু-চারদিন মাত্র দূরে, যখন শত্রু আক্রমণ করে নিজের শক্তিক্ষয় পর্যন্ত করছে না, তাদের কাছে তো কাজটা তখন লুটেপুটে খাওয়া। কিন্তু ভারতের প্রশাসনিক বা ব্যবসায়ী ইংরেজরা সেই চরম বিপদেও ঘুষ খায়নি। ঘুষ খেয়েছে বাঙালি কেরানি ও মন্ত্রী। শাহেবরা মাথা ঘামায়নি। সাপ্লাই লাইন যদি ঘুষ খেয়ে খোলা রাখে, খাক ঘুষ।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একমাত্র নেতা তখন শেষ লড়াইয়ের জন্য সারা দেশের মানুষের প্রস্তুতি অনুভব করে ফেলেছেন, সুভাষ বোস যেমন অনুভব করেছিলেন মাত্র বছর তিন আগে। কিন্তু সেবার যেমন কংগ্রেসের কোনো নেতাই সেই প্রস্তুতি অনুভব করেননি, এবারও কেউ করলেন না। অনুভবের এমন সময়-ভাগাভাগি হয়তো সম্ভবও নয়। ১৯৪২-এর এপ্রিল থেকে আগস্টের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত গান্ধীজি ব্যাখ্যা করে চলেছেন—তিনি এক বিশাল আন্দোলন করবেন বলে ভাবছেন। বলছেন—ইংরেজরা যে লজ্জাকর দণ্ডী কাটছে, তা দেখে বোঝা যায় ওরা কোনো দেশও নয়, জাতিও নয়। 'আমি ফ্যাসিস্ত ও নাৎসি ও মিত্রশক্তির ভিতরে কোনো পার্থক্য দেখছি না।' তারই সঙ্গে গান্ধীজি খোলাখুলি বলছেন, 'যার সঙ্গে দেখা হয়, সেই যেন বাঁচতে-বাঁচতে হাঁফাচ্ছে। সমস্ত দিকে অনাস্থা আর জালজোচ্চুরি। জীবন আর বাঁচার মত কোনো কাজ নয় যদি-না সর্বশক্তি দিয়ে রোখা যায়।' কী রোখার কথা উঠছে? জীবনে অবিশ্বাস ও পচনের মহামারী? কাদের? যারা যুদ্ধ করছে আর ভারতের। ভারতের কোনো যুদ্ধ নেই অথচ ভারতের ওই এক ১৯৩৫-এর মন্ত্রিসভাগুলো নাচছে নিজেদেরই শবদেহ ঘিরে। ব্রিটেনের শত্রু যাতে ভারতে ঢুকে একদিন বাঁচার মতও, আশ্রয়, প্রশ্রয় বা আহার, জলও, না পায়, সেজন্য নৌকো পোড়ানো, ঘর পোড়ানো, বাড়ির ধানচাল সরকারকে দিয়ে দেয়া। তাতে ক-জন জাপানিকে ঠেকানো যেত? নিশ্চয়ই পনের লক্ষ নয়। কিন্তু এই চাল কিনে নেয়া ও প্রক্রিয়োর করাটা ও সমুদ্রে ফেলে দেয়াটাই পৃথিবীর মানবশাস্ত্রের সবচেয়ে নৈতিক কাজ। আর এই চালের অভাবে এক বছরের কম সময়ের মধ্যে অন্তত দেড় কোটি বাঙালির না-খেয়ে মরে যাওয়াটা কোনো অনৈতিক কাজ নয়—কারণ ওই দেড় কোটির মরে যাওয়া, সত্য হলেও সে-মৃত্যুর কোনো হত্যাকারী নেই। যুদ্ধ, যুদ্ধই হচ্ছে সেই কুয়াশামোড়া দিগন্তের ঘের, যে-ঘেরের মধ্যে মৃত্যু ও হত্যা একমাত্র-বিধান। মৃত্যু আর হত্যা বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। বেঁচে থাকা, সবসময়ই একক। একা বেঁচে থাকতে কোনো যুক্তির দরকার নেই। চারদিকে খাড়া চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকতে হবে—কোথাও কি কোনো সুযোগে 'আমি'-ছাড়া আর-কেউ বেশি বেঁচে গেল কনট্রাক্ট পেয়ে, ঘুষ পেয়ে?

লিগের মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে যে-মন্ত্রিসভা হকশাহেব পেলেন, তার ১৫-১৬ মাসের

স্থায়িত্বের মধ্যে হকশাহেব ছোটলাট শাহেবের কাছে জানিয়ে দিচ্ছেন—তিনি প্রধানমন্ত্রীত্ব ছেড়ে দেবেন যদি ভাইসরয়ের একজিকিউটিভ কাউন্সিলে আকবর হায়দারির শূন্যপদে হকশাহেবকে নেয়া হয়। সেটা বেশি এগল না দেখে আবার জানান—হাসান সারওয়ারদি আপাতত লন্ডনে ফিরছেন না, কলকাতায় থাকছেন, তাহলে হকের জায়গায় তিনিই তো প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন আর হককে শাহেবরা জুটিয়ে দিতে পারেন তাঁর পক্ষে সম্মানজনক ও আর-একটু বেশি পয়সার একটি চাকরি।

সে-সব খবর জেনে ফেলে হকেরই মন্ত্রিসভার অন্য সব মেম্বার। তাদের কেউ-কেউ গোপনে দেখা করে নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে। নাজিমুদ্দিন জানিয়ে দেয়—সে প্রধানমন্ত্রী হতে রাজি আছে যদি হক তার মন্ত্রিসভায় না থাকে। সে-খবর ঠিকঠাক লাটশাহেব ও হকশাহেবের কাছে পৌঁছে যায়। হকশাহেব লাটশাহেবকে গোপনে জানান—তাঁকে যদি একটু বেশি মাইনে দিয়ে স্পিকার করা হয়, তিনি প্রধানমন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিতে রাজি আছেন। এটা হকশাহেবের টোপ লাটশাহেবকে। হকশাহেবের চাইতে আর কেউ কি এটা বেশি জানে যে তাঁকে কেউই চায় না—না লাটশাহেব না কোম্পানির শাহেবরা, না লিগ, না কোনো কংগ্রেস, না কোনো কৃষক প্রজা। কিন্তু হকশাহেব কি কারো চাইতে এটাও কম জানেন যে মেম্বারদের সমর্থনের যোগফল সব সময়ই তাঁর বেশি থাকছে। নাহলে খাজার জন্য এতটা সময় যে দিলেন লাটশাহেব সেও কি পারল তাকে আরো সময় দিতে? নাজিমুদ্দিন তো কিরণশঙ্করের সঙ্গেও কথা বলেছে, তাতেও তো এগল না। হকশাহেব তো ইয়োরোপিয়ান ব্লকের মেম্বারদের কথায় রাজি হয়ে গিয়েছিলেন যে ব্লক ন্যাশনাল গবর্নমেন্টের প্রস্তাব তুললে হকশাহেব সমর্থন করবেন। প্রস্তাব উঠল যথাসময়ে—ঠিক ওই সময় হকশাহেবকে খুঁজে পাওয়া গেল না। কেন? হকশাহেব তো তাঁর এই প্রগ্রেসিভ মন্ত্রিসভার ঠিক চার মাসের মাথায় লাহোর থেকে দিল্লি পৌঁছে ঘোষণা করেছিলেন, তিনি জাতীয় সরকার চান? আবার, হকশাহেব তো তার একমাস আগেই সিন্ধুপ্রদেশের প্রধানমন্ত্রী আল্লা বক্সের নেতৃত্বে দিল্লিতে আজাদ মুসলিম সম্মিলনে হাজির ছিলেন?

সে তো ছিলেনই। কিন্তু তাঁর সঙ্গে তো 'ন্যাশন্যাল গভর্নমেন্ট' নিয়ে শাহেবরা কোনো দরাদরিতেই নামল না। হকশাহেবকে নিয়ে বা অন্তত হকশাহেবের সম্মতি ছাড়া কোনো 'ন্যাশন্যাল গভর্নমেন্ট' তৈরি করা সম্ভব? তাহলে ইয়োরোপিয়ান ব্লকের লেজে যখন আগুন লেগেছে ও তাদের কলকাতা থেকে সরে যাওয়ার নোটিশ আসতে পারে যে-কোনোদিন, তখন ব্লক ন্যাশন্যাল গভর্নমেন্টের কথা তুলতেই হকশাহেব রাজি হবেন? এর মধ্যে তো হকশাহেবের পার্টি ছ-ছটা বাই ইলেকশনে হেরে বসে আছে। তারপর, গান্ধী যখন এআইসিসিকে ৪২-এর মে মাস থেকে 'ভারত ছাড়ো' বোঝাতে শুরু করেছেন ও রাজাগোপালাচারি ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছেন কংগ্রেস পাকিস্তানে রাজি হচ্ছে না বলে, তখনই কলকাতার টাউন হলে বাংলার সমস্ত শ্রদ্ধেয় ও দায়িত্বশীল হিন্দু-মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের সম্মিলনে হকশাহেব যোগ দিলেন ও তাঁর সমর্থন নিয়েই 'হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সমিতি' গঠিত হল, ২০ জুন, ওই ৪২-এই। এরপর সপ্তাহ দু-এক কাটতে-না-কাটতেই ওয়ার্ধায় বসল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির টানা ন-দিনের বৈঠক। গান্ধী প্রস্তাবিত দেশব্যাপী আন্দোলনের পক্ষে ওয়ার্কিং কমিটির একজন মেম্বারও ছিলেন না। একজনও না। কেউ চারদিক দেখে বলতে পারছিলেন না—এত বড় আন্দোলনের পক্ষে এটাই সবচেয়ে ভাল সময় কী না। তাঁরা নিজেরা কেউ বুঝতেই পারছিলেন না—যুদ্ধের এই বিশেষ সময়ে ব্রিটিশ-বিরোধী এত বড় আন্দোলন, নীতির দিক থেকে ক্ষতিকর কী না। কংগ্রেসে প্রাদেশিক নেতাদের কথা থেকে এই ভয়ও গোপনে ছড়িয়েছিল যে এই

আন্দোলনের ফলে মহাত্মার নেতৃত্ব ও কংগ্রেসের প্রাধান্য নষ্ট হবে।

একের পর এক সাংবাদিকরা এসে গান্ধীজিকে ছেঁকে ধরছেন। তাঁদের বিশ্বজোড়া নাম। তাঁদের অনেকের ব্যক্তিগত সংযোগ আছে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা ও আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে। তাঁদের নিজেদেরও রাজনৈতিক মত আছে। তাঁরা কেউ মনে করছেন, ফ্যাসিস্তদের জয় অনিবার্য করে তুলছেন গান্ধীজি। বার্মা থেকে উদ্বাস্তুরা আসছে যখন, তখন, কোথায় গান্ধীজি ফ্যাসিস্ত বিরোধী যুদ্ধের সৈন্য রিক্রুট করবেন, তা না, তিনি বলছেন—'ফ্যাসিস্ত, নাৎসি আর মিত্রশক্তির ভিতর আমি তো কোনো পার্থক্য করতে পারছি না।' ব্রিটেনের ইতিহাসে এর চাইতে বড় কোনো দুঃসময় অতীতে আসেনি। তখন, ভারতের ভারতীয়দের সমর্থন ব্রিটেনের পক্ষে দরকারই শুধু নয়, অপরিহার্য। জিন্না, সাভারকর, লিব্যারালস, সিকান্দার হায়াত, রাজাগোপালাচারিয়া ও সিপিআই, আরো কত আঞ্চলিক নেতারা প্রতিদিন বিবৃতি দিচ্ছেন—লিগের পাকিস্তান প্রস্তাবের পক্ষে-বিপক্ষে কিন্তু কংগ্রেসের শেষ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের পক্ষে অন্য কোনো পার্টি বা সামাজিক সংগঠন একটি অর্ধস্পষ্ট কথাও উচ্চারণ করেনি।

এমন বিপন্নতার মধ্যে যখন ব্রিটেন, তখনো ছোটলাটের অনুরোধে, পরে পরোক্ষত বড়লাটের অনুরোধেও শেষে হুমকি সত্ত্বেও, হকশাহেব, গান্ধী-পরিকল্পিত আন্দোলনের বিরুদ্ধে, বা রাজনৈতিক নেতা হিশেবে মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে, বা কংগ্রেসের আন্দোলনের বিরুদ্ধে কোনো বিবৃতি দেননি, যুদ্ধ সংক্রান্ত কোনো মিটিঙে একটিও শব্দ বলেননি ইংরেজের বিরুদ্ধে, ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর কাজ নির্বিঘ্ন করেছেন।

এটা ওঁর কোনো পরিকল্পনা থেকে করা নয়। হকশাহেব পরিকল্পনা ছকারই মানুষ আবার জনমানুষেরও নেতা। বাংলার রাজনীতিতে দল পাকানো, ঘোঁট পাকানো ও ছলচাতুরি, পদ্ধতি হিশেবে স্বীকৃত বরাবরই। তারা নানা কারণই থাকতে পারে। একটা কারণ কংগ্রেসে, বা রাজনীতিতেই, জমিদারদের প্রাধান্য, ও কলকাতার কায়েতদের প্রাধান্য। সম্পত্তি রাখতে ও বাড়াতে, কোম্পানি বানিয়ে অন্যদের ঠকানো, নিজেদের তৈরি নানা প্রতিষ্ঠানে যা নিজেদের দখল রাখতে যে-সমস্ত প্যাঁচপঁয়জার এঁদের পুরুষানুক্রমিকভাবে রপ্ত ছিল, রাজনীতিতেও এঁরা সেটাই ব্যবহার করতেন। বিড়ালের বিয়ে, বুলবুল পাখির লড়াই, ঘুড়ি কাটাকাটি, নিজের কবিদল পোষা, নিজের কাগজ পোষা, নিজের মেয়েমানুষ রাখা—প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির আগে এসব সামাজিক আচার-আচরণ একজন ক্ষমতাবানের চরিত্রের সঙ্গে মিশে যেত ও বাইরের সব লোকজনের সেই ক্ষমতাবান সম্পর্কে ধারণার প্রধান উপাদান হয়ে উঠত। ব্রাহ্মসমাজের দু-একজন নেতার মতামত ও কাজকর্ম স্বতন্ত্র ছিল আর তাদের সমাজ-সম্বন্ধীয় ধ্যানধারণাও আধুনিকতর ছিল বা হিন্দুদের মধ্যেও তো বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন—এমন একটা ধারণা-বিভ্রাট 'বাংলার জাগরণ'কে একটু হয়তো রঙিন করেছে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলিতে ও তাঁর কিছু উপন্যাসে কত-যে বিচিত্র লোকজন বাঙালি সমাজের টাইপ হয়ে আছে আর সেই টাইপগুলো একসঙ্গে মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত, বিলেতফেরত, বামুন, ব্যারিস্টার, পোস্টমাস্টার, ডেপুটি, হিন্দুনেতা, ব্রাহ্মনেতা, স্কুল মাস্টার, স্কুলপণ্ডিত, আত্মধিক্কার শেখা ও প্রেম-করা শেখা যুবক, ব্রাহ্ম সমাজকর্মী বাঙালির চালচিত্র হয়ে আছে। সেই মানবদলিলের সঙ্গে আমাদের ইতিহাস-রচনার শৃঙ্খলার বিরোধ না বেধেই পারে না। 'জাতীয়তাবাদী', 'ব্রাহ্মভাবাপন্ন', 'ভদ্রলোক', 'বিষয়ীলোক' এইসব ক্যাটিগরি দিয়ে বা 'শিক্ষিত', 'মুক্তমনা', 'ভূস্বামী' এইসব বিশেষণ দিয়েও সেই সমাজের হকশাহেব-মার্কা ব্যক্তিদের চিনে নেয়া যায় না। হকশাহেব তো মৌলবি ও গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। পাঁচ-সাত বার নামাজ বরিশালের যোগেন

পড়তেন না হয়তো কিন্তু দু-চারবার যে পড়তেন তা নিয়ে মজার গল্প ছড়ানো আছে। একবার তিনি বাংলার বাইরে কোথায় এক জনসভায় এমন কথাও বলেছিলেন যে বাংলার বাইরের মুসলমানদের ওপর অত্যাচার হলে বাংলার হিন্দুদের ওপর তিনি তার প্রতিশোধ নেবেন। তবু এখন ভাবলে যেন মনে হয়—মুসলমানির ওপর তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের নির্ভরতা ছিল, যেমন, তেমনি তাঁর আবেগ, চতুরতা, উপস্থিত বুদ্ধি, কথাখেলাপ, চকিত সাহস, বড়মানুষি, স্বার্থবুদ্ধি, বোকামো ও আত্মবিশ্বাসে বাঙালি মধ্যবিত্তের জমিদারি ব্যারিস্টারি টাইপটাকেই চেনা যায় বেশি। একবার যুদ্ধের মধ্যে সুভাষ বোসের ভাইপো দ্বিজেন বোসের কী একটা কাজে বাড়িতে উপস্থিতি দরকার। দ্বিজেন বোস জেলে আছেন নিরাপত্তা-বন্দী হিশেবে। হকশাহেব তাঁকে গোপনে চারদিনের ছুটি দিলেন জেল থেকে বাড়িতে যেতে। হকশাহেবের মন্ত্রিসভার লোকজনই লাটশাহেবকে জানিয়ে দিলেন। ছোট লাট তাঁকে চেপে ধরলে তিনি বললেন, 'না। কখনোই না।' তাঁর প্রতিপক্ষের লোকজন মূল অর্ডার বের করে এনে যখন দেখায় তখন হকশাহেব তাকিয়েও দেখেন না।

কিন্তু লাটশাহেব একটু বেশিই চটেছিলেন। বললেন, 'এও সম্ভব? তাও যুদ্ধের সময়? ডিফেন্স অব ইন্ডিয়ার আসামির জেল থেকে চারদিনের ছুটি? আমার মুশকিল কী জানেন? আমি সারা দুনিয়ায় কাউকে বিশ্বাস করাতে পারব না যে এটা সত্যি-সত্যি ঘটেছে। দিল্লিতেও না। লন্ডনেও না।'

চোখ বন্ধ করে হকশাহেব বলেন, 'সেডা হইব্যারও পারে। এহন তো সব জোয়ান বয়সেই লাটবেলাট হচ্ছে। বুড়া বলতে তো এক চার্চিল। তাও আমার জুনিয়ার। তাছাড়া চার্চিলের তো এক্সপিরিয়েন্স নাই ইন্ডিয়ার। আমি আপনারে কই। চেনাজানা ফ্যামিলি। ছেলেডারে আটকাইছে ক্যান কে জানে। ওর ফ্যামিলি থিক্যা একেবারে মোস্ট প্রাইভেটলি আমারে কইল, ওর য্যান কী-একটা কাজ, আটকা পইড়্যা আছে। চারটা দিনের জন্য যদি খালাশ দেয়া যায় তাইলে ও সব কাজ শেষ কইর‍্যা অন ফিফথ ডে উইল রিপোর্ট টু দি জেইলার। এত ঘনিষ্ঠ একডা ফ্যামিলিরে এইটুক সাহায্য যদি কইরতে না-পারি তাইলে আমার প্রধানমন্ত্রী থাকার কামডা কী? রোজ-রোজ ওই খাজার গুঁতা খাওয়ার লগে? দিল্যাম ছাওয়ালডারে ছুটি—ফির‍্যাও গিছে ছ্যামরা। অ্যাহন এই নিয়্যা লাগালাগির কারণডা কী?'

ছোটলাট বললেন, 'আপনি তো বললেন আপনি এমন অর্ডার দেননি—'

'দ্যাহেন, ইয়োর এক্সেলেন্সি, আমারে দিনে নরম্যালি কতগুলা অর্ডার সই কইরব্যার লাগে? অ্যাহন তো যুদ্ধের টাইম। অ্যাবনরম্যাল। আপনাগ পলিসি হচ্ছে টু লুক নরম্যাল। তাই যত সইসাবুদ আমারে দিয়্যা করান। আমি মনে রাইখব ক্যামনে যে কোন ছ্যামরারে কয়দিনের ছুটি দিছি?'

'অসুবিধেটা হচ্ছে দোজ ইন সার্ভিস তারা এটা জেনে গেলে আমাদের তো সাবোতাজও করতে পারে।'

'স্যার, একটা গল্প শুনেন। আমার বাপজানের কাছে শোনা। আমার আব্বা খুব নামকরা উকিল ছিলেন। গবর্মেন্ট প্লিডার। সত্য ঘটনা। আপনে তো জানেন আমাগ এই বড়-বড় নেটিভ স্টেটে তাদের কারো-কারো নিজেগ সুপ্রিম কোর্ট আছে। মাঝামাঝি যারা তারাও চেষ্টা করে। কিন্তু পাইর‍্যা ওঠে না। আবার, বড়গর মইধ্যেও কেউ-কেউ এসব আইন-আদালতের হাঙ্গামায় যাইব্যার চায় না। ওইসব দেশীয় রাজ্যের সুপ্রিম কোর্টের জাস্টিসরা অনেক সময় ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার জুডিসিয়ারিতে আসে। ফ্যামিলি রিজনস থাকে। মেয়েগ বিয়া আর ছাওয়ালগ চাকরির ব্যাপার থাকে। এহানে তাগ বড়জোর ডেপুটি থিক্যা শুরু কইরব্যার লাগে। তেমনি এক মুন্সেফ-কোর্টে

বাপজান এক কেসে গিয়্যা দ্যাখে, তার মক্কেলের আসামি হইছেন, এমন-একটা এক্স-জাস্টিস অব সাচ অ্যান্ড সাচ স্টেট। কোর্ট তারে এডড্ রাইগ্যাই জিগ্যাস কইরছে, 'আপনে জুডিসিয়ারির লোক হইয়া কী কইর‍্যা এডড়া জামিন না-পাওয়া আসামিকে আপনার বাড়িতে পাঠাইতে কন কাজের লোক কইর‍্যা।' তহন সেই এক্স-জাস্টিস আসামি হাত জোড় কইর‍্যা কয়, স্যার, বুঝি নাই, আমি যহন স্টেটে ছিল্যাম তহন তো চাষের সময় এক গাদা কয়েদিরে ছাইড়্যা দিতাম, আমার গ্রামের জোতের চাষ কইরব্যার লগে। ধান তুইল্যা তারা আবার জেলে ফিরত। বুঝি নাই, স্যার। আমি তো লোকডারে জেল-কাস্টডি থিক্যা আমার বাড়ির কাজ কইরব্যার কইছি। এডা যে অপরাধ, বুঝি নাই, স্যার।'

ভোলা থেকে দুধু মিয়ার হাতচিঠি নিয়ে লোক এসেছিল যোগেনের কাছে। কাউকে দিয়ে লিখিয়েছেন। সেই বাঁধা-চিঠিনবিশের গুণে চিঠি পড়ে উদ্ধার কঠিন যে ঘটনাটা কী। 'বহুদিন আপনার সংবাদাদি কিছু পাই নাই' দিয়ে শুরু আর 'অধিক কী লিখিব' দিয়ে শেষ। যোগেনকে এককালে এমন কত চিঠি লিখতে হয়েছে। একটা পোস্টকার্ড এনে বাপ-বয়েসি কেউ বলতেন, 'একটা চিঠি লিখ্যা দে বড়জামাইরে।' ঐ শেষের খবরটিই সবচেয়ে দরকরি—কাকে লেখা হচ্ছে। দুই পিঠে ভর্তি করে লিখে যোগেন আবার 'পু' দিয়ে পুনশ্চও লিখত। যাঁর চিঠি তিনি একটিও কথা বলতেন না।

পেশাদারি অভিজ্ঞতায় যোগেনের সন্দেহ হয়েছিল—প্রোকিওরমেন্ট নিয়ে কিছু গোলমাল হয়েছে হয়তো—'অত্র নতুন বিপদ ধান-চাল-অপহরণ। ঐ সব বেচাই যাহাদের ব্যাবসা তারা এখন কী বেচে?'

বাটাজোড় থেকে প্রমথ দাশগুপ্তের একটি চিঠি পেয়ে, ডাকে, যোগেন নিশ্চিত হয় যে প্রোকিওরমেন্ট করা হচ্ছে পরিবারের খাদ্য অতিরিক্ত সব ফলন। প্রোকিওরমেন্টের সঙ্গে পোড়ামাটি নীতি জুড়ে দিয়ে স্থানীয় সরকার হয়তো এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছে। নদীতীর বা উপকূল থেকে তিরিশ মাইল ভিতরে যাওয়াটা বরিশালের লোকের বুঝতে একটুও অসুবিধে হয়নি—বড় বান, সাইক্লোন, ঘূর্ণির খবর পেলে তো তারা নিজেরাই পাড় ছেড়ে ভিতরে যায়। কিন্তু সেটা তো সরতে হয় যেমন প্রাণে-বাঁচতে তেমনি প্রাণের পক্ষে অপরিহার্য চাল-ডালও বাঁচাতে। কিন্তু দাশগুপ্ত মশায়ের চিঠি পড়ে সন্দেহ হয়—প্রোকিয়োরমেন্টকেও পোড়ামাটিরই অংশ ধরে নেয়া হয়েছে। বরিশালে তো খাদ্য শস্যের পাইকারি একটা মধ্যবিত্ত ব্যবসায়। সারা বছরের খরচের ব্যাপার। কিন্তু দাশগুপ্ত মশায় স্পষ্ট করেই লিখেছেন যে সরকার পক্ষের কথাবার্তা এ-রকম যে আপনারা যখন বেচতেনই, সরকারের কাছে বেচেন। 'মনে হয়, কল্পনার সহিত বাস্তব ঘটনার মিল নাই।'

যোগেন খুঁজে পায় না কার কাছে গেলে সে কী ঘটছে, তার একটা আন্দাজ পাবে।

এটুকু বুঝতে পারে, অ্যাসেম্বলির বাইরে যে-দেশ সেখানে কী ঘটছে আর কী ঘটছে না—তা নিয়ে কারো কোনো মাথাব্যথা তো নেইই, এমনকি কিছু-কিছু সহানুভূতি ও দুশ্চিন্তা তো দেখাতেও হয়—কারো মারা যাওয়ার খবর পেয়ে তার বাড়িতে তো কেউ দুর্গা পূজার বোধনের ঢাক পিটিয়ে যায় না, সেটুকু আক্কেলও নেই।

যারা খবরের কাগজ পড়ে তাদের তো না জেনে উপায় নেই যে কলকাতার শিয়রে শমন, জাপানের যুদ্ধ-পরিকল্পনায় এখন একমাত্র লক্ষ হতে পারে ফল অব ক্যালক্যাটা। জাপান তো সমুদ্র দিয়েও আসতে পারে। যোগেন শিউরে ওঠে ভাবতে যে সমুদ্র দিয়ে একটা পুরো

জাপানি-বাহিনী বরিশাল, নোয়াখালি, চট্টগ্রামে এসে গেলে বা বার্মা থেকে আরাকান দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে নেমে যুদ্ধজাহাজে কলকাতা রওনা দিলে, তাদের কে ঠেকাবে, কোথায় ঠেকাবে, কী দিয়ে ঠেকাবে। কলকাতা হাইকোর্টে এক জজশাহেব সরকার-বাদী এক মামলার রায় দিতে গিয়ে বলেছেন—'শাহেবদের কাছ থেকে আমরা বিজয়ীর গলায় মালা দিতে শিখেছি। সেই শিক্ষাই এখন কাজ লাগানো হচ্ছে—এ-যুদ্ধে জিতছে কারা তা স্থির করতে।'

যোগেন স্থির জানে না—সে কি ইংরেজ বা মিত্রশক্তির জয় চায়, সে কি জাপানের জয় চায়, সে কি ভারতের স্বাধীনতা চায়।

প্রত্যেকটিই তার চাওয়ার কারণ আছে। নীহারেন্দু-বঙ্কিমের কাছে সে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে পাঠ নিয়েছে। ওঁরা, নীহারেন্দু-বঙ্কিমবাবুরা সোভিয়েতের জয়ের জন্য যেমন উদ্বেগে থাকেন, যেমন চরম কিছু করতে চান, তার তাপে, যোগেন যে কখন থেকে সোভিয়েতের জয় চাইছে, তা নিজেই টের পায়নি। তাহলে তো ইংল্যান্ডেরও জয় চাওয়া হয়।

যোগেন ভেবে দেখে, স্বাধীনতা বা স্বরাজ কখনোই তার কাছে প্রধান বিষয় হয়ে ওঠেনি। তার কাছে প্রধান বিষয় স্বাধীনতা উচ্চবর্ণের দাসত্ব থেকে। এই শূদ্র-স্বাধীনতা ছাড়া কোনো স্বাধীনতাই তার কাছে বড় ছিল না। একদিন তো বঙ্কিমবাবু তাকে অনেকক্ষণ ধরে বোঝাতে পেরেছিলেন—বৌবাজারের ট্রেড ইউনিয়ন অফিসে। বেলা একটা থেকে নামল আকাশভাঙা বৃষ্টি। নামল তো নামল—একইরকম বেগে ঝরতে লাগল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ফলে, কেউ কোথাও যেতে পারছে না। টি-ইউ অফিসেও নতুন কেউ এল না। বাড়ি ফেরাটা বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে কোনো দুশ্চিন্তার বিষয় নয়। যোগেনের তো নয়ই। জল তো জল। যদি বালি হত, কাদা হত, তাহলেও, যোগেনকে রাস্তা দিতে রাস্তা তো বাধ্য। বঙ্কিমবাবুর তো কথা বলতেই আনন্দ আর যোগেনের প্রশ্নে তো বটেই। এমন শোনে ক-জন। এমন জিজ্ঞাসাই-বা থাকে ক-জনের?

বঙ্কিমবাবু বলেন, 'আপনাদের রাজনীতি নিয়ে এই একটা গোলমাল কিন্তু আছে। হিন্দু জাতের উঁচুনিচুর লড়াই। যে-রাজনীতিতে হিন্দু নেই, বামুন নেই, ছোট জাত নেই, সে-রাজনীতিতে আপনারা কোনো টান পান না। পাবেনই-বা কেন? কে পায়? আমাদের ইউনিয়নের একটা সম্মিলন হল পার্বতীপুরে। প্ল্যাটফর্মে লাইন করে সবাই খেতে বসেছে। সারাদিন ধরে রেলগুদামে সবাই গাদাগাদি করে কথা বলেছে—যুদ্ধটা জিততে হবেই, সোভিয়েত ইউনিয়নকে বাঁচাতে, শ্রমিকদের বাঁচাতে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এখন ভেক নিয়ে বিড়াল সেজে একাদশী করছে। ও একাদশী আমরা চিনি। ঐ বিড়ালের ভেক থেকে এমন কথা যেন না-বেরয় যে মজুররা চটের থলি সাপ্লাই দেয়নি বলে বালির বস্তা সাজিয়ে যুদ্ধ করা যায়নি। বা, লসকররা যুদ্ধজাহাজে নতুন করে তেল ঢালতে দু-দিন দেরি করেছে বলে টাইম মত কার্তুজ পৌঁছায়নি। এটা বোঝা মজুরদের পক্ষে বেশ কঠিন। যদি-বা তারা শ্রমিক শ্রেণীটাকে ধরতে পেরে থাকে কিছুটা, এই সিধে অঙ্কে, যে-আদায় সব লেবারের জন্য নয়, সে-আদায় একামজুরের জন্যও নয় ; কিন্তু সারা জীবন শুনল-জানল মালিক দুশমন, শাহেব দুশমন, এখন তাকে জানতে-মানতে হবে—তার মালিকের দুশমন-যে, এই শাহেবের দুশমন যে সে আমারও দুশমন। জানেন, যোগেনবাবু, মজুর যে তার শ্রমের কত রকমের তুলনা তৈরি করতে পারে—ভাবা যায় না। কিন্তু একটা অঙ্ক তো তার 'পার্মেন্টি' হতে হবে। সব অঙ্কই 'কেজুল' হলে অঙ্ক দাঁড়াবে না। গ্রেট ব্রিটেন আমার শত্রু। জার্মানি ব্রিটেনের শত্রু। তাহলে গ্রেট ব্রিটেনের শত্রু তো আমার বন্ধুই হয়। এটা তো কমনসেন্সের হিশেব। এর কোনো কাটান নেই। নানা মিটিং-টিটিঙের মধ্য দিয়ে একটা গল্প বেরল। কী গল্প? না, আমি একটা অধবা-বিধবা। আমার শ্বশুরও নেই, দেওরও নেই। আমার গ্রামের এক জোতদার

আমার চাষের জমিটা দখল করল। দখলদারকে মেনে নেয়া ছাড়া আমি করবটা কী? দখলদারকে বেদখল করতে আমি তো রোজ গুড়জল খাচ্ছি আবার বছরে দু-তিনবার গিয়ে ভাগও নিয়ে আসছি। এখন, যদি ঐ জোতদারের বাড়িতে ডাকাত পড়ে এক রাতে, তাহলে কি আমি ডাকাত তাড়াতে যাব—না-হলে ডাকাতরা আমার জমির খাড়া ফসলে আমার ভাগও কেটে নিয়ে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে। অন্তত সেই রাতটা তো জোতদারের সঙ্গে আমার ভাগের লড়াই মুলতুবি রেখে ডাকাত তাড়াতে হবে। মনে হয়, এই গল্পটা মজুরদের কমনসেন্সে ধরবে।'

'হ্যাঁ—আ। আমার চেনাজানা বন্ধুর শত্তুর তো আমারও শত্তুর, এটা একটা সোজা অঙ্ক—'

'অঙ্ক তো সোজা। হলটা কী দেখেন। কনফারেন্সের পর পার্বতীপুরের লম্বা প্ল্যাটফর্মে লাইন বেঁধে সব খেতে বসেছি। খিচুড়ি, কী একটা ভাজা আর কাঁচালঙ্কা-পেঁয়াজ। বিরাট লাইন—চা-বাগান, রেল সব শ্রমিক আছে তো, নেপালি, মদেশিয়া, রাজবংশীও কিছু, রাজবংশী ওয়ার্কার তো কম, হো, মুণ্ডা, সাঁওতাল। এত রকমের মানুষ লালঝাণ্ডার নীচে? বুকটা কেমন করে ওঠে। উত্তেজনায় একটু বেশি খেয়ে ফেলি। আমি তো লম্বা লোক, খেতে-খেতে বাঁয়ে-ডাইনে-সামনে অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি। নাম ধরে ডাকছি একে তাকে। এত উৎসাহের ফলেই, সবার মাথার ওপর দিয়ে তাকাতে-তাকাতে ডাকাডাকি করতে-করতে হঠাৎ যেন মনে হয়—ওয়ার্কাররা একসঙ্গে কনফারেন্স করল, একসঙ্গে থাকল, একসঙ্গে খাচ্ছে সবই ঠিক, কয়েক ঘণ্টা ধরে তর্ক-আলোচনার পর, একই যুদ্ধ 'না এক পাই—না এক ভাই' থেকে 'জনযুদ্ধ' ও 'জাপানকে রুখতে হবে'র যুদ্ধে বদলে গেল, সেটার প্রক্রিয়াটা বোঝার জন্য শ্রমিকশ্রেণী নিজের শ্রেণীগত তুলনা খুঁজতে পারছে, আর, এখন সবাই বসে একসঙ্গে খাওয়ার সময় কেমন জাতপাত মেনে আলাদা-আলাদা বসেছে, রাজবংশী হিন্দুরা রাজবংশী মুসলমানের ছোঁয়া বাঁচিয়ে, নেপালি শ্রমিকদের ক্ষত্রিয়-শূদ্র ভাগ আছে, মুণ্ডারা হো থেকে আলাদা। চোখে দেখে ফেলার পর নিজেকে ঠাট্টা করলাম, দুনিয়ার মজুর এক হও, খাওয়ার সময় ছোঁয়া বাঁচাও। কিন্তু তাড়াতাড়ি ভুলে যেতে চাইলাম দেখাটা। নইলে তো নিজেই বিপদে পড়ব। আমার মনে হয় আপনি সেই বিপদে পড়ে গেছেন। এ-যুদ্ধে তো বর্ণভেদ নেই, বামুন নেই, শুদ্দুরও নেই, তাই এ-যুদ্ধটাতে নিজেকে জুড়তে পারছেন না। অথচ আপনার মত শিক্ষিত মানুষ রোজ দেশী-বিদেশী এক ডজন খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিন পড়ে-পড়ে আপনি তো না-জেনেও পারেন না—এ যুদ্ধে না-জিতলে কী সর্বনাশ হতে যাচ্ছে। জিতলেও দুনিয়াটা আর আগের মত থাকবে না।'

'হয়তো আপনার কথাটা ঠিক। আমি তো একডা ভোটে জেতা এমএলএ। এত বিপদের যুদ্ধে আমারে কী কইরতে লাগব, সেডা তো আমারে কেউ জানাবে। গভর্নর আর সরকার এমন ভাব করছে যেন কিছুই হয়নি। য্যান ইংরাজরা শখ কইর‍্যা হংকং, সিঙ্গাপুর, মালয়, বার্মা, জাপানিগ ঐ জায়গাগুল্যা প্রেজেন্টেশন দিয়্যা আইসছে। ইচ্ছাপূর্বক আত্মসমর্পণ। এখানে তো সবই এক আছে—রেস্টুর‍্যান্ট-হোটেল খোলা, খদ্দের বাড়ছে—গোরা সৈন্যরা আছে। আইনসভাও বসছে। মন্ত্রীরাও আছে। লাটশাহেবের ট্যুরও আছে। শুধু আলোর ওপর ঠোঙা আর এ-আর-পির প্যারাড।'

'মানে, আপনি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা গভর্নরের কাছ থেকে জানতে পারছেন না—কলকাতায় কী যুদ্ধ কোথায় হচ্ছে। গভর্নমেন্ট কী চায়—সেটা ঝেড়ে কাশছে না কেন।'

'ঝেইড়্যা কাশা বা না-ঝেইড়্যা কাশা না। দ্যাশ থিক্যা দুইডা চিঠি পাইছি। একডা ভোলা থিক্যা আর-একটা আমাগ থানার একজন মান্যগণ্য মানষের। মনে হয় য্যান সেহানে বিপদ-আপদ

হচ্ছে। আমি যাব তো। যাওয়ার আগে তো এডডু জাইনতে হব।'

'মানে আপনি যুদ্ধ-পলিটিকসে যোগ দিতে চান? তপশিল পলিটিক্স ছেড়ে? আপনার অন্য কলিগরা রাজি হবেন তো?'

'আপনাগ নাগাল পার্টির লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা-কাজকম্মের এই একডা বিপদ। একডা ঘোর জঙ্গলে একডা মেয়ে যদি 'পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ' জিগ্যায়, আপনারা পালটা জিগ্যাবেন, তা দিয়্যা তোমার কী প্রয়োজন? আরে, আমার আইসছে দেশ থিক্যা চিঠি। য্যান, একডা কিছু বিপদের ঘটনা ঘটছে। বিপদ বলতে তো অ্যাদ্দিন ছিল হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। অ্যাহন তো সেডাও নাই। কোথায় কী ঘটে, কে কী আইন দ্যায়, কে কী করে, কিছুই তো কেউ ট্যার পায় না। কিন্তু কইলকাতায় তো মনে হয়, লোকের ফুর্তি য্যান ব্ল্যাক-আউটে আরো বাইড়ব্যার ধরছে আর বাতাসে য্যান টাকার গন্ধ। আমি একডা নিশানা না নিয়্যা দ্যাশে যাই ক্যামনে? আর, আপনে জিগ্যাব্যার ধইরছেন, আপনার নিশানা আমাগ অন্য নেতারা মানব কী না। আপনারা যদি সিডিউলগ দুঃখ-বঞ্চনা বুইঝতেন, গান্ধীজিও যদি বুঝতেন, তাইলে কি যোগেন মণ্ডলরে সিডিউল-সিডিউল কইর‍্যা চেঁচাবার লাগে?'

বঙ্কিম মুখার্জি দরাজ গলায় হেসে ওঠেন। তারপর বলেন, 'শুনুন। একমাত্র আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব বশত একটি গোপন খবর আপনাকে দিচ্ছি যদিও পার্টি-শৃঙ্খলায় বাধছে। কিন্তু পার্টি শৃঙ্খলা তো আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে। সেই স্বার্থেই আপনাকে জানাচ্ছি। বার্মায় আমাদের পার্টি খুব শক্তিশালী—'

'আপনাদের পার্টি, মানে কংগ্রেস?'

'এটা প্রশ্ন করার কোনো মানে হয়? আমাদের পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি অব ইনডিয়া, কংগ্রেস তো আমাদের বের করে দিয়েছে।'

'বাইর কইর‍্যা না-হয় দিছে, আপনারা কি পাকাপাকি বাইরিয়্যা আইসছেন? আপনারা তো অ্যাহনো কংগ্রেসের এমএলএ। বুঝছি, কন। একডা আপনাগ অ্যাসেম্বলি পার্টি। আর-একডা কনফিডেনশিয়াল পার্টি। ক—ন।'

'বার্মাতে আমাদের পার্টি খুব স্ট্রং। মাসবেস ভাল। মিলিটারির মধ্যেও আছে। ফরেস্ট ওয়ার্কারদের ইউনিয়ন না কী একচেটিয়া। উইমেন্স মুভমেন্টও খুব স্ট্রং।'

'আপনাগ পার্টি যদি স্ট্রং হয় তাইলে যুদ্ধে এমন গো-হারান হারল ক্যা?'

'স্ট্রং বলেছি। তার মানে কি পাওয়ারে আছি? পাওয়ারে আছে তো ব্রিটিশরাই। বার্মিজ ইভ্যাকুদের মধ্যে আমাদের বার্মা পার্টির কিছু নেতা আছেন, সাধারণ মেম্বারও আছেন অনেকে। এই নেতাদের সঙ্গে আমাদের একটা মিটিং ছিল। তাতে এই নেতারা বার্মার পতনের আসল কারণগুলি বলেন। সিঙ্গাপুর ফলের সঙ্গে-সঙ্গেই নাকী ব্রিটিশ ক্যাবিনেট বার্মা-ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে ও প্রথমে দফায়-দফায় ব্রিটিশ আর্মিকে রিট্রিট করায়। তারপর নন-ব্রিটিশ আর্মি। জাপান বার্মাতে যখন ঢোকে তখন সাউথ বার্মাতে মিলিটারি বলতে কিছু সিভিক গার্ড। এমন কী আর্মড পুলিশও না। থানা-পোস্টাপিসও তুলে নিয়েছে। যা হোক, আমাদের পার্টি বলছে—সিঙ্গাপুরের সামনের সমুদ্রে ব্রিটেনের প্রধানতম যুদ্ধজাহাজকে জাপানিরা ডুবিয়ে দেয়ার পর ব্রিটেনের প্রায় কোনো যুদ্ধজাহাজই ছিল না। সেই কারণে ওয়ার-ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত নেয়—জাপানকে সমুদ্রযুদ্ধ ও জঙ্গল যুদ্ধের সুযোগ দেয়া হবে না। গ্রেট ব্রিটেনের বল-ভরসা ছিল রয়াল এয়ারফোর্স আর ভারতীয় ইনফ্যানট্রি। ওয়ার-ক্যাবিনেট নির্দেশ দেয়—কুকুরী যেমন শ্রাবণ-ভাদ্রে কুকুরকে নিজের পেছনে আসতে বাধ্য করে, সেইভাবে জাপানী সৈন্যদের গাঙ্গেয়

সমতলে নামাও। এটাও মিলিটারি অপারেশন কিন্তু মিলিটারির ভাষায় এটাকে বলা হয় রিকনোয়সাঁস। আমাদের পার্টি নেতারা বলেছেন, বার্মায় ব্রিটেন বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তাঁরা এও বলেছেন, 'কালকাতাসহ পূর্বভারতকে আমরা রেঙ্গুন করতে দেব না।' তাঁরা বেশ কিছু দলিলও দেখিয়েছেন। আমি পার্টি-শৃঙ্খলা আরো ভাঙব না। শেষ কথাটা এই যে ডরম্যান-স্মিথ নামে এক শাহেব, খুবই উচ্চপদস্থ, সিবিল সার্ভিসের বা মিলিটারির, তিনি বার্মাপতনে ক্ষিপ্ত হয়ে যান। বার্মার সেনাবাহিনীতে আমাদের লোকদের তিনি জানান, বেসামরিক ও সামরিক ব্যবস্থার এতটা বিচ্ছিন্নতা ইচ্ছাকৃত বলে সন্দেহ হতে পারে। যুদ্ধের একটা কৌশল এমন করে ব্যবহার করা হল—যেন লেজ গুটিয়ে শেয়াল পালানো। এই ডরম্যান-স্মিথকে ঠান্ডা করতে তাঁকে কলকাতাকে কেন্দ্র করে বেসামরিক-সামরিক সংযোগের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আপনি এর পাত্তা লাগিয়ে এর সঙ্গে দেখা করুন।'

হকশাহেবের স্টাইল যুদ্ধে ও শান্তিতে

১৫৯

এ কথা কারো জানতে বাকি ছিল না যে শাহেবরা হকশাহেবকে সহ্য করতেই পারে না। না রাইটার্সের শাহেবরা, না ক্লাইভ স্ট্রিটের শাহেবরা। তার কারণ নানা রকম ভাবা যায়। কিন্তু শাহেবরা যে হকশাহেবের বাতাস পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না তেমন অপছন্দের কোনো কারণ থাকতে পারে না। সতিনকে যেমন সহ্য করতে পারে না আর-এক সতিন, শাহেবদের ছিল তেমনি। তারা নিজেদের মধ্যে হকশাহেবকে বলত, 'লিজার্ড'। শাহেবরা, সব রকম শাহেবরা, পছন্দ করত খাজাকে, সারওয়ারদিকে, চিফ হুইপ সাহাবুদ্দিকে। এরা ক্লাব করতে পারে, ইঙ্গিত বুঝতে পারে, কোনো সময় ভোলে না যে শাহেবরা রাজার জাত। হকশাহেব যে টাকা খান না, তা না। তাঁর যে অসামাজিকতা নেই, তাও নয়। কিন্তু কখনো আন্দাজ দেবেন না। তাঁর নিজের স্বার্থ ছাড়া এক পাও যাবেন না। কথা যখন বাংলায় বলেন, তখন বরিশাইল্যা আর যখন ইংরেজিতে বলেন, তখন আই-সি-এস সেক্রেটারিরাও অবাক না হয়ে পারেন না। শাহেবদের পক্ষে হকশাহেব ডিফিকাল্ট। অথচ তাঁর কড়ে আঙুল মাপের কোনো দ্বিতীয় জননেতা নেই বাংলায়। হকশাহেবের স্টাইলটাই হকশাহেব। কোনো-কোনো আই.সি.এস বা লাটশাহেবকে এতটা মেজাজি মানা যায়। যেমন লর্ড কার্জনের গল্প শোনা যায়। তাই বলে হকশাহেব? সম্পূর্ণ বেআইনি কাজ করেন এমন অবহেলায় যেন সরকারটা তাঁর সেরেস্তা। সমস্ত দিক থেকে আইনমাফিক প্রস্তাব ঝাঁকিয়ে ফেলে দেন। হকশাহেব যেন নিজেকে ইচ্ছে করে দুষ্পাচ্য ও সুপাচ্য করতে পারেন। এদিকে তো হাউসের মেজরিটি কী করে রাখবেন, সেই চিন্তায় কাঁটা হয়ে থাকেন। এতটাই অপছন্দ একটা লোককে ভোট দিয়ে তো টিঁকিয়ে রাখল ইয়োরোপিয়ান ব্লক। কেন, সেটা আগে থেকে বোঝেন হকশাহেব।

হকশাহেব ১৯৪১-এর ডিসেম্বরের ১৭ তারিখে, শপথ গ্রহণের দিন ছয় পরে আইনসভায় নতুন মন্ত্রীদের নিয়ে বসলেন। একটা হাততালিও বাজল। হকশাহেব স্পিকারের অনুমতি নিয়ে হাউসকে জানালেন, 'দি কিং ইজ ডেড, লং লিভ দি কিং। আমি ও আমার পূর্বতন মন্ত্রিসভার সদস্যরা মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলাম। তার ফলে, লিগমন্ত্রিসভা আর বেঁচে নেই। নতুন

প্রোগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স পার্টির মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে। আমাদের যে মহাযুদ্ধের সংকটের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে, বিশেষ করে সেই কারণেই এখন প্রয়োজন জাতির সমস্ত রকম রাজনৈতিক মত ও সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করে এমন সব পার্টিকে নিয়েই সরকার তৈরি করা। সেই ঔচিত্যবোধ থেকেই আমরা এই 'প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি' গঠন করেছি। এই পার্টিতে আছে কৃষকপ্রজা পার্টি, হিন্দু মহাসভা, ফরোয়ার্ড ব্লক—যাদের বাংলার কংগ্রেস বলেই সবাই জানে, প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি, তপশিলি। আমি কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের জন্যও দরজা খোলা রেখেছি ও আশা করছি জাতির এই সংকটে তাঁদের শুভবুদ্ধি উদয় হবে। আমি মন্ত্রীদের আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। আমি মৌলবি এ.কে. ফজলুল হক, প্রধানমন্ত্রী, প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি ও মুসলিম কোয়ালিশন পার্টির নেতা। প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশনের বাকি মন্ত্রীরা হচ্ছেন খাজা নবাব হবিবুল্লা বাহাদুর—কৃষি ও শিল্প, খানবাহাদুর আবদুল করিম—শিক্ষা ও অস্থায়ীভাবে বাণিজ্য ও শ্রমিক, খান বাহাদুর হাশেম আলি খান—সমবায় ও গ্রামীণ ঋণ, কৃষক-প্রজা পার্টির সামসুদ্দিন আমেদ—যোগাযোগ ও সরকারি কাজ, হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং কমিটির সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—অর্থ, ফরোয়ার্ড ব্লকের সন্তোষকুমার বসু—জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন, প্রমথনাথ ব্যানার্জি—রাজস্ব, বিচার-ব্যবস্থা ও আইনসভা, তপশিলি—উপেন্দ্রনাথ বর্মণ—ফরেস্ট ও আবগারি।' ফজলুল হককে থামিয়ে দিয়ে হঠাৎ বিরোধী কংগ্রেস থেকে নলিনাক্ষ সান্যাল দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, 'মিস্টার স্পিকার, আজ আমাদের এক মহা পবিত্র দিন। শাস্ত্রে দশ-অবতারের কথা পড়েছি। নিজেদের চর্মচক্ষুতে দশ-অবতার দর্শন হল। কেশব ধৃত হকশাহেব রূপং জয় জগদীশ হরে। কত মন্ত্রিসভা আসে যায়, হকশাহেবের তাতে কী আসে যায়?'

ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা, বা প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার ১৬ মাস খুব শান্তিতে কাটছিল বাংলায়। যুদ্ধ বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছে—বাংলার পূর্বোত্তরে। ইংরেজরা সিঙ্গাপুর-বার্মা থেকে পালিয়ে কুলুতে পারছে না। ছোটলাটশাহেব শুধুই যুদ্ধ সামলাচ্ছেন—যুদ্ধের উনকোটি কাজ। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন আইন স্থগিত হলেও প্রাদেশিক সরকারের একটা কাকতাড়ুয়া খাড়া আছে দুনিয়াকে দেখাতে যে বাংলা রণাঙ্গনে ভারতের বাঙালিরাই ব্রিটিশদের পক্ষে কেমন লড়ছে। আইনসভার দলগুলির বিশেষ কাজ না-থাকায় একটা বেশ উদাস-উদাস হাওয়া বইছিল। টিকে থাকার জন্য সরকার ইয়োরোপিয়ান ব্লকের ২৫ জনের ভোটের ওপর নির্ভরশীল ছিল না। হকশাহেবের লিগ-অবতারের মন্ত্রিসভার সে নির্ভরতা ছিল এতই, যে হকের সেই প্রথম মন্ত্রিসভাকে বলা হত 'ছোটলাট হার্বার্ট-এর লিগ'—মন্ত্রিসভা। ইয়োরোপিয়ান ব্লকের ২৫ জন ছাড়াও আরো জনা ২৫ ছিল—যারা কেউ-কেউ কখনো-সখনো সরকারকে সমর্থন করত, কেউ-কেউ কখনো-সখনো বিরোধীপক্ষকে সমর্থন করত। আর আদি কংগ্রেসের বা ওয়াকিং কমিটির অ্যাডহক—কংগ্রেসের ছিল ২৫ জন, তাদের ঘোষিত নীতি ছিল দায়িত্ববান সমর্থনের। তাছাড়াও, তাদের আর-কোনো রাজনৈতিক উৎসাহও ছিল না। ওয়ার্কিং কমিটি কোনো ব্যাপারেই বাংলার আড্হক কংগ্রেসকেও কোনো স্বাধীনতা দিতে রাজি ছিল না।

এই প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা মানুষজনের সমর্থনও পেয়েছিল। এতজন বর্ণহিন্দু থাকায় হিন্দুদের ভয় একটু কমেছিল আর মুসলিম মন্ত্রীদের মধ্যেও অনেকেই ছিলেন বাঙালি মুসলমান ও সমাজে শ্রদ্ধেয়। এই সব কারণে, মন্ত্রিসভা আছে কী নেই—এই নিয়ে উদ্বেগ-উত্তেজনা, হাউসে কে বিরোধী পক্ষে চলে গেল তা নিয়ে খোঁজখবর, নাজিমুদ্দিনের প্রধানমন্ত্রীশোভন কাজকর্ম ও কথাবার্তা, সারওয়ারদিকে নিয়ে নানা গুজব—এইসব রোজকার

অশান্তি ছিল না। ছিল না বলেই এই মন্ত্রিসভাকে ব্যঙ্গ করে মুসলিম লিগ 'শ্যামাহক মন্ত্রিসভা' বললেও ও হকশাহেবকে খাটো করতে 'শ্যামাপ্রসাদই সরকার চালাচ্ছেন', লিগের এই রটনা সত্ত্বেও, এই মন্ত্রিসভা বেশ শান্তিতে ১৫-১৬ মাস কাজ করেছে। তাতে গভর্নর হার্বার্ট-এর সঙ্গে বিবাদে যেতে হয়েছে ও হকশাহেব সেসব বিবাদে বেশিরভাগ সময়ই নিজের রাজনৈতিক ক্ষমতা দেখাতে পেরেছেন। তার ওপর—মুসলিম রাজনীতির একটা জট জটই থাকল বটে কিন্তু তা থেকে তখনো আরো জট তৈরি হয়নি—জিন্না চাইছিলেন বাংলায় দাঁড়াবার জায়গা আর হকশাহেব চাইছিলেন ভারতের রাজনীতিতে দাঁড়াবার জায়গা। তফাৎ ছিল একটা। জিন্নার কাছে রাজনীতিটা টাকা-পয়সা আয়ের উপায় ছিল না। হক-শাহেবের ছিল। কোথাও কিছু ঘটছে না বলে, আলস্যবশত যা কিছু ঘটছে, তা সবই হয় আন্তর্জাতিক নয় আন্তর্জাতীয়। সেখানে বাংলার রাজনীতির কিছু করার ছিল না। এক কমিউনিস্টরা মনে করত যুদ্ধের একটা ফ্রন্ট বাংলাও। তাই মাঝেমধ্যে ছোটখাটো মিছিল করত, পোস্টারও দিত। 'জাপানকে রুখতে হবে', 'পাটের দর বাঁধতে হবে', 'রাজবন্দীদের মুক্তি চাই।' জওহরলাল ছিলেন ভারতে স্বনিযুক্ত কম্যান্ডার—অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ত কম্যান্ডের। কংগ্রেস আর লিগ আলাদা-আলাদা করে, কিন্তু ফলত এক হয়ে, তাদের যুদ্ধসমর্থন শর্তহীন না শর্তাধীন এই একটা বাঁকানো শিকে খোলা তন্দুরের ওপর গেঁথে লিনলিথগ সরকারকে আগুনে ঝলসাচ্ছিল।

হকশাহেবকে কেউই বিশ্বাস করত না, আবার কেউই তাঁর কথা ফেলতে পারত না। সেলস ট্যাক্স বিল সিলেক্ট কমিটি হয়ে আইনসভায় আসার পর সেটা পাস করে দেয়া ছাড়া আইনসভার তো আর-কিছু করার ছিল না। হঠাৎ সরকার পক্ষের কিছু মেম্বার সই করে এক দরখাস্ত দিলেন স্পিকারের কাছে। দরখাস্তের বক্তব্য—সেলস ট্যাক্সের বাবদ নতুন আইনে যে-টাকা আসবে তা প্রদেশের উন্নতিতে খাটাতে হবে, এই শর্ত যদি না মানা হয় তবে তাঁরা দলের হুইপ অনুযায়ী ভোট দেবেন না। মন্ত্রিসভায় এই দরখাস্ত নিয়ে কথা বলার সময় হকশাহেব বললেন, ঠিক আছে, আমি ওদের সঙ্গে কথা বলি, ওরা তাহলে আর আপত্তি করবে না।

যারা সব কাজেরই রহস্যভেদ করতে চায় বা কোনো কাজকেই গোপন-উদ্দেশ্যমুক্ত ভাবতে পারে না, তারা ঠিক খুঁজে-খুঁজে বের করল যে হকশাহেবই ওদের বলেছেন স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে। এ নিয়ে গোলমাল বেঁধে যাবে। তখন তিনি বললে ওরা দরখাস্ত উইড্র করবে। এই গোলমালের ফাঁকে হকশাহেব তাঁর এক আত্মীয়কে রেজিস্ট্রার অব কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ পদে নিয়োগ করে ফেলবেন।

আইনসভায় একেবারে প্রায় প্রথম প্রস্তাব উঠল মুলতুবি প্রস্তাব, শরৎ বোসের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে। বিরোধী পক্ষের নেতা নাজিমুদ্দিন বলে উঠলেন, 'শরৎ বোস জাপানের গুপ্তচর। দেশদ্রোহী। তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য সরকারকে অভিনন্দন।'

যোগেনই একমাত্র বিধিসংক্রান্ত আপত্তি জানাল, 'এই আইনসভার একজন সদস্যকে, যিনি ছিলেন বিরোধী পক্ষের নেতা, দিন দশেক আগেও ও গভর্নর সাহেব নতুন মন্ত্রিসভা গঠনে অকারণ দেরি না করলে যাকে হয়তো বর্তমান সরকারের উপ-প্রধানমন্ত্রী হিশেবে আমরা দেখতাম—তাকে কি দেশদ্রোহী ও গুপ্তচর বলা যায়? বললে কি সেই অনুপস্থিত সদস্যের অধিকার ভঙ্গ হয় না।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিশেবে তাঁরই জবাব দেয়ার কথা। সেই জবাব শুনেই স্পিকার এই বিধিসংক্রান্ত আপত্তি মেনে নেবেন বা অগ্রাহ্য করবেন। স্পিকার ডাকলেনও—সরকার পক্ষের কোনো মত আছে?

বঙ্কিম মুখার্জি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'অভূতপূর্ব রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলায় আইনসভার সদস্য হয়েও আমি জানি না, আমার দল সরকারে আছে না বিরোধী পক্ষে আছে। এই বিশৃঙ্খলার সুযোগও নেয়া যায়। এটা নিশ্চয়ই এ-সরকারের অধিকারের মধ্যে পড়ে না যে কোনো রাজনৈতিক বা ট্রেড ইউনিয়ন নেতাকে কোনো কারণ না দেখিয়ে তাঁর স্বাভাবিক বাসস্থান বা কাজের জায়গা থেকে বের করে দেয়া হবে ও তাঁর পুনর্প্রবেশ নিষিদ্ধ হবে। মাত্র কিছুদিন আগে সাতজন শ্রমিক নেতাকে কলকাতা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বহিষ্কারের আদেশ দিয়েছিলেন তখনকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বর্তমানের বিরোধী পক্ষের নেতা, একই সঙ্গে খাজা এবং স্যার নাজিমুদ্দিন। সেই সাতজন বহিষ্কৃত শ্রমিক নেতাদের একজন আমি। আরো দু-জন এই সভার মেম্বার। আমরা বহিষ্কার আদেশ স্বেচ্ছায় অমান্য করে এই সভায় এসেছি এইটি পরীক্ষা করতে স্পিকার মহাশয় আমাদের নিরাপত্তা রক্ষা করতে পারেন কী না।'

পরে গভর্নর হার্বার্ট ও হকশাহেব মধ্যে ইংরেজিতে কথা হচ্ছিল—আপনি কি কাকের এই অভ্যাসের কথা জানেন?

হকশাহেব—আপনি কোন কাকের কোন স্বভাবের কথা বলছেন সেটা না জানলে কী করে বলব। বিলাতের কাক তো দেড়-দুই হাত লম্বা। আমাদের দেশের কাক তো ফাজিল কাক। বিলাতি কাকের পক্ষে ইচ্ছে করলেও ফাজিল কাকের তৎপরতা ও ছোঁচাবৃত্তি আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। কাক নিয়ে বোধহয় সব দেশেই অনেক গল্প আছে।

গভর্নর—আপনার প্রস্তুত জবাব শুনে মনে হয়, এ-প্রশ্নটা আপনার প্রত্যাশিত ছিল।

হকশাহেব—এটা আমার নিয়তি। আমি যথেষ্ট অপ্রস্তুত হলেও সেটা আমাকে দেখে বোঝা যায় না। তাতে ক্ষতি যা হওয়ার আমারই হয়।

গভর্নর—আমি জানতে চাইছিলাম—শরৎ বোসের গ্রেপ্তার নিয়ে ও মুক্তি দাবি করে যে-মুলতুবি প্রস্তাব আইনসভায় উঠল তাতে আপনি কোনো মন্তব্য করেননি। আপনি তো প্রধানমন্ত্রী। এ-রকম একটা গ্রেপ্তারকে রাজনৈতিকভাবে কী মনে করেন সেটা পরিষ্কার করে জানানো আপনার কর্তব্য, জানা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু আইনসভায় আপনার নীরবতার অর্থ নানারকম হতে পারে। আপনি যেন ইঙ্গিত দিলেন এই গ্রেপ্তারে আপনার ভূমিকা ছিল। তাতে যাঁরা শরৎ বোসকে সন্দেহ করেন, তাঁরা খুশি হবেন। আবার, আপনি এমন ইঙ্গিতও দিলেন যে আপনি শরৎ বোসকে দেশদ্রোহী ও গুপ্তচর মনে করেন না। তাতে তাঁরা খুশি হবেন যাঁরা শরৎ বোসকে বিশ্বাস করেন।

হকশাহেব—যার কোনো আক্কেল আছে সে তো তারিখ মিলিয়ে দেখবে যে মিস্টার বোসের গ্রেপ্তারের দিন ও সময় আমি কোনোভাবেই ক্ষমতায় ছিলাম না। সুতরাং আমি কোনোভাবেই এ-ব্যাপারে জড়িত থাকতে পারি না। যাদের এটুকু আক্কেল নেই, তাদের এসব কথার দাম কী?

গভর্নর—ভারত রক্ষা আইনে ভাইসরয়ের নির্দেশে যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তা নিয়ে আইনসভায় আলোচনা ঠিক নয়।

হকশাহেব—সেটা তো স্পিকারের ব্যাপার। ট্রেজারি থেকে তো কিছু বলা হয় নি। আপনার মন্তব্য কি আমি আইনসভাকে জানাব?

কিন্তু এ তো অবতার পর্বের ঘটনা না। বরাবরই তো এ-রকম।

১৯৪০-এর ২ জুলাই সুভাষ বোস গ্রেপ্তার হলেন। সে-গ্রেপ্তারে নাজিমুদ্দিন এমন লাফঝাঁপ করল যে মনে হল সিরাজদৌল্লা নাটকে মহম্মদি বেগের পার্ট করছে। হকশাহেব চাইছিলেন

না। কিন্তু যুদ্ধের পরিস্থিতিতে আইন-লঙ্ঘনকে তো স্বীকার করা যায় না। তা ছাড়া সুভাষের গ্রেপ্তার চাইছিলেন ভাইসরয় স্বয়ং। মানে, ওয়ার-ক্যাবিনেট।

সুভাষ গ্রেপ্তারের কয়েকদিন পর থেকেই, সুভাষ যখন জেলেই, আর কংগ্রেস যখন তাদের বের করেই দিয়েছে আর শরৎ বোস বম্বে গিয়ে গান্ধীজিকে যখন দয়া পরবশ হতে রাজি করাতে পারেনি—তাহলে দুই ভাইয়ের একজনকে মন্ত্রিসভায় আনা হচ্ছে না কেন—এরকম প্রশ্ন হকশাহেব করছেন কিরণশঙ্করকে, কিরণশঙ্কর করছেন সামসুদ্দিনকে, সামসুদ্দিন করছেন হকশাহেবকে। হকশাহেব আর কাকে জিগগেস করবেন, তাই জেলে গিয়ে সুভাষকেই প্রশ্ন করেন, 'তুমি যদি কংগ্রেসেরই বাহিরে থাইকল্যা তালি জেলে পচো ক্যা? বরং মন্ত্রিসভায় আইস্যা আসন ন্যাও'। সুভাষ রাজি হয়ে বুদ্ধিও দিয়েছে, মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিলটা পাস করিয়ে নেয়ার আগে যেন তাকে ছাড়া না-হয়। কর্পোরেশনে সুভাষপন্থীরা লিগের লোকজনকে কোনো কাজ করতে দিচ্ছে না। খাজা নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে দেখা করে ছোট ইস্পাহানি সুভাষকে ছাড়তে বলেন। তাহলে সে তার দলবল সামলাবে নিজেরই স্বার্থে। নাজিমুদ্দিন ছোট-ইস্পাহানিকে ভাগিয়ে দেন। ছোট-ইস্পাহানি তখন এই একই কথা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী হকশাহেবের সঙ্গে দেখা করেন। হকশাহেব তাকে বলেন, 'এটা খুব ভাল বুদ্ধি, উকিলগ সঙ্গে কথা কইয়্যা আইনের ফাঁক গুইল্যা জাইন্যা আমারে কও। আমি জেলে যাইয়্যা সুভাষরে রাজি করাইব। আইনরক্ষার জন্য কিছু তো শর্তমর্ত দিতেই হব। নাহলে তো আর গভর্নমেন্ট হয় না।'

ঐ ৪০ সালেই কালীগঞ্জ মসজিদে গুলি চলল। হকশাহেবের ওপর খাজা ছড়ি ঘোরাতে গেল।

কালীগঞ্জ তো মুর্শিদাবাদে।

মুর্শিদাবাদে তো আওয়াজ অনুযায়ী মশজিদ। থানার সীমানাও মশজিদের আজান যদ্দুর শোনা যায়, তাই দিয়ে মাপা হয়। কালীগঞ্জ সে-রকমই একটা থানা বা মশজিদ বা গ্রাম। যুদ্ধ যদি বেঁধে থাকে মাস পাঁচ আগে, তাহলে ৪০ সালের ফেব্রুয়ারিতে সেই কালীগঞ্জে পুলিশ গুলি চালায় আর তার পরে, পুলিশ-আইন মোতাবেক জিলা-ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত করে রায় দেন—পুলিশ ঠিকই করেছে। এই জিলা-ম্যাজিস্ট্রেট মুসলমান। একই নিয়ম-মোতাবেক কমিশনারও একটা তদন্ত করেন ও জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের রায় বহাল রাখেন। ব্যাপারটা মিটেই গেল। তার বেশ অনেকদিন পর, নাজিমুদ্দিন ওই এলাকায় গিয়েছিলেন। তিনি ইনস্পেকটর জেনারেল অব পুলিশকে বলেন, তিনি যেন কোনো এক ডিআইজি (সিআইডি)-কে দিয়ে আর-একটা তদন্ত করান শুধু এইটুকু গোপন কথা জানতে যে এই ঘটনার সময় অকুস্থলে যে একজন হিন্দু এসডিও আর দু-জন হিন্দু পুলিশ অফিসার ছিলেন, তাঁরা এই ঘটনাটির সঙ্গে জড়িত ছিলেন কী না। সেই গোপন তদন্তের রিপোর্ট পেয়ে নাজিমুদ্দিন ওই হিন্দু এসডিও আর দুই হিন্দু পুলিশ অফিসারদের চার্জশিট করেন যে ঘটনার আগেই তাঁরা মুসলিমবিরোধী উশকানি দিয়ে পরিস্থিতি আরো খারাপ করে ফেলেন। আর-একটি ঘটনা ঠিক এর উলটো। হিন্দুদের একটা মিছিল থামাতে হল। মুসলমানদের একটা দলের আক্রমণ থেকে তাদের বাঁচাতে। তাতে মিছিলের হিন্দুরা চটে যায় ও পুলিশকে পালটা আক্রমণ করে। বেশ কিছু জখম হওয়ার পর হিন্দু মিছিলটার ওপর গুলি চালানো ছাড়া পুলিশের কোনো উপায় ছিল না। হিন্দুদের মত রক্ত গরম করা লেখা আর কে লিখবে। কলকাতার হিন্দু কাগজগুলো খেপে উঠে আওয়াজ ছড়াল—গুলিচালনার বিশেষ ট্রাইবুন্যাল তদন্ত করা হোক। হিন্দুদের উকিল-ব্যারিস্টার বেশি আর হিন্দুদের তোলা কোনো দাবির বিরোধিতা করার মত মনের জোর কোনো হিন্দুনেতার ছিল না। খুব বেশি হলে

কমিউনিস্টরা বা ওয়ার্কার্স পার্টিরা মুসলমানদের কোনো স্থানীয় দাবিকে সমর্থন দিয়ে দিত।

মুসলিম লিগ বিরোধী পক্ষ হওয়ার পর তারা ফজলুল হক-শ্যামাপ্রসাদ মন্ত্রিসভাকে সহ্য করতে পারছে না। তারা একটা উদ্ভট বুদ্ধি বা কৌশল বের করেছে। কলকাতার বাইরে সব জায়গায় হকশাহেবের নামে সত্য-মিথ্যা নানা কথা রটাবে যাতে সাধারণ মুসলমানদের মনে হকশাহেবকে নিয়ে আর-কোনো মোহ না থাকে। কিন্তু আইনসভায় তারা ব্রিটিশবিরোধী নানারকম প্রস্তাব তুলে হিন্দুদের সমর্থন আদায় করবে। হিন্দু মানেই স্বদেশী আর মুসলমান মানেই হকশাহেব—এমন একটা ধারণা তো চালু আছে। সেই ধারণার ফলে হিন্দুদের কোনো পার্টি বা কোনো হিন্দুর পক্ষে ইংরেজের বিরুদ্ধে কোনো প্রস্তাব সমর্থন না-করা সম্ভব নয়। সে-প্রস্তাবে গোপন বা প্রকাশ্য মুসলিম নিন্দা না থাকলেও। সব প্যাঁচপয়জারির ব্যাপার। কংগ্রেসে হিন্দুরা হিন্দু মারল—গান্ধীরা সুভাষদের। আর লিগে মুসলিমরা মুসলিম মারল—জিন্নারা হকশাহেবদের।

দমকলে কাজ করতে লোক আসছে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে। কলকাতায় বোমা পড়তে শুরু করলে বাড়িঘর পুড়বে যেন বুড়ির ঘর পুড়ছে। আর এখানকার দমকলের আছে বলতে আছে এক দমকলের ঘণ্টা। ১০টা ট্রেইলার পাম্পও নেই। সাউথ আফ্রিকা থেকে আগুন নেবাবার লোকজন আসা পর্যন্ত যে-করেই হোক আগুন জ্বলন্ত রাখতে হবে।

সেই কারণে হিন্দুরা মুসলমান-মারার সময় পাচ্ছে না। বা মুসলমানরা হিন্দুমারার সুযোগ পাচ্ছে না। হকশাহেবের মনে কখনোই 'পারলাম না'—কথাটি আসে না। যেন, পারা না-পারাটা হকশাহেবের কোনো ব্যাপারই নয়। আজকাল, তাঁর মনে হতে শুরু করছে—যার যা মতলব বলে মনে হচ্ছে—তার বাইরেও বেশ কিছু মতলব উড়ে বেড়ায়।

রাজারা কী চান? চান সোনার পাথর বাটি। মানে, কলকাতা চলবে কলকাতারই মত। সীমান্ত থেকে যদি যুদ্ধ আসে, তাহলে তখন হবে যুদ্ধের মত। এটা যদি কারো মাথায় থাকে তাহলে কি সে আর যুদ্ধ ঠেকাতে পারে? তাহলে কি রাজারা কলকাতা ছেড়ে যেতে চাইছে? লাটশাহেব দিনের মধ্যে বায়াত্তর বার হকশায়েবকে জিজ্ঞাসা করে যাচ্ছেন—কলকাতা থেকে বেদরকারি লোকদের সরানোর কী হল?

হকশাহেব তার কী করবেন?

তিন-চারটি প্রদেশ একই জিওসির অধীনে। আবার, অন্যদিকে, প্রত্যেক প্রদেশেরই নিজের-নিজের গবর্মেন্টি আছে। তাহলে এই চারটি প্রদেশের চার রকম মত মেলাবে কে?

এখনো নাকী ফয়শালাই হয়নি—আসামকে ইস্টার্ন কম্যান্ডের বাইরে নেয়া হবে কী হবে না। তাহলে, ধরো প্রাইম মিনিস্টারকে?

সাইগন থেকে 'ফ্রি ইনডিয়া রেডিও' নাকী রোজ প্রচার করছে, 'হু ডাজ নট লাইক টু বি ফ্রি? ফ্রি ইনডিয়া।' লাটশাহেব বলেছেন, প্রধান মন্ত্রীকে ব্যবস্থা করতে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর সেক্রেটারির ওপর খেপে গিয়ে বললেন, আমি কি আপনাদের শত্রুপক্ষ? আমি তাহলে কী করে জানব কে কেন কী চায়? সেক্রেটারি চেয়ারে হেলে নোটটা পড়ে বলেন, 'স্যার, আপনি যা বলছেন, তা না। এইচ-ই বলতে চেয়েছেন এই সাইগনি প্রচারটাকে কাজে লাগিয়ে পালটা প্রচারে নামতে। এ-রকম বলতে—'ভারতের স্বাধীনতা চাই। এ-কথা কারা বলে? দেশের শত্রুরা।'

হকশাহেব হেসে বলেন, 'এইচ-ইকে বুঝান, সব ইংরাজির কাউন্টার হয় না। উল্টা শুনায়—'দেশের স্বাধীনতা কারা চায়? দেশের শত্রুরা।' এই প্রপাগাণ্ডা হইলে আর দেইখতে হব না।'

একদিকে লাটশাহেবের কাউন্টার-প্রোপ্যাগাণ্ডা—বাংলাকথার অর্থ হয় কথার অর্থ দিয়ে না,

কথা-বলার স্বরে, সেটা যে হকশাহেবের মত জানে না, সে ক্যামব্রিজের বি.এ আর সংস্কৃতের মহামহোপাধ্যায় হলেও কি বুঝতে পারত প্রোপাগাণ্ডার কাউন্টার কেমন রি-কাউন্টার হয়।

হকশাহেব খুব আরামে নেই। তাঁর ভাল লাগছে না। কী তাঁর কাজ তাই জানেন না। সারওয়ারদি আর খাজারা সারা বাংলার কোনো মজাপুকুরের কাদা আর বাকি রাখেনি। তাঁকে রাতদিন এমন দশমাটা করছে যে হকশাহেব নিজেকেই চিনতে পারছেন না। শের-ই-বাংলা এখন শিয়াল-ই-বাংলা। ওদের লক্ষ হকশাহেবের নাম মুসলমানদের মন থেকে মুছে ফেলা। হিন্দুদের মন থেকেও মুছে ফেলা।

আর, চারদিকে যেন ঘিরে ধরেছে আরশোলা, টিকটিকি, কেন্নো, উকুন, কৃমি। এগুলো সব রাতের অন্ধকারের পোকামাকড়। এদের গলায় কোনো আওয়াজ নেই, শুধু আছে হাজার-হাজার শুঁড় আর পা। প্রভুর মনের ইচ্ছে প্রভুর মনে আসার আগেই এরা পূর্ণ করে দেয়। বাঙালি নবাব-জমিদারদের সেবায়েত বংশেই এরা বেশি থাকে। শাহেব-কোম্পানিতেও এমন বড়বাবু লাগে। কর্তার আদেশ পালন—এদের বাঁচার একমাত্র ও অদ্বিতীয় অবলম্বন। সে আদেশ-পালন এমন শারীরিক বাধ্যতা কর্তা আদেশ উচ্চারণের আগেই কর্তার ইচ্ছে এদের জানা হয়ে যায়। কর্তার সঙ্গে তাদের জৈবপ্রক্রিয়া এমনই এক যে এরা নিজের শরীরের ভিতর থেকে নির্ভুল ইশারা পায় কর্তার এখন ইচ্ছেটা কী? তৎক্ষণাৎ তারা সেই ইচ্ছা মেটাতে লেগে যায়। এমন ইচ্ছেও তো হতে পারে যেটা কর্তা নিজের কাজেও মানতে চান না। তেমন ঘটনায় এরা হয়তো কয়েকদিনের জন্য নিজেকে আড়ালে রাখে। এমন আনুগত্য যে নিজের ভালমন্দ বা সামাজিক ভালমন্দের কোনো নীতি এদের ওপর কাজ করে না। এমন কী ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থবোধও কাজ করে না। তখনও তো জাতিশুদ্ধির দরকাবে হিটলারের ইহুদিনিধনের কোনো কথা—জার্মানির লোকরাও জানে না। অথচ একই সময়ে ইংরেজের অধীনস্থ বাংলা প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী শিউরে শিউরে উঠছিলেন—ব্যক্তিহীন আনুগত্যের ভয়ঙ্কর শীতে।

রেঙ্গুন থেকে টেলিগ্রাম এসেছে, দুই জাহাজ উদ্বাস্তু আসছে। মিলিটারি জানতে চেয়েছে, জাহাজদুটো কোন ঘাটে ভিড়বে। বাবু এসে নোটশিট ফেলে দিল হকশাহেবের সামনে—সইয়ের জন্য। একটা প্রিন্সেপ ঘাটে, আর-একটা ব্যান্ডেলের ঘাটে।

'ক্যা? আইসতেছে ইভ্যাকুয়ি। মিয়া নামব প্রিন্সেপে আর বিবি নামব ব্যান্ডেলে? কেউ কাউরে খুঁইজ্যা না পাইলে তুমি গিয়া কাজি হইব্যা? রহস্যডা কী, খুইল্যা কও।'

'না স্যার, একটাতে তো শুধু শাহেবরা, তাই সেটাকে প্রিন্সেপে দিয়েছি। সে-রকমই চায় মিলিটারি।'

'মিলিটারি চাউক না-চাউক, তুমি অন্তত তাই চাও? শাহেবগ আর কালা আদমিগ একঘাটে নামান্ যায়? মহাভারত অশুদ্ধ হইয়্যা যাবে না? শোনো বাবা, এই যুদ্ধে ইংরাজপক্ষ জিতুক এডা বুঝি তোমার থিক্যা আমি বেশিই চাই। তার সঙ্গে এইডা চাই না—বাংলাডা ভাইস্যা যাক আর বাঙালি জাইতডা মইর্যা যাক। নিজেগ এত মাইরো না বাবু। কবরে চিরাগ দিতেও তো দুই-একজনরে বাঁচাইয়্যা রাখা দরকার।'

জাতীয়তাবাদ বলেও কিছু একটা

১৯৪১-এর ৮ মে দিল্লির 'হিন্দুস্তান টাইমস' কাগজে গান্ধীজির একটা বিবৃতি বেরিয়েছিল। সেই বিবৃতির কোনো আনুষঙ্গিক ঘটনা গান্ধীজি সম্পর্কিত প্রকাশিত কোনো জীবনী বা ইতিহাসে নেই।

১৬০

কিন্তু ওই দিনই গভর্নর জেনারেল লিনলিথগ এটা টেলিগ্রাম করে জানান সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইনডিয়াকে। গান্ধীজি বলেছিলেন, আমরা (কংগ্রেসিরা) নিজেদের কাপুরুষ ও বর্বর বলে প্রমাণ করেছি (এই সব দাঙ্গার জায়গায়)। কংগ্রেসিদের অহিংসা যদি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঠেকাতে না পারে, তাহলে যারা হিংসার সদ্ব্যবহার জানে, তাদের কাছেই ক্ষমতা (পাওয়ার) আসবে।'

১৯৪১-এর সেনসাস-দাঙ্গা ঢাকায় ঘটেছে। ঢাকা জেলারই নারানগঞ্জে হয়নি—কিন্তু দুটো থানায় হয়েছে। খুলনা, বাখরগঞ্জ ও চট্টগ্রামে এক-এক এলাকায় হয়েছে। পুলিশ নাকী কিছু চিঠিপত্র পেয়েছে যাতে 'প্রতিশোধ সংগঠিত' করতে বলা হয়েছে। দুটো-একটা লিফলেটও কলকাতার কোথাও-কোথাও একটু-আধটু বিলি হয়েছে, 'হিন্দুরা প্রতিশোধ নাও'।

কিন্তু, সেনসাসে হিন্দু-বাড়ানো ও মুসলমান কমানোটাই ছিল এসব দাঙ্গার লক্ষ। ফলে, কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার পক্ষে এমন দাঙ্গার সুযোগ বেশ সংগঠিতভাবে নেয়া হয়েছিল। হিন্দু-মহাসভা নানারকম নামে সাহায্য তহবিল তৈরি করছিল ভারতের নানা জায়গায়। ২৭০০০ টাকা মত সংগ্রহ ও হিন্দুদের হাতে অস্ত্র দেয়ার এ আন্দোলন শুরু করে। কংগ্রেস তো কোথাও মন্ত্রিসভায় ছিল না। মহাসভা দাবি তুলল—মুসলমান-মন্ত্রিসভাগুলিকে বাতিল করতে হবে। হিন্দুরা সামনের ভোটের প্রচার শুরু করে দিয়েছে। হিন্দু মেয়েদের ওপর মুসলমানদের অত্যাচার নিয়ে হিন্দু কাগজে নতুন-নতুন সব খবর বেরতে লাগল, বিশেষ করে বিহার-যুক্তপ্রদেশে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা 'নারী রক্ষা সমিতি' বলে একটি সংগঠন শুরু করে দিল। কংগ্রেস এত সরাসরি কিছু না করলেও, হিন্দু মহাসভাকে সমর্থনই করছিল। অনেক জায়গায় সেখানকার কংগ্রেসি নেতারা হিন্দু মহাসভার নেতা হয়ে উঠেছিলেন। হিন্দু-মহাসভা হিন্দুদের ওপর মুসলমানদের আক্রমণকে সর্বভারতীয় বিষয় করে তুলতে আদা-নুন খেয়ে লেগেছিল। মহারাষ্ট্র, তাঞ্জোর, পাঞ্জাব, সেন্ট্রাল প্রভিন্সে 'দাঙ্গাপীড়িত হিন্দু সাহায্য তহবিল' খোলা হল। এই হিন্দু সমাবেশের রাজনৈতিক তাৎপর্য কতটা গভীর ছিল, বোঝা যায়, এই রকম এক তহবিল উদ্বোধন করলেন, সেন্ট্রাল প্রভিন্সের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডাক্তার খারে।

১৯৪১-এর ২০ মে বাংলার ছোটলাট হার্বার্ট তাঁর কর্তা ভাইসরয় লিনলিথগকে মে-মাসের প্রথম পনের দিনের 'সাম্প্রদায়িক' অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্টে প্রথমেই বললেন, 'আমি বুঝতে পারছিলাম, বেশ গভীরভাবেই বুঝতে পারছিলাম যে হাটবাজার ব্যবসাবাণিজ্য স্বাভাবিক হলে পরিস্থিতিও স্বাভাবিক হবে। আমি ঢাকা-পরিদর্শনে যাওয়ায় লোকজন ভরসা পেয়েছে। যদিও তখনো দোকানবাজার বন্ধ ছিল। রায়ট এনকোয়্যারি কমিটি ঘোষিত হওয়ায় তার বিপক্ষে নানারকম ওজর তোলা হচ্ছে। জুনের শেষ সপ্তাহ থেকেই 'এনকোয়্যারি কমিটি' কাজ শুরু করে দিয়েছে।

ঢাকায় সে-বছরের জন্মাষ্টমী পুজোর মিছিলে ২৭ আগস্ট কোনো অশান্তি হয়নি। শান্তিরক্ষার জন্য সরকারও পুলিশ-মিলিটারি নামায়নি। যে-সব বিশেষ জায়গায় গোলমাল বাঁধে সেখানে মুসলিম ভলান্টিয়াররা আগে থেকেই হাতে-হাত বেঁধে মিছিলের পথটা নিরাপদ রাখছিল। এই সব হাঙ্গামার সময় যে-সব গুণ্ডা-বদমাস দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টায় থাকে, মুসলমান ছাত্র-যুবদের

স্থানীয় নেতারা তাদের চোখে-চোখে রাখছিল। এই মোড়টা পেরিয়ে গেলে বলা যায় যে জন্মাষ্টমীতে কোনো হাঙ্গামা হয়নি। তখন তো দাঙ্গা অনুসন্ধানের কাজ শুরু হয়ে গেছে। ১৯৪১-এ দুটো প্রমাণের দরকার ছিল। ১. হিন্দুরাও দাঙ্গা বাধায়। ২. মুসলমানরাও দাঙ্গা থামায়।

আপাতত যদি একটা মতৈক্য তৈরির দায় থেকে মেনেও নেয়া যায় যে আমাদের একটা জাতীয় ইতিহাস আছে, তাহলেও কি এই প্রশ্নের কোনো মীমাংসা সম্ভব—সেই আনুমানিক জাতীয় আখ্যানে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গাই সবচেয়ে 'মূল্যবান' উপাদান? আর, তার সঙ্গে জড়িয়েই গান্ধীজি ও জিন্নার রাজনৈতিক সব কাজকর্ম দেখা কি সংগত? আর সেই দেখা থেকেই কি আমাদের তিন দেশেই দরকার দেশভাগের একজন শহিদ একজন খলনায়ক ও একজন মতলবি?

চিন্তার এই ধাঁচাটা বেশ পুরনো যদিও এখন যেসব পদ ব্যবহার করে ধাঁচাটার আঁচ দেয়া হয়, আগে তা হত না। নতুন পদ ব্যবহারের দরকার নতুন জ্ঞানতত্ত্ব থেকে। রমেশচন্দ্র মজুমদার পর্যন্ত 'জাতীয়তাবাদ' বলতে হিন্দু জাতিত্বই বোঝাত। সেই 'জাতীয়তাবাদ'-পদটিই শুষে নিত হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিরোধীদের। কখনো এমন কী, খ্রিস্টানদেরও বা মুসলমানদেরও। তাঁরাও ভারতের কল্পিত জাতীয়তাবাদের অন্তর্গত। তার অর্থ এই নয় যে সারা ভারতে লিগ-বিরোধী ও জিন্না-বিরোধী মুসলমানদের মিলিত হওয়ার একটা সম্ভাবনা ছিল। ভারতীয় মুসলমানদের দ্বিভাজন সম্ভবই ছিল না। অথচ ভারতে যে-চারটি প্রদেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার ছিল—বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—তার একটির নেতাও লিগের ছিলেন না বা জিন্না-সমর্থক ছিলেন না।

তবু মুসলমান সমাজে নিগ্রহবোধ ছিল ব্যপ্ত উচ্চারণ। হিন্দুদের কাছে নিগৃহীত হওয়া। তা থেকে একটা বিপন্নতা বোধ সমস্ত মতের মুসলমানদের মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছিল।

এখন যাঁরা রমেশচন্দ্রের 'জাতীয়তাবাদ'কে তুচ্ছ করতে চান তাঁদের সামনে দু-তিনটি মাত্র রাস্তা বা গলি খোলা আছে। একটা হচ্ছে—জাতীয়তাবাদ বা জাতীয় আখ্যান এসব কিছুই ভারতের ছিল না। ওই সব নামে যে-লক্ষণগুলি চিহ্নিত করা হয়, সেসব ইংরেজদেরই সৃষ্টি ও এমনকী যে-আবেগ ও সংলগ্নতা অপ্রমেয় সেগুলোও ইংরেজদের কাছেই শেখা। এ-কথা যাঁরা বলেন, তাঁদের কথার সবচেয়ে বড় গুণ সরলতা। তাঁরা সোজা ও খাড়া বলে দিয়েছেন বলেই মনে হয় তাঁরা সত্যি কথা বলছেন। এই সরলতার সুযোগ আমরা সকলেই নিই।[১]

জাতীয়তাবাদ-বিরোধীদের সামনে আর-একটা পথ আছে। জাতীয়তাবাদকে স্বীকার-অস্বীকারের মধ্যে না গিয়ে 'ফ্র্যাগমেন্টস' বলে মার্কা দেয়া। তৈরি হয়নি, কিন্তু মালপত্তর সব আসছে। সেটা যেমন ফ্রাগমেন্টস, তেমনি কোনো একটা ধ্বংসের পরেও যা পড়ে থাকে তাও ফ্র্যাগমেন্টস। 'পুরাতন বাড়ি ভাঙা হইয়াছে। পুরাতন জানলা-দরজা-বিম-সুঁড়কি ইত্যাদি বিক্রয় হইবে।'

---

১. এমন দুটো ঘটনা আমার কাছে বাঙালি মধ্যবিত্ত হিন্দুর মনের কলোনির অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত। একটি নীরদচন্দ্র চৌধুরী নিজেই লিখে গেছেন—পূর্ব অপরিচিতা নতুন স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম শুয়ে স্ত্রীর সঙ্গে তিনি প্রথম কথা বলেন, তুমি কি বিঠোভেন বানান জানো? পরেরটুকুও নীরদবাবুই লিখে গেছেন—স্ত্রী ঘাড় ঘুরিয়ে শুদ্ধ বানানটি বলে আবার ঘাড় ফেরালেন।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি ছাপা নয়, শোনা, দেবব্রত বিশ্বাস (জর্জ)-এর কাছে। গান্ধীজির ডাকে ওরা স্কুল যাওয়া বন্ধ করেছেন। দু-একদিন পর ওঁর বাবার খেয়াল হওয়ায় জিজ্ঞাসা করেন, 'স্কুল যাস নাই ক্যা?' ওঁরা গান্ধীজির কথা বললেন। তাতে জর্জদার বাবা বলেন, 'শোন্ শাহেবরা তো বাহ্য করা শিখাইছে, আর গান্ধী শিখাইছে মাঠে হাগা। যা, স্কুলে—।'

আরো দুটি বা একটি রাস্তা খুলে গেছে।

বলা উচিত দুই লেনের দু-মুখো রাস্তা। পুরনো ধারণায় রাস্তার দুই মুখ খোলা থাকে, যে-পথে গেলে সে-পথে ফিরলে, এর নাম রাস্তা। নতুন ধারণায়, যখন দক্ষিণ থেকে উত্তরে যাচ্ছেন তখন সেটাই আপনার রাস্তা, যাওয়ার সময় ফেরার কথা কেন। তাই জাতীয়তাবাদ নিয়ে একটি ঘুরপথ বলা ঠিক নাকী দুটো ঘুরপথ বলা ঠিক—এটা প্রসঙ্গের ওপর নির্ভর করে। প্রথমে দুটো বিপরীত ওয়ান-ওয়ে বা দুইলেনি একটা রাস্তা। একটায় 'সংগঠিত রাজনীতি' লেখা তীরচিহ্ন আঁকা নিশানা আছে। আর-একটায়, বিপরীত বিন্দুতে, 'অসংগঠিত' রাজনীতি লেখা তীরচিহ্ন আঁকা নিশানা আছে। নিশানার একটা গোলমালের ভয় এতে আছে—যেন সংগঠিত রাজনীতির সড়ক ধরলে তো মেনে নেয়া হয়, সংগঠন দিয়ে শুরু করলে অসংগঠন দিয়ে শেষ করতে হয়।

এর আর-একটা রকম আছে—এলিট বা অভিজাত, পপুলার বা বারোয়ারি। এলিট বা পপুলারকে আরো ছোট খোপে ঢোকানো যায়। অভিজাত সাম্প্রদায়িকতা ও বারোয়ারি সাম্প্রদায়িকতা, ...সংস্কৃতি ও...সংস্কৃতি,....রাজনীতি ও...রাজনীতি। এটাকে আরো খোপ করা হয়—'ইতিহাস ওপর থেকে', 'ইতিহাস তলা থেকে।'

তাহলে জাতীয়তাবাদের একটা ধরণকে বলা যায় 'সংগঠিত রাজনীতি/সংস্কৃতি/ আরোহণ।' এর পালটা 'অসংগঠিত ও বারোয়ারি রাজনীতি/সংস্কৃতি/ আরোহণ।'

কিন্তু এত ভাগাভাগি করে মানামানি কেন। এ তো প্রায় হিন্দু সমাজের মত। একে চতুর্বর্ণ। তার ওপর প্রত্যেক বর্ণের আবার চৌষট্টি ভাগ। বামুনদেরও। বামুনদের যদি কুলীন থাকে, তাহলে কায়েত-বদ্যি-শূদ্রদের না-থাকলে তারা ছোট জাত হয়ে যায় না? খুব সুন্দর বলেছিলেন কেউ, 'নিচু জাতে কেউ জন্মায় না, নিচু জাতে একজনকে পতিত্ করা হয়।

'৪১ সালের সেনসাস নিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামার গল্প করতে জাতীয়তাবাদ নিয়ে এত কথা এল কেন? এই গল্পের পক্ষে তিনটি কারণে। প্রথম কারণ, কোনো সেনসাসই ভারতে নিরুপদ্রব হয়নি। ধর্ম ও জাতি উল্লেখ নিয়েই যাবতীয় গোলমাল। প্রত্যেকটি দাবির সঙ্গে একাধিক সৃষ্টিপুরাণ থাকলে বেচারা সেনসাস কমিশনারের করার কী আছে?

কিছুই করার নেই। সেনসাস একটা কেন্দ্রীয় সরকারাধীন কাজ যা চাষের ক্ষেত ও হাটখোলা পর্যন্ত ব্যাপ্ত। ভারতীয়দের, সবরকম ভারতীয়েরই, তার পূর্বপুরুষ ও তাঁদের নিয়ে তার যে বংশ সে-সবের প্রতি, আনুগত্য নিয়ে কোনো তর্ক চলে না। তার কাছে তার সত্তা ও অস্তিত্বের যুক্তি এই একটাই বংশ। ভারতে 'ভবঘুরে' বৃত্তি হিশেবেই অর্থশাস্ত্রে ও কামশাস্ত্রে স্বীকৃত। এই ভবঘুরেকে নিয়ে একটা বেশ টাইপ কল্পনা করে সংস্কৃতে একটা উদ্ভট শ্লোক আছে—যেখানে-সেখানে যাওয়া যা জোটে তাই খাওয়া, হাটখোলায় নিশিযাপন আর গোমতী তীরে মরণ। এ-লোকটার কোনো জিনিশই দরকার নেই, সবই জুটে যায়, কিন্তু মরণটাই তার কাছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার। মরার পরে পরজন্ম আছে। মরার ব্যাপারে পূর্বপুরুষরা আছেন। তাই যেখানে-সেখানে তো মরা যায় না। মরণং গোমতী তীরে।

এই ভারতীয়তা থেকেই 'জাতীয় আখ্যান' বা 'জাতীয়তাবাদ' ধারণাটিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না। তার ওপর স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদের একটা আত্মীয়তা হয়তো মনের ভিতরে কাজ করে। তার ওপর জাতীয়তাবাদের শিক্ষা আমাদের ইংরেজ সংসর্গে। 'নেশন' এই ধারণার একটি মহত্ত্ব আছে। আবার, এটাও সত্য যে রবীন্দ্রনাথ প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে এই নেশনবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু ইতিহাস, রাজনীতি ও সমাজবিভাজনের মত তাত্ত্বিক,

দৈনিক ও মিশ্র বিষয়ের যাঁরা নির্ণায়ক তাঁরা রবীন্দ্রনাথের মতানুযায়ী চললে বিপদ আছে।

ঠিক তাও নয়। ভারতে জনসাধারণ সবাই হিন্দু নন—এইটুকুই জিন্নার বক্তব্য ছিল। 'মুসলমানরাও ভারতের একটা জাতি'—এই সিদ্ধান্তে তো কোনো দোষ পাওয়া যাবে না। ১৯৪০-এর লাহোর বক্তৃতায় জিন্না বললেন, মুসলমানরা সংখ্যালঘু নয়।

নিষ্পত্তিহীন এমন মতানৈক্যে রবীন্দ্রনাথ-গান্ধী-ইকবাল যে ভারতবর্ষ-ধারণা বা হিন্দ্-এর ধারণাকে সত্য করে তুলেছিলেন, মহম্মদ আলি জিন্না কুঠার হেনেছিলেন সেই ধারণাটির ওপর—তাঁর দ্বিজাতিতত্ত্ব দিয়ে। জাতীয়তাবাদের বিরোধিতায় তাই সাম্প্রদায়িকতা সংক্রমণের ভয় থেকে যায়। আবার, সাম্রাজ্যবাদের মুৎসুদ্দি হওয়ার ভয়ও থেকে যায়।

'জাতীয় আখ্যান' নতুন করে লেখা হোক কিন্তু জাতীয়তাবাদ বলেও যেন কিছু একটা থাকে।

ভারতে একটা ভারতীয় জাতি বেশ বুদ্ধিগ্রাহ্য। কিন্তু জাতির সংখ্যা গুনে দুই, মাত্র দুই, বলতে সেটা বুদ্ধির বাইরে চলে যায়। কেন দুই? দ্রাবিড়তা নেই? বৌদ্ধ পর্বত বাসীরা নেই সমুদ্রের আদিবাসীরা নেই?

জাত, জাতি, জাতীয়তা বিভ্রাট

১৬১

জিন্নার এই দ্বিজাতিতত্ত্বটা এল কোত্থেকে? ভারতবর্ষে জাতির সংখ্যা তো কখনোই কিছু কম ছিল না। জাত আর জাতির ফারাকটা হল কবে, কেন? জাত গোনার দরকার পড়ল কেন, তাও এত সূক্ষ্ম হিশেব কষে? গোনাগুলি দুইয়েই কেন থেমে থাকল—হিন্দু ও মুসলমান? বা এক না দুই, এই ঝগড়াতেই কেন আটকে গেল? এর আগে, ও পরেও, শিখ, হিন্দু ও মুসলমানরা সবাই মিলে পাঞ্জাবীও ছিল।

১৯৩৬-এর মার্চে পাঞ্জাবের শহিদগঞ্জে শিখ ও মুসলমানদের ভিতর এমন একটা বিষয় নিয়ে দাঙ্গা প্রায় বাঁধে-বাঁধে যে জিন্নাকে অনুরোধ করা হয় তিনি যদি একটা সুপারিশ দেন। জিন্না একটি মীমাংসাসূত্র বের করায় কৃতজ্ঞ পাঞ্জাবের একটি শাহেব তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, পাঞ্জাবে তিনটি ধর্মের লোকজন সমসংখ্যক থাকায় এখানে কোনো একটি সম্প্রদায়ের লোকের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না—এটাই পাঞ্জাবের শক্তির সবচেয়ে বড় গ্যারান্টি।

এর পর বছর না-পড়তেই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রথম ভোট হল। ভোটের প্রচারের সময় কংগ্রেস ও লিগের মধ্যে রেষারেষির বদলে বরং বোঝাবুঝির ভাবই বেশি ছিল। যুক্তপ্রদেশ, আসাম, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বাংলা—সর্বত্রই এই দুটি দলের—কংগ্রেস ও মুসলিমদের প্রাদেশিক কোনো দলের—কোয়ালিশন সরকার হবে। কাজে তা হল না। যুক্তপ্রদেশে কংগ্রেস বলেছিল, লিগকে মন্ত্রিসভায় নেব না। বাংলার ব্যাপারে কংগ্রেসের হাইকম্যান্ড বলে দিল, কোনো কোয়ালিশনেই যাব না—কৃষকপ্রজার হকশাহেব হলেও না। কংগ্রেস ও লিগের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভাই হবে যুক্তপ্রদেশে। প্রচারের সময় লিগ কংগ্রেসকে আক্রমণ করেনি, কংগ্রেসও লিগকে তেমন গালাগালি দেয়নি। জামায়েত-উল-উলেমা-হিন্দ ছিল লিগ-কংগ্রেসের তৃতীয় পার্টনার। লিগের দুই নেতা খালিকুজ্জমান ও নবাব ইসমাইল খাঁ ছিলেন যথেষ্ট সম্মানাস্পদ। অথচ ভোটের পর মন্ত্রিসভা তৈরির কথা উঠলে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু একটা প্রকাশ্য বিবৃতিতে জানালেন,

বরিশালের যোগেন

তিনিই তখন কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি, 'দেশের রাজনীতির বিবর্তনে এখন ভারতের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুটি মাত্র পক্ষ মতবিনিময় করতে পারে—ব্রিটিশরাজ ও কংগ্রেস।' এরই উত্তরে জিন্না বলেছিলেন, 'তিন নম্বর আর-এক পক্ষও আছে—মুসলিমরা।...আমরা কোনো পার্টিরই তল্পিবাহক নই কিন্তু ভারতের কল্যাণকর যে কোনো কাজে আমরা সমানাধিকার নিয়ে প্রস্তুত থাকি।'

জওহরলালের ঠিক এই বিবৃতিটি থেকেই ভারতের জাতীয়তাবাদ সংখ্যা দিয়ে গোনার শুরু কী না, তার দলিলি প্রমাণ তেমন কিন্তু কেউ যদি চান, তাহলে তিনি এই তারিখটাকে তেমন জাতিসুমারির শুরুর বছর ধরতে পারেন। জওহরলাল সারা দেশের সব নেতাদের মধ্যে বেশি আধুনিক, সংস্কারমুক্ত, ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত ও গণতন্ত্রী। আর তিনিই কী না ব্রিটিশ বনাম ভারত, পাশ্চাত্য বনাম প্রাচ্যে, সাম্রাজ্যবাদ বনাম গণতন্ত্রের ঐতিহাসিক মহারণে পক্ষ স্থির করলেন ধর্ম দিয়ে? তা তিনি করতে চান নি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল—জিন্নাকে নিষেধ করা। তিনি আপত্তি করছিলেন—ধর্মের যুক্তিতে মুসলমানদের জাতীয়তাবাদী করে তোলা। ইতিহাসের নিয়তিতে তিনিই হয়ে গেলেন তাঁর দলের সেই সমস্ত মুসলিম বিদ্বেষীর প্রতিনিধি, বিশেষত উত্তরপ্রদেশে, তাঁর দলে যারা গিজ-গিজ করছিল। কিন্তু জওহরলাল নিজে তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত মনে করে গেছেন, তখনকার সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিতে, সাম্প্রদায়িক ক্ষমতাকেন্দ্রগুলির বিরুদ্ধে ওই জায়গায় দাঁড়ানো ছাড়া কোনো পথ খোলা ছিল না।

মাত্র একবছর আগেই কিন্তু শিকরবন্দের শিখ-মুসলমান দ্বন্দ্বে, পাঞ্জাবের গভর্নর বলেছিলেন—সাম্প্রদায়িক দলের বৈচিত্র্য ও বহুতাই দাঙ্গার বিরুদ্ধে গ্যারান্টি।

ব্রিটিশরাজের প্ররোচনায় সাম্প্রদায়িকতা বেড়েছে বা সাম্প্রদায়িকতা ধারণাটাই ব্রিটিশরাজের আমদানি—এমন সিদ্ধান্তের মধ্যে একটা কোনো সত্য হয়তো আংশিক আছে কিন্তু সঙ্গে আছে বহুতর অসত্য। ভারতে হিন্দুরা সংখ্যায় বেশি। একটা জিলা বোর্ডে বা স্কুলবোর্ডে বা মিউনিসিপ্যালিটিতে বা টাউনকমিটিতে বা ইউনিয়ন বোর্ডে বা ফজলুল হকের তৈরি নানাবিধ মনোনীত প্রার্থীপদে একজন উঁচু জাতের হিন্দু মনোনীত হলে, সে যে হিন্দু এটা হিশেবে ততটা আসত না, যতটা আসত তার যোগ্যতার প্রসঙ্গ। কিন্তু কোনো মুসলমান মনোনীত হলে, বা, তপশিলি কোনো প্রার্থী মনোনীত হলে, সে যোগ্য কী না—এ প্রশ্ন উঠতই না, উঠত তার ধর্ম-পরিচয় ও জাত-পরিচয়। সেই পরিচয়ের ওপর তার হাতে জল বা খাদ্য খাওয়া চলবে কীনা—এত দরকারি সব প্রশ্ন উঠত, যুক্তপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুর মত বড়-বড় সব জায়গায়।

হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা বা জাতীয়তাবাদের এই সুযোগটা ছিল, বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের সিটভাঙা ভোটজোড়া এই সবের পর। মুসলমান ব্যতীত অন্য সব ধর্মই যেন হিন্দু-সংস্কৃতির অংশ। এমনকি আদিবাসী (ওরিজিন্যালস) হলেও। ভারতবিদ্যার পেডাগজিতেও এই অসমব্যবধান মেনে নেয়া হয়েছে। এখন তো সে প্যাঁচ আরো শক্ত হয়েছে যে মুসলমানরা যদি মেনে নেয় তারা ভারতের মুসলমান তাহলে তাদের জায়গা দিতে আপত্তি নেই। ফলে, সমস্ত প্রদেশেই কংগ্রেস নেতা, হিন্দু মহাসভার নেতা, গীতাযজ্ঞের নেতা, রথযাত্রার নেতা, এখন গণেশ চতুর্থীর নেতাও একই রকম দেখতে, একইরকম জামাকাপড় পরা।

এটা নিয়ে একটা কোনো মতৈক্য এতদিনে ঘটে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এতদিন পর এইটুকু বোঝা যাচ্ছে যে সে-মতৈক্য কোনোদিনই ঘটা সম্ভব নয়।

কেন সম্ভব নয়?

জাতি-ধারণাটার মধ্যে যুক্তিসঙ্গত কারণেই ইয়োরোপীয় এনলাইটেনমেন্টের ধারণা ও বিচারশীল জ্ঞানের ধারণাটা মিশে আছে। শুধু মিশে আছে বললেও হবে না। এ দুটো ধারণা

এমন লেপ্টে আছে যে আলাদা করতে হলে অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে। আলাদা করা বা আলাদা হওয়া তো সম্ভবই নয়, বরং, এই দুটো জীবন আরো এক পরতে ঢাকা পড়ছে যে, হতে পারে, দুটো মিলিয়ে একটা জীবন হয়ে গেল। এনলাইটেনমেন্ট তো একটু সাবেকি ব্যাপার। হালের আধুনিক ও উত্তর-আধুনিক, তত্ত্ব যদিও অর্থনীতির পুঁজি-সংগ্রহ ও উদ্বৃত্ত শ্রম-তত্ত্বরূপের প্রতিষ্ঠিত যুক্তি অগ্রাহ্য না করেও, ঘটনাগুলির নতুন নামকরণ মাত্র।

সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, শ্রমিক, উদ্বৃত্ত শ্রম—এইসব শব্দ যেন বড় বেশি পুরনো। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় সর্বাধিকতম অনুসন্ধান ও আলোচনার বিষয় একটিই—দাঙ্গাটা শুরু করল কোন পক্ষ। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসাতেও এইটুকু আক্কেল কেউই দেখায় না যে বলবে, দাঙ্গা ঘটার আগেই দাঙ্গা শুরু না-হলে দাঙ্গা ঘটে না। দাঙ্গা একটা উপায় বলে মেনে নেয়ার হাওয়া থেকেই দাঙ্গা শুরু হয়। সেই উপায়, বিচিত্র সব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারে—পরম নিঃস্বার্থ ও নৈর্ব্যক্তিক উদ্দেশ্য, যেমন একটা মশজিদ বা মন্দির বানানো, যেমন একটা ফুটবল টিমকে আই এফএর লিগ থেকে বাদ দেয়া, যেমন কয়েকটি দাড়ি-না-গজানো হিন্দু ছেলে মুসলমান মেয়ে সেজে, হিন্দুপাড়ায় গিয়ে হিন্দু ছেলেদের উশকোয়, তাদের পেছনে লাগতে। এমন সব ঘটনা থেকে দাঙ্গা বেঁধেছে, নামকরা সব দাঙ্গা। দাঙ্গা যদি উপায় হিশেবে গ্রাহ্য হয়, তাহলে তার লক্ষ তো কত বিচিত্র হতে পারে। একটি হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করার জন্য একটা দাঙ্গা বাধানো হতে পারে। সে-দাঙ্গায় মেয়েলুটের ঘটনা দাঙ্গা বিষয়ক বিবেচনায় একটা স্তরান্তর ঘটায়। সত্যিকারের মেয়ে লুটের ঘটনা একবার ঘটলে, বা রটলেও, ছেলেটি ও মেয়েটির যুগল-সম্মতিতেও এমন ছলনাময় দাঙ্গা ঘটতে পারে। খুব বিখ্যাত উর্দু গল্প আছে। পাঞ্জাবে মেয়েলুটের অভিযোগ মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমন গরম করে তুলেছিল হাওয়া যে নবগঠিত দুই রাষ্ট্র ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তানের দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে চুক্তি হয় সামরিক বাহিনী গ্রামে-গ্রামে গিয়ে এই লুণ্ঠিত মেয়েদের উদ্ধার করবে ও তাদের বাড়িতে ফিরিয়ে আনবে। একটি গল্পে এমন একটি লুণ্ঠিত মেয়ে উদ্ধার-বাহিনী আসা সত্ত্বেও ফিরল না তার নিজের বাড়িতে, থেকে গেল সেই লুঠেরা পরিবারেই। গল্পটির যাদু আছে এইখানে—লুঠ হওয়া আর উদ্ধারের মাঝখানে যে সময়টা রাষ্ট্রের আওতা থেকে খসে পড়েছে দুটি মানুষের মধ্যে, তখন তো আর কেউ লুঠেরাও নয়, লুঠের মালও নয়। আর-একটি গল্পে এমন এক বধূকে সামরিক বাহিনী উদ্ধার করে পৌঁছে দিল তার স্বামীগৃহে আর তারপর শুরু হল সেই দম্পতির নতুন করে তাকানো, নতুন করে ছোঁয়া।

প্রশ্নটা যদি হত—দাঙ্গা থামে কেন ও কখন, তাহলে এই গল্পগুলিতে হয়তো একটা সংকেত খোঁজা যেত। কিন্তু দাঙ্গা ঘটে কেন—এমন প্রশ্নের জবাবে একটা বিস্ময়ের নেশাতুর ঘোর আমাদের পেরতে হয়। যারা দাঙ্গা করছে, তাদের কোনো ধর্মেই তো দাঙ্গার অনুমোদন নেই। বা দাঙ্গার সময় সেই অনুমোদন খুঁজে বের করা হয় শাস্ত্র থেকে—ন্যায়যুদ্ধ ও জেহাদ। ধর্ম কথাটাকে সবচেয়ে সোজা করে নিলে তো দাঁড়ায় একটি বিশ্বাস ও সেই বিশ্বাসের সঙ্গে বাঁধা কিছু ব্যবহার। বিশ্বাস না-থাকলে কোনো তত্ত্ব দানা বাঁধে না। দাঙ্গা বাঁধে কেন—এমন প্রশ্নের উত্তরখোঁজার সর্বোত্তম শর্টকাট ধর্মের ওই তত্ত্বটিতে পৌঁছনো। ওই যে-বিশ্বাস তত্ত্ব তৈরি করেছিল তাতে তো এটাই স্পষ্ট হওয়ার কথা—বিশ্বাসের ফলে কী কী করা সম্ভব ও কেমন করে করা সম্ভব: সম্ভবপর আর ইচ্ছাপূরণকে দৈনন্দিনের আচরণে মেলানো যায় না, যখন, তখনই দাঙ্গা ন্যায্য বলে মনে হয়।

মেলানো হয়তো যায়, যদি দুঃসাধ্য আত্মনিগ্রহের ভিতর যেতে হয় আর যদি ঈপ্ট হয় প্রমাণাতীত কিছু পাপমুক্তি ও তার জন্য প্রাপ্য শাস্তি থেকে মুক্তির জন্য পৃথিবীর সব ধর্মেই

দুঃসাধ্য সব ব্রতের প্রায়শ্চিত্ত আছে। দণ্ডী কেটে-কেটে তীর্থদেবতার কাছে যাওয়া। নিরক্ষীয় রৌদ্রে নিরম্বু রোজাপালন। লেট-এর উপোস। শিবরাত্রির উপোস। নমাজ আদায়। তিন আহ্নিক বা সন্ধ্যা। ইচ্ছামৃত্যু। অহিংসা।

শেষ পর্যন্ত—বিশ্বাসের জন্য কী কী করা সম্ভব ও কেমন করে করা সম্ভব—সম্ভাবনা আর সম্ভব করে তোলা—পরস্পর থেকে আলাদাই হয়ে যায়। এই দুইয়ের কোনো অভিন্নতা থেকে ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মাচরণ তৈরি হয় না।

এনলাইটেনমেন্টের আধুনিকতার যে-ঘের থেকে আমরা বেরতে চাই সেই ঘেরের ফাঁকফোঁকর খুঁজতে-খুঁজতে আমরা ভেবেই ফেলি—জাতীয়তা নিয়ে সম্মতি তৈরির জন্য সব সাক্ষ্যপ্রমাণ জড়ো করা হয়েছে ও সেগুলোকে সাজানো হয়েছে কোনো নিয়মে, কোনো কাঠামোতে, কোনো গুণাগুণ বিচার করে। যেন, তেমন কোনো পরীক্ষা সম্ভব! যেন, এমন কোনো পরীক্ষার ফলে আমরা জানতে পারব সম্ভাবনার কতটা সম্ভব ছিল বা আছে। সেই সম্ভব জানা গেল কী করে ও সেই সম্ভবকে সম্ভব করে তোলার কর্মসূচির নৈতিকতা প্রমাণের জন্য কোনো পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে কী না এটাও কি আমাদের পক্ষে পরীক্ষণ সম্ভব? জাতীয়তাবাদ আধুনিক হতে চায়। সেই কারণে এই আধুনিকতার যে-সর্বমান্যতা তৈরি হয়েছে, সেটা মানা ছাড়া তার গতি নেই। সে-আধুনিকের জ্ঞানের কাঠামো তৈরি হয়েছে এনলাইটেনমেন্ট-উত্তর যুক্তিবাদ ও ধনতন্ত্রের সুতিকাগৃহে। তাই তার আধুনিকে নিজেরই বিরুদ্ধপক্ষ হয়ে যাচ্ছে।

গান্ধীজি এই সম্ভবের একটা ঠিকানা দিয়েছিলেন : রামরাজ্য। সেখানে পৌঁছুবার একটা পথও বাৎলেছিলেন : শত্রুর প্রতি অহিংসা ও শত্রুর হিংসার পরোক্ষ প্রতিরোধ।

ফলে, তিনি তাঁর এক বিরুদ্ধপক্ষ তৈরি করেছিলেন জিন্না। জিন্নাও এই সম্ভবের একটা ঠিকানা দিয়েছিলেন। পাকিস্তান। সেখানে পৌঁছুবার একটা পথও বাত্‌লেছিলেন! প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, ডাইরেক্ট অ্যাকশন।

সেই সম্ভবকে গান্ধিজির অনুচেতনা দিয়ে জানতে দক্ষিণ আফ্রিকায় কঠিন আত্মনিগ্রহের মধ্যে তাঁকে যেতে হয়েছিল। সেই কঠিন আত্মনিগ্রহে সবাই দেখল গান্ধীজির সারাটা শরীর নরকের আগুনে ঝলসে গেছে। তাই তিনি হয়ে উঠ[illegible]ন বিশ্বাস।

জিন্নাও [illegible]র জীবনে আত্মনিগ্রহের গোপন আক্রমণ সইতে-সইতে আরো আত্মনিগ্রহের দিকে যাচ্ছিলেন। জিন্নার এই আত্মনিগ্রহে ছিল তাঁর একার। কোনো প্রতিনিধিত্ব ছিল না তাঁর। স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন। স্ত্রীর অকাল মরণের কোনো প্রতিকার তাঁর হাতেও ছিল না, মাথাতেও না। একমাত্র মেয়ে তাঁকে একলা ফেলে বিয়ে করল। এরও কোনো প্রতিকার তাঁর মাথাতেও ছিল না, হাতেও ছিল না। রাজনীতি করতেন, গান্ধীজি সে রাজনীতিকে করে দিলেন শিকড়হীন, অবান্তর ও বাতিল। এরও কোনো প্রতিকার তাঁর হাতেও ছিল না, মাথাতেও ছিল না। টাকা-পয়সা ছিল তাঁর ইচ্ছাধীন, তাঁর বৃত্তিসাফল্যের গুণে। সে-সাফল্য ছিল এতই সহজে পাওয়া যে তাতে তাঁর আত্মনিগ্রহের কোনো নিরাময় ছিল না। পরন্তু, তাঁর শরীরের ভিতরের ব্যাধি যে তাঁকে প্রতিটি দিন মৃত্যুর দিকে ঠেলে ও টেনে নিয়ে যাচ্ছে, সেটা জেনেও, তাঁকে ব্যবহার করতে হত বিপরীত—তিনি মৃত্যুরোগাক্রান্ত এটা বাইরের লোক জানলে কেউ আর তাঁকে বিশ্বাস করবে না। সেখানে গান্ধীজি বারবার অনশনে নিজের মৃত্যুকে করে তুলেছেন চরম।

মহাদেশ বিভ্রাট ও যুদ্ধবিভ্রাট ৪২

১৬২

দুনিয়া সম্পর্কে মানুষজনের নানারকম ধারণা থাকা স্বাভাবিক। তার ক্ষেতের শেষে যেখান থেকে বৃষ্টি আসে জ্যৈষ্ঠ মাস থেকেই ও রোদ আসে অঘ্রান মাস থেকেই সেখানে পৃথিবীর শেষ। বেশ, তা যদি না হয় মাইল-দশ এক মাঠ পেরিয়ে লোহার দুটো লাইনের ওপর আগুন-ওগরানো একটা মেশিন আরো দুটো কামরা টানতে-টানতে আসে যেখানে সেটা তো পৃথিবীর শেষ না হয়ে পারে না—লোহার লাইনের চাইতে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে?

দুনিয়া সম্পর্কে দেশবিদেশের সরকার বা সম্রাটদের ধারণাও এরকমই, তবে ওসারে-বহরে একটু আলাদা। যেমন, ভারতের দক্ষিণের মহাসাগরে কালির ছিটের মত যেসব হাজার দ্বীপপুঞ্জ আছে তার মালিকানা চিরকালের জন্য স্থির হয়ে ছিল। যেমন, সোভিয়েত-জার্মানির সীমান্ত-ঘেঁষা উক্রেইনের রাজধানী কিয়েভে সাড়ে ছয়লক্ষ রুশ সৈন্য আর তাদের ব্যবহারের জন্য রাখা অপরিমেয় অস্ত্র কী করে ধরা পড়ে জার্মান বাহিনীর হাতে? যেমন, সিঙ্গাপুরের পেছনে যে মালয়ের জঙ্গল ও পাহাড় ব্রিটিশরা চিরকাল সিঙ্গাপুরের পেছন বলেই জেনে আসছিল, যেন, ওটা যদি সিঙ্গাপুরের সম্মুখভাগের কোনো টুকরো বা পার্শ্বভাগও হত তাহলে তো ইংল্যান্ডই সেটা ব্যবহার করত, জাপানিরা সেই পাহাড় ও জঙ্গলকেই রাজপথের মতো ব্যবহার করল কী করে? যেমন, ব্রিটিশ ভারতের রেডিয়োতে রেঙ্গুন থেকে ব্রিটিশ বাহিনীর উইড্রয়াল ঘোষণার (৯মার্চ, ১৯৪২) আগেই রেঙ্গুন খালি করে দেয়া হয়, তারপর রেঙ্গুনের ওপর জাপানিরা দুদিন ধরে বোমা ফেলে আর সেই বোমা-ফেলার আগেই ব্রিটিশ বাহিনী বার্মা ছেড়ে ভারতের দিকে পালানোর সময় নানা জায়গায় আগুন লাগিয়ে বার্মা পুড়িয়ে ছাই করে দিতে-দিতে পেছয়। তার মধ্যে পেট্রলের খনিও ছিল। রেঙ্গুন-পোড়ানো সেই আগুন না কী চট্টগ্রাম থেকে দেখা যাচ্ছিল। আসলে সেটা ছিল বার্মাশেল পেট্রল কোম্পানির টাওয়ারের আগুন, যুদ্ধ ছাড়াও চট্টগ্রাম থেকে দেখা যেত। বার্মা আর ভারতের মধ্যে তফাৎ কী? কোনো সীমান্ত আছে? ভারত থেকে বার্মায় যাওয়ার কোনো স্থলপথ আছে? জাহাজ কোম্পানিগুলি তেমন স্থলপথ কখনো তৈরি করতে দেয়নি।

রেঙ্গুন থেকে ইম্ফল ও চট্টগ্রাম যথাক্রমে ৬০০ মাইল ও ৮০০ মাইল। বার্মার জঙ্গল দিয়ে পালাতে পারলে আপাতত ভারত। জঙ্গল ঘন, প্রথম বর্ষা শুরু হয়ে গেছে, জঙ্গলে প্রধানত বিষধর সাপ আর উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত নদী, ঘাড়ের ওপর শ্বাস ফেলছে জাপানী সৈন্য যাদের কাছে এই জঙ্গল যেন তাদের ইস্কুলের মাঠ। জেনারেল স্টিলওয়েল ও জেনারেল আলেকজান্ডারের এই পশ্চাদপসরণকে পরে ব্রিটিশ সামরিক ইতিহাসে নাম দেয়া হয়, 'এপিক অব এ রিট্রিট'—পলায়মান মহাকাব্য।

১৯৪২-এর মে মাসের মধ্যেই ব্রহ্মপর্যন্ত পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে জাপানের নিঃসপত্ন আধিপত্য। এত কম সময়ে, ১০০ দিনে, এত বড় সাম্রাজ্য বিস্তার-এর আগে বা পরে কখনো ঘটেনি। ব্রিটিশ, ডাচ, মার্কিন সমস্ত পুরনো ও নতুন দিগ্বিজয়ী, সমুদ্রজয়ী ও সূর্যাস্তহীন সাম্রাজ্য, জাপানী বাহিনীর কাছে শুধু যে হেরে গেল, আত্মসমর্পণ করল তাই নয়। পাঁচ-শ বছর ধরে সমুদ্র শাসনের যে-পুরাণ ইয়োরোপ রচনা করেছিল ও তার ওপর ভিত্তি করে, যুক্তি-বিজ্ঞান, বিদ্যা-বাণিজ্যের নতুন যে সংজ্ঞা, সারা পৃথিবীর অদ্বিতীয় হয়ে উঠেছিল, সে সব একেবারে বুদ্বুদের মত ফেটে গেল। জাপানীদের যুদ্ধলক্ষ, যুদ্ধপদ্ধতি, গতিবেগ, সহ্যশক্তি, ব্যূহভেদ কৌশল,

অননুমেয়তা, শত্রুর আন্দাজ জব্দ করার চতুরতা ও যুদ্ধ প্রচলিত সমস্ত রীতিনীতি লঙ্ঘন, ভারত পর্যন্ত একটা খুশির হাওয়া ছড়িয়ে দিয়েছিল। আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছিল। সৈন্য ও বেসামরিক উদ্বাস্তু মিলিয়ে, 'পোড়ামাটি' 'উইড্রয়াল', 'ডিনায়াল', 'খাদ্য প্রক্রিয়োরমেন্ট' যে যুদ্ধ-আনুষঙ্গিক ঘটনা তা প্রথম জানা গেল। ৪-লাখের ওপর ভারতীয়, পারিবারিক-উদ্বাস্তু। তারা যে-ইতিহাস ও রাজনীতি দুর্গম বার্মা রোড দিয়ে নিয়ে এল শেষ পর্যন্ত ভারতে, প্রধানত আসামে ও বাংলায়, তাতে যুদ্ধ থেকে নামপরিচয় খসে গেল—জাপান, ব্রিটিশ ইত্যাদি। তাতে যুদ্ধের আতঙ্ক ও ধ্বংস হয়ে উঠল একমাত্র সত্য। উপকূলের পাঁচ জিলায়—ঢাকা-ফরিদপুর-বরিশাল-চট্টগ্রাম-নোয়াখালিতে যুদ্ধ যে কতটাই অসম্মান ঘটাতে পারে সেটা বাস্তব হয়ে উঠল।

হয়তো এটাও একটা কারণ, ওই পাঁচটি জিলার সমস্ত নৌকো পুড়িয়ে ফেলার, সমস্ত খাদ্যশস্য সরকারের হাতে নেয়ার ও উপকূল ও নদীতীর থেকে সমস্ত লোকজনকে অন্তত বিশ মাইল দূরে সরিয়ে দেয়া শুরু হল যখন, তখন তেমন কোনো আপত্তি জোট বাঁধল না। অথচ এই জায়গাগুলোর মানুষজন কখনো হিন্দু হয়ে, কখনো মুসলমান হয়ে কত জোট বেঁধে গত তিন-চার বছরে কত দাঙ্গা ও খুনোখুনি করেছে। আইনসভার নথিপত্রে মেম্বারদের বক্তৃতায় সামরিক অত্যাচারের বিবরণ কি কোনো প্রমাণ হতে পারে যে এঁরা এই মানুষজন, এই সব অসম্মান ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাদের ভিতরের কোনো ক্রোধ, হিংসা ও ঘৃণা থেকে নিজেদের মস্তিষ্কের কোশে-কোশে এমন আগুন জ্বালিয়ে তুলেছিল যাতে ছাই হয়ে গিয়েছিল অন্য সব প্রতিবর্ত-ভয়-আশঙ্কা-মান্যতা আর দাউ দাউ হয়ে উঠেছিল ঐ ক্রোধ-হিংসা-ঘৃণা, সব মানুষের মাথায় একই সঙ্গে, যেমনটি হয় না মানুষের মধ্যে, যেমন হয় পশুর পালে, আলাদা করে একটি পশু ভয় পায় না, আলাদা করে কোনো পশু পালায় না, আলাদা করে কোনো পশু আত্মরক্ষার কারণেও আক্রমণ করে না, সেই পলায়মান পশুর পাল আগুন থেকে বা বন্যা থেকে সমবেত গতিতে পালাতে-পালাতে যেন একটা নীতির প্রতি বিশ্বাস তৈরি করতে থাকে—একা কোনো আত্মরক্ষা নেই, আত্মরক্ষা আছে দঙ্গলে, দঙ্গলই সেই আত্মরক্ষায় আক্রমণ করে, দঙ্গলই সেই আত্মরক্ষায় একসঙ্গে পালায়। ভোটের আগে দাঙ্গা, সেনসাসের দাঙ্গা, এলিটদের দাঙ্গা, জনসাধারণের দাঙ্গা, চাপানো দাঙ্গা, উথলনো দাঙ্গা, কৃষকের নিহিত বি[illegible] বিস্ফোরণের দাঙ্গা, কৃষকের নিহিত ধর্মানুগত্য থেকে আস্তিক্যের বজ্রপাতের দাঙ্গা—দাঙ্গ[illegible] এত শ্রেণীভাগ হয়? যুদ্ধের অসংখ্য চূড়ান্ত মুহূর্তে একজন সৈন্য তার প্রতিপক্ষের সামনে যখন শেষ আঘাতটি হানে তখন কি সেই যুদ্ধের শ্রেণীভাগ থাকে—কোন পক্ষ কোন দেশ, কার কী কৌশল, কার কী উদ্দেশ্য, কার কত সৈন্য, কার কত অস্ত্র? হ্যাঁ, এই সব থেকেই যুদ্ধ ঘটে, যুদ্ধের বিচারও হয় এই সব দিয়েই। সেই হেতু নির্ণয় ও ফলবিচার তো যুদ্ধ নয়। যুদ্ধ তো শেষ পর্যন্ত সেই অজস্র চরম ক্ষণটিতে যখন দু-জন মানুষই একমাত্র চায় তার আঘাতটাই যেন শেষ আঘাত হয়। প্রতিপক্ষকে হত্যা না করে যুদ্ধ জয় ঘটে না। সেই মাত্র একজন সৈন্যের পতন ছাড়া বাহিনীর জয় ঘটে না। বাহিনীর জয় ছাড়া দেশের জয় ঘটে না। দেশের জয় ছাড়া কোনো জোটের জয় ঘটে না। জোটের জয় ছাড়া কোনো মতের জয় ঘটে না। মতের জয় না ঘটলে যুদ্ধের নামকরণ হয় না—'ভারত ছাড়ো'ও না, 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'ও না।

৪২-এ বাংলায় যুদ্ধ এসে গেছে উলটো পথে। শত্রু যদি পেছু ধাওয়া করে তাহলে সে যেন খেতে না পায়, জল না পায়, বসত না পায়, মানুষ না পায়। দ্বীপপুঞ্জের যুদ্ধগুলিতে জাপানের কাছে এমন সব হার হারতে হল, যা চিরকালের জন্য ইতিহাসে ব্রিটিশ ও ডাচ সাম্রাজ্যের চরম লজ্জার উদাহরণ হয়ে থাকল। সিঙ্গাপুর পতন, থাইল্যান্ড পতন, ইন্দোচীন পতন, মালয় পতন,

বার্মা পতন, হংকং পতন—কোনো একটি জায়গাতেও ব্রিটিশ সেনাবাহিনী একটা হোঁচট-খাওয়ার মত বাধাও জাপানীদের দিতে পারেনি। এমন কী চোখের সামনে ব্রিটেনের ভুবনবিখ্যাত যুদ্ধজাহাজ 'প্রিন্স অব ওয়েলস' আর তার সঙ্গী জাহাজটি ব্রিটেনের সবচেয়ে বেশি প্রচারিত নৌদুর্গ সিঙ্গাপুরের খালে ডুবিয়ে দিল জাপানীরা। এই এক-একটি যুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্য জাপানের যুদ্ধবন্দী হয়েছে হাজারে-হাজারে। যুদ্ধে যুদ্ধবন্দীর সংখ্যা দিয়ে বোঝা যায়—যুদ্ধ ছেড়ে পালিয়েছে না যুদ্ধের কারণে অবস্থান পালটেছে। জাপানের হাতে যুদ্ধবন্দী ব্রিটিশ সৈন্য ও ব্রিটিশ ভারতীয় সৈন্যের সংখ্যা নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ করে—ব্রিটেন কোনো রকম যুদ্ধের চেষ্টাই করেনি। ১৯৪২-এর ২৮মে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লি থেকে বার্মা ও ভারতসহ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সেনাপতি লর্ড ওয়াভেল ঘোষণা করেছিলেন যে তখনকার মত যুদ্ধ মুলতুবি থাকল। এর দিন সাতেক আগে জেনারেল আলেকজান্ডার ও জেনারেল স্টিলওয়েল বার্মা রোড শেষ করে যথাক্রমে আসাম ও ইম্ফলে অর্থাৎ ব্রিটিশ ভারতের সীমায় ঢুকতে পেরেছিলেন।

৪২-এর জুন থেকে জাপান যেন উধাও হয়ে গেল। রুটিন অনুযায়ী ও সাম্প্রতিক যুদ্ধে জাপানের প্রমাণিত মতিগতি অনুযায়ী একটা হিশেব ছিল—জাপান হয় অস্ট্রেলিয়ার দিকে যাবে, না-হয় ভারতে ঢুকবে। যেন, এমন একটা অনুমান করতে রাষ্ট্রনায়ক বা সেনানায়ক হতে হয়। জাপান যে যুদ্ধে নামবে, সেটাই তো এরা বিশ্বাস করেনি। আত্মরক্ষার ব্যস্ততায় যুদ্ধের সময় প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্য সম্পর্কে শুধুই সন্দেহ করা যায় মাত্র, কিছুই নিশ্চিত হয় না, মন দিলেও কাজের সময় মনে পড়ে না। জাপান মাত্র ১০০ দিনে এত কম খরচায় এত বড় একটা সাম্রাজ্য পেয়ে গিয়েছিল এটা না-ভাবাটাই বেয়াক্কেলে যে আসাম হয়ে জাপান বাংলা দিয়ে ভারতে ঢুকবে না। এতই যুক্তিযুক্ত ছিল এই সিদ্ধান্ত যে আসাম থেকে বাংলা হয়ে ওড়িশা—মাদ্রাজ হয়ে সিংহলের মাথা পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের উপকূলভাগ জুড়ে জাপানের ভারত প্রবেশ নিয়ে উদ্ভট সব গুজব রটতেই থাকে। সিংহলের ভুতিকোরিনে, চট্টগ্রামে ও কলকাতায় ক-দিন বোমা ফেলে জাপান তাদের ভারতীয় কর্মসূচি ঘোষণাও করেছিল যেন। ফলে, গুজব এতটাই পাকিয়ে ওঠে যে জাপানী প্যারাসুট বাহিনীর সঙ্গে অনেকেরই দেখা হয়ে যাচ্ছে এখানে-ওখানে, যখন-তখন। জাপানের গুপ্তচরদের রিস্টওয়াচ এমন যে সেটা দিয়ে খবর পাঠানো যায়। জাপানীদের সুইসাইড স্কোয়াড নাকী প্লেন নিয়ে যুদ্ধ-জাহাজের চোঙের মধ্যে ঢুকে যায়, পূর্ব সীমান্তে নাকী জাপানী গুপ্তচররা গ্রামাঞ্চলে জাপানী নোট দিয়ে যাচ্ছে তারা, যখন আসবে তখন যা কিনবে তার আগাম হিশেবে।

গুজব বাস্তবের চাইতেও শক্তিমান। মাদ্রাজে সরকারি খবর ছুটল যে জাপান মাদ্রাজ-উপকূলে নৌ সৈন্য নামিয়েছে ও তাদের সঙ্গে উপকূল রক্ষী বাহিনীর গুলি বিনিময় গত রাত্রি থেকে চলছে। মাদ্রাজ উপকূল বলতে পুরো করোমণ্ডল উপকূল। কোথায় জাপানীরা নেমেছে, সেই জায়গাটির নাম সঠিক জানা যাচ্ছিল না। কিন্তু ব্রিটিশ-ভারত কোনো অবস্থাতেই পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জগুলির মত পলায়ন করে বাঁচতে পারবে না। কারণ ভারত তখন সামরিক দিক থেকে একটি কেন্দ্র। বোমা তৈরির বেশ কিছু কাঁচামাল ভারত থেকে যেত। আরো অনেক কিছু যুদ্ধ-সংশ্লিষ্ট জিনিশ। সুতরাং উপকূলে সম্ভাব্য জাপানী নৌসৈন্য নামার খবর পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে 'আক্রান্ত হলে অবশ্য করণীয়' এমন একটা সামরিক নির্দেশপত্র অনুযায়ী মাদ্রাজ বন্দর ও সরকারি দপ্তর স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া হল, নিয়েই যাওয়া হল ও সরকার সেনাবাহিনীকে মাদ্রাজ শহরের দায়িত্ব নিতে বলল। সেনাবাহিনী, এমনকী গুজবটাও শোনেনি।

দলবিভ্রাট নীতিবিভ্রাট

১৬৩

ঢাকা দাঙ্গার সময়ই হিন্দু মহাসভা এক রিলিফ ফান্ড খুলে বসল। ইতিমধ্যে কংগ্রেসের 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি'—নীতির ফলে, এত বেশি হিন্দু বাঙালি-অবাঙালি ব্যবসায়ীদের ব্যাপক সমর্থন পেয়ে গেল যে মহাসভা ঘোষণাই করে দিল, কোনো অবস্থাতেই তারা তাদের রিলিফের সংগ্রহ সরকারের হাতে বা অন্য কোনো কমিটির হাতে তুলে দেবে না। রিলিফের ব্যাপারে তারা সরকারি কোনো নীতি বা নির্দেশও মানবে না। ১৯৪১-এর সেনসাসের সুযোগে প্রায় সমস্ত জিলা কংগ্রেস কমিটি, হয় পুরোপুরি, না-হয় অংশত, হিন্দু হয়ে গেল। সুভাষ বোসকে কংগ্রেস থেকে তাড়িয়ে দেয়ায় বাংলায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির হাল খুবই খারাপ দাঁড়িয়েছিল। কংগ্রেসের সদস্য ও সমর্থক সকলেই যে সুভাষ বোসের পক্ষে ছিলেন, মোটেই তা নয়। সুভাষ বোসের সম্পূর্ণ বিরোধী রাও কোনো বড়সড় মানিগণ্যি নেতা পাচ্ছিলেন না যাকে ঘিরে তারা দল গুছতে পারে। তার ওপর 'বেঙ্গল টেন্যান্সি অ্যাক্ট (অ্যামেণ্ডমেন্ট)' ও 'বেঙ্গল মহাজনি অ্যাক্ট (এ্যামেন্ডমেন্ট)' এর বিল এসে গিয়েছিল। আইনসভায় কংগ্রেস দলের নেতা হিশেবে শরৎ বোসের পক্ষে সম্ভবই ছিল না—রায়ত ও জোতদারের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে বা শুধু জমিদারদের স্বার্থের কথা ভেবে এই বিল দুটির বিরোধিতা করা। তার ফল হত কংগ্রেস কৃষকবিরোধী বলে একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়ত। বোঝার ওপর শাকের আঁটি হয়ে এল 'কলকাতা মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট' ও 'বাংলা সেকেন্ডারি এডুকেশন অ্যাক্ট' বিল দুটি। কোনো বাঙালি হিন্দুর বুঝতে বাকি থাকল না—সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও বাংলা প্রদেশে হিন্দুরা যে প্রভুত্ব পেতে অভ্যস্ত, লেখাপড়া জানা বাবু বলে, বামুন বলে, ও গ্রামসমাজের কর্তা বলে, আঘাতটার লক্ষ সেই প্রভুত্ব। প্রভুত্বের সঙ্গে তো জড়ানো থাকে সরকারি খাতির। পুলিশ ইনস্পেক্টার থেকে এসপি কেউই এসে আর হিন্দুকর্তাদের বাড়ি গেস্ট হবে না। বাড়ির বার্ষিক পূজায় এস ডিও বা ডিএম, অন্তত একদিন, আসবেন না। উচ্চবর্ণ হিন্দু এত দিন ধরে লালিত হয়েছে যে-আধিপত্য ও আনুগত্যের আড়াঠেকায়, তাতে এ-আঘাত সে-সমাজের পক্ষে অস্তিত্ববিদারক। বাংলার হিন্দুদের অস্তিত্ব বিপন্ন। ৪১-এর সেনসাস-নোটিশ, ইতিমধ্যেই ঘটে-যাওয়া ঘটনাকে আইনের স্বীকৃতি দিচ্ছে। হিন্দু বাঙালিবাবু যে কংগ্রেস থেকে সরে যাচ্ছে—এ আর নতুন দুশ্চিন্তার কথা ছিল না। জমিদারদের কাছ থেকে জমিদারির ট্যাক্স-খাজনা আদায় কমতে-কমতে খুব বিপদের জায়গায় চলে গেল। কংগ্রেস কৃষক ঋণ বা সালিশি নিয়ে আইনসভায় মুখ ফুটে কিছু বলে বসলে, হিন্দু-উচ্চবর্ণ ও জমিদার যে কংগ্রেস ছেড়ে চলে যাবে সে-বিষয়ে কারো মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। কংগ্রেসের কায়েমি হিন্দু সমর্থকরা যাতে ছেড়ে না যায়, শরৎ বোস সেই মতলবেই আরো সব বিপ্লবী কথা বলে আইনগুলিকে ভেস্তে দিতে চেষ্টা করছিলেন। তাতে হিন্দুরাই তাঁকে কমিউনিস্ট বলে গাল দিতে লাগল। কংগ্রেসিরা কোনো ভোটেই প্রার্থী খুঁজে পায় না। নৌসের আলির মত নেতা হেরে গেলেন, দুটো আসনেই। কংগ্রেসের যাঁরা জমিদার-নেতা তাঁরা কৃষক সমিতির 'না-এক পাই, না-এক ভাই' শ্লোগানে আঁতকে উঠলেন। যশোর কংগ্রেস কমিটি, হুগলি জিলা জমিদার সংস্থা, বর্ধমান জিলার অনেকগুলি কংগ্রেস লোক্যাল কমিটি, মেদিনীপুর কংগ্রেস কমিটি, অনেক

রাজবন্দী, কলিকাতা ব্রাহ্মণ সভা, কংগ্রেস-নেতা বলে প্রতিষ্ঠিত অনেক খ্যাতিমান মানুষ—কংগ্রেসের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠলেন। তাঁদের সেই বিরক্তির মূল কারণ ছিল—কংগ্রেসের বা উচ্চবর্ণ হিন্দুদের, বা ছোট-বড় ভূস্বামীদের, বা হিন্দু ব্যবসায়ীদের, বা হিন্দু অবাঙালি ব্যবসায়ীদের, বা শিক্ষিত-বলে-চাকরি-পাওয়া হিন্দু বাঙালিদের, বা ডাক্তার-ইনজিনিয়ার-উকিল এই সব পেশার হিন্দু বাঙালিদের ক্রমাগত ছোট ও খাটো হয়ে যাওয়া, রাজনীতি- ব্যবসাবাণিজ্য-ভূসম্পত্তি সব দিক দিয়ে ছোট ও খাটো হয়ে যাওয়া। আত্মরক্ষার এমন শ্বাসরোধী বোধ, যেন একটা টানেলে বেরবার পথটা সিল করে দেয়া হয়েছে, হিন্দু-বাঙালি মনে-ভয় শারীরিক ভয় হয়ে উঠছিল। সত্য হয়ে উঠেছিল। একা বা অসময়ে বাজারে যেত না কেউ। রাতে ঘরে কেরসিনের ডিম লাইটে ভরসা থাকছিল না। বাঙালি বলে সর্ব ভারতীয় রাজনীতি ও অর্থনীতিতে বাঙালি কোনো পাত পাচ্ছিল না। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মত কেন্দ্রীয় সংগঠনে কোনো বলবার মত বাঙালি নেতা নেই। মুসলিম লিগেও এক হকশাহেব ছিলেন, তাঁকে সরিয়ে দিলে কেউ নেই। হিন্দু মহাসভাতেও এক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আর এন-সি চট্টোপাধ্যায় বাঙালি।

বাঙালি হিন্দুর এই দম-আটকানো হাঁসফাঁসে রাজনীতির বা তত্ত্বের লেবেল সেঁটে দেয়া যায় না। লেবেল তো সাঁটা যায় যদি কোনো তাক থাকে বা খোপ থাকে। হিন্দু বাঙালিরা কেউই অন্ধকূপের বাইরে ছিল না। সরকারি ভাষায় যাকে বলা হত 'হিন্দু প্রেস', যারা নিজেদের বলত 'ন্যাশনালিস্ট প্রেস,' যারা নিজেদের যুক্তিবাদী ও সাম্প্রদায়নিরপেক্ষ রাজনীতির প্রচারক মনে করত—তাদের সবার শরীরে যে হিন্দুরক্তই বইছে তা বোঝা যেত যখনই হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সমাজ ঘটিত কোনো বিষয়ের সঙ্গে সরকার ও জনসাধারণ জড়িয়ে পড়ত। তখন তারা প্রত্যেকেই, 'লিবার্টি'ই হোক আর 'অ্যাডভান্স'ই হোক, 'ফরোয়ার্ড'ই হোক আর 'অমৃতবাজার'ই হোক, 'আনন্দবাজার'ই হোক আর 'হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড'ই হোক, মুখব্যাদান করে হিন্দুধর্মের সনাতন ঐতিহ্যের কথা ও মহান উত্তরাধিকারের কথা এতই চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলত যে ছাপানো হরফগুলি যদি কণ্ঠস্বর হত, তাহলে কারো কোনো কথাই বোঝা যেত না—একটা প্রাকৃতিক সর্বনাশের প্রবল আওয়াজ ছাড়া।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়তুল্য আওয়াজের কোরাসে কিন্তু এমনও অনেকে ছিলেন যাঁরা হিন্দু বলে কোনো গৌরবে বিশ্বাসই করতেন না, দীর্ঘ জীবনযাপনে যাঁদের কোনো হিন্দু সংকীর্ণতার পক্ষ সমর্থন করতে হয়নি ও যাঁদের ব্যক্তিগত আর সমাজগত পরিচয়ের সর্বাধিকতম মূল্য ছিল এই যে তাঁরা বুদ্ধির মুক্তিতে বিশ্বাস করেন। যেমন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়। এমনকী রবীন্দ্রনাথও। তিনি তাঁর শেষ শয্যা থেকেও প্রস্তাবিত মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সম্পর্কে আপত্তিতে বাঙালি হিন্দুর সংস্কৃতিকেই বাঙালি সংস্কৃতি ধরে নিয়ে কথা বললেন। তাঁরাও কিন্তু হিন্দু পরিচয়ের সম্মানহানিতেই তাঁদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন, বলেছেন, এটা অস্বীকারের তো কোনো উপায় নেই যে হিন্দু সমাজে আমার জন্ম ও লালন। নিজের জন্ম ও লালনের সমাজ ও সংস্কৃতিকে স্বীকার করে নেয়া যে মুক্ত ব্যক্তিত্বের কোনো কলঙ্ক নয়, তা মুসলমান সমাজ শিখেছিলেন হিন্দু সমাজের বিশিষ্টদের আচরণ থেকে। এঁদের এই যুক্তি, হিন্দু বঞ্চনাবোধকে মর্যাদা দিয়েছিল। সেই মর্যাদা যে-সম্ভব, আমার শিক্ষালব্ধ মর্যাদা ও জন্মলব্ধ মর্যাদা যে একই দুঃখের দিকে আমাকে টেনে নিতে পারে তার এমন উদাহরণ, এই ১৯৪২ থেকে বহু-বহু মুসলিম বুদ্ধিজীবী, বিশেষজ্ঞ ও ঐতিহাসিককে অনুপ্রাণিত করেছে, পাকিস্তান-প্রস্তাব সমর্থনে, জিন্নাকে সমর্থনে ও লিগকে সমর্থনে। যে-জাতে আমার জন্ম, সেটি বেছে নেয়ার কোনো অধিকার বা সুযোগ ছিল না, থাকা সম্ভবও নয়, আর সেই কারণেই সেই জাতের ভবিতব্যকে আমার নিজের ভবিতব্য বলে মেনে

নিতে আমার কোনো কুণ্ঠা নেই। এঁদের মধ্যে তো ছিলেন আবুল করিম সাহিত্য বিশারদ, কাজী আবদুল ওয়াদদ, হুমায়ুন কবির, রোহেসানা, রেজাউল করিম।

১৯৪২। বাঙালির সমাজশরীর মাথা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত ছেঁড়া দুটো গোটা অর্ধদেহ হয়ে আছে। একটা স্বাধিকার বঞ্চিত হিন্দুসমাজ। আর-এক অর্ধস্বাধিকার বিশ্বাসী মুসলমান সমাজ। হিন্দু সমাজের লক্ষ ছিল অধিকাররক্ষণ। মুসলমান সমাজের লক্ষ ছিল অধিকারঅর্জন।

৪২-ই এমন কোনো অনড় মাইলফলক নয়। দু-পাঁচবছর পেছিয়ে যাওয়া যায়, এগিয়ে আসা যায়। তাতে কিছু বদলাবে না এই অর্ধদেহের। খুব সম্ভবত শরীর-বিবর্তনে লুপ্ত অঙ্গ আবার গজায়। তেমন শারীরিক ক্ষতিপূরণে এই শোক বা বংশানুক্রমিক অসম্পূর্ণতাবোধ তো দূর হয় না, যে, আমার দেহটা পূর্ণ নয়, আলম্ব অর্ধেক। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ মিলে যে-বালা ছিল এই একুশ শতকের এই প্রথম দশকান্ত থেকে আরো আরো অতীত দশকগুলিতে, তাকে কি সংক্ষেপ করে আনা যায় মাত্র পাঁচ-ছয়-সাত-আট দশকে, কোনো অব্যবহিত সান্ত্বনার দরকারে, যেন আমরা খুব বেশিদিন হল অর্ধদেহ হয়ে নেই, হিশেবের মধ্যেই আনা যায় সময়টিকে? না-হয় আরো পেছিয়ে যাওয়াই গেল, আরো আরো আটদশক। রামমোহন? প্রথম পূর্ণদেহী? নাকী শেষ? তিনি নিরাকার জ্ঞানদীপ্ত ঈশ্বরকে পেলেন ইসলাম থেকে। ঋণ-খেলাপি করে সেই নিরাকারকে স্থাপন করলেন তাঁর নিজের কল্পিত এক বেদান্তে-উপনিষদে? যে-বেদান্ত উপনিষদ তখন পর্যন্ত ভারতে চর্চা হত, তার সঙ্গে রামমোহনের ব্রহ্মের ধারণার কোনো মিল নেই, কোনো সংযোগও নেই। যাকে নাম দেয়া যায়, এমন কী যে-ধারণারও নাম দেয়া যায়, সেটাই তো একটা মূর্তি হয়ে যায়। রামমোহন হিন্দু ছিলেন হয়তো এমন একটা প্রাগৈতিহাসিক কারণে যে তিনি এ-কথা স্বীকারে ভয় পেয়েছিলেন, আমি হিন্দু নই। সেই কি প্রথম? হিন্দু নই বলার ভয়? হয়তো নিম্নবর্ণ জাতগুলির বানানো বংশপরিচয়গুলোর কল্পনাগুলি বিনির্মাণ করলে পাওয়া যাবে এমন কোনো সময়, যখন বৌদ্ধ বলতে ভয় ছিল, যখন জৈন বলতে ভয় ছিল, এখন যেমন বাংলাদেশ থেকে বর্ডারডিঙনো কোনো মেয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসে নিজেকে অনুপ্রবেশী বলতে ভয় পায় সে, সে একটা হিন্দু নাম নেয়।

না। অতদূর অতীত পর্যন্ত পেছনো যাবে না, দুটি অর্ধদেহের খোঁজে। অতীতের একটা সীমা আছে। একটা অতীতের পর অতীতের নিসর্গ ও বিন্যাস এমন একটি দৃশ্য হয়ে যায় যা শুধু বানানো যেতে পারে, ভিন্ন পাওয়ারের দুই চোখের কনট্যাক্ট লেন্স উলটে লাগালে।

তার চাইতে ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ এই দশ বছর ধরলে নিরাপদ ঠেকে। আর যুক্তিগুলোও কানে সয়ে গেছে।

সেই-যে ৩২-এর গোলটেবিল, তারপর ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ, গান্ধীজির অনশন, পুণা চুক্তি, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, রাজনীতির নতুন মাপক—ভোটসংখ্যা আসন সংখ্যা, তার মধ্যে গোটা একটা বিশ্বযুদ্ধ, এই বাংলার সেই যুদ্ধে লেপ্টে যাওয়া, একেবারে লেপ্টে যাওয়া, বানানো লেপ্টানো নয় নোংরা, পচা, গলা, থকথকে, মৃতে ঠাসা, অচেনা সামুদ্রিক প্রাণীর খোলশে ভর্তি যেন একটা উলটনো ভ্যাট, বালি বদলে গেছে তরল কাদায়, সে কাদার ভরশূন্যতায় ডোবা যায় না, সাঁতরানোও যায় না, ভাঁটির সৈকতের মত, দীর্ঘস্থায়ী এক বড় জোয়ারের পরের ভাঁটিতে সৈকতে মানুষ দাঁড়াতে পারে না চলতে পারে না, উড়তে পারে না, পালাতে পারে না, এগুতে পারে না, শুধু শুদ্ধতম অক্সিজেনের আর-একটা বিষাক্ত মানবদেহের রসায়নের বিনিময় ঘটে যাচ্ছে, অথচ ইতিহাসের কোথাও কোনো প্রমাণ রইল না যে বাংলার, বাংলার, বাংলার একটা যুদ্ধ ছিল ; সে-যুদ্ধে, যুদ্ধের নিয়ম-অনুযায়ী মৃত ও নিরুদ্দেশের সংখ্যা গোনা

ছিল, সেই, সেই বাংলার যুদ্ধের একটা ভূমণ্ডল, ভূতল ও নভস্তলও ছিল, সে যুদ্ধের আক্রান্ত ও আক্রমক ছিল কখনো অবাঙালি হিন্দু, কখনো অবাঙালি মুসলিম, কখনো অবাঙালি শিখ, কখনো অবাঙালি নিরামিষ ভোজী হিন্দু।

বরং এই ১৯৩৭ থেকে ৪৭-এর দশ বছরে একটা নকশা পাওয়া যায়। সেই নকশায় ক্ষমতা-হস্তান্তর সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র গুছনো ও সাজানো আছে। সেই নকশায় আবার পরিকল্পিত ইতিহাসের শৃঙ্খলাও আছে। যখন এই ঘটনাগুলি ঘটছিল, এই বিষয়ানুগ ও বর্ণানুগ ঘটনাগুলি ঘটছিল, তখন কি কারো কল্পনাতেও কোথাও ছিল এই বিষয়ানুগত্য ও বর্ণানুগত্য? আরো বিস্ময়ের কথা—বাংলার সেই যুদ্ধও ছিল বহুকৌণিক। কখনো হিন্দু-মুসলমানের, কখনো শাহেব-অশাহেবের, কখনো হলদে চামড়ার মানুষদের সঙ্গে শাদা চামড়ার।

কালানুক্রমিক ও বিষয়ানুক্রমিক

কোন কাল?

ঐ ৩৭ থেকে ৪৭—দশ বছর। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ থেকে মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদ পর্যন্ত।

১৬৪

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন থেকে দেশভাগ, একটি কেন্দ্রীয় সরকারের জায়গায় দুইটি কেন্দ্রীয় সরকার, একটি সেনাবাহিনীর জায়গায় দুইটি সেনাবাহিনী, একটি সংবিধানের জায়গায় দুইটি সংবিধান, একটি রাষ্ট্রীয় পতাকার জায়গায় দুইটি পতাকা।

ঐ দশ বছরের মধ্যেই পড়বে—জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে আগস্ট বিপ্লব, মুসলিম লিগের নেতৃত্বে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, আম্বেদকারের নেতৃত্বে দলিত-আন্দোলন ও বামপন্থী নেতৃত্বে বাংলায় সাম্রাজ্যবিরোধী আন্দোলন।

ঐ দশ বছরের মধ্যেই পড়বে—সুভাষচন্দ্রের বিগ্রহের পুনস্থাপন, আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধ জাতীয় করণ ও সর্বত্র দলিত আন্দোলনকে স্বাধীনতা আন্দোলনের ভাগনামা।

ঐ দশ বছরের মধ্যেই পড়বে—৪৩ ও ৪৬-এর নগ্নতা, ক্ষুধা ও রিরংসায় বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ মরণ।

ঐ দশ বছরের মধ্যেই পড়বে—স্বাধীন হয়ে যাওয়া দুটি দেশ ধর্মভিত্তিক সন্ত্রাসে প্রতিটি ঘটনায় কেমন উৎরিয়ে যাচ্ছে তাদের পূর্ববর্তী রেকর্ড।

কিন্তু ঐ দশবছরের মধ্যে পড়বে না—ক্রিপস, ক্যাবিনেট মিশন, ওয়াভেল ও মাউন্টব্যাটেনের ছলদৌত্য।

বিষয় কী?

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আখ্যান বা ইতিহাস নয়। স্বাধীনতা আন্দোলন মানে তো ইংরেজ-বিরোধিতা, যেমন হয়েছিল ১৮৫৭-তে পাল্টা সম্রাট ঘোষণা করে। ইংরেজদেরও কিছুটা জায়গা ছেড়ে বা নিজেদের জন্য কিছুটা জায়গা কেড়ে তো স্বাধীনতা আন্দোলন হয় না। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কোথাও কোথাও কোনো কোনো প্রদেশে দশ বছরই মন্ত্রিসভা ছিল। বেশির ভাগ প্রদেশেই ছিল না। না-থাকার কারণ—কংগ্রেস তার সরকারগুলিকে হুকুম দিয়েছিল, ভারতকে, মানে কংগ্রেসকে একটি কথাও না বলে ভারতের হয়ে ভাইসরয়ের যুদ্ধঘোষণা অন্যায়—কংগ্রেস

তাই পদত্যাগ করেছে। অকংগ্রেসি প্রদেশগুলিতে মেম্বাররা আয়ারাম-গয়ারাম হয়ে গেছেন।

যদি এমন একটা ভাগ কল্পনা করে নেয়া যায়, তাহলে ব্রিটেনেরও একটা জাতীয়-আখ্যান থাকে তাহলে তার সূচি হতে পারে ব্রিটিশ-প্রশাসন-পদ্ধতিতে তৈরি ও ব্রিটিশ রাজনীতির উদ্দেশ্য-অনুযায়ী ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক আলোচনার পর গৃহীত ভারত শাসনের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন সংস্কার ও বিভিন্ন আইন। তাতে যদি গভর্নর-জেনারেল ভাইসরয়ও হন, বা, বড়লাটের একটা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলও হয় পরামর্শ দেয়ার জন্য, বা, মুসলমানদের জন্য কিছু চাকরি সংরক্ষিত রাখা হয়, এমন সংরক্ষিত আসন যদি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে—যেমন, টাউন কমিটি, ইউনিয়নবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড—কিছু থাকে, চরম ক্ষমতা সরকারি অফিসারের কব্জায় থাকা সত্ত্বেও তেমন সংরক্ষণ যদি ব্রিটিশ সরকারের একটা নীতিই হয়ে যায়—তাহলে এই সবই তো ব্রিটিশের জাতীয় আখ্যানের অন্তর্গত, বড়জোর একটা আলাদা অধ্যায়ের নাম দেয়া যায় 'উপনিবেশে ব্যবহার্য নীতি' ও আরো বড়জোর ভারতের জন্য একটা উপপরিচ্ছেদও থাকতে পারে, দি ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, নাম দিয়ে। কারণ, সত্যি তো, ভারতের মত বড় কলোনি কারোই আর ছিল না।

কিন্তু ইতিহাসের বিষয়ের এমন একটা ভাগাভাগি কল্পনা করে নিতে হবে কেন? এই ভাগাভাগিই তো ইতিহাসের বিষয়। তাহলে?

ব্রিটিশ জাতীয়-আখ্যানের অন্তর্গত এই সব নীতি, নিয়ম ও আইন ভারতবাসীর ওপর ব্যবহৃত হয়েছে, সুতরাং এটা ভারতের কলোনি-অস্তিত্বেরই অংশ এই যুক্তি মানলে, কি এটাও মেনে নেয়া হল না যে কলোনি-অস্তিত্বও আমাদের জাতীয় আখ্যানের অন্তর্গত?

বাইরের দিক থেকে মনে হতে পারে, বাঃ, কলোনিই-ছিলাম আমরা আর তার কাহিনী আমাদের হবে না?

ভিতরের দিক থেকে মনে হওয়া উচিত, কলোনি কি কেউ নিজের ইচ্ছেয় হতে পারে? তাকে কলোনি করা হয় বলেই সে কলোনি হয়। তাহলে কলোনি কী করে জাতীয় আখ্যান হতে পারে? কলোনি তো কখনোই ঐতিহাসিক কার্যকারণে অবশ্যম্ভাবী নয়। বা, কোনো ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার পরিণতি নয়।

যোগেনের তেমন কোনো বাইরের দিক বা ভিতরের দিক ছিল না। তেমন কোনো জাতীয় বা কলোনি-আখ্যানও না।

যোগেন সরেজমিন হিশেব নিতে বেরিয়েছিল, সরকার আইনসভায় যে কথা দিয়েছে বছর দুই আগে—সরকারি চাকুরিতে তপসিলিদের জন্য ১৫ শতাংশ সংরক্ষিত থাকবে, সেটার অবস্থা কোন জিলায় কী রকম? ১৯৪২-এ গ্রামাঞ্চলে সৈন্য রিক্রুটের ক্যাম্প বসেছে। যোগেন জানতে চায় সরকারি চাকরির মধ্যে মিলিটারির চাকরি পড়ে কী না। যদি না পড়ে, তাহলে পড়ানোর উপায় কী?

এগুলো যোগেন আইনসভাতে প্রশ্ন করে আরো বিশদে জানতে পারত, আরো অনেক মেম্বারের সমর্থন পেত। কিন্তু পাঁচ বছরে আইনসভায় যোগেন নিশ্চিত জেনেছে যে আইনসভার বিশদ কদ্দুর পর্যন্ত বিশদ ও অন্য মেম্বারদের সমর্থন কদ্দুর পর্যন্ত সমর্থন। দু-বছর আগে মুসলমানদের জন্য চাকরির শতাংশ সংরক্ষণের রিনিউয়্যালের সময় যোগেন আরো সব তপশিলি মেম্বারদের সঙ্গে মন্ত্রীদের কাছে দাবি করেছিল, এবার মুসলমানদের শতাংশের সংরক্ষণের রিনিউয়্যালের সঙ্গে তপশিলিদের জন্য সংরক্ষণের হার ঘোষণা করতে হবে। হকশাহেবের প্রথম মন্ত্রিসভার নাম-করা হিন্দু নেতারাই আপত্তি করেছিলেন—নলিনীরঞ্জন সরকার, স্যার বিজয়,

মহারাজা শ্রীশ। এঁরা সকলেই বলেছিলেন, শিডিউল কাস্ট তো তৈরিই হল সেদিন, এর মধ্যে চাকরির জন্য সংরক্ষণের দরকার কী? হকশাহেব নাকি বলেছিলেন, শ্রীশ নন্দীকেই, ওরা যে-জাতের অগ চাকরিও তো সেই জাতেরই হব, তাতে আপনাগ কারো চাকরি যাওয়ার ভয় নাই তো—আপনারা তো মহারাজ আর স্যার। মন্ত্রিসভার এই কথা যোগেনের কাছে ফাঁস করে দেন হকশাহেবই। রাইটার্সে আচমকা বারান্দায় দেখা হয়ে যাওয়ায় হকশাহেব যোগেনকে বলেন, 'তুমি তো বাসট্রামেই যাতায়াত করো?'

'সে-বিষয়ে আপনার কাছে কি কোনো খবর আছে?'

'আছে বইল্যাই তো জিগাই। মেম্বারদের মইধ্যে যারা বলাকওয়া করে তাগ কয়জনের গাড়িতে আসার সুযোগসুবিধা অ্যাহনো হয় নাই। এইডা এনকোয়্যারি কইরতে গিয়্যা জানি, তোমার অ্যাহনো সে সুবিদা হয় নাই। আমি মনে মনে তাই বল্যাম, বরিশালের বাঙাল তো! বোধোদয় হইতে টাইম লাগে। বামুন-বইদ্য হইলেও তো আশা ছিল। তাই কইতেছিল্যাম—ট্রামেবাসে যে চড়ো, পকেটমার হয় নাই?'

'কী যে কন! এত কম বুদ্ধি হইলে পকেটমার হওয়া যায়? তাইলে তো স্যায় প্রাইম মিনিস্টার অব বেঙ্গল অইত।'

হকশাহেব হো হো হেসে যোগেনের কাঁধে হাত দিয়ে বাহবা জানিয়ে বলেন, 'পকেটের দায় না-হয় পকেটমারগ বিবেচনা বোধের উপর ছাইড়্যা রাখছ? বাড়িতে সিঁদকাটা কী দিয়্যা সামলাও? সে তো মিনিস্টার হইয়াই আছে'। যোগেন কোনো উত্তর না-দেয়ায় হকশাহেব বুঝে নেন, যোগেনে বুঝেছে হকশাহেব কিছু বলতে চান। হকশাহেব গলা নামিয়ে ইংরেজিতে বলেন, তোমাদের রিজার্ভেশন তো পাশ হয়ে যেত, তোমাদের স্বধর্মীরাই বাগড়া দিচ্ছে, একটু চেঁচামেচি করো। বলে আবার খুব জোরে হেসে উঠলেন। হাসতে-হাসতেই তাঁর লিফটের দিকে চলে গেলেন।

হকশাহেব চলে যাওয়ার পরও যোগেন দাঁড়িয়েই ছিল—হকশাহেবের প্রস্থানের দিকে তাকিয়ে। কাছাকাছি দু-একজন চাপরাশি-দারোয়ান ছিল। যোগেনের অমন দাঁড়িয়ে থাকায় তারাও যেন হক-মণ্ডল কথাবার্তার ভাগীদার হয়ে গেল। তারা যেন সবটা বুঝেছে, এমনভাবে হেসেও উঠল, হাততালিও দিল। যোগেন তাকালে একজন বলেও উঠল, 'এইসা দিলওয়ালা লিডার...।'

যোগেন তারপর 'ইনডিপেনডেন্ট শিডিউল কাস্ট অ্যাসেম্বলি পার্টির সম্পাদক হিশেবে আইনসভার লনে সমস্ত পার্টির তপশিলি এমএলএদের পরদিন জড়ো হতে বলল। পরদিন সে মন্ত্রীদের নামও বলতে পারল যারা তফশিলদের চাকরির শতাংশ-কোটায় আপত্তি করেছে। সেই সমাবেশ একটা স্মারকপত্রও তৈরি করল। গভর্নরের উদ্দেশে এক কপি ও প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে আর-এক কপি।

যা-হোক, সেবারই সংরক্ষণ পাশ হল।

সামনের বছর আইনসভার ইলেকশন। যোগেন জানে, 'বাউনবাড়ি নেমন্তন্ন, না-আঁচাইলে বিশ্বাস নাই।' সংরক্ষিত থাকলেই যদি চাকরি হত তাহলে শুদ্দুররা তো পুরাণের কালেই অমৃতের পুত্র হয়ে যেত, তাই তো বলেছিল উপনিষদে—কিন্তু সবাই অমৃতের পুত্র হলে আর মৃতপুত্র কে হবে?

স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস বিশ-একুশ দিন দিল্লিতে থেকে লন্ডনে ফিরে গেলেন কেউই তাঁর প্রস্তাব

মানলেন না বলে। তাঁর চলে-যাওয়াটা একটু আকস্মিক ছিল। কোনো প্রমাণ নেই, তবু এখন আভাস পাওয়া যাচ্ছে—ভাইসরয় লিনলিথগ-র সঙ্গে তাঁর মত মেলেনি বলেই তিনি আর অপেক্ষা করেননি। কিন্তু এখন এ-খবরও তো বেরুচ্ছে যে ক্রিপস-এর প্রস্তাবে রাজাগোপালাচারি, জওহরলাল ও আজাদ রাজিই ছিলেন। গান্ধীজিই সব ভণ্ডুল করে দিলেন।

ক্রিপস ভারত ছাড়লেন ১২ এপ্রিল। এক সপ্তাহ পরে ১৯ এপ্রিল 'হরিজন'-এর জন্য গান্ধীজি লিখলেন ও ২৬ এপ্রিলের 'হরিজন'-এ সেই লেখাটা বেরবার পর প্রথম আঁচ পাওয়া গেল যে ভিতরে-ভিতরে গান্ধীজি কতটা জঙ্গি হয়ে উঠেছেন। যেন এটা গান্ধীজির ভাষাই নয়, ভাবনা তো নয়ই, অথচ স্পষ্টতা একেবারেই গান্ধীজির নিজস্ব। গান্ধীজি লিখলেন, 'সিঙ্গাপুরে যেমন ব্রিটিশ শক্তি সিঙ্গাপুরকে তার নিয়তির হাতে ফেলে চলে এসেছে, ভারতেও যদি তাই করে তবে অহিংস ভারত কিছুই হারাবে না ও সম্ভবত জাপানও ভারতকে একা থাকতে দেবে।' তাঁর মতে, 'ভারত ও ইংল্যান্ড উভয়েরই স্বার্থে যথাসময়ে যথাশৃঙ্খলায় ব্রিটিশশক্তির ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার ওপর সব নির্ভর করে।' এও বললেন, 'যুদ্ধের পরে স্বাধীনতার ব্যাপারে আমার কোনো উৎসাহ নেই। আমি এখনই স্বাধীনতা চাই।'

গান্ধীজির সব আন্দোলনের ভিতর যেমন একটা যোগসূত্র থাকে, তেমনি যোগসূত্র আছে ১৯২০-এর খিলাফৎ-এর সঙ্গে ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো'র। কিন্তু এগুলো তো ভাবের কথা, কোনো প্রমাণ সাপেক্ষ কথা নয়। ম্যাকিয়াভেলির মত ধূর্ত, নেপোলিয়ানের মত রণবিদ—এসব কথার বারোক-বাহার আছে। তাতে গান্ধী-মানুষটি বদলে যায়। সেই কল্পিত বদলের ফলে গান্ধী হয়ে ওঠেন শব্দার্থে অতুলনীয়। তাঁর সঙ্গে তুলনীয়তা উত্থাপনই হয়ে যায় নৈতিক অপরাধ। জিন্না নিজে সেই তুলনীয়তা উত্থাপন করেছিলেন ও ব্রিটিশ ভারতের সামান্য কমবেশি ১০কোটি মুসলমানকে সেই তুলনীয়তায় কমবেশি বিশ্বাস করিয়েছিলেন। আম্বেদকর সেই তুলনীয়তা উত্থাপন করেছিলেন ও তখনকার ব্রিটিশ ভারতের কমবেশি ১০কোটি দলিতকে সেই তুলনীয়তায় বিশ্বাস করিয়েছিলেন।

গান্ধীজি তাঁর সেই অতুলনীয়তা অসম্ভব সাহস ও সঙ্কটের সঙ্গে রক্ষা করেছেন। রক্ষা করতে সংকটও ঘনিয়ে তুলেছেন। 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গ্রহণের পরদিন ভারতব্যাপী অভূতপূর্ব দমন -পরিকল্পনা পাকা করতে লিনলিথগ যখন সমস্ত ব্যবস্থা শেষ বারের মত জরিপ করছিলেন, কোন নেতাকে কোন জেলে রাখা হবে সেসব বারবার যাচাই করছিলেন, তখন ভারতের সব প্রাদেশিক গভর্নর আলাদা করে তাঁকে একটা কথাই জানাচ্ছিলেন যে গান্ধীজি যে-মুহূর্তে জেলে অনশন শুরু করবেন, সেই মুহূর্তে তাঁকে যেন জেলখানা থেকে বের করে নিয়ে তাঁর আশ্রমে ডাম্প করা হয়।

গান্ধীজি নিজেই বলেছিলেন, ক্রিপস চলে যাওয়ার একসপ্তাহের মধ্যে যে-সোমবার তাঁর মৌন দিবস ছিল, সেই সোমবার তাঁর এটা মাথায় আসে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একটা মিটিং ডাকাই ছিল। গান্ধীজি একটা প্রস্তাবের খশড়া তাদের পাঠিয়ে দিলেন। সে খশড়াতে বলা হল, ১. ক্রিপস আসার পর যে-নগ্নতায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে দেখা গেল, তেমন আগে কখনো ঘটেনি, ২. ব্রিটেনকে এই মুহূর্তে ভারত ছেড়ে চলে যেতে হবে, ৩. স্বাধীন দেশ হিশেবে ভারতের প্রথম কাজ হবে, জাপানের সঙ্গে শান্তিস্থাপন করা, ৪. যদি জাপান শান্তিস্থাপনে সম্মত না হয় তা হলে জনসাধারণকে অহিংস অসহযোগ করতে ডাক দেয়া হবে, ৫. ইংরেজ-শাসন ভারতের অভিশাপ, ইংরেজ এদেশ থেকে চলে গেলেই ভারত শাপমুক্ত হবে, ৬. ভারতের সঙ্গে জাপানের কোনো শত্রুতা নেই। তার শত্রুতা ব্রিটেনের সঙ্গে।

ওয়ার্কিং কমিটির যাঁরা মেম্বার ছিলেন তাঁদের মধ্যে বল্লভভাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও কৃপালনী বিশ্বরাজনীতি খুব কিছু জানতেন না, যুদ্ধের কোনো খবরও রাখতেন না। তাঁদের গান্ধীজির প্রতি আনুগত্য ছিল—জল কাৎ তো জল কাৎ। মৌলানা, জওহরলাল আর রাজাগোপালাচারি এই তিনজন খবর রাখতেন, জানতেন, যুদ্ধ বুঝতেন, কে জিতলে কী হবে তা ভাবতেন।

৫ জুলাই থেকে ওয়ার্কিং কমিটি টানা আলোচনা করতে থাকে কিন্তু কোনো মতৈক্য তৈরি হয় না। আগে থেকে ডাকা মিটিঙে গান্ধীজির ছয় দফা খশড়া পেয়ে সকলেই হাঁ। গান্ধীজি কোনো আভাসই দেন নি। কেউ বুঝতেই পারছে না—ইংরেজদের সঙ্গে ঝগড়া বাঁধাতে পায়ে পা লাগানোর এই কি সময়। জওহরলাল মনে করতেন—গান্ধী যুদ্ধে মিত্রপক্ষের হার সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে জাপানের সঙ্গে বোঝাপড়ার দরজা খুলছেন আর, যখন ভারতবাসীকে ফ্যাসিস্তদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের টেকনিক শেখানো দরকার, তখন উনি ফ্যাসিস্তদের সমর্থন করছেন। রাজাগোপালাচারি মনে করতেন—জাপানের সম্ভাব্য আচরণ সম্পর্কে আকাশকুসুম ভাবা হচ্ছে, আর, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কোনো শূন্যস্থান নেই। আজাদ মনে করতেন—এটা প্রায় বিপ্লবের জন্য খোলা ডাক, আর, আমরা আমাদের সমর্থকদের রক্ষা করতে পারব না, তাদের খোলা বন্দুকের সামনে ছেড়ে দেয়া হবে।

মতপার্থক্য এমন জায়গায় পৌঁছয় যে ৭ জুলাই সকালে মৌলাদা আজাদকে গান্ধীজি একটা হাতচিঠি পাঠিয়ে জানালেন—তাঁদের দুজনের মতের পার্থক্য এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে তাঁদের দু-জনের একসঙ্গে কাজ করা অসম্ভব। গান্ধীজি মনে করেন—মৌলাদা আজাদের কর্তব্য কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতির পদ ছেড়ে দেয়া ও ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করা। জওহরলালেরও তাই করা উচিত।

দুপুরের মধ্যেই গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করে বল্লভভাই আপত্তি জানালেন। আজাদ ও জওহরলাল একসঙ্গে ওয়ার্কিং কমিটি ছেড়ে গেলে দেশের লোক কংগ্রেসের ওপর আর বিশ্বাস রাখবে না। গান্ধীজি মৌলানাকে ডেকে তাঁর কাছ থেকে চিঠিটা ফেরৎ নেন।

ওই ৭ জুলাই থেকেই ওয়ার্কিং কমিটি মিটিং করতে-করতে ওয়ার্ধা গেল ও ওয়ার্ধাতে ১৪ জুলাই পর্যন্ত মিটিং করে গেল। গান্ধীজি সেই ১৯ এপ্রিল থেকে এই ১৪ জুলাই পর্যন্ত 'হরিজন'-এ লেখার পর লেখায়, 'হরিজন'-এর বাইরে দেশ-বিদেশের পত্রপত্রিকার সঙ্গে কথায়, বিদেশীদের কাছে লেখা চিঠিতে, তাঁর রোজকার প্রার্থনা ভাষণে ও অসংখ্য জনসভার বক্তৃতায় 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রয়োজন ব্যাখ্যা ও প্রচার করে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটিতে মতপার্থক্য গভীর ও দুস্তর হল। রাজনীতির বিশ্বাস ও আন্দোলনের অভিজ্ঞতার শিক্ষা সম্পূর্ণ বিসর্জন না দিয়ে কেউই গান্ধীজির একমত হতে পারছিল না। পারা সম্ভব নয়।

একবার গান্ধীজি এমন তিরস্কারও করে ওঠেন, 'আপনারা এত বড় একটা রাজনৈতিক দলের সর্বোচ্চ কমিটি। আপনাদের অনেক অসুবিধে থাকতে পারে। তাহলে আমাকে ছেড়ে দিন। আমি ভারতের ধুলোমাটি থেকে এই আন্দোলন তৈরি করি।'

আর-একবার বলেন, 'আপনারা তো সম্ভ্রান্ত নেতা। জুয়োখেলায় আপনাদের হারার ভয় থাকতেই পারে। আমি তো চিরকালের জুয়াড়ি।'

১৪ জুলাই ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটি 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব মেনে নিল। বা, বলা ভাল, মেনে নিতে গান্ধী বাধ্য করলেন কমিটিকে। বস্তুত, ওয়ার্কিং কমিটিকে ব্ল্যাকমেইলই করলেন গান্ধীজি। কমিটি গান্ধীজিকে হারাতে চাইল না। তাই, কমিটি নিজেকে হারাল।

তারপর সপ্তাহ তিন চলল দেশের ভিতরে ও বাইরে নানা প্রতিক্রিয়া ও প্রস্তুতি। বম্বেতে এআইসিসি ডাকা ছিল। সেখানে প্রস্তাবটি কী কী ভাবে কার্যকর হবে সেসব নিয়েই কথাবার্তার শেষে এআইসিসি জানিয়ে দিল—এটাই এখন কংগ্রেসের নীতি হয়ে গেল।

প্রকাশ্য সভায় মহারাষ্ট্র ও বম্বে প্রদেশ কমিটি তাদের এলাকাভুক্ত নানা জায়গা থেকে লোকজন আনিয়ে ছিলেন। সেই কর্মীরা, ও নেতার বিশেষ করে গান্ধীজি, এই বিদ্রোহের পক্ষে কী বলছেন, সেটা শুনতে বুঝতে বম্বে ও তার কাছাকাছি নানা শহর থেকে হাজার-হাজার মানুষ এসেছিলেন। তাঁদের কাছে গান্ধীজি দু-ঘণ্টা ধরে বোঝালেন—কেন এখনই এই বিদ্রোহ, কেন এই বিদ্রোহ অহিংস থাকতেই হবে, সেই কবে থেকে যুদ্ধ লেগেছে, প্রথম দিন থেকে কংগ্রেস ব্রিটেনকে দুটো কথা বলে আসছে—যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করতে চাই, স্বাধীন দেশ হিশেবে সে-সাহায্য হবে আরো মূল্যবান, শাহেবরা সেই এক গোঁ ধরে বসে আছেন—যা হবে তা যুদ্ধের পরে হবে, গান্ধীজি বললেন, 'তাই এই নতুন আন্দোলন, শান্তিপূর্ণ বিপ্লব, শাহেবদের বলব 'ভারত ছাড়ো', আর নিজেদের বলব 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'।

যেন সবই তৈরি, সবই প্রকাশ্য। কারো তো কিছু অজানা ছিল না। সেই এপ্রিল থেকে। ক্রিপস শাহেব ভারতের নেতাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন, যদি তাঁর মারফৎ ব্রিটিশ সরকারের প্রস্তাব পাঠানো, তারই একটু উনিশ-বিশের মধ্যে ভারত ও ব্রিটেনের সম্পর্ক স্থির না হয়, তাহলে যুদ্ধের সময় ও যুদ্ধের পরের অনিশ্চয়তায়, কথাটা যে আবার উঠবে, তারও কোনো সম্ভাবনা নেই। এই মুহূর্তে অনেকগুলি কারণে ভারতের জনসাধারণ কতকগুলি সুযোগের সুবিধে পাচ্ছে—গান্ধীজি বোঝালেন।

যুদ্ধে ব্রিটিশ পক্ষের বস্তুত সম্পূর্ণ পরাজয় ও দক্ষিণ এশিয়ার রণাঙ্গনে একের পর এক দেশ ছেড়ে পালিয়ে আসা, অন্তত লাখখানেক যুদ্ধবন্দী হয়ে আছে জাপানের হাতে, ব্রিটেনের মিত্রদেশ আমেরিকা এখনো পুরোপুরি যুদ্ধে নামেনি, সোভিয়েত ইউনিয়নের উক্রেনের মত বিশাল সমতল, যুদ্ধাস্ত্রগুলির কারখানাগুলি সমেত, জার্মান দখলে ও জার্মানরা আরো দখল করছে। যুদ্ধ করতে হলে তো কোথাও একটা পা রাখার জায়গা চাই। ১৯৪২-এর এপ্রিলে তেমন একহাত জায়গাও ব্রিটেনের পায়ের নীচে ছিল না। উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধে বিদ্যুৎগতি রোমেল প্রতিটি মুহূর্তে একটি করে যুদ্ধ জিতে ফেলায়, ব্রিটিশ-বাহিনীর সৈন্যদের কাছে কম্যান্ডার-ইন-চিফের দুই প্যারাগ্রাফের ছোট একটি আবেদন ছড়ানো হয়েছে, 'রোমের আর-সকলের মতই একজন সৈন্য ও যোদ্ধা। তাঁর গতি ও সাফল্য নিয়ে যে-সব রূপকথা ব্রিটিশ-বাহিনীতে কানাকানি হচ্ছে—সে সবই বানানো। এতে বাহিনীর যুদ্ধোদ্যমের ক্ষতি হচ্ছে। এই ধরণের কানাকানি ও গুজব-ছড়ানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হচ্ছে।'

ভারত ছাড়া ব্রিটেনের লড়াই দেয়ার জায়গাও নেই। ক্রিপস এসেছেন যুদ্ধে পরাজিত ইংল্যান্ডের পক্ষ থেকে স্বাধীন ভারতের সঙ্গে প্রতিরোধের চুক্তি করতে। আর এই সুযোগ ও সুবিধে যদি ভারত না নেয়, যদি ক্রিপস-প্রস্তাব থেকে ব্রিটেনকে সম্পূর্ণ শর্তহীন সমর্থনের কোনো পরিস্থিতি, ভারত, তৈরি করে নিতে না পারে, তাহলে ইংল্যান্ডের যে-মানুষরা ভারতের স্বাধীনতার সমর্থক, তাঁরাও ভারতকে স্বাধীন করে দেয়ার জন্য কোনো উদ্যোগ নিতে পারবেন না। কারণ ভারত তো ইংল্যান্ডের এই বিপদেও তাকে সাহায্য করেনি। 'ভারত' বলতে ক্রিপস বোঝাচ্ছিলেন গান্ধী ও কংগ্রেস।

স্যার স্ট্যাফর্ড ক্রিপস ব্রিটেনের খুবই বড় নেতা। ব্রিটেনের ওয়ার-ক্যাবিনেটের মন্ত্রী, লর্ড প্রিভিসিল। তাঁর রাজনীতি ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক সংসারে খুব একটা পছন্দসই নয়। সোস্যালিস্ট।

চার্চিলের সঙ্গে তাঁর বেশ প্রকাশ্য অমিল। তবু ইংল্যান্ডের রাজনীতি চর্চায় রক্ষণশীলতার বিরোধী একটু খোলামেলা গণতন্ত্রের পক্ষপাতী ও অর্থনীতিতেও একটু সমাজতন্ত্র-ঘেঁষা মতের জন্য খানিকটা জায়গা থেকে যায়। ক্রিপস সেই মতের নেতা হিশেবে মান্যগণ্য ছিলেন। চার্চিল তাঁর রাজনীতির বারটা বাজাতেই তাঁকে এই প্রস্তাব দিয়ে পাঠিয়েছেন—এ-সব আজগুবি কথা তখনো শুরু হয়ে এখনো চলে। কিন্তু এখন তো লিনলিথগ-র কাগজপত্রে দেখা যাচ্ছে, ক্রিপস সম্পর্কে নোটশিটে লিনলিথগ কত বদ-রসিকতা করেছেন। তিনি নোটের মার্জিনে লিখতেন ক্রিপসিস, ক্রিপসি, ক্রিপ।

স্যার স্ট্যাফর্ড ক্রিপস একটা রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়েই এসেছিলেন দিল্লিতে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের চাপে যদি প্রধানমন্ত্রী চার্চিলকে ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে তাঁর আগ্রহ ও উদ্যোগের প্রমাণ দিতে হয়, আর সেই প্রমাণের ওপর যদি যুদ্ধে আমেরিকার নামা না-নামা প্রভাবিত হয়, তাহলে মন্ত্রিসভারই প্রতিনিধি করে কাউকে সেখানে পাঠানোই সবচেয়ে নিরাপদ—এমন কূটনীতি চার্চিলসুলভ। খুব সম্ভবত, তেমন সংকেত পেয়েই স্যার স্ট্যাফর্ড এই মিশন দিয়ে তাঁকেই দিল্লি পাঠাতে চার্চিলকে কোনোভাবে সংকেত দিয়েছিলেন। সম্ভবত। কিন্তু প্রমাণ নেই।

প্রমাণাভাবে অনুমানকে প্রমাণ জ্ঞান করা যায়। স্যার স্ট্যাফর্ড ছাড়া ওয়ার কেবিনেটের আর কোনো সদস্যের এই রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল না। ১. ফ্যাসিস্তবিরোধী যুদ্ধে জিততেই হবে। ২. সোভিয়েত ইউনিয়নকে রক্ষা করতেই হবে। ৩. ভারতের কংগ্রেসকে মধ্যবর্তী একটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় রাজি করাতেই হবে। ৪. কংগ্রেস ও গান্ধীর রাজনৈতিক আদর্শ ও ঐতিহ্যের সঙ্গে ১ ও ২ সংখ্যক কর্মসূচি মেলাতেই হবে।

মন্ত্রিসভার প্রস্তাব নিয়ে তাই এলেন স্যার স্ট্যাফর্ড, লর্ড প্রিভিসিল।

এমন অনুমানের জায়গা থাকলে, ক্রিপস মিশনের অসাফল্যের আরো একটা অনুমানও করা যায়।

স্যার স্ট্যাফর্ড তাঁর নিজের রাজনীতির কর্মসূচি সম্পর্কে এতটা দায়িত্ববান ছিলেন যার তুলনা ব্রিটিশ রাজনীতিতে ও প্রশাসনে খুব বেশি পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষকে নিয়ে তাঁর কোনো 'বড় ইংরেজ'-এর ভূমিকা ছিল না। ভারতবর্ষের কোনো উপকার তিনি করতে চাননি। স্বাধীনতা ভারতের অধিকার ও প্রাপ্য—এটাই ছিল তাঁর রাজনীতি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নেতৃত্ব ভারতকে সেই প্রাপ্যের অধিকার দেবে না—এটাও ছিল তাঁর রাজনৈতিক জ্ঞান। রুজভেল্ট ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে ব্রিটেনকে প্রায় জোর করছিলেন। এতটাই, যা দুটি সার্বভৌম দেশের একটি অপরের ওপর চাপাতে পারে না। ব্রিটেন ছিল আমেরিকার কাছে প্রার্থী। ব্রিটেনের পক্ষে সম্ভব ছিল না, আমেরিকার এই জোর-দেয়াটা অস্বীকার করা। রুজভেল্ট জোর দিচ্ছিলেন, যুদ্ধে আমেরিকার প্রত্যক্ষ ভূমিকা আমেরিকার জনসাধারণের মতামতের ওপর নির্ভরশীল ও সেই জনমত ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে—এই যুক্তির ওপর। তিনি তাঁর নিজের একজন দূত পাঠিয়েছিলেন, ক্রিপস মিশনকে সাহায্য করতে। সেটাকে যে চার্চিল ভালভাবে নেননি তা বোঝা যায়, একেবারে শেষ দিকে আবার নতুন করে ক্রিপসের চেষ্টার সুবাদে ভাইসরয়কে পাঠানো চার্চিলের টেলিগ্রামে—ক্রিপসের কোনো দরকার নেই জনসনের কথা শোনার। জনসনই ছিলেন মার্কিন রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত দূত।

এতগুলি কারণ একই সময়ে সক্রিয় হওয়ায় স্যার স্ট্যাফোর্ড মনে করেছিলেন—ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে সেটাই সম্ভাব্যতম শুভক্ষণ। ক্রিপসের এই চিন্তার মধ্যে ছলনা ছিল না। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তখন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা-

আন্দোলনের তুলনা করে বলেন—আমাদেরও তো স্বাধীনতা ঘোষণার পর মাত্র ১১টি রাজ্য একমত ছিল, তারপর তো নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ, সিভিল ওয়ার ইত্যাদি ঘটতে-ঘটতে শেষে যুক্তরাষ্ট্রের আকার তৈরি হয়। ভারতেও তাই হত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে এটা একটা স্থায়ী রসিকতা হয়ে আছে—মিত্রশক্তির তিন প্রধান স্ট্যালিন, চার্চিল ও রুজভেল্টের মধ্যে ভারত সম্পর্কে সবচেয়ে কম জানতেন কে? স্ট্যালিন কী সবচেয়ে বেশি জানতেন কারণ কোনো এক শীর্ষ সম্মিলনে তিনি নাকি ভারতের জাতপাত সমস্যার কথা তুলেছিলেন। চার্চিল এটা তাঁর জ্ঞাতব্য বিষয়ই মনে করতেন না। রুজভেল্ট বোঝাতে চাইতেন, তিনি ব্যাপারটি বোঝেন। তাই আমেরিকায় ব্রিটেনের কলোনি বানিয়েছিল যে-ইয়োরোপীয়রা, তাদের তুলনা করেছেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে, সেটা খুব ভেবেচিন্তে তৈরি করা একটি সূত্র। এই সূত্র ইয়োরোপীয় ইতিহাস চর্চায় এখনো সক্রিয়, বিশেষ করে আমেরিকায় ও অংশত ইংল্যান্ডে। সেই ইতিহাসচর্চায় কলোনি তৈরি করা না-করাকে কলোনিদেশের ও মালিকদেশের সম্পর্কের কোনো অপরিহার্য উপাদান মানা হয় না। তাঁরা সাম্রাজ্য মানেন, কলোনি মানেন না।

কলোনি হয়ে যাওয়ার পর কলোনিদেশের ভিতরে কলোনি মালিকদের মধ্যে নানারকম গোলমাল হতে পারে। ভারতেও হয়েছে। তাতে কলোনিওয়ালাদের একপক্ষের কেউ-কেউ কলোনিদেশের কারো-কারো সাহায্য নিতেও পারেন, দিতেও পারেন। এটা কলোনিকর্তাদের ভিতরকার লড়াই—মুনাফার ভাগ নিয়ে।

ভারতে এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ও তাঁর প্রথম কাউন্সিলের সদস্যদের মধ্যে বিবাদ। সেই বিবাদের সুযোগ নিতে গিয়েছিলেন মহারাজ নন্দকুমার রায়। নেহাৎই এক বোকা বামুন। কলোনির মানুষ হিশেবে করেকম্মে খাচ্ছিল। ছিলেন হিজলি ও মহিষাদল পরগনার তসিলদার। ক্লাইভের সঙ্গে উকিল হয়ে পাটনায় যান। ক্লাইভের ওপর তাঁর প্রতিপত্তি দেখে তাঁকে বলা হত ব্ল্যাক কর্নেল। নদীয়া ও হুগলির কালেক্টর, ১৭৬৫-তে বাংলার নায়েব-সুবা। নায়েবসুবা মানে পুরো সুবার ট্যাক্স কালেক্টর। নগদ পয়সার ছড়াছড়ি। নন্দকুমার ধরা পড়ে যান। চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেয়া হয় ও ঐ পদে রেজা খাঁ নিযুক্ত হন। হেস্টিংস প্রথম গভর্নর-জেনারেল হলে হেস্টিংসের কাছে তিনি রেজা খাঁ সম্পর্কে নালিশ জানান। রেজা খাঁর চাকরি যায়। হেস্টিংস নন্দকুমারের ছেলে গুরুদাসকে বালক-নবাব মকরদদৌল্লার আমলা করে দেন। তার পর কাউন্সিলসহ গভর্নর-জেনারেল, সব সময়ই ভোটে হারছেন দেখে নন্দকুমার হেস্টিংসকে ছেড়ে কাউন্সিলে হেস্টিংসের বিরোধী পক্ষে যোগ দেন ও হেস্টিংসের নামে ঘুষ খাওয়ার মামলা করেন। নির্দোষ প্রমাণ হওয়ার পর হেস্টিংস নন্দকুমারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ও জালিয়াতির নালিশ রুজু করেন। ইংলিশ আইন অনুযায়ী বিচারে ৭০ বৎসর বয়সী নন্দকুমারের ফাঁসি হয়। ইংরেজের উপনিবেশে প্রথম ফাঁসি। প্রথম ব্রহ্ম হত্যা। অনেক হিন্দু কলকাতা ছেড়ে চলে যান। ফাঁসির দিন নাকী শহরের বাঙালিরা অরন্ধন পালন করেন। কলোনিকর্তাদের ভিতরকার লড়াইয়ে কলোনিমানুষ কখনো সহযোগী, কখনো অপরাধী। এটাই ধাঁচা। এর ভিতর কলোনিবিরোধিতা বলে কিছু নেই।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন তো ভারতবাসীদের নিজেদের যুদ্ধ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। ইয়োরোপীয় দেশগুলির সাম্রাজ্য-নির্মাণের সঙ্গে কলোনি যখন জুড়ে গেল, তখন উপনিবেশ-বিস্তারের যুক্তিতে কলোনি কত রকমের হতে পারে তার বিভাজন ও পুনর্বিভাজন ও পুনর্বিভাজন ও পুনরপুনর্বিভাজন শুরু হয়ে গেছে ও এখনো (২০১০-এও) চলছেই।

কলোনি একটি নতুন দেশ, একটি বাইরের দেশের দ্বারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত—অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, সামাজিক। কলোনি হতে পারে, একটি দেশের সম্পূর্ণ কৃষিসম্পদ ও কৃষিব্যবস্থা ধ্বংস করে সেখানে ইয়োরোপীয় কৃষি কোম্পানিকে বসিয়ে স্থানীয় কৃষকদের ভূমিদাসে পরিণত করা—যেমন কেনিয়ায়। ফলে, 'কলোনি' নাম দেয়া যায় সেই দেশকে যা কলোনি হয়েছে ও যে-কলোনির মালিকদেশ আছে। কলোনির উৎপাদনে শ্রমিক ও মালিক পক্ষের লড়াইটাও কলোনির ভিতরের সংগ্রাম। এর ওপর ভারতের মত একটা মহাদেশতুল্য দেশ জুড়ে কোটি কোটি মানুষকে জড়িয়ে সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি নিয়ে আন্দোলন। এটাই স্বাধীনতা যুদ্ধ দখলদার দেশের বিরুদ্ধে। কলোনিয়ালিজমের রকমফের জানতেন স্যার স্ট্যাফোর্ড। জানতেন—যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়াকে শাদাদের দেশ বানানো ও কলোনি বানানো। জানতেন—আবার ভারতবর্ষ, উত্তর আফ্রিকা, পশ্চিম আফ্রিকা দখল করেও বসবাস না করে, তাদের রাজনীতি-অর্থনীতিকে গ্রাস করাও কলোনি। আবার, দক্ষিণ আফ্রিকাও কলোনি, আবার, ফ্যারাও-এর ইজিপ্টও কলোনি।

কিন্তু স্যার স্ট্যাফোর্ডের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না—ভারতের মত দেশে কংগ্রেসের মত পার্টির গান্ধীজির মত নেতার অধীনে দেশের সমস্ত শ্রেণীর সমাবেশ ঘটনাটি কী। সে সমাবেশে রাজাও আছে, নবাবও আছে, মেথরও আছে, ধাঙড়ও আছে, চাষীও আছে, বাবুও আছে, উকিলও আছে, মক্কেলও আছে, ডাক্তারও আছে, রোগীও আছে...।

এটা জানাই যদি স্যার স্ট্যাফোর্ড-এর পক্ষে অসম্ভব হয়, তা হলে এই সমাবেশে অনুপস্থিত বিপুলতর পরোক্ষকে জানা বা অনুমান তো অসম্ভবতর। সেই পরোক্ষে আছে, সেই সব ভিতু মানুষ যারা সরকারকে মা-বাপ জানে। বা, হয়তো স্বাধীনতা চায় না। বা, হয়তো শাহেবদেরই পক্ষে।

নিজের ভয়ডর, মতামত ইচ্ছা-অনিচ্ছার অতিরিক্ত এক হাওয়া, বেঁচে থাকাটাকে একটা নৈতিক দায় করে দেয়। স্যার স্ট্যাফোর্ড এই পরোক্ষ কী করে জানবেন? এই পরোক্ষ সর্বদাই যুদ্ধক্ষেত্র। অথচ সর্বদাই যুদ্ধ এড়ানো চলছে।

১৯৪০-এ লাহোর অধিবেশনে মুসলিম লিগ প্রথম পাকিস্তান প্রস্তাব নিল। একজনও বিরোধিতা করেনি। অথচ 'পাকিস্তান' শব্দটি বলার বা লেখার সাহস হয়নি। কারণ, তখনো ভারতের মুসলমানরা পাকিস্তান নিয়ে, জিন্না নিয়ে, মুসলিম লিগ নিয়ে একমত ছিল না। কিন্তু একমত ছিল মুসলমানদের স্বাতন্ত্রের বিষয়ে ও হিন্দুদের সমতুল্য সম্মান আদায়ে।

যুদ্ধধ্বস্ত চারটি বছরে মতৈক্যের প্রয়োজনই বোধ করলেন না মুসলমানেরা। তখন এই মুসলমানরাই অন্য একটা ঐতিহাসিক সমীকরণের মধ্যে পড়ে গেলেন। মুসলমানদের দেশ = পাকিস্তান = মুসলমান = জিন্না = লিগ = মুসলমান।

পাকিস্তান ধারণা ও জিন্নানেতৃত্বের একশ শতাংশ বিরোধীও, মুসলমানদের বিরোধিতা করতে পারবেন না, করা সম্ভব নয়। পাল্টা হিন্দু সমীকরণও ঘটেছিল। কিন্তু সে-সমীকরণ ঘটেছিল মুসলমান-সংহতির প্রতিক্রিয়ায়। প্রতিক্রিয়ায় শক্তিহ্রাস ঘটা প্রাকৃতিক নিয়ম। তদুপরি হিন্দু প্রতিক্রিয়া ঘটছিল বহু বহু বিচ্ছিন্ন নিশানের তলে—কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, ফরোয়ার্ড ব্লক, হিন্দু মিশন আর জাতপাত দিয়ে তৈরি আরো অনেক ঝাণ্ডার নীচে। মুসলমানরা এক হয়ে যেতে পেরেছিলেন শুধু মুসলমানির প্রতি আনুগত্য থেকে। মুসলমানের সমস্ত শাস্ত্রে, সমস্ত সামাজিক পারিবারিক নীতিবোধে, 'আনুগত্য' একটা পরম ধারণা। হিন্দুদের যেমন শুদ্ধতা বোধ। আনুগত্য কিন্তু ভক্তি নয়। 'ভক্তি'র ধারণায় বর্জনও নিহিত থাকে। ন্যায়শাস্ত্রের বর্জন, নিত্যকর্ম বর্জন, দশকর্ম-সহস্রকর্ম বর্জন। আনুগত্যে কোনো বর্জন নেই, শুধু আছে প্রস্তুতি। ইসলামি শাস্ত্র,

বিধিবিধান ও নীতিবোধ এই আনুগত্যকেই গড়ে তোলে। জিন্নাবিরোধী, পাকিস্তানবিরোধী, লিগবিরোধী হওয়ার মধ্যে মুসলমানির কোনো বিরোধিতা নেই।

কিন্তু মুসলমানির মধ্যে ওগুলোও থাকতে পারে, আরো কিছু থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। আনুগত্য, মুসলমানির প্রতি। সেই আনুগত্য ও ধারাবাহিকতাতেই মুসলমানরা জিন্নাকে অদ্বিতীয় নেতা করে তুলেছিল।

জিন্না ধর্মাবিশ্বাসী ছিলেন না, কোনো মুসলমান রীতিনীতি জানতেন না, ইসলাম নির্দিষ্ট কোনো নিষিদ্ধ খাদ্যগ্রহণে তাঁর কোনো আপত্তি ছিল না, জীবনে একদিন মাত্র নমাজে গিয়েছিলেন, নমাজিদের দাঁড়ানোর বসার ভঙ্গি পর্যন্ত জানতেন না। সারাক্ষণ জোড়াসনে বসে থাকলেন। ১৯৪৭-এর ১৪ আগস্ট স্বাধীনতা উপলক্ষে একটা বড় খানা লাগিয়েছিলেন না জেনে যে ওটা রমজানের সময়।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ব্যর্থতা বা রহস্য কোথায়? দেশভাগে? দেশভাগ, পার্টিশন, যেন স্বাধীনতাকেই মিথ্যে করে দিল? তাহলে গোলমাল তো শুরু বা গোলমালের বীজ তো পোঁতা আরো অনেক আগে, ভারতবর্ষ নামক রাজনৈতিক ভূখণ্ডকে অখণ্ড ভাবা হয়েছিল যখন? ভারতবর্ষ ও ভারতীয়তা এমন আকার পেল কবে—এই অখণ্ডতার আকার?

একটা তো মনে হয়, 'নিখিল ভারত কংগ্রেস' এই নামকরণে সেই অখণ্ডতার আকারটা ছিল। ফলে, এর পরে রাজনৈতিক দলগুলি 'অল ইনডিয়া' হয়ে গেল। বিশশতকের তৃতীয় দশক থেকে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন যখন সহজানন্দ, কমিউনিস্ট ও সোস্যালিস্টদের নেতৃত্বে সারা দেশের আন্দোলন হয়ে উঠল, তখন তারা তো বাধ্যতই অল ইনডিয়া। ব্রিটিশ সরকার যখন গভর্নর-জেনারেলকে ভাইসরয় বা উপসম্রাট বানালেন, তখনো তো ভারতের অখণ্ডতাই সেই উপসম্রাটের সাম্রাজ্যান্তর্গত ছিল। ভারত হিশেবে এই দেশের অখণ্ডতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দান নয়। ওরা, সারা ইয়োরোপই তো, জানত 'ইন্ডিজ' বলে এক মায়াময় ও লুণ্ঠিতব্য দেশ আছে।

৩৫-এর প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনে এই মিথ্যেটা তৈরি হল যে ইংরেজরা থাকল শুধু কেন্দ্রে। ভোট হচ্ছে, আইনসভা হচ্ছে, আইন পরিষদ তো প্রায় সত্তর বছর ধরেই আছে। নিজেরাই দল পাকাচ্ছে। ভোটের আগে জোট করছ। ভোটের পর জোট ভাঙছ। আবার নতুন জোট বাঁধছ। মন্ত্রি হচ্ছ, মন্ত্রিসভা পাচ্ছ। স্বাধীনতা তো হয়েই গেল, স্বাধীনতা আর এর বেশি কী? প্রদেশের স্বাধীনতা এসে গেছে, স্বাধীন কেন্দ্রের কাজ ঠিক হলে, আকারও ঠিক হবে। ফেডারেশন তো হয়েই যেত, যদি কংগ্রেস রাজি হত। তবে কংগ্রেসের অনেক নেতাই রাজি ছিলেন। কংগ্রেসের আবার অনেক রকম গট-আপ আছে। যে যার মত মত দিয়ে গেলেন। গান্ধী এসে বললেন, 'না'। ব্যস, না। ওয়ার্কিং কমিটি বলল, 'না'। গান্ধী বললেন, 'হ্যাঁ'। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। প্রস্তাব নেয়ার রাতটাও কাটল না। সারা ভারতের কংগ্রেস নেতাদের গুনে গুনে জেলে আটকানো হল। তারা ফাটকই খাটবে যুদ্ধ শেষ না-হওয়া পর্যন্ত। বাদ এক রাজাগোপালাচারি। তিনি ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছেন, 'ভারত ছাড়ো'র বিরোধিতায়।

গান্ধীর মাথায় কেন 'কুইট ইনডিয়া' খেলল—এটা তো কোনো জাতির স্বাধীন হওয়ার উপায়ের সঙ্গে জড়ানো নয়। প্রস্তাব দিয়েছেন গান্ধী। ওয়ার্কিং কমিটি একবার নয়, যতবার মিটিং করেছে, তার চাইতে মুলতুবি রেখেছে বেশি। শেষে ওয়ার্কিং কমিটি পাশ দিল। প্রস্তাব চলল এআইসিসিতে। ব্যস। পা—শ। সব তো সাংবিধানিক পথেই ঘটছে। এমন কী ৮-আগস্ট রাতেই গ্রেপ্তারও সবাই জানত। রাজাজি তো সেই কথাই বলেছিলেন যে নিজেরা নিরাপদ থেকে জেল খাটছ, কর্মীদের বাঁচানোর কেউ নেই—ভারত যদি সত্যিই ছাড়ে শাহেবরা তা হলে কে কাকে

বাঁচাবে? সারা দেশে সত্যাগ্রহ চলছেই। সব সময় বোঝাও যাচ্ছে না—আইনের দোষটা কী! ধরেছে হয়তো আইন-অমান্যে, জেলের ভিতরে জানা গেল মাদক আইনে। এটা অবিশ্যি আগেও ঘটেছে, এবারও ঘটল। এত লোককে একসঙ্গে ধরে রাখার জায়গা বাংলা বা ভারত সরকারের নেই। তাই এডেন বন্দরের গভর্নরকে জানানো হল—এক জাহাজ বন্দী পাঠাচ্ছি, রাখার ব্যবস্থা করো। এডেনের গভর্নর জবাব দিলেন, 'বন্দীদের মধ্যে নিরামিষ কজন?' আসলে জানতে চাওয়া হয়েছে—শাহেব কজন আর নেটিভ কজন?

কিন্তু ক্রিপস নিয়ে এত মাথাব্যথা নতুন করে কেন? কারণ, আমাদের স্বাধীনতা অর্জনকে কলঙ্কিত করে রেখেছে দেশভাগ—এই একটা মত স্থায়ী হয়ে আছে। প্রায় অনড়। সেই কলঙ্কের খলনায়ক বরাবরই ভারতের হিন্দুদের কাছে মহম্মদ আলি জিন্না, ভারতের মুসলমানদেরও কারো-কারো কাছেও জিন্না-ই ভিলেন। প্রায় জিলাস্তরের নথিপত্র ঘেঁটে যে নতুন ইতিহাসবিদ্‌রা প্রমাণ করছেন যে জিন্না নন, জাতির আন্দোলনের প্রধান বিষয় হিশেবে হিন্দুরাই সাম্প্রদায়িকতাকে তৈরি করেছিলেন—তাঁরাও কিন্তু দেশভাগকে স্বাধীনতার কলঙ্ক বলেই ধরে নিয়েছেন। ক্রিপস যখন ভারতে এসেছিলেন ব্রিটেনের যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার মিশন নিয়ে, তখন থেকেই একটা মত প্রচলিত ছিল যে ক্রিপস প্রস্তাব মেনে না-নেয়াটাই প্রাথমিক ভুল। এখন (২০১০), সেই মতটাকে আরো ছড়িয়ে ভাবা হচ্ছে যে ক্রিপসপ্রস্তাব মেনে নিলে দেশভাগ না করেই স্বাধীনতা আসত ও তাহলে স্বাধীনতা থাকত অকলঙ্কিত। ইতিহাস তো আর 'যদি'-ঘটত ঘটনার আধার নয়। কল্পবিজ্ঞান যেমন বিজ্ঞান নয়। 'যদি ঘটত'-ইতিহাসও তেমনি কল্পইতিহাস, ইতিহাস নয়। গত পঁচিশ বছরে যে-কয়েকটি নভেল বিক্রি-সংখ্যায় মোবাইল-ফোনের বিক্রি-সংখ্যার তুলনীয় হয়েছে, তার সবগুলিই কল্পইতিহাস—'ফুকোস পেন্ডুলাম', 'নেম অব দি রোজ', 'দ্য ভিঞ্চি কোড' ও 'হ্যারি পটার'। ভারত-শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান-বাংলাদেশের ইংরেজি লেখকদের মধ্যে এই 'কল্পইতিহাস', উপন্যাসের একটা আকার হিশেবে গৃহীত হয়ে যাচ্ছে ও এই উপন্যাসগুলির বেশিরভাগেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেকে ১৯৬৫-র পাক-ভারত যুদ্ধ পর্যন্ত ত্রিশ বছর সময়কে ঘটনাকাল হিশেবে বাছা। লেখকদের অনেকেরই জন্ম এই ত্রিশ বছরের পর। এটা ধরে নেয়া যায়, স্মৃতির কোনো দুর্বহ ভার তাঁদের বাধ্য করেনি—ঐ ত্রিশ বছর পুনর্যাপনে। তাঁরা ঐ ত্রিশ বছরকে উপন্যাসে তৈরি করতে চেয়েছেন। যে আধুনিকতর চিন্তা থেকে ঘটা-ইতিহাস যথেষ্ট না-হয়ে 'যদি ঘটত' ঘটনার ইতিহাস প্রামাণিক ঠেকে, সেই আধুনিকতর চিন্তাতেই ঐ নভেলগুলি লেখা।

ক্রিপস প্রস্তাব ব্যর্থ হল কেন—এমন একটি প্রশ্ন তখন ও এখন তোলা হয় কেন? তখন তোলা হয়েছিল—দোষী সাব্যস্ত করতে। এখন তোলা হয়—দেশভাগের কলঙ্কের কারণ খুঁজতে, বা এও এক দোষী-সাব্যস্ত করা। কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্নটির ভিতরে একটি সম্মতিবিন্দু ধরে নেয়া আছে যে আমাদের স্বাধীনতায় দোষ আছে।

কেউ-কেউ মনে করেন যে ব্রিটিশ ভারত যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হল, তখন সেটা দোভাগা হওয়ার মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। দেশভাগ সত্ত্বেও দুটি দেশ তো স্বাধীন হয়েছে—সে ঘটনাটি নাকচ করার গা কোনো উপায় নেই। এঁদের কাছে তাই ক্রিপস-মিশনের কোনো পৃথক মর্যাদা নেই।

আরো কেউ কেউ মনে করেন ব্যর্থ হওয়ার কারণ, ব্যর্থ হওয়ার জন্যই এটা তৈরি হয়েছিল। গান্ধীজিও সেই কথাই বলেছিলেন স্যার স্ট্যাফোর্ডকে তাঁদের প্রথম সাক্ষাতে—'এই যদি আপনাদের প্রস্তাব, আর এর বেশি কিছু দেয়ার যদি ক্ষমতাই না-থাকে আপনার, তাহলে মিছিমিছি

এলেন কেন এত্দূর? পরের প্লেনেই ঘরে ফিরে যান।' এরও পরে আর-একটা কথাও তিনি না কী বলেছিলেন বলে রটে আছে, প্রমাণ নেই কিন্তু রটে আছে—'একটা ফেল-পড়ছে এমন ব্যাঙ্কের ওপর আগাম তারিখের চেক। তামাদি হুন্ডি?

এত ঠাট্টা করে ব্রিটিশ প্রস্তাবকে নাকচ করেননি আর কেউ।

ঠাট্টাটা, বা আক্রমণ, উঠে এসেছিল ব্যক্তিত্বের এমন একান্ত থেকে, গান্ধীর, যেমন জায়গা আর কারো একান্তে ছিল না। পরে, লুই ফিসার-কে বলেওছিলেন যে ক্রিপসের প্রস্তাব থেকেই তাঁর মাথায় বিদ্যুৎ চমকে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের কথাটা এসেছিল। যে-ভাবে কবিতার কোনো লাইন মাথায় আসে কবির? বা, নভেলের কোনো বিস্তার দেখে ফেলেন কোনো নভেলকার? কোথাও কি অভিমানে বা সম্মানে লেগেছিল গান্ধীজির? সার্বভৌম ভারত যাঁর ইষ্ট ভারত, তাকে শুধু একটা নতুন শব্দ দিতে এসেছ, সে-শব্দের অর্থও ঠিক করা আছে তোমাদের ভূরাজনীতিতে, ক্যানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায়, ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস? আমরা তো নতুন শব্দ চাইনি, আমরা আমাদের লুণ্ঠিত দেশটাকে ফেরৎ চেয়েছি। নইলে আমরা ফেরৎ আদায় করে নেব।

ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার কোনো ধারণাই ছিল না, তাঁরা রাজনীতির যে-সব মূল্য নানা অভিজ্ঞতা দিয়ে শ-আড়াই বছর আগে জেনেছেন, অভ্যাস করেছেন ও দুনিয়াকে শিখিয়েছেন সেই, নিয়মিত নির্বাচনে তৈরি পার্টি-প্রতিনিধি বা ব্যক্তিগত প্রার্থীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্টির সরকার চালনা, তার বাইরে আর কী ধরণের মানবসমাবেশ ঘটতে পারে? ব্রিটেনে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার স্বীকৃত। খনি, রেলওয়ে, পরিবহণ, ইত্যাদির কর্মীদের সঙ্গে বিনিময়ের ব্যবস্থা আছে সেই বিনিময়ের একটা নিরপেক্ষতাও আছে। এ-কথাও তো ঠিক—ব্রিটেনে জীবনযাপনের ও শাসনের সমাজদুটি যেমন দুই পায়ে ভর দিয়ে একা ও খাড়া, তেমনি আবার এ ওর ঘাড়ে হেলেও থাকে। এটা পৃথিবীর আর-কোনো দেশে নেই।

যখন থেকে ব্রিটেন কলোনি বসাতে শুরু করেছে ইয়োরোপের বাইরের নানা দেশে, তখন থেকে ইংরেজ সভ্যতার একক বিশিষ্টতা বেশ খানিকটা সময় জুড়ে বদলে গেল বিনিময় মূল্যে। কার মধ্যে বিনিময়? ইংরেজের নিজের দেশের জীবনের গণতন্ত্র ও ব্যক্তিমানুষের বেঁচে থাকার অধিকার যদি রক্ষা করতে হয়, তা হলে কলোনি বসাতে হবে। ইংল্যান্ডের লোকজনকে কলোনাইজেশনের নৈতিকতা বোঝাতে তো প্রায় এক শতক লেগেছে—পুরো আঠার শতক। বোঝানো তো গেলই। কিন্তু সেই বোঝানোর দাম দিতে হল কড়ায়-ক্রান্তিতে। ব্রিটেনে, শাসনের ও জীবনের দুই সমাজ, নতুন এক সমাজের অধীনস্থ হয়ে গেল—তত্ত্বসমাজ। সেই তত্ত্বে গ্রেট ব্রিটেনের ঘরের জীবন আর তারই কলোনির জীবন বা বাইরের জীবনে আড়াআড়ি ঘটে গেল। ব্রিটেন হারিয়ে ফেলল জনজীবনের সমগ্রতা বোঝার বিশেষ শ্রুতি। সরকারের বাইরে বা বিরুদ্ধে কোনো সমাবেশ কী করে ঘটতে পারে? ডাকাতি, দাঙ্গা, লুটপাট—এমন অসামাজিকতা ছাড়া? বা গান্ধীজির অনশনের 'ফেরেববাজি' ছাড়া?

গান্ধীজি ছিলেন সমাবেশ গড়ার শিল্পী। সমাবেশ ছিল তাঁর সৃষ্টি। সমাবেশকে তিনি ভাষা দিতেন। সবাক সমাবেশ রচনা ছিল তাঁর শিল্পকর্ম। এই শিল্পকর্মের প্রথম অস্পষ্ট আভাস ঘটে কোনো মাহেন্দ্রক্ষণে। তারপর, সেটা হয়ে ওঠে একটা সিমফনি।

অহিংসা, অসহযোগ, আইন-অমান্য, সত্যাগ্রহ ছিল সেই স্বরলিপির প্রধানতম চারটি নির্ভর। সেই নির্ভর তিনি গুছিয়ে তুলে নিয়েছিলেন, দক্ষিণ আফ্রিকার পথঘাটে, মাঠেবাটে, গলিতে-রাস্তায় বর্বরতর এক সরকারের সঙ্গে রোজকার চলাফেরায়, সশ্রম জেলখানায়। তাঁর

আন্দোলনের ব্যাপারে তিনি এতই ছিলেন খুঁতখুঁতে যে তাঁর বাহিনী অন্য কোনো রকম বাহিনী যেন মনে না হয় সেই উদ্দেশ্যে তিনি তাদের নতুন নামকরণ করলেন, 'সত্যাগ্রহী'। এমনকী দেখলেই যাতে তাঁর বাহিনীকে চেনা যায় সেজন্য সত্যাগ্রহীদের একটা ইউনিফর্মও ভেবেছিলেন তিনি, তাদের মাথার টুপির নকশাও। এখানে যে-টুপি গান্ধীটুপি সেটা দক্ষিণ আফ্রিকার জুলু উপজাতির টুপি—মাথাঘেরা রিং, কাপড়ের ক্যাপ, মাঝখানটা গর্ত। এবার তাঁর সমাবেশের লক্ষ, ইংরেজকে বলা—'ভারত ছাড়ো' আর নিজেকে বলা, 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'। আর নির্দেশ দিলেন, 'কংগ্রেসের কোনো নেতা যদি জেলের বাইরে না থাকেন, তাহলে প্রত্যেক সত্যাগ্রহী নিজেকে মনে করবেন নেতা ও ভারতের কথা মনে রেখে একা সিদ্ধান্ত নেবেন।'

'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের এই নির্দেশনামার স্পষ্টতা, আইন-অমান্য-অসহযোগ আরো অনেক রকম সত্যাগ্রহের নির্দেশে এর আগে কখনো ছিল না। সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বিতাড়নের একটা কারণ বলা হয়েছিল—অননুমোদিত সত্যাগ্রহ (সিরাজ দিবসে)। সত্যাগ্রহের নির্দিষ্ট অর্থ গান্ধীজি বারবার উদ্ধার করেছেন। কিন্তু 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে সেই নির্দিষ্টতা থেকে তিনি সত্যাগ্রহীকে মুক্তি দিলেন। শুধু থাকল লক্ষ—'ভারত ছাড়ো', শুধু থাকল উপায়—'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে', শুধু থাকল সত্যাগ্রহীর পদমর্যাদা—'তুমিই নেতা। সারা ভারতের কথা মনে রেখে যোগ্য সিদ্ধান্ত নেবে।'

কাউকে যদি 'উপায়' বলা হয় 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে', তাহলে তাকে নিজনেতৃত্বের মর্যাদা না দিলে কবিতার যুক্তির হানি ঘটে, ছন্দ মেলে না।

আন্দোলন বা সমাবেশে ক্ষমতার প্রায় চরম বিকেন্দ্রণ ঘটালেন গান্ধীজি, যখন, সাম্রাজ্যক্ষমতার কেন্দ্রীয়তা রক্ষা করতে ব্রিটিশ ওয়ার ক্যাবিনেট, স্যার স্ট্যাফোর্ডকে মিশনে পাঠালেন। ক্রিপসপ্রস্তাবে যেন কোথাও একটা অভিমানের কারণ ঘটেছিল গান্ধীজির, অপমান ঠেকেছিল যেন, ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনের সমাবেশের প্রতিনিধি হিশেবে অভিমান ও অপমান। নিজেদের পশ্চাদপসরণে শশব্যস্ত ব্রিটেনের সৈন্যরা যখন আশ্রয় খুঁজতে গৌহাটি থেকে লাহোর পর্যন্ত কত রকমের হাসপাতালে ছড়ানো, সিঙ্গাপুর-মালয়-থাইল্যান্ড-রেঙ্গুন পতনের পর পতনে ব্রিটিশের পরাজয় যখন আসন্ন, ঠিক তখনই সারা ভারতে ছড়ানো অসংখ্য সত্যাগ্রহীকে নির্দেশ দেয়া হল, জয় ছাড়া তোমার কোনো লক্ষ নেই। ইতিহাসে কি এই দ্বন্দ্বগুলি খোঁজা নিরর্থক?

তা কোনো বস্তু বা ঘটনা বা মানুষ তো নিজের থেকে নিরর্থক হয় না। তাকে সার্থকতা দেয়া হয়নি বলে সে নিরর্থক। গান্ধীজির এই নির্দেশনামার ত্রিশ-একত্রিশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ একটি নাটকে বিকেন্দ্রণের জয় গেয়েছিলেন, 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।' ত্রিশ-একত্রিশ বছর পরে তার দ্বিতীয় চরণটি এল সারা ভারতের মানুষের পায়ে-পায়ে, 'আমাদের সবাই রাজা'।

'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন যে বাঁধাধরা গতে চলবে না, সেটা গান্ধীজি জানতেন। কথায়-কথায় বলেওছিলেন অ্যাগুরুজ শাহেবকে। তিনি অনুভব করেছিলেন, ভারতের মানুষ স্বাধীনতা লাভের শেষ লড়াই লড়ার জন্য মনে-মনে তৈরি হয়ে গেছে কিন্তু তারা কোনো রাস্তা পাচ্ছে না। তিনি সেই রাস্তাটা খুলে দিতে চান ও তাদের সমবেত ইচ্ছাকে মুক্ত করে দিতে চান সমস্ত পেছুটান থেকে। এটাই লড়াইয়ের শুভতম লগ্ন কারণ তাদের যারা বন্দী করে রেখেছে সেই ব্রিটেন এখন সবচেয়ে বিপন্ন। সিঙ্গাপুর থাইল্যান্ড মালয় আর বার্মার মত ছোট-ছোট জায়গাকে, দেড়শ বছর ধরে রাজত্ব করার পর যারা রক্ষা করতে পারে না, তারা বাঁচাবে ভারতকে? ভারতরক্ষার জন্য ব্রিটেনেরই সবচেয়ে বেশি দরকার ভারতীয়দের—সৈন্য হিশেবে, কর্মচারী হিশেবে, ডাক্তার-নার্স-

ইনজিনিয়ার হিশেবে, গোলন্দাজ হিশেবে, যুদ্ধ জাহাজের খালাশি হিশেবে, বাহিনীর অস্ত্রবাহক হিশেবে, স্ট্রেচার বাহক হিশেবে, সাপ্লাই লাইন সব সময় খোলা রাখতে, অসামরিক জীবনযাত্রা চালু রাখতে, কারখানার মেশিন চালাতে, এয়ার রেইড ঠেকাতে, অ্যাম্বুলেন্স চালাতে, হাতে গ্রেনেড চালাতে, মাইন পুঁততে, ডুবুরি হয়ে জলে ডুবতে, পাহাড়-জঙ্গল-সমুদ্র-গভীর বনাঞ্চলে পুরুষানুক্রমে বসবাসী মানুষদের স্থানীয় জ্ঞানকে কাজে লাগাতে—ভারত ছাড়া লোক পাবে কোথায় ব্রিটেন? হ্যাঁ, যুদ্ধ করবে ভারতবাসী, তাহলে দেশটা তো ভারতবাসীকে পেতে হবে! ভারতবাসী ব্রিটিশের অত্যাচার সইবে শান্তির সময় আর ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য রক্ষা করবে যুদ্ধের সময়? ভারত জাপানকেও লড়বে যদি জাপান ভারতে ঢোকে। ভারত জাপানকে ঠেকাবে স্বাধীন ভারত হিশেবে। 'আগামী কালের স্বাধীনতায় আমার বিশ্বাস নেই। এই মুহূর্তে আমি স্বাধীনতা চাই। এই শয়তানের রাজত্ব আর-এক মুহূর্তও টিকিয়ে রাখা চলবে না।' ব্রিটেন যদি চাইত তাহলে তার ভবিষ্যতের বিপদ থেকে বাঁচতে অনেক আগেই ভারত ছেড়ে চলে যেত। এখন ভারত ইংরেজদের কাছ থেকে স্বাধীনতার ছলে কিছু সুযোগ-সুবিধে চাইছে না। এখন ভারত ব্রিটেনকে বলছে, 'ভারত ছাড়ো', 'কুইট ইনডিয়া'।

গান্ধীজির অন্ধ ভক্তও এই চিন্তার মধ্যে অনেক অসংগতি পাবে। সেই অসংগতি খুব আড়ালের চেষ্টাও নেই। গান্ধীজির সারা জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে তাঁকে নৈতিক পুরুষোত্তম স্থির করে, তাঁর সম্পর্কে নিজের বিচারক্ষমতা ব্যবহার না করে স্বেচ্ছায় অন্ধ হয়েছে, যে-ভক্ত, সে তো এমন কথায় চক্ষুষ্মাণ হয়ে দেখবে, গান্ধীজিই সবচেয়ে বড় আঘাত করছেন গান্ধীর জীবননীতিকে। যুদ্ধবিরোধী যে-মানুষটি অহিংসাকে তীব্র রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে প্রধান অস্ত্র হিশেবে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত, 'গীতা'য় শ্রীকৃষ্ণও যা করতে পারেননি, বুদ্ধ-মহাবীর-খ্রিস্ট ছাড়া কোনো ধর্মপুরুষ যা করতে পারেননি, মানব সভ্যতার সেই প্রতিনিধি ও সেই ব্যতিক্রম যিনি, তিনিই বলছেন, মানুষের স্বতস্ফূর্ততাকে মুক্তি দিতে হবে, আন্দোলন এক-এক জায়গায় এক-এক ভাবে হবে, এ-আন্দোলন অহিংস থাকবে এ গ্যারান্টি কে কাকে দেবে?

উপায় আর লক্ষের যে-অবিভাজ্যতা গান্ধীজি প্রথম নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন—সে-অখণ্ডতা কি তিনি নিজেই ভেঙে দিলেন না?

ভারতীয় হিন্দু আধ্যাত্মিকতার বিমূর্তনের পদ্ধতি গান্ধীজি নীতিনির্ণয়ে ব্যবহার করতেন—এমন যাঁরা মনে করতেন ও মনে করেন, তাঁরা ভাবতেই পারেন, গান্ধীজি সেই বিমূর্ত আধ্যাত্মিকতা থেকে স্খলিত হলেন। এটা তাঁদের ভাবনা। তেমন ভাবতে গান্ধীজিই যে উৎসাহ জুগিয়েছেন কখনো-কখনো, তাও তো সত্য। 'এক বছরের মধ্যে স্বরাজ', 'অস্পৃশ্যতা পাপের শাস্তি বিহারের ভূমিকম্প', 'এই বয়সে এক রাতে আমার স্বপ্নদোষ ঘটেছে—আমি নিজেকে অন্তরে শুদ্ধ করতে পারিনি, আমার পাপেই দেশের এই কষ্ট।' কিন্তু যখনই তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য সমাবেশ গড়ে তোলেন, তখন তার প্রস্তুতির শৃঙ্খলা সীতা-উদ্ধারের জন্য রামচন্দ্রের প্রস্তুতির মত। প্রথমে প্রচার ও কী করতে চান ও কেন করতে চান—অজস্র সভায়, মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ কথায়, লেখায়, চিঠিপত্রে, প্রতিদিনের প্রার্থনাসভায় সেই প্রচার ও প্রস্তুতি চলতেই থাকে। পরের স্তরে তাঁর নিখুঁত সংগঠন। বেশির ভাগ সময়ই কংগ্রেসই সেই সংগঠন। কিন্তু কংগ্রেসের উচ্চতম নেতৃত্ব যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তাতে তো আছেন নানা প্রদেশের, ভাষার, শিক্ষার, বিশ্বাসের, ধর্মের মানুষ। তাঁরা প্রত্যেকেই তো একেবারে প্রাথমিক সংগঠনের সঙ্গে জড়িত। সেখানে সংগঠনের শৃঙ্খলা মানা ও মানানোর একটা প্রক্রিয়া চলতে থাকে। কখনো, যেমন সুভাষচন্দ্রের বেলায়, সংগঠনের শৃঙ্খলাই ব্যবহার করেন তাঁর প্রতিপক্ষকে হারাতে। কখনো সমবেত আপত্তির

কারণে নিজেই নিজেকে সরিয়ে নেন শৃঙ্খলা থেকে।

তার পরের স্তরে, আন্দোলনের দিন, তারিখ, লোকজন, তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলে বিকল্প ব্যবস্থা—এই সব ঊণকোটি কাজ করে যাওয়া।

প্রত্যেকটি আন্দোলন স্থান-কাল-পরিপার্শ্ব নির্দিষ্ট।

'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাবে ওয়ার্কিং কমিটির একজনও তাঁকে সমর্থন করেনি। সেই অসম্মতিকে সম্মতিতে বদলে নিতে গান্ধীজি চার মাস ধরে অবিরাম চেষ্টা করে গেছেন। এর মধ্যে ক্রোধের মুহূর্ত ছিল। ব্ল্যাকমেইলের মুহূর্ত ছিল। শেষ পর্যন্ত হয়তো ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা তাঁর প্রতি আনুগত্যবশতই সম্মতি দিয়েছিলেন। আর, গান্ধীজি যে বারবার বলেছিলেন—সারা দেশ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত, আর এই হচ্ছে সেই মুহূর্তে যখন ব্রিটেন আত্মরক্ষার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে—এটাই সবচেয়ে বড় কারণ হয়ে উঠেছে সম্মতির। গান্ধীজির অনুভবশক্তি ও সমাবেশ ক্ষমতার ওপর আস্থা অন্য ''ব নেতার।

তবু একটা সংশয় থেকেই যায়। ৩ বছর ৫ মাস থেকে মাত্রই তিন-দিন কম আগে ১৯৩৯-এর ১০ মার্চ কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনের নির্বাচনজয়ী রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র অবিকল এই যুক্তি বলেছিলেন—দেশের মানুষ অস্থির, বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন। এখনই সময়। তাঁর এই অনুভবকে কোনো মূল্য না দিয়ে গান্ধীজিকে ব্যবহার করে ওয়ার্কিং কমিটির নেতারা কংগ্রেস থেকে তাড়ালেন। তিনি তাঁর অনুভবের সত্য প্রমাণ করতে এক নিরুদ্দেশ অভিযানে বেরলেন। সম্পর্ণ অজানা অপরিচিত জায়গায় দরজায়-দরজায় পাগলের মত ঘুরলেন, 'আমাকে একটা সৈন্যবাহিনী দিন, আমি ভারতকে স্বাধীন করব।' শেষে তিনমাস টানা সাবমেরিনের ওপরের বাঙ্কে শুয়ে পিঠময় বেডসোর নিয়ে জাপানে পৌঁছুলেন। ক্রিপস যেদিন এসে পৌঁছুলেন দিল্লিতে ১৯৪২-এর ২২ মার্চ, সুভাষচন্দ্র সেদিন আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে বার্মা সীমান্তে। সেখান থেকে তিনি রেডিওতে একটি ভাষণ দেন, গান্ধীজির উদ্দেশ্যে, 'মহাত্মাজি' সম্বোধন করে, বলেছিলেন, আমি বার্মা সীমান্তে, আমরা ভারতের দিকে এগিয়ে চলেছি। একমাত্র আপনিই পারেন সমগ্র ভারতকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আমাদের সঙ্গে মেলাতে। শুধু আপনিই পারেন। আপনি।

গান্ধীজি 'ভারত ছাড়ো' ভাবলেন ক্রিপস চলে যাওয়ার পরপরই এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে।

'ভারত ছাড়ো' কি সেই 'দিল্লি চলো' ডাকেরই সম্মত জবাব?

১৮

যোগেনের তিন সাক্ষাৎ

১৬৫

ক্রিপসের প্রস্তাব, 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব আর 'চলো দিল্লি' প্রস্তাবের ভিতর যোগেন যেন দিশেহারা হয়ে পড়ল। তার দিশে আরো হারিয়ে গেল বাংলার রাজনীতির অস্থিরতায়। ১৯৪২ সালেও বাংলায় যাদের কিছু-না-কিছু সংগঠন ও কর্মী আছে তাদের কেউ এই তিনটি প্রস্তাব নিয়ে একটি কথাও বলেনি। কাগজ পড়ার সময় আর পড়ে, তার মনে হত যুদ্ধের রিপোর্টগুলি তার কাছে যতটা দুর্বোধ্য, সে যেখানে আছে সেই বাংলার কলকাতা শহর ঐ যুদ্ধের সঙ্গে বা ঐ সব প্রস্তাবের সঙ্গে কোনোভাবে যুক্ত নয়। যেন, ও-সব আর-কারো সমস্যা, আর-কোনো দেশের, সে-দেশের সঙ্গে বাংলার কোনো সম্পর্ক নেই। এখানে কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে জেলের বাইরে ছিলেন ডাক্তার বিধান রায় ও তুলসী গোস্বামী। কিরণশঙ্কর রায়ও কখন জেলে যাচ্ছেন আর কখন বেরিয়ে আসছেন ঠিক বোঝা যেত না। 'নলিনাক্ষ সান্যালও বাইরেই ছিলেন কিন্তু তিনিও বুঝে উঠতেই পারছেন না ইংরেজদের এখনই নোটিশ দেয়াই-বা হল কেন, নিজেদেরই বা জেলে যাওয়ার দরকার কী?

কিন্তু দরকারের এত অভাব পড়ল কেন? যোগেন একদিন জানতে চেয়েছিল কিরণশঙ্কর রায়ের কাছে, 'দাদা, এই-যে দিল্লিতে এত লেনদেন হচ্ছে, একটু বুঝায়্যা দেন-না'। কিরণশঙ্কর খুব হেসে বলেছিলেন, 'যোগেনবাবু, আমি বুঝলে তো আপনাকে বলব? আমার তো কোনো শোর্সও নেই, আপনার শোর্স হয়তো আমার থেকে বেশি।'

'আমার শোর্স আসবে কোথা থেকে—আমার কেউ চেনাই নাই দিল্লিতে—'

'বাঃ, আপনি তো সুভাষের সব কন্ট্যাক্টই জানেন। তাঁদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ বা ফোনাফুনি নেই? না-থাকলে কনট্যাক্ট করুন। বার্মা মানে রেঙ্গুনে তো সুভাষের অনেক বন্ধু—তাঁদের কাছ থেকে জানুন। আমাদেরও একটু জানান। অন্যে যে-খবর জানে না, সে-খবর জানতে সকলেরই কৌতূহল হয়।'

'কিন্তু আপনে তো ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বার।'

'সে ওদের ইচ্ছে হয়েছে, রেখেছে, মিটিং ডাকলে যাব, শুনব। যদি ভোট দিতে হয়, তাহলে হয়তো প্যাঁচ কষে একটু কদর বাড়াবার চেষ্টা করব, চেষ্টা করে কোনো লাভ নাই জেনেও। আমার চাইতেও যারা বেশি বুদ্ধিমান তারা পৌঁছেই ভুলাভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে মহাত্মাজির ইচ্ছে জেনে নেন। হাত তুলতে হলে, তোলেন। চুপ করে বসে থাকতে বললে, বসে থাকেন।'

'আপনে এত বানায়্যা কন! এত বড় শাহেব আইস্যা এত্দিন ধইর‍্যা শলাপরামর্শ, সে যাওয়ার আগেই আপনাদের নিজেগ শলাপরামর্শ, এক-একদিন এক-এক খবর। আর আপনে কন, আপনেরা সব হাত-পা কাটা জগন্নাথ?'

'উদাহরণটা জুতসই হল না, যোগেনবাবু। হাতটা কাটা হলে আর তুলবটা কী বা না-তুলবটা কী। আর পাও যদি না থাকে তাহলে—গান্ধীজি যেমন করে লবণে হেঁটেছিলেন, বা, খিলাফতে, না আপনারা তো তখন খুবই ছোট, হয়তো মনে নেই, আমাকে তো আমার জায়গায় সে-রকম

হাঁটতে হবে। না-হলে রটে যাবে যে আমি গোপনে সুভাষপন্থী ও সোস্যালিস্ট। তাই হাত-পাটা কেটে নিলে মুশকিলে পড়ব। বরং কনিষ্ক বলতে পারেন—মুণ্ডু বা মুখের তো কোনো দরকার নেই।'

'কিরণশঙ্করদা একডা কথা কইয়্যা একডু শান্তি পাই। বলেন তো জিগাই।'

'বলুন। এ কী? নিজেদের মধ্যে কথা বলা যাবে না?'

'ক্রিপসের প্রস্তাবগুল্যা আমি এড্ডু খুঁটাইয়্যাই পড়ছি। আমার মতামতও একডা তৈরি হইছে। সে-কথা না। ধরেন, খুব পরিষ্কার না-থাইকলেও ভাগাভাগির একটা কথা কিন্তু উইঠ্যা পইড়ছে। কী ভাগাভাগি, কী কথা—সে সব কই না। আপনে জমিদার—ভাগাভাগির কথা ক্যামনে উঠে, সেডা আমি কী কইব, যার চোদ্দ পুরুষেরও একডা কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ির মাপের জমি নাই। হাওয়াডা যে উইঠল, এড্ডু উইড়ল তাতে বারবারই কয়েকডা জায়গার নামই ঘুর্যাফির্যা উইঠল—পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম, বাংলা, আর বাংলার সঙ্গে মিশ্যাইয়া দুই-একবার আসাম। তো বাংলার একডা নেতার সঙ্গে কোনো কথা হইল না? বাংলার, যে-পার্টিরই হোক, তো একটা মতামত নিব?'

'কেন? হকশাহেবের সঙ্গে তো কথা হয়েছে। নাজিমুদ্দিনের সঙ্গেও বোধহয়—'

'সে তো নামরক্ষা। আমার য্যান মনে হইল—বাংলারে হিশাবের বাইর্ কইর্যা রাইখছে। আপনাগ মনে হয় নাই?'

কিরণশঙ্কর একটু চুপ করে থাকলেন, চোখটাও সরিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, 'বাংলার আর লিডার কোথায়, সুভাষের পর, যার কথা না-শুনলেই না। আমরা তো সব অ্যাড-হক।'

যোগেনও চুপ করে থাকে। বোঝাতে চায় যে সে কিরণশঙ্করের নরম জায়গা ছুঁয়ে ফেলেছে। যখন সে কথা বলল আবার, তার স্বরটা নেমে গেছে।

'কিরণশঙ্করদা, অ্যাদ্দিনে হয়তো আন্দাজ পাইছেন যে আমি যে কংগ্রেস না সেডা কুনো স্বার্থের কারণে না। কংগ্রেস আমার কাছে সত্যি-সত্যি উচ্চবর্ণ হিন্দুপার্টি। কিন্তু সুভাষ বোসরে শরৎবোসরে নেতা মাইনতে আমার ঠেকে না।'

'সে তো সবাই দেখতেই পাচ্ছে শিডিউল্ড কাস্ট পলিটিক্সে আপনি একটা ননকাস্টিস্ট ডাইমেনশন এনেছেন কিন্তু তার ফলে আপনাদের নিজেদের পরিচয়টা আরো স্পষ্ট হয়েছে। হ্যাঁ, আপনি বোধহয় কিছু বলছিলেন—'

'হ্যাঁ, ওই নিজেগ পরিচয়ের কথাডাই। কংগ্রেসের পক্ষে গেলে সেটাই আমাগ হারাইবার লাগব। পুরাটা গিল্যা খাবে। কিন্তু তাই বইল্যা তো এডা মানা যায় না যে বাঙালি উচ্চবর্ণের মাথা নাই। তোগ দ্যাশ শিখাইল কেডা? এত বড় আলোচনায় তাগ কোনো জায়গা নাই?'

'ভাল বলেছেন। আমরাও এমন করে ভাবতে পারি না। আপনি ভাবতে পারলেও বলতে পারবেন না।'

'আমি তো চাঁড়াল বইল্যা গৌরব পাই। চাঁড়াল বইল্যাই চোখের দৃষ্টি দেইখ্যাই বুইঝব্যার পারি—এর নজরে কিন্তু আমারে হিশাবের বাইরে ধইরছে। অবহেলা বোঝা যায়।'

যোগেন একেবারে সোজা চিফ সেক্রেটারিকে গিয়ে বলে বসল, ইংরেজিতেই, আপনি কি এখন যুদ্ধ ছাড়াও কিছু-কিছু কাজ করছেন?

চিফ সেক্রেটারি শাহেব খুব ঠাণ্ডা মানুষ। কম বয়সেই মাথায় টাক পড়েছে। সেই জন্য সিঁথির একদিকের চুল আর একদিকে ফেলে টাক ঢাকা দেন, ঐ একটা কাজ ছাড়া আর-সব কাজ করছি। কোনো মারামারির মধ্যে নেই আমি।

তাই তো। এটা তো খেয়াল করিনি। এত রকমের দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মারামারি আর আপনি তো হেড অব দি গবমেন্ট, কোথাও তো আপনি নিজে হাজির থাকেন না।

আমরা সিভিল সার্ভেন্টরা হচ্ছি সরকারের ভিতরের কঙ্কাল, স্কেলিট্যাল ফ্রেম। কোনো লোকের বুকের বা কোমরের হাড় যদি বেরিয়ে আসে—তা হলে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে— শুনে, যোগেন গলা খুলে হাসে আর চিফ সেক্রেটারি হাসিটা ঠোঁটে বাড়িয়ে দেন।

আমার একটা উপকার করে দিন। ডরম্যান্ট-স্মিথের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে দিন।

ডরম্যান্ট-স্মিথ? বার্মা-র?

তাই তো শুনেছি।

আর কী শুনেছেন?

আমি এই যুদ্ধটার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছি না। এই শাহেব নাকী বার্মায় যুদ্ধ করে এখানে এসেছেন। উনি নাকী যুদ্ধের ব্যাপার সব থেকে ভাল জানেন।

হ্যাঁ—আ, হয়তো বার্মার যুদ্ধ জানেন। উনি তো কলকাতায় এসেছেন দিন পনের। আপনি তো এখানকারই মানুষ। আপনি যা বোঝেননি, উনি কী করে বুঝবেন? আপনার সমস্যাটা কী? তাছাড়া উনি তো আর্মির মানুষ।

সেটাই তো কারণ। নইলে আপনিই তো সবচেয়ে ভাল জানেন। কিন্তু আপনি তো আমাকে বলবেন না। গবমেন্ট, অ্যাসেম্বলি, ক্যাবিনেট এ-সব বাধা আছে। যদি বেআইনি না হয়, তা হলে দিন-না একটা সময় ঠিক করে। আমি ক্ষতি করব না কোনো।

ছি ছি। তাই কি হয়। আপনার মত মানুষ তো দুর্লভ।

ও, এত প্রশংসা যখন করছেন তখন আর চান্স নেই।

একেবারেই না। দেখুন, আপনি আমাকে কী বিপদে ফেললেন। এখন যদি আমি করতে না পারি, আপনি তো ভাববেন আমি ইচ্ছে করে করিনি। বসুন, দেখি বলে।

চিফ সেক্রেটারি কাউকে কিছু বললেন, তারপরই ফোনটা বেজে উঠল। রিসিভার মুখের কাছে নিয়ে এত ফিসফিসিয়ে কথা বলেন, যোগেন কিছুতেই শুনতে পায় না। শুনতে পাচ্ছে না বুঝে যোগেন সাবধান হয়, চিফ সেক্রেটারি যেন সন্দেহ না করেন সে শোনার চেষ্টা করছে। সে নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ঘাড় চুলকোতে শুরু করে।

চিফ সেক্রেটারি 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে সামান্যতম হাসির একটা আওয়াজ তুলে ফোন রেখে দিয়ে কলিং বেলটা টিপলেন। যোগেনকে বললেন, আজই যান। উনি অপেক্ষা করছেন। খুব কাজ-পাগলা মানুষ। আমি বলেছি—আপনি কোস্ট্যাল এরিয়ার ইলেকটেড মেম্বার। আপনিও উনি যদি বরিশাল-নোয়াখালি নিয়ে কিছু জানতে চান, খুব পরিষ্কার করে বলে দেবেন। তা হলে উনিও আপনি যা জানতে চান সেটা বলবেন—যদি ওঁর কোনো আইনি বাধা না থাকে। হি ইজ এ ম্যান অব প্রোফাউন্ড ইনটেলিজেন্স অ্যান্ড হাইলি অ্যাডমায়ার্ড বাই আওয়ার প্রাইম মিনিস্টার।

হকশাহেবের সঙ্গে দেখা হল কোথায়?

সরি। আমি স্যার উইনস্টনের কথা বলছিলাম। আপনি একা যাবেন না। শেষে আটকে-টাটকে দেবে, ও আপনার সঙ্গে যাচ্ছে—দরজায় পৌঁছে দেবে। তুমি গাড়িতে নিয়ে যেও। তাঁর বেল শুনে যে এসেছিল তাকে বললেন চিফ সেক্রেটারি। সে টেবিলের দিকে দু-পা এগিয়ে জিগগেস করল কিছু। শাহেব মাথা হেলিয়ে হ্যাঁ জানিয়ে দুই হাত তুলে ডান-বাঁ কিছু বোঝালেন।

যোগেন উঠে দাঁড়িয়ে ছিল। চিফ সেক্রেটারি তাঁর হাসিটা হাসলেন। যোগেন নমস্কার জানিয়ে

বলল, আপনার মত ব্যস্ত মানুষকে এমন একটা ব্যাপারে কষ্ট দেয়ার জন্য ক্ষমা করবেন। তবে, আমার প্রয়োজন কিন্তু ব্যক্তিগত না। আইনসভার মেম্বারদের মাথায় যদি পরিষ্কার ছবি না থাকে, তা হলে মানুষের কাছে গবমেন্টের কথা বলব কী করে। আমি কি সাক্ষাৎ সেরে আপনাকে জানিয়ে যাব, কী কথা হল।

নেভার মাইন্ড। আমাকে আপনি যে-কথা বললেন না, সে কথা আমি শুনব কেন। ও কে। থ্যাঙ্ক ইউ।

যোগেন আবার নমস্কার করে লোকটির সঙ্গে বেরিয়ে যায়।

লোকটি একটি জিপ গাড়িতেই তাকে নিয়ে গেল, যোগেনকে সামনের আসনে বসিয়ে।

চিনতে পারল যোগেন, জায়গাটা, এই রাস্তার শেষে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল থেকে বাঁয়ে ঘুরলে এলগিন রোড। জায়গাটা বেশ নামজাদা জায়গা—'স্পেশ্যাল ব্র্যাঞ্চ'। ভিতরে অনেকটা মাঠ। ডান দিকে ঘুরিয়ে পরের সমকোণটায় গাড়ি থামল।

'আসুন', বলে লোকটি বারান্দায় উঠে তাকে সোজা নিয়ে গেল, একটা আবছা প্যাসেজ দিয়ে এক ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে ঘরটা দেখিয়ে দিল। যোগেন ইতিমধ্যেই দুই জোয়ানের স্যালুট পেয়েছে। এই দরজার সামনেও এক সান্ত্রী। যোগেন তার সঙ্গের লোকটিকে বলল, 'আপনে আমার জইন্য খাড়াবেন না। আমি ফিরব্যার পারব।' লোকটি একটু হেসে ঘুরে চলে গেল আর সান্ত্রী বুটের আওয়াজ তুলে স্যালুট করল। যোগেন প্রতিনমস্কার করে এগতেই সান্ত্রী দরজাটা খুলে দিল।

একমাথা লাল চুল নিয়ে ডরম্যান-স্মিথ টেবিলের ওপর ঘাড় নুইয়ে কিছু দেখছিলেন। ঘাড় তোলেননি। যোগেন বুঝতে পারে, উনি বুঝেছেন সে এসেছে। নিশ্চয়ই কোনো একটা কিছু থেকে চোখ তুলতে পারছেন না। যোগেন বসেনি। উনি সেটাও টের পেলেন। তারপর, একটা ছোট বই বন্ধ করার মত কিছু একটু আওয়াজ তুলে, 'স্যরি', বলে খাড়া শালগাছের মত উঠে দাঁড়ালেন। আপনি মিস্টার মণ্ডল? বসুন— বলে তিনি নিজের চেয়ার থেকে বেরিয়ে এসে একটা চেয়ার টেনে যোগেনকে বলেন, বসুন, তারপর তার পাশের চেয়ারটি টেনে ঘুরিয়ে যোগেনের মুখোমুখি বসে পড়লেন। কোনো ভূমিকা না করে সোজা জিগগেস করলেন, ওরা যখন বলল তুমি কোস্টাল বেঙ্গলের লোক, তখন তো আমিই তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। তুমি কি এখনো ওখানে থাকো নাকি ইনার মাইগ্রেসন করে সরে এসেছ?

যোগেন পুরো হেসে বলল, আমি এখানে থাকতে চাইলেই কি থাকতে দেবে? আমি তো বরিশালের ছেলে। বরিশালে না থাকলে কোথায় থাকব?

ভেরি গুড। তোমার মত কারো সঙ্গে কথা বলতে যে আমি কী অস্থির হয়ে আছি! জানো, আমি তো ওয়েলস থেকে। ঐ ইংলিশ চ্যানেলের প্যারালাল আছে, উত্তরের দিকে, বিস্টল চ্যানেল, ঐ বিস্টলের অপর পাড়ে কার্ডিফ বলে একটা পুরনো শহরে। এখন, সেখানে তো আর যাওয়া হয় না। যার যেখানে কাজ সে সেখানেই থাকে। আমার মা তাঁর ছেলেমেয়েদের কাছে ঘুরে-ঘুরে থাকেন। আমার প্রথম চাকরি নিয়ে আমি সুমাত্রায় এসেছি। সাউথ এশিয়া—সুমাত্রা। একদিন দু-চারজন গেস্ট এসেছেন, নাথিং স্পেশ্যাল, দেখা করতে এসেছেন, কে কোথাকার লোক কথা হচ্ছে, ওঁরা জানতেনও, আমি বলেছি, ইংল্যান্ড থেকে। গেস্টরা চলে গেলে, মা আমাকে বকে উঠলেন, তুই কেন বললি তুই ইংল্যান্ড থেকে, কেন বললি না ওয়েলস থেকে? আমরা মোটেই স্যাকসন নই। সে মাকে শান্ত করতে পারি না। তারপর থেকে যে যখন জিজ্ঞাসা করে, আমি বলি, কার্ডিফ থেকে। তখন, তিনি আবার জিগগেস করেন, সেটা

কোথায়। আমি তখন বলি, ওয়েলস্‌-এ। ওয়েলস কী করে জানবে সবাই? তিনি আবার জিজ্ঞাসা করেন, সেটা কোথায়। তখন আমি বলি, গ্রেট ব্রিটেন। ফলে এখন সব জায়গায় আমি কোত্থেকে সেটা বলতেই এতটা সময় লাগে। কিন্তু সেই সময়টা জুড়ে আমার মায়ের হাসিমুখটা দেখতে পাই। নিজের জায়গাকে ভালবাসাটা কি সব ভালবাসার আগে?

হতে পারে। ভেবে দেখিনি। প্রথম ভালবাসা বোধহয় মা, বুকের দুধের কারণ। দ্বিতীয় ভালবাসা নিজের জায়গা। তখন তো আর-কোনো ভালবাসা নেই।

শাহেব খুব এক চোট হাসল, একটুও আওয়াজ না করে।

তোমাদের জায়গা থেকে সমুদ্র কদ্দুর—

বলা মুশকিল। রোজ চারবার জোয়ার-ভাঁটা, একেবারে সমস্ত খালবিল দিয়ে পুরো জিলায় ছড়িয়ে পড়ে—

শরীরে যেমন রক্ত?

তাই বটে। তবে রক্ত তো দেখা যায় না। আমাদের রোজ কার সমুদ্র তো পুকুরের মত আমাদের ঘাটে আসে।

শাহেবের চোখদুটো অর্ধেক নেমে আসে, 'ও য়া ন্ডা র ফু ল। দি সি ইজ মাই পন্ড', তুমি কি কবি নাকী?'

না, না। ঠিক উল্টো। উকিল।

ওঃ, ওয়ান্ডারফুল। তোমার সঙ্গে কথা বলাই তো প্লেজার।

শাহেব একটু বুঁদ থেকে বলে, চোখটা আধখোলা রেখেই, দেখো, মনে- মনে তোমাকে হিংসে করছিলাম—রোজ জোয়ার-ভাঁটায় থাকো। হঠাৎ মনে হল—তার অসুবিধেও তো আছে। ধরো, আমার মত কেউ তোমার ওখানে গেছি। আমার বড় জোর এটুকু জানা যে নদীতে-খালে জোয়ার-ভাঁটা খেলে। এখন...যখন গেছি তখন তো জোয়ারের জলে তোমাদের ঘাটে পৌঁছে গেছি, কিন্তু ফেরার সময় ভাঁটা হয়েছে। তখন পাড় আর জলের মাঝখানে একটা থকথকে কাদার জায়গা থাকবে তো—যার ওপর হাঁটা যায় না, তাহলে তো আমাকে আবার জোয়ার আসার জন্য অপেক্ষা করতে হবে?

যোগেন চুপ করে থাকে এতটাই যে শাহেব তার দিকে চোখ তুলে তাকায়, চুপ করে আছো কেন। আমি নিজেকে কতটা স্টুপিড প্রমাণ করেছি।

যোগেন একটু হেসে বলে, 'আমি আপনার অসুবিধেটা বোঝার চেষ্টা করছিলাম। সত্যি তো এমন অসুবিধে হতেই পারে, কারো। কিন্তু সারা জীবনে কখনো এই অসুবিধের কথা শুনিনি কেন, বুঝিনি কেন, কেউ বলেনি কেন। তাতে মনে পড়ল—যদি একটু দূরে কোথাও যাওয়া হয়, কিংবা দূরে না, হয়তো কিছু ঘুরপাক খেয়ে যেতে হয়, মানে, জোলা থেকে খালে, খাল থেকে বিশাল স্রোতের নদীতে, নদী থেকে আবার খাঁড়িতে—তা হলে একটা হিশেব তো করতেই হয় জোয়ার-ভাঁটার, বা, যাওয়া আর ফেরতের প্ল্যান করতে হয়, তখনো তো একটা হিশেব থাকে। হিশেবটা থাকে প্রধানত মাঝির, যেমন গাড়ির তেলের হিশেবটা থাকে ড্রাইভারের। সঙ্গে-সঙ্গে যাত্রীদেরও থাকে। যাত্রীদের মধ্যেও অনেকের বদবুদ্ধি থাকে। ভাঁটার সময় তার ঘাটে নামার সুবিধা। জোয়ার এসে গেলে তাকে উজানে নেমে আবার অনেকটা হাঁটতে হবে। লেগে গেল দুইপক্ষে যুদ্ধ। ঠিক ঠিক। আপনি ঠিক বলেছেন। আমার মনেই পড়েনি—এটা এমন স্বাভাবিক গতিতে হয় যে খেয়ালই থাকে না। আপনি ঠিকই বলেছেন—

মানে একজন বিদেশীর পক্ষে যাওয়া-আসায় ঝামেলা থাকতে পারে। চিটাগাঙে বোধহয়

এই সমস্যাটা নেই, বিরাট একটা সৈকত আছে আর চিটাগাঙে তো খাল কম। তবে সাউথ নোয়াখালিতে আপনাদের মত, না? ঐ ফেণীর দিকে—

আপনি কি আমাদের ওদিকে গেছেন?

না, না, আমি তো রেঙ্গুন থেকে দৌড়ে পালাতে-পালাতে সবে এসে পৌঁছেছি। এগুলো সব পুস্তকলব্ধ খবর।

মনে হচ্ছিল যেন গেছেন, দেখেছেন—

থ্যাঙ্ক ইউ। কিন্তু আমি তো পড়ছিলাম, দেখার সবচেয়ে কাছাকাছি হল পড়া, ম্যাপ দেখা—তাই মনে হচ্ছে আপনার।

রেঙ্গুন থেকে আপনারা যে সরে আসবেন, কেউ ভাবতে পারেনি। আমি দেখিনি কিন্তু শুনেছি, বার্মাশেলের ট্যাঙ্কার আর খনিতে যে আগুন লাগিয়েছিল সেটার শিখা পাঁচ-সাতদিন ধরে চিটাগং থেকে দেখা যাচ্ছিল। অবশ্য শুনেছি, ইংরেজরাই নাকী আগুন লাগিয়ে সব পুড়িয়ে দিয়েছে যাতে জাপানিরা পেট্রল ব্যবহার করতে না পারে।

শাহেব তাঁর চওড়া তেলো দিয়ে চওড়া কপালটাকে চেপে ধরে মাথা ঝাঁকাচ্ছিলেন। খুব না হলেও, একটু তো নাটুকে বটেই। তারপর, তিনি নিজেই সংযত হয়ে গলাতে একটা খাঁকারি দিয়ে বললেন, যারা বলেছে আগুন আমরাই লাগিয়েছি তারাই ঠিক কথা বলেছে। রেঙ্গুন, মানে, বার্মা থেকে যে, উইড্র করা হবে এটা এই যুদ্ধের সর্বোচ্চ কর্তারা আগেই ঠিক করেছিলেন। কিন্তু আমরা যারা এক-একটা ফ্রন্টের কর্তা, আমাদের জানানো হয়নি। সেটাও প্ল্যানিঙের পার্ট। এটা জেনে আমি এত খেপে গিয়েছিলাম যে আর্মি ছেড়ে দেব ঠিক করি। কিন্তু আমার দেশ যখন হারছে তখন আর্মি ছেড়ে যেতে পারি না।

এখানেও কি তাই হবে? ডিস্ট্রিক্ট থেকে অদ্ভুত সব খবর পাচ্ছি। নৌকো, সাইকেল সব কেড়ে নেয়া হয়েছে। নৌকো পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। যত ধান-চাল সব কিনে নেয়া হচ্ছে। কলকাতাতেও নানারকম অজানা ব্যাবসা চলছে। কন্ট্রোল, পারমিট, পারমিট, লাইসেন্স, ব্ল্যাকমার্কেট, এই সব শুরু হয়েছে। শুনছি—কলকাতাও ছেড়ে দিয়ে লড়াইটাকে আরো পশ্চিমে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি সেটা একটু বুঝতেই আপনার কাছে এসেছি। আমি দেশে যাব। সবার কাছ থেকে খারাপ খবর পাচ্ছি।

মিস্টার মণ্ডল। আমি জানলেও আপনাকে বলব না। এটা যুদ্ধ। পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ। যুদ্ধ বোধহয় মানুষের বিচারশক্তি ব্যবহারের সবচেয়ে কঠিন জায়গা। যুদ্ধ চলে সম্পূর্ণ আস্থার ওপর। আর তার উল্টো ষড়যন্ত্রের ওপর। রেঙ্গুন থেকে সরে আসা হবে—এটা রাজনৈতিক নেতা ও যুদ্ধের সেনাপতিদের সিদ্ধান্ত। এটাও সেই সিদ্ধান্তের অংশ যে এরিয়া-কম্যান্ডার বা সেক্টর-কম্যান্ডারদের জানানো হবে না, শেষ মুহূর্তে আদেশ দেয়া হবে, 'উইথড্র'। কেন? যদি ফ্রন্ট-কম্যান্ডার লেভেল পর্যন্ত জেনে যায় তা হলে, যুদ্ধের ধরণে সেটা ধরা পড়বে আর জাপান মিলিটারির যা চোখ তাতে তারা বুঝে ফেলবে। আমি এ-কথা মানি না। এমন ভাবার মধ্যে যে-সোলজার মুখোমুখি এনিমিকে ফেস করছে, তার ইনটিগ্রিটিকে সন্দেহ করা হচ্ছে। আমার মনে হয়, একমাত্র সেই যুদ্ধই জেতা যায়, যে-যুদ্ধে জিততেই হবেটা প্রধান শক্তি। আমাদের এরিয়া কম্যান্ডারকে যখন আমি এ কথা বলি উনি হেসে বলেন, যাঁরা আমাদের যুদ্ধের কৌশল ঠিক করছেন, তাঁরা চাইছিলেন বার্মা থেকে উইড্রয়ালকে এমন নাটকীয় ও অপ্রত্যাশিত করতে, যাতে জাপান অহংকারে অন্ধ হয়ে যায়।

যোগেন জিজ্ঞাসা করে, আপনাদের বার্মিজ উইড্রয়াল কবে থেকে শুরু হল?

শাহেব একটু হেসে বলেন, যুদ্ধের কালক্রম তো যুদ্ধ-চলার সময় তৈরি হয় না। যুদ্ধে কে জিতল সেটা ঠিক হয়ে যাবার পর তৈরি হয়। যা হোক, যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করে বলা যায়, এ বছরের নয়ই মার্চ, অফিসিয়ালি। আর উইড্রয়্যাল শেষ হল, অফিসিয়ালি শেষ হল ৪৯ দিন পর ২৮ মে, ফটটি-টু, জেনারেল ওয়াভেল-এর ঘোষণার পর। কিন্তু বোম্বার্ডমেন্ট তো শুরু হয়েছে ৪১-এর ডিসেম্বর থেকে। আর, সিলেকটিভ ডিন্যায়াল, আমাদের পক্ষ থেকে ভাঙতে ভাঙতে পোড়াতে পোড়াতে পেছিয়ে যাওয়াও শুরু হয় ঐ সময়ই, যদিও ফ্রন্টে আমরা জানতাম না।

আর, চার্চিল-রুজভেল্টের মিটিং? মানে সেই বিখ্যাত মিটিং? আর্কেডিয়া? শুরু হল ডিসেম্বর, একচল্লিশে, আর শেষ হল তিন সপ্তাহ পর ১৪ জানুয়ারি, বেয়াল্লিশে।

তা হলে যখন চলছে ঐ আর্কেডিয়া, তখনই চলছে বার্মা উইড্রয়াল?

তাই কী? কেন? ,আপনি যেন কী একটা হিশেব খুঁজছেন?

সেটা আবার একটু বেশি বেশি বলা হয়। হিশেব কী খুঁজব? তবু, কাগজের খবরও যদি সাজানো যায় কালানুক্রমিক, তাহলে বার্মা যুদ্ধ থেকে উইথড্রয়্যাল, আর অ্যাংলো-আমেরিকান ইউনাইটেড নেশনস চুক্তি নিয়ে কথা শুরু হল প্রায় একই সময়ে—ঐ ডিসেম্বরে, মানে ঐ তিন সপ্তাহে মোটামুটি। আমি বলছিলাম—দুটো তারিখের এতটাই মিল। তা হলে তো ধরে নিতে হয় প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের প্রথম এই মিটিং যখন তৈরি হয়েছে তখনই বার্মা যুদ্ধে উইড্রয়াল শুরু হয়ে গেছে। মিটিংটা রেঙ্গুনে করলেই পারতেন—! যদিও রেঙ্গুনে বসে ঐ জোড়া-ডিসিশন নিতে পারতেন কী, যে 'ইউনাইটেড নেশনস' জার্মানিকে প্রথম অপরাধী হিশেবে মার্কা দিয়েছে।

আপনি তো মশায় এ গ্রেট হিস্টরি অ্যানালিস্ট গিভিং ইয়োর কমেন্টস অন ইভেন্টস দ্যাট হ্যাভ নট ইয়েট হ্যাপেন্ড।

আমার যুদ্ধ ইতিহাস ও ভুগোল নিয়ে কোনো বিশেষ জ্ঞান নেই, অ্যাসেম্বলি লাইব্রেরিতে যে—কাগজগুলো বাইরে থেকে আসে, সেগুলো পড়তে পড়তে মনে একটা সময়পঞ্জি আর জায়গাগুলো সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হয়েছে—সেটা আমার পেশাগত ব্যাপার। আমাদের যখন একটা ক্রিমিন্যাল কেসে ডিফেন্ড করতে হয় তখন আমরা অকুস্থলের একটা ম্যাপ ছকে নেই। আমার ডিফেন্সের বিপক্ষে যাবে তেমন ডিটেল বাদ দিয়ে।

সেটা তো একটা আলাদা ক্ষমতার ব্যাপার। আমি তো আর পারব না।

একেবারেই কোনো ক্ষমতা-টমতার ব্যাপার না। কারণ, ল-তে কেউ তো ঘটনাস্থল বা উপস্থিত লোকজন বা রোদের তাপ বা জলো হাওয়া, যা ঘটনার সঙ্গে জড়ানো, সে কথা আনছে না। আপনাকে শুধুই অ্যাবস্ট্রাক্ট করতে হচ্ছে। উদ্দেশ্য, যাতে ক্রাইমটা আইনের ধারার খাপে সেঁটে যায়।

শাহেব দুটো ভুরু তুলে তাঁর বড় কপালে সমান্তরাল লাইন তৈরি করেন। যোগেন বলে, আপনার কাছে আমি এসেছি জানতে। আমি দেশে যাব। বন্ধু-বান্ধব চেনাজানা মানুষদের কাছ থেকে চিঠি পাচ্ছি, বাড়ি থেকে চাল নিয়ে যাচ্ছে, ক্ষেত থেকে সরিয়া দিচ্ছে, নৌকো পুড়িয়ে দিচ্ছে। আমি কলকাতায় থেকে আইনসভা করছি। অথচ এসব কেন হচ্ছে, কী হচ্ছে তার কিছুই বুঝতে পারছি না। কেউ আমাকে বুঝিয়ে দেবে না—এটা আমি জানি। কিন্তু এটা কি যুদ্ধের অংশ? যে সব নাম শুনছি তারা তো আমাদের মতই দেশের লোক। তাহলে তারা কি যুদ্ধের সুযোগ নিচ্ছে?

আপনি জানতে চাইছেন সব কাজেরই তো অধিকার থাকে। এখানে তিনটে অধিকার থাকতে

পারে—এক যুদ্ধ ও আর্মি, দুই সিভিল গভর্নমেন্ট, তিন প্রফেশন্যাল অপরাধী যারা লোকজনকে ভয় দেখিয়ে পয়সা কামাচ্ছে। ইয়োরোপে এটা কোনো সমস্যা নয়। শিক্ষার একটা ন্যূনতম হার আছে। পাবলিকের একটা দায়িত্ব আছে। সিভিল অথরিটি আর মিলিটারির সম্পর্কটা একেবারে নির্দিষ্ট। কিন্তু কলোনিতে এটা সমস্যা। শিক্ষার অভাব তো আছেই। তাছাড়া মিলিটারিই বলুন আর সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলুন—সবাই তো লোকদের শাসন করছে। একটা মতলববাজ লোক তো সেই ভয় দেখিয়ে ব্ল্যাকমেইল করতেই পারে। বার্মাতে দেখেছি, এখানেও দেখছি—এটা আমাদের সবচেয়ে বড় ফাঁক। এর ফলও ভয়াবহ হতে পারে। আপনার মত একজন পাবলিকম্যানকে আমার মত একজন অফিসারের কাছে এসে জানতে হচ্ছে নৌকোপুড়নো, চাললুট ইত্যাদি কি যুদ্ধের ব্যাপার নাকী যারা আসলে যুদ্ধের ক্ষতি করছে তেমন নোংরা লোকদের ব্যাপার। বাংলা তো একটা ফ্রন্ট হয়ে গেছে। আপনারা তো যুদ্ধ-অঞ্চল। আমার মনে হয়—আপনি একটা আধা-ব্ল্যাক আউট বা দুটো বাফার ওয়াল বা পার্কে ট্রেঞ্চ কেটে এটা সবাইকে বোঝাতে পারবেন না যে এটা একটা যুদ্ধ-অঞ্চল।

আমি তো আর জানতে চাইতে পারি না, আপনার মত হাই অফিসারকেও যদি না-জেনে থাকতে হয় যে আপনি পালাচ্ছেন না এগচ্ছেন—তা হলে আমরা কী করে বুঝব?

ডরম্যান-স্মিথ শুধু একজন মান্যগণ্য আর্মি অফিসারই ছিলেন না, তাঁর একটা খাতিরও ছিল মিলিটারিতে ও সিবিল গবর্নমেন্টে দিল্লিতে কিংবা লন্ডনে। এ খাতিরটা তৈরি হয় নানা উপাদানের ভাল মিশেলে। যদি ওঁর অর্থ সম্পত্তি যথেষ্ট থাকে, যদি তাঁর মিলিটারিতে আসার অন্য কোনো বাধ্যতা না থাকে, যদি উনি একেবারে ট্রেঞ্চের সোলজারের সঙ্গে বিপন্ন রাত কাটান, যদি উনি তাঁর চাইতে বড় অফিসারদের সঙ্গে মত-পার্থক্য প্রকাশ্যে জানান, যদি উনি সব সময়ই বড় পদের ও ছোট পদের অধিকারীর মধ্যে কোনো বিবাদে সব সময়ই ছোট পদের অধিকারীর পক্ষে থাকেন—সেটা মেজর জেনারেল ও ব্রিগেডিয়ারের মধ্যেই হোক, আর লাইনস-নায়েক ও তার সহকর্মী লাইনস-ম্যানের সঙ্গেই হোক, তা হলে তাঁর যেমন খাতির হয়, তেমনই ছিল তাঁর সম্পর্কে খাতির। তাঁর সম্পর্কে একটা গুজবও ছিল যে তিনি স্পেশ্যাল অ্যাপয়েন্টমেন্টে মিলিটারিতে এসেছেন। তাঁর কাজটা কী, সেটা খুব স্পষ্ট ছিল না আর উনি ইউনিফর্ম পরতেন না বলে, তাঁকে নিয়ে একটু রহস্যও ছিল। উনি ওঁর মত বা ধারণা খুব মজা করে প্রকাশ্যেই বলতেন, যুদ্ধটা কী করে সবচেয়ে গোপন ব্যাপার হয়, এটা আমি হাজার মাথা খাটিয়েও বুঝতে পারি না। ধরুন, যুদ্ধটা তো একটা স্বাভাবিক অবস্থা নয়। যেমন, আপনার একটা কার্বাঙ্কল হয়েছে। যদ্দিন ঘরোয়া ও টোটকায় চলল, চলল। কিন্তু যদি ফেটে যায়, তা হলে হয় তোমাকে দৌড়ে হাসপাতালের এমার্জেন্সিতে যেতে হবে, নয়তো, সবচেয়ে কাছের কবরখানায় গিয়ে নাম লেখাতে হবে। এ দুটোর মাঝখানে তো কিছু হয় না। যুদ্ধটা তো কারবাঙ্কল, ফেটে গেছে। এখন আর গোপনতা কী? সবাইকে সব জানিয়ে দিলেই তো সবাই মিলে যুদ্ধটা ভাল করে করা যায়। তা নয় তো, টপ সিক্রেট, প্রাইভেট, এমারজেন্সি, হায়েস্ট প্রায়োরিটি—এত কিছু। মানে, যাকে এত লেবেল সেঁটে কিছু জানানো হচ্ছে, তিনি ইতিমধ্যেই সেটা জেনে গেছেন।

চিফ সেক্রেটারি যোগেনের অনুরোধে যে এই অ্যাপয়েন্টমেন্টটা এমন তাড়াতাড়ি করিয়ে দিলেন, তার কারণ, মাত্র দু-দিন আগে ডরম্যান-স্মিথকে লন্ডন থেকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে উনি কি জরুরি কাজ হিশেবে ইস্টার্ন ফ্রন্টের সিভিল-মিলিটারি সংযোগের (লিয়াজোঁ) দায়িত্ব নেবেন, ডিন্যায়াল পলিসি কার্যকর করার দায়িত্বসহ।

ডরম্যান-স্মিথ ইতিমধ্যেই কোস্ট-লাইন নিয়ে বলতে পারেন এমন স্থানীয় সংবাদদাতাদের

সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছেন। মণ্ডল সে খবরও দিতে পারবে, মণ্ডলও তার যা দরকার তা জেনে নিতে পারবে।

চিফ সেক্রেটারি গত মাসের শেষ পনের দিনের যে রিপোর্ট অনলি ফর ভাইসরয়, গভর্নরের কাছে পাঠিয়েছেন, যে রিপোর্ট দেখে ও তাঁর ইচ্ছে মত আরো কথা লিখে গভর্নর তাঁর রিপোর্ট জানাবেন ভাইসরয়ের কাছে, সে-রিপোর্ট ছোটলাট নিজের হাতে লেখেন। টাইপ যাঁরা জানেন, তাঁরাও টাইপ করেন না—কার্বনপেপার টেপ এগুলো পুড়িয়ে ফেলতে হয়। চিফ সেক্রেটারির কাছ থেকে যে রিপোর্ট ছোটলাটকে পাঠানো হয়েছে ও যে রিপোর্টটাও উনি ওঁর রিপোর্টের সঙ্গে পাঠাবেন, তাতে এক নম্বরে ছিল, ডিন্যায়াল পলিসি আপাতত উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রয়োগ করা হচ্ছে, চিটাগঙে কমপ্লিট ইভ্যাকুয়েশন। ডিমোলিশন অব চিটাগং তো মিলিটারিই করবে কিন্তু শত্রু আসার আগে সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চিটাগং ছাড়তে পারবে না। ছাড়লে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, চুরিজোচ্চুরি, খুনোখুনি, আগুন লাগানো শুরু হয়ে যাবে।

এর আগের রিপোর্টেও চিফ সেক্রেটারি লিখেছিলেন, কলকাতা বন্দর থেকে দিনে ১০টার বেশি জাহাজ ছাড়া যায় না। কলকাতা থেকে নিতান্ত প্রয়োজনের বাইরের সব লোকজন, অফিসপত্র ও মালপত্র ইভ্যাকুয়েশন যদি প্যানিক তৈরি করে, তা হলে পরিস্থিতি খুব খারাপ হবে। কলকাতা হঠাৎ আক্রান্ত হলে, এখানকার লোকজন আটকা পড়ার ভয়ে পাগল হয়ে যাবে। কলকাতা থেকে এখন পর্যন্ত সাতলক্ষ লোক সরেছে। রোজ দেড় লক্ষ মত শড়ক বেয়ে যেতে পারে।

চিফ সেক্রেটারি আন্দাজ করছেন—বার্মার মত বেঙ্গল থেকেও আর্মি উইথড্র করবে ও বোমা মারার যুদ্ধ চালাবার উপযুক্ত খোলা জায়গায় জাপানকে নিয়ে যাবে। কলকাতায় আকাশের যুদ্ধ কি লন্ডনের মতই বীভৎস হবে? চিফ সেক্রেটারির এমন স্বগত জিজ্ঞাসায় একটা মন খারাপও লেগে ছিল। এই সময় লন্ডনে থাকতে পারলে দেশের জন্য কিছু খাটা যেত!

কলকাতায় যুদ্ধে খাটাও তো দেশের জন্যই খাটা। এখন ভারতই ব্রিটেনের পা-রাখার জায়গা।

যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ

খুলনা থেকে স্টিমারে উঠতে উঠতে সিঁড়ির গোড়ায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। এটা বরিশাল লাইনার তো? ওপরে যাওয়ার খাড়া সিঁড়িটার মাথার ফাঁকাটায় তাকায়, যেন সেখানে কোনো চিহ্ন আছে চেনার। ফাঁকাটা তো অন্ধকার।

১৬৬

যোগেন সত্যিই লজ্জা পায়। তাকে কি এখন জিজ্ঞাসা করতে হবে কাউকে, এটা বরিশালের জাহাজ তো? কিন্তু তার খটকাটা ঠেকল কেন? এখনো তো ঠেকছে।

যোগেন সিঁড়ি দিয়ে না উঠে ইঞ্জিন ঘরের পাশের গলি দিয়ে সামনে এল। তাকাল—এত কম লোক, এই ট্রিপে? রাত কাটালেই বরিশাল—সেই জন্যই তো সবাই এই জাহাজটা ধরে। আর, খুলনা মেলের প্যাসেনজাররাও ধরে। এতক্ষণ সময় গেল, যোগেনকে কেউ সম্ভাষণ করল না? সে-ও তো কাউকে চেনা পাচ্ছে না। তাহলে কি গেটে সিঁড়ির কাছের টিকিটবেচাকে জিজ্ঞাসা করবে? কী জিজ্ঞাসা করবে—এটা কি বরিশালের? একটু হালকা করেও জিজ্ঞাসা করা যায়, বরিশালের তো? কিন্তু টিকিট বেচা তো তাকে চিনতে পারবে। সে যদি সেই চেনার সুযোগে

বরিশাইল্যা রগড় করে, 'বরিশাল? বরিশাল হইব ক্যা?' সে তো আর যোগেনকে বলতে পারবে না—আরে মণ্ডলমশায়, নিজের জাহাজ ভুইল্যা গেলেন? তাহলে যোগেন বুঝবে কী করে, টিকিট বেচার জবটা জব না ঠাট্টা?

নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে যোগেন ইঞ্জিন ঘরের পাশের উল্টো গলি দিয়ে এগল। দু-পা গিয়েই থেমে যায়—আরে, এই জাহাজের একতলায়-না জামির মিয়ার পান-বিড়ির দোকান আর ভাতের হোটেল। জামির মিয়া থাকলে তো এটা বরিশাল না হয়ে যায় না। যোগেনের আত্মবিশ্বাস তলানিতে ঠেকল। যোগেন মণ্ডল থাকলে বরিশাল হয় না? যোগেন মণ্ডলের এখন জামির মিয়া-র সাবুদ লাগে? বদলাইলডা কী?

জামির মিয়ার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে যোগেন দেখে ওটা জামির মিয়ার দোকান। সব জাহাজের একটাই নকসা। এ জাহাজেও একটা পান-বিড়ির দোকান আর একটা ভাতের হোটেল পাশাপাশি আছে। কিন্তু জামির মিয়া নেই। তাহলে কি...। আরে, তা কি হয়? তাইলে একটা খবর হইত না?

কয়ডা কী? রোজ সেইখানে এতগুলা যুদ্ধে লাখে-লাখে মানুষ মরে, সেখানে জামির মিয়া কি অমর হবে? এটা বরিশালের সার্ভিস হতে পারে, যোগেন জাহাজ ভুল করে থাকতে পারে, সে যাই হোক, যোগেন এটা নিশ্চিত যে দোকানের ঐ লোকটা জামির মিয়া না, এ-লোকটার মাথায় বেখাপ এক জিন্নাটুপি, বোধহয়, খুলির মাপের থিক্যা বড়, মাঝে মাঝেই ঝুইল্যা পইড়্যা চোখডা ঢাকে। আর লোকটা হাতের এক ঠেলায় টুপিটা পেছিয়ে দেয়। ঝিলিক মারে তার কাল কুচকুচে টেড়ি। এর ওপর কাল একগুচ্ছ নুড়, সেও ঝকঝকে কাল, জামির মিয়ার কষ্মিনকালেও নুড় ছিল না, থাকলেও কাল থাকা সম্ভব?

জামির মিয়ার দোকানেই একবার বাকলার নোয়া পণ্ডিতমশায় যথেষ্ঠ দূরত্ব রেখে জামির মিয়াকে দেখিয়ে যথাযথ দূরত্ব রেখে যোগেনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'মণ্ডল, কও দেহি কোন দ্বার দিয়্যা ছাড়া মানুষের গমন নাই শুধুই নির্গমন আছে?' যোগেন এই পণ্ডিতি বদরসিকতা সহ্য করতে পারে না। খানিকটা ঠাট্টার সুরেই বলে, 'আমার তো শুদু বাহ্যদ্বার মনে হয় পণ্ডিতমশায়।'

একটু হাসাহাসির পর পণ্ডিতমশায় বলেন, 'তোমার জাতধর্ম অনুযায়ী যা ভাবার তাই তো ভাববা—গায়ত্রী-জিজ্ঞাসিতঃ শূদ্রঃ করোতি শৃগালরবঃ। শূদ্রকে গায়ত্রী বলতে বললে সে শিয়ালের মত হুক্কাহুয়া করে। তুমি শুদ্দুর হইয়্যা কি কইর‌্যা বাহ্যদ্বার ছাড়া ভাইবব্যা যোগেন?'

নেহাৎ যোগেন রাগতে পারে না, তাই এটুকু বলেই সেদিন বাকলার পণ্ডিতকে ছেড়ে দিয়েছিল, 'আপনে য্যান জামির মিয়ারে নিয়্যা কী য্যান বলব্যার চান। সেইডা কন। কমক্রোধোহি বিপ্রাণাম মোক্ষদ্বারার্গলা বুভৌ।

শেয়ানাবুদ্ধিতে বামুনের বাড়া নাই। পণ্ডিতমশায় যোগেনের জবাবে বুঝলেন, যোগেন ডুবজল। তাই যোগেনের পরামর্শ মত জামিয়ে ফিরে গেলেন—'কইতেছিলাম জামির আমাগ সিদ্ধপুরুষ। নির্গত হওয়ার কালেই মাথামুণ্ড চিরতরে কামাইয়া কেমন পক্ক পেয়ারার মত ডালে ঝুইল্যা আছে।'

যে জামিরকে নিয়ে এত স্মৃতি, সেই জামিরকেও পাচ্ছে না যখন, তখন যোগেন ভুলই করেছে। নিজের কাছে ভুল মানলেই তো টোপ পালানো মাছ ফিরে আসে না। যোগেন মণ্ডল থাকলেই জাহাজ বরিশালে যায় না। যোগেনকে এখন বেরিয়ে কোনো একভাবে বরিশালের ব্যাপারটা মেটাতে হবে। হ্যাঁ। পাড়েই যেতে হবে।

পা-টাও বাড়িয়েছিল যোগেন কিন্তু আর-এক পা টানল না। ঐ দোকানে বসা লোকটিকে একটু দূর থেকেই জিজ্ঞাসা করে বসল, 'জামির মিয়া কি অ্যাহন দোকানে বসে না, অবসর নিছে? দোকানের লোকটি কোনো খদ্দেরকে কিছু দিতে ঘাড় নুইয়েছিল, জামির মিয়ার অব্‌সর্‌ নিয়্যা এত দুশ্চিন্তা ক্যা, যদি মানুষডারে চিনব্যারই না পারেন?'

তাহলে জামিরই নাকী? এক পায়ে দোকানের সামনে গিয়ে যদিও যোগেন বলে ফেলে, 'দ্যাখো তো চেনা যায় কি না যায়,' এটা আবার নিশ্চিত হয়—এই কুচকুচে কাল চুলে টকটকে জিন্নাটুপি আর লখনৌ-পাঞ্জাবি পুনর্জন্মেও জামির হওয়া সম্ভবব না। সে লোকটি প্রথমে বলে, 'কে ডা?' তারপর ভুরুর ওপরে হাতের পাঞ্জাব আড়াল দেয়, আলোটাতে ঢাকান দেয়া, যাতে বাইরে না আসে, সব আলোই লোকটার চোখে পড়ে তাকে কানা করে দিয়েছে, 'কে ডা? জিন হইলেও তো এতক্ষণে দেখা যাওয়ার কথা।' লোকটি ধৈর্য রাখতে না পেরে আলোটা একটু ঘুরিয়ে এক পলক দেখেই হেঁকে ওঠে, 'আরে মণ্ডল-চেম্বার?' আলোটা আবার সে নিজের দিকে ঘুরিয়ে ফেলে, 'আপনার এই দশা?'

'ক্যা? আমার দশ কী দেইখল্যা? কিন্তু তুমি যদি সত্যিকারের জামির হও, জিনহুরির দখলি জামির না হও, তাইলে, কও—তোমার এই দশা ক্যা?

'কী দশা দ্যাহেন মণ্ডলমেম্বার। কারো তো তেমন ভুল হয় না। বেবাক তো একবার চায়্যাই চিনে। তবে, অ্যাহন তো না চেনা মাইনষিই বেশি। তারা তো ডাকে মিয়াশাব আদাব। বুইঝ্যাই যাই নয়াচেনা। আপনারে য্যান অনেকদিন পরে দেহি? হকশাহেব হিন্দু হওয়ার পর বোধহয় আগমন নাই? যান কই? সদর। তো যান, গাও মেইল্যা দ্যান। আমি যাবনে উপরে—'

যোগেন বিমূঢ়তা নিয়েই দোতলায় ওঠে, একটা কিছু বড় রকমের বদল ঘটেছে। কাল শাহেবের সঙ্গে কথা বলে যুদ্ধের জানা-অজানা নিয়ে কী কী বিভ্রাট হতে পারে—তার একটা আন্দাজ সে পেয়েছে, মানে, একটা আন্দাজ বানাতে পেরেছে। সে-আন্দাজটাকে সে আরো খানিকটা বাড়াতেও পেরেছে শাহেবের ঐ কথা থেকে—যুদ্ধ তো একটা স্বাভাবিক অবস্থা নয়, স্বাভাবিকের সম্পূর্ণ বিপর্যয়। বিকার। যুদ্ধই হচ্ছে সেই সময় যখন সাপখোপ, পোকামাকড়, রেপটাইলস, বিষাক্ত মাকড়সা, তেলাপোকা, উকুন, কেন্নো, কেঁচো বেরিয়ে পড়ে। কোনো কিছুই যুদ্ধে অসম্ভব নয়। যুদ্ধের সময় হয় চোখ বুঁজে বা দৃষ্টি সরিয়ে রাখতে হয়। সেটাকে, এই কথা অনেক ছড়িয়ে নিলেও কি এই পর্যন্ত ভাবা যায় যে সে খুলনার ঘাটে বরিশালের জাহাজ হারিয়ে ফেলবে আর জামির মিয়া এমন বদলে গিয়ে তার পুরনো দোকানেই বেচাবিক্রি করবে?

সরু, খাড়া ও ছোট সিঁড়িটা ভাঙতে গিয়ে যোগেন বোঝে, পা হড়কে যেতে পারে, দেখতে পাচ্ছে না, ওপরের ধাপের ছায়া পড়ছে নীচে ধাপে, সিঁড়ির ওপরে কোনো আলো নেই—অন্য কোথাও থেকে আলো এসে পড়ছে। যোগেন রেলিংটা ধরে পায়ে-পায়ে ওপরে ওঠে। ওঠার পর ঘুরে দাঁড়িয়ে সে সিঁড়ির অন্ধকার খাড়াইটা মাপে। আর, তারপর আবার ঘুরে ওখান থেকেই অন্ধকার প্রবাহের দিকে চেয়ে থাকে। চাইতেই সেই প্রবাহ তার বিস্তার ও শূন্য আকাশের সঙ্গে কল্লোল নিয়ে ফিরে আসে। জল, জল, আঃ জল। বড় নদীতে অন্ধকার কখনো জমাট হয় না। কুয়াশা, একটু ঘন বা পাতলা, ছড়িয়ে থাকে আলোর আভার মতো। হাওয়া, জলের, জাহাজের ও-মুখ থেকে।

যোগেন এগিয়ে যায়। কোণের একটা চেয়ারে একটু বসে থাকলে শরীর ও মন শুশ্রুষা পাবে।

চেয়ারটায়, ডেক্‌ চেয়ারটায় শরীর এলিয়ে দিয়ে যোগেন জলের দিকে তাকায়। কোনো ডিঙি

নৌকো, ছিপ নৌকো, ছই নৌকো নেই, কিন্তু এ-সময় তো গিজগিজ করে জিনিশবেচার নৌকোগুলো। যোগেনের মনে পড়ে, সব নৌকো পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

ডিনায়্যাল পলিসি। সংবাদ বা তথ্যের ভিতর এতটাই তফাৎ? জাহাজে এখনো একটি লোকও তার সঙ্গে কথা বলেনি। এটা সম্ভব? এক জাহাজ লোকের মধ্যে যোগেন মণ্ডল একজনেরও চেনা নয়?

তা কেন? জামির তো আসবে।

চেয়ার থেকে ঘাড় উঁচিয়ে সে অন্য যাত্রীদের দিকে তাকায়। যত কম যাত্রী মনে হয়েছিল, তত কম নয়। চোখ সয়ে গেলে বোঝা যায় যত ফাঁকা ভেবেছিল, তত ফাঁকা নয়। চেয়ারে অনেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে।

যোগেন তো কারো মুখই দেখতে পাচ্ছে না। তাহলে চিনবে কী করে? তার চেনা লোকরাও নিশ্চয়ই তার মুখ দেখতে পাচ্ছে না। তাহলে তারাই-বা চিনবে কী করে? যোগেন তাকাচ্ছিল—কোনো বাটলারকে দেখা যায় কী না। খিদে পেয়েছে, একটু কিছু খাবে।

বাটলার খুঁজতে গিয়েই যোগেন এমন একটা কারণ খুঁজে পেল—এই ব্ল্যাক-আউটের জন্যই সব বিভ্রাট। ব্ল্যাক-আউট নিয়ে কলকাতার বাইরে, ইনডাসট্রিয়াল বেল্ট ছেড়ে দিলে কোথাও তো কোনো অসুবিধের কথা শোনেনি যোগেন। প্রথমত, কলকাতার বাইরে সন্ধ্যা ছোট, তাড়াতাড়ি রাত হয়। দ্বিতীয়, সদরগুলো বাদ দিলে বাংলা বা মফস্বল তো চিরকাল ছোট সন্ধ্যাটা অন্ধকারেই কাটায়। এমন কী দুর্যোগের রাতও। এমন কী তুফানের নদীও অন্ধকারে পেরতে হয়।

এখানে হয়তো বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে জাহাজ-লাইনের এত ভিড় বলে। রাতের জাহাজে তো সব সময়ই ফুর্তি, ঘুমিয়ে থাকলেও। এত জাহাজ, এত নৌকো, এত আলো—এ ঘাট তো গমগম করে। কোনো ছোট লঞ্চও যাচ্ছে না—একটা হুইসলও শোনেনি। এই তরল জলবিস্তার দিয়ে আলোকিত কোনো রেখা এখনো চোখে পড়েনি।

যোগেন এক বাটলার খুঁজে পায় বটে কিন্তু সে যোগেনের ডাকের ইশারা দেখতে পায় না।

এতক্ষণে যোগেন ধরতে পারে—আলো সব গোলমাল করে দিচ্ছে। আলো? না, ছায়া। আলোগুলি থেকে কোনো ছায়া তৈরি হচ্ছে না। বা, যেটুকু হচ্ছে, তা হারিয়ে যাচ্ছে। মাথার ছায়া ঢেকে দিচ্ছে মুখ। তাই, কেউ কাউকে চিনতে পারছে না।

একটা কারণ খুঁজে পেয়ে আশ্বাস্ত হয় নাকী যোগেন?

যোগেন উঠে রেস্টুরেন্টে যায়। রেস্টুরেন্ট তো ঠিকই আছে, শাদা ধবধবে কাপড়ে মোড়া। কাচের গ্লাশগুলো উপুড় করা। মেইন দরজার ডানদিকে ক্যাশ কাউন্টার। এক মহিলা, এক বাচ্চা ও এক ভদ্রলোক খাচ্ছেন। সেই টেবিলটার ওপর যে আলো জ্বলছে, সারা রেস্টুরেন্টে সেটাই আলো।

যোগেন ঢোকার পরই এক বাটলার ছুটে আসে, 'আসেন বাবু, আসেন, ডিনার তো, কয় কোর্স, স্টার্টার দিব নি?'

ধুতি-পাঞ্জাবি বলে যোগেন বাবু, কোটপ্যান্ট হলে স্যার পাজামা-পাঞ্জাবি হলে ছাহাব, লুঙি হল মিয়াছাব।

'তোমার মেনু তুমি তো কইয়্যা সারলা! এদিকে যে চাতক পক্ষীর মতন চাইয়্যা আছি—কারো তো দেহা নাই—'

'খাইছে। আপনে খুঁইজ্যা পান নাই বাবু? কাউরে খুঁজছিলেন আমাগ?' মানে যারা খুব নিয়মিত যাতায়াত করে ফার্স্ট ক্লাশ বা কেবিনে, তাদের কোনো-কোনো বাটলারের সঙ্গে এমন ভাব হয়ে যায় যেন তার নিজেরই বাটলার।

'তোমারেই তো খুঁজছিল্যাম সোনা। ডিনারের অর্ডার বাদে নিয়ো। অ্যাহন এড্ডু চা দ্যাও। আর, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই এক ডিশ। আমার একজন গেস্ট আসব। দুইডা চা দিয়ো। জাহাজ ছাড়ব কহন?'

বাটলার তার কোর্টের হাতাটা তুলে ঘড়ি দেখে বলে, 'টাইম তো হয়্যা গিছে। তবে মনে হয় আইজ মেটেরিওয়াল লোড হচ্ছে। দেইখ্যা আইসব? দেখা নিষেধ বটে, মেটেরিওয়াল লোড তো। ডিপারচার টাইম পার না হইলে, সিঁড়ি না তুইললে, স্টার্ট হয় না। ঐ পিছনের দিকে লোড হয় ডাইরেক্ট এক্কেবারে ছোট বোট থিক্যা। দেইখ্যা আইসলে মনে শান্তি—দুই ঘন্টা না চারঘন্টা আন্দাজ কইর‍্যা কাম করা যায়।' বাটলার আবার তার হাতা তুলে ঘড়ি, দেখে। 'দেখাইড্যা কিন্তু পুরা বেআইন। এম. পির আওতায়। কিন্তু বাবু, সিঁড়ি যদি তুইল্যা থাহে, কাছি যদি ছুঁইড়া থাহে, তাইলে আপনার গেস্ট ক্যান লেট বাবু', ছেলেটি আবার ঘড়ি দেখে।

'আরে মিয়া, তোমার ঘড়ি-দেখা তো শ্যাষ হয় না।'

বাটলার ছোট্ট একটা 'হিস্‌স্' আওয়াজ করে, নতুন আওয়াজ, কলকাতায় শুনেছে, ইয়াংকি সোলজাররা ট্যাকসি-ডাকলে, টমিরা করে না। আওয়াজটা খুলনা-বরিশাল লাইনে পৌঁছে গেছে। ছেলেটি ততক্ষণে তার ঠোঁটের উপর তর্জনীর নিষেধে কথা বলতে না করে। তারপর ফিসফিসিয়ে বলে, 'ঘড়ি পইড়ব্যার পাইরলে তো পড়ব? জাপানি মাল বাবু। বার্মার এক ইভ্যাকুর থিক্যা দিন দুই আগে কিনছি। চাইছিল একশ। জামির আলি দর পাকা কইর‍্যা দিল, সত্তর। যুদ্ধের বাজার কিন্তু চড়া। বাঘের দুধ চান, সিল কৌটায় পাবেন, সত্যিকারের বাঘের দুধ। জাপানি বাঘ।'

'জামির মিয়া কেডা। তলার ভাতের হোটেল?' যোগেনের কথা শুনে ছেলেটি আবার সেই হিস্‌স্‌স্ শব্দ তুলে আঙুল ঠেকায় ঠোঁটে, 'কন কী বাবু, জামির মিয়ার ক্যাপাসিটি জানেন? লিগের সেক্রেটারি।'

'কও কী? জামিরই তো আমার গেস্ট!'

'কন কী বাবু। আপনে কি লিগ? তাইলে ধুতি ক্যা? বাবু, তেষ্টার কথা কইতেছিলেন, এডডু স্কচ দিব। খাশ জাপানি। জামির মিয়ারে দিয়্যা যাচাই করেন।'

'আচ্ছা। সে জামির মিয়্যা আউক। তার লগে বুঝো। আমারে তুমি মণি এডডু আলুভাজা আর একডা জাপানি চা দ্যাও।' যোগেন বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ঘুরতেই বাটলার তাকে আধা-পাক দিয়ে সামনে এসে বলে, 'বাবু, চা তো জাপানি হয় নাই অ্যাহনো?'

'ও। তুমি না কইল্যা জাপানি বাঘের দুধও কৌটায় সিল করা পাওয়া যায়। স্কচও জাপানি পাওয়া যায়, তাই ভাইবল্যাম চা কি আর জাপানি না হইয়া পাবে?'

'বাবু, আমার একডা কথা রাখেন। ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের লগে একডা স্কচ, ঠিক এক পেগ বাবু। দ্যাহেন, তেষ্টাটাও দূর হইব, মনডাও ভাল হইব', ছেলেটি আবার ঘড়ি দেখল।

'সে তো কইল্যাম, জামির মিয়্যা আসুক—' যোগেন বেরিয়ে গেল। বাটলার দৌড়ল ভিতরে। যোগেন একটু হাসতে পারে, সামান্য। না, বাটলার বাটলারই আছে। এখনো যুদ্ধেও। মুরগির যে ডিম তখনো পাড়া হয়নি তারও ওমলেট ভেজে খাওয়ায় খদ্দেরকে।

হয় চা, না হয়, জামির মিয়ার জন্য অপেক্ষায় থাকতে গিয়ে যোগেন একটু স্বাভাবিক হয় ও ঝিমিয়ে যায়। জাহাজে উঠে বুঝতে পারছে না, বরিশালের জাহাজ কী না, চেনা লোক পায় না, তাকে চেনে এমন লোক পায় না, পাকা পেয়ারাতুল্য মাথা-মুখ বদলে জামির মিয়া

কেমন টুপি পরা, ঝালর-লেজা মোরগ হয়ে যায়—এতে কার না মাথা খারাপ হবে। এমন একটা যুতসই যুক্তিও তো পাওয়া যায়—রাত বলেই এমন, দিনের বেলা তো সূর্যের আলো। সেটা তো আর ব্ল্যাকআউট হবে না। তখন মানুষের ছায়াও পড়বে, চোখও দেখা যাবে।

বাটলারটা জাপানি স্কচের গল্প বলে মনের সাড় ফিরিয়ে দিয়েছে।

তার চেয়ারের পাশে একটা পেগ টেবল রেখে দিয়ে যায় বাটলার। তারপর দৌড়ে ফিরে পট-পুট ঢাকা ট্রে নিয়ে আসে, চায়ের। 'বাবু, এডড়ু ভিজব্যার দিবেন, দার্জিলিং টি তো, তাও আবার গোল্ডেন পিকো। এই চা তো সার্ভিস করা বেআইন। শুদু মিলিটারি অফিসারগ আর গরমেন্টের অফিসারগ।' বাটলার একটু হেসে, কথাটা শেষ না করে চলে যায় ও এক জামবাটি ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, ঢাকা দেয়া, নিয়ে ফেরে।

'বাবু, আপনে কি সস নিবেন, চিলি, আলুভাজার লগে'?

'না। কোন দুঃখে? যাগ দ্যাশে কাঁচা মরিচ নাই, স্যায়রা সস খাবার পারে, আমি তো কচ কইর‍্যা কামড়াইয়া কাঁচা মরিচ কাইটব্যার পারি।'

'যা কইছেন, বাবু। এই যুদ্ধের দৌলতে তো এই সবের খুব আমদানি হচ্ছে। বাবুলোকদের দিমাগ বদলে তাজ্জব লাগে। সময়ডা তো আগের মতন নাই।'

'এই শোনো, বান্যায়া বান্যায়া দুঃখের কান্না যদি কাঁদো, তাইলে তুমি যাও, আর কাউরে পাঠাইয়্যা দ্যাও'—

'অর্থাৎ যে আপনারে হাস্যরস দিব্যার পারে—এই তো? তার কারণে আমারে বিদায় দেওনের কারণডা কী। তার থিক্যা কইলেই হয়। আইজকাইল লোকে দুঃখের কথা শুইনব্যার চায়। বেশি। ওয়ারটাইম তো? বাবু, চাটা আমি ঢালি?'

'তো ঢালো—'

পটের ঢাকনি খুলতেই ভাল চায়ের গন্ধ নাকে লাগে, 'বাবু, কইছিল্যাম না গোল্ডেন পিকো। শুধু বাবু অফিসারগ লাইগ্যা। হাই অফিসার। ধরেন, মিলিটারির লগে বাবু, কর্নেলের নীচে কাউরে দেয়ার অর্ডার নাই কিন্তু বাবু, মিথ্যা কথা কব না, আমরা লেফটেন কর্নেলরেও দেই আর আপনারে দিল্যাম—'

'আমারে কি তুমি গবর্মেন্টের অফিসার ধইরছ? আমি কিন্তু অফিসার না। আইন ভঙ্গ কইরো না। চা খায়্যা ফেলার পর ফিরৎ চাইলে ফেরৎ দিব্যার পারব না।'

'কী যে কন, বাবু। অফিসার মানে সাব-ডেপুটি কি মুনসেবা হইলে চলব না। কমপক্ষে সদর-হাকিম। আপনার কথা আলাদা'।

'ক্যা? আমি তোমার বাপের গুরুঠাকুর লাগি ক্যামনে?'

'ছি বাবু। ছী। আপনারা মানী মানুষরাই মানুষের মান নষ্ট করেন বেশি। আপনে-না কইলেন, জামির মিয়া আপনার লোক। তাই যদি হয়, তাইলে আপনে কি এই বরিশ্যাল লাইনে স্পেশ্যাল গেস্ট লাগেন না? জামির মিয়ার লোকরে যদি গোল্ডেন পিকু খাওয়াবার না পারি তাইলে আমার বাটলার হাওয়ার কামডা কী? তাইলে কুনো কর্নেল শাহেবকে কইলে তো আমারে আর্মি মেসের বাটলার কইর‍্যা নিয়্যা যাব, তেমন গেলেই হয়। এই যে বাবু, বরিশাল-বাখরগঞ্জ-চাটি গাঁ-খুলনা—যুদ্ধের এই বেবাক তল্লাটে কুনো একজন লেফটেন—কর্নেলের আর তার থিক্যা উপর দিকের লাইনে কুনো শাহেব অফিসার পাইবে না যে আমার হাতে তৈরি ককটেল খাইব্যার আসে নাই। তার উপুর বাবু, আপনে জামির মিয়ার মানুষ। জামির মিয়া হইল লিগের সেক্রেটারি। তাইলে আপনে আমার নিজের মানুষ কী না, কন।'

'তা তোমার সেক্রেটারি শাহেবরে তো দেখি না।'

'এই অ্যাহনি আইয়া পড়ব। জাহাজ ছাড়ার মিনিট পনেরর পরে মেক-আপ তুইল্যা জামির মিয়া সব দেইখবার বারান।'

'জাহাজ ছাড়ছে নি?'

'বুঝেন নাই? পনের মিনিট হইল। আলো নাই তো। জলে তাই জাহাজের ছবি ছাপা হচ্ছে না। আপনার মত পুরান—প্যাসেনজারই টের পাইলন না। এমন হচ্ছে। তবে অভ্যেস হয়া যাবে? যুদ্ধের সময় বাবু, কত যে অভ্যাস হয়। ডিনারে কী দিব কন'। লোকটি বলে বসে।

'সেডা আমি কই ক্যামনে? আমারডা কইব্যার পারি। কিন্তু জামির মিয়ারডা জামির মিয়ারে শুধাইয়্যা আইসো। না হয় তো ধইর‍্যা আনো তারে।'

'খাড়ান বাবু। সেডাই উত্তম কথা' ছেলেটি দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যায়। একটু পরেই পুরনো জামির মিয়াকে নিয়ে ফেরে। যোগেন দেখে, সেই আদি জামির মিয়া—সেই গাল-মাথা কামানো, একেবারে ঝুঁটি না বাঁধা বড় পেঁয়াজ।

যোগেন বলে, 'এই তো বন থিক্যা বারাইল চেনা টিয়্যা।'

'বাবু। ডিনারের অর্ডারডা—'

'জামির, কয়্যা দ্যাও কী খাবা?'

'যা তো অ্যাহন। জানিস মানুষডা কেডা? তোর যা খাওয়াওইবার বাস্‌না, তাই নিয়্যা আয়। যা-আ। অ্যাহন দরকারি কথা হইব। মাইঝখানে আইয়্যা কথা ছিটাইস না।'

ছেলেটি দৌড়ে চলে যায় বলতে-বলতে, 'মোরগা কোঁক পাড়ে, কোঁক পাড়ে আন্ডা পাড়ে না।'

যোগেন আর জামির দুজন দু-জনার দিকে তাকিয়ে হাসে। যোগেন বলে, 'এইডা কী কাম কইরছ। বেবাক বদল। আমি তো চিনব্যারই পারি না।'

'যুদ্ধ-না? শুনি যে কইলকাতা এক্কেরে বদলাইছে? কী য্যান একটা থাম্বা আছে গড়ের মাঠে। সেইডা না কী পূর্ণিমা রাইতে আকাশ থিক্যা দেখা যায়। তাই থাম্বা ডারে উলটা কইর‍্যা মাটির ভিতর ঢুক্যাইয়্যা রাখছে।'

'আর এমন কী বদলের সংবাদ পাইল্যা জামির?'

'শাহেবগ সঙ্গে মুসলমানগ কথা পাকা হইয়্যা গিছে। এই চাইর জিল্যার মালিকানা শাহেবরা ঢাকার নবাব ছাহাবরে গস্ত কইর‍্যা 'তবে' বলে জামির গায় আমারই বঁধূয়া আনবাড়ি যায় আমারই আঙিনা দিয়্যা?'

'সত্যিই বদলাইছে জামির। নাইলে তোমার গলায় রাধিকার গান? তুমি না কংসবধ পালায় নেপথ্যে কংসের অট্টহাস্য হাসতা? এমন সাহস তোমার জুটাইল্যা কোত্থিকা'।

জামির এদিক-ওদিক তাকিয়ে যোগেন আর লঞ্চের বেড়ার মাঝখানের ফাঁকটাতে বসে পড়ে, যোগেনের হাঁটুতে হাত রাখে আর হাসে। তারপর বলে, 'দ্যাশের বিপদ, ইসলামের বিপদ, লড়কে লেঙগে পাকিস্তান।'

'আরে, তা ন্যাও। কিন্তু তার লাইগ্যা ঐ নাম্বা টুপি, পাঞ্জাবি ক্যা যে আমিও তোমারে চিনব্যার পারি না? চুল কি পরচুলা? নুরও তাই?'

'ভ্যাক লাগব না? ভ্যাক না লইলে নেতা হয়? আমি তো সেক্রেটারি। লিগের। দ্যাহেন মেম্বারশাব, নসিবের কথা কেউ কইব্যার পারে? আপনাগ জামির না কী লিগের সেক্রেটারি। তাই সন্ধ্যাডা ভ্যাক লইয়্যা থাকি, পরচুল্যা আর পরনুর লইয়্যা। সন্ধাবেলা তো লোকজন বেশি,

লাইট কম। তাই ভ্যাক মাইন্যা যায়।'

'তুমি কোন লিগের সেক্রেটারি?'

'হকশাহেবের না। হকশাহেব তো হিন্দুমহাসভা হইছেন।'

'এইডা কি একডা সেক্রেটারি আন্দাজের কথা হইল? যত বরিশাইল্যা জব। মণি, তুমি খাবা? না-খাওয়ার তো কারণ নাই। সিধা কও তোমার নেতা কেডা?'

'সব মুসলমানের যেডা নেতা—'

'তুমি কি নবী মোহম্মদের কথা কও, জামির?'

'আরে, আপনে কি আমার পড়া ধনের নাকী! আমি ক্যামনে নবী মোহম্মদের কথা জানব? আমি তো কই, কায়েদ আজমের কথা।'

'ঠিক, তাইলে তাই কও। তো কংগ্রেসে যেমন বামুন আছে, লিগেও তো তেমনি বামুন আছে। বামুনরা কি চায় আমার মত শুদ্দুররে সেক্রেটারি, মিনিস্টারি কইরতে, আর লিগের বামুনরা কি চায় তোমার নাগাল পাতি-নেড়ারে সেক্রেটারি কইরব্যার? বামুন কেউ ছিল না?'

'কী যে ক—ন,' বলে জামির একেবারে আওয়াজ না-করে এমন হাসে যেন জোয়ারের কাদার ভিতর থেকে কুমির শুধু তার চোয়ালের হাসিটুকু বের করে রেখেছে। যা হোক, জামির তার নিজের সময়ে হাসিটা শেষ করে একটা হেঁচকি তুলে। তারপর বলে, 'সেইডাই তো রহইস্য! নাইলে জামিররে করে সেক্রেটারি?'

যোগেন রহস্য জানতে চায় না। সে বলে, 'তোমার সাজগোছ কি তোমার ন্যাতারাই সাপ্লাই দিল?'

'না, না, ঐটা তো আমারই বাছা। যশোরে এক যাত্রাপার্টির দুকানে গিয়্যা নিজে পইর্যা-পইর্যা আয়নায় দেইখ্যা-দেইখ্যা চয়েস করছি। দোকানি এক বুড়া ঠসা। সে শুদু জিগায় পালা কী আর পাট কী। আমি কি জানি নাকী যে কব। আমি বুড়ার দিকে চাইয়্যা ঠোঁট নাড়াই। বুড়া ভাবে আমি তার কথার জব দিছি, সে-ই ঠসা বইল্যা শুইনব্যার পারে নাই। কিন্তু বুড়া নজর কইর্যা দেইখছে, আমি পরচুলা আর টুপি পইর্যা-পইর্যা দেখবার লাগছি বেশি। তহন আবার চিল্লায়, 'আরে, আমার দুইকানে তো পালা মাইপে পাট মাইপে সেট আছে। কী, মুগলের পাট? আমি তার দিকে ঘুইর্যা আবার মুখ নাড়াইয়া যেডা কইল্যাম না সেইডা হইল—আরে বুড়া খাটাশ, আমার কি পালার পাট? আমার তো ড্রেসের পালা।'

'তোমার কি সেক্রেটারির লগে এডা ইউনিফর্ম, নাকী ইউনিফর্মের লগে সেক্রেটারি?'

'আমি কি পুলিশ, নাকি সিভিক গার্ড, নাকি হোমগার্ড, নাকি এ-আর পি যে আমারে সরকারের কাছ থিক্যা ইউনিফর্ম নিব্যার লাগব? আমি তো পার্টির লিডার। ঠিক লিডার না অইলেও, মুসলিম লিগ পার্টি, জিন্নাপন্থীর সেক্রেটারি। পার্টির নেতাগ তো নিজের পছন্দসই পোশাক। কায়েদে আজমের লম্বা কোট আর চিপা পায়জামা। আবার সারওয়ারদি সাহেব তো খাশশাহাব। গান্ধীর না কাপড় হাঁটু থিক্যা মাজার দিক বরাবর উইঠতেই থাহে। হিন্দুসভার শ্যামাপদর গলা বন্ধ কোট। তো একডা বড় মুশকিল হইছে যে পাড়ার লিডারও পোশাক বানায়। জাহাজেই সেদিন দেহি, ছোট হুলার কাঠির হাটের এক হাটদার ছিল না, গুলি কইয়্যাই তো ডাকত্যাম, মনে আছে নি?'

'ক্যা আমার মনে কি মড়ক দিছে। ওরে কম চিনব্যার পারি, ওর বাবাকে তো চিনত্যাম। চশমা ছিল—ছোট হুলার হাটের সব মানুষের মইদ্যে একা চশমাধারী।'

'কন কি মেম্বার শাহাব, স্যাও মনে রাইখছেন?'

'আরে, বড় আবিদ আলি কার হাফশার্ট বানাইল—না? বাঁ-কাঁধের থিক্যা ডাইন কাঁধ নাকি বড় হইয়্যা গিছে। একে হাফশার্ট কেডা পরে এহানে? বাবুগ কলেজে পড়া ছাওয়ালরা ছুটিতে বাড়ি আইলে পরে। বড় আবিদ আলি যার হাফশার্ট অর্ডার নিছিল, তারে তো কেউ এইখানকার মানুষ বইল্যা চেনে না। সে বোধহয় ঐ পশ্চিমের মাইঝ্যান বাবুর প্রথম পক্ষের শালার ছাওয়াল। যশোর না খুলনায় কলেজে পড়ে। স্যায় তো শার্ট ডেলিভারি লগে আইস্যা শার্ট পইর‍্যা কয়, আমার ডান কাঁধ ক্যা বাঁ কাধ থিক্যা বেশি ঝোলা?'

'দ্যাখল কই, সেই পোলা? নিজের কাঁধ নি নিজে মাপা যায়?'

'তোমার দেহি লিগের সেক্রেটারি হইয়্যাও উন্নতি নাই। কথার সুত ছাইড়ব্যার চাও না? না-হয় ধইর‍্যা নিল্যা, এক হাটে ডেলিভারি দিয়্যা পরের হাটে কমপ্লেন দিছে। তাতে তোমার কী আপত্ত আছে?'

'আপত্ত নাই। সত্যাসত্য মাপার লাগব না? সেটাই তো পার্টির লিডারের কাম আর খ্যামতা—'

'আরে, এইডা তো সাবেক কালের ঘটনা। তহন তোমার কামও তৈরি হয় নাই, খ্যামতাও তৈরি হয় নাই।'

'স্বীকার হইল্যাম। ক—ন।'

'সেই ছ্যামড়া আইস্যা, আবিদ আলিরে কয়—তার শার্টের দুইখান কাঁধের ব্যাশকম হইল ক্যা? তোমার কাঁধ যদি বেমাপের হয় ঠাকুরবাছা, তাইলে তো তোমারে ফৌজদারি রুজু কইরব্যার লাগে খোদার দরবারে। এহানে বিচার কইরব কেডা—আবিদ আলি তার দিকে চাউনি উপুড় করে না। সে পোলার তো য্যান কুত্তার গাঁড়ে পাটের মশাল ঢুইকছে। তহন শার্টের কথা আর নাই। পোলা ইংরাজি বাংলায় আবিদ আলিরে ধুয়াইতে লাগে। তহন তার নালিশ শার্ট নিয়্যা না। তহন তার নালিশ আবিদ আলি তার নামে স্ক্যান্ডাল কইরতেছে। স্ক্যান্ডাল বুঝ?'

'আপনারে কি কওয়া যায়—বুঝি। তবে মতলবডা বুঝছি। অকথা-কুকথা।'

'আবিদ আলি তারে একবার কইছে কিন্তু আমার চোখ দিয়্যা মাপ নিছি। আর কাচি দিয়্যা কাটছি। এর মইধ্যে আমি আসি কুথায়?'

তহন পোলাবাবু চিক্কুর দিয়্যা কয়—তুমি তো আমার মাপই ন্যাও নাই। আবিদ আলি এইবার কইল, ক্যান? আমি তোমার দিকে চাই নাই? দুইডা চক্ষু দিয়্যা চাই নাই? পোলাবাবু তহন তার শেষ অস্ত্রডা ছাইড়ল—আপনার চশমাডা তো ঘোলা, বাইরে থিক্যা তো আপনার চক্ষু দেহা যায় না, আর, আপনে কন চক্ষু দিয়্যা মাপ নিছেন? খলিফার কাম করেন, মাপ নিয়ার ফিত্যাও নাই? আবিদ আলির অপমান ঠেকে। এ ছ্যামড়া তাকে কইল—চোখে কানা, মাপে কানা, ফিতাকানা। সে কইয়্যা উইঠল—হারামি কথা কইবেন না। আপনার কাঁধও খোদার সৃষ্টি। আমার চক্ষুও খোদার সৃষ্টি। এর মইধ্যে শাহেবগ মাপামাপির ফিতা আসে কোথ্‌থিক্যা? কাফেরগ ভাষার ১, ২ লেখা। কাফেরের সংখ্যা আমি পইড়ব ক্যামনে। বাংলাও যে পারি, তা না, তবু সংখ্যাগুলা তো বেশি চেনা ঠেকে। চক্ষুর মাপ থিক্যা ফিত্যার মাপ হইল বড়? এই সব লেখাপড়া শিখায় ইশকুলে? তহন পোলাডা একডা পাল্টা কথা কইয়্যা আবিদ আলিরে দিল ফাঁসাইয়া। পোল্যা কয়্যা বসে, তোমার খোদার দরবারে কি সুবিচার নাই? কার দোষ সেডা তো মাপা লাগে। মাপা লাগে কি লাগে না? তহন আবিদ আলি তার প্রস্তাব দেয়। তুমি এইহানে ঐ শার্টটা পইর‍্যা খাড়াও, এই মানুষ ভর্তি হাটের একগণ্ডা এক মানুষও যদি কয় তোমার শার্টের দুই কাঁধের দুই মাপ, এক-গণ্ডা-একজন মানুষও যদি কয়—আমি নিজের গুনাহ মাইন্যা শোধ দিব। ব্যাস। শুরু হইয়্যা গেল খোদার বিচার। মাইঝ্যান কত্তার আগের পক্ষের শালার পোলা সেই শার্টখান

পইর‍্যা খাড়াইল। আবিদ আলির দুকানের সামনে দিয়্যা যে যায়, তারেই আবিদ আলি ডাইক্যা কয়, 'এই মিয়া, দেহ তো এই ছ্যামড়ার শার্টের মাপে কান্ধের ডাইনে-বাঁয়ে তফাৎ আছে কী নাই।' প্রথম দিকের দুই-চাইর জনকে বলার পর আর কাউরে বলার লাগে নাই। কেউ আইস্যা, তলার সেলাই দেইখ্যা কয়, 'এরে কয় খলিফাগিরি। খোদার দোষও সামলায়।' কেউ-কেউ আবার সমস্যাটা বুঝতেই পারে না। কিন্তু খোদার দুনিয়ায় তো ইবলিসও থাকে। এমন এক ইবলিশের বাচ্চা পোলাবাবুরে কানে-কানে কইল—আবিদ আলির একডা চোখ তো কানা, সেই দিকের মাপডা টেড়া হইয়্যা যায়। আর, আবিদ আলিরে কইল, 'তোমার কামের খুঁত ধরে কেডা?' আর-একজন পোলাবাবুরে কয়, 'আরে আবিদ আলি কি সারা জীবনে লুঙ্গি-ছাড়া কিছুর সেলাই দিছে?' আপনারা টাউনের...।' আর, আবিদ আলিরে বলে, 'তোমার সেলাইয়েরও পরীক্ষা?' একগণ্ডা-এক তো দূরের কথা, মানে, একহাতের পাঞ্জায় পাঁচডা আঙুল, দূরে থাক, পোলাঠাকুর তো লবডঙ্কাও পাইল না যে কইব যে তার শার্টের বাঁ কাঁধের থিক্যা ডাইন কাঁধডা বড়। মাঝখানে একহাট লোকের মইধ্যে এইডা প্রমাণ হইয়্যা থাকে যে বাবুগ পোলার দুই কাঁধ অসমান। তার তো নামই হইয়্যা গেল—দেড়কান্ধা। শ্যাষে নামের বেড় থিক্যা বাঁইচবার লগে পালাইল তার বাপের বাড়ি। তো, কী য্যান কইতেছিল্যা এবাদ আলির পোলা গুলিরে লইয়্যা?'

'আমি? কহন কইল্যাম? গুলিরে লইয়্যা? ক্যা? কব ক্যা?'

'আরে—কইল্যা-না—লিডারগ ড্রেস লইয়্যা? আমি তো তহন ওর বাবার গল্প কইল্যাম—দেড়কান্ধার গল্প।

'ও ও ঠিকই তো। আমনে যদি এই বেবাক মানুষের বাবা বাবারবাবা নিয়্যা টানাটানি করেন, তালি আর বাপের পোলার কেচ্ছা কার মনে থাইকব? গুলিরে দেখি সেদিন একখান নমাজি টুপি মাথায় দিয়্যা জাহাজ পারায়। ছিটের। ঐ বাপের সেলাই-ফোঁড়ার বাড়তি ছেঁড়া কাপড়গুলা সিলাইয়া মাথায় দিছে। আমি ডাইক্যা কইল্যাম, ক্যারে গুলি, খুলি-ঢাকার কাম হইল কী? তো, সেই ছ্যামড়ার নিকট শুনি পরের কোন হাটবারে ইশকুলের মাঠে মিটিং দিবে পিরশাহেব কুমিল্যার। সেই মিটিঙে আবদুল বারি ছাহাব গুলিরে কাজ দিছে। দশ-দশজন এমন মানুষরে জড়ো দিব্যার লাগব যারা আগে কহনো পার্টিও ধরে নাই, মিটিঙও ধরে নাই। তো কও কাহা, আমার কথা শুইন্যা পিরের মিটিঙে যোগ দিবার মতন আহাম্মক কি দ্যাশে কেউ আর বাকি আছে? তাই আগেই একখান টুপি পইড়ল্যাম, যাতে মাতবর মাতবর লাগে দেইখবার। তারপর আবার শুনায়—নামাজির এক বয়েৎ। মেম্বার শাহেব, দ্যাশের হাল বুঝেন। গুলি, ছোট হুলার হাটের গুলি, শুনায় বয়েত। তো জিগ্যাই—এ কার কাছ থিক্যা বিদ্যা নিলি। ক্যা, আমাগ গ্রামের মসজিদের ইমাম মৌলানা জমিরুদ্দিনের কাছ থিক্যা। সে তহন জাহাজের ঐখানে খাড়াইয়াই ইমামের কাছে শিখা আজান ছাড়ে আমারে শুইন্যাব্যার তালে। একটা ভুল কইর‍্যা ফেইলছে। তহন তো দু-পহরের নমাজের টাইম। ও দিয়্যা বইসছে, ফজরের আজান। জাহাজে তো পাঁচ ওক্ত সাত ওক্ত নমাজির অভাব নাই। তারা তো নিজের—নিজের মাদুর-শতরঞ্চি বিছাইয়্যা পা দিয়া চাইপ্যা খাড়া হইছে। যশোরের পুরানা রাজবাড়ির মসজিদের হাজি ইমাম ছিলেন উপরে। তিনি দিলেন বিরাশি সিক্কার গর্জন —আরে, আজান দ্যাও তো নমাজ জানো না? কিন্তু ততক্ষণে স্যায় গুলিও তার আজান থামায় না, আর, জাহাজ জুইড়্যা বর উইঠ্যা গিছে—আজান যহন কানে গিছে নামাজ ফিরাইয়ো না। খোদাতালা নমাজে ডাইকছেন, নমাজ ফিরাইনা নাই। আমাগ সেই ছ্যামড়াগুলি, ছিট সেলাইয়া নমাজি টুপিতে, দু-পহর কালে মেঘনার বুকে পড়াইয়া দিল ফজরের নমাজ। হাজি ইমামের ফতোয়ারে লবডঙ্কা দেখাইয়্যা। সেই থিক্যা তো গুলির নামই

হইয়্যা গিছে—'লেট আজানি'। জাহাজের যেমন লেট হয়—।'

'আরে তোমার হইলডা কী জামিদ? কইল্যা—বেবাকে যদি লিডার সাজে, তাইলে, লিডারের সাজের কী দাম থাকে? গুলিও মাত্‌বর্‌ সাইজব্যার লগে মাথায় দেয় ছিটের নমাজি-টুপি। আর শেষ কইরল্যা, গুলি কেমন হাজি ইমামের মুখ ঘইষ্যা দিয়্যা 'লেট আজানি' নামধাম লইয়্যা মাত্‌বর হইল। তোমার কথাডা শ্যাষ তক খাড়াইল কী? কথার সুতা হারাও ক্যা?'

জামিদ ঐ একটু আবছায় যে মুখ তুলে তাকায় তাতে তার সারাটা মুখ থেকে যেন অসহায়তা গলে পড়ে। সে কার পক্ষে বা তার পক্ষ কোনটা।

'কী য্যান, মেম্বার, একবার মনে হয়—দেড়কান্ধা, লেট আজানি ভাল। আবার মনে হয়, পোলাবাবু-হাজি ইমামই ভাল। কোনডা যে ঠিক ভাল বুঝি না।'

'বুঝাডারে আবার এত কঠিন কইর‍্যা তুলা ক্যান?' যোগেন বলে।

'আমি কই কঠিন করি? আমারেই যে কঠিন করে। চারি দিগে যে মুসলমানের রাজ্যলাভ ঘইটব্যার লাগছে।'

'তা ঘটুক। তুমি তো কুনো কালে মুসলমানও ছিলা না রাজাও ছিলা না। যার হওয়ার স্যায় যাউক। তুমি জামিদ থাইক্যাই গোরে যাইতা।'

'অ! আপনের সন্দ যে আমার লোভ হইছে তাই লিগে গেছি।'

'সন্দেহ না-হওনের কি কারণ আছে?'

'কোনডারে সন্দ? আমার মনে হওয়াডায়? না কী মুসলমানের একডা দেশ হওয়ায়? শুধু-শুধু মুসলমানগ লাইগ্যা একটা দ্যাশে?'

'আমার সন্দ দিয়্যা তোমার কাম কী? রাজ্য হইলে আমার কী ক্ষতি? চণ্ডাল তো মুসলমানগ ভাই। চণ্ডালগরও তো হিন্দু হওয়ার কুনো দায় নাই। আমার তো সুবিদা, মুসলমান আর শিডিউলগো আলাদা রাজ্য অইলে, যে-রাজ্যে বামুন নাই—।'

'আপনে যেমন কয়্যা দিলেন, আমি তেমন ক্যান কইব্যার পাইরল্যাম না? এদিগে কইলকাতার কোম্পানি,আইস্যা চাউল আর নাও ধইরব্যার লাগে। ধরাধরি থাইকলে তো এদিক-ওদিক পালানও থাহে। পালানো আটকাইতে তো শক্ত দাগী মানুষ লাগে। ধরেন, বরিশাল আর বাখরগঞ্জের কোনো হাট-বন্দর নাই যে হানে এক মুসলিম লিগের দুই-তিনজন সেক্রেটারি নাই। যেমন এক সেক্রেটারি খাল ঘুইর‍্যা চাউল আনে। আর-এক সেক্রেটারি সেই চাউল নৌকায় তোলে। আর-এক সেক্রেটারি টাহা দ্যায়—গুইন্যা-গুইন্যা দেয়। আর আমি সেক্রেটারি সেই মাল ফেলি, নৌকার পেট থিক্যা জাহাজের খোলে। আর তারপর খোল থিক্যা সেইডা ডেলিভারি দেই মেইললাইনের কুনো জায়গায়। এইটা তো হারামির কাজ। যারই রাইজ্য হোক, হারামির কাজ। অ্যাহন কার রাইজ্য? সব রাইজ্যেই তো হারামি লাগে।'

'তোমার যা কওয়ার কও। ঠিক ভুল দিয়্যা তোমার কী? আমি শুদ্ধ কইর‍্যা ভাইব্যা নিব।'

'বে—শ। ধরেন, যদি কেউ কয় এই বেবাক এলাকার সব চাইল এই জিলাতেই রাইখ্যা দিয়া নিষেধ। খাওয়ার চাল রাইখ্যা বাকি চাইল সরকাররে বেইচ্যা দ্যাও। হাতে নগদ পয়সায় দাম। আপনে তো জানেন মেম্বার শাহাব—রাজা হইলেও চাষা নগদের আকাঙ্খি। এক্কো চাউলও ঘরে রাখে নাই। যে-নৌকায় চাল ডেলিভারি দেই, সেই নৌকা তো আর জল পাড়ায় না। পুড়ায়্যা দ্যায়। মাস খান হইল তো ঘরদুয়ার ভাঙা শুরু হইছে। অ্যাহন শুরু হইছে যা হোক কিছু হাতে নিয়্যা ভিক্ষায় বাড়ান। রাজ্য যারই হোক, স্যায় ইবলিশ। যার ধান তারে দ্যায় না। তার হাতে দ্যায় এক ভাঙা সাকনি। সেইডা ধইর‍্যা টাউনে-টাউনে ঘুরে। ক্ষুধার তরে। ক্ষুধার

তরে। মেম্বার শাহাব—আপনার চোদ্দ পুরুষে শুইনছেন কুনোদিন বাখরগঞ্জের মানুষ না-খাইয়্যা মরে? এই-যে দ্যাহেন মেম্বারশাহাব, রাইত নিশুত, মানুষভরতি জাহাজ, জলে য্যান আলো না পড়ে, হেডলাইটের আলো জ্বাইলব্যা না, অন্ধকার এই নদী দিয়্যা, অন্ধকার এই জাহাজ, অন্ধকার সব মানুষ নিয়্যা আন্ধার থিক্যা আন্ধারে যাইবার পাইরলে উচিত হইত। কিন্তু আন্ধারের নিয়ম আছে তো। যুদ্ধের আর আন্ধারের নিয়ম তো এক না। আন্ধার জুইড়্যা আন্ধার জাহাজ যদি আন্ধার মানুষগ নিয়্যা আন্ধার পারায়—তালেও তো আলো ফুটবে-নে। অমাবস্যার পক্ষ জাহাজ চইলবে আর জামিদ মিয়া যশোর-খুলনার যাত্রার দোকান থিক্যা কেনা জামা-কাপড় আর জিন্না-ক্যাপ পইর‍্যা মুসলিম লিগের সেক্রেটারি সাজব। তারপর আবার সেই সব খুইল্যা, নারকেল তেল দিয়্যা মুখের রঙ তুইল্যা উপরে আসব পুরানা মেম্বার শাহাবের লগে কথা কইব্যার?'

যোগেনের আর জামিদ মিয়ার এই সব কথা চলছিলই।

জাহাজটা অন্ধকারে নদীর অন্ধকার জল পেরিয়ে চলছিলই।

যখন ওদের কথাবার্তা চলছিল না, তখন জলস্রোতের আওয়াজ আসছিল তলা থেকে ওপরে, মানে, জাহাজ যে-জলস্রোত ঠেলে এগচ্ছে, সেই স্তর থেকে দোতলার ডক পর্যন্ত। অন্ধকারে থাকতে-থাকতে যেমন চেনা হয়ে যায় অন্ধকার, গভীর খনির গর্ত কয়লার ধসে বন্ধ হয়ে গেলে আটকে-পড়ে-যাওয়া খনি-মজুররা যেমন চিনে নেয় অন্ধকার, অন্ধকারে বন্যার কলনাদ, দশদিকের কাল পাথরের ঘের, কাল পাথরে জল বা অন্য কিছুর আকার। যোগেন যুদ্ধ বলতে তার জিলাবাসী দু-জনের কাছ থেকে সর্বনাশা খবর পেয়ে, রাজপুরুষদের কাছ থেকে যাচাই করে তার দেশে ফিরছে। কিন্তু ঘাট থেকে তাকে আর নদী পেরতে হয় না। সে সেই যুদ্ধের অন্ধকারে প্রত্যাবর্তনহীন ঢুকে পড়েছে।

'জমিজমা না কী চৈত্যা বচপাতার নাখাল রাইত—খসব্যার ধরে?'

'না খইস্যা করে কী? ঐ জমির ধানডা তো আর গোলায় নাই। সরকার নিয়া সারা। সেই জমিতে পরের বছরের চাষ তো আর চলব না। তার থিক্যা বেইচ্যা যদি দুইডা পয়সা পায়—নগদ পয়সায় টাউনে গিয়্যা চাইল কিনব্যার পারব। কয়, খাও কী? কয় যে নোট খাই। খিদ্যা মেটে? খিদ্যার হিশাব কই যে মেটার হিশ্যাব কইব? যোগেন জানে—এটা যুদ্ধ, উপকূল থিক্যা মরুভূমি বানান্, বার্মায় টাইম পায় নাই, ইনডিয়ায় তাই আগের থিক্যাই বেকবুল কইরছে। জামিদ মিয়া জানে না। সে সন্ধ্যার শো-তে মুসলিম লিগের সেকরেটারি সাইজ্যা পরচুলা পরে।

[illegible] অনেক অ[illegible] আগে, বলা চলে গত সন্ধ্যায়, দুই ট্রেতে আলাদা-আলাদা ঘটি সাজাইয়্যা দিয়্যা গিছিল, তার সুবাসে ভরে ছিল যোগেন, জামিদ ও আরো প্যাসেঞ্জারের শ্বাস। সুবাসের যেটুকু আয়ু সেটুকু থাইক্যা সুবাস যায় ফুরাইয়া। সুবাস-ফুরানোডার তো আর কোনো বাস নাই। কিন্তু পচনের তো আছে। পচা ভাত, পচা রোস্ট, পচা মাছ। পচনের বাসে নাক জ্বলে। জামিদ মিয়া লাথি মাইর‍্যা সেই ট্রে-দুইডারে জাহাজের বেড়া গলাইয়া জলে ফেলে।

যোগেন জানে, এই যে তার প্রবেশ, এর থিক্যা আর নিষ্ক্রমণ নাই। যুদ্ধ।

বেকবুল দেশ—ডিনায়্যাল

ব্যূহটা তো যোগেনের তৈরি না।

১৬৭

যোগেন ভেবেছিল, অ্যাসেম্বলি লাইব্রেরিতে দেশবিদেশের কাগজ পড়ে-পড়ে যুদ্ধটা জানা হয়ে যাবে। আর, আইনসভার মেম্বারদের দলবদলাবদলিতে আজ এ-মন্ত্রী, কাল ও-মন্ত্রী করে যুদ্ধটা করা হয়ে যাবে, যেটুকু করার। যোগেন জানবে কী করে—এ ছাড়া যুদ্ধ জানার বা যুদ্ধ-করার আর কী উপায় আছে।

খুলনা ঘাট থেকে বরিশালের জাহাজে উঠে সে প্রথম সন্দেহ করল—এটা বরিশালের জাহাজ তো? চেনাজানার সেই গোলমালটা যোগেনের মাথায় ঢুকেই পড়েছে। কিছুতেই আর বেরয়নি। কুইনাইন খাওয়ার পরের সকালে যেমন মাথা ফাঁকা ঠেকে, চোখের পাতা ভারী ঠেকে, দৃষ্টি একজায়গা থেকে আর এক-জায়গায় সরানোয় অনেক খাটনি ঠেকে—এই যাত্রায় যোগেনের তেমনি হল। তার দুটো পা-ই মাটি থেকে দুই-আঙুল মত ওপরে উঠে গেল।

তার ফলেই যোগেন বাখরগঞ্জ-ফরিদপুর-বরিশাল-ফরিদপুর-খুলনা-ফরিদপুরের বিলএলাকা, যশোরের রিক্রুটিং সেন্টার পাক দিতে পারল। এ-তল্লাটে নৌকোই তো মানুষের পা। সেই নৌকোগুলি ধরে-ধরে পুড়িয়ে দেয়ায় মানুষ তো হাগতে যেতেও পারবে না। এ তল্লাটে মানুষজনের পেটের খোলও বড়, জমির খোলও বড়। যদি দ্বীপ-দ্বীপান্তরে ঘুরে-ঘুরে ঠিকাদারের লোকরা সেই চাইল লিগের নতুন সেকরেটারি জামিদ আলির মারফৎ কলকাতায় চালান দেয়া চালাতেই থাকে, তা হলে, তিন বেলার খিদে মেটানো তো বাউন-কায়েতদেরও সম্ভব না আর জমির আইল ধরে হেঁটেহেঁটে ধানের গন্ধে যারা পেট ভরাত, তাদের পেট তো খালির ওপর খালিই থাকে, কয়টা খিদে পুরল সেটা তো আর খাওয়ার হিশাবে ধরা থাকে না। জমির খাড়া ধান উপড়িয়ে আগুনে পুড়িয়ে মাটির ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। তা হলে, কাঁটা গাছে ভরা সেই আষাঢ়ে জমি দুই-চারটাকায় কিনে নেয় খাজাশাহেবের মুসলিম লিগ, বা হকশাহেবের কৃষকপ্রজা, বা প্রগতিশীল লিগ, বা কংগ্রেসি উকিল-বাবু, বা মহাসভার স্থানীয় নেতা। চালের দাম বাড়ে আর জমির দাম কমে—এটা যুদ্ধ।

যোগেন দেখছিল, সেই তার পায়ের তলার মাটি থেকে দু-আঙুল উচ্চতায় দাঁড়িয়ে ফরিদপুরের গোপালগঞ্জের সাতলা বিলের আলের ওপর থেকে। সে-না বছর দুই আগে এই সাতলা বিলের জলভাগ গুলিকে জোড়া লাগানোর কাজ করে বুক ফুলিয়েছিল। মুসলমান আর নমশূদ্র বিলচাষীরা তাকে দুই হাতে আশীর্বাদ করেছিল, তুলসীতলায় হরির লুটে মুসলমানরাও এসেছিল। তারপর থেকে সাতলা বিলে কোনো রায়ট হয়নি। রায়ট করতে হলে তো অবসর চাই। চাষি যদি জলের তলা থেকে নতুন ক্ষেত বের করে আনতে পারে আর পুরনো চেনা পাথুরে ডাঙাটার ওপর দিয়ে জল বওয়াবার বুদ্ধি করতে ব্যস্ত থাকে আর এমন সব কাজে একবারের ভুল আরেকবার শুধরতে হয়, তাহলে রায়ট-করার টাইম পাবে কোথায়? হ্যাঁ। নিজের কাছে মিছা নাই। যোগেনের বুক তো একটু ফুলেছিল। মাত্র বছর দুই? কটা চাষ? এত বড় একটা আলাদা থানার মত জায়গা, দু-বছরে তো তার জলের তলার মাটিগুলোও চেনা হয় না। তার ওপর বিল্যা জমি। সে-জমির তো দুই আলের মাঝখানে দশ চেহারা। সেই মাটি দেখে বুঝে চাষ দিতে দুটো বছর তো ব্রহ্মা ঠাকুরের এক পলক। আর, এর মধ্যেই সে-জমিতে ডিনায়্যাল। উপকূল আর নদীকূল থেকে তিরিশ মাইলে কোনো বসতি থাকবে না, কোনো

পশুপাখি এমন থাকবে না যেগুলো থেকে বোঝা যায় মানুষের বসতি ছিল। মানুষ তার খাটনি দিয়ে চাষ করে তার সব প্রমাণ লোপ। তাছাড়া বিলের জল তো মিষ্টি। জাপানিদের জন্য কি মিষ্টি জলে শরবৎ রাখা হবে? মিষ্টি জল ডিনাই করো। একটা শুকনো খাত আছে যেখান দিয়ে নোনা জল ঢুকতে পারে। যোগেন যখন সাতলা বিলের সংস্কারের প্ল্যান জমা দিচ্ছিল, তখন, ওখানকার চাষিরা দেখিয়েছিল। খুব একটা কেউ জানে না। মিলিটারিরা তো নতুন মানুষ। তারা জানবে কোথা থেকে? এত বড় বিল-এলাকায় কোন একটা জায়গা নিচু হয়ে উঁচু হয়েছে, তা চোখে দেখে চেনা যায়? শুখা খাত যে কত তাড়াতাড়ি বুঁজে যায়, মিশে যায়—তা জাপানিরা জানে না ব্রিটিশরা জানে? কিন্তু যুদ্ধ তো শুধু যন্ত্রেরই খেলা। সেই কোনো যন্ত্র যদি থাকে যাতে মাটির নোনা মিষ্টি ধরা যায়? আর ধরার পর যদি সেই শুখা খাত আর-এক যন্ত্র দিয়ে খাল বানিয়ে নোনাজল ঢুকিয়ে দেয়, তাহলে তো পুরা সাতলা বিলটাই চিরজন্মের মত নোনা হয়ে যাবে। তাহলে?

এ ডিনায়্যাল চোখে না-দেখলে মালুম হয় না। চোখে দেখলেও চাক্ষুষ হয় না। কী মাস এটা? আষাঢ় না? আষাঢ়ই তো। মাসটা আষাঢ়ই কী না সেটা নিশ্চিত হতে যোগেন আকাশের দিকে তাকায়। আকাশটা যেন ক্যালেন্ডার।

যোগেন দিগন্তের আকাশের দিকে তাকায়। সেই দিগন্তে তাও একটু আষাঢ় লেপা। জলে ভরা কাল মেঘ। কাল? কে যেন বলে, কালো আবার দেখিস কোথায়, বর্ষার মেঘ কি কাল হয়, ওরে কালো কয় না, শ্যাম কয়। কে যেন বলে? কেষ্টা? যোগেনের কেষ্টা? বেঁচে আছে কেষ্টা এখনো? এই যুদ্ধের মধ্যে? এই তো গোপালগঞ্জ। নদীটার তফাৎ। এক নদীর তফাৎ। এডা কী নদী? তেঁতুলিয়া না কী? না, বারকান্দির খাল? যোগেন পুবে তাকিয়ে দেখতে পায় বরিশালের পশ্চিমের বিলগুলো—বাগধা, সাতলা, বিসারকান্দি, হারতা, নিচা বিসারকান্দি, বালিখালি, মালুহার, বলদিয়া—নামের তো শেষ আছে, বিলের তো শেষ নাই। যোগেন দেখতে পায়, সেই বরিশালের আকাশের শেষ থেকে একটা ছায়া ধীরে-ধীরে আকাশ বেয়ে আসছে ফরিদপুরের দিকে। দূর থেকে মনে হচ্ছে ধীরে-ধীরে (জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ের মেঘ কি খুঁড়াইয়্যা চলে নাকী, চলে যেন সাগরভাঙা ঢেউয়ের বেগে?)

যোগেন দেখতে পায়, সেই-যে ছায়াটা মাটি থেকে রোদ মুছে উড়ে আসছিল ফরিদপুরের পারে, তার নীচে মাটিতে, জল, নদীর জল, যে-নদীকে খাল বানানো যায়নি। ঐ মেঘচ্ছায়াপাতে যোগেন দেখতে পায়, নদীর একটা চর। কিন্তু কোথাও কোনো একটা মানুষ নেই। কোথাও কোনো একটা মানুষের স্বর নেই। কোথাও রোয়াগাড়া নেই। কোথাও ক্ষেতের কাদায় মানুষের হাঁটু পর্যন্ত ডোবানো নেই। ডিনায়্যাল পলিসি। উপকূল বা নদীকূলের তিরিশ মাইলের মধ্যে কোনো মানুষ, পশু, বসবাস, খাওয়ার জল, সবুজ শস্য, বাড়ির ধান থাকতে পারবে না। এরা সব গেল কোথায়? এই এতগুলো বিলের চরের এত হাজার-হাজার মুসলমান আর নমশূদ্র। এটা না আষাঢ় মাস? চাষ নাই। চাষ নিষিদ্ধ।

নিষিদ্ধচাষ সমুদ্রের মত বিস্তারের ওপারের আকাশ থেকে মেঘের ছায়াটা ডাইনে যশোরের দিকে ঘুরল। ছায়াতে কি বেশি দূর দেখা যায়? ছায়া দেখে যোগেন বুঝবে, ওইদিকে যশোর-খুলনা? মেঘের ছায়া তো দক্ষিণপুবে নেই। তাহলে কি নোয়াখালি বা ফেনি নেই? আছে যে তার চিহ্নটাও তো নেই। আষাঢ়ে কি এবার বৃষ্টি কম, বন্যা কম, ঝড় কম? ওই সব কম-বেশি মাপে পশ্চিমডাঙার মানুষ—বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুর। বাঙাল-সাগরে কি জল মাপা যায়, আকাশেরই হোক আর নদীরই হোক। যোগেন না সরেজমিনে খোঁজ নিতে

এসেছে? তাকে তো চিঠি লিখেছে—এখানে বড় বিপদ। বিপদ জানতে-বুঝতে এসেছে যোগেন। কাল সন্ধ্যায় যে-গোধূলিদেশে ঢুকেছে সে-গোধূলির শেষ নেই। একেই বিপদ বলে? তাহলে কী বলে এখানে বাঁচন নাই? আষাঢ় মাসে একটা ক্ষেতে ধানের রোয়া গাড়া নেই, যে-মাটি চৈত্র মাসেও ভেজা থাকে, সে মাটি আষাঢ় মাসে শুকিয়ে গেল? এত নদী, এত জল, এত বিল, এত মেঘ, মেঘের ছায়ার এমন দৌড় অথচ একটা কোনো পাল পতপতায় না নৌকোর, একটা কোনো জল-পেরনো মানুষের ছপ ছপ আওয়াজ নেই, আষাঢ়ের মেঘের নীচে একটা কোনো পাখি নেই যেগুলো ঝাঁক বেঁধে নামে বিছন-ধান চিরতে? পাখির খিদ্যাও মেটায় না—এ আবার কী আষাঢ় মাস? কার আষাঢ় মাস?

যোগেন যেন মানতে পারে না সে যত চেষ্টাই করুক সে এই নদী পেরিয়ে কেষ্টার কাছে পৌঁছুতে পারবে না। জন্মেরও আগে থেকে, পূর্বজন্মেরও পূর্বজন্ম থেকে যোগেন যে-জলকে জানে সেতু বলে, যে-জলকে জানে পারাপারের পথ বলে, যে-জলকে জানে রাসলীলার রাস-অঙ্গন বলে, যে-জল ঘাটেও থাকে, সমুদ্রেও থাকে, যে জল কোনো বাধা মানে না—ভেঙে দেয়, ভাসিয়ে দেয়, সেই জল, সেই জলই, সেই তার আপন জল এখন তার শত্রু। তার সবচেয়ে বড় বাধা। সে কেষ্টার কাছে পৌঁছুতে পারবে না। যোগেন কেষ্টার কাছে পৌঁছুলে জাপানীরা এসে পড়ে যুদ্ধ বাধাবে। ব্রিটিশদের সঙ্গে।

যোগেন সেই জনশূন্য নৌকাশূন্য জলপ্রান্তরের দিকে তাকিয়ে নিজেকে জিজ্ঞাসা করে, 'এই এক দেশের বেবাক মানুষ গেলটা কই? এডা তো, ব্যূহ খাড়া করছে, ঢোকার উপায়ও নাই, হুকুমও নাই।'

বেকবুল দেশের তল্লাশ

যোগেন তার চেনাজানা মানুষগুলির খোঁজে সেই জনহীন জলভুবন পেরতে লাগল, হ্যাঁ, হেঁটেই, কিন্তু পায়ের তলা দিয়ে সেই সেই মাটি বা জল ছুঁল না। সেখানে, সেই বেকবুল (ডিনায়েড) দেশে, মানবসম্পর্কোচিত সমস্ত সম্বোধন লোপাট। সেই জলপ্রান্তরে যাতায়াতের কোনো পথও নেই, সাঁকোও নেই, উপায়ও নেই। সেখানে মানুষের পায়ের ছাপফেলা আইনত নিষিদ্ধ।

১৬৮

যোগেন তো শূদ্র। তেমন কোনো উপমা-প্রতিমা তৈরি করা তার ধাতে নেই। স্বদেশ, জন্মভূমি, স্বাধীনতা, জাতিত্ব, এসব এখন তার জানা কথা হতে পারে। এ-বিষয়ে তার নানারকম মত বা অমতও তৈরি হয়ে থাকতে পারে। এ-সব কোনোটাই তার জন্মসূত্রে পাওয়া নয়, এমন কী শিক্ষাসূত্রেও নয়। শিক্ষায় হতে পারত। স্কুল-কলেজে তো যোগেন পড়েছে খিলাফৎ-আইন-অমান্য, অসহযোগ, সত্যাগ্রহের সময় জুড়ে। গান্ধী না জেনে কি তখন কোনো উপায় ছিল? বিশেষ করে যোগেন বর্ণভেদ নিয়ে তখন কিছু আপত্তি করেছে, বরিশালের কালীবাড়ির ঘটনা, ল-কলেজ সরস্বতী পুজোর ঘটনা, সমস্ত গীতা মুখস্থ করার ঘটনা ও সেটা সবার সামনে আবৃত্তির ঘটনা। এগুলো তো সচেতনতা ছাড়া সম্ভব ছিল না।

সম্ভব হোক বা না-হোক, যোগেন জানে ও-সব সচেতনতার খোঁজখবরও তার ছিল না। গান্ধীজির আন্দোলনের সে বিরোধীই ছিল। স্কুল-কলেজ ছেড়ে দিলে বামুনের ছেলে বামুনই

থাকবে, পরে পরীক্ষা দিয়ে পাশও করবে, চাকরিও করবে কিন্তু কোনো নমশূদ্রের ছেলে ক্লাশ টেনে বা কলেজে পড়াশুনো ছেড়ে গান্ধীজি-স্বামীজি করলে তার আর জীবনে কখনো পরীক্ষা দেয়াও হবে না, পাশ করাও হবে না। তেমন একটি শূদ্রসন্তানের পড়াশুনো করা বা পাশ দেয়াটা তার বাড়ির লোকজনও চায় না, তার চৌদ্দ পুরুষও চায় না। বরং পড়াশোনা বন্ধ হলে বাড়িতে একজন কাজের লোক বাড়বে। করা যায় এমন কোনো কাজ বাড়িতে না-থাকলেও, জমি-নৌকো-মহাজনি-মাঝিগিরির মত কাজের সামান্য সুযোগও না থাকলেও। বাড়ির লোকজন অন্তত স্বস্তির শ্বাস ফেলত—যাক, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরল, শুদ্দুরের ছেলে শুদ্দুরই থাকল। ঘরে থাকলেই শুদ্দুরের কাজ জুটে যায়—বামুনবাড়ি কায়েতপাড়া বদ্যিদের বাড়িতে আসা-যাওয়া করলেই, এই কাঠটা চির‍্যা দে, এই গোয়ালটা ধুয়্যা দে, এই আলটায় মাটি ঢাল, এই বস্তাটা ঘাড়ে নে, এই নৌকাডায় গুন টান। এটা তো মুখের কথা—বামুনবাড়ি যাইও না, ওরা খাড়া মানুষ দেইখব্যার পারে না। খাটালেই যে খেতে দেবে বা একটা ডবল পয়সা দেবে মজুরি বলে—তার কিছু ঠিক নেই। শুদ্দুরের ছেলে তো, চোর কী না কে জানে—ঠাকুরগ এই মত ঠিক হতেই তো দুই বর্‌ষা ফরশা। এক যদি কপালের জোরে দাঙ্গা বাঁধে বা বামুন বাড়িতে ডাকাত পড়ে আর ছ্যামড়া যদি টাইম-মাফিক থাকে ঐখানে আর বামুনদের ও তাদের বাড়িঘর বাঁচায়, তা হলে ঠাকুরমশার বা ঠাকুরগিন্নির কৃপা হতেও পারে। কত শুদ্দুরই তো সেই সুবাদে কত ভদ্রবাড়িতে থেকে গেছে, লেঠেল হয়েছে, নামধাম করেছে। শুদ্দুরনি ছাড়া ভদ্রলোকদের বাড়ির পোয়াতিদের আঁতুড় সামলাবে কে। শুদ্দুর ছাড়া বাড়ির বুড়িকে পোড়ানোর জন্য অমাবস্যার শেষ রাতে গাছ কাটবে কে।

যোগেনের সচেতনতা, সে বাইরেরেই হোক আর ভিতরেরেই হোক, হিন্দু বর্ণভেদ থেকে মুক্ত হতে পারেনি। দেশ, জাতি, নেতা, দাঙ্গা, গান্ধীজি, শ্রমিক-কৃষক, স্বাধীনতা, যুদ্ধ এগুলো মাত্র বছর পাঁচ-সাত হল তার কাছে সত্য হয়ে উঠছে। সত্য হয়ে উঠছে এমন বিস্ফারে ও গতিতে, যে আগ্নেয়গিরির লাভা উদগীরণ দেখা থাকলে সেই উপমাটাই সে ভাবত। কিন্তু সে তো শিশুকাল থেকে এই সেদিনও ভোলায় দেখেছে কী বেগে সমুদ্রের হাওয়া তার চলাচলের নদীগুলির তল থেকে মাটি পর্যন্ত পৌঁছে অতলের মাটির জল-বিস্ফোরণ ঘটায়। যোগেনের ভিতরসত্যের তেমনই একটা বিস্ফোরণ ঘটছিল এই জলপ্রান্তরের ওপর দিয়ে কিছু স্পর্শ না করে এই বেকবুল দেশে অনুপ্রবেশের ফাঁক-ফোঁকর খুঁজতে। যোগেনের পা মাটি ছুঁচ্ছিল না বলেই সে যেতে পারছিল। সে যেতে পারছিল বলেই, সে এই জমিকে তার স্বদেশ ভাবতে পারছিল ও বাংলার অজস্র নভেল-নাটকের স্টাইলে সেই স্বদেশ, স্বাধীনতা ও যুদ্ধ সম্পর্কে ভাবতে পারছিল

এই সেই পূর্বদেশ, গৌড় ও বঙ্গ, যেখানে ভাসমান পৃথিবীর একমাত্র অথচ অকালভূমিষ্ঠ কণ্টকারণ্য। এই সেই নদীভাসা দেশ যার নানা আকারের জলের নানা মিষ্টত্বে, নানা রঙের অঙ্গুলিমেয় মৎস্যকন্যারা যথা পুঁটি, ফলি, ফেঁসা, মৌরলা, ট্যাংরা, সরপুঁটি, খড়সে, চাপিলা—নাচের মুদ্রায় সাঁতার কাটে। এই সেই ভেজা দেশ যার ভিতর থেকে নিশিদিন উদ্গত হতে থাকে অজস্র রঙের ও নকশার সবুজ লতাপাতা ও শাকপাতা। এই সেই জল-মাটি-পাখিদের অতি উর্বরতার বাহুল্যকে ঠাট্টা করে বিন্ধ্য পর্বতের উত্তর ও রাজমহল পাহাড়ের পশ্চিমের আর্যাবর্তের সামবেদী দীর্ঘ পৈতেধারী দীর্ঘবাহু অতিহিন্দু বিদূষকগণ শাকম্ভরী, মছলিখোর, পক্ষীখোড় ও অক্ষরডম্বরের কবি বলে আসছেন অন্তত হাজার দেড়েক বছর। এই সেই একনদীর দুই মোহানার দেশ যেখানে উজানস্রোতে শীতের সৈকতের ঝুরঝুরে রুপোলি বালি রঙের মৎস্যানী তার চ্যাপ্টা ও খর্বুটে শরীরে গোপন শ্রোণি দেশের অনাস্বাদিতপূর্ব তৈলাক্ত যৌনতার

গন্ধে শ্বাস ভারী করে। সে-মৎস্যানীরা অধিকাংশ সময় মূর্তির যক্ষিণীর মত।

এই বিপুল জলদেশ মহাদেশ স্রোতোদেশ ঘূর্ণিদেশ নৌদেশ মেঘদেশকে কতটাই শিক্ষিত নিশ্চয়তায় চিহ্নহীন করে দেয়া হল। এমন শিক্ষিত নিশ্চয়তা থাকে শুধু তেমন কল্পনাক্ষমদের যারা এক কল্প পরিমাণ সময় দেখে ফেলতে পারে সেই সময়ের সূচনার আগে। যারা দ্রষ্টা। যারা নিজেরও অজ্ঞাতে ইতিহাসের বাহক। যারা অনেক অতীত থেকে স্থির মানববসতিকে অনায়াসে বাতিল করে দিতে পারে নদীর পারাপার সেতুতে জুড়ে দিয়ে, মানুষের ভারবহনশক্তির অতিরিক্ত ভার—উত্তোলনে ক্রেন ব্যবহার করে। যদি পেরেক আর ক্রেন, যদি সামান্য স্বয়ংক্রিয়তাই, সভ্যতাবাহক হতে পারে, তা হলে, এমন একটা জলদেশ, মহাদেশ, ঘূর্ণিদেশ, স্রোতোদেশ, থেকে ইতিহাসের সব চিহ্ন লোপাট করে দেয়া সম্ভব। ইতিহাসকে ধ্বংসচিহ্নহীন, ক্ষতহীন, আদিম ও নৈসর্গিক করে দিতে তো শুধু একটা মহকুমার হাকিম হলেই চলে, যারা গেজেটেড হওয়ার কারণে সার্টিফিকেট দিতে পারে যে অন্যের ঘরের চালে আগুন লাগানো ফৌজদারি অপরাধ নয়, যদি ইতিহাসের অজুহাত জুড়ে দেয়া হয়। একজন এস-ডি-ওই তো ইতিহাসের অজুহাতটুকুকে আইনসঙ্গত করে দেয়ার পক্ষে যথেষ্ট একটি সার্টিফিকেটের জোরে।

শত্রুবাহিনী যেন চিনতে না পারে, হ্যাঁ, এই সেই দেশ, তাদের আক্রমণের লক্ষদেশ। শত্রুবাহিনী যদি সমুদ্রের ভিতর থেকে এই গৌড়দেশ-বঙ্গদেশের দিকে তাকায় তবে তাদের মনে হতে পারে এই ভূখণ্ড একটি কচ্ছপ যেন। মনে হতে পারে, এক প্রাচীন ও প্রাচীন কূর্ম যেন নানাবিধ জলের ভিতর থেকে চারটি থাবা জলেরই ভিতর এগিয়ে রেখেছে ও তার প্রাচীন ও প্রাচীয়মান পাথরতুল্য শক্ত খোলার বৃত্ত ঘিরে কেলি-আসক্ত তরলাবালাগণ জল-নূপুরের ধ্বনি তুলছে। তা হলে, যেমন কোনো অতীতে অডিসিয়ুস নামক এক গ্রিক বা ধনপতি নামধারী এক বাঙালি, সমুদ্র থেকে সমুদ্রান্তরে মায়াদৃশ্যরাজি দেখতে ও শুনতে-শুনতে সেই দৃশ্যমান দৃশ্যকে মাত্রই মায়াদৃশ্য মনে করেছে ও তাদের অবতরণের লক্ষ বিবেচনা করেনি তেমনি, তেমনি, এই জাপানি-শত্রুরাও, এই কূর্মভূমি, এই কূর্মের জলাবতরণ, এই কূর্মঘেরা জলকেলিকেও অসত্য ও মায়া মনে করে চলে যাবে। তারা যেন জানতে-বুঝতে না পারে, তারা যেন গন্ধও না পায় যে তারা পার হয়ে যাচ্ছে বাংলার সামুদ্রিক উপকূলের শস্যভূমি। তারা যেন চিনতে না পারে খুলনা-বরিশাল- ফরিদপুরের নিম্নভূমি। বায়ু সমুদ্র থেকে স্থলভূমিতেই বয়। ফলে, সেই আক্রামী বাহিনী বাংলার শস্যগন্ধ পাবে না।

শিকড়ের সুবাস ও পাকা ধান থেকে চাউলের সুবাস, একঋতু-ভর বায়ুকে, ভারী করে রাখে এমন মায়ায়, যেন সেই সুবাস, পরিণত ফসলের নয়, যেন সেই বায়ুর মন্থরতা জল থেকে উত্থিত বাষ্পের ভারে, যেন সেই মন্থরতা জলপাত-ধারাপাত-বজ্রপাতকে আসন্ন করে তুলবে এই বিপুল জলদেশে মহাদেশে স্রোতোদেশে ঘূর্ণিদেশে নৌদেশে মেঘদেশে, যেন এখন কর্ষণের ঋতু আসেনি, যেন এখন শস্যসুবাসে বাতাস মন্থর হওয়ার ঋতু আসেনি, ঋতু বদলে দাও, আকাশ বদলে দাও, মাটি বদলে দাও, বায়ুবাস বদলে দাও, আক্রমক জাপানি বাহিনী চিনতে না পারে এই সেই গৌড়বঙ্গ যেখান দিয়ে তারা ভারতের সমতলে ঢুকে যেতে পারে। সব চিহ্ন, মানুষের সব চিহ্ন, মানুষের বসবাসের সব কুটির, মানুষের চাষবাসের সব হাতিয়ার, মানুষের যাতায়াতের সব রকমের নৌকো পুড়িয়ে দাও, ছাই করে দাও, ধ্বংস করে দাও, অস্বীকার করো এটা কোনো জায়গা যেখানে শত্রু মাটি পেতে পারে, জল পেতে পারে, খাদ্য পেতে পারে। এই বিপুল জলদেশটিকে উৎখাত করো। এই মানুষ-বসতিকে অস্বীকার করো। ডিনায়্যাল। এই বিশেষ জলের মাটির বিশেষ রকম জলা ফলনকে অস্বীকার করো। ক্ষেতের ধান পুড়িয়ে দিয়ে চলে যাও। তোমার পা যে-নৌকো সেগুলো জমা দিয়ে চলে যাও।

যোগেন পেরেছিল সেই তার আজন্ম ধাত্রী জলভূমি। নিপুন সামরিকতায় পরিকল্পিত সংগঠন তৈরি করে সেই জলভূমিকে আদিমতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মানুষের হাতে-হাতে জল ঘরনি হয়ে ওঠে, এখন যেমন সাজগোছ তেমন সেজে ওঠে গুছিয়ে ওঠে, মানুষের খাটাখাটনিতে সেই জল আর ভূমির একটা লেনদেনও তৈরি হয়, জলের স্বভাব ও মর্জি বুঝে সেই লেনদেন, জলের ওপর কোনো জোর খাটিয়ে সে-লেনদেনে জলের বিস্তারকে ছোট বা তার জোয়ারপথকে আটক করা হয় না, জলের একেবারে ভিতরে সেই চাষবাস সম্ভব করা হয় মাত্র মানুষের খাটুনি দিয়ে, যতটা খাটুনি মানুষ শরীর থেকে বের করতে পারে, সে-খাটুনি কোনো তদ্‌বিরে বা মালিকানায় বাড়ানো হয় না, বাড়ানো যায় না। থাকার মধ্যে আছো তুমি আর এই জল আর কিছু গাই-বলদ। বাড়তে চাইলেই তো আর বাড়ানো যায় না। তবু সারা বছর যে খাটুনি একই পরিমাণ থাকে তা তো নয়। কোনো-কোনো ঋতুতে কাজ এতটা বেড়ে যায় যে রাত-হওয়াটাকে মনে হয় বাজে সময় নষ্ট। একটা রাত কম করেও যত প্রহরের হতে পারে তার সমতুল্য খাটুনিটা তো এই একটা শরীর থেকেই নিংড়ে বের করতে হয়। মানুষের শরীর আর খাটুনি আর যে-ফসল ফলছে—তার ভিতরে-ভিতরে এক চলাচল ঘটে, চলাচল তৈরি হয়, সে-চলাচলেও জোয়ার-ভাঁটা খেলে। সেই চলাচলই শরীরকে বাড়তি খাটুনির জোগান দেয়। সে-জোগানে কখনো কাজের গতি বেড়ে যায়, সে-জোগানে কখনো কাজের গতিতে আড় আসে। এ-সব তার আর আড় কোনো তত্ত্ব তৈরি করে না। তৈরি করে ঋতু-ঋতু ধরে ব্যাপ্ত এক বিশাল ছন্দ। তাই চাষের কাজ আর ফসল ফলে-ওঠা অনন্ত কাল ধরে মানুষের কত সম্পর্কের তুলনা হয়ে ওঠে। স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কই বেশি আসে। আসারই কথা। সেই দুজনের ভিতরও তো এক চলাচল চলে, জোয়ার-ভাঁটা খেলে, সেই স্রোতের ভাটি-উজানের উল্টো লীলায় তাদের অবলম্বন তো, এই জলচাষের মতই, দুটো শরীর। স্ত্রী-পুরুষের মিলনে আনন্দের বিনিময় চলতে থাকে। এটাকে ঐ আনন্দটুকু নিতে কত ভাবুক এই নিয়ে গানও বাঁধে। সে-গানে স্ত্রী-অঙ্গের কত বদল ঘটে—যেন তার বুক কখনো পাহারা, কখনো ভাণ্ডার, যেন সে-শরীরে ঢোকার চেনা পথটাও অচিন পথ, যে অন্ধকারেও যে-অঙ্গ নির্ভুল পাওয়া যায়—আলোর প্লাবনেও তাকে চিনে ওঠা যায় না। সেই সব গানে-কথায় এমন ভাব আসে যেন স্ত্রী পুরুষের মিলন ভগবানেরই নাম-গান। আর ভগবান যেমন সর্বত্র থাকেন, স্ত্রী-পুরুষও তেমন সর্বত্র থাকে। জলকে নিয়ে খেলতে পারো। কিন্তু তোমার খেলা যদি হয় জবরদস্তি তাহলে সে-খেলা জল ভেঙে দেবে। জলকে তুমি একটুখানি পথ করে আনতে পারো, ক্ষেত থেকে ক্ষেতে, কিন্তু সেই আনা যদি হয় চুলের মুঠি ধরে আনা তাহলে জল সে-মুঠি ছাড়াতে তোমার বেশি জলের খাঁই মিটিয়ে দেবে। তুমি তো মিষ্টি জল ছাড়া চাষ করতে পারবে না। এ তো সমুদ্র আর নদীর, নোনা আর মিষ্টির অদল-বদলের এলাকা। কোনো একদিন এখানে নদীর জল থেকে প্লাবন এসে মাটির তলায় ঢুকে গেছে। সেই মাটির বুকের কাছের জলটাকে তুমি তুলে এনেছ। তোমার দরকার যদি বাড়তেই থাকে, সঙ্গে বেচাবিক্রিও যদি ছড়াতে থাকে, সঙ্গে নগদ টাকার লোভও যদি বাড়তে থাকে, তুমি নৌকোয় ফেরি করার বদলে চাও আরো বাদশাহি সড়ক, আর এই জলভূমিতে তোমার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা যদি জুড়ে ফেলতে চাও, সাঁকোতে সাঁকোতে, তাহলে, এ-জল অত লোহা আর কংক্রিটের ভার বইতে পারবে না। পৃথিবীর কোথায় কোন নদীর ওপর কত সাঁকো আর কত বাঁধ সে-হিশেব দিয়ে ঢাকা-ফরিদপুর-বরিশাল-নোয়াখালি- যশোর-খুলনার জলের যোগ-বিয়োগ মিলবে না। শুধু সাঁকোর হিশেব আর বাঁধের হিশেব কষছ, যত কষছ তত ভুলছ জলের মাটির কথা। কোন মাটির ভিতর দিয়ে জল তার পথ করে নিয়ে নদী হয়ে

বয়েছে, খাল হয়ে টিকে আছে, বিল হয়ে আলগোছে আছে সেই মাটির হিশেব নেই? কোন মাটি পাহাড় গুঁড়ো হয়ে মাটি হয়েছে আর কোন মাটি নদীর ফেলে-যাওয়া পলিতে মাটি হয়েছে? এত পৃথিবী-পৃথিবী শুনছ তো শাহেবরা যদ্দিন এসেছে তদ্দিন থেকে, সে আর ক-দিন, বড়জোর শ-দেড়েক বছর, ঠিকঠাক হিশেবে তাও নয়, সেই পৃথিবী তো এখন তোমার বসত, তোমার চাষ, তোমার মাটি-জল-নৌকো সব সবকিছু গুঁড়িয়ে দিচ্ছে, পুড়িয়ে দিচ্ছে, তোমার চুলের ডগাটি চেঁছে দিচ্ছে, একটা মড়াকেও তো এতটা চামড়া ছুলে মাটি চাপা দেয়া হয় না, আর তোমার পৃথিবী তো তোমাকে চেঁছে মুছে দিচ্ছে তোমার এই জল থেকে, তোমার এই নিজের জল থেকে, তোমার এই জলের চাষ থেকে, এ-জলে যেন এমন কোনো নিশানা না থাকে যা থেকে আভাস পাওয়া যায় যে এ-মূল মানুষের ছোঁয়া আছে, যে মানুষের ছোঁয়া আছে তারা শাহেব জন্মাবার হাজার-হাজার বছর আগে নির্বাসিত শূদ্র হয়ে এই জলে ঠাঁই গেড়ে থাকলেও জলে তোমার ছোঁয়ার চিহ্ন থাকা চলবে না। হাজার-হাজার বছরের ছোঁয়া চিহ্ন কি লোপাট করা যায়? লোপাট করতেই হবে যখন আরো বড় পৃথিবী তোমার দরজা ভাঙছে, সমুদ্রের দরজা, শাহেবের সাম্রাজ্যের দরজা। যুদ্ধ। যুদ্ধের এই নিয়ম। জলচাষ দিয়ে তো আর যুদ্ধ হবে না। যুদ্ধে জেতার জন্য জায়গা চাই। যুদ্ধে পিছিয়ে আসার জায়গা চাই। যুদ্ধে ছড়িয়ে যাবার জায়গা চাই। যুদ্ধে যুদ্ধই হয়, কোনো চাষ হয় না। কটা মানুষ থাকে এই সব নদীগুলোর তিরিশ মাইলের মধ্যে? কত ফলন হয় এই চারজেলার এই জলে? কটা নৌকো ভাসে এই এত জলে? কটা গাই-বলদের সংসার তোমার? সারা পৃথিবী বাজি রেখে যে-যুদ্ধ তাতে বাংলার এই চার-পাঁচ জিলার মধ্যে ছড়ানো এই ক-মাইল জলা-জায়গার দাম কী? তোমার সাজানো সংসার কি আমি আমাদের শত্রুসৈন্যের ঘরকন্নার জন্য রেখে যাব? যাতে তারা খেয়েপরে সুখেশান্তিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তলা ফোঁপড়া করে দিতে পারে? যুদ্ধ যুদ্ধের নিয়মে চলে। আর-সব আইন এখন মুলতুবি। সাম্রাজ্যের এখন দরকার তোমার বেকবুলিয়ত। অস্বীকার করা যে কোনো কালে এখানে মানুষ ছিল। নিজেও অস্বীকার করো তোমার এখানে চাষবাস ছিল। হাজার-হাজার বছর ধরে ছিল। শূদ্ররা এখানে নির্বাসিত হয়ে এসেছিল? নির্বাসন তো কোনো সাফ-কবলা দেয় না, হাজার-হাজার বছরের পুরনো নির্বাসন হলেও দেয় না। দিলেও, যুদ্ধের সময় সে কবলার আইনের জোর থাকে না। যুদ্ধ মানে, ডিন্যায়াল, অস্বীকার, বেকবুলিয়ৎ।

যোগেন এই বেকবুলিয়তি জলভুবন পার হচ্ছিল, এখানকার উচ্ছন্ন মানুষদের খোঁজে। সাঁতরে নয়, নৌকোতেও নয়, লঞ্চসার্ভিসেও নয়। হেঁটেও নয়। উড়েও নয়। তার পা জল বা মাটি ছুঁচ্ছিল না অথচ তার ভঙ্গি ছিল হাঁটার, সেই সময় থেকে ছেষট্টি বছর পরে পিকিং অলিম্পিকের শেষ দৃশ্যে নভশ্চর যেমন পরবর্তী অলিম্পিকের পতাকা গ্রহণের জন্য স্পেসে হাঁটছিল, হাঁটছিল। স্পেসে তো মাটি নেই। তবু হাঁটছিল।

জানলে তো? এগুলো তো যোগেন জানতেই পারে না। প্রধামন্ত্রীও না। এগুলো তো যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা। সামরিক বাহিনীর প্রধানরা জানেন। আর, লাটশাহেব জানেন, যদি জানেন, যদি জানানো হয়। যোগেন জানবেই না, এদের খিদেগুলো ক্রমে ক্রমে দৈনিক থেকে আধা-সাপ্তাহিক থেকে সাপ্তাহিক হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যোগেন এদের পরিংখ্যান জানবে। পোড়ামাটি নীতি থেকে প্রকিওরমেন্ট, নৌকো-ডুবনো থেকে স্মাগলিং, প্রধানত পূর্ববঙ্গের চার জিলা থেকে কত হাজার জন কলকাতায় এসেছিল, সে সব, সবেরই পরিসংখ্যান আছে।

সেই সব সংখ্যা ও পরিসংখ্যা ব্রিটিশ সরকারকে ব্যবহার করতে হবে, প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের মন্ত্রিসভা ও আইন সভাকে ব্যবহার করতে হবে, প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের

বিধি-অনুযায়ী আইনসভার বিরোধী পক্ষকে ব্যবহার করতে হবে, সরকারের বাইরে যাঁরা গবেষক ও সংখ্যাতাত্ত্বিক তাঁদেরও ব্যবহার করতে হবে। যোগেনকেও ব্যবহার করতে হবে।

যোগেন মন্ত্রী। ও আইনসভার মেম্বার। তদুপরি যে চারটি জিলা থেকে আশিরপদ ক্ষুধা নিয়ে মানুষজন শহরে ও কলকাতায় এসেছিল ও আসছিল এমন একটা অনুমান থেকে যে শহরে বড়লোকরা থাকে, তাদের খাওয়ার জন্য শহরে অনেক খাবার থাকে, হয়তো সেই শহরবাসীর মন সহজেই মানুষের দুঃখে ভিজে যায়, সেই চার জিলা থেকে এই যারা কলকাতায় আসছিল, তারা হয় নমশূদ্র নয় মুসলমান—খুলনার, বাখরগঞ্জের, বরিশালের, ফরিদপুরের নমশূদ্র ও মুসলমান। তাদের, সেই ক্ষুণ্ণ ক্ষুধার্তদের শরীরে রক্ত-মেদ-মজ্জা এত নিঃশেষে ঝরে গেছে যে তারা শুধু শরীরের সেই নিয়মে বেঁচে থাকে ও হাঁটে ও এমন কী মানুষের স্বরেই 'মা, ফ্যান দ্যাও মা', রব তোলে, যে-নিয়মে বলির ও কোরবানির পশুর মুণ্ডুচ্ছেদের পরও তার শরীরের ভিতর থেকে আক্ষেপ শরীরের ওপরে উঠে আসে। সুস্থ, পেশল, রক্তপূর্ণ পশুর শরীরে সেই আক্ষেপ নিহিত থাকে যা খড়্গের বা ছুরির আচমকা আচমকা ধারে ও সূচ্যগ্রতায় উৎক্ষিপ্ত হয় কিন্তু ক্ষুধার্ত এই মানুষদের তেমন উৎক্ষেপণ অবশিষ্ট থাকে না, তারা কোনো কোনো জ্যান্ত মানুষের মত মরতে পারে না। তারা অঙ্গে-অঙ্গে আলাদা-আলাদা করে মরতেই থাকে। তাদের হাঁটুসন্ধি থেকে যখন আর গতি বেরয় না, তখন তারা স্থানু হয়ে যায়। তাদের কোমর যখন আর ভাঁজ হয় না, তখন তাদের পতন ঘটে। তাদের চামড়া যখন আর কুঞ্চিত হয় না তখন তাদের শরীরের অন্তর্গত তাপ, কোনো পোড়ো ভিটের উনুনের এমন গর্তের মত হয়ে যায় যেখান থেকে বিড়ালবাচ্চার বেঁচে থাকার মত তাপটুকুও বেরয় না।

এটা মাপা হয়নি—তাদের শ্বাস আগে শেষ হয়, নাকী তাদের শরীর আগে ঠাণ্ডা হয়। তখন যুদ্ধের মধ্যপর্ব। সামরিক সেন্সার অতিমাত্রায় প্রখর। ক্যামেরা, মুভি ক্যামেরা না-হয় দশ মিনিট বা এক রিলের বেশি সেলুলয়েড ঘোরাতে পারে না। দশ মিনিটই বা কম কীসের, না-খেতে পেয়ে একজন মানুষের মৃত্যু কোন ক্রমে ঘটে তার প্রমাণচিত্র রাখতে? দশ মিনিটে তো কত অনন্ত ঘটে যায়।

হিটলারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের বন্দীদের কিছু ছবি ও ফটো বেরতে তখনো বছর দুই বাকি। রুয়াণ্ডার-দুর্ভিক্ষ আক্রান্ত শিশুনারীদের ছবি বেরতে তখনো তিরিশ বছর বাকি। বাংলার কলকাতায় ক্ষুধার মৃত্যুর প্রথম ছবি দেখা গিয়েছিল। প্রমাণচিত্রই তো বটে। না-হয় মুভি নয়। তখনো তো দূষণ নিয়ে সবাই এখনকার মত চিন্তিত ছিল না। তকনো তো আণবিক যুগ শুরু হতে বছর দুই দেরি আছে। তকনো তো নারীপুরুষের বিভাজন নিয়ে কোনো আপত্তি তৈরি হয়নি, যদিও পৃথিবীর প্রথম নারী—পাইলট বোমারু বিমান নিয়ে লন্ডন থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন জার্মানির আকাশে। যদিও নাৎসি—আক্রান্ত সোভিয়েতে মেয়েরাই প্রধান কর্মী ছিলেন যুদ্ধের অস্ত্রনির্মাণের কারখানায়।

কিন্তু, তারও আগে মানুষের শরীরের নারীপুরুষভেদ লোপ হয়ে যায়, প্রথম কলকাতার ফুটপাতে ১৯৪৩-এ।

আয়হীন, ভূমিহীন, পেশাহীন, মাঝেমধ্যে' নৌকো বানানোর সুবাদে যা কিছু আয়, এত বড় পরিবার, সবার শোয়ার জায়গাও জোটে না, এমনই হয়ে আসছে চিরকাল, সে-চিরকালের যত গল্প অন্যমনস্ক চলে এসেছে হঠাৎ-হঠাৎ, তেমন একটি নমশূদ্র-বাড়ির ছেলে হিশেবে যোগেনের বিপন্নতাবোধ প্রায় ধাতেই নেই। যেমন, যোগেরন ছেলেরও থাকবে না। বিপন্নতা বা ভয় বা

তরাস হয় কখন? যখন মরণ আসে আচম্বিতে। আচম্বিতে। ভাঙনের নদীতে এক আঙুল তফাতের ঘূর্ণির পাশ কাটানো গেলে অমরণ, না-গেলে মরণ, এটা আচম্বিত। আসছ চরপথে অনেক দূর থেকে, অনেক দূর যাবে। এক উল্টা হাওয়ার ঘূর্ণি এসে পাক দিয়ে ঘেরে তোমাকে। তুমি সেই পাক থেকে ছাড়া পেতে পাকের উল্টো পাকে ঘুরতে থাকো বনবন করে। কিন্তু এমন আচম্বিত ঘূর্ণি যখন পাক দেয় তখন কি আর যুক্তি থাকে—কোনটা বাঁধার পাক আর কোনটা খোলার? তাই তুমি কোন পাকে মরণ আর কোন পাকে অমরণ সেটা বুঝে ওঠার আগেই তোমার নিজেরই ঘূর্ণবাতাসের পাকে পাকে জড়িয়ে তুমি আচম্বিত মরণে পড়ে গেছ।

শুদ্দুরদের মরণের ভয় পাওয়ার টাইম নেই।

না-খেতে পাওয়ায় শরীরের যে ক্ষয় ও বিনাশ তাতে ভয় নেই, ত্রাস নেই। শুধু একদিন বেঁচে থেকে একদিন মরে-যাওয়া—ভয়-পাওয়ার সময় কোথায়?

যোগেন খুব ছোট মাপের সাম্প্রদায়িক কারণে কলকাতার রাস্তায় ফুটপাতে এই ভয়ের কারণহীন মরণকে মানতে পারছিল না। পারত, যদি সে নিশ্চিত না জানত যে এমন যারা মরে যাচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে, মরে থাকছে, পড়ে থাকছে যেখানে ভঙ্গিগুলো চিহ্নিত নয়—বাঁচার বা মরার, যে-শরীরে কোনো লিঙ্গভেদ নেই—তাদের ষোল আনার ওপর আঠারো আনা শরীরই শূদ্রের, চাঁড়ালের, মুসলমানের। যোগেন, এমন একটা প্রশ্ন দানা বাঁধতেই দেয় নি যে মৃতেরা যদি উচ্চবর্ণ হিন্দু হত, তাহলে কি তার এতটা অস্থির লাগত না?

যোগেন মন্ত্রী হওয়ার সুবাদে সিভিল সাপ্লাইয়ের মন্ত্রী সারওয়ারদিকে ধরে কলকাতা থেকে মাইল পঁচিশ দূরে বারাসতের যশোর রোডের ওপরে একটা লঙ্গরখানা খোলাল। উদ্দেশ্য—কলকাতায় পৌঁছুবে বলে যারা পাকা রাস্তা ধরে পুব থেকে পশ্চিমে আসছে, তাদের থামিয়ে দেয়া, তাদের পথ একটু ঘুরিয়ে দেয়া, তাদের একবেলা বড় এক হাতা গরম জল-ডাল-চাল নিশ্চিত করা।

এ সব কাজের হিশেব নিতে গেলে জানা যায় না, কারা বা কে কে কাজটাকে তৈরি করেছে। যেমন, পাড়ার একটা বাড়িতে আগুন লাগলে এটা বের করা যায় না, কে বা কারা প্রথম আগুন নেবাতে ডোবা থেকে বদনা বা বালতি ভরে জল এনে আগুনে ঢেলেছিল।

বাংলার সরকার, তখন না-হয় নাজিমুদ্দিনের ও বাংলার গভর্নর হার্বার্টের, দুর্ভিক্ষটাকে চেপে যেতে চেষ্টা করছিলেন। চেপে যাওয়ার চেষ্টা ছাড়া তাঁদের কিছুই করণীয়ও ছিল না।

অলৌকিক আরো তল্লাশ

১৬৯

যোগেন যে সেই মাটির আধ-ইঞ্চি মত ওপর দিয়ে হাঁটার মত করে চলছিল খুলনাতেই সে তিরিশ মাইলের জনহীন, বাস চিহ্নহীন, কৃষিহীন, বেকবুল জলপ্রান্তর ছেড়ে এল, যদিও তার হিশেবমত ছাড়ার কথা নয়—যেখানে সে প্রথম অনস্বীকারের লক্ষণ পেল সেটাও তো নদীতীর, যদিও প্রাচীন কিন্তু তার নতুন খাতও তো আছে, সেটা থেকে তিরিশ মাইলের মধ্যে মানুষের স্থায়ী বাস শুরু হয়ে গেছে। যোগেন তো এই স্থান তার সর্বাঙ্গ দিয়ে জানে। মাটি থেকে সে স্পর্শ নিচ্ছে না বা মাটিকে কোনো স্পর্শ দিচ্ছেও না, এখন, তার এই অলৌকিক পর্যটনে। কিন্তু তার গায়ে তো লাগছে বাতাসের

ছোঁয়া—জলপ্রান্তর থেকে বয়ে-আসা হাওয়ায় কত দূরে নদী তা বোঝা যায়, আবার বর্ষণঘন কোনো দীর্ঘ ঋতুতে সেই ছোঁয়া দূরত্ব ঘুচে যায়। আবার ভাদ্র-আশ্বিন দু-মাস ধরে হাওয়ায় হাওয়ায় ফসল-ফসল-ফসলের গন্ধ থাকে। কাঁচা ও সবুজ সে-গন্ধের এমনই বশীকরণ যে আর কোনো অনুভবের জন্য জায়গা রাখা যায় না। কিন্তু যোগেন তো পেয়ে যাচ্ছে এখানে এখন আলাইপুরে—তাকে ঘিরে থাকা আঠারবাঁকি আর মজা ভৈরবের বাতাস। তাহলে আলাইপুরও কি বরবাদ? যোগেন নিজের মনে মুচকে হাসে—যে-যুদ্ধ চলছে বলে খবর সে যুদ্ধে আলাইপুরও কি একটা অনস্বীকার্য গ্রাম হতে পারে?

আলাইপুরেই যোগেন যখন মজা ভৈরবের পাড় ধরে উত্তরে এগচ্ছে, একটা সরকারি খাম তার হাতে এসে ঢুকে পড়ল। হ্যাঁ। সরকারি খামই বটে। [illegible]শির রঙের খসখসে কাগজ। যুদ্ধের সময় এর চাইতে ভাল কাগজ ব্যবহার নিষিদ্ধ। তার ওপরে ছাপা 'অন হিজ মেজেস্টিস সার্ভিস'। আঠা ও কাগজ দুইয়েরই অভাব। তাই খামের মুখ আঠা দিয়ে সাঁটা নয়। খামের ঢাকনাটুকুতে একটুখানি স্লিপ লাগিয়ে দিতে হয়। ওটা ছিঁড়ে চিঠি খুলে পড়ে, তার জবাব ঐ খামেই নতুন স্লিপে প্রাপকের নাম-ঠিকানা লিখে দেয়া হয়। চিঠি যদি একাধিক পৃষ্ঠার হয়, তাহলে, জোড়া লাগাতে আলপিনের বদলে বেলের শুকনো কাঁটা দিয়ে পিন-আপ করতে হবে। সর্বত্র সরকারি অফিসে শুকনো বেলকাঁটা সাপ্লাইয়ের কনট্র্যাকট দেয়া হয়েছে লোক্যালদের। কারো সুপারিশে তো নিশ্চয়ই। কিন্তু কমিউনিটি রেলিও সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রেখে। মুসলমান, বর্ণহিন্দু, মুসলমান ও অবর্ণ তপশিলিদের মধ্যে যোগেন তার অব্যাহত যাত্রায় চিঠিটি পড়ে দেখে, তাকে নাজিমুদ্দিনশাহেব, তাঁর মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করেছেন ও তাকে অবিলম্বে কাজে যোগ দিতে বলেছেন।

সে-রকমই কথা ছিল। তপশিলের ২১টার ভোট নাজিমুদ্দিনের প্রধানমন্ত্রিত্বে বড় বেশি দরকার।

যোগেন আরো খানিকটা এগিয়ে যেতেই দু-একজন শাহেব দেখে, তাদের কাঁধে ও বুকে দাঁড়ি কাটা—কিছু সাঁটা কাপড়ে সাঁটা, ঠিক বাঁ পকেটের ওপরে।

যোগেন তেমন এক বিদেশীর সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে, যুদ্ধ প্রস্তুতির কাজ কোথায় দেখা যাবে।

যোগেনকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে সেই শাহেব মুচকে হেসে জিজ্ঞাসা করে—আপনাকে তার হদিশ দেয়া কেন হবে। যোগেন পকেট থেকে তার নিয়োগপত্রটা বের করে দেখায়। যোগেন নিশ্চয়ই দুই পায়ের জুতোর ঠকঠক সেলামের অপেক্ষায় ছিল। লোকটি সেলাম না দিয়ে মুখটা তুলে বলে, ওয়েলকাম। মন্ত্রিসভাটভা এত তাড়াতাড়ি বদলে যায় যে ঠিক খেয়াল রাখা যায় না। আপনি থানায় রিপোর্ট করলে সবচেয়ে সুবিধে হত। মন্ত্রী-টন্ত্রী তো ওদেরই কাজ। আমাদের কাজ যুদ্ধ করা।

আমাকে কি তবে অন্য কোথাও যেতে হবে?

না। কখনো-কখনো এমন উদ্ভট ব্যাপারও ঘটে। আপনি না-জেনেও সবচেয়ে ঠিক জায়গায় এসেছেন। এটা আমাদের রিক্রুটিং সেন্টার। এখানে আমরা তিনদিন ক্যাম্প করছি, গতকালও করেছি, আগামীকালও করব। একটু দাঁড়াতে হবে। আপনার জন্য গাড়ি পাঠাতে বলব।

আপনার লাগলে বলুন। আমার গাড়ি দরকার হবে না। আপনার লাগলে বলতে পারেন। এখানেই কি অপেক্ষা করব?

না। এই তো চলুন, এই গেটের পেছনেই ডিউটি রুম। আপনি একটু বসুন। ওখান থেকেই ফোন করব।

যোগেন যে তার মত করে সেই ভিতর দিকে চলে গেল, তা, ঐ অফিসার টেরই পেলেন না, উনি ফোনের ওপর নুয়ে ছিলেন, যোগেনের দিকে পেছন করে।

মাটির আধইঞ্চি ওপর দিয়ে যোগেন হাঁটার ভঙ্গিতেই এগিয়ে যাচ্ছিল। খুব একটা খোঁজাখুঁজি ছিল না সেই গমনে। যোগেন যে জানেই সে পৌঁছে যাবে। আর পৌঁছে গেলও।

সে খুঁজছিল ওই বেকবুল জলদেশ থেকে উৎখাত মানুষগুলো কোথায় গেল। একটু-আধটু নিশানা পেলেই সে বুঝে যাবে। যোগেন জানে, এটা আইনসভায় নোটিশ দিয়েও জানা যাবে না যে সৈন্যবাহিনীতে নতুন নিয়োগে তপশিলি অনুপাত কী? কোন জেলায় কত?

যুদ্ধসংক্রান্ত তথ্য মন্ত্রিসভার জানার এক্তিয়ার নেই। এমন সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন যুদ্ধরত সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙে দিতে পারে।

যোগেন তার মতো করে বুঝে নিতে পারে।

একটা নতুন ক্ষেত আবাদে আনতে নাকি প্রথম বছর চাষ দেয়া হয় না। প্রথম বছরে কয়েকবার হাল চালিয়ে কিছু আউশ ছিটিয়ে দেয়া হয়। আউশের মধ্যেও এই ধান একটু না কী আলাদা যে আগে চাষ দেয়া যায়, আগে পেকে যায়, আগে কাটা যায়। সেই পাকা ধানের ক্ষেত যখন পাশাপাশি প্রথম হালের আমন ক্ষেতের মধ্যে সোনালি হলুদের একটা পোচ হয়ে ওঠে, তখন মনে হয় ঐ সোনা-হলুদ মাটির নয়, আকাশের সূর্যোদয় বা অস্তের রং। আকাশেই এক রং গড়ায় না। পোচ হয়ে থাকে। সে ধান তো কাটা হয় না। দুনিয়ার যত বেলে হাঁস সেই জলদেশ থেকে উড়ে এসে এই ক্ষেতটুকুর ওপর পড়ে। লুটপাট করে ধান খায়। বন্দুক নিয়ে শিকারে আসে শাহেবসুবোরা কোনো বাবুর নেমন্তন্নে। যে পাখি ধান ঠুকরচ্ছে তাকে তাক করা যায় না। উড়াল দেয়া পাখি তাক হয় সবচেয়ে ভালো। একটা বানানো আওয়াজে পাখিগুলো উড়িয়ে দেয়া হয়। বন্দুকগুলি একসঙ্গে গুলি ছাড়ে। পাখির ঝাঁক আওয়াজ পেয়েই তল বদলে ফেলে, নীচে নেমে যায় বা ওপরে উঠে যায়। ঝাঁক থেকে দুটো-একটা পাখি চৈত্র মাসের বট পাতার মতো ঝরতে থাকে। বারুদের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে যায়, নড়ে না।

তখন একটা বেশ মজার ঝগড়া বাঁধে—ঝাঁকে কত পাখি ছিল, কটা পাখি মারা গেল, কে কটা মারল। সকলেই জানে, এ ঝগড়ার কোনো মিটমাট নেই। সমস্ত হিশেবটাই মিথ্যে।

যোগেনদের বাড়িতে কোনো চাষ নেই। চাষ নিয়ে, ফসল নিয়ে, মাটি নিয়ে তাদের বাড়িতে কোনো কথাবার্তা গড়ায় না। তাই সে কিছুতেই মনে আনতে পারে না—এই নতুন আবাদের প্রথম ধানটাকে কী নামে ডাকে। এই ধান আর ঐ বেলেহাঁসের ঝাঁক আর ঐ বন্দুক নিয়ে কী একটা ছড়াও ছড়ানো আছে—সেটাও যোগেনের মনে পড়ে না। ধানটার নাম মনে পড়লে হয়তো ছড়াটাও মনে পড়ে যেত। সেই ছড়া কেটে বলা হয়েছে, অকালের ধান খেয়ে গতর যা করেছ, শিসের গন্ধ পেলে বলে। না, এমন না। এ-কথাটা ছড়া থেকে মনে হতে পারে, কিন্তু এত কথা কি ছড়া জিভ নাড়িয়ে বলতে পারে? যোগেন আবার চেষ্টা করে ধানটার নাম মনে করতে ; ধান ফোলে—উড়ি ফোলে, শিসা ডলে। মনে পড়ে গেছে যোগেনের। উড়ি ধান—ঐ ধানের নাম যার সঙ্গে বেলেহাঁস আর বন্দুক মিলে গেছে।

যুদ্ধের সৈনিকের চাকরিতে যদি নেয়, তাও তো খেয়ে বাঁচবে, মাইনে পাবে, টাকা পাঠাতে পারবে। আর, নেবেই বা না কেন? নমশূদ্ররা নাকী কোন এক কালে যোদ্ধা ছিল, বারভুঁইয়াদের সেনাপতি ছিল, কত গল্পকথা, কোন সর্দার এক লাঠিতে দশজনের মহড়া নিত।

যোগেন দেখে, লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে তার চেনাজানা মুখগুলি। বেশির ভাগই খালি গা বলে হাড়ের কাঠামোটা যেন ফুঁড়ে বেরচ্ছে—চওড়া কাঁধ, উরুর হাড় যেন মাটিতে গেঁথে যায়, না

খাওয়া শরীরে কলাপাতায় যেটুকু তেল থাকে, তাও নেই। বুকের খাঁচাটা পেটের হাড়ের ওপর খাড়া—যেন দুই মানুষের বুকের জন্য তৈরি খাঁচাটা এক মানুষের বুকেই এঁটে গেছে।

যোগেন লাইনের মাথায় টেবিলের মতো কিছু একটা পেতে যে লোকটি ওজন নিচ্ছিল, হাইট দেখছিল, নাম-ঠিকানা লিখছিল তার কাছ থেকে জানল—এদের সকলেই আর্মিতে যাবে ; কিন্তু সকলেই বন্দুক হাতে ফ্রন্টে যাবে না, বেশির ভাগই সাপ্লাই লাইনে থাকবে, সিগন্যালিঙে থাকবে যদি একটু লেখাপড়া জানে, ক্যাম্প কিচেনে যাবে, ক্যাম্প হসপিটালে যাবে, সুইপার, মেসেঞ্জার, এগুলোতেও যাবে। যুদ্ধ চলছে আর ফ্রন্ট এগিয়ে আসছে বলে মেডিক্যাল একজামিনেশন বাদ দেওয়া হয়েছে। এই লিস্ট থেকে অফিসার আর ডাক্তাররা মিলে টিক দিয়ে দেবে—ওজন, হাইট আর বয়স মিলিয়ে, কে কোনো কাজ জানে কী না—ড্রাইভার বা কামার বা ছুতার বা মুচি বা ডোম বা মেথর, রসুইওয়ালা, সেটাও লেখা হচ্ছে। স্পেশালাইজ জব। আমি এখানে কিছু করছি না। শুধু টানা নেশাখোর আর চামড়া বা বুকের কোনো দেখলে-শুনলে চেনা যায় এমন অসুখের রোগীদের বাদ দিচ্ছি আর হাঁটাচলা স্বাভাবিক কী না দেখে নিচ্ছি। যাদের ফ্রন্টের জন্য বাছা হবে তাদের পনের দিনের ট্রেনিঙে পাঠানো হবে। যারা ফাইটিঙে যাচ্ছে না, তাদের কালই পোস্টিঙে পাঠিয়ে দেয়া হবে। ওখানেই কাজ করতে করতে ট্রেনিং হবে।

যোগেন এই সৈন্যের কথা শুনতে-শুনতে দেখ ছিল—সেই জলদেশের অনেক মানুষ লাইন বেঁধে এমন হাঁটছে যেন তার সামনে দুটো বলদ আছে আর তার মুঠোতে হালের হাতল। কেউ-কেউ যেন জলের ভিতর দিয়ে হাঁটছে জলকে মাটি ভেবে। একটু হাসিঠাট্টা যে নেই তা না, হাসিঠাট্টা না করে কি মানুষ যুদ্ধ পর্যন্ত যেতে পারে, কিন্তু এই পুরো সমাবেশের ওপর গুমোট এক মেঘের অনিশ্চিত ছায়া। এক চির-অচেনার সম্মুখীন হওয়ার অনিশ্চয়।

আর, বাকিরা? যাদের যাওয়ার মতো যুদ্ধও নেই?

লৌকিক কিছু প্রতিকার

যোগেন যেন একটা মিছিল দেখছিল, কাল ফাঁকা লম্বা রাস্তায়, রাস্তার দুদিকের গড়ান বেয়ে মিছিলটার তৈরি হয়ে ওঠাও যেন দেখছে। এমন দেখা যায়—ধূ ধূ জলের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে। লোকে বলে তরাস খাইছে।

১৭০

এ মিছিলের আলাদা লোকজন যোগেনের চেনাই শুধু নয়, যোগেনের গাঁয়ের, নদীপারের, হাটের, আলের, খালের। যোগেনের গাঁয়ের, পাড়ার, ঘরের। যোগেনের সাহসই নেই এই মিছিলের মুখগুলি যাচাইয়ের। কে জানে সে তার যোগামা বা তার বৌয়ের মুখটা দেখে ফেলবে কী না। না দেখার তো কোনো কারণ নেই। তারা তো উচ্ছেদ হয়ে গেছে। তাদের বাড়িঘরগুলো তো এতদিনে ধুলো হয়ে গেছে। তাদের জমির দাঁড়ানো ধান তো ছাই করে আকাশে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। তাদের গোলার চাল তো প্রকিওরমেন্ট করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাদের নৌকোগুলো তো জলে ভাসা থেকে জলে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল বিএ, বিএল, এমএলএ, এখন তো আবার পরন্তু মন্ত্রী কি তাদের বাঁচাতে পারত না? পারত, পারত। কোনো মন্ত্রী বা মেম্বারের কেউ কি আর দুর্ভিক্ষে মারা গেছে? তাহলে যোগেনের মা-কাকিরা- খুড়া-ভাইয়ের ব্যাটারা কেন মারা যাবে? তাদের

ধান-চাল নেই, তাই। তাদের ধান-চাল-কেনার টাকা নেই তাই। এখন নৌকো গড়ার ও ভাসাবার দিন না, এখন নৌকো ডোবাবার দিন। বাড়িতে ধান-চাল নেই, ধান-চাল কেনার পয়সাও নেই, হাঁটাচলার নৌকো নেই, তোমার গ্রাম হয়ে গেছে বেকবুল, তাহলে তাদের আর বাঁচা কেন?

যোগেন তরাস খেয়েছে।

লঙ্গরখানা যে খুলতেই হবে সেটা যোগেন বোঝাতে পারল সিভিল-সাপ্লাই মিনিস্টার সারওয়ারদিকে। সারওয়ারদি সত্যি সত্যি রাতদিন খাটছে। খাটতে পারে সারওয়ারদি। আলসে নয়। বুদ্ধি ও কৌশলও যথেষ্ট। সারওয়ারদিকে ভেড়াতে না পারলে লাটশাহেবকে রাজি করানো যেত না। হার্বার্টের সমস্ত বাহাদুরি তো কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলে যুদ্ধ-সংক্রান্ত উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত সমস্ত শ্রমিকের রেশন নিশ্চিত করা। সেনসারের ফলে খাদ্যাভাব সংক্রান্ত খবর কাগজে বেরচ্ছে না—বেরচ্ছে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির খবর। মফস্বল বাংলার খবর ব্ল্যাক-আউট হার্বার্টকে সুযোগ দিয়েছে—কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলের খাদ্যব্যবস্থা বহাল রাখতে। এখন যদি কলকাতার রাস্তাতেই দুর্ভিক্ষ উঠে আসে, তা হলে আর থাকল কী? বড়লাটকে বেশ রাগত স্বরেই হার্বার্ট তাঁর রিপোর্টে জানিয়েছেন—'কলকাতার পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে যদি সপ্তাহ দু-তিনের মধ্যে চাল-আটা না আসে ও সেগুলো যথাযথ বিলি করা না হয়।' ছোটলাট এও লিখে ফেলেছিলেন, 'বাংলাকে খাদ্যশস্যে উদ্বৃত্ত ধরে নিয়ে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে এক দানা সাহায্যও পাওয়া যাচ্ছে না। গভর্নররা রাজি, কমিশনাররা রাজি কিন্তু স্থানীয় অফিসাররা রাজি নয়।' এও স্বীকার করে ফেলেছেন, 'মফস্বলে অনাহার বেড়ে যাচ্ছে। একটা বড় মুশকিল বাধছে যে হাজার-হাজার ভিখারি বিনি পয়সায় ট্রেনে উঠে, খাবার-পাওয়া-যেতে-পারে এমন জায়গা খুঁজছে। এতে মহামারী লাগতেই পারে, তার চাইতেও বেশি, যুদ্ধের নিরাপত্তা ধ্বংস হতে পারে। চিটাগঙের মতো ফৌজ-সমাবেশের জায়গায় ভিখিরিরা বেশি করে আসছে। ওখানকার এরিয়া কম্যান্ডার রেলওয়েকে ধমকাচ্ছেন টিকিট ছাড়া প্যাসেঞ্জার বহনের অপরাধে।'

সারওয়ারদি যোগেনকে সঙ্গে নিয়ে হার্বার্টের কাছে যান ও হার্বার্টকে ভজান যে ভিখিরিদের কলকাতার ফুটপাতে মরতে না দিতে হলে, তাদের তো মরার একটা জায়গা করে দিতে হবে—কলকাতার বাইরে। সেখানে তারা যাবে কেন? যাবে, যদি লঙ্গরখানা খোলা যায়। একহাতা লপসি ২৪ ঘণ্টায় একবার পেলে ওরা চাঙা হয়ে উঠবে। কয়েকদিনের মধ্যেই কিছু লোককে হয়তো গ্রামে ফেরত পাঠানো যাবে।

হার্বার্ট শাহেবের কী একটা অপারেশন হবে, ওঁর শরীরটা ভাল ছিল না, ছুটিতে যাওয়ার কথাও শোনা যাচ্ছে। যোগেন একটু আপত্তি জানায়, 'এরা কিন্তু ভিখিরি নয়, এরা কৃষিকাজ করে।'

লাটশাহেব সারওয়ারদিকে বললেন, 'আপনার যদি সাপ্লাই থাকে—তাহলে করুন। পিনেলকে স্পেশ্যাল অফিসার রিলিফ করে একটা অর্ডার বেরবে। তা হলে কাজটা হতে পারে।'

পিনেল শাহেব হচ্ছেন সরকারের ফায়ার ব্রিগেড। যেখানে ঝামেলা, সেখানেই পিনেল। নানান ছোটখাটো ঘটনা তো যুদ্ধের সময় ঘটতেই পারে। স্থানীয় ভাবেই মিটে যায়। এমন কী সদর পর্যন্তও যায় না। কিন্তু ফেনির একটা ঘটনা বেশ গোলমেলে হয়ে উঠল। আইনসভায় স্থানীয় মেম্বার কথাটা তুলল। সে খুব ভাল বক্তা না কিন্তু ওই গ্রামে তার ছেলের বিয়ে হয়েছে। মিলিটারিরা বাড়ির মেয়েদের অপমান করছে। এতে তাঁর পারিবারিক সম্মানে চোট লেগেছে। তার ওপর মুসলমানদের গ্রাম। এমন একটা হৈ হৈ বেধে গেল যে মন্ত্রিসভার পাশ কাটানোর কোনো উপায় থাকল না। এই সব ঝামেলায় হকশাহেবের প্রত্যুৎপন্নতা খুব কাজে আসে। উনি

হাউসকে বললেন, এ-বিষয়ে সরকার, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, হাইকোর্টের কোনো বিচারপতিকে দিয়ে বিচারবিভাগীয় তদন্ত করাবে ও সেই তদন্তের পর সিদ্ধান্ত মেবে। হকশাহেব এর সঙ্গেই যোগ করে দেন, বিষয়টি মিলিটারি-ঘটিত ও যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত। এর আগে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি তাঁর পদত্যাগ সংক্রান্ত ভাষণে কাঁথির সাইক্লোন আক্রান্ত মানুষজনের সঙ্গে ফৌজের ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ এই ঘটনা নিয়ে আইনসভায় আলাপ-আলোচনা করবেন না ও কোনো রাজনৈতিক দল বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সভা-সমিতিতে এ নিয়ে কিছু বলবেন না।

হকশাহেবের অনুরোধ সকলেই মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনায় এত গিঁঠ পড়ল যে ভাইসরয় জানতে চাইলেন বাংলার গভর্নর হার্বার্ট-এর কাছ থেকে—ঘটনাটি কী?

হার্বার্ট-এর সঙ্গে হকশাহেবের সম্বন্ধ বিড়াল-ইঁদুরের মত। হার্বার্ট সব সময়ই বিড়াল হতে চান কিন্তু কোনো বারই হকশাহেবের গায়ে থাবা বসাতে পারেন না। তিনি হকশাহেবকে ডেকে বলেন, ভারত রক্ষা আইনে যখন দেশশাসন চলছে, তখন, মিলিটারি ও যুদ্ধ প্রস্তুতি সংক্রান্ত কোনো তদন্ত করার অধিকার প্রাদেশিক সরকারের থাকে না—এটা হকশাহেবের জানা নেই, এটা ছোটলাট মানতে পারছেন না। আইনসভায় হকশাহেব ওই তদন্ত কমিশনের সুপারিশ তুলে নেবেন—এটাই ছোটলাটের নির্দেশ।

ছোটলাট-হকশাহেবের এই দেখাশোনা নিয়ে নানারকম গল্প রটেছে।

হকশাহেব তাঁর অত বড় মুখে শিশুর মতো হাঁ করে লাটশাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন—উনি তো মনে করতে পারছেন না এমন কোনো তদন্তের কথা তিনি ঘোষণা করেছেন।

ছোটলাট বিরক্ত হয়ে বলেন, আপনার স্মৃতিশক্তির দশা তো খুব ভাল নয়। আমি ফেনির ঘটনার কথা বলছি।

হকশাহেবের উত্তর তাঁর মুখের ভাষাতে অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, 'কন কী স্যার। নারীপুরুষের মিলনরে অবিশ্যি রমণযুদ্ধ কওয়া হয় সংস্কৃতে, কিন্তু সেডা তো অলঙ্কারমাত্র। ওই এনকোয়ারি কমিশন তো ওই গ্রামের একাধিক মহিলার অভিযোগ বিচারের লগে। অভিযোগ—তাগ মইধ্যে কাউকে-কাউকে ধর্ষণ করা হইছে। কমিশন তো সেডাই দ্যাখব। এর মইধ্যে আপনে মিছামিছি মিলিটারি ঢুকান ক্যান? এ অভিযোগে তো মিলিটারির নামগন্ধও নাই। আমার স্মৃতিশক্তি স্যার বয়সের ভারে দুর্বল হইবারই পারে, কিন্তু আপনার বয়সের তুলনায়, আপনার শ্রবণশক্তির অবস্থা তো খুব সুবিধার দেখি না।'

ছোটলাটকে হজম করতে হল। ভাইসরয় তাঁকে ছাড়লেন না। অগত্যা, হার্বার্ট-শাহেবকে যুদ্ধপ্রস্তুতির কাজে সিভিল-মিলিটারি কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিল তৈরি করতে হল। পিনেল-শাহেব ঘুরেফিরে দেখে পরামর্শ দিলেন, ফৌজিরা কোনো গ্রাম-বসতে যাওয়ার সময় সঙ্গে একজন স্থানীয় ভাষা বলতে পারে এমন লোককে সঙ্গে নেবে। আর, 'সিভিল' বলতে যেন শুধুই 'অ্যাডমিনিস্ট্রেশন'কে বোঝায় না। তৃতীয় সুপারিশটা করার আগেই হকশাহেবের বরখাস্ত, লাটশাহেবের শাসন ও কলকাতার রাস্তায় না-খাওয়া মানুষের মরে পড়ে থাকার দৃশ্য রোজকার হয়ে যায়।

দুর্ভিক্ষ কলকাতার রাস্তায় চলে আসায় হার্বার্ট একেবারে অপ্রস্তুত। কলকাতায় যাতে দুর্ভিক্ষ না এসে পড়ে তার জন্য ব্রিটিশ সরকার, ভাইসরয়ের সরকার ও ছোটলাটদের প্রদেশ সরকার—চারদিকে চৌকি বসিয়েছিল।

তার ওপর কলকাতা তো যুদ্ধের ফ্রন্ট। যুদ্ধে যে কী দরকার হয় না, সেটা বুঝতে-বুঝতেই

ছোটবড় সব কারখানার মালিকদের বছরখানেক লাগল। তার মধ্যে যুদ্ধ আর কদিন হল? ব্রিটিশ বাহিনী, ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনী, নানা জাতের রেজিমেন্ট, নানা রকমের রাইফেলস, নানা রকমের উপবাহিনী—সব মিলে তো সমুদ্র টমুদ্র পেরিয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে পশ্চাদপসরণের এপিক তৈরিতে ব্যস্ত।

এখনো পর্যন্ত পালটা কোনো নথি পাওয়া যায়নি যাতে আন্দাজ করা যায় যে ব্রিটেনের কোনো হিশেব বা আমেরিকার কোনো ধারণা ছিল যে ভারত মহাসাগরে জাপান যুদ্ধ টেনে আনলে ব্রিটেন ও আমেরিকা কী করবে। জাপানের পার্ল হারবার আক্রমণে আমেরিকা যে হাঁ হয়ে গিয়েছিল, সেই হাঁ বন্ধ হতে আরো বছর খানেক লেগেছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসে ঘটনাচক্রে বাংলা হয়ে উঠল পূর্ব রণাঙ্গণ আর কলকাতা হয়ে উঠল এমন উলটো যুদ্ধের প্রধান বা একমাত্র—লক্ষ, উপলক্ষ, যুদ্ধের জন্য দৈনিক সাপ্লাই লাইন পুরোপুরি খুলে রাখার ও সাপ্লাই অব্যাহত রাখার প্রধান জায়গা, আবার, একই সঙ্গে, বা তার ফলেই, কলকাতা থেকে অপ্রয়োজনীয় লোকজনকে সরিয়ে দেয়া হয়ে উঠল, সামরিক নির্দেশে ভাইসরয়ের ইনডিয়ার প্রধান কর্মসূচি।

যুদ্ধের এমন একটা হিশেবে এমন গড়মিল হলে, বইপত্র ঘেঁটে সাতকেলেনে বিধি-বিধান খুঁজে ব্যবহার করা হয় ও সেই বিধানগুলির ভিতর এমন গোলমাল বাঁধে যে যুদ্ধটা বিপর্যস্ত হয়ে যায়। জাপান যুদ্ধে নামার ফলে ব্রিটিশ পক্ষের তেমনই নাজেহাল দশা ঘটে যাচ্ছিল। কেন তেমনটা পুরো ঘটল না, বা ঘটতে-ঘটতেও ঘটল না—সেটার কারণ আলাদা। কিন্তু যুদ্ধের একেবারে উলটোপালটা সব ব্যবস্থা একটু খতিয়ে দেখা এই নভেলের সঙ্গে জড়ানো। সেগুলিকে সাজিয়ে নিলে এ-রকম একটা অব্যবস্থা দেখা যাবে।

১. সিঙ্গাপুর, মালয়, ব্রহ্মদেশ, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপগুলিতে ব্রিটিশ পক্ষ হেরে যাওয়ায় তারা জাপান-সম্পর্কিত নতুন ধারণা অর্জন করে মিলিয়ে ফেলল—পরবর্তী লক্ষ নিশ্চয়ই কলকাতা। জাপান কলকাতায় দুটো-একটা 'নুইসেন্স' (ছোটলাট হার্বার্টের ভাষায়) বোমা ফেলে কলকাতা—আক্রমণের আন্দাজটাকে গরম রাখল। কলকাতা-রক্ষা মানে—কলকাতা থেকে অপ্রয়োজনীয় লোক সরাও। ছোটলাট রোজ রাতে হাওড়া-শিয়ালদা-র চিফ টিকিট ইনস্পেক্টারের কাছ থেকে হিশেব নিতে লাগলেন, কোন ট্রেনে কত লোক কলকাতা ছাড়ল। আর, ভাইসরয়কে চিঠি লিখতে লাগলেন—অন্ধবধির বিদ্যালয়, অনাথ আশ্রমগুলি ও বৃদ্ধাবাসগুলি বিধি-মোতাবেক সরানো হবে কী না?

২. 'কলকাতাকে রক্ষা করো'র সঙ্গে-সঙ্গেই সমুদ্র থেকে তিরিশ মাইলের ভিতর পর্যন্ত বসবাসী সমস্ত মানব-বসতির চিহ্ন লোপাট করো, বাড়িঘর গুঁড়িয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও, ক্ষেতের দাঁড়ানো ধান জ্বালিয়ে দাও (ডিন্যায়াল পলিসি)। কোন তিরিশমাইল। মিলিটারি ম্যাপ পাঠিয়ে দিল। সেই ম্যাপ দেখে ছোটলাট বড়লাটকে লিখলেন—মিলিটারির তিরিশ মাইলে কোনো প্রমাণ নেই যে তারা জায়গাটা চেনে, যেখান দিয়ে ইচ্ছে, সেখান দিয়ে লাইন টেনে দিয়েছে। ফলে, জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত, সব নৌকো পোড়ানো হয়ে গেছে। তাই ছোটলাট একটু রদবদল করে দিয়েছেন। কিন্তু সরিয়ে দিলে লোকজনের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা কী হবে?'

৩. ছোটলাট নিজেই তার উত্তরে নিজেকে হুকুম দিলেন, 'ক্ষতিপূরণ' দাও, বাড়িপিছু, নৌকা পিছু। নগদে। যুদ্ধের ফলে নগদ টাকার যে এমন হরির লুট পড়বে, কেউ ভেবেছে কোনোদিন? বড় হোক, মেজ হোক, ছোট হোক—কোনো লাট-বেলাটের ক্ষমতা আছে ঘর-পোড়ানো আর নৌকো-পোড়ানোর ক্ষতিপূরণ পাবে, কে সে-জট খোলার? বাড়ি বা নৌকো তৈরি হয়েছে

যে-জমিতে বা যে-জমির গাছ কেটে, সেটার মালিক তো জমিদার। 'বেঙ্গল টেন্যান্সি অ্যাক্ট' তো এখন কোথায় কী অবস্থায় তা জানা ও খোঁজা কারো পক্ষে সম্ভবই নয়। তা হলে, ক্ষতিপূরণ তো জমিদার পাবে। কিন্তু যে-সব অঞ্চলে তহশিলদার বা চুকানিদার হিশেবে বড় জোতদার নিজেই রায়ত, তাহলে, সে যেমন জমিদারের তশিল-বরাবর সম্পত্তির হকদার, তেমনি নৌকারও হকদার। ক্ষতিপূরণ পাবে দখলি রায়ত। কিন্তু যদিও এ-কথা ঠিক যে ঋণসালিশি বোর্ডে বসে সালিশির জোরে মহাজনী ঋণ ফয়সালা হয়েছে বেশ কিছু, তাতে তো মহাজন নিজেই নিজের টাকার ধারদার হয় না। দখলি রায়তের দখলি চাষীকে মহাজন টাকা না দিলে সে নৌকো বানানোর খরচ পেত কোথায়? তা হলে মহাজনও এক হকদার।

এক নৌকোর যদি এমন পাঁচ মালিক দেখা দেয় তা হলে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে কাকে? ছোটলাট হুকুম দিলেন, যে-কজন দাবিদার তাদের কাগজপত্র পরীক্ষা করে ক্ষতিপূরণের টাকা তাদের মধ্যে ভাগ করে দাও। মানে, এসে গেল, সিভিল আইন। সিভিল আইন বিচার করতে পারে সাবডেপুটি, কমপক্ষে। তা ছাড়া নগদ টাকা ভাগ করার জন্যও সাবডেপুটি চাই।

সাব-ডেপুটি এসে গেলে তো বাবুরাও আসবেন। বাবুরা এসে পড়লে কাজে কর্মে একটা শৃঙ্খলা তৈরি হয়ে যায়। যেমন, ঠিক হয়ে গেল, এক ছিপ-নৌকোর ক্ষতিপূরণে বাবুদের পাওনা ১৬-আনায় দেড় পয়সা। এতে মাঝিদের কোনো আপত্তি ছিল না। এত কাগজ লিখতে হয়। বাবুদের খাটনি হয় না? একটা চারমানুষি ডিঙা, ছই ছাড়া, যদি কাঠের হয়, তা হলে ৩০০ টাকা ক্ষতিপূরণে বাবুরা ১০ টাকা না নিলে ধর্ম থাকে? এটাই তো রাজাপ্রজার সম্পর্ক। সম্পর্ক ভাল থাকলে বাবুরা লেখার সময় তালডোঙাকেও কাঠের ডোঙা বানিয়ে দেন। যাতে দুইজন মাঝি পাশাপাশি বসে ডাইনে-বাঁয়ে হাতবৈঠ্যা চালায়, তাকে বাবুরা চারজনার ডিঙি করে দেন। নমশূদ্র আর মুসলমানদের দাঙ্গা-হাঙ্গামায় বদনামি জায়গায় বাড়ি-পোড়ানো আর নৌকো-পোড়ানোর মতো ঘটনায় কোনো হাওয়া গরম হল না।

ভালো-লাগার রহস্য একটু ছিল বই কী। বাবুদের সঙ্গে শাহেবদের আগেই বোঝাপড়া থাকত যে মালিকদের নৌকোর সংখ্যা সাব্যস্ত হত বাবুদের কথায়। কারো হয়তো পাঁচটি নৌকোর জায়গায় লেখা হল ১০টি নৌকো। বাকি পাঁচটি থেকে বাবুর শাহেবও ভাগ পান। দু-এক জায়গায় মুসলমান মাতবররা নালিশ তৈরি করছিল যে ডেপুটি শাহেব হিন্দু বলে মুসলমানদের নিগ্রহ করছেন কিন্তু আরো বড় মাতবররা এসে তাদের নিবৃত্ত করেছে। সে সবই হল কিন্তু তাতে মোট নৌকার সংখ্যা যা দাঁড়ায়, বাংলার জনসংখ্যার চাইতে নৌকোর সংখ্যা অনেক বেশি হল। আর নৌকায় কত লোক উঠত, তার হিশেব নিলে হয়তো বেরবে বাংলায় জনসংখ্যার চাইতে নৌকাবাহিত জনসংখ্যা আরো বেশি। কিন্তু এগুলো তো আর প্রাদেশিক সরকারের নিয়ম-অনুযায়ী সরকারি অডিট হয়নি। সবই যুদ্ধকালীন খরচ হিশেবে ধরা হয়েছে।

৪. যুদ্ধে যে এত টাকা তৈরি হয় সেটা বাংলার বা বিশেষ করে কলকাতার ও গঙ্গাপারের জিলাগুলির মগজে ঢুকতে একটু সময় লেগেছে আর আজও এটার নিষ্পত্তি হয়নি যে ভারত মহাসাগর থেকে ব্রিটিশ বাহিনীর পশ্চাদপসরণ না ঘটলে বাংলার এই টাকা-বিস্ফোরণ ঘটত কী না। যুদ্ধে কী লাগে আর কী লাগে না। কর্কের তৈরি বোতলের ছিপি। নানা সাইজের সেলাই না-করা হেসিয়ান, পাতলা বুনটের। পাটের বস্তা—সেলাই-করা ও মোটা বুনটের। নানা ধরণের স্পিরিট। সার্জিক্যাল টেপ—মাইল-মাইল। কাল রঙের কাচ নানা সাইজের। বাঁশ—কোটি-কোটি মণ, জাহাজ-জাহাজ। কাঠের নল। পাউডার মানে গুঁড়ো, যে-কিছুরই হোক। ড্রাম—টিনের, সেখানে শ-দুই মানুষকে সেদ্ধ করা যায়। ফিলামেন্ট। তার। মণ মণ, জাহাজ-জাহাজ। কয়্যার,

নারকেলের দড়ি, অন্তত দশ প্লাইয়ের। অত নারকেলের দড়ি বাংলায় তৈরি হয় না, অর্ডার চলে গেল ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে। নানা রকম মোটা মার্কিন কাপড়, কোঁড়া গজ ফিতে—কয়েক জাহাজ। ফুটবল বা সাইকেলের পামপার। ছোট-ছোট চাকতি—রবারের।

বেশ গোলমাল বাঁধত কোন জিনিসটা কী কাজে লাগবে সে-বিষয়ে কিছুই বলা থাকত না বলে। তার ছবি তো নয়ই, কারণও নয়। সেটা যুদ্ধের গোপনতা ভাঙা হবে। কিন্তু যে-জিনিশ চাওয়া হত, তার সমস্ত মাপ থাকত পরিষ্কার। এমন কী হোমিয়োপ্যাথি ওষুধের শিশির কাচের বেধ পর্যন্ত। যদিও দু-চারটে কারখানা পাওয়া গেল কিন্তু তাদের কাছে কাচের বেধ মাপার যন্ত্র ছিল না।

এর ফলে মিলিটারি সাপ্লাইয়ে খুব গুলবাজ ও চালিয়াৎ কিছু লোক গজিয়ে উঠেছিল ধীরে-ধীরে। তাদের ভাবসাব এমন হয়ে গেল, যেন কয়েক পুরুষ ধরে যুদ্ধই করছে। একজন হয়তো জিগগেস করল, 'ভাই, এই উইথ-হোল আর উইদাউট-হোল ব্যাপারটা তো আন্দাজ করতে পারছি না।' উত্তর পেল—'বাংলাতেই তো লিখেছে, দেখে নাও। তুমিও যাকে বলো, শাহেবও তাকেই বলে'। যার দরকার সে হয়তো কিছুক্ষণ কাগজটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আপনি যা বলছেন তার বানান কি ডবলিউ দিয়ে?' 'আরে ওটা উল্টে দিলে তো ডবলিউয়ের মতই দেখায়।'

কিন্তু এই ধরণের স্মার্ট ফিচলেমিই নয়, কোনো-কোনো অজ্ঞানতা বড় রকমের কেলেংকারিও ঘটাচ্ছিল। অর্ডার ছিল নাকী গ্লাভস। গ্লাভস বলতে সাপ্লায়ার তো জানে এক বক্সিং গ্লাভস আর না-হয় তো ফুটবলের গোলকিপারের গ্লাভস। আসলে না কী চাওয়া হয়েছিল সার্জিক্যাল গ্লাভস। তেমন বিশিষ্ট কোনো গ্লাভস কারো জানা ছিল না। কোথাও কোনো সন্দেহও ছিল। মাস তিন-চার পর ইনভেনটরি থেকে চিঠি এল—এক জাহাজ গ্লাভস পাঠানো হয়েছে, এমন কিছু যদি ইনডেন্ট করা থাকে, তাহলে তার ফটো কপি যেন এক্ষুনি পাঠানো হয়। 'ফটো কপি' কাকে বলে তাও কলকাতায় জানা ছিল না। তবু 'ফটো'-কথাটি থেকে কিছু আন্দাজ করা যায়। এই ঘটনাটা খুব রটেছিল। মিটল কী করে তা নিয়ে নানা গুজব আছে। তার মধ্যে একটি গুজব ছিল। এই বিভ্রাটের ফলেই নাকী ইস্টার্ন কম্যান্ডে বিশেষজ্ঞ-সাপ্লাইয়ের আলাদা এজেন্সি খোলা হয়। আর-একটা গুজব হচ্ছে—জিওসি ইস্টার্ন কম্যান্ড নাকী অ্যাকশন অর্ডার দিয়েছিলেন, গ্লাভসের জাহাজ ফেরৎ না পাঠাতে। বলেছিলেন, স্টকে রাখতে বা ডিসপোজ করে দিতে। কলকাতার সাপ্লায়াররা যুদ্ধের এই অভাবিতপূর্ব সংকটে তাঁদের প্রোডাকশন, ম্যানুফ্যাকচারিং ও মার্কেটিঙের যুদ্ধকালীন কোনো অভিজ্ঞতা না-থাকা সত্ত্বেও সাপ্লাই-লাইন খোলা রাখতে ও যুদ্ধের জন্য দরকারি সমস্ত বিচিত্র মাল সরবরাহ করতে যে অব্যর্থ চমৎকারিতা দেখিয়েছেন, তাতে, এত বড় একটা সাপ্লাই রিফিউজ করলে তাঁদের মনোবল ভেঙে যাবে ও যুদ্ধে তার প্রতিক্রিয়া পড়বে। যে-গ্লাভস পাঠানো হয়, মিলিটারি অ্যাকাউন্টস যেন আগের সাপ্লাইয়ের সঙ্গে নতুন সাপ্লাইয়ের দাম বোঝাপড়া করে নেন।

এতে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় ১৯৩৯-এর যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বমুহূর্তে পূর্ব রণাঙ্গনে কলকাতার ভূমিকা নিয়ে কোনো রকম সামরিক চিন্তাই ছিল না। গঙ্গার দুই পারের ফরেস্টের মতো ঘন-সন্নিবিষ্ট নানা ধরণের কারখানা চালু রাখা ও তাদের সবচেয়ে কম দামে খাদ্য-সরবরাহ নিশ্চিত করাই ছিল ব্রিটিশ প্রশাসনের সবচেয়ে বড় কাজ।

কলকাতার বাইরের বাংলা ছিল শুধুই রেঙ্গুন-উদ্বাস্তুদের ক্যাম্প, আহত ভারতীয় জোয়ানদের চিকিৎসার জায়গা ও ধীরে-ধীরে নিম্ন বাংলার চারটি জিলাকে বেকবুল করে দেয়া, গ্রাম তুলে বরিশালের যোগেন

দেয়া, নৌকো পুড়িয়ে দেয়া ও চাল প্রকিওর করে কলকাতায় নিয়ে আসা। হার্বার্টের মত ছোটলাটের পক্ষে এ নিয়ে দুর্ভাবনারও কোনো ক্ষমতা ছিল না যে নৌকো আর বাড়িঘরের ক্ষতিপূরণের টাকা আর সরকারের কাছে একটু বেশি দরে চালবিক্রির টাকায় ফুর্তি, পরের আউশ পর্যন্ত স্থায়ী হওয়া সম্ভবই নয়।

হার্বার্ট তখন কলকাতা ও দার্জিলিং থেকে বড়লাট লর্ড লিনলিথগকে প্রতি পনের দিনে একটা করে গোপন ও প্রাইভেট রিপোর্ট পাঠাতেন। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য ১৯৪০-এর ১৭ জানুয়ারি মজা করে জানিয়েছিলেন যে বম্বেতে কম-মাইনের সরকারি কর্মচারীদের ওয়ার-টাইম অ্যালাওয়েন্সের খবর পড়ে তাঁর পিলে চমকে গেছে, এখানেও তো তাহলে সেই দাবি উঠবে—সর্বভারতীয় একটা নীতি করলে হয় না?

খরচের খাতায় বাংলা

১৭১

বম্বে তো রণাঙ্গনের সম্মুখভাগ ছিল না। আর কলকাতা ও বাংলা পুরো পূর্ব-রণাঙ্গনের বোঝা নিয়ে, পলায়মান ব্রিটিশ ও ভারতীয় সৈন্যদের বোঝা নিয়ে, রেঙ্গুন-উদ্বাস্তুদের বোঝা নিয়ে, চালের খোলা বাজার ক্রমেই বন্ধ হয়ে যাওয়ার সামনে সরকারি কর্মচারীদের যুদ্ধভাতা দু-এক পয়সা দেয়ার ব্যাপারে সর্বভারতীয় নীতির জিগির তুলে রাখেন, বাংলার ছোটলাট হার্বার্ট। সব দিক দিয়েই বাংলা খরচের খাতায় উঠে গিয়েছিল। যেটুকু গুরুত্ব ছিল তাও মুসলিম জনসংখ্যার কারণে।

এরপর হার্বার্টের যে ব্যক্তিগত ও গোপনীয় রিপোর্টে প্রথম খাদ্যের কথা এল, দাম বাড়ার কথা এল ও দরনিয়ন্ত্রণের কথা এল, তার তারিখ ৭ জুলাই ১৯৪২—প্রথম সেই চিঠিটির ২ বছর ৭ মাস পর, তাও কমিশনারদের একটা সম্মিলনের বিবরণ দিতে গিয়ে। 'সবচেয়ে জরুরি ও ঝামেলার কথাটা ছিল প্রতিদিনের খাওয়া-দাওয়ার খরচার ব্যাপারে। চালের দাম বাঁধতে গেলে আবার পাঞ্জাবের মতো প্যাঁচে পড়তে না হয়, গমের দর বাঁধতে গিয়ে যা হয়েছিল। কমিশনাররা সকলেই বললেন, লাইসেন্স ছাড়া বাংলা থেকে চাল রপ্তানি বন্ধ করা যায়, তাহলে দরবাঁধার দরকার নেই। জিলাগুলির মধ্যে চাল যাতায়াত একটু নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ও জিলা-অফিসাররা যেন তাঁদের জিলার ধানচালের আলাদ-আলাদা দর বেঁধে না বসেন।'

৪২-এর জুলাইয়ে বাংলার গ্রামে ভাতের অভাব যে কতটা ছড়িয়ে পড়ছে ও কত গভীরে ঢুকেছে—তা জানতেন না প্রশাসন, তা জানতেন না এম এল এরা, জানতেন না কোনো পার্টি। প্রশাসন ব্যতিব্যস্ত ছিল যুদ্ধের সিভিল সাপ্লাই বহাল রাখতে ও জিলা সদরে ওয়ার ফ্রন্ট তৈরি করে চাঁদা তুলতে। আইনসভার অধিকার যুদ্ধের সময় এতই কমিয়ে দেয়া হয়েছে মেম্বররা মন্ত্রিসভার লোকবদলে ও পার্টি বদলে অষ্টপ্রহর ব্যস্ত থাকতে পারতেন। তাঁরা তাঁদের নির্বাচনক্ষেত্রে যেতেনই না। যদি যেতেন, তাহলে তাঁরা বুঝতে পারতেন, এক-একটা পার্টি যে এক-একটি জায়গায় জোরদার হয়, তার কারণ তো সেই জায়গার কোনো আঞ্চলিক সমস্যা মেটাতে সেখানকার মানুষজনেরা তাঁরা জড়ো করতে পারেন। যেমন কালীগঙ্গার লঞ্চ সার্ভিসকে শুধু ফেয়ার ওয়েদারের বদলে অল ওয়েদার করা, যেমন কুমিল্লার চাষীদের বাসে পাটের টিকিট তুলে দেয়া, যেমন নোয়াখালির ফেরিবাড়ির খালের ওপর আড়াআড়ি একটা কাঠের ব্রিজ

বানানো—যাতে গরুর গাড়ি পেরতে পারে। যুদ্ধের সময় তো আর এ-সব লোক্যাল থাকে না। সবই হয়ে যায় যুদ্ধ বিষয়, গ্লোব্যাল। এই সব স্থানীয় পার্টিগুলিতে আর পার্টি বলে কোনো কাজ ছিল না। থাকলে, তাঁরা জানতে পারতেন।

দুর্ভিক্ষ কথাটির অর্থ যদি হয়—সে সময় একমুঠ ভিক্ষেও জোটে না, বা, আরো একটু বদলে যদি অর্থটাকে করা যায় মানুষের অনাহার, ১৯৪২-এর জুলাই, মানে বাংলার ১৩৪৯-এর আষাঢ়-শ্রাবণেও যে মানুষজন হাটে ঘাটে ঘুরে বেড়াত তাদের চোখেই পড়ল না—বড় বড় হাটখোলায় বা স্টিমারঘাটায় কোনো কোনো ভিড় হয়ে যাচ্ছে?

৪৩-এর দুর্ভিক্ষ পৃথিবীর ইতিহাসে কঠিনতম দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষ দুর্ভিক্ষতত্ত্বই বদলে দিয়েছে। খাদ্য ছিল না, ফলন নষ্ট হয়ে গেছে বা পঙ্গপাল চেটে দিয়েছে—এমন কোনো কারণই নেই। ফলন ভাল, দর ভাল, পরের বছরের আমনও ভাল। খাদ্য-ফসলের অভাবের কারণে দুর্ভিক্ষ হয় না। দুর্ভিক্ষ, মানে যদি হয় না-খেয়ে মরা, তাহলে খাদ্যের অভাব বোঝায় না, বোঝায় যারা মারা গেল তারা খাদ্যের কাছে পৌঁছুতে পারল না। সে কী করে খাদ্য পাবে? কেমন ভুল পায়ে দুর্ভিক্ষটা দুর্ভিক্ষ হয়ে গেল।

চাষী কোনোদিন ফসলের বিনিময়ে এত নগদ পায়নি। বাংলায় ঐ ১৯৪০ থেকে ৪২ ছিল চাষীদের ফুর্তির সময়। প্রশাসন, রাজনীতি, নেতা কারো চোখেই পড়ল না। চোখে পড়ে গেলে বিরক্ত হচ্ছেন সবাই। ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪২ হার্বার্ট সেই বিরক্তি নিয়েই লিখছেন, 'এই প্রদেশ থেকে পারস্য উপসাগর ও সিংহলে চাল রপ্তানির কথা জানলে আপনি নিশ্চয়ই খুশি হবেন। হকশাহেব ভয় দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন—বাংলার কোথাও চাল নেই। বরং শ্যামপ্রসাদ মুখার্জির আক্কেল আছে। আইনসভার মেম্বারদের তিনি মুখের ওপর বলে দিয়েছেন—বাঙালি একা বাঁচতে পারবে না, চাল ছাড়া আর সব কিছুতেই ভারতের অন্য সব প্রদেশের ওপর বাংলা নির্ভরশীল। চাল রপ্তানির ফলে আমাদের কী ক্ষতি হয়েছে? তিন মাসের যে রপ্তানি-বরাত এসেছে আমাদের কাছে, ৩৫০০০ টন, সে চাল তো বাঙালির দু-দিনের আহার।'

সেই প্রথম লঙ্গরখানার জায়গা বাছতে যাচ্ছেন সারওয়ারদি, যোগেন, পিনেল শাহেব আর বরিশালের এম এল এ হাশেম আলি শেখ। হোম সেক্রেটারি এস ডি ওকে জানিয়ে দিয়েছিলেন —এয়ার রেইডের জখমি লোকজনের জন্য বারাসতের একটু পুবে যে ক্যাম্প তৈরি হয়েছিল, ওপরে বাঁশের ছাউনি ও মেঝেতেও বাঁশের বাতা ছড়িয়ে, সেই ক্যাম্পটাতে লঙ্গরখানা চালু করতে। কাঁচা ঘর বলেই লঙ্গরখানার আশ্রয়প্রার্থীদের তাদের দেশে ফেরৎ পাঠানোর পর এই ক্যাম্পটা পুড়িয়ে দেয়া যাবে—সংক্রমণ এড়াতে। তখন প্রয়োজন হলে একটু পাকা ব্যবস্থাও করা যাবে।

এস ডি ও জায়গা মত দাঁড়িয়ে ছিলেন। একসঙ্গে তিন-তিন মন্ত্রী হাজির হওয়ায় নার্ভাস হয়ে যান। তারপর পরস্পরের কথাবার্তায় ঠিক হল—এক বেলার গ্রুয়েল কিচেন। প্রথম ধাক্কায় গ্রুয়েল বেশি করে খেয়ে পেটখারাপে মানুষজন মরে যেতে শুরু করে। তাই, এক হাতার বেশি প্রথম দিকে দেয়া হবে না। বারাসাত হাসপাতালকে প্রথম দিকে 'সক্রিয় সহযোগিতার' জন্য অনুরোধ করা হবে, যাতে কারো কোনো অসুখবিসুখ করলে সেও আরো কিছুটা যত্ন পায়। পিনেল শাহেবই বললেন, 'কাউকে সন্দেহ না করেও এটা আমাদের দায়িত্ব হওয়া বোধহয় দরকার যে লঙ্গরখানা সম্পর্কে এমন গুজব যাতে তৈরির সুযোগ না থাকে যে এখানে যে খাবার দেয়া হচ্ছে, তা যথেষ্ট নিরাপদ নয়।'

যোগেন একটু হেসে বলে, 'যুদ্ধের টাইমে সবচেয়ে বেশি চাষ হয় গুজব। এতদিন ধরে

যুদ্ধ তো, নতুন-নতুন জায়গা, নতুন নতুন নাম, লোকজনের জিভ শুলশুলায়। এগ কিন্তু কোনো ফল লাভের আকাঙ্ক্ষা নাই, শুধু কর্মের অধিকার। রটাইয়্যাই সুখ।'

সারওয়ারদি এস ডি ও-র সঙ্গে পায়চারি করতে করতে কথা বলেছিলেন, গ্রুয়েল কিচেনের জন্য খাদ্য সাপ্লাই কোথা থেকে হবে, সেন্ট পারসেন্ট গবমেন্ট অর্গানাইজেশন, রান্নাবান্নার কাজ যারা করবে তারা ঠিকে লোক হিশেবে কাজ করবে ও পেমেন্ট পাবে। কোনো প্রাইভেট বা ভলান্টারি সংগঠন যদি রিলিফ দিতে চান, দে উইল হ্যাভ টু হ্যান্ডওভার দেয়ার মেটেরিয়ালস টু গবমেন্ট অ্যান্ড সাচ অর্গানাইজেশনস মাস্ট হ্যাভ নো রোল ইন দি অর্গানাইজেশন। নো ডিসিশন মে বি টেকেন অর অ্যামেনডেড উইদাউট দি স্পেসিফিক ইনস্ট্রাকশনস অব দি রিলিফ কমিশনার, মিস্টার পিনেল। যদি কোনো ভুল বোঝাবুঝি ঘটে, গভমেন্ট উইল টেক সাইড অফ মিস্টার পিনেল। এটা না হলেই ভাল হত, কিন্তু আমরা এটা এড়াতেও পারি না যে টু রান সাচ গ্রুয়েল কিচেনস থ্রু আউট দি প্রভিন্স ইজ অ্যান এসেনশিয়াল পার্ট অব দি ওয়ার ইফর্টস।'

গৃহযুদ্ধে পক্ষবিভ্রাট

১৭২

কিন্তু গোলমাল বেধে গেল দিন আট-দশের মাথায় যোগেনের সঙ্গে হিন্দু মহাসভার শ্যামাপ্রসাদের। নাজিমুদ্দিন যাতে তাঁকে ক্যাবিনেটে নেন সে জন্য শ্যামাপ্রসাদ অনেক চেষ্টা করেছিলেন। 'স্টেটসম্যান'-এর আর্থার মুরকে তিনি দূত করেছিলেন, যে-ভাবে শ্যামা হক মন্ত্রিসভা থেকে তিনি পদত্যাগ করেছিলেন ও তাঁর বিদায়ী বক্তৃতায় তিনি লাটশাহেব সম্পর্কে ও প্রশাসন সম্পর্কে যা বলেছিলেন, তা তাঁর বলা উচিত হয়নি। অর্থার মুর দৌত্য করেছিলেন, গভর্নর হার্বার্টের কাছে। গভর্নর একটু নরমও হয়েছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ মন্ত্রী হিশেবে নির্ভরযোগ্য ও তাঁকে নিলে হিন্দুরা একটু খুশিও হবে। কিন্তু হার্বার্ট নাজিমুদ্দিনকে রাজি হতে বাধ্য করা পর্যন্ত এগলেন না। নাজিমুদ্দিন বললেন, এটা তাঁর ও সরকারের পলিটিক্যাল ডিসঅ্যাডভানটেজ হবে। দুর্ভিক্ষের জন্য শ্যামাপ্রসাদ ও হকশাহেব দায়ী করছেন নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রিসভাকে। আর, নাজিমুদ্দিন, সারওয়ারদি ও মুসলিম লিগ দায়ী করছিল হকশাহেবকে ও শ্যামাপ্রসাদকে। পরন্তু শ্যামা-হক মন্ত্রিসভার জীবৎকাল জুড়ে সারা বাংলায় মুসলিম লিগ হকবিরোধী অভিযান চালিয়ে বাঙালি মুসলমানদের কাছ থেকে হকশাহেবকে সরিয়ে নিতে পেরেছিল। সেটা সম্ভব হয়েছিল শ্যামাপ্রসাদের ওপর হকশাহেবের নির্ভরতার গুজব রগরগে করে রটিয়ে-রটিয়ে। বাংলা ভাষায় রাজনৈতিক বিরোধিতা উনিশ শতকের শেষ বিশ-পঁচিশ বছরে বদলে হয়ে যায় ঘৃণার ভাষা। ভাষা এমন ঘৃণা প্রকাশের অবলম্বন হয়ে ওঠে প্রধানত হিন্দু উচ্চবর্ণের রক্ষণশীল স্বার্থে। সতীদাহ নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে, বিধবা বিবাহ আইনসঙ্গত করার বিরুদ্ধে উচ্চবর্ণের রক্ষণশীল স্বার্থে। সতীদাহ নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে বিধবা বিবাহ আইনসঙ্গত করার বিরুদ্ধে, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলনের বিরোধিতায় রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে কালীপ্রসন্ন বিদ্যাবিনোদ পর্যন্ত প্রায় আশি বছর ধরে যে-বীভৎস রসের চর্চা হয়েছে তার সঙ্গে অর্ধসংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অশ্লীলতা ও আদিরসপক্ষিতার সংযোগ খুবই স্পষ্ট। তারপর থেকে এটা হয়ে যায় বাঙালির রাজনৈতিক সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য উপাদান। সেই বাঙালিয়ানা মুসলিম রাজনীতিরও অংশ হয়ে ওঠে। হকশাহেবের দরকারে তিনি মুসলিম লিগ নেতাদের গ্রাম-বাংলা থেকে উচ্ছেদ করেছিলেন। শহরাঞ্চলে নিজের শিকড় পান নি। একই পদ্ধতিতে লিগের যখন দরকার হল হক উচ্ছদের, তখন লিগের একমাত্র উপায় হল, বাংলার অন্দর-বন্দরে এই কথা বলে বলে সত্য করে তোলা—হকশাহেব খাঁটি মুসলমান নয়। নইলে তিনি শ্যামাপ্রসাদের মত মুসলিমদ্বেষীর সঙ্গে হাত মেলান? এর চাইতে অভ্রান্ত আর কোন প্রমাণ?

ততদিনে, মুসলমানের খাঁটিত্ব রাজনৈতিক বিষয় হয়ে গেছে দু-তিনটি মাত্র বছরে। ততদিনে, মুসলমানের খাঁটিত্ব সর্ব ভারতীয় রাজনীতির বিষয় হয়ে গেছে, বিশেষ করে মুসলিম-সংখ্যালঘু প্রদেশগুলির অভিজাত মুসলমানদের সমর্থনে। ততদিনে হকশাহেবের ডালভাতের শ্লোগান হয়ে

গেছে অবান্তর, কারণ, মুসলমানরা ডাল-ভাত নির্ভর উপোসী মানুষ থাকতে চায় না, তারা চায় রাজসিংহাসনের ভাগ।

ততদিনে, খাঁটি-মুসলমান ধারণাটি বদলে গেছে মুসলমানির খাঁটিত্বে।

তাই, জিন্না, নাজিমুদ্দিন, সারওয়ারদিকে কেউ পরীক্ষা করে না, তাঁরা কি মুসলমান হিশেবে খাঁটি? তাই হকশাহেবকে পরীক্ষা করা হয়—হকশাহেবের মুসলমানি কি খাঁটি?

কত অবাককাণ্ডই যে ঘটে।

যেন আমাদের জাতীয় আখ্যান উদার ও গ্রহিষ্ণু হিন্দু আখ্যানই, যেন সেখানেই জায়গা জুটছে ধর্ম-উদাসীন জিন্না ও ধর্মধ্বজী মালব্যজির। এমন সময় মুসলমান ও মুসলমানির খাঁটিত্ব সারা ভারতের রাজনীতির প্রধান বিষয় হয়ে উঠল জাতীয় আখ্যানের বিপরীত একটি পাঠ তৈরি করতে। সেই মাত্র কয়েকটি বছর ১৯৪১ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত পাঁচটি বছরে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয়েছে সংখ্যায় সবচেয়ে কম। সেদিক থেকে ৪১-এর সেনসাস-দাঙ্গাই শেষ বড় দাঙ্গা। পাঁচ বছর পরই দাঙ্গা, গৃহযুদ্ধের আকার নিয়ে ফেলল ও দাঙ্গা দিয়েই স্থির হল, রাজনীতির বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচি, যেমন হয়ে থাকে গৃহযুদ্ধে, অনেক সময়ই একশ-দেড়শ বছর ধরে।

সেই গৃহযুদ্ধেরই দুই পক্ষ ছিল—হিন্দু মহাসভা ও শিডিউল কাস্টরা। যারা এমন দুটি পক্ষ মেনে নিত, তারা। যারা এমন দুটি পক্ষ মেনে নিত না, তাঁরা শিডিউল কাস্ট হিন্দু মহাসভা হয়ে থাকত। বাংলাতেই তেমন হত কারণ বাংলার শিডিউল কাস্টদের একজন নেতা, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, তাঁর জমায়েৎ তৈরির ক্ষমতা ছিল, নিজেকে ও শিডিউলদের, হিন্দুদের খাঁচার বাইরে নিয়ে যান ও ঘোষণা করেন, 'শূদ্ররা হিন্দু নয়।' শূদ্ররা ভোটে কাকে সমর্থন করবে—সেটা ঠিক হত সেই প্রার্থীর হিন্দুয়ানি দিয়ে। শ্যামাপ্রসাদ ও যোগেন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল অনিষ্পন্ন ধর্ম রাজনীতির বিরোধ।

যোগন খবর পেল যে, শ্যামাপ্রসাদ তার দলবল নিয়ে লঞ্চে করে প্রচার অভিযানে বেরুচ্ছেন, প্রধানত গোপালগঞ্জ থেকে ভাটি পাড় ধরে। দুটি মিটিং ডাকা আছে—আশুগঞ্জ হাট ও নবি মসজিদে। গোপালগঞ্জ আবার নমশূদ্র প্রধান বলে যোগেনের অতিরিক্ত দখলে। শ্যামাপ্রসাদকে যোগেন গোপালগঞ্জ ছেড়ে দিতে পারে না।

কিন্তু যোগেন তো ফাঁপড়েও পড়ল। অন্তত মাসখানেক যদি লঙ্গরখানাটাতে তদারকি না করা যায়, তাহলে কোনটা আগে, কোনটা পরে সেটা গুলিয়ে যাবে। সরকারের লোকজন চাইবে, লঙ্গরখানটা চলুক। সরকারের কোনো ব্যবস্থা চালু করা সহজ, বন্ধ করারা দায় কেউ নিতে চায় না। অথচ লঙ্গরখানার উদ্দেশ্যই হল—একটু সুস্থ করে এদের দেশে ফেরৎ পাঠানো ও নতুন লোকদের ভর্তি করা। তাতে পুরনো-নতুন কোনো অনাহারীই বা আর ক-দিন লঙ্গরখানায় থাকবে? যোগেন আন্দাজ করতে পারে—এর ভিতর অনেক প্যাঁচঘোঁচ আছে, মানবিক প্যাঁচঘোঁচের পাল্টা অমানবিক প্যাঁচঘোঁচও আছে ও এই দুটো প্যাঁচ মিলিয়ে গিঁঠ বাঁধে আরো অনেক। যেমন, নেহাৎ দরকারি জলটুকু ও খাদ্যটুকু পেয়ে গেলেই শরীরের স্বাভাবিক চাহিদা ফিরে আসে। দু-বেলা খিদে পায়। খিদে পাওয়া শুরু হলেই তৈরি হতে হয় এদের দেশে পাঠানোর জন্য। এরা দেশে ফিরতে চাইবে কেন? দেশে তাহলে টেস্ট রিলিফের ব্যবস্থা করতে হয়। নইলে দেশে ফেরার দল তৈরি করে ছেড়ে দিলে, সে দল কয়েক পা গিয়েই ভেঙে যাবে। আবার, তারা নতুন দলের সঙ্গে লঙ্গরখানায় ঢুকবে, বা লঙ্গরখানা থেকে দেশের দিকে না গিয়ে কলকাতা শহরের দিকে যাবে। ততটুকু রক্ত এদের ধমনী থেকে সঞ্চালিত হচ্ছে এক হাতা গ্রুয়েল ও

জলের মিশ্রণ কয়েকদিন খেয়েই। কলকাতার রাস্তার মোড়ে-মোড়ে জৈন সমিতি, হিন্দু সেবা সঙ্ঘ, পাঞ্জাব হিন্দু অ্যাসোসিয়েশন, আনজুমান মিলায়েত, জামাত—এই সব প্রতিষ্ঠানের লঙ্গরখানা আছে। কারো-কারো লঙ্গর দিনরাত খোলা থাকে। সময়-অসময় নেই, গিয়ে দাঁড়ালেই এক গ্লাশ জল, ও শালপাতায় দুটো পুরি ও একহাতা তরকারি মিলবে। কোনো নাম লেখার ঝন্‌ঝাট নেই, কোনো নিষেধ নেই, কোনো এমন হুকুম নেই যে কাউকে দশদিনের বেশি লঙ্গরখানায় খেতে দেয়া হবে না। এই লঙ্গরগুলো যাঁরা চালান তাঁরা প্রত্যেকেই এমন সব ধর্মে বিশ্বাসী, যে-ধর্মে উপবাসী মানুষকে খাবার দেয়াটাই প্রধান একটি আচরণ। পৃথিবীতে কোনো ধর্মই কি এমন আছে যার নিত্যকর্ম পদ্ধতিতে নিরন্নকে অন্নদানের পরামর্শ নেই? নিজেকে নিরন্ন রাখা, উপবাসে থাকা, সাপ্তাহিক উপোস, প্রত্যেকদিনের উপোস, নানা তিথির উপোস—একাদশী, টেকাদেশী, পূর্ণিমা, রমজান—এটাও যেমন সব ধর্মের বিষয়, তেমনিই অন্যকে খাওয়ানোও।

এ-সব গুজব রটানোর সময় আছে, লোক আছে।

সারওয়ারদি বলেন, 'আপনি তো আর গ্রুয়েল কিচেন ওয়ানের রান্নার ঠাকুর না যে ওখানে আপনাকেই পাহারা দিতে হবে। দুর্ভিক্ষ বড় শত্রু, না জাপান, না শ্যামাপ্রসাদ? বড় শত্রুকে বেছে নেন। আরো কী যেন আছে—কত রকম কনট্রাডিকশন হয়। লন্ডনে থাকতে পড়েছিলাম। সাবজেকটিভ আর অবজেকটিভ। এখন আপনি দেখেন—আপনার সাবজেকটিভ কোনটা আর অবজেকটিভ কোনটা। যদি মনে হয়, মুখার্জিই অবজেকটিভ, তাহলে তাকেই বিনাশ করা প্রথম শর্ত। কারণ, না হলে লঙ্কার সিংহাসনে বসার জন্য বিভীষণ তো উইথ ফ্যামিলি রেডি। আগে বংশ নির্বংশ করুন, তারপর নতুন মালিক খুঁজবেন। আমি লন্ডনে আমাদের স্টাডি সার্কলে সাবজেকটিভ আর অবজেকটিভ কনট্রাডিকশনের বাংলা করেছিলাম—জ্ঞাতিশত্রু আর অজ্ঞাতিশত্রু।'

'আপনার আবার বাংলা করার দরকার পড়ছিল ক্যা?' যোগেন হেসে বলে, 'এ তো ভাল কারবার ফাঁইদ্‌ছেন—লন্ডনে ইংরাজি বোঝেন না আর কইলকাতায় বাংলা বোঝেন না', যোগেনের ঠাট্টাটা সরব হয়। সারওয়ারদিও খুব হাসেন, তারপর বলেন, 'এই কথা কি সবাই জানাজানি হয়ে গেছে? তাহলে তো আমার দিন শেষ—গেলাম একটু মার্ক্সিজম কপচাতে, দিলেন আমার পেট ফুটো করে। খুব পড়ছেন না, নতুন আমদানি মার্ক্স-এঙ্গেলস-লেনিন? গবমেন্ট তো তুলে দিয়েছে আমদানির আপত্তি। এটা বোধহয় এখন পর্যন্ত এই যুদ্ধের বড় বেনিফিট।'

'আরো বেনিফিট আপনে হবে মনে করেন?'

'নিশ্চয়ই। দেখেন, যদি মনে না করতাম তা হলে কি আমি কলকাতার ট্রেড ইউনিয়নের সবচেয়ে বড় নেতা হতাম? শ্রমিক শ্রেণীটা আমি শিখেছি মার্ক্সিজম থেকে। শিখে তা প্রয়োগ করছি কলকাতায় বা বেঙ্গলে অ্যাজ এ ট্রাইব্যাল মেনিফেস্টো। আপনার শ্যামাপ্রসাদের তো কিছু শেখারও নাই, ব্যবহারেরও নাই। ও তো লন্ডন যায় নাই। বাপের কথায় বাংলা পড়ল। তাই মার্ক্সিজম শিখল না। বাংলায় তো আর মার্ক্সিজম হয় না। ব্রিটিশ গবমেন্টকে না দেখলে ডায়ালেকটিকস শেখা যায় না। কোনো সিদ্ধান্তই স্থায়ী না। রাশিয়া ছিল ব্যান্ড ফর এভার। যেই জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ করল, অমনি রাশিয়া হয়ে গেল ওপেন ফর এভার। এখন কলকাতার ফুটপাতে এঙ্গেলসের ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রপার্টি বিক্রি হচ্ছে আর লেনিনের স্টেট অ্যান্ড রেভলিউশন। জানেন তো শুধু এই বইটি তাঁর কাছে পাওয়া গিয়েছিল বলে সতীশ পাকড়াশির আন্দামান হয়েছিল। আর এখন লে-লে-বাবু-ছে-আনা করে সিনেট হাউসের সিঁড়ির ওপর বিক্রি হচ্ছে, কিন্তু সতীশ পাকড়াশি এখনো আন্দামানেই।' সারওয়ারদি হো হো হাসিতে

প্রায় গড়িয়ে পড়েন।

'ছাইড়্যা দিলেই তো হয়। সে-র বেলায় তো কোনো নেতাই কানের তুলা খোলেন না—যেমন হকশাহেব, তেমনি স্যার শাহেব, তেমনি আপনে শাহেব।'

'বলেন কী যোগেন বাবু! হকশাহেব আর স্যারশাহেবের সঙ্গে এক লাইনে আমাকেও শাহেব বানাবেন না। আচ্ছা, আপনার কথাটার একটা উত্তর দি। ধরেন, সব রাজবন্দীকে মুক্তি দেয়া হল। তাহলে তো ইলেকশনে আমাদের একটা পয়েন্ট চিরতরে লস্ট। ইলেকশন মানে তো স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতায় আপনি আমাদের প্রধান অস্ত্রটি কেড়ে নিচ্ছেন?'

'আপনারা মানে?'

'মানে, আপনারা নন।'

'আমরা মানে?'

'মনে, আমরা না।'

'আপনাদেরও তাহলে ছোঁয়াছুঁয়ি আছে? বামুন-শূদ্র আছে?'

'নিশ্চয়ই। বামুন-শুদ্দুর না থাকলে দেশ চলে? সমাজ চলে? আমাদের একটা অতিরিক্ত সুবিধে। তবে সব কথা এত গলা চড়িয়ে বলারই-বা কী? আমাদের দেখেও শিখতে পারেন, যা কিছু সব মুসলমানদের দোষ।'

'মানে, আমরা মানে?'

'মানে, আপনারা নন?'

'মানে, আমরা তো আমরা—'

'আপনারা মানে তো আমরা না—'

'আরে, এই আপনারা কারা? আর আমরাই বা কারা? তফাৎটা কোথায় রাখছেন, কাদের রাখছেন, সে-সব না কইলে আমরা-আপনারা ভাগ মানব কেডা?'

'দেখেন, যোগেনবাবু, ওদের, মানে আপনাদের ট্যাকে আছে একটা মুসলমান। তাতেই তো আপনারা সেজেছেন জাতি। আর মুসলমানদের সাজিয়েছেন জাত। আমাদের মধ্যে, মানে লিগের সঙ্গে যে আপনারা এতজন হিন্দু আছেন তাদের মাথা গুণেও কংগ্রেসকে এইটুকু মানাতে পারছেন না, যে আমরা অন্তত ইনডিয়ার মুসলমানদের দল। কোত্থেকে এক মৌলানা জোগাড় করে তাকে কংগ্রেসের পার্মানেন্ট প্রেসিডেন্ট বানিয়েছেন। কী দেখাতে? না, কংগ্রেসের সভাপতি একজন মুসলমান। কাকে দেখাতে? জানি না। লিগকে যে আপনারা মোল্লা-মৌলানার দল বলেন, সেটার শুরু তো কংগ্রেসই করল। এখন একটা টুর দিয়ে আসেন, সারা বাংলা মোল্লা-মৌলানা-মসজিদে ছেয়ে গেছে।'

'আপনার কথার প্রতিবাদ কইরলে মাইন্যা নেয়া হব যে আপনে আমারে যে-দলে ঠেলতে চান, সে-দলের প্রতি আমার দুর্বলতা আছে। আপনে যতই আমারে শিখণ্ডী বানান, আমি শিখণ্ডী হব না। আমি শুদ্দুর। খাঁটি শুদ্দুরই থাকব। বামুনচাটা শুদ্দুর হব না। শুদ্দুরগ নিয়্যা হিন্দুগ দল পাকাইতে দিব না। আমি চলি গোপালগঞ্জে। শ্যামাপ্রসাদের আগে তো পৌঁছানো নাগে। তাই আপনারে কয়্যা গেলাম। না-হয় তো ভাইব্যা রাইখবেন লঙ্গরখানা তো মণ্ডলের কারখানা।'

'গোপালগঞ্জে আপনার উদ্দেশ্য কী?'

'শ্যামাপ্রসাদকে লঞ্চ থিক্যা নামতে দিব না।'

'সেটা তো খবর পাঠিয়েই করা যায়। আপনি গেলে তো আরো ভাল। সেখানে লিগের লোকজন যদি আপনাদের সঙ্গে থাকে, তাহলে কি কোনো আপত্তি আছে। আপনার?'

'লিগ কী করবে না করবে সে তো লিগের ব্যাপার। আমি কেডা আপত্তি তোলার?'

'আপনি লিগ মন্ত্রিসভার লোক না?'

'না। আমাগ তো কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা। স্যারের—'

'বেশ তো। শিডিউল ক্লাশ বলেই তো লিগের সঙ্গে আন্দোলন করতে আপনার বাধবে না। হিন্দু হলে বা কংগ্রেস হলে—বাধত।'

'লিগের কোনো নাম করা নেতা য্যান না থাকে। ফ্ল্যাগেরও কাম নাই। তাইলেই কইলকাতার ইংরাজি-বাংলা কাগজ হেডিং করব, 'শ্যামাপ্রসাদের বিরুদ্ধে লিগের বিক্ষোভ।' তাইলে সব মাঠে মারা যাব। কিন্তু 'শ্যামাপ্রসাদের বিরুদ্ধে তপশিলিদের বিক্ষোভে'—বাবুদের টনক নড়ব।' যোগেন উঠে দাঁড়িয়েছিল, সারওয়ারদি হাত তুলে তাকে আটকায় ও ফোনটা তুলে নেয়। নম্বর চেয়ে রিসিভার রেখে বলে, 'আপনি কখন, কোথায় নামছেন?' ফোন লাইনটা এসে যায়। সারওয়ারদি বলেন, 'গোপালগঞ্জে কাল আমাদের ল-মিনিস্টার জে এন মণ্ডল যাচ্ছেন। হিন্দুমহাসভার মিটিং ডাকা আছে। তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভে লিগের লোকজনকে জমায়েত হতে হবে—ফ্ল্যাগ ছাড়া। মিঃ মণ্ডলের নির্দেশমত সব হবে। এই খবরটা তো আজই পৌঁছুতে হয়।'

গৃহযুদ্ধে পক্ষ সাজানো

১৭৩

খুলনা থেকে গোপালগঞ্জের লঞ্চের সময় যোগেনের জানা থাকলেও সে ঠিক করেনি, কোন সার্ভিস নেবে। তার একবার মনে হয়েছিল, বিরাট জ্যাঠাকে নিয়ে যাবে কী না। বিরাট জ্যাঠার খ্যাতি-প্রতিপত্তির ওজন আলাদা। সঙ্গে যেতেন কী না সন্দেহ ছিল—এতটা সরাসরি হিন্দু মহাসভার বিরোধিতায় যেতে তাঁর একটু বাধা থাকতে পারে। কিন্তু তপশিলি-বিক্ষোভকে একটু বেড়াভাঙা না করলে বিক্ষোভের ওসারটা বাড়বে না। বিরাট জ্যাঠাকে নিয়ে যেতে পারলে সব দিক দিয়েই মানানসই হত—হকশাহেবের দলের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। আবার একটু হিন্দু-হিন্দুও আছেন। যোগেন না-হয় তার রাজনীতিই বলবে—শূদ্ররা হিন্দু না। কিন্তু যদি হিন্দু বলে মান্যগণ্য কেউ এমন রাজনীতির কথা বলেন যে হিন্দুত্বের বিচারেও মহাসভা হিন্দুস্বার্থের রক্ষক নয়—তা হলে বিষয়টা পুরোপুরি খুলত।

প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ায় বিরাট জ্যাঠা এত মনমরা হয়ে গিয়েছিলেন, যে মাস আটেক না-যেতেই দ্বিতীয় স্ত্রীকে ঘরে তোলেন। আগরতলার অধরবাসী মজুমদারের বড় মেয়ে, খ্যাতিমান পরিবার, শিক্ষিত। জেঠি বিয়ের পর কলকাতায় মেয়েদের মেট্রপলিটানে আই-এ পড়েছেন। বি-এও পড়ছেন। জেঠিমার ছোটবোনও নাকি খুব ভাল ছাত্রী। দ্বিতীয় স্ত্রী এমন কিছু ব্যাপার না, বিশেষ করে প্রথম স্ত্রী যদি মারা গিয়ে থাকেন। বিরাট জ্যাঠার প্রথম পক্ষ থেকে কোনো সন্তানসন্ততি হয়নি বলেও দিনদিনই কেমন মিইয়ে যাচ্ছিলেন। দ্বিতীয় বিয়ের পর জ্যাঠার চলাফেরাই বদলে গেছে। সেটা নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা করা যায় ও করা হয়ও। কিন্তু বিরাট জ্যাঠা এমন সহজভাবে জ্যেটিকে সঙ্গে নিয়ে ১৫ নম্বরের নানা মিটিঙে আসেন আর জেঠিও এত সুন্দর ও সহজভঙ্গিতে সমিতি ও সমাজের নানা বিষয়ে নিয়ে কথা বলেন যে শিডিউল কাস্ট আন্দোলনের নতুন নেতাদের মনে হতে শুরু করেছে—তাদের মেয়েদের এই সব কাজকর্মে

নামাতে হবে। এর আগেও মুন্সিগঞ্জ-সত্যাগ্রহে ডাক্তার মোহিনী সরকারের স্ত্রীর নেতৃত্ব সকলের মনে আছে। আরো আছেন কয়েকজন। শিক্ষার দিকেও মেয়েদের টান এসেছে। বিরাট জ্যাঠার কাছে লোক পাঠিয়েছিল যোগেন, নিজে যেতে পারেনি। এখানকার নানা কাজে এত জড়িয়ে থাকেন যে ওঁর পক্ষে 'চলো' বললেই চলা সম্ভব নয়। অন্তত কদিন আগে না-জানালে ওঁর পক্ষে প্রোগ্রাম করা সম্ভব নয়।

যোগেন নিজের খোঁজাখুঁজিতে মজা পেল। একজন নামজাদা লোক তার দরকার। কিন্তু তাকে বলতে হবে—যোগেনের বুদ্ধিমত কথা। তার চাইতে যোগেন নিজে বসুক। তাও হবে না। তাহলে যোগেনের কথাটা কে বলবে? কিন্তু এ বিষয়ে যোগেনের সন্দেহ নেই যে হিন্দু হিশেবে হিন্দু মহাসভার বিরোধিতাটা দরকারি। কিন্তু সেটা তো কংগ্রেসই সবচেয়ে ভাল পারত। যোগেন নিজেকে ঠাট্টা করে, সে যেন গান্ধীজি হয়ে উঠছে—এক দেহেই হিন্দু-অবতার, হরিজন নেতা, কংগ্রেসের ডিকটেটর, আগস্ট বিপ্লবের বিপ্লবী। এই ঠাট্টাটা মনে খেলে গেল বলেই যোগেনের মগজে ভেসে ওঠে, পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধ সঙ্ঘে এমন কোনো বৌদ্ধ ভিক্ষুকে পাওয়া যেতে পারে, যিনি হিন্দু বর্ণভেদের অধার্মিকতার একটার পর একটা উদাহরণ দিতে পারবেন।

তাই করবে যোগেন।

পারলে, খুলনা থেকেই লোক পাঠাবে পার্বত্য চাটগাঁয়। যোগেন জেনে গেছে—ডাউন-সার্ভিস ধরে বরিশাল-গোপালগঞ্জ থেকে অনেক লোক খুলনা চলে এসেছে, তার গোপালগঞ্জ যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে। এখন সে দেখে, দুদু মিয়ার মাথা। প্ল্যাটফর্ম তো 'যোগেন মণ্ডল জয় জয়' আওয়াজে গমগম করছে। তার অনুরাগী ও সমর্থকদের ভিড় ঠেলে যোগেন দুদু মিয়ার দিকে এগিয়ে যায়। সারওয়ারদিই লিগের আসল নেতা? প্রদেশের লিগের জেনারেল সেক্রেটারি। প্রথম ভোটে, লিগ একটু কেৎরে ছিল, এবার তার পুরো বদলা দেবে।

'আরে, দুদু ভাই, আপনে এদ্দুর কেন আইলেন?' দুদু মিয়া খুব আপ্যায়িত বোধ করেন—যোগেন যে ভিড়টা ঠেলে তার কাছেই প্রথম এল। দুদু মিয়ার ধুতি পরা শাদা ফুলশার্টের মাথায় কুচকুচে বাবরি, ঘোর কাল কোঁকড়া চুলের কাল মুকুট যেন। দুদু মিয়া তার শরীরটাকে কোমরের ভাঁজে ভেঙে, দুই হাতে যোগেনের হাঁটু ছুঁয়ে বলে, 'খোদা হাফেজ।' তারপর সোজা দাঁড়িয়ে বলে, 'কাইল মইধ্য রাইতে নদী বাইয়া চোঙা ফুঁইখ্যা জাগাইয়া থুইল। আগামীকল্য আমাগ সেনাপতি আইনমন্ত্রী যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল খুলনা হইয়্যা গোপালগঞ্জ স্টিমার ঘাটায় নামিয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিবেন! আপনারা সগগলে জাহাজঘাটায় সমবেত হইবেন। তো ভাইবল্যাম, 'সেনাপতির লগে গেলে খুলনাতেই যাই, গোপালগঞ্জরে এত গৌরব দিব্যার কারণ নাই। কইল্যাম, নাও ভাসাও।'

দুদু মিয়া যে ভাসানচর থেকে একেবারে খুলনায় দলবল নিয়ে এসে গেছে—তাতে যোগেন যেন একটু ভরসা পায়। তাহলে কি যে ধরনের রাজনীতির পক্ষে মুসলমান ও তপশিলিদের জড়ো করা দরকার বলে যোগেনের মনে হচ্ছিল, তার একটা সম্ভাবনা গ্রাম-বাংলায় তৈরি হয়েই আছে? দুদু মিয়াকে জড়িয়ে ধরে যোগেন বলে ওঠে, 'দেখছো কি কাণ্ড! আইলেন কী সে?'

দুদু মিয়া তার ধুতির খুঁটটা তুলে নিজের চোখে ঠেকায়। তারপর নিজেকেই ধমকে যেন বলে, 'আরে, ঠাকুর ভাই, জিগ্যান কী? বোয়াল মাছরে জিগ্যান, তুই এই জলে আইলি ক্যামনে?'

'না—আ। কইলেন না নৌকা কইর‍্যা? নাও কি একডা দুইটা ছাইড়ব্যার ধইরছে অ্যাহন, কহনো-সহনো?'

'ঠাকুরভাই, যে যুদ্ধের লগে এত সব আন্ধার, ঘরপোড়ানো, নাওপোড়ানো, ক্ষেত পোড়ানো,

মাটিপোড়ানো স্যায় কি থামছে?'

'থামে নাই। ক্যা? কেউ কি কিছু সংবাদ দিছে?'

'সংবাদ তো ঘইটলে দিব? যুদ্ধ থামছে কী থামে নাই—এমন খবর দিয়ার মানুষ এই জলদেশে আর কেডা হব? সে সব কথা তো জাইন্যা যাবেন আপনে। আমারে শুদু আপনার, কী কইল য্যান, কী কইল রে, পরোগ্রাম, কুথায় কুনদিন আর কী কাম সেইডা জানাইয়্যা থোন। আমি আপনাকে খুঁইজ্যা নিব।'

'তার থিক্যা তো সোজা হয়, আপনে আমার লগে-লগেই থাইক্যা যান, খোঁজাখুঁজির কাম কী?'

'এইডা কি কুনো কথা হইল। আপনে হইছেন মন্ত্রী। আপনে এই বিপদের সময় মন্ত্রী হইয়া তো জানান দিলেন, এ করাল যুদ্ধ শ্যাষ হইলেও হইব্যার পারে। কত শাহেব-সুবার সঙ্গে মিটিং? আর সবহানে এক ইবলিশের মতন খাড়াইয়্যা থাকব দুদু মিয়া? এডা হয় না। আপনে ঐ, ক্যারে, কী কইলি য্যান, ঠাকুরভাইয়ের কী একখান লাগব? পোরো—?'

যোগেন ঘাড় ঘুরিয়ে একবার যেন কাউকে খোঁজে। না পেয়ে ডাকে, 'সুবিমল', তাতেও না পেয়ে গলা তুলে চেঁচায় 'হ্যাঁ রে, এ-ই উদ্দুর।' তখন দেখা গেল, প্যারীডাক্তারের মধ্যম পুত্র উদ্দুর মুখ বাড়িয়েছে। দেখে, যোগেন তাকে বলে, 'এগ এডডু কইয়্যা দে, কবে কোথায় কীসের মিটিং।' উদ্দুর দূর থেকে হাত তুলে মাথা হেলায়।

যোগেন গোপালগঞ্জ অভিযানে যে-একটা ছক মনে মনে তৈরি করতে চাইছিল ভোলার ভাসানচরে দুদু মিয়া খুলনায় এসে যোগেনকে সংবর্ধনা জানানোয় যোগেনের মনে-মনে যে-আন্দাজ তৈরি হচ্ছিল ও ভেঙে যাচ্ছিল সেটা একটা আকার পেয়ে গেল। দুদু মিয়া না কোনো পার্টির, না কোনো সরকারের, না কোনো আদর্শের লোক। ভোলার সাইক্লোনের পর যে ত্রাণ সমিতি তৈরি হয়েছিল, যোগেনের দৌড়োদৌড়িতে, তার দৌলতে হয়তো দুদু মিয়ার নামটা টাউনের মানুষদের কারো-কারো কানে উঠেছিল। সে-সব কোনো কারণেই দুদু মিয়া খুলনা পর্যন্ত আসেনি। বলল তো, নদী থেকে ফোঁকা চোঙা শুনেছে। যোগেন মণ্ডলের মিটিং জেনেছে। তার কোনো চিঠি নিয়ে যোগেনের কাছে কেউ আসেনি। সারওয়ারদি শাহেবের টেলিফোন নির্দেশ তাঁর কাছে পৌঁছুতে পারে—এটা দীনদুনিয়ার মালেকেরও জ্ঞানের বাইরে। দুদু মিয়াই যোগেনকে ছেড়ে দেয়, 'আপনারে আটকানোর লগে তো আমরা খাড়াইয়্যা নাই। সব অফিসাররা বড়-বড় নেতারা আপনার লগে মিটিং কইরবে বইল্যা খাড়াইয়্যা আছে। আপনে আগান। অগর লগে তো আমাগ নিয়্যাই কথা হব। আপনারে লেট করাইয়্যা দিলে তো আমাগই ক্ষতি। আপনে আগান—'

যোগেন পেছন ফিরতেই দুদু মিয়ার দলবল থেকে ধ্বনি উঠল, 'যোগেন মণ্ডল—জয় জয়।'

যোগেন ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার হাত তুলল। আবারও যোগেনের নামে জয়ধ্বনি উঠল।

যোগেন চলল তার জন্য যারা আপেক্ষা করছে সেই নেতা আর অফিসারদের ভিড়ের দিকে। পেছন থেকে উদ্দুর প্রায় দৌড়ে এসে বলে, 'স্যার, স্যার—'

যোগেন থমকে তাকে বলে,'তুই আবার স্যারানো শুরু কইরলি ক্যা?'

উদ্দুর তার হাতে একটা লম্বা টাইপ-করা কাগজ দিয়ে চাপা স্বরে ইংরেজিতে বলে—সরকারি স্তবরে আপনার এখানে আসা নিয়ে যা যা খবর এখানে আজ পর্যন্ত এসেছে, তার লিস্টি এটা। এঁরা সবাই লিস্ট করে রেখেছেন, আমার এক ঝলক দেখে মনে হল—একই সময়ে একের বেশি প্রোগ্রাম আছে।

'সেইডা আমি কী করব? তুই যা বুঝিস, কর গিয়্যা—'

সুবিমল ইংরেজিতেই বলে ও যোগেনের বাঁ কানের পেছন থেকে। যোগেন তার মুখোমুখি হওয়ার জন্য দু-বার ঘুরেছে। দুবারই উদ্দুর ঘুরে যোগেনের কানের পেছনে চলে গেছে।

স্যার, এটা বোধহয় আপনাকেই ঠিক করতে হবে। এটা কারো কোনো দোষে ঘটে নি। বরং সবার সদিচ্ছাগুলির মিলিত ফল এটি। আপনি যে এই টুরে আসছেন, সেটা সরকার যতটা উশুল করতে পারে, সেই চেষ্টাতেই আপনার প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বের অধীন ডিপাটমেন্টগুলি, তার সঙ্গে স্যার পি এম-এর ডিপার্টমেন্টগুলো থেকে ও তার সঙ্গে সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী মিস্টার সারওয়ারদির মন্ত্রক থেকেও প্রোগ্রাম করা হয়েছে।

'অ্যাহন থিক্যা কি আমারে মামা না-ডাইক্যা, স্যার, ডাকবি? আর আমার লগে ইংরাজিতে কথা কবি?'

'হ্যাঁ। মামা, তুমিও আমারে উদ্দুর বলে ডাকবে না, সবার সামনে। আর, ইংরেজিতে কথা বলবে। না হলে, আমার কাজের অসুবিধে হবে। তোমার মন্ত্রীগিরির কাজের মতই, তোমার কনফিডেনশিয়াল অ্যাসিস্টান্টের চাকরিটাও, আমার পক্ষে নতুন। আমি যে তোমার এত নিকটজন, সেটা এখন থেকেই সবাই জানলে, আমার অসুবিধে হবে।'

'কী চাকরি দিলি রে, বাবা, যাতে উদ্দুররে উদ্দুর ডাকা যায় না?' যোগেন বাইরের দিকে পা বাড়ায়—অফিসারদের মিটিঙের জন্য। মিটিংটা ডাকবাংলোতে।

এ-বাড়িতে যোগেন তো আগেও থেকেছে। রসিককাকাকে নিয়ে, নাকি সার্কিট হাউসে? রকিস কাকাকে জিজ্ঞেস করলে হত, সেবার কংগ্রেস অফিসে এক কম বয়েসি ছেলে, রায়িস্ট? দারুণ বক্তৃতা করেছিল। তাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায়? বা, সেই এক রাজবন্দী-ডেটিনিউ, বুড়ো মানুষ। তাঁকে পেলেও চলে কিন্তু তাঁকে কি খবর দেওয়া হয়েছে। মিটিঙের শুরুতেই এই ঝামেলা চোকাতে হবে। যোগেন মিটিং ঘরে ঢুকতেই সবাই উঠে দাঁড়ায়। একটা খশখশ আওয়াজ ওঠে—পরনের ধুতি-প্যান্টের ঘষায়।

চেয়ার সরাবার ও টানার কোনো আওয়াজ উঠল না। যোগেন না বসে বলল, কলকাতায় গোপালগঞ্জ থেকে খবর পাই যে সেখানে সাম্প্রদায়িক অবস্থা খুব খারাপ। কোনো হিন্দু বা মুসলমানকে বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। এই অবস্থা শুনে আমি বলতে গেলে রাইটার্স থেকে ট্রেন ধরেছি। শুধু সিভিল সাপ্লাই মিনিস্টার মিস্টার সারওয়ারদির সঙ্গে মুখের কথা বলে আসতে পেরেছি। আমি যখন ট্রেনে, ওঁরা তখন আমার প্রোগ্রাম সেট করে আপনাদের পাঠিয়েছেন। তাঁদের ধন্যবাদ জানানোর ভাষা আমার নেই। কিন্তু আমরা সকলে মিলেই যুদ্ধ, খাদ্যাবস্থা, দাঙ্গাঘটিত এই সংকটে কাজের চেষ্টা করছি। আপনাদের নিজেদের কাজ সম্পর্কে কোনো সমস্যা থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারেন। যতটুকু পারি, জানাব। আমার নিজের দুটি ডিপার্টমেন্টকে অনুরোধ করব—কোনো ডিপার্টমেন্টাল বা রুটিন ঝামেলার কথা তুলবেন না। কিন্তু যুদ্ধ, খাদ্য, পোড়ামাটি ও সাম্প্রদায়িক—এই চারটি বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলব।

এতক্ষণ সবাই দাঁড়িয়েই। যোগেন বসার পর, সবাই বসে। সেই বসায় আবার কাপড়-ঘষার আওয়াজ হয়। সেই ফাঁকে যোগেন বাঁয়ে পেছনে তাকায়, যেন কাউকে খুঁজছে। উদ্দুর এসে পেছন থেকে কান পাতে। যোগেন বলে, 'রসিক কাহারে তালাস দে। পাইলে এইহানে বসাবি, চেয়ার টাইন্যা। না পাইলে কয়্যা যাবি।'

যোগেনের কথা কেউ শুনতে পেল না কিন্তু সে যে তার ডান হাত নাড়িয়ে তার চেয়ারের পাশের জায়গাটা দেখাল—সেখানে একটা টুলের ওপর ফাইল পাঁজা করা—সেটা সবাই দেখল,'

টেবিলের উল্টো মাথায় এক শাহেব বসেছিলেন—একটা খুব পাতলা সুতির কোট-টাইয়ে। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে নিজের পরিচয় দিলেন ডিভিশন্যাল কমিশনার বলে। তিনি তাঁর দু-পাশে হাত ছড়িয়ে বললেন—ইস্টার্ন বেঙ্গল বলতে বাংলার যে পূর্বদেশ বোঝায়, তার প্রায় প্রত্যেকটি জিলা থেকেই দায়িত্বসম্পন্ন উচ্চপদস্থ অফিসাররা মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন। তার প্রধান কারণ এটা নয় যে তাঁরা কোনো মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চান—কারণ, তাঁরা কোনো কথা কাউকেই কিছু বলতে পারছেন না, কারো কাছ থেকে কিছু জানতে পারছো না। অথচ তাঁদেরই তো রোজ খবর দিতে হয়—চিনি দেয়া হবে কবে, গেলবারের আগের বার ওড়িশার চালে খুব পচা গন্ধ ছিল, ওড়িশা আর আসামের চালের গুণ ও নিয়মানুগত্য নিয়ে কি ভরসা করা যায়? আপনাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা কথা বলার সময় নিজের পরিচয় দিয়ে দেবেন। তারিখহীন ও তথ্যহীন কোনো শখের অভিযোগ তুলে সময় নষ্ট করবেন না। মাননীয় মন্ত্রী ওপারে তাঁর পূর্বনির্ধারিত মিটিঙে যাবেন প্লী-ই-জ।

একজন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে জানায়—সে নদীয়ার মহকুমা শাসক। খাদ্যসমস্যা তো আমরা সকলেই বুঝছি, কেন্দ্র থেকে প্রদেশ, প্রদেশ থেকে জিলা, জিলা থেকে মহকুমা—সকলেই আত্মরক্ষা করতে পারছে, আপনি বাঁচলে বাপের নাম নীতি অনুসরণ করে—'টেল অব ইয়োর ফাদার, অনলি হোয়েন ইউ আর সিয়োরার'—। এটা নিশ্চয়ই খুবই বড় আকারের দুর্ভাগ্য যে—একটা সংকটে বাঁচলাম কী না বুঝে ওঠার আগেই আর-একটা সংকট এসে যাচ্ছে, 'সে' 'ওয়ার', ফলোড বাই প্রাইজরাইস, অ্যান্ড দি স্টার্ভেশনস এগেইন ফলোড বাই ম্যালেরিয়া-এপিডেমিক।' আমাদের ওখানে একজন সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জেন অব পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্টিকে জিলা ম্যাজিস্ট্রেট আরেস্ট করেছেন। সে হাসপাতালের রোগীদের কুইনিন বলে সাধারণ জল ইনজেক্ট করছিল। আর এই চুরি করা কুইনাইন বাইরে বিক্রি করছিল প্রতি পাউন্ড ২০০ থেকে ৪০০ টাকা দরে। তার সরকারি দর পাউন্ড প্রতি ৭০ টাকা। এই চুরি সম্ভব হয়েছে রাজনৈতিক প্রচারের ফলে। সে প্রচারে সব দলেরই এক রা। মুখে গরিবদের জন্য চোখের জল আর হাহাকার। খাদ্যের বাড়তি দর ও অভাব মধ্যবিত্তদের বিপদে ফেলেছে। তাঁরাও ম্যালেরিয়া এপিডেমিকে কুইনিন কিনতে পারছেন না। আজকের মিটিঙ থেকে কুইনাইন সরবরাহের পরিকল্পনাটা জানতে চাই।

এ রকম ভাবেই উঠল—চিনির কথা, কোথাও কোথাও লঙ্গরখানা বন্ধ করে দেয়ায় ক্ষুধার্তদের কলকাতার দিকে পুনর্যাত্রা, গ্রামস্তর থেকে জিলাস্তর পর্যন্ত বিভিন্ন রিপোর্ট পাঠানোর নিয়ম ও রুটিন ভেঙে পড়ছে, মানে, প্রদেশের সরকারের সিদ্ধান্ত তথ্যনির্ভর হওয়ার বদলে প্রভাব নির্ভর হয়ে যাচ্ছে। গ্রাম থেকে প্রদেশের নেতারা এই দুনীর্তির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন অথবা তাঁরা এই বিপদে অবান্তর হয়ে যাচ্ছেন। এর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে যুদ্ধের বাজার। সে-বাজার সিভিল বাজারের সঙ্গে কোথাও মিশে যাচ্ছে, কোথাও সিভিল বাজারকে মজিয়ে দিচ্ছে। এমন একটা সিদ্ধান্ত যেন পুরনো এই বদ্বীপ অঞ্চলে ও পূর্বের এই অববাহিকা অঞ্চলে প্রতিদিনই সত্য হয়ে উঠেছে যে এখানে কাউকে বাঁচানোর দায়িত্ব সরকারের নয়। সরকারের কাঠামোটা কিন্তু রাখতেই হবে।

এ রকম আরো কিছু আলোচনার পর যোগেন বলে আপনারা তো এই অঞ্চলে সরকারকে রক্ষা করছেন। আজকে আমি খুলনাতে থাকব জেনে এখানে এসেছেন, কমিশনার থেকে রিলিফ অফিসার পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের অফিসার। আমি একজন মন্ত্রী বলেই যে আপনারা এসেছেন, অন্তত আমি তা বিশ্বাস করি না। আমি এইখানকার মানুষ, কত পুরুষের, তা আমি জানি না।

আপনারা আমার এই মিটিঙে এসেছেন শুধু আমার প্রতি বিশ্বাসে আর আপনারা যেখানে কাজ করেন সেখানকার মানুষজনকে বাঁচিয়ে রাখতে। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি—এই বিশ্বাস ও ভালবাসার মূল্য আমি দেব। এর সঙ্গে মন্ত্রী থাকা না-থাকার সম্পর্ক নেই। তেমনি এ-কথাটাও আপনাদের আমি মনে রাখতে অনুরোধ করছি যে আপনাদের প্রতিটি অভিযোগ কয়েকগুণ বাড়িয়ে নিলেও সেটা সত্যিই থাকবে। মন্ত্রী হওয়ার ফলে আমার পক্ষে দায়িত্বহীন ভাবে বলা সম্ভব নয় এই সংকটের কারণ কী। কারণ নিয়ে তো মতপ্রভেদও থাকতে পারে। যুদ্ধ চলছে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে। আজ ৪৩ সালের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। যুদ্ধ চারবছর চলছে। তার আগে ধরুন ৩২/৩৩ সাল থেকেই যুদ্ধের আওয়াজ উঠেছে। তাহলে যুদ্ধ তো প্রায় ১০ বছর সময় দিয়েছে। যুদ্ধ, ডিনায়্যাল পলিসি, প্রকিওরমেন্ট, চাল আমদানি বন্ধ, সৈন্য ও যুদ্ধ উৎপাদনের জন্য কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলের রেশন চালু রাখা, এগুলোর জন্য তৈরি হওয়ার সময় ছিল না—এ কথাটি ঠিক নয়। যাঁদের দায়িত্ব ছিল, তাঁরা করেননি। অথবা, তাঁরা যুদ্ধটাকে যেভাবে ভেবেছিলেন, যুদ্ধটা সে ভাবে হল না। তাও যদি ঘটে থাকে, সেটাও তো একটা বিচ্যুতি। আমি দোষারোপ করতে অক্ষম। আমি বংশগত শূদ্র। সুতরাং দোষী থাকাটা আমার অগ্রাধিকার। কিন্তু শূদ্র বলেই আমি শুধু আমার সেবা ও কর্মের মধ্য দিয়ে নিজের দোষ ক্ষালন করার চেষ্টা করতে পারি।

যোগেন তো এই কথাগুলি ইংরেজিতে বলছিল। বরিশালিয়া বাংলায় বললে তার আবেগ পাকিয়ে ওঠা সে আগেই টের পেত ও রঙ্গ-রসিকতা-আয়রনিতে নিজেকে সামলে নিত। কিন্তু ইংরেজিতে তো সেটা সম্ভব না। সে যখন বলে ফেলল বলে নিজেই শুনল, 'আই অ্যাম আনেবল টু সার্চ ফর গিল্ট ইন আদারস বিকজ অব মাই বার্থ অ্যাজ এ শূদ্র। দিস ইজ মাই প্রিভিলেজ অ্যাজ-এ শূদ্র টু প্লিড গিল্টি অলওয়েজ আন্ড টু অ্যাটোন বাই কনস্ট্যান্ট ওয়ার্ক অ্যান্ড সারভিস', আর এই মিটিঙের অনেকে চাপা হাততালি দিয়ে ফেলেন মিটিঙের আদব কায়দা ভেঙে, তাদের মধ্যে বেশ কিছু শাহেব, নানা বয়সের। তারা বিশ্বখ্যাত তাদের জাতিগত নিরাবেগের কারণে, যোগেন নিজের কাছে বোকা হয়ে যায়। এটা সে কী করল?

বোকামো থেকে বেরিয়ে আসতে যোগেন বলে, সে বলতে চাইছে যে অন্তত কিছু কাজ করতে পারে, আমাদের সকলের দুশ্চিন্তা দূর করতে। আলোচনা থেকে এই কটি কাজ বেরিয়ে আসে, তার পক্ষে যা করা সম্ভব। এখানে কয়েকটি ঘটনার কথা বলা হয়েছে—উদাহরণ হিশেবে। রাই মোহন সাহা ২৬ টাকা থেকে সাড়ে ২৬ টাকা মন দরে ৯৫০ মণ চাল কিনেছে। কিন্তু যে বেচেছে সে চাল তার কাছে পৌঁছে দিতে পারছে না, পুলিশের ভয়ে। তার চালের পরিমাণ প্রায় দুই ওয়াগনের মত। আর একটা ঘটনায় লাইসেন্স-ছাড়া কেরসিন তেল পাইকারি দরে বেচার কথা এসেছে। স্টক করা হচ্ছে দুর্গম গ্রামে। আরো একটা ঘটনা এসেছে—গোপনে ১৪ টাকা মণ দরে ৪০০ মণ ধান কলকাতায় পাচার করতে সম্পূর্ণ ছইয়ে ঢাকা নৌকো পাঠাতে বলা হয়েছে। আর একটা ঘটনায় মজুত চাল বাজারে ছাড়তে না করা হয়েছে, পরে ভাল দাম পাওয়া যাবে। এগুলো সবই আইনলঙ্ঘনের ব্যাপার ও ফৌজদারিযোগ্য। কলকাতায় ফিরেই আমি সিভিল-সাপ্লাই মন্ত্রীকে বলব। আমার আশা মিস্টার সারওয়ারদি ও আমি একটা পারচেজ বোর্ড তৈরি করে দিতে পারব। ফার্মগুলির প্রতিনিধি থাকবে, রেল ও যে-সব চেম্বার জড়িত, তাদের প্রতিনিধিরাও থাকবে। বোর্ড কনট্রাকটারদের বলবে চাল কিনতে। রেল ও ইনডাস্ট্রি ও সরকারের জরুরি রিজার্ভের জন্য। যাদের জন্য চাল, তাদের দেয়া টাকায় কিনতে হবে। পাইকারিতে সরকার একচেটিয়া ব্যবসা করবে এমন আইন এখন তৈরি করা যায় না। কারণ সরকারের লোক নেই।

সরকার এখন এইটুকু পর্যন্ত করতে পারে—একটি বোর্ড মারফৎ ক্রেতা হতে পারে, জানুয়ারির মধ্যে চালের পাইকারি দর ১৫ টাকায় নামিয়ে ১০ লক্ষ মণ প্রকিয়োর করবে, এই বোর্ডেও এই উদ্দেশ্যে মাত্র কয়েকজনকে ডেপুটি কনট্রোলার পদে কাজ করতে বলা হবে। কুইনাইন বিতরণ ব্যবস্থাকে গ্রাম বাংলায় সিভিল সাপ্লাইয়ের ভিতরে আনলে ভাল হয়।

সমবেত গুঞ্জনে সমর্থন পেয়ে যোগেন হেসে বলল—আপনাদের এই সভার সুপারিশ কটি পাঠিয়ে দিলে সুবিধে হয়। আর, আমার দপ্তর সংক্রান্ত একটি আনন্দ সংবাদ আপনাদের জানিয়ে শেষ করছি। একটি অর্ডিনান্স করে ৪৩ সালের জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ৫ বিঘের নীচে সমস্ত বিক্রীত জমির বিক্রয় নাকচ করা হল।

নৌযুদ্ধ

১৭৪

গোপালগঞ্জে সভার ব্যাপার বা হিন্দুমহাসভার ঘোষিত সভা নিয়ে কিছু ভাবার আগেই যোগেন অফিসারদের সঙ্গে মিটিঙে ফেঁসে গেল। মিটিঙের পর তার মনে হয়—তার এখানে আসল উদ্দেশ্য ছিল এই মিটিংটাই। গোপালগঞ্জের জন্য যে সে একটা বেশ জঙ্গি সমাবেশের কথা ভেবেছিল সেটা হয়তো হবে—কিন্তু ঐ তাত্ত্বিক আলোচনাকে রাজনীতির ভাষা করে তোলা যাবে না। তার জন্য অন্য সভা করতে হবে।

নদীর ওপর বেশ দূর থেকেই দেখা যাচ্ছিল, গোপালগঞ্জের স্টিমার ঘাটায় কিছু একটা ঘটছে যেন। অনেক সময় লঞ্চের ছাদ থেকে পাড়ের এই ঝড়-তাণ্ডব দেখা যায়।

কিন্তু গোপালগঞ্জের কাছাকাছি এলে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়—গাছপালার ঝড় নয়, মানুষের ভিড়। যোগেন বুঝে উঠতে পারে না—হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেস তো এই সভার জন্য তৈরি হচ্ছে অনেকদিন। সে যে আজ আসবে এখানে, তা কি তেমন করে সবাই জানে? তাহলে এই সমাবেশ তো ওদেরই অভ্যর্থনা করতে তৈরি হয়ে থাকতে পারে। নদীর মাঝখানে লঞ্চটাকে থামিয়ে রেখে যোগেন সারেঙের ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। সারেঙের কাছে অনেক সময় টেলিস্কোপ থাকে।

যোগেন সারেঙের কাচে মোড়া দিগন্ত ঘেরা ঘরটায় ঢুকলে সারেঙ টেলিস্কোপটা নামিয়ে বলে, 'আ, একটা লঞ্চ যেন দেখা যায়—'

'আর একটা? দেখি?'

টেলিস্কোপটা লাগিয়ে যোগেন দেখে, হ্যাঁ, আর-একটা লঞ্চ পাড় ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। পাড়ের সঙ্গে ঐ লঞ্চের মাথা সমান হয়ে যাওয়ায় দূর থেকে আলাদা করা যাচ্ছে না। যোগেন আর একটু ঘুরিয়ে দেখে—লঞ্চের মাথায় একটা ঝান্ডা উড়ছে। যোগেন টেলিস্কোপ থেকে সরে দাঁড়িয়ে বলে—'একডা ঝান্ডা য্যান! দ্যাহেন তো কার—', যোগেন চোখদুটো রগড়ে ফেলে। সারেঙ বলে, 'অ ত হিন্দুবাবুগ ফ্ল্যাগ, আপনাগ না। লিগেরও না।' যোগেন টেলিস্কোপের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সারেঙ তার ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে নামতে ঘুরলে যোগেন টেলিস্কোপটা একটু হেলিয়ে নদীপাড় বনবাদাড় ও মানুষজনসহ আকশে তুলে দিয়ে ও নামিয়ে চিৎকার করে সারেঙকে বলে, আপাতত পেছন থেকে, বস্তুত সামনে থেকে, 'নাও, নড়াইয়ো না। খাড়াইয়্যা রও।'

জলযুদ্ধের সেনাধ্যক্ষের আদেশ সারেঙ শুনেছিল কী না তা নিয়ে কোনো তদন্ত দরকার হয়নি। যোগেনের সঙ্গে লঞ্চে ছিলেন ডিভিশন্যাল কমিশনার আর বরিশালের এস পি। শাহেবরা সশরীর উপস্থিত থাকতে সারেঙের পক্ষে সেনাপতি হিশেবে যোগেনকেই একমাত্র মেনে নেয়া সম্ভব ছিল না। তার ওপর ইতিমধ্যে গোপালগঞ্জের পাড় থেকে একটা ছোট ছিপ মেঘনার আকাশ থেকে তারা খসার মতো ছিপের পেছনে এক আন্দোলিত ফেনরেখা মোছার আগেই এই জাহাজের তলায় এসে পড়ে। নামিয়ে দেয়া দড়ির মইতে ইঁদুরের মত. উঠে যায় নেংটি পরা জলের রাখাল, দোতলায় ও যোগেনের অনুপস্থিতিতে আক্রমণ করে—'করেন কী, আগে আইছে বর্ধমান, তার বাদে শ্যামপ্রসাদ, তারও বাদে এক লঞ্চ। আপনারা নাও খাড়াইয়া ক্যা? শ্যাষে উরা যদি নামাইয়া পড়ে, এ—ই, নাও ছাড়ো নাও ছাড়ো।' হয়তো স্বরে কোথাও স্বাভাবিক এমন নেতৃত্ব ছিল যে লঞ্চের ইঞ্জিন থরথরিয়ে জল ভাঙতে শুরু করে ও গতি পায়। সারেঙের ঘরে এক কাচঘেরা দীর্ঘ দিগন্ত যোগেনের টেলিস্কোপের লেন্সে নিকটতর হতে-হতে, হতে-হতে পুরো লেন্সটাকে যখন নানা রঙিন অসংখ্য বিন্দুতে ভরে দেয়—যোগেন সারেঙের ঘর থেকে বেরিয়ে লঞ্চের মাথায় বুকের ওপর আড়াআড়ি হাতে শ্রী যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

সরকারি সেই লঞ্চের ফ্ল্যাগপোস্টে যোগেনের মাথার ওপরের আকাশটুকুতে ইউনিয়ন জ্যাকের মোটা-মোটা রেখাগুলি মেঘনার সামুদ্রিক হাওয়ায় ভেঙে ভেঙে গড়িয়ে আবার জুড়ে যাচ্ছিল, আবার ভাঙছিল। সেই নিশানের ও নদী-উৎক্ষিপ্ত এই হাওয়ার লাস্যময় শৃঙ্গার থেকে যে 'পাওয়ার' উৎপন্ন হচ্ছিল তারই জোরে লঞ্চের বাঁশি বেজে ওঠে গম্ভীর লম্বিত—সামনের লঞ্চটিকে সরে যেতে, ও যোগেন্দ্রনাথের লঞ্চটিকে ঘাটায় ভিড়বার পথ করে দিতে, বলে।

সারেঙের শূন্য ঘরের সামনে যোগেন্দ্রনাথ বুকের ওপর হাত আড়াআড়ি রেখে দাঁড়িয়েই ছিল।

বর্ধমানের মহারাজা, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, আশুতোষ লাহিড়ী ও হিন্দু মহাসভার আরো নেতাদের নিয়ে যে লঞ্চটি দাঁড়িয়ে ছিল অথচ নোঙর ফেলতে পারেনি, সেটি ততক্ষণে প্রশস্ততর জলের দিকে মুখ ঘুরিয়েছে। ঘাটায় জড়ো মানুষজনের গলা থেকে আওয়াজ বেরয়, 'জয়, জয় যোগেনো মণ্ডল'।

হিন্দু মহাধর্ম মহাসম্মিলন বেশ কয়েকমাস ধরেই তৈরি হচ্ছিল। স্থানীয় অনেক নেতাই সেই আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় মনে হচ্ছিল—সম্মিলন তো হবেই, যতটা ভাবা গিয়েছিল তার চাইতে বড় তো হবেই, ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ থেকে বরিশালের নাজিরপুরের 'লড়া' গ্রাম পর্যন্ত নদীতীরের অনেকগুলি জায়গাতেই দিনের বেলা সম্মিলন হতে-হতে আসবে। 'লড়া' গ্রামটি সমুদ্র থেকে তিরিশ মাইলের বাইরে। এই হিন্দু সম্মিলনের মূল কর্মসূচি ছিল—১. তপশিলিদের হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত করে নেয়া, ২. শুদ্ধি-সংক্রান্ত কিছু অনুষ্ঠানে তপশিলিদের অস্পৃশ্যতা দূর করা ও পাওয়া গেলে দু-একজন মুসলমানকে হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনা, ৩. নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রিসভায় মুসলমান, তপশিলি ও নমশূদ্রদের বাংলার রাজনীতির নিয়ন্ত্রক শক্তি হয়ে ওঠায় যোগেনের নেতৃত্বের বিরোধিতা।

বরং একটু দেরি করেই যোগেন সিদ্ধান্ত নেয় যে এ সম্মিলন করতে দেয়া হবে না। ডিনায়্যাল পলিসির ফলে নিষিদ্ধ এলাকায় এই রকম সম্মিলন করে নমশূদ্র মানুষদের যুদ্ধের বলি করা হচ্ছে—এই যুক্তিতে। অবস্থা ক্রমেই বদলাতে থাকে ও তপশিলিদের মধ্যে মতপার্থক্য ঘটে। কেউ-কেউ কংগ্রেসকে, কেউ বা হিন্দু মহাসভাকে সমর্থন করার পক্ষে যায়। ফলে এই হিন্দু সম্মিলনের উদ্দেশ্যও বদলে যায়। যোগেনের মনে হয়—প্রকাশ্য বিরোধিতা ছাড়া তপশিলিদের

ও নমশূদ্রদের হিন্দু, কংগ্রেস ও মহাসভা-নির্ভরতা থেকে বের করে আনা সম্ভব নয়।

ঠিক যে-রুটে হিন্দু সম্মিলন হওয়ার কথা ছিল, সেই রুট ধরেই যোগেন লড়া গ্রামে পৌঁছুল। অজস্র মিটিং করল। একটিও জনসভা নয়—মুসলমান পাড়ায়, নমশূদ্র পাড়ায়, খালের এ-পারে ও-পারে, জোলাপাড়ায়, নুইন্যা পাড়ায়, কোনো কোনো স্কুলে, মাঝিপাড়ায়, শেষপর্যন্ত গৌরনদীতে ; আরো শেষ পর্যন্ত মৈস্তারকান্দিতে। শ্বশুর বাড়িতেও এক পাক। হ্যাঁ। লঞ্চেই। অফিসারদের বরিশাল সার্কিট হাউসে জমা রেখে। তার দপ্তরের দুজন অফিসারকে লঞ্চেই রেখে। হ্যাঁ। লঞ্চে ইউনিয়ন জ্যাকটা কখনো নেতিয়ে ছিল, কখনো আবার উচ্ছ্বসিতও।

যোগেন ডেকে ওঠে, 'উদ্‌দুর রে, তোর মায়ের বাপের দ্যাশ দ্যাখ রে।' ডাকে আপত্তি করার মত কেউ কাছে না-থাকায় উদ্‌দুরও ডেকে ওঠে 'মা-মা-আ।'

বায়ুযুদ্ধ

১৯৪৪ সালের ১৫ জানুয়ারি ছিল শনিবার। রেসের দিন। মধ্য কলকাতা থেকেই ট্র্যাফিক দক্ষিণমুখী। যুদ্ধের জন্য ক-দিন বন্ধ ছিল রেস খেলা? যে-বার্মিজ সৈন্যদের প্রতি সহানুভূতিতে

১৭৫

রেসখেলা কবে যেন বন্ধ হয়েছিল, তাদেরই চাহিদায় রেসখেলা আবার শুরু হল। সপ্তাহের শেষে একদিন শাহেবসুবো ও বাবুরা মিলে একটু মহোচ্ছব না করলে কি শরীরের আড় ভাঙে?

ইতিমধ্যে কলকাতার লোকজনের, মানে, যারা কলকাতাতে থেকেই গেছে, তাদের, সামান্য হলেও কিছু যুদ্ধ-অভ্যাস তৈরি হয়ে গেছে। ব্ল্যাক-আউট, রেশনের চাল, ফুড কনট্রোল, কিউ, এ-আর-পি, সাইরেন, আন্ডার গ্রাউন্ড সেলটার, অল ক্লিয়ার, প্লেনের আওয়াজগুলোও, চেনা হয়ে গেছে। এমন একটা হিশেবও কারা বাজারে ছেড়েছে যে শুক্লপক্ষের শনিবার যদি ত্রয়োদশী থাকে, তা হলে জাপানী বোমারু আসবেই। ওই রাত নটা-দশটা পর্যন্ত। বোমা কি পাঁজি দেখে ফেলা হয়? এও রটেছে, দু-এক দিন নাকী মিলেও ছিল। ফলে এখন, উত্তর কলকাতার কোনো-কোনো পাড়ায় স্যাটারডে পিকনিক নিয়মিত হয়ে আসছে। আর, তার প্রস্তুতি চলে সকাল থেকেই। সন্ধ্যা নাগাদ কলেজ স্ট্রিটের মোড় থেকে শ্যামবাজারে ঘোষ কাজিনের মোড় পর্যন্ত খিচুড়ি ও মাংসের গন্ধে বাতাস বেশ ভারী থাকে।

লোকজন কলকাতায় এত কমে গেছে যে রাস্তাঘাট ফাঁকা ঠেকে। ভিড় বেড়েছে সৈন্যদের আর বেশ্যাদের। তা নিয়ে নানা গল্পগুজবও আছে। বার্মাপতনের পর ওখানকার পেশাদারি মেয়েরাও নাকী কলকাতায় এসেছে। বাংলা কাগজে সে-সব নিয়ে নানারকম আদিরসের নীতিকথাও লেখা হচ্ছে। মিলিটারি খদ্দের পাকড়াতে এ-পাড়া ও-পাড়ার মেয়েদের মারামারিও হত। চাঁদনির উলটোদিকে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের স্কার্টপরা মেয়েরা নাকী একদিন ব্ল্যাক-আউটের আগেই এতদূর বিডন পার্কে মিলিটারি ধরতে এসেছিল। বিডন রোডের মেয়েরা ছাতি লাঠি ঝাঁটা হাতে তাদের ধাওয়া করে। ওয়ার্ডের হোমগার্ডের লিডার পার্কের শেডে রাখা বেঞ্চে লুকিয়ে শুয়ে দীর্ঘ দিবানিদ্রা দিচ্ছিল, হাফপ্যান্টের ফুল পকেটে হুইসল নিয়ে। সবাই ধরেই নিয়েছিল—একই কাণ্ড, ঘটছে। টমিদের কোনো দল এসে মেয়েদের কিছু করে ফেলেছে ও মেয়েগুলো কিছু গোলমাল পাকিয়েছে। তাই, সাইরেন বাজিয়ে দিলেই দশদিক ঠান্ডা হয়ে যাবে। সাইরেনের চাবি

যার কাছে, তাকে ডাকতে-ডাকতেই আকাশে সত্যি-সত্যি জাপানী প্লেন, বেঁটে, ছোট, আর ফল্‌স্‌ গোঁত্তায় মনে হয়, বোধহয় ভেঙে পড়ছে। এ তো আর ফ্রি স্কুল স্ট্রিট আর প্যারাবাগানের মেয়েদের ব্যাপার না, এ যে সত্যি-সত্যি জাপানি বোমারু, 'এই মোতে রে—এ, মোতে-এ।'

মোতের ঘুম কীসে ভেঙেছিল সেটা আর-কেউ জানার টাইমই পায়নি। কিন্তু ঘুম তার ভেঙেছিল। সে চোখ খোলেনি। তার পরই জাপানি প্লেনের ফিরতি গোঁত্তা যেন পাইলিঙের হ্যামারের মত এসে পড়ে মোতের মাথায়। এ তো মিলে যাচ্ছে গ, শনিবারের বারবেলা। আজ তো হপ্তাবাবুদের মাগ মারতে আসারই কথা।

কিন্তু মোতের স্বভাব চড়ুই পাখির মত ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ নয়। কোনো একটা আওয়াজ পেলেই ওর বসার বা শোয়ার জায়গা থেকে পালাবে এমন নয়। টিকটিকি যেমন নিঃশব্দে খাড়া দেয়ালে লেপটে যায়, মোতেও সে-রকম আওয়াজের রকম না বুঝে লেজটা পর্যন্ত নাড়ায় না। যে-মুহূর্তে সে বোঝে, সে একটা পালাবার ফাঁক পেয়েছে, সেই মুহূর্তে, সেদিনও সে পার্কের হেলানিটা গড়িয়ে শুয়ে-শুয়ে মাটিতে পড়ে গেল আর তারপর উটকো বসে ব্যাঙের মত লাফে, যে-গাছটার ছায়ায় সে এমন গভীর সময় পর্যন্ত ঘুমিয়েই ছিল, তার গোড়ার শিকড়গুলির ওপর বসে, দাঁড়িয়ে, হেঁটে বাঁ দিকের কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মোতে ও সময় লাগে বলে এদিক-ওদিক তাকিয়ে পিচ কেটে থুতু ফেলে, প্যান্টের বোতাম লাগাতে-লাগাতে নিজেরই ভেজানো রেলিং গেট টপকে গলিতে পড়ে।

মোতেও লাফিয়ে রাস্তায় পড়েছে আর আর-এ-এফ-এর পালটা আক্রমণের আওয়াজ বর্শার মতো হাওড়া ব্রিজের ওপর থেকে জাপানী প্লেনকে তাড়া করে।

আরে, এয়ার ফাইটিং কখন শুরু হল? তার ঘুমের মধ্যে? এমন ঘুমিয়েছে সে?

এয়ার ফোর্সের প্লেনগুলির সমবেত আওয়াজে প্যারাবাগানের, মানে এ-পাড়ার মেয়েরা, 'ওরে, মা-রে, বাবা-রে' বলে বস্তির দিকে ছুটতে লাগল। মুহূর্তে মোতে এক লাফে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুই হাত তুলে তাদের ধমকে ওঠে, "এ—ই, দৌড়চ্ছ কোথায়, দাঁড়াও', মেয়েদের মধ্যে হাঁফাতে-হাঁফাতে কেউ বলে, 'সাইরেন বাজায় নিকো, এ-সব বেপাড়ার আবাগিগুলোর কাজ।'

মোতে জোরে ধমকে ওঠে, 'শেলটারে ঢোকো, শেলটারে, শেলটারে। নো রান, নোরান। স্লো স্লো।'

শেলটার মানে উল্টোদিকের দেশী ভাটিখানার বাজারমুখো তিন সিঁড়ি নিচু অন্ধকারটা। যারা খুচরো খায় মাটির ভাঁড়ে তাদের বসা ও গড়ানোর জায়গা। এয়ার-রেইডের সময় শেলটার।

শেলটারে একসঙ্গে এতজন ঢোকায় যিনি বলে উঠলেন, 'মোতে, এই সময় এদের নিয়ে তুমি ওপেন স্পেস দিয়ে মুভ করলে?'

'মুভ না করে কি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বোমা খাব?'

'সাইরেন বাজাওনি কেন?'

বাইরে দুই ধরণের প্লেনের আওয়াজের তীব্রতায় এদের কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কে একজন হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে বলে, 'আরে, এয়ার ফাইটিং হচ্ছে—।'

'অ্যাঁ? এয়ার ফাইটিং? তুই দেখলি? এ না দেখলে জীবনবৃথা—', মোতে হামাগুড়ি মেরে বেরিয়ে যায়। বাইরে গিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে কিছু দেখা যাচ্ছে না। মোতে এবার গুঁড়ি মেরে আর-একটু আগে সে যে-পার্কটাতে শুয়েছিল, তার সামনের ফাঁকা রাস্তাটার ওপরের আকাশটায় দেখে, একটা জাপানী প্লেন ধোঁয়ায় আকাশটা কাল করে গঙ্গার দিক থেকে দমদমের

দিকে উড়ে গেল—কিছু দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু সেই কাল ধোঁয়ার তলা দিয়ে এয়ার ফোর্সের একটা প্লেন যেন ছাতগুলোর ওপর দিয়ে আগের প্লেনটাকে ধাওয়া করল। উল্টে দমদমের আকাশ থেকেও একটা এয়ার ফোর্সের প্লেন সেই কাল ধোঁয়ার পাঁজার ওপর দিয়ে গঙ্গার দিকে চলে গেল। আর-কিছু ঘটছে না। চারদিকে কোনো আওয়াজ নেই। একেবারে এত চুপ যে কানে তালা লাগে।

মোতে ঘুরে শেল্টারের দিকে ঘুরতে-ঘুরতে ভাবল—তার চাকরিটা আজকেই যাবে। পকেটে সাইরেনের চাবি নিয়ে সে পার্কের বেঞ্চে এমন ঘুমুচ্ছিল যে এয়ার ফাইটের আওয়াজেও তার ঘুম ভাঙল না? এখন কি সে সাইরেনে গিয়ে অল ক্লিয়ার দেয়ার জন্য অপেক্ষা করবে?

আর-একটা উপায় আছে।

সে পকেট থেকে চাবিটা ফেলে দিয়ে বলতে পারে যে তার কাছে চাবি ছিলই না।

তা হলে, কার কাছে ছিল?

সে তা জানবে কী করে?

বাঃ! চাবি তো থাকতে পারে এক তোমার কাছে আর ইমানুলের কাছে।

মোতে বুঝতে পারে, তার ওজরটা বিশ্বাস্য হচ্ছে না। চাকরিটা তার যাবেই। কিন্তু যে-ফাইটিং দেখল, তাতে তার জন্ম সার্থক। যুদ্ধ...যুদ্ধ...যুদ্ধ। দেখে তো কিছু শাহেব সোলজারের মুখ আর পাঞ্জাবি শিখের মুখ। এতদিনে তাও একটু যুদ্ধ দেখা গেল।

মোতে আর শেলটারে ঢোকে না—গুঁড়ি মেরে সাইরেন-ঘরের দিকে যায়। তার চাকরি-রাখাটা কঠিন। কিন্তু অল ক্লিয়ার না-দেয়াটা অসম্ভব। সে তখন না-হয় ঘুমিয়ে ছিল। কিন্তু জেগে থেকেও অল ক্লিয়ার না-দেয়াটা আরো বড় অপরাধ।

মোতে শুনতে পায়, অন্য কোথাও অল ক্লিয়ার বাজছে।

সে তালা খুলে সাইরেনের ঘরে ঢুকে দেখে—তারও অল ক্লিয়ারের নির্দেশ এসে গেছে। মোতের বাজানো অল ক্লিয়ারটা এই প্রথম তার কাছে অল ক্লিয়ারই শোনাল। সে তো এয়ার ফাইট দেখে এসে বাজাল! যেন ফাইটটা করে এসে সবাইকে জানাল—অ-ল-ক্লি-য়া-র।

কিন্তু এয়ার ফাইটটা কলকাতার আকাশে এমন বিরল ঘটনা, যে এমন গোলমাল শুরু হল কেউ জিগগেসই করল না—সাইরেন বাজেনি কেন? সাইরেন যে বাজেনি সেটা কেউ বুঝতেই পারেনি। প্লেনগুলোই তো সাইরেন বাজিয়েছে। প্লেনের ওই আওয়াজের পর কি কেউ শেলটার থেকে বেরত, অল ক্লিয়ার না পেলে।

মোতের চাকরিটা বেঁচে গেল কী না সে সম্পর্কে নিশ্চিত না-হয়েই সে এয়ার ফাইটটা যা দেখেছে তার গল্প করতে লাগল—'আরে, দেখি প্যারিবাগানের মেয়েগুলো সব ফাঁকা রাস্তা দিয়ে দৌড়চ্ছে—হাতে লাঠি-ঝাঁটা। চলাফেরা করলেই তো পাইলট বুঝতে পারবে এটা টারগেট। আমি ওদের ঠেলে ভাটিখানার শেলটারে ঢুকিয়ে দিয়ে গুঁড়ি মেরে বাইরে গিয়ে দেখি একটা জাপানী প্লেন ঘন কাল মেঘ বানাতে-বানাতে ছুটছে—'

একজন বলে ওঠে, 'আমি তো আগে দেখে শেলটারে গিয়ে বললাম, না হলে তুই দেখতে পেতি?'

রেসের মাঠে প্লেনের ওই আওয়াজে ঘোড়াগুলো ভয় পেয়ে ছুটে গিয়ে ওই সবুজ মাঠের মধ্যে এলোমেলো দৌড়ে পালাতে চাইছিল, কোনো-কোনো ঘোড়া পেছনের দুই পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে হ্রেষারব তোলে। যাদের হাত থেকে ঘোড়াগুলো আচমকা ছুটে বেরিয়ে গেছে, সেই অ্যাটেনডেন্টরা নিজেদের ঘোড়াগুলোকে ফিরিয়ে আনতে ছুটে মাঠে ঢুকতে গেলেই

মাইক্রোফোনে ধমকে ওঠেন মিলিটারির এক খুব বড় অফিসার—পরের দিন কোনো কাগজ লিখেছে জি ও সি ইন সি, কেউ লিখেছে মেজর জেনারেল, কেউ লিখেছে ব্রিগেডিয়ার ওসমান, কেউ লিখেছে হাউসম্যান—'এভ্‌রিওয়ান অন নীজ, হেডস ডাউন, নো মুভমেন্ট।' মাঠে অনেক ফৌজি ছিল। সাইরেন বাজতেই তারা যে যেখানে ছিল সেখানেই হাঁটু গেড়ে বসে বুকের ওপর মাথা নামিয়ে আনে। তাদের দেখাদেখি আরো যারা ছিল, তারাও একই রকম বসে পড়ে। আকাশ, নীল আকাশ থেকে বিদ্যুতের মত তীব্রতায় প্লেনগুলি থেকে শিসধ্বনি আকাশ-মাটির শূন্যতা চিরে নেমে আসছিল, মিলিয়ে যাচ্ছিল, ফিরে আসছিল। হঠাৎ তৈরি হওয়া এক ঘন কাল মেঘের ছায়া বাঁ-দিকের গঙ্গা থেকে ডান-দিকের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যালের ওপর পর্যন্ত গড়িয়ে যাচ্ছিল রেসের মাঠের সবুজ জুড়ে ও ছাড়িয়ে। সেই ছায়া রোদে বাদামি, শাদা আর কালরঙের গতিময় বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে সেই ঘোড়াগুলো পরিত্রাণ চেয়ে ছুটছিল। কখনো এক-একটা গুচ্ছের দিকে—যেন গুচ্ছতেই পরিত্রাণ, কখনো এমন গুচ্ছ থেকে নিজেদের ছিঁড়ে নিচ্ছিল—যেন একা-একাই বাঁচা যাবে। কয়েকটি গোড়া ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের দিক থেকে হঠাৎ ঘাড় সোজা করে সোজা তাকিয়ে হয়তো ট্র্যাকগুলি ও উইনিং পোস্টগুলো চিনে ফেলে ও সেই দিকেই ছুটতে থাকে। কিন্তু ভয় তাদের এতই অস্থির করে তুলছিল যে ট্র্যাক চিনেও, পোস্ট চিনেও তারা মনে রাখতে পারছিল না আর ট্র্যাকের মাঝখানে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ছিল, বা ঘাসে মুখ দিয়ে ফেলছিল, বা বাঁয়ের বেড়াটায় গিয়ে দুই পা উঁচু করে তুলছিল। তিন দিকের নানা লেভেলে সারি দিয়ে মানুষের মাথাগুলি দেখে মির‍্যাকলে বিশ্বাসীদের প্রার্থনা মনে হচ্ছিল অথবা তারা শুধুই মৃত্যুবিশ্বাসী ও তারা মৃত্যুপ্রস্তুত। সেখানে, সেই গড়ানো আকাশে-প্রান্তরে কয়েকটি ছুটন্ত প্রাণী ও ছুটন্ত বিমান এই নির্মোহ বাস্তবকে সত্য করছিল—এটা যুদ্ধ আর যুদ্ধই, আর যুদ্ধে একমাত্র প্রাসঙ্গিক বিষয় মৃত্যু। আর কিছু নয়। হয় হত্যা করা, না-হয় নিহত হওয়া। এই দুয়ের মধ্যে কোনো উপমা নেই, কোনো সাধর্ম্য নেই।

১৫ জানুয়ারি, ১৯৪৪, শনিবার কলকাতার আকাশে এই বায়ুযুদ্ধ দেখে তখন বাংলার গভর্নর রাদারফোর্ড তখন ভারতের ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেলের কাছে, ১৮ তারিখে এক চিঠিতে লেখেন, মাত্র দু-দিন আগে 'রয়্যাল এয়ার ফোর্স একগাদা শত্রুবিমানকে যেভাবে তাড়া করল, যেভাবে তাদের মধ্যে ঢুকে পড়ল ও তাদের ধ্বংস করল—সেটা সত্যিই একটা বেশ সুন্দর কাজ' (এ ফাইন পিস অব ওয়ার্ক)।

১৯৪৪-এর জানুয়ারির ১৫। যুদ্ধ বদলে গেছে। ইয়োরোপের পূর্ব রণাঙ্গনে জার্মানি পারেনি সোভিয়েত ইউনিয়নের স্তালিনগ্রাদের অবরোধ ভাঙতে। জার্মানরা একটু পেছিয়ে এসে আবার একটা আক্রমণের উদ্দেশ্যে সৈন্যবাহিনীকে বদলে সাজাচ্ছে। সোভিয়েত ইউনিয়নও, সেনাবাহিনীকে গুছিয়ে নিচ্ছে জার্মানদের এবার আক্রমণ করে আরো পেছিয়ে দিতে। এর আগে, সাত মাস আগে উত্তর আফ্রিকায় তিউনিসিয়ার যুদ্ধে জার্মানির সেনাপতি রোমেল হারলেন। মধ্য ইয়োরোপে অবস্থানের সুযোগে হিটলার যে এতগুলো ফ্রন্টে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন—আতলান্তিক মহাসাগরে, ইংল্যান্ডে, উত্তর আফ্রিকায়,—যুদ্ধকৌশলের দিক থেকে তার চমৎকারিত্ব অনস্বীকার্য, আজও। মধ্য ইয়োরোপের দেশগুলি তো হিটলারের বাহিনী তাদের মাটিতে পা-রাখার আগেই আত্মসমর্পণ করেছিল। যুদ্ধের সবচেয়ে অদৃশ্য শক্তি হিউম্যান ফ্যাক্টর—জনউপাদান, তখন জার্মানির পক্ষে। অবিশ্বাস্য দ্রুততায়, অনভ্যস্ত কৌশলে, জনউপাদানকে অবলম্বন করে খুব কম দিনে যুদ্ধ শেষ করে দেয়ার কৌশল, ১৯৩৯-এ, ১৯৪১-এ, খুবই সময়োপযোগী ছিল। জনউপাদানকে কিছুতেই দানা বাঁধতে না-দেয়া, সব সময়

সেই উপাদানগুলিকে ভেঙে গুঁড়ো করা ও অসম্ভব সব কীর্তি তৈরি করে যুদ্ধটাকে অবিশ্বাস্য এক দৈবী যুদ্ধে বদলে ফেলা হিটলারের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। এই পরিকল্পনা নিশ্চয়ই একটা যুদ্ধ কল্পনার ফলিত আকার। সেই কল্পনা ছিল একজনেরই—হিটলার। তার আকার তৈরি হয়েছে—জার্মান ও প্রুশিয়ান যোদ্ধাদের অভিজ্ঞতার ঐতিহ্য থেকে। হিটলারের দিগ্বিজয় যে ঘটবেই তার অনুকূল উপাদানগুলিকে কি একটু-আধটুও দাগানো যায়? হ্যাঁ, যায়।

১. জার্মানির ভৌগোলিক অবস্থান।

২. দেশের ভিতরে সমস্ত রকমের রাজনৈতিক বিরোধিতা টুঁটি চিপে বন্ধ করা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির ইয়োরোপীয় ছকটা লাথি মেরে ফেলে দেয়া।

৩. ফেলে দেয়া যেত না যদি দেশের মানুষের সংখ্যাধিকতম অংশ হিটলারকে সমর্থন না করত. নাৎসি জার্মানিতে হিটলার ছিলেন এক উৎসব। তাঁকে যাঁরা আদর্শ বা তত্ত্বের কারণে বা সংগঠনের কারণে মানতে পারতেন না—তাঁরা যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে ও পরে দেশ থেকে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদেরও কেউ প্রকাশ্যে হিটলারকে ব্যাখ্যাও করেননি, প্রতিবাদও করেননি।

এই উপাদানগুলি এত বেশি এ ওর গায়ে ঠেস দিয়ে খাড়া, যে কোনো একটি ঠেস নড়বড়ে হয়ে গেলে পুরো কাঠামোটাই ধসে যায়। ৪৩-৪৪-এ সেই ধস ঘটে গেল—সোভিয়েত সীমান্তে ও ইজিপ্ট সীমান্তে। রোমেলকে যে ঠেকানো যায় না আর রোমেল যে ফ্যানটম বা স্পাইডারম্যানের মত অতিপ্রাকৃতিক—এই বিশ্বাস ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর মধ্যে এমনই ছড়িয়েছিল যে ব্রিটিশ সৈন্যরা নিজেদের পকেটে তার ছবি রাখতেন ও ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর প্রধানকে একটা লিখিত ওয়ারেন্ট ছড়াতে হয়েছিল এইটুকু বলতে যে রোমেল একজন সাধারণ মানুষ।

হিটলারের রণকৌশল ছিল গতি নিয়ন্ত্রিত। কোনো ঘটনা দু-মিনিট আগে হতে পারে। কিন্তু পরে হতে পারে না। সোভিয়েত ফ্রন্টে সেই গতির হিশেব চোট খেল আর মরুভুমির ফ্রন্টে রোমেল পড়ল মুখ থুবড়ে। পেট্রল নেই। রাশিয়ার পেট্রল তো দখল করা যায়নি—যাচ্ছে না। তা হলে পেট্রল আসবে কি ছপ্পর ফাঁড়কে?

সেই ৩৯ সালের পুজো থেকে বাংলার গভর্নর শুধু হিশেব দিয়ে যাচ্ছেন কলকাতা থেকে কত লোক সরানো গেল। কলকাতায় লোক বেশি থাকার অর্থ—বেশি পেট, বোমায় বেশি জখম, বেশি হাসপাতাল, বেশি অ্যান্টি-এয়ার গান, আটটা নতুন এয়ারপোর্ট বানানো হয়েছে—আরো দশটা বানানোর হুকুম। তার চাইতে লোক যদি কমানো যায়, সবাইকে যদি কলকাতার বাইরে পাঠানো যায়, তা হলে বোমায় আর রিস্ক থাকবে না, রেশনেও কোনো রিস্ক থাকবে না। ১৯৪২-এর ২১ এপ্রিল ছোটলাট হার্বার্ট নালিশ করছেন বড়লাট লিনলিথগকে, 'কলকাতায় যাদের দরকার নেই তাদের শহর ছেড়ে চলে যেতে বলে আমরা একটা হ্যান্ডবিল ছাড়ব ভেবেছিলাম। দিল্লি সেটা আটকে দিল এই বলে যে এর চাইতে একটা এয়ার রেইড করে লোক-তাড়ানো ভাল ও সোজা। আমরা হ্যান্ডবিল ছাড়িনি। এখন দেখছি দিল্লিই একটা হ্যান্ডবিল ছেড়েছে যে সামরিক বাহিনী জানিয়েছে পূর্ব-বিহার থেকে লোক-সরানোর ব্যবস্থা নেয়া হোক। যাঁরা নিজেরাই সরে যেতে পারেন, তাঁরা দিন দশ-পনেরর মধ্যে সরে গিয়ে আমাদের জানালে আমরা ব্যবস্থা করব। এই হ্যান্ডবিলের পর আমার অবস্থাটা ভেবে দেখুন।'

আর ১৯৪৪-এর ২৩ সেপ্টেম্বর বাংলার গভর্নর আর-জি কেসি বড়লাট লর্ড ওয়াভেলকে একান্ত গোপনীয় ব্যক্তিগত এই চিঠিতে জরুরি খবর জানাচ্ছেন—অস্ট্রেলিয়া (কেসি-র দেশ) থেকে ব্যক্তিগত সূত্রে তিনি জানতে পেরেছেন যে ভারতের সৈন্যবাহিনীর আহারে মাংসের

অভাব দূর করতে অস্ট্রেলিয়া থেকে ধেড়ে ইঁদুর আমদানি করা হবে। 'আমার যে-বন্ধুরা জানিয়েছেন, তাঁরা পশুপালন, রেশমচাষ ও এই ধরণের চাষের সঙ্গে যুক্ত। তাঁরা বলেছেন—ধেড়ে ইঁদুর অস্ট্রেলিয়াতেও আমদানি করা হয়েছিল এককালে, কোনো সমতুল্য প্রয়োজনে। কিন্তু তারপর সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছে কৃষির মহাশত্রু আর বছরে কয়েক হাজার ডলার খরচ হয় ইঁদুর মারতে। ইঁদুরের মাংস নিশ্চয়ই সৈন্যদের সুস্বাদু লাগবে ও তাদের খাদ্যমূল্যও শুনেছি বেশ উঁচু ডিগ্রির। কিন্তু যুদ্ধের পর শান্তির সময় তারা আবার দায় হয়ে না-ওঠে।' ধেড়ে ইঁদুরের সুবিধে-অসুবিধে নিয়ে উচ্চতম ব্রিটিশ ভারতীয় প্রশাসনের ব্যস্ততার পর একমাস না-কাটতেই কেসি-কে আবার লিখতে হয়—মাউন্টব্যাটেন সমস্যা নিয়ে। সমস্যা হচ্ছে মাউন্টব্যাটেন বার্মাযুদ্ধের সুপ্রিম কম্যান্ডার নিযুক্ত হয়ে দিল্লি এসেছেন ও প্রাক্তন এক সর্বাধিনায়ক ওয়াভেল ও বর্তমান এক সর্বাধিনায়ক অকিনলেক-এর কাছাকাছি একই শহরে থাকা তাঁর পক্ষে অস্বস্তিকর হতে পারে। তাঁর জন্য একটা ভাল বাড়ির বন্দবস্ত করতে পারলে তিনি কলকাতা পছন্দ করতেন। সেটা যে আদৌ সম্ভব নয় আর কলকাতার সমস্যা এখন অফিসার ও কর্মচারীদের জন্য বাড়ি জোগাড় করা এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা বলে কেসি জানান। কলকাতাও বদলে গেছে? ১৯৪৪—এই? ওই বছর সেপ্টেম্বরে জিন্না-গান্ধী চিঠি লেখালেখি চলছে। নতুন কোনো মতামত দিয়ে চিঠিচাপাটি নয়। প্রতিষ্ঠিত মতগুলির লিখিত প্রমাণ হিশেবে চিঠিচাপাটি। আরো ঠিক কথা হল—জিন্না আজ যা বলেন, কাল তা গেলেন ও পরশু তা ওগরান। সেই ওগরানোতে আর দু-রাত আগের কথার কোনো চিহ্ন থাকে না—এমন একটা প্রচলিত অপবাদের কারণেই এই চিঠিপত্রে গান্ধী-জিন্না সাক্ষাতের মিনিট রাখা।

বাংলার তপশিলিদের পার্টিশন

১৭৬

৪৬-এর আইনসভা ভোটের পর যেহেতু যোগেনই ছিলেন ফেডারেশনের একমাত্র জয়ী প্রার্থী, তাঁকেই মন্ত্রিসভায় নিলেন প্রধানমন্ত্রী সারওয়ারদি। তার আগের বছর তিনেকের কিছু কম সময় নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রিসভা থেকেই এটা সকলের কাছেই প্রকাশ্য হয়ে পড়ছিল যে যোগেন তাঁর ২১জন সমর্থক নিয়ে আইনসভার নিয়ামক নেতা হয়ে উঠেছেন। তপশিলি সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা এর আগে নেতৃত্বের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন হয়তো অর্থের জোরে বা খ্যাতির জোরে বা প্রতিষ্ঠার জোরে, তাঁরা যোগেনের নেতা হয়ে ওঠায় ও বাংলা আইনসভায় সরকার রাখা না-রাখার কর্তা হয়ে ওঠায় প্রথমে অখুশি হলেন, তারপর বিরক্ত হলেন, তারপর ঈর্ষা করতে লাগলেন ও শেষে তাঁরা বিরোধিতায় সক্রিয় হয়ে উঠলেন। মূলত যা ব্যক্তিগত হিংসা তা থেকে বিরোধী হয়ে ওঠার কোনো উপলক্ষ দরকার হয় না। উপলক্ষ তৈরি করতে হয় বিশেষ করে তাদের জন্য যারা যোগেনকে সমর্থন করেন ও বিশ্বাস করেন। সেই উপলক্ষটাই এসে গেল ৪৬-এর নির্বাচনে যোগেন ফেডারেশনের প্রার্থী হওয়ায় ও সারওয়ারদি মন্ত্রিসভায় বিচার, আইন ও পূর্তবিভাগের মন্ত্রী হিশেবে যোগ দেয়ায়। মহারাষ্ট্রের দলিত নেতা আম্বেদকরের নেতৃত্ব মেনে নেয়ার ফলে যোগেনের বিরুদ্ধে বাংলার নমশূদ্র নেতাদের এক পক্ষের অভিযোগ শক্ত হয়ে ওঠে। পি. আর ঠাকুর, মুকুন্দবিহারী মল্লিক, উপেন এদ্‌বার, এঁরা ১৫ নম্বর হ্যারিসন রোডের অফিসে একটি সভা ডাকেন ও নমশূদ্রদের

মান্যগণ্য সবাইকে ও অন্যান্য তপশিলি নেতাদের কাউকে-কাউকে ডাকেন। আলোচ্য বিষয় হিশেবে বলা হয়েছিল—'তপশিলি আন্দোলনের ভবিষ্যৎ'।

মুখে-মুখে এটা রটে গিয়েছিল যে যোগেনের বিরুদ্ধেই এই সভা ডাকা হয়েছে ও যোগেনের নেতৃত্ব থেকে তপশিলি আন্দোলনকে মুক্ত করা হবে। সেই মুক্তির একটা উপায় নিশ্চয়ই হতে পারে—সংগঠন থেকে যোগেনকে বের করে দেয়া।

সাধারণত, এই ধরণের সংগঠনের এমন চরম সিদ্ধান্তের আগে অনেকগুলি স্তর থাকে। তপশিলিদের তেমন কোনো শক্তপোক্ত সংগঠন ছিল না বাংলায়। আইনসভায় ৩০-জন সদস্যের একটা গ্রুপের শক্তি যথেষ্ট। কোনো-কোনো সময় তা প্রমাণিতও হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন তপশিলি গোষ্ঠীর নিজস্ব জাতি-সংগঠন থাকায় ও বিশিষ্ট তপশিলি নেতারা তাঁদের পছন্দমত পার্টিতে থাকার ফলে, তপশিলিরা একটি রাজনৈতিক গ্রুপ হিশেবে প্রাধান্য পায়নি, প্রচারিতও হয়নি। যোগেনকে তেমন একটি রাজনৈতিক বিষয় হিশেবে উত্থাপন করার ইচ্ছেও হয়তো উদ্যোক্তাদের ছিল।

১৫-নম্বরে এত বড় সভা আগে কখনো হয়নি—এমন বলার কোনো অর্থ নেই। ঘরটি যথেষ্ট বড় বটে কিন্তু বেমাপি। উত্তরদিকটা বেশি চওড়া। দক্ষিণদিকে সিঁড়ি বলে, জায়গাটা কোনাচে। দক্ষিণ দিকের জায়গাটি আবার পশ্চিম দিকে কিছু গড়িয়ে গেছে বলে সে-জায়গাটা কাজেই লাগে না। ওখানে বসলে বা দাঁড়ালে উত্তরদিকের যে-জায়গাটিকে সভাস্থল বলা যায়, সেই সভাস্থল চোখে পড়ে না।

ওই পশ্চিমের টুকরোটা ছাড়া ঘরটা ভর্তিই ছিল। অনেক কমবয়েসি ছেলেমেয়েরা এসেছে—কলেজে পড়ে হয়তো। উদ্দুর খুব ব্যস্ত। সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে দু-চারজন বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছে বটে কিন্তু নতুন কেউ এলেই সে খুঁটিয়ে দেখছে, কে এল। হয়তো তারও কিছু লোক আসার কথা।

যোগেন বরাবর যেখানে বসে, সেখানেই বসেছে, রসিক কাকার পাশে, হাইবেঞ্চে পা তুলে। বিরাট কাকা সস্ত্রীক। জেঠিমা বয়স যত বেশি দেখানো যায় তেমন দেখিয়ে মেয়েদের জায়গায় বসেন। বিরাট জ্যাঠা এসে উলটো দিকের চেয়ারে বসেন। যোগেন খুব চাপা গলায় রসিকলালকে বলে, 'কাহা, এ তো কাইজ্যার মিটিং। সারা রাইতেও শেষ হব না। এডডু তাড়াতাড়ি শুরু কর্‌য়াইয়া দেন-না।'

রসিকলালের কথা বলার ঠোঁটচাপা এক বিশেষ ভঙ্গি আছে, মনে হয় ঠাট্টা করছেন। বলেন, 'আমি যশুর্‌য়া হব্যার পারি কিন্তু তুই বরিশাইল্যা বইলে অ্যাডভ্যানটিজ পাবি না। আমি অত বোকা না রে।'

'ওডারে কি অ্যাডভ্যানটিজ কয়? এ আছে না?'

'তুই হাগতে বইস্যা প্র্যাকটিস কর। তবে অ্যাডভ্যানটিজ কইতে বুকের পাটা লাগব। সেডা তোর আছে খানিকডা। কিন্তু বরিশালি জিভ তো! মোটা আর ময়লা। তাতে কি ওই সূক্ষ্ম কাজ আসে? তোগ চাঁদসীতে জিভ কাটা যায় না, খাড়াখাড়ি?'

যোগেন তার স্বাভাবিক হাসি হেসে ফেলে, সবগুলো দাঁত বের করে আর দুলে উঠে। কিন্তু হাসির আওয়াজ উঠতে দেয় না। তাতেই মনে হয়—হাসিটা স্বাভাবিক।

বিরাট জ্যাঠা উলটো দিক থেকে জিজ্ঞাসা করেন, 'ক্যারে যোগেন, তোর দেহি ফূর্তি উথাল দিছে।' যোগেন আঙুল তুলে রসিককে দেখিয়ে বলে, 'কুকথায় পঞ্চমুখ—'

'তুই তো বাইছ্যা বসলি রসিকলালের লগে। তো রসের কথা শুনবি না? আয়, আমার

লগে, দ্যাখ, অখণ্ডমণ্ডলাকারং বিরাট রে—'

রসিক তার অভ্যস্ত ভঙ্গিতে কিছু একটা বলে, যোগেন আবার হেসে ফেলে, 'এই দ্যাহেন জ্যাঠা, আপনারে নিয়্যা, কয় যে আপনার লগে নাকি সিট খালি নাই, হাউস ফুল।'

অশ্বিনী মণ্ডল সভাপতির চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, 'আমি প্রস্তাব করি আজিকার সভায় প্রবীণ তপশিলি নেতা বিরাট চন্দ্র মণ্ডল সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।'

এদবার ছিলেন পাশে, বলে দিলেন, 'আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করি।'

বিরাট মণ্ডল সভাপতির চেয়ারে বসে তাঁর সামনে যে-কাগজটা রাখা, দেখে বললেন, 'আইজকার সভা কোনো প্রতিষ্ঠানের নামে তো ডাকা হয় নাই! কয়েকজন আমাদের বন্ধুরা ডাইকছেন। তাগ মইধ্যে নিশ্চয়ই কথা হইছে, না হইলে মিটিং ডাকা কেন। তাদের মইধ্যে কেউ একজন যদি বলেন এই সভার প্রয়োজন এঁরা কয়েকজন বোধ কইরলেন কেন। শুধু এই কথাডা। বিষয় নিয়া কিছু কইব্যার কই না। শুধু সভাডা নিয়্যা। তারপর আমরা যদি সাব্যস্ত করি, এই সভাটা হওয়াই উচিত, তাইলে আর-একজন কেউ বিষয়ডা বিস্তার কইররেন।'

মিটিংটা ডেকেছিলেন যাঁরা, তাঁরা প্রত্যেকেই অনেক দিনের নেতা। বিরাট মণ্ডলকেই যে সভাপতি করা হবে, তাও ঠিক হয়নি, উপস্থিতদের মধ্য থেকে যেমন করা হয় তেমনি করা হয়েছে। বিরাট মণ্ডল যে-ভাবে শুরু করলেন, মনে হয়, তিনি শুরুতে এই কথাটি বলবেন বলে ভেবে এসেছেন। যদি তাই এসে থাকেন তাহলে কি ধরে নেয়া যায় যে যোগেন মণ্ডলরা প্রস্তুত হয়েই এসেছেন।

বিরাট মণ্ডল বলে ওঠেন, 'আহ্বায়কদের নামগুল্যা পড়ার কি দরকার আছে। প্রফেসার মল্লিক যদি আইস্যা যাইতেন, তাইলে আমিও চেয়ার পাইত্যাম না আর উদ্যোক্তারাও কথা কইতে বাধ্য হইতেন না। যেমন হইলে ভাল হইত, তেমনডা তো সর্বদা হয় না। শুধু দশজনের একজন কইরলে তো উনি সাধারণত আসেন না। উনি তো একাই দশ। এই কাগজডাতেই উনাকে সভাপতি বইল্যা উল্লেখ কইরলে ভাল হইত। মধুর অভাবে গুড় তো গ্রাহ্য। কেউ একজন বলেন। প্রমথ, তুমিই কও। তোমারে কেউ গুড় ভাইবব না।'

পি আর ঠাকুর সভাপতির পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সভাপতি মশায়ের আদেশে বলছি, যারা এই সভা আহ্বান করেছি, তাদের মধ্যে যে খুব কিছু আলোচনা হয়েছে তা না। এইটুকু কথা হয়েছে যে আমাদের তপশিলিদের নিয়ে নানারকম কথা রটছে। আমরা সবাই সব জানি না। সবাইকে ডেকে একবার নিজেদের জানাজানিটা ঠিক করে নিলে ভাল। এর বেশি কিছু না।'

'আমাগ তো দুই-তিনডা প্রতিষ্ঠান আছে অলবেঙ্গল শিডিউল্ড কাস্ট বইল্যা, অ্যাসোসিয়েশেন না কী কমিটি বইল্যা। সব গুল্যাতেই তো তোমরাই আছো। সেই গুল্যার একডা থিক্যা ডাইকলে হইত না?'

'হ্যাঁ। নিশ্চয়ই হত। আমরা আবার ভাবলাম অল বেঙ্গল সিডিউল্ড সংগঠন তো একাধিক। একাধিক হওয়ার কারণ আছে বলেই একাধিক। তাদের ঘাড়ে চাপানো ঠিক হবে না। তাই আমরাই ডাকলাম, যে-কজনের মধ্যে কথা হয়েছে। সে-অধিকার তো সবারই আছে। কথা বলার জন্য সভা ডাকার অধিকার। যেমন আসা না-আসার অধিকারও সবার আছে।'

'তুমি কৈফিয়ৎ দ্যাও ক্যান? একডা সভা ডাকা ঠিকমত হইছে কী না সেডা জানা বোঝা তো সভাপতির কর্তব্য, যদি তিনি আহ্বায়ক না হন। ধরো, তোমরা যদি আইজ সিদ্ধান্ত ন্যাও সবাই মিল্যা ব্রিটিশ সরকাররে ডুবাইব্যা—তাইলে সিডিশনের দায়ে শেষ রাত্তিরে আমারে থানায়

নিয়্যা যাবে। সভাপতির ওইটুকুই দায়। শ্যাষ রাতে হাজতবাস।'

'না। আপনাকে হাজতখাটানোর জন্য মিটিং ডাকা হয়নি।'

'মানে যারা মিটিংডা ডাইকছ তারা ইচ্ছাপূর্বক কাউকে বাদ দ্যাও নাই। আবার ইচ্ছাপূর্বক কাউরে আনা করো নাই। তাইলে বিষয়ডা তুমিই উত্থাপন করো।'

'এটা কি ন্যায্য কাজ হল জ্যাঠা? আমাকে আদেশ করলেন মিটিং এরা কেন ডেকেছে। তার উত্তর আমি দিয়েছি। মনে হচ্ছে সে উত্তর আপনি গ্রহণ করেছেন। তাহলে বিষয়-উত্থাপনও আমাকেই করতে হবে কেন। আমরা ঠিক করে রেখেছি উপেনবাবু বলবেন।'

'সেইডা কইব্যা তো। আইসো। উপেন। আইসো।'

এদ্‌বার একটু পেছনে বসেছিল। সে উঠে সভাপতির কাছে চলে আসতে, যারা বসে আছে চেয়ারে, বেঞ্চে বা শতরঞ্চিতে তাদের পেরতে হল। এদ্‌বার লম্বা চেহারার শক্ত মানুষ। তাকে নিজের জন্য পথ করতে হল না—যারা বসেছিল তারাই এদিক-ওদিক কাত হয়ে বা সরে এদবারকে পথ করে দিল। এদ্‌বার ঘাড় নিচু করে বা এমন কী চোখ দিয়েও দেখল না—সে তিন-চারবার পা ফেলে সভাপতির চেয়ারের সামনে পৌঁছে গেল, সভাপতিকে আড়াল করে। ঠিকঠাক দাঁড়াতে না-দাঁড়াতেই এদ্‌বার তার কথা বলতে শুরু করে দেয়।

'আমাদের এই রকম একটা মিটিং ডাকার দরকার বোধ হইছে নিজেদের কাছে কতকগুলি কথা সাফ করতে। কথাডা খুব সোজা—আমরা তো তপশিলভুক্ত জাইত। তার আগেও আমাগ অন্য সব নাম কওয়া হইত—ডিপ্রেসড, ব্যাকওয়ার্ড, অনুন্নত। সেডা খুব সুবিধার ছিল না। আমাগর ভাল লাগে নাই। আমরা নিজেগ নাম বলত্যাম নানা রকম—ক্ষত্রিয়, গুপ্তক্ষত্রিয়, নমস্য ব্রাহ্মণ এই সব। গবর্মেন্টি একডা আইন বানাইয়্যা আমাগ জন্য আইনসভায় কতকগুলি আসন সংরক্ষণ করে। তার বাদে সেই রক্ষণ কাদের লাইগ্যা তাগ সম্প্রদায়ের একডা লিস্টি বানাইয়্যা ট্যাক কইর‌্যা দিছে সেই আইনের লগে। আমরা যা ছিল্যাম তাই আছি। তার পর নতুন হইল যে আমরা কয়েকটা আসন পাইল্যাম। সেখানে ঐ লিস্টের বাইরের কেউ খাড়াইব্যার পারব না। ভাল। কিন্তু এই যে জাইতের লিস্টি—তাগ সবাইরে নিয়্যা কুনো নাম নাই। সেই কারণে কাগজপত্রে ছাপায় কথায় আমাগ লিস্টের জাইতগুল্যারে মিলাইয়্যা নাম হইল সিডিউল্ডকাস্ট। সরকার যদি চাহিতেন অন্য যে-কোনো নামও হইব্যার পাইরত। অ্যাহনো পারে। ধরো কেউ যদি ডাইকব্যার ধইরত, সংরক্ষিত জাইত, রিজার্ভ কাস্ট, তাইলে সেডাই চাইলব্যার ধইরত রিজার্ভ কাস্ট। আমরা নিজেরাই তো আমাগ কত পরিচয় দেই।'

এদ্‌বার গুছিয়ে বলতে পারে না। পারে হয়তো, কিন্তু চায় না হয়তো। বিশেষ করে যে-কথাগুলো সে জানে বোঝে কিন্তু তার শ্রোতাদের মনে করিয়ে দিতে তাকে বলতে হচ্ছে, সেই বাধ্যতাটা হয়তো তাকে বিরক্ত করে। অথচ সে-সব না বলে তার বলার কথাতে আসা যায় না। তাই তার কথাগুলোতে একটু অন্যমনস্কতা থাকে, একটু তাড়াও থাকে। বলতে-বলতেই হয়তো তার নিজেরই মনে হয়—এত প্যাচাল পাড়ি ক্যা, বেবাকই তো জানে। এই সব মিলিয়ে তার কথাগুলো জট পাকিয়ে যায়, অনেক কথা শেষ হয় না, অনেক কথার সঙ্গে অনেক কথাগুলিয়েও যায়। এদ্‌বার সে-সব গ্রাহ্য করে না।

'সে সব দিয়্যা তো সিভিল কোর্টে মামলা হবে না। সিডিউলকাস্ট স্বাধীন জাইত—এডা কি আমাগ নেতারা কোনোদিন শিখাইছে? অনগ্রসর আর অহিন্দু তো এক কথা না। তাইলে এডা তো ভোটাভুটিতে ঠিক হওয়ার না যে আমরা হিন্দু কি হিন্দু না। আমরা হিন্দু ব্রাহ্মণ্য যে-সব বিধিবিধান আমাগ নিয়্যা আছে, অস্পৃশ্যতা এই সব, একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া এই সব,

পূজা-আর্চায় ঢোকাঢুকি এই সব থিক্যা মুক্তি চাই। সেইখানে অ্যাহন এমন একডা কথা ক্যান উঠে শিডিউল-লিগ ঐক্য। নাজিমুদ্দিন শাহেবরে প্রধান মন্ত্রী খাড়া কইরব্যার লগে আমাগ ২১ জন এম.এল.এ হাত তুললেন। তহন থিক্যাই এই আওয়াজডা। তাগ হাত তারা তুইলছেন তোলেন। কিন্তু লোকজন তো তাগ-আমাগ মিল্যাইয়্যাই এক কইর‍্যা দ্যাহে। সুরাবর্দি শাহেবের মন্ত্রিসভা নিয়্যাও তো লিগ-তপশিল রটব্যার ধইরছে। এইডা তো নিরাপদ ঠেকে না। ছিল্যাম নিচুতলার মানুষ। তাও হিন্দু। অ্যাহন তো দেহি, উঁচু তলায় উঠার সিঁড়িডা মশজিদে গিয়্যা ঠেকে। হিন্দু থাকা যায় না। এই কথাডা সাফ কইরব্যার দরকার। তপশিলির ধর্মত হিন্দু। এমন কোনো কাজ শোভন হয় না যে তাই নিয়্যা নিজেগ মন্দ হয়। এই কথাডা জানাইয়্যা দেয়া কাম—সিডিউলরা হিন্দু।'

এদ্‌বার থেমে যায়। তাকে পাশের বেঞ্চে জায়গা করে দেয় সবাই ঠেসেঠুসে। বিরাট মণ্ডল বলে ওঠেন, 'এদ্‌বারের বক্তৃতার এডা মজা। কহন যে শ্যাষ বুঝা যায় না। কিন্তু আমি যেটা বুইঝল্যাম না, সেইডা একডু বোঝার লাগে। আমারে কে বাধা দিছে নিজেরে হিন্দু কইতে? আগ বাড়াইয়্যা নিজেগ হিন্দু প্রমাণের লগে নাম-সংকীর্তনের দল বাইর কইরব্যার লাগব না কী? এইডা যদি এদ্‌বার বুঝায়, বুঝাক। আর-কেউ যদি বলে, বলুক। কিন্তু আমি হিন্দু কী হিন্দু না, এডা কী খবরের কাগজ ঠিক কইর‍্যা দিবে? এইডা তো আমার মাথায় ঢুকতেছে না। খবরের কাগজ বিধান-দেয়ার পুরুত হইল কবে থিক্যা?'

সভার ভিতর থেকে কেউ বলে ওঠে, 'আগে তো কখনো এই কথা ওঠে নাই। এখন ওঠে কেন?'

'সেটা কি এই সভা ঠিক কইরব্যার পারে? আগে যারা কইত না তা গ জিগাব্যার লাগে—আগে তো কহনো এমন ডাকে ডাকেন নাই, লিগ-তপশিল। ক্যান ডাকেন নাই? আর ডাকেন যহন নাই, তাইলে অ্যাহন ডাকেন ক্যা?'

অগ্নি মণ্ডল দাঁড়িয়ে বলেন, 'জ্যাঠা, আমারে এডডু অনুমতি দ্যান।'

বিরাট মণ্ডল বলে ওঠেন, 'তোমার তো কারো অনুমতি দরকার হয় না, অগ্নিদেব। এই দ্যাহেন—আমারে সেদিন আমার পরিবার জিগ্যাইল, আপনারে সবাই জ্যাঠা কয় ক্যা?'

সভায় একটা হাসি তৈরি হল।

বিরাট মণ্ডল হাসিটা শেষ হতে দিলেন। তারপর বললেন, 'সেডার জব আমি দেই ক্যামনে? যারা ডাকে তাগ জিগ্যাও। অ্যাহন আমারে যদি কেউ জিগ্যায়—দুনিয়ার সব স্বামী-স্ত্রী যদি তুমি-তুমি কইর‍্যা কথা কয় তাইলে তুমি আমাকে আপনে কও ক্যামনে—সে-কথার জবাব আমি দেই ক্যামনে?'

বিরাট মণ্ডলের স্ত্রী উঠে দাঁড়ান ও বিরাট মণ্ডল ছাড়া পুরো সভাটার ওপর চোখ বোলান। সবাই চুপ করে যায়, এ-রকম ঘটনা সাধারণ ঘটনার মধ্যে পড়ে না। উনি বলেন, 'মাননীয় সভাপতি মশায় আমার একটি কথা বললেন না। তাঁকে সবাই 'জ্যাঠা' বলায় আমি আপত্তি করার কে? কিন্তু সেই সুবাদে আমাকে কেন সকলের জেঠিমা হতে হবে? এমন কী তাঁদেরও, যাঁদের আমি কন্যাতুল্যা।' হাততালি দিয়ে সবাই হৈ হৈ করে উঠল। অগ্নি মণ্ডল দাঁড়িয়েই ছিলেন। তাঁকে ডাকলেন সভাপতি।

'তোমার বক্তৃতা তো শোনার যেমন, দেখারও তেমন। তুমি যেইহানে আছো হান থিক্যাই বলো, তাইলে বেবাক মানুষের চক্ষুকর্ণ তৃপ্ত হবে নে।'

'কথাটা কিন্তু শুধু ডাকাডাকির না। আইনসভার গত ভোটে প্রার্থী হইয়্যা আমি এই প্রশ্নডাই

সব থিক্যা বেশি শুনছি—আপনারা লিগের সঙ্গে গেলেন ক্যা? আপনাদের কারো-কারো কাজের ফলেই তো কথাটা লোকের মনে ঢুইকছে? তার দায় আমরা ক্যান বহন করব?'

যোগেন তার আসন থেকেই জিজ্ঞাসা করে, 'যারা জিগ্যাইল, তারা কি হিন্দু না মুসলমান?'

'আমারে আর মুসলমান ভোটার জিগাইব ক্যামনে? তারা আমার ভোটার—তপশিলি। তারা আমারে গোঁড়া হিন্দু বইল্যা জানে কারণেই আমারে জিগাইল। আমি কথাটাকে রাস্তায় খাড়া করি। তপশিলিরা লিগের প্রতি সমর্থনের কারণে এবারের ভোটে খুবই বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইছে। এটার প্রতিকার না হইলে অদূর ভবিষ্যতে বিপদ আরো বাড়িবে। এখনই গৃহস্থের সাবধান হওয়ার সময়।'

কেউ একজন পেছন থেকে বলে, 'এ-সব হাওয়ার কথা দিয়ে তো নিষ্পত্তি হবে না। কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকলে সোজাসুজি বলুন।'

'এর আগেও নাজিমুদ্দিন কি মন্ত্রিসভা করতে পারতেন যদি আমাদের ২১ জন তাঁহাকে সমর্থন না দিতেন? যারা মন্ত্রী হয়েছিলেন, তাঁদেরই-বা মন্ত্রী হওয়ার অনুমতি দিলেন কে?'

'সে তো তাঁরা বুঝবেন আর তাঁদের পার্টি বুঝবে। আমরা কী করে তাদের অনুমতি দেব। সিডিউল্ড কাস্ট তো শুধু বাংলায় নয়, সারা ভারতে আছে। যাঁরা কংগ্রেস থেকে বা মহাসভা থেকে প্রার্থী হয়েছে, তারাও কি এই সভা থেকে অনুমতি নিয়েছে?'

'এর আগে তো অল ইনডিয়া সিডিউল্ড কাস্ট ফেডারেশনের নামে কখনো কোনো প্রার্থী দেয়া হয় নি। এবার দেয়া হয়েছে ছ-সাতজন। একজন মাত্র জিতেছেন। এঁরা কারা? এঁদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কী?'

'এটা তো মহারাষ্ট্রের দলিত নেতা ডঃ ভীমরাও আম্বেদকারের পার্টি। ডঃ আম্বেদকর তো ঘোর হিন্দুবিরোধী। আমরা যদি তাঁর পার্টির পক্ষ থেকে দাঁড়াই তা হলে আমাদের সম্পর্ক আরো মারাত্মক কথা উঠবে। ডঃ আম্বেদকরকে বহুদিন ধরে ব্রিটিশের গুপ্তচর ভাবা হয়। শেষ গোলটেবিলে তিনি জিন্নাকে সমর্থন করেছেন। তাঁকে রক্ষার দায় আমরা নিলাম কবে? কখন? কেন? আমাদের কে দেখে তার ঠিক নেই। আমরা আবার শঙ্করাকে ডাকছি?'

পেছন থেকে কেউ গলা তুলে বলে, 'এত সব কথা ওঠে কোত্থেকে? এর আগে কোনোদিন কোনো সরকার কি তপশিলিদের কথামত হয়েছে? নাজিমুদ্দিনের আগে?'

আরো একজন বলে ওঠে, 'তপশিলিরা তো প্রেসার গ্রুপ হিশেবেও আইনসভায় কোনো পাত্তা করতে পারে নি। যোগেন মণ্ডলের সময়ে তপশিলিদের প্রেসার গ্রুপ তৈরি হল। ইট ওয়াজ এ মাস্টারস স্ট্রোক।'

কারা এই সব তর্ক-বিতর্ক করছে দেখতে, সভাপতিকে ঘিরে পুরনো নেতারা যাঁরা ছিলেন তাঁরা, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাচ্ছিলেন। কেউ-কেউ দাঁড়িয়ে ঘুরে দেখছিলেন। খুব একটা চিনতে পারলেন না। সব নতুন ছেলে, দুটি মেয়েও আছে। এরা কবে ১৫-নম্বরের লোক হল? কথা ও পাল্টা-কথায় এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হল যে কারো-কারো সন্দেহ হল—তপশিলিদের মিটিং আগেকার দিনে যেমন মারামারিতে গিয়ে শেষ হত এখানেও তাই ঘটছে। একবার তো দুই পক্ষের লড়াইতে যোগেনের দল সভাপতির চেয়ার নিয়ে সভাত্যাগ করে পাশে কার বারান্দায় চেয়ার পেতে সভা করে প্রস্তাব পাশ করেছিল। সুভাষ বোসের সময়।

বিরাট মণ্ডল দাঁড়িয়ে চোখ কুঁচকে একটু তাকিয়ে বুঝতে চাইলেন—মিটিংটা ভাঙবে না চলবে। তার পর সেই গোলমালের দিকে তাকিয়ে খুব জোরে ধমকে উঠলেন, 'সা-ই-লে-ন্স'। এত জোরে যে ধমক উঠতে পারে কেউ সেটা কারো জানা ছিল না। ভড়কে গিয়ে সবাই একেবারে

চুপ করে গেল। ঐ ফাঁকটুকুতেই বিরাট মণ্ডল বলে উঠলেন, 'আমি এই সভার সভাপতি। সবাই চুপ কইর‍্যা নিজেদের জায়গায় না বসলে আমি মিটিং বন্ধ কইর‍্যা দিব। নো সেকেন্ড চান্স। যাঁরা পূর্ববর্তী বক্তার কথায় আপত্তি করছেন, তাঁদের কাউকে আমি এখানে আইস্যা তাঁর কথা জানাইব্যার আহ্বান করি।'

একটি বিশ-বাইশের যুবক পেছন থেকে সভাপতির দিকে এগিয়ে আসে—মাঝখানের ফাঁকগুলি লাফিয়ে পার হয়ে।

সে বিরাট মণ্ডলের পাশ থেকে বলে উঠল, 'আমরা আপনাদের একটা কথা বিবেচনা করতে অনুরোধ করছি। তপশিলি আন্দোলনকে একটা কাস্টিস্ট-রেসিস্ট আন্দোলনে আটকে রাখবেন না। আমরা যারা এই আন্দোলনের সীমান্ত থেকে বাইরে, তারা কিন্তু এই আন্দোলনে যোগ দিতে চাই। এর আগে কখনো এমন সুযোগ আসে নি যে মনুসংহিতার বামুন-পণ্ডিতরা আর আন্তর্জাদিক ক্যাপিটালিজম আপোশ করে তপশিলিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ক্যাপিট্যালিস্টরা মুসলমানদের ওপর আর নির্ভর করতে পারছে না। জিন্না সম্পর্কে তাঁরা আশ্বস্ত নন। তাই এখন তাঁরা চাইছেন—তপশিলিদের ওপর ভরসা করতে। এমন হতে পারে যে ডক্টর আম্বেদকর এই ডিলে যথেষ্ট এগিয়ে যাবেন। তাঁর বিরোধিতা করা ভুল হবে। মারাত্মক ভুল হবে। আপনারা তো নিজেরাই নেতাগিরি করেন। আর নিজেরা নিজেদের ছাড়া কাউকে দেখতেই পান না। আপনারা শুধু হিশেব কষেন এই চার জেলায়—ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, যশোর—কত নমশূদ্র। এই সব গোনাগনতিতে কিছ হবে না। ওয়ার্ল্ড পার্সপেকটিভ দরকার। তা যদি না পান তা হলে অন্তত ন্যাশন্যাল পার্সপেকটিভ তৈরি করুন ও তাতে ডক্টর আম্বেদকারকে আপনাদের দরকার। যদি কোনো ভাবে মুসলিম লিগ ও সিডিউল্ড কাস্টের মধ্যে একটা বোঝাপড়া সম্ভব হয়, তা হলে ভারতের রাজনীতি বদলে যাবে। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।'

ছেলেটি শুধু তাঁর বক্তব্য বলার দাপটে এই কথাগুলি শুনতে বাধ্য করে মিটিংটাকে মিটিঙে ফিরিয়ে আনল।

পি আর ঠাকুর সভাপতিকে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই বলতে শুরু করেন, 'এই যুবকটিই সবচেয়ে পরিষ্কার করে দিল, আজকের এই মিটিং কেন আমরা ডাকতে বাধ্য হয়েছি। ইতিমধ্যেই লিগ-তপশিলি-আম্বেদকার ঐক্য দেশের রাজনীতিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে! ও এই যুবকের মত আরো অনেক যুবককে আলোড়িত করছে, যে এটা বোধহয় একটা আরো বড় ও সম্ভাবনাপূর্ণ শক্তি তৈরি করতে পারে। আমরা এটাকে ভুল মনে করি। সেই আলোড়নকে আমরা তপশিলি আন্দোলনের সহায়ক মনে করি না। সহায়ক তো নয়ই, বরং উল্টো। আমাদের পক্ষে সর্বনাশা। মিস্টার জিন্নার পাকিস্তান প্রস্তাব পাঁচ-ছ বছরের মধ্যে দেশের সবচেয়ে বড় বিপদ হয়ে উঠেছে—'

যোগেন হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে পি-আর-কে জিজ্ঞাসা করে, 'কোন দেশ? কার বিপদ?'

পি-আর একটু হকচকিয়ে যায়। বলে ফেলে, 'অ্যাঁ?'

'আপনে কোন দেশের বিপদের কথা বলতে চান?'

'আমাদের আন্দোলন কখনো আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের বাইরে যায় নি।'

'তাইলে গান্ধী-আন্দোলনে যোগ দিতে না করছিলেন কেন গুরু গুরুচান্দ?'

'তখন তো লিগ শক্তিশালী ছিল না। তখন তো পাকিস্তান ছিল না। লিগ-তপশিলি-আম্বেদকর যুক্ত ছিল না। আমাদের এত শত্রু ছিল না।

পি-আর তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি ফিরে পায়। খুব ঠাট্টা করে বলে উঠতে পারে—'আপনার আর আমাদের দেশের মধ্যে তফাৎ কি এত বড় হয়ে গেছে যে আপনি দেশ চিনতে পারছেন

না। এখন আমাদের জাতীয় মূলধারা—হিন্দু-মসলমান-তপশিলি জাতীয় ঐক্য বদলে আর-এক ঐতিহ্য বানালেন ও আমাদের সেইটা মানতে বাধ্য করছেন।'

'ও-সব কথা রাখেন। ঐ বাসি পচা সব হিন্দু ছলনা দিয়্যা একডা দ্যাশ বানাইয়া একডা ধর্ম বানাইয়া মুসলমানগ একটা শত্রু খাড়া কইর‍্যা শুদ্দুরগ সর্বনাশ আর কইরবেন না। মিস্টার জিন্না-র পাকিস্তান যদি আপনার দ্যাশের বিপদ হয়, তাইলে মিস্টার গান্ধীর হরিজনও আমার দ্যাশের পক্ষে আরো বড় বিপদ।'

'সেটা আপনার মত হতে পারে। সেটা যে তপশিল জাতির মত নয় সেটাও তো জানানো দরকার', পি-আর চেষ্টা করেন গলা তুলতে।

'হ্যাঁ জানান। আপনাগ মতডাও যে তপশিলি জাতির মত না, সেডাও তো জানাবার লাগব। সে তো পনের নম্বরের মিটিঙের প্রস্তাব কইর‍্যা হব না। ৩৭ থিক্যা এই ৪৬ নয়-দশ বছর জুইড়্যা পায়ের তলায় চামড়ায় ফোস্কা ফ্যালাইয়্যা ছাওয়াল-পাওয়ালগ লাইগ্যা দুইডা একডা হস্টেল আর তাগ বাবাগ লাইগ্যা নিম্নপ্রকারের চাকরির সামান্য শতাংশ রিজার্ভ কইরতে মাত্র পারা গিছে। আপনেও আমাগ লগে ছিলেন। অস্বীকার যাব না। আপনার নেতৃত্বের মূল্য আমাগ ভিতরে সর্বাধিক। কিন্তু এত কইর‍্যাও সেও তো কাগজের আইন। আমি আপনারে কই—কোথাও কুনো হিন্দু উচ্চবর্ণের কেউ থাইকলে মেথরের কাজও দিবে না শুদ্দুরগ। তার বদলে পচ্চিমামেথর আনব। সেইডা দ্যাশের বিপদ না?'

পি-আর বলেন, 'আপনি রাজনীতিতে এই জট পাকিয়ে দিয়েছেন। তপশিলিদের অ্যান্টি হিন্দু পরিচয়কে প্রধান করেছেন।'

'লুকায়্যা করি নাই। কইছি, শুদ্দুরের পাশের আইলের মানুষডাই শুদ্দুরের সব থিক্যা নিকট বন্ধু। আপনার বামুনদের কন, জমি হালাইতে—'

'আপনি নিজেই তো দাঙ্গায় প্ররোচনা ও নেতৃত্ব দিলেন গোপালগঞ্জে। হিন্দুদের মহাসম্মিলন করতেও দেন নি।'

'অ্যাহন কি তপশিলগ সম্মিলন কইর‍্যা হিন্দুধর্ম জয় জয়, আমাগ শুদ্দুর রাইখছে জয় জয়, কীর্তন গাইব্যার লাইগব! যা কইছি লুকায়্যা কই নাই। কইছি, আমাগ তো মনু বানাইছে চাঁড়াল। মনুসংহিতায় রায়ট নাই। তাইলে, রায়ট লাইগলে বামুনগ বাঁচাইবার লগে মুসলমানগ লগে রায়ট বান্ধান্টাও শূদ্রের কাজ না। এত রায়টে একডাও বামুন তো মরে না। শুদ্দুরের প্রাণের কুনো দাম নাই?'

'আমাদের একটা সেন্স অব কমিউনিটি না থাকলে থাকবেটা কী আমাদের?'

'সমান। স্বাধীনতা। আপনার ঠাকুরদা যা শিখাইছিলেন। শূদ্র মুসলমান/পাশের আইলের সম্মান। সেন্স অব অনার।'

সারা ভারতে কংগ্রেস, হিন্দুসভা, সেবাশ্রম ইত্যাদি মিলে মুসলমানদের কিছু বলতে বাকি রাখে নি। হিন্দুদের মধ্যে লেখাপড়া বেশি। তাঁদের পক্ষে শাস্ত্র আর ইতিহাস বানিয়ে মুসলমানদের নরকের কীট প্রমাণ করা ছিল সহজ। জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম রাজনীতির প্রচারে হিন্দুদের নিন্দা করার চাইতে বেশি করা হত মুসলমান হওয়ার গৌরব ও হিন্দু-কংগ্রেসের জাতিদ্বেষ। জিন্নার ছিল জাতিগঠনের কর্মসূচি। কংগ্রেস-সহ হিন্দুদের ছিল জাতির আত্মরক্ষার কর্মসূচি।

১৬ আগস্টের জুয়ো কে কার পার্টনার?

বাঙালিদের হিন্দুবড়াইয়ের জায়গাটা স্বাধীনতার পূর্ব মুহূর্ত থেকে কুয়াশামাখা হয়ে উঠেছিল। তখন তো সকলে জেনে গেছে দেশভাগ হবে। এমন আহাম্মক কেউ ছিল যে ধরে নেবে—

১৭৭

দেশভাগ বা পার্টিশন হচ্ছে বটে কিন্তু পাঞ্জাব আর বাংলা ভাগ হবে না? কংগ্রেস নেতারা ৪৫-সালে জেল থেকে বেরিয়েই যে একটা হাওয়া তুললেন, তার প্রধান বিষয় ছিল—একটা চরমসীমার ভাব। যা, পার্টিশনই হোক। এই নতুন ভাব দেশে রটনা হওয়ার সঙ্গে আরো একটা হাওয়া লোকের মুখে-মুখে উঠল—পাকিস্তান যদি হয়ও, টিকবে ক-দিন?

এমনই একটা হিন্দুয়ানির মধ্যে কংগ্রেস আর মুসলিম লিগ কানামাছি খেলতে শুরু করে। সিমলা ব্যথ ঘোষণার পর (১২ মে, ৪৬), জুন থেকে শুরু হল এই খেলা। একবার লিগ বলে 'হ্যাঁ।' তখন কংগ্রেস বলে, 'না।' তখন লিগ বলে 'না।' তখন কংগ্রেস বলে, 'হ্যাঁ।' তখন লিগও বলে বসে 'না'। 'না' তো বটেই—১৬ আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। গত বছর থেকে লিগের কোনো দাবির প্রতি কোনো সুবিচার হয়নি। তোমরা যখন দিচ্ছ না—শাহেব-কংগ্রেসরা যখন দিচ্ছই না, আমাদের মত করে আমরা আন্দোলন করব। যুদ্ধের মধ্যেও ব্রিটিশ কর্তাদের পক্ষপাতিত্ব ছিল লিগের দিকে। যুদ্ধের শেষে সে পক্ষপাত আর নেই। তখন ১৯৪৬-এ, ব্রিটিশ কর্তারা ভারত থেকে সরে যেতে চান শুধু, জিন্নার পাকিস্তান প্রস্তাব তখন ব্রিটিশদের সামনে সবচেয়ে বড় বাধা। ক্যাবিনেট মিশনের পক্ষপাত জিন্নার দিকে ছিল না। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ছিল সেই অধিকার ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা।

এ-কথা আজ আর পরীক্ষা করা সম্ভব না যে ১৬ আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বলতে কী বুঝিয়েছিলেন, জিন্না বম্বেতে? হ্যাঁ, এটা বলেননি—হিন্দু মারো। এর আগেই অবিশ্যি বলেছিলেন, ২৩ জুন গৃহযুদ্ধ আসন্ন। যে যাকেই মারুক, গৃহযুদ্ধের কথা কিন্তু জিন্নাই বলে যাচ্ছিলেন। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার অঘোষিত জোটের অঘোষিত নেতা শ্যামাপ্রসাদও বলেছেন কিন্তু বোঝা যায় যে তিনি ভয় দেখাচ্ছিলেন, যুক্তি বলছিলেন না। জিন্নার 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' ডাক, গান্ধীজির 'ভারত ছাড়ো' ডাকের তুলনীয় ছিল না—উত্তাপে না, সংগঠন না, পরিকল্পনায় নয়, প্রচারে নয়, প্রস্তুতিতে নয়। কিন্তু 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন'-এর ভাষা ও ভঙ্গি গান্ধীজির অনুকরণে তৈরি, 'ভারত ছাড়ো'র ছাঁচে তৈরি। জিন্না নিজেই জানতেন না—সেদিন কী ঘটবে। তাঁর অক্ষমতা তাঁকে দায় থেকে অব্যাহতি দেয়নি। 'ভারত ছাড়ো'র প্রস্তাবকে গান্ধীজি একবার জুয়ো খেলা বলেছিলেন। বছর চার, পর গান্ধীর জুয়োর পাল্টা দান দিলেন জিন্না। 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' বলে। জিন্না গান্ধীজির বিরুদ্ধে বলেছিলেন কি? নাকি, বলেছিলেন—ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে?

সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জিন্না খুব বেশি কথা বলেননি। তাঁর রাজনীতির জীবন থেকে আবার উল্টোটাও বলা যায়—তিনি কখনোই সাম্রাজ্যের মুৎসুদ্দি ছিলেন না। ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডাকা হয়েছিল ব্রিটিশ পক্ষপাতিত্বের লক্ষ-বদলের বিরুদ্ধে, কংগ্রেসের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের নতুন

ঘনিষ্ঠতার বিরুদ্ধে ও 'পাকিস্তান'-নামকরণটি স্বীকারে। বেশ, আমরা যদিও বলিনি, শত্রুরাই যদিও পাকিস্তান আওয়াজটি তুলেছে, তবু আমরা মেনে নিচ্ছি ঐ নাম, আমরা আদায় নেব ঐ নাম। আদায় করে নেব।

১৬ আগস্টে কলকাতায় যে ঐ রকম দাঙ্গা লাগবে তা প্রায় কোনো উচ্চপর্যায়ের লিগনেতাই জানতেন না। সারা ভারতে এই আহ্বান ছড়ানো হলেও কোথাও তো আর দাঙ্গা হয়নি, এমন কী, কলকাতার কাছাকাছিও হয়নি। ১৬ আগস্ট কলকাতার দাঙ্গা লিগের কোনো কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা নয়। দেশব্যাপী আন্দোলনের সুযোগ নিয়েছেন কলকাতার কিছু হিন্দুপক্ষীয় ও মুসলমান পক্ষীয় স্থানীয় নেতারা ও তাঁদের প্রশ্রয়ে গুণ্ডাবহিনী।

১৬ আগস্ট ময়দানের সমাবেশে সারওয়ারদি বক্তৃতা করেন ও নাকি তিনি বলেন, পুলিশকে তিনি বলে দিয়েছেন। তা থেকে মুসলমানরা উৎসাহিত হন নাকি! এই কথার কোনো প্রমাণ নেই, ছাপা কাগজ ছাড়া। সারওয়ারদি বাংলা বলতে পারতেন না। তাঁর উর্দু বক্তৃতার কোনো বাংলা অনুবাদ করা হয়নি। তিনি পরদিন স্কুল-কলেজ ছুটি দেন।

১৬ আগস্ট ময়দানের সমাবেশে যোগেন মণ্ডল তাঁর সমর্থন জানান।

১৬ আগস্ট ময়দানের সমাবেশকে কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থন জানায়—শ্রমিকশ্রেণীর একটি বড় অংশ মুসলমান ও পাকিস্তানের পক্ষে এই জাগরণ, একদিক থেকে গরিব মুসলমানের আত্মনিয়ন্ত্রণের জাগরণ—এই যুক্তিতে।

১৬ আগস্ট বাংলার লিগের সম্পাদক আবুল হাশেম ময়দানে গিয়েছিলেন আরো অনেক বন্ধুর সঙ্গে, তাঁর নাতিদেরও হাত ধরে। যদি দাঙ্গা হাঙ্গামার সামান্য ভয়ও থাকত, তিনি কি নাতিদের নিয়ে যেতেন?

মীজানুর রহমান শাহেব ১৬ আগস্ট নিয়ে ছোট একটা গোটা বই লিখেছেন, 'কৃষ্ণ ষোলই।' তাতে তিনি বলেছিলেন, ময়দানে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল না। কিন্তু মানিকতলার মোড় থেকেই তিনি দেখছিলেন, আর-একটু উত্তরে উল্টোডিঙি থেকে একদল লোক বাস-ট্রাক থেকে নামছে ও নেমেই লুটপাট শুরু করেছে। ওয়েস্ট ক্যানাল ও ইস্ট ক্যানাল রোড জোড়া লাগিয়ে কাঠের একটা সাঁকো ছিল। সেটার ওপর দিয়ে ছোটাছুটি বালক মীজানুর দেখেছিলেন।

আরো এমন কিছু সাক্ষ্য থেকে এটা জানা যায় যে ১৬ আগস্ট ময়দানের সমাবেশ যখন চলছে, তখনই উত্তর ও মধ্য কলকাতায় দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে। দাঙ্গার সরাসরি অভিজ্ঞতা যাঁদের ছিল, তাঁদের কথাগুলি মেলালে দেখা যায় ১৬ আগস্টের এই দাঙ্গায় পাড়া-প্রতিবেশীরা সমবেতভাবে অপ্রস্তুত ও আতঙ্ক বোধ করেন ও সবাই মিলে বাঁচার চেষ্টা করেন।

পুলিশ না থাকায় সন্ধ্যার পর থেকে শুরু হয় আগুন লাগাবার ঘটনা।

১৭ আগস্ট, আশা ছিল, সব ঠিক হয়ে যাবে। বেলা একটু বাড়তে বোঝা গেল, দাঙ্গা নতুন মোড় নিয়েছে। আগে, কোনোদিন কোনো দাঙ্গা এতটা ছড়িয়ে পড়েনি। ১৭ তারিখ থেকে অচেনা মানুষজন সশস্ত্র হয়ে রাস্তায় নেমেছে। নির্দিষ্ট লক্ষের দিকে এগচ্ছে। কাজ শেষ করে বেরিয়ে পড়ছে। দুপুরের পর থেকে মুসলমানপ্রধান অঞ্চল থেকে হিন্দুরা ও হিন্দুপ্রধান অঞ্চল থেকে মুসলমানরা নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে শুরু করে। ফলে গুজব আরো ছড়ায়। কোনো পুলিশ ছিল না। সন্ধ্যার পর থেকে আগুন লাগানো শুরু হয়।

লুটপাট হয়নি। মেয়েদের ওপর অত্যাচার খুব একটা ঘটেনি। শুধু হত্যা আর মৃত্যু আর হত্যা। ১৬ তারিখে রাস্তার পড়ে থাকা মৃতদেহগুলি সরানো হয়নি, পচতে শুরু করেছে আর বাতাসে পচা, ভ্যাপসা, বাসি মৃত্যুর গন্ধে দম আটকে আসে।

১৭ তারিখ সন্ধ্যা থেকে শুরু হয়ে যায়—দলবেঁধে সশস্ত্র বেরনো। মুখোমুখি লড়াই। দলগুলির খুব লক্ষ ছিল না কোনো। ১৭ তারিখ থেকে সারওয়ারদি পুলিশ কনট্রোল রুমে। ফলে, কমিশনার কোনো কাজ করতে পারলেন না। কোনো পুলিশ নেই। ১৮ তারিখ সন্ধ্যা থেকে গুর্খা বাহিনীর ভাঙাচোরা কিছু সোলজারকে দেখানো হল। ১৯ তারিখে দাঙ্গা থামেনি।

কলকাতার দাঙ্গা, গ্রেট ক্যালকাটা কিলিঙে যে লক্ষ-লক্ষ মানুষ মারা গেছেন তাঁরা বেশির ভাগই গরিব থেকে গরিবতর। কোনো পাড়ার কোনো বাড়ির কোনো কর্তাব্যক্তি খুন হন নি, এঁদের কোনো মহিলার কোনো অমর্যাদা ঘটেনি। কলকাতার মত শহরে যাঁদের বেঁচে থাকার জায়গা ছিল না, সুতরাং তাঁদের মেরে ফেলায় কোনো বাধা ছিল না। ও তাদের ধর্মীয় কোনো পরীক্ষাও করা হয় নি।

যেন একটা পর্যায়ক্রম আছে।

১৬ আগস্ট পাড়া বাঁচিয়েছেন পাড়ার লোক—হিন্দু-মুসলমান মিলে। দাঙ্গা সম্পর্কে ধারণা ও এতটা আগুন লাগা আকাশ থেকে, ভয় ছড়াল।

১৭ আগস্ট দুপুর থেকে ধর্মানুযায়ী নিরাপদস্থানে চলে যাওয়া। তখনো পাড়ার লোকই পাড়া বাঁচাচ্ছে, যারা নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে চাইছে তাদের পাঠিয়ে দিচ্ছে। নিরাপদ মনে করে এই পাড়ায় যারা আসছে, তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ছোট একটা পরিবারে বড় একটা পরিবার যদি এসে ওঠে, কোনো বড় বাড়ির বাড়তি ঘর তাদের দেয়া হচ্ছে।

১৭ আগস্ট সন্ধ্যা থেকে পাড়ার ছেলেরাও বেরতে শুরু করে। আগুন আর অচেনা থাকে না। দাঙ্গার দলও অচেনা নয়। মুখোমুখি যুদ্ধ শুরু হয়। কী ভাবে শেষ হয়, কেউ জানে না।

১৮ ও ১৯ দিনরাত এমনই চলে।

১৯ তারিখ গোধূলিতে পুরো শহরের স-বটা, স-বটা শহর, অচেনা হয়ে যায়। শহরের মানুষ অচেনা। মড়া ও বিষবাতাস থেকে শ্বাস টানে। নিজের ফুসফুস নিজের অচেনা।

মৃত্যু নয়, নরকের পরের শহর।

যে-মৃত্যু আমার কাছে স্মৃতি হয়ে ফিরে আসে না, সে-মৃত্যু যেন ভুলে যেতে চাই, ভুলে থাকতে চাই, ভুলে যাওয়া অভ্যাস করি, শেষে একদিন আর মনে পড়ে না—কবে যেন এমন একটা মৃত্যু ঘটেছিল, আমার বেঁচে থাকা যেখানে প্রত্যাশিত ছিল না। কোনো মৃত মানুষ যেমন জীবিত সমাজের সম্পর্কহীন, তেমনি কোনো জীবিত মানুষ মৃত সমাজের অনাবাসী। ১৬ আগস্ট ১৯৪৬ কলকাতায়, একটি কলোনিদেশের শাসনক্ষমতা নিয়ে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায় জীবিত ও মৃতের সমাজ তৈরি করেছিল। কেউ কেউ বলেন এটা একটা নতুন পদ্ধতি—এই পদ্ধতিতে নোয়াখালি, বিহার, গড়মুক্তেশ্বর, পাঞ্জাব, কেউ কেউ বলেন। এই পদ্ধতির ভিতর শৃঙ্খলা আছে। কেউ কেউ বলেন, এই শৃঙ্খলাতেই 'দেশভাগ' পর্যন্ত পৌঁছে যায় তারা, যারা জীবিত ও মৃতের সমাজের দ্বন্দ্বকে রাজনীতির এক আপতিক সমস্যার বিশল্যকরণী হিশেবে ব্যবহার করে।

ঘটনার একটা পরম্পরা সাজিয়ে ইতিহাসের কালানুক্রম তৈরি করা যায়। তেমন এক পরম্পরায় সাজিয়ে বলা হয়েছে, 'দুটো ঘটনা, কলকাতার হত্যা (১৬ আগস্ট, ১৯৪৬) ও পণ্ডিত নেহরুর প্রথম মন্ত্রিসভা (অন্তর্বর্তী সরকার, সেপ্টেম্বর ১৯৪৬) শুরু করে দিল ১৬ মাসের এক গৃহযুদ্ধ। এই গৃহযুদ্ধে মারা গেল আনুমানিক ৫০০,০০০ মানুষ। ছ-বছর ধরে (১৯৩৯-১৯৪৬) যে মহাযুদ্ধ চলল তাতে সমগ্র ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মৃত্যুর সংখ্যার প্রায় সমান' (আয়ান স্টিফেন্স, পাকিস্তান, ১৯৬৩, পৃ. ১০৭)।

এ সব তুলনায় গোলমাল থাকে। ভারতের লোকসংখ্যা ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মোট লোকসংখ্যার (ভারত বাদে) চাইতে বেশি। সেই কারণেই এমন নির্বাচিত পরিসংখ্যান যতটা চমকে দেয়, ততটা সত্য নয়।

এটা সত্য নয় যে জেল থেকে বেরিয়েই কংগ্রেস নেতারা যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তাতেই প্রথম বোঝা গিয়েছিল, কংগ্রেস দেশভাগের সম্ভাবনা স্বীকার করল। তারপরই শুরু হল দুই বা তিন সম্প্রদায়ের দাঙ্গা—যতক্ষণ না দুটো আলাদা দেশ বা রাষ্ট্র আলাদা পতাকা, সেনাবাহিনী সংবিধান ও রাষ্ট্রকাঠামো নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হল। মানে, জেল থেকে ছাড়া পেয়েই কংগ্রেস-নেতারা বুঝলেন, পার্টিশন হবেই। কংগ্রেস পার্টিশনে রাজি হয়ে গেছে রটানো মাত্রই গ্রাম পর্যন্ত দাঙ্গা শুরু হল, সেই জায়গাটিকে নিজেদের সুবিধে মত 'স্তানে' রাখতে।

সত্য এইটুকুমাত্র নয়।

ভারতের প্রদেশগুলিকে তিনটি আলাদা গুচ্ছে ভাগ করার ও সেই ভাগের ভিত্তিতে যুদ্ধের পর ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস নিয়ে কথা-বলার ক্রিপস প্রস্তাব বাতিল হল তামাদি হুন্ডি বলে। কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে প্রদেশগুলিকে তিনটি গুচ্ছে যে সাজানো হয়েছিল, সেটা থেকেই গেল। ক্যাবিনেট মিশন সেই গুচ্ছভাগের ম্যাপ বহাল রাখলেন। ক্যাবিনেট মিশন ফিরে যাওয়ার পর ওয়াভেল 'ইনটেরিম গবর্নমেন্ট' শব্দটি ব্যবহার করলেন ভাইসরয়ের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের বদলে। ১৪ জন সদস্য হবেন। লিগের জন্য দুটি আসন খালি রেখে ১২ জনকে নিয়ে 'ইনটারিম গভর্নমেন্ট' বা অন্তর্বর্তী সরকার হল। ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বারদের 'মন্ত্রী' বলা হত না। কিন্তু তাঁদের দপ্তর ছিল—মেম্বার-ফাইন্যান্স, মেম্বার-হোম, মেম্বার-রেইলওয়েজ ইত্যাদি। অন্তর্বর্তী সরকারের সদস্যদের 'মন্ত্রী' বলা হল—জওহরলাল—প্রধানমন্ত্রী, বল্লভভাই প্যাটেল—স্বরাষ্টমন্ত্রী, বলদেব সিং—প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ; এইভাবেই রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রাজাগোপালাচারি, শরৎ বোস, জগজীবনরাম, অরুণা আসফ আলি, সফফৎ আমেদ খাঁ, সৈয়দ আলি জাহির, সি এইচ ভাবা, জনমাথাই।

যোগেন মণ্ডল এমন বিশিষ্ট কোনো নেতা নয় যে অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কোনো একটা টুকরো জায়গাতেও তার কোনো জায়গা তৈরি করা যায়। ১৯৩৫-এর প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন আইনে সম্প্রদায় ধরে তপশিলিদের জন্য কয়েকটি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল। ফলে, ব্রিটিশ ভারতের ১১টি প্রদেশেই কোটা-অনুযায়ী কিছু তপশিলি মেম্বার ছিল। তার বেশি কিছু যোগেন ছিল না। আর, যোগেনের মত এমন মেম্বার সারা ভারতে দু-বারের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ভোটে, একবার ১৯৩৭-এ, আর-একবার ১৯৪৬-এ, আরো অন্তত পাঁচ-শ তপশিলি মেম্বার জিতেছিলেন। যোগেন তাদের একজন মাত্র, একতমজন নয়।

১৯৩৭-এর ভোটে একটা বিষয়ে যোগেন সারা ভারতে ছিল অদ্বিতীয়। সে সাধারণ আসনে দাঁড়িয়ে জিতেছিল। সাধারণ আসনের ভোটার ছিল সকলেই, কিন্তু প্রধানত নানা ধরণের হিন্দু। ভারতের ১১টি প্রদেশের আইনসভার হাজারটি সাধারণ আসনে কোনো তপশিলি প্রার্থীকে কোনো হিন্দু ভোট দেয়নি। একজন প্রার্থীকেও না। যোগেন সেই অদ্বিতীয় একা। অথচ আমরণ অনশনে গান্ধীজি মৃতপ্রায় হয়েছিলেন—তপশিলি হিন্দুদের আলাদা ভোট নাকচের দাবিতে। গান্ধীজি বলেছিলেন, হিন্দুদের ভাঙতে দেব না। গান্ধীজি এটা হিশেব কষে দেখেছিলেন ভারতের হিন্দুজনসংখ্যা থেকে তপশিলিদের আলাদা ভোট করলে, উঁচু হিন্দুরা জিততেই পারবে না।

যোগেনের আর-একটা অদ্বিতীয় আছে। ১৯৪৬-এর প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের দ্বিতীয় ভোটের আগে সারা ভারতে তপশিলিদের একটিমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন তৈরি হচ্ছিল মহারাষ্ট্রের দলিত-নেতা আম্বেদকরকে নেতা মেনে—'ভারতীয় তপশিলি জাতি ফেডারেশন।'

এই ফেডারেশন তপশিল আসনগুলিতে প্রার্থী দিয়েছিল। তারা কেউই জিততে পারেনি। এক যোগেন্দ্র ছাড়া।

যোগেনের আরো একটি অদ্বিতীয় আছে। 'সংবিধান রচনা পরিষদ'-এর সদস্য-নির্বাচনে আম্বেদকর হেরে যান, বম্বে থেকে। যোগেন তাঁকে ডেকে এনে বাংলা থেকে জিতিয়ে দেন। নইলে আম্বেদকর সংবিধান পরিষদে ঢুকতেই পারতেন না। বল্লভভাই প্রকাশ্যে বলে দিয়েছিলেন, আম্বেদকার যাতে গণপরিষদে কোনো ভাবেই ঢুকতে না পারেন, কংগ্রেস যে-ব্যবস্থা করে রেখেছে। সেই ব্যবস্থা হচ্ছে কংগ্রেসের শিডিউল কাস্ট এক এম.এল.একে রংপুরে নিয়ে গিয়ে গোপন জায়গায় আটকে রেখেছিল আম্বেদকর—বিরোধী কংগ্রেস। যোগেন তাঁর তরুণ সমর্থকদের সাহায্যে সেই এম.এল.একে উদ্ধার করেন। আম্বেদকর বেশ ভাল ভোটে জেতেন।

যোগেন মণ্ডল প্রথম মন্ত্রী হয়েছিল ১৯৪৩-এর ২৪ এপ্রিল শনিবার নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রিসভায়। শুধু যোগেন নয়, পুলিনবিহারী মল্লিক ও প্রেমহরি বর্মণও। কেবল তাই নয় এই মন্ত্রিসভার ডেপুটি লিডার হয়েছিলেন মুকুন্দবিহারী মল্লিক। পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি হয়েছিলেন তিন তপশিলি মেম্বার রায়শাহেব অনুকূলচন্দ্র দাস, রায়বাহাদুর বঙ্কবিহারী মণ্ডল আর রসিকলাল বিশ্বাস। এর আগে কোনো মন্ত্রিসভায় তপশিল দলের মেম্বারদের এতটা জায়গা দেয়া হয়নি—তিনজন মন্ত্রী, হাউসের ডেপুটি লিডার ও তিনজন পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি। এর মধ্যে নমশূদ্র ছিল চারজন।

এমনটা ঘটল কী করে?

খুব মাপজোখ করে দেখলে হয়ত বলা যায়, তপশিলি আন্দোলনের লক্ষবিন্দু বদলে গেল বলে। কেন বদলাল যদি খোঁজ করতে হয়, তাহলে, সেই বদলের একটা পার্শ্বকারণ হিশেবে যোগেনের রাজনৈতিক ধরণের আঁচ নিতে হয়।

এক যোগেনই নিজের তপশিলি পরিচয় ভাঙিয়ে অন্য কোনো বড় পার্টির লেজ হতে যায়নি। চায়ও নি।

এক যোগেনই ছিল নিজের তপশিলি পরিচয়ে ও নমশূদ্র পরিচয়ে সম্পূর্ণ এক নেতা, আইনসভায় সম্মানিত ও বিভিন্ন রকম সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত।

শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা যখন তৈরি হয় তখন তপশিলি মন্ত্রী নেয়া হয় একজন। আর-একজন মন্ত্রী নেয়া হবে কথা ছিল, আইনসভায় কথা তোলা হয়েছিল, হকশাহেব বরাবরই রাজি ছিলেন, কোনো সময়েই নেননি। তিনি যে নেবেন না সেটা বুঝে ফেলে তপশিলি মেম্বাররা, বিশেষ করে নমশূদ্ররা, নিজেদের এক জোট করতে চাইল। যোগেন সেই ৩৭ সালের ভোটের পর থেকেই বলে আসছে দুটি কথা। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গেও তার এ নিয়ে কথা হয়েছিল। একটি কথা—তপশিলিদের রাজনৈতিক পরিচয় তপশিলি। অন্য পার্টিতে কী আন্দোলনেও তপশিলরা থাকতে পারে, যেমন মজুর আন্দোলনে, কৃষক আন্দোলনে। কিন্তু তাদের রাজনীতির পরিচয় তপশিলি হিশেবেই। যোগেন 'শূদ্র' কথাটাই বলে বেশি। 'শুদ্দুর'ও বলে। 'চাঁড়াল' বলেও নিজের পরিচয় দেয়। এমন একটা আত্মপরিচয়কে এতটা প্রাধান্য দেয়ার মধ্যে একটা অস্বীকার অঘোষিত ছিল—নমশূদ্র বা রাজবংশী ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর শাবেক নেতৃত্বকে অমান্য করা। হয় বামুনদের মত গুরুগিরি করে, পৈতে পড়ে, মন্ত্র দিয়ে তারা গুরু হওয়ার সূত্রে নেতা হত। না-হয় পূর্বপুরুষের বড় জমিদারি বা রাজাগিরির সুবাদে অনগ্রসরদের নেতা হত।

এই দুই ধরণের নেতার প্রথম ধরণের উদাহরণ, ঠাকুররা। আর দ্বিতীয় ধরণের উদাহরণ প্রসন্নদেব রায়কত। এ-ছাড়াও মল্লিকদের মত শিক্ষিত পরিবার ছিল। তাঁরাও নেতা হতে

চাইতেন। চাইতেন শুধু না—নেতৃত্বে তাঁদের যেন স্বাভাবিক অধিকার আর শূদ্র পরিচয়টা সেই অধিকারের প্রমাণ মাত্র। এঁদের ও বাইরে যাঁরা শিক্ষিত, আধুনিক, বড় সমাজের নেতা—বিরাট মণ্ডল, রসিকলাল বিশ্বাস, মোহিনী ডাক্তার তাঁরা কখনোই শুধু শূদ্রদের নেতা হতে চাইতেন না। যোগেন এমন একটা বোঝাবুঝি থেকেই বলত, আগে তপশিলরা তপশিলি হোক তারপর ভাগে যাক।

যোগেনের রাজনীতির দ্বিতীয় সূত্রটাও ছিল প্রথমটির মতই স্পষ্ট ও শাদাসিধে। শূদ্ররা শূদ্র। তারা হিন্দু হওয়ার ফলে শূদ্র নয়। কোনো রকম হিন্দুগিরির ছোঁয়া শূদ্রকে রক্ষা করে না। গান্ধীজিরও না। হিন্দু মিশনেরও না। মন্দিরে ঢোকার আইন পাশ করে বা শুদ্ধি করে শূদ্রের শূদ্র-থাকাটাকে শুধু অস্থির করা যায়। শূদ্রের স্বাভাবিক আত্মীয়তা মুসলমানদের সঙ্গে। শূদ্র ও মুসলমানদের দুঃখ-কষ্ট, আয়-ব্যয়, চাষ-আবাদ, মাছ ধরা, নৌকা চালানো, সুখ-অসুখ, চেঁচামেচি, ডাকাডাকি অসুখ-বিসুখ, টোটকা-টুটকি—সবই একরকম। তাহলে, কোথাও হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধলেই শূদ্ররা গিয়ে, বামুন-কায়েত হিন্দুদের লেঠেল হবে কেন? হিন্দুরা যে থেকে-থেকেই শূদ্রদের 'আয় ভাই, বুকে আয়' বলে ডাকে তার হিশেব আছে। রায়টের সময় বাঁচাস। আর, মুসলিম আর তপশিলি এক হলে উচ্চবর্ণের হিন্দুর সংখ্যা তো নামবে : একহাটে দেড়জন।

১৯৪১-এর ডিসেম্বর থেকে ৪৩-এর মার্চ পর্যন্ত ষোলমাস স্থায়ী শ্যামা-হক মন্ত্রিসভায় জায়গা না পাওয়ায় সব রকম তপশিলিরা ২৩ মার্চ একটা মিটিঙে বসে যোগেনের প্রথম কথাটা মেনে নেয়। ভবিষ্যতে তপশিলি মেম্বাররা তপশিলি জোট হিশেবে সমস্ত কথাবার্তা যুদ্ধবিগ্রহ সমর্থন-অসমর্থন করবে। আর, দ্বিতীয় কথাটা নিয়ে কোনো কথা হয় না—তপশিলিরা হিন্দু না।—যখন হবে, দেখা যাবে। নাজিমুদ্দিনের হঠাৎ এমএল এ সংখ্যা কম পড়ে গেল। বরাবরই ইয়োরোপিয়ান ব্লকের ২৩টি ভোট কংগ্রেস-বিরোধীদের বাঁচিয়ে এসেছে। হকশাহেবের পক্ষে শাহেবদের ভোটেই সরকার বাঁচিয়েছে এক সময়। কিন্তু সেই ইয়োরোপিয়ান ব্লকের সঙ্গে গভর্নর ও তাঁর অফিসারদের সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হল। তার নানা রকম কারণই ছিল। প্রধান কারণ ছিল—ইয়োরোপিয়ান সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, শিক্ষক-অধ্যাপক, ধর্মপ্রচারের লোকজন, ছাত্রছাত্রীরা যুদ্ধের জন্য যাকে নাগরিক অধিকার বলে, তেমন অধিকার দমন মেনে নিতে পারছেন না। তাঁরা চান আইনসভার মেম্বার হিশেবে স্বাধীনতা। আর্থার মুর ছিলেন এর নেতা। 'স্টেটসম্যান' কাগজ ছিল এদের সমর্থক। কলকাতার 'স্টেটসম্যান' ৪৩-এর ৬ জানুয়ারির প্রেস ধর্মঘটেও যোগ দিতে যাচ্ছিল—সেনশরশিপের বিরুদ্ধে। শেষে গভর্নর হের্বার্ট তাদের ডেকে পাঠিয়ে নিষেধ করেন। ইয়োরোপিয়ান ব্লকের এই সমর্থন সম্পর্কে নাজিমুদ্দিন অনিশ্চিত ছিলেন। সুতরাং তিনি তপশিলি-মেম্বারদের ২১ জনের জোটের সমর্থনের বিনিময়ে তাদের সমস্ত দাবি মেনে নিলেন।

কিন্তু সময়টা বড় তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছিল। সমস্ত রকম চেনার বাইরে। যুদ্ধ যতক্ষণ চলছিল উত্তর আফ্রিকায় আর পশ্চিম আটলান্টিকে, ততদিন বেশ আরামের তাপ লাগছিল। জাপান যুদ্ধে নেমে ১০০ দিনের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে সমুদ্রপথের আক্রমণে বিধ্বস্ত করে ডিমাপুর-আসামের কাছে চলে এসেছে। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের একটা অংশে জাপানী সেনাবাহিনীর কথাতে বেশ বড় একটা অঞ্চল স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে, বেশির ভাগই মুসলমান। বাংলার উপকূল ও নদীতীরবর্তী তিরিশ মাইলের মধ্যে কোনো মানুষ, জীবজন্তু, ধানচাল, নৌকোডিঙি, ঘরবাড়ি থাকতে দেয়া হয়নি, যে-চাল ঐ সব জায়গা থেকে প্রকিওরমেন্ট করা হয়েছে সব আনা হয়েছে কলকাতায়—যুদ্ধের যে-কোনো প্রয়োজনে যে-সব ফ্যাক্টরি চলছে,

তার মজুরদের রেশন চালু রাখতে আর গ্রামের সব মানুষ এসে পড়েছে কলকাতায়, বার্মিজ উদ্বাস্তুদের সঙ্গে, তার ওপর, ৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন দমনে মেদিনীপুরের গ্রামে প্যারাসুট বাহিনী নামাবার জন্য এয়ার ফোর্সের সঙ্গে কথা বলছেন গভর্নর, প্রায় একই সময়ে কাঁথি-র সাইক্লোনে (এখন শোনা যাচ্ছে, সেটা না কী ছিল সুনামি) পর্যুদস্ত মানুষের ওপর সেনাবাহিনীর অত্যাচারের বিবরণ মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ছে অথচ এ-বিষয়ে হাইকোর্টের কোনো বিচারপতিকে দিয়ে তদন্ত করা হবে, হকশাহেবের এমন ঘোষণায় তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে তিরস্কার করেন ছোটলাট—সেটা, আর যাই হোক, মন্ত্রিত্বের পক্ষে সুসময় নয়।

ভারতের ব্রিটিশ সরকারের সব হিশেবই গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের এই চেহারা তাঁরা আন্দাজ করতেও পারেননি। লিনলিথগ নিজেদের মধ্যে বলেছিলেন, '১৮৫৭-র পর এমন বিদ্রোহ আর হয়নি।' দুশ বছরের ইংরেজ-শাসনে ইংরেজের বিরুদ্ধে যত মত তৈরি হয়েছে তার সবগুলি 'ভারত ছাড়ো'তে এসে বিদ্যুৎস্পর্শে বিস্ফোরণ ঘটাল। ব্রিটিশ রাজের অনুগততম যাঁরা বড়লাটের মন্ত্রী, হাইকোর্টগুলির বিচারপতি, কংগ্রেসের মত প্রাচীন সংস্থা, গান্ধীবাদীদের অহিংস ও গুরুবাদী কর্মীরা, কংগ্রেসবিরোধী ফরোয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি, গবর্মেন্টের ভারতীয় অফিসাররা, উপকূল রক্ষা বাহিনীর জোয়ানদের গ্রুপ, পুরনো সশস্ত্র বিপ্লবীরা, রেললাইন উপড়ে ফেলার ও ওয়াগন ভাঙার কাজে দক্ষ সব ফাটক-খাটা কয়েদি, গ্রামের চাষি—যে কারো কাছে এই খবরটা পৌঁছেছে—'ভারত ছাড়ো', 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'—সেই কোনো-না-কোনো ভাবে আন্দোলনে নেমেছে। কোন সম্প্রদায় নামেনি, কোন মহকুমা নামেনি, কোন প্রদেশ নামেনি—এ-সব গবেষণা অর্থহীন। ভারতের জনসংখ্যার অনুপাতে তা হলে কোনো আন্দোলনই সফল নয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধানতম নির্ভর ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস শুরু হয়ে গেছে, তাদের নিজেদের সব রকম রাজনৈতিক বিভ্রান্তি সেই ধ্বংসকে আরো এগিয়ে এনেছে। ধ্বংস বা মৃত্যু যত কাছে আসে ও যত নিশ্চিত হয়ে ওঠে, ততই শরীর যেন স্ববশ ছেড়ে দেয়। যেন কিছুই হয়নি এমন একটা ভঙ্গিতে প্রাদেশিক নির্বাচন এতদিন স্থগিত রেখে হঠাৎ ঘোষিত হল।

তারিক-ই-যোগেন

আইনসভার ভোটের ডাক আকস্মিক ঠেকলেও, আকস্মিক নয়। এই ভোট হওয়ার কথা ছিল ১৯৪২-এ। সেইজন্যই ১৯৪১-এর সেনসাসে এত মারামারি—তপশিলিরা তপশিলি-না- হিন্দু।

১৭৮

৪২-এর ভোট স্থগিত রাখা হল যুদ্ধের কারণে। একই সঙ্গে একটা দেশকে পুড়িয়ে ছাই করে, লোকজন সরিয়ে, বেকবুল করা যায় আবার তার সঙ্গে ভোটও করা যায়।

১৯৪৬-এ তো করাই যায়। সারা ভারতের আরো সব প্রদেশের সঙ্গে। করাই যায় বলে করা নয়। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। যুদ্ধে ব্রিটেন-আমেরিকা-সোভিয়েত জিতেছে। ইয়োরোপ ও এশিয়ার অনেক দেশ দু-টুকরো হয়েছে। ইংরেজদের পক্ষে ভারত হয়ে গেছে গলার ঢেঁকি। গেলার চেষ্টা করে লাভ নেই, ওগরাতে পারলে বেঁচে যায়। কিন্তু কারো হাতে তো 'পাওয়ার'টা জমা দিতে হবে। যে হোক, সে হোক। গান্ধীজি বারতিনেক ওয়ার্নিং দিয়েছেন—তোমরা চলে

যাও, দেশের যা হবে, হবে, আমাদের দেশ, আমরা দেখব।

তাতেই শাহেবদের ভয় ধরে গেছে। তারা না-হয় ভারত ছেড়ে চলে গেল, বস্তুত গিয়েওছিল তাই, সঙ্গে যদি 'পাওয়ার-টাও' তাদের সঙ্গে ভারত ছেড়ে লন্ডনে চলে যায়। গ্রেট ব্রিটেনের পক্ষে ভারত সাম্রাজ্য তখন দিন-আনি-দিন-খাইয়ের ব্যাপার। ভারতের কাছে ঋণ প্রতিদিন বাড়ছে। ব্রিটিশ ফৌজ ও অফিসারদের মাইনে দেয়ার টাকা পর্যন্ত নেই। যে কারণে ১৭৫৭তে কলোনি বানাতে হয়েছিল, তার উল্টো কারণে ১৯৪৬-এ কলোনি ছাড়তে হয়েছিল। সাম্রাজ্যবিস্তার, কলোনিবিস্তার, বিভাজনবিস্তার, আধুনিকতা বিস্তার, উত্তর-আধুনিকতা বিস্তার, উত্তর-কলোনি বিস্তার—এ-সব নিয়ে খুব জোর তর্ক-বিতর্ক চলছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে, গবেষণাগারগুলিতে। ইংরেজরা ১৯৪৬-এ জেনে ফেলেছে, হিশেবের চাইতে ঠিকঠাক আর কীসে জানবে—১৭৫৭-তে মুর্শিদাবাদের সোনাভরা কলসীগুলি লন্ডনে পাঠাতে একটা জাহাজে কুলোয় নি, তাই গেছে। সেগুলো থেকে ১৯৪৬-এ সেই ততদিনে ফাঁকা ও ফাঁপা কলসীগুলো, ফাঁপা ও শূন্য কলসীগুলি ভারতে ফেরৎ পাঠানোর জন্য ভাড়াশোধের পয়সাও তার নেই। সুতরাং যুদ্ধের শেষে বিউগল বাজার আগেই ব্রিটেন তিন-তিনজন মন্ত্রী এসে পড়লেন। তাঁরা দিলেন এক ক্যাবিনেট প্ল্যান।

কিন্তু ১৭৫৭-ই হোক আর ১৯৪৬-ই হোক ভারতের প্রায় দশ কোটি শিডিউল্ড কাস্টের অন্তর্গত একটি লোকও ঐ পঞ্জিকার কোনো নির্ঘন্টের সঙ্গে কোনোভাবে যুক্ত ছিল না।

১৯৪৫-৪৬-এ ইতিহাসের নির্ঘন্ট (সচেতন বা অচেতন) ও যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল নামের একটা লোকের 'ব্যক্তিগত কোষ্ঠী (সচেতন বা অচেতন)' পরস্পরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। সেই দুটো ঘটনার তারিখগুলি যদি পরপর সাজানো যায়, তা হলে হয়তো আভাস পাওয়া যায়—এ ওর শরীরের বা জীবনযাপনের ভিতর ঢুকে পড়ার প্রক্রিয়াটা ছিল কতই স্বাভাবিক, অসম্ভব, ধর্মাশ্রিত, অধর্মাশ্রিত, পরিণত, অপরিণত, বানানো, ও সংগত।

১৯৪৬

২৪ মার্চ	গবর্নর্স প্লেস-এর দরবার কক্ষে সারাওয়ারর্দি মন্ত্রিসভার শপথ। যোগেনসহ।
২৬ মার্চ	ব্রিটিশ ক্যাবিনেট জানাল যে তারা ১৯৪৮ সালের জুনে ভারতের শাসনক্ষমতা ছেড়ে দেবে। তিনজনের এক প্রতিনিধি দল প্রস্তাব নিয়ে দিল্লি এলেন। তিনজনই ভারতের সঙ্গে পুরনো সম্বন্ধে বাঁধা—ক্রিপস, আলেকজান্ডার ও প্যাথিক লরেন্স। তঁদের হাতে ছিল ক্রিপস-সাহেবের তৈরি করা সেই পুরনো ম্যাপ—ভারতের প্রদেশগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা।
৫ মে	ভারতের বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ভারতীয় নেতাদের সিমলায় ডাকলেন, ক্যাবিনেট মিশন নিয়ে আলোচনা করতে।
১২ মে	ঘোষণা—সিমলা বৈঠক ব্যর্থ। বাংলার কোনো প্রতিনিধি সিমলায় ছিল না।
৬ জুন	লিগ জানাল, তারা ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবে রাজি।
২৪ জুন	কংগ্রেস জানাল, সংবিধান রচনার জন্য গণপরিষদে রাজি। কিন্তু কোনো অন্তর্বর্তী সরকারে রাজি নয়। ৬-৭ জুন মহারাষ্ট্রের আইনসভা আম্বেদকরকে গণপরিষদে পাঠায় নি। আম্বেদকর হেরে গিয়েছিলেন।

যোগেন তাঁকে কলকাতায় আসতে বলল। ডক্টর আম্বেদকর যে হিন্দুদের কতটা অসহ্য ছিলেন তার ইতিহাস কী সম্পূর্ণ লুপ্ত? এরা হিন্দু মহাসভার হিন্দু নন। এঁরা 'জাতীয় হিন্দু'। তাঁকে ভাবা হত, ব্রিটিশের চর। আম্বেদকরের এখনকার স্বীকৃতি (১০১০) তাঁর আমৃত্যু অপমানের জীবনকে মিথ্যা করে দেয় না। সর্দার প্যাটেল ঘোষণা করেছিলেন, আম্বেদকরকে গণপরিষদে ঢুকতে না-দেয়ার ব্যবস্থা পাকা। যোগেন তাঁকে বাংলায় ডেকে এনে প্রয়োজনের চাইতেও বেশি ভোটে তাঁকে জিতিয়ে তুলনাহীন সংগঠনজ্ঞান, রাজনৈতিক কৌশল ও পার্লামেন্টারি দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছিলেন।

২৫ জুন — লিগ জানাল, তারা অন্তর্বর্তী সরকারে আসবে।

৬ জুলাই — কংগ্রেস বম্বে অধিবেশনে মিশন-প্রস্তাবে রাজি হল। (লিগের সম্মতির একমাস পর)।

২৭ জুলাই — কংগ্রেসের মিশনপ্রত্যাখ্যানের মাসখানেক পর লিগ জানাল, তার ওয়ার্কিং কমিটির বম্বে অধিবেশনের পর, যে তারা আর রাজি নয়। তাদের সম্মতি-অসম্মতির কোনো মূল্য দেয়া হচ্ছে না, তাদের দাবিও মানা হচ্ছে না, তাই তারা ১৬ আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করবে।

১০ আগস্ট — কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি জানাল—তারা মিশনপ্রস্তাব সম্পূর্ণ মেনে নিচ্ছে, কোনো শর্ত ছাড়া।

১২ আগস্ট — গণপরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কংগ্রেসের নেতা হিশেবে জওহরলাল নেহরুকে ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল আমন্ত্রণ জানালেন অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করতে।

১৬ আগস্ট — কলকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। উপলক্ষ লিগের ঘোষিত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।

২২ আগস্ট — জওহরলাল ভাইসরয়কে জানালেন তিনি কোয়ালিশন সরকার তৈরি করতে রাজি। কিন্তু লিগের কাছে মাথা নোয়াবেন না ও এ-ব্যাপারে তাদের মতামতও মানবেন না।

৪ সেপ্টেম্বর — ভাইসরয় প্রাসাদে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রথম অধিবেশন—লিগ ছাড়াই। লিগের জন্য কয়েকটি মন্ত্রক খালি রাখা হল।

১১ সেপ্টেম্বর — জিন্না বললেন, গৃহযুদ্ধ আসন্ন।

৬ অক্টোবর — জিন্না জানালেন, লিগ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেবে। সন্ধে নাগাদ বাংলার প্রধানমন্ত্রী সারওয়ার্দি জিন্নার কাছ থেকে ফোন পেলেন—যোগেন মণ্ডল অন্তর্বর্তী সরকারের মন্ত্রী হতে সম্মত কী না, জানতে ও জানাতে। গোপনতা রক্ষা করতে। রাত নটার খবরে দিল্লি থেকে সংবাদ প্রচারিত হল—অন্তর্বর্তী সরকারে লিগের পাঁচ মন্ত্রীর নাম।

জিন্না অন্তর্বর্তী সরকারে তাঁর প্রতিনিধিদের নাম ঘোষণা করলেন। তার চারটি নামই সবার জানা ও তাঁদের যোগ্যতা প্রশ্নাতীত। লিগের মন্ত্রিতালিকা কংগ্রেসের মন্ত্রিতালিকা থেকে অধিকতর সম্ভ্রান্ত ছিল। লিয়াকৎ আলি খান, আই-আই চুন্দ্রিগড়, আবদুর রব নিস্তার, গাজনফর আলি খান। পঞ্চম নামটি ছিল, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল।

পঞ্চম এই নামটি নিয়ে প্রায় বিশ্বব্যাপী আলোড়ন দেখা দিল—অন্তত ইংল্যান্ডে, আমেরিকায় ও ভারতে। কংগ্রেসে। ভাইসরয় ও ইন্ডিয়া অফিসে। ইয়োরোপিয়ান ব্লকে। লিগে। কাগজপত্রে। এতদিনের পুরনো স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতাদের নামধাম তো সকলের মোটামুটি জানা। এমন কী কে কোন উপদলে, তাও তো সবাব জানা। এ-নামটি কারো চেনা নয়।

লিগ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিচ্ছে—এই সিদ্ধান্তের পর খাজা নাজিমুদ্দিন তো নিশ্চিতই ছিলেন যে বাংলার প্রতিনিধিত্ব তাঁকেই করতে হবে। পটুয়াখালির ভোটে (১৯৩৭) হকশাহেবের কাছে সেই শ্বাসরোধী হার হেরে খাজা ভোটাতঙ্কে ভুগতেন। ৪৬-এর ভোটে তিনি দাঁড়াননি। কেন্দ্রীয় সরকারে তাঁর তো না-গেলেই নয়। তিনি কলকাতায় না-ফিরে খবর পাঠালেন তাঁর খাশ-বেয়ারা নোস্তাকে দিয়ে একটা ক্যাবিনসুটকেসে তাঁর লিস্টি অনুযায়ী পোশাক-আশাক ও ওষুধপত্র ভরে যেন পাঠানো হয়। সফিকুল যেন আপাতত ছ-মাসের ছুটি নেয়, উইদাউট পে। যখন দিল্লি আসব।

সফিকুল তাঁর এক ভগ্নীপতির ছেলে, মানে ভাগ্নে। বিলেতে পড়াশুনো শেষ করে এসেছে। একটা ব্রিটিশ ফার্মে কাজ শুরু করেছে, সেটার মালিক হওয়ার গোপন ইচ্ছায়। সফিকুলকে নাজিমউদ্দিন তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি করবেন।

নাজিমুদ্দিনকে জিন্না মন্ত্রী বানালেন না। বানালেন যোগেন মণ্ডলকে? একে হিন্দু তায় নিচু জাত? নাজিমুদ্দিন বলেও ফেললেন, 'এ-রকম মনোনয়ন অর্থহীন'।

গান্ধীজি বলে ফেললেন, 'নতুন কেন্দ্রীয় সরকারে আরো একজন হরিজন মন্ত্রী হলেন, এতে তো আমার খুশি হওয়ারই কথা। কিন্তু সত্যি খুশি জানালে তো নিজেকে ও জিন্নাশাহেবকে ঠকানো হবে। কারণ, জিন্নাশাহেব তো বলেন হিন্দু আর মুসলমানরা দুটো আলাদা জাতি। আর লিগ হচ্ছে একটি সাম্প্রদায়িক সংগঠন। তাই যদি, তবে তিনি একজন হরিজনকে কেন তাঁর প্রতিনিধি করেন?'

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ পরে লিখেছেন, '(মিঃ জিন্না) যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে মনোনীত করলেন। এমন মনোনয়নে সবাই মজাও পেয়েছিল, রেগেও গিয়েছিল। মিঃ সারওয়ার্দি যখন তাঁকে তাঁর মন্ত্রিসভার একমাত্র হিন্দু সদস্য বলে মনোনীত করেছিলেন, তখন তিনি বাংলায় প্রায় অপরিচিত ও সর্বভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর কিছু করার ছিল না। তাঁকে একটা দপ্তর দিতে হবে বলেই তাঁকে আইনমন্ত্রী করে দেয়া হয়। তখন ভারত সরকারের বেশির ভাগ সেক্রেটারিই ছিলেন ব্রিটিশ। তাঁরা প্রায় রোজই নালিশ করতেন মিঃ মণ্ডলের মত মেম্বারের সঙ্গে কাজ করা বড় মুশকিল।'

সম্রাট ষষ্ঠ জর্জকে বড়লাট লর্ড ওয়াডেল ১৯৪৭-এর ২৪ ফেব্রুয়ারি জানালেন, 'লিগের তপশিলি প্রতিনিধি মণ্ডল হয়েছেন আইনমন্ত্রী। তিনি গ্রামে-গ্রামে তপশিলিদের রাজনৈতিক মিটিং করে বেড়ান।'

সম্ভাব্য পাকিস্তানের নিশ্চিত প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান ও তাঁর অনুগামী লিগনেতারা জিন্নার এই মনোনয়নে বিরক্ত হয়েছিলেন ও যোগেনকে পাকিস্তানের গণপরিষদের অস্থায়ী সভাপতি করতে চান না। জিন্নাশাহেবের আদেশে মানতে বাধ্য হন।

যোগেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বাংলার উচ্চবর্ণের হিন্দু নেতারা, এমন কোনো নোংরা কথা নেই যা বলেননি। উচ্চবর্ণের এই হিন্দু নেতারা শুধুই কংগ্রেসের বা হিন্দু মহাসভার সমর্থক নন, এমনকী বামপন্থী হিন্দু নেতারাও তাঁর সম্পর্কে ঘৃণা প্রচার করেছেন। এখনো করেন।

তার একটিই মাত্র কারণ।

১৯৩৭-এর ভোটে মুসলিম-মন্ত্রিসভার শাসনে বসবাস বাঙালি উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কাছে ছিল ধিক্কারময় এক বন্দীজীবন—যুদ্ধে দখল-হওয়া শহরের বা দেশের অধিবাসীদের যেমন হয়। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ১৯৪৭-এ বাংলা ভাগের পক্ষে আন্দোলনের সময় সর্বত্র এই কথা প্রচার করেন যে—দীর্ঘ মুসলমান শাসনে বাংলার হিন্দুদের সমস্ত সম্পদ লুট হয়ে গেছে, হিন্দু সংস্কৃতি ও ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে পরাজিতের সংস্কৃতি ও ধর্ম, মুসলমানদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রেখে বাঙালি হিন্দু বাঁচতে চায়, পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গকে নিয়ে আমরা হিন্দুপ্রধান একটি প্রদেশ চাই, সে-প্রদেশ ভারতের সঙ্গে যুক্ত থাকবে।

শ্যামাপ্রসাদের হিন্দু সব সময়ই উচ্চবর্ণ হিন্দু। ফজলুল হকের দুই মন্ত্রিসভা, নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রিসভা ও সারওয়ার্দির মন্ত্রিসভায় হিন্দু মন্ত্রীরা উচ্চবর্ণ হিন্দুদের যথাযথ প্রতিনিধি বলে স্বীকৃতই হননি—সে নলিনী সরকার, স্যার বিজয়, তুলসী গোস্বামী যেই হন না কেন। বাঙালি সমাজে এদের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি সত্ত্বেও উচ্চবর্ণ হিন্দুদের কাছে তপশিলিদের হিন্দু-প্রতিনিধিত্বই ছিল সবচেয়ে আপত্তিকর। মহারাজা শ্রীশ নন্দীই হন আর রাজা প্রসন্নদেবই হন—এদেরকেও বাঙালি হিন্দুরা ডাকতেন, লোকাস্ট।

উচ্চবর্ণ বাঙালি হিন্দু যে কাকে হিন্দু বলে মানতে চাইতেন, তার হদিশ করাই মুশকিল। মনে হয়, বাঙালি হিন্দুদের উচ্চবর্ণের এই জাতপাত বোধ গোপন ও বংশানুক্রমিক রক্তব্যাধির মত হয়ে গেছে ও এই মনোভাব লালন-পালন করতেন অশিক্ষিত, হতদরিদ্র, ভিক্ষাজীবী, দাননির্ভর পুরোহিতরা। যে-কোনো মাঝারি আয়ের বাড়িতেও বাঁধা পুরোহিতের সিদ্ধান্ত চরম ছিল যে-কোনো অবৈষয়িক ব্যাপারে। কখনো-কখনো বৈষয়িক মামলা-মোকদ্দমাতেও। যজমানের স্বার্থ ও ইচ্ছা বুঝে নিয়ে এঁরা হত্যা ও ধর্ষণসহ যে-কোনো বিধান দিয়ে দিতেন। এই প্রতিপত্তি ও অধিকার ব্রাহ্মণ ছাড়া কারো ছিল না। বাংলায় হিন্দু রক্ষণশীলতার এই ব্রাহ্মণ-নির্ভরতার সংক্রমণ সমাজে ব্যাপক ছিল। বাঙালি হিন্দু কাকে, সৎ হিন্দুর মর্যাদা দেবে তার কোনো সূত্র নেই। তুলসী গোস্বামী তো গোঁসাই-বামুন, জমিদার। তাঁকেও যে হিন্দুরা হিন্দুপ্রতিনিধি মানতে চাইত না, তার হয়তো একটা কারণ, তুলসী গোঁসাইয়ের আধুনিকতা। মুর্শিদাবাদের নওদী জমিদারদের দানে যারা জীবনধারণ করত, তারা তাঁদের বা কাউকেই ভুলতে দিত না যে ওঁরা তিলি। শোভাবাজার রাজবাড়ির কৃপা ছাড়া যাদের চলত না, সেই বামুনরা তাদেরই বিরুদ্ধে প্রকাশ্য মত দিত, 'দেব আবার কায়স্থ হল কবে?' প্রসন্ন দেব রায়কতদের তো ভারতের আদিবাসী ভাবতেন এঁরা।[১]

আর-কোনো প্রদেশে বা জনগোষ্ঠীতে ব্রাহ্মণদের বিচার বা ব্রাহ্মণোচিত বিচার জাতপাতের প্রধান নিয়ামক নয়। অব্রাহ্মণ বর্ণহিন্দুও ব্রাহ্মণদের মত পারিবারিক রীতিনীতি মেনে চলতে চান ও সমাজে যদি তাঁর প্রতিষ্ঠা থাকে, তা হলে তিনি বামুনদের মতই বিধান দেন।

সেই হিন্দু গৌরববোধ থেকেই বাংলার উচ্চবর্ণের হিন্দু নেতারা—কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার, আর তার বাইরের নেতারাও, তাঁদের সমস্ত শক্তি ও চাতুর্য ব্যবহার করে বাংলা বিভাজনে কেন্দ্রীয় কংগ্রেসকে রাজি করান। বাংলা বিভাজন কোনো পক্ষেরই রাজনৈতিক লক্ষ ছিল না। জিন্না তো এমন কী 'স্বাধীন বাংলা'র হুজুগ শুনে বলেছিলেন, 'ভালই তো। ওরা আলাদা হলে ভাল থাকবে একসঙ্গে।' যুদ্ধের পর ব্রিটেন সত্যি করেই বিপদে পড়েছিল। যুদ্ধের সময় ভারত

১. ঋতুপর্ণ ঘোষ তাঁর 'অন্তর মহল'-সিনেমায় বর্ণহিন্দুদের শাহেব-আনুগত্য ও ব্রাহ্মণ-আনুগত্যের বীভৎসতা অতুলনীয় যাথার্থে দেখিয়েছেন।

থেকে লোহা-সিমেন্টের মত দরকারি জিনিস ও বোমা-তৈরির একটা বিশেষ উপকরণ এত বেশি নিয়েছে যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার কাছে ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ডের ধার হয়ে গেছে লক্ষ-লক্ষ পাউন্ড। সেই কারণে যুদ্ধের একেবারে শেষ-সময় থেকেই ব্রিটিশ সেনাপতি, প্রধানমন্ত্রী এটলি ও ভাইসরয়দের এমন প্রাণান্তিক চেষ্টা ভারতকে ঘাড় থেকে নামাতে। ব্রিটেনের তখন একমাত্র উদ্দেশ্য, ভারতশাসনের দৈনিক খরচা কমানো। পাউন্ড বাঁচানো। সেই খরচার অনেকটাই ব্রিটিশ সৈন্যদের ও অফিসারদের মাইনে দেয়ার খরচা। ভাঁড়ে মা ভবানী নিয়ে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা জানে না আগামীকাল বাজার হবে কী না। ব্রিটেন যাকে বলে ক্ষমতা হস্তান্তর, ভারতীয়রা যাকে বলে স্বাধীনতা, পাকিস্তান যাকে বলে পার্টিশন—সেই ঘটনা ঘটল ১৪-১৫ আগস্ট, ১৯৪৭। তার আগেই ব্রিটিশ সৈন্যদের দেশে ফেরত পাঠানো শুরু হয়ে গেছে। এমন কী, প্রাদেশিক গভর্নররাও জানতেন না। এটা যেন সামরিক সিদ্ধান্ত। পাঞ্জাবের গভর্নর যখন লাহোরের গৃহযুদ্ধ থামাবার জন্য ও বাংলার গভর্নর যখন কলকাতার দাঙ্গা থামাতে মিলিটারি তলব করছে, তখন প্রায় কোনো ব্রিটিশ ট্রুপই নেই দিল্লিতে বা ফোর্ট উইলিয়ামে। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা—স্বাধীনতার আগে ও পরে—পাঞ্জাবে বাংলায় বিহারে ঘটেছিল ব্রিটিশ ইনডিয়া থেকে ব্রিটিশ সৈন্য দেশে পাঠিয়ে দেয়ার ফলে অনিবার্য প্রশাসনিক শূন্যতায়। সেই শূন্যতা সম্পর্কে গোপনতায়। ও প্রকাশ্য মিথ্যাচারে। মাউন্টব্যাটেন তো যখন-তখন লন্ডন যেতেন শলাপরামর্শ করতে। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা তাঁর দ্রুততায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রস্তাব পর্যন্ত নেয়। সে-রকমই এক আলোচনায় ক্রিপসই বোধহয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন—এই অবিশ্রান্ত দাঙ্গা থামানোর জন্য কোনো ব্যবস্থা নিয়েছেন। মাউন্টব্যাটেন তাঁর ইতিমধ্যে বিখ্যাত জনচিত্তহারিতা দিয়ে পুরো ব্রিটিশ মন্ত্রিসভাকে এই মিথ্যা বললেন যে আমি হুকুম দিয়েছি এয়ারফোর্সকে নিচু থেকে স্ট্রাইক যেখানেই গোলমাল দেখবে, সেখানেই বম্বিং করবে। অকপট এই মিথ্যা মাউন্টব্যাটেন ব্রিটিশ মন্ত্রিসভাকে বললেন, যখন পাঞ্জাব থেকে বা পাঞ্জাবের দিকে, ট্রেন যাতায়াত করছে শুধু মৃতদেহ নিয়ে ও ভারত সরকারের রেলদপ্তর রেলযাত্রাকে বিপদসঙ্কুল ঘোষণা করেছেন। প্রোটোকলচালিত ব্রিটিশ প্রশাসনের মাথায় যে-মন্ত্রিসভা তাঁদের কারো কাছ থেকে এই প্রশ্নটি এল না যে এয়ারফোর্সকে কী করে ভাইসরয় 'হুকুম' করতে পারেন, সেটা তো সি-ইন-সির বিষয়।

কিন্তু ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা তখন মিথ্যাই শুনতে চায়।

ভারত ভাগ করেও যে ভারত ছাড়তে হবে এমন একটা নীতি তৈরি করতে ও 'ক্ষমতা হস্তান্তর'-এর জন্য একটা সময়সীমা দিয়ে মহারানি ভিক্টোরিয়ার পুতি আর সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের ভাগ্নে মাউন্টব্যাটেনকে নতুন নীতির নতুন রূপকার বানিয়ে দুনিয়া-ভর ঢাকঢোল পিটিয়ে 'শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের' ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ব্রিটিশ সূর্য এখন, যেখানে পারে সেখানেই ডুববে। ১৯৪৭-এর ৫ জানুয়ারি সেই বিতর্ক শুরু হল ব্রিটিশ পার্লামেন্টে। ৬ জানুয়ারি চার্চিল বিরোধী পক্ষের নেতা হিশেবে গবর্মেন্টকে তুলোধোনা করলেন, 'পার্টিশনে আর কুলবে না, এখন খণ্ড-খণ্ড করতে হবে। লাস্ট ডেট দিয়ে দেয়া হচ্ছে ১৪ মাসের। এ তো গিলোটিনের ব্যবস্থা। এই সময়ের মধ্যে কোনো দরকারি কথাই বলা হবে না। নেহরুকে দিয়ে 'অর্ন্তবর্তী' এক সরকার খাড়া করাই হয়েছে সর্বনাশা ভুল। সেই 'অর্ন্তবর্তী' ক্ষমতার চার মাসে দাঙ্গায় যা খুন হয়েছে, তার আগের ৯০-বছরে তেমন হয়নি।'

প্রধানমন্ত্রী এটলি তোতলাতে তোতলাতে উত্তর দিলেন, 'ভারতে তো অর্থের বৈষম্য আছেই। কিন্তু সে তো আমাদের পুরো রাজত্বকাল জুড়েই আছে। অপদার্থ জমিদারগুলোকে খেদিয়ে আমরা কোনো সমাজবিপ্লব ঘটাতে চাইনি। সুদখোর মহাজনদের ঠেকানোর জন্য কিছু চেষ্টা হয়েছে

বটে কিন্তু সেও তো কিচ্ছু নয়। আমরা তো ভারতের আর্থ-সামাজিক অবস্থা মেনে নিয়েই ওখানে আছি। এখন, যখন আমরা চলে আসতে চাই তখন বলা হচ্ছে, আমাদের দায়িত্ব পালন করে আসতে হবে। কিন্তু দায়িত্বটা আমাদের ওপর এল কখন?

তখনো ভাইসরয় ওয়াভেলকে একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন, ব্রিটেনের সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্সের ডিরেক্টার স্যার নরম্যান পি. এ. স্মিথ—এক তেতো বিষাদে এমন নিষ্ঠুর সত্য এত সহজ স্বরে আর কোনো ব্রিটিশ অফিসার বলেননি। 'খেলা তো জমে উঠেছে। কংগ্রেস আর লিগকে একটা কেন্দ্রীয় সরকারে ঢোকানো গেছে। ফলে ভারতীয় রাজনীতিকে তার সাম্প্রদায়িকতা খেলার জন্য একটা সাইজমত কোণে গুঁজে দেয়া গেছে। এখন আমাদের শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে [ভারত] ছেড়ে চলে আসার সুযোগ এল। ...হাঁফ ছাড়ার জন্য যেটুকু সময় পাওয়া গেছে তার পুরো সদ্ব্যবহার করতে হবে।...যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেক্রেটারি অব স্টেটকে বেসরকারি অফিসিয়্যালদের দায়দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেয়া উচিত। এতে অফিসারদের মঙ্গল হবে। আর, এমন একটা ব্যবস্থার রাজনৈতিক সুবিধেও আছে। সমস্যাটাকে ঠিকঠাক সাম্প্রদায়িক স্তরে আটকানো যাবে। যত বড় দাঙ্গাই হোক, তাতে যেন আমরা কোনোভাবেই জড়িয়ে না পড়ি। জড়িয়ে পড়লেই ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়ে যাবে।...সাম্প্রদায়িকতা যত ভয়ংকরই হোক, ভারতের সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায়ও তো বটেই।'

যুদ্ধে সর্বাধিকতম পাপ ঘটে যুদ্ধবিরতির পর।

তখন সত্য ও মিথ্যার ভিতর আর কোনো বাফার-দেয়ালও থাকে না।

তখন জাপানের হার ঘটে যাওয়ার পর আত্মসমর্পণটুকু যখন বাকি তখন অ্যাটম বোমার ধ্বংসক্ষমতা হাতেকলমে পরীক্ষা করতে হিরোসিমাতে অ্যাটম বোমা ফেলা হয়।

তখন মাউন্টব্যাটেন ভারতভাগের নকশা তাঁর প্রাইভেটতম লকারে তালাচাবি দিয়ে আটকে রেখে ভারতের নেতাদের সঙ্গে মিটিং-য়ের পর মিটিং করে যান—সংবিধান পরিষদ নিয়ে, কংগ্রেসকে ও লিগকে দেশভাগে রাজি করাতে, কংগ্রেসকে পাকিস্তান মানাতে, লিগকে বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগে রাজি করাতে, সীমান্ত কমিশন তৈরি করতে, একাধিক কমিশনের জায়গায় একজনকেই দুই কমিশনের চেয়ারম্যান বানিয়ে বহুত্ব রক্ষা করতে।

ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব মেনে নিতে ও গণপরিষদে যেতে কংগ্রেস রাজি হওয়ায় ১২ মার্চ (৪৭) বম্বের সাংবাদিক সম্মিলনে জিন্না জানালেন—'আমরা পাকিস্তান কোনোদিনই চাইনি। ঐ নামটি আমাদের শত্রুপক্ষ কংগ্রেস আমাদের উপহার দিয়েছে. ইনশা আল্লা, আমরা পাকিস্তানই পাব।' কংগ্রেস তখনো বলছে—পাকিস্তান মানছি না, কয়েকটি মুসলমান-প্রধান জেলামাত্র ছেড়ে দিতে পারি।

২ মার্চ ৪৭-এর মধ্যরাতে মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে ঠিক হল, জিন্না দেখা করে বললেন, পরের দিন সকালে নেতৃ সম্মিলনে মাউন্টব্যাটেন তাঁর যে-প্ল্যান ঘোষণা করবেন, তাতে পূর্ণ সম্মতি জিন্না দিতে পারছেন না। অ্যালান কেম্বল জনসনের ডায়ারি অনুযায়ী মাউন্টব্যাটেন নাকী ধমকে ওঠেন যে এত পরিশ্রমের ফলে যে সমাধান বেরিয়ে এসেছে তা একা জিন্নাকে নষ্ট করতে দেবেন না। পরদিন সকালে সমস্ত রাজনৈতিক নেতা ও প্রাদেশিক গভর্নরদের সামনে মাউন্টব্যাটেন তাঁর প্ল্যান ব্যাখ্যায় বলবেন, যে 'মিঃ জিন্না আমাকে এমন আশ্বাস দিয়েছেন যে আমি সেই আশ্বাসকে তাঁর সম্মতি ধরে নিতে পারি, ও জিন্নার দিকে তাকাবেন, জিন্না তখন যেন সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়েন, জিন্নাকে পাঞ্জাব-বাংলা ভাগে সম্মত হতে বাধ্য করার জন্য মাউন্টব্যাটেন নিজে লন্ডনে গিয়ে অসুস্থ চার্চিলের সঙ্গে দেখা করে তাঁর কাছ থেকে তাঁর

(চার্চিলের) নিজের হাতে লেখা এক হাত চিঠি নিয়ে আসেন, তাতে চার্চিল লিখেছিলেন, 'যা পাচ্ছ নিয়ে নাও, এরপর তাও পাবে না।' এই হাতচিঠিই ছিল মাউন্টব্যাটেনের শেষ অস্ত্র।

নিজের এই মিথ্যাচারণকে প্রায় সত্যের মত দেখাতে মাউন্টব্যাটেন শর্ত করেছিলেন, দেশভাগের নীতিতে রাজনৈতিক নেতারা একমত হলে, ১৫ আগস্ট ক্ষমতা হস্তান্তর হবে ও তার পরে সীমান্ত কমিশনের রিপোর্ট খোলা হবে—কোথায় হিন্দুস্তান আর কোথায় পাকিস্তান জানতে। মাউন্টব্যাটেন চান না, স্বাধীনতা-উৎসবে কোনো মালিন্য লাগে।

নতুন দুটো স্বাধীন দেশ বানাতে তাঁকে যে-সময় দেয়া হয়েছিল—সেই সময়ের আগেই র‍্যাডক্লিফ তাঁর কাজ শেষ করে, রিপোর্ট জমা দিয়ে লন্ডনে ফিরে যান।

সেই পুরনো ম্যাপটি ছিল। প্রদেশগুলিকে গুচ্ছ করে ব্রিটিশ, ক্যাবিনেটের ভারত-পাকিস্তানের ম্যাপ—প্রথমে স্যার স্ট্যাফোর্ড-এর হাত দিয়ে, তারপর ক্যাবিনেট মিশনের হাত দিয়ে। র‍্যাডক্লিফের কিছু করারই ছিল না।

যে-দেশে তিনি কখনো আসেনই নি, সেই দেশ ভেঙে ম্যাপ তৈরি হয়ে ছিল ছ-বছর আগে। ছ-বছর ধরে। আলোচনা তো হচ্ছিল—নাম নিয়ে। একটা হিশেবই মাউন্টব্যাটেনের মেলে নি। তিনি মুখ ফুটে চেয়েছিলেন—দু দেশেরই গভর্নর-জেনারেল ও কম্যান্ডার-ইন-চিফ ও থাকতে। তা হলে ইতিহাসে একটা নামটাম পাকা হত। নেহরুকে বলতে হয় নি, নেহরু ও প্যাটেলই তাঁকে ধরাধরি করে রাজি করান। তিনি নিম-রাজি হওয়ার ভানটুকু রাখতে পারলেন।

কিন্তু ইতিহাসের অমরতা বাংলায় পুকুরের জলের ভিতরের গর্তের মহাশোল মাছের মত পিচ্ছিল। শুদ্দুরের হাত ছাড়া আর কোনো রাজদণ্ড মাছের গতির চাইতেও তীব্রতর গতিতে গর্তে ঢুকে মহাশোলের গলা মোক্ষম মুঠোতে ধরে বের করতে আনতে পারে না।

মাউন্টব্যাটেন মাস চারেকে যুদ্ধোত্তর সাম্রাজ্যের পাট গোটালেন। শেষ পর্যন্ত জিন্নাকে আলাদা করে বলতে হল। বলার জন্য ভাবতে হল। প্রথমে কম্যান্ডার-ইন-চিফ হতে চাইলেন। পাকিস্তানেরও। জিন্না বললেন, 'সে কী করে হবে? দুনিয়ার লোক ভাববে আসলে পাকিস্তান হয়ই নি। যা ছিল তাই আছে। বড়জোর কোর্ট অব ওয়ার্ডস হয়েছে।

মাউন্টব্যাটেনের তখন আর লাজলজ্জা নেই। জিন্নার কথায় ব্যারিস্টারি প্যাঁচটা কাটাতে না পেরে বলে বসলেন—'তা হলে আমাকে টিটুলার হেড করুন। গভর্নর-জেনারেল উইথ অনলি অ্যাডভাইসারি পাওয়ার।'

জিন্নার একটা মুদ্রা ছিল—আঙুল খেলাতেন। সে-রকম খেলিয়ে বলতেন, 'তা হলে আমি কী হব? দেশটা তো আমার? না কী?'

'আমি না হলে পেতেন আপনার পাকিস্তান? আর আমাকে বছর খানেকের জন্য গভর্নর জেনারেল করার ভদ্রতা নেই?'

'আমি নিতে রাজি না হলে আপনার পাকিস্তান নিত কে? তেমন হলে বলুন, আমি আপনার সম্মানরক্ষার জন্য পাকিস্তান রিফিউজ করতে পারি।'

'দোহাই, এই উপকারটুকু স্থগিত রাখুন।'[১]

সীমান্ত কমিশনের কাজে ভাইসরয় কোনোভাবেই নাক গলাবেন না—এই প্রতিশ্রুতি যে তিনি রক্ষা করেছেন তার প্রমাণ হিশেবে র‍্যাডক্লিফ যেদিন রিপোর্ট জমা দিলেন সেদিন মাউন্টব্যাটেন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বাইরে কোথায় গিয়েছিলেন। পাছে এটা কারো নজর এড়িয়ে

---

[১] এই গল্পটা কিন্তু সত্যি।

যায় মাউন্টব্যাটেন সাংবাদিকদের কাছে সন্ধ্যায় বলেন, 'আমি তো ঠিক জানি না। আমি বাড়ি ছিলাম না। কমিশন কী করেছেন তার বিন্দুবিসর্গও আমি জানি না।' যিনি বলছেন তাঁর নিজের ব্যক্তিগত লকারে তৈরি ভারত-পাকিস্তানের মানচিত্র ছিল। হিন্দু মহাসভার নেতা এন সি চ্যাটার্জি ছিলেন ব্যারিস্টারিতে র‍্যাডক্লিফ-এর সহপাঠী। একজন ফার্স্ট হয়েছিলেন, একজন সেকেন্ড। খুব সম্ভবত তিনি পুরনো বন্ধুর কাছ থেকে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশটি উপহার হিশেবে চেয়ে এনেছিলেন।

একটা অদ্ভুত ও কৌতুককর মিল।

সিরাজদৌল্লার সঙ্গে ইংরেজেরা যুদ্ধে যাবে কী যাবে না, তা নিয়ে ক্লাইভ ও তার সমতুল্য আর-এক সেনাপতির মধ্যে তুমুল মত পার্থক্য ঘটে আগের রাতে। তারপর ক্লাইভ একটা সই জাল করে দেখান যে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যুদ্ধ করতে বলেছেন। পরদিন সকালে ক্লাইভ চললেন জালি যুদ্ধ জিততে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসানও হল এই জালিতে ও মিথ্যায়। মাউন্টব্যাটেন ভাইসরয় হতে রাজি হচ্ছিলেন। তিনি ব্রিটিশ নৌবাহিনীর ফার্স্ট অ্যাডমির‍্যাল হতে চান। সেই পোস্টটা খালি হবে ৪৮ সালের জুন নাগাদ। তাই এটর্লি ঘোষণা করলেন ৪৮ সালের জুনের মধ্যে ক্ষমতা-হস্তান্তর হবে। মাউন্টব্যাটেন একই সঙ্গে দুই চাকরির ব্যবস্থা করলেন।

মাউন্টব্যাটেন কখনো মিথ্যা ছাড়া সত্য বলেননি।

১. ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণ শুরু হয়ে গেছে গভর্নরদের জানাননি।

২. গভর্নরদের নির্দেশ দিয়েছেন—কোনো ভাবেই দাঙ্গার দায়িত্ব যেন ব্রিটিশ সৈন্যের ওপর না চাপে।

৩. ভারতের নেতাদের বোঝান—দেশভাগে সম্মত হওয়া পর্যন্ত তাঁদের অধিকার। কোনটা হিন্দুস্থান, কোনটা পাকিস্তান সেটা ঠিক করবে স্বাধীন দুটি সীমান্ত কমিশন। যদিও দেশভাগের ম্যাপ তাঁর ড্রয়ারে।

৪. দাঙ্গা দেখে ভয় পেয়ে নেহরু ও প্যাটেল দুজনে মাউন্টব্যাটেনকে অনুরোধ করলেন—স্বাধীনতার তারিখ এগিয়ে দিন। মাউন্ট ব্যাটেন এগিয়ে দিলেন— ১৪/১৫ আগস্ট ১৯৪৭।

মাউন্ট ব্যাটেন কি পূর্বজন্মের লর্ড ক্লাইভ?

এই এত বড় আন্তর্জাতিক বিনিময়ে এই শূদ্রসন্তান কোত্থেকে এল?
কোত্থেকে আসে?

কে ও?
কে চেনে ওকে?

ও কি মুসলমান হয়ে গিয়েছিল?
বাংলার সব মুসলমানই তো প্রাক্তন শূদ্র—যোগেন মণ্ডলেরও হতে ক্ষতি কী?

ও তাহলে মোল্লা না-হয়ে মণ্ডল থাকছে কেন?
যোগেন মোল্লা নাম তো খারাপ নয়?

যোগেন মোল্লা বললে লোকজন অন্তত বুঝতে পারত যে জিন্নাশাহেবের অন্তর্বর্তী সরকারে কোনো হিন্দুকে পাঠিয়ে লিগের সর্বজাতীয়তা প্রমাণ করতে চাননি?

তিনি একজন গুপ্ত মুসলমানকেই পাঠিয়েছিলেন?

তাও ঠিক না?

কেন?

মুসলমানদের মধ্যে মণ্ডল হয় না?

হয়তো?

তাহলে?

একটা চাঁড়াল গিয়ে বসল রাজসিংহাসনে?

বরিশালের বাইরে ওকে চেনে কে?

বরিশালই-বা কেন? বরিশালে কি নেতার খুব অভাব পড়েছে?

ঐ গৌরনদী থানার বাইরে, যেখানে ওর বাড়ি?

বাড়ি আছে?

চাঁড়ালের আবার বাড়ি?

থাকত গ্রামে, প্র্যাকটিস সবে শুরু করেছিল বরিশালে, কলকাতায় এমএলএ হয়ে এসে হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করল কী করে?

শরৎ বোসের জুনিয়ার হয়ে?

শরৎ বোস কি যাকে-তাকে জুনিয়ার নিতেন?

ঐ হয়তো কোর্টে শরৎ বোসের সেরেস্তা বইত, তাতে কিছু বকশিস পেত?

কিন্তু যোগেন মণ্ডলের দোষটা কী?

ও কি টুপাইস করে নিয়েছে—কলকাতার, ইস্পাহানিদের মত?

প্রকিওরমেন্টের এজেন্সি পেয়ে?

ও কি দালাল—প্রাসাদ বিক্রি করে ১০০-২০০ শতাংশ লাভ করেছে—ভারত স্বাধীন হচ্ছে রটে যাওয়ার পর বিদেশিদের কাছে প্রাসাদের দর খুব বেড়ে গেছে, সব দেশের রাষ্ট্রদূতাবাসের জন্য? জিন্নাশাহেব তো তাই করেছেন?

যোগেনও হয়তো তাই করত, যদি তার প্রাসাদ থাকত?

মৈস্তারকান্দি ওর বাড়ি যেখানে, সেই খালের দ্বীপে এখনো পৌঁছুতে হয় এক কোমর কাদা ও এক বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে।

দেশে গেলে থাকতে হত শ্বশুরবাড়ি।
বাড়িতে ঘর নেই।

বরিশালে থাকত এক মোক্তার বন্ধুর সঙ্গে।
কলকাতায় নিজের আত্মীয়দের বাড়ি।

তাহলে? ভারত ভাগের আন্দোলনে তার ইন্টারেস্ট কী?
কিছু না।

অপরাধ কী?
শুদ্দুর হয়ে জন্মানো।

১৭৯

যোগেন অন্তর্বর্তী সরকারে

অন্তর্বর্তী মানে কী?
ইনটেরিম। কোর্টের ইনটেরিম অর্ডার হয় না?
ও? ফাইন্যাল অর্ডার ইস্তক? আপাতত?
আপাতত আবার স্বাধীনতা হয় না কী?
হওয়ালেই হয়—ইনটেরিমের পর ডোমিনিয়ন?
সেটাই ফাইন্যাল তো? ফাইন্যাল অর্ডার?
দুটো আলাদা ডোমিনিয়নে আলাদা ফাইন্যাল।
ও? তা হলে ইনটেরিমটা কার, ইনটেরিম?
ওটা ধরে নিত হবে। বিষুব রেখা যেমন ধরে নেয়া।
কোন রেখাটা ধরব, ইনটেরিম বলে?
দুটো সীমানা কমিশনের একজন চেয়ারম্যান যা দাগিয়েছেন।
সেটা তো বর্ডার, পার্টিশন?
হ্যাঁ, হ্যাঁ, বর্ডার বা পার্টিশন। অনন্ত অন্তর্বর্তী।

নানা নামই আছে।

ইনটেরিম সরকার। অন্তর্বর্তী সরকার। নেহরুর প্রথম সরকার। মাউন্টব্যাটেনের একমাত্র সরকার—অন্তর্বর্তী সরকারের কর্তা কে? ভাইসরয় ছাড়া কেউ তো কর্তা হতে পারে না।

এটা প্রথম তৈরি হয়েছিল ১৯৪৬-এর সেপ্টেম্বরে। তাতে লিগের পাঁচজন যোগ দিল

অক্টোবরে। কিন্তু মোট সংখ্যা তো ১৪-র বেশি হতে পারবে না। লিগের জন্য খালি রাখা ছিল দুটো পদ। সেখানে পাঁচ এলে তিনজন বেশি হয়ে যায় না? সুতরাং তিনজন কমাতে হবে। কমানো হল শরৎ বোসকে ও আর-দুজনকে।

কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিশেবে মৌলানা আজাদ এলেন না? না। তাঁর সঙ্গে সিমলা বৈঠকে জিন্না হ্যান্ডশেক পর্যন্ত করেন নি। চাইছেন একটা সরকার বানাতে আর প্রথম থেকেই রগড়াবেন?

অন্তর্বর্তী সরকারের মিটিং বসত, বড়লাটের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বারদের মিটিঙের ঘরে। প্রতিদিনই। অফিসের মত। প্রতিদিনই ভাইসরয়ের সভানেতৃত্বে। কারণ, ভাইসরয় উইথ কাউন্সিলের মতই, ইনটেরিমও উইথ ভাইসরয়।

প্রত্যেক দিন সকাল শুরু হত, গত সন্ধ্যার মিটিঙের পর নতুন দাঙ্গার খবর দিয়ে। ভাইসরয় সামনে একটা আথালিক ম্যাপ ছড়িয়ে বসতেন। তাঁর সেক্রেটারি জনসন, রেডিওগ্রামের কাগজ থেকে নামগুলি পড়ে যেতেন। মাউন্টব্যাটেন তাঁর পাশে রাখা কুশন থেকে একটা করে পিন তুলে গাঁথতেন। পিনগুলোর সঙ্গে হয় সবুজ না-হয় শাদা ডট্ কাগজ লাগানো থাকত। আক্রমণকারীরা মুসলমান হলে সবুজ পিন, অমুসলমান হলে শাদা পিন।

চৌদ্দ জন মন্ত্রী। গোলটেবিল। কাঠের পিঠ উঁচু চেয়ার। দেয়াল ঘেঁষে সেক্রেটারির। কেবিনেট সেক্রেটারি ও সি-ইন-সি আকিনলেক আলাদা দুটি চেয়ারে। তাঁদের পেছনে বোধহয় তাঁদের দুই সেক্রেটারি। পাগড়ি-পালক পরা বেয়ারারা আসছে যাচ্ছে, জল-চা-কাজু নিয়ে ঘুরছে, বেরিয়ে যাচ্ছে। কথাবার্তা চাপা গলাতেই হয়—বড় জোর একেকটা ঘরঘর আওয়াজ ওঠে মাঝে-মাঝে। উঠলেই সবার কানখাড়া হয়। হয় বলদেব সিং ঘুমিয়ে পড়েছেন, না-হয় লিয়াকত আলি কোনো বাগড়া তুলেছেন, যার জবাব হয় না।

প্রতিদিন দশটা-পাঁচটা যদি একটা মিটিং চলে, তা হলে বসার চেয়ার ও জায়গাটাও মোটামুটি পাকা হয়ে যায়। মাউন্টব্যাটেনের ডান দিকে বসতেন জওহরলাল, বাঁ দিকে বসতেন লিয়াকত আলি। জওহরলালের চেহারা ও পোশাক তো সকলেরই চেনা—ধুতি, কুর্তা আর জওহরকোট, গান্ধীটুপি। কারো কারো মাথাতেই কোনো টুপি থাকত না—পাঞ্জাবিদের পাগড়ি ছাড়া। পাকিস্তানের চারজনই স্যুট-কোট-টাই পরতেন, যোগেন পরতেন ধুতি-পাঞ্জাবি। বসতেন বলদেব সিং আর লিয়াকত আলির মাঝামাঝি। এই মাস দশেক মন্ত্রিসভায় অহরহ একসঙ্গে বসা সত্ত্বেও একটা দিনও এমন কোনো উপলক্ষ ঘটে নি যে জওহরলাল যোগেনের সঙ্গে কথা বলছেন। যোগেনেরও তেমন কোনো কারণ ঘটে নি। পরোক্ষে অবিশ্যি দু-একবার হয়েছে। যেমন যোগেন যোগ দেয়ার পরপরই মন্ত্রিসভায় যোগেন বলেছিলেন, এটা খুব অদ্ভুত ঠেকছে যে সমস্ত সমাধান যে-প্রদেশের ওপর নির্ভর করছে বা এখানকার সমাধানের ওপর যে-প্রদেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সবচেয়ে বেশি, সেই বাংলার কোনো প্রতিনিধি এই মন্ত্রিসভায় নেই।

প্রথমে সবাই চুপ করে গেলেন, যেন যোগেনের কথাটা একেবারে অবান্তর। তারপর, প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার জন্য, মাউন্টব্যাটেন তাঁর সামনে রাখা ফাইলের পাতাগুলির কোনা দুটো-একটা নাড়িয়ে মুখটা নিচু রেখেই সামান্য হেসে খুব চাপা গলায় বললেন, আমাদের অবিশ্যি তেমন মনে হচ্ছে না, বরং মাননীয় মিস্টার মণ্ডলের দিকে তাকিয়ে আমরা বাংলাকে যথেষ্ট উপস্থিত মনে করছি।

বিশেষ করে সেক্রেটারিরা হেসে উঠল, যেন কথাটা বলার সময় যোগেন নিজে যে বাঙালি সেটাই ভুলে গিয়েছিল।

ঘটনার এমন একটা মোচড় প্রায়ই ঘটত, অসাবধানতায়। অসাবধানতা কখনো মনে হত

বুঝি বলদেব সিঙের বা যোগেনেরই। পরে মনে হতে পারত, অসাবধানতা ছিল তাঁদেরই বোঝায়, যারা তাঁদের কথা শুনে হাসতেন। একদিন যোগেন জিগগেস করেছিল—বাংলার দাঙ্গা বললেই তো আমরা বুঝে নিচ্ছি হিন্দু-মুসলমান। পাঞ্জাবের দাঙ্গা বললেই আমরা বুঝে নিচ্ছি হিন্দু-শিখ ও মুসলমানের দাঙ্গা। কিন্তু বাংলাতেই হোক আর পাঞ্জাবেই হোক, যে দুটি সম্প্রদায়ের দাঙ্গা, সেই দুটি সম্প্রদায়ের বাইরেও তো অনেক মানুষ থাকেন, যেমন, তপশিলিরা, তাঁরা কী করছেন।

সকলেই ধরে নিয়েছেন, যোগেনের তৃতীয় পক্ষ কাল্পনিক। এতেই সবাই এমন হেসে উঠলেন।

বিহারের দাঙ্গা নিয়ে প্যাটেল বললেন, গভর্নর নাকী বরাবরই বলছেন, সাহেবরা যেন কোনো ভাবেই দাঙ্গা-হাঙ্গামায় থার্ড পার্টি না হয়ে যায়।

তখন কেউ আর হাসে নি।

১৫ আগস্টের সপ্তাহ ছয়েক আগে পাঞ্জাবে, লাহোর-অমৃতসরে, আগুন লুটপাট ও হত্যা যে-কোনো যুদ্ধের চাইতেও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা বারবার পাঞ্জাবের গভর্নর জেনকিনসকে জানাচ্ছিলেন—মার্শাল ল জারি করতে। গভর্নর করছিলেন না ও বরাবরই যুক্তি দিচ্ছিলেন, মিলিটারি রাজি নয়। জিন্না আলাদা করে মাউন্টব্যাটেনকে জানিয়েছেন যে সামরিক আইন জারি করার ফলে যদি মুসলমানদের ওপর গুলি চালাতে হয় তাই চলবে। তবু, এই গৃহযুদ্ধ এই মুহূর্তে বন্ধ করা হোক।

জওহরলাল হঠাৎ রেগে গিয়ে বলে উঠলেন, এ তো শৃঙ্খলাভঙ্গের ব্যাপার। গভর্নর থেকে শুরু করে চাপরাশি পর্যন্ত সবাইকে এক্ষুনি বরখাস্ত করা হোক।”

মিটিং একেবারে চুপ করে গেল। মাউন্টব্যাটেন থমথমে মুখে নিজের চোখ ফাইলের ওপর নামিয়ে রাখলেন। তারপর থমথমে গলায় বলে উঠলেন, আমি সম্রাটের প্রতিনিধি হিশেবে আমার এই মন্ত্রিসভায় সভাপতিত্ব করছি। এটা প্রত্যাশিত যে এই মন্ত্রিসভায় যিনি আমার প্রধানমন্ত্রী তিনি তাঁর প্রতিক্রিয়া জানাতে প্রকাশ্যে আর-একটু দায়িত্ববোধের পরিচয় দেবেন। প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্য যেন মিনিট করা না হয়।

একটু তেতো মুখে, মাউন্টব্যাটেন বলেন, এ-বিষয়ে আমার আইনমন্ত্রী মিস্টার মণ্ডলের পরামর্শ জানতে চাই।

যোগেন বলল, এটাকে আইনের আওতায় বিচার করলে সত্যি করেই প্রধানত সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার আনুপাতিক ভাগের কথা উঠবে। আমার মনে হয় না, মার্শাল ল জারি করতে আদেশ দেয়া হয়েছিল বা গভর্নর তা করতে অস্বীকার করায় অনানুগত্য দেখানো হয়েছে। আইনের দিক থেকে ও কমনসেন্সের দিক থেকে এটাকে, এমন কঠিন-পরিস্থিতিতে, আলোচনার বিষয় হিশেবেই দেখা উচিত। আইনের খাঁচায় নয়।

যোগেন এত কম কথায় ও এত কাটা-কাটা করে বলেছিলেন, যা এ সভার সম্ভবত কেউই আশা করেন নি।

প্যাটেল যোগেনকে জিজ্ঞাসা করলেন, পাঞ্জাবের পরিস্থিতির সবচেয়ে জটিলতা কোথায় বলে আপনার মনে হয়।

কলকাতায় যা হয়েছিল। সিভিক অথরিটি ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছিল কিন্তু নির্বাচিত সরকারকে তা জানায় নি। গভর্নর তাঁর ক্ষমতা ব্যবহার করেন নি। কলকাতা, পাঞ্জাব, নোয়াখালি, বিহার—সর্বত্রই এই সন্দেহ তৈরি না হয়ে পারবে না যে সব পক্ষকেই কর্তৃপক্ষ হিন্দু-মুসলমান-শিখ-তপশিলি ভাগাভাগি সাব্যস্ত করার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়। তাঁরা যে স্বাধীনতা দিয়েছেন, সেটা দেখাতেও চাইছিলেন।

প্যাটেল যোগেনের কথায় সম্মতি জানিয়ে জোরে ঘাড় হেলিয়ে বললেন, আমি মিস্টার মণ্ডলের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। আমাদের এক-একটা আন্দোলনের সময় লাঠিবন্দুক নিয়ে পুলিশ যে-ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ত ও সম্মানিত নেতাদেরও যে-রকম লাঠি ও বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করত, এই দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঠেকাতে পুলিশ তার এক হাজার ভাগের একভাগও করছে না।

নেহরু একটি প্রস্তাব দিলেন, তাঁর বোন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে সোভিয়েত উইনিয়নে রাষ্ট্রদূত হিশেবে পাঠানো হোক।

লিয়াকৎ আলি সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠলেন, এটা তো পুরোপুরি গবর্মেন্টিই নয়। একটা মাঝামাঝি ব্যবস্থায় রাষ্ট্রদূত কী করে হবে?

নেহরু খুব চোটে উঠে বললেন, সেটা তো আপনার ওপর নির্ভর করে না, আমার ওপর নির্ভর করে।

লিয়াকৎ আলি তাঁর রাগ জানালেন অবাক হয়ে—এটা একটা খবরের মত খবর বটে। আপনার নিজের উপকার হবে যদি এই ধারণাটার ভুল আপনি এখনই শুধরে নেন।

জওহরলাল চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে চিৎকার করে আঙুল নাচিয়ে লিয়াকৎকে ধমকে উঠলেন, আমি আপনাকে শেষবারের মত সাবধান করে দিচ্ছি, আমার পা মাড়াতে আসবেন না। আমার কথা না শুনলে আপনার বিপদ ঘটবে।

লিয়াকৎও চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে বলেন, আপনার ভাষাই আপনার পরিচয় দিচ্ছে যে আপনার যোগ্য আসন চেয়ার নয়, আপনার যোগ্য আসন রাস্তার গুণ্ডাদের ঠেকে।

যা হোক, শেষ পর্যন্ত ঘুষোঘুষিটা এড়ানো গেল।

কিন্তু এই গবর্মেন্টের সাংবিধানিক মর্যাদা নিয়ে ধোঁয়া কাটল না। সত্যি করেই তো এটা প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচিত মন্ত্রিসভা নয়, পার্টিদের প্রতিনিধিদের মন্ত্রিসভা।

গবর্মেন্টের উঁচু অফিসারদের সঙ্গেও এ নিয়ে টক্কর বাধে নেহরুর।

হায়দারাবাদের ব্রিটিশ প্রতিনিধি চাইছিলেন হায়দারাবাদ স্বাধীন থাক। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ীই নিজাম ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা চান, হায়দরাবাদ নিজস্ব সৈন্যবাহিনীর প্রস্তুতি নিতে শুরু করে, চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে চারটি সামরিক প্লেনের অর্ডার দেয়।

ব্রিটিশ প্রতিনিধি যখন অন্তর্বর্তী সরকারের মন্ত্রিসভার সঙ্গে দেখা করেন নেহরু তাঁকে ধমকে বলে ওঠেন, এগুলো হচ্ছেটা কী, আমাকে না-জানিয়ে এ-সব কী করে হয়। আমি পুরনো আবর্জনা ঝেড়ে ফেলে, নতুন স্টেট ডিপার্টমেন্ট তৈরি করব।

হায়দারাবাদের ব্রিটিশ প্রতিনিধি দাঁড়িয়ে বলেন, তাঁর কর্তৃপক্ষদের না জানিয়ে তিনি কোনো কিছু করেন নি ও প্রতিটি ঘটনা তাঁদের জানানো হয়েছে।

ব্রিটিশ প্রতিনিধি নেহরুর নাম একবারও বলেন নি। নেহরু তাঁর ইঙ্গিত না বুঝে আবার ধমকে উঠলেন, আমি বলছি আমি জানি না আর তুমি বলছ রিপোর্ট করেছ। ব্রিটিশ প্রতিনিধি জবাব দিলেন, আমার রিপোর্টিং অথরিটি মিনিস্টার অব স্টেট ফর ইন্ডিয়া, লন্ডন।

যোগেনের নভেল ত্যাগ

১৮০

না, কোনো আঁতুড়ঘরের কাঠকয়লার ধোঁয়ার গন্ধ আর আমাকে এমন মায়া দিতে পারবে না যেন ঐ ধোঁয়ার গন্ধের ভিতর আমার মায়ের বুকের দুধের গন্ধ আছে। না। নেই। কবে যে আমাদের কে হিন্দু বলেছিল—জানি না। সেই কবেটা কত দিন আগে? কয়েক শ বছর? নাকী কয়েক হাজার? সেই কয়েকশ বা কয়েক হাজারই হোক—এত বছর ধরে শুধু তো গন্ধই পেয়ে যাই আমরা, শূদ্ররা—আঁতুড়ঘরের পোড়া কাঠকয়লার, ঠাকুরঘরের ধূপ-ধুনো-ফুল-চন্দনের, মা ঠাকরুনদের শাড়ির, কর্তাঠাকুরদের পৈতের, পৈতে না-থাকলে গায়ের, কিন্তু কোনো গন্ধই তো আমাকে এই এত বিশাল সময়ের কোনো ভিতরঘরই দেখাতে পারল না। না মায়ের বুকের ঘর, না ঠাকুরের পুজো নেয়ার ঘর, না প্রতিমার মত ঠাকরুনদের মনের ঘর, না আকাশে আশ্বিন মাসের মেঘের মত মিশ্রদল।

না, আমাকে, আমাদের যদি বাঁচতেই হয়, বাঁচার ইচ্ছে থেকে বাঁচতে হয়, পোকামাকড়-গাইকুকুরের মত জন্মেছি বলে বেঁচে যাচ্ছি—তেমন নয়, মরতে জানি না বলে বেঁচে আছি—তেমনও নয়, ফুল বা ফল হয়ে গাছে-লতায় ফুটে আছি, ঝুলে আছি বলে ঝরে পড়ব—তেমনও নয়, তেমন কত-যে মৃত্যু প্রায় প্রতিদিনই আমাদের বুকের হাওয়ায় আমাদের শরীরের ছোঁয়ায় আলগোছে ভাসিয়ে দিতে হয়, ছুঁয়ে যেতে হয় তেমন কোনো চণ্ডালের মত বাঁচা নয়, আমি শূদ্র, এখন তোমরা বলছ আমি হিন্দুও, যদি আমি হিন্দু হতাম, বামুনদের মত ভাবতে পারতাম, বামুনদের মত বলতে পারতাম, সেই ভাবা আর বলাকে আর-সব-জাতের কাছে নিষিদ্ধ রাখতে পারতাম, আমার ভাষাকে কখনো দেবতাদের ভাষা বলা হত, আমি শূদ্র, আমার নিশিদিন দিননিশি কাটে পশুর সঙ্গে, শুয়োর-কুকুর-গরুর সঙ্গে, মড়ার সঙ্গে, মানুষের শরীরের নোংরার সঙ্গে, সেই সারা জীবনের সঙ্গ আমাদের মুখের ভাষাকে করে জিভকাটা, ঠোঁটকাটা, পশুর জিভ ঠোঁট থাকে, সে তার ভাষায় সেগুলো ব্যবহার করতে জানে না, পশু জানে শুধু জিভ দিয়ে চাটতে, জিভ ঠোঁট দিয়ে লেহন করতে, দাঁত দিয়ে কামড়াতে, গলার আওয়াজে তার জিভ বা ঠোঁট বা দাঁত কোনো কাজে লাগে না, আমি শূদ্র, আমার ভাষায় তো চুম্বন হয় না, আমার মুখের ভিতর তো লালা নেই, তাই ভেজা নয়, সেই মুখের ভিতরের মরুভূমির তুল্য পুরুষ কোন নারী ভাসিয়ে দেবে তার জিহ্বার জন্যে। আমার ভাষায় তো বিলাস নেই, আমার ভাষায় তো হাসি হয় না, হাসি—যা ঠোঁট ঢাকা থাকে, ঢাকা খুলতেই ডালিমের বিচিদানার মত ছড়িয়ে পড়ে, আমার ভাষা তো নিষিদ্ধ, নিষিদ্ধ মানে—আমার ভাষা তো শুধু আমারই ভাষা, আর-কেউ কি থাকে যে নিজে শূদ্র না কিন্তু শূদ্রের ভাষা ছাড়া কথা বলে না, ধু—উ—য়, সে হবে কী করে, আমার ভাষা তো আর—কারো পক্ষে নিষিদ্ধ, হিন্দু বামুনদের বা হিন্দু বর্ণের অন্য উঁচু জাতের বাবুদের পক্ষে নিষিদ্ধ, ওদের মুখের ভিতরে জিভ আছে, দাঁত আছে, গাল আছে, গলা আছে, ওরা কি আমাদের ভাষা বলতে পারে, তাহলে তো তোমাদের মনে এ-ডাকটা উঠতই না, তোরা হিন্দু হ বা ওরা তো হিন্দুই, তাহলে বাঙালি মুসলমানকেও শুদ্ধি করে হিন্দু বানানো যেত না কী, তাহলে এই গর্বটা কোথায় যে যেত—আর-সব ধর্ম গ্রহণ করা যায়, হিন্দুধর্ম গ্রহণ করা যায় না, হিন্দু হতে হলে হিন্দু হয়ে জন্মাতে হয়, কী করে শূদ্র না হয়ে হিন্দু জন্ম নেয়া যায়, নাকি শূদ্র হবি কী করে হিন্দু না হয়ে, তুই হিন্দু বলেই তো শূদ্র, কিন্তু এতদিনে এই একটা ব্যবস্থা করা গেল না, এতদিনে পণ্ডিতদের দিয়ে একটা নতুন

স্মৃতি শাস্ত্র লেখানো গেল না, কোনো ধর্মে কেউ অচ্ছুৎ থাকতে পারবে না, অনেক ধর্মে তো নেইও, অস্পৃশ্যতা তো নিষিদ্ধ হয়েই গেছে, মন্দিরে তো তারা ঢুকতে পারছে, যে-কোনো একটা বদলের জন্য তো একটু সময় দিতেই হয়, সে তো যাবচ্চন্দ্রদিবাকর : সময় আমাদের পেছনেও আছে, সামনেও থাকবে, গান্ধীজির চাইতে প্রিয়তর কেউ হরিজনদের থাকবে কেন—এটা প্রমাণ করতে তিনি বললেন, আমি হিন্দু, আমি চতুর্বর্ণ মানি, অস্পৃশ্যতা মানি না।

এই গল্পটির আগাগোড়া, ওসার-বহর, এপিঠ-ওপিঠ, তেলো-চেটো, খাদ-খাড়াই, সব, সবটাই বানানো, যেমন কোথাও বেড়াতে গেলে আমাদের দেখাশোনা বানানো, যেমন কোথাও বংশানুক্রমিক বসবাসেও আমাদের চেনাজানা বানানো। গল্পটাতে একটা ঘটনাকাল বদলানো যদি নাই যায় অন্যভাবে গুলনো যায়। তারিখ ধরে-ধরে মাপা আছে।

কেউ পরীক্ষা করলে দেখবে—দুটো-একটা ছাড়া সে-সব ঠিকঠাকই আছে। কারণ এগুলো ঠিকঠিকই ঘটেছিল, বদলানো যায় না।

প্রতিদিনের আশপাশ বা চিরকালের শিলীভূত ইতিহাসের সঙ্গে কোনোরকম মিলের কোনো হদিশ যাতে না থাকে, বা থাকলেও সে-হদিশ নিশ্চিত ভুল নিশানা যেন দেয়। ১৯৩৭ থেকে ৪৭ যেন এক অলীক দশক হয়ে যায়। সে অলীক এখন আর আমাদের জীবন নয় যেন। বা তখনো আমাদের জীবন ছিল না। সে অলীক এখনো ইতিহাসের অজৈব নয় যেন। সেই অলীক, দশকের নায়ক খলনায়কের সম্পর্কে মন্তব্যের অপরাধে ঘটনার ৬২ বছর পরে এখনকার বড় নেতারও চাকরি যায়।

যেহেতু বানানোটা এ-খেলার নিয়ম হয়ে আছে, এই গল্প-বলার বা হিস্ট্রি-হিস্ট্রি খেলার।

সেই নিয়ম মেনেই এই আজগুবি সন-তারিখের বহু রকম প্রমাণ মজুত। চন্দ্রদ্বীপের পাঁজি, নদীয়ার পাঁজি, ইসলামি পাঁজি, তুরুক পাঁজি, বিষ্ণুপুরের পাঁজি, আরবী পাঁজি, এই সব।

কিছু ঘটনা যে জানাশোনা ঠেকে ও কিছু লোকজনকেও যে চেনা-চেনা ঠেকে?

সে সবই এক বানানো অসত্যের অছিলা। বানানো হলেও তো হিস্ট্রি। প্রমাণের কোনো অভাব নেই। বানানোরও কোনো প্রমাণ নেই।

এত ছড়ানো একটা জালি একা-একা ছড়ানো যায় না।

কত যে সঙ্গীত, কত যে যাতায়াত, কত যে পাট-শ্রীপাট-কাঠি-খালি-চর-হাট বলে ডাকা জনপদ, কত যে খাল-বিল-জলা-হাওর-নদীর ভঙ্গিল জলপথ, কত যে চ্যাপ্টা, গোল, ছিপছিপে, একতলা, দু-তলা জলযান ও আকাশযান, কত যে মুচমুচে হয়ে যাওয়া কাগজ, কত যে শহরের সিপিয়া-রঙের স্মৃতি, কত যে দুর্ভিক্ষ আর যুদ্ধ, কত যে অমিলন, চাপা শ্বাস, ঘামের হঠাৎ ফুটে ওঠা বিন্দু, স্থানাঙ্ক, একই দিনে সময়ের বদল, তরলতা, স্থায়ী সিদ্ধান্তের লেবেল, পর্যটন, পুনরুদ্ধার, গোলকধাঁধা এই গল্পের সঙ্গে মিশে গেল, গল্পটাকে অসত্য করে তুলতে ও অসত্য করেই রাখতে। সেই সব সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা নেই কোনো।

যোগেন মণ্ডল মানুষটি এ গল্পে সত্যের সবচেয়ে বড় অছিলা। ১৯০৪ সালে জন্ম। বি.এল তাই, এই নভেল থেকে এখানেই আমি বের হয়ে যাচ্ছি। আমি ঢুকেছি কখন তা আমি বুঝিনি। ঢুকব কোথায়? নভেল তো একটা খেলা পরিসর। সেখানে ঢোকার কোনো পথ থাকে? আমন্ত্রণপত্রও অন্তত দেখাতে হয় না। তারপর বেরিয়েও আসা যায়, যখন ইচ্ছে তখন? প্রবেশ ও প্রস্থান অবাধ? অবাধ মানে কী? তার চাইতে 'স্বাধীন' ও 'ইচ্ছাধীন' শব্দদুটির একটি ভাল হত না?

যদি আমি এতটা পর্যন্ত নভেলটার ভিতরেই থেকে যেতে পারি, তাহলে, বাকি সময়টুকুও

থেকে গেলে ক্ষতি হত কী? নভেলে নায়কের উপস্থিতির বাধ্যতাসূচক কোনো আইন তো নেই। তাই যদি না থাকে, তাহলে নিষ্ক্রান্ত হওয়ারই-বা নিয়ম কী বা আইন কী।

না, ওরকম কোনো আইনানুগ ব্যাপার নয়, বরং একটু আলগা কথাই। একেবারেই আলগা। কোনোভাবেই স্ক্রু বা পেরেক মেরে অন্য কিছুর সঙ্গে আঁটা নয়। বা, কেমিক্যাল গ্লু দিয়ে সাঁটা নয়।

এতটা সময় তো দিলাম হাজিরা, নভেলে। আর না-হয় না-দিলাম। না-হয় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলির কাছ থেকে ক্যাজুয়াল ছুটি নিয়েই সরে পড়লাম। না-হয় আর ফিরলাম না, নভেলে বা পাকিস্তানে। আমি শূদ্র। এখন নায়ক বা যজমান ডাকলেও তো আর ফেরা যায় না। কারণ আমি না কী হিন্দুও বটে। হিন্দুস্থানে তো বটেই, পাকিস্তানেও। আমি কী করে হিন্দু হই? আমি তো দ্বিজ নই। আমি শাহেবদের দরবারে শাহেবদের সার্কুলারে হিন্দু। তেমন দোআঁশলা হিন্দু হয় নাকী, শিখণ্ডীর মত? চলি এখন।

১৯৩৭-এ নতুন আইনে একটা কোটা হয়েছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন কায়েম করতে। তখন যুদ্ধটুদ্ধ ছিল না। কিন্তু পরে দেখেছি, ৩৭ সালে ইয়োরোপে যুদ্ধের আবহাওয়া এতটাই ভারী যে স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস খুব স্বাভাবিক ছিল না। ১৯৩৬ সালের এপ্রিলের গোড়াতে তখন ব্রিটিশ সরকারের বিরোধী নেতা উইনস্টন চার্চিল ওখানকার কাগজে লিখে দিয়েছিলেন, 'হের হিটলার (ইয়োরোপের) কয়েকটি দেশকে কী বলেছেন বা গ্রেট ব্রিটেন আর ফ্রান্স বা বেলজিয়ামের মধ্যে কী কথাবার্তা হবে, তার ওপর সামনে একটা ইয়োরোপীয় যুদ্ধ বা সম্ভবত বিশ্বযুদ্ধ এড়ানো যাবে কী যাবে না ভাবা ভুল।' ভারতের অন্তত দু-জন নেতা, জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসু ইয়োরোপে বেশ কিছুদিন থেকে ও ঘুরেফিরে এসে এর চাইতেও স্পষ্ট করে এই যুদ্ধের কথা বলেছিলেন। এখন হয়তো এই সব কথা কালানুক্রমে ও বিষয়ানুক্রমে সাজানো যায়।

বাংলার ভোট হয় ৩৭ সালের পৌষমাসে আর ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা তৈরি হয় ১ এপ্রিল। তখনো কংগ্রেস যে-সব প্রদেশে জিতেছে সেখানে সরকার তৈরি করবে কী করবে না তাই নিয়ে ভাইসরয়ের সঙ্গে দরাদরি চালাচ্ছে। ১৬ এপ্রিল তারিখে চার্চিল লিখেছিলেন, 'তারা (কংগ্রেস) এখন যখন ইচ্ছে তখন ভারতের বেশির ভাগ জায়গা শাসন করতে পারে। তারা চাইলেই বিচারব্যবস্থা ও পুলিশ তাদের হাতে ছেড়ে দেয়া হবে। ইয়োরোপের বড়বড় দেশগুলির সমান আকারের আধ-ডজন প্রদেশের রাজস্ব, তাদের খুশিমত খরচা করতে পারে। কোটির অঙ্কে গুণতে হয় এমন বিরাট সংখ্যক জনসাধারণকে তারা বাঁচাতেও পারে, মারতেও পারে এবং তাদেরই জন্য যে আইন বানানো হল তা তারা রক্ষাও করতে পারে, ভাঙতেও পারে।'

এই সব কথাবার্তা মেলালে মনে হয় প্রদেশিক স্বায়ত্ত শাসন—গভর্নরের বিশেষ ক্ষমতাসহ যে ভারতে চালু করা হয়েছিল, তাও, আসন্ন মহাযুদ্ধের কথা ভেবেই। সে-ভাবনাতে কেন্দ্রীয় সরকারকে ভাইসরয়ের সরকারই করে রাখা হল—যুদ্ধ প্রস্তুতিতেই। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে প্রতিরক্ষা ও অর্থ জড়িত।

আমি ভোটে দাঁড়িয়েছিলাম অথচ তার আগে রাজনীতির কোনা-কানছিও আমি কখনো মাড়াইনি। দাঁড়িয়েছিলাম—ল-পাশ করে প্র্যাকটিস করছি আর নমশূদ্রদের জন্য আসন আলাদা রাখা হয়েছে। ঘটনাচক্রে আমাকে দাঁড়াতে হল সকলের জন্য খোলা আসনে। জেতার পর দেখা গেল—সারা ভারতে আমিই একমাত্র প্রার্থী যে শিডিউলভুক্ত জাতের লোক হয়েও সকলের-জন্য-খোলা-আসনে জিতেছি। এটা নাকী মহাকীর্তি। সারা দেশ থেকে সবাই অভিনন্দন

জানালেন। মহাত্মা গান্ধীও। আমার দর বেড়ে গেল। দশের কাছে। আমার কাছেও।

আমি লোকটাই আলগা।

আমার পক্ষে সবচেয়ে স্বাভাবিক ছিল কংগ্রেসে ঢুকে পড়া। কংগ্রেসেরও দরকার ছিল। আমিও নিরাপদ থাকতাম।

অথবা হকশাহেবও বরিশালের, আমিও বরিশালের। সেই সুবাদে লেগে থাকলে মন্ত্রী যদি নাও হই, তাহলেও, পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি একটা হতে পারতাম। হকশাহেবের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল গৃহশত্রু। ওঁর গৃহের বাইরের একটা লোক, আমার মত, ওঁর শত্রু হওয়ার ভয় যার নেই, ওঁর দরকারও ছিল। কিন্তু আমিও ওদিকে ঘেঁষলাম না আর খাজা-গাজাদের দাপটে হকশাহেবও দিশেহারা।

এখন মনে হয়—আমার কংগ্রেসে না-যাওয়া আর হকেও না-যাওয়া অত নিরীহ ব্যাপার ছিল না। কংগ্রেস শুনলেই মনে হত বামুন-কায়েত-বৈদ্যদের বাড়ি। তাদের বাড়ির বারান্দাতেও আমরা উঠতাম না। অথচ বরিশালে কোর্টে আমার সব সিনিয়ার ছিলেন কাস্ট হিন্দু। তাঁরা ভালবেসেই আমাকে ওকালতি শেখাতেন। সেখানে তো একসঙ্গেই বসতাম। যদিও জলের গ্লাস আলাদা ছিল। সেটাও তো আমার মনে হতে পারত—বর্ণহিন্দু হলেই কংগ্রেসি হয় না। মানুষ সম্মান পেলে ভাবে আমার প্রাপ্য। অসম্মান পেলে পরজন্মেও ভোলে না। আইনসভায় অতগুলি, আমাকে ধরে ৩১ জন নিচু জাতের এমএলএকে দেখে মনের ভিতরে একটা জোর এসে গিয়েছিল। এদের এক করা, এক রাখা আর আইনসভার সবচেয়ে নাম-করা মেম্বারদের সমান যোগ্যতা প্রমাণ করা—এটাই আমার কাজ হয়ে উঠল যেন স্বাভাবিক নিয়মে। সেটা ঘটেও গেল যেন স্বাভাবিকভাবেই। তার কারণও খুব সোজা। আমাদের নিচুজাতের যারা দু-একজন বড় নেতা ছিলেন তাদের নিজেদের আরো নানারকম কাজ ছিল। সেগুলোও বড় কাজ। সেগুলো থেকে তাঁদের আয়ও হত। দু-একজন ছিলেন ধনীলোক। তাঁদের কাছে আইনসভা ছিল আরো দু-চারটে শখের ব্যাপার। আমার মত লোক তো অন্য পার্টিতেও খুব ছিল না—কমিউনিস্ট ছিল দু-একজন। তারা তো বিলাত ফেরৎ। আমার মত সর্বঘটে বিল্বপত্রের মত হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় আর কাজ চুকে গেলে কোনো দায় নেই, ছাগলে খেয়ে নেবে—এমন তো আর কেউ ছিল না। আমি ছিলাম আইনসভা সর্বস্ব। আমার স্বার্থ ছিল উচ্চাশা। খুব কম দিনেই সেটা হয়ে গেল। আমার আর-এক স্বার্থ ছিল ছোটজাতের সম্মান বাড়ানো।

সেই সব কারণেই আমি এখন এই নভেলটা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। আমি অত বেহিশেবি না। ১৯৪৩ সালে হার্বার্ট, হকশাহেবকে রাত্রিবেলা ডেকে পাঠিয়ে টাইপ-করা পদত্যাগপত্রে সই করালেন। খুবই দুর্নাম হয়েছিল। বড়লাট খুব রেগেও গিয়েছিলেন। হকশাহেবেরও দোষ ছিল কিন্তু ছোটলাট তাঁকে টোপ দিলেন—সাংবিধানিক কারণে এটা করতে হচ্ছে, যেহেতু আইনসভায় অর্থসংক্রান্ত একটি প্রস্তাবে সরকার হেরে গেছে। ছোটলাট এবার হকশাহেবকেই ডাকবেন একটা ন্যাশনাল গবর্নমেন্ট তৈরি করার জন্য সব দল মিলিয়ে। হকশাহেবই প্রধানমন্ত্রী হবেন। পদত্যাগ করে পাশ। নমশূদ্র। বরিশালের নানা জেলা বোর্ড ইউনিয়ন বোর্ডের কাজ করে ৩৭ সালে হয়ে গেল এম.এল.এ। 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ'-এ তপশিলিদের জন্য সংরক্ষিত আসনে নয়। সারা ভারতের একমাত্র তপশিলি প্রার্থী যে খোলা আসনে জিতেছিল। ১৯৪৩-এ মুসলিম লিগের নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে দর কষাকষিতে তপশিলিদের জন্য মন্ত্রিসভায় বেশি জায়গা আদায় করে। নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা ও সারওয়ার্দি মন্ত্রিসভায় ছিল। মুসলিম লিগ তাকে ইনটেরিম বা অন্তর্বর্তী সরকারে (১৯৪৬) পাঠায়। পাকিস্তানের প্রথম মন্ত্রিসভার সে ছিল সদস্য।

ভারতের স্বাধীনতা পাওয়ার চেষ্টার একেবারে শেষ দশকে সারা ভারতে সে একমাত্র নেতা যে পাকিস্তান-প্রস্তাব সমর্থন করেছিল, বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছিল, তপশিলি হলেও হিন্দু থাকে নি ও পাকিস্তান প্রস্তাব মানলেও যে শূদ্র মুসলিম হয় নি। ৫০ সালের দাঙ্গায় পূর্বপাকিস্তানে সংখ্যালঘু, প্রধানত নমশূদ্র, হত্যার প্রতিবাদ করেছিল পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় মন্ত্রী হিশেবে, জিন্নাহীন পাকিস্তানের সামরিক ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির নেতারা তাকে খুন করার ষড়যন্ত্র ফেঁদেছিল, সে তাদের ফাঁসিয়ে দিয়ে পালাতে পারে।

এই প্রায় দশ বছরের রাজনীতিতে হিন্দুরা তাকে পার্টিশনের ভিলেন ও মুসলিম লিগের চর বানিয়ে যে-নিন্দা সারা বাংলায় রটিয়েছিল, তার প্রধান প্রচারক ছিল, তখন হিন্দু মহাসভাগ্রস্ত কংগ্রেস, তার প্রধান বাহক ছিল হিন্দু খবরের কাগজ ও পরে, তার প্রধান তাত্ত্বিক ছিল আমাদের জাতীয় হিস্ট্রির লেখকরা। এই জাতীয়-হিস্ট্রি রক্তের শ্বেতকণিকার মত এমন হিন্দুয়ানিতে সংক্রামিত যে শেষ পর্যন্ত সেই সংক্রামক ইতিহাস থেকেও তাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিল।

তার চাইতে অনেকানেক ছোট-বহরের নেতাকেও এমন করে মুছে দেয়া যায় নি, যেন তার জীবাশ্মটুকুও না থাকে। মুছে দেয়া যায় না কারণ তাদের বংশধর-অনুরাগী কেউ, দু-তিনশ বছর পরও হাজার-হাজার টুকরো হয়ে যাওয়া শরিকদের পক্ষ থেকে তিনশ-চারশ বছরের ইতিহাসের ওপর তাদের দাবিনামা এখনো জারি করছে। যেমন সাঁঝের আটচালার সাবর্ণ চৌধুরীদের কলকাতার প্রতিষ্ঠাতার দাবিনামা। তাঁরাই জমিদার হিশেবে জব চার্নককে সুতানুটি-গোবিন্দপুর-কলকাতা বেচেছিলেন। যোগেনের বেলায় তা হয় নি। কারণ যে-শূদ্রদের সে নেতা ছিল, সেই শূদ্রতা হয়ে গেল একাডেমিক পলিটিক্যাল বিষয়।

কোনো রাজনৈতিক নেতাকে, সারা ভারতে এতটা অপমানিত হতে হয় নি, এতটা ঘৃণিত হতে হয় নি, এতটা তুচ্ছ হয়ে যেতে হয় নি। হিন্দুয়ানি যোগেন মণ্ডলের মত এক শূদ্রের এই স্বাধীনতা ও সাহস মেনে নিতে পারে নি, যে, নিজের শূদ্র-পরিচয়টাকেই একমাত্র পরিচয় করে তোলে ও হিন্দু পরিচয়কে অস্বীকার করে একেবারে ছলচাতুরিহীন সরলতায়। একলব্য ও শম্বুকের মত, এই শূদ্রের কোনো ব্রাহ্মণ অস্ত্রগুরু বা হিন্দু অবতারের দরকার হয়নি। হিন্দু সংস্কারে অস্পৃশ্য এই নমশূদ্র জাতীয় অস্পৃশ্য থেকে গিয়ে নিজের শূদ্র-আত্মপরিচয়ের মহাত্ম্য রচনা করেছে।

যোগেন—ঘটনাটা ঘটল কী করে?

ঘটনা যখন ঘটে, তখন উল্টোপাল্টাই ঘটে। পরে, চিন্তাভাবনা দিয়ে ঘটনার কার্যকারণ, ফলাফল এইসব জুড়ে দেয়া হয়। যে-অনশনে গান্ধী মৃত্যু পর্যন্ত চলে গিয়ে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ঠেকাতে চেয়েছিলেন, সেই অনশন শেষ হল কিন্তু আম্বেদকরের সঙ্গে হিন্দু-কংগ্রেসিদের দর কষাকষিতে। ৩৭ সালের ভোটের সময়ও তো কংগ্রেস ঠিক করে উঠতে পারেনি—ঐ রোয়েদাদ মেনে ভোট করবে কী না। তারপর থেকে গান্ধীজি হরিজন আন্দোলনকেই প্রধান আন্দোলন করে তুললেন, 'হরিজন'—সাপ্তাহিক বের করলেন, জেল থেকেই। আর জেল খেটে বেরিয়ে নভেম্বর ১৯৩৩ থেকে আগস্ট ১৯৩৪-এর মধ্যে ১২,৫০০ মাইলের হরিজন-ট্যুর সারলেন। কংগ্রেসের হিন্দুরা জোট বাঁধছিল। গান্ধীজির হরিজন-সভার ওপর জসিডি, বক্সার আর আজমিড়ে হিন্দু গুণ্ডারা আক্রমণ করল। ঐ ৩৪-এর ২৫ জুন পুনাতে গান্ধীজির গাড়ির ওপরই বোমা পড়ল।

তার ঠিক একমাস পরে, জুলাইয়ে, যোগেন মণ্ডল বি-এল পাশ করে বসল। ওকালতির লাইসেন্স পেতে কলকাতার স্মল জজেজ কোর্টে, পরের বছর ১৯৩৬, একই মাসে, ২৫ জুলাই, বরিশাল কোর্টে প্র্যাকটিশ শুরু করে দিল। তার পরের বছর বরিশাল সদরের লোকাল বোর্ডে, তার পরের বছর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে, তার পরের বছর ১৯৩৭-এ মেম্বার, বেঙ্গল লেজিসলেটিভ

অ্যাসেম্বলি।

যেদিক থেকে বলা যায়, ১৯৩২-এর অনশনের পর গান্ধীজি হরিজন-ছাড়া কিছু ভাবেননি। নতুন আইনে বাংলার ও পাঞ্জাবের হিন্দুদের যে মুসলমানদের তলায় নামানো হয়েছে, তা নিয়েও তিনি একটিও শব্দ উচ্চারণ করেননি, তাঁর ভক্ত অনুরাগীরা তাঁর ওপর খাপ্পা, হিন্দু গোঁড়ারা রেগে গিয়ে বলতে শুরু করল—হরিজনরাই বাপুকে খেল—ঠিক সেদিক থেকেই বলা যায়, যোগেনও এর পর শিডিউল কাস্ট ছাড়া কিছু ভাবেনি, প্রদেশের চাকরি-বাকরিতে শিডিউল কাস্টের সংরক্ষণ ছাড়া কিছু ভাবেনি, দূর-দূর জায়গা থেকে যে শিডিউল কাস্টরা কলকাতায় পড়তে আসত তাদের জন্য তপশিলি হস্টেল ছাড়া কিছু ভাবেনি। হরিজন গান্ধী যদি ম্যাকডোনাল্ড-এর সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের হরিজান প্রোডাক্ট হন, যোগেন তাহলে ঐ রোয়েদাদেরই শিডিউল কাস্ট প্রোডাক্ট। ঐ রোয়েদাদে জাতপাতের শিডিউল একবার তৈরি হয়ে গেলে, গান্ধীরও শিডিউল ছাড়া গীত নেই, যোগেনেরও শিডিউল ছাড়া গীত নেই। গান্ধীজি ১৯৩৯-এ ভোটে জেতা সুভাষ বোসকে কংগ্রেস থেকে তাড়ালেন আর যোগেন সেই সুভাষের প্রার্থী হয়ে বড়তলা থেকে কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার হলেন।

এইভাবে একটা প্রতিন্যাস ঘটানো যায়—জাতির পিতার সঙ্গে জাতির শূদ্রের। একেবারে অসম্ভব এই প্রতিন্যাস তো ঘটে আছে জাতির হিস্ট্রিতে। প্রতিন্যাস বলে চিনলে কি আর থাকত, ঘটালেও? জাতির হিস্ট্রির ঘটনাগুলো ঘটার সময় তো ডি-এন-এ জানা ছিল না। জানা ছিল—লাশ গুম করে দিলেই কেস খতম। সেই জ্ঞানতত্ত্ব-অনুযায়ী যোগেন মণ্ডলকে জাতীয় হিস্ট্রিতে নিঃশেষে গিলে ফেলা হয়েছে ও সেই গেলার কোনো ভুক্তাবশিষ্ট পর্যন্ত রাখা হয়নি। কিন্তু এখন তো ডি-এন-এ জ্ঞানতত্ত্ব অনুযায়ী জেনেটিক কোড পর্যন্ত যাওয়ার উপায় আছে।

বেদব্যাসও জানতেন, আছে, একটা জেনেটিক কোড। কিন্তু কোডটার পাঠোদ্ধারের টেকনিকটা জানতেন না। টেকনিকটা জানা না-থাকায় তাঁর এপিকের ভিতরে বে-এপিক ঘটে যায়। অমন যে পিতামহ ভীষ্ম, বাপের বিয়ের পণ দিল যে নিজের বংশ লোপ করে, সে কী না আরও এক পণ করে বসে-হিজড়ের সঙ্গে কখনো যুদ্ধ করবে না। এমন পণের মানে কী, প্রসঙ্গ কোথায়, হিজড়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আসবে কী করে, আসবেই-বা কেন। ভীষ্মের একটু বাতিক ছিল—প্রতিজ্ঞা করার। সেটাকে একটু খোঁচা দিতে গিয়ে বেদব্যাস এটুকু বে-এপিক ঢুকিয়ে দিলেন। ভীষ্মের বিয়ে না-করার প্রতিজ্ঞাটাকে তো ওভাবেও বলা যায়—আমি সারাজীবন হিজড়ে হয়ে থাকব।

এপিকের ভিতরের এই বেএপিকটা পর্যন্ত না-গেলে দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার কোনো মানে বোঝা যায়? আমি হিজড়ে হয়ে থাকব ও কখনো কোনো হিজড়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরব না। ব্যাস, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ট্র্যাফিক খুলে গেল।

ভীষ্ম তো গঙ্গার ছেলে। গঙ্গা স্বর্গে শিবের বৌ। আর এখানে, মাটিতে, শান্তনু—তার সঙ্গে থেকেই তো গঙ্গার আট ছেলে, শেষ ভীষ্ম। তা হলে ভীষ্ম শিবের সৎ ছেলে, মানে বৌয়ের আগের পক্ষের ছেলে। এপিক হচ্ছে—গঙ্গার আট ছেলের জন্ম ও বিসর্জন। বেএপিক হচ্ছে ভীষ্ম শিবের দ্বিতীয় পক্ষের প্রথম স্বামীর ছেলে। এপিক হচ্ছে—সতীর মৃতদেহ নিয়ে নটরাজের প্রলয়নাচন। বে-এপিক হচ্ছে শিবের বলদে সতীর বাপের বাড়ি যাওয়া।

শিবের বাহন তো বলদ। বাহন ছাড়া দেব-দেবতা অসম্পূর্ণ। বলদ ছাড়া শিবও তাই। কিন্তু সে-বলদে কি শিবের বউ সতীও চড়তে পারে? চড়তে আর পারবে না কেন? কিন্তু চড়লে দক্ষযজ্ঞ ঘটে।

বাপ দক্ষ বিরাট যজ্ঞ করছে, দুনিয়ার সকলের নেমন্তন্ন, সতী আহ্লাদ করে শিবকে বলল, 'অনুমতি দেহ হর। যাই বাপার ঘর।' সতী ভুলে গেল তার বাবার সঙ্গে শিবের ঝগড়া। দক্ষ যে তাদের নেমন্তন্ন করে নি সে-দোষও যেন শিবেরই। সাত বৎসর হল বিয়ে হয়েছে, একবারের জন্যও বাপের বাড়ি যাই নি। 'পুরহ আমার সাধ। মায়ের রন্ধনে খাব ভাত।'

শিব রাজি হয় না।

চটেমটে সতী 'চলিলা ভ্রুকুটি ভীমা। একাকিনী বাপের বসতি।' শিবের ইঙ্গিতে, 'পাছে নন্দী যায় ধায়্যা। বৃষবর করিয়া সাজন।' সতী খুশি। 'বৃষ যোগাইল নন্দী। চাপিয়া চলিল চণ্ডী।'

আঃ! এপিকের পাল্টা বে-এপিকের নীরবতার কী বাহার। বলদের ঘাড়টা তো একটা কুঁদ, প্রায় শিবলিঙ্গ। সতীকে যদি বলদের পিঠে উঠতে হয় ও বসতে হয় তাহলে, কিছু-না কিছু সেক্স আসবেই। যিনি এ এপিক লিখছেন, তার কোনোরকম সেক্সেই কোনো আপত্তি নাই। আপত্তি শুধু সেক্সের অসম্মানে। একটা মেয়ে রাগ করে বাপের বাড়ি যাচ্ছে, যা পেয়েছে তাতেই চড়েছে, সেই অনভ্যস্ত বাহনে তার সেক্স আসতেই পারে। একটা ছোট অরগ্যাজম হয়ে গেল। সে বুঝুক, যার বোঝার। যে নাবুঝ, সে চুপ থাকুক। শুনতে এসেছে এপিক, আর, যা বলা হল না তা শুনতেই পেল না? ঐ অসময়ে সেক্স এলে সতীর রাগ জল হয়ে যাবে না? অ্যাকশন তো রাখতে হবে, তাই, বাপের বাড়িতে পৌঁছেই 'সত্বরে চলিলা চণ্ডী যজ্ঞের সদন'। সেখানে বাপ-বেটির মধ্যে দু-চারটি গরম কথা হতে না-হতেই সতী সুইসাইড করে বসলেন। কিন্তু আত্মহত্যার আগে 'দৃঢ় করি মহাদেবী পরেন বসন'।

সুইসাইডের আগে ভাল করে শাড়ি পরা? তাও আবার শিবের প্রলয়নাচনের সত্যিকারের এপিকের আগে? হ্যাঁ। সতী তো একটা জানা নাটক করছেন। তিনি তো জানেন শিবের কাঁধে ঝুলে তাঁকে কত পাক খেতে হবে। ডেডবডির কাপড়-চোপড় যেন এলোমেলো হয়ে না যায়। সতী তো জানে, তার ডেডবডি নিয়ে শিব আর অন্য দেবতারা কী কাণ্ড বাধাবে!

'দক্ষযজ্ঞনাশ'-এর সেই কাণ্ডটা শুরু হয়ে গেল। 'প্রসরিল বীরভদ্র যজ্ঞ নাশিবারে।' বামুন ছাড়া যজ্ঞ হয় না। ধর্ ধর্ বামুন ধর। আচমকা আক্রান্ত হলে আরশোলারা যেমন পালায়, বামুনরা তেমনি পালাচ্ছিল। 'বামুনে ধরিয়া পুথি নিল কাড়িয়া—' পুথি না-থাকলে আর বামুন কীসের?

বামুনদের দ্বিতীয় চিহ্ন—পইতে। বামুনরাও জানে—পৈতে টেনে ব্রহ্মশাপ বামুনদের অস্ত্র। সবাই ভয় পায়। পালাতে-পালাতে বামুনরা 'পৈতে দেখায় কান্ধে'। 'বামনের জিউ রাখো, বামনের জিউ রাখো'।

বামুনদের তৃতীয় চিহ্ন দাড়ি। শিবের বাহিনী দাড়িওয়ালা বামুনের 'তাইড়্যা ধরে তায়। পাড়িয়া দাড়ি উপড়ায়।'

চতুর্থ চিহ্ন টিকি। 'শিবের বাহিনী যেন মরিচ উপড়ায়।'

কিন্তু যজ্ঞকুণ্ডে তো তখনো যজ্ঞাগ্নি জ্বলছে। যজ্ঞের আগুন নেবা, আগুন নেবা, মুতে দে, মুতে দে, 'সঙ্গে দানা ঘটা। ধাইল ল্যাংটা। মুতয়ে যজ্ঞের কুণ্ডে। যজ্ঞকুণ্ডে মুতে যজ্ঞের আগুন নিবিয়ে শিব ধরে ফেলল সূর্যঠাকুরকে। সূর্য ঠাকুর সাত ঘোড়ার লাগাম ফেলে দিয়ে দুই হাত মাথার ওপর তুলে বলে ওঠে, 'নাহি মার বামনের জিউ।' সেই ফাঁকে তার সাত ঘোড়া 'লাগাম ফেলাইয়া পালায় চৌদ্দ দিগন্তরে।'

আ হা হা হা রে! এমন পরম দৃশ্য কি কপালে না থাকলে দেখা যেত। মুতে দিয়ে যজ্ঞের আগুন নেবানো। আর সূর্যের সাত ঘোড়াকে চৌদ্দ দিগন্ত খুঁজতে খেদানো। এর চাইতে বড়

নাশকতা আর কী হয়। দক্ষের ডাকা বামুনদের এমন ব্রহ্মাণ্ড জ্বালানো যজ্ঞের তেজ যে শিবের এক মুতেই নিবে যায়। এমনই সপ্তাশ্ববাহিত রথারূঢ় সূর্যের তেজ, যে সাত ঘোড়া চৌদ্দ দিকে ছোটে।

নাশকতা ছাড়া কেউ পারে দু-পাঁচশ খাড়া দেয়াল টিকটিকির মত উঠতে? পারে কোনো গল্প নাশকতা ছাড়া, নিজের জামাকাপড় খুলে ফেলে কুড়কুড়ে ভাজা তুল্য নিজের পেশিগুলিকে নাচাতে?

নাশকতার নেশাই আলাদা।

নাশকতা ছাড়া নেশা হয়?

সব কেমন সাজানো-গোছানো, ফিটফাট, হাড়িকাঠ, পৈতে-তিলক, সপ্তমীর চাঁদের আকারে চেয়ারপত্র সাজানো, সবাই সবাইকে দেখতে পাচ্ছে, এর নাম যজ্ঞস্থল, অ্যাসেম্বলি, কোনো পোয়াতি নারী হঠাৎ এখানে এসে পড়লে এই সব দেখেশুনে তার নির্ঘাৎ গর্ভপাত।—দে ছেড়ে এই স্টেজে বলদে চড়া সতীকে। অন্তত শিবভক্ত যোগেনকে। মুতে দে, মুতে দে, যজ্ঞকুণ্ডে। মুতে দে। যজ্ঞ দেখলেই যাজ্ঞসেনী? আরে আগুন থাকলে তো—? এপিক হয়, বে-এপিক ছাড়া?

এপিকের খাসমহল বাড়াতে ও বে-এপিকের জবরদখল কমাতে, জন্মান্তর-অভিশাপ-পুনর্জন্ম-পুনরুদ্ধারের গল্পে তাপ্পি বাড়তেই লাগল। তাপ্পি সেঁটে কি আর বে-এপিককে ঠেকানো যায়? লাভের মধ্যে এপিকের তাপ্পিতে এপিকের রাজপোশাকই গেল হারিয়ে।

ইন্দ্র তো স্বর্গের রাজা। তার এক ছেলে নীলাম্বর। সে নাকী একটা অভিশাপে নরজন্ম নেবে। সে নরজন্মের জন্য বাছা হয়েছে ব্যাধিনী নিদয়ার পেট। ধর্মকেতু আর নিদয়া, মানে, আজকালকার ফরেস্ট ভিলেজার। এমন জন্ম-জন্মান্তরের শূদ্র ছাড়া গর্ভ-ভাড়িনী সারোগেট মাদার পাওয়া যাবে কোথায়? পেটে পূর্বজন্মে-ইন্দ্রপুত্র নিয়ে নিদয়া তার স্বামীকে বলে কী কী খেতে ইচ্ছে। সাধ। ধানবাছা খৈ, ভয়সা দইয়ে মাখা। টোপা কুল আর করঞ্জা। পাকা চালতের ঝোল। মিঠা ঘোল। আমসির আচার। হলুদবাটা দিয়ে কাঁচকি আর পাঁকালমাছ। 'আমার সাধের সীমা। হেলেঞ্চ কলমি গিমা।' 'পুঁইডগা মুখিকচু। ফুলবড়ি তাহে কিছু। তাতে দিবে মরিচের ঝাল।'

পেটে মানবজন্মের ইন্দ্রপুত্র থাকলেও শূদ্র শূদ্রই থাকে। মানবজন্ম নিতে ইন্দ্রপুত্রও যদি পেটে ঢোকে তাহলে শূদ্রাণী শূদ্রাণীই থাকে। যে-গর্ভভাড়িনী তার নিজের সাধের এই ফর্দ বানিয়ে বলে, 'আমার সাধের সীমা', তার পেট থেকে শূদ্র ছাড়া কিছু জন্মাতে পারে? পারে না। জন্মের সময় কেউই শাপভ্রষ্ট দেবতা নয়, অবতারও নয়। শাপমুক্তি-টুক্তি অবতার-টবতার, সে সব মৃত্যুর সময়ের ব্যাপার।

একমাত্র যোগেন মণ্ডলই তো বলেছিল, 'আমি শিডিউলও না, হরিজনও না। বামুন যদি তার জন্মপরিচয়ে বামুন হয়, আমিও তা হলে আমার জন্ম পরিচয়ে চাঁড়াল। চাঁড়াল হিন্দু নয়। হিন্দুকে রক্ষা করাও তার দায়িত্ব নয়।' আঃ রে, আহা রে, আহা। কী মনোহর নাশকতা। কী চিরঞ্জীব নাশকতা। মুতে দে, মুতে দে। যজ্ঞের আগুনে মুতে দিয়ে আগুন নেবা।

যোগেন একেবারে হিন্দুধর্মটাকেই রসাতলে পাঠাল। শূদ্র ও অতিশূদ্র না থাকলে বর্ণাশ্রমের বাকি তিন বর্ণ কোথায় থাকে? চাঁড়াল কেন হিন্দু হবে বা হিন্দুদের বাঁচাবে? চাঁড়ালের তো অন্তত চাঁড়াল হওয়ার স্বাধীনতা আছে।

নাশকতা! নাশকতা!!

হ্যাঁ—এই গল্পটি যখন তৈরি হচ্ছে, তখন চারদিক থেকে নাশকতার সচিত্র সংবাদ আসছিল। সেই সচিত্র নাশকতার সংবাদ-আসাটা তো রোজকার ব্যাপার। রাতে খাওয়ার সময় এগুলো

মিশে গেছে। এটা আপাতত বিসদৃশ যে মৃত মানবশরীরগুলির বৈচিত্র্য রোজকার খাদ্যের উপকরণ হয়। শ্রীলঙ্কার তামিল, আফগানিস্তানের তালিবান, ইরাকের আত্মঘাতীরা, অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয়রা,... দীর্ঘ দীর্ঘ দৈনন্দিন তালিকা। সংবাদ সংবাদের সময়ই আসছিল। কেন যে তখন যোগেনের গল্পটা তৈরি হতে শুরু করে? এখনকার পক্ষে নিরর্থক, বাসি, বাতিল একটি গল্প? কে যোগেন মণ্ডল? তাকে নিয়ে হাজার পাতা?

নাশকতার সামনে বেঁচে থাকাটাই একমাত্র ভঙ্গি। টিভি স্ক্রিনের আড়ালে লক্ষ মাইলের নিরাপদ দূরত্ব সত্ত্বেও, নাশকতার সামনে পালানোর প্রাথমিক প্রতিবর্ত কখনো এসে যায়।

একটু তো অন্যমনস্কতা ঘটে থাকতে পারে। চোখে ঘটমান সংবাদের ছবি আর মাথায় একটু যোগেন। এত নাশকতা দেখলে-শুনলে সেটুকু অন্যমনস্কতা কি এখনো স্বাভাবিক? মনের মধ্যে খেলা করছিল আত্মরক্ষা। দরজার কপাটটা তাই খোলাই ছিল। আর, এমন একটা জালি গল্প ঘটে যাচ্ছে খোলা দরজার চৌকাঠটার ওপারেই—!

খোলা কপাটের ফাঁক দিয়ে গলে, যোগেন ঢুকে গেল গল্পে। ঢুকল, যেন তার স্বাধিকারে। হিস্ট্রি নিয়ে জালি আর তাতে যোগেন নেই—এ কখনো হতে পারে?

যোগেন যেন এ-গল্পের খাপে খাপে সেঁটে গেল। আর, তার তো এসেন্সিয়াল ও ডিজায়্যারেব্‌ল—অপরিহার্য ও আকাঙ্ক্ষিত সব গুণই আছে।

সে ছিল কিন্তু নেই। সে হিস্ট্রিখেলায় ছিল কিন্তু এখন সে নেই। ঐ খেলা যখন ছিল, ৩৭ সাল থেকে ৪৭ সাল, যোগেন ছিল। তারপর ঐ সময়টাও অলীক হয়ে গেল, যোগেনও তার সময়ের মতই অলীক হয়ে গেল। যোগেন যদি পাখি হত, তাহলে হত উটপাখি, সে উড়তে পারে না। যদি মাছ হত, তাহলে হত শুটকি মাছ—যা জলে বাঁচতে পারে না। যদি গাছ হত তাহলে হত গড়ান গাছ—যা শিকড় গাড়ে না। যোগেন ছাড়া চলে? বানাউটি, জালি, দুনম্বরি এই গল্পের ভরশূন্যতায় যোগেন খেলবে ভাল। খেলবে দারুণ!!

ও স্বদেশযাত্রা

যোগেনকে ৫ আগস্ট ৪৭ সিন্ধু এক্সপ্রেসে করাচি রওনা হতে হল। যোগেন পাকিস্তানে আইনমন্ত্রীর পদে আমন্ত্রণ পেয়ে যাচ্ছে মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে।

১৮১

এতই শেষ মুহূর্তে খবর এসেছে যে সে কাউকে জানাতেও পারেনি। পুরোনো দিল্লি দিয়ে দিল্লি স্টেশনে পৌছুবে। তার গাড়ির আগে একটি পাইলট, তার আগে সার্জেন্ট, পেছনে এসকর্ট। কয়েকদিন ধরে নানা জায়গা থেকে হত্যার হুমকি আসছে। জিন্নাশাহেবের ওপর দু-বার শারীরিক আক্রমণ হয়ে গেছে। তিনি এখন মুসলিম ন্যাশন্যাল গার্ডের পাহারাও নেন। আম্বেদকরশাহেবকে নিয়েও গুজব রটেছিল। পাঞ্জাবের নেতা স্বর্ণ সিং-কে আক্রমণ ঘটে গেছে। তবে, বোঝা যাচ্ছে না, সেটা ভিড়ের ভিতর থেকে হঠাৎ ঘটেছে কী না। যোগেন করাচি থেকে ফোন পেয়ে বাড়ি এসে রওনা দেয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে যখন, তখন তার পি এ ফোনে জানতে চাইল, 'মুসলিম ন্যাশন্যাল গার্ডের এসকর্ট তাঁর লাগবে কী না।' যোগেন একটুও অপেক্ষা না করে, 'না' বলে নিজেকে ঠাট্টা করে মুচকি হাসলেন—যে-হাসি যোগেনের জন্মচিহ্ন। কপালে একটু ভাঁজও খেলল। এটা জন্মচিহ্ন নয়।

যোগেন বলল মনে-মনে, নিজেকে, উকিল হিশেবে বলল, ন্যায়শাস্ত্র অনুযায়ী বলল, অন্তবর্তী সরকারের আইনমন্ত্রি হিশেবে বলল ও আইন-শাসনের প্রতি তার আনুগত্য থেকে বলল—'এটাই হচ্ছে নৈরাজ্য। যখন মানুষের ব্যক্তি পরিচয় থিক্যা তার গোত্র পরিচয়, গোষ্ঠীপরিচয়, জাতিপরিচয় সবার উপরে উঠে।'

যোগেনের চোখে পড়ল, চোখ এড়ানো উপায় নেই বলেই চোখে পড়ল—দাঙ্গা-উদ্বাস্তুদের রিলিফ ক্যাম্প। চাঁদনিতে, লালকেল্লার মাঠে। তাঁবু আছে কিছু, আর যুদ্ধের পর প্লাস্টিক বলে যে কেমিক্যাল চাদর এসেছে, তাও আছে। কিন্তু বেশির ভাগটাই খালি ও খোলা। এরা কি হিন্দু? পাঞ্জাব থেকে এসেছে? তাহলে চাঁদনিতে কেন? এখানে তো চারদিকেই মুসলমান। তারা এদের মারছে না? তাহলে, এরাও কি মুসলমান, পাঞ্জাবের? যোগেন দুই-একজন আর্মড পুলিশ দেখে।

যোগেন বন্দুক দেখে আর্মড পুলিশ চিনতে পারল? ওরা তো মুসলিম ন্যাশন্যাল গার্ডও হতে পারে। বা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বেচ্ছাসেবক—বাহিনী। পরশুদিন মন্ত্রিসভার বৈঠকে গজনফর আলি বলেছিলেন—আর এস এসের ভলান্টিয়ার ফোর্সের ভয়ে তো রাস্তায় বেরনো যাচ্ছে না। তারা অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে ঘিরে ধরে প্রমাণ চাইছে সে হিন্দু কী না। তারপর তাকে মেরেধরে ছেনতাই করে। এদের তো অ্যান্টি সোস্যাল হিশেবেই অ্যারেস্ট করা দরকার। তাতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার প্যাটেল এত রেগে যান যে গজনফর থতমত খেয়ে যান। সর্দার বলেন, 'আমরা এখানে গবর্মেন্ট চালাতে এসেছি। এটা বাই পার্টি টকের জায়গা নয়। আর এস এস স্বেচ্ছাসেবকরা মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড আর শিখ যুব সংস্থার মতোই তাদের সম্প্রদায়কে নিরাপত্তা দেয়ার কাজ করছে। আমাদের তো উচিত তাদের অভিনন্দন জানানো, নাহলে শুধু হিন্দু ডেডবডিতেই দিল্লির সব রাস্তা বন্ধ হয়ে যেত। ততক্ষণে গজনফরও রেগে গিয়ে বলল—গবর্মেন্ট কীভাবে চলে এ বিষয়ে আপনার যদি সামান্য অভিজ্ঞতাও থাকত, তাহলে আপনার ক্যাবিনেট কলিগকে সম্বোধনের ভাষাও আপনার জানা থাকত।

এ-ঘটনাটা মনে পড়ায় যোগেন অপ্রস্তুত বোধ করে নিজের কাছেই। এই জাতিদাঙ্গায় প্রত্যেক জাতির লোকই তো বেঁচে আছে তাদের জাতের নিজস্ব বাহিনীর দৌলতে।

সে লালকেল্লার ঐ রিলিফ ক্যাম্পটা শিখদের না হিন্দুদের না মুসলমানদের সেটা একঝলকে বুঝতে পারল না? ভুলে গেল শিখদের দাড়ি-পাগড়ি চিহ্ন?

যোগেন একটা সান্ত্বনা খুঁজল—সে তো এদিকে কখনো আসেনি, তাই সে চট করে চিনে উঠতে পারছে না।

এই সান্ত্বনাটা পুরো ভাবার পর যোগেনের ঠোঁটে সেই জন্মচিহ্নের হাসিটা ফুটে উঠল, হয়তো একপ্রান্ত একটু ঝুলেও গেল। যোগেনের জন্মচিহ্নে কি ছলনা এসে গেল?

এর চাইতে কি সহজ ছিল না স্বীকার করা যে সে এখনো বুঝছে না—কাদের ঐ রিলিফ ক্যাম্প? বাইরের জাতিচিহ্ন ছিল উচ্চবর্ণদের। বামুনের তিলক-টিকি-পৈতে থেকে নাপিতদের কাঠের বাক্স। আর উচ্চবর্ণের গৌরববৃদ্ধির জন্য নিম্নবর্ণকেও নিজের জাতিচিহ্ন পরতে হয়। তাদের সমাজে তুলসীকাঠের মালা। মাদ্রাজে তাদের মতো শূদ্রদের পেছনে ঝাঁটা বেঁধে দেয়া হয় যাতে যে রাস্তাটাকে সে অপবিত্র করছে হেঁটে, সে রাস্তাটাকে সে নিজেই মুছে দিয়ে যাচ্ছে। আঃ আঃ। যোগেন ভারত সরকারের মন্ত্রি হওয়ার সুবাদে সামনে-পিছনে পাহারা নিয়ে নিজে একা একটা গাড়িতে সেই নিভৃতি পায়, যে-নিভৃতি ছাড়া তার চোখ এমন ছলছলিয়ে উঠত না। যোগেন মনে মনে একটা আর্তনাদে মুচড়ে ওঠে। পাছে গলা দিয়ে আওয়াজ বেরয়, সে

গলাখাঁকারি দিয়ে সেই ঝোঁকটা সামলায়। আজ সব জাতই আত্মরক্ষার জন্য আক্রমণ করছে, জাতের জন্য মরছে, জাতের জন্য মারছে, জাতের জন্য নিজের দেশকে জাতের গ্রাম বানাচ্ছে। কেউ একবারের জন্য তাকিয়ে দেখছেও না, ভাবছেনও না, এই আক্রমণ ও মৃত্যু কত যুগ ধরে আমরা শূদ্ররা সয়ে আছি। রায়ট কি ভারতে এই প্রথম? শূদ্রদের ওপর শারীরিক পেষণ তাহলে রায়ট ছিল না। সেটা ছিল উঁচু জাতের ধর্মপালন। ধর্মপালনের জন্য বেশ্যাবাড়ির মাটি আর শূদ্রের রক্ত লাগে।

স্টেশন এসে গেলেও যোগেনকে নামতে দেয়া হয় না। সিকিওরিটির লোকটি এসে তার মালপত্র নিয়ে তাকে বলে যায়, আমি সব ঠিক করে আপনাকে নিয়ে যাব।

যোগেন গাড়ির ভিতর বসেই দেখে—তাকে নিয়ে আসা পাইলট ও সিকিয়োরিটির জোয়ানরা গাড়ি ঘিরে রেখেছে, একটু বড় বৃত্তের পরিধি জুড়ে দাঁড়িয়ে। তাদের হাতে নানা রকম বন্দুক, সেগুলোর নিশ্চয়ই আলাদা-আলাদা নাম আছে। যোগেন জানে না। এমন পাহারায় থাকতে থাকতে জেনে যাওয়া হয়ে যাবে কোনো একদিন।

যোগেন, আবার এই সশস্ত্র নিরাপত্তা বলয়ের ভিতরে, গাড়ির নিভৃতিতে, তার ঠোঁটে লেপে থাকা হাসিটাকে জন্মচিহ্নের মতোই সরল করে তুলতে পারে। আত্মছলনায় বিদ্রূপের কোনো আড়াল না নিয়ে। সেটা তো দরকার হয় উচ্চবর্ণের সামনে। নিজেকে 'শুদ্দুর শুদ্দুর' বলে, নিজেকে 'চণ্ডাল' বলে, 'চোদ্দ পুরুষের চাঁড়াল' বলে। এখানে তো সে একা ও ব্রিটিশ ভারতের সম্রাট, সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ কর্তৃক মনোনীত এক মন্ত্রি, তার সেই নিয়োগপত্র আছে তার পোর্টফোলিয়োতে, পোর্টফোলিয়ো আছে সুটকেসের মধ্যে। এতবার দেখেছে যোগেন যে তার মুখস্থ হয়ে গেছে। একবার দেখলেও মুখস্থ হয়ে যেত।

GEORGE R. I

George The Sixth by the grace a God of Great Britain, Ireland and the British Dominions beyond the Seas King defender of the Faith Emperor of India.

To our Trusty and well beloved the honourable Jogendra Nath Mondal.

GREETING

(i) We do by this our warrant under our Sign Mannal appoint you the said Jogendra Nath Mondal to be during our pleasure a Member of the Excutive council of our Governor General of India.

(ii) And do hereby appoint that so soon as you Shall have entired upon the duties of your office this our Warrant shall have effect.

GIVEN at our Court at St. James's this Twenty first day of October 1946 and in the tenth year of our Reign.[১]

যতবার পড়ে ততবারই হাসে যোগেন। আশু স্যার কিছুতেই ঠিকঠাক উদাহরণ দিতে পারতেন না ইংরেজি প্রোনাউন পড়াতে গিয়ে 'রয়্যাল উই'-এর। পারতেন কিন্তু সে সবই শেক্সপিয়ারের নাটক থেকে, যোগেন বুঝবে কী করে। আশুবাবুকে এটা দেখিয়ে যদি বলতে পারত, 'স্যার, এই যে পাইছি royal we-এর একডা কারেক্ট এক্সাম্পল।'

যোগেন তার ঘড়িটা একবার দেখে, সময় দেখে না, পেনটাও ছোঁয় একবার।

স্যার, এই যে পাইছি royal we-এর সবথিক্যা অথেনটিক প্রমাণ। কাল কী পরশু আর একটা পাব, সেডায় বোধহয় We থাকব না। কায়েদে আজম মোহম্মদ আলি জিন্না তো এমপেয়র

১. বানান ও বাক্য সবই মূল নিয়োগপত্রের অনুযায়ী।

না, গভর্নর জেনারেল অব দি ডোমিনিয়ন অব পাকিস্তান। গভর্নর জেনারেলও কি royal we ব্যবহার করতে পারে, স্যার?

সিকিয়োরিটির সেই অফিসার এসে অ্যাটেনশন হয়ে স্যালুট করে। যোগেন আইনসভা থেকেই অভ্যেস করে ফেলেছে, তাকে যদি কেউ পদমর্যাদার কারণে স্যালুট বা নমস্কার করে, যোগেনও তাকে প্রতিনমস্কার করে।

অফিসার বলে, 'সবই তৈরি স্যার। আপনার সেলুন লাগানো হয়েছে। গার্ড পোস্টেড হয়েছে। আর পনের মিনিট পরে স্যার আপনি বোর্ড করবেন। আপনার সিটে আপনি আরাম করে বসার পর আপনার এসকর্ট গার্ডকে হুইসল দেবে গাড়ি ছাড়তে। তখনই গাড়ি ছাড়বে। ইয়েস স্যার', অফিসারটি আবার স্যালুট করে গাড়ির দরজা বন্ধ করল। যোগেনের প্রতিনমস্কার সে খেয়াল করেনি।

যোগেন ঘড়িতে সময়টা দেখে। পনের মিনিট পরে ছাড়বে? যেন শুনেছিল, গাড়িটা আগেই ছাড়ে। তবে পশ্চিমের ট্রেন ব্যবস্থা বলে কিছু আর নেই। পাঞ্জাবের দিকে কোনো ট্রেন যাচ্ছে না। পাঞ্জাব থেকে কোনো ট্রেন আসছে না। কয়েক দিন আগেই আপ-ডাউন দুই ট্রেনেই শ-পাঁচেক যাত্রীর ভিতর আপে ১৭৫ জন আর ডাউনে ২১৩ জন খুন হয়ে তাঁদের কামরাতেই বসেছিলেন, গন্তব্যে পৌঁছুতে। এই ঘটনার পর কোনো ট্রেনই আর চলেনি। বোধহয় সেই কারণেই তাকে অন্য পথে করাচি যেতে হচ্ছে—রাজপুতানা দিয়ে। এই রুটে এখনো কোনো হাঙ্গামা নেই। সে এদিককার ভূগোল কিছুই জানে না। সে কিছু-কিছু নাম শুনেছে মাত্র। বেশি শুনেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মিটিঙে। মন্ত্রীরা সকলেই সব জানে। আর যোগেন জানে শুধু পাঞ্জাব, বিপাশা-ইরাবতী, রানা কুম্ভ, অমৃতসর, স্বর্ণমন্দির, লাহোর, নানকানা শাহি (এটা এখানে কাগজ পড়ে জেনেছে), লুধিয়ানা, জলন্ধর। ব্যস।

যোগেন বাইরে তাকিয়ে দেখে—তাকে ঘিরে থাকা নিরাপত্তা বলয়ে জোয়ানদের হাতে বিচিত্র সব বন্দুক, একেবারে তাক করে ধরা। মনে হচ্ছে, কারো যেন চোখের পাতা পড়ছে না।

তাকে এত করে পাহারা দেয়া হচ্ছে কেন? সে কে? কেন্দ্রীয় মন্ত্রী? সব কেন্দ্রীয় মন্ত্রীই এই পাহারা পাওয়ার অধিকারী। তাই? কিন্তু পাহারা পাওয়া যায় বলেই নেয়া যায়? নেয়ার তো একটা কারণ থাকবে?

তাকে চেনে কে? সে বাংলার পুবে বরিশাল বলে একটা সদরের গৌরনদী বলে একটি থানার মৈস্তারকান্দি বলে একটি গ্রামের এক নমশূদ্র বাড়ির ছেলে। তাদের গ্রামটার কোনো মৌজাও নাই, সেনসাসে টেনাম্সি নাম্বারও নেই। ঐ জায়গাটা দুর্গম বলেই নমশূদ্ররা কোনো এক পলায়নে ওখানে আত্মগোপন করেছিল। সেই পল্লি এখনো তার আত্মগোপনতা শেষ করেনি...

দরজায় একটা শব্দ করে অফিসার খুলে দিয়ে স্যালুট করল। যোগেনের প্রতি নমস্কারের পর সে হাত দেখিয়ে যোগেনকে নামার ও প্ল্যাটফর্মে যাওয়ার ইশারা দেয়। যোগেন নামতেই সমবেত অ্যাটেনশনের আওয়াজ।

সেই মৈস্তারকান্দির খাল-বিল-ক্ষেতে সমুদ্রের জোয়ারের জল তাদের ঘাটের মাটির ধাপের কখনো তিন তাক, কখনো চার তাক, ডুবিয়ে দেয়। প্রতিদিন চব্বিশ ঘণ্টা তাদের সঙ্গে সমুদ্রের বিনিময়।

নানা আকারের বন্দুক ধরা জোয়ানদের মুখোমুখি দুই সারির মাঝখান দিয়ে যোগেন হেঁটে প্ল্যাটফর্মে ঢোকার প্রথম সিঁড়িটিতে পা দেয়। তার সামনে দুজন, আর, পেছনে দুজন বন্দুক

উঁচিয়ে তাকে নিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঢোকে।

আমার মৃত্যু কবে থেকে এত গুরুত্বের হল? আমাদের মারতেও তো আমাদের স্পর্শ করতে হয় না, আমি এতদূর পর্যন্ত অস্পৃশ্য শূদ্র। আমাকে মারতে এত আয়োজন কার? আমাকে বাঁচাতে এত আয়োজন কার? আমাকে কে মারবে?

যোগেন তার আসনে বসে, হুইসল বাজে, হুইসল বাজে, একটু দোল দিয়ে ট্রেন ছাড়ে। তার জানলাগুলিতে দুটি করে কপাট—একটা জালের আর একটা কাচের। বাহির দেখা যায় কিছু অদৃশ্যতাসহ। দিল্লি, হস্তিনাপুর থেকে সে, যোগেন, চলেছে সিন্ধুপ্রদেশের দিকে।

আমাকে খুন করতে পারে বর্ণহিন্দুরা। আমি শূদ্র। আমি তাদের উচ্চতা অস্বীকার করতে আমার জন্মের নীচতা স্বীকার করেছি। আমি শূদ্র। আমি হিন্দু নই। শূদ্রের এই স্বাধিকার আমি ব্যবহার করেছি। শূদ্র হিন্দু নয়। সে স্বতন্ত্র। তাকে হিন্দু বলতে পারে—গান্ধীজি থেকে সেনসাস। শ-খানেক বছর হয়নি এখনো, আমাদের পূর্বপুরুষদের কেউ কেউ পৈতে পরে, টিকি রেখে আর তিলক কেটে বামুন হতে চেয়েছিল। চাইলেই কি আর বামুন হওয়া যায়? বামুন হয়ে জন্মাতে হয়। তেমনি গান্ধীজি আর সেনসাস চাইলেই কি শূদ্র হয়ে যায় হিন্দু? শূদ্র হয়ে জন্মাতে হয়। একমাত্র তাহলেই পাওয়া যায় শূদ্রের এই স্বাধীনতা। আমি স্বাধীন শূদ্র।

ট্রেনটা হুইসল দিল টানা, গতি কমিয়ে দিল, একটু পরে আবার একটা ছোট হুইসল দিল, তারপর একটা আওয়াজ তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভিতর থেকেই বোঝা যায় বিলম্বিত বিকেলে একটা ছোট স্টেশন। কোথায় এল? কোথায়? যোগেন সে-সব তো জানে না, কিন্তু এটুকু জানে, সে আর্যাবর্তের শেষ-পশ্চিমে। এই পথেই তো আর্যরা এসেছিল। তাদের সঙ্গে কোনো শূদ্র ছিল না। তারপর দুই হাজার মাইল হেঁটে হেঁটে তারা শূদ্র পেতে থাকে ও শেষে মৈস্তারকান্দি, যোগেনের পূর্বপুরুষকে শূদ্র বানাতে। যোগেন এখন সেই আর্যবর্তের পশ্চিম ধরে আর্যদের মুখোমুখি হতে চলেছে। যোগেন নিঃসংশয় জানে মুসলিম লিগও আর্য, তারও শূদ্র দরকার।

যোগেন একটু অস্থিরতা নিয়েই দরজার সামনে গিয়ে দরজাটা খুলতে চায়। পারে না। তার এসকর্ট হাত বাড়িয়ে খুলে দেয়। যোগেন একবার চাক্ষুষ করতে চায়—সেই পথ, তার বিদ্রোহের, আর্য প্রবেশের ও এখন স্বতন্ত্র স্বাধীনতার।

যোগেন নিজেকে দেখতে চায়, ভারতবর্ষ নামে হাজার-হাজার বছরের ধ্যানের একমাত্র প্রতিনিধি সে, এক শূদ্র। চলেছে পাকিস্তানে। সেই ধ্যানের স্বদেশকে সত্য রাখতে।

শূদ্র ছাড়া সে-দায় আর কে নেবে?